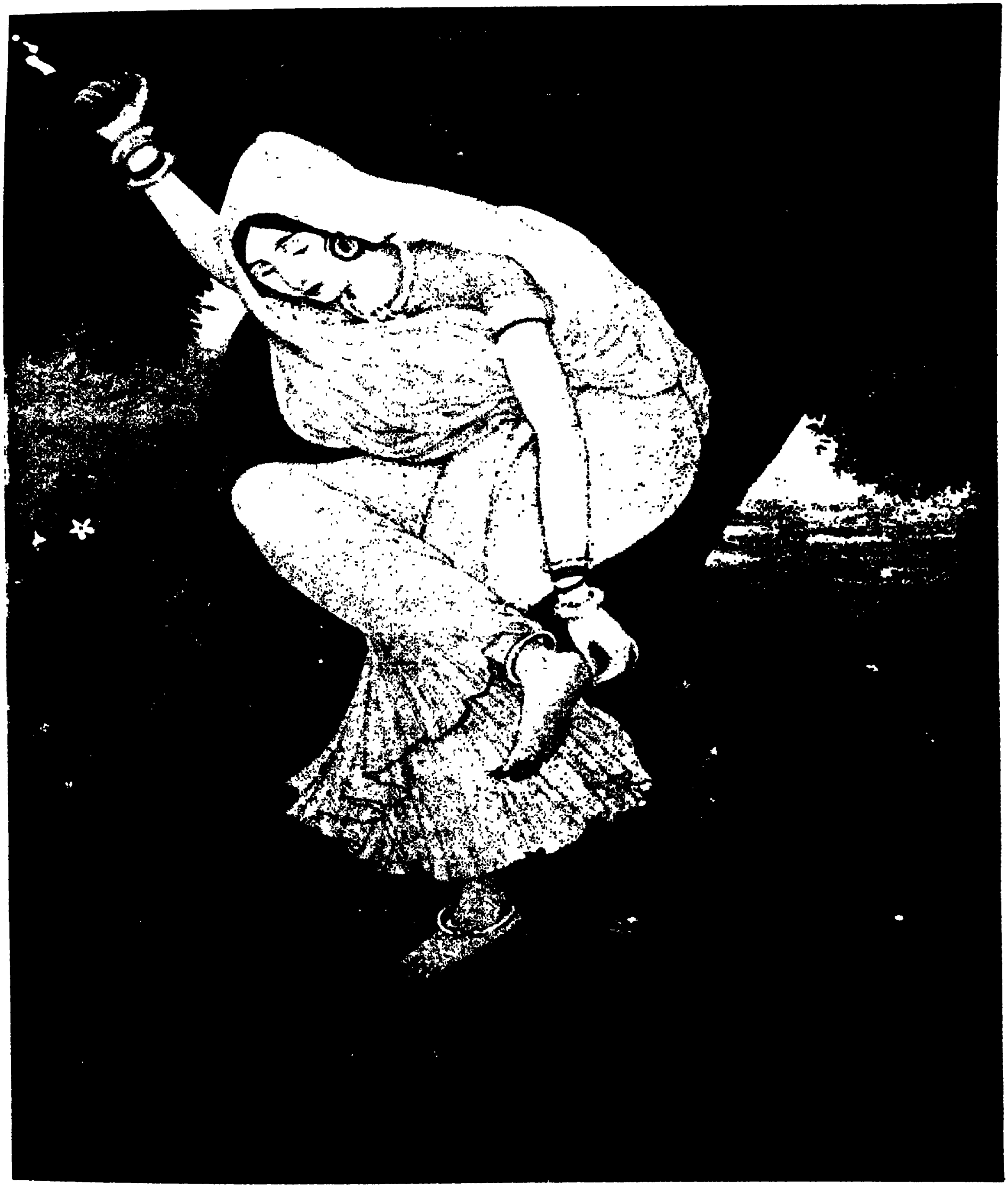


পায়ের কাঁটা

শিল্পী শ্রী বীরেশ্বর সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৩৫

১ম সংখ্যা

নাম্নী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে ;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্ত্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোটো ক'রে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তা'র, তারি ধূলি পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তা'রে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোট দীপ জ্বালায় নেবায়
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাঙ্গ করি' এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
[illegible]াতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।

মধ্যদিনে বাতায়নতলে
চেয়ে দেখে নিম্নে দীঘিজলে
শৈবালের ঘনস্তর,
পতঙ্গের খেলা তারি পর
আব্‌ছায়া কল্পনায়
ভাষাহীন ভাবনায়
মন তার ভরে
মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্ম্মরে।
সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি',—
—নাম কি শামলী?

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।
সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,
অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী
যে-পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
ক্লিষ্ট ক্লান্তিভারে,
সেই অজানার লাগি' গৃহকোণে আনত-নয়ন
বুনিছে শয়ন।
সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দীঘিজল
অচঞ্চল,
কানায় কানায় ভরা,
শীতল অতল মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।

কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে
স্তব্ধ ছায়া পাতি'
হাসির খেলার সাথী
সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা-অঞ্জলি,—
—নাম কি কাজলী ?

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নূতন ধাঁদায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তা'রে,
কেবলি আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায় ;—
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া ?
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে !
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে ?
তার পরে আপনার নির্দ্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;
আপনার অভিমানে করে খানখান।
কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা !
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে !

গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে
আপনার সাথে তার কি আছে বিরোধ,
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ ;
মুহূর্ত্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি,—
—নাম কি হেঁয়ালি ?

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের ক্ষেতের পরপারে,—
নিরালা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অন্ধকারে
যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
প্রসারিয়া চলেছে সঙ্কেত
অজানা গ্রামের
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের।
অপরাহ্নে ছাদে বসি',
এলোচুল বুকে পড়ে খসি',
গ্রন্থ নিয়ে হাতে
উদাস হয়েচে মন সে যে কোন্ কবি-কল্পনাতে।
সুদূরের বেদনায়
অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।
বীরের কাহিনী
না-দেখা জনের লাগি' তারে যেন করে বিরহিণী।
পূর্ণিমা-নিশীথে
স্রোতে-ভাসা একা তরী যবে সকরুণ সারি-গীতে
ছায়াঘন তীরে তীরে সুপ্তিতে সুরের ছবি আঁকে
উৎসুক আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে

নিষুপ্ত প্রহরে,
অহৈতুক বারিবিন্দু ঝরে
আঁখি-কোণে ;
যুগান্তরপার হ'তে কোন্ পুরাণের কথা শোনে।
ইচ্ছা করে সেই রাতে
লিপিখানি লেখে ভূর্জ্জপাতে
লেখনীতে ভরি' লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালী,—
—নাম কি খেয়ালী ?

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ,—
নিত্য বহমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
চারিধারে
প্রত্যহের জড়তারে ;
সঙ্গীতে তরঙ্গ তুলি'
হাসিতে ফেনিল তার ছোটে দিনগুলি।
আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—
যে-কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায়,
যে-কথাটি ঢেউ তোলে
আশ্বিনে ধানের ক্ষেতে—প্রান্ত হ'তে প্রান্তে যায় চোলে,
যে-কথাটি নিশীথ-তিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্ম্মিরে,
যে-কথাটি মহুয়ার বনে
মধুপগুঞ্জনে
সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি',—
—নাম কি কাকলি ?

চাহনি তাহার, যেন সব কোলাহল হ'লে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায়ে লতায়ে যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে
নির্ব্বাক চাহিয়া থাকে নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কী যে দেবে।
দুয়ার-বাহিরে
আসে ধীরে,
ক্ষণেক নীরব থেকে চ'লে যায় ফিরে।
নাও যদি কয় কথা
মনে যেন ভরি' দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা।
পায়ের চলায়
কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়।
তা'রে কিছু করিলে জিজ্ঞাসা,
কিছু বলে, কিছু তবু বাকি থাকে ভাষা।
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি' সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি,—
——নাম কি পিয়ালী?

জনতার মাঝে
দেখিতে পাইনে তারে থাকে তুচ্ছ সাজে।
ললাটে ঘোম্‌টা টানি'
দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী।
রজনীর অন্ধকার
তুলে দেয় আবরণ তার।
রাজ-রাণী-বেশে
অনায়াস-গৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে।
বক্ষে হার ঝলমলে,
সীমন্তে অলকে জ্বলে

মাণিক্যের সঁীথি।
কি যেন বিস্মৃতি
সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
মনে পড়ে আপন মহিমা।
ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
বরমাল্য তার
আপন সহস্র দীপ জ্বাল',—
—নাম কি দিয়ালী?

ব্যঙ্গ-সুনিপুণা,
শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণা!
অনুগ্রহ-বর্ষণের মাঝে
বিদ্রূপ-বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্ম্মে এসে বাজে।
সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খান্‌খান
অট্টহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে;
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয়;
মোহমন্ত্রে যে-হৃদয়
করে জয়
তারি পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দ্দয়।
আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভ'রে!

বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময় ;
বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা ;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহঙ্কার,
বিদ্যারে করেছে অলঙ্কার।
প্রসাধন-সাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণ-ভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।
জাদুকরী বচনে চলনে ;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে ;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি' দেয় দূর ;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।
আঁধার আলোরি কোলে রয়েছে জাগরি',—
—নাম কি নাগরী ?

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে,—
উচ্চহাস্য-তরঙ্গ সে হানে
সূর্য্য চন্দ্র পানে।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক।
কভু অন্ধকার-পুঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্য্যবেগে তটের মর্য্যাদা ফেলে টুটি'

গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর ;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি',—
—নাম কি সাগরী ?

যেন তার চক্ষুমাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জ্জনী।
ইন্দ্রের অশনি
মৌনে তার ঢাকা ;
প্রাণ তার অরুণের পাখা
মেলিল দিনের বক্ষে তীব্র অতৃপ্তিতে
দুঃসহ দীপ্তিতে ;
সাধক দাঁড়ায় যবে তা'র কাছে
সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে ;
দুঃসাধ্য সাধন তরে
পথ খুঁজে মরে ;
তুচ্ছতারে দাহে তা'র অবজ্ঞা-দহন ;
এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মাল্য ; দিবে কণ্ঠে তার
কার্ম্মুকে যে দিয়েছে টঙ্কার,
কাপট্যেরে হানিয়াছে, সত্যে যার ঋণী বসুমতী,—
—নাম কি জয়তী ?

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্ত্ত্যের প্রদীপে তা'র মৃত্তিকার কারা।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গিহীন তরু,

তারে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হ'য়ে রয়।
মন পাখা মেলিবারে চায়
চারিদিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তার;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে ?
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হ'তে,
পথ রুদ্ধ চারিধারে,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা।
সে যেন অশোকবনে সীতা
চারিদিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয়;
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
বিচ্ছেদের অতল সমুদ্র পারে ?
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে।
কোন্ দেব নিত্য নির্ব্বাসনে
পাঠালো তাহারে।
স্বর্গের বীণার তারে
সঙ্গীতে কী করেছিল ভুল;
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে' গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু ?
আজো তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
অধরে রয়েছে তার ম্লান
—সন্ধ্যার গোলাপসম—
মাঝখানে ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।

অদৃশ্য যে অশ্রুধারা
আসিক্ত করেছে তার চক্ষুতারা
সে যে দিব্য বেদনার করুণা-নির্ঝরী,—
—নাম কি ঝামরী ?

যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা ;
যে-গুণী প্রজাপতির পাখা
যুগ যুগ ধ্যান করি' একদা কী খনে
রচিল অপূর্ব্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে—
এই নারী
রচনা তাহারি।
এ শুধু কালের খেলা,
এর দেহ কী আলস্যে বিধাতা একেলা,
রচিলেন সন্ধ্যাকালে
আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেয়ালে—
যে-লগনে
কর্ম্মহীন ক্লান্তক্ষণে
মেঘের মহিমা-মায়া মুহূর্ত্তেই মুগ্ধ করি' আঁখি
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি'।
শরতে নদীর জলে যে-ভঙ্গিমা,
বৈশাখে দাড়িম্ব-বনে যে রাগ-রঙ্গিমা
যৌবনের দাপে
অবজ্ঞা-কটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,
শ্রাবণের বন্যাতলে হারা
ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে-নৃত্যের ধারা,
মাঘশেষে অশ্বত্থের কচি পাতাগুলি
যে-চাঞ্চল্যে উঠে দুলি' ;
হেমন্তের প্রভাত-বাতাসে
শিশিরে যে-ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
প্রথম আষাঢ়-দিনে গুরু গুরু রবে
ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে-গৌরবে

তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী ;
লতা যেন নারী হ'য়ে দিল চক্ষু ভরি'
রঙীন বুদ্বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি'—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে।
মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।
সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন্ অবসরে
রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে ;
অমৃতে মাটিতে মেশা সৃজনের এ কোন্ সুরতি,—
—নাম কি মূরতি ?

হাসি-মুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে।
প্রসন্নতা তার অন্তহীন
রাত্রিদিন
গভীর কী উৎস হোতে
উচ্ছলিছে আলো-ঝলা কথা-বলা স্রোতে।
মর্ত্ত্যের ম্লানতা তারে
পারেনি তো স্পর্শ করিবারে।
প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্য্যমুখী
রক্তারুণ উল্লাসে কৌতুকী।
মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম অমলিন রাগে
প্রফুল্ল সে সূর্য্যের সোহাগে।
সায়াহ্নের জুঁই সে যে,
গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতায় বাঁশি ওঠে বেজে।
মৈত্রী-সুধাময় চোখে
মাধুরী মিশায়ে দেয় সন্ধ্যা-দীপালোকে।

রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি'
আনন্দ-হিল্লোল রাশি রাশি ;
সঙ্গহীন আঁধারের নৈরাশ্যকালিনী,—
—নাম কি মালিনী ?

তরুলতা
যে ভাষায় কয় কথা
সে ভাষা সে জানে,—
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বলি' মানে।
পুষ্পপল্লবের পরে তার আঁখি
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি'।
স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন
কাননের অন্তর-বেদন
দূর করিবার লাগি'
নিত্য আছে জাগি'।
শিশু হ'তে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর ;
বাতাসে বৃষ্টিতে
চঞ্চলিয়া জাগে তারা অর্থহীন গীতে,
ধরণীর যে-গভীরে চির রসধারা
সেইখানে তারা
কাঙাল প্রসারি' ধরে তৃষিত অঞ্জলি,
বিশ্বের করুণারাশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি' ;-
সে তরুলতারি মত স্নিগ্ধ প্রাণ তার ;
শ্যামল উদার
সেবাযত্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারিভিতে ;
তাহার মমতা
সকল প্রাণীর পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ;
পশু পাখী তার আপনার ;
জীববৎসলার

স্নেহ ঝরে শিশুপরে, বনে যেন নত মেঘভার
ঢালে বারিধার।
তরুণ প্রাণের পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী,—
—নাম কি করুণী ?

চতুর্দ্দশী এল নেমে
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে
অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তারে মর্ত্ত্যভূমি শঙ্কা নাহি বাসে।
এ ধরার নির্ব্বাসনে
কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইকো তার মনে,
সংসার-জনতামাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য্য তার প্রফুল্লতাভরা,
সকল উদ্বেগভার-হরা!
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।
দুর্য্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে বহে যায় কত
বারেবারে,
প্রভা তার মুছিতে না পারে।
তবু তার মহিমায় কিছু আছে বাকি,
সেইখানে রাখে ঢাকি'
অশ্রুজল
বিষাদ-ইঙ্গিতে ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল।
কণামাত্র সে ক্ষীণতা
নাহি কহে কথা,
কেহ না দেখিতে পায়
নিত্য যারা ঘিরে আছে তায়।
অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা,—
—নাম কি প্রতিমা ?

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি'।
বর্ষাঅন্তে ইন্দ্রধনু
মর্ত্ত্যে নিল তনু।
দিগ্বধূর মায়াবী অঙ্গুলি
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তূলি।
সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি
যেন শুভ্র কমল-কলিকা,
আঁখি দুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।
অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,
সে আনিয়া দেয় চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দ-জাহ্নবী।
বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সঙ্গীত-স্পন্দিনী,—
—নাম কি নন্দিনী?

ভোরের আগের যে প্রহরে
স্তব্ধ অন্ধকার পরে
সুপ্তি-অন্তরাল হ'তে দূর সূর্য্যোদয়
বনময়
পাঠায় নূতন জাগরণী,
অতি মৃদু শিহরণী
বাতাসের গায়ে;
পাখীর কুলায়ে
অস্পষ্ট কাকলি ওঠে আধো-জাগা স্বরে;
স্তম্ভিত আগ্রহভরে
অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে;
ও কোন্ তরুণ প্রাণে আত্ম-অগোচর
অন্তর্গূঢ় সে প্রহর করিয়াছে ভর!

চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তিমাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি'
নির্ম্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়!
কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা-আবিষ্কার!
প্রভাত-মহিমা ওর সম্বৃত রয়েছে নিশ্চেতনে,
তাহারি আভাস পাই মনে।
আমি ওই রথশব্দ শুনি,
সোনার বীণার তারে সঙ্গীত আনিছে কোন্ গুণী!
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময়;
মানস-কমল একমনা
নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।
জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উল্লাসে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারিপাশে।
নিরুদ্ধ চেতনা হ'তে হবে চ্যুত
লালসা-আবেশে জড়ীভূত
স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশ।
বিলুপ্ত করিবে দূরে উন্মুক্ত বাতাস
দুর্ব্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলুষ-নিশ্বাস।
আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি',—
—নাম কি উষসী?

শেষের কবিতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক্ বর্ত্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়্‌বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল সে-ঘরে অমিত বস্‌ল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারিদিকে চায়, সকল জিনিষ থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস ক'রে। শেল্‌ফে, পড়্‌বার টেবিলে ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখ্‌লে; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেচে। সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা ওল্‌টানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর প'ড়ে-থাকা বই। চম্‌কে উঠ্‌ল যখন টেবিলে দেখ্‌তে পেলে ইংরেজ কবি ডন্‌-এর কাব্য সংগ্রহ। অক্‌স্‌ফোর্ডে থাক্‌তে ডন্ এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন একজায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ কর্‌ল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপ্‌সা হ'য়ে গিয়েছিল, যেন মাস্‌টারের হাতে ইস্কুলের প্রতিবছরে পড়ানো একটা টিলে মলাটের টেক্‌স্‌ট্ বুক্। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্ত্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতিমুহূর্ত্ত ব্যগ্র হ'য়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হ'য়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে-উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্ব্বাঙ্গ-প্রবাহিত রসের মধ্যে ফুলফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতদিনের ধূলো-পড়া পর্দ্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিষের থেকে ফুটে উঠ্‌চে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগ্‌ল। সে মনে মনে বল্‌লে, "আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব।"

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করেনি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েচে। গৌরবর্ণ মুখ টস্ টস্ করচে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন ক'রে সমস্ত দেহ সম্বৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্ম্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম কর্‌লে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর যোগমায়া বল্‌লেন, "তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্ব্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হ'তে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েচেন। আমাকে ডাকতেন বৌদিদি ব'লে।"

অমিত বল্‌লে, "আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বৌদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার মা আছেন ?"

অমিত বল্‌লে, "ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।"

"মাসির জন্যে খেদ কেন, বাবা ?"

"ভেবে দেখুন না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকৃত না ; বল্‌তেন এটা বাঁদরামি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন, ছেলেমানুষী।"

যোগমায়া হেসে বল্‌লেন, "তাহ'লে না হয় গাড়িখানা মাসিরই হোলো।"

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লে, "এই জন্যেই তো পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল মান্‌তে হয়। মায়ের কোলে জন্মেচি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করিনি—গাড়ি ভাঙাটাকে সৎকর্ম্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হ'লেন,—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।"

যোগমায়া হেসে বল্‌লেন, "কর্ম্মফল কার, বাবা ? তোমার, না আমার, না যারা মোটর মেরামতের ব্যবসা করে তাদের ?

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বল্‌লে, "শক্ত প্রশ্ন। কর্ম্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারি সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চ'লে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে ?"

যোগমায়া লাবণ্যের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাস্‌লেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হ'তে না হ'তেই তিনি ঠিক ক'রে ব'সে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ্য ক'রেই বল্‌লেন, "বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে আসি গে।"

দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে সুরু ক'রে দিলে, "মাসিমা আমাদের আলাপ কর্‌বার আদেশ করেচেন। আলাপের আদিতে হোলো নাম। প্রথমেই সেটা পাকা ক'রে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো ? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার্ নেম্।"

লাবণ্য বললে, "আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।"

"ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।"

লাবণ্য হেসে বল্‌লে, "ক্ষেত্র অনেক থাক্‌তে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।"

"আপনি যে কথাটা বল্‌চেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of names প্রচার ক'রে আমি নামজাদা হ'ব স্থির করেচি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।"

"আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন ? মিস্‌টার রয় ?"

"একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক কর্‌তে গেলে মেপে দেখ্‌তে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।"

"দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।"

"বেগ দ্রুত কর্‌তে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।"

লাবণ্য বল্‌লে, "সহজ নয়, সময় লাগ্‌বে।"

"সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। এক-ঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ ত্রিভুবনে নেই, ট্যাঁকঘড়ি আছে, ট্যাঁক অনুসারে তা'র চাল। আইনস্টাইনের এই মত।"

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌ছে।"

"ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য্য ক'রে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।"

"সময় আর নেই, কাজ আছে" ব'লেই লাবণ্য চ'লে গেল।

অমিত তখনি স্নান কর্‌তে গেল না। স্মিত হাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কি রকম একটি চেহারা ধ'রে উঠ্‌ছিল, ব'সে ব'সে সেইটি ও মনে কর্‌তে লাগ্‌ল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেচে, তাদের সৌন্দর্য্য পূর্ণিমা-রাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে ক'রে গড়্‌বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখ্‌লেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত ক'রে আকর্ষণ করেচে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য্য নেই, ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শান্তি পায়নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনা-শক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্ব্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা পাহাড়পর্ব্বতের সঙ্গে হাসি-তামাসা চলে না, তাদের সঙ্গে কোন-রকম উল্টো ব্যবহার কর্‌তে গেলেই ঘা খেয়ে মর্‌তে হয়, তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তারা অরসিক, সেই জন্যে সহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হোল, শিলঙ পাহাড়টা চারদিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্চে। আজ সে উঠেছে সূর্য্য ওঠ্‌বার আগেই; এটা ওর স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখ্‌লে, দেবদারু-গাছের ঝালরগুলো কাঁপ্‌ছে, আর তার পিছনে পাৎলা মেঘের উপর পাহাড়ের ও-পার থেকে সূর্য্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে—আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠ্‌চে তার সম্বন্ধে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়্‌ল। রাস্তা তখন নির্জ্জন। একটা শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন পাইন্ গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বস্‌ল। সিগেরেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বস্‌বার পূর্ব্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া

যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেই রকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্রদাগটাতে এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবী করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল সন্ধ্যে-বেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়্‌ল যে, তাতে ক'রেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে, তার কারণ দ্বি-বচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাক্‌বার উপলক্ষ্য ঘন ঘন ঘট্‌ত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হোলো, কর্ত্তামা এই দুটি আলোচনা-পরায়ণের যে-অনুরাগ লক্ষ্য করেচেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ মনটি আছে কোমল। এতে ক'রেই আলোচনার উৎসাহ তার আরো প্রবল হ'ল। নির্দ্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশঙ্করের সঙ্গে আপোষে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। সুরু করলে সাহায্য,—এত বাহুল্য-পরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াতো দুপুরে, সাহায্য গড়াতো বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্ত্তব্য হ'য়ে পড়্‌ত। এমনি ক'রে দেখা গেল অবশ্যকর্ত্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশঙ্করের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বল্‌ত, যে-জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সঙ্গত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিল্‌পে-গাড়ি ক'রে নিয়েছিল। ও বল্‌ত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ ব'লেই ঘুমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল সকাল জাগ্‌বার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে—তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হ'য়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েচে; কিন্তু সময় চুরির অপরাধ ধরা পড়্‌বার ভয়ে সেটা বারবার করা সম্ভব হোত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখ্‌লে বেলা এখনো সাতটার এ-পারেই। মনে হোলো ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিক্‌টিক্‌ শব্দ।

এমন সময় চম্‌কে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আস্‌চে লাবণ্য। সাদা সাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিন-কোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝ্‌তে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্দ্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েচে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্য্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়তে দৌড়তে তার পাশে উপস্থিত।

বল্‌লে, "জান্‌তেন এড়াতে পার্‌বেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চ'লে গেলে কতটা অসুবিধা হয়?"

"কিসের অসুবিধা?"

১



যোগমায়া

অমিত বল্‌লে, "যে হতভাগা পিছনে প'ড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্দ্ধস্বরে ডাক্‌তে চায়। কিন্তু ডাকি কী ব'লে? দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধ'রে ডাক্‌লেই তাঁরা খুসি। দুর্গা দুর্গা ব'লে গর্জ্জন কর্‌তে থাক্‌লেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুস্কিল।"

"না ডাক্‌লেই চুকে যায়।"

"বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাক্‌তে চাই অথচ ডাক্‌তে পারিনে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।"

"কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যেস আছে।"

"মিস ডাট্? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিল্‌ল, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক কর্‌বার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি কর্‌লে, তারি মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্ত্ত্যের ডাক-নাম। মনে হচ্চে না কি, একটা নাম ধ'রে ডাকা উপর থেকে নীচে

আস্‌চে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেচে? মানুষের জীবনেও কি ঐ রকমের নাম সৃষ্টি কর্‌বার সময় উপস্থিত হয় না? কল্পনা করুন না, যেন এখনি প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হোলো, আকাশের ঐ রঙীন মেঘের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছল, সাম্‌নের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘমুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, মনে ভাব্‌তেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস্ ডাট্?"

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বল্‌লে, "নামকরণে সময় লাগে, আপাততঃ বেড়িয়ে আসিগে।"

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বল্‌লে, "চল্‌তে শিখ্‌তেই মানুষের দেরি হয়, আমার হোলো উল্‌টো, এত-দিন পরে এখানে এসে তবে বস্‌তে শিখেচি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না—সেই ভেবেই অন্ধকার থাক্‌তে কখন থেকে পথের ধারে ব'সে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখ্‌লুম।"

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ঐ সবুজ ডানাওয়ালা পাখীটার নাম জানেন?"

অমিত বল্‌লে, "জীবজগতে পাখী আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জান্‌তুম, বিশেষভাবে জান্‌বার সময় পাই-নি। এখানে এসে, আশ্চর্য্য এই যে, স্পষ্ট জান্‌তে পেরেচি, পাখী আছে, এমন-কি, তা'রা গানও গায়।"

লাবণ্য হেসে উঠে বল্‌লে, "আশ্চর্য্য!"

অমিত বল্‌লে, "হাস্‌চেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য্য রাখ্‌তে পারিনে। ওটা মুদ্রা-দোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সর্ব্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচ্‌কে না হেসে মর্‌তেও জানে না।"

লাবণ্য বল্‌লে, "আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখীও যদি আপনার কথা শুন্‌তো হেসে উঠ্‌তো।"

অমিত বল্‌লে, "দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝ্‌তে পারে না ব'লেই হাসে, বুঝ্‌তে পার্‌লে চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌ত। আজ পাখীকে নতুন ক'রে জান্‌চি এ কথায় লোকে হাস্‌চে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন ক'রে জান্‌চি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ!"

লাবণ্য হেসে বল্‌লে, "আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে?"

"এর জবাবে খুব একটা গম্ভীর কথাই বল্‌তে হোলো যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরানো,—ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরানো, নতুন ফোটা ভুঁইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিষ, নতুন ক'রে আবিষ্কার।"

কিছু না ব'লে লাবণ্য হাস্‌লে।

অমিত বল্‌লে, "আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারা-ওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি। বুঝেচি আপনি যে-কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের একথাটা আগেই প'ড়ে নিয়েচেন। দোহাই আপনার আমাকে দাগী চোর ঠাওরাবেন না,—এক এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শঙ্করাচার্য্য হ'য়ে ওঠে, বল্‌তে থাকে আমিই লিখেচি, কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন



"...পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরণার ধারা.....সেইখানে পাথরের উপর দুজনে বস্‌লো"

না, আজ সকালে ব'সে হঠাৎ খেয়াল গেল আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি, যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখ্‌লুম, আর কোন কবির লেখ্‌বার সাধ্যই ছিল না।"

লাবণ্য থাক্‌তে পার্‌লে না, প্রশ্ন কর্‌লে, "বের কর্‌তে পেরেছেন?"

"হাঁ, পেরেছি।"

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মান্‌চে না, জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল্‌লে, "লাইনটা কী বলুন না।"

অমিত খুব আস্তে আস্তে কানে কানে বলার মতো ক'রে বল্‌লে,—

"For God's sake, hold your tongue
and let me love!"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠ্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।"

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইসারায় জানিয়ে দিলে, "হাঁ।"

অমিত বল্‌লে, "সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন্‌-এর বই আবিষ্কার কর্‌লুম, নইলে এ লাইন আমার মাথায় আস্‌ত না।"

"আবিষ্কার কর্‌লেন?"

"আবিষ্কার নয় তো কি? বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে, আপনার টেবিল দেখ্‌লুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েচে। সেদিন ডন্‌-এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখ্‌তে পেয়েচি। মনে হোলো, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়; বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালী বিদায়ের মতো। ডন্‌-এর কাব্যমহল নির্জ্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বস্‌বার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট ক'রে শুন্‌তে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্‌!
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।"

লাবণ্য বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনি বাংলা কবিতা লেখেন না কি?"

"ভয় হচ্ছে আজ থেকে লিখ্‌তে সুরু কর্‌ব বা। নতুন অমিত রায় কী যে কাণ্ড ক'রে বস্‌বে পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয় তো বা সে এখনি লড়াই কর্‌তে বেরোবে?"

"লড়াই? কার সঙ্গে?"

"সেইটে ঠিক কর্‌তে পার্‌চিনে। কেবলি মনে হচ্ছে খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এখ্‌খুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ কর্‌তে হয় রয়ে ব'সে করা যাবে।"

লাবণ্য হেসে বল্‌লে, "প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।"

"সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে ইংরেজ বাঁচিয়ে চল্‌ব। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোচের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্ম্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেচে—তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বল্‌ব, যুদ্ধং দেহি! ঐ যে লোক অজীর্ণ রোগ সার্‌বার জন্যে হাঁসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হ'য়ে হাওয়া খেতে বেরোয়!"

লাবণ্য হেসে বল্‌লে, "লোকটা তবু যদি অমান্য ক'রে চ'লে যায়?"

"তখন আমি পিছন থেকে দু'হাত আকাশে তুলে বল্‌ব—এবারকার মত ক্ষমা কর্‌লুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।—বুঝ্‌তে পার্‌চেন, মন যখন খুব বড়ো হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু আমার কথা যে-রকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হ'লুম যে, ভাবনা নেই।"

অমিত বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বেন?"

"কি, বলুন।"

"আজ ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।"

"আচ্ছা বেশ, তার পরে?"

"ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাৎলা-পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝিরঝির ক'রে বয়ে যাচ্চে ঐখানে বসবেন আসুন।"

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু সময় যে অল্প।"

"জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্য দেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ মসক্ মাত্র জল, যাতে সেটা উছলে উছলে শুক্‌নো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্ক্‌চুয়াল হওয়া শোভা পায়; দেবতার হাতে সময় অসীম, তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য্য ওঠে ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্ক্‌চুয়াল হ'তে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'ভবে এসে করলে কি' তখন কোন্ লজ্জায় বল্‌ব, 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোল্‌বার সময় পাইনি।' তাইতো বলতে বাধ্য হ'লুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।"

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারো যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্ত্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, "চলুন।"

ঘনবনের ছায়া। সরুপথ নেমেচে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্দ্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরণার ধারা একজায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার ক'রে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকার-চিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বস্‌ল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হ'য়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দ্দার ছায়ায় একটি পর্দ্দানসীন্ মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জ্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগ্‌ল। সামান্য যা-তা একটা কিছু ব'লে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করচে, কিছুতেই কোন কথা মনে আসচে না,—স্বপ্নে যে-রকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা কিছু বলাই চাই। বললে, "দেখুন আর্য্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু, আর একটা চল্‌তি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা, এইরকম জায়গার জন্যে। পাখীর গানের মতো, কবির কাব্যের মতো,—সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন ক'রে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা! প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হোত তা হ'লে কী হোত ভেবে দেখুন! সত্যি বলুন, লাবণ্য দেবী, এখনি আপনার সুর ক'রে কথা বলতে ইচ্ছে করচে না?"

লাবণ্য মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

অমিত বল্‌লে, "চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র, কোন্‌টা অভদ্র, তার হিসেব মিট্‌তে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই, অভদ্রও নেই। তাহ'লে কি উপায় বলুন; মনটাকে সহজ কর্‌বার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চল্‌চে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।"

দিতে হলো অনুমতি, নইলে লজ্জা কর্‌তে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বল্‌লে, "রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।"

"হাঁ, লাগে।"

"আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ কর্‌বেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে, তার লেখা এত ভালো, যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে কর্‌চি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।"

"আপনি এত ভয় কর্‌চেন কেন?"

"এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে কর্‌লে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চল্‌লে তাতে ক'রেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আরেক জনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।"

"আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় কর্‌বেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করিনে।"

"এটা বেশ বলেচেন, তাহ'লে নির্ভয়ে সুরু করা যাক্।—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?

বিষয়টা দেখ্‌চেন? না-চেনার বন্ধন। সব-চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েচি, চিনে-নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তি-তত্ত্ব

কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি সুধালেম, "কোথা সঙ্গোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?"

নিজেকেই ভুলে থাকার মতো কোন এমন ঝাপ্‌সা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হোলো না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই ব'লে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
ক'রে নেব জয়

সংশয়-কুণ্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লব টানি'
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দ্দয় আলোতে।

একেবারে না-ছোড়-বান্দা। কত বড়ো জোর। দেখেচেন রচনার পৌরুষ!

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্ত্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্য্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক্ নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব!"—লাবণ্যর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লে,—

"হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় র'বে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি' দিক্,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জ্বলি'
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।"

আবৃত্তি শেষ হ'তে না হ'তেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধর্‌লে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বল্‌লে না।

এর পরে কোনো কথা বল্‌বার কোনো দরকার হোলো না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বল্‌লে, "মাসিমা, ঘটকালি কর্‌তে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা কর্‌বেন না।"

"পছন্দ হ'লে তবে তো। আগে নাম-ধাম বিবরণটা বলো।"

অমিত বল্‌লে, "নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।"

"তাহ'লে ঘটক বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়্‌বে দেখ্‌চি।"

"অন্যায় কথা বল্‌লেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মনরক্ষার চেয়ে বাইরে মানরক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।"

"আচ্ছা, নামটা না হয় খাটো হোলো, রূপটা ?"

"বল্‌তে ইচ্ছে করিনে, পাছে অত্যুক্তি ক'রে বসি।"

"অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে ?"

"পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিষ লক্ষ্য করা চাই,—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।"

"আচ্ছা নামরূপ থাক্, বাকিটা ?"

"বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।"

"বুদ্ধি ?"

"লোকে যা'তে ওকে বুদ্ধিমান ব'লে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।"

"বিদ্যে ?"

"স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েচে মাত্র। তাঁর মতো সাহস ক'রে বল্‌তে পারে না, পাছে লোকে ফস্ ক'রে বিশ্বাস ক'রে বসে।"

"পাত্রের যোগ্যতার ফর্দ্দটা তো দেখ্‌চি কিছু খাটো গোছের।"

"অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে ব'লেই শিব নিজেকে ভিখারী কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।"

"তাহ'লে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।"

"জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাস্‌চেন কেন, মাসিমা ? ভাব্‌চেন কথাটা ঠাট্টা !"

"সে ভয় মনে আছে, বাবা, পাছে শেষ পর্য্যন্ত ঠাট্টাই হ'য়ে ওঠে।"

"এ সন্দেহটা পাত্রের পরে দোষারোপ।"

"বাবা, সংসারটাকে হেসে হাল্‌কা ক'রে রাখা কম ক্ষমতা নয়।"

"মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে-কথা বুঝেছিলেন।"

"আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েচে ?"

"কিরকম পরীক্ষা চান, বলুন।"

"একমাত্র পরীক্ষা হচ্চে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।"

"কথাটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করুন।"

"যে-রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল, তারো আসল মূল্য যে বোঝে সেই জানুব জহুরী।"

"মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম ক'রে তুল্‌চেন। মনে হচ্চে যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েচেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা,—জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক, এক ভদ্র রমণীকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেচে। দোষেগুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুসি হ'য়ে তখনি ঢেঁকিতে আনন্দ-নাড়ু কুট্‌তে সুরু করেন।"

"ভয় নেই, বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েচে। ধ'রেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইচ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝ্‌ব লাবণ্যের মতো মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার তুমি যোগ্য।"

"আমি যে এ-হেন আধুনিক আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন!"

"আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখ্‌লে?"

"দেখ্‌চি বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।"

"তার কারণ আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার মাসিমাদের খেলার সখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।"

"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে ক'রে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে ব'লেই অমিত রায় মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ। নইলে, আমার মোটর-গাড়িটা অচেতন পদার্থ হ'য়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বস্‌বে কেন?"

"বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্ত্তায় লাগ্‌চে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হ'য়ে না দাঁড়ায়।"

"মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারি গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হাল্‌কা হ'য়ে ভেসে ওঠে, তাই ব'লে তার ওজন কমে না।"

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। দেখা হোলো যতিশঙ্করের সঙ্গে। মনে পড়্‌ল আজ তাকে এণ্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল জীবের প্রতি দয়া ক'রেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্ত্তব্য। সে বল্‌লে, "অমিৎদা, কিছু যদি মনে না করো, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।"

অমিত পুলকিত হ'য়ে বল্‌লে, "পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না, তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করচ কেন?"

"কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাবো—"

"ইস্কুল-মাস্‌টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিইনে। যে-ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হ'য়ে যায়।"

হঠাৎ যে-উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মেতে উঠ্‌ল তার মূল কারণটা অনুমান ক'রে যতির খুব মজা লাগ্‌ল। সে বল্‌লে, "কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠ্‌চে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চল্‌লেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।"

"সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম?"

বলেছিলে, "অকর্ত্তব্য বুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌গুণ। তার ডাক পড়্‌লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না। ব'লেই বই বন্ধ ক'রে তখনি বাইরে দিলে ছুট্‌। বাইরে হয়তো একটা অকর্ত্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করিনি।"

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে-চাঞ্চল্য উঠেচে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগ্‌চে। ও লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষক জাতীয় ব'লেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছে, সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বল্‌লে, "কাজ উপস্থিত হ'লেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এই উপদেশের বাজারদর বেশি, আকবরি মোহরের মতো,—কিন্তু ওর উল্‌টো পিঠে খোদাই থাকা উচিত অকাজ উপস্থিত হ'লেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।"

"তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্চে।"

যতির পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে অমিত বল্‌লে, "জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবন-পঞ্জিকায় একদিন যখন আস্‌বে দেবীপূজায় বিলম্ব কোরো না, ভাই, তার পরে বিজয়া দশমী আস্‌তে দেরী হয় না।"

যতি গেল চ'লে, অকর্ত্তব্য-বুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় ক'রে অকাজ দেখা দেয় তারো দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, একধারে সূর্য্যমুখীর ভিড়, আরেকধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালুঘাসের ক্ষেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস্‌ গাছ। তারি গুঁড়িতে হেলান্‌ দিয়ে সাম্‌নে পা ছড়িয়ে ব'সে আছে লাবণ্য। ছাইরঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুক্‌রো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়ালো, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলো, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সাম্‌না-সাম্‌নি ব'সে বল্‌লে, "সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েচি।"

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না ক'রে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারীদলের একজন।

অমিত বল্‌লে, "যদি আপত্তি না করো তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।"

"তা দাও।"

"তোমাকে ডাক্‌ব বন্য ব'লে।"

"বন্য!"

"না, না এ নামটাতে হয়তো বা তোমার বদ্‌নাম হোলো। এরকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাক্‌ব, বন্যা। কি বলো?"

"তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।"

"কিছুতেই নয়। এসব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারো কাছে ফাঁস কর্‌তে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আমারো ঐরকমের একটা বেসরকারী নাম চাই তো। ভাব্‌চি ব্রহ্মপুত্র কেমন হয়? বন্যা হঠাৎ এলো তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।"

"নামটা সর্ব্বদা ডাক্‌বার পক্ষে ওজনে ভারি।"

"ঠিক বলেচ। কুলি ডাক্‌তে হবে ডাক্‌বার জন্যে। তুমিই তাহ'লে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারি সৃষ্টি।"

"আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বল্‌ব মিতা"

"চমৎকার! পদাবলীতে ওরি একটি দোসর আছে, বঁধু। বন্যা, মনে ভাব্‌চি, ঐ নামে না হয় আমাকে সবার সাম্‌নেই ডাক্‌লে, তাতে দোষ কি?"

"ভয় হয় এক কানের ধন পাঁচ-কানে পাছে শস্তা হ'য়ে যায়।"

"সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা।"

"কী মিতা?"

"তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাবো জানো?—অনন্যা।"

"তাতে কী বোঝাবে?"

"বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।"

"সেটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়।"

"বলো কি, খুবই আশ্চর্য্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চম্‌কে ব'লে উঠি এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো। পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বল্‌ব—

"হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

"তুমি কবিতা লিখ্‌বে না কি?"

"নিশ্চয়ই লিখ্‌ব! কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

"এমন মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?"

"কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্য্যন্ত, ঘুম না হোলে যেমন এ পাশ ওপাশ করতে হয়, তেমনি ক'রেই কেবলি অক্সফোর্ড বুক অফ্ ভর্সেস্‌-এর এ পাত ওপাত উল্‌টেচি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেক্‌ত। স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাচ্চি আমি লিখ্‌ব ব'লেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা ক'রে আছে।"

এই ব'লেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে বল্‌লে, "হাত জোড়া পড়্‌ল, কলম ধর্‌ব কী দিয়ে! সব চেয়ে ভালো মিল হাতে-হাতে মিল। এই যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইচে কোনো কবিই এমন সহজ ক'রে কিছু লিখ্‌তে পার্‌লে না।"

"কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি, মিতা।"

"কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখ। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নি-পরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন, সে যাচাই কর্‌বে কী দিয়ে? তা'কে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্ম্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেচে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার প'ড়ে নিচ্চি, কত অল্পই টিঁক্‌ল! সব হু-হু শব্দে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বল্‌তে হোলো, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা কোয়োনা, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

For God's sake, hold your tongue
and let me love!"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার পরে একসময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধ'রে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বল্‌লে, "ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্চে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই

অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখ্‌তে পেলে শিলঙপাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপ্‌টস্ গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার-গুলিই পরম নম্র, চোখে পড়্‌তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদীঘি থেকে আরম্ভ ক'রে নোয়াখালি চাটগাঁ পর্য্যন্ত চীৎকার শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দ্দান্ত বাজে খবরটা বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রধান খবর হ'য়ে উঠ্‌ল। কে জানে হয় তো এইটেই ভালো।"

"কোন্‌টা ভালো?"

"ভালো এই যে সংসারের আসল জিনিষগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে।—আচ্ছা, বন্যা, আমি তো ব'কেই চলেচি, তুমি চুপ ক'রে ব'সে কী ভাব্‌চ বলো তো।"

লাবণ্য চোখ নীচু ক'রে ব'সে রইল, জবাব কর্‌লে না।

অমিত বল্‌লে, "তোমার এই চুপ ক'রে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত ক'রে দেওয়ার মতো।"

লাবণ্য চোখ নীচু ক'রেই বল্‌লে, "তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়, মিতা।"

"ভয় কিসের?"

"তুমি আমার কাছে কী যে চাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই দিতে পারি ভেবে পাইনে।"

"কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পারো এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।"

"তুমি যখন বল্‌লে কর্ত্তা-মা সম্মতি দিয়েচেন আমার মনটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। মনে হোলো এইবার আমার ধরা পড়্‌বার দিন আস্‌চে।"

"ধরাই তো পড়্‌তে হবে।"

"মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চল্‌তে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়্‌ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাক্‌বে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না,—না, না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি ক'রে বল্‌চি, আমাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়ো না। বিয়ে ক'রে তখন গ্রন্থি খুল্‌তে গেলে তাতে আরো জট প'ড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েচি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চল্‌বে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।"

"বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্য্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুল্‌চ?"

"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বল্‌বার জোর দিয়েচ। আজ তোমাকে যা বল্‌চি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জানো। মান্‌তে চাও না, পাছে যে-রস এখন ভোগ কর্‌চ তাতে একটুও খট্‌কা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদ্‌বার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফেরো; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেচ। বল্‌ব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জানো, যাকে তুমি সর্ব্বদাই বলো, ভাল্‌গার্। ওটা বড়ো রেস্‌পেক্টেবল্; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া, সেই সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিষ যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্ম্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান্ দিয়ে বসে।"

"বন্যা, তুমি আশ্চর্য্য নরম সুরে আশ্চর্য্য কঠিন কথা বল্‌তে পারো।"

"মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না,—তাতেই আমি খুসি থাকব।"

"বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বল্‌তে দাও। কি আশ্চর্য্য ক'রেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেচ। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিষটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিক্‌লি বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিক্‌লি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্ত্তি।"

"আজ তুমি তার কোন্‌টা ?"

"যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, রুচির ঢাকা-লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো, বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ ?"

লাবণ্য চুপ ক'রে রইল।

অমিত বল্‌লে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্ম্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন,দোঁহে এক হ'য়ে ওঠ্‌বার আগুন 'ওঠে জ্বলে'! সেই আগুন জ্বলেচে, অমিত রায় বদ্‌লে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক. কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদ্‌লিয়ে দিয়েচ, বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়্‌ল।

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না-ক'রে থাকতে পার্‌লে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে সব কথা ওর মনে বরফ হ'য়ে জ'মে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে, কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, মিতা, তুমি কি মনে করো না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হ'ল সেদিন মম্‌তাজের মৃত্যুর জন্যে সাজাহান খুসি হয়েছিলেন ? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে সাজাহানের শোক প্রকাশ পায়নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেচে।"

অমিত বল্‌লে, "তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।"

"আমি চাইনে কবি হ'তে।"

"কেন চাও না ?"

"জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসব-সভা সাজাবার হুকুম পেয়েচে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।"

"বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করচ ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন ক'রে জাগিয়ে দেয়। মি কি ক'রে জানবে তুমি কী বলো, আর সে বলার কী অর্থ! আবার দেখ্‌চি নিবারণ

চক্রবর্ত্তীকে ডাক্‌তে হ'ল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হ'য়ে গেছ! কিন্তু কী কর্‌ব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হ'য়ে যায়নি,—ও প্রত্যেক বারেই যে-কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরণার উপরে কবিতা,—কী ক'রে খবর পেয়েচে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরণা আমি খুঁজে পেয়েচি। ও লিখ্‌চে :—

ঝরণা, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য্য তারা।

আমি নিজে যদি লিখ্‌তুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর ক'রে তোমার বর্ণনা কর্‌তে পার্‌তুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়া সেই আলো আমি দেখ্‌তে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হ'য়ে ব'সে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি :—
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী॥

তুমি ঝরণা, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চল্‌চ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চলো তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরাণে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী,
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "যতই আমার আলো থাক্ আর ধ্বনি থাক, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে-ছায়াকে আমি ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ব না।"

অমিত বল্‌লে, "কিন্তু একদিন হয় তো দেখ্‌বে আর কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।"

লাবণ্য হেসে বল্‌লে, "কোথায়? নিবারণ চক্রবর্ত্তীর খাতায়?"

"আশ্চর্য্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে-ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন ক'রে সেটা বেরিয়ে আসে।"

"তা হ'লে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্ত্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।"

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাক্‌তে,—খাবার তৈরি।

অমিত চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, যে, লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট ক'রে জান্‌তে চায়। মানুষ স্বভাবতঃ যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে-কথাটা বল্‌লে, সেটার তো প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌চিনে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ কর্‌তেই হয়, কেউ বা করে জীবনে; কেউ বা করে রচনায়,—জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সর্‌তে সর্‌তে, নদী যেমন কেবলি তীর থেকে সরতে সর্‌তে চলে, তেম্‌নি। আমি কি কেবলি রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে স'রে স'রে যাব? এইখানেই কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি কর্‌তে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা কর্‌তে, পুরোনোকে রক্ষা কর্‌বার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হ'ল? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত কর্‌বেই। যেখানে খুব ক'রে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাব্‌চি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি। এ কথাটা ভাব্‌তে অমিতকে পীড়া দিল, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পার্‌লে না। (ক্রমশঃ)

এসিয়া ও য়ুরোপ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার জীবনে এমন কোন রিপোর্ট বেরয়নি যাতে ঠিক মতো আমার ভাব প্রকাশ করেচে। কথাগুলোর পরিমাণ ঠিক থাকে না, মাত্রাবৈষম্যে ব্যাপারটা এক-ঝোঁকা হ'য়ে পড়ে। এ কথা খুবই সত্য, আমরা, যারা য়ুরোপের বাহিরে আছি, আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের প্রধান সম্বন্ধ শোষণ-সাধনের, exploitation-এর। অর্থাৎ তার প্রবর্ত্তনা আধিভৌতিক, materialistic। প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য, প্রকাণ্ড বাণিজ্য—অপরিমিত তার আয়তন ও ক্ষুধা; তার মধ্যে বাহ্য শক্তির চেহারাই অতিমাত্রায়। এর সংস্পর্শে আমাদের মানবচিত্ত পীড়িত হ'য়ে পড়ে;—মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতে বাধা পাই ব'লেই বাহ্যিক বৈষয়িক স্থূল বন্ধনের কঠোরতাই আমাদের অত্যন্ত পীড়িত করে। এই পীড়া উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেচে। আজ সমস্ত এসিয়াতে কোনো জাতিই নেই

য়ুরোপকে যে ভয় ও সন্দেহের চক্ষে না দেখে। অথচ একদিন ছিল যখন য়ুরোপের আইডিয়ালের দিকটা আমরা তার সাহিত্য প্রভৃতি থেকে লাভ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিলুম, আশান্বিত হয়েছিলুম—মনে করেছিলুম, জগতে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করাই বর্ত্তমান য়ুরোপের প্রধান কাজ। কিন্তু ক্রমেই এমন হ'ল যখন য়ুরোপের বৈষয়িকতার ক্ষেত্র হ'য়ে উঠ্‌ল এসিয়া আফ্রিকা—যেখানে তার প্রধান লক্ষ্য লাভ করা, শাসন করা, বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করা;—তখন থেকে এই প্রকাণ্ড মহাদেশগুলি তাদের গুদাম ঘর, তাদের আপিস, তাদের পুলিসের থানা ও সৈনিকের ব্যারাক বিস্তার কর্‌তে কর্‌তে চলেছে, মানব-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ গৌণ হ'য়ে পড়েচে। যাদের আমরা শোষণ করি, স্বার্থ-সাধনের উপলক্ষ্য করি, তাদের আমরা অশ্রদ্ধা না ক'রে থাকৃতে পারিনে। অন্তত অশ্রদ্ধা যদি কর্‌তে পারি তাহ'লে তাদের ঘরে ছিদ্রবিস্তার পূর্ব্বক অপহরণ ব্যাপার সহজ হয়, মনে ব্যথা লাগে না। মাছকে যখন বঁড়সি দিয়ে বিঁধ্‌তে হয় তখন বল্‌তে ইচ্ছা করে, মাছটা প্রাণীর মধ্যে সব-চেয়ে বেদনাবোধহীন। মানুষ সম্বন্ধেও তাই—শাসন ও শোষণ কর্‌বার ধর্ম্মনৈতিক জবাবদিহীকে নিষ্কণ্টক কর্‌বার জন্যে ওরিএন্টালকে মানুষের কোঠায় অত্যন্ত সুদূর ও নিকৃষ্ট স্থান দিতে পার্‌লে ওরিএন্টকে প্রাণান্তিক ভাবে দোহন করা সুখসাধ্য হয়। এমনি ক'রে বৃহৎ পৃথিবীকে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকবলশালী য়ুরোপ দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এই বিভাগের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে য়ুরোপের যেটা শ্রেষ্ঠ সেটা পূর্ব্বদিকে এসে পৌঁছতে পারে না। য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ে এইটুকুই বড় ক'রে জান্‌তে পেরেছি যে, য়ুরোপ ভয়ঙ্কর কর্ম্মনিপুণ, efficient। কর্ম্মনৈপুণ্য জিনিষটা মেটিরিয়াল সভ্যতার মহত্তম শক্তি—তাকে দেখে বিস্মিত হ'তে পারি—কিন্তু ভীত হ'য়ে তার পায়ে যদি ভক্তির অর্ঘ্য দিই তাহ'লে জান্‌ব আমরা দুর্গতির মধ্যে তলিয়ে যাচ্চি—এ যেন রক্তপিপাসু দেবতাকে ভক্তি করার বর্ব্বরতা। এই কারণেই কেবলমাত্র আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে আজ সমস্ত এসিয়া য়ুরোপের চারিত্রিক শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার কর্‌চে। অথচ অন্য পক্ষে য়ুরোপের উৎপাত ঠেকাবার জন্যে তার সেই অংশই নকল করচে, যে-অংশটা দানবিক, যে-অংশে সে মারে, সে কাঁচা মাংস খায়, এবং শিকারকে দোষ দিয়ে তাকে ল্যাজায় মুড়োয় গলাধঃকরণ করাকে সুগম করে।

কিন্তু য়ুরোপকে এই-রকম জানার মধ্যে অসত্য আছে। আমি নিজে বিশ্বাস করিনে যে, য়ুরোপ একান্ত ভাবে মেটিরিয়ালিষ্টিক। ধর্ম্মমতে তার বিশ্বাস গেছে, কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরে যায়নি। সেই মনুষ্যত্ব কখনই একান্ত বস্তুবিলাসী হ'তেই পারে না। য়ুরোপে কর্ত্তব্যের আদর্শ শাস্ত্রের বন্ধনে জড়ভাবে বাঁধা নয় ব'লেই সেটা যথার্থ ভাবে আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ তার অনুশাসন মানুষের অন্তরে, মানুষের বাহিরে নয়। বাহ্য শাস্ত্রের জড়বন্ধন থেকে মনুষ্যত্বের এই মুক্তি, এইটি বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার মস্ত সম্পদ। সেখানে মানুষ জ্ঞানের জন্যে প্রাণ দিচ্চে, মানব-সেবার জন্যে প্রাণ দিচ্চে, স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিচ্চে; কিন্তু সেটা ভাটপাড়ার বিধান নিয়ে বা পাঁজি পুঁথির সঙ্গে দিনক্ষণ মিলিয়ে নয়—নিজের আন্তরিক আদর্শকে শ্রদ্ধা ক'রে। এই মনোভাবটাই যথার্থ স্পিরিচুয়াল। যথার্থ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের মুক্তি দেয়। য়ুরোপ আজ জ্ঞানে কর্ম্মে সাহিত্যে কলায় যে মুক্তি পেয়েছে, সেই মুক্তি বস্তুতন্ত্রের অসাড় মূঢ়তা থেকে নয়। সেই আত্মবিকাশের স্বাধীনতা দ্বারা মানবাত্মা নিজের অবাধ উন্নতির অধিকার ঘোষণা করছে। ধার্ম্মিকতার নাম দিয়ে আমরা যে সব জড় শৃঙ্খল সৃষ্টি করি তাতেই মানুষের আত্মাকে যত বাঁধে এমন বৈষয়িক বন্ধনেও নয়। মানুষের মধ্যে মুক্তির যে-নিকেতন সে হচ্চে মানুষের আত্মা—সেই আত্মা জ্ঞানে কর্ম্মে শক্তিতে কোথাও আপনার সীমা মান্‌তে চায় না। প্রকৃতির বেড়া, প্রবৃত্তির শাসন, সমস্তকে সে অতিক্রম করতে সাহস করে। আকাশে এরোপ্লেন উড়্‌চে; বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলে একে বস্তু-শক্তির পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে হ'তে পারে—কিন্তু এর পিছনে সবল সজাগ মানবাত্মা। এই মানবাত্মাই প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরগুলিকে একান্ত ব'লে স্বীকার করেনি—এই মানবাত্মাই, প্রকৃতি আমাদের মনের মধ্যে মৃত্যুভয়ের যে-শিকল জড়িয়েছে তাকে, ছুঁড়ে ফেলে উড়িয়ে

দিয়েছে—তবেই মানুষ আকাশে উড়্‌বার দেবতা-যোগ্য অধিকার পেয়েছে। তবু তার মধ্যে দানবও বেঁচে আছে—সেই দানব ঐ এরোপ্লেন্ থেকে মৃত্যুবৃষ্টি কর্‌তে উদ্যত। কিন্তু আমার বল্‌বার কথা এই যে, দানব একলা নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে সুরাসুরের যুদ্ধ নিরন্তর চল্‌ছে, অনেক সময়ে দানব জয়ী হয়, কিন্তু দেবতারও জয় সঙ্গে সঙ্গে আছে। তার পরিমাণ নিয়ে বিচার কর্‌লে চল্‌বে না, তার সত্যতা নিয়ে বিচার করতে হবে। সেইজন্যই গীতা বলেছেন, ধর্ম্ম স্বল্প হ'লেও মহৎ দুর্গতি থেকে রক্ষা করে। কেননা দেবতার প্রকাশটা হচ্চে সত্যের অ-নেতির দিক, সত্যের পজিটিভ দিক—নেতির দিকে, নেগেটিভ দিকে, আছে দানব। যতক্ষণ এই পজিটিভ দিকের কিছুমাত্র সাড়া পাওয়া যায় ততক্ষণ ভয় নেই। যেখানে দেবতা আছে সেখানেই সুরাসুরের যুদ্ধ সম্ভব। যেখানে উভয়েই সমান দুর্ব্বল, সেখানে যুদ্ধ নেই, কিন্তু সেই অগত্যা-সম্ভব শান্তিকে বলে তামসিকতা, আধ্যাত্মিকতা কদাচ নয়। অনেক সময়ে যখন আমাদের কোনো সামাজিক দুর্গতির লক্ষণ নিয়ে কেউ নিন্দা করে তখন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা সহজ যে, য়ুরোপে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে দুর্গতির চিহ্ন আছে। কিন্তু এটা নেগেটিভ দিকের কথা; দুর্গতির উপরকার বড়ো কথাটা হচ্ছে এই যে,সেখানে সেটা স্থাবর নয়—সেখানে তার সঙ্গে মানুষের আত্মিক শক্তি কেবলি বোঝাপড়া করছে। সেইজন্য য়ুরোপেই দেখ্‌তে পাই একদিকে স্বাজাত্য-জায়ান্টের দুর্গ—আর এক দিকে সার্ব্বজাত্য জ্যাক, জায়ান্টঘাতী। এই জায়ান্ট-কিলারটি ছোট কিন্তু সত্য। আমরা য়ুরোপকে বাইরে যখন খুব ক'রে গালও পাড়ি তখনো আমরা আমাদের সমস্ত অর্ঘ্য নিয়ে তার জায়ান্টেরই দুর্গ গড়্‌তে চাই, জায়ান্টঘাতী জ্যাক্‌কেই বিদ্রূপ ও সন্দেহের দ্বারা লাঞ্ছিত করি। তার প্রধান কারণ আমরাই বস্তু-পূজারী, আমরাই সাহসহীন, বিশ্বাসহীন। আমাদের মধ্যে দেবতা ঘুমিয়ে আছেন ব'লেই দৈত্য আসবামাত্র সমস্ত নৈবেদ্য সেই-ই একলা গ্রাস কর্‌তে থাকে—দ্বন্দ্বমাত্রই থাকে না। যেমন ব্যাধির বীজ সবদেশেই আছে,কিন্তু আরোগ্যের শক্তি প্রবল থাক্‌লে সেই ব্যাধিকেও মানুষ অতিক্রম করে, তেম্‌নি যেখানে স্পিরিচুয়াল শক্তি জাগ্রত আছে সেখানে রক্তলোলুপ বস্তু-উপদেবতার পূজা সত্ত্বেও মানুষ উপরের দিকে মাথা তুল্‌তে পারে। আসল কথা, য়ুরোপে সম্পূর্ণ মানুষই সজাগ—এই সম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে মেটিরিয়ালিষ্ট্‌ও আছে, স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌ও আছে। নিছক মেটিরিয়ালিষ্ট্ হচ্চে যারা অর্দ্ধেক মানুষ, অর্থাৎ যারা বর্ব্বর; যারা বাহ্যকর্ম্মের জাদুশক্তির প্রতি মূঢ় বিশ্বাসের দ্বারা আপন আত্মার আন্তরিক মহিমাকে খর্ব্ব করে—যারা জ্ঞানে অন্ধ, কর্ম্মে জড়, যারা পূজা-আর্চ্চনাতেও দেবতার জায়গায় নির্ব্বোধ বিশ্বাসকেই নির্ব্বিচারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রতিমুহূর্ত্তেই আত্মাবমাননা করতে পারে। যাদের একথা বিশ্বাস করতে বাধে না যে, কোন বিশেষ স্থানে, বিশেষ উপকরণে, বিশেষ রূপে, বিশেষ শব্দে, বিশেষ অনুষ্ঠানে পবিত্রতার অতিলৌকিক শক্তি আছে। সেইজন্যেই যারা ভূতপ্রেত দেবতা উপদেবতার ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রবলের ভয়ে, দিনক্ষণ তারিখের ভয়ে, বাস্তবিক কাল্পনিক সকল প্রকার উপরওয়ালার ভয়ে। দিবারাত্রি কম্পান্বিত, আত্মা দুর্ব্বল ব'লেই যারা নিজের অন্তরে পরাধীন ও বাহিরে শৃঙ্খলিত।

৩০শে ভাদ্র

শান্তিনিকেতন

"লেখন"

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষর লিপির দাবী মেটাতে হ'ত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাথায় অনেক লিখ্‌তে হয়েচে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি ক'রে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট ক'রে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্য-বর্জ্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস ব'লেই কবিতার আয়তন কম হ'লে তাকে কবিতা ব'লে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হ'লে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহার্য্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হ'য়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে—সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাম্নে মুখমস্তি—নাট্য সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্য্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোট কাব্যের অমর্য্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখ্‌তে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেন না তারা জাত আর্টিস্‌ট্‌। সৌন্দর্য্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব কর্‌বার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবী করেচে, দুটি চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হইনি। তার কিছু কাল পূর্ব্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখ্‌ছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা ক'রে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে দলের লোকের অভাব নেই।

এই রকম ছোট ছোট লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগ্‌ল তখন আমি অনুরোধ-নিরপেক্ষ হ'য়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা তা লিখেছি, এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় ক'রে বলেছি :—

আমার লিখন ফুটে পথ-ধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চল্‌তে চল্‌তে দেখারই দোষ। যে-জিনিষটা বহরে বড় নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখিনে—যদি দেখ্‌তুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুসি হ'লেও লজ্জার কারণ থাক্‌ত না। তার চেয়ে কুমড়ো-ফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হ'তে পারে।

গেল বারে যখন ইটালিতে গিয়েছিলুম তখন স্বাক্ষর-লিপির খাতায় অনেক লিখ্‌তে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবী। এবারেও লিখ্‌তে লিখ্‌তে কতক তাঁদের খাতায় কতক আমার নিজের খাতায় অনেকগুলি ঐ রকম ছোট ছোট লেখা জমা হ'য়ে উঠ্‌ল। এই রকম অনেক সময়েই অনুরোধের খাতিরে লেখা সুরু হয়,তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অনুরোধের দরকার থাকে না।

জার্ম্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েচে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালী দিয়ে লিখ্‌তে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে,

তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হ'বার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্যহিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই-ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়ম্ পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তরুণ বন্ধু বললেন, "আপনার কিছুকাল পূর্ব্বেকার লেখা কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা আছে সেইগুলিকে এই উপলক্ষ্যে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্ব্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহৈতুক বিরাগ জন্মায়। এইজন্যই তরুণ লেখকরা সাহিত্যিক পদবী থেকে আমাকে যখন বরখাস্ত করবার জন্যে কানাকানি করতে থাকেন তখন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় যে, "আগে-ভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগ্নেশন-পত্র পাঠিয়ে যৎসামান্য কিছু পেন্সনের দাবী রেখে দাও।" এটা যে-সম্ভব হয় তার কারণ আমার পূর্ব্বের লেখাগুলো আমি যে-পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই যোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উঞ্ছস্বরূপ যা-কিছু সংগ্রহ ক'রে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিস্র-লোকে বৈতরণী পার ক'রে ফেরৎ পাঠাব।

গুটি পাঁচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম, "কিছুতেই মনে পড়বে না এগুলি আমার লেখা", তিনি জোর ক'রেই বললেন, "কোনো সংশয় নেই।"

আমার রচনা সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা করা হয়। আমার গানে আমি সুর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সদ্যোজাত সুর শিখিয়ে দিই। তখন থেকে সে-গানের সুরগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তারপর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ কথা বলতে সঙ্কোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করচি। এসম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হ'ল—মনে হ'ল ভালোই লিখেচি। বিস্মরণ-শক্তির প্রবলতা বশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে স'রে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও ক'রে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সঙ্কোচ হয় না—কেননা তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হ'য়ে যায়। প'ড়ে দেখলাম :—

তোমারে ভুলিতে মোর হ'ল না যে মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহো ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হ'ল যে, ছোটোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভ'রে উঠেচে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ ত্রিশ লাইন পর্য্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত—এমন-কি, এ'কে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হ'ত সহজ। কিন্তু লোভে প'ড়ে এ'কে বাড়াতে গেলেই এ'কে কমানো হ'ত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম। তারপরে আর-একটা কবিতা :—

ভোর হ'তে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে—
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে॥

আবার বললেম্, সাবাস! হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ ক'রে হাহাকার ক'রে উঠচে এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ ক'রে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেচে? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি

যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্যে নিজেকে মনে মনে বলতে হ'ল ধন্য।

তারপরে আর একটি কবিতা :—

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জ্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি? পূর্ণ নাম ধ'রে
আ'জ ডাকিবার দিন. এ হেন সময়
সরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এলো চির জীবনের পরিচয় দিন।

"মানসী" লেখ্‌বার যুগে—সে আজকের কথা নয়—এই ভাবের দুই একটা কবিতা লিখেছিলেম ব'লে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমা-সিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তনু আকারেই সম্পূর্ণ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েচে।

আর-একটি ছোট কবিতা :—

প্রভু, তুমি দিয়েছ যে ভার
যদি তাহা মাথা হ'তে এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বারবার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়, ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরাণ আমার॥

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ ব'লেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁই-ফুলটির মত ফুটে উঠেচে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্ব্বের সঙ্গেই এই কবিতা কয়টি এলুমিনিয়মের পাতের উপর স্বহস্তে নকল ক'রে নিলেম। যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতকার সঙ্গে এ কয়টিও আমার "লেখন" নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আজ প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে "লেখন" একখণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি পেয়ে যে পত্র লিখেচেন সেটা উদ্ধৃত ক'রে দিই :—

"'লেখন' পড়্‌লাম। এর কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা বড়ো চমৎকার—দুচার ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি সুসংস্কৃত মণি, আলো ঠিক্‌রে পড়্‌চে। লেখনে দেখ্‌লাম ২৩ এর পৃষ্ঠায় আমার ৪টি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম দু লাইন। যথা,

১। তোমারে ভুলিতে মোর হ'ল নাক মতি
২। ভোর হ'তে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে
৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জ্জন
৪। প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার
৫। শুধু এইটুকু মুখ অতি সুকুমার (প্রথম দু লাইন।)

সবগুলিই পত্র-লেখায় ছাপা হ'য়ে গিয়েছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে যেন কিছু বল্‌বেন না।"

তখন আমার মনে পড়্‌ল যখন "পত্র-লেখা"র পাণ্ডুলিপি প্রথম আমি প'ড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জ্জিত কবিতার আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মান লাভ করেনি। অন্তত "পত্র-লেখা"র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ কর্‌তে পেরেছি ব'লে খুসি হলেম।

নীলাতঙ্ক

রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী

আমাদের দেশ যখন মুসলমান রাজার হাতে ছিল তখন এ দেশে নীলের চাষ ছিল না, চীন দেশের ও জর্ম্মনীর নীলে কাজ চলিত। ইংরেজেরা এ দেশের রাজা হইলে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এ দেশে নীলের চাষ প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পূর্ব্বে নীলের চাষ আমাদের দেশে ছিল না। পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলায় সমভাবে নীলের চাষ আরম্ভ হইল। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে দেশের ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এখন এ দেশে আর

নীলের চাষ হয় না, কিন্তু নীলের কুঠী-সমূহের ধ্বংসাবশেষ এখনো স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকালয়-গুলি কোথায়ও অক্ষত, কোথায়ও বা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। নীল-কুঠীয়াল ইংরেজেরা যে-সকল জমিদারী ক্রয় বা জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়াছিলেন সেই-সকল জমিদারী বিক্রী করিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। ৺দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার নীলদর্পণ পুস্তকে ইহাদের অত্যাচারকাহিনী সম্পূর্ণ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি দেশে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছিলেন।

নীলের চাষ কেমন করিয়া হইত তাহা বোধ হয় এখন আর অনেকেই জানেন না। সেকালের লোক যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহারা ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। নীল-দর্পণের ৺ দীনবন্ধু মিত্র এখন আর জীবিত নাই। তিনি ইহার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই সরিয়া পড়িয়াছেন। নীলকরদিগের অত্যাচারকাহিনী শুনিলে এখনো লোকের প্লীহা চম্‌কাইয়া উঠে। নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে জর্জ্জরিত না হইয়াছে ছোট বড় এমন লোক দেশে ছিল না। নীলকরদিগের পাশবিক অত্যাচারে রমণীগণ পর্য্যন্ত নির্য্যাতিত হইতেন। বর্ত্তমানকালে চা-করের অত্যাচার হইতে তাহাদের অত্যাচার ভীষণতর ছিল।

ইহাদের অত্যাচার-বিষয়ক চিঠি-পত্রে কতকগুলি সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার হইত। সে-সকল কথা অনেকে ছাপিত না, কিন্তু তাহাদের নিজেদের মধ্যে এ সকল সীমাবদ্ধ ছিল। মানুষের নাম, অত্যাচারের উপায় ইত্যাদি তাহারা সঙ্কেতে তাহাদের লোকদিগকে বা এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে জানাইত। তদনুসারে তাহারা প্রস্তুত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। পশ্চিম বাঙ্গালার কুঠীয়ালেরা তাহাদের সদর আড্ডা করিয়াছিলেন ঢাকায়। ঢাকা ও কলিকাতা হইতে তাহাদের চিঠিপত্র ও আদেশ যাইত। তখন এদেশে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন জারী হয় নাই, কাজেই তাহাদের অত্যাচারের সুবিধা ছিল। দণ্ডবিধি আইন জারী হইলেই ইহারা একে একে নীলের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া দেশত্যাগ করিয়া যায়। এই সময় স্বজাতীয় জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটরাও না কি তাঁহাদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। থানার দারোগারা তাঁহাদের বেতনভোগী ভৃত্যমাত্র ছিলেন কেহ থানায় বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়া ফল পাইত না বলিয়া তাঁহাদের ভয়ে কাবু হইয়া থাকিত।

নদীর চরে হালচাষ করিয়া নীলের বীজ বপন করা হইত। বর্ষার জল আসিবার পূর্ব্বেই বা জল আসিয়া গাছের গোড়ায় ধরিয়াছে এই সময়ে তাড়াতাড়ি করিয়া নীলের গাছ কাটা হইত। গাছের গোড়ায় বেশী জল লাগিলে নীল নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল গাছ বোঝা বাঁধিয়া আনিয়া চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া যে পুকুর আছে তাহার জলে ভিজাইতে হয়। এখনকার দিনে যেমন পাট বা নালিতা ভিজান হয় উহাও সেইরূপ একটা কাণ্ড ছিল। ঐসকল গাছ পচিলে তাহা হইতে এক প্রকার নীল রস বহির্গত হয়। সেই রসমিশ্রিত জলকে বড় বড় কটাহে ফেলিয়া তাহাকে জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিয়া তাহা ঘন হইলে তাহাকে পাত্রে রৌদ্রতপ্ত করিতে হয়। যখন এই রস জ্বাল দিতে হয় তখন প্রকাণ্ড হাতা দিয়া তাহাকে ঘাঁটিতে হয়। এই ঘাঁটাঘাঁটিতে বেশ নিপুণতার প্রয়োজন। সময় বুঝিয়া তাহা নামাইয়া লইতে হয়। তারপর ঐ রস রৌদ্রেতে আরও ঘন হইলে উহাকে তক্তির আকারে কাটিতে হয়। এইরূপ কর্ম্ম করা শেষ হইলে ঐরূপ খণ্ড খণ্ড নীল শুকাইয়া লইয়া বাক্‌স-বন্দী করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া হইত। তার পর তথা হইতে বিলাত ও অন্যান্য দেশে চালান যাইত। এই সকল কার্য্য খুব ক্ষিপ্রতার সহিত করিতে হয়। নীল কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সব কার্য্যেই ক্ষিপ্রতার সহিত না করিলে পণ্ড হইয়া যায়। যে-স্থানে নীলের গাছ ভিজাইতে হয় আর যে-স্থানে জ্বাল দিতে হয় ও যেখানে শুকাইতে হয় সবটাই পাকা। নীল রক্ষার গুদামগুলিও পাকা।

তখনকার দিনে রেল ছিল না। নৌকায় কলিকাতার জিনিষ চালান যাইত। নীলের ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ এদেশ হইতে ইংরেজ সওদাগরেরা লইয়া গিয়াছেন। নদীর চর বা নদীর জল নিকটে না থাকিলে নীলের কুঠী হইত না।

নীলের কুঠী উঠিয়া গেলে সাহেবরা ব্যবসান্তর অবলম্বন

করিলেন। কেহ ইক্ষু, পাটের ব্যবসা, কেহ কৃষি, কেহ রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া দিলেন। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীও এই সকলের একাংশমাত্র। ময়মনসিংহ, ঢাকা, রঙ্গপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে ইংরেজদের জমিদারী এখনো আছে। কোন কোন স্থানে সাহেবেরা এদেশীয় রমণীর গর্ভে যে-সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহারা সেই সকল দখল করিয়া আছে। এই সকল ফিরিঙ্গীদের মধ্যে অনেকে সাধারণ কৃষিজীবী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারা সহজেই রেল ও জাহাজে চাকরী পায়। ইংরাজ সওদাগরদের আফিসেও ইহাদের আদর আছে।

ক্ষিপ্রতার সহিত নীলের কার্য্য করা হইত বলিয়া কুঠীয়ালরা লোকের উপর জুলুম করিয়া কার্য্য করিত। রাস্তায় লোক পাইলে উহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিত। বয়স্থ ও কার্য্যে অক্ষম ব্যক্তিরাও তখন বাড়ীতে থাকিতে পাইত না। নীলকরের লাঠিয়ালেরা উহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কাজে লাগাইয়া দিত। উহারা কিছু কিছু করিয়া পয়সা পাইত। সেখানে রান্না করিয়া উহাদিগকে খোরাকী দেওয়া হইত। যাহাদের জমিতে বলপূর্ব্বক নীল চাষ করিত সেই সকল প্রজাগণের জমিদার-সরকারের খাজানাটা উহারা চালাইয়াও কিছু বেশী দিত। প্রজাদিগকে উহারা জমি লইয়া নীলচাষের জন্য দাদন দিত। প্রজাদিগের নিকট মানুষ বেগার ত লইতই, তাহা ছাড়া হাল বেগার লইত। অনেক সময় প্রজারাই জমী চাষ করিয়া দিত, তদ্রূপভাবে দাদন দেওয়া হইত। কুঠীর দেওয়ান কর্ম্মচারীরা চাষের সময় বা নীল কাটার সময় স্বয়ং গিয়া জমী তদন্ত করিত। সময় সময় কুঠীর ম্যানেজার সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া বা বজরাতে চাপিয়া তদন্ত করিতে যাইতেন। সাহেব স্বয়ং না গেলে লোকে উহার গুরুত্ব বুঝিত না। এই সময় কুঠীয়ালের পাইকরা সাধারণ লোকের উপর জুলুম করিত। কেহ কেহ ইহাদিগকে ঘুষের পয়সা দিয়া নিষ্কৃতি পাইত। যাহারা নীলকরদিগের সঙ্গে মিলিয়া তাহাদের চাকরী করিয়াছে তাহারাও প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়াছে। সাহেবদের অত্যাচারে এই সময় দেশমধ্যে একটা প্রবল হাহাকার চলিয়াছিল।

নীল প্রস্তুতের সময় সাহেবেরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িত। তাহাদের কর্ম্মচারিগণেরও নাওয়া-খাওয়ার সময় ঠিক ছিল না। নীল প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় চালান হইয়া গেলে তাহারা বিশ্রাম পাইত। সাহেবেরা আপনাদের অপরাধ ঢাকিবার জন্য সময় সময় জেলায় গিয়া রাজপুরুষদিগকে ভোজ দিত। আর মধ্যে মধ্যে থানায় ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদিগকেও ভোজ দিত। ইহা ছাড়া তাহাদের বেতন দেওয়া হইত। নীলের চাষ বাঙ্গলা হইতে উঠিয়া গেলেও বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এখনো তাহার চাষ চলিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি সে-সকল স্থানে অত্যাচার করিবার সুবিধা সাহেবদের নাই। সাহেবদের নীলের ব্যবসা ভারতে আর চলিবে না। এখন সাহেবেরা চা-এর ব্যবসায় মনযোগ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য ব্যবসাও তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু নীলের ব্যবসায়ে যেরূপ প্রচুর অর্থার্জ্জন হইত অন্যান্য ব্যবসায় সেরূপ হইতেছে না।

নীল অনেককেই লাল করিয়াছে। প্রবলপ্রতাপশালী অত্যাচারী সাহেবদের সঙ্গে থাকিয়া যাহারা প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়াছে তাহাদের বিত্ত-সম্পত্তি এখনও অনেকের নিকট পরিচিত রহিয়াছে। যাহারা লোকের উপর যত অধিক জুলুম করিয়াছে তাহারাই তত অধিক অর্থার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন আর এদেশে নীলের চাষ সম্ভব হইবে না, তাই সকলেই হাত গুটাইয়া ব্যবসান্তর গ্রহণ করিয়াছে। নীল প্রস্তুতের সময় সারি বাঁধিয়া কুলিরা গান করিতে করিতে কাজ করিত। এই সময় অনেকে সাহেবদিগকে গালাগালি করিয়া গান বাঁধিয়া কাজ করিত। ইহাতে সাহেবরা চটিতেন না বরং হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। এইরূপ রঙ্গরসময় বিদ্রূপাত্মক গান যাহারা ভাল বাঁধিতে পারিত তাহাদিগকে বেতন দিয়া রাখা হইত। নীলচাষের গান ও নীলের কুলিদের গান এখনো মাঝে মাঝে গ্রাম্য প্রাচীন লোকের কাছে

শুনিতে পাওয়া যায়। নীলকুঠীর স্মৃতিচিহ্ন এখনো স্থানে স্থানে ভগ্নাবস্থায় বা ইষ্টকস্তূপাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক কুঠীই পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি নদীগর্ভে পতিত হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। নীলের অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিয়া এখনো প্রাচীনেরা তরুণের মনে আতঙ্ক জাগাইয়া দিয়া থাকেন।

"এভারেষ্ট" ও গৌরীশঙ্কর

শ্রী সত্যভূষণ সেন

হিমালয়ের অন্তর্গত "এভারেষ্ট" গিরিশৃঙ্গ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ। এই পর্ব্বত-শৃঙ্গের কোনো বাংলা নাম নাই। এপর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণে ইহাকে বাংলাতেও "এভারেষ্ট" বলিয়াই জানিতেন। অধুনা এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টার ফলে বাংলা সাহিত্যেও নানা প্রকার আলোচনার প্রসঙ্গে ইহার নাম উল্লিখিত হইতেছে এবং সেই সকল স্থলে ইহাকে অনেকেই "গৌরীশঙ্কর" বা "গৌরীশৃঙ্গ" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বাংলা ভূগোলে বোধ হয় সকলেই ইহাকে গৌরীশঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করেন।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "এভারেষ্ট" "গৌরীশঙ্কর" নয়। আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে * নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে "গৌরীশঙ্কর", এভারেষ্ট" হইতে দূরে স্বতন্ত্র একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ—উহার উচ্চতাও "এভারেষ্ট" হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট কম। এই ভুল প্রচলনের মূল কোথায়, তাহাও ঐ প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম। আমার ঐ প্রবন্ধ লেখার ফলে কোন আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া জানি না; কিন্তু দেখিতেছি যে, ভুল হইলেও দেশীয় নামের মোহ এখনও ঘোচে নাই—বাংলা সাহিত্যে "গৌরীশঙ্কর" নামই প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি 'প্রবাসী'র ন্যায় পত্রিকায়ও ঐ ভুলই চলিতেছে, বিশেষত যে-পত্রিকায় আমার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ ছাপান হইয়াছিল।

যাঁহারা আমার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ পড়িয়াও এবিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য আরও আধুনিক এবং ওয়াকিবহাল প্রমাণ দিতেছি। সুইডেনের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক স্বেন হেডিন্ * (Dr. Sven Hedin) হিমালয় পর্য্যটন করিয়া এইসকল বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। আমি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ লেখার পরে হেডিন্ সাহেবকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, "গৌরীশঙ্কর" এভারেষ্ট হইতে স্বতন্ত্র একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ। —"Gaurisankar is another peak than Mount Everest—"

তার পরে এবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিপক্ক খবর পাইবার অভিপ্রায়ে আমি বিলাতের ভৌগোলিক মহাসভার (Royal Geographical Society of London) নিকট এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া যে-পত্র লিখি তাহার উত্তরে তাঁহারা আমাকে জানাইয়াছেন যে, "গৌরীশঙ্কর" "এভারেষ্টের' পশ্চিম দিকে অনেকখানি দূরে অবস্থিত একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ "Gaurisankar is many miles west of Mount Everest. This was first determined by Major Wood of the Survey of India and has been confirmed by the Mount Everest Expeditions." আমি আমেরিকার ভৌগোলিক

* প্রবাসী, মাঘ ১৩২৫

* ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। সুইডেনের যে সংসদ হইতে Noble Prize দেওয়া হয় ইনি সেই Swedish Academyর একজন সদস্য।—লেখক।

মহাসভার (American Geographical Society of New York) নিকটও পত্র লিখিয়াছিলাম। তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, এসম্বন্ধে বিলাতের ভৌগোলিক মহাসভাই সর্ব্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহারা এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং ওয়াকিবহাল তাঁহারা একমত হইয়া বলিতেছেন যে, "এভারেষ্ট" "গৌরীশঙ্কর" নয়—"গৌরীশঙ্কর" সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ। এখন আমরা যদি এভারেষ্টকে অহেতুকীভাবে "গৌরীশঙ্কর" বলিয়াই চালাইতে থাকি তবে তাহাতে আমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, "গৌরীশঙ্কর" যখন স্বতন্ত্র একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে তখন এভারেষ্টের জন্য একটা বাংলা নামাকরণের চেষ্টা করা হউক। আমার সেই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকার অধিবেশনে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা হয় নাই। আমি এই সুযোগে আবার বিষয়টির প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এভারেষ্টের জন্য নূতন নামকরণ সম্ভব না হইলেও অন্ততঃ যাহাতে ভুলটার সংশোধন হয় অর্থাৎ এভারেষ্টকে আর কেহ গৌরীশঙ্কর বা গৌরীশৃঙ্গ বলিয়া অভিহিত না করেন সে-বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত—বিশেষতঃ যাঁহারা ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

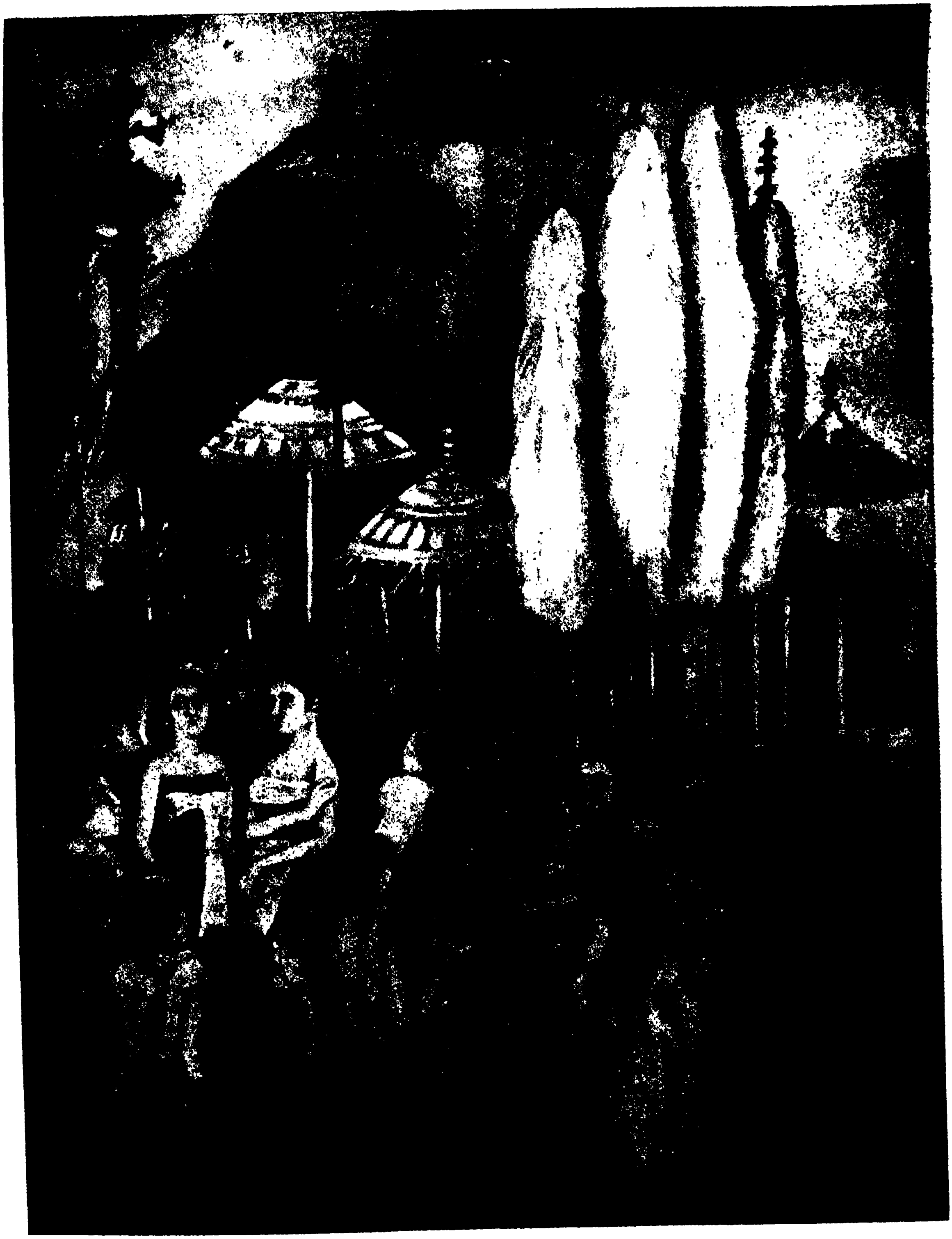
এভারেষ্টকে বাংলা সাহিত্য এবং ভূগোলেও "এভারেষ্ট" বলিয়া চালাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না, কারণ মুখে মুখে এখনও "এভারেষ্ট" নামই প্রচলিত; শুধু লিখিত ভাষায়ই কোন কোন স্থলে "গৌরীশঙ্কর" আসিয়া পড়িতেছে।

শিল্পের মর্য্যাদা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শিল্পের মর্য্যাদা নির্ভর করে সে কি বলিতেছে তাহার উপর, না কেমন করিয়া বলিতেছে তাহার উপর—অর্থ-গৌরবের উপর, না রচনা-সৌষ্ঠবের উপর? দুই দলের দুই মত। একদল বলিতেছে, শিল্পের রীতিই সব; আর একদল বলিতেছে, তা কেন, বস্তুই সব। শুকের দল বলিতেছে রীতিই আত্মা, বস্তু জড় উপকরণমাত্র; শারীর দল বলিতেছে বস্তুই আত্মা, রীতি বাহিরের কাঠাম মাত্র, ভাব না ভঙ্গী, প্রকৃতি না আকৃতি, ওজন না গড়ন—'রস' না 'রূপ' ও বলিব কি?—কোন্‌টি প্রধান কথা, কোন্‌টি কায়া আর কোন্‌টিই বা ছায়া?

বস্তুবাদী যাঁহারা তাঁহারা বলিতেছেন হাল্‌কা বা চুট্‌কি বিষয় লইয়া উঁচুদরের শিল্প কিছু গড়া চলে না—সর্ব্বত্রই দেখি শিল্পী যত বড়, তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয়ও তত গুরু ও গম্ভীর। উদ্ভট-কবিতায় রচনা-চাতুর্য্য আছে, তাই বলিয়া তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। বরং দেখি ঠিক এই অর্থ-গৌরবের তারতম্য হিসাবেই মহাকবিদের মধ্যে মর্য্যাদার ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালিদাস হইতে ব্যাস-বাল্মীকি বড়, আবার ব্যাস-বাল্মীকি হইতেও বেদ উপনিষদের কবি বড়। কারণ শকুন্তলা মেঘদূত হইতেছে ঐহিক ভোগসুখের আলেখ্য, রামায়ণ মহাভারত বলবীর্য্যের বৃহৎ প্রয়াসের আদর্শপরায়ণতার চিত্র,আর বেদ-উপনিষদ হইতেছে আধ্যাত্মিক সাধনার রহস্য। আমাদের আদিকবি চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া আসিতেছেন কেন? রচনা-সৌষ্ঠবই যদি কাব্যের প্রধান কথা হইত, তবে বিদ্যাপতিকেই তাঁহার উপরে স্থান দেওয়া হইত। চণ্ডীদাস বড় কারণ, ভাগবত প্রেমের যত গভীর কথা তিনি বলিয়াছেন আর কেহ তাহা বলে নাই। অতদূরেই বা যাইতে হইবে কেন? আজ রবীন্দ্রনাথ একরকম জগতের কবিগুরু



বলীদ্বীপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

শিল্পী শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

হইয়া পূজিত, কোন্ গুণে? তাঁহার রচনা-চাতুর্য্য বিদেশীরা ত সম্যক্ উপভোগ করিতে পারে না, তবে তাহারা ভুলিল কি দেখিয়া? কারণ, রবীন্দ্রনাথ এমন একটা আধ্যাত্মিক অনুভবের জগৎ খুলিয়া ধরিয়াছেন, এমন একটা সুন্দরের চেতনা জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন যাহা আর কোথাও আমরা পাই নাই। শুধু রূপ বা গড়নের দিক্ দিয়া মদনমোহনের—

উঠ শিশু. মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহনিবেশ।

আর রবীন্দ্রনাথের—

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন পরে অন্তিম নিমেষ।

এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? উভয়ের কাঠাম ঠিক একই অথচ কবিত্বগুণে উভয়ের একই মর্য্যাদা কেহ দিবে না। কেন, শুধু অর্থ-গৌরবের পার্থক্যের জন্য নয় কি? মধুসূদনী ছন্দে হাঁক দিয়া বলিতে পারি—

হঠাইয়া দিব যত পাষণ্ড ইংরাজে।

কিন্তু তাহাতে মধুসূদনের বস্তু সম্বন্ধ নাই বলিয়াই ত তাহা হাসির জিনিষ? ছাঁচ এক হইলে কি হইবে—একই ছাঁচে সোনাও ঢালিতে পারি আবার কাদাও গুলিতে পারি। জিনিষের দাম ছাঁচে নয়, সার পদার্থে।

শিল্পে চাই পদার্থ, বস্তু-সম্বন্ধ—অর্থাৎ চাই দর্শন, তত্ত্ব, সমস্যা-নির্ণয়, সত্য বিচার,—অর্থাৎ শিল্পী হইতেছেন প্রচারক, উপদেষ্টা, দিশারী, নেতা; অন্য কথায়, শিল্পের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হইতেছে লোকশিক্ষায়, সমাজের কল্যাণ সাধনে, মানুষের নৈতিক উন্নয়নে। এই রকমে শিল্পে যাঁহারা খুঁজিয়াছেন পদার্থ তাঁহারা শিল্পকে টানিতে টানিতে শেষটা স্কুল-মাষ্টারের সমাজ-সংস্কারকের হস্তে বেত্ররূপে তুলিয়া দিয়াছেন। ইব্‌সেন্ বা বার্ণার্ড শ'য়ের কাছে শিল্পসৃষ্টি সাধনার শাস্ত্র বা শস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ তাঁহারা বলিবেন, যে-শিল্প শ্রেষ্ঠ হইতে চাহে তাহাকে কেবল সুন্দর হইলেই চলিবে না, তাহাকে হইতে হইবে সত্য ও মঙ্গল; শ্রেষ্ঠ শিল্প কেবল প্রেয়ই নয়, তাহা আবার শ্রেয়। তাই ত কোরাণ, বাইবেল, আবেস্তা, গীতা, বেদ, উপনিষদ সকল সাহিত্যের সেরা সাহিত্য। রাফাএলের মাদোনা বা ভারতের নটরাজ কি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির যে তুলনা নাই, তাহারও হেতু এইখানে। শিল্প যেখানে শীল-নীতি ধর্ম্ম শিক্ষাদীক্ষার অনুগত হইয়া চলিয়াছে সেইখানেই তাহার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিব্যক্তি। কিন্তু যে শিল্প স্বাধীন 'স্বতন্ত্রী' হইয়াছে, চাহিয়াছে কেবল সুন্দরকে কিন্তু সুন্দরকে মঙ্গলের সেবক করিয়া ধরিতে পারে নাই, তাহা অনিবার্য্য অবনতির, ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, শিল্পীকেও তাহা কখন স্বস্তি আনিয়া দেয় নাই। গ্রীসের শেষযুগে, রোমকের শেষযুগে বাইজান্তিনের (Byzantine) শেষযুগে বিলাসীর শিল্প-সৃষ্টি এই কথারই কি প্রমাণ দিতেছে না? ব্যক্তিগত ভাবে, ইংরাজের অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) ও ফরাসীর পিয়ের লুইস্ (Pierre Louys) কেবল সৌন্দর্য্যের পূজা করিতে করিতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই দারুণ পরিণাম কি একই শিক্ষা দিতেছে না?

এই গেল এক দিক্‌কার কথা। প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, শিল্পের বিষয় কি, শিল্পের দিক হইতে সেটি অবান্তর প্রশ্ন। শিল্পীর শিল্প নির্ভর করিতেছে তিনি কি কথা বলিয়াছেন তাহার উপর নয়, কিন্তু যে-কথা বলিয়াছেন তাহা সুষ্ঠু করিয়া বলিতে পারিয়াছেন কি না তাহার উপর, তা যে কথাই হউক না কেন। বিদ্যাসুন্দর হইতে অন্নদা-মঙ্গলই যদি বরণীয় হয় তবে কবিত্বের জন্য নয়। বিষয়ের মর্য্যাদা দিয়াই যদি কবিত্বের মর্য্যাদা হইত, পঞ্চদশীর মত কাব্য ত্রিভুবনে মিলিত কি না সন্দেহ। আর উপনিষদের কবিকে কি রামায়ণের কবিকে যদি শৃঙ্গারতিলক বা মেঘদূতের কবি হইতে কবি-হিসাবেই উচ্চাসন দেই তবে উপনিষদ রামায়ণে সুমহান্ সদুপদেশের জন্য নয়; তাহার কারণ উপনিষদে রামায়ণে সৃষ্টি-চাতুর্য্য, গড়নরূপন ভঙ্গীই চমৎকার, অতুলনীয়। তবে বিষয়ের গভীরত্ব গম্ভীরত্ব এই দিকটা আমাদের চোখে সেখানে ঢাকিয়াই ফেলিয়াছে; চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্য এমন (ভগবৎ) প্রেমের কথা বলিয়াছেন সেইজন্য নয়, কিন্তু (ভগবৎ) প্রেমের কথা এমনভাবে বলিয়াছেন, সেইজন্য। শিল্পী বুদ্ধ-মূর্ত্তিকেও আঁকিয়াছেন, মিথুনমূর্ত্তিকেও আঁকিয়াছেন সমান পক্ষপাত-শূন্য হইয়া, বিশেষ ব্যক্ত যে আধার তাহা সৌন্দর্য্যলীলার

আশ্রয়মাত্র। সেই সৌন্দর্য্য যতখানি পরিস্ফুট ততখানি সেই আধারের মর্য্যাদা—তাই গান্ধারের বুদ্ধমূর্ত্তি বা রবিবর্ম্মার শিবের শিল্পহিসাবেই কোনই মূল্য নাই; ধার্ম্মিকের চক্ষে তাহা যতই পূজ্য, এমন কি সুন্দরই বলিয়া বিবেচিত হউক না।

ফলতঃ, শিল্পে যে আমরা সত্যের মঙ্গলের স্থান বা প্রাধান্য চাই, সে দাবী মানুষের শিল্পবোধের দিক্ হইতে নয়, তাহা হইতেছে মানুষের ধর্ম্ম ও নীতিবোধের কথা। জীবনে মানুষের মধ্যে এই দুইটি দিক্ ওতঃপ্রোতঃ জড়িত, সুতরাং একের প্রয়োজন যে অন্যটির স্কন্ধে সে চাপাইয়া দিবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ ব্যবহারের দিক্ হইতে সর্ব্বসাধারণের কাছে ধর্ম্মের নীতির ক্ষেত্রটাই চোখের সম্মুখে বৃহৎ হইয়া জাগিয়া আছে—সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র তাহার চেতনার গৌণ দিক ' তাই ধর্ম্মের মানদণ্ড কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রের জন্যই নয়, ঐ মানদণ্ডে আমাদের জাগ্রত চেতনা এত অভ্যস্ত যে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও উহাই ধরিয়া আমরা মাপ করি, বিচার করি। কিন্তু সমাজে বর্ণসঙ্করের ন্যায় ইহা চেতনায় বৃত্তিসঙ্কর। সৌন্দর্য্যের পূজারী যিনি তিনি সৌন্দর্য্য-জিজ্ঞাসায় ধর্ম্মবোধকে নৈতিকতাকে পৃথক করিয়া সরাইয়া রাখিবেন, শুধু তাঁহার নির্জ্জলা সৌন্দর্য্যবোধ দিয়াই সৌন্দর্য্যের বিচার করিবেন; তখন তিনি দেখিবেন না জিনিষটি ভাল কি মন্দ, সত্য কি মিথ্যা—তিনি দেখিবেন শুধু তাহা সুন্দর কি অসুন্দর। শিল্পসৃষ্টিতে যাহা বস্তু বা বিষয় তাহা বড়-জোর বিশেষ একটা রসের জোগান দিতে পারে, কিন্তু সেই রস রূপের মধ্যে সে-হিসাবে ও যতখানি শরীরী হইয়া উঠিতেছে সে-হিসাবেও ততখানিই তাহা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেছে। রসসৃষ্টি করাই যদি শিল্পের লক্ষ্য বলিয়া ধরা হয়, তবে বলিব বস্তুগত রস নয়, কিন্তু রূপগত যে রস, সুন্দর রূপই যে রস জাগাইয়া ধরিতেছে তাহাই শিল্পে উদ্দিষ্ট রস। এই যে রূপের পিপাসা ইহারই প্রেরণায় ব্রজ-গোপীদের মত কবিরাও কুলশীল সব ভাসাইয়া দিয়াছেন, এই যে সৌন্দর্য্যের উপর অহেতুকী টান, চিত্তের এই যে রঞ্জিনী বৃত্তি শিল্পীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কবির ভালবাসা কোন্ পাত্রে গিয়া পড়িতেছে তাহা আসল কথা নয়, আসল কথা এই ভালবাসার স্বরূপ। ঔপনিষদিক সত্য হউক আর প্রাকৃত সত্য হউক কবির চিত্ত উভয়কেই সমানভাবে রঞ্জিত অর্থাৎ সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। সুতরাং কালিদাসের মতই বলি—

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং

অথবা উপনিষদের মত বলি—

কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা

বিদ্যাপতি ঠাকুর যে কহিতেছেন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মেলি গেল

আর রবীন্দ্রনাথ যে কহিতেছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি

সৌন্দর্য্য-রচনার দিক হইতে উভয়েরই সমান মর্য্যাদা; বিষয়ের গুরু-লঘু-তারতম্যে একটিকে ব্রাহ্মণের আর একটিকে শূদ্রের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

এইরকম যুক্তির উপর ভর করিয়াই আজকাল এক শ্রেণীর শিল্পী দাঁড়াইয়া উঠিতেছেন; তাঁহারা art for art's sake এই সুপ্রাচীন মন্ত্রটি একেবারে চূড়ান্ত টানিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছে এখন বিশুদ্ধ শিল্প (pure art), অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিল্পের ধারা আপনার বৈশিষ্ট্যকে ধরিয়াই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য গড়িয়া তুলিবে। অন্য শিল্পের নিকট হইতে কি অন্য কোন ক্ষেত্র হইতে কোন রকম পরধর্ম্ম ধার করিতে যাইবে না। এক সময় ছিল যখন, শিল্পে শিল্পে বিভিন্ন চারুকলার সম্মেলনেই শিল্পী তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইতে চাহিয়াছেন। Wagnerএর প্রতিভা—সঙ্গীত ও কবিতার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনে। কাব্যচিত্রের ও ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য, চিত্রে কাব্যের সৌন্দর্য্য, ভাস্কর্য্যে চিত্রের সৌন্দর্য্য—এই রকমে সকলের সহিত সকলকে মিলাইয়া-মিশাইয়া শিল্পীরা এতদিন রূপসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কথা উঠিয়াছে—তাহা নয়, প্রত্যেকে আপনার স্বাতন্ত্র্য অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিবে, কেবল আপন স্বধর্ম্ম ধরিয়া চলিবে, নিজের সত্তার গণ্ডী যেটুকু তাহারই মধ্যে নিজের বিশেষত্বটি যে যত ফলাইয়া ও খেলাইয়া তুলিবে তাহারই তত কৃতিত্ব। চিত্রকর যিনি, পটুয়া যিনি, তাঁহার উপকরণ হইতেছে রং ও রেখা; সুতরাং কেবল রংএর ও রেখার লীলা-খেলার কি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া

উঠিতেছে তাহাই তিনি দেখাইবেন। রেখার সরল বক্র এলায়িত গতিতে কি ছন্দ, রেখায় রেখায় মিলিয়া কত রকমের সুন্দর রেখায় আকার সব গড়িয়া তোলে, আকারে আকারে মিলিয়া কত সঙ্গত সৃষ্টি করে, আবার বর্ণের সমাবেশে বৈপরীত্যে কত রকমারি মেলা বসিয়া যায় এই হইতেছে চিত্রকরের কাজ। নতুবা রং-এর ও রেখার সহায়ে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা একটা ঘটনা, একটা বিশেষ বস্তু কিছু চিত্রিত করিতে হইবে, এমন কোন প্রয়োজন নাই। বরং ঐ রকম অবান্তর চেষ্টাতে রং ও রেখা মুক্ত স্বচ্ছন্দ অমিশ্র সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না। বস্তুকে প্রকাশ করিতে গিয়া নিজের বিশুদ্ধ রূপটি ফলাইয়া ধরিতে পারে না। সেই-রকম সঙ্গীতেও চাই কেবল সুরের খেলা, ধ্বনির নৃত্য—কথার সহিত ধ্বনিকে যত জুড়িয়া দিতে চাহিব কিম্বা একটা স্পষ্টভাব কিছু ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব, ধ্বনি তত আড়ষ্ট ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, নিজস্ব সৌন্দর্য্য তত কম অনায়াসে সে ব্যক্ত করিতে পারিবে। স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যেও চাই কঠিন পদার্থকে ধরিয়া শুধু রেখাপাতের আয়তন (volume) সন্নিবেশের কৌশল। বিশেষ আকার আমি যাহাই গড়ি না কেন, তাহা বুদ্ধের মূর্ত্তি হউক বা ভিনসের মূর্ত্তি হউক অথবা লতাপাতা, আলিপনা হউক তাহাতে শিল্পমর্য্যাদার কোন ব্যতিক্রম হয় না। সকল শিল্পই মূলত হইতেছে মণ্ডনের শিল্প (Decorative art)।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা একটু কঠিন। কাব্যের উপকরণ বাক্য; বাক্যের সৌন্দর্য্য দেখান অথবা সৌন্দর্য্যকে বাক্যের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া বাঙ্ময় করিয়া ধরা হইতেছে কাব্যের সমস্ত প্রয়াস। কিন্তু বাক্যের বস্তু হইতেছে অর্থ—এখানেও যদি বস্তুকে একান্ত বাদ দিয়া তবে বাক্যাবলীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে হয় তবে অর্থকেই বাদ দিতে হয়। তবুও এই দুঃসাহসের চেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নয়—তখন পাই অর্থের পরিবর্ত্তে অক্ষরের ঝঙ্কার, শব্দকে আশ্রয় করিয়া ছন্দের তালের অলঙ্কারের কারিগরি। এই ভাবের ভাবুক হইয়াই কবি পাল্কীর, রেলগাড়ীর, চরকার বাঙ্ময় রূপ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।* এই পথে চলিয়া যদি কেহ একদিন বলিয়া বসে যে, ছন্দের সূত্রই হইতেছে আদর্শ অর্থাৎ নির্জ্জলা বিশুদ্ধ কাব্য তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার নয়। কারণ কাব্য হইতে অন্যান্য অবান্তর ভাব বা রস বাদ দিয়া কেবল যদি কাব্যগত সৌন্দর্য্যটুকু—নীর বাদ দিয়া ক্ষীরটুকু যদি গ্রহণ করি তবে অবশিষ্ট কি থাকে? সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য যদি উপভোগ করিতে চাই তবে কালিদাসের—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারাপ্রমত্তঃ

শুনিয়া কোন লাভ নাই, যক্ষের বিরহব্যথা অতি অবান্তর কথা, কবিত্ব হিসাবে এখানে যাহা সুন্দর উপভোগ্য তাহা হইতেছে যে কাঠামে বা ছাঁচে এই সব কথা গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে, সুতরাং আসল সেরা কাব্যের কাব্য হইতেছে—

মন্দাক্রান্তাম্বুধিরস ন গৌ র্মৌ তনৌ তৌ গযুগম্

এ যেন বাহিরের ইন্দ্রিয়লভ্য নানা নামরূপ অতিক্রম করিয়া কাব্যের সমাধিগূঢ়-স্বরূপ—তদেব বস্তুমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যম্ ইত্যাদি!

তবে আশা, কাব্যের কঙ্কাল পূজা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে এমন কবি-কাপালিক সচরাচর বড় বেশী দেখা যায় না।

কিন্তু আসল কথা এই, বস্তুর ও রূপের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের বৈপরীত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, তাহা হইতেছে মতবাদের কথা অর্থাৎ একটা সত্যকে অতিমাত্র করিয়া ভুলিবার ফল, একচোখে দেখিবার ফল। নতুবা বস্তুর ও রূপের সম্বন্ধ হইতেছে আত্মার ও দেহের সম্বন্ধ। বস্তু ছাড়া রূপ এবং রূপ ছাড়া বস্তু বলাও যা, আত্মা ছাড়া দেহ

*আর এক শ্রেণী অবশ্য অর্থকে চাপা দিয়া রাখিতে চাহিতেছেন, অর্থের উপরে উঠিয়া যাইবার জন্য ব্যক্ত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া অব্যক্ত ভাবের সন্ধানে। বাক্য তাঁহারা ব্যবহার করিতে চাহেন কেবল ইঙ্গিতরূপে, গৌণ-আশ্রয় অবলম্বন রূপে। তাঁহাদের কাছে স্পষ্ট অর্থের ত কোন মূল্যই নাই, বাক্যেরও মূল্য বাক্যের মধ্যে নয়—কিন্তু বাক্য যতখানি নির্ব্বাক হইতে পারিতেছে, পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে, ব্যঞ্জনার জল্পনার জন্য ফাঁকের আকাশের সৃষ্টি করিতে পারিতেছে, ততখানিই তাহার সার্থকতা। কিন্তু ইঁহারা মোটেও রূপবাদীদের দলে নহেন। বরং ইঁহারা আরও ঘোর বস্তুবাদী। তবে ইঁহাদের বস্তু সুঠাম, পূর্ণ পরিণতি না হইয়া, আর-এক ধরণের—

কি পুছসি অনুভব মোয়।

এবং দেহ ছাড়া আত্মা বলাও তা। একটিকে বাদ দিয়া আর একটির সার্থকতা নাই; বাদ দেওয়া ত দূরের কথা কোন একটিকে প্রধান করিয়া তুলিলেও ওজন ঠিক রাখা যায় না। আত্মাকে একান্ত অত্যন্ত ও অতিরিক্ত করিয়া ধরার ফল শঙ্করাচার্য্য; আর দেহকে একান্ত অত্যন্ত অতিরিক্ত করিয়া ধরার ফল চার্ব্বাক—উপনিষদের মতে দু জনেই—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি।

শিল্পগত যে সৌন্দর্য্য-রচনা তাহাতেও চাই এই দুইএর সংযোগ ও সম্মিলন। রূপ ভিন্ন বস্তুকে অর্থাৎ কেবল তত্ত্ব বা সত্যকে ধরিয়া দেখান শিল্পের কাজ নয়, তাহা হইতেছে দর্শনের বিজ্ঞানের কাজ; আবার বস্তু ভিন্ন শুধু যে রূপ তাহাও শিল্প নয়, তাহা হইতেছে ব্যাকরণ। সুরূপের মধ্যবস্তুকে প্রকটমূর্ত্তি করিয়া ধরা ইহাই ত শিল্পরচনার সনাতন সহজ রহস্য।

তবে যে-তথ্যটি আমাদের চেতনায় সচরাচর ধরা দেয় না, যাহা আমরা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করি না, তাহা হইতেছে বস্তুর ও রূপের কেবল সমন্বয় সামঞ্জস্য নয়, তাহাদের চরম ঐক্য ও একত্ব। সাধারণ দৃষ্টিতে বস্তু ও রূপ দুটিকে দুই পর্য্যায়ের জিনিষ বলিয়া মনে হয় এবং একটিকে অপরটি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু দৃষ্টিকে যদি গভীরে লইয়া চলি, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের তর্কের ক্ষেত্র সব ডিঙ্গাইয়া পিছনে নিভৃততর চেতনার মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকি তবে দেখিব আপাতদৃষ্টিতে যাহা 'বস্তু' ও রূপ এই দুই পৃথক জিনিষ, তাহা ক্রমে সালোক্য সামীপ্য ও মনুষ্যের দিকে চলিয়াছে, আস্তে আস্তে পরস্পরের নিকট হইতে নিকটতর হইয়া মিলিতে চলিয়াছে; শেষে এমন এক জায়গায় পৌছি যেখানে উভয়ের পৃথকত্ব আর থাকে না, তাহারা হইয়া যায় অভিন্ন অখণ্ড—এক-মেবাদ্বিতীয়ম্। এই যে লোকে যে-চেতনার স্তরে জিনিষের আকার ও প্রকার, নাম ও রূপ পার্ব্বতী পরমেশ্বরের মত সম্পৃক্ত হইয়া আছে সেই লোক, সেই চেতনা হইতেই আসিতেছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিপ্রেরণা।

শিল্পে স্থূলমনে, মোটা অনুভূতিতে যে বস্তু আমরা চাই তাহা হইতেছে বস্তুর ত্বকমাত্র। তত্ত্ব, নীতিকথা, সদুপদেশ, অলোচনা, জিজ্ঞাসাবাদ এই সবই বস্তুর স্থূল বা উপরকার দিক লইয়া ব্যাপৃত—এহ বাহ্য। আমাদের মস্তিষ্কের, তর্কবুদ্ধির বা ব্যবহারিক জীবনের সংস্পর্শে সত্য যে ধরণের বস্তুটি লইয়া দানা বাঁধে, তাহা শিল্পীর বস্তু নয়। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পী যে বস্তুকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিবেন এমন কথা নাই—শিল্পীর বস্তু হইতেছে এই সকল বাহ্য খোলসের অন্তরালে রহিয়াছে, প্রত্যেক বস্তুর বা ঘটনার যে সনাতন যে অন্তরতম সত্তা, জিনিষ যেখানে শুধু "আছে",আছে আপনার আনন্দে—অস্তি ভাতি —অর্থাৎ তাহার স্বরূপে, সেখানে রূপই জিনিষের বস্তু, কারণ তাহার বিশেষ রূপটিই তাহার সত্যকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে। রূপ সেখানে প্রসাধন, অঙ্গসৌষ্ঠব, এমন কি,দেহমাত্র নয়—রূপ অর্থপ্রকাশ, জিনিষের প্রথম জন্মগ্রহণ। সত্তার বৈশিষ্ট্যই স্বরূপ, স্বরূপের স্বচ্ছন্দ-প্রকাশই স্বরূপ। সেখানে সত্যকে গলাবাজী করিয়া কোন রকম তত্ত্বকথা প্রচার করিতে হয় না, সেখানে সত্যের থাকিবার ঢঙ, চেতনার চলিবার ভঙ্গীই হইতেছে শ্রীমান, সুন্দর ও কল্যাণময়।



ছেলেদের খাবার

একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ ও সুবিধা এই ছিল যে, একজনের বোঝা দশ জনে হাসিমুখে বহিতেন—তাহাতে সংসার করা সুখের হইত এবং সেই সংসারে থাকিয়া শিক্ষাও যথেষ্ট হইত। এখন যে যার স্বতন্ত্র; একা গৃহিণী হওয়ার সুখও যত, অসুবিধাও তত। পূর্ব্বে অল্পবয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ হইত; শিশু-মাতারা বর্ষীয়সী আত্মীয়াদের দ্বারা নিজ শিশুর ভরণপোষণ করাইয়া লইতেন এবং তাঁহাদের দেখিয়া নানারূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিতেন। এখন নিজ সংসারে একা গিন্নী হওয়ার, প্রতি হাতে ঠেকিয়া ঠেকিয়া, অনেক রকম বোকামির মাশুল দিয়া, তবে তাঁহারা দশটি ছেলের মধ্যে পাঁচটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন এবং সে মানুষ করা কি প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষ করা?

এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার একটি মস্ত কুফল এই যে, ঐ শিক্ষায় যতটা না হউক, ইংরাজদের মুখের বুলির চোটে, আমরা যাহা কিছু নিজস্ব, তাহাকে ঘৃণা করি ও যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাকে ভাল বলিয়া আঁকড়াইতে যাই।

আমরা পূর্ব্বে শুধু গায়ে থাকিতাম—সারাদিন প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র ও বায়ু সেবন করিতাম। তাহার ফলে আমাদের রোগ-বালাই এক-রকম ছিল না। এখন আমরা পয়সা খরচ করিয়া সার্সী আঁটিয়া ভগবদ্দত্ত রৌদ্র ও বাতাসকে বারণ করি এবং সভ্যতার খাতিরে সারাদিনই জামাজোড়া পরিয়া ও ছাতা ব্যবহার করিয়া রৌদ্র-বাতসকে দূরে রাখি,—কাযেই এখন আমরা নিত্যই ব্যারামে পড়ি।

আমরা অন্নভোজী—আকাঁড়া অথবা আতপ চাউলই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ইংরাজ ধব্‌ধবে মাজা চাউল সম্মুখে ধরিল—আমরা বিনা বিচারে তাহাকেই গ্রহণ করিলাম। এইরূপ করার ফলে দেশকে ও দেহকে দীন করিয়াছি।

দুধ এ দেশের লোকের প্রধান খাদ্য ছিল। এমন ভদ্রগৃহস্থ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কমই ছিলেন, যাঁহার গৃহে ১০।১৫টা দুগ্ধবতী গাভী থাকিত না। এখন চা খাইয়া, কথায় কথায় সন্দেশ খাইয়া, কাজে-কর্ম্মে ক্ষীর-দৈএর শ্রাদ্ধ করিয়া এবং অপর দিকে বৃষোৎসর্গ করা তুলিয়া দিয়া গো-চারণের ভূমিতে প্রজা-বিলি করিয়া লাভ খাইতে যাইয়া, কসাইকে গরু বিক্রয় করিয়া, গো-সেবাটাকে হীনতার পরিচায়ক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া—আজ দেশে ভাল জাতির গরু নাই, পর্য্যাপ্তসংখ্যক গরু নাই—দুধের দুর্ভিক্ষ! অথচ এই দুধে যত শীঘ্র ও যত সহজে মানুষের শিশু হইতে বৃদ্ধের যেমন শরীর গড়ে, তেমন আর কোনটিতে হয় না। দুধের সঙ্গে দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। অথচ, ঘৃতহীন অন্ন, হীন অন্ন; বিনা ঘৃত অন্ন-ভোজনে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

জন্ম হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—দেহের গঠন কার্য্য ও পুষ্টি ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রত্যহ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করার জন্য দেহের ক্ষয় হয়; সেই ক্ষয়েরও পূরণ করা চাই। দেহের পুষ্টি ও ক্ষয়পূরণ মাত্র এক জাতীয় খাদ্য-দ্রব্য হইতে হয়; সে জাতীয় খাদ্যকে ইংরাজীতে "প্রোটীন্" বা "প্রোটীড্" জাতীয় ও বাঙ্গালায় আমিষজাতীয় খাদ্য বলা হয়। মাংস, ডিম্ব, ডাইল, ছাতু, বেশম, ছানা, দুধ, মাছ এই শ্রেণীভুক্ত। কাযেই পাঁপর, বড়ি, বড়া, ধোঁকা, গুটি, বরবটি, কলাইশুটি, ছোলা প্রভৃতি এই দলে পড়ে। বাল্যকাল হইতে যৌবনের শেষ পর্য্যন্ত এই সকল খাদ্য অতীব প্রয়োজনীয়।

কচি-ছেলেরা মাংস সহজে পরিপাক করিতে পারে না এবং বুড়া বয়সে মাংস একবারে নিষ্প্রয়োজন, কারণ, বুড়াবয়সে শরীর গড়িবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলেই ১০।১২ বৎসর বয়স হইতে ২৫।৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাংস খাওয়া চলিতে পারে।

মাংসভক্ষণে শরীরের যে উপকার হয়, নিত্য প্রচুর পরিমাণে দুধ পান করিলেও ঠিক সেইমত উপকার হয়। ডিম মাংসাপেক্ষা লঘু আহার, যদি না বেশী করিয়া সিদ্ধ ও মসলাযুক্ত হয়।

শারীরিক শ্রমের জন্য "শালি" জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। চাউল ও চাউল হইতে প্রস্তুত সকল খাদ্য, শাক, পাতা, কন্দ, মূল, ফল, ইক্ষু, খর্জ্জুর ও বীটপালম হইতে প্রস্তুত যাবতীয় মিষ্টরস—ইহারা সকলেই এই "শালি" শ্রেণীভুক্ত।

স্নেহজাতীয় খাদ্যও শারীরিক শ্রমসাধনে সহায়তা করে। ঘি, তেল, মাখন, চর্ব্বি এইজন্য সকল দেশেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শালিজাতীয় খাদ্য হইতে যত শীঘ্র শরীরের উত্তাপ সৃষ্ট হয়, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ হইতে তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে ও শীঘ্র দেহের উত্তাপ জন্মে।

যতদিন দাঁত না উঠে ততদিন মাতৃ-স্তন্যই শিশুর প্রধান খাদ্য। তাহার পরে, মাতার স্বাস্থ্য ভাল হইলে, আরও ২।১ বৎসর স্তনের দুধ দিতে পারেন। অথবা নিজ স্তনদুগ্ধ বন্ধ করিয়া, ছাগী বা গোদুগ্ধ অন্ততঃ এক সের করিয়া প্রত্যহ খাওয়ান চাই।

পিতামাতার পক্ষে খুব যত্ন করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দুইবার দাঁত উঠে—একবার জন্মের পর ছয় মাস বয়সে এবং দ্বিতীয়বার প্রায় ছয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে। এই দুই বয়সে দন্ত উদ্গত হইলেও, ঐ কালের বহুপূর্ব্ব হইতেই শিশুর চোয়ালের মধ্যে দাঁতের জন্ম হইয়া থাকে। বাস্তবিক বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ছয় মাস বয়সে দুধে দাঁত উঠিলেও, গর্ভাবস্থায় শিশুর দাঁত তৈয়ারী হইয়া থাকে; এবং ছয় বৎসর বয়সে যে দাঁত "বাহির" হয়, শিশুর ছয় মাস বয়সের পূর্ব্বেই সেই স্থায়ী দাঁতগুলির অঙ্কুর চোয়ালের মধ্যে "জন্মিয়া" ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। কাযেই গর্ভের প্রথম দিন হইতে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর মাতাকে ও শিশুকে

যেমন খাওয়ান হইবে, সেই হারেই তাহার দাঁত ভাল বা মন্দ হইবে।

আমরা পুত্রের বিবাহে নারদের নিমন্ত্রণ করি, সকলকেই ভূরি-ভোজন করাই—কিন্তু পুত্রবধূর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য ও খাদ্যের বিষয়ে অবহিত নহি।

আমাদের গৃহস্থের ঘরের বধূরা অন্তঃসত্ত্বা হইলে লুকাইয়া কেহ হাঁসের ডিমের ডালনা, কেহ উড়িয়ার দোকানের জঘন্য ফুলুরি খাইয়া, কেহ বা বাসি "ক্ষীরের খাবার" খাইয়া দেহের উপরে অত্যাচার করেন। কয়টি গৃহে শাশুড়ী, ননদ অথবা স্বামী অন্তঃসত্ত্বা বধূর রুচি, স্বাস্থ্য ও দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য নিত্য যোগান? শুধুই কি তাই? খুব ধুমধাম করিয়া "সাধ-ভক্ষণ", "দ্বিতীয়-বিবাহ", "ষষ্ঠী-পূজা" প্রভৃতির উৎসব হয়, কিন্তু কি বধূ কি তাহার গর্ভস্থ সন্তান কাহারও স্বাস্থ্যের জন্য এতটুকু উৎকণ্ঠা দূরে থাকুক, অনুসন্ধিৎসারও আভাস পাওয়া যায় না। কাজেই আমাদের দেশে গর্ভিণীরা নানা রোগের আকর হইয়া থাকেন, প্রসবের সময়ে বা পরে ইহলীলা সাঙ্গ করেন অথবা জীবন্মৃতা হইয়া সূতিকা প্রভৃতিতে ভোগেন এবং বহু শিশু জন্মিয়াই মরিয়া যায়।

এক বৎসর বয়স হইতে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর খাদ্য এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই:—

(ক) প্রত্যহ অন্ততঃ এক সের খাঁটি গো বা ছাগীদুগ্ধ খাওয়া চাই।

(খ) প্রত্যহ কোনও টাট্‌কা ফল খাওয়া চাই। যে-দিন কিছুই না জুটিবে, সে-দিন পাতি বা কাগজীলেবুর রস গুড় দিয়া খাইবে।

(গ) প্রত্যহ কিছু কিছু শাক খাওয়া চাই। চিবাইয়া ভাজা শাক না খাইলে, ঝোলে প্রচুর পরিমাণে শাক দিয়া, সেই শাককে নিঙড়াইয়া তাহার রসটা ঝোলের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া চাই। ছেলেরা যেন এই ঝোলটা চুমুক দিয়া খায়।

(ঘ) এ বয়সে মাছ ও কখনও কখনও কাঁচা ডিম্বের কুসুমটা খাওয়ান ভাল। মাংস যত কম খাওয়ান যায়, ততই ভাল।

(ঙ) প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে খালি গায়ে রৌদ্র সেবন করান চাই।

(চ) চিনির পরিবর্ত্তে গুড়, ময়দার পরিবর্ত্তে জাঁতায় সদ্যো-ভাঙ্গা আটা এবং অবস্থায় কুলাইলে, শিশুবয়স হইতেই পুরাতন ভাল (চিনি-শর্করা, গোবিন্দভোগ ইত্যাদি) আতপ চাউল খাওয়াইতে অভ্যাস করান ভাল। পাতে সামান্য একটু ঘি বা মাখন রোজ খাওয়া খুব ভাল।

(ছ) দোকানের খাবার বিষবৎ ত্যাগ করা চাই। তৎপরিবর্ত্তে খৈ, মুড়ি, মুড়কি, বিস্কুট, ঘরের তৈয়ারী লুচি, রুটি, মোহনভোগ; ছোলা সিদ্ধ মুগের ডাল ভিজান, ছোলা ভিজান (কল বাহির করা), চীনা-বাদাম, আখরোট, বাদাম, কলাইশুটি (কাঁচা বা সিদ্ধ); কিস্‌মিস্, মনকা, খোবানি, খেজুর; সময়ের ফল—জাম, জামরুল, আনারস, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, ফুটি, খরমুজ, শশা, তরমুজ, কলা, বিলাতী বেগুন, পেঁয়াজ (কাঁচা), কমলা লেবু, বাতাবি লেবু, পেয়ারা, কুল, নাশপাতি, আঙুর, আপেল প্রভৃতি যাঁহার যেমন অবস্থা ও রুচি, তিনি তেমনই জলযোগের ব্যবস্থা করিবেন। তবে এইটুকু বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে, পেয়ারা, আখরোট, চীনাবাদাম, ছোলা, মটর প্রভৃতির নাম শুনিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন; অথচ এই জিনিষগুলি প্রাকৃতিক প্রেরণায় ছেলেরা খোঁজে। এই সকল জিনিষ খাইলে দাঁত চিরকাল থাকে, কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, অথচ ইহারা অত্যন্ত পুষ্টিকর, সস্তার খাবার।

(জ) অভ্যাস না করাইলে বালকরা তরীতরকারী খাইতে শিখে না। তাহারা তরকারীর মধ্যে আলুটাকে বাছিয়া খায়। এখানে বিশেষ করিয়া তরকারী রাঁধার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে চাই। আলু-পটোলই বল, শাক-পাতাই বল,—প্রত্যেক উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ফস্‌ফরাস্, আইওডীন, ক্যাল্‌সিয়াম, পটাশ প্রভৃতি ধাতব লবণ থাকে। সেই লবণগুলি উদরস্থ হইলে দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সাহায্য করে। যদি তরকারীকে কুটিয়া রাঁধিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তরকারীর ভিতরকার বেশীর ভাগ লবণ (সল্ট) ঝোলে চলিয়া যায়। অতএব তরীতরকারী খাওয়াইয়া ছেলেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করাইতে হইলে এই তিনটার মধ্যে একটা প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়:—(১) সকল তরকারীকেই খোসাশুদ্ধ রাঁধিতে হয় এবং ভোজনের সময় ছেলেরা খোসাশুদ্ধ চিবাইয়া তাহার ছিবড়া বা সিটাটা ফেলিয়া দেয়, তাহা দেখা; (২) অথবা এমনভাবে ছাড়ান-আনাজের তরকারী রাঁধিতে হয়, যাহাতে ঝোলটা সমস্তই তরকারীর গায়ে লাগিয়া থাকে; (৩) অথবা তরকারী খাইয়া বাটিতে যে ঝোলটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহা চাঁছিয়া পুঁছিয়া ছেলেদিগকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। আলু, পটোল, নাশপাতি প্রভৃতি "ভাতে দিতে" হইলে, আস্ত দেওয়াই উচিত। তরকারীর খোসাটাকে চিবাইয়া খাইলে দাঁত সাফ হয়, প্রচুর পরিমাণে ভাইটামীন উদরস্থ হয় এবং অপচয় হয় না।

(ঝ) আমরা ভাতের ফেনটাকে ফেলিয়া দিই এবং অর্থব্যয় করিয়া বিলাতী সাগু-বার্লি খাওয়াই। ভাতের ফেনটাকে লবণ ও লেবুর রস এবং অল্প গুড় সংযোগে সরবৎ করিয়া খাওয়াইলে দেহের যথেষ্ট পুষ্টি হয়। অথবা জলের পরিবর্ত্তে ফেনে কিছু কিছু তরকারী দিয়া ঝোল রাঁধিয়া ছেলেদিগকে খাওয়ান উচিত।

(ঞ) কচি ছেলেদিগকে যে কোনও খাদ্য বা পেয় দেওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটির গন্ধ শুঁকিয়া ও "চাকিয়া" দেখিয়া তবে তাহাদিগকে খাইতে দিতে হয়। এরূপ না করিলে পচা মাছ, বাসি দুধ প্রভৃতি তাহাদের পেটের মধ্যে যাইয়া অসুখ আনিতে পারে।

(ট) অনেক বাড়ীতে এমন অভ্যাস আছে যে, যে যখন খাইতে বসে, তখনই কচি ছেলের মুখে যা' তা' তুলিয়া দেয়। এ অভ্যাসটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অপকারী।

(ঠ) কচি ছেলেরা সাধারণতঃ ভাল করিয়া চিবাইয়া খায় না, এজন্য প্রত্যেক ছেলের মাতার কর্ত্তব্য, নিজ সন্তানকে স্বয়ং বসিয়া খাওয়াইবেন।

(ড) ছেলেদের খাবারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে ৬৷৭টায়, দুপুরে ১০৷১০॥টায়, বৈকালে ৩৷৩॥টায়, সন্ধ্যা ৭৷৭॥টায় এবং কোন কোন স্থলে রাত্রি ৯৷১০টায় খাওয়াইতে হয়।

(ঢ) রৌদ্রসেবনটা "খাদ্য" কথার মধ্যে যথার্থ স্থান পাইবার উপযুক্ত না হইলেও, উহাকে খাদ্যকথার মধ্যে স্থান দেওয়া অত্যন্ত সমীচীন বোধ করিয়াছি। তেমনিই খাদ্যকথার মধ্যে শিশুদের মলত্যাগের কথারও উল্লেখ থাকা চাই। প্রত্যেক শিশুর মল প্রত্যহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে জননী নিজ সন্তানের নিত্য কতবার কতখানি ও কিরূপ মলত্যাগ হইল, তাহার যথাযথ সংবাদ না লয়েন, তিনি কর্ত্তব্যের অবহেলা করেন।

(মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৫) শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

রামের বারোমাসী

রামের বারোমাসী ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। পল্লীগ্রামের বিবাহোৎসবে ও অন্য অনেক প্রকার শুভ অনুষ্ঠানের সময় ইহা অতীব সমাদরের সহিত গীত হইয়া থাকে।

অযোধ্যার প্রমোদকানন ছাড়িয়া রামচন্দ্রের বনবাস গমন ও ইহার আনুষঙ্গিক অনেক প্রকার সুখ-দুঃখই এই বারোমাসীর প্রতিপাদ্য বিষয়। সুখ-দুঃখ-বিজড়িত পল্লীজীবনের অনুরূপ ঘটনায় ইহা একদিকে যেমন পল্লীবাসীদের অন্তরে ধৈর্য্য আনয়ন করে, অপরদিকে তেমনি ইহার মধ্য দিয়া তাহাদের নিজ মনোভাবের পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

মাঘ না মাসেতে রামরে বনবাসে যায়।
অভাগিনী রামের মাগো কান্দিয়া বেড়ায় ॥
রাজা অইতা রাজ্য লইতা মনে ছিল সাধ।
কেকই মা পাষাণী অইয়া ঘটায় পরমাদ ॥
আহা পুত্র রামচন্দ্র কৌশল্যানন্দন।
কিরূপে রইলা বনে তোমরা তিন জন ॥
ফাল্গুন মাসেতে রামরে মনে উঠে রোল।
গোকুলে গোবিন্দ নাই কে করিবে দোল
চৈত্রি না মাসেতে রামরে যুধিষ্ঠির ধরাণ।
কেমতে রইব ঘরে মায়ের পরাণ ॥
বৈশাখ মাসেতে রামরে বসি বৃক্ষতলে।
পঞ্চসুখে ধেনু মায়ে তুল্যা লইলা কোলে ॥
এইত না মাসেতে রামরে গাছে কচি পাতা।
অভাগিনী মায়ের তোমার মনে জাগে কথা ॥
জ্যৈষ্ঠিনা মাসেতে রামরে গাছে পাকে আম।
কে মোরে আনিয়া দিব নবগুণ শ্যাম ॥
যে আমারে আইন্যা দিব নবগুণ শ্যাম।
অযোধ্যার অর্দ্ধেক রাজ্য তারে করবাম দান ॥
আষাঢ় মাসেতে রামরে ঘন বরিষণ।
কাষ্ঠের কটরায় আছ তোমরা তিনজন ॥
শ্রাবণ মাসেতে রামরে বৃষ্টি পড়ে ধারে।
পশুপক্ষী রোদন করে বস্যা তরুডালে ॥
ভাদ্র না মাসেতে রামরে গাছে পাকে তাল।
কেমতে হাটিবা রামরে পায়ে ফুটব শাল ॥
আশ্বিন মাসেতে রামরে দুর্গাপূজা দেশে।
অবশ্য আসিবা রামরে দুর্গারে পূজিতে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে রামরে রাণীর চোখ হ'ল অন্ধ।
যারে দেখে তারেই বলে আইস রামচন্দ্র ॥
অগ্রাণ মাসেতে রামরে সবে নয়া খায়।
অভাগিনী রামের মাগো কান্দিয়া বেড়ায় ॥
পৌষ মাসেতে রামরে পুষ্প অন্ধকার।
যামিনী লইয়া আইল রাম রঘুনাথ ॥

(সৌরভ, আশ্বিন ১৩২৫) শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়

—

পল্লীগঠনের উপায়

পল্লীসংস্কারককে নিজের চিত্তকে প্রথম দৃঢ় করিতে হইবে। "এক মনে এক প্রাণে নিজ নিজ জন্মপল্লীগুলিকে নিশ্চয়ই সংস্কার করিয়া পল্লীজননীর রোগশোকক্লিষ্ট মলিনমুখে আবার হাসির রেখা ফোটাইব", ইহা শপথ করিতে হইবে; সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে "সাধু কার্য্যে বাধা অনিবার্য্য, সেইসকল বাধাবিঘ্নে কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইব না।"

পল্লীবাসিগণকে একতাবদ্ধ করিতে হইবে। এই একতাবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে।

প্রথম সকলের সহিত ভাল করিয়া মিশিতে হইবে। কাহার কিরূপ মনের ভাব—কে কিরূপ চাহে, কি করিলে সন্তুষ্ট হয়, সেই-সকল বিষয় তীক্ষ্ণরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহার পর যে যেরূপ চাহে, সেইরূপ ভাবে তাহাকে কার্য্য-তালিকায় নাম লিখিতে হইবে। তখন দেখিবেন যে, প্রত্যেক কার্য্য-তালিকায় কতকগুলি করিয়া কর্ম্মী পাওয়া যায়। ঐ যে এক-একটি কর্ম্মীদল গঠিত হইল, উহাদিগকে তখন পল্লীসংস্কারের এক-একটি বিভাগের কর্ম্মের ভারার্পণ করিতে হইবে এবং ঐ সকল কর্ম্ম যাহাতে সুচারুরূপে চলে তাহার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।

পল্লীগ্রামে ভেদাভেদের প্রচলন বড়ই দেখা যায়। একটি গ্রামে সাধারণতঃ অনেক জাতির বাস হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, বাগ্দি প্রভৃতি অনেক ইতর ও ভদ্রলোক বাস করেন। কিন্তু এই জাতিগত পার্থক্যের জন্য পরস্পর পরস্পরে এক সঙ্গে, এক ভাবে প্রায়ই কোনো কার্য্য করেন না। পল্লীর উন্নতিসাধন করিতে হইলে সকল পল্লীবাসীদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সহযোগিতা করিতে হইবে—পরস্পর পরস্পরকে সমান চক্ষে দেখিতে হইবে—"অমুক লোক বাগ্দি—অমুক লোক হাড়ী, তাহাদের সহিত কিরূপে এক সনে, এক আসনে কাজ করা যায়' এরূপ মনের গতি হইলে কোন কার্য্য করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ঐ যে "ইতর ভদ্রের" ইতর জাত উহারাই এখন আমাদের পল্লীগঠনের প্রধান সাহায্যকারী। ভদ্রসন্তানগণ সুখের কোলে লালিত-পালিত। দৈহিক পরিশ্রম করিতে হইলেই, প্রায়ই তাঁহাদের উদ্যম হ্রাস হইয়া আসে, এবং তাহার ফলে গঠনের অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

পল্লীগঠন-কার্য্যের প্রধান সহায়ক সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। এই জিনিষটি আমাদের পল্লীগ্রামে বড়ই অভাব এবং তাহারই ফলে গ্রামগুলির এই দারুণ দুর্গতি। শিক্ষার অভাব প্রযুক্ত এই সাধারণের মধ্যে হিতাহিত-জ্ঞান খুব অল্প।

যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয় তজ্জন্য প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, এবং সেই বিদ্যালয় যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই শিক্ষাদান যাহাতে ইতর ভদ্র সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে হয়, সে-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রেণীগত পার্থক্য যেন কাহারও মনে না আসে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকেও সে-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতে হইবে এবং যাহাতে ইতর শ্রেণীর ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য উহাদের মধ্যে শিক্ষার উপকারিতা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইতে হইবে, এবং ঐ শ্রেণীর মধ্যে যদি কেহ সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য করিতে হইবে এবং তাহাদ্বারা তাহাদের জাতির মধ্যে শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইবার ভারার্পণ করিলে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের আরও সুবিধা হইবে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া বালিকা বিভাগ খোলা উচিত। ঐ বিভাগে কি ইতর কি ভদ্র সর্ব্বশ্রেণীর বালিকাগণকে সমানভাবে শিক্ষাদান করিতে হইবে এবং তাহার ফলে ঐ বালিকাগণ যখন জননীরূপে পরিগণিত হইবেন তখন, শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া স্ব স্ব সন্তানগণকে, শিক্ষিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিতা হইবেন।

পল্লীবাসিগণ অর্থাভাব প্রযুক্ত কোন কার্য্য সুচারুরূপে করিতে সক্ষম হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্য্যে প্রথম কিছু খরচ না করিলে, তাহার ফল আশাজনক হয় না। আর এই কৃষি-কার্য্যের উন্নতি না হইলে দেশের অর্থসমস্যারও মীমাংসা হইবে না। পল্লীগ্রামে যে-সকল মহাজন আছেন, তাঁহারা প্রায়ই অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার দেন—যে-সকল কৃষক টাকা ধার লয়—যদি কোন কারণে কৃষিকার্য্যের বিঘ্ন ঘটে, তাহা হইলে প্রায়ই আসল টাকা শোধ দেওয়া'ত দূরে থাকুক, সুদের টাকা তাই শোধ হয় না, এ অবস্থায় ঐ সকল মহাজনগণ তখন টাকা আদায়ের জন্য, তাহাকে গৃহহীন পথের ভিখারী করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। এক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এক একটি "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি"—খোলা উচিত। দেশের ইতর ভদ্র ১৫ জন একত্রে একটি সমিতি গঠন করিয়া, বঙ্গীয় সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার বাহাদুরের নিকট উক্ত সমিতিকে রেজিষ্টারীভুক্ত করিতে আবেদন করিলে, উক্ত রেজিষ্ট্রার বাহাদুর, সমিতি গঠনের সমুদয় সাহায্য করিয়া রেজিষ্টারী করিয়া দিবেন। এবং সমিতি রেজিষ্টারী হইলে, সেই জেলার সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য উক্ত ব্যাঙ্কে আবেদন করিতে হইবে। আবেদন মঞ্জুর হইলে, উক্ত ব্যাঙ্কের সেয়ার বা অংশ খরিদ করিতে হইবে। অংশ খরিদ করা হইলে, ঐ যে গ্রাম্য-সমিতি উক্ত সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে খুব অল্প সুদে টাকা ধার পাইবেন এবং গ্রাম্য-সমিতির বাৎসরিক পরিচালন খরচা কত হইবে তাহা, ও সেণ্ট্রাল সোসাইটির সুদ ধরিয়া একত্রে যে টাকা হইবে, সেই হারে সুদ ঠিক করিয়া, কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কৃষকদিগকে ঋণদান করা উচিত। অবশ্য যাহাতে কৃষকশ্রেণী ঐ গ্রাম্য সমিতির অধিকাংশ সভ্য হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং ইহার সুদের হার অল্প হওয়ায় কৃষকদের পরিশোধের জন্য তত কষ্ট পাইতে হইবে না।

(সোনার বাংলা, ভাদ্র ১৩৩৫) শ্রীকালীকুমার মিত্র

—

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির ইতিবৃত্ত

যে-জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতে বসিয়াছি, এই জাতির বাস উত্তরবঙ্গের মাত্র চারিটি জেলায় দৃষ্ট হয়, যথা—জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও কোচবিহার। আশ্চর্য্যের বিষয়,—এই চারিটি জেলা ছাড়া অন্য জেলার লোক রাজবংশীজাতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত নহে।

এই জাতি সাধারণতঃ আর্য্যাবর্ত্তের ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। রামায়ণোক্ত 'সগর' রাজার সময়ে একদল সমাজচ্যুত ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রদেশে সম্ভবতঃ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রাচীন পৌণ্ড্রদেশ প্রাচীন করতোয়া নদীর উত্তরপারে অবস্থিত ছিল। উত্তরকালে যখন বহু ক্ষত্রিয় পরশুরামের ভয়ে ভীত হইয়া 'জল্পেশ মহাদেও' বা বর্ত্তমান জলপাই-গুড়ী অঞ্চলে আসিয়া বাসস্থাপন করিতে লাগিল, তখনই ইহারা আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে সকলেই নিজ নিজ বৃত্তি, ধর্ম্ম ও ভাষা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আদিম অধিবাসিগণের সহিত মিশিয়া গেল।

ডাঃ গ্রিয়ার্সনের মতে রঙ্গপুর জেলায় বহু প্রাচীনকালে হিন্দু উপনিবেশ বিদ্যমান ছিল, কারণ মহাভারতে 'করতোয়া' ও 'লোহিত্য' (রঙ্গপুর জেলার পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র) নদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু এই জেলা বহুকালাবধি 'ক্রোঞ্চা' বা 'কুচবেহার' রাজ্যের অধীন ছিল এবং 'ক্রোঞ্চা' শব্দ 'ক্রুষ্টা' বা কাপুরুষ শব্দের অপভ্রংশ; যেহেতু তৎকালে ক্ষত্রিয়গণ বৈদিক উপাসনার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া পার্ব্বত্য দেবতার উপাসনায় মজিয়া গিয়াছিল।

আবার মিঃ রিজ্‌লি রাজবংশী জাতির মুখাবয়ব দর্শনে ইহাদিগকে কোচজাতির বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, এই জাতি সম্ভবতঃ প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের শরীরে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ আছে।

মিঃ গেইট বলিয়াছেন, "প্রকৃত কোচগণ মঙ্গোলীয় জাতি হইতে উদ্ভূত; উদাহরণ স্বরূপ আসামবাসী কোচগণের কথা ধরা যাইতে পারে। রাজবংশী জাতিও গোড়ায় দ্রাবিড়দিগেরই একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণী বা সম্প্রদায় ছিল; কিন্তু গ্রামে বহুধা বিভক্ত হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান থাকায় তাহারা যখন হিন্দুসমাজে আসিয়া মিশ্রিত হইয়া গেল, তখন তাহারা মানাস নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী কোচনামে গৃহীত হইল। ঐ নদীর পূর্ব্বতীরে প্রকৃত রাজবংশী নামক কোনও জাতির বাস ছিল না এবং 'কোচ'গণ প্রবল জাতি বলিয়া জাতিগত নাম পরিবর্ত্তন না করিয়াই হিন্দুসমাজে গৃহীত হইল।"

তবকত্‌-ই, নাশিরী গ্রন্থের মতে উত্তরবঙ্গের অধিবাসিগণ কোচ্‌, মেচ্‌ এবং থারুদিগেরই বংশধর। ইহাদের আকৃতির সহিত দক্ষিণ সাইবিরিয়ার অধিবাসীদিগের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তিন শতাব্দী পরে আইন-ই-আকবরী বর্ণনা করিয়াছে—"কামরূপের অধিবাসিগণ 'প্রিয়দর্শন' ছিলেন। কালক্রমে অন্যান্য জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে তাঁহাদের মুখাবয়বের এই মঙ্গোলীয় বিশেষ লক্ষণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে।"

মিঃ ডাজ্‌ এই জাতির মধ্যে চ্যাপ্টা নাসিকা ও মুখমণ্ডল, চওড়া কাণ ইত্যাদি দর্শনে এই মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন যে, রাজবংশী জাতির মধ্যে আর্য্যরক্তের অপেক্ষা মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় রক্তের সংমিশ্রণই বেশী পরিমাণে আছে।

কোন কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও জাতিতত্ত্ববিৎ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণকে কোচ জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ডাঃ হাণ্টার ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ এরূপ মনে করেন যে, কোচ দলপতি হাজো কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য অধিকার করিলে এদেশে কোচদিগের প্রাধান্য প্রথম পরিলক্ষিত হয়। হাজোর দৌহিত্র বিশু (বিশ্ব) সিংহের রাজত্বকালে রাজা নিজে অমাত্যাদিসহ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও কোচ অভিধা পরিহারপূর্ব্বক রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বসু মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাজবংশী যে কোচ হইতে সম্পূর্ণ একটি পৃথক জাতি ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত বৈষম্য বর্ণনা করিয়াছেন :—

(১) আকৃতি—বর্ণ ও শারীরিক গঠনাদি।

(২) [illegible]

(৩) ধর্ম্ম—উভয় জাতির ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রানুশাসনে ভক্তি বা অবহেলা।

(৪) আচার-ব্যবহার—উভয় জাতির মধ্যে প্রচলিত আচার ব্যবহারের আলোচনা।

(৫) আদিম কালের ইতিহাস—উভয় জাতির উৎপত্তির বিবরণ ও প্রাগেতিহাস আলোচনা।

(১) আকৃতি—আদিম কোচ কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার জাতি। পক্ষান্তরে অনেক রাজবংশী সুপুরুষ। কোচ ও রাজবংশীদিগের মধ্যে বিবাহ-বিষয়ক আদান-প্রদানে ও পরস্পরের আচার ও ব্যবহারাদির অনুসরণে এই দুই জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে সমতা সংঘটিত হইয়াছে। অনেক রাজবংশীর সুন্দর আর্য্য-সুলভ আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) ভাষা—ভাষায়ও কোন কোন স্থলে উভয় জাতির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রাজবংশীদিগের প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত ও মৈথিল শব্দ হইতে উৎপন্ন। মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাই রাজবংশী ভাষারও মাতামহী; কিন্তু কোচ শব্দের ঈদৃশ ধাতুগত ব্যুৎপত্তি কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পিয়াস—পিপাসা; চিন্—চিহ্ন; পখী—পক্ষী; মোর—আমার; মোক্—আমাকে; গরা—গোরা, গৌর ইত্যাদি রাজবংশী শব্দ। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু কোচ শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক না হওয়ায় উহার উৎপত্তি নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ঝিৎ—চুপ কর; চাকুন্না—পঙ্গু; ডেক—কাঁকড়া, মাছের বড় পা; ত্যাড়াং ঝ্যাটাং—জীর্ণ ও ভগ্ন; আমু—ভগিনী-পতি; ছ্যাকা—ক্ষার ইত্যাদি কোচ শব্দ।

(৩) ধর্ম্ম—কোচগণ বিশু সিংহের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। রাজবংশীগণ পূর্ব্বাপর হিন্দু। পূজা বিষয়েও উভয় জাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহাকাল পূজা রাজবংশীরা করে না, কিন্তু কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুর রাজবাটীতে উহা প্রচলিত আছে। মদন বাঁশের পূজা আদিম রাজবংশীদিগের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না; তবে যাহারা কোচদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, অথবা অন্য প্রকারে কোচদিগের ধর্ম্ম ও আচারাদির অনুকরণ করিয়াছে, তাহারা মদন বাঁশের পূজা করিয়া থাকে। রাজবংশীদিগের পূজাদি মূলতঃ হিন্দুদিগের পূজাদি হইতে গৃহীত।

(৪) আচার-ব্যবহার—অনেক রাজবংশী শূকর কিংবা কুক্কুট মাংস আহার করে না, কিন্তু কোচেরা তাহা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে। তবে, 'শুট্‌কি' (শুষ্ক) মৎস্য ব্যবহারে উভয় জাতিরই সমতা পরিদৃষ্ট হয়। রাজবংশীদিগের সাধারণ উপজীবিকা কৃষি। তাহাদিগের আচার-ব্যবহার প্রধানতঃ হিন্দুদিগের অনুরূপ; তাহাদের স্পৃষ্ট জল অনেক হিন্দুই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কোচদিগের আচার-ব্যবহার প্রায়শঃ হিন্দুদিগের অননুমোদিত।

রাজবংশী জাতি যে রাজার অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর, এই অনুমানই সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এই দেশীয় রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) হিন্দুর প্রধান প্রধান দেব-দেবীর উপাসনার সহিত কতকগুলি গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রধান—'খোনারার' (বন্য জন্তুর দেবতা), 'হুতুমদেও' (বৃষ্টি-দেবতা), 'গোরক্ষনাথ' (গোপালকগণের দেবতা), 'মদনকাম' (জনন-দেবতা), 'বলরাম' (লাঙ্গল দেবতা) এবং 'বিষহরি' (সর্পদেবী) বিধবা-বিবাহ পূর্ব্বে এই জাতির মধ্যে সামান্য পরিমাণে প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজ-কাল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ইহা সমাজের পক্ষে দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। কারণ, উচ্চবর্ণের হিন্দু-সমাজে যেরূপ কন্যার সংখ্যা বেশী, পক্ষান্তরে নিম্নবর্ণের মধ্যে বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় সমাজে কন্যার সংখ্যা সেইরূপ কম। ফলে, একটি কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে পারিলে সে যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, পক্ষান্তরে অন্যান্য পুরুষগণ বিবাহই করিতে পারে না।

এই জাতির ভিতরে অধিকাংশই কৃষি-জীবী, সরলপ্রাণ, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। পোষাক, পরিচ্ছদ, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতা আদৌ নাই। বিবাহ ও অন্যান্য প্রকার অনুষ্ঠানাদি হিন্দুমতেই হইয়া থাকে। নারীগণ শঙ্খ, বলয় ও সিন্দূরে শোভিতা হইয়া থাকে এবং পোষাকের মধ্যে একখানা আট হাত ধুতি বক্ষদেশে জড়াইয়া গিরো দিয়া রাখে। পুরুষের মধ্যে যাহারা কৃষিজীবী তাহারা কৃষি-কর্ম্মের সময়ে প্রায়ই ধুতির পরিবর্ত্তে নেংটি পরিধান করে, কেবল যখন সহরে কিংবা মেলায় পাঁচজনের সম্মুখে বাহির হয়, তখন ধুতি ও জামা পরিধান করে।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র ১৩৩৫) শ্রী দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিনের যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের সৈন্য ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, কেবল প্রহরীরা সতর্ক হইয়া জাগিয়া রহিল; পাছে রাত্রে শত্রু গোপনে আক্রমণ করে। সন্ধ্যার পর সেনাপতির আদেশমত বেথর ও ভল্লধারীগণ সাবধানে আসিয়া সৈন্যদলে মিলিত হইল। দ্বিতীয় দিবস সকল সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবে, যাহাতে সেদিন যুদ্ধ শেষ হয় সে চেষ্টা করিতে হইবে।

বিমানসকল দূরে গিয়া অন্ধকার প্রান্তরে রক্ষিত হইয়াছিল, কেবল আরাতামা সৈন্যের নিকট কোথাও তলিতাকে গোপনে রাখিয়াছিলেন। রাত্রি এক প্রহর হইলে তিনি নাদিবকে দিয়া বেথরকে চুপিচুপি ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহাকে কহিলেন, আমি একবার বিশলাম যাইতেছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

বেথর বিস্মিত হইয়া কহিল, যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া এমন সময় নগরে কেন?

—আমার কিছু প্রয়োজন আছে। রাত্রে এখানে তলিতার কোন প্রয়োজন নাই; রাত্রি থাকিতেই আমি ফিরিয়া আসিব।

—সেনাপতির নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আসি।

—কোন আবশ্যক নাই। তিনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তর আমি দিব।

বেথর মনে করিল যদি বিশলাম নগরে যাওয়া হয় তাহা হইলে কোন্ না শেমিদার সঙ্গে দেখা হইবে! আরাতামার আদেশ পালন করিয়া সে খালাস। সে আর কোন আপত্তি করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া আরাতামা গিয়া তলিতায় আরোহণ করিলেন, বেথর ও নাদিব তাঁহার সঙ্গে গেল। আরাতামা স্বয়ং যন্ত্র চালাইবার স্থানে বসিলেন, বেথর ও নাদিব পিছনে বসিল। যন্ত্রে একবার অতি অল্প শব্দ হইল তাহার পর আর কোন শব্দ নাই। বৃহৎ বাদুড়ের মত শূন্যে উঠিয়া তলিতা অত্যন্ত বেগে চলিয়া গেল। যেদিকে শত্রু-সৈন্যের শিবির সেদিকে আরাতামা গমন করিলেন না। বিশলাম নগরের অভিমুখে সোজা চলিলেন। তলিতা অধিক উর্দ্ধে নয়, নীচে বন; গ্রাম, নদী, মাঠ, সব অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তলিতার গতিবেগ এত অধিক যে, যেন মনে হইতেছে নীচে সমস্ত লেপিয়া যাইতেছে। আকাশের বিশালতা অন্ধকারে আবৃত, উপরে ক্ষীণ চঞ্চলরশ্মি নক্ষত্রপুঞ্জ, বিচিত্র বেগের সহিত বায়ু ভেদ করিয়া তলিতা চলিয়াছে।

ক্রমে বিশলাম নগরের আলোক দূরে দৃষ্ট হইল। আরাতামা তলিতার বেগ মন্দীভূত করিলেন।

নগরের উপর দিয়া আরাতামা বিমান চালনা করিলেন না। দূর হইতে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া নিজগৃহের অভিমুখে গমন করিলেন। গৃহ হইতে দূরে তৃণসমাচ্ছন্ন সমতল ভূমির উপর তলিতা নিঃশব্দে অবতরণ করিল। আরাতামা নামিয়া বেথরকে মৃদুস্বরে কহিলেন,—তুমি আমার সঙ্গে আইস। নাদিবকে বিমানে বসিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। গৃহের বাহিরের দরজা ভেজান, কোন শব্দ নাই, যাহারা গৃহে আছে তাহারা বোধ হয় নিদ্রিত। আরাতামা ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া বেথরকে নীরব থাকিতে সঙ্কেত করিলেন। বিনা শব্দে দ্বার খুলিয়া আরাতামা ভিতরে প্রবেশ করিলেন, বেথর তাঁহার পশ্চাতে আসিল। যে-ঘরে আরাতামা একাকিনী বসিতেন আর কেহ প্রবেশ করিত না সেই ঘরের দিকে সাবধানে চলিলেন। দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে মনুষ্যকণ্ঠ শোনা যাইতেছে। কণ্ঠ চাপা, কথা বুঝিতে পারা যায় না, রাত্রি ও গৃহের স্তব্ধতায় কেবল কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। আরাতামা বেথরের কানের কাছে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন,—বলপূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া ফেল। একেবারের অধিক যেন বলপ্রয়োগ করিতে না হয়।

দুই দরজার মাঝখানে বাম স্কন্ধ রাখিয়া দুই পা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিয়া বেথর সবলে দ্বারে ঠেলা দিল। দ্বার সশব্দে ঝনাৎ করিয়া উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

ঘরে আলোক জ্বলিতেছে, জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ান, লোবান সমস্ত ওলট-পালট করিতেছে, পাশে দাঁড়াইয়া বাষ্টি।

লোবান ও বাষ্টীর প্রথমে মনে হইল কোন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে, অথবা ভৌতিক ছায়া। আরাতামা যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া এত রাত্রে বিশলাম নগরে তাঁহার গৃহে কেমন করিয়া আসিলেন? যুদ্ধে কি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি এমন সময় দেখা দিয়াছে?

আরাতামা গৃহে প্রবেশ করিয়া লোবানকে কহিলেন,—হাতিল, এমন সময়ে কি অভিপ্রায়ে তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ?

বাষ্টীর প্রতি আরাতামা দৃক্‌পাত করিলেন না। বিশালদেহ বেথর মুক্ত দরজার মধ্যস্থলে দাঁড়াইল।

লোবান ও বাষ্টীর ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। দুইজনে পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ।

হাতিল? লোবানের এ নাম ইতিপূর্ব্বে বেথর বা বাষ্টী কখন শুনে নাই। ইহার ভিতর কি রহস্য আছে? বাষ্টীর ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে, বেথর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে সময় যে-কেহ লোবানকে দেখিত সেই তাহাকে অপরাধী বিবেচনা করিত। এত রাত্রে চোরের মত অপরাধী ভিন্ন আর কে পরের গৃহে প্রবেশ করে? আরাতামার কথায় স্পষ্ট বুঝা গেল, লোবান নাম ভাঁড়াইয়া এ নগরে বাস করিতেছেন। তখন যদি লোবান বলিতেন প্রকৃত অপরাধী আরাতামা তাহা হইলে সে কথা কে বিশ্বাস করিত? আরাতামা নিজের নাম কাহারও নিকট গোপন করেন নাই, রাজা স্বয়ং তাঁহাকে সম্মান করেন, যুদ্ধের সম্বন্ধে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন, রাজ-কন্যা আরাতামার প্রিয় বন্ধু। লোবানকে কে চিনে? আরাতামার অবর্ত্তমানে রাত্রিকালে আরাতামার গৃহে প্রবেশ করিয়া পরিচারিকার সহায়তায় তিনি কি খুঁজিতেছেন? লোবান সকল কথা বাষ্টীকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু বাষ্টীর কথাই বা কে বিশ্বাস করিবে?

লোবান সাহস করিয়া কহিলেন,—আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমার নিজের সম্পত্তি খুঁজিতে আসিয়াছি।

আরাতামা অগ্রসর হইয়া লোবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার চক্ষের প্রতি চাহিলেন। লোবানের চক্ষু স্থির হইল, বাক্যস্ফুর্ত্তি রহিত হইল। আরাতামা একবার শুধু তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন, হস্ত অথবা অঙ্গুলি চালনা করিলেন না।

সেই অবকাশে বাষ্টী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। আরাতামা মুখ না ফিরাইয়াই বেথরকে কহিলন, বাষ্টীকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিও না, ও বন্দিনী। উহার বিচার পরে করিব।

বেথর দরজার দুই দিকে দুই বাহু বিস্তারিত করিয়া বাষ্টীর পথ রোধ করিল। সে ফিরিয়া ঘরের ভিতর যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে আবার দাঁড়াইল।

আরাতামা কহিলেন,—হাতিল, তোমার বিত্ত কোথায়?

—তোমার অধীন।

তুমি এখানে আসিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলে কেন?

—তোমার নিকট হইতে আমার পরিচয় গোপন করিবার জন্য।

—এখানে এখন কেন আসিয়াছিলে?

—তুমি সমস্ত হীরা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ খুঁজিবার জন্য।

—চোর বলিয়া তোমাকে এখন যদি ধরাইয়া দিই?

—আমি চুরী করিতে আসি নাই, নিজের সামগ্রী লইতে আসিয়াছি।

—তোমার সাক্ষী কে?

—জিমরাণ। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

—বাষ্টি আমার দাসী, সে তোমাকে গোপনে এখানে প্রবেশ করিতে দিয়াছে কেন?

—বাষ্টী আমার প্রতি অনুরক্ত, সেইজন্য সে আমার পক্ষে।

—তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইলে বাষ্টীর কি লাভ?

—সে আমার সঙ্গে যাইবে।

—তাহাকে তুমি কি আশা দিয়াছ?

—সে মনে করে তাহাকে আমি বরাবর আশ্রয় দিব।

—সত্য কথা কি?

—আমার কার্য্য উদ্ধার হইলেই আমি উহাকে পরিত্যাগ করিব। মিথ্যা আশা দিয়া উহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি।

বাষ্টী আর থাকিতে পারিল না। তবে রে মিথ্যাবাদী ভণ্ড চোর। বলিয়া চীৎকার করিয়া হাতিলের অভিমুখে দৌড়িল। বেথর এক হাতে বাষ্টীকে ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করিল, আর তাহাকে ছাড়িল না। বেথর অবাক্ হইয়া আরাতামা ও হাতিলের প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিল। বাষ্টীর চীৎকার হাতিল শুনিতে পাইল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

আরাতামাও বাষ্টীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় স্পষ্ট দৃঢ়স্বরে হাতিলকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—আমি তোমাকে আদেশ করিয়া

ছিলাম, বাষ্টী তোমার প্রতি যেমন অনুরক্ত, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ আসক্ত হইবে। সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছ?

—না, কিন্তু আমার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন তোমার আয়ত্ত আমার হৃদয় সেরূপ তোমার অধীন নয়। আমার হৃদয় তোমার আদেশে বাষ্টীর প্রতি অনুরক্ত হইবে না।

—তোমার নাগরিক সেনার বেশ কেন? কাহার পরামর্শে তুমি সৈন্যদলে ভুক্ত হইয়াছ? গালিমের?

—না, ফারেজের।

ফারেজের নাম শুনিয়া আরাতামার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হাতিলের মুখের সম্মুখে কয়েকবার ক্ষিপ্রবেগে হস্তচালনা করিলেন। যন্ত্রণার মুখ বিকৃত করিয়া হাতিল কহিলেন,—আমার বড় কষ্ট হইতেছে।

আরাতামা হস্ত সম্বরণ করিলেন। কহিলেন—আমার কথার যথার্থ উত্তর না দিলে তোমার যাতনা আরও বাড়িবে।

—যথার্থ উত্তরই দিতেছি।

—গালিম সৈন্যের অধ্যক্ষ। ফারেজ তোমাকে পরামর্শ দিতে গেলেন কেন?

—ফারেজ ত গালিমের পক্ষে নয়।

বেথর উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। বাষ্টীও নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া বিস্মিত হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল।

আরাতামা কিছু মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গালিম ত রাজার পক্ষে। ফারেজ কি রাজার পক্ষে নয়?

—না, তিনি শত্রু পক্ষে। আমিও সেই পক্ষে।

—বটে? তোমাদের মতলব কি?

—শত্রু আসিলে ফারেজ তাহাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে দিবেন। রাজকুমারী সাফিরাকে রাজপ্রাসাদে বন্দিনী করা হইবে। তাহা হইলে বিনাযুদ্ধেই রাজার পরাজয় হইবে।

—তাহাতে তোমার কি লাভ?

—আরাদ রাজ্য পাইলে ফারেজও আমাকে কোন উচ্চপদ দিবেন। তিনি তোমাকে বন্দিনী করিবেন, তাহা হইলে আমি জিমরাণের নিকট যেরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম তাহা প্রতিপালন করিতে পারিব।

—ফারেজ শত্রুপক্ষে কাহার সহিত পরামর্শ করেন? রুদেলা?

—ফারেজ আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলেন না, কিন্তু শত্রুপক্ষে রুদেলাই ত সর্ব্বেসর্ব্বা। গুপ্তচর আসে, ফারেজ নগরের বাহিরে গিয়া সঙ্গোপনে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

—যুদ্ধে যদি রুদেলার পরাজয় হয়?

—তাহা হইলেও বিশলাম নগর তাঁহার হস্তগত হইবে। এই নগর অধিকার করিবার জন্য কিছু সৈন্য তিনি স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন।

ঘরে গালিচা পাতা ছিল। সেই দিকে নির্দ্দেশ করিয়া আরাতামা হাতিলকে বলিলেন,—তুমি ঐখানে নিদ্রিত হইয়া থাক। আমি আদেশ না করিলে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।

হাতিল সেইখানে শয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলেন। আরাতামা বেথরকে কহিলেন,—তুমি উরীমকে এখানে পাঠাইয়া দিয়া গোপনে শীঘ্র গালিমকে ডাকিয়া আন। শেমিদার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকেও এখানে আনিবে; যেন বিলম্ব না হয়। রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বেথর চলিয়া গেল। আরাতামা বাষ্টীর দিকে ফিরিয়া, নিদ্রিত হাতিলের দিকে প্রদর্শনী অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া কহিলেন,—আমার সঙ্গে এ ব্যক্তির বিরোধ থাকিতে পারে, হয়ত মনে কর আমি ইহার অনিষ্ট করিয়াছি, কিন্তু তুমি সকল রকমে আমার কাছে উপকৃত, তুমি কেন এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ?

বাষ্টী ওষ্ঠাধর দৃঢ় করিয়া চাপিয়া, চক্ষের দৃষ্টি কঠিন করিয়া কহিল,—আমি কোন কথার উত্তর দিব না, তোমার যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে শাস্তি দাও।

আরাতামা মৃদু মৃদু হাসিলেন। সে হাসি বড় নিষ্ঠুর, বড় ভীষণ। সে হাসি দেখিয়া বাষ্টীর হৃৎকম্প হইল, কিন্তু মুখে সে ভয় প্রকাশ করিল না।

হাসিয়া হাসিয়া আরাতামা মৃদু মৃদু কহিলেন,—ইচ্ছা করিলেই আমি তোমাকে কথা কহাইতে পারি। আমার অনুগ্রহ অনেক দিন ভোগ করিয়াছ, এইবার আর এক

রকম ভোগ। আমি তোমাকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করিলে মৃত্যু শত গুণ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে হইবে।

হাতিলের নিদ্রিত মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাহার নির্ম্মম কথা স্মরণ করিয়া বাষ্টীর হৃদয় আরও কঠিন হইল। সে গর্ব্বিত ভাবে কহিল,—আমি ত বলিয়াছি তোমার কোন কথার উত্তর দিব না। ভয় দেখাইয়া আমার কি করিবে?

হাসিমুখে আরাতামা বাষ্টীর সম্মুখে গিয়া বস্ত্রের ভিতর হইতে একটি ছোট উজ্জ্বল ধাতুনির্ম্মিত ছড়ি বাহির করিয়া বাষ্টীর গালে আঘাত করিলেন। স্পর্শ অতি লঘু, আঘাতে কিছুমাত্র তীব্রতা ছিল না, কিন্তু স্পর্শ মাত্রেই বাষ্টী অসহ্য যন্ত্রণাসূচক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। একবার নয়, দুইবার তিনবার সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তধ্বনি রাত্রির অন্ধকার স্তব্ধতার বক্ষে শাণিত ছুরীর মত বিদ্ধ হইল। দ্বারদেশে আসিয়া উরীম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

বাষ্টীর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইয়াছিল, কয়েক বার চীৎকারের পর কণ্ঠ রুদ্ধ। আরাতামা তাহার মুখের দিকে মুখ বাড়াইয়া উন্নমিত-ফণা সর্পিণীর গরল নিঃশ্বাসের তুল্য কহিলেন,—এখন আমায় ভয় করিস্? আমার কথার উত্তর দিবি?

আরাতামা যেমন মুখ বাড়াইতেছিলেন বাষ্টীর দেহ ভয়ে সেইরূপ কুঞ্চিত হইতেছিল। কম্পিত স্বরে কহিল,—সকল কথার উত্তর দিব, আমাকে আর এরূপ যন্ত্রণা দিও না।

•

একটা পাশের ঘরে আরাতামা বাষ্টীকে বন্ধ করিলেন, উরীমকে কহিলেন, তুমি দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাক, বাষ্টী যেন পলায়ন করিবার চেষ্টা না করে।

অল্পক্ষণ পরেই বেথর ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে গালিম ও শেমিদা। গালিম আরাতামাকে কহিলেন,—যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া, আপনি যে এখানে! যুদ্ধের কি হইল?

আরাতামা কহিলেন,—যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই, প্রভাত হইলে আবার আরম্ভ হইবে। শত্রুর অনেক সৈন্য নিহত হইয়াছে, আমাদের জয় হইবে আশা করা যায়। এই নগরে গৃহ-শত্রু আছে, আপনি কি সে-সংবাদ রাখেন?

গালিম বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এ কথা আপনি কোথায় শুনিলেন? নগরে ত কোনরূপ আশঙ্কা নাই!

ঘরের এক পার্শ্বে নিদ্রিত হাতিলকে দেখাইয়া দিয়া আরাতামা কহিলেন,—ইহাকে দেখিয়াছেন?

গালিম নিকটে গিয়া দেখিলেন,—লোবান! বিস্মিত হইয়া কহিলেন—এমন সময় এ ব্যক্তি এখানে কেন! কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে?

আরাতামা কহিলেন,—ইহার নাম লোবান নয়, হাতিল। নাম ভাঁড়াইয়া এখানে বাস করিতেছে। ফারেজ ও এই ব্যক্তি মিলিয়া শত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে, আপনার অজ্ঞাতে শত্রু-সৈন্যকে নগরে প্রবেশ করাইবে, রাজকন্যাকে বন্দিনী করিবে, আপনার সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া নগর অধিকার করিবে। এই দেখুন লোবান অথবা হাতিল নিজ মুখেই সমস্ত স্বীকার করিবে।

আরাতামা ডাকিলেন,—হাতিল? উত্থান কর।

হাতিল উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুদ্রিত।

আরাতামা পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, হাতিল অকপটে সকল কথা বলিল। সকল কথা শুনিয়া গালিম বলিলেন, দেখিতে ইহাকে নিদ্রিত বোধ হইতেছে, ইহার চক্ষু মুদ্রিত অথচ আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। একি রহস্য?

আরাতামা কহিলেন,—বাহ্যিক ইহাকে নিদ্রিত দেখিতেছেন, কিন্তু ইহার অন্তরাত্মা জাগ্রত। আপনি যাহা শুনিলেন সকল কথা সত্য। আপনি অবিলম্বে ফারেজ ও তাহার পক্ষে যাহারা আছে তাহাদিগকে ধৃত করুন। তাহা হইলেই সকল কথা জানিতে পারিবেন। এই হাতিলকে আমার পরিচারিকা প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহাকে আমি আটক করিয়াছি। আপনি তাহাকেও বন্দিনী করুন। আমি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতেছি।

শেমিদাকে আরাতামা কহিলেন,—আমি যতদিন না ফিরিয়া আসি তুমি এইখানে থাকিবে। তোমার মাসিকেও এখানে আনিতে পার।

হাতিলের সম্মুখে গিয়া কহিলেন,—তুমি জাগ্রত হও।

হাতিল চক্ষু উন্মীলন করিয়া গৃহের চারিদিকে চাহিয়া

দেখিল। গালিম তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া কহিলেন, তুমি ষড়যন্ত্র অপরাধে বন্দী। ফারেজের সহিত মিলিত হইয়া তুমি এই নগর শত্রুহস্তে দিবার উদ্যোগ করিতেছ।

হাতিলের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, মুখে বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। গালিম সেই রাত্রেই সকল ষড়যন্ত্রকারীদিগকে বন্দী করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

তলিতায় আরোহণের পূর্ব্বে আরাতামা বেথরকে বলিলেন,—যুদ্ধ কেবল আরাদের জন্য। সে না থাকিলে যুদ্ধ আপনি থামিয়া যায়।

এই কথার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বেথর কহিল,—এই বার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমি আরাদকে বধ করিব, শপথ করিতেছি।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রি-শেষে সকল সৈন্য জাগ্রত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল। সৈন্য-নায়কগণ সৈন্য-মণ্ডলীর মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ আদেশ করিতেছিলেন। নদীতে উপলাহত জলস্রোতের শব্দ, বৃক্ষে প্রভাত-সমীরণের সঞ্চরণ। বহুসহস্র মনুষ্যের অস্পষ্ট কণ্ঠরবে সে শব্দ ডুবিয়া গেল। যখন আকাশ পরিষ্কার হইল, পূর্ব্বদিকে আলো দেখা দিল, তখন উভয়পক্ষের সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদেশ হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রাজসৈন্যের কিছু পশ্চাতে তলিতা, অপর বিমান-সকল কিছু দূরে। বেথর নামিয়া সৈন্যের মধ্যে গিয়া মিশিল, নাদিব যন্ত্র দেখিয়া পরিষ্কার করিয়া নদীর তীরে গিয়া মুখ ধুইতেছিল। আরাতামা একবার শিবিরে গিয়াছিলেন, তখন আবার ফিরিয়া আসিলেন।

উভয়পক্ষের সৈন্য সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের দৃঢ়সঙ্কল্প—আজ যুদ্ধ অবসান হইবে। একটা কিছু মীমাংসা হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সৈন্যগণ দেখিল, একজন অশ্বারোহী তীরের মত তলিতার অভিমুখে গমন করিতেছে। অনেকে চিনিতে পারিল অশ্বারোহী রুদেলা! একা তিনি কি করিবেন? রাজপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত না হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় আরাতামা ফিরিয়া আসিলেন। তলিতায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন, অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে বিমানের দিকে আসিতেছে। দূর হইতেই চিনিতে পারিলেন, রুদেলা। আরাতামার ভাবিবার চিন্তিবার অবসর রহিল না। তালিতার পাশে আসিয়াই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া রুদেলা একেবারে বিমানে উঠিলেন। হাস্যমুখে আরাতামাকে কহিলেন,—আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, আবার দেখা হইবে। কিন্তু যুদ্ধস্থলে দেখা মুখের কথা নয়। আপনি আমার বন্দিনী।

বিমানে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। আরাতামাও হাসিয়া কহিলেন,—বন্দী কে কার? আপনার মনে হইতেছে না আপনি আমার বন্দী।

আরাতামা যন্ত্র চালনা করিলেন। তলিতা সশব্দে আকাশে উঠিল। নাদিব দৌড়িয়া আসিতেছিল, আসিয়া দেখিল তলিতা আকাশে, রুদেলার অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অশ্ব নাদিব চিনিত। অশ্বের বল্গা ধারল। আকাশে একমাত্র বিমানের শব্দ শুনিয়া সৈন্যেরা উপরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

রুদেলা নিজের পক্ষের বিমানাধ্যক্ষকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনি আরাতামার বিমান বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আকাশে সে বিমান দেখিতে পাইলেই রুদেলার পথের সকল বিমান তাহাকে বেষ্টন করিবে। তলিতা আকাশে উঠিতেই অপরপক্ষের সকল বিমান আকাশে উঠিয়া তাহার পথরোধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহ আক্রমণ করিল না। যদি তলিতা আকাশ হইতে পতিত হয় তাহা হইলে রুদেলার মৃত্যু হইবে। রাজপক্ষের বিমান-নায়ক কিছু জানিতেন না, তাঁহার বিমানসমূহের আকাশে উঠিতে বিলম্ব হইল। ততক্ষণ তলিতা ও শত্রুপক্ষের সমস্ত বিমান অদৃশ্য হইয়া গেল।

নাদিব রুদেলার অশ্বে আরোহণ করিয়া যেখানে রাজা শিশেরা ও সেনাপতি অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হইয়াছে?

নাদিব কহিল,—দস্যুপতি রুদেলা তলিতাকে গ্রহণ করিয়াছে। আরাতামাও বিমানে আছেন।

রাজা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—দস্যু আরাতামাকে হত্যা করিবে না ত?

সেনাপতি কহিলেন—সে আশঙ্কা নাই, তবে আরাতামা বোধ হয় বন্দিনী হইয়াছেন। আমাদের বিমান-সমূহও অনুসরণ করিয়াছে। তাহারা আরাতামাকে রক্ষা করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। আমরা সে চিন্তা করিয়া কি করিব? দস্যুপতি এখন নাই, এই অবসরে শত্রুকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।

—তাহাই হউক।

সেনাপতি যুদ্ধের আদেশ দিলেন, সৈন্যাধ্যক্ষগণকে কহিলেন, শত্রুকে আক্রমণ করিবার এই উত্তম অবসর। সমস্ত সৈন্য অগ্রসর হউক।

এই আদেশ শুনিয়া রাজপক্ষের সৈন্যগণ ভীম গর্জ্জন করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিল। প্রথমে অশ্বারোহী, তারপর পদাতিক, সৈন্যগণ কাতারে কাতারে উচ্চ স্থান হইতে অবরোহণ করিয়া প্রবল বেগে শত্রুসৈন্যের উপর পড়িল।

রুদেলা যে নিজের সৈন্যদলে নাই তাঁহার পক্ষের অধ্যক্ষেরা অনেকে সে-কথা জানিতেন না। রুদেলা মনে করিয়াছিলেন তলিতা হরণ করিতে কিছু বিলম্ব হইবে না এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাজা শিশেরাকে আক্রমণ করিবেন। রুদেলার অভাবে আরাদ এক মাত্র নেতা রহিলেন। ইফ্রেম, জাফেত প্রভৃতি দস্যুদিগকে ও অপর অশ্বারোহী সৈন্যকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু রুদেলার অভাব পূর্ণ করে এমন কেহ ছিল না। অশ্বারোহী দস্যুসৈন্য কয়েক বার অপর পক্ষের শ্রেণী ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল, দুই এক বার কতক কৃতকার্য্য হইল, কিন্তু রাজসৈন্যের নিবিড় শ্রেণী তাহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারিল না। সারি একবার ভঙ্গ হইলে আবার পশ্চাৎ হইতে ও দুই পার্শ্ব হইতে সৈন্য আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হয়।

সেনাপতির উদ্দেশ্য, শত্রুসৈন্যকে ক্রমে ক্রমে নদীর তীরে লইয়া যান। একবার সেখানে গিয়া পড়িলে শত্রু আর পিছাইতে পারিবে না, তাহা হইলে নদীগর্ভে পড়িবে, সুতরাং নদীতীরে উপস্থিত হইতেই শত্রু ছত্রভঙ্গ হইয়া এদিক ওদিক পলায়ন করিবার সম্ভাবনা।

রুদেলাকে দেখিতে না পাইয়া আরাদ অস্থির হইয়া পড়িলেন। রুদেলা কোথায়, রুদেলা কোথায়? আরাদের মনে নানা রূপ সংশয় হইতে লাগিল। রুদেলা কি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, না রাজা শিশেরা কোন রূপ প্রলোভন দেখাইয়া দস্যুপতিকে নিজের পক্ষে করিয়া লইয়াছেন? এমন সময় সংবাদ আসিল, রুদেলা রাজার পক্ষের শ্রেষ্ঠ বিমান কৌশলে হরণ করিতে গিয়াছেন।

আরাদ কহিলেন—সমস্ত বিমান ত চলিয়া গেল। যুদ্ধস্থল ছাড়িয়া রুদেলা বিমান লইতে গেলেন কেন?

জাফেত কহিল,—তিনি বলিয়া গিয়াছেন এখনই ফিরিয়া আসিবেন। চিন্তার কোন কারণ নাই।

চিন্তার অবসরও রহিল না। রাজা শিশেরা ও সেনাপতি সমস্ত সৈন্য লইয়া আরাদকে আক্রমণ করিলেন। জাফেত, ইফ্রেম ও অপর সৈন্যনায়কেরা দেখিলেন যে, আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যদি তাঁহাদের সৈন্যকে হটিতে হয় তাহা হইলে বিষম বিপদ, কেন না পশ্চাতে কিছু দূরেই নদী। সৈন্যবল পশ্চাতে না সরিয়া বক্র ভাবে পাশের দিকে অল্প অল্প সরিলে আশঙ্কা কম। নায়কেরা সেই ভাবে সাবধানে সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। সম্মুখ হইতে আক্রমণের বেগ ভঙ্গ করিবার জন্য জাফেত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বার বার রুদেলার মত রাজপক্ষের সৈন্যের সম্মুখ ভাগ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিচিত্রবীর্য্য রুদেলা নাই, তাঁহার বিচিত্র-গতি অশ্বও নাই।

রাজা শিশেরার সেনাপতি অত্যন্ত কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহারও সৈন্যের অগ্রে অশ্বারোহী সৈন্য। তাহারা শত্রুর অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, যেন শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষিণে ও বামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে চলিয়া যাইতে লাগিল। অপর পক্ষের অশ্বারোহীরাও উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিয়া সজ্জিত সৈন্যব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অমনি

ভল্ল ও বর্শাধারী সৈনিকগণ সারি বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়া অশ্বারোহীদিগের সম্মুখে আসিয়া অশ্ব ও আরোহীকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

নাদিব রুদেলার অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বপক্ষের অশ্বারোহী দলে মিশিল। অশ্ব দস্যুদিগের অশ্বসমূহ সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বেগে সেই দলে প্রবেশ করিল। নাদেব তাহাকে কোন মতে ফিরাইতে পারিল না। নাদিব তৎক্ষণাৎ বন্দী হইল, উভয় পক্ষের অশ্বারোহীগণ হাসিতে লাগিল।

আরাদের পক্ষের সৈন্য ক্রমশঃ হটিতে আরম্ভ হইল। তাহারা যেমন যেমন নদীর পাশ দিয়া পিছনে সরিতে লাগিল রাজপক্ষের সৈন্য সেই অনুসারে তাহাদের পথ বন্ধ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। যুদ্ধের আরম্ভে, সৈন্যের সম্মুখ-ভাগ ছিল সঙ্কীর্ণ, সেনাপতি ক্রমে তাহা প্রসারিত করিতে লাগিলেন। সকল সৈন্য প্রথমে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। সম্মুখে অল্প পরিসরে যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের পশ্চাতে সারি সারি সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল। সেনাপতি যখন দেখিলেন শত্রু হটিতেছে, তখন তিনি পশ্চাতের সৈন্যদিগকে ঘুরাইয়া সম্মুখে আনিতে লাগিলেন, তাহাতে রণস্থলের ব্যাপ্তি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সৈন্যসজ্জা ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করিল। দুই শৃঙ্গে শত্রুসৈন্যের দুই সীমা, মধ্যস্থলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সৈন্যের কোন ভাগ নির্লিপ্ত রহিল না, সকল সৈন্যে সর্ব্বত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। বূহ ভাঙ্গিয়া গেল।

ভল্ল ও বর্শাধারীদের মধ্যে বেথর। তাহার হস্তে ভীষণ গদার ন্যায় লৌহদণ্ড, আর কোন অস্ত্র সে গ্রহণ করে নাই। দুই হস্তে দণ্ড ঘুরাইতেছিল, প্রত্যেক আঘাতে হয় অশ্বের অথবা অশ্বারোহীর কিম্বা পদাতিকের মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। লৌহদণ্ডে বর্শাফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণ শলাকায় কত শত্রু বিদ্ধ হইয়া মরিতেছিল! বালকে যেমন বংশদণ্ড লইয়া ক্রীড়া করে বেথর সেইরূপ অবলীলাক্রমে গুরুভার লৌহদণ্ড চালনা করিতেছিল, ভয়ে কোন শত্রু তাহার সম্মুখীন হইতেছিল না। আরাদ যেখানে অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতেছিলেন বেথর ভল্লধারীদিগের সহিত সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বেগে নয়, ধীরে, মহাকায় মাতঙ্গের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া, সম্মুখের শত্রু দলিত মথিত করিয়া, অপ্রতিহত গতিতে গমন করিতেছিল। মল্লের বেশ, বাহুদ্বয়ের ও বক্ষের মাংসপেশী ফুলিয়া উঠিতেছিল।

ইচ্ছা করিলে আরাদ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না। রুদেলার অবর্ত্তমানে তিনি সেনাপতি। তাঁহার বিপদ দেখিয়া আশেপাশের সৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উভয় পক্ষের অনেকে হত আহত হইল, কিন্তু বেথর নিয়তির ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। আরাদকে শুনাইয়া ডাকিয়া কহিল, তোমার রাজ্যলাভের সাধ মিটাইতেছি। এখনি তোমাকে আর এক রাজ্যে পাঠাইব।

আরাদ দক্ষিণ হস্তধৃত বর্শা বেথরকে লক্ষ্য করিয়া সবলে নিক্ষেপ করিলেন। বেথরের লৌহদণ্ডে লাগিয়া বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বেথরের বক্ষে না লাগিয়া তাহার বাম হস্তে বিদ্ধ হইল। বেথর দুই হস্তে লৌহদণ্ড ঘুরাইয়া আরাদের অশ্বের মস্তকে প্রহার করিল, অশ্ব ভগ্নমস্তক হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বেথরের পার্শ্বস্থিত একজন সৈনিক অবিলম্বে আরাদের মস্তক ছেদন করিয়া ভল্লাগ্রে বিদ্ধ করিয়া তুলিয়া ধরিল। রাজপক্ষের সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া বার বার গর্জ্জন করিতে লাগিল।

আরাদ নিহত হইলেন, রুদেলা সমরক্ষেত্রে উপস্থিত নাই। সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজপক্ষের সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক সৈন্য নদীগর্ভে ডুবিয়া মরিল, অনেকে বিনা যুদ্ধে নিহত হইল। ইফ্রেম, জাফেত প্রভৃতি নায়কগণ যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের ন্যায় মরিলেন। কতক অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধস্থল হইতে বেগে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

রাজা শিশেরা সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, কিছু সৈন্য দস্যুদের পশ্চাতে গিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূল করুক। অবশিষ্ট সৈন্য রাজ্যসীমায় ও দুর্গসমূহে প্রেরিত হউক।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ

ঢাকা নিউ গার্ল স্কুলের ছাত্রী কুমারী অমিয়া গাঙ্গুলী এবৎসর ঢাকার শান্তি-সঙ্ঘ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ৩৫ মিনিট সময়ে সে অন্যান্য পুরুষ প্রতিযোগীগণের সহিত দুই মাইল সন্তরণ করিয়াছিল।



কুমারী কুরীয়ান্



কুমারী অমিয়া গাঙ্গুলী
[সাঁতারের পোষাকে—বামদিকের টেবিলে পুরস্কারসমূহ সজ্জিত]



কুমারী মনোরমা



কুমারী ইন্দিরা আম্মা

বাঙ্গালার গবর্ণর এই প্রতিযোগিতার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং কুমারী অমিয়াকে কয়েকটি বিশেষ পুরস্কার



শ্রীমতী শ্রীরাম ভগীরথ অম্মল



কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ

প্রদান করিয়াছিলেন। এই বালিকাটির বয়স মাত্র দশ বৎসর এবং ইতিমধ্যেই সে লাঠি ও অসি চালনায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে।

কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় গণিত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন ও ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এরূপ সম্মান পাইলেন। তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে মিশ্র-গণিতে এম্ এ পড়িতেছেন।

কুমারী ইন্দিরা আপ্পা বি-এ বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তিনি লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এড. (Master of Education) উপাধির জন্য প্রস্তুত হইবেন।

কুমারী কুরীয়ান্ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়া আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্‌বার্ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

ভিজগাপট্টমের কুমারী মনোরমা এবার মাদ্রাজ সরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উড়িয়া বালিকাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি স্চী-শিল্প ও সঙ্গীতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী শ্রীরাম ভগীরথ অম্মল মাদ্রাজের চেঙ্গলীপুট জেলা শিক্ষা-সংসদের সভ্য হইয়াছেন।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(৩৫)

ভানুমতী মেয়েকে ঘরের ভিতর লইয়া আনিয়া বলিলেন, "মা, এই তিনটা ঘর তোমার জন্যে ঠিক ক'রে রেখেছি। অনেকটা পথ আস্‌তে খুব হয়ত ক্লান্ত আছ। কাপড়-চোপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধোও, আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

সাধারণতঃ মা মেয়ের সঙ্গে এ-ভাবে কথা বলে না। কিন্তু কৃষ্ণাকে নিজের মেয়ে বলিয়া অনুভব করিতে পুরাপুরি ভাবে এখনও ভানুমতীর বাধিতেছিল। ইহার শিশুকালের কোন স্মৃতি তাঁহার নাই, বাল্য এবং কৈশোরের ভিতর দিয়া দিনের পর দিন অক্লান্ত যত্নে স্নেহে তিনি ইহাকে মানুষ করিয়া তোলেন নাই। একেবারে পরিপূর্ণ যৌবনে সে হঠাৎ তাঁহার বাহুবন্ধনের মধ্যে আসিয়া ধরা দিল। ইহার শিক্ষা দীক্ষা ভিন্ন, ইহার ধর্ম্ম ভিন্ন, এ চিরকাল অন্য মানুষকে নিজের আত্মীয় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। নিজের মায়ের প্রতি তাহার ভালবাসা কোনদিনই কি ধাবিত হইবে? ইহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া ভানুমতীর চিত্ত স্নেহে বিগলিত হইতেছে বটে, কিন্তু নিজের সন্তানের প্রতি যতখানি মমতা মনে থাকা উচিত, ততটা কি তিনি অনুভব করিতেছেন? অর্দ্ধেকের বেশী হৃদয় কি তাঁহার সুবীরকে হারানোর জন্য হাহাকার করিতেছে না?

সুবীরের কাছে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, কিন্তু কৃষ্ণাকে হঠাৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেও তিনি পারিতেছিলেন না। সে তাহা হইলে মনে করিবে কি? তাহার মন কি একেবারে বিমুখ হইয়া যাইবে না? একেত ভাগ্যের চক্রান্তে সে এতদিন নিজের জন্মাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কাটাইয়াছে। এখনও যদি মায়ের অখণ্ড মনোযোগ সে না পায়, তাহা হইলে মাকে সে অপরাধিনী ত করিবেই সুবীরের প্রতিও প্রসন্ন থাকিবে না। সুবীরকে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যতখানি সুখ-সুবিধা করিয়া দিতে ভানুমতী সংকল্প করিতেছেন, কৃষ্ণা বাধা দিলে সবটা করিয়া তোলা বড়ই কঠিন হইবে।

সুতরাং মনের ব্যাকুলতা মনেই চাপিয়া তিনি কৃষ্ণাকে যথাযোগ্য আদরযত্নে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে ঘরে বসাইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, দিদিমণির জলটল সব ঠিক দে। ওর বাক্স তোরঙ্গ সব এই দিকে নিয়ে আস্‌তে বল্‌। আমি একটু আস্‌ছি, চায়ের জোগাড় কর্‌তে ব'লে।"

ভানুমতী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। নার্স সুরবালাকে সাম্‌নে দেখিয়া বলিলেন, "যাও ত বাছা, নীচে চায়ের সব যোগাড় ক'রে উপরে পাঠিয়ে দিতে বল।"

সুবীরের ঘরগুলি সিঁড়ির একপাশে—অন্য পাশে মেয়েদের মহল। ভানুমতী সিঁড়ির মাথার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সুবীরের বসিবার ঘরের দরজাটা ভেজান। ভিতর হইতে খিল বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইল না; তিনি কপাটের উপর মৃদু করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ভিতরে আস্‌ব, বাবা?'

ভিতর হইতে সুবীর বলিল, "এস মা।" কৃষ্ণাকে মোটরে করিয়া বাড়ীর সদর দরজার সাম্‌নে পৌঁছাইয়া দিয়াই সুবীর পলায়ন করিয়াছিল। চারিদিকের উৎসব-সজ্জা তাহার চোখে যেন সূচ ফুটাইতেছে, নহবতের বাজনা তাহার কানে পিশাচের অট্টহাসির মত লাগিতেছিল। আজ তাহার চিরদিনের মত নির্ব্বাসন, আর আজই তাহার চিরদিনের ঘরে এত আনন্দের আয়োজন? শুধু ধনরত্ন হারাইলেও এতটা দারুণ নিরাশা আর অবসাদ তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু সে আজ কৃষ্ণাকেও হারাইতে বসিয়াছে। কৃষ্ণাই তাহার তরুণ মনের প্রথমা প্রেয়সী, ইহারই পায়ে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজার করিয়া সে ঢালিয়া দিয়াছিল। সামান্য একটু মুখের

হাসি, দুইটা সাধারণ কথা, এই মাত্র এখন পর্য্যন্ত কৃষ্ণার নিকট হইতে সে পাইয়াছে। কিন্তু ভালবাসা দেয় যতখানি প্রতিদানে ততখানিই না পাইলে তাহার শান্তি কোথায়? কিন্তু হতভাগ্য সুবীরের নিকট স্বর্গপুরীর দ্বার রুদ্ধ হইতে চলিয়াছিল। ইহার পর কৃষ্ণাকে একটুখানি চোখের দেখা দেখিবার অধিকারও তাহার থাকিবে না। তাই আজ দুর্ভাগ্যের পাষাণভার তাহাকে যেন পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিতেছিল। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হত-চেতনের মত সে পড়িয়া ছিল। উঠিয়া জাহাজের কাপড়-চোপড় ছাড়িবে সেটুকু ক্ষমতাও যেন তাহার ছিল না। ভানুমতীর ডাকে সে তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। কোনক্রমে নিজেকে খানিকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "এস, মা।"

ভানুমতী ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা আমার, এমন ক'রে ব'সে আছিস্ কেন? আমার কাছে যেতেও তোর অভিমান? আমি কি আর তোর মা নেই?"

সুবীর কোন উত্তর দিল না। তাহার হৃদয়ের আগুন এই স্নেহের বারি-সিঞ্চনে একটু যেন জুড়াইয়া গেল। মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সে বালকের মত পড়িয়া রহিল, তাহার চোখের জলে ভানুমতীর অঞ্চল ভিজিয়া উঠিল।

মিনিট কয়েক এই অবস্থায় থাকিয়া পরে মাথা তুলিয়া সুবীর বলিল, "মা, এইবার তবে আমায় ছেড়ে দাও। আমার এখানকার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। এর পর সংসারে নিজের জায়গা আমায় ক'রে নিতে হ'বে ত?"

ভানুমতী তাহার চুলের ভিতর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "না বাবা, তোকে আমি ছেড়ে দিতে পার্‌ব না এমন ক'রে। আমি মনে মনে সব ঠিক ক'রে রেখেছি, তোর কোনও অসুবিধা হ'বে না। সব ব্যবস্থা আমি পাকাপাকি ক'রে দিই, তারপর তোর যেতে ইচ্ছে হয় যাস্। পেটের ছেলে হ'লেও চিরকাল কোলে বসিয়ে রাখ্‌তে পার্‌তাম না। সব মাকেই এ দুঃখ সইতে হয়, আমিও সইব, তা ব'লে এই রকম ভিকিরীর মত চ'লে যেতে তোকে আমি কিছুতেই দেব না। তা যদি যাস্, আমিও তোর পেছন পেছন যাব। আমায় লুকিয়ে যদি যাস্, তোর মাতৃহত্যার পাতক হ'বে।"

সুবীর বলিল, "মা, এ বাড়ী যার এখন সে না বল্‌লে আমি কি ক'রে থাকব? আমি ভিকিরী ছাড়া আর কিছুই নয় এখন, তবু তোমার ছেলে সেজে এতদিন বেড়িয়েছি, আর কিছু না শিখ্‌তে পেরে থাকি, আত্ম-সম্মানটা বাঁচিয়ে চল্‌তে শিখেছি।"

ভানুমতী বলিলেন, "কৃষ্ণা কখনও অমত কর্‌বে না। তার জন্যে সব ছাড়্‌লি তুই, নিজের হাতে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে তুই বনে যাচ্ছিস, আর সে তোকে দু'দশদিন বাড়ীতে থাক্‌তে দিতে পার্‌বে না? যদি আমার মেয়ে সে সত্যি হয়, তাহ'লে এ রকম কিছুতেই কর্‌তে পার্‌বে না।"

সুবীর কিছু বলিবার আগেই, বাহির হইতে সুরবালা ডাকিয়া বলিল, "মা, দিদিমণির চা, জল-খাবার সব উপরে নিয়ে এসেছে, কোন্ ঘরে রাখ্‌বে?"

সুবীর বলিল, "মা যাও, ওকে দেখ গিয়ে। নূতন জায়গায় এসে ওর এমনিই বোধ হয় ভাল লাগ্‌ছে না, তুমিও দূরে সরে স'রে থাক্‌লে ওর মন ভেঙে যাবে। বাড়ীতে লোক-সমাগম আজ নিতান্ত কম হয়নি, সকলের আদর-অভ্যর্থনা কর গিয়ে। না পার ত মাসীমাকে প্রতিনিধি ক'রে এস, তিনিই ওসব তোমার চেয়ে ভাল পার্‌বেন। তোমার ভয় নেই, আমি তোমাকে না ব'লে পালাব না।"

ভানুমতী একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শোভাবতীর বাড়ীর সকলে এবং অন্যান্য আত্মীয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এতক্ষণ ভানুমতীর শোবার ঘর জুড়িয়া সভা জাঁকাইয়া বসিয়া ছিলেন। কৃষ্ণাকে ঠিক নিজেদের দলের বলিয়া কাহারও মনে হয় নাই। সুতরাং ভানুমতী যখন তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া চলিলেন, তখন সকলে পিছন পিছন উপরে আসিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণার ঘরে না ঢুকিয়া ভানুমতীর ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল।

ভানুমতীকে দরজার সাম্‌নে দিয়া দেখিয়া শোভাবতী ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ভানু, কোথায় কোথায় ঘুর্‌ছিস্, মেয়েকে জল-টল খাইয়েছিস্?"

ভানুমতী বলিলেন, "এই যে যাচ্ছি, মেজদি। তুমিও এসনা ?"

শোভাবতী উঠিয়া পড়িলেন। বৌঝির দল একটু ইতস্ততঃ করিয়া যেখানে ছিল সেইখানেই থাকিয়া গেল। সুরবালা ও দুইজন দাসী তাহাদের পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেল।

কৃষ্ণাকে ঘরে বসাইয়া ভানুমতী বাহির হইয়া যাইতেই সে উঠিয়া পড়িল। তাহাকে যে-ঘরে আনা হইয়াছিল, সেটা বসিবার ঘর। বেশী বড় নয়, কিন্তু সুসজ্জিত। আসবাব-পত্র, দেয়ালের গায়ের ছবি, সবই বহুমূল্য, কিন্তু কিছু সাবেকী ক্যাসানের। তবু কৃষ্ণা মনে মনে ভানুমতীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পাশেই তাহার শয়ন-কক্ষ। একটি নূতন কালো কাঠের পালঙ্কের উপর ধব্‌ধবে বিছানা পাতা, সম্প্রতি কাশ্মিরী-কাজ-করা চাদরে ঢাকা রহিয়াছে। জানালার কাছে বড় একটি ইজিচেয়ার। মেজেতে দামী কার্পেট পাতা। জয়পুরের পিতলের টেবল্ একটি, তাহার উপর ফুলদানীতে এক-গোছা রজনীগন্ধা ফুল। ছোট একটি মেহগণী কাঠের লিখিবার টেবল্ ও তাহার সাম্‌নে একটি চেয়ার। ঘরে আর কিছু আসবাব নাই। তাহার কাপড় ছাড়িবার ঘরটি ছোট, কিন্তু ইহার ভিতরেই জিনিষ বেশী। বড় একটি আয়না-ওয়ালা আলমারী, দেরাজ, শুদ্ধ ড্রেসিং টেব্‌ল্-আল্‌না, ময়লা কাপড়ের বাস্‌কেট, মুখ ধুইবার গামলার ষ্ট্যাণ্ড, বড় দুই তিনখানি চেয়ারে ঘরটি বেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। এ-ঘরে আসবাবগুলি নূতন বলিয়া বোধ হইল না। খুব সম্ভব এগুলি ভানুমতীর সম্পত্তি, নিজে ব্যবহার করেন না বলিয়া কৃষ্ণার ঘর সাজাইতে দান করিয়া দিয়াছেন।

তাহার কাছে যে দাসীটিকে ভানুমতী রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, আপনার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা সব এই খানেই কি নিয়ে আস্‌ব ?"

কৃষ্ণা জাহাজের পোষাক ছাড়িয়া স্নান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "এই খানেই নিয়ে এস।"

দুই জন চাকর আসিয়া তাহার ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, বিছানা, এই সব ঘরটাতে রাখিয়া গেল। কৃষ্ণা জুতা মোজা খুলিয়া ফেলিয়া সুট্‌কেস হইতে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় বাহির করিতে লাগিল। ঝিটি সব কিছু তাহার হাত হইতে লইয়া গুছাইয়া আল্‌নার উপর রাখিতে লাগিল।

একটু একলা থাকিবার অবসর পাইয়া কৃষ্ণা যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। কয়দিন সে একেবারে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই। জাহাজ হইতে নামিবার পর গোলমালে, লোকের ভীড়ে এবং নিজের নূতন অবস্থায় তাহার একেবারে মাথা ঘুরিতেছিল। এতকাল পরে নিজের মাকে পাইয়া আবার সেই সঙ্গেই সুবীরকে হারাইবার সম্ভাবনায় তাহার চিত্তে স্বাভাবিক স্থৈর্য্য একেবারে হারাইয়া গিয়াছিল। একটা ঘণ্টা সে কি করিয়া যে কাটাইয়াছে তাহা নিজেও যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

কাপড়-চোপড়, চিরুণী, সাবান প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিয়া সে ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্নানের ঘর কোথায় বল্‌তে পার ? একেবারে স্নান ক'রেই কাপড় ছাড়্‌ব ?"

দাসী কিছু বলিবার আগেই ভানুমতী এবং শোভাবতী ঘরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণার কথার উত্তরে শোভাবতী বলিলেন, "ওমা, এখনি চান করবে ? আগে একটু চা-টা খেয়ে নাও, সেই সকাল থেকে ত পিত্তি চুঁইয়ে ব'সে আছ।"

তড়িতের মায়ের সঙ্গে এই মহিলার স্বভাবের সাদৃশ্যের কথা সুবীর তাহাকে আগেই বলিয়াছিল, মনে করিয়া কৃষ্ণার হাসি পাইল। সে বলিল, "একেবারে স্নান ক'রে খাব ভাব্‌ছিলাম, বড় মাথা ধ'রে উঠেছে।"

ভানুমতী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তাত ধর্‌তেই পারে। কম পথ ত নয় ? আচ্ছা মা স্নান ক'রেই নাও। কয়েকটা দিন আমার স্নানের ঘর দিয়েই চালাতে হ'বে, উপরে আর ত নেই ? তার পর তোমার ঘর হ'য়ে যাবে। দেওয়ানজীকে আমি কালই ব'লে রেখেছি,—দু-তিন দিনের মধ্যেই মিস্ত্রি লেগে যাবে।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "কেন মা, আপনার ঘরে আমার

কি অসুবিধা? আবার আর-একটা ঘরের কিছু দরকার নেই।"

কৃষ্ণার মা সম্বোধনে ভানুমতীর বুকের ভিতর কে যেন সুধার প্রলেপ দিয়া গেল। এই ডাক শুনিবার আকাঙ্ক্ষা কি নারীর মনে কখনও মেটে না? এত দিন ত তাঁহার শূন্য যায় নাই। মা ডাক ত তিনি প্রাণ ভরিয়াই শুনিয়াছেন, তবু কি বাসনা অতৃপ্ত ছিল? না এ নিজের সন্তান বলিয়া, এত মিষ্ট লাগিতেছে?

দাসীর সঙ্গে কৃষ্ণা স্নানের ঘরে চলিয়া গেল। শোভাবতী বোনকে বলিলেন, "দিব্য পদ্মিনীর মত মেয়ে তোর। ঐ বয়সে তুইও খুবই সুন্দর ছিলি। ভবানী গর্ব্ব করত যে, সাহেবের বাড়ী খুঁজ্‌লেও এমন রং মিল্‌বে না। তা মেয়েও তোর রং পেয়েছে। চেহারাও অবিকল তোর মত, জ্ঞানদার সঙ্গে বিশেষ কিছু সাদৃশ্য নেই। তার মত ঢ্যাঙা হ'য়েছে বটে।"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, কোলে ক'রে খুসি হ'বার মত মেয়ে বটে; তবে এই সঙ্গে আর একটিকেও যদি রাখ্‌তে পার্‌তাম, তাহ'লে এই কপাল নিয়েও মর্‌বার ক'টা দিন সুখে কাটিয়ে যেতাম। কিন্তু কি যে অদৃষ্টে আছে তা ত জানি না।"

এমন সময় চাকর ডাকিয়া বলিল, "মা, চা ত জুড়িয়ে যাচ্ছে। আবার কি ক'রে আন্‌ব?"

শোভাবতী বলিলেন, "চল্, বস্‌বার ঘরটাতেই যাই। এখানটায় গরম বড়। চাকরকে ব'লে দে গরম জল চড়িয়ে রাখ্‌তে। মেয়ে বেরবে তারপর চা করা যাবে এখন।"

বসিবার ঘরে আসিয়া, পাখা চালাইয়া দিয়া শোভাবতী সোফার উপর বসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, খোকার কি ব্যবস্থা কর্‌লি? সে কি চ'লে যেতে চাইছে?"

ভানুমতী বলিলেন, "তাইত বলে। কিন্তু মেজদি ওকে আমি এমন ক'রে ভাসিয়ে দিতে পার্‌ব না। আমার স্ত্রীধন যা কিছু আছে, সব মিলিয়ে অনেক টাকা হ'বে। সব ওকেই দেব ভাব্‌ছি, তারপর যেমন খুসি থাক্‌তে পার্‌বে। কাজ কর্‌তে চায় কর্‌বে, না কর্‌তে চায় কর্‌বে না। এখানে একটা বাড়ী দিতে পার্‌লে ভাল হ'ত, কিন্তু কল্‌কাতায় বাড়ী করার খরচ জান ত? অবিশ্যি গহনাই আমার হাজার পঞ্চাশের আছে, তা বিক্রী কর্‌লে বাড়ী বেশ ক'রে দিতে পারি। কিন্তু মেয়ে আবার তাতে কিছু মনে না করে। পাওনা হাজার হ'লেও তারই ত? কিছু রেখে কিছুটা দেব ভাব্‌ছি।"

শোভাবতী বলিলেন, "তাত ঠিক না। না, সব গহনা বেহাত করিস্ না। অমন চমৎকার জিনিষগুলো। নিজে আর ক'টা দিনই বা পর্‌তে পেলি। তোর মেয়ের গায়ে দিব্যি মানাবে। দেখে তবু তোর চোখ জুড়বে। বিক্রী কর্‌লে কোন্ ভুত্‌নি না পেত্‌নীর অঙ্গে উঠ্‌বে কে জান? টাকা যা যা জমান আছে দে, তাতেই খোকা খুসি হ'বে। ওর ত যা সন্ন্যাসীর মত মতি-গতি।"

ভানুমতী বলিলেন, "খোকা কি কিছু চায় মনে কর্‌ছ, মেজ্‌দি? তেমন ছেলে আমার নয়। ও ত এখনি এক কাপড়ে বেরিয়ে যেতে রাজী। নিতান্ত মাথার দিব্যি দিয়ে আমি ধ'রে রেখেছি। কৃষ্ণা না বল্‌লে ও এ বাড়ীতে শুদ্ধ থাক্‌তে রাজী নয়। কত কষ্টে তাকে রেখেছি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ভানুমতী থামিয়া গেলেন। শোভাবতী তাড়াতাড়ি রেকাবী টানিয়া খাবার সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন, "এস মা, এস। বড় দেরী হ'য়ে গেল। ওরে ও মনা না ধনা কি তোর নাম ছাই মনেও থাকে না। চায়ের জল দিয়ে যা না।"

মা মাসীতে মিলিয়া কৃষ্ণাকে খাওয়াইতে বসিয়া গেলেন। মাথা ধরার ওজুহাত দিয়া সে কোনো প্রকারে দুই চারিটা ফল ও মিষ্টান্ন ও এক পেয়ালা চা খাইয়া উঠিয়া পড়িল। শোভাবতী বলিলেন, "এই হ'য়ে গেল খাওয়া? ওমা আজকালকার সবই একরকম। আচ্ছা, চল এখন ওঘরে একটু। তোমায় দেখ্‌বার জন্যে কত লোক ব'সে আছে।"

কৃষ্ণার এ ভাবে নিজকে দেখাইয়া বেড়াইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। তবু উপায় যখন নাই, তখন হাসি-মুখেই

মা এবং মাসীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মেয়ে-মজলিসে প্রবেশ করিল।

ভোরবেলা হঠাৎ কৃষ্ণার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া একটু বিস্মিত ভাবে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; পরক্ষণেই কোথায় সে আছে, কেন সে এখানে আসিয়াছে, সব কথাই তাহার মনে পড়িয়া গেল। আবার চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্ক তাহাকে আর সে সুবিধা দিল না। খানিকক্ষণ শুধু শুধু শুইয়া থাকিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ড্রেসিং রুমে কুঁজার জলে হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া সে শুইবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

তখন বাড়ীতে সাড়াশব্দ নাই, সকলেই নিদ্রায় অচেতন। কালকার উৎসব শেষ হইতে রাত বারটা বাজিয়াছিল। কৃষ্ণাকে যদিও ভানুমতী দশটার পরেই জোর করিয়া ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তবু গোলমালে অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসে নাই। গভীর অবসাদ এবং অতৃপ্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। সুবীর এত কাছে অথচ এত দূরে? সমস্ত দিনের ভিতর তাহাকে কৃষ্ণা এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখেও দেখিতে পায় নাই।

জানালার পাশের ইজি-চেয়ারটায় সে আসিয়া বসিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার ঘরের নীচেই সুন্দর একটি বাগান। ফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া তাহার তপ্ত মনকে একটু যেন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল একটু নীচে গিয়া বেড়াইয়া আসে। এই ইঁট-কাঠের খোপের মধ্যে তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু কোথা দিয়া যে যাইতে হইবে তাহাই তাহার জানা ছিল না।

আরো মিনিট দুচার ইতস্ততঃ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। এক জোড়া বেড়াইবার জুতা পায়ে দিয়া, বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, ভানুমতীর ঘরের দরজা এখনও বন্ধ, কিন্তু এধার ওধারে মানুষের নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছে। একজন ঝি পিছনের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "একটু এদিকে শুনে যাও।"

দাসী বিস্মিতা হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছেন, দিদিমণি? এত সকালেই উঠে পড়েছেন?"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, একটু বাগানে যাব, আমার সঙ্গে চলত।"

ঝি আগে আগে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, অনেক ঘর বারাণ্ডা সব অতিক্রম করিয়া, তাহারা অবশেষে বাগানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণা দাসীকে বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার। এখানে বা্‌ইরের লোক কেউ আসে না ত?"

ঝি বলিল, "না দিদিমণি, বাইরের লোক কোথা দিয়ে আস্‌বে? মালী দুটো কাজ কর্‌তে আসে তাও এখনও দেরি আছে। আমি এই রান্নাঘরেই থাক্‌ব, দরকার হ'লে আমায় ডাক্‌বেন।"

ঝি চলিয়া যাইতে, কৃষ্ণা বাগানটা ঘুরিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। মস্তবড় বাগান, আজকালকার দিনে, কল্‌কাতার মধ্যে এতখানি জায়গা কেহ আর এমন করিয়া অপব্যয় করে না, কিন্তু কৃষ্ণার পিতামহ যখন এবাড়ী তৈয়ারী করেন, তখন ভবানীপুরে জমির দাম ছিল কম। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন বড় মানুষ, সখের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা দরাজ হাতেই করিয়াছিলেন, খরচ কমাইবার বা একটার জায়গায় পাঁচটা বাড়ী বসাইয়া টাকা উঠাইবার কথা ভাবেন নাই।

বাগানের শেষের দিকে ছোট একটি পুকুর। তাহার চারিদিক বাঁধানো, সিঁড়িগুলি সাদা এবং কালো মার্ব্বেল পাথরের। এধার-ওধার লোহার বেঞ্চি ও চৌকি সাজান। কৃষ্ণার শরীরের আলস্য তখনও ভাল করিয়া দূর হয় নাই। একটু বসিয়া আরাম করিবার ইচ্ছায় সে ঐ পুকুর-পাড়ের চৌকিগুলির দিকে চলিল। কিন্তু কাছাকাছি আসিতেই সে চমকিত হইয়া থামিয়া গেল। সামনের বেঞ্চির উপর কে একজন মানুষ শুইয়া ছিল। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখা যাইতেছিল না, তবু কৃষ্ণার প্রত্যেকটি রক্তকণা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ভাল করিয়া না দেখিয়াই চিনিল, যে, সে সুবীর।

সুবীরেরও ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘরের ভিতর ভাল না লাগায় সে বাগানে আসিয়া শুইয়াছিল। রোদ উঠিবার আগে এখানে যে আর জনসমাগম হইবে তাহা সে মনে করে নাই।

কৃষ্ণার পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। তাহার পর আগন্তুকটিকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়া পুলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি, এরই মধ্যে ঘুম ছেড়ে উঠে পড়েছেন? বাগানের পথ চিন্‌লেন কি ক'রে?"

কৃষ্ণা যেন বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু বোবার মত দাঁড়াইয়া থাকাও ত চলে না! মুখটা একটু ফিরাইয়া বলিল, "ঘুম হচ্ছিল না, তাই একটু বেড়াবার জন্যে এলাম।"

সুবীর বলিল, "কাল সারাদিন আর রাত্রের বেশীর ভাগ যে উৎপাত গিয়েছে, তাতে ঘুম না হ'বারই কথা। এখানে এসেই না অসুখে পড়েন। এই রকম উৎপাত এখনও অনেক দিন চল্‌বে; জমিদারীতে গেলে ত কথাই নেই, পাড়াগাঁয়ে লোক কালেভদ্রে উৎসব কর্‌বার অবকাশ পায়, কাজেই যখন করে একেবারে পেট ভ'রে ক'রে নেয়।"

কৃষ্ণা তাহার এ সকল কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কি আপনি বাড়ী ছিলেন না? আপনাকে ত একবারও দেখিনি?

সুবীর বলিল, "বাড়ীতেই ছিলাম। তবে লোকের ভীড়ের মধ্যে আর বেরইনি।"

কৃষ্ণা কি যেন একটা বলিতে চাইতেছিল, অথচ সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে বাধা দিতেছিল। সুবীর বলিল, "বস্‌বেন চলুন না।"

কৃষ্ণা বলিল, "থাক, একটু বেড়িয়েই যাই। দেখুন আপনাকে একটি কথা বল্‌ব। আমার পক্ষে সেটা বলা বোধ হয় ঠিক হ'বে না। কিন্তু আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। না বল্‌লে আমার নিজের প্রতি এবং আপনার প্রতি অন্যায় করা হ'বে সেইজন্যে বল্‌ছি।"

সুবীর অত্যন্ত অবাক্ হইয়া বলিল, "কি এমন কথা, আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যাই হোক, আমি আগেই কথা দিলাম যে আমি কিছুই মনে কর্‌ব না।"

কৃষ্ণা বলিল, "কাল মায়ের একটা কথা আমি হঠাৎ শুনে ফেলেছি, তিনি মাসীমাকে বল্‌ছিলেন, আমি সেই সময় ঘরে গিয়ে পড়ি। আপনি কি এখান থেকে চ'লে যেতে চাইছেন?"

সুবীর বলিল, "চ'লে যেতে ত আমাকে হ'বেই, সেটা আপনি নিজেও কি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না?"

কৃষ্ণা বলিল, "কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কর্‌বার দর্‌কার কি? কোনো কারণে আপনার কি মনে হ'য়েছে যে, আপনার এবাড়ীতে থাকায় আমার আপত্তি আছে? আপনি মায়ের কাছে বলেছেন, আমি না বল্‌লে আপনি এবাড়ীতে থাকতে পারেন না। কেন একথা বলেছেন জানি না। মা চান আপনি এখানে থাকেন, তাঁর কথার উপর কথা বল্‌তে আমি কেন যাব? আমার আলাদা ক'রে আপনাকে থাকতে বল্‌বার দরকার আছে তা আমি মনেই করিনি। তা ছাড়া কাল ত মাত্র আমি এসেছি, এরই মধ্যে সব ব্যবস্থা বদ্‌লে যাবার কি দরকার?"

সুবীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "দেখুন এসব কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যখন কথাটা উঠ্‌লই বেশ ভাল ক'রে আলোচনা হ'য়ে সব পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়া ভাল। তা না হলে দুপক্ষের মনে নানারকম ভুল ধারণাও থেকে যাবে, সেটা ডিজায়ারেব্‌ল্ নয়। আপনি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না যে, এখানে থাকা আমার একেবারেই অসম্ভব? কারণটা আপনাকে বলে দিতে হ'বে না। যখন আমি জান্‌লাম যে, আমি এদের কেউই নয়, তখনই আমার চ'লে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পারিনি মায়ের জন্যে। তা ছাড়া তাঁর মেয়েকে খুঁজে বার কর্‌বার এবং তাঁর হাতে মাকে সঁপে দিয়ে যাবার জন্যে আমি অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। এখন সে কাজও আমার হ'য়ে গেছে। আপনাকে কদিনের মধ্যে আমি যতটা চিনেছি, তাতে জানি যে, মাকে সান্ত্বনা দিতে আপনি পার্‌বেন। সুতরাং আর দেরি ক'রে দরকার কি? সংসারে নিজের পথ খুঁজে নিতে হ'বে ত?"

কৃষ্ণা ধীরে ধীরে গিয়া একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। সুবীর তাহার সাম্‌নে একটা বেঞ্চে ঠেশ্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে ঝি কৃষ্ণাকে বাগানে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছিল সে তাহার খোঁজে আসিতেছে দেখা গেল। কিন্তু সুবীরকে কৃষ্ণার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

খানিকক্ষণ পরে কৃষ্ণা বলিল, "আপনার দিকটা না বুঝ্‌ছি তা নয়। কিন্তু মায়ের দিকটাও দেখ্‌তে হ'বে। আপনি যদি এরকম সব সম্পর্ক কাটিয়ে চ'লে যেতে চান, তা হ'লে তিনি বাঁচ্‌বেন না। তিনি আপনার জন্মে যে-রকম ব্যবস্থা কর্‌তে চাইছেন, তাতে আপনি আপত্তি কর্‌বেন না। এ বাড়ীতে না থেকেও, কলকাতায় আপনি থাকলে তিনি শান্তিতে থাক্‌বেন।"

সুবীরের পক্ষে অবস্থাটা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। কৃষ্ণাকে যদি সে সব কথা অকপটে বলিতে পারিত! কি করিয়া সে ইহাকে বুঝাইবে তাহার প্রধান বাধা কোথায়? কিসের প্রলোভন, কোন্‌ বিপুল আকর্ষণ হইতে পলায়ন করিতে সে চাহিতেছে, তাহা কৃষ্ণাকে বলিবার উপায় কোথায়?

অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "কল্‌কাতা থেকে চ'লে যেতে চাইছি নানা কারণে। আর মা আমায় যা দিতে চাইছেন তা নেবার অধিকার আমার নেই, তাঁরও দেবার অধিকার ঠিক আছে কি না জানি না।"

কৃষ্ণা বলিল, "মায়ের নিজের জিনিষ দেবার অধিকার যথেষ্টই আছে। আপনি যদি মনে করেন যে, তিনি আপনাকে কিছু দিলে আমি একটুও ক্ষুণ্ণ হ'ব, তা হ'লে আপনি ভুল কর্‌ছেন। আপনি যদি দয়া ক'রে নেন, তাহ'লে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ থাক্‌ব তা বল্‌তে পারি না। আপনি এরকম ভাবে চ'লে গেলে আমার নিজেকে ক্ষমা করা শক্ত হ'বে। ভাগ্যচক্রে প'ড়ে আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার অপকার কর্‌তে হ'য়েছে, যতটা প্রতিকার এর মানুষের হাতে আছে, তা অন্ততঃ কর্‌তে দিন্‌? কল্‌কাতায় কেন থাক্‌তে চাইছেন না, জানি না অবশ্য; কোনো উপায়ে সে বাধাটাকে অতিক্রম করা যায় না?"

সুবীর এমন ভাবে কৃষ্ণার দিকে চাহিল যে, তাহার চোখ আপনা হইতেই নত হইয়া গেল। তবে কি সুবীরের মন হইতে পূর্ব্বের সেই অনুরাগ এখনও দূর হয় নাই? এতবড় অপকার যে তাহার করিল, সুবীর কি সেই অপরাধিনীকে হৃদয় হইতে এখনও নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই?

সুবীর আসিয়া কৃষ্ণার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল। বলিল, "তা হ'লে কতগুলো অসম্ভব কথা শোন্‌বার জন্মে প্রস্তুত হ'ন। এগুলো কোনোদিন মুখে বল্‌ব তা মনে করিনি, কিন্তু আপনি আজ আমায় বল্‌তে বাধ্যই কর্‌ছেন শুনে বিরক্ত হ'বেন না এইটুকু আমার প্রার্থনা। আমার ব'লে আর কোনো লাভ নেই, বল্‌তে পেলাম এইটুকুই লাভ। আর্থিক কোনো লাভের প্রত্যাশায় একথা আমি বল্‌ছি না, একটু জাষ্টিস্‌ আপনি আমায় কর্‌বেন তা জানি। আমি আপনাকে ভালবাসি। বিশ্বাস কর্‌বেন না, হয়ত কারণ আপনার সঙ্গে আলাপ আমার অতি অল্প দিনের। শুধু চোখে দেখে ভালবাসা যায় এটা আগে আমিও বিশ্বাস কর্‌তাম না, কিন্তু এখন বিশ্বাস না কর্‌বার উপায় নেই। রেঙ্গুনে শোয়েডাগন প্যাগোডায় বেড়াতে গিয়ে আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম। সেদিন থেকে নিজের জীবনের সার্থকতা আমি খুঁজে পেয়েছি। ভবিষ্যতে আমার জন্মে কি আছে জানি না। কিন্তু জন্মেছিলাম ব'লে আমি কখনও দুঃখ কর্‌ব না।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চোখ তখন তারার মত দীপ্ত, মুখের উপরও যেন জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবু চ'লে যেতে চাইছেন?"

সুবীর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এরই জন্মে আমায় চ'লে যেতে হ'বে তা কি আপনি বুঝ্‌চেন না? আমি মানুষ মাত্র।"

কৃষ্ণা বলিল, "যা আপনার পক্ষে সম্ভব হ'য়েছে, তা কি আর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? আমার কি আপনাকে থাক্‌তে বল্‌বার অধিকার নেই?"

সুবীর কৃষ্ণার পায়ের কাছে শানের উপর বসিয়া পড়িল। সবলে তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কি বল্‌ছ তুমি? আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না। আমায় ভালবাস তুমি? এটা হতভাগ্যের প্রতি করুণা, না আর কিছু?"

কৃষ্ণার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল, বলিল, "করুণা ক'রে নিজেকেই দিয়ে ফেল্‌ব এতখানি করুণাময়ী আমি নই।"

সুবীর তাহাকে টানিয়া নিজের অতি নিকটে আনিয়া ফেলিল। মিনিট কয়েক বন্দিনী থাকিয়া শেষে কৃষ্ণা বলিল, "ছেড়ে দিন। কেউ হঠাৎ এসে পড়্‌বে।"

সুবীর বলিল, "এলোই বা? তোমাকে ছাড়্‌তে আমার ভরসা হচ্ছে না। এটা হয়ত সত্য নয়, স্বপ্ন, এখনি জেগে উঠে দেখ্‌ব, আমি যেমন একলা ছিলাম তাই আছি। তুমি ধ্রুবতারার মত আমার জীবনাকাশের গায়ে ফুটে আছ, কিন্তু তোমাকে হাত দিয়ে নাগাল পাবার আমার কোনোই সাধ্য নেই।"

কৃষ্ণা বলিল, "স্বপ্ন এত সুন্দর হয় না।"

সুবীর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে একবার আস্‌বে? তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।"

কৃষ্ণা বলিল, "চলুন। উপহার ত এখন আমার পাওনাই আছে।"

সুবীর তাহাকে ঘুরাইয়া সাম্‌নের সিঁড়ি দিয়া উপরে লইয়া গেল। সিঁড়ির মাথায় আসিয়া বলিল, "এইদিকে আমার আড্ডা। ভিতরে তোমার একটি সতীন আছে দেখ্‌বে চল।"

কৃষ্ণা বলিল, "তাই না কি? সজীব নয় আশা করি।"

সুবীর তাহাকে ঘরের ভিতর আনিয়া বলিল, "দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে।"

আলমারী খুলিয়া সে একখানি তৈলচিত্র বাহির করিল। তাহার ব্রাউন কাগজের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া বলিল, "দেখ। এখনও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না কোন্‌টি বেশী সুন্দর।"

বিস্ময়ে কৃষ্ণার মুখে কথা সরিতেছিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি? কোথায় পেলেন? কে এঁকেছে এটা?"

সুবীর বলিল, "বুকের মধ্যে ছিল, তাই কাগজের গায়ে কোন রকমে এঁকে রেখেছিলাম। তারই সাহায্যে একজন আর্টিষ্ট এঁকেছে।"

তারপর আর একটা দেরাজ খুলিয়া একতাড়া চিঠি বাহির করিল। বলিল, "এই আমার উপহার। এতদিন ঠিকানা জান্‌লেও পাঠাবার অধিকার ছিল না। আর কোন উপহার দেবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি ভিকিরী ছাড়া আর কিছু নই, তা জান। কাজেই তোমার সম্পত্তি থেকে তোমায় উপহার দিতে চাই না।"

কৃষ্ণা তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "ও সব কথা আর একবারও শুন্‌তে চাই না, কিন্তু মাকে এখন সব কথা বল্‌তে হ'বে।"

সুবীর বলিল, "বেশ, চল. এক সঙ্গে গিয়ে বল্‌ছি।"

কৃষ্ণা তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "না, না, আমি তাঁর সাম্‌নে আপনার সঙ্গে যেতে পার্‌ব না।"

সুবীর বলিল, "তাহ'লে তাঁকেই এখানে নিয়ে আসি।" কৃষ্ণা বাধা দিবার আগেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভানুমতী তখন সবে মাত্র উঠিয়াছেন। সুবীরকে এমন আনন্দদীপ্ত মুখে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, এত সকালেই যে?"

সুবীর বলিল, "মা, তোমার বউ দেখ্‌বে চল।" ভানুমতী ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আমার বউ? কে রে সে? যাকে কোলে পেয়েছি, তাকেই ত দেখাবি?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ মা, তাকে বউ বল্‌বে, না, আমাকে জামাই বল্‌বে, ঠিক ক'রে নাও।"

কৃষ্ণা সুবীরের ঘর হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। পথের মধ্যেই ভানুমতী তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া পথের মাঝখানেই তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মা, তোকে পেয়ে আমি সব পেলাম।

তোরই জন্যে আমি একে এতদিন বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি। মা, তোর অনেক সৌভাগ্য, তাই এমন স্বামী পেলি। আমার কথা যে সত্যি তা প্রতিদিন তুই স্বীকার কর্‌বি। আমি ম'রেও এর পর শান্তি পাব। তোদের দুজনেরই জন্যে এর বাড়া সৌভাগ্য আমি আর কিছু চাইনি।"

বাড়ীর লোকজন সবাই অবাক হইয়া তাকাইতেছে দেখিয়া সুবীর বলিল, "মা, খবরটা সবাইকে জানিয়ে দাও, কিরকম সব হাঁ ক'রে আছে দেখ্‌ছ না?"

সারাদিনটা আবার বিষম গোলমালের ভিতর দিয়া কাটিল। সুবীরের অধৈর্য্যের সীমা ছিল না, তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, সব ক'টা মানুষকে ঠেলিয়া সরাইয়া কৃষ্ণাকে আবার কাছে টানিয়া আনে। অথচ উপায় নাই। মা, মাসী, দিদি, বৌদি, ঝি, রাঁধুনী মিলিয়া কৃষ্ণার চারিদিকে এমনই এক ব্যূহ রচনা করিয়াছে যাহার ভিতর সুবীরের কোনোই প্রবেশ-পথ নাই।

অবশেষে বিকাল বেলা আর নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া সে চাকরের হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "একবার এদিকে পথ ভুলে পাঁচ মিনিটের জন্যে চ'লে আস্‌তে পার না?"

খানিক পরে কৃষ্ণা মুখ লাল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "কি চমৎকার শিভাল্‌রাস্ জেণ্টেল্‌ম্যান! আমাকে কি ব'লে ডেকে পাঠালেন? নিজে যেতে পার্‌লেন না?"

সুবীর বলিল, "যা তোমার চারিদিকে নারী-বাহিনী; এগোতেই সাহস হয় না।"

কৃষ্ণা বলিল, "আহা, আমার বুঝি আর আস্‌বার কোনো অসুবিধে নেই? সবাই কিরকম হাঁ ক'রে দেখ্‌ল যদি দেখ্‌তেন।"

সুবীর বলিল, "আমাকে 'আপনি' সম্বোধন কর্‌বার কোনো দরকার আছে কি?"

খানিক পরে সুবীর বলিল, "দেখ, যেজন্যে তোমায় ডাকা তাই ভুলে যাচ্ছিলাম। নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে কাণ্ড ত বেশ একখানা কর্‌লাম। এরপর কি করা যাবে?"

কৃষ্ণা বলিল, "সেটা ত ভেবে ঠিক করা শক্ত নয়। মা ত এখনই নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ কর্‌ছেন।"

সুবীর বলিল, "ঘরজামাই হ'য়ে থাক্‌তে আমি পারব না। আমার ইচ্ছা বিলাত গিয়ে কিছু দিন পড়াশুনো করি, তার পর একটু মানুষের মত হ'য়ে এলে তোমার পাশে দাঁড়াতে আমার অতটা লজ্জা কর্‌বে না।"

কৃষ্ণার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ, আমারও অনেক দিন থেকে প্ল্যান ছিল বিলেত যাবার। আমিও তাহ'লে একবার ঘুরে আস্‌ব।"

সুবীর তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "সেই বেশ হ'বে।"

ভানুমতী শুনিয়া কিন্তু একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না বাছা, আমি বেঁচে থাক্‌তে ওসব হ'বে না। যথেষ্ট খ্রীষ্টানী কার্‌খানা হ'য়ে গেছে, আর দরকার নেই। এখন ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হ'য়ে গেলে বাঁচি। তারপর আমি মর্‌লে তোমরা বিলেত আমেরিকা যে-দিকে খুসি যেও।"

সুবীর কৃষ্ণাকে বলিল, "মা এত আপত্তি কর্‌লে কি ক'রে যাওয়া যায়? তাঁর যা শরীর।"

কৃষ্ণা বলিল, "এখনকার মত তাঁর কথাতেই চল্‌তে হ'বে। তুমি মনে ক'র না যে, তুমি আমার স্বামী মাত্র; তুমি যেমন জমিদার ছিলে তাই আছ। তাহ'লেই সব আপদ চুকে যায়। মায়ের কয়েকটা দিন ভুলে গেলেই হ'বে।"

সুবীর বলিল, "তা তুমি যদি বল, আমি বেশ ভুলে যেতে রাজী আছি।"

সমাপ্ত

মুক্তি

শ্রী জগৎ মিত্র

দাও মোরে ওগো দাও গো বিদায়
এ ধূলি-ধূসর জীবন হ'তে,
আমি ভেসে যাই তীর্থ-পথিক
মুক্ত আলোর বন্যা-স্রোতে

পারি না বহিতে বন্ধন আর,
কোন্ পথে যাব—বন্ধ যে দ্বার,
দিকে দিকে মোর হয়েছে আঁধার,
মিছা মোর ধাওয়া পথ-বিপথে

*

আকাশের নীল ডেকেছে আমারে
প্রভাতের আলো বেসেছে ভাল,
কান্না-জীবনের ছোট বাতায়নে
তা'রা যে আমায় ডাক্ পাঠালো।
ভোরে জাগা পাখী আমারে জাগায়,
গান গেয়ে ডাকে—"ওরে আয় আয়",
করুণ-অরুণ-দীপ্তির ভায়
তন্দ্রা-জড়িমা ওই পাগলো।

* * *

নিশীথের তারা ভিড় করে দ্বারে,
হাতছানি দেয় পূর্ণ শশী,
বর্ষার মেঘ, কোথা' যাও ভাই,
হেথা যে যক্ষ কাঁদিছে বসি'!
যদি চ'লে যাও বোল গিয়ে তা'রে—
মুক্ত আলোর দীপ্ত প্রিয়ারে—
বিরহ-জ্বালার ক্রন্দন-ভারে
ব্যথিত প্রদোষ, মৌনোষসী।

* * *

আমার শ্রেয়সী মুক্তি-প্রতিমা
তনু যা'র নীল গগন-তল,
ধরণী চুমিয়া ঢলিছে চিকুর,
বিটপীর ছায়ে শ্যামাঞ্চল।
এক চোখে তা'র জ্বলিছে তপন,
আন্ চোখে শশী দেখিছে স্বপন,
আঁধারের বুকে করেছে বপন
তারা-বীজ, তাহে নিশি উজল।

* * *

আমি হেথা' বসি' নগর-কারায়
সবুজ প্রিয়ারে স্বপ্নে হেরি,
দিকে দিকে মোর বিধুর সুদূর—
শ্যামলিমা নাচে আমারে ঘেরি'।
আমি ব'সে আছি যেন তৃণদলে,
চরণ চুমিয়া নদী ব'হে চলে,
ওপারের তীর ডুবিছে অতলে—
সাঁঝ হ'তে আর নাহিকো দেরি।

* * *

দূরে বহুদূরে নয়নের পারে
গ্রাম হ'তে কভু বাজিছে ধ্বনি,
কৃষক-বধূর অঙ্গন-তলে
শঙ্খের ডাক উঠিছে রণি'।
মূর্চ্ছনা তা'র কাঁপিছে বাতাসে,
কি যেন বেদনা শ্বসিছে আকাশে,
কে যেন বিরাট বিরহ-নিশাসে
আকুলিছে মোর দিন-রজনী।

* * *

লয়ে যাও মোরে লয়ে যাও ওগো,
এ ধূলি-জীবন চূর্ণ করি',
ঐ সুদূরের নীলিমার তলে
ছোট মোর কুঁড়ে লইব গড়ি'।
যাক্ দূরে যাক্ বাসনা-বিশাস,
সঞ্চয়-ভারে বাঁধিব না ফাঁস,
খ্যাতি-হেম-তরে কেন হাহুতাশ?—
প্রকৃতিরে ল'ব পরাণ ভরি'।

* * * *

কেহ মোর পাশে নাহি যদি রয়
এক একা নিশি যদি বা জাগি,
প্রাণ-পেয়ালায় জীবনের সুরা
ভ'রে দিতে যদি আসে না সাকি।
গভীর নিশায় সুখের ব্যথায়
অশ্রুর ধারে ঘুম ভেঙে যায়,
কোমল করের শীতল মায়ায়
যদি কেহ মোর মোছে না আঁখি,—

* * * *

সেই ভাল ওগো সেই ভাল মোর
আপনারে লয়ে খেলিব একা,
আপনার ব্যথা আপনি বুঝিব
আপনি মুছিব অশ্রু-রেখা।
আকাশের দিকে চাহি' আন্মনে
আপনি গুণিব তারা অগণনে,
পাগলের মত ঘুমে জাগরণে
দেখিব অমর-স্বপ্ন-লেখা।

* * * *

লয়ে যাও মোরে লয়ে যাও ওগো
নামহীন ঘন-স্বপ্ন-পুরে,
বেসুরো লৌহ-শৃঙ্খল-নাদে
অকাজের বাঁশী মেলে না সুরে।
ধূলি-নর্ত্তনে তাল রেখে রেখে
ক্লান্ত চরণ আজি যায় ঠেকে,
অজানা পুলকে বাধাহীন মেঘে
প্রাণ চায় মোর মরিতে ঘুরে।
নীড়-হারা পাখী উড়িবে একাকী
অসীমের বুকে মহাসুদূরে।

প্রাম্বানান্ শৈব-মন্দিরে প্রস্তর-খোদিত রামায়ণী চিত্রাবলী

অধ্যাপক শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা আজ পরাধীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি, এই কারণে দম্ভ করিয়া অতীতের কীর্ত্তিকাহিনী পরের নিকট প্রকাশ করার মধ্যে বর্ত্তমান হীন অবস্থার জন্য আমাদের নিগূঢ় লজ্জা আছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই সকল অতীত গৌরব সম্বন্ধে আলোচনারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের এই মাটীতে জন্মিয়াই যাহা করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমরা তাহা করিতে পারিব না কেন, এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিবার সময় আসিয়াছে।

আমাদের চরমতম লজ্জার কথা এই যে, ভারতবর্ষের অতীত কীর্ত্তি-গরিমা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুষ্ট করিতেছেন অভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা। তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম অর্থব্যয় ও দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের হারানো পাতা সংগ্রহে লাগিয়া বহুক্ষেত্রে সফলকাম হইয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিছক জ্ঞান আহরণের জন্য ইঁহারা স্থানকাল পাত্রের ভেদাভেদ বিস্মৃত হন।

এই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতদের কৃপায় আমরা আজ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিতেছি যে ভারতবর্ষের আজ যে দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকুক, একদা এই ভূখণ্ডে জ্ঞান ও শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এখান হইতেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দেশে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল তাহা যে কত মহান ও জীবন্ত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একটি প্রমাণ এই যে, ভারতবর্ষ যেখানে যেখানে প্রচারের জন্য পদার্পণ করিয়াছিল সেই সকল স্থানেই নবতন শিল্পকলার জন্ম হইয়াছে, সেই সকল জাতির জীবনী ও সৃজনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কুত্রাপি নষ্ট হয় নাই।

অন্যান্য বহুদেশের মত যবদ্বীপেও ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। এখানে হিন্দু-সভ্যতা-প্রসারের নিদর্শনসমূহ আজিও প্রস্তরাক্ষরে বর্ত্তমান আছে। প্রাম্বানান্ মন্দির ও বরবুদুর চৈত্য তাহাদের অন্যতম। হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া যবদ্বীপে বহুবিধ প্রস্তর-মন্দির অথবা চৈত্য গড়িয়া উঠে, ইহাদের কোনোগুলি ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কোনো গুলি বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্য্যের সাক্ষ্য স্বরূপ বর্ত্তমান; কোনোটি বা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার, কোনোটি বা পালন-কর্ত্তা বিষ্ণুর এবং কোনোটি বা সংহার-কর্ত্তা শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরগুলি যবদ্বীপে প্রাচীনতম হিন্দুসভ্যতার প্রভাবের শ্রেষ্ঠতম ফল—এইগুলির মধ্যে প্রাম্বানানের মন্দির ও বর-বুদুর-এর চৈত্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার এই দুইটি নিদর্শনই প্রায় একই কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।' তখন হিন্দুসভ্যতার ছোঁয়াচ লাগিয়া যবদ্বীপের শিল্পকলা উদ্বুদ্ধ হইতেছে, জাতির নবজাগরণ সুরু হইয়া গিয়াছে। এই দুইটির ভাস্কর্য্য অনেকটা এক হইলেও, অনৈক্যও যথেষ্ট আছে। এই অনৈক্যগুলি বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সময়ের হিসাবে বরবুদুরই প্রাচীনতর। চৈত্যটি সাত-তলা—উপরতলার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। ভিতরের চৈত্যস্তূপকে ঘিরিয়া সাতটি চতুষ্কোণবারান্দার শ্রেণী। এই সকল বারান্দা চৈত্যের চিত্রশালার মত। এইস্থানে রক্ষিত বা খোদিত ধর্ম্ম-বিষয়ক শোভাযাত্রাদির চিত্র সংখ্যায় এত বেশী যে সবগুলিকে পাশাপাশি রাখিলে বহু মাইল দীর্ঘ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ, নানা দেবতা, বহুবিধ ঋষি ও দেবযোনীদের খোদিত মূর্ত্তি অপরূপ শ্রীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকল মূর্ত্তির মধ্যেই একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য, একটা অপার্থিব দিব্য ভাব আছে। যে মহাপুরুষ যৌবনে যোগী হইয়া রাজ্যধন, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া সকল তাপিত মানবের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার জন্য দেহকে অবহেলা করিয়া দেহাতীতের সাধনায় জীবনপাত করিয়াছিলেন তাঁহারই প্রভাব এই চৈত্যে সুপরিস্ফুট। এই লৌকিক পৃথিবীর ব্যথা স্মরণ করিয়া তাঁহার আত্মা যে বেদনা বোধ করিয়াছিল এই সকল মূর্ত্তিতে সেই বেদনা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু প্রাম্বানান্ মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্রাবলীতে, বিষ্ণু-মন্দির গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা বিষয়ক অথবা লোরো জোঙ্গরাং শিব-মন্দিরের রামায়ণী চিত্র সমূহে একটা মানবীয়তার আভাস পাওয়া যায়। এই কারণে এইগুলি আমাদিগকে অধিকতর আনন্দ দান করে। মনে হয় যেন আজন্মপরিচিত রামায়ণ মহাকাব্যটি প্রস্তরলিপিতে পাঠ করিতেছি।

ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রচলিত বীর-কাহিনী, কথা, জাতকের গল্প ও অন্যান্য মহাকাব্য-

গুলিও ভারতের বাহিরে প্রচার লাভ করিতে থাকে। ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারতে রামায়ণের গল্পই লোককে যেন বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ, হিন্দু-চীনে-(ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ ও সিয়ামে)ও অন্যান্য প্রচলিত কাহিনী অপেক্ষা রামায়ণের কাহিনীর প্রভাবই বেশী লক্ষিত হয়।

রামায়ণী কাহিনীর মূল উৎস কোথায় তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। আমরা বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণকেই মূল বলিয়া মানিয়া রাখিয়াছি বটে কিন্তু এখনো এদেশে ও বৃহত্তর ভারতে বাল্মীকির রামায়ণ হইতে অল্প বিস্তর বিভিন্ন বহু রামায়ণী গল্প প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ রামায়ণী গল্প বহু বিভিন্ন গল্পের সংমিশ্রণে, বহু উৎস হইতে রস আহরণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই গল্পে যে বহু জোড়া-তাড়া আছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই অনার্য্য-জাতিসমূহের মধ্যেও এই গল্প প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ অনার্য্যেরাই এই গল্পের আদি জন্মদাতা। অন্ততঃ পালি 'দশরথ জাতক' পাঠে মনে হয়, যে তখনও গল্পটি স্পষ্ট আকার ধরিয়া উঠিতে পারে নাই, তখনও নানা দিক হইতে অন্য নানা গল্পের দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি সাধন চলিতেছিল। ইহা খৃষ্ট পূর্ব্ব পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কিন্তু, ব্রাহ্মণেরা এই গল্পের মাল-মসলা হাতে পাইয়া ইহাকে একটি নূতন রূপ দান করিলেন—ছন্দে ও ভাবৈশ্বর্য্যে যাহা অপরূপ। সম্ভবতঃ ব্রহ্মণ্য সাহিত্যের ইহাই প্রথম সজ্ঞান শিল্পসৃষ্টি প্রচেষ্টা। এই ঘটনাটা আন্দাজ খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ রামায়ণের নায়ককে বিষ্ণু-অবতাররূপে খাড়া করিয়া অন্যান্য বীর, বনের রাক্ষস, অযোধ্যার রাম ও লঙ্কায় রাবণকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া একটি মহাকাব্য গড়িয়া তুলিলেন। এই সংস্কৃত মহাকাব্য বাল্মীকির নামের সহিত যুক্ত হইল। ইহাই রামায়ণের আদর্শ গল্প বলিয়া বিবেচিত হইলেও অন্যান্য রামায়ণী গল্পও চলিতে লাগিল। এই কাহিনী জন-সাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল এবং নানা দেশে বিভিন্ন গল্প লইয়া ইহার বিভিন্ন পাঠান্তর দেখা যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-গণের দ্বারা প্রচারিত রামায়ণে যে সকল ঘটনা বিবৃত হয় নাই এমন সকল ঘটনাও ভিন্ন ভিন্ন রামায়ণী গল্পে ক্রমশঃ যুক্ত হইয়া গেল। এই সকল পৃথক্ রামায়ণী গল্প আজিও ভারতবর্ষে, হিন্দুচীনে ও দ্বীপময় ভারতে প্রচলিত।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ রামায়ণের এই সকল বিভিন্ন পাঠ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ডাক্তার হ্বিলহেল্ম্ ষ্টুটেরহাইমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পুস্তকের নাম—Rama-legendem U. Ramareliefs in Indonesien। কলিকাতার বৃহত্তর ভারত সমিতির তরফ হইতে ডাক্তার বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় ভারতীয় সভ্যতা' (Indian Culture in Java and Sumatra, Bulletin No. 3 of the Greater India Society, Calcutta) নামে যে পুস্তিকা লিখিয়াছেন তাহাতেও এবিষয়ে বহুতথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডাক্তার ষ্টুটেরহাইম সাহেব তাঁহার পুস্তকে রামায়ণী চিত্রাবলীর বহু মূল্যবান ও চমৎকার নিদর্শন সন্নিবেশিত করিয়া ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্থীদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। খোদিত চিত্রগুলির প্রতিলিপি দেখিলে চক্ষুসার্থক হয়। ডাক্তার জে কাট্‌সের বইখানি (Het Ramayna op Javaansche Tempelreliefs) খুব ছোট ও সর্ব্বসাধারণের জন্য লেখা। ইহাতে প্রাম্বানান্ ও পানাতারাণ মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্রসমূহের চমৎকার প্রতিলিপি আছে ও ছবিগুলির বর্ণনা ইংরাজী ও ডাচভাষায় দেওয়া আছে। এতদ্‌ব্যতীত Volkslek-tuur বা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য ডাচ-সরকারের প্রতিষ্ঠান (মালয় দ্বীপপুঞ্জের Balai Poestakaও) যবদ্বীপের অধিবাসীগণকে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদের প্রস্তর-শিল্প ও অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের সহিত পরিচিত করিবার জন্য বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে রোমা-নাইজড জাভানীজ লিপিতে Serat Raman নামে তিনখণ্ডে এক সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রাম্বানান্ ও পানাতারাণের সকল চিত্র ত আছেই, ভূমিকায়, যবদ্বীপের প্রাচীন কবিতা হইতে সংগৃহীত রামায়ণের গল্প ও ওয়েয়াং বা ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত রামায়ণী গল্পের বিভিন্ন সংস্করণও বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যবদ্বীপবাসীরা তাহাদের প্রাচীন শিল্প-কীর্ত্তির কাহিনী অতি সহজেই জানিতে পারিতেছে। অথচ ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে আমাদিগকে অভিজ্ঞ করিবার তেমন কোনো চেষ্টা আমাদের এ দুর্ভাগ্য দেশে হয় নাই!

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা যবদ্বীপ-বাসীকে গতানুগতিক করে নাই। তাহারা যে শুধু ভারতীয় সভ্যতার অনুকরণই করিয়াছিল এমন নহে, নিজেরাও শিল্পকলার বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিল। প্রাম্বানান চৈত্যে রামায়ণের ৪২টি ঘটনার চিত্র আছে। রাবণ-বধের জন্য বিষ্ণুর নিকট দেবতাদের তপস্যায় এই চিত্র-কাহিনীর আরম্ভ ও বানরগণ কর্ত্তৃক সেতুবন্ধ ও রামলক্ষ্মণের লঙ্কায় প্রবেশের দৃশ্য দিয়া ইহার সমাপ্তি হইয়াছে। দেওগড়ের

এ-হোল মন্দির-গাত্রের চিত্রাবলীতে ব্যতীত এভাবে একটি বৃহৎ কাহিনীকে প্রস্তর-শিল্পে গ্রথিত করার চেষ্টা ভারতবর্ষেও দেখা যায় না। এই সকল চিত্রে শুধু দেবতাদের কীর্ত্তিকলাপ বা রামকে অতিমানুষ করিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা নাই। মনে হয় শিল্পী অতি সাধারণ মানুষের ও পশুর সুখদুঃখ হাসি-আনন্দময় জীবনের কাহিনী অতি সহজ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রস্তর-কাহিনীর রাজা-রাজড়ারা আপনাদের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সহজ মানুষ, রাক্ষস ও বানরেরা যেমন ভীষণ ও পশুভাবাপন্ন তেমনই আবার বহু হাস্যরসেরও খোরাক জোগায়। কোথায়ও শিল্পীর অসম্ভব বা আজগুবী কল্পনার ছাপ নাই। পশুপক্ষীরা ঠিক যেন পশু ও পাখীর জীবন যাপন করিতেছে—এই ভাবে চিত্রিত, অবশ্য স্থানে স্থানে গল্পের ধারা বজায় রাখিবার জন্য শিল্পী তাহাদিগের দ্বারা মানবীয় কার্য্যও করাইয়া লইয়াছেন। প্রয়োজনানুযায়ী অথবা স্থান-পূরণের জন্য শিল্পী যে সকল গাছপালার অবতারণা করিয়াছেন সেগুলি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মোটের উপর এগুলিতে আমরা হিন্দু জাভানীজ শিল্পের পরবর্ত্তী 'গথিক' ভাব, ইন্দোনেশিয়ান শিল্পের পূর্ব্বতন ধারার প্রাধান্য, 'ডেকোরেশন'-প্রীতি, আজগুবী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ, এসব কিছুই দেখি না। পানাতারাণের রামায়ণ শিল্পে এইগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। অবশ্য যবদ্বীপ-শিল্পের এই দ্বীপ-গত স্বাতন্ত্র্যই জাতীয় শিল্পের যথার্থ পরিচায়ক, দেশের শিল্পধারার পূর্ণবিকাশ ইহাই। শিল্পহিসাবে ক্লাসিকাল বা হিন্দুজাভানীজ শিল্প-কলা হইতে ইহার প্রাধান্য অধিক। কিন্তু প্রাম্বানান্ মন্দিরের চিত্রাবলী ভারতীয় কলা-শিল্পকেই ভাষান্তরিত করিয়া দেখাইতেছে বলিয়া ভারতের সঙ্গে ঐক্য খুঁজিবার সময় ঐতিহাসিককে এগুলি বিশেষ সাহায্য করে। ভারতীয় শিল্পের সোনার কাঠির স্পর্শে যবদ্বীপবাসীর মনে কোন ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহার পরিচয় এইগুলিতে আছে। ভারতীয় শিল্পীর অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন যবদ্বীপের শিল্পীরা যে বিস্ময়কর সৃষ্টিশক্তি দেখাইয়াছিলেন, দিয়েং, বরবুদুর ও প্রাম্বানানে শিল্পবিলাসীগণ তাহার পরিচয় পাইবেন। যবদ্বীপের পরবর্ত্তী শিল্পধারা এই শিল্প হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এবং পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ কলা-শিল্পের সহিত পরবর্ত্তী শিল্প সমান আসনের অধিকারী হইলেও হিন্দুসভ্যতার স্পর্শে সঞ্জীবিত এই প্রাচীন শিল্পধারাও মোটেই উপেক্ষার নয়।

প্রাম্বানানের রামায়ণী চিত্রাবলীর শিল্প-কলার দিক দিয়া প্রাধান্য ছাড়া ভারতীয় কথাসাহিত্য ও পুরাণ-কাহিনীর দলিল স্বরূপেও এগুলি অমূল্য। এগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শিল্পীরা বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়িয়া অন্য কোনও প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীকেই চিত্রবদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত ১৯ খানি চিত্রের মধ্যে দু'একখানির বিশেষ বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছি, যে বাল্মীকির রামায়ণের সহিত প্রাম্বানানের প্রস্তর লিখিত রামায়ণের পার্থক্য আছে। Stutterheim ও Przyluski প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে প্রভূত গবেষণা করিয়াছেন।

২১নং চিত্র। এই চিত্র দুই দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম রাবণ তাহার মায়ারথে সীতাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই মায়ারথটি আকাশচারী পক্ষবিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত দানব কর্ত্তৃক বাহিত হইতেছে। দশ-মুণ্ড বিশ হস্ত রাবণ সীতাকে ধরিয়া আছে। রাবণের সহিত যুদ্ধরত জটায়ুকে রাবণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও আহত দেখিয়া সীতা তাড়াতাড়ি তাহাকে রামকে দিবার জন্য স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করিতেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে সীতার ব্যর্থ অনুসন্ধানে পরিশ্রান্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা বিমর্ষ মুখে বসিয়া আছেন এমন সময়ে জটায়ু ঠোঁটে করিয়া সীতার অঙ্গুরী রামকে আনিয়া দিতেছে। দুই চিত্রের মধ্যবর্ত্তী অংশে অরণ্যের দৃশ্য—এক জন অরণ্যবাসী বসিয়া আছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে গাছের উপরে কাঠবিড়ালী ও সর্পেরা খেলিয়া বেড়াইতেছে। বাল্মীকির মূল রামায়ণে সীতা কর্ত্তৃক জটায়ুকে অঙ্গুরী দেওয়ার কোনো উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ জাভায় প্রচলিত ও বর্ত্তমানে ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত কোনও সংস্করণ হইতে এই চিত্র গৃহীত হইয়াছে।

২৫নং চিত্র। এই চিত্রটি তিন দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম দুই দৃশ্যে যাহা প্রদর্শিত হইতেছে তাহা সংস্কৃত ও ভারতীয়

রামায়ণ সমূহে নাই। এই কাহিনী সম্ভবতঃ কেবলমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত। প্রথমদৃশ্যে রাম সীতাকে খুঁজিতে খুঁজিতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, লক্ষ্মণ একটি বাঁশের চোঙায় তাঁহাকে পানীয় আনিয়া দিতেছেন। রাম জল খাইতে গিয়া দেখিলেন লবণাক্ত জল। লক্ষ্মণ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন (দ্বিতীয় দৃশ্য) যে জলস্রোত হইতে তিনি রামের জন্য পানীয় লইয়া গিয়াছিলেন তাহা একটি গাছ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই গাছের উপর বসিয়া সুগ্রীব মনোদুঃখে ক্রন্দন করিতেছিল, তাহারই অশ্রুধারা গাছ বাহিয়া পড়িতেছে। তৃতীয় দৃশ্যে সুগ্রীব ও রামের সাক্ষাৎ ও লক্ষ্মণকে সাক্ষী রাখিয়া পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন। দ্বিতীয় দৃশ্যে সুগ্রীবের নীচে ও লক্ষ্মণের মাথার উপরের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য একটি করিয়া হরিণছানা অথবা ভেড়া খোদাই করা হইয়াছে। রাম কর্ত্তৃক সুগ্রীবের অশ্রুবারি পান গল্প আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা ধারণা করিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ এই চিত্রে রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে ইন্দোনেশিয়াতে প্রচলিত কোনো প্রাচীন প্রথানুযায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, প্রথম দৃশ্যে বাঁশের চোঙার মদ আছে, দ্বিতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণ প্রজ্জ্বলিত মশাল ধরিয়া আছেন এবং ভেড়াদুটী উৎসর্গ বা বলির ভেড়া।

২৭ ও ২৮ নং চিত্র। এই দুইটি চিত্রে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম চিত্রে বালি ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে, রাম লক্ষ্মণ ও বনের অনুচরেরা তাহা দেখিতেছেন। দুই ভাই-এর আকৃতিগত পার্থক্য না থাকাতে রাম প্রতিশ্রুত হইয়াও বালির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। দ্বিতীয় চিত্রে সুগ্রীবের গলায় মালা দেওয়া আছে এবং বালি ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে। রাম শরনিক্ষেপ করিয়া বালিকে বধ করিতেছেন। এখানেও খালি জায়গায় একজন অরণ্যবাসীর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। শেষ অংশে কিষ্কিন্ধ্যার রাজসিংহাসনারূঢ় সুগ্রীব ও রাজমহিষী তারার চিত্র।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে প্রাম্বানান্ মন্দিরে রামায়ণের ৪২টি দৃশ্যের বর্ণনা প্রস্তরে খোদিত আছে। ডাক্তার জে কাটসের Het Ramayana Op Javaansche Temple Reliefs পুস্তকে এগুলিকে ২৪টি চিত্রে বিভক্ত করা হইয়াছে, ৮খানি বড় ও ১৬খানি অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রবাসীর জন্য এই ৪২টি দৃশ্যের ৩৯টি চিত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ১৩৩৪ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে ১০খানি পূর্ণ পৃষ্ঠা, ঐ সালের কার্ত্তিকের প্রবাসীতে ৮খানি পূর্ণ পৃষ্ঠা এবং ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে ২খানি পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী ১৯খানি এই সংখ্যায় দেওয়া হইল। গল্পের ধারাটী দেখাইবার জন্য এই ৩৯খানি চিত্রেরই বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত শয়নে বিষ্ণু। বামে গরুড় বিষ্ণুকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। দক্ষিণে দেবতাগণ রাবণের অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন। অসংখ্য জলচর জন্তু দৃষ্ট হইতেছে।

২। রাজোদ্যানে রাজা দশরথ, রাজমহিষী, রামলক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন চারিপুত্র ও রাজ কন্যা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন।

৩। দশরথ কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান।

৪। রাম কর্ত্তৃক তাড়কা বধ।

৫। বিশ্বামিত্রের আশ্রম। ঋষিগণ তপস্যা করিতেছেন, ইতি মধ্যে রামের রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ, মারীচের প্রতি শরনিক্ষেপ।

৬। রাজর্ষি জনকের সভায় বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণ, সীতাদেবীর সমক্ষে রামের হরধনু ভঙ্গ।

৭। সীতাকে বিবাহ করিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির অযোধ্যা যাত্রা। পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ, পরশুরামের আস্ফালন।

৮। পরশুরামের ধনুতে রামের জ্যারোপণ, পরশুরামের পরাজয়।

৯। দশরথ ও কৌশল্যার রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন। কৈকেয়ীর ক্রোধ, ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্ম তাঁহার বর-প্রার্থনা।

১০। ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক। নৃত্যগীতাদি উৎসব।

১১। রাম-বনবাসের আজ্ঞার পর দশরথ ও কৌশল্যার বিলাপ।

১২। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের বন-গমন।

১৩। দশরথকে দাহ করিবার আয়োজন। ব্রাহ্মণগণকে কৌশল্যা ও ভরতের দান।

১৪। রামের অনুসন্ধানে ভরত শত্রুঘ্নের যাত্রা, বনমধ্যে মিলন। রামকে রাজ্যে ফিরিবার জন্ম ভরতের অনুনয়। রামের অসম্মতি ও ভরতকে তাঁহার পাদুকা প্রদান।

১৫। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ। বিরাধ রাক্ষস কর্ত্তৃক সীতাহরণ-চেষ্টা ও বিরাধকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার।

১৬। রাম সীতা ও কাকের উপাখ্যান। সীতা বৃক্ষ-শাখায় হরিণের মাংস শুষ্ক করিতে দিয়াছিলেন। একটি কাক আসিয়া তাহা চুরী করিতে চেষ্টা করে। সীতা কাককে তাড়াইয়া দিতে গেলে সে তাঁহাকে আক্রমণ করে। ভয়ার্ত্ত সীতা রামের কাছে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। রাম কাকের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। কাক উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মাস্ত্রও ছুটিতে থাকে। কাকটি শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া রামের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে। রাম বলেন নিক্ষিপ্ত শর কিছুকে আঘাত না করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। কাক তাহার একটি চক্ষুতে আঘাত প্রার্থনা করে। ব্রহ্মাস্ত্র কাকের চক্ষে প্রবিষ্ট হয়।

১৭। সূর্পণখার সুন্দরী বেশ ধারণ ও রামের প্রেম প্রার্থনা।

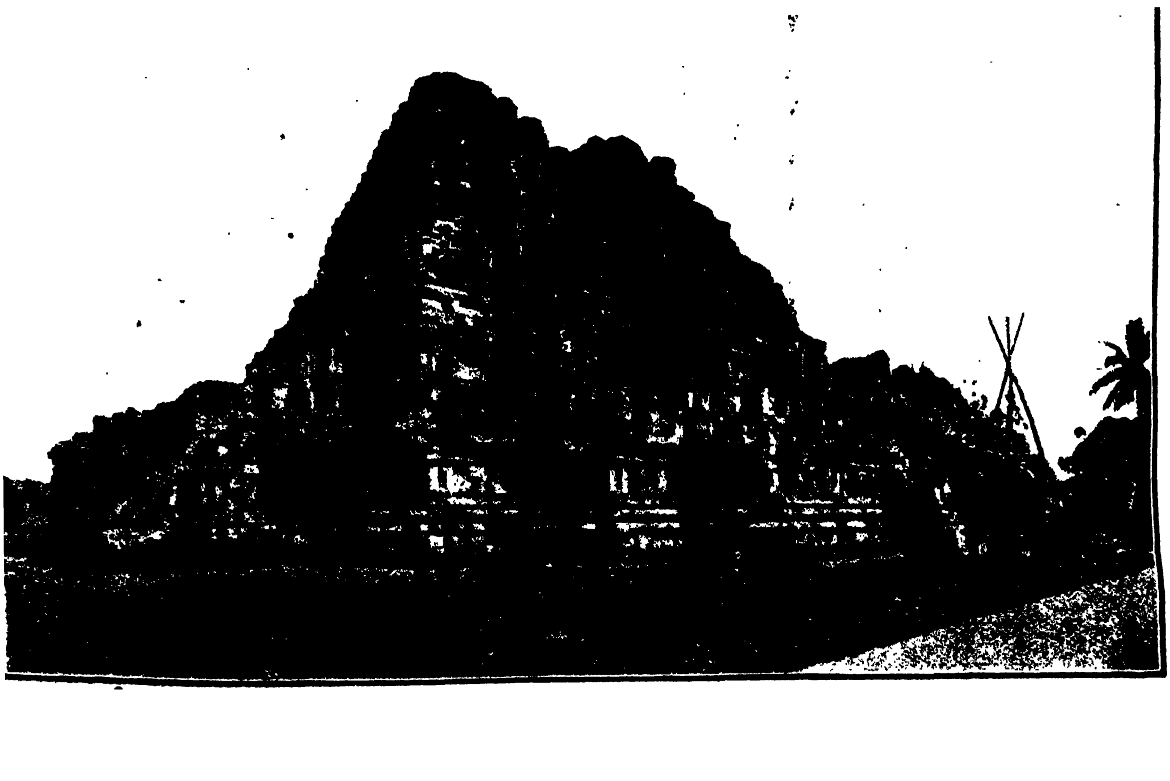
১৮। রামকর্ত্তৃক সূর্পণখাকে প্রত্যাখ্যান ও লক্ষ্মণের নিকট যাইতে উপদেশ প্রদান। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃকও সূর্পণখার প্রত্যাখ্যান।

১৯। লক্ষ্মণ সীতার প্রহরায় নিযুক্ত। রামের স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন।

২০। স্বর্ণমৃগ বধ, আহত মারীচের স্বদেহ ধারণ ও রামের স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর বিলাপ। সীতার চাঞ্চল্য।

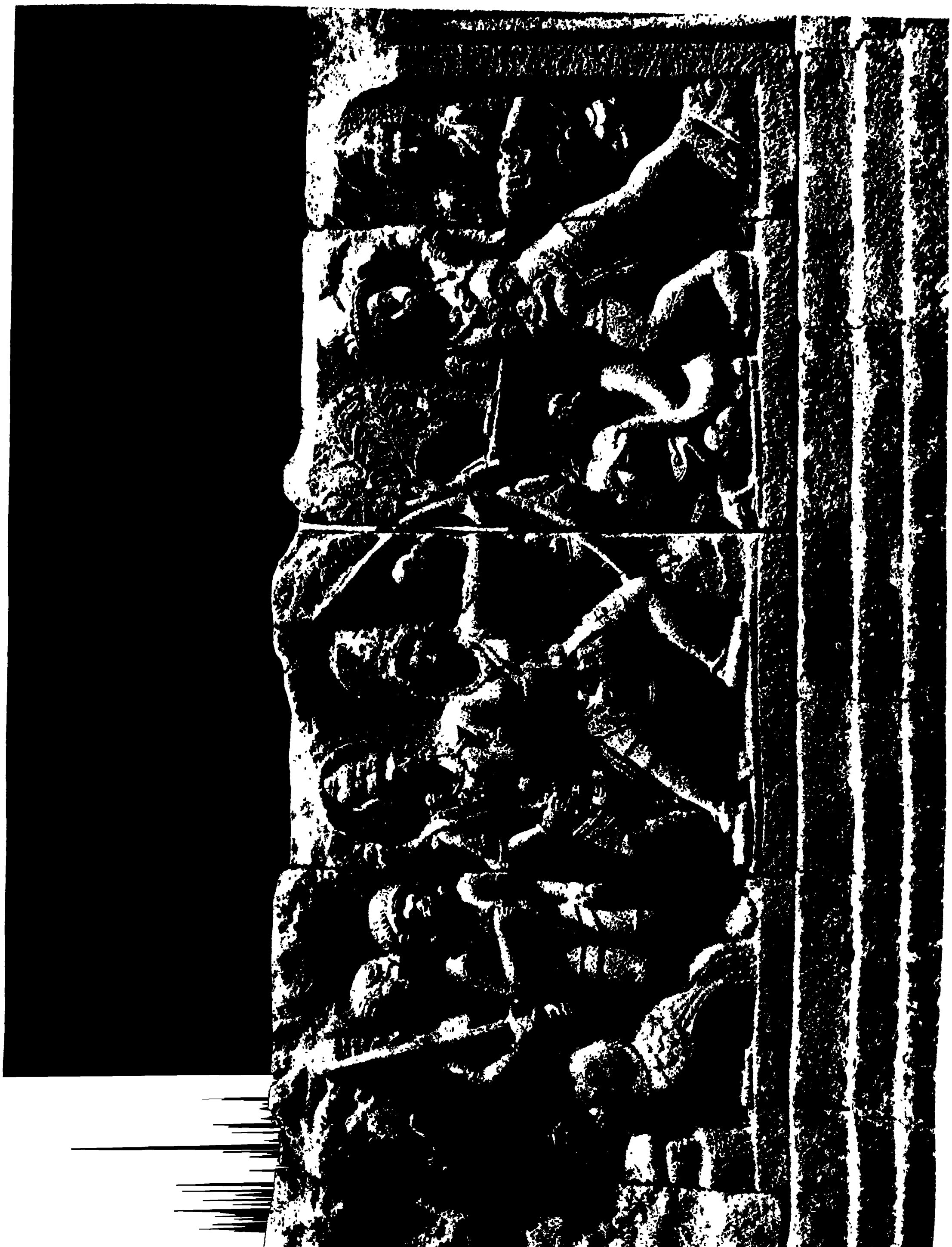
২১ সংখ্যা চিত্র হইতে ৩৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত চিত্র বিবরণী সহ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

এই চিত্রগুলি হইতে সুদূর অতীতে ভারতীয় শিল্প ও কাব্য যবদ্বীপ-বাসীদের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।



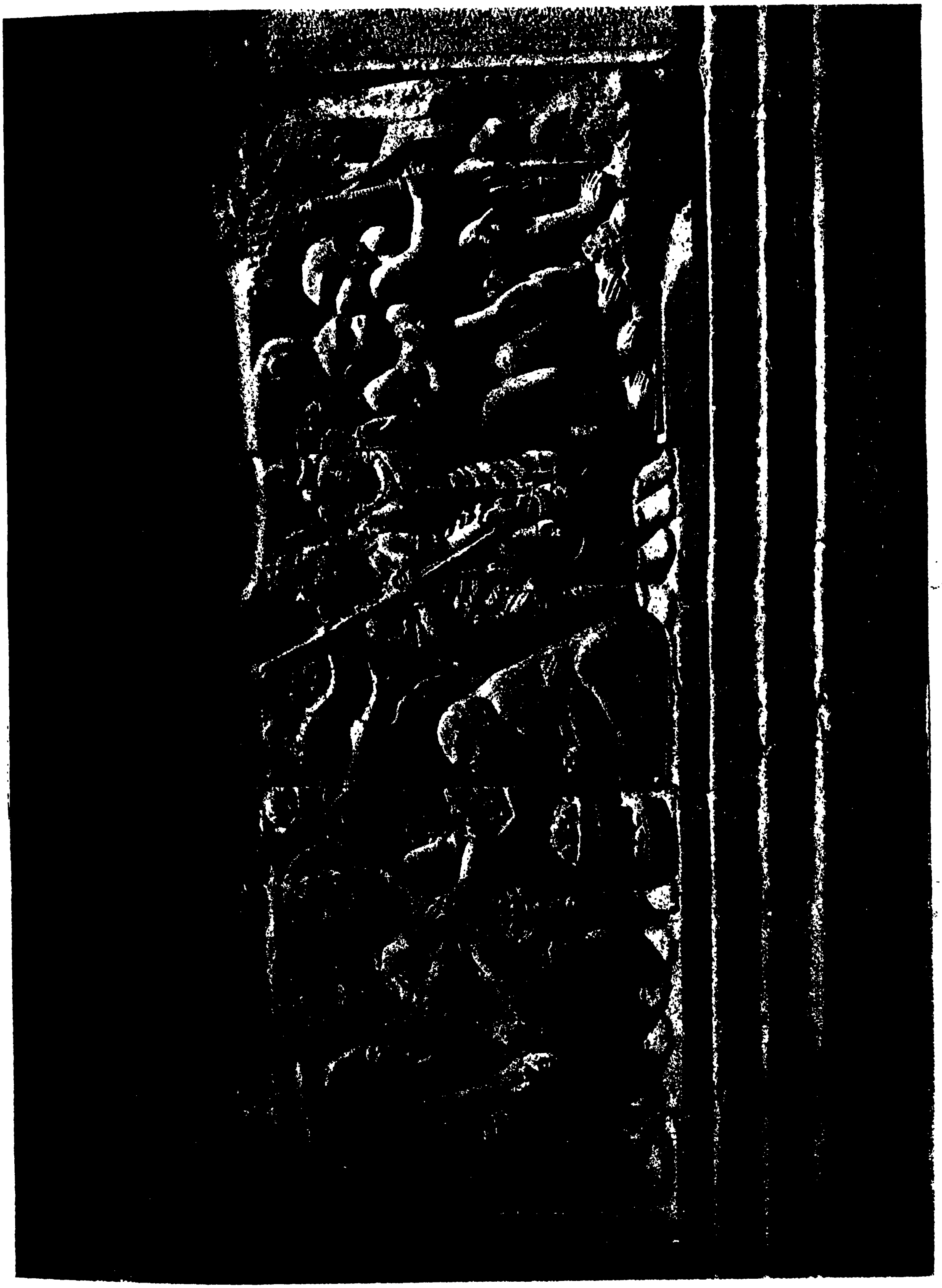


২১। (ক) রাবণ ও জটায়ুর দ্বিতীয়বার যুদ্ধে জটায়ুর পরাজয়, সীতা কর্ত্তৃক জটায়ুকে অঙ্গুরী প্রদান
(খ) সীতার ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর রাম ও লক্ষ্মণ বিমর্ষমুখে উপবিষ্ট। রামের হাতে জটায়ু কর্ত্তৃক সীতার অঙ্গুরী প্রদান

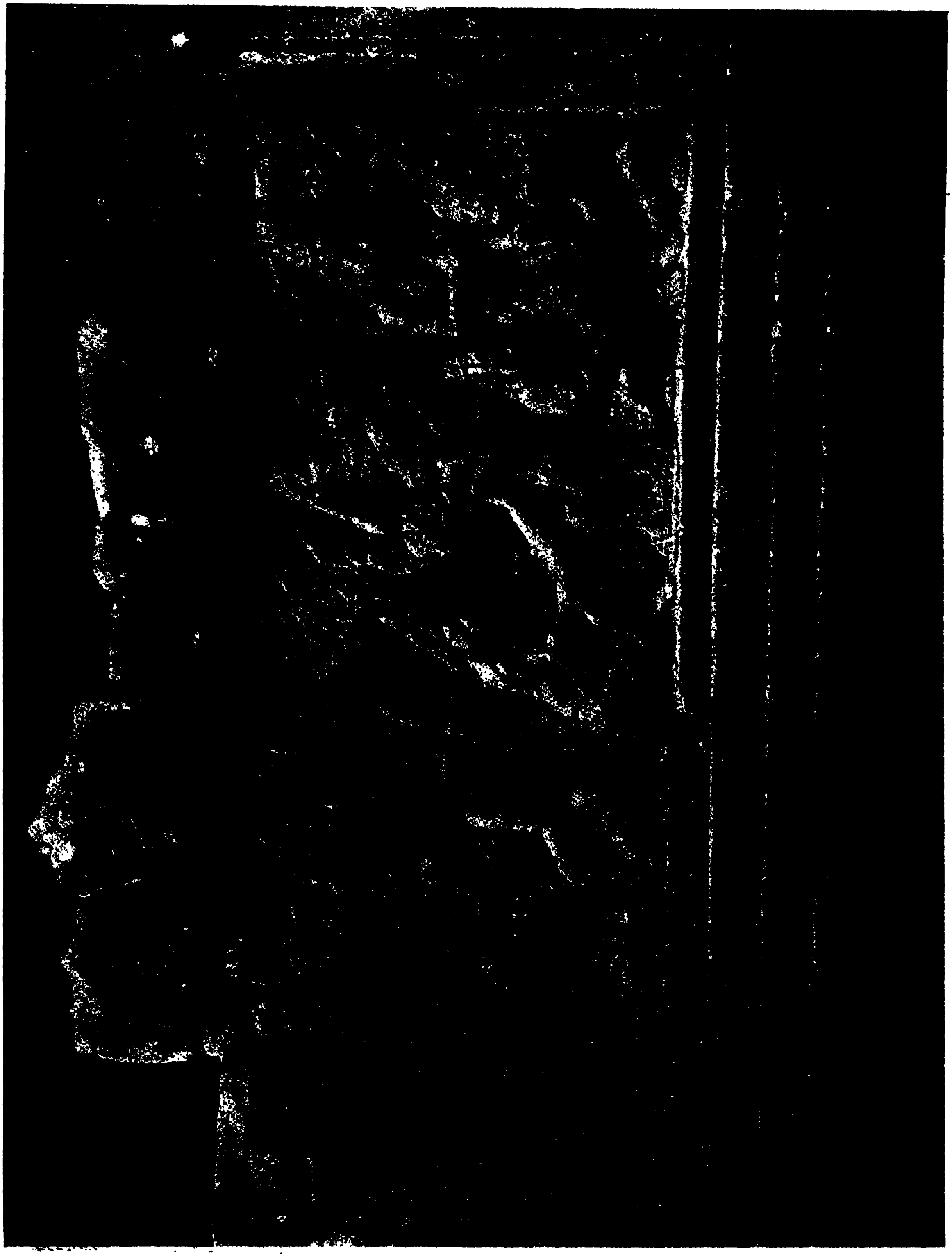


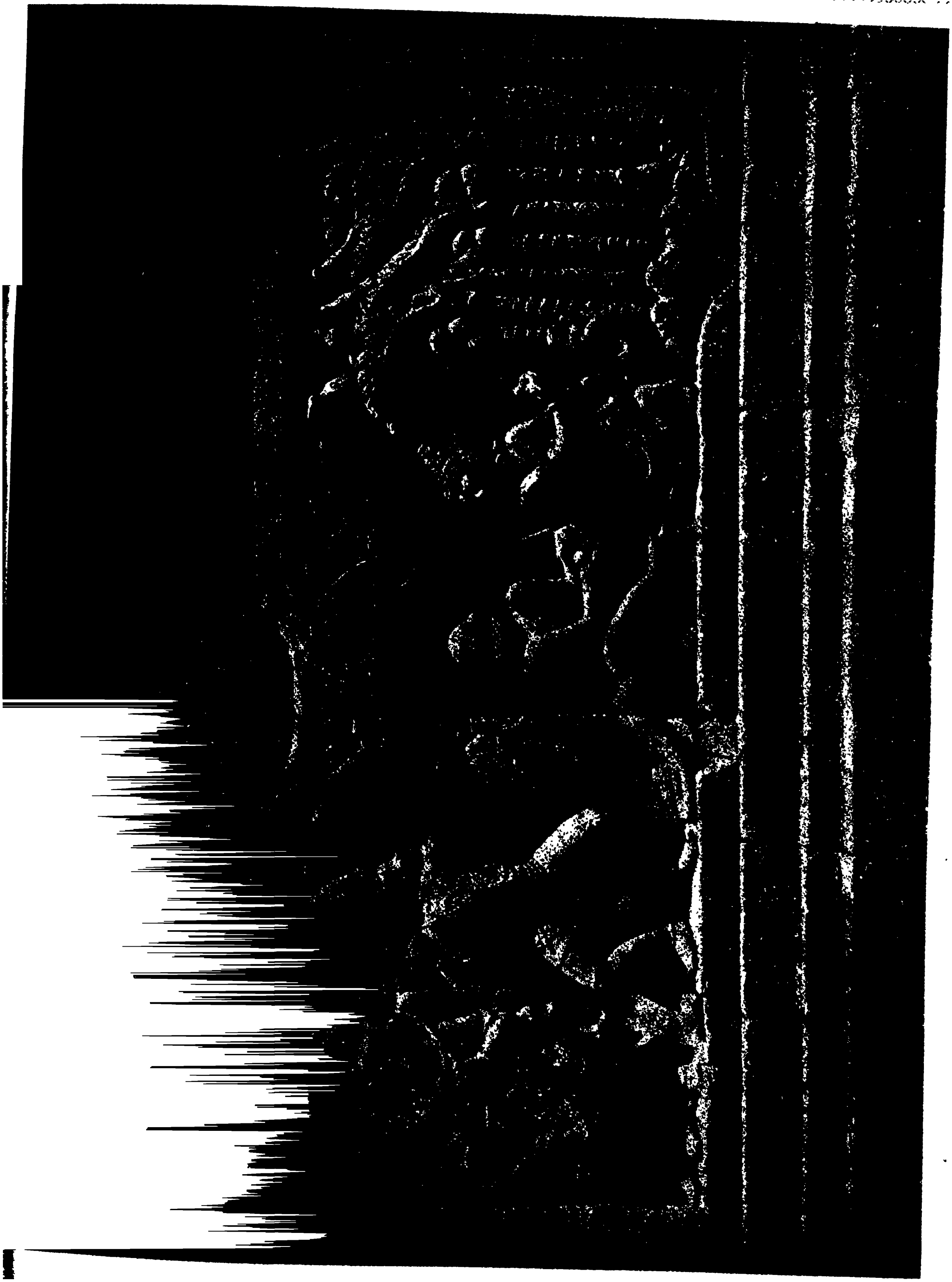
২২। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে কবন্ধের পরাজয় ও কবন্ধের দেহে বন্দীকৃত দেবতার মুক্তি ও স্বর্গে গমন



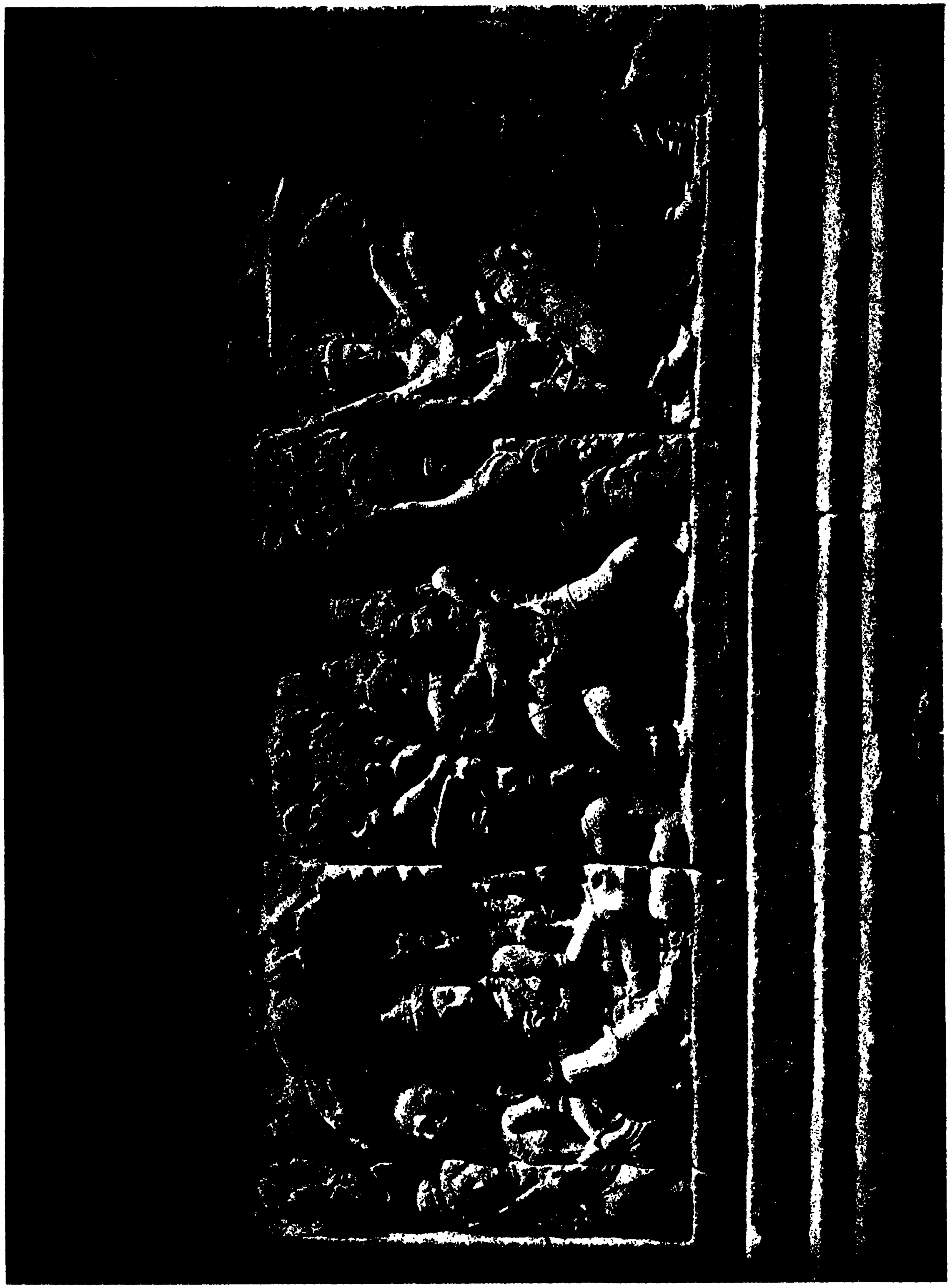


২৪ । রাম-লক্ষ্মণের হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ (বামভাগে) ও পরস্পর বিদায়-গ্রহণ (দক্ষিণে)

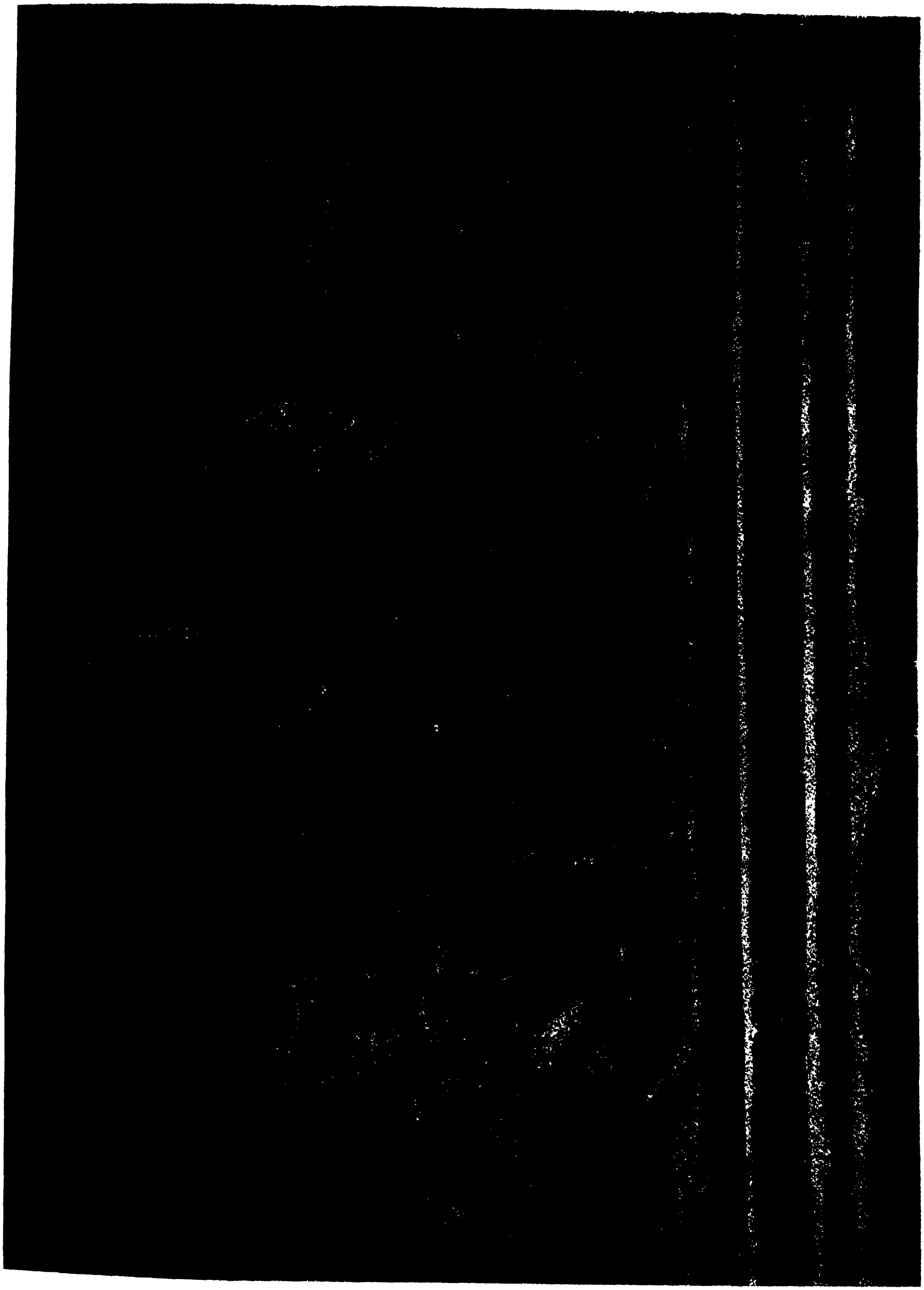




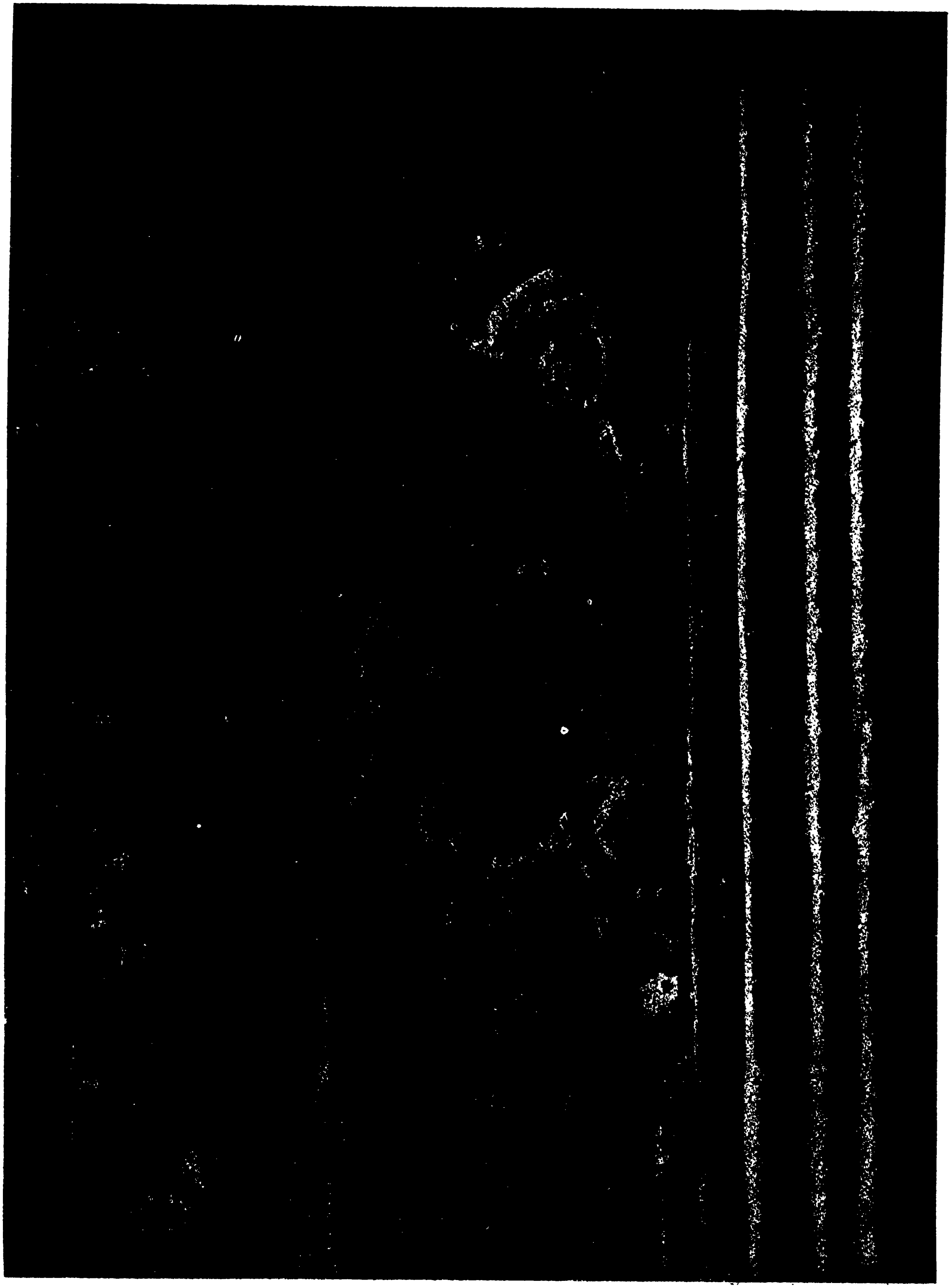
২৬। শরনিক্ষেপে সপ্ত তাল গাছ ভেদ করিয়া সুগ্রীবকে রামের বাহুবল প্রদর্শন



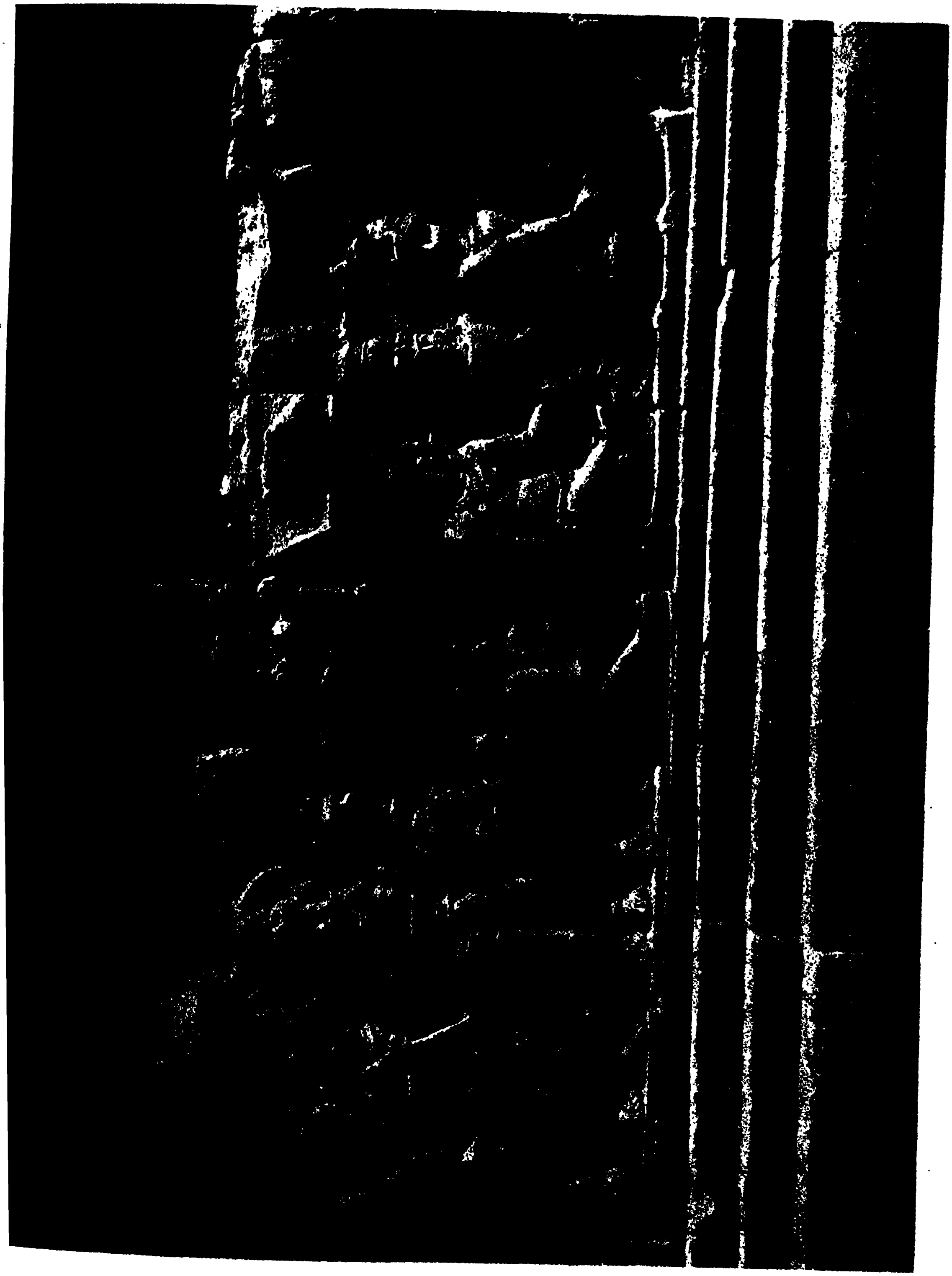
২৭। বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ ও সুগ্রীবের পরাজয়



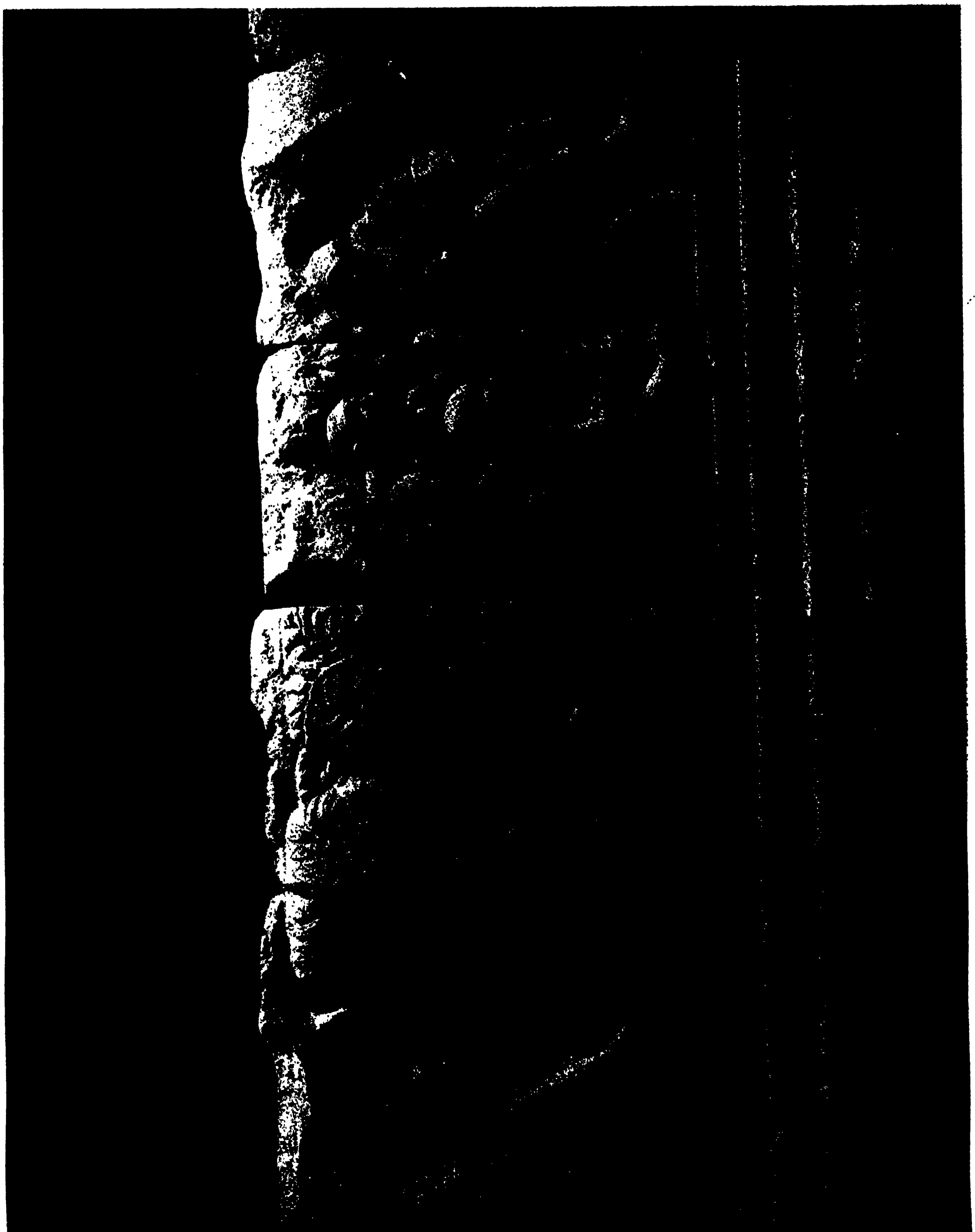
২৮। পরাজিত সুগ্রীবের পুনর্ব্বার বালিকে যুদ্ধে আহ্বান, কণ্ঠে মাল্যধারণ, বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ ও রাম কর্ত্তৃক বালি বধ



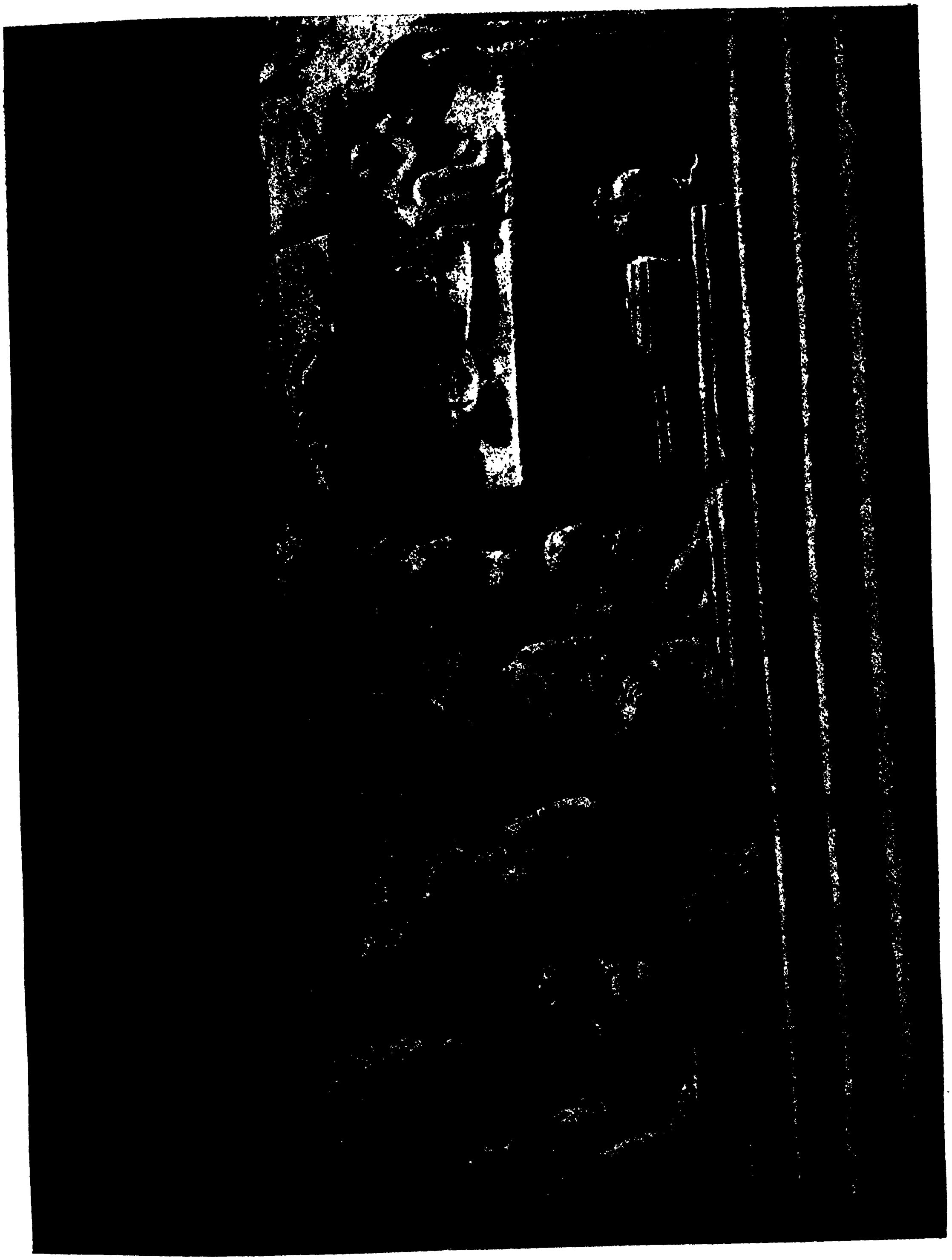
২৯। সুগ্রীবের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি ও তারা লাভ। বানরদের হর্ষ



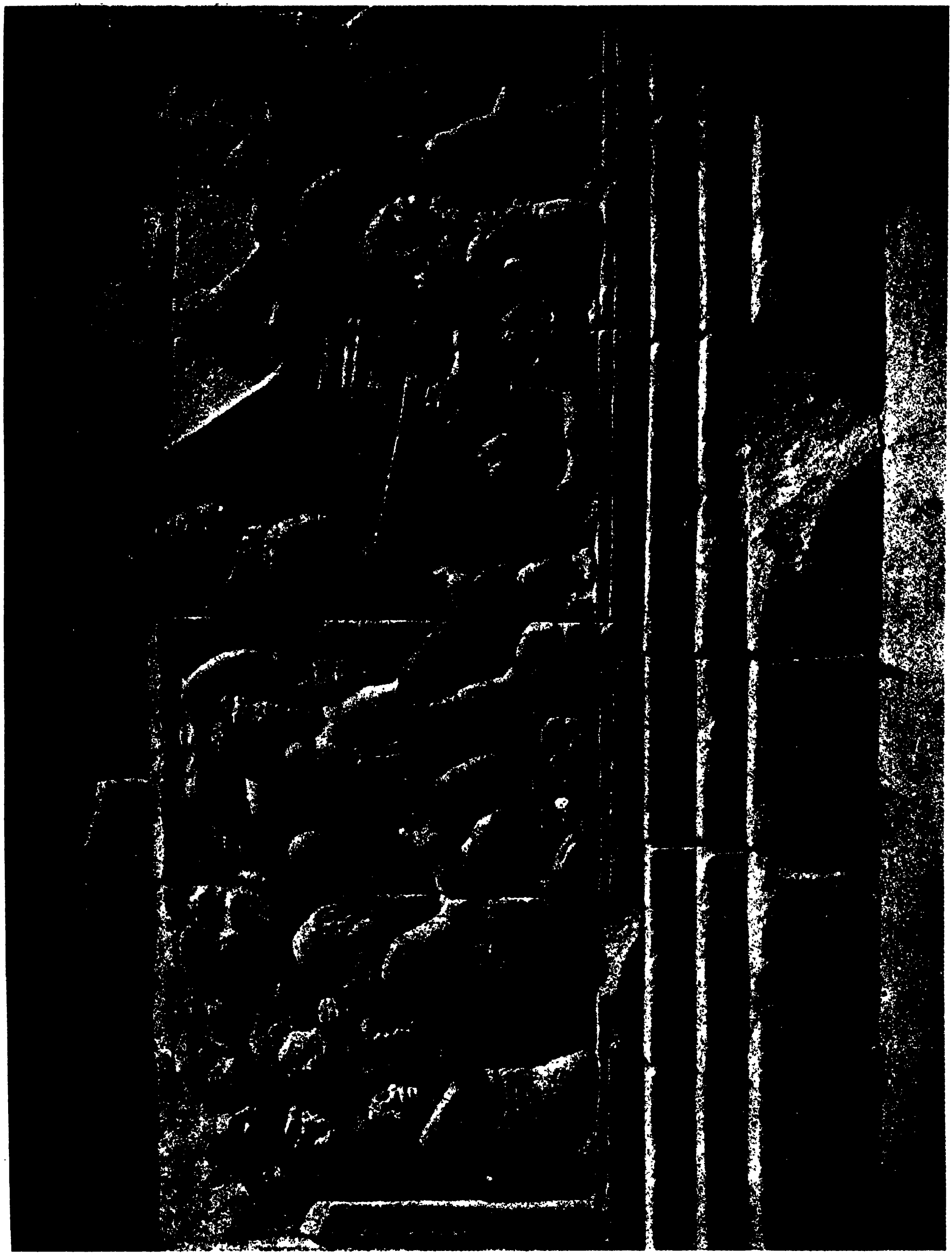
৩০। রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পরামর্শ

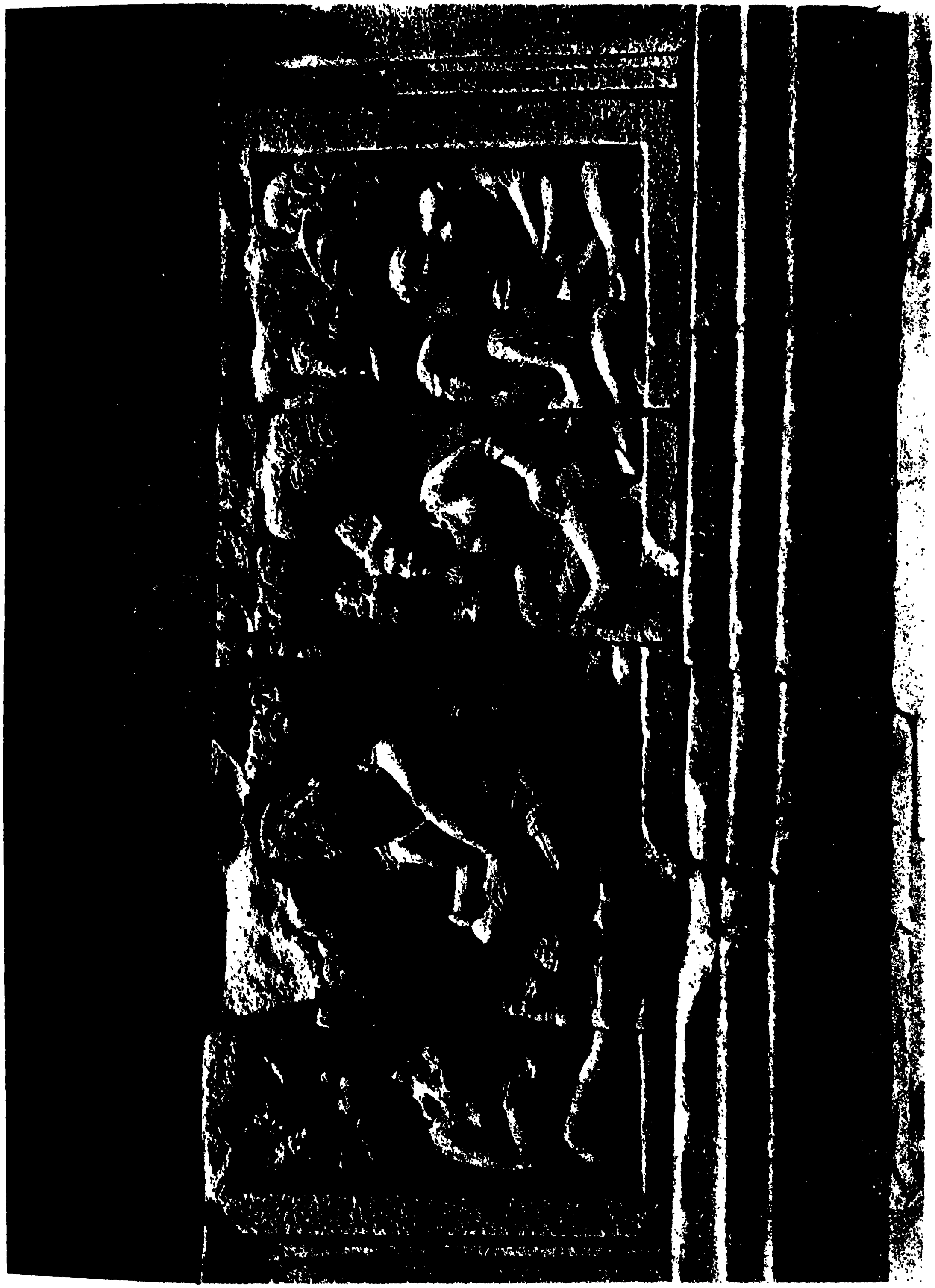


৩১। বানর-সৈন্যদের সীতা-অন্বেষণে দিগ্‌বিদিকে প্রেরণ করিতে সুগ্রীবের পরামর্শ

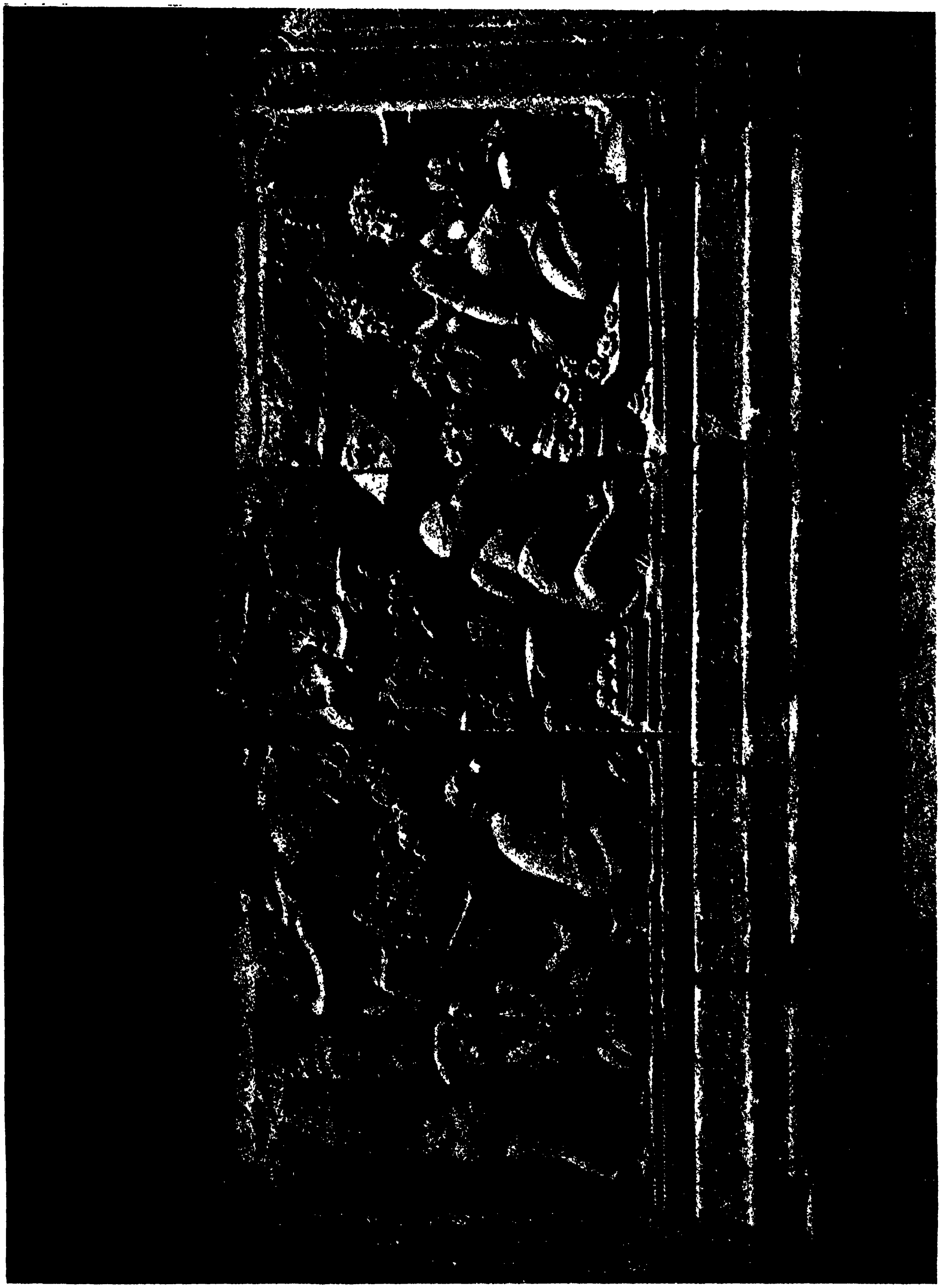


১২

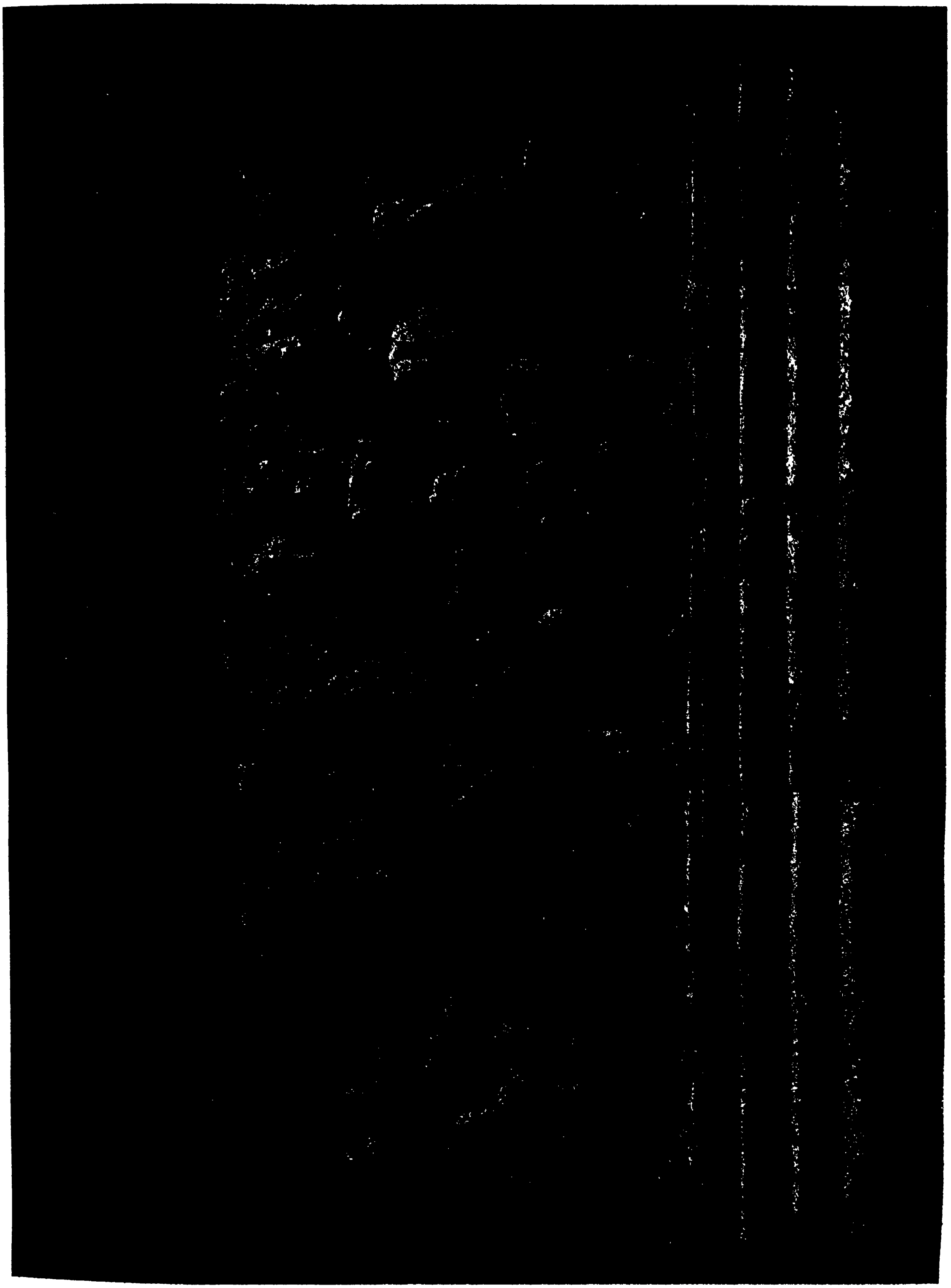




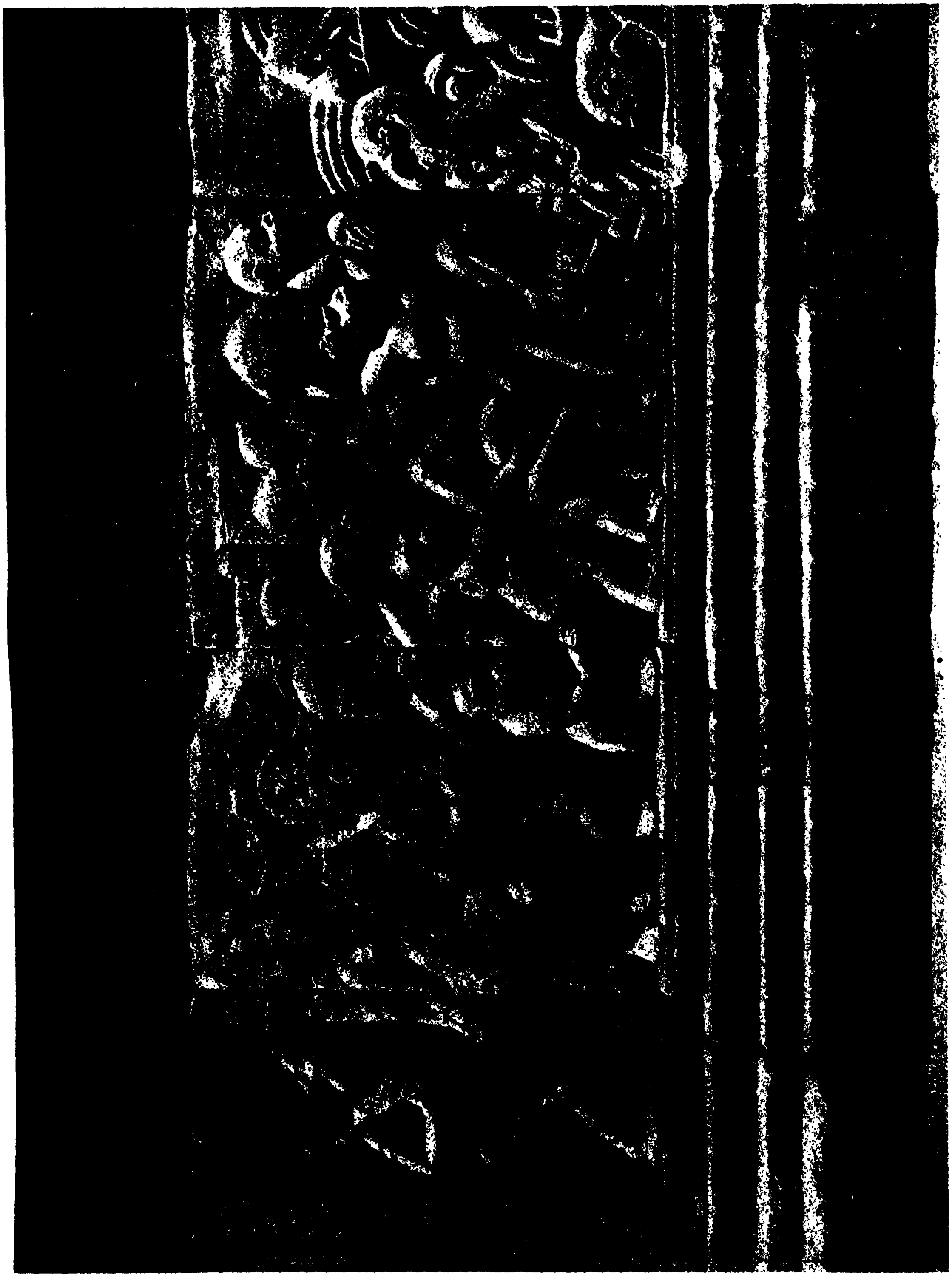
৩৪। অশোক বনে সীতা ও হনুমানের সাক্ষাৎ



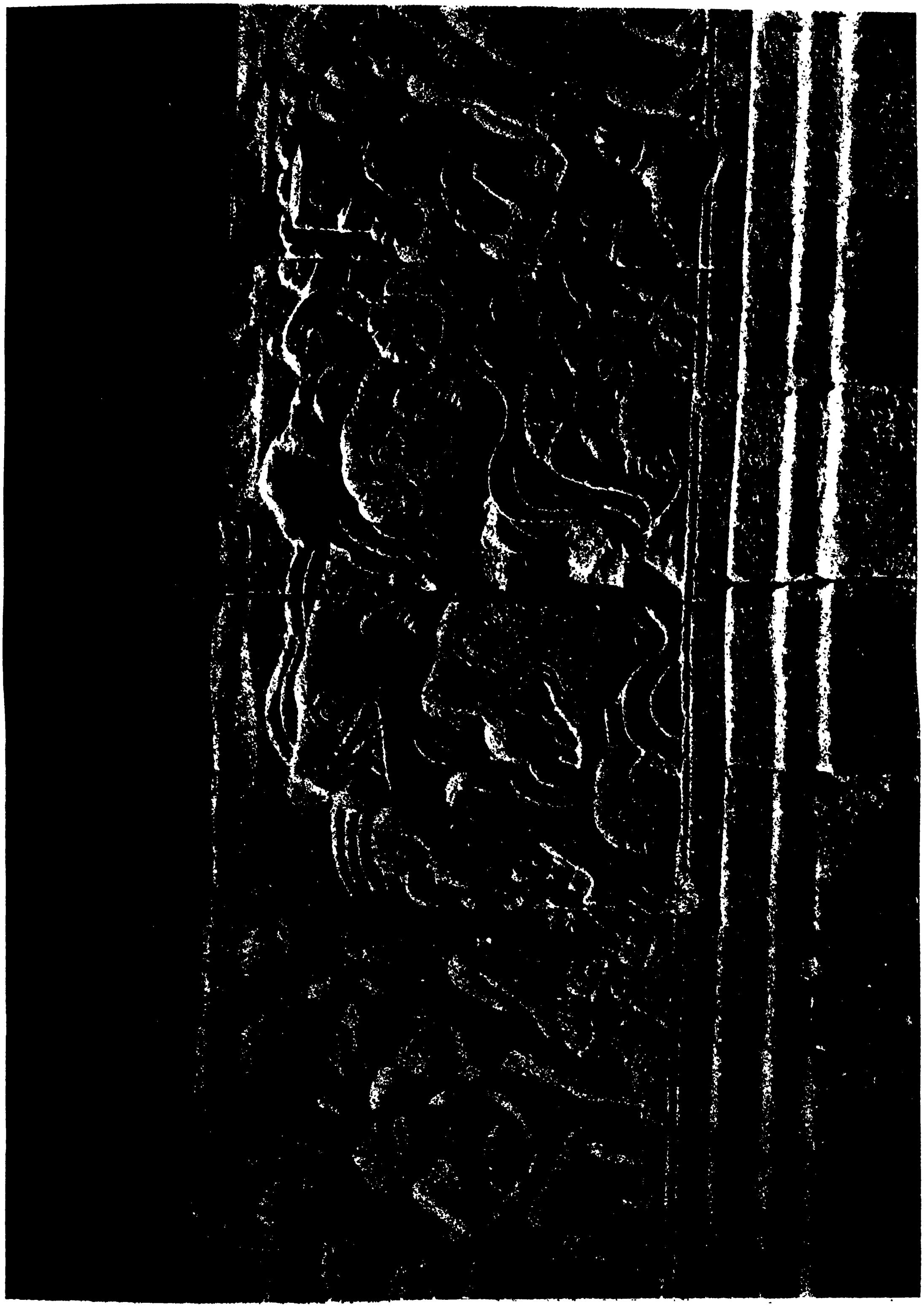
১৫। রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকট হনুমানের সীতা-সাক্ষাৎ-কাহিনী কথন



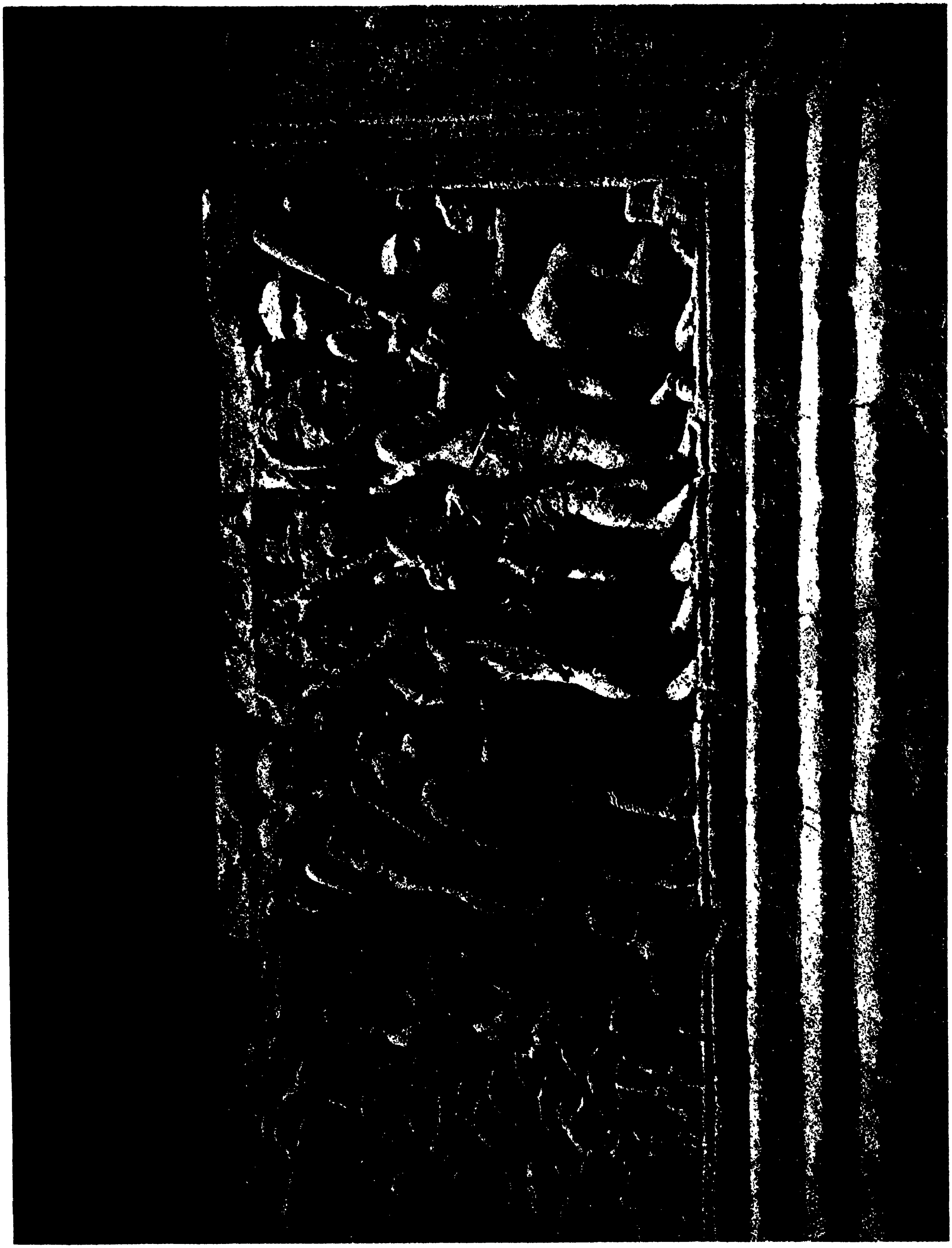
৩৬। রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন



৩৭। রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব কর্ত্তৃক আদিষ্ট বানরসৈন্যের সমুদ্রে প্রস্তর নিক্ষেপের আয়োজন



৩৮। বানরদের কার্য্যে সমুদ্রস্থিত জীবগণের আপত্তি



জীবনের মূল্য *

শ্রী স্বর্ণলতা চৌধুরী

জোসেফ ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। সে খবর দিতে আসিয়াছিল যে, গাড়ী প্রস্তুত। আমার মা এবং ভগিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এখনও সময় আছে, তোমার মত বদ্‌লাও। আমাদের সঙ্গে থাক, অত দূরে যাবার দরকার নেই।"

আমি বলিলাম, "মা, আমি ভদ্রলোকের ছেলে। আমার কুড়ি বছর বয়স হ'য়েছে, দেশ আমায় ডাক দিচ্ছে। আমায় যশ অর্জ্জন কর্‌তে হ'বে, সে সামরিক বিভাগেই হোক্, কি রাজসভাতেই হোক্। লোকের মুখে আমার নাম আমি শুন্‌তে চাই, একটু খ্যাতি চাই।"

"আর তুমি যখন দূরে চ'লে যাবে, বার্‌নার্ড্, আমি, তোমার বুড়ী মা, আমার তখন কি দশা হ'বে?"

আমি বলিলাম, "তোমার ছেলের সফলতা লাভের খবরে তুমি আনন্দে এবং গর্ব্বে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌বে।"

"আর তুমি যদি কোনো যুদ্ধে মারা যাও?"

"মারা যদি যাই, তাতেই বা কি? জীবন একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। কুড়ি বছর বয়সে ভদ্রলোকের ছেলে কেবল যশের স্বপ্নই দেখে। কিন্তু ভয় ক'রো না, মা, আমার কিছু অনিষ্ট হ'বে না। কয়েক বছর পরেই দেখো আমি একজন কর্ণেল কি জেনারেল হ'য়ে ফিরে আস্‌ব, এমন-কি রাজদরবারে খুব ভাল কাজ জুটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।"

মা বলিলেন, "তাই না কি? কখন সেটা হ'বে?" আমি বলিলাম, "সবুর ক'রে থাক, দেখ্‌তেই পাবে। সকলে তখন আমায় কিরকম সম্মান কর্‌বে, মনে মনে কত হিংসা কর্‌বে। সকলে আমায় টুপী তুলে অভিবাদন কর্‌বে। তারপর বোনদের বড় বড় ঘরে বিয়ে দেব, নিজে হেন্‌রিয়েট্‌কে বিয়ে কর্‌ব। তারপর সুখে স্বচ্ছন্দে সবাই মিলে আমার ব্রিটানীর জমিদারীতে বাস কর্‌ব।"

মা বলিলেন, "তা এসব এখনই কর না, বাছা? তোমার বাবা ত তোমার জন্যে যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। আশে-পাশে কোথাও, এর চেয়ে ভাল জমিজমা বা সুন্দর বাড়ী কারো আছে কি? তোমার প্রজারা কি রকম অনুগত। তুমি যখন গ্রামের ভিতর দিয়ে যাও, তখন একটা লোকও এমন দেখা যায় না, যে তোমায় টুপী তুলে অভিবাদন করে না। আমাদের ছেড়ে যেয়ো না, বাছা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে থাক। না হ'লে ফিরে এসে আমাকে হয়ত আর দেখ্‌তে পাবে না। মানুষের জীবন বড় শীগ্‌গির শেষ হ'য়ে যায়। বৃথা যশের পিছনে ছুটে, দিন নষ্ট ক'রো না। নানারকম চিন্তা জ্বালা যন্ত্রণায় জীবনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না। জীবন বড় মধুর, বাছা, আর ব্রিটানীর সূর্য্যালোক অতি উজ্জ্বল।"

এই বলিয়া আমার মা আমাকে জানলার কাছে লইয়া গেলেন। তিনি বাগানের গাছের সারির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। গাছের মাথাগুলি ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে; বাতাস ফুলের গন্ধে ভারাক্রান্ত।

চাকরবাকরের দল পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা গম্ভীর ও বিষণ্ণ। তাহাদের নীরবতাই যেন বলিতেছিল, "প্রভু আমাদের ত্যাগ কর্‌বেন না।"

আমার বড় বোন হর্টেস্ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিলেন। ছোন বোন এমেলী ঘরের এক কোনে বসিয়া একটি ছবির বই পড়িতেছিল। সেও কাছে আসিয়া বইখানা আমার হাতে দিয়া বলিল, "ভাই, প'ড়ে দেখ।"

কিন্তু আমি সকলকে ঠেলিয়া সরাইয়া বলিলাম, "আমি কুড়ি বৎসরের হয়েছি। আমি ভদ্র সন্তান। যশ এবং খ্যাতি অর্জ্জনের জন্যে আমায় যেতেই হ'বে। তোমরা বাধা দিও না।"

আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ঠিক

* Augustin Eugene Scribe হইতে।

তখনই সিঁড়ির মুখে একটি রমণী-মূর্ত্তি দেখা দিল। সে আমার সুন্দরী বাগ্‌দত্তা বধূ! সে অশ্রুপাত করিল না, বা কোনো কথা বলিল না; কিন্তু তাহার দেহ কম্পিত ও মুখ বিবর্ণ, দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে হাতের শাদা রুমালখানি নাড়িয়া বিদায় দিল, পরক্ষণেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পাড়িয়া দৌড়িয়া তাহার কাছে গেলাম। তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া চিরজীবনের জন্য তাহার ভালবাসার দাস হইয়া থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। যে-মুহূর্ত্তে সে চেতনা ফিরিয়া পাইল, তাহাকে আমার মায়ের কোলে সমর্পণ করিয়া আমি দৌড়িয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। আর একবারও পিছনের দিকে না চাহিয়া আমি গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলাম।

পিছনে চাহিয়া সেই বিষাদক্লিষ্টা তরুণীর মুখ দেখিলে আমার সংকল্পচ্যুতি ঘটিতে পারিত। কয়েক মিনিট পরেই আমরা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম এবং তাহাই ধরিয়া চলিলাম।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আমার মা, বোন এবং তরুণী প্রণয়িনীর কথা ভিন্ন আর কিছু ভাবিতেই পারিলাম না। কিন্তু যতই পরিচিত দৃশ্যাবলী চোখের অগোচর হইয়া যাইতে লাগিল, ততই এইসকল চিন্তা দূর হইয়া যশের ও খ্যাতির স্বপ্নে চিত্ত অভিভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। কত কল্পনা-জল্পনাই না করিলাম। আকাশকুসুম চয়ন করিয়া মনের সাজি ভরিয়া ফেলিলাম। কত কীর্ত্তি করিলাম, তাহার জন্য কত খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলাম। ভাগ্য অজস্র ধন মান বর্ষণ করিতে লাগিল, আমি সকলই গ্রহণ করিলাম। আমি ডিউক হইলাম, দেশের শাসনকর্ত্তা হইলাম। অবশেষে যখন সন্ধ্যাকালে নিজের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন আমি ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছি। আমার ভৃত্য আমাকে সোজা-সুজিভাবে 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করায়, আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল এবং আমি আবার মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিলাম।

পরদিন সকালে আবার পথে বাহির হইলাম। আবার স্বপ্নে ডুবিয়া গেলাম, কারণ পথের শেষ এখনও বহু দূরে।

অবশেষে সেদাঁতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে সি—র ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশায়, আমার আগমন। তিনি আমার পিতৃবন্ধু। মাসখানেক পরে তাঁহার রাজধানীতে যাইবার কথা আমি আশা করিতেছিলাম, তিনি আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। রাজদরবারে আমায় পরিচিত করিয়া দিবেন, এবং অন্ততঃ পক্ষে সৈন্য দলে আমায় একটা কাজ জুটাইয়া দিবেন।

আমি সেদাঁতে পৌছিলাম সন্ধ্যাকালে। ডিউক নগর হইতে কিছু দূরে, তাঁহার প্রাসাদে বাস করিতেন, সুতরাং তখন আর তাঁহার কাছে যাইবার সময় ছিল না। আমি কাল তাঁহার সহিত দেখা করিব, স্থির করিয়া, নগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলে গিয়া উঠিলাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া, ডিউকের প্রাসাদের পথ জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমার কাছেই একটি যুবক সৈনিক বসিয়াছিল। সে বলিল, "ও, এটা আপনাকে যে-কেউ দেখিয়ে দিতে পার্‌বে। সমস্ত দেশের লোক ও বাড়ী চেনে। এখানেই আমাদের বিখ্যাত যোদ্ধা প্রধান সেনাপতি ফবেয়ার মারা গিয়েছিলেন।"

দুইজন সৈনিকের দেখা হইলে যুদ্ধের গল্প হওয়া অনিবার্য্য। আমরাও সেনাপতি ফবেয়ারের গল্প জুড়িয়া দিলাম। তাঁহার যুদ্ধের কাহিনী, তাঁহার অমর কীর্ত্তি, তাঁহার বিনয় সব বিষয়েই গল্প চলিল। রাজা চতুর্দ্দশ লুই ইঁহাকে অভিজাত পদবী দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর তাঁহার ভাগ্য। তিনি সামান্য সৈনিক মাত্র ছিলেন, অতি দরিদ্রের সন্তান তিনি, তাঁহার পিতা ছাপাখানায় কাজ করিতেন। কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এতখানি অবস্থান্তর আর কাহারও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এইজন্য মূর্খ লোকে বলিত তাঁহার উন্নতির মূলে কোনো অলৌকিক শক্তি কাজ করিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে নানা-প্রকার গল্প শোনা যাইত। তিনি না কি বাল্য-

কাল হইতে যাদুবিদ্যা অভ্যাস করিতেন, শয়তানের সহিত তিনি না কি সন্ধি করিয়াছিলেন। আমাদের সরাইখানার মালিক এক মূর্খ চাষা। সে বলিল, ডিউকের যে প্রাসাদে প্রধান সেনাপতি মারা যান সেখানে না কি প্রায়ই একজন কৃষ্ণবর্ণ মানুষকে দেখা যাইত, তাহাকে কেহই চিনিত না। তাহাকে না কি ডিউকের ভৃত্যেরা প্রধান সেনাপতির ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার আত্মা লইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিয়াছে। এখনও প্রধান সেনাপতির মৃত্যুদিনে প্রাসাদের ভিতর ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। সে হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল লইয়া বেড়ায়। ঐ মশালটাই প্রধান সেনাপতির আত্মা। বৃদ্ধের গল্প আমাদের বেশ লাগিল। এক বোতল মূল্যবান মদ্য আনাইয়া আমরা ফবেয়ারের কৃষ্ণবর্ণ বন্ধুকে উৎসর্গ করিয়া পান করিলাম। তাঁহার মত যুদ্ধে জয় এবং পদোন্নতি লাভ করিতে ঐ ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া রাখিলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া আমি ডিউকের দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌঁছাইয়া দেখিলাম, উহা গথিক ধরণের প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ, তবে উহাতে বিশেষত্ব কোথাও কিছু নাই। অন্য কোনো সময়ে উহা দেখিলে, আমি বিশেষ মনোযোগ দিতাম না, কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রেই এই প্রাসাদের বিষয় এত গল্প শোনাতে, আমি কৌতূহলের সঙ্গেই দুর্গটিকে দেখিতে লাগিলাম।

একজন বৃদ্ধ দরজা খুলিয়া দিল। আমি বলিলাম, "আমি ডিউকের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।" বৃদ্ধ বলিল, "তাহার প্রভু এখন দেখা করিতে সম্মত হইবেন কি না সে বলিতে পারে না।" আমি তাহাকে নিজের কাড একখানা দিয়া, উহা ডিউকের কাছে লইয়া যাইতে বলিলাম। বৃদ্ধ আমাকে প্রকাণ্ড একটা আধা অন্ধকার ঘরে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। ঘরটি পুরাতন তৈল-চিত্রে এবং শিকারের চিহ্নে সুশোভিত। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, তবু ভৃত্যটির ফিরিয়া আসিবার কোনোই লক্ষণ দেখিলাম না। চারিদিকের অটুট নীরবতা আমাকে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। বসিয়া বসিয়া ঘরের ছবিগুলি, ছাদের কড়িবরগা, সব যখন দুই তিনবার গুণিয়া শেষ করিয়াছি, তখন দরজার কাছে একটা শব্দ শোনা গেল।

দরজাটা হাওয়ার ধাক্কায় খুলিয়া গিয়াছে দেখিলাম। তাহার অপর পার্শ্বে সুসজ্জিত একটি ঘর, তাহাতে বড় বড় দুটি জানালা, এবং একটি শার্সি বসান দরজা। দরজার বাহিরে প্রকাণ্ড উদ্যান। আমি ঘরটার ভিতর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া, হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখিয়া থামিয়া গেলাম। আমার দিকে পিছন ফিরিয়া একটি মানুষ, ঘরের মধ্যে কৌচের উপর শুইয়া ছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার দিকে না তাকাইয়া, দরজার কাছে ছুটিয়া গেলেন। তিনি অবিরল অশ্রুপাত করিতেছিলেন; মুখ তাঁহার গভীর নৈরাশ্যে অন্ধকার। কিছুক্ষণ তিনি দরজার সম্মুখে হাতে মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, ঘরের এ ধার হইতে ও ধার হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমিও এরকম অবিবেচকের মত কাজ করায় ভীত ও অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চলিয়া যাইব স্থির করিয়া, ঐ লোকটির কাছে কোনোক্রমে ক্ষমা-প্রার্থনা করিলাম।

তিনি নিকটে আসিয়া খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি চাও?"

আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম, তবুও নিজের পরিচয় দিয়া বলিলাম, "আমি সবে মাত্র আজ ব্রিটানী হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি বটে," বলিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার নিকটে কৌচে বসাইয়া আমার পিতা, আমার পরিবারস্থ সকলের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি সকলকেই বেশ জানেন দেখিয়া আমি স্থির করিলাম ইনিই দুর্গাধিপতি হইবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনিই শ্রীযুক্ত—ত?" তিনি আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "এককালে ছিলাম বটে, এখন আমি কেউ নই।" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি দেখিয়া বলিলেন, "যুবক, আমাকে কোনো প্রশ্ন ক'রো না।"

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, "আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার যন্ত্রণা এবং দুঃখ দেখতে পেয়েছি। আমার বন্ধুত্ব এবং আনুগত্য কি আপনার কষ্টের কোনো লাঘব কর্‌তে পারে না?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, তুমি ঠিক কথা বলেছ। যদিও আমার অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন তুমি কর্‌তে পার্‌বে না, তবু আমার শেষ সঙ্কল্প এবং ইচ্ছা আমি তোমায় জানিয়ে যেতে পার্‌ব। তোমার কাছে এ ছাড়া আর কিছু আমি চাই না।"

তিনি উঠিয়া গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিলেন। আমি কম্পিত কলেবরে তাঁহার বাক্যের অপেক্ষা করিতেছিলাম। ভদ্রলোকের মুখে এমন একটা ভাব ছিল, যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও মুখে আমি দেখি নাই। তাঁহার ললাটে যেন দুর্ভাগ্যের তিলক আঁকা। তাঁহার মুখের রং একেবারে ফ্যাকাশে, চোখ দুইটি উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ, ঠোঁটে মাঝে মাঝে দানবীয় হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে।

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি তোমায় যা বল্‌তে যাচ্ছি, তা হয়ত তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না, আমি নিজেই সময়ে সময়ে বিশ্বাস করি না। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এ রকম ব্যাপার হ'তে পারে না, কিন্তু তার প্রমাণগুলো এতই বাস্তব যে, বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই। আমাদের চারি পাশে অনেক জিনিষ আছে, যার অর্থ বুঝবার সাধ্য আমাদের নেই, কিন্তু সেগুলি বিশ্বাস কর্‌তে আমরা বাধ্য।"

নিজের কপালের উপর একবার হাত বুলাইয়া লইয়া তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি এই দুর্গেই জন্মগ্রহণ করেছি। আমার দুটি বড় ভাই ছিল, তাদেরই ভাগ্যে পরিবারের ধনসম্পত্তি মান-সম্ভ্রম সব জুটেছিল। পুরোহিতের কাজ পাওয়া ছাড়া, আমার আর কোন প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সারাক্ষণ যশ, খ্যাতি এবং ধনের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকৃত, আশায় আকাঙ্ক্ষায় আমার বুক স্পন্দিত হ'তে থাকৃত। আমার নগণ্য অবস্থা আমার যন্ত্রণার আকর হ'য়েছিল। আমি সারাক্ষণ কেবল চিন্তা কর্‌তাম, কি উপায়ে যশ খ্যাতি উপার্জ্জন করা যায়। এর জন্যে যে-কোনো মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম, এবং এরই চিন্তায় আমোদ-প্রমোদ সব আমি বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম আমার কাছে বর্ত্তমানটা কিছুই ছিল না, আমি কেবল ভবিষ্যতের চিন্তায় বাস কর্‌ছিলাম। ভবিষ্যৎ ত বড়ই অন্ধকার মনে হ'ত, কারণ, আমার প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স হ'তে চলেছিল, তখন পর্য্যন্ত কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি। এই সময়ে আমাদের রাজধানীতে কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের উদ্ভব হ'ল, তাঁদের খ্যাতি আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত এসে পৌঁছল। আমি ভাবতে লাগলাম আমি যদি সাহিত্যের খ্যাতি লাভ কর্‌তে পারি, তাহ'লে জীবনটা সুখের হয়। আমার দুঃখের সাথী ছিল একজন বৃদ্ধ কাফ্রী ভৃত্য, সে আমার জন্মের পূর্ব্ব থেকেই আমাদের পরিবারে কাজ কর্‌ছিল আশে-পাশে তার চেয়ে বৃদ্ধ আর কোনো মানুষ ছিল না, সে যে কখন প্রথম আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, তাও কেউ মনে আন্‌তে পার্‌ত না। চাষা-ভুষোরা বল্‌ত সে না কি সেনাপতি ফবেয়ারকেও জান্‌ত, তাঁর মৃত্যুর সময়ও সে উপস্থিত ছিল। অনেকের ধারণা ছিল, সে মানুষ নয়, শয়তানের অনুচর।"

সেনাপতির নাম শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভদ্রলোক থামিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এত বিচলিত হইলাম কেন?

আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই বলিয়া তাঁহার কথাটা উড়াইয়া দিলাম। মনে মনে কিন্তু বুঝিলাম এই কাফ্রী ভৃত্যের কথাই সরাইখানার বৃদ্ধ মালিক বলিয়া থাকিবে।

দুর্গাধিপতি আবার বলিতে লাগিলেন, "ঐ বৃদ্ধের নাম ছিল ইয়াগো। একদিন তার সাম্‌নে আমি নিজের ধনমানহীন জীবনের দুঃখের কথা ব'লে খুব কান্নাকাটি কর্‌লাম। আমি বল্‌লাম, 'আমার আয়ু থেকে দশটা বছর আমি দিয়ে দিতে রাজী আছি, যদি আমাকে কেউ প্রথম শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে স্থান ক'রে দিতে পারে।'"

ইয়াগো বলিল, "দশ বছর কিছু কম নয়। তুমি অল্প মূল্যের জিনিষের জন্যে বেশী দাম দিতে চাইছ। যাই হোক্, তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ কর্‌লাম। নিজের প্রতিজ্ঞা মনে রেখো, আমার কথা আমি মনে রাখব।"

"তাকে এ ভাবে কথা বল্‌তে শুনে আমি যে কি পরিমাণ অবাক্ হ'লাম, তা বল্‌বার নয়। প্রথমে মনে কর্‌লাম, বার্দ্ধক্যে তার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেয়েছে। সুতরাং আমি তাকে অগ্রাহ্য ক'রে হেসে চ'লে গেলাম। কয়েকদিন পরে আমি রাজধানী যাত্রা কর্‌লাম। সেখানে বিখ্যাত সব সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ পেলাম। তাঁদের দৃষ্টান্তে আমার কি রকম একটা উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা এল, তা বল্‌বার নয়। আমি অনেকগুলি বই প্রকাশ কর্‌লাম, এবং সবগুলিই খুব সফলতা লাভ কর্‌ল। সব কাগজে আমার প্রশংসাবাদ বেরুতে লাগ্‌ল, দলে দলে মানুষ আমাকে দেখ্‌বার জন্যে এসে ভাড় কর্‌তে লাগ্‌ল। আমি নূতন যে নাম নিয়ে লিখছিলাম, তা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। তুমিও আমার লেখা প'ড়ে খুব মোহিত হয়েছ।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহ'লে আপনি দুর্গাধিপতি নন্?"

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না।"

আমি ভাবিতে লাগিলাম ইনি কোনো বিখ্যাত লেখক। ইনি কি ভল্‌টেয়ার? ইনি কি মারমন্‌টেল?

অপরিচিত ভদ্রলোক একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু সাহিত্যিক খ্যাতি বেশীদিন আমার মনকে তৃপ্ত রাখতে পার্‌ল না। আমি আরো উচ্চতর যশের প্রয়াসী হ'য়ে উঠলাম। ইয়াগো আমার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসে এসেছিল; সে সর্ব্বদাই আমার উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চল্‌ত। আমি তাকে একদিন বল্‌লাম, "এ সত্যিকার যশ নয়, যুদ্ধে যে খ্যাতি তার মত আর কিছু নয়। লেখক বা কবি হ'য়ে লাভ কি? বড় একজন সেনানায়ক হ'লে কিছু কাজ হয়। বিখ্যাত যোদ্ধা হ'বার জন্যে আমি জীবনের আরো দশ বৎসর দিতে রাজী আছি।"

ইয়াগো বলিল, "ভাল কথা। আমি রাজী। মনে রেখো।"

আমার মুখে সম্ভবতঃ অবিশ্বাস এবং বিস্ময়ের চিহ্ন অত্যন্ত গভীর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, কারণ বক্তা থামিয়া গিয়া বলিলেন, "যুবক, তোমায় আমি আগেই বলেছিলাম, যে, তুমি আমার কাহিনী বিশ্বাস কর্‌বে না। এটা আমার কাছেও দুঃস্বপ্ন মনে হয়, কিন্তু আমি যে পদোন্নতি এবং যশ লাভ করেছিলাম, সেগুলো স্বপ্ন নয়। ভীষণ যুদ্ধে কত সৈন্যকে আমি চালনা করেছি। কত শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত ক'রে তাদের পতাকা কেড়ে এনেছি। সমস্ত ফ্রান্স আমার বিজয়-কাহিনী শুনেছে।"

ভদ্রলোক ঘরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিতে করিতে এইসব কাহিনী বলিয়া চলিলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "ইনি কে? ইনি কি কলিনী? ইনি কি রিশ্‌ল্যু?"

ভদ্রলোক আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইয়াগো নিজের কথা ঠিক রক্ষা ক'রেছিল। কিন্তু এর পরে ফাঁকা খ্যাতিতেও আমার আর তৃপ্তি রইল না। আমি সারবান কিছুর জন্যে ব্যস্ত হ'লাম। জীবনের পাঁচ ছয় বৎসরের পরিবর্ত্তে আমি অতুল সম্পদ প্রার্থনা কর্‌লাম। ইয়াগো সন্তুষ্ট চিত্তেই রাজী হ'ল। যুবক, তুমি অবাক্ হচ্ছ, কিন্তু এককালে আমি প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিলাম। আমার প্রাসাদ, বিস্তীর্ণ জমিদারী কিছুর অভাব ছিল না। আজও এসব আমার। তুমি যদি আমার কথায় বা ইয়াগোর অস্তিত্বে সন্দেহ কর, তাহ'লে খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর। ইয়াগো এখানেই আস্‌বে, এবং তুমিও এমন কিছু দেখবে যা কল্পনারও অতীত, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তা অতি সত্য হ'য়ে উঠেছে।"

ভদ্রলোক একবার গিয়া ঘড়ি দেখিয়া আসিলেন, এবং ভীতিসূচক অঙ্গভঙ্গী করিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "আজ সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙ্‌ল তখন দেখলাম যে, আমি এত দুর্ব্বল, যে, উঠে বস্‌বার ক্ষমতাও আমার নেই। ঘণ্টা বাজাতে, ইয়াগো এসে উপস্থিত হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আমার এ রকম লাগ্‌ছে কেন?'

সে বল্‌ল, "এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। আপনার সময় ঘনিয়ে আস্‌ছে।"

আমি বল্‌লাম, "তার মানে?"

"মানে কি বুঝতে পার্‌ছেন না? ভগবান আপনার

মাত্র ষাট বৎসর আয়ু লিখেছিলেন, আপনার ত্রিশ বছর বয়সে আমি আপনার সঙ্গে কারবার আরম্ভ করি।"

আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে বল্‌লাম, "ইয়াগো, তুমি কি সত্য কথা বল্‌ছ?"

"হাঁ প্রভু, পাঁচ বছর আপনি ধনমান খ্যাতি নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন, এর জন্যে আপনি মূল্য দিয়েছেন পঁচিশ বৎসরের পরমায়ু। আমি তা কিনে নিয়েছি। আপনার জীবন থেকে ঐ পঁচিশ বৎসর এখন আমার জীবনে যুক্ত হ'বে।"

আমি বল্‌লাম, "সেকি? এই নাকি তোমার সাহায্যের দাম?"

ইয়াগো উত্তর দিল, "হাঁ, শুধু তোমাকে নয়, অন্য অনেক লোককে, বহুকাল থেকে আমি এই মূল্য নিয়ে সাহায্য ক'রে আস্‌ছি। ফবেয়ারের নাম শুনেছ? তিনিও আমার আশ্রয়ে ছিলেন।"

আমি চীৎকার ক'রে বল্‌লাম, "চুপ কর, চুপ কর, এ কখনও হ'তে পারে না।"

ইয়াগো বল্‌ল, "তা তোমার যেমন ইচ্ছা মনে কর। কিন্তু প্রস্তুত হও, তোমার আর আধ ঘণ্টামাত্র পরমায়ু বাকি আছে।"

"তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছ?"

"মোটেই নয়। নিজেই হিসাব ক'রে দেখ। তোমার বয়স পঁয়ত্রিশ, আর তুমি বিক্রী করেছ আমার কাছে পঁচিশ বছর। সব জড়িয়ে ষাট বছর হ'ল না? প্রস্তাবটা তুমিই করেছিলে, তোমার প্রাপ্য তুমি পেয়েছ, এখন আমারটা আমি নেব।" এই ব'লে সে চ'লে যাবার উপক্রম কর্‌ল। আমার মনে হ'ল আমার সব শক্তি শেষ হয়ে আস্‌ছে এখনি প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

আমি দুর্ব্বল কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লাম, "ইয়াগো, ইয়াগো, আমাকে আরো কয়েক ঘণ্টা বাঁচতে দাও।"

সে বল্‌ল, "না, না, তোমাকে দিতে গেলে আমার নিজের আয়ুতে ভাগ বসাতে হ'বে। তোমার চেয়ে আমি জীবনের মূল্য যে কতখানি তা বেশী বুঝি। দু-ঘণ্টা পরমায়ুর সমান ঐশ্বর্য্য আর কি আছে?"

কথা বল্‌বার ক্ষমতাও আমার যেন আর ছিল না, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছিল, শিরায় রক্ত-চলাচল থেমে আস্‌ছিল। অনেক কষ্টে আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা, তোমার দাম তুমি ফিরিয়ে নাও, এরই জন্যে আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'লাম। আমাকে চার ঘণ্টা পরমায়ু দাও, আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ত্যাগ কর্‌ছি।'"

ইয়াগো বল্‌ল, "আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে সর্ব্বদা ভাল ব্যবহার করেছ, প্রতিদানে আমারও কিছু করা উচিত। আমি রাজি হ'লাম।"

আমার শরীরে আবার একটু শক্তি ফিরে এল। আমি বল্‌লাম "ইয়াগো, চার ঘণ্টা বড় কম। আরো চার ঘণ্টা আমায় দাও, আমি আমার সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিপত্তি সব ত্যাগ কর্‌ছি।"

কাফ্রী ভৃত্য অবজ্ঞার সুরে বল্‌ল, "এর জন্যে চার ঘণ্টা পরমায়ু? বড় বেশী চাইছ। যাই হোক্ আমি রাজী হ'লাম। তোমার শেষ অনুরোধ উপেক্ষা কর্‌তে পারি না।"

আমি তার সাম্‌নে হাত জোড় ক'রে বল্‌লাম, "না ইয়াগো, এইটা শেষ অনুরোধ নয় আরো আছে। আমাকে সন্ধ্যা অবধি সময় দাও। সমস্ত দিনটা দাও, তাহ'লে আমার সামরিক যশ, খ্যাতি, সব আমি বিসর্জ্জন দিচ্ছি। এগুলির স্মৃতিও মানুষের মন, থেকে মুছে যাক্, আমি গ্রাহ্য করি না। ইয়াগো, এই অনুরোধটা রাখ, তাহ'লে আর আমি কিছু চাইব না।"

ইয়াগো বল্‌ল, 'তুমি আমার কাছে অন্যায় আব্‌দার কর্‌ছ। যাক, আমি আজকের দিনটা দিলাম তোমাকে। সূর্য্যাস্তের পর আমি আস্‌ব।" এই ব'লে সে চ'লে গেল। যুবক, আজকার দিনই আমার শেষ দিন।"

তিনি বাগানের দিকের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হায় আমি আর এই সুন্দর আকাশ, এই ঘাসে-ঢাকা সবুজ মাঠ, এই ঝরণা, কিছুই দেখতে পাব না। বসন্তের সুগন্ধী বাতাস আর আমি আঘ্রাণ করব না। আমি কি নির্ব্বোধ! ভগবান এইসব উপহার আমাদের সকলকে দিয়েছেন, কিন্তু এদের মূল্য সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞান ছিলাম। এখন বুঝতে পার্‌ছি, কিন্তু এখন বুঝে

লাভ কি? আমি আরো পাঁচিশ বছর এগুলি উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু আমার জীবন শেষ হ'য়ে এসেছে। আমি কিসের জন্যে নিজের অমূল্য জীবন নষ্ট করলাম? মিথ্যা খ্যাতি ও যশের জন্যে। এগুলিও আমার জীবনের সঙ্গেই শেষ হ'বে। এতে কিছু সুখাও হইনি আমি।"

কয়েক জন কৃষক গান গাহিতে গাহিতে বাগানের ওপারের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তাহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "ওদের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের একটু অংশের জন্যে আমি কি না দিতে পারি। কিন্তু এখন আমার দেবার কিছু নেই। পৃথিবীতে আমার আর কোনো আশা নেই।"

সূর্য্যের রশ্মি আসিয়া তাঁহার বিবর্ণ মুখের উপর পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, দেখ, কি সুন্দর! হায়, আমাকে এসব ছেড়ে যেতে হ'বে। এখনও তবু আমি বেঁচে আছি। সারাটা দিন এখনও আমার আছে। দিনটা কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল। এই আমার শেষ দিন, আর নেই।"

তিনি সিঁড়ি দিয়া দৌড়িয়া বাগানের ভিতর নামিয়া পড়িলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেলেন। আমার তাঁহাকে ফিরাইবার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তি ছিল কি না সন্দেহ। আমি বিস্মিত এবং অভিভূত হইয়া সেই কৌচটার উপর বসিয়া পড়িলাম।

খানিক পরে আমি উঠিয়া ঘরময় ঘুরিতে লাগিলাম। নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না, জাগিয়াই আছি। সেই সময় আর-একটা দরজা খুলিয়া গেল, এবং একজন ভৃত্য বলিল, "আমার প্রভু, ডিউক আসছেন।"

একজন সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ঘরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া সম্ভাষণ করিলেন, এবং আমাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করানোর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমি দুর্গে ছিলাম না। আমার পীড়িত ছোট ভাই সি—র কাউণ্টকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁর কি খুব বেশী অসুখ?"

ডিউক বলিলেন, "না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো সাঙ্ঘাতিক অসুখ তার হয়নি। কিন্তু যৌবনে যশ এবং খ্যাতির স্বপ্নে তার মস্তিষ্ক বড় উত্তেজিত হ'য়েছিল। সম্প্রতি তার অসুখ হয়, তখন থেকে তার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়ে গিয়েছে। তার ধারণা হ'য়েছে যে সে আর মাত্র একদিন বাঁচবে। এটা পাগ্‌লামী ছাড়া আর কিছু নয়।"

এতক্ষণে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিলাম। ডিউক বলিলেন, "আচ্ছা, এর পর তোমার জন্যে কি করা যায়, তা দেখতে হ'বে। এই মাসের শেষে রাজধানীতে গিয়ে রাজসভায় তোমার পরিচয় ক'রে দিতে হ'বে।"

আমি মুখ লাল করিয়া বলিলাম, "আপনার অনুগ্রহের জন্যে শত সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু রাজসভায় আমি যেতে চাই না।"

ডিউক বলিলেন, "সে কি? রাজসভায় যেতে চাও না? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, রাজসভায় না গেলে নিজের সব রকম উন্নতির পথেই তুমি কাঁটা দেবে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ মহাশয়, সব জেনেই বলছি।"

"কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আমার সাহায্যে তোমার খুব দ্রুত পদোন্নতি হ'বে? দশ বছরে তুমি যে বিখ্যাত হ'য়ে উঠতে পারবে?"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "দশ বৎসর!" ডিউক অবাক হইয়া বলিলেন, "সেকি? যশ, মান, খ্যাতি, এ সবের জন্য দশটা বছর ব্যয় করা কি বেশী কথা হ'ল? চল, চল, আমার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে চল।"

আমি বলিলাম, "না মহাশয়, আমি দেশে ফিরে যাওয়াই স্থির করেছি। আমার এবং আমার পরিবারস্থ সকলের গভীর কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাচ্ছি।"

ডিউক বলিলেন, "কি বোকামী!" আমি ইয়াগো এবং তাহার প্রভুর কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলাম, "বোকামী নয়, সুবিবেচনা।"

পরদিনই আবার পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। নিজের গৃহ, পরিবার-পরিজন দেখিয়া কি আনন্দ অনুভব করিলাম বলিবার নয়। এক সপ্তাহ পরেই আমি হেন্‌রিয়েট্‌কে বিবাহ করিলাম।

মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার

রাজা রামমোহন রায়

[এই বিচার সংস্কৃতে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গিরিডিনিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী রায় মহাশয় শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত রাজার গ্রন্থাবলীতে ইহা নাই। শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই বিচারের যে বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নীচে প্রকাশিত হইল। এ বিষয়ে অন্যান্য আবশ্যক সংবাদ আশ্বিনের প্রবাসীর ৮৪১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।]

ওঁ তৎসৎ

পরম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মাদির অজ্ঞেয় কার্য্য ও কারণ উভয় ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত পরম সৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি।

আপনি পরম ভাগবত বৈষ্ণব, আপনা কর্ত্তৃক যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী বিষ্ণু বৈকুণ্ঠনাথের এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনের সগুণত্ব এবং শরীরিত্ব কথিত হইয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। কেন না, যে সকল বস্তু দিক্ কাল ও আকাশের সহিত সম্বন্ধ সম্পন্ন, মন প্রভৃতির জ্ঞেয়, তাহাদের সগুণতা এবং পরিচ্ছিন্নতা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব আপনি প্রশংসিত হরিহরোপাসকগণের ইষ্ট এবং এই হেতুই আপনি সাধু এবং পণ্ডিতগণের প্রশংসনীয়।

কিন্তু আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনের একত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের মধ্যে এক বিষ্ণু সেব্য ও ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সেবক এই যে উক্তি করিয়াছেন তাহা সমস্ত সদ্‌যুক্তিবিরুদ্ধ। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের ইহা অভিমত নয়। ইহা আপনার কথিত বিষয়েরও প্রতিকূল। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনই যদি এক হয়েন, তাহা হইলে দ্বিতীয় থাকেন না বলিয়া সেব্য সেবক ভাব অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষ একের সেব্যত্ব এবং অপর দুইটির সেবকত্ব বিষয়ে কোনও যুক্তি নাই। অপিচ সেবকত্ব এবং পরমেশ্বরত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উহা একবস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না (অথচ পূর্ব্বেই আপনি তিনকে এক বস্তু স্বীকার করিয়াছেন)।

আরও একটি কথা—আপনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব সূচনা ও ব্রহ্মা এবং শিব হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও কেবল কষ্টসাধ্য ব্যুৎপত্তির সাহায্যে দশোপনিষদের যে যে শ্রুতিবাক্যের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শিবোপাসকগণও শিবের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব এবং বিষ্ণু হইতে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সেইরূপভাবেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন। বরং শ্রুতি সগুণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এই কথা স্বীকার করিলে, অভিধান এবং ব্যবহারের সাহায্যে শ্রুতিবাক্যস্থ ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর প্রভৃতি পদের শিবরূপ অর্থবোধনের শক্তিই প্রসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ সৌরগণ (সূর্য্যোপাসক) সূর্য্যের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনের জন্য এবং শাক্তগণ শক্তির প্রাধান্য-খ্যাপনের জন্য সেই সকল শ্রুতিই উদ্ধৃত করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোপনিষদ প্রভৃতি বিষ্ণু প্রতি-পাদক শ্রুতিসমূহের দশোপনিষদের শ্রুতির সহিত এক-বাক্যতার, (একার্থতার একার্থবোধকতার; জন্য সমস্ত শ্রুতিই বিষ্ণু প্রতিপাদন করিতেছে। তাহা হইলে (উত্তরে) বলা যায় যে, কৈবল্যোপনিষদ প্রভৃতি শিবপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের সেই সকল দশোপনিষদীয় শ্রুতির সহিত একবাক্যতার (একার্থতার) জন্য সমস্ত শ্রুতিবাক্যই শিবকে প্রতিপাদন করিতেছে। শৈবগণ এই-রূপ অনায়াসে বলিতে পারেন। এই প্রকার কালিকোপনিষদ্ প্রভৃতির দশোপনিষৎশ্রুতির সহিত একবাক্যতা সম্পাদন জন্য শাক্ত প্রভৃতিরা সমস্ত শ্রুতিকে শক্তিপ্রভৃতির প্রতিপাদক-রূপে ব্যাখা করিতে পারেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, নিজের মতে পক্ষপাতসম্পন্ন সগুণোপাসকগণ নিজের মতের পোষকতার জন্য বলপ্রয়োগে বেদমন্ত্রসমূহের বিরোধ ঘটাইতেছেন এবং উহার অর্থকে অবোধগম্য করিতেছেন। অপিচ আপনি বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া ভগবান বিষ্ণুর প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যেইরূপ ভগবদ্গীতার শ্লোক এবং শ্রীভাগবত,

বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ শিবভক্ত সাধুগণও শিবের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য মাহেশ্বর গীতা, এবং স্কন্দ, শিব, ও লিঙ্গপুরাণ এবং মহাভারতের বচনসমূহ ও নানা তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করেন? ইহাদের মধ্যে একটি শাস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অপর শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করার বিষয়ে কোনও কারণ নাই।

আরও দেখুন, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য আপনি যে নারদপঞ্চরাত্রের বচন দেখাইয়াছেন, শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য শাক্তগণও সেইস্থলে অসংখ্য তন্ত্রের বচন পরমোৎসাহে উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বচন লিখিতেছি, যথা—নির্ব্বাণতন্ত্রে—"অনন্তর মুরলীধর বিষ্ণু ভক্তি সহকারে বহুযত্নে মহাবিদ্যা কালীর আরাধনা করিয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি হইয়াছেন।" "সেই গোলোকাধিপতি দেবীর স্তুতি এবং দেবীর প্রতি ভক্তি বশতঃ কালীর অনুগ্রহে লোকপালক হইয়াছেন।" "লোকের রক্ষার জন্য সস্ত্রীক মুরলীধর সর্ব্বদা ভদ্রকালীর আরাধনা করিয়া গোলোকে বাস করেন।" "বিষ্ণু কালিকাদেবীর নির্ম্মাল্য গ্রহণ করেন বলিয়া অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন হইয়া পালক হইয়াছেন।" "অয়ি দেবেশি, সেই ভদ্রকালীর আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, তাঁহারই আজ্ঞায় এই সনাতন বিষ্ণুলোক রক্ষা করেন।" (আরও) প্রথম পটলে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আছে, "সত্ত্বগুণাবলম্বী দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিলেন।" ইত্যাদি।

বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবলম্বী বলিয়া রজোগুণাবলম্বী ব্রহ্মা এবং তমোগুণাবলম্বী শিব হইতে প্রধান, এই কথা আপনি বলিয়াছেন। এই বিষয়ে শৈবগণ প্রপঞ্চময় জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুর অপেক্ষায় মুক্তিকল্প সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা ভগবান্ শিবই প্রধান, এই কথা বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে মহাভারতে দানধর্ম্মে মহেশ্বরের প্রতি বিষ্ণু বলিয়াছেন—"তোমাকে নমস্কার, তুমি নিত্য, সকলের কারণ, ঋষিগণ তোমাকে প্রজার অধিপতি বলিয়া থাকেন, সাধুগণ তোমাকেই তপঃ, সত্ত্ব, রজঃ, তম, এবং সত্য বলিয়া থাকেন।" ইত্যাদি। সেইরূপ সেইখানেই আছে—"যিনি পরিণামরহিত, অতুলনীয়, অচিন্ত্য, শাশ্বত (নিত্য) প্রভু, নিরংশ, পূর্ণ, ব্রহ্ম, নিগুর্ণ, গুণের গোচর, যোগিগণের পরমানন্দস্বরূপ এবং মোক্ষ নামে অভিহিত তাঁহাকে" ইত্যাদি। ইহা পাঠ করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ভগবান শিব ত্রিগুণের অধিষ্ঠাতা, বস্তুতঃ তমোলেশ বিবর্জ্জিত নিগুর্ণ। এ বিষয়ে তাঁহারা কিছু সন্দেহ করেন না। (অতএব) অধিক বাক্য প্রয়োগ বৃথা।

আপনি আরও বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ, পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং এই শ্রুতির উপপদশূন্য ঈশ শব্দের ব্যাখ্যার সময়ে 'পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা' এই দুইটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করায় বিষ্ণুই ইহার অভিপ্রেত মনে হয়। তাহা আপনারই কল্পিত কিন্তু পূজ্যপাদ আচার্য্যের কখনও ইহা অভিমত নয়। যেহেতু ভাষ্যে কথিত হইয়াছে ঈশাবাস্য প্রভৃতি মন্ত্র আত্মার স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা আত্মবিষয়ক স্বাভাবিক অজ্ঞান দূর করতঃ, শোক-মোহাদিরূপ সংসারের বিনাশের কারণ আত্মার একত্ব বিজ্ঞান উৎপাদন করে। এইহেতু এইরূপে উদ্দেশ্যবাচক কথিতাভিধেয় সম্বন্ধনির্ণায়ক মন্ত্রসমূহকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব। ২—ঈশা শব্দের অবয়বার্থ (শব্দগত) ব্যাখ্যা করা হইতেছে—ঈষ্টে অর্থাৎ প্রভু হন এই অর্থে ঈশ্ এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহারই তৃতীয়ার এক বচনে ঈশা পদটি হইয়াছে। ঈশিতা, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, তিনিই সকলের প্রভু, সকল জন্তুর আত্মা হইয়া নিজের স্বরূপের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন। কি আচ্ছাদন করিয়াছেন? এই সকল,—যাহা কিছু পৃথিবীতে বিনাশী ইত্যাদি।

আরও যে লিখিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণেরই নিগুর্ণত্ব শ্রবণে শৈবগণের ক্রোধ করা অসঙ্গত, সেই উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত। যেহেতু বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু হইতে শিবের প্রাধান্য শ্রবণে এবং শৈবগণের শিব হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য শ্রবণে, এবং এইরূপ সমস্ত দেবতার উপাসকগণের নিজ ইষ্টদেবতা হইতে অন্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণে ক্রোধ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বলাভেচ্ছু ও সর্ব্বত্র একত্ব দর্শন করেন তাঁহাদের কাহারও স্তুতি বা শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণে কখনও ক্রোধের লেশমাত্রেরও উৎপত্তি হয় না।

আরও যে কথিত হইয়াছে, কৈবল্যউপনিষদ্ প্রভৃতি

এবং শিববিষয়ক পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি দর্শন না করা (অর্থাৎ তাহা পাঠ না করা) বৈষ্ণবগণের অনুকূল। যেহেতু বহু গ্রন্থের অধ্যয়ন পরিত্যাগ ভক্তির অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। ইহা অতীব আশ্চর্য্য এবং আপনার মত পণ্ডিতের অযোগ্য। বিষ্ণুপ্রতিপাদক বলিয়া বেদের একাংশকে এবং ইতিহাস পুরাণাদির একাংশকে গ্রহণ করিতে হইবে, আর শিব-প্রতিপাদক বলিয়া সেই বেদ এবং সেই পুরাণাদিরই অন্য অংশকে বর্জ্জন করিতে হইবে, এ কথা কোনও সদ্‌যুক্তি বা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সঙ্গত হয় না। বরং সমস্ত বেদ যেই তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করিতেছে, "সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরম্পরায় পরব্রহ্মেরই প্রতিপাদকরূপে আদর এবং গ্রহণ করা উচিত।

"বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে না" ইত্যাদি আপনার লিখিত বচনকে যদি সপ্রমাণ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সকল গ্রন্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকাশ করে নাই। আর উক্ত বচন সেই সকল গ্রন্থেরই অধ্যয়ন নিষেধ করিতেছে। যে, সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতা প্রতিপাদন করিয়াছে তাহাদের সমাধান (সমন্বয়) করিতে অসমর্থ বৈষ্ণব-গণের পক্ষে নিজের মতের প্রতিকূল শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন নিষেধ করা পলায়নের একটা উৎকৃষ্ট পন্থা বটে।

আপনি বলিয়াছেন, যেই যেই স্থলে বেদ এবং স্মৃতি শিবকে বিষ্ণু প্রভৃতির জনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সেই সেই স্থানে শিবপদ গর্ভোদকশায়ি-মহাবিষ্ণুকে বুঝাইয়াছে। এই বিষয়ে বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনারা বৈষ্ণবগণ, নিজ মত স্থাপনের জন্য শব্দের অর্থবোধক শক্তির আপ্ত বাক্য এবং ব্যবহার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া কেবল পক্ষপাতবশতঃ রুদ্র, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, শিব প্রভৃতি পদের গর্ভোদকশায়ি-মহা-বিষ্ণুতে প্রয়োগ কল্পনা করেন। সেইরূপ যে যে স্থলে বিষ্ণুকে ব্রহ্ম ও শিবের সেব্যরূপে বলা হইয়াছে সেই সেই স্থানে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি শব্দের আনন্দ-কানন-এইরূপে স্ব স্ব মত স্থাপনের জন্য পরস্পর শব্দের শক্তি কল্পনা করিতে গেলে শক্তির বোধক কোষ প্রভৃতির নিষ্ফলতা এবং শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের উচ্ছেদ হয়। অতএব ইহা অতি অলীক কথা, অর্থাৎ অগ্রাহ্য।

আরও বলা হইয়াছে, গোলোকরূপ নিত্যধামে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অন্যের উপাসনা একেবারে অসম্ভব। সেই গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে ব্যাস, নারদ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির এবং শিবের সেবা করিয়াছেন তাহা লোকশিক্ষার জন্য। এই সেবা দ্বারা বস্তুত নারদাদির সেব্যত্ব ও কৃষ্ণের সেবকতা আইসে না। এই বিষয়েও শ্রবণ করুন,—স্বধামস্থিত শ্রীকৃষ্ণের শিবশক্তি-সেবকতা সর্ব্বপ্রকারে সম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি যে, নির্ব্বাণতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"গোলোকের অধিপতিকে ভক্ত করিয়া যেই শিব রক্ষা করিতেছেন, অয়ি চণ্ডিকে! সেই দেবের মাহাত্ম্য সবিস্তারে শ্রবণ কর।" ইত্যাদি। অবশ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ বিষ্ণুর শিব-সেবা অতি প্রসিদ্ধ এবং আপনাদিগেরও অঙ্গীকৃত।

অপিচ লোক বর্ণগুরু এবং বান্ধব গুরুগণের সম্মান করুক এবং শিবের পূজা করুক এই অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য ব্যাস প্রভৃতির এবং শিবের পূজা করিয়াছেন। যেরূপে আপনি এইরূপ কল্পনা করিতেছেন, তেমনি যেখানে শিব কর্ত্তৃক শক্তি, ভৈরব প্রভৃতির এবং বিষ্ণুর স্তব কৃত হইয়াছে, তাহাও লোকশিক্ষার জন্যই হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা কেন না করা যাইবে। যেহেতু কেবল বিশেষ এক পক্ষের জন্য যুক্তি নাই। উভয় পক্ষেই কল্পনার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আরও যে উক্ত হইয়াছে, শৈব এবং বৈষ্ণবগণ পঠিত শিব এবং বিষ্ণুর পার্থক্যসূচক বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া হরিহরোপাসকগণের দুঃখ করা উচিত নয়, তাহাও অসঙ্গত। কেন না বিষ্ণু এবং শিবের একাত্মতাবাদী হরিহরোপাসকগণের পক্ষে বিষ্ণুশিবের ভেদ শ্রবণে বিষাদ স্বাভাবিক। আপনি যে একত্বদর্শী পরমাত্ম-তত্ত্ববিদগণের বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন উহা আপনার পক্ষে ঠিক হইয়াছে। যেহেতু আপনি পরমার্থদৃষ্টিসম্পন্ন এবং পরোপকার-রত।

"দহরোপাসনা চিত্তশুদ্ধির জন্য" "কাম্যকর্ম্মে এবং নিষিদ্ধ-কর্ম্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ মুক্তির বহির্ভূত", "ঈশ্বরের বিষয়ে বিবাদকারিগণ সম্ভাষণের অযোগ্য"—আপনার এই মতগুলি আমাদেরও অভিমত। কিন্তু আপনি ভগবান বিষ্ণুর সেবক, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত জগতের অনুভব কালে সত্তা স্বীকার করেন এবং যাঁহারা আত্মরত কেবল সেই সকল অদ্বৈতিগণের নিন্দা এবং মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়াছেন। ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য "বরং শূন্য বৃন্দাবনে সে শৃগালত্ব ইচ্ছা করে।" ইত্যাদি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা উত্তরের অযোগ্য; যেহেতু সর্ব্বপ্রকারে উহা বেদ দর্শন স্মৃতির বহির্ভূত।

ঈদৃশ অধিকারীর (যাহারা শৃগালত্ব ইচ্ছা করে) বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহার আদর করি না। "অয়ি খঞ্জন-(পক্ষিবিশেষ) রম্য-লোচনে, তোমার জন্য যদি আমার মস্তক যায় যাউক।" যাহারা এই কথা বলিয়া পরস্ত্রীতে রত হইয়া "বরং রম্য বৃন্দাবনে শৃগালত্ব" প্রার্থনা করিব এই কথা বলিয়া থাকে, সেই সকল অবিবেকীলোকগণ মুক্তির অনধিকারী। তাই তাহারা মুক্তি হইতে শৃগালত্বের প্রশংসা করিয়া মুমুক্ষুগণকে উপহাস করিয়া থাকে। এই সকল বিজাতীয় রুচিবিশিষ্ট লোকদিগের নিকট শাস্ত্রপ্রমাণ দেখান নিষ্প্রয়োজন।

এই বৈষ্ণব মহাশয় যে মধ্বাচার্য্যের মত অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরতম (শ্রেষ্ঠতম) তিনি সর্ব্ববেদবোধ্য, জগৎ সত্য, জীব ভিন্ন, জীবসমূহ হরিদাস, বিষ্ণু-পাদলাভ মুক্তি, আত্যন্তিকী ভক্তি তাহার (মুক্তির) উপায়। নিজ মত স্থাপনের জন্য ইনি নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য সমূহ উদাহৃত করিয়া থাকেন। শ্রুতিগুলি এই—"দেবকে প্রত্যক্ষ করিলে সকল পাশ ছিন্ন হয়." "মহান বিভু আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না" 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ তিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া কোথাও হইতে ভয় পান না," "সমস্ত বেদ যে অবশ্যবোধ্য তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সমস্ত তপস্বী যাহা প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই পদটি ওম্ শব্দবাচ্য এবং ওম্ শব্দ তাহার প্রতীক।"

তিনি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, শুভ্র অর্থাৎ দীপ্তিমান্, অশরীর ও অক্ষত। সাক্ষাৎ আত্মার প্রতিপাদক এই শ্রুতিগুলিকে ইনি হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট কৃষ্ণের প্রতিপাদক বলেন। ইনি আরও বলেন সমস্ত বেদান্তই প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষ্ণের প্রতিপাদক। অন্যান্য শাস্ত্রও পরম্পরায় উহার প্রতিপাদক।

এ বিষয়ে কিছুকাল চিত্ত স্থির করিয়া শুনুন। কোষ, ব্যবহার এবং প্রকরণের (প্রস্তাব) সাহায্যে যেই যেই শব্দের যে যে অর্থ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেই সকল মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কষ্টসাধ্য ব্যুৎপত্তির (অবয়বার্থ) সাহায্যে গৌণ অর্থ স্বীকার করিলে, কোনও শাস্ত্রেরই সমন্বয় (শাস্ত্র ও প্রতিপাদ্য বিষয় এবং ফলের সঙ্গে সম্বন্ধ), অভিধেয় (প্রতিপাদ্য), প্রয়োজন (ফল) এবং তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না।

অপিচ "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম," "যাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়," "আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম অবগত হইয়া কিছু হইতে ভীত হয় না," "যিনি অশব্দ, যিনি স্পর্শহীন যিনি অরূপ, যিনি অবিনাশী, সেইরূপ যিনি রসহীন, যিনি অগন্ধ, অনাদি অনন্ত, মহত্তত্ত্বের কূটস্থ সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়।"

'যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, যাহা দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয় তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অনাত্মা অনীশ্বর প্রভৃতির যে উপাসনা করা হয় উহা ব্রহ্ম নহে।" "মহান বিভু আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিদ্বান্ শোক করেন না।" "তিনি হস্তবিহীন অথচ গ্রহণ সমর্থ, পাদহীন অথচ বেগবান্, অচক্ষুঃ অথচ দর্শনশক্তিসম্পন্ন, কানহীন তথাপি শুনিতে পারেন," "তিনি স্ত্রী নন পুরুষ নন ষণ্ড (ষাঁড়) নন।" এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের কোষের সাহায্যে এবং ভগবান্ ব্যাস প্রভৃতি বৃদ্ধগণের ব্যবহারের সহায়তায় ও প্রকরণের সামর্থ্যে পরব্রহ্মপ্রতিপাদকতাই নির্ণীত হয়। "সাধন চতুষ্টয় লাভের পর ব্রহ্ম বিচার করিবে।" "শ্রুতি কর্ম্মফলের ধ্বংসত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের

পরম পুরুষার্থ প্রদর্শন করায় শমদমাদি সদ্গুণ জন্মিবার পর ব্রহ্ম বিচার করিবে।" "ব্রহ্ম রূপাদি আকার বর্জ্জিতই, যেহেতু 'অশব্দ, অস্পর্শ'।'ইত্যাদি নিরূপতাপ্রতিবাদক বাক্য উহার নিরূপতা প্রমাণ করিয়াছে," "শ্রুতি নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন," "দেবযানে ব্রহ্মলোকগতগণ আর ফিরিয়া আসেন না, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মলোকগত প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।"

এই সকল ব্রহ্মসূত্রের ও উক্ত কোষাদির সাহায্যে ব্রহ্মসিদ্ধান্তই অবধারিত হয়, কিন্তু হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন অবগত হওয়া যায় না। কষ্টকল্পনার সাহায্যে উদাহৃত শ্রুতিবাক্য এবং এই সকল ব্রহ্মসূত্রের হস্তপদাদি অবয়ব বিশিষ্ট বনমালী শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রতিপাদ্য হন তাহা হইলে সেই কল্পনারই সাহায্যে অন্য দেব ও দেবীগণ সেই সকল শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য কেন না হইবেন।

"কৃষ্ণই পরম দেবতা" এই সমস্ত কৃষ্ণোপনিষদ্‌শ্রুতির এবং "আমিই সমস্ত বেদের বোধ্য" এই সকল গীতাবচন ও শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদক পুরাণের সাহায্যে যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত বেদান্ত প্রতিপাদ্যত্ব বর্ণিত হয়, তাহা হইলে "ঋতসত্যপরব্রহ্ম" ইত্যাদি নানাশ্রুতি, "সমস্তবেদ, পুরাণ স্মৃতি ও সংহিতার আমিই প্রতিপাদ্য, আমি ভিন্ন জগতে অন্য প্রভু নাই" ইত্যাদি শিববাক্য, শিবগীতা এবং শিব প্রতিপাদক পুরাণের সাহায্যে সর্ব্বজ্ঞ, পরমানন্দ দেহ, মহেশ্বর শিবের প্রধানত্ব ও সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যত্ব কেন না অঙ্গীকৃত হইবে? এইরূপ কালিকোপনিষদ্, দেবীসূক্ত, দেবীপ্রতিপাদক পুরাণ ও নানাতন্ত্রাদির সাহায্যে সমস্ত জগতের মাতা, ভগবতী কালিকার প্রধানতা ও সর্ব্ববেদবোধ্যতা কেন না কথিত হইবে? এইরূপ সূর্য্য, গণেশ ও বায়ু প্রভৃতির প্রতিপাদক শ্রুতির সাহায্যে তাহাদেরও শ্রেষ্ঠতা এবং সর্ব্ববেদগম্যতা কেন না স্বীকৃত হইবে?

যদি ইহাই (উপরোক্ত কথা) স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"। এই ব্রহ্মেতে ভেদ নাই যে ইহাতে ভেদ দর্শন করা যায়। "দ্বিতীয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি বেদের অঙ্গীকারগুলি সর্ব্বলোকসম্মত ব্রহ্মবিষয়ক প্রতীতি হইলেও সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। আরও এক কথা, শাস্ত্রে এক ব্রহ্মবস্তুতেই পারতম্য (সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব) এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বকে অনেক (দেব দেবতার) ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

কিন্তু "এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম" "এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক" (সৎস্বরূপ) "তুমি সেই ব্রহ্ম" "ব্রহ্মই ভৃত্য ব্রহ্মই দ্যূতকার" মন ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে, "মন ব্রহ্ম এই কথা বলেন," এই সকল শ্রুতির অর্থ আলোচনা করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির প্রতিপাদক শ্রুতি দর্শনে দেবতাগণের এবং তদিতরের ব্রহ্মেতে অধ্যাস নিবন্ধনই ব্রহ্মত্ব ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এ জন্য ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্বই মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগতভেদরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নানাত্ব মনে করেন না। ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্ত সূত্রে বলিয়াছেন, যথা "সেতু প্রভৃতি সংজ্ঞার নিরাকরণ ও ব্যাপ্তি বাচক শব্দের সাহায্যে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়।" "পর ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্য নহেন, যেহেতু 'আমাকেই জান' বলিয়া বক্তা নিজেকেই বলিয়াছেন। আরও একথা বলা যায় না কারণ এই অধ্যায়ে অধিকাংশই পরমাত্মবোধক উপদেশ আছে" "ইন্দ্র যে আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা; আমাকেই জান বলিয়াছিলেন, উহা তিনি বা মদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারেই বলিয়াছিলেন।" মধ্বাচার্য্য যে জগৎকে সত্য বলিয়া বলেন, তাহা যদি ব্রহ্মের সত্যতা-নিবন্ধন স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ জগতের সত্যতা নির্দ্দেশক না হয়, তাহা হইলে উহা আমাদের অনুকূলই হইল। আর যদি পরমাত্মা হইতে নিরপেক্ষভাবে ও স্বাধীনরূপে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে আর ব্রহ্মের স্বীকারের প্রয়োজন কি কেন না জগৎকে সত্য বলিয়া আবার ব্রহ্ম স্বীকার করার গৌরব কি? এরূপ হইলে চার্ব্বাকের মত আর মাধ্বমতের কি পার্থক্য রহিল?

আর যে জীবভেদ বলা হইয়াছে—"এই অভিন্ন ব্রহ্মেতে ভিন্নের ন্যায় অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্ম আমা



'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে"

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী শ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হইতে ভিন্ন এইরূপ যে অনুভব করে সে মরণ হইতে মরণকে প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ-লাভ করে। "ইহা মনের দ্বারাই লাভ করা যায়" ও "এই ব্রহ্মেতে কিছুমাত্র ভেদ নাই" ইত্যাদি শ্রুতির প্রতি অবহেলা করিয়াই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। "দুইটি সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট সর্ব্বদা যুক্ত সখা" (অর্থাৎ অভিব্যক্তির কারণ উভয়ের তুল্য) "যাহা হইতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এই ভূত সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতি উপাধিকৃত ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া সহজ উপদেশের দ্বারা প্রথম অধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবর্ত্তিত করায়। উহা আত্মজ্ঞানের উপায়ভূত।

ব্রহ্মের সত্যতাকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান প্রত্যক্ষীভূত জন্য জগৎ দেখিয়া তাহার কারণ "যিনি সত্যস্বরূপ যিনি জ্ঞানস্বরূপ যিনি দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্ন তিনি ব্রহ্ম" ইহা অনুভূত হয়। যে সকল শ্রুতি পরমাত্মাকে উপাধিবিশিষ্ট রূপে প্রতিপাদিত করে তাহারা অপ্রধান। এই সিদ্ধান্ত, "সত্য-স্বরূপ নির্দ্দেশানন্তর—যেহেতু সত্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব সেই হেতু ব্রহ্ম স্বরূপ করিতেছি—(যথা) ইহা নয় ইহা নয়" ইত্যাদি শ্রুতি ব্যক্ত করে।

কেহ বলিয়া থাকেন বিষ্ণুপাদ লাভ মোক্ষ, কেহ বলেন শিবপাদপদ্মে লীন হওয়ার নাম মুক্তি, কেহ কালী পাদপদ্মের রেণুর অনুগ্রহ পরম পুরুষার্থ লাভ অর্থাৎ মুক্তি বলিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, কেহ বৃন্দাবনে শৃগালত্ব প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলেন, কেহ গঙ্গায় কচ্ছপাদি যোনি-প্রাপ্তিকেই পরম শ্রেয় অর্থাৎ মুক্তি মনে করেন, এ সকল কথা স্ব স্ব রুচির বৈচিত্র্য অনুসারেই উক্ত হইয়া থাকে।

অপিচ "এক শাস্ত্র অপর শাস্ত্রের ব্যাখ্যা," এই বাক্য মধ্বাচার্য্য ও তন্মতানুযায়িগণ গ্রাহ্য না করায়, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র বিবাদের জন্য ও স্বশাস্ত্রে উদ্ধৃত বেদান্তসম্মত অদ্বৈতবাদ আলোচনা বিশেষভাবে করেন নাই। সেই হেতু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বেদান্তের বিষয় (প্রতিপাদ্য) স্বরূপ, আনন্দপ্রাপ্তি মোক্ষ বেদান্তের প্রয়োজন (ফল), এই বেদান্তসিদ্ধ পক্ষটিকে বিপক্ষের ন্যায় দূরে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কোন সৎপ্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকেই জীব-ভেদ বেদান্তের সম্মত এবং বিষ্ণুপাদলাভকে মুক্তি কল্পনা করিয়াছেন।

তর্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে বিবাদের জন্য দ্বৈতবাদকে কখনও বেদান্তসম্মত বলিয়া উদ্ধৃত করা হয় নাই। অথবা বিষ্ণু-পাদ প্রাপ্তিকে মোক্ষ বলিয়া কোথাও গ্রহণ করা হয় নাই। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদকে বেদান্তসম্মত ও স্বরূপানন্দপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলিয়া অবতারণা করা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য, পক্ষপাত বশতঃ দৃষ্ট বস্তুও অদৃষ্টের ন্যায় শ্রুত, বস্তুও অশ্রুতের ন্যায় হইতেছে।

অন্য এক কথা,—মধ্বাচার্য্য যে বলিয়াছেন, জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মরহিত ব্রহ্মকে শক্তি বা লক্ষণার সাহায্যে কোনও শব্দের দ্বারা বোঝান যায় না, তাহা অদ্বৈতবাদি-গণের অনভিমত নহে, যেহেতু "প্রকাশ করিতে না পারিয়া যেই ব্রহ্ম হইতে মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়" "সেই ব্রহ্মেতে চক্ষুঃ গমন করে না, বাক্য যায় না" অনন্তর এই হেতু ব্রহ্ম বিচার করা হইতেছে, "ইহা নয় ইহা নয়" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "সেই পরব্রহ্ম কার্য্য অথবা কারণ নহেন" (সৎ অথবা অসৎ নহেন) এবং এই সকল স্মৃতি প্রতিপাদন করিয়াও শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, (অর্থাৎ এই সকলের স্ববিষয় প্রকাশন সামর্থ্য আত্মার অস্তিত্ব নিবন্ধন) "যাহা হইতে এই ভূত সমূহ হইয়াছে।" এই সকল শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ সদ্যুক্তির সাহায্যে কোনও অনির্ব্বচনীয় অধিষ্ঠাতা এবং নিয়ন্তা আছেন ইহা নির্ণীত হয়। ব্রহ্ম বিভু ও নীরূপ বলিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না এবং পরিচ্ছেদবিষয়তা স্বীকার করা হয় নাই বলিয়া পরিচ্ছিন্নতা হইতে পারে না, মধ্বাচার্য্য এই যে দোষ দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈত মতে অনভিজ্ঞতার জন্যই। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিশেষরহিত সর্ব্বব্যাপিব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। অদ্বৈতবাদীরাও তাহা স্বীকার করে না; তবে প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে এই দেখান হইয়াছে যে, একই বস্তু উপাধি ভেদে নানারূপে প্রতীত হয় এবং পরিচ্ছিন্নের উপমায় দেখান হইয়াছে নিরবয়ব

বিভু পদার্থ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদীদিগের তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রেতেই হউক অথবা ব্যবহারেই হউক, উপমানের সমস্ত ধর্ম্মের দ্বারা উপমা সম্ভব হয় না। চন্দ্রের ন্যায় মুখ এই কথা বলিলে মুখের দেবত্ব, আকাশস্থতা, কলঙ্কশালিতা, উভয় পক্ষে হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ততা, কখনও বুঝায় না।

অদ্বৈত, সুখ, আনন্দ, বিজ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। "'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ। "জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই তিনটি মায়া দ্বারা প্রকাশিত হয়। তিনটিকে বিচার করিলে এক আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। চৈতন্য স্বরূপ আত্মাই জ্ঞান, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জ্ঞেয় এবং স্বয়ং আত্মাই জ্ঞাতা ইহা যে জানে সেই আত্মবিৎ।" ইত্যাদি বচন সমূহ, "শ্রবণ করিবে মনন করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মোপাসনার জন্যই। অতএব ঐ বচন সমূহ কেবল আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব প্রাতিপাদক নহে। কাজেই এই স্থানে মধ্বাচার্য্য কথিত সিদ্ধসাধনতা দোষের অবসর নাই।

"যাহা শব্দহীন রূপহীন রসহীন গন্ধহীন, সেইরূপ (সত্তা) অবিনাশী অতএবই 'নিত্য" "যিনি দর্শনের অবিষয়ীভূত, নিজেই দ্রষ্টা শ্রবণের অবিষয়ীভূত নিজে শ্রোতা। স্থূল নন সূক্ষ্ম নন" "অনুল্লেখ্য নিগু'ণ ব্রহ্মেতে গুণবৃত্তি সমূহ" "তিনি নির্ব্বিকার, নিরাশ্রয়, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সকলের আত্মা, সর্ব্বদর্শী, এবং সর্ব্বব্যাপী।" এই সকল শ্রুতি, সূত্র, পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ বর্ত্তমান থাকতেও "নিগু'ণ ব্রহ্ম প্রমাণের অবিষয় বলিয়া অলাক" (আকাশকুসুমবৎতুচ্ছ) মধ্বাচার্য্যের উক্তি। এবং ইহাই, "বেদ প্রমাণ, স্মৃতি প্রমাণ এবং মীমাংসকগণের বাক্য-প্রমাণ, যাহার নিকট এই তিনটি প্রমাণ গ্রাহ্য নয়, তাহার বাক্যকে কে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে?"—এই স্মৃতি অনুসারে অপ্রমাণ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে সত্য বলায় বাদী বিশিষ্টা-দ্বৈত বাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চ-বাদী। তাঁহারা মনুষ্যত্বকে বিফল করিতেছেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বাদীর যে উক্তি তদ্দ্বারা স্বীয় উক্তির উপরেই দোষ পড়িতেছে।

কেবল অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বলিয়া জানেন না অপিচ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানেন। এই নিমিত্ত তাহাদের পক্ষে প্রপঞ্চের বিচার অসম্ভব। কারণ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া সেই প্রপঞ্চের বিচার করা কখনও সম্ভব হয় না। "হে পরমেশ, প্রভো, সর্ব্বরূপসম্পন্ন, অবিনাশিন্' অনুল্লেখ্য, সকল ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সত্যভূত, অচিন্ত্য, অপরিবর্ত্তমান, বিভো, সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য, জগৎপ্রকাশক, ঈশ্বরগণেরও অধীশ্বর, নিত্য, তোমাকে আশ্রয় করিতেছি। ওঁ তৎসৎ ৩১ শে আশ্বিন ১২২৩ সন। পূর্ব্বের প্রাপ্ত প্রত্যুত্তরের এই উত্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা দেওয়া যায়।

সেয়ানে সেয়ানে

(শেখভ হইতে)

শ্রী প্রমথনাথ রায়

"কে যায়?"

কেহ উত্তর দিল না। পাহারাওয়ালা কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু বাতাসে সঞ্চালিত তরুমর্ম্মর ধ্বনি ভেদ করিয়া সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল কে যেন তাহার সম্মুখের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। মার্চ্চ মাসের রাত্রি, মেঘে ও কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী, আকাশ একাকার হইয়া এক অপরিসীম কৃষ্ণতার ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে। পাহারাওয়ালা অতি ক্লেশে পথ অন্বেষণ করিয়া চলিতে সক্ষম হইতেছে মাত্র।

"কে যায়?"—সে আবার ডাকিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল যেন চাপাহাসি ও কানাকানির শব্দ শুনা যাইতেছে।

"কে ওখানে?"

বৃদ্ধোচিত কণ্ঠে একব্যক্তি উত্তর দিল—"আমি ভাই…"

"কে তুমি?"

"আমি…একজন মুসাফের।"

চীৎকার করিয়া মানসিক ভয় গোপন করিবার প্রয়াসে পাহাড়াওয়ালা কণ্ঠ উচ্চ করিয়া সক্রোধে প্রশ্ন করিল—"কিরকম মুসাফের? এখানে কি চাও? রাতের বেলা গোরস্থানের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান হচ্ছে, বদ্‌মায়েস!"

"এ গোরস্থান কে বল্লে?"

"তা নয়ত কি? এইত গোরস্থান। দেখ্‌তে পাও না নাকি?"

জনৈক বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ও… কিছু কি দেখার জো আছে ভাই! যা অন্ধকার হয়েছে! ব্যাপরে হাতটা একেবারে চোখের কাছে আন্‌লেও তা মালুম হয় না, এমন অন্ধকার! ও…"

"কিন্তু কে তুমি?"

"আমি একজন তীর্থযাত্রী, ভাই, একজন পর্য্যটক।"

অপরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া পাহারাওয়ালা বলিতে লাগিল—"চমৎকার তীর্থযাত্রী। মাতাল কোথাকার…সারাদিন মদ খেয়ে রাতের বেলা চ'রে বেড়ান হচ্ছে! কিন্তু তোমার সঙ্গে যেন আরো লোক ছিল। দু-তিন জনের আওয়াজ শুনেছিলাম।"

"আমি একা ভাই, একা। সম্পূর্ণ একা‥ আ! যা পাপ‥"

পাহারাওয়ালা চলিতে চলিতে লোকটার সহিত ধাক্কা খাইয়া থামিয়া দাঁড়াইল। সে প্রশ্ন করিল—"এখানে কি ক'রে এলে?"

—"পথ ভুলে এসেছি, ভাই। আমি মিটি্রেডস্কি মিলে যাচ্ছিলাম, এখন পথ হারিয়ে ফেলেছি।

—"হুঁ! এই বুঝি সেখানে যাবার রাস্তা! বোকা কোথাকার! মিটি্রেডস্কি মিলে যেতে হ'লে আরো বাঁ দিক দিয়ে টাউন হ'তে বেরিয়ে সোজা উঁচু রাস্তাটা ধ'রে যেতে হবে। মদের নেশায় তুমি দু'মাইল এদিকে স'রে এসেছ। নিশ্চয়ই টাউনে দু-এককোঁটা ঢালা হয়েছিল।

"হাঁ ভাই সত্যি। পাপ গোপন কর্‌ব না। কিন্তু এখন যাই কি ক'রে?"

"এই পথ ধ'রে সোজা চ'লে যাও। যেখানে গিয়ে দেখবে আর সম্মুখে যাওয়া যায় না, সেখানে বামদিকে মোড় ফিরে যতক্ষণ না গোরস্থান পেরিয়ে গেটে গিয়ে পৌছাও, ততক্ষণ চল্‌তে থাক্‌বে।…গেট পেলে সেটা খুলে ভগবানে ভর্‌সা ক'রে বেরিয়ে যাবে। দেখো, নর্দ্দমায় প'ড়ে যেও না যেন, একবার গোরস্থানের বাইরে গেলে বড় রাস্তা না পাওয়া পর্য্যন্ত সারাটা পথ কেবল মাঠে মাঠে যেতে হবে।"

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু একটু দয়া ক'রে গেট পর্য্যন্ত আমাকে রেখে এস না ভাই।"

'যেন আমার কত সময়! একাই যাও।"

"একটু দয়া কর! আমি তোমার জন্য প্রার্থনা কর্‌ব। কিছুই দেখা যায় না ভাই…এমন অন্ধকার, এমন অন্ধকার! দাও না ভাই পথটা দেখিয়ে।"

"আমার সময় নেই। সকলকে এমন ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে হলেই হ'য়েছিল আর কি।"

"খ্রীষ্টের দোহাই ভাই, আমাকে নিয়ে যাও! একে ত কিছু দেখা যায় না, তার উপর গোরস্থানের ভিতর দিয়ে একা যেতে ভয়ও হয়। এ ভয়ঙ্কর কাজ ভাই, আমার ভয় লাগ্‌ছে।"

"না, এ আচ্ছা নাছোবান্দার পাল্লায় পড়েছি।" পাহারা-ওয়ালা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আচ্ছা এস।"

পথিক ও পাহারাওয়ালা বিনা বাক্যব্যয়ে এক সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিল। তীব্র শীতল বায়ুপ্রবাহ তাহাদের মুখমণ্ডলে আঘাত করিতে লাগিল। অদৃশ্য বৃক্ষ সকল সেই আর্দ্র-বাতাসে কাঁপিয়া উঠিয়া বড় বড় সলিল-কণায় তাহাদিগকে সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।…… তদুপরি প্রায় সারাটা পথ ছোট ছোট খানায় পরিপূর্ণ।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পাহারাওয়ালা বলিল—"একটা জিনিষ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে তুমি এখানে এলে

কি ক'রে। গেটেও ত তালা দেওয়া। তবে কি দেয়াল টপকে এসেছ? কিন্তু তোমার মত বৃদ্ধের পক্ষে তাও ত সম্ভব নয়।"

"কি জানি ভাই, কি ক'রে এসেছি কিছুই বল্‌তে পারিনে। পাপের শাস্তি, সবই পাপের শাস্তি। শয়তান আমার পেছনে লেগেছে। তুমি এখানে পাহারাওয়ালার কাজ কর বুঝি?"

"হাঁ।"

"সমস্ত গোরস্থানের জন্য মোটে একজন?"

এমন সময় বাতাস এমন বেগে প্রবাহিত হইল যে, তাহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া দাঁড়াইতে হইল। অবশেষে বায়ুবেগ প্রশমিত হইলে পাহারাওয়ালা উত্তর দিল, "না, আমরা তিনজন আছি। একজন জ্বরে কাতর, আরেক জন ঘুমুচ্ছে। সে আর আমি পালা ক'রে পাহারা দিই।"

"আ! বাতাসের কি বেগ! ঠিক যেন বুনো জানোয়ারের মত গর্জ্জাচ্ছে! ও-ও-ও!"

"তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

"অনেক দূর থেকে ভাই। ডলোগণ্ডা থেকে। সে বহু দূরে। আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই আর লোকের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। করুণাসিন্ধু হে! মানুষকে তুমি করুণা কর।"

পাহারাওয়ালা তামাকের পাইপ ধরাইবার জন্য থামিল। সে পথিকের পৃষ্ঠান্তরালে নত হইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালনের চেষ্টা করিল। প্রথম শলাকার কিরণে পথের দক্ষিণে কিছুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকে অদূরে একটি দেবদূতাঙ্কিত সাদা সমাধি-স্তম্ভ ও একটি ক্রুশ চিহ্ন দেখা গেল। দ্বিতীয় শলাকাটা অন্ধকারের ভিতর তড়িৎ-রেখার মত উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গেল। কিন্তু এই নিমেষ নিক্ষিপ্ত আলোকে বামদিকে চানখা জাতীয় এক প্রকার পদার্থ নজরে পড়িল। তৃতীয়বার উভয় পার্শ্ব সমভাবে আলোকিত হইয়া উঠিল এবং একটি সাদা সমাধি-স্তম্ভ, একটি কালোক্রুশ-চিহ্ন এবং জনৈক শিশুর কবরের উপরে নির্ম্মিত একটী চানখা দৃষ্টিগোচর হইল।

পথিক জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল—"মৃতেরা ঘুমুচ্ছে, প্রিয়জনেরা ঘুমুচ্ছে! ধনী ও গরীব, জ্ঞানী ও মূর্খ, সাধু ও অসাধু, সকলেই সমভাবে নিদ্রা যাচ্ছে। এখন তাহাদের সকলেরই মূল্য এক। শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত তারা এই ভাবে নিদ্রা যাবে। তাদের আত্মার শান্তি হোক।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "আজ আমরা এখানে হেঁটে বেড়াচ্ছি, কিন্তু একদিন আমাদেরও এখানে ওদের মত নিদ্রা যেতে হবে।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমাদের সকলেরই একদশা হবে। কেউ অমর হ'য়ে জন্মেনি। ও! আমাদের কার্য্য পাপময়, আমাদের চিন্তা দুষ্টাভিসন্ধিপূর্ণ! মহা পাতকী আমরা, কেবল উদরের পূজা করি, কেবলি বিষয়-বাসনায় মত্ত হয়ে থাকি। দেবতা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ইহলোকে পরলোকে কোথাও আমাদের মুক্তি নেই। পঙ্কনিমগ্ন কীটের মত আমরা পাপে হাবুডুবু খাচ্ছি।"

"আর মৃত্যুও অবধারিত।"

"ঠিক বলেছ।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "কিন্তু আমাদের মত লোকের চেয়ে তীর্থযাত্রীর পক্ষে মৃত্যু বরং কিছু সহজ।"

"তীর্থযাত্রীদের ভিতরেও রকম ভেদ আছে। যারা সত্যিকার তীর্থযাত্রী তারা দেবতাকে ভয় করে, নিজের চিত্তবৃত্তির উপর নজর রাখে। আবার আরেক প্রকার তীর্থযাত্রী রাত্রিকালে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায় আর শয়তানের সেবা করে...... হাঁ! এমন যাত্রীও আছে যে ইচ্ছা করলে কুড়ুল দ্বারা তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে।"

"এসব বল্‌ছ কেন?"

"কিছু না—এই বুঝি গেট। হাঁ, তাই বটে। খোল ত ভাই।"

পাহারাওয়ালা হাতড়াইয়া গেট খুলিয়া পথিককে বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"এই গোরস্থানের সীমানা। এখান থেকে বড় রাস্তা না পাওয়া পর্য্যন্ত কেবল মাঠে মাঠে যেতে হবে। নিকটেই সীমানার খাল—তাতে প'ড়ে যেয়োনা...রাস্তায় পৌঁছে ডান দিকে গেলেই মিল পাওয়া যাবে।"

একটু থামিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত পথিক বলিল—"ও-ও! এখন ভাবছি মিলে যাবার আমার কোন

প্রয়োজন নেই, সেখানে গিয়ে কি হবে? তার চেয়ে বরং তোমার সঙ্গেই একটু থাকা যাক—

"আমার সঙ্গে থেকে কি হবে?"

"তোমার সংসর্গটা বেশ ভাল লাগ্‌ছে।..."

"তাই না কি? তুমি ত দেখছি বেশ রসিক লোক হে..."

একটু মোটা স্বরে হাসিয়া পথিক বলিল—"তা আর বল্‌তে! দেখো, এ আদমীকে তোমার অনেক দিন মনে থাক্‌বে।"

"কেন?"

"কারণ এমন চতুর ভাবে তোমাকে ঠকিয়েছি তুমি মনে করেছ আমি সত্যই কোন তীর্থযাত্রী? ও সব আমি কিছুই নই।"

"তাহ'লে তুমি কি?"

"প্রেত—এই মাত্র আমি কবর থেকে উঠে এসেছি। কুলুপের কারিকর গুবারিয়েভকে মনে আছে, যে গলায় ফাঁসি দিয়ে মরেছিল? আমিই সেই।"

"অন্য আলাপ কর।"

পাহারাওয়ালা পথিকের কথা বিশ্বাস করিল না বটে, কিন্তু ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি গেটের জন্য হাতড়াইতে লাগিল।

"দাঁড়াও, যাচ্ছ কোথায়? পথিক তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। "এ্যাঁ কেমন লোক হে তুমি। আমায় একা ফেলে চলে যাচ্ছ?"

"ছেড়ে দাও!" পাহারাওয়ালা হাত ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

"দাঁড়াও। জোর ক'র না বল্‌ছি। ভাল চাও ত আমি আদেশ না করা পর্য্যন্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক। শুধু রক্তপাতের ইচ্ছা নেই তাই, নতুবা অনেকক্ষণ আগেই তোমাকে মৃতের রাজ্যে পাঠিয়ে দিতাম। দাঁড়াও!"

পাহারাওয়ালার বোধ হইল যেন তার জানুদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে সে দেওয়াল ঘেষিয়া দাঁড়াইল। সে চীৎকার করিতে চাহিল, কিন্তু এমন স্থানে চীৎকার করিলে তাহা কোন জীবিত প্রাণীর কানে পৌছিবে না জানিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। পথিক তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিল...তিন মিনিট কাল নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

পথিক বলিল—"একজন জ্বরে কাতর, একজন নিদ্রিত, আরেক জন পথিকের সাহায্যে ব্যস্ত। চমৎকার পাহারাওয়ালা। মাহিনা পাবার উপযুক্তই বটে। না ভাই, চোরেরা চিরকালই পাহারাওয়ালাদের চেয়ে অধিক সেয়ানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক নড়ো না..."

পাঁচ মিনিট দশ মিনিট সময় নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সহসা বাতাসে বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিল।

"আচ্ছা এখন যেতে পার।" পাহারাওয়ালার হাত মুক্ত করিয়া পথিক বলিল—"ভগবানকে ধন্যবাদ দাও এখনো তুমি জীবিত আছ।

তারপর সেও একটি বাঁশী বাজাইয়া, গেট হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিল সীমানার খালটা পার হইবার সময় পাহারাওয়ালা তাহার উল্লম্ফন ধ্বনি শুনিতে পাইল। শঙ্কাকুল চিত্তে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে কোনো প্রকারে গেট খুলিয়া রুদ্ধ নেত্রে দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিল। গোরস্থানের প্রধান রাস্তাটার কাছে আসিয়া সে দ্রুত পদক্ষেপ শুনিতে পাইল। একজন তাহাকে প্রশ্ন করিল—"টিমোফি না কি? মিটকা কোথায়?"

অবশেষে সমস্তটা পথ ছুটিয়া আসিয়া অন্ধকারের ভিতর সে একটা ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইল। যতই সে ইহার নিকটে আসিতে লাগিল ততই তাহার মন শঙ্কায় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল—"আলোটা যেন গির্জ্জার ভিতরে মনে হচ্ছে। ওখানে সেটা কি ক'রে এল! ঈশ্বর!"

ভগ্ন জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে দেখিতে পাইল একটা ক্ষুদ্র মোমবাতি বাতায়ন পথাগত বায়ু-প্রবাহে দুলিয়া দুলিয়া মেঝের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মযাজকের বস্ত্রাদি এবং বেদীর আশে পাশে একাধিক মনুষ্য পদাঙ্কের উপর অস্পষ্ট লাল আলোক নিক্ষেপ করিতেছে। সে বুঝিল চোরেরা পলায়ন কালে তাড়াতাড়িতে ইহা নিভাইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছে।

অনতিকাল পরে গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে বিপদসূচক ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া উঠিল...

ঢাকা অনাথ আশ্রম

১৯০৭ সনের মে মাসে ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী নিবাসী ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন বি এ, পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের তৎকালিক আচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী এবং পারজোয়ারনিবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত (রায়-সাহেব) সতীশচন্দ্র ঘোষের সহিত সম্মিলিত হইয়া ঢাকাতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ও আসামের পিতৃমাতৃহীন অথবা অভিভাবকহীন বালক বালিকা ও জারজ শিশু এবং নিরাশ্রয় হিন্দু বিধবা-দিগের জন্য একটি "অনাথ আশ্রম ও বিধবা আশ্রম" প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশ করেন। তৎকালীন কমিশনার মিঃ (সার) হেভিলেণ্ড লিমেসুরীয়ার এবং শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ৺বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস ও ৺নবাব মহম্মদ ইউসফ্ প্রভৃতি সহৃদয় ভদ্রমহোদয় ও কতিপয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহায়তায় ১৯০৮ সনের নববর্ষদিনে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সনের ৬ই জুন উয়ারী লারমিনি ষ্ট্রীটের অন্যতম স্বাক্ষরকারীর একতালা বাটীতে দুইটি মাত্র অনাথ শিশু লইয়া আশ্রম খোলা হয়। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁহার



ঢাকা অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ ও বালকগণ

সুশিক্ষিতা পত্নী প্রায় তিন বৎসর কাল আশ্রমের পরিচালনের প্রারম্ভিক সুবন্দোবস্ত করেন। তৃতীয় বৎসর হইতে বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ তত্ত্বাবধায়কতা করিতেছেন। ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত আশ্রম উয়ারী মদনমোহন বসাক রোডের একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থিত ছিল। ১৯১৫ সনের জানুয়ারী মাসে বক্‌সিবাজারে বর্ত্তমান "বৈকুণ্ঠনাথ ভবনে" ইহা স্থানান্তরিত হয়।

১৯১০ সনে টাঙ্গাইলের স্বর্গগতা দানশীলা কীর্ত্তিমতী রাণী দীনমণি চৌধুরাণী আশ্রমভবন নির্ম্মাণার্থ এককালীন ২৫,০০০৲ (পঁচিশ সহস্র টাকা) দান করেন। ১৯১২ সনে গভর্ণমেণ্ট (ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রান্তবর্ত্তী) আমলাপাড়া



ঢাকা অনাথ আশ্রম—সূতাকাটা ও অন্যান্য শিল্প

ময়দানে পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি সম্বলিত প্রায় দশ বিঘা জমি দান করিয়া সংকল্পিত কার্য্য সম্পাদনে পরমোৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর ক্রমে সুপ্রশস্ত বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় গৃহ এবং ৺মোহিনীমোহন রায়ের প্রদত্ত অর্থে পুষ্করিণীর পাকা ঘাট ও হৃষীকেশবাবুর দানলব্ধ টাকায় হৃষীকেশ-আলয় নির্ম্মিত হয়। পনর বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সুরম্য আশ্রমভবনের সম্মুখে ময়দানের মত মাঠ ছিল। এখন ইহা কত বৃক্ষলতা ফলফুল শোভিত মনোহর উদ্যানাদিতে কি সুদৃশ্য স্থানে পরিণত!

এইত গেল বাহিরের দিক। লোকচক্ষুর অগোচরে যাহা প্রতিনিয়ত সম্পাদিত হয় তাহাই প্রধান বলিবার কথা আশ্রম প্রতিষ্ঠাকাল হইতে প্রায় বিশ বৎসরে শতাধিক বালকবালিকা এখানে আশ্রয়লাভ করিয়া সংসারের প[...] দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের সংবাদ কয়জন[...] লইয়া থাকেন? আশ্রমপোষ্য ছেলেদের অনেকে এব[...]

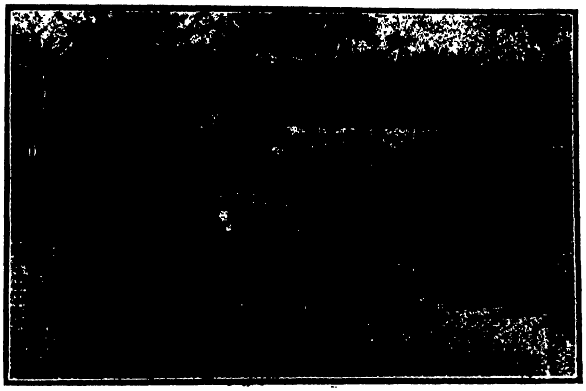
বিবাহিত মেয়েদের সকলেই সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পত্রাদিযোগে এখনও সন্তানবৎ ব্যবহার করিতেছে।

গত বৎসর ৩ মাস হইতে ১৪ বৎসর বয়সের ১১টি বালক এবং দুই বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ২২টী বালিকা ছিল। ইহাদের একটি শ্রীহট্টের এক বিধবার পুত্র ৩১ দিনের সময় আশ্রমে আসিয়াছিল। এক মাদ্রাজী ঝাড়ুদারের স্ত্রী মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি ছেলে প্রসব করিয়া ১৫ দিনে মারা যায়, শিশুটি আশ্রমে আনীত হয়। আর একটি অতি রুগ্ন শিশু ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত হাসপাতাল হইতে আনীত হয়। মাদ্রাজী শিশুটির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরা-



ঢাকা অনাথ আশ্রমের শিক্ষয়িত্রীদ্বয় মেয়েদের সেলাই শিখাইতেছেন—দুটি শিশুও বসিয়া আছে

নুগ্রহে এটিও দিনে দিনে সুস্থ হইয়া উঠে। তিন বৎসর পূর্ব্বে এক বিধবা নারী আট দশ দিনের সন্তান লইয়া আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হয়। আর একটি বিধবার প্রায় একমাসের এক শিশু আশ্রমে আসিয়াছে। আরও কয়েকটি বালিকার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। এক বিপত্নীক দরিদ্র ব্যক্তির একটি দশ মাসের কন্যাকে অতি শীর্ণ অবস্থায় নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পাঠাইয়াছিলেন। সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ ১৯১৯ সনে বাত্যাক্লিষ্ট লোকের সাহায্যার্থে রুহিতপুর গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বারবনিতার গৃহ হইতে একটি দুই বৎসরের বালিকাকে আনয়ন করেন। আর একটি শিশু মিটফোর্ড হাসপাতাল হইতে রুগ্ন অবস্থায় এখানে আসিয়াছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে একটি রুগ্ন ভিখারিণী বিধবা শিশু কোলে



অনাথ আশ্রমের বালকগণ স্নান ও সন্তরণ করিতেছে

লইয়া চট্টগ্রাম হইতে আসে এবং মিটফোর্ড হাসপাতালে মারা যায়।

সর্ব্বপ্রথম যে অজ্ঞাতকুল বালিকাটিকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, সে বিবাহিত হইয়া সন্তান সহ চট্টগ্রামে স্বামীগৃহে বাস করিতেছে। বিহার হইতে প্রেরিত হইয়া আর একটি বালিকা বিক্রমপুরবাসী এক ভদ্রলোকের পালিত পুত্রের সহিত বিবাহিত হইয়া সন্তান সহ সুখে সংসার-জীবন যাপন করিতেছে। ঢাকার কোন বারনারীর পালিতা একটি বালিকা সোণারগাঁ নিবাসী গবর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণীর সহিত বিবাহিত হইয়াছে, । এই বালিকাও এখন গৃহিণীরূপে সন্তান সহ সুখে বাস করিতেছে। আততায়ীর হস্তে নিহত এক



ঢাকা অনাথ—আশ্রম সতরঞ্চ বুনা

যুবতী বিধবার কন্যা তের বৎসর আশ্রমে লালিত পালিত হয়। ইহারও ১৫০৲ টাকা বেতনভোগী জনৈক গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। মেদিনীপুর হইতে একজন সহৃদয় মুন্সেফ এক নিরাশ্রয় বালিকাকে পথে



ঢাকা অনাথ আশ্রম—গণিত প্রভৃতি শিক্ষা



ঢাকা অনাথ আশ্রম—রন্ধনের আয়োজন

কুড়াইয়া পাইয়া আশ্রমে প্রেরণ করেন। বিধাতার কৃপায় এই বালকাটির পূর্ব্ববঙ্গের এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ হইয়াছে, দুইটি কন্যা লইয়া অতি সুখে কালাতিপাত করিতেছে। আর একটি বিধবার শিশু চৌদ্দ বৎসর আশ্রমে থাকিয়া হাওড়া ষ্টেশনের ষ্টোর আফিসের এক কেরাণীর সহিত বিবাহিত হইয়াছে। একটি কুলীর কন্যা একজন আমীনের সহিত বিবাহিত হইয়াছে। স্বজনত্যক্ত পথে প্রাপ্ত একটি বিকলাঙ্গ বালিকা এগার বৎসর আশ্রমে



অনাথ আশ্রমের বালকগণ খেলা করিতেছে

থাকিয়া একজন গভর্ণমেণ্ট আফিসের পিয়নের সহিত বিবাহিত হইয়াছে। চারিমাসের একটি নমঃশূদ্র বিধবার শিশু ষোল বৎসর আশ্রমে পালিত হইয়া চাঁদশীর একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের সহিত বিবাহিত হইয়াছে। একটি মুসলমান বারবনিতার কন্যাকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এক মুসলমান কর্ম্মচারীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। ৭টি বিবাহ হিন্দু মতে, ২টি ব্রাহ্ম মতে এবং ২টি মুসলমান মতে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিকাংশ বিবাহ রেজেষ্টরী হইয়াছে। একটি ছেলে ঢাকার উপকণ্ঠে এক কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেখানেই বাস করিতেছে। কোন বিধবা সমাজের ভয়ে অল্পদিনের একটি অতি সুন্দর শিশুকে আশ্রমের দ্বারে রাখিয়া যায়। উক্ত বালিকাটিকে একটি পদস্থ মহিলা আপনার কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মেয়েরা স্বামীগৃহ হইতে মধ্যে মধ্যে এখানে বেড়াইতে আসে এবং খাবার পাঠায় ও আসিয়া থাকে।

ছেলে মেয়েরা গুরুকুল বিদ্যালয় এবং বোলপুর বিদ্যা-



অনাথ আশ্রমের বালিকাগণ খেলিতেছে

লয় ও অন্যান্য আশ্রমের নিয়ম মত নিজেরাই নিজদের কাজ করে। বিশেষতঃ মেয়েরা সংসারের সকল কাজ করিয়া থাকে। মেয়েদের শিশু লালন-পালন প্রধান কার্য্য। সময় সময় মুসলমান দাই রাখা হইত; এখন দুর্ল্লভ হইয়াছে। হিন্দু দাই কোন দিনও পাওয়া যায় নাই। ছেলেমেয়েদের বাগানের কাজ করার ও খেলিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকের জন্যই নির্দ্দিষ্ট এক এক খণ্ড ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু উক্ত দুই বাগানের

জমিতেই কারখানার দালান নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। আশ্রমস্থ ছেলেমেয়েদের পুকুরে সন্তরণ শিক্ষা করার সুবিধা রহিয়াছে।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য আশ্রমের অনুরূপ চালান' যায় না। ইহাদের আহার মধ্যবিত্ত অবস্থার হিন্দুদের মত—বালাম চাউল, ডাল, তরকারী প্রভৃতি। তবে, মাছ ও মাংস দেওয়া হয়। শিশু ও ছোটদের জন্য দুগ্ধ, বিলাতী ফুড্ প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন তিনবার বড়'রা যাহা খায়, তাহা নিজ হাতে প্রতিদিনের-খাবার-বহিতে লিখা হয়। এদের জন্য পূর্ব্বে তক্তপোষের ব্যবস্থা ছিল। ছারপোকার জন্য তাহা পরিত্যক্ত হয় এবং লোহার খাট কেনা হয়। কিন্তু মিঃ লায়ন, মিঃ হর্ণেল এবং মিঃ ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ ইহাদিগকে মেজেয় শুইবার অভিমত দেন। প্রত্যেকের জন্য সতরঞ্চি কম্বল বা সুজনি ও চাদর এবং



ঢাকা অনাথ আশ্রমের দুইটি মেয়ে নেওয়ার টেপ ও কার্পেটের আসন বুনিতেছে

মশারী আছে। শীতকালে গরম কম্বল দেওয়া হয়। উয়ারী থাকিতে ইহাদিগকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। এখন আর বাহিরে যাইতে না দিয়া পারা যায় না। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য আশ্রমের মত নিয়ম প্রবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন।

ইহাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক, তাঁত শিক্ষক, সঙ্গীত শিক্ষক এবং দুইজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। তত্ত্বাবধায়ক সস্ত্রীক আশ্রমের পৃথক প্রকোষ্ঠে বাস করেন এবং



ঢাকা অনাথ আশ্রমের বালিকাগণ ও শিক্ষয়ত্রীদ্বয়

পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়া অনাথ বালকবালিকাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বালকদের একজন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের আরটিজেন বিভাগে ৪ বৎসর বৃত্তিধারী থাকিয়া ও পুরস্কার লাভ করিয়া ঢাকা রেল আফিসের কাজ শেষ করিয়া এখন পঞ্চাশ



ঢাকা অনাথ আশ্রম

টাকা বেতনে শিক্ষানবীশি করিতেছে। দুইটি কলিকাতায় মোটরের কাজ করিতেছে। দুটি বালক সূত্রধরের, একটি মুসলমান ছেলে ময়মনসিংহে রুটীর বড় দোকান খুলিয়া কাজ চালাইতেছে। আরও অনেকে নানাভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে।

একটি মেয়ে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কম্পাউণ্ডারি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। আর একটি ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত হাঁসপাতালে নার্সিং শিক্ষা করিয়াছে। একটি নার্সিং পাশ করিয়া ৭০, টাকা বেতনে রাঁচিতে কাজ করিতেছে।

তিনটি ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে বৃত্তি পাইয়া সূত্রধরের কাজ শিক্ষা করিয়া কারবার চালাইতেছে। একটি তাঁতের কাজ শিক্ষা করিয়া শ্রীরামপুর গিয়াছিল।

ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস আফিসের সূচি-শিল্প পরীক্ষায় ৫টি এবং রন্ধন পরীক্ষায় ২টি বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলিকাতা প্রদর্শনীতে এবং বোলপুর শান্তিনিকেতনে আশ্রমের তাঁতের প্রস্তুত কাপড়, আসন, গালিচা এবং মশারির নেট, ইত্যাদি পাঠান, হইয়াছে। তাহাতে সার্টিফিকেট এবং মেডাল পাওয়া গিয়াছে।

২৮।৮।২৭

ডাক্তার-বাবু

শ্রী বীরেশ্বর বাগছী

কম্পাউণ্ডার ওষুধ দিচ্ছে—ডাক্তারবাবু গম্ভীরমুখে ব'সে লম্বা খাতা খুলে জমাখরচ দেখ্‌ছেন। তাঁর টেবিলের সাম্‌নে পাঁচপায়া-ওয়ালা, পোকায়-খাওয়া জাম কাঠের একখানা বেঞ্চির উপরে ব'সে জনচারেক রোগী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কখনও ডাক্তারবাবুর দিকে, কখনও বা কম্পাউণ্ডারের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কেউ কোনো কথা বল্‌ছে না। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পরে একজন রোগী সাহস ক'রে ডাক্তারবাবুকে বল্‌ল—"বাবু, আমার ওষুধটা আগে দিলে ভাল হ'ত। আমি পীলের রোগী, যেতেও হবে অনেক দূরে, রোদের তেজ বেশী বাড়লে শেষে আর পথ চল্‌তে পারব না।" খাতার পাতা উল্‌টাতে-উল্‌টাতে অন্যমনস্ক ভাবে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন "হুঃ।" ভরসা পেয়ে রোগীটা টেবিলের দিকে এক পা এগিয়ে বল্‌ল, "কাল শেষ রাত থেকে পীলেয়, এই দেখুন, এমন ব্যথা ধরেছে যে, এখন পর্য্যন্তও সোজা হ'তে পাচ্ছি নে।"

হিসাব দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাক্তারবাবু পূর্ব্ববৎ বল্‌লেন, "ও সব হচ্ছে মৃত্যুলক্ষণ।"

ডাক্তারবাবুর টেবিলের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে ভীতিবিজড়িত কাতরকণ্ঠে রোগী বল্‌ল, "বাবু দোহাই আপনার! আমায় বাঁচান! আপনি ভাল ক'রে দেখে একটু ওষুধ দিলেই আমি বাঁচ্‌ব! খাতাবন্ধ ক'রে সোজা হ'য়ে ব'সে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "এদিকে স'রে এসত দেখি।" রোগী তাঁর বাঁ হাতের কাছে গিয়ে সরে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে তিনি বাঁ হাতে তার পেট টিপ্‌তে লাগ্‌লেন। মিনিট পাঁচেক টেপার পর শেষে গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "এ রকম পীলে হ'লে রোগী প্রায়ই বাঁচে না। একে ব'লে বোম্বাই পীলে। এর ইংরিজী নাম হচ্ছে Elephant Spleen! তবে তোমার অবস্থাটা এখনও তেমন বেয়াড়া দাঁড়ায়নি। এখন থেকে নিয়ম মত ওষুধপত্তর খেলে ভাল হ'য়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব নয়।"

জোড় হাত ক'রে ব্যাকুল ভাবে রোগী বল্‌ল, "ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা করুন।" ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "তোমাকে বাঁচাতে আমার এত-টুকুও আপত্তি নাই, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন ক'রে তুমি বাঁচতে পারবে কি? সবই টাকা-পয়সার কারবার। বলি পয়সা-কড়ি কিছু এনেছ সঙ্গে?"

কাতরভাবে রোগী বল্‌ল, "কোথা পাব? পেট চলাই ভার—বড্ড গরীব আমি। অনেক দূর থেকে আপনার নাম শুনে এসেছি। দিন্ আমায় একটু ওষুধ।"

বিতিকিচ্ছি রকমের মুখভঙ্গি ক'রে ডাক্তারবা[illegible] রাগতস্বরে বল্‌লেন, "সকাল বেলা খালিহাতে ও স[illegible] চল্‌বে না। অমনি ওষুধ খেতে হ'লে খয়রাতি ডাক্তার-

খানায় যাও। আমি এখানে সদাব্রত খুলে বসি নি। কি হে তোমার চোখ্ কেমন ?"

ডাক্তারবাবুর রকম সকম দেখে পীলের রোগী আর কথা বল্‌তে সাহস করল না। চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটা খোনা রোগী ডাক্তারবাবুর সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে চিঁ চিঁ ক'রে বল্‌ল, সাঁড়া হঁয়ে গেঁছি এঁকেবাঁরে—কাঁল সমস্ত রাত্তির চোঁখের ব্যঁথায় এঁকটুকুঁও চোঁখ বুঁজতে পারিনি ।"

অল্প হেসে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "একশবার ক'রে সেদিন তোমায় বল্‌লুম যে, গোটা দশেক টাকা খরচ কর—ভাল একটা ওষুধ আনিয়ে দেই—দুদিনের মধ্যে চোখ সেরে উঠুক—তা তোমার ভাল লাগ্‌ল না। চোখের চেয়ে তোমার কাছে টাকাটার দামই হ'ল বেশী! এখন আর আমি কি করব? খুব ভোগো—চোখ কানা হো'ক্। আর তাও বলি দুটো চেখের দরকারই বা কি তোমার? রাস্তা-ঘাট দেখে চলা ফেরা করা ত? তার পক্ষে একটাই যথেষ্ট! অনর্থক কেন গাঁঠের টাকা অতিরিক্ত আর একটা চোখের পিছনে খরচ করবে? এসেছ যা হয় একটা কিছু নিয়ে যাও।" কম্পাউণ্ডারের দিকে ফিরে বল্‌লেন, "ওহে একে দুই ড্রাম জিঙ্কলোশন দাও ত! এর দামটা কালই অবিশ্যি অবিশ্যি পাঠিয়ে দিও। ওষুধের পার্শ্বেল এসে রয়েছে—টাকার বিশেষ দরকার, বুঝলে?" খোনা ঘাড় নেড়ে, ওষুদের জন্যে বসে রইল।

এই বার তৃতীয় রোগীটি এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল' "ডাক্তার-বাবু পেটের অসুখ ত আজও কম্‌ল না। একটু ভাল ওষুধ দিন ত!" ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "ছাই মাটি যাচ্ছে তাই গিল্‌বে—যমন করলে কি পেটের অসুখ কমে! টাকা এনেছ?" রোগী বল্‌ল, "পরশু পাবেন।" রুক্ষকণ্ঠে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "তুমি বাপু নিতান্তই বেয়াকেল! কাল থেকে ওষুধ খাচ্ছ এ পর্য্যন্ত একটা পয়সা উপুড় হাত কর্‌তে পারলে না, অথচ এদিকে ওষুধ নেবার বেলায় নিয়ে এসেছ ত একসেরী একটা বোতল। একটু চক্ষু-লজ্জাও ত থাকা উচিত।"

ধমক খেয়ে পেটের অসুখের রোগী একেবারে চুপ-কর্‌ল। সুযোগ পেয়ে ভয়ে ভয়ে আর-একটা রোগী মুখ কাঁচু মাচু ক'রে বল্‌ল, "—আ—আ—আমার টা—আ—আ—কা—আ—র জন্যে ভাব্‌বেন না। পা—আ ট—বে—এ চা—আ হলে—এ—ই লি-- -ই---পর পাবেন। ওষুধটা তাড়াতাড়ি দেন।"

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "থামহে বাপু তো তো ক'রে আর আমার কানের মাথা খেও না। তোমার পাট আর আমি বেঁচে থাক্‌তে বিক্রী হচ্ছে না। বাড়ী থেকে আস্‌বার পথে উমেশ কব্‌রেজের ওখানে একটু বসেছিলাম। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল একেবারে! কেমন সুন্দর চলছে তার ব্যবসাটা—কি লক্ষ্মী সব রোগী! বাকী বকেয়ার নামটি পর্য্যন্ত নাই কারো মুখে। যে আস্‌ছে সেই ঝন্ ঝন্ করে নগদ টাকা ফেলে দিয়ে মান্ধা তার আমলের পুরানো আরশুলো-চাটা বড়িগুলো দিব্যি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। শূল বেদনার যে-রোগীটা সে দিন আমার এখানে এসে গরীব সেজেছিল সে-বেটাও নগদ দুটো টাকা দিয়ে আমারি সাক্ষাতে এক হপ্তাহের ওষুধ কিন্‌লে। বেটাকে জিজ্ঞেস্ করলুম—'কি রে টাকা পেলি কোথায়? তুই না বড় গরীব!' সে বল্‌লে—'কবরেজী ওষুধ কি না তাই ধার ক'রে এনেছি।' দেখলে একেই বলে পড়তা—যে, ডাক্তারি ওষুধে কথা বলে সেই ওষুধ সে টাকা দিয়ে না কিনে কিন্‌তে গেল কি না কবরেজী ওষুধ! এতটা না হ'লে কি আর লোকে দুদিনে অমন ক'রে ফেঁপে ওঠে। যে, উমেশ কবরেজ তিন উপোসে এক সন্ধ্যে ভাত খেত—বাঁশের চোঙ্গে ক'রে ওষুধ ফেরী ক'রে বেড়াত, এমন না হ'লে কি আর সেই উমেশ কব্‌রেজ আজ টকীং পায়ে দিতে পারে!" একটু থেমে আবার বললেন,—"আমার এখানে এলে কেউ হ'য়ে পড়েন গরীব—কারো হয়ত পাটই বিক্রী হয় না, আবার যাঁর হাতে টাকা আসে তিনি রোগ পুষে রেখে ওষুধ খাওয়ার ভাণ করেন মাত্র। যাক্‌গে, মিছে আর বকাবকি কি করব! আজও ওষুধ দিলাম ভবিষ্যতে আর ধারে কেউ ওষুধ পাবে না আমার এখানে।"

ডাক্তারবাবু আবার জমাখরচের খাতায় মন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোগীরা ওষুধ নিয়ে চলে গেলে কম্পাউণ্ডার এসে বল্‌লে—"বড় আলমারির চাবীটা দিন্ ত!" সন্দিগ্ধ-

ভাবে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন কি হবে চাবি দিয়ে ?"

কম্পাউণ্ডার বলল—"কুইনাইনের শিশিটা বের করব—গিরিশবাবুর মেয়ের ওষুধ দিতে হবে কি না।" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছে ওষুধ নিতে ?"

কম্পাউণ্ডার বললে—"কেউ আসে নি, আমিই বাড়ী যাবার পথে পৌঁছে দিয়ে যাব।" ডাক্তারবাবু বললেন—"দেখি প্রেস্‌ক্রপশন্ খানা ?" প্রেস্‌ক্রপশন্‌খানার উপরে চোখ্ বুলিয়ে, সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক পানে বারকতক চেয়ে মৃদুতীক্ষ্নস্বরে ডাক্তারবাবু বললেন "দ্যাখো, প্রেস্‌ক্রপশনে কি দাগে তিন গ্রেণ কুইনাইন হাইড্রোক্লোর দেওয়ার কথা থাকলেই যে অম্‌নি তাই দিতে হবে তার কোন মানে নেই। একটু বুদ্ধিশুদ্ধি খরচ ক'রে চলতে হয়: কুইনাইন হাইড্রোক্লোরের বদলে দাগ পিছু আধ গ্রেণ ক'রে সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ দিয়ে দাও গিয়ে।" কম্পাউণ্ডার বলল—"তা'লে জ্বর বন্ধ হ'বে না, এত অল্প ডোজে সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ দিলে কখনো জ্বর বন্ধ হয় ?"

ধমক দিয়ে ডাক্তার বাবু বললেন"আরে মুখ্যু একদিনেই যদি জ্বর বন্ধ হ'য়ে যায়, তাহলে তোমাকে ডাকবে কেন ? আর পয়সাই বা দেবে কেন ? কাজ করতে হবে রোগীকে হাতে রেখে। এখন থেকে এসব বোঝ, শেখো। নেহাৎ হাবাগঙ্গারাম হ'লে জীবনে কখ্‌খনো ক'রে খেতে পারবে না। আর দেখো এ সব ব্যবসায়ের গুহ্যতত্ত্ব। বাইরের লোকের কাছে এ সব খুব চেপে যাবে, বুঝলে ?" "যে আজ্ঞে"ব'লে কম্পাউণ্ডার আবার ওষুধ তৈরী কর্ত্তে লাগল। ডাক্তারবাবুও টেবিলের উপরকার খাতাপত্তর গোছাতে সুরু করলেন। এম্‌নি সময়ে বাচস্পতি মশায় এসে ডিস্‌পেন্সারীর বারান্দায় উঠলেন। তাঁর বাঁ হাতে ছিল একটি নস্যদানী, কাঁধে আধ ময়লা একখানা চাদর, আর ডান হাতে গুটীপাকান একখানা ভিজে গামছা। তাঁকে দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, "আরে বাচস্পোতি দাদা যে, কি মনে ক'রে, এসো দেখি শুনি।"

তিনি ডাক্তারবাবুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে প্রথমে একটিপ নস্য নিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'রে বার কতক হাঁচলেন। তারপর বললেন—"এই দগ্ধ উদরের নিমিত্তই তোমার দ্বারস্থ হয়েছি, ভায়া।"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন, দগ্ধ উদরে আবার কি হ'ল তোমার ? পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বাচস্পতি-ভায়া বললেন, "আর জিজ্ঞাসা করো না ভায়া, স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। আমার বর্ত্তমান বিপত্তির মূলীভূত কারণই হচ্ছেন আমার ব্রাহ্মণী। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়েই ত এই ঘোর বিপত্তি।" একটু অসহিষ্ণুভাবে ডাক্তারবাবু বললেন—"বিপত্তিটা কি হ'ল সোজাসুজি ব'লে ফেল না কেন, এত বড় লম্বা ভূমিকা ফাঁদার কি দরকার ?" বাচস্পতি ভায়া বললেন, 'আরে ভায়া সে কি সোজাসুজি বিপত্তি যে চট ক'রে তোমার কাছে ব'লে ফেলব। ধৈর্য্য ধারণ কর, আমিও ক্রমশঃ বিবৃত করতে থাকি আর তুমিও অবহিত হ'য়ে শ্রবণ কর।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা'হলে অন্য সময় শুনবো, কাজের তাড়া আছে, এখন থাক্।" নিরুপায় মুখে বাচস্পতি বললেন, "তোমার কাজের তাড়া থাকলে আমি যে মারা যাই। এই দ্যাখো, উদরস্ফীত হ'য়ে, কত বড় একটা কুষ্মাণ্ডাকৃতি হয়েছে, এর যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে তবে অন্যত্র গমন কর।"

বাচস্পতি পেটের কাপড় খুলে ডাক্তারবাবুকে পেট দেখালেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "পেট অত ফাঁপল কি ক'রে, খেয়েছিলে কি ?"

পেটের ব্যথায় মুখ বিকৃতি করে বাচস্পতি বললেন, "এমন আর বেশী কি খেয়েছিলাম—নিঃস্ব দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেশী কোথায় কি পাব রে ভাই, যে খাব। তেমন উল্লেখ-যোগ্য কিছু ভক্ষণ করেছি ব'লে ত মনে আসছে না—তবে ব্রাহ্মণীর অনুরোধে সামান্য কয়েকটা কলার বড়া খেয়েছিলাম মাত্র।"

কৌতুহলী হ'য়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"আন্দাজ কতগুলো খেয়েছিলে ?" বাচস্পতি কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে বললেন, "এমন আর বেশী কি খেয়েছিলাম!

এই ধরণে, তোমার পঁচিশ তিরিশ গণ্ডার চেয়ে অধিক বেশী হবে না।”

বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারবাবু বল্লেন, “বাচস্পতি দাদা, তুমি রাক্ষস না কি! অতগুলো কলার বড়া কোন্ আক্কেলে তুমি খেলে বলত?” তোমার কি প্রমাদের ভয় মোটেই নেই—এর পরেও আর কিছু খেয়েছিলে না ওখানেই ইতি।” বাচস্পতি বল্লেন, “ইতিটাত ওখানেই করার ইচ্ছা ছিল রে দাদা, কিন্তু ব্রাহ্মণীর আগ্রহাতিশয্যে তা আর পেরে উঠলাম কৈ? তাঁর মাথার দিব্যি এড়াতে না পেরে কিঞ্চিৎ ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধও পান কর্‌তে হয়েছিল।” ডাক্তারবাবু বল্লেন—“বল কি! এর উপরে আবার ঘণাবর্ত্ত দুগ্ধ! সে আবার কতখানি?” দুই হাতে পেট চেপে ধ'রে বাচস্পতি বল্লেন—“বেশী আর কোথায় পাব বল'? এই ধরণে তোমার কিঞ্চিৎ ন্যূন দুই সের হবে।” বাচস্পতি মহাশয়ের সাধু ভাষার অনুকরণ ক'রে ডাক্তারবাবু বল্লেন, “এতেই সম্যক্ ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছিল, না আরো কিঞ্চিৎ গ্রহণ কর্‌তে ব্রাহ্মণী অনুরোধ করেছিলেন?”

বাচস্পতি বল্লেন, “ব্রাহ্মণী বল্লেন—এর পরে দুটো মাছের ঝোল ভাত খাও, নয়ত গলা জল্‌বে। কি করি বল'। তাঁর ত আর কেউ নাই এই আমিই হচ্ছি তার—এই তোমার গিয়ে (বেদনায় মুখবিকৃতি ক'রে)—এই সামান্য অনুরোধটা না রাখ্‌লে পাছে সন্তপ্তা হন এই আশঙ্কায় আর কি করি—না বল্‌তে সাহস হ'ল না। খেলাম দুমুঠো ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে'।

শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে ডাক্তারবাবু বল্লেন—“ঐ রকম খাওয়ার পরেও মাছের ঝোলভাত খাওয়ার অনুরোধটা তোমার কাছে সামান্য হ'তে পারে বটে, কিন্তু ফলটা কতখানি অসামান্য হয়েছে দেখ্‌তেপাচ্ছ ত? এই যে পেট ফুলে ঢাকের মতন হয়েছে—কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে কথা বলছ, এ থেকে তোমার মৃত্যু পর্য্যন্তও ত হ'তে পারে। কাতরকণ্ঠে বাচস্পতি বল্লেন—“ছিঃ অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই—ব্রাহ্মণী শুনলে চোখের জল ফেল্‌বেন। এখন তুমি ভাই, আমি যাতে নিরাময় হ'তে পারি তারই মতন একটু ওষুধ দেও।”

একটু মুচ্‌কে হেসে ডাক্তারবাবু বল্লেন—“এর কোন ভাল ওষুধ আমার কাছে নেই, তুমি বরং রাইচরণ পানওয়ালার দোকান থেকে এক বোতল সোডা খেয়ে চুপ্ ক'রে শুয়ে থাক গিয়ে। আজ আর কারো অনুরোধে কিছু খেও না। খেলেই মারা যাবে ব'লে রাখ্‌ছি।” মাথা নেড়ে বাচস্পতি মশায় বল্লেন—“না ভাই, নানা জাতিস্পৃষ্ট বোতলের জল আমি কদাচ পান কর্‌তে পার্‌ব না—প্রাণ গেলেও নয়।” ডাক্তারবাবু বল্লেন—“তা'হ'লে এক ছটাক আদার রসে দুই তোলা সৈন্ধব মিশিয়ে খেয়ে একটু ঠাণ্ডা জল খাওগে।” বাচস্পতি এইবার আশ্বস্ত স্বরে বল্লেন—“বেশ্ বেশ্—তাই করিগে—বলি ভাল হবেত?” হেসে ডাক্তারবাবু বল্লেন—“নিশ্চয়, আর দেখ, আমার আমোৎসর্গটাও এই বোশেখ মাসের দশইএর মধ্যেই সেরে দিতে হবে কিন্তু।” বাচস্পতি বল্লেন—আমার আর তাতে আপত্তি কি, সমস্ত যোগাড় ক'রে খবর দিও। তারপর একটু থেমে অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—“বলি ভায়া, দুপুরবেলায় একটা নেমন্তন্ন ছিল—অত্যল্প—কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্নাহার করলে কি বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ব'লে বোধ হয়?” ডাক্তারবাবু বাচস্পতির পানে তীব্রদৃষ্টিতে একবার চেয়ে শ্লেষপূর্ণস্বরে বল্লেন—“না তেমন বিশেষ ক্ষতি আর কি হবে—তবে বিসূচিকা হ'য়ে রাতের নাগাদ দুপুরের মধ্যেই তোমার প্রাণহানি ঘট্‌তে পারে এই পর্য্যন্ত।” ভীতকণ্ঠে, কতকটা আর্ত্তনাদের স্বরে বাচস্পতি বল্লেন—“ওরে বাপ্‌রে—না-তবে থাক্।”

বাচস্পতি মশায় চ'লে গেলেন। ডাক্তারবাবু সবগুলো আলমারি বন্ধ ক'রে প্রত্যেকটির তালা টেনে টেনে দেখ্‌লেন—শেষে একবার চারদিকে তাকিয়ে কম্পাউণ্ডারের টেবিলের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—“হয়েছে ওষুধ দেওয়া।” শিশিতে ওষুধ ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে কম্পাউণ্ডার বলল, “এই হ'ল আর কি?” ডাক্তারবাবু টেবিলের উপর থেকে প্রেসক্রপসনখানা তুলে নিয়ে বারকতক উল্টে পাল্টে দেখে বল্লেন, “দ্যাখো, প্রেস্‌ক্রপসনে ওষুধের যে সব ডোজ আমি লিখে দিই তুমি দেওয়ার সময় ঠিক ঐ রকম ডোজে ওষুধ দিও না। রকম সিকি মাত্রা বাদ দিয়ে দেবে। আমাদের গরম দেশ কি না, বিলিতি ওষুধ পূর্ণমাত্রায় দিলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশী। যাবার সময় দরজাটা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে রেখে যেও। আমি চল্লুম।” কয়েক মিনিট পরে দরজা বন্ধ ক'রে ওষুধের শিশি নিয়ে কম্পাউণ্ডারও চলে গেল।

(২)

বেলা ৮টা—ডাক্তারবাবু তাঁর শোবার ঘরে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পর্‌ছেন। এমন সময় বড় ছেলে বিভূতি এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, “বাবা এই নোট্‌খানা বদ্‌লে দিতে হবে—হেডমাষ্টার মশায় বল্লেন এখানা জাল নোট—ইস্কুলে চলবে না।” অতি বিস্মিত হ'য়ে ডাক্তারবাবু বল্লেন “জাল নোট! বলিস্ কি! পাঁচটাকার এক-

খানা নোট হ'য়ে গেল জাল। তুই ত কারো সঙ্গে বদ্‌লে আনিস্ নি?" বিভূতি ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, "আমি—আমি বদ্‌লাতে যাব কার সঙ্গে। যত সব অনাছিষ্টি কথা আপনার। কে আপনাকে ঠকিয়ে দিয়েছে তার নেই ঠিক—আপনি দোষ চাপাচ্ছেন আমার ঘাড়ে!" ছেলের ধমক কানে না তুলে চিন্তিতভাবে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "কে ঠকাল? মহিম দুলে দিয়েছে তিনটাকা, প্রসন্ন সরকার দিল পাঁচ টাকার নোট একখানা—"মাঝখানে বাধা দিয়ে বিভূতি বল্‌ল "তবেই হয়েছে প্রসন্ন সরকারকে ধরে নোটখানা এইবার বদ্‌লে নিন্ গিয়ে।"

তিক্তকণ্ঠে ডাক্তারবাবু বল্‌লে "থামরে বাপু, গোলমাল করিস্ নে ভাল ক'রে মনে ক'রে নিতে দে আমাকে! তারপর গোপাল দাস দিল সেও একখানা পাঁচ টাকার নোট, ছিদামের মাস্‌তুত ভাই গোবিন্দ বাকী ওষুধের দাম আর ভিজিট দিয়েছিল সব শুদ্ধ তেইশ টাকা সাড়ে বার আনা। সেও দিয়েছে পাঁচ টাকার চার খানা নোট আর খুচরো টাকা তিন্‌টে। এই ত হ'ল কালকের মোট পাওনা। এখন কাকে ধরি? দিয়ে থাক্‌লেও এদের মধ্যে কেউ সে কথা স্বীকার করবে না। না, দণ্ড যাবার সময় হ'লে এই রকমেই যায়?" বিভূতি বল্‌লে, "জিজ্ঞেস করুন না সবাইকে, শোনা যাক্ কে কি বলে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "এখানকার লোকের নাড়ীনক্ষত্র চিন্‌তে আমার কি আর বাকী আছে রে বাবা। কেউ স্বীকার করবে না, প্রত্যেকে না করবে। এখানকার লোকগুলো আমাকে দেখে হিংসেয় ফেটে মরে একেবারে! আমি যে দুবেলা দুমুঠো ভাত খাই, গাছ তলায় না থেকে পাকা বাড়ীতে বাস করি এটা এদের একেবারেই অসহ্য। এদের মধ্যে যদি কেউ দিয়েই থাকে তবে বদ্‌লে ত দেবেই না, বরঞ্চ এই নিয়ে হাসিঠাট্টা ক'রে বেড়াবে। তা করুক তবু সবাইকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌তে হবে।" বিভূতি বল্‌ল, "তা'লে মাইনের টাকার কি হবে? আজ তিন দিন হ'ল মাইনের তারিখ পেরিয়ে গেছে রোজ দু'পয়সা ক'রে 'ফিলে' ফাইন লাগ্‌ছে। ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "বলেছি ত—অর্থ দণ্ডের সময় হ'লে এরকম যাবেই! কাল দেওয়া যাবে আর কি। আজকের মতন ইস্কুলে যাও। উচিত মাইনের টাকাই জুটিয়ে দিতে পারিনে, তারপরে আবার জরিমানা দিতে হবে চার দুগুণে আট পয়সা। যা-ই-হোক দেব, বেঁধে মারলে অনেক সয়।" বিভূতি চলে গেল।

ডাক্তারবাবু জামা কাপড় প'রে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসেছেন এমনি সময় স্ত্রী এসে বল্‌ল, "বলি, তোমার আক্কেলখানা কেমন গা! মেয়েটা আজ তিন দিন হ'ল একজ্বরী হয়ে পড়ে আছে, এর মধ্যে তুমি এসে তাকে একবার চোখের দেখাটাও দেখতে পারলে না!" আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "দেখালে ত দেখতে পারি। কথাটা হ'ল কি যে আমরা হচ্ছি ডাক্তার "কল" না দিলে রোগী দেখা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষেধ। তা 'কল' ফল পড়ে মরুক গিয়ে তুমি একবার জানালেও ত পার্‌তে আমাকে?" ঝাঁঝালো গলায় স্ত্রী বল্‌ল, "তোমার ভীমরতি হয়েছে কিনা তাও ত বুঝতে পারিনে। বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছ তুমি। জ্বরে মেয়েটা মর মর হয়েছে, ঘরে পড়ে দিন রাত কাতরাচ্ছে, পাড়ার লোকেরা পর্য্যন্ত এসে দেখে যাচ্ছে! তুমি ভুলেও কি একবার খোঁজ-খবর নিতে পার না! চোখ কাণের মাথা খেয়ে ব'সে আছ?"

ঈষৎ বিব্রতভাবে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "ছাখো, তুমি বড্ডই বাজে বক'। কথার মাত্রা একটু কমিয়ে দিও। তোমার কি শ্রান্তি ক্লান্তি কিছুই নেই। বেশী কথা বল্‌লে আয়ু ক্ষয় হয় বুঝলে, সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে হ'লে economy of words দরকার জান্‌লে? চল খুকীকে দেখি একবার গিয়ে।"

স্ত্রী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময়ে রামা চাকর এসে বল্‌ল, "বাবু, একজন অতিথ এসেছে বাইরে ডাক্‌ছে আপনাকে!" রাগতস্বরে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "যত সব উড়ো আপদ এসে জোটে আমার এখানে! বল্‌গে অতিথ-ফতিথ হবে না—ব্যাটারা অতিথ থাক্‌বার আর বাড়ী খুজে পায় না! ঐ সেবারে এক বেটা চোর অতিথ ব'লে রাত্তিরে এসে থাকল, শেষে ভোরে উঠে যাবার সময়ে দুটো কল্‌কে, আধসের তামাক আর এক ঝুড়ি টীকে চুরি ক'রে নিয়ে অন্তর্ধান হ'ল। বাপ পিতামহও আর খুঁজে জায়গা পান নি—ভদ্রাসন করেছেন একেবারে চৌরাস্তার মোড়ের উপরে! আর এই ছাখ্। খুকীর প্রেস্‌ক্রপশন লিখে রেখে যাচ্ছি। একটা শিশি নিয়ে তাড়াতাড়ি ডিস্‌পেন্‌সরী থেকে এখনই ওষুধ এনে দিবি জান্‌লি রামা?"

স্ত্রী বল্‌ল—অতিথকে যেতে দিসনে রে রামা—বাড়ীর ভেতর থেকে তেল নিয়ে তার নাওয়ার যোগাড় ক'রে দে গিয়ে। অতিথ ফিরিয়ে দিলে অমঙ্গল হয়। আমার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে থাকা, উনি তার কি বুঝবেন, যা মুখে আসে তাই বলেন।" রামা চলে গেল। ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "চল, মেয়েটাকে দেখে যাই একবার।"

(৩)

ডাক্তারবাবু ডিস্‌পেন্সারীতে ঢুকেই কম্পাউণ্ডারকে টেবিলের উপর ঝুঁকে পরে একখানা কাগজ পড়তে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"অত মনোযোগ দিয়ে ওখানা কি পড়ছ হে?"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডার বল্ল—"আজ্ঞে একখানা প্রেসক্রৃপসন্—বিলাত ফেরত ডাক্তার মিঃ ঘোষ জেলা থেকে গোপীবাবুর ছেলেকে দেখতে এসেছিলেন। তিনিই এখানা ক'রে রেখে গেছেন। এই ওষুধটা আমরা দিতে পারবো কি না জানার জন্যে গোপীবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।" শুনে ডাক্তারবাবু বল্লেন, "বটে! এ যে দেখছি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া। আমার কাছে একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞেসা না ক'রে একেবারে সটান জেলা থেকে বিলেত-ফেরত ডাক্তার নিয়ে এল! দেখি প্রেসক্রপসন-খানা?"

খুব মনোযোগ দিয়ে প্রেসক্রপসন-খানা প'ড়ে, পকেট থেকে ফাউণ্টেন্ পেন্ বের ক'রে ডাক্তারবাবু তার উপরে কি যেন একটু লিখলেন—শেষে বললেন—"দেখেছ ব্যাটা গাধার আক্কেল! লোকে ভাবে যে বিলেতের মাটী একবার ছুঁয়ে এলেই সবজান্তা হওয়া যায়! কিন্তু কোনো ব্যাটার মাথায় এই সাধারণ বুদ্ধিটুকু আসে না যে,গাধা স্বর্গ থেকে ফিরে এলেও সে গাধাই থাকে। কি হাইডোজে সব ওষুধ দিয়েছে! ওষুধের ঝাঁঝেই ছোঁড়াটা দম আটকে মরবে! তা মরুকগে—এই ফাঁকে আমাদের গোটা কয়েক ওষুধ বিক্রী হ'য়ে যায় ত মন্দ কি? ব'লে দিও ওষুধ আমরাই দিতে পারবো। দাম অন্ততঃ দেড়া ধরতে হবে। একদিকে যেমন ফাঁকি দিয়েছে অন্যদিকে তেমন পুষিয়ে না নিতে পারলে চলবে কেন?"

কম্পাউণ্ডার জিজ্ঞাসা করল—"আজ্ঞে, আমাদের যে এই প্রেসক্রপসনের ৫ আর ৭ নম্বরের ওষুধ দুটা মোটেই নেই; কি করে 'সার্ভ' করবো?"

বিরক্তিপূর্ণস্বরে ডাক্তারবাবু বল্লেন, "তুমি একটি আস্ত ঢেঁকিরাম! কাজের সময় যদি অম্‌নি করে ধর্ম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির সাজ, তা'হলে তোমারই যে সারাটা জীবন একাদশী করতে করতে কাটবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমা-কেও পথে বসতে হবে। যে-সব ওষুধ আছে তাই দিয়েই প্রেসক্রপসন সার্ভ করবে। আমি জানি ঢের-ঢের বড় বড় ডিসপেন্সারীতে ও-রকম ক'রে থাকে।" কুণ্ঠিতভাবে কম্পাউণ্ডার বল্লে—"তা আজ্ঞে, আমি ত অত-শত বুঝি না, যা বলেন তাই করবো এখন থেকে। গিরিশবাবুর মেয়ের না কি আজ কুইনিন্ ইনজেক্‌শন্ দেওয়ার কথা ছিল, তা একটু তাড়াতাড়িই যেতে বলে-ছেন তাঁরা!"

ডাক্তারবাবু বল্লেন,—"এই দ্যাখো কথায় কথায় এত-বড় একটা জরুরী কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি মনে না করলে হয়তো আজ যাওয়াই হয়ে উঠ্‌ত না সেখানে। দেখি সিরিঞ্জ-ফিরিঞ্জগুলো বের ক'রে দাও ত ছোট আলমারী খুলে, এই নাও চাবি!" কম্পা-উণ্ডার চাবি খুলে কয়েকটা সিরিঞ্জ এবং ৪।৫টা কুইনিন্ এর টিউব এনে দিল। সেগুলো পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তারবাবু কুইনিন্ এর টিউব দেখে বিরক্ত হ'য়ে বল-লেন—"কুইনিন্ এর টিউবগুলো আবার বের করেছ কি জন্যে বন্ধ করে রাখ এ সব। ঐ যে ডি ওয়ার্ল্ডর বাড়ী থেকে ফরমাইস দিয়ে কতকগুলো ছোট টিউবে ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার পুরিয়ে নিয়ে এসেছি, তারি গোটাকতকে কুইনিন্ এর লেবেল এঁটে দাও।" একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে কম্পাউণ্ডার জিজ্ঞাসা করল—ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার ইন্‌জেক্‌শন্ করলে জ্বর বন্ধ হবে কি ক'রে? ডাক্তারবাবু বল্লেন—"সে আমি বুঝব, তোমায় ভাব্‌তে হবে না তার জন্যে। এখন যা বলি তাই কর। তুমি আমায় তেমনি মুখ্যু পেয়েছ কি না যে আজ দুটো কুইনিন্ ইন্‌জেক্‌শন্ ক'রে দেই আর জ্বর বন্ধ হয়ে যাক্ কাল-ই। আজ জ্বর বন্ধ করে দিলে কাল কি আর সে আমার ডিস্‌পেন্সারীর ত্রিসীমানায় ঘেঁস্‌বে, না, ওষুধের দামগুলো দেবে। ওর ঠাঁইয়ে আগে দুইদশটাকা নিয়ে নেই, তার পরে দেখে শুনে শেষে যা হয় করা যাবে একটা। (একটু থেমে) ব্যবসার মধ্যে একটু মাথা খেলাতে চেষ্টা করো। কার কাছ থেকে কি ক'রে পয়সা আদায় করতে হয়, তা যদি ভাল ক'রে না শেখ, তাহ'লে ঢের কষ্ট পাবে জীবনে। টাকাত আর গরীবে দিতে পারে না—আদায় করতে হয় বড় লোকের কাছ থেকেই। এখন কথা হচ্ছে বড় লোক সোজাভাবে কখ্‌খনো কাকেও টাকা দেয় না। ওরা ঠিক্ জান্‌বে খেজুর গাছের মতন। ভাল বেসে যদি আলিঙ্গন করতে যাও, কিছু পাবে না, লাভের মধ্যে বুকের চামড়া ছিঁড়ে যাবে আর গায়ে হবে বেদনা; কিন্তু দড়া লাগিয়ে ঘাড়ে চ'ড়ে যদি সু-ধার অস্ত্র দিয়ে, অল্প অল্প ক'রে গলা কাট্‌তে পার, পরিষ্কার মিষ্টি রস পাবে। ভাল কথা, রামা ওষুধ নিতে এসেছিল?" ঈষৎ হেসে কম্পাউণ্ডার বল্‌ল—"আজ্ঞে হাঁ।" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল ক'রে দেখে শুনে ওষুধ দিয়েছত? কম্পাউণ্ডার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—প্রেস্‌ক্রপসনের লেখা সব ওষুধ দিয়েছ? এবার একটু বাহাদুরী নেওয়ার আশায় কম্পাউণ্ডার সোৎসাহে বল্‌ল—"আজ্ঞে তা কি আর দেই! আপনার উপদেশ আমি প্রাণপণে মনে রাখার চেষ্টা ক'রে থাকি। ছ' আউন্স কোয়াশিয়ার জলে একটু রোজসিরাপ মিশিয়ে শিশিতে ঢেলে দাগ কেটে দিয়েছি। শুনে ডাক্তারবাবু মহাবেগে টেবিলে ঘুসী মেরে চেঁচিয়ে বল্লেন—"পাজি গাধা, উল্লুক! কোন্ আক্কেলে তুই কোয়াশিয়ার জল আমার বাড়ীর শিশিতে ঢেলে দিলি রে? কেমন ধারা আক্কেল তোর! তুই ভাত খাস্, না ছাই খাস্?"

কম্পাউণ্ডার অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্‌ল—"অনর্থক বকেন কেন মশাই? আপনিই ত ব'লে দিয়েছেন যে সাধারণ কুইনিন মিক্‌শ্চার এর প্রেস্‌ক্রপ্‌শন পেলে কোয়াশিয়ার জলে সিরাপ মিশিয়ে দিতে হবে আমি ঠিক তাই ই দিয়েছি।" ডাক্তার বাবুর রাগ তখন কমে নাই—নিজের অস্ত্রে নিজে জখম হয়ে, গর্জ্জন ক'রে তিনি বল্‌লেন—"আরে হতভাগা গাধা কোয়াশিয়া দেওয়ার কি স্থান অস্থান তোর জ্ঞান নাই? আমার মেয়ের ওষুধের উপর তুই গেলি দোকানদারী কর্‌তে! যা শিগ্‌গির এখনই একটা ভাল শিশিতে ক'রে ভাল ওষুধ আমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।"

অপ্রতিভ ভাবে কম্পাউণ্ডার ওষুধ তৈয়ার করার জন্যে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ডাক্তারবাবুও ইন্‌জেক্‌শন্‌ এর সরঞ্জাম বগলে ক'রে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। মেজার গ্লাস হাতে নিয়েই কম্পাউণ্ডারের আর-একটা কথা মনে পড়ল—সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—প্রেস্‌ক্রপসনে যেমনটা আছে ঠিক তেমনটাই দেব না সবগুলোরই ডোজ একটু কম কম করে দেব? ডাক্তার-বাবুর রাগ আগের চেয়ে অনেকটা কমে গিয়েছিল এবার তিনি সহজ সুরে বল্‌লেন—মনে রেখ, আমার বাড়ীর ওষুধ সর্ব্বদা ঠিক্‌ ঠাক্‌ মতনই দিতে হবে। অন্যের ওষুধ সম্বন্ধে সাবেক উপদেশ মতন চলবে। যাবার সময়ে ভাল ক'রে তালা বন্ধ ক'রে যেও—বন্ধ করে তালা টেনে দেখে তবে যাবে—আমি আর এ পথে ফিরুব না।"

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। গোপীবাবুর বাড়ীতে আজ মহা গণ্ডগোল। জেলার ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ার পর থেকেই ছেলের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে আরম্ভ করেছে—তিন দাগের পর একেবারে অজ্ঞান, মাঝে মাঝে ঐ অবস্থায় ভুলও বক্‌ছে। গোপীবাবুর ঐ একই ছেলে; শোকে তিনি একেবারে মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছেন। চণ্ডীমণ্ডপে গলবস্ত্র হ'য়ে ব'সে কেবলই কাঁদছেন—চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। ডাক্তার ঘোষকে আনার জন্যে জেলায় পর পর তিনজন লোক পাঠান হয়েছে। তিনি এখনও এসে পৌঁছান নাই। গাঁয়ের আমাদের ডাক্তার-বাবুর কাছেও লোক গিয়েছিল। তিনি শিগ্‌গিরই আসছেন ব'লে পাঠিয়েছেন। উৎকণ্ঠিত এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে সবাই কেবল পথপানে তাকাচ্ছে।

প্রথমে আস্‌লেন আমাদের ডাক্তারবাবু। এই বিপদের সময় তাঁকে দেখে সবাই একটু আশ্বস্ত বোধ কর্‌ল। গোপীবাবু চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে এসে তাঁর হাত ধ'রে বল্‌লেন "ভাই, সর্ব্বনাশ হতে বসেছে রক্ষে কর।" কিছুই না জানায় ভাল ক'রে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ব্যাপার কি বলুন ত? অসুখ কার? গোপীবাবু স্বল্প কথায় আদ্যোপান্ত তাঁকে বল্‌লে তিনি রোগী দেখতে চাইলেন, বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে রোগীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। রোগীকে বহুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে শেষে ডাক্তার বাবু মন্তব্য প্রকাশ করলেন—"ছেলেটার দফা সারবার উপক্রম করেছে দেখ্‌ছি। ওরা সব বিলেত ফেরত ডাক্তার "হাইডোজে" ওষুধ দেওয়াই হচ্ছে ওদের অভ্যেস এক রত্তি ছেলে এত সইতে পারবে কেন?" ওষুধের ঝাঁঝেই কোলাপ্‌স্‌ হয়েছে। তা ভাববেন না আপনি—ভাল ক'রে দিচ্ছি এক্ষুনই। একটা লোক আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন চিঠি লিখে দিচ্ছি।

চিঠি, প্রেস্‌ক্রপশন এবং ওষুধের শিশি নিয়ে লোক রওনা হ'য়ে গেলে ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—"আমি হচ্ছি আপনার নুন্‌ ভাতের সাথী—একটা "সিম্পল কেসের" জন্যে আমাকে না জানিয়ে আন্‌তে গেলেন বিলাতী ডাক্তার! আমাদের হাতে একটু খারাপ হ'লে ভালমন্দ যা খুসী বল্‌তেও পারেন—হাজার হ'লেও ঘরের লোক ত আমরা। এ সব ডাক্তারদের কি আর কিছু বল্‌তে পার্‌বেন! বল্‌লেই বল্‌বে গেঁয়ো কম্পাউণ্ডার ওষুধ দিতে গোলমাল করেছে। চোখের জল ফেলতে ফেল্‌তে গোপী-বাবু বললেন—"আমার ঘাট হয়েছে ভাই ও সব কিছু মনে করো না এখন তুমি আমার বাছাকে বাঁচাও।"

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"সে আর বল্‌তে হবে কেন? আমি যখন এসেছি তখন যমের মুখ থেকে কেড়ে আন্‌তে হলে তাও আনুব। একখানা প্রেস্‌ক্রপশন লিখে ফেলে দিয়ে ভিজিটের টাকা কয়টা পকেটে পুরে চলে' ত আর আমি যেতে পারুব না!" গোপী বাবু কথা বল্লেন না। বাড়ীর ভিতর থেকে ঝি এসে বল্‌লে—"মা বল্‌ছেন খোকা ভাল না হ'লে আপনি বাড়ী যেতে পার্‌বেন না—গেলে তিনি মাথা খুঁড়ে মর্‌বেন।" হাস্‌তে হাস্‌তে ডাক্তারবাবু ঝিকে বল্‌লেন—"বল্‌গে মাকে আমি বিলেত ফেরত ডাক্তার নই—দায়িত্ব জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে, খোকা ভাল না হ'লে কখনো আমি যাব না।" ঝি চ'লে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে দুটো শিশিতে দু রকম ওষুধ আস্‌ল। সেই ওষুধ দু তিন বার খাওয়ার পর থেকেই খোকার অবস্থা একটু ভাল বোধ হ'তে লাগল। দেখে গোপীবাবু আশ্বস্ত হ'য়ে তামাক খেতে বসলেন—চাকর-বাকরেরাও দুদণ্ড বিশ্রামের অবসর পেল। গোপীবাবুর স্ত্রী অন্তঃপুর থেকে ডাক্তার-বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে পাঠালেন।

জেলার ডাক্তারবাবুর তখনও খোঁজ নাই। তাঁকে ডাকৃতে যে তিনজন লোক গিয়েছিল তাদের একজন ফিরে এসে বললে—পাওয়া গেল না। আধ ঘণ্টা পরে আর একজন এসে জানাল—বাড়ী নাই। আর ঘণ্টা

খানেক পরে তৃতীয় ব্যক্তি এসে খবর দিল—বিকালে আসবেন। এইবার আর আমাদের ডাক্তারবাবুকে পায় কে! তিনি সুরু কর্‌লেন—"দেখেছেন লোকটার আক্কেল! মানুষের জীবন নিয়ে খেলা এর মধ্যে যদি একটা ভাল মন্দ কিছু হ'য়েই যায় তাহলে বিকালে এসে তুই কি কর্‌বি! শ্মশানে কাঠের বোঝা বয়ে দিয়ে আসা ছাড়া তোকে দিয়ে আর কি হ'তে পার্‌বে।"

গোপীবাবু বল্‌লেন—"আহা-হা ও সব অলক্ষুণে কথা বল কেন! বাছা ত আমার ভালই হ'য়ে গিয়েছে এখন তার ইচ্ছে হয় আসুক না হয় না আসুক!" ডাক্তারবাবু বল্‌লেন —"ভাল ত হয়ে গিয়েছে ওবু ধরুন যদি আমায় বাড়ী না পেতেন কি সাংঘাতিক হত তখন! সে যে আসবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই—আর এক দফে ভিজিটের টাকা আপনার কাছ থেকে না নিলে চল্‌বে কেন! আমি হ'লে এ অবস্থায় টাকা ত দিতামই না, উপরন্তু খ্যাংরা মেরে বিদেয় ক'রে দিতাম।" শান্তস্বরে গোপীবাবু বল্‌লেন—"থাম ডাক্তার, ভদ্দর লোকের ছেলেকে ও-রকম সব কথা বল্‌তে নেই।" ডাক্তারবাবু চুপ করলেন।

ছেলে ভাল হওয়া সত্বেও দুপুরবেলা ডাক্তারবাবুর আর বাড়ী যাওয়া ঘটল না; খাওয়া-দাওয়া ওখানেই করতে হ'ল। বিকেলে ভিজিটের টাকা ওষুধের দাম ইত্যাদি নিয়ে নগদ গোটা-পঁচিশেক টাকা পকেটজাত করে ডাক্তারবাবু যখন বাড়ী রওনা হবার উদ্যোগ করছেন এমন সময়ে জেলা থেকে ডাক্তার ঘোষ এসে পৌছিলেন। তাঁকে কেউ অভ্যর্থনা করল না কিম্বা তাঁর সঙ্গে কোনো রকম কথাবার্ত্তা বল্‌ল না। ব্যাপার ভাল বুঝতে না পেরে তিনি গোপীবাবুর সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটা কেমন?" বিমর্ষভাবে গোপীবাবু বল্‌লেন, "এ যাত্রায় কোন রকমে যমের দক্ষিণদ্বার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।" ডাক্তার ঘোষ বল্‌লেন—"চলুন তাকে দেখে আসা যাক্ একবার।" গোপীবাবু বল্‌লেন, "দেখে আর কি করবেন, ভালই আছে এখন। অবস্থা বরঞ্চ আমাদের এই ডাক্তার বাবুর কাছে শুনুন। এবার উনিই রক্ষে করেছেন তাকে। আপনি ত মশায় প্রেস্‌ক্রপসন লিখে দিয়ে চ'লে গেলেন। আপনার ওষুধ খাওয়াবার পর অবস্থা যা হ'ল সে আর কি বলব; বিপদের মুখে তিন-তিন্‌টে লোক পাঠালাম, সময়মত একবার আসতেও পারলেন না।" ডাঃ ঘোষ বললেন, "একটা serious case এ engaged হয়ে পড়েছিলাম কি না,—হ্যাঁ, প্রেস্‌ক্রপসনের কথা কি বল্‌ছিলেন?" গোপীবাবু বললেন---"কি আর বলব---ওষুধ এনে খাওয়ার পর থেকেই অবস্থা খারাপ হ'তে আরম্ভ করে, শেষটায় কি না একেবারে কোলাপ্‌স্! প্রাণের দায়ে তাড়াতাড়ি লোক পাঠালাম আপনার ওখানে, আপনি এলেন না। শেষে আর কি করি, আমাদের গায়ের এঁকেই নিয়ে এলাম---উনি বহু চেষ্টা করে বাছাকে কতকটা খাতে এনেছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন সে ভালই আছে।" এইবার আমাদের ডাক্তার বাবু মুখ খুললেন---"হ্যাঁ আমি ত আর বিকেলে আসব ব'লে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিনে; খবর পাওয়ামাত্রই আস্‌তে হয়। ওঁরা হচ্ছেন অবিশ্যি বড় ডাক্তার, ওঁদের ভুলচুকে একটা ভালমন্দ হ'লেই বা সাহস ক'রে সে কথা বলে কে! জান্‌লেন ডাক্তারবাবু, আমি এসে দেখি যে ছেলের অবস্থা একেবারে ভয়ঙ্কর Serious—Suffocation বন্ধ হয় হয় ভাব! দেখে গতিক্ ভাল বোধ হ'ল না—দেখতে চাইলাম আপনার প্রেস্‌ক্রপশন! অপরাধ নেবেন না দেখে আমার ত একেবারে চক্ষুস্থির! ভয়ঙ্কর Over high doseএ এ সব ওষুধ দিয়েছেন—বাঙ্গালীর ছেলের ধাতে অতটা সইবে কেন! ডাক্তার ঘোষ বল্‌লেন, ওষুধ আনা হয়েছিল কোত্থেকে? Dispensingএ ভুল হয়নি ত? হেসে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—সেটী হবার যো নেই—ওষুধ আমারই ডিস্‌পেন্‌সারীর—সেখানে কোনো কিছুর এক চুল নড়চড় হবার উপায় নেই।" ডাঃ ঘোষ বল্‌লেন—"আপনার কি Passed compounder!" ডাক্তারবাবু বল্‌লেন--"Passed" ত বটেই তা বাদে 15 years' exprience!" শুনে চিন্তিত ভাবে ডাক্তার ঘোষ বল্‌লেন—"তাহলে গোল হ'ল কোন খান্‌টায়---যে ওষুধ দিয়েছি তাতে ত অমনটি হবার কথা নয়! শ্লেষপূর্ণ হাসি হেসে আমাদের ডাক্তারবাবু বল্‌লেন —"আমাদের ছোটমুখে বড় কথা বলা হয়---আমার বিশ্বাস ডায়োগ্‌নিসিস্‌ই ঠিক হয় নাই!"—ডাক্তার ঘোষের কান লাল হ'য়ে উঠ্‌ল তিনি বল্‌লেন—"দেখি প্রেস্‌ক্রপসন্‌খানা?"

প্রেস্‌ক্রপশন্ খানার দিকে একবার তাকিয়েই বিস্মিত ভাবে চীৎকার করে তিনি বল্‌লেন, "একি! এ দুটো ওষুধ কেটে দিলে কে! আমাদের ডাক্তারবাবু বল্‌লেন ওটা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম শেষে কাটার উপরে সর্টে আপনার নাম সই দেখে ভেবেছিলাম ভুলে হয়ত কেটে দিয়ে থাক্‌বেন। ভুলভ্রান্তি মানুষ মাত্রেরই হ'য়ে থাকে, তবে আমাদের ভুল একটু বেশী মারাত্মক হয় এই যা কথা!" অধিকন্তর বিস্মিত ভাবে ডাক্তার ঘোষ বল্‌লেন' "আমি কেটেছি! অসম্ভব! অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, মাঝে মাঝে হঠাৎ বেসামাল হ'য়ে গেলে প্রথম অবস্থায় আমিও ওরকম বিস্ময়ের ভাণ করতাম!" এবার আর ডাক্তার ঘোষ

স্থির থাক্‌তে পারলেন না। ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, "গোপীবাবু, বাড়ীতে ডেকে এনে আমাকে অপমান করাই কি আপনার উদ্দেশ্য! আপনার মতন পদস্থ লোকের বাড়ীতে মানসম্মান নিয়ে আসা ভদ্র-লোকের পক্ষে নিরাপদ না হ'লে বড়ই আক্ষেপের কথা।" এইবার বাধল বিষম গণ্ডগোল! ডাক্তারবাবু জোর গলায় নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে লেগে গেলেন। কাকেও অপমান করা তাঁর উদ্দেশ্য নয় এবং যেটুকুন বলেছেন তা না বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়, এই কথাই তিনি হাত মুখ নেড়ে বারবার বল্‌তে লাগলেন। গোপীবাবু ডাঃ ঘোষের কাছে কয়েকবার ত্রুটি স্বীকারের প্রয়াস পেলেন বটে, কিন্তু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ ডাক্তারবাবুর গলা ছাপিয়ে ডাঃ ঘোষের কানে পৌঁছাতে পারল না। পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁকে অগত্যা চুপ করতে হ'ল।" ডাক্তারবাবু বকতেই লাগলেন; সে দিকে লক্ষ্য না ক'রে ডাঃ ঘোষ গোপীবাবুকে নমস্কার করে বল্‌লেন—"এখন আসি তবে।" গোপীবাবু বল্‌লেন—"যাবেন! ওরে শীগ্‌গির আটটা টাকা এনে দে ত!" ডাঃ ঘোষ বল্‌লেন—"এ বেলা আর ভিজিট নেব না আপনার ঠাঁইয়ে। রোগী যখন ভাল হয়ে গিয়েছে তখন আর কথা কি!" গোপীবাবু বল্‌লেন—"তা কি হয়। কষ্ট ক'রে যখন এসেছেন তখন ভিজিট নিতেই হবে আপনাকে।" পাছে গোপীবাবুর অনুরোধে ডাঃ ঘোষ টাকা নেন এই ভয়ে আমাদের ডাক্তার বল্‌লেন—"না-না ঠিকই বলেছেন— ন্যায্য মত ভিজিট আর উনি পেতে পারেন না। এবারে আর ওঁকে টাকা দিতে হবে না।" একটু হেসে ডাঃ ঘোষ চ'লে গেলেন। তিনি চ'লে যাবার পর মহা আস্ফালন ক'রে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"টাকা নেওয়া অমনি মুখের কথা! আমরা রোগীকে সুস্থ করে নানারকম টনিক ওষুধ খাইয়ে সবল ক'রে টাকা নিতে পারিনে আর উনি টাকা নেবেন রোগীর গঙ্গাযাত্রা করিয়ে। টাকা সস্তা! আকাশ থেকে পড়ে আর কি! কাণ্ডটি যা করেছেন অন্য বাড়ী হ'লে এতক্ষণ হাতে দড়ী পড়ত। গোপীবাবু বল্‌লেন, "না রে ভাই। এসব হুড়হাঙ্গামের মধ্যে থাকতে আমি ভালবাসিনে—জানিস্‌ই ত গো-ব্রাহ্মণ বিরলে সুখী।" ডাক্তার-বাবু বল্‌লেন "সেকি আর জানিনে—আপনি শিবতুল্য ব্যক্তি। আপনার সঙ্গে কার তুলনা। তবে একথা ঠিক প্রমাদের ভয় থাকে ত বাছা জীবনে আর এ গাঁ মুখো হবে না।"

কেউ কোন কথা বলল না—বুক ফুলিয়ে আমাদের ডাক্তারবাবু বাড়ী চ'লে গেলেন।

আলোচনা

জন্মাষ্টমী

ভাদ্রমাসের প্রবাসীর "জন্মাষ্টমী" প্রবন্ধে বৃন্দাবন-লীলাকারী কৃষ্ণ ও দেবকী-নন্দন কৃষ্ণকে এক করা হইয়াছে। ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ, মহাভারত ও বঙ্কিম-বাবুরও ইহাই মত। কিন্তু চৈতন্য-মহাপ্রভু দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, এই দুই কৃষ্ণ এক নহেন। বৃন্দাবন-লীলাকারী ঈশ্বর- তাঁহার লীলা লোক অনুভব করে—দেখিতে পারে না। দেবকীনন্দন মানুষ। মহাপ্রভুর শিষ্য রূপ গোস্বামী. তাঁহার আদেশে, এই দুই কৃষ্ণ সম্বন্ধে পৃথক দুই নাটক লিখিয়াছিলেন।

মানুষ-কৃষ্ণ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর ঋগ্বেদোক্ত চন্দ্রবংশীয় মহারাজা-ধিরাজ যযাতির বংশধর। যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে উত্তর ভারতে স্থাপন করিয়া সম্রাটের পদবী প্রদান করেন। অন্য চারি পুত্রের মধ্যে অনু পূর্ব্ব দিক্ (Farther India) দ্রুহ্যু উত্তর, যদু পশ্চিম (Western Asia, Europe) এবং তুর্ব্বসু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ (Africa)র সামন্ত নরপতি হয়েন। ইঁহাদের সকলেরই নাম ঋগ্বেদে আছে।

যবদ্বীপের ইতিহাস অসুর বংশধর কর্ণকে তথাকার রাজা বলে, কাম্বোডিয়ার ইতিহাস বলে ঐ দেশ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধিকারে ছিল। মৎস্য-পুরাণ বলেন অসুর বংশধর শিবি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃব্য তিতিক্ষু "পূর্ব্ব-দেশের" প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। Mexicoর Aztec History এই তিতিক্ষুকে আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী বলে।

ইজিপ্টের ঐতিহাসিক (Herodotus)—ইজিপ্টের রাজা বলিয়া পুরুর Pheros, যদুর বংশধর সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিধনকারী পরশুরামের Rhampsinitos এবং তুর্ব্বসুর বংশধর মরুত্তের পোষ্যপুত্র "পৌরবের" বংশধরগণের "পৌরব" (Pharaoh) এই নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩২ অধ্যায়ে—নকুলের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবকী-নন্দনকে মদ্র (Media) দ্বারাবতী [ন] (Dardanu—Dardanelles—Asia Minor), অম্বষ্ঠ (Mesopotamia), লোহিত সমুদ্রের পারের দশার্ণ (Egypt), পশ্চিম-মালব (Avanti—Italy) যবন (Greece) গ্রামনীয় (Germany) এমন কি দ্বারপালের দেশ (Dover—England) এর অধিরাজ রূপে পাই।

রাজতরঙ্গিণী ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে পাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ২৫২৬ শক পূর্ব্বাব্দ অর্থাৎ ২৪৪৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল।

মহাভারতে পাই নকুল Syrian desert ও Great Oasisএর মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত দশার্ণ দেশে রাজর্ষি "আক্রোশ"কে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইনি IXth Dynastyর প্রবর্ত্তক Akthoes, (Hall সাহেবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

তাঁহার "দুইশত বৎসরের অধিক" কে ২৫০ বৎসর ধরিলে Hall সাহেবের মতে আক্রোশের রাজ্যাভিষেকের কাল হয় ২৪৬৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ।

দেবকী-নন্দন পশ্চিম-কোসল বা Oudh (Ur)এর দেশ (Babylonia)র অধিপতি নগ্নজিতের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। Hall সাহেব বলেন Lugal Annamundu—নগ্ন(জিৎ) উত্তান মুণ্ড—২৪৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত Babyloniaতে রাজা ছিলেন।

সুতরাং মহাভারতে যদুনন্দনের যে ইতিহাস আছে তাহা Egypt ও Babyloniaর ইতিহাস হইতে সমর্থিত হইতেছে এবং তিনি যে ২৪৪৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যুধিষ্ঠির ঐ বৎসর একটি অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাও এ দেশের অংশ বিশেষে এখনও প্রচলিত আছে।

প্রভাস তীর্থ (Papa—Baba স্বরূপ), বৈবত [ক] (Aiada—Ida পর্ব্বত) এবং পশ্চিম-বাহিনী সরস্বতী (Harbai—Hermes নদী)র দেশ দ্বারাবতী [ন] (Dardanu Asia Minor) ই যাদব অর্থাৎ 'শূরসেন' দের দেশ হইতেছে, কারণ Moor গণ ঐ দেশ অধিকার করিয়াই 'শূরসেন Saracen নামগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি যদুনন্দনের উপদেশ সমূহ গীতার আকারে অদ্যাপি আমরা পাঠ করি।

সুতরাং যদুনন্দন কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতেছেন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে যদি কেহ কবিতা লিখিয়া থাকে তাহাতে তিনি mythical person হইতে পারেন না।

শ্রী ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী

গীতায় পুরুষোত্তম-বাদ

(১)

গত শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গীতার পুরুষোত্তম-বাদকে অবৈদান্তিক ও বৈষ্ণব মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পুরুষোত্তম-বাদটি যে একটী বিশিষ্ট বৈদান্তিক অথবা অদ্বৈত মত—এই সিদ্ধান্তটি প্রতিপাদন করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

(ক) ন্যায়ের পরিভাষা-প্রয়োগ বিধি থাকা সত্ত্বেও স্মৃতি এবং শ্রুত্যাদিতে একই শব্দ বিভিন্নার্থে বহুল প্রয়োগ লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ, সমন্বয়গ্রন্থ গীতায় পরিভাষাকে গৌণ করিয়া ভাবকেই মুখ্যস্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং "অক্ষর" শব্দকে 'ব্রহ্ম পরমং' অর্থে ব্যবহার করিয়া, অন্যস্থলে 'কূটস্থ' বিশেষণের দ্বারা ভিন্নার্থে (১) জীব-শ্রীধর; (২) মায়াধীশ-শ্রীশঙ্কর) প্রয়োগ করা কিছু অসমীচীন নহে। উক্ত অর্থদ্বয়ের যে-কোন একটি গ্রহণ করিলেই অক্ষরাতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ পুরুষোত্তমের উল্লেখ প্রয়োজন। শ্বেতাশ্বেতরে অক্ষরকে জীব-অর্থে স্বীকার করিয়া অন্ত আরেক "দেবের" উল্লেখ করা হইয়াছে;—ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে দেব একঃ (১।১০)। পুনশ্চ, বিষ্ণুপুরাণে অক্ষরের মায়াধীশ অর্থ দৃষ্ট হয়;—সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংশয়ঃ (১।১।২)। অতএব গীতার ত্রি-পুরুষবাদ অ-প্রসিদ্ধ নহে।

"কূটস্থ" শব্দের "অচল" অর্থ করিলেও উহা যে কেবল পুরুষোত্তমেরই বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইবে, এমন নহে; দেশ-কাল-নিমিত্তরূপ ক্ষর পুরুষ বা change categoryর তুলনায় 'জীব' অথবা 'মায়াধীশকে'ও দেশকাল নিমিত্তের হেতুভূতরূপে 'অচল' বলা যাইতে পারে।

(খ) পুরুষোত্তমকে যদি বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণার্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ইঁহাকে বেদান্তমত-মূলক পরমাত্মা (গীতা-১৫।১৭) বলার কারণ নাই—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ব্যক্ত হইল কৈ?

(গ) 'আমি বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া কথিত হই'—ইহার দুইটি অর্থ সম্ভব; (১) পুরুষোত্তম শব্দটার বেদে উল্লেখ আছে, (২) পুরুষোত্তম তত্ত্বটি বৈদিক। দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করিলেই উক্ত বাক্যের ঐতিহাসিক প্রাচীনতা সম্বন্ধে আপত্তি থাকিতে পারে না। শ্রীধর ও শ্রীরাঘবেন্দ্র পুরুষোত্তমতত্ত্বের প্রমাণ-হিসাবে শ্রুতি হইতে "স বা অয়মাত্মা' ইত্যাদি ও 'চেতনশ্চেতনানাম্' ইত্যাদি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রুতি হইতে পরম্পরাপ্রাপ্ত 'গুহ্যতম' এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব সর্ব্বোপনিষদসারভূত গীতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২)

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপিও গীতার পুরুষোত্তমযোগের সমধিক আলোচনা। কাশী-হরিদ্বার অঞ্চলে সন্ন্যাসিগণের "ভাণ্ডারার" সময় নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসিগণ পুরুষোত্তম-যোগের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিয়া 'ওঁ নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হরহর' এই জয়-ধ্বনি করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ এই পুরুষোত্তমনামীয় অবস্থা অদ্বৈতমার্গাবলম্বী সাধককুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভীষ্ট বস্তু। সাধনের চরমাবস্থায় ত্রিপুটি যখন ধ্বংস হইয়া যায় তখন এমন এক চৈতন্যময় অস্তিত্বই শুধু অবস্থান করেন, যাঁহাতে এই ভাব ব্যতিরিক্ত অন্য দ্বিতীয় ভাব—ব্যষ্টি বা সমষ্টি, জীবত্ব বা ঈশ্বরত্ব, ক্ষরত্ব বা অক্ষরত্ব—কিছুই নাই। এই নিরপেক্ষ অবস্থায় যে মহাশান্তি অনুভব হয়, যোগবাশিষ্ঠে তাহাকে "নিশ্ছিদ্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান থাকা হেতু নিরন্তর জ্ঞানের যে ব্যাঘাত হইতেছিল, তাহা চিরতরে অদৃশ্য হয়—এক নিস্তরঙ্গ বোধসমুদ্র তখন বিরাজ করিতে থাকে। জগতের অন্তরালে এই যে সচ্চিদানন্দ, নিত্য বর্ত্তমান—ইনিই পুরুষোত্তম।

সুতরাং গীতার পুরুষোত্তম বাদ বৈদান্তিক সন্দেহ নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দেব, বি, এ।

প্রতিবাদ

'বাঙ্গাল ভাষার' আলোচনা

আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বাগছী মহাশয় "বাটপাড়" শীর্ষক গল্পের মধ্য দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের 'বাঙ্গাল ভাষা' কে অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি, গল্পের ভিতর কথোপকথনচ্ছলে তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের যে ইতর

ভাষার অবতারণা করিয়াছেন তাহা কোন প্রকারেই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গ্রাহ্য নহে। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরাও এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা বলিয়া দাবী করেন না বরং দেখিতে পাওয়া যায় পশ্চিম বঙ্গবাসী লেখকেরা কেহ কেহ সাহিত্যের বাজারে খাস কলিকাতার কথ্য ভাষা অবাধে চালাইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ ব্যকরণ সম্মত সাধু ভাষাই (যাহা সকল প্রদেশের লোকদেরই বোধগম্য এরূপ ভাষা) বাণীর পূজোপচারে ব্যবহার-যোগ্য।

লেখক মহাশয় পূর্ব্ব বাঙ্গালার নিরক্ষর কৃষকশ্রেণীর ইতর ভাষাকে ভেঙ্গচাইতে যাইয়া তিনি যে নিজেই অনেকস্থানে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন তাহা বোধ করি তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন নাই, তিনি 'বাঙ্গাল' লেখক না হইলেও 'বাঙ্গাল' ভাষাকে বিদ্রূপ করিতে যাইয়া যে 'বাঙ্গালের' পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। তাহার মুখভেংচানী এত অতিরঞ্জিত ও শ্লেষপূর্ণ হইয়াছে যে তাহার অনুকরণ বা ক্যারিকাচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি এই অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইয়া কেন যে হাস্যাস্পদ হইলেন বুঝিলাম না, কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার অসংলগ্নতা দেখাইতেছি—

(১) "বদ্র সমাজে তুমি আমার মুখ হাসাইবা শুয়ার"।
(২) "হিগ্‌গির পাঠ করিয়া হুনাও"।
(৩) "এ ব্যাবাক্ দ্যাখশোন করব ক্যাডা'' ?
(৪) "বেয়াই হল্‌গল্ জাইনা ফ্যালুছি''।

আর অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই। জমিদার জগৎবাবুর মুখ দিয়া তিনি যে ভাষায় কথা বলাইয়াছেন—কোন জমিদারই এই প্রকার নোংরা অশ্লীল ভাষায় কথা বলে না। নিরক্ষর কৃষকেরা ঝগড়ার সময় ঐ ধরণের শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু লেখকমহাশয় সংস্কার প্রভাবে সমস্ত কথায়ই 'স,' 'শ,' 'ষ,' কার স্থানে 'হ' কার লিখিয়া অর্ব্বাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'শ'কার স্থানে 'হ'কার বসাইলেই 'বাঙ্গাল ভাষা' হয় না ইহা কি 'কোল্‌কাতা' বাসী লেখকের জানা নাই? উল্লিখিত উদাহরণের চিহ্নিত শব্দগুলি বাঙ্গালরা এই ভাবে উচ্চারণ করে না। এক নম্বর উদাহরণে 'হাসাইবা' স্থলে 'আসাইবা' লিখিলে 'বাঙ্গাল ভাষার' প্রতি সুবিচার হইত। কিন্তু সংস্কারান্ধ লেখক কেবল 'শ'কার কে 'হ'কারে পরিবর্ত্তন করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। তৃতীয় উদাহরণে 'দ্যাখশোন' স্থলে দ্যাখ হোন্ লিখিলেন না কেন। ভুল হইয়াছে বুঝি।

বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে কোন অংশেই কম গৌরবান্বিত নহে।

শুধু পূর্ব্ববঙ্গের নয়, সকল দেশেরই কথ্য-ভাষা সাহিত্যের ভাষা অপেক্ষা অশুদ্ধ। এই হিসাবে শুধু পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিদ্রূপের অধিকারী নহে।

আমরা লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন মনোযোগ সহকারে বিক্রমপুরের ও পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসখানা আলোচনা করেন। এবং যদি কোন গ্রন্থকার বা সাহিত্যিকের রচনা হইতে ঐ প্রকার নোংরা ইতর ভাষার উদাহরণ দেখাইতে পারেন—তবেই যেন এই প্রকার বিদ্রূপ করিতে সাহসী হ'ন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চর্‌কা বনাম মিল

গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাশয়ের 'খদ্দরের কথা' শীর্ষক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে কাপড়ের কলের সহিত তুলনা করিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে খাদির অধিকতর উপযোগিতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করি।

বলা হইয়াছে "কৃষিকার্য্যে আমাদের দেশে ৮০।৯০ দিনের অতিরিক্ত খাটিতে হয় না! স্ত্রীলোকের কাজ ত আরও কম।" এ কথা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযুজ্য না হইতে পারে। যে সকল প্রদেশে বৎসরে একাধিক ফসল হয় সে সব স্থানে কৃষকদিগকে আরও বেশী পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাহা ছাড়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে যে, অবসর মিলে সেই সময় চর্‌কায় সূতা কাটার মত একঘেয়ে কাজে অতিবাহিত করা প্রীতিকর না হওয়াই সম্ভব। আমাদের মনে হয় যে অবসর সময়ের অন্ততঃ কতক অংশ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে এবং যাহাতে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধন হইতে পারে সেইরূপ কাজে নিয়োজিত করা উচিত। তাহা না হইলে জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে ও নিরানন্দ হইয়া উঠিতে পারে।

এখানে কথা উঠিতে পারে যে, যেখানে উদরান্নের সংস্থান নাই সেখানে যাহাতে দু'পয়সা উপার্জ্জন হয় অবসর সময় সেইরূপ কাজে ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। একথা সত্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় কথা হইতেছে পরিশ্রমের ফলোপধায়িতা (Efficiency) বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধি করা। এইখানেই যন্ত্রের বিশেষ সার্থকতা।

ম্যাঞ্চেষ্টারে হেন্‌রী ফোর্ডের একটি মোটরের কারখানা আছে। যেখানে প্রতিদিন আট ঘণ্টা করিয়া সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ হয়। এখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক ঘণ্টায় তিন শিলিং অর্থাৎ প্রায় দুই টাকা। বিলাতে আর কোথাও সাধারণ মজুরদিগকে এত অধিক বেতন দেওয়া হয় বলিয়া জানি না। হেন্‌রী ফোর্ড বলেন যথেষ্ট আর্থিক আয় এবং যথোপযুক্ত অবসর দুইই সামাজিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক—এবং একমাত্র যন্ত্রের সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইতে পারে।

উক্ত প্রবন্ধে হিসাব করিয়া দেখান হইয়াছে যে, মিলের একজন মজুরের মারফৎ যতটা সূতা বাহির হইতে পারে ততখানি সূতা হাতের চরকার কাটিতে দুই শত লোকের প্রয়োজন। এখানে দেখা যাইতেছে যে মিলের মজুরের পরিশ্রম চরকার কাটুনীর পরিশ্রম হইতে দুইশতগুণ অধিক ফলোপধায়ক (Efficient)। ইহার অন্ততঃ কতক অংশ বার্দ্ধিত পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিকের প্রাপ্য। তাহা ছাড়া যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত হওয়ার দরুণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ বাড়ে। এইরূপে সমস্ত সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন সূতার কলের প্রত্যেক মজুর ১৯৯ জন গরীবের অবসর সময়ের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করিতেছে। এই তর্ক নূতন নহে। ল্যাঙ্কাশায়ারেও যখন কাপড় ও সূতার কলের প্রথম প্রচলন হয় তখন তাহার বিরুদ্ধেও ঠিক এই যুক্তিরই অবতারণা করা হইয়াছিল। অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ ইহার নিম্নলিখিতরূপ উত্তর দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কাপড়ের কলই

লওয়া যাউক। কাপড়ের কলের জন্য যন্ত্রপাতির দরকার। কলকজা তৈয়ার করার জন্য লোহার আবশ্যক। কয়লা না হইলে লোহা প্রস্তুত হইতে পারে না। কাজেই বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে কলকজার কারখানা, লোহার কারখানা এবং কয়লার খনি সকলেই এই সমৃদ্ধির অংশ পাইবে। তাহা ছাড়া রেল, জাহাজ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ব্যবসারও উন্নতি হইবে। এই সকল ব্যবসায়ের বৃদ্ধির দরুন্ অধিকতর লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন হইবে। এইরূপে যে-কোনও শিল্পের উন্নতি অন্যান্য অনেক শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির কারণ হয়। তাহাতে মোটের উপর উপার্জ্জনের সুযোগ এবং সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়।

উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত ভারতবর্ষের কাপড়ের কলের মোট সংখ্যা ২৫৬। কিন্তু Indian Tariff Boardএর রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৪-২৫ সালে ২৭৫টি মিলে কাজ চলিতেছিল এবং ১৯টি মিল বন্ধ ছিল—সর্ব্বসমেত ২৯৪ টি।

উক্ত রিপোর্ট হইতে শেষ দুই বৎসরের বিদেশ হইতে আমদানী এবং দেশে প্রস্তুত সূতা ও কাপড়ের পরিমাণ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

	সূতা ('মিলিয়ন' পাউণ্ড)		কাপড় ('মিলিয়ন' গজ)	
	বিদেশ হইতে আমদানী	দেশীয় মিলে প্রস্তুত	বিদেশ হইতে আমদানী	দেশীয় মিলে প্রস্তুত
১৯২৪-২৫	৫১	৭১৯	১,৭১০	১,৯৭০
১৯২৫-২৬	৫১	৬৮৬	১,৫২৯	১,৯৫৪

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় মিলে এখন যে-পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত হয় তাহা হইতে দ্বিগুণ উৎপন্ন হইলে তাহা সমস্ত দেশের প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে।

সূতার আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয়সংখ্যা প্রায় সমান সমান। অর্থাৎ বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর যত সূতা আমদানী হয় দেশীয় মিলে প্রস্তুত প্রায় সেই পরিমাণ সূতা বিদেশে রপ্তানী হয়।

এই সম্পর্কে একটা বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-প্রসাদ বলিয়াছেন যে, আরও অন্ততঃ পাঁচ শত মিল প্রতিষ্ঠা না করিলে দেশের প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কাপড় প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু আর একটিও নূতন মিল প্রতিষ্ঠা না করিয়াও বর্ত্তমান অপেক্ষা দ্বিগুণ কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব। কিরূপে তাহা বলিতেছি।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ কাপড়ের কলে দিনে দশ ঘণ্টা করিয়া কাজ হয়। অবশিষ্ট ১৪ ঘণ্টা কল বন্ধ থাকে। ১০ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে যদি দুই shiftএ ২০ ঘণ্টা কাজ হয় তাহা হইলে অনায়াসেই দ্বিগুণ মাল উৎপন্ন হইতে পারে। জাপানে অনেক মিলে দুই shiftএ কাজ হয়। তাহাতে কাপড়ের দাম সস্তা পড়ে এবং কলওয়ালাদিগেরও লাভ বেশী হয়। ফলতঃ কাপড়ের খরিদ্দার ও প্রস্তুতকারক উভয়েই লাভবান্ হন। তাহা ছাড়া একই কলে প্রায় দ্বিগুণ লোকের কার্য্যের সংস্থান হয়। ১৯২৫-২৬ সালে আমেদাবাদে একটি এবং বোম্বাইয়ে একটি মিলে এইরূপে দুই shiftএ কাজ চলিয়াছিল, এখনও চলিতেছে কি না জানি না। দুই shiftএ কাজ করিতে যে অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হইবে কলের মালিকগণ নিজেদের স্বার্থেই তাহা যোগাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মালের কাট্‌তি হইলে মূল-ধনের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

তর্কের জন্য ধরিয়া লওয়া যাউক যে, দেশের সমস্ত মিল বন্ধ করিয়া দিয়া এবং বিদেশ হইতে কাপড় ও সূতার আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়া চরকা ও হাতের তাঁতের দ্বারা দেশের বস্ত্রাভাব নিবারণ করা সম্ভব। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, এই অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে কি না।

আমাদের বিবেচনায় পৃথিবীর বর্ত্তমান অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য-নৈতিক অবস্থায় তাহা অসম্ভব। কারণ কোনও জাতির পক্ষেই আজ-কাল অন্য সমস্ত জাতির বাণিজ্যিক সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নহে। এবং যাহারা সস্তায় মাল উৎপন্ন করিতে পারিবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মালেরই সর্ব্বত্র কাট্‌তি হইতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, আজকালকার শিল্পবাণিজ্যের প্রতিযোগিতা কোনও দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—তাহা পৃথিবীব্যাপী। এই অবস্থায় ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়।

এই সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয় যে, শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র চর্‌কার দ্বারা দেশের বস্ত্রসমস্যার মীমাংসা হইবে না। অবশ্য যাহাদের অন্য কোনও কাজ নাই বা যাহারা অন্য কোন কাজ করিতে অসমর্থ তাহাদের চর্‌কা কাটাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান না গড়িয়া উঠিলে আমাদের চিরদারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না। যাঁহারা দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও গৌরবময় দেখিতে চান তাঁহাদিগকে একথা ভুলিলে চলিবে না।

অনেকে অর্থনৈতিক ভিন্ন অন্য কারণে যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। সে-সব বিষয়ের আলোচনার এখানে স্থান নাই। কেবল-মাত্র এইটুকু বলিয়া রাখিতে চাই যে, সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান অসম্ভব বলিয়া মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হাউস অব্ লেবারার্স লিঃ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

হাউস অব্ লেবারার্স লিঃ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে হাউস অব লেবারার্স শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক কালিকচ্ছ নিবাসী ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

হাউস অব লেবারার্স যে শ্রমশিল্পের আদর্শ লইয়া বর্ত্তমানে আপন কর্ম্মপথে চলিয়াছে,—প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ নন্দীই আমাদিগের জনকয়েককে সেই শ্রমশিল্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। বিদেশে বা কোন স্কুল কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার্জ্জনের আমাদের কোনরূপ সুবিধা হয় নাই। তিনিই তাঁহার ক্ষুদ্র কারখানার ভিতরে আমাদের হাতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার হাতেখড়ি দিয়াছেন। তাঁহার জীবনব্যাপী শিল্প-সাধনার উদ্দীপনাময় কাহিনী নিজে শুনাইয়া কর্ম্মে উৎসাহিত করিয়াছেন।

স্কুল কলেজে কেরাণীগিরির শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। কেরাণীগিরি ছাড়া কর্ম্মজীবনে শিক্ষার আর যে কোন সার্থকতা আছে তেমন ধারণাও আমাদের ছিল না। তিনিই আমাদিগকে হাতে হাতুড়ি দিয়া শিল্প-জগতের রুদ্ধ দুয়ারের বদ্ধ অর্গল ভাঙ্গিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। আজ তাঁহার সে উৎসাহ-বাণী সার্থক হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা ও উৎসাহ পাইয়াই আমরা হাউসের গোড়া পত্তন করি। শ্রম-শিল্পে শিক্ষিত যুবকের যে কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহা আজ হাউস প্রমাণ করিয়া আপন পথে চলিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতেই আমরা শ্রম-শিল্পের আদর্শ ও কর্ম্মে দুর্জ্জয় সাহস পাইয়াছি। তাই হাউস অব লেবারার্স তাঁহার নিকট চিরঋণী। তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদেই হাউস দিন দিন আপন পথে চলিয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

কৃষি-ক্ষেত্র

বাংলা দেশে কিংবা ভারতবর্ষে এমন কোন কৃষিক্ষেত্র আছে কি যেখানে বিনা বেতনে শিক্ষা করা যায়? যদি থাকে তাহা কোথায় বা তার ঠিকানা কি?

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দুষ্প্রাপ্য বই

নিম্নলিখিত বইগুলি কি বর্ত্তমানে কোথাও পাওয়া যাইবে? উহাদের কি বাঙলা বা ইংরাজী তর্জ্জমা আছে? থাকিলে কোথায় পাওয়া যাইবে?

(১) রাজা রামমোহন রায় প্রণীত ফারসী বহি "পৌত্তলিকতার প্রতি চপেটাঘাত"।

(২) কুমার দারা শেকো প্রণীত ফারসী বহিগুলি।

(৩) Von Nour প্রণীত আকবর

মুহম্মদ মন্‌সুর-উদ্দীন

শ্রীশ্রী শঙ্করদেবের জীবনী

আসামের মহাপুরুষ শ্রীশ্রী শঙ্করদেবের কোন বাংলা বা ইংরাজী জীবনচরিত আছে কি না? থাকিলে কাহার রচিত, কোথায় প্রাপ্তব্য, ও মূল্য কি, জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী অজিতনাথ চক্রবর্ত্তী

দর্শন শাস্ত্র

ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে অনেকানেক পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার প্রণালীবদ্ধ বঙ্গানুবাদের পুস্তক পাওয়া যায় কি না? যদি যায়, তবে কাহার রচিত, কোথায় প্রাপ্তব্য ও মূল্য কি জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী অজিতনাথ চক্রবর্ত্তী

বাউল গান

বাউল গানের জন্ম কোন্ সময় হইয়াছে? ইহার সম্বন্ধে বহি আছে কি? কোথায় কোথায় বাঙলার বিখ্যাত বাউল কেন্দ্র আছে?

মুহম্মদ মন্‌সুর-উদ্দীন

পারলৌকিক রহস্য

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে পারলৌকিক রহস্য সম্বন্ধে যে-গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে তদ্বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তকাদির নাম, প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী বিশ্বেশ্বর সেন

"ভলটুঙ্গী" ও "কামটুঙ্গী"

মৈমনসিংহ গীতিকায় 'ভলটুঙ্গী' ও 'কামটুঙ্গী' ঘরের কথা পাওয়া যায়। উহা কি প্রকার ঘর? এখনও কোথায় এই ধরণের ঘর আছে কি?

মুহম্মদ মন্‌সুর-উদ্দীন

—

মীমাংসা

জাগ গান

জাগ শব্দটি খুব সম্ভব জাগরণ শব্দ হ'তে উৎপত্তিলাভ করেছে। রাত্রি জাগরণ ক'রে এই গান গাওয়া হ'য়ে থাকে।

পাবনা জিলায় প্রচলিত জাগগান নানাধরণের; কৃষ্ণের জাগ, (ভারতী Optic) নিমাই এর জাগ (বদগুনী), সোনাপীরের জাগ জাগগানের বিভিন্ন বিষয়। তবে গান গাওয়ার পদ্ধতি একই রকমের। মূল গায়েন প্রথমে গেয়ে যায় পরে ছেলেরা কোরাসে গান করে।

সোনাপীরের প্রকাশ জাগগান সংগ্রহ করেছি, তাতে মনে হয় সোনাপীর ও সত্যপীর একই ব্যক্তি। সোনাপীরের বাড়ী চাট মহরে (পাবনা) ছিল, "চাট মহর সহর নিয়া সোনাপীরের বাড়ী"।

রাজশাহী জিলায়ও জাগগান প্রচলিত আছে, নাটোরের অন্তর্গত চগনবিলের তীরস্থ গ্রাম সিংড়ায় জাগগান প্রচলিত আছে।

মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন

তান-সেন

1. Vernacular Literature of Hindusthan—Grierson Pp. 29-30
2. Ain-i-Akbari (Blockman's translation) Pp 406, 612.
3. বৈষ্ণবদিগদর্শনী—শ্রী মুরারীলাল অধিকারী (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)
4. হিন্দুসঙ্গীতে মুসলমানের দান—শ্রী প্রমথ চৌধুরী (বিচিত্রা, বৈশাখ, ১৩৩৫)

মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন

সোহানী মোহম্মদরিয়াজউদ্দীন চৌধুরী

তানসেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের কৌলিক উপাধি 'মিশ্র' ছিল, সেজন্য দেশে তিনি তান মিশ্র নামেও পরিচিত ছিলেন; তবে সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি তানসেন নামেই প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতা তানসেনকে তন্নুয়া নামে ডাকিতেন। বালক তন্নুয়াকে তাঁহার পিতা যত্নপূর্ব্বক গান শিখাইতেন; কিন্তু বালকের ইহাতে মনোযোগ নাই দেখিয়া একদিন তিরস্কার করেন, ইহাতে রাগ করিয়া তানসেন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যান। এই অবস্থায় একদিন রোদের তাপে ক্লান্ত হইয়া পথিপার্শ্বস্থিত অদূরবর্ত্তী জঙ্গলে একবৃক্ষে আরোহণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর স্বর অনুকরণ করিতে থাকেন। দৈবক্রমে জনৈক সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ সেই পথ দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। তিনি দিবাভাগে রাস্তার অদূরে এই প্রকার শব্দ শুনিয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গিয়া দেখেন যে, একটি বালক বৃক্ষের ডালে বসিয়া ঐ প্রকার শব্দ করিতেছে। বালকের এই প্রকার অদ্ভুত স্বরানুকরণ-শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে নিজালয়ে নিয়া যত্ন-পূর্ব্বক সঙ্গীত শিক্ষা দেন, ফলে তানসেন সঙ্গীতে অসাধারণ পার-দর্শিতা লাভ করেন।

একদা সম্রাট আকবর সদলবলে মৃগয়ার্থ বাহির হইয়া পড়িলে অনেক অনুসন্ধানে শিকার খুঁজিয়া না পাওয়াতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সামনের দিক্ হইতে একটা স্বর-লহরী শুনিতে পান ও সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া গিয়া দেখিতে পান যে, একজন লোক বনমধ্যে বসিয়া একমনে গান করিতেছে ও তাহার চতুর্দ্দিকে বাঘ, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদি নানা জন্তু পরস্পরের দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া যেন সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে। বাদসাহ ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। যথাসময়ে গান বন্ধ হইলে পর উক্ত বন্য জন্তুসমূহ প্রকৃতিস্থ হইয়া চতুর্দ্দিকে বেগে পলায়ন করে। গুণগ্রাহী বাদসাহ আকবর তানসেনের নিকট গিয়া বহু অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ-ধানীতে লইয়া যান এবং রাজগায়ক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পদোচিত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে "তানসেন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বাদসাহের নিকট তানসেনের প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া কতিপয় সভাসদ ও অন্যান্য গায়কবর্গ অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে জব্দ অথবা বিনষ্ট করিতে ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন ও একদিন তানসেনের অনুপস্থিতির সময় তাঁহারা বাদসাহকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তানসেনকে রাজসভায় দীপক রাগ গাইতে আদেশ দেন এবং বাদসাহকে তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তৎকালে এক তানসেন ব্যতীত উক্ত রাগ ঠিকমত গাহিতে কেহ সক্ষম নহেন। সম্রাট ইহার পর সরল বিশ্বাসে একদিন তানসেনকে দীপক রাগ গাইতে অনুরোধ করায় তানসেন উত্তরে বলেন যে, খাঁটি দীপক রাগ গাহিলে তাঁহার শরীর দগ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু একে সম্রাটের কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়াছে, তদুপরি রাজসভাসদ ও অন্যান্য গায়কবর্গের ঈর্ষামূলক প্ররোচনাতে রাজাদেশে অবশেষে তানসেন দীপক রাগ গাইতে সম্মত হন ও তানসেনের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার স্ত্রীকে (কাহারও মতে কন্যাকে) দীপকের দাহিকা-শক্তি দূর করার জন্য মেঘমল্লার গান করানোর ব্যবস্থা করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে তানসেন রাজসভায় নিখুঁত ভাবে দীপক রাগ গাহিতে আরম্ভ করায় তাঁহার শরীর হইতে অগ্নি নির্গত হইতে থাকে ও পূর্ব্ব ব্যবস্থামত তাঁহার স্ত্রী মেঘ-মল্লার গাহিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু স্বামীর তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে ত্রাসপ্রযুক্ত তাঁহার কণ্ঠ হইতে প্রকৃত মেঘমল্লার রাগিণী নির্গত না-হওয়ার জন্য তানসেনের দহন জ্বালা সম্পূর্ণ দূর না হওয়াতে ত্রাসে তিনি অসুস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত বিকৃত মেঘমল্লারই পরে সিয়ামল্লার নামে অভিহিত হয়।

এই প্রসঙ্গে অপর এক বিবরণ এই যে,উপরের লিখিত ঘটনার পরও দহন-জনিত অসুস্থতা বাড়িতেছে দেখিয়া বিশেষত রাজসভাসদগণের চক্রান্ত-জনিত তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া, রাজধানীতে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া মনঃকষ্টে তানসেন গোপনে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিকট একস্থানের জনৈক বিখ্যাত গায়িকার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের দুর্দ্দশার বিবরণ জানান। সেই গায়িকা দয়াপরবশ হইয়া ও তানসেনের কষ্ট দূর করার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া স্বীয় আবাসে একটা চৌবাচ্ছা গাঁথাইয়া তাহাতে তানসেনকে বসিতে বলেন ও বিশুদ্ধ মেঘমল্লার গাইতে আরম্ভ করেন, কিছুক্ষণ পরেই ঝর ঝর বৃষ্টি পড়িয়া চৌবাচ্ছা পূর্ণ হইয়া যায় ও সেই জলে স্নান করিয়া তানসেন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন। ইহার পর তানসেন আর দিল্লীতে না গিয়া তিব্বত অঞ্চলে চলিয়া যান এবং তথা-কার বৌদ্ধলামাগণ দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া মঠে অবস্থিতি করিতে থাকেন এবং পরে সেখানেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তানসেন যে তিব্বতে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এখনও তিব্বতে বহুলামা-অধ্যুষিত তানসেন (Tansan) মঠ বিদ্যমান আছে এবং ইহা যেন তানসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অথবা তদীয় নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

শ্রী রজনীকান্ত চৌধুরী

ধনুর্ব্বিদ্যা

(১৫)

ধনুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কোন বাংলা বই আছে কিনা, সে-সম্বন্ধে আমার জানা নাই—তবে যে ধনুর্ব্বিদ্ সম্বন্ধে আমি লিখিতেছি আমার মনে হয় তিনি বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ। এঁর নাম শ্রীমণীন্দ্রমোহন ঘটক,—প্রোফেসর ঘটক নামে এ দেশে পরিচিত। ১৫ বৎসর বয়সেই ইনি ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকেন; পরে এই ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন ও দেশবিদেশে এই ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। 'শব্দভেদ' 'লক্ষ্যভেদ' 'অদৃশ্যভেদ' 'চক্রব্যূহভেদ' 'পরশুরামের পরশুর ক্ষিপ্রতা' ইত্যাদি ক্রীড়ায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এঁর সমস্ত খেলার ভিতর 'ভীষ্মের শরশয্যা' একটি বিশেষত্ব। মাত্র পাঁচটি তীক্ষ্ণধার লৌহ-শলাকার উপর সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে অবস্থান। বর্ত্তমানে এঁর বয়স মাত্র ২৮ ও ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। ঠিকানা—বেলাকোবা পোঃ, জলপাইগুড়ি।

(১৬)

তমসুক

তমসুক শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে আরবী 'মসক্' শব্দ হইতে। আরবী ভাষায় তমসুক (তামাসুক্) শব্দের অর্থ পরস্পর গ্রহণ করা বা আদান প্রদান করা। তাই টাকা ধার দিয়া যে অঙ্গীকার-পত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাকে তমসুক বলা হয়।

আইন সংক্রান্ত যে সমুদয় শব্দাবলী বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই আরবী বা পারসী ভাষা হইতে সংগৃহীত। মুসলমানদের শাসন-কালে এই সমুদয় শব্দ রাজকীয় নানা বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন উহার কোন কোনটির বা ইংরেজী নামকরণ হইয়াছে, আর কোন-কোনটির এখনও আরবী অথবা পারসী নামেই প্রচলিত আছে। যথা—মুন্সেফ, পেশ্‌কার, নকল-নবীশ, আদালত, ফৌজদারী, মামলা' মোকদ্দমা, কওয়ালা, দলীল, ইস্তাহার, গেরেপ্তার, জামীন, মুলতবী, জাবেদা (জাবেতা), সেরেস্তা, উকীল, ওকালতনামা, সনাক্ত, তৌজী, আরজী, দরখাস্ত ইত্যাদি আরও অনেকানেক শব্দ এখনও ভারতীয় বিচার-বিভাগে প্রচলিত আছে, যাহা আরবী বা পারসী ভাষা হইতে সংগৃহীত। স্থানাভাবে সমুদয়ের নাম উল্লেখ করা গেল না।

আব্দুর রশীদ

আরবী—তমস্ সুক=ঋণ স্বীকার পত্র। আরবী তমস্ সুক শব্দ হইতে বাংলায় 'তমসুক' শব্দ আসিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র দাস

(১৭)

চলতিভাষা

'আদিখ্যেতা' শব্দ আধিক্যতা শব্দের অপভ্রংশে হইয়াছে।

ধবধবে স—√ধাব হইতে হওয়া সম্ভব। তুলনীয়—ধোবা, ধবল ইত্যাদি।

টুকটুকে—মেদিনীকোষে (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা) টুক্‌টুক—রক্তবর্ণ

সংস্কৃত √তর্ক=দীপ্তি আর √তক্ হসনে তক>টক>টুক ?

কুচকুচে—স° √কুচ—চিক্কণতায়। এই √কুচ হইতে "কুচকুচে" হওয়া সম্ভব।

সুরেশচন্দ্র দাস

দর-কষাকষি

দর-কষাকষি আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে ছিল, তার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে বেশ পাওয়া যায়। দর-কষাকষি অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। নিজের জিনিষের দাম বেশী লওয়া এবং কিনিবার সময় কিছু কম দেওয়া লোকের স্বভাবসিদ্ধ।

সুরেশচন্দ্র দাস

আমাদের দেশে এই দর-কষাকষি রীতি কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইতিহাসে দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমান রাজত্বকালে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজি তাঁহার রাজ্যে সমুদয় দ্রব্যের একটা দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কোন জিনিষ কেহ ইচ্ছা করিয়া কম বা বেশী দামে বিক্রয় করিতে পারিত না, ইহাতে প্রজাদের খুব সুবিধা হইয়াছিল। অতএব ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্বের পূর্ব্বেও এদেশে দর-কষাকষির রীতি প্রচলিত ছিল। নতুবা সম্রাটের দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার কোন কারণ ছিল না।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(২০)

সংস্কৃত ভাষার মন্ত্র

ভারতবর্ষের যে যে স্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রচলন আছে সে-সকল স্থানেই দেবদেবীর পূজার মন্ত্র সংস্কৃতে পঠিত ও উচ্চারিত হয়। তবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ বিবাহ ও প্রার্থনা ইত্যাদির সময় ব্যবহার করেন।

সুরেশচন্দ্র দাস



প্রথম দৃশ্য

* * * *

আবেগ জিনিসটা বড় গোলমেলে। সকল কাজের সিদ্ধির মূলেও আবেগ, আবার সকল কাজে ব্যাঘাত দিতেও ঐ আবেগই রহিয়াছে। কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাঠক বা শ্রোতা মহলে খ্যাতি লাভের একমাত্র উপায় তাহার মূলগত আবেগটাকে টানিয়া প্রকাশ্যে বাহির করিয়া দেখান, আবার কোন বিষয় গোপন করিবার অথবা অপরকে ভুল বুঝাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সেই আবেগটাকেই মুখোস পরাইয়া লুকাইয়া বা বাঁকা করিয়া দেখাইয়া সে উদ্দেশ্য সফল করাই পন্থা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সমস্ত সৃষ্টিটার মূলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাণের বা সৃষ্টির আবেগ নিহিত রহিয়াছে, আবার সৃষ্টি নষ্ট করারও মূলে রহিয়াছে সংহারের তাড়না। যে আবেগ প্রেমে সফলতা আনয়ন করে তাহাই ব্যবসাতে মানুষকে দেউলিয়া করে, যে প্রেরণায় মানুষ শ্রেষ্ঠ "গেরস্ত" রূপে সমাজে পরিচিত হয় সেই প্রেরণাতেই সে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া চির অখ্যাতি-ভাজন হয়। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানালোচনা করিয়া সঙ্ঘমনের আবেগ আলোড়ন করিয়া আমরা স্বরাজ্য-পার্টির উত্থান বা মডারেটের পতনের যথার্থ ব্যাখ্যান করিতে পারি, আবার কোন বিষয় ধামাচাপা দিতে হইলেও সেই সঙ্ঘ মনের আবেগটাকে মোচড় দিয়া তেরছা করিয়া দেখাইয়া সে কার্য্য সাধন করিতে পারি। বস্তুত এই আবেগের ব্যাপারটা একাধারে সকল রহস্যের উদ্ঘাটক সকল রহস্যের কারণ, সকল অকৃতকার্য্যতা বা সফলতার মূল, সর্ব্ব বিষয়ে সত্য ও মিথ্যা। এ হেন নির্গুণ আবেগের আরাধনা করিয়া গল্পের সূচনা করি।

* * * *

সকালবেলা। চা খাইতে বসিয়া সবে বিস্কুটে এক কামড় ও পেয়ালায় দ্বিতীয় চুমুক মাত্র দিয়াছি এমন সময় বাহিরে ঘন ঘন তোপধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তৎপরে বন্দুকের দুমদাম শব্দ, হনন-মত্ত সেনানীর হিংস্র সিংহনাদ ও হতাহতের মরণ-কাতর-আর্ত্তনাদ। ভয়ে চায়ের ঢোক পাকস্থলীর পথ পরিত্যাগ করিয়া ফুসফুসের দরজায় আসিয়া হানা দিল। কাশিতে কাশিতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে শয্যা হইতে লেপখানা তুলিয়া লইলাম, শরীরে জড়াইলাম, দ্রুত গড়াইয়া পালঙ্কের নিম্নে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আধো অন্ধকার আধো আলো। ভাবিলাম 'তাইতো সন্ধ্যা হইল না কি? কোনপ্রকারে মূর্চ্ছাকাতর লেপজড়িত আড়ষ্ট দেহটিকে নাড়া দিয়া ঈষৎ সজাগ করিয়া পালঙ্কের অধোদেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম ঘরের সকল আসবাবপত্র মায় চা ও বিস্কুট, যথাস্থানে মোতায়েন রহিয়াছে। বাহিরে রাস্তায় গোলমাল নাই বলিলেই চলে। ঝাঁটা ও বুরুষ চালনা এবং দু-একখানা ময়লা গাড়ীর ঘড়-ঘড়ানি ব্যতীত চরাচর শব্দহীন। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া ভারতীয় কায়দায় কারুকার্য্য করা রি-ইন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটে ঢালা অলিন্দে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দেখিলাম সন্ধ্যা নহে, ঊষা। পূর্ব্বে লালের আভা, বারান্দার রেলিং-এ প্রভাতী শিশিরের আর্দ্র সম্ভাষণ। কিন্তু একি! পূর্ব্বগগনের সে লালকে যেন মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া অদূরের সরকারী



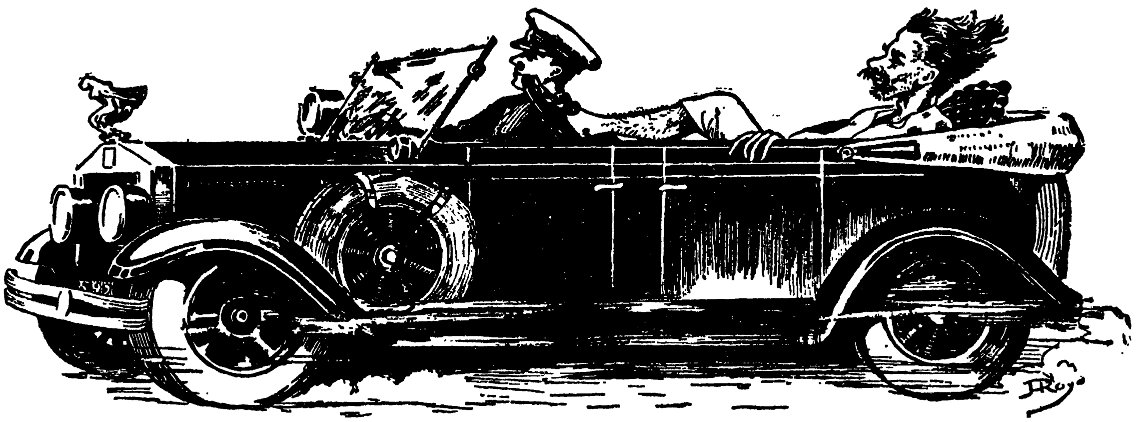
খাজাঞ্চিখানার শীর্ষ হইতে একটা উৎকট রক্তবর্ণ পতাকা পত পত নিনাদে ভোরের হাওয়ার সহিত কলহ করিতেছে। আশ্চর্য্য হইলাম! কাল ঐ অট্টালিকাশীর্ষে মহাত্মা গান্ধি-প্রণোদিত চরখাবহ ত্রিবর্ণ পতাকা জগতবাসীকে ভারতের অহিংসা--ডিগনিটি—অফ--লেবর-রাক্ষুসে-কারখানাবাদ-বর্জ্জন প্রভৃতি কত কথা মৃদু ভাষে জানাইতেছিল—আজ আবার এ কি উৎপাত! এতো জাতীয় নব-জাগরণের নূতন আশার সূর্য্যের আলো বিকিরণ করিতেছে না, এ যেন পশ্চিমের অস্তগামী তপনের বার্দ্ধক্য-জটিল লালসার দেহে অস্ত্র-সাহায্যে "মর্ঙ্কি গ্ল্যাণ্ড্" -বসান নকল যৌবনের লালিমা।

প্রাণে আতঙ্ক অথচ আত্মা-পুরুষ কুতূহল-জর্জ্জরিত। যায় প্রাণ যাক্ বলিয়া বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিতে চলিলাম ব্যাপারটা কি ও কতদূর গড়াইয়াছে। মার্ব্বেল বাঁধান সিড়ি বাহিয়া, অজন্তার অনুকরণে চিত্রিত করিডর অতিক্রম করিয়া, তিব্বতী মঠের নকলে উৎকীর্ণ কাষ্ঠে গড়া দরজা খুলিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথমেই কানে আসিয়া পশিল—বুরুষের খস্ খস্ আওয়াজ ও তৎসঙ্গে মিহি গলায় স-দরদে রবীন্দ্রনাথের—

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি—

ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ! ধাঙ্গড়ের সঙ্গে বুরুষের তালে তালে এ গান কে গায়? এ আবার ফ্রয়েডীয় যাদুঘরের কোন্ কম্প্লেক্স? পুষ্পতেও পুরীষে মিলন; মানব-প্রাণের কোন জটপড়া আবেগের ফলে এ অঘটন-ঘটন সম্ভব হইল?

গানটা ক্রমে নিকট হইতে আরও নিকটে আসিতে লাগিল; বুরুষের শব্দও নিখুঁত কাওয়ালিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি আশা করিতে লাগিলাম যে আজ বোধ হয় ধাঙড় মহাশয় নিজে কাজে বাহির না হইয়া নিজ



পরিবারের অপর কাহাকেও প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন তাই প্রাতে বুরুষ প্রান্তে এ তরুণ সমাবেশ।

কিন্তু যখন বুরুষ-চালককে দেখিলাম তখন নিমেষেই আমার সে কষ্টকল্পিত রোম্যান্স অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখিলাম বুরুষ-চালক ও গায়ক একই লোক। চুড়িদার-পাঞ্জাবী-পরিহিত সুবিন্যস্ত-কেশ এক যুবা বুরুষ ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়াছে—ড্রেণের গন্ধকে তাহার প্রাণের কল্পনা-কুসুমের প্রভাতী আহ্বান অগ্রাহ্য করিতেছে। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম।

যুবক কিছু ময়লা সংগ্রহ করিয়া টিনের আধারে সযত্নে তুলিয়া অদুরস্থিত হুইল-ব্যারোতে রাখিল। গাহিল,

হ'ল মোদের পাওয়া,
তাই ধরেছি গান গাওয়া—

আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, ও মশায়, বলি শুনছেন? সকাল বেলা সুর ভাঁজবার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক কি আর ভাল কিছু পেলেন না! তাই সখের ধাঙড় সেজে নর্দ্দমাতে "প্রথম ফুলের প্রসাদ" খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

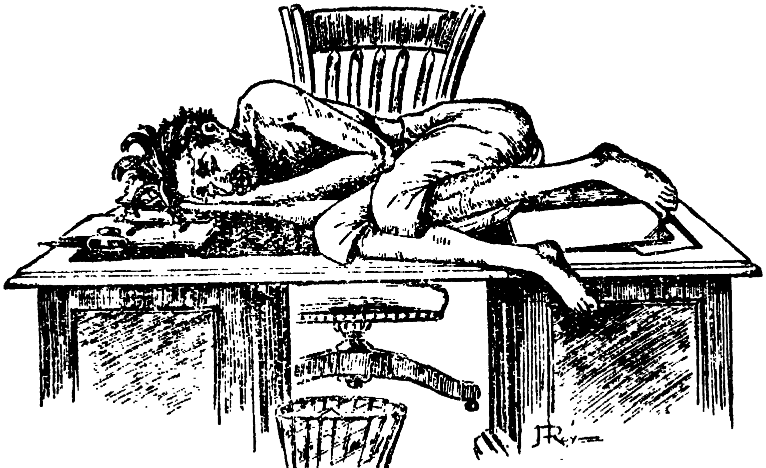
যুবক একটা অবাধগতিশীল ভঙ্গিতে ঘাড়খানা অল্প ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, কমরেড, কর্ম্ম ক্লান্তির আবেশের মধ্যে যে পুষ্পের সৌরভ লুকান আছে, তার কাছে মধ্যযুগের বেগম মহলের গুলবাগের খোসবয় কিছুই না।

আমি বলিলাম, মহাশয়, ভালবেসে যা করেন তাতেই আনন্দ, আর আনন্দ থাকলেই সৌরভ; এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু আমায় যে প্রিয় সম্ভাষণটা করলেন ওটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না।

যুবক মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, সখে, বললাম কমরেড অর্থাৎ কি না বন্ধু। দুনিয়ার যেথানে যেখানে যে কোনে মানুষের ছেলে খেটে খাচ্ছে, শক্ত হাতে কপাল থেকে ঘাটুনির ঘাম মুছে ফেলছে, সেখানের হাওয়াতে একটা নতুন ফুল আপনা হ'তে ফুটে উঠছে—বন্ধুত্বের ফুল—সহকর্ম্মের সৌরভ তার প্রাণে, সাহচর্য্যের রংএ সে ফুল রঙিন—সহস্র দলের মতই তার পাপড়ি আকারে বিভিন্ন কিন্তু পরিপূর্ণ শক্তি, প্রাণ, সৌন্দর্য্য ও সমগ্রের সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে মূল্যে এক অর্থাৎ বহু বিভিন্ন মানবের বহু ক্ষেত্রের শ্রমের মধ্যে এই পুষ্পের বিকাশ এবং আকার ও কর্ম্মের বিভিন্নতার মধ্যেও সকল শ্রমিকের সম্মান ও প্রয়োজনীয়তা সমান।

কি যেন একটা আবেগ আমার প্রাণে প্রগল্ভ হইয়া উঠিতে লাগিল। রুসো, টলষ্টয়, মার্কস্, ক্রপট্‌কিন, লেনিন প্রভৃতি মহা মহা পুরুষের বাণী যেন মূর্ত্ত হইয়া আমার চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। কর্ম্মের মধ্যে সাম্যের অমরত্ব যেন ফুটিয়া উঠিয়া আমায় পূজায় ডাকিতে লাগিল। যে ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ যুগ যুগ ধরিয়া আমার শত পূর্ব্ব পুরুষকে কর্ম্ম-ক্ষয়ের মধ্যে নির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণের মধ্যে সর্ব্বজীবের মুক্তি ও মুক্তির মধ্যে মিলন দেখাইয়া আসিয়াছে, সে বুদ্ধ যেন আজ চঞ্চল হইয়া কোদাল, কাস্তে, হাতুড়ি হস্তে নিজ ভ্রম সংশোধনে মাতিয়া উঠিল। যেন আফিমের সম্মোহন বাণ ব্যর্থ করিয়া মদিরার উদ্দাম নেশায় নূতন করিয়া প্রাণ মৃত্যুর পথ খুঁজিতে লাগিল। বুকের রক্ত হিমের

আড়ষ্টতা ভাঙ্গিয়া বন্যায় জাগিয়া উঠিল। উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া বলিলাম, ঠিক বলেছ বন্ধু, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমায় বল', আজ হঠাৎ ভারতের জড় অস্তিত্বের তুষারার্দ্র অঙ্গনে এ আগুণ কি ক'রে জ্বালাতে সক্ষম হ'লে।



যুবক বলিল, শোননি! কাল প্রাতে যে দেশে বিপ্লব হ'য়ে গেছে। সমগ্র ভারত আজ কর্ম্মীর শ্রমের মূল্য বাবদ তাহার সম্পত্তি ব'লে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। সর্ব্বত্র আমাদের জয় হ'য়ে গেছে। আমরা যারা যুগ যুগ ধ'রে অনুপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের সম্ভোগ-ব্যাধিতে ধুঁকে ধুঁকে মরছিলাম, আমাদের সকলের উপর কাল প্রাতে সামাজিক ভাবে অস্ত্র-প্রয়োগ হ'য়ে গেছে—কেউ কেউ আমরা নীরোগ হ'য়ে কাজে লেগে গেছি—আর কেউ কেউ "বাট দি পেশেণ্ট সাকাম্বড্" বলিয়া নিজ নিজ অকর্ম্মণ্যতা বহন ক'রে পরপারে 'গমন করেছে। তুমি বন্ধু, কি ঘুমচ্ছিলে, যে এত বড় কথাটা জান না?

আমি সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, না ঘুমিয়ে থাকিনি, মূর্চ্ছিত হ'য়ে ছিলাম। যুবক বলিল, দিনে আট ঘণ্টা পূরা কাজ করতে হবে। দশ মিনিট বেরিয়ে গেল। কমরেড, আজ তবে……। নির্ব্বাক হইয়া একটা ভঁইসা গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার চালক একজন সাহিত্যিক-জাতীয় যুবক। মনে হইল, ভাবের বাজারে ভিড়ের মধ্যে কলম চালান আর শকট-সঙ্কুল রাজবর্ত্মে এক জোড়া উদ্দাম মহিষ চালনা দুইয়ে কি সাদৃশ্য অথচ কি পার্থক্য! সেই একই আবেগ, শুধু অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য।

ভইসা গাড়ীর গাড়োয়ান যেন আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিল, হ্যাঁ বন্ধু, এ লাঙ্গুল মর্দ্দনের যে গৌরব তার পাশে মাইকেলের মেঘনাদ-বধ লেখা, রবীন্দ্রনাথের বলাকা রচনা মধুমক্ষিকার দুর্দ্দমনীয় আবেগের কাছে প্রজাপতির ফর-ফরায়নের সামিল। দেখো যেন 'ষ্ট্যাগনেট' করো না। চরিত্রে সর প'ড়ে যাবে। খালি নাড়া দাও। কর্ম্মের ঘোল-মোড়ায় ফেলে জীবন-দুগ্ধকে মন্থন কর; তবেই না মুক্তির নবনীত তোমার নিজের হ'য়ে দেখা দেবে।'

মুগ্ধ হইলাম। চালায় মহিষ অথচ কি উপমা-কুশলতা! কর্ম্ম চাই। কর্ম্মের জন্যই হিমাচল অপেক্ষা তাহার ক্রোড়চর ছাগশিশু অধিক গৌরবময়, উদর অপেক্ষা হস্ত, কপাল অপেক্ষা নয়ন, খাটিয়া অপেক্ষা ছারপোকা এবং পথ অপেক্ষা পথের কুক্কুর অধিক জীবন্ত। এই কারণেই, স্বাস্থ্য অপেক্ষা ব্যাধি, পুণ্য অপেক্ষা পাপ এবং আত্মা অপেক্ষা অবয়ব অধিক চিন্তাপ্রসূ। সমগ্র সৌরজগৎ, সমস্ত সৃষ্টি চাক্ষুস ভাবে মানবসন্তানকে দেখাইয়া দিতেছে, ঘোর', ঘোর', পাক খাও, চল, দৌড়াও, স্থান ও কালের বক্ষে ক্রমাগত নিজের চঞ্চল পদচিহ্ন এখানে ওখানে সেখানে আঁকিয়া দাও, জয় কর, সব আপনার ক'রে নাও—মাথা ঘুরিতে লাগিল।

এই জগৎ এই সৃষ্টি ইহার মধ্যে কর্ম্মের এই প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনশীলতার আবেগ এই প্রভাব অথচ এতদিন শুধু ব্রিজ খেলিয়া কাটাইতেছিলাম! লজ্জায় ঘৃণায় ঘাড় হেঁট করিয়া গৃহের দিকে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ম্মের জগতে প্রায়শ্চিত্ত আন্তরিক হয়' না—বাহ্যিক প্রবলতার সহিতই তাহা পাপীর মস্তকে আসিয়া পড়ে।

বিপ্লবায়িত নগরীর পথ ছাড়িয়া গৃহে চলিলাম। আবেগে টেলিফোনের তারোপবিষ্ট বায়সকুলকেও লাল মনে হইতে লাগিল। কবে এক দিন হোলির আবেগে, ধমার-ছন্দে ব্রজবাসী চরাচর বিশ্বকে লাল দেখিয়াছিল—আজ আবার রুষ-রসে মাতিয়া আমরা জগতকে লাল দেখিলাম।

গৃহে প্রবেশ করিতেই একটা রূঢ় ধাক্কা খাইলাম। দরজায় দেখিলাম একজন হ্যাটকোটধারী ইংরেজতনয় উবু হইয়া বসিয়া তোলা উনুনে রুটি সেঁকিতেছে। আমায় প্রবেশেচ্ছুক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি চাই। বলিলাম, আমি গৃহের মালিক, নিজের গৃহে প্রবেশ করিতে চাই। সে বলিল, মালিক আবার কি পদার্থ? আমি কিঞ্চিৎ চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে কে যে. আমার দরজায় বসিয়া রুটি সেকিতেছে! সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দরজার পথে আর এক বিপত্তির আবির্ভাব হইল। খোঁচা খোঁচা আচাঁছা-দাড়ি এক ব্যক্তি ঢেকুর তুলিতে তুলিতে আসিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল। আমি এবার সত্যই চটিয়া গিয়া বলিলাম, তুমি কে হে বাপু? আমার বাড়ী চড়াও হ'য়ে কি করছ?

সে ব্যক্তি যেন হতভম্ব হইয়া গেল। বলিল, বাড়ী? বাড়ী আবার কাহারও হয় না কি?

আমি বলিলাম, তামাসা রাখ। কার হুকুমে আমার বাড়ীতে তোমরা ঢুকে ব'সে যা-ইচ্ছে-তাই করছ?'

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল। ইংরেজ পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, লোকটা কি পাগল?

ইংরেজ-তনয় অতঃপর আমায় সমঝাইয়া বলিল যে, দেশের আইন অনুসারে বাড়ীঘর আর কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নহে। সকল কর্ম্মীদের ব্যবহারের জন্য সকল বাড়ী বর্ত্তমান আছে। যে যত অধিক শ্রমের কার্য্য করে তাহাকে তত উত্তম বাসস্থান রাষ্ট্র হইতে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। খোঁচা দাড়ি-বিশিষ্ট ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী মিলে মোট-বহনের কার্য্য করে এবং ইংরেজটি নিজে সেই মিলেরই ইঞ্জিনীয়ার। শ্রমাল্পতা হেতু ইংরেজকে বাড়ীর প্রবেশ-পথটি বাসের জন্য দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রম-বাহুল্যের জন্য মোটবহনকারীকে বাড়ীর অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।

আমি বলিলাম, আর আমি?

এবার উভয়ে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কর? আমি বলিলাম, কিছু না, শুধু লেখাপড়া বক্তৃতা ইত্যাদি।

খোঁচা দাড়ি লোকটা উৎসাহিত হইয়া বলিল, তা বেশত, ভাবছ কেন! আমাদের এখানে ঝাড়-পোঁছের কাজে লেগে যাও আর কি? খাওয়া-দাওয়ার অভাব হবে না। শুতেও পাবে। আমি আপ্যায়িত হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিব এমন সময় ইংরেজ ব্যক্তি আমায় বলিল যে, আমার পক্ষে মানে মানে কোন শ্রমের-কার্য্যে লাগিয়া যাওয়াই মঙ্গল কারণ, তাহা না করিলে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় আমার জন্য যে কার্য্যের ব্যবস্থা হইবে তাহাতে আমার অনভ্যস্ত শরীরের শ্রমলাঘব হইবে না। সুতরাং আমি কাজে লাগিয়া গেলাম।

*　　*　　*　　*

সকাল বেলা খোঁচা দাড়ির খাবার ব্যবস্থা করি, তারপর সে মিলের-প্রাচীনযুগের-ম্যানেজারের ও বর্ত্তমানে-রাষ্ট্রের সম্পত্তি মোটরটাতে চড়িয়া বেড়াইতে যায়। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব গাড়ী চালায়। আমি সেই সুযোগে আমার সখের লাইব্রেরীতে গিয়া ঢুকি, যেখানে কেতাবের উপর কেতাব সাজাইয়া তাহার উপর বসিয়া লোকটা মেটে কলিকায় কড়া তামাক খাইয়াছে, সেখানটা পরিষ্কার করি। বই গুলিকে যত্নে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া তুলিয়া রাখি যেন আমি প্রাচীন গ্রীসের কোন ক্রীতদাস, গোপনে আপনার উৎপীড়িত সন্তানদিগকে মনিবের চোখ এড়াইয়া আদর করিতেছি। হায় সাম্য, আজ তোমার ধাক্কায় কালিদাসের কাব্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার 'কামরেড' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাগ্যে কালিদাস মরিয়াছেন, না হলে বুঝিবা তাঁহাকে দিয়া নবযুগের কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য 'কম্পোজ' করান হইত। অজন্তার গুহা-চিত্র অঙ্কন আজ ঘর-লেপার সামিল। হে সাম্য, তুমি অবশেষে মানুষকে কোথায় না লইয়া ফেলিবে!

বিকালে মিল হইতে ফিরিয়া আমার 'মনিব' আমারই লিখিবার টেবিলের উপর শুইয়া নাক ডাকায়, যতক্ষণ না নৈশ ভোজনের জন্য তাহাকে জাগান হয়। মানুষটা রোজ বড় বড় শিল্পীর চিত্র দেখে আর হিঃ হিঃ করিয়া হাসে। গ্রামোফোনে উৎকৃষ্ট গান বাজনা শুনিয়া কড়িকাঠ হইতে পাপোষ পরিমাণ হাই তোলে। ইংরেজটা বলে, পরে ইহার শিক্ষার সহিত রুচির উন্নতি হইবে। আমি বলি, হ্যাঁ তবে ও তখন আর মোট বহিবে না।

কষ্টে দিন কাটে। ভাবি আবার কবে যুগচক্র উন্নতির চরমে উঠিয়া নিম্নাভিমুখী হইবে।

সমাপ্তি

বন্ধু বলিলেন, বেশ লিখিয়াছ। প্রায় সত্যের মতই কষ্ট-উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে ও দ্বিতীয় দৃশ্যে কমিউনিষ্টিক বিপ্লবের প্রতি লেখকের মনোভাব বিভিন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কি?"

আমি বলিলাম, উভয় দৃশ্যেই একই আবেগের বিভিন্ন রূপ দেখাইয়াছি। প্রথম দৃশ্যে দেখাইয়াছি, পরকীয় কমিউনিজম্‌, দ্বিতীয়ে স্বকীয়। উন্নতিশীলতা ও রক্ষণশীলতা শুধু পরদ্রব্যে ও স্বীয়দ্রব্যে সুর বিভিন্নতা মাত্র। বন্ধু বলিলেন, সাবাস!

আনন্দ

শ্রী শান্তা দেবী

আনন্দ জন্মেছিল নিতান্তই সেকালের বাঙালী গৃহস্থ-ঘরে। আধুনিক বাংলার রাজধানী কলিকাতা সহরেই তার পাঁচ পুরুষের বাড়ী হ'লেও কলিকাতার অতি-আধুনিকতার স্রোতটা তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের গা-ঘেঁসেও কখন যায়নি। শোনা যায় এঁদের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ কামারশালে হাতুড়ি পেটার কাজ করতেন। তারপর এ বাড়ীর পুরুষরা আজ চার পুরুষ ধ'রে তাদের পৈত্রিক দোকানের গদিতে ব'সে ক্যাশবাক্স আর খেরো-বাঁধানো খাতা নিয়ে লোহার কারবার ক'রে আসছে। প্রপিতামহ যে তক্তপোষের উপর গদিতে ব'সে কাজ সুরু করেছিলেন প্রপৌত্ররাও সেই গদিতে ব'সে আজ কাজ চালাচ্ছেন; সাহস ক'রে কেউ চেয়ার টেবিল কিন্‌তে পারেননি, চামড়া-বাঁধানো খাতা কি ফাউণ্টেন পেনের সাহায্যে হিসাব লেখ্‌বার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারেননি। ট্যাক্‌-ঘড়িকে বর্জ্জন ক'রে হাতঘড়ি কেন্‌বার লোভ তাদের হয়নি, কারণ ইস্কুল কলেজের সেই শ্রেণী পর্য্যন্ত এ বাড়ীর কোনো ছেলে পড়েনি যে-সব শ্রেণী থেকে ফ্যাশান জিনিষটা শিক্ষার একটা অঙ্গ ব'লেই ছেলেদের ধারণা হয়। হাতের লেখা ও বানান একটু ভদ্র-গোছের হ'য়ে উঠ্‌লেই ছেলেরা দোকানে খাতালেখা প্রভৃতির কাজে ভর্ত্তি হ'য়ে যেত, ইস্কুল কলেজের জুতো জামা চশমা কলম ছড়ি, ঘড়ি বিড়ি ইত্যাদি ফ্যাশনে ধরা পড়বার তাদের সময় হ'ত না।

এ বাড়ীর মেয়েরাও যে সেকালের আদর্শেই চল্‌তেন তা আর বেশী ক'রে বল্‌বার কিছু দরকার নেই বোধ হয়। আজ চার পুরুষ ধ'রে এবাড়ীর সব মেয়েরই বার বছরের ভিতর সংসারপাতা হ'য়ে আসছে। তার আগে তারা করেছে খেলাধূলো বারব্রত আর মা-মাসির ফর্‌মাস্ খাটা; একটু বড় হ'লে কাঁকালে ছোট ভাইবোন কাউকে নিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় গল্প ক'রে পরের ঘরের খবর নিয়ে আর নিজের বিয়ের আগমনী শুনে দিন কেটে গেছে। তার পর তের বছর থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চলেছে সংসার চরকার চাকার মত একই গণ্ডীর ভিতর ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে। এচাকার আবর্ত্তনের সীমা নেই, কিন্তু এতে গতির কোনোই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘকাল ধ'রে তারা নিত্য শয়নকক্ষ থেকে ভাঁড়ার এবং ভাঁড়ার থেকে রান্নাঘরে ঘুরেছে আবার দিনশেষে সেই কক্ষে ফিরে এসেছে। একের পর এক সন্তান তাদের কোলে এসে একই রকম অযত্নে ও আদরে লোহার গদির ভবিষ্যৎ কর্ম্মীরূপে গ'ড়ে উঠেছে, নয়ত গদির কিছু টাকা খসিয়ে পরের ঘরে চ'লে গিয়েছে; জননীরূপে তাদের কোনো ইচ্ছা কি সংকল্প সন্তানের জীবনকে রূপায়িত কর্‌তে পারেনি। জীবন-মধ্যাহ্নে পুত্রকন্যার পালা সেরে পৌত্র-পৌত্রী নিয়ে আবার ঠিক এম্‌নি ক'রেই পুরাতন দিনগুলির পুনরাবর্ত্তন তাদের জীবনে ঘটেছে, তাতে নবীন ও প্রবীণ পন্থার ভিতর এতটুকু প্রভেদ ধরা পড়ে না। ঘর-সংসারের এই একান্ত প্রয়োজন পর্ব্বের বাইরে প্রাণসৃষ্টি ও প্রাণধারণের মোটা আয়োজনের উপরে আর যে কিছু আছে তা এ বাড়ীর মেয়েদের দেখ্‌লে সহজে বোঝা যায় না। পুরুষদের লোহার কার্‌বারে যদি অপর্য্যাপ্ত অর্থ ঘরে আস্‌ত তাহ'লেও হয়ত বা অলঙ্কার ও পূজা-পার্ব্বণের ছলে প্রয়োজনের বাহিরের দুটো একটা জিনিষ সংসারের ব্যূহ ভেদ ক'রে মেয়েদের অন্তরে আনন্দ ও জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে উঁকি দিতে পার্‌ত। কিন্তু মালক্ষ্মী এ সংসারকে অর্থও দিয়েছিলেন ঠিক প্রয়োজনের মাপে মাপে। সুতরাং ওপথটাও বন্ধ থেকে গেল।

সংসার ষষ্ঠীর কৃপায় ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল, কিন্তু কার্‌বার আর তার সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চল্‌তে পার্‌ছিল না। এমনই দিনে আনন্দ এ সংসারে এসেছিল। তার দশ বৎসর বয়সে কে একজন শুভানুধ্যায়ী অকস্মাৎ তার পিতাকে পরামর্শ দিলেন যে, ছেলেকে ভাল ক'রে ইংরিজী লেখাপড়া শেখাও, হাকিম কি ব্যারিষ্টার হ'তে পার্‌লে সংসারের চেহারা ফিরে যাবে। পিতার কি দুঃসাহস মনে জাগল জানি না, তিনি বন্ধুর কথামত আনন্দকে ইস্কুলেই রেখে দিলেন। শুধু রেখে দিলেন বল্‌লে ভুল হ'বে; পিতা সেদিন থেকে ছেলেকে ইস্কুলের ছাঁচে গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য কৃতসঙ্কল্প হ'লেন।

তাদের ঘর-গেরস্তালী আর দোকান-পাটের বাইরে আর-একটা যে জগৎ আছে এতদিন আনন্দ তা লোকমুখে মাঝে মাঝে শুন্‌ত। আজ অকস্মাৎ সে একেবারে সেই বহির্জ্জগৎটার বুকের মধ্যে এসে পড়ল। আনন্দর বাবা পাড়ার এক-চার পুরুষে মাষ্টারের হাতে ভার দিলেন, তাঁর ছেলেটিকে বিদ্যালয়োচিত ক'রে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে! মাষ্টার মহাশয়দের সংসারের ভাষাই ছিল মাষ্টারী ভাষা। এ বাড়ীর মত বাজার নরম গরম, কড়িবর্‌গা সিঁড়ি, খদ্দের

দেনদার, মাল চালান গুদোমসাফ, ইত্যাদি বিষয়ে কথা সে বাড়ীতে কেউ কোনোদিন বলত না। তাদের কথা ছিল নম্বর পাওয়া, স্ট্যাণ্ডকরা, ক্র্যাম করা, ব্রেন থাকা এই রকম আরো হাজার অজ্ঞাত অশ্রুত বিষয়ে।

প্রথম প্রথম আনন্দর বড়ই অদ্ভুত লাগ্‌ত। কতকগুলো কাগজের খাতার উপর লাল পেন্‌সিলের বড় বড় হরফে কয়েকটা নম্বর পেয়ে মানুষ যে এত খুসী হয় কি কারণে সেটা সে বুঝ্‌তেই পার্‌ত না। খাতার পাতার এই লাল হরফগুলো যদি হ্যাণ্ডনোটের অক্ষরের মত কিছু আদায় কর্‌বার পরোয়ানা হ'ত তা হ'লেও বা খুসী হবার কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু এই নিছক ফাঁকা অক্ষরগুলো নিয়ে পঞ্চাশ ষাট বছরের বুড়ো বুড়ো মানুষগুলোও যে আনন্দে দিশাহারা হ'য়ে পড়ে এটা আনন্দর আজন্মের অথবা পাঁচ পুরুষের সংস্কারে বড়ই বিসদৃশ ঠেক্‌ত।

কিন্তু আনন্দর বয়স অল্প ছিল; শীঘ্রই সে বু'ঝে নিলে যে নীরেট জিনিষ নিয়ে গর্ব্ব করার চেয়ে কায়াহীন শব্দ সংখ্যা ও অদৃশ্য হৃদয় মগজ ইত্যাদি নিয়ে গর্ব্ব করাটা অনেক বেশী শিক্ষার ও আধুনিকতার পরিচয়। তাদের পরিবারে শিক্ষা ও আধুনিকতার অগ্রদূত হ'য়ে যে সে প্রথম দেখা দিল একথাটা এর পর থেকে সে কিছুতেই আর ভুল্‌তে পার্‌ত না। তার কথাবার্ত্তা ধরণধারণ সমস্তই তাই সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লে গেল। তার বাংলা কথায় বুনো কল্‌কাতার যে গন্ধ ছিল, সর্ব্বদা হাল কল্‌কাতার কেতাবী মশ্‌লা দিয়ে সে সেটা দূর করতে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ত। তার উপর ছিল তার ইংরেজী বুক্‌নি; যে ক'টা ইংরেজী কথা সে শিখেছিল সবগুলো স্থানে অস্থানে লাগিয়ে না দিতে পার্‌লে তার শিক্ষার অহঙ্কারটা তৃপ্ত হ'ত না। ইংরেজী শিশুশিক্ষার বানানগুলো মুখস্থ হ'বার আগেই সে বাংলায় চিঠি-পত্র হিসাব-নিকাশ লেখা ছেড়ে দিলে। রাজভাষায় তার মনোভাব প্রকাশের চেষ্টাগুলো যাদের বাড়ী গিয়ে পৌছত সেখানে তার আত্মসৃষ্ট প্রকাশভঙ্গী নিয়ে হয়ত হাসি-তামাসা পড়ে যেত, কিন্তু তার উৎসাহ তাতে কিছুমাত্র দম্‌ত না; কারণ তার নিজের বাড়ীতে এমন একটাও মানুষ ছিল না যে, তাকে একটা ভারী কেষ্ট বিষ্ট না মনে করত। মা মুগ্ধ হ'য়ে বল্‌তেন, "হ্যাঁরে আনন্দ, তুই যে এরি মধ্যে সায়েবদের মত লিখ্‌তে শিখে গেলি রে।"

আনন্দ বল্‌ত, "আজ বাদে কাল কলেজষ্টুডেন্ট্‌ হ'ব, এখনও যদি ইংলিশে উইক্‌ থাকি তাহ'লে প্রোফেসারদের লেকচার ফলো কর্‌বই বা কি ক'রে আর কোয়েশ্চন্‌স্‌ অ্যানসার কর্‌বই বা কি ক'রে! তাই ত ষ্টডির সময় আউটবুক্‌স্‌ প'ড়ে শেষে ক্লাশে টিচারের কাছে টাস্ক্‌ লিখ্‌তে হয়।" মা কিছুই না বুঝে পুত্রসৌভাগ্যে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌তেন।

আনন্দ যেদিন কলেজে ভর্ত্তি হ'ল সেদিনই সে তার নূতন কোটগুলো ত্যাগ ক'রে মা'র হাতে পায়ে ধ'রে গোটা কয়েক চুড়িদার আস্তিনের পাঞ্জাবী তৈরী করিয়ে আন্‌লে। সে কলেজে দেখেছে এ্যকেলে ছেলেরা বুটজুতো আর কোট ছেড়ে অ্যালবার্ট শ্লিপার ও পাঞ্জাবী ধ'রেছে। সুতরাং ঠিক তাদের মত বেশ না হ'লে ছেলেরা ত তাকে লোহার গদির সহিত সম্পর্কিত ব'লে চট্‌ করে ধ'রে ফেল্‌তে পারে। লোহাপট্টিতে তার ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ থেকে সুরু ক'রে এবাড়ির পুরুষ জাতীয় সকলেই যে বিচরণ করে এটা তার কাছে বড়ই লজ্জার বিষয় ছিল। লোহার গায়ে আঁচড় কাটা যেমন শক্ত এদের গায়ে চলন্ত জগতের ছাপ পড়াও তেমনি শক্ত তা সে বুঝ্‌ত ব'লেই তার ভাবলোকের বন্ধুদের কাছ থেকে লোহার মত নীরেট এই মানুষগুলিকে সে আড়াল ক'রে রাখ্‌তে চাইত। কারণ এরা লোহার বদলে সোনাও এতটা আন্‌তে পারেনি যার দীপ্তিতে এদের অশিক্ষাটা আর্য্যামি ব'লে ঢাকা দিয়ে দেওয়া যায়। আনন্দ মাকে বল্‌ত, "মা আমাদের এই লোহার গুদোমে স্পর্শমণি যদি কেউ কোনো দিন ছোঁয়ায় ত সে তোমার এই ছেলে। বাস্তবিক এবাড়ীতে আমি যে কি ক'রে জন্মলাম তা ভেবেই পাই না।"

মা মনে কর্‌তেন ছেলে ভবিষ্যতে কত ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করবে তারি বুঝি গর্ব্ব কর্‌ছে। তিনি বল্‌তেন, "হ্যাঁ বাবা, তুই পরেশ পাথর আন্‌বি বৈ কি। আমার এ দুঃখের সংসারে তুই একদিন লক্ষ্মী পিতিষ্ঠে কর্‌বি সেই ভরসাতেই ত বেঁচে আছি।"

আনন্দ বল্‌ত, "মা, তোমাদের যে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা এ সে লক্ষ্মী নয় এ আমার মানস স্বর্ণ-কমলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

মা বল্‌তেন, "ঐ একই হ'ল। ঠাকুর দেবতার কথা আমরা মেয়েলি কথায় বলি, তোরা লেখাপড়া জানিস তোরা পুরুতঠাকুরের মত বলিস্‌। তুই আমার ষেটের কোলে বেঁচে থাক্‌, যদি তেমন উপায় কর্‌তে পারিস ত আমি তোর লক্ষ্মীর জন্যে সোনার পেঁচাই গড়িয়ে দেব।"

মা'র নির্ব্বুদ্ধিতায় হতাশ হ'য়ে আনন্দকে স'রে পড়্‌তে হত। কিন্তু তবু এ সংসারের লৌহকঠিন সংস্কারগুলোর গায়ে ঘা মার্‌তে সে ছাড়্‌ত না। একেবারেই হাল ছে'ড়ে দিতে তার আত্মশক্তির অপমান বোধ হ'ত।

মাষ্টারমহাশয়ের বাড়ীর আদর্শ অনুসরণ ক'রে সে একদিন তার ঘরে কোথা থেকে দুখানা রংকরা বেতের চেয়ার সংগ্রহ ক'রে আন্‌ল। সারাটা সকাল খেটেখুটে

ঘরখানাকে সে একটু আধুনিক গোছের ক'রে তুল্‌লে। কিন্তু বিকালে বাড়ী ফিরে এসেই দেখ্‌ল একখানা চেয়ারের উপর তার বাবার ঘর্ম্মসিক্ত পিরাণ এবং আর একখানার উপর তার দাদার ছ মাস ব্যবহৃত ভিজে ও চিঁড়ধরা গামছাখানি শোভা পাচ্ছে। তার টেবিলের উপর পাতা, বড় বালি কাগজখানার উপর কে একবাটি সরষের তেল উল্‌টে ফেলে গেছে। সম্ভবতঃ সেই তেল মাখা টেবিলেই কেউ তার কর্দ্দমাক্ত পা দুখানি তু'লে আবার বেশী আরাম পাবার লোভে দেয়ালে পা চাপিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। চেয়ারের ঠিক সাম্‌নে দেওয়ালের গায়ে লক্ষ্মীর চরণ চিহ্নের পূর্ব্বাভাস স্বরূপ তেলকালী মাখা কর্কশ ও বিশাল একজোড়া পায়ের বাঁকা-বাঁকা ছাপ। দেখে আনন্দর "ব্রহ্মরন্ধ্র" পর্য্যন্ত রাগে জ্ব'লে উঠ্‌ল। সে ভিজে গামছা ও পিরাণটা টান মে'রে উঠানে ফেলে দিলে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার রংকরা চেয়ারের অনেকখানি রংও যে অন্তর্হিত হ'য়েছে দেখে এবার সত্যিই সে কেঁদে ফেল্‌লে।

কিন্তু তখনও তার দৃষ্টি সমস্ত ঘরটা প্রদক্ষিণ করে-নি। পুরানো একটা বিছানার চাদরের দুইমুখ মুড়ে সেলাই ক'রে কাপড়ের পাড়ের সাহায্যে সে একটা পর্দ্দা তৈরী ক'রেছিল ঘরের দরজার জন্যে। দরজার দিকে চোখ পড়তেই দেখলে তার একটা কোণ থেকে চৌকো রুমালের মত একটা টুক্‌রো কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে; বাকিটাতে খুকীর কাজললতা পালিশের সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। দেয়ালে কয়লা দিয়ে কে গোয়ালার হিসাব লিখে রেখেছে। আনন্দর মনে হ'ল তার আধুনিক শোভন রুচিকে উপহাস ক'রে কোন্ বর্ব্বর দানব যেন তার বুকটা মাড়িয়ে চ'লে গেছে। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে আধুনিক গৃহসজ্জার সকল সখে জলাঞ্জলি দিল।

কিন্তু মানুষ একটা সংস্কার বরদাস্ত করতে না পার্‌লেও আর একটাতে হয়ত কায়মনোবাক্যে সায় দিতেও পারে। যাদের বয়স হ'য়েছে তাদের উপর আশা করা বৃথা মনে ক'রে সে তার ছোট ভাইকে নিয়ে পড়ল। একে আধুনিক আব্‌-হাওয়ায় রাখলে যদি এর কোনো উন্নতি হয় এই ভেবে সে তাকে মাসে মাসে ইস্কুলে আর মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়ে যাবে ঠিক কর্‌ল।

সেদিন নিজের হাতে ভাইটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে আনন্দ তাকে অনেক তালিম দিয়ে ইস্কুলে নিয়ে গেল। দাদার ভয়ে খানিকক্ষণ সে তার কচি মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে ব'সে রইল। কিন্তু শত গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও তার মুখের মাধুর্য্য ছেলেদের চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। তারা ওর গাল দুটো টিপ্‌বার জন্যে মহা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। দু-চার জন একটু টানাটানি করাতেও খোকা কিছু বল্‌লে না; কিন্তু তার পর আর একজন দুঃসাহসিক চট্ ক'রে খোকার গালদুটো টিপে ধর্‌তেই সে "দুল্ পোলাল্ মুখো" ব'লে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। ক্লাসশুদ্ধ হাসিতে ফেটে পড়তে লাগ্‌ল। আনন্দর মুখখানা তখন রক্তজবার মত লাল হ'য়ে উঠেছে। তার সব চেয়ে ভয় হ'ল যে মাষ্টার থেকে ছেলেরা পর্য্যন্ত সকলেই মনে কর্‌বে তাদের বাড়ীতে ভদ্রতার কোনো আব্‌হাওয়া নেই। খোকাকে ভদ্র সমাজে এনে ভদ্র কর্‌বার আশা সে ছেড়ে দিলে।

সে বাড়ীর লোকদের পরিচ্ছদ সংস্কারে একবার মন দেবার চেষ্টা কর্‌ল। কিন্তু দেখলে এ বড় কঠিন ঠাঁই। কারণ এ সংস্কারে পয়সা খরচ করতে হয়। আট দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুবাহিনী যেখানে শুধু আহার্য্য মাত্র পেলে নাগা সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাতে পারে সেখানে তাদের জন্য গ্রাসের উপর আচ্ছাদন জোগাতে কর্ত্তৃপক্ষ একেবারেই নারাজ। বয়স্ক মানুষদের ধুতির উপর একটা জামা পর্‌তে বল্‌লে তারা বলে "যাঃ যাঃ, বেশী ডেঁপোমি করিস্‌ নে, বাঙালীর ঘরে বাঙালী ধড়াচুড়ো এঁটে ব'সে থাকবে, তারপর কোন্ দিন টেবিলে খানা খেতে আর বল নাচতে বল্‌বি। ছোঁড়া কলেজে পড়ে বিদ্যেয় যা করুক্ না করুক খিষ্টানীটা বেশ শিখে নিয়েছে।"

আনন্দর ইচ্ছা কর্‌ত বলে, "টেবিলের খানাটা পেলে জর্ডনের জল মাথায় দিয়ে খৃষ্টান হ'তে একটুও আপত্তি করব না।" কিন্তু যাদের অন্নে দিন কাট্‌ছে তাদের মুখের উপর কিছু বল্‌তে সাহস হ'ত না।

অবশেষে আনন্দকে মনে মনে স্বীকার করতেই হ'ল যে, এ বাড়ীর কোনো স্থান থেকে লোহাপট্টির মনোভাব সে তিলার্দ্ধও সরাতে পারবে না। পরের আশা ছেড়ে দিয়ে সে নিজের দিকেই মন দিল।

মাষ্টারমহাশয়ের বাড়ীতে তার অবাধ গতিবিধি। মাষ্টার দরিদ্র হলেও বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তাঁর বাড়ীতে আনাগোনা চলে। আনন্দর এদের সঙ্গে পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠই হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু নিজের বংশ-পরিচয়টা সে এই নূতন বন্ধুদের কাছ থেকে সর্ব্বদাই গোপন ক'রে চল্‌ত। কেউ জিজ্ঞাসা করলেই বল্‌ত, "আমাকে মাষ্টার-মহাশয়ের ছাত্র ব'লেই জান্‌বেন। সেটা আমার মস্ত বড় পরিচয়।"

সেদিন সন্ধ্যায় মাষ্টার-ভবনে ছোট একটি মজ্‌লিসের আয়োজন হয়েছিল। জলযোগের চেয়ে গোলযোগই সব মজলিসে সচরাচর বেশী হ'ত। আনন্দর একটা সাধনা ছিল এই মজ্‌লিস-রত্নদের মধ্যমণি হ'য়ে ওঠবার। যেদিন সে বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, প্রতিভায়, শিষ্টাচারে এবং নিত্য-নৈমিত্তিক সকল আচরণের পালিসে তার এই গুরুদের গুরু হ'তে পার্‌বে সেদিন তার জীবনে আর কোনো কামনা থাক্‌বে না।



শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুর

শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

আনন্দ অনেকটা রবাহূত হ'য়েই আজ এসেছিল। তাকে আজ নিমন্ত্রণ করা হ'বে কি না একথা জান্‌বার আগেই বাহিরে আর এক বন্ধুর মুখে খবর পেয়ে সে এসে গৃহসজ্জা ও সঙ্গীত-নির্ব্বাচনে এমন উঠে-প'ড়ে লেগে গেল যে, কারুর সাধ্য হ'ল না তাকে একেবারে ঘরের লোক ছাড়া আর-কেউ মনে কর্‌তে।

আনন্দ ঘরের আলোটা ঠিক কর্‌তে ব্যস্ত ছিল। একটা টুলের উপর চ'ড়ে আস্তিন গুটিয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত অন্ধকারের প্রতীকার করতে বিজলি বাতিটার সংস্কারে লেগেছিল। মাথার উপরে বিজলি আলো জ্ব'লে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরেও যেন এক ঝলক বিদ্যুতের মত ঠিক্‌রে এসে একটি মেয়ে ঢুক্‌ল। সে হেঁটে এসে ঘরে ঢুক্‌ল মনেই হ'ল না। অন্ধকারের মাঝখানে আলোর সুইচটা টিপে দিলে বাতিটা যেমন বিনা ভূমিকায় একেবারে দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, মেয়েটিও যেন ঠিক তেম্‌নি ক'রে ঘরের দরজার উপর এক নিমিষে জ্ব'লে উঠ্‌ল। সেকালের মরালগামিনী কি গজেন্দ্রগামিনীর গতির সঙ্গে এ বহ্নিরূপিনীর গতির তুলনা হয় না। এ ত আগমন নয়, এ আবির্ভাব।

আনন্দ শরাহত পক্ষীর মত বিবর্ণ হ'য়ে গেল। কে এ মহিমাময়ী তাকে এমন গদ্যময় কাজে অতর্কিতে এসে চম্‌কে দিলে। আনন্দ ভে'বে পে'ল না তার এই প্রথম দেখা মূর্ত্তির ছাপ এ সুন্দরীর মন থেকে সে কি ক'রে মু'ছে ফেলে। ঘরে যে মেয়েরা ছিল তারা সুন্দরীকে দেখে আনন্দে কলরব ক'রে উঠল। যুবকদের মুখে হাসি ও খুসীর একটা দীপ্তি ফু'টে উঠল। মাষ্টারমশায়ের কন্যা বরুণ, বল্‌লো "এস ভাই উজ্জ্বলা, আনন্দ বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি, আর সকলকে ত তুমি চেনই।"

আনন্দ তখনও সাম্‌লে উঠতে পারেনি। তবু সেই অপ্রতিভ মুখেই স্মিতহাস্য টেনে এনে সে কোনো প্রকারে এগিয়ে এল। বরুণা বল্‌লে, "ইনি আনন্দ-বাবু, বাবার মস্ত একজন কৃতী ছাত্র। আমাদের এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে সকলেই এঁর বিদ্যা-বুদ্ধি প্রতিভা ও সৌজন্যে বশীভূত।"

উজ্জ্বলা আরো উজ্জ্বল হেসে বল্‌লে, "তবে আমিও যে ওঁর হিপনটিজমের হাত থেকে রক্ষা পাব না, সে ত বলাই বাহুল্য।"

বরুণা বলিল, "তুই নিজে কোন্‌ কম? জানেন আনন্দ-বাবু, উজ্জ্বলাকে যে একবার দেখেছে, সে আর জীবনে ওকে ভোলে না। মেয়েদের কথা ত ছেড়েই দিন, আপনাদের স্বজাতীয় 'অ্যাড্‌মায়ারারই' ওর একুশ জন জুটেছে শোনা যায়। অতএব সাবধান।"

উজ্জ্বলা একেবারে নব-পরিচিতের সঙ্গে এভাবের আলাপের জন্য প্রস্তুত ছিল না সে তার উজ্জ্বল হাসি সলজ্জ ভঙ্গীতে একটু স্নিগ্ধ ক'রে তুলে কৃত্রিম রোষে বরুণাকে একটা ঠেলা দিয়ে বল্‌লে "যা, আর ফাজ্‌লামী কর্‌তে হ'বে না।"

তারপর জুতার খুরের উপর ভর দিয়ে কলের লাটিমের মত চট্‌ ক'রে ঘুরে আশমানী সাড়ীর জড়ির আঁচলটা দুলিয়ে ঘাড়টা ফিরিয়ে আনন্দর দৃষ্টির উপর আর একবার আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিপাত ক'রে ঘরের অন্যদিকে খুসীর উপহার বিতরণ কর্‌তে চ'লে গেল।

আনন্দ মুগ্ধনয়নে তার গতিভঙ্গী দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সে রূপকথায় পড়েছিল রাজকন্যার পায়ে পায়ে পদ্ম ফুটে ওঠে, হাস্‌লে মণি, কাঁদ্‌লে মুক্তা ঝ'রে; আজ সেই রূপকথার রাজকন্যা যেন একেবারে তার চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। এর চরণে মঞ্জীর বাজ্‌ছে না কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন এর প্রতি পাদক্ষেপেই রূপ-শতদল বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। তার হাসির আলোর যে মণি জ্ব'লে উঠ্‌ছে খনিজ হীরার সাধ্য কি যে তাকে পরাজিত করে? আনন্দর মনে হ'ল "এ কুঁচ বরণ কন্যা"র চোখের মুক্তা-বিন্দু যার জন্যে ঝরচে সত্যই সে পৃথিবীতে ভাগ্যবান।

উজ্জ্বলা তার পদ্মকোরকের মত হাত দুখানি জোড় ক'রে বন্ধুদের নমস্কার কর্‌ছিল; আনন্দ দেখ্‌ছিল তার নিটোল মৃণালবাহু থেকে তার ধূলিলেশহীন মার্জ্জিত নখাগ্র পর্য্যন্ত কি শোভন ভঙ্গীতে তার সৌজন্য তার বন্ধুবৎসলতা জানিয়ে দিচ্ছে। বরুণার সতর্ক দৃষ্টি আনন্দর পিছন পিছন ফির্‌ছিল। সে অকস্মাৎ এগিয়ে এসে বল্‌লে, "আনন্দবাবু, বাইশের কোঠায় কি আপনার নাম লিখ্‌তে বল্‌ব? আপনি হয়ত অগ্রগামী একুশ জনকেই হার মানাতে পার্‌বেন।"

লজ্জায় আনন্দের মুখখানা লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু গর্ব্বে বুকের ভিতরটাও তার দুলে দুলে উঠছিল। বরুণার শেষ কথাটার মধ্যে একটুকুও যে পরিহাস থাক্‌তে পারে এটা ভাবতে তার অহমিকায় ঘা লাগছিল। তবু সে ভদ্রতার খাতিরে বল্‌লে, "কেন মিথ্যে গরীব বেচারীকে ঠাট্টা কর্‌ছেন?"

উজ্জ্বলার হাসির প্রসাদ কুড়োতে তার মুগ্ধ পূজারীর দল তখন চারিদিকে ভীড় ক'রে বসেছে। কার অর্ঘ্যে আর কার স্তবে এই হাসির আলো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে দেখবার জন্য যেন তাদের ভিতর রেষারেষি লেগে গিয়েছিল। আনন্দ ভাবছিল কবে সে আপনার প্রতিভার তরঙ্গে এই মূঢ় উপাসকদের ক্ষীণ স্তুতিবাদ শৈবালের মত ভাসিয়ে দিয়ে জয়টীকা ললাটে ক'রে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজ সে সুযোগ মিল্‌ল না। আজ পিছন থেকে গিয়ে পরের কথার উপর ফোড়ন দিয়ে সে নিজের যত্ন সঞ্চিত অমূল্য অর্ঘ্যগুলি হাটে হারিয়ে আস্‌তে চায় না।

সূর্য্য অস্ত গেলেও তার বিদায়ের দান সমস্ত আকাশকে রঙে রঙে ভ'রে দিয়ে যায়। উজ্জ্বলা চ'লে গেল, কিন্তু সকলের মনে যেন রং ধরিয়ে দিয়ে গেল। আনন্দর মনে রংমশালের মত উজ্জ্বলার বর্ণোজ্জ্বল স্মৃতি জ্বল্‌তে লাগল। এ উজ্জ্বলা কে জান্‌বার জন্ম তার সমস্ত মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু বরুণার পরিহাসের ভয়ে তাকে সে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস করল না; ছেলেদের কিছু জিজ্ঞাসা করাকে সে একটা পরাজয়ের চিহ্ন ব'লেই ভাবত।

অভিমন্যু সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর বীরত্ব ভারতে চিরস্মরণীয়। আনন্দকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল ত্রি-সপ্তরথীর সঙ্গে, যদিও এটা অস্ত্রযুদ্ধ নয় কিন্তু অস্ত্রযুদ্ধ না হ'লে কি হবে? রাজ্য লাভের চেয়ে হৃদয় লাভের যুদ্ধে নৈপুণ্য অনেক বেশী দরকার। আনন্দ আজ এতদিন পরে এই শ্রেষ্ঠ সমরে জয়ী হ'বার সুযোগ পেয়ে তার সমস্ত মানস-অস্ত্র দুই বেলা শান দিতে লাগল। বরুণা কেন জানি না হয়ে উঠ্‌ল আনন্দর শ্রেষ্ঠ সহায়। যখন তখন উজ্জ্বলা ও আনন্দর নিমন্ত্রণ হ'তে লাগল বরুণার টব-ঘেরা ছোট ছাদে। এর উপর আর একুশ জন লোকের ত স্থান সেখানে হওয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া বরুণার স্বোপার্জ্জিত অর্থে আতিথ্যের এত বিরাট আয়োজনও করা শক্ত। সুতরাং সেই ত্রি-সপ্তকে বেশীর ভাগ সময় সপ্ত খণ্ডে বিভাগ ক'রেই পালা ক'রে ডাকা হ'ত। উজ্জ্বলা বল্‌ত, "আনন্দবাবু, বরুণাদির সঙ্গে আপনার কি নিমন্ত্রণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে? এ যেন সেই—'স্থির হ'য়ে আছে একটি বিন্দু ঘূর্ণীর মাঝখানে।'"

বরুণা বল্‌ত, "ঘূর্ণী ত তোরই চারিধারে ঘোরে আমার চারধারে ত নয়। মনে করেছিস্ কি যে এখনও একটি বিন্দু স্থির হ'বার সময় হয়নি? আনন্দ-বাবুকে ত ডাক্‌বার দরকার হয় না; উজ্জ্বলা এলে উনি তার আনন্দ বর্দ্ধন করতে না এসে থাক্‌তে পারেন না।"

আনন্দকে অগত্যা আপত্তি করতে হ'ত। সে বল্‌লে, "আপনার করুণার দান অনেক গ্রহণ করেছি। মুখের কৃতজ্ঞতায় তার রিটার্ণ দেওয়া যায় না। কিন্তু তা হ'লেও আমার নামে ট্রেস্‌পাসিংএর চার্জ্জ আন্‌লে আমাকে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেই হ'বে।"

উজ্জ্বলার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "লোভকে জয় করতে পারিনি এটা ঠিক। আপনার সান্নিধ্য যে লোভনীয় তা অকপটেই স্বীকার করছি; কিন্তু সিঁধ কে'টে সেখানে ঢোক্‌বার চেষ্টা করব না কোনোদিন।"

বরুণা হেসে বল্‌লে, "সিঁধ কে'টে নয়,আনন্দবাবু পাঁচিল টপ্‌কে। দেখেন ত ঘরে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে চারদিকে পাঁচিল খাড়া হ'য়ে যায়। উজ্জ্বলার স্তবস্তুতি বন্দনার পাঁচিল অনেক আছে, আপনার প্রতিভার মন্ত্র-বলে সেগুলোকে আপনি ভূমিসাৎ করতে পারেন। কিন্তু এই যে সাকার সাড়ে পাঁচ ফুট ক'রে পাঁচিলগুলি তার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদের আমি যদি আরো আস্কারা দি, তবে আপনি কোনো মন্ত্রবলেই তাদের সরাতে পারবেন না।"

বরুণার এত স্পষ্ট কথায় উজ্জ্বলা লজ্জিত হ'ত। এ যেন সোজা ভাষায় বলা যে আনন্দর সঙ্গে তার গাঁটছড়া বেঁধে দেবার জন্যই তাদের এত ডাকাডাকি।

আনন্দ কিন্তু খুসী হ'ত। এই ভীড়ের মাঝখান থেকে তার মূল্য বুঝে যে এই দুটি তরুণী তাকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে এতে তার জয়াশা দিন দিন গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌ত।

সে শুভক্ষণ একদিন এল। একদিন শারদজ্যোৎস্নায় যখন বরুণার ছোট ছাদটি প্লাবিত, বরুণা তার তৃতীয় এক অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজনে নীচে নেমে গেছে, ঘন নীল আকাশের গায়ে মল্লিকার মালার মত মেঘ ভেসে চলেছে তখন আনন্দর হাত উজ্জ্বলার হাতে একবারটি এসে পড়্‌ল। উজ্জ্বলা সে হাত সরালে না, নিজে সঙ্কুচিত হ'ল না, শুধু কোমল মুঠির ভিতর তার সুদৃঢ় হাতখানা চেপে ধ'রে তার মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি হাস্‌ল। তারপরই তার চোখ দিয়ে নিটোল মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু ঝ'রে পড়্‌ল।

আনন্দ দেখ্‌লে এ চোখে "কাঁদিলে মুকুতা ঝরে" সত্যই।

উজ্জ্বলা আনন্দর দিকে সজল চোখে চেয়ে বল্‌লে, "তুমি কেন এত কাছে এলে? কি চাও তুমি আমার কাছে?"

আনন্দ বল্‌লে, "এই হাতখানি চিরকাল ধ'রে রাখ্‌তে চাই।"

উজ্জ্বলা বল্‌লে "কার হাত ধরেছ জান? এ হাত কি তোমার যোগ্য? তুমি কৃতী, গুণী মানী আর আমি কে?"

আনন্দ বল্‌লে, "উজ্জ্বলা, তোমাকে পাবারই ত সাধনা এসব। যে ঘরে জন্মেছিলাম সেখান থেকে লোহার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়েছি তোমারই সন্ধানে, তা তুমি জান না। কোনোদিন তোমার কাছে নিজের পরিচয় দিই নি, কারণ জান্‌তাম আমার নিজের মূল্য ছাড়া আর এমন কোনো পরিচয় আমার নেই যার জোরে তোমাকে আমার কাছে ডাক্‌তে পারি। আমার সে মূল্য যদি তুমি যথেষ্ট মনে কর তাহ'লে যেন সেই আমার একমাত্র যোগ্যতা, আর সবই আমার ফাঁকির ঘরে।"

উজ্জ্বলা বল্‌লে, "মানুষের নিজের মূল্যই যে তার আসল মূল্য তা যদি এত দিনে না বুঝে থাক্‌তাম তাহ'লে আজ তোমার সঙ্গে আমাকে কথা বল্‌তে দেখতে না। ধন মান বংশ-গৌরব মানুষের গায়ে যে গিল্‌টি মাখিয়ে

দেয় তা সংসারের স্রোতের ধাক্কায় ক'দিন টেঁকে? নিজে যে খাঁটি সোনা হ'য়ে উঠেছে, তাকেই আমি চিন্‌তে চাই, জান্‌তে চাই।"

দিনগুলো স্বপ্নের মত কেটে যাচ্ছিল। আনন্দ হঠাৎ এক দিন তার মাঝখান থেকে বল্‌লে, উজ্জ্বলা আমাদের অন্তরের পরিচয় নিয়ে যা বোঝা-পড়া কর্‌বার তা আমরা করেছি। কিন্তু বাহিরের জগৎ ত আর কিছু চায়। বাহিরের সে পরিচয় আমার তোমায় খুলে বলা উচিত। তুমি শুন্‌লে অবাক্ হ'য়ে যাবে যে আমাদের বাড়ীতে মেয়েরা আজও কেউ এক অক্ষর পড়তে জানে না, ছেলেরা নামসই আর খাতা লেখায় তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং—এবং—আমার পিতামহ শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁর নামের শেষে লিখ্‌তেন 'দাস কর্ম্মকার'। আমরা সেই দাসটুকু রেখে কর্ম্মকারটা বাদ দিয়েছি।"

বল্‌তে বল্‌তে আনন্দ ঘেমে উঠেছিল। সে ম্লান হেসে উজ্জ্বলার মুখের দিকে চাইলে।

উজ্জ্বলা দীপ্ত হাসিতে মুখখানা আলো ক'রে শুধু বল্‌লে, "আর আমার বাবা লিখ্‌তেন 'দাস চর্ম্মকার'। আমি যখন বোর্ডিংএ আসি ছোট্টবেলা, আমাদের হেডমিষ্ট্রেস্ তখন শেষটুকু বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।"

*　　　*　　　*

ক'দিন পরে উজ্জ্বলার নামে চিঠি এল,

"উজ্জ্বলা, নিজের কথা আজ আর কিছু বল্‌ব না; কারণ সে সব কথা আজ আর আমার মুখে শোভা পাবে না। কিন্তু মা কি জিনিষ তা ত তুমি জান? আমাদের কথা শুনে তিনি শয্যা নিয়েছেন। তাঁকে আঘাত দেব কি ক'রে? নিজের সকল সুখ ও স্বার্থ ত্যাগ ক'রেও মার পায়ের তলায় আমাকে প'ড়ে থাক্‌তে হ'বে।

অভাগ্য আনন্দকে ভুলে যেও। সে সত্যই তোমার যোগ্য নয়।

—আনন্দ"

আপন-পর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৩

ঘন কুয়াশায় আকাশ পরিব্যাপ্ত। পথপার্শ্বের দীর্ঘ বৃক্ষগুলি অস্পষ্ট ধূম্রচ্ছায়ামণ্ডিত। বাড়ী ঘর মাঠ—সবই যেন এক নিরানন্দ বিঘ্ন-কল্পনায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। পথে লোকজন নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই। এক অশরীরী মৃত্যুপুরীর মধ্যে সারা বিশ্বপ্রকৃতি যেন বিলীন হইয়া গেছে। কেবল মাঝে মাঝে দুই-একটা পক্ষীর কর্কশ রব অনাগত অমঙ্গল সূচনা করিয়া কাঁপিয়া ফিরিতেছিল।

প্রশস্ত নির্জ্জন পথ ধরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। ভিতরে দুইটি নারী, কাহারো মুখে কথা নাই—সেই কুয়াশার মতই বিস্ময়েরা অদৃষ্ট ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছে। ভগবান জানেন, তাহারা গিয়া কি দেখিবে। প্রকাশবাবু বলিয়াছেন, গুরুতর জখম। কিন্তু প্রাণান্তকর ত নাও হইতে পারে। এক-একটা মুহূর্ত্ত তাহাদের কাছে দণ্ড বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কাঁকরবিছানো পথে গাড়ীর ঝাঁকি অনবরত তাহাদের পরস্পরের গায়ের উপর বেগে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

উপরে প্রকাশ গরম কাপড়ে নিজেকে উত্তমরূপে আবৃত করিয়া আপন মনে বসিয়া চলিয়াছে। কাল-রাত্রের দুর্ঘটনা বার বার তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। জড়পিণ্ডের মত অমরনাথের অচৈতন্য দেহ—শুধু প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। সে কি বাঁচিবে?

তাহারা হাঁসপতালে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ীবারান্দায় গাড়ী থামিলে একজন প্রবীণ বয়স্ক ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন, এবং ইহাদের লইয়া আপন বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাশকে নিভৃতে ডাকিয়া তিনি কহিলেন,—এইমাত্র রুগী মারা গেছে।

অ্যাঁ, বলেন কি, মারা গেছে?

হাঁ। হঠাৎ একটা convulsion হ'ল। এই দুঃসংবাদ শুনবার জন্য আপনি মেয়েদের প্রস্তুত করুন।

খানিকক্ষণ প্রকাশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—না মশায়। সে আমার দ্বারা হ'বে না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন,—আমি ডাক্তার। আমার মুখে মৃত্যু-সংবাদটা যেমন রুক্ষ তেমনি আকস্মিক মনে হবে। একাজ আত্মীয়-স্বজনেরই উপযুক্ত। বাঙালী

বাঙালীর আত্মীয় না হইয়া যায় না, এই পশ্চিম দেশীয় ডাক্তার বোধ করি তেমনি কিছু অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিয়া, প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মেয়েদের কাছে গিয়া বলিল—আসুন।

একটি পরিচ্ছন্ন ঘরে লোহার খাটে শুভ্র বিছানার উপর অমরনাথের মৃতদেহ শায়িত, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—কঠোর বিবর্ণ মুখের উপর বেদনার চিহ্নগুলি তখনো প্রকটিত। চোখের তারা উর্দ্ধে উঠিয়া পল্লবের নীচে লুকাইয়াছে। চোয়াল বিকৃতভাবে ঝুলিয়া শূন্য মুখবিবর পরিব্যক্ত করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া তিনজন থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে প্রকাশ কহিল,—অমরবাবু আর নাই।

বাবাগো,—অনিমা ও করুণা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর অমরনাথের বক্ষের উপর করুণা ছুটিয়া গিয়া আছড়িয়া পড়িল। অনিমা ভূতলে হাঁটু গাড়িয়া শয্যাপ্রান্তে মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া রহিল। পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে লইয়া এই দুই ভগ্নীর মধ্যে কতই না বিরোধ ঘটিয়াছে, এখন আর তাহাদের কোনো দ্বন্দ্ব কোনো মতভেদ রহিল না। দুইজনই এখন সমদুঃখ-ভাগিনী, পিতৃহীনা। পিতার প্রাণশূন্য দেহের উপর এই দুই পিতৃহীনা সমানে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল, কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা দিল না। আকাশে সূর্য্যদেব তখন রাশীকৃত কুজ্ঝটিকা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া যুদ্ধ শ্রান্ত বীরের মত বিশ্রাম করিতেছেন। মুক্ত গবাক্ষ দিয়া এক ঝলক রবিরশ্মি মৃতের শুভ্র আচ্ছাদন বস্ত্রের উপর পড়িয়া এই করুণ দৃশ্যটিকে পবিত্রতা মণ্ডিত করিয়া দিল। তফাতে দাঁড়াইয়া প্রকাশ দেখিতেছিল। ইহারা তাহার কেহ নহে, তথাপি তাহার চোখ দুটা ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রকাশ যখন তাহাদের গাড়ীর ভিতর আনিয়া বসাইল, তখন করুণা অনেকটা শান্ত হইয়াছে, কিন্তু অনিমার শোক আজ কিছুতে বারণ মানিতে চাহিল না। ঝোড়ো হাওয়ার মত ঝাপ্‌টায় ঝাপ্‌টায় সে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। পিতার অপরাধগুলির কথা সে এখন ভাবিতেও পারিল না, তাহার অন্তরে নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা উচ্ছ্বসিয়া উঠিতে লাগিল। করুণার সহিষ্ণুতা, সেবা—চিরদিন এগুলি তাহার কাছে প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইত। আজ সে কাঁদিয়া আকুল হইল এই ভাবিয়া যে, একটি দিনের জন্যও সে ইহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, সেবা করে নাই। সে তর্ক করিয়াছে, যুক্তি দিয়া মনকে বুঝাইয়া আসিয়াছে যে, ভক্তি শ্রদ্ধা নির্ভর করে সম্বন্ধের উপর নহে, মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর। পণ্যবস্তুর মত মূল্য হিসাব করিয়াই যদি এই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইল, তবে যে এগুলি নিতান্তই ছোট হইয়া যাইবে! আজ তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, একটি দিনের জন্যও যদি তাহার স্বর্গীয় পিতা জীবন্ত হইয়া আবার আসিয়া দেখা দেন, তাহা হইলে করুণার মতই সে অকুণ্ঠিত সেবা দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিতে পারিবে।

বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সংবাদ শুনিয়া সুরধুনী ভূতলে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যোগমায়া মূঢ় বিস্ময়ে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল—বোধ করি তাহার অক্ষম চিত্ত এই আকস্মিক দুর্ব্বিপাক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সে অনিমাকে কহিল, প্রেতের ডাক শুনেচিস তুই? আমি রোজ শুনি। তারা চারিদিকে নেচে বেড়ায়—ডেকে বলে, মঙ্গল নেই চুপ চুপ—কাঁদিস নি, কাঁদ্‌তে নেই।

প্রকাশ ঘরের একদিকে দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের এই অবস্থায় রাখিয়া সে যাইবে কি যাইবে না ভাবিতে-ছিল; করুণা আসিয়া কহিল,—সর্ব্বনাশ যা হবার তাত হ'য়ে গেল। মার যা অবস্থা এখন তাকে যে কেমন ক'রে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে, সেই হয়েচে ভাবনা। বলিয়া অশ্রু-সজল নেত্রে মাতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

যোগমায়ার দিকে ফিরিয়া প্রকাশ বোধ করি কিছু অনুমান করিয়া লইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—কেন নিয়ে যাওয়া যাবে না বলচেন?

করুণা কহিল,—মা হয় ত যেতেই রাজি হবে না। তারপর একটু থামিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিল,—মার মাথার ব্যারাম আছে।

ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রকাশ বলিল,—আমাকে আর যদি কিছু কর্‌তে হয় বলুন।

করুণা কহিল,—আপনি অনেক করেচেন। কিন্তু আমরা নিরুপায়—সৎকারের ব্যবস্থাও আপনাকে কর্‌তে হবে।

করুণার নির্দ্দেশমত লোকজন ডাকিয়া প্রকাশ অমরনাথের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল, এবং যথারীতি দাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিনশেষে বাড়ী ফিরিল।

১৪

কতকগুলি কারখানার পাশে পাশে রেল রাস্তাটি রাণীগড়ের ভিতর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দুই ধারে সারি সারি গুদাম আর কল। গলির উপর লম্বা লম্বা খোলার বস্তি-অন্ধকার স্যাঁৎসেতে, চিমনির ধূমে কালী বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাঁকা-চোরা রাস্তাটিতে অপর্য্যাপ্ত ধূলার সঙ্গে

কয়লার গুঁড়ি মিশিয়া, আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া, একখণ্ড ধূসর ঘন কুজ্ঝটিকা এই জায়গাটিকে যেন দেবদৃষ্টির আড়াল করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। রেলের ইঞ্জিন বাঁশী ফুঁকিতে-ফুঁকিতে দিগন্তকম্পিত করিয়া ছুটিত, রাশি রাশি মাল বোঝাই মহিষের গাড়ী একটা আর একটার সঙ্গে লাগিয়া ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করিয়া অগ্রসর হইত, কলগুলি দিনরাত অবিশ্রান্ত গর্জ্জন করিত। এখানে মানুষের সৃষ্টিগুলি মানুষকেও অতিক্রম করিয়াছিল—তাই, মানুষের হল্লা মনুষের গোলমাল অনেকটা খাটো অনেকটা, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

পর্ব্বতগুহায় একপ্রকার জীব আছে, তাহারা আঁধারের জীব। এখানকার মজুরেরাও সেই রকম হইয়া উঠিয়াছিল। আঁধারের কীটাণুর মত ধূলা আবর্জ্জনার মধ্যেই তাহারা বসবাস করিত, বাহিরের মুক্ত শীতল বাতাসটুকুর খবর রাখিত না। মহাজনের দেনার দায়ে, সরিকি বিবাদে, মামলা-মোকদ্দমায় স্বেরবার হইয়া হাল গরু বেচিয়া শেষে রিক্ত হস্তে আসিয়া কারখানার জোয়ালে কাঁধ দিয়াছিল। কিন্তু, এখানে তাহাদের একটি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। দেশে তাহারা রোজগার করিত স্ত্রী পুত্রের জন্য—ঝগড়া মারামারি খুণা করিত, যদি করিত সে-ও স্ত্রী-পুত্রের জন্য। এখানে তাহাদের সুবিধার জন্য কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ যে আবকারি দোকান আনিয়া বসাইলেন, প্রতি-দিন সন্ধ্যার পর সেখানে আসিয়া নেশার ঝোঁকে অনর্থক ঝগড়া মারামারি করিয়া রক্তাক্ত দেহে তাহারা যখন বাড়ী ফিরিত, তখন তাহাদের ট্যাঁকে যে কয়টি পয়সা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতে স্ত্রীপুত্রের দুবেলা দুমুষ্টি অন্নেরও সংস্থান হইত না।

এখানে আসিয়া ইহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা প্রকাশ স্বচক্ষে দেখিল। অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ইহারা, নীতিজ্ঞানশূন্য—হিতাহিত বিবেকবুদ্ধি অনুশীলন করিবার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত কেহ ইহাদের দেয় নাই। ইহারা সঙ্ঘহীন, ইহাদের অসহায় অস্তিত্ব স্বত্বাধিকারীর দায়িত্বশূন্য মর্জ্জির উপর নির্ভর করিতেছে। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা ইহারা ধনীর যে অর্থাগমের সুবিধা করিয়া দিতেছে, সেই অনুপাতে ইহাদের লভ্যাংশ কত তুচ্ছ। শ্রমিকদলের আন্দোলনের পক্ষপাতী প্রকাশ চিরদিনই, সে দেখিল, ইহাদের অসহায় অবস্থার মূল কারণ আত্ম-বিস্মৃতি। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইলে প্রয়োজন—সঙ্ঘ-গঠন এবং শিক্ষা। ইহাদের সংশ্রবে আসিয়া প্রথম হইতেই ইহাদের প্রতি এ গভীর সহানুভূতি অনুভব না করিয়া সে থাকিতে পারে নাই। শীঘ্রই সে একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত হইবে, এবং অচিরাৎ তাহারা সংঘগঠনের উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে, ইহা সে তাহাদের উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল। তাহারা সদাশয়তা ও হিতৈষণা দেখিয়া মজুরেরা মুগ্ধ হইয়াছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে, দলে দলে তাহারা শিক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

সেদিন সংকারের পর বাড়ী ফিরিয়া প্রকাশ ভৃত্যকে ডাকিয়া এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিতে বলিল। সারা রাত্রি নিদ্রা হয় নাই—অনাহারে, রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কাটিয়াছে। সে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করিতেছিল। বাজার হইতে কিছু খাবার আনাইয়া খাইয়া, চা পান করিবার পর সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। তন্দ্রার ঘোরে তাহার অবসন্ন চক্ষুর্দ্বয় ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া ডাকিল,—বাবু!

প্রকাশ চোখ মেলিয়া চাহিলে, ভৃত্য জানাইল—রামটহল সর্দ্দার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

—ডেকে দে।

রামটহল মজুরদের সর্দ্দার। দেখিতে বেঁটে, প্রভূত শক্তিশালী। ভিতরে আসিয়া সে একটি সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে রামটহল, সকলে বইটই নিয়ে ইস্কুলে এসে জমায়েত হয়েছে বুঝি?

রামটহল কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। মজুরেরা সকলেই এসেছে। কিন্তু, বাবু সারাদিন পরিশ্রম করেছেন। আজ আর পড়িয়ে কাজ নাই। আমি ওদের বিদায় ক'রেদি।

প্রকাশ হাসিয়া কহিল,—তাও কি হয় রামটহল? আমার সব বুড়ো বুড়ো ছাত্র, একদিন না পড়ালে কত খানি ক্ষতি হবে বল দেখি? না না, তুমি তাদের থাকৃতে বল, আমি যাচ্ছি।

বস্তির ভিতর একটি ঘরে মজুর-পোড়োরা আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। মেজের উপর চাটাই বিছানো। ঘরটি যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। কয়েকটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরখানি কথঞ্চিৎ আলোকিত করিতে-ছিল। প্রকাশ আসিলে, সম্বর্দ্ধনা করিয়া ইহারা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিল। রোজই সন্ধ্যার পর সে এখানে আসিত। তাহার অবসর ছিল প্রচুর, কয়েক জন সামান্য লেখাপড়া জানা মজুর নিয়মিতরূপে তাহাকে শিক্ষাকার্য্যে সাহায্য করিত।

একটিবার চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া প্রকাশ কহিল,—দুখাইকে দেখ্‌ছি না যে। আজও সে শুঁড়িখানায় গেছে বুঝি?

একজন কহিল,—হ্যাঁ বাবু। সে কিছুতে আমাদের

সঙ্গে ভিড়তে চায় না। আজও তার পরিবার এসে বিস্তর কান্নাকাটি ক'রে গেল।

প্রকাশ কহিল,—এ বড় দুঃখের বিষয়। দেখ্‌চি, এই শুঁড়িখানাগুলিই আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এগুলিকে একেবারে তুলে দিতে না পার্‌লে অনেকের পক্ষেই প্রলোভন জয় করা কঠিন হ'য়ে উঠবে। একে ত সামান্য মজুরি, খেতে পরতেই কুলোয় না—এর ওপর কি অপব্যয় করা পোষায়?

সর্দ্দার রামটহল কহিল,—বাবু আমরা ঠিক করেছি মজুরি বাড়িয়ে দেবার জন্য কোম্পানীর কাছে একটা আরজি পেশ করবো।

বিদ্রূপ করিয়া মজুর লছমন বলিল,—সর্দ্দার মনে ভেবেচে যেমনি আরজি পেশ করা হবে অমনি কোম্পানীর সিন্দুক খুলে যাবে। আমি ব'লে রাখ্‌ছি ও সবে কিছু হবে না।

সর্দ্দার উত্তেজিত হইয়াছিল, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল,—না হয় তখন ধর্ম্মঘট করা যাবে। আমিও ব'লে রাখ্‌ছি লছমন, আরজি পেশ করেই হোক আর ধর্ম্মঘট করেই হোক মজুরি বাড়াবই বাড়াব।

চারিদিক হইতে মজুরেরা প্রশংসাধ্বনি করিয়া উঠিল,—এইবার সর্দ্দার মরদের মত কথা বলিয়াছে।

প্রকাশ স্থিরচিত্তে ইহাদের কথা শুনিতেছিল। হঠাৎ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, দেখ তোমরা সব ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব করচ। কিন্তু ধর্ম্মঘট করতেও একটা শিক্ষা দরকার। সে শিক্ষা তোমাদের আছে কি? ধর্ম্মঘট একটা বিদ্রোহ। বিদ্রোহ সফল হ'লে অনেক সুবিধা ঘটে, একথা ঠিক। কিন্তু এত বড় শক্তির ঘায়ে বিদ্রোহ চূর্ণ হ'লে বিদ্রোহীদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। নিজের শক্তির ওজন না বুঝে ধর্ম্মঘট করা নিছক পাগ্‌লামী।

যাহারা ধর্ম্মঘটের নামে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রকাশের কথা শুনিয়া এখন তাহারা দমিয়া গেল। এক জন বলিল, কিন্তু বাবু অত বিবেচনা করতে গেলে ত ধর্ম্মঘট করা কখনো হ'য়ে ওঠে না।

হুজুগে মাতিয়া ধর্ম্মঘট করিবার ফলে ভারতে সকল ধর্ম্মঘটই অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, প্রকাশ সেই শোচনীয় ইতিহাস ইঁহাদের শুনাইল। শ্রমিকেরা গরীব, দিনের রোজগারে কোনমতে তাহাদের সংসার চলে। রোজগার বন্ধ হইলে তাহাদের যে সপরিবারে উপবাস করিয়া কাটাইতে হইবে। অতীত অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না।

লছমন বলিল,—দূর হোগগে।ধর্ম্মঘট—আমরা আরজিই পেশ করবো।

সকলে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিল। এই সব সরল প্রকৃতি বয়স্ক লোকদের হিন্দি বর্ণমালার অক্ষরগুলির সহিত প্রথম পরিচয় করিতে দেখিয়া প্রকাশের অন্তর এক অননুভূত জাতীয় ভাবে ভরিয়া উঠিতেছিল। এক দিন হয় ত ইহারা যথার্থ মানুষ হইয়া উঠিবে এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে মানুষের অধিকার দাবী করিবে। পৃথিবীতে এমন শক্তি কোথায় যে তখন ইহাদের মিলিত কণ্ঠের দাবী অগ্রাহ্য করিবার সাহস রাখিবে? যতদিন ইহাদের অজ্ঞান অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে, স্বার্থ সম্পর্কিত লোকাদর লাভ ততদিন। তারপর যেদিন শিক্ষা প্রভাবে এই লোকগুলি মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিবে, সেদিন ঔদ্ধত্য প্রতারণা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কারগুলি শুষ্ক পত্রের মত একে একে ঝরিয়া পড়িবে না,কে বলিবে?

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রকাশের মনে পড়িল, অমরনাথের মৃত্যু। এই আকস্মিক দুর্ব্বিপাক দূরদেশে ক্ষুদ্র বাঙালী পরিবারটিকে কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, প্রকাশ তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভৃত্য আসিয়া বারান্দায় জল রাখিয়া গিয়াছিল, উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া প্রকাশ জামা পরিল। তারপর জুতা জোড়া পায়ে দিয়া ধীরে ধীরে অমরনাথের বাড়ীর দিকে চলিল।

করুণা তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া হলঘরে আনিয়া বসাইল। কহিল,—অনুগ্রহ ক'রে এসেচেন, ভালই হয়েচে। এই বিপদে একজন দেশের লোক দেখ্‌লেও শান্তি পাই।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—আপনারা কেমন আছেন?

করুণা কহিল,—আর থাকা? সব ঝুকিই এখন আমার উপর এসে পড়েচে। অনু ত কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না। অনেকক্ষণ ধ'রে ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করলুম।

অনিমা ঘরেই ছিল। তাহার পানে চাহিয়া প্রকাশ কহিল,—শোক ক'রে কি হবে বলুন। যে যায় সে ত আর শোক কর্‌লে ফিরে আসে না। দেখুন, আমার এমনি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আমি তখন কলেজে পড়ি, একদিন দেশের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে দেখি, চিতা জ্বলচে! প্রাণটা ছ্যাঁক্ ক'রে উঠ্‌লো। তার পর শুনলুম, মা কলেরায় মারা গেছেন। মরবার আগে একটিবার দেখ্‌তেও পেলুম না। সংসারের ভার ছিল মার উপর—বাবা ত অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন।

একটি চেয়ারের পিছনে ভর দিয়া অনিমা দাঁড়াইয়া-

ছিল। স্বাস্থ্যপুষ্ট সজীব মূর্ত্তি—মুখখানিতে বিষণ্ণতার কালিমা মাখান। চক্ষুর্দ্বয় আয়ত করিয়া সে প্রকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রকাশ বলিতে লাগিল,—শুধু তাই নয়। মার মৃত্যুর পরই আমার ভিটে মাটি সব গেল। আমাদের বাড়ী নদী ভেঙে নিলে—আমি ফকির হ'য়ে পথে এসে দাঁড়ালাম।

অনিমা জিজ্ঞাসা করিল,—নদীতে বাড়ী ঘর ভেঙে নিলে কি রকম?

প্রকাশ কহিল,—আমাদের দেশে খুব বড় বড় নদী—এ পাড় ভাঙে, ও পাড়ে চড়া পড়ে। কত অবস্থাপন্ন লোক একেবারে ফকির হ'য়ে যায়—নিয়তির এমনি খেলা! একবার ভাবুন দেখি, তারা কত দুঃখী! তারা আমারি মত হেসে খেলে দিনগুলি স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিচ্ছে, সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য নিয়ে চিন্তা করবার অবসর নেই।

অনিমার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। প্রকাশের কথাগুলি যেন কোনো গোপন মর্ম্মব্যথা ঝঙ্কার দিয়া বাজাইয়া গেল।

সুরধুনী ঘরে ঢুকিলেন। প্রকাশকে দেখিয়া কহিলেন,—আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, তা আর কি বল্‌বো। বাড়ীতে পুরুষ আত্মীয় কেউ নেই—এই দুটি মেয়ে, আর ওদের মা। এদের নিয়ে যে কি করি আমি ত কিছু ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌চি না।

তিনজনের চোখে জল; প্রকাশের নেত্রপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল। সুরধুনী বলিতে লাগিলেন, অমরকে হাত ধ'রে মানুষ করেছিলাম, বাবা। ও যখন এতটুকু তখনি ত আমি এই সংসারে আসি। তীর্থ কর্‌তে বেরিয়েছিলাম, এইখানে এসে আটক পড়লাম—দিদি কিছুতেই ছাড়লেন না। বিধবা মানুষ, ছেলেপিলের মুখ দেখিনি—ওই ছিল আমার ছেলের মত। আমার এই শেষকাল, কোথা মনে করেছিলাম কাশীবাস কর্‌বো—তা অমর যে আমাকে এমন বিপদের ভিতর ফেলে রেখে যাবে, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বলিয়া তিনি চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রকাশ কহিল, ওই দেখুন, আপনি নিজেই অধীর হ'য়ে পড়েচেন। তা'হলে এদের সান্ত্বনা দেবে কে বলুন ত? না না, আপনি একটু স্থির হন। তাহ'লে এঁরা ভরসা পাবেন।

প্রকাশ উঠিল—বেলা বাড়িয়া চলিয়াছিল।

পুস্তক-পরিচয়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম—মূল শ্লোকসমূহ ও তাহার সংস্কৃত টীকা দেবনাগর অক্ষরে। তৎপরে তাঁহার ব্যাখ্যার ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত কোন শ্লোক বা শ্লোকাংশ কোন উপনিষদ বা অন্য শাস্ত্র হইতে গৃহীত, তাহাও ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছে। মহর্ষি কি উদ্দেশ্যে ও কি প্রকারে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহাতে সংকলিত শ্লোকগুলি তাঁহার রচনা না হইলেও কি অর্থে গ্রন্থখানি তাঁহার রচনা, ইত্যাদি নানা কথা একটি দীর্ঘ ভূমিকায় বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। বাংলা ব্যাখ্যা সহ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের যে সংস্করণ আছে, তাহাতে এই সকল কথা নাই। যাঁহারা বাংলা জানেন ও পড়েন, এই ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত সংস্করণ তাঁহাদের কাজে লাগিবে। যাঁহারা বাংলা জানেন না, ইংরেজী জানেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্ এ ইহা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিয়া শেষোক্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে নিবদ্ধ অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মোপদেশ ও মহর্ষির তৎসমুদয়ের ব্যাখ্যা এখন তাঁহাদেরও অধিগম্য হইল। ইংরেজী অনুবাদ আমরা যতটুকু পড়িয়াছি তাহাতে ভালই হইয়াছে।

পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। ইহা সাড়ে আট ইঞ্চি লম্বা সওয়া পাঁচ ইঞ্চি চৌড়া মোট ২৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত। নাম ও ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবের সীল মোহর স্বর্ণাঙ্কারে মুদ্রিত। মূল্য তিন টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২১০-৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

র

নির্ম্মল পাঠ ও নীতি কথা—শ্রীউপেন্দ্রকুমার সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ১৪নং ডিহি শ্রীরামপুর রোড, কলিকাতা, মূল্য যথাক্রমে।৶১০ ও।৶০ আনা (দু'খানা বহি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক পাঠ্য লিষ্ট ভুক্ত)।

দুইখানা বহি সুশোভিত, সুচিত্রিত, সুলিখিত ও সুগঠিত হওয়ায় বড় লোভনীয় হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, বেশ বড় বড় অক্ষর, পরিষ্কার ছাপা ও কাগজ খুব উৎকৃষ্ট। সংস্করণের সংখ্যাধিক্য বহির অত্যধিক উপযোগিতার প্রমাণ। গ্রন্থকারের উপযুক্ততা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছি। আশা করি, বহি দু'খানা শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়েই সাদরে পাঠ্য লিষ্ট ভুক্ত হইবে।

ক

তীর্থের পথে—শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী প্রণীত এবং গৌরীপুর কৃষ্ণপুর ময়মনসিংহ হইতে শ্রীসুশীলপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজি ৩১২ পৃষ্ঠা অত্যুত্তম ছাপা কাগজ বাঁধা। সচিত্র। মূল্য চার টাকা।

এই পুস্তকে ৩৫টি তীর্থযাত্রার বিবরণ ও ৪৪ খানি চিত্র পথ, যান-বাহন, তীর্থ স্থান তীর্থকৃত্য প্রভৃতির বর্ণনা সরস সাধু ভাষায় আন্তরিকতার সহিত লিখিত হওয়াতে বইখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। দু এক জায়গায় প্রাদেশিক ভাষার ও উচ্চারণের চিহ্ন থেকে গেছে। দু তিনখানি ছবি ফিকা কালী নির্ব্বাচনের জন্য অস্পষ্ট ছাপা হয়েছে। এগুলি খুঁতের কথা। কিন্তু পুস্তকখানির বাহ্য ও আন্তর সৌষ্ঠব উৎকৃষ্ট ব'লেই এই খুঁতের উল্লেখ করলাম। বহু তীর্থের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিবরণ দেওয়াতে বর্ণনা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়েছে। যাঁরা তীর্থ দর্শন অভিলাষী তাঁরা এই পুস্তকখানিকে সঙ্গে পাওা কর্‌লে অনেক সাহায্য পাবেন, যাঁরা ভারততীর্থের পরিচয় পেতে চান তারা সাহিত্য হিসাবে প'ড়েও সুখী হবেন।

চট কলের কথা—বেঙ্গল জুট ওয়ার্কারস্ এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠা। মূল—এক আনা।

আজকাল চারিদিকে ধনিকে শ্রমিকে দ্বন্দ্ব লেগেছে। ধনিকের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে শ্রমিকের সঙ্গত অংশ দাবী করার এই প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টার ফলে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। বাংলাদেশের চটকলের শ্রমিক সঙ্ঘের বিবরণ ও নিয়মাবলী এবং সেই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কর্ম্ম ও চেষ্টার সফলতা প্রভৃতির বিবরণ এই পুস্তিকায় আছে। অন্যান্য শ্রমিক সঙ্ঘ এখানি পাঠ করলে অনেক বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করতে পারবেন এবং নতুন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতারা নিজেদের কর্ম্ম পরিচালনার একটা আদর্শ দেখতে পাবেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

গেঁয়ো—(গল্প) শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় কৃত। প্রকাশক ডি-এম লাইব্রেরী ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ৮০।

গল্পগুলি সুলিখিত। গেঁয়ো গল্পটিতে গ্রন্থকার অদ্ভুত বিশ্লেষণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। আর লেখার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি সাবলীল ভঙ্গী বজায় রাখিয়াছেন যাহার জন্য পড়িতে কোথাও বাধে না। ছাপাই বাঁধাই সুন্দর।

সরোজ-নলিনী—(জীবনী) শ্রী গুরুসদয় দত্ত প্রণীত। প্রকাশক দি-বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ।।০

আমরা ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ হইল ইহা অত্যন্ত ভরসার কথা। এই সংস্করণের ছাপাই বাঁধাই অধিকতর সুন্দর হইয়াছে।

জাপানে-বঙ্গনারী—(ভ্রমণকাহিনী) স্বর্গীয়া সরোজ-নলিনী দত্ত প্রণীত। ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড হইতে সুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যে এইখানি একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিবে। সহজ সরলভাষায় লেখিকা, জাপান ও জার্ম্মান-যাত্রার পথের যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ সম্বন্ধে যে সকল তুলনা মূলক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কত প্রখর ছিল ও দেশের জন্য তাঁহার কি ঐকান্তিক প্রীতি ছিল। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি বাঙালীমেয়েদের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। জাপানের নারী-প্রগতি দ্রুত সংঘটিত হইয়াছে ও আজ তাহারা সমাজে রাষ্ট্রে কি ভাবে নিজেদের ন্যায্য অধিকার গ্রহণ করিয়াছে তাহার ইতিহাস বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। আমরা এই বইটির প্রচার কামনা করি।

সঞ্চিতা—(কবিতা পুস্তক) কাজি নজরুল ইসলাম। প্রকাশক, ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মূল্য ২।।০ এই পুস্তক খানিতে কাজি নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রচেষ্টার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তাঁহার দশখানি কাব্যগ্রন্থের তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবি নজরুলের কবিতা ও কাব্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রচ্ছদ-পটের তিন-রঙা চিত্রখানি চমৎকার।

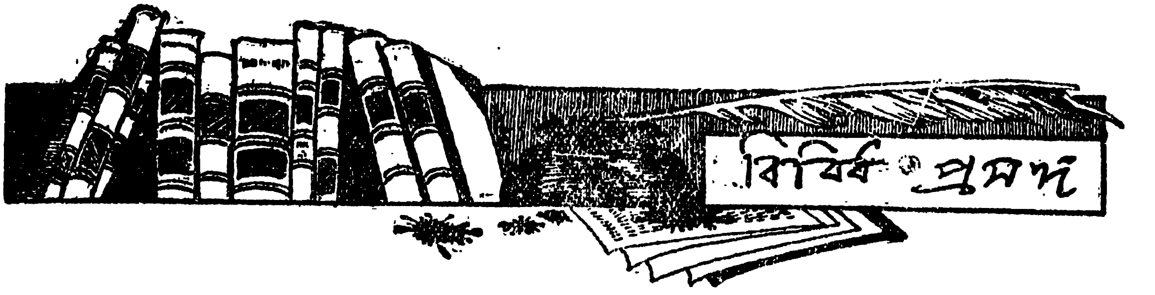
বুলবুল—(গানেরবই) কাজি নজরুল ইসলাম, প্রকাশক ডি-এম লাইব্রেরী ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা মূল্য ১৲ টাকা, উপহারের সংস্করণ ১।০। কাজি নজরুল ইস্‌লামের গজল গানগুলি আজকাল বাজারে খুব চলিতেছে। এই পুস্তকে তাঁহার আধুনিকতম গজল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। ছাপাই বাঁধাই সুন্দর।

—গ—

বনে জঙ্গলে—শ্রী যোগেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক সিটিবুক সোসাইটী ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২৲ টাকা।

ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য নানা দেশে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে হিংস্র বন্য জন্তু এবং সভ্য মনুষ্যের সহিত নানা রোমাঞ্চকর সংঘর্ষের বর্ণনায় এই পুস্তকখানি পূর্ণ। গ্রন্থকার বাংলা-দেশের শিশু-সাহিত্যর প্রবর্ত্তক। তাঁহার এই নূতন পুস্তক। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের শিশু সাহিত্য রচনায় তাহার কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু এই খানিকে শিশু-সাহিত্যের কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও পক্ষে ইহা কম উপযোগী হয় নাই। শিকারের গল্প বাংলা সাহিত্যে বিরল হইলেও একেবারে নাই বলা চলে না, কিন্তু দেশে-বিদেশে বন্য পশু শিকারের এবং বন্য পশু সংক্রান্ত অন্যান্য নানা প্রকারের অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্বলিত এতগুলি গল্প অন্য কোনও বাংলা পুস্তকে সমাবেশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

এই পুস্তকটির প্রত্যেকটি গল্প কোনও না কোনও সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু বিস্ময়, ভীতি বা রোমাঞ্চ উৎপাদনে পুস্তক-খানি যে-কোনো ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বা ভূতের গল্পের বইকে হারাইতে পারে। বিশেষভাবে অবসর-বিনোদনের জন্য গল্পগুলি লিখিত হইলেও একদিকে মানুষের অধ্যবসায় সাহস ও অনুসন্ধিৎসায়, অপরদিকে বনের পশুর আচার ব্যবহারের ঘনিষ্ট পরিচয় এই বইটিতে পাওয়া যায়। বহুস্থলে বিদেশী পুস্তক ও পত্রিকা হইতে অনুবাদ সত্ত্বেও ইহার ভাষার মধ্যে কোথায়ও লেশমাত্র আড়ষ্টতা নাই। এই এইরূপ সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বই পড়িলে বাংলা দেশের বালক বালিকারা সহজেই মাতৃভাষা শিখিবে। পুস্তকখানির আর একটি প্রধান অঙ্গ—ইহার চিত্রগুলি। ঠিক যে ধরণের ছবি যে গল্পটিতে দরকার, তাহাই যেন বাছিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবি ও লেখার পরস্পরের সহযোগিতায় মনে হয় যেন প্রত্যেকটি ঘটনা চোখের সামনে জীয়ন্ত হইয়া উঠিতেছে। সর্ব্বশেষে বলিতে চাই, প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের অঙ্কিত প্রচ্ছদ পটের চিত্রে সমগ্র পুস্তকের বিষয় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—বলিষ্ঠ পশুর দুর্দ্দান্ত হিংস্রভাব শিল্পীর রেখাপাতের মধ্য দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই মনোরম। শ্রী হিরণকুমার সান্যাল।



বঙ্গের স্বাধীনতাসঙ্ঘ

ভারতের কোন রাজনৈতিক দলই কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত ডোমিনিয়ন শাসন-প্রণালী অপেক্ষা কম গণতান্ত্রিক কোন শাসনপ্রণালী চান নাই। এইজন্য নেহরু কমিটির রিপোর্টে এই ন্যূনতম দাবী ভারতবর্ষের দাবী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রিপোর্টে কিন্তু ইহাও লিখিত হইয়াছে, যে, যাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণস্বাধীনতা চান, তাঁহারা (ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করিলেও) উহার জন্য আন্দোলন করিতে পারিবেন। সেই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌতে যখন নেহরু কমিটির রিপোর্ট আলোচিত হইতেছিল, তখনই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হয়; ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর প্রাদেশিক স্বাধীনতাসংঘগুলি গঠিত হইতেছে। বাংলার সংঘ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য, মত প্রভৃতির যে বর্ণনাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শুধু যে রাজনৈতিক আদর্শের কথাই আছে, তাহা নহে; পণ্যশিল্পাদির দ্বারা ধন উৎপাদন, ধনের ন্যায্য বণ্টন, ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়ে সংঘের মত ও লক্ষ্য বর্ণিত হইয়াছে; জমীর খাজনার ন্যায্য বন্দোবস্ত, জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে মত ব্যক্ত হইয়াছে। সামাজিক বিষয়ে জাতিভেদের পূর্ণ বিলোপ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সকল বর্ণের লোকের এক-পংক্তিতে ভোজন ও বৈবাহিক আদান-প্রদান, নারীদের অবরোধপ্রথার লোপ, তাহাদের শিক্ষার অবশ্যকৃত্যতা, ব্যায়ামাদি দ্বারা তাহাদের দৈহিক উৎকর্ষ-সাধন, বিধবাদের বিবাহ করিবার স্বাধীনতা, দায়াধিকার সম্বন্ধে পুরুষ ও নারীর সাম্য, বহুবিবাহ বিলোপ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে বিবাহে উৎসাহ দান, বাল্যবিবাহ লোপ, পণদান ও গ্রহণ প্রথার বিলোপ ইত্যাদি সমর্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিশ্বাস ও মত কিরূপ হইবে, সংঘের প্রতিষ্ঠাতারা তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন, যে, কোন বংশের লোকেরা সেই বংশে জাত বলিয়াই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পুরোহিত ও গুরু হইতে পারিবে না, এবং পেশাদার পুরোহিতদের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রত্যেক মানুষকে ধার্ম্মিক ক্রিয়াকলাপ স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে উৎসাহিত করা হইবে।

বঙ্গীয় স্বাধীনতাসংঘের সূচনাপত্রে যাহা-কিছু লেখা হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। যিনি যখন বড় বড় কথা বলিবেন, তখনই তাহার আলোচনা করিতে হইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। বক্তারা বা লেখকেরা যাহা বলিতেছেন, তাহা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁহাদের আছে, করিবার কতকটা শক্তি আছে, যাহা করিতে চান সে বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছেন—এইরূপ প্রমাণ যদি পরে পাওয়া যায় তখন যথাসাধ্য আলোচনা বিবেচ্য হইতে পারে।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য হইবার যোগ্য ইহা 'প্রবাসী'তে অনেকবার লেখা হইয়াছে। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাধীনতালাভের কোন কোন সাধ্যায়ত্ত উপায় আমাদের জানা না থাকায় আমরা কেবল লক্ষ্য নির্দ্দেশই করিয়াছি এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও যাহা যাহা আমাদের করণীয় থাকিবে বর্ত্তমান সময়েও সেই সকল বিষয়ে স্বদেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকি। এই সকল বিষয়ে মন দিলে স্বাধীনতা লাভের এবং লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার সুবিধাও হইবে।

সূচনাপত্রে নির্দ্দিষ্ট করণীয় কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা স্বাধীনতাসংঘের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে রাজশক্তি না আসিলে তাঁহারা করিতে পারিবেন না। সেগুলি করিতে হইলে আইন করিতে ও আইন জারী করিতে হইবে। আর্থিক অসাম্য দূরীকরণের, শ্রমোৎপাদিত ধনের ন্যায্য বণ্টন, জমীদারীপ্রথার উচ্ছেদ, কারখানার লাভের অংশ শ্রমিকদিগকে দান, বার্দ্ধক্যে অভাবগ্রস্ত সকলকে পেন্সান দান, ইত্যাদি নানাবিষয়িণী ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যতিরেকে করা যায় না। সুতরাং এগুলি স্বাধীনতাসংঘ করিতে না পারিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এইসকল বিষয়েও সংঘের সহিত সংসৃষ্ট লোকদের অকপটতার পরিচয় দিবার সুযোগ বর্ত্তমান সময়েও ঘটিয়া থাকে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি যে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন পাস হইয়াছে, তাহার ধারাগুলি লইয়া তর্কবিতর্কের সময় স্বরাজী সভ্যেরা জমীদারদের পক্ষই বেশী করিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, এইরূপ অভিযোগ বিস্তর কাগজে বাহির হইয়াছে। এই অভিযোগের সমুচিত জবাব স্বরাজী কাগজে দেখি নাই। ন্যায়ত জমীদারদের পক্ষেই ভোট দেওয়া উচিত ছিল

কি না, তাহা এখানে বিবেচ্য নহে। এখানে কেবল ইহাই বিবেচ্য, যে, যাঁহারা সুযোগ পাইয়াও প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাদেরই কেহ কেহ এবং তাঁহাদের অনেক সহকর্ম্মী ও অনুচর এখন জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ, ন্যায্য খাজনা প্রবর্ত্তন, কৃষিঋণ নাকচ করা প্রভৃতির আশা ও প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। এইরূপ কারণে, তাঁহাদের আচরণে সঙ্গতি ও অকপটতা নিশ্চয়ই আছে বলিতে পারা যাইতেছে না।

কতকগুলি সংস্কার আছে, যাহা রাষ্ট্রশক্তির ও আইনের সাহায্য ব্যতিরেকেও সম্পাদিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

স্বাধীনতা-সংঘের সূচনাপত্রে আছে, যে, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের কারখানায় লোক নিয়োগ ও পদচ্যুত করায় শ্রমিকদেরও হাত থাকিবে, এবং কারখানা পরিচালনাতেও তাহাদের হাত থাকিবে। কারখানার লাভে শ্রমিকদের অংশ থাকিবে। প্রত্যেক কারখানায় এই রূপ নিয়ম চালাইতে হইলে আইনের দরকার। কিন্তু সংঘের সভ্যদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারখানার মালিক বা অংশীদার থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঐরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে আইন বাধা দিবে না। সংঘের সভ্যদের তালিকা যাঁহাদের নিকট আছে, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন, কারখানার পূর্ণ, বা আংশিক মালিক তাঁহাদের মধ্যে কেহ আছেন কিনা, এবং, থাকিলে, তিনি ঐরূপ নিয়ম চালাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন।

ধনের ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টন সংঘের আর একটি করণীয়। সংঘের সভ্যেরা নিজেদের ধন বা ধনের কোন অংশ এই প্রকারে বাঁটিয়া দিতে পারেন। আইন তাহাতে বাধা দিবে না। বাঁটিয়া দিতেছেন কিনা, অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া এবং সাধারণ লোকদের খাওয়া পরা থাকার আদর্শ উঁচু করা অন্য দুটি করণীয়। সভ্যদের মধ্যে জমীদারেরা প্রজাদিগকে এবং অন্য সঙ্গতিপন্ন সভ্যেরা ভৃত্য ও আশ্রিতবর্গকে এই উভয় দিকে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, জানা দরকার। আইন এরূপ সাহায্য দানের বিরোধী নহে। তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্যে কি তাঁহাদেরই মত বাড়ীতে থাকে, তাঁহাদেরই মত খায় পরে, যানবাহন ব্যবহার করে, ভাল ভাল স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার সুযোগ পায়?

সংঘের আর একটি করণীয় ব্যক্তিগত মূলধন সীমাবদ্ধ করা। সভ্যেরা কি ত্যাগী হইয়া স্থির করিয়াছেন, যে, ধনের একটা সীমায় উপস্থিত হইলে তদূর্দ্ধ টাকা তাঁহারা দান করিয়া ফেলিবেন? আইন এরূপ প্রতিজ্ঞাপালনে বাধা দিবে না। এরূপ প্রতিজ্ঞাপালন অসাধ্যও নহে। সংঘ যদি এক কোটি টাকা সীমা নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সভ্যেরা সকলেই এই নিয়ম পালন করিতে পারিবেন। ভাগ্যক্রমে কাহারও মূলধন এক কোটি এক টাকা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ এক টাকা দান করিতে কিম্বা সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

আইনের সাহায্য না লইয়া এবং বর্ত্তমান কোন না কোন আইনের সাহায্য লইয়া সামাজিক অনেক সংস্কার সাধন করা যায় যথা জাতিভেদ বর্জ্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ইত্যাদি। সংঘের সভ্যেরা আহারে এবং নিজেদের ও সন্তানদের বিবাহে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতেছেন কিনা, লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সদ্য সদ্যই দেখিতে হইবে, তাঁহারা পাচকের কাজে বামুন না রাখিয়া হাড়ি মুচি বাউরী বাগদী প্রভৃতি জাতির লোক নিযুক্ত করিতেছেন কিনা। এই সকল সংস্কার করিবার জন্য ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের অপেক্ষায় থাকা অনাবশ্যক।

অবরোধপ্রথা দূরীকরণ, নারীদিগকে শিক্ষা দান, বিধবাদের বিবাহ দেওয়া, ইত্যাদি বিষয়ে সভ্যেরা আগে কোন উৎসাহ দেখাইয়াছেন কিনা, জানি না; কিন্তু অতঃপর তাঁহাদের পশ্চাৎপদ থাকিলে চলিবে না। বাল্য-বিবাহ দূরীকরণেও তাঁহাদিগকে কার্য্যত সচেষ্ট হইতে হইবে।

সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা অবিবাহিত, তাঁহারা যেন প্রকাশ্যে বা গোপনে পণ না লইয়া বিবাহ করেন। পণ না লইলে মাতৃদেবী আত্মহত্যা করিবেন, কিম্বা একটি খুকীকে বিবাহ না করিলে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী দেবী প্রায়োপবেশন করিবেন—এবম্বিধ কারণ যে-যে স্থলে প্রদর্শিত হইবে, তাহা স্বাধীনতাসংঘের কোন নিয়মে ব্যতিক্রমস্থল বলিয়া উল্লিখিত থাকিবে কিনা, জিজ্ঞাস্য। বর যদি সভ্য না হন, বরের বাবা সভ্য হন, তাহা হইলে বর কর্ত্তৃক পণ লওয়া বোধ হয় চলিতে পারে। বর যদি সভ্য হন, বরের বাবা সভ্য না হন, তাহা হইলে বরের বাবা পণ লইলে তাহা নিয়মভঙ্গ বলিয়া অবশ্য গণিত হইবে না।

সভ্যদের মধ্যে কয়জন পৈত্রিক গুরু ও পৈত্রিক পুরোহিতদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ব্রহ্মদেশে জেলে থাকিতে প্রাণপণ করিয়া দুর্গা-পূজার অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। পৌরোহিত্যও নিজেই করিয়াছিলেন কি? তখন না করিয়া থাকিলে, আশা করা যায় এখন হইতে তিনি ও অন্য সব সভ্য সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠান পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেই করিবেন

বঙ্গের একজন শক্তিমান্ পুরুষ একবার সংস্কারক বলিয়া পরিচিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি

সংস্কারকদের চেয়েও বড় সংস্কারক।" স্বাধীনতাসংঘের প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতারাও বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম সংস্কারক পর্য্যন্ত সকলকে নিজেদের ফর্দ্দের বিশালতা ও ব্যাপকতায় পরাস্ত করিয়াছেন। কারণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি উপদেষ্টাদের অধিকাংশ জীবনের এক একটি বিভাগেই কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-সংঘের লেখার ও বক্তৃতার দৌড় কোন দিকেই বাধা মানে না। কাজের দৌড়ও তদ্রূপ হইবে কি?

—

"নিম্ন অধিকারী"

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রাচীনপন্থী হিন্দুও রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় যোগ দিয়া সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উদ্যোগী আগে আগে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা ও অন্যান্য সংস্কারপ্রয়াসীরাই হইতেন। সুখের বিষয়, ক্রমশ অন্যেরাও এখন এবিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছেন। কারণ, রামমোহন রায় কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দলের একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন। যে-কেহ তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, যে-কেহ তাঁহার আদর্শ অনুসরণীয় মনে করেন, তিনি তাঁহারই আত্মীয়। দেশী বিদেশী সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার।

বর্ত্তমান বৎসরে হিন্দু মিশন রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি সভা আহ্বান করেন। অনুরুদ্ধ হইয়া আমি তাহার সভাপতির কাজ করিয়াছিলাম। বক্তারা সকলেই রামমোহনের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন। দুই জন বক্তা বলেন, রামমোহন রায় স্বীকার করিয়াছেন, যে, মূর্ত্তিপূজা নিম্ন অধিকারীর পক্ষে অনাবশ্যক বা অবৈধ নহে; তাঁহারা ঠিক্ কি কি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন মনে নাই, তাৎপর্য্য দিলাম। সভাস্থলে এ বিষয়ের কোন প্রকার আলোচনা করা আমি উচিত মনে করি নাই। এখানেও তাহা করিব না। নিম্ন অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা আবশ্যক, বৈধ, কর্ত্তব্য প্রভৃতি যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সসম্মান-অনুরোধ করিতেছি।

আমাদের দেশের এমন কোন রাজনৈতিক দল বা ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক সমিতি নাই, যাঁহারা ভারতীয় বিস্তর লোককে সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত মনে করেন না। বস্তুতঃ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, নানা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, সামরিক নানা বিভাগ—যে-কোন বিভাগের যে-কোন কাজের যোগ্য ভারতীয় লোক পাওয়া যায়, ইহা ভারতীয়েরা বিশ্বাস করেন, এবং এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন নহে। দর্শনের, বিজ্ঞানের, গণিতের, সাহিত্যের অতি সূক্ষ্ম, জটিল, গভীর ও দুরূহ তত্ত্ব ভারতীয়দের অধিগম্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা মনে করি, আমাদিগকে সকল বিষয়ে জোর করিয়া অধিকারচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্যদিকে, আমাদের প্রভু ইংরেজরা বলেন, "তোমরা অধিকাংশই নিম্ন অধিকারী; দু দশ জন ধীরে ধীরে যেমন উচ্চ অধিকারী হইতেছে, অমনি তাহাদিগকে কঠিন কাজের ভার দেওয়া হইতেছে।" এরূপ কথার প্রতিবাদ করিয়া আমরা বলি, "না, আমরা উচ্চ অধিকারী; তোমরা জোর করিয়া আমাদিগকে নিম্ন অধিকারী করিয়া রাখিয়াছ।"

প্রাচীন কালের বহু ঋষি, মধ্যযুগের নানক কবীর প্রভৃতি এবং আধুনিক সময়ে রামমোহন তাঁহাদের দেশবাসীদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে উচ্চ অধিকারী হইবার ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ অধিকারী হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভারতীয়দিগের মধ্যে, অশিক্ষিতদের কথা দূরে থাক, খুব প্রতিভাশালী বিদ্বান বুদ্ধিমান অনেক লোকও বলিতেছেন, 'না, আমরা নিম্ন অধিকারী; উচ্চ অধিকারের যোগ্য আমরা নহি, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিম্ন অধিকারীই থাকিব।" যাঁহারা অন্য সব বিষয়ে ভারতীয়দের জন্য উচ্চ অধিকারের দাবী করেন, ধর্ম্ম বিষয়ে উচ্চ অধিকারের দাবী না করিয়া তাঁহারা নিম্ন অধিকারীই কেন থাকিতে চান, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, ইহাই আমার সবিনয় অনুরোধ। এই প্রশ্নের উত্তর আমি চাহিতেছি না। মূর্ত্তিপূজকেরা নিম্ন অধিকারী, ইহাও আমার উক্তি নহে, তাঁহাদেরই কাহারও কাহারও উক্তি। মূর্ত্তিপূজক না হইলেই উচ্চ অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ জীব হওয়া যায়, ইহাও আমি বিশ্বাস করি না। অন্য সব বিষয়ে নিজেদের উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিব, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে নিম্ন-অধিকার-বাদের সাহায্য অধিকাংশ দেশবাসীর পক্ষে আমরণ লইব, এবম্বিধ মনোভাবের কারণ সকলেরই চিন্তনীয়।

এবিষয়ে কোন আলোচনা বা বাদানুবাদ প্রবাসীতে ছাপা হইবে না, কিন্তু আমার লিখিত কোন তথ্যে ভুল থাকিলে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে।

—

রামমোহন ও বিবেকানন্দ

হিন্দু মিশনের রামমোহন স্মৃতিসভায় স্বামী বিবেকানন্দের নামের উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের উক্তিতে আমার মনে পড়িয়া যায় ও আমি বলি, ভগিনী নিবেদিতার একখানি বহিতে আছে, যে, স্বামীজি বলিতেন তিনি রামমোহনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতেছেন। "ধম্মপদ" নামক পালি গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু তাহাতে বলেন, যে, তিনিও স্বয়ং স্বামীজিকে রামমোহনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ কথা বলিতে একাধিক বার শুনিয়াছেন।

যাঁহারা স্বয়ং শক্তিমান, তাঁহারা নিজেদের উপর অন্যের প্রভাব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না।

—

রামমোহন ও শুদ্ধি

রামমোহন রায়কে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকেরা নিজের লোক বলিয়া দাবী করিয়াছেন। হিন্দু মিশনের সভায় একটি নূতন কথা শুনিলাম। তাঁহারা বলেন, রামমোহনই (কথায় না হইলে ও) কার্য্যতঃ শুদ্ধির পথ-প্রদর্শক। এক জন বক্তা বলিলেন, রামমোহন যে বালকটিকে পালন করিয়াছিলেনও যে রাজা রাম নামে পরিচিত, সে বংশতঃ মুসলমান ছিল। ইহার কোন প্রমাণের উল্লেখ বক্তা করেন নাই। একটি পরোক্ষ প্রমাণের কথা বা অনুমান আমাদের মনে হইতেছে। রামমোহন রায় যখন বিলাত যান, তখন তিনি যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অনুচরদের মধ্যে জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় শেখ বক্সু নামক এক জনের নাম ছিল,রাজা রাম বলিয়া কোন লোকের নাম ছিল না। কিন্তু বিলাতে তাঁহার পোষ্যদের মধ্যে শেখ বক্সু নামক কেহ ছিল না, রাজা রাম ছিল। এই গরমিলের কারণ এপর্য্যন্ত এই রূপ অনুমিত হইয়া আসিতেছে, যে, এদেশ হইতে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে কোন কারণে শেখ বক্সুর যাওয়া হয় নাই, রামমোহন রায় তাহার জায়গায় রাজা রামকে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অদল-বদল ত হঠাৎ হইতে পারে না, জাহাজে বিদেশ যাত্রা করিতে হইলে হুকুম লইতে হয়। শেখ্ বক্সুর জন্য হুকুম লওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে, রাজা রামের জন্য হুকুম লইবার কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য ইহাই সম্ভব, যে, বক্সুকেই রামমোহন রায় রাজা রাম নাম দিয়াছিলেন।

এই অনুমান সত্য হইলেও অবশ্য ইহা প্রমাণ হয় না, যে, বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধি বলিতে যাহা কিছু বুঝায় রামমোহন তাহার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য, যে, তিনি কোন ধর্ম্মের লোককেই অবজ্ঞা করিতেন না, সুতরাং মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, মনে করিতেন।

—

রামমোহনের অগ্রদৌত্য

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে রাজনৈতিক সামাজিক ও অন্য কোন কোন বিষয়ক যে-সব আন্দোলন ও প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়, তিনি সেই সকলের সূত্রপাত তাঁহার নানা কাজে ও রচনায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত ও রচনাবলী সম্বন্ধে যত নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে, ততই বুঝা যাইতেছে, যে, তিনি আগাম জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের কথা তিনি আগেই বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের যে কয়টি চিঠি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের অগ্রদৌত্যের নূতন প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন কোন কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা সকল মানুষের ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধে যাহাই বলিয়া থাকুন, সকল দেশ ও জাতির ভাগ্য ও মঙ্গলামঙ্গল যে পরস্পরের সহিত জড়িত, সমুদয় মানব যে এক বৃহৎ পরিবারের মত, রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইহা সবেমাত্র অধুনা কথায় স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—কাজে এখনও অল্পই স্বীকৃত হইয়াছে। এন্‌থ্রপলজিষ্ট অর্থাৎ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এখনও শ্বেতবর্ণ এমন বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা উত্তর-য়ুরোপের জাতি-সকলকে ও তাঁহাদের বংশধরদিগকে অর্থাৎ নর্ডিকদিগকে অন্য সব মানুষের চেয়ে মূলতঃ শ্রেষ্ঠ মনে করেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের সেবকগণ সকলে এখনও সমগ্র মানবজাতির একত্ব স্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু ১৮৩১ সালে রামমোহন রায় ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখিতেছেন :—

"It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which the numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

তাৎপর্য্য। ইহা আজকাল সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে, যে, শুধু ধর্ম্ম নহে কিন্তু কুসংস্কারমুক্ত সাধারণ বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলও আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে সমগ্র মানবজাতি এক বৃহৎ পরিবার এবং নানা দেশবাসী জাতি ও উপজাতি তাহার শাখা মাত্র। এই জন্য সমুদয় মানবজাতির সুখ সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরের মিলামিশা ও আদান প্রদানের পথে সকল অন্তরায় দূর করিয়া এইরূপ মিলামিশা সহজ করিতে সব দেশের প্রজ্ঞালোকপ্রাপ্ত লোকেরা নিশ্চয়ই চাহিবেন।

এখনও ইউরোপ আমেরিকার সভ্যদেশসকলে ও তাহাদের অধিকৃত অন্য সব দেশে, ছাড়পত্র বা পাস্‌পোর্ট না দেখাইলে কোন বিদেশীকে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। রামমোহন রায় ইংলণ্ড পৌঁছিয়া তথা হইতে ফ্রান্স দেখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই নিমিত্ত, ছাড়পত্র দাবী করিবার প্রথাটাই যে খারাপ, তাহাই নানা যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়া তিনি ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে উদ্ধৃত কথাগুলি আছে। "ইহা আজকাল সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে," বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু এখনও সাধারণতঃ স্বীকৃত হয় না; তাঁহার নিজের উজ্জ্বল উদার বিশ্বাসকে সাধারণ ধারণা বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন।

য়ুরোপের মহাদেশে কোথাও কোথাও এবৎসর ছাড়পত্র প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন ইহার নিকৃষ্টতা ও অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি উল্লিখিত পত্রে ইহাও লিখিয়াছিলেন, যে, বিদেশীদের নানা দেশে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের ছাড়পত্ররূপ বাধা এশিয়ার জাতিদের মধ্যে নাই (চীন ছাড়া)। অর্থাৎ এ বিষয়ে এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের লোকেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে হেগ্ নগরে আলোচনা ও সালিসীর দ্বারা শান্তিস্থাপনার্থ আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপিত হয়। যুদ্ধ না করিয়া জাতিতে জাতিতে বিবাদের মীমাংসা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। তৎপরে, গত মহাযুদ্ধের পর জেনীভায় যে লীগ্ অব্ নেশ্যন্স্ বা মহাজাতি-সংঘ স্থাপিত হইয়াছে, তাহারও অন্যতম উদ্দেশ্য বিনাযুদ্ধে জাতিতে জাতিতে ঝগড়াবিবাদের মীমাংসা। রামমোহন তাঁহার ১৮৩১ সালের উল্লিখিত চিঠিতে বিনাযুদ্ধে জাতিতে জাতিতে বিবাদ নিষ্পত্তির উপায় সূচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

'I beg to observe that it appears to me the ends of constitutional government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a congress composed of an equal number from the Parliament of each; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the chairman to be chosen by each nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other; such as at Dover and Calais for England and France.

"By such a congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civilised countries with constitutional governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved betweent them from generation to generation."

তাৎপর্য্য। কোন দুই দেশের মধ্যে কোন বিষয়ে রাজনৈতিক মতভেদ হইলে বিবাদের বিষয়টি উভয় দেশের পার্লেমেণ্টের সমসংখ্যক সভ্য লইয়া গঠিত একটি কংগ্রেসের নিকট নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত করিলে নিয়মতন্ত্র গবর্ন্মেণ্টের উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইতে পারে। এই কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যের মত উভয় জাতিকে গ্রাহ্য করিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক জাতি হইতে এই কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইবে, ইহার অধিবেশন পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে হইবে, যেমন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে ডোভার ও ক্যালেতে।

এই প্রকার কংগ্রেস দ্বারা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অধীন সভ্য কোন দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বা বাণিজ্যিক সকল বিবাদের বিষয় ন্যায়সঙ্গত রূপে ও বন্ধুভাবে মীমাংসিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে পুরুষানুক্রমে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষিত হইতে পারে।

রামমোহনের এই চিঠিখানির মধ্যে যুদ্ধনিবারণের যে উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইলে অবশ্য তাহার কোন কোন কোন পরিবর্ত্তন দরকার হইত; কিন্তু ইহার ভিত্তিগত নীতিটি ঠিক্। এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভারতীয় একজন মনীষী যুদ্ধনিবারণ বাঞ্ছনীয় ও সাধ্যায়ত্ত মনে করিয়াছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা জাতীয় আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারি। কিন্তু রামমোহনের স্বজাতি বলিয়া দাবী করিতে হইলে তদুপযুক্ত জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহা আমরা করিতেছি কি না, প্রত্যেককে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

—

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ১৯২৭ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ঐ বৎসর উহার সভ্যসংখ্যা ১৬২ ছিল। সভ্যদের যোগ্যতা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিয়মাবলী যদি বহুবিস্তৃত না হয়, তাহা হইলে রিপোর্টের মধ্যে তাহা প্রতি বৎসর মুদ্রিত হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, এরূপ একটি উৎকৃষ্ট ও হিতকর প্রতিষ্ঠানের এই সভ্যসংখ্যা যথেষ্ট ও আশানুরূপ কি না।

১৯২৭ সালে ইহার আয় ৬৪০৮০৫/৭ এবং ব্যয় ৫৬৭০৭১,/৮ হইয়াছিল।

প্রধানতঃ যাঁহাদের প্রদত্ত মূলধনাদি হইতে পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তাঁহাদের নাম রিপোর্টে আছে; যথা—স্যার রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ এবং বাবু দুর্গাদাস বসু।

১৫টি বিদ্যালয় পরিষদের অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত। ১৯২৭ সালে তাহারা মোট ৩৪০০ টাকা সাহায্য পাইয়াছিল।

পরিষদ শিয়ালদহ হইতে ৫ মাইল দূরে যাদবপুরে শিক্ষাভবন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, কারখানা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিজের নলকূপ হইতে ঘণ্টায় ৮০০০ গ্যালন ভাল পানীয় জল পাইয়া থাকেন। তাড়িত আলোক ও শক্তি সরবরাহের জন্য নিজের যন্ত্রাদি বসাইয়াছেন। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের জন্য গ্যাস পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইমারৎ প্রভৃতিতে এ পর্য্যন্ত ৭৭৩৭৮২।৩ খরচ হইয়াছে।

পরিষদের শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের নাম বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌স্‌টিটিউট। ইহাতে যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমেরিকার ও জার্ম্মেনীর ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্য অধ্যাপকগণ এখানে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সিটি এণ্ড্ গিল্‌ডস্ অব্ লণ্ডন ইন্‌স্‌টিটিউট পরীক্ষার কর্ত্তৃপক্ষ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটের ছাত্রদিগকে নিজেদের পরীক্ষা দিতে দিয়া থাকেন। ইহার কুড়ি জন ছাত্র ১৯২৭ সালে ঐ পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। ইহার দুজন ছাত্র এডিনবরায় দেড় বৎসরের মধ্যে বৈদ্যুতিক এঞ্জিনীয়ারিংএ প্রথম শ্রেণীর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তন্মধ্যে একজন পারদর্শিতা অনুসারে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

ছাত্রদের দৈহিক উন্নতি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানা প্রকার খেলার বন্দোবস্ত আছে। ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা হইয়া থাকে। বিশ্বভারতীতে তিব্বতী ও চীন ভাষা ও সাহিত্যের এবং তিব্বত ও চীনদেশে বিদ্যান ভারতীয় সাহিত্যের চর্চ্চার সুযোগ থাকায় তাহার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় চীন তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায় হিন্দু সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই সমস্ত বক্তৃতা ইংরেজীতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

পরিষদ কৃষি শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

১৯২৭ সালে ইহার ছাত্র সংখ্যা ৫৮৫ ছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী পরিষদকে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে জাতীয় স্বাবলম্বনের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে এই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা ইহাকে অর্থ দিয়া ও অন্য সেবা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, এবং প্রতি বৎসর প্রায় এক শত ছাত্রকে নানাবিধ শিক্ষা দিয়া উপার্জ্জনক্ষম করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে সমর্থ করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন।

—

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

এবৎসর বঙ্গের যে সকল জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সর্ব্বত্রই মাঠের ধান মালিকদের গৃহে সঞ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষে নিরন্ন লোকদিগকে অন্ন দিতে হইবে। কিন্তু ভীষণতর সত্য কথা এই যে, দুর্ভিক্ষ না হইলেও দেশের বিস্তর লোক সকল সময়েই অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় থাকে। সুতরাং শুধু দুর্ভিক্ষের সময়েই কতকগুলি লোককে বাঁচাইয়া রাখিলে দেশের দুরবস্থার প্রতিকার হইবে না; সকল সময়েই যাহাতে সকলে খাইতে পরিতে পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বঙ্গের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়ার কয়েকটি গ্রামে সাহায্যে দিবার ভার বাঁকুড়া সম্মিলনী লইয়াছেন। প্রেরিত সাহায্য গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে পাঠাইবার ভার প্রবাসীর সম্পাদকের উপর সম্মিলনী অর্পণ করিয়াছেন। যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এই কারণে, আরও দুই মাস কি করিয়া চলিবে ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে। বিশেষতঃ সম্মুখে পূজা উপস্থিত বলিয়া সকলেরই এখন অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। তবে, তাহারই সামান্য অংশ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের জন্য প্রেরিত হইলে অনেকের প্রাণ বাঁচিবে। যাঁহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে অনেক লোক খাওয়ান হয়, তাঁহারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকেও অতিথি মনে করিয়া তাহাদের জন্য কিছু সাহায্য পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। প্রবাসী কার্য্যালয় ৪ঠা কার্ত্তিক বন্ধ হইবে। আমাদিগকে যাঁহারা টাকা পাঠাইতে চান, তাঁহাদের টাকা যাহাতে ঐ তারিখের পূর্ব্বেই আমাদের হস্তগত হয়, এরূপ আগে পাঠান দরকার। চিঠি অপেক্ষা মনিঅর্ডার পৌঁছিতে ২।১ দিন দেরী হয়।

ক্ষুদ্র সহর হইতেও চেষ্টা করিলে বিপন্ন লোকদের জন্য কিরূপ সাহায্য প্রেরিত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের ৩০শে শ্রাবণ তারিখের চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমাদের কমিটি হইতে স্থির হইয়াছে, আপাততঃ বর্দ্ধমানে ২০০ টাকা ও ১০ মণ চাউল, বাঁকুড়ায় ৫০০

টাকা ও অর্দ্ধেক কাপড় জামা (২০৩ খানি) এবং বালুরঘাটে ৭০০ টাকা ও অর্দ্ধেক কাপড় জামা (২০৩খানি) উপস্থিত দেওয়া। আমি এই সহিত একখানি পাঁচশত টাকার চেক ও ফর্দ্দমত পুরাতন ও নূতন কাপড় জামা ২০৩ খানা বাঁকুড়ার জন্য পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। আমাদের সাহায্যসমিতিতে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে সাহায্য-অভিনয় দ্বারা চন্দননগর নাড়ুয়া নাট্যসমাজের সভ্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভিক্ষা দ্বারা এবং সহৃদয় লোকেদের নিকট হইতেও সাহায্য পাইয়াছি। সমস্ত হিসাব পত্র ঠিক হইলে সাধারণের নিকট উহা প্রকাশ করা হইবে, এবং উদ্বৃত্ত টাকা বা আরও যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা কমিটির নির্দ্দেশ মত দান করা যাইবে।"

—

চীনদেশীয় অতিথি

চীন দেশীয় পণ্ডিত ও কবি সিমো স্যু ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে নামিবার পর এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যে, তিনি কবি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি পেকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন চীন ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া ও সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে আসিয়াছেন, বলিয়াছেন। তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথ চীনদেশ দর্শন করায় চীন ও ভারতের প্রাচীন শৈল্প, সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত করিবার পক্ষে সাহায্য হইয়াছে। তিনি বলেন, চীনদেশীয়েরা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল; রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে তাঁহাদের মনে সসম্ভ্রম ধারণা উৎপন্ন হওয়ায়, তাঁহারা ভারতবর্ষের সহিত আগেকার মত সভ্যতার যোগ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হয়েন। চীনদেশীয়েরা রবীন্দ্রনাথের চীনে আগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ক্রেসেণ্ট মুন সোসাইটী বা চন্দ্রলেখা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

চীনদেশের গৃহবিবাদজনিত যুদ্ধের সময় তথায় ভারত গবর্মেণ্ট ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করায় এদেশে দেশব্যাপী প্রতিধ্বাদ-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিবাদ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা চীনদেশে পৌঁছিয়াছিল এবং রেডিয়োর সাহায্যে তাহা সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সিমো স্যু মহাশয়ের প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাওয়া গেল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া একদিন রবীন্দ্রনাথের গৃহে অতিথি ছিলেন, পরে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শান্তিনিকেতন গিয়াছেন। তাঁহার সহিত ডাক্তার লী নামক একজন সুযোগ্য চীনদেশীয় নৃতত্ত্ববিৎ আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় নৃতাত্ত্বিক ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহের অতিথি ছিলেন।

—

চীনের দুষমন

চীনের গৃহবিবাদের সময় এবং তাহার অনেক আগে হইতে নানা পাশ্চাত্য জাতি তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং তাহার ধন শোষণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে বিশৃঙ্খল অনুন্নত অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কোন্ পাশ্চাত্যজাতি চীনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতা করিয়াছে, চীনের ইতিহাস বিশেষ করিয়া না জানিলে বাহিরের লোকে বলিতে পারে না। চীনের বিশেষ চিন্তাশীল ও জ্ঞানী কোন কোন লোকও এ বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ করেন না, বা করিতে ইচ্ছা করেন না। সবাই যখন দুষমন, তখন তাহার উনিশ বিশ নির্ণয়ে লাভ কি? কিন্তু বর্ত্তমানে চীনের সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বাধা এখন জাপান। ইহা চীনজাতীয় বিশেষজ্ঞদের মত। জাপানের সঙ্গে চীনের বিবাদের নিষ্পত্তি প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি জাপানের প্রধান মন্ত্রী যিনি হইয়াছেন, তিনি সামরিক শক্তির মাদকতায় মতিভ্রান্ত। তিনি চীন সাধারণতন্ত্র হইতে মাঞ্চুরিয়া ছিন্ন করিয়া জাপানের অধীন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই কারণে চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধও হইতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষ খুব কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারে, এবং কৃতজ্ঞতার খাতিরে স্বার্থত্যাগও করিতে পারে। কিন্তু সমগ্র একটা দেশ বা জাতি কৃতজ্ঞতার খাতিরে অন্য দেশের অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে বিরত থাকিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের মনে পড়িতেছে না।

ইতিহাস বলে, জাপান কোরিয়ার মারফৎ বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাহার সভ্যতার অন্য কোন কোন অংশ পাইয়াছিল। কিন্তু জাপান কোরিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে এবং তাহার উপর নানা অত্যাচার করিয়াছে; কখনও যে তাহার জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব ফিরাইয়া দিবে, তাহার নামটি মাত্র করে না।

জাপান তাহার সভ্যতার জন্য চীনের নিকট ঋণী। জাপানের বর্ণমালা চীনের নিকট হইতে প্রাপ্ত। শিল্প ও

সাহিত্যক্ষেত্রেও চীনের নিকট জাপানের ঋণ প্রভূত কিন্তু ইহা স্মরণ করিয়া জাপান কখন স্বার্থসিদ্ধি জন্য চীনের অনিষ্ট করিতে বিরত হয় নাই।

—

ভারতীয় সিবিলিয়ানের সম্মান

হাবড়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বাঁকুড়া ও বীরভূমে কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচনাদির ব্যবস্থা করাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই কারণে গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে একটু "সম্মানিত" করিয়াছেন। ইতালীর রাজধানী রোমে ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট অব এগ্রিকালচ্যার বা অন্তর্জ্জাতিক কৃষি প্রতিষ্ঠান নামক একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে ডি এন্ ব্যানার্জ্জি নামক এক জন ভারতীয় লোক কাজ করেন। ইহার নবম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে নানাদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইবেন। ভারতগবর্ন্মেণ্টের প্রতিনিধিদের সর্দ্দার প্রতিনিধি হইবেন শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত। ইহা মন্দের ভাল।

রোমের প্রতিষ্ঠানটিতে যদি রাজনীতির একটুও গন্ধ থাকিত, তাহা হইলে সর্দ্দার প্রতিনিধি নিশ্চয়ই ইংরেজ হইত।

—

লীগ্ অব্ নেশুন্স

লীগ অব নেশুন্সে ভারতবর্ষের নামে যত প্রতিনিধি প্রেরিত হয়, তাহাদের সর্দ্দার বরাবর একজন ইংরেজ হয়। ভারতীয়েরা ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যত্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, একজন ভারতীয়কে সর্দ্দার করা উচিত, বলিয়াছে। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; আইনসচিব শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস, ইহা অনাবশ্যক, বলিয়া দেশের অপমানে যোগ দিয়াছেন।

এবারকার সর্দ্দার লর্ড লিটন কিন্তু জেনীভায় লীগের অধিবেশনে দু-চারটা সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লীগের ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে; মিতব্যয়িতার সহিত ইহার কাজ চালাইবার বন্দোবস্ত নাই। ভারতবর্ষ ব্যয়ের ক্রমবর্দ্ধনশীল অংশ দিতে রাজী নয়; ভারতবর্ষের লোকেরা মনে করে, লীগের সভ্য থাকিয়া ভারতের কোন উপকার হয় না। লীগ কেবল পাশ্চাত্য জাতিদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র, প্রাচ্য জাতিদের কোন উপকার লীগের দ্বারা হয় না।

লর্ড লিটনের এই সব কথার তারিফ সব ভারতীয় কাগজে হইতেছে। কিন্তু এই সব কথা ও এইরূপ আরও অনেক কথা আমরা জেনীভা হইতে লিখিয়াছিলাম, এবং দেশে আসিয়াও বলিয়াছিলাম লিখিয়াছিলাম; তখন অল্পসংখ্যক সংবাদ পত্র দয়া করিয়া তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশ নীরব ছিলেন। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্য ডাঃ মিসেস্ বেসাণ্টের কোন কোন চিঠি তিনি বিলম্বে পান লেখায় সংবাদ পত্র মহলে খুব আন্দোলন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের চিঠিপত্র সম্বন্ধেও এইরূপ বিলম্বের অভিযোগ আমরা পত্রস্থ করায় অতি অল্প সংখ্যক কাগজেই তাহার উল্লেখ আলোচনা হইয়াছিল।

. অর্থাৎ সাধারণ অশ্বেত লোকের কথার ও অভিযোগের মূল্য কম, মান্যগণ্য শ্বেত মানুষদের কথা ও অভিযোগের মূল্য বেশী। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা চরম গণতান্ত্রিক তাঁহারাও ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে চলেন বলিয়া বোধ হয়।

—

কেলগ শান্তি চুক্তি

আমেরিকার অন্যতম মন্ত্রী কেলগের উদ্যোগিতায় যুদ্ধ নিবারণের ও শান্তিরক্ষার জন্য কয়েকটি জাতি একটি চুক্তিতে দস্তখত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর গবর্ন্মেণ্টের কোন ভারতীয় কর্ম্মচারী করেন নাই ইংলণ্ডের অস্থায়ী বৈদেশিক-মন্ত্রী লর্ড কুশেণ্ডান করিয়াছেন। ইহার আরও একটু মজার কথা আছে। কানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়্যানের পক্ষে উক্ত লর্ডের স্বাক্ষর করিবার কথা হয়। তাহাতে ডোমিনিয়নরা রাজী না হওয়ায় তাহাদের লণ্ডনস্থ হাই কমিশনাররা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ভারতবর্ষেরও একজন হাই কমিশনার আছেন। তিনি যোগ্য লোকও বটেন। তাঁহার নাম স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য হাই কমিশনারের মত তাঁহার দ্বারা চুক্তিটি-স্বাক্ষর করাইলে পাছে জগতের লোক ভারতবর্ষকে আত্মকর্তৃত্ব বিশিষ্ট ডোমিনিয়নগুলির সমশ্রেণীস্থ ভাবিয়া সম্মান করিয়া ফেলে, এই ভয়ে বোধ করি শ্বেত কর্পল্লেরই স্বাক্ষর ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে করান হইয়াছে।

—

কলিকাতা হিন্দু অবলা আশ্রম

কলিকাতা হিন্দু অবলা আশ্রমের চতুর্থবার্ষিক সভার অধিবেশনে পঠিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে গত বৎসর আশ্রমে ৩১০ জন স্ত্রীলোক এবং ৭০টি বালকবালিকা ও শিশু আসিয়াছিল। জন্মের পর জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত অথবা গোপনে অভিভাবকদের দ্বারা প্রদত্ত শিশু গ্রহণ

করিতে আশ্রম আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে অনেক শিশুর প্রাণরক্ষা হইতেছে। ৩১০ জন নারীর মধ্যে ১৭৪ জনকে অভিভাবকদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ৩৬ জনের বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, ২৯ জনকে ফিরোজপুর ও কানপুরের অনাথাশ্রমে পাঠান হইয়াছে, ২ জনকে দমদমা গ্রীভস উদ্ধারাশ্রমে পাঠান হইয়াছে, ৭জন পলায়ন করে, এবং দুজনকে মুসলমান অনাথালয়ে পাঠান হয়। বিবাহের অধিকাংশ বর সিন্ধুদেশবাসী, কন্যা বাংলা দেশের। এই আশ্রমে যাহারা আশ্রয় পায়, তাহাদের অধিকাংশ বাঙালী ; কিন্তু বাঙালীরা ইহার বেশী সাহায্য করেন না বা খোঁজখবর রাখেন না। এরূপ অবহেলা অবাঞ্ছনীয়। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন ; ঠিকানা ১৬০ নং হ্যারিসন রোড।

—

'বিপজ্জনকভাবে জীবন যাপন কর'

বাঙালী ছাত্রদের সভাপতিরূপে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ইতালীর ফ্যাসিষ্টদের কর্ম্মনীতি "বিপজ্জনকভাবে জীবন যাপন কর" ইহা বলিয়া ছাত্রগণকে তাহার অনুসরণ করিতে বলেন। এই পরামর্শের উল্লেখ করিয়া ১লা অক্টোবরের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ার' দেখাইয়াছেন যে, ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বাঙালীরা যে অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে তাহা রণক্ষেত্রে যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈনিকদের জীবন অপেক্ষাও বিপজ্জনক। কারণ, সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের রপোর্ট হইতে দেখা যায়, শিশুমৃত্যুর হার বঙ্গে অতি ভয়ানক, বাল্যে কৈশোরে যৌবনে প্রৌঢ়দশায় ও বার্দ্ধক্যেও তদ্রূপ। যুদ্ধক্ষেত্রে শতকরা যত সৈন্য মারা যায়, শান্তির সময়ে ঘরে বসিয়া শতকরা তদপেক্ষা বেশী বাঙ্গালী প্রাণ হারায়। তাহার কারণ ওয়েলফেয়ার বিস্তারিতরূপে লিখিয়া উপসংহারে মন্তব্য করিতেছেন :—

"If Pandit Jawaharlal Nehru had thought for amoment of the murder that is in every Bengali ome, showing itself in its foul manifestation in home after home with the accuracy of routine work, he would never have asked the Bengalis to live dangerously. He would have asked them to learn to *live less dangerously* and to *die dangerously*, if necessary, to achieve that end."

ইহার অনুবাদ দিলাম না।

পণ্ডিত জওয়াহরলাল যে অভিপ্রায়ে ফ্যাসিষ্টদের কর্ম্মনীতি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ওয়েলফেয়ার তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এমন নয়। তাহা বুঝিয়াও তাহার আক্ষরিক অর্থ করিয়া বঙ্গের অবস্থা প্রদর্শন ও তাহার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণপণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন, এই আদর্শ নবীনদের সম্মুখে ধরা 'ওয়েলফেয়ারের' উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। ঐ পত্রের পরবর্ত্তী সংখ্যায় পণ্ডিত জওয়াহরলালের চিঠি ও তদুপরি সম্পাদকের মন্তব্য হইতে বুঝিলাম, আমাদের এই ধারণাই ঠিক।

ফ্যাসিষ্টদের মন্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ দুঃসাধ্য নহে, উহার মধ্যে যতটুকু সত্য আছে, তাহার অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাসা ভাসা ভাবে উহা বুঝিয়া যদি কেহ সর্ব্বদা এমন ভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, যাহাতে যে কোন সময়ে বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য পালন হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। মানুষের জীবনের অধিকাংশ শ্রেয়স্কর কাজও এরূপ, যে তাহাতে সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ বিপদের সম্ভাবনা কম। সুতরাং কেহ যদি কেবল এরূপ কাজই করিতে চায় যাহা বিপদসঙ্কুল, তাহা হইলে তাহার করণীয় অনেক মঙ্গলজনক কার্য্যও অসম্পন্ন থাকিবে, এবং সে কেবল বিপদের সন্ধানে ফিরিবে। তাহাতে তাহার মনের ধীর শান্ত ভাব ও স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া এক প্রকার উত্তেজনা প্রিয়তার উদ্ভব হইবে, ইহা সুস্থ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। ইহাতে কোন্ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা নির্ণয়ে বাধা জন্মে। যুদ্ধক্ষেত্রে অতি বড় সাহসী সুদক্ষ সেনাপতিরাও বিপদ খুঁজিয়া বেড়ান না, যদিও বিপদেরও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে তাঁহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন্।

বক্তৃতার সময় ও অন্য কোন কোন সময় নাটকীয় আকস্মিক ঘটনার মত চমক লাগাইবার জন্য এমন অনেক কথা বক্তারা বলেন, যাহা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করার যোগ্য নহে। "বিপৎসঙ্কুল জীবন যাপন কর" ঐরূপ একটি উক্তি। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে যে-সকল উপদেশ আছে তাহার মর্ম্ম এইরূপ মনে হয়, যে, মানুষকে ধীর শান্ত ভাবে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া সুখদুঃখ সমান জ্ঞানে কর্ত্তব্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহাতে যদি বিপদ আসে, মৃত্যু আসে, বিচলিত না হইয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। যদি সম্পদ আসে, তাহাতে বিলাসনিমগ্ন হৃতবল হইয়া পড়িলে চলিবে না। কোন কোন অবস্থায় এমন কর্ত্তব্য আছে, যাহার ফলে স্বাভাবিক কারণে বা আইনের বলে মৃত্যু বা লঘুতর বিপদ ঘটিতে পারে। শান্তভাবে চিন্তার পর যদি কেহ উহাই তাঁহার প্রবৃত্তির ও শক্তির উপযুক্ত কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা হইলে ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকা কাপুরুষতা। যেহেতু ফ্যাসিষ্টরা বলে বা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, অতএব প্রত্যেককেই অবস্থা এবং স্ব স্ব শক্তি ও প্রবৃত্তিনির্ব্বিশেষে বিপদের জন্য বিপদ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে, এরূপ পরামর্শ সমীচীন নহে।

—

বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি

বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির ১৯২৭-২৮ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ঐ বৎসর উহার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১৮ এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ১৭৪৭৮ ছিল। গবর্মেণ্ট এবং জেলা বোর্ড ও ম্যুনিসিপালিটী সমূহের ইহা অপেক্ষা বেশী বিদ্যালয় আছে। কিন্তু বঙ্গের অন্য কোন বেসরকারী সমিতির পরিচালনার অধীন এতগুলি বিদ্যালয় নাই। সমিতির বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১২টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, ২৯৬টি বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬টি বালকদের প্রাথমিক নৈশ বিদ্যালয় এবং ৯৩টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়। ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ১৩৫৪৩, ছাত্রীদের ৩৯৩৫। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি হইতে ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। এই বিদ্যালয়টির ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ। ইহা যশোহর জেলার মসিয়াহাটি গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী তিনটি গ্রামে সমিতির তিনটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কেবলমাত্র নমঃশূদ্রদের দ্বারাই অধ্যুষিত ৯৬টি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া তাহারা মসিয়াহাটিতে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খুলিতে চায়। প্রথমে তাহারা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটিকে একত্র করিয়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করে। পরে উহাকেই তাহারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করে। গ্রামের লোকেরা সবাই চাষী। তাহারা দিনান্তে মাঠের কাজ শেষ করিয়া আসিয়া অনেক সময় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইট ফেলিত এবং তাহা পুড়াইবার জন্য কাঠ সংগ্রহ করিত। এইরূপে তাহারা দেড় লাখ ইট পুড়াইয়া বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করে। সমিতির মেথরদের স্কুল, লাইব্রেরী, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা, সংকীর্ত্তনের দল, অবৈতনিক চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা, শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত, ব্রতী বালকের দল, প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জজ চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি সমিতির কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

—

"দীপালি", ঢাকা

ছয় বৎসর পূর্ব্বে ঢাকানগরীতে শ্রীমতী লীলা নাগ এম, এ, এবং অপর কয়েকটি মহিলার উদ্যোগে "দীপালি" সমিতি সংস্থাপিত হয়। তদবধি এই সমিতি নানাভাবে নারীগণের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এই দেশে লিখিতে পড়িতে জানে এইরূপ নারীর সংখ্যা শতকরা ৪ জনেরও কম। নারীগণ মিলিত হইয়া যাহাতে পরস্পর সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, নানাবিষয়ে আলোচনা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন যাহাতে তাঁহাদের আদর্শ উচ্চ হয়, আকাঙ্ক্ষা মহৎ হয়, দেশের কার্য্যে উৎসাহ ও ত্যাগ-স্বীকারে ইচ্ছা হয়, শিল্পশিক্ষা দ্বারা অসহায় মহিলাগণের আয়ের সংস্থান হয়, এই সকল ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সমিতির উৎপত্তি। ১৯২৭ সালে ঢাকার নানাপল্লীতে ৮টি শাখাসমিতি ছিল। কায়েৎটুলীতে এই বৎসর নূতন শাখা হয়। বক্সীবাজার, উয়ারী প্রভৃতিস্থলে পূর্ব্ব হইতেই শাখাসমিতি ছিল। নারীগণের উন্নতিকল্পে দীপালি সমিতি যে সকল কার্য্য করিতেছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা যাইতেছে; (১) দীপালির এক অধিবেশনে অবরোধ প্রথার অনিষ্টকারিতা বিষয়ে আলোচনা হয়, তাহার ফলে এখন অনেক মহিলা হাঁটিয়া সমিতির কার্য্য করিয়া বেড়ান। (২) নির্য্যাতিতা নারীগণের কথা শুনিয়া ১৯২৬ সালে এক সভাতে নারী-রক্ষার জন্য একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হয়; অনেক ধর্ষিতা নারীকে এই ফণ্ড হইতে সাহায্য করা হইয়াছে। নারী-গণকে ব্যায়াম ও আত্মরক্ষাপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিক্ষক রাখা হইয়াছে। আত্মরক্ষাপ্রণালী প্রদর্শনের জন্য গত বৎসর এক সভা হয়। প্রায় ৪০০ শত মহিলা তথায় উপস্থিত ছিলেন। (৩) "দায়ভাগ" প্রণালীতে নারীগণের পতির ও পিতার সম্পত্তিতে কোন-রূপ অধিকার নাই। এই দূষিত প্রথা পরিবর্ত্তনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য আলোচনা হইয়াছিল। (৪) স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নির্ম্মম হত্যায় এক সভা হয়। খড়্গ বাহাদুর সিংহের বীরোচিত কার্য্যের জন্য শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে এক সভা হয়। (৫) "অধ্যয়নই ছাত্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য কিনা" এই বিষয় আলোচনার জন্য এক সভা হয়। (৬) শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন 'দাদূর কন্যাদের বাণী', শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বর্ত্তমান নারী সমস্যা," শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য "ভারতের তত্ত্বজ্ঞান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

উয়ারী, বক্সীবাজার, ঠাটারিবাজার, তাঁতিবাজার, শাখা-সমিতির বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়।

ছাত্রীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের জন্য ভাবিতে ও কার্য্য করিতে শিখাইবার জন্য "ছাত্রীসঙ্ঘ' স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা বেশী হওয়াতে একটী শাখা সভাও স্থাপিত হইয়াছে।

দুঃস্থ বালিকাগণের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে ৫টী

অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যরাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। তবে বেতনভোগী শিক্ষয়িত্রীরও প্রয়োজন হইয়াছে। প্রায় ২০০শত বালিকা এইসকল স্কুলে পড়িতেছে।

দীপালীর সভ্যগণের জন্য একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক পুস্তক রহিয়াছে।

সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন শিক্ষা দিবার জন্য একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ও শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবী তাহাতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেতার এস্রাজ বেহালা শিক্ষা দেওয়া হয়। ৪০।৫০টী ছাত্রী শিক্ষালাভ করেন।

চিত্রাঙ্কণবিদ্যা অল্পব্যয়ে শিখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দশবার জন ছাত্রী চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা করিয়া থাকেন।

পূজার পূর্ব্বে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গতবৎসরও শিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ছায়াচিত্র সহযোগে "মা ও দেশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রায় ৫০০ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি দীপালী সমিতি একটী নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জানুয়ারী মাস হইতে "নারীশিক্ষামন্দির" নামে একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নূতন প্রণালীতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। কারু ও চারুশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে। যাহাদের বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক শিক্ষালাভের সুবিধা হইবে না, তাহাদের সপ্তাহে কয়েকদিন বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। অনেকে কার্য্যোপলক্ষে বা শিক্ষালাভের জন্য সহরে আসিয়া সুবিধামত বাসস্থান প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের জন্য "মহিলাশ্রম" খোলা হইবে। তাহাতে অল্প ভাড়াতে তাঁহারা থাকিতে পারিবেন।

১৯২৭ সালে সাধারণ বিভাগে আয় সর্ব্বসমেত ৫৭২-৸৵১৫ ব্যয়ে ৫০৪৷৶১০ ; প্রদর্শনী বিভাগে আয় ৫৯০।১৫ ব্যয় ৬২০৸৵, ২০৷৶৫ সাধারণ বিভাগ হইতে দেওয়া হইয়াছে। নারীরক্ষাবিভাগে আয় ৬৩৮৸৵, ব্যয় ৩৪৫৲ টাকা।

সমিতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে বা স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইলে প্রতিদিন বেলা ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে শ্রীমতী হইলা নাগ এম, এ, ৩ বক্সী বাজার অথবা শ্রীমতী প্রিয়তমা গুপ্ত, র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, উয়ারী—ইঁহাদের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

—

অভয় আশ্রম

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের কেন্দ্রস্থান। ইহার সভ্যেরা অভয়, সত্যবাদিতা, প্রীতি, অস্তেয়, কর্ম্মিষ্ঠতা, শুচিতা, ও দেশভক্তির প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। স্বাজাতিকতা প্রচার; হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব বৃদ্ধি; অস্পৃশ্যতা ও বংশগত জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন; ধর্ম্মবিরুদ্ধ অন্যান্য সামাজিক কুরীতির উচ্ছেদ সাধন; বেকার অবস্থা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, দেশের ধন বিদেশীদের দ্বারা শোষণ নিবারণ এবং আনুষঙ্গিক আর্থিক দাসত্ব নিবারণ, এবং এই সকল উপায়ে দেশকে স্বরাজ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত হাতে সুতা কাটা ও হাতের তাঁতে কাপড় বোনা প্রচলিত করা; এবং জাতীয় ভাবে শিক্ষা বিস্তার;—ইহা আশ্রমের কার্য্যতালিকা।

আশ্রমের কাজের দ্বারা যে গরীব লোক উপকৃত হয়, তাহার প্রমাণস্বরূপ ১৯২৭ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ঐ বৎসর পারিশ্রমিক বাবতে তন্তুবায়েরা ২৮৫০০, সুতা কাটুনীরা ২৭০০০, সূচীর কারুকার্য্যের জন্য মহিলারা ১৭৩৬, রজকেরা ৩২৩৩ এবং দরজিরা ৬০৫৬ টাকা আশ্রমের নিকট হইতে পাইয়াছেন।

আশ্রম কাপড় রঙাইবার ও ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করিবার কাজে ক্রমাগত উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবন করিতেছেন।

আশ্রমের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে চারি বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার হাঁসপাতাল এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অবনত শ্রেণীসমূহের যুবকদের ভর্ত্তি হইবার দরখাস্ত সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হয়।

আশ্রমের সভ্যেরা হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও জাতি মানেন না। রন্ধনের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন না; মেথর প্রভৃতি সকল জাতির লোকের সহিত একত্র ভোজন করেন। সকল জাতির হাঁসপাতালের রোগী নমঃশূদ্র পাচকের রান্না এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করে। জাতিভেদের সমর্থক আমরা নহি, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহারা জাতি মানে, তাহারা অভয় আশ্রমের হাঁসপাতালের সুবিধা হইতে যাহাতে বঞ্চিত না হয়, জাতিভেদের সমর্থন না করিয়া আশ্রম এরূপ কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়, মনে করি।

কুমিল্লায় আশ্রমের শিক্ষায়তন ছাড়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। দুটি লাইব্রেরী আছে। চাষ, এবং দুধের জন্য গোপালনও আশ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার চাষের জমীর পরিমাণ ও গাভীর সংখ্যা ইহার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

—

ছুটির সময়ের কাজ

এক সময়ে আমরাও বিদ্যালয়ের ও কলেজের ছাত্র ছিলাম। সে সময়কার সুখ দুঃখের কথা এখনও মনে আছে। অল্পদিন আগে পর্য্যন্তও স্বপ্ন দেখিয়াছি, কাল পরীক্ষা অথচ গণিত কিছুই শিখা হয় নাই, তাহাতে প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে, এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সাতিশয় আরাম বোধ করিয়াছি এরূপ স্বপ্ন যে আবার দেখিব না, নিশ্চিত এরূপ আশা করিতে পারি না। ছাত্রজীবনের দুঃখ জানি বলিয়া, যাহা ভাল লাগে না এরূপ কোন কাজের ভার ছাত্রদের উপর চাপাইতে ইচ্ছা করি না। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন শিক্ষক মহাশয়েরা ছুটির সময়ে কতগুলি অঙ্ক করিতে হইবে, অন্যান্য বিষয় কি কি কতদূর শিখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। ছাত্রেরা যাহা শিখিয়াছে, তাহা বন্ধের সময় যাহাতে ভুলিয়া না যায়, এবং আলস্য না করে, সেই উদ্দেশ্যই শিক্ষক মহাশয়েরা এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু ছাত্রদের ইহা ভাল লাগিত না। এখনও হয়ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এবং কলেজের অধ্যাপকেরা এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা তাহার উপর আমাদের কোন বরাত চাপাইতে চাই না। যাহা করিতে অতিরিক্ত কোন পরিশ্রম হইবে না, কেবল এইরূপ একটি বিষয়ের দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাই।

আগে আমাদের দেশে জাতিভেদের কঠোরতা এখনকার চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু "উচ্চ" ও "নীচ" জাতিদের মধ্যে হৃদ্যতা এখনকার চেয়ে কোন কোন বিষয়ে বেশী ছিল, যদিও গরীবের উপর অত্যাচার ছিল না, এমন নয়। সেকেলে একজন ভদ্রলোক হয়ত কোন কোন জাতির লোকের হাতের জল বা রান্না খাইতেন না, কিন্তু সেই সব জাতিরই লোকদের সঙ্গে জ্যাঠা খুড়ো মামা ভাগ্নে ভাইপো দাদা প্রভৃতি সম্পর্ক পাতাইতে ও কতকটা তদনুরূপ ব্যবহার করিতে বাধিত না। ভদ্রলোকেরা তাহাদের বিপদ আপদ সুখ দুঃখের খবর অনেক স্থলে রাখিতেন। এখন ইংরেজী-জানা ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে একটা পার্থক্য হইয়াছে, আগে "ভদ্র" শ্রেণীর ও অন্য সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তাহা ছিল না। এই পার্থক্যের জন্য ইংরেজীশিক্ষিতদিগকে দোষ দিতেছি না। কিন্তু এই অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি, যে, তাঁহারা অশিক্ষিতদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন, যাহাতে তাহারা মনে না করে, যে, ইংরেজীওয়ালা বাবুরা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জীব এবং অশিক্ষিতদিগকে নিকৃষ্ট জীব মনে করেন। ইংরেজী-শিক্ষিতেরা কেতাবে কাগজে সকল মানুষের সাম্য, জাতীয় সংঘবদ্ধতা, প্রভৃতি অনেক উচ্চকথার আলোচনা পাঠ করেন। যদি অশিক্ষিত ও দরিদ্র প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে, তাহা হইলে ঐ সব আলোচনা সার্থক হয়।

—

নারীনিগ্রহের সংবাদ

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন এবং নারীনিগ্রহের সংবাদের প্রাচুর্য্যে ব্যথিত হন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, এরূপ সংবাদ কমিতেছে না—বাড়িতেছে কি না বলিতে পারি না। এই অবস্থার কি কোন প্রতিকার নাই? শাস্তি অনেক দুর্ব্বৃত্তের হয়, কিন্তু তার চেয়ে অধিকসংখ্যক দুরাত্মার শাস্তি হয় না। যদি সকল অত্যাচারীরই শাস্তি হইত, তাহা হইলে নারীনিগ্রহ কতকটা কমিত বটে, কিন্তু একেবারে নিবারিত হইত না।

পুরুষ ও নারী উভয়েরই সুশিক্ষার প্রয়োজন। পুরুষেরা যাহাতে নারীকে শ্রদ্ধা করিতে পারে, এবং নারীর উপর অত্যাচার কাপুরুষের কাজ মনে করে, এরূপ শিক্ষা আবশ্যক। চরিত্রহীনা নারীকে সমাজ যে চক্ষে দেখে, চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত পুরুষকে সেই চক্ষে দেখিলে সুফল ফলিবে। বর্ত্তমানে নারীদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য যতটা আছে, মানসিক ও দৈহিক শিক্ষা দ্বারা তাহা বাড়াইবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। নারী-রক্ষা সমাজের সকল পুরুষের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা করা উচিত। দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা সেই কর্ত্তব্যেরই একটি অংশ। অত্যাচরিতা নারীদের সামাজিক যে অসুবিধা ও লাঞ্ছনা হয়, এবং যাহার ফলে অনেকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বা আমরণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকিতে বাধ্য হয়, তাহা আমাদের দেশের একটি কলঙ্ক। অত্যাচারিতা নারীরা যদি আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে স্থান লাভ করে, তাহা ত খুবই ভাল। তদভাবে এরূপ আশ্রম থাকা চাই, যেখানে তাহারা ও তাহাদের শিশুরা আশ্রয় পাইতে পারে, এবং প্রয়োজন মত বিবাহিত হইতে পারে।

ময়মনসিংহের কোন কোন জমীদার যে এইরূপ একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার আরও খবর জানিতে অনেকেই ব্যগ্র; কিন্তু কিছুদিন হইতে কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না।

—

নারীরক্ষকের শাস্তি

নারীরক্ষা উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্ত লোকদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত গবর্ন্মেণ্ট কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিবেন কিনা, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারী উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, "না"। কিন্তু সরকার ভাল করিতে না পারুন মন্দ করিবেন—নারীরক্ষককে পুরস্কৃত না করিয়া সামান্য ত্রুটির জন্য গুরুতর শাস্তি দিবেন, এরূপ আশঙ্কা কেহ করে নাই। কিন্তু এক স্থলে কার্য্যত তাহাই ঘটিয়াছে।

নদীয়া জেলার মীরপুর থানার কনষ্টেবল মহারাজ সিং দুর্বৃত্ত লোকের হাত হইতে ইন্দুবালা নাম্নী কোন নারীকে দুইবার রক্ষা করিয়া তাহার নিজের গ্রামে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহাতে তাহার কাজে যোগ দিতে কিছু দেরী হয়। এই কসুরের জন্য তাহার চাকরী গিয়াছে। ঠিক্ সময়ে কাজে হাজীর না হওয়া একটা দোষ বটে। কিন্তু যে-কারণে তাহার দেরী হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার ত্রুটি মার্জ্জনা করা উচিত ছিল। কিম্বা, তাহা সম্ভবপর না হইলে ও নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক মনে হইয়া থাকিলে, মহারাজ সিংহের কিছু জরিমানা করিলেই চলিত। অত্যাচার দমন করা এবং অত্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা করা পুলিশের একটি কর্ত্তব্য। সুতরাং ঠিক কথা বলিতে গেলে মহারাজ সিং পুলিশের কর্ত্তব্য ও সাধারণ বেসরকারী মানুষের কর্ত্তব্য উভয়ই করিয়াছিল। তাহাকে চাকরীতে পুনরায় বাহাল করাইবার নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা হওয়া দরকার। তাহা না হইলে, তাহার ভাল বেসরকারী কোন কাজে নিয়োগ দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। কেহ যদি মহারাজ সিংহের বর্ত্তমান ঠিকানা জানেন, তাহা হইলে তাহা খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলে ভাল হয়।

—

উদ্ভিজ্জ "ঘৃত" ও বর্ণহীন খনিজ তৈল

উদ্ভিজ্জ কোন কোন তৈলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাইড্রোজেন গ্যাস মিশাইয়া তাহাকেই উদ্ভিজ্জ ঘৃত বলিয়া বিক্রী করা হয়। ইহা দেখিতে ঘিয়ের মত আসল ঘি যে নয়, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ব্যতীত ধরিবার জো নাই। দামে সস্তা বলিয়া আসল ঘিয়ের সহিত মিশাইয়া ব্যবসাদারেরা ভেজাল ঘি প্রস্তুত করিয়া তাহা খুব চালাইতেছে। আসল ঘিয়ে মানুষের দেহের পুষ্টির পক্ষে ভাইটামীন্ নামক যে সব পদার্থ থাকে, উদ্ভিজ্জ তৈলে সে সব নাই। অধিকন্তু উদ্ভিজ্জ তৈলে মানুষের দেহের পক্ষে হিতকর এমন কোন কোন উপাদান আছে যাহা তেলের সহিত হাইড্রোজেন মিশাইবার প্রক্রিয়ায় নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে, উদ্ভিজ্জ ঘৃত আসল ঘিয়ের মত উপকারী ত নয়ই অকৃত্রিম উদ্ভিজ্জ তৈলের মত উপকারীও নয়। ভারতবর্ষের লোকেরা অনেকেই মাছ মাংস ডিম্ব খায় না; যাহারা খায় তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে খায় না বা খাইতে পায় না। এই জন্য তাহাদের পক্ষে দুধ ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দই, মাখন, ঘি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া দরকার। কিন্তু এই সব জিনিষই মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর এখন উদ্ভিজ্জ "ঘৃত" সস্তায় পাওয়া যাওয়ায় আসল ঘি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিবার ও যোগাইবার চেষ্টা মন্দীভূত হইতেছে ও বাধা পাইতেছে। মানুষ এই ঘৃতবৎ কৃত্রিম জিনিষটা ব্যবহার করিয়া কোন সুফল পাইতেছে না। অবশ্য উহা আসল ঘৃতে মিশাইবার জন্য অসাধু ব্যবসাদারদের দ্বারা ব্যবহৃত পচা চর্ব্বি প্রভৃতির মত অনিষ্টকর নহে; কিন্তু উহা পুষ্টিকরও নহে। উহার জন্য যত টাকা খরচ করা যায়, তাহা কম হইলেও অপব্যয়।

এই সকল কারণে উহার বিরুদ্ধে দুই প্রকার আইন করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার আইন এই হইতে পারে, যে, উদ্ভিজ্জ "ঘৃত" দেশে যত আমদানী (বা ভবিষ্যতে দেশেই উৎপন্ন) হইবে, তাহাতে এমন একটা রং মিশাইতে হইবে, যে, উহা আসল ঘিয়ে মিশাইলে তৎক্ষণাৎ ভেজাল ধরা পড়িবে।—ভেজাল জিনিষ আসল বলিয়া বিক্রী করা ত আইন অনুসারে দণ্ডনীয় আছেই।—কিন্তু এরূপ আইন করিলেও উদ্ভিজ্জ এই জিনিষটার ব্যবহার বন্ধ হইবে না, কেবল ঘৃতের সহিত উহার মিশ্রণ বন্ধ হইবে।—অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকে উহা ব্যবহার করিতে থাকিবে। অথচ জিনিষটার ব্যবহারই বন্ধ করা দরকার। সেই জন্য আইন দ্বারা ভারতবর্ষে উহার আমদানী ও উৎপাদন নিষিদ্ধ হইলে ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ন্মেণ্ট, প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট, এবং জেলাবোর্ড মুনিসিপালিটী ও গ্রাম্য য়ুনিয়ন সমূহকে গোপালন ও দুগ্ধাদি উৎপাদনের উপায় অবলম্বন ও তাহাতে উৎসাহ দান করিতে হইবে। লোকহিতসাধক সমুদয় বেসরকারী সমিতিকেও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কেরোসীন জাতীয় এক প্রকার গন্ধহীন ও বর্ণহীন খনিজ তৈল বাজারে আমদানী হয়, তাহার নাম হোয়াইট অয়েল। ইহা পূর্ব্বে কেবল সুগন্ধি কেশতৈল প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত, এবং এখনও হয়। তাহা চুলের কোন ক্ষতি করে কিনা, জানি না। কিছুদিন হইতে

এই হোয়াইট্ অয়েলও আসল ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া ব্যবসাদারেরা সস্তায় ভেজাল ঘি বিক্রী করিতেছে। এই খনিজ তৈল শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর ত নহেই, বরং অনিষ্টকর। সুতরাং ঘৃতের সঙ্গে ইহা ভেজাল দেওয়া আইন ও অন্যবিধ ব্যবস্থা দ্বারা বন্ধ করা উচিত। এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, যে, ইহা কেবল কেশতৈলের জন্য আমদানী হইতে পারিবে, এই প্রকার আইন করা উচিত। তাহা ভাল; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে ইহার আমদানী ওরূপ আইনের দ্বারা বন্ধ হইবে কি?

—

"শারদীয় উপহার"

ইণ্ডিয়ান ফোটো এংগ্রেভিং কোম্পানী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা একটি সুন্দর ছবি সাত রঙে পরিপাটী করিয়া ছাপিয়া "শারদীয় উপহার" নাম দিয়া বাহির করিয়াছেন। ছবিটির সম্মুখের পৃষ্ঠায় একটি করিয়া কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে। সাতটি কবিতা দিয়া সাত রকম উপহার প্রস্তুত করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুটি তাঁহার হাতের প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আরো তিনটি পত্রীতেও অন্য দুই কবির হাতের লেখার প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। পত্রগুলি প্রিয়জনকে দিবার মত জিনিষ হইয়াছে।

—

স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দাবী

স্কট্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের বিজিত দেশ নহে। ইংলণ্ডের রাজা স্কট্ল্যাণ্ডের উপর প্রভুত্ব করেন, ইহাও সত্য নহে। বরং ইতিহাস ইহাই বলে, যে, রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্ ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ হইয়া উভয় দেশের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। তাহার পর উভয় দেশের যে সব রাজা রাণী হইয়াছেন, তাঁহাদের মাতৃ বা পিতৃকুল এই জেম্‌স্ ইহাতে উৎপন্ন। ১৭০৭ সালে আইন দ্বারা এই দুটি রাজ্যকে এক করা হয়, এবং তখন উভয়ের পার্লেমেণ্টও সম্মিলিত হইয়া যায়। ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা ৩,৭৮,৮৫,২৪২; স্কটল্যাণ্ডের ৪৮,৮২,৪৯৭; অর্থাৎ তাহার লোকসংখ্যা ইংলণ্ডের প্রায় আট ভাগের একভাগ। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্সের ৬১৫জন সভ্যের মধ্যে ইংলণ্ডের সভ্য ৪৯২জন, স্কটল্যাণ্ডের ৭৪জন। সুতরাং পার্লেমেণ্টে জনসংখ্যার অনুপাতে ইংলণ্ড অপেক্ষা স্কটল্যাণ্ড বেশী সভ্য পাঠাইয়া থাকে। স্কচ্ ও ইংরেজের ভাষা এখন এক। বিবাহদ্বারা রক্তমিশ্রণ এখন এত হইয়াছে, যে, স্কচ্ ও ইংরেজরা কোন কালে আলাদা জাতি ছিল ধরিয়া লইলেও, এখন আর আলাদা জাতি নাই বলিলেও চলে। স্কচরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সব কাজ করিতে অধিকারী, এবং সবই করিয়াছে। জলস্থলআকাশযুদ্ধের সব বিভাগে তাহাদের অবারিতদ্বার। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাণিজ্যাদি ব্যপদেশে ইংরেজের যেমন অবাধগতি, স্কচেরও তেমনি। ধন ক্ষমতা সর্ব্ববিধ শক্তি লাভ ও প্রয়োগের সুযোগ ইংরেজের যেমন, স্কচেরও তেমনি। অধিকন্তু ইংরেজরা বলে' স্কচ্‌রাইত সাম্রাজ্যে প্রভুত্ব করে ও বেশী করিয়া ধন লুটে। আমরা কলিকাতায় দেখি বটে, পাটের রাজা স্কচ্‌রা, কিন্তু এই সকল সুযোগ সত্ত্বেও স্কচ্‌রা একটা জাতীয় দল গঠন করিয়াছে। গত ২৩শে জুন উহার প্রারম্ভিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কোন তিক্ততা না জন্মাইয়া স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অর্জ্জন ("The achievement of Scottish Independence withuot bitterness against England") ইহার উদ্দেশ্য। এই স্কচ জাতীয়দলের অভিযোগ অনেক। তাহাদের এক প্রধান বক্তা বলেন, "স্কচদের উপর মাথা পিছু ট্যাক্স ইউরোপের মধ্যে সব চেয়ে বেশী। জনসংখ্যার অনুপাতে ইংলণ্ডের চেয়ে স্কটল্যাণ্ডে বেকার লোকদের সংখ্যা বেশী। প্রতিবৎসর শরৎকালে বিস্তর স্কচ্ দারিদ্র্যবশতঃ দেশ ছাড়িয়া অন্যদেশে চলিয়া যায়। কারণ কি? যেহেতু আইন অনুসারে স্কট্‌ল্যাণ্ড আজ ইংলণ্ডের গোড়ালির নীচে ("Scotland lies today egally under the heel of England"), এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত প্রত্যেক বিষয়ের আইন হয়, তর্ক বিতর্ক হয়, সিদ্ধান্ত হয় এরূপ মানুষদের (ইংরেজদের) দ্বারা যাহাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান কোরিয়ার সম্রাট সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের চেয়ে বেশী নয়। এসব আমাদিগকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবম্বিধ সব ব্যাপারে আমাদের যে জাতীয় অপমান বর্ত্তমানে আছে, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। স্কটল্যাণ্ডের সব ব্যাপার সম্বন্ধে স্কট্‌ল্যাণ্ডের নির্ব্বাচকদের চোখের সামনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত আমরা এডিনবরায় একটি স্কচ জাতীয় পার্লেমেণ্ট চাই।" অন্য একজন বক্তা বলেন, "স্কটল্যাণ্ডের কুড়িলক্ষেরও উপর লোক কেবল মাত্র দুটি কামরাবিশিষ্ট ঘরে বাস করিতে বাধ্য হয়।" ভারতবর্ষে যত কোটি লোক কামরাহীন ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে বা আকাশের তলে বাস করে, তাহারা ত দেখিতেছি হতভাগ্য স্কচদের তুলনায় রাজার হালে বাস করে। সুতরাং ভারতবর্ষের নিজের কোন পার্লেমেণ্টের প্রয়োজন নাই।

জুলাই মাসের এডিনবরা রিভিউতে সাংবাদিক মিস্টার লুইস্ স্পেন্স স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় দলের বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে পাঁচশত মাইল দূরবর্ত্তী লণ্ডনে বসিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্যেরা স্কট্‌ল্যাণ্ডের একান্ত জরুরী অভাব অভিযোগ সমূহের প্রতি মন দিতে পারেন না বলিয়া, স্কট্‌ল্যাণ্ডের আর্থিক দৌর্ব্বল্য, পণ্যশিল্পের বিনাশ, স্কচ ব্যাঙ্কগুলির বিলোপ, বিস্তর স্কচের দেশত্যাগী হইয়া বিদেশ যাত্রা প্রভৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া এই লেখকও লিখিয়াছেন।

ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্ট ৪০০।৫০০ মাইল দূর হইতে স্কটল্যাণ্ডের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, কিন্তু ছয় হাজার মাইল দূর হইতে ভারতবর্ষের কল্যাণসাধন করিতে পারেন। ইংরেজরা ভারতের সাতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ অভিভাবক। আমাদের অভিভাবকত্ব তাঁহারা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না।

—

অধ্যাপক মোলিশের কলিকাতা আগমন

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো রেক্টার অধ্যাপক মোলিশ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভিয়েনা প্রবাসকালে তাঁহার



ডাঃ মোলিশ

যন্ত্রগুলির সাহায্যে তাঁহার উদ্ভাবিত নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া তাঁহারই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইহা তিনি ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক কাগজ নেচারে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতা আসিবেন। উদ্দেশ্য, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে অভিনব প্রণালীতে গবেষণার সহিত



আইনুদের মধ্যে ডাঃ মোলিশ

সাক্ষাৎ পরিচয়লাভ। তিনি প্রবীণ লোক। ইতিপূর্ব্বে জাপানে গিয়াছিলেন। "উদীয়মান সূর্য্যের দেশে" নামক তাঁহার জাপানসম্বন্ধীয় পুস্তক হইতে একটি ছবির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হইল। জাপানে লোমশ কেশশ্মশ্রুবহুল আইনু জাতিদের একটি গৃহের নিকটে দণ্ডায়মান দীর্ঘাকৃতি পুরুষ অধ্যাপক মোলিশ। তাঁহার মূর্ত্তির একটি পদকের প্রতিলিপি দিতেছি। মূল ছবি ও পদক কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য্য সহায়রাম বসু মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অধ্যাপক মোলিশ জাপান সম্বন্ধে যেমন বহি লিখিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া গিয়া হয় তো ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও সেইরূপ বহি লিখিবেন।

মাণিকলাল দত্তের দানশীলতা

শ্রীরামপুরের সুবর্ণবণিক সমাজের পরলোকগত বাবু মাণিকলাল দত্ত পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি উইল দ্বারা সৎকার্য্যের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেস্ দানের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন :—

কলিকাতা হুগলী ও চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবণিক পরিবারসমূহের সাহায্যের জন্য তাঁহার পত্নী প্রেমবতী দাসীর নামে একটি এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত একলক্ষ দশহাজার টাকা; কলিকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের বিশ্বেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড নামে শিশুদের বিনা পয়সায় শুশ্রূষার নিমিত্ত একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৫০০০; শ্রীরামপুর হাঁসপাতালে

একটি দাতব্য চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার জন্য ৫০০০০ (এই বিভাগটি দাতার নামে হইবে); কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজে অবৈতনিক শিক্ষা লাভের নিমিত্ত স্বুবর্ণবণিক সমাজের ছাত্রদের জন্য ২০০০০ (এই বিভাগটি দাতার মাতার নামে হইবে); স্বুবর্ণবণিক ছাত্রদের ফ্রী ষ্টুডেন্টশিপের জন্য আশুতোষ দে স্মৃতি ফণ্ড নামে একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০০০; হুগলী জেলায় নলকূপ খননের জন্য ১০,০০০ টাকা; কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কয়েকটি রোগীর বিনা পয়সায় শুশ্রূষার 'শয্যার' জন্য ১০,০০ টাকা; ২৪ পরগণার অন্তর্গত যাদবপুরে চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়াল স্যানাটোরিয়ামে যক্ষ্মা-রোগীর শুশ্রূষার জন্য ১০,০০০ টাকা; শ্রীরামপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ২০০০ টাকা; ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়ের জন্য ২,২০,০০০০ টাকা; এবং শ্রীরামপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০ টাকা। বাঙ্গলা সরকারের এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলকে এই সব এণ্ডাউমেণ্টের ট্রাষ্টি বা অছি করা হইয়াছে। হুগলী জেলায় এত বড় দান আর নাই।

—

করিমগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়টি আট বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। নানা বিপদ আপদের মধ্যেও ইহার কর্তৃপক্ষ ইহা চালাইয়া আসিতেছেন। চারিবৎসর পূর্ব্বে প্রবল ঝড়ে বিদ্যালয়ের গৃহগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেগুলি আবার নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু গত বৎসর ৯ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়গৃহে আগুন লাগিয়া সব নষ্ট হইয়াছে। একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। তাহাতে আনুমানিক দশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। করিমগঞ্জ হইতে এত টাকা উঠিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দেশের অন্য সকল স্থানের লোকদের নিকট হইতেও সাহায্য চাহিতেছেন। বিদ্যালয়ে কয়েক জন ত্যাগী কর্ম্মী শিক্ষকতা করিতেছেন। ইহাতে দান করিলে অর্থের সদ্ব্যয় হইবে। সাহায্য বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস উকীল মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

—

মোটর বাস ও রেলগাড়ী

স্থলপথে শীঘ্র যাতায়াতের জন্য আগে কেবল রেলগাড়ী ছিল। কিছুদিন হইতে অল্প দূর যাইবার জন্য মোটর বাসে যাত্রাও সম্ভবপর হইয়াছে। কোথাও কোথাও মোটর বাস্ রেলের সহিত প্রতিযোগিতায় রেলকে পরাস্ত করিতেছে। বসিয়া স্বচ্ছন্দে যতদূর যাওয়া যায়, তাহার জন্য মোটর বাসই পছন্দ করিবার অনেক কারণ আছে। অনেক সময় রেলের টিকিট কিনিতে যেরূপ অপমানিত হইতে ও কষ্ট পাইতে হয়, মোটর বাসে তাহা হয় না। রেলে যাইতে হইলে অনেক অভদ্র রেলকর্ম্মচারীর অপমান কখন কখন সহিতে হয়। মোটর বাসে সে উৎপাত নাই। রেলে বাক্স গাঁঠরীর ওজন যেরূপ বাঁধা আছে, মোটর বাসে তাহা না থাকায় গরীব লোকের বেশী স্থবিধা হয়। যাত্রীদের একান্ত দরকার হইলেও ষ্টেশন ভিন্ন অন্যত্র রেলগাড়ী থামে না, থামিলেও তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য। মোটর বাস্ যাত্রীদের প্রয়োজনমত যেখানে সেখানে অল্পক্ষণ থামিতে পারে।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার জন্য এবং রাত্রিতে শুইয়া ঘুমাইয়া যাইবার নিমিত্ত রেলগাড়ীর প্রয়োজন আছে।

মোটর বাস্ চলিবার জন্য দেশের সর্ব্বত্র রাস্তা আরও ভাল হওয়া উচিত। ছোটনাগপুরের ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের রাস্তা বেশ ভাল।

মোটর বাসের প্রতিযোগিতায় ভদ্রব্যবহার এবং উচিত ভাড়ার প্রতি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মন দিলে প্রতিযোগিতা আরও স্থফলপ্রদ হইবে!

—

জাহাজে শ্রমিকদের মৃত্যু

দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বান বন্দর হইতে রয়টার তারের খবর পাঠাইয়াছে, যে, সট্লেজ নামক জাহাজে ২৪জন ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হইয়াছে। ব্রিটিশ গিয়ানাতে অনেক ভারতীয় কুলিকে চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া ইক্ষুক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য পাঠান হয়। তাহাদিগকে যেরূপ স্থখের জীবনের ও উপার্জ্জনের আশা দিয়া বিদেশে লইয়া যাওয়া হয়, তাহারা সেখানে গিয়া বুঝিতে পারে যে তাহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত। চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ইহাদিগকে জাহাজে করিয়া ভারতবর্ষে ফেরত পাঠান হয়। ব্রিটিশ গিয়ানার জর্জ টাউন হইতে সট্-লেজ জাহাজে এইরূপ প্রায় আটশত শ্রমিক আসিতেছে। তাহার মধ্যে ২৪ জন মারা পড়িয়াছে। রয়টার মৃত্যুর কারণ কিছুই বলে নাই! এই সব জাহাজে শ্রমিক-দিগকে সঙ্কীর্ণ একটু একটু স্থানে জাহাজের পাটাতনের উপর বস্তার মত কোন প্রকারে বসিয়া শুইয়া আসিতে হয়। আহার, স্নানাগার, শৌচাগার প্রভৃতির বন্দোবস্ত অতি কদর্য্য—নাই বলিলেও চলে। এমত অবস্থায় সংক্রামক বা অন্যবিধ ব্যাধিতে এরূপ যাত্রীদের মৃত্যু হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই চব্বিশ জন লোকের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর দোষে এরূপ

দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে তাহাদের নিকট ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া মৃতব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে না ঘটে, তাহার উপায় অবলম্বন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে কোন না কোন সভ্য যেন এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

—

"ও'ডোয়াইয়ার নরহন্তা"

পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব জুলুমবাজ লাট স্যার মাইকেল ও'ডোয়াইয়ার ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত মোটা বেতন ও পেন্সানের দৌলতে বিলাতে বসিয়া ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে মনের সুখে বাধা দিতেছেন। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কাগজে লিখিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, এবং অপ্রকাশিত কথাবার্ত্তা চিঠিপত্রেও অবশ্য এই পুণ্যকর্ম্ম করিতেছেন। তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা ভারতীয়দের নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার রাজনৈতিক মতের জন্য বিলাতে শ্রমিকদলের বিরাগভাজন হইয়াছেন। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর যখন তিনি উত্তর লণ্ডনের ব্রাদারহুড্ চার্চে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠেন, খুব গোলমাল আরম্ভ হয়। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকে, এবং "ও'ডোয়াইয়ার নরহন্তা," "ইংরেজ শ্রমিকদের প্রাণবধ করিতেছে," এইরূপ লেখা-যুক্ত বড় বড় প্ল্যাকার্ড খুলিয়া ধরে। তখন ভূতপূর্ব্ব জবরদস্ত লাট, বক্তৃতা করিবার চেষ্টা বৃথা, বুঝিতে পারিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ব্যক্তি ভারত-প্রবাসী ইংরাজ ও বিলাতবাসী উন্নতিবিরোধীদের মধ্যে সাম্রাজ্য-রক্ষক বলিয়া যশস্বী। হঠাৎ তাহার এই ভাগ্যবিপর্য্যয় কেন ঘটিল?

—

সাধারণের আপৎশূন্যতা বিল

গবর্ন্মেণ্টের সন্দেহভাজন বিদেশী লোকদিগকে ধরিয়া বিনাবিচারে ভারতবর্ষ হইতে চালান করিয়া দিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট যে বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচিত হওয়ার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান সমান ভোট হওয়ায় এবং পার্লেমেণ্টের প্রথা অনুসারে সভাপতি পটেল বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় উহা আপাততঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে বন্ধু ষ্টেট্স্ম্যান খুশি হন নাই, কিন্তু এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন, যে, ১৮৭০ সালের ফরেনার্স য়্যাক্ট অনুসারে গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটিশ ছাড়া অন্য সব বিদেশীদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, এবং ব্রিটিশ বিদেশীদিগকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশ্যন অনুসারে তাড়াইয়া দেওয়া যায়; ব্যবস্থাপক সভা যখন নূতন আইন করিতে দিলেন না, তখন অগত্যা এই দুটা অস্ত্রই ব্যবহার করিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি এই দুটা অস্ত্র আগেই হইতেই মৌজুদ আছে, তাহা হইলে আর একটা বজ্র পড়িবার কি দরকার ছিল? অধিকন্তু ন দোষায়?

সামাজসংস্কার ও ভারতগবর্ন্মেণ্ট

অধ্যাপক উড্ ও তাঁহার স্ত্রী দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে ছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। তাঁহারা আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহাতে শ্রোতারা মিস্ মেয়োর অনেক কথা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে। মিসেস্ উড্ একটি বক্তৃতায় বলেন, ১৯২৫,১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয় পুরুষ ও মহিলারা বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করিতে তিনবার অনুরোধ করেন, তিনবারই ভারত গবর্ন্মেণ্ট এই প্রার্থনা না-মঞ্জুর করেন।

বিদেশী অব্রিটিশ খৃষ্টীয় মিশনারীরা যখন এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন, তখন তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, যে, তাঁহারা বিশ্বস্ততার সহিত গবর্ন্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন ("they will loyally co-opera e with the Government")। এই সহযোগিতার মানে এই, যে, তাঁহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভার্থ ভারতীয়দের কোন আন্দোলনে যোগ দিবেন না। এই বিষয়ে একজন অব্রিটিশ মিশনারী বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, যে, গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে তিনি একখানা এই মর্ম্মের চিঠি পাইয়াছেন, যে, যদি তিনি রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার দেশের প্রচার-বোর্ডের নিকট নালিশ করা হইবে, এবং তিনি যে স্কুলের সহিত যুক্ত তাহার সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইবে। এই সরকারী চিঠিতে লেখা হইয়াছিল, যে, তিনি রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত থাকেন, ইহা ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু এই উপস্থিতি দ্বারাই মিশনারী বোর্ডের প্রদত্ত বিশ্বস্ত সহযোগিতার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হইয়াছে। তাহার পর মিশনারী পত্রলেখক মহাশয় ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আরও চমৎকার। তিনি লিখিয়াছেন "বিধবাবিবাহ প্রচলন, জাতিভেদের

কঠোরতা দূরীকরণ, হিন্দুমুসলমানের একতা উৎপাদন যে সব সভার উদ্দেশ্য, সরকার পক্ষ আমার তাহাতে উপস্থিতিও আপত্তিজনক মনে করিয়াছেন—এই ওজুহাতে যে,এই সকলের মধ্যেই রাজনীতি উহ্য আছে।" ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা সঙ্গত, যে, সমাজসংস্কার দ্বারা এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতা বর্দ্ধন দ্বারা ভারতীয় জাতিউন্নত ও শক্তিশালী হয়, সরকার বাহাদুরের এরূপ ইচ্ছা নয়।

বঙ্গে জলসেচনের ব্যবস্থা

স্যার উইলিয়ম উইলকক্স একজন বিখ্যাত ইংরেজ এঞ্জিনীয়ার। কৃত্রিম খাল খননাদি দ্বারা জলসেচন বিষয়ে তিনি বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। মিশর ও ইরাকে তাঁহার কৃতিত্ব ও কীর্ত্তি বিদ্যমান। বঙ্গের—বিশেষতঃ পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের—যে-সব নদী ভরাট হইয়া গিয়াছে, যাহাতে এখন আর স্রোত বহে না, সেইসব দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন, যে, এইগুলি এক সময়ে কৃত্রিম খাল ছিল এবং তাহাতে প্রবহমান জলের সাহায্যে শস্যোৎপাদন এবং দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা হইত; পুনর্ব্বার তাহাতে জল বহাইতে পারিলে দেশের সুদশা ফিরিয়া আসিবে। এরূপ কথা বলিলে, পরোক্ষ ভাবে ইহাই বলা হয়, যে, ইংরেজদের আগেকার কোন সময়ে দেশশাসকেরা নিজেদের কর্ত্তব্য ভাল করিয়া বুঝিতেন ও করিতেন, ইংরেজ কর্ত্তারা বুঝেন না কিম্বা বুঝিয়াও করেন না। ইহাতে কর্ত্তাব্যক্তিদের রাগ হইবারই কথা। সুতরাং তাঁহারা ও তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী ভারতীয়েরা উইলকক্সের মতের প্রতিবাদ করেন। উইলকক্স প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছেন।

উত্তর প্রত্যুত্তরে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়। পড়িতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু কাজ এগোয় না। যদি উইলকক্স সাহেব বা আর কেহ ইংরেজ গবর্মেণ্ট ও জাতিকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, যে, পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের মজা নদীগুলিতে স্রোত বহাইলে এই অঞ্চল হইতে ভাল গম কাপাস প্রচুর পরিমাণে বিলাতে রপ্তানী করা যাইবে এবং জমীর খাজনা হিসাবে সরকার অনেক বেশী বেশী টাকা পাইবেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা অনুসারে কাজ হইবার সম্ভাবনা খুব বাড়িবে।

উপকূলসমীপস্থ সমুদ্রে যাত্রী ও মাল বহন

পুরাকালে এবং কোম্পানীর আমলেরও কিছুকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় অনেক জাহাজ সমুদ্র পার হইয়া দূরদেশে যাইত, এবং ভারতবর্ষের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে মাল ও যাত্রী লইয়া যাইত। ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরেজ শাসক ও শোষকদের সদয় সহযোগিতায় ভারতবর্ষের এই বিশাল বহন ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে। এখন ইহার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, ভারতীয় বন্দরগুলির মধ্যে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবসায় আইন দ্বারা কেবল ভারতীয় জাহাজের একচেটিয়া করা ভিন্ন উপায় নাই। কারণ অবাধ প্রতিযোগিতায় প্রভূত ধনশালী ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে পারিবার জো নাই। তাহারা ভারতের টাকায় এত ধনী হইয়াছে, যে, ভারতীয় জাহাজ ভাল করিয়া প্রতিযোগিতায় নামিলেই নিজেদের ভাড়া কমাইয়া ভারতীয় কারবারকে ফেল করিবে। একাধিক বার তাহারা এই কৌশলে কাজ হাসিল করিয়াছে। বহু সভ্য দেশে, ইংলণ্ডেও, দেশের সমীপস্থ সমুদ্রে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেশী জাহাজকে কোন না কোন সময়ে দেওয়া হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য এরূপ অধিকার দানের আইন একান্ত আবশ্যক।

ইহা বুঝিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ একটি আইনের খসড়া পেশ করেন। বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত সারাভাই হাজী এবিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞান আছে বলিয়া এবৎসর ক্ষিতীশবাবু হাজী মহাশয়ের উপর এই বিলের ভার অর্পণ করেন। ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে ইহা সিলেক্ট কমিটির হাতে অর্পিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যে তর্কবিতর্ক হয়, তাহার মধ্যে স্যার জেম্‌স সিমসন নামক এক ইংরেজ সভ্য বলিয়া বসে, যে মিঃ হাজী সিন্ধিয়া জাহাজ-কোম্পানার একজন বেতনভোগী ভৃত্য, এই বিল আইনে পরিণত হইলে ঐ কোম্পানীরই সব চেয়ে বেশী লাভ হইবে, অতএব মিঃ হাজী অপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থ কোন ব্যক্তি বিলটির ভার লইলে ভাল হইত, ইত্যাদি। মিঃ হাজীর উপর এই অশিষ্ট আক্রমণের উত্তরে ক্ষিতীশবাবু অন্যান্য কথার মধ্যে এই মর্ম্মে বলেন, থ্যাকারের ডিরেক্টরীতে দেখিলাম এক স্যার জেম্‌স্ সিমসন ইংরেজদের কয়েকটা সওদাগরী আফিসে চাকরী করেন। এই আফিসগুলা চার পাঁচটা য়ুরোপীয় জাহাজ কোম্পানীর এজেণ্ট। লর্ড ইঞ্চকেপের জাহাজ কোম্পানী তার মধ্যে একটা। অতএব স্যার্ জেম্‌স্ এরূপ লোকদের ভৃত্য, মিঃ হাজীর বিল পাস হইলে যাহাদের অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত লাভের কারবারে হাত পড়িবে।

সরকারী রেলের চাকরীতে অবিচার

রেলওয়ে বিভাগের ১৯২৬-২৭ সালের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, যে, উহার উচ্চতর চাকরীগুলির শতকরা ৭৮·৮টি য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের অধিকৃত, বাকী শতকরা ২১·২টি ভারতীয়দের। নিম্নতর শ্রেণীর চাকরীগুলির শতকরা ৭০·৪টি য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীরা দখল করিয়া আছে, বাকী শতকরা ২৯·৬টি ভারতীয়েরা পাইয়াছে। উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর এই সব চাকরী পাইবার যোগ্য ভারতীয় লোকদের সংখ্যা তদ্রূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট ইংরেজ ফিরিঙ্গীর চেয়ে ঢের বেশী।

গার্ড নিয়োগে রেলে খুব পক্ষপাতিত্ব আছে। সাধারণ রীতিই এই যে, নিয়োগের সময়েই ইংরেজ ফিরিঙ্গীরা প্রথম শ্রেণীর চাকরী পায়,ভারতীয়েরা পায় দ্বিতীয় শ্রেণীর। টিকিট-কলেক্টর, এঞ্জিন-চালক, প্রভৃতির নিয়োগেও এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়।

রেলের ইংরেজ ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীদের এবং ভারতীয় কর্ম্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষ যে সাহায্য করেন, তাহাতেও এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্তদের জন্য অভিপ্রেত ওকৃগ্রোভ স্কুল নামক একটি বিদ্যালয়েই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ১,৩৪০০ টাকা সাহায্য করেন কিন্তু ভারতীয়দের কোন একটি স্কুলের জন্য সাহায্য মাত্র ৪৫০০ টাকা এবং ভারতীয় সব স্কুলের জন্য মোট সাহায্য ১৪,৭০০ টাকা। ইংরেজ ফিরিঙ্গী বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভারতীয় বালিকাদের জন্য নাই।

চিকিৎসা সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই, যে, রেলের হাঁসপাতালে দুই শ্রেণীর রোগীদের জন্য আলাদা অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে; উচ্চতর ও অধিক অভিজ্ঞ ডাক্তার ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের এবং নিম্নশ্রেণীর ও কম অভিজ্ঞ ডাক্তার ভারতীয় রোগীদের চিকিৎসা করেন।

কর্ম্মচারীদের জরিমানা হইতে যত টাকা আদায় হয়, তাহার বেশীর ভাগ দেয় ভারতীয় কর্ম্মচারীরা। কিন্তু বেশীর ভাগ টাকা খরচ হয় ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের অবসর-বিনোদনের প্রতিষ্ঠান সমূহে।

বড় দিনের ছুটির সময় রেলের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেবল খৃষ্টিয়ানদিগকেই পাস দেওয়া হয়। কখন কখন খৃষ্টিয়ান পাদরীদিগকে বিনামূল্যে ভ্রমণের জন্য পাস্ দেওয়া হয়;—উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনের খৃষ্টিয়ান কর্ম্মচারীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকে এরূপ পাস্ দেওয়া হয় না।

—

ত্রুটি-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ যে দুই ব্যক্তি ও বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য জানাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রবাসীতে কিছু বাহির হয় নাই, মডার্ণরিভিউর এক পত্রলেখকের চিঠিতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু অমিয়বাবুর চিঠিখানি বাংলায় লেখা এবং প্রবাসীর জন্য অভিপ্রেত বলিয়া তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি। ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণরিভিয়ুতে বাহির হইবে।

সম্পাদক, "প্রবাসী" সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন :—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার তাঁহার সম্বন্ধে মডারন্ রিভিয়ুতে প্রকাশিত মন্তব্য পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে কবি তাঁহার বক্তব্য আপনাকে জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিম্নে লিখিলাম—

"শ্রীমান দিলীপকুমার রায়ের সহিত আমার আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গ বাঙ্গলায় প্রবাসীতে ও ইংরেজিতে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসীতে উক্ত প্রসঙ্গের ভূমিকায় আমাকে লিখিতে হইয়াছিল যে, ঐ আলোচনার ভাষা সম্পূর্ণ আমার নিজের।* ইংরেজি অনুবাদে এই ভূমিকা অংশ অপ্রাসঙ্গিক বোধে আমি বাদ দিয়াছিলাম। এই কারণে উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের নাম থাকাতে ঐ লেখার বাঙলা ও ইংরেজী তাঁহারই রচনা বলিয়া সাধারণের ধারণা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এজন্য দিলীপকুমারের কোনো দায়িত্ব নাই। যখন এই লেখাগুলি কোন গ্রন্থ বা পত্রিকায় তিনি নিজে প্রকাশ করিবেন, তখন লেখকের নাম তিনি স্বীকার করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের গায়কদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ খ্যাতি পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। পুরুষানুক্রমে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। শ্রীযুক্ত ভাটখণ্ডে মহাশয় সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞতায় ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি—ইঁহার যোগ্যতার প্রশংসাবাদ করিবার উপলক্ষ্যে অন্য কোন গীতিবিশারদের মান খর্ব্ব করার আমি অনুমোদন করি না।" ইতি ৬ই অক্টোবর ১৯২৮

ভবদীয়—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দিলীপবাবুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশের উপ-

* ঐ আলোচনার প্রশ্নগুলি ছাড়া শুধু ভাষা কেন, আর সবই কবির, দিলীপবাবুর প্রশ্ন উপলক্ষ্য মাত্র; ইহা সুস্পষ্ট হইলেও মনে রাখা ভাল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

লক্ষ্যটি পাঠকদের বোধগম্য করিবার জন্য আমাদিগকে কিছু লিখিতে হইতেছে।

ইংরেজী বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের বৈশাখ (এপ্রিল) সংখ্যায় "The Function of Woman's Shakti in Society" নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটির নামের নীচেই লেখা আছে "By Dilip Kumar Roy"। কিয়দংশ দিলীপ বাবুর রচনা বলিয়া ষ্টার নামক কাগজের জুলাই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশিত মূল বাংলা প্রবন্ধটি দিলীপ বাবুর রচনা নহে, ইংরেজী অনুবাদও তাঁহার নহে। এইজন্য প্রবন্ধটিতে লেখক হিসাবে দিলীপবাবুর নাম প্রকাশ ঠিক হয় নাই। মডার্ণ রিভিয়ুর একজন পত্র লেখক এই মনে করিয়া দিলীপবাবুর উপর কটাক্ষ করিয়াছেন, যে, এই "ভুলের" জন্য দিলীপ বাবুই দায়ী; কারণ, বাস্তবিক দায়ী কে, তাহা তাঁহার জানিবার সম্ভবনা ছিল না। মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশের জন্য দিলীপবাবু প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, দায়িত্ব হয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিম্বা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের। ষ্টারে উহার কিয়দংশের দিলীপ বাবুর রচনা বলিয়া পুনর্মুদ্রণে দিলীপ বাবুর কোন দায়িত্ব ছিল কিনা জানি না। যাহা হউক, ইহা সুস্পষ্ট যে এপ্রিল মাস হইতে এ পর্য্যন্ত দিলীপবাবু ঐ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির রচয়িতা বলিয়া প্রশংসা সম্ভোগ বিনা আপত্তিতে করিয়া আসিতেছেন, এবং মডার্ণরিভিয়ুর পত্রলেখক কটাক্ষ না করিলে আরও অনির্দ্দিষ্ট কিছুদিন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা সম্ভোগ করিয়াই চলিতেন। গ্রন্থাকারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সময় তিনি অবশ্য প্রকৃত লেখকের নাম প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থপ্রকাশে এখনও কত বিলম্ব আছে, তাহা তিনিই জানেন। যে প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে, তাহা এতদিন আত্মসাৎ করা কি ঠিক্ হইয়াছে? যে নিন্দা তাঁহার প্রাপ্য নহে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা ত তিনি খুব ক্ষিপ্রহস্তে করিয়াছেন; প্রশংসা সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবস্থা কেন? আমাদিগকে অনেকে অতিরিক্ত দোষদর্শী মনে করিতে পারেন। সেরূপ অখ্যাতি অর্জ্জনের ইচ্ছা আমাদের নাই। দিলীপবাবুই খুঁৎ ধরিতে বাধ্য করিয়াছেন। কারণ, মডার্ণরিভিয়ুতে প্রকাশের জন্য তিনি যে প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রশংসা সম্বন্ধে নিজের নির্লোভতার প্রমাণস্বরূপ লিখিয়াছেন, যে তাঁহাকে লোকে ডক্টার অব মিউজিক এবং ব্যাচিলার অব মিউজিক বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার ওরূপ উপাধি নাই। আলোচ্য ক্ষেত্রে এবম্বিধ নির্লোভতা তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সত্বর প্রদর্শন করেন নাই। তাহার কারণ কি ইহা হইতে পারে না, যে, প্রবন্ধটির লেখকত্ব আপনা হইতে দাবী করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন "তরুণের" মনে কষ্ট দিবেন না, এইরূপ একটা আশা ছিল?

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য, গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে। বংলা দেশের বিদ্যালয় সকলে সঙ্গীত শিখাইবার প্রস্তাব গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে হওয়ায়, শিক্ষা কি রীতিতে কাহার দ্বারা হইবে, এই আলোচনা উপলক্ষ্যে প্রধানতঃ দিলীপবাবু ও তাঁহার অনুচর সহচরদের দ্বারা গোপেশ্বর বাবুকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা দৈনিক কাগজে হইয়াছে। সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে মডার্ণরিভিয়ুর পত্রলেখক অনেক কথা লিখিয়া ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতস্রষ্টা এক্ষণে গোপেশ্বর বাবুর ন্যায্য প্রশংসা করায় আশা করি ন্যায়-পরায়ণ সঙ্গীতরসিকেরা সন্তুষ্ট হইবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত ভাটখণ্ডে মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞতায় ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি—ইহার যোগ্যতার প্রশংসাবাদ করিবার উপলক্ষ্যে অন্য কোনো গীতিবিশারদের মান খর্ব্ব করার আমি অনুমোদন করি না।" মডার্ণ রিভিয়ুর পত্রলেখকও এইরূপ কথা ঐ পত্রিকায় লিখিয়াছেন। যথা—"Bhatkhande is no doubt great; but let not those who have also served die unsung and unlamented because a blind man does not sing of them."

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্নে জলযোগ

আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া শিক্ষালয়ে যান, বাড়ী ফিরিতে ৪টা বাজিয়া যায়; কাহারও কাহারও আরও দেরি হয়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মধ্যে সামান্য জলযোগ করিতে পারে না, বা করে না। ইহাতে তাহাদের দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য শিক্ষালয়ের পক্ষ হইতে সকলেরই মধ্যাহ্নে জলযোগের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইহা খুব সস্তায় হইতে পারে, এবং তাহাতে ফল ভাল হয়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীযুক্ত ডাক্তার নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে কলিকাতার কেশব একাডেমীতে মধ্যাহ্নে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে মাসে চারি আনা অর্থাৎ দিনপ্রতি আধ পয়সা আন্দাজ লওয়া হয়। মাসে চারিআনা দিয়া ছাত্রেরা প্রত্যহ একখানি বড় রুটি এবং কিছু হালুয়া বা আলুরদম বা ডাল পায়। কিছুদিন এই ব্যবস্থা চলিবার পর ছাত্রদিগকে ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, তাহাদের ওজন বাড়িয়াছে। এত অল্পব্যয়ে যখন কলিকাতার মত জায়গায় এরূপ সুফলপ্রদ সুব্যবস্থা হইতে পারে, তখন বাংলাদেশের অন্য সব জায়গাতেও হইতে পারে এবং হওয়া উচিত।



চন্দ্রলোকের অজ্ঞাত রহস্য—

চন্দ্রলোকের অনেক রহস্যই এখনো বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত রহিয়াছে। মিঃ জে, এ, লয়েড্ এসম্বন্ধে লণ্ডনের 'ডিস্কভারি' পত্রে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে তাকাইলে চন্দ্রে অনেক বড় বড় কালো স্থান দেখা যায়। সেগুলি যে কি, এখনো ঠিক হয় নাই। এক সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, উহা চন্দ্রলোকের সমুদ্র। অনেকে মনে করিলেন, উহা শুষ্ক সমুদ্রের চিহ্ন। কেহ বা বলিলেন যে, উহা মরুভূমি। তবে সম্ভবত চন্দ্রলোকে যে সব গর্ত্ত ও ফাটল দেখা যায় এইগুলি তাহার সমকালীন।



পূর্ণচন্দ্র



চন্দ্রমণ্ডলের গর্ত্ত

কিন্তু, এই গর্ত্ত, গর্ত্তের মুখ, ও ফাটল, এইসবই বা কি? এক সময়ে বৈজ্ঞানিকগণের কাহারো কাহারো বিশ্বাস ছিল যে চন্দ্রগর্ভস্থ কেন্দ্র হইতে নানা বস্তু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তাই এইরূপ গর্ত্ত রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, ঊর্দ্ধ শূন্য হইতে নানা উৎক্ষিপ্ত উল্কার আঘাতে এইসব গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কেহ বা বলিয়াছেন, আগ্নেয়গিরিস্রাবের বুদ্বুদ ফাটিয়া এইরূপ গর্ত্ত রাখিয়া গিয়াছে। লয়েড্ সাহেবের মতে এই সব অনুমান কাঁচা। তাঁহার বিশ্বাস যে, হায়াই দ্বীপপুঞ্জে যেমন 'শান্ত'আগ্নেয়গিরি দেখা যায় চন্দ্রমণ্ডলেও একসময় সেইরূপ আগ্নেয় গিরি ছিল। অগ্নি উদ্গারের পূর্ব্বে এইগুলি ফাঁপিয়া উঠিত, পরে ফাটল ধরিত, এবং শেষে ফাটিয়া অগ্নিস্রাব উৎক্ষেপ করিত। এইরূপে যে গর্ত্ত হইয়াছে তাহাই রহিয়া গিয়াছে। তিনি আরেকটি আধুনিক মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রলোকের অভ্যন্তরে গ্যাস জমিয়াছিল। তাহাতে উপরিভাগ এক সময়ে ফাঁপিয়া উঠে, শেষে ফাটিয়া গেলে গ্যাস বাহির হইতে থাকে। তখন উপরের ফাটা অংশ ভাঙিয়া নীচে পড়িয়া পড়িয়া এইরূপ গর্ত্তগুলির সৃষ্টি করে। চন্দ্রে বায়ু নাই,—এতদিন ইহাই সকলের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু, এখন অনেকে মনে করিতেছেন, এই পৃথিবীর চারিদিককার বায়ুর মত বায়ু না থাকিলেও চন্দ্রে আরেকধরণের বায়ু আছে।

মস্তিষ্ক—

মস্তিষ্কের শক্তিতেই মানুষ তাহার নিকটতম আত্মীয়েরও শত শত গুণ উপরে। এই মস্তিষ্ক আসিল কোথা হইতে? 'ইভোল্যুশান্" নামক অভিব্যক্তিবাদীদের মুখপত্র বলেন যে, এই বিষয় আধুনিক



শিম্পাঞ্জি



জাভায় প্রাপ্ত মানবকল্প বানর

বিজ্ঞানের উত্তর এই—মানুষের হাতই মানুষের মস্তিষ্ককেও গড়িয়াছে।

মানুষের অনেক লুপ্ত জ্ঞাতির হাত ছিল, যেমন মানব-জাতের (anthropoid) বানরদের। জীব-জগতের অন্যান্য জীবদের তুলনায় তাহাদের মস্তিষ্ক কম নয়। যদি জীবনযুদ্ধে মানুষ ইহাদের পরাজিত না করিত, তবে হয়ত ইহাদের মস্তিষ্কের আরও বিকাশ হইত। কিন্তু এখন আর ইহাদের সে সম্ভাবনা নাই।



ধ্বংসমুখী শ্বেতগণ্ডার
গতবৎসর আন্দাজ করা গিয়াছিল ১৫০ শত
মাত্র এইরূপ জীব জীবিত আছে

মানুষ হাত দিয়াই জিনিষ ধরে, তাহা পরীক্ষা করে, কাজে খাটায়। এইরূপে কাজে খাটাইয়াই ত সে দ্রব্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করে। এইরূপে হাতের কাজ শিখিয়াই সে মাথা খাটাইতে



সমুদ্র-হস্তী
আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্রতীরে একসময়ে
এইরূপ জীব বহু স্থলে ছিল। এখন ইহাদের
দেখাই যায় না।

শিখিল, তাহার মস্তিষ্কও বাড়িয়া চলিল। কর্ম্মী ও ভাবুকের সম্পর্কটা এইরূপ পুরাতন। মস্তিষ্ক আজ মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছে, কিন্তু হাত না থাকিলে মানুষের এই মস্তিষ্ক কোনো কাজে আসিত না। ঘোড়ারও ত মগজ আছে; কিন্তু, তাহাতে কি আসে যায়? হাত ছাড়া মগজের সার্থকতা নাই। কিন্তু হাত থাকিলে মগজের আর কোনো আশঙ্কাই থাকে না। তাহা ক্রমশই বাড়িয়া চলে।

যতদিন ভূমিতে চলিতে হইয়াছিল, ততদিন হাত ছিল সামনের পা দুটির সামিল—প্রায় নিরর্থক। হঠাৎ একদিন মানুষের এক ভাগ্যবান্ পূর্ব্বপুরুষ লাফাইয়া গাছে চড়িয়া বসিল—হয়ত প্রকৃতিক বিবর্ত্তনের তাড়নায়। গাছে চড়িতে চড়িতে তাহার সন্ততিদের হাত প্রয়োজনের তাগিদে কার্য্যদক্ষ হইল। তারপরে, ইহাদের একদল এত ভারী হইল যে ইহারা মাটিতে নামিয়া চলিতে বাধ্য হইল। কিন্তু গাছের অভ্যাস রহিয়া গিয়াছিল। তাই, মাটিতেও দুই পায়ে খাড়া হইয়াই ইহারা চলিল। এইরূপ একটি জীবেরই প্রাচীনতম নিদর্শন জাভার মানবকল্প নর বা নরকল্প বানরটি। সে জীবটির কপাল কত নীচু। মানব পূর্ব্বপুরুষের মগজ তখনও কম; তাই এইরূপ দেখাইত। কিন্তু পার্শ্বের শিম্পাঞ্জির সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, তখনই তাহারা কতটা উন্নতি করিয়াছে। মানুষের আদি পুরুষেরা যখন যন্ত্র ব্যবহার শিখিল তখন তাহাদের চোয়ালের দরকার কমিল, চোয়াল ছোট হইল, এবং ক্রমশঃ অনুশীলনে মস্তিষ্ক বাড়াতে ললাট উচ্চ হইল।

—

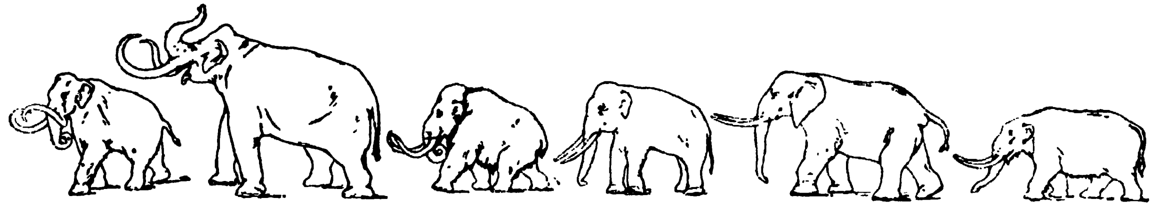
অতিকায়-যুগের অবসান—

'ডিস্কভারি' পত্রে এচ্, জি, ম্যাসিঙ্গাম লিখিয়াছেন যে, ব্যবসার প্রয়োজনে মানুষ পৃথিবীর অবশিষ্ট অতিকায় জীবদের প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তিনি বলেন যে, অতিকায়-যুগের অবসান সন্নিকট। গত ১০০ শত বৎসরের মধ্যে ব্লু ব্যাক্, কোয়েগা, বুর্সেলের জেব্রা, যাত্রী পায়রা, ষ্টেলারের ইসী কাউ, বড় কচ্ছপ, প্রভৃতি অতিকায় ভূচর জলচর ও খেচর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের জলাভূমির বড় হরিণ এখন অত্যন্ত দুর্লভ, নেপাল টিরাইএর বড় মৃগ (গ্যাজেল) দুর্লক্ষ্য ও একশৃঙ্গী গণ্ডার কেবল আসামের একটি জিলাতে এখনও পাওয়া যায়। লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ফেল্থোর্প বলেন, শীঘ্রই সরকারী সংরক্ষিত বনগুলির বাহিরে কোনো শিকারই ভারতবর্ষে পাওয়া যাইবে না। সভ্যতার বিস্তৃতি ইহাদের ধ্বংসের কারণ নয়; মানুষের ব্যবসাগত লোভই অধিকাংশক্ষেত্রে এই জীব-জগতের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতেছে।

—

লুপ্ত ও জীবিত অতিকায়—

পৃথিবীর অনেক অতিকায় জীব লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের হাতীর মত দুই একটী চতুষ্পদ বাঁচিয়া আছে। এই



এই চিত্রের জীবদের নাম বামদিক হইতে—
১। জেফারসনের পেরিলিফাস্, ২। আর্কিডিস্কুন্ ইম্পারেটর, ৩। মেমথ প্রিমিজিনাস্,
৪। এলিফান্ ইণ্ডিকাস (ভারতীয় হস্তী) ৫। লেকেসা জেণ্টা আফ্রিকেনা, ৬। মেষ্টুন্ এমেরিকাশস

…লুপ্ত ও জীবিত সেই সব জীবদের একটী অনুপাতানুযায়ী চিত্র দেওয়া গেল। অভিব্যক্তিবাদীদের পক্ষে এইসব জীব খুব বড় প্রমাণ। ভারতবর্ষের হাতীটী বাম দিক হইতে চতুর্থ, ইহার আকার সাধারণত ১০ ফিট্, তৎপর আফ্রিকার হাতী ১১ ফিট্ … ইঞ্চি।

মানুষের জাতি—

মানুষের জাতি ও গোত্র এই তিনটি মূর্ত্তি হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে।



মানুষ (man)

…টি রহিয়াছে মানুষ, (man) দ্বিতীয়টি তাহার নিকটতম …য় লাঙ্গুলহীন মানুষ (Ape man), শেষটি তাহার …াতি লাঙ্গুলহীন মর্কট (Ape)।



মানুষকল্প বানর (Ape-man)



লাঙ্গুলহীন বানর (Ape)



বিদেশ

জাতি সঙ্ঘ ও ভারতবর্ষ—

"জাতি সঙ্ঘের ব্যয় বৃদ্ধিতে ভারত জাতি-সঙ্ঘের-সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে"—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখ লীগ্ পরিষদের অধিবেশনে লর্ড্ লিটন উক্তরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ভারতে এই অভিমত প্রচারলাভ করিয়াছে যে লীগের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যে টাকা ভারতকে দিতে হয় ঐ টাকার অনুরূপ উপকার ভারতবর্ষ পায় না। লর্ড্ লিটন লীগের বাজেট বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করেন। ছয়টি রাষ্ট্র ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ভোট দেন! লর্ড লিটন বলেন, বর্ত্তমানে ব্যয় বৃদ্ধির কোনই কারণ নাই। ভারতবর্ষ বর্ত্তমান অবস্থায় কখনই গত বৎসরের ব্যয়ের উপর শতকরা ৭ টাকা বৃদ্ধি সমর্থন করিতে পারে না। লীগের খরচা বৃদ্ধির জন্য তিনি কর্ত্তৃপক্ষের ব্যয়-বাহুল্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এবৎসর লীগের অনেক নূতন চাকুরীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঐগুলি সৃষ্টির কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ভারতই লীগে অপরাপর অনেক সদস্য অপেক্ষা বেশী টাকা দিয়া থাকে, অথচ জাতি সঙ্ঘের কাউন্সিলে ভারতের স্থায়ী আসন নাই। ভারতে এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে যে, প্রাচ্য দেশের হিতকর কাজ রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রায় কিছুই করেন না। অন্য দেশের ক্ষতি করিয়া ইউরোপের স্বার্থবৃদ্ধিই জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য এবং ভারত যে টাকা দেয় তদনুরূপ কাজ জাতিসঙ্ঘ হইতে ভারত পায় না। লর্ড লিটন জানান ভারতের প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে তিনি এই বৎসরের বাজেটের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু প্রতিবাদের ফলে কোনরূপ ব্যয় সঙ্কোচ হয় নাই!

আফগানিস্থান—

আফ্গান সরকার ভোটাধিকারী প্রজাদের নির্ব্বাচিত সভ্যদিগকে লইয়া নূতন এক ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অর্থাৎ আফগানিস্থানে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অনুরূপ সাধারণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

নিখিল এসিয়া কংগ্রেস—

চীনের কুমিনটাং দলের সাংহাই শাখা চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কাবুলে নিখিল এসিয়াটীক সম্মেলনে চীন যাহাতে যোগ না দেয় তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া একখানা তার করিয়াছেন। সাংহাই শাখার মত এই যে, কাবুল সম্মেলনে জাপান এসিয়ার অন্যান্য জাতিকে দাস জাতিতে পরিণত করিবার জন্য আধিপত্য বিস্তার করিবে। উঁহারা বলেন যে, গত বৎসর সাংহাইয়ে যে নিখিল এসিয়াটিক সম্মেলন হয় তাহাতে জাপানই কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিল। সাংহাই শাখা জাতীয় গবর্ণ্মেণ্ট্কে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন এসিয়ার সমস্ত নিপীড়িত জাতিকে আহ্বান করিয়া কি ভাবে তাহাদের দাসত্ব দূর হয় তজ্জন্য আলোচনা করেন; কিন্তু এ সম্মেলনে জাপানকে যেন নিমন্ত্রণ করা না হয়।

শ্রমিকদল ও ভারতবর্ষ—

ভারতের প্রতি শ্রমিকদলের মতিগতি সম্পর্কে শীঘ্রই শ্রমিকদলের একটি বৈঠক হইবে। ঐ বৈঠককে সম্বোধন করিয়া ভারতবন্ধু মি: সি, এফ, এণ্ডরুজ এক আবেদনে দেখাইয়াছেন ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কেন শ্রমিকদলের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন নাই।

শ্রমিকদলের অতীতের কার্য্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মি: এণ্ডরুজ জানাইয়াছেন, শ্রমিকদলের আধিপত্যের সময়ই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স সৃষ্টি হইয়াছিল এবং অনেক দেশহিতকামী যুবককে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষমূলক আইন ও শ্রমিকদলের আধিপত্যের সময় পাশ হইয়াছে। মি: এণ্ডরুজ সাইমন কমিশন সম্পর্কে শ্রমিকদলের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, ঐ মনোভাবের পরিবর্ত্তন ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভ করিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সাইমন কমিশনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মি: এণ্ডরুজ বলেন, সাইমন কমিশন আগাগোড়া সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে অনুপ্রাণিত এবং লর্ড লিটন ভারতকে বিজিত দেশ বলিয়া মনে করেন বলিয়াই সাইমন কমিশন গঠিত হইয়াছে। কমিশন বড়লাটকে কমিটি মনোনয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ব্যবস্থা পরিষদের জনমতকে পদদলিত করিয়াছেন। সাইমন কমিশন সরলতার বড়াই করেন, কিন্তু একটা আপোষ নিষ্পত্তিতে পৌঁছিবার জন্য কি সাইমন কমিশন সর্ব্বদল সম্মিলনের সহিত গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করিতে রাজি আছেন? যদি হন, তাহা হইলে একটা কথাবার্ত্তার সূত্র পাওয়া যাইবে।

—ফ্রী প্রেস

১৮-বৎসর পর নিদ্রাভঙ্গ—

১৮ বৎসর নিদ্রিত থাকিয়া জোহান্সবার্গের একটি স্বাস্থ্যবা... সম্প্রতি একজন স্ত্রীলোকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। ১৯১০ সালে তাঁহা... একজন প্রিয়জনের মৃত্যু হয়। এই শোকের আঘাতে তিনি এ... নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন, বহু চেষ্টায়ও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গা...

সূর্য্য গ্রহণ দেখায় চোখের অনিষ্ট

আমাদের চোখ বড় সুকুমার ইন্দ্রিয়। অপব্যবহার করলে বড় সহজেই এর ভারী অনিষ্ট হয়। সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখে কত শত লোকের চোখের অনিষ্ট হয়েছে তা এই বিশ বছর চোখ পরীক্ষা ক'রে দেখে আস্‌ছি। একটা গ্রহণের পর বহু লোক চোখ দেখাতে আসেন। সূর্য্যের দিকে চেয়ে চোখের যে জায়গাতে সকলের চেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয় এঁদের সেই জায়গাটাই নষ্ট হ'য়ে যায়। চোখ পরীক্ষার নূতন যন্ত্র দিয়ে এই জায়গাতে কতদূর, কি রকম অনিষ্ট হ'য়ে যায় তা আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি—আগেকার যন্ত্র দিয়ে এটা প্রায়ই দেখা যেত না। যে অনিষ্ট হয় তা আর এ জীবনে কিছুতেই সারে না।

আস্‌ছে ১২ই নভেম্বর সূর্য্য গ্রহণ হবে। লোকে নানা রকম উপায়ে গ্রহণ দেখে। কেউ হাত মুঠো ক'রে আঙ্গুলের ফাঁকে দেখে কেউ থালায় হলুদ গোলা জল রেখে দেখে আর কেউ বা সোজা-সুজি খালি চোখেই দেখে। এর প্রত্যেকটীতেই অনিষ্ট হ'বার সম্ভাবনা।

কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে সাধারণ সার্শির কাঁচে খুব পুরু ক'রে ভুষো পড়াবেন। এই ভুষোর মধ্যে দিয়ে দেখলে সূর্য্যকে কমলা লেবুর রংয়ের একটা গোলার মতন দেখাবে। আর অনিষ্টের ভয়টা অনেকটা কম হ'বে। কিন্তু এক সঙ্গে অনেকক্ষণ দেখবেন না।

এই সতর্ক বাণীর ফলে আমাদের দেশবাসীর দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকুক, শারদীয়া পূজার সম্ভাষণের সহিত ইহাই আমাদের কামনা।

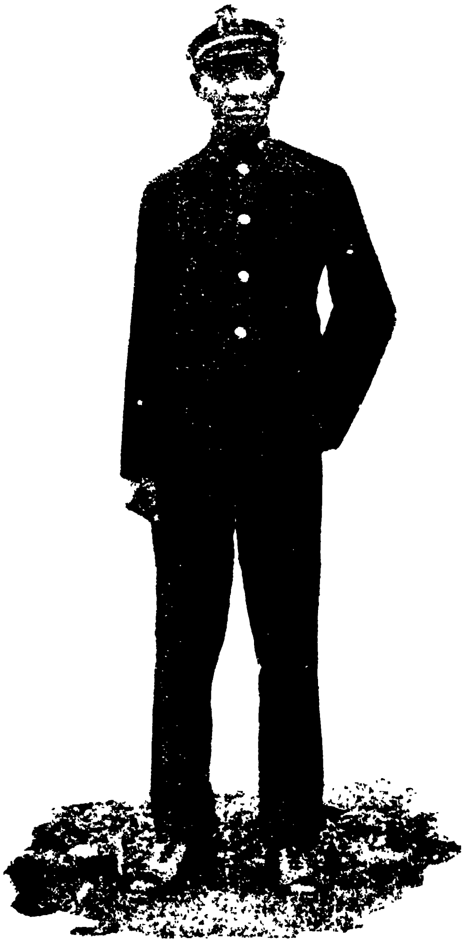
প্রেসীডেন্সী ফার্ম্মেসী

বসু এণ্ড সন্

২০৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৬৮-এ, বিডন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

যায় না। তাঁহাকে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর নল দিয়া খাওয়ান হইত; কিন্তু তিনি ক্রমেই কৃশ হইয়া যাইতে থাকেন। অবশেষে তিনি একটি নরকঙ্কালে পরিণত হন। ধীরে ধীরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু তিনি এখনও মানুষ দেখিলেই মাথা লুকান। এযাবৎ তিনি মাত্র কয়েকটি অস্পষ্ট কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছেন।



শ্রী অমিয়াংশু চৌধুরী

১৮ বৎসর পর জাগ্রত হইয়া তিনি জগতকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় দেখেন তিনি যখন নিদ্রিত হন, ঐ সময় বিমানপোতের একান্ত শৈশবাবস্থা—বেতার তখন স্বপ্নের বিষয় ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের আশঙ্কাও তখন লোকের কল্পনায় স্থানলাভ করে নাই।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

নেপালের মানচিত্র—

নেপালের মহারাজা নেপাল রাজ্যের জরিপ-মানচিত্র প্রস্তুত করাইবার ভারত সরকারের জরীপ-বিভাগের সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন। তিন বৎসরের কার্য্যের পর এখন নেপালের মোটামুটি জরিপ-নক্সা প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে নেপালের বিস্তারিত নক্সা ছিল না। মাপে দেখা গিয়াছে যে পার্ব্বত্য নেপালরাজ্য পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল। এখন মোটামুটি যে মানচিত্র খাড়া হইয়াছে তাহাতে দেশটার একটা সাধারণ বিবরণ এবং জলপ্রবাহগুলি চিত্রিত আছে। ইহার পর যে সকল নূতন সংবাদ পাওয়া যাইবে, তাহা বিস্তৃত মানচিত্রে দেখান হইবে। কোথাও নদী, কোথাও উন্নত পর্ব্বতশিখর, কোথাও জঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভূপৃষ্ঠ এবং প্রতিকূল জলবায়ু জরিপের কার্য্যে বহু বাধা-



শ্রী মনোমোহন দে

বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল কিন্তু উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এই ম্যাপ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবার যে সকল ত্রুটি, বিচ্যুতি রহিয়া গেল, পরবর্ত্তী সঙ্কলনে তাহার সংশোধন হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করা যায়। জরিপে নেপালের অনেক অজানা স্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেছেন। এখন ঐ সমস্ত অঞ্চলের ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, প্রাণী-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অভিযান চলিবে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস।

—প্রকৃতি

—

ভারতবর্ষ

শারীরিক চর্চ্চায় প্রফেসার রামমূর্ত্তি—

সুপ্রসিদ্ধ শারীর চর্চ্চাবিদ্ প্রফেসার রামমূর্ত্তি স্বয়ং স্বাস্থ্যের

আদর্শ। দেশে স্বাস্থ্য চর্চ্চার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি একটি আদর্শ স্বাস্থ্য শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য যত্নপর হইয়াছেন। এই শিক্ষালয় স্থাপনে অন্যূন ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে এবং তজ্জন্য তিনি দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

বোম্বাইয়ের নানা স্থানে জৈন-শোভাযাত্রা ও গণপতি উৎসবের মিছিল লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। গোধারায় জৈনদের এক শোভা যাত্রা মসজিদের সম্মুখ অতিক্রম করিবার সময় মুসলমানগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তার ফলে একজন নারী আহত হয়। উক্ত শোভা যাত্রা ছত্রভঙ্গ হইলে মসজিদের নিকটবর্ত্তী স্থানে আর একটি হাঙ্গামা হয় তাহাতেও ১২ জন লোক আহত হইয়াছে।

বোম্বাই ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ ডব্লিউ, এস, মুকাদাম, মস্তকে ও বাহুতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৩ জন আহত ব্যক্তির মধ্যে ১২ জনই হিন্দু। যে মুসলমানটি আহত হইয়াছে তিনি একজন পুলিশ পেট্রল। গোধ্র হিন্দু মহাসভার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং প্রসিদ্ধ উকিল মিঃ পুরুষোত্তম একজন মুসলমান তৈল ব্যবসায়ী দ্বারা গুরুতর রূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ—

জনমতের দিক্ হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সিমলা অধিবেশন ফলদায়ক হইয়াছে। উপকূল সংরক্ষণ বিলে গভর্ণমেণ্টের পরাজয় ও জনরক্ষা বিল নাকচ, এই দুইটি সিমলা অধিবেশনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ।

মহাত্মার আত্মজীবনী—

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আত্মজীবনীর বৈদেশিক সত্ত্ব (copy-right) এক ইংরেজ কোম্পানীকে ১ লক্ষ টাকার বিক্রয় করিয়াছেন। ঐ অর্থ চরকাভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—

য়ুরোপের সুধী মণ্ডলীর সমক্ষে আপনার নব আবিষ্কার ও তথ্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়া জগতের শ্রদ্ধার অঞ্জলি লইয়া, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মতিথি পড়িয়াছে। এই সময়ে তাঁহাকে অভিনন্দিত করার আয়োজন হইতেছে। প্রকাশ্য যে, এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কলিকাতাতে আসিবেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও ভক্তগণ তাঁহাকে এই সময়ে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ পাইবেন, অনেকে আশা করিতেছেন যে, এই উপলক্ষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অতিথিগণকে একটা নূতন বাণী শুনাইবেন।

—

বাঙলা

ভাওয়ালের রাজকুমার—

সন্ন্যাসীবেশধারী যে ব্যক্তি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ও ভাওয়ালের জমিদারীতে তাঁহার দাবী রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু উক্ত জমিদারীর অন্তর্গত প্রজা এবং তালুকদারগণ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য কর প্রদান করিবার জন্য উৎসুক হইয়া প্রজাবৃন্দ পুনরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। এই আবেদন নামঞ্জুর হইলে ধর্ম্মঘট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

—চারুমিহির

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সভা—

গতমাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে বার্ষিক বিবরণ পাঠ করা হয়। সভার কার্য্য যে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে, এই রিপোর্ট পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি হয়। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ২ শত ৭৫টি শাখা সভা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে বরিশালে ৫৭, ময়মনসিংহে ৪৪, পাবনায় ৪১, নদীয়ায় ১৯, যশোহরে ১১, খুলনায় ১০, রঙ্গপুরে ১৮ এবং ২৪ পরগণায় ১২টি শাখা স্থাপিত হয়। এই সভার উদ্যোগে এ-পর্য্যন্ত ১ শত ৮৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তন্মধ্যে পাবনায় ১৪০ ময়মনসিংহে ১০, ত্রিপুরায় ১৮ এবং ঢাকায় ১৫টির বিবাহ হইয়াছে।

যাহাদের হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১ হাজার ৬৩ হইবে। তন্মধ্যে ২ শত ৭৫ জন খৃষ্টান এবং ৭ শত ৮৮জন মুসলমান।

আলোচ্য বর্ষে সভার আয় ৩২ হাজার ৮ শত ৫৩ টাকা দুই আনা এবং ৩২ হাজার ৭ শত ৯৩ টাকা ৯ পাই ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট ৬০ টাকা ১ আনা ৩ পাই তহবিলে আছে।

নিখিল বঙ্গ যুবক সম্মিলন—

কলিকাতা নগরে বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। একদিকে সমগ্র বঙ্গীয় ছাত্র-সম্প্রদায়ের বিপুল উদ্যম, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি, অপরদিকে তাঁহাদের নবীন সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেম, উচ্চ আদর্শ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ; এতৎ-সমবায়ে সম্মিলন সর্ব্বতোভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

শ্রীহট্ট ও কাছাড় বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে না,—এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব আসাম ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

দান—

শ্রীরামপুরের সুবর্ণ বণিক সমাজের বাবু মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি নানা সৎকার্য্যে দানের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন।

ব্যায়ামবিদ্ শ্রীমনোমোহন দে—

বিগত বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে যে ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী। বাল্যে মনোমোহন বাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মদেশীয় ব্যায়ামবিৎ মং চিটুন্ এর পেশীসংযম ও দলগীর মহেন্দ্রনাথের অদ্ভুত শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া উদ্বোধিত হন। তখন হইতে তিনিও ব্যায়াম অভ্যাস করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। ইনি ইতিমধ্যেই নানা প্রকার শক্তির খেলায় বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন। মনোমোহনবাবুর অনুচরবর্গও লাঠি, ছোরা, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলোন প্রভৃতি খেলায় বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

বাণিজ্যবাহী জাহাজে বাঙালী নাবিক—

বোম্বাইএর "ডাফ্‌রিন" জাহাজে ভারতীয় যুবকদিগকে নাবিকের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বরিশালের শ্রীমান্ অমিয়াংশু চৌধুরী এই জাহাজে একমাত্র বাঙালী হিন্দু নাবিক। এক বৎসর শিক্ষানবিশি করিয়াই ইনি ক্যাডেট্ ক্যাপ্টেন (অর্থাৎ শিক্ষানবিশদের নেতা) হইয়াছেন।

ঔপন্যাসিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

গত মাসে কলিকাতায় ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্ম-তিথি উপলক্ষে সভা-সমিতি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার সভায় তদীয় মানপত্র ও উপহার প্রদান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খদ্দর প্রদর্শনী—

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে গত ১৫ই আশ্বিন কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি খদ্দর প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় পতাকা স্থাপন করেন। প্রদর্শনীতে বাংলার বিভিন্ন স্থানের বহু খদ্দর বিক্রয়ের জন্য আনীত হইয়াছে, খাদি প্রতিষ্ঠান অভয়াশ্রম ও প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের দোকান খোলা হইয়াছে। লোকের উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে, বহুপরিমাণে খদ্দর বিকাইতেছে।

ফরওয়ার্ডের দণ্ড—

বেলুর ট্রেণ দুর্ঘটনার সম্পর্কে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ফরোয়ার্ডের সম্পাদক ও মুদ্রাকর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উৎপাদন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেই মামলার রায় দিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর তিনমাস অশ্রম কারাদণ্ড ও ১৯০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে; মুদ্রাকর শ্রী পুলিন-বিহারী ধরকে ১০০০৲ টাকা জরিমানা দিতে অথবা একমাস অশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে।

ছাত্রী সঙ্ঘ—

বাঙলার ছাত্রীগণ যাহাতে জাতীয় জীবনে নিজেদের স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে একটি ছাত্রীসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ উহার উদ্বোধন করেন। ৭ নং রামমোহন রায় রোডে সঙ্ঘের কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে, সকল স্কুল কলেজের ছাত্রীদিগকে সভ্য হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—

শ্রীযুক্ত শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন জানাইতেছেন 'প্রায় আড়াই বৎসরব্যাপী পটুয়াখালীতে অবিচ্ছেদ সংগ্রামের পরে রাজপথে সঙ্গীতসহ শোভা যাত্রার অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সংগ্রামে ভারতের সকল স্থান হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মুক্তহস্তে দানের আশীর্ব্বাদে সত্যাগ্রহ সাফল্য সহজ হইয়াছে; কিন্তু এই বিরাট আন্দোলনের জন্য সত্যাগ্রহ কমিটী এখনও সাত হাজার টাকা ঋণী। আমাদের আশা ও বিশ্বাস আছে যে, যে জনসাধারণের সহৃদয়তা ও দানের ফলে সত্যাগ্রহ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নর-নারীই সত্যাগ্রহ কমিটীকে এই ঋণভার হইতে মুক্ত করিবেন।

"স্বামী জ্ঞানানন্দ শ্রীযুত তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি কর্ম্মিগণ অর্থ সংগ্রহের জন্য ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর এবং অন্যান্য জিলায় গমন করিবেন। আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণ তাঁহাদিগের নিকট যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যদ্বারা সত্যাগ্রহ কমিটির ঋণশোধে সহয়তা করিবেন।"

মুর্শিদাবাদ গীতগ্রামে নূতন আবিষ্কার—

কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী সহরের নিকট-বর্ত্তী গীতগ্রামের এক ডাঙ্গা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্র-সভ্য মোল্লা রবীউদ্দীন আহম্মদ বি এ, কর্ত্তৃক খৃঃ পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাচীন মুদ্রা, জপমালার দানা প্রভৃতি আবিষ্কারের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে আরও জপমালার দানা, তিনটি গোলাকার প্রাচীন মুদ্রা, মাটীর উপরে মোহরের ছাপ এবং একখানি অশ্বারোহীমূর্ত্তি যুক্ত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত, রায় শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ-গণ বলেন যে, এইগুলির অনুরূপ মুদ্রা বঙ্গদেশে ইতঃপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, এগুলি সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। যে মোহরের ছাপ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চন্দ্র-কথা উৎকীর্ণ আছে। সম্ভবতঃ ইহা গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মোহরের ছাপ। অশ্বারোহী লাঞ্ছন ইষ্টকখানিকেও ঐ যুগের বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। গত ৭ই আশ্বিন তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই শেষোক্ত দ্রব্যগুলি পূর্ব্বে আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলির সহিত প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কলিকাতা অনাথ আশ্রম—

কলিকাতা অনাথ আশ্রমের সম্পাদক (১২।১, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার) লিখিতেছেন, দুর্গোৎসব সমাগত এই আনন্দের দিনে আপনাদের আশ্রিত কলিকাতা অনাথ আশ্রমের অনাথ বালকবালিকা-গুলি আপনাদের স্নেহ-প্রদত্ত নব বস্ত্রাদি লাভ করিয়া যাহাতে

পিতা মাতার অভাব বিস্মৃত হইয়া ঐরী পূজার আনন্দ অনুভব করিতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করিয়া জগজ্জননীর শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এক্ষণে কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৫২টি বালক ও ২৫টি বালিকা বাস করিতেছে। নিম্নে তাহাদের বয়সের উপযোগী বস্ত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ধুতি সাটি,—১০ হাত ১২ খানি, ১০ হাত ৬ খানি, ৯ হাত ৪ খানি ৯ হাত ৩ খানি, ৮ হাত ১৪ খানি, ৮ হাত ৭ খানি, ৭ হাত ১১ খানি, ৭ হাত ৪ খানি, ৬ হাত ১১ খানি, ৬ হাত ৫ খানি, ৫ হাত ০ খানি।

বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে।

নিম

শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

নিদাঘ-তপন-তপ্ত বিজনে বসিয়া তোমার তলে—
ওগো নিম! তব ছায়ার মায়ায় পরাণ পড়েছে গ'লে!
ত্বকে, ত্বকে, আজি হেরি নবরূপে,
পত্রে, পত্রে প্রতি দেহকূপে
প্রাণের বিরাট সাড়া চুপে চুপে, উঠে ছাপি' পলে পলে!
নিরালায় বুঝি; শাদা চোখে ধাঁধাঁ আঁকিয়াছ কোলাহলে!

মেদিনীর মেদ মন্থি' কবে যে উঠেছিল হলাহল!
পলকে থামিল সারা অটবীর স্পন্দন-চলাচল!
কোথা মহাকাল? বিষ শোষা প্রাণ?
কে করে কে করে আশীবিষ পান?
ধরার বক্ষে জরার নিদান, করে কে নীরবে বল্!
মহাকাল কূট তিক্ত, কণ্ঠে ধরি' সুখে অবিরল!

তাই আজ শোভা-সম্পদে ছাপি' নিখিল-বনস্পতি
স্তুতি-গান পেল খেজুর, ইক্ষু; গৌরব পরিণতি!
ওগো তপস্বি! কোনো মধুকর
গুঞ্জিত তব করে না আসর!
কোন্ শাশ্বত গানে অন্তর ভরি' নির্ব্বাণে রতি!
সুধার ভাণ্ড বিলায়ে জগতে, মহা বিষে এই মতি!

আজি হেরি তব পত্রে পত্রে বিচিত্র মধুরতা!
সবুজ শাখায় ঢাকা প'ড়ে গেছে বেদনার আবিলতা!
পুরুর সমান বরি' বিষকস্—
ধরণীর বুক করেছ সরস!
হে নীলকণ্ঠ, তোমার পরশ দিল কিবা সঞ্জীবতা!
ব্যথার দরদী মায়ের সমান, হৃদিভরা আকুলতা!

পলাশের রং, গোলাপ গন্ধ, চন্দন-লেপবাস,
লোধ্ররেণুতে রমণীর মুখে, হাসি হয় পরকাশ!
কে তোমারে চায়? তুমি প্রাণ-ধারে
কুষ্ঠের ক্ষত ধুয়ে বারে বারে,
বঞ্চিত যেবা শুধু করো তারে, সুধারসে অধিবাস,—
তব শির সেথা গগন-চুম্বী, যেথা বিশ্বের ত্রাস!

বিশ্বের ব্যথা বিস্ফোটকের ক্লেদ জলোকা সম,
পান করি' ধরা যৌবনে করো সুন্দর, অনুপম!
কোথা লয় পেত সুধা-সন্ধান?
মৃত্যু-ভীরু এ মানবের প্রাণ?
নিঃশেষে সব ক'রে যাও দান, ওগো বঞ্চিততম!
হে নীলকণ্ঠ! ঘৃণিত, নিঃস্ব! নমো নমো শত নমঃ!

ভ্রম-সংশোধন

আশ্বিন সংখ্যা ৮১৫ পৃঃ ১ম স্তম্ভের মূর্ত্তির পরিচয়ে "অপরাজিতা মূর্ত্তি" এবং ২য় স্তম্ভের মূর্ত্তির নিম্নে "মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব" হইবে। ৮১৬পৃঃ ১ম স্তম্ভের মূর্ত্তির পরিচয়ে "মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব" এবং ২য় স্তম্ভে মূর্ত্তির নিম্নে "জম্ভল অথব কুবের" হইবে।

পৃঃ ৮১৬ প্রথম স্তম্ভের ছবির নাম অবলোকিতেশ্বর ও দ্বিতীয় স্তম্ভের ছবির নাম কুবের হইবে।

পৃঃ ৮২৯ প্রথম স্তম্ভ ১১পংক্তিতে "কালের ভূমিকায়" কথা দুইটির পর দেশ ও "কালকে" কথাগুলি উঠিয়া যাইবে। বাক্যটি নিম্নলিখিত রূপ হইবে—

"আত্মা নিজের মধ্যে দেশ-কালের ভূমিকায় সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে বিশ্বজগতে ঐক্য সূত্রটিকে আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে।"

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



দ্বারপথে

শিল্পী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

২য় সংখ্যা

শেষের কবিতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বল্লেন, "মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেচ ?"

"ঠিক বুঝেচি, মা।"

"অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্তেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখনা, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবি যেন প'ড়ে প'ড়ে যায়।"

লাবণ্য একটু হেসে বললে, "ওঁকে সবই যদি ধ'রে রাখ্‌তেই হোত, হাত থেকে সবই যদি খ'সে খ'সে না পড়্‌ত তাহ'লেই ওঁর ঘট্‌ত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্চে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখ্‌তে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।"

"সত্যি ক'রে বলি, বাছা, ওর ছেলেমানুষী আমার ভারি ভালো লাগে।"

"সেটা হোলো মায়ের ধর্ম্ম। ছেলেমানুষীতে দায় যত কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলচ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে ?"

"দেখ্‌চনা, লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন, আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বলো, ও তোমাকে ভালোবাসে।"

"তা বাসেন।"

"তবে আর ভাবনা কিসের ?"

"কর্ত্তা মা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাইনে।"

"আমি তো এই জানি, লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।"

"কর্ত্তা মা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে ; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন নয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়্‌লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েচে ভালোবাসার ট্র্যাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারেনি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে কর্‌বার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো ক'রে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি কর্‌ব।"

"তা, মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাত্‌তে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না ক'রে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ,—যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্র্যাজেডি বলো, তাই ঘটে।"

"সংসার পাত্‌বার জন্যেই যে মানুষ তৈরি, তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতি দিনের চাপেই তার গড়ন পিটোন আপনিই ঘট্‌তে থাকে। কিন্তু যে-মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয়, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়্‌তে পারে না। যে-মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবী করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানা-হেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে, আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যে-রকম পায় সেই আর কি।"

"তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য ?"

"বিয়ে ক'রে দুঃখ দিতে চাইনে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জানো, কর্ত্তা মা, খুঁৎখুঁতে মন যাদের, তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে স্ত্রী-পুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কার্‌বার করতে হয়, নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখ্‌বার জো থাকে না।"

"লাবণ্য, তুমি নিজেকে জানো না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।"

"কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখ্‌তে পেয়েচেন ব'লে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অম্‌নি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেচে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গ'ড়ে তুলেচেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়্‌বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

"তোমার মনে হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পার্‌বে না ?"

"স্বভাব যদি বদ্‌লায় তবে পার্‌বেন। কিন্তু বদ্‌লাবেই বা কেন ? আমি তো তা চাই না।"

"তুমি কী চাও ?"

"যতদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হ'য়েই থাক্‌ব। আর স্বপ্নই বা তাকে বল্‌ব কেন ? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েচে। না হয় সে গুটি থেকে বের হয়ে আসা দু চার-দিনের একটা রঙীন প্রজাপতিই হোলো, তাতে দোষ কি—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়

—না হয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলো, আর সূর্যাস্তের আলোতে ম'রেই গেলো তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে, সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হ'য়ে না যায়।"

"সে যেন বুঝ্‌লুম, তুমি অমিতর কাছে না হয় ক্ষণকালের মায়ারূপেই থাক্‌বে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে কর্‌তে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়া?"

লাবণ্য চুপ ক'রে ব'সে রইল, কোনো জবাব কর্‌লে না।

যোগমায়া বল্‌লেন, "তুমি যখন তর্ক করো তখন বুঝ্‌তে পারি তুমি অনেক বইপড়া মেয়ে, তোমার মতো ক'রে ভাব্‌তেও পারিনে, কথা কইতেও পারিনে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হ'তে পারিনে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেচি, মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে—দেখ্‌লুম তোমার ঘরে আলো জ্বল্‌চে, ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলের উপর নুয়ে প'ড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদ্‌চ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাব্‌লুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি, তার পরে ভাব্‌লুম সব মেয়েকেই কাঁদ্‌বার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি কর্‌তে চাও না, ভালবাস্‌তে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না কর্‌তে পার্‌লে তুমি বাঁচ্‌বে কী ক'রে? তাই তো বলি ওকে কাছে না পেলে তোমার চল্‌বে না। বিয়ে কর্‌ব না ব'লে হঠাৎ পণ ক'রে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপ্‌লে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।"

লাবণ্য কিছু বল্‌লে না, নতমুখে কোলের উপর সাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ কর্‌তে লাগ্‌ল। যোগমায়া বল্‌লেন, "তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক প'ড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশী সূক্ষ্ম হ'য়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গ'ড়ে তুল্‌চ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ ক'রে দেহটাকে যেন অগোচর ক'রে দিচ্চে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল—সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলচ, কিছুই আর সহজ রাখ্‌লে না।"

লাবণ্য একটুখানি হাস্‌লে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেচে—এওতো সূক্ষ্ম; যোগমায়ার মা ঠাকরুণ একথা এমন ক'রে বুঝ্‌তেন না। বল্লে, "কর্ত্তা মা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে ততই শক্ত ক'রে তার ধাক্কা সইতেও পার্‌বে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেন না সেটা অস্পষ্ট।"

যোগমায়া বল্‌লেন, "আজ আমার বোধ হচ্চে কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হ'লেই ভালো হোত।"

"না, না, তা বোলো না। যা হয়েচে এ ছাড়া আর কিছু যে হ'তে পার্‌ত এ আমি মনেও কর্‌তে পারিনে। একসময়ে আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুক্‌নো,—কেবল বই পড়্‌ব আর পাস কর্‌ব এমনি করেই আমার জীবন কাট্‌বে। আজ হঠাৎ দেখ্‌লুম আমিও ভালোবাস্‌তে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হোলো এই আমার ঢের হয়েচে। মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই! আমাকে বিয়ে করতে বোলো না, কর্ত্তা মা!"

ব'লে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

বাসা বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক ক'রে রেখেছিল অমিত দিন পনেরোর মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দুমাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েচে,—রঙপুরের কোন জমিদার এসে সেটা দখল ক'রে বস্‌ল। অনেক খোঁজ ক'রে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর,—তার পরে একজন কেরাণীর হাতে প'ড়ে তা'তে গরীবী ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরাণীও গেছে ম'রে, তারি বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সঙ্কীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে 'অপ্' অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্য্যের সঙ্গে, অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চম্‌কে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, "বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেচে ?"

অমিত উত্তর কর্‌লে, "উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্য্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হোলো নিরাস্‌বাবের তপস্যা,—খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে প্রায় এসে ঠেকেচে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্ব্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্চেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা,—এখন শেষ পর্য্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সার্‌তে হবে।"

অমিত হাস্‌তে হাস্‌তে কথাগুলো বলে কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো,—থেমে গেলেন। ভাব্‌লেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুল্‌চেন তার মধ্যে আমাদের হাত পড়্‌লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠ্‌তে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বারবার বল্‌লেন, "মা, লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।"

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখ্‌লেন, নড়্‌বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত একলা ব'সে একখানা ইংরেজি বই পড়্‌চে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসঙ্গত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে ব'সে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চল্‌ল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্ব্বদাই প্রয়োজন সেখানে আস্‌বার সময় সেটা আন্‌বার কথা মনে হয়নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সঙ্কল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেচে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে প'ড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "এ কি কাণ্ড, অমিত ?"

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেচে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।"

"অসম্বদ্ধ প্রলাপ ?"

"অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বল্‌লেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আল্‌গা। এই-জন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘট্‌লেই চারিদিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হ'তে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সোঁ সোঁ ক'রে উঠ্‌তে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রোটেস্‌ট্ স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি,—ঘরের মিস্‌গভর্মেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্‌সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।"

"মূলনীতিটা কী শুনি।"

"সেটা হচ্চে এই যে, যে-ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হোক্ তার শাসনের চেয়ে যে-দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।"

আজ লাবণ্যর পরে যোগমায়ার খুব রাগ হলো। অমিতকে তিনি যতই গভীর ক'রে স্নেহ করচেন ততই মনে মনে তার মূর্ত্তিটা খুব উঁচু ক'রেই গড়ে তুল্‌চেন। "এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন! গুছিয়ে কথা বল্‌বার কী অসামান্য শক্তি! আর যদি চেহারার কথা বলো আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেচে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত ক'রে দুঃখ দিচ্চে। খামকা ব'লে বস্‌লেন কিনা, বিয়ে কর্‌বেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী! ধনুক-ভাঙা পণ! এত অহঙ্কার সইবে কেন? পোড়ামুখীকে যে কেঁদে কেঁদে মর্‌তে হবে।"

একবার যোগমায়া ভাব্‌লেন অমিতকে গাড়িতে ক'রে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়তে। তার পরে কী ভেবে বল্‌লেন, "একটু বোসো, বাবা, আমি এখনি আস্‌চি!"

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়্‌ল, লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির "মা" ব'লে গল্পের বই পড়্‌চে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠ্‌ল।

বললেন, "চলো, একটু বেড়িয়ে আস্‌বে।"

সে বল্‌লে, "কর্ত্তা মা, আজ বেরোতে ইচ্ছে কর্‌চে না।"

যোগমায়া ঠিক বুঝ্‌লেন না, যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েচে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল কখন আস্‌বে অমিত। কেবলি মন বলেচে এলো বুঝি। বাইরে দম্‌কা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন্ গাছগুলো থেকে থেকে ছট্‌ফট্ করে, আর দুর্দ্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরণাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেচে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল,—যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধ'রে ব'লে উঠি—জন্মে জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরীয়া হ'য়ে উঠ্‌ল, হূহু ক'রে কী যে হেঁকে উঠ্‌চে তার ঠিক নেই, তারি ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েচে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি ক'রেই কেউ শুন্‌তে আসুক লাবণ্যের কথা, অম্‌নি মস্ত ক'রে, স্তব্ধ হ'য়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না; ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। এর পরে যখন কেউ আস্‌বে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আস্‌বে মনে, তখন তাণ্ডব নৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে; বৎসরের পর বৎসর নীরবে চ'লে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে

আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোল্‌বার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল, তবে কোনো দিনই ঠিক কথাটি অবুণ্ঠিত স্বরে বল্‌বার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপারগামী পাখীর মতো। কতদিন থেকে, কত দূর থেকে আস্‌চে, সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। স্পর্শ কর্‌ল আজ সেই কথাটি,—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আর কাকে এমন ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চ'লে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করতে লাগ্‌ল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেল্‌লে, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হোলো ওর জীবনে যা জ্বল্‌বার তা একবার মাত্র দপ ক'রে জ্ব'লে তার পরে গেল নিবে, সাম্‌নে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে স্বীকার ক'রে নিতে ওর সাহস চ'লে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ ক'রে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যখন যোগমায়া ডাক্‌লেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হোলো না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বস্‌লেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বল্‌লেন, "সত্যি ক'রে বলো দেখি, লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাসো?"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বল্‌লে, "এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করচ, কর্ত্তা মা?"

"যদি না ভালোবাসো ওকে স্পষ্ট ক'রেই বলো না কেন? নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধ'রে রেখোনা।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠ্‌ল, মুখ দিয়ে কথা বেরল না।

"এই মাত্র যে-দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও প'ড়ে আছে? ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কত বড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝ্‌তে পারো না?"

চেষ্টা ক'রে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য ব'লে উঠ্‌ল—"আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ, কর্ত্তা মা? আমি তো ভেবে পাইনে আমার চেয়ে ভালোবাস্‌তে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হ'য়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য্য সে আমি কাউকে কেমন ক'রে জানাব? আর কেউ কি এমন ক'রে জেনেচে?"

যোগমায়া অবাক হ'য়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেচেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এত বড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল? তাকে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে,—সম্পূর্ণ ক'রে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও,—একটুও ভয় কোরো না যে-আলো তোমার মধ্যে জ্বলেচে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তাহ'লে তার কোনো অভাব থাক্‌ত না। চলো, মা, এখনি চলো আমার সঙ্গে।"

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

ক্রমশঃ

বলাই

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীব-জন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েচে,—আমাদের বাঘ গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েচে পুরে, অহি নকুলকে এক খাঁচায় ধ'রে রেখেচে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সারেগামাগুলোকে সঙ্গীত ক'রে তোলে, তারপর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু সঙ্গীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হ'য়ে ওঠে—কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই;—তার প্রকৃতিতে কেমন ক'রে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েচে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ, চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ানো নয়। পূবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্‌ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেল বেলাকার রোদ্দুর প'ড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কি একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে;—ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেচে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক জোড়া অতি পুরানো পাখী, বেঙ্গমা, বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্ব্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সাম্‌নে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে, আর ওর মন ভারি খুসি হ'য়ে ওঠে; ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না, ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলি গড়াচ্চে; প্রায়ই তারি সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হ'য়ে উঠ্‌ত,—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগ্‌ত আর ও খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সাম্‌নের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা রঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপর এসে পড়ে,—ও কাউকে না ব'লে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারু-বনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম্‌ছম্ করে,—এই সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখ্‌তে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, এক যে ছিল রাজাদের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেচি ও আমার বাগানে বেড়াচ্চে মাটির দিকে কি খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠ্‌চে এই দেখ্‌তে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে প'ড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, "তার পরে," "তার পরে" "তার পরে"। তারা ওর চির অসমাপ্ত গল্প।

সদ্য গজিয়ে ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্য-ভাব তা ও কেমন ক'রে প্রকাশ করবে? তারাও ওকে কা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্যে আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে তোমার নাম কি, হয়তো বলে, তোমার মা কোথায় গেল; বলাই মনে মনে উত্তর করে, "আমার মা তো নেই।"

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর কারো কাছে ওর এই সঙ্কোচের কোনো মানে নেই এটাও সে বুঝেচে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকি পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দুপাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুল-গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়, ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামী মনে করে। ওর সব-চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েচে, এতটুকুটুকু লতা, বেগনি হলদে নামহারা ফুল, অতি ছোট ছোট; মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল, পাখীতে খাওয়া নীম ফলের বীচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েচে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের সৌখীন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই। এক একদিন ওর কাকীর কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।" কাকী বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন?" বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চারদিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে,—সেদিন পশু নেই, পাখী নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর আর পাঁক, আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্য্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেচে, "আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে বাদলে, দিনে রাত্রে।" গাছের সেই রব আজও উঠচে বনে বনে, পর্ব্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠচে, "আমি থাকব, আমি থাকব।" বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দ্যুলোককে দোহন করে, পৃথিবীর অমৃত ভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে, আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে, "আমি থাকব।" সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী"? দেখলুম একটা শিমুল গাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেচে। হায়রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনি এটা বলাইয়ের চোখে পড়েচে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েচে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হ'য়ে দেখেচে, কতটুকু বাড়ল। শিমুল গাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েচে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত ক'রে দেবে।

আমি বল্‌লুম, "মালীকে বল্‌তে হ'বে এটা উপ্‌ড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চম্‌কে উঠ্‌ল। এ কি দারুণ কথা! বল্‌লে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপ্‌ড়ে ফেলোনা।

আমি বল্‌লুম, "কী যে বলিস্ তার ঠিক নেই! একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেচে। বড়ো হ'লে চারদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির ক'রে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পার্‌লে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকীর কাছে। কোলে ব'সে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, "কাকী, তুমি কাকাকে বারণ ক'রে দাও গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকী আমাকে ডেকে বল্‌লে, "ওগো শুন্‌চ! আহা ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হোত না। কিন্তু এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠ্‌ল। বলাইয়ের এমন হোলো এই গাছটার পরেই তার সব-চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্চে নিতান্ত নির্ব্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই একেবারে খাড়া লম্বা হ'য়ে উঠ্‌চে, যে দেখে সেই ভাবে এটা এখানে কী কর্‌তে! আরো দু চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব! বল্‌লেম, "নিতান্তই শিমুল গাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখ্‌তে হ'বে।" কিন্তু কাট্‌বার কথা বল্‌লেই বলাই আঁৎকে ওঠে, আর ওর কাকী বলে, "আহা, এমনিই কি খারাপ দেখ্‌তে হয়েচে"!

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েচে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখ্‌তে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকীর কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতী কায়দায় শিক্ষা দেবেন ব'লে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিম্‌লেয়—তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কাকীর কোল ছেড়ে বলাই চ'লে গেল, আমাদের ঘর হোলো শূন্য।

তার পরে দুবছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকী গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক পাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন চাড়েন; এতদিনে এই সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হ'য়ে উঠেচে এই কথা ব'সে ব'সে চিন্তা করেন।

কোন এক সময়ে দেখ্‌লুম লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েচে—এতদূর অসঙ্গত হ'য়ে উঠেচে যে,আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিম্‌লে থেকে বলাই তার কাকীকে এক চিঠি পাঠালে—"কাকী, আমার সেই শিমুল গাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্ব্বে একবার আমাদের কাছে আস্‌বার কথা ছিল, সে আর হোলো না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকী আমাকে ডেকে বল্‌লেন, "ওগো শুন্‌চ, একজন ফটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "কেন!"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখ্‌তে দিলেন।

আমি বল্‌লেম, "সে গাছ তো কাটা হ'য়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকী দুদিন অন্ন গ্রহণ কর্‌লেন না, আর অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কননি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজ্‌ল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত ক'রে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।*

* শান্তিনিকেতনে বর্ষা-উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও পঠিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চল্‌চে। ইচ্ছা ছিল না এর মধ্যে প্রবেশ করি। প্রথম কারণ, আমার শরীর অপটু; দ্বিতীয় কারণ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ভার সম্প্রতি আমি নিজের হাতে নিয়েচি। শরীর যখন দুর্ব্বল তখন একান্ত আমার আশু কর্ত্তব্যের বাইরে অন্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নিজেকে জড়িত করা শক্তির অমিতব্যয়িতা, তাতে ব্যর্থতার সৃষ্টি করে। কিন্তু অকাজকে অগ্রসর হ'য়ে গ্রহণ না করলেও বাইরে থেকে সে ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন তাকে অস্বীকার করতে গেলে জটিলতা আরো বেড়ে যায়।

শিক্ষাবিভাগ থেকে কিছুদিন হ'ল এক পত্র পেয়েছিলুম; তাতে সঙ্গীত শিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। বিষয়ের গুরুত্ব বিচার ক'রে আমি চুপ ক'রে থাকতে পারিনি। উত্তরে লিখেছিলুম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা গ'ড়ে তোল্‌বার পক্ষে অধ্যাপক ভাট্‌খণ্ডেই যোগ্যতম। আশা করেছিলুম, এইখানেই আমার কাজ ফুরোলো। কর্ম্মফলের পরম্পরা এখনো শেষ হয়নি। চিঠিপত্রযোগে তর্কবিতর্কের জালের মধ্যে জড়িত হ'য়ে পড়েচি। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ গায়ক বলেচি, এই কারণে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েচে; সেটা পরিষ্কার করা ভাল।

সাধারণত আমরা যাঁদের ওস্তাদ বলি, পুরাতন বিদ্যাধারাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ একটা উপযোগিতা আছে। তাঁরা সংগ্রহ করেন, সঞ্চয় করেন, সঙ্গীত ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রাখেন। চিরপ্রচলিত রাগরাগিণীকে চিরপ্রচলিত প্রথার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধ'রে রাখ্‌বার কাজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাঁদেরকে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। ছেলেবেলা থেকেই এক মাত্র এই কাজেই তাঁদের দেহ-মন-প্রাণ নিযুক্ত। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়; অনেকের তা নেই, অনেকে তাকে অবজ্ঞাই করেন। গান সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিভার স্বকীয়তাও বাহুল্য, এমন কি তাতে হয়ত তাঁদের আপন কর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাঁরা একান্ত অবিকৃত ভাবে প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করে' চলেন এইটেই তাঁদের গর্ব্বের বিষয়। এইরকম রক্ষকতার মূল্য আছে। সমাজ সেই মূল্য তাঁদের যদি না দেয় তবে তাঁদের প্রতিও অন্যায় করে, নিজেরও ক্ষতি ঘটায়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এমন একটি কলাবিদ্যা যার রচনার নিয়ম বহুকাল পূর্ব্বেই সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। সেই বহুকাল পূর্ব্বের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়েই তার বিচার চলে। যাঁরা সেই আদর্শ-মতেই বহু পরিশ্রমে এই জাতীয় সঙ্গীতের সাধনা করেচেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্যকেই প্রামাণ্য ব'লে গ্রহণ করতে হয়।

এই ওস্তাদ সম্প্রদায়ের মধ্যেও গুণের তারতম্য নিশ্চয় আছে। কারো গানের সংগ্রহ অন্যের চেয়ে হয়ত বহুলতর, রাগরাগিণীর রূপের পরিচয় হয়ত এক ওস্তাদের চেয়ে অন্য ওস্তাদের অধিকতর বিশুদ্ধ; তাল তানের প্রয়োগ সম্বন্ধে কারো বা কসরৎ অন্যের চেয়ে বিস্ময়জনক।

ওস্তাদীর চেয়ে বড়ো একটা জিনিষ আছে, সেটা হচ্চে দরদ। সেটা বাইরের জিনিষ নয়, ভিতরের জিনিষ। বাইরের জিনিষের পরিমাপ আছে, আদর্শে ধ'রে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়ি-পাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে মাপা চলে না, সেটা হ'ল "সহৃদয় হৃদয় বেদ্য।" কে সহৃদয় আর কে সহৃদয় নয়, বাইরে থেকে তারও তল পাওয়া যায় না, তার শেষ নিষ্পত্তি কর্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা মাথা ফাটাফাটিতে গিয়ে পৌঁছয়—অর্থাৎ যাকে বলে হিংস্র দুঃসহযোগ।

বাল্যকালে যদুভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে ব'লে বর্ণনা

কর্‌লে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ কর্‌ত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরৎও ছিল বহুসাধনাসাধ্য, কিন্তু যদুভট্টর মতো সঙ্গীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কি না সন্দেহ। অবশ্য একথাটা অস্বীকার কর্‌বার অধিকার সকলেরই আছে ; কারণ কলাবিদ্যায় যথার্থ গুণের প্রমাণ তর্কের দ্বারা স্থির হয় না, যষ্টির দ্বারাও নয়। যাই হোক্ ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরি হ'তে পারে, যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্ত-রচিত। অতএব চল্‌তি কাজে যদুভট্টদের প্রত্যাশা করা বৃথা। কথাটা হচ্চে এই যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো একটা স্থাবর পদার্থের আধার যখন খুঁজি তখন ওস্তাদকেই সহজে হাতের কাছে পাই।

বিশুদ্ধ রাগরাগিণী শুন্‌তে বা শিখ্‌তে যখন চাই তখন ওস্তাদকেই খুঁজি। যেমন যে-পূজাবিধি মন্ত্রে ও অনুষ্ঠানে একেবারে অচল ক'রে বাঁধা, তার জন্যে পুরুতের দরকার হয় তখন এমন লোককে জুটিয়ে আনি, অক্ষরে অক্ষরে যার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অভ্যস্ত। তার মানে বুঝতে পারে এতটুকু সংস্কৃতজ্ঞান এই পুরুতের পক্ষে অনাবশ্যক। কারণ এই-সকল ক্রিয়াকলাপের বাইরের রূপটাই হ'ল প্রধান, সেটা যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলেই কাজটা নিষ্পন্ন হ'তে পারে। যিনি পণ্ডিত তিনি তাঁর অর্থবোধের দ্বারা এইসকল মন্ত্রে হয়ত প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু একান্তচর্চার অভাবে বাইরের দিকে তাঁর স্খলন হ'তে পারে, অন্তত তাঁর পক্ষে কাজটা অনর্গলভাবে সহজ নাও হতে পারে। যেখানে দৃঢ় ক'রে বেঁধে দেওয়া বাহ্যরূপটাই প্রধান সেখানে আয়াস-সাধ্য অভ্যাসটাই বেশি কাজে লাগে, সেখানে প্রতিভা লজ্জিত হ'বে। আপিসের অভিজ্ঞ কেরাণী তার স্বস্থানে উপরের অধ্যক্ষের চেয়ে বেশি যোগ্য, কিন্তু সেই যোগ্যতা সেই সীমার মধ্যেই পর্য্যাপ্ত।

হিন্দুস্থানী গানকে যেহেতু আমরা অতীতকালের নির্দ্দিষ্ট বিধির দ্বারা বিচার করি সেইজন্যেই তার এমন বাহন চাই, যার চর্চ্চা আছে, প্রতিভা যার পক্ষে বাহুল্য ; যে আবিষ্কারক নয়, যে ব্যাখ্যাকারক,—সঙ্গীতে যে জগদীশচন্দ্র বসু নয়, যে বিজ্ঞানপাঠশালায় ডেমনেস্‌ট্রেটর। এককথায় যে ওস্তাদ।

আমাদের যখন অল্প বয়স ছিল তখন কলকাতায় ধনীদের ঘরে এইরকম ওস্তাদের সমাগম সর্ব্বদাই দেখেচি। তাতে ক'রে সঙ্গীতের অলঙ্কার শাস্ত্রবোধ অন্তত ধনীসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই সব বনেদীঘরে গানের এই অলঙ্কার শাস্ত্রবোধটা না থাকা লজ্জার বিষয় ছিল। ঠিক্ কোন্‌খানে সুর বা তালের কতটুকু স্খলন হচ্চে সেটা তাঁরা অনেকেই জান্‌তেন, সেই দিকে কান রেখেই তাঁরা গান শুন্‌তেন। বাঁধা আদর্শের সঙ্গে তানমানলয় সম্পূর্ণ মিলেচে দেখ্‌লেই তাঁরা পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তেন। রাগিণীর যে-সব জায়গায় দুরূহ গ্রন্থি, সেইখানটাতে যে-সব গাইয়ে অনায়াসে সঙ্কট পার হ'য়ে যেত তারাই বরমাল্য পেত।

যে কারণেই হোক্, সহরে অনেক দিন থেকেই গাইয়ে সমাগম বিরল হ'য়ে এসেচে। তাই হিন্দুস্থানী গানের অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চ্চা অনেক দিন থেকে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে নেই বল্‌লেই হয়। অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অলঙ্কারশাস্ত্রবোধটা প্রধান জিনিষ। এই কারণেই যখন আমরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষভাবে আলোচনা কর্‌তে চাই তখন ওস্তাদকে খুঁজি। সেও পাওয়া দুর্লভ হয়েচে।

আমাদের বাড়ীতে একদা নানাপ্রয়োজন বশত এই-রকম ওস্তাদের খোঁজ আমরা প্রায়ই কর্‌তুম। শেষ যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল তিনি খ্যাতনামা রাধিকা গোস্বামী। অন্যান্য গায়কদের মধ্যে যদুভট্টর কাছেও তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। যাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁরা সকলেই জানেন রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার কর্‌তে পার্‌তেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশী। সেটা যদি নাও থাক্‌ত তবু তাঁকে আমরা ওস্তাদ ব'লেই গণ্য কর্‌তুম, এবং ওস্তাদের কাছ থেকে যেটা আদায় কর্‌বার তা আমরা আদায় কর্‌তুম, আমরা আদায় করেওছিলুম। সে-সব কথা সকলের জানা নেই।

তাঁর মৃত্যুর পরেও ওস্তাদের খোঁজ কর্‌বার দরকার ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনে হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করি। নিজেও চেষ্টা করেচি, বন্ধুবান্ধবদের-কেও অনুরোধ জানিয়েচি স্বয়ং দিলীপকুমারকেও এ-সম্বন্ধে আমার অভাব জ্ঞাপন করেচি। তখনই আবিষ্কার করা গেল, বাংলাদেশে একমাত্র হিন্দুস্থানীগানের ওস্তাদ আছেন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর। আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়। আমি তাঁকেও শান্তি-নিকেতনে শিক্ষকতা কাজের জন্যে পেতে ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু কলকাতায় তাঁর এত কাজ যে, তাঁকে কলকাতার বাইরে পাওয়া সম্ভব হয়নি। দিলীপকুমার তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কোনো ওস্তাদের কথা আমাকে জানাতে পারেননি। আজকের দিনে কলকাতায় যেখানেই সঙ্গীত-শিক্ষার প্রয়োজন হয়েচে সেখানেই তাঁকে ডাক পড়েচে। আর যাই হোক্ আজকের দিনে সাধারণের মতে তিনিই বড়ো ওস্তাদ ব'লে স্বীকৃত।

যাঁরা সঙ্গীত-ব্যবসায়ী নন বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ কেউ আছেন কি না, সে-কথা বলা কঠিন। যাঁরা সঙ্গীত-ব্যবসায়ী তাঁরা শিশুকাল থেকেই একান্তভাবে গান শিক্ষায় প্রবৃত্ত, অনেক স্থলে তাঁদের বংশের মধ্যে গানচর্চ্চার ধারা প্রবহমান। অতএব গানের সংগ্রহ ও সাধনা সম্বন্ধে তাঁদের উপর নির্ভর করা চলে। একসময়ে আমি বহুল পরিমাণেই হোমিয়োপ্যাথী চিকিৎসার চর্চ্চা করেছিলুম। দৈবাৎ আমার চিকিৎসায় যাঁরা ফল পেয়েছিলেন তাঁরা ব্যবসায়ী চিকিৎসককে ছেড়ে আমার কাছেই আস্‌তেন। তার থেকে আমার পক্ষপাতীর দল যদি বিচার করতেন আমি সত্যই বড়ো ডাক্তার তবে তাঁদের সেই বিশ্বাসের জোরে আমার ডাক্তারি বিদ্যার প্রমাণ হ'ত না। অন্যান্য শিক্ষা বা কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে যাঁরা কোনো একটি বিদ্যার চর্চ্চা করেন সাধারণত তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না এমন দলের যাঁরা একান্তভাবেই সেই বিদ্যার চর্চ্চা করেচেন। অব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন লোক থাকতে পারেন,—কিন্তু, পূর্ব্বেই বলেচি,—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের দ্বারা প্রায় অচল ভাবে নিয়মিত বিদ্যায় কেবল প্রতিভা দ্বারা ওস্তাদী লাভ করা যায় না, বহুল শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারাই করা যায়।

আর-একটি বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্চে,—গোপেশ্বরবাবুর গানের ষ্টাইলটা বিষ্ণুপুরী ব'লে কেউ কেউ তাঁর ওস্তাদীতে কলঙ্ক আরোপ ক'রে থাকেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রদেশভেদে সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতিভেদ স্বীকার করা হয়েচে। বৈদর্ভী রীতি, গৌড়ীয় রীতি প্রভৃতি রীতির বিশিষ্টতা তিরস্কৃত হয়নি। ভারতীয় স্থাপত্যে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার ও উত্তর ভারতের অনেক পার্থক্য। মাদুরার মন্দির রচনায় স্থাপত্য পদে পদে যে তান লাগিয়েছে, তার অংশে অংশে-অলঙ্কার-বৈচিত্র্যের যে অতি বাহুল্য তা কারো কারো ভালো লাগে না; তার সঙ্গে সেকেন্দ্রার স্থাপত্যের তানবিহীনতা ও অলঙ্কার-বিরলতার তুলনা কর্‌লে সেকেন্দ্রাকেই কারো কারো রুচিতে ভাল ঠেকে, তবুও ভারতীয় স্থাপত্যে দক্ষিণী রীতিকে অস্বীকার করা চলে না। তেমনিই হিন্দুস্থানী গান বাংলা দেশে যদি কোনো বিশেষরীতি অবলম্বন ক'রে থাকে তবে তার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হ'বে। সেই রীতির মধ্যেও যে উৎকর্ষের স্থান নেই তা বলা চলে না। যদুভট্টের প্রতিভার প্রথম ভূমিকা এই বিষ্ণুপুরী রীতিতেই, রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। পশ্চিম-দেশী শ্রোতারা যদি এই রীতির গান পছন্দ নাও করে তবে সেটাকেই চরম বিচার ব'লে মেনে নেওয়া চলে না। রসবোধ সম্বন্ধে মতভেদ অভ্যাসের পার্থক্যের উপর কম নির্ভর করে না। এমনও যদি ঘটে যে, কোনো বিশেষ গায়কের মুখে বিষ্ণুপুরী রীতির গান সত্যই প্রশংসাযোগ্য না হ'য়ে থাকে, তাতে সাধারণভাবে বিষ্ণুপুরী রীতিকে নিন্দা করা উচিত হয় না। শত শত গায়ক আছে যারা হিন্দুস্থানী দস্তুর-মতোই গান গেয়ে শ্রোতাদেরকে পীড়িত করে, সেজন্যে হিন্দুস্থানী রীতিকে কেউ দায়ী করে না।

আমাদের দেশের কোনো খ্যাতনামা ওস্তাদকে বা বিষ্ণু-পুরী রীতিকে কেন আমি বর্ত্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গে নিন্দা করতে চাইনে তার কারণ পূর্ব্বেই বল্‌লেম। যে তর্ক

উপস্থিত হয়েছে তার প্রধান মীমাংসার বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষাবিভাগ গ'ড়ে তোল্‌বার কাজে কে সব-চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই, যে, ভাট্‌খণ্ডেই সেই লোক। ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর যে ভূরিদর্শিতা তা আর কারো নেই, তা ছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদান প্রণালীর অসাধারণ নৈপুণ্য সকলকেই স্বীকার কর্‌তে হ'বে। তিনি গায়ক নন, তিনি গান-শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়, অতএব তিনি হিন্দুস্থানী গানশিক্ষার যে ভিত্তি রচনা করেচেন, বাংলা দেশেও যদি তাঁকে সেই ভিত্তিরচনার সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ সফলতালাভ কর্‌বেন ; এ কাজ তিনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সুসম্পূর্ণ হ'তে পার্‌বে না।

সম্বরে লবণের পাহাড়

শ্রী যোগেশচন্দ্র পাল

রাজপুতানার সম্বর হ্রদ সকলের নিকটই পরিচিত, বিশেষ করিয়া স্কুলের ছোট ছোট বালকের নিকট। ইহাই ভারতের একমাত্র লোনা-জলের হ্রদ ; যদিও আকারে ইহা তেমন বড় নয়। ইহার বিস্তৃতি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে চৌদ্দ মাইল ও দশ মাইল মাত্র ; কিন্তু ইংরেজের কৃপায় অপ্রাকৃতিক ভাবে আরও কিছু বড় হইয়াছে।

সম্বরের প্রাকৃতিক দৃশ্যও উপভোগ করিবার মত, শুধু লোনা-জলের তীব্র গন্ধ যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠে। পশ্চিম ও উত্তর দিকে পাহাড়শ্রেণী দূর হইতে মেঘের মত সুন্দর দেখায়। আর সেই পাহাড়ের প্রতিবিম্ব হ্রদের জলে অস্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠে চারিদিকে বিরাট শূন্যতা শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। হ্রদের চারিদিকে বালুরাশি সূর্য্যের আলোকে দীপ্ত হইয়া মরীচিকার সৃষ্টি করে, রাত্রিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকে জোনাকির মত জ্বলিতে থাকে। এই বালুরাশির প্রত্যেকটি কণা কত যুগের কত অতীত স্মৃতি মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, রাজপুতানার অতীত ইতিহাসের কত স্বাধীনতার কাহিনী গল্পের মত বলিতেছে, কত রাজপুত-রমণীর সতীত্বের তেজে আজো তারা তেজময়, কত রাজপুতরমণীর একনিষ্ঠ প্রেমের কাহিনী আজও তাদের নিকট শুনা যায়! সাগরের জলে কোথায়ও একটু আবর্জ্জনা নাই, সে জল বড় পবিত্র, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহা অপবিত্র করিতে পারে নাই।

সম্বরের বিশেষত্ব এই যে, আদিযুগ হইতে সে সারা রাজপুতানাকে অবাধে লবণ বিলাইয়াছে, রাজপুতানা-বাসীকে লবণের জন্য পরের দুয়ারে হাত পাতিতে হয় নাই বা লিভারপুলের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। রাজপুতানার সন্তান সম্বরের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে লবণ লুটিয়া লইয়াছে। কিন্তু আজ রাজপুতনাবাসিগণ তাহাদের মায়ের বুকের ধন স্পর্শ করিতেও পারে না। আজ তাহাদের মাতা ইংরেজের নিকট দাসী বৃত্তি করিতেছে। সে যেন ইংরেজের কেনা দাসী। মায়ের সহিত আর সন্তানের কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরেজ রাজপুতনাবাসিগণের লবণ জোগায়। যাহার মায়ের বুকে এত দুধ সে আজ তাহার মায়ের বুকের দুধ পয়সা দিয় ক্রয় করে। মায়ের ছেলে হইয়াও আজ রাজপুতনাবাসিগণ পরের ছেলে। মায়ের উপর আর কোন আব্দার চলে না।

সম্বরের দুই তীরে ইংরেজেরা কল বসাইয়াছে। সম্বরের আয়তন অস্বাভাবিক ভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছে ! যে লবণের কাজ ভারতবাসিগণ করিত আজ তাহা ইংরেজ নিজেদের হাতের মধ্যে লইয়াছে।

ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণতঃ লবণ

নিৰ্ম্মাণের সময়। ইংরেজগণ সম্বরের তীরে কিছু উচ্চ জমিতে বড় বড় পুকুরের মত অনেক ক্ষেত করিয়াছে। তাহার চারিদিক মাটি দিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা এই সকল পুকুরের তলদেশ হ্রদের জলের উপরিভাগ হইতে উচ্চে। দুই তিন শত একর জমিতে এরূপ পুকুর। শীতের শেষে কলের সাহায্যে এই সকল পুকুরগুলি জলে ভৰ্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ তিন মাসে এই জল হইতে লবণ তৈয়ার হয়।

পুকুরগুলি জলে ভৰ্ত্তি করিয়া দিলে আস্তে আস্তে বাষ্প উঠিয়া জল কমিয়া আসিতে থাকে এবং গাঢ় হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে জলের রং কটা হইতে থাকে। তিন চার মাসে সাধারণতঃ জল শুকাইয়া যায় এবং নীচে লবণ পড়িয়া থাকে। যখন লবণ এইভাবে তৈয়ার হইতে থাকে তখন পাছে বৃষ্টি হইয়া লবণ নষ্ট হয় এই ভয়ে অনেক লোক নিযুক্ত আছে; তাহারা সৰ্ব্বদাই কাদা-মাটি দূর করিতে ব্যস্ত। যাহারা এই কাজে নিযুক্ত তাহাদের মাসিক বেতন দশ টাকা হইতে বিশ টাকা। তাহাদিগকে দিনে রাত্রে বার ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। প্রতি সাত দিন পর তাহাদের কৰ্ম্ম তালিকা বদল হয়। ইহাতে যাহারা সাত দিন রাত্রে কাজ করে সাত দিন পর তাহাদিগকে দিনে কাজ করিতে হয়।

জল শুকাইয়া গেলে যখন লবণের চর পড়িয়া থাকে, তখন তাহা আরও কিছু দিন রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। এই সময় পুকুরের তীরে অনেক রেল লাইন বসান হয়। লবণ কাটিয়া কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া এক স্থানে লইয়া যাইয়া জমা করা হয়। এইভাবে লক্ষ লক্ষ মণ লবণ তিন চার মাসে জমা হয়।

মাত্র চারি মাসেই বৎসরের মধ্যে লবণ জমা হয়। অন্যান্য মাসে হয় না। বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য লবণ তৈয়ার হইতে পারে না। শীতকালে জল বেশী কমে না।

লবণ তৈয়ার হইলে তাহা বিক্রয় আরম্ভ হয়। নানা দেশ হইতে ব্যবসায়ী আসিয়া লবণ খরিদ করে এবং সুবিধা অনুযায়ী চালান করে। লবণ খরিদ এক অদ্ভুত কারবার; এক কথায় বলা যাইতে পারে,—ভাগ্যপরীক্ষা। স্থানে স্থানে লবণের পাহাড় পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাহার মধ্যে সাধারণ তারতম্য বুঝিয়া নম্বর দেওয়া হয়। সাধারণতঃ পাঁচ ও ছয় নম্বরের লবণ বেশী। আবার এই নম্বরের মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য আছে। পাঁচ নম্বরের লবণের মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। কিন্তু পাঁচ নম্বরের লবণ একই স্থানে জমা থাকে। ইহার ভিতর কোথাও লবণ খুব ভাল, একদম ধপ-ধপে, কোথাও লালচে, আবার কোথাও ভিজা ইত্যাদি প্রকারভেদ আছে। কিন্তু এই প্রকারভেদের জন্য দামের কোন কম বেশী নাই। সকলেরই একদাম। ভাল লবণের যে দাম, খারাপ লবণেরও সেই দাম। ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া যেমন একদাম লওয়া হয়, তেমনি যাহাতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঝগড়া না হয় তাহার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাকে বলে ব্যবসায়ী চাল। সে এক প্রকার ভাগ্যপরীক্ষা। যাহার যেরূপ ভাগ্য তাহার সেইরূপ লবণ মিলিয়া থাকে।

লবণ সমতলভূমির উপর পাহাড়ের মত করিয়া রাখা হয়। এবং তাহার উপরিভাগও সমতল করা হয়। অনেক সময় লবণের পাহাড়ের উপর লবণ আনা লওয়ার সুবিধার জন্য রেল লাইন বসান হয়। লবণ স্তূপীকৃত করিলে তাহা বরফের মত শক্ত হয় এবং একটুকরা তুলিলে অন্য টুকরা স্থান ছাড়া হয় না।

মহাজনগণ আসিয়া লবণ দেখিয়া ক্রয় করিবার সুযোগ পায় না। কারণ তাহারা জানে, তাহার যাহা পছন্দ হইবে তাহা হয়ত তাহার মিলিবে না। যে যে পরিমাণ লবণই ক্রয় করুক না কেন, তাহার ভাগ্য অনুযায়ী লবণ লইতে সে বাধ্য। সাধারণতঃ ফুট হিসাবে লবণ বিক্রয় হয়। যাহার যে স্থানে লবণ লইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় সে সেখান হইতে লবণ লইয়া থাকে। পূৰ্ব্বের দিন খরিদদারগণ লবণ ক্রয় করে। দিনের লবণ ক্রয় করিলে কোম্পানী খরিদদারদের নাম লটারী করে, প্রথম হইতে একটি একটি নাম তুলিতে থাকে। যখন যাহার নাম উঠে তখন তাহার নম্বর পড়ে। এক দুই করিয়া এইভাবে সকল নম্বর পড়ে। এইভাবে লবণের পাহাড়ে নম্বর দেওয়া হয়। যেখানে যে ব্যক্তির নম্বর পড়িবে তাহাকে সেখান হইতেই লবণ লইতে হয়, সে লবণ ভালই হউক আর মন্দই হউক। তবে

লবণ ভালই হউক আর মন্দই হউক তাহাতে মহাজনদের লোকসান হয় না বরং বিস্তর লাভ হয়।

লবণ সাধারণ লোকের নিকট বিশ সের টাকায় বিক্রয় হয় অর্থাৎ দুই টাকা মণ। মহাজনদের নিকট দেড় টাকা মণ বিক্রয় করা হয়।

প্রতি মণ লবণ কাটিয়া মাপিয়া গাড়ীতে তুলিতে কুলিকে তিন পয়সা দিতে হয়। কুলীরা ভোর পাঁচটা হইতে কাজ আরম্ভ করে। তাহাদের কাজ দেখিতে বেশ সুন্দর। কুলীরা দশজন করিয়া এক একটি দল বাঁধে। দল বাঁধিলে তাহাদের কাজের সুবিধা হয়। তাহারা তারপর কাজ ভাগ করিয়া লয়। ইহাকে ভাগী কাজ (distribution of work) বলে। এই পদ্ধতিতে কাজ করিতে খুব সুবিধা হয়। এবং অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট কাজ হয়। এই সকল কুলীরা কোন দিন অর্থশাস্ত্র (Economics) পড়ে নাই তবু তাহারা যে ভাবে কাজ করে এবং তাহাদের কাজের যে সুন্দর বন্দোবস্ত তাহা দেখিয়া অর্থনৈতিকগণ অনেক কিছু শিখিতে পারেন। দুইজন লোক লবণের পাহাড় কাটিয়া নীচে ফেলিয়া দেয়, দুইজন সেই লবণ কাটিয়া বস্তা ভরিয়া দেয়, আর দুইজন তাহা মাপযন্ত্রে তুলিয়া মাপিয়া দেয়, দুইজন তাহা সেলাই করিতে থাকে, অবশিষ্ট দুইজন বস্তা গাড়ীতে তুলিতে থাকে। প্রত্যেক দলে আবার একজন করিয়া চৌধুরী আছে, সে হুকুম চালায়, কাজের ত্রুটি হইলে ধমক্ লাগায়। আবার সমস্ত দলের উপর একজন নায়ক আছে, যেন বড় আফিসের সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্ট্। অবশ্য তাহার বেতন কুলীদের অপেক্ষা বেশী।

সম্বরে যত লবণ তৈয়ারী হয় তাহাকে আমাদের বাঙ্গালাদেশে করকচ লবণ বলে। এখানকার লবণ বাঙ্গালাদেশেও কিছু কিছু যায়। রাজপুতানা ও সংযুক্ত প্রদেশে ইহার কাট্‌তি বেশী।

লবণের যাহারা কারবার করে বা এখান হইতে লবণ চালান দেয় তাহাদের অধিকাংশই মাড়োয়ারী। এই সকল মাড়োয়ারীর দল লবণের ব্যবসায় করিয়া লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইয়াছে।

আমরা এখানে স্থানীয় লোকদের সম্বন্ধে দুই চার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সম্বর মাড়বার দেশে অবস্থিত। বি, বি, সি, আই, রেলওয়ের একটি লাইন সম্বর হইয়া মাড়বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সম্বরে একটি ছোট ষ্টেশনও আছে। ষ্টেশনের নিকটে একটি ধর্ম্মশালাও আছে। যাত্রী এখানে আসিয়া থাকিতে পারে। সম্বর পূর্ব্বে একটি ছোট গ্রাম ছিল। কিন্তু যেদিন হইতে মাড়োয়ারী লোকেরা ব্যবসায়ে মন দিয়াছে সেদিন হইতে ইহা সহরে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ ইহা ছোট একটি সহর। সহরটি ছোট হইলেও বাড়ীগুলি বালুর উপর বিরাট্ সুন্দর দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামটি এক মাইলের বেশী লম্বা হইবে না। গ্রামের সকলেই ব্যবসায়ী ও উচ্চদরের ধনী। তাহাদের ধনের দৌলতে এই এক মাইল লম্বা সহরটিতে বিজলী আলো জ্বলিয়া থাকে। সমস্ত সহরটি বিজলীর আলোকে আলোকিত। সহরের অনেক মাড়োয়ারীই লবণের ব্যবসায় করিয়া থাকে। সহরের মধ্যে কিন্তু ভাল রাস্তা নাই। রাস্তা নির্ম্মাণ করাও বড় মুস্কিল। বালুর ভিতর রাস্তা নির্ম্মাণ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বালুতে ঢাকিয়া যায়। যে সকল রাস্তা আছে তাহার উপর দিয়া চলা বড় কঠিন। বালুর ভিতর পা ডুবিয়া যায়। হাঁটিতে বড় কষ্ট হয়। এক মাইল রাস্তা চলিলেই অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। এই স্থানে সব চেয়ে জলের অধিক অভাব। কূয়া ত অনেকই আছে; কিন্তু প্রায় সকল কূয়ার জলই লোনা। দুই একটি কূয়াতে মাত্র "মিঠা পানি" পাওয়া যায়। এবং সেই কূয়ার জল গ্রামের লোকে ঘড়া ভরিয়া লইয়া যায়। এই জল কেবল পান করা হয়। অন্যান্য কাজে লোনা জলই ব্যবহার করা হয়।

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দিবা অবসান হইবার পূর্ব্বে ভূতলে সংগ্রাম সমাপ্ত হইল, আর আকাশে? যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রাজা শিশেরা হইতে সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেই উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আকাশে কোথাও একটি বিমানেরও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

তলিতা আকাশে উঠিল দেখিয়া রুদেলা আরাতামাকে কহিল,—এখন আমি রত্নবণিক নহি।

আরাতামা কহিলেন, আমি জানি তুমি দস্যুপতি।

—আপাততঃ সেনাপতি, তোমাকে বন্দিনী করিয়া তোমার বিমান গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের সৈন্যের পশ্চাতে বিমান মাটিতে নামাও।

আরাতামা হাস্য করিলেন। তলিতা আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, উভয় পক্ষের সৈন্য হইতে আরও দূরে চলিল।

রুদেলা রাগিয়া কহিলেন,—তুমি আমার আদেশ শুনিতেছ না? বিমান ফিরাও, আমাকে এখনি যুদ্ধে যাইতে হইবে।

—তোমার আদেশ যদি পালন না করি?

—তাহা হইলে বলপূর্ব্বক করাইব। না হয় তুমি সরিয়া যাও আমি যন্ত্র চালাইতেছি।

—অবলার প্রতি বলপ্রকাশ? এই কি তুমি বীর পুরুষ! ছি! এই কয়টি কথার সহিত মুখের ঈষৎ বঙ্কিম ভাব, লোচনের লোল তরঙ্গ। রুদেলা অধীর হইয়া আরাতামার হস্ত ধারণ করিলেন। আরাতামা কহিলেন, ছাড়, ছাড়! আমার হস্ত মুক্ত না থাকিলে যন্ত্র সামলাইতে পারিব না, তাহা হইলে দুজনেই মরিব.

রুদেলা আরাতামার হাত ছাড়িয়া দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন আরাতামাকে বন্দিনী করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন ও তাহার পর সসৈন্যে রাজা শিশেরাকে আক্রমণ করিবেন। আরাতামা মনে করিলেন শত্রুপক্ষে রুদেলাই প্রধান ও এক মাত্র নেতা, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার পক্ষের পরাজয় স্থির। একটা স্ত্রীলোককে ভয় দেখাইয়া অথবা বলপূর্ব্বক বশীভূত করা যে কঠিন হইতে পারে এ কথা একবারও রুদেলার মনে হয় নাই। আরাতামার ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না, তিনি জানিতেন রুদেলা বিমানে আসিয়া বুদ্ধির কাজ করেন নাই, তাঁহার বলের অহঙ্কার মিথ্যা।

সংগ্রাম-ভূমি দৃষ্টির অতীত হইল দেখিয়া রুদেলা ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন,—বিমান তুমি কোথায় লইয়া যাইতেছ? সৈন্যেরা আমার অপেক্ষা করিতেছে। তোমার দোষে আমাকে বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে।

রুদেলা হাত বাড়াইয়া আরাতামাকে ধরিতে উদ্যত হইলেন। আরাতামার এক হস্ত যন্ত্রের উপর, অপর হস্ত দিয়া যে যষ্টি দিয়া বাষ্টীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহাই বাহির করিয়া রুদেলার বক্ষ স্পর্শ করিলেন। বজ্রাহতের মত রুদেলা পতিত হইলেন। যখন তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন তখন আরাতামা মৃদুমন্দ হাসিতেছেন, মুখে ক্রোধ অথবা বিরক্তির কোন চিহ্ন নাই। কহিলেন,—বলেও তুমি আমার সঙ্গে পারিবে না। তুমি স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়াছ, তোমাকে মুক্ত করা না করা আমার ইচ্ছা। যুদ্ধে তুমি আর যাইতে পাইবে না, তুমি না থাকিলে রাজা শিশেরার সহজে জয় হইবে।

রুদেলা অধোবদন, কহিলেন,—তুমি আমাকে কি করিয়াছ? আমার বল হরণ করিয়াছ।

—তোমার বাহুবল, আমার বল গুপ্তবিদ্যার কৌশল। ইহাতে তোমার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। তবে

আমার ইচ্ছা না হইলে তোমার মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধে তুমি উপস্থিত না থাকিলে রাজা শিশেরার জয় হইবে। আমি সেই কামনা করি।

রুদেলা কহিলেন, আরাদের জন্য আমি ভাবি না, কিন্তু স্ত্রীলোকের হস্তে বন্দী হইয়া আমি কেমন করিয়া মুখ দেখাইব ?

আরাতামা আবার হাসিয়া, কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন,—স্ত্রীলোকের হস্তে বন্দী হওয়া কি লজ্জার কথা ? সে বন্ধনের জন্য কি পুরুষ লালাইত নয় ?

পশ্চাতে বিমানের শব্দ হইল। রুদেলার পক্ষের বিমান-সমূহ তলিতাকে বেষ্টন করিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া ভূতলে নামাইবার জন্য আসিতেছে। আকাশে যুদ্ধ হইলে বিমান ভূতলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইতে পারে। বিমানাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ তিনি রুদেলাকে মুক্ত করিয়া ও আরাতামাকে বন্দিনী করিয়া আনিবেন, কোন মতে যুদ্ধ করিবেন না।

অপর বিমান সকল যেমন নিকটে আসিতে লাগিল আরাতামা তলিতার বেগ সেইরূপ উত্তরোত্তর বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন তলিতার তুল্য বেগগামী বিমান আর নাই, পশ্চাতের বিমান-চালকেরা কেহ সে কথা জানিত না। আরাতামা এমন কৌশলে ধীরে ধীরে তলিতার বেগ বাড়াইতে লাগিলেন যে, পশ্চাদ্বর্ত্তী বিমান-চালকেরা মনে করিতে লাগিল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা তলিতার পাশে আসিয়া পহুঁছিবে। তাহারা নিকটে আসিলেই তলিতা কিছু আগাইয়া যায়, আবার তাহারা লুব্ধ আত্ম-প্রতারিত হইয়া তলিতার অনুসরণ করে।

আরাতামাও যুদ্ধের কোন চেষ্টা করিলেন না, শত্রুর বিমান-সমূহের শঙ্কা উৎপাদন করিবার জন্য কোন কৌশল করিলেন না। উদীয়মান সূর্য্য পশ্চাতে রাখিয়া আরাতামা তলিতাকে পশ্চিম দিকে চালনা করিতেছিলেন। রুদেলা স্তব্ধ হইয়া কখন আকাশের দিকে, কখন আরাতামার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। চারিদিকে আকাশের উজ্জ্বল, গাঢ় নীলিমা, বায়ু ভেদ করিয়া নিঃশব্দে তলিতা উড়িয়া যাইতেছে, পশ্চাতে অন্য বিমান-শ্রেণীর শব্দ, নীচে নগর গ্রাম ক্ষুদ্রায়তন ক্রীড়াগৃহের মত একে একে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছে, কোথাও সূক্ষ্ম রজত-রেখার ন্যায় নদী, কোথাও ক্ষুদ্র স্তূপের ন্যায় পর্ব্বত।

ইচ্ছা করিলে আরাতামা অল্প সময়ের মধ্যে তলিতাকে লইয়া অদৃশ্য হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য ছিল না। রুদেলা তাঁহার বিমানে বন্দী, তাঁহার অবর্ত্তমানেই যুদ্ধ শেষ হইবে। সেই সঙ্গে যদি রুদেলার পক্ষের বিমান-সমূহ যুদ্ধে কোনরূপ যোগ দিতে না পারে তাহা হইলে রাজা শিশেরার জয়ের সম্ভাবনা আরও বাড়িবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী বিমান-শ্রেণীকে আরাতামা বঞ্চিত করিতে লাগিলেন। তাহারা মনে করে আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেই তাহারা তলিতার গতি রোধ করিতে পারিবে, কিন্তু কোন মতে তাহারা তলিতার পাশে উপনীত হইতে পারিল না। রুদেলা আরাতামার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন ? এই রমণীকে তিনি বলেও আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই ; কোন অজানিত বিদ্যাবলে আরাতামা বজ্রধারিণী। তাহার বজ্রের আঘাত রুদেলা অনুভব করিয়াছিলেন। এই রূপসীর হৃদয়ও কি বজ্রে গঠিত ? স্তব্ধ, অনিমেষনয়নে মর্ম্মাহত লজ্জিত প্রাণে রুদেলা আরাতামাকে দেখিতেছিলেন।

দিনমান এইরূপ গেল। পশ্চাদ্বর্ত্তী বিমান-চালকেরা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা তলিতার গতি রোধ করিতে পারিবে না, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেও তাহাদের সাহস হইল না। রুদেলা যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরাতামার বিমানে আছেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। একজন স্ত্রীলোক যে বল পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রুদেলার স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি উপস্থিত না থাকিলে যুদ্ধের কি পরিণাম হইবে তাহা বলা যায় না। তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইবে ? কোন স্থানে না কোন স্থানে আরাতামাকে ভূতলে নামিতেই হইবে। সেই সময় তাঁহাকে ও তাঁহার বিমানকে ধৃত করা যাইবে, রুদেলাও ফিরিয়া যাইতে পারিবেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রি অন্ধকার, নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ, আর কোন আলোক

নাই। ইচ্ছা করিলে সেই অন্ধকারে আরাতামা তলিতাকে লইয়া অসীম অন্ধকার আকাশে অন্তর্হিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার আদৌ সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি তলিতার সমস্ত আলোক জ্বালিয়া দিলেন, যন্ত্রের শব্দও শ্রুত হইতে লাগিল। যাহারা পশ্চাতে আসিতেছিল তাহাদের আশা হইল আরাতামা আর অধিকদূর যাইতে পারিবেন না, শীঘ্রই তাঁহাকে অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিতে হইবে।

বাস্তবিক তলিতা নীচে নামিতেছিল। গগনবিহারী প্রসারিত-পক্ষ বৃহৎ মরাল মানস সরোবর দেখিয়া যেরূপ নামিয়া আসে তলিতাও সেইরূপ বক্র গতিতে আকাশ হইতে নামিতেছিল। অনুবর্ত্তী বিমান-চালকেরা মনে করিল তলিতা নীচে নামিলেই তাহারা ধরিবে।

অকস্মাৎ বিমানে নিম্ন হইতে অবিচ্ছিন্ন ঘোর গম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল। উত্তাল তরঙ্গরাশির কোলাহল! নীচে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বিশাল তরঙ্গ-ভঙ্গ। আরাতামা যন্ত্রচালনা ও পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বিমানের পক্ষ সঙ্কুচিত হইয়া আর দুইটি পক্ষ বাহির হইল। মরালের ন্যায় তলিতা সমুদ্র বক্ষে নামিল, আকাশ-বিহারিণী সাগরচারিণী হইল।

অপর বিমান-সমূহের জলে নামিবার সাধ্য নাই। নিরস্ত হইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

ত্রিত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আরাতামা যন্ত্রচালনা ত্যাগ করিলেন। চক্ষের দৃষ্টি অলস হইল, অঙ্গ শিথিল হইল। রুদেলার দিকে ফিরিয়া অল্প ক্লান্ত হাসি হাসিয়া কহিলেন, আর বল প্রকাশের চেষ্টা করিও না। এখন যদি তুমি আমাকে বন্দিনী করিয়া তলিতাকে গ্রহণ কর তাহা হইলেও তোমার কোন লাভ নাই। আমাদের দুইজনের অবর্ত্তমানে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

পরাহত, নিশ্চেষ্ট রুদেলা কহিলেন,—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি।

—আমরা দুই জনেই প্রাতঃকাল হইতে অভুক্ত। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া তোমাকে সকল কথা বলিতেছি।

উত্তম আহার্য্য ও শীতল পানীয় ছিল, আরাতামা রুদেলাকে দিলেন, স্বয়ং ক্ষুৎপিপাসা শান্ত করিলেন।

তরঙ্গ-দোলায় তলিতা দুলিতে লাগিল।

আরাতামা মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—এই যুদ্ধে দুই সেনাপতি, এক দিকে তুমি আর এক দিকে আমি? তোমার কি মনে হয়?

—আমি সিপাহী, আবশ্যক হইলে লড়াই করিতে পারি। তুমি স্ত্রীলোক হইলেও সেনাপতির সকল ক্ষমতা তোমাতে বর্ত্তমান।

—রাজা শিশেরার সেনাপতি খুব দক্ষ, আমি কেবল বিমান বিভাগের ভার লইয়াছি। যুবরাজ আরাদের পক্ষে সেনাপতি কে? তিনি স্বয়ং?

রুদেলা মুখ-বিকৃতি করিলেন।

—আরাদের পক্ষে সেনা চালনায় যথেষ্ট কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। এত সৈন্য এত দিন কাহার যুক্তিতে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিল? আর সকল রাজাকে কে হস্তগত করিয়াছিল? বিশলাম নগর কে গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছিল? কে ফারেজকে ও লোবানকে হস্তগত করিয়া বিশলাম নগর অধিকার করিবার পথ পরিষ্কার করিয়াছিল?

রুদেলা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ সকল কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

—সে কথা এখন নাই বা বলিলাম? কাল রাত্রে আমি বিশলাম নগরে গিয়াছিলাম।

রুদেলার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। কহিলেন,—যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া বিশলাম নগরে?

—তলিতার যাইতে আসিতে কতক্ষণ? ফারেজ ও লোবান বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদের দলের সকলেই ধরা পড়িয়াছে। রাজা শিশেরা এখন পর্য্যন্ত এ কথা জানেন না। তুমি আজ যে যুক্তি করিয়াছিলে তাহা উত্তম। তলিতাকে গ্রহণ করিয়া যদি তুমি আমাকে বন্দিনী করিতে পারিতে তাহা হইলে আকাশ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের সংশয় থাকিত, তলিতা আর আমি থাকিলে তোমাদের জয়ের সম্ভাবনা অল্প। স্থল-যুদ্ধে তোমার তুল্য বীর অথবা সেনাপতি রাজার পক্ষে নাই, তোমাদের জয় হওয়

বিচিত্র নহে। আর আমাকে পরাস্ত করিয়া অবরুদ্ধ করাতে যে তোমার কোনরূপ আশঙ্কা হইতে পারে এমন কথা তোমার মনে স্থান পাইতে পারে না। পাইবার কথাও না। তুমি শূর বীর—যুদ্ধে আমি তোমার প্রতাপ ও অলৌকিক বীর্য্য দেখিয়াছি—আর আমি একটা সামান্য স্ত্রীলোক; আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া যুদ্ধে যাইতে কতক্ষণ? তোমার পক্ষ হইতে এইরূপ জল্পনা। পক্ষান্তরে, আমি যখন দেখিলাম যে, তুমি অশ্বত্যাগ করিয়া তলিতায় আরোহণ করিলে তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, বিজয়লক্ষ্মী রাজা শিশেরাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আমার রথে প্রবেশ করিলে তোমার যুদ্ধে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। আমি স্ত্রীলোক হইলেও মহাবলবান পুরুষকে অনায়াসে বলহীন করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে হত্যা করিতে পারি সে কথা তুমি কেমন করিয়া জানিবে? আমি তলিতাকে বেগে চালনা করি নাই, আমার পশ্চাতে উভয় পক্ষের সকল বিমানই আসিয়াছে। তোমাদের পক্ষের বিমান জলে নামিতে পারে না, ফিরিবার পথে রাজপক্ষীয় বিমানের দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। সে সকল বিমান আমার শিক্ষিত, সম্ভবতঃ তাহাদের জয় হইয়াছে। স্থল-যুদ্ধে তোমাদের পক্ষে তুমি নাই, আরাদ সেনাপতি। রাজা শিশেরারই জয় হইয়া থাকিবে। আরাদ জীবিত আছেন কি না তাহাও বলা যায় না। এ সকল কথা তোমার সঙ্গত মনে হইতেছে?

—সমস্তই সঙ্গত। তুমি যেরূপ বলিতেছ তাহাই ঘটিয়া থাকিবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে।

—আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে?

—রাজার সাক্ষাতে তোমাকে উপনীত করিলেই আমার কাজ শেষ হইল। তুমি রাজদ্রোহী, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছ, তোমার বিচার রাজা করিবেন।

—বিচারে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। সেজন্য আমি চিন্তা করি না, কিন্তু রাজদ্রোহী হইলেও দস্যুর অপরাধে দণ্ডিত হইব। দস্যুর ন্যায় নিহত হইব। আমার অধিক কথা বলিবার নাই, কিন্তু যে-সময় আমি আরাদের পক্ষ গ্রহণ করি, সে সময় আজিকার ঘটনা কল্পনা করিতে পারি নাই। তুমি কি মনে কর যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা তাহার পর রাজার সেনাপতি কি সৈন্যগণ আমাকে বন্দী করিতে পারিত?

আরাতামার স্মরণপথে উদিত হইল রত্নবণিকের অশ্বারোহণের অপূর্ব্ব কৌশল, অসিবিদ্যায় পারদর্শিতা। এই রুদেলা রত্নবণিক সাজিয়া তাঁহার কর্ণে বহুমূল্য কুণ্ডল পরাইয়া দিয়াছিল। স্মরণ হইল, সমরাঙ্গণে সেই শ্রেষ্ঠ বীর, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা হাস্যমুখ সেনাপতি, সেই অলাতচক্রের ন্যায় সর্ব্বতোমুখ অরিন্দম। স্মরণ করিয়া আরাতামার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যাহার নামে লোকের মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়া যায় সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু, যাহার শৌর্য্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষ চমৎকৃত হইয়াছিল, সেই প্রথিতনামা রুদেলা এখন রমণীর নিকট বলে পরাজিত হইয়া তাহার বন্দী! স্মরণ করিয়া আরাতামা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন না, এমন নয়, কিন্তু তাঁহার চিত্ত কোমলও হইল। কহিলেন,—আমার মনে হয় না যে কেহ তোমাকে বন্দী করিতে পারিত।

—যুদ্ধে জয় না হউক, অসিহস্তে মরিতে পারিতাম, না হয় যেমন দস্যু ছিলাম সেইরূপ আবার দস্যু হইতাম।

ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের ন্যায় রুদেলা নিস্তেজ, বাতাহত তরুর ন্যায় মুহ্যমান। আরাতামা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। আরাতামা কহিলেন,—তোমার মত তেজীয়ান পুরুষের রমণীর কৌশলে বন্দী হওয়া অপমানের কথা স্বীকার করি। আমার কথায় রাজা তোমাকে গুরুদণ্ড নাও দিতে পারেন।

রুদেলার মর্ম্মে কষাঘাত হইল। মস্তক উন্নত করিয়া দৃপ্তস্বরে কহিলেন, আমি কাহারও কৃপাপ্রার্থী নহি, তোমার কিংবা রাজা কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করি না। যুদ্ধে জয়পরাজয় আছে, দস্যু ধৃত হইলে দস্যুর মতই দণ্ডিত হইবে। আমি তোমায় শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অনুরোধ বা ভিক্ষাস্বরূপ কোন কথা বলি নাই।

রুদেলার গর্ব্বিত ভীতিশূন্য মূর্ত্তি, তাঁহার চক্ষের তীব্র জ্যোতি দেখিয়া আরাতামা প্রীতি অনুভব করিলেন। কহিলেন, রুদেলা, এ কথা তোমার উপযুক্ত হইয়াছে

আমার এমন অভিমান নাই যে, তোমাকে কাহারও কৃপা-পাত্র বিবেচনা করিব। ঘটনাক্রমে তুমি আমার হস্তগত হইয়াছ। আমার চক্ষে তুমি দস্যু নও, তুমি অসাধারণ যুদ্ধকুশলী মহাবীর। ঘাতকের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে আমার কলঙ্ক কখন ঘুচিবে না, জীবনে কখন অনুতাপ শেষ হইবে না। আমি রাজা শিশেরার প্রজা নই, তাঁহার এমন সাধ্য নাই যে, তিনি বলপূর্ব্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। আশ্বস্ত হও, এ কথা তোমাকে বলিলে তোমার অপমান করা হয়, তবে স্ত্রীলোক হইলেও বীরের মর্য্যাদা জানি এ কথা আমি বলিতে পারি। তুমি বন্দী এ কথা ভুলিয়া যাও, রাজা শিশেরার সাক্ষাতেই তোমার যেখানে অভিরুচি হয় গমন করিও। এ সময় মনে কর তুমি আমার অতিথি।

রুদেলা উঠিয়া আরাতামার বস্ত্রাঞ্চল ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিলেন, কহিলেন,—আমি তোমার আজ্ঞাকারী দাস।

মাথা তুলিতে রুদেলার বাহিরে দৃষ্টি পড়িল। দূরে সমুদ্রের মধ্যে হুতাশনের ন্যায় আলোক জ্বলিতেছে, তাহা ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া নিকটে আসিতেছে। জলে অগ্নি! রুদেলা বিস্মিত হইয়া আরাতামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি এ?

আরাতামা উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন, কহিলেন—ইহাই বাড়বাগ্নি।

—জলে অগ্নি কি রকম? তাহা হইলে এখানে আসিলে ত তোমার বিমানে আগুন লাগিবার ভয়।

—অগ্নি নয়, আলোকমাত্র। এ আগুনে দাহিকাশক্তি নাই। যেমন খদ্যোতের আলোক বা চন্দ্রালোক স্পর্শ-শীতল; জলেও জীবাণুসমূহের আলোক, ইহাতে অগ্নি নাই।

দেখিতে দেখিতে তলিতার চারিদিকে জলস্ত জলরাশি ঘিরিয়া আসিল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গের উচ্ছাস, ফেন-রাশি লেলিহান লোলায়মান অগ্নিশিখার ন্যায় সঞ্চরিত। সমুদ্রগর্ভে,সমুদ্রের উপরে আলোড়িত তরঙ্গায়িত আলোক-প্রবাহ। উজ্জ্বল আলোকিত সমুদ্রতলে, সমুদ্রের জলে অসংখ্য জীব বিচরণ করিতেছে, ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। সেই সঙ্গে আরাতামা তলিতার তীব্র আলোক জলের ভিতর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। একটা বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যগুলিকে খাইতে যাইতেছিল, আরাতামা তাহার চক্ষে তলিতার আলোক ফেলিতেই পলায়ন করিল। ক্রমশঃ বাড়বাগ্নি দূরে চলিয়া গেল, জলে আলোক নির্ব্বাপিত হইল।

আরাতামা রুদেলাকে কহিলেন,—এইবার তোমাকে যথার্থ বন্দী হইতে হইবে।

—সমস্ত দিন ত বন্দী রহিয়াছি।

—এখন সে হিসাবে নয়। তুমি একটু বিশ্রাম কর।

আরাতামা একটি ক্ষুদ্র কক্ষের দ্বার খুলিলেন, তাহার ভিতরে শয়নের স্থান ছিল। রুদেলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আরাতামা বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবি দিলেন। কহিলেন,—তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন কর। কাল তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় গমন করিও।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয় শিল্পের পুনরুত্থান

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাব্দীব্যাপী চাঞ্চল্যের পরে গৌড়রাজলক্ষ্মী পাল-কুলাবতংস প্রথম মহীপালদেবের করগ্রহণ করিয়া স্থির হইলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে শত বর্ষের অবসাদ দূর হইল, ব্রহ্মপুত্রতীর হইতে শোণতীর এবং হিমাদ্রির পাদমূল হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের বেলা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পালরাজবংশের অধীনতা স্বীকার করিল। গুর্জরের অধিকার নিমেষের মধ্যে সুদূর প্রয়াগ পর্য্যন্ত অপসারিত হইল, অনধিকারী কাম্বোজ পালরাজের পিতৃভূমি হইতে দূরীভূত হইয়া



রকু কিহারের মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি



নালন্দার নাগার্জ্জুন (?) মূর্ত্তি



বিহারের বজ্রপাণি মূর্ত্তি


বিহারের জম্ভল মূর্ত্তি


বুদ্ধগয়ার মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি


মালদহের স্থিরচক্র মূর্ত্তি

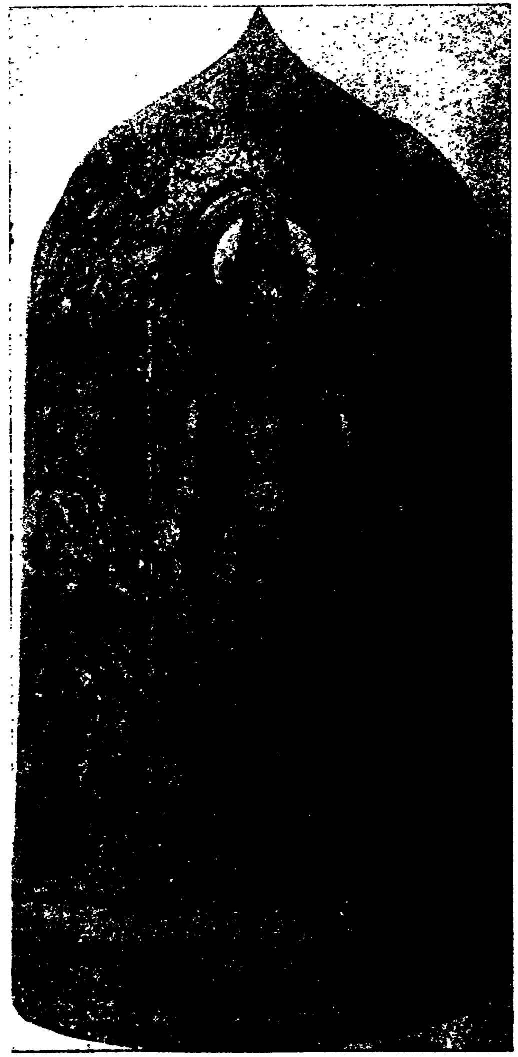












প্রজ্ঞাপুঞ্জের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল এবং বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা বোধ হয় মহীপালের অধীনতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন।

দশম শতকের প্রথম পাদে গৌড়ীয় শিল্পে যে অবসাদ আসিয়াছিল, দ্বিতীয় পাদে তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছিল, কিন্তু তৃতীয় পাদে তাহার পরিবর্ত্তে নবযৌবনাঙ্কুরে তাহা নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছিল। দশম শতকের শেষভাগে নবজীবন লাভ করিয়া গৌড়ীয় শিল্প যে-আকার গ্রহণ করিল, তাহা শিল্পের ব্যাপ্তির ইতিহাসে নূতন। নবজাত গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসে এই নবজীবনের যুগ ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় গৌরবময় যুগ। এই যুগে গৌড়ীয় শিল্পী মগধ হইতে ব্রহ্মপুত্র-তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের প্রাদেশিক আদর্শ একত্র করিয়া শিল্পাদর্শের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিল; সেরূপ সমন্বয় ভারতের সুদীর্ঘ শিল্পেতিহাসেও অতীব বিরল। দশম শতকের শেষপাদ হইতে দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ভিন্ন প্রদেশের শিল্পাদর্শের প্রদেশগত পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছিল। প্রাদেশিকতা-বর্জ্জন গৌড়ীয়-শিল্পের নবজীবনের প্রধান লক্ষণ।

ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তি, ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামের মৎস্যাবতার, দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের বিষ্ণুমূর্ত্তি, মুর্শিদাবাদ নগরের নাককাটি তলার বিষ্ণুমূর্ত্তি, মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটের বিষ্ণুমূর্ত্তি, বুদ্ধগয়ার মহীপালের একাদশ রাজ্যাঙ্কের বুদ্ধমূর্ত্তি, নালন্দার বৃহৎ বরাহমূর্ত্তি ও গোরখপুরের বিষ্ণুমূর্ত্তি সমস্তই যেন একই শিল্পীর শ্রীমূর্ত্তি-রচনার নিদর্শন।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কঙ্কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডপ্রমাণ একত্র যোজনা করিয়া সংগৃহীত হইতেছে, কিন্তু বিশাল গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসের ছায়ামাত্র উপলব্ধ হইয়াছে। সে-শিল্পের ক্রমবিকাশের লিপিবদ্ধ ইতিহাস কোনও কালে আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং কিরূপে গোরক্ষপুর হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্যভূমিতে শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহা কোনও দিন জানিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। আবিষ্কৃত শিল্পনিদর্শন হইতে বর্ত্তমানে আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে গৌড়, মাগধ, মৈথিল, বাঙ্গ ও আযোধ্যক শিল্পী একই প্রণালী অনুসারে এবং শিল্পের একই আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গৌড়ীয় শিল্পের নবযুগ দশম শতকের শেষপাদ হইতে একাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত শিল্পনিদর্শন শিলালেখ অনুসারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই যুগে প্রাদেশিক আদর্শ সমন্বয় ব্যতীত গৌড়ীয় শিল্পে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল :—

(ক) গৌড়ীয় রাষ্ট্রে ভাগবত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্যলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শত শত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ। গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাসের প্রথম যুগে বৈষ্ণব এমন কি, হিন্দুমূর্ত্তি অতীব বিরল। এই যুগে বৌদ্ধমূর্ত্তির সংখ্যার আধিক্য হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, মগধে, গৌড়ে ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম অধিকতর প্রবল ছিল।

(খ) দশম শতকের শেষপাদ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের দ্রুত অবনতি কেবল লেখযুক্ত মূর্ত্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়: এই যুগে বুদ্ধগয়া বা মহাবোধি এবং নালন্দাপ্রমুখ বৌদ্ধতীর্থ ব্যতীত অন্যত্র আবিষ্কৃত বৌদ্ধমূর্ত্তি অত্যন্ত বিরল।

(গ) গৌড়ীয় শিল্পের নবযুগে গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র দিগম্বর জৈনধর্ম্মের অভ্যুত্থানের কথঞ্চিৎ পরিচয় আবিষ্কৃত শিল্পনিদর্শন হইতে পাওয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক রাজগৃহের জৈনমন্দিরসমূহে আবিষ্কৃত সুন্দরতর জৈনমূর্ত্তিগুলি এবং রাজসাহী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মানভূম জিলার অধিকাংশ জৈন-দিগম্বর মূর্ত্তি গৌড়ীয় শিল্পের নবজীবন-যুগের শিল্পনিদর্শন।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায় উন্নতিলাভ করিয়াছিল; কিন্তু কেমন করিয়া করিয়াছিল তাহার ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। প্রবল প্রতাপান্বিত প্রথম মহীপালদেব যখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্য ভূখণ্ডের একচ্ছত্র অধীশ্বর, পরমেশ্বর পরমসৌগত গৌড়েশ্বর যখন বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র অষ্টমহাস্থানে ত্রিরত্নের সৌধমালা সংস্কারে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, তখন রাজশক্তির সহায়ের অভাবে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে পালরাজ-

বংশের কুলধর্ম্মকে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ করিয়া গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস চমৎকার হইলেও অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত।

(ঙ) গৌড়ীয় রাষ্ট্রে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষের কেন্দ্র, বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র মগধ হইতে অপসারিত হইয়া পালরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র বরেন্দ্রভূমিতে আনীত হইয়াছিল।

(চ) দশম শতকের শেষপাদ হইতে গৌড়ীয় শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা শিল্পশাস্ত্রের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে সংযত হইয়াছিল।

দশম শতকে শিল্পোৎকর্ষের কেন্দ্র যে মগধ হইতে অপসারিত হইয়া বরেন্দ্রভূমিতে আনীত হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাণগড়ে আবিষ্কৃত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। আমার স্বর্গগত বন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেঙ্কট নটেশ আয়ার ইহা বাণগড় হইতে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন (*I. M. No. N. S. 2245*)। এই বিষ্ণুমূর্ত্তিটির সহিত এই প্রবন্ধে যতগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল, তাহা তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আদর্শের সমন্বয় এবং শিল্পশাস্ত্রের নাগপাশ সত্ত্বেও বারেন্দ্র শিল্পীর রচনা অন্যান্য প্রাদেশিক শিল্পী অপেক্ষা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন :—

(১) কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

(২) সুন্দরবনে চব্বিশ পরগণা জেলার চরে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি (I. M. No. Sn. 1)। ইহা শ্রীযুক্ত জে, এইচ, রাইলি (J. H. Reily) কর্ত্তৃক ২৫শে জানুয়ারী ১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

(৩) গোরখপুর নগরের উপকণ্ঠে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি ; প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ সার জন্ মার্শাল এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ইহা প্রাচীন গুপ্তযুগের শিল্প নিদর্শন এবং

(৪) বাণগড়ের বিষ্ণুমূর্ত্তি।

এই চারিটির মধ্যে বাণগড়ের মূর্ত্তিটি যে সর্ব্বোচ্চ শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তি একত্র মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। দেবতার মূর্ত্তি, মানুষের মূর্ত্তি, একের অধিক মস্তক বা দুইএর অধিক হস্ত যোজনা করিলে শিল্পাদর্শের বিকৃতি হয় না, গৌড়ীয় শিল্পের নবজীবনের যুগে সর্ব্বজাতীয় সর্ব্বধর্ম্মের মানবমূর্ত্তি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন করিয়া গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রদেশে শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি। নালন্দার মহা বিহারের দ্বারফলকের শিলালেখ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই মহাবিহার অগ্নিদাহের পরে প্রথম মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শিলালেখের উপরে কৃত্রিম লতাবিতানের মূলে (Arabesque) একটি দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি আছে। সুন্দরবনের, গোরখপুরের এবং বানগড়ের বিষ্ণু দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত এবং বর্ত্তমান কালে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত সূর্য্যমূর্ত্তিটিও (I. M. No. Ms. 8.) দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি। ঢাকার বজ্রযোগিনীর মৎস্যাবতারের মূর্ত্তি, নালন্দার তথাকথিত নাগার্জ্জুন মূর্ত্তি, বিহার বা উদ্দণ্ডপুরের বজ্রপাণি মূর্ত্তি (I. M. No. 3785), মালদেহে আবিষ্কৃত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ শালায় রক্ষিত স্থিরচক্র মূর্ত্তি (B. S. P. No. C (d) 8, কুরকিহারের মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি

16

(I M No. Kr. 10), বুদ্ধগয়ার অষ্টভুজ মঞ্জুশ্রী (I. M.-No. 6271) সমস্তই উপবিষ্ট পুরুষ মূর্ত্তি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এই সমস্ত দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীমূর্ত্তির কল্পনায় গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ব প্রদেশের শিল্পী সুন্দর মানবের যে মূর্ত্তি আদর্শ করিয়া লইয়াছিল তাহা সর্ব্বত্রই এক। অথচ প্রত্যেক মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রভাব আছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আবশ্যক মত মূর্ত্তিগত পার্থক্য আছে এবং কিয়ৎপরিমাণে

আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি ও বস্তুতে প্রাদেশিকতা আছে।

শিল্পাদর্শের এই প্রদেশবিস্তৃত সমন্বয়ে গৌড়ীয় শিল্প নবজীবনের যুগে যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে গৌড়ীয় রাষ্ট্রের বহির্দেশেও শিল্পিগণ গৌড়ীয় শিল্পাচার্য্যের নিকট ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বারাণসী পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও সমগ্র কোশল দশম বা একাদশ শতকে পালরাজের অধীনতা স্বীকার করে নাই; অথচ গোরখপুর ও গণ্ডা জেলার গ্রামে গ্রামে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনি গৌড়ীয় শিল্পীর রচিত শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ খনন-কালে স্বর্গগত ডাক্তার হোই (Dr. W. Hoey I. C. S.) গৌড়ীয় শিল্পের নবজীবনের যুগের যে দুইটি শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা এখনও লক্ষ্ণৌএর সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। লেখক গর্ব্বান্ধ গুর্জ্জর প্রতিহারের রাজধানী প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও গৌড়ীয় শিল্পী রচিত শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে বর্দ্ধিত মাথুরক শিল্পনিদর্শন যেমন খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকে পূর্ব্বে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া দক্ষিণে বিদিশা ও সাঞ্চী এবং পশ্চিমে মরুপারে সিন্ধুদেশে সাদরে নীত হইত, সেইরূপ দশম শতকের শেষপাদে ও একাদশ শতকে গৌড়ীয় শিল্পের নবজীবনের যুগে গৌড়ীয় শিল্প-নিদর্শন সাদরে মধ্যদেশের সর্ব্বত্র গৃহীত হইত।

নবজীবনের যুগে গৌড়ীয় শিল্পের প্রধান লক্ষণ সাম্য। দৈহিক আকারের অনুপাত, পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক মূর্ত্তি ও বস্তুর অনুপাতে সর্ব্বত্র সাম্য গৌড়ীয় শিল্পের নবযুগের প্রধান লক্ষণ। শ্রীমূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে মূর্ত্তির ধ্যান বলে যে জম্ভল ক্ষুদ্রাকার স্থূলকায় ও লম্বোদর; শিল্পশাস্ত্র বলে যে, মূর্ত্তির দেহলব্ধ অঙ্গুলীর এই পরিমাণ সর্ব্বাঙ্গের আকার হইবে। গৌড়ীয় শিল্পের প্রথম যুগের শিল্পী হইতে শেষ যুগের শিল্পী পর্য্যন্ত সকলেই দু-চারি-দশটা জম্ভলের মূর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। প্রথম যুগের শিল্পী প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যে নিখুঁত স্থূলকায় লম্বোদর মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছে নবজীবনের যুগের শিল্পী তালমানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাহা পারে নাই বটে; কিন্তু সে সাম্যের বলে জম্ভলের মূর্ত্তির যে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে শিল্পোৎকর্ষের হিসাবে তাহার স্থান কুরকিহারের জম্ভলমূর্ত্তির (I. M. No. Kr. 1) অব্যবহিত পরে (I. M. No. 3911)।

গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস লিখিতে গিয়া কেহ কেহ এককালে বৌদ্ধশিল্প, হিন্দুশিল্প ও জৈনশিল্প স্বতন্ত্র করিতে গিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের অনুমান মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে। মালদহের স্থিরচক্র, বুদ্ধগয়ার মঞ্জুশ্রী, গৌড়ের সূর্য্য এবং বাণগড়ের বিষ্ণু যে শিল্পশাস্ত্র অনুসারে একই রীতির মূর্ত্তি, এ কথা যাঁহারা ভাস্কর অথবা যাঁহারা শিল্প-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা দৃষ্টিমাত্র স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যের প্রারম্ভে গৌড়ীয় শিল্প নবজীবন লাভ করিয়া কি কি লক্ষণোপেত হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে জানিয়া রাখা উচিত :—

(ক) দেবমূর্ত্তি অর্থাৎ মনুষ্যমূর্ত্তিমাত্রেই নাতিদীর্ঘ নাতিস্থূল ও ক্ষামধ্য।

(খ) অস্বাভাবিক অবয়ব সংযোজনের ফলেও শিল্পী মানবদেহের স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম হইতে দেয় নাই। নালন্দার দ্বিভুজ নাগার্জ্জুন এবং বুদ্ধগয়ার অষ্টভুজ মঞ্জুশ্রীতে আকারগত বিশেষ পার্থক্য নাই।

(গ) শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে গৌড়ীয় শিল্পী এই যুগে সর্ব্বপ্রথমে 'ললিতাক্ষেপ', 'মহারাজলীলা' প্রভৃতি বক্র, ভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অনুভঙ্গ, অতিভঙ্গ প্রভৃতি চারু-ললিত দেহসংস্থানের উদাহরণ দিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে শিল্পশাস্ত্রের এইসমস্ত অনুবন্ধ অত্যধিক অনুসরণের জন্য শ্রীমূর্ত্তিকে বিকটাকার করিয়া তুলিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রী গোপাল হালদার

(১)

বঙ্কিমকে এ যুগের বাঙালী 'ঋষি' বলিয়া অভিনন্দন করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যাসটা খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু মনে হইতেছে অন্যান্য অভ্যাসের মত' এটি-ও যতই পাকা হইতেছে, ইহার পিছনের সত্যও তাহার নিকট ততই অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

বঙ্কিম ঋষি নিঃসন্দেহ—রসবেত্তা ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, সর্ব্বোপরি সত্যদ্রষ্টা ঋষি, যিনি এক বৃহৎ জাতির যুগ-যুগ-বাহিত ইতিহাসের উপল-বিকীর্ণ তটরেখা অনুসরণ করিয়া তাঁহার চির-নিভৃত অন্তরের উৎস-মুখটির সন্ধান পাইলেন, ভারতবর্ষের তাপস-আত্মার সুগভীর সুন্দর শিবমূর্ত্তিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্রন্দন-মথিত, অট্টহাস-মুখরিত শ্মশান-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিলেন।

বঙ্কিমকে লইয়া বাঙালীর গৌরবের কারণ—শুধু বঙ্কিমের রূপলোক নয়, শুধু জাতীয় উদ্বোধন-মন্ত্র 'বন্দেমাতরং'-ধ্বনি নয়,—এই মন্ত্রের যাহা মূল ও প্রাণ, সেই ভারতাত্মাকে বঙ্কিমের এই যুগে নূতন করিয়া আবিষ্কার ও নূতন করিয়া উপলব্ধি।

(২)

জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার এক ভাবনা বঙ্কিমকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল বলিয়াই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের গঙ্গোত্তরীতে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই যাত্রায় তাঁহার সহায় ছিল দু'টি—তাঁহার সুস্থ, সবল প্রতিভা ও তাঁহার বুক-ভরা স্বদেশপ্রীতি।

বহুদিন পূর্ব্বে মনস্বী অরবিন্দের মুখে আমরা শুনিয়াছি, "The religion of patriotism, this is the master idea of Bankim's writings." মাতৃভূমির প্রতি প্রবল ও প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধাই বঙ্কিমের মাতৃভাষার প্রতি নিবিড় ভালোবাসারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কথা ভুলিবার নয় যে, তখনো বাঙলা ভাষা নব শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অনাদৃত ও অপরিচিত ছিল। 'বঙ্গ দর্শনের পত্র সূচনায়' বঙ্কিম কহিতেছেন,

"ইংরেজিপ্রিয় কৃতবিদ্যদের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না।… ইংরেজিভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদের 'ভাষায়' যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই।"

(বিবিধ প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড)।

সত্য বটে, স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি অনুরাগ বঙ্কিমের সমকালে প্রকাশ-লাভের চেষ্টায় পথ খুঁজিতে সুরু করিয়াছে। তখন পূর্ব্ববর্ত্তী দুই-তিন 'ডিকেডের' উদ্দাম পাশ্চাত্যানুরাগ ধীরে ধীরে স্বস্থ হইয়া উঠিতেছিল। 'রেণেসাঁস্' তখন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়া 'রিফর্ম্মেশন্'এর দিকে মুখ ফিরাইতেছে। অপরদিকে, 'অর্থোডক্সি'র বুকের ভিতরেও আত্ম-শোধনের চেতনা ও অনুভূতি জাগিতেছে। কিন্তু, তখনো এই নব ভাব-গঙ্গাকে বহন করিবার সামর্থ্য ও জ্ঞান লইয়া কেহই অগ্রসর হন নাই। বঙ্কিমের যে স্বদেশানুরাগ পশ্চিমকে বরণ ও বারণ করিবার ভার লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বুঝিল যে,

"আমরা যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজি কহি, বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব।…নকল ইংরেজি অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরেজি লেখক, ইংরেজি বাচক সম্প্রদায় হইতে খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই।"

(বিবিধপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, 'বঙ্গদর্শনের মুখপত্র')।

স্বভাষার ভাব-গঙ্গাকে শঙ্খধ্বনি করিয়া যখন বঙ্কিম আমাদের দুয়ারে লইয়া আসিতেছিলেন, তখনও তিনি হৃদয়ে জপিতেছিলেন এই স্বদেশের শুভ মন্ত্রটি। এই যুগে এই কথা ধরা পড়িলে সাহিত্যিকের পক্ষে অপাংক্তেয় হইবার কথা। সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজ আর্টের অদ্বৈতবাদের যুগ,

আর্ট সত্য, জগৎ মিথ্যা,—স্বদেশ ত বটেই, জীবনও মিথ্যা। বঙ্কিমের নিকট এই ব্রহ্মবাদ যে অজ্ঞাত ছিল তাহা নয়ঃ—

"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়।"
('দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব')।

কিন্তু, তথাপি কেন আমরা তাঁহার জগতে এই অদ্বৈতবাদের কোনো পূর্ণ প্রসার দেখি না? সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, আর্টের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বঙ্কিমের রূপলোকে নাই কেন? ইহার উত্তরও বঙ্কিম রাখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম্ম।...কিন্তু, সাহিত্য যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা অংশমাত্র। অতএব, কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপে আলোচনীয় হওয়া উচিত।*"
(বিবিধ প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য')

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার শেষ অদ্বৈতবাদে, কাব্যজিজ্ঞাসার শেষও অদ্বৈতবাদে। ইহাদের তুরীয় লোক স্বতন্ত্র হইলেও দু'এরই কোল ঘেঁসিয়া আছে একদিকে সর্ব্বাস্তিবাদ ও অন্য দিকে সর্ব্ব-নেতি-বাদ, একদিকে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এই বোধ, অন্যদিকে সর্ব্ব জগৎ ও সর্ব্ব জীবন মায়া, 'অধ্যাস', এই জ্ঞান। যাঁহার পূর্ণতা ও অখণ্ডতার বোধ হয় নাই, তাঁহার পক্ষে এই দুই অদ্বৈতজ্ঞানের ক্ষুরধারা সম সুতীক্ষ্ণ কঠিন পথ শোচনীয় সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্কিম এই অখণ্ডতাকেই খুঁজিতেছিলেন। সাহিত্যিকের 'স্বধর্ম্ম' যে সৌন্দর্য্য-ধর্ম্ম ইহা তাঁহার জানা ছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, ইহা 'জীবন-ধর্ম্মের' অংশ মাত্র। অখণ্ড জীবন-ধর্ম্মই সাধনার বস্তু;—সাহিত্যিকেরও কাছে তাহা 'ভয়াবহ পরধর্ম্ম' নয়।

আর্ট জীবনের লাবণ্য স্ফূর্ত্তি, সাহিত্য জীবনের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আনন্দ-গদ্গদ বাণী। বঙ্কিম দেখিতেছিলেন, ফিদিয়াস্, এস্কাইলাস্, সোফোক্লিস্ প্রভৃতির পিছনে পেরিক্লিয়ান্ এথেন্স-এর জীবন; এলিজাবেথান সাহিত্যের পিছনে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের প্রথম জাগ্রত চেতনা। বাঙালী আত্ম-প্রতিষ্ঠ না হইলে, স্বস্থ না হইলে, সুস্থ না হইলে, বাঙলার সাহিত্য আসিবে কোথা হইতে? জাতীয় প্রাণের গ্রেনাইট স্তরের উপর না হইলে জাতীয় সাহিত্যের মন্দির উঠিবে কোথায়?

যে দেশপ্রীতি সাহিত্যের রূপলোকে রসবেত্তা বঙ্কিমকে ডাকিয়া আনিল, তাহাই কহিল, "আগে চল্, আগে চল্।"

বঙ্কিমের দেশপ্রীতি সাহিত্যিকের 'স্বধর্ম্ম'-বিরোধী নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠা-রূপ পূর্ণধর্ম্মমুখী। তাই, বঙ্কিমের সন্ধান হইল স্বদেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র, বঙ্কিমের ধ্যান হইল ভারতবর্ষের প্রাণপদ্ম, ভারতেতিহাসের মর্ম্ম-নিহিত সত্যটি।

(৩)

বাঙলা দেশে যে-যুগে বঙ্কিমের আবির্ভাব সে-যুগের মানুষ হয় কেশব ও মহর্ষির সঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, না হয় সর্ব্ব আস্থা হারাইয়া কোঁৎ প্রচারিত নবধর্ম্মের মধ্যে একটা কূল খুঁজিয়া লইয়াছে (শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)। বঙ্কিমের মনও এক সময় কোঁৎ ও মিল-এর প্রভাবে দোলা খাইয়াছিল (বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৮৮)। সেই প্রভাব তিনি কাটাইয়া উঠিলেন; কিন্তু কোঁৎ, মিল্, হার্বার্ট স্পেন্সর, মাথু আর্ণল্ড এবং সর্ব্বোপরি সীলির শিক্ষা ও যুক্তিবাদ, তাঁহাদের ধ্যান ও মননশক্তি, তাঁহার সবল মনের মধ্যে একটি পরিমিত স্থান পাইল। তাঁহার লক্ষ্য হইল জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রেরণা স্বদেশানুরাগ, পদ্ধতি ইয়ুরোপীয় জিজ্ঞাসুদের যুক্তিনিষ্ঠা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভূমিকা; কৃষ্ণচরিত্র, ১০ম—১৩শ পরিচ্ছেদ)। তাই, বঙ্কিমের স্বদেশবৎসল প্রাণ সর্ব্ব-মানবতার সীমায় পৌঁছিয়াও কেশবচন্দ্রের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল, আবার তাঁহার নব্য-জ্ঞান-প্রবুদ্ধ মন থিয়োসফিষ্ট-এর সান্ত্বনায় বা যোগধর্ম্মের নূতন হুজুগে (দ্রঃ ধর্ম্মতত্ত্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) দেশের কোনো শুভসম্ভাবনা না দেখিয়া সাড়া দিল না। তাই সমাজ-সংস্কারে তাঁহার উৎসাহের অভাব,

"সমাজ সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণ পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরণের হয়। (কৃষ্ণচরিত্র, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়),

* বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তারাজ্যে ধর্ম্ম কথাটির যে বিশেষ অর্থ আছে তাহা স্মরণীয়।

সমাজ সংস্কার পূর্ণধর্ম্মের আংশিক ব্যবস্থা মাত্র। (তুলনীয় : সাহিত্য সম্বন্ধীয় মত),—

"ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজ সংস্কার কিসের জোরে হইবে ?"

(কৃষ্ণচরিত্র, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়)

আবার ৺শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখায়ও তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠেন,

"মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখার যে ধর্ম্ম টঁ্যাকে আর ঐ গুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে।...নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা নূতন ধর্ম্ম চায়।"

(বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৩০৪)

সেই 'নূতন ধর্ম্মই' বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম্ম—যাহাতে পশ্চিম রূপান্তরিত হইয়া উঠিল, ভারতবর্ষের সনাতন সাধনা শাস্ত্র ও প্রথার আবরণ মুক্ত হইয়া আপনার চিরন্তন রূপ ফিরিয়া পাইল।

বঙ্কিমের এই ধ্যানলব্ধ সত্য মাথু আর্ণল্ডের Doctrine of Culture—Sweetness and Light—অপেক্ষা ব্যাপক (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ম অধ্যায়) কোৎ-এর উদার Unityবাদ (ধর্ম্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র [খ]) অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত ; মিল্-প্রমুখ মনস্বীদের Greatest Good of the Greatest Number লক্ষণযুক্ত নীতি তাহার একটি অংশমাত্র (ধর্ম্মতত্ত্ব ২২শ অধ্যায়); সীলির Substance of Religion is Culture উক্তি তাহার মধ্যে স্থান পাইয়া একটি অভিনব ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করে। এই সব বিদেশীয় চিন্তাবীরদের নীতিগুলি বঙ্কিমের অনুশীলনের অনেকখানি জুড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বের' সাতটি মূলতত্ত্বের মধ্যে তাহাদের স্থান এইরূপ :—

"১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে।...সেইগুলির অনুশীলন, পরিস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

"২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

"৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

"৪। তাহাই সুখ।"· (ধর্ম্মতত্ত্ব, উপসংহার)

ইহার সহিত আমাদের সনাতন কোনো পন্থারই সহজ ও সম্পূর্ণ মিল আছে বলিয়া মনে হয় না। Ecce Homo ও Natural Religion-এর ধ্বনি যেন এই ধর্ম্মতত্ত্বের প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্য হইতে সমুত্থিত হইতেছে। এই 'religion in itself'-এর সন্ধান ও 'religion of ideal humanity'র বিবৃতির মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের কোনো সুপরিচিত মত বা পথ-বিশেষকে চিনিয়া লইতে পারি না।

কিন্তু বঙ্কিমের পক্ষে এখানেই থামা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার স্বদেশবৎসল মন খুঁজিতেছিল জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন স্থায়ী পাদপীঠ, চাহিতেছিল এই বিদেশীয় নীতিবাদ ও 'স্বভাবধর্ম্মবাদকে' (Natural Religion) স্বদেশীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লইতে। তাঁহার শক্তিধর্ম্মী-প্রতিভা তাগিদ দিতেছিল, 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর।' সেই প্রতিভার তাড়ায় ও স্বাদেশিকতার হৃদয়াবেগে চালিত হইয়া তিনি দেখিলেন অনুশীলনের শেষ সূত্র তিনটি :

"৫। এই সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

"৬। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন ; এইজন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

"৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি পশুপ্রীতি দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।" (ধর্ম্মতত্ত্ব-উপসংহার)

বঙ্কিম জানিতেন,

"ইউরোপীয় patriotism এক ঘোরতর পৈশাচিক পাপ।"

(ধর্ম্মতত্ত্ব, ২৪শ অধ্যায়)

তথাপি তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না,

"ভারতবর্ষীয়দের ঈশ্বরপ্রীতি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যঘটিত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।"

(ধর্ম্মতত্ত্ব ২৪শ অধ্যায়)

এইরূপে সীলির যে মানবতাবাদ (religion of humanity) শিকলছেঁড়া হইলে ভৌগলিক শূন্যবাদিতায় যাইয়া ঠেকে বঙ্কিম তাহাকে একটি দেশগত পরিস্থিতি দিয়া পরম নিজস্ব করিয়া লইলেন, এবং যে শাণিত কাল্চারবাদ চিররহস্যময় আত্মার সুনিভৃত কক্ষটির দুয়ারেই "a threefold devotion to Goodness, Beauty and Truth"এর (দ্রঃ Natural Religion) ডালি নামাইয়া হাঁপাইতে থাকে, বঙ্কিম তাহাকে পরাপ্রীতির অমৃতস্পর্শ দিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় আত্মার একেবারে নিকটতম করিয়া ফেলিলেন। বঙ্কিম শুনাইলেন,

"অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ৭ম অধ্যায়)

সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সাধনা সহসা কাল্‌চার্‌বাদের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া একেবারে একটি উদার sublime লোকে উঠিয়া গেল। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব সমাপ্ত হইল বঙ্কিমের অন্তরতম, প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম মহাবাণীটি উচ্চারণ করিয়া,

'সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি
ইহা বিস্মৃত হইও না।'

এই পরম সমন্বয়টির সন্ধান পাইয়া বঙ্কিম ভাবিতেছিলেন,

"এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে ?"

তাঁহার দৃঢ় দেশপ্রীতি ও তাঁহার ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে জানাইয়া দিল—

"যদি কেহ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ম অধ্যায়,)

এইরূপে রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে যেমন বেদান্তের মন্ত্র তাহার বহুশত বৎসরের অবহেলিত মৌনতা ভাঙিয়া নবীন ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনি বঙ্কিমের শিক্ষায় সে যুগের কোঁৎ-সীলিপুষ্ট মন আবার গীতার মধ্যে তাহার সামঞ্জস্যের মন্ত্র ফিরিয়া পাইল এবং আপনার এই লাভে আপনার ইতিহাস ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিল। ইউরোপ যেমন তাহার গ্রীক-রোমক-হিব্রাএক প্রবাহপুষ্ট কাল্‌চারের ত্রিবেণীসঙ্গমে একটি আদর্শ পুরুষ অথবা Personal Godএর জীবনকে দাঁড় করাইয়া তাহারই মধ্যে তাহার কাল্‌চারের পূর্ণ প্রকৃতি ও পরিণতি দেখে, বঙ্কিমও তেমনি এই পুনরুজ্জীবিত 'গীতাধর্ম্মের' তথ্যটিকে একটি পুরুষকারের মধ্যে সঞ্জীবিত ও সার্থক দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি যেমন একমাত্র গীতাকারই ধ্যানে লাভ করিয়াছেন, জীবনে সেই ধর্ম্মের পূর্ণ সার্থকতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রদর্শন করাইয়াছেন। খৃষ্ট ও বুদ্ধের প্রধান আশ্রয় asceticism (দ্রঃ ধর্ম্মতত্ত্ব, ২৩শ অধ্যায়)। বঙ্কিম বলিতেছেন,

"সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না, অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তি মার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম।"... "আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী ; যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ২৩শ অধ্যায়)

তাঁহার ধ্যানলব্ধ মহামহিমময় চরিত্রের' আদর্শ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই পরিস্ফুট হইয়াছে—

"যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন,... যিনি বেদপ্রবলদেশে বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছেন, 'বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে,'...যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়,..." (ধর্ম্মতত্ত্ব, ৪র্থ অধ্যায়)

বঙ্কিমের এই শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের মধুর রসের দেবতা নহেন। ব্রজলীলার লীলা-চপল 'নাগরকে' বিদায় করিয়া কুরুক্ষেত্রের পার্থ-সারথি পুনরাবির্ভূত হইলেন। বাঁশী খসিয়া পড়িল, শঙ্খ ও চক্র, গদা ও পদ্ম আবার তিনি হাতে তুলিয়া লইলেন। সেনবংশের সমকাল হইতে বৈষ্ণবের কোমলকান্ত-পদাবলীতে যে 'বিদগ্ধ মাধবের' একচ্ছত্র অধিপত্য দেখি, তাহা আর রহিল না। গুপ্ত সম্রাটদের দেবতা বাসুদেব বাঙালীর মনের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গীতার জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়। তখন নবজাগ্রত বৈষ্ণব স্তব করিল, 'হরে মুরারে, মধুকৈটভারে।'

এই মধুর রসের দেবতাকে পৌরুষ-দৃপ্ত মানবাদর্শে পরিণত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিম বাঙলার শক্তি-রূপিণী দেবীকেও একটি নূতন প্রকৃতিতে মণ্ডিত করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। পুরাণ-অধ্যুষিত সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিবার উপায়স্বরূপ ছিল তাঁহার গীতার সমন্বয়-ধর্ম্ম। কৃষ্ণ-প্রেম-মুগ্ধ জনমনকে বিশুদ্ধ করিবার পথ দেখিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নব ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহ-স্থাপনায়। তেমনি শক্তির সু-উচ্চ-সাধনা-বিস্মৃত জড়-চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিবার মন্ত্র পাইলেন তিনি দেশমাতৃকার সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায়। বাঙালার জাতীয় জীবনের তিনটি কেন্দ্র এইরূপে জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হইল। বঙ্কিমের স্বদেশানুরাগ সেই শক্তি-মূর্ত্তিকে বাঙলার প্রাণে এমনি করিয়া রূপান্তরিত করিয়া দিল যে, বাঙালী হঠাৎ গাহিয়া উঠিল, 'ত্বং হি দুর্গাদশপ্রহরণ ধারিণী!'—গাহিতে গাহিতে তাহারও চোখে জল আসিল—যেমন মহেন্দ্রের চোখে আসিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দিক্‌ভ্রান্ত বাঙালীর সম্মুখে বঙ্কিমের কীর্ত্তি ইতিহাসের মর্ম্মগত সত্যকে তাহার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরা, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করিয়া ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধন-ক্ষেত্রেই নব যুগের তপস্যার পুণ্যভূমি তৈয়ারী করা, সমাজের হৃত-শক্তি দুর্ব্বলতার আশ্রয়গুলির সংস্কার করিয়া ও পরিবর্ত্তন করিয়া সেইগুলিকে শক্তির আশ্রয়ে পরিণত করা। ইহারই প্রথম ও প্রধান অংশ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে (সাংখ্য-) সন্ন্যাস-বিরোধী 'কর্ম্মযোগ-শাস্ত্র' রূপে উপলব্ধি ও ইহার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ সাধারণে প্রচার (তুল্—লোকমান্য তিলকের 'গীতারহস্য বা কর্ম্মযোগ শাস্ত্রে'র গীতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা ; দ্রঃ "পূর্ব্বগামী হিন্দুদের উপদেশ কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ। গীতার উপদেশ কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে ?" ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬শ অধ্যায় ; ও 'সীতারাম' ভূমিকা-ধৃত শ্লোক ; এবং 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দ মঠ' ইত্যাদির প্রতিপাদ্য)। দ্বিতীয় অংশ লীলারসাশ্রিত পদাবলীর চতুর নায়কের পরিবর্ত্তে বীররসাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ (রূপান্তর নহে) ; এবং সর্ব্বশেষ অংশ, শক্তিমূর্ত্তির স্বদেশ-মূর্ত্তিতে এমনি এক সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন যে স্নেহমুগ্ধ সমস্ত বাঙালীর প্রাণ একেবারে 'মা' 'মা' বলিয়া আত্মহারা হইয় গেল।

বঙ্কিমের সমগ্র জীবনে—তাঁহার রসসৃষ্টিতে, তাঁহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায়, তাঁহার স্বদেশাত্মার ধ্যানে ও তাঁহার বিদেশাগত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বরণ ও বারণ করিবার তপস্যায়—একই মন্ত্রই ধ্বনিত হইতেছে—'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

(৪)

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বঙ্কিমের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে স্বধর্ম্মানুরাগ দেখিতে পাই, স্বাজাত্যানুরাগ কোথায় ? ইহা নব্য হিন্দুত্ব (Neo-Hinduism) মাত্র—ভারতবর্ষের জাতীয়তা নয়।

বঙ্কিমের স্বাজাত্যবোধের বাহিরের দিকটা খুব পরিসর নয়। তার কারণ, সে যুগের স্বাজাত্যাদর্শই খুব ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। তখন, স্বদেশ বলিতে বাঙালী বাঙলা দেশকেই বুঝিত, সমগ্র ভারতবর্ষের ভৌগলিক রূপটি তখন ঐ কথায় তাহার নিকট ভাসিয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। আজ ভারতমাতা আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু এখনো বঙ্গ-জননী তাঁহার সত্তা হারাইয়া ফেলেন নাই। বোধ হয় ফেলিবেনও না। 'বাঙালী পেট্রিয়োটিজম্' এই 'ইণ্ডিয়ান্ নেশানালিজম্-এর' 'ভাই- বেরাদরির' ফাঁকে ফাকে 'বেহার ফর্ দি বেহারীজ্', প্রভৃতি হাঁকডাকের মধ্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বাঙালীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

আবার, সেইযুগে 'স্বাজাত্য' বিশেষ করিয়া হিন্দুরই সাধনার ও প্রয়োজনের সামগ্রী ছিল। তখন স্বাদেশি-কতায় প্রবুদ্ধ হইয়া ৺নবগোপাল মিত্র প্রমুখ বাঙালীরা 'হিন্দুমেলা' স্থাপন করিতেছেন। তখন উগ্র 'স্বদেশী' বাঙলার বিদ্রোহী-বৃদ্ধ ৺রাজনারায়ণ বসু স্বাজাত্যের প্রেরণাবশে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশার কথা' বলিতেছেন। তখন বাঙালীর কাছে মুসলমান বিদেশী, উদ্ধত বিজেতা। মুসলমানও হয়ত নিজেকে তখনো সম্পূর্ণ বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে রাজী হইতেছেন না—আজই কি তাঁহারা 'শুধুমাত্র বাঙালী' বা 'শুধুমাত্র ভারতীয়' বলিয়া পরিচয় দিতে রাজী আছেন ?—তাই একথা নিঃসন্দেহ সত্য যে, বঙ্কিম প্যাক্ট রূপ কাগজের স্বাজাত্য-সেতু নির্ম্মাণে সচেষ্ট হ'ন নাই।

কিন্তু বঙ্কিমের স্বাজাত্যবোধের বাহিরের দিকটিই এই সন্দেহ উদ্রেক করে, তাহার ভিতরের দিকটি দেখিলে এই সন্দেহের স্থান থাকে না। বঙ্কিমের স্বাজাত্যাদর্শ সঙ্কীর্ণ হইতেই পারে না ; কারণ উহা স্বদেশাত্মার (National Being) চিন্ময় মূর্ত্তির,—শাশ্বত জাতীয়-চেতনার,—বহিঃ-প্রকাশ মাত্র। বহিঃ-প্রকাশ হিসাবে সে যুগের 'বাঙালী' ও সে যুগের 'হিন্দু' চিন্তাধারার ছাপ তাহার উপর থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলি ছাড়াইয়া লইলেও তাঁহার জাতীয়াদর্শ টিঁকিয়া থাকে। তাই, 'সপ্তকোটি কণ্ঠ' ও 'দ্বিসপ্তকোটি ভুজ' ত্রিংশকোটি কণ্ঠে বাধিয়া গেল না, 'দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজে' একটু অশোভন ঠেকিল না। কারণ, তাঁহার মাতৃমূর্ত্তির ধ্যান, পরিকল্পনা, নির্ম্মাণকলা, প্রতিষ্ঠিত প্রাণ, সকলই যে শাশ্বত ভারতবর্ষের, ক্ষুদ্র প্রদেশের নহে।

ঠিক এইরূপেই, অন্তরলোকের সন্ধান লইলে দেখিব যে, হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে', রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' যেমন এক-একটি অতীত ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান লজ্জা ও লাঞ্ছনারই আক্ষেপ, তেমনি 'মৃণালিনী', 'আনন্দমঠ,' 'কমলাকান্তের দুর্গোৎসব' প্রভৃতির মধ্যেও বঙ্কিমের সেই 'ধোঁয়ার ছল করিয়া কাঁদা।' রাজসিংহের কথা কি বলিব জানি না, কিন্তু কমলাকান্তের 'পে-বিল্,' 'পলিটিক্‌স্' প্রভৃতি দেখিলে এই সন্দেহের অনেকটা নিরসন হয়। অন্তরের দিকে তাকাইলে বাহিরের প্রকাশ লইয়া ক্ষোভের কারণ কমিয়া যায়।

তথাপি জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, 'তাঁহার স্বদেশাত্মা হিন্দুর গীতাকে অবলম্বন, হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় ও হিন্দুর শক্তিমূর্ত্তিকে মাতৃমূর্ত্তি-রূপে বরণ করিয়া প্রকাশিত; তাহাতে ভারতবর্ষের অহিন্দুদের মন সাড়া দিবে কেন? সকল ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবার মত কোনো স্বাজাত্যাদর্শ বঙ্কিম স্থাপন করিয়াছেন কি?'—কথাটি ধীর ভাবে বিচার করিবার মত।

প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম আসলে তাহার সভ্যতার বা সাধনার সেই জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তি উদ্ভাসিত দিকটি যাহার মুখ পরমার্থের দিকে, পরপারের দিকে, বা পরাবিদ্যার দিকে। বঙ্কিমের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একথা বিশেষরূপে সত্য। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের প্রথম ও শেষকথাই কাল্‌চার্, যাহা ritual ও সমস্ত অস্থায়ী স্থানিক ও কালিক conditions বা গুণকে অতিক্রম করিয়া ফুটে। বঙ্কিমের সেই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের ভৌগলিক বেষ্টনকে মানিয়াও ছাড়াইয়া যায়; উহা বৃহত্তর মানবতার (Greater Humanity) মহত্তর আদর্শ—সাম্প্রদায়িক স্বপ্ন নয়। অথচ, প্রত্যেক ধর্ম্মেরও তাই প্রত্যেক কাল্‌চারেরই, একটি ভৌগলিক সংস্থান চাই। বঙ্কিমের ধর্ম্মতত্ত্ব—যাহার শেষবাণী 'সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি'—ভারতবর্ষীয় মন ও ভারতবাসীর মানস লোককেই আশ্রয় করিতে চায়। যত না বিভিন্নতা মতবাদের দিক হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করুক, ভারতবাসীমাত্রেরই মনটি ভারতবর্ষীয়—ইহাই তাহার জাতীয়তার একমাত্র স্থির অবলম্বন।

কোনো Religion মূলত সেই মানবসমাজের Cutlure-এরই অংশ—এইটি মনে রাখা দরকার। হিব্রুর ধর্ম্ম জেরুশালেম্-এর কঠিন তপস্যার ফল। ইস্‌লাম আরবীয় মরুপ্রান্তরের উষ্ট্রচালকের মহান্ স্বপ্ন। খৃষ্টান্ ধর্ম্ম গ্রীক্ রোমক ধারায় স্নাত হিব্রুদ্রোহী ভক্তিবাদ। হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের শতযুগের আলোকাঘাতে বিকশিত তাহার চিত্ত-শতদল।—মত বদ্‌লানো সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু মন বদলানো দুর্ঘট। হিন্দুস্থানের অধিবাসী যে ধর্ম্মাবলম্বী হোন্ হিন্দুই থাকিবেন, হিন্দুত্বই তাঁহার ধর্ম্ম, হিন্দুস্থানের মনের যাহা সত্য সৃষ্টি তাহা তাঁহারও প্রাণের সত্য, আত্মার বাণী। ডীন্ ইঙ্গে 'The Church in the World' নামধেয় পুস্তকের প্রথমেই বিশপ হুকারের এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "There is not any man of the Church of England but the same man is also a member of the Commonwealth, nor any man a member of the Commonwealth which is not also a member of the Church of England." ভুলিলে চলিবেনা, ইংলণ্ডে 'এংগ্লিকান্ চর্চ্চের' বাহিরেও আরো চর্চ্চ আছে, এবং অধিকাংশ ইংরেজ চর্চ্চে যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না। তথাপি তাঁহারা সবাই মনোজগতে এংগ্লিকান্ চর্চ্চের লোক। ভারতবর্ষেও অহিন্দুর অভাব নাই। কিন্তু কাইরো, ও কনষ্টান্টিনোপোল হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত নানাস্থানের বিদেশীয়গণ ভারতবাসী মাত্রকেই যখন 'হিন্দু' বলে তখন তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহারা সেই পরম সত্যটিকেই স্বীকার করেন। বঙ্কিমও স্বাজাত্যাদর্শ স্থাপন করিতে যাইয়া মতের ঐক্য না খুঁজিয়া মনের ঐক্য খুঁজিয়াছেন। তাই, তাঁহার Neo-Hinduism সেই সর্ব্ব-ব্যাপ্ত Indianismই, তাঁহার নব্যহিন্দুত্ব সেই চিরন্তন ভারতবর্ষীয়ত্বই।

ভারতবর্ষের মনে ও জীবনে-গীতার স্থানটি খুঁজিয়া পাইলেই বোধ হয় বঙ্কিমের স্বাজত্যাদর্শ সম্পর্কে আমাদের আর কোনো সন্দেহ থাকিবে না।—গীতা ভারতবর্ষের শতদিক-ধাবিত বিবিধ পথের মাঝখানটিতে

এক চির-জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপের মত জ্বলিতেছে। ইহার ভিতরে সেই বাণীটি শুনিতে পাই যাহা আয়ত্ত করিতে না পারায় ভারতবর্ষের ইতিহাস ট্রেজিডি, এবং যাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মালিন্য মুছিয়া যাইবে—সেই জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির মহাসমন্বয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্ভবত দুইবার মাত্র এই সমন্বয় সফল হইয়াছিল—একবার মৌর্য্য সম্রাট্ 'দেবাণংপিয় পিয়দস্‌সির' 'ধর্ম্ম বিজয়ে,' আর একবার গুপ্ত সম্রাটদের নব জাগ্রত বীর্য্যে, বুদ্ধিতে ভক্তিতে;—সেই দিনকার রূপকলার গরিমাময় স্বপ্ন এই ধারণাই মনে আঁকিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, আর এ সামঞ্জস্য কোথাও প্রস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেই যে ইতিহাসের উষাকালে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড উপনিষদের কর্ম্মবিমুখ জ্ঞান ও ভক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহার পর হইতে কখনো বৌদ্ধ যুগের উষর জ্ঞান-তপস্যায়, কখনো মহাযানীর নব-জাগ্রত ভক্তি প্রতিক্রিয়ায়, কখনো বা আবার শঙ্করের 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের' কর্ম্মবিমুখ জ্ঞানযোগে, অথবা বহুদিনের তৃষ্ণার্ত্ত সোমপায়ী আর্য্য মনের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকাচারের বীভৎস gluttonyতে, কিম্বা এক ছন্দহারা জ্ঞান-কর্ম্ম-ত্যাগী ভক্তি-প্লাবনে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। গীতার প্রচারিত সমন্বয় ধর্ম্মের জাতীয় মূল্য (national significance) এই খানেই—ভারতাত্মা তাহার মধ্যে মূর্ত্ত, তাহার মধ্যেই আবার ভারতের জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার বোধনমন্ত্র।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সত্যটি এই যুগে প্রথম দেখিলেন সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিম।

ভারতবর্ষের সমস্ত সাধনা ও ইতিহাসকে দোহন করিয়া এই নব-যুগের ক্ষীরধারা দোগ্ধা বঙ্কিম তাঁহার ভোক্তা স্বদেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিলেন।

(৫)

বঙ্কিমের উপন্যাস সমস্ত বাঙালীর চিত্তকে বন্দী করিয়াছে; বঙ্কিমের ধর্ম্মতত্ত্ব তাহার মনকে ছুঁইতেও পারে নাই। রসলোক চিরদিনই তত্ত্বলোকের উপরে। তাহা ছাড়াও কারণের অভাব নাই। তাঁহার স্বাজাত্য-বোধের উপর জন-মনের বিশেষত পলিটিসিয়ান্ মনের সন্দেহ আছে, দেখিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার ধ্যানলব্ধ স্বদেশাত্মার মূর্ত্তিটিকে সযত্নে মনন করিবেন, তাঁহারা অবশ্য এ সন্দেহকে প্রশ্রয় দিবেন না। কিন্তু মনন-শক্তি পালিটিসয়ান্ মনের ধর্ম্ম নয়। আবার চোখের উপর দেখিতেছি যে, ধর্ম্মের আওতায় পড়িয়া ভারতবর্ষের স্বাজাত্যবোধ শুষ্ক ও খিন্ন হইয়া উঠিতেছে। তাই, ধর্ম্মকে 'স্বদেশীর' আর বিশ্বাস করা চলে না। অবশ্য, বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম্ম এই religionও নয়, religiosityও নয়। কিন্তু মানুষের মন লৌকিক ধর্ম্মের কাছেই বন্দী, তাত্ত্বিক ধর্ম্মে সাড়া দেয় না। তাই, বঙ্কিমের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' তত্ত্ব রহিয়া গেছে, ধর্ম্মরূপে গৃহীত হয় নাই।

বঙ্কিমের 'ধর্ম্মতত্ত্বের' এই ত্রুটি বরাবরই দেখা গিয়াছিল। মানুষের ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা এক জিনিস, তাহার ধর্ম্ম-পিপাসা আর এক জিনিষ। একটি বুদ্ধির তত্ত্ব-সন্ধান, আর একটি হৃদয়ের সত্য-বন্ধন। তাহা ছাড়া, বাস্তব জীবনে মানুষ সকাম কর্ম্মের এমনি দাস যে, তাহার মুক্তিপিপাসা নিষ্কাম ধর্ম্মের নামে মিটিতে চাহে না, একেবারে কর্ম্ম-বিনাশে 'নিষ্কর্ম্মা' হইয়া দেহ মন ঢালিয়া 'আরাম' করিতে চায়। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' তাহাদের তৃপ্তি দেয় না। বরং বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ ও নব-বৈষ্ণব ধর্ম্ম কতকাংশে কাহারো কাহারো হৃদয়ে প্রবেশ-পথ পাইয়াছে; এবং শক্তিস্বরূপা মাতৃমূর্ত্তি অনেকের 'বাহুতে শক্তি' ও 'হৃদয়ে ভক্তি' জাগাইয়া তুলিয়াছে। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুইটি জিনিষই কম বেশী গোঁজামিল। কাল্‌চারের মূর্ত্ত বিগ্রহ ভারতবর্ষ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে বিদেশীয় খৃষ্টের নিকট পরাজয় মানিতে হয়;—এই প্রয়োজনেই বঙ্কিমের অভিনব 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র'-সৃষ্টি। শক্তি মুক্তির মাতৃ-মূর্ত্তিতে রূপান্তর সাধন ও যুক্তিবাদী মনের নিকট এইরূপই গোঁজামিল মাত্র। তথাপি, জনমন ইহাতে ন্যূনাধিক তৃপ্ত হইয়াছে। কারণ, 'অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ' এই বাণী যতই সত্য হোক্, যতই সান্ত্বনার হোক্, আত্মা তাহাতে নিবৃত্ত হয় না, সে আরো কিছু চায়।

'স্বদেশীর' উদ্বোধনে যেদিন বঙ্কিম 'ঋষিত্ব' পাইলেন,

সাহিত্যে, কর্ম্মজীবনে, নব-চেতনা জাগিল, ভাবিলাম বুঝি বাঙলা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইল, বাঙলা 'সন্তানের' বাঙলা হইল। বাঙলার জীবনে আজ কত গর্জ্জমান, ক্রন্দনমান, অর্থহীন আবিলতা, কত ঔদ্ধত্যের ঢক্কা-নিনাদ, কত বিক্ষোভ! 'সন্তানের' সেই সংযত সাহস কই? সেই মৌন সাধনা কই? বাঙলা কি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, না আত্মঘাতী হইতেছে?

তবু, যদি কোনো শুভ মুহূর্ত্তে স্বদেশ আপনাকে ফিরিয়া পায়, তবে সেই দিন তার শতদ্বার প্রাসাদের চত্বরের পর চত্বর পার হইয়া অন্তরের মণিকোঠায় গিয়া পৌছিলে দেখিব—সেই আনন্দ মঠের চিরনিভৃত মন্দিরে—দণ্ডবৎ প্রণত মূর্ত্তি—দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ,—স্থির, অচঞ্চল, গভীর ধ্যানমগ্ন,—সত্যানন্দ নয়—ঋষি বঙ্কিম! ধ্যানধীর কণ্ঠে মৌন মন্দিরের স্তব্ধতা কাঁপাইয়া উচ্চারিত হইতেছে, 'বন্দে মাতরং'। সম্মুখে,—'মা যা হইবেন!

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন কারখানায় মজুরিবৃদ্ধির আরজি লইয়া মজুরদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিল। একদল বলিল, কড়া ভাষায় লিখিয়া জানান হোক্ যে প্রার্থনা মঞ্জুর না করিলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে। অন্যদল বাধা দিয়া বলিল, ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা যখন নাই তখন শুধু ভয় প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়া কোনমতে যুক্তি-সঙ্গত নহে। উত্তরে প্রথমদল কহিল, সম্ভাবনা নাই কেন? যদি প্রয়োজন হয় কাজ বন্ধ করিতে হইবে। প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দল কহিল, সকলে সে কথা শুনিবে কেন? অনেকে কাজে আসিবে, যাহারা আসিবে না তাহাদের চাকুরি যাইবে। উত্তেজিত হইয়া প্রথম পক্ষ বলিল, যে আসিবে আমরা তাহার মাথা ভাঙিয়া দিব। বিপক্ষেরা বিদ্রূপ করিল, ঈস্ মগের মুল্লুক কি না! তাহারা তোমাদের মাথা ভাঙিতে পারে না?

আপিসে প্রকাশের কাছে আসিয়া রামটহল জানাইল, তাহাদের মধ্যে বিষম গোল বাধিয়াছে।

প্রকাশ বসিয়া কি ভাবিতেছিল মুখ তুলিল না।

রামটহল কহিল,—এখন কোন ব্যবস্থা না করিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

তথাপি প্রকাশ নীরব রহিল। রামটহল পুনরায় মিনতি করিয়া একবার তাহার সঙ্গে কুলিদের কাছে যাইতে বলিলে, সে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, কেন আমায় যখন তখন এসে দিক্ করিস্ বলত? যোড়হাত করিয়া রামটহল, তোদের বুদ্ধিতে যা আসে তাই কর— আমায় জ্বালাতন করিস্ না। চিরদিন আর এমন ক'রে পরের ভাবনা ব'যে বেড়াতে পারি না।

প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। পরের কাজে কিসের জন্য সে আত্মনিয়োগ করিবে? সে যে নিজেই ভাবনার অতল সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। নিজের ভাবনা ভুলিয়া আজীবন সে কেবল পরকে লইয়া মাতিয়া থাকিবে, এমন নিষ্ঠুর লিপি ভাগ্য-বিধাতা তাহার ললাটে লিখিয়া দিল কাহার বিচারে? আজ সারাটিক্ষণ অনিমার শোক-সন্তপ্ত মূর্ত্তি তাহার মনের ভিতর আনাগোনা করিতেছিল। সকালবেলা নিপুণ শিল্পীর তুলি দিয়া একটি করুণ প্রতিচ্ছবি অক্ষিপটে আঁকা হইয়া গিয়াছিল, এখন সে তাহা কোনমতে অপসৃত করিতে পারিল না। কোন উপায়ে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে সে শক্তি তাহার নাই। তবে কিসের জন্য সে এই অপরিচিত পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ক্লিষ্ট হইতেছে? সে বিস্মিত হইল এই ভাবিয়া

সে, নিতান্ত অযাচিতভাবে সে ইহাদের চিন্তার বোঝাগুলি একে একে আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার নিজের দূরদৃষ্ট লাঠি হাতে উদ্যত হইয়া উঠিল—নিজের উপায় সে কি করিয়াছে? আপন দুষ্ট ক্ষত মুক্ত রাখিয়া কোন্ নির্ব্বোধ এমন পরের চিকিৎসায় মন দিবে? যে দেয়, সে দিক্—সে পারিবে না।

সন্ধ্যা নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। রোজকার অভ্যাস মত প্রকাশ মজুরদের পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল, একজন মজুরও সেখানে নাই। তাহার মনে পড়িল, আপিসে সর্দ্দার রামটহলের প্রতি সে আজ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে। সেইজন্যই কি ইহারা আসে নাই? ধীরে ধীরে রামটহলের বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া সে ডাকিল রামটহল!

রামটহল বাহির হইয়া আসিল।

আজ তোরা সব ইকুলে আসিস্ নি কেনরে?

মুখভারী করিয়া রামটহল কহিল, আর বাবু ইস্কুল গরীবদের দুঃখের কথা যখন গিয়ে জানালুম, তখন আমল দিলেন না—হাঁকিয়ে দিলেন। এখন আর গরীবরা কোন্ ভরসায় আস্‌বে?

আলগোছে প্রকাশ রামটহলের কঠিন কর্কশ হাত-খানি মুষ্টিমধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল,—আমি যে তোদেরই মত গরীব, তোদেরই মত দুঃখী। তোদের কি আমি কখনো অশ্রদ্ধা করতে পারি? তাহ'লে যে আমার নিজেকেই অশ্রদ্ধা করা হ'বে, বলিতে বলিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

রামটহল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিঃস্বের প্রতি একজন ভদ্রবংশীয়ের সহানুভূতি এত গভীর হইতে পারে, সে তাহা কোনো দিন ভাবে নাই। সে গলিয়া গেল, আবেগভরা কণ্ঠে কহিল,—বাবু আমাদের গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে একটা উপায় করে দিন। আমরা চিরকাল আপনার কাছে বাঁধা থাক্‌বো।

প্রকাশ কহিল, চল রামটহল, আমি সব মিটমাট ক'রে দিচ্চি। তারপর আর্জ্জি লি'খে পেশ কর্‌বার ব্যবস্থা করা যাবে।

পরবর্ত্তী তিন চারদিন প্রকাশ মজুরদের লইয়া নানারূপ যুক্তি পরামর্শ করিল। দিন রাত ইহাদের লইয়া থাকিত এবং কিরূপে ইহাদের সঙ্গত দাবীগুলি গ্রাহ্য হইতে পারে তাহার পন্থা উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এ কয়দিন সে আর অমরনাথের বাড়ী গেল না।

বাবু! বাবু!

প্রকাশ আপিস যাইতেছিল ফিরিয়া দেখিল, চৌকিদার কিষণ। কাঁধে একটা ঝুড়ি, ঝুড়িতে ফল মূল। কিষণ বাজার হইতে ফিরিতেছিল।

বাবু কি এইখানে থাকেন?

হাঁ। বাড়ীর খবর কি? সকলে ভাল আছেন ত?

কিষণ কহিল, যে বিপদ—ভাল আর কেমন ক'রে থাক্‌বেন বলুন। বড়দিদি আপনার খোঁজ কর্‌ছিলেন। কিন্তু আপনার বাড়ী জানা ছিল না, তাই খবর দিতে পারিনি।

অকস্মাৎ একটা হর্ষের উচ্ছ্বাস প্রকাশের চোখে-মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, তুমি ব'লো কিষণ কাজ ছিল, তাই যেতে পারিনি। আজ বিকালবেলা আপিস থেকে ফিরে দেখা ক'রে আস্‌বো।

কিষণ চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে বৈঠকখানা ঘরে মেজের উপর বসিয়া করুণা হিসাবের কাগজগুলি দেখিতেছিল। এ কাজ বরাবর তাহাকেই করিতে হইত। সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গোমস্তা দুটি একটি বিষয় বুঝাইয়া দিতেছিল। বারান্দায় অশোক কি একটা বায়না ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। অনিমা তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া হাতে পুতুল দিয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট সাধ্য-সাধনা করিতেছিল, এমন সময় প্রকাশ ঘরে ঢুকিল।

সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া গোমস্তার দিকে ফিরিয়া করুণা কহিল,—তা দেখুন, স্বরূপ সিংএর কাছে পাওনা টাকাটা যেমন ক'রে হোক্ আদায় কর্‌বেন। এ সময় টাকা না পেলে চল্‌বে না, সে কথা তাকে বুঝিয়ে বল্‌বেন।

যে আজ্ঞে। আমি এখনি তার কাছে চল্লুম।

তেওয়ারি, বেহারী লাল আরো যার যার কাছে টাকা পাওনা আছে তাদেরও একবার তাগাদ

করবেন। মনে রাখ্‌বেন, কিছু কিছু টাকা আদায় চাই।।

যে আজ্ঞে, বলিয়া নমস্কার করিয়া গোমস্তা বিদায় হইল।

প্রকাশের দিকে ফিরিয়া করুণা কহিল, কি মুস্কিলে পড়া গেছে! টাকাকড়ি যাদের কাছে পাওনা আছে, সময় বুঝে তারা সব এখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। আমরা মেয়ে মানুষ কি উপায় যে কর্‌বো কিছু ভেবে পাচ্চি না।

প্রকাশ বিনীতভাবে জানাইল, তাহার দ্বারা যদি কিছু উপকার হয়, সে তাহা করিতে প্রস্তুত আছে।

করুণা বলিল,—আপনি ত আমাদের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন, আর কত কর্‌বেন? তা ছাড়া, আপনার ত নিজের কাজও ঢের আছে। কিষণের কাছে শুন্‌লাম, আপনি না কি এ কয়দিন কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন।

প্রকাশ কহিল,—হাঁ, মজুরদের একটা হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছিলাম বটে,—বলিয়া ভিতরে বারান্দার দিকে চাহিতে দেখিল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অণিমা তাহারই পানে চাহিয়া আছে।

উৎসাহ সহকারে, বোধ করি তাহাকে শুনাইবার জন্যই কথাগুলির উপর জোর দিয়া সে বলিয়া গেল,—হাঙ্গামা এমন বিশেষ কিছুই নয়। ধর্ম্মঘট কর্‌বে কি না, তাই নিয়ে এদের ভিতর একটা দলাদলি বেধে গিয়েছিল। মাঝে প'ড়ে, অনেক ক'রে গোলমালটা মিটিয়ে দিয়েচি।

অণিমা ধীরে ধীরে আসিয়া দিদির কাছে দাঁড়াইয়াছিল। কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কেন তারা ধর্ম্মঘট কর্‌তে চায়?

প্রকাশ কহিল,—তাদের মজুরী কম। যা পায় তাতে তাদের পোষায় না। তারা বলে, সকলে একসঙ্গে মিলে কাজ ছেড়ে দিলে কোম্পানি জব্দ হবে। তা হ'লেই তাদের মজুরি বাড়িয়ে দেবে।

অণিমা আবার প্রশ্ন করিল, তাদের কম মজুরি দেয় কেন? কোম্পানীর কি লাভ হয় না?

প্রকাশ হাসিয়া উঠিল, বিলক্ষণ! লাভ হয় না আবার! লাভ না হ'লে অংশীদারদের শতকরা পঞ্চাশ টাকা, ষাট টাকা, কখনো কখনো একশ' টাকা লভ্যাংশ দেয় কোত্থেকে? আসল কথা, শ্রমিকদের পরিশ্রমের টাকা শ্রমিকদের ঠকিয়ে বেশীর ভাগই এঁরা নিতে চান। শ্রমিকেরা বোঝে না, কেন না, তারা নিরক্ষর। সেই-জন্যই ত আমি একটা ইস্কুল বসিয়েচি, এরা যাতে একটু লেখাপড়া শিখে বিষয়টা ভাল রকম বুঝতে পারে।

হর্ষ ও বিস্ময় যুগপৎ অণিমার মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল করিয়া দিল।

আপনি ইস্কুল খুলেচেন?

লজ্জিতভাবে প্রকাশ কহিল, হাঁ একটা 'নাইট' ইস্কুল। রাত্রে মজুরদের পড়ান হয়। তা সে এমনি ইস্কুল, দেখলে কেউ না হেসে থাক্‌তে পার্‌বে না।

কেন?

বস্তির ভিতর একটা ঘর—কাঁচা মেজে—তার উপর চাটাই বিছান, এই ত পাঠশালা। সারি সারি ছাত্র ব'সে গেছে—তারা সাত আট বছরের শিশু নয়, কেউ পঁচিশ, কেউ পঞ্চাশ, সত্তর আশীও যে দু চার জন না আছে, এমন কথা বল্‌তে পারি না। সকলের মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি গোঁফ—কারু পাকা, কারু কাঁচা। আর তারা সব পড়চে কি না, অ আ ক খ!—বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই উদার যুবকটির প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় অণিমার মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে তাহা গোপন করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না—হর্ষ-সমুজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় আয়ত করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মত সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সেই প্রশংসমান অক্ষিযুগলের স্থির দৃষ্টি অনুভব করিতে করিতে সন্ধ্যার পর প্রকাশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার এই যে উদ্যম, এই যে সাধনা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা যেন অপূর্ব্ব সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। কে জানিত, শুধু ওইটুকু প্রশংসার জন্য তাহার ছন্নছাড়া জীবন এমনি কাঙাল হইয়া বসিয়াছে, যে, ঐ ঘন-কৃষ্ণ চোখ দুটির এতটুকু প্রশস্তি লাভ করিতে সে আজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে?

কেরোসিন কাঠের টেবিলের উপর বৈকালের ডাকে প্রাপ্ত একখানি পত্র পড়িয়া ছিল। এতক্ষণে তাহা প্রকাশের

চোখে পড়িল। প্রকাশ পত্রখানি তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একবার দেখিল, পত্র সুরবালার। চার মাস হইল সে এখানে আসিয়াছে, ইহার মধ্যে সুরবালাকে কোন পত্র লিখে নাই। দীর্ঘকাল পরে প্রবাসে স্ত্রীর এই প্রথম পত্রখানি পাইয়া খুলিয়া পড়িতে সে কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করিল না। কিছুক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া, শেষে পত্র খুলিয়া প্রকাশ চোখ বুলাইয়া গেল। সামান্য কয়েক ছত্র লেখা—অনেকদিন তাহার খবর পায় নাই, সে কেমন আছে, তাহার জন্য সে চিন্তিত রহিল, ইত্যাদি। বিরক্ত হইয়া প্রকাশ চিঠিখানি মুষ্টি করিয়া ফেলিল। কে চাহে এই অনাহূত পত্র?

নূতন উৎসাহে, পরিপূর্ণ উদ্যমের সহিত প্রকাশ করুণার কাজে লাগিয়া গেল। অপরিমিত পরিশ্রম এবং প্রচুর আগ্রহ-বলে প্রতি কর্ম্মে সে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। তাহার একাগ্র কর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া সত্যই করুণা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। একদিন কহিল,—আপনি বড় বেশি খাট্‌চেন এ কিন্তু আপনার বাড়াবাড়ি।

প্রকাশ কহিল,—আপনি কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না। আমার খাটুনির মেয়াদ বোধ করি ফুরিয়ে আসচে। যে ক'দিন এখানে আছি, আপনাদের কাজ নিয়ে আমায় প্রাণভ'রে খাট্‌তে দিন, এই আমার প্রার্থনা।

বিস্মিত হইয়া করুণা বলিল, ও কি বল্‌চেন? আপনি কি এখান ছেড়ে চ'লে যাচ্চেন না কি?

—তা কি জানি? তবে মনে হচ্চে, শিগ্‌গিরই আমার ভাগ্যচক্রের একটা বিবর্ত্তন ঘট্‌বে।

করুণা বুঝিতে পারিল না, কহিল, সে কি!

প্রকাশ কহিল, সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে এই বল্লেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জান্‌তে পেরেচেন যে এই কুলি-বিদ্রোহের মূলে আমি রয়েচি এবং এই ব'লে শাসালেন যে, আমি যদি এই ব্যাপারের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন না করি, তা হ'লে যাতে আমার এখানকার অন্নজল ঘুচে যায় তিনি সেই ব্যবস্থা করবেন। তা আমিও তাঁকে জানিয়েচি, ভবিষ্যতে অন্নজলের ব্যবস্থা তিনি যা খুসী করুন, কিন্তু আপাততঃ যদ্দিন এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির অভাব বোধ না করব তদ্দিন যেমন চলেচি তেম্‌নি চল্‌বো। শুনে সাহেবের কি তম্বি আর আস্ফালন! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অণিমার মুখমণ্ডল আঁধার হইয়া উঠিল—সে করুণার পাশেই বসিয়াছিল। কহিল, এদের কাজ ছেড়ে আপনি অন্য একটা কলে চাকরি নিন না কেন?

প্রকাশ হাসিয়া কহিল,—সহজ মীমাংসা; কিন্তু কথা হচ্চে, খাল কেটে কুমীর আন্‌তে রাজি হবে, এমন বেকুব কলওয়ালা এখানে আছে কি না সন্দেহ। আমায় তারা কেউ বড় প্রীতির চক্ষে দেখে না।

অণিমা আর কিছু বলিল না।

এদিকে কুলীমহলে আবার একটা হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল। তাহাদের আরজি না-মঞ্জুর হইয়াছিল।

দুপুরবেলা আপিসে রুদ্ধশ্বাসে রামটহল ছুটিয়া আসিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, বাবু বাবু! আসুন শিগ্‌গির একবার। সর্ব্বনাশ হ'ল।

কেন রে? কি হয়েছে আবার?

রামটহল কহিল, শিউনন্দন আরজিখানা নিয়ে ফের সাহেবের কাছে গিয়েছিল। সাহেব রেগে তাকে জুতোর ঠোক্কর মেরে তাড়িয়ে দিয়েচে। এখন বুঝি আর কুলীদের সাম্‌লে রাখা যায় না।

প্রকাশ লাফাইয়া উঠিল, বলিস্ কিরে, রামটহল! লাথি মেরেচে? এখন উপায়?

উপায় আর কি? ওরা একটা দাঙ্গা বাধিয়ে তুল্‌লো ব'লে। আমি ত কিছুতে ঠাণ্ডা কর্‌তে পার্‌লাম না। এখন আপনার চেষ্টায় যদি কিছু হয়।

প্রকাশ কলের দিকে ছুটিল। বাহিরে উচ্চকণ্ঠের কোলাহল স্পষ্টই শোনা যাইতেছিল। ভয়ঙ্কর উত্তেজিত ভাবে মজুরেরা ছুটাছুটি করিতেছিল। কাহারো হাতে লাঠি, কেহ বা কারখানার প্রাঙ্গণ হইতে লোহার ডাণ্ডা তুলিয়া লইয়াছে। অদূরে জনকতক মজুর ঝুড়ি ভরিয়া পাথর-টুকরা আনিয়া ফেলিতেছিল, সেই টুকরাগুলি হাতে লইয়া লোকেরা ক্রমাগত কলঘরের দিকে ছুড়িতে লাগিল। কাচের জানালা-দরজাগুলি সব ভাঙিয়া চুরমার হইতেছিল। ভিতরে যে কয়েকজন তখনো

কল চালাইতেছিল, তাহারা কল বন্ধ করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। চারিদিকে গোলমাল বিশৃঙ্খলা।

প্রকাশ তাহাদের ভিতর গিয়া পড়িল, ওরে তোরা থাম্, থাম্। দোহাই তোদের। সব নষ্ট করিস্ নি, এখনো সময় আছে।

তখন সংহার-মূর্ত্তি দানব আসিয়া ইহাদের অন্তরে বাসা লইয়াছিল, প্রকাশের কথায় তাহারা কর্ণপাত করিল না।

—জান্ যায়—যাক্। তবু অপমানের প্রতিশোধ নেব। আপনি স'রে দাঁড়ান, বাবু, স'রে দাঁড়ান। আজ একদিনের জন্য আমাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দিন।

—ভাঙ্—ভাঙ্ কল উপড়ে ফেল।

—কোথা গেল শালারা, যারা কাজ কর্‌ছিল?

—মার—মার।

প্রকাশ যোড়হাত করিল,—ভাই, ও ভাই! তোরা একটু থাম্। আমি সাহেবের কাছে চল্লুম। যতক্ষণ ফিরে না আসি উপদ্রব করিস্ নি, বল কর্‌বি নি? আমি ব'লে দিচ্ছি, তোদের মজুরি বাড়বে। আমি বল্‌চি, সে এসে তোদের কাছে মাপ চাইবে।

কুলীরা একটু নরম হইয়াছিল। একজন কহিল,—তা যদি হয়, তা হ'লে আমরা কিছু কর্‌বো না। আমরা বাপু কাজ কর্‌তেই এসেচি, দাঙ্গা কর্‌তে ত আসি নি।

অপর মজুর বলিল, বাবু যাচ্ছেন বটে, কিন্তু কিছু যদি না হয় তবে জান কবুল—কলের একখানা চাকাও আস্ত রাখ্‌বো না।

প্রকাশ আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিল না—ছুটিয়া সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া সাহেব রুদ্র-মূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। গলা সপ্তমে চড়াইয়া বিকট চীৎকার করিয়া কহিলেন,—চেয়ে দেখ বাবু তোমার কীর্ত্তি! এইজন্যই কি তোমাকে এখানে আনা হয়েছিল?

অপরাধীর মত প্রকাশ মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিবে সে? এই দানব-প্রকৃতি উদ্ধত লোকগুলার কৃতকর্ম্মের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সে আজ কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? ইহাদের প্রতি কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত সে। তখন কে জানিত, প্রতিদিনকার ব্যবহার যাহাদের এত কোমল, যাহারা এমন দয়ার্দ্রচিত্ত, তাহারাই আবার ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে? ইহাদের স্বভাব সে আগাগোড়াই ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে।

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া সে কহিল,—সাহেব, আমি তাদের নিরস্ত ক'রে এসেচি। কোন হাঙ্গামা বাধ্‌বে না, আপনি যদি একটিবার বাহিরে দাঁড়িয়ে বলেন—

আমি কি বল্‌বো?

শুধু এইটুকু যে, আপনি দুঃখিত। আর আর মজুরি সম্বন্ধে বিবেচনা করা হ'বে।

ক্রোধে সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

Idiot! তুমি আমাকে অপমান কর্‌তে এসেচ? দূর হও!

প্রকাশ অধীর হইয়া কহিল, সাহেব, বিবেচনা ক'রে দেখুন। এ আগুন একবার জ্ব'লে উঠ্‌লে আর কিছুতে নিভ্‌বে না। বিষম অনর্থ ঘট্‌বে।

বাহিরে কোলাহল অকস্মাৎ দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পাথর বৃষ্টি। চারিদিকে ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। মজুরেরা দলে দলে কারখানা ও গুদাম-ঘর আক্রমণ করিতেছিল।

প্রকাশ চমকিয়া উঠিল। সাহেব তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—মিলিটারি পুলিসকে 'ফোন' করে-ছিলাম, তারা এসে পড়েচে। এখন আমাকে সদুপদেশ না দিয়ে, তোমার বন্ধুদের গিয়ে বাঁচাও।

—মিলিটারি পুলিশ! কি সর্ব্বনাশ! এখন ত আর ইহাদের কোন মতে নিরস্ত করা সম্ভব হইবে না, ইহারা যে প্রাণের মমতা হারাইয়াছে! উপায়? প্রকাশ দৌড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বন্দুক হাতে পুলিসের দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বারবার কুলীদের হুঁসিয়ার করিতেছিল। কুলীরা হটিল না, লাঠিভাঙা লইয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিল। পিছনের কুলীরা কলঘরের ভিতর ঢুকিয়া কল ভাঙিতে-

ছিল। আর একদল গুদাম ঘরে মালগুলি নষ্ট করিয়া প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল।

—ফের, ফের। দোহাই তোদের, ফিরে চল্।

উত্তেজিত মজুরদের ভিতর উন্মত্তের মত প্রকাশ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

—দুম্ দুম!—দেখিতে দেখিতে কয়েকজন লোক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেল।

প্রকাশ তখনো চেঁচাইতেছিল,—ওরে নির্ব্বোধ, ওরে গোঁয়ার! ওরে এমনি ক'রে কি তোরা আজ আত্মহত্যা করবি? বাড়ীতে যে তোদের স্ত্রী-পুত্র আছে! তাদের মুখ একটিবার চেয়ে দেখ্‌লি না? এখনো ফের্ বল্‌চি, তোরা এখনো ফের্।

আবার গুলি চলিল, দুম, দুম। চীৎকার করিয়া প্রকাশ ভূপতিত হইল। একটা গুলি তাহার স্কন্ধদেশ ফোর-ফার করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

১৫

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে প্রকাশ দেখিল, একটি ক্ষুদ্র কক্ষে লোহার খাটে একখানি কম্বলের উপর সে শুইয়া আছে। এ কোন্ স্থান? এখানে তাহাকে কে আনিল? সে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু স্কন্ধের ভিতর একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিতেই বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মনমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। স্মরণ হইল, গুলির আঘাতে সে আহত হইয়াছিল, তারপর আর কিছু মনে নাই। পাশের ঘরে একটা অস্ফুট গ্যাঁঙানির শব্দ শোনা গেল। এ কি হাঁসপাতাল? ত্রস্তদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সে একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল সেদিন অচৈতন্য অমরনাথকে লইয়া সে এইখানে আসিয়াছিল।

ডাক্তারবাবু পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন—সেই ডাক্তার যাহাকে সেদিন দেখিয়াছিল। প্রকাশ চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন কেমন আছেন?

প্রকাশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, যে, সে ভাল আছে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—আপনার জখম সামান্য। আশা করি, শিগ্‌গিরই সেরে উঠ্‌বেন। ওকি, যন্ত্রণা হচ্চে কি?

প্রকাশ কহিল—বিশেষ না।

—আপনার আত্মীয়দের খবর দেব কি?

—আমার আত্মীয়?

ডাক্তারবাবু কহিলেন, অমরবাবুর মেয়েরা—যারা সে-দিন এসেছিলেন।

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া প্রকাশ কহিল, তারা আমার কেউ নয়।

তাহার আত্মীয়! প্রকাশের সর্ব্বশরীর ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছিল। কে তাহার আত্মীয়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই। এই হাঁসপাতালের আর আর রোগীর মত সেও একান্ত নিরাশ্রয়, কেহ নাই যে, তাহার জন্য একবিন্দু অশ্রুমোচন করিবে। তাহার বক্ষ জুড়িয়া অভিমানসমুদ্র ক্ষুব্ধ-আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু কাহার উপর এই অভিমান, কেনই বা এই ক্ষোভ, তাহা সে কোন মতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

অপরিমিত রক্তক্ষয়ে প্রকাশের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মুদ্রিত চক্ষুর্দ্বয়ের উপর তন্দ্রার ঘোর ধীরে ধীরে চাপিয়া বসিল। সায়াহ্নের উতলা শীতল বাতাস থাকিয়া থাকিয়া ঘরের ভিতর ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল। কোথাও সাড়াশব্দ নাই—শুধু নিকটস্থ গাছের ডালে বসিয়া পাখীগুলা বিষম কিচিমিচি জুড়িয়া দিয়াছিল।

কাহার পদশব্দ কানে যাইবামাত্র প্রকাশ চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, ধীরে ধীরে করুণা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে প্রকাশ ডাকিল—দিদি, দিদি!

এই যে এসেচি, ভাই। শয্যাপ্রান্তে বসিয়া করুণা সযত্নে প্রকাশের হাতখানি মুষ্টিমধ্যে তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ ভাই?

প্রকাশের চোখ দিয়া অবিরল জল ঝরিতেছিল।

অস্ফুট ক্ষীণকণ্ঠে সে কহিল—কেন তুমি এখানে এলে, দিদি ?

—না এসে কি থাকৃতে পারি, ভাই ? আমি সব শুনেচি। কেন তুমি গুলির মুখে ওদের থামাতে গিয়েছিলে ভাই ? কেন তুমি জেনে-শুনে এমন বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লে ? আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্রকাশের মনের ভিতর আনন্দের হিল্লোল বহিতেছিল। সে নীরবে সেই সুকোমল হস্তের স্পর্শ পরম তৃপ্তির সহিত অনুভব করিতে লাগিল।

অতি-সন্তর্পণে ঘরের একটি কোণে নিতান্ত জড়সড়ভাবে সুরধুনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রকাশ বলিয়া উঠিল,—আপনিও যে এসেচেন দেখচি। বুড়ো মানুষ—কেন কষ্ট করলেন ?

মুখ ভারি করিয়া সুরধুনী কহিল—দেখ ত বাবা করুণার আক্কেল। অণিমা আসতে পারলে না, আমায় ধরে টানাটানি, দিদি মা, তোমায় যেতে হবে। তা অনিমা ঠিকই করেচে। এই জাত-বেজাতের মাঝে কি কখনো আসতে আছে ? ভর সাঁঝে এখনি গিয়ে আবার চান করতে হবে। কি অনাছিষ্টি বল ত ? তুমি, বাবা, কিছুতে এখানে থেকো না। বলে, এখানে সুস্থ মানুষ এলেও ম'রে যায়। সে দিনই না আমার অমর, অমন সুস্থ মানুষ, ব্যামো নেই, কিছু নেই—এখানে এসেই ম'রে গেল, বলিতে বলিতে তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই শোকোচ্ছ্বাস অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি তখনি আবার চোখ মুছিয়া বলিলেন, থেকো না বাবা, এখানে থেকো না। বাড়ী থেকে কাউকে আনিয়ে নিয়ে বাসায় ব'সে চিকিৎসা ক'র।

বিষণ্ণমুখে প্রকাশ কহিল, কে আসবে বলুন ? আমার যে আপনার জন কেউ নেই।

—ও মা, তা হ'লে তুমি বে থা' এখনো কর নি ?

—না।

ফস্ করিয়া কথাটা প্রকাশের মুখ দিয়া কখন্ যে বাহির হইয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারে নাই, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে যখন বুঝিল, তখন তাহার মনে হইল, কে যেন একখণ্ড তপ্ত লৌহশলাকা দিয়া তাহার বুকের ভিতর ছেঁকা দিয়া দিতেছে। সে বিবাহিত, এতদিন এ কথা কাহাকেও বলে নাই, কেন না, কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। কিন্তু আজ এমন জলন্ত মিথ্যা কথা সে কেমন করিয়া উচ্চারণ করিল ? তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিল—তুই মিথ্যাবাদী, তুই ভণ্ড। তাহার মাথার ভিতর আগুন ছুটিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল দেহের সমস্ত শক্তি জড় করিয়া সে লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। রক্তের ঝলকে তাহার ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়া গেল।

ভয়ে করুণার মুখমণ্ডল সাদা হইয়া গেল, ওকি—ওকি, ভাই !

প্রকাশ হাঁপাইতেছিল।

—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, শিগ্‌গির আসুন—করুণা দৌড়িয়া দরজার দিকে গেল। সেখানে কিষণকে দেখিয়া কহিল—যা যা, শিগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন।

ডাক্তারবাবু পাশের ঘরে ছিলেন, গোল শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিলেন। প্রকাশকে তদবস্থ দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, কি হয়েছে ? আপনি উঠে বসেচেন যে ? তাই ত এত রক্ত বেরুচ্চে! শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। না না, কথা বলতে চেষ্টা করবেন না—তা হ'লে রক্ত থামবে না।

দুই হাতে আলগোছে ধরিয়া করুণা তাহাকে শোয়াইয়া দিল। একজন কম্পাউণ্ডার ডাকিয়া ডাক্তারবাবু নূতন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সাজ-সরঞ্জাম আনিতে বলিয়া দিলেন।

যতক্ষণ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইতেছিল, প্রকাশ নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না। একটা বিপরীত ভাবতরঙ্গের প্রতিঘাতে বিষয়টি আবার সে নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিল। কেন সে ইহাদের কাছে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে ? ইহারা তাহার কে ? সত্যমিথ্যার মূল্য যে সম্পর্কিত তাহার কাছেই থাকিবে—নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির তাহাতে কি আসে যায় ? কি জন্য সে তবে ইহাদের ঘৃণাদৃষ্টি স্বেচ্ছায়

আহ্বান করিয়া লইবে ? হোক মিথ্যা, হোক অসত্য ! এই অসত্যের সহিত যাহা-কিছু সম্বন্ধ, সে শুধু তাহারই —আর কাহারো স্বার্থ ইহাতে বিন্দুমাত্র জড়িত নাই।

প্রকাশের কাছে বিদায় লইয়া করুণা বাহিরে আসিল। ডাক্তারবাবু তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। করুণা জিজ্ঞাসা করিল, একে কি এখন বাড়ী নিতে পারা যাবে, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু কহিলেন, এখন নয়। তবে আশা করা যায় দিন-দুয়ের ভিতর স্থানান্তরিত করা যাবে।

তাহারা বাড়ী পৌছিবামাত্র অণিমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রকাশবাবু কেমন আছেন, দিদি ? জখম কি সাংঘাতিক ? তাঁর কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

উপর্য্যুপরি তিনটি প্রশ্ন বর্ষিত হইতে দেখিয়া করুণা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে কহিল, ভয় নেই অণু, যখম তেমন গুরুতর নয়। ডাক্তার বল্‌লেন, দিন-দুই পরে তাঁকে এখানে আনা যাবে।

বিস্মিত হইয়া অণিমা কহিল, এখানে নিয়ে আস্‌বে ?

করুণা বলিল, হাঁ, অণু। হাঁসপাতালে থাকৃতে বেচারীর বড় কষ্ট হবে। সংসারে তার কেউ নেই।

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অণিমা একখানি চৌকি-উপর এলাইয়া পড়িল। প্রতিমুহূর্ত্তে সে অনুভব করিতেছিল কোনো অপরিচিত পথে অগ্রসর হইয়া অসংখ্য জটিলতার মধ্যে সে জীবনের খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। জীবন বুঝি আর তেমন সরল নাই ! তাহার মনে সবচেয়ে বেশী আঘাত করিল এই যে, আপনাকে বুঝিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তাহার লুপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এ কিসের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সে ভূতের মতন ঘুরিয়া মরিতেছে ! সেই চিরপরিচিত পুরাতন পৃথিবী। কিন্তু তাহার মনে হইল, চারিদিকের সমস্ত পদার্থই অকস্মাৎ যেন রং বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে ! কোথায় হইয়াছে এই বিষম বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত ?

চরিত্র-সৌন্দর্য্যের সাধিকা—আজীবন মানুষের চরিত্র যেমন তাহাকে মুগ্ধ করিত, এমন আর কিছুই করে নাই। প্রকাশের পরার্থপরতা, মজুরদের শিক্ষাদান, তাহাদের লইয়া সংঘগঠন, পরিশেষে পিতার মৃত্যুর পর এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারটির সাহায্যকল্পে তাহার একাগ্র কর্ম্মনিষ্ঠা—সব মিলিয়া অণিমার মন-রাজ্যে শীতল বৃক্ষচ্ছায়ার মত শ্রদ্ধা ও প্রশস্তির অধিকার ধীরে ধীরে বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। তাই আজ অপরাহ্নে যখন কিষণ আসিয়া জানাইল যে, কুলীদের দাঙ্গা হইতে নিরস্ত করিতে গিয়া প্রকাশ গুলির আঘাতে আহত হইয়াছে, এবং তাহার অচৈতন্য দেহ পুলিসের লোকেরা এইমাত্র হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে, তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিতে লাগিল। করুণার দুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে সে কহিল,—দিদি, প্রকাশবাবুকে একবার দেখে এস গে।

করুণা কহিল,—চল যাচ্ছি।

—না দিদি, আমি যেতে পার্‌বো না। তুমি যাও, —বলিয়া অণিমা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পলাইল।

সন্ধ্যাবেলা একলাটি বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া সারাক্ষণ সে নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। যাহাকে চিনিত না, জানিত না—তাহার জন্য এই ভয়-ভাবনা নিজের কাছেই বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। এমন উচ্ছৃঙ্খল মনোভাব লইয়া কোন্ সাহসে সে প্রকাশের সম্মুখীন হইবে ?

দুই দিন তাহার কি ভাবে কাটিল, তাহা অন্তর্যামী জানেন। এই দুই দিন ভাবিয়া ভাবিয়া সে একটি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে সেবা করিবে—সেবাই যে নারীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। মিথ্যা সঙ্কোচের খাতিরে এই কর্ত্তব্যটি সে কি অস্বীকার করিবে ? তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয় সরম-সঙ্কোচের জালগুলি নিমেষ মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। এত নির্ব্বোধ সে—সত্যকে গোপন করিয়া শুধু একটা লোক-দেখান মিথ্যার উপাসনা করিতেছে, নিজের অনুভূতিগুলি পদদলিত করিয়া কে কি ভাবিবে এই চিন্তাই সে মূলমন্ত্র করিয়াছে ! কিন্তু এই অনুভূতিগুলিই তাহার একান্ত আপন, সর্ব্বস্ব—অপরের কথা লইয়া বৃথা সে ভাবিয়া মরিতেছে। যাহার যাহা খুসী ভাবুক, কালই প্রকাশকে বাড়ী আনিয়া সে তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইবে। সেইদিন সে প্রকাশের জন্য একটি শয়নকক্ষ চেয়ার টেবিল দিয়া সাজাইল, পালঙ্কে

বিছানা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল এবং যাহাতে এই রুগ্ন অতিথির কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সেইমত ব্যবস্থা করিল।

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া অণিমা ডাকিল,—দিদি, আজ প্রকাশবাবুকে আন্‌তে হবে মনে আছে?

—আছে বৈ কি, অনু।

—বাঃ—আন্‌বে কখন্? এখনো যে শুয়ে রয়েচ?

—একটু বেলা হোক।

—তুমিও যেমন! গাড়ী ডাক্‌তেই যে বেলা আট-টা হ'য়ে যাবে।

করুণা উঠিয়া বসিল। হাসিয়া কহিল,—বাজ্‌বে না রে, বাজ্‌বে না। গাড়ী এখনি আস্‌বে। তুইও যাবি না কি?

—হাঁ দিদি, আমিও যাব।

দুই দিন পর আজ প্রকাশ উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া বসিয়া ছিল, করুণার সহিত অণিমাকে আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পুলকিত স্বরে করুণাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আবার কেন কষ্ট ক'রে এলেন? আমি এখন সেরে উঠ্‌চি।

করুণা কহিল,—আমরা তোমায় নিয়ে যেতে এসেচি, ভাই।

—কোথা, দিদি?

—আমাদের বাড়ী। সেইখানে থেকে তোমার চিকিৎসা চল্‌বে।

হঠাৎ প্রকাশ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল,—আমার ত সেখানে যাওয়া হ'তে পারে না, দিদি।

—কেন?

—আমি নিরাশ্রয়। নিরাশ্রয়ের মতই আমাকে থাক্‌তে দাও।

তাহার কথার সুরে একটু বেদনা জড়িত ছিল, বোধ করি করুণা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার চোখদুটি আর্দ্র হইয়া আসিল। ঈষৎ আবেগের সহিত কোমল স্বরে সে কহিল,—কে বলে তুমি নিরাশ্রয়? আমি যে তোমার দিদি! দিদি থাক্‌তে ছোটভাই নিরাশ্রয় হবে, তাও কি হয়? চল ভাই, বাড়ী চল।

প্রকাশ ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর অণিমার পানে দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিল, একটু দূরে সরিয়া ডাগর চোখ দুটি তাহারি মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া যেন তাহারি উত্তরের প্রতীক্ষায় একান্ত উৎসুকভাবে সে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকাশ আর দ্বিরুক্তি করিল না, দুই হাতে জানালা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—চলুন।

বাড়ী পৌছিয়া নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে অণিমা প্রকাশকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঔষধের শিশিগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া, একবাটি গরম দুধ আনিয়া কহিল,—এটুকু খেয়ে ফেলুন।

প্রকাশ পান করিল। কিছুক্ষণ পর রুটি সেঁকিয়া, মাছের ঝোল রাঁধিয়া থালা হাতে অণিমা ঘরে ঢুকিল। টিপয়ের উপর থালা রাখিয়া কহিল,—পথ্যি এনেচি। আপনি উঠে বসুন।

প্রকাশ উঠিয়া বসিল। তাহার ডান হাতের উপরিভাগ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে কহিল,—একখানা চামচে চাই যে। ডান হাত দিয়ে ত খেতে পার্‌বো না।

অণিমা হাসিল,—চাম্‌চে দিয়ে কি করবেন? রুটি ত আর চাম্‌চে দিয়ে খাওয়া চল্‌বে না।

অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ কহিল,—রুটি চল্‌বে না, কিন্তু ঝোল ত চল্‌বে। এক কাজ করুন, আমায় দুটি-খানি ভাত এনে দিন না কেন?

—বেশ ত আপনি? ডাক্তার বলেচে রুটি খেতে আর আপনি খাবেন ভাত? সে হবে না,—বলিয়া অনিমা একখানি রুটি ছিঁড়িয়া ঝোলে ভিজাইল।

ও কি কর্‌চেন?

—আপনাকে খাইয়ে দেব। একটু এগিয়ে এসে বসুন ত।

নিবিড় বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া প্রকাশ অণিমার পানে চাহিয়া রহিল। সংশয়-ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—আপনি খাইয়ে দেবেন?

অণিমা হাসিল,—বাধা কি?

অণিমা রুটির টুকরাগুলি প্রকাশের মুখে তুলিয়া দিল। আর প্রকাশ? তাহার মনে হইতেছিল, কোন দুর্দ্দান্ত অসুর তাহার হৃদপিণ্ড লইয়া বিষম

লুফালুফি আরম্ভ করিয়াছে। অণিমার চম্পক-অঙ্গুলি সুঘ্রাণ সুরার মত তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। তপ্ত ওষ্ঠাধর দিয়া পরম আগ্রহে সেই পুষ্প-পরাগের মসৃণতা সে উপভোগ করিতে লাগিল। অতীত ভাসিয়া গেল, ভবিষ্যৎ মনে জাগিল না—শুধু বর্ত্তমানের অশান্ত জলধিবক্ষে উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে বিভোর হইয়া সে দোল খাইতে লাগিল।

বসন্ত মলয়ের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসের মত এমনি করিয়া দিনগুলি আসিতে যাইতে লাগিল। কোথায় তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে, কি যায় আসে? জুয়ারির মত অনিশ্চিত খেলায় মত্ত থাকিয়া প্রকাশ এক রোমাঞ্চকর হর্ষ অনুভব করিতে লাগিল। তাহার রুগ্ন অবসন্ন দেহ ক্রমশঃ কর্ম্ম-বিমুখ হইয়া পড়িতেছিল, কাজে ফিরিবার কল্পনাও তাহার কাছে বিভীষিকার মত বোধ হইত। বাহিরে লোকজনের সহিত অবাধ মেলা-মেশা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার জীবন এখন বদ্ধ দুষ্ট বাতাসের মত একান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। সারা বিশ্ব এই গৃহখানির একটি নিভৃত কক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, আর সেই নূতন জগতের বাসিন্দা হইল, দুইজন—অণিমা আর সে। কি সুন্দর, অলস মন্থর এই জীবন। হোক সে রুগ্ন, হোক সে অকর্ম্মণ্য—এমন রুগ্ন অকর্ম্মণ্য বলিয়াই না সে আজ অণিমার সুকুমার হস্তের সেবাগুলি সম্ভোগ করিতে পারিল।

অণিমার নিঃসঙ্কোচ যত্ন, অক্লান্ত শুশ্রূষা দেখিয়া করুণা সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। একদিন একান্তে অণিমাকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া কহিল,—অণু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌বো?

—কি দিদি?

—সত্যি বল্‌বি?

—তোমার কাছে কখনো কিছু গোপন করেচি, দিদি?

—তুই কি প্রকাশকে—, বাকি কথাটি তাহার মুখেই রহিয়া গেল, কিন্তু চোখের ভিতর দিয়া মনের প্রশ্নটুকু স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নারীসুলভ লজ্জায় অণিমার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পরক্ষণে একটি সহজ সরল হাস্যে করুণাকে চমৎকৃত করিয়া সে বলিল,—ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কর্‌চ, দিদি? কি জানি—ও কথা কখনো ভেবে দেখিনি। তবে আমার মনে হয়, ভালবাসাটাকে নাটক-নভেলের মধ্যে আটক রাখাই ভাল। সত্যিকার জীবনের ভিতর এমন আচম্‌কা টেনে আনা উচিত নয়।

করুণা কহিল,—কিন্তু অণু, মেয়ে-মানুষ ওই ভালবাসাটুকুর জন্যই যে বেঁচে আছে। ওটুকু বাদ দিলে তার মূল্য কাণাকড়িও নয়। পুরুষ হরেক-রকম কাজের ভিতর তার জীবন সার্থক করে' তোলে, আর মেয়ে-মানুষের জীবনই হচ্চে ভালবাসা।

একটু চিন্তা করিয়া অণিমা কহিল,—হয়ত তাই। কিন্তু এইটেই আমি কিছুতে বুঝ্‌তে পারি না দিদি যে, ভালবাসা পুরুষের জীবনে যদি অংশ মাত্র হয়, তবে নারীর জীবনে তা' সবখানি হ'বে কেন?

বসন্তের শীতল বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রকাশ ঘরের ভিতর উঠিয়া আসিয়া বসিল। তাহার রোগমুক্ত দেহ দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, কিন্তু একথা তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই স্বপ্নাবিষ্ট দিনগুলির মায়ামরীচিকা কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে একদিন তাহাকে দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। কেন সে এত শীঘ্র সুস্থ সবল হইয়া উঠিল? এই স্বাস্থ্য লাভের জন্য সে যদি আজ ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতে না পারে, তবে হে অন্তরবাসী জাগ্রতপুরুষ, তুমি সাক্ষী, সে দোষ তাহার নহে।

—দিদি, দিদি—এইবার আমার ছুটি।

—কিসের ছুটি ভাই?

—আমার কাজে জবাব হয়েচে, এই দেখ চিঠি। হিসাব চুকিয়ে মাইনে যা কিছু পাওনা হয়েচে তাই নিয়ে যেতে লিখেচে,—বলিয়া প্রকাশ হাত বাড়াইয়া একখানা চিঠি ধরিল। আপিস হইতে চিঠিখানি সে এইমাত্র পাইয়াছে।

করুণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রকাশ কহিল,—দিদি, আমি কালই কলকাতা রওনা হ'ব ঠিক করেচি।

করুণা ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কহিল,—যাব বল্‌লেই ত যাওয়া হয় না, প্রকাশ। তুমি যে এখন আমাদের কতখানি আপনার মানুষ, সে কথা একবার ভেবে দেখো।

প্রকাশ কহিল,—কিন্তু, দিদি, চাকরি গেছে—আমার ত এখন এখানে থাকা হ'তে পারে না। যেতে যখন হবেই তখন দেরী ক'রে লাভ কি?

আমায় বিদায় দাও।........

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা করুণা আসিয়া কহিল,—কিছুদিন ধ'রে আমি একটা কথা ভাবচি, প্রকাশ। আমার বড় ইচ্ছা যে, অনিমাকে তুমি বিয়ে কর।

প্রকাশ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ কথার জবাব কি দিবে সে? এ আবার কোন্ নূতন সমস্যা? তাহার জীবন সৃষ্টি হইয়াছিল কি সমস্যার পর সমস্যা সমাধা করিতে? সে ভাবিয়া দেখিল, কাহার দোষ দিবে, সবই তাহার নিজের সৃষ্টি—সে স্বখাত সলিলে ডুবিতেছিল! অলক্ষ্যে অগোচরে সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। না বুঝিয়া আপনার চারিধারে সে যে প্রতারণার জাল বুনিয়াছে, এখন সাধ্য কি তাহা কাটিয়া বাহির হয়? তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল।

করুণা কহিল,—আজ হঠাৎ প্রস্তাবটি কর্‌তাম না। মনে করেছিলাম তুমি সেরে উঠ্‌লে একদিন একথা জানাব।

সে যে এখনো ঘরের ভিতর আছে, প্রকাশ তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। কণ্ঠস্বরে চমকিয়া ফিরিয়া তাহার পানে অগ্রসর হইয়া সে কহিল,—দিদি, আমায় একটু ভাবতে দাও। আজকের দিনের মত সময় দাও।

করুণা উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ফিরিয়া কহিল,—এ কথাও ভেবে দেখো, প্রকাশ, যে, তোমার মত একজন সহায় আমাদের দরকার। আর অণিমার কথা কি বল্‌বো ভাই, তুমি যে আমার চেয়েও তাকে বেশী চেন। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইজি চেয়ারে শুইয়া প্রকাশ আপন মনে ভাবিতে লাগিল। অতীতের কথা স্মরণ করিয়া সে আজ সত্য সত্যই অবাক হইয়া গেল। সেই আশা-উৎসাহহীন দিনগুলির তমসাচ্ছন্ন অন্ধকূপে এতকাল সে কিরূপে অবস্থান করিয়াছিল? এত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সংযম, তিতিক্ষা কোথায় পাইল সে? আজ তাহার অবসাদগ্রস্ত কর্ম্মবিরত মন সেই দিনগুলিকে স্মরণ করিবামাত্র শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যে নিশ্চিন্ত তৃপ্ত আনন্দের ভিতর বিগত কয়টা দিন সে যাপন করিয়াছে, তাহার তুলনায় সারা জীবন কি একটা পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর ব্যর্থ আর্ত্তনাদ নহে? তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, সবই আছে—সে শুধু এই বিচিত্র জগতের অপরূপ উপভোগ সুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া সন্ন্যাসীর অস্বাভাবিক সাধনায় মগ্ন হইয়াছিল। জীবন লক্ষ্যহারা, কর্ম্ম উদ্দেশ্যবিহীন—একটা উগ্র উত্তেজনার মধ্যে শান্তির সন্ধানে সে নিরবধি ঘুরিয়া মরিয়াছে। কিন্তু কোথায় শান্তি? সে কি তাহা পাইয়াছে? না, বিন্দু-মাত্রও পায় নাই। প্রবৃত্তির স্বভাব-ধর্ম্মগুলিকে দলিত করিয়া সে কেবল ধ্বংসোন্মাদ রাক্ষসের বিকট তাণ্ডব জুড়িয়াছিল। আজ শ্রান্তির পরম অবসরক্ষণে তাহার শরীর মন একটা স্নিগ্ধ অলস কর্ম্মহীন জীবনের সুশীতল ছায়াতলে বিশ্রাম লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বহুদিন পর আজ তাহার মনে সুরবালার কথা জাগিল। পর্য্যালোচনা করিয়া সে দেখিল, পত্নীকে সে কোনো দিন ভালবাসে নাই, শুধু বাহিরে যত্ন আদর শুশ্রূষা করিয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। সুরবালাকে সে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, লোকসমাজে একটা মহৎ আচরণের সুযোগ পাইয়া তাহার আত্মাভিমানী অন্তর কেবল মাত্র ইহাকেই কৃতার্থ করিতে চাহিয়াছিল। এই প্রেম-সম্পর্কশূন্য বিবাহের ফল সে ত হাতে-হাতেই পাইয়াছে। বিধাতার অভিশম্পাতের মত এই নারী তাহার সারা জীবন বিফল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু ভোগ-লিপ্সা ত যায় নাই, বরঞ্চ রহিয়া রহিয়া তাহার অন্তর তুষানলে দগ্ধ করিয়াছে। তাহার মনে পড়িল, একদিন সে সুরবালার হাতে বিষ তুলিয়া দিয়াছিল। এই স্মৃতিটা বরাবর তাহার মনে অনুশোচনার তুফান জাগাইয়া তুলিত। সে কোনো মতে ভাবিয়া পাইত না, কি প্রকারে

সে তাহার অসহায় রুগ্না স্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আজ এই সঙ্কল্পটা তাহার কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক, এমন কি প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। বিঘ্ন অন্তরায়ের মত যে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কে না তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবে? যে করিবে না, সে হয় কাপুরুষ নয় দেবতা। না না, সে দেবতা নয়, সে মানুষ। মানুষের রক্ত-মাংসে তাহার শরীর গঠিত—মানুষের লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা লইয়া তাহার আত্মার সৃষ্টি। সে দেবতা হইতে চাহে না, মানুষের মতই তাহাকে বাঁচিতে দাও।

আরও একদিন মনে পড়িল, যেদিন সে সুরবালাকে লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিল। সেইদিন সুরবালা যে কুৎসিত সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া বিরাজকে অভিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাই কি এই নারী-অন্তরের যথেষ্ট পরিচয় নহে? ইহার পর সে আর সুরবালার সহিত কথা কহে নাই, এখানে আসিয়া পত্র দিয়া সে তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই। এই তাহার স্ত্রী, আর সে কি না ইহারি জন্য সকল আশা আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া যতির সংযম শিরোধার্য্য করিয়াছে! বিরাজের রোষদৃপ্ত কণ্ঠের ভর্ৎসনা কেবলি এখন তাহার কানে বাজিতে লাগিল। এই তোদের স্বামী-ভক্তি! এতটুকু বিশ্বাস নাই, তবু এই ভক্তির এত বড়াই!—ঘৃণায় তাহার সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার চোখের সম্মুখ হইতে হঠাৎ যেন একটা চালিসা খসিয়া পড়িল—সে এই পরিপ্রেক্ষিত স্বামী-ভক্তির স্বরূপ বুঝিয়া লইল। কিসের স্বামীভক্তি? ও শুধু একটা চিনির আবরণে স্বার্থ গোপন করা বৈ আর কিছুই নয়। যে দিকে খুসী চাহিয়া দেখ, শুধু স্বার্থ! আপনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া ফিরিতেছে। যতক্ষণ তুমি, ততক্ষণই না জগৎ? তার-পর, রুদ্র প্রলয়ে এই শৃঙ্খলা-সুন্দর বিশ্ব ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়—যাক্। তোমার কি?—একটি গানের ছন্দ প্রকাশের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। বহুদিন পূর্ব্বে একজন বাউলের মুখে গানটি সে শুনিয়াছিল।

আমার স্বর্গ, আমার মুক্তি,
আমার অশ্রুমাখা ভক্তি,
ওরে—আমার ঠাকুর আমি ডাকি,
আমি আপন—সবাই পর।

বাগানে একটা গাছে সদ্য প্রস্ফুটিত জুঁই ফুলের সুবাস বাতাসময় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আকাশে খণ্ড চন্দ্রের একটু জ্যোৎস্না কালোর উপর সোনালি রং ঢালিয়া বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য আঁকিয়া তুলিতেছিল। কি ফুলের গন্ধ, কি সেই অস্পষ্ট ছায়ামণ্ডিত পৃথিবীর মসৃণ সৌন্দর্য্য ক্ষণেকের জন্য প্রকাশকে মুগ্ধ করিয়া দিল, সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। তারপর মন্ত্রাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া বাগানে একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। বসন্তের বাতাস ঝিরঝির করিয়া তখনো বহিতেছিল,—চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু মৃদু নম্র। উপরে দূরে দূরে কয়েকটা তারা ম্লান দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল। প্রকাশ চারিদিক চাহিয়া দেখিল, নীরব নিস্পন্দ—কোথাও এতটুকু কোলাহল নাই। বিশ্বযন্ত্রীর মিলন-সুরে বাঁধা এই মনোহর বিশ্বজগৎ, এখানে নিরানন্দের স্থান কোথায়? অতৃপ্তির বেদনা বক্ষে চাপিয়া অমঙ্গল বাঁশী কে বাজাইতে আসিয়াছে?

ওরে—আমার ঠাকুর আমি ডাকি,
আমি আপন—সবাই পর।

বেঞ্চের পিছনে কখন অণিমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রকাশ তাহা জানিল না। কণ্ঠস্বরে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল।

অণিমা বলিতেছিল—এখনো বাইরে ব'সে আছেন? রাত হয়েছে। আপনি এখন ঘরের ভিতর উঠে আসুন।

প্রকাশ নড়িল না। তাহার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল,—এদিকে এস, অণিমা, কথা আছে।

অণিমা বেঞ্চের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—আমি কালই কলকাতা ফিরে যেতে চাই। জান?

অনিমা মৃদুস্বরে কহিল,—হাঁ, দিদির কাছে শুনেচি।

প্রকাশ বলিল,—দিদির কাছে একথা শুনেচ বোধ করি যে, আমার যাওয়া না-যাওয়া তোমার উপর নির্ভর করে?

অণিমা কিছু বলিল না, নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

—এখন বল, আমি যাব, কি যাব না। কথাটা আমি তোমার মুখ দিয়ে শুনতে চাই, অণিমা।

অণিমার মুখের উপর খণ্ড চন্দ্রের একটু জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছিল, প্রকাশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর ঈষৎ আবেগের সহিত তাহার হাতখানি মুষ্টি-মধ্যে তুলিয়া লইয়া অসহিষ্ণুভাবে কহিল,—বল, অণিমা, বল—আমি যাব, কি যাব না?

অণিমার বক্ষে ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছিল। লজ্জানম্র দৃষ্টি ভূতলে নত করিয়া সঙ্কোচের সহিত অর্দ্ধ-স্ফুট কণ্ঠে সে কহিল, তুমি যেও না।

—তাই হবে, অণিমা। আমি যাব না।

প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্ফুট ছায়ালোকে অণিমার মুখের অস্ফুট রেখাগুলি হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে দেখিতে দেখিতে বাহু ধরিয়া সে তাহাকে চকিতে আপন বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল, এবং নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাহার কিসলয়-কোমল ওষ্ঠাধরে একটি আবেগপূর্ণ দীর্ঘ তপ্ত চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

অণিমা বাধা দিল না।

(ক্রমশঃ)

"মুরশিদা বা ভাবগান"

শ্রী হিরণ্ময় মুন্সী

আমাদের অঞ্চলের চাষী মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে মাঝে মাঝে "ফকিরি বৈঠক" বসিয়া থাকে। এই "ফকিরি বৈঠকে" নানা স্থানের, বিশেষ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদেশের, খ্যাত-নামা ফকির-সকল সমবেত হইয়া "ফকিরি-গান" গাহিয়া থাকে। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একখানি ক্ষুদ্র চাঁদোয়া খাটাইয়া, কেরাসিনের মৃদু আলোকে, অগণিত নিরক্ষর সরল-প্রাণ কৃষাণ শ্রোতার সমক্ষে এইসকল ফকিরগণের নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে নৃত্য-গীতে রাতের পর রাত কাটিয়া যায়।

কিছুদিন হইল আমার এইরূপ এক "ফকিরি-বৈঠকে" যোগদানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। একজন "মূল-গায়ন" গান গাহিতে থাকে, পিছনে "পাছ-দোয়ার" ধুয়া ধরিয়া "পাছ-দোয়ার"-কি করে। বাবরী চুল ও লম্বাদাড়ীওয়ালা "মূল-গায়নের হাতে" একটি একতারা বা গোপীযন্ত্র টুং টুং করিয়া বাজিতে আরম্ভ করে। "পাছ-দোয়ার"দের কাহারও হাতে খঞ্জনী, কাহারও হাতে খোল বা তবলা বাঁয়া। "মূল-গায়ন" একতারা বাজাইয়া ঢিলে আল্-খাল্লা ঝুলাইয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, নূপুর পায়ে নাচিতে ও গাহিতে থাকে।

এই গানকে "মুরশিদা বা ভাবগান" কহে। এই গানে প্রধানতঃ দুইটি পদ বা অংশ আছে। "গুরুপদ" "মুরশিদ" পদ ও "শিষ্যপদ" তাহা ছাড়া "উপর পদ" ও "নীচপদ" আছে। "উপর পদে" শুধু দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও অনুভূতির কথা। নীচের পদে সাধন ও ভজনতত্ত্ব। এই-সকল গানের অধিকাংশই লালন সা, কচিম্ কাওরা, আদিলদ্দি প্রভৃতি খ্যাতনামা ফকিরের রচিত।

নিম্নে কয়েকটি গান দিলাম; ভণিতায় রচয়িতার নাম পাইবেন।

(ক) গুরুপদ। ("নীচপদ")

(১)

গুরুকে ভজনা কর মন ভ্রান্ত হয়ো না……(ধুয়ো)
তুমি থাক রে মন সচেতনে, অচেতনে ঘুম যেওনা।
ব্যাধ যেমন পাখী ধরতে যায়
সদাই ঊর্দ্ধ পানে রয়,
পাখীর পানে আঁখি দিয়ে পলক না ঘুরায়;
তুমি নিরিখ রেখ পাখীর পানে নয়নে পলক ফেল না।
নারিকেলেতে জলেরই সঞ্চার
সদা দেখতে পরিষ্কার;
মধ্যে জলে পরিপূর্ণ বুঝে উঠা ভার;
ও তার গোপনে গোপীদের ধর্ম্ম, মর্ম্ম জানে রসিক জনা।

ছিদ্র কুম্ভে জল আনিতে যায়
ও তাতে জল কি মতে রয় ?
আস্‌তে যেতে পথ ফুরাল পিপাসায় প্রাণ যায় ;
ফকীর তাসের ব'লে আদেল্‌রে তোর গুরুর চরণ
ঠিক হ'ল না।

(২)

প্রেম কর রে ও আমার মন চিনিয়ে সুজন……(ধুয়ো)
তুমি হামেশা যার কাছে থাক, সেইত প্রেমের মহাজন।
প্রেম করবে সুজনের সাথে
চার যুগেতে ভাঙ্গবে না প্রেম রবে যতনে,
প্রেম করগে "আলাপুল্লা"র * অনুরাগে দিয়ে মন
প্রেম সহরে যাবি আমার মন,
তুই দেখ্‌তে পাবি প্রেমের মানুষ প্রেম-রসে মিলন ;
প্রেমে কালা রসে ভোলা, প্রেমায় দিবেন দরশন।
ফকির দিনু চাঁদের মুখেরই বচন
ও তুই শোন্ নইমদ্দি বলি তোরে প্রেম অমূল্য ধন ;
যে দেশে প্রেমরসিক আছে, সেই দেশে কর্ গমন।

(৩)।

প্রেমের মানুষ বিনে কে জানে ?
প্রেমে যে জন মত্ত হ'য়ে আছে গোপনে।
আর, প্রেমে আসে, প্রেমে বসে, প্রেমেতে চলে
মানুষ প্রেমেতে চলে,
প্রেমেরি আসা যাওয়া, প্রেমেরি লীলে;
সে প্রেমের এমনি ধারা
জানে ভেদ রসিক যারা,
সেই প্রেমে মজ্‌গে তোরা নিরজনে।
আর, প্রেমের হাটে যাবি যদি প্রেমের চাবী গড়্,
আগে প্রেমের চাবী গড়্,
প্রেমের তালা আন্ চিনে, প্রেমের কামার,
প্রেমের আগুনে পুড়ে,
দিবে তোর তালা সেরে,
চিনে নে সন্ধান জেনে, কল চিনে।
তালার কল চিনে,
আর, প্রেমের বাক্‌সের মধ্যে মানুষ আছে একজনা
মানুষ আছে একজনা।
কচিম কয় বড় জ্বালা,
কঠিন সেই তালা খোলা,
গুরু যার আছে সখা, তালা সেই খোলে।
মানুষ সেই ধরে।

(৪)

মধুর দিল্-দরিয়ায় ডুবিয়া কর ফকিরি
কর ফকিরি, ছাড় ফিকিরি।
খোদার তত্ত্ব বান্দার দিল্ যথায়
বলেছে কোরানে আপনি খোদ্ খোদায় ;
আজাজিনের * পর হ'ল খাতা তার
না বুঝে সেই গভীরি,
দিল্ দরিয়ার ডুবরি হয় যে
আল্‌খানার ভেদ জান্‌তে পারে সে,
থাকে আদম্ দ্বিরলে বিরাম লালন খোঁজে বাহিরি।
শুনি দেহের সাড়ে চোদ্দ ঘর
রাম, কাম তাহারই উপর
ও খোদার নিজপুরি সেই পুরি।

(৫)

আছে মানুষ মহল দ্বিদলে,
তারে দেখ্‌লে জীবের জ্ঞান হরে।
ও যার চিকন নজর হয়,
মানুষ সেইত দেখ্‌তে পায়,
মোটা নজর হ'লে মানুষ পলকে লুকায়
তুই ধরবি যদি "অধর মানুষ" বস্ রে যোগ সাধনে।
তারা তিনজনা নারী,
তারা পরমা সুন্দরী,
বিনা মাতায় জন্ম তাদের বেশ তামেশ গিরি ;
ওরে বিনা পিতায় জন্ম তাদের বিনা বীজ্ বিনা ফুলে।
ফকির আদিলদ্দি কয়
মানুষ হাওয়ার ভরে রয়,
পলকেতে ঢাকার খবর দিল্লি লয়ে যায় ;
সেই খবর আসে বিনা তারে বিনা কলে।

* এস্‌লাম মতে ভগবানের নিরানব্বই নামের একটি।

* ফেরেস্তা বিশেষ।

ঝুঁটা মোতি

শ্রী সীতা দেবী

দীর্ঘ বর্ষাকালের পর আজ প্রথম আকাশের নীলিমা দেখা দিয়াছে। এধার-ওধার দুই চারিটি মেঘের ভেলা এই নীল সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরও বর্ণ ভয়াবহ ধূসর নয়, বকের পালকের মত শাদা।

এমন দিনে ঘরে থাকিতে মন ওঠে না কাহারও। ব্রহ্মদেশের বর্ষা যে কি ভয়ানক জিনিষ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই বোঝে না, কাজেই তাহার অবসানটাও যে কতখানি আরাম দিতে পারে তাহাও ভাল করিয়া বোঝে তাহারাই। তাই রেঙ্গুন সহরে সেদিন ঘরে বসিয়া থাকিতে কাহারও মন উঠিতেছিল না।

বড় রাস্তার উপর দোতলার ঘরে বসিয়া দুইটি বাঙালী যুবক গল্প করিতেছিল। একটির বয়স বছর চব্বিশ, আর একটির কিছু বেশী।

অল্প-বয়স্ক যুবকটি বলিল, "কি হে, তোমার চা হ'তে আর দেরি কত? আমার আর ঘরে এক মিনিটও বস্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।"

অন্য যুবকটি বলিল, "আহা, অত ব্যস্ত হও কেন? সবুরে যে মেওয়া ফলে, তা তোমার জান্‌তে এখনও বাকি আছে, হে যতীন।"

যতীন বলিল, "তোমার মেওয়া তুমি খেয়ো এখন, আমার চা হ'লেই চল্‌বে। অক্টোবরটা একেবারে পার্‌ফেক্ট বেড়াবার সময় ব'লে ত আমায় খুব টেনে নিয়ে এলে, তার পর ঘর থেকে নড়্‌তে চাও না। কার্ত্তিক রায়ের কথা বিশ্বাস করাই আমার অন্যায় হয়েছিল।"

কার্ত্তিক বলিল, "আমি ত আর বিধাতা নই, বা মেটিরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের হেডও নই। সচরাচর অক্টোবরে বর্ষা চুকে যায়, সেই আন্দাজে বলেছি। তা অক্টোবর ত এখনও ফুরিয়ে যায়নি? তুমি এসেছ ত মোটে পাঁচ দিন।"

এমন সময় চা এবং লুচি মোহনভোগ আসিয়া পৌঁছিল। যতীন আর উত্তর না দিয়া খাওয়ায় মন দিল।

যতীন কলিকাতার এক ধনী ব্যক্তির ছেলে। এখন এই পরিচয় ভিন্ন তাহার আর অন্য কোনো পরিচয় নাই। সে যাঁহার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার সেই দরিদ্র জনক এখন পরলোকে। জননী বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু যতীন মা সম্বোধন করে এখন যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের পত্নী মহামায়াকে। যোগীন্দ্রনাথ বছর দশ বারো আগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাস্তায় বাহির হইয়া কার্ত্তিক বলিল, "কোন্ দিকে যাবে?"

যতীন বলিল, "সব দিকে। ঘুরে ঘুরে সহরটা দেখা যাক্।"

কার্ত্তিক বলিল, "তোমার বাবা যখন এখানে এসেছিলেন, সে আমলের বাঙালী বাসিন্দাও এখানে দু দশ ঘর এখনও আছেন। যদি দেখা কর্‌তে চাও ত নিয়ে যেতে পারি।"

যতীন বলিল, "আজ আর ঘরে ঢুক্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না। ও সব সামাজিক কর্ত্তব্য পালন কর্‌বার সময় ঢের পাব। আজ যতক্ষণ না ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ কর্‌বে, ততক্ষণ বাইরে ঘুরব।"

কার্ত্তিক বলিল, "এখানে ঘরের চেয়ে বাইরে খাবার পাওয়া যায় ভাল। আমার নোয়াখালী-নিবাসী ভৃত্যটিকে নলরাজা ব'লে ভুল করা যায় না তার ত পরিচয় পেয়েইছ। এখানে চীনা, জাপানী, বর্ম্মা মুসলমানী, হিন্দু বা ইংরেজী যেরকম খাবারই চাও, রাস্তায় পাবে। এক-একটা জায়গায় রীতিমত ভাল খাবার পাওয়া যায় হে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও বটে।"

যতীন বলিল, "না হে, বুড়ীকে কথা দিয়ে এসেছি। জাহাজে শুদ্ধ উইদাউট-ডায়েট্ টিকিট ক'রে, ভাণ্ডারীর রান্না অপূর্ব্ব খিঁচুড়ী এবং তরকারী খেতে খেতে এসেছি।"

বুড়ী অর্থাৎ যতীনের পালিকা মাতা মহামায়ার শুচিবায়ু ছিল অসাধারণ। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতেই, তাঁহার অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত, এখন বিধবা হওয়ার পর বৃদ্ধা আত্মীয়-স্বজনের কাছে একটা ভয়ের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

কার্ত্তিক বলিল, "আহা, তিনি ত আর তোমার পিছনে ডিটেক্‌টিভ্‌ লাগান নি? বেড়াতে এসে অত হিন্দু বিধবার মত আচারনিষ্ঠ হ'লে বেড়িয়ে সুখ কি?"

যতীন বলিল, "বিশ্বাস নেই, ভাই। ও সব আধপাগ্‌লা মানুষের কখন কি মর্‌জি হয় বলা যায় না। নিজের মা হ'লে কথা ছিল না, ধরা পড়্‌লেও দিন দুই গালাগালি দিয়ে চুপ ক'রে যেত। কিন্তু যত্তি ক'রে যাঁরা ছেলে কিন্‌তে পারেন, যত্তি ক'রে ছাড়াতেও তাঁরা পারেন। নিজের বাপ, মা, পৈত্রিক নাম শুদ্ধ যে টাকার লোভে ত্যাগ কর্‌লাম, সেই টাকাই শেষে হাত-ছাড়া হ'য়ে যাবে?"

কার্ত্তিক বলিল, "অত ভয় পাও ত কাজ নেই। তবে কি না কেউ টেরও পেত না, কিছুই না। তোমার মা কি তোমায় খুব বেশী সন্দেহ করেন?"

যতীন বলিল, "খুব না হ'লেও খানিক খানিক করেন বটে। কল্‌কাতায় ত সব সময়ই আমার পিছনে লোক থাক্‌ত তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। এতদুর অবশ্য তাঁর চরেরা ধাওয়া করেছে কি না জানি না।"

কার্ত্তিক বলিল, "মাথায় থাক্‌ বড় মানুষ হওয়া। আমি হ'লে কবে লেজ তুলে পালাতাম তার ঠিকানা নেই। এ যে "সেলিং ইয়র বার্থরাইট ফর এ মেস্‌ অব পটেজ।"

যতীন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "এক রকম তাইই বটে। তবে ভাই, টাকা জিনিষটার নেশা বড় ভয়ানক। একবার এতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে, আর ছাড়া যায় না। তার জন্যে নিজের মনুষ্যত্ব বিক্রী কর্‌তেও রাজী হ'তে হয়।"

গল্প করিতে করিতে তাহারা অনেক রাস্তা পার হইয়া গেল। অনেকগুলি বাড়ীতে আলোকমালা স্তরে স্তরে জ্বলিয়া উঠিল। ফুটপাথের উপর রেশমী লুঙ্গি পরা সুসজ্জিত ব্রহ্মদেশীয় ছেলে মেয়ে আর মলিন ছিন্নবেশধারী ভারতীয় শিশুর দল মিলিয়া জায়গায় জায়গায় মহা কোলাহল সহকারে পট্‌কা ফুটাইতে এবং বাজী পোড়াইতে আরম্ভ করিল।

যতীন বলিল, "ব্যাপার কি হে?" কার্ত্তিক বলিল, "এটা এদের দীপান্বিতার উৎসব। কয়েক দিন ধ'রে খুব হৈ চৈ, আলো দেওয়া, বাজী পোড়ান, নাচ গান সব চল্‌বে। এদের সব-চেয়ে বড় পরব এটা। এদের নাচ দেখ্‌তে চাও ত কাল বড় প্যাগোডায় যাওয়া যাবে।"

যতীন বলিল, "আরে দুর! শুক্ল পক্ষে কেউ দীপান্বিতা করে? এ খ্যাঁদাগুলোর আক্কেল নেই। এ যেন তেলা মাথায় তেল ঢালা! অমাবস্যা না হ'লে আলো দিয়ে লাভ কি?"

কার্ত্তিক বলিল, "অত ভেবে দেখা ওরা দরকার মনে করেনি। বিষ্টির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ফুর্ত্তি কর্‌তে কর লেগে গেছে, মানায় না মানায় তার জন্যে মাথা ঘামায় নি।"

যতীন বলিল, "এক পেয়ালার জায়গায় দু পেয়ালা চা খেয়ে বেরলে পার্‌তাম। চার ধারে আলো আর হাওয়াই তুবড়ী দেখে দেখে বেজায় জল-তেষ্টা পেয়ে গেছে।"

কার্ত্তিক বলিল, "তুমি যে আবার বামুনের ঘরের বিধবা হে, তা না হ'লে তেষ্টা নিবারণের রয়্যাল রোড ত সাম্‌নেই রয়েছে। এ হোটেলটার দেশী মহলে সব-চেয়ে নাম-ডাক বেশী। এরা দিশী এবং বিলাতীর বেশ সুবিধা মতে সংমিশ্রণ। কাঁটা চামচ ঠিক মত না ধরলেও এখানে কেউ হাসে না। কিন্তু একজনের ব্যবহার-করা পেয়ালা বা গেলাস এরা নোংরা জলে ডুবিয়ে এনে আর একজনকে দেয় না। কাজেই যদি চা কি লেমনেড্‌ চাও ত এইখানে ঢুকি।"

যতীন হোটেলের ভিতরে তাকাইয়া দেখিল। বেশ লোভনীয়ই বোধ হইল। বেশী লোকের ভীড় নাই, অথচ একেবারে খালিও নয়। বলিল, "চল হে, এক বোতল লেমনেড্‌ খেয়েই আসা যাক্‌। যা রয় তাই সয়। এতেও যদি বুড়ীর আপত্তি হয় ত আমি নাচার। কলকাতায় চা-টা এধারে ওধারে খেয়েছি, তাতে বড় বেশী কিছু বলেনি। তবে একদিন রুটি কাবাব খেয়ে ধরা পড়েছিলাম, সেদিন কেবল মার দিতেই বাকি রেখেছিল।"

দুই বন্ধুতে ঢুকিয়া খোলা দরজার পাশে একটা টেব্‌ল্ লইয়া বসিল। খান্‌সামা আসিয়া অর্ডার লইয়া গেল, এবং অবিলম্বে কাঁচের গেলাসে বরফযুক্ত পানীয় আসিয়া পৌঁছিল।

আস্তে আস্তে লেম্‌নেডে চুমুক দিতে দিতে যতীন এধার ওধার তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। সাম্‌নের টেব্‌লে একটি বর্ম্মা পুরুষ এবং দুইটি সেই জাতীয়া রমণী। চুলের খোঁপা হইতে আরম্ভ করিয়া, মখমলের চটীজুতা পর্য্যন্ত তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার সবই যেন ঝল্‌মল্ করিতেছে। গায়ের জামা শুধু শাদা, পরণে একজনের কমলালেবু রঙের এবং অন্য জনের সোনালী রঙের লুঙ্গি। গলায়ও ঐ রঙেরই পাতলা ফ্রেঞ্চ রেশমের scarf জড়ান। হাতে হীরার আংটি, গলায় চুনীবসান হার, কানে চুণীর ফুল, এবং জামায় চুনীর বোতাম। একটি মেয়ের মুখ একেবারে ধবধব করিতেছে শাদা, অন্যটির রঙ কিছু গোলাপী। দুইটিই অতি সুশ্রী।

কার্ত্তিক বলিল, "অত হাঁ ক'রে কি দেখছ হে? শেষে বর্ম্মাটার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যাবে।"

যতীন বলিল, "এরা খুব বড় মানুষ হবে বোধ হয়?"

কার্ত্তিক বলিল, "কিছু বলা যায় না। পোষাক বা গহনা দেখে এদের অবস্থা ঠিক করা ভয়ানক ভুল। ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর স্ত্রী, এবং লক্ষপতির স্ত্রীর পোষাকের তুমি কোনই তফাৎ দেখ্‌তে পাবেনা। সাজ করাটা তাদের জাতের ধর্ম্ম, খেতে না পেলেও তারা রাণীর মত সেজে বেরবে। এদের পাশে আমাদের বড়ই গরীব দেখায়।"

যতীন বলিল, "এই পাশের মেয়েটি বেড়ে দেখ্‌তে। কে বল্‌বে যে বর্ম্মিনী। কেমন খাঁড়ার মত নাক দেখেছ?"

কার্ত্তিক বলিল, "দিশী রক্ত আছে খানিকটা, দেখ্‌ছ না মাথার উপর চুল না বেঁধে, মাথার পিছনে খোঁপা বেঁধেছে? এ জেরবাদী আর কি?"

যতীন বলিল, "সে আবার কি পদার্থ?"

কার্ত্তিক বলিল, "এই আধা মুসলমান আর আধা ব্রহ্মদেশী আর কি?"

লেমনেড্ পান করিতে বেশী সময় লাগে না, হাজার চেষ্টা করিলেও যতীনের তখনই উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, সে জিজ্ঞাসা করিল, "আর এক গেলাশ খাওয়া যাবে না কি হে?"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "দরকার হবে না, ওরাও উঠ্‌বার জোগাড় কর্‌ছে।"

বর্ম্মা পুরুষটি এবং একটি মহিলা বিল্ চুকাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। যে তরুণীটিকে লইয়া দুই বন্ধুতে গবেষণা হইতেছিল, সে আর এক পেয়ালা চা ফরমাশ দিয়া বসিয়া রহিল। কার্ত্তিক বলিল, "আচ্ছা, তুমি একটু বোস, একটা সিগারেট আর দেশলাই কিনে আমি আস্‌ছি। বেশী ডুবে যেওনা হে। বুড়ীকে ধ্যান কর, তাহ'লেই এদিকের আকর্ষণ কেটে যাবে। হোটেলে খেলে যাঁর আপত্তি হয়, হোটেলে ব'সে বিজাতীয়া মেয়ের সঙ্গে প্রেম কর্‌লে তাঁর আরোই আপত্তি হবে।"

যতীন অপ্রস্তুত মুখ করিয়া বসিয়া রহিল, কার্ত্তিক বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটির দ্বিতীয় চায়ের পেয়ালাটা বড় শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। খান্‌সামা বিল লইয়া আসিল, মেয়েটি সুদৃশ্য হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দিল। তাহার পর চেয়ার হইতে তাহার হাত-পাখা, একখানা ইংরাজী মাসিকপত্র এবং ব্রাউন কাগজে মোড়া কি একটা জিনিষ উঠাইয়া লইয়া যাইবার জোগাড় করিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে খান্‌সামাটা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে কি বলিল। তাহার হাতে সেই টাকাটা। মেয়েটি বিরক্তভাবে লোকটার দিকে তাকাইয়া, নিজের ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হাত্‌ড়াইতে লাগিল। তাহার পর বিপন্ন মুখ করিয়া লোকটাকে কি যেন বলিতে লাগিল। লোকটা দাড়ীযুক্ত মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল, এবং ফিরিয়া গিয়া হোটেলের একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া আনিল।

পুরুষের মনে যৌবনকালে রোমান্স করিবার প্রবৃত্তিটা থাকেই, যতই প্রচ্ছন্নভাবে হউক না কেন। যতীন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের ছেলে, এবং অতিশয় কঠোরচিত্তা মহিলার পোষ্যপুত্র। জীবনে কোনও দিন সে নিঃসম্পর্কীয়া

মেয়ের সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগও পায় নাই, এবং এদিকের সব প্রলোভন সে প্রাণপণে দমন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ সে সমস্তই সে ভুলিয়া গেল। মনে রহিল কেবল যে, একটি সুন্দরী তরুণী বিপদে পড়িয়াছে এবং সে কাছে আছে।

তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া সে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে মাপ করবেন, আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি?"

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে তাকাইল। তাহার পর বলিল, "আমাকে একটা টাকা যদি ধার দেন ত ভাল হয়। এই একটা টাকাই আমার সঙ্গে ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা অচল।" তাহার ইংরাজী বলিবার ভঙ্গী বেশ সপ্রতিভ এবং উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

যতীন একটা মাত্র টাকা দেওয়ার কথা শুনিয়া অল্প একটু দমিয়া গেল। খুব বিরাট গোছের একটা ব্যাপার করিতে পারিলে তখন তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসটার প্রতি সুবিচার হইত। যাহা হউক এটুকু সুযোগও হেলায় হারাইবার নয়। সে মনিব্যাগ হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া মেয়েটির হাতে দিল।

হোটেলের পাওনাদারদের বিদায় করিয়া দিয়া মেয়েটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। যতীনের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি আমার বড় উপকার করেছেন। কাল সন্ধ্যার সময় যদি অনুগ্রহ ক'রে আসেন এখানে, তাহ'লে আপনার টাকা ফিরিয়ে দেব। সুবিধা না হ'লে, আপনার ঠিকানা পেলে পাঠিয়েও দিতে পারি।"

যতীন ত হাতে চাঁদ পাইল। বলিল, "নিশ্চয় আসতে পারব। কাল সন্ধ্যা ছ'টায় আমি ঠিক আসব।"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বাঙালী?"

যতীন বলিল, "হ্যাঁ, আমার বাড়ী কলকাতায়।"

মেয়েটি একটু হাসিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। যতীন নিজের চেয়ারের কাছে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কার্ত্তিক ইতিপূর্ব্বেই ফিরিয়াছে, এবং দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া বসিয়া আছে।

যতীন তাহার দিকে চাহিবামাত্র বলিল, "কি হে, বেশ ত গুছিয়ে নিলে। কালকের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট শুদ্ধ হ'য়ে গেল? বড় হিংসা হচ্ছে, এত দিন এখানে আছি, কেউ কোনো দিন মুখ তুলেও চায়নি। আর তুমি আসতে না আসতেই—"

যতীন বাধা দিয়া বলিল, "কপাল জোর আর কি? চল এখন যাওয়া যাক।"

কার্ত্তিক উঠিয়া বলিল, "চল, কিন্তু বেশী এগিয়োনা হে। শেষে কোনো বিপদে প'ড়ে যাবে। এ জাতটিকে ত চেন না!"

যতীন বলিল, "তুমিও দেখছি বুড়ীরই মাসতুতো ভাই। একটি মেয়ের সঙ্গে দুটো কথা বললাম বলেই তার থেকে একেবারে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত আন্দাজ ক'রে নিলে?"

কার্ত্তিক বলিল, "বড় জিনিষের সূচনা ছোট জিনিষ দিয়েই হয়। যাক্ আমি বলে খালাস, এরপর নিজের মাথা সামলিও নিজে।"

যতীনের মনে তখন যে সুর বাজিতেছিল, তাহার সঙ্গে এ সব সতর্কতা এবং বিষয় বুদ্ধির কথা মোটেই খাপ খায় না। কাজেই সে কথা বদলাইয়া বলিল, "চল, আরো খানিক ইলুমিনেশন দেখা যাক, ঘুরে ঘুরে, তারপর বাড়ী ফেরা যাবে।"

পরদিন সকাল হইতে যতীনের মনটা ছটফট করিতে লাগিল। দিনটাকে কোনোক্রমে শেষ করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। কার্ত্তিক পাছে ঠাট্টা করে এই ভয়ে সে তাহাকে কিছু বলিতেও পারিতেছিল না, কিন্তু অস্থিরতা তাহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ঘড়ি দেখিয়া বা রাস্তায় পায়চারি করিয়া খবরের কাগজ খানা বার দশ পড়িয়াও তাহার সময় আর ফুরায় না।

কোনো রকমে দুপুরটা পার হইয়া গেল। তখন যতীনের আর এক ভাবনা হইল। কার্ত্তিক যদি তাহার সঙ্গে যাইতে চায়? অবশ্য মেয়েটির সঙ্গে তাহার কিছু গোপন কথাবার্ত্তা নিশ্চয়ই হইবে না, তবু কার্ত্তিকের রসিকতাপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে যতীনের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। কিন্তু এ কথা ত কার্ত্তিককে বলাও যায় না।

সৌভাগ্যক্রমে কার্ত্তিকই তাহাকে নিষ্কৃতি দিল।

বিকাল চারটা আন্দাজ সময়ে সে যতীনকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে দেখ, ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গেই যাব, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই সেটা পছন্দ করতে না। তবু আমার এখানে যখন রয়েছ তখন বিপদে আপদে না পড় সেটা আমায় দেখ্‌তে হয়। আমায় ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তলব করেছেন, অকস্মাৎ কেন জানি না, কাজেই তোমার line clear. কিন্তু খুব সাবধানে চোলো। গল্প-গাছা যা কর্‌তে চাও, ঐ খানে ব'সেই কোরো। বাড়ী-টাড়ি যেয়োনা যেন।"

কার্ত্তিকের হাত হইতে মুক্তি পাইবার আনন্দে যতীন সব কিছুই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। এবং বন্ধু বাহির হইবামাত্র সে বাথরুমে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া সাজ করিতে বসিয়া গেল। যদিও মেয়েটি নিশ্চয়ই ছয়টার আগে আসিবে না, তবু ঘরে আর যতীনের মন কিছুতেই টিকিল না। ট্রাঙ্ক খুলিয়া ঢাকাই ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, হীরার আংটি প্রভৃতি সব বাহির করিয়া লইল। নাগরা জুতাটা একটু পুরানো হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার দুঃখ হইল। কলিকাতায় সে দুজোড়া জরীর জুতা ফেলিয়া আসিয়াছে, সেখানে সেগুলা ছাই কি বা কাজে আসিবে? বুড়ী এ দিকে লোক ভাল, নিজের সাজ-গোজের জন্য যত খুসি টাকা খরচ কর, কখনও আপত্তি করে না। যতীন একটার বদলে দশ আঙ্গুলে দশটা হীরার আংটি পরিতে চাহিলেও তিনি আপত্তি করিতেন কি না সন্দেহ। টাকাকড়ির হিসাবও বৃদ্ধা বড় একটা রাখিতেন না। বৃদ্ধ সরকার ভূষণ যতীন সঙ্গত কারণ দেখাইলেই যত দরকার টাকা অগ্রসর করিয়া দিত।

সাজগোজ শেষ করিয়া যতীন গাড়া ডাকিয়া বাহির হইয়া গেল। মাঝের দেড় ঘণ্টা কি করিয়া এবং কোথায় যে কাটাইবে, সেই হইল এক ভাবনা। এ দোকান সে দোকান ঘুরিয়া, সবগুলি জাহাজ ঘাট পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে ছ'টা বাজিতে মিনিট পনেরো যখন বাকি, তখন সে আসিয়া হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল যে, মেয়েটি তখনও আসে নাই। শুধু শুধু ভিতরে না ঢুকিয়া সে গাড়ী বিদায় করিয়া দিয়া ফুটপাথে পায়চারি করিতে লাগিল। মেয়েটির উপর তাহার রাগ হইতেছিল। দু পাঁচ মিনিট আগে আসিলে এমন কি ক্ষতি হইত?

একটা গাড়ী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং একটি সুসজ্জিতা বাঙালী মেয়ে নামিয়া পড়িল। বাঙালী ভদ্র ঘরের মেয়ে হোটেলে অতি কমই দেখা যায়। কাজেই যতীন বেশ খানিক অবাক হইয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিবামাত্র তাহার বিস্ময়টা আরো সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল। কারণ মেয়েটি আর কেহই নয়, পূর্ব্বদিনের পরিচিতা তরুণী। কিন্তু আজ তাহার পরণে জরীর ফুল তোলা লাল ঢাকাই শাড়ী এবং সেই কাপড়েরই ব্লাউস্‌। মাথায় কাপড় নাই, চুলটা সাম্‌নে পাতা কাটিয়া পিছনে এলো খোঁপা বাঁধা।

গাড়োয়ানকে পয়সা চুকাইয়া দিয়া মেয়েটি দ্রুতপদে যতীনের নিকটে আসিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন না কি?"

যতীন বলিল, "না বেশীক্ষণ নয়। কিন্তু আপনি আজ এরকম পোষাক করেছেন কেন? আমি ত প্রথমে চিন্‌তেই পারিনি।"

একদিন নিতান্ত ঘটনাচক্রে যাহার সহিত আলাপ হইয়াছে, তাহাকে সচরাচর এ ধরণের প্রশ্ন কেহই করে না। কিন্তু একে ত ভদ্র মহিলাসমাজে মেলামেশায় যতীন একেবারেই অনভ্যস্ত, দ্বিতীয়তঃ বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিও বেশ খানিক ভোঁতা হইয়া আসিয়াছিল, কাজে কাজেই সে যে কিছু অসঙ্গত কথা বলিতেছে, তাহার তা মনেই হইল না।

যাহা হউক মেয়েটি কিছু বিরক্ত হইল না, হাসিয়া বলিল, "ভিতরে গিয়ে বসা যাক চলুন, সেখানেই আপনার কথার উত্তর দেব।"

দুজনে ভিতরে গিয়া বসিল। যতীন সামান্য কিছু খাবার ফরমাস দিল, যদিও খাইবার ইচ্ছা যতীনের অন্ততঃ বিন্দু-মাত্রও ছিল না। সে বসিয়া বলিল, "আপনার বাড়ী কি এখান থেকে অনেক দূরে?"

মেয়েটি বলিল, "না, তবে আমি এক দোকানে কাজ করি, সেখান থেকে ছুটি পেলে তবে বেরতে পারি। তারপর বাড়ী হ'য়ে এখানে এসেছি।"

যতীন আসল কথা পাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আপনি বাঙালী সেজেছেন কেন, তা ত বল্‌লেন না ?"

মেয়েটি বলিল, "আমি বাঙালী ব'লেই বাঙালী সেজেছি, এইটাই আমার নিজের পোষাক। তবে সুবিধার জন্যে এদেশী পোষাক পরি। আপনি আমার স্বজাতি ব'লে, আজ এরকম পোষাক প'রে এসেছি। আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

যতীন নিজের নাম বলিয়া বলিল, "তবে আপনি ইংরাজীতে কথা বল্‌ছেন কেন ? বাংলা কি জানেন না ?"

মেয়েটি বলিল, "না, বাংলা দেশ কখনও আমি চোখেও দেখিনি, বাঙালী কোন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই। আমার বাবা বাঙালা ছিলেন, এখানে বেড়াতে এসে আমার মাকে বিয়ে করেন। আমাকে এক বছরের রেখে তিনি দেশে ফিরে যান, সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা আপনাদের আর কোনো খোঁজ খবর নেননি ?"

যুবতী বলিল, "না, খোঁজ না নেওয়াই স্বাভাবিক। এদেশের মেয়ে বিয়ে করা ত বাঙালীরা পছন্দ করে না।"

যতীন সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনার নাম কি ?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "বাবা নাকি আমার নাম রেখেছিলেন মায়া, তবে সে নামে আমায় কেউ ডাকে না। এখানে আমার নাম মা সাকিনা।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় কাজ করেন ?"

মা সাকিনা বলিল, "কাছেই একজন জাপানী মেয়ের কাপড়ের দোকান আছে, সেখানে আমি কাজ করি।"

কথা-বার্ত্তা থামিতে দিবার ইচ্ছা যতীনের ছিল না। কারণ তাহা হইলেই মেয়েটি বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার দোকানের কাজ ভাল লাগে ?"

"ভাল কিছু লাগে না, তবে এর চেয়ে ভাল কাজ আমার পক্ষে পাওয়া শক্ত। আমি লেখা-পড়া বেশী ত শিখিনি ?"

যতীন বলিল, "কিন্তু ইংরাজী ত আপনি খুব ভাল বল্‌তে পারেন। আমি ত বি-এ, অবধি পড়েছি, কিন্তু আমার চেয়ে আপনি বলেন ভাল।"

মা সাকিনা হাসিয়া বলিল, "আমি মেমদের স্কুলে পড়্‌তাম কি না, তাই কথা বল্‌তে তাড়াতাড়ি পারি। আমার ইচ্ছা ছিল এখানের পড়াশুনা সেরে বিলাতে গিয়ে ট্রেনিং পড়বার, কিন্তু মায়ের সংসার চালাতে বড় কষ্ট হচ্ছিল, অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে, কাজেই আমি স্কুল ছেড়ে দিয়ে কাজে ঢুক্‌লাম।"

যতীন একটু অবাক হইয়া বলিল, "আপনার কি আরো ভাই বোন আছে ?"

মেয়েটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তবে ঠিক নিজের ভাই বোন নয়। বাংলা দেশে বিধবারা আর বিয়ে করে না, এদেশে তাতে কেউ দোষ দেখে না। আমার মা বাবা মারা যাবার পর একজন সুর্ত্তি মুসলমানকে বিয়ে করেন। তিনিই আমাকে পড়াচ্ছিলেন। বছর পাঁচ আগে তিনিও মারা গেছেন।"

যতীন বলিল, "এখানে ত বাঙালীর অভাব নেই, আপনারা কি কারো সঙ্গে মেশেন না ?"

মা সাকিনা বলিল, "না, মা পছন্দ করেন না। বাবা তাঁর সঙ্গে খুব ত ভাল ব্যবহার করেননি। একেবারে অসহায় ক'রে ফেলে যান। কাজেই ছোট বেলা থেকে তিনি আমার নিজের জাত সম্বন্ধে আমাকে খুব সতর্ক করতেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছা তাঁদের সঙ্গে মিশবার এবং বাংলা কথা শিখবার। কিন্তু এর আগে সুবিধা হয়নি। ইচ্ছা করলে ঢের লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পার্‌তাম, কিন্তু কে কেমন লোক তা বোঝা শক্ত ব'লে সাহস ক'রে এগোই নি।

যতীন লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, "তবে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌লেন যে ?"

মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর বলিল, "এ আলাপ ত ভগবান ঘটিয়ে দিয়েছেন। তার মানে আপনি ভাল লোক।"

যতীনের বুকের ভিতর যেন বীণা বাজিয়া

ভগবানই কি সত্য তাদের দুজনের আলাপ ঘটাইয়া দিয়াছেন ? কি তাঁর উদ্দেশ্য ?

হঠাৎ দেওয়ালের গায়ের ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। মেয়েটি সেইদিকে চাহিয়া বলিল, "তাইত, অনেক দেরি হ'য়ে গেল। আমায় এখন যেতে হবে।" হাতের ব্যাগ হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, "আসল কাজটাই এখনও করা হয় নি।"

টাকাটা লইতে যতীনের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি উপায়ে যে অস্বীকার করা যায় তাহা ভাবিয়া পাইল না। ঘড়িটার উপর তখন তাহার বিষম রাগ হইতেছিল। বাজিবার আর তাহার সময় হইল না।

মেয়েটি উঠিবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে আর কি আমার দেখা হবে না ?"

মা সাকিনা বলিল, "শক্ত বটে।"

যতীন ব্যগ্রভাবে বলিল, "কিন্তু আপনিই না বল্‌লেন, ভগবান আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছেন ? তা হ'লে সেটা এমন ক'রে ভেঙে দেওয়া কি উচিত ? আপনাদের বাড়ী কি আমি যেতে পারি না ?"

মেয়েটি বলিল, "মা হয়ত বিরক্ত হবেন। আচ্ছা, আপনি আর কত দিন আছেন ?"

যতীন বলিল, "তার কিছু ঠিক নেই। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। দিন দশ পনেরোর বেশী থাক্‌বার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দু মাস থাক্‌লেও কেউ আপত্তি কর্‌বার নেই।"

মা সাকিনা হ্যাণ্ড ব্যাগ হইতে একটা কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিল, একটা ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিল, "এই আমার দোকানের ঠিকানা। একটার সময় আমি আধ ঘণ্টা চা খাবার ছুটি পাই, আপনি যদি তখন আসেন ত কোথাও এক সঙ্গে গিয়ে চা খেতে পারি।"

যতীন ত হাতে স্বর্গ পাইল। বলিল, "আমি নিশ্চয়ই আস্‌ব। আপনি ভুলে বেরিয়ে যাবেন না ত ?"

মেয়েটি বলিল, "না, নিজে যখন আপনাকে আস্‌তে বল্‌ছি, তখন ভুল্‌ব কেন ? আচ্ছা, আপনার ঠিকানাটা আমায় দিন, যদি কোনো কারণে আমার অসুবিধা হয়, আমি চিঠি লিখে জানাব।"

যতীন ঠিকানা লিখিয়া দিল। অভুক্ত খাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া, দুই বন্ধুতে উঠিয়া পড়িল এবং বিল চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গাড়ী ডাকিয়া মা সাকিনা তাহাতে চড়িয়া বসিল। বলিল, "এই পোষাক প'রে আমার খোলা রিক্‌শতে যেতে লজ্জা করে, তা না হ'লে গাড়ী আমি চড়ি না সচরাচর।"

গাড়ীটা চোখের বাহিরে চলিয়া যাইতেই যতীনের মনে হইল রাস্তাটা অনেকখানি যেন অন্ধকার হইয়া গেল। বুকের ভিতরটাও কেমন যেন ফাঁকা বোধ হইতেছে। এ তাহার হইল কি ? ইংরাজী নাটক নভেলে ইহাকেই কি প্রথম দর্শনে প্রণয় বলে ? জিনিষটা যদি সত্যই সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই রকম মেয়ের সঙ্গেই সম্ভব। কি অপূর্ব্ব সুন্দরী ! শাড়ী পরিয়া সত্যই তাহাকে যেন ইন্দ্রাণীর মত দেখাইতেছিল। আর কি মিষ্ট কথাবার্ত্তা, কেমন সপ্রতিভ অথচ বিন্দুমাত্রও বেহায়ামী বা ন্যাকামী নাই।

কিন্তু রেঙ্গুনের রাস্তাটা ঠিক প্রেয়সীর ধ্যান করিবার পক্ষে আদর্শ জায়গা নয়। আরোহী পাইবার আশায় প্রথমে তাহার সম্মুখে গোটা দুই তিন রিক্‌শ আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর একখানা গাড়ীও আসিয়া হাঁক দিল। ইহার পর তাহার চারিধারে ছোটখাট ভীড় জমিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া যতীন তাড়াতাড়ি একটা রিক্‌শতে চড়িয়া বসিয়া বাড়ী যাত্রা করিল।

কার্ত্তিক তখন পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরে নাই। সাজসজ্জা ছাড়িয়া ফেলিয়া, খাটের উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া, যতীন কল্পনাকে লাগাম ছাড়িয়া দিল। হাতের চুরুটটাতে শুদ্ধ টান দিতে ভুলিয়া গেল, এমনি তাহার ভাবনা তাহাকে পাইয়া বসিল। কাল তাহার সহিত সত্যই কি আবার দেখা হইবে ? কি বলিবে সে ? মা সাকিনাও কি যতীনের প্রতি একটুও আকৃষ্ট হইয়াছে ? দুর ছাই এ বিদেশী নামে উহাকে একেবারেই মানায় না। যতীন তাহাকে মায়া বলিয়াই ডাকিবে। আচ্ছা, কাল যদি সে মেয়েটির জন্য কিছু উপহার লইয়া যায়, তাহা হইলে সে কি কিছু মনে করিবে ?"

কার্ত্তিক সশব্দে কাশিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার চিন্তাজাল

ছিন্ন করিয়া দিল। ছড়ি রাখিয়া পাঞ্জাবী খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ ফিরেছ হে?"

অর্দ্ধ দগ্ধ চুরুটটাকে আবার ধরাইয়া যতীন বলিল, "বহুকাল।"

"তারপর কি রকম গল্প-স্বল্প হল?"

কার্ত্তিকের কাছে ব্যাপারটাকে অতঃপর গোপন করিয়া চলাই যতীন স্থির করিয়াছিল। কার্ত্তিকের প্রশ্নের উত্তর বলিল, "কি আবার গল্প হবে? টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।"

কার্ত্তিক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বালল, "তাই না কি? সেরেফ চ'লে গেল? ঠিকানা-টিকানা কিছু দিয়ে যায়নি?"

যতীন খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া চুরুটে খুব জোরে একটা টান দিয়া, সেটা জান্‌লা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "কি তোমার মতলবখানা বল দেখি? হোয়াট আর ইউ ড্রাইভিং অ্যাট?"

কার্ত্তিক তাহার বিরক্তি দেখিয়া একটু দমিয়া গেল। বলিল "আরে অত চট কেন? এমন একটা রোমান্স গ'ড়ে তুল্‌ছিলে, আমাদেরও ত একটু ইণ্টারেষ্ট্ লাগে?"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। কার্ত্তিক অন্য কথা পাড়িয়া বসিল।

পরদিন কার্ত্তিককে এড়াইবার জন্য তাহাকে কোনো কষ্ট পাইতে হইল না। কার্ত্তিকের ছুটি ফুরাইয়াছিল। সে সাড়ে দশটার সময় স্নানাহার সারিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যতীনও চাকরকে ছুটি দিবার জন্য ১১টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইল। তাহার পর গুটি কত টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, মায়ার জন্য ভাল দেখিয়া কিছু উপহার কিনিতে হইবে। সে যেমন নিষ্ঠুর ভাবে যতীনকে একটা টাকা ফিরাইয়া দিয়াছে, যতীন তেমনি তাহার জন্য উহার দশগুণ খরচ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবে।

কি যে কিনিবে, তাহাই ঠিক করিতে তাহার ঘণ্টা খানেক কাটিয়া গেল। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাহার কিছু মাত্র ছিল না। কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করা চলে না, জিজ্ঞাসা করিলেও সে যে বিশেষ কিছু বলিতে পারিত তাহা নয়। অবশেষে যাহা থাকে কপালে, ভাবিয়া সে একটা সাহেবী গোছের দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। এখানে জুতা শেলাই হইতে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত সব কিছুর উপাদানই যে পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য সে দেখিয়াই ঢুকিয়াছিল।

একটি অল্পবয়স্কা মেম সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে কি দিব?"

যতীনের মাথায় হঠাৎ একটা খেয়াল আসিল, ভাবিল ইহাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন? ইহারা ত এসব বিষয়ে বেশ ওস্তাদ বলিয়াই শোনা যায়। আশা করি, মেয়েটি কিছু মনে করিবে না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "আমার এক-জন মহিলা বন্ধুর জন্য কিছু উপহার নিতে চাই। কি নিলে ঠিক হয় আপনি বল্‌তে পারেন?"

মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল, "তিনি যদি অল্পবয়স্কা হন, তাহা হইলে এক বাক্স ভাল চকোলেট নিতে পারেন।"

যতীন সম্মত হইয়া বাছিয়া বাছিয়া আট টাকা দামের একটি সুন্দর চকোলেটের বাক্স ক্রয় করিল। তাহার পর মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

মায়ার দোকান খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। বড় রাস্তার উপর নাম-জাদা দোকান। তাহার সাম্‌নে গাড়ী দাঁড় করাইয়া সে নামিয়া পড়িল। হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও একটা বাজিতে মিনিট পাঁচ বাকি। স্থির করিল ভিতরে ঢুকিয়া সামান্য কিছু কিনিবে। তাহাতে নিজের আগমন-সংবাদ দেওয়াও হইবে, সময়টাও কাটিবে ভাল।

ভিতরে ঢুকিতেই সে মায়াকে দেখিতে পাইল। সে তখন এক মোটা মেম সাহেবকে রেশম দেখাইতে ব্যস্ত। আর একটি মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিল। যতীন বলিল, রুমাল তৈয়ারী করিবার জন্য সে খানিকটা রেশম চায়।

মেয়েটি দুই তিন রকম শাদা রেশম আনিয়া তাহাকে

দেখাইতে লাগিল। যতীন পছন্দ করিয়া দু গজ কাপড় কিনিল। বাহির হইবার সময় সে মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার কাজ শেষ হইয়াছিল, সে নিজের হাত-ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

যতীন বলিল, "আমি গাড়ী দাঁড় করিয়েই রেখেছি। কোথায় যাবেন ?"

মায়া বলিল, "এখান থেকে গাড়ী ক'রে না গেলেই হ'ত। আমার সহকর্ম্মিণীরা দেখলে আমাকে ভয়ানক ঠাট্টা করবে।"

যতীন বলিল, "তাহ'লে কি করা যায় ? গাড়ীটাকে বিদায় ক'রে দেব ?"

মায়া বলিল, "থাক, এনেইছেন যখন। কাছেই একটা জাপানী চায়ের দোকান আছে, সেখানে যাওয়া যাক।"

গাড়োয়ানকে কোথায় যাইতে হইবে বলিয়া দিয়া মায়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। যতীন পিছনে উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই বলিল, "আপনার জন্যে সামান্য একটা জিনিষ নিয়ে এসেছি।"

মায়া বলিল, "কি জিনিষ, দেখি ?" যতীন চকোলেটের বাক্সটা বাহির করিল। মায়া সেটা হাতে লইয়া বলিল, "বাঃ, বেশ সুন্দর। কিন্তু শুধু শুধু কেন এত খরচ করতে গেলেন ?"

উত্তরে যতীনের অনেক কথাই বলিবার ছিল, কিন্তু কোনো ক্রমে সাম্‌লাইয়া গেল।

জাপানী হোটেলে বসিয়া, চা খাইতে খাইতে তাহারা গল্প করিতে লাগিল। মায়ার বাংলা দেশ সম্বন্ধে সব কিছু জানিবার আগ্রহ খুব বেশী। মাঝে একবার সে বলিল, "আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহ'লে আপনার কাছে আমি বাঙলা ভাষা শিখে নিতাম।"

যতীন বলিল, "দেখা যাক্, এখনও ত কিছুদিন আছি।"

আধ ঘণ্টা সময় দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। মায়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যাই তবে ?"

যতীন বলিল, "কালও একটার সময় দোকানে আস্‌ব কি ?"

মায়া একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, "না না, রোজ আস্‌বেন না। তাহলে নানা রকম কথা উঠ্‌বে। কাল আপনাকে চিঠি লিখে জানাব, কোথায় দেখা হ'তে পারে।"

যতীন বড়ই মুশড়াইয়া গেল। মায়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখনও ত কিছুদিন আছেনই, প্রায়ই দেখা হবে।"

মায়া চলিয়া যাইতেই যতীন সোজা ঘরে ফিরিয়া আসিল। নিজের অবস্থায় তাহার নিজেরই অবাক লাগিতেছিল। এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িবে তাহা সে মনে করে নাই। এখন এব্যাপারের অবসান হইবে কি প্রকারে ? সে কিছু এখানে চিরকাল থাকিতে পারিবে না। মায়াকে বিবাহ করিতে পারিলে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু মহামায়া ঠাকুরাণী বাঁচিয়া থাকিতে সে কল্পনা করাও চলে না। মায়াকে কথা দিয়া সে যাইতে পারে, বুড়ী মরিলে পর না হয় আসিয়া বিবাহ করিবে। কিন্তু বাঙালী সম্বন্ধে ইহাদের যা ধারণা, তাহাতে মায়া রাজী না হওয়াই সম্ভব। বিবাহই বা হইবে কোন্ মতে ? আজকাল শুদ্ধি প্রভৃতি অনেক কিছু হয় বটে। মায়ার পিতার পরিচয় যদি জানা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের টাকাকড়ি দিয়া এক প্রকার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এত সব ব্যাপার লুকাইয়া করা চলে না। আবার তাহার মাতা ঠাকুরাণী ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতে পারিলে ত সর্ব্বনাশ।

কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিলে চা খাইয়া দুই বন্ধুতে শোয়ে ডাগন প্যাগোডা দেখিতে চলিয়া গেল। যতীন চোখ দিয়া অনেক কিছু দেখিল বটে, তবে তাহার সমস্ত মন পড়িয়া রহিল অন্যখানে। মায়ার অ দেখা মায়ের উপরেও তাহার রাগ হইতে লাগিল। বুড়ীর এত বাঙালী বিদ্বেষেরই বা দরকার ছিল কি ? তা না হ'লে সে ত দিব্য উহাদের বাড়ী যাইতে পারিত। জগতে যত গোলমাল, তাহার অর্দ্ধেকের মূলে এই বুড়ীগুলি।

মায়ার চিঠির অপেক্ষায় পরদিন সকাল হইতে সে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ডাকে আসিবে, না হাতে আসিবে, তাহাও জানা নাই। কার্ত্তিকটা চিঠি দেখিলে না জানি আবার কি বলে। মনে মনে গোটা কতক মিথ্যা কথা সে তৈয়ারী করিয়া রাখিল।

চিঠিখানা ডাকেই আসিল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ভারতবর্ষের ডাক আসিবারও দিন। কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কলকাতার চিঠি না কি?"

যতীন বলিল, "হ্যাঁ, এই সরকার মশায় লিখেছেন।" কার্ত্তিকের বৌএর চিঠি আসিয়াছিল, সে আর অন্য দিকে মন দিল না।

মায়া লিখিয়াছে, কাল দোকান বন্ধ হইবার পর যতীন আসিলে সে তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে পারে। তাহার মাকে সে বলিয়া কহিয়া রাজী করাইয়াছে।

কার্ত্তিক না থাকিলে যতীন ঠিক ঘরের ভিতর দুই চার পাক নাচিয়া লইত। সে সুবিধা না পাওয়ায়, সে বারান্দায় বাহির হইয়া রাস্তার লোকজন দেখিতে লাগিল। ভোরবেলা সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, মায়ার সহিত সে এক জাহাজে চড়িয়া কোথায় যেন চলিয়াছে। হঠাৎ তাহার স্বপ্নের জাল ভেদ করিয়া কানে একটা মোটা গলার স্বর আসিয়া পৌঁছিল, "টেলিগ্রাম বাবু!"

কার্ত্তিক এবং যতীন প্রায় একই সঙ্গে উঠিয়া বসিল। কার্ত্তিক দরজা খুলিয়া টেলিগ্রামটা হাতে লইয়া বলিল, "তোমার দেখ্‌ছি। নাও, খুলে দেখ, আমি সই ক'রে দিচ্ছি।"

একটা কিছু অশুভ সম্ভাবনায় যতীনের বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে হল্‌দে খামখানা তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া, কাগজটা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। মহামায়ার কঠিন পীড়া, এখনি তাহার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক। যতীনের হাত হইতে কাগজখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

কার্ত্তিক কাগজখানা তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল। তাহার পর যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বুড়ো বয়সে ব্যারাম পীড়া সব মানুষেরই হয়। তাতে অত ভয় পেলে চল্‌বে কেন?"

যতীন তবু কিছু কথা বলে না দেখিয়া সে আবার বলিল, "আরে ভাই, নিজের মাবাপও মানুষের চিরকাল থাকে না, এ ত তোমার পাতানো মা। কথায় ত তাঁর উপর খুব ঝাল দেখি, কিন্তু অসুখ শুনে একেবারেই যে ঘাব্‌ড়ে গেলে?"

যতীন এতক্ষণ পরে বলিল, "কি বিপদ যে আমার হ'ল, তা যদি জান্‌তে।"

কার্ত্তিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি আবার এমন বিপদ হ'ল? আজকের জাহাজে আর যাওয়া হবে না এক যদি উড়ে না যাও। কিন্তু পরশু স্বচ্ছন্দে যেতে পার্‌বে। বল ত আমি গিয়ে খবর নিচ্ছি, আজও দু একটা বার্থ খালি থাকতে পারে। তোমার ত আর টাকার ভাবনা নেই, ফার্ষ্ট ক্লাশে যাও। সেদিকে প্রায়ই ঢের জায়গা থাকে।"

যতীন বলিয়া ফেলিল, "তুমি যে আমাকে বিদায় করতে পার্‌লে বাঁচ দেখছি। আমার এ দিকে প্রাণ বেরিয়ে আস্‌ছে আর দুটো দিন থাক্‌বার জন্যে।"

ইহার পর আর কথা লুকান চলে না। যতীন সমস্তই কার্ত্তিকের কাছে খুলিয়া বলিল।

কার্ত্তিক রুদ্ধ নিশ্বাসে সব শুনিয়া বলিল, "এই ক'টা দিনে এতখানি বাধিয়ে তুলেছ? খাসা ছেলে! এখন কর্‌বে কি? তাকে কোনও রকম কথা দিয়েছ নাকি?"

যতীন বলিল, "মুখের কথায় কথা নাই দিলাম? সেও আমার মন জানে, আমিও তার মন জানি। এখন কি করা যায় তাই বল।"

কার্ত্তিক বলিল, "বুঝছি না ঠিক। ওসব নভেলী ব্যাপার আমার চৌদ্দ পুরুষের ধাতে নাই। আমি বলি সেরেফ স'রে পড়। আমি দিন কতক কোনো মেসে গিয়ে থাক্‌ব। একে বর্ম্মার রক্ত, তাতে মুসলমানের ভাতে মানুষ, খুনখারাপি কর্‌তেও তাদের আট্‌কাবে না।"

যতীন মুখ লাল করিয়া বলিল, "আমার প্রাণ থাক্‌তে তা পার্‌ব না। তুমি আমাকে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে বল?"

কার্ত্তিক বলিল, "তবে যা খুসি কর গিয়ে। বারণ কর্‌লাম ওদের ছায়া মাড়াতে, তা পার্‌লে না আর লোভ সাম্‌লাতে!"

যতীন বলিল, "আমায় গাল দিলে ত কিছু লাভ হবে না? যা হবার তা হয়েইছে। আমি তাকে কথা দিয়ে যাব, তারপর স্বাধীন যখন হব, তখন এসে বিয়ে

করব্‌। মোট কথা শুক্রবারের আগে আমার যাওয়া হ'তেই পারে না।"

কার্ত্তিক বলিল, "ততদিন সে তোমার জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌বে? মনুষ্যচরিত্র তুমি বড়ই জান দেখ্‌ছি।"

যতীন বলিল, "না থাকে ত আর আমি কি কর্‌তে পারি? কিন্তু আমি তাকে চীট কর্‌তে পার্‌ব না।"

কার্ত্তিক বলিল, "বেশ, যা খুসি কর। কিন্তু আমি এ সবের মধ্যে নেই বাবা, তা ব'লে রাখছি।"

সারাটা দিন যতীনের ভূতাবিষ্টের মত কাটিয়া গেল। মায়াকে কেমন করিয়া কি বলিবে, সে যতীনের প্রস্তাবে রাজী হইবে কি না, তাহাই সে হাজারবার করিয়া ভাবিতে লাগিল। অবশেষে বিকাল হইবামাত্র গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া গেল। মায়ার দোকান বন্ধ হইতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি ছিল, কিন্তু যতীন আর কিছুতেই ঘরে টিঁকিতে পারিতেছিল না।

মায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে বলিল, "ব'লে কয়ে, আধঘণ্টা খানিক আগেই চ'লে এলাম। আজও যে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখেছেন দেখ্‌ছি। আপনি বড় বেশী বাজে খরচ করেন।"

যতীন ব'লিল, "এর চেয়ে ঢের বেশী কর্‌বার সুবিধা পেলে খুসি হ'তাম।"

মায়াদের বাড়ী কাছেই। রাস্তার মোড়ের উপর প্রকাণ্ড এক বাড়ীর তিন তলার ছোট একটা ফ্ল্যাটে তাহারা থাকে।

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেই গুটি দুই তিন বালক-বালিকা বাহির হইয়া আসিয়া যতীনকে দেখিতে আরম্ভ করিল। মায়া বলিল, "এগুলি আমার ভাই বোন। বড় মেয়েটি স্কুলে যায় ছোট দুটো সারাদিন বাড়ীতে বাঁদরামী করে।"

সাম্‌নে একটি বড়ঘর, তাহার পর একটি ছোট কুঠরি, একেবারে শেষে রান্নাঘর স্নানের ঘর প্রভৃতি। সাম্‌নের ঘরটি বেশ সাজানো ফিট্‌ফাট, দেখিলে গরীবের ঘর বলিয়া মনেই হয় না। যতীন ভাবিল গৃহস্বামী হয় ত ধনবান ছিলেন, এখনও সে সময়কার আস্‌বাবপত্র কিছু কিছু থাকিয়া গিয়াছে।

মায়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "আমি মাকে ব'লে আসি।"

কিন্তু খবর দেওয়াটা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল না। বালকবালিকাগুলির সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এককালে দেখিতে সুন্দরীই ছিলেন বোধহয়, তবে এখন কিছু অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছেন।

মায়া বলিল, "ইনি আমার মা। ইংরেজি জানেন না, কিন্তু হিন্দিতে কথা বল্‌তে পারেন।"

মায়ার মায়ের যতীনের সঙ্গে কথা বলিবার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। ভদ্রতা রক্ষা করিয়া তিনি আবার ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন। যতীন এবং মায়া বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল, ছোট ছেলেমেয়ের দল ক্রমাগত ঘরের ভিতর ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

খানিক পরে একটি বালিকা চা এবং কেক্‌ লইয়া আসিল। যতীন বলিল, "আপনিও ত কম বাজে খরচ করেন না?"

মায়া বলিল, "এটা কি বাজে খরচ? এ ত যে-কোনো মানুষ এলেই কর্‌তে হ'ত।"

যতীন সাম্‌নের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তা হ'লে যে-কোনো লোকের চেয়ে একটু আলাদা?"

মায়ার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তা ত বুঝতেই পারেন।"

ঘরে তখন আর কেহ ছিল না। যতীন মায়ার কোমল ক্ষুদ্র হাতখানি একবার নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। মায়া বাধা দিল না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া লইল।

যতীনের গলার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। সে মায়ার মুখের দিকে আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মায়া, আমাদের কি মিলন হ'তে পারে না?"

মায়া মাথা নীচু করিয়া খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আপনিই ভেবে দেখুন। কিন্তু বাঙালীরা ত এ বিয়ে পছন্দ করবে না?"

যতীন বলিল, "তাদের পছন্দ কেউ চাইছেও না। তুমি তা হ'লে রাজী আছ ?'

মায়া বলিল, "হাঁ, আমি রাজী। কিন্তু দেখুন, আমার একটা সর্ত্ত আছে। আমার মা খুব সম্ভব রাজী হবেন না। সুতরাং বিবাহ যদি করেন তাহ'লে আমাকে সঙ্গেই নিয়ে যেতে হবে, এখানে রেখে যেতে পারবেন না।"

যতীন বলিল, "তোমাকে রেখে যেতে পারব ব'লে তোমার মনে হয় ? পারলে আমি এখনই নিয়ে যাই।"

মায়া একটু যেন উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "খুব বেশী কি দেরি হবে ?"

যতীন বলিল, "আমার অবস্থা তোমায় খুলেই বল্‌ছি। তোমার মা যেমন মত দেবেন না, আমার মাও তেম্‌নি মত দেবেন না। তাঁর খুব অসুখ ব'লে আমায় কালই চ'লে যেতে হবে। কিন্তু আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, সুবিধা পাবা মাত্র আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব এবং কলকতায় গিয়ে আমাদের হিন্দু নিয়মানুসারে বিয়ে করব। তোমাদের দেশের বিয়েতে পুরুষগুলোকে বড় বেশী সুবিধা দেওয়া হয়। আমার যদিও সেরকম কুমতি কখনও হবে না তবু তোমার প্রতি অন্যায় ঘট্‌বার কোনো সম্ভাবনাও আমি রাখতে চাই না।"

মায়া বলিল, "কিন্তু তা কি হ'তে পারে ? আমি ত পুরো বাঙালী নয় ?"

যতীন বিজ্ঞভাবে বলিল, "আজকাল সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়। ইংরেজ মেয়ে শুদ্ধ হিন্দু হয়ে যাচ্ছে তা তুমি—" মায়ার মা ভিতর হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। যতীন বুঝিল, তাহার বেশীক্ষণ থাকা ঐ মহিলাটি মোটেই পছন্দ করিতেছেন না, তাহাকে শীঘ্রই কাজ সারিয়া বিদায় হইতে হইবে।

মায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া, তোমার বাবার নাম, বংশপরিচয় জান কিছু ?"

মায়া বলিল, "অল্পই। মা জানেন, তবে তাঁকে জিগ্‌গেস করলে বিরক্ত হ'ন। এসব কি জানা দরকার ?"

যতীন বলিল, "হ্যাঁ, হিন্দু বিয়ে হ'তে হ'লে দরকার বই কি ?"

মায়া একটা টেবলের দেরাজে চাবী লাগাইয়া বলিল, "তাঁর একটা ছবি মাত্র আমার কাছে আছে। কলকাতা থেকে মাকে কয়েকখানা চিঠি-পত্র লিখেছিলেন, সে-সব মা কোথায় রেখেছেন জানি না ; পরে আদায় করতে হবে।"

যতীন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছিল, মায়ার হাত হইতে ছবি লইবার জন্য। কিন্তু ছবি হাতে লইয়াই সে বজ্রাহতের মত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মায়া ভয় পাইয়া গেল। ছুটিয়া তাহার পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি শরীর খারাপ লাগ্‌ছে ?"

যতীন মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহা নহে। মায়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি হয়েছে ?"

যতীন ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "এ ছবি আমার বাবার, এঁরই স্ত্রী আমায় পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। আইনের চক্ষে তুমি আর আমি ভাই বোন। আমাদের বিয়ে হ'তে পারে না।"

মায়ার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেল। সে একটা চেয়ার ধরিয়া নিজেকে কোনোমতে সাম্‌লাইল। তাহার পর হঠাৎ এক সময় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মাতালের মত টলিতে টলিতে যতীন বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সকালে দেখা গেল,জাপানী রেশমের দোকানের সম্মুখে ম্লান মুখে এবং মলিন বেশে একটি বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া আছে। দোকানের দরজা খুলিয়া একজন চাকর সব ঝাড়-পোঁছ করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোনো জিনিষ কিনিতে চাহেন কি না। যুবক মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে কিছুই চাহে না।

রিক্‌শ হইতে নামিয়া মায়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ, চোখ দুইটা অস্বাভাবিক দীপ্ত। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কেন এসেছ ? এবার আমায় নিষ্কৃতি দাও।"

যতীন বলিল, "আমাকে কেন অপরাধী করছ, মায়া ? আমিও কি কষ্ট পাচ্ছি না ? ভগবান প্রতিকূল, আমি কি করব ? আমি তোমায় বিরক্ত করতে আসিনি। শুধু একটা কথা বল্‌তে এসেছি। যে ধন-ঐশ্বর্য্য আমি ভোগ কর্‌ছি, তা আসলে তোমার। তোমাকে মাসে মাসে কিছু টাকা কি পাঠাতে পারি ? তা হ'লে তোমার এই দোকানের কাজ আর করতে হ'বে না।"

মায়া বলিল, "দরকার নেই। তোমাদের বংশের টাকা আমাদের সইবে না। ও তোমারই থাক। এর জন্যে তুমি নিজেকে বিক্রী করেছ। ভগবান্ আমাদের মিলনের কোনো বাধা রাখেন নি। এই টাকার লোভই বাধা। তা না হলে তুমি সত্যিই কিছু আমার ভাই নও। তুমি যাও, আর আমার সঙ্গে দেখা কোরো না।"

যতীন বলিল, "আচ্ছা মায়া। আমি কালই যাচ্ছি; তোমায় আর বিরক্ত করব না।"

শনিবার বেলা বারোটায় জাহাজ ঘাটে মহা ভীড়। এলোরা জাহাজ চলিয়াছে। যাত্রীর দল সব ডেকে দাঁড়াইয়া বিদায় লইতেছে। নীচে জেটিতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া।

যতীন ডেকে দাঁড়াইয়া উদাস দৃষ্টিতে লোকের মেলার দিকে চাহিয়া ছিল। এই ক'টা দিনে তাহার জীবনের উপর দিয়া যেন প্রলয়ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন ভীড়ের ভিতর মায়া দাঁড়াইয়া। ভাল করিয়া দেখিতে গেল, কিন্তু আর দেখিতে পাইল না।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ইরাবতীর তটভূমি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী প্রামুজম ঠাকুর আমেরিকাতে গিয়া কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল উচ্চ পরীক্ষায় পাস করিয়াছেন সে সংবাদ আমরা গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে দিয়াছি। সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া পল্লী-শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে ভারতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তত্রত্য হিন্দুস্থান সভ্যগণ তাঁহাকে একটি অভিনন্দন দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী কনকলেখা আম্মা মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ উপাধি লাভ করিয়া বিলাত যান। সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সম্প্রতি তিনি সিংহলের আনন্দ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী কনকলেখা সঙ্গীত-বিদ্যাতেও পারদর্শিনী।

শ্রীমতী গঙ্গাবাই পাত্রবর্দ্ধন পুনার মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসরী-শিক্ষা-প্রণালীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইয়োরোপের অনেক বিদ্যালয়ে ঘুরিয়া সে সকল স্থানের শিক্ষা-প্রদান প্রণালী দেখিয়া আসিয়াছেন।



শ্রীমতী দয়ালদাস



শ্রীমতী কনকলেখা আম্মা



শ্রীমতী পাত্রবর্দ্ধন





শ্রীমতী ইরাবতী কার্ভে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা অধ্যাপক কার্ভের পুত্রবধূ। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জার্ম্মেনীর লাইপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান শাস্ত্রে গবেষনার জন্য গিয়াছেন।

সিন্ধুদেশের পরলোকগত দানশীল নেতা নারায়ণ দেয়ালদাসের পত্নী শ্রীমতী দেয়ালদাস তাঁহার শ্বশ্রূমাতার স্মৃতিরক্ষার্থে নিজব্যয়ে কারাচিতে একটি মহিলা সভা গৃহ নির্ম্মান করাইয়াছেন। শ্রীমতী দেয়ালদাস তাঁহার স্বামীর সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

মুলতানের চিকণ-করা টালির কাজ (Glazed Tile Work)

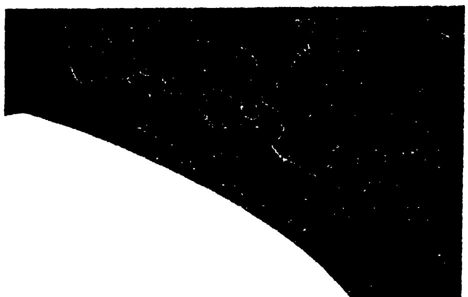
শ্রী প্রাণনাথ পণ্ডিত

মুলতান জেলায় বহুকাল থেকে চিকণ-করা টালির কাজ চলে' আস্‌ছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পাঠানরা পাঞ্জাবে প্রথম নীলবর্ণের চিকণ-করা টালির কাজের সূত্রপাত করেছিল। মোগল সম্রাট সাজাহানের সময় এই কাজের চরমোৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছিল। এখনো লাহোরের ওয়াজির খাঁর মস্‌জিদে (সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত) এবং মুলতানের শত শত ধ্বংসাবশেষ মিনারের মধ্যে এই শিল্পের অপ্রতিহত গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রকার কাজকে "কাসিগরি" কাজ বলে,—এবং এই কাজের কারিগররা "কাসিগর" নামে খ্যাত। স্থানীয় প্রবাদ মূলে যদিও এই কাজের মৌলিকত্ব চীনের প্রতি আরোপিত হয়, কিন্তু এর পরিকল্পনা দেখে বা মিনার মস্‌জিদ প্রভৃতির দেয়ালে এর পরিচয় পাঠ করে' এর সঙ্গে চৈনিক শিল্পের কোনো মিল বোঝা যায় না। হয় ত' চীন দেশ থেকে এই শিল্প সোজাসুজি না এসে পারস্যের ভিতর দিয়ে পরিবর্ত্তিত রূপে এসেছে। পারস্যের "কাসান" সহরের নাম থেকে এর এই "কাসি" নামের উৎপত্তি হ'য়েছে বলে' অনুমান করা হয়।

খাঁজ কাটা বা নক্সাদার সকল রকম স্মৃতি-সৌধের পরিকল্পনাই জ্যামিতিক আকারে করা হয়েছে। একমাত্র লাহোর দুর্গের দেয়ালগুলি এর ব্যতিক্রম; কারণ, এই দুর্গের সম্পূর্ণ দেয়াল মানুষ, প্রাণী, পরী প্রভৃতির মূর্ত্তি দ্বারা বা সাধারণ সংসারযাত্রা এবং রাজকীয় জীবনযাত্রার চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত।

মিঃ বার্ড উড তাঁর শিল্প সমালোচনায় এই শিল্প প্রণালীর চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন,—"ভারতের সমতল ভূমিতে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে যখন কোনো মস্‌জিদের সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়, তখন তার শিল্প-কৌশল ও সৌন্দর্য্যে



লাহোর দুর্গের একটি খিলানের এক অংশ

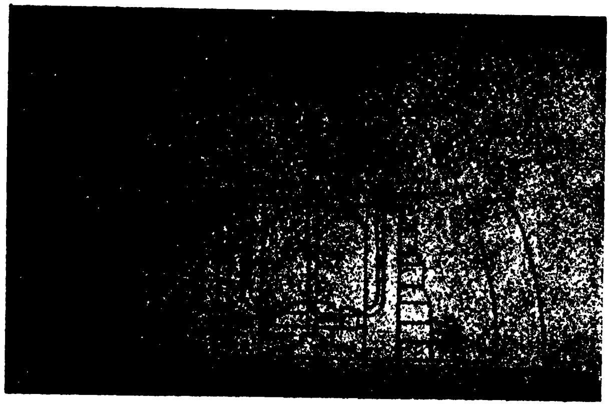
যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে' হয়। পীত হরিৎ নীল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ-সমাবেশে মস্‌জিদগুলি বিচিত্র সুন্দর। সূর্য্যোদয়কালে দূর থেকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে এর উচ্চ গুম্বজ ও উজ্জ্বল মিনারগুলি—যেগুলি এক প্রকার নভোনীল এবং সবুজ বর্ণের অনুলেপে অনুরঞ্জিত—নিখাদ স্বর্ণ-নির্ম্মিত বলে'ই বোধ হয় এবং সেগুলির সম্মোহন দ্যুতিতে চিত্ত স্বভাবতই আকৃষ্ট হতে' থাকে। অপূর্ব্ব অভাবনীয়, অনির্ব্বচনীয় এই সৌন্দর্য্য!..."

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হ'য়েছে সাজাহানের সময়ে প্রস্তুত মস্‌জিদ ও মিনারে এই শিল্পের চরমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত

হয়। সাধারণ মাটির টালি ছাড়াও বালি চুণ, গঁদ প্রভৃতি অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে আর এক প্রকার টালি তৈরি করা হ'ত। উপযুক্ত বা পাতলা করে' টালির চাপ তৈরি করে' তার ওপর "ডিজাইন" আঁকা হত এবং



পুষ্পাধার নির্ম্মাণরত কাসিগরি কারিগর



পোয়ানের নক্সা

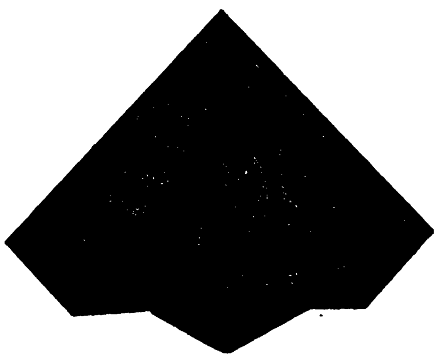
তারপর "ডিজাইন" অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আকারে কাটা হ'ত। চিত্রের ফুল বা লতাপাতা প্রয়োজন অনুসারে সবুজ বা লাল রঙে রঙানো হ'ত। টালির অ-নক্সাদার অংশও পৃথক পৃথক মাপে কেটে রঙানো হ'ত এবং আগুনে দিয়ে পোড়ানো হ'ত।

প্রাচীন কালের চিকণের কাজে ব্যবহৃত কতকগুলি বর্ণের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা এখানে দেওয়া গেল—

বর্ণ	খড়িমাটি	বর্ণের অন্য উপাদান	
১। ফিরোজা (Turquoise blue)	১ সের ,, ,,	চীলটম্বা (thin flakes of oxidized or calcined metalic copper)	১ ছটাক
২। কস্নি (Pinc or Lilac)	,, ,,	অঞ্জনী (Oxide of manganese)	১ ,,
৩। সস্নি (Violet)	,, ,,	অঞ্জনী (Oxide mixed with reta of zaffre)	১৫ ,,
৪। উদা (Purple or Puce)	,, ,,	অঞ্জনী	২ ,,
৫। খাকি (ash grey)	,, ,,	রেটা অঞ্জনী	১·৫ ,,
৬। নীল (deep blue)	,, ,,	রেটা	৪ ,,
৭। আসমানি (sky blue)	,,	,,	১·৫ ,,
৮। হাল্কা আবি (very pale blue)	,,	,,	১ ,,
৯। ফিরোজি-আবি (pale Prussian blue tone)	,, ,,	চীলটম্বা	১/১৬ সের

একটা ডিজাইনের মধ্যেই চার পাঁচটা বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়—সাদা, হল্দে জরদা, নীল বা নীল-লোহিত। এই রকমের কাজ এখন প্রাচীন যুগের স্মৃতি চিহ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য রঙীন চিকণের অন্য কাজ এখনো অনেক জেলায় প্রচলিত আছে—বিশেষ করে' শিয়ালকোট, গুজরাণওয়ালা এবং পেশোয়ারে।

আধুনিক মুলতানের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।



লাহোর দুর্গ হইতে সংগৃহীত একখানি চিত্রিত টালির অংশ

মুলতানের কারিগর বা কাসিগররা অ-ভিন্ন টালির ওপরই বিভিন্ন বর্ণ ব্যবহার করে। অধিকাংশ বর্ণের ব্যবহারও

তারা ভুলে গেছে। তারা এখন কেবল ফিকে নীল, সবুজ এবং একপ্রকার স্বচ্ছ সাদার কাজ জানে।

এরা পাত্র প্রভৃতি তৈরি করে না—তৈরি পাত্র রঙ করে। রঙ করবার পূর্ব্বে চরকির চাকা বেগে ঘুরিয়ে পাত্রের ওপর একটা ভিজে কাপড় চেপে' ভালো করে' পালিশ করে' নেয়। যে সকল তৈরি পাত্র তারা সংগ্রহ করে, সেগুলি সাধারণ মাটিতে এমন ভাবে তৈরি, যে তার ওপর কোন রঙ চলে না। এরা রঙ করবার পূর্ব্বে 'খড়িয়া' বা খড়িমাটির সঙ্গে কাচের গুঁড়ো মিশিয়ে এক প্রকার মণ্ড দিয়ে মেড়ে তার প্রলেপ দেয়। এই প্রলেপ দেওয়াকে এরা আস্তর করা বলে। হাতেই আস্তর চলে।



কারিগরগণ পাত্র রঙ করিতেছে

আস্তরের পর ডিজাইন। এজন্যে 'ফারফোর' করা ধাতুর পাতের সাহায্য নেয়। প্রথমে কাগজের ওপর নক্সা কেটে নিয়ে পিন্ বা সূচ দিয়ে সেই কাগজে ছিদ্র করে। তারপর সেই কাগজের ওপর 'ফারফোর" করা ধাতুর পাত বসিয়ে একটা মস্‌লিনের পুঁটুলিতে করে' তার ওপর কয়লার গুড়ো ছড়িয়ে দিতে থাকে। এই রূপে পাত্রটির ওপর কাগজের নক্সাটির হুবহু অনুলিপি হ'য়ে যায়।

তারপর তুলি দিয়ে ডিজাইন আঁক্‌বার পালা। ধাতব ক্ষার-জলের মধ্যে দিয়ে বর্ণের উপাদান নিষ্কাষিত করে' নেওয়া হয়। পাত্রের সাধারণ অংশ "চৌল টম্ব" (oxide of copper) দিয়ে নীল রঙে রঙানো হয়; লতাপাতার অংশ "লাজওয়ারদ্" (oxide of cobalt) দ্বারা নীল করা হয়।

এই রঙের কাজ বিশেষ সহজ নয়। নিয়মিত ভাবে শিক্ষা বা অভ্যাস না করলে যার তার দ্বারা একাজ চলে



পোয়ানের আগুনে পাত্র শুষ্ক করা হইতেছে

না। কিন্তু কাসিগররা সহজ নিপুণতার সঙ্গে অল্প সময়েই একাজ করে।

রঙ-করা হয়ে' গেলে তার ওপর পূর্ব্বের তালিকা মাফিক স্বচ্ছ লেপ দিয়ে চিকণের কাজ করে' বিশেষ যত্নের সঙ্গে 'পোয়ানের' আগুনের আঁচে শুকিয়ে নেওয়া হয়। 'পোয়ানের' ব্যাপারটা বুঝাবার জন্যে একটা ছবি দেওয়া গেল।

বাবলা কাঠের ছোট ছোট টুক্‌রা দিয়ে পোয়ানের আগুন ধরানো হয়। আগুন ঠিক করতে প্রায় ঘণ্টা দশেক সময় লাগে। ঋতু অনুসারে তিন বা চার দিন পরে পোয়ান ঠাণ্ডা হয়। এই তিন চার দিন ভারি হুসিয়ার থাকতে হয়—পাছে বাতাস বা ধুলোয় পোয়ানের কোন ক্ষতি হয়।

এই প্রাচ্য শিল্প-প্রসঙ্গে ফর্টাম্ বলেন,—"সহজ ভাব-ব্যঞ্জনা, সুসমঞ্জস বর্ণ বৈচিত্র্য, সুন্দর চিত্র-কুশলতা সত্যই আমাদের অনুকরণীয়—যদিও অনুরূপ কিছু গড়ে তোলা নাও যেতে পারে।"

ভারত-কলা-বিশেষজ্ঞ বার্ডউড বলেন,—"আকারের সরলতায়, প্রকারের সহজ প্রকাশে, আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্যে, বর্ণ-সৌন্দর্য্যে সত্য সত্যই এই শিল্প অপূর্ব্ব চমৎকার।"

বর্ত্তমান কাসিগরদের পড়্‌তা বড়ই খারাপ। চীনে মাটির জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হতে' হ'চ্ছে। যদি সস্তা মাল মসলায় জিনিষ তৈরি করে' প্রতিযোগিতার পথে দাঁড়ায়—জিনিষ ভালো হয় না।

অল্পদিন হ'ল এখানে এক রকম চিত্রিত কুঁজোর ব্যবসা



একটি চিত্রিত পুষ্পাধার

বেশ বেড়ে' উঠছে। কিন্তু গরীব কাসিগরদের কারিগরি এসে ঠেকেছে—রঙ-করা "হুক্কা' আর 'চিলামে'।

একজন বড় কাসিগর কার্‌বারী মুসতানি কাজের অ-পড়তায় বিদেশ থেকে, চিত্রের এবং চিকণের সুলভ উপাদান নিয়ে এসে কাজ সুরু ক'রেছে। বিদেশের জিনিষ-গুলির মধ্যে কোন মলা নেই এবং ব্যবহার কর্‌বার পূর্ব্বে শোধন করে' নিতে হয় না। দেশী উপাদানের ভিতর বড্ড মলা-মাটি থাকে—শোধন করে' না নিলে চলেই না। তাতে খরচও পড়ে বেশী, সস্তা মালের প্রতিযোগিতায় হীন হ'য়ে পড়তে হয়।

আজকালকার টালিতে বড্ড দুটি দোষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—ফেটে যাওয়া ও চটে যাওয়া। তৈরি কর্‌বার ও চিকণ কর্‌বার ত্রুটিতেই এরূপ হয়।

আরো,—এই টালি বড্ড শক্ত। এর রঙও প্রাচীনের তুলনায় মন্দ। এর বেগুনে আভাযুক্ত নীল রঙও (cobalt blue) খুব মসৃণ। "ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" খুব বেশী সাদা এবং পুরানো টালির ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের চেয়ে একটু পুরু।

নিম্নের বিশ্লেষণে পুরাণো ও নতুনের প্রভেদ বুঝতে পারা যাবে।

	পুরাতন	নূতন
Silica SiO_2	৭৬.৯	৬৫.০০
Alumina Al_2O_3	৬.৫	১৭.৭০
Lime CaO	৮.২	
Alkalis K_2O / Na_2O	৮.৯৬	২.৬
Magnesia MgO		০.৫
Iron Oxide FeO		৫.০

এই সব খুঁতের জন্যে এর প্রতি আমাদের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। একটা প্রাদেশিক শিল্প বলে'ই নয়,—গৃহ-শিল্পের দিক দিয়েও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অল্প মূলধনে এবং সামান্য পরিশ্রমেই একে চালিয়ে নেওয়া যায়।*

* "Multan Glazed Tile Work"—Welfare, June 1924.

অনুবাদক শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্বনাম-প্রসিদ্ধ প্রবীণ এডভোকেট বাবু যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্প্রতি (এপ্রেল, ১৯২৮) ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ অধিকতর দুর্ব্বল এবং এলাহাবাদে এংগ্লো-বেঙ্গলী ইণ্টারমীডিএট কলেজ বিশেষ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। চৌধুরী মহাশয়ের আদিবাস ছিল জনাই বাক্সা। বাক্সাগ্রামে তিনি ১৮৪৮ অব্দের ৭ই মে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনে তিনি প্রতিভার

পরিচয় দিয়াছিলেন এবং স্কুল কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে অল্প বয়স হইতেই তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। ২১ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৬৯ অব্দে তিনি এক সঙ্গে এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহোদর স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা এক সঙ্গেই এম-এ পাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণবিহারী-বাবু একটি স্বর্ণপদক এবং যোগেন্দ্রবাবু একটি রৌপ্য-পদক লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর জেনারল এসেম্ব্লীস্ ইন্‌ষ্টিটিউস্যনের অধ্যাপক স্বনামখ্যাত উইলসন্ সাহেব (Prof. Wilson) ছুটি লইলে তাঁহার স্থানে যোগেন্দ্রবাবু অধ্যাপকতা করিতে থাকেন। ডাক্তার ওগিল্‌বী তখন অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের পরলোক গমনে তাঁহার স্থলে অধ্যাপনা করিবার জন্য যোগেন্দ্রবাবু অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ থাকায়, তিনি উক্ত কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া বিদেশে যাইতে মনস্থ করেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্বীয় পিতৃস্বসার নিকট হইতে ৩২টি মাত্র টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। প্রথমে তিনি বারাণসীতে আসিয়া তথাকার আদালতে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কিছু দিন পরে তথা হইতে জব্বলপুর যাইবার উদ্যোগ করেন। তাহা জানিতে পারিয়া মধ্যপথ হইতে ফিরাইয়া তাঁহার আত্মীয় এলাহাবাদের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺কালীচরণ নন্দী মহাশয় তাঁহাকে এলাহাবাদে আনয়ন করেন। এখানে তিনি স্বনামখ্যাত যোদ্ধা মুন্সেফ প্যারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগে এলাহাবাদ হাইকোর্টে উকীল-সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন।. প্রায় ৪২ বৎসর ওকালতি করিয়া তিনি যে নাম যশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ১৮৯৬ সালে যখন এখানকার হাইকোর্টে এডভোকেট পদের সৃষ্টি হয় তখনকার দিনে ঐ পদ অতিশয় সম্মানিত ও দুর্ল ভ ছিল। চৌধুরী মহাশয় ঐ বৎসরেই মুন্সী রাম প্রসাদ, স্যার সুন্দর লাল এবং পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর সহিত ঐ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন।



যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী

১৯১৩ অব্দ হইতে অর্থাৎ প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে অবসর লইয়া প্রথম কয়েক বৎসর কখন কখন বিশেষ কোন দিন আদালতে উপস্থিত হইতেন। ১৯১৩ অক্টোবরের দীর্ঘ অবকাশের পর হইতে আর হাইকোর্টে যান নাই।

তাঁহার চির অনুরাগের বিষয় অধ্যয়ন এবং উদ্যান পালন লইয়া তাঁহার অধিকাংশ অবসর সময় আনন্দে কাটিত। অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার এত অধিক ছিল যে, এমন সপ্তাহই যাইত না যাহাতে তাঁহার জন্য বিলাতী ডাকের সহিত নূতন নূতন গ্রন্থ না আসিত।

বিদ্বম্মণ্ডলীতে তাঁহার প্রগাঢ় পণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তাঁহার ইংরেজী ভাষার উপর বিস্ময়জনক অধিকার দর্শন করিয়া ইংরেজ বিচারপতিগণ এবং ব্যারিষ্টার সম্প্রদায় চমৎকৃত হইতেন। বহু বৎসর ধরিয়া স্যর সুন্দর লাল, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু এবং বাবু যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই তিন জনের নাম এলাহাবাদের উকীল সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় (The big three of Alla-

habad bar") হইয়াছিল। তিনি সাধারণ সভা সমিতিতে যাইতেন না এবং দেশ নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করিবার অথবা রাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। যে-কোন ক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিতেন। কারণ তাঁহার প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় এবং আত্মপ্রকাশবিমুখতাই তাঁহাকে সার্ব্বজনিক অনুষ্ঠান বা সাধারণ বক্তৃতামঞ্চ হইতে দূরে রাখিয়াছিল। জীবনে তিনি একবার মাত্র সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই সভা ১৯০৫ অব্দে লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক ভারতীয় চরিত্রে কলঙ্ক রোপের প্রতিবাদ সভা। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, অনাড়ম্বর—অধ্যয়নশীল, বন্ধুবৎসল, মধুরভাষী এবং সৌজন্যমণ্ডিত। অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার মানসিক শক্তির হ্রাস হয় নাই। তাই স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু বলিয়াছেন—

"That Mr. Chaudhri was a great advocate is beyond question, that he was a greater gentleman we must acknowledge with pride, reverence and affection." (*The Leader*)

তাঁহার মৃত্যুতে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ীদের যে শোকসভা হইয়াছিল তাহাতে প্রবীণ এডভোকেট বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশীয় এবং মিষ্টার বি, ই, ওকনর প্রমুখ য়ুরোপীয় উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদের মধ্যে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণের গোচরার্থ এখানে তাঁহাদের উক্তির কোন কোন স্থান উদ্ধৃত হইল। স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব এবং দেশনায়ক স্যার তেজবাহাদুর সপরু চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে ১৯২৮ সালের ২১ এপ্রেল তারিখের লীডর পত্রে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি চৌধুরী মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি ১৯০৮ সালে ঘটে। ঐ বৎসর পাটনার জেলা জজের আদালতে একটি মোকদ্দমায় ডাক্তার সপ্রু উকীল নিযুক্ত হইয়া যান। আইনের কয়েকটি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য বিষয় ঘটিত ব্যাপারসংসৃষ্ট এই মোকদ্দমায় সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে তিনি সাহস করিতেছিলেন না, বিশেষতঃ সে মামলায় তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন বঙ্গের এডভোকেট জেনারেল, মিষ্টার উমাকালী মুখার্জ্জি এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ আইন-বিশারদ্ মিষ্টার গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী। তাঁহারা কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। সপ্রু মহাশয় অবস্থার গুরুত্ব ও নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া তাঁহার মক্কেলকে একজন প্রবীণ আইনজ্ঞকে উপদেষ্টা স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার মক্কেল তাহাতে সম্মত হইয়া চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করেন। চৌধুরী মহাশয়ের ওরূপ ভারী মোকদ্দমা পরিচালন করিবার মত শরীরের অবস্থা তখন ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি পাটনা যাইতে এবং আইনের যে কোন সন্দেহজনক বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে সম্মত হন। রাত্রিতে রেলযাত্রা করিবেন না বলিয়া চৌধুরী মহাশয় সকলের সঙ্গে না গিয়া পূর্ব্বেই পাটনা ডাক বাঙ্গলায় গিয়া অবস্থিতি করেন। মিঃ সপ্রু পরদিন তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং সেই দিনই তাঁহাকে খুব সংক্ষেপে মোকদ্দমার বিবরণ দান করেন। তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। মিষ্টার সপরু অথবা তাঁহার মক্কেল কেহই চৌধুরী মহাশয়কে আদালতে যাইবার কষ্ট দিতে চাহেন নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা বিচারালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র মোকদ্দমার ডাক পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ চৌধুরী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। মিঃ তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহার মক্কেল এবং তদ্বিরকারক অন্য উকীলগণ তাহাতে আসন্ন বিপদ ভাবিয়া গভীর আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়েন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন চৌধুরী মহাশয় মোকদ্দমার নথি-পত্র কিছুই দেখেন নাই। তিনি ইহার বিশেষ বিবরণ কিছুই জানিতেন না এবং উভয় পক্ষের ওকালতি ও যুক্তিতর্কের কিছুই শুনেন নাই। কিন্তু তিনি সপ্রু মহাশয়ের মুখে আদালতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে মোকদ্দমার যেটুকু ইতিহাস শুনিয়াছিলেন তাহাই অবলম্বন করিয়া ৪৫ মিনিট আদালতকে সম্বোধন করেন। তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে স্যার তেজবাহাদুর স্বয়ং বলেন যে, তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতা এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল

যে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জল, অধিক যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা তাঁহার সমস্ত ব্যবসায় জীবনে ক্বচিৎ শুনিয়াছেন। তাঁহার এই প্রারম্ভিক বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া প্রতিপক্ষের এড্‌ভোকেট-জেনারল মহোদয় আদালতের মধ্যাহ্নকালীন অবসর সময়ে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আসিয়া অতিশয় সৌজন্যসহকারে তাঁহার প্রাবেশিক বক্তৃতা এবং বাগ্মিতার প্রশংসা করেন। সপ্‌রু সাহেব বলেন, "বাগ্মী তিনি ছিলেনই এবং এলাহাবাদে বাগ্মিতায় তাঁহাকে অতিক্রম করিবার এমন কি তাঁহার সমকক্ষ হইবার মতও কেহ ছিলেন না।"

যোগেন্দ্রবাবুর বাগ্মিতায় প্রসিদ্ধি যেমন ছিল, তাঁহার পক্ষসমর্থনের (advocacy) পদ্ধতি এবং সহানুভূতি আকর্ষণের শক্তিও ছিল তেমনি চমৎকারজনক এবং অপূর্ব্ব। সপরু সাহেব প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মিষ্টার ওকারের (M. B. E. O'Connor) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, চৌধুরী মহাশয়ের কথার সাহিত্যিক কবিশুদ্ধি, বাগ্মিতা, ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার এবং বক্তব্য বিষয়াদি মনো-হর ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া সজ্জিত করিবার শক্তি এরূপ ছিল যে, প্রধান বিচারপতি স্যার জন ষ্ট্যান্‌লী তাঁহাকে "dangerously eloquent" অর্থাৎ "বিপজ্জনক বাগ্মী" বলিতেন। কারণ তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে তিনি এরূপ আভিভূত হইয়া পড়িতেন, যে, সহসা রায় লিখিতে সাহস করিতেন না। বক্তৃতার মোহ কাটাইতে সমর্থ হইলে পর রায় দেওয়া নিরাপদ মনে করিতেন। ওকনর সাহেব চৌধুরী মহাশয়ের গুণাবলীর ভূরিভূরি প্রশংসা করিবার কালে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় আইন ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "যখন আমি ব্যবসায় আরম্ভ করি, তখন চৌধুরী মহাশয় আদর্শ এড্‌ভোকেট স্বরূপ যশ ও গৌরবের শিখর-দেশে অবস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার মোকদ্দমা পরিচালন ও যুক্তিতর্কের পদ্ধতি অনুকরণ করিতে করিতে অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। বিচার্য্য বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করিয়া সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার ক্ষমতায় তাঁহাকে অতিক্রম করা দূরে থাক্, কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন কি না সন্দেহ, তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার যুক্তি একদিকে যেমন অকাট্য হইত অন্য দিকে তেমনি তাঁহার অনর্গল সরল সতেজ চোস্ত ইংরেজী শুনিয়া ইংরেজী ভাষায় শুচিবাগীশরাও তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইত।"

আদালতে যে শোকসভা হইয়াছিল, তাহাতে বর্ত্তমান অস্থায়ী চীফ জষ্টিস্ মহোদয় চৌধুরী মহাশয়ের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে মিষ্টার চৌধুরী হাইকোর্টের উকীল সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক সফলকীর্ত্তি আইনজ্ঞদের অগ্রণীদিগের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলী, তাঁহার অমায়িকতা ও সৌজন্য কি বিচারকমণ্ডলী, কি উকীল সম্প্রদায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি সদয় সুব্যবহারে নবীন উকীলদিগের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জল চিত্তচমৎকারজনক ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ থাকিতেন এবং তাঁহার যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে; তিনি সেই শেষবার আসিয়া হাইকোর্টের পুরাতন বাড়ীতে প্রধান বিচারপতির এজলাসে এক মোকদ্দমায় ওকালতি করিতেছিলেন। হয় উহা ১৯১২ অব্দের শেষ অথবা ১৯১৩ অব্দের আরম্ভের কথা। তখন আমি সবে মাত্র হাইকোর্টে যোগ দিয়া ব্যবসায়ে হাত দিয়াছি। চৌধুরী মহাশয় তখন প্রায় ৪২ বৎসর প্র্যাক্‌টিস করিয়া কার্য্যতঃ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ও কালেভদ্রে কখন বিশেষ কোন মোকদ্দমা থাকিলেই আসিতেন। তাঁহার সেই শেষবারের উপস্থিতির দিন আমি তাঁহার পিছনে বসিয়া অনন্যমনে তাঁহার যুক্তি তর্ক শুনিতেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে- সে-দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আদালত শুদ্ধ লোক তাঁহার মোকদ্দমার পরিচালন কৌশল এবং ওকালতি যে অসাধারণ ও স্মরণীয় হইয়াছিল তাহা স্বীকার করেন। ঐ সময় শুনিলাম তাঁহার আর

পূর্ব্বের মত গলার জোর নাই, কিন্তু তাহা না থাকিলেও তাঁহার বাগ্মিতায় কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার প্রয়োজন সাধক যথাযথ শব্দের প্রয়োগ কৌশলে এই পথের নূতন পথিক আমার মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।"

শেষ ১৫ বৎসর তিনি আর আদালতে যান নাই। দেশেও বড় যাওয়া-আসা ছিল না। আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে যখন দেশে যাইতেন বাক্সার দরিদ্রগ্রামবাসীদের জন্ত স্বতন্ত্র করিয়া টাকার থলি লইয়া যাইতেন এবং তথায় তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতেন; এলাহাবাদের "বঙ্গ সাহিত্য মন্দির" প্রতিষ্ঠাকালে তাঁহার অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালীদের ইণ্টারমীডিএট কলেজ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অর্থ সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে। তাঁহার পরিবারবর্গ এখানেই বাস করিতেছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী, এম-এ, এল এল ডি মহাশয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের উপস্থিত অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি পিতার পাণ্ডিত্য, অধ্যয়নশীলতা, বিনয় ও সৌজন্য আদি বিবিধ সদগুণের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ছাত্রবন্ধু শিক্ষা-জগতে বিরল।

দুঃখ-সম্রাট

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হে সম্রাট শক্তিমান, তব ছত্র-তলে
সুস্নিগ্ধ স্নেহের ছায়ে পালিছ আমারে
নিশিদিন অনন্ত আদরে। কত ছলে
শত শোকে, সঙ্গীহীন বিপদ-পাথারে।
বহিয়া এনেছ ক্ষুদ্র শিশু চিত্ত মোর
জিয়াইয়া তপ্ত বক্ষে, করিয়ে বিভোর
শক্তির আনন্দ মাঝে; নিজ হাতে তব
যে বর্ম্ম পরায়ে দেছ দৃপ্ত অভিনব—
তারি পরে জগতের শতেক শাসন
আছড়ি' ভাঙিয়া পড়ে। কঠোর বেদন,
তোমার সুচির সখী, জননীর সম
অঙ্কে ঢাকি' পালিছেন ক্ষুব্ধ প্রাণ মম।
হে সম্রাট, জন্মে জন্মে তোমারি পতাকা
বহিয়া জিনিব সিন্ধু—দুর্দ্দম বলাকা।



জ্ঞানযজ্ঞ

দেবতারা আমাদিগকে কি না দিতেছেন—সূর্য্য-দেবতা প্রাণ-চৈতন্ত তেজ দিতেছেন, চন্দ্র-দেবতা সুধারস জ্যোৎস্না দিতেছেন, আকাশ-দেবতা বৃষ্টি দিতেছেন, তবেই আমরা বাঁচিয়াবর্ত্তিয়া থাকিয়া নিয়মিতরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেছি। আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যে, আমাদের উপর দেবতাগণের এইরূপ অজস্র কল্যাণ বর্ষণের একটা যথাসাধ্য প্রতিদান আমরা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া দিই। আমাদের দেশের যজ্ঞকর্ত্তারা ইন্দ্রাদি অগ্নকথায় আকাশাদি দেবতাগণকে বেদমন্ত্রদ্বারা আবাহন করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্যমিশ্রিত ঘৃতাহুতি নিবেদন করিয়া দিতেন। গীতা কিন্তু বলিতেছেন যে, সকল দেবতার পরম দেবতা—পরব্রহ্মের উদ্দেশে যদি যজ্ঞ করিতে হয় তবে দ্রব্যময় যজ্ঞের পরিবর্ত্তে জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে এইরূপ যে—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

পাঠকের আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, উদ্ধৃত শ্লোকটির শেষের দুই চরণ প্রথম দুই চরণের বিরোধী। তার সাক্ষী প্রথম দুই চরণে জ্ঞানকে যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গীভূত করিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, শেষের দুই চরণে উল্টা ধরণের আর একটি কথা বলা হইয়াছে এই যে, জ্ঞানের উদয় হইলে যজ্ঞাদি সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিঃশেষে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। যেমন তপ্তশিলায় জলবিন্দু পড়িলে তাহা তৎক্ষণাৎ শূন্যে পর্যবসিত হয়, প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নির কাছ ঘেঁসিবামাত্র যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মও তেমনি তৎক্ষণাৎ পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলে দাঁড়ায় যে জ্ঞান-যজ্ঞ সোনার পাথর-বাটির ন্যায় একটা অর্থশূন্য শব্দ বই আর কিছুই নহে। পাঠকের জানা উচিত যে, একজন তুখোড় দার্শনিক পণ্ডিতের সূক্ষ্ম বিচারে জ্ঞান যদিচ কর্ম্মের কোঠায় স্থান পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি যখন তাঁহার দর্শনের গিরিশিখর হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন সেক্ষেত্রের একপদ অগ্রসর হইতে-না-হইতেই তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বলেন, আমি এটা বেশ জানি যে, জ্ঞানকে কর্ম্মের কোঠায় স্থান দেওয়া বিচার-সঙ্গত নহে. কিন্তু তিনি যখন বলেন "আমি বেশ জানি" তখন ভাষাবোধ যাঁহাদের স্বল্পমাত্রও আছে তাঁহারা বলিবেন যে "আমি জানি" এই বাক্যটির কোঠার ভিতরে কর্ত্তা হচ্ছে "আমি" এবং ক্রিয়া হচ্ছে "জানি।" এইরূপ তোমার আপনার কথাতেই দাঁড়াইতেছে যে বসা বা দাঁড়ান যেমন একটি কর্ম্ম বিশেষ, জানাও তেমনি একটি কর্ম্ম-বিশেষ। তবে আর কোন্ লজ্জায় বলা চলে যে জ্ঞান কর্ম্মের কোঠায় স্থান পাইবার মূলেই যোগ্য নহে? স্বয়ং জ্ঞানই যখন একটি কর্ম্ম-বিশেষ, তখন আর জ্ঞানযজ্ঞে কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? জগতের মূল প্রকৃতিতে চৈতন্যস্ফুরণের উদ্যোগ মাত্রই কর্ম্ম,. অতএব কর্ম্ম ছাড়িয়া জ্ঞান নাই। কর্ম্ম শক্তি, জ্ঞান মুক্তি, উভয়ের মিলনে পরমানন্দের অভিব্যক্তি।

(বঙ্গলক্ষ্মী, কার্ত্তিক ১৩৩৫) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত?

ইতিহাস লিখিতে গেলে যে মাল-মসলা পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইতিহাস গড়িয়া লইতে হয়। ইংরাজেরা গোড়ায় যে মাল-মসলা পাইয়াছিলেন, তাহার সমস্তই মুসলমানদের দেওয়া। সুতরাং তাঁহারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্ব যখন আরম্ভ হয়, তখন হইতেই ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার আগে হিন্দুরা রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, তাঁহাদেরও ইতিহাস কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু সে সব সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত তখন ইংরাজেরা কিছু জানিতেন না। সুতরাং মুসলমানেরা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারা হিন্দুর ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে পারেন নাই।

মিলের ইতিহাস পড়িলে, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে সত্য, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়।

মিলের পর প্রায় ৪০ বৎসর পরে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন। তখন অনেক সাহেব সংস্কৃত পড়িয়াছেন, কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথিও সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু সে সংস্কৃত সকলে পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং এলফিন্‌ষ্টোনকে মুলসমানদের ভারত অধিকারের সময় হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি কেবল সাহিত্যের কথাই কিছু কিছু বলিয়াছেন। রাজবংশ, রাজাদের ইতিহাস কিছুই বলিতে পারেন নাই।

ইহারও ২০ বৎসর পরে মার্শমান্ সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন, হিন্দুদের ইতিহাস সবে ১৬ পাতা, মুসলমানদের প্রায় ২৫০ পাতা, দুই ভলিউমের বাকী প্রায় সব ইংরাজের কথা।

কিন্তু এই দীর্ঘ কালের ইউরোপীয়েরা কতকগুলি সংস্কৃত বই পড়িয়াছিলেন। অনেক শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, অনেক সিকা পড়িয়াছিলেন, বিদেশী লোকে ভারতবর্ষের কথা কে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বিদেশীয়দিগের লিখিত ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা উপায়ে ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিতেছিলেন। কেবল ভাল করিয়া পড়েন নাই সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি। আর যে-সব মাল-মসলা পণ্ডিতেরা পাইয়াছিলেন, যাঁহারা ইতিহাস লিখিতেন, তাঁহাদের সে-সকল প্রায়ই পড়া ছিল না। সুতরাং ইতিহাস সেই পুরাণো ধারায় চলিয়া আসিতেছিল।

এই দীর্ঘ কালের মধ্যে হিন্দুদের দুইটি ইতিহাসের ঘটনা মাত্র স্পষ্টরূপে জানা গিয়াছিল। একটি বুদ্ধদেবের জন্ম, অপরটি অশোকের শিলালিপি।

১৮৯৫ সালে আমার ইচ্ছা হইল, বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান-আক্রমণ পর্য্যন্ত এই সময়ের—ষোল সতের শত

বৎসরের একটা একনাগাড়ে ইতিহাস লিপি। কিন্তু মাল-মসলা ঐ। আমি তখন ইউরোপীয়দিগের শিষ্য—যে বইএর গ্রন্থকারের পরিচয় না পাইয়াছি, সে বই গ্রহণ করি নাই। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি বই আমাকে পরিহার করিতে হইয়াছিল।

ইহারই কয়েক বৎসর পরে এলাহাবাদ গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব পেন্সন্ লইয়া দেশে যান এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের কোথায় কি ইতিহাসের খবর বাহির হইতেছে, তিনি সেগুলির খুব সন্ধান লইতেন এবং সেগুলি হইতে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই আপনার পুস্তকে ভরিয়া লইতেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার জানা ছিল না; এমন কি সংস্কৃতে যে-সমস্ত বই ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও তিনি পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ইতিহাসও সেই বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ।

অনেক সংস্কৃত বই ছাপা হইয়াছে। ভালই হউক, মন্দই হউক, ছাপা হইয়াছে। তাই পড়িয়া যাহারা ইতিহাস লিখিতে চাহিবে তাহাদের কথা বলিতেছি।

সে চেষ্টা করিতে গেলে, কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে? এক একবার মনে হয়, পুরাণ যেমন আরম্ভ করিয়াছে, প্রজাপতিদিগের সময় হইতে আরম্ভ করা ভাল। ব্রহ্মার মানস পুত্র দশ জন—তাঁহাদের সময় হইতেই আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু এ কালের লোক বলিবে, সে-সকল কল্পনামাত্র, সে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। আমার নিজের মত, সেইখান থেকেই আরম্ভ করা ঠিক। সকল দেশেরই ইতিহাসের গোড়ায় খানিকটা কল্পনা থাকে। সেই কল্পনা হইতে ক্রমে ইতিহাসের ক্ষেত্রে লোকে নামে এবং একটি ইতিহাস গড়িয়া ফেলে।

কিন্তু আমি এখন আমার মত জাহির করিতে চাই না। লোকে যাহা লইতে চাহে, এমন মতই প্রকাশ করিতে চাই। আমি বলি, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইতে আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত।

পুরাণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে ধারাবাহিক ইতিহাস ও সময়-তালিকা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছয় মাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হন। তিনি ৭১ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন ও ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নাতি পরীক্ষিৎকে রাজা করিয়া যান। পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে নন্দ রাজার রাজত্ব পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, মগধবংশের রাজাদিগের ধারাবাহিক নাম ও রাজত্বের কাল পাওয়া যায়। রাজ্যকালের সমষ্টি ১০৫০ বৎসর। নন্দ রাজার অভিষেক খৃঃ পূঃ ৪২৫ বৎসরে হইয়াছিল। সুতরাং পরীক্ষিতের অভিষেক ১৪৭৫ খৃঃ পূঃ হইয়াছিল। ইহাতে ৩৭ বৎসর যোগ করিলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় (১৫১২ খৃঃ পূঃ) পাওয়া যায়। আমি বলি, এইখানেই আমাদের আরম্ভ করা উচিত।

এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধদেবের জন্ম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল। সুতরাং হিন্দুদের যদি কিছু গৌরবের থাকে, এই সময়েই আছে।

পার্জিটর সাহেব তাঁহার কলি যুগের ইতিহাসে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ১৪৭৫ খৃঃ পূঃ ধরিয়া, তাহার পরে যে আর একখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে ১৪৭৫কে ক্রমে কমাইয়া ১০০০এ দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, তিনি এ কার্য্যটি অন্যায় করিয়াছেন। কেন বলি, তাহার কারণ পরে জানাইতেছি।

কৌটিল্য খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে ৩৫০এর মধ্যে তাঁহার অর্থশাস্ত্র লেখেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, দণ্ডই রাজার বিদ্যা অর্থাৎ রাজারা দুষ্টের দমন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—না, তাহা হইবে না, শুধু দণ্ড দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। প্রজাদের ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ তাহারা যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কৃষি-বাণিজ্য ও পশুপালন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। কৃষি, বাণিজ্য ও গো-পালনের নাম এক কথায় বার্ত্তা। মানবেরা বলিলেন, শুধু দণ্ড ও বার্ত্তায় হইবে না, তাহাদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। কিন্তু চাণক্যের আচার্য্যেরা বলেন—না তাহাতে হইবে না, তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। এই যে চারি থাকে অর্থশাস্ত্রের উন্নতি, এ উন্নতি হইতে কত দিন লাগে? ইউরোপে এ উন্নতি হইতে প্রায় বারো শত বৎসর লাগিয়াছিল। রোমান রাজত্বের ধ্বংস (৪৭৬ খৃঃ অঃ) হইয়া গেলে যে অসভ্যেরা ইউরোপ দখল করিল, তাহারা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করাই আপনাদের মূল কার্য্য বলিয়া মনে করিল। কৃষিবাণিজ্যাদির তত ভাল ব্যবস্থা বোধ হয় ছিল না। সেই-জন্য চারি পাঁচ শত বৎসর পর হইতে ব্যবসায়ীরা আপনাদের ব্যবসায় রক্ষার জন্য জোট বাঁধিতে লাগিল। ক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা গেল, সকল দেশে সকল রাজ্যের প্রায় ১৫০টি বণিক্-নগর জোট বাঁধিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। ইহাতে রাজাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। তখন রাজারা ঐ জোট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং আপনারা বাণিজ্যাদির ভার লইতে লাগিলেন। তাহার পর যখন ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কনষ্টাণ্টিনোপল্ দখল করিয়া লইল এবং সেখানকার গ্রীক্ পণ্ডিতেরা পশ্চিম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িলেন, তখন রাজারা তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া এবং শিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। আর এখন বিংশ শতকে সকল রকম লেখাপড়ার ভারই রাজারা লইয়াছেন। চাণক্য যে চারিটি থাকের কথা বলিয়াছেন, এও ত সেই চারিটি থাক। ইউরোপে যদি এই চারিটি থাক জমিতে চৌদ্দ পনেরো শত বৎসর লাগিয়া থাকে, তবে কৌটিল্যের লিখিত চারিটি থাক জমিতে কত বৎসর লাগা উচিত? আমার বোধ হয়, আরও বেশী বৎসর লাগা উচিত। কারণ, ইউরোপের সমাজ একটা সভ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর স্থাপিত, আর আমাদের সব গড়িয়া লইতে হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৩৫০ বৎসর চাণক্যের সময় হইতে যদি এই চারি থাকে ১২০০ বৎসরও লাগে, তাহা হইলে ত ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১৬০০ বৎসরে পঁহুছিবে।

এ ত গেল রাজনীতির কথা। ধর্ম্মনীতিতে দেখুন। রোম-রাজ্য যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন ধর্ম্মের কি অবস্থা ছিল? রোম-সাম্রাজ্যের লোক কতক খৃষ্টান হইয়াছিল, অসভ্যেরা আপনাপন ধর্ম্ম লইয়া থাকিত। শেষ শার্লেমেনের সময় Holy Roman Empire হইলে, রাজা হইলেন শার্লেমেন, পোপ হইলেন ধর্ম্মের কর্ত্তা। ক্রমে সব অসভ্যদেশ খৃষ্টান হইয়া গেল। রোমের প্রভাব খুব বাড়িয়া উঠিল। ভিক্ষুরা প্রবল হইল। তাহার পর এই ভিক্ষুকদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য অনেকবার অনেক জায়গায় চেষ্টা হয়। পনেরো শতকে লুথারের চেষ্টা সকলের চেয়ে সফল হইয়াছিল। তারপর এখনকার অবস্থা সকলেই জানেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র ধর্ম্মযাজক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের একাধিপত্য হইল। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিপথের পথিক হইলেন, অনেকে ভিক্ষু হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে আর মানিতেন না। তাই সাত আটটি নূতন ধর্ম্ম হইল। ইহারা

কেহই ব্রাহ্মণ মানে না, চেলাও চের করে। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় খুব বড় হইল। ধর্ম্মের এত পরিবর্ত্তন করিতে কত সময় লাগে? ইউরোপে ভিক্ষু মারিয়া পাদ্রী হয়, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ মারিয়া ভিক্ষু হয়, এইমাত্র তফাৎ। কিন্তু এ কাজ করিতে কত বৎসর লাগে? পার্জিটরের মত মানিতে হইলে চারি পাঁচ শত বৎসরে এত কাজ করিতে হয়; কিন্তু তা করা যায় না। ইউরোপে যতদিন লাগিয়াছিল, আমাদেরও ততদিন লাগা উচিত, বরং বেশী।

কুরুক্ষেত্রের পর বেদের ব্রাহ্মণভাগ সৃষ্টি হইতে থাকে। কারণ, ব্রাহ্মণ ত শাখাভেদের পর আর শাখাভেদ জিনিষটা বেদব্যাসের শিষ্যেরা করেন। তখন ব্যাকরণের কি অবস্থা ছিল? অক্ষর ধরিয়া ব্যুৎপত্তি হইত। 'সা' একটা শব্দ, 'ম' একটা শব্দ, দুইটি মিলাইয়া হইল 'সাম'। ছান্দোগ্য উপনিষদের গোড়াটাই দেখুন না, এ রকম অনেক ব্যুৎপত্তি তাহাতে আছে। 'নদী'র 'ঈ'-কার পূর্ব্বরূপ 'অর্থে'র 'অ' কার পররূপ, উভয়ে মিলিয়া 'ঘ'-কার একাদেশ হইল। বেদের মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, সংহিতা ও পদপাঠ পড়িতে এই 'ঘ'-কার কোথা হইতে আসিল, এই তর্ক লইয়া সংহিতা-উপনিষৎ হইল। এই সংহিতা-উপনিষৎ অনেক শাখাতেই আছে। এই সকল অতি সামান্ত ব্যাকরণের চর্চ্চা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৯০০ ধাতু হইতে সমস্ত শব্দরাশি উৎপন্ন হইয়াছে,—এই মতে উপস্থিত হইতে কত বৎসর লাগে? পাণিনি ত ঐ ১৯০০ ধাতুই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে আর দশ জন ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। দশ থাক ব্যাকরণ লিখিতে কত বৎসর লাগে? পাণিনির সময় ৪০০—৫০০ খৃঃ পূঃ। এই দশ থাক ব্যাকরণ লিখিতে যদি দশ শত বৎসর লাগে, তাহা হইলে ত ১৪০০ বৎসর।

ইউরোপে নাট্যশাস্ত্র কিরূপে আরম্ভ হয়? প্রথম থাকে Mystery play, রোমান্ ক্যাথলিক্ ভিক্ষুরা কথা না কহিয়া প্যাণ্টোমাইম্ করিত। তাহার পর Miracle play হয়। তার পর থিয়েটার হয়। সে থিয়েটারে সিন্ ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু এই যে স্তরে স্তরে উন্নতি, ইহাতে ইউরোপে কত বৎসর লাগিয়াছিল? আমাদেরও দেবাসুরের যুদ্ধ লইয়া প্রথম প্যাণ্টোমাইম্ আরম্ভ হয়। বর্ষা যায়, শরৎ আসে, এমন সময় দেবতারা অসুরদের জয় করিয়া এই ইন্দ্রধ্বজ খাড়া করিলেন। এখনও ইন্দ্রধ্বজ নেপালে আছে, মহীশূরে আছে। কৃষ্ণ মথুরায় ইন্দ্রধ্বজ তোলা বন্ধ করিয়া দেন, তাইতে তাঁকে গোবর্দ্ধন ধারণ করতে হয়। দেবতারা ইন্দ্রধ্বজের চারিপাশে কেমন করিয়া অসুর বধ করিয়াছিলেন, তাই প্যাণ্টোমাইম্ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। অসুরেরা ব্রহ্মার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইল,—"আমাদের একে ত হারাইয়াছে, তাহার উপর আবার অপমান করিতেছে!" ব্রহ্মা এলেন, বিষ্ণু এলেন, শিব এলেন,—দেবতারাও সমুদ্রমন্থন দেখাইলেন, ত্রিপুরদাহ দেখাইলেন। তাঁরা বলিলেন, "বাঃ! বাঃ! বেশ হয়েছে!" ব্রহ্মা বলিলেন, "এদের বেশ দেওয়া চাই," বিষ্ণু বলিলেন, "এদের প্রহরণ দেওয়া চাই," শিব বলিলেন, "এদের একটু নাচ দেওয়া চাই।" এই রকমে ক্রমে পাকাপাকি থিয়েটার হইয়া দাঁড়াইল। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এ ত নাটকের উৎপত্তি হইল,—কত নাটক জন্মাইলে একটা নাট্যসূত্রের দরকার হয়? পাণিনিরও আগে তিন রকম নাট্যসূত্র অন্ততঃ ছিল। এক ত ভরত মুনির, এক শিলালীর, আর এক কৃশাশ্বের। আর কত ছিল, আমরা জানি না। এই সকল সূত্রের ভাষ্য হইত, টীকা হইত, সংগ্রহ হইত, নিরুক্ত হইত, কারিকা হইত। এই সমস্ত সূত্র,ভাষ্য; নিরুক্ত ইত্যাদি একত্র করিয়া, তবে ত নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। নাট্য-সূত্রও ইউরোপে এখনও হয় নাই, নাট্যশাস্ত্রও ইউরোপে এখনও হয় নাই। দেবাসুরের যুদ্ধের নকল হইতে থাকে নাট্যশাস্ত্রে উঠিতে কত সময় লাগে? দু' পাঁচ শত বৎসরে হয় না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতেই আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ৩৭ বৎসর, পরীক্ষিতের রাজত্ব ৩৭ বৎসর, জন্মেজয়েরও প্রায় সেইরূপ,—তাঁহার পুত্র শতানীক, তাঁহার পুত্র অশ্বমেধদত্ত, তাঁহার পুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র নিচক্ষু। পরীক্ষিতের সময় ভাগবত তৈয়ারী হয়, জন্মেজয়ের সময় মহাভারত প্রথম প্রকাশিত হয়, শতানীকের সময় ভবিষ্যপুরাণ লিখিতে আরম্ভ করা হয়, বাকী পুরাণ সমস্তই অধিসীমকৃষ্ণের দোহাই দেয়। পুরাণে এই সকল রাজার কাল বর্ত্তমান কাল বলে। ইহার পূর্ব্বের ঘটনা ভূতকাল বলিয়া লেখা হয় এবং ভবিষ্যতের ঘটনা ভবিষ্যতের বিভক্তি দিয়া লেখা হয়। নিচক্ষুর সময় হস্তিনাপুর গঙ্গাসাৎ হইয়া যায়। পাণ্ডববংশীয়েরা তখন কৌশাম্বীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। এই বংশে সঙ্গীত ও নাট্যসূত্রকর্ত্তা ভরতের জন্ম। এই বংশে সম্রাট উদয়নেরও জন্ম,—যিনি হস্তিবিদ্যায় অদ্বিতীয়, বীণাবাদনে অদ্বিতীয়, প্রজাপালনেও অদ্বিতীয়। এই উদয়নই বোধ হয়, বুদ্ধদেবের তুল্যকালিক।

(সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

—

শিক্ষা-সমস্যা

পরীক্ষার আদর্শ শ্লথ ও অস্বচ্ছ হওয়ায় দেশের শিক্ষাদীক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলন আগাইতেছে,—না পিছাইতেছে—ইহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। Experimentএর কাল অতীত হইয়াছে—এখন জাতীয় জীবন-যাত্রা, অন্ন-সমস্যা ও দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কিরূপ ফল ফুলের জন্ম হইল—তাহার হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে।

১। দরিদ্রদেশে অন্নসংস্থানের উপযোগিতা লাভের জন্যই বালকেরা বিদ্যালয়ে আসে। সেই উপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট হয়, পরীক্ষা পাশের দ্বারা। অধীত বিদ্যা কাজে লাগিবে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ সকলের, কিন্তু পরীক্ষাপাশের সার্টিফিকেট যে কাজে লাগিবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেজন্য সকল শিক্ষার্থীই পরীক্ষার পানেই চাহিয়া থাকে। এই পরীক্ষা পাশ দুরূহ হইলেই বাধ্য হইয়া পরিশ্রম করিয়া পড়িতে হয়—সহজ হইলেই পড়াশুনায় শিথিলতা আসে। যতটুকু পড়িলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় ছেলেরা ততটুকুই পড়ে। ইহা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হইলেও পরীক্ষার্থীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ছেলে পরীক্ষা পাশ করিলেই অভিভাবক সন্তুষ্ট—শিক্ষকরাও পরীক্ষাপাশের যোগ্যতা জন্মিলেই কর্ত্তব্য শেষ মনে করেন। যোগ্যতা সম্বন্ধে সামান্ত সন্দেহ থাকিলেও পরীক্ষা দিতে বাধে না। পরীক্ষাই শিশুকাল হইতে ছাত্রের শিক্ষাজীবনের একমাত্র নিয়ামক। অষ্টম শ্রেণী হইতে বি-এ, এম-এ পর্য্যন্ত আগাগোড়া তারে-তারে গাঁথা। পরীক্ষার গ্রন্থি শিথিল হইলেই আগাগোড়া সবই শিথিল। সহজ পরীক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া—স্কুলে প্রথম প্রবেশাধিকার শ্রেণী হইতে শ্রেণ্যন্তরে উন্নয়ন (Promotion), শেষ-পরীক্ষায় অনুমতি লাভ, শিক্ষকদের শিক্ষা-পদ্ধতি, অর্থ, পুস্তকাদি রচনা সমস্তই আগাগোড়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

২। পরীক্ষার শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজের শাসন-

শৃঙ্খলার যে শিথিলতা আসিয়াছে তাহা শিক্ষক মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। পরীক্ষা পাশের জন্যই যাহারা স্কুল-কলেজে আসে ঐ পরীক্ষা পাশ যত কঠোর হইবে—ততই তাহারা মন দিয়া শিক্ষকের অধ্যাপনা শুনিবে—শিক্ষকগণকে মানিয়া চলিবে, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে—বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মানিয়া চলিবে। পরীক্ষা পাশ যত সহজ হইবে,—শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন ততই কমিয়া আসিবে—শিক্ষককে ততই অগ্রাহ্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে,—পড়াশুনায় অমনোযোগী হইবে—ক্রমে স্কুলের নিয়মকানুন উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিবে। ইহাই স্বাভাবিক। হইতেছেও তাই। সহজ পরীক্ষা তাই ছাত্রদের কেবল অলস, পরিশ্রম-বিমুখ, আরামপ্রিয় করে নাই—কতকটা উচ্ছৃঙ্খলও করিয়াছে।

এই উচ্ছৃঙ্খলতা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংক্রামিত হইতেছে। ইহা স্বভাবের অন্তর্গত হইয়া উঠিতেছে, ফলে সমগ্র জাতীয়-জীবনে একটা বিশৃঙ্খলতা আনিতেছে। যে-সকল দুঃশীল বালক কঠোর পরীক্ষায় পাশ হইতে না পারিয়া স্কুল হইতেই বিদায় লইত—তাহারা অনায়াসে কলেজের শ্রেণীতে গিয়া বসিতেছে—তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতা স্কুল হইতে কলেজে লইয়া যাইতেছে—কলেজে দুঃশীলতার ক্ষেত্র স্কুল হইতে আরো অবাধ আয়ত ও অনুকূল। স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা আংশিক ভাবে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া একবৎসরের জন্য শিক্ষাশ্রমকে উপেক্ষা করিতে থাকে তাহাদিগকে দুঃশীল ছাত্রগণ সহজেই দলে টানিতে পারে। স্কুলের শিক্ষাই যাহাদের সমাপ্ত হয় নাই তাহারা কলেজে পড়ার অভিমানে সহজেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অধ্যাপকদের কত ক্লেশে যে ক্লাশ শাসন করিয়া পড়াইতে হয়—তাহা অধ্যাপকগণ মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন।—অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে বলিয়া অনেকেই তাহা প্রকাশ করেন না—'বঞ্চনা চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ'। এ কথা অন্যে না বুঝুন মতিমান্ অধ্যাপকেরা বুঝেন।

এই যে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব তাহা স্কুল-কলেজেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ঘরে বাহিরে সকল গুরুজন, প্রবীণ ও নমস্য ব্যক্তিই নিত্যই ছাত্রগণের শ্রদ্ধাশূন্যতার ফলভোগ করিতেছেন। ইহা তরুণ সাহিত্যে ও তরুণ রাজনীতি-ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হইয়াছে। আজকাল স্কুল-কলেজে কেবল যে ছাত্রদ্রোহের কথা শুনা যায়—সভা-সমিতিতে যে ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়,—প্রবীণ দেশগুরুগণকে যে তরুণ লেখনীর উদ্ধত অগ্রাহ্য সহ্য করিতে হইতেছে সহজ পরীক্ষা পাশ তাহার জন্য যে কতটা দায়ী—তাহা কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

৩। শিক্ষাদানকে যাঁহারা ব্যবসায় হিসাবে চালাইতে চাহেন—তাঁহাদের পক্ষে ছাত্রের সংখ্যাধিক্যই ব্যবসায়ের মূলধন। তাঁহারা সহজ পরীক্ষার প্রসাদে লাভবান হইতেছেন,—ছাত্র-সংখ্যার প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক মমতার ফলে ছাত্রের সাতখুন মাফ হইয়া পড়ে। নির্ব্বিচারে ছাত্রসংখ্যা বাড়িলেই শাসনশৃঙ্খলা শিথিল হইয়া উঠে। এই সকল বিদ্যালয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমে সুশাসিত বিদ্যালয়েও সংক্রমিত হইতেছে কি না তাই বা কে বলিল? শাসন-শৃঙ্খলার আদর্শ এতই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য ভর্ৎসনাতেও আজ ছাত্রগণ ক্ষেপিয়া উঠেন।

৪। সুলভ পরীক্ষা পাশে ধনি-সন্তানগণের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত ছাত্রদের জীবন সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া পড়িয়াছে। যে-সকল ধনিসন্তান অতিরিক্ত বিলাসী, আরামপ্রিয় ও শ্রমবিমুখ তাহারাও আজকাল সহজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাহাদের পরীক্ষা পাশে কাহারো আপত্তি নাই। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তানদের আর উঠিতে দেয় না, সেটা দেশের পক্ষে খুব শুভঙ্কর বলিয়া মনে হয় না। চাকুরী, ডাক্তারি, ওকালতি, উচ্চশিক্ষামূলক ব্যবসায় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তাহারা পিতৃপ্রতিপত্তি, প্রচুর অর্থবল, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন, নানা প্রকারের মূলধন, সহায়-সম্বল লইয়া অবতীর্ণ হইলে—দৃঢ়চরিত্র শ্রমশীল মধ্যবিত্ত ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পদবীমণ্ডিত হইয়াও তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় মুহুর্মুহুঃ পরাজিত হইয়া পড়ে,—তাহারা বহুশ্রমার্জ্জিত বিদ্যার প্রয়োগের অবসর বা ক্ষেত্রই পায় না। এক সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইবার ক্ষেত্রই নাই। সুলভ পরীক্ষাপাশ প্রকারান্তরে বিদ্যার মর্য্যাদা কমাইয়া ধনেরই মর্য্যাদা বাড়াইয়াছে,—দরিদ্রের জীবন সংগ্রামকে যথেষ্ট ক্লেশাবহ করিয়া তুলিয়াছে। দেশের সমস্ত আন্দোলন মধ্যবিত্তগণের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। উপরে বণিক ও বণিক-সম্প্রদায়, নীচে শ্রমিক সম্প্রদায়, মাঝখানে যাহারা, তাহারাই অবিরত নিপীড়িত ও পিষ্ট হইতেছে। সুলভ-পরীক্ষা পাশ তাহাদের পক্ষে নূতন আর একটি চাপ।

৫। সুলভ পরীক্ষাপাশে মুসলমান-সম্প্রদায়ের যে সুবিধা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরীক্ষা পাশ সুলভ না হইলে এতদিন হয়ত তাহাদের বিদ্যাবিচারের জন্য স্বতন্ত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইত—অথবা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিতে হইত। পক্ষান্তরে আবার দেশে যে এত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বাড়িয়া চলিয়াছে—সুলভ পরীক্ষা পাশ তাহার মূলে কি না তাই বা কে বলিল?

৬। পরীক্ষা পাশের আদর্শ যেমনই থাকুক্—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের কোন' অসুবিধা নাই—তাহারা উপরে উঠিবেই,—তাহারা কোন' কালে পরীক্ষার পানে চাহিয়া শিক্ষার্থী হয় না। সেই শ্রেণীর ছেলেদের দেখাইয়া পরীক্ষা পাশের সুলভতাকে সমর্থন করা যায় না। দুর্মেধাঃ দুঃশীল ছেলেদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে—তাহারা যদি অসদুপায় অবলম্বন না করে—তাহা হইলে মধ্যপথে কোথাও না কোথাও ঝরিয়া যাইবেই। কিন্তু যাহাদের মাঝামাঝি ধরণের বুদ্ধিশুদ্ধি ও যোগ্যতা তাহারা পরীক্ষার অনুচ্চ ও শিথিল আদর্শের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করিতে যে পারে না—সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা যতটা শিক্ষা লাভ করিতে পারিত—ততটা লাভ করিবার সুযোগ-সুবিধা প্রেরণা বা উদ্দীপনা এ ব্যবস্থায় পাইতে পারে না।

৭। সুলভ পাশের আমলে যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছে—তাহাদের বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে কোন কোন সাধনার উল্লেখ করিয়া সুলভ পরীক্ষা পাশকে কেহ কেহ সমর্থন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানানুশীলনের উপকরণ বাড়িয়াছে এবং এই উপকরণের সহায়তায় কেহ কেহ সারস্বত সাধনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—সুলভ পরীক্ষা পাশের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ আছে? ইহার মূলে আছে স্যার আশুতোষের ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের মনীষা—আর ঘোষ-পালিতের অর্থ-সাহায্য। বাংলার যুবকেরা আজ যদি দেশে বিদেশে কৃতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন—তবে তাহা কি সুলভ পরীক্ষা পাশের ফলে? এই বিশ বৎসরে বাংলা দেশ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থাতেও এতটা অগ্রসর হইত না? জগৎব্যাপী নব জাগরণের সাড়া কি

বাংলায় পৌঁছায় নাই? যুগধর্ম্মের প্রভাব হইতে কি বাংলাদেশ বঞ্চিত? এযুগের এক একটি বছর কতটা কর্ম্মঘন চিন্তানিবিড়? ইউরোপীয় বিজ্ঞান সাহিত্য কি কৃতীছাত্রের মনে উচ্চকাঙ্ক্ষা জাগায় নাই? বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ, আশুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জনের প্রভাব কি দেশে কোন কাজই করে নাই? তাহা ছাড়া দেশে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ ও রাজনীতিক আন্দোলন বাঙালীযুবকের কৃতিত্বলাভে সহায়তা কি করে নাই? বিশ বৎসরের বাঙ্গালী যদি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাকে—তবে সে অগ্রসর হইয়াছে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যায়। জগদীশচন্দ্রের সাধনা,—মেঘনাদ, জ্ঞানচন্দ্র, নীলরতন ইত্যাদির কৃতিত্বের সঙ্গে সুলভ পরীক্ষা পাশের কোন' সম্পর্ক নাই। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিজয়িনী খ্যাতি ও তাঁহার শিষ্যদের সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আর আজ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শিল্পশিক্ষালয়ের নেতৃত্ব লইয়াছে যে বাঙ্গালী চিত্রকরেরা—তাহারা বিশ্ব-ভারতীর কাছে ঋণী, অবনীন্দ্র, নন্দলালের কাছে ঋণী—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কোন ভাবেই ঋণী নয়।

৮। সুলভ পরীক্ষা পাশ দলে দলে বাংলার বালকদের স্কুল কলেজে টানিয়া আনিয়াছে—তাহারা গড্ডালিকা প্রবাহে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয় বলে—"আমার এই কাজ—তাহারা ভবিষ্যতে কি করিবে—কি করিয়া খাইবে—সে কথা বাৎলাইয়া দিবার কথা আমার নহে।" বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বিকার থাকিতে পারে—দেশের লোকের নির্ব্বিকার নিশ্চি থাকিলে চলিবে কেন? পরীক্ষা পাশের টোপ' না থাকিলে বহু ছাত্রই কৈশোরে সরিয়া পড়িত—। প্রশ্ন হইতে পারে, সরিয়া পড়িয়া কি করিত? কেন? কেহ পিতৃব্যবসায় করিত—কেহ দোকান করিত—কেহ দূর দেশে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিত—অন্নের জন্য সংগ্রাম করিত—নিজের পথ কাটিয়া লইবার জন্য ভাবিত—উপায় অবশ্য বাহির করিত—সময় থাকিতে কোন কাজে ঢুকিয়া পড়িয়া গ্রাজুয়েট হইবার বয়সে কৃতী হইয়া উঠিত—আর কিছু না করুক অযথা বলক্ষয় করিত না, একটা কিছু করিবার ক্ষেত্রটা অন্ততঃ বড় পাইত। তাহারা হয়ত এতদিন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বঙ্গে বর্গিত্বের প্রতিরোধ করিতে পারিত। দেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা নাই—সে একটা সমস্যা বটে। কিন্তু স্কুল কলেজে সমস্ত ছেলে ভিড় না করিলে তাহাদেরই প্রয়োজনে—তাহাদের অভিভাবকদের প্রয়োজনে দেশনেতাদের চেষ্টায় অনেকের সহযোগিতায় চাহিদার চীৎকারে ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয় নিশ্চয়ই জন্মিত—অন্য ব্যবস্থাও হইতে পারিত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যশূন্য নিঃসার শুষ্ক পাশের প্রলোভনে সব চাহিদা, সব প্রয়োজন ভাষাসর্ব্বস্ব শিক্ষার মধ্যেই কবলিত হইয়া গেল।

এখন কথা হইতে পারে, গ্র্যাজুয়েট হইয়াও ত অন্নসংস্থানের পথ খুঁজা যায়। খোঁজা যায় বটে, খুঁজিতেছেও দলে দলে।—কিন্তু সুখময় অতীত উদ্যম, বল, ভরসা, সহিষ্ণুতা, সংগ্রাম করিবার দৃঢ়তা সবই তিরোহিত। গ্র্যাজুয়েটের বিদ্যা না হউক—অভিমানটা খুবই জাগ্রত—সেই সঙ্গে নৈরাশ্যও ঘনীভূত। ক্ষেত্রও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—শিক্ষাভিমানী গ্র্যাজুয়েট অনেক কর্ম্মক্ষেত্রকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হয়—নূতন একটা আত্মাভিমানে মত্ত ও হ্রস্ব দৃষ্টি হইয়া শেষে ধাক্কা খাইয়া ক্রমে নীচে নামিতে বাধ্য হয়। স্কুলের পুরাণো অশিক্ষিত বন্ধুটি মইএর প্রথম পাব হইতে সুরু করিয়া আজ যেখানে উঠিয়াছে—একবারে তাহার উপরে উঠিতে ইচ্ছা অথচ নীচেও ঠাঁই মেলে না—১ম পাব হইতে আর আরম্ভ করাও তো চলে না। তখন সে বুঝে কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জ্জন এ পথে হয় না। একমাত্র উপায় বিবাহ করিয়া কিছু পণ প্রাপ্তি। ছেলে ভাবে ঐ টাকাকে মূলধন করিয়া একটা কিছু করিতে হইবে—বাপ ভাবেন—ছেলের শিক্ষার জন্য এত ব্যয় করিলাম ছেলে ত তাহার কিছুই পরিশোধ করিতে পারিবে না, পণের টাকাটাই লভ্য।

সুলভ পরীক্ষা পাশের ফলে দিন কতক পণের পরিমাণ খুব বাড়িয়াই গিয়াছিল—অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি মরীচিকা-প্রলুব্ধ হইয়া ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছিল—বহু লোকের বহু অর্থ জলে গিয়াছে। এখন ক্রমে চৈতন্য হইতেছে—এখন অনেকে ম্যাট্রিক পাস ৩৫৲ টাকা কেরাণীকেও কন্যাদান করিতে রাজী হয় তবু লক্ষ্যশূন্য গ্র্যাজুয়েটকেও দিতে চাহে না। যাই হউক—বিবাহ-ব্যাপারটা বি-এ পাশের পর আসিয়াও জুটে,—তখন জীবন-সংগ্রাম আরো জটিল হইয়া পড়ে।

কথা হইতে পারে, দেশশুদ্ধ সকল যুবকই যখন গ্র্যাজুয়েট হইয়া পড়িবে—তখন গ্র্যাজুয়েটরা তার বকাণ্ড-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিবে না—নিম্নশ্রেণীর কাজকর্ম্ম করিতে লজ্জাবোধ করিবে না। ভাল কথা! কিন্তু বাঙালীর জীবনের শক্তিসামর্থ্য কতটুকু তা ভাবিয়া দেখা উচিত—যে শিক্ষা তাহার কোন কাজে লাগিবে না তাহা লাভ করিয়া লাভ কি?—পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া বা লাভ কি? যে-কার্য্যে বিদ্যাবলের অপেক্ষা দৈহিক বল ও সাধারণ বুদ্ধিবলের অধিকতর প্রয়োজন—সে কার্য্যের জন্য পরদেশী একটা ভাষাকে প্রাণপণে আয়ত্ত করিতে গিয়া অযথা বলক্ষয় করিয়া লাভ কি? নিরক্ষরতা দেশে থাকা উচিত নয়—সাধারণ শিক্ষাও দরকার, কিন্তু পরদেশী ভাষায় নহে—নিজের দেশের ভাষাতেই। অন্নবস্ত্রেরই যাহার অভাব—সুলভ হইলেও দীর্ঘসময়সাপেক্ষ জীবনী-ক্ষয়কর সখের—বি-এ পাশ করার তাহার কি প্রয়োজন? যে-শিক্ষা দেশশুদ্ধ লোককে সন্তোষমূলক শান্তিময় জীবন হইতে অশান্তিময় বিদ্যাবিলাসে টানিয়া আনে—তাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। একটা জাতি যদি পরদেশী ভাষা শিখিয়া আর নানা বিষয়ের উপরি-উপরি কতকটা জ্ঞান লাভ করিয়াই বড় হইত—তাহা হইলে সুলভ পাশের মূল্য আছে স্বীকার করিতাম।

৯। গরীব পিতা পাহাড়ের মত সম্মুখে পরীক্ষা পাশকেই দেখিতে পায়—তাহার অপর পার তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত। সে রাজ্য তাহার কল্পনার রাজ্য—রহস্যময়। সেখানে সে কত সুখসম্পদসৌভাগ্যপ্রতিষ্ঠাকে মনে মনে গড়িয়া রাখে তাহার ইয়ত্তা নাই। সহজে পাশ হইবার সম্ভাবনাই তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে পুত্রকে কলেজে পাঠাইতে। ঋণ করিয়া, স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া—অন্যান্য সন্তানগণকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া—অর্থাভাবে কন্যার কুপাত্রে বিবাহ দিয়া—নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এমন কি আহার্য্যের ব্যয় পর্য্যন্ত সঙ্কোচ করিয়া গরীব পিতা পুত্রের নাগরিক শিক্ষা ব্যয় চালাইল। তারপর ছেলে যখন পাশ হইয়া আসিল—বছরের পর বছর অপেক্ষা করিয়া দেখিল—সব ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে—তখন তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ কি রূঢ়! তখন সে ভাবে—ইহার চেয়ে ছেলে মূর্খ হইয়া থাকিলে অযথা অর্থব্যয়টা বাঁচিত—কয়েক বৎসর এতকষ্টে সংসার চালাইতে হইত না। কন্যার ভাল বিবাহ দেওয়া যাইতে পারিত। ছেলেটা মাঝপথে ফেল করিয়া আসিলেও এতটা অর্থব্যয়

হইত না—এতদিন একটা কাজে ঢুকান যাইত—নয় ত পিতৃব্যবসায়ই চালাইত। ইহা হইল দুই এর বা'র। বিশ্ববিদ্যাসরস্বতীমাতার অতিরিক্ত স্নেহই হইল কাল। তিনি দয়া করিয়া নিঠুরা হইলে—সময় থাকিতেই যা হউক একটা ব্যবস্থা হইত।

১০। সুলভ পাশে বাংলার পল্লীর কিছুমাত্র উপকার হয় নাই—বরং অপকারই হইয়াছে। সুলভ পাশের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া যাহারা নগরে আসে—তাহাদের অধিকাংশই আর পল্লীতে ফেরে না—যাহারা ফিরিতে বাধ্য হয়—তাহারা আর পল্লীর আত্মীয় হইয়া উঠে না। যাহারা পল্লীতে ফেরে না—তাহাদের অধিকাংশকেই নগরও চায় না—তাহারা আবার পল্লীকে চায় না। ফলে তাহারা একটা দোটানায় পড়িয়া অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। পাস যত সুলভ হইয়াছে নগরে ছেলে তত বাড়িয়াছে—স্কুল-কলেজের আয় বাড়িয়াছে—স্কুলকলেজের ঘরদুয়ার সাজসরঞ্জাম গরীব দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অযথা রকম বাড়িয়া গিয়াছে—তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া হোষ্টেল-বোর্ডিংএর বিলাসঘটা ও সমারোহ বাড়িয়াছে। তাহাতে শিক্ষার ব্যয়ই যে শুধু বাড়িয়া গিয়াছে তাহা নয়—ভাঙাকুঁড়ের পল্লীদুলালরা এই সকল বিলাস-ঘটা সমারোহের মধ্যে বাস করিয়া,—আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, চালচলনে, শয়নে, স্বপনে রাজার হালে কৃত্রিম অস্বাভাবিক জীবন-যাপন করিয়া নিজ নিজ পল্লী-সংসারের দীনতাকে ঘৃণা করিতে শিখে। এই অস্বাভাবিক বাবুয়ানীর জীবন কয়দিনের? পরে কি আর জীবনে পল্লীর দরিদ্র-সংসারের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে পারে? হোষ্টেল ছাড়িয়া ছাত্র যখন কেরাণীদের মেসে যায়—তখনই তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়া যায়।

নগরে এই যে সুলভ পাসের কুম্ভমেলা—ইহাতে পল্লীর কুম্ভ ক্রমে শূন্য হইয়া নগরের কুম্ভগুলিই ভরিয়া উঠিতেছে। নগরের সিনেমা, থিয়েটার, চায়ের দোকান, রেস্তোরা, ধনী হইতেছে। যাহারা ফুটবল ম্যাচের টিকিট বিক্রয় করে তাহারাও ধনী। নগরের দোকানদাররা—পাব্‌লিশাররা, ষ্টেসনারী-বিক্রেতারা—এমন কি ধোবা নাপিত পর্য্যন্ত ধনী হইয়া উঠিতেছে, নিঃস্ব হইতেছে পল্লীভূমি।

গ্রামের চাষী কারিগরদের ছেলেরা সুলভ প্রোমোসনে স্কুলে অনেকটা উঠিয়া পড়িতেছে—অথবা সুলভ ম্যাট্রিক পাশ করিতেছে—কিন্তু তারপর? কলেজে পড়িবার খরচ কোথা হইতে মিলিবে? সহায়-সম্বল মুরুব্বি নাই, চাকরী দেখিয়া কে দেবে? কিন্তু লেখাপড়া শেখার অভিমানটা পুরোদস্তুর জন্মিয়া যাইতেছে—আত্মীয়স্বজন, স্বজাতি-কুটুম্ব এমন কি অসভ্য (?) পিতামাতা ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত অবহেলা করিতে এমন কি ঘৃণা করিতে শিখিতেছে। এমন অবস্থায় তাহারা পিতৃ-ব্যবসায় বা জাত্-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিতেছে না—নগরেই কাজের সন্ধানে ঘুরিতেছে—কে কাজ পাইতে সাহায্য করিবে? যদি কাজ মেলেও—তবে কোন' দোকানে পেটভাতা মাহিনায়। তাহাতে সে আত্ম-পরিবারকে কোন' সাহায্য করিতে পারে না—দুচারটা ইংরাজী বুলি পেটে না ঢুকিলে ঘরে থাকিয়া অনায়াসে শ্রমক্লান্ত পিতাভ্রাতাকে সাহায্য করিতে পারিত। ছোট বড় চুল ছাঁটিয়া, ছিটের জামা গায়ে দিয়া, বিড়ি টানিয়া ভদ্রলোক বনিয়া গেল বটে—কিন্তু নগরে যে আবহাওয়ায় তাহাকে জীবন যাপন করিতে হইল, তাহাতে নৈতিক অবনতি অনিবার্য্য।

আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিই মূলতঃ এজন্য দায়ী। সুলভ পাশ এই বিড়ম্বনাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে বলিয়াই এ সকল কথা বলা।

১১। নগরে নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ কাজে বেশী ইংরাজী ভাষার জ্ঞান, দেশ-বিদেশের ইতিহাসের ফিরিস্তি মুখস্থ করা বা কেমিষ্ট্রীর ফরমুলা লাগে না।—বেশী বেশী লাগে উৎকৃষ্ট হাতের লেখা, টাইপ করিবার ক্ষমতা, তাড়াতাড়ি লিখিতে পারা, কার্য্যতৎপরতা, শৃঙ্খলা-বোধ, সময়ের মিতব্যয়িতা, অক্লান্ত শ্রমশীলতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিষয় বিভাগ করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি নানা গুণ যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা পাস ছাড়াও ধীর প্রকৃতির যুবকেরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। বি-এ-পাশ-করা যুবকদের যে এ সকল গুণ থাকিতে পারে না—তাহা আমি বলিতেছি না। তবে বি-এ পাস করা সত্ত্বেও অনেকের যে ওগুলি নাই—তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে ইহারাই নির্ব্বাচিত হয়। যে কার্য্যে যাহারা সম্পূর্ণরূপে যোগ্য, কেবলমাত্র সুলভ পাসের চাপরাশের জোরে অন্যে তাহাদিগকে সে কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছে। অবশ্য এজন্য সুলভ পাসই একমাত্র দায়ী নয়—গতানুগতিক বুদ্ধিতে নির্ব্বাচনই দায়ী। যতদিন সুলভ পাশের ব্যবস্থা থাকিবে—ততদিন নিয়োক্তার এ ভ্রম হইবেই। চাপরাশের যে একটা দাবি আছেই—তা সে চাপরাস যতই মেকী হউক।

১২। সুলভ পাশ কথাটা ব্যবহার করিতেছি—পাশের জন্য, অসম্যক্ সাধনায় জন্য, সুশিক্ষা লাভ না করিয়াই শিক্ষিতের মর্য্যাদা অধিগত করার জন্য। কিন্তু অর্থ-ব্যয়ের দিক হইতে ইহা আদৌ সুলভ নয়। এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে ডিগ্রী লাভ রীতিমত অর্থ-সাপেক্ষ। গরীব দেশের লোকের পক্ষে কাঞ্চন-মূল্যে রঙীন কাচ কেনার সখ হিতকর হইতে পারে না। দশটি ছেলের জন্য তথাকথিত উচ্চশিক্ষা ক্রয়ের বাবদে যে অর্থব্যয় হয়—তাহা লইয়া যদি তাহারা যৌথ কারবার করে—তবে দশের ও সেই সঙ্গে দেশেরও উপকার হয়। বাঙলার বাহিরের লোকেরা বাঙলার অন্ন এমন করিয়া লুটিয়া খাইতে পারে না। কিন্তু কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দিয়া পাসের সার্টিফিকেট কেনার লোভে ও-সব কথা কাহারো মাথাতেই আসিতে পায় না। পাসকরা যতদিন সুলভ থাকিবে, ততদিন বাঙালী চাকুরী খুঁজিবে—আর ব্যবসায় যদি করে তবে করিবে ওকালতির ব্যবসায়। বাঙালীর সকল ব্যবসায়ই যে ক্রমে অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাইতেছে—তাহার একটি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের দানসত্র।

১৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ সুলভ হওয়ায় নিকটবর্ত্তী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দলে দলে ছাত্র কলিকাতায় জুটিতেছে,—তাহাতে নিকটবর্ত্তী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিরও ক্ষতি হইতেছে—ঐ সকল ছেলেদের ও ক্ষতি হইতেছে তাহারা নিজ নিজ প্রদেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সুবিধাগুলি হারাইতেছে।

১৪। সুলভ পাশের সমর্থনকল্পে কেহ কেহ ইউরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নজীর দেখান। কিন্তু তাঁহারা ইউরোপের শিক্ষা-প্রণালী ও এ দেশের শিক্ষা-প্রণালীর প্রভেদটা কি ভাবিয়া দেখেন? গোড়া হইতেই ছাত্রকে ইউরোপের স্কুল কলেজে যে ভাবে গড়িয়া তোলা হয়—যে ভাবে তাহাদের তত্ত্বাবধান করা হয়—শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সংস্পর্শ সেদেশে এতই ঘনিষ্ঠ—দিনের পর দিন ছাত্রের ক্রমোন্নতি সাধনের দিকে যেরূপ লক্ষ্য রাখা হয়—তাহাতে তাহাদের কোন পরীক্ষারই প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া—ইউরোপে এত

অসংখ্যবিধ শিক্ষার ক্ষেত্র আছে যে, অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই ভাষা-সাহিত্যমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই-প্রকার শিক্ষার দিকে যাহাদের বিশেষ অনুরাগ ও নিষ্ঠা নাই—এমন ছাত্র এ শিক্ষার জন্য আসে না,—আপনার মাতৃভাষাতেই তাহারা সহজেই শিক্ষণীয় বিষয় অধিগত করে! অভিভাবক একটি ধ্রুবলক্ষ্য নিরূপণ করিয়াই বালককে শিক্ষালয়ে প্রেরণ করে। ইউরোপের মত সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে এদেশেও পরীক্ষা পাস সুলভ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে—জাতীয় জীবনে কোন-প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না।

১৫। অন্ন-সংস্থানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে আর একটি বিশেষ কারণে। ১৯১০-১১ সালের আগে যাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া সম্যকরূপে পরীক্ষানির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—তাহাদের সহিত দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে ১৯১০ সালের পর অনায়াসে উত্তীর্ণ যুবকদের সঙ্গে। এই যুবকগণ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে উচ্চতর পরীক্ষাগুলিও পাশ করিয়া ফেলিয়াছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে যেখানে উচ্চতর ডিগ্রীর দ্বারাই যোগ্যতা নিরূপিত হইতেছে—সেখানেই আগেকার পাশ-করা প্রৌঢ়গণকে সরিয়া পড়িতে হইতেছে। যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াও যাঁহারা পূর্ব্বে পরীক্ষায় অতিরিক্ত দুরূহতার জন্য উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—তাঁহাদের দশা আরো শোচনীয়। তাঁহাদের বিশাল অভিজ্ঞতা অনাদৃত হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষা-বিভাগেই এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই এ বিভাগে ছাত্রেরা তাহাদের শিক্ষকদিগকে স্থানচ্যুত করিতেছে। আগেকার পরীক্ষার আদর্শেও দেশের যথেষ্ট বলক্ষয় হইয়াছে—এখনও অন্যভাবে একই ফল হইতেছে—মাঝামাঝি আদর্শের প্রতিষ্ঠাই দেশের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে হয়। ম্যাট্রিক হইতে এম-এ পর্য্যন্ত একটি পরীক্ষা অন্ততঃ কঠোর হইলেও সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। ভারতবর্ষের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই ভুল করিতেছে—এক কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ই অভ্রান্ত।

১৬। প্রশ্ন হইতে পারে, সুলভ পাশ যদি এতই অহিতকর—তবে দেশে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় না কেন? আন্দোলন কেন হয় না—তাহার উত্তর সোজা। ছাত্র, শিক্ষক, স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, পরীক্ষক, গ্রন্থকার কাহারো লাভ বই ইহাতে ব্যক্তিগত ক্ষতি নাই।—ছাত্র-সংখ্যা যত বাড়িতেছে—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ও বাড়িতেছে। সংস্কার ভিতরের চেষ্টাতেই হইতে পারিত—বাহিরের কাহারো ত মাথাব্যথা নাই—ভিতরের লোকের গরজ থাকিলে হইতে পারিত। দেশের পক্ষে ইহাতে লাভ হইতেছে বলিয়াই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। কিন্তু এ লাভ যে আপাতমধুর। ব্যষ্টি-ভাবেই লাভালাভ বিচার হইতেছে - সমষ্টি ভাবে যে কত লোকসান—জাতীয় জীবনে ইহাতে যে সর্ব্বাঙ্গীণ দারিদ্র্য কতটা বাড়িয়া যাইতেছে—দেশের ঘনায়মান শক্তি যে কতটা তরলতা প্রাপ্ত হইতেছে তাহা ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

১৭। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের জাতীয় জীবনের সম্পর্ক এতটা শিথিল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।—কেবল নির্ব্বিকার ভাবে উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানানুশীলন করিতে—জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দার্শনিক ঔদাসীন্য দেখাইয়া চলিতে হইবে—একথা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বলা চলে না ইহা বিশিষ্ট জ্ঞানসংসদের (academy) পক্ষে শোভা পায়। জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন সকল ব্যবস্থা করিবে—সেই-দিনই বিশ্ববিদ্যালয় হইবে 'জাতীয়' (National)—দেশের পক্ষে পরমাত্মীয়।—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব অধ্যাপকেরাই করুক—আর দেশবাসিগণই করুক—সরকারের লোকেই করুক—আর বে-সরকারী লোকেই করুক—তাহাতে কিছু যায় আসে না।

(বসুধারা, কার্ত্তিক ১৩৩৫) শ্রীকল্যাণভিক্ষু গুপ্ত

বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য*

শ্রী অনাথনাথ বসু

বাঙালীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাহারই গর্ব্বে বাঙালার চরিত্রে একটি ক্ষুদ্রতা ঢুকিয়াছে। গত একশতাব্দী ধরিয়া প্রতীচ্যের দূতরূপে ইংরেজ তাহার ঐশ্বর্য্যসম্ভার দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। প্রতীচ্যের এই স্পর্শে আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া গিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা। ইহার মধ্যে যে কিছু পরিমাণ সত্য আছে সেটা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু প্রতীচ্যের স্পর্শে আর-এক প্রকারের সঙ্কীর্ণতা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতীচ্যের দানগ্রাহী হইয়া আমরা স্বদেশের প্রতি অবিচার করিয়াছি; আমরা ভারতবর্ষকে অবজ্ঞা করিতে বসিয়াছি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই দোষ প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু বাংলাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতীচ্যভাবাপন্ন প্রদেশ এবং এই প্রদেশেই এই দোষ বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে বাংলার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কথা বাঙালীর প্রাণে জাগিয়াছিল। বাঙালী বাংলার সেবায় কায়মনে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু স্বদেশী

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ১৭শ অধিবেশনে পঠিত।

আন্দোলনে যে রাষ্ট্রবোধ জাগ্রত হইয়াছিল তাহা প্রাদেশিকতায় অনুরঞ্জিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের অন্তরে যে সত্য জাতীয়তা-বোধ আছে, যাহা জাতি ধর্ম্ম প্রদেশ বর্ণের অপেক্ষা রাখে না, যাহাতে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই সাধারণ অধিকার, যাহার উদ্বোধনে গুজরাট ও বাংলা, পাঞ্জাব ও সিংহল একত্রে এক স্থানে মিশিতে পারে, যাহা ভারতের সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে, সেই পরম সত্য জাতীয়তা-বোধ জাগে নাই। তখন নিজেদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার দিকেই আমাদের দৃষ্টি বেশী ভাবে পড়িয়াছিল। অন্তর্প্রাদেশিক সহানুভূতির দিকে আমাদের দৃষ্টি সে ভাবে যায় নাই। তাই সকল প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে ও ঐক্যে ভারতীয় সভ্যতার যে বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহার কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; আমরা ভুলিয়াছিলাম ভারতবর্ষ শুধু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ নহে, ভারতীয় সভ্যতা শুধু বাঙালী সভ্যতা নহে।

ফলে মহারাষ্ট্র বাংলাকে বুঝিতে পারে নাই, বাংলা পাঞ্জাবকে ভুল বুঝিয়াছে, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছে। প্রাদেশিকতা-মোহে মুগ্ধ হইয়া বাংলা ভারসাম্য হারাইয়া ভারতে তাহার স্থান ও অন্যান্য প্রদেশের স্থান ঠিক ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করে নাই।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইহার যে ফল হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ন্যায় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের এই বৈষম্য ও প্রভেদ-বোধের ফল প্রতিফলিত হইয়া আমাদের জীবনে এক বিপুল অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সাহিত্য জাতির প্রাণধারার মূর্ত্তরূপ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই অন্তর্প্রাদেশিক সহানুভূতির অভাব যে বিরাট ক্ষতির সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার ফলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অন্য নানা দিক দিয়া পরিপুষ্টি সাধন হইলেও এক দিকে তাহার দৈন্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহারই দিকে সমবেত সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অভিমান ততক্ষণ পর্য্যন্তই ভাল যতক্ষণ এই অভিমান অন্যের গুণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি অন্ধ না করিয়া দেয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক অভিমান আছে এবং এই অভিমানের সার্থকতাও আছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেরূপ দ্রুতভাবে পরিণতিলাভ করিয়াছে তাহা বোধ করি জগতে অতুলনীয়। এই অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বঙ্গবাণীর বিবিধ সেবকের অর্ঘ্যভারে আমাদের অতীতের একদিনের দীনা জননী আজ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যসম্ভারে ভূষিতা হইয়া অপরূপরূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাংলা ভাষা আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা।

ইহা বাঙালীর গৌরবের বিষয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অপরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু তাহা কি উন্নতির সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে? উন্নতির সীমানির্দ্দেশ আজও পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই; এবং বাংলা ভাষার সেবক মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন যে, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের এখনও যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ আছে।

আমাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের এমনি একটা পথের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

ভাষা ও সাহিত্যের পরিপূর্ণতার মাপকাঠি কি সে-কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলার সহিত ভারতের যে-যোগ তাহা নানাদিক দিয়াই; বাংলার সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার নিকট নানাভাবেই ঋণী; বাংলা ভারতের সন্তান এবং বাঙালী সভ্যতা বিপুলতর ভারতীয় সভ্যতার একটি অংশমাত্র। বাংলার সহিত ভারতের এই সম্বন্ধ, এবং ভারতের বিস্তার ও ভারতের বিরাটতর আদর্শের পরিণতি সাধনে বাংলার অধিকার ও কর্ত্তব্য, বাঙালীর দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেহের একটি অঙ্গ যদি দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও সমগ্রের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় তাহাতে পরিণামে তাহারই সমূহ ক্ষতি। তেমনি বাংলা যদি ভারতীয় সভ্যতার নিকট তাহার ঋণ এবং তাহার প্রতি নিজের

কর্ত্তব্য এবং ভারতে বাংলার বিশেষস্থান কোন্‌টি তাহা ভুলিয়া যায় তবে পরিণামে তাহারই সমূহ ক্ষতি হইবে।

এই দৃষ্টিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতার মাপকাঠি কি আমাদের বিচার করিতে হইবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙালী শিশু যদি জগতের বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ ও বাংলার সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দানগুলির সহিত অন্যভাষার সাহায্য ব্যতীত পরিচয় লাভ করিতে পারে তবেই এভাষা ও সাহিত্যকে অনেক পরিমাণে পরিণত বলিতে পারিব।

কথাটা একটু বিস্তারিতভাবে বিচার করিতে হইবে। বাংলায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তকের যে অভাবের কথা বাঙালী মাত্রেই জানেন তাহাকে উদাহরণরূপে দিতে পারি। বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে আজ বিজ্ঞানের পরিচয় বিদেশী ভাষার সাহায্য বিনা অসম্ভব।

ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলা ভাষায় কয়খানি মৌলিক বা অন্যভাষা হইতে অনূদিত পুস্তক আছে?

ইহা বাংলা ভাষার দৈন্যেরই পরিচয় দেয়।

আমি অবশ্য অন্যভাষা শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাকে ছোট করিয়া দেখিতেছি না, কিন্তু অন্যভাষা শিক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক, জ্ঞানলাভের পক্ষে অপরিহার্য্য এই বোধই আমাকে পীড়া দেয়।

বাংলা ভাষার এই দৈন্যের ফলে যেমন জগতের বিভিন্ন দেশের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রত্নগুলির সহিত বাঙালী শিশুর পরিচয় অসম্ভবপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে তেমনি আর একপ্রকার দৈন্যের ফলে ভারতীয় সভ্যতার সম্যক্‌ বোধের পথে একটি বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু বাংলারই সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞান আমরা আজ লাভ করিব তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যে হতভাগ্য বাঙালী ইংরেজী জানে না তাহার পক্ষে পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিল প্রভৃতি দেশের ভাষার, সাহিত্যের ও সভ্যতার কথা—ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডারে আমাদের এই প্রকাণ্ড নিকট প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের দানগুলির কথা—জানা অসম্ভব বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। বাংলা ভাষার ও বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, এই প্রকাণ্ড প্রয়োজনীয় পরিচয়ের উপায় বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক বৈদেশিক ভাষায় লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ মাত্র। আজ আমাদের নিজেদের আত্মীয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছে একজন পর।

মেকলিফ্‌ বা ট্রাম্পএর অনুবাদ না পড়িলে পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তকের সহিত আমাদের পরিচয় হওয়া সম্ভবপর নয়। ভারতের যে-কোন প্রদেশের রীতিনীতি, ধর্ম্ম, সভ্যতা সম্বন্ধে জানিতে হইলে বিদেশী এবং অধিকাংশ স্থলেই সংস্কারাপন্ন ধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীগণের দ্বারা বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পাঠ না করিলে চলিবে না।

মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে চাই তাহার ইতিহাস, তাহার ধর্ম্ম, তুকারাম, নামদেব প্রভৃতি তাহার মহাপুরুষগণের বাণী, সকলই জানিতে হইবে এমন লোকের লেখা গ্রন্থ হইতে যাহাদের নিকট এসকল বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র।

দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছে সে সম্বন্ধে জানিতে হইলে খুলিতে হইবে Pope Burnett-এর গ্রন্থাবলী।

এমন কি ঘরের পার্শ্বেই যে হিন্দীভাষী প্রদেশগুলি তাহাদের সম্বন্ধে, কবীর, তুলসীদাস প্রভৃত তাহার ভক্ত মহাত্মাগণের বাণীর সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইলেও ইংরেজীর সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই।

সাত সমুদ্র তেরনদী পারের বিদেশ হইতে আসিয়া বিদেশী আমার ঘরের লোকের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার নিকট যাহা শিখিবার, জানিবার তাহা শিখিয়া জানিয়া লইয়া গেল আর আমরা তাহাদের অবজ্ঞা করিয়াই দিন কাটাইয়া দিলাম, ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের আগে গ্রিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করেন নাই। Garein du Tassy ফরাসী দেশে বসিয়া

হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দ্দ) সাহিত্যের যে ইতিহাস রচনা করিলেন তাহা আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

Grierson (গ্রিয়ার্সন), Pope (পোপ). Caldwell, (ক্যাল্ডওয়েল), Block (ব্লক), Macauliffe প্রভৃতি সুদূর বিদেশ হইতে আসিয়া হিন্দী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভাষার আলোচনা করিলেন আমরা নিকটে নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিদেশীর সাহায্যে স্বদেশীর সহিত পরিচয় লাভ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিলাম না।

এই মধ্যবর্ত্তী বিদেশী যে-পরিচয় দেয় তাহা যে কত পরিমাণে ঠিক তাহা ত আমরা বিচার করি না। একথা অনেকেই জানেন ইংরেজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির সকল প্রচেষ্টার মূলেই নিজেকে বড় করিয়া দেখাইবার একটা চেষ্টা আছে। ভারতীয় সভ্যতার আলোচনা-কালে বহু বিদেশীই তাহাদের এই সংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে একথাও বহু সুধীজন-বিদিত। বিশেষভাবে এই আলোচনা আবার যখন কোন মিশনারীর দ্বারা হয় তখন ভারতীয় প্রাদেশিক ধর্ম্ম ও সভ্যতার আলোচনার অন্তরালে তাহাদের এই চেষ্টা সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে যে, কি উপায়ে একদেশদর্শী যুক্তির অবতারণা করিয়া সর্ব্বদা নিজেদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। অনেক স্থলে গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি মনীষী ঐতিহাসিকগণও এরূপ সংস্কার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

সুতরাং এরূপ ভাবে পরিচয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে আমাদের পদে পদেই ঠকিতে হইবে, আপনার লোককে এই ভাবে পরের সাহায্যে বুঝিতে গেলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না, ভুল বুঝিব। অথচ ইহারা আমাদেরই প্রতিবেশী, ইহাদের সহিত আমাদের রক্তের সম্পর্ক।

এই প্রসঙ্গে বাংলার সহিত ইংরেজীর একটা তুলনার কথা স্বতই মনে আসিয়া পড়ে। বাংলাকে আমরা সম্পদশালী বলিয়া গর্ব্ব করি ;তাহার তুলনায় ইংরেজী কত অধিক পরিমাণে সম্পদশালী। জার্ম্মাণ ভাষা এ বিষয়ে ইংরেজী হইতে অধিকতর সম্পদশালী। বোধ করি এমন খুব অল্প বিষয়ই আছে যে সম্বন্ধে অনূদিতই হউক মৌলিকই হউক এক আধটি গ্রন্থ এই সকল ভাষায় নাই। ডাঃ মেঘনাদ সাহা যে একটি সভায় বলিয়াছিলেন, জগতের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে ইংরেজী, জার্ম্মান্ ও ফরাসী এ তিনটি ভাষা না জানিলে কাহারও চলিবে না, একথার সারবত্তা এখন বোঝা যায়। য়ুরোপের বিশেষ করিয়া ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি অগ্রণী দেশসমূহের বিভিন্ন দেশের জ্ঞানের ও সভ্যতার প্রতি এই সুগভীর শ্রদ্ধার আর এক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল যখন মহাযুদ্ধের সময়েও ইংরেজপণ্ডিতগণ শত্রু জার্ম্মানের রচিত গ্রন্থাবলী নিজেদের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ; এই ঔদার্য্য ও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাই ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাকে এত মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল ভাষার সেবকগণ নানাদেশ, নানাসভ্যতার ভাণ্ডার হইতে নিজেদের জননীর জন্য রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছে ; স্বদেশবিদেশ বিচারে এই সাধুচেষ্টাকে খণ্ডিত করে নাই, জ্ঞানাহরণে কোন কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। চোখের উপর দেখিতেছি বিদেশীভাষায় কোন মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে-না-হইতেই ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ বা সে-সম্বন্ধে আলোচনা-মূলক গ্রন্থ বাহির হইতেছে।

য়ুরোপের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, আমাদেরই ভারতের কয়েকটি ভাষার সেবকদের মধ্যেও পরভাষা ও পরসাহিত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধার বহু নিদর্শন আমরা পাই।

অনুবাদ-সাহিত্যে, হিন্দী, গুজরাতী, তেলেগু প্রভৃতি সাহিত্য বিশেষভাবে সম্পদবান্ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা প্রকাশিত হইবার তিনমাস যাইতে-না যাইতেই গুজরাটী ও তেলেগুতে তাহার অনুবাদ হইয়া গেল ; বাংলা সাহিত্যের যেগুলি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ তাহাদের অধিকাংশেরই অনুবাদ গুজরাতীতে হইয়াছে, হিন্দীতেও পাওয়া যাইবে।

শুধু বাংলাভাষার প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয় নাই ; ইংরেজী হইতেও বহুমূল্যবান্ গ্রন্থ গুজরাতী ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং হইতেছে। Plutarch এর গ্রন্থের ন্যায় বিরাটাকার গ্রন্থেরও গুজরাতী অনুবাদ রহি-

য়াছে ; Macdonellএর সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট্ ইতিহাসও মহারাষ্ট্রী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বিনয় বাবুর বহু পূর্ব্বেই Booker T. Washingtion এর Up from Slavery নামক বিখ্যাত গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। আজও পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর Young Indiaর ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ বাহির হইল না—অথচ Young India পুস্তকাকারে বাহির হইবার ছয়মাসের মধ্যেই ইহার হিন্দী অনুবাদ বাহির হইল।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যসেবিগণ যখন এই ভাবে অনুবাদের দ্বারা নিজেদের সাহিত্যেই সৌষ্ঠবসাধন করিতেছিলেন তখন শুধু বাঙ্গালীই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল।

এইখানে আর-একটি কথার বিচার করা প্রয়োজন। অনুবাদে সাহিত্যের সম্পদ বাড়ে কি না? একদল সমালোচক আছেন যাঁহারা বলেন, অনূদিত প্রাচ্য সাহিত্য ভাষার দৈন্যের পরিচয় দেয়; একদল বলেন, আর্টের দিক দিয়া দেখিলে অনুবাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ অনুবাদ মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষণ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে আমরা ইংরেজী সাহিত্যের নজীর দিব। গ্রীক সভ্যতা হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপীয় এবং এশিয়ার অন্যান্য সভ্যতার ও সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় ইংরেজীর ভিতর দিয়াই ত। রম্যাঁ রলাঁর জ্যাঁ ক্রিস্তোফ্ হইতে প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্ব এমন কি বৌদ্ধধর্ম্ম ইসলাম প্রভৃতির সহিত আমাদের যে পরিচয় তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও একেবারেই নিরর্থক নহে, একথা সকলেই স্বীকার করেন; তাহা ত বিদেশী ইংরেজীর কল্যাণেই।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলগ্রন্থের সহিত কয়জন সাধারণ বাঙ্গালীর পরিচয় আছে? বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়খানি মৌলিক গ্রন্থ আছে? তাহার সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তাহার তাহার মূল কি অনুবাদ-সাহিত্যের ভিতরে নাই? বাইবেল, কোরাণ এমন কি হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থগুলির সহিত আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পরিচয়, তাহাও ত' এইরূপ অনুবাদের সাহায্যে আমরা লাভ করিয়াছি। প্লেটোর উপর যে স্বল্প পরিচয় মানুষকে নিবিড়তর পরিচয় লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তাহা সু-অনূদিত গ্রন্থেরই সাহায্যে যে হইতে পারে এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই।

ভারতের অন্যান্য ভাষার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ভারতীয়ের দৃষ্টি লইয়া বিচার করা হইয়াছে। আর-এক দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিব।

ভাষা চেতনাবান্, ক্রমপরিবর্ত্তনশীল, বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার গঠনের ধারা প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কে জানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে কত বহিপ্রাদেশিক প্রভাব আছে? ভাষার সহিত জাতির ও ধর্ম্মের গভীর যোগ রহিয়াছে। এই বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্ম ও সাহিত্যের উপর কত বৈদেশিক বা বহিঃপ্রাদেশিক প্রভাব রহিয়াছে তাহা তত্ত্বান্বেষী মাত্রেই জানেন। অতি সাধারণ দর্শকের মনেও একথা জাগে যে, আজিকার বাংলা ও তাহার জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা এবং সাহিত্য প্রভৃতি বহু বিভিন্ন প্রভাবের পুঞ্জীকৃত পরিণাম।

সুতরাং বাংলা তথা বাঙ্গালীর, জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতির তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিচারে এই বিভিন্ন প্রভাবের কথা আলোচনা করার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।

যে ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বাংলা তাহার বর্ত্তমান রূপ লাভ করিয়াছে সেগুলিকে ভাল করিয়া না জানিলে বাংলাকেই যে ভাল করিয়া জানা যাইবে না। প্রতিবেশী ভাষা ও সাহিত্যগুলি বাংলাকে এই ভাবে আপন প্রভাব-দ্বারা নূতন রূপ লাভে সহায়তা করিয়াছে; এইজন্যই তাহাদের আলোচনা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

ওড়িয়া সাহিত্যের গোপন অন্তরালে বাংলা ভাষার, বাংলার সামাজিক ধর্ম্মজীবনের কতখানি ইতিহাস লুক্কায়িত আছে কে বলিতে পারে? ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন, ওড়িষ্যার প্রান্তবর্ত্তী স্থানসমূহে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও প্রচ্ছন্ন রূপে বাস করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলার ভাষা সাহিত্য সমাজ আচার ব্যবহারের উপর এককালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাতে অনেকভাবে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে এই প্রভাব বাঙালীর জীবনে কি পরিমাণে কোন্ পথে আসিয়াছে তাহা জানিতে হইলে এই সকল ভাষার আলোচনা প্রয়োজন।

মধ্যযুগে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক অভিনব আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইহা মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার

এবং সেই সঙ্গে বাংলার সভ্যতার ইতিহাসকে রূপ দিয়াছে। এইযুগ ভারতের পক্ষে এক অপূর্ব্বযুগ; এক হিসাবে ইহাকে য়ুরোপীয় রেনাসাঁসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে ইসলামসভ্যতার ও প্রতীচ্যের প্রভাব ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। শঙ্করের জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম ভারতের মাটীতে যে বীজবপন করিয়া গিয়াছিল তাহা রামানুজ, রামানন্দ, বল্লভাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির চেষ্টায় ভক্তিবৃক্ষে পরিণতি লাভ করিতেছিল। কবীর, নানক প্রভৃতি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন; তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করিতেছিলেন; তুকারাম অভঙ্গ রচনা করিয়া বিঠোবার পূজা করিতেছিলেন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সুরদাস কৃষ্ণলীলাগান করিতেছিলেন। চিন্তা ও ধর্ম্মজগতে যে-বিপ্লব চলিতেছিল তাহার জন্য ভারতের সমাজ ও সাহিত্য বিচিত্র রূপ ধারণ করিতেছিল। এক একজন মহাপুরুষ আসিতেছিলেন ও সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যের গতিকে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিতেছিলেন। বাংলার এই আন্দোলন শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলাকে কি দিয়াছে, তাহার ভাষা ও সাহিত্যকে কি অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে তাহা বাঙালীর সাহিত্যিক সম্মেলনে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই নূতন ভাবের বন্যা বিপুলতর প্রদেশের উপর তাহার করচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; আসামে শঙ্করদেব ও মাধবদেব, মহাপুরুষীয় মতবাদ প্রচার করিয়া চিন্তাক্ষেত্রে যে আলোড়ন আনিয়াছিলেন বাংলার ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসের আলোচনার সময় সেদিকে দৃষ্টি না দিলে চলিবে কেন? তখন বাংলা যে আসামের নিকট দেশ ছিল তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? সমগ্র ভারতে তখন জাতির জীবনকে একটা নূতন রূপ দিবার এই নব প্রচেষ্টা চলিতেছিল, শুধু বাংলায় ত তাহা সীমাবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এই যুগের বাংলার নব জন্মের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে তদানীন্তন যুগের বাংলা সম্পৃক্ত প্রদেশসমূহের সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইবে; কবীর, দাদু, মীরা, তুলসীদাস, সুরদাস হইতে আরম্ভ করিয়া, সিন্ধু দেশের সুফী সম্প্রদায়, পাঞ্জাবের নানক, অর্জ্জুন প্রভৃতি শিখগুরুগণ, গুজরাতের নরসিংহমেহতা প্রমুখ ভক্ত কবিগণ মহারাষ্ট্রের তুকারাম, নামদেব, একনাথ রাম দাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, ওড়িষ্যার সারলা দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, তেলেগু দেশের পোতন প্রভৃতি ভক্তগণের বাণীর সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইবে; তাহার সাহায্যে এই সকল প্রদেশের বিশিষ্ট সভ্যতার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলার উপর তাহাদের প্রভাবের তুলনা-মূলক আলোচনা করিতে হইবে।

বাংলার বৈষ্ণব প্রভাব বুঝিতে হইলে সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইবে। কারণ ইহা সমগ্র ভারতবর্ষকেই নাড়া দিয়াছিল। বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত পরিচয় করিতে হইবে। কারণ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতেই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ইহার জন্য তামিল সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইবে, কুরাল, নলইরা প্রবন্ধম, বিশেষ করিয়া তামিল আলোয়ারগণের বাণীর সহিত পরিচয় করিতে হইবে, পোতনের তেলেগু ভাগবত দেখিতে হইবে।

এরূপ আলোচনা হইলেই তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এবং বাংলার সাহিত্যে ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রভাব ভাল করিয়া বোঝা যাইবে।

দাক্ষিণাত্য ত আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। আমরা ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যের কথা বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি, জীবন-প্রণালী ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? অথচ সুধীমাত্রেই জানেন, উত্তর ভারতীয় সভ্যতার উপর দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কত বেশী। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনার প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু শুধু যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরেই দাক্ষিণাত্যের করচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য ধর্ম্ম সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের উপরেও তাহার

চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। বাংলার শৈব ও শাক্ত আচার, ও মতবাদের মধ্যে কতখানি দক্ষিণী প্রভাব আছে তাহা আজও আলোচিত হয় নাই।

দক্ষিণকে না জানিলে ভারতীয় সভ্যতার অন্তঃসলিলা গোপন ধারাটি আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না।

এই দিকেই বাংলার শিক্ষিত বাঙালীর খুব বড় একটা অনিষ্পন্ন কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে। গবেষণার, সাহিত্য-সেবায় আনন্দ লাভ করিবার এই এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে; বাংলার ভাষার ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই সকল প্রাদেশিক সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া আনিতে হইবে। আশা করি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য সুধীমণ্ডলী এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

এই ক্ষেত্রে এপর্য্যন্ত বাংলা দেশে যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল ও হইতেছে তাহার কোন উল্লেখই আমরা এখন পর্য্যন্ত করি নাই, তাহার কারণ কর্ম্মের বিরাটত্বের তুলনায় এ চেষ্টার পরিমাণ অতি সামান্যই।

বোধ করি বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য আলোচনার ভিত্তি পত্তন করেন মনীষী কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ। কিন্তু তাঁহাদের পরে সে-চেষ্টায় বিশেষ কেহ যোগ দেন নাই।

হিন্দীসাহিত্যের সহিত বাংলার যে গভীর যোগ তাহার তুলনায় হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এভাবের চেষ্টা অতি সামান্যই হইয়াছে বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর ও বঙ্গ সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে তুলসীদাস, সুরদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের রচনা বাংলাভাষার অনধিগম্যপ্রায়। তুলসীদাসের অমরকীর্ত্তি রামচরিতমানসের ভাল একটি অনুবাদ বাংলাভাষায় নাই। সুরদাস, দাদূ, মীরা, রইদাস প্রভৃতির কথা ত আমরা জানিই না; অথচ সমসাময়িক যুগে সমসাময়িক সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব যে কত প্রবল হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বাণী দেশকে যে কি গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল তাহা যাঁহারা জানেন বলিতে পারেন। সম্প্রতি মাসিকপত্রাদিতে প্রবন্ধগুলি দেখিয়া মনে হয় এদিকে কয়েক জনের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালের মধ্যে এ চেষ্টার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও অধুনা স্বর্গগত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেন মহাশয় কবীরের অমূল্য বাণী বাঙালী পাঠকের সহজলভ্য করিয়া দিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দাদূর প্রতীক্ষা করিয়া আছি এবং আশা করি এই দিকে তাঁহার প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে।

অবিনাশবাবু শিখগুরুগণের অমূল্য বাণী বাঙালীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছিলেন। তাঁহার সুখমণি জপজী প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের নিকট শিখদের অন্তর্জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করিয়া দিতেছিল। বিধাতার বিধানে তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তাঁহাকে বিদায় লইতে হইল। কিন্তু আশা আছে যে, কোন নবীনতর উৎসাহী আসিয়া তাঁহার অপূর্ণ কার্য্য পূর্ণ করিবেন।

৺সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় অন্যপ্রদেশিক ভাষার চর্চ্চার আয়োজন হইয়াছে এবং এটাও গৌরবের বিষয় যে, বাংলাই এবিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। বহুছাত্রই এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পলোকেই পরীক্ষা দিয়া ডিগ্রীলাভের পরও এ-বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া বাংলাভাষার সম্পদ বাড়াইতেছেন; অধিকাংশ স্থলে অন্যপ্রাদেশিক ভাষার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় তাঁহাদের পরীক্ষার বাহনমাত্র হইতেছে।

ইহাই বাংলায় ভারতের অন্যপ্রদেশের ভাষার ও সাহিত্যের আলোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস আমাদের গৌরবের পরিচয় দিতেছে না; আমাদের যতটুকু কর্ত্তব্য ততটুকু চেষ্টার লক্ষণ ইহাতে নাই। কিন্তু আমরা আশা করি, এদিকে বাঙালীর দৃষ্টি অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট হইবে এবং বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের এই দৈন্য দূর করিতে বাংলার সাহিত্যিক-মণ্ডলী সচেষ্ট হইবেন।



বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা—

মিঃ হুভার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ অল্ স্মিথ্ তাঁহা'র অপেক্ষা দুইকোটি ভোট কম পাইয়াছেন। অল্ স্মিথের পরাজয়ের একটি কারণ তাঁহার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে আরও দুইটি কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। মিঃ অল্ স্মিথ "সুরা নিবারণের" বিরোধী। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ঔষধের জন্য ব্যতীত সুরা বিক্রয় নিষিদ্ধ। মিঃ অল্ স্মিথ্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলে এই নিষেধাত্মক আইন তুলিয়া দিতেন, ইহা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই কারণেই আমেরিকার নারী ভোটারেরা প্রায় সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। তৃতীয় কারণ, মিঃ অল্ স্মিথ "ট্যামানীহল' নামক রাজনৈতিক কূটচক্রীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই কারণে তাঁহার নিজের দল "ডেমোক্রাট"দের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার পক্ষে ভোট দেয় নাই।

মিঃ অল্ স্মিথের পরাজয়ের যে তিনটি কারণ উল্লিখিত হইল, সেগুলি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, নারী ভোটারদের জন্যই মিঃ হুভার এত বেশী ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা যে আমেরিকার মত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের ভাগ্যবিধাতা হইতে পারে, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। ইংলণ্ডেও এবার নারীরা পুরুষদের মতই ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। সেখানেও আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল এবং দেশের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী নারী-ভোটারদের দ্বারাই নির্ণীত হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

তুরস্ক—

কামাল পাশা স্কুল মাষ্টার হইয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া তিনি এনাটলিয়ার সকল সহরে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি ঐ সকল সহরের পার্কগুলিকে এক একটি ক্লাসে পরিণত করিয়াছেন। কামাল সে-সকল স্থানে গিয়া সকলকে নূতন ধরণের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

তিনি মোটরে দেশের সকল সহরেই বেড়াইতেছেন। প্রায়ই গাড়ী থামাইয়া কৃষকদের সহিত নূতন অক্ষর সম্বন্ধে আলাপ করেন। তাহারা ল্যাটিন অক্ষরগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রামের লোকেরা ইহাকে "গাজির অক্ষর" বলিয়া নাম দিয়াছে।

আফ্‌গানিস্থান—

সৈয়দ কাশিম খাঁ, দুই বৎসর আফগানরাষ্ট্র-দূতরূপে ভারতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি কাবুল হইতে ফিরিয়া ইটালীতে আফগানরাষ্ট্র দূতরূপে যাইতেছেন। সৈয়দ কাশিম খাঁ আফগানীস্থানে নূতন সংস্কার সম্পর্কে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—আফগানীস্থানে হিন্দু ও ইহুদীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও, সেখানে রাজনীতিক্ষেত্রে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলিয়া কোন কথা নাই। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংখ্যাল্প সম্প্রদায় তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ অধিকারের দাবী করে না? সৈয়দ কাশিম খাঁ উত্তর করিলেন, তাহারা সকলেই আফ্‌গান। হিন্দু, ইহুদী ও মুসলমানের স্বার্থ যে এক, কাজেই হিন্দু বা ইহুদীদের কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করিবার কারণ নাই। আর ভারতের মুসলমানগণ জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে মুসলমান মাত্র; তথাপি তাহারা নিজেদের ভারতীয় মনে করিতে পারে না। তাহাদের রাজনৈতিক নেতারা সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা, এমন কি আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার স্বার্থবাদ ও ভাগবাটোয়ারার দাবী করিতে কুণ্ঠিত হন না। পরাধীনতার ফলে দৌর্ব্বল্য এবং আত্মবোধের অভাবই ভারতীয় মুসলমানদিগকে এমন রাষ্ট্রীয় কল্যাণবোধ-বর্জ্জিত স্বার্থান্বেষী করিয়া তুলিয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

এট্‌না আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার—

এট্‌না আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার সুরু হইয়াছে। অনেক নগরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অধিবাসীগণ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। মাস্কালী নগরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। নগরের ১০ হাজার অধিবাসী নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ২০ হাজার অধিবাসীসমন্বিত জিয়ারী নগরটিও বিনষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

ধাতুনিঃস্রাবের ২টি স্রোতের ভিতর যেটি প্রধান সেইটি মাস্কালি নগরের নবনির্ম্মিত সমর স্মৃতিস্তম্ভটি, একটি গির্জ্জা এবং বহু গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে। উহার দ্বারা কেটানিয়া এবং মেসিনা নামক নগরদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত রেলের সেতুটি বিনষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। অন্য স্রোতটি কয়েকটি গোলা-বাড়ীও ধ্বংস সাধন করিয়া এক্ষণে অন্নুনটিয়াটা নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতবর্ষ

বারদৌলির কৃষকদের অভিযোগ—

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ কে, এম্, মুন্সীর সভাপতিত্বে বারদৌলি-কৃষকদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বেসরকারী কমিটি বলিয়াছে যে, রাজস্ব আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট্ যে-সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে।

রাজস্ব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কমিটির অভিমত এই যে, অন্যান্য সভ্য দেশে যে-নীতি অনুসারে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয় ভারতেও তাহাই হওয়া উচিত এবং রাজস্বের হারে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই।

নৌবিদ্যা শিক্ষায় বৃত্তিদান—

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে, নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁহারা ৬০৲ টাকা করিয়া দুইটি বৃত্তি দিবেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রদিগের মধ্য হইতে দুইজন ছাত্র নির্ব্বাচিত হইবেন। 'ডাফ্‌রিন' নামক জাহাজে তিন বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

লাহোরে পুলিসের অত্যাচার—

গত মাসে সাইমন কমিশন ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্যগণ দুইখানি পৃথক্ ট্রেনে পুণা হইতে লাহোরে আসিয়া পৌঁছে। ষ্টেশনে প্রবেশের একটি পথ ব্যতীত আর সমস্ত পথ কাঁটা, তার ও কাঠের খুঁটা দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ষ্টেশনের নিকটস্থ প্রায় এক হাজার গজ ব্যাপী স্থান জনহীন মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল। ষ্টেশনে "পাস" ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। "ট্রিবিউন" ও "হিন্দুহেরাল্ড্" পত্রিকার প্রতিনিধিরা পাস থাকা সত্ত্বেও পুলিসের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয়েন। মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন হইতে কৃষ্ণবর্ণের পতাকা-সমূহ লইয়া বহুলোক শোভাযাত্রা সহকারে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে লালা লজপৎ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, রায়জাদা হংসরাজ, মিঃ আলম প্রভৃতি খ্যাতনামা নেতৃগণ ছিলেন। শোভাযাত্রাকারিগণ যাইতে যাইতে "সাইমন ফিরিয়া যাও" শব্দে চীৎকার করিতে থাকে। তাঁহারা মুলচাঁদ ষ্টেশনে রোডে গিয়া থামেন; কারণ ঐ স্থানটি কাঁটা, তার ও কাঠের খুঁটা দ্বারা ঘিরিয়া দিয়া ষ্টেশনে যাইবার পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। এই সময় জনতা সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব থাকা সত্ত্বেও পুলিস আসিয়া লাঠি চালায়। ফলে লালা লজপৎ রায়, ডাঃ গোপীচাঁদ, ডাঃ সত্যপাল ও রায়জাদা হংসরাজ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। পাঞ্জাব পুলিসের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল ও পাঞ্জাব সরকার কর্ত্তৃপক্ষের দোষের বহরটা কতকটা হ্রাস করিয়া দেখাইবার জন্য নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য একটি সরকারী তদন্তও হইতেছে। লালাজী বলিয়াছেন, সরকারী ইস্তাহারের সমস্ত উক্তি মিথ্যা।

নারী-বিক্রয়—

সমগ্র উত্তরভারতে এবং দুর্গম নেপালে সুন্দরী ও সরলা বালিকাদিগকে অপহরণ ও প্রলুব্ধ করিয়া এবং ভারতের নানাস্থানে তাহাদিগকে চালান দিয়া একদল গুণ্ডা কিরূপ ঘৃণিত উপায়ে হীন ব্যবসায় চালাইতেছে, সম্প্রতি 'পাওনিয়ার' তাহার এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। এই গুণ্ডার দলের ষড়যন্ত্র যেমন অভিনব, তাহাদের আচরণ এবং ব্যবসায়ও তেমনই সাংঘাতিক। আইনের বিশেষ কড়াকড়ি ও পুলিশের তীব্র দৃষ্টি সত্ত্বেও যুক্ত প্রদেশে স্ত্রী-ঘটিত ব্যবসায়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহুস্থলে অপরাধীরা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যবসায়ের নিবৃত্তি বা হ্রাস হইতেছে না বলিয়া যুক্ত প্রদেশের পুলিস ইহার দমনে আবার নূতন করিয়া লাগিয়াছেন। এই ব্যবসায় এক প্রদেশে সীমাবদ্ধ না থাকায় পুলিশের কার্য্য অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় যদিও ঐ প্রদেশেই এই ব্যবসায়ের সুরু হইয়াছে, তথাপি ইহার শাখা প্রশাখা পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, মধ্য প্রদেশ বাঙ্গলা এবং এমন কি নেপালে পর্য্যন্ত-বিস্তার করিয়াছে; অধিকন্তু এই সম্প্রদায়ে সকল জাতি ও শ্রেণীর লোকই আছে। নেপালী বালিকাদের সৌন্দর্য্য ভারত-বিখ্যাত বলিয়া এই ব্যবসায়ীরা ঐ সকল বালিকা সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে।

এই প্রসঙ্গে সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন—

আমরা বহু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, এই বাঙ্গলা দেশেও নারী-হরণ ও নারী-বিক্রয়ের ব্যবসা চালাইবার জন্য একটা বড় রকমের সঙ্ঘবদ্ধ দল আছে। আমরা যতদূর জানি, কলিকাতাতেই ঐ দলের প্রধান আড্ডা এবং পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক সহরে, এমন কি অনেক গ্রামেও তাহাদের কেন্দ্র আছে। মফঃস্বলে যে-সব নারী-হরণ হয়, তাহার সঙ্গে এই সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নির্য্যাতিতা হিন্দুনারীদের কতকগুলিকে মুসলমানী করিয়া নিকাহ দেওয়া হয় এবং বাকিগুলিকে কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। কলিকাতাতে বেশ্যাবৃত্তির জন্য এইসব অসহায়া নারী বিক্রীতা হয়। বাঙ্গলার পুলিশ এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলে বহু রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহা করিবার মত উদ্যম ও দক্ষতা তাঁহাদের আছে কি!

দীপালি প্রদর্শনী—

গত অক্টোবর মাসে ঢাকায় "দীপালি"র বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে এবার মহিলা স্বেচ্ছাসেবকগণই বিক্রয়ের ও অন্যান্য ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এবার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, কাশী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ এবং অন্যান্য অনেক মফঃস্বল সহর হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জিনিষ আসিয়াছিল। মহিলাদের প্রস্তুত সকল প্রকার তৈরী জামা, নানাপ্রকার সুদৃশ্য এম্‌ব্রয়ডারী, উলের জামা, কসিদার কাজ—তালপাতা ও বেতের সুদৃশ্য ঝুড়ি ব্যাগ, পাখা, সাজি ইত্যাদি নানাপ্রকার কাঠের কাজ ও তারের কাজ—চন্দন, কাপড়, কাগজ, শোলার মালা, কাঠের কাগজের, মাটির, কাপড়ের, পিসবোর্ডের ও প্যারিপ্লাষ্টারের খেলনা এবং সকল প্রকার জ্যাম, জেলী, মিষ্টান্ন, কেক ইত্যাদি এবার প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হইয়াছে। তাঁতের শাড়ী, ধুতি, চাদর, তোয়ালে, থান এবং মেয়েদের তৈরী গালিচা, শতরঞ্চি, পাপোষ, খদ্দর ইত্যাদি প্রদর্শনীতে বিক্রয়ার্থ ও প্রদর্শনার্থ আসিয়াছিল। "আর্ট গ্যালারির" নানাপ্রকার চিত্রের বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

দিনাজপুরেও ঢাকা দীপালি সঙ্ঘের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষিত যুবকের গো-সেবা—

কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ঢাকার উপকণ্ঠে একটি গোগৃহ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা বড়ই আশার কথা। হিন্দু গরুকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য খুব যত্ন লয় না বা লইতে পারিতেছে না। জীবন যাপনে ব্যয়-বাহুল্য, গোচারণ-ভূমির অভাব ও গো-চিকিৎসার অজ্ঞতাই ইহার জন্য দায়ী। অভয়াশ্রমের শিক্ষিত কর্ম্মক্ষম উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় স্থাপিত এই অনুষ্ঠানের উন্নতি হইবে আশা হয়। আমাদের নিরক্ষর দরিদ্র গো-পালকগণের মধ্যে যদি তাঁহাদের গো-

সেবার আদর্শ ও অভিজ্ঞতা ছড়াইয়া পড়ে ও তাহাতে যদি গো-জাতির উন্নতি হয় তবেই এ প্রচেষ্টার সফলতা।

—ঢাকা প্রকাশ

—

বাংলা

দান—

রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর তাঁহার পরলোকগত পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ঢাকা জিলা বোর্ডকে ১০০০০৲ দান করেন। এই টাকায় চৈতনকাণ্ড গ্রামে পুলিনচন্দ্র স্মৃতি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত মাসে ঢাকা জিলাবোর্ডের সভাপতি রায় কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন।

—ঢাকা গেজেট

সতীত্ব রক্ষায় দুর্ব্বৃত্ত হত্যা—

নোয়াখালী জেলায় বামনী থানার অধীন চরফকিরা গ্রামের মজিদের স্ত্রী মেহেরবানু নাম্নী একটি মুসলমান যুবতী শিশুসহ তাহার শয়নাগারে নিদ্রা যাইতেছিল। মেহেরের স্বামী মজিদ বাড়ী ছিল না। উক্ত গৃহের অপর কক্ষে তাহার শাশুড়ীও ঘুমাইতেছিল। গত ৮ই জুলাই রাত্রিতে মনুষ্যের হস্ত-স্পর্শে হঠাৎ মেহেরবানু জাগিয়া উঠে। নিজকে এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় দেখিয়া, সতীত্ব-নাশের আশঙ্কায় সে তাহার শিয়র হইতে ছেণী লইয়া তাহা দ্বারা দুর্বৃত্তকে আঘাত করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকার শুনিয়া ঐ গৃহের ও বাড়ীর সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাহারা সকলে ঘটনা স্থলে আসিয়া দেখে মোহরের স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর দারগালি রক্তাক্ত কলেবরে শয্যা পার্শ্বে পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার দেহে প্রাণ নাই। হত্যা অপরাধে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয়। বিচারকালাবধি মেহেরবানু জামিনে খালাস ছিল। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে মেহেরবানু বে-কসুর খালাস পাইয়াছে।

—দেশের বাণী

ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা—

গত ৫ই নবেম্বর রাজসাহী জেলার ভবেশ মিশ্র নামক একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পত্নী হেমন্তকুমারী দেবী বিষাক্ত ফল ভক্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ৫টি শিশু সন্তান সহ নাটোরে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া চাকুরির খোঁজে যায়। তিনি স্থানীয় একটি দোকানের জন্য ডাকের সাজ তৈয়ার করিয়া সেই সামান্য আয়ে নিজে অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া কোন রকমে সন্তান কয়েকটিকে বাঁচাইয়া রাখেন। পূজার পরে জীবিকা অর্জ্জনের তাঁহার অন্য কোন উপায় থাকে না, সন্তানদের খাদ্য সংস্থান করিতেও তিনি অক্ষম হন। অবশেষে তিনি এইভাবে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

—হিন্দুপত্রিকা

কলিকাতায় পতিতা সমস্যা—

কলিকাতার ভিজিল্যান্স এসোসিয়েসনে'র আবেদনের উত্তরে লণ্ডনের নৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিধান সমিতি মিস্ মেরিসেন্ট শেফার্ডকে ৩ বৎসরের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করিতেছেন।

মিস্ শেফার্ড একজন অভিজ্ঞা নারীকর্ম্মী এবং কলিকাতায় তিনি পতিতালয় সমস্যা বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষাদান করিতে মনোনিবেশ করিবেন।

বিধবা বিবাহ—

বিগত আশ্বিন মাসে কিশোরগঞ্জ মহকুমার করগাঁও নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাসের বালবিধবা কন্যা শ্রীমতী কুন্দকামিনীর সহিত নগরকুল (তারাইল) নিবাসী শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন কর্ম্মকারের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বর্ত্তমান বয়স ১৩ বৎসর। সে ১১ বৎসর বয়সে বিধবা হয়।

বিগত আশ্বিন মাসে শ্রীনীলকান্ত নমঃদাসের সহিত শ্রীজ্ঞানদাসুন্দরী নমঃদাস্য নাম্নী এক বিধবার পুনর্ভূঃ বিবাহ শ্রীসনাতন নমঃদাসের বাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র পট্টি গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহসভায় স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

—চারুমিহির

গত আশ্বিন মাসে নাগরপারা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভৌমিক মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর শুভ বিবাহ সোনামুই নিবাসী স্বর্গীয় কালীকিশোর দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান জ্যোতীশচন্দ্র দত্তের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৯ বৎসর এবং পাত্রীর বয়স ২২ বৎসর।

—টাঙ্গাইল হিতৈষী

কৃষকের সাধুতা—

কুষ্টিয়ার জনৈক দুগ্ধ বিক্রেতা রাজচন্দ্র দের ভ্রাতুষ্পুত্র ময়মনসিংহ হইতে সেনবাড়ী দুগ্ধ বিক্রী ও পয়সার বাট্টাদারী করে। বিগত শ্রাবণ কি ভাদ্রমাসে একদিন ময়মনসিংহ হইতে ২৩১৲ টাকার সিকি ও খালী দুগ্ধের টিনগুলি নিয়া সেনবাড়ী ষ্টেশনে নামিবার সময় ভুলক্রমে উক্ত ২৩১৲ টাকার সিকির থলিয়াটি ফেলিয়া দুগ্ধের খালি টিনগুলি নিয়া নামিয়া পড়ে। বিশেষতঃ উক্ত ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই কাশিহারী নিবাসী বৃদ্ধ জনু হাজী সাহেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়ার দরুণ অনুরোধ করায় সে তাহাতে স্বীকৃত হয়। গাড়ী ষ্টেশনে থামিলে ঐ বৃদ্ধ হাজী সাহেবকে নামাইয়া দিয়া তাহার দুগ্ধের খালী টিনগুলি নিয়া অতি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়ে। এখানে গাড়ী ২।১ মিনিট সময় অপেক্ষা করে মাত্র ইহাই তাহার ভুলের কারণ। গাড়ী ছাড়িলেই সে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করিলে ষ্টেশনে উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। এখানে টেলিগ্রাফ কি টেলিফোন কিছুই নাই। পরে নিরুপায় হইয়া স্থানীয় সেনবাড়ী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার বাবুর নিকট সে সাহায্য প্রার্থনা করে। হেডমাষ্টার বাবু একখানা সাইকেল দিয়া তাঁহার জনৈক ছাত্রকে কালীগঞ্জের ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। বালিপাড়া বা রামঅমৃতগঞ্জ ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ করিয়া জানা গেল যে সেনবাড়ীর নিকটস্থ জালুকী নিবাসী বাবুজান সরকার নামক জনৈক মুসলমান ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট বলে যে "সেনবাড়ী ষ্টেশনের নিকট একজন দুগ্ধ বিক্রেতা ভুলক্রমে একটি টাকার থলিয়া গাড়ীতে ফেলিয়া গিয়াছে। উক্ত টাকার থলিয়াটি আপনার নিকট আমানত স্বরূপ রাখিয়া যাইতেছি। উক্ত দুগ্ধ বিক্রেতা আপনার নিকট আসিলে তাহার টাকাগুলি দিয়া দিবেন।" এই সংবাদ পাইয়া সে বালিপাড়া চলিয়া যায়। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় তাহার প্রাপ্য টাকার থলিয়াটি দিয়া দেন। প্রকাশ যে, উক্ত

বাবুভান সরকার একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিল। বর্ত্তমানে তাহার দরিদ্রাবস্থা হইলেও লোভহীনতা ও চরিত্রগুণে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

—চারুমিহির

পরলোকগত পীযূষকান্তি ঘোষ—

পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে কেবল যে, 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'রই সমূহ ক্ষতি হইল তাহা নহে, বাঙ্গলাদেশ একজন অক্লান্তকর্ম্মী, সংবাদপত্রসেবী এবং হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট সেবককে হারাইল। পিতা শিশিরবাবু এবং খুল্লতাত মতিবাবুর নিকট তিনি উত্তমরূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

হিন্দুসভার কার্য্যে তিনি পরম উৎসাহী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উদ্যোগেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা প্রথম গঠিত হয় এবং তিনি তাহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহার মধ্যে বঙ্গীয় প্রেততাত্ত্বিক সভার নাম উল্লেখযোগ্য। শিশিরবাবু মতিবাবুর ন্যায় এই প্রেততত্ত্বালোচনায় তাঁহারও খুব উৎসাহ ছিল। শিশিরবাবুর প্রতিষ্ঠিত 'স্পিরিচুয়ালিষ্ট ম্যাগাজীন' তিনি দীর্ঘ তের বৎসর কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলা দেশের যুবকেরা যাহাতে শরীরচর্চ্চা করে, তাহার জন্য তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল এবং তিনি এ-সম্বন্ধে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে কয়েকখানি পুস্তিকা বাহির করিয়াছিলেন। "বঙ্গীয় শারীর চর্চ্চা সমিতি" নামে একটি সমিতিও তাঁহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বৎসর লণ্ডনে গৃহীত



শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেন

আই সি এস্ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ পাশ করিয়াছেন।

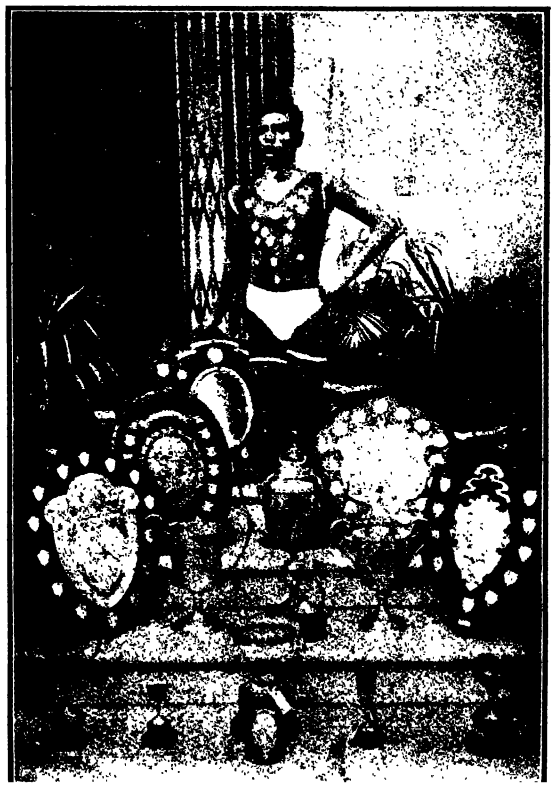
বিক্রমপুর বিদগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সেন ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত টেকনোলজিক্যাল বিদ্যালয় হইতে



শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বি-এস্-সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ১০০ পাউণ্ড গবেষণা বৃত্তি পাইবেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্-সি পাশ করিয়া হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর ইঞ্জিনিয়ারীং পড়িয়াছিলেন।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা—



ত্রয়োদশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সাঁতারু
শ্রী নলিনচন্দ্র মল্লিক

কলিকাতার ৩০ মাইল ও ১৩ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতার বিজয়ী বালকগণের চিত্র এইখানে দেওয়া হইল।



ত্রিশ মাইল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সাঁতারু—(১) শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; (২) শ্রীকালীপ্রসাদ রক্ষিত; (৩) শেখ ইয়াকুব আলি; (৫) শ্রীসুকুমার ভড়

মেজর হাসান সুহ্রাওয়ার্দ্দি—

ডাঃ মেজর হাসান সুহ্রাওয়ার্দ্দি এম্-ডি; এফ্, আর, সি, এস্; ডি, পি, এইচ্; এল্. এম্; ও, বি, ই সম্প্রতি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ষ্টেট্ রেলওয়েতে এই পদ পাইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে বাংলার নানা-জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। মুসল-



মেজর হাসান সুহ্রাওয়ার্দ্দি

মান শিক্ষা সমিতির সভাপতি রূপে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সর্ব্বপ্রথম মুসলমান সহকারী সভাপতিরূপে, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট সভার সদস্যরূপে তিনি ইতিপূর্ব্বে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন।



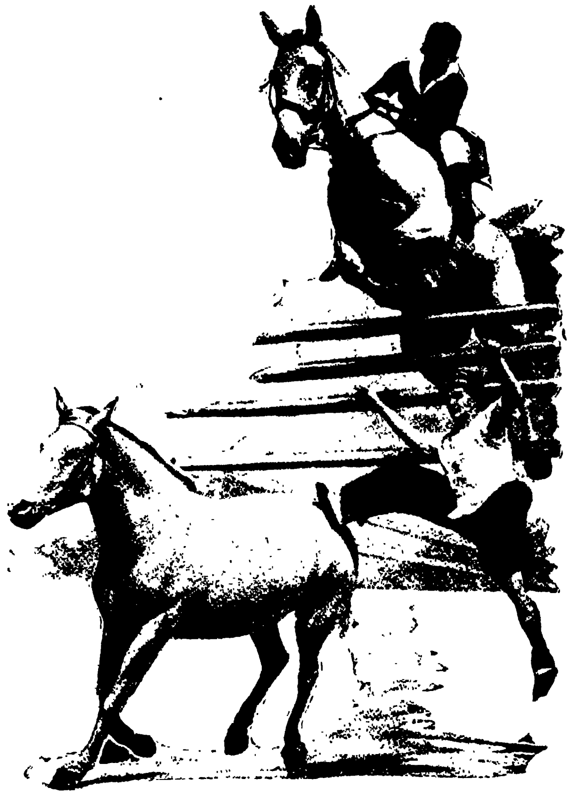
সার্কাসের ঘোড়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা—

সার্কাসের ঘোড়ার শিক্ষা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু বহু আয়াসে এই শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।



সার্কাসের ঘোড়ার ও খেলোয়াড়দের আশ্চর্য্যজনক কৌশল

সার্কাসে সাধারণত দুই রকম ঘোড়ার ব্যবহার হয়—মুখ্য (principal) ও পার্শ্বচর (finish)। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ঘোড়ার শিক্ষার জন্যই খেলোয়াড়দের যত্ন করিতে হয়। এইরূপ এক-একটি ঘোড়াকে শিখাইতে অন্তত দুই বৎসর লাগে।



ফিল্ ওয়াইস' একটি লাগাম্-জিন্ শূন্য ঘোড়ার পিঠ হইতে অদ্ভুতরূপে নামিতেছেন এবং অপর একটি সার্কাসের ঘোড়া শিক্ষানুযায়ী বাধা ডিঙাইতেছে।

'মুখ্য' ঘোড়ার পিঠ খুব চওড়া হওয়া দরকার; পা সরু হওয়াই ভালো। চওড়া পিঠে খেলোয়াড়ের বসিতে দাঁড়াইতে লাফাইতে, ডিগ্‌বাজি খাইতে খুব সুবিধা। ধূসর বা শাদা রঙের ঘোড়া পাইলেই ভালো। তাহা হইলে খেলোয়াড়দের ঘোড়ার পিঠে যে রজন্ মাখাইতে হয়, তাহা দর্শকদের চোখে পড়িবে না। আকার ও বর্ণ সন্তোষজনক হইলে ঘোড়া নির্ব্বাচনে পরে দেখিতে হইবে ঘোড়ার স্নায়ুর চপলতা। মানুষের কক্ষপুটে যেমন হাত দিলেই বুঝা যায়

তাহার 'কাতুকুতু' আছে কি নাই, ঘোড়ারও পরীক্ষা অনেকটা সেইরূপেই করিতে হয়। এই পরীক্ষায় টিকিলেই ঘোড়া শিক্ষা-ব্যবস্থার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার পরে আরম্ভ হয় শিক্ষাদান।

প্রথম অবস্থার শিক্ষা :—বিন্ আঁটিয়া লাগাম পরাইয়া ঘোড়াকে প্রতিদিন মুক্তক্ষেত্রে কিছুক্ষণ ধরিয়া দৌড় শেখানো। এই সময়েই লাগামে ঘোড়ার মুখ বাঁকাইয়া ঘাড়ের কাছে টানিয়া আনার নিয়ম আয়ত্ত করিতে হয়। ইহাতে ঘোড়া কদমে চলিতে শিখে। কিন্তু, সাবধানে এইটি শিক্ষা না দিলে ঘোড়ার ঘাড় মটকাইয়া যাইবার



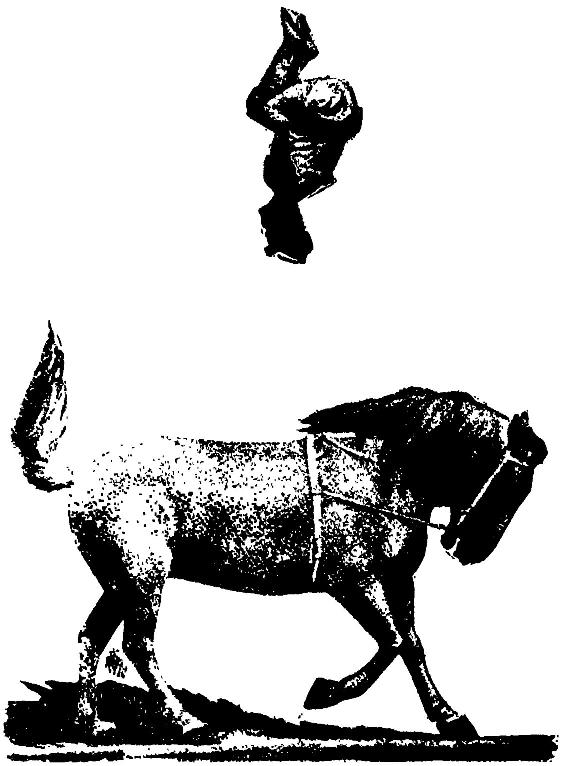
প্রসিদ্ধ মেয়ে-খেলোয়াড় মে ওয়াইর্থ-এর একটি অপূর্ব্ব খেলা

সম্ভাবনা। অনেক সপ্তাহ এইরূপ শিক্ষাদান করিলে 'দ্বিতীয় পাঠ' আরম্ভ হইবে। সে শিক্ষা চক্রাকার। তাঁবুতে বা আচ্ছাদিত স্থানে এখনো বিন লাগাম খুলিয়া লওয়া হয় না। এই সময়ে ঘোড়াকে চক্রাকারে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দৌড়াইতে শেখানো হয়। এই সময়েই উল্টা দৌড়ও ঘোড়াকে শিখাইতে হয়। ইহা ভালো না শিখিলে ঘোড়া চম্‌কাইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভাগের এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে বহুলোকের সম্মুখে খেলা দেখাইবার কালেও কোন অভাবনীয় কাণ্ড না হইলে ঘোড়া ভয় পায় না। এই পাঠ সমাপ্ত হইলে তৃতীয় পাঠে বিন্-লাগাম খুলিয়া লওয়া হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে চামড়ার সরু বেষ্টনী পিঠে ও মুখে আঁটিয়া দেওয়া হয়। একগাছি দড়ি ব্রিডেল্-এর সহিত জুড়িয়া প্রথমদিকে শিক্ষক চাবুক হাতে বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়ান এবং ঘোড়াকে বৃত্তের বেড়া ঘেঁসিয়া দৌড়াইতে শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা আয়ত্ত হইলে শিক্ষক চলন্ত ঘোড়ার উপর লাফাইয়া চড়া শিক্ষা করেন। তারপর ক্রমশঃ ঘোড়ার উপর দাঁড়ানো, লাফানো, ডিগ্‌বাজি খাওয়া প্রভৃতি নানাখেলা শিক্ষা আরম্ভ করেন।

বাধা-ডিঙানো ও 'বেলুন্, পার হওয়া প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ খেলা প্রত্যেক ঘোড়াকেই শেখানো হইয়া থাকে। হার্ডেল্ দৌড়ে যেমন দৌড়ের ঘোড়া দৌড়ায়, প্রথমে সার্কাসের ঘোড়াও সেইরূপেই বাধা ডিঙাইতে শিখে; পরে. ইহা ঘোড়ার অভ্যাসগত হইয়া যায়। 'বেলুন' বা নিশানের কৌশল অন্য রূপ।—বেলুন বা নিশানের নিকট আসিলে ঘোড়া উহার নীচ দিয়া মাথা নোয়াইয়া দৌড়াইয়া বাহির হয়, আরোহী তৎক্ষণে উহার উপর দিয়া লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে পুনরায় ঠিক উপবেশন করে। এই খেলায় প্রথমে ঘোড়াকে মাথা নোয়াইয়া দৌড়ানো শিখাইতে হয়, পরে ঘোড়ার

উগ্র আরম্ভ হইলে আরোহীর নিম্ন অংশ আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতে হয়।

খেলোয়াড়ের কাছে এক-একটি শিক্ষিত ঘোড়া অমূল্য সম্পত্তি।



মে ওয়াইর্থ উল্টা ডিগবাজি খাইতেছেন। এইরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্যে তাহার নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কারণ, এইরূপ শিক্ষাদান যে কি শ্রমসাধ্য ও কষ্টসাধ্য তাহা একমাত্র সেই জানে।

—

মাংসপেশীর ব্যবহার—

মাংসপেশীর যথোচিত ব্যবহার জানিলে ভারোত্তোলন সহজ হইয়া উঠে। এইরূপ কয়েকটি সহজ নিয়ম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। মাটি হইতে কোনো ভার তুলিতে হইলে পিঠ সোজা রাখিয়া হাঁটু নোয়াইয়া সেই জিনিষটিকে ধরিয়া খাড়া উঠিয়া দাঁড়াইলে জিনিষটি তোলা সহজ হইবে। টুল তুলিবার চিত্রে পায়ের মাংসপেশী কত প্রয়োজনীয় তাহা বুঝা যায়।

ভারোত্তোলনের প্রথম সূত্র :- পায়ের উপর সর্ব্বাগ্রে নির্ভর করিবে। পায়ের মাংসপেশী হাঁটিতে হাঁটিতে শক্ত হইয়া উঠে। তাই, ভারোত্তলনেও সহায়তা করে। দ্বিতীয় সূত্র :—ভারযুক্ত বস্তুটি যত নিকট হইতে সম্ভব ধরিয়া লইবে। দূর হইতে ধরিলে তুলিতে ভয়ানক অসুবিধা। ভারোত্তলনে আরেকটি প্রধান জিনিষ—ব্যালান্স বা ভারসাম্য। যথা, দুইহাতে দুইটি ১৫ সের ওজনের ব্যাগ্ লইয়া চলা এক হাতে একটি ১৫ সের ওজনের ব্যাগ্ লইয়া চলার চেয়ে সহজ। তাহার কারণ,



ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া দুইটি ব্যাগ্ লইয়া চলাও সহজ হইয়াছে

দুইদিকে ব্যাগ্ থাকিলে ভারসাম্য বা ব্যালান্স রক্ষিত হয়। চীনা কুলীরা বা আমাদের দেশের গয়লারা এইরূপেই অনেক ভারী জিনিষ একটি দণ্ডের দুইদিকে ঝুলাইয়া অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে লইয়া চলে। আরএকটি সূত্র—সুবিধা হইলেই ভারবস্তু তোমার কাঁধে তুলিয়া বা মাথায় করিয়া লইবে। কাঠের বোঝা, ময়দা, চাল, কয়লা প্রভৃতির বোঝা এইরূপেই প্রতিনিয়ত বহিয়া লওয়া সম্ভবপর হইতেছে। ভারোত্তোলনের আর একটি নিয়ম সাধারণত লক্ষিত হয় না ;—জঙ্ঘার উপর জোর দেওয়া। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে গেলেও প্রথম শরীর শুদ্ধ সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া জঙ্ঘার উপর জোর দিয়া ওঠাই সহজ। অথচ, অনেকেই হয়ত ইহা জানেন না, এবং কার্য্যত মানেনও না।

—



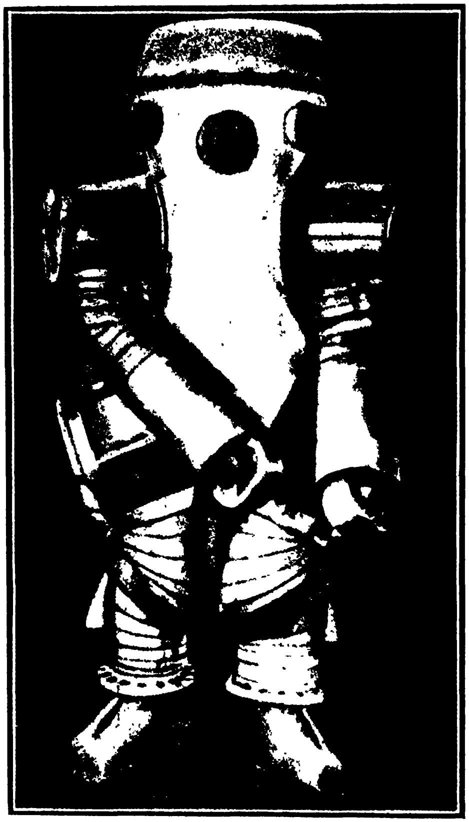
টুল তুলিতে পায়ের মাংস-পেশীরই উপর জোর পড়িবে



বাক্স তুলিতে জানুর উপর ঝুঁকি লওয়াই স্থবিধা জনক

...ীর অদ্ভুত পোষাক—

এই ধাতবদ্রব্যের প্রস্তুত অদ্ভুত পোষাকে ডুবুরীরা ২০০ ফিট নিম্নে ডুব দিয়া নামিতে পারিবে ও ৪৫ মিনিট্‌কাল ডুবিয়া থাকিতে



ডুবুরীর অদ্ভুত পোষাক

আছে ; এবং ইহার বায়ুপূর্ণ মোজা ইস্পাতের মোড়কে স্থসংরক্ষিত থাকে। কাজেই, এই পোষাকে ডুবুরীরা নির্ভয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীক্ষণ সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশে নামিয়া থাকিতে পারিবে।

—

নারীর কৃষিকর্ম্মে সহায়তা—



সুমাত্রা দ্বীপের 'বটকদের' মধ্যে নারীরা গৃহের ও ক্ষেত্রের অনেক কাজই করিয়া থাকে। ইহাদের কৃষিকর্ম্মের কোন কোন উপাদানও অদ্ভুত। উপরের চিত্রে এইরূপ একটি যন্ত্র সহযোগে সুমাত্রার মেয়েরা কৃষির জন্য মাটি খুঁড়িয়াজমি তৈয়ারী করিতেছে। ইহা আমাদের দেশের খন্তার মত; লম্বা লম্বা কাঠের একদিক বেশ ধারাল করিয়া মাটিতে ঢুকাইয়া চাড় দিয়া তাহা তুলিয়া লওয়া হইতেছে। বহু পুরুষ ধরিয়া এইরূপে ইহারা ভূমি চারা রোপনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

"বধূ"

শ্রী যুগলকিশোর সরকার

প্রকৃতির অনবদ্য অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য-সম্ভারের মধ্যে প্রতিপালিত, রাজধানীতে, নবাগতা পল্লীবালার মর্ম্মবাণী। রবার্ট ব্রাউনিংয়ের একটি গীতি-কবিতা পাঠ করিয়া জনৈক সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—It is the picture of a man thinking aloud—এই মন্তব্য আলোচ্য-ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজন্ম পল্লীর স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট হইয়া বালিকা রাজধানীর পাষাণ কারার বিরাট্ ভিত্তিতলে বন্দিনী হইয়াছে এখানে বিরাট সৌধশ্রেণী, রাজপথের উজ্জ্বল দীপাবলী, যানবাহনাদির প্রাচুর্য্য, কর্ম্মের কোলাহল, ঐশ্বর্য্যের বিবিধ বিচিত্র ঘনঘটা, নাগরিকজনসুলভ প্রগল্ভতা—কিছুই বালিকাকে আনন্দ দান করিতে পারিতেছে না। এই প্রাচুর্য্যের মাঝখানেও সে বড় দীন, এই জনারণ্যের মাঝখানেও সে বড় নিঃসঙ্গ একক। এ সবের মধ্যে সে একটা দরদী প্রাণের, একটা সরল অনাবিল স্নেহের স্পর্শের অভাব মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। এখানকার বদ্ধবাতাসে পল্লীবালা সহজ ভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, এখানে যেন তাহার মন-প্রাণের সহজ বিকাশ অসম্ভব। বন লতার সহজ-বিকাশ বনভূমির পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যেই সম্ভব, ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্যের বারাণ্ডায় স্থাপিত কারু শিল্প-সম্পন্ন টবের উপর হওয়া সম্ভব নয়। তুলসীমঞ্চের শান্ত শ্রী পল্লীর উটজ-প্রাঙ্গণেই ফুটিয়া উঠে, রাজধানীর ধনীগৃহের প্রশস্ত চত্বরে তাহা ম্লান হইয়া যায়। পল্লীর সন্ধ্যা-প্রদীপে হয়ত বা রাজধানীর বিজলী বাতির উগ্রদীপ্তির সন্ধান মিলিবে না, কিন্তু পল্লীকুটিরের অন্ধকার দূর করিতে প্রদীপের স্নিগ্ধরশ্মিই প্রয়োজনীয়। ঐশ্বর্য্যের মোহময় প্রলেপে অনেক দৈন্য, অনেক কুশ্রীতা, অনেক আবিলতা অপবিত্রতা বাহ্যতঃ মনোহারী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। কারণ 'পল্লী সৃষ্টি করিয়াছেন ঈশ্বর, আর সহর সৃষ্টি করিয়াছে মানুষ।' মানুষের হাতের কারিগরীর কুশ্রীতা যখন প্রকৃতির অনবদ্য অঙ্গকে মলিন করে নাই, তখন প্রকৃতির সেই অনাবিল সৌন্দর্য্যের মাঝখানেই আদিমানব পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তখন মন ছিল তাহার জ্যোৎস্নার মত স্বচ্ছ-তরল, প্রাণ ছিল শিশুর মত সরল-উদার, বক্ষে ছিল তাহার ঝটিকার বিক্রম। আত্মগোপন করিতে সে জানিত না, ছলা-কলা সে তখন শিখে নাই, কৌশলী সে ছিল না, দুঃখে সে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিত, আনন্দে আত্মহারা হইয়া অট্টহাস্য করিত। বাস করিত সে বৃক্ষ-কোটর বা গিরিগুহায়, পান করিত নদীনির্ঝরের স্ফটিকস্বচ্ছ জল, ভোজন করিত বনভূমির কন্দ ফল মূল। বিশ্রামের ঠাঁই ছিল শাল-তমালের পাদমূল—প্রকৃতির সন্তান লালিত হইতেছিল প্রকৃতির অনবদ্য বক্ষের শুভ্রপীযূষ ধারায়—'আলোকের আলিঙ্গনে ও বাতাসের চুম্বনে।' তারপর বিবর্ত্তনের অনিবার্য্য বিধানে আদি মানবের সরল-উদার, বীর্য্যবান মন-প্রাণ সভ্যতার পুটপাকে শোধিত হইতে লাগিল। মস্তিষ্ক সম্পদে মানুষ কিছু গরীয়ান হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অমোঘ বীর্য্য, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, সর্ব্বোপরি 'শিশু-হেন-উলঙ্গ পরাণ' হারাইল। আসল জিনিষটি কৃত্রিমতায় ঢাকা পড়িয়া গেল। মন-প্রাণের সহজ-বিকাশ সভ্যতার গুরুভারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু যতই 'চোলাইকরা' যাউক না কেন, সভ্য মানুষের ভিতরে আদি-মানবের অস্তিত্ব, আদি-যুগের ভাব-সম্পদ একবারে 'মরিয়া' গেল না, প্রচ্ছন্ন রহিল। তাই সভ্যতা-ভব্যতা, নিয়মকানুন, শাসন-সংযমের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মাঝে মাঝে মানুষ আত্মভোলা হইয়া গিয়া পুরাতনকে ফিরিয়া পাইতে চায়।

"নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।"

পল্লীমায়ের এই দুলালটি ছিল 'পলাতকা ঝরণার জল, শাসনের পাথর ডিঙ্গিয়ে চ'লত মনটি ছিল তার যেন বেণুবনের উপর ডালের পাতা, কেবলি ঝির ঝির ক'রে কাঁপ্‌ত।' আজ সে রাজধানীর ইট-কাঠের ভিতর নববধূর আকার লাভ করিয়াছিল,—'নদী যেন চ'লতে চ'লতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হ'য়ে গেছে।' পল্লীবালার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য-গতি প্রতিহত হইয়াছে, চিরপরিচিত সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আবেষ্টনের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। পল্লীর চিরপরিচিত স্নানের বাঁধাঘাট, সবুজ মাঠ, পল্লীর অশথ-তল, দীঘির শীতল কালো জল, বেণুকুঞ্জের অবনমিত শ্রী, আকাশের রাকাশশী, পল্লীভবনের গোষ্ঠগৃহ, সন্ধ্যাদীপ-মঙ্গলশঙ্খ, দোয়েল-মদনা-চন্দনার গান, পল্লীচত্বরের শুভ্র আলপন প্রভৃতি তুচ্ছতম জিনিষগুলিতেও কি অপূর্ব্ব মাধুরী মিশ্রিত ছিল, বঞ্চিতা হইয়া বালিকা আজ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সেখানকার 'মাটি যে তা'কে কোলের দিকে টান্‌ত, জল বুকে ক'রে নিত, বাতাস গায়ে হাত বুলোত, আকাশ কপালে চুমো খেত।'

সেখানকার— "কাউকে চেনে পরশ তাহার
কাউকে চেনে প্রাণ
কাউকে চেনে বুকের রক্ত
কাউকে চেনে ঘ্রাণ।"

সেখানকার প্রতি ধূলিকণাটির সহিত সে এমন ওতঃপ্রোতভাবে

বিজড়িত ছিল, যে, সেখানের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার সমস্ত সত্তা আলোড়িত হইয়া যাইবে। হইয়াছেও তাহাই। বাস্তবতঃ মনে হইতে পারে যে রাজধানীতে আসিয়া বালিকা অনেক-কিছুই পাইয়াছে। সহানুভূতির অভাবে পুরনারীগণের পক্ষে এমনও মনে করা সম্ভব, যে, বালিকার অসন্তুষ্টির কারণ একমাত্র তাহার গ্রাম্য দোষদুষ্ট রক্ষণশীল মন। কিন্তু

"কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!"

মনের ক্ষুধা মিটিবে কিসে? পল্লীর সুখনীড়ে মাতার বক্ষের উত্তপ্ত কটাহে স্নেহের যে ক্ষীর ধারা তাহারই জন্য নিবিড়-ঘন হইয়া থাকিত, বেলাশেষে সখিদের যে মধুময় আহ্বানে তাহার মনে শত বেণুবীণা বাজিয়া উঠিত, দীঘির যে শীতল কালো জল তাহার সর্ব্ববিধ উষ্মা দূর করিয়া তরলিত স্নেহের মতই তাহার কুম্ভ ও বক্ষ ভরিয়া দিত, কোথায় সেই সব সোণার কাঠির অমৃত পরশ! রাজধানীতে আসিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই বালিকা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যে, এখানে তাহাকে যোগ্যতার মাপ কাঠিতে পরিমাপ করা হইতেছে—যাহা কঠিন পরীক্ষারই রূপান্তর মাত্র, স্নেহ মমতার অবকাশ যেখানে নাই।

"ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।"

সে যেন একটা চৈতন্যবর্জ্জিত, প্রাণবর্জ্জিত পণ্য, রক্তমাংসে গড়া মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য স্নেহ-সহানুভূতি পাইবার সহজ অধিকারে যেন সে বঞ্চিত। তাই তাহার সমস্ত সত্তা আলোড়িত করিয়া যে সুগভীর ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিয়াছে, আলোচ্য কবিতাটি তাহারই ছন্দোময়ী প্রতিকৃতি। বঙ্গবধূর হৃদয়দর্শী কবি বঙ্গবধূর বেদনাতুর ব্যাথাদীর্ণ হৃদয়ের মর্ম্মবাণী যে করুণ মধুর ছন্দে গাহিয়াছেন, তাহা, শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও অতুলন। কবি যে শুধু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই করেন না. তিনি যে দ্রষ্টা—তাঁহার গভীর অনুভূতি শক্তি, তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি যে কিছুই এড়াইয়া যায় না—আলোচ্য কবিতাটি তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"বেলা যে পড়ে গেল জলকে চল'
* * *
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে
কে যেন ডাকিল রে জলকে চল!"

কি করুণ-মধুর নান্দী! "ভিতের প্রথম ইট খানিতেই গোটা বাড়ির কথা।" সুচতুর সূত্রধার একবারে মূলসূত্রটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় বীণায় এই করুণ রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া সমস্ত মিড়গুলি আর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। বেলা পড়িয়া আসিতেছে, উঠানে ছায়া পড়িতেছে, দিগ্বধূ রক্তিম-উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর রঙ ফিরিতেছে, সখিদের মধুময় আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে, 'আনমনে একেলা গৃহকোণে' অবস্থিতা ধ্যানমগ্না বধূর মানস-কমল ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু

"হায়রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট্ মুঠিতলে চাপিতে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!"

পল্লীর প্রতি, তথা প্রকৃতির প্রতি, এই যে সহজ-মমত্ব. এই যে সুগভীর আসক্তি, ইহা বালিকার নিজস্ব বা ব্যক্তিগত অবস্থা নহে। ইহা সার্ব্বজনীন। শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্তের রাজধানীতে আসিয়া শার্ঙ্গরব বলিতেছেন,—

"তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিত বিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব।"

তবে কেবলমাত্র পল্লীর শান্ত-স্নিগ্ধ ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই এবং চিরাভ্যস্ত আবেষ্টন হইতে নূতন আবেষ্টনের ভিতর অর্থাৎ চেনা-মহল হইতে সম্পূর্ণ অচেনা মহলে আসার জন্যই যে বধূর-চিত্ত ক্রন্দন-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ নহে। বধূর চিত্ত-ক্ষোভের কারণ-সমূহের মধ্যে ঐগুলি অন্যতম হইলেও একমাত্র কারণ নহে। মানুষের মন বড় জটিল, বড় রহস্যপূর্ণ; বিচিত্র তাহার গতি, বিচিত্র তাহার ভাবনা-বেদনা, বিচিত্র তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিশ্লেষণ করিয়া কারণ নির্ণয় করিতে যাওয়া, অথবা তত্ত্ব পদার্থের নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া অনেক সময় সম্ভবপর হইয়া উঠে না। রসের দিক দিয়া কবিতার যে উপভোগ তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। "বধূ" কবিতাটি পাঠ করিয়া যদি কাহারও চিত্তপটে পল্লীর ধূসর-পাণ্ডুর গোধূলির ছায়ালোকে পল্লীবালাদের 'জলকে চলিবার' সময়ের আনন্দ-ছবি রূপায়িত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে দীঘির 'শীতল কালো জল, দু'ধারের ছায়া ঘন বন, সাঁঝের ঝিকিমিকি আলো, তীরে রাখালের জটলা, বামদিকের দিগন্তপ্রসারিত মাঠ, ডাহিনের হেলান বাঁশবন' প্রভৃতি অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয় এবং রাজধানীতে নির্ব্বাসিতা বঞ্চিতা পল্লীবালার বিষাদপ্রতিমাখানি মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠে, তবেই তিনি কবিতাটি পাঠের যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন বুঝিব এবং তবেই তিনি বধূর মর্ম্মস্পর্শী চিত্তক্ষোভ—

"দীঘির সেইজল শীতল কালো
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভালো"

এই পংক্তি দুইটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন।

রুপার্ট ব্রুক*

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

কবিতা পড়িতেছিনু, ইংরাজী সে সনেট দু'চারি—
আরো কিছু স্বল্প-কলেবর। জানি নাই, কখন সে ভাষা
হইল আমারি বাণী, বহিল সে আমারি পিপাসা।
যে সরল সত্য মন্ত্রে জীবনের আমিও পূজারী—
তারি ছন্দ, তারি সুর, অনবদ্য প্রকাশ তাহারি
মর্ম্মরি' উঠিল মর্ম্মে,—এক আশা, এক ভালোবাসা!
মনে হ'ল, যে-বিহঙ্গ স্বপ্নে মোর বেঁধেছিল বাসা
অন্ধকারে, সে আজি অরুণালোকে উঠিছে ফুকারি'।
প্রতি শব্দ অর্থবান, প্রতি পংক্তি ব্যথায় বিধুর,
শ্লোকে-শ্লোকে অতিরুদ্ধ হৃদয়ের সিন্ধুকলোচ্ছ্বাস;
অসীমার অভিসারে পদধ্বনি যেন সে সুদূর,
কণ্ঠে তবু একি গীত!—ধরণীর এ মর্ত্ত্য-আবাস
এত ভালো লেগেছিল! প্রেমে প্রাণ এত ভরপুর!
এত আলো—নিবাইতে নারে তারে মৃত্যুর নিশ্বাস!

২

বহিতেছে মৃত্যু-ঝড়; মহামারী-রূপে মহাকাল
অযুত জীবন-দীপ নিবাইছে ফুৎকারে ফুৎকারে;
ছিন্নমস্তা 'য়ুরোপা'র কণ্ঠস্রুত শোণিত-উৎসারে
কি ভীষণ কলধ্বনি! না, সে বুঝি মত্ত প্রেতপাল
ছড়াইছে দিকে দিকে বহুজীর্ণ আপন কঙ্কাল—
কৃপণ জীবন যাহা করেছিল জড় স্তূপাকারে
সঞ্চয়, শতাব্দী ধরি'! ভরি' উঠে দারুণ ধিক্কারে
সারাচিত্ত, টুটে যায় জীবনের মিথ্যা মোহজাল।

* 1914 & Other Poems, By Rupert Brooke.

সেই ঘৃণা, অবিশ্বাস, অট্টহাসি, হাহাকার মাঝে
ধ্বনিল কি শুভ-গীত—কবিকণ্ঠে সুন্দর বন্দনা।
আপনার হৃদ্‌পিণ্ড,রক্তজবা, ছিঁড়িয়া অঞ্জলি
দানিল সে হাসিমুখে—রাজকর মৃত্যু-মহারাজে।
মরণ মরিল লাজে, তাই হেন অমৃত-মূর্চ্ছনা—
জীবনেরি জয়গানে ভরি' উঠে নব পদাবলী।

৩

"যে বিধাতা গড়িয়াছে আমা সবে নিজ প্রয়োজনে
যুগ-যোগ্য করি'; বরিয়াছে মোদের যৌবন;
হরিয়াছে সুখ-নিদ্রা; চক্ষে দীপ্তি, অব্যর্থ-সাধন
দুই বাহু দিল যেই, ঝাঁপাইতে দ্বিধাশূন্য মনে
নীল নির্ম্মলতা মাঝে—নমি আজ তাঁহার চরণে।"
"লভেছি অভয় মোরা, যাহা কিছু নিত্য চিরন্তন
তারি সাথে :—বায়ু, উষা, মানুষের হাসি ও ক্রন্দন,
নিশীথ, বিহঙ্গগীতি, মেঘেদের গমন গগনে।"
"করি না যুদ্ধের ভয়। চলিয়াছি শুভযাত্রা করি'
গোপন কবচে মোরা মৃত্যুবাণ করিব নিষ্ফল;
অ-রক্ষায় সুরক্ষিত; মানুষ যেতেছে যেথা মরি'
দলে দলে, সবচেয়ে ভীতিশূন্য সেই রণস্থল।
আর, যদি প্রাণ এই ক্ষুদ্র দেহ যায় পরিহরি'—
লভিব পরম স্বস্তি হারাইয়া চরম সম্বল।" *

৪

"এই সব প্রাণ ছিল জীবনেরি দুঃখ-সুখে গড়া,
অপরূপ অশ্রুজলে স্নান-শুচি, হরষ-চপল।
বয়সে বেড়েছে স্নেহ। ধরণীর রঙের পসরা
একদা এদেরও ছিল,—উষা, আর সান্ধ্য নভোতল।
এরা ভুঞ্জিয়াছে গীত, গতিরাগ, নিদ্রা, জাগরণ,
চকিত বিস্ময়-সুখ, ভালোবাসা, বন্ধুতা-গৌরব,
বিজনে বসিয়া-থাকা, সুকোমল স্পর্শ-শিহরণ
রেশমে, কপোলে, ফুলে;—ফুরায়েছে আজি সেই সব।

* রুপার্টব্রুকের কবিতা হইতে

আছে হ্রদ হিম-দেশে—সারাদিন ক্ষ্যাপা বায়ু সনে
হাসে হাহা করি', হাসে বুকে নীলাকাশ। পরক্ষণে,
সে চঞ্চল রূপচ্ছায়া, ঊর্ম্মি নৃত্য—শীত সুকঠিন
স্তব্ধ করি দেয় শুধু একটি ইঙ্গিতে; রেখে যায়
নিস্তরঙ্গ শুভ্র ভাতি, পুঞ্জীকৃত প্রভা ছায়াহীন,
একটী বিস্তার শুধু, দীপ্ত শান্তি,—গভীর নিশায়।" *

৫

হে প্রেমিক আয়ুহীন! এ জীবন এত কি সুন্দর?
সত্যকার তৃষাভরে যে করেছে সেই সুধাপান,
মৃত্যুর আঁধারে সে কি পাইয়াছে পূর্ণিমা-সন্ধান?
বৈতরণী-তীরে বসি' ভুঞ্জে সে কি মলয় মন্থর?
এ কি প্রেম প্রাণময়! জগতের এই যুগান্তর—
নির্দ্দয় প্রলয়-বন্যা সাঁতারিয়া, তুমি বীর্য্যবান্
উতরিলে সেই স্রোতে—তারকারা করি' যাহে স্নান
নীরবে চাহিয়া থাকে পৃথ্বীপানে, ভরিয়া অম্বর।

প্রাণমন্ত্রে দীক্ষা দিলে, মরণের বরযাত্রী তুমি।
হে গাণ্ডীবা, বিস্ফারি' বিশাল বক্ষ করিলে যোজনা
ধনুকে অমোঘ শর, ভেদ করি' কঠিন শ্মশান
বহাইলে ভোগবতী—পূত হ'ল সারা প্রেতভূমি।
মমতার মোম দিয়ে বধূমুখ করিলে মার্জ্জনা
প্রকৃতার,—নর-চক্ষে করিলে যে নবদৃষ্টি দান

৬

তাই আজ, ওগো বন্ধু, ধরণীর দূর প্রান্তভাগে
তোমারে সম্ভাষ করে ভিন্নভাষী আর এক কবি;
তব কাব্য দুগ্ধ যেন, ঈষদুষ্ণ, দোহন-সুরভি!—
পান করি' প্রাণে তার কি আনন্দ, কি ভরসা জাগে!
শতযুগ-জরাভার যেই জাতি নিশ্চিন্ত বিরাগে
বহে আজও, তারি মাঝে ভগ্নজীর্ণ এ জীবন লভি'
গাহি গান ভয়ে-ভয়ে; আজি মোর ভবন-বলভি
স্পন্দিছে এ কোন ছন্দে, প্রাণ মোর এ কি মুক্তি মাগে!

* রূপার্ট ব্রুকের কবিতা হইতে

হেরি মূর্ত্তি—নগ্ন-শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, কুণ্ঠালেশহীন ;
মসৃণ মর্ম্মরে যেন গড়িয়াছে যুনানী ভাস্কর !—
পৃথ্বী 'পরে পদাঙ্গুলি, দেহ তবু আকাশে উড্ডীন,
মর্ত্ত্যেরি সে বার্ত্তাবহ স্বর্গপানে বাড়াইছে কর !
গুল্ফ-মূলে কাঁপে পাখা—অন্তরীক্ষে এখনি বিলীন !—
গানের কিরীটখানি ফেলে গেছে ধরণীর 'পর।

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫। কুআলা-লুম্পুর যাত্রা—চীনাক্লাব—"রোঙ্গেং" নাচ।

৩০শে জুলাই তাম্পিন থেকে কুআলা-লুম্পুর রেলপথ উঁচুনীচু পাহাড়ে দেশের ভিতর দিয়ে আবার কতকটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই পথ মনোহর। তাম্পিন ষ্টেশনেই বুঝলুম, আর পথের ধারের প্রত্যেক ষ্টেশনেই সেটা দেখলুম, এদেশের রেলপথের সেবক—রেলের কর্ম্মচারী কারিগর কুলী মজুর সবই ভারতবাসী। চাকরী করবার জন্য এত লোকও এদেশে এসেছে ভারতবর্ষ থেকে! আমাদের দেশের লোকের তুলনায় চীনারা কত কম চাকুরীজীবী! কতটা স্বাধীনবৃত্ত তারা!

বর্ম্মায় একজন বর্ম্মী ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তার অবজ্ঞা জানিয়ে ব'লেছিল যে, ভারতবাসীরা এতই নিম্ন-স্তরে প'ড়ে আছে যে, চেহারায়, দারিদ্র্যে, আচারে, ব্যবহারে they spoil the landscape তারা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে তাকে খারাপ করে দেয়। বাস্তবিকই সস্তা বিলিতী ঢ্যাবঢেবে রঙের ছিটের সাড়ী বা ঘাগরা পরা, নাককাণ ফুঁড়ে একরাশ রূপোর বা কাঁসার গয়না পরা, সমস্ত ভঙ্গীতে একটা দারিদ্র্যজনিত 'কুরুচি' ফুটে উঠেছে, এরকম ভারতীয় মেয়ে পুরুষকে এই সুন্দর দেশে সৌষ্ঠবশালী মালাই বা বর্ম্মী মেয়ে পুরুষদের পাশে এমন কি সুদৃঢ় স্বাধীনতার মূর্ত্তি চীনাদের পাশে কতটা নগণ্য কতটা খেলো দেখায়! ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েও, যেখানে ভারতবাসী জনসাধারণ এসেছে সেখানেই ভারতের সেই অপরিসীম দারিদ্র্যের চিত্র স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে আর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বা উপনিবিষ্ট অন্যজাতীয় লোকেদের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্নের মত দেখা দেয়। ভারতবর্ষ যে এককালে কত বড়ো ছিল তা ইন্দোচীনে আর ইন্দোনেসিয়ায় এসে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব না দেখলে অনুমান ক'রতে বা অনুভব ক'রতে পারা যায় না। আর আধুনিক ভারতবর্ষ যে কত হীন, কত অসহায়, কত পতিত তাও এইসব উপনিবিষ্ট অতি মামুলী ভারতীয় লোকেদের, চীনা বা মালাই, শ্যামী বা যবদ্বীপীদের পাশে না দেখ্‌লে কল্পনা করা যায় না। ষ্টেশনে তামিল ষ্টেশন-মাষ্টার, তামিল কেরাণী, শিখ ইঞ্জিনের কারিগর, কচিৎ শিখ কণ্ট্রাক্টর আর অস্থিচর্ম্মসার চেহারার তামিল কুলি, পরিধানে শতছিন্ন ক্লেদলিপ্ত গঞ্জি আর কটীবস্ত্র বা ময়লা লুঙ্গী, মাথায় হয়তো ঝুঁটী বাঁধা চুলের উপরে এক টুকরা লাল কাপড় জড়ানো নয় একটা ময়লা ফেল্ট হ্যাট—কানে মাকরী প্রায় সবার আছে, কাচর বা নাকও বেঁধানো। মালাইদেশের সমস্ত রেলপথ গ'ড়ে তুলেছে এই ভারতীয় কুলিরা ; মালাই দেশে চার হাজার মাইলের উপর চমৎকার মোটর রাস্তা আছে তাও বানিয়েছে ভারতীয় কুলিতে।

এইসব সুন্দর সুন্দর রাস্তায় আমরা বিশ পঞ্চাশ মাইল ক'রে পথ মোটরে বেড়িয়েছি, পরিষ্কার সমতল রাস্তা যেখানে যেখানে মেরামত হচ্ছে দেখেছি সেখানেই ভারতীয় কুলী। একবার আমাদের সঙ্গে ঐ দেশে উপনিবিষ্ট একজন স্থানীয় তামিল ভদ্রলোক ছিলেন। মালাই দেশের রাস্তার আর তার দুধারের নারকেল-কুঞ্জের আর রবারের বগানের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করতে তিনি হঠাৎ একটু Sentimental বা ভাববিলাসী হয়ে গিয়ে গলার স্বরে বিশেষ একটা ঐকান্তিকতা আর একটা গর্ব্ব-ভাব এনে থিয়েটারী ঢঙে হাত নেড়ে আমায় ব'ল্‌লেন—"আমার দেশের লোক। এরাইতো এদেশে সভ্যতা এনেছে। এই জঙ্গলের দেশের নানা অংশে lines of communication বা গমনাগমন পথ এরাই তো বানিয়েছে! জানেন, ডক্টর, এই সব বড়ো বড়ো সরকের প্রতি ইঞ্চি আমার জা'তের লোকেই তৈরী ক'রেছে।" রবীন্দ্রনাথ ভাবজগতে তথা বাস্তব সভ্যতায় পৃথিবীকে ভারতের দান সম্বন্ধে, ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন কালে এইসব দেশে কি আশ্চর্য্য স্পর্শমণির কাজ ক'রেছিল সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন; সঙ্গের ভদ্রলোকটী কাগজে সেই সব কথা প'ড়ে তাঁর ভারতীয় স্বাজাত্য-বোধ সম্বন্ধে খুবই সচেতন হ'য়ে পড়েন, খুবই গৌরব আর গর্ব্ব অনুভব করেন। তাই রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ একজনকে পেয়ে আধুনিককালে বহির্ভারতে ভারতীয়দের কৃতিত্বের আর তাদের glorious destiny বা দেবতাদিষ্ট গৌরবময় ভবিষ্যতের এই পরিচয় দিয়ে একটু আত্মহারা ভাব দেখিয়ে ফেল্‌লেন। কিন্তু ভারতের প্রাণশক্তি যখন অটুট ছিল, সেদিনকার ভারতের সংস্কৃতিবাহী মূর্ত্তি কোথায়, আর কোথায় বা অন্নাভাব-পীড়িত, সামাজিক অত্যাচারে আর অবিচারে জর্জ্জরিত আর পরাধীনতা-ভারে নিপিষ্ট বিদেশে বৈদেশিক প্রভুর দাস ভারতীয় কুলি—মূর্ত্তিমান্ দাস্ত, অজ্ঞতা, নিঃস্বতা, কুসংস্কার; তাম্রখণ্ডের বিনিময়ে দেহের রক্ত জল ক'রে তার এই বিদেশী ধনিকের বাণিজ্য বা বিলাস-যান গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করা—এ জিনিসকে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ফল কল্পনা করাকে একটি বীভৎস ও করুণ রস-পূর্ণ ট্রাজেডী ব'লে আমার কাছে মনে হ'তে লাগ্‌ল। এ যেন ভারতের চা-বাগানের কুলীর পরিশ্রমের দ্বারা অর্দ্ধেক জগৎকে চা খাওয়ানো, ফ্রান্সে, ইরাকে বা চীনদেশে ইংরেজ জা'তের সুবিধার জন্য ভারতীয় সেপাইদের প্রাণ দেওয়াকে ভারতের সংস্কৃতির আত্মার আর ভারতের এক অভিনব দান আর অভিনব বিকাশ ব'লে গর্ব্ব অনুভব করা।

কুআলা-লুম্পুরের পথে Negri Sembilan নেগরি-সেম্বিলান্ রাজ্যের রাজধানী Seremban সেরেম্বান পড়ে। এখানে আমাদের এ যাত্রায় নামা হ'ল না। ষ্টেশনে বিস্তর লোকসমাগম হ'য়েছিল। কবিকে মাল্যদান ক'রলে, আর তাঁকে গাড়ী থেকে নেমে আর সকলের সঙ্গে ছবি তোলাতে হ'ল। স্থানীয় বাঙালী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন্ এস্ নন্দী মহাশয় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, ইনি কুআলা-লুম্পুর অবধি আমাদের সঙ্গে যাবেন। আর এই-খানেই কু-আলা-লুম্পুর থেকে এসে উপস্থিত হ'লেন, ঐ স্থানের বাঙালী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোজেন্দ্রনাথ মল্লিক, আর একটি সিংহলী ভদ্রলোক মিষ্টার B, Tallala বি, তালালা, এঁরা এখান থেকে কুআলা লুম্পুরের লোকেদের তরফ থেকে কবিকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন। ক'লকাতায় মনোজবাবুর পিতার সঙ্গে কবির পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনিও আগে থাকৃতেই কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কুআলা লুম্পুরে এঁর আপিস আছে, সেরেম্বানের নন্দী মহাশয় এঁর সঙ্গে মিলে কাজ কর'ছেন। কুআলা লুম্পুরে অবস্থানকালে মনোজবাবুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হ'য়েছিল, আর ঐ স্থানে তাঁর সদানন্দ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রতিপত্তি দেখে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রেছিলুম। শ্রীযুক্ত তালালা সিংহলী বৌদ্ধ ভদ্রলোক, কুআলা-লুম্পুরে বাড়ী, স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, ভারতবর্ষে বেড়িয়ে এসেছেন, শান্তি-নিকেতনে গিয়ে কবিকে দর্শন ক'রে এসেছেন, বিনয়ী ভদ্র সুজন, শান্তি-নিকেতনের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে এসেছেন।

সেরেম্বানে উঠ্‌ল আমাদের সহযাত্রী হ'য়ে একটি তামিল ছেলে, বছর আঠারো কুড়ি বয়স হবে, খর্ব্বাকার শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল বুদ্ধিমান্ মূর্ত্তি. নামটি তার সভাপতি দূরৈ সিংহরাজন্। এর বাড়ী সিংহলে জাফনায়, কিন্তু বছর কতক ধ'রে এদেশে বাস ক'রছে, এর আত্মীয়েরা এখানে

আছে, এই খানেই থিতু হ'য়ে ব'সে যেতে পারে। সেরেম্বানের একটি স্কুলে মাষ্টারী করে, গভর্মেণ্ট ইস্কুল, সরকারী চাকরী। কুআলা-লুম্পুরের আরও উত্তরে Ipoh ইপোঃ শহরে মালায়দেশের শিক্ষকদের একটা সম্মেলন হবে, সেই উপলক্ষ্যে যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। ছোকরার খুব আগ্রহ আর ইচ্ছা, ভারতের ইতিহাস আর বহির্ভারতের সভ্যতার বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করে। এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে সিংহলেই দেখা সাক্ষাৎ করে, সিংহল যে সংস্কৃতি বিষয়ে ভারতেরই অংশ, আর ভারতের সঙ্গে সিংহলের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা যে অনুচিত, এই বিষয় অবলম্বন ক'রে দুচারটী প্রবন্ধও লিখেছে। মালাই দেশের বিবরণ আর ইতিহাস, আর সেখানে ভারতীয়দের কীর্ত্তি ইত্যাদি নিয়ে একখানা ইংরেজি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমায় দেখালে। ব'ল্‌লে, ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গেই মালাই জাতির নাড়ীর টান এই কথা অবলম্বন ক'রে যাতে ভারতীয়দের সঙ্গে মালাইদের সৌহার্দ্য আরও বাড়ে এই মতলবে পত্র-পত্রিকায় চিঠি আর প্রবন্ধও লিখেছিল, কিন্তু মালাইদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বেশী উৎসাহ পায়নি, বরং বিরূপভাবই পেয়েছে। ভারত-বাসীরা ওদের দেশে গিয়ে দেশটায় উপনিবেশ স্থাপন ক'রছে—মালাইরা নানা বিষয়ে হ'ঠে যাচ্ছে, শিক্ষিত বহু মালাইয়ের মনে সেইজন্য ভারতীয়দের প্রতি একটা প্রতিযোগিতা-জনিত বিরোধ ভাব আছে। চীনেদের সম্বন্ধেও আছে। দুরৈসিংহরাজন্-এর লেখার প্রতিবাদ ক'রে Anak Negri "আনাঃ-নগরী" বা 'দেশ-সন্তান' এই ছদ্ম নামে একজন মালাই ভদ্রলোক প্রবন্ধ লেখেন, বলেন, এ সব কথা, যে মালাইদের ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গেই যোগ আছে, এ সব হ'চ্ছে বাজে কথা, খালি ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্যে এই সমস্ত কথার অবতারণা, মালাইদের উচিত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যা আছে তাকেই অবলম্বন ক'রে থাকা। দুরৈসিংহরাজন্ ছোকরা আমায় ব'ল্‌লে যে, সে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশুনা ক'রতে চায়, প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে চায়। তার সঙ্গে কু-আলা-লুম্পুরে আর ইপোঃতে রোজই দেখা হ'ত। ছেলেমানুষ কি না, তায় আবার কল্পনাশক্তি প্রবল, একেবারে গবেষণা করার দিকে বড়ো উৎসাহ। শেষটা ঠিক হ'ল যে, একটু পড়াশুনো ক'রে তারপর ভবিষ্যতে যাবে শান্তিনিকেতনে। যাহোক, কু-আলা-লুম্পুরের পথে অনেকটা সময় এর সঙ্গে গল্প ক'রে, মালাইদেশে ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে নানা টুকিটাকি খবর সংগ্রহ ক'রতে ক'রতে কাটিয়ে দেওয়া গেল।

বিকাল পাঁচটার দিকে গাড়ীতেই বৈকালী চা-সেবা হ'ল। তাম্পিন থেকে কুআলা-লুম্পুর, সারা দেশটায় ছোটো ছোটো পাহাড়। কাজাং শহর পেরিয়ে যাওয়া গেল, এখানে ষ্টেশনেও লোকের ভীড়। এর পরে এই অঞ্চলে রেল পথের ধারে টিনের খনি দেখা গেল। পাহাড়ে জমী, দূরে দূরে সব খনির কলের উঁচু উঁচু কাঠের তৈরী বিরাট বিরাট Scaffolding বা ভারা, আর কল-ঘর, ধোঁয়ার চিম্‌নি। গভীর খনির খাদ থেকে টিন্‌মিশ্র পাথরের চাবড়াগুলিকে ছোটো ছোটো মালগাড়ী ক'রে ট্রেন উপরে তোলবার জন্যে ঢালু রেলপথ উঠেছে, অনেকটা লম্বা, কাঠের ভারায় তৈরী রেলপথ। মাঝে মাঝে টিন্-পাথরের গুঁড়ার ঢিপি, লাল পাহাড়ে জমীর গা কাটা, আর মাঝে মাঝে দু চারটা ডোবা আর পুকুর, শক্ত মাটী পাহাড়ে জমীর মধ্যে। গাছপালার বেশী আধিক্য নেই, পৃথিবী এখানে শ্যামল শস্যের বদলে কঠিন ধাতু দিচ্ছে ব'লে তার বাহ্য রূপটীও এখানে কোমলতা বিহীন—সাদা আর লাল, পাথুরে। ক্বচিৎ চীনা কুলীদের কুটীরের আশপাশে একটু আধটু শস্যক্ষেত্র। টিনখনিতে কাজ করে চীনা কুলীরা। মালাইতো নেইই; আর ভারতীয় কুলী, খুবই কম একাজ পরিপাটী রূপে করবার উপযুক্ত সামর্থ্য পোষণ করে। মালাই দেশের টিনের খনিগুলি চীনাদেরই একচেটে, কোথাও কোথাও বা মালিক হিসাবে, আর সর্ব্বত্রই পরিচালক আর শ্রমিক হিসাবে। ইংরেজ, ডচ্, পোর্ত্তুগীসদের এ অঞ্চলে আস্‌বার আগে থাক্‌তেই চীনারা এ দেশে এসে মালাই রাজাদের কাছ থেকে খনি খুঁড়ে টিন্ বার ক'রে চালান দেবার অধিকার কিনে নিত; Perak পেরাঃ রাজ্যে চীনা টিন ওয়ালারা বেশ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল, Taiping তাই-পিং ব'লে একটা চীনা শহরেরও পত্তন ক'রেছিল। এ অঞ্চলে

চীনারাই সংখ্যাধিক্যে সব-চেয়ে বেশী—মালাইদের চেয়ে, ভারতীয়দের চেয়ে। ইপোঃতে আমাদের একটা টিনের খনির ভিতরে গিয়ে সব পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখবার সুযোগ হ'য়েছিল। সে-সম্বন্ধে পরে ব'লবো। কুআলা লুম্পুরের পথে আমাদের রেল চ'লেছে, সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দলে দলে নীল পোষাক পরা চীনা কুলি সারা দিন খেটে ঘরে ফিরছে। জামা অনেকের গায়েই নেই, অনেকের অঙ্গে খালি একটা ক'রে নীল কাপড়ের জাঙিয়া। মাথায় বাঁশের চওড়া টোকা। অনেকে পুকুরের বা বাঁধের লাল ময়লা জলে নেমে স্নান ক'রছে। এদের খোলা হাসি, আর সুদৃঢ়পেশীযুক্ত সবল দেহ দেখে আনন্দ হয়। ভারতীয় কুলীদের কঙ্কালসার দেহ আর গরাণের খুঁটির মতন তাদের পেশীহীন, মাংসহীন হাত পা র কথা মনে হ'ল।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে কুআলা-লুম্পুরে পঁউছুলুম। ষ্টেশনে ভীষণ ভীড়। শহরের সমস্ত ভারতীয় যেন ভেঙে প'ড়েছে ষ্টেশনে। তামিলদের সংখ্যাই বেশী। শিখ আর অন্যজাতও কিছু কিছু আছে। এই শহরটি হচ্ছে সেলাঙর রিয়াসতের রাজধানী। সেলাঙর রিয়াসতের লোকসংখ্যা চার লাখের কিছু উপর, তার মধ্যে একলাখ সত্তর হাজার চীনে, একলাখ বত্রিশ হাজার ভারতীয়, আর মোটে একানই হাজার হচ্ছে মালাই। সমস্ত মালাই দেশটায় তিন রকমের শাসন প্রচলিত আছে; প্রথম, ইংরেজদের খাস অধীনে—শিঙ্গাপুর সহর আর সিঙ্গাপুর দ্বীপ, মালাক্কা জেলা, পেনাং দ্বীপ, আর ওয়েলেসলী প্রদেশ, এগুলি হ'ল ইংরেজদের কলোনি বা উপনিবেশ, শাসন পুরোপুরি ইংরেজদের হাতে। দ্বিতীয়, Federated Malay States—Perak পেরাঃ, Selangor সেলাঙর, Negri Sembilan নেগরি সেম্‌বিলান, Pahang পাহাং এই কয়টি মালাই রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে একই শাসন-সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে ইংরেজদের অধীনে আছে; এইসব রাজ্যের রাজা আছে, সর্দ্দার আছে, রাজাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা আছে, এদের আলাদা ঝাণ্ডা নিশান আছে, আলাদা ডাকটিকিট;—নামে স্বাধীন রাজ্য, কিন্তু কাজে ইংরেজদের অধীন, ইংরেজদের রেসিডেণ্ট বা প্রতিনিধি, বা এই সমস্ত রাজ্যের তথাকথিত ইংরেজ চাকররাই সত্যিকার প্রভু। কুআলা লুম্পুর সেলাঙর রাজ্যের রাজধানী; আবার তাছাড়া হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ মালাই রাষ্ট্রমণ্ডলীর রাজধানী। এভিন্ন আছে, তৃতীয়, non-Frederated Malay States—Johore জোহোর, Kedah কেডাঃ, Perlis পের্লিস, Trengganu ত্রেঙ্গান্নু আর Kelantan ক্লান্তান—এই কয়টি রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কতকগুলি বিশেষ সর্ত্ত মেনে নিয়ে ইংরেজদের অধীনে আসে নি, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে ইংরেজ সরকারকে ব্যবহার ক'রতে হয়। Federated Malay States—বা সাঁটে F. M. S. এ যে-সব ভারতীয় বা ইংরেজ কাজ করে, তারা মুখে মালাই রাজ্যের মালাই রাজাদের চাকর, কাজে অবশ্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চাকরীর থেকে আলাদা নয়। মালাইরা অলস, অল্পে তুষ্ট, সদানন্দ জাতি; সংখ্যায় বেশী নয়; দেশ প্রকাণ্ড, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে কৃষিজে খনিজে দেশ অতুলনীয়; এইরূপ দেশেকে exploit করার জন্য তা থেকে যা পারা যায় আদায় করবার জন্য বাইরের লোক না হ'লে চলেই না। তাই বাইরে থেকে ভারতীয় আর চীনেদের আমদানী। মালাই রাজাদের তাতে আপত্তি নেই, কারণ জঙ্গল কেটে আবাদ হ'লে তাদেরই লাভ, মাটির ভিতর থেকে টিন উঠ্‌লে খনির জমির মালিক হিসাবে তাদের একটা হিস্‌সা প্রাপ্য হয়। কিন্তু বাইরের সকলেই আস্‌ছে, দেশ থেকে কিছু আদায় ক'রে পয়সা ক'রতে বা দু মুটো ক'রে খেতে। চীনা, মালাই ভারতীয় আর অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি, রুচির আর মনোভাবের এই জা'তগুলির একত্র অবস্থানে ভবিষ্যতে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভবের পথ তৈরী হ'চ্ছে। কারণ এ চার জা'ত মিলে এক হ'তে পারা কঠিন। যাই হোক, ইংরেজের রাজদণ্ডের তলায় সকলে নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে শান্ত ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের অর্থাগমের বা আজীবিকার প্রবর্দ্ধমান পন্থা বা উপায়গুলি এক রকম আপ্‌সে এদের মধ্যে ভাগ হ'য়ে গিয়েছে।

যাক্—কুআলা-লুম্পুরে তো গাড়ী পৌঁছুলো। ষ্টেশনে ভীড় হ'ঠিয়ে অনেক কষ্টে একটু জায়গা ক'রে স্থানীয়

স্বাগতকারিণী সভার সভ্যরা এসে কবিকে স্বাগত ক'রলেন। একজন মাদ্রাজী খৃষ্টান ভদ্রলোক কবির গলায় মাল্য দান ক'রলেন। সঙ্গে সঙ্গে তামিল, চেট্টি মন্দিরের রোশন-চৌকী বাদ্য বেজে উঠ্‌ল—শাঁখ ঝাঁঝর ঢোলক, মন্দিরা আর শানাই। কি কর্ণভেদী আওয়াজ সেই শানাইয়ের! বাদ্যের দল ষ্টেশনকে কাঁপিয়ে কাঁদিয়ে চ'ললো আগে আগে, আর তার পরে কবির সঙ্গে আমরা, আর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির দল। অনেক চেষ্টা ক'রে ভিড় ঠেলে' আমরা আমাদের জন্য রক্ষিত মোটরের আশ্রয়ে গিয়ে উঠ্‌লুম। ষ্টেশনে আমাদের কাণ্ডারী হ'লেন মনোজবাবুর মামাতো ভাই, আর মনোজবাবুর বন্ধু, কুআলা-লুম্পুরের অধিবাসী অতি সজ্জন প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী একটি বাঙালী যুবক, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তি-প্রকাশ নান্দের। এঁর বাড়ী বর্দ্ধমানে, ইনি বর্দ্ধমানের রাজ-পরিবারের সঙ্গে সংপৃক্ত, তা হ'লে হ'লেন পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়, বাঙালী ব'নে গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত মনোজবাবু একে দেশ থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন, সপরিবারে এখানে আছেন, এখানে estate valuer বা বিষয় সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারকের কাজ করেন শুনলুম। কুআলা-লুম্পুরে কদিন ধ'রে কীর্ত্তিপ্রকাশবাবুর আলাপে চালচলনে সব সময়েই একটা সহজ আভিজাত্যপূর্ণ আর অমায়িক সৌজন্যের প্রকাশ আমাদের মনকে বেশ প্রসন্ন আর আনন্দিত ক'রে দিয়েছিল দেখে আরও সুখী হ'লুম যে, কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয় আর চীনা মহলেও তাঁর প্রভাব পৌঁছেচে—অভিজাত ভব্যতার আর সৌজন্যের যে একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যা সকলেরই সম্ভ্রম আকর্ষণ করে, তা এখানে একজন ভারতীয়ের কাছে থেকে বিকীর্ণ হ'চ্ছে দেখে বাস্তবিকই খুসী হ'য়ে গেলুম।

আমাদের অবস্থানের জন্য এখানকার লোকেরা বেশ ভালো ব্যবস্থাই ক'রেছিলেন। স্থানীয় জন আষ্টেক অতিশয় ধনশালী চীনা বণিক আর বিষয়ী লোকে মিলে একটি ক্লাব ক'রেছেন, এই ক্লাবে বাইরের লোকেরা পাত্তা পায় না। ক্লাবটিতে এরা এসে আহারাদি করেন, আড্ডা দেন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করেন, কখনও বা কারও বন্ধু প্রভৃতি এলে তাঁদের থাকবারও ব্যবস্থা হয় ক্লাব বাড়ীতে। নীচের তলায় খাবার ঘর, বৈঠকখানা প্রভৃতি সাধারণ ঘর, উপরে ছুটি বড়ো শোবার ঘর। খুব খরচ-পত্র ক'রে সাজানো গোছানো। এই ক্লাবটির বাড়ী বেশ চমৎকার পল্লীতে স্থাপিত, এর ঠিকানা চব্বিশ নম্বর Weld Road ওয়েল্ড রোড। ক্লাবটির নাম Chun Chook Kee Lo চ্যন্-চুক্ কীলো; কিন্তু এখানকার ভদ্র লোকেরা এটিকে Millionaire's Club বা 'দশ লাখিয়া ক্লাব' ব'লে থাকে। এই ক্লাব বাড়িটি তার চীনা চাকর-বাকর সমেত আমাদের বাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনায় স্থানীয় চীনারা যে প্রাণ দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন, এই ব্যাপারটী তার একটি বড়ো প্রমাণ।

রাস্তার তেমাথার উপর প্রশস্ত হাতার মধ্যে হাল ঢঙের সুন্দর বাড়ীটি। আশপাশের বাড়ীগুলি ধনীলোকের, তাদের হাতায় খুব গাছপালা। ক্লাব বাড়ীর দরওয়ানেরা হ'চ্ছে পাঞ্জাবী মুসলমান, খানসামারা চীনা। উপরের একটা ঘরে রবীন্দ্রনাথের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'ল, তার পাশের ঘরে রইলুম আমরা তিন জন, আরিয়াম, সুরেনবাবু, আমি; আর নীচে রইলেন ধীরেনবাবু আর ফ্যঙ্। ৩০শে জুলাই থেকে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই ক'দিন আমাদের কুআলা-লুম্পুরে এই ক্লাব বাড়ীতে অধিষ্ঠান হ'য়েছিল। প্রথম যে-দিন পৌঁছুলুম, ঐ দিনই সন্ধ্যায় ক্লাবে স্বাগত-কারিণী সভার সভ্যরা আমাদের সঙ্গে ডিনার খেলেন। জন দশেক ভদ্রলোক; চীনা ভদ্রলোক কতকগুলি, তাঁদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছেন মিষ্টার Loke Chow Thye লোক্-চাউ-থাই, একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ; কতকগুলি তামিল, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় রবার বাগানের মালিক শ্রীযুক্ত এম্ কুমারস্বামী পিল্লেইকেই বিশেষ ভাবে মনে হয়, মুখে রা-টি নেই, অতি গোবেচারী-গোছের "দুবলা" চেহারার একটি ভদ্রলোক; মিষ্টার তালালা; মনোজবাবু; আর অন্য ভারতীয় দুএক জন। শ্রীযুক্ত এ, কে, মুস্‌লিম্ ব'লে একটী সাহেবী পোষাকপরা আধা-বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় (বোধ হয় পাঞ্জাবী) মুসলমান, মা চীনে, জন্মস্থান হংকং, চেহারায় খাঁটী চীনে, বলেনও কাণ্টনী চীনে, ভারতীয় কোনও

ভাষার ধার ধারেন না, কিন্তু ভারতীয় ব'লে একটু গর্ব্বের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন। ধর্ম্মে মুসলমান, আহার হ'ল আধা চীনা আধা ইউরোপীয় ধরণে। খাবার টেবিলে বেশীর ভাগ কথা হ'ল, স্থানীয় পলিটিক্স্ নিয়ে।

কবি যাঁদের অতিথি তাঁরা প্রায় সকলেই বিষয়ী লোক, দু একজন ব্যারিষ্টার ছাড়া cúlture ব'লে জিনিসের কেউ বড়ো-একটা ধার ধারে না, তবে কবির ব্যক্তিত্বের প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল; আর কবির আগমন-উপলক্ষ্যে সিঙ্গাপুরের ইংরেজ আর চীনা বইওয়ালারা কবির বই কিছু আনিয়েছিল, এখানে তার বিক্রীও কিছু হ'য়েছিল এই সব টিনের খনিওয়ালা আর রবার-ওয়ালা আর বণিক, সরকারী চাকুরে আর ব্যারিষ্টারদের মধ্যে, আর চীনা আর ভারতীয় যুবকদেরও মধ্যে। সুতরাং কবির সামনে বেশীর ভাগ লোক চুপচাপ ক'রেই ছিল, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে পলেটিক্‌সের কথা উঠ্‌তে সকলেরই মুখ খুল্‌ল। আর সকল চীনা সাহেবী পোষাক প'রে এলেও একটি চীনা ভদ্রলোক সাবেক ধরণের চীনা পোষাক প'রে এসেছিলেন—অতি সুন্দর আর সুঠাম দেখাচ্ছিল তাঁকে, তাঁর কালো রেশমের পা-পর্য্যন্ত লম্বা আলখাল্লায়, তাঁর চীনা টুপীতে, আর চীনা মান্দারিনের অনুকারী লম্বা গোঁফে। দেখ্‌লুম, এই ভদ্র-লোকটির পলিটিক্সের উপর সকলেই বিরূপ। ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির একজন সদস্য; অন্য সদস্যও, আর সদস্য পদ যাঁদের ফ'স্‌কে গিয়েছে কিম্বা জোটেনি—কি নির্ব্বাচনে, কি মনোনয়নে—এমন কতকগুলি ব্যক্তিও ছিলেন তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের কোনোও কোনোও বিষয়ে সাহায্য করার জন্য বা যাদের সঙ্গে সহযোগ করার জন্য এঁর সম্বন্ধে একটু চাপা কটাক্ষ ক'রে কথা ব'ল্‌ছিলেন। ইনি এই-সকল বাক্যবাণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রছিলেন। দেখলুম, এ দেশের পলিটিক্যাল মনোভাবযুক্ত লোকদের ধরণ-ধারণ আমাদের দেশের মতন। পলিটিক্স্ এখানে যেটুকু আছে, সেটুকু হচ্ছে এক চীনাদের মধ্যে জোর সংগঠন, যাকে সরকার ভয় করে আর যা বাইরে চেঁচামেচি হৈ-চৈ না ক'রে ধীরে ধীরে চ'ল্‌ছে; আর দুই, মাঝে মাঝে অতি মোলায়েম ভাবে কেঁউ-কেঁউ করা কমলাকান্ত-বর্ণিত কোলুর ছেলের পাতের মাছের কাঁটার বা তেঁতুল-গোলা ভাত এক গ্রাসের প্রার্থী কুকুরের পলিটিক্স। সকলেই বাইরে মস্ত পেট্রিয়ট আর স্বাধীনচেতা ব্যক্তি যদিও দেশাত্মবোধ নেই কারণ দেশই নেই—যেখানে সরকারের কিছু জান্‌বার উপায় নেই—আর ভিতরে মিউনিসিপাল কমিশানরের কাজটা আস্‌বার জন্য সাহেবদের উমেদারী ক'রছে। সাহেবদের অনুগ্রহের উপর এই দেশে চীনা আর ভারতীয় উভয় জা'তের অবস্থান, এদের চটাতে কেউ ভরসা পায় না। শ্যাম আর কূল দুই রাখ্‌তেই চেষ্টা সকলের। সাহেবের খোসামদ ক'রো, যাতে কাক পক্ষীও টের না পায় আর বাইরে জোরগলায় অভাব অভিযোগ অবিচারের কথা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এসবের প্রতিকারের কথাও ব'লো, কিন্তু বাড়াবাড়ি না ক'রে, যাতে সাহেবেরা টের পেয়ে চটে না যান। কিন্তু যদি কেউ সাহেবদের সঙ্গে মানিয়ে-জুনিয়ে চলা যা সকলেই ক'রছে সেইটেই তার রাজনীতি ব'লে প্রকাশ্যে স্বীকার করে তাহ'লে সে হ'ল কাপুরুষ, আর সকলে মিলে তাকে গালিগালাজ ক'রবে, প্রকাশ্যে অপমান ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রবে।

খাওয়া-দাওয়া চুক্‌ল সাড়ে নটার মধ্যে। ওই সময়ে কুআলা-লুম্পুরে একটি সরকারী কৃষি প্রদর্শনী হ'চ্ছিল, তাতে নানা রকম কৃষি আর শিল্পজাত জিনিস আনা হয়। এ ছাড়া মোটরকার, কলকজা, যন্ত্রপাতি, আর নানা দেশীয় আর বিদেশীয় দ্রব্য-সম্ভারের প্রদর্শনও হচ্ছিল। সাধারণ লোককে আকর্ষণ ক'রবার জন্যে বায়স্কোপ, নাচগানের ব্যবস্থা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন মালাই রাজ্য থেকে আগত ফুট-বল খেলোয়াড় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার খেলাও ছিল। মালাইদের শিল্প আর মালাই নাচ গান আমাদের এদেশে পদার্পণ ক'রেও এতদিন কিছুই দেখা হয় নি, সেই লোভে এই প্রদর্শনীতে যাওয়া ঠিক হ'ল। তালালা মহাশয় ফোন ক'রে খবর নিলেন যে, প্রদর্শনী বিভাগ—শিল্প দ্রব্য প্রভৃতির ঘরগুলি—তখন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, সন্ধ্যেতেই এগুলি বন্ধ হয়, কিন্তু ঐ রাত্রে মালাই নাচের ব্যবস্থা আছে। কবি ক্লান্ত ছিলেন, তিনি তাঁর ঘরে বিশ্রামের জন্য গেলেন, আর তালালা মহাশয় তাঁর গাড়ী ক'রে আমাদের তিনজনকে নিয়ে

গেলেন ঐ নাচ দেখাতে। শহরের ঘোড়দৌড়ের ময়দানে প্রদর্শনী। আগত দর্শকদের ভীড় খুব। দীর্ঘকায় শিখ পাহারওয়ালা, গুর্খার আকারের মালাই পাহারাওয়ালার সাহায্যে, ইংরেজ সার্জ্জেণ্টের নেতৃত্বে অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে গাড়ীর ভীড় মানুষের ভীর নিয়ন্ত্রিত করছে। চীনা, মালাই ভারতীয় বয়স্কাউটের দল প্রদর্শনীর দরজায় হাজির, যাত্রীদের সাহায্য ক'রছে তাদের গাড়ী ডাকিয়ে এনে আর অন্য উপায়ে। স্থানটি আলোক-মালায় সুসজ্জিত। সরকারী প্রদর্শনীর ঘরগুলি বন্ধ, কিন্তু ব্যবসায়ীদের পণ্যবীথিগুলি খোলা, সেগুলি খুব জ'মেছে। ঘুরতে ঘুরতে যেখানে মালাই নাচের ব্যবস্থা সেই ঘেরা জায়গায় এসে পৌঁছুলুম, আলাদা দর্শনী দিয়ে ঢুকতে এ'ল।

নাচের নাম Ronggeng রোঙ্গেং। "রোঙ্গেং" শব্দের মানে হ'চ্ছে নাচওয়ালী, এই প্রকারের নাচকে বোঝাতেও শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। মালাইদের নাচ কয়েক রকমের আছে, কতকগুলি আবার যবদ্বীপ থেকে ধার ক'রে নেওয়া, যেমন Joget "জোগেৎ" নাচ। রোঙ্গেং মালাইদের নিজস্ব নাচ। চমৎকার কবিত্বমণ্ডিত এর ভাবটি। এই প্রদর্শনীতে রোঙ্গেং নাচের মজলিসের বাহ্য সমাবেশটির কথা আগে বলি। খোলা মাঠ একটা, চারদিক কাঠের পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। এক দিকে একটা উঁচু মাচা, বুক সমান উঁচু, কাঠের পাটাতনের মেঝে তার, থিয়েটারের ষ্টেজের মতন বাঁধা সিঁড়ী দিয়ে উঠতে হয়। তার উপরটা ঢাকা। সাজানো গোজানো। মাচাটি বেশ বড়, ঠিক থিয়েটারের মঞ্চের মতন। দুজন নাচওয়ালী, তাঁদের জন্য বস্‌বার চেয়ার আছে; আর বাজিয়ের দল পিছনে, বাজনা হ'চ্ছে একটা ঢোলক আর গোটা দু তিন বেহালা ব্যস, বাজিয়েরা ব'সে আছে চেয়ারে, মাচার কোণে, নাচিয়েদের পিছনে, দর্শকদের সাম্‌নে মুখ ক'রে। মাচার সাম্‌নে, বাঁ পাশে ডান পাশে, নীচে মাটির উপরে দর্শকদের জন্য চেয়ার পাতা; মাচার সাম্‌নাসাম্‌নি, প্রেক্ষণ গৃহের-ওধারে খানিকটা জায়গা আলাদা ক'রে (মালাই জাতীয়া) ভদ্রমহিলাদের বসবার স্থান।

দর্শক সব জা'তের সব বয়সের এসেছে, তবে "বাবা"-চীনা বা মালাইদেশে উপনিবিষ্ট চীনা, আর মালাই যুবকের দলই বেশী। ইউরোপীয়ও কতকগুলি এসেছে। এই নাচ মেয়ে আর পুরুষের নাচ, মাঝে মাঝে মেয়েদের গানও আছে। পেনাং-শহর মালাই থিয়েটার আর মালাই নাচ গানের জন্য বিখ্যাত; রোঙ্গেং নাচউলীরা পেনাং থেকে এসেছে। আমাদের দেশের যে-শ্রেণীর মেয়েরা এই ব্যবসায় অবলম্বন ক'রে থাকে, এই নটীরা সেই শ্রেণীর। এদের পোষাক সাধারণ মালাই মেয়েদের মতন—গায়ে একটা লম্বা জামা, কব্‌জী পর্য্যন্ত তার আঁট হাতা, সাদা রঙের; একটা রঙীন সারং, একটা রঙীন ওড়না উত্তরীয় আকারে ঘাড়ের দু পাশ দিয়ে দু কাঁধ থেকে ঝুল্‌ছে, গলায় সোনার হার আর হাতে চুড়ী কতকগুলা ক'রে, মালাই ধরণে চুল বাঁধা, তাতে ফুল গোঁজা, পায়ে সোনার মল আর উঁচু-গোড়ালীযুক্ত মেয়েদের বিলিতি জুতো। অনির্দ্দিষ্ট বয়স্কা শ্যামবর্ণ নাক চেপ্টা মধ্যাকার তন্বঙ্গী, নাচের উপযুক্ত চেহারা। প্রথম চেয়ারে ব'সে ব'সে গান ধ'রলে। বিশুদ্ধ মালাই সুর আর সঙ্গীত মালাইদেশে আর নেই, যা আছে তা বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপে। মালাইরা সব জাত থেকে এখন গানের সুর নিচ্ছে—ইউরোপীয়, ভারতীয়, চীনা। মালাই থিয়েটারে মালাই নাটকের মধ্যে, ভারতের পারসী থিয়েটারের কাছ থেকে সংগৃহীত গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, ফারসী ভাষার গান হঠাৎ গেয়ে ওঠার রেওয়াজ খুবই; তামিল গানেরও সুর এরা নিয়েছে। এ বিষয়ে এদের মধ্যে অন্তঃসারহীনতা এসে গিয়েছে। গ্রহণ আছে, স্বাঙ্গীকরণ নেই। তারপর মেয়েদের গানে চীনা নটীদের মতন উঁচু সপ্তকে গান ধরবার চেষ্টায় falsetto গলায় গাইবার রেওয়াজ—বড়ই অস্বাভাবিক শোনায় প্রথমটা; পরে যবদ্বীপেও এই অবস্থা ব'লে সেখানে বিস্তর শুনে শুনে দেখেছি যে এটা স'য়ে যায়, আর পরে মন্দও লাগে না। গান হ'চ্ছে মালাই Pantum "পান্তুম" চার লাইনের ছোটো ছোটো সম্পূর্ণ কবিতা—প্রেমের বিষয়েই সাধারণতঃ। কবি সত্যেন্দ্র দত্তের রসজ্ঞতা আর কবিত্ব-শক্তির কল্যাণে শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের কাছে মালাই "পান্তুম" তার ভাবসম্পৎ আর তার গতিভঙ্গী দুই নিয়ে,

এখন আর অজ্ঞাত বস্তু নয়। "পান্তুম"এর রস ইউরোপীয় সাহিত্য-রসিকেরাও পেয়েছেন, ফরাসীতে এর অনুকরণে কবিতাও রচিত হ'য়েছে। জাপানী "তানকা" বা "উতা" ছন্দের ছোট্টো ছোট্টো চিত্র-কবিতার মত "পান্তুম" মালাই সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট জিনিস। খাঁটী মালাই সুরে "পান্তুম" দু একটি শুন্‌লুম। শেষ শব্দটি একটু নীচু পরদায় টেনে শেষ ক'রে দেওয়া হয়, বেশ করুণ লাগে। কিছুকাল ধ'রে "পান্তুম" গাওয়ার পরে নাচওয়ালীরা নাচ্‌তে উঠে। এ নাচে ইউরোপীয় বিশেষ ইংলাণ্ডের country dance এর মত একটু উদ্দাম ভাব আছে—ঘুরে ফিরে নাচ্‌তে হয়,—বর্ম্মী নাচের মতন একটু-আধটু পাঁয়তারা আর ঊর্দ্ধাঙ্গের ভঙ্গী নয়, ভারতীয়, যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয় নাচের মতন অতটা ধীর-স্নিগ্ধ ভাবেরও নয়। যে দুটি মেয়ে নাচ্‌ছিল তারা দুজনে যুগপৎ ঠিক একই ভঙ্গী পালন ক'রছিল না, একটু বৈষম্য ক'রছিল, কিন্তু বাজনার তাল ঠিক রেখে তাতে এক-ঘেয়ে ভাব চ'লে গিয়ে বেশ একটু বৈচিত্র্য আন্‌ছিল। কেউ কারো অঙ্গ স্পর্শ না ক'রে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে চল্‌ছিল। কখনও কোমরে দু হাত দিয়ে, ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে মাথা উঁচু করে যেন একটু মনোহর তাচ্ছিল্য-মিশ্র স্বাধীন ভাব দেখিয়ে সলীল ভাবে ভেসে যাওয়ার মত এগিয়ে বা ঘুরে গেল, কখনও বা হাতের রঙীন রুমাল ঘুরিয়ে বিলাস-বিলোল ভাবে উঠল আবার কখনও বা অবনতমুখী হ'য়ে লজ্জানম্র ভাব দেখিয়ে অল্প স্থানের মধ্যে পদবিক্ষেপ করতে লাগ্‌ল। মোটের উপর, বিশেষ সংযত নাচ, আপত্তিযোগ্য কিছু নেই এতে। মেয়েরা খানিক নাচ্‌তে নাচ্‌তেই দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন একজন ক'রে দুজন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নৃত্যমঞ্চে উঠ্‌ল, মেয়েদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কোমড় বেঁকিয়ে ঘাড় নীচু ক'রে কতকটা যেন্ ইউরোপীয় ঢঙে তাদের অভিবাদন ক'রে, এক একটি জুড়ী ঠিক ক'রে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'রলে। এই ছোকরারা হয় পুরো ইউরোপীয় পোষাকে, নয় হালের মালাই পোষাকে—গায়ে বর্ম্মীদের কোর্ত্তার ধরণে একটা ঢিলে জামা, কিংবা বিলিতী কোট, পায়ে পাজামা বা পেন্ট্‌লেন, কারো বা তার উপর হাঁটু পর্য্যন্ত একটা রঙীন সারং বা লুঙী জড়ানো, পায়ে বিলিতি জুতো, খালি মাথা বা নরম মখমলের কালো বা অন্য গাঢ় রঙের তুর্কী টুপীর মতন টুপী রেশমের খোঁপাবিহীন। এরা নিজের জুড়ীর সঙ্গে নাচে, কিন্তু এই মেয়ে-পুরুষের নাচও অত্যন্ত সংযত; এক এক জুড়ীর দুজন নাচিয়ে মেয়ে আর পুরুষ কেউ পরস্পরের মধ্যে এক হাতের চেয়ে বেশী কাছে আসে না—গাত্র-স্পর্শ হওয়া তো দূরের কথা। এদের এই নাচ, কতকটা যেন নাচের ভাষায় প্রেমাভিনয়, যুবকের ভঙ্গীতে কোথাও যেন কন্যার কাছে প্রেম-নিবেদন, আর সেইক্ষণই কন্যার ভঙ্গীতে যেন তাচ্ছিল্য-ভরে প্রত্যাখ্যান, আবার যুবকের যেন রাগের সঙ্গে বৈমুখ্য-ভাব প্রদর্শন, আর কন্যার তখন হয় ঘাড় হেঁট ক'রে লজ্জার ভাব, বা ধীরে ধীরে উৎসুক উৎকণ্ঠিত ভাবে অনুসরণ। সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে ঘোরা-ফেরা ক'রতে থাকে, তালে তালে পা প'ড়তে থাকে, দ্রুত লয়ে। এই রকমে যখন নাচ চ'ল্‌ছে, তখন হয় তো আর-একজন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নৃত্য-মঞ্চের উপরে উঠে এল, একজন যুবকের কাছে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে খালি অভিবাদন করলে, অমনি সে দ্বিরুক্তি না ক'রে তখনি তার নমস্কারের প্রতিনমস্কার করে, তার জন্য স্থান দিয়ে নেমে চ'লে এলো; নবাগত যুবক মেয়েটিকে অভিবাদন করে তার সঙ্গে নাচ সুরু ক'রে দিলে, মেয়েটার নাচের নিবৃত্তি নেই, খানিক পরে আবার তৃতীয় ব্যক্তির এইরূপে আগমন, আর দ্বিতীয়ের প্রত্যাবর্ত্তন। মিনিট পনেরো ধ'রে এই নাচের এক একটা পর্ব্ব চলে, তার মধ্যে হয় তো দু চার জন যুবক এই রকম করে এসে যোগ দিলে; তার পরে নাচ থামে, মেয়েরা এসে চেয়ারে বসে, বিশ্রাম ক'রে হাত-পাখার বাতাস খায়; বাজিয়েদের কেউ গিয়ে এদের পানীয় লেমনেট এনে দেয়। এই নাচ যে বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ নাচ একেবারে ঠাণ্ডা দেশেরই নাচ, গরম মালাই দেশে আর আল্‌সে মালাই জাতের মধ্যে এর উদ্ভব কি ক'রে হ'ল তা ঠাওর করা মুস্কিল। ইউ-রোপীয়েরা এই নাচ ভারী পছন্দ করে শুন্‌লুম, আর কখনও কখনও নৃত্যপ্রিয় ইউরোপীয় দর্শক ব'সে স্থির থাকৃতে পারে না, উঠে গিয়ে নটীদের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়।

"বাবা" চীনে ছোক্‌রা ও অনেকের অবস্থা এই রকম। আর আর মালাই যুবকদের তো কথাই নেই।

এই "রোঙ্গেং" নাচ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ নাচ হ'চ্ছে মূলে প্রাচীন মালাই পল্লী-জীবনে ছোকরাদের আর মেয়েদের প্রাণময় স্ফূর্ত্তির আর বিবাহোদ্দেশে তাদের প্রণয়রীতির একটি মনোহর কলা সৌন্দর্য্য পূর্ণ অভিব্যক্তি। মানুষের প্রাণের স্ফূর্ত্তি বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অব্যক্ত অভিলাষ প্রকাশ পায় নানা কলার মধ্য দিয়ে—কোথাও বা গানে কবিতায়, কোথাও বা মহাকাব্যে গল্পে রোমান্সে, কোথাও বা চিত্রকলায় ভাস্কর্য্যে, কোথাও বা চমৎকার চমৎকার গানের সুরে, কোথাও বা বাস্তু শিল্পে, আবার কোথাও বা নানা ছোটো-খাটো গৃহ শিল্পে; কোনও কোনও ভাগ্যবান জাতের মধ্যে একাধিক উপায়ে। সমগ্র মালাই জাতির মধ্যে তাদের সৌন্দর্য্য-বোধের আর সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রধান প্রকাশ হ'য়েছে তাদের নাচে। গান কথা বা সুর এদের হয় তো নগণ্য; কিন্তু নাচ এদের আশ্চর্য্য রূপে ভাব-প্রকাশক। যবদ্বীপের নাচের কথা পরে যখন ব'লবো তখন এ বিষয় আর একটু আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা করা যাবে! যবদ্বীপে খালি নাচের মধ্যে দিয়ে রামায়ণ প্রভৃতির নাটকাভিনয় দেখে প্রীত বিস্মিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব'লেছেন। মালাই জাতি যখন তার নিজের মধ্যে উদ্ভূত প্রাচীন রীতি-নীতি নিয়েই খুশী ছিল, যখন তার জীবন ছায়াঘন পল্লীর শান্তি আর প্রাচুর্য্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সে-সময়ে তার মেয়েদের আর যুবকদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা চ'লত (এখনও এই অবস্থা একেবারে যায় নি, যদিও যতই দিন যাচ্ছে তত "ধর্ম্ম-প্রাণ" মুসলমান হবার চেষ্টায় এরা নিজেদের দেশের সুন্দর রীতিনীতি ত্যাগ ক'রে একেবারে আরব ব'নে যাবার চেষ্টা ক'রছে, তার মধ্যে মেয়েদের ঘেরা-টোপ ঢেকে রেখে দেবার বর্ব্বরতা আমদানী করবার চেষ্টাটা হ'চ্ছে একটা)। মালাই জা'তের জীবনের সেই "সোনার যুগে" তাদের মধ্যে পূর্ব্বরাগ হ'য়ে বিয়ে হ'ত, আর তখনই এই রকম নাচে এই পূর্ব্ব রাগের বাহ্য প্রকাশ দাঁড়িয়ে যায়। ইস্‌লামের প্রভাবে গৃহস্থঘরের মেয়েদের নাচ এখন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, এই নাচ "রোঙ্গেং" নটীদের উপজীব্য হ'য়ে প'ড়েছে; যুবকেরা এই নটীদের নাচে এখনও সঙ্গে যোগ দেয় বটে, কিন্তু জিনিসটা আর নির্দ্দোষ সামাজিক ব্যাপার থাক্‌তে পারে না, কারণ এর বিশুদ্ধি আর পুরা নেই। কিন্তু ইউরোপের নানা উদ্দাম নাচের বীভৎসতার কথা ভাবলে, এই ধরণের নাচকে খুবই একটা মার্জ্জিত রুচির, সংযতভাবের অথচ, মাধুর্য্যপূর্ণ নাচ ব'লে স্বীকার ক'রতে হয়। কুআলা-লুম্পুরের প্রদর্শনীতে এই নাচ দুবার দেখবার আমাদের সুযোগ হ'য়েছিল। পরে ইপোঃতে আমাদের বাসাতে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্যে এই নাচের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল,—এর সংগত শালীনতাটুকু কবিকেও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ক'রেছিল।

নাচুনী দুটি মাঝে মাঝে ব'সে ব'সে বা আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে গান ক'রছিল—সেই falsetto সুরে এই ব'সে ব'সে বা ঘুরে ঘুরে গান গাওয়ায় তারা কাঠের পাটাতনে জুতোপরা পা ঠুকে ঠুকে তাল দি'চ্ছিল—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের মলগুলি বেজে উঠছিল। মালাই সুরগুলি বেশ করুন আর সোজা সুর, এত সোজা যে কতকটা যেন আমাদের দেশের সুর ক'রে সংস্কৃত শ্লোক পাঠের মত লাগ্‌ছিল। মোটের উপর, এই 'রোঙ্গেং' নাচে মালাই সংস্কৃতির একটুখানি সুন্দর আর উপভোগ্য দিক দেখাবার সুযোগ ঘটল আমাদের। রাত প্রায় বারোটায় বাসায় ফেরা গেল।

মালাই ছোক্‌রারা অনেকেই বড়ো ঘরের, তালালার সঙ্গে ইংরিজিতে আলাপ জুড়ে দিলে, আমাদের সঙ্গেও বেশ ভালো ব্যবহার ক'রলে। এরা আপ্‌সে মালাই ভাষায় হাসি ঠাট্টা মস্করা ক'রে কথা ক'চ্ছিল—এদের মুখে মালাই ভাষা যেন তার অন্ত্য স্বরবর্ণের উচ্চারণে আর তার টান-টোনে আমার কাছে পরিচিত সাঁওতালী মুণ্ডারী ভাষার মতন লাগছিল। মালাই আর সাঁওতালী মুণ্ডারী এরা সম্পর্কে জ্ঞাতি হয়—মূলে এক ভাষা থেকেই এদের উৎপত্তি; তাই কি আমার কাছে যা প্রতীয়মান হ'ল এদের মধ্যে এই উচ্চারণ সাম্য? (ক্রমশঃ)



পুরুষোত্তম কে ?

(প্রত্যুত্তর)

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে 'গীতার অক্ষর ও ব্রহ্ম' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পুরুষোত্তম বাদ গীতার মৌলিক মত নহে। এই সংক্রান্ত অংশটি (১৫।১৬—১৮) প্রক্ষিপ্ত। শ্রী বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন মহাশয় আশ্বিনের প্রবাসীতে এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১। মূল প্রবন্ধে এই অংশটি ছিল "অষ্টাদশ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে আমি বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হই। কথাটা ঠিক নহে। কোন বেদের কোন শাখাতেই কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণরূপী ভগবানকে বা পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হয় নাই"।

বেদরত্ন মহাশয় এই অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আসল কথাটার উত্তর দেন নাই। বেদে 'পুরুষোত্তম' কথাটাই নাই। "আমি বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হই"—যিনি এই অংশটি রচনা করিয়া গীতাতে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করিতে পারি না। তিনি পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তবুও ইঁহাকে সমর্থন করিতে হইবে; এইজন্য বেদরত্ন মহাশয় পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "বেদে ইহাকেই পুরুষ বলে" (১০।১০।১ ঋক)। এস্থলে পুরুষ সূক্তের উল্লেখ করা হইল। পুরুষ সূক্তের পুরুষ পরমাত্মা কি না তাহার বিচার না করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, পুরুষ এবং পুরুষোত্তম এক কথা নহে। নিরীশ্বর বাদেও 'পুরুষ' আছে।

২। তিনি লিখিয়াছেন :—

"গীতার বক্তা কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বা কৃষ্ণরূপী ভগবান্ নহেন। তিনি অর্জ্জুনের সখা। গীতার কোনস্থলেই ভগবানের উক্তিতে কৃষ্ণকে ভগবান্ বলা হয় নাই। তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া অন্যত্র স্বীকৃত হইয়াছেন বটে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতায় যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নহে, তাহা ভগবানের উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঐ উক্তি ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।"

এস্থলে যাহা যাহা বলা হইল তাহার কোনটাই সম্পূর্ণ সত্য নহে।

(১) প্রথমতঃ কৃষ্ণ যে কেবল বক্তাই তাহা নহে, অনেকস্থলে তাঁহাকে ভগবান্‌ও বলা হইয়াছে। ১০।১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, সে-সকল আমি সত্য মনে করি। হে ভগবান্! না দেবগণ, না দানবগণ তোমার অভিব্যক্তি জানে"। ১০।১৪

এস্থলে কেশবকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভগবান্ বলা হইল। 'ভগবান্' শব্দ কেবল সম্মানার্থ এরূপ বলিবার উপায় নাই; কারণ ঠিক ইহার পরের শ্লোকেই সেই কেশবকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে "হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে জগৎপতে (১০।১৫)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে এস্থলে কেশব বা কৃষ্ণই ভগবান্, পুরুষোত্তম, জগৎপতি পরমেশ্বর।

সপ্তদশ শ্লোকেও তাঁহাকেই আবার 'ভগবন্' বলা হইয়াছে ১০।১৭॥

(২) দ্বিতীয়তঃ চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অর্জ্জুন যাঁহার ভক্ত (৪।৩), তিনিই (কৃষ্ণরূপে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (৪।৪), তাঁহার অনেক জন্ম (৪।৫), তিনি অজ, অধ্যয়াত্মা, ভূত সমূহের ঈশ্বর (৪।৬), তিনিই যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (৪।৬—৮)।

(৩) তৃতীয়তঃ—একাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন এবং অবশেষে অর্জ্জুনের অনুরোধে বিশ্বরূপ সম্বরণ করিয়া তাহাকে কিরীটধারী, চক্রহস্ত ও চতুর্ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন। (১১।৩৫,৪৬,৫০,৫১)।

(৪) চতুর্থতঃ তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে পার্থ! আমার (কিছুই) কর্ত্তব্য নাই (যেহেতু) ত্রিলোকে (আমার) অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছুই নাই; (তথাপি) আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই রহিয়াছি" ৩।২২।

এস্থলে বলা হইল যে, পরমেশ্বরের কোন কর্ত্তব্য নাই অথচ তিনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংসারের কার্য্য করিতেছেন।

(৫) পঞ্চমতঃ সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, মহাত্মগণ মনে করেন যে "সমুদায়ই বাসুদেব" ।৭।১৯।

গীতাতে বাসুদেবশব্দে আরও তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ১০।৩৭ শ্লোকে বাসুদেব বৃষ্ণিগণের মধ্যে একজন। ১০।৫০ ও ১৮।৭৪ শ্লোকে কৃষ্ণই বাসুদেব। যখন ৭।১৯ শ্লোকে বলা হইল "সমুদায়ই বাসুদেব" তখন বুঝিতে হইবে যে, বৃষ্ণি কুলোদ্ভব কৃষ্ণই—বাসুদেব এবং তিনিই ভগবান্ কিংবা ভগবানের অবতার।

(৬) কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা সত্য। তিনি কৃষ্ণের ভক্তও (৪।৩)। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রভু বলিয়াও সম্বোধন করিয়াছেন (১১। ৪; ১৪।২১)। অর্জ্জুন যখন বুঝিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরই, তখন তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া (১১।৩৫) এবং দণ্ডবৎ হইয়া প্রণামও করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে মানব ভাবে সখারূপে দেখিতেন। এজন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলেন (১১।৪১,৪৪)।

অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ কেবল বক্তা নহেন তিনি ভগবান্ বা ভগবানের অবতারও।

৩। বেদরত্ন মহাশয় বলেন "ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট হইয়া যিনি লোকত্রয়কে ধারণ করেন" তিনিই পুরুষোত্তম। আর একস্থলে বলিয়াছেন—"ঈশ্বর পুরুষোত্তম রূপে ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত"।

ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি বা ত্রৈলোক্য ধারণ করিবার জন্য পুরুষোত্তম নামক তৃতীয় পুরুষের সত্তা কল্পনা করা অনাবশ্যক।

কারণ গীতাকার বলেন "যাহা দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে (যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ)" তাহা ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি ৭।৫ আর আমরা যাহাকে আত্মা বলি—তাহা জীবাত্মাই হউক বা

পরমাত্মাই হউন—সেই আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী (২।৪৭, ২।২৪)। অক্ষর ব্রহ্ম ও "সর্ব্বত্রগ" (১২।৩)। সুতরাং পুরুষোত্তমের স্থান নাই।

৪। বেদরত্ন মহাশয় আরও বলেন যে, "পুরুষোত্তম যিনি ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট তিনি সাকার''।

এ বিষয়ে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে—যাহা সাকার, তাহা বিশ্ব ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না—সাকার সাকার বস্তুতেও সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, নিরাকার বস্তুতে ত পারেই না। দ্বিতীয়তঃ যাহা সাকার, তাহা সীমা বিশিষ্ট। যাহা সীমা বিশিষ্ট, তাহার স্থান অক্ষর ব্রহ্মের উপরে নহে। তৃতীয়তঃ—যাহা সাকার তাহা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত; যাহা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত, তাহা মুক্ত, পুরুষ নহে, তাহা বদ্ধ। যাহা বদ্ধ তাহা পরমাত্মা হইতে পারে না। এই সাকার পুরুষোত্তম আর বেদান্তের সগুণ ব্রহ্ম একই সত্তা। উভয়ই সীমাবিশিষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল। এই প্রকার সত্তার স্থান অক্ষর ব্রহ্মের নিম্নে।

যখন প্রকৃতি ও সগুণ ব্রহ্ম রহিয়াছে, যখন ব্রহ্মের জীবভূত সনাতন ভাব রহিয়াছে। (১৫।৭) যখন পরাপ্রকৃতি রহিয়াছে (৭।৫), ইহারাই যখন জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তখন পুরুষোত্তমের স্থান কোথায়?

৫। "পুরুষোত্তম" শব্দের মৌলিক অর্থ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানব। এই অর্থে গীতাতে তিনটি স্থলে কৃষ্ণকে 'পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে (৮।১; ১০।১৫; ১১।৩)। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে। পালিভাষায় ইহার অনুরূপ শব্দ ''পুরিসুত্তম''। বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পুরিসুত্তম অর্থাৎ পুরুষোত্তম বলা হয় (ধর্ম্মপদ, ৭৮; সুত্ত-নিপাত, ৫৪৪; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩২৫-৩২৬, ইংরাজী সংস্করণ)। শেষোক্ত দুইখানা পালি গ্রন্থে এই অংশ আছে :—

"নমো তে পুরিসুত্তম''

অর্থাৎ "হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার''। সুত্তনিপাত একখানা প্রাচীন গ্রন্থ এবং গীতা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। সম্ভবতঃ বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পুরুষোত্তমের ভাব এবং সম্ভবতঃ শব্দটাও গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধ পুরুষোত্তম। বুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহ নাই। বৈষ্ণবগণের মতে কৃষ্ণ ও পুরুষোত্তম এবং কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কেহ নাই। এই "পুরুষোত্তম কৃষ্ণ'' অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব'মতের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্যই এই প্রকার পুরুষোত্তম বাদের কল্পনা—নতুবা এ মতের কোন আবশ্যকতা ছিল না।

বেদরত্ন মহাশয়ের অপরাপর বক্তব্যের আলোচনা করা আবশ্যক।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

—

'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ'

'প্রবাসী'র গত আষাঢ় সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় 'প্রবাসী'র গত শ্রাবণ সংখ্যায় তাহার প্রতিবাদ করেন। 'প্রবাসী'র গত আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসু মহাশয় সেই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন সত্যের খাতিরে তাহার আলোচনা হওয়া দরকার।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ ও সরসীবাবুর মধ্যে মনোবিশ্লেষণ লইয়া যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা খুব সংক্ষেপে এবং সাধারণভাবেই প্রকাশ করিয়াছি। সমস্ত কথা মনে করিয়া রাখা অসম্ভব, তবে মূল বক্তব্যগুলি সমস্তই লিখিয়াছি; এ কারণ উক্ত প্রবন্ধ পড়িয়া সাধারণের মধ্যে মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) সম্বন্ধ ভ্রান্ত ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে।" কিন্তু এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও সরসীবাবু দুইজনেরই সাইকো-এ্যানালিসিস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকায় সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা, সংক্ষেপে লেখার জন্য নহে। অনিলবাবু লিখিয়াছেন, "Psycho-analysis এর উপর রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্বন্ধে গিরীন্দ্রবাবুর কোথায় কোথায় আপত্তি তাহা লেখা উচিত ছিল।'' ডাঃ বসু মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও সরসীবাবু দুইজনই সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের পার্থক্য ভুলিয়া কথা বলিয়াছেন, এইজন্যই সাইকো-এ্যানালিসিস-সম্বন্ধে তাঁহাদের মত গ্রাহ্য নহে। গোড়াতেই যেখানে ভুল, সেখানে আলোচনার প্রত্যেক পদেই যে ভুল হইবে তাহা কি অনিলবাবু জানেন না? প্রতিপদের ভুল দেখাইয়া আলোচনা করিবার স্থান মাসিকপত্রের আলোচনা-বিভাগে সম্ভব নয় বলিয়া ডাঃ বসু মহাশয় শুধু গোড়ার ভুলটি দেখাইয়া দিয়াছেন। অনিলবাবু লিখিয়াছেন, "গিরীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, নির্জ্ঞান সম্বন্ধে (the subconscious) মতামত নির্জ্ঞানবিদেরাই দিতে পারেন, কবি অথবা দার্শনিকের মত গ্রাহ্য নহে;—এ কথা কি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার বলা উচিত হইয়াছে? তিনি মনীষী—নিজের অন্তর-দৃষ্টি দিয়া সকল জিনিস বুঝেন; এই জন্যই তাঁহার 'মতামতের মূল্য আছে। তাঁহার মৌলিক গবেষণাশক্তির জন্যই তিনি বিলাতে Hibbert lectures দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।'' ডাঃ বসু মহাশয় নির্জ্ঞানের দ্বারা 'the subconscious' বুঝান নাই। সাইকো-এ্যানালিসিস subconscious লইয়া কারবার করে না, সাইকো-এ্যানালিসিসের কারবার unconscious লইয়া। অনিলবাবু দেখিতেছি সাইকো-এ্যানালিসিসের আলোচ্য বিষয় কি তাহাও জানেন না! রবীন্দ্রনাথ ও সরসীবাবুর কথোপকথনের কলমচী হইলেই কি একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের আলোচনা করিবার ক্ষমতা জন্মায়? এ শুধু এ-দেশেই সম্ভব! রবীন্দ্রনাথ মনীষী এ-সংবাদ কষ্ট করিয়া অনিলবাবুর না দিলেও চলিত! কিন্তু, মনীষী হইলেই কি 'অন্তর-দৃষ্টি'-দ্বারা সকল সত্য জানা যায়? নির্জ্ঞানের কোনো ইচ্ছাই কোনো 'অন্তর-দৃষ্টি'তে ধরা পড়িবে না। আর সাইকো-এ্যানালিসিস সম্বন্ধে গবেষণার জন্যই কি তিনি Hibbert lectures দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন? রবীন্দ্রনাথকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে, তাই যখন দুইএকজন অতিভক্ত তাঁহাকে লইয়া কোনো হাস্যকর অভিনয়ের সূত্রপাত করে তখন ব্যাপারটা অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। আসলে রবীন্দ্রনাথ কখনও অনধিকার-চর্চ্চা করেন না। তবে এক জাতীয় লোকের খ্যাতিলাভের উপায়ই অন্যের মতামত ছাপানো। তাহারা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণকে নানাবিষয়ে প্রশ্ন করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। তখন নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোনো একটা মত না দিলে চলে না। রবীন্দ্রনাথও হয়ত তাহাই করিয়া থাকিবেন। অনিলবাবু নির্জ্ঞান-সম্বন্ধে সাধারণ বৈজ্ঞানিক জগতে ডাঃ বসুর মতামতের মূল্য কতটা সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন! এ-'বৈজ্ঞানিক জগতে'র কোনো খবর রাখিলে এ-সন্দেহ তাঁহার মনে আসিত না। অতএব, সুয়েজ খালের এধারে- সাইকো-এ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে ডাঃ বসুর স্থান কোথায় তাহা অনিলবাবু সাইকো এ্যানালিসিসের জন্মদাতা আচার্য্য ফ্রয়েডকে লিখিয়া জানিতে পারেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকমাত্রেই জানেন যে

ডাঃ বসু আজ বিশ বৎসর ধরিয়া সাইকো-এ্যানালিসিসের চর্চা করিতেছেন, তিনি 'Concept of Repression' নামক বইখানি লিখিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি অবদমনের (repression) একটি নূতন থিওরির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত International Psycho-analytical Journal-এর অন্যতম সম্পাদক, এবং তিনি Indian Psycho-analytical Society'র সভাপতি। অনিলবাবু লিখিয়াছেন, "(সরসীবাবুর) প্রবন্ধ সম্বন্ধে গিরীন্দ্রবাবু বলিতেছেন—উহা Psycho-analytical নহে; Psychological! ডাক্তারবাবু দেখিতেছি Psycho-analysis ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে Psychology জিনিসটা ভুলিতে বসিয়াছেন। প্রবন্ধটি তিনি সজ্ঞানে পাঠ করিয়াছেন অথবা নির্জ্ঞানে পাঠ করিয়াছেন?" সরসীবাবুর প্রবন্ধ কেন সাইকো-এ্যানালিটিক্যাল নহে ডাঃ বসু মহাশয় তাহার কারণ দিয়াছেন, সুতরাং সে-আলোচনার আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু তর্কে নামিয়া যুক্তির অভাবে মানুষ কতটা ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে পারে, উপরের পঙ্‌ক্তিকয়টি তাহার প্রমাণ। অনিলবাবু কি জানেন না যে, সরসীবাবুর প্রবন্ধ সাইকো-এ্যানালিটিক্যাল নয় বলিয়া Dr. Ernest Jones তাহা না ছাপাইয়া ফেরৎ দিয়াছেন? অনিলবাবু অধ্যাপক রবীন হালদার মহাশয়কেও ছাড়েন নাই। ডাঃ বসুকর্ত্তৃক অধ্যাপক হালদারের প্রশংসা দেখিতেছি অনিলবাবুর কাছে একেবারে অসহ্য! অনিলবাবু অধ্যাপক হালদারের প্রবন্ধ না দেখিয়াও প্রবন্ধপাঠের সময় উপস্থিত না থাকিয়াও মন্তব্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই! অধ্যাপক রবীন হালদার মহাশয়ের গবেষণার বিষয় ছিল 'Working of an Unconscious Wish in the Creation of Poetry and Drama'। তিনি তাঁহার গবেষণায় বিশেষ অনন্যতন্ত্রতার পরিচয় দেন এবং দেখান যে নির্জ্ঞানের যে-ইচ্ছা স্বপ্ন, পুরাণ, ও মনোবিকার সৃষ্টি করে, সে-ইচ্ছাই কাব্য ও নাটকের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আরও অনেক কবি ও নাট্যকারের কাব্য ও নাটক সাইকো-এ্যানালিসিস-সম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করেন। নির্জ্ঞানে যদি কামময় ইচ্ছা থাকে, তবে নির্জ্ঞানের আলোচনায় কামের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। 'জঘন্য' কথাটা সমাজে অথবা আর্টে থাকিলেও সাইকো-এ্যানালিসিসে তাহার স্থান নাই।

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

"জাড়া গোলক বৃন্দাবন"

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

প্রবাসীতে সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত "রেভারেণ্ড টম্‌সনের পণ্ডিতম্মন্যতা" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া তাঁহার চিরাচরিত নিরপেক্ষ উক্তি ও স্পষ্ট সমালোচনায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ঐ প্রবন্ধে "কবি" গানের মানে বলিতে গিয়া "কি করে্য বল্‌লি জগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন" পদটি ভুলিয়াছেন। এই পদটি কবি গানের সম্পর্কে বহুবার মাসিক পত্রের প্রবন্ধে বাহির হইয়া সাহিত্যের আসরে বেশ পরিচিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের যতদূর সংগ্রহ আছে তাহাতে দেখিতে পাই ১৩০৪ সালের বৈশাখের ভারতীতে, ১৩০৮ সালের ভাদ্রের প্রবাসীতে, ১৩১৪ সালের বৈশাখের নব্যভারতে ও ১৩১৫ সালের সাহিত্যসংহিতায় এই গানটি আংশিকভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং কোথাও বা ইহাকে ভোলাময়রার গান বলিয়া বলা হইয়াছে। কবির লড়াইএর প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া এই গানটি কাহার উক্তর তাহাও কেহ বলেন নাই এবং কোথাও পূরা গানটি দেওয়া হয় নাই। সেজন্য মনে হয় কোন প্রবন্ধলেখকই কোন প্রকৃত সন্ধান লয়েন নাই।

এক্ষণে এই গান সম্বন্ধে একটু কিছু বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া রাখিলে মন্দ হয় না এবং কালে হয়ত আংশিক গানটাই সাহিত্যক্ষেত্রে রহিয়া যাইবে, পূরাটা পাওয়া যাইবে না। এই ভাবিয়া প্রবাসীতে লিখিয়া পাঠাইতেছি। ইহার ইতিবৃত্ত এই—

সে বাংলা ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা। জাড়া বাবুপাড়ার বাৎসরিক শীতলাপূজা উপলক্ষে কবির গান হয়। বেণেগোঠে (এখন যেখানে ডাক্তারখানা আছে) ইহার আসর হয়। চন্দ্রকোণার যজ্ঞেশ্বর ওরফে জগা ধোপা ও ঘাটালের হরিবোল দাস গাওনা করিতে আসেন। সেকালে ইঁহাদের কবির দলের বেশ সুনাম ছিল এবং ইঁহাদের উভয়ের সংগ্রহ ও এবিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য এক আসরে উভয়ের গান জমিতও ভাল। এখানে গোষ্ঠপালা গাওনা হইয়াছিল। বেণেগোঠের পালা সাঙ্গ হইলে উভয়েই দলবল সহ বাবুদের কাছারিতে ইনাম লইতে আসেন! সে-সময়ে ভরপুর কাছারি হইতেছিল। দেশ-বিদেশ হইতে বহু লোকও বৈষয়িক ব্যাপারে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলের আগ্রহে আমার জ্যেঠতাত ৺শম্ভুচন্দ্র রায় প্রমুখ বাবুমহাশয়গণ জাড়ার বিষয়ে একটি গান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তখনই কাছারি বাটির সম্মুখে আখড়া বসিয়া যায় ও জগা ধোপা এই গানটি সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া গাহিয়া দেন:—

কবির সুর

জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
জাড়ার পরব্রহ্ম বাবুগণ
যেমন গোলক হোতে গোকুলেতে অবতীর্ণ গোবর্দ্ধন ॥
গোলকের ভাব দেখি গোকুলে
জাড়াগোলক আলো করেন বাবু সকলে,
যেমন সহস্রপীঠ কমলদলে রে,
গোবিন্দজী বিরাজমান ॥

দ্বাদশ বিপিন ত্রিশ উপবন
কুঞ্জে কুঞ্জে গোষ্ঠে ঘাটে পূর্ণ বৃন্দাবন ;
সাত সরোবর গিরিগোবর্দ্ধন রে ;—
জাড়াতে এ সব বর্ত্তমান ॥
দ্বাদশ রাখাল দেওয়ান কারকুন
নায়েব গোমস্তা আদি সবে সুনিপুণ,
তাই দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রে ;
এই রামরাজ্যে হয় সুশাসন ॥
রম্য ধামের মনোহর লীলা,
দুঃখ দূর করিতে বাবুদের খেলা,
তাই হাটুহোটেল্ অতিথশালারে—
তুলেছে যশের নিশান ॥
কল্পতরু বাবুমণ্ডলী,
ধনে মানে কুলেশীলে খ্যাত সকলি,
তাই জগা বলে পরাণ খুলে রে ;—
জাড়া জড়তা নাশন ॥

ইহার উত্তর দিবার জন্য হরিবোল দাসকে বলায় তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। বিশেষ পীড়াপীড়িতে এবং জাড়া বা বাবুদের অখ্যাতিসূচক গানে কেহ কিছু মনে করিবেন না বলায় হরিবোল দাস গাহেন—

কি ব'লে বল্‌লি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
(যথায়) বামুন রাজা চাষি প্রজা চারিদিকে তার বাঁশের বন ॥
কোথায় রে শ্যামকুণ্ডু, কোথায় রে তোর্ রাধাকুণ্ডু
সাম্‌নে আছে মাণিককুণ্ডু, করগে মূলা দরশন ॥
তুই বাজিয়ে যাবি ঢুলির ঢোল,
কেন রে তোর গণ্ডগোল,
তুই কবি গাইবি পয়সা নিবি
খোসামুদির কি কারণ ॥

এই গানে একবারে তখন হাসির রোল উঠিয়া গেল, হরিবোল দাসের এই-দুচার কথার-রঙ্গরস সকলেই বেশ আনন্দের সহিত উপভোগ করিলেন। গানের আসর জমিয়া গেল, কেহই ছাড়িলেন না ; যজ্ঞেশ্বরকে পাল্টা জবাব দিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। তিনি উঠিয়াই হরিবোল দাসকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন

আমি যে সে যজ্ঞেশ্বর নই,
আমি চন্দ্রকোণায় রই
আমার মাথায় কাপড় বয় ॥

কারণ এখানের ন্যায় অন্যত্রও যজ্ঞেশ্বরকে হরিবোল দাসের সহিত গাওনায় প্রথমে পাতন করিতে হইত। তারপর গান ধরিলেন—

কেমনে চিন্‌বি কাণা রাধাশ্যামকুণ্ডু কেমন (তুই) চোখ্ থাকৃতে আঁধার-কাণা রে—
মরি তোর্ চোখের্ নজর্ বিলক্ষণ ॥
হলি রে তুই বনের বানর, বৃন্দাবন কি চিন্‌বি পামর,
ফল মূলোয় দে গে কামড় রে, জানিস লম্ফন আর ঝম্ফন
তাইতে শ্যামকুণ্ডু ছেড়ে, মাণিককুণ্ডেতে গমন ॥
তুই হরিবোল্ নয় হরবোলা, কিসে তোর এ গাত্রজ্বালা
কিসে তুই ঝালাপালা রে, করগে (ঘাটালে) নারিকেল ভক্ষণ,
হের হোরের কুঁড়ে হরিকুণ্ডুরে, শ্যামকুণ্ডু সে নিদর্শন ॥
তোকে দেখতে দিনু শ্রীগোবিন্দ, তুই দ্বন্দ্ব ভ'রে হলি অন্ধ,
বুঝবো রে তোর রঙ্গ ব্যঙ্গ দিস্ না ভঙ্গ রে,
অঞ্জনা হৃদি-রঞ্জন ;—
বামুনের কি গুণ জানবে রে, তোর মত পোড়ার মুখো হনুমান ॥
জাড়া দোষ নাশের আশে, পূর্ণ জাড়া বাবুর বাসে,
তোর মত হনু হাসে রে, সকলেতে তুচ্ছজ্ঞান ;—
কোথা তোর চৌদিকে বাঁশ রে (হরে),
এই আঝুড়া তার প্রমাণ ॥
নিন্দুকেরই গুণের ধারা, কুচ্ছা নিন্দে রঙ্গ করা,
কেউ টেরা কেউ বাকা খোঁড়া রে, তুই বুঝি রূপে গুণেতে সমান ;
জগা আর বলবে কত রে, হরি হরি বল মন ॥

বেলা অধিক হইয়া যাওয়ায় এখানেই গান শেষ হইল। বাবু-মহাশয়রা সন্তুষ্ট হইয়া উভয়কেই পারিতোষিক দিয়া বিদায় করেন।

হরিবোল দাসের গানটি কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কিছু দিন পরে আমার এক খুড়তুত ভগিনীর বিবাহে কলিকাতা হইতে বরযাত্রী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ঐ গানটির একটি ইংরাজি অনুবাদ এখানে প্রচার করেন, তাহাও দিতেছি। সুতরাং "কি কোরে বল্‌লি জগা" গানটি অচিরেই ইংরেজী পোষাকে তাহার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসায় ইহার দ্রুত প্রসারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তার পর মাসিকপত্রের প্রবন্ধ-লেখকদের আশীর্ব্বাদে মূল গানটি এখানে সাহিত্যেও কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

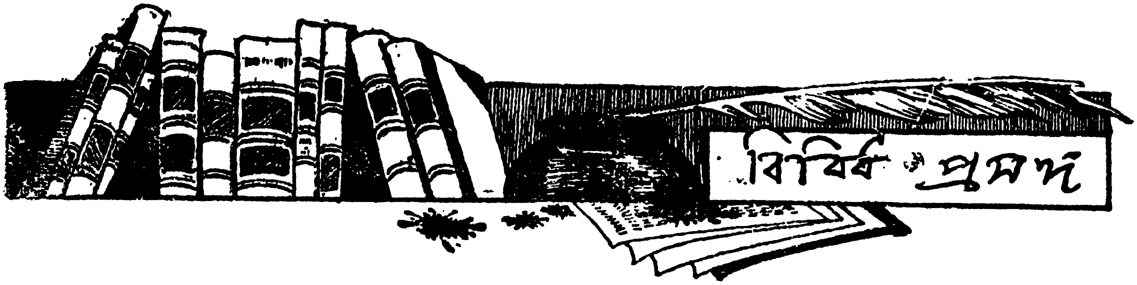
ইংরাজি অনুবাদটি এই। কবির সুরে ইহাকেও গাওয়া চলে।

How do you call Jaga Jara
Heavens compound
Where Brahmin king, pessant tenant,
Bamboo bush all around.
Where is your Shyam Kundu, where is your
Radha Kundu ?
Look at near Manik Kundu,
(where) radish-roots all abound.
Go on beating the drum.
Need not be noisesome.
Poetry make, money take, flattery on
what ground.

ভ্রম-সংশোধন

কার্ত্তিক সংখ্যা ১১৫ পৃঃ ১ম স্তম্ভের ১৭-১৮ পংক্তিতে—

"সহকারী সুপারিণ্টেডেণ্ট রায়..." উঠিয়া নিম্নলিখিত রূপ হইবে "রায়বাহাদুরের সহিত সুপারিণ্টেডেণ্ট"



স্বাধীনতা ও ডোমিনিয়ন্-অবস্থা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, না ডোমিনিয়ন-অবস্থা হওয়া উচিত, এই তর্ক আবার উঠিয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, জাপান, ইটালী প্রভৃতির মত স্বাধীন না হইতেছে, তত দিন এই তর্ক অল্পাধিক পরিমাণে চলিবে। ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে যদি ডোমিনিয়ন হয়, তাহা হইলে তখনও স্বাধীনতা-লিপ্সুরা স্বাধীনতালাভের জন্য আন্দোলন ও চেষ্টা চালাইতে থাকিবে। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য অনেক বার বলিয়াছি। কিন্তু তর্ক পুনঃ পুনঃ উঠিতেছে বলিয়া আমাদের মতও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে হইতেছে।

স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে লোকদের ধারণা যতটা স্পষ্ট, ডোমিনিয়ন-অবস্থা সম্বন্ধে ততটা স্পষ্ট নহে। ব্রিটেনের যতগুলি উপনিবেশ আছে, তাহাদের মধ্যে যে পাঁচটির আভ্যন্তরীন আত্মকর্তৃত্ব আছে, তাহাদিগকে ডোমিনিয়ন বলা হয়। যথা—কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নব জীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড। এইগুলির রাজনৈতিক অবস্থা ও অধিকার কিরূপ তৎসম্বন্ধে চেম্বাসের্র এন্সাইক্লোপীডিয়া বা বিশ্বকোষে অধ্যাপক বেরিডেল কীথ লিখিয়াছেন :—

In the strict legal aspect all these are colonies; their legislation may be disallowed by the crown, their laws may be overridden by imperial acts, the head of the executive government is appointed by the king on the advice of the British Government, and appeals lie from their courts to the Judicial Committee of the Privy-council. In practice they are almost autonomous; the governors-general are appointed in accordance with the wishes of the dominions; disallowance of their acts is obsolete or nearly so; the British parliament has ceased to legislate for them save with their consent; and, if they desired, the right of appeal to the Privy-council would doubtless be cancelled. Save Canada, they have a wide power of constitutional alteration, though they cannot sever their connection with the British crown. The chief sign of their condition of quasi-dependence is the fact that under international law they are not, for many purposes, treated as independent states: the governors-general and ministers cannot declare war or make peace or enter into treaties, except under the authority of the king, on the advice of the British government. But these restrictions are of less importance in practice than in theory, for in all important political treaties since the Peace Conference of 1919, the Dominions (other than Newfoundland) have separate representation, and their consent is obtained before ratification, while no commercial treaty since 1880 has been made binding on them without their consent, and special treaties are negotiated for them by their own representatives, acting with the authority of the British government. Further, the Dominions (except Newfoundland) are distinct members of the League of Nations, side by side with the British empire as a whole, and as such members act independently of, and sometimes in opposition to, the British empire representatives. The Dominions have not the power to declare themselves neutral in any war into which Britain enters, but they may refuse any active aid, and they obviously can claim that they should participate in framing British foreign policy, so as to obviate their being involved in war without consultation and full knowledge. Effective arrangements exist under which, in matters immediately and directly affecting them, the British government does not act without Dominion concurrence, but the problem of consultation on general foreign policy is not yet solved. It is complicated by the fact that the Dominions, while able to maintain internal order, are not yet prepared to undertake proportionately the same burden of defence expenditure as is borne by the United Kingdom.)

তাৎপর্য্য। "ঠিক্ আইনের চক্ষে ডোমিনিয়নগুলি উপনিবেশ; ব্রিটিশ রাজা তাহাদের আইনগুলি নামঞ্জুর করিতে পারেন, সাম্রাজ্যিক আইন দ্বারা তাহাদের আইন ব্যর্থ করা যাইতে পারে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পরামর্শ অনুসারে রাজা তাহাদের শাসকদের কর্ত্তা গবর্ণর-জেনার্যালকে নিযুক্ত করেন, এবং তাহাদের আদালতের রায় হইতে প্রিভি-কৌন্সিলে আপীল চলে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা স্বয়ংশাসিত বা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট, ডোমিনিয়নগুলির ইচ্ছা অনুসারে তাহাদের গবর্ণর-

জেনার‍্যাল নিযুক্ত হয়; ব্রিটিশ নৃপতি কর্তৃক তাহাদের আইন নামঞ্জুর করিবার রীতি অপ্রচলিত বা প্রায় অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে; ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে না; এবং তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রিভি-কৌন্সিলে আপীলের অধিকারও নিশ্চয়ই লোপ করা হইবে। কানাডা ছাড়া, অন্য ডোমিনিয়নগুলির কন্সটিটিউশ্যন বা ভিত্তিগত রাষ্ট্রীয় বিধি বদ্‌লাইবার বিস্তৃত ক্ষমতা আছে, যদিও তাহারা ব্রিটিশ রাজার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে না। তাহাদের অর্দ্ধঅধীনতার প্রধান চিহ্ন এই, যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া তাহারা গণিত হয় না ও তদ্রূপ ব্যবহার পায় না; তাহাদের গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও মন্ত্রীরা, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পরামর্শ অনুসারে রাজার প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে, যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতাসঙ্কোচক এই বিধিগুলির গুরুত্ব থিওরিতে যত কার্য্যতঃ তত বেশী নয়; কারণ ১৯১৯সালের শান্তি-কন্‌ফারেন্সের সময় হইতে সমুদয় গুরুত্ববিশিষ্ট রাজনৈতিক সন্ধিতে নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড ছাড়া অন্য ডোমিনিয়নগুলির প্রতিনিধি থাকে, এবং সন্ধি বলবৎ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের সম্মতি লওয়া হয়; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বাণিজ্যিক সন্ধিতে তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হয় নাই; বিশেষ সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ও বন্দোবস্ত ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে কার্য্যকারী তাহাদের প্রতিনিধিরা করিয়া থাকে। অধিকন্তু, নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড ছাড়া অন্য ডোমিনিয়ানগুলি লীগ্‌ অব্‌ নেশ্যন্সের স্বতন্ত্র সভ্য, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সভ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এই সভ্যত্ব বিদ্যমান। এই সভ্যত্বের বলে তাহারা ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের মতনিরপেক্ষভাবে, কখন কখন তাহাদের মতের বিরুদ্ধে, লীগ অব নেশ্যন্সে কাজ করিতে পারে। ব্রিটেন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ডোমিনিয়নদের নিরপেক্ষ থাকিবার অধিকার নাই, যদিও তাহারা কার্য্যতঃ ব্রিটেনকে কোন সাহায্য করিতে অস্বীকার করিতে পারে। ইহাও স্বতঃ প্রতীয়মান, যে, আগে হইতে পরামর্শ ও পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে যাহাতে তাহারা কোন যুদ্ধে জড়িত না হইয়া পড়ে, সেইজন্য ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতিনির্দ্ধারণ কার্য্যে তাহারা ব্রিটেনের অংশী হইবার দাবী করিতে পারে। যাহাতে অব্যবহিত ও সাক্ষাৎভাবে ডোমিনিয়নদের ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এরূপ বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যাহাতে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কাজ না করে তাহার জন্য সমুচিত বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু সাধারণ বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে তাহাদের সহিত পরামর্শ রূপ সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। এই সমস্যাটি জটিল হইয়াছে এই কারণে, যে, ডোমিনিয়নগুলি আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ হইলেও, সমগ্র সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয়ভার ব্রিটেনের সহিত সমানুপাতে বহন করিতে এখনও প্রস্তুত নহে।"

উপরের কথাগুলি অধ্যাপক বেরিডেল কীথ ১৯২৩ সালে লিখিয়াছিলেন। তাহার পর কোন কোন ডোমিনিয়ন বা ডোমিনিয়নবৎ আইরিশ রাষ্ট্র স্বাধীনতার দিকে আরও কিছু অগ্রসর হইয়াছে। যেমন কানাডা ও আইরিশ রাষ্ট্র ওয়াশিংটনে ও পারিসে, ব্রিটেনের অনুমতি না লইয়াই, নিজ নিজ দূত নিযুক্ত করিয়াছে, কানাডা ঐ প্রকারে আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের সহিত সন্ধি করিয়াছে, আইরিশ ফ্রী ষ্টেট পূর্ণ স্বাধীন দেশের মত লীগ অব্‌ নেশ্যন্সে একটি সন্ধি রেজিষ্টারী করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুঅরদের জাতীয় (ন্যাশন্যালিষ্ট) দলের নেতা বলিয়াছেন, ইচ্ছা করিলেই ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকার আছে।

ডোমিনিয়নগুলি—অন্ততঃ প্রধান ডোমিনিয়নগুলি—সম্ভবতঃ এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে আরও অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু অধ্যাপক বেরিডেল কীথ যাহা লিখিয়াছেন, ডোমিনিয়নগুলির অবস্থা মোটের উপর এখনও সেইরূপ আছে। এই অবস্থা পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা হইতে নিকৃষ্ট, কিন্তু দেশগুলির **আভ্যন্তরীন** বিষয়ে তাহারা কার্য্যতঃ স্বাধীন। তথাপি ইহা কখনই বলা যায় না, যে, তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতা পূর্ণ স্বাধীন ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, জাপান, ইটালী প্রভৃতির সমান।

আইরিশ ফ্রী ষ্টেট সম্বন্ধে অধ্যাপক বেরিডেল কীথ বলেন:—

"The status of the Free State in Ireland is essentially that of a Dominion on the model of Canada, but that status is possessed under the terms of a formal treaty of 1921 between Great Britain and Ireland, and the terms of that treaty provide certain powers which Great Britain can exercise in respect of defence matters, and definitely limit the right of the Irish Free State to maintain naval and military forces, matters left indefinite in the case of the Dominions."

তাৎপর্য্য। "আয়ার্ল্যাণ্ডের ফ্রী ষ্টেটের রাজনৈতিক মর্য্যাদা সারতঃ কানাডার মত ডোমিনিয়নের তুল্য, কিন্তু ১৯২১ সালের গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যে একটি সন্ধি অনুসারে আয়ার্ল্যাণ্ড ইহার অধিকারী হইয়াছে। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ব্রিটেন দেশরক্ষা বিষয়ক কোন কোন ব্যাপারে কোন কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারে এবং আইরিস ফ্রী ষ্টেটের নৌসৈন্য ও স্থল সৈন্যদলগঠন ও রক্ষা করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিতে পারে। ডোমিনিয়ন-গুলির বেলায় ব্রিটেন এই বিষয়টি অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছে।"

ডোমিনিয়নগুলি সাধারণ ব্রিটিশ উপনিবেশ অপেক্ষা অধিক স্বশাসনক্ষমতা লাভ করিবার অনেক পরে আয়ার্ল্যাণ্ডের ফ্রী ষ্টেটের জন্ম হয়। অথচ ব্রিটেন তাহাকে দেশরক্ষণরূপ একটি প্রধান বিষয়ে ডোমিনিয়নগুলি অপেক্ষা কম ক্ষমতা দিয়াছে। টাকার জোর থাকিলে দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে স্থলসৈন্য, আকাশসৈন্য এবং সামুদ্রিক যুদ্ধবল বাড়াইতে পারে—সীমা কেবল আন্তর্জাতিক চুক্তি। কিন্তু আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্ ব্রিটেনের অনুমতি ব্যতিরেকে জলস্থলআকাশে, আত্মরক্ষার্থেও, নিজের যুদ্ধশক্তি বাড়াইতে পারে না। ভারতীয় স্বাধীনতালিপ্সু ব্যক্তিদের ইহা হইতে কিছু শিখিবার আছে—চিন্তার খোরাক যে ইহাতে আছে তাহাতে ত সন্দেহ নাই। ডোমিনিয়ন-অবস্থা বলিতে আমরা সচরাচর মনে করি, কানাডার মত রাষ্ট্রীয় অধিকার। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে নামে ডোমিনিয়ন বলিয়া যদিই বা স্বীকার করে, তাহা হইলেও বস্তুতঃ যে ভারতবর্ষ কানাডার মত ক্ষমতা সব বিষয়ে পাইবে তাহার প্রমাণ কি? কীথ সাহেবের যে-সব কথা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট হয়, যে, নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড নামে ডোমিনিয়ন হইলেও কোন কোন বিষয়ে তাহার অধিকার অন্যান্য ডোমিনিয়নগুলি অপেক্ষা কম। আয়ার্ল্যাণ্ডের ফ্রী ষ্টেট্ নামে ফ্রী অর্থাৎ অধীনতা-পাশমুক্ত বা স্বাধীন হইলেও বস্তুতঃ কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়ন অপেক্ষা একটি গুরুতর বিষয়ে উহা নিকৃষ্ট। মিশর দেশ নামে স্বাধীন হইলেও তাহার ক্ষমতা ও অধিকার কানাডা প্রভৃতি অপেক্ষা কম। অতএব, যাঁহারা ডোমিনিয়ন-অবস্থার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা যাহাতে নামসার ভুও একটি জিনিষের দ্বারা প্রতারিত না হন, তজ্জন্য তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাঁহারা পূর্ণস্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারাও দেখিবেন যেন মিশরের মত স্বাধীনতা তাঁহাদের কপালে না জুটে। বস্তুতঃ, আমরা যাহার যোগ্য, তাহা অপেক্ষা বেশী বা কম কিছু পাইব না। এই যোগ্যতা সাইমন কমিশন বা অন্য কোন ইংরেজসমষ্টিদ্বারা নির্ণীত যোগ্যতা নহে। আমরা নিজেরা স্বাধীন হইবার জন্য ও দেশের সমুদয় লোককে স্বাধীন করিবার জন্য বুদ্ধিসহকৃত যত শ্রম, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখভোগ করিতে পারি, তাহার দ্বারা ঐ যোগ্যতা তিনি নির্দ্ধারণ করিবেন যাঁহাকে ঠকান যায় না। সভ্য মানবজীবনের জন্য আবশ্যক সব রকম কাজ স্বাধীন ভাবে আমরা করিতে সমর্থ কিনা তাহা তিনি স্থির করিবেন যাঁহাকে ঠকান যায় না। সেবার দ্বারা, সাহসের দ্বারা দেশকে নিজের করিতে আমরা সমর্থ কি না, তাহা তিনি দেখিতেছেন যিনি কখনও নিদ্রালস হন না। তাঁহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সাইমন কমিশনের রিপোর্টকে ভয় করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধ্যাপক কীথ বলেন :—

"British India, together with the Indian or native states, is destined to hold the position of a Dominion, and is an independent member of the League of Nations."

তাৎপর্য্য। "দেশী রাজ্যগুলিসমেত ব্রিটিশশাসিত ভারত ডোমিনিয়ন-মর্য্যাদা লাভ ও ভোগ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ইহা লীগ অব নেশ্যন্সের অন্যতম স্বতন্ত্র সভ্য।"

ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন-মর্য্যাদা দিবার জন্য বিধাতা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন, না ইংরেজ জাতি রাখিয়াছে, অধ্যাপক কীথ তাহা বলেন নাই।

ভারতবর্ষ, ডোমিনিয়নসমূহ ও ব্রিটেন

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, ডোমিনিয়ন-অবস্থা ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, পূর্ণ স্বাধীনতাই চরম লক্ষ্য হইবার যোগ্য। অনেকে বলেন, নিঃসঙ্গ স্বাধীনতা (isolated independence) নিরাপদ আদর্শ নহে, ভাল আদর্শও নহে। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের জন্য সৃষ্টিছাড়া রকমের কোন স্বাধীনতা চাহিতেছি না। ফ্রান্স জাপান ব্রিটেন প্রভৃতির স্বাধীনতা যেমন নিঃসঙ্গ নহে, আমরা ভারতবর্ষের জন্যও সেইরূপ সঙ্গিবন্ধুযুক্ত অবস্থা চাহিতেছি। এইরূপ একটি যুক্তি শুনিয়াছি, যে, পৃথিবীতে যখন একা থাকা যায় না, একা থাকা বিপৎসঙ্কুল, কাহারও না কাহারও সঙ্গে মিত্রতা করিতেই হইবে, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত থাকিতে ও তাহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ব্রিটেন ভারতবর্ষকে বন্ধুরূপে চায় না, দাসরূপে চায়; ব্রিটেন ভারতবর্ষকে দোহন করিবার কামধেনুরূপে চায়। তাহা আমরা ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর ও সম্মানজনক মনে করি না। ডোমিনিয়নগুলির ভারতবর্ষের প্রতি ব্যবহার এক দিক দিয়া ব্রিটেনের চেয়েও খারাপ। যে-কোন ভারতীয় অবাধে ইংলণ্ড যাতায়াত করিতে ও তথায় বসবাস বা সাধ্যমত জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা কানাডা প্রভৃতিতে ভারতীয়দের সে অধিকার নাই। যদি কখনও ভারতবর্ষকে ব্রিটেন ও তাহার ডোমিনিয়নগুলি সমশ্রেণীস্থ বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে, তখন আলোচ্য তর্ক কতকটা সঙ্গত হইবে, এখন নহে।

কিন্তু তখনও ঐ যুক্তিতে খুঁৎ থাকিবে। স্বাধীন দেশগুলি কাহারও না কাহারও সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকে বটে; কিন্তু কোন জাতিরই সহিত চিরকাল সংলগ্ন থাকিতে বাধ্য থাকে না। সব স্বাধীন জাতিই নিজের সুবিধা বুঝিয়া আবশ্যকমত পুরাতন মিত্রজাতির স্থানে নূতন মিত্র-জাতির সহিত সন্ধি করে। ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা এই, যে, ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ক্ষতিকর হইলেও তাহা ছেদন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই; অন্য কোন জাতির সহিত মৈত্রী হিতকর হইলেও তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার উপায় নাই। অধিকন্তু, কোন জাতি যদি ব্রিটেনের শত্রু বিবেচিত হয় অথচ বস্তুতঃ ভারতবর্ষের শত্রু না হয়, তথাপি ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সঙ্গে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে পারে। ইহা কল্পিত অবস্থা নহে। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে এরূপ ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে। যে শত্রু নহে, অন্যের প্রয়োজনে এইরূপে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়া কেবল ক্ষতিকর নহে, ইহা মহা অধর্ম্ম এবং অত্যন্ত অপমানকর। এই ধর্ম্মহানিকর, অপমানজনক ও ক্ষতিকর অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন সহজ উপায় নাই, স্বীকার্য্য। কিন্তু আমরা অগত্যা যে-অবস্থায় আছি, তাহাকে যত মহিমান্বিতই করা যাক্, তাহা আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। এই মন্তব্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, যে, ডোমিনিয়নগুলিও ব্রিটেনের শত্রুর সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে না, ব্রিটেনের সহিত কাহারও যুদ্ধ বাধিলে ব্রিটেনকে সাহায্য করিতে বাধ্য না হইলেও নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না, ব্রিটেনের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতিরেকে শান্তি স্থাপন বা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে না। বস্তুতঃ ব্রিটেনের সহিত কোন দেশের যুদ্ধ বাধিলে ডোমিনিয়ন-গুলি থিওরিতে ব্রিটেনকে সাহায্য করিতে বাধ্য না থাকিলেও কার্য্যতঃ বাধ্য হইবারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ, কোন ডোমিনিয়নেরই ব্রিটেনের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং যদি কোন ডোমিনিয়ন বলে, "আমরা ব্রিটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করিব না," ব্রিটেনও তৎক্ষণাৎ বলিতে পারে, "তোমাদের বিপদের সময় আমরাও তোমাদের সাহায্য করিব না।" তখন সেই ডোমিনিয়নের চৈতন্যের উদ্রেক হইতে পারে। ব্রিটেন যদি অষ্ট্রেলিয়ার সাহায্য না করে, তাহা হইলে জাপানের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া দখল করা মোটেই কঠিন হইবে না। কানাডাও ব্রিটেনের সাহায্য না পাইলে জাপান কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে পারে। অন্য সব ডোমিনিয়নের অবস্থাও এইরূপ।

অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করা অস্বাভাবিক ও অপমানকর নহে; কারণ ঐসব ডোমিনিয়নের অধিকাংশ লোক ব্রিটিশবংশজাত। কানাডার পক্ষেও ইহা সম্পূর্ণ আস্বাভাবিক বা অপমানকর নহে। কারণ তথাকার কয়েক লক্ষ আদিম আমেরিকান চীনা জাপানী প্রভৃতি বাদ দিলে, বাকী অধিকাংশ লোক ইউরোপীয়-বংশোদ্ভূত। ১৯২১ সালের সেন্সাস্ অনুসারে কানাডার মোট ৮৭,৮৮,৪৮৩ জন অধিবাসীর মধ্যে ৪৮,-২৬,৯৫০ জন ইংরেজীভাষী ও ২৪,৫২,৭৫১ ফ্রেঞ্চভাষী। বাকী লোকদের মধ্যে জার্ম্যান বলে ২,৯৪,৬৮৬ জন; ডচ্ ১,১৭,৫০৬, নানা আদি আমেরিকান ভাষা ১,১০,৮১৪; অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্যান) ১,০৭, ৬৭১; উক্রেনিয়ান ১,০৬,৭২১; রুশীয় ১,০০,০৬৪; নরুইজিয়ান ৬৮,৮৫৬; ইতালিয়ান ৬৬,৭৬৯; সুইডিশ ৬১,৫০৩; চৈনিক ৩৯,৫৮৭; জাপানী ১৫৮৬৮; অন্যান্য ২,৯২,৫৯১। ১,২৬,১৯৬ জন ইহুদীর মধ্যে কত জন কি ভাষায় কথা বলে, জানা নাই। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ লোক ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যোদ্ভূত এবং বাকী অধিকাংশও ইউরোপীয়। সুতরাং কানাডার প্রায় সব লোকদের একটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত থাকিতে তত আপত্তি হইবার কারণ নাই, যত আপত্তি কোন প্রাচ্য জাতির হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার শতকরা ২২জন অধিবাসী ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত। এই শেষোক্তদের মধ্যে শতকরা ৬০জনের মাতৃভাষা ডচ্। কিন্তু অর্দ্ধেক ইউরোপীয় ইংরেজী ও ডচ্ দুই বলিতে পারে, সিকি কেবল ইংরেজী বলে, সিকির চেয়ে কম কেবল ডচ্ বলে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা শতকরা ২২জন হইলেও সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাহাদের হাতে। সুতরাং একটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত থাকা তাহাদের স্বার্থবিরোধী নহে। তবুও ইউরোপীয়দের শতকরা ষাটজন ডচ্ বলিয়া তাহারা বলে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সহিত যোগ রাখা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন, উহা কখনও তাহাদের স্বার্থবিরোধী হইলে তাহারা ব্রিটিশ-সম্পর্ক ত্যাগ করিতে অধিকারী এবং ত্যাগ করিবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রত্যেক নয় জনের মধ্যে ছয় জন কৃষ্ণকায়, দুই জন শ্বেতকায়, একজন এসিয়াটিক বা মিশ্রজাতীয়। কৃষ্ণকায়েরা চিরদিন অশিক্ষিত অনগ্রসর, অদলবদ্ধ, দুর্ব্বল থাকিবে না। 'এসা দিন নাহি রহেগা'। যখন তাহাদের শুভ দিন আসিবে, তখন তাহারা শ্বেতদের ল্যাজে বাঁধা থাকিতে চাহিবে না বলিয়াই মনে হয়।

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য: কি অর্থে ব্রিটিশ

ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আনুমানিক ৪৫ কোটি লোকের মধ্যে ৩২ কোটি ভারতের অধিবাসী।

এই সাম্রাজ্যের প্রায় পাঁচ কোটি লোক ইংরেজীভাষী। ভারতবর্ষের প্রায় দশ কোটি লোক হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে, পাঁচ কোটি লোক বাংলায় কথা বলে। শিক্ষিত উৎকলীয়, শিক্ষিত আসামী এবং অনেক শিক্ষিত বিহারী বাংলা বলেন। তাঁহাদিগকে ধরিলে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছয় কোটির কম হইবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ৪৫ কোটি লোকের মধ্যে আনুমানিক ছয় কোটি শ্বেতকায়। অশ্বেতকায়দের সংখ্যা তাহার ছয় গুণ। অশ্বেতকায় ভারতীয়দের সংখ্যাই ৩২ কোটি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বাইশ কোটি হিন্দু, দশ কোটি মুসলমান, আট কোটি খৃষ্টিয়ান, এক কোটি কুড়ি লক্ষ বৌদ্ধ, এক কোটি কুড়ি লক্ষ আদিমধর্ম্মাবলম্বী, চল্লিশ লক্ষ শিখ জৈন পারসী, সাড়ে সাত লক্ষ ইহুদী ইত্যাদি।

অতএব ইহার অধিকাংশ অধিবাসীর বাসস্থান, জাতি (race), মাতৃভাষা, গায়ের রং, বা ধর্ম্ম, যাহাই ধরা যাক্, কোন দিক্ দিয়াই ইহাকে **ব্রিটিশ** সাম্রাজ্য বলা সঙ্গত নহে। ইহাকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বা শ্বেত সাম্রাজ্য বলাও সঙ্গত হইবে না। বাসস্থান, জাতি, মাতৃভাষা, গায়ের রং, ধর্ম্ম-প্রত্যেক ও সমুদয় দিক্ দিয়া বরং ইহাকে ভারতীয় সাম্রাজ্য বলা অধিকতর সঙ্গত। বাসস্থান প্রভৃতি কোন্ দফা ধরিলে ইহার কি নাম সঙ্গত হয়, তাহা পাঠকেরা অনায়াসেই স্থির করিতে পারিবেন। কেবল একটি কারণে ইহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলা হয়। তাহা এই, যে, ব্রিটিশরা এই

সাম্রাজ্যে প্রভুত্বশক্তিবিশিষ্ট। এই প্রভুত্ব-শক্তির উদ্ভব যে-প্রকারেই হইয়া থাকুক, এখন ইহা ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর রূপে পাশব বলের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইতেছে। সুতরাং যদি কেহ বিশ্বাস করেন, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামক ভূভাগ-সমষ্টি ও মানব-সমষ্টি চিরকাল এইরূপ সমষ্টিই থাকিবে এবং ইহার ব্রিটিশ নামও কায়েম এবং সুসঙ্গত থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে, যে, পাশব বলের আধিক্যই প্রধান শক্তি, পাশব বলের প্রাধান্যই চিরন্তন প্রাধান্য, এবং ব্রিটিশ জাতির পাশব বল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব জাতির চেয়ে চিরকাল বেশী থাকিবে। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ নহে। সুতরাং আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্বে বা দীর্ঘকাল স্থায়িত্বে এবং ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের অচ্ছেদ্য ভবিষ্যৎ চিরন্তন সম্বন্ধে বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষের বত্রিশ কোটি লোক চিরকাল ব্রিটেনের সাড়ে চারিকোটি বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছয় কোটি শ্বেত লোকের চেয়ে দুর্ব্বল থাকিবে, ইহা বিধাতার অভিপ্রায় বলিয়া বিশ্বাস করি না। ইউরোপের অনেক ছোট ছোট জাতির স্বাধীন হইবার সুযোগ যিনি গত পনের বৎসরের মধ্যে করিয়া দিয়াছেন, তিনি বৃহৎ ভারতীয় জাতির স্বাধীন হইবার সুযোগ করিয়া দিতে পারেন না বা দিবেন না, বিশ্বাস করি না। অবশ্য, ভারতীয়দের প্রকৃত, আন্তরিক স্বাধীনতাপ্রিয়তা জন্মিলে তবে সুযোগ আসিবে। এরূপ স্বাধীনতাপ্রিয়তার উদ্ভব অসম্ভব নহে। এইজন্য আমরা স্বাধীনতালাভের আশা পোষণ করি।

এরূপ কথা উঠিতে পারে, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে ব্রিটেনে অনুসৃত নীতি অনুসারে সকল কাজ হয় বলিয়া সাম্রাজ্যটির নাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। কিন্তু ইহা কেবল উহার শ্বেত অধিবাসীদের পক্ষেই খাটে। রাষ্ট্রীয় কার্য্যে ব্রিটিশ নীতির দুটি প্রধান অঙ্গ এই, যে, দেশের লোকদের সম্মতি অনুসারে দেশের কাজ নির্ব্বাহিত হইবে, ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধিদের মত অনুসারে ভিন্ন ট্যাক্স ধার্য্য হইতে পারিবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোনও অংশের অশ্বেত লোকদের সম্মতি অনুসারেই তাহাদের দেশ শাসিত হয় না, তাহাদের প্রতিনিধিদের মত অনুসারেই তাহাদের উপর ট্যাক্স স্থাপিত হয় না; এবং অশ্বেত লোকদেরই সংখ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বেশী।

আমরা যাহাকে ব্রিটিশ জাতির পাশব বল বলিয়াছি, তাহা সংক্ষিপ্ত নাম মাত্র। উহা সর্ব্বৈব পাশব বা জড়ীয় নহে। মানসিক শক্তি, চারিত্রিক কোন কোন গুণের বল, বিজ্ঞানবল এবং যন্ত্রবলও উহার অন্তর্ভূত। কিন্তু শক্তির এই সকল উৎস চিরকাল আমাদের অনধিগত এবং ব্রিটিশ জাতির একচেটিয়া থাকিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা এবং উদ্যোগ থাকিলে আমাদেরও অভ্যুদয় অনিবার্য্য।

আমরা অব্রিটিশ হইলেও চিরকাল কাজে বা নামে ব্রিটিশ রাজার প্রজা থাকিব, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পৌর অধিকারের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বা তাহা লাভের পর তাহার অহঙ্কার করিয়া অপমানিত হইব, এরূপ কল্পনা করিতে মাথা হেঁট হয়।

এই সব কারণে আমরা ডোমিনিয়ন-অবস্থাকে ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু ডোমিনিয়ন-অবস্থা অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক দলের নিম্নতম দাবী বলিয়া, আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অপেক্ষা উহা স্বাধীনতালাভের অধিক অনুকূল হইতে পারে বলিয়া, এবং বিনা যুদ্ধে ও বিনা বিপ্লবে পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা ডোমিনিয়নত্ব লাভ অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া আমরা ভারতকে ডোমিনিয়ন করিবার চেষ্টার বিরোধী নহি। কিন্তু ডোমিনিয়নত্ব প্রাপ্তি ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তি যে যে দলের লক্ষ্য, তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ আমরা পছন্দ করি না, তাহা অনিবার্য্যও মনে করি না। সকল দলেরই যাঁহারা নিজেদের প্রাধান্য চাহেন না, কেবল ভারতের হিত চান, তাঁহারা ঝগড়া বিবাদ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।

—

ব্রিটিশ সম্পর্কের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

ভারতবর্ষে শিশু বিবাহের, প্রকৃতপক্ষে-কুমারী শিশুর বৈধব্যের, তিথিবিশেষে ফলমূলবিশেষ ভক্ষণের

বা বর্জ্জনের, টিকির এবং হাঁচিটিক্‌টিকিরও যখন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়, তখন ব্রিটেনের সহিত ভারতের সম্বন্ধের তথাকথিত অচ্ছেদনীয়তারও যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ একটি ব্যাখ্যা নামজাদা উদারনৈতিক শ্রীযুক্ত কে. নটরাজন্‌ তৎসম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল কাগজে ৭ই নবেম্বর দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

The late Mr. C. R. Das, in a moment of inspiration, spoke of freedom within the British Commonwealth as being spiritually a higher ideal than the goal of independence. He did not explain his meaning but it has a very full and real meaning. It is a higher spiritual ideal to transform the conditions, however adverse, in which a people finds itself into opportunities for self-realisation and self-development, than to run away from them in the hope, which may or may not be fulfilled, of lighting upon others which would be wholly different and agreeable. The "Independence" school of thought is entirely alien to the Indian temperament, which through immemorial centuries has established a tradition for continuity. The defects of the present system of administration are patent to all observers, and the *Indian Daily Mail* has frequently occasion to dwell on them and to insist on their rectification. But what is not so obvious to the newer generation of politicians, is the great work of emancipation which British rule has been the means of accomplishing, consciously and unconsciously. The severance of the connection which has been so fruitful of good, notwithstanding the evils which have come in its train, is not in the best interests of the country, and the assertion of the All-India Congress Committee to the contrary will find little response in the hearts of the people of India.

তাৎপর্য্য। "পরলোকগত মিঃ চিত্তরঞ্জন দাশ, একদা অনুপ্রাণনা বা ভগবৎপ্রেরণার মুহূর্ত্তে, ব্রিটিশ "সাধারণ-তন্ত্রের" অন্তর্গত থাকিয়া মুক্ত অবস্থাকে স্বাধীনতা অপেক্ষা উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু তাহার খুব পূর্ণ ও প্রকৃত অর্থ আছে। কোন জাতি যতই প্রতিকূল অবস্থানিচয়ের মধ্যে আপনাদিগকে অবস্থিত দেখুক না, সেই অবস্থানিচয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া তৎসমুদায়কে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের সুযোগে পরিণত করা, সেইসব প্রতিকূল অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং সুখকর অন্য অবস্থানিচয়ে উপনীত হইবার যে আশা পূর্ণ হইতে পারে বা না পারে তদ্রূপ আশায় সেইসব প্রতিকূল অবস্থানিচয় হইতে পলায়ন অপেক্ষা উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ। "স্বাধীনতা"বাদীদের চিন্তার ধারা ভারতীয় প্রকৃতির সহিত সম্পর্কশূন্য—কারণ ভারতীয় প্রকৃতি স্মরণাতীত যুগ হইতে পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকতা রক্ষার একটি লোকপরম্পরাগত প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির দোষ-ত্রুটি সকল পর্য্যবেক্ষকের নিকটই সুস্পষ্ট ; ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল বার বার তাহাদের বর্ণনা করিয়া তাহাদের সংশোধনের উপর জোর দিয়া কলম চালাইয়া থাকে। কিন্তু নবীন দলের রাজনৈতিকদের কাছে যাহা তেমন স্পষ্ট নহে, তাহা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ শাসন কর্ত্তৃক সম্পন্ন বন্ধনমোচনের মহৎ কার্য্য। (ব্রিটেনের সহিত) যে-সম্বন্ধ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগত অমঙ্গল সত্ত্বেও, এত শুভফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহার ছেদন দেশের পক্ষে হিতকর হইবে না, এবং সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এতদ্বিপরীত উক্তিতে ভারতবর্ষের লোকদের হৃদয় সাড়া দিবে না।"

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া মুক্তি সম্বন্ধে কি অর্থে কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মনে নাই। তিনি কি বলিয়াছিলেন, খোঁজ করিলে তাহা বাহির করা যায় ; কিন্তু তিনি যখন নিজের উক্তির ব্যাখ্যা করেন নাই এবং তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই, তখন তর্কের মধ্যে তাঁহাকে টানিয়া না আনিয়া ব্যাখ্যাটির জন্য মিঃ নটরাজন্‌-কেই দায়ী করা সঙ্গত।

ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনতা ও পরাধীনতা উভয়ের মধ্যে কেবল পরাধীনতার সঙ্গেই স্মরণাতীত কাল হইতে ধারাবাহিকতা বা অন্বয় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ইহা সত্য নহে। ইতিহাস বরং ইহাই বলে, যে, ভারতীয়েরা যত বার পড়িয়াছে, ততবার উঠিয়াছে। তাহার সমর্থক দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে পরে দিতেছি।

প্রথম বিচার্য্য এই, যে, প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থাকে, পরাধীনতাকে, আত্মবিকাশের অনুকূল করিবার চেষ্টা সুবুদ্ধির পরিচায়ক, না স্বাধীনতা লাভ দ্বারা আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের চেষ্টা করা সমীচীন ? বৃথা কথা কাটাকাটি না করিয়া ইতিহাসের সাক্ষ্য লওয়া যাক্‌। পৃথিবীর কোন জাতি পরাধীনতারূপ প্রতিকূল অবস্থাকে

আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের অনুকূল করিতে পারে নাই, তাহা করিবার চেষ্টাও করে নাই। যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে, তাহারাই পরাধীনতার পাশ ছেদন করিয়া স্বাধীন হইয়াছে। আমেরিকা ইংলণ্ডের শিকল কাটিয়াছে, গ্রীস বুলগেরিয়া রুমেনিয়া প্রভৃতি তুরস্কের শিকল কাটিয়াছে; অষ্ট্রিয়ার শিকল ইটালী ছেদন করিয়াছে। ইংলণ্ডকে নর্ম্যাণ্ডীর শিকল কাটিতে হয় নাই, কারণ নর্ম্মান রাজারা নর্ম্ম্যাণ্ডীর রাজা থাকিয়া ইংলণ্ডেরই নিজস্ব রাজা হইয়া যান। দক্ষিণ আমেরিকার দশটি দেশ এক সময়ে স্পেনের অধীন ছিল। পরে তাহারা স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হইয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বত্র এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তাহা হইলে, পরাধীনতাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা গিল্‌টি করিবার মহৎ অবদান বিধাতা কি ভারতবর্ষের জন্যই রাখিয়া দিয়াছেন?

ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যে, ভারতবর্ষ বহুবার বহু বিদেশী জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এত বার আক্রান্ত হওয়া ভারতবর্ষের মত প্রাচীন-সভ্যতাবিশিষ্ট, সম্পৎশালী ও বৃহৎ দেশের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। ইংলণ্ডের মত ছোট দেশ ইহার অপেক্ষাকৃত অল্প-কালস্থায়ী ইতিহাসের মধ্যেই কত বিদেশী জাতির দ্বারা আক্রান্ত উপদ্রুত ও শৃঙ্খলিত হইয়াছে। ইংরেজেরা স্বাধীন ও কৌশলী বলিয়া নিজেদের ইতিহাস লেখে, পরাধীনতার কথা বাদ দিয়া বা চাপা দিয়া কিম্বা মাত্র দু-চার কথায় তাহার উল্লেখ করিয়া। অন্যদিকে আমাদের ইতিহাস ইংরেজেরা এমন করিয়া লেখে যেন পরাজিত হওয়া ও থাকাই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বাধীন হওয়া ও থাকা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মিঃ নটরাজন্ সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ইংরেজদের এই মত দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশ প্রাচীনকালে এক সময় পারস্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষার অনুরোধে ঐ অংশের লোকেরা পরাধীনই থাকিয়া যায় নাই, স্বাধীন হইয়াছিল। উত্তরপশ্চিমের কিয়দংশ একদা গ্রীকদেরও অধিকৃত হয়। কিন্তু তাহারাও ভারতীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হয়। শক, হূন, পারদ, তাতার প্রভৃতি নানা নামধারী বিদেশীদের আক্রমণ ও শাসন ভারতবর্ষের কোন কোন অংশকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরাধীন অবস্থায় কোন অংশই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহাকে আত্মোপলব্ধির ও আত্মবিকাশের অনুকূল করিবার চেষ্টা কেহ করে নাই। তাহারা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল কিম্বা পরাস্ত করিয়া হৃতবল করিয়াছিল। পাঠান-মোগলের শাসনও স্থায়ী হয় নাই। একদিকে মরাঠারা, অন্য দিকে শিখেরা তাহার উচ্ছেদ সাধন করে।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে এই যে শত্রুজয় শত্রু-বিতাড়ন চলিয়া আসিতেছে, পরাধীনতাকে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের অনুকূল করিবার বৃথা চেষ্টা করা হয় নাই, হইতে পারে, যে, তাহার কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মিঃ নটরাজনের মত বিজ্ঞ লোক ছিল না। কিন্তু এই সব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, যে, ভারতীয় ধাতু বা প্রকৃতি পরাধীনতাকে সহ্য করিয়া তাহাকেই আত্মোপলব্ধি আদির অনুকূল করিবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, নটরাজন্ ভারত-বর্ষের ইতিহাসের ও ভারতীয় মানবপ্রকৃতির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বাধীনতাবাদীদের চিন্তার ধারা ভারতীয় মানবপ্রকৃতির কাছে বিজাতীয় নহে।

মানুষ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে, সে-অবস্থার বিলোপ সাধন করিয়া অনুকূল অবস্থা আনা যায় কি না, সুস্থ-প্রকৃতির মানুষ তাহাই বিচার করে এবং তদ্রূপ চেষ্টা করে। অবশ্য যদি প্রতিকূল অবস্থা অপ্রতিবিধেয় হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যেই নিজের যতটা সুবিধা সম্ভব তাহার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। মনে করুন, কাহারও একটা পায়ে আঘাত লাগিয়া তাহা আপাততঃ অকেজো হইয়াছে। সে-অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রথমেই চিরকালের নিমিত্ত এক পায়ে হাঁটিবার ও দৌড়াইবার বুদ্ধি আঁটে না,—চির-কাল খোঁড়া থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় না। প্রথমে আঘাতপ্রাপ্ত পা-টার চিকিৎসা করায়, যদি চিকিৎসা বিফল হয়, তবে তখন অগত্যা তাহাকে এক পায়েই কাজ চালাইবার উপায় চিন্তা করিতে হয়। পরাধীনতা অপ্রতিবিধেয় নহে; ইতিহাস—ভারতবর্ষেরও ইতিহাস—তাহার সাক্ষ্য দেয়।

পরাধীনতা যত মৃদু রকমেরই হউক, তাহা কখনও পূর্ণ আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের পক্ষে স্বাধীনতার মত ফলদায়ক হয় নাই, হইতে পারে না।—সাক্ষী জগতের অতীত ও সমসাময়িক ইতিহাস। পরাধীনতা সহ্য করিয়া তাহাকেই কতকটা অনুকূল করিবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্বাধীনতালাভচেষ্টা অপেক্ষা বেশী পৌরুষ, সাহস বা আধ্যাত্মিকতা, কিছুই নাই।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের কিছু হিত হইয়াছে স্বীকার্য্য, কিন্তু হিত বেশী না অহিত বেশী হইয়াছে স্থির করা কঠিন। হিত যাহা হইয়াছে, তাহারই উপর দৃষ্টি রাখিয়া ব্রিটিশ রাজত্বকে রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বলিয়াছেন। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। কিন্তু কোন সময়ে কোন অবস্থায় কোন ব্যবস্থা হিতকর বোধে বিধাতার বিধান বলিয়া মানিলেই তাহা চিরকালের জন্য বিধির বিধান মনে করিবার কারণ নাই। রামমোহন রায় এখন বাঁচিয়া থাকিলে ব্রিটিশ অধীনতাকে বিধাতার বিধান নিশ্চয়ই বলিতেন না। পতন বা অন্য কোন কারণে কাহারও হাত-পা-পাঁজরার হাড় ভগ্ন স্থানচ্যুতাদি হইলে তাহার চলাফিরা বন্ধ করিয়া ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থিগুলিকে স্বস্থানে রাখিবার ও জোড়া দিবার জন্য নানাপ্রকার বন্ধনের দরকার হইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা তাৎকালিক বিধির বিধান মনে করিলে দোষ হয় না। কিন্তু এই বন্ধন মানুষটির জীবনব্যাপী করা বিধাতার অভিপ্রেত বলা যায় না। রোগবিশেষে কুচিলার বিষ, সেঁকো বিষ, গোখুরা সাপের বিষ প্রয়োগ বৈধ। তখন তাহাই বিধাতার বিধান। কিন্তু অন্য অবস্থাতেও মানুষকে বিষ খাওয়ান বিধাতার বিধান নহে।

ইংরেজ রাজত্বের একটি ফলের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেশশাসনের এবং বাণিজ্যের দ্বারা ধন আহরণের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে, যাহার দ্বারা ভারতীয়দের ঐক্য ও জাতীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে। যদিও আমাদের ঐক্য ও জাতীয়তা বর্দ্ধন কোন কালেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত ছিল না, তথাপি এইরূপ শুভ ফল ও তাহার পরোক্ষ সংসাধক ব্রিটিশ শাসন বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসীরা মনে করিতে পারেন। তাহা তাঁহাদের ভ্রম নহে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ শাসনের গতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির (caste এর) মধ্যে, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মধ্যে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের মধ্যে, কৃষক এবং অকৃষকের মধ্যে, রায়ৎ ও জমিদারের মধ্যে, পল্লীগ্রামবাসী ও নগরবাসীর মধ্যে, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এবং দেশী রাজ্যসমূহ ও ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের মধ্যে অনৈক্য অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের দিকে চলিয়াছে। অতএব ব্রিটিশ রাজত্বের এই দিক্‌টা বিধাতার অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

ব্রিটিশ রাজত্বে কিছু কিছু বন্ধন মোচন হইয়াছে বলিয়া তাহার নানা কুফল সত্ত্বেও আরও বন্ধন মোচনের আশায় ব্রিটিশ-সম্পর্ক আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কোন কারণ নাই। কেননা, অন্যান্য দেশে, প্রাচ্য দেশেও, এক দিনের জন্যও ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও, জীবনের সকল বিভাগে মুক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; সুতরাং ব্রিটিশশৃঙ্খল ব্যতীত ভারতবর্ষেও তাহা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, অতীতে এ পর্য্যন্ত ইংরেজরাজত্ব আমাদের হাতে পায়ে যত বেড়ি পরাইয়াছে, তার চেয়ে বেশী বেড়ি ভাঙিয়াছে, তাহা হইলেও ভবিষ্যতেও যে বেড়ি পরাণ অপেক্ষা বেড়ি ভাঙার কাজ তাহার দ্বারা বেশী হইবে, তাহার প্রমাণ কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও কি সম্পূর্ণ স্বাবলম্বন দ্বারা আমরা এশিয়ার স্বাধীন জাতিদের মত কিছু করিতে পারি কি না, চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত নয়?

মিঃ নটরাজন বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রতিকূল পরাধীন অবস্থার পরিবর্ত্তে সুখকর অনুকূল ভিন্ন রকমের অবস্থায় উপনীত হইবার আশা সফল হইতে পারে, না হইতেও পারে। কিন্তু বুদ্ধি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য যে অনুকূল অবস্থায় উপনীত হইবার আশা সমর্থন করে, তাহার আশার অনুবর্ত্তন করাই

উচিত। কতকটা অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ না দিলে শ্রেয় লাভ হয় না। অনিশ্চিতের ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকা কাপুরুষতা। ফল কি হইবে, নিশ্চিত না জানিয়াও শ্রেয়ের অভিমুখে বিপৎসঙ্কুল পথে চলায় আর কিছু না থাক্ মনুষ্যত্ব আছে। বর্ত্তমান প্রতিকূল পরাধীনতার অবস্থায় ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে, তাহাও ত অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চিত জিনিষটা বেশীর ভাগ শুভই হইবে, তাহার প্রমাণ কি ?

ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বকালবর্ত্তী যে যে রাজত্বকে ভারতবর্ষের অধীনতা বলা হয় তাহাদের সহিত ইংরেজ রাজত্বের একটি প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আগেকার যে-সব রাজবংশ বিদেশাগত ছিল তাহারাও ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষেই তাহারা বাস করিত। ভারতবর্ষ হইতে ধন ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া কোন বিদেশকে সমৃদ্ধিশালী, শক্তিশালী করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরেজ রাজত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাহাদের রাজারাণী রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষকে স্থায়ী বাসভূমি করে নাই, করিবে না। বিদেশী এক আধ জন মানুষের পক্ষে অন্য কোন দেশের জন্য জন্মভূমির সমান তার চেয়েও বেশী হিতচেষ্টা ও শ্রম করা অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু কোন জাতি বা তাহার কোন ক্ষুদ্রতর লোকসমষ্টি কখনই অন্য কোন দেশের নিমিত্ত স্বদেশের মত হিতচেষ্টা করিতে পারে না। বিদেশ তাহাদের পক্ষে প্রধানতঃ ধন ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ক্ষেত্র মাত্র। ভারতের প্রভু ইংরেজেরা এই প্রকারের মানুষ। তাহাদের সহিত শাসক শাসিত সম্পর্কের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা আমরা স্বীকার করি না। তাহাদের নিকট হইতে বেতন দিয়া কিছু শিখিবার বা কাজ লইবার আবশ্যক হইতে পারে। তাহার বন্দোবস্ত জাপানীরা যেরূপ করে, সেইরূপ করিলেই চলিতে পারে।

—

স্বাধীনতা লাভের উপায়

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাধীনতা লাভের উপায় আমরা জানি না কিন্তু স্বাধীনতা থাকিলে তাহা রক্ষা করিতে হইলে দেশের যে অবস্থা থাকা উচিত, সেই অবস্থা দেশে আনিতে পারিলে, আনিবার অবিরাম চেষ্টা করিতে পারিলে, হয়ত স্বাধীনতা লাভের উপায়ও জানিতে পারা যাইবে।

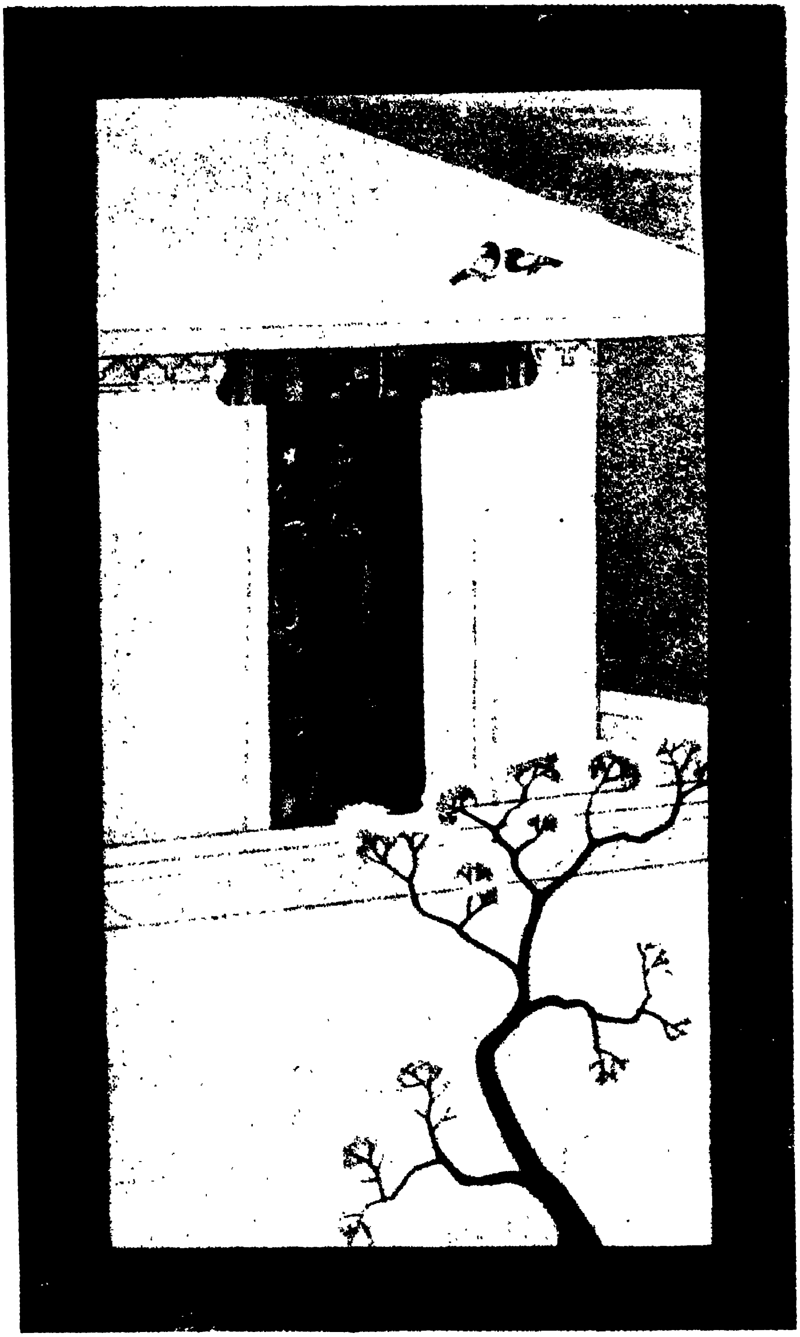
দেশের কিরূপ অবস্থা হইলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, স্বাধীন দেশগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা কতকট বুঝা যায়।

অধিকাংশ স্বাধীন দেশে শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশের চেয়ে ভাল। আফগানিস্থান প্রভৃতি এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলিও শীঘ্রই ভারতবর্ষকে শিক্ষায় পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় সকল বয়সের, সকল লোকের শিক্ষা চাই।

সামাজিক দাসত্ব যাহাদের সহ্য হয়, রাজনৈতিক দাসত্বে তাহারা অসহিষ্ণু হইতে পারে না। আমাদের দেশকে স্বাধীন করিতে ও রাখিতে হইলে পরাধানতা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে অসহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সামাজিক কুশাসনের ফলে যাহাদের মাথা হেঁট ও মেরুদণ্ড বক্র হইয়া আছে, তাহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন বা রক্ষার জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইবে কেমন করিয়া ? এইজন্য "অস্পৃশ্য", "অনাচরণীয়" "উচ্চ জাতি", "নীচ জাতি" প্রভৃতি ভেদ দূর করিতে হইবে।

প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর নিজ ইষ্ট দেবতার পূজা আরাধনা সাক্ষাৎভাবে পুরোহিতের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নতুবা সকল মানুষের সামাজিক অধিকার সমান হইবে না। পূজার্চ্চনার অধিকার পুরুষের যেমন নারীরও ঠিক তেমনি হওয়া উচিত। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে উভয়ের অধিকার সমান করা হইয়াছে।

নারীর শিক্ষা কি প্রকারের হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু সেই আলোচনার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ উদ্দেশ্য বা ফল নারীশিক্ষা বিলোপ যেন না হয়। সকল পুরুষের যেমন, সকল নারীরও তেমনি, উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া চাই। স্ত্রীলোকদের ঘাড়ে বেশী বোঝা চাপান হয় বলিয়া তাহাদের শরীর মন ভাঙিয়া পড়ে। অল্পবয়স হইতে গর্ভধারণ, সন্তান-প্রসব ও সন্তান-পালন এইরূপ



মধ্যাহ্ন-প্রতীক্ষা

শিল্পী শ্রী নন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

বোঝা। এইজন্ত বাল্য-বিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব বন্ধ করিতে হইবে। যাহাতে বালিকারা শিক্ষার যথেষ্ট সময় পায়, তাহার নিমিত্তও বাল্য-বিবাহ ও বাল্য-মাতৃত্ব দূর করিতে হইবে। নারীদের শিক্ষার সুবিধার জন্য, জগতের সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, স্বাস্থ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য, সাহস বাড়াইবার জন্য, দেশের নানা কাজে যথেষ্টসংখ্যক কর্ম্মী পাইবার জন্য, এবং সামাজিক অন্য নানাবিধ কল্যাণের জন্য স্ত্রীজাতিকে অবরোধমুক্ত করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও বৃদ্ধি এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, গ্রাম ও নগর, এবং স্বাস্থ্যকর পরিধেয় বস্ত্র চাই।

এসব অতি পুরাতন মামুলী কথা। ইহাতে হুজুক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এগুলি ভুলিয়া থাকিলে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে না, এবং, যদিই বা তাহা কোন প্রকারে পাওয়া যায়, রক্ষিত হইবে না।

—

জাতিভেদ ও জাতীয় উন্নতি

পুরাকালে ভারতবর্ষে জাতিভেদ কিরূপ ছিল, এবং তাহার দরুন আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছিল বা তাহা সত্ত্বেও বা তাহার প্রভাবে কি উন্নতি হইয়াছিল, এখন তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। পুরাকাল এখন আর নাই। জাতিভেদও এখন নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। এখন ইহা দ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। আধুনিক দেশী সংস্কারকদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা প্রথমে জাতিভেদের অনিষ্টকারিতার বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের কথায় বেশী লোকে কান দেন নাই। কিন্তু যখন সমাজসংস্কার-বিরোধী বা তদ্বিষয়ে উদাসীন অথচ রাজনৈতিক প্রগতিপ্রয়াসী লোকেরা দেখিলেন, যে, হিন্দুসমাজে অবহেলিত লোকদিগকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রগতির বিরোধীরা তাহাদের নিজের দলে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন তাঁহারাও সকল শ্রেণীর হিন্দুর সামাজিক অধিকার ও সম্মান সমান হওয়ায় অন্তত মৌখিক সম্মতি দিলেন। তাহার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম নহেন এরূপ অনেক রাজনৈতিক কর্ম্মী অনগ্রসর জাতিদের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছিলেন। আর্য্যসমাজ ও অন্যান্য কোন কোন সমাজের লোকেরা এই প্রকার লোকহিতচেষ্টা আগ্রহের সহিত করিয়াছেন।

জাতিভেদের কুফল দেখিয়া বিদেশী লোকেরাও এ বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপানের রাজধানী টোকিও হইতে ইয়ং ইষ্ট্ বা তরুণ প্রাচ্য নামক একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়। ইহা জাপানী বৌদ্ধদের মুখপত্র, বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক তাকাকুসু ইহার সম্পাদক। ইহা ওসাকা মাইনিচি নামক জাপানী খবরের কাগজ হইতে নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি ভারতীয় পাঠকদিগের বিবেচনার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছে। বাংলায় তাৎপর্য্য দিতেছি। মূল ইংরেজী মডার্ণ রিভিউ ও ওয়েলফেয়ারে দিয়াছি।

"সাতান্ন বৎসর আগে ২৮শে আগষ্ট জাপান গবর্মেণ্ট জাপানী সাম্রাজ্যের সকল প্রজাকে সমান ঘোষণা করিয়া একটি ঘোষণাপত্র বাহির করেন। ইহা একটি নব-যুগারম্ভ-সূচক ঘটনা। যে-সব লোক-পরম্পরাগত শ্রেণী বিভাগ জাতিভেদের ভাব পুষ্ট করিত এবং জাতীয় প্রগতিতে বাধা দিত, এই ঘোষণাপত্র একেবারে চিরদিনের জন্য সেইগুলাকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিল।

"সামুরাই (যোদ্ধা জাতি) এবং সাধারণ লোক, এই দুই বিভাগ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। জনসাধারণের জন্য এই ঘোষণাপত্র এক নূতন ও বিস্তৃততর জগতের সৃষ্টি করিল; চিরাগত শ্রেণীবিভাগজাত কুসংস্কারের প্রভাবে লাঞ্ছিত হইবার ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যে-কেহ যে-কোন কাজ করিবার অধিকার পাইল। সাধারণ লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঘোষণাপত্রটির বিচক্ষণতা প্রমাণ করিল।

"কিন্তু লোক-পরম্পরাগত প্রথা মরিতে চায় না; যাহা বহু শতাব্দী জীবিত ছিল, তাহাকে কেবল একটি ঘোষণাপত্র দ্বারা অপসৃত করা যায় নাই। লোকেরা ঘোষণাপত্রটির উদ্দেশে জয়জয়কার দিল, কিন্তু শ্রেণীগত কুসংস্কার অনেকটা রহিল। সামুরাইরা সাধারণ লোকদের সহিত মিশিবার হীনতা স্বীকার করিতে সহজে রাজা হইল না। অতীত কালের অহঙ্কার তাহাদের মনে

আড ডা গাড়িয়া থাকিবার চেষ্টা করিল। আজ কিন্তু এই চিরাগত শ্রেণীবিভাগের শেষ চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। দরিদ্রতম কৃষকের পুত্রদিগকে গবর্মেণ্টের অত্যুচ্চ পদে আরূঢ় হইতে আমরা দেখিয়াছি; ক্ষুদ্রতম মুদীখানার মালিকের পুত্রেরা সৈনিক বিভাগে, রণতরী বিভাগে এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে অত্যুচ্চ স্থানে উপনীত হইয়াছে। কেহ ইহাকে অদ্ভুত মনে করে না; সকলে এইরূপ তথ্যকে উৎসাহোদ্দীপক মনে করে।

"সকলের জন্য সমান সুযোগের প্রভাবেই সকল কার্য্যক্ষেত্রে দুর্লভ যোগ্যতার লোক দেখিবার সৌভাগ্য এই দেশের হইয়াছে। জাতিভেদের অভাবের মানে প্রগতি, এবং জাপান অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা বুঝিয়াছে।"

প্রাচ্য জাপান জাতিভেদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিয়াছে। পাশ্চাত্য আমেরিকা হইতেও সাক্ষ্য আসিয়াছে। মিশর দেশের রাজধানী কায়রোতে অন্তর্জাতিক আদালতে আমেরিকার যিনি প্রতিনিধি তিনি ওয়াশিংটন সহরের "দি নেশুন্স বিজ্‌নেস্" নামক কাগজে "ব্রিটিশ জাতিভেদ ও ব্রিটিশ বাণিজ্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, ব্রিটেন যে আমেরিকার সহিত পণ্যশিল্পের ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য যে-সব কারণ ইংরেজরা নির্দ্দেশ করে তাহা বাজে; আসল কারণ এই, যে, ব্রিটেনে যে-রূপ জাতিভেদ আছে, আমেরিকায় তাহা নাই। পণ্যশিল্পে ও বাণিজ্যে আমেরিকার শ্রীবৃদ্ধির কারণ তিনি বলিয়াছেন।

"American education does not engender class distinction. American social conditions do not beget caste. American industry does not place a bar sinister upon brains. Our men of affairs are our biggest brains; our ablest brains are at the head of our chambers of commerce :..."

"আমেরিকান্ শিক্ষা শ্রেণীভেদ উৎপন্ন করে না, আমেরিকান্ সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি জাতিভেদের জন্ম দেয় না, আমেরিকার পণ্যশিল্পক্ষেত্রে মস্তিষ্কশালী লোকদের প্রবেশে কোন বাধা নাই। আমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত লোকেরাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা মস্তিষ্ক-শালী লোক; আমাদের বাণিজ্যসমিতির মাথায় দক্ষতম মস্তিষ্কের লোকেরা অবস্থিত ;......"

—

গৃহস্থালীর বাহিরে নারীর কার্য্যক্ষেত্র

যে সকল নারীর উপযুক্তরূপ শিক্ষা, শক্তি ও অবসর আছে, গৃহস্থালীর বাহিরেও তাঁহারা কাজ করিতে পাইলে যে তাঁহাদের এবং সমাজের কল্যাণ হয়, তাহা আমরা বার বার বলিয়াছি।

নারী-শক্তির প্রভাব যে কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে, সম্প্রতি আমেরিকার দেশপতি (প্রেসিডেণ্ট) নির্ব্বাচনে তাহার একটি নূতন উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। মিঃ হুভার এবং য়্যাল স্মিথ এই পদের প্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদের মতের নানা পার্থক্য ছিল, দেশপতি হইলে কে কি করিবেন তাহার সংকল্প পত্রেও প্রভেদ ছিল। তাহার একটির উল্লেখ করিতেছি। কয়েক বৎসর হইল, প্রধানতঃ আমেরিকার নারীদের চেষ্টায়, সেই দেশে, ঔষধার্থে ভিন্ন, মদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আইন উঠাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে, অন্য দিকে ইহা বজায় রাখিবার চেষ্টাও হইতেছে। হুভার আইনটি রাখিতে চান, স্মিথ উঠাইয়া দিতে চান। এই কারণে আমেরিকার মদ্য-পান-বিরোধিনী নারীরা নিজে হুভারের দিকে ভোট দিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য ভোট জোগাড় করিয়াছেন। স্মিথ অপেক্ষা অনেক অধিক ভোটের দ্বারা হুভারের নির্ব্বাচনের ইহা একটি প্রধান কারণ।

এই উদাহরণটি আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মনে হয় ত ভোট সংগ্রহে নারী জাতীয় দালাল নিযুক্ত করিবার ইচ্ছার উদ্রেক করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নারীর শিক্ষা ও অন্যবিধ উন্নতির চেষ্টা বিশেষ কিছু করেন নাই। সুতরাং আমেরিকার দৃষ্টান্ত কেন, আফগানিস্থানের মত "অসভ্য" দেশের দৃষ্টান্তও তাঁহাদের চেতনা সম্পাদন করিবে কি না, সন্দেহ।

—

এভারেষ্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারক বাঙালী

এভারেষ্ট হিমালয়ের এবং পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২৯১৪৪১ ফুট। ভারতবর্ষের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়ার জেনার্যাল

স্যার জর্জ্জ এভারেষ্টের নামে ইহার নামকরণ হয়, কিন্তু তিনি ইহার আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন না। ইহা আবিষ্কৃত হয় ১৮৫২ সালে, কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বে ১৮৪৩ সালে পেন্স্যন লইয়াছিলেন। এভারেষ্ট আবিষ্কারের বৃত্তান্ত সিমলায় প্রদত্ত মেজর কেনেথ সেসনের একটি বক্তৃতায় পাওয়া যায়। এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বর্ত্তমান ১৯২৮ সালের ১২ই নবেম্বরের ইংলিশম্যানের ১৭ পৃষ্ঠায় জর্ন্যাল অব দি সোসাইটী অব আর্টস্ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে আবশ্যক অংশ আমরা নীচে তুলিয়া দিতেছি।

"It was during the computations of the North eastern observations that a babu rushed on one morning in 1852 into the room of Sir Andrew Waugh, the successor of Sir George Everest and exclaimed; "Sir, I have discovered the highest mountain on the earth." He had been working out the observations taken to the distant hills. It was Sir Andrew Waugh who proposed the name Mount Everest, and no local name has ever been found for it on either the Tibetan or the Nepalese side."

নিম্নপদস্থ কোন দেশী কর্ম্মচারী কোন একটা বড় আবিষ্ক্রিয়া করিলে তাহার যশটা উপরওয়ালা ইংরেজের হয়। অতএব এক্ষেত্রে যে একজন ইংরেজ নাম না করিয়া, গোড়ার বি অক্ষরটা ছোট করিয়া, একজন ব্যাবুকে কিঞ্চিৎ যশোভাগী করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশী লোকদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ছোট বি গোড়ায় দিয়া ব্যাবু লিখিলে ইংরেজীতে তাহার মানে হয় নেটিভ কেরাণী। ইংরেজরা যে এই নেটিভ কেরাণীর বেশী সম্মান করে নাই, তাহার জন্য তাহাদিগকে দোষ না দিয়া আমাদের ঘাড়ে এই দোষ লওয়া উচিত যে, আমরা অনেকে এই বাঙালী ভদ্রলোকটির নাম জানি না। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইনি পরলোকগত রাধানাথ শিকদার। সেকালে গণিতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খুব নাম ছিল। বাড়ী ছিল কলিকাতার শিকদার পাড়ায়। ইনি দেরাদুনে সার্ভে আফিসে কাজ করিতেন। ঐ আফিসে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার কোন লিখিত দলিল থাকিলে কেহ তাহার নকল প্রকাশ করিলে একটি সৎকর্ম্ম করা হইবে। ইনি বিবাহ করেন নাই, ইহাঁর ভ্রাতার বংশ আছে।

—

সতীশরঞ্জন দাশ

ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি ভারত গবর্ন্মেণ্টের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আইনের জ্ঞান তাঁহার বিশেষ রকম ছিল, আইনের ব্যবসাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ দিক্ নানা সৎকর্ম্মে, দানশীলতায়, বন্ধু ও স্বজন বাৎসল্যে, অকপট ব্যবহারে এবং নারীর উপর অত্যাচার দমনের চেষ্টায় প্রকট হইয়াছিল। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটে নাম কিনিবার চেষ্টা ও অকাজ অনেকে করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের টাকা খরচ করিয়া ধর্ম্মঘটীদিগকে বিপন্মুক্ত করিবার চেষ্টা তাঁহা অপেক্ষা বেশী কেহ করেন নাই।

—

পীযূষকান্তি ঘোষ

শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র এবং অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। সাংবাদিকের কার্য্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গীয় বালক ও যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

—

পঞ্জাবে আমলাতন্ত্রের কীর্ত্তি

যে-সব খবরের কাগজ সাইমন কমিশনের সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও কমিশনের কার্য্যকলাপ ও তাহার সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছেন; কমিশনের ও সাক্ষীদের সমালোচনাও করিতেছেন; কতকটা খবর দিবার খাতিরে ইহা করিতে হইতেছে, সমালোচনা কর্ত্তব্যও বটে। কিন্তু এইরূপ করায় বয়কটটা পুরাদস্তুর হইতেছে না।

সাইমন কমিশন লাহোর পৌঁছিবার প্রাক্কালে লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি নেতারা মিছিল বাহির করিতে মনস্থ করেন, এবং রেলওয়ে

ষ্টেশ্যনেও কাল পতাকা লইয়া দলবদ্ধ হইয়া গিয়া "সাইমন ফিরিয়া যাও," ইত্যাদি বুলি আওড়াইতে সঙ্কল্প করেন। সেই হেতু কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ষ্টেশন কাঁটাযুক্ত তারের বেড়ায় ঘিরিয়া দেওয়া হয়। কেবল সঙ্কীর্ণ একটি প্রবেশ-পথ রাখা হয়। লাজপৎ রায় প্রমুখ বর্জ্জনকারীরা সেইখান পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া দাঁড়ান। ষ্টেশ্যনে ঢুকিবার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না, সেচেষ্টাও করেন নাই, যদিও সরকারী জ্ঞাপনীতে এই মিথ্যা অভিপ্রায় তাঁহাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, জনতা পুলিসের উপর ঢিল ছুঁড়িয়াছিল, তাহাও মিথ্যা। স্বয়ং লাজপৎ রায় এবং অন্য কোন কোন নেতা এই দুটি সরকারী বানান কথা মিথ্যা বলিয়াছেন।

জনতা ষ্টেশ্যনের প্রবেশ পথে চমকিয়া দাঁড়াইবার পর, সরকারী লোকেরা (তাহার মধ্যে ইংরেজও ছিল) উহার উপর লাঠি চালায়। এই কাপুরুষোচিত আক্রমণে লাজপৎ রায় ও অন্য কোন কোন নেতা আহত হন। তাঁহারা অহিংস ছিলেন, প্রত্যাক্রমণ বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন নাই।

সরকারী লোকদের এই কাপুরুষোচিত বর্ব্বর ব্যবহারে অন্ততঃ বেসরকারী ভারতীয়দের মনে ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। ইংরেজরা তাহাদের প্রভুত্ব, এবং চাকরী ও ব্যবসা দ্বারা টাকা রোজগারের পথ খোলা রাখিবার জন্য যাহাই করুক, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু আমাদের লজ্জা হয় সেই সকল নিরক্ষর ও লিখন-পঠনক্ষম ভারতীয় সরকারী ভৃত্যদের জন্য যাহারা টাকার খাতিরে চড়াও হইয়া শান্তিপ্রিয় স্বদেশবাসীদিগকে আঘাত করে। ইংরেজ যখন তাহার নোংরা কাজ করিবার জন্য নিরক্ষর বা লিখনপঠনক্ষম ভারতীয় লোক পাইবে না, তখন দেশের সুদশা আসিবে।

—

সাইমন কমিশন ও অবনতশ্রেণীর লোক

'অস্পৃশ্য', 'অনাচরণীয়' ও অন্য অবনত শ্রেণীর লোকেরা যতক্ষণ বলে, "ইংরেজ মাবাপ, ইংরেজরাজত্ব আছে বলিয়াই আমরা টিকিয়া আছি, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আমাদের উপর বড় অত্যাচার করে, আমাদের উন্নতির জন্য তাহারা কিছু করে না, অল্পস্বল্প যাহা করে তাহাও নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য করে, ইংরেজের হাত থেকে সব রাষ্ট্রীয় কাজের ভার দেশের লোকদের হাতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে আমাদের আলাদা প্রতিনিধি চাই," ততক্ষণ তাহারা সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের ও সাইমন কমিশনের খুব প্রিয়পাত্র থাকে। কিন্তু যখনই তাহারা ও তাহাদের প্রতিনিধিরা কিছু অন্য রকমের কথা বলিতে আরম্ভ করে, অমনই তাহাদের কথা বিশ্বাসের ও শুনিবার অযোগ্য হইয়া যায়। ইহার একটি প্রমাণ সম্প্রতি লাহোরে পাওয়া গিয়াছে। অবনতশ্রেণীর কতকগুলি লোক ও প্রতিনিধি সাইমন কমিশনকে বলিতে চায়, যে, গবর্ন্মেণ্টও তাহাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী, গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করেন না, প্রকৃত সহানুভূতি ও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া দেশের অনেক লোক তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করে, ইত্যাদি। এই লোকগুলিকে সাইমন কমিশনের নিকট উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় নাই, তাহাদের সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই।

—

"কালীকমলীওয়ালা" ক্ষেত্র

স্বামী বিশুদ্ধানন্দগিরি অবধূত কাল কম্বল পরিতেন বলিয়া বাঙালীদের নিকট কালীকমলীওয়ালা বাবা নামে পরিচিত ছিলেন। কেদারনাথ বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হিমালয়স্থ তীর্থ দর্শন করিবার নিমিত্ত যে সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী গমন করেন, তাঁহাদের নানা দুঃখ দেখিয়া তিনি প্রভূত সম্পত্তি ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তীর্থপথে অনেক ধর্ম্মশালা, অন্নসত্র ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। তিনি এই বৃহৎ সম্পত্তির উইলাদি কোন বন্দোবস্ত না করিয়া পরলোকযাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে তাঁহার কোন সন্ন্যাসী শিষ্য বা প্রশিষ্যের হাতে ইহার ভার পড়ে নাই। এক্ষণে যাহাদের হাতে ইহা পড়িয়াছে বা যাহারা ইহা অন্যায় উপায়ে দখল করিয়াছে, তাহারা সাধু সন্ন্যাসী নহে। সম্পত্তির আয়, দান প্রভৃতি হইতে এখন বার্ষিক দুই লক্ষ

টাকা আয় হয়। কালীকমলীওয়ালা ক্ষেত্রের উপযুক্ত ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়া যাহাতে অর্থের সদ্ব্যবহার ও তীর্থযাত্রীদের সুবিধা হয়, তজ্জন্য সমবেত চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গবর্মেণ্ট এই ক্ষেত্রের আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা-বিভাগে কয়েক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। শাহারানপুর প্রভৃতি ম্যুনিসিপালিটীও ক্ষেত্রের সাহায্য করিয়াছেন। গবর্মেণ্ট স্বর্গাশ্রমে ক্ষেত্রকে বিস্তৃত বনভূমি দান করিয়াছেন। এই সকল কারণে এবং সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গবর্মেণ্টের আইন কর্ম্মচারীদিগকে কালীকমলীওয়ালা ক্ষেত্রের বৈষয়িক ব্যাপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তত্ত্বাবধানের সুবন্দোবস্ত করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না।

—

সাইমন কমিশন ও ফ্রীপ্রেস

সাইমন কমিশনের সভাপতি ফ্রী প্রেসের রিপোর্টারের অনুমতিপত্র প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট বা সাইমন কমিশন, যাহা গোপনীয় মনে করেন অথচ গোপনীয় বলিয়া লিখিয়া দেন নাই, অন্য লোকেও তাহা গোপন রাখিবে, এরূপ আশা করা আহাম্মকী। সুতরাং সরকারী গোপনীয় কথা প্রকাশের ওজুহাতে সাইমন কমিশনের সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষ্য রিপোর্ট করিবার অধিকার হইতে ফ্রী প্রেসকে বঞ্চিত করা জবরদস্তী হইয়াছিল। একদিন পরে সভাপতি উক্ত আদেশ নাকচ করিয়াছেন।

—

আফগানিস্থানের কথা

তুর্কিভাষা শিখাইবার জন্য রাজা আমানুল্লা আফগানিস্থানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আদেশ দিয়াছেন। যাহাতে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পরে তুরস্কের সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইবে। তুর্কি ভাষার কাগজ, কেতাব প্রভৃতি আরবী অক্ষরের পরিবর্ত্তে লাটিন অক্ষরে লিখিবার আদেশ হইয়াছে। তদনুসারে কাজ হইতেছে। বৎসর খানেকের মধ্যে তুরস্কের আর কোন উদ্দেশ্যেই আরবী অক্ষরের ব্যবহার থাকিবে না। রাজা আমানুল্লা কি লাটিন অক্ষরে লিখিত তুর্কী শিখাইবেন? সম্ভবত তাই। তাহা হইলে আফগানিস্থানে ফারসী ও পশ্‌তু ও কি লাটিন অক্ষরে লিখিবার আদেশ হইবে?

যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য আফগান ছাত্রদিগকে তুরস্ক প্রেরণের কারণ নানা রকম হইতে পারে। আমানুল্লা হয় ত বিশ্বাস করেন, তুরস্কে যুদ্ধ বিদ্যার যতটা উন্নতি হইয়াছে, ইউরোপের অন্য কোথাও সেরূপ হয় নাই। কিম্বা তিনি মনে করিতে পারেন, মুসলমানের দেশ তুরস্কে মুসলমান আফগান ছাত্রদিকে যেমন কিছু গোপন না রাখিয়া যুদ্ধ-শিখান হইবে, ইউরোপের খৃষ্টিয়ান কোন দেশে সেরূপ হইবে না।

আফগানিস্থানে নিযুক্ত কোন বিদেশীর বেতন সেইরূপ কাজে নিযুক্ত কোন আফগানের চেয়ে বেশী হইবে না, এই আদেশ হইয়াছে। এই হুকুম খুব বিজ্ঞোচিত। ইহার ফলে, বিদেশীদের মনে এই ধারণা জন্মিতে ও বদ্ধমূল হইতে পারিবে না, যে, তাহারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জীব, এবং আফগানদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিবে না, যে, তাহারা নিকৃষ্ট। এই নীতি ভারতেও অবলম্বনীয়।

রাজা আমানুল্লা কয়েক হাজার আফগান যুবককে ইউরোপের নানা পণ্য-শিল্পের কারখানায় কেজো শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাইবেন। তাহা হইলে তাঁহার দেশের নানা রকম কাঁচা মাল সেইখানেই আফগানদের ব্যবহার্য্য দরকারী নানা পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইবে; এবং, চাই কি, তাহা ভারতবর্ষেও রপ্তানী হইবে। ভারতবর্ষের আয়তন, লোকসংখ্যা, ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য আফগানিস্থানের চেয়ে ঢের বেশী, কিন্তু ইংরেজ গবর্মেণ্ট "পিত্তিরক্ষা" নীতি অনুসারে জন কয়েক যুবককে কারখানায় শিল্প শিখিতে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা এ পর্য্যন্ত জোর কয়েক গণ্ডা হইবে—কয়েক শত নহে, কয়েক হাজার ত নহেই। আফগানিস্থানের লোকসংখ্যার সর্ব্বোচ্চ অনুমান আশি লক্ষ, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩২ কোটি অর্থাৎ ৩২০০ লক্ষ। তাহা হইলে আফগানিস্থান যত হাজার যুবককে কারখানায় কাজ শিখিতে পাঠাইবে, ভারতবর্ষ হইতে তাহার ৪০ গুণ ছাত্রের কারখানার কাজ শিখিতে বিদেশে যাওয়া উচিত।

রুশিয়ার বাকু নামক স্থানের অনেক কূপ হইতে

কেরোসীন তেল তুলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পাঠান হয়। আফগানিস্থান হইতে ১৫ জন ছাত্রকে, তৈল কূপ-খনন ও তৈল উত্তোলন বিদ্যা শিখিবার জন্য, বাকু পাঠান হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, আফগানিস্থানে ভূগর্ভে তৈল আছে। রাজা আমানুল্লা বিদেশীদিগকে তৈল উত্তোলনের অনুমতি না দিয়া যে নিজের দেশের লোকের দ্বারাই তাহা করাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। বিদেশী বণিকরা ছুঁচ হইয়া ঢুকেন, ফাল হইয়া বাহির হন। বণিকের মাপকাঠি রাজদণ্ডে পরিণত হয়।

সনেট

শ্রী সুশীলকুমার দে

(১)

কবি কহে—তুমি মোর কল্পনার পরী,
নয়ন-আলোকে করি স্বপন-রচন ;
শিল্পী কহে—বাসনার তীরে বসি' গড়ি
ও প্রতিমা, ভেঙে ভেঙে হৃদয় আপন ;
জ্ঞানী কহে—পুরুষ তো আছে পদে পড়ি',
প্রকৃতির খেলা হেরি সারা ত্রিভুবন ;
কর্ম্মী কহে—তোমা লাগি', হে মোর সুন্দরি,
করি লক্ষ্যভেদ, ভাঙি হর-শরাসন ;
প্রেমিক কহিছে—আজো বাঁশরীর স্বরে
চিত্ত-যমুনার তটে ওই নাম বাজে ;
ভক্ত কহে—সৃষ্টি-নাভি-পদ্মের উপরে
ও রূপের রস-মূর্ত্তি নিয়ত বিরাজে ;
গৃহী আমি, ওগো নারি, চিরদিনতরে
আহ্বানি তোমারে শুধু মোর গৃহমাঝে !

(২)

সে তো নহে বিশ্বরমা, কল্পনা নিঙাড়ি'
মুগ্ধ কবি-বিধাতার সৃষ্টি সুমধুর,—
পদ-নখে শত সূর্য্য পড়ে না আছাড়ি,'
হয় না পরশ-লোভে অশোক বিধুর !
হাতে বেলোয়ারী চুড়ি, সীঁথিতে সীঁদুর,
একরাশি এলোচুল, আটপৌরে শাড়ী,—
অযত্ন-সম্ভূত শোভা গৃহস্থ-বধূর
সব কল্পলোক-কান্তি লইয়াছে কাড়ি' !
ফুলধনু নাহি ভায় ভ্রুকুটির তলে,—
মৌনমুগ্ধ স্নেহ আছে ভরি' দু'নয়ন ;
মুকুতা ঝরে না, জ্যোৎস্না পড়ে না উথলে',—
হাসিটি মধুর তবু, মধুর রোদন !
অয়ি গৃহ-মহাশ্বেতা, গৃহ-শকুন্তলে,
মোর ক্ষুদ্র গৃহ আজ কাব্যের ভুবন !

(৩)

মোর তরে, হে অপর্ণা, হে তাপসী প্রিয়া,
বল্কলে শোভিলে অঙ্গ ত্যজি' আভরণ ;
মোর সাথে মহারাসে রহিলে মগন
অশ্রু ও কলঙ্ক শুধু জীবনে মাগিয়া ;
সহিলে ঋষির শাপ আমারি লাগিয়া ;
কণ্ঠে দিলে লতা-ফাঁসী বরিয়া মরণ ;
আনিলে স্বৈরিণী-দেহে সাবিত্রীর মন ;
অচ্ছোদের তীরে ধ্যানে রহিলে জাগিয়া,
স্বয়ংবরে কতবার কণ্ঠে মালা দিলে ;
রণক্ষেত্রে রথ রশ্মি হাতে তুলে নিলে ;
কতবার অপমান সহি' সভাতলে
মোর পাপ মুছে দিলে নয়নের জলে ;
আমার চিতায় পুড়ি' জন্ম-জন্মান্তরে
হে প্রাক্তনী, সাথে সাথে আছ চিরতরে।

(৪)

তোমারে গড়েছি আমি তিল তিল করি',
ওগো তিলোত্তমা, মোর মানস-সৃজন ;
ছুটেছি তোমার দেহ স্কন্ধে মোর ধরি'
শূল-পাণি, বিষ কণ্ঠ, অনল-নয়ন ;
তোমার বিরহে কত, হে মোর সুন্দরি,
ডাকি মেঘে মেঘে, ফিরি খুঁজি' পল্লবন ;
কোটাল শ্মশানে লয় তব স্তব গড়ি' ;
হে সাবিত্রী, তোমা' লাগি' বরেছি মরণ ;
সর্পে ধরি' লতা ভাবি, তোমারি কারণে
শবদেহ আলিঙ্গিয়া আঁধারে সাঁতারি' ;
তোমারে পাঠায়ে বনে, শূন্য সিংহাসনে
কেঁদেছি সোনার মূর্ত্তি নেহারি' নেহারি' ;
অন্নপূর্ণা, শুধু মুষ্টি ভিক্ষা-আকিঞ্চনে
হয়েছি তোমার তরে শাশ্বত ভিখারী !

ভারতীয় কুস্তীগীর

শ্রী শচীন্দ্র মজুমদার

বহু কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় পালোয়ানদের বিষয়ে প্রবাসীতে যা লিখেছিলুম, বিখ্যাত কুস্তীগীর গামার বিস্কোবিজয়ের মুহূর্ত্তে তার কতকটা পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন হয়েছে। যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন তাঁরা জানেন যে, গত ২৯শে জানুয়ারী পাতিয়ালায় গামা বিস্কোকে এক মিনিটের ভিতর জয় করেছেন। এই জয় গামার ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র জাতির এ জয় গৌরবের বস্তু।

এই কুস্তীর পূর্ব্বাহ্ণে আমি গামা তথা দেশী পালোয়ানদের প্রতিপত্তির কথা এবং গামার জয় যে স্থির-নিশ্চিত Leader পত্রিকায় তা বর্ণনা করেছিলুম। Pioneer আমার লেখার চুম্বক প্রকাশ করেছিলেন অথচ সেটা স্বীকার করা প্রয়োজন বিবেচনা করেননি, কারণ আমার প্রবন্ধে ভারতীয় পালোয়ানদের প্রতি সুবিচার করার কথা ছিল, Pioneer সেগুলো বাদ দিয়ে গামার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কথাই লিখেছিলেন। গামার জয়ের পরেও আমি Leader পত্রিকায় দেশী পালোয়ানদের ব্যায়াম-জগতে প্রকৃত স্থান নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি। এই প্রবন্ধ কতকটা তাহারই অনুসরণে।

এসোসিয়েটেড প্রেস্ একটা ভুল কথা প্রচার করছেন, এবং তাই নিয়ে আমরা আনন্দও করছি যে, বিস্কো গামার নিকট পরাজিত হ'য়ে নিজের "জগৎজয়ী আখ্যার (Championship of the World) বিজয়-মুকুট গামার মাথায় পরিয়ে দিয়ে গেছেন"। সত্য বটে, বিস্কো একদিন জগতের কুস্তীগীরদের শীর্ষ-স্থানে ছিলেন, কিন্তু তার পর বহু কাল কেটে গেছে এবং জগৎজয়ী পদটি অনেক হাত-ফের হয়েছে। বিস্কোকে জয় করে গচ; গচ শেষে আপনার পদবী আমেরিকাসকে (Americas) স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়, তাকে জয় করে Pat Connolly, এবং শেষে তাকে জয় করে Louis Strangler আজ এই পদবীর অধিকারী। টাইম্স্ অব্ ইণ্ডিয়া ছাড়া সকলেই এই ভুল সংবদটা প্রচার করছেন। গামা এবং আরও অনেক ভারতীয় কুস্তীগীর যে ষ্ট্রাঙ্গলার-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ অনেকেই স্বীকার করেন, কিন্তু আসল প্রয়োজন official recognition পাওয়া।

য়ুরোপের নিকটে পরীক্ষিত না হ'লে কোন ভারতীয়ের যে-কালে বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি অথবা গৌরবের সত্য স্থান নির্ণয় হয় না গামাকেও সেই অনুসারে যাচাই করা দরকার। যদিও তা দিয়ে গামার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা কঠিনই হবে, কেননা গামার মত আদর্শ কুস্তীগীর আজও য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করেনি।

দেশী পালোয়ানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গোলাম য়ুরোপ যান। বহুদিন পূর্ব্বে প্যারিস প্রদর্শনীতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গোলামকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। য়ুরোপের তখনকার শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীর আহমদ্ মদ্রালীকে গোলাম অবলীলাক্রমে জয় করেন, কিন্তু বোধ করি তুর্কি মুসলমান ব'লে মদ্রালীর অঙ্গে এশিয়ার গন্ধ ছিল, তাই গোলামের খ্যাতি বিস্তারলাভ করেনি, তবুও সমঝ্‌দারেরা স্বীকার করেছিল যে, গোলাম অপূর্ব্ব, অজেয়।

য়ুরোপে ভারতীয় কুস্তীগীরের খ্যাতির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন ভুটা সিং। তখনকার ভারতবর্ষে ভুটা সিংএর প্রকৃত আসন কোথায় ছিল জানি না, কিন্তু তিনি ভারতের বাইরে অসীম খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৯০৮ সালে সিড্‌নি (Sydney) তে হ্যাকেন্‌স্মিথ-এর কাছে পরাজিত হ'বার পর ভুটা সিং অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করেন। তার পর ভুটার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

ভারতীয় কুস্তীগীরদের প্রকৃত পরিচয় দেবার চেষ্টা ১৯১০ সালে আরম্ভ হয়। আর, বি, বেঞ্জামিন নামে এক ইংরেজ গামা, গামু, ইমামবক্স ও আহমদ্‌বক্স, এই চারজন কুস্তীগীরকে সঙ্গে ক'রে লণ্ডনে উপস্থিত হন ও পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীয়ের বিরুদ্ধে 'আহ্বান-পত্র'

(Challenge) ঘোষণা করেন। এই অভিযানের প্রথম অবস্থায় য়ুরোপীয় কুস্তীগীরদের গামা প্রভৃতির সঙ্গে বল-পরীক্ষার জন্য সম্মত করাতে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। বহু সাধনার পর বিখ্যাত সুইস্ কুস্তীগীর John Lemm-



কুস্তিগীর যতীন বসু (ওরফে গোবর)

কে ইমামবক্সের সঙ্গে লড়বার জন্যে লণ্ডনে আনা হয়। ইংলণ্ড আশা করেছিল যে, Lemm অল্লায়াসে ইমাম তথা ভারতীয়দের সব উচ্চাশা চূর্ণ ক'রে দেবে, কিন্তু Lemm যখন সকলকে নিরাশ ক'রে অতি অল্প সময়ে ইমামের কাছে পরাজিত হ'ল, য়ুরোপীয় কুস্তীগীর সমাজে ভারতীয়দের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। এই শ্রদ্ধা আবার ভয়ে পরিণত হ'ল যখন অতুল-শক্তি-শালী ডাঃ রোলাচ গামার কাছে শিশুর মত হেরে গেল। আইরিশ কুস্তীগীর Pat Connolly পরে Americas-কে জয় ক'রে কিছু দিনের জন্য "জগৎজয়ী" পদবী লাভ করেছিল বটে, কিন্তু এই সময়ে ইমামবক্স তাকে এক সন্ধ্যায় কুস্তীর নামে খেলার পুতুলের মত নাড়াচাড়া করেছিল। তিন তিন জন বড় ওস্তাদ যখন এই দুই বিজয়ী ভাইয়ের কাছে পরাস্ত হল, লোকে 'রুষ সিংহ' আখ্যাধারী Hackenchmidt কে ধ'রে বস্‌ল, "তুমি এসে এই বিদেশী-গুলোর গর্ব্ব চূর্ণ ক'রে দাও।" সিংহকে তার বিবর থেকে টেনে বার করা গেল না বটে, কিন্তু Zbyscoর ইংলণ্ড আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লোক উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল Lemm এবং Appolloর (Wur Baukier) সাহায্যে বিস্কোর মহাড়ম্বরে কস্‌রৎ সুরু হ'য়ে গেল এবং তার ফল-পরীক্ষা এক সন্ধ্যায় হ'ল লণ্ডনের Holborn Stadiumএ। অশ্বারোহীর মত গামা বিস্কোর ওপর ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট তাকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, কিন্তু বিস্কোর বিরাট্ দেহকে আখাড়ায় শেষ পর্য্যন্ত চিৎ করা তাঁর হয়নি। পরদিন এ কুস্তীর পুনর্বিচার হবার কথা ছিল বটে, কিন্তু বিস্কো দেশ ছাড়লেন এবং Hackenchmidt-ও সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ইংল্যাণ্ড খুসী হ'য়ে গামাকে John Bull Championship Belt দান করেছিল। এই পুরস্কা-

সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বজয়ী কুস্তীগীরকে দেওয়া হয়।

বিস্কোর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে পেশাদারী কুস্তী লোপ পেয়ে গেল। গামা কিছুকাল বৃথা অপেক্ষা ক'রে দেশে ফিরে এলেন। পর বৎসর বেঞ্জামিন সাহেব রামমূর্ত্তি ও বাছা বাছা কয়েকজন কুস্তীগীরকে নিয়ে আবার ইংল্যাণ্ড যান। এই দলের মধ্যে রহিম গোলাম মহীদীন, আহমদ্ বক্স ও তীলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রহিমের জন্য রামমূর্ত্তি Sporting Life Officeএ বোধ করি দু লক্ষ টাকা জমা রেখেছিলেন, তার কোনো ফল হয়নি। আহমদ্ বক্সের সঙ্গে যখন Mauriee Deriaz-এর সর্ত্ত স্বাক্ষর হয়েছিল তখন সকলেই আশা করেছিলেন Deriaz আহমদ্‌কে অল্পায়াসেই জয় করবে, কেন না Deriaz কেবল Gotch ও Hackenchmidt ছাড়া আর কারো কাছে কখনো হার স্বীকার করেনি। তাছাড়া Deiraz ছিল য়ুরোপের এক বিখ্যাত ভারোত্তলনকারী (Weight-lifter), তার নিজের শক্তির উপর অসাধারণ নির্ভর ছিল। Health and Strength পত্রিকায় আমার আজও Deriaz-এর দুটি লেখার কথা মনে পড়ে। কুস্তীর পূর্ব্বে সে লিখেছিল, "হ'তে পারে আহমদ্ বক্স খুব চতুর, খুব প্যাঁচওয়ালা, কিন্তু আমার শক্তির কথা সে জানে না, আমার সেই প্রভূত শক্তি দিয়ে আমি তার চতুরতা ভুলিয়ে দেব।" আহমদ্ বক্সকেও তার জবাবে ওই পত্রিকায় লিখতে হয়েছিল—"আগের থেকে আর কি বলব, তোমাদের Boy Scoutদের motto বলে "Be ready" আমিও হরদম তৈয়ার, তবে তোমাকে হারতেই হবে।" একবার ৬৬ সেকেণ্ড একবার মিনিট পাঁচেক, দু'দুবার হেরে Deriaz উক্ত পত্রিকার অনুরোধে আবার লিখলে—"যারা বলে ভারতীয়দের শরীরে শক্তি নেই, শুধু প্যাঁচের কারসাজি, তাদের আমি বলি "সাবধান" আহমদ্ বক্সকে আমার চিরদিন মনে থাকবে—I shall ever remember his terrible arm rolls." আহমদ বক্স শুধু বলেছিল, "I willed him to go down under me and he did."

ডিরিয়াজ-বিজয়ের পর তাঁর ম্যানেজার Earnest Delaloye আর একজন সুইস্ কুস্তীগীরকে নিয়ে এলেন আহমদের গর্ব্ব চূর্ণ করতে। Armand Cherpillod-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে National Sporting Club এর কর্ত্তা বিশেষজ্ঞ বেটিসন ব'লে বেড়াতে লাগলেন, "এই-



কুস্তিগীর গামা (বামে) ও ইমাম্ বক্স (দক্ষিণে)

বার ঠিক মুগুর পাওয়া গেছে, ভারতীয়দের পরের জাহাজেই দেশে ফিরতে হবে।" আমাও তখন কতকটা white hope-এর মত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ঢাক বেটিনসন্ যত জোরে বাজিয়েছিলেন, প্রকৃত কুস্তীর সময়ে "Cochon, cochon, you are killing me"—গালাগালি আর অনুনয়ের আর্ত্তনাদে সে ঢক্কানিনাদ চাপা প'ড়ে গেল। বিলিতি কুস্তী এখনো সেই ঢাকচাপাই রয়ে গেছে।

এর পর যখন ইংলণ্ডে কুস্তী পাওয়ার আশা রইল না, গোলাম মহীদীন তাঁর দুই শিষ্য ছাগা ও তীলাকে নিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে কুস্তীর য়ুরোপীয় ধরণ গ্রীকো-রোমান ষ্টাইল শিখে, এই পদ্ধতির সর্ব্বজয়ী বীর মরিস গ্যাম্বিয়ার প্রমুখ জনপঞ্চাশকে হারিয়ে আমেরিকা গেলেন 'জগৎজয়ী' গচের সন্ধানে। ম্যাডিসন স্কোয়াচ গার্ডেন্‌স্ শিকাগোতে

যেদিন গচ হ্যাকেন্‌স্মিথ এর 'জগৎজয়ী' আখ্যার জন্য কুস্তী হয় গোলাম মহীদীন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গচ রুষসিংহকে পরাজিত ক'রে নিজের সম্মান বজায় রাখলেন বটে, কিন্তু গোলাম মহীদীনের দিকে চেয়েও দেখলেন না। গোলাম মহীদিন অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে "The mice will play while the cat is away" বল্‌তে বল্‌তে ঘরে ফিরে এলেন।

এই সব ঘটনার অনেক দিন পরে গোবর (যতীন গুহ) ইংলণ্ডে যান। জিমি ক্যাম্বেল এবং ইংলণ্ডের চ্যাম্পিয়ন জিমি এসন্‌কে তিনি জয় কর্‌লেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ড তাঁকে "বয় রেস্‌লার্‌" ব'লে পিঠ চাপ্‌ড়ে ছেড়ে দিলে। যুদ্ধের কিছু পরে গোবর Stranglerএর সন্ধানে আমেরিকা গিয়েছিলেন, তাকে তিনি জয় কর্‌তে না পার্‌লেও, লাইট হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান অব্‌ দি ওয়ার্‌ল্ড আখ্যাটা নিজস্ব ক'রে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।

মানুষের ভিতর শক্তিপূজার যে একটা সাধারণ সংস্কার আছে তা দিয়ে আমরা বলবানকে কিছু শ্রদ্ধা কর্‌তে বাধ্য হই। কিন্তু আমাদের দেশে শক্তিচর্চ্চা নিম্নশ্রেণী এবং অশিক্ষিত লোকের ভিতর আবদ্ধ ব'লে প্রকৃত শক্তিমান্‌কে প্রাণখোলা অভিনন্দন দিতে আমরা সঙ্কুচিত হই। পূর্ব্বের চেয়ে শরীরচর্চ্চার প্রতি অবজ্ঞা ঢের কমে গেলেও এখনো এই সঙ্কোচের আড়াল একেবারে চূর্ণ হয়নি। গোবর কলিকাতার বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের সন্তান, ইংরাজী শিক্ষাও কিছু আছে। তিনি যে নিজের সাধনা ও শক্তির দ্বারা ব্যায়াম-জগতে একটা উচ্চ আসনের অধিকারী একথা বাংলা দেশের অধিকাংশ লোক জানে না; বাঙালীর দুর্ব্বলতার কলঙ্ক যে তাঁর দ্বারা অনেকটা মোচন হয়েছে এ কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ মনে করে নি; আজও গোবরকে বাংলাদেশের আদর্শ শক্তিমান ব'লে তাঁর প্রাপ্য সম্মান যে আমরা দিইনি, তার মূলেও এই সঙ্কোচ। গল্প আছে যে, বিখ্যাত লেখক আনাটোল ফ্রান্স এক দিন এক রেষ্টোরায় ব'সে আহার কর্‌ছিলেন, এমন সময় রাস্তা দিয়ে সহাস্য-বদন Carpentier যাচ্ছিলেন, কার্পেন্টিয়ার একা পথ চল্‌তে পেতেন না, পথে বার হ'লেই তাঁর পূজারীর দল ভীড় ক'রে সঙ্গে চল্‌ত। আনাটোল ফ্রান্সের এক বন্ধু তাই দেখে জিজ্ঞাসা করেন, "দেখুন, আমি আশ্চর্য্য হই যে, আপনার মত জগদ্বরেণ্য লোক পথে বেরুলে প্রায় কেউ চেয়েও দেখে না, অথচ কার্পেন্টিয়ার সামান্য একটা মুষ্টিযোদ্ধা, তাকে লোক অহরহ রাজার সম্মান দেয়।" বৃদ্ধ আনাটোল ফ্রান্স উত্তরে বলেছিলেন, "কার্পেন্টিয়ারকে সম্মান দেখাবে না ত কাকে দেখাবে? ও যে দেশের যৌবন, দেশের পুরুষ-শক্তির আদর্শ। আসুন, আমরাও ফ্রান্সের এই আদর্শ বীরকে সম্মান প্রদর্শন ক'রে আসি।" ফ্রান্স বাইরে গিয়ে কার্পেন্টিয়ারকে অভিবাদন ক'রে এলেন।

এই কার্পেন্টিয়ার যেদিন ডেম্পের সঙ্গে সেই ভুবন-বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, সারা ফ্রান্স কাজ-কর্ম্ম বন্ধ ক'রে ফল জান্‌বার অপেক্ষায় ছিল, সারাটি ফরাসী জাতি এক হ'য়ে কার্পেন্টিয়ারের জয় কামনা করেছিল। খেলার জগতে গোবরের স্থান কার্পেন্টিয়ারের চেয়েও কোন অংশে হীন নয়, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা দেখাতে বাংলাদেশ কোন কালে মুখর হ'য়ে ওঠেনি।

পাতিয়ালায় বিস্কোকে ৩০ সেকেণ্ডের ভেতর জয় ক'রে গামা ব্যায়মজগতে ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপন করেছেন। পৃথিবীতে যত খেলোয়াড় আছে গামা এবং পোলাণ্ডের নুর্মীর (Nurmi) মত অসাধারণ পুরুষ কেউ হয়নি। ত্রিশ বৎসর বয়সে যে-দেশে মানুষ বৃদ্ধত্ব পায় ব'লে বরাবর শোনা গেছে, সেই দেশেরই মানুষ গামা ৪৪ বৎসর বয়সেও আপনার শারীরিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে যে সমগ্র পৃথিবীকে শক্তির পরীক্ষা দিতে ভারতবর্ষেই আস্‌তে হবে তার পথ গামা তৈরী করেছেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে।

নগরের আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার

(মৌলিক জার্ম্মান প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদের ভাব অবলম্বনে লিখিত)

শ্রী পরমেশচন্দ্র মল্লিক

বহু পুরাকাল হইতেই নগরের আবর্জ্জনা যাহাতে সহজেই দুরীকৃত হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, আবর্জ্জনাই মশক, মক্ষিকা ও রোগের বীজাণুসমূহের উৎপত্তি-স্থান। যাহাতে সহজে নির্দ্দোষ ভাবে এই আবর্জ্জনা পরিষ্কারের সুব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য নগর-পূর্ত্তবিদেরা যে-চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমে নগরের আবর্জ্জনা নগরপ্রান্তস্থ লোকালয়শূন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধিবশতঃ ক্রমশঃ স্থানাভাব হইতে লাগিল। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারেরা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় রহিলেন। জীবদেহ-নির্গত মলমূত্রকফ প্রভৃতি পয়ঃপ্রণালী দিয়া নিকটস্থ নদীতে কিংবা অন্য কোন বৃহৎ জলাশয়ে লইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু তাহাতে নদী ও জলাশয়ের জল দুষিত হইত।

তাহার পর সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা হয়। এই সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক একটা সুবৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত জলাধার বা চৌবাচ্চা। ইহা বহুরন্ধ্রবিশিষ্ট অতিদগ্ধ ইষ্টক বা ঝামায় পূর্ণ থাকে। ইহাতে দাহক চূণ বা caustic lime এবং ক্লোরাইড অফ লাইম ও অন্য দু-একটা রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া হয়। মলমূত্র প্রভৃতির কতকাংশ দ্রবীভূত হয় ও যে কিছু কঠিনাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহার গুরুত্ব জল অপেক্ষা অধিক বলিয়া অধোদেশে গমন করে ও ঝামাপ্রভৃতির ছিদ্র-পথে বাধা পাইয়া রহিয়া যায়। কেবল স্বচ্ছ, নির্ম্মল, তরল ও দোষশূন্য জলীয়াংশ নির্গত হয়। ইহা আদর্শ সেপ্টিক ট্যাঙ্কের কথা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা সব সময় হয় না, বিশেষতঃ আমাদের মত অভাগা দেশে। কারণ এখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া আশু প্রতিকারলাভ অসম্ভব।

তাহার প্রথম কারণ, এখানে কর্ত্তৃপক্ষেরা ঝামা প্রভৃতির সময়মত পরিবর্ত্তনে খুব কমই যত্নবান। অতি অল্পদিন পরেই ঝামার ছিদ্রপথ বন্ধ হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। ঝামার পরিবর্ত্তন বা অগ্নিসংযোগে সংশোধন এবং নূতন রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগ একান্ত আবশ্যক, তাহা না করিলে নদীর জল রোগের বীজাণুতে বিষাক্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের জন্য একজন রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক (*Chemist*) ও অন্ততঃ তিনজন শ্রমিকের প্রয়োজন। Automatic Working of the Septic Tank তবেই সেপটিক ট্যাঙ্কের কার্য্য স্বতঃ হওয়া সম্ভব হয়। কলিকাতাস্থ Septic Tank নির্গত জলের রাসায়নিক পরীক্ষা বৎসরের মধ্যে কয়দিন করান হয় এবং উহার দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য কি ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থাপক সভায় তাহার উত্থাপন ও আলোচনা হইলে দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ ড্রেনের পাইখানা ও ভূগর্ভস্থ ড্রেন। কলিকাতাবাসিগণ এ দুইটিরই সুবিধা-অসুবিধা দুইই জানেন। কিন্তু কলিকাতাতেও মশা আছে। বৃষ্টির সময় কলিকাতার জলপ্লাবন এই ব্যবস্থার একটা অসুবিধা। নর্দ্দমার প্রবেশদ্বার (Manhole) গুলিতে বিষাক্ত বায়বীয় পদার্থ থাকায় মেথর প্রভৃতির কদাচিৎ মৃত্যু ও অন্যতম অসুবিধা।

ড্রেনের পাইখানায় মেথরের দরকার নাই বটে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ড্রেনের মুখ বন্ধ হইলে জলের টানের কোন দোষ বা কোন কারণে ড্রেনের পাম্পিং ষ্টেশনের (drainage pumping stationর) জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইলে পাইখানার ভিতর যে দৃশ্য হয়, তাহা ভুক্তভোগী সকলেই জানেন। মলকে তরল করিবার জন্য High Pressure Steam ব্যবহার করা হয়।

ইংলণ্ডের লণ্ডন নগরে প্রথমে অন্য ব্যবস্থা করা হয়। নগরের কেন্দ্র মধ্যেই তিনটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করা হইল। তাহাতে নগরের যত প্রকার আবর্জ্জনা, উনানের

ছাই, আনাজের খোলা, ময়লা কাপড়ের টুক্‌রা সমস্তই পোড়াইয়া ফেলা হইতে লাগিল ও যে ছাই অবশিষ্ট রহিল তাহাতে রাস্তানির্ম্মাণ হইতে লাগিল।

তাহার পর হমবার্গ নগরে লণ্ডন এর দেখাদেখি ঐরূপ অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করা হইল। সেখানেও বেশ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। লণ্ডন ও হামবার্গ এর মিলিত পরীক্ষায় উৎসাহিত হইয়া জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট বার্লিনেও ঐরূপ অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করিলেন। কিন্তু যদিও এখানে শিক্ষিত ইংরাজ কারিকরেরাই কাজ করিতে আসিল, তথাপি এখানকার অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি আর জ্বলিল না। অধিক পরিমাণে অঙ্গারচূর্ণ মিশাইবার পরেও যখন এই ফল হইল, তখন জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট নিরাশ হইয়া এই ব্যবস্থা ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু জার্ম্মানীর লোক বেশীদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে না। অতি অল্পদিন পরেই বুডাপেষ্ট নগরে একজন স্থির করিলেন, যে, বার্লিনে যে এই পরীক্ষা (Experiment) অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ বার্লিনের আবর্জ্জনায় অদাহ্য (Incombustible) পদার্থের আধিক্য। তিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সঙ্গে একটি খুব প্রশস্ত ও বৃহৎ ফিতা (A long and broad endless band) সংযুক্ত করিলেন। ঐ ফিতাযন্ত্রের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট গরীব ছেলেমেয়েদের দাঁড় করাইয়া দিলেন। এক একজন বালক-বালিকাকে তিনি এক এক রকম কাজ দিলেন। ফিতা-যন্ত্রের একপ্রান্তে 'লিফটে' করিয়া মালগাড়ী হইতে আবর্জ্জনা ঢালা হইতে লাগিল। ফিতাযন্ত্র (Bandmachine) যেমন ধীরে ধীরে ঘুরিতে লাগিল, অমনি তাহার সহিত ফিতার উপর দিয়া আবর্জ্জনাও ঘুরিতে লাগিল।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান বালক-বালিকারা কেহ অভগ্ন কাচের বোতল, কেহ ভগ্ন কাচখণ্ড, তুলিয়া আপনার ঝুড়ি বোঝাই করিতে লাগিল, কেহ ছিন্ন কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড, কেহ ইট, কেহ প্রস্তর, কেহ ভগ্ন লৌহখণ্ড, বা ধাতুফলক সংগ্রহ করিতে লাগিল। এইপ্রকারে সংগৃহীত বোতলের সংখ্যা এত অধিক হইল, যে, সেখানে বোতল পরিষ্কার করিবার যন্ত্রের আবশ্যক হইয়া পড়িল। সেই সমস্ত পরিষ্কৃত বোতল সুরাপরিশ্রুতিকার বা ক্রয়াস দিগকে বিক্রয় করা হয়।

ভগ্নকাচখণ্ড কাচের কারখানায়, ময়লা কাপড়, ছিন্ন রজ্জু ও কাগজখণ্ড কাগজের কারখানায় পাঠান হয়। ছেঁড়া জুতা হইতে চূর্ণীকৃত চামড়া তৈয়ার হয়। ঐ চর্ম্মচূর্ণ হইতে অতি উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌সার প্রস্তুত হয়। পেটেণ্ট চামড়া ও সিরিস আঠা নির্ম্মাণ-কার্য্যেও ইহার বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়। মাছের আঁশ হইতে সিরিস আঠা ও এক প্রকার রূপালি পাউডার প্রস্তুত হয়। এক্ষণে ভগ্ন ধাতুদ্রব্য হইতে নানাপ্রকার ধাতব পাউডার ও ধাতব রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাষণ করা হইতেছে। রোগেমৃত ও বধ্য জন্তুর রক্ত হইতে ফিব্‌রিন, রক্ত অঙ্গার Blood-charcoal, সিরাম (রক্তদ্রব্য) প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে, তাহাদের দেহ হইতে চর্ব্বি ও চর্ব্বি হইতে গ্লিসারিণ তৈয়ারী হইতেছে। মৃতজন্তুর অস্থি হইতে নানা-প্রকার সুদৃশ্য সখের জিনিষ, এবং যাহা একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়াছে তাহা হইতে চর্ব্বি, সিরিস আঠা, ফস্‌ফরাস ও চূণ বাহির করা হইতেছে। সাবানের অব্যবহার্য্য লবণ জল হইতে যে পরিমাণে গ্লিসারিণ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, এই গ্লিসারিণ যুদ্ধের একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ।

বুডাপেষ্ট পন্থার এক দোষ যে, ইহা অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু ইহার এই দোষ এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে। আজকাল প্রথমেই ফুটন্ত দাহক সোডা ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া আবর্জ্জনাকে শুদ্ধ ও দোষশূন্য করিয়া লওয়া হয়।

শুধু তাহাই নয়, পরে যে কিছু দাহ্য পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহা লণ্ডন ও হামবার্গের মত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিয়া এক-প্রকার সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। তাপবিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ঐ অগ্নিকুণ্ডেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উহাতে ধূলি গলাইয়া একপ্রকার কাচ প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সকল অগ্নিকুণ্ডের (Wastcheat) অতিরিক্ত উত্তাপে অনেকগুলি বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালান হয়। ঐ সকল ইঞ্জিন নগরের জলের কারখানায় জল পম্প করে। উহা দ্বারা ডাইনামো ঘুরাইয়া যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা নগরের বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করে। আলো জ্বালাইয়াও যে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ থাকে তাহাতে অনেক কারখানা চালান হয়।

আবর্জ্জনার এইরূপ সুন্দর ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়; আমাদের দেশে ঐরূপ প্রথার প্রবর্ত্তন হইতে বোধ হয় এখনও এক শতাব্দী বিলম্ব আছে। আমাদের দেশে একটি অতি ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে, দুর্গন্ধ জীবজপদার্থ পোড়াইয়া মাটিতে দিলে অতি উত্তম সার হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহাতে অতি নিকৃষ্ট সার হয়। জীবজপদার্থ পোড়াইবার সময় তাহার মধ্যে যেটি সবচেয়ে উপকারী—যবক্ষারজান, তাহা উড়িয়া যায়, এবং 'পটাশ' মাত্র পড়িয়া থাকে।

নেপালের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী ফ্রান্সের সোরা সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—অথচ সোরা গোলাগুলির বারুদের একটি অপরিহার্য্য উপকরণ। তখন ফ্রান্সের পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন যে, যাহা কিছু যবক্ষারজান পূর্ণ জীবজ আবর্জ্জনা আছে, তাহা হইতে সোরা প্রস্তুত হইতে পারে। জীবজন্তুর মলমূত্র নগরের এক প্রান্তে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইল। এই সকল পদার্থের যবক্ষারজান হইতে অবিলম্বে 'অ্যামোনিয়া' উৎপন্ন হয়। ঐ অ্যামোনিয়া অম্লজানের সহিত মিশিয়া নাইট্রস অ্যাসিডে' পরিণত হয়। ঐরূপ পচনশীল আবর্জ্জনার উপর চুণ দিলে 'ক্যালসিয়ম নাইট্রাইট' প্রস্তুত হয়, এবং 'নাইট্রাইট' কিছুকাল পরে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত হয়। 'ক্যালসিয়াম নাইট্রেটে' 'পটাশ' দিলে সোরা প্রস্তুত হয়। ঐ সোরা হইতে ফ্রান্স আপনার বারুদ তিনবৎসর ধরিয়া সংগ্রহ করিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে সকল দেশেই এইরূপে সোরার চাষ করা যাইতে পারে।

বন্দী *

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

সে আজ পনর বছরের কথা। সেদিনও প্রকৃতির অঙ্গে এমনি করিয়া বসন্তের আভা আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ বণিক ব্যাঙ্কার গভীর রাত্রিতে নিজের কক্ষের মধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে সেই পনর বছর আগেকার এক রাত্রির কথা ভাবিতেছিলেন। সেদিন রাত্রি এমনই অন্ধকারময় ছিল। তাঁরই বাড়ীতে সেই রাত্রে একটা ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্যাঙ্কারের অনেক বন্ধু-বান্ধব আসিয়াছিলেন। খাওয়ার পরে গল্পের মজলিস বসিল। নানাজনে নানাকথা কহিল। অবশেষে একজন প্রশ্ন তুলিলেন যে, বিচারে প্রাণদণ্ড ভাল কিংবা চিরজীবন বন্দী হইয়া থাকা ভাল। আগন্তুকের মধ্যে অধিকাংশই প্রাণদণ্ডের বিপক্ষেই মত দিলেন। একজন বলিলেন—মৃত্যুদণ্ড আজকাল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে—এর চেয়ে অমানুষিক আর কিছু নাই। আর-একজন বলিলেন—পৃথিবী হইতে মৃত্যুদণ্ড সমূলে তুলিয়া দেওয়া উচিত—তার পরিবর্ত্তে চিরজীবন কারাবাস প্রচলিত করা ভাল।

ব্যাঙ্কার কহিলেন, "না তোমাদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। আমি যদিও চিরজীবন কারাবাসের আদেশও পাই নাই, কিংবা যদিও আমার কথনো মৃত্যুদণ্ডও হয় নাই, কিন্তু যদি স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখা যায় তবে মৃত্যুদণ্ডই অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া মনে হয়। কারণ মৃত্যু চক্ষের নিমেষে আসে—কারাবাসে তিলে তিলে মরিতে হয়।" আর একজন নিমন্ত্রিত কহিলেন, "দুইটিই খারাপ—কারণ এই দুইটি দণ্ডের উদ্দেশ্য এক—প্রাণ লওয়া। রাজা ভগবান নহেন—রাজা মানুষ গড়িতে পারেন না সুতরাং মানুষ হত্যা করিবার অধিকারও তাঁর নাই।" এক কোণে একটি তরুণ যুবক ব্যারিষ্টার বসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স বছর পঁচিশেক হইবে। তিনি চুপ করিয়াছিলেন—তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার মত কি—তখন তিনি কহিলেন—"দণ্ড দুইটিই সমান, তবে যদি তার মধ্যেও

* অ্যান্টন বেকুভ হইতে

বাঁচিয়া লইতে হয়, তবে আমি চিরজীবন কারাবরণ করিয়াই লই। বাঁচিয়া না থাকার চেয়ে—কোন মতে বাঁচিয়া থাকা ভাল।"

নানা বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। সে সময়ে ব্যাঙ্কারের অবস্থা এ রকম ছিল না—তরুণ বয়স, অতুল অর্থ, অজস্র সম্মান। তিনি ব্যারিষ্টারকে উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ—যদি তুমি পাঁচ বছর একটা ঘরে আটক থাকিতে পার তবে তোমাকে আমি দুই লাখ টাকা দিব। রাজী আছ?"

"তুমি কি ঠাট্টা করিতেছ না কি? যদি সত্য করিয়া বল তবে পাঁচ বছর কেন, আমি পনর বছর নির্জ্জন কারাবাস বরণ করিতে পারি!"

"পনর বছর! পারিবে? বেশ—মহাশয়, সবাই শুনিলেন ত? আমি দুই লাখ বাজী রাখিলাম।" "হাঁ আমি রাজী—তোমার বাজী দুই লাখ আমার বাজী আমার স্বাধীনতা," তরুণ ব্যারিষ্টারের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ব্যাঙ্কার অবশেষে কহিলেন, "আবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। দেখ আমার কাছে দুই লাখ কিছুই না, কিন্তু ইহাতে তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কারণ, ইহা ঠিক তুমি ৩।৪ বছরের বেশী থাকিতে পারিবে না। জোর করিয়া নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করার চেয়ে স্বেচ্ছায় সে দণ্ড ভোগ করা অনেক কঠিন।"

আজ পনর বছর পরে সেইদিনের সেই চিত্রটি বৃদ্ধের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। কেন—কেন আমি এ কাজ করিলাম—কেন বাজী রাখিলাম? ইহাতে কাহার কি উপকার হইল? ব্যারিষ্টার তার জীবনের পনরটি বৎসর নষ্ট করিল—আর আমি দুই লক্ষ টাকা নষ্ট করিলাম। ইহাতে মানুষের কি উপকার হইবে? কাহার কি আসিল গেল? ইহার পরে কি লোকে বুঝিবে যে, প্রাণদণ্ড অপেক্ষা নির্ব্বাসন-দণ্ড শ্রেয়? নাঃ—তখন ঝোঁকের আবেগে কি ছেলেমিই না করিয়াছি! আর ব্যারিষ্টার অর্থলোভে কি দুষ্কর্ম্মই না করিয়াছে।

তার পরে স্থির হইল যে, ব্যারিষ্টার নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিবেন। নির্ব্বাসনের জন্ত ব্যাঙ্কারের বিস্তৃত উদ্যানের এক কোণের একটি ক্ষুদ্র ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল। স্থির হইল যে, এই পনর বৎসরের মধ্যে নির্ব্বাসিত ব্যক্তি সেই কক্ষের বাহিরে আসিতে পারিবে না—কাহাকেও দেখিতে পারিবে না—কাহারও কথা শুনিতে পাইবে না—কাহারও চিঠি তাহাকে দেওয়া হইবে না, এমন কি, দৈনিক খবরের কাগজও পড়িতে পাইবে না। কিন্তু অপরপক্ষে তাহাকে একটি বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হইবে, পুস্তক ইচ্ছামত পাঠ করিতে দেওয়া হইবে—কিন্তু কাহারও পত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না—মদ খাইতে পাইবে, ধূমপান করাও চলিবে। বাহিরের জগতের সহিত সে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিবে সেইজন্য ঘরে একটি ক্ষুদ্র জানালা রাখা হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিবে না—কাগজে লিখিয়া মনের ভাব জানাইতে হইবে।

পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, খাদ্যদ্রব্য সে যত চাহিবে ততই পাইবে—তার জন্য শুধু জানালা দিয়া লিখিয়া দিলেই চলিবে। এই প্রকার সর্ত্তে দলিল লিখিত হইল—১৮৭০ সালের ১৪ই নভেম্বর রাত্রি বারঘটিকা হইতে ১৮৮৫ সালের ১৪ই নভেম্বর রাত্রি বারঘটিকা পর্য্যন্ত এই ১৫ বছর তার নির্ব্বাসন। যদি এই সর্ত্তের এতটুকু এদিকওদিক হয়—যদি বন্দী নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট পূর্ব্বেও ঘর হইতে বাহির হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কারের আর কিছুই দিতে হইবে না—তিনিও কিছুই পাইবেন না।

নির্ব্বাসনের প্রথম বৎসরে তার জানালা দিয়া কেবল সঙ্গীতের শব্দ ভাসিয়া আসিত। বন্দী গাহিতেন বাজাইতেন। জানালা দিয়া চিঠি লিখিয়া রাখিতেন তাহাতে বোঝা যাইত যে, একাকী থাকিতে তাঁর বড় কষ্ট হইতেছে। বন্দী ধূমপান ও মদ্যপান পরিত্যাগ করিল। সে লিখিল—"ঐগুলি আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করিয়া দেয়—আর আকাঙ্ক্ষাই বন্দীর প্রধান শত্রু। আর দেখ মদ যদি খাইতে হয় তবে দশজনের সঙ্গে খাওয়া দরকার—একা মদ খাইলে আমোদ হয় না। তামাক চুরুট খাওয়া ছাড়িলাম, ভাল লাগে না, ওগুলি ঘরের বাতাস দূষিত করে।" প্রথম বছরে বন্দী নানা রকম বাজে উপন্যাস, গল্প, প্রহসনের বই পড়িতে লাগিল—প্রেমের বই সে সংখ্যায় বেশী পড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় বৎসরে—গান থামিয়া গেল, পিয়ানোর সঙ্গীত আর শুনা যাইত না। বন্দী বড় বড় গ্রন্থকারের বই চাহিয়া পড়িতে লাগিল। পাঁচ বছর কাটিয়া গেল—আবার ধীরে ধীরে পিয়ানোর মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া গেল। বন্দী আবার লিখিল—"আমার মদ চাই।" সেই বছরে সে কেবল ভাল ভাল খাবার খাইত, ভাল ভাল মদ চাহিত আর বিছানায় পড়িয়া থাকিত। সে কখনো একাকী ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইত—কখনো রাগত স্বরে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া গালি দিত—আর কখনো বিছানায় উপুড় হইয়া অধীর হইয়া কাঁদিত। কখনো তাহাকে দেখা গিয়াছে, অতি গভীর নিশীথে টেবিলের সম্মুখে সে বসিয়া লিখিতেছে আর ভাবিতেছে। সারারাত্রি সে হয়ত লিখিয়া চলিল—পরদিন সকালে সমস্ত লেখা ছিঁড়িয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ বৎসরের মাঝামাঝি বন্দী অতি আগ্রহ ভরে পৃথিবীর নানা ভাষা শিখিতে লাগিল। দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বই সে যথেষ্ট পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে তার পুস্তকের দাবী এত অধিক হইত যে, ব্যাঙ্কার অতি কষ্টে তাহা যোগাড় করিয়া দিতেন। কত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ কত দূরদেশ হইতে তার জন্য আনিতে হইত তার ইয়ত্তা নাই। এই অল্প সময়ে সে প্রায় ৬০০ শত পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে সে লিখিল—"প্রিয়তম কারারক্ষী, আমি এই চিঠিখানি ৬টি নূতন ভাষায় লিখিতেছি, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ইহা দেখাইও। তাহাদের ইহা পড়িতে দিও: যদি তাহারা এইগুলির মধ্যে কোনও ভুল না পান তবে আমি প্রার্থনা করি, যে, এই বাগানে সেই উদ্দেশ্যে দুই বার বন্দুকের আওয়াজ করিও। শব্দ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিব যে, আমার পরিশ্রম বৃথা যায় নাই। প্রত্যেক যুগের ও দেশের মনীষিগণ বিভিন্ন ভাবে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেন—কিন্তু তাঁহাদের সময়ের মধ্যে জ্ঞানের একটি মাত্র শিখা প্রজ্জলিত থাকে। হায় মানব, তুমি যদি জানিতে, তুমি যদি বুঝিতে আজ আমি কি স্বর্গীয় আনন্দে মগ্ন রহিয়াছি কারণ আজ আমি সবার আনন্দে ভাগ পাইতে শিখিয়াছি।" বন্দীর আশা পূর্ণ হইল। ব্যাঙ্কারের আদেশে বন্দুকের দুইটি আওয়াজ করা হইল।

তারপরে দশ বছরে, বন্দী তার ছোট টেবিলের সামনে চেয়ারখানিতে সর্ব্বদা স্থির হইয়া বসিয়া রহিত—আর শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িত। ব্যাঙ্কার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, যে লোক চার বছরে ছ'শ বই পড়িয়া ফেলিল সে আজ এক বছর যাবৎ ঐ একখানি বহি পড়িতেছে। আর বইখানি কি?—না বাইবেল! পড়িতেও কোন কষ্ট নাই—আর খুব বড়ও ত' নয়!

নির্ব্বাসনের শেষ দুই বৎসরে বন্দী যে সমস্ত বই পড়িল তার কোন ধারা পাওয়া যায় না। কখনো সে পদার্থ-বিদ্যার বই চায়, কখনো বায়রণ, কখনো ধর্ম্মের বই আবার কখনো বা সেক্সপিয়ার। কখনো সে রামায়ণের বই চাহিল, কখনো ডাক্তারি বই, আবার কখনো বা উপন্যাস, দর্শন, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি। তার এই ভাবধারা দেখিলে মনে হইত সে যেন ধ্বংসোন্মুখ জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণরক্ষার জন্য যাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাই জড়াইয়া ধরিতেছে—সে যেন তার নির্দ্দিষ্ট কাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ব্যাঙ্কারের একে একে এই সব কথা মনে পড়িল—"কাল রাত্রি বারোটায় সে মুক্তি পাইবে—সর্ত্ত অনুসারে তাহাকে দুই লক্ষ টাকা দিতে হইবে, আর সেই দুই লক্ষ টাকা দিলে আমার ত' কিছুই থাকিবে না—আমি ভিখারী হইব—আমার সর্ব্বনাশ হইবে।......"

সেই পনর বছর আগে—আজ দুই লক্ষ মুদ্রার কাঙ্গালী ব্যাঙ্কার একসঙ্গে কোটী কোটী টাকা বাহির করিয়া দিতে পারিত কিন্তু আজ ঋণগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত ব্যাঙ্কারের সেই দিন আর নাই। নানা ভাগ্যদোষে, স্বভাব দোষে সেই বিত্ত নষ্ট হইয়াছে। তার ব্যবসা ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে।

বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার নিরাশায় হাত দিয়া মাথা চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে কহিলেন, "হায়, সে মরিল না কেন?" তার এখনো বয়স আছে—আর আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। কাল সে আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাইয়া সুখে বাস করিবে—আর আমি পথের ভিখারী হইব—আর সে প্রত্যহ আমায় কৃতজ্ঞতা জানাইবে কেন? কেন সে মরিল না? নাঃ এ অসহ্য! এই বয়সে অপমান সহ্য করিতে হইবে—

হায় এর উপায় কি?় সে যেন তার কানে কানে কহিল—উপায়—তার মৃত্যু!

রাত্রি গভীর—তিনটা বাজিয়াছে! ব্যাঙ্কার কাণ পাতিয়া ঘড়ির শব্দ শুনিলেন। গৃহের সকলেই ঘুমাইয়াছে। বাহিরে বরফে ঢাকা গাছগুলির ঝাপটার শব্দ শুনা যাইতেছিল।······নিঃশব্দে ব্যাঙ্কার সিন্দুক হইতে বন্দীর ঘরের চাবিটি লইলেন। উদ্যান অন্ধকারময়—বাহিরে শীতল বাতাস—ব্যাঙ্কার ওভার-কোটটি পরিয়া বাহির হইলেন। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আর্দ্র বায়ু গাছগুলিকে লইয়া মাতামাতি করিতেছিল। বাহিরে এত অন্ধকার যে, হাতের কাছের জিনিষ দেখা যায় না—ব্যাঙ্কার ধীরে ধীরে বাগানের গেটের সম্মুখে আসিয়া প্রহরীকে দুইবার ডাকিলেন। কোন উত্তর নাই। প্রহরী অন্যত্র গিয়াছে।

বৃদ্ধ ভাবিলেন, "এই-ই সুযোগ! যদি আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি তবে লোকে আমায় সন্দেহ করিতে পারিবে না—প্রহরীর উপরই সকলের সন্দেহ পড়িবে!"

কম্পিত হৃদয়ে বৃদ্ধ বন্দীর ঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ছোট জানালা দিয়া ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন। ঘরের মধ্যে একটি মোমবাতি পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। বন্দী টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিল। পশ্চাৎ হইতে কেবলমাত্র তার মাথার রাশি রাশি ঝাঁকড়া চুল দেখা যাইতেছিল। টেবিলের উপরে, চেয়ারের উপরে, মেঝের কার্পেটের উপরে ছোট বড় অনেক বই ইতস্তত খোলা পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু বন্দী একবারও একটু নড়িল না। পনর বৎসরের নির্ব্বাসনে সে নিশ্চল অবস্থায় বসিতে শিখিয়াছে। বৃদ্ধ জানালায় মৃদু আঘাত করিলেন, কিন্তু বন্দী নিস্তব্ধ নির্ব্বিকার। কোন সাড়া দিল না। তখন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে শীলমোহর করা দরজার শীলমোহর ভাঙিয়া ফেলিলেন, তার পরে নিঃশব্দে তালার মধ্যে চাবি পুরিয়া দিলেন। তালা সশব্দে খুলিয়া গেল—পনর বছর পরে সে যেন আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্যাঙ্কার এই শব্দে চমকিয়া উঠিলেন—ভাবিলেন এইবার বন্দী আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিবে। কিন্তু এক মিনিট, দুই মিনিট কৈ—কেহ আসিল না—কেহ ডাকিল না—চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

টেবিলের সাম্‌নে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বসিয়া আছে, কিন্তু মানুষের অবয়ব হইলেও সাধারণ মানুষের চেহারা ত' নয় এর! প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় কঙ্কালসার শুষ্ক চর্ম্ম—রমণীর ন্যায় দীর্ঘ কেশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে—। তার মুখের রং ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। গাল বসিয়া গিয়াছে—কিন্তু চোখ দুইটি তেমনি উজ্জ্বল রহিয়াছে। বন্দী তার জীর্ণ হাতের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়াছিল—উঃ, কি পরিবর্ত্তন!—বৃদ্ধের চোখ বাহিয়া জল ঝরিল। তার সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা একখানি দীর্ঘ চিঠি পড়িয়াছিল।

"হা হতভাগ্য বন্দী! ঘুমাইতেছে? হাঁ স্বপ্ন দেখিতেছে বটে, লক্ষটাকার স্বপ্নে অঘোর হইয়া আছে। একে ত এক নিমেষে টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারি—কেহই সন্দেহ করিবে না। সবাই মনে করিবে—আপনা আপনি মরিয়া গিয়াছে। দেখা যাক্ এর চিঠিতে কি লেখা আছে!" বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার টেবিলের উপর হইতে কাগজটি তুলিয়া পড়িতে লাগিল।

"কাল রাত্রি বারোটার সময় আমি আবার স্বাধীন হইব—আবার মুক্ত হইয়া লোকের সঙ্গে মিলিতে পারিব। কিন্তু আমার এই কারাগৃহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় দিনের আলো দেখিবার পূর্ব্বে তোমার কাছে দুইটি কথা বলিয়া লই। আমার বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া, ভগবান সাক্ষী করিয়া আমি বলিতে পারি যে স্বাধীনতা, জীবনের-মুক্তি, স্বাস্থ্য আমি কিছুই চাহি না—ওসব আমার ভাল লাগে না। তোমাদের পুঁথিতে এইগুলিকেই পৃথিবীর সুখ বলিয়া লেখা আছে—কিন্তু আমার কাছে তা' নয়!

"পনর বছর যাবৎ আমি অভিনিবেশ সহকারে জীবনের ধারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সত্যকথা এই যে, এতদিন আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলাম—পৃথিবী আমায় গোপন করিয়া ছিল কিন্তু পুস্তক পড়িয়া আমি জীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়াছি—কখনো আমি সুপেয় মদ খাইয়াছি—কখনো গান গাহিয়াছি—কখনো শৃঙ্গে শৃঙ্গে মৃগয়া করিয়া ফিরিয়াছি—আবার কখনো নারীর প্রেমে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিয়াছি। এক নিশীথে

পৃথিবীর সেরা সুন্দরীরা আমায় ঘিরিয়া রহিয়াছে—আমি তাদের কাহিনী পড়িতে পড়িতে কখনো আনন্দে উন্মাদ-প্রায় হইয়া উঠিয়াছি। কখনো এলব্রুজ ও মণ্টব্লাঙ্কের উচ্চ শৃঙ্গে বিচরণ করিয়াছি—কখনো প্রভাতসূর্য্যের কিরণ আসিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গকে চুম্বন করিতেছে—কখনো সন্ধ্যাকাশে অজস্র তারাগুলী হাসিতেছে—কখনো অসীম অনন্ত সমুদ্রে তরঙ্গরাজি আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়াছি। কখনো আমি ভাবি নাই যে, আমি বন্দী! কখনো ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিজলীর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—কখনো গভীর অরণ্যে গান গাহিয়া, কত হ্রদে হ্রদে বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি—সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্রজন্তু আমার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে—কত রাজ্য, কত দেশ, কত নদী—তোমার উদ্যানের এককোণে এই ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া আমি দেখিতে পাইয়াছি, তোমায় ধন্যবাদ! তোমার দেওয়া পুস্তক-রাশিতে আমি অসাধ্য-সাধন করিয়াছি—কখনো যুদ্ধ জয় করিয়া রাজ্য অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়াছি, কভু বা নর-অবতাররূপে নূতন ধর্ম্মের কাহিনী মানবকে শুনাইয়াছি—কখনো ভিক্ষাপাত্র হস্তে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি।

"তোমার পুস্তক পড়িয়া আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে। শত শতাব্দী ধরিয়া মানবের যে চিন্তারাশি অক্ষরে অক্ষরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে আমি তাহা নিজ মস্তিষ্কে ধারণ করিতেছি। আজ তোমাদের সকলের চেয়ে আমি বড় একথা স্বীকার করিবে কি?

"কিন্তু তুচ্ছ এই জগৎ, তুচ্ছ হে মানব তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য, তুচ্ছ এই পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ! এ জগতের সব ক্ষণভঙ্গুর, সব ব্যর্থ! এ সমস্ত মায়াজাল! আজ তুমি গর্ব্ব কর কিসের, তোমার ধন, তোমার মান, তোমার সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে মৃত্যু একদিন অধিকার করিয়া লইবে। তবে গর্ব্ব কিসের?

"হে মানব, আজ তুমি মিথ্যা মায়ায় ভুল পথে ঘুরিয়া মরিতেছ। আজ তুমি সত্যকে ছাড়িয়া মিথ্যাকে বরণ করিয়াছ, সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া কুৎসিতের পূজায় রত রহিয়াছ, আজ আপেল গাছে কমলা জন্মায়, যদি গোলাপ ফুলে ভাগাড়ের গন্ধ আসে, যদি ধান গাছে আম জন্মে তবে তুমি খুব আশ্চর্য্য হও? না? আমিও তেমনি তোমায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, হে মানব আজ তুমি স্বর্গ ছাড়িয়া নরকের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছ।

"তোমরা ভাবিতেছ আমি মিথ্যা বলিতেছি, আমি প্রলাপ বকিতেছি। কিন্তু তোমরা যে জন্য আজ বাঁচিয়া রহিয়াছ আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। আমি শুধু কথায় নয় কাজেও দেখাইব। পনর বছর পূর্ব্বে যে দুই লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিয়া আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিতে-ছিলাম আমি আজ তা তুচ্ছ মনে করি। আমি সে অর্থ চাই না।

"এখনও বিশ্বাস হইতেছে না? দেখিও, আমি সর্ত্ত ভঙ্গ করিব—সে অর্থ, সেই দুই লক্ষের আশা আমি ত্যাগ করিব। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আমি বাহিরে আসিব। তুচ্ছ—সংসারের এই হীন আশা!"

পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধের দুই চোখ দিয়া দরদরধারে জল ঝরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বন্দীকে চুম্বন করিলেন—একবিন্দু তপ্ত অশ্রু বন্দীর মাথায় পড়িল। তারপর ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বৃদ্ধ শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন। জীবনে এর চেয়ে দুঃখ বৃদ্ধের আর কোনো দিন বুঝি হয় নাই। সারাটি রাত্রি চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ভোরের দিকটায় বৃদ্ধ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিল—বন্দী বাহির হইয়া প্রাচীর বাহিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—শীঘ্র আসুন। বৃদ্ধ লোকজন লইয়া বন্দীর কক্ষে চাহিয়া দেখেন, ঘর শূন্য, কাগজখানি তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। বইগুলি তেমনি খোলা পড়িয়া আছে। মোমবাতিটি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অন্যের অলক্ষ্যে বৃদ্ধ কাগজখানি লইয়া নিজের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। বন্দীকে আর কেহ সেখানে কোনো দিন দেখিতে পায় নাই।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা

শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রতিবেশী সুশৃঙ্খল অথবা উচ্ছৃঙ্খল জাতির সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ম-বিধির নিয়ন্ত্রণে সীমান্ত সমস্যার মীমাংসা করিতে হয়। দরিয়ুস, আলেকজান্দার, মহম্মদ ঘোরী, মহম্মদ গজনী প্রভৃতি সকলেই ভারতের এই জীর্ণ দ্বারেই আঘাত করিয়াছেন, এক কথায় বলিতে, স্থল-পথে এটি ভারতবর্ষের তোরণ দ্বার!

এই সীমান্তকে লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মেণী তুর্কীর সখ্যতায় বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত রেলপথ স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিল—বলশেভিক রুষিয়া এখনও এই জীর্ণদ্বারের দিকেই চাহিয়া আছে। কাজেই প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে এই সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে অতি সাধারণ তথ্যগুলি জানা দরকার, সন্দেহ নাই।

সীমান্ত সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে তথাকার প্রাকৃতিক আবেষ্টন, লোকসমাজের রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্পর্কে কিছু জানিতে হইবে। আমরা প্রথমে সে সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

সীমান্ত প্রদেশ পর্ব্বতময়, অনুর্ব্বর; মাঝে মাঝে অপ্রশস্ত উপত্যকা;—সে সকলই লোকের আবাস-ভূমি। প্রথমতঃ, সীমান্ত প্রদেশ বলিতে আমরা দুইটি সীমান্ত বুঝি। একটি বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ আর ডেরা ইস্মাইল খাঁ, পেশোয়ার, কোহাট প্রভৃতি শাসিত দেশের সন্ধি-স্থল আর দ্বিতীয়টি এই সীমান্তের স্বাধীন দেশ ও আফগানিস্থানের মিলন-রেখা। এই স্বাধীন দেশটির সহিত আমাদের সীমান্ত সমস্যা অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এই প্রদেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ কাবুল নদীর উত্তর হইতে 'ওয়াজিরিস্থান' পর্য্যন্ত আর-একটি শেষোক্ত প্রদেশটিই। প্রথম ভাগে 'খির' এর নবাব 'স্বৎ' এর মিরাণগুল প্রভৃতি বিশিষ্ট ও শক্তিশালী নায়ক। ইহারা নিজেদের মধ্যে অসদ্ভাবের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়াই চলিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ-বিসম্বাদ বিশেষ নাই। বিশেষতঃ জমিতে জল নিষেকের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশের জনসাধারণের—উপজীবিকার, উপায় হইয়াছে এবং জমিকর্ষণ, বীজ বপন, প্রভৃতির ব্যপদেশে তাহারা ক্রমশঃ শান্তিস্থাপনে মনোনিবেশ করিয়াছে।

কিন্তু কথা হইতেছে এই ওয়াজিরিস্থান লইয়া। দেশের লোক মুসলমান; একাধারে এমন শক্তিশালী, যোদ্ধা, কষ্টসহিষ্ণু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও রক্তলোলুপ জাতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ক্ষুদ্র দেশের নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকের দৌরাত্ম্যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে, বিপুল অর্থব্যয়ে, শান্তি সংস্থাপনের আশায় বারবার বিরাট সৈন্যদলের অভিযান প্রেরণ করিতে হইয়াছে! কিন্তু তাহাতে মাত্র সাময়িক কিছু উপকার হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশিষ্ট কোনো শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উপজীবিকা বলিতে, এইদেশবাসীর পক্ষে তেমন বিশেষ করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না। দস্যুতাকে ইহাদের প্রধান অবলম্বন বলিলেও চলে। পাষাণ-যুগের হিংস্রতা ও বর্ব্বরতা ইহাদের শিরায় শিরায়; আর বেদুইন বা মুর সম্প্রদায়ের বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তাধারা অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধি ও চিন্তা কোনোক্রমেই উন্নত নহে।

কাজেই প্রতিবেশী বিত্তশালী দেশগুলির প্রতিই ইহাদের লক্ষ্য সমধিক—সে সকল দেশের শস্য, ধন, ও রত্নাদিই ইহাদের প্রকৃত আশা ও ভরসার স্থল। ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত এই চারি বৎসরের মধ্যে অল্পাধিক ১১৯৬ বার এই পার্ব্বত্য, অসভ্য জাতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শাসিত দেশে অত্যাচারের রেখা অঙ্কিত করিয়া

গিয়াছে! এইসকল আক্রমণে তাহারা অর্থ, শস্য, অস্ত্র কিছুই বাদ রাখিয়া যায় নাই।

এই সকল লোকগুলি যেমন সাহসী তেমনি ধূর্ত্ত। ইহারা কেমন করিয়া উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী-সুরক্ষিত তাঁবু হইতেও অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ করিয়াছে, কেমন করিয়া শতসহস্র বাধার মধ্যে অলক্ষ্যে অসম্ভব কার্য্য সকল সামাধা করিয়াছে সে সকল আজকাল বোধ হয় অনেকেই জানেন। অস্ত্রচুরি ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন এবং সে-ক্ষেত্রে ইহারা অত্যন্ত কুশলী। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহাদের জনসংখ্যা ও অস্ত্র-প্রাচুর্যের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাদিগকে বিশেষ শক্তিমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (১) কিন্তু এসকল অপেক্ষা তাহাদের আবাস-স্থান-মাহাত্ম্যই অত্যধিক সহায় বলিয়া মনে করা অনুচিত হইবে না।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রভাবে এই দেশের কিয়দংশ সুশৃঙ্খলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আদিম কালের চিন্তাধারা হইতে ইহারা বিচ্যুত হয় নাই। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ ইহাদের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির অঙ্গ বিশেষ। এই ব্যাপারের ব্যপদেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে কতবার ইহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। আফ্রিদি, ওয়াজির, বা মস্থদ যাহাদের দিকেই চাওয়া যায় সকলেরই এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রলোভন সমধিক।

আদিম অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা ইহাদের অন্তরে অন্তরে। সীমান্তের যে সকল দল সভ্যতার সংস্পর্শে একটু শান্তি-স্থাপনে অগ্রসর হয়, ইহাদের দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় তাহাদের ভিতরেও প্রচ্ছন্ন বর্ব্বরতার তাণ্ডব-নৃত্য জাগিয়া উঠে আর তাহারা ক্রমশঃ অত্যাচারের পথে আত্ম-নিবেদন করে।

এই সকল ব্যাপার পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এখনও ইংরাজের অস্ত্রাগার হইতে আগ্নেয়াস্ত্র আহরণে এই সম্প্রদায় বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হয় না, মেজরই হউক বা ক্যাপ্টেনই হউক বা সামান্য পদাতিক সৈন্যই হউক, কাহাকেও হত্যা করিতে ক্ষণমাত্রও চিন্তা করে না আর সুবিধা পাইলে, স্ত্রী, পুরুষ, শ্বেতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ কাহারও উপরই অত্যাচার করিতে দ্বিধা মাত্রও নাই! যাঁহারা মেজর এলিসের স্ত্রীর হত্যা সম্পর্কে আর তাহার কন্যার অপহরণের সম্বন্ধে সংবাদ রাখেন তাঁহাদিগকে আর এই অসভ্যদের অত্যাচারের বীভৎসতা বলিয়া দিতে হইবে না।

স্বধর্ম্মী ও প্রতিবেশী বলিয়া এবং আরো অন্যান্য কারণে আফগানিস্থানের সহিত এই সম্প্রদায়ের সদ্ভাব ও সহযোগ সমধিক। কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগান আমীরের সম্পর্কের তারতম্য অনুসারে ইহাদের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমীরের শত্রুতামূলক সম্বন্ধ ছিল, ততদিন ইহাদের অত্যাচারের মাত্রা অতিশয় প্রবলভাব ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু ১৯২১ সনে আমীরের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধিপত্র পাকাপাকি স্বাক্ষর হওয়ার পর হইতে ইহাদের অত্যাচার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া বৃটিশ-শাসিত সীমান্তের অধিবাসিগণ এখনও কিছুতেই নিঃশঙ্ক হইতে পারে না, কারণ উচ্ছৃঙ্খলতা যাহাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে গ্রথিত তাহাদের পক্ষে কোনও বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুনের বন্ধনে অবিচলিত থাকা সহজ নহে; যে-কোনো কারণ উপলক্ষে, যে-কোনো ক্ষুদ্র ব্যাপার কেন্দ্র করিয়া এমন কি অকারণ রক্তলালসার উল্লাসে এই আগ্নেয়গিরির বিরাট অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হইতে পারে। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সকল ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিকের ঘটনা মাত্র। ইহারা যে কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ তাহা নিম্নে Administration Reports (1922-23 IV) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

The only serious attack of Government troops occurred in May, 1922 near Shinki, whon a strong gang of Mashuds, ambushed a patrol of 101st Grenadiers, killed 21 Sepoys and wounding four and carrying away 22 rifles and 800 rounds.

যতদিন পর্য্যন্ত না জ্ঞান ও সভ্যতার স্বর্ণালোক ইহাদের অন্তরের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিতে পারিবে ততদিন এই অত্যাচারের বীভৎসতা অবশ্যম্ভাবী। আজ বৃটিশ

(১) The population of this independent country is estimated 2,800,000 of whom half are males and 600,000 are regarded as adults and fighting men. It is safe to say that their arms have increased tenfold during the last twenty years. In 1920 they were believed to be 140,000 rifles of a modern type and this number has now been increased.

Round Table (Dec) 1926.

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ প্রাথমিক ভাবে সেইদিকেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন শিখ-সম্প্রদায়ের হাত হইতে বর্ত্তমান শাসিত সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করেন, তখন তাহাদের সেই সীমান্ত সম্পর্কে কোনো জটিল প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা ছিল না। তাই সকল প্রদেশ একজন ডেপুটী কমিশনারের অধীনে রাখা হইত। লর্ড ডালহৌসী একবার এই প্রদেশ সুসংরক্ষণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণেল ম্যাকসনের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সে বাসনা মনোমধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইল।

সীমান্ত সমস্যা-সম্পর্কে কোনো কথা তুলিতেই সর্ব্বাগ্রে মেজর স্যাণ্ডিম্যানকে মনে পড়ে। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বলেই বেলুচিস্থানের শান্তি সংস্থাপন সম্ভব হইয়াছিল; তাঁহার অদম্য সাহস ও অসীম বুদ্ধিমত্তার কথা সর্ব্বজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা চিরদিনই বলিয়াছেন, মেজর স্যাণ্ডিম্যানের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসরণে ক্রমশঃই সীমান্ত সমস্যার সমাধান হইবে আর প্রকৃতপক্ষে অধুনাতন প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত রীতির সঙ্গে তাঁহার নীতির বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। (১)

তিনি সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেথাকার দলপতিদের সঙ্গে সর্ত্তবদ্ধ হইলেন; এমন অসম সাহসিকতার, এমন নিশ্চিত মৃত্যুর ক্রোড়ে অবলীলাক্রমে পাদক্ষেপে সাহস হইয়াছিল বলিয়াই তখন বেলুচিস্থানে অভূতপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব শান্তি সংস্থাপন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

কিন্তু আজকাল আর-একটা কথা আছে। অনেকে বলেন, বেলুচিস্থানে তখন সেই অসভ্যদের দল ছিল, দলপতি ছিল; কাজেই সর্ত্তস্থাপনে সুবিধা হইত। কিন্তু আজকাল মসুদ বা ওয়াজিরদের দলপতি বলিতে কিছু নাই, দেশের বৃদ্ধদের কথা সর্ব্বদা তাহারা মানে না পরন্তু উত্তেজনার সময়ে যুবকদের কথাই সর্ব্বথা উন্মাদনার মূলভিত্তি; কাজেই আজকাল সেই পূর্ব্বতন রীতি-পদ্ধতির অনুসরণে শান্তি সংস্থাপন সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। এ সন্দেহ যে একেবারে অমূলক নহে তাহা ১৮৯৭ সালের বিদ্রোহে প্রকাশিত হইয়াছে। (১)

লর্ড কার্জ্জন এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেন, আর করিবারও অবশ্য কারণ ছিল। বহির্জ্জগতের আক্রমণ-ভীতি আর স্থানীয় অরাজকতা তাঁহাকে এই কার্য্যে প্ররোচিত করে। তিনি পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে সে প্রদেশের শাসনভার হস্তান্তরিত করিয়া সেখানে এক অনিয়মিত সৈন্য দল গঠন করেন। সীমান্ত প্রদেশে রাস্তা, রেল পথ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া সেখানে বহির্জ্জগতের সম্পর্ক আনয়ন করেন। তাহাতে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হইল, উপরন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিকাশ ও সভ্যতা বিস্তারের সুবিধা হইতে থাকিল। এবং এক কথায় বলিতে গেলে তিনি ক্রমশঃ সে দেশের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা রক্ষার ভার তাহাদের উপরই প্রায় ন্যস্ত করিলেন —অবশ্য তাহাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই ছিল বটে। (২)

কার্জ্জন নীতির দোষগুলি বাস্তবক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ সেগুলির আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

১৮৩৮ সালের অফগান যুদ্ধের পর হইতে সীমান্ত সমস্যা আর শুধু স্থানীয় সমস্যা না থাকিয়া ব্যাপক ভাব ধারণ করিল বিশেষত রুষের উদ্‌গ্রীব ও লোলুপ দৃষ্টির প্রাচুর্য্যে সে সমস্যা ক্রমশ বিরাট ভাব ধারণ করিল। কিন্তু ইহার সমাধান দুইদল দুইভাবে করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, একেবারে আফগানিস্থানের সীমানা পর্য্যন্ত দখল কর—সে দেশ সুশাসিত কর; ইহারা চরমপন্থী। তাঁহাদের মতে, রুষ যদি ভারতে প্রবেশ করিতেই চায় তবে তাহাকে ভারত সীমায় আসিবার পূর্ব্বেই বাধা দেওয়া দরকার—একেবারে শেষ পর্য্যন্ত আসিতে দেওয়া কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

অন্যদল—তাঁহারা নরমপন্থা—বলিলেন, ইংরাজ ভারতের সীমানায়ই থাকুক। যদি রুষ আসে তবে তাহাকেও

(১) British Dominion in India—Lyall.

(১) India 1925. p. 218.

(২) The essence of his policy which he avowedly borrowed from Beluchistan was to make the tribesmen themselves responsible for the maintenance of order.

তো এই অশেষ বিপদসঙ্কুল অসভ্যদের মধ্য দিয়া আসিতে হইবে ; তাহাতে আসা কি এত সহজ হইবে ?

এই চরমপন্থী ও গরমপন্থী দলের তর্কবিতর্ক অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার কোনো সুমীমাংসা হইয়া উঠে নাই ; তবে অধুনাতন যে নীতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে তাহাকে এই উভয়দলের মধ্য পন্থা বলিতে পারা যায় বটে।

এই স্থলে ১৯১৯ সালের আফগান যুদ্ধের কথা না বলিলে আজকালকার প্রচলিত নীতি সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না। আমরা প্রথমত তাহারই অনুসরণ করিব, কিন্তু প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, আফগানিস্থানের সহিত এই অসভ্যদের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে।

১৯১৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী কাবুলের আমীর হবিবুল্লা খাঁকে হত্যা করা হয়। তখন দেশে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছিল ; একদল এই হত্যাকে সমর্থন করে অন্যদল তাহাদের বিরুদ্ধবাদী। হত্যার সমর্থনকারিগণ মৃত আমীরের ভাই নসরুল্লাখাঁকে মসনদে বসাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে সমস্ত আফগানিস্থানে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে, ফলে হবিবুল্লার পুত্র আমিনুল্লা খাঁকে তক্তে বসান হয়।

আমিনুল্লা যখন আমীর হইলেন, তখন ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খলা, দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতা, বিদ্রোহ! এই অন্তর্মুখী বিদ্রোহকে বহির্মুখী অভিযানে পরিবর্ত্তিত করিতে তিনি চেষ্টিত হইলেন। তিনি আফগানদের মনের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই এ পরিবর্ত্তনে অন্তর্বিপ্লব মিটিল সত্য ; কিন্তু তাহাতে যে প্রবল বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল তাহার ফল আফগানদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলময় হইল বলিয়া মনে হয় না।

ইহাতে বিশেষ করিয়া ইন্ধন জোগাইল তখনকার ভারতের অবস্থা। পাঞ্জাব প্রদেশে তখন বিশেষ গোলযোগ ; আমীর মনে করিলেন, ভারতবর্ষ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। এখন ভারতের পিছে দাঁড়াইলে, আফাগানিস্থানের সাময়িক অন্তর্বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হইয়া বৃহত্তর আফগানিস্থান স্থাপন সম্ভব হইবে, সন্দেহ নাই।

এই আফগান যুদ্ধের শেষ হইল ৮ই আগষ্ট তারিখে ; কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল ১৯২১ সনের নভেম্বরে। এই সন্ধিপত্রে অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে কাবুলে, কান্দাহারে ও জালালাবাদে ইংরাজ-প্রতিনিধি স্থাপন এবং লণ্ডন, কলিকাতা ও করাচীতে আফগান-প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠার বিধি হইল। ঐ যুদ্ধাভিযানের অন্তরালে আমীরের পশ্চাতে রুষিয়ার বলশেভিক্ দলের বিরাট প্ররোচনা ও একান্ত প্রচেষ্টার পরিকল্পনা ভিত্তিহীন নহে ; আমরা সেকথা পরে লক্ষ্য করিব।

১৮৯৩ সালে সীমান্ত প্রদেশে ইংরাজের দায়িত্বহীন প্রদেশের একটি সীমা নির্দ্দেশ হয়। এটিকে চল্‌তি কথায়, নির্দ্দেশকের নামানুসারে "ডুরাণ্ড লাইন" (Durand Line) বলা হয়। এখন পর্য্যন্ত সে সীমা পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

অধুনাতন সীমান্ত-নীতির মূলভিত্তি, 'ওয়াজিরিস্থানে'র সভ্যতা বিকাশ ও প্রসার আর আফ্‌গানিস্থানে আমীরের সহিত সখ্যতা। ওয়াজিরিস্থানের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় সেখানে বিপুল অর্থব্যয়ে পথ-প্রণালী প্রস্তুত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ দেশের অভ্যন্তরে ইংরাজের প্রভাব প্রসার করিবার ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই একান্ত অসভ্য ও রক্তলোলুপ জাতিকে করায়ত্ত করিতে প্রকৃষ্টরূপে সাহায্য করিতেছে নূতন একদল স্কাউট আর খাসাদার (Khassadar) সৈন্যদল। অবশ্য দুইই সেই দেশের লোকদ্বারাই গঠিত বটে।

সম্প্রতি এই স্কাউট ও সৈন্যদল উভয়েরই প্রসার হইতেছে (১) ইহার ফল যে অত্যন্ত শুভ হইবে তাহা ধারণা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেও এই প্রকার সৈন্যদল ছিল ; কিন্তু ইহার সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পূর্ব্বে যে সৈন্যদল ছিল

(১) This year witnessed the expansion of the Tochi Scouts and South Waziristan Scouts from less than 2000 to 4974.

Administration Reports 1923 (v)

তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট আগ্নেয়াস্ত্র দিত, ফলে গোলমালের সময়ে তাহারা সেই সকল অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া পলায়ন করিত, তাহাতে একাধারে কেবল যে অস্ত্র ও সৈন্য বিয়োগই হইত তাহা নহে, উপরন্তু বিদ্রোহী দলের ঐ দুইটি জিনিষেরই পুষ্টিসাধন হইত। এই সমস্যার সমাধানে এখন আর "খাসাদার" দিগকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করা হয় না, তাহারা নিজেরাই তাহাদের অস্ত্র লইয়া আসে। কাজেই কোনো গোলযোগের সময় দুই প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা যে বেশ ভালভাবে কাজ করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এই খাসাদারগণ সেখানে মাত্র পুলিসের কার্য্য করিয়া থাকে; আমাদের এখানে যেমন পুলিসের পশ্চাতে বিরাট সৈন্য-বাহিনী, সেখানেও তেমনি।

এই তোরণদ্বারের উপর বলশেভিক দলের দৃষ্টি ও তাহার অধিকার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখন সে কথা আরও বিস্তৃতভাবে বলা দরকার কারণ বর্ত্তমান যুগে তাহাদের এ প্রয়াসের মূল্য সমধিক—ব্যাপারটা সার্ব্বজনীন।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ইংরাজের সাম্রাজ্য ভঙ্গের দিকে। তাহারা স্পষ্টই একথা বলিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাহাদের Super Cabinet-এর সদস্য Zinoviev এর বক্তৃতা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই তাহাদের চিন্তার ধারা ও কার্য্য-প্রণালী প্রকাশিত হইবে।"

"We are at war with the British Empire. Our first weapon to propaganda and our Second, force of arms. The schalles heel of the British Empire is India. We must therefore make every effort to develop all possible lines of advance leading on to India ***"

— "আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছি। এই যুদ্ধে আমাদের অস্ত্র দুইটি প্রথমতঃ নীতি-প্রচার আর দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রশস্ত্র। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তিভূমি ভারতবর্ষ, কাজেই আমরা যাহাতে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারি সর্ব্বপ্রকারে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।"

ইহা হইতে অধিকতর স্পষ্টভাবে আর কি বলিতে হইবে? সত্য কথা বলিতে, এই একটি মাত্র দ্বারকে লক্ষ্য করিয়া এখনও বলশেভিক দলের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, আর ভবিষ্যৎ যুগও এই প্রবেশ-পথে অগ্রসর হইবার সাধনা হইবে, সন্দেহ নাই।

এই পথটিকে কেন্দ্র করিয়া সাম্যবাদীদের কার্য্য প্রণালী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কাবুলে তাহাদের একটি প্রকাণ্ড সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং আফগানদিগকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাগুলি প্রভৃতি সরবরাহ করা হইতেছে আর ক্রমশঃ কাবুল গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের সংস্পর্শে বিপুল শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। (১) এই বিরাট সমস্যার যে কবে সমাধান হইবে কে বলিতে পারে? তবে মনে হয়, উড়ো-জাহাজের কল্যাণে হয় ত অদূর ভবিষ্যতে একটা সহজ সমাধানের পথ আবিষ্কার হইতে পারে।

জগতের রাজনৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাতে, ভারতের এই আদিম তোরণদ্বার দেশী ও বিদেশী উভয়ের চক্ষেই একটা প্রকাণ্ড "কুরুক্ষেত্র" হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে এখানে বিপ্লববাদের রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু কবে হইবে কে জানে? কে বলিতে পারে? *

(১) Their legation in Kabul is in charge of an able minister, large subsidies in kind, in the shape of arms and munitions are given by the Soviet to the Afgans. The Afgan Air Force is growing stronger by the effectual aid of the Soviet and contemplating passage to India by those Frontier lines.

The Statesman, 9th July. 1926.

* 'ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা" প্রবন্ধের লেখক সম্ভবত বিষয়টি গভীর ভাবে ও সকল দিক দিয়া অধ্যয়ন না করিয়াই লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখা পাঠ করিলে মনে হয় যে তিনি বৃটিশ লিখিত রিপোর্টনিচয়কে অভ্রান্ত বিবেচনা করেন। এই কারণে তাঁহার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীদিগের প্রতি একটা বৃটিশ-সুলভ 'বিদ্বেষভাব দেখা যাইতেছে। ইহা সমর্থন-যোগ্য নহে। তাঁহার প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে; কিন্তু তাঁহার মতামত সর্ব্বত্র বিচারসহ ও ইতিহাসসঙ্গত নহে।
বারান্তরে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। —সম্পাদক



মহাত্মা গান্ধীজির সঙ্গে সাত মাস—শ্রীকৃষ্ণদাস। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ও প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী যখন সারা ভারতবর্ষে অসহযোগের মন্ত্র প্রচার করিয়া ভারতকে নব দীক্ষা দান করিয়া ঘুরিতেছিলেন সে-সময় যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী ও সহকর্ম্মী ছিলেন বর্ত্তমান লেখক তাঁহাদের একজন। গান্ধীজির ভ্রমণ-কালে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য পাওয়ায় লেখক এই স্থিতধী প্রাজ্ঞ সাধু শিরোমণি মহাত্মার দৈনন্দিন জীবন ও কর্ম্মশক্তির সবিশেষ পরিচয় লাভ করেন। সেই পরিচয় তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিবরণটি "আনন্দবাজার পত্রিকায়" বহু দিন ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনই ইহা পাঠক সাধারণের চিত্ত আ'র্ষণ করে। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিজ জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছেন, তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিত-লেখকের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান নহে, কেননা গান্ধীজি আত্মকাহিনীতে নিজেকে সঙ্কোচে ও সংক্ষেপে প্রকাশ কারয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকে গান্ধীজির জীবনের খুঁটিনাটি বহু ব্যাপার সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে বুঝিবার পক্ষে পুস্তকটি বিশেষ সাহায্য করে। এই পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই—কখনও সিদ্ধিলাভে গান্ধীজি উজ্জ্বলমুখ, কখনও অকৃতকার্য্যতায় ম্রিয়মান, কখনও সহস্র কর্ম্ম ও উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে যোগীর ন্যায় মৌন ও তপস্যামগ্ন, কখনও বা সারল্যে শিশু এবং শুচিতায় মহান্। বর্ত্তমান ভারতের গুরু এই কর্ম্মযোগী মহাপুরুষের জীবন অতি সুন্দর সরল ভাবে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার দৈনন্দিন অভ্যাস, হাস্যরসপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও আচার-ব্যবহার কিছুই ইহাতে বাদ যায় নাই। পুস্তকটি এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, উপন্যাসের মতই ইহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় আগ্রহে ও আনন্দে ভাসিয়া যাইতে হয়।

পুস্তকটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে। গান্ধীজির একখানি চিত্রও ইহাতে আছে।

ক্ষয়-রোগের আক্রমণ ও আরোগ্যের উপায়—শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র বসু। স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। আট আনা।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের বাঙালী জাতির প্রতি প্রীতি ও তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি-প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। খাদ্য ও স্বাস্থ্যের কিরূপ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণে এই নিস্তেজ অবসন্ন জাতিকে শক্তিমান ও প্রফুল্ল করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে গ্রন্থকার মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে একটি ভয়াবহ রোগ বাঙালীর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহারই বিশদ আলোচনা ও সবিশেষ প্রতিকারের পথ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধন করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় যক্ষ্মার প্রভাব; ক্ষয়-জীবাণুর বিবরণ; সংক্রমণ ও প্রতিরোধ-শক্তি; ফুসফুসের যক্ষ্মা; অন্যান্য স্থানের যক্ষ্মা; চিকিৎসা; রোগীর কথা; যক্ষ্মার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রতিষেধ; ইত্যাদি শীর্ষক অধ্যায়ে পুস্তকটি রচিত। মোটের উপর, যক্ষ্মা রোগ ও রোগী সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙালীর জীবনমরণসমস্যামূলক এমন বিশদ অথচ সংক্ষিপ্ত, সরল ও সর্ব্বজনবোধগম্য ক্ষয় রোগ সম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক বাংলা ভাষায় আর আছে কি না সন্দেহ। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই পুস্তক পঠিত হওয়া উচিত, কেননা ভয়াবহ ক্ষয়-রোগ আজ বাঙালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

গোবিন্দ-মন্দির—শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ দাশ মজুমদার। প্রকাশক শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র দাশ মজুমদার, পোঃ আঃ ইছাপুর, ঢাকা। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

সামাজিক উপন্যাস। ধর্ম্মের নামে বাঙালীর ব্যভিচার, দেবতার কাছে জাত-বিচারের গোঁড়ামি এবং অসহায়া ধর্ষিতা-বঙ্গনারীর প্রতি হিন্দু সমাজের ঘোরতর অবিচার, প্রভৃতি অন্যায়ের প্রতিবাদে এই উপন্যাস রচিত। কিন্তু লেখার ভাব ও প্লট একেবারে এলোমেলো, সেকেলে, জোড়াতালি-দেওয়া। তাহার উপর, লেখকের ভাষা কদর্য্য।

সত্যের-সন্ধান—শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায়। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রকাশক—শ্রী প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি-এল, মল্লিকপুর হিন্দু লাইব্রেরী, যশোহর।

নাটক—মিনার্ভায় অভিনীত। লেখা ভাল। অরিন্দম, কবি, রাজা প্রভৃতি কয়েকটা চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। কিন্তু চন্দন ও পুরোহিতের চরিত্র কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। নাটকের শেষটা চিত্তাকর্ষক। পিয়ারীর সরলতায় আমরাও মুগ্ধ।

সতী-ধর্ম্ম—(স্ত্রীশিক্ষা-মূলক)—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায়। মূল্য একটাকা চারি আনা মাত্র। প্রকাশক শ্রী রমেশচন্দ্র পাল বি-এ, যুগবার্ত্তা পাব্লিশিং হাউস, ৪ নং ছকু খানসামার লেন, কলিকাতা।

বইখানি "স্ত্রী-শিক্ষামূলক" হইলেও সুধু "স্ত্রী-পাঠ্য" নয়। লেখক স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষার কথাই ইহাতে বেশী। প্রথম খণ্ডে "শাস্ত্রোক্ত প্রাচীনা নারী-ধর্ম্ম"

"স্ত্রী ধর্ম্মের বিশেষত্ব', "প্রাচীন যুগের অনুশাসন", "প্রাচীন গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম" প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে "সেকাল ও একালে"র তফাৎ কি ও সেকালের রীতি কোন্‌টি বর্জ্জনীয় ও কোন্‌টির কতখানি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, "বর্ত্তমান সমাজে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিরূপ" লেখক যথাসাধ্য তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু লেখক পাতিব্রত্যের উপরই আগাগোড়া ঝোঁক দিয়াছেন। নারী পতিব্রতা হইলেই সংসার মধুময় হইয়া উঠে, খাঁটি সত্য-কথা। কিন্তু স্বামীদের সম্বন্ধেও তো বলিবার কিছু আছে। লেখকের লেখার মধ্যে এরূপ ভাবই আগাগোড়া আছে যে, স্বামী যেমনই হোন, স্ত্রী সেই স্বামীকে দেবতা ছাড়া আর কিছুই ভাবিবে না। স্বামী যদি মদ্যপ, চরিত্র হীন, কপট, নীচমনা, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারী, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্কশ-স্বভাব, বা জুয়াচোর—এইরূপ যে কোনও প্রকৃতির হন তাহা হইলেও যে স্ত্রী তাঁহার মতেই মত "ও তাঁর ধর্ম্মই ধর্ম্ম" বলিয়া মানিয়া লইবে, এ কথা এখনকার দিনে চলিবে না। মিষ্ট কথায় স্বামী সৎপথে না আসিলে কঠিনভাবে তাঁহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করাও স্ত্রীর ধর্ম্ম। তবে স্বামীর অন্যায়ের জন্য স্ত্রী যতই কঠিন হোন না কেন, যে-নারী স্বামীর সুখ দুঃখের সমভাগিনী হন না তিনি দুর্ভাগিনী। কারণ হিন্দুনারীর স্বামীর অপেক্ষা আত্মীয় জগতে কেহ নাই। তবে "দেবতা ও দাসী" স্বামী-স্ত্রীর এভাবটা এখন আর কেহ মানিবে কি ?

তথাপি পুস্তকটি অতীব সারবান। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হইলে বোধ হয় এই সব শিক্ষণীয় সৎগ্রন্থের আদর নারীসমাজে ব্যাপক ভাবে হইবে না। কারণ, আমাদের সহিত কতকগুলি মতের অমিল থাকিলেও বহু অমূল্য উপদেশ ইহাতে আছে। ছাপা ও বাঁধাই খুব ভাল।

যন্ত্রপুরী—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়। দি বুক ষ্টল, পি ৮১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। দাম ১৲ টাকা মাত্র।

একটি জার্ম্মান উপন্যাসের ছায়ায় রচিত। লেখা বেশ সহজ সরল; অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জার্ম্মান নামগুলি থাকিলেই ভাল হইত। নায়ক-নায়িকার বাংলা নাম করিতে গিয়া লেখক গল্পটাকে আজগুবি করিয়া ফেলিয়াছেন। 'আরতি' যে মেয়েটি তাহার কোনই পরিচয় নাই কেন ? আর বাংলায় এরোপ্লেন এত সস্তা হয় নাই যে, "হরনাথ" এরোপ্লেন চড়িয়া পালাইবে। এবং এরোপ্লেন শুষ্ক মাঠে পড়িবার পর সেখানে চাষার মেয়ের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেবা করাটাও বাংলা দেশের পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার. বাংলা নাম চালাইয়া লেখক পাঠককে এই বিপদে ফেলিয়াছেন। অতএব লেখক যদি নামগুলি বিদেশীয় রাখিতেন তাহা হইলে বইটি আরো ভাল লাগিত।

সত্যের-আভা ; ফুল-বাটিকা—শ্রীআশুতোষ মিত্র। ১ নং শ্যামপুকুর লেন হইতে এ, মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে পাঁচসিকা ও ১৲ টাকা।

উপন্যাস ও গল্পের বই। এরূপ অলৌকিক ভাব ও অদ্ভুত ভাব এ যুগে একেবারে অচল।

অজয়—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। প্রকাশক হিরণ পাব্‌লিশিং হাউস, ৪০, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

রচনার সরলতা ও স্বচ্ছতাই কুমুদরঞ্জনের প্রধান বিশেষত্ব। আধুনিক কালের কবিদিগের মধ্যে কেহই বাংলার পল্লীর সুর ও তাহাদের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কথা কুমুদরঞ্জনের মত আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠ করিলে পল্লীজননীর অমল স্নেহধারায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি সম্বন্ধেও আমাদের ইহাই বক্তব্য। বর্ত্তমান পাঁচোয়া অতি আধুনিক সাহিত্যর দুর্গন্ধের মধ্যে পল্লীর এই সৌরভ প্রাণে স্বস্তি আনে।

কুমুদরঞ্জন কবিতার মিল ও ছন্দ সম্বন্ধে সব জায়গায় অবহিত হন না ইহা দুঃখের কথা। আমরা এদিকে কবির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ঋষিদের প্রার্থনা—শ্রী সুধীরকুমার দাশ। প্রকাশক শ্রীসুশীলকুমার দাশ, ৭.১ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বারো আনা।

গ্রন্থকারের ভূমিকার কিয়দংশ উদ্ধার করিলেই পুস্তকটির পরিচয় পাওয়া যাইবে—"...উপনিষৎ শাস্ত্রে মোট ১৭টি প্রার্থনা দেখা যায়। ইহার সঙ্গে ব্রহ্মের স্তব ও প্রণাম মন্ত্র ৩টি, ব্রহ্মজ্ঞানীর বিরাট আত্মা-নুভূতির মন্ত্র ১টি এবং শান্তিপাঠ মন্ত্র ৬টি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অতি প্রসিদ্ধ ঋক্‌-সংহিতার একটি ও যজুঃ সংহিতার ৩টি প্রার্থনা মন্ত্র এবং...গায়ত্রী মন্ত্রটিও দেওয়া হইয়াছে। সঙ্কলন শেষ করা হইয়াছে, প্রশ্নোপনিষদের ঋষি-প্রণাম-মন্ত্র দ্বারা। পুস্তিকাখানি প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের প্রার্থনা হইলেও এইজন্য নাম করা হইয়াছে 'ঋষিদের প্রার্থনা'।"

পুস্তকটির প্রত্যেক বাম পৃষ্ঠায় অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহিত একটি করিয়া উক্ত মন্ত্র বা প্রার্থনা, এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠায় সেই মন্ত্র বা প্রার্থনার পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সংগ্রহ, বিন্যাস ও পদ্যানুবাদে গ্রন্থকারের যথেষ্ট পরিশ্রম বুদ্ধি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে ভারত গৌরবমূলক গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব দূর করিয়াছেন। পুস্তকটি পাঠক সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার যোগ্য।

পুস্তকটির প্রচ্ছদপট ভাল হয় নাই।

বিষপান—শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য। সি, টী, এজেন্সী, ১ ডালিমতলা লেন, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

উপন্যাস কলিকাতার কুহকিনীদের মোহে পড়িয়া কি করিয়া লোকে ধীরে ধীরে জাহান্নমের পথে নামিয়া যায় ও পরে তিলে তিলে অনুতাপে পুড়িয়া মরে, ইহাই লেখক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখার মাঝে মাঝে অসঙ্গতি আছে। লেখক কলিকাতার বস্তির যে চিত্রটি দিয়াছেন তাহা চমৎকার।

গুপ্ত



লালা লাজপৎ রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৩৫ | ৩য় সংখ্যা

শেষের কবিতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেচে। টেবিলে এক দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চল্‌চে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী সুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকাল বেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো—সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না ক'রে সে থাক্‌বে কি ক'রে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয়, তার কারণ, একদিকে সংসারে সে মরে, আর একদিকে মানুষের মনে সে নিবিড় ক'রে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন একদিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর একদিকে সে উঠেছিল তীব্র ক'রে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেন না পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটুতে পারে, তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেচে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়্‌চে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেচে পাৎলা হ'য়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "এ কী অন্যায় মাসিমা!"

"কেন, বাবা, কী করেচি?"

"আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন?"

"শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন?"

"শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।"

"এমন ভেদবুদ্ধি কেন, বাছা?"

"নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য্য দিয়েই ঐশ্বর্য্য দাবী করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্ব্বাদ। মানব-সভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা জাগিয়েচেন ঐশ্বর্য্য, আর মাসিমারা এনেচেন আশীর্ব্বাদ।"

"দেবীকে আর মাসিকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে, অমিত; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।"

"এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ কাব্যকে বলেচেন ক্রিটিসিজম্ অফ্ লাইফ্, আমি কথাটাকে সংশোধন ক'রে বল্‌তে চাই লাইফ্‌স্ কমেণ্টারি ইন্ ভার্স্। আত্মাবশেষকে আগে থাক্‌তে জানিয়ে রাখি যেটা পড়তে যাচ্ছি সে লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়:—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস্‌নে তা'রে,
সিক্ত চোখে যাস্‌নে দ্বারে।

ভেবে দেখ্‌বেন, ভালবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনি আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আন্‌বি যবে
মাল্যবদল তখন হ'বে,
পাত্‌বি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধূলায় পথের ধারে?

সেই জন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী। এই ভিজে খবরের কাগজগুলো? আজকাল সম্পাদকী কালীর দাগকে সব চেয়ে ভয় করি। কবি বল্‌চেন, ডাক্‌বার মানুষকে ডাকি, যখন জীবনের পেয়ালা উছ্‌লে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার সরিক হ'তে ডাকনে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস্ নিত্য ধনে,
লক্ষ শিখায় জ্বল্‌বে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে॥

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটীরে তারি কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক ক'রে রেখেচি এই কুটীরের নাম দেবো মাস্‌তুতো বাঙলো।"

"বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্য্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা। এ কুটীরেও তোমার সে সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়্‌বে না। বর পাইনি ব'লে নিজেকে ভোলাচ্চ? মনে মনে নিশ্চয় জানো পেয়েচ।"

এই ব'লে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখ্‌লেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বল্‌লেন, "তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক্।"

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর্‌লে। তিনি বল্‌লেন, "তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।"

ব'লে গাড়ি ক'রে ফুল আন্‌তে গেলেন। অনেকক্ষণ দুইজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ ক'রে ব'সে রইল। একসময়ে অমিতর মুখের দিক মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন?"

অমিত উত্তর দিলে, "কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আন্‌তে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না ব'লে বাদ্‌লার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেচে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধজল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটুচি নে ভাব্‌চ? সে অকূল কোনোকালে কি পার হ'ব?

For we are bcund where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো
　　যায় নি নেয়ে সাহস করি,'
ডুবি যদি ত ডুবি না কেন,
　　ডুবুক্ সবি, ডুবুক্ তরী॥

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা ক'রে ছিলে?"

"হাঁ, মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেচি। মনে হয়েচে কত অসম্ভব দূর থেকে যে আস্‌চ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।"

"বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটাতে ছিল এতকাল তোমাকে না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত্ত। ঐখানটা ছিল সব চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভ'রে উঠ্‌ল—তারি উপরে আলো ঝলমল্ করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ সেইখানটাই হয়েচে সব চেয়ে সুন্দর। এই যে আমি ক্রমাগতই কথা ক'য়ে যাচ্চি এ হচ্চে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণ-সরোবরের তরঙ্গধ্বনি, একে থামায় কে!"

"মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে?"

"মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বল্‌তে চাচ্ছিলুম,—কোথায় সেই কথা! আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়্‌চে আর আমি কেবলি বলেচি, কথা দাও, কথা দাও!

O what is this?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be

Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.

এ কি রহস্য, এ কি আনন্দরাশি !
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিঃশ্বাসি,
তবু সে সরল যেনরে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

ব'সে ব'সে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা ক'রে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম,—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া !

যা'কে না হ'লে চলে না, তা'কে না পেয়ে কি ক'রে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়! উপরে চেয়ে কখনো বলি, কথা দাও, কখনো বলি, সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ-ভুল করেন, খামকা আর কাউকে দিয়ে বসেন,—হয় তো বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।"

লাবণ্য হেসে বল্লে, "রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার ক'রে তাঁকে স্মরণ করে না।"

"বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকচি, না? আমার মধ্যে বকুনির মন্‌সুন্‌ নেমেচে। ওয়েদার রিপোর্ট যদি রাখো তো দেখ্‌বে এক একদিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কল্‌কাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে ক'রে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাস্‌তে হাস্‌তে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

এমন সময় ডালিতে ভ'রে যোগমায়া সূর্য্যমুখী ফুল আন্‌লেন। বল্লেন, "মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।"

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিষকে বাইরে শরীরে দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোল্‌বার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বল্লে, "বন্যা একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।"

লাবণ্য বল্লে, "কী দরকার, মিতা!"

"তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েচ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারিনে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েচে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইসারা; ভালোবাসার যত কিছু আদর, যত কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ যত অনির্ব্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো; সে কথাটি শুধু এই, 'পেয়েছি।' আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মাণিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক্‌ না।"

লাবণ্য বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই থাক্।"

"কল্‌কাতা থেকে আন্‌তে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাসো।"

"আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাক্‌লেই হবে।"

"আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।"

১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হ'য়ে গেল আগামী অঘ্রাণ মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কল্‌কাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বল্‌লে, "তোমার কল্‌কাতায় ফের্‌বার দিন অনেককাল হোলো পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চ'লে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।"

"এমন কড়া শাসন কেন?"

"সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখ্‌বার জন্যে।"

"এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি ব'লে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ কর্‌চি ফিলজফার ব'লে। চমৎকার বলেচ। সহজকে সহজ রাখ্‌তে হ'লে শক্ত হ'তে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় ক'সে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা কালই চ'লে যাব, একেবারে হঠাৎ এই ভরা দিনগুলোর মাঝখানে মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চম্‌কে থেমে-যাওয়া লাইনটা—

—চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।

শিলঙ থেকে আমিই না হয় চল্লুম কিন্তু পাঁজি থেকে অঘ্রাণ মাস তো ফস্ ক'রে পালাবে না। কল্‌কাতায় গিয়ে কী কর্‌ব জানো?"

"কী কর্‌বে?"

"মাসিমা যতক্ষণ কর্‌বেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা, ততক্ষণ আমাকে কর্‌তে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন ক'রে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে, বন্যা, রঘুবংশে অজ মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন?"

লাবণ্য বল্‌লে, "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

অমিত বল্‌লে, "সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্ব্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।"

"মিলনের আর্ট তোমার মনে কী রকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা কর্‌তে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক্।"

"আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর কর্‌তে

হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামী জিনিষকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা শক্ত ক'রে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।"

"দামের হিসাবটা শুনি।"

"রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ড হারবারের ঐ দিকটাতে। ছোটো একটি ষ্টীম লঞ্চ্ ক'রে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কল্‌কাতায় যাতায়াত করা যায়।"

"আবার কলকাতায় কী দরকার পড়্‌ল ?"

"এখন কোনো দরকার নেই সে কথা জানো। যাই বটে বার লাইব্রেরিতে,—ব্যবসা করিনে, দাবা খেলি। এটর্ণিরা বুঝে নিয়েচে কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপোষের মকদ্দমা হ'লে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে,—জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়—কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কল্‌কাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেচ তো ? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।"

"বুঝেচি। তাহ'লে দরকার তো আমারো আছে। আমাকেও কল্‌কাতায় যেতে হবে—দশটা পাঁচটা।"

"দোষ কি ? কিন্তু পাড়া বেড়াতে নয়, কাজ কর্‌তে।"

"কিসের কাজ বলো। বিনা মাইনেয় ?"

"না, না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি। ইচ্ছে কর্‌লেই তুমি মেয়ে কলেজে প্রোফেসারি নিতে পার্‌বে।"

"আচ্ছা, ইচ্ছে কর্‌ব। তার পর ?"

"স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, গঙ্গার ধার ; পাড়ির নীচে তলা থেকে উঠেচে ঝুরি-নামা অতি পুরোণো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বট গাছে নৌকো বেঁধে গাছ তলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরি দক্ষিণ ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধ'সে যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ করা আমাদের ছিপ্ ছিপে নৌকোখানি। তারি নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম, বলে দাও তুমি।"

"বল্‌ব ? মিতালি "

"ঠিক নামটি হয়েচে, মিতালি। আমি ভেবেছিলুম, সাগরী, মনে একটু গর্ব্বও হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মান্‌তে হোলো।......বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চ'লে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন ব'য়ে। তার ওপারে তোমার বাড়ি এপারে আমার।"

"রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব ?"

"দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম, মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।"

"দীপক।"

"ঠিক নামটি হয়েচে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব, মিলনের

সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কল্‌কাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধ্যে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাৎ দিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লজিক পড়্‌বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্চে অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।"

"আর তোমার বাড়িতে আমি ?"

"ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লে সেটা অসহ্য হবে না।"

"নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম হ'য়ে না ওঠে তাহলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরঞ্চ আমি বুরকা পরে যাব।"

"তা হোক্ কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ চিঠি চাই। সে চিঠিতে আর কিছু থাক্‌বার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি চারটি লাইন মাত্র।"

"আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ ? আমি এক-ঘরে ?"

"তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে ; চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে।"

"এইবার তোমার প্রিয় শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।"

"আচ্ছা, বেশ।" পকেট থেকে একটা নোট্‌ বই বের ক'রে তার পাতা ছিঁড়ে লিখ্‌লে :—

Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.

চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি
দখিন সাগরের সমীরণ,
যে শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ ॥"

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

"এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও"

অমিত বললে,

দেখি তোমার শিক্ষা কতদূর এগোলো।"

লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখ্‌তে যাচ্ছিল। অমিত বল্‌লে, "না, আমার এই নোট্‌ বইয়ে লেখো।"

লাবণ্য লিখে দিলে,

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।"

অমিত বইটা পকেটে পুরে বল্‌লে, "আশ্চর্য্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেচ পুরুষের। কিছুই অসঙ্গত হয় নি। শিমুল কাঠই হোক্ আর বকুল কাঠই হোক্, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।"

লাবণ্য বললে, "নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে ?"

অমিত বল্‌লে, "সন্ধ্যাতারা উঠেচে, জোয়ার এসেচে গঙ্গায়, হাওয়া উঠ্‌ল ঝিরঝির ক'রে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠ্‌ল স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদীঘি সেইখানে খিড়কির নির্জ্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেচ, তোমার এক-একদিন এক-একরঙের কাপড়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাব আজকে সন্ধ্যেবেলার রঙটা কি। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনদিন বাড়ির ছাতে, কোন-দিন গঙ্গার ধারের চাতালে · আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পর্‌ব, পায়ে থাক্‌বে হাতির দাঁতে কাজ করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেচ, সাম্‌নে রূপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পূজোর সময় অন্তত দুমাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরব। কিন্তু দুজনে দুজায়গায়। তুমি যদি যাও পর্ব্বতে আমি যাব সমুদ্রে।—এইতো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কা মত ?"

"মেনে নিতে রাজি আছি।"

"মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাৎ আছে, বন্যা"

"তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন নাও যদি থাকে তবু আপত্তি কর্‌ব না।"

"প্রয়োজন নেই তোমার ?"

"না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাকো তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে। কোন নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পার্‌বে সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল ক'রে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।"

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "তোমার কাছে আমি হার মান্‌তে পার্‌বো না, বন্যা। যাক্‌গে, আমার বাগানটা! কল্‌কাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আফিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাক্‌বে তুমি, আর থাক্‌ব আমি। চিদাকাশে কাছে দূরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পুব দেওয়ালে একখানা আয়না-ওয়ালা দেরাজ, তাতেই তোমারো মুখ দেখা আর আমারো। পশ্চিম দিকে থাক্‌বে বইয়ের আলমারী, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সাম্‌নের দিকে সেটাতে থাক্‌বে দুটি পাঠকের একটি মাত্র সার্ক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারি বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বস্‌ব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আলনার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দুহাত তফাতে। নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধর্‌ব কম্পিত হস্তে, তাতে লেখা থাকবে :—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ হাওয়া,

প্রেয়সীর সাথে যে-নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া ॥

এটা কি খাপ শোনাচ্ছে, বন্যা ?"

"কিচ্ছুনা, মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হোলো কোথা থেকে ?"

"আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ ক'রে ঐ ইংরেজ কবিতাটাকে কল্‌কাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিক্সে এম. এ পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আপাদ ভরি গয়না সমেত নব-বধূকে লোকটা ঘরে আন্‌লে, চার চক্ষে চাওয়াও হোলো, দক্ষিণে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর সংকিকে কাব্যটির সর্ব্বস্বত্বসমর্পণ করতে বাধবেনা।"

"তোমারো ছাতে দক্ষিণে বাতাস বইবে কিন্তু তোমার নব-বধূ কি চিরদিনই নব-বধূ থাকবে ?"

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বল্‌লে, "থাক্‌বে, থাক্‌বে থাক্‌বে।"

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী থাক্‌বে অমিত ? আমার টেবিলটা বোধ হচ্চে থাক্‌বে না।"

"জগতে যা কিছু টেকসই সবই থাক্‌বে। সংসারে নব-বধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাক্‌বে নব বধূ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।"

"একদিন সময় আস্‌বে, দেখাব।"

"বোধ হচ্চে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।"

(ক্রমশ)

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

শ্রী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

১

শান্তিনিকেতন ও শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর নাম এক্ষণে বিশ্ব-বিশ্রুত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পূর্ব্ববিবরণ অনেকেই অবগত নহেন। শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বকথা ও আমার জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের কিঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৭৭৮ শকে (১২৬৩ সাল) শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংসারে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নির্জ্জনবাসে কঠোর তপঃসাধনের জন্য হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। পরে অকস্মাৎ একদিন একটি পার্ব্বত্যনদীর গতিবেগ দর্শনে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে ? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবলবেগে ছুটিতেছে !

কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমিসকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ-বাণী শুনিলাম—'তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর'। আমি চমকিয়া উঠিলাম! তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল, মনে হইল আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লানভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম।"

রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। শেষরাত্রিতে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, বুক জোরে ধড়ফড় করিতে লাগিল। সঙ্গের অনুচরকে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে হৃদ্‌কম্প কমিয়া গেল—তিনি আরাম লাভ করিলেন। "ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া" ইহাই ধারণা হইল। এই সময় সিপাহীবিদ্রোহের বিভীষিকায় দেশ ছাইয়া গিয়াছিল অনেক বিঘ্ন-সঙ্কুল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ ৪১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পরেই মহর্ষির পারিবারিক ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল। কিন্তু শান্তরসাস্পদ নির্জ্জন প্রদেশে পরমাত্মার স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণায় ও দেশভ্রমণেই তিনি প্রাণের যথার্থ আরাম লাভ করিতেন। আমরা দেখিতে পাই তিনি সময়ে সময়ে কর্ম্মকোলাহল হইতে উপরত হইয়া কখন স্থলপথে, কখন জলপথে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, কাশ্মীর, দার্জ্জিলিং ও হিমালয় প্রদেশের নানা স্থানে অল্পসংখ্যক পরিচারক মাত্র সঙ্গে লইয়া একপ্রকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করিতেছেন। এক সময়ে তিনি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গুস্‌করা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে তাম্বুতে বাস করিতেছিলেন। বোধ হয় এই স্থলে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে বীরভূম জেলার বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী রায়পুরের জমিদার বাবু ভুবনমোহন সিংহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই সময় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থজাতীয় এই সিংহ মহাশয়দের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অমায়িকস্বভাব বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ভুবন বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং 'প্রেম" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুপণ্ডিত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ভায়া প্রতাপনারায়ণ বাবুর তৃতীয় পুত্র। হেমেন্দ্রবাবু ময়ুরভঞ্জ ও নীলগিরি এই দুইটি দেশীয় রাজ্যের শাসনকার্য্যে ন্যায়পরতা ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে যথেষ্ট খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে * শ্রীযুক্ত লর্ড এস, পি, সিংহ মহোদয় রায়পুর সিংহবংশের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার নামযোগে রায়পুর গ্রাম এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বীরভূম জেলার ভিতরে এই গ্রামকেই আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আদিস্থান বলা যাইতে পারে।

বোলপুর রেলষ্টেশনের উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মৃত্তিকা কঙ্কর ও বালুকামিশ্রিত বলিয়া সাধারণতঃ এই স্থানে কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। ষ্টেশনের সমতলভূমি হইতে এই ডাঙ্গাভূমি অনেক উচ্চ, এজন্য এই ডাঙ্গা ভেদ করিয়া রেললাইন প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা রেলে যাতায়াত করেন, এই প্রান্তর বা উচ্চ ডাঙ্গাভূমি তাঁহাদের নয়ন-গোচর হয় না। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কয়েকঘর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান প্রজা বসাইয়া ভুবনবাবু একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের পত্তন করেন। ভুবনবাবুর স্থাপিত বলিয়া গ্রামখানি ভুবনডাঙ্গা নামে পরিচিত হইয়াছে। বর্ষার সময় বৃষ্টির জলে ডাঙ্গার কোন কোন স্থান ক্ষয় হইয়া গভীর খাদে পরিণত হয়। ভুবন-ডাঙ্গার উত্তর ও পশ্চিম অংশে এইরূপ একটি বড় খাদ

* এই প্রবন্ধ লর্ড সিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিত।

ছিল। এই খাদের পশ্চিম দিকের ভূমি ক্রমশঃ নিম্ন। খাদের মাটী খনন করিয়া এই নিম্ন ভূমির উপরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি উচ্চ বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রামবাসীদের জল সরবরাহের ও নিম্নের কৃষিভূমির সেচনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এদেশে এই জলাশয়কে বাঁধ বলে। ইহা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা বলিয়া মনে হয়।

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে, সম্ভবতঃ সন ১২৬৮ সালে মহর্ষিদেব ভুবনবাবুর সাদর আহ্বানে তাঁহার রায়পুরের বাটীতে আগমন করেন। এই দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে মহর্ষির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল প্রান্তরে দৃষ্টি অবারিত, অনন্ত আকাশ ব্যতীত দিগ্বলয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তস্বরূপের এই উদাত্ত সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয়-মন আপ্লাবিত হইল, উন্মুক্ত আকাশতলে এই নির্জ্জন প্রান্তর তপস্যার একান্ত অনুকূল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।

পূর্ব্ববর্ণিত বাঁধ বা জলাশয়ের অনতিদূরে দুইটি সপ্তপর্ণী (ছাতিম) বৃক্ষ ছিল, এই স্থানটির পশ্চিমভাগ বহুদূর প্রসারিত বলিয়া মহর্ষিদেব প্রান্তরের এই অংশে তাম্বু স্থাপন করিয়া নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রদেশে তপঃসাধনে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এই প্রান্তরে তাঁহার মন বসিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে এই স্থানে তাঁহার তাম্বু পড়িতে লাগিল। কিছু দিন পরে এখানে স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়া সন ১২৬৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ভুবনবাবুর পুত্রদের * নিকট কুড়ি বিঘা ভূমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজানা ধার্য্য করিয়া মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে এই জনশূন্য প্রান্তরে বহুঅর্থব্যয়ে বাসোপযোগী প্রথমে একতালা পরে দোতালা পাকা ইমারত প্রস্তুত হইল, প্রয়োজনীয় গৃহোপকরণ আসবাবাদি সংগৃহীত হইল, আম জাম নারিকেল কাঁঠাল আমলকী শাল দেবদারু বকুল কদম্ব প্রভৃতি বিবিধ ফলবান ও ছায়াতরু সকল রোপিত হইল, নানা জাতীয় পুষ্পসম্ভারে প্রস্ফুটিত মালতী ও মাধবীর লতাবিতানে কঙ্করময় উষরভূমি পরমশোভাময় হইয়া উঠিল। মহর্ষি এই পরম রমণীয় উদ্যানবাটিকার নাম দিলেন "শান্তিনিকেতন"।

এই অনুর্ব্বর প্রান্তরে উদ্যান প্রস্তুত করা বহু আয়াস ও অর্থ-সাধ্য ব্যাপার। ডাঙ্গার কঙ্করমিশ্রিত মাটী তুলিয়া ফেলিয়া অন্যত্র হইতে উৎকৃষ্ট মাটী আনিয়া ঐ সকল স্থান পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। জলাশয় ব্যতীত উদ্যানের শোভা হয় না, এ নিমিত্ত একটি সুপ্রশস্ত পুষ্করিণী খনন করিতেও বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। খনিত কঙ্করময় মৃত্তিকা স্তূপীকৃত হইয়া ছোট পাহাড়ের আকারে পরিণত হইল, তথাপি এই উচ্চ ডাঙ্গায় জল উঠিল না। অগত্যা পুষ্করিণীর আশা পরিত্যাগ করিয়া জলের জন্য ভুবনডাঙ্গার পূর্ব্বোক্ত বাঁধ ও সুগভীর ইন্দারার উপরেই নির্ভর করিতে হইল। এই উদ্যানের চারিদিকের সীমানায় শাল সেগুণ মহুয়া কেন্দ্ (আব্‌লুশ্) প্রভৃতি তরুশ্রেণী রোপণ করা হয়, কিন্তু বেড়া দিয়া গণ্ডীবদ্ধ করা হয় নাই। "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" যেমন সকলের অধিগম্য, এই শান্তিনিকেতনও সেইরূপ সকল মানবের অধিগম্য, গণ্ডীবদ্ধ না হওয়ায় মহর্ষি দেবের হৃদয়ের এই উদার ভাবই সূচিত হইতেছে। ক্রমশঃ নানা-শ্রেণীর তরুরাজি উন্নতশীর্ষ ও শাখা-প্রশাখায় পরিশোভিত হইলে নানাজাতি কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীত-নিনাদে আশ্রম-কানন নিনাদিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে যে দুইটী সপ্তচ্ছদ বা ছাতিম বৃক্ষের কথা বলা হইয়াছে উহারই একটির পাদমূলে ছায়াতলে শান্ত সমাহিত চিত্তে "আনন্দরূপমমৃতং" ব্রহ্মের উপাসনার জন্য মহর্ষি শ্বেত-প্রস্তরের একটি বেদী নির্ম্মাণ করিলেন, এই উদ্যানবাটী সাধনাশ্রমে পরিণত হইল। মহর্ষিদেবের মুখে শুনিয়াছি, বেদীপ্রস্তুতের জন্য এই স্থান খনন করিবার সময় অনেক নরমুণ্ডাস্থি (skull) পাওয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসিগণকে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করিতে এই বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিতে হয়। এক্ষণে স্থানে স্থানে সাঁওতাল প্রভৃতির বসতি হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে সুবিস্তৃত মাঠ ধূ ধূ করিত, জনমানবের সাড়া-শব্দ ছিল না। দস্যুগণ এই মাঠে রাহাজানি করিত, দুই চারিটি পয়সা বা একখানি বস্ত্রের লোভে নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার নানাস্থানে

* শান্তিনিকেতনের ট্রাষ্ট্ ডিড্ দলিলে লিখিত আছে "শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহদিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি।" ইহাতে অনুমিত হইতেছে এই সময়ের পূর্ব্বে ভুবনবাবু লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ অত্যাচার সঙ্ঘটিত হইত। এই নরঘাতক দস্যুগণকে লোকে "মানমুরে" ও "ফাঁসিয়ারা" বলিত রাজশাসনে এক্ষণে ইহাদের উপদ্রব প্রায় তিরোহিত হইয়াছে।

মহর্ষির অবস্থিতিকালে শান্তিনিকেতনে একবার ডাকাতি হয়। এজন্য তিনি দস্যুদলের অবস্থাভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত দরোয়ান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। শুনিয়াছি মানকরের জমিদার বাবু হিতলাল মিশ্র একজন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ লাঠিয়ালকে মহর্ষির নিকটে পাঠাইয়া দেন। ইহার নাম দ্বারিক সর্দ্দার। দ্বারিক সর্দ্দার এই কর্ম্মসূত্রে মানকর হইতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাসস্থাপন করিয়াছিল। বার্দ্ধক্যঅবস্থাতেও এই ব্যক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্রেরা ভুবনডাঙ্গায় বাস করিতেছে। প্রায় উনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৯৫ সালে আমি যখন সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলাম, তখন দ্বারিক সর্দ্দার আশ্রমের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। তাহার বিশ্বস্ততায় নির্ভর করিয়া আমরা নির্ভয়ে বাস করিতাম। এই সময়ে একবার আশ্রমের উত্তর দিকের মাঠে রাহাজানির উপক্রম ঘটিয়াছিল। যথাস্থানে ইহার বিবরণ উল্লিখিত হইবে।

বাবু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক জীবনবৃত্তগ্রন্থের ৫৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙ্গা গ্রাম, সে গ্রামে থাকিত এক ডাকাতের দল। * * পথের মধ্যে এই বিশাল প্রান্তর, চারিদিক জনশূন্য। ডাকাতির পক্ষে এমন উপযুক্ত জায়গা আর হইতে পারে না। কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া ঐ ছাতিম গাছের তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দ্দার ধরা দিল, ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল।" তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি বোলপুরে বাস করিতাম, ভুবনডাঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লীতে ডাকাইতদলের বাস ছিল শুনি নাই। গ্রামও বেশীদিনের নহে, নামেই তাহার পরিচয়। প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুর্বৃত্ত লোকে পথিকদিগের প্রতি দস্যুতা করিত, ইহাই সম্ভবপর। জনশূন্য মাঠে ডাকাতি হয় না, রাহাজানি হয়। আর দ্বারিক সর্দ্দার "ডাকাতের দলের সর্দ্দার" রূপে ধরা দেয় নাই, চাকরী করিতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল। সুতরাং অজিতবাবুর উক্তি ভ্রমাত্মক।

কলিকাতা হইতে বোলপুরের দূরত্ব ৯৯ মাইল মাত্র। রেলযোগে অল্প সময়েই যাতায়াতের সুবিধা। এখন হইতে মহর্ষিদেব মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রেরা কেহ কেহ অনেক সময় এখানে তাঁহার কাছে থাকিতেন। মহর্ষির অন্তরঙ্গ সখা রায়পুর-নিবাসী বাবু শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করিলে মহর্ষির শান্তিনিকেতন প্রবাসের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মহর্ষি ইহাঁকে শান্তিনিকেতনের বুল্‌বুল্ বলিতেন। ইহাঁর বিষয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। "ইনি পারস্য ভাষাভিজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, আর বিশেষরূপে সুকণ্ঠ, সুগায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁর প্রেম ও ভাববিহ্বলতা ইহাঁকে অমৃত্যু সুরসাল করিয়া রাখিয়াছিল। ইনি বহু সময় শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সহবাসে থাকিয়া সেই নির্জ্জন শান্ত শান্তিনিকেতনকে ঝঙ্কারিত করিয়া রাখিতেন"।* ইনি লর্ড এস, পি, সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।

মহর্ষির প্রব্রজ্যানুরাগ অসাধারণ। বিপুল অর্থব্যয়ে প্রস্তুত এত সাধের শান্তিনিকেতন পড়িয়া রহিল। নদনদী সমুদ্র পর্ব্বত নব নব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সৌন্দর্য্যঘন পরমাত্মায় চিত্তসমাধান করিবার জন্য আবার ছুটিলেন। তিনি বাবু রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণকে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি কখন শান্তিনিকেতনে, কখন শিমলা শৈলে, কখন অমৃতসরে, কখন বক্রোটাশেখরে, কখন মসুরী পর্ব্বতে, কখন কাশ্মীরে বাস করিতেছেন, আবার

* পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী" ২১৭ পৃষ্ঠা।

কখনো বা তাঁহার জমিদারী শিলাইদহ, সাহাজাদপুর, কালীগ্রাম ও কলিকাতার বাটিতে আসিয়া বিষয়-ব্যাপার ও ব্রহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার চীন, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের কথা অনেকেই অবগত আছেন। সন ১২৯০ সালের বোধ হয় অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি পানিনায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মসূরী পর্ব্বতে গমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন এবং শোকাচ্ছন্ন পরিজন-বর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কলিকাতা গমনের উদ্দেশে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে কলিকাতা গিয়া "বাড়ীতে তিন দিন মাত্র থাকিলেন। অনন্তর বজরাযোগে পদ্মাবক্ষে বেড়াইতে বাহির হইলেন।" * ইহার পর মহর্ষি আর কখনও শান্তিনিকেতনে আগমন করেন নাই।

* মহর্ষিদেবের আত্মচরিতের পরিশিষ্ট ৩৭ পৃষ্ঠা।

গীতায় আত্মা ও জগৎ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সাংখ্যদর্শনে মৌলিক সত্তা দুই শ্রেণীর—(১) প্রকৃতি (২) পুরুষ। এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার অঙ্গাঙ্গি ভাব নাই, এক অপর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—ইহারা যেন দুইটি সমান্তরাল রেখা। পুরুষ অকর্ত্তা ও অপরিবর্ত্তনীয়। কার্য্য করে প্রকৃতি, পরিবর্ত্তন হয় প্রকৃতির। কিন্তু করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, প্রকৃতি তাহা নিজে উৎপন্ন করিতে পারে না; আবার পুরুষও কর্তৃত্ববিহীন। তবে কার্য্য আরম্ভ হইবেই বা কি প্রকারে এবং কি প্রকারেই বা কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে? ইহার উত্তরে স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। প্রকৃতির সন্নিধানে পুরুষ রহিয়াছে; ইহাতেই প্রকৃতির অন্তরে বিকার উপস্থিত হইতেছে। এই বিকারই সৃষ্টি ও সংসার।

গীতাকার এই সাংখ্যমতকে ঈশ্বরবাদে পরিণত করিয়াছেন। সাংখ্যের পুরুষ বহু; গীতাতে বহু পুরুষের স্থলে এক পুরুষ বা আত্মা গৃহীত হইয়াছে।

এই আত্মার সহিত প্রকৃতির কি সম্বন্ধ, অদ্য তাহাই আলোচিত হইবে।

আত্মা অকর্ত্তা

প্রথম প্রবন্ধেই দেখান হইয়াছে যে, গীতার আত্মা অকর্ত্তা। ইহাতে কোন প্রকার কর্তৃত্ব নাই; আত্মার স্বভাবই এই যে, ইহার পক্ষে কোন প্রকার কর্ম্ম করা সম্ভব নহে।

'কর্ম্ম করে না' এবং 'কর্ম্ম করিতে পারে না'—এই দুইটি পৃথক কথা। 'কর্ম্ম করে না' বলিলে লোকে বুঝিবে যে, কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু এই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কর্ম্ম করে নাই। এইজন্য যদি বলা হয় যে, 'আত্মা কর্ম্ম করে না'; তাহা হইলে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না। গীতার কর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে যে, আত্মা কর্ম্ম করিতে পারে না—ইহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

কর্ম্ম প্রকৃতিরই

যাহা কিছু কর্ম্ম, তাহা প্রকৃতিরই। সমুদায়ই প্রকৃতির বিকার, প্রকৃতিমূলক, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সংসার সত্ত্বরজস্তমো-ময়। সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন—'প্রকৃতিজ' (৩,৫, ১৩।২২; ১৮,৪০), প্রকৃতি সম্ভব (১৩,২০; ১৪,৫)।

মানুষ ভাবে সে নিজেই কর্ম্ম করে; কিন্তু ইহা তাহার ভ্রম। কার্য্য করিতেছে প্রকৃতির গুণসমূহ, কিন্তু বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে আমিই কর্ত্তা (৩। ২৭, ২৮)। যাঁহারা বুঝিয়াছেন প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য করে, তাঁহারাই জ্ঞানী (১৩। ৩০, ৫। ৮, ৯; ১৪। ১৯ ইত্যাদি)।

আত্মা অধ্যক্ষ

প্রকৃতি স-চরাচর বিশ্ব প্রসব করিতেছে ; কিন্তু ইহা সম্ভব হইয়াছে পুরুষের সান্নিধ্যবশতই। পুরুষ যদি প্রকৃতির পার্শ্বে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে প্রকৃতি কোন কার্য্যই করিতে পারিত না।

এ বিষয়ে ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছি বলিয়াই প্রকৃতি চরাচর সহিত এই বিশ্ব প্রসব করিতেছে। এই হেতু জগৎ বিপরিবর্ত্তিত হইতেছে" ৯।১০।

'অধ্যক্ষ' শব্দের অর্থ স্বামী, অধিপতি, ঈশ্বর, কিংবা দ্রষ্টা, সাক্ষী।

ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই অধ্যক্ষতার মধ্যে কর্ত্তৃত্ববিকার নাই। আত্মা স্বামী বা দ্রষ্টা রূপে নিকটে বর্ত্তমান। ইহাই যথেষ্ট। এই সান্নিধ্যবশতই প্রকৃতিতে কার্য্য-প্রবৃত্তি জন্মে এবং এইরূপেই সৃষ্টাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ

আত্মা কোন কার্য্যই করিতে পারে না আর প্রকৃতিও নিরপেক্ষ ভাবে কর্ম্ম করিতে অসমর্থা। কর্ম্ম সম্পাদিত হয় উভয়ের সংযোগে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে গীতাকার ইহাই বলিয়াছেন :—"যে কিছু স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হয় সে সমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়—এইরূপ জানিও" ১৩।২৭।

পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি

গীতাকার এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে" ১৩।২০।

এই মত বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ এতদুভয় পৃথক ; এক অপর হইতে উৎপন্ন হয় নাই ; উভয়েই অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান। উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্রের একটি বিশেষ মত এই যে, একটিমাত্র সত্তাই বর্ত্তমান ; আত্মা বা ব্রহ্মই এই সত্তা। যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আত্মা হইতেই। ইহাই অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, প্রকৃতিও আত্মা হইতে উৎপন্ন। কিন্তু গীতাকার এই মত গ্রহণ করেন নাই ; তাঁহার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং উভয়ই অনাদি।

উভয়ের সম্বন্ধ

প্রকৃতির সহিত পুরুষের কি প্রকার যোগ, জগতের পরমাত্মার কি সম্বন্ধ, গীতাকার তাহা নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এবিষয়ে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। একস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন :—

"আর যে সকল সাত্ত্বিক ভাব এবং তামসিক ও রাজসিক ভাব—সে সমুদয় আমা হইতেই (মত্তঃ) এইরূপ জানিবে। আমি সে সমুদয়ে নাই, কিন্তু সে সমুদয় আমাতে" ৭।১২।

নবম অধ্যায়ে এই ভাব আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নিম্নে সেই কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

ভগবান বলিতেছেন—

"অব্যক্ত মূর্ত্তি আমাকর্ত্তৃক এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত ; সমুদায় ভূত আমাতে স্থিত, কিন্তু আমি সে সমুদায়ে অবস্থিত নহি ৯.৪।

(কিন্তু প্রকৃত পক্ষে) ভূতগণ আমাতেও অবস্থিত নহে। দেখ (কেমন) আমার ঐশ্বর যোগ—আমার আত্মা ভূতগণের ধারক ও পালনকর্ত্তা ; (কিন্তু আমি) ভূতে অবস্থিত নহি ৯।৫।

যেমন সর্ব্বত্রগামী মহান্ বায়ু আকাশে নিত্য স্থিত, তদ্রূপ সমুদায় ভূতই আমাতে স্থিত—ইহা জানিও" ৯।৬।

এই অংশ সহজবোধ্য নহে ; সেইজন্য ইহার কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

১। পরমাত্মা এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। শেষে বা লোকে ভাবে—বায়ু যেমন আকাশ ব্যাপিয়া থাকে পরমাত্মাও বুঝি সেই ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য বলা হইল, তিনি অব্যক্ত ভাবে জগতে বর্ত্তমান, তাঁহার মূর্ত্তি যেমন অব্যক্ত, তাঁহার ব্যাপ্তিও অব্যক্ত।

২। ইহার পরে বলা হইল ভূতসমূহ পরমাত্মার স্থিত। ভূতসমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় পরমাত্মার উপরে

নির্ভর করে; পরমাত্মা না থাকিলে এ সমুদায় কিছুই সম্ভব হইত না। এই অর্থে বলা হইয়াছে ভূতসমূহ পরমাত্মায় স্থিত।

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইল পরমাত্মা ভূত সমূহে অবস্থিত নহেন।

৩। পরমাত্মা সুপ্রতিষ্ঠ, কি অপ্রতিষ্ঠ কিংবা অন্যপ্রতিষ্ঠ এ সমুদায় তত্ত্ব এস্থলে আলোচিত হয় নাই। ভূতসমূহের উৎপত্ত্যাদি পরমাত্মার উপর নির্ভর করে। এস্থলে প্রশ্ন—এই সমুদায় ঘটনায় পরমাত্মা কি ভাবে ভূতসমূহের সহিত সম্পর্কিত হইয়া থাকেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের এই অংশে এই প্রশ্নেরই বিচার করা হইয়াছে। পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোন প্রশ্নও উঠে নাই এবং তাহার বিচারও করা হয় নাই।

যখন কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করা আবশ্যক হয়, তখন কর্ত্তা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কর্ম্মের সহিত সম্পর্কিত হয়, কর্ম্মে সংলগ্ন হয়, সংস্পৃষ্ট হয়, সংশ্লিষ্ট হয়, আদ্যন্ত সেই কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে—অর্থাৎ কর্ত্তা নিত্য কর্ম্মে অবস্থিত। গীতাকার বলিতেছেন সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে পরমাত্মা ভূতাদিতে এ ভাবে অবস্থিত নহেন। লোকে যে অর্থে স্থিতি বা বর্ত্তমানতা বুঝিয়া থাকে, সে অর্থে পরমাত্মা ভূতসমূহে অবস্থান করেন না।

যদি লৌকিক ভাষাই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পরমাত্মা প্রকৃতির বহির্ভাগে বর্ত্তমান। অথচ তাঁহার প্রভাব প্রকৃতির উপরে কার্য্য করে। পরমাত্মাকে যে ইচ্ছা করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে হয় তাহা নহে, তিনি নিত্যই ইচ্ছা-বিহীন, প্রবৃত্তি-বিহীন কর্ত্তৃত্ব-বিহীন। তবুও প্রকৃতির উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়, প্রকৃতির পার্শ্বে পুরুষ; পুরুষ নির্ব্বিকার; কিন্তু প্রকৃতির অন্তর বিকার উপস্থিত হয়। এই বিকারই সৃষ্ট্যাদি নামে অভিহিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মা প্রকৃতিতে অবস্থান করেন না, অথচ তাঁহার অব্যক্ত প্রভাবে প্রকৃতি অভিভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে।

৪। পরমাত্মা যদি ভূতসমূহে বর্ত্তমান না থাকেন, তাহা হইলে ভূতসমূহই বা কিরূপে বর্ত্তমান থাকিবে? এইজন্য গীতাকার বলিয়াছেন যে, ভূতসমূহও পরমাত্মায় অবস্থিত নহে। লৌকিক কর্ম্ম যে ভাবে লৌকিক কর্ত্তার সহিত যুক্ত এবং সংস্পৃষ্ট, সে ভাবে ভূতসমূহ পরমাত্মায় যুক্ত বা সংস্পৃষ্ট নহে। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যোগ নাই, স্পর্শ নাই, অথচ পুরুষের প্রভাবে প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন—দেখ, আমার কি ঐশ্বর ভাব; ভূতসমূহও আমাতে নহে, আমিও ভূতসমূহে নহি—অথচ আমি ভূতসমূহের ধারক ও পালন কর্ত্তা।

৫। যখন বলা হয় ভূতসমূহ পরমাত্মাতে অবস্থিত, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় পরমাত্মার উপর নির্ভর করে। যখন বলা হয় ভূতসমূহ পরমাত্মাতে অবস্থিত নহে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহাদিগের মধ্যে লৌকিক কর্ম্মকর্ত্তৃমূলক কোন প্রকার যোগ বা সংস্পর্শ নাই। ইহা বুঝাইবার জন্য আকাশস্থ বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। বৃক্ষাদি ভূমিতে অবস্থিত; এ সমুদায় ভূমি হইতে উৎপন্ন এবং ভূমিতেই প্রথিত। বায়ু আকাশে অবস্থিত, কিন্তু আকাশ হইতে উৎপন্নও নহে, আকাশে প্রথিতও নহে। বায়ু সর্ব্বত্রগ—ইহা যেখানে ইচ্ছা সেইখানে এবং যে ভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বিচরণ করে। ইহাতে আকাশের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। বায়ু সুগন্ধবহই হউক বা দুর্গন্ধ বহন করুক, অমল ভাবেই থাকুক বা সমল ভাব প্রাপ্ত হউক—কিছুতেই আকাশের বিকার উৎপন্ন হয় না—অথচ বায়ু আকাশেই অবস্থিত। গীতাকার বলেন, আকাশের সঙ্গে বায়ুর যে প্রকার সম্বন্ধ—পরমাত্মার সহিত ভূতগণের সম্বন্ধও সেই প্রকার।

৬। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গীতার মত অনাদি কাল হইতেই পৃথক্ পৃথক্ সত্তা। ইহাদের মধ্যে এক অপর হইতে উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহাদিগের মধ্যে কোন অঙ্গাঙ্গি-ভাব নাই। আমরা সাধারণতঃ অঙ্গ বলিতে যাহা বুঝি, সে অর্থে প্রকৃতি আত্মার অন্তরঙ্গও নহে, বহিরঙ্গও নহে। আত্মা অবিকৃত থাকিয়া এবং অকর্ত্তা হইয়াও অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বচনীয় ভাবে প্রকৃতিতে বিকার উৎপন্ন করেন। উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ

যে মতে দুইটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা দ্বৈতবাদ। প্রকৃত পক্ষে গীতা দ্বৈতবাদী।

ঈশ্বরবাদ

গীতাকার সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে ঈশ্বরবাদে পরিণত করিয়াছেন। ঈশ্বরবাদ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর ঈশ্বরবাদ এই :—

(১) এক ঈশ্বর আছেন ;

(২) সেই ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও প্রহর্ত্তা। প্রাচীন উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্রে এই মত গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈশ্বরবাদ এই :—

(১) এক ঈশ্বর আছেন ;

(২) ঈশ্বর ছাড়া একটি পৃথক সত্তা আছে—যাহার নাম প্রকৃতি।

(৩) ঈশ্বর নিজ শক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে স্বেচ্ছানুরূপ চালিত এবং নূতন ভাবে গঠিত করেন।

বিদ্রূপ করিয়া এই ঈশ্বরকে কেহ কেহ নাম দিয়াছেন 'সূত্রধার-ঈশ্বর,' 'কর্ম্মকার ঈশ্বর,' 'কুম্ভকার-ঈশ্বর' ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণীর ঈশ্বরবাদ এই :—

(১) একজন ঈশ্বর আছেন ; তিনি অকর্ত্তা।

(২) ইহা ছাড়া আর একটি অনাদি সত্তা আছে—যাহার নাম প্রকৃতি।

(৩) ঈশ্বরের অচিন্ত্য প্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

গীতাকার এই তৃতীয় শ্রেণীর ঈশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখ্যমতের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষ বহু, কিন্তু গীতার পুরুষ এক। এই পুরুষই ঈশ্বর, ভগবান্, আত্মা, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত।

গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই চারিটি সত্য স্মরণ করিয়া রাখা আবশ্যক—

(১) পারমার্থিক ভাবে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছু করেন না, (২) প্রকৃতি অসৃষ্ট এবং অনাদি (৩) কার্য্য করে প্রকৃতিই (৪) ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইয়া প্রকৃতি কোন কার্য্য করিতে পারে না। ঈশ্বরের অচিন্ত্য প্রভাব প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়, এইজন্যই প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

ঈশ্বরের প্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছে—এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গৌণভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরই স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক ইহা গৌণ ভাব। মুখ্য অর্থে ঈশ্বরে স্রষ্টৃত্বাদি আরোপ করা যায় না। কিন্তু গীতাকার ভাষার আবরণে ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয় ভাবকে এতই প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং বর্ণনা গৌরবে গৌণ ভাবকে এতই মহিমান্বিত করিয়াছেন যে, সহজেই মনে হইতে পারে যে, স্রষ্টৃত্বাদিই যেন ঈশ্বরের মুখ্য ভাব।

গৌণ ভাব

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি অংশে ভগবান্ আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

"আমি অজ হইলেও, অব্যয়াত্মা হইলেও, ভূত সমূহের ঈশ্বর হইলেও, আমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া দ্বারা জন্মগ্রহণ করি। ৪৬

হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। ৪।৭

সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।" ৪।৮

অন্য এক স্থলে আছে :—"আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া এই সমুদায় ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি" ৯।৮

এই সমুদায় অংশের মূল অর্থ—পরমাত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে স্রষ্টা। এই অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, গীতাকারের ঈশ্বরবাদ তৃতীয় শ্রেণীর নহে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু ইহাতে গীতার মূল সত্যকেই অস্বীকার করা হয়।

শঙ্করাদি পণ্ডিতগণ বলেন, এই স্রষ্টৃত্বাদি মায়াময়। সর্প নাই, অথচ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, ইহাই মায়াবাদ। এই প্রকার মায়াবাদ গীতাতে গৃহীত হয় নাই। গীতাকারের মতে জড়জগৎ, জড় চেতনার সংযোগাদি কিছুই অলীক

নহে—এ সমুদায়ই প্রকৃত ঘটনা। গীতাতে মায়া শব্দের উল্লেখ আছে ; কিন্তু এই মায়া গুণময়ী। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই সমুদায় প্রভাবই মায়া। সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। প্রথম প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা কিছুই করে না, গুণ-সমূহই কার্য্য করে। কিন্তু এই প্রকরণে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অর্থ ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গুণময়ী মায়াই কার্য্য করে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজ গুণ ভগবানের প্রভাবে কার্য্য করে ; এইজন্য বলা হইয়াছে ভগবানই কার্য্য করেন। সুতরাং ভগবানের স্রষ্টৃত্বাদিকে গৌণ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আত্ম অব্যয় ও অকর্তা ; এই আত্মার সহিত কি প্রকারে গুণাদির সংযোগ হয়, তাহা অবোধ্য।

(২)

নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে ভগবান্ স্পষ্ট ভাবেই সৃষ্টি ব্যাপারে লিপ্ত :—

"হে ভারত! মহৎ ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি, আমি তাহাতে গর্ভ নিক্ষেপ করি, তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। ১৪।৩।

হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে মূর্ত্তিসমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাদের যোনি মহৎ ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। ১৪.৩।

এ স্থলে পার্থিব জনকজননী এবং রক্তমাংসময় সন্তানের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। পার্থিব জনকের ন্যায় ভগবান্ জনক হইয়া এই জগৎ উৎপাদন করেন—ইহাই পূর্ব্বোক্ত অংশের মুখ্য অর্থ। গীতার মূল মত অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এস্থলেও গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে ভূত-সমূহের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতির উৎপত্তির কথা বলা হয় নাই। প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতেই আছে ; প্রকৃতি অনাদি।

(৩)

আরও একশ্রেণীর উক্তি আছে, যাহাতে গীতার মত বিষয়ে লোকের মনে ভুল বিশ্বাস জন্মিতে পারে।

ভগবান্ বলিতেছেন :—

(ক) 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ'—

অর্থাৎ 'আমি সকলের উৎপত্তির হেতু' ১০।৮।

(খ) 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা'

অর্থাৎ 'আমি সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থল। ৭।৬

(গ) 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্'

অর্থাৎ '(আমিই) উৎপত্তির হেতু, প্রলয়ের কারণ এবং আধার' ৯।১৮।

(ঘ) একস্থলে (১৩।১৭

পরমাত্মাকে গ্রসিষ্ণু (গ্রাসকারী) এবং প্রভবিষ্ণু (উৎপত্তিশীল বা উৎপাদনশীল) বলা হইয়াছে।

(ঙ) একস্থলে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে :—

"যাঁহা হইতে চিরন্তন (সংসার) প্রবাহ নিঃসৃত হইতেছে।" ১৫।৪

(চ) অপর একস্থলে বলা হইয়াছে "যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্" অর্থাৎ "যাঁহা হইতে ভূতসমূহের প্রবৃত্তি" ১৮.৪৬।

(ছ) একস্থলে ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন :—

"আমা হইতে (মত্তঃ) স্মৃতি, জ্ঞান এবং (তাহাদের) বিলোপ" ১৫ ১৫।

(জ) বুদ্ধি জ্ঞান সুখ-দুঃখাদির উল্লেখ করিয়া ভগবান্ একস্থলে বলিতেছেন :—

"ভূতগণের এই সমুদায় নানাবিধ ভাব আমা হইতেই (মত্তঃ এব) উৎপন্ন হয়" ।১০.৫

এই সমুদায় অংশ হইতে মনে হয় এই জগৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই প্রবেশ করিবে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—"যাঁহা হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবিত থাকে এবং (প্রলয়কালে) যাঁহাতে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে—তিনি ব্রহ্ম" ৩.১।

বেদান্ত সূত্রেও (১।১।২) বলা হইয়াছে "এই জগতের জন্মাদি যাঁহা হইতে (তিনিই ব্রহ্ম)'।

এই ভাব ও ভাষা অনুকরণ করিয়া গীতাকার বলিতেছেন পরমাত্মা হইতেই সকলের উৎপত্তি এবং তিনিই সকলের প্রলয়ের স্থল।

ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, গীতাতে উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। আত্মা এক না বহু এ বিষয়ে উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা এই প্রস্থানত্রয়ই অদ্বৈতবাদী। কিন্তু আত্মা ও জগৎ এতদুভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এস্থলে উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র অদ্বৈতবাদী, কিন্তু গীতা দ্বৈতবাদী। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের মতে সত্তা কেবল একটি, তাহার নাম আত্মা বা ব্রহ্ম। এই সত্তা হইতেই ভূত-সমূহের উৎপত্তি, ইহাতেই তাহাদিগের স্থিতি এবং প্রলয়কালে ইহাতেই তাহাদিগের প্রবেশ। কিন্তু গীতার মতে সত্তা দুইটি—আত্মা ও প্রকৃতি। উভয়ই অনাদি এবং পৃথক্। সুতরাং সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে গীতার মত উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের মত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পরমাত্মা নিরপেক্ষ হইয়া প্রকৃতি কিছুই করিতে পারে না। পরমাত্মার অচিন্ত্য প্রভাবেই প্রকৃতি হইতে ভূতাদির উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতে লয়। সুতরাং এক অর্থে পরমাত্মাই উৎপত্ত্যাদির কারণ। এই কথা বলিতে যাইয়া গীতাকার উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতমূলক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন

এস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে, উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রে যাহা মুখ্যভাবে বলা হইয়াছে, গীতাকার তাহা বলিয়াছেন গৌণ অর্থে।

(৪)

আরও এক প্রকার ভাষা আছে, যাহা দ্বারা গীতার মৌলিক দ্বৈতবাদ কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। ভগবান নানাস্থলে বলিয়াছেন :—

(ক) আমার প্রকৃতি (মে প্রকৃতি, ৭।৪)।

(খ) আমার মায়া (মম মায়া, ৭।১৪)

(গ) আত্মমায়া (আত্মমায়য়া ৪।৬)

(ঘ) ভগবান্ প্রকৃতিকে 'স্বীয় প্রকৃতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (স্বাম্ প্রকৃতিম্ ৪।৬,৯।৮)।

(ঙ) আর একস্থলে ভগবান্ ইহাকে 'মদীয় প্রকৃতি' বলিয়াছেন (মামিকাম্ প্রকৃতিম্ ৯।৭)।

এই সমুদায় অংশ পাঠ করিলে মনে হইতে পারে যে, প্রকৃতি এবং মায়া যেন পরমাত্মারই স্বরূপ বা অঙ্গ কিংবা তাহারই অন্তর্নিহিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। পরমাত্মার অচিন্ত্য প্রভাবে প্রকৃতি কার্য্য করে, পরমাত্ম-নিরপেক্ষ হইয়া প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে না এইজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন ইহা "আমার প্রকৃতি"।

সিদ্ধান্ত

অদ্যকার আলোচনার সিদ্ধান্ত এই :—

(১) গীতাকার সাংখ্যমতকে ঈশ্বরবাদে পরিণত করিয়াছেন। সাংখ্যে বহু পুরুষ; বহু পুরুষ স্থলে গীতাতে এক পুরুষ। এই পুরুষই ঈশ্বর বা পরমাত্মা নামে পরিচিত।

(২) পরমাত্মা ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক সত্তা; উভয়ই অনাদি। সুতরাং এ স্থলে গীতাকার দ্বৈতবাদী।

(৩) পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়; প্রকৃতিই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করে।

৪ প্রকৃতি পরমাত্ম-নিরপেক্ষ হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না; প্রকৃতি যাহা করে, তাহা পরমাত্মার অচিন্ত্য প্রভাবেই এই অর্থে পরমাত্মাকেই স্রষ্টা পাতা প্রহর্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু পারমার্থিক ভাবে পরমাত্মার স্রষ্টৃত্বাদি কর্তৃত্ব নাই।

(৫) পরমাত্মা ও প্রকৃতি যেন দুইটি সমান্তরাল রেখা। এক অপরকে স্পর্শ করে না। প্রকৃতি পরমাত্মার বহির্ভাগে; পরমাত্মাও প্রকৃতির বহির্ভাগে। পারমার্থিক ভাবে জগৎও পরমাত্মাতে অবস্থিত নহে এবং পরমাত্মাও জগতে অবস্থিত নহেন। অথচ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। গীতাকার নিজেই ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং ভগবানের মুখ হইতে এই বাণী নিঃসৃত হইয়াছে—

ভূত-সমূহ আমাতে অবস্থিত নহে, আমিও ভূতসমূহে অবস্থিত নহি। অথচ আমার আত্মা ভূতগণের ধারণ-কর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা—দেখ আমার কি ঐশ্বর যোগ। ৯৫।

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পর দিবস সূর্য্যোদয়ের সময় আরাতামা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। মাটীতে নামিবার পূর্ব্বে তলিতা হইতে যুদ্ধভূমি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তিনি যেমন অনুমান করিয়াছিলেন ঘটিয়াছিলও সেইরূপ। শত্রু-সৈন্য বিস্তর নিহত, আহত ও বন্দী হইয়াছে, অবশিষ্ট পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের বিমানের কোন চিহ্ন নাই। রাজসৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। পূর্ব্ব দিবস তলিতা যেখানে ছিল আরাতামা সেইস্থানে অবতরণ করিলেন।

নাদিব অধিকক্ষণ বন্দী ছিল না। যে সময় আরাদের সৈন্যেরা আত্মরক্ষায় বা পলায়নে ব্যস্ত সেই সুযোগে সে রুদেলার অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজের পক্ষে গিয়া মিশিয়াছিল। আকাশ হইতে তলিতাকে নামিতে দেখিয়াই সে আসিয়া উপস্থিত হইল

আরাতামা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যুদ্ধে কি হইল?

—আমাদের জয় হইয়াছে। আরাদ নিহত হইয়াছেন। বেথর তাঁহার ঘোড়ার মাথা ভাঙ্গিয়া দেয় তখন আর এক জন আরাদের মাথা কাটিয়া ফেলে। শত্রু অনেক বন্দী, অল্পসংখ্যকই পলাইয়া গিয়াছে।

—আমাদের পক্ষের বিমান সব ঠিক আছে?

—সব নয়, দুই চারিটা নষ্ট হইয়াছে। রাত্রে শত্রুর বিমানের সঙ্গে কোথায় লড়াই হইয়াছিল আমরা জানি না। তাহাদের বিমান যদি অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলেও এদিকে একটিও ফিরিয়া আসে নাই।

—আমাদের লোকেরা কি বলিতেছে?

—সকলে বলিতেছে যে, রুদেলা ছিলেন না বলিয়া আমাদের সহজে জয় হইয়াছে। নহিলে ভারি লড়াই হইত। রুদেলাকে দেখিতে না পাইয়া শত্রুপক্ষ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। আরও অন্য কথা বলিতেছিল।

—কি?

—রুদেলা আপনাকে বন্দিনী করিয়াছেন। আমি মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখি তলিতা নাই, রুদেলার অশ্ব সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। আমি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সেনাপতিকে খবর দিতে যাইতেছি, ঘোড়া কিছুতেই বাগ মানে না, একেবারে নক্ষত্রের মত ছুটিয়া শত্রু সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত। তাহারা তখনই আমাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

আরাতামা হাসিতে লাগিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঘোড়াই তোমাকে বন্দী করিল।

নাদিব মাথা হেঁট করিয়া, মাথা চুলকাইয়া বলিল, আজ্ঞা হাঁ, ঘোড়াই আমাকে বন্দী করাইয়া দিল।

—মুক্তি পাইলে কিরূপে?

—যুদ্ধের সময় শত্রু সৈন্য নিজেদের দেখিবে না আমায় সামলাইবে? অবসর বুঝিয়া রুদেলার ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া আসিলাম। এবার ঘোড়া ভাবিল যুদ্ধে যাইতেছে।

এইরূপে আরাতামা যুদ্ধের সংবাদ লইতেছেন এমন সময় কয়েক জন সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সেনাপতি আগমন করিলেন।

সঙ্গীদিগের সঙ্গে সেনাপতি তলিতায় উঠিলেন। বিস্মিত হইয়া সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—রুদেলা আপনাকে বন্দিনী করিয়াছিল। আপনি মুক্তি পাইলেন কিরূপে?

কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিয়া আরাতামা স্মেরমুখী। সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন মুক্তির কথা স্মরণ করিয়া রমণী আনন্দ অনুভব করিতেছেন। আরাতামা কহিলেন,—আপনি আমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন

সমস্ত বিমান আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু যখন আপনার বিমান সমুদ্রে পতিত হইল তখন তাহারা কি করিবে? শত্রুর বিমান-সমূহকে বিধ্বস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল আপনার বিমানে কোনরূপ দোষ হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে।

—এখন কি রকম মনে হইতেছে?

—কই, আপনারও কিছু হয় নাই, রথেরও কিছু হয় নাই। কিন্তু আপনি ত আমার কথার উত্তর দিলেন না?

—কি কথা?

—বন্দী অবস্থা হইতে আপনি মুক্তি পাইলেন কিরূপে?

—আমি বন্দিনী হইয়াছিলাম আপনি জানিলেন কিরূপে?

—রুদেলা যুদ্ধক্ষেত্রে নাই, আপনি ও আপনার বিমানও নাই, যেখানে আপনার বিমান ছিল সেখানে রুদেলার অশ্ব রহিয়াছে আপনি বন্দিনী হইয়াছেন ইহা ছাড়া আর কি অনুমান হইতে পারে?

—আমাকে বন্দিনী করিতে পারিলে রুদেলা আমার বিমানও গ্রহণ করিতেন। আমাকে বন্দিনী অবস্থায় রাখিয়া তিনি সমর-ক্ষেত্রে যাইতেন। রুদেলা কি যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবার লোক?

—এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

—তাঁহার অবর্ত্তমানে আপনাদের সহজে জয় হইয়াছে একথা স্বীকার করেন?

—রুদেলা থাকিলে বোধ হয় আরও অধিকক্ষণ যুদ্ধ হইত।

—তবে কি তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন?

—তাহা ত মনে হয় না

—বিমান বিভাগের ভার আমার উপর; আমার বিমান এখানে ছিল না, অপর কোন বিমানও ছিল না, অন্ত স্থানে বিমানযুদ্ধের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে অথবা বন্দিনী হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। রুদেলা যুদ্ধে উপস্থিত না থাকায় আরাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সৈন্ত বিধ্বস্ত হইয়াছে যুদ্ধে রুদেলার আসিবার উপায় ছিল না বলিয়াই আসেন নাই।

—কেন?

—আমি বন্দিনী হই নাই, রুদেলাই বন্দী হইয়াছে।

—আপনি আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন।

—বিদ্রূপ করিবার কোন কারণ নাই। রুদেলা শূরবীর, একাকী অনেককে পরাজয় করিতে পারেন, আমি অবলা স্ত্রীলোক, কেমন করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিব? এমন সংশয় সহজেই মনে হইতে পারে।

—একথা আপনি নিজেই বলিতেছেন।

—অঘটনও সময়ে সময়ে ঘটে। রুদেলা বন্দী, এ কথা সত্য।

—বন্দী হইলেও পরে পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না।

—দেখিতে পাইলে কি করিবেন?

—শুধু বিদ্রোহী হইলে রাজার নিকট বিচার হইত, কিন্তু রুদেলা দস্যু, রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই।

—রুদেলাকে পাইলে আপনি কি করিবেন?

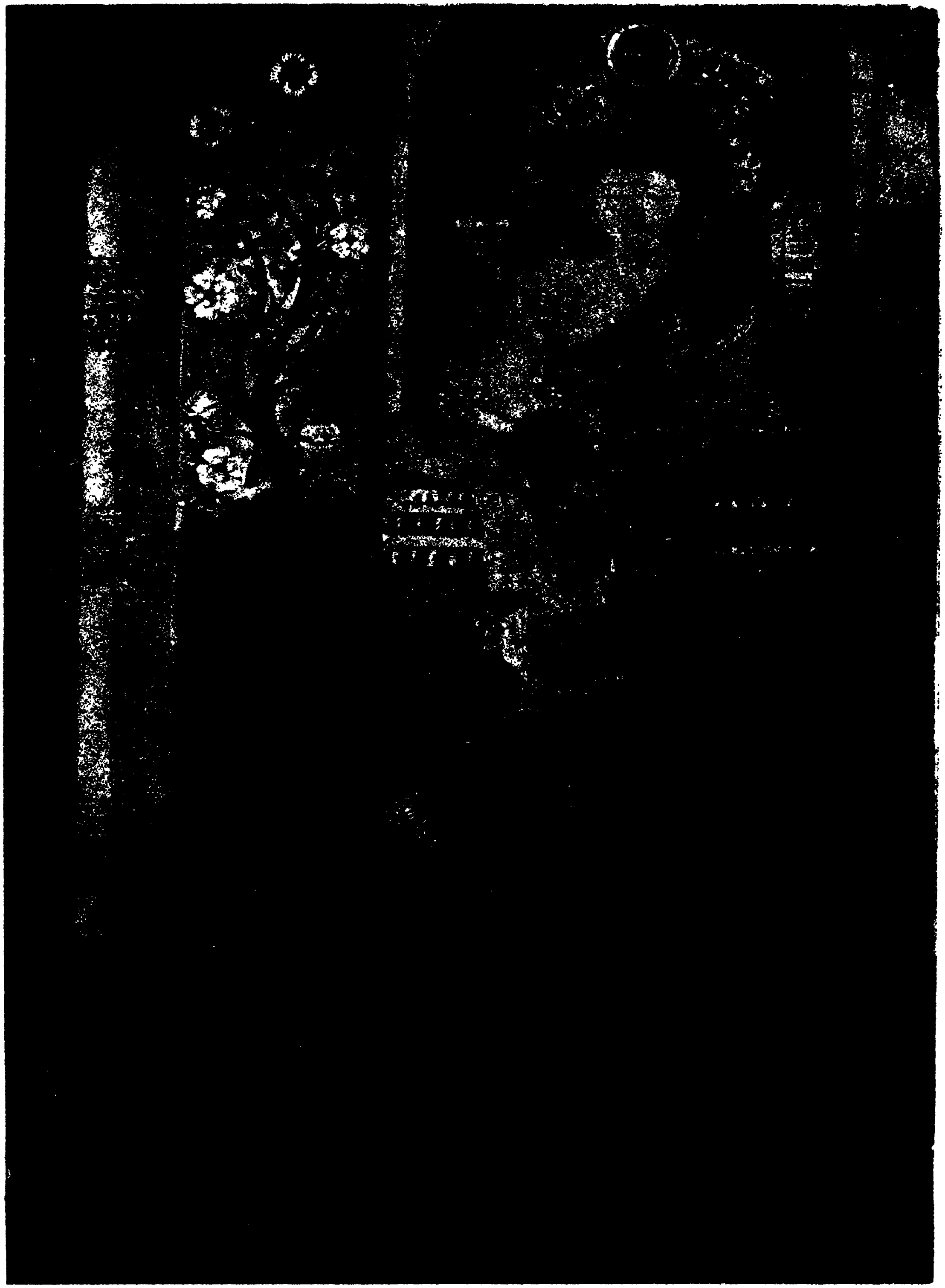
—একটা গাছে ঝুলাইয়া দিব।

যে কক্ষে রুদেলা রুদ্ধ ছিলেন আরাতামা তাহার দ্বার খুলিয়া দিলেন। দ্বারদেশে মুক্ত অসি হস্তে দাঁড়াইয়া রুদেলা। মুখে অল্প হাসি, সে হাসিও শাণিত তরবারির ন্যায়। সেনাপতি ও তাহার সঙ্গীরা একটু পশ্চাতে সরিয়া অসি-মুষ্টিতে হস্তার্পণ করিলেন। আরাতামা হস্তদ্বারা রুদেলাকে অসি তুলিতে নিষেধ করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন,—রুদেলা একাই আপনাদের কয়েকজনকে বিনাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বিমান রক্তপাতের স্থান নয়। যদি রুদেলাকে এই রণ-ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের অশ্ব-পৃষ্ঠে দেখিতে পান তাহা হইলে বন্দী করিতে পারেন।

—সে কথার প্রয়োজন কি? আমি কয়েক জন সৈনিক ডাকিতেছি তাহারা ইহাকে নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

—আমার অনুমতির প্রয়োজন নাই?

সেনাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—কাহারও অনুমতির



বুদ্ধদেবের আরাধনা

[illegible]তী প্রতিমা দেবী

আবশ্যক নাই। একে বিদ্রোহী তাহাতে আবার দস্যু, ইহাকে কি আপনি প্রশ্রয় দিবেন ?

—তাহাই যদি দিই ?

সেনাপতির ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ক্রোধের মুখে বলিয়া ফেলিলেন,—তাহা হইলে আপনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

রুদেলার হস্তে অসির ঝনঝনা শব্দ হইল। বাহিরে নাদিবের পাশে বেথর দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘোররবে গদা ঘুরাইয়া মাটীতে আঘাত করিল। আরাতামা হাত তুলিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কহিলেন সেনাপতি মহাশয় আমার দণ্ড হইবার পূর্ব্বে আপনাদের প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা অধিক। আপনি বিস্মৃত হইতেছেন যে, আমি রাজার বেতনভুক্ত সেনাপতি নহি, রাজার প্রজাও নহি, তাঁহার নিকট কোনরূপে উপকৃত নহি, রাজা কোথায় ?

ক্রোধে, লজ্জায় সেনাপতির মুখ রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিলেন,—রাজা বিমানে বিশলামে ফিরিয়া গিয়াছেন।

—উত্তম। আমিও আপনার বন্দীকে লইয়া বিশলামে যাইতেছি। সেখানে রাজার সাক্ষাতেই সকল কথা হইবে। আপনি শিবিরে ফিরিয়া যান।

সেনাপতি বিনাবাক্যে সদলে তলিতা হইতে অবতরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। আরাতামা নাদিবকে আদেশ করিলেন,—তুমি রুদেলার অশ্বে অরোহণ করিয়া বিশলামে ফিরিয়া যাও।

বেথরকে সঙ্কেত করিলেন,—তুমি বিমানে আরোহণ কর।

শিবিরের পথে যাইতে সেনাপতি দেখিলেন, শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তলিতা বিশলামে উড়িয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিশলামে রাজা শিশেরা ফিরিতেই নগরবাসী সকলে জানিল যুদ্ধে রাজার জয় হইয়াছে ও শত্রুভয় অপনীত হইয়াছে। রাজা আসিয়াই রাজকন্যা সাফিরার মুখে তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা ও সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবার সংবাদ পাইলেন। রাজকন্যার বিশেষ অনুরোধে এ সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে পাঠান হয় নাই। বিস্মিত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি এ সংবাদ পাই নাই কেন ?

রাজকন্যা কহিলেন,—আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। যাহারা আমায় ধরিতে আসিয়াছিল তাহারা ব্যর্থকাম হইল, আমারও কোন আশঙ্কা রহিল না। যাহারা এই ব্যাপারে লিপ্ত তাহারা হয়ত ফিরিয়া গিয়া শত্রুসৈন্যে মিশিয়াছে। এমন সময়ে তোমাকে অনর্থক চিন্তা করাইলে তুমি যুদ্ধে মনোনিবেশ করিতে পারিতে না, হয়ত ফিরিয়া আসিতে, তাহাতে সৈন্য নিরুৎসাহিত হইত।

—সে কথাও বটে। তুমি বুদ্ধিমতীর কাজ করিয়াছ।

সাফিরা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন—আমি রাজার কন্যা ত বটি !

রাজা বলিলেন,—গালিমকে ডাকাইয়া পাঠাই, তিনি আর কিছু জানিতে পারেন।

রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া গালিম নিজেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন, পথে রাজার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গালিম আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। রাজা কহিলেন,—শত্রু পরাজিত হইয়াছে, আরাদ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

রাজকন্যাকে ধৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সে বিষয় কোন সন্ধান পাইয়াছ ?

—তাহাদের মধ্যে কেহ ধরা পড়ে নাই। আরাদ অথবা রুদেলার চক্রান্ত বিবেচনা হয়।

—তাহাতে কোন সংশয় নাই।

—মহারাজ আর একটি বিশেষ সংবাদ আছে। পরশু রাত্রে আরাতামা এখানে আসিয়াছিলেন।

—যুদ্ধ ত কাল শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে তিনি আসিলেন কিরূপে ?

—এখানে অধিকক্ষণ ছিলেন না, রাত্রি থাকিতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ নগরে ঘরের শত্রু ছিল, আরাতামা আমাকে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, আমার হস্তে যে ভার ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা আমি পালন করিতে পারি নাই। রাজদণ্ডে আমি দণ্ডার্হ

রাজা স্মিতমুখে কহিলেন,—অপরাধ জানিবার পূর্ব্বেই কি দণ্ডের বিধান করিতে হইবে ?

—অপরাধ স্বীকার করিবার জন্যই আসিয়াছি। নাগারক সৈন্যদিগের মধ্যে আমার পরিচিত কয়েক ব্যক্তি শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া গোপনে আমাদের অজ্ঞাতে শত্রুসৈন্যকে নগরে প্রবেশ-পথ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। আরাতামা এই সংবাদ দিলেন। সংবাদ যে সত্য সে বিষয় কোন সংশয় নাই।

—তিনি জানিলেন কিরূপে?

—মহারাজ, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরাতামার বিশেষ কোন শক্তি আছে যাহার বলে তিনি অপরকে বশীভূত করিতে পারেন। আমার সাক্ষাতে লোবান নামক এক ব্যক্তি সকল কথা স্বীকার করে। ফারেজ ও অপর কয়েক ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত আছে। আরাতামার কথামত তাঁহার পরিচারিকাকেও কারারুদ্ধ করিয়াছি।

—রাজকন্যাকে ধৃত করিবার সম্বন্ধে কিছু জান?

—আমার সন্দেহ হয় ফারেজ ও লোবান ইহার ভিতর আছে। সৈন্য হয়ত রুদেলার কিন্তু সন্ধান ইহারাই দিয়া থাকিবে।

রাজা গালিমের পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া কহিলেন, তোমার কোন অপরাধ দেখি না। আরাতার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ বাড়িয়া যাইতেছে সেই কথা ভাবিতেছি। দুঃখের বিষয় তিনি নিজে সমূহ বিপন্ন।

—কি হইয়াছে, মহারাজ?

—দ্বিতীয় দিবস যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রুদেলা কোন কৌশলে তাঁহাকে বন্দিনী করে, তাহার পর বিমান আকাশে অদৃশ্য হয়। উভয় পক্ষের বিমান-সমূহ আরাতামার বিমানের অনুসরণ করে, আকাশ যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, কিন্তু আরাতামার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—মহারাজ, অতি নিদারুণ সংবাদ: রুদেলার অসাধ্য কোন দুষ্কর্ম্ম নাই।

—দুশ্চিন্তার তাহাই প্রধান কারণ। আরাতামাকে মুক্ত করিবার কোন উপায় দেখিতে পাই না। যদি তাঁহার বিমান না থাকিত তাহা হইলে তাঁহার সন্ধানের জন্য সৈন্য পাঠাইতে পারিতাম। এখন কি করিব কিছু ভাবিয়া পাই না। রুদেলা দস্যু, পর্ব্বতের সকল স্থান তাহার জানা, আরাতামাকে হরণ করিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে কে বলিতে পারে?

—যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে মহারাজের বিমান লইয়া আমি অনুসন্ধান করিতে পারি। এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার পরে হইতে পারে।

—আমার বিমান তুমি লইয়া যাও, কিন্তু সঙ্গে কয়েক জন সৈনিক লইও।

—এখান হইতে দুইজনকে লইয়া যাইব, সমর-ক্ষেত্র হইতে বেথরকেও লইয়া যাইব।

রাজা বিমান-চালককে আদেশ করিলেন যে, গালিমের আজ্ঞামত বিমান লইয়া যাইবে।

গালিম কালবিলম্ব করিলেন না। গৃহ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া দুইজন সৈনিক লইয়া বিমানে যাত্রা করিলেন।

আকাশমার্গের অনেক দূর গিয়া গালিম বিস্মিত হইয়া দেখিলেন আর-একটি বিমান বিশালামের অভিমুখে আসিতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলেন, তলিতা! গালিমকে দেখিয়া আরাতামা হাত বাড়াইয়া হস্ত আন্দোলন করিলেন।

গালিম অবাক্। তাঁহারা আরাতামার জন্য ভাবিয়া অস্থির, এদিকে আরাতামা হাস্যমুখে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছেন, যেন কিছুই হয় নাই। গালিম বিমান-চালককে বিমান ফিরাইয়া তলিতার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তলিতা এত বেগে যাইতেছিল যে, দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নগরে ফিরিয়া গালিম প্রথমে আরাতামার গৃহে গমন করিলেন। আরাতামার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই বলিলেন,—আমি রাজার বিমানে আপনার অনুসন্ধান করিতে যাইতে ছিলাম, পথে আপনাকে দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

—কোথায় অনুসন্ধান করিতে যাইতেছিলেন?

তাহা ত গালিম নিজেই জানেন না। তিনি বলিলেন, —রাজার মুখে শুনিলাম রুদেলা আপনাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাই খুঁজিতে যাইতেছিলাম।

—আমি কি রাজকন্যা যে আমাকে কেহ হরণ করিবে?

আর রুদেলা আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে কোথায় অন্বেষণ করিতেন? রুদেলার অগম্য ত স্থান নাই, আপনি কেমন করিয়া আমার সন্ধান পাইতেন?

—তলিতার সন্ধান পাইবার আশা ছিল। যাহা হউক প্রকৃত ঘটনা আপনি বলুন, আমাকে এখনি রাজার নিকট নিবেদন করিতে হইবে। তিনি আপনার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

—রাজা আমার জন্য চিন্তিত হইয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আপনি স্বয়ং দেখিতেছেন চিন্তার কোন কারণ নাই। রাজাকে বলিবেন যে, রুদেলা আমাকে আটক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নগরের সংবাদ বলুন।

—নগরে কোন কুসংবাদ নাই তাহাও আপনার কৃপায়। নগরের ভার আপনার উপর অথচ ঘরের শত্রুর সংবাদ আমি রাখিতাম না।

—শত্রু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে, এখন আর আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ফারেজ ও লোবান—এখানে তাহাকে হাতিল নামে কেহ জানে না—কোথায়?

—তাহাদিগকে কারাগারে রাখিয়াছি। আরও কয়েক জন ধরা পড়িয়াছে।

—বাষ্টী কোথায়?

—তাহাকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। সে অত্যন্ত উৎপাত করে, চীৎকার করে, বলে তাহাকে বিনা অপরাধে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, সে এখানে বিদেশিনী, কাহাকেও চেনে না, সে ষড়যন্ত্রের কি জানে?

—দুই চারি দিন আরও আটক থাক্, তাহার পর তাহাকে এখানে আনিলেই হইবে। আমি নিজে তাহাকে শাস্তি দিব।

—সেই কথা ভাল। বাষ্টী পরিচারিকা মাত্র, সে যে এই চক্রান্তে লিপ্ত আছে, একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

—যাক্ সে কথা। আপনি রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিবেন যে, সেনাপতি ফিরিয়া আসিলেই রুদেলা কি করিয়াছিলেন জানা যাইবে। সে পর্য্যন্ত আমি কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

গালিম গিয়া রাজাকে সেইরূপ নিবেদন করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুদেলা আরাতামার গৃহেই ছিলেন, কিন্তু গালিম সে কথা জানিতে পারিলেন না। আরাতামার বৃহৎ গৃহের একাংশ রুদেলার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আরাতামার আদেশ মত বাড়ীর কোন লোক সে কথা প্রকাশ করে নাই। রুদেলা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আরাতামার বিনা অনুমতিতে তিনি পলায়ন করিবার কিংবা অন্যত্র কোথায়ও যাইবার চেষ্টা করিবেন না। গালিম চলিয়া গেলে আরাতামা রুদেলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কহিলেন, আমাকে তুমি ধরিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া রাজা শিশেরা বড় চিন্তিত হইয়াছেন। নগরের সৈন্যাধ্যক্ষ এই মাত্র সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়াছি দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

রুদেলা কহিলেন,—আমি তোমার বন্দী তাঁহারা জানেন?

—এখনও জানেন না। গালিমকে বলি নাই।

—কিন্তু সেনাপতি আসিলেই রাজা জানিতে পারিবেন যে তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়াছ। তখন তুমি কেমন করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে?

—তাহার উপায় আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সেনাপতি তোমাকে বন্দী করিতে পারেন নাই. রাজাও পারিবেন না। সে বিশ্বাস না থাকিলে আমি তোমাকে পথে কোথাও নামাইয়া দিতাম। তুমি বন্দী হইলে আমার কলঙ্ক।

—আমি নিজের জন্য আর ভাবি না।

—একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি এখানে হইতে গিয়া কি আবার দস্যুদের দলপতি হইবে?

—আর কি করিব?

—তুমি আর কোন রাজ্যে গিয়া বাস করিতে পার। তুমি সেনাপতি হইবার যোগ্য, দস্যুপতি কেন থাকিবে? আরও একটা কথা আছে। যদি রাজা শিশেরা তোমার অপরাধ ক্ষমা করেন তাহা হইলে তাঁহার অধীনে সেনাবিভাগে তুমি কর্ম্ম স্বীকার করিবে?

—একে বিদ্রোহী তাহাতে দস্যু, আমার কি মার্জ্জনা আছে? তোমার অনুরোধে হয়ত রাজা তাহাও পারেন। আমি কখনও কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করি নাই, কিন্তু এক আশা পাইলে আমি সকল কথায় স্বীকৃত আছি।

আরাতামার মুখে অল্প হাসি দেখা দিল। কহিলেন, কি আশা?

—অন্য স্থানে হইলে, আমি মুক্ত থাকিলে তুমি জিজ্ঞাসা না করিলেও বলিতাম, কিন্তু এখন আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন আমার মুখ বন্ধ।

—এখানকার কথা ভুলিয়া যাও, মনে কর তুমি পূর্ব্বে যেমন ছিলে সেইরূপ আছ। তুমি কি আশা করিতে?

—তোমাকে পাইবার আশা।

—ধীরে ধীরে আরাতামার গণ্ডস্থল রক্তিম বর্ণ হইল। রুদেলার সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার চক্ষু নত হইল। মৃদুস্বরে কহিলেন,—সেইজন্য আমাকে হরণ করিতে চাহিয়াছিলে?

—তাহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। তোমার নিকট পরাজিত না হইলে তোমাকে বন্দিনী করিয়া রাখিতাম, যুদ্ধের পর তোমাকে পর্ব্বতের অবরোধে লইয়া যাইতাম।

আরাতামা কোন কথা কহিলেন না, অঙ্গুলিতে বস্ত্রের অঞ্চল পাকাইতে লাগিলেন।

রুদেলা কহিলেন,—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিলে একথা আমি এখন বলিতাম না। আমি দস্যু, অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, রাজার লোকে আমাকে ধরিতে পারিলে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। তুমি বিত্তশালিনী, রাজা তোমাকে সম্মান করেন, তুমি যে আমাকে কৃপাচক্ষে দেখিবে এমন কল্পনাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা আমার কথায় যদি তোমার বিরক্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

আরাতামা কহিলেন,—বিরক্তির কোন কারণ নাই। তুমি জান আমি তোমাকে দিগ্বিজয়ী বীর মনে করি, সামান্য দস্যু বিবেচনা করি না। তোমার পরিচয় আমি জানি, আমি কে তাহা তুমি জান না। সকল কথা বলিতে পারিব না, আবশ্যক হইলে সময়ান্তরে বলিব। আমিও পরস্ব অপহরণ করিয়াছি, এ সম্পত্তি পূর্ব্বে আমার ছিল না। আমি বিবাহের কথা কখন ভাবি নাই, কোন পুরুষের প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। তোমার বীরত্বে আমি চমৎকৃত হইয়াছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে কোনরূপ চঞ্চলতা হয় নাই। কখন কোন পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিব কি না তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। বিবাহে সুখ কি দুঃখ বুঝিতে পারি না।

রুদেলা অগ্রসর হইয়া আরাতামার হস্ত ধারণ করিলেন, আবেগের সহিত কহিলেন,—আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান না করিলে আমি আশা পরিত্যাগ করিব না।

কয়েক মুহূর্ত্ত আরাতামার হাত রুদেলার হাতে রহিল। তাহার পর আরাতামা নিজের হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন, কহিলেন, এখন আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না। বিবেচনা করিয়া পরে তোমাকে বলিব।

আরাতামা উঠিয়া গিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গালিম রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন এমন সময় দেখিলেন আরাতামা তাঁহার যন্ত্ররথ হইতে নামিতেছেন। কিছুদিন হইল এ যন্ত্ররথ তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। গালিম আরাতামাকে কহিলেন,—আপনি নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিয়া রাজা দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিতেছিলেন।

আরাতামা কহিলেন,—রাজা আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করা। তাঁহাকে নিবেদন করিবার কয়েকটা কথা আছে।

গালিম আর দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন।

রাজা শিশেরা আরাতামাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন, কহিলেন,—আপনার জন্য আমরা সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। রুদেলার মত দস্যুর হাতে প'ড়লে সকল প্রকার আশঙ্কা। এখন বুঝিতেছি সে সংবাদ মিথ্যা, এইবার আপনার কাছে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিব।

আরাতামাকে দেখিয়া রাজা শিশেরা রাজকন্যার নিকট তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইলেন। সাকিরা একেবারে ছুটিয়া

আসিয়া আরাতামাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চক্ষের কোণে অশ্রুবিন্দু, মুখে হাসি পরিপূর্ণ। আরাতামাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—আমরা তোমার জন্ত যে কি ভয় পাইয়াছিলাম তাহা বলিবার নয়। এ সকল কথা কে রটাইয়াছিল ?

—তাহা কেমন করিয়া জানিব। এই ত দেখিতেছ আমি নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছি, আমার অঙ্গে কোথাও আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নাই।

রাজা কহিলেন, তবে দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

—মহারাজ, আকাশযুদ্ধ হইতেছিল, বিমানে আমরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম, ফিরিতে অনেক বিলম্ব হয়, তাহাতেই নানা রকম কল্পিত কথা উঠিয়া থাকিবে।

—যাহা হউক আপনাকে দেখিয়া চিন্তার আর কোন কারণ নাই। কিন্তু রাজা আর এই রাজ্য যে আপনার কাছে কিরূপ ঋণী তাহা পূর্ব্বে আমি কিছু জানিতাম, নগরে ফিরিয়া আরও জানিয়াছি। আমার এ কৃতজ্ঞতার ঋণ কেমন করিয়া শোধ করিব ?

—মহারাজ, সে কথার উল্লেখ করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না।

—পুরস্কারের আমি উল্লেখ করিতেছি না, তাহাতে আপনার অবমাননা করা হয়, কিন্তু একবার নয় বার বার আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন না দেখাইতে পারিলে আমাকে কৃতঘ্ন হইতে হয়। সে কলঙ্ক হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করুন।

—আপনি রাজা, আপনি মহৎপ্রকৃতি, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু আমি যদি যৎসামান্ত কিছু করিয়াই থাকি তাহাকে আপনি নিজের উদারতায় একটা বড় কার্য্য করিয়া তুলিবেন না।

—আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা যদি ক্ষুদ্র কার্য্য হয় তাহা হইলে মহৎ উপকার কাহাকে বলে ? যখন শত্রুবল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল তখন তাহাদের সন্ধান কে জানিয়াছিল ? এই যুদ্ধের উদ্যোগে কে সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরামর্শ দিয়াছিল ? আকাশযুদ্ধে কাহার জন্ত আমাদের জয় হইয়াছিল ? এই নগর রক্ষার ভার আমি গালিমের হাতে দিয়া গিয়াছিলাম। গালিম বিশ্বাসী, চতুর, সতর্ক অথচ তাহার অজ্ঞাতে এই নগর শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার সম্পূর্ণ আয়োজন হইয়াছিল। যুদ্ধে আমাদের জয় হইলেও আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিতাম বিশলাম শত্রুহস্তে, আমার কন্তা বন্দিনী। যেরূপ অতর্কিত, নিশ্চিন্তভাবে আমি এখানে আসিয়াছিলাম তাহাতে আমিও বন্দী হইতাম। এই মাত্র গালিম নিজেকে অপরাধী স্বীকার করিয়া আমার নিকট দণ্ড প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। কে অলৌকিক কৌশলে এই নগরকে রক্ষা করিয়াছিল ? কোথায় যুদ্ধক্ষেত্র আর কোথায় বিশলাম ! রাত্রে যুদ্ধস্থল হইতে নগরে আসিয়া গালিমকে শত্রুর দুরভিসন্ধি জানাইয়া অপরাধী ব্যক্তিদিগকে ধরাইয়া দিয়া কে আবার সেই রাত্রে যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া গিয়াছিল ? যে এই সকল ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিয়াছিল সে আমার প্রজা নয়, এই নগরের অধিবাসী নয়, পুরুষ পর্য্যন্ত নয়, আর আমি এই দেশের রাজা, আমি যে কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছি, অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এ কথা বলিবার কোন আবশ্যক নাই। ধিক্ আমার রাজমুকুটে, ধিক্ আমার রাজগর্ব্বে ! রাজ সিংহাসন কৃতঘ্নেরই উপযুক্ত স্থান বটে !

রাজা শিশেরার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল, চক্ষু নক্ষত্রের ন্তায় জ্বলিতে লাগিল।

সাফিরা স্তম্ভিত হইয়া একবার রাজার মুখের দিকে আর বার আরাতামার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠে আবার তখনি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়। রাজকন্তা অসম্বদ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলেন,—বিশলামেও শত্রুভয় ? কে—কোথা হইতে আসিত ? আমাকে বন্দিনী করিত, না হত্যা করিত ? আরাতামাই সকলকে রক্ষা করেন…কে ? রাজলক্ষ্মী না নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ?…আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা কহিলেন,—তুমি স্থির হও, আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই। সকল কথাই পরে শুনিতে পাইবে।

আরাতামা যুক্তকরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মস্তক নমিত

করিয়া কহিলেন,—লজ্জিতা তিরস্কৃতাকে মার্জ্জনা করুন। রাজপ্রসাদ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মস্তকের অঙ্গের ভূষণ করিব।

রাজার মুখ প্রসন্ন হইল, কহিলেন—কৃতজ্ঞতার ঋণ কখন শুধিতে পারা যায় না, ভার কিছু লঘু হয় এই মাত্র।

আরাতামা দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন,—মহারাজ রাজকুমারীর অসাক্ষাতে কিছু নিবেদন করিবার আছে।

রাজকুমারীর ঠোঁট ফুলিল, কটাক্ষ আড় হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কহিলেন,—আবার রাজকর্ম্মের কথা?

আরাতামা হাসিয়া কহিলেন,—অধিকক্ষণ লাগিবে না, তাহার পর তোমার মহলে যাইব।

রাজকন্যা উঠিয়া গেলেন।

রাজা আরাতামাকে কহিলেন,—আপনি দাঁড়াইয়া কেন? বসুন।

আরাতামা বসিলেন। রাজা আর কোন কথা কহিলেন না, আরাতামা কি বলিবেন তাহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আরাতামা কহিলেন,—আপনি শুনিয়াছিলেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে রুদেলা আমাকে বন্দিনী করিয়া গিয়াছিলেন!

—এই কথাই শুনিয়াছিলাম।

—রুদেলা আমাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমিই তাঁহাকে বন্দী করি।

রাজা শিশেরা কি বলিবেন, বিস্মিত হইয়া আরাতামার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিথ্যা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা আরাতামার স্বভাব নয়, নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বলিতে চাহিতেন না, আরাতামা তেজস্বিনী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী, কিন্তু উল্কাতুল্য ঘোরদর্শন দস্যু-পতিকে স্ত্রীলোকে কেমন করিয়া বন্দী করিবে? আরাতামা কি কৌশলে এমন অসাধ্য সাধনায় সক্ষম হইয়াছিলেন? রাজা কোন কথা কহিলেন না।

আরাতামা কহিলেন,—মহারাজ, এমন কথা শুনিতে অসম্ভব বটে, কিন্তু মহারাজের সেনাপতি প্রত্যক্ষ অবগত আছেন। তিনি নগরে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহার মুখে সত্য সংবাদ শুনিতে পাইবেন।

রাজা কহিলেন,—আপনার কথায় ত সংশয় করিতেছি না, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া না বলিলে কেমন করিয়া বুঝিব?

—মহারাজ, কোন কৌশলের গুণে আমি অনায়াসে যে কোন পুরুষকে পরাভব করিতে পারি। আর এক কৌশলে নগরের আশঙ্কার কথা গালিমকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিব না। আপনি আমাকে পুরস্কার দিতে চাহিতেছেন। আমার প্রার্থিত পুরস্কার গ্রহণ করিতে আমি স্বীকৃত আছি।

—পুরস্কার বলিবেন না, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

—আপনার নিকট আমি দস্যুপতি ও শত্রু-সেনাপতির মুক্তি প্রার্থনা করি।

রাজা হাসিলেন, কহিলেন,—আপনার কাছে আমার হার হইল, যে ব্যক্তি অথবা যে সামগ্রী আমার নিকটে নাই তাহা আমি কেমন করিয়া দিব?

—মনে করুন, রুদেলা যুদ্ধে আপনার সৈন্যের নিকট বন্দী হইতেন। তাহা হইলে আমার প্রার্থনা মত কি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতেন?

রাজার ললাট কুঞ্চিত হইল। কহিলেন,—এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে আমি অক্ষম। রুদেলা এরূপ জলন্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যে একবার মাটীতে পড়িলেই যে পাইত নিভাইয়া দিত। বন্দী হইলে সৈন্যেরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিত অথবা সেনাপতি আমাকে কিছু না জানাইয়াই তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন। নৃশংস দস্যু আবার প্রধান রাজদ্রোহী, সকলেরই বধ্য।

—সেনাপতিরও সেই মত। তিনি রুদেলাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ফাঁসি দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হই নাই বলিয়া সেনাপতি কিছু রুষ্ট হইয়াছিলেন। আমাকেও রাজদ্রোহী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

আরাতামার মুখে অল্প হাসি। রাজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—সেনাপতি আর কিছু করেন নাই?

—করিয়াছিলেন বই কি! তিনি বলপূর্ব্বক রুদেলাকে

গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

—সৌভাগ্য কাহার? সেনাপতির না রুদেলার?

—সেনাপতির। বল প্রকাশ করিলে রাজ-সৈন্য সেনাপতি শূন্য হইত, মহারাজকে অপর সেনাপতি নিযুক্ত করিতে হইত।

—সেনাপতিকে আক্রমণ করিলে সৈন্যেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত?

সৈন্যেরা সেখানে ছিল না। সেনাপতি কয়েকজন অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া আমার বিমানে আসিয়াছিলেন। রুদেলাও বিমানে ছিলেন। তাঁহাকে নিরস্ত্র করিতে পারিতেন না, তাঁহারাই নিহত বা আহত হইতেন।

রাজা মনে করিতেছিলেন যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে সে এভাবে কথা কয় না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—রুদেলা কি এখনও আপনার বন্দী?

—হাঁ, মহারাজ। আমি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে পারি, কিন্তু আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি

—রুদেলাকে ছাড়িয়া দিলে আবার শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নাই?

—না মহারাজ, রুদেলা দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন। রুদেলা শুধু দস্যু নন, তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না।

—আপনি তাহাকে মুক্তিদান করিবেন, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

—মহারাজ, আপনি মহানুভব, এ আদেশ আপনার উপযুক্ত হইয়াছে। আমি আশানুরূপ পুরস্কার লাভ করিয়াছি।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—আপনি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না। প্রার্থিত বর ছাড়া আপনাকে অপ্রার্থিত ভারও বহন করিতে হইবে।

—আর এক ভিক্ষা আছে। সেনাপতি ফিরিলে আমার প্রার্থনামত তাঁহার সঙ্গে মহারাজকে একদিন আমার গৃহে আগমন করিতে হইবে।

—সানন্দে।

আরাভামা রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

চার্ব্বাকদর্শনের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রী সতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

দেবগুরু বৃহস্পতি চার্ব্বাক-দর্শনের জন্মদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, এবং তিনি বৃহস্পতিসূত্র নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। মৈত্রায়ণ উপনিষদে (৭.৯) বর্ণিত আছে যে, দেবগুরু বৃহস্পতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের বেশে দৈত্যগণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে মিথ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, যেন দৈত্যগণ পাপাচারী হইয়া নিজ পাপেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ঘটনাটি একটু অন্যরূপে বুঝিতে হইবে। খুব সম্ভব বৃহস্পতির শিষ্যদের মধ্যে কেহ তাঁহার উপদেশের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চার্ব্বাক-দর্শনের সৃষ্টি করে। গ্রীস দেশীয় দর্শনের ইতিহাসেও দেখিতে পাই যে, জ্ঞানীপ্রবর সোক্রেটীশের শিষ্য এরিষ্টিপ্পাস গুরু সোক্রেটীশের উপদেশের ভুল অর্থ করিয়া চার্ব্বাক-দর্শনের অনুরূপ একটি দর্শনের সৃষ্টি করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৮) আর একটি

গল্প আছে, তাহা হইতে আমার কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। তথায় লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা দেবগণকে উচ্চাঙ্গের ও দৈত্যগণকে নিম্নাঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, কারণ দৈত্যগণ উচ্চাঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা করিতে অসমর্থ। রাক্ষস বা দৈত্য একটি নিন্দাবাচক শব্দ। এইরূপ নিম্নাধিকারী চার্ব্বাক নামক বৃহস্পতির কোনও শিষ্য গুরুবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ একটি নিম্নাঙ্গের দর্শন-সৃষ্টি করিবে তাহা অসম্ভব নয়, এবং বৃহস্পতির নিকট হইতেই সে এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ প্রচারিত করাও অসম্ভব নয়। আর একটি কথা এই যে, ঋষিগণ মূল সত্যটী বলিয়া দিয়া শিষ্যদিগকে ধ্যানযোগে বুঝিয়া লইতে বলিতেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই যে পুত্র পিতাকে ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায় পিতা বলিলেন—"যাঁহা হইতে এই প্রাণিসমূহ জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া যাঁহাতে জীবনধারণ করে, এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর, তিনি ব্রহ্ম।" পুত্র কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"অন্ন (জড়প্রকৃতি) কি ব্রহ্ম ?" ঋষি উত্তর করিলেন—"তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর।" এইরূপে ক্রমে পুত্র প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও অবশেষে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া বুঝিতে পারিল (১)। পুত্র যদি বুদ্ধিহীনতা বশতঃ অথবা ধৈর্য্যাভাববশতঃ ব্রহ্মকে জড়প্রকৃতি বলিয়া মনে করিত তবে সেও চার্ব্বাক মতাবলম্বী হইত।

চার্ব্বাক নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলেন যে, চার্ব্বাক নামক ব্যক্তি এই দর্শনের জন্মদাতা বলিয়া এই দর্শনের নাম হইয়াছে চার্ব্বাক দর্শন। (২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, নামটি ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে হয় নাই। (৩) ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন যে এই দার্শনিকগণ কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিবে না, কেবল 'চর্ব্বণ' (অর্থাৎ আহার—নিন্দার্থে) করিবে বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে চার্ব্বাক, এবং এই দর্শনের নাম চার্ব্বাক-দর্শন। (৪) কিন্তু ইহাঁরা, তিন জনের কেহই স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। আমার মনে হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় মতের মধ্যেই কিছু সত্য আছে।

দ্বিতীয় মতের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, চার্ব্বাক দর্শনের এক নাম বার্হস্পত্য দর্শন, কাজেই বৃহস্পতিশিষ্য চার্ব্বাকের নামের সহিত পুনর্ব্বার সংযোগের কারণ কি ? ইহা খুবই সম্ভব যে, চার্ব্বাকগণের বেদবিরুদ্ধতা, ধর্ম্মহীনতা ও নীতিহীনতার জন্য তাহা চার্ব্বাক (অর্থাৎ যাহারা চর্ব্বণ করে) আখ্যা পাইয়াছিল। কার্লাইল ইউরোপীয় সুখবাদকে শূকর-দর্শন (Pig philosophy) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। চার্ব্বাক দর্শনের আর একটি নাম লোকায়ত দর্শন। এই নামটির মধ্যেও উপহাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—লোকায়ত, যাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত, অর্থাৎ বিজ্ঞলোক যাহা গ্রহণ করে না। বেদপন্থী, পবিত্রপ্রাণ ব্রাহ্মণ-দার্শনিকগণ যে বেদ-ধর্ম্ম-নীতি বিরোধী দর্শনকে চার্ব্বাক ও লোকায়ত আখ্যা প্রদান করিবেন তাহা আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু পক্ষান্তরে, প্রথম মতের স্বপক্ষে দেখিতে পাই যে, হেমচন্দ্র চার্ব্বাক-দর্শন ও বার্হস্পত্য দর্শনের মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়া লিখিয়াছেন, যদিও কি প্রভেদ, তাহা তিনি বলেন নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এক প্রকার হইলেও ইহারা দুইটি দর্শন। আর একটি কথা এই যে, চার্ব্বাক নামে যে রাক্ষসের নামের উল্লেখ আছে, সে বৃহস্পতির শিষ্য ছিল। সুতরাং চার্ব্বাক-দর্শনের নাম ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতেও হইতে পারে। আপাততঃ চার্ব্বাক দর্শন সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অতি অল্প। আরও কিছু জানিতে না পারিলে বিরোধী মত দুইটির সামঞ্জস্য করা বা একটিকে গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

চার্ব্বাকদর্শন ভারতের একটি অতি প্রাচীন দর্শন। এমন কি ঋগ্বেদেও চার্ব্বাক মতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া

(১) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ভৃগুবল্লী।

(২) S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, vol.1.

(৩) M.M. Dr. Satish Chandra Vidyabhusan—History of Indian Logic.

(৪) Dr. Surendra Nath Das-Gupta—History of Indian Philosophy, vol 1.

যায়। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, বেদেও চার্ব্বাকমতের উল্লেখ আছে। (১) বহু-উপনিষদে আমরা চার্ব্বাক-দর্শনের সন্ধান পাই। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে দেখিতে পাই যে ঋষি একটি মতে কয়েকটি চার্ব্বাক মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।"

—"কাল, পদার্থ-সমূহের স্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ঘটনা, ভূতসমূহ অথবা পুরুষ কি কারণরূপে চিন্তনীয় ?"

মৈত্রায়ণ উপনিষদে (৭।৯) লিখিত আছে যে, দেবগুরু বৃহস্পতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণ করতঃ শাস্ত্র ও ধর্ম্মের কদর্থ বুঝাইয়া দিলেন যেন দৈত্যগণ পাপাচারী হইয়া নিজ পাপে বিনষ্ট হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮।৮) লিখিত আছে যে, প্রজাপতি দেবগণকে উচ্চাঙ্গের বিদ্যা ও দৈত্যগণকে নিম্নাঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই এই দুইটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, বৃহস্পতি গায়ত্রী-দেবীর মস্তকে আঘাত করিয়া মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেন, এবং মস্তকখণ্ডসমূহ হইতে বষট্-কারের উৎপত্তি হয়। এই উপাখ্যানটির বোধ হয় ভাবার্থ এই যে, কালক্রমে নাস্তিক মত এত প্রবল হইয়াছিল যে, বৈদিক ধর্ম্মের অবনতি হয়, যদিও পরবর্ত্তী কালে বৈদিক ধর্ম্ম স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্ত্তী কালে মনুসংহিতায়ও চার্ব্বাক মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা এত সংক্ষিপ্ত যে, মনু চার্ব্বাকদিগকে মনে করিয়াই ঐ শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা কঠিন। তথায় "নাস্তিক" অর্থাৎ পরলোকে অবিশ্বাসী, 'পাষণ্ডী' অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, "শঠ" অর্থাৎ বেদনিন্দক এবং "হৈতুক" অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ তার্কিক প্রভৃতি নিন্দাবাচক শব্দে ইহাদিগকে আখ্যাত করা হইয়াছে মাত্র। রামায়ণে লিখিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে যখন ভরদ্বাজাশ্রমে বাস করিতেছিলেন তখন জাবালি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ চার্ব্বাকমত অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে রাজ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। জাবালির কথা হইতে চার্ব্বাক-দর্শনের অনেক কথা জানিতে পারা যায়—

"আশ্বাসয়ন্তং ভরতং জাবালি ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
উবাচ রামং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাপেতমিদং বচঃ ॥
অর্থধর্ম্মাপরা যে যে তাং স্তান্ শোচামি নেতরান্।
তেহি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্যলভিরে ॥
অষ্টকা পিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতোহি কিমিশিষ্যতি ॥
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ ॥
দান-সংবননাহ্যেতে গ্রন্থাঃ মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরুবুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যত্তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতো কুরু ॥
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বলোক নিদর্শিনীম্।
রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্ণীষ ভরতেন প্রসাদিতঃ ॥"

—অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮।১.১০-১৮

—রাম ভরতকে আশ্বাস দিতেছেন ইত্যবসরে দ্বিজবর জাবালি ধর্ম্মজ্ঞ রামকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এই কথা বলিলেন—

—"যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে উৎসুক হয়, আমি তাহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, অন্যের জন্য শোক করি না ; কারণ তাহারা (পূর্ব্বব্যক্তিগণ) ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া পরলোকে অভিলষিত ধর্ম্মফলও পায় না। কারণ ফল-ভোক্তারই সত্ত্বা নাই। অষ্টকা প্রভৃতি পিতৃদৈবত্যশ্রাদ্ধ করিতে যে লোক রত হয় সে কেবল নিজভোগসাধন অন্নাদির বিনাশের কারণ। দেখ মৃতব্যক্তি কি ভোজন করিবে ? এই স্থানে অপর ব্যক্তি ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে যায়, তবে সকলে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নদান করুক। কৈ, ঐরূপ করিলে ত পথিকের পাথেয় হয় না। দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ কর, তপস্যা কর, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ কর এই সকল দানের বশীকরণোপায় স্বরূপ বেদাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থসম্পাদন করা ও পামরগণকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। মহামতে ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিবলে ইহা অবগত হও। যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমান-গ্রাহ্য পরোক্ষকে অগ্রাহ্য কর। প্রত্যক্ষবাদী সাধুগণের সর্ব্বলোক-সম্মত বুদ্ধিতে সাদরে গ্রহণ করিয়া তুমি ভরত কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া রাজ্য শাসন কর।"

—মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদ।

রামায়ণে প্রদত্ত চার্ব্বাকমতের সহিত মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণের সম্পূর্ণ মিল আছে। মহাভারতে চার্ব্বাক নামক একটি রাক্ষসের তপস্যার উল্লেখ দেখিতে

(১) M.M. Dr. Satish Chandra Bidyabhusan—History of Indian Logic.
তাঁহার উল্লিখিত বৈদিক মন্ত্র—১০-৩৮—৩ ; ৮-৭০-৭ ; ৮-৭১-৮।

পাওয়া যায়। (১) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধান্তে ভগ্নোরু দুর্য্যোধন তদীয় বন্ধু চার্ব্বাক বৈরীনির্য্যাতন করিবে বলিয়া বিলাপ করিতেছে দেখিতে পাই। (২) এই দুর্য্যোধনবন্ধু চার্ব্বাকই পরে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে দেখা যায় (৩)

বিষ্ণুপুরাণের ৩.১৮ অধ্যায়টিও চার্ব্বাকমতে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বৌদ্ধ ও জৈন বৃত্তান্ত মাত্র। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্ব্বাক সকলেই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। তাহারা বেদ-নিন্দার্থ একই প্রকার কারণ প্রদর্শন করিবে ইহা খুবই সম্ভব। মৈত্রায়ণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুরূপ গল্প রচনা করিয়া পুরাণকার বৌদ্ধ ও জৈনগণের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা চার্ব্বাকগণের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

বৌদ্ধ পুরাতন গ্রন্থেও চার্ব্বাকমতের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে যে, মানব ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুতের সংযোগে উৎপন্ন, এবং মৃত্যুর পর ভূতচতুষ্টয় পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। (৪) চার্ব্বাকগণ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—ধূর্ত্ত ও সুশিক্ষিত। ধূর্ত্তগণ বলে যে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোনই পদার্থ নাই। সুশিক্ষিতগণ বলে যে, দেহাতিরিক্ত একটি আত্মা আছে, কিন্তু তাহা শরীরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সদানন্দকৃত বেদান্তসারে চারিটি চার্ব্বাকমত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বলে আত্মা স্থূলশরীর; কেহ বলে ইন্দ্রিয়সমূহ; কেহ বলে শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং কেহ বলে আত্মা মস্তিষ্ক। বৌদ্ধ গ্রন্থে আমরা আরও চার্ব্বাক মতাবলম্বীর উল্লেখ দেখিতে পাই (১)।

(ক) মাখালি গোশল (বা মস্করিণ গোশল)—ইনি কোন প্রকার কারণ স্বীকার করেন না,—বিনা কারণেই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে। মানুষ নিজে কিছুই করিতে পারে না, সে প্রকৃতির পুতুল মাত্র।

(খ) অজিতকেশকম্বলী—ইনি বলেন যে, সদসদ্ কার্য্যের ভিন্ন ফল নাই। এই পৃথিবী ব্যতীত অন্য স্বর্গ নাই, যদিও এই পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।

(গ) কুকুদকাত্যায়ন—ইনি বলেন পদার্থ পঞ্চ প্রকার—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং দেশ, এবং সংযোগ ও বিয়োগ নামক দুইটি শক্তি জগতে খেলা করিতেছে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে, সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত চার্ব্বাকমত ভারতে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগে চার্ব্বাকমতের বিশেষ প্রসার হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ ও মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চার্ব্বাকমতাবলম্বী কোন ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত চার্ব্বাকমত সকলেরই কিছু কিছু জানা আছে; বিশেষতঃ তাহাতে বিশেষ নূতন কথা নাই বলিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি না। আমাদের দেশে চার্ব্বাকমত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় নাই আশা করি পণ্ডিতগণ এই দিকে দৃষ্টি দিবেন।

---

(১) "পুরাকৃতযুগে রাজংশ্চার্ব্বাকো নাম রাক্ষসঃ। তপস্তেপে মহাবাহো বদর্য্যাং মহাবাধিকম্ ।।"—শান্তিপর্ব্ব।

(২) "যদি জানাতি চার্ব্বাকঃ পরিব্রাড় বাগ্বিশারদঃ। করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সোপচিতিং মম।"—শল্যপর্ব্ব

(৩) "রাজানং ব্রাহ্মণছদ্মা চার্ব্বাকোরাক্ষসোঽব্রবীৎ।" শান্তিপর্ব্ব।

(৪) Rhys Davids—Dialogues of Buddha ii p 46.

(১) এতদ্বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে কূটদন্ত সুত্ত ও পোত্থপাদ সুত্ত দ্রষ্টব্য।

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গলির ভিতর দোতলা খোলার বাড়ীর এক ঘরে বিরাজ থাকিত। বাড়ীর অন্যান্য ঘরগুলিতে স্ত্রী পুরুষ অনেক ভাড়াটিয়া ছিল।

দুপুরে হোটেলের কাজ সারিয়া বিরাজ বাড়ী ফিরিয়া, নিজের ঘরের বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিন জন অপরিচিত লোক, বেশভূষা মলিন, চেহারা কদর্য্য—খাটের উপর বসিয়া রাসু ঘোষের সহিত মদ খাইতেছে আর হল্লা করিতে করিতে তাস পিটিতেছে। বিরাজকে দেখিবামাত্র রাসু বলিয়া উঠিল, এই যে বিরাজ এসেচিস। যা, হোটেল থেকে খান কতক মাছ-ভাজা নিয়ে আয়।

বিরাজ ক্রোধে কাঁপিতেছিল। লোকগুলার ভিতর একজন ঝাঁ করিয়া একটা বালিস কোলের উপর টানিয়া লইয়া চাপড় দিয়া কহিল, তাস আর ভাল লাগচে না। একটা গান গাও না ভাই, বিরাজ।

আর-একজন কহিল, নাচতে জান গা?

যে-বালিস বাজাইতেছিল, সে মাথা নাড়িতে নাড়িতে গান আরম্ভ করিয়া দিল—

—আমার কাছে এস বঁধু বস্‌তে দেব পিঁড়ে,

বিরাজের আর সহ্য হইল না। লোকগুলার কর্কশ শ্লেষ তাহাকে সূঁচের মত বিঁধিতেছিল। সে আর কথাটি না বলিয়া চলিয়া আসিল।

নীচে নামিয়া রোয়াকের একটি কোণে বসিয়া বিরাজ তাহার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল। নিজের ঘরেও কি তাহার লাঞ্ছনার অবধি নাই?

বাহিরে আসিয়া বিরাজকে দেখিয়া ক্ষান্তমণি বলিল, ও কি লা, এখানে ব'সে যে?

বিরাজ কিছু বলিল না।

ক্ষান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, যাই ভাই, দেখি গোষ্টোর দোকানে একটু তেল ধার যদি পাই। যে টানা-টানি একটা কিছু কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দিতে পারিস্?

পিছনে রাসু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে কহিল, বড় যে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্চিস? য শিগ্‌গির, মাছ ভাজা নিয়ে আয়। বড্ড খিদে পেয়েচে।

বিরাজ কহিল খিদে পেয়েচে, রোজগার ক'রে খাও গে। আমি তোমায় খাওয়াতে পার্‌বো না।

রাসুর চোখ দুটা হিংস্র পশুর মত ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। বিকৃত স্বরে তীব্র শ্লেষ ভরিয়া সে কহিল, আমায় কেন খাওয়াবি? সেই যে ছোঁড়া দিন কত হোটেলে খেতে এসেছিল, তাকে যে আলাদা ঘরে বসিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াতে তা কি আমার মনে নেই? বলি, এখন কোথা গেল সে?

ক্রোধে বিরাজের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। গভীর ঘৃণাভরে রাসুর পানে চাহিয়া রোষ-কম্পিত স্বরে কহিল, তুমি নেহাৎ ছোট লোক। চ'লে যাও, আমার এখানে তোমায় দাঁড়াতেও হবে না।

তবে রে বেটি—ইতিমধ্যে রাসু বিরাজের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে বেদম প্রহার আরম্ভ করিয়াছিল। কিল, ঘুসি, চাপড় একটার পর আর একটা নির্দ্দয় ভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল।

—ও লো তোরা আয় শিগ্‌গির, দেখ'সে বিরাজিকে মেরে ফেল্লে—চীৎকার করিতে করিতে ক্ষান্ত রাসুর পিঠের উপর দমাদম কয়েকটা কিল বসাইয়া দিল। রাসু ভ্রূক্ষেপও করিল না, ভূলুণ্ঠিতা বিরাজের দেহের উপর ক্রমাগত লাথি মারিতে লাগিল। ক্ষান্ত দুই হাতে তাহাকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া তাহার পৃষ্ঠের উপর দাঁত বসাইয়া দিতে, সে একটা ভীষণ গালি উচ্চারণ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষান্তকে লইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আরও কয়েক জন স্ত্রীলোক কেহ কাষ্ঠ-খণ্ড, কেহ সম্মার্জ্জনী হস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সকলে মিলিয়া রাসুকে আক্রমণ করিল। গোলমাল শুনিয়া বন্ধুবর্গ বাহিরে আসিল এবং রাসুকে তদবস্থ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়

ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় রণ-রঙ্গিণীর দল হঠাৎ, রাসুকে ছাড়িয়া তাহাদের দিকে ছুটিল। তারপর যে যাহাকে পারে—মার। বেগতিক দেখিয়া বন্ধুরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

এমন হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা পর এই স্ত্রীলোকদের দেখিলে কেহই বলিত না, এই মাত্র তাহারা একটা যুদ্ধ শেষ করিয়া ফিরিয়াছে। ইহাদের মুখে তখন উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র ছিল না, অভ্যাস মত রঙ্গ তামাসা আরম্ভ করিয়াছিল। উত্তেজনার গভীরতাটুকু পর্য্যন্ত ইহাদের নাই—যেমন সামান্য কারণে আসে, তেমনি সামান্য সময়ে আবার চলিয়া যায়।

বারান্দার একধারে বিরাজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অপমানবিদ্ধ অন্তর ধিক্কারে ভরিয়া গিয়াছিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুটা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গের বেদনা প্রতি মুহূর্ত্তে লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। ছি ছি, এমন জীবনও সে বহিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্গিনীদের রঙ্গ-কৌতুক প্রেতের অট্টহাসির মত তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। প্রেতের মতই যে ইহারা আপন-আপন জীবন-মহাশ্মশানে ধ্বংসের উপর উল্লাসে নৃত্য করিতেছে।

বিরাজ আর ভাবিতে পারিল না। রাত্রি আসিয়া পড়িয়াছিল—বারান্দায় ঝুলান কাপড়খানি তুলিয়া লইয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

কাশীমিত্রের ঘাট নিকটেই, বিরাজ সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্মশানে তখন কয়েকজন লোক একটি মৃতদেহ নামাইয়া রাখিয়া সৎকারের আয়োজন করিতেছিল। দেহটি এক যুবতীর, যৌবনের প্রারম্ভেই বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বে বসিয়া একজন যুবক—বোধ করি, স্বামী—সেই প্রাণশূন্য শুষ্ক মুখখানির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া অনর্গল অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল।

এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া মাঝে মাঝে বিরাজ এরূপ দৃশ্য দেখিত না, তাহা নহে। কিন্তু আজ এই শোকাচ্ছন্ন স্বামীর নীরব বিলাপ তাহার মর্ম্মে একটি করুণ সুর বাজাইয়া দিয়া গেল। রুগ্না পত্নীর প্রাণরক্ষার্থ স্বামী হয়ত কত চেষ্টাই না করিয়াছে, কত সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে। এমন আর একজন যুবককে সে একদিন একাগ্রচিত্তে পত্নীর শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছিল। সে কি এখনো বাঁচিয়া আছে? না, ইহারি মত স্বামীর কাতর অশ্রুজলে জন্মের শোধ বিদায় লইয়াছে? সে দিনের কথা মনে পড়িতে বিরাজের গণ্ডদ্বয় জলে ভাসিয়া গেল। সেই দিন জীবনে সর্ব্বপ্রথমে তাহার মন একটি সত্যকার সুখের চিত্র পরিকল্পনা করিয়া আশ্রয় লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। হায় রে, তাহার সেই কল্পনা সূচনাতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে!

ঘাটে সিঁড়ির উপর পা ঝুলাইয়া দুই গালে হাত দিয়া বিরাজ বসিয়া রহিল। নীচে নদীর জল, অতলস্পর্শী গভীর—মৃত্যুর মতই যেন এই বিচিত্র বিশ্বজীবনের মাঝ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—ব্যবধান একটি ধাপ মাত্র! বিরাজের সকল ইন্দ্রিয় যেন কোন ব্যথার স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল।

—এত রাত্রে এখানে একলাটি ব'সে কি ভাবচিস্ মা? তুই কি কোন দুঃখ পেয়েচিস?

বিরাজ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল—গৈরিক পরিহিত এক ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাকেই সম্বোধন করিতেছেন। সাধারণ সন্ন্যাসীর মত তাঁহার মাথায় জটাভার নাই, আকৃতি সৌম্য-শুদ্ধ, গায়ে আলখাল্লার মত লম্বা একটা ঢিলা পাঞ্জাবী। নিকটস্থ বাতির সবটুকু আলোক তাঁহার স্নিগ্ধ মুখখানির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তিনি কহিলেন, ঐ দেখ মা, চেয়ে দেখ।

বিরাজ দেখিল, মৃতার দেহ চিতা শায়িত করিয়া অগ্নি-সংযোগ করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে আগুনের শিখাগুলি লক্ লক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। একটু দূরে বসিয়া মৃতার কয়েক জন আত্মীয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল।

গৌরিকধারী বলিলেন, দেখলি মা, এখন বলত সইতে পারিস কি না? কেন পার্‌বি না? অতি বড় কাপুরুষ যে, সেও এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে। আর আমরা সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে মন গড়া দুঃখ-কষ্টগুলি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না, এও কি হয়? কি জানিস্ মা, দুঃখের মাত্রা আমরা বড় ক'রে দেখি ব'লেই ত দুঃখ এমন

ঘাড়ে চেপে বসে। নইলে দুঃখ কোথায়? এখানে যে কেবলি আনন্দ—জীবনে আনন্দ, মরণে আনন্দ।

বিরাজের সকল তাপ যেন জুড়াইয়া আসিতেছিল। বিস্মিত নেত্রদ্বয় আয়ত করিয়া সে তাঁহার আনন্দ-দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুই ঢের দুঃখ পেয়েছিস? কিন্তু সান্ত্বনা কি কখনো পাস্ নি মা? পেয়েছিস বৈ কি,—দুঃখের চেয়েও যে সান্ত্বনাই বেশী পেয়েছিস। একগুণ দুঃখ এসে দেখা দিলে, দশগুণ সান্ত্বনা এসে সেই দুঃখটুকু কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে যায়। নৈলে মানুষ কি একটি দিনও বেঁচে থাক্‌তে পার্‌তো? এখন ভাবতে চেষ্টা কর দেখি মা, ঐ সান্ত্বনা কোথেকে আসে। ও যে আত্মারই স্বরূপ—আনন্দময় আত্মা নিজের ভিতর কখনো নিরানন্দ পুষে রাখতে পারে? হাজার দুঃখেও স্বপ্রকাশ সে হবেই, তাই না আমরা বিপদে আশ্বাস, দুঃখে সান্ত্বনা পেয়ে থাকি।

কে এ মহাপুরুষ? এমন সত্য সুন্দর উৎসাহ-বাণী সে যে কাহারো মুখে শুনে নাই। বিরাজ ধীরে ধীরে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, কহিল, বাবা সংসারে সকলের স্থান আছে, কিন্তু আমার মত হতভাগিনীর স্থান কোথাও নেই।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—এত বড় পৃথিবী এখানে স্থানের অভাব কি মা? দুটি অন্নের জন্য ভাবচিস, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, একটা পেটত—ওর জন্য কতটুকু দরকার? সংসারের দিকে তাকাচ্চিস আর মনে কর্‌চিস—ওরা সব দিব্যি পরস্পর নির্ভর ক'রে আছে, স্ত্রী স্বামীকে, ছেলে বাবাকে আশ্রয় করে বেশ মনের সুখে কাল কাটাচ্চে। বাইরে দেখে অমনি মনে হয়, কিন্তু আসলে ঐ আশ্রয়টুকুর মূল্য কতটুকু মা? নিজের চেয়ে বড় আশ্রয় কোথায় কার আছে? বাইরের আশ্রয় কিছুই নয়—তার জ্বলন্ত প্রমাণ বুকে ক'রে, ঐ দেখ, চিতা এখনো জ্বল্‌চে।

১৭

অধিক রাত্রে বিরাজ বাড়ী ফিরিল। প্রতিবেশিনীগণ যে যাহার ঘরে শয়ন করিয়াছিল। তখন হাস্য-কোলাহল থামিয়া গেছে। উঠান অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে তাহার পা চলিতেছিল না, রেলিং ধরিয়া কোনমতে বারান্দায় উঠিয়া দরজার সম্মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল দরজা বন্ধ—সে ঠেলিল না। ঘরের ভিতর কাহাকে শায়িত দেখিবে, ভাবিতেও তাহার শরীর ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এমন সময় একটা দমকা বাতাস দরজার পল্‌কা পাল্লা দুটাকে খুলিয়া দিল। ভিতরে রাস্তার গ্যাসের আলোক শয্যার কিয়দংশ আলোকিত করিতেছিল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভিতরে চাহিতে বিরাজ দেখিল, সেখানে কেহ শুইয়া নাই। বিরাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

ভিতরে ঢুকিয়া বিরাজ দরজা বন্ধ করিয়া দিল ঘরটি অন্ধকার, সে আলো জ্বালিল না—সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া বিছানার উপর গিয়া বসিল। তাহার ক্ষুধা ছিল না, কিন্তু তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতেছিল, মাথার ধারে সোরাই হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া লইয়া সমস্তটা সে পান করিল। তারপর ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল। দিবসের ঘটনা পরম্পরায় তাহার দেহমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, শীঘ্রই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন গ্রীষ্মরাত্রের দখিনা বাতাস সারা সহরটির বুকের উপর ঘুম-পাড়ানো গানের মতন ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

পরদিন যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা হইয়াছে। প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া সে হোটেলে যাইত। অভ্যাস মত আজও সর্ব্বপ্রথম হোটেলে যাইবার কথা মনে উঠিতে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা তাহার স্মরণ হইল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দ্বার খুলিবে এমন সময় খাটের নীচে দৃষ্টি পড়িতে ভয়ে বিস্ময়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত তাহার হাতখানি অর্গল ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ ঝুলিয়া পড়িল। সে দেখিল, খাটের তলে তোরঙ্গটির তালা ভাঙ্গিয়া কে জিনিষ-পত্রগুলি টানিয়া বাহির করিয়াছে। আশে-পাশে কয়েকটা বডি জ্যাকেট সেমিজ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ডালার ফাঁক দিয়া বেগুনী রংএর একখানি কাপড়ের অর্দ্ধেকটা দেখা যাইতেছিল। বিরাজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কোন্ চোর তাহার এমন সর্ব্বনাশ করিয়া গেল? বাক্সের ডালা খুলিয়া বিরাজ

দেখিল, সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার, ভাল কয়েকখানা কাপড়, মূল্যবান যাহা কিছু ছিল, সবই অপহৃত হইয়াছে!

বিরাজ ভাবিতে লাগিল। এ কাজ কে করিয়াছে সে সম্বন্ধে এখন তাহার বিন্দু মাত্র সংশয় রহিল না। গতকল্য তাহার অনুপস্থিতি কালে রাসু ঘোষ বাক্স ভাঙিয়া টাকা-কড়ি গহনা-পত্র লইয়া চম্পট দিয়াছে। তাহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, যাক্—কিন্তু একথা ঠিক, এই লোকটা আর তাহাকে জ্বালাইতে আসিবে না। ইহাকে সে যে কত ঘৃণা করিত, আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও একটা মুক্তির উল্লাস তাহাই জানাইয়া দিল। বাঁচা গেছে। তুচ্ছ কয়েকখানা গহনা আর অর্থই না তাহাকে এমন-ধারা আটক করিয়া রাখিয়াছে। ওগুলি থাকিলে আরও কত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত, কে জানে?

একে একে জিনিসগুলি সে বাক্সের ভিতর ভরিতে লাগিল। চুরির কথা কাহাকেও সে জানাইবে না। কেন জানাইবে? রাসুর উপর তাহার কিছু মাত্র রাগ নাই, বরঞ্চ তাহার মনে হইতেছিল, সে বড় সহজে নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং সেজন্য দেখা হইলে সে এই লোকটিকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে পারিবে। কাল হইতে একটা অনিশ্চয়তা তাহাকে একেবারে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, সে যে কি করিবে কোন মতে তাহা ভাবিয়া পায় নাই। এক্ষণে তাহার নব মুক্ত আত্মা কর্ত্তব্যের পথ মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল। ছেলে বেলায় সে কাশীতে থাকিত—সে দিন তাহার এখনো মনে পড়ে যেদিন কাশী ছাড়িয়া তাহার মাতা তাহাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল। সেই শৈশব কল্পনা-মার্জ্জিত বারাণসীর স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিতেই সে যেন সকল চিন্তার কূল পাইল। আশ্রয়ের ভাবনা কি? কত অসহায় নর-নারী, কত পাপী তাপী এই মর্ত্ত্যের কৈলাসে আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে। কেন সে তবে মিছা অন্নের ভাবনায় ভুলিয়া এই পাপ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবে? সন্ন্যাসী ঠিকই বলিয়াছে—একটা পেট ত? ওর জন্য কতটুকু দরকার?

হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিরাজ হোটেলে গেল। যথাস্থানে রাম-ঠাকুর বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া কহিল,—কাল রাত্তিরে কোথা ছিলি বল্?

বিরাজ সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল,—কাল আস্‌তে পারি নি।

রাম-ঠাকুর গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—তা ত জানি। সন্ধ্যার পর কামিনীকে পাঠাই, সে এসে বললে, তুই বাড়ী নেই। আজও এত বেলা ক'রে এলি। বলি এ সব কি হচ্চে? খদ্দের পত্তর মাটি হ'তে বস্‌লো যে! এমন ধারা কাজে গাফিলি কর্‌লে আমার হোটেলে চাকরি করা পোষাবে না, সাফ ব'লে দিচ্চি।

বিরাজ কহিল,—ঠাকুর, আমি আর চাকরি কর্‌বো না ঠিক করেচি। আমার পাওনা টাকা কয়টা দাও।

মুহূর্ত্ত মধ্যে রাম-ঠাকুরের গলা চড়া সপ্তম হইতে কড়ি মধ্যমে নামিয়া আসিল। সে বিলক্ষণ বুঝিত, হোটেলের বর্ত্তমান স্বচ্ছলতা সম্পাদনে কর্ম্মপটু বিরাজ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন চাকরি কর্‌বি না বিরাজ? এখানে কি তোর কোন অসুবিধা হচ্চে?

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—না।

—চাকরি কর্‌বি না ত খাবি কেমন ক'রে?

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল।

রাম ঠাকুর আবার বলিল,—মরগে যা, আমার কি? কিন্তু আমার ত এক জন ঝি চাই। লোক দিয়ে না গেলে একটি পয়সাও মাইনে পাবি না।

বিরাজ কহিল,—আমার হাতে একজন ঝি আছে। তাকে এখনি এনে দিচ্চি।

বাড়ী আসিয়া বিরাজ ক্ষান্তর ঘরে গেল। এখান হইতে একটু চাল ওখান হইতে একটু দাল সংগ্রহ করিয়া সে রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল।

বিরাজ কহিল,—ক্ষান্তদি কাজ খুঁজছিলে না? এস আমার সঙ্গে?

কোথা?

—হোটেলে। আমি কাজ ছেড়ে দিয়েচি। আমার কাজটাই তোমায় দিয়ে যাব।

বিস্মিত হইয়া ক্ষান্ত জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি, তুই কোথা যাবি?

বিরাজ কিছু বলিল না। কি ভাবিয়া ক্ষান্ত হাসিয়া উঠিল,—ও বুঝি। তুই বাহাদুর বটে।

সন্ধ্যাকালে একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া বিছানা এবং তোরঙ্গটি চালের উপর চাপাইয়া বিরাজ হাবড়া ষ্টেশনে গেল। গাড়ী ছাড়িবার তখনো বিলম্ব ছিল। মেয়ে কামরায় একটি ভাল স্থান দেখিয়া বিরাজ উঠিয়া বসিল। তখন যাত্রীর ভিড় জমিতে সুরু করিয়াছিল, অল্পক্ষণ মধ্যে স্ত্রী-যাত্রীর ভিড়ে কামরাখানি ভরিয়া উঠিল। চারিদিকে কলরব—বিশৃঙ্খলা। কুলিরা বড় বড় বাক্স-তোরঙ্গ আনিয়া গাড়ীর ভিতর ফেলিতেছিল এবং তাহা লইয়া যাত্রীরা পরস্পর উচ্চকণ্ঠে কলহ করিতে লাগিল। এই গোলমালের ভিতর হইতে সরিয়া আসিয়া এক স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া বিধবা বিরাজের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। মুহূর্ত্তকাল বিরাজের মুখের পানে তাকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কোথা যাবে গা?

বিরাজ বলিল,—কাশী।

প্রৌঢ়া কহিল,—আমরাও ত কাশী যাচ্চি। যে ভিড়, দেখ্‌চি আজ রাত্তিরটা ব'সেই কাটাতে হবে। তা ভালই হ'ল, দুজন একজায়গায় যাচ্চি। ব'সে গল্প করা যাবে এখন।

বিরাজ জানালার বাহিরে লোকের তাড়াহুড়া দেখিতে লাগিল। যাত্রীর চঞ্চলতা, মিঠাইওয়ালার হাঁক ডাক, মাল বোঝাই ঠেলা গাড়ীগুলির লৌহচক্রের ঘর্ঘর। প্ল্যাট-ফরমের মধ্যস্থলে কয়েকজন এক যুবককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল—বোধ হয় ইহারা বন্ধুকে বিদায় দিতে আসিয়াছে।

—ঐ যা, আমার কম্বলখানাত ও গাড়ীর বিছানার ভিতর গেছে। হাঁ গা, তোমার সঙ্গে কম্বল আছে কি?

বিরাজ জানাইল,—একখানা তাহার সঙ্গে আছে।

প্রৌঢ়া কহিল,—তা এক কাজ কর্‌লে হয় না? কম্বল বিছিয়ে তার ওপর দুজনা বসি, কি বল?

—বেশ ত—বিরাজ তোরঙ্গ খুলিয়া একখানি লাল রংএর কম্বল বাহির করিল। দুজন মিলিয়া সেটি বিছাইলে, প্রৌঢ়া বলিল,—আঃ—এতক্ষণে নিশ্চিন্দি হ'য়ে বসা গেল। এখন গাড়ী ছাড়্‌লে বাঁচি, যে গরম—উঃ!—তারপর উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিয়া কহিল,—দাদাবাবু, অ-দাদা বাবু—গাড়ী ছাড়্‌বে কখন গো?

যে যুবকটিকে ঘিরিয়া সকলে গল্প করিতেছিল, সে ঘড়ি দেখিয়া কহিল,—আর পাঁচ মিনিট আছে।

বিরাজের দিকে ফিরিয়া বসিয়া হতাশাব্যঞ্জক স্বরে প্রৌঢ়া কহিল,—এ পোড়া পাঁচ মিনিট কি আর যাবে না গা? একেবারে যে সেদ্ধ হয়ে গেলুম!

বিরাজ তাহার স্থূল শরীরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

সে কহিল,—তুমি বুঝি ভাব্‌চো, আমি বড্ড মোটা—না? পোড়া কপাল, মোটা আর রইলুম কোথা? মালোয়ারি জ্বরে জ্বরে শরিলে কি আর কিছু রেখেচে? নৈলে তিরিশ বছর বাবুদের হেথায় আছি, ভাল খাওয়া পরার ত অভাব হয় নি। এরা তেমন বাবু নয় যে নিজেদের বেলা দই সন্দেশ আর চাকর-বাকরের বেলা মুড়ি।

গাড়ী ছাড়্‌বার ঘণ্টা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর শব্দ হইল।

—ওগো দাদাবাবু—উঠে পড় গো, উঠে পড়। গাড়ী যে ছেড়ে দিলে।

বন্ধুদের কাছে বিদায় লইয়া যুবক পার্শ্বস্থ একটি সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় উঠিয়া পড়িল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রৌঢ়া কহিল,—দাদাবাবুকে সেই এতটুকুখানি থেকে মানুষ করেচি। বড় ভাল লোক—কর্ত্তাবাবু যেমন ছিলেন ঠিক তেম্‌নি। আর হবে নাই বা কেন—কেমন ঘরের লোক ওরা। চন্দনবাড়ীর বাবুদের নাম শোন নি গা?

বিরাজ ঘাড় নাড়িল,—না।

গালে হাত দিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সে কহিল,—ও মা, বল কি গো? চন্দনবাড়ীর সত্যেন্দর-বাবুর নাম শোন নি? তুমি দেখ্‌চি, পিথিমির কোন খবর জান না। পেল্লায় জমিদারী, বিষয়-আশয়—বাড়ীখানা যদি দেখতে তা'হ'লে বুঝতে—বার বাড়ী, ভিতর বাড়ী, নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, হাতী ঘোড়া, বেহারা, মালী, পাইক, বরকন্দাজ—গিজ্ গিজ্ কর্‌চে। দাদাবাবু—ঐ যাকে দেখ্‌লে গা, ঐ ত সত্যেন্দর বাবু—

সে কিন্তু এত সব জাঁকজমক দহরম মহরম পছন্দ করে না। কিন্তু বাপ পিতামোর সময় থেকে চলে আস্‌চে, ও সব ত আর বন্ধ করা যায় না। ফি বছরই বাবু বৌঠাকরুণকে নিয়ে কাশী যায়, সঙ্গে থাকে কেবল একজন চাকর আর আমি। লোকজন নেবার কথা হ'লেই বলে, কাশীর জমিদার বাবা বিশ্বনাথ, আমি ত সেখানে একজন সামান্য লোক! শুনেচ এমন কথা গা?

মাঠ নদী গ্রাম একে একে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বেগে ছুটিতেছে। কচিৎ দুটি একটি পাখী গাড়ীর সহিত পাল্লা দিয়া উড়িয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া ক্ষান্ত হইল। বিরাজ কিছু কাল বাহিরে চাহিয়া রহিল। জানালার ভিতর জোর হাওয়া তাহার চুলগুলি উড়াইয়া লইয়া মুখের ভিতর চোখের উপর আনিয়া ফেলিতে লাগিল। সে দুইহাতে সেগুলি সরাইয়া দিয়া মাথার কাপড় চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।

যথাসময়ে গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। অমনি চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া কেহ নামিল, কেহ বা উঠিল; ফেরিওয়ালার চীৎকার, যাত্রীর কোলাহল বিস্তীর্ণ প্লাটফরমটিকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল।

—ঝি—অ ঝি!

বিরাজ ফিরিয়া দেখিল, সেই যুবক একটি গৌর-কান্তি সুন্দর শিশু কোলে করিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—এই নাও, উষাকে ধর। ও গাড়ীতে ও কিছুতে থাক্‌বে না, সে কি কান্না।

—এস রাণী এস লক্ষ্মী এস।

অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া শিশু ঝির কোলে লাফাইয়া পড়িল। ঝি তাহাকে লইয়া বিরাজের পাশে আসিয়া বসিতে সে জিজ্ঞাসা করিল,—এটি বাবুর মেয়ে বুঝি?

হাঁ এই একটিই সন্তান। বেঁচে জিয়ে থাক—

বিরাজ কহিল,—বেশ মেয়েটি ত। আস্‌বে খুকী আমার কাছে?

খুকী একটিবার অপরিচিত নূতন মুখখানির দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরীক্ষাটা বোধ করি অনুকূলই হইয়াছিল কেন না পরক্ষণে সে আবার হাসিতে লাগিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় একজন ফেরিওয়ালা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ঝুনুঝুনি বাজাইয়া ডাকিল, খেল্‌না—খেল্‌না চাই।

খুকী সহর্ষে হাত বাড়াইয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল উটা নেব।

ফেরিওয়ালা বিনা বাক্যব্যয়ে খুকীর হাতে একটি খেল্‌না তুলিয়া দিল। ঝি কহিল,—ও মা, ও খুকী—খেল্‌না নিয়ে বস্‌লি? আমার কাছে যে একটিও পয়সা নেই-রে।—দাদা-বাবু—ও গো বাবু—

একটি ক্ষুদ্র থলি হইতে কয়েক আনা পয়সা বাহির করিয়া বিরাজ কহিল,—তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি। আমার কাছে খুচরো পয়সা আছে, আমি দিচ্চি।

দাম দিয়া ফেরিওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিয়া বিরাজ বলিল, এস দিদি, আমার কাছে ব'সে পুতুল নিয়ে খেলা কর্‌বে এস।

খুকী নির্ব্বিকার চিত্তে বিরাজের কোল অধিকার করিয়া বসিল। গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ঝি কহিল,—বেশত! এতক্ষণ ধ'রে আলাপ কর্‌চি, কিন্তু তোমার নামটি পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করি নি।

—আমার নাম বিরাজ।

—কাশীতে কোথা গিয়ে উঠ্‌বে?

বিরাজ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—তার কিছু ঠিক নেই।

—ঠিক নেই? সে কি! আর কখনো কাশী গিয়েছিলে?

—ছেলেবেলা কাশীতে ছিলুম মনে পড়ে। তারপর আর যাই নি।

—তোমার সঙ্গে কে আছে?

—কেউ নেই।

ঝি বিস্মিত হইয়া বলিল,—ও মা বল কি গো। একা মেয়ে মানুষ কাশী যাচ্চ, সঙ্গে কেউ নেই, কোথা যাবে তার ঠিক নেই। তোমার ত সাহস কম নয় দেখ্‌চি।

গাড়ীর একঘেয়ে ঝাঁকুনিতে খুকী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঢলিয়া-পড়া দেহটি বাহু দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বিরাজ কহিল,—আমি বড় দুঃখী দিদি। সংসারে আমার

দাঁড়াবার স্থান নেই। তাই যাচ্চি দেখি, বাবা বিশ্বনাথের দোরে প'ড়ে থাক্‌বার মত একটু জায়গা ক'রে নিতে পারি কি না।

তাহার কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঝির মনে কষ্ট হইল। সে কহিল,—আহা তা আর পার্‌বে না? বাবার স্থান, যে জন ভক্তি ক'রে যায়, তার আবার আশ্রয়ের ভাবনা?

কিছু কাল দুইজন চুপ করিয়া রহিল। গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশন লাফাইয়া পার হইয়া চলিল। অন্ধকার বহিঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিরাজ বোধ করি আপন অদৃষ্ট ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শিশু অঘোরে ঘুমাইতে লাগিল।

আসানসোলে খুকীকে মাতার গাড়ীতে রাখিয়া ক্ষুদ্র একটি চ্যাঙারি লইয়া ঝি ফিরিয়া আসিল। কহিল,—কিছু খাবার এনেচি, খাবে এস।

খাবার খাইতে খাইতে ঝি বলিল,—আমি একটা কথা ভাবছিলুম। তুমি বরঞ্চ এখন আমাদের বাড়ীতেই উঠ্‌বে চল। তারপর দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করা যাবে এখন, কি বল?

বিরাজ কি বলিবে? তাহার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ]

লালা-লাজপত্ রায়

শ্রী হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য

(১)

ভারত-মাতার কণ্ঠমণি উদার-চেতা মহৎ-প্রাণ,
তোমার তরে পুঞ্জীভূত আজ্‌কে আমার সাঁঝের গান।
যোদ্ধা তুমি, তাপস তুমি, সরল সহজ কর্ম্ম-বীর.
গর্ব্বে তোমার গরব মোদের—ভারত আজি উচ্চশির।
অমরপুরের তোরণদ্বারে দাঁড়াও সখা একটি বার,
বেদন-সাগর-মথন হ'তে লহ মোদের নমস্কার।

(২)

পাঞ্জাবেরি বীর-কেশরী নও শুধু হে সিংহরাজ,—
সিংহনাদে ভারত-জোড়া আকাশখানা গর্জ্জে আজ।
হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় তোমার বাণীর আগুন ছোটে;
ভারতমাতার অঙ্গনে আজ তোমার প্রাণের দীপ্তি ফোটে;
তোমার ঝড়ে কুমারিকার সাগর কাঁপে বারংবার;
ঝড়ের রাজা, ঝড়ের পূজায় লহ মোদের নমস্কার।

(৩)

সিন্ধুনদের গহনবনে কুন্দকুসুম-শুভ্র-প্রাণ,
আর্য্য-ঋষির কণ্ঠ-হ'তে উৎসারিত বেদের গান
পঞ্চ-ধারার অন্তরেতে আজও বাজে গুঞ্জরি,
আর্য্যবিভায় পুষ্পলতা আজও ওঠে মুঞ্জরি;—
সেই দেশেরি দুলাল তুমি, সেই দেশের কণ্ঠহার,—
আর্য্যকুলতিলক, আজি লহ মোদের নমস্কার।

(৪)

দেশকে তুমি দেখ্‌তে পেলে কোন্ দিঠিতে দার্শনিক,
কোন্ বিভূতির সোনার কাঠি জাগিয়ে দিল সকল দিক;
মূর্ত্ত হোলো, সবল হ'লো প্রাচীণকালের মৃণ্ময়ী,
তোমার-আঁখির আবাহনে উঠ্‌ল জেগে চিন্ময়ী,—
উষার আভায় উজল নয়ান—সন্ধ্যাকাজল আঁখির তলে,
শেষ প্রহরের তারার মাঝে মায়ের গভীর দীপ্তি জ্বলে;
পাঁচনলিটি পঞ্চধারায়,—কুন্তলদাম শৈলশিরে,
নীল আকাশের নীলাম্বরী অঙ্গ-খানি আছে ঘিরে;—
আম্রবনের মঞ্জরীতে মায়ের মৃদু অঙ্গবাস,
নদীতটের কাশের গোছে ভারত-মাতার মধুর হাস;
শ্যামলবনের ঝিল্লীসুরে বাজে বুঝি কাঁকণ দুটি,
শেফালিকার অর্চ্চনাটি চরণমূলে পড়ছে লুটি;

আষাঢ়-মেঘের গর্জ্জনেতে মায়ের ব্যথা গুম্‌রে ওঠে,
শ্রাবণরাতে নয়নে তাঁর পাগ্‌লাঝোরার ঝরণ ছোটে ;
চরণ তলে নূপুরবাজে জনগণের কণ্ঠরোলে,
বিংশকোটির হর্ষবেদন মরমতলে সদাই দোলে ;—
দেখেছিলে ভারতীর এই বিশ্বরূপের মূর্ত্তি-খানি,
অন্তরেতে রইল জেগে মাতৃপূজার পরম-বাণী ;—
তাইত প্রীতির পুণ্য-ধারায় ধৌত হলো তোমার প্রাণ,
তাই সাজালে পূজার বেদী—গাহিলে কোন্ রুদ্রগান ;
তাই জ্বালালে হোমের অনল স্বাধীনতার যজ্ঞে আজ,
মরণ নিলে বরণ ক'রে, পূর্ণ হলো মায়ের কাজ।
মোদের তরে জীবন দিলে—ভারত আজি অন্ধকার,—
যাদের ভালবাস্‌লে, সখা, লহ তাদের নমস্কার।

(৫)

ঝটিকারি দোসর তুমি,—অত্যাচারের দুর্গ-চূড়া
ঝড়ের বেগে কাঁপিয়ে দিয়ে ধূলির মত কর্‌লে গুঁড়া।
কত আঘাত সইলে সখা, সইলে কত নির্য্যাতন,
দেবদানবের সমর মাঝে বীরের মত কর্‌লে রণ।
দেশের দুখে বেদন ভরা বিশাল তব বক্ষখান্
মরণবাণে বিদ্ধ হ'লো—চল্‌লে তুমি মহৎ প্রাণ।
ক্লান্ত আঁখি, শ্রান্ত দেহ—হ'লো তোমার সাঙ্গ কাজ,—
তন্দ্রাহারার চক্ষে বুঝি ঘনিয়ে এল সুপ্তি আজ।
ভেরীর মত এসেছিলে শিকল-পূজার অরির বেশে,
বাঁশীর করুণ সুরের মত মিলিয়ে গেলে উষার শেষে।
দীন দুনিয়ার রাজাধিরাজ দাঁড়াও সখা একটিবার,
উষারাণীর ধূসর দেশে—লহ মোদের নমস্কার।

(৬)

রাত্রি শেষের তিমির ভরা আকাশ গাঙের স্রোতটি বেয়ে
মরণ এল সখার রূপে—অভিসারের গানটি গেয়ে ;—
নয়নে তার প্রীতির আলো, বক্ষে তারার বরণ মালা,
অতনু তার তনুর রেখা পারিজাতের গন্ধে ঢালা ;
স্বপ্নবীণার গভীর সুরে কইল কাণে গোপন কথা,
জাগরণীর পরশটুকু জাগিয়ে দিল ঘরের ব্যথা ;—
শিশিরভরা মরণ হাওয়ার প্রাচীন আগমনীর গানে
ঘর ছাড়া আজ মোদের ছেড়ে পালিয়ে গেলে ঘরের পানে।
ইরাবতীর বিজন কূলে জ্বল্‌ল তোমার প্রাণটি আজ,
হোমের অনল-শিখার মাঝে দেখনু তোমার নূতন সাজ ;
তোমার চিতার দীপক রাগে ভৈরবেরি জাগল গান,
অগ্নি-পূজার পূজারী আজ কর্‌লে মহা অর্ঘ্য দান।
নিভ্‌ল চিতা গভীর রাতে—পঞ্চধারা অন্ধকার ;—
আকাশ ভরা নীরবতায়—লহ মোদের নমস্কার।

মহিলা-সংবাদ

কুমারী প্রমীলা পিটার্স ১৯২৬ সনে আমেরিকা যান। ইঁহার পূর্ব্বে তিনি লক্ষ্ণৌএর ইসাবেলা থবার্ণ কলেজের ছাত্রী ছিলেন। বহু ভারতবর্ষীয়া শিক্ষার্থিনীর মত তিনিও আমেরিকায় শিক্ষাপদ্ধতি অধ্যয়ন করেন। এই বৎসর তিনি নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-বি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি দেশে অবস্থানকালে পল্লীশিক্ষায় নিবুক্ত ছিলেন এবং উক্ত কার্য্যের সম্পর্কে এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। শিক্ষাসমাপন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি পুনরায় এই কার্য্যেই আপনাকে নিয়োজিত করিয়া দেশের সেবা করিবেন এই আশা করা যায়।

স্ত্রী শিক্ষার জন্য বার্ব্বার (Barbour) বৃত্তির তিরাশিটি এপর্য্যন্ত প্রাচ্য ছাত্রীদিকে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে চুয়াল্লিশটি চীনের, বাইশটি জাপানের, নয়টি ভারতবর্ষের, তিনটি ফিলিপিন দ্বীপের, দুইটি কোরিয়ার দুইটি হাওয়াইয়ের, ও একটি সুমাত্রার মহিলারা

পাইয়াছেন। আমরা অন্য পৃষ্ঠায় বার্ব্বার বৃত্তিধারিণীদের একটি ছবি দিলাম।



মিসেস এম্ সোরাবজী



কুমারী প্রমীলা পিটাস



শ্রীমতী খটকাট জানকী আম্মা



মিসেস এ ট্রপেন



কয়েকজন বার্ব্বার বৃত্তিধারিণী

ভারতীয়া বৃত্তিভোগিনীদের নাম; যথাক্রমে (বামদিক হইতে) মিসেস্ আরন, মিস্ আর্লিক, ও মিস্ এচিলিপ

মিসেস্ এ ইপেন মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেজওয়াদা মিউনিসিপালিটির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী থট্টকাট জানকী আম্মা ত্রিচুরের একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা। ইনি সম্প্রতি কোচিন দরবার কর্ত্তৃক কোচিন রাজ্যের অবৈতনিক বিচারক (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট) রূপে নিযুক্তা হইয়াছেন।

কানানোরের উকীল মিঃ মানিকজীর পত্নী মিসেস এম সোরাবজী কানানোরের স্পেশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিস্ এ জে ওয়াচা বি এ (অনার্স) এ বৎসর ধারওয়ারের কর্ণাটক কলেজ হইতে সসম্মানে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



মিস এ জে ওয়াচা

ভুট্‌কি

শ্রী শান্তা দেবী

সোনালি ধানের ক্ষেতের প্রান্তে ঘন সবুজ তরুশ্রেণী, দূরে শরতের নীল আকাশের কোলে ছোট বড় পাহাড় সারি সারি নানা ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ পাঠান সিপাহীর মত সূক্ষ্মাগ্র শিরোভূষণ সগর্ব্বে উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া, কেহ ধ্যানী যোগীর মত জটাবহুল মস্তক ভক্তি-ভরে ঈষৎ আনত করিয়া, কেহ বা নববধূর মত নীলাঞ্চলে আপাদমস্তক মুড়িয়া লজ্জা-নম্র মুখটি নীচু করিয়া আবার কেহ বা প্রণত বিন্ধ্যাচলের মত সর্ব্বাঙ্গ মাটিতে লুটাইয়া যেন অগস্ত্য মুনিকে প্রণাম করিতেছে। মহাকায় এই অচল, প্রাণহীন প্রস্তর স্তূপগুলি শুধু তাহাদের এই বিচিত্র ভঙ্গিমার সাহায্যেই যেন কত কথা বলিয়া যাইতেছে।

সূর্য্য অস্ত যায় যায়। অস্তরবির বর্ণচ্ছটা শুভ্র মেঘের পুঞ্জে পুঞ্জে সহস্র রঙের ছোপ ধরাইয়া দূর বনানার মাথায় শেষরশ্মির ম্লান আলোটুকু যেন ক্লান্তিভরে ছড়াইয়া দিয়াছে। ক্ষেতের পাশ দিয়া বাঁধের মত উঁচু পথটি চলিয়া গিয়াছে, তারপর ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীটি তাহার বালুময় বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছে। ক্ষীণ বক্র জলস্রোতটুকুর ধারে একা সুপুষ্ট মহিষ ও গোটা দুই তিন গাভী দুটি মসীকৃষ্ণকায়া কোল বালিকার তত্ত্বাবধানে জল খাইতে নামিয়াছে। তাহাদের সুচিক্কণ দেহে লুপ্তপ্রায় সূর্য্যালোক আর একটু পালিশ লাগাইয়া দিয়াছে।

বাঁধের উপরের পথ দিয়া মাধবী চলিয়াছিল সমরেশের সঙ্গে। মাধবী সূর্য্যাস্তের বর্ণসমারোহের দিকে তাকাইয়া বলিল, "পৃথিবীতে যে প্রতিদিন সূর্য্য উঠছে আর অস্ত যাচ্ছে কলকাতায় থাক্‌লে ভুলেই যাই।"

সমরেশ হাসিয়া বলিল, "সূর্য্যের সঙ্গে না হয় কোনো সম্পর্ক রাখি না তাই তাকে মনেও থাকে না; কিন্তু ভাত ডাল যে রোজ দু-বেলা খাচ্ছি সেটা কোথা থেকে পাই তাই কি মনে থাকে? এই সোনার ধানের ক্ষেত চোখের আড়াল হ'লেই মনে করি পৃথিবীটা বুঝি আগাগোড়াই "ম্যাকাডা-মাইজড্‌ রোড" দিয়ে বাঁধানো আর কংক্রিটে ঢালাই করা।"

মাধবী ও সমরেশের উচ্চাঙ্গের কথাবার্ত্তায় বাধা দিয়া একদল মানুষ ধুলা উড়াইয়া কলরব করিতে করিতে পথের মোড়ে আসিয়া দেখা দিল। কতক বেহারী, কতক সাঁওতাল কতক বা দুইয়ের মিশ্রণ। তাহাদের প্রায় সকলেরই পরণে চওড়া লাল পাড়ের মোটা মোটা শাড়ী ধুতি ও চাদর। শাড়ী ও চাদরের লাল আঁচলের প্রান্তে লাল কালো সুতার থোপা সারি সারি দুলিতেছে, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ঘনকৃষ্ণ চুলের রাশি সযত্নে পালিশ করা। গলায় তাহাদের দুই তিন ছড়া করিয়া রঙীন পুঁথির সুদীর্ঘ মালা। লোকগুলি মাথায় বোঝা লইয়া চলিয়াছে। মেয়েদের পিঠে লাল চাদরে একটি করিয়া শিশু দুলিতেছে, মাথায় হাটের নূতন চ্যাঙারিতে শাক-সবজী চাল ডাল বোঝাই। ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেই পা ছুঁড়িয়া আপনার ক্ষুধা জানাইতেছে, মা অমনি বাঁ হাতের টানে তাহাকে সামনে আনিয়া চলিতে চলিতেই স্তন্য দিয়া পিছনে আবার ঠেলিয়া দিতেছে।

অল্প বয়স্ক একটি মেয়ে তাহার সাথীর সঙ্গে চলিয়াছিল; মাথায় তাহারও বোঝা, কিন্তু পিঠে ছেলে নাই। মেয়েটির গায়ে বিলাতী ছিটের একটা জামা, মাথার একরাশি চুল চওড়া লাল ফিতা দিয়া ঠাস এলো খোঁপা বাঁধা, কালো মুখের উপরে কপালে লম্বা উল্কি; পরণের শাড়ীটাও বিলাতী, কিন্তু চাপা নাক, গোল মুখ ও নিকষ কালো রঙে তাহার জাতি বুঝিতে দেরী হয় না। রূপের মাপকাঠিতে মাপিলে তাহার সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, কিন্তু স্বাস্থ্য ও পূর্ণ যৌবনের শক্তিতে তাহার সমস্ত শরীরে একটা অপরূপ লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার গতি ভঙ্গী, হাত-পা নাড়া, কথা বলা কোথাও এতটুকু জড়তা কি দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই।

মেয়েটি দ্রুতপাদক্ষেপে মাধবীর কাছে আসিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল, "মেম সাহেব, দাই মাংতা ?"

মাধবী অস্ফুটস্বরে সমরেশকে বলিল, "দেখেছ ! ও আমাকে মেম সাহেব ঠাওরেছে।"

সমরেশ বলিল, "তা অমন কষ্টিপাথরের কাছে তোমাকে মেম ত মনে হবেই।"

মেয়েটি পরম গম্ভীর মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধবী বলিল, "তুই কি হিন্দুস্থানী ? হিন্দি শিখ্‌লি কি ক'রে ?"

মেয়েটি নিজের জাতি বলিল না, শুধু বলিল, "পুরাণা মেম সাহেবকা কোঠিমে শিখ্‌ লিয়া।"

সে যে হিন্দুস্থানী নয় তাহা তাহার ভাঙা হিন্দীও কথার সুরেই বোঝা যাইতেছিল, তবু মাধবীর কথার পুরা উত্তর সে দিল না।

মাধবী বলিল, "কি কাজ করতে পারিস ?"

সে বলিল, "বর্ত্তন মলে গা।"

তাহার সঙ্গীটি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "সব কাম করে গা, হুজুর।"

সমরেশ বলিল, "তোমার ত লোকের কিছু মড়ক পড়ে নি, রাস্তার মাঝখানে লোক না ঠিক করে এখন বাড়ী ফিরবে চল।"

মাধবী বলিল, "দাঁড়াও না, আপনি এসে সাধছে, অল্পেতেই রাজি হবে। খোকাটাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার লোক পাই না, এ বেশ গুণ্ডা আছে, কাঁধে ক'রে রোজ দুবেলা বেড়িয়ে আন্‌বে।"

সমরেশ রাগিয়া বলিল, "তোমার যা খুসী করগে। পয়সা নষ্ট কর্‌তে পেলে তুমি আর কিছু চাও না।"

মাধবী সমরেশের কথায় কান না দিয়া বলিল, "এই কত মাইনে নিবি ?"

মেয়েটি বলিল, "যো আপকা খুসী, মেমসা'ব।"

মাধবী বলিল, "তিন টাকা আর খাওয়া পাবি।"

মেয়েটি বলিল, "ভাত নেই খায়েগা মেম সা'ব।"

মাধবী বলিল, "ভাত খাবি না ত কি পোলাও খাবি ?"

কিছুমাত্র না হাসিয়া মেয়েটি বলিল, "চাউল দেনেসে পাকায় লেগা, বাবুর্চ্চিখানামে নেই খাতা হামলোগ।"

সমরেশ হাসিয়া বলিল, "বাপরে! জাত বিচার দেখেছ। আমাদের মত আর্য্য-জাতিকে শেষে সাঁওতালের কাছে ম্লেচ্ছ হ'তে হ'ল।"

মাধবী বলিল, "আচ্ছা, চালই দেব, সিধে পাবি আর তিন টাকা মাইনে।"

মেয়েটি কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। মাধবী বলিল, "বাড়ীর ঠিকানা দিচ্ছি, কাল সকালে ছটায় আসিস্‌। তোর নাম কি ?"

সে বলিল, "ভুটকি।"

বাড়ীর ঠিকানা লইয়া ভুটকি চলিয়া গেল। মাধবী বলিল, "তুমি ত কেবল আমার টাকা খরচ করতে দেখ ! লোকটা যদি টে কে ত কত সুবিধা বল দেখি ! কল্‌কাতায় ত ছেলের লোক খুঁজলেই বল্‌বে কুড়ি টাকা মাইনে খাওয়া পরা দাও ; তার জায়গায় তিন টাকায় পেলে আমাকে তোমার কিছু বকশিশ দেওয়া উচিত।"

সমরেশ হাসিয়া বলিল, "সর্ব্বস্বই ত দিয়ে রেখেছি ; আমি নিজে পর্য্যন্ত তোমারি সম্পত্তি ; আর বকশিশ দিতে পার কোথা ?"

মাধবী বলিল, "আমি ম'রে গেলে যেন ভুলে যেও না সে কথাটা ; তখন ত অনায়াসেই আমার সম্পত্তিটা পরকে তুলে দেবে ?" সমরেশ হাসিল।

পরদিন সকাল বেলায় ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টার সময় ভুটকি চার ছড়া পুঁথির মালা গলায় দিয়া লালফিতায় খোঁপা বাঁধিয়া কাজে আসিয়া হাজির। মাধবী চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "দেখছ গো, তিন টাকার ঝিএর সময় জ্ঞান ? তোমার বারো টাকা মাইনের খোট্টা বেয়ারার এখনও ত ঘুমই ভাঙল না। এর পর উঠে কাজ সেরে খোকাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে সাড়ে ন'টার কমে কি আর কোনো দিন হবে ? সাধ ক'রে কি আর লোক রাখ্‌তে চাই ? এ লোকগুলো আমার হাড় ক'খানা ভাজা ভাজা ক'রে দিয়েছে।"

খোকা ভুটকিকে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ও কে এতেতে মা ?"

মা বলিলেন, "ও ভুটকি, তোমার ঝি।"

খোকা দুই হাতে মা'র মুখখানা নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "ঝি কি কব্‌বে, মা ?"

মা বলিলেন, "তোমার সঙ্গে খেলা করবে, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে, গল্প বল্‌বে।"

খোকা মহাখুসী হইয়া বলিল, "কোন্ গোল্প ? বিলালেল গোল্প বল্‌বে ? ছিয়ালেল গোল্প বল্‌বে ?"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "জানিনে বাপু, কিসের গল্প, ওকে জিগ্‌গেস কর্।"

খোকা প্রথম খানিকক্ষণ মার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া মা'র হাঁটুর কাছে মুখ গুঁজিয়া সলজ্জ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে ঘাড়টি ফিরাইয়া দুই চার বার আড়চোখে ভুটকিকে দেখিয়া লইল। খোকার রকম দেখিয়া ভুটকির পরম গম্ভীর মুখেও হাসি দেখা দিল। সে হাত দুইটা বাড়াইয়া বলিল, "আও বাবা।"

এক ডাকেই হৃদয় জয়। খোকা ঝাঁপাইয়া ভুটকির কোলে গিয়া পড়িল। তাহার পুঁথির মালা শোভিত গলাটি কচি দুই হাতে জড়াইয়া বলিল, "ভুত্‌কি, আমাকে ওনেক গোল্প বল।"

ভুট্‌কি খোকার কাজ করিতে আসিত কি পূজা করিতে আসিত বলা শক্ত। ভোরবেলা অন্ধকার না কাটিতে শোনা যাইত চুড়িবালার ঝঙ্কার তুলিয়া ভুট্‌কি খোকার থালা বাটি গামলা ঘটি মাজিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। মাধবী যত ভোরেই ঘরের বাহিরে আসুক না কেন, দেখিত ভুট্‌কি সুবিন্যস্ত বেশভূষায় ফিট্‌ফাট হইয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছে, খোকাবাবুকে কোলে লইবে বলিয়া। তাহার রকম দেখিয়া লজ্জায় পড়িয়া মাধবী ও সমরেশের প্রাতঃকালীন নিদ্রাটা ক্রমশই কমিয়া আসিতে লাগল। সমরেশের ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল, কিন্তু মাধবী বলিত, "না বাবু, ওসব চল্‌বে না। দোর গোড়ায় একটা মানুষ দাঁড়িয়ে কাঁপবে তোমার ছেলের সেবার জন্যে, আর তুমি দিব্যি কম্বল মুড়ি দিয়ে বেলা আটটা পর্য্যন্ত নাক ডাকাবে সেটি হবে না। ওসব চুনোগলির সায়েবীয়ানা আমি দেখতে পারি না।"

তাহাদের ঘরের দরজার মুখেই উত্তর খোলা বারাণ্ডা; হু হু করিয়া হেমন্তের তীক্ষ্ণ হাওয়া বাগানের গাছপালা দুলাইয়া তারের মত গায়ে আসিয়া বিঁধিত। ভুট্‌কি শুধু—তাহার বিলাতী কাপড়ের আঁচলখানা গায়ে জড়াইয়াই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইত। অগত্যা মাধবীর বকুনিতে সমরেশকে ভোর বেলাই লাল কম্বলের মায়া কাটাইয়া উঠিতে হইত।

সমরেশের উঠিবার শব্দ পাইলেই খোকার গভীর সুপ্তি এক নিমেষে কাটিয়া যাইত। সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে রাজকন্যার সহস্র বৎসরের নিদ্রা যেমন টুটিয়া যায় তেমনি ভুট্‌কির স্মৃতি তাহার সারারাত্রির সমস্ত জড়তা যেন হরণ করিয়া লইত। খোকা কচি দুইহাতে চোখ দুটা ঘসিয়া মুঠি দিয়া ঝাঁকড়া চুলগুলা মুখের দুই পাশে সরাইয়া দিয়া একলাফে খাটের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিত, "বাবা, আমি নাম্‌ব ; ভুতকি কাছে যাব।"

মাধবী বলিত, "মাগো মা, কি নিমকহারাম ছেলে দেখেছ ? সারারাত আগ্‌লাম আমি, রাত জেগে পাঁচ শ' বার লেপ চাপা দিচ্ছি, গা চুল্‌কোচ্ছি, পায়ে হাত বুলোচ্ছি, কত যে লেঠা তার ঠিক্ নেই ; আর ছেলে কি না ভোর না হতেই নাকি-সুর ধরলেন—ভুঁতকি কাঁছে যাঁব। যা তুই ওরই কাছে, আমি চ'লে যাচ্ছি, আর আস্‌ব না। কার কাছে ঘুমোবি তখন দেখে নেব।"

ছেলে স্বচ্ছন্দে নিটোল হাতখানি তুলিয়া মাকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আততা তুমি দাও, আমি ভুতকি কাছে ঘুমাব।"

মাধবী শুধু বলিল, "বাঁদর ছেলে কোথাকার!"

খোকা মোটা মোটা গোল গোল পা ফেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া ভুটকির সন্ধানে দৌড় দিল। তাহাকে দেখিয়াই তাহার কোলের উপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ভুতকি, আমাকে আদল্ ক'ল। আমি এতেতি।"

ভুটকি আড়চোখে চাহিয়া দেখিত কেহ কোথাও কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আছে কিনা ; তারপর খোকাকে চুমায় চুমায় ভরাইয়া দিত। মেম সাহেব দেখিলে এখনি

বলিবে, "খবর্দ্দার খোকার মুখে মুখ দিবি না।" ভয়ে ভুট্‌কি খোকাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইত।

খোকার প্রাতরাশের পর বাগানের বিলাতী নিম গাছের তলায় ভুট্‌কি ও খোকার সভা বসিত। সভাটা আসলে এই দুইজনকে লইয়াই, তবে কখনও কখনও মালী, বেয়ারা এবং মেথরাণীও ফুল ফল এবং হাসি গল্পের ভেট লইয়া খোকার দরবারে হাজির হইত।

ভুট্‌কি রোদের দিকে মুখ করিয়া ভাঙা একটা কঞ্চির মোড়ায় বসিত, খোকা বসিত রোদের দিকে পিঠ দিয়া তাহার চাকাওয়ালা চেয়ারে। ভুট্‌কি বলিত, "বাবা, বহুৎ জাড়া লাগ্‌তা, কাপড়া ত কুছ্ নাহি হ্যায়।"

খোকা দয়ায় গলিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিত, "কালকে দুকান থেকে কিনে দেব। নূতন কোট, তুমি পকেতে হাত দিয়ে লাস্তায় বেলাতে যাবে। ছিঁলাতা ফেলে দাও।"

ভুট্‌কি বলিত, "বাবা, আউর ক্যা মিলে গা ?"

খোকা বলিত, "আলুভাদা দেব, লেবু দেব, ছন্দেত দেব, ছ——ব দেব।"

বাগানের ঝারি হাতে মালী আসিয়া বলিত, "খোকা বাবু, আমাকে কি দেবে ?"

খোকা পরম গম্ভীর মুখ করিয়া বলিত, "তোমাকে মা কিনে দেবে।"

বেয়ারা আসিয়া বলিত, "আর আমি, খোকা বাবু ?"

খোকা বিরক্ত হইয়া বলিত, "তুমি এখন চ'লে যাও। তোমাকে চাই না।"

ভুট্‌কি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বিজয়গর্ব্বে হাসিত আর গাড়ী হইতে খোকাকে টানিয়া আনিয়া বুকে চাপিয়া ধরিত।

বিকালে খোকার মাঠে বেড়াইতে যাইবার কথা। মাধবী দিবা নিদ্রা সারিয়া উঠিয়া দেখিল খোকা ও ভুট্‌কি ঘরে নাই; তাহার আলনা বাক্স সব উলোট পালোট হইয়া পড়িয়া আছে। খোকা নাই অথচ জিনিষ পত্র এমন ঘাঁটা ঘাঁটি করিয়া রাখিয়াছে কে ? চাকরদের বকাবকি করিয়া কোনো খবর পাওয়া ভাল না।

শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে পড়িয়া আসে। রৌদ্রোজ্জ্বল পথ ম্লান স্নিগ্ধ হইয়া আসে, গাছের মাথার আলোর কিরীট ক্রমে খসিয়া পড়ে। মাধবী পথপারের ধান ক্ষেতের দিকে চাহিয়া দেখিল ভোজপুরীদের তাঁবুতে ক্ষেতের পাশটা ভরিয়া গিয়াছে। বেদেনীরা হাঁড়ি কুড়ি সাজাইয়া গাছ তলায় গর্ত্ত কাটিয়া রান্না করিতে বসিয়াছে। মাধবী ভাবিল ইহারাই বোধ হয় তাহার ঘরে ঢুকিয়া কিছু চুরি করিতে আসিয়াছিল; তাড়াতাড়িতে সব এলো মেলো করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। মাধবী জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল তাহার কোনো জিনিষ দূর হইতে চিনিতে পারা যায় কিনা। পথে ভুট্‌কির চওড়া লাল ফিতা জড়ানো মস্ত কালো খোঁপা দেখা দিল। মাধবীর দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। কিন্তু খোকার গাড়ীতে বসিয়া ও কে ? রামধনুর মত সাত রঙে তাহাকে কে রঙাইয়াছে ? কাছে আসিতে মাধবী দেখিল খোকাই ত বটে। তাহার গায়ে লাল মকমলের পাজামার উপর নীল সাটিনের কোট, তাহার উপর গোলাপী রঙের শাল, পায়ে সবুজ মোজা, মাথায় জরির টুপি। ভুট্‌কি আলনা বাক্স সমস্ত [illegible] যেখানে যা কিছু সুদৃশ্য পাইয়াছে তাহাই খোকার অঙ্গে চাপাইয়াছে। মাধবীর সযত্নে সঞ্চিত সমস্ত পোষাক একদিনে লণ্ড ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। মাধবী চটিয়া আগুন হইয়া বলিল, "ওরে রাক্ষুসী, এ করেছিস কি ? এই ত গরম সুটটা ছিল চোখে দেখতে পাস্ নি ?"

ভুটকি বলিল, "বাবা ময়লা কপড়া নহি পহরেগা। হমারা সরম লগতা।"

মাধবী বলিল, "ছেলে আমার নবাব সিরাজুদ্দৌলা, তাই ওঁর ময়লা কাপড়ে লজ্জা হোলো। যা তুই বেরো, আমার ছেলে ধর্‌তে হবে না।"

ভুটকি খোকাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। খোকা আকাশ ফাটাইয়া "ভুতাক গো," বলিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ভুটকি তবু সাহস করিয়া খোকাকে কোলে তুলিল না। অভিমানে খোকা একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। মাধবী বলিল, "লক্ষীছাড়া ছেলের জ্বালায় একটা কথা যদি বল্‌বার জো আছে ওটাকে।

যা, বাঁদরটাকে তুলে নিয়ে যা। আর যদি কথনো সর্দ্দারি ক'রে আমার বাক্স ডেস্কের হাত দিস্ত টের পাবি।"

ভুটকি খোকাকে কোলে তুলিয়া তেমনি অটল গম্ভীর মুখেই চলিয়া গেল। আড়ালে গিয়া খোকাকে বলিল, "বাবা, তুম্ আমীর আদ্‌মি, বড়া হোনেসে এত্‌না এত্‌না সোনা চাঁদি পহরেগা। রাজা হোগা, ব্যালিষ্টর হোগা।"

খোকা বলিল, "না, বালিশতা হোবেনা, খোকা হোবে।"

যত দিন যাইতে লাগিল বাগানের মালীটার খোকার দরবারে হাজিরা ততই বাড়িতে লাগিল। মাধবী কলিকাতা হইতে একটামাত্র চাকর লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিল কলিকাতার গলির ভিতরকার আটহাত লম্বা ঘর আর দু হাত চওড়া বারাণ্ডা পরিষ্কার রাখিতেই ভৃত্যপুঙ্গবকে চারবেলা গালাগালি না দিলে চলে না; আর এখানকার সুবিধা জোড়া বাগানের তদারক করাইতে হইলে ত তাহাকে দু বেলা মুগুর পেটা করিয়াও পারা যাইবে না। আর একটা লোক রাখাতে সমরেশের সহিত এক পালা রাগারাগি হইল বটে, কিন্তু তবু মাধবী একটা মালী রাখিয়া বসিল।

এত দিন লোকটা সকাল বিকাল জয়পুরী পিতলের ঘটিতে চন্দ্রমল্লিকার তোড়া সাজাইয়া আর ঝারি করিয়া গাছের গোড়ায় জল দিয়াই নিষ্কৃতি পাইত। টাটকা ফুলের গন্ধে ঘরটা যখন আমোদিত হইয়া উঠিত এবং চন্দ্রমল্লিকার দ্যুতিতে সমরেশের পুরানো বাংলো বাড়ীর তালি দেওয়া দেওয়াল এবং ভাঙা টেবিলও আলো হইয়া উঠিত, তখন সে মালীটাকে রাখিয়া পয়সা নষ্ট করার আপশোষটা একেবারে ভুলিয়া যাইত। মাধবী কিন্তু লোকটার ফাঁকি দেওয়া স্বভাব দু চক্ষে দেখিতে পারিত না। ঘরের একটা কাজ যদি তাহাকে ছুঁইতে বলা হইত অমনি যে ফোঁস করিয়া উঠিত। নিজের কাজ করব না ঘর সংসার দেখতে যাব?"

কিন্তু অকস্মাৎ তাহার অবসর অফুরন্ত হইয়া উঠিল। যখন তখনই দেখা যাইত বাগানের কাজ সারিয়া সে নিমগাছ তলায় খোকার পাশে বসিয়া আছে অথবা বিকালে খোকাকে কাঁধের উপর বসাইয়া ময়দানে বেড়াইতে চলিয়াছে। ভুটকি পিছন পিছন শুধু খোকার টুপী কি কোটটা হাতে করিয়া ভারিকি চালে চলিয়াছে। যেন সে মনিব আর উড়ে মালীটা তার দীনতম ভৃত্য।

মাধবী দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া যাইত। বলিত, "লোকটার রকম দেখেছ? ভারী ত বাগানের কাজ, ওইটুকুন সেরে ছেলেটাকে নিয়ে একটু বেড়াবে চেড়াবে ব'লেই ওকে রাখলাম; তা এমন ট্যাঁটা যে কিছুতে ঘাড় নোয়ালে না। গাছে জল দিয়ে আর পাঁচ বার কাঁচি চালিয়ে পাঁচটা ফুল কেটে সকাল সন্ধ্যেয় তিনি আর এক বিন্দু ফুরসৎই পেলেন না। আর এখন ওই সাঁওতাল মেয়েটার পেছন পেছন অষ্ট প্রহর পোষা কুকুরের মত ঘুরছে। ঝাঁটা মেরে একদিন বিদায় ক'রে দেব তখন রঙ্গ করা বেরোবে।"

সমরেশ বলিত, "কেন রাগ কর, মিছে? মানুষ ত ওরাও, ওদের কি আর সঙ্গী সাথী দরকার হয় না?"

মাধবী বলিত, "তাই ব'লে যা নয় তাই? ওটা হোলো উড়ে আর এটা হোলো সাঁওতাল, ওদের অত ভাব নাই বা হ'ল।"

সমরেশ বলিত, "তুমি না সমাজ সংস্কারের পাণ্ডা? ছোট লোক ব'লেই বুঝি ওদের বেলা তোমার শাস্ত্র উল্টে গেল?"

মাধবী মালীর উপর যতই রাগ করুক তাহার কাজের উন্নতিতে তাহাকে চুপ করিয়া যাইতে হইল। আজ কাল আর খোকার স্নানের জল দিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে হয় না। ভুটকি স্নানের জোগাড় করিতে না করিতে উদয় মালী জল লইয়া হাজির হইত। মাধবী যদি বলিত, "ভুটকি, খোকার তোয়ালেটা খুঁজে আন্," উদয় অমনি দুই হাতে দুখানা তোয়ালে লইয়া ছুটিয়া আসিত। ভুটকি খোকাকে কোল হইতে নামাইতে না নামাইতে উদয় তাহাকে লুফিয়া লইত। দুর্দ্দান্ত খোকার দুরন্তপনায় হয়রান হইয়া ভুটকিও যখন হাল ছাড়িয়া দিত, তখন উদয় আসিয়া খোকার মনস্তুষ্টিসাধন করিত তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিত।

ভুট্‌কির মন রাখিতে গিয়া উদয় মনিবকেও প্রসন্ন করিয়া তুলিল।

হাটের দিন জিনিষ পত্র কিনিবার জন্য ভুট্‌কি মাঝে মাঝে ছুটি লইত। খোকা পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত আর সহস্র বার প্রশ্ন করিত, "মা, ভুট্‌কি কোথা গলি ?"

সহরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ ঘিরিয়া হাট বসে। মাটির উপর চাটাই পাতিয়া আপন আপন পণ্য লইয়া লোকে বেচিতে বসে। চাল ডাল মাছ তরকারী ত আছেই ; তার উপরমাঝে মাঝে রঙিন ছিটের শাড়ী, জামা, পুঁথির মালা, কাচের চুড়ি, কাঁসা ও রূপার গহনা, আয়না, চিরুনী কাঁটা মেয়েদের প্রসাধনের খোরাক জোগাইতেছে। উদয় বাবুদের বাজার লইয়া ফিরিতেছিল, ভুট্‌কি একখানা চিরুনী, ঘরের আলোর জন্য রেড়ীর তেল ও জল রাখিবার একটা ছোট বাল্‌তি কিনিতে আসিয়াছিল। লালের উপর হল্‌দে ফুলের ছাপ দেওয়া শাড়ী পরিয়া মাথায় ঝাঁকা লইয়া এক চুড়িওয়ালী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল, "চুড়ি চাই, চুড়ি !" গোছা গোছা রঙ্গীন রেশমী চুড়ির দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভুট্‌কি মুখ ফিরাইয়া লইল। চুড়িওয়ালী বলিল, 'নাও না দিদি!"

ভুট্‌কি বলিল, "পয়সা নাই।"

উদয় মুচ্‌কি হাসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "নে না চুড়ি, আমি পয়সা দেব এখন।"

ভুট্‌কি হন্ হন্ করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, "ভারী দু পয়সার চুড়ি দিয়ে আমাকে রাজা ক'রে দিবি ? কে চায় তোর চুড়ি ?"

সাম্‌নেই স্যাকরারা রূপার হার চুড়ি বালা মল বিক্রী করিতেছিল। উদয় স্যাকরার দোকানে ঢুকিয়া একছড়া হার তুলিয়া বলিল, "এইটা নিবি ?"

ভুট্‌কি রাগিয়া উঠিল, "যা পালা, আমি কেন তোর জিনিষ নিতে গেলাম ?"

উদয় তাহার কানে কানে কি যেন বলিল। ভুট্‌কি নরম হইয়া একটু মিষ্ট হাসি হাসিল। উদয় হার ছড়ার দাম চুকাইয়া দিয়া তাহা ভুট্‌কির গলায় পরাইয়া দিল।

বাড়ী আসিতেই খোকা হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। ভুট্‌কির গলার নূতন হার সে লইবে। ভুট্‌কি লজ্জায় খুলিয়া পরাইয়া দিতেও পারিতেছেনা, অথচ না দিলেও খোকা আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে। তাহাদের হট্টগোলের সাড়া পাইয়া মাধবী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে রে ? বাড়ীতে যে কাক চিলও বস্‌বার যো নেই চেঁচানির চোটে !"

ভুট্‌কি লজ্জিত ভাবে বলিল, "খোকাবাবু হার পর্‌তে চায়।"

মাধবী নাক সিঁট্‌কাইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছিঃ, ও হার আবার কি পরবি ? বোকা ছেলে কোথাকার ! ভুট্‌কির হার পর্‌তে নেই।"

ভুট্‌কি ভয়ে ভয়ে বলিল, "মেমসা'ব, খোকাকে একছড়া কিনে দিন না !"

মাধবী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল,"হ্যাঃ, আমার ত ঘুম হচ্ছে না, তাই রূপোর হার গড়াতে যাব।"

কি ভাবিয়া আবার বলিল, "হ্যাঁরে তোর গলায় ত আগে হার দেখিনি! তিন টাকা ত মাইনে পাস্, হার গড়ালি কোথা থেকে ?"

ভুট্‌কি চুপ করিবা রহিল। মাধবী আবার বলিল, 'চুপ ক'রে রইলি যে। কোথায় পেলি বল না।"

ভুট্‌কি ইতস্তত করিয়া বলিল, "একজন দিয়েছে।"

সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়া মাধবী জেরা সুরু করিল, "কে দিয়েছে শুনি !"

ভুট্‌কি অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বলিল, "উদয়।"

মাধবী এইবার সত্য সত্যই রাগিয়া ছিল। সে গর্জ্জাইয়া উঠিয়া বলিল, "লক্ষ্মীছাড়ী, তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয় ! আমার বাড়ীতে উদয়ের গয়না দেখিয়ে বেড়াস্ তুই কোন সাহসে ? ও তোর কে শুনি ?"

ভুট্‌কি চুপ করিয়া রহিল। মাধবী বলিল, "চুলোয় যাবি তারি চেষ্টা। ওর সঙ্গে যে অত ভাব করিস, ও কি তোকে বিয়ে করবে যে ভয় ডর কিচ্ছু তোর নেই।"

ভুট্‌কি এইবার অত্যন্ত ভীতভাবে বলিল, "হাঁ মেমসা'ব, সাদী করবে বলেছে।"

মাধবী বলিল, "তোর মুণ্ডু করবে। আমার হেঁসেলে

ভাত খেলে তোর জাত যায়, আর উড়েটাকে বিয়ে করলে জাত যাবে না?"

ভুটকির চোখে জল দেখা দিল। সে বলিল, "আমার ত কেউ নেই মেমসা'ব, জাত রেখে কি করব? ও যদি আমাকে উড়ে ক'রে নেয় তাহ'লে ত তবু একটা নিজের লোক হবে!"

মাধবী আর কিছু বলিল না। ভুট্‌কি খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল! বাগানের কোণে লেবু গাছের তলায় কেউ কোথাও নাই দেখিয়া রূপার হার ছড়া খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। খোকা খুসী হইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি লক্ষী ছেলে, তুমি ছোনা ছেলে।"

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না। রাত্রে মাধবী সমরেশকে বলিল, "ওগো, তোমার গুণের উদয়ের কীর্ত্তি শুনেছ? তিনি ভুট্‌কিকে রূপোর হার কিনে দিয়েছেন। আর সে লক্ষ্মীছাড়ী বেহায়ার মত তাই সকলের সামনে পরে বেড়াচ্ছে। ওদের মতলব কি বল ত?"

সমরেশ বলিল, "বোধ হয় সিভিল ম্যারেজ করতে চায়।"

মাধবী সমরেশকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমাকে এখন রসিকতা করতে ডাকা হয় নি। লোকটাকে কাল একটু শাসিয়ে দিও মনে ক'রে।"

পরদিন সমরেশ উদয়কে ডাকাইয়া বিনা ভূমিকায় সর্ব্বাগ্রে প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁরে, তুই ভুট্‌কিকে বিয়ে করতে চাস্ বলেছিস্?"

উদয় আচম্‌কা প্রশ্নে থতমত খাইয়া গিয়া তার পরেই বিস্মিত মুখে জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি হুজুর, আমার জাতি যাইবে যে! দেশে আমার স্ত্রীপুত্র আছে, আমি কি একটা সাঁওতালকে বিয়ে করতে পারি?"

সমরেশ বলিল, "তবে ওকে জিনিষ দিতে গিয়েছিলি কেন?"

উদয় হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়া কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। বোকার মত বলিয়া বসিল, "হুজুর, সে হার ত আমি দিই নি, সে আর কেউ দিয়ে থাকবে।"

সমরেশ তাহার গালে একটা প্রচণ্ড চড় কসাইয়া বলিল, "বেরো এখুনি আমার বাড়ী থেকে। হারের খবর উনি রাখেন, আবার সাধু সাজা হচ্ছে? আর এক দণ্ড আমার এখানে তুই দাঁড়াবি না।"

উদয় চলিয়া গেল। ভুট্‌কি যেন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেল। কিন্তু তবু উদয় চলিয়া যাইবার সময় সকলের চোখের উপর দিয়াই সে ছুটিয়া তাহাকে কি যেন বলিতে গেল। উদয় হাত মুখ নাড়িয়া এক ঝঙ্কার দিয়া ভুট্‌কিকে বিদায় করিয়া দিল। ভুটকি খোকাকে কোলে করিয়াই তাহার পিছন পিছন পথে ছুটিল। মাধবী ঘরের বারাণ্ডা হইতে এক ধমক দিল, "খবদ্দার, গেটের বাইরে পা দিবি ত পুলিশে ধরিয়ে দেব।"

ভুটকি ফিরিয়া আসিল। মাধবী বলিল, "পোড়ারমুখী, তোর লজ্জা নেই? ওর পিছনে যে ছুটেছিস ভদ্দর ঘরে আর তোকে কেউ ঠাঁই দেবে?"

ভুট্‌কি কিছু বলিল না, খোকাকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিনে খোকাকে একবার সে কোলছাড়া করিল না, একবার মাধবীর কাছে তাহাকে যাইতে দিল না। সন্ধ্যাবেলা খোকাকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া গোপনে তাহার নিটোল মুখখানি চুম্বন করিয়া সে নীরবে তাহার শিয়রে বসিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

মাধবীকে ঘরে আসিতে দেখিয়া বিছানার পাশ হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভুট্‌কি বলিল, "মেমসা'ব, আমার একটা কসুর মাপ করেছেন, আর যদি কোনো কসুর ক'রে থাকি তাও মাপ করবেন।"

সে সেলাম করিয়া অন্ধকারে নীচে নামিয়া গেল।

* * *

ভোর বেলা খোকার বাসন ধোওয়ার শব্দ না পাইয়া মাধবীর ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বেলা হইয়া গেল। জানালার পর্দ্দার ফাঁক দিয়া আলো আসিয়া মুখের উপর পড়িতে সে তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "ওমা, আজ অনেকখানি বেলা হ'য়ে গেছে, ভুটকিটা শীতে সারা হ'য়ে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

ঝনাৎ করিয়া সর্ব্বাগ্রে দরজাটা খুলিয়া দেখিল বাহিরে উত্তরে বাতাস গাছপালা কাঁপাইয়া বহিতেছে রোজকারই মত, কিন্তু দরজার গোড়ায় গায়ে আঁচল জড়াইয়া শীতার্ত্ত ভুটকি নিত্যকার মত দাঁড়াইয়া নাই। বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাকর বাকরকে ডাকাডাকি করিয়াও সে ভুটকির কোনো সন্ধান পাইল না। ঘরে ঢুকিয়া মাধবী বলিল, "ভুটকিটা আসে নি। হয়ত লজ্জায়ই আজ আর এমুখো হ'ল না।"

সমরেশ বলিল, "কে জানে? মুখে রাগ দেখালেও উদয়টাই হয়ত কোনো রকমে ফুস্‌লে নিয়ে গেছে।"

মাধবী খোকাকে বিছানা হইতে তুলিতে গেল। খোকার হাত দুটা টানিতেই দেখিল একটা হাতের মোটা সোনার বালা নাই। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "খোকার হাতের বালা কে নিলে গা? ডাইনীটাই নিয়েছে। আসেনি কেন এখন বুঝছি। বালাগাছা নিয়ে ওর সঙ্গে স'রে পড়েছে।"

সমরেশ বলিল, "তা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু নিল যদি ত একগাছা না নিয়ে দু গাছা নিলেই ত পারত! নেওয়ার মানে বুঝলাম না।"

মাধবী বলিল, "মানে আর কি? দুটোই নিচ্ছিল, আমি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় পারে নি। যাবার সময় আবার নেকা সেজে মাপ চেয়ে যাওয়া হ'ল। ওরা ভূত প্রেতের ভয় করে কিনা। তাই ভাবলে চুরি ক'রে মাপ চেয়ে গেলে ভূতের নজর আর লাগ্‌বে না। আমি কি তা জানি ছাই! আমি মনে করেছি রাস্তায় দৌড়েছিল ব'লে বুঝি এতক্ষণে মনে অনুতাপ হয়েছে। ও হরি, এই তার মাপ চাওয়ার কারণ?"

মাধবী খোকাকে একটানে মেঝেয় নামাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটা টাকা, রূপার হারছড়া ও ভুটকিরই আর দুই একটা সৌখীন জিনিস ঝন্ ঝন্ করিয়া মাটিতে পড়িল। সমরেশ বলিল, "এত মন্দ চোর নয়? নিজের জিনিষ রেখে পরেরটা চুরী করে নিয়ে গেল? তবে হার ছড়া ত দেখছি রূপোর গিল্টি। লোকটা ওকে সকল-দিকেই ঠকিয়েছে।"

মাধবী বলিল, "ওসব ন্যাকামি বোঝ না? আমরা যাতে ওকে সন্দেহ না করি তাই এইসব ছাইভস্ম রেখে দিয়ে গিয়েছে। তোমায় কিন্তু এখনই থানায় খবর দিতে হবে, আমি ওসব শুন্‌ছি না।"

চা খাইয়া সমরেশ থানায় চলিল। থানার দরজায় পা দিতেই সকলের আগে চোখে পড়িল ভুটকির লাল-ফিতা শোভিত খোঁপা। খোঁপার ফিতা ছাড়া আর কোনো আভরণ তাহার অঙ্গে নাই সমস্তই সে খোকা বাবুর শয্যা পার্শ্বে রাখিয়া আসিয়াছে। সে মাথা নীচু করিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সমরেশকে দেখিতে পায় নাই। সমরেশ দেখিল তাহার চোখে জল।

মেয়েটাকে দেখিয়া তাহার কেমন মায়া হইল। দরজায় দণ্ডায়মান পুলিশটাকে বলিল, "ওকে কোথা থেকে ধ'রে এনেছ? এত সকালে কে পুলিশে খবর দিতে এল? ছেড়ে দাও ওর নামে আমার কোনো নালিশ নেই।"

পুলিশটা লম্বা একটা সেলাম ঠুকিয়া সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। ভুট্‌কি লজ্জায় লাল হইয়া পিছনে সরিয়া গেল। পুলিশ বলিল, "বাবু, ওকে আমরা ত ধরে আনি নি, ওই পরের নামে নালিশ কর্‌তে এসেছে। বল্‌ছে উদয় মালী ব'লে কে ওর মনিবের সোনার বালা ঠকিয়ে নিয়েছে তাকে ও ধরিয়ে দিতে চায়।" ও দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করবে।

সমরেশ বলিল, "হ্যাঁ বালা গিয়েছে বটে। কিন্তু সে যে চুরি করেছে তার প্রমাণ কি? ছেলে ত থাকৃত এ'র কাছে।"

ভুট্‌কি এই বার কথা বলিল। সে বলিল, "বাবু আমিই নিয়েছিলাম, কিন্তু চুরি করব ব'লে নিইনি। খোকা রূপোর হার চাইলে, মা তাকে দিলেন না। খোকাবাবু বড় কাঁদছিল। উদয় বল্লে—আমি সোনা রূপা ডবল করতে পারি, খোকার বালা জোড়া খুলে দে আমাকে, আমি দু জোড়া বালা এনে দেব। তাইতে খোকার হার বালা দুই হবে। ভাল ক'রে বিশ্বাস হচ্ছিল না ব'লে এক গাছা দিয়েছিলাম পরীক্ষা করতে। কাল সে

পরিষ্কার বল্‌লে—বালার কথা সে কিছু জানে না। বাবু, এতবড় কসুর করে আমি কি করে মুখ তুলব জানি না। যদি উদয়কে না ধরাতে পারিত নিজেই জেল খেটে মরব। জাত দিতে পারি বাবু, কিন্তু ধরম দিতে ত পারব না।"

ভুটকি কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "খোকাবাবুকে ছেড়ে কি করে থাক্‌ব বাবু আমাকে এবার মাপ করুন।"

সমরেশের কানে তখন "ভুত্‌কি গো," "আমার্‌ ভুত্‌কি," কান্না বাজিতেছিল। সে বলিল, "চল্‌ চল্‌, এখন বাড়ী চল্‌, খোকার কাজের দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

একখানা প্রাচীন পুঁথির মলাট-চিত্র

অধ্যাপক শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমি গত বৎসর বড়দিনের ছুটিতে ত্রিপুরা জেলার কোন এক গ্রাম হইতে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেগুলি যেমন ভাবে আনিয়াছিলাম ঠিক্‌ সেইভাবেই পড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম অবসর মত পুঁথিগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিব। এবার ছুটিতে সে পুঁথিগুলির পাতা উল্টাইয়া একে একে এই পুঁথিগুলি পাইলাম—(১) কৃত্তিবাসের রামায়ণ (সম্পূর্ণ)—দুই শত বৎসর পূর্ব্বের অনুলিখিত, (২) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, (৩) ক্রিয়াযোগ সার, (৪) ফলিতজ্যোতিষ (বাঙ্গালায় লেখা), (৫) প্রহ্লাদ-চরিত্র, (৬) ভাগবতপুরাণ—দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত আছে, পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অনুলিখিত। এতদ্ব্যতীত আর যেসব পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার একখানাও সম্পূর্ণ নাই, সেগুলিতে তেমন বিশেষত্বও দেখিলাম না,—যেমন গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, সঞ্জয়ের মহাভারত ইত্যাদি। এসব পুঁথি লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক আলোচনাও হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একখানা পুঁথির মলাটের চিত্র লইয়া আলোচনা করিব। ভাগবত পুরাণের পুঁথির মলাটের পাটা দুইখানি মূল্যবান্‌ এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাটা দুইখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৮ × ৩$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পাটার দুই দিকেই বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র। দুইখানি পাটারই উপরের দিকের চিত্র অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। একখানার রং এমন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহার উপরের চিত্র কি ছিল তৎসম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না। অপরখানার উপরের দিকের মাঝের চিত্রখানি বেশ স্পষ্ট, অনেকটা উঠিয়া গেলেও বেশ চিনিতে পারা যায়।—চিত্র মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান (বোধ হয় চিত্রকর কোনও নবাব বা বাদশাহের আদর্শ লইয়া ছবিটি আঁকিয়াছেন) গালিচার উপর সুখোপবিষ্ট। সম্মুখে গড়গড়া। গড়গড়াটি একটু বিচিত্র রকমের। চিত্রিত মনুষ্যটি তাকিয়া ঠেশান দিয়া এক হাতে নলটি ধরিয়া লম্বা নলে তামাক খাইতেছেন। অপর হাতখানা তাকিয়ার উপর রক্ষিত ও ছোরা ধরিয়া অবস্থিত। মাথায় পাগ্‌ড়ি মোগল বাদশাহদের মত। চিত্র দেখিলে অনেকটা শাহজাহান বাদশাহের কথা মনে পড়ে। ছবির পেছনে একটী শিকারী পাখী, তার দক্ষিণ দিকে শিকার চিত্র। বিবর্ণ ও অস্পষ্ট। এই পাটাখানির ভিতরের দিকের নয়টি মাতৃরূপ মূর্ত্তি অতি সুন্দর সুস্পষ্ট ভাবে সুচিত্রিত। এখানে মাতৃকা-মূর্ত্তির পরিচয় সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলাম।

দেবতারা যখন অসুর বধ করেন তখন ব্রহ্মাদির স্বেদ হইতে এই সকল মাতৃগণের উৎপত্তি হয়। অষ্ট মাতৃগণ হইতেছেন :—

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী তথা।
কৌমারীচৈব চামুণ্ডাচর্চ্চিতৃকত্যষ্ট মাতরঃ॥



পাটার গায়ে নব-মাতৃকা মূর্ত্তি

সপ্তমাতৃকা এইরূপ :—

ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী রৌদ্রী বারাহিকী তথা।
কৌবেরী চৈব কৌমারীমাতরঃ সপ্তকীর্ত্তিতা।

[অমরটীকা—ভরত]

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চর্চ্চিকা এই অষ্ট মাতা। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, রৌদ্রী, বারাহিকা, কৌবেরী, কৌমারী এই সাতজন সপ্ত-মাতৃকা। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নরসিংহিকা, কৌমারী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই নয়জনও মাতৃকা নামে কথিত হইয়া থাকেন। আমাদের পাটার গায়েও এই নয়টি মাতৃকার মূর্ত্তি অঙ্কিত। ব্রাহ্মী, ব্রহ্মার স্বেদ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, অন্যান্য মাতৃকারাও তন্নামীয় দেবতাগণের স্বেদ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। দুর্গাপূজার সময় এই সকল মাতৃকার পূজা হইয়া থাকে।

গৌরী প্রভৃতি ষোড়শদেবতাদের ষোড়শ মাতৃকা কহে। অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও ষষ্টি পূজায় এই ষোড়শমাতৃকার পূজা করিতে হয়। ষোড়শমাতৃকাগণের নাম—

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ
শান্তি পুষ্টি র্ধৃতিস্তিস্তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ
আদৌ বিনায়ক পূজ্যোঽন্তে চ কুলদেবতা।

বরাহপুরাণে ও মাতৃকাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাহা এইরূপ, পূর্ব্বে রুদ্রদেব স্বীয় ত্রিশূলাঘাতে অন্ধকাসুরের দেহভেদ করেন। কিন্তু তাহাতে তাহার জীবন নষ্ট হয় নাই। অধিকন্তু তদীয় দেহ হইতে যে সকল রক্ত ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল সেই রক্তরাশি হইতে তখন অসংখ্য অন্ধকাসুরের সৃষ্টি হইল। রুদ্রদেব এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া নিজ ত্রিশূলাগ্র দিয়া অবিলম্বে অন্ধকাসুরকে গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যে-সকল অন্ধকাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অজস্র দৈত্য দেহ নিপাতিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও অসুরবংশ সমূলে নির্ম্মূল হইল না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে যে, দৈত্যরাজ শুম্ভের সৈন্যগণের সহিত যখন চণ্ডীদেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মা,

মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, ইন্দ্র ইঁহাদের স্ব স্ব শক্তি সমবেত হইয়া নিজ নিজ বাহন, ভূষণ ও আয়ুধ দিয়া অসুর বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, মহেশ্বর শক্তি মাহেশ্বরী, কার্ত্তিকেয় শক্তি কৌমারী, বিষ্ণু শক্তি বারাহী এবং ইন্দ্র শক্তি ইন্দ্রাণী নামে অভিহিত হন। এই যে সমবেত শক্তিপুঞ্জ ইহাই "মাতৃকা" নামে প্রসিদ্ধ।

তিনশত বৎসরের প্রাচীন অখ্যাত অজ্ঞাত বিস্মৃত-নামা চিত্রকর এখানে নয়টি মাতৃকামূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রথমেই আঁকিয়াছেন দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়র শক্তি কৌমারা। কৌমারীর বাহন ময়ুর, মাথায় কিরীট, দ্বিভুজা, উদ্যত আয়ুধ চক্ষে দৃষ্টিতে ও মুখভঙ্গিমায় নির্ভীকতা সূচিত হইতেছে। কৌমারীর পরে ব্রহ্মাণী চিত্রিতা হইয়াছেন—হংস বাহনা, মাথায় কিরীট, সৌম্যশান্ত মূর্ত্তির মধ্যেও রুদ্রভাব, লোহিত-বর্ণা, হস্ত-প্রকোষ্ঠে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, কেশ কুঞ্চিত, বক্ষে কাঁচুলি ও দুই হস্তে বরাভয়। তৃতীয়া ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রানী।—ঐরাবতারোহিনী তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, তেজস্বিনী রণরঙ্গিনী ভাব পরিস্ফুট, দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে অভয়। চতুর্থ চিত্র মাহেশ্বরী—বৃষভবাহনা বিভূতিছাদিতা ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিতা, মাথায় জল্ জল্ মুকুট, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল—বাম হস্তে শিঙা, বোঁ বোঁ বম্ বম্ শিঙা যেন বাজিতেছে,—অসুর নিধনে সমুৎসুকা মাহেশ্বরীর মূর্ত্তি ভীষণ অথচ সুন্দর। তাঁহার বাহন বৃষের পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, গমনভঙ্গী বিচিত্র ও সুন্দর। পঞ্চম চিত্রে রৌদ্রী—রুদ্রশক্তি। তিনি সিংহবাহিনী, দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে অসুর মুণ্ড, তাঁহার বিক্ষিপ্ত অঞ্চল বায়ুভরে বিচঞ্চল, পদদ্বয় লম্বিত, চোখে ভীষণ কোপদৃষ্টি। চিত্রকর সিংহের চিত্র ভাল আঁকিতে পারেন নাই। ষষ্ঠ চিত্রে বিষ্ণুশক্তি বারাহী। বরাহ পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা। তাঁহার মুখাকৃতি বরাহের ন্যায়, দক্ষিণ হস্তে শোণিতে রাঙ্গা তরবারি, বামহস্তে বরদ মুদ্রা। সপ্তম চিত্রে নর-সিংহিকা। তাঁহার মুখাকৃতি সিংহের ন্যায়, জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে, কেশর গুচ্ছে গুচ্ছে স্কন্ধদেশ বাহিয়া প্রলম্বিত, কণ্ঠে দোহল মালা, দক্ষিণ হস্তে কৃপাণ, বাম হস্তে



অপর পাটার দশাবতার মূর্ত্তির নক্সা

জপমুদ্রা। অষ্টম চিত্রে বৈষ্ণবী—এই একটি মাত্র মূর্ত্তি চতুর্ভুজা। তাঁহার দক্ষিণ দিকের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে চক্র, অপর দুই হস্তে বরদ ও অভয় মুদ্রা। মূর্ত্তি পদ্মাসনোপবিষ্টা, তাঁহার কণ্ঠে প্রলম্বিত মাল্য ও উত্তরীয়। বক্ষে কাঁচুলি আঁটা, হস্তে অলঙ্কার। নবম মাতৃকা মূর্ত্তি চিত্রকর আঁকিয়াছেন ভীষণা চণ্ডিকার—প্রত্যালী চাপদা সবোপরি দণ্ডায়মানা। এলায়িতকুন্তলা শক্রনিধনোৎফুল্লা ভয়ঙ্করী শক্র-বিমর্দ্দিনী রক্তলোলুপা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি, হস্তে অসুরনিধনব্যাপৃততীক্ষ্ণ তরবারি, বাম হস্তে রুধির পরিপূর্ণ খর্পর, স্তন প্রলম্বিত। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। চিত্রের প্রত্যেকটি মূর্ত্তির চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত, দৃষ্টিও মুখ ও ভঙ্গিমার বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়। এই নবম মাতৃকা মূর্ত্তির চিত্র এ পর্য্যন্ত কোনও প্রাচীন পুঁথি কিংবা সংগ্রহে দেখা যায় নাই, সে দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব।

অপর মলাট খানিতে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম ও বুদ্ধ। দশাবতার মূর্ত্তির বিস্তৃত পরিচয়ের কোন আবশ্যক নাই, কেননা তাহা সর্ব্বজনবিদিত। পাথরের গায়ে (Slab) খোদিত দশাবতারের মূর্ত্তিও অনেক পাওয়া গিয়াছে। এই দশাবতারের চিত্রের মধ্যে বুদ্ধের চিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে। বুদ্ধদেবের মাথায় জটা ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, হাত দু'খানি বৈষ্ণবদের মত উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট। আবক্ষ্য অবিলম্বিত দা[illegible] পীন পরিহিত পদ্মাসনোপবিষ্ট, পুঁথির পাটার উপর দশাবতারের এবং নবম মাতৃকার মূর্ত্তি অঙ্কিত চিত্র এপর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এই মূর্ত্তিগুলি পুরাণবর্ণিত ধ্যানকে আদর্শ করিয়া আঁকা হইয়াছে। ধ্যানের সহিত মিলাইয়া চিত্রগুলি দেখিলেই যে কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মোটামুটি ভাবে বিচার করিতে গেলেও এই মলাট চিত্রের বয়স প্রায় ২৫০ শত হইতে ৩০০ তিন শত বৎসরের মধ্যে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শান্তিনিকেতনে চৈনিক সুধী সু-সীমোর অভ্যর্থনা

শ্রী অনাথনাথ বসু

কয়েকদিন আগে আশ্রমবন্ধু খ্যাতনামা চৈনিক সুধী শ্রীযুক্ত সু-সীমো মহাশয় য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে গুরুদেবের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আশ্রমে এসেছেন। গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে আশ্রমের অধ্যাপকগণ কলাভবনের দ্বিতলে সুসীমচাচক্রে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সুসীমচাচক্র সু-সীমো মহাশয়েরই নামে প্রতিষ্ঠিত।

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের নির্দ্দেশ অনুসারে কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা কলাভবনটি সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। দ্বিতলে বিস্তৃত কক্ষে অতিথি ও অধ্যাপকদের আসন করা হয়েছিল। কক্ষের মেঝেটিতে কলাভবনের ছাত্রীরা নিপুণহস্তে চিত্র বিচিত্র আলপনা এঁকেছিলেন। শ্রীযুক্ত সুসীমো ও গুরুদেব কক্ষের একপার্শ্বে বসেছিলেন। তাঁদের সম্মুখে দুইপাশে অভ্যাগতদের আসনের ব্যবস্থা ছিল; তাঁদের আসনের সামনে কাঠের পাটার উপরে সুন্দর সাদা চাদর দিয়ে জলযোগের পাত্রগুলি রাখা হ'য়েছিল। পাত্রগুলি পদ্মপাতা; প্রত্যেক অতিথির পাশে একটি শ্বেতপদ্ম; পদ্মের পাতাগুলির ওপরে সামান্য জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল।

অতিথিরা সমবেত হ'লে ছাত্র-ছাত্রীরা গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে নিয়মন্ত্রিত চক্রসঙ্গীতটি গান করেন।

হায় হায় হায়
দিন চলি' যায়!
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল, চল হে!
টগ্‌বগ্‌—উচ্ছল
কাথলিতল-জল
কল-কল হে!
এল চীন-গগন হতে
পূর্ব্ব-পবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণ বাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ।
এস পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিত-কারক
তারক তুমি কাণ্ডারী,
এস গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূ-বিবরণ-ভাণ্ডারী।
এস বিশ্বভারনত,
শুষ্ক-রুটিন পথ
মরু পরিচারণ ক্লান্ত।
এস হিসাব-পত্তর-ত্রস্ত
তহবিল-মিল-ভুল-গ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছলছল হে।
এস গীতি-বীথি-চর
তম্বুর-করধর
তান-তাল-তল-মগ্ন,
এস চিত্রী চটপট্‌
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণ বিলগ্ন।
এস কন্‌ষ্টিট্যুষণ্‌
নিয়ম বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত।
এস কমিটি-পলাতক
বিধান ঘাতক
এস দিক-ভ্রান্ত
টলমল হে॥

গানটি গুরুদেবকর্ত্তৃক চা-চক্র প্রতিষ্ঠার সময় রচিত হয়েছিল। সঙ্গীতের পর মেয়েরা চা পরিবেশন করেন। এই সময়ে গুরুদেব শ্রী সুসামোকে আশ্রমে অভ্যর্থনা করে' কিছু বলেন। তাঁর অভিভাষণের মর্ম্ম দেওয়া হ'ল।

তিনি বলেন—সাধারণতঃ একজাতি অন্যজাতির কাছে রাজদূত প্রেরণ করেন। তাঁরা হন রাজনীতিবিদ্; রাজনীতির এসকল ব্যাবসাদাররা যান লাভের জন্য, অর্থের জন্য; তাঁরা যে বন্ধন বাঁধেন সে বাঁধন হচ্ছে রাজনীতির বাঁধন। কোন জাতিই অন্য জাতির কাছে কবিদূত পাঠান না; কিন্তু আমি গিয়েছিলেম তোমাদের দেশে কবিদূত হ'য়ে ভারতবর্ষ আর চীনের মধ্যে সখ্যের বাঁধন বাঁধ্‌তে; লাভ নয়, অর্থ নয়, রাজ্য নয়, আমি চেয়েছিলাম প্রীতি। তোমরা আমাকে আদরে আত্মীয় বলে গ্রহণ ক'রে নিয়েছিলে তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি যে য়ুরোপে যশলাভ করেছি বা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি তার জন্যে তোমরা আমাকে অভ্যর্থনা করোনি; তোমাদের একান্ত আত্মীয়রূপেই তোমরা আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলে। তোমাদের দেশের সব জায়গাতেই আমি এই সহজ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেম।

বহু প্রাচীন যুগ হ'তেই ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যে অতি নিবিড় সখ্যের সম্বন্ধ ছিল আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলাম তাকেই নূতন করে জাগাতে। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে এই যোগসূত্রটি ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। এ যোগসূত্র যাঁরা অতীতকালে একদিন বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁরা রাজনৈতিক ছিলেন না—তাঁদের পিছনে পিছনে অস্ত্রধারী সৈন্য ছিল না—তাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সাধনার সম্পদ নিয়ে।

আমি তোমাদের দেশের নানা-জায়গায় গুহা দেখেছি, যেখানে সে যুগের সাধকরা দিনের পর দিন সাধনায় কাটিয়েছিলেন। তোমাদের দেশে গিয়ে আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি জেগে উঠেছিল, আমার মনে হয়েছিল যেন এই সাধকেরাই আমার মধ্যে নব জীবন লাভ করে এ যুগের কবিদূতরূপে তোমাদের কাছে আবার গিয়েছেন।

তোমাদের সহজ প্রীতির সেই সুন্দর অভ্যর্থনা আমি চিরদিন স্মরণ করে রাখবো। বিশেষ করে তোমার কথা।

আমার মনে পড়ে যেদিন তুমি আমার আছে প্রথম এসেছিলে। একান্ত সহজ ভাবেই তুমি এসেছিলে,—আমার পরম আত্মীয়রূপে। সেদিন আমি কামনা করেছিলাম আজ যে-প্রীতি তোমার ও তোমার দেশের কাছ থেকে আমি পেলাম যেন ভবিষ্যতে তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে সেই ভাবে আত্মীয়রূপে একদিন অভ্যর্থনা করে নিতে পারি।

আজ তুমি এখানে আমাদের কাছে এসেছ। আশ্রমের সকলের পক্ষ থেকে আমাদের প্রীতি আজ আমি তোমাকে জ্ঞাপন কর্‌ছি। এ আমার আশ্রম; এখানে আমি শুধু কবি নই, এখানে আমি বস্তুকে সৃষ্টি করতে চেষ্টা কর্‌ছি। তোমাদের দেশে আমাকে যে রূপে দেখেছিলে সে রূপ শুধু আমার কবিরূপ। সেটা আমার জীবনের একটি বড় প্রকাশ হ'লেও সেটা আংশিক। এখানে তুমি আমাকে পূর্ণতররূপে আমার নিজের সত্য আবেষ্টনের মধ্যে দেখবে। এখানে দেখবে কবি কিরূপে তার স্বপ্নকে বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করবার সাধনা কর্‌ছে।

এই আশ্রমে আমরা সমগ্র বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করেছি; সমস্ত বিশ্ব এখানে আমাদের অতিথি; তুমি আমাদের আশ্রমের এই সখ্যের বাণী বহন করে] তোমাদের দেশে নিয়ে যাবে এই আমার কামনা।

উত্তরে সুসীমো মহাশয় বলেন—

বহুপ্রাচীন কালে আপনাদের এদেশ হ'তে দূত গিয়েছিলেন মৈত্রীর বাণী বহন করে; তাঁরা আমাদের দেশে সত্যের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুরূপে, আমাদের আত্মীয়রূপে। আমাদের দেশের নিভৃততমস্থানে দীর্ঘকাল নিভৃতে সাধনা করে তাঁরা এদেশের বাণী আমাদের দেশে প্রচার করেছিলেন।

তারপর দীর্ঘকাল সে-বাণী আমরা শুনিনি।

আপনার যাবার আগে যখন শ্রীযুক্ত এল্‌মহার্ষ্ট আমাদের দেশে গেলেন তখন তাঁর কাছ থেকে শুনলাম আপনি চীনে যাবার সঙ্কল্প করেছেন।

আমরা তার পর থেকে প্রতীক্ষা করেছিলাম। আমাদের দেশে একটি পর্ব্বতশিখর আছে। সেখানে বহু সাধক সাধনা করেছিলেন; একদিন প্রত্যুষে সেই পর্ব্বত-শিখর হ'তে পূর্ব্বদিগন্তে চেয়েছিলাম, পূর্ব্বদিগন্ত তখন ঘন কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে আলোর রেখা ফুটে উঠল তারপর নিবিড় অন্ধকার ভেদ ক'রে জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তি প্রকাশ করে সূর্য্য উঠ্‌লেন।

আমার সেদিন মনে হয়েছিল আপনি তেমনি করে আসবেন, তেমনি ক'রে অতীত দিনের মৈত্রীর দূতরূপে আপনি আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতীয় জীবনপটে দেখা দেবেন। আমার সেই দিনের মনোভাব আমি একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলাম। তারপর মনে আছে আপনি এলেন। বন্দরে দাঁড়িয়ে দূর হ'তে আপনার ঋজু সৌম্য, শান্তমূর্ত্তি দেখলাম; মনে হল অন্ধকার দূর হ'ল, রবির প্রকাশ হ'ল।

আমরা আপনাকে আপনার জন বলে গ্রহণ করেছিলাম। আমার মনে হ'য়েছিল যেন আমার একান্ত আপন জনকেই আবার নূতন করে পেলাম। আমি আপনাকে দাদাম'শায় বলেছিলাম দাদাম'শায়ের স্নেহ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আপনাকে আমাদের দেশে পেয়ে আমার মন তৃপ্ত হতে পারেনি। আমার মনে হয়েছিল কবে আমি আপনাকে আপনাদের দেশে গিয়ে আপনার নিজের আসনে দেখতে পাবে।

অতীতদিনে আমাদের দেশহ'তে তীর্থযাত্রী আসতেন—ভগবান বুদ্ধের দেশ দেখতে। এদেশের সাধকেরা আমাদের দেশে ভগবান বুদ্ধের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন; আমাদের দেশের তীর্থযাত্রীরা তাঁদের শ্রদ্ধা-অঞ্জলি নিয়ে আস্‌তেন। নূতন যুগের শান্তির বাণী আপনি বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের দেশে; আমি নূতন যুগের তীর্থ-যাত্রী তেমনি আপনার কাছে এসেছি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। আমার এ নিবেদন আপনাকে এবং এ আশ্রমের আমার সকল বন্ধুকে জ্ঞাপন কর্‌ছি, আপনারা গ্রহণ করুন।

আমি আপনাদের মাঝে আমার এই প্রবাসের স্মৃতি চিরদিন অন্তরে বহন করে রাখবো।



আনন্দের সন্ধান

মনে করা যাক্ আমরা কাব্য পড়্‌চি; সে কাব্যের ভাষা ভাল জানিনে। বানান, শব্দরূপ, অলঙ্কার ছন্দে নিয়ম আলোচনা ক'রে ক'রে বহু কষ্টে একপা একপা ক'রে অগ্রসর হ'তে হচ্চে। প্রত্যেক শব্দটাকে স্বতন্ত্র ক'রে—তার অর্থ এবং রূপ নির্দ্ধারণ কর্ত্তে গিয়ে মনে হয় এই রকম শব্দযোজনা কি ভয়ঙ্কর দুঃসাধ্য! তখন মনে হয় কাব্য জিনিষটা ব্যাকরণ অলঙ্কারের বন্ধনে জর্জ্জরিত, এ একটা কৃচ্ছ্রসাধনেরই ক্ষেত্র; দুঃখ হতেই এর উৎপত্তি এবং পাঠককে দুঃখ দেওয়াই এর লক্ষ্য।

এমন সময় যদি কোন রসজ্ঞের দেখা পাই তবে তার ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারি যে, কাব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার ধারণটা ভুল ধারণা। তখন বুঝ্‌তে পারি কাব্যের মধ্যে দুর্গম নিয়ম, দুঃসাধ্য কৌশল, বিষম ক্লান্তির পরিশ্রম, এগুলো মায়া বল্‌লেই হয়। এগুলো ততক্ষণ প্রতীয়মান হয়, যতক্ষণ কাব্যের সত্যকে আমরা না পাই। কবির আনন্দকে যখনি দেখি সেই মুহূর্ত্তেই এই সমস্ত নিয়ম কৌশল পরিশ্রম আর দেখ্‌তেই পাইনে।

কিন্তু যে হতভাগ্য সেই আনন্দে পৌঁছতে পার্‌ল না, যে ব্যক্তি প্রভূত বাধার রণক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গে শব্দের সংগ্রাম দেখচে, সে স্বভাবতই বলতে পারে যে, "তুমি যে আনন্দের কথা বলচ কাব্যপদার্থের মধ্যে কোথাও তার প্রমাণ নেই। ওটা তোমার নিজেরই একটা সৌখীন কল্পনা; তুমি নিতান্ত চোখ বুজে এর দুঃখরূপটা দেখচ না, সেটা তোমার চিত্তের অসাড়তা।" তা হোক্, যে সন্দিগ্ধ সে আপন সন্দেহ নিয়েই থাকুক, কিন্তু মোটের উপর আমরা এই বুঝি যে, কাব্য সম্বন্ধে কাব্যরসিকের সাক্ষ্য হচ্চে চূড়ান্ত।

তেম্‌নি ক'রেই তাঁর কথা আম্‌রা মেনে নেব যিনি বলেচেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" তিনি জগতের আনন্দরূপ দেখেচেন, আমরা তেমন ক'রে দেখ্‌তে পাইনি। কিন্তু যে লোক দেখেনি তার সাক্ষ্যটাই কি প্রামাণ্য?

এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টিকে যারা বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে লেগেচে তারা নিয়মের পর নিয়ম দেখ্‌চে। এর মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার কোনো আনন্দ ত পরীক্ষাগারের কোনো যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়েনি, নিয়মে নিয়মে একেবারে ঠাসা, কোথাও তার একটু ফাঁক নেই। এই সব সারবন্দী সাক্ষীর দল, যাদের হাতে পায়ে নিয়মের লোহার বেড়ি—এদের কাছ থেকে ত আনন্দের প্রমাণ মিলবে না।

এমন সময়ে যিনি দেখলেন তিনি এক দৃষ্টিতেই দেখলেন, তিনি ব'লে বসলেন, আদি অন্তে মধ্যে এই সৃষ্টির অর্থ আনন্দ। তিনি অন্তরের মধ্যে সৃষ্টির ঠিক রসটি পেয়েচেন, তাই তিনি এক কথায় বলে' দিলেন—"যেটাকে তুমি বোধ করচ নিয়মের বন্দীশালা, সেইটেই আনন্দনিকেতন।"

বড় দুঃখের এবং পরম আনন্দের এই দুই অভিজ্ঞতা পরস্পর-বিরোধী। এক জায়গায় চোখ কানের সুস্পষ্ট প্রমাণ, আর এক জায়গায় চিত্তের অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধি। এর মধ্যে কোন্‌টি চরম সেটা জানা চাই।

তর্কের কথা থাক। বিশ্ব-নিয়মের ভিতর দিয়ে আনন্দের রূপ কি দেখিনি? নক্ষত্রখচিত নিশীথরাত্রে, বসন্তের পুষ্পিত কাননে, পাখীর পাখায় এবং কণ্ঠে, মানুষের প্রেম এবং আত্মত্যাগে? এই সব দেখা যখনি ঠিক মত দেখেচি তখনি ভিতর থেকে মন বলেচে, কদর্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অপবিত্রতা সমস্তকে অতিক্রম ক'রে এই সত্যই সত্য। কিন্তু যাঁরা জগতের আনন্দরূপের কথা বলেচেন, তাঁরা কেবলমাত্র এই বাইরের প্রমাণ থেকে বলেননি। তাঁদের কাছে নিজের অন্তরতম স্বত-উৎসারিত অমৃত-রসের আস্বাদন থেকেই বিশ্বের চরম রস ধরা পড়ে।

যাই হ'ক, দুই দল সাক্ষীর দ্বন্দ্ব, যা আমরা দেখতে পাচ্চি, সেই দ্বন্দ্বের একটা কারণ আছে। অনন্তের প্রকাশ অন্তের মধ্যে, অমৃতের প্রকাশ মৃত্যুর মধ্যে; যেমনতর, কাব্যের প্রকাশের বাহনটা হচ্চে ব্যাকরণ। আমরা প্রকাশের উপকরণকে প্রকাশের সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে এমন একটা জিনিষ দেখতে পাই যেটা নিরর্থক, যেটা কষ্টকর, যেটা থেকে কোনো মতে নিষ্কৃতি পাওয়াই মুক্তি।

প্রকাশের সত্য থেকে প্রকাশের বাহনকে বিচ্ছিন্ন কর্‌লে আমরা যে জগৎকে দেখি সেটাই হচ্চে মৃত্যুর জগৎ, শক্তির জগৎ। দুটিকে সম্মিলিত ক'রে যে জগৎ দেখি সেই হচ্চে অমৃতের জগৎ, আনন্দের জগৎ।

জরামৃত্যুর জগতে মানুষ যে শক্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে কাজ করচে সে হচ্চে বাসনার শক্তি। প্রকৃতি এই শক্তির তাড়া দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করে। তাই এই শক্তির নাম প্রবৃত্তি। প্রকৃতির ক্ষেত্রে আমাদের যত কিছু কাজ সেইসব কাজে এই শক্তি আমাদের প্রবৃত্ত করায়। অথচ এম্‌নি মায়া যে, আমাদের মনে হয় এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই যেন আমাদের স্বাধীনতা। প্রবলের ভয়ে আমরা যেখানে তার কাছে দাসত্ব স্বীকার করচি সেখানে আমরা যেমন ভয়েরই অধীন, তেমনি অত্যাচারের দ্বারা যেখানে আমরা দশের উপর প্রভুত্ব করচি সেখানেও আমরা ক্ষমতা-লালসার অধীন। দুই অধীনতাই প্রকৃতির অধীনতা, অর্থাৎ বাইরের অধীনতা, অতএব এ'কে স্বাধীনতা বলাই চলে না। এম্‌নি ক'রে মৃত্যুর রাজত্বে মানুষ যে উত্তেজনায় চল্‌চে সে প্রবৃত্তির উত্তেজনা।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে যিনি আছেন এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের তফাৎ হচ্চে। বাইরের কোনো তাড়নায় তাড়িত হ'য়ে তিনি কিছু করচেন না। তাই উপনিষৎ যখন তাঁর কর্ত্তৃস্বরূপের কথা বল্‌চেন তখন তাঁকে বল্‌চেন স্বয়ম্ভু, পরিভূ। এই আত্মার ইচ্ছা প্রকাশ করাকেই বলে আনন্দ, এই "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

এই আনন্দ আপন ইচ্ছাতেই আপনি বন্ধন স্বীকার করে, কারণ নিয়ম-বন্ধনের মধ্যেই আত্মার প্রকাশ। সুতরাং এখানে মুখ্য সত্যটি হচ্চে সেই ইচ্ছা, গৌণ হচ্চে নিয়ম-বন্ধন। সেই জন্যে আনন্দের জগতে যে আছে তার কাছে নিয়ম সেই ইচ্ছার পশ্চাতে নিজেকে সম্বৃত ক'রে রাখে; যেমন কাব্যের আনন্দরূপ যারা দেখে তাদের কাছে ব্যাকরণ অলঙ্কারের নিয়মরূপটি আনন্দের পশ্চাতে অভিভূত ও অগোচর হ'য়ে থাকে।

এই আনন্দের জগৎ হচ্চে ত্যাগের দ্বারা আত্মপ্রকাশের জগৎ। এখানে আত্মার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য আত্মোৎসর্জ্জনের দ্বারা নিজেকে নিয়ম-ব্যক্ত করে। তাই অমৃত লোকে আমাদের অধিকার প্রবৃত্তির উল্টা পথে, ত্যাগের পথে

এই জন্যে অমৃতের সাধনা কেবলমাত্র ধ্যান করা, মন্ত্রোচ্চারণ করা নয়। প্রতিদিন এমন একটি কর্ম্মধারা আশ্রয় করা, যেটির দ্বারা নিজেকে দান করতে পারি। এমন কোন কাজ করা, ধন মান খ্যাতির দ্বারা যার কোন মজুরি মিলবে না—যা সম্পূর্ণই নিজেকে ত্যাগ। এই প্রত্যহ ত্যাগের অভ্যাসেই মৃত্যুর বন্ধন ক্ষয়, অমৃতের উপলব্ধি উজ্জ্বল হয়, এই ত্যাগের দ্বারাই আত্মাকে জানি।

এই বাধা-নির্ম্মুক্ত আত্মাকে নিজের মধ্যে যে পরিমাণে জানব সেই পরিমাণেই সুখদুঃখের দ্বন্দ্বক্ষেত্র থেকে আনন্দের ক্ষেত্রে পৌঁছব, সেই পরিমাণেই জানতে পারব, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। তখন সুখদুঃখের অভিঘাত এবং নিয়মের বন্ধন যে থাকবে না তা নয়, কিন্তু ওস্তাদের অঙ্গুলিতে সেতারের তারের আঘাত যেমন থাকে অথচ সে আঘাত যেমন সঙ্গীতে পরিণত হ'তে থাকে—তেমনি হয়েই থাকবে।

(বিচিত্রা, কার্ত্তিক, ১৩৩৫) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

একটি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের অভিযান

[গজনাপতি সুলতান মাহমুদের ভগ্নীপতি সৈয়দ সালার সাহু ও তৎপুত্র ম'সূউদ্ অযোধ্যার অন্তর্গত সতরিখ ও বহরাইচ্ নামক দুইটি সমৃদ্ধিশালী নগরে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কয়েকটি অভিযান করেন। বহরাইচের নগর বাহিরে বালার্ক বংশীয় সূর্য্য-স্বরূপ সুহেলদেবের (প্রচলিত কথায় 'বালার-সুরজ') হস্তে মসউদ্ নিহত হন, ও তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হয়। পরবর্ত্তীকালে ফিরোজশাহ্ তুগলকের আজ্ঞায় বহরাইচের সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যকুণ্ড ও সূর্য্যমন্দির মসউদের শহীদ-স্থান বলিয়া কথিত হয় ও তখন হইতে মুসলমানদের একটি দর্শনীয় স্থানরূপে পরিগণিত হইতেছে। মসউদের স্মৃতিতে এখানে সৌর জ্যৈষ্ঠ মাসে হিন্দুমুসলমানের একটি মেলা হয়।]

যদিও সূর্য্যদেব ও নবগ্রহের মন্দির ভাঙ্গা হইয়াছে, তথাপি হিন্দুরা সৌর জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাচীন উৎসবের কিছু অভিনয় করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ মেলা ও উৎসবের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছে, এখন বলা হয় যে, মসউদের মৃত্যুর স্মৃতিরক্ষার জন্য মেলা করিয়া থাকে। এখানে যে সূর্য্যকুণ্ড ছিল, হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল, তাহা স্থানীয় লোকরা এখন ভুলিয়া গিয়াছে। এই গোরস্থানের আধুনিক পাণ্ডাদের পূর্ব্বপুরুষ এখানকার হিন্দু অধিবাসী ছিল, হয়ত সূর্য্যকুণ্ডের পাণ্ডা ছিল, তাহাদের জোর করিয়া মুসলমান করা হইয়াছিল। পরে ফিরোজ তুগলক তাহাদের গোররক্ষার ভার ও যাত্রীদের কাছে দর্শনী লইবার অধিকার দিয়াছিলেন এখন তাহাদের চলিত কথায় ডফালী বলে।

সালার মসউদকে এখন শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের অবতার, বালা লছমন, বালা পীর, বালা শহীদ ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বালা শব্দটি, বালার্ক শব্দের অংশ ও সূর্য্য উপাসকদের শেষ চিহ্ন। মসউদকে এখন যুক্তপ্রদেশে চলিত কথায় "গাজি মিয়া" বলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রচলিত—অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশে ও অযোধ্যায় তাহাকে বালে মিঞা, গাজী মিঞা, সালার গাজী, দিল্লী প্রদেশে তাহাকে পীর বহলীম ও ইরাণের খোরাসান প্রদেশে সালার রজব্ বলে। যুক্তপ্রদেশ ও অযোধ্যার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান উভয়ে তাঁহাকে শ্রী রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করিত। এখন আর্য্যসমাজী ও হিন্দুসভার প্রচারকদের চেষ্টায় "গাজী মিঞা"র পূজা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে, তবে, প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গোরের কাছে একটি মেলা হয় তাহাতে গরু, ঘোড়া ইত্যাদি দূর দেশ হইতে বিক্রয় করিতে আনে। তাহার গোরের কাছে এখন মীর মাহ শহীদ, পীরু শহীদ, সুকর সালার ইত্যাদি আরও কতকগুলি গোর আছে। ফিরোজ তুগলকের গোর নির্ম্মাণের বহু পরে স্থানীয় পাণ্ডারা অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য আরও অনেকগুলি গোর নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের মন্দিরের কাছে নবগ্রহের মন্দির ছিল, তাহাদের ঠিক স্থান জানা নাই, বোধ হয় চন্দ্রের মন্দিরের স্থানে মীর মাহ শহীদের গোর হইয়াছে, দেবগুরু বৃহস্পতির পরিবর্ত্তে পীরু শহীদ ও শুক্রের পরিবর্ত্তে সুকর সালার গোর হইয়াছে। তবে প্রচীন মন্দিরগুলি জলাশয়ের তীরে ছিল, ও এখনকার গোরগুলি কুণ্ড সুজান অংশে।

এ অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য, ধর্ম্মপ্রচার বলা হইয়াছে, কিন্তু বক্তৃতা করিয়া, শিক্ষা দিয়া, শ্রোতার বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া, অর্থাৎ আধুনিক কালে আমরা যাহাকে ধর্ম্মপ্রচার মনে করি, তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ঈশাব্দের ৬১০-৬১১র কাছাকাছি ইসলাম ধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, ৬৩২ ঈশাব্দে প্রতিষ্ঠাতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার জ্ঞাতী ও নগরবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে যুক্তি, তর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদি দেখিতে পাই, কিন্তু যখন দেশজয় ও ধর্ম্মপ্রচার এক সহিত আরম্ভ হইল তখন আর যুক্তিতর্কের চিহ্ন রহিল না। অন্য দেশে যাহাই হউক ভারতে বিশ্বাস করিয়া বোধ হয় শতকরা একজনও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। বেশীর ভাগ, ভারতবাসী আপনাদের দেশবাসী নিজেদের সমাজপতি বা প্রধানদের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া আত্ম-হত্যা না করিয়া মুসলমান হইয়াছে, কেহ শত্রুপক্ষের ছল ও বল দ্বারা পীড়িত হইয়া জাত হারাইয়াছে, পরে, আর হিন্দুসমাজে প্রবেশের উপায় না থাকায় মুসলমান রহিয়া গিয়াছে। ভারতের হিন্দুদের ধর্ম্ম ছাড়া আর একটি সম্পত্তি আছে, যাহা অন্য দেশবাসীর নাই, ইহা তাহাদের "জাত।" এই জাত অতি অল্প কারণে খোয়া যায় ও একবার হারাইলে এ জীবনে আর পাওয়া যায় না। এই বস্তুকে অনেকে ভ্রমক্রমে জাতি ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু একজন মানুষের মাথার কতকগুলি চুল কাটিয়া দিলে, গলায় ঝোলান কয়েকগাছি সুতা খুলিয়া লইলে, অথবা মুখের মধ্যে জোর করিয়া কিছু ঢুকাইয়া দিলেই তাহার "জাতি" পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, কিন্তু "জাত" চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়, অতএব বুঝিতে হইবে যে, জাতির

অতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার অতি সূক্ষ্ম, অতি-ক্ষণ-ভঙ্গুর, অতি-অল্পে ধ্বংস-সম্ভব বস্তুর নাম "জাত।" মুসলমান আক্রমণকারীরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, একজন হিন্দুর যে কোন উপায়ে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, একবার শিখা কাটিয়া দিলে, গলায় ঝোলান সূতা অর্থাৎ পৈতা ছিঁড়িয়া দিলে বা খুলিয়া লইলে, ও তাহার মুখে এক টুকরা গোমাংসের মত হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ খাদ্য অথবা অবস্থা-বিশেষে একজন বিদেশী মুসলমানের পাত্রের একবিন্দু জল দিতে পারিলেই সে জাত হারায়, হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়া যায়, আর সহস্র চেষ্টা করিলেও সে হিন্দু হইতে পারে না; তাহার পক্ষে মুসলমান সমাজে থাকিয়া প্রাণধারণ করা অথবা আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

এই অভিযানের ধর্ম্মপ্রচারকরা ঠিক কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে কেহ লেখে নাই বটে, কিন্তু বরাইচ নগরে প্রতি বৎসর সৌর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবারে যে গাজী মিঞার মেলা হয়, তাহাতে এক প্রকার অভিনয় করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের স্মৃতিরক্ষা করা হয়, তাহা দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, সেকালে কি করা হইয়াছিল।

হিন্দুরা যেমন বলিয়া থাকে, যে শিশু জন্মকালে শূদ্র থাকে, পরে তাহার সংস্কার হইলে সে দ্বিজাতিমধ্যে গণ্য হয়, সেইরূপ এ অঞ্চলের মুসলমানদের বিশ্বাস, যে শিশু জন্মের সময় কাফের জন্মায়, পরে গাজী মিঞার দরগাতে—পূজা দিয়া প্রসাদ পাইলে মুসলমান হয়। এই সম্প্রদায়ে শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহার মাথার পশ্চাৎ দিকের কতকগুলি চুল ফেলা হয় না, অন্য অংশের চুল ক্ষৌর করা হয়। এই চুলগুলি বাড়িয়া উঠিলে দেখিতে ঠিক বড় আকারের শিখার মত হয়, ও ইহাকে "গাজী মিঞার নজারা" অর্থাৎ ভেট বলে। মেলার দু এক দিন পূর্ব্বে লাল ও পীত রঙে ছোপান কতকগুলি কাঁচাসূতার একছড়া হার বা পৈতার মত করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দেওয়া হয়। দরগাতে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেখানে মেলার দিন শিশুর মাথার চুল ক্ষৌর করা হয়, পরে ঐ চুল (বা শিখা) ও গলার সূতার হার (বা পৈতা) এক পাত্রে রাখিয়া কিছু দক্ষিণা সহ গোরের পূজারীর হাতে দেওয়া হয়। পূজারী ঐগুলি গোর ঠাকুরকে ভেট দিয়া অল্প চিনি বা একখানি বাতাসা শিশুর মুখে গুঁজিয়া দেন, তাহা হইলেই শিশু মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবার অধিকারী হয়।

পূর্ব্বকালে মুসলমান আক্রমণকারীরা গ্রামের লোকদের ধরিয়া আনিয়া তাহাদের শিখা কাটিয়া দিত, তাহাদের পৈতা খুলিয়া লইত, পরে এক টুকরা প্রসাদ [বোধ হয় নিষিদ্ধ গোমাংস] তাহার মুখে জোর করিয়া গুঁজিয়া দিত, এইরূপ করিতে পারিলেই তাহার জাত যাইত, হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়া যাইত, আর মাথা খুঁড়িলেও হিন্দুসমাজ তাহাকে গ্রহণ করিত না। সতরিখে মসউদের পিতা সাহুর গোরের বাৎসরিক উৎসবে এখনও গোর-রক্ষকরা গোমাংসের কবাব যাত্রীদের বিক্রয় করে। মেলার সময় মুসলমান যাত্রীমাত্রেই ঐ কবাব কিনিয়া খাইতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য বলিয়া বিশ্বাস করে, অতএব গোররক্ষককে অসম্ভব উচ্চমূল্য দিয়া অতি অল্প পরিমাণে কবাব কিনিয়া খায়। এই মেলাতে রক্ষকদের বেশ লাভ হয়। দেশের হিন্দু শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে এরূপে জাত হারাইবার পর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে তুষানলে দেহত্যাগ অথবা ফুটন্ত ঘৃত পান করিয়া দেহত্যাগ ইত্যাদি অতি সুখকর ও সরল ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অতএব একবার জাতি হারাইবার পর জীবিত অবস্থায় হিন্দুসমাজে থাকা অসম্ভব। আত্মহত্যার মত সুখকর প্রক্রিয়া সকলে করিতে পারিত না, অতএব পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে দেশের হিন্দুসংখ্যা কমাইয়া মুসলমান সংখ্যা বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতে ইসলাম ধর্ম্মপ্রচার, হয় এইরূপে জাত মারিয়া করা হইয়াছে, নয় হিন্দুদের মধ্যে যাহারা অস্পৃশ্য বা নীচজাতীয় বলিয়া গণ্য, তাহাদের প্রতি উচ্চজাতীয় বা দ্বিজাতির অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে তখন তাহারা বাধ্য হইয়া ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়' পীড়নের হাত এড়াইয়াছে, ইসলামের দোষ গুণ বিচার করিয়া, শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মপ্রচার কোন কালে হয় নাই। এ প্রথা যে কেবল প্রথমাবস্থাতেই হইয়াছে তাহা নহে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক (১৫১০ ঈশাব্দের কাছাকাছি) কায়স্থ-কুলোদ্ভব গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের মুখে মুসলমানের ঘটির জল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। জাত হারাইয়া তিনি ভারতের নানা স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন, তখন সকলেই দেহত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যদি জীবিত থাকা অসম্ভব হয়, তবে তাহা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা না হইয়া ব্যবস্থা অভাবে আত্মহত্যা হইল। এক কথায়, হিন্দু-শাস্ত্রে জাত-হারান রূপ দুর্ভাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অনেকে বলে, হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্রবৎ, কিন্তু সমুদ্রের জল লবণাক্ত, তাহাতে পিপাসিতের তৃষ্ণা দূর হয় না, পিপাসিত জীব সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া পিপাসায় ছটফট করে। অকবরের সময়ের মুসলমান কবি রহীম যথার্থই বলিয়াছেন,—

ধনি রহীম জল পঙ্ককো, লঘু জিয় পিয়ৎ অঘায়।
উদধি বড়াই কওন হ্যা, জগৎ পিয়াসো যায়॥

আজকাল আর্য্য-সমাজের শুদ্ধিপ্রথাতে এই পিপাসিত জীবের নিস্তারের পথ মুক্ত হইয়াছে বলিয়া হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে, আজকাল জাত আর সেকালের মত ভঙ্গুর নহে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে কঠিন হইয়াছে!

(উত্তরা, কার্ত্তিক ১৩৩৫)　　শ্রী অমৃতলাল শীল

—

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের মধ্যে এখনও অনেকের মনে হয়—বাংলা কথা-সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবটা যেন একটু আকস্মিক। এক বিষয়ে যে আকস্মিক তাতে সন্দেহ নেই, সে বিষয়ে তিনি অনন্যসাধারণ। একান্ত নিভৃত-নির্জ্জনে তাঁর সাধনা শেষ করে' তিনি একেবারে তাঁর পূর্ণসিদ্ধির ফলটি আমাদের হাতে তুলে দিলেন। সে যে কত বড় বিস্ময় তা, যাঁরা সেদিনের লোক, তাঁরা আজও স্মরণ করবেন। কিন্তু আর একটা বিস্ময়ের কারণ আজও রয়েছে। একথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, তাঁর উপন্যাসগুলিতে জীবনের যে দিকটি যেমন করে' ফুটে উঠেছে, তাতে ভাব ও চিন্তার যে বৈশিষ্ট্য আছে—বাঙ্গালীর পক্ষে যে কঠোর আত্মজিজ্ঞাসার তাগিদ আছে, তাতে আমাদের হৃদয় যেমন উন্মুখ হয়ে ওঠে, মন তেমনি সঙ্কুচিত হয়; আমাদের চিরদিনের সংস্কারে আঘাত লাগে, নিরুদ্বেগ আত্ম-প্রসাদের হানি হয়। যাঁরা রসিক তাঁরা এতে বিচলিত হন না, তাঁরা সেটুকু পরম আগ্রহে দ্বিধাশূন্য হয়ে উপভোগ করেন, বাস্তবের দিকটা

অনায়াসে অতিক্রম করে' যান। কিন্তু যাঁদের মধ্যে শাস্ত্রসংস্কার প্রবল হয়ে রয়েছে, সেই সংসারপ্রবীণ জনমণ্ডলী শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-গুলি পড়ে' যতটা অভিভূত হন, ঠিক ততটাই লেখকের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন। বাংলা-সাহিত্যে এতদিন যে ধরণের ভাবকল্পনা ও আদর্শের চর্চ্চা হয়ে আসছিল, এ যেন তার বিপরীত। এ বিপ্লবের কি প্রয়োজন ছিল? জীবনের বাস্তব দিকটা নিয়ে এমন নাড়াচাড়া করবার—তাকে আবার এমন রসোজ্জ্বল করে তোলবার এই দুর্ম্মতি কেন? শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এই মৌলিক প্রবৃত্তি এখনও সন্দেহ ও সংশয়ের হেতু হয়ে রয়েছে। আমাদের জীবনের জীর্ণভিত্তির তলদেশে, অন্ধকার গহ্বরে, যে সকল প্রেতমূর্ত্তি পিপাসার্ত্ত হয়ে এক বিন্দু জল প্রার্থনা করছিল, শরৎচন্দ্র তাদেরই সেই রুদ্ধ আর্ত্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর করে' দিয়েছেন; আমরা এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথকে আমরা এখন কতকটা বুঝতে পারছি; কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের অব্যবহিত পরেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটু অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত—আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়েছে। এই আপাতবৈষম্যের মূলে কোনও সত্য আছে কি না, আমাদের সাহিত্যের ভাবধারার ক্রমবিকাশে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় স্বাভাবিক কিনা, তারি কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

বঙ্কিমের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কথা-সাহিত্য ভাবপ্রধান; অর্থাৎ কল্পনা ও ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টির প্রসারই যেন এ সাহিত্যে বেশি। বঙ্কিম খাঁটি আদর্শবাদী, তাঁর উপন্যাসগুলিতে অতি সাধারণ জীবনযাত্রার উপরেও একটি অবাস্তবরমণীয় কল্পনার ছায়াপাত হয়েছে। কতকগুলি চরিত্র, ঘটনা ও অবস্থান (Situation)কে সেই কল্পনার উপযোগী করে তার মধ্যে লেখক নিজের মনোমত আদর্শ ও সাহিত্যিক রসপিপাসা চরিতার্থ করেছেন। এজন্য তাঁর উপন্যাসের প্লটরচনায় কৃতিত্বের পরিচয় আছে। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি ঠিক নভেল নয়—গল্প-রোমান্স; ভাষা, ভাব ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে পাঠককে স্বপ্নাতুর করে' তোলে। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়বার সময় মনের রাশ একটু আল্‌গা করে' রাখতে হয়; কেবল মাত্র সেই রস উপভোগ করার জন্যেই যদি সেগুলি পড়া যায় তবে তার ভিতরকার সেই গভীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, passion ও emotionএর আবেগ এবং একটি অপ্রাকৃত কল্পনার মোহে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। বঙ্কিমের এই Idealism বাঙ্গালীর মনোহরণ করেছিল; Shakespeareএর নাটক ও Scottএর Romance পড়ে' এককালে বাঙ্গালীর প্রাণে যে রসের ক্ষুধা জেগেছিল তা' বঙ্কিমই কতকটা তৃপ্ত করেছিলেন। সে-কালের কাব্যগুলিতেও এমন খাঁটি সাহিত্যরস ছিল না—কাব্য, নাটক ও উপন্যাস, এই ত্রিবিধ সাহিত্যের রস ওই একজনই এক পাত্রে পরিবেশন করেছিলেন।

এই ধরণের রুচি ও রস পুরানো হয়ে না আসতেই—বরং, যখন পুরোমাত্রায় বঙ্কিমের যুগই চল্‌ছে—সেই সময় এলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় গোড়া থেকেই ভাবকল্পনার একটা নূতন অভিব্যক্তি দেখা গেল। এখানে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির উল্লেখ না করে', বাংলা কথা সাহিত্যে যেগুলি তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে সুন্দর ও মৌলিক সৃষ্টি, সেই 'গল্পগুচ্ছে'র কথা মনে রাখলেই হবে। বঙ্কিমের ভাবুকতা যে বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে রসের সন্ধান করেছিল, রবীন্দ্রনাথের Idealism সেই বাস্তবকেই এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করেছে। যে কল্পনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা Subjective সে কল্পনার রঙে যা অতিশয় সাধারণ ও সুপরিচিত, এমন কি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র—তা'ই অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে, বাস্তবের মধ্যেই লোকোত্তরচমৎকার বিস্ময়রসের সঞ্চার হয়েছে। বাস্তবের সেই অতি-পরিচয়ের আবরণ-খানি তুলে ধরে' বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করাই তাঁর কল্পনার মূল প্রবৃত্তি। সে কল্পনা বস্তুকে একেবারে রূপান্তরিত করে, অথচ মনে হয় সেইটিই যেন তাঁর একমাত্র সত্যকার রূপ। যে আনন্দে কবি এই অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করেছেন তার মূলে কোন্ প্রেরণা ছিল তা কবিই বলেছেন—

মাথাটি করিয়া নীচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে',
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে'।
ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি'
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
কত ভাব কত ভয় ভুল—
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মত—
ক্ষণ অশ্রু ক্ষণ হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমিষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ নিশার।

এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এ Idealism কত বড়—কত দুরূহ! পৃথিবীর ধূলামাটিকে সোনা করে' তোলা, মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে, বিশ্বসৃষ্টির যে রহস্য তারি অন্তর্ভুক্ত করে' দেখা—এ ত' সোজা Idealism নয়! এ কল্পনার সঙ্গে দেশের লোকের এখনও ভালো করে' পরিচয় হয় নি। এর প্রভাব আকস্মিক হতে পারে না—রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছে খুব ধীরে। বঙ্কিমের কল্পনা সূর্য্যাস্তশেষ বর্ণগরিমার মত আমাদের মনের আকাশে যে সৌন্দর্য্যরাগের আয়োজন করেছিল, তারই অন্তরালে, শুক্লসন্ধ্যার অস্ফুট চন্দ্রালোকের মত রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অলক্ষিতে আমাদের মনকে অধিকার করেছে। এ আলোক যে কখন কেমন করে' গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠল, কখন যে সে আলোকে পথের উপর আমাদের ছায়া গভীর হয়ে উঠল, সে আমরা জানতেই পারিনি! এ রূপের মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো উত্তেজনা নেই—নিশীথরাতের দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্নার সঙ্গে শুধু একটি স্বপ্নের ঘোর ঘনিয়ে ওঠে। বাস্তবের সঙ্গে যেন কোথাও কোনো বিরোধ নেই—সকল কর্কশতা ও রূঢ়তা একটি গভীরতর চেতনার আশ্বাসে যেন লুপ্ত হয়ে যায়। বাস্তবের মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য্য

রয়েছে সেইটুকুই সত্য, অথবা তার যতটুকু সত্য ততটুকুই সুন্দর—বাকিটুকু মিথ্যা, মিথ্যা ব'লেই দুঃখকর। এই ভাবদৃষ্টি, এই আনন্দবাদ, এই সত্যসন্ধান বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় দান। কিন্তু এ ত' সকলের পক্ষে সহজ নয়। যে কল্পনায়, ছোট-বড়, সুন্দর-কুৎসিত, সুখ-দুঃখ—সবই একটা নিগূঢ় ঐক্যবোধের আনন্দে সমান হয়ে দেখা দেয়, তাকে আত্মসাৎ করা একটা বিশেষ Culture বা সাধনার অপেক্ষা রাখে। তবু এই কল্পনার জাদুশক্তি সজ্ঞানে স্বীকার না করলেও অনেকের প্রাণে একটা নূতনতর স্বপ্নের আবেশ লেগেছে। মানুষের সম্বন্ধে কোনো কিছুই উপেক্ষার যোগ্য নয়, সত্যকার জগৎকে অস্বীকার করে' বৈরাগ্য সাধন বা কোনো অপ্রাকৃত কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যে ঠিক নয়, এমনি একটা ভাব মানুষের মনে ক্রমশই স্থান পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের দূরারোহিনী কল্পনার ঊর্দ্ধশাখায় যে ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে উঠল তার সবটুকু শোভা সকলের চোখে ধরল না বটে, কিন্তু সেই ফুলের বীজ নিম্ন ভূমিতে একটি নূতন রূপে অঙ্কুরিত হ'ল। শরৎচন্দ্রের সুনিভৃত সাধনার পরিচয় আগে কেউ পায়নি, তাই হঠাৎ যখন দেখা গেল, একেবারে পথের ধারেই লতাগুল্মের বেড়াগুলি এক নতুন ধরণের ফুলে ভরে' উঠেছে। তার বর্ণ ও গন্ধ যেমন চমক লাগায়, তেমনি অতি সহজে প্রাণমন অভিভূত করে—তখন আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ যেন ভাবকল্পনার বস্তু নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব; এ যেন চিরদিনের দেখা জিনিষ, অথচ এমন করে কখনো দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্যগগনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করেছে, তখন সেই রবীন্দ্রালোকিত মহাদেশের একপ্রান্তে একটা নতুন আলো বিচ্ছুরিত হ'ল, নিথর নিবিড় জ্যোৎস্নাকাশের এক কোণে বিদ্যুৎ-শিহরণ সুরু হ'ল।

যে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিব্যবস্থার বশে, বাঙালীর জীবনে আত্মত্যাগের মহিমা ও স্বার্থরক্ষার দৈন্য, এই দুয়েরই বেদনা করুণ হয়ে উঠেছে—যে tragedy কোনো অতিমানুষ নাটকীয় tragedyর থেকে কিছুমাত্র কম নয়, তাকেই তিনি সাহিত্যের আকারে সুপ্রকাশিত করলেন। তিনি জীবনকে খুব বিস্তৃত করে' দেখেননি, কিন্তু যেটুকু দেখেছেন গভীর করে'ই দেখেছেন—সে গভীরতা ততটা কল্পনার নয়, যতটা অনুভূতির। এই সহানুভূতি যেখানে যতটুকু পৌঁছতে পেরেছে ততটুকুই তাঁর কল্পনার প্রসার। সমাজ যে পাপে জর্জ্জরিত হয়েও তাকে স্বীকার করে না—আত্মঘাতীর সেই ব্যথাকে শরৎচন্দ্র তাঁর নিজেরই হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করেছেন। তিনি যা দেখেছেন বিনা সঙ্কোচে তার সবটুকুই প্রকাশ করেছেন, সবটুকু প্রকাশ না করলে যে সে ব্যথার পরিমাণ করা যাবে না। অসহায় শক্তিহীন সমাজের এই ব্যথাকেই তিনি বড় করে' দেখেছেন, তাদের মতন অসহায় ভাবে তিনি নিজেও সেই ব্যাথা ভোগ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা, অনেক ভাবনা করেছেন বটে, কিন্তু কোথাও বিচার করতে বসেন নি। তিনি দুঃখের কোনো দার্শনিক মীমাংসা করতে চাননি, তার বাস্তব রূপটির ধ্যান করেছেন—চোখে দেখা এবং গভীর করে' অনুভব করা, এই হ'ল তাঁর কল্পনার উৎস।

রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবকে অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল করে' তুলেছেন শরৎচন্দ্র সেই বাস্তবকে বাইরের দিক থেকেই হৃদয়ের নিকটতর করে' দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের পরিধি সীমাহীন হয়ে আনন্দঘন শান্তরসের উদ্বোধন করে, শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক কল্পনায় সুখ দুঃখের সেই সীমারেখা কোথাও হারিয়ে যায় না—ব্যথার ব্যথাটুকু শেষ পর্য্যন্ত জেগেই থাকে। এই অনুভূতির সঙ্গেই তাঁর মানসবৃত্তি জেগে ওঠে, কিন্তু তাঁর সেই চিন্তাগুলিকে কোথাও বস্তুনিরপেক্ষ, abstract ideaর ভাবনা বলে' মনে হয় না। অমাবস্যার রাত্রে নির্জ্জন শ্মশানে বসে শ্রীকান্তের সেই ধ্যান—'অন্ধকারের একটা রূপ আছে'—পড়তে পড়তে মনে হয়, এখানে শরৎচন্দ্র বুঝি নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছেন; কিন্তু তার মধ্যে নিছক ভাবকল্পনা নেই, একটা অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতির emotion আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সৃষ্টির মর্ম্মমূলে একটা অব্যভিচারী রসবস্তুর সন্ধান করেছে—সে কল্পনা সকল বস্তুরই সেই এক রসপরিণাম উপলব্ধি করেছে। এই ভাবকল্পনার প্রভাবে শরৎচন্দ্রের অনুভূতিকল্পনাও যেন একটু জোর পেয়েছে; তাই নীলাম্বরের মত নিরক্ষর গাঁজাখোর পল্লীসন্তানের মধ্যেও রসের উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ধান করতে তাঁর সাহসের অভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর ভাষার মধ্যেও রয়েছে। তথাপি তাঁর ষ্টাইল যেমন মৌলিক তাঁর কল্পনাও তেমনি নিজস্ব। এইজন্যই তাঁদের দুজনের দুই বিভিন্ন কল্পনা প্রকৃতি তুলনা করে' দেখাবার মত ঠিক একই ধরণের গল্প খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবু আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করে' দেখব। শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গল্পের সেই মেয়েটির অবস্থা রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের রতনের অবস্থার সঙ্গে যেন একটু মেলে। রতনের দুঃখ যেন সমস্ত আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়ে গেল, তার মধ্যে মানব ভাগ্যের চিরন্তন tragedyর ছায়া পড়েছে। সে দুঃখ যেন ভাবের শাশ্বত-লোকে একটি পরম পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। অরক্ষণীয়ার মধ্যে সে ধরণের ভাবুকতা নেই; তার মধ্যে যে দুঃখের বর্ণনা আছে, সে ঠিক সেই ব্যক্তি ও সেই অবস্থার মধ্যেই কঠিন ও সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে জেগে রইল, কোনো একটি ভাবলোকে সমাপ্তি লাভ করলে না। এখানে কাব্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতিই তাঁকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছে। চন্দ্রনাথ উপন্যাসের সেই কৈলাসখুড়া' ও 'দাদু'র কথা বাংলার গল্প-সাহিত্যে অতুলনীয়। ঐ উপন্যাসখানির শেষের দিকে এই যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে, তার প্রভায় মূল-কাহিনী ম্লান হয়ে গেছে। একি শুধুই বাস্তবের তীব্র অনুভূতি? কত বড় রস-কল্পনার প্রমাণ এই চিত্রটি! এর সঙ্গে একদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির তুলনা করা যায়। কাবুলিওয়ালার ব্যথা বিশ্বজনীন হয়ে এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করেছে বটে, তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের করুণ রস যেন আরও গভীর, আরও উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের সত্যাশ্রয়ী ভাবকল্পনা বাঙ্গালীকে রসের অতি উর্দ্ধলোকে বিচরণ করবার অধিকার দিয়েছে। এই সত্যকে তিনি পৃথিবীর ধূলামাটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সীমাকে অসীমের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র এই ধরণী ও ধরণীর ধূলামাটিকে তেমন করে' দেখেননি—তিনি বিশ্ব বা প্রকৃতি, কাউকেই ভক্তি করবার অবকাশ পান নি। তাঁর নিজের সমাজে তিনি যে জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই তিনি গভীর বর্ণে চিত্রিত করেছেন, আর কিছুর ভাবনা তিনি করেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথের মানবতাটুকুই গ্রহণ করেছেন, বিশ্বমানবতা বা বিশ্বপ্রাণতার দিক দিয়েও তিনি যাননি।

কিন্তু তাই বলে' শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক বা Realist নন। তিনিও একজন বড় দরের Idealist। অতি নিম্নশ্রেণীর জীবন-যাত্রা, এমন কি সমাজ-বহির্ভূত জীবনকে তিনি তাঁর কল্পনায় স্থান দিয়েছেন অথবা অনেক বাস্তব দুঃখের চিত্র এঁকেছেন বলে'ই তিনি Realist নন। বরং তাঁর হৃদয়ের আবেগ এতই বেশি যে, কোন কিছুকেই তিনি ঠিক তার মতনটি করে' দেখতে পারেননি—ঢের বড় করে' দেখেছেন।

মানুষের দুঃখ তিনি যেটুকু দেখেছেন তার চেয়ে বেশি করে' উপলব্ধি করেছেন—এই উপলব্ধি করার মধ্যে যে শক্তি আছে সেইটাই তাঁর কল্পনাশক্তি। যিনি প্রকৃত Realist তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করেন, এজন্যে, সুন্দরের চেয়ে কুৎসিত দিকটা, ভাবের চেয়ে অভাবের দিকটা, আস্থার চেয়ে অনাস্থার দিকটাই তাতে বেশি করে' ফুটে ওঠে। তার মধ্যে লেখকের নিজের কোনও অভিপ্রায় বা ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে না। এইটি মনে রাখলেই শরৎচন্দ্রকে কেউ Realist বলবেন না। প্রমাণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলিই ধরা যাক। শরৎচন্দ্রের যত কিছু নিন্দা-প্রশংসা এই গুলিকে নিয়েই। এই নারী-চরিত্রই বাংলার সকল বড় বড় ঔপন্যাসিকের একটি শক্তি-পরীক্ষার স্থল। বাংলা উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলিই যা একটু বৈচিত্র্যময়, পুরুষ-চরিত্রগুলো নাকি তেমন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধেও Thompson সাহেব এই কথাই বলেছেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের দেশে নারীর মধ্যেই একটু শক্তির পরিচয় আছে, তাই গল্পে উপন্যাসে নারী-চরিত্রের একটু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তবু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই উভয়ের মধ্যে, এ বিষয়ে, বরং বঙ্কিমের কল্পনাই একটু বাস্তব-ঘেঁসা; রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র সর্ব্বত্রই একটা আদর্শ কল্পনায় অনুরঞ্জিত, তাদের সম্বন্ধে তাঁরই কথায় বলা যেতে পারে—"অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।" আমাদের সমাজে নারীর যে শক্তির কথা বলেছি, শরৎচন্দ্র ঠিক সেইটির সন্ধান পেয়েছেন, তাই তাঁর কল্পনাও বাস্তবের অনুকূল হয়েছে। তিনি আমাদের মেয়েদের মধ্যে সেই একটি মহিমা লক্ষ্য করেছেন—দুঃখ সহ্য করিবার অসাধারণ শক্তি। 'অন্নদাদিদি'কে দেখে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যে এক বিষয়ে নিঃসংশয় হন,—সেটা উপন্যাস নয়, খুব সত্য কথা। কিন্তু একথা ত শুধুই আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধেই খাটে না, নারীমাত্রেরই প্রকৃতিতে এই passive শক্তি নিহিত রয়েছে। নারী-বিদ্বেষী Schopenhauerও বলেছেন, "She pays the debt of life not by what she does but by what she suffers." নারী-জীবনের এই নিয়তি শরৎচন্দ্রকে বিশেষ করে' অভিভূত করেছে, তার কারণ আমাদের সমাজের নারীর এই নিয়তি সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান। যে সমাজে পুরুষের পৌরুষ প্রায় নির্ব্বাপিত, ভীরু দুর্ব্বল স্বার্থপর পুরুষের সংখ্যাই বেশী, সেখানে নারীকেই যে পুরুষের সকল অত্যাচার, সকল পাপের বোঝা বইতে হয়। এই সমাজের অন্ধতম গহ্বরে শরৎচন্দ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন—সেখানে নারীর সেই ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা তাঁর প্রাণে অপরিসীম সহানুভূতির উদ্রেক করেছে, তাই তিনি Son of Manএর পরিবর্ত্তে Daughter of Womanএর মহিমা এমন করে' কীর্ত্তন করেছেন।

আমার মনে হয়, যে-অপূর্ব্ব ভাবুকতা ও Lyric sentiment শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে একটি গীতি-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছে নারী-জীবনের এই দুঃখ-কল্পনাতেই তার জন্ম। এর থেকেই তাঁর কল্পনা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কিন্তু নারীচরিত্রের এই একটি দিক তিনি বিশেষ করে' দেখেছেন বলে,' এবং সেইটিকেই কেন্দ্র করে, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস গড়ে' উঠেছে বলে,' তাঁর কল্পনার মণ্ডলটি কিছু সংকীর্ণ। প্রত্যক্ষ বাস্তব অনুভূতির ধারাই তাঁর কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে' তাঁর দৃষ্টি যেমন গভীর, সৃষ্টিশক্তি তেমন প্রচুর নয়। বাস্তব অনুভূতি ও Subjective কল্পনা এই দুয়ের পূর্ণ মিলন হয়েছে বলে'ই, তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে তাঁর শক্তির এমন পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। এই উপন্যাসখানির গঠনে ও পরিকল্পনায় অতিশয় স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটেছে, বাস্তব অনুভূতি ও স্বকীয় কল্পনার বিরোধ এখানে নেই। তাই এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের Idealism এমন অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করেছে।

আমাদের কথাসাহিত্যে এ পর্য্যন্ত Idealismই জয়ী হয়ে এসেছে। বঙ্কিমের কল্পনায় ছিল একটা বড় Idealএর sentiment; রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real ও Idealএর সমন্বয় চেষ্টা আছে; শরৎচন্দ্রের কল্পনায় আছে Real এর একটা Emotional প্রতিরূপ। বঙ্কিমের কল্পনায় Real একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, সে ছিল সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ; রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real রূপান্তরিত হয়েছে, তার Realityই যেন লোপ পেয়েছে; শরৎচন্দ্রের কল্পনায় এই Realএর সমস্যা ঘোরালো হয়ে উঠেছে—Realএর জন্যে একটা প্রবল আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্রিধারায় আমাদের সাহিত্যের Idealism বোধ হয় নিঃশেষ হয়ে এল। অতঃপর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, শাদা চোখে Realএর সঙ্গে বোঝাপড়া করাই হবে তার একমাত্র প্রেরণা।

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৩৫

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

সাপ্তাহিক সংস্কৃত পত্রিকা

১। এমন কোন সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে কি না, যাহাতে সাপ্তাহিক খবর বাহির হয়। ও বালবোধ্য সাপ্তাহিক হিন্দি পত্রিকা আছে কি না? থাকিলে কোথায় পাওয়া যাইবে?

২। "হিন্দি হইতে বাংলা" কোনও ভাল অভিধান আছে কি না? থাকিলে মূল্য কত ও ঠিকানা কি?

শ্রী তরণীকুমার ভট্টাচার্য্য

নদীপতি সমুদ্র

রামের প্রতি পিতা রাজা দশরথের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের আদেশের কথা শুনিয়া মাতা কৌশল্যা রামকে বলিয়াছিলেন "তুমি আমার কথা অবহেলা করিয়া বনবাসে গেলে আমি জীবনধারণ করিতে পারিব না; তাহা হইলে নদীপতি সমুদ্র, মাতাকে দুঃখ দেওয়া প্রযুক্ত যেরূপ ব্রহ্মহত্যা নিবন্ধন দুঃখ পান, তুমিও সেইরূপ লোকবিখ্যাত দুঃখ পাইবে।" (অযোধ্যাকাণ্ড ২১ সর্গ ২৮ শ্লোক)।

এখন জিজ্ঞাসা এই

(ক) নদীপতি সমুদ্রের মাতা কে ?

(খ) নদীপতি সমুদ্র কি জন্ম মাতাকে দুঃখ দিয়াছিলেন ?

(গ) মাতাকে দুঃখ দিবার জন্য ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়; ইহা কোন্ স্মৃতির বিধান ?

(ঘ) সমুদ্র কিরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন ? ইহার বৃত্তান্ত ও ইতিহাস কি ?

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

কণ্ডু ঋষির গোবধ

মাতা কৌশল্যা রামের প্রতি রাজা দশরথের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের আদেশ অবৈধ সুতরাং ঐ আদেশ প্রতিপাল্য নয় বলিলে, রাম মাতা কৌশল্যাকে বলিয়াছিলেন "পিতৃ আজ্ঞা অবৈধ হইলেও তাহা অবশ্যই পালনীয়।" ইহা বলিয়া বলিলেন "বিশুদ্ধ ব্রতানুষ্ঠায়ী অতি বিজ্ঞ কণ্ডুঋষি ধর্ম্মভীত থাকিয়াও পিতৃবাক্য পালনার্থ গোবধ করিয়াছিলেন।" (অযোধ্যাকাণ্ড ২১ সর্গ ৩১ শ্লোক)।

(ক) পিতৃ বাক্যে কণ্ডুঋষির এই গোবধ করিবার ইতিহাস কি ? অর্থাৎ পিতা কিজন্য গোবধ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন ?

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

মাধবদেবের জীবনী

আসামে মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মাধবদেবের, বাংলা কিম্বা ইংরাজী কিম্বা অসমীয়া ভাষায় লিখিত কোন জীবন-চরিত আছে কি না ? বাংলা মাসিক পত্রিকাদিতে উক্ত মহাপুরুষের সম্বন্ধে কখনো কোনো আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে কি ?

শ্রী অমিতাভ দত্ত

ঘর-জেউতী নামক অসমীয়া মাসিক পত্র

শ্রীযুক্তা কমলালয়া কাকতি ও শ্রীযুক্তা কনকলতা চালিহা সম্পাদিত 'ঘর-জেউতী' নামক অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি কোন্ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য ?

শ্রী অমিতাভ দত্ত

নিকুচি

"উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক লোকের মুখেই নিকুচি শব্দটি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে এই শব্দের ব্যবহার নাই। মহিলা-গণই এই শব্দটি অধিক ব্যবহার করেন। যাঁহারা এই শব্দ ব্যবহার করেন তাঁহাদের নিকট শব্দটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু কোনও সদুত্তর পাই নাই। "নিকুচি"র পরে সর্ব্বদাই "করেছে" র যোগ থাকে যেমন "নিকুচি করেছে"। এই "নিকুচি" শব্দের অর্থ কি ?—

শ্রীভবানী সেন।

মৎস্য পুরানোক্ত দুর্গাপূজা

মৎস্য পুরাণোক্ত 'দুর্গা পূজা' বঙ্গ ও আসামের কোন্ কোন্ স্থানে প্রচলিত আছে ? ইহা কাহার দ্বারা কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হয় এবং উক্ত পূজা বিধি কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ? মুদ্রিত বই আছে কি ? কোন্ পুরাণোক্ত দুর্গা-পূজা সব চেয়ে প্রাচীন ?

শ্রী রোহিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

রূপ ও সনাতনের উপাধি

রূপ ও সনাতনের উপাধি দবির খাস ও সাকার মল্লিক পাওয়া যায়। উহার অর্থ কি এবং কি পদবীর নাম ?

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বই কোন কোন ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছে ? অনুবাদকগণের নাম ও প্রাপ্তিস্থান জিজ্ঞাস্য।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

পূজার পুরোহিত

বাংলাদেশে পূজা পার্ব্বণে পুরোহিতের ব্যবসা খুব ব্যাপক; ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য দ্বিজাতিগণ ও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম্ম প্রায়শঃই নিজেরা করেন না—পুরোহিতের দ্বারাই সম্পন্ন করান। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে কিরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে ? পূজা অনুষ্ঠান নিজেরা না করিয়া পুরোহিতের দ্বারা করাইলে সেই অনুষ্ঠানের মূল্য এবং মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় কি ?

শ্রী সত্যভূষণ সেন

—

মীমাংসা

বাউল গান

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে জন্ম হইয়াছে, ইহার সম্বন্ধে বহিও আছে "কাঙ্গাল হরিনাম গ্রন্থাবলী" নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া হরিনাম কুটীরে প্রাপ্তব্য। ভক্ত হরিনাথ মজুমদার বাউল সঙ্গীতের বৃহৎ সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়া নিজে ফিকির চাঁদ নামগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় "চোরমর্দ্দন গ্রামে" হুধারাম বাউলের সুবৃহৎ কেন্দ্র আছে, তাঁহার বহু শিষ্য মিলিত হইয়া ঢাকা বিক্রমপুর সেরেজাবাজ গ্রামেও একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। বাউল গানের মূল "গুরু ব্রহ্ম"। গানে গায় "মানুষ গুরু কল্পতরু ভজ মন। মানুষ ভজ্‌লে মানুষ পাবি আছে মানুষে মানুষ রতন॥"

শ্রী রাইমোহন বরাট।

"জলটুঙ্গী"

টুঙ্গী শব্দের অর্থ ঘর। জলাজায়গায় যেস্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায় তেমন স্থানে ছোট ঘর খুব লম্বা খুঁটি দিয়া করা হয় ও জলের হাতখানেক উপরে মাচা বাঁধিয়া লওয়া হয়। ইহাকে জলটুঙ্গী বলে। সৌখীন লোক পূর্ব্বে পুকুরের মধ্যেও এইরূপ ঘর করিত। সাধারণতঃ বৈঠকখানাকেই টুঙ্গী বলা হয়।

শ্রী মণিলাল সেনশর্ম্মা।

সঙ্করদেব

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব প্রণীত ও তৎকর্তৃক (১৪৭নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা) ধর্ম্ম দেশীয় কায়স্থ সভা হইতে "সঙ্করদেব" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র। ঐ ঠিকানায় অথবা কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহে ঐ পুস্তক না পাওয়া গেলে "গৌহাটি পোঃ আঃ আসাম" এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া উক্ত মহাত্মার জীবন-কথা ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা উদ্বোধন পত্রিকাতে "সঙ্করদেব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বাউল সম্প্রদায়

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে ১৩২৯ সালে এক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে "কৃষ্ণ বিনোদিনী" পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রশ্নকর্ত্তা উক্ত পুস্তকে তাঁহার জিজ্ঞাস্য ও ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক পুস্তকের ১ম ভাগে কতক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকেই বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় "ব্রজ উপাসনা তত্ত্ব, নায়িকা সিদ্ধি" ইত্যাদি বহির নামোল্লেখ আছে। ঐগুলি এখন মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা জানিনা।

শ্রী রজনীকান্ত চৌধুরী।

জলটুঙ্গী

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জিলার জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমি ঐ নামের একখানা ঘর দেখিয়াছিলাম। পুকুরে জলের উপর দুই চালার একখানা ঘর, বেড়া নাই; গৃহস্বামী গরমের দিনে উক্ত ঘরের নীচে বাঁশের মাচানের উপর চেয়ার ও বেঞ্চ নিয়া বসিয়া সঙ্গের লোকজনসহ গল্পগুজব করিতেন। ইদানিং এই প্রকার ঘর আমার চক্ষে পড়ে নাই।

শ্রী রজনীকান্ত চৌধুরী

বীজগণিতের পরিভাষা

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে দেখিলাম বেতালের বৈঠকে ১০নং জিজ্ঞাসায় শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দত্ত বীজগণিতের কতকগুলি শব্দের পরিভাষা জানিতে চাহিয়াছেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অনুরোধে সম্প্রতি আমি গণিত-পরিভাষা সঙ্কলন ও সংগঠনে ব্যাপৃত হইয়াছি। এই সূত্রে উল্লিখিত শব্দগুলির নিম্নলিখিত পরিভাষা স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বে এগুলির কোনও প্রতিশব্দ ছিল কি না জানিতে পারা যায় না। Asymptote এর উপগা, Hindi Scientific Glossary হইতে গৃহীত, Progression এর জন্য শ্রেঢ়ী এবং Surd এর করণী, সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। অন্যগুলি ভাবানুসরণ পূর্ব্বক গঠিত।

Harmonical progression—ছন্দান্বিত শ্রেঢ়ী, Graph—সম্বন্ধ, রেখা, Abscissa—প্রস্থভুজ বা বর্ত্ম, Ordinate—দৈর্ঘ্যভুজ বা উপবর্ত্ম, Coordinate—অক্ষভুজ বা অবস্থান সঙ্কেত। Variable—অধ্রুব, Canstant—ধ্রুব। Axis—অক্ষ, Asymptote—উপগা, Symptote—সহগামী, Rational—নির্দ্দেশ্য, Irrational—অনির্দ্দেশ্য, Theory of Indices—শীর্ষসংখ্যা বিচার, Eleinimation—অপসরণ, Invertendo—বিপরীতানুপাত, Dividendo—অবশিষ্টানুপাত, Componendo—বিযুক্তানুপাত, Alternendo—বিপর্য্যানুপাত, Involution—প্রতিনিষ্কাশ।

শুনিয়াছি শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালাতে বীজগণিতের পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

শ্রী পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী এম, এসসি; এম-এ।

পুরাণোক্ত ভৌগোলিক নাম

বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পুরাণোক্ত ভৌগোলিক নামের ধারাবাহিক তালিকাযুক্ত কোনও পুস্তক দেখা যায় না। কিন্তু স্কুল-পাঠ্য ভারত ইতিহাসে (পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণের ইতিহাস) অল্প-বিস্তর ভৌগোলিক নাম পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন সুবল মিত্রের "সরল বাঙ্গালা অভিধান" এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-কৃত "বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে" ও উক্ত নামের তালিকা আছে। এ-সম্বন্ধে "প্রবাসী" "বঙ্গবাণী" প্রভৃতি মাসিক পত্রেও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে।

পরিশেষে প্রশ্নকর্ত্তার জ্ঞাতার্থ নিবেদন জানাইতেছি যে, মৎলিখিত "শব্দের ইতিহাস" নামক * পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ২য় খণ্ড পৌরাণিক শব্দ-তালিকায় এতদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মেয়ে শব্দ

সংস্কৃত 'মাতৃকা' হইতে প্রাকৃত ভাষায় 'মাইআ' হইয়াছে। এই 'মাইআ' শব্দই রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় ক্রমান্বয়ে 'মায়্যা' 'মেয়ে'তে পরিণত হইয়াছে। 'মেয়ে' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 'মেয়্যা' হইবে।

অথবা

সংস্কৃত 'মহিলা' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'মেয়ে' শব্দের উৎপত্তি হওয়াও বিচিত্র নহে। কারণ 'মহিলা' শব্দে স্ত্রীজাতিকে বুঝাইয়া থাকে। উত্তরবঙ্গের কোন কোন জিলায় স্ত্রী অর্থে 'মেয়ে' শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত হইল।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

* "শব্দের ইতিহাস" খানি ৭ খণ্ডে বিভক্ত। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় শব্দ, পৌরাণিক শব্দ, ঐতিহাসিক ভৌগোলিক শব্দ, দার্শনিক শব্দ, বৈজ্ঞানিক শব্দ, বৈদেশিক শব্দ ও প্রচলিত শব্দ। কেহ এই বহি দেখিতে ইচ্ছা করিলে বা গ্রহণ করিতে চাহিলে সাদরে তাঁহাকে উহা দিতে রাজি আছি। অর্থাভাবে ছাপিতে পারিতেছি না।

দুধ রাখার উপায়

দুধের মধ্যে খানিকটা খাঁটি সরিষার তৈল এবং কয়েকটি পাকা শুকনা লঙ্কা রাখিয়া দিলে, ১২।১৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দুধ ঠিক ভাবে থাকে। কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না; যেরূপ দুধ, ঠিক সেইরূপ থাকিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত।

শ্রী কমলকামিনী দেবী

আলু ও কাঁঠাল বীজ

যেখানে আলু রাখিবেন, সেস্থানটিতে প্রথমে বালু ছড়াইয়া দিবেন। তৎপরে আলুগুলি ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া রাখিবেন; সাবধান যেন একটির সঙ্গে আর একটি না লাগে। এই সকল আলুস্তূপের উপর আবার বালু ছড়াইয়া দিবেন, যেন ১ ইঞ্চির বেশী পুরু না হয়। এই উপায়ে রাখিয়া দিলে বহুদিনেও আলু পচিবার আশঙ্কা থাকে না।

আলুর ন্যায় কাঁঠাল-বীজকে ঠিক ঐভাবে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে। যেসকল বীজ কাটা, ঐগুলি না রাখাই ভাল।

শ্রী কমলকামিনী দেবী

মাছি তাড়াইবার উপায়

১। ঘরে যতগুলি দরজা-জানালা থাকে, সমস্তগুলি বন্ধ করিতে হইবে। পরে একটি পাত্রে খানিকটা "কার্ব্বলিক এসিড্" ঢালিয়া তাহাতে একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহ ডুবাইয়া ধরিলে, এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হইবে। এই বাষ্পের জোরে ঘরে যত মাছিই থাকুক না কেন, সমস্তই মরিয়া যাইবে।

২। এই নিয়ম অতীব সাধারণ। বাঁশ ও বেতের সাহায্যে "খন্তির" আকারে এক রকম যন্ত্র প্রস্তুত করত: তদ্দ্বারা কয়েকবার বাড়ি দিয়া মাছি মারিলে কিছু সময়ের জন্য মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ ৩।৪ বার করিলে, মাছির উৎপাৎ আর মোটেই থাকে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালাভাষায় ভূ-পর্য্যটন-কাহিনী

বাঙ্গালাভাষায় ভূ-পর্য্যটন-সংবলিত পুস্তক বড় বেশী দেখা যা না। তবে এ-বিষয়ে চন্দ্রশেখর সেন প্রণীত "ভূ-প্রদক্ষিণ" নামক একখানি পুস্তক আছে। উক্ত বহি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। দাম ২॥ টাকা।

তদ্ভিন্ন বাবু যামিনীকান্ত ঘোষ রচিত "পৃথিবীর ভ্রমন-বৃত্তান্ত" নামক আর একখানি পুস্তক আছে। উহা কোন্ Libraryতে পাওয়া যায়, তাহা সঠিক বলিতে পারিলাম না। কলিকাতার যে-কোন প্রসিদ্ধ Libraryতে অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত পুস্তক দুইখানিতে ভারত-সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে যথা—

১। "দেবগণের মর্ত্তে আগমন"—লেখক দুর্গাচরণ রায়। প্রাপ্তিস্থান—২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,কলিকাতা। গুরুদাস বাবুর দোকান। দাম ৩৲ টাকা

২। "ভারত-পরিচয়"—লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান ঐ। দাম ২৲ টাকা।

'হিতবাদী' কাগজেও উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর "পৃথিবী ভ্রমণ" সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রসরক্ষা করিবার উপায়

নিম্নে রস রক্ষা করিবার উপায় উল্লেখ করা হইল।

প্রথমে হাঁড়ীটি বিশেষত: তলাটী উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবেন। তৎপরে উহা (হাঁড়ী) উনানের উপর রাখিয়া খুব ভালরূপে পোড়াইয়া নিবেন। পোড়াইবার পূর্ব্বে ফিট্‌কারীর জল দ্বারা তলাটী মুছিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। এইরূপে হাঁড়ী ঠিক করিয়া গাছে বসাইলে, রস সহজে আর ঘোলা হইতে পারে না। গাছ হইতে রস নামাইয়া আর একটি কাজ করিতে পারেন। রসের সহিত কিছু ফিটকারী মিশাইলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রস অবিকৃত থাকিবে। ইহা পরীক্ষিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সনেট*

শ্রী সুশীলকুমার দে

(১)

ভালবাসি তোরে, তবু এই কথা দু'টি
কথায় ফোটেনা শুধু; দু'জনার মুখ
আলোকিতে তুলে ধরি সোনার দেউটি—
হাত থেকে খসে পড়ে, কেঁপে ওঠে বুক।
ভালবাসি কি না বাসি? একান্ত উৎসুক
প্রশ্নভরা আঁখি তোর রহে নিত্য ফুটি।
কোথা দোঁহে কাছাকাছি র'ব মুগ্ধমুখ—
মাঝখানে ভাষা সেই নীরবতা টুটি
আনে শুধু ব্যবধান! আকাশ-পাথার
ছানিয়া কি ল'বে নীল আভাটুকু তার?
ভাব নাই, ভাষা নাই—আমা'-অন্তরাল
রহি আমি লুকাইয়া, কোথায় নাগাল?
উপরে উচ্ছ্বাস শুধু, ব্যথার রিক্ততা—
সিন্ধুর অতল-তলে স্তব্ধ নীরবতা।

(২)

সমগ্র জীবন হ'তে একটি নিমেষ
তুমি মোরে দাও শুধু; কত রাত্রি দিন
অনন্ত কালের স্রোতে বিরাম-বিহীন—
তার মাঝখানে শুধু মুহূর্ত্তের লেশ,
শুধু একবিন্দু সুধা—মন্থনের শেষ।
একটু সে পলকের অনুপথ-লীন
জীবনের আলোকের রশ্মি সীমাহীন,
শিশিরের বিন্দু-কেন্দ্রে সূর্য্যের আবেশ!
যে-পলকে ফুটে ওঠে সমগ্র জীবন
একটি ফুলের মত সহজ সুন্দর,—
মুকুলের প্রয়াসের পূর্ণ সমাপন;
একটি সুরের মাঝে উচ্ছ্বসি' যেমন
কেঁপে ওঠে অন্তহীন ভাবের গুঞ্জর;
বিন্দু অশ্রুমাঝে যেন অনন্ত বেদন!

(৩)

সে আজ অনেক দিন, তখনো অম্বরে
নিভেনি সোনার সন্ধ্যা; সিন্ধুতীর পথে
ফিরি মোরা গৃহপানে গ্রামান্তর হ'তে
নীরবে দু'জনে। কহিল সে মৃদুস্বরে
সহসা নিকটে আসি একান্ত নির্ভরে
"আমাদের চেয়ে সুখী কে আর জগতে?"
চাহিনু নয়ন তুলি, পরতে পরতে
সায়াহ্নের শেষ-রেখা' হেরিনু সাগরে
মুছে আসে ধীরে ধীরে। কহিনু তখন
"প্রেম তা'রো পলে পলে রয়েছে মরণ!"
অন্ধকার ঘিরে এল সাগর গগন।
করিল মিনতি দুটি ব্যথিত নয়ন
কথাগুলি ফিরে নিতে কত বার-বার।
সেই আঁখি, সে মিনতি,-আজো স্মৃতি তার।

(৪)

ভেবেছিনু ফুরাবে না এ পথের ক্লেশ
বহু দিন বহু মাস বহু বর্ষ পরে
অতিক্রমি অবশেষে কামনার দেশ,
সম্মুখে হেরিনু মোর মুহূর্ত্তের তরে
পরিপূর্ণ কৃতার্থতা, প্রতীক্ষার শেষ,
আশার সে প্রান্তভূমি,—প্রশান্ত অধরে
হাসিস্ফুরণটুকু, স্নিগ্ধ প্রত্যাদেশ
সে দৃষ্টির; সানুরাগ করুণার ভরে!
সে কপোল, সে নয়ন, সে রক্ত অধর
হেরিনু নিমেষ শুধু,—শিহরি' মরমে
ঠেকানু অধরে লয়ে সে কোমল কর,
আর্ত্ত হৃদয়ের রুদ্ধ আদরে সম্ভ্রমে।
সবেদন আবেদন নীরব তৃষ্ণার,—
এইটুকু জন্মার্জ্জিত ক্ষুদ্র দাবী তার।

---

* এই সনেট চারিটি গ্রন্থকারের সদ্য প্রকাশিত 'দীপালি' নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল। সঃ প্রঃ



আঙ্টির ভিতর বই—

সচিত্র একখণ্ড ওমরখৈয়ম দেখিতে এত ক্ষুদ্রাকৃতি যে আঙ্টির অভ্যন্তরে অনায়াসে পুরিয়া রাখা যায়। এইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। গত যুদ্ধের সময় ভারত সরকার



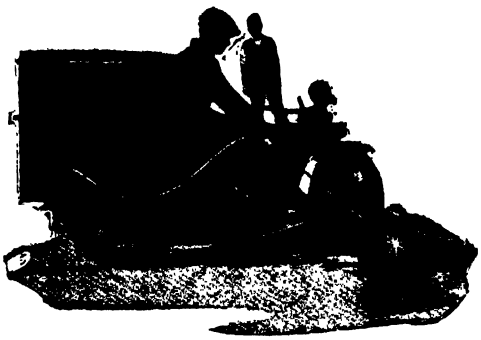
আঙটির ভিতরে বই

নাকি তাহাদের মুসলমান সৈনিকদের জন্য পাঁচ লক্ষ এমনি ক্ষুদ্রাকৃতি কোরাণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন যে, তাহা কবচ করিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখা চলিত।

—

মোটর সাইকেলে সিঞ্চন-যন্ত্র—

শিকাগোর সহরতলীতে মশক-ধ্বংসের জন্য এইরূপ মোটর সাই-কেলের বন্দোবস্তহইয়াছে। ইহার যন্ত্রের সঙ্গে পঁয়ত্রিশ গ্যালন পরিমিত



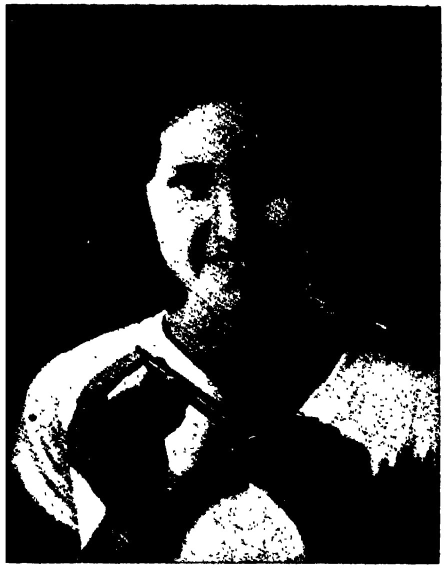
মোটর সাইকেলে সিঞ্চন যন্ত্র

এ্যাসিড্ টার অয়েল্ থাকে—যে সব ড্রেন-নালায় মশা থাকে তাহার উপরে এই তেল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। আরোহীকে এই ছিটানো কাজের জন্য গাড়ী হইতে নামিতে হয় না; তাই এক একদিনেই সে অনেকদূর কাজ সারিতে পারে।

—

ফাউণ্টেন্ পেনের ন্যায় গ্যাস্-বন্দুক—

যে ফাউণ্টেন্ পেনের ছবিটি দেওয়া হইল উহা আসলে ফাউণ্টেন পেন্ নহে, একটি বন্দুক। এই বন্দুক গুলির বদলে গ্যাস্ ছোঁড়ে। ইহার মাঝখানে স্ক্রু খুলিয়া গ্যাসের কার্টিজ ভরিয়া দিতে হয়। পরে



ফাউণ্টেন্ পেন্ নয়—বন্দুক

ঘোড়া টিপিলেই তীব্র বেগে বাহির হইয়া ১২ ফুট পর্য্যন্ত গ্যাস প্রক্ষিপ্ত হয়। চোর, ডাকাত প্রভৃতিকে উপস্থিত মত আটকাইবার জন্য ব্যাঙ্কের ক্লার্ক ও অন্যদের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু।

—

গুহার উৎকীর্ণ গণ্ডার-চিত্র—

আজ কাগজ, কাপড়, রেশম, কাঠ প্রভৃতি কত প্রকার দ্রব্যের



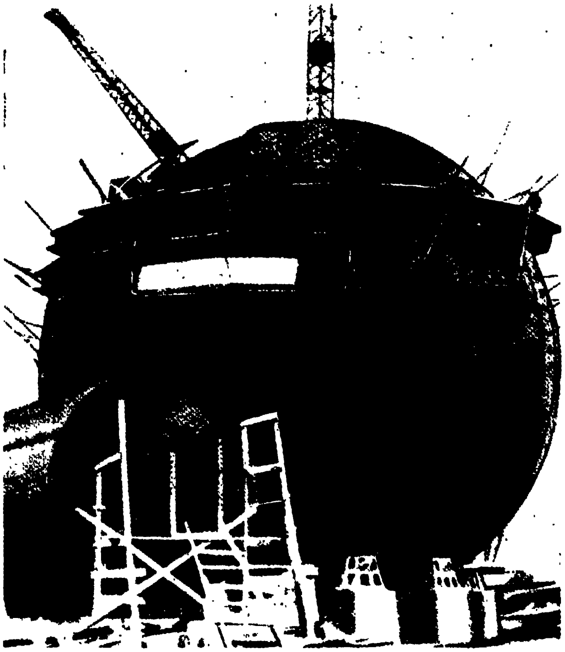
আদিম আর্টিষ্টের আর্ট

উপর চিত্রকর ছবি আঁকিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আদি চিত্রকর তাঁহার সখ মিটাইয়াছিলেন গুহাগাত্র উৎকীর্ণ করিয়া। এখানে যে গণ্ডারের চিত্রটী দেওয়া হইল দক্ষিণ আফ্রিকার গুহাগাত্রে তাহা পাওয়া গিয়াছে। ইহা ২৫,০০০ হইতে ৫০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছিল। এই চিত্রটির বিশেষ কিছুই নষ্ট হয় নাই এবং ইহাই বোধ হয় আর্টিষ্ট মানবের আদিমতম আর্টচর্চ্চা।

—

লোহার গোল স্বাস্থ্যাগার—

এই প্রকাণ্ড গোলকটি ইস্পাতের তৈয়ারী। ওহিও'র অন্তর্গত ক্লিভল্যাণ্ডে দশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার



লোহার স্বাস্থ্যাগার

ভিতরে হোটেলের মত ঘর-দুয়ার, বৈঠকখানা প্রভৃতি থাকিবে।—বহুমূত্রের রোগীদের অক্সিজেন-সহযোগে চিকিৎসা করিবার জন্যই এই স্বাস্থ্যাগারটি নির্ম্মিত হইতেছে।

—

বিজ্ঞানের জন্য আত্মবলি—

দেবতাদের রক্ষার জন্য দধীচি আপনাকে বলি দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য আত্মবলিও পৃথিবীতে বিরল নহে। কিন্তু বিজ্ঞানসাধনায়ও আধুনিক জগতে কত বীর যে নীরবে এবং অকুতোভয়ে আত্মোৎসর্গ করিয়া চলিয়াছেন তাহার ইতিহাস পাঠ করিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানও আজ বিজ্ঞানের এই ধর্ম্মযুদ্ধে পশ্চাৎপদ নহে।

জাপানী ভিষগ্বীর ডাঃ হিদিও নোগুচির নাম বিশ্ববিশ্রুত। তিনি ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও সিফিলিসের উপর গবেষণা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৮ সালে পীতজ্বরের সংক্রামক জীবাণু আবিষ্কার এবং পরে উহার প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন্ ও সিরাম্ আবিষ্কার ইঁহারই কীর্ত্তি। এই পীতজ্বর লইয়া ডাঃ নোগুচি বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি আফ্রিকার পীতজ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য আফ্রিকার অন্তর্গত হেম-তটে গোল্ড কোষ্ট্ গিয়া আপনার উপর এই রোগের পরীক্ষার দ্বারা ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষা করিতে গিয়া ঐ দুরন্ত ব্যাধির নিকট আপনাকে আহুতি দিতে হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ও জাপান পৃথিবীতে শুধু মানুষ মারিয়াই বড় হন নাই, মরিয়াও বড় হইয়াছেন। ইঁহাদের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস শুধু বক্তৃতার বা ফেলোশিপের ইতিহাস নহে, আপনার



বিজ্ঞানের দধীচি ডাঃ হিদিও নোগুচি

বুকের রক্ত দিয়া বিজ্ঞানদেবতার তর্পণ-কাহিনী। এই সকল পুণ্য-কাহিনীর কথঞ্চিৎ মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কয়েক মাস পূর্ব্বে বিলাতী সংবাদ পত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ম্যাঞ্চেষ্টারের খ্যাতিপন্ন অস্ত্রচিকিৎক ও অ্যানিস্থেটিষ্ট ডাঃ সিড্নী রসন্ উইল্সন্ গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে, তাঁহার স্বামী একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছেন,—মুখে গ্যাসরক্ষা-মুখোস, দেহ প্রাণহীন। ডাঃ উইল্সন্ বহু কাল হইতে সংজ্ঞাহারক এ্যানিস্থেটিক্স্ ঔষধ লইয়া গবেষণা করিয়া এমন একটি ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন যাহা দ্বারা রোগীর নিঃসংজ্ঞ অবস্থার কাল আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত 'নিউ জার্সী'র ভ্যান্ ক্যাম্পডেন্ হাইল্নার নামক ব্যক্তি একটী অসমসাহসের কার্য্যে বাহামা দ্বীপে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। হাঙ্গরে মানুষকে আক্রমণ করে কিনা ইহাই ইঁহার প্রতিপাদ্য সমস্যা। সকলেই জানে যে হাঙ্গরমাত্রেই

মানুষের শত্রু কিন্তু হাইল্নার বলেন যে শুধু শ্বেতজাতীয় হাঙ্গরই হিংস্র, অন্যগুলি নিরীহ। এখন তিনি হাঙ্গরপূর্ণ বাহামায় যাইতেছেন এবং সেখানে গিয়া জলে নামিয়া হাঙ্গরদের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া তাঁহার কথা প্রমাণ করিবেন। সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য শুধু একটা ছোরা রাখিবেন।

এখন পর্য্যন্ত শরীরের উপর বিষের কার্য্য দেখিবার জন্য অনেকেই নিজেদের উপর পরীক্ষা করিয়াছেন। মানবশরীর কি পরিমাণ পর্য্যন্ত কীট পতঙ্গজ বিষ আত্মস্থ করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে ডাঃ লিন্ জে, বয়েড কতকগুলি পরীক্ষা করেন। ঐগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নিউ ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল্ কলেজের পঞ্চাশ জন ছাত্র আপনাদিগকে বলি দিতে প্রস্তুত হন। ছ'মাস ধরিয়া প্রত্যহ ইঁহাদের শরীরে অল্প অল্প করিয়া মাকড়শা, ভীমরুল্ ও অন্যান্য পতঙ্গজাতীয় প্রাণীর বিষ প্রয়োগ করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইহার ফল মারাত্মক হয় নাই এবং ইঁহাদের এই আত্মোৎসর্গের প্রয়াস চিকিৎসা বিদ্যার বহু নূতন জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে।



বিজ্ঞানের দাবীতে নিদ্রাহীন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাক্তার ফিশার—পাঁচদিন চাররাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া নিদ্রাহীনতার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার ছাত্র উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা-ফল টুকিয়া লইতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধে বীরত্বের যত নিদর্শন দেখা গিয়াছে, তাহার তুলনায় ওয়েল্‌স্‌দেশীয়া জীবণু চিকিৎসক (ব্যাক্‌টেরিওলজিষ্ট) কুমারী মেরীর বীরত্ব কিছু মাত্র কম নহে। সহস্র সহস্র সৈনিক ধ্বংস করিয়া যে-ব্যাধি লোকসমাজের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সেই গ্যাস্-গ্যাংরিণের প্রতিষেধক একটী ঔষধের ফলপরীক্ষার্থে তিনি স্বেচ্ছায় নিজ দেহে উহার বিষ ফুটাইয়া দেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বর্ত্তমানে "পার্কিন্সনের ব্যাধি" সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক পণ্ডিত স্যর হেন্‌রী হাইও্ বিজ্ঞানের জন্য লণ্ডন সহরে এই রহস্যময় সাংঘাতিক পক্ষাঘাত রোগের কবলে পলে পলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছেন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই রোগের প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার জন্য আপনার বাম হস্তের স্নায়ু-তন্ত্রীগুলি অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করান। এই ভাবে ঐ ব্যাধি নিজশরীরে সংক্রামিত করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন এবং একটীর পর একটী করিয়া ঐ রোগ সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। আজ তিনি একএক পা করিয়া মৃত্যু-পথে চলিয়াছেন, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায়, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, বিশ্বমানবের হিতের জন্য।



প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জে, বি, এস্ হল্‌ডেন্—'ডাক্তারদের বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি জীবিতচ্ছেদিত (vivesected) হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানের জন্য এই আত্মদান য়ুরোপে আজ নূতন নহে, বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পরীক্ষাগারে কৃত্রিম আলোক (গ্যাস, বৈদ্যুতিক প্রভৃতি) প্রচলনের পূর্ব্বতর যুগে ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক জ্যান্ ভ্যান্ সোয়ামারডাম সূর্য্যালোকের সাহায্যে অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া মধুমক্ষিকার শরীর-সংস্থান (এ্যানাটমি) আবিষ্কার করেন, কিন্তু মূল্য স্বরূপ আপনার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক লাজারো স্পালাঞ্জানি পরিপাক ক্রিয়ার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নিজের উপর কতকগুলি অদ্ভুত ও মারাত্মক পরীক্ষা করেন। সেই সময় পর্য্যন্ত এ-রহস্য গভীর অজ্ঞানতায় আবৃত ছিল। স্পালাঞ্জানি একদা কয়েকটি ছোট ছোট কাপড়ের থলিতে রুটি পুরিয়া গিলিয়া ফেলেন। বন্ধুরা সকলেই বলিলেন তিনি মরিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি মরিলেন না। দেখা গেল যে কাপড়ের থলি ঠিকই রহিল, কিন্তু অন্ত্রপথ দিয়া যাইবার সময়ে রুটিগুলি হজম হইয়া গেল। অতঃপর তিনি কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ছোট ছোট নলের মধ্যে মাংস, কঠিন ও নরম-অসম্পূর্ণ হাড় পুরিয়া খাইয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, নলের মধ্য হইতেই পাকস্থলী ও অন্ত্রের জারকরসে মাংসটুকু হজম হইল বটে কিন্তু কঠিনতর পদার্থগুলির কিছুই হইল না।

এইরূপ বহুতর দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আর দুইটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এখানে শেষ করিব।

আজ সকলেই জানেন যে ম্যালেরিয়া কোনও দেশবিশেষে আবদ্ধ নহে। কিন্তু যখন এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল যে ম্যালেরিয়া গরম দেশেরই ব্যাধি সেই সময়ে স্যর প্যাট্রিক্ ম্যান্‌সন্ ইহার অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য লণ্ডন সহরে কয়েকটী ম্যালেরিয়াবাহী মশক আমদানী করিয়া নিজের উপর ঐ মশক দংশন করান এবং তীব্র ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে পরে তিনি নিরাময় হইয়াছিলেন।

ডাঃ জেস্ ল্যাজেয়ারের কাহিনী প্রত্যেকের জানা উচিত। পীতজ্বরের বিষ যে বিশেষ এক শ্রেণীর মশক দ্বারা বাহিত হইয়া সংক্রামিত হয় এই সত্যটুকু প্রমাণ করিবার জন্য ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকান্ চিকিৎসক ডাঃ ল্যাজেয়ার আপনার জীবন দান করেন। তিনি ঐ জাতীয় একটী মশক দ্বারা আপনাকে দংশন করাইয়া প্রবল পীতজ্বরে আক্রান্ত হন এবং দেহত্যাগ করেন। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার এই আত্মদানের ফলেই আজ জগদ্বাসী ঐ ব্যাধিভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে।

'মার্কিণ চিকিৎসা প্রগতি সমিতি' সম্প্রতি তাঁহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ পরীক্ষাগুলির বিষয় অনুধাবন করিয়াছে। ডাঃ ল্যাজেয়ার ওয়াণ্টার রীড কমিশনের অন্যতম সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ কমিশন্ কিউবা দ্বীপে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলেন যে 'মশকই যে ঐ রোগে জন্য দায়ী তাহার আরও প্রমাণ চাই। যুক্তরাজের পূর্ব্বতন সৈনিক জন্ আর কিসিঙ্গন্ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। তাঁহাকে পাঁচটী বিষাক্ত মশক দ্বারা দংশন করান হয়। তিন দিনের মধ্যে জ্বরের তাপে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। সপ্তাহের পর সপ্তাহে ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি চলিল। পরে তিনি সারিয়া উঠিলেও চিরদিনের মত স্বাস্থ্য হারান। অপরকে বাঁচাইতে গিয়া এখন তিনি আজীবন পঙ্গু। ইঁহার বিষয়ে সেই সময়ে ডাঃ রীড বলিয়াছিলেন "যুক্তরাজ্য সৈন্যবিভাগের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত ইঁহার সমতুল্য নৈতিক সাহস কখনো দেখা যায় নাই।"

প্রতীক্ষায়

(গ্রাম্যচিত্র)

হেমমালা বসু

'লতি, ও লতু!'

পিতার আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুলতা ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল; ধরা-গলায় বলিল, "বাবা এসেছ?"

"এসেছি তো অনেক ক্ষণ; রোজকার মত আজ আফিস থেকে এসেই তোমায় দেখ্‌তে পাইনি কেন, বল তো মা?"

সুলতার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল, "জল খেয়ে নাও, তার পরে বল্‌বো।"

"না না! আগে শুন্‌ব, তবে হাত মুখ ধুতে যাব; খিদে পায় নি এখনো; বল্ তো সব কথা, আজ আবার কি হলো?"

সুলতার মাতা খাবার লইয়া আসিলেন; ডিস্‌খানা টেবিলের উপরে রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, মুখ-টুখ না ধুয়েই যে মেয়েকে আহ্লাদ দেওয়া হচ্ছে! যাও শিগ্‌গির, লুচি ক'খানা আবার জুড়িয়ে যাবে। মেয়েকে অত আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলো না—ওকে যে পরের ঘরে যেতে হবে, তোমার কাছে চিরকাল থাক্‌তে পার্‌বে না, সে-কথাটা মনে রেখো!'

বিপিনবাবুও হাসিয়া বলিলেন, 'সে-কথাটা মনে রেখে ওর সঙ্গে এখন থেকেই পরের মত ব্যবহার কর্‌তে হবে নাকি? তুমি বেশ যা হোক! আগে লতির মুখে হাসি দেখ্‌ব, তবে মুখ ধুতে যাব; যাক্ ওগুলো ঠাণ্ডা হয়ে! বল তো মা, কি হয়েছে; তোমায় কে কি বলেছে?'

'কে আবার কি বল্‌বে, আমিই দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি, 'অসরণ তো সইতে পারি না; তা এমন কিছু বলিনি, যা'তে মেয়েকে কোণে বসে কাঁদ্‌তে হবে! অরুণের কলেজ ছুটী হয়ে গেছে, তাই সে দেখা কর্‌তে এসেছে, এইবারে গোবিন্দপুর যাবে। সে লতিকে সেখানে নিয়ে যেতে চায়; বলে, তুমি মেট্রিক একজামিন দিয়েছ,

এখানে ব’সে থাকবে কেন? চল না আমার সঙ্গে পাড়াগাঁয়ে বেশ বেড়িয়ে আসবে।’ মেয়েও অমনি নেচে উঠ্‌লেন, তার সঙ্গে যাবেন—”

“এতে তো আমি দোষের কিছুই দেখ্‌লুম না; একজামিন দিয়েছে, লতু এখন একটু বেড়িয়ে আস্‌তে চায়; তুমি কি ওকে ছেড়ে একটা দিন থাক্‌তে পার্‌বে না?”

“ও মা, তুমি বল্‌ছ কি গো! সোমত্ত বেটা ছেলের সঙ্গে এই মেয়ে যাবে সেই ‘ধ্যাড়ধ্যাড়া’ গোবিন্দপুর? তাও আমরা কেউ থাক্‌বো না, একেবারে একলা!”

“এখনো কি তোমার মন থেকে এসব সেকেলেপনা দূর হয়ে যায় নি? তোমাদের যুগ যে চলে গেছে, তা কি দেখে শুনেও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? মেয়েরা এখন একলা বিলেত চলে যাচ্ছে, আর লতি এইটুকুন যাবে তা’তে হয়েছে কি? ওকে তো পিঁজরের পুরে রাখবার জন্যে মানুষ করি নি!”

সুলতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ‘যাব বাবা?’ বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল; “তা হ’লে আমার বইটই সব গোছ করে নিই গে? জামাইবাবু তো প্রায় দেড় মাস দেশে থাক্‌বেন; তোমার স্যুট-কেশটাতেই আমার সব জিনিস এঁটে যাবে। সেটা সঙ্গে নিয়ে যাই, কেমন?” বলিয়া সুলতা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার মাতা ম্লান মুখে বলিলেন, “যা খুসী তাই কর! অমন করে পথে ঘাটে যার তার সঙ্গে মেয়ে ছেড়ে দিলে পরে আর ও মেয়ের বিয়ে দিতে পার্‌বে না। চিরকাল দেখ্‌লুম, আমার কথা বাসি হলেই ফলে!”

বিপিনবাবু বলিলেন, “অরুণকে কি তুমি ‘তেমনি’ বলেই মনে কর না কি? কত দেখে শুনে তবে ওর হাতে সুরমাকে দিয়েছি, তা তো জান না; লতিও বেশ সেয়ানা মেয়ে, তার জন্যে তুমি ভেব না।”

আটটা বাজিলে পরে ভৃত্য গাড়ী আনিল, অরুণ সুলতার বাক্সটা গাড়ীতে তুলিয়া দিতে বলিল। সুলতা পিতার নিকটে বিদায় লইয়া মাতাকে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বলিল, ‘আমি যাই মা?’

মাতা মনে করিয়াছিলেন, তিনি আর ইহাদের কোন কথায় থাকিবেন না; তাঁহার কথা যখন থাকেই না, তখন আর কেন! কিন্তু কন্যাকে বিদায় দিবার সময়ে তিনি আর সে সংকল্প স্থির রাখিতে পারিলেন না; তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, ‘খুব সাবধানে থাকিস্ লতি! রাস্তায় যেন ঘুমিয়ে পরিস্ নি; পরের বাড়ী যাচ্ছিস, সেখানেও খুব বুঝে-সুঝে চলিস।’

সুলতা হাসিয়া সম্মতি জানাইল; সেই হাসিভরা অতি সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া মাতার ভয় শত গুণে বৃদ্ধি পাইল। আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অরুণ হয়তো লতিকে পুরুষদের গাড়ীতে লইয়া বসাইবে। ইহাকে একলা মেয়ে-গাড়ীতে দিতেও তো তিনি বলিতে পারেন না—মিন্‌সেগুলো নিশ্চয় তাঁহার রূপসী কন্যার দিকে চাহিয়া থাকিবে; তাহাদের কাহারও যদি কুমত্‌লব থাকে? অরুণও তো ছেলে মানুষ, সে যদি ঘুমাইয়া পড়ে, তখন যে কি হইবে? আর ভাবিতে না পারিয়া তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশ, আপদনাশন বিপদ-বারণ মধুসূদনকে একমনে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুলতা বলিল, ‘আচ্ছা জামাই বাবু, দিদির কাছে শুনেছি, তোমাদের দেশ একেবারে বনে জঙ্গলে ভরা; সেখানে কল্‌কাতার মতো এমন চওড়া রাস্তা টাস্তা নেই; গলির চেয়েও সরু সরু নাকি সেখানকার সব রাস্তা; লোকেরা তাতেই চলা-ফেরা করে, না?’

অরুণ হাসিয়া বলিল, ‘হ্যাঁ।’

‘কেন, তোমরা কি এমনি রাস্তা তৈরী করিয়ে নিতে পারো না? রাত্তিরে সেসব রাস্তায় না কি আলো দেওয়া হয় না! গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে, লোকেরা যখন অন্ধকারে যাওয়া আসা করে, তখন তাদের ঠিক ভূতের মতোই দেখায়, না জামাইবাবু?’

‘তোমার দিদি আমাদের দেশের তো বেশ বর্ণনা করেছে লতু! এতে আমি আর কি বল্‌ব বল! যাচ্ছ যখন, তখন দেখ্‌তেই তো পাবে।’

‘তবু বল না, তোমার কাছেও একটু শুনি!’

'আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে লতা? তার দরকারও কিছু নেই, চোখে দেখেই সব বুঝে নিও!'

'আচ্ছা, দিদির কথা সত্যি কি না, এইটুকু শুধু বল!'

'যে দেখতেই জানে না, তার কথা কি সত্যি হ'তে পারে কখনো?'

'দিদির অমন ডাগর-ডাগর চোখে, সে দেখতে জানে না বই কি; এর জবাব তার কাছ থেকেই পাবে, আমি মিছে তর্ক আর করব না!'

গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনে থামিলে অরুণের বন্ধুরা আসিয়া মুটে ডাকিয়া জিনিষগুলি নামাইয়া লইল; একটি যুবক অরুণকে বলিল, 'আমি এসেই তোমাদের দুজনের জন্মে দু' খানা টিকিট কিনে রেখেছি, নইলে এখন আর তার সময় পেতে না, যে দেরী করে এসেছ!'

একখানা অপেক্ষাকৃত খালি গাড়ীতে তাহারা অরুণ ও সুলতাকে তুলিয়া দিল। বাঙ্কের উপরে বাক্সগুলি রাখিয়া অরুণ ঘড়ী দেখিল, ট্রেন ছাড়িতে আর তিন মিনিট দেরী আছে। সে হাসিয়া হাসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। তাহাদের কথা শুনিয়া সুলতা বুঝিল, যে-যুবকটি টিকিট কিনিয়াছিল তাহার নাম পরেশ; দেখিতে সুন্দর, বেশভূষাও বেশ জমকালো। ইহার সঙ্গেই অরুণের সব চেয়ে বেশী ভাব বলিয়া সুলতার মনে হইল। সোণার চশমাঢাকা চক্ষু দুটি তাহার দিকেই স্থির হইয়া আছে দেখিয়া সুলতা একটু বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া বসিল। একটি বন্ধু তখন বলিতেছে, 'আচ্ছা, যাও আমরাও তো শিগ্‌গিরই তোমাদের দেশে যাচ্ছি; দেখো ভাই পরেশ, আমায় নেমন্তন্ন করতে যেন ভুলে যেও না; বড় আশা করে রয়েছি ভাই, তোমার বিয়ের বরযাত্রি হয়ে গোবিন্দপুরে যাব; সে আশায় যেন নিরাশ হতে না হয়!'

আর একজন বলিল, 'তোমার কথা বিশ্বাস ক'রে আমরা তো বেশ রইলুম অরুণ, কনে দেখতেও গেলুম না; এই কালবোশেখীর দিনে 'পদ্মার পার' হওয়া, সে সোজা কথা নয় তো! পরেশের কাকাবাবুকে পাকা দেখতে পাঠানো যেত। কিন্তু ওই বুড়োদের সঙ্গে আমাদের পছন্দ যে মোটেই মেলে না; মোটা-সোটা হস্তিনীর মতো মেয়ে ওঁরা ভালো দেখেন; পাত্‌লা ফিনফিনে পদ্মিনীটির মত দেখতে হ'লে তবে না পরেশের মনে ধরবে। ফটো দেখতে চাইলুম, 'পাড়াগাঁয়ে ওসব নেই' ব'লে তাও তুমি উড়িয়ে দিলে; এখন বল তো, তোমার সেই বোনটি দেখতে কি রকম? যাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ, তাঁর চেয়ে তো খারাপ হবে না? দেখো, শেষটায় যেন একটা 'অখদ্দে' 'অবদ্দে' বোঝা পরেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিও না। আমার কেমন খট্‌কা লাগছে।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, 'তোমার তো 'খট্‌কা' লাগবেই' কাউকে যে কখনো বিশ্বাস করতে শেখনি; ক্লাশে কিছু হারিয়ে গেলে আমাদের পকেট শুদ্ধ খুঁজে দেখ, তুমি এমনি চামার! তোমার কথা কাউকে আর বলো না! পরেশ, মাণিকের কথায় ভয় পেয়ে আমার দিকে অমন ক'রে চেও না! তুমি যেমন কাকিমাকে দয়া করলে, টাকা-কড়ি কিছু নিলে না, কনেটি পাবে তেমনি সরেশ। বেলু সুলতার মত হ'লে একাজে আমি হাত দিতুম না; এতে আর তা'তে অনেক তফাৎ; সে একেবারে বাঙ্গলার নূরজাহান—পদ্মিনীও বলতে পারো। পদ্মিনী নূরজাহানের চেয়েও সুন্দরী ছিলেন, না ভাই? তা নইলে আলাউদ্দিন তাঁকে পাবার জন্মে অত কাণ্ড করতেন? লতিকে আমার মাঝারি বলেই তো মনে হয়; চোখ-মুখের যা একটু ছিরি আছে, তা নইলে এ আবার দেখতে এমন কি ভালো?'

'তোমার যে কথা! বাঙ্গালা দেশে এমনি মেয়েই ক'টা আছে হে? যাক, সে দেখতে এমনটি হ'লেও আমরা অসুখী হব না।' গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে তাহারা 'গুড্ বাই' বলিয়া রুমাল উড়াইতে লাগিল। সুলতা ভাবিল, সে আর অরুণের সঙ্গে কথা বলিবে না; যে তাহাকে সুন্দরীও মনে করে না, তাহার সঙ্গে কথাবলা উচিত ও নয়। নীরবে বিছানাটি বেঞ্চের উপরে বিছাইয়া সুলতা শুইয়া পড়িল। কাল বিকালে গোবিন্দপুরে পৌঁছিয়া পল্লীবালাদের মধ্যে সে যে একটি অপূর্ব্ব রূপসীকে দেখিতে পাইবে, সে বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ রহিল না। কিন্তু

দিদি তো তার ননদদের কাউকেই খুব ভালো দেখিতে বলে নাই, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাও হয় নাই তো। আচ্ছা, বেলু দেখিতে স্কুলের কোন্ মেয়েটির মত হইবে? লীলা, বীণা, কি সুশোভার মত, না, অশ্রু, অমিয়া, কমলার মত? এরা সুন্দরী হইলেও পদ্মিনী কি নূরজাহান বলিয়া কেউ ইহাদের মনে করিবে না! তবে স্কুলের প্লেতে তাহারা যখন ঐ সব সাজে তখন তাহাদের ঠিক তাই বলিয়া মনে হয় বটে; তাহাদের চেয়েও সেই মেয়েটি যদি বেশী ভাল দেখিতে হয়! সুলতা স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে বেলুর রূপের তুলনা করিতে করিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল তাহা সে নিজেও জানিতে পারিল না।

পরদিন ভোরে পদ্মাতীরে একটা ষ্টেশনে নামিয়া অরুণ সুলতাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া নিজে একটা ভাড়া করা ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া পড়িল। সুলতা পাল্কীর দরজা খুলিয়া নির্জ্জন মেঠো পথ দেখিতে দেখিতে চলিল। অরুণ অশ্বারোহণে সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'পাড়াগাঁর রাস্তা দেখতে কেমন লাগছে লতা?'

সুলতা হাসিয়া বলিল,'বেশ লাগছে তো জামাইবাবু?'

সুদূর বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠগুলি দেখিতে তাহার বাস্তবিকই ভালো লাগিতেছিল। মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় বটগাছগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দূরে দূরে, গাছপালার ভিতরে এক এক খানি গ্রামও দেখা যাইতেছে; গ্রামের অধিকাংশ লোকের বাড়ীতেই বড় বড় সব টিনের ঘর। সুলতা কলিকাতার সরু গলির ভিতরের বহু দৃশ্য দেখিয়াছিল। সেখানকার সেই আলোবায়ুহীন ঘন সন্নিবিষ্ট খোলার বসতি বা ইট-বার-করা পুরানো বাড়ীগুলির চেয়ে ঐ পরিষ্কার টিনের বাড়ীগুলি তাহার অনেক বেশী ভাল লাগিতেছিল। এইসব বাড়ীর পাশে, বনের ধারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কেমন ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিতেছে; কলসী-কাঁখে বধূরা পাল্কীর শব্দ শুনিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ঘোমটা ঈষৎ সরাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

সুলতা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করে, সেদিক হইতেই নয়ন আর ফিরাইতে পারে না। শ্যামল শ্রীসম্পন্ন পল্লীভূমি যে তাহার মনটিকে এত আকৃষ্ট করিতে পারিবে এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে তাহা ভাবিতেও পারে নাই।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পল্লীবালারা যখন তুলসী তলায় প্রদীপ রাখিয়া প্রণাম করিতেছে, দেবমন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া সকলের মনে ভক্তির উদ্রেক করিতেছে, ধূপধূনার মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া পথচারী দিগকে কি একটা অজানা তৃপ্তি দিয়া যাইতেছে, তখন সুলতার পাল্কী ও অরুণের অশ্ব একখানা একতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। সে রক বারান্দা পার হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বালকবালিকারা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। একজন বর্ষীয়সী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'এস, মা এস'! সুলতা বুঝিল ইনিই অরুণের মাতা; সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যে ঘর হইতে কয়েকটি বধূ তাহাকে উঁকি দিয়া দেখিতেছিল সত্বর পদে সেই ঘরে গেল। সুরমা হাসিয়া বলিল, 'তুইও এসেছিস্ যে লতি?'

'হ্যাঁ দিদি, তোমাদের দেশ দেখতে এলুম" বলিয়া সুলতা তাহার হাত ধরিল। গৃহিণী আসিয়া সুরমাকে বলিলেন, 'যাও মেজ বউ রান্না হয়ে গেছে, বোনকে বেশ করে খাইয়ে নিয়ে এস; আহা বাছা রাস্তায় নাকি কিছু মুখে দেয় নি!"

সুলতার হাতমুখ ধোয়া, কাপড় কাচা হইলে, সুরমা আলো হাতে করিয়া তাহাকে রান্না-ঘরে লইয়া গেল। বড় বধূ ভাত বাড়িয়া বসিয়াছিলেন,সুলতা আহারে বসিলে 'তিনি এটা খাও, ওটা খেতেই হবে' বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন'; গৃহিণীও বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বেশ ভাল করে খেও মা, এ তোমার আপনার বাড়ী, লজ্জা করো না যেন!"

দালানের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই খাটের উপরে সব সুন্দর শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে; সুলতাকে একটি ঘরে আনিয়া সুরমা বলিল, 'এখন শুয়ে পড়ে ঘুমো ভাই লতি, কাল থেকে ভালো করে ঘুমুতে পাস নি; আমি যাই বাবুরা এখনি খেতে বস্‌বেন।' নূতন স্থানে ঘুম সহসা আসিল না, জানালাটি খুলিয়া দিয়া সুলতা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল; নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি; একটু আগেই এক পশলা

বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখন ও বাতাসটি বেশ ঠাণ্ডা হইয়া বহিতেছে ; মেঘ সরিয়া গিয়া পূর্ণ চন্দ্রালোক, খাল ও পুকুরের জলে, আমগাছের মাথায়, ভিজে ঘাসের পাতায়, ফুলের বাগানে বা বাড়ীর ছাদে যেখানে পড়িয়াছে, সেই খানেই স্বপ্নের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

পরদিন খুব ভোরে সুলতার ঘুম ভাঙিয়া গেল ; সে হাত মুখ ধুইতে পুকুর ঘাটে গেল। তখন সূর্য্যদেব পুকুরের ওপারে বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া স্বর্ণরথ চালাইয়া দশ দিক স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতেছেন। সুলতা আনন্দিত মনে বাড়ী ও বাগানের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অরুণদের ফুলবাগানে একটি মেয়ে সাজী ভরিয়া ফুল তুলিতেছে, বধূরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া কেহ রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, কেহ বা মস্ত বড় কলসী কাঁখে করিয়া পুকুরে জল আনিতে যাইতেছেন। হাঁসগুলি ছাড়া পাইয়া পুকুরের জলে পড়িয়াই কেমন সাঁতার কাটিতেছে! ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বই শ্লেট লইয়া পাঠশালায় যাইতে যাইতে আমবাগানে গিয়া গাছতলায় কচি আম কুড়াইতেছে দেখিয়া সুলতাও সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। জড়করা আমগুলির দিকে অপরিচিতার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া ছেলেরা খুসী মনে তাহাকে কয়েকটা কচি আম দান করিয়া ফেলিল। সুলতা হাসিয়া সরল প্রাণের দান গ্রহণ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। সাম্‌নেই দেখিল অরুণ। সে বলিল, 'তুমি এই সব কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ লতা, আর আমি যে তোমাকে খুজে বেড়াচ্ছি! এখন বল তো শুনি, পাড়া গাঁ তোমার কি রকম লাগ্‌চে? ছুটির দিন ক'টা এখানে থাক্‌তে পারবে তো না তার আগেই তোমাকে কলকাতা পৌঁছে দিতে হবে?'

সুলতা হাসিয়া বলিল, এখানটা আমার ভারী ভালো লাগচে জামাই বাবু, আমি খুব থাক্‌তে পার্‌বো। এত খানি যায়গা নিয়ে এক এক খানা বাড়ী, কলকাতায় যদি আমাদের থাকৃত, কি মজাই হতো তা হ'লে!'

"সে কথা ভেবে কষ্ট ক'রে লাভ কি বলো, যা হবার নয়, তা না ভাবাই উচিত; এখন চল তো খাবার ডাক পড়েছে যে!'

যাইতে যাইতে সুলতা আবার বলিল, 'আচ্ছা জামাইবাবু, তোমাদের বাড়ীর সবাইকে তো দেখলুম্। এখনো ভাব হয় নি যদিও তবু শোভনাকে আমার বেশ ভালোই লেগেচে ; কিন্তু সেই দিন যার কথা শুনেছিলুম, কই, তাকে তো দেখতে পেলুম না!'

অরুণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কার কথা বল্‌ছো লতা? সেই যে পদ্মিনী নূরজাহান যাকে তুমি বলছিলে বেলু না কি তার নামটা—সেই অপরূপ রূপসীর তো কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না!'

অরুণ শুষ্ক স্বরে বলিল, "তাকে দেখবার তোমার তো কিছু দরকার নেই লতা, সে যাদের দরকার, তারা দেখ্‌বে। তুমি দেখছি আমাদের সব কথা শুনেছ!'

সুলতা একথার অর্থ বুঝিতে পারিল না; ভাবিল, বেলু বোধ হয় এখানে থাকে না, বিবাহের সময়ে আসিবে তার তো আর বড় বেশী বিলম্বও নাই।

দ্বিপ্রহরে আহারের পরে সুলতা আবার আসিয়া আমবাগানে দাঁড়াইল। সূর্য্যদেব তখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, রৌদ্রতাপে পুকুরের জল গরম হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই স্থানটি তাঁহার অধিকারের বাহিরে। কী শীতল এই গাছগুলির ছায়া! শীতল বাতাস বহিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছে।

সুলতা ঘাসের উপরে বসিয়া একমনে পাখীর গান শুনিতে লাগিল ; সকাল বেলা সেই বালকেরা আসিয়া কেহ আম পাড়িয়া তাহার পদতলে জড় করিয়া রাখিল, কেহ ফুল আনিয়া তাহাকে উপহার দিল। একটি বিধবা মহিলা পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি মা, কোথা থেকে এখানে এসেছ?'

সুলতা বলিল, 'আমি জামাইবাবুর সঙ্গে কাল কলকাতা থেকে এখানে এসেছি।'

'অরুণ কি বাড়ী এসেছে না কি?' বলিয়া তিনি চিন্তিত ভাবে অরুণদের বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সুলতার কৌতূহল হইল, সেও উঠিয়া তাঁহার সহিত চলিল। উপহারগুলি পড়িয়া রহিল দেখিয়া বালকেরা বহন করিয়া লইয়া চলিল, সেগুলি বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবে।

বাড়ী আসিয়া সুলতা দেখিল, গৃহিণী তাঁহার ঘরের মেজেয় পাটী বিছাইয়া শয়ন করিয়াছেন; বধূ ও কন্যারা একটা ঘরে বসিয়া কেহ লেস্ কেহ বা আসন বুনিতেছে, খুব হাসি-গল্প চলিতেছে। সে-ঘরে এক বার উঁকি দিয়া দেখিয়া বিধবা গৃহিণীর নিকটে গিয়া বসিলেন, সুলতাও সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মলিন মুখের পানে চাহিয়া গৃহিণী বলিলেন, 'বসে কেন ভাই ছোট বউ, আমার পাশে শুয়ে একটু গড়িয়ে নাও; যে রোদের তাপ!—তেতে পুড়ে এসেছ।'

'অরুণ বাড়ী এসেছে শুনেই এলাম দিদি, সে কেন আমার সঙ্গে দেখাটাও করলে না। যে কাজ করতে বলেছি, তার যে কি করলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

গৃহিণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'ওসব মতলব ছেড়ে দাও ভাই ছোট বউ, ছেলে মানুষের সঙ্গে মিশে তুমিও ছেলে মানুষী করো না! ও মেয়ে কি কেউ বিয়ে করবে? মনে কষ্ট করোনা ভাই, আমি সত্যি কথা বলছি! টাকার লোভে যদিই কেউ তা করে, ওকে নিয়ে ঘর তো আর করবে না, সেই তোমাকে ওর বোঝা চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে। মিছে হুজুগে মেতে ঠাকুরপো যা দুটো পয়সা রেখে গেছে, খুইয়ে বসো না। লোকের কথা কানে তুলো না, যে যা বলছে, বলুক; তুমি একটু শক্ত হয়ে চলতে শেখ বোন!"

'দিদি, বিয়ে না হ'লে যে ওর হাতের জল শুদ্ধ হবে না, আমাকেও সবাই এক-ঘরে ক'রে রাখবে! গাঁয়ে থাকতে হ'লে নিয়ম না মানলে তো চলে না! মেয়েটার বিয়ে না দিলে নিন্দে যা হচ্ছে, সে তো চিরকাল শুনতে হবেই, আবার এক-ঘরে করবে, ধোপা নাপিত বন্ধ করবে। সে ভাই সইতে পারব না! আর লোকেরই বা দোষ কি, মেয়েটার বয়েসও যে কুড়ি পেরিয়ে গেল। যেমন ক'রে হোক, টাকা ক'টি খরচ করে ওর বিয়েটা তো দিয়ে ফেলি, তার পরে যা হয় হবে। কত কুকুর বেড়াল তুমি ভাত দিয়ে পুষছো, আমি তো তোমার বোন, না খেয়ে কি আমায় মরতে হবে, দিদি?'

বিধবা কাঁদিয়া ফেলিলেন। গৃহিণী সযত্নে তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এই দুপুর বেলা অমন করে কাঁদিস্ নি যোগমায়া, চুপ কর্! তোর কি অমঙ্গলের ভয়ও নেই'? নে আমার পাশে একটু শুয়ে পড়; অরুণ ঘুম থেকে উঠলে তার কাছেই সব শুনতে পাবি। সে না কি তার ক্লাশের একটা ছেলেকে কি ক'রে এবারে রাজী করেছে।'

সুলতা অবাক হইয়া ইঁহাদের কথা শুনিতেছিল; সে বুঝিতে পারিল, এই যোগমায়া বেলুর মাতা। বেলু 'নূরজাহান' তো নয়ই এমন কিছু, যাহার জন্য তাহার বিবাহ হয় না, মাতার এক-ঘরে হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহার দুঃখ হইল, অরুণের সেই বন্ধুটির কথা মনে করিয়া, সে বেচারা 'পদ্মিনী' পাইবার আশায় কেমন প্রলুব্ধ হইয়া আছে! যখন সত্য আবিষ্কৃত হইবে, তখনকার কথা মনে করিয়া সে আমোদ এবং একটু দুঃখও বোধ করিল। ভাবিল জামাইবাবু কি ভীষণ মিথ্যাবাদী!

সুলতা দিদিকে এই ভয়ানক প্রতারণার কথা বলিল; সকল শুনিয়া সুরমা উত্তর দিল, 'কি করবেন ভাই, কাকীমার জন্যে ওঁকে এই সব চালাকী করতে হচ্ছে। ছেলে বেলায় কাকীমা ওঁকে মানুষ করেন কি না, উনি এখনও তাই কাকীমার খুব ন্যাওটো। আগে এরা তো সব একত্তরে ছিলেন, কি গোল হওয়ায় আলাদা হয়েই কাকাবাবু মারা যান; বেলু তখন কাকীমার পেটে ছিল। তার কথা কি বলব ভাই! ও বাড়ী চল্ না, আপনার চোখেই দেখবি। যাক্, ওকে বিয়ে করলে পরেশ বাবুর তো কিছু ক্ষতি হবে না। পুরুষ মানুষ সে, আবার বিয়ে করতে পারবে; কাকীমার কিন্তু জাত-মান রক্ষে হয়।'

জাত-মান রক্ষে হয়! যার বিয়ে হওয়া উচিত নয়, তাকেও বিয়ে না দিলে 'জাত-মান' নামক অদৃশ্য পদার্থ দুইটি কেন যে থাকিবে না, সুলতা তাহা বুঝিতে পারিল না। দিদি বলে কি?

দিদি তখন একেবারে পাড়াগেঁয়ে হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া সুলতার বড় দুঃখ হইল।

কৌতূহলবশে সুলতা তখনই বেলুকে দেখিতে দিদির সঙ্গে যোগমায়ার বাড়ীতে চলিল। যোগমায়া তাহাদের

দেখিয়া ম্লান মুখে হাসি আনিয়া বসিতে বলিলেন ও একটি ছোট ধামিতে করিয়া মুড়ী, মুড়কী, নারিকেল-লাড়ু আনিয়া তাহাদের জল খাইতে দিলেন। সুরমা ধামিটি ভগিনীর নিকটে রাখিয়া বলিল, 'মুড়ি ক'টি একটু হাত চালিয়ে মুখে দে ভাই লতি, বেলা পড়ে এসেছে; ঝাঁট-পাট, সন্ধ্যে-পিদীম গোছানো, কিছুই এখনো করা হয় নি।' সুলতা সবিনয়ে জানাইল, সে এখন খাইতে পারিবে না। তাহার দৃষ্টি গৃহমধ্যে উপবিষ্টা বেলুর দিকেই বদ্ধ হইয়া রহিল। সে কি মেয়ে! যেমন কুৎসিত, তেমনি অথর্ব্ব, অচল! সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে পারে না, বাহিরে যাইতে হইলে আঁকিয়া বাঁকিয়া খানিক দূরে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে; তাহার বসিবার ভঙ্গীটিও হাস্যোদ্দীপক। সুলতার মনে হইল বেলু বোধ হয় ভাল করিয়া কথাও বলিতে পারে না। যতক্ষণ তাহারা সেখানে ছিল, সে একটি কথাও ত বলিল না; তাহার বয়স কুড়ি বাইশ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল; জাত-মানের ভয়ে এই মেয়েরও বিবাহ দিতে হইবে।

এই অদ্ভুত বিবাহের আর বেশী দিন দেরী ছিল না; খই মুড়ী ভাজা, চা'ল ডাল প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। বাড়ীতে কাজ পড়িয়াছে দেখিয়া সুলতাও তাহার কিছু কিছু ভার গ্রহণ করিল। ক্রমে কাজ এত বাড়িল যে সুলতার আমবাগানের সহচরেরা ফলফুল লইয়া বৃথা তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত, সে একটিবারও তাহাদের আনন্দ দিতে সেখানে যাইতে পারিত না।

অরুণ বর আনিতে কলিকাতা যাইবে শুনিয়া সুলতা তাহাকে ধরিল, 'আমাকেও নিয়ে চল না জামাই-বাবু, অনেক দিন এসেছি; মা শিগ্‌গির করে যেতে লিখেছেন।'

অরুণ অবাক হইয়া বলিল, 'এখনই যেতে চাচ্ছ যে লতা, পাড়াগাঁ দেখ্‌বার সখ এরি মধ্যে মিটে গেল? দেখবার জিনিস এখানে আছেই বা কি, তার জন্যে বলছি না, তবে এই বিয়েটা না দেখে এখান থেকে যেতে পাবে না; একটা দিন কষ্ট ক'রে থাক্‌তেই হবে তোমায়।'

সুলতা প্রতিবাদ করিল, 'তোমাদের যা জুচ্চুরির বিয়ে, আমি দেখতে চাইনে ও সব! বোকা পেয়ে বন্ধুটিকে ঠকাচ্ছ, এর পরে কত অপমান সইতে হবে, দেখো!'

'জুচ্চুরি ঠিক নয়; তুমি ছেলে মানুষ, ভেতরের কথা বুঝ্‌তে পারবে না। একটা দিন এখানে থেকে যাও লতা, তার পরে তখন তোমায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব।'

অরুণ চলিয়া গেলে শোভনা আসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, তোমার কি ভালো লাগছে না আমাদের কাছে থাক্‌তে?'

'ভালো লাগছে তো খুবই—

'তবে কেন যেতে চাইচ, মার জন্যে মন কেমন করছে?'

সুলতা হাসিয়া বলিল, 'তা একটু একটু কর্‌ছে বই কি!'

'তবে আর কি বল্‌ব, যাও, মার কাছে গিয়েই থাকো!'

সুলতা দেখিল, এখন যাইবার কথা বলিয়া সে ভালো করে নাই; যাওয়া তো হইলই না, শোভনার মান ভাঙাইতে তাহাকে এখন বেশ বেগ পাইতে হইবে।

বিবাহের একদিন পূর্ব্বে দানের জিনিষ, বর ও বরযাত্রীদের লইয়া অরুণ বাড়ী আসিল। বাড়ীর সকলেই তখন মহাব্যস্ত। যোগমায়াও এ বাড়ীতে আসিয়া কাজ দেখিতে লাগিলেন, পাড়ার মেয়েরাও আসিয়া শুভ কার্য্যে যোগ দিলেন। খাওয়া দাওয়া গান বাজনা সবই হইতে লাগিল। বেলু যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে, সে দিকে সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি। বেচারার প্রহরীর পদে শোভনাই প্রতিষ্ঠিতা হইল, সে অনবরত বেলুকে সাবধান করিতে লাগিল। আজকাল অরুণদের বাড়ীতে অনেক লোকের ভিড়। তাই সুলতা বই হাতে করিয়া যোগমায়ার নির্জ্জন খড়ের বাড়ী খানির বারান্দায় বসিয়া শোভনার খবরদারী করা দেখিতে লাগিল—'ওদিকে অমন ক'রে যাস্‌ নি বেলু, বর এয়েছে তোকে দেখে ফেল্‌বে। মেয়ে যেন ঠিক অষ্টাবক্র মুনি, দেখলে কি আর বিয়ে করবে সে! নে আমি জল এনে দিচ্ছি, বাড়ীতেই নাওয়া-ধোওয়া সব কর। এখন আর অত চেঁচিয়ে আঁই আঁই করিস্‌ নি, বিয়ে হবে যে, চুপ করে থাক্‌! বই পড়া বন্ধ

ক'রে মেয়ের রকমখানা একবারটি চেয়ে দেখ না ভাই লতা! ঐ যে কথায় বলে না—'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই'—বেলুর হয়েছে ঠিক তাই!'

বেলুর দুর্দ্দশা দেখিয়া সুলতা ব্যথিত স্বরে বলিল, 'ওর হাত পা-গুলো ওরকম হলো কি ক'রে, শোভনা?'

'কি জানি; আমরা তো জন্মে অবধি ওকে এই রকমই দেখছি, ও কাকীমার পেট থেকেই না কি অমনি পড়েছিল।'

'তখুনি যদি ওকে কল্‌কাতা নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখানো হতো, তা হলে বেলু অনেক সেরে যেত, এমন হয়ে কক্ষণো থাকৃত না।'

'সে আর হলো কই, ভাই! বেলু হ'বার আগেই যে কাকাবাবু মারা গেলেন; ওদের অবস্থা খারাপ হ'য়ে গেল, দেখবার তেমন লোকও রইল না। ওসব কর্‌তে গেলে যেমন টাকার তেমনি লোকেরও দরকার।'

সুলতা ভাবিতে লাগিল, আজ বেলুর মা 'জাত-মান' বাঁচাইবার জন্ম যে টাকাটা খরচ করিতেছেন, তাহা যদি উহার চিকিৎসায় ব্যয় করিতেন, তবে মেয়েটি তাঁর হয়তো সুস্থ হইয়া উঠিতেও পারিত!

শোভনাকে তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সুলতা ফিরিয়া দেখিল দুইটি বাবুর সহিত অরুণ উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সুলতার দিকে তাকাইয়া দেখিয়া খানিক পরেই তাহারা চলিয়া গেল। সে ইহাদের এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শোভনা হাসিয়া বলিল, 'এটা আর বুঝ্‌তে পারলে না! তুমি ভাই, কোনো কথায় কান দাও না। বরের কাকা কনে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে চেয়েছিলেন; দাদা বলেছে, আমাদের ওসব কর্‌তে নেই, একেবারে বিয়ের পরে আশীর্ব্বাদ হয়; তাই শুনে তাঁরা কনে দেখতে চাইলেন, তাই দাদা তাঁকে মেয়ে দেখিয়ে নিয়ে গেল।'

বেলুর দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া সুলতা বলিল, 'কিন্তু তাঁরা তো বুঝতে পারলেন না যে এই কনে!

'বুঝ্‌লে কি আর রক্ষে থাকৃত, এখনি গোল বেধে যেত। ওরা বোধ হয় তোকেই কনে ভেবে গেল।'

'জামাইবাবু ভয়ঙ্কর চালাক তো! কিন্তু শেষ রক্ষে হবে কি?'

শোভনা হাসিয়া বলিল, 'সে ভাই দেখতেই পাবে।'

গায়ে হলুদ, আইবড় ভাত সব হইয়া গেল। বিবাহের দিন বিকাল বেলা ডাক্তার আনিয়া বেলুকে মর্ফিয়া খাওয়াইয়া নিঝুম করিয়া রাখা হইল। কনেচন্দন, পাটের সাড়ী পরাইবার সময়ে অভিজ্ঞাগণ 'পেণ্ট' করিয়া বেলুর কালো রঙ ফরসা করিয়া দিল। বিবাহ-সভায় তাহার হাত দেখিয়া কাহারও মনে সন্দেহ হইল না। অরুণ বেলুকে কৌশলে ধরিয়া রাখিল, সে ঝিমাইয়া না পড়িয়া যায়। দৃষ্টি বিনিময়ের সময় পরেশকে বেলুর টায়রা ও সোণার ফুল শোভিত মস্তকের একাংশ মাত্র দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হইল। অরুণ তবুও বেলুর মাথার কাপড়খানা প্রায় সবটাই তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'দেখ ভাই বেশ ভালো কোরে কনে দেখ সবাই!' তখন বেলুর মুখ এমন ঝুঁকিয়া পড়িল যে, পরেশ ও তাহার বন্ধুগণ এক দৃষ্টে আগ্রহ ভরে চাহিয়াও তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। 'দেখা হয়েছে ত?' বলিয়া অরুণ যখন ঘোমটাটি ফেলিয়া দিল, তখন তাহারা যে-আঁধারে ছিল, সেই আঁধারেই রহিয়া গেল।

বিবাহের পরে বেলুকে পীঁড়িতে বসাইয়া বাসরঘরে লইয়া যাইতে দেখিয়াও তাহারা কোন আপত্তি করিল না, ভাবিল এদেশের বুঝি এই রকম নিয়ম। বাসরঘরে আসিয়াই কনেকে বিছানার এক পাশে শোওয়াইয়া রাখা হইল। পরেশ অবাক হইয়া চাহিতেই সুরমা বুঝাইয়া বলিল, "সারাদিন না খাইয়া থাকাতে বেলুর অসুখ করিয়াছে, মাথা ঘুরিতেছে।"

বেলু সারারাত সে সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল, বাসরের আমোদ সে কিছুই উপভোগ করিতে পারিল না। হাসি, গল্প গান চলিতে লাগিল। পরেশ তাহাতে যোগ দিতেছে না দেখিয়া অরুণ আসিয়া তাহার পাশে বসিল ও তরুণীদের সহিত রঙ্গ-রহস্য করিয়া তাহাকে খুসী করিতে লাগিল। বাসরঘরে সুলতাকে দেখিয়া ও তাহার গান শুনিয়া পরেশ তাহার মন, চক্ষু ও কর্ণ এই ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্য কার্য্য হইতে অবসর দিয়া,

শুধু সুলতাকে দেখিবার, তাহার কথাটি হাসিটি অভিনিবেশ সহকারে শুনিবার জন্যে নিযুক্ত রাখিল। সুলতা চলিয়া গেলে তাহার মনে হইল, সে-ঘরের সমস্ত আলোও সেই মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল !

রাত্রিশেষে সকলেই শয়ন করিতে গেল; তখন বাসরঘরের ফুলের সাজ শুকাইয়া আসিয়াছে, আলোগুলি নির্ব্বাপিতপ্রায়। সে-ঘরে আর কেহ রহিল না দেখিয়া পরেশ বেলুর নিকটে গিয়া তাহার মুখ অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়াই শিহরিয়া উঠিল। এই তাহার নব পরিণীতা নূরজাহান! কি ভয়ানক প্রতারিত হইয়াছে সে! অরুণ, তাহার পরম বন্ধু অরুণ, সেও এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল! জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। কত প্রেমকল্পনা, কত সুখের আশা লইয়া পরেশ বিবাহ করিতে আসিয়াছিল, তার পরিণাম এই! এই কুৎসিত জড়পিণ্ড লইয়া গিয়া পিতা মাতা, আত্মীয়গণকে কেমন করিয়া দেখাইবে? সেই বা ইহার সহিত কিরূপে বাস করিবে? জীবন একেবারে মাটী হইয়া গেল, এখন মরিতে পারিলেই শান্তি!

পরেশ আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কান্না শুনিয়া সুপ্তোত্থিতা বেলু চোখ মেলিয়া চাহিল। জন্মান্ধ যদি সহসা দৃষ্টি লাভ করে, তবে সে যেমন দুই চক্ষু ভরিয়া প্রকৃতির পরম শোভা নিরীক্ষণ করে, বেলু ঠিক তেমনি করিয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? এই রূপবান যুবা কি করিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিল, কেনই বা সে কাঁদিতেছে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বেলু একদৃষ্টে পরেশের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে যোগমায়া আসিয়া পরেশের পাশে বসিলেন, সযত্নে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, 'তুমি কেন কাঁদছ বাবা, তোমার তো কোনো ক্ষতি হয় নি! আমার বোঝা চিরকাল আমিই বইব! ওর জন্যে কক্ষণো কিছু ভুগ্‌তে হবে না। আমার আশীর্ব্বাদে তুমি মনের মত স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার করবে। আমার যে উপকার করলে, তাহার ফলে তুমি কত সুখ-সম্পদ লাভ করবে। অরুণ আমার কষ্ট সইতে না পেরে তোমার সঙ্গে এই চালাকী করেছে! সে জন্যে তার ওপরে মনে রাগ রেখ না, বাবা!'

পরেশ নতমস্তকে বসিয়া রহিল, যোগমায়ার কথার কোনই উত্তর দিল না। বহির্ব্বাটীতে তখন একেবারে হুলস্থূল ব্যাপার; তাহার কাকা কাহার মুখে এই খবর পাইয়া তৎক্ষণে তর্জ্জন, গর্জ্জন, আস্ফালন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই জুয়াচোরদের যে অবিলম্বে পুলিশে দেওয়া কর্ত্তব্য, তিনি সে কথা সর্ব্বাগ্রে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন। অরুন আসিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া গেল। সে এমন কয়েকটি কথা বলিল যে, আগুন তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেল। বরকর্ত্তা তখন বাহিরে আসিয়া এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে আরও যতগুলি হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়া, এই কন্যার সহিত পরেশের নিতান্তই নির্ব্বন্ধ ছিল, ভবিতব্য কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, বলিয়া নিজের মনকে শান্ত করিয়া বরযাত্রীদিগকেও বুঝাইতে লাগিলেন।

পরেশ কিন্তু এই অতি সহজ কথাটা বুঝিতে চাহিল না। সে তখনই চলিয়া যাইতে চাহিতেছে শুনিয়া যোগমায়া আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মিনতি করিয়া বলিলেন, 'দুঃখিনীর উপকার করলেই যদি, তবে সবটুকুন কাজ শেষ করে যাও বাবা; আজকে কুশণ্ডিকা, আর কাল ফুলশয্যাটা হলেই তো হয়ে গেল।'

সুলতা হাসিয়া বলিল, 'আপনাকে যে এঁরা ঠকিয়েছেন, সেটা কেন আর সবাইকে জানাতে চাচ্ছেন, পরেশ বাবু! এ দুটো দিন দয়া করে এখানে থেকেই যান, রাগ ক'রে ফুলশয্যার আমোদটা নষ্ট করছেন কেন?'

পরেশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুলতার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। সুলতার উপদেশে কুশণ্ডিকা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। অতিরিক্ত মকিয়া ভক্ষণের ফলে বেলু আর সেদিন উঠিতেও পারিল না। সে সারা দিন শুইয়া থাকিতেই বাধ্য হইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি রহিল পরেশের দিকে। পরেশ কি বলে, কি করে, তাহাই সে একান্ত মনে দেখিতে শুনিতে লাগিল। এই জ্ঞানহীনা অর্দ্ধাঙ্গিনীর অন্তরে যে প্রেমের দেবতা আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, পরেশ তাহা বুঝিতেও পারিল না, তাহার দৃষ্টি কেবলি



শাল-বীথিকায়

শিল্পী শ্রীমতী সবিতা দেবী

সুলতার অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছিল। পরেশ বিবাহের সকল অনুষ্ঠান শেষ করিতে সম্মত হওয়াতে সুলতা খুসী হইল। সুলতাকে খুসী করিয়া পরেশও এত আনন্দ পাইল যে, তাহার প্রতারিত হইবার দুঃখও নিঃশেষে মুছিয়া গেল। অরুণও শেষটা তাহার কাছে আসিতে সাহস করিল। এই চাতুরীর জন্য বন্ধুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া অরুণ হাসিয়া একটি আশার কথা বলিল। পরেশ শুনিয়াই রাগিয়া উঠিল, 'চুপ কর! তোমার কথা আর আমি বিশ্বাস কর্‌ছি না!'

'এখন নেই বা বিশ্বাস কর্‌লে, আমার চেষ্টা যখন সফল হবে, তখন তো সেটা করতেই হবে?' বলিয়াই বন্ধুর রাগ না বাড়াইয়া অরুণ আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রিটিও বাসরের মত আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া গেল। সেদিন বেলুও সকলের সঙ্গে বসিয়া রহিল। তাহার চোখ দুইটি পরেশের দিকেই স্থির রহিল, কিন্তু মুখ একটি কথাও উচ্চারণ করিল না। সুলতার গান, শোভনার নীরব সেবা ও বধূদের হাসি গল্পে সেদিন পরেশ এত আনন্দ পাইল যে, তাহার বিবাহ ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া এখন আর সে মনে করিতে পারিল না।

পরদিন পরেশের কাকা বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দানের ও অন্যান্য জিনিষ পত্র সব বাঁধা হইতে লাগিল। কালবোশেখীর দিন, জল পথ, যাহাতে শীঘ্র যাত্রা করিতে পারা যায় সে বিষয়ে সকলেই সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, কন্যাপক্ষের বর কনে একত্রে আসার নিয়ম নাই, বলিয়া বাড়ীর লোকদিগকে জানাইবেন। কনে পরে আসিবে বলিলেই চলিবে। আহারাদির পরে পরেশ যোগমায়া ও অরুণের মাতাকে প্রণাম করিল; সুলতা, শোভনা ও বধূদের নিকটে হাসিয়া বিদায় লইল। বেলুর কথা তাহার মনেও পড়িল না। বেলু কিন্তু অনেক কষ্টে আসিয়া পিছনের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কি এখানে আবে না?'

পরেশ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, বেলুকে তদবস্থায় দেখিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'আবার আস্‌ব।' তাহাদের এই প্রথম ও শেষ কথা! মুগ্ধা বেলু ওই কথাটুকু সম্বল করিয়া রাখিল। বরযাত্রীরা জিনিষপত্র লইয়া আগেই নৌকায় উঠিয়াছিলেন, পরেশ চিন্তিত মনে অরুণের সহিত সেই দিকে চলিল। সুলতা ও শোভনার সাহায্যে বেলুও তাহাদের পিছন পিছন খানিকদূর গেল; যখন পরেশকে আর দেখা গেল না, তখন সজল চোখে শোভনার মুখ পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও আবা কবে আবে দিদি?'

শোভনা ম্লান হাসিয়া যেন আপন মনে বলিল, 'সারাটি জীবন প্রতীক্ষা ক'রে থাক্‌লেও তুমি আর ওঁর দেখা পাবে না।'

বেলুর কানে সে কথা গেল না সে পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাড়ী আসিয়া সুলতা চুপি চুপি দিদিকে বলিল, 'আমায় এই বারে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও ভাই দিদি, আর এখানে থাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।' সুরমা তখন কোমরে আঁচলটা জড়াইয়া হেঁসেল সারিতে ব্যস্ত ছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আর দুটো দিন সবুর কর ভাই লতি, এই বিয়েটা হয়ে গেল—তার পরে তোকে দিয়ে আসবে'খন।'

পরেশের নৌকা তখন খাল পার হইয়া নদীতে গিয়া পড়িয়াছে; শুষ্ক খালের ভিতর দিয়া মাঝিরা কোন রকমে এতটা পথ নৌকা টানিয়া আনিয়াছে, এইবারে পাল খাটাইয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল। পরেশের বন্ধুরা তাহার বিমর্ষ ভাব দূর করিবার জন্য পরনিন্দারূপ মুখরোচক দ্রব্যের অনেক অপব্যয় করিল। তাঁহারা যে অরুণের মতলব অনেক আগেই বুঝিতে পারিয়াছিল, সে কথাও প্রমাণ করিল। পরেশের বিশ্বাস হইবে না বলিয়া এ-কথাটি এত দিন বলে নাই। পরেশ যখন কোন কথারই প্রতিবাদ করিল না, তখন কেহ ভগ্নোৎসাহ হইয়া গান ধরিল—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর!

কেহ বা মাঝিদের নিকটে গিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিতে লাগিল। তাহারা জানিতে

পারিল না, পরেশের মন্দির শূন্য থাকিলেও মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তীরের ফসলভরা মাঠ ও গ্রামগুলির দৃশ্য, বন্ধুদের গল্প, গান বা নদীর জলের কল কল তান—কিছুই পরেশ দেখিতে শুনিতে পাইতেছিল না; সে দেখিতেছিল সেই মাঠের ওধারের বটগাছটি, যেখানে বনদেবীর মত স্থলতা বেলুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের গমন পথের দিকে চাহিয়াছিল। সেই ছবিখানি সে হয় তো আর চোখে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু মনের ভিতরে চিরকালই দেখিবে। পরেশ স্থির করিল, স্থলতার প্রতীক্ষায় থাকিয়া সে সারাজীবন কাটাইবে; বাহিরে যদিই তাহাকে না পায়,—অরুণের কথা প্রত্যয় করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না—ভিতরে যাহা পাইল, তাহার ধ্যান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে।

পরেশের এই আজীবন প্রতীক্ষা কয় মাসে শেষ হইয়াছিল জানি না, কিন্তু মাঠের ধারে বটগাছতলায় যেই কুরূপা মেয়েটি তাহার যাত্রা-পথ চাহিয়া দেখিতেছিল তাহার ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যহীন জীবনের সব কটা দিনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও আশা-ছিল পরেশের প্রতীক্ষা।

বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার যোগ

অধ্যাপক শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেন

ভারতীয় জীবনে বর্ত্তমানে যে-ভাবস্রোত বহমান তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এখন স্বাদেশিকতার দিন-কাল, সকল কথাই জাতীয়তাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে। আমাদের এখন জাতীয়তার যুগ, যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, যাহা কিছু বলি, জাতীয়তার দিক হইতে তাহা যে দেখা দরকার সে কথা আমাদের মনের কোণে মাঝে মাঝে উঁকি মারে। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভ্যাস, খুঁটিনাটি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজ কর্ম্ম, সকলের মধ্যে, আমাদের মধ্যে যে নিতান্ত স্বার্থপর তাহারও মুখে স্বজাতি-প্রীতির কথা শোনা যায়। আমরা প্রত্যহ নিখিল ভারতকে এক করিয়া, অখণ্ড করিয়া দেখার শিক্ষা লাভ করিতেছি। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই—একথা সত্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমগ্র ভাবে দেখিবার শিক্ষার মূলে খণ্ড করিয়া দেখারও শিক্ষার যে প্রয়োজন তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই; নিখিল ভারতকে ভালবাসতে হইলে তাহাকে জানা দরকার, তাহাকে জানিতে হইলে খণ্ডশঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে জানা দরকার এবং তাহা হইতে মূলে গেলে ভারতের বিভিন্ন জেলা বা আরও ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্থানের সহিত পরিচয় আবশ্যক করে। দুঃখের এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই পরিচয়ের অভাব, পরস্পরের সহানুভূতির অভাব অপেক্ষাকৃত আধুনিক; পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গোৎকল বিহার আসাম পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, রাজনীতিক্ষেত্রে কিম্বা ভাব জগতে গণ্ডী দিয়া ইহাদিগকে পৃথক করা হয় নাই, ইহাদের ভৌগোলিক সীমা ছাড়াইয়া পরস্পর ভাবের আদান প্রদান চলিত। কিন্তু অধুনাতন যুগে ইহারা কি রাষ্ট্রে, কি সাহিত্যে বিচ্ছিন্ন, একের সহিত অন্যের পরিচয়ের যথেষ্ট অভাব ঘটিতেছে। তাই এই নিখিল ভারত কথাটার আতধ্বনি সত্ত্বেও ইহার মূলে যে বৃহৎ অজ্ঞান তথা সহানুভূতির একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়, অতীতের কথা মনে পড়িলে তাহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতেই হয়; একথা মানিতেই হয় যে, জাতীয়তার যুগে আমরা বিজাতীয় ঈর্ষা ও অজ্ঞানে পরস্পর হইতে বিযুক্ত

বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বিদেশে অতিথি-সৎকারের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"বঙ্গবাসী মাত্রেই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীর

পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড় ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য; তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয় কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার জন্য; পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই; তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসীপরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপাশে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথমদিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে; তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরেই ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিতে হইবে, নয়ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটির দরখাস্ত দিতে হইবে।"

সঞ্জীবচন্দ্র—প্যালামৌ)

সঞ্জীবচন্দ্র বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মানব-জাতির সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পারে, এবং এই উদ্ধৃত মন্তব্য বঙ্গ ও বঙ্গের প্রতিবেশী উভয় পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। নিজেদের দোষ গুণ কাহার মধ্যে কি অনুপাতে কতখানি আছে তাহার বিচার এস্থলে শুধু অপ্রাসঙ্গিক নয়, অন্যথাও দোষাবহ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে উড়িষ্যা এবং বাঙ্গলা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া আসিতেছে; ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই ঠাকুরমার মুখে উড়িষ্যার হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার কথা শুনিয়াছি; তখনও রেল হয় নাই, আর রেলপথে উড়িষ্যার সঙ্গে যোগ ত সেদিনকার কথা। এখানে ইহাও জিজ্ঞাস্য যে, রেলওয়ে ইত্যাদি সহজ যান বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের পক্ষে বাস্তবিকই সহায়তা করিয়াছে কি না; তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে সমগ্র ভারত ভ্রমণ ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুজাতির দৃঢ়তর যোগসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যাক্ সে কথা, রেলের সাহায্যে দূরকে নিকট করিলেও পরকে আপন করিয়া দেওয়া যায় কি না সে বিচার আপততঃ স্থগিতই থাক। সাহিত্যজগতে ভাবের আদান প্রদান দিয়া যে সম্বন্ধ তাহা শুদ্ধ ভৌগোলিক সম্পর্ক হইতে নিগূঢ়তর। প্রতিবাসীর মনের খবর রাখিতে হয়, নহিলে তাহাকে জানিতে পারিব না, তাহাকে লইয়া চলিতে পারিব না, তাহার ডাকে সাড়া দিতে পারিব না, নিজের ডাকেও তাহার সাড়া পাইব না। অন্যান্য প্রতিবেশীর মত উড়িষ্যাবাসী জনগণেরও মনের খবর তাই আজ আমাদের অতি প্রয়োজন, কারণ আমরা একই তালে চলিতে চাই। একথা অবশ্য অস্বীকার করিবার পথ নাই যে, উভয়ের মধ্যে আজ ঈর্ষার, বিদ্বেষের ধূম অতি প্রবল,—একে অন্যকে সহ্য করিতে পারে না, বাঙ্গালীতে ওড়িয়া আজ দেখে লুণ্ঠনকারী বিদেশীর চাতুর্য্য, ওড়িয়াতে বাঙ্গালী দেখে দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি; কিন্তু একটি যেমন মিথ্যা, অন্যটিও তেমনি। আজ তাই এই মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উভয়কে বলা দরকার যে, পূর্ব্বকালের যে ধারা এপর্য্যন্ত উভয়ের মধ্য দিয়া সকল বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া বহিয়া আসিতেছে তাহা যেন ক্ষণিকের মোহে বা মাৎসর্য্যে, আপাতসর্ব্বস্ব আমাদের চেষ্টায় বন্ধ না হয়। বর্ত্তমানের যে ক্ষুদ্র কলহ, ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাত, বৃহত্তর লাভের আশায় আমরা যেন তাহা পরিবর্জ্জন করিতে শিখি এবং ঈর্ষার পরিবর্ত্তে প্রীতি, শত্রুতার পরিবর্ত্তে আত্মীয়তা, বৈদেশিকতার স্থলে স্বাজাত্য যেন আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া প্রকৃতই নিখিল ভারত মৈত্রী সংস্থাপনের পক্ষে সহায়তা করে। অন্ততঃ এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য বঙ্গের সহিত ওড়িষ্যার যোগ দেখান এবং পরস্পরের সাহিত্য জানার প্রয়োজন হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালের ওড়িষ্যা বা বাঙ্গলা, কাহারও ইতিহাস বোধ করি এপর্য্যন্ত সুনিরূপিত হয় নাই; সাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে চোখে পড়ে যে, উভয়ের সম্বন্ধ এমন নিকট যে, কোন্‌টা বাঙ্গালীর আর কোন্‌টা ওড়িয়ার তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতেরও গোল বাধে, অন্যে পরে কা কথা। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালী বলিতেছেন বাঙ্গালীর, ওড়িয়া পণ্ডিত বলিতেছেন ওড়িয়ার। চর্য্যাপদে যেসব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি আজও ওড়িয়ায় বর্ত্তমান এবং যে সব সাধকের উল্লেখ আছে তাঁহাদের একজন অন্ততঃ ওড়িষ্যা দেশাগত বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ওড়িয়া পণ্ডিত উৎকলের এই হৃতসম্পদ্ উদ্ধার কল্পে উৎকল সাহিত্য সমাজকে বদ্ধপরিকর হইতে বলিতেছেন। চর্য্যাপদ বাস্তবিক বাঙ্গলায় না ওড়িয়ায় লেখা সে বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এরূপ তর্ক যে উঠিতে পারে তাহাতেই দেখিতে পাই এখানে দুই দেশের ভাবস্রোত একদিকে ছুটিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের বা

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণ বাঙ্গালার মতই ওড়িয়া সাহিত্যেরও নিজস্ব কথা।

কিন্তু বাঙ্গালা ও ওড়িষ্যার ভাবসঙ্গমের প্রধান যুগ, যে-যুগে বাঙ্গলার অদ্বিতীয় সাধক ও নবভাব প্রবর্ত্তক ওড়িষ্যার সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে মনের কবাট একেবারে খুলিয়া দিয়া দিব্যভাব বিতরণ করেন,—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের যুগ। সে আজ প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের কথা। জীবনের বহুবর্ষ ধরিয়া বাঙ্গলার এই মহাসাধক তাঁহার ভক্তিবারি, প্রীতিরস ওড়িষ্যাক্ষেত্রে সিঞ্চন করেন; তাঁহার স্মৃতিপদ্ম এখনও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নীলসাগরের বুক জুড়িয়া আছে; যে-পথ দিয়া তিনি নিত্য মন্দিরে যাইতেন আজও তাহার নাম গৌরবাট, সে-পল্লী গৌরবাটসাহী নামে পরিচিত; গঙ্গামাতা মঠ, ওড়িয়া মঠ, গম্ভীরা ও অরুণ স্তম্ভে মহাপুরুষের পরশ এখনও যেন লাগিয়া আছে,—সে-পরশ ত শুধু বাহ্য নয়। চৈতন্যদেবের পূত স্পর্শে কত হিয়া জাগিল, কত স্ফুটমান পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া দশদিক সৌরভে আমোদিত করিল, কত সুপ্তপ্রাণ উদ্বুদ্ধ হইল, কে তাহার সন্ধান রাখে? কিন্তু ওড়িষ্যার কবি জগন্নাথ দাসের সঙ্গে তাঁহার যে সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা স্মরণ-যোগ্য, ইতিহাস তাহা ভুলিবে না। কবি জগন্নাথ দাস ওড়িষ্যার ব্যাস কবি, তিনি নবাক্ষর বৃত্তে ওড়িয়া ভাগবত রচনা করিয়া গিয়াছেন, ধনীর প্রাসাদে ও দরিদ্রের কুটীরে সর্ব্বত্র তাঁহার অব্যাহত গতি; ইউরোপে যেমন বাইবেল, ওড়িষ্যায় তেমনই ভাগবত; বাঙ্গলার চণ্ডীমণ্ডপের মত কি তদপেক্ষাও আবশ্যক—ওড়িষ্যার "ভাগবত টুঙ্গী"। চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাসীবেশে সহচর সংবেষ্টিত হইয়া শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন তখন জগন্নাথ দাসের বয়স ১৯ বৎসর মাত্র। বড় দেউলে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রভু যখন বটমূলে উপস্থিত হইলেন তখন সেখানে জগন্নাথ শ্রীমদ্ভাগবত চর্চ্চায় একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মস্তুতি (১০ম স্কন্ধ) পাঠ করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে সেই প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর আড়াই দিন উভয়ের একত্র বাস—এবং তাহার পরও মহাপ্রভু মন্দিরে আসিয়া নিত্য বটমূলে কিছুক্ষণ ধরিয়া পুরাণ শুনিতেন; অবৈষ্ণবের এতাদৃশ আদর দেখিয়া অন্য ভক্তগণ আপত্তি তুলিলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। এদিকে জগন্নাথ দাসেরও মনে দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ জন্মিলে তিনি দুই হস্তে মহাপ্রসাদ লইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন; মহাপ্রভু তখন কাশী-মিশ্রের গৃহে বাস করিতেছিলেন; কাশীমিশ্রের গৃহ এখন রাধাকান্ত মঠ নামে পরিচিত। মহাপ্রভুর আদেশানুসারে উৎকলীয় মত্ত বলরাম দাস জগন্নাথকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণে অনুরাগ এবং পুরাণ ব্যাখ্যার নৈপুণ্যে চৈতন্যদেব তাঁহাকে "অতি বড়" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং সে আখ্যা আজও তাঁহাতে লাগিয়া আছে। অতি বড় জগন্নাথ দাসের প্রতিষ্ঠিত ওড়িয়া মঠ বড় দেউলের সন্নিহিত। ওড়িষ্যার প্রসিদ্ধ স্ত্রী কবি মাধবী শিখি মাহিতীর ভগ্নী। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ে আসিয়া তিনি মধুর পদ রচনা করেন। আজও সে কান্তপদাবলী রসিক ভক্তজনের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। সার্ব্বভৌম চৈতন্য-দেবের সঙ্গে ওড়িষ্যার ভক্তবৃন্দের পরিচয় করাইয়া দিবার সময় বলিতেছেন,—

এই সব লোক প্রভু! বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হৈয়া আছে তোমা মিলিবারে॥
... ...
শিখি মাহিতী এই লিখন অধিকারী।
... ...
মুরারি মাহিতী শিখি মাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই॥

(শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত
মধ্য লীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ)

শিখি মাহিতীর ভগ্নী মাধবী দেবীর নিকট ভিক্ষা লইতে গিয়াছিল বলিয়াই মহাপ্রভু, হরিদাসের চরম দণ্ড বিধান করেন :—

ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া॥
মোর নামে শিখি মাহিতীর ভগ্নীস্থানে গিয়া।
ওরাইয়া চালু এক মান আনহ মাগিয়া॥
মাহিতীর ভগিনী সেই—নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আরে পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে রাধা ঠাকুরাণীর গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিন জন॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী, আর তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধজন॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা,
২য় পরিচ্ছেদ)

অনুসন্ধান করিলে হয়ত আরও অনেক পদাবলীর পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। গত বৎসরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আর দুইজন প্রসিদ্ধ পদ-রচয়িতার নাম করিয়াছেন—কানাই খুঁটিয়া ও চম্পতি রায়; গত পৌষ সংখ্যার বঙ্গবাণীতে এক প্রবন্ধে ওড়িয়্যার অন্য দুইজন পদকারেরও উল্লেখ দেখিলাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নয়াগড়ের অধ্যাপক বংশে সদানন্দ কবি সূর্য্যব্রহ্ম নামে জনৈক বৈষ্ণবের আবির্ভাব হয়; কবিকুলের তিনি অন্যতম মণি; 'কবিসূর্য্যব্রহ্ম' উপাধিতে তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার লেখনী-প্রসূত 'চোরচিন্তামণি' কাব্যে তিনি গুরু-পরম্পরার কথা বলিতে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাধন সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন;—

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বেশ্বর।
সে আশ্রয় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।
তদনুজ শ্রীঅনন্ত আচার্য্য গোস্বামী।
সে শিষ্য শ্রীরঘুগোপাল গোস্বামী পুণি।
তাঙ্ক অনুগত লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
ঠাকুরাণী গঙ্গামাতা তাঙ্ক কৃপাপাত্র।
শ্রীবনমালীদাস গোস্বামী সে আশ্রিত।
তাঙ্ক সেবক শ্রীকিশোরদাস নামরে।
সাধুচরণ দাস আশ্রয় তা পয়রে।

এই সাধুচরণের নাম—সদানন্দ কবি সূর্য্যব্রহ্ম। চৈতন্যদেবের প্রভাব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব তাঁহার কাব্যে কতদূর পড়িয়াছিল তাহা কবির রচিত "চোরচিন্তামণি" কাব্য পাঠ করিলে অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে; উক্ত কাব্যের প্রত্যেক 'ছন্দে' বা সর্গের প্রথম ভাগে গৌরচন্দ্রের কৃষ্ণলীলা শ্রবণে ভাবাবেশের উল্লেখ করিয়া তৎপরে রাধাকৃষ্ণ কথার সন্নিবেশ করা গিয়াছে। কবিসূর্য্যের শিষ্য 'অভিমন্যু সামন্তসিংহার' উৎকলের কাব্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বৈষ্ণবধর্ম্মের, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলন এখনও উড়িষ্যায় থামে নাই, বিংশ শতাব্দীতেও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ওড়িয়াভাষায় অনূদিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ভাবে দেখা যায়, বৈষ্ণবধর্ম্মের যে-ভাবস্রোত একদিন বঙ্গ হইতে উৎকলাভিমুখে তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, আজও সে-স্রোত মিলাইয়া যায় নাই। একটা বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উভয় দেশ হাত ধরাধরি করিয়া অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছিল, আজও সে-গতির বেগ সম্বরণ করে নাই; যে-মধুর আনন্দসঙ্গীত তাহাদের কণ্ঠে বাজিয়াছিল তাহার সুর এখনও বাতাসে মিলাইয়া যায় নাই; যাহাতে সে-সুর না মিলায়, যাহাতে সে-বেগ না ফুরায়, তৎপ্রতি অবহিত হইবার আবশ্যকতা কিছু আছে কি না তাহা সুধীজনের বিবেচ্য; কিন্তু এস্থলে এইমাত্র দ্রষ্টব্য যে, অতীতের সে-বন্ধন এখনও একেবারে ছিন্ন হয় নাই, তাহা অটুটই রহিয়াছে এবং আমরা পথভ্রষ্ট না হইলে তাহা অটুটই থাকিবে।

চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধনার যে-ধারা চলিতেছিল তাহা বাদ দিলেও ওড়িষ্যার ও বাঙ্গলার অন্যবিধ যোগসূত্র আমাদের চোখে পড়ে। মোগল ও মারাঠাদের আমলে অনেক বাঙ্গালী দেশ ছাড়িয়া আসিয়া উৎকলে বসবাস আরম্ভ করেন তাহার প্রমাণ আছে। যাজপুরের গৌরাঙ্গরায় মারাঠাদের আমলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তারপর ইংরেজদের আমলে উনবিংশ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর যে প্রাধান্য দেখা যায় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া টয়েনবী সাহেব বলিয়াছেন, তখন ওড়িষ্যার শাসনকর্ম্ম ইংরাজীনবিশ অথবা ইংরাজী কায়দায় অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ বাঙ্গালীর সাহায্য নহিলে চলিত না। এই কর্ম্মসূত্রে জড়িত হইয়া বহু বাঙ্গালী উড়িষ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম নহে।

কিন্তু ওড়িষ্যায় বাসমাত্রে কিম্বা রাজকার্য্য সম্পাদনেই বাঙ্গালীর শক্তি ও সাধনা পর্য্যবসিত হয় নাই; ওড়িষ্যার সাহিত্যভাণ্ডারে সে বিবিধ রত্নসম্ভার আহরণ করিয়া আনিয়া দিয়াছে। ওড়িষ্যার সাহিত্যসম্পদ সাধ্যমত সমৃদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক উড়িয়া সাহিত্য যে তিনটি বাণী সাধকের কীর্ত্তি, তাঁহারা তিনজনই ওড়িয়া বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের একজন মহারাষ্ট্রীয় বংশসম্ভূত,—ওড়িয়া সাহিত্যের ভক্তকবি মধুসূদন রাও, আর একজন বাঙ্গালী বংশসম্ভূত,—রাধানাথ রায়। রাধানাথের উপর ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাব পড়িয়াছিল, অন্ততঃ তাঁহারই উপদেশে রাধানাথ বাঙ্গলা কবিতা ছাড়িয়া ওড়িয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন তাহার

প্রমাণ আছে। পুরাতন বঙ্গদর্শনের ফাইল খুঁজিলে অন্যতম সাহিত্যিক সূত্রধার ফকিরমোহন সেনাপতি মহাশয়ের বাঙ্গলা লেখাও পাওয়া যাইবে। ওড়িষ্যার ভাষা অর্থাৎ বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ভাষা ওড়িয়া হইবে না বাঙ্গলা হইবে এই লইয়া যখন গোল বাধিতেছিল তখন সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্যের আদর্শে পুস্তক লিখিত হয় এবং ফকিরমোহন, বিদ্যাসাগর-কৃত জীবনচরিত ওড়িয়ায় অনুবাদ করেন, একথা যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর ওড়িষ্যার বিষয়ে কিছুমাত্র সংবাদ রাখেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন। ওড়িয়া সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের কতখানি বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধেয়। প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর রায় ওড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালী; সুতরাং আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের উপর বাঙ্গালীর ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

একদিকে যেমন ওড়িয়া সাহিত্যে বাঙ্গালীর ছাপ ধরিতে পারা যায়, অন্য দিকে তেমনই ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের দেশের বহু সাহিত্যিক, বঙ্গ সাহিত্য সেবকদের মধ্যে অনেকে, ওড়িষ্যায় কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়া কাব্যরসের উপাদান বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমযুগের কথা মনে পড়ে; রঙ্গলাল, বঙ্কিম এবং তৎপরবর্ত্তী নবীনচন্দ্র তাঁহাদের রচনার বহু উপাদান ওড়িষ্যায় পাইয়াছিলেন; বিশেষ করিয়া রঙ্গলালের কাঞ্চিকাবেরীর কথা বলা চলে। আবার, উৎকলের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস তিনি সর্ব্বপ্রথমে রচনা করেন, উৎকলের সুসন্তান সেই প্যারীমোহন আচার্য্য মহাশয় তাঁহার পুস্তক বঙ্গকবি রঙ্গলালের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

সংশয়কুহেলিসমাচ্ছন্ন চর্য্যাপদের ইতিহাসে উৎকল-দেশাগত কাহ্নুপাদের কথা আমাদের মানসপটে গভীর রেখাপাত না করিলেও ইংরাজাধিকারের পরবর্ত্তী বঙ্গ-সাহিত্যে অন্ততঃ দুইজন ওড়িষ্যাবাসীর পদাঙ্ক স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়;—গোপাল উড়ে ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। পাশ্চাত্য প্রভাবের সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বে যে-যে বাক্যকলাকুশল কবিদের শব্দঝঙ্কারে বঙ্গ-সাহিত্য মুখরিত, ধ্বনিত, ঝঙ্কৃত হইতেছিল, গোপাল উড়ে তাঁহাদের অন্যতম; আর ১৮০১ খৃঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ, অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া যাঁহারা বাঙ্গলা গদ্য রচনারীতির ভিত্তিস্থাপন করেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহাদের মধ্যে একজন। উভয়েরই পূর্ব্বনিবাস যাজপুরে বলিয়া শোনা যায়। এই ভাবে উৎকলবাসী বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীর গুরুস্থানীয় হইয়া বসিয়াছিল,সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

কণার্কের বিবরণ-রচয়িতা ও ওড়িয়াশিল্পশাস্ত্রে অভিনিবিষ্ট স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমার বসুর নিকট শুনিয়াছি, স্থপতিবিদ্যার, মন্দির নির্ম্মাণ, ওড়িয়ার সহিত বাঙ্গালীর এককালে গুরুশিষ্য কিম্বা দাতা ও গ্রহীতার সম্বন্ধ ছিল, তাহা বাঙ্গালীর মন্দিরের গঠনপ্রণালী এখনও সপ্রমাণ করিতেছে! শুদ্ধ একখানি এক চালার ঘর, ইহাই বাঙ্গালী মন্দিরের আদি স্বরূপ; তাহার পর ক্রমে পাশাপাশি দুইখানি চালের উপর ওড়িষ্যার সাধারণ মন্দিরের অনুরূপ একটি অংশ চূড়ার মত বসাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা অবশ্য তেমন খাপ খায় নাই, সুসমঞ্জস হয় না; ক্রমে সমস্ত মন্দিরের সহিত সঙ্গিত রক্ষা করিবার জন্য উপরের এই অংশ খর্ব্ব করিয়া নেওয়া হইয়াছে, এবং ইহাকেই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রত্ন নাম দিয়া যত্র তত্র বিন্যস্ত করিয়া শোভাবর্দ্ধনের আয়োজন করা হইয়াছে; পাহাড়পুরে ঐতিহাসিক অন্বেষণে, যে মন্দির প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য শিল্প বিষয়ে, মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, বাঙ্গালীর মৌলিকতার প্রমাণ থাকিতে পারে—যবদ্বীপের মন্দিরের সহিত তাহার না কি একটা চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে, দেবতা দর্শনের জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই, বাহির হইতেই সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। মন্দিরের গাত্র খোদাই করিয়া দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু পাহাড়পুরের কথা ছাড়িয়া দিলে বঙ্গ দেশের অন্যত্র যে ধরণের মন্দির সর্ব্বদা প্রচলিত দেখা যায় তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ওড়িষ্যার শিল্পের প্রভাব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঈদৃশ সংযোগ অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে।

ওড়িয়া শিল্প শাস্ত্রে অবশ্য গৌড়ীয় রীতি বা শৈলীর উল্লেখও আছে।

শুধু মন্দির নির্ম্মাণে নয়, অলঙ্কার শাস্ত্রেও উৎকলীয় পণ্ডিত বাঙ্গলার গুরুর আসনে বসিয়াছিলেন; আজ পর্য্যন্ত "অষ্টাদশ ভাষা বারবিলাসিনী ভুজঙ্গ" বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ বাঙ্গলার তথা ভারতের অন্যতম প্রামাণ্য অলঙ্কার গ্রন্থ বলিয়া সম্মান পাইয়া আসিতেছে, বহু বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গলাকে অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছে। বিদ্যাধর-কৃত একাবলী, বিদ্যানাথের প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের রসগঙ্গাধর অলঙ্কারশাস্ত্রে উৎকল মনীষার পরিচয়। যদি সাহিত্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্প জাতীয় আত্মার অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে বঙ্গে ও উৎকলে যে আত্মার যোগ আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা যদি অতীতকে উপেক্ষা করিয়া অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারিতাম তাহা হইলে হয়ত এই যোগ অস্বীকার করা চলিত। কিন্তু তাহা ত আর সম্ভব নয়, আর আমরাও নিশ্চয় অগ্রসর হইতে চাই, অতীতে যাহা কিছু উদার ও মহৎ ছিল তাহা লইয়াই, তাহা কাটিয়া ছাঁটিয়া বাদ দিয়া নয়।

অতীতের সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চর্চ্চার দ্বারা তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া লইতে হইবে; তাই নিবেদন, প্রতিবেশীর বিষয়ে বঙ্গবাসী অবহিত হউন। বহু দিন হইতে বাঙ্গালীর সাধ আছে, মহাপ্রভুর লুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধার করিবে, উড়িষ্যার বহু স্থলে যে-সব অপ্রকাশিত পুঁথি আছে সে সব পুঁথি আনিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবে, মহাপুরুষের উদার চরিতের আরও পরিচয় পাইবে। উড়িষ্যার গহন বনে নানা কর্ম্ম ব্যপদেশে অনেক বাঙ্গালীকে যাইতে হয়; তাঁহাদের কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি এ লক্ষ্য তাঁহাদের সকল কর্ম্মের মধ্যে স্থির থাকে, তাঁহারা যদি কিছু জানিতে পারেন তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু বাহির হইল না। কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক পরলোকগত ডাক্তার [illegible]শেখর কালী মহাশয় "ওড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য" সম্বন্ধে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে পুরস্কার ঘোষণার ফল আজও আমাদের অজ্ঞাত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা কটকে স্থাপিত হইবার সময় শুনিয়াছিলাম এবং আশাও ছিল যে, এইবার বুঝি উৎকলের কথা বঙ্গ ভাষায় শুনিতে পাইব, কিন্তু সে আশাও আশামাত্র রহিয়া গেল। বাস্তবিক পক্ষে এ আশা কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত নহে; ওড়িষ্যায় যে-সব ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, তাঁহাদের সহায়তা পাইলে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ঔপনিবেশিক নহেন, অথচ নানাবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এরূপ বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ওড়িষ্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে; তাঁহাদের সাহায্য পাইলেও এরূপ আশা মনে পোষণ করা নিতান্ত বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না।

প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যের কথা আসিয়া পড়ে; সাহিত্যে দেশের আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য কথা বলিতে কি, বাঙ্গালীর পক্ষে প্রাদেশিক সাহিত্য চর্চ্চা করা এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে প্রয়োজনের কথা পরলোকগত আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব হইয়াছে। তবে দেশবাসীর সেজন্য জ্ঞানপিপাসা আদৌ না থাকিলে এরূপ সব ব্যবস্থাই নিষ্ফল। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশবাসীর দিক হইতে সে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি কবে হইতে হইবে? শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর সহিত ওড়িষ্যার যোগাযোগ এখনও বর্ত্তমান; বাঙ্গালী কি নিজ সাহিত্য-গর্ব্বে অন্ধ হইয়া থাকিবে, প্রতিবেশীর বর্ত্তমান সাহিত্য-রচনার এবং অতীত সাহিত্যসম্পদের খোঁজ লইবে না? দেশে দেশে অভাব অনুযায়ী সৃষ্টি হয়; যদি আমাদের এ বিষয়ে অভাববোধ থাকে তবে সে অভাব পূরণের ব্যবস্থা কোনও উপায়ে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের অভাববোধ কোথায়? বঙ্গসাহিত্য আজ যতই সমৃদ্ধ বলিয়া মনে করি না কেন, প্রতিবেশী সাহিত্যের সহিত তাহার একটা সম্বন্ধ আছে, তাহাকে সে উপেক্ষা করিয়া বাড়িতে পারে না। কবে সে-সম্বন্ধ বিদেশী পণ্ডিত আসিয়া দেখাইয়া দিবেন তবে আমরা তাহা জানিতে পারিব।

মিশনরীদের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইতেছে ; আমরা কি সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব ? আর, আমাদের দেশে যে সব মনস্বীর দৃষ্টি বৃহত্তর ভারতের প্রতি অধুনা নিবদ্ধ, নিঃসন্দেহ তাঁহারা আমাদের নমস্য, কিন্তু আলোর পাশে অন্ধকার স্বাভাবিক হইলেও জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে অমার্জ্জনীয় ত্রুটি এবং নিতান্ত অশোভন ; প্রতিবেশীর গৃহে, কি আমাদেরই ঘরের আনাচে-কানাচে বহু দর্শনীয় বস্তু আছে, অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয় আছে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করাও কর্ত্তব্য। সুতরাং বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্গের প্রতিবেশী বিহার ওড়িষ্যা আসামের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, অতীত ইতিহাসের অনেক পাদপূরণ করিতে পারিবেন, নিজেদের দেশও আরও সহজবোধ্য হইবে।

জার্ম্মান্ নারীর ব্যায়াম চর্চ্চা

(এলিস্ মেয়ার)

[এই প্রবন্ধটির ছবিগুলিতে নারীদের পরিচ্ছদ যেরূপ আছে, তাহা ভব্য ও শোভন নহে, সুতরাং অনুকরনীয়ও নহে। কেবল ব্যায়ামগুলি বুঝাইবার জন্য ঐরূপ চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় নারীরা তাঁহাদের শোভন ও ভব্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ব্যায়াম করিবেন। ব্যায়ামরতা জার্ম্মান নারীদের যেরূপ পরিচ্ছদ চিত্রে আছে, মনে রাখিতে হইবে তাহা তাঁহাদেরও সাধারণ পোষাক নহে। প্রবাসীর সম্পাদক।]

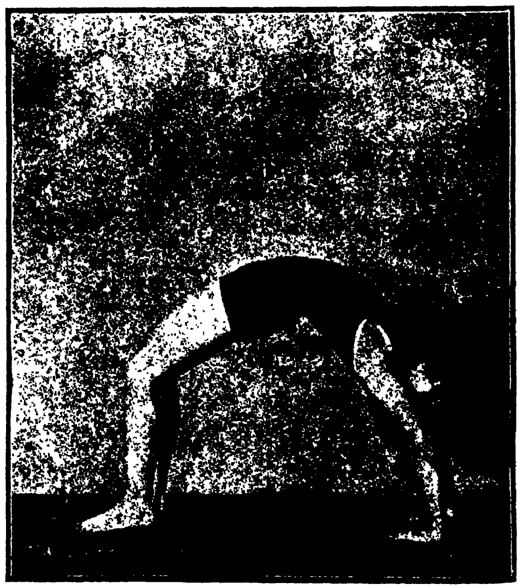
বর্ত্তমান জার্ম্মান্ নারীদের তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

১। প্রাচীনপন্থী—ইঁহাদিগের শরীরচর্চ্চার কোন চেষ্টা নাই।

২। মধ্যপন্থী—বিদ্যালয়ে বাধ্য হইয়া ইঁহাদিগকে ব্যায়াম করিতে হইত। সে ব্যায়াম বালকদিগের ব্যায়ামেরই অনুরূপ ; এবং তাহা যুদ্ধের ড্রিল্ শিক্ষার মত। নারী-ব্যায়ামের বিশেষ কোন ব্যবস্থা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

৩। আধুনিকপন্থী—ইঁহাদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চা হইতেছে এবং সে-ব্যায়াম নারীর শরীরগঠনের উপযোগী।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই মেয়েদের শরীর-চর্চ্চার প্রয়োজন দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতেছিলেন ; কিন্তু বালকদের ব্যায়াম-রীতিই বালিকাদের জন্যও ব্যবস্থিত হয়। বালিকাদিগকে সপ্তাহে দুইবার ড্রিল্ ও নিম্নলিখিত ব্যায়াম করিতে হইত—



১ম চিত্র

গোড়ালি একত্রে—পায়ের পাতা ফাঁক ; বুক—উঁচু তলপেট—সঙ্কোচ ; হাঁটু—সোজা ; ইত্যাদি।

মোটের উপর ইহা সম্পূর্ণ বালকদের ব্যায়াম এবং যুদ্ধের ড্রিল্।



২য় চিত্র



৩য় চিত্র

গত কয়েক বৎসরে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের পরে, ব্যায়ামকার্য্যে জার্ম্মান্ নারী বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন।



৪র্থ চিত্র

তাঁহাদের ব্যায়ামের অনেক নূতন পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। এই সব পন্থা নারী-শরীরের উপযোগী। ব্যক্তি বিশেষে স্বতন্ত্র পন্থা গৃহীত হইলেও মেয়েদের ব্যায়াম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। ইহা পুরুষদের ব্যায়াম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।



৫ম চিত্র

বর্ত্তমানে মেয়েদের ব্যায়ামের প্রধান কথা হইতেছে—প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বপ্রকৃতি অনুযায়ী উপায়ে শরীরোন্নতি লাভে অগ্রসর করা। এই প্রণালীর মূলে শরীর-গঠন যেমন রহিয়াছে তেম্নি রহিয়াছে মানসিক উন্নতি।

প্রথম কথা—ড্রিলের অভ্যাস বর্জ্জন। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা ও মনোযোগ লইয়া চট্ করিয়া খাড়া

শক্ত হইয়া দাঁড়ানোর বদলে মেয়েদের শরীরের কাঠামো অনুযায়ী নমনীয় ভাবে দাঁড়ানো। দাঁড়ানোর ভঙ্গী আদেশের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে না। ব্যায়ামের কোন প্রণালী চালাইবার আগে সে প্রণালীটি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার উদ্দেশ্য ও ফলাফল দেখানো হয়; তাহাতে বালিকারা যাহা করিতেছে সে-সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ চেতন থাকে। প্রত্যেক পেশীসমষ্টি তাড়িত হয় এবং সমস্ত শরীর জীবন্ত হইয়া উঠে। যাহা



৬ষ্ঠ চিত্র

করিলে শরীরের উপকার হয়—এইভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেককে এরূপ ব্যায়াম নির্দ্দেশ করা হয় যাহাতে পেশীর সঙ্কোচন ও বিস্তারের দ্বারা সমস্ত শরীর খুব দৃঢ় ও নমনীয় হয়।

এই ব্যায়ামের প্রত্যেক প্রণালীর পরিচয় দিতেছি। প্রণালীগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম।
(২) ছন্দানুগ ব্যায়াম।
(৩) কলাকৌশল ব্যায়াম

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত ব্যায়াম

ইহা প্রাচীনতম এবং অপর প্রণালী-সমূহের ভিত্তি স্বরূপ। শরীর-সংস্থানের প্রকৃত জ্ঞানের উপর এই প্রণালী



১ম চিত্র

প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও তলপেট সংবদ্ধ হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সুনিয়মিত হয়। অন্যান্য প্রণালীও আছে



২য় চিত্র

যাহা দ্বারা শিথিল তলপেট দৃঢ় হয়, তোবড়ানো চিবুক সংস্থিত হয়, পৃষ্ঠদেশের পেশী সকল শক্ত হইয়া মেরুদণ্ডের পার্শ্বিক বক্রতা দৃঢ় করে, তলপেটের পেশী আঁট করে,

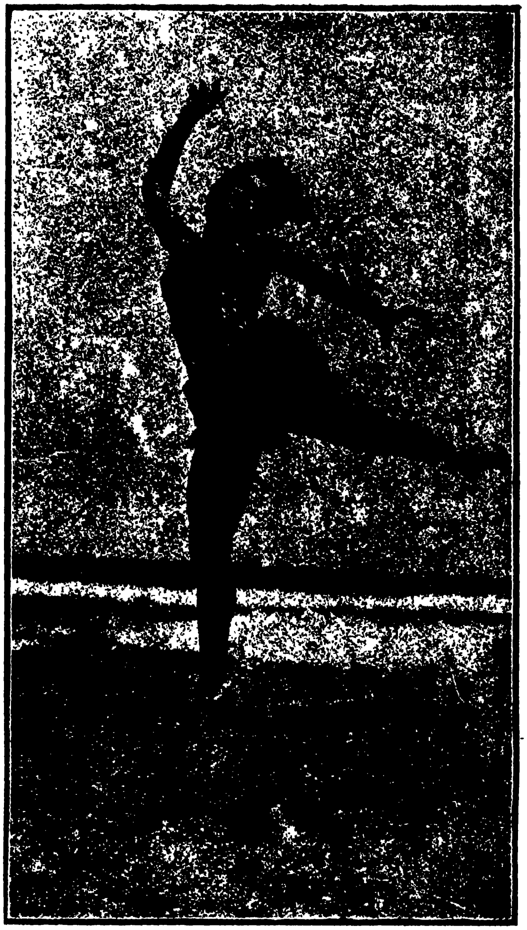


৮ম চিত্র

বক্ষস্থলের গঠন আল্‌গা হয় না, ইত্যাদি। এই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানগত ব্যায়ামের একটি প্রকার হইতেছে দেহবিকৃতি-দূরীকরণ প্রণালী; এই প্রণালীকে দেহারোগ্যকর প্রণালীও বলা যাইতে পারে।

ছন্দানুগ ব্যায়াম

ইহা দ্বারা দেহের অঙ্গসমূহের পরস্পরের সুসঙ্গতি ও ছন্দানুবর্ত্তিতা সাধিত হয়; অর্থাৎ, পেশীসমূহ এরূপ ভাবে পরিচালিত হয় যাহাতে প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী বেশ নমনীয় ও সৌন্দর্য্যানুগ হয়। এইজন্য এই ব্যায়ামের সঙ্গী



১১শ চিত্র

হইতেছে সঙ্গীত। এই ব্যায়ামে বয়স্থ মেয়েরা দেহে ও মনে উন্নতি লাভ করিতে পারে। এই ব্যায়াম শিক্ষার দুইটি বিদ্যালয় জার্ম্মানীতে আছে। সঙ্গীতের সাহায্যে অঙ্গপরিচালনের যে ব্যবস্থা তাহা সম্পূর্ণ স্ত্রীচরিত্রানুরূপ। এই হেতু ব্যায়ামের খুব চলন।

কলাকুশল ব্যায়াম

এই ব্যায়াম বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত গ্রহণীয়। বুদ্ধিমতী মেয়েরাই নিজ নিজ পন্থা অনুযায়ী ইহা পালন করে। এই



১৩শ চিত্র

ব্যায়ামের উদ্দেশ্য—দেহোন্নতি সাধন বিষয়ে দেহ যে মনের যন্ত্র মাত্র, ইহাই শিক্ষা দেওয়া। শরীর-সংস্থান জ্ঞান ইহাতে



১২শ চিত্র

উপেক্ষিত হয় না। এই ব্যায়াম শিক্ষারও নির্দ্দিষ্ট পথ আছে; তবে সেই নির্দ্দেশেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। ইহার ভাবটা ধরিয়া লইয়া তাহা প্রকাশ করাই হইতেছে উদ্দেশ্য।



১৬শ চিত্র



১৭শ চিত্র



১৯শ চিত্র



১৫শ চিত্র

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিস্তারের পুরাতন পন্থা অল্পই অনুসৃত হয়। ছাত্রীদের দলে দলে দাঁড় করাইয়া দান, গ্রহণ, হর্ষ, ক্লেশ,



১৮শ চিত্র

যুদ্ধ ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে বলা হয়, আর ছাত্রীগণ প্রত্যেকে যথাশক্তি অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যে-সব মনোভাব প্রকাশ করিতে থাকে। যে-ভাব প্রকাশ করিতে বলা হয় তাহার সুপ্রকাশের দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়, কমনীয়তার দিকে তত নয়। প্রথম দর্শনেই এই ব্যায়ামকে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। একটা বিশেষ ভাবকে প্রকট করিবার জন্য ছাত্রীরা প্রত্যেকে ধীরে ধীরে ও পরস্পর অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ ভঙ্গী প্রদর্শন করে এবং অংশেষে প্রকাশের সঙ্গতি করিয়া লয়। এইরূপে



১৪শ চিত্র

প্রত্যেকের প্রকাশে পারস্পরিক শৃঙ্খলার অভাব দেখা গেলেও এই বিভিন্ন প্রকারের ভঙ্গীসমূহ একটি বৃহৎ শৃঙ্খলারই উপলব্ধি বা অভিব্যক্তি।

এইরূপে জার্ম্মাণীতে ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রভূত আন্দোলন ও উন্নতি হইতেছে। আমাদের এই দুর্ব্বল রোগগ্রস্ত দেশে মেয়েদের মধ্যে ব্যায়াম প্রবর্ত্তিত হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। নারী দৃঢ়দেহা, ও শক্তিসম্পন্না হইলে সন্তানও বলবান হইবে, এবং তাহা হইলেই জাতির ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। আমাদের বালিকাবিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিষয়ে অবহিত হইলে দেশের উপকার হইবে।

গুপ্ত

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয় করকমলে

বন্ধু

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝংকারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারি ভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—

কাছে থেকে শুনি নাই;— হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি'; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি', প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হ'তে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মের সাথে মানবমর্ম্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপ্তহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে। মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,

ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণে
হয়েছে পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এক কূলে ও কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

বার্গসঁ ও নোবেল প্রাইজ—

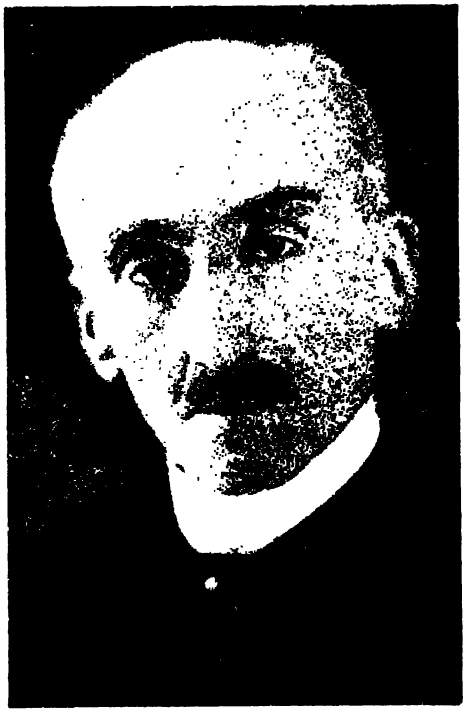
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ এবৎসর নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, এ সংবাদ এতদিনে সকলেই জানিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্যারিসের সাপ্তাহিক পত্র 'লা ভোয়া' লিখিতেছেন,—

"নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিয়া মসিয় আঁরি বার্গসঁর বিমল যশের অধিকতর বিস্তার হইবে না। বরঞ্চ বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিককে এই চরম সম্মানে ভূষিত করিয়া নোবেলপ্রাইজ কমিটির বিচারকগণই নিজেদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন একথা বলিলেই ঠিক হইবে।

"যে সময়ে বার্গসঁর প্রথম আবির্ভাব হয়, তখন ফ্রান্সের যুবক সম্প্রদায় কোঁত-কৃত 'পজিটিভ'-দর্শনের বদ্ধগৃহে বাস করিতে করিতে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আসিয়া চারিদিকের বাধাবন্ধন ভাঙিয়া, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন, বুদ্ধিবৃত্তির স্থান ঠিক কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, বুদ্ধি যে কেবলমাত্র জীবনধারণের সহায়ক, জড়পদার্থই যে তাহার প্রধান অবলম্বন, এই সত্য প্রমাণ করিয়া দার্শনিক বিচারের মধ্যে "ইনটুইশন"কেই মুখ্য স্থান দিলেন; জড়বাদী ও আদর্শবাদী উভয়কেই একটা সঙ্কীর্ণ মত অথবা বাদ আঁকড়াইয়া থাকিবার ভুল দেখাইয়া দিয়া অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সত্যানুসন্ধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর একটা সত্যকার 'পজিটিভ' দর্শনের স্থাপনা করিলেন। এই ধরণের দার্শনিক তত্ত্ব কোনো একটা "বাদে"র মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাই বার্গসঁ প্রাণহীন ও জড়, অথচ চিরাভ্যস্ত এবং চির-পরিচিত সংস্কারের ফাঁদ এড়াইয়া "সহজ" চোখে জগৎ ও সত্যকে দেখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

"বার্গসঁর প্রধান প্রধান বইগুলির নাম এই ;—'লে দনে ইমেদিয়াত দ্যু লা কঁসিয়ঁস'; 'মাতিয়ের এ মেমোয়ার'; 'লেভল্যুসিয়ঁ ক্রেয়াত্রিস্'; 'আঁত্রদ্যুক্সিয়ঁ আ লা মেতাফিজিক্'; ও 'লেনের্জি স্পিরিত্যুয়েল্'। এই কয়টি গভীর তথ্যপূর্ণ পুস্তক ভিন্ন তিনি আবার 'লা রির" নামক বিখ্যাত পুস্তকের প্রণেতা। দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া বার্গসঁ ১৯২২ সনে 'দ্যুরে এ সিমিউলতানেইতে আ প্রপ দ্য তেওরি দাইনষ্টাইন"নামক আর একটি বই প্রকাশিত করিয়াছেন। (বলা বাহুল্য, বার্গসঁপ্রণীত সবগুলি পুস্তকেরই ইংরেজী অনুবাদ আছে।) এবারে তাঁহার লেখনী হইতে নীতি সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রসূত হইবে, এই গ্রন্থ তাঁহার জীবনব্যাপী সত্যানুসন্ধান ও গবেষণার মুকুটমণির মত বিরাজ করিবে; এ আশা লোকে অনেক দিন ধরিয়া করিতেছে। কিন্তু বার্গসঁ লোক-সমাজ হইতে বহুদূরে নির্জ্জনবাস করিতেছেন। তাঁহার তপস্যা আজিও শেষ হয় নাই, কিন্তু তিনি আর কিছু লিখিবেন না।"

বার্গসঁ চিন্তাজগতে একটা যুগান্তর আনিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বার্গসঁর দার্শনিক তত্ত্বের আর একটা দিক আছে। সেই দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহার মতামত সমাজের পক্ষে একান্তই মঙ্গলজনক হইয়াছে একথা বলা চলে না। তিনি নিজে চিন্তাবীর মাত্র, কর্ম্মক্ষেত্রে কখনও সাক্ষাৎভাবে



আঁরি বার্গসঁ

নামিয়া আসেন নাই। তবুও তাঁহার দার্শনিক মত বিংশ শতাব্দীর সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন ও বিপ্লবের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা একটা নিছক্ দার্শনিকবাদের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল ইহাই বিস্ময়ের কথা। ১৯১৬ কি ১৯১৭ সনে সুপরিচিত ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদ্ হবহাউস্ প্রথমে একটি প্রবন্ধে বার্গসঁর দর্শনের সহিত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ এবং নব্য সিণ্ডিকালিজম্ ও অ্যানার্কিজম্ এর যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহার ইঙ্গিত করেন। তারপর এই দশ বার বৎসরে বার্গসঁর বিরুদ্ধবাদীরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। রণশ্রান্ত, বিপ্লবশ্রান্ত, পরিবর্ত্তনশ্রান্ত নব্য ফ্রান্সের নূতন দার্শনিকগণ বুদ্ধিদ্বেষী, অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনবাদী বার্গসঁ

হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহার নাম মসিয় জাক মারিতঁ। ইনি ইতিমধ্যেই য়ুরোপে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইনি যে কেবলমাত্র বার্গসঁরই বিরোধী তাহা নহে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেকার্তও ইঁহার মতে অন্তঃসারশূন্য। ইনি দেকার্তপ্রমুখ সকল পুরাতন সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মধ্যযুগের সেণ্ট টমাস আকুইনাস্‌কে আবার দার্শনিক রাজচক্রবর্ত্তীত্বে অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছেন। আর একজন ফরাসী সমালোচক কেবলমাত্র বার্গসঁর দার্শনিক যুক্তিকে একটি প্রগাঢ় পণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার উপরে আবার বার্গসঁর মতকে বর্ত্তমান যুগের উচ্ছৃঙ্খলতা, গণতান্ত্রিক উত্তেজনা ও ভাঙিবার জন্যই ভাঙিবার প্রবৃত্তির জন্য দায়ী করিয়া তাঁহাকে 'বিশ্বাসঘাতক দার্শনিক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অভিযোগ যে অন্ততঃ আংশিক ভাবে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বার্গসঁ নিজে কখনও রাজনৈতিক অথবা সামাজিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে হীন বলিয়া প্রচার করিয়া, প্রাণের সাবলীল স্ফূর্ত্তিকেই জীবজগতের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার দর্শনকে একটা সবুজ, অবুঝ, কাঁচা ও অন্ধ বিপ্লববাদের বেদ করিয়া তুলিয়াছেন. ভুল হইলেও প্রাণের উন্মাদনায় সত্যের সন্ধান করিতে বলিয়া, সাধারণ বার্গসঁপন্থীকে সত্যানুসন্ধানের অপেক্ষা বাছা বাছা ভুলকেই বড় করিয়া দেখিবার একটা সুযোগ দিয়াছেন। বার্গসনীয় দর্শনপ্রসূত এই মাদকতার একটা ঢেউ আমাদের দেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আজকাল আমরা চারিদিকে যে একটা 'ভাঙ', 'ভাঙ' রব শুনিতেছি তাহার প্রথম সূত্রপাত কোথায় হয় তাহা কে না জানে? সেই অধুনালুপ্ত সবুজপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রথমচৌধুরী নিজেকে বার্গসঁপন্থী বলিয়া প্রচার করিতেন ইহা কাকতালীয় ন্যায় মাত্র নয়।

'ফাশিস্ত' ও 'ফাশিস্ত'-বিরোধী—

সিনিয়র মুসোলিনির বক্তৃতাগুলি পড়িবামাত্রই মনে হয় এই সুর, এই কথা যেন কাহারও মুখে আগেই শুনিয়াছি, যেন বহুবিস্মৃত অথচ চিরপরিচিত কেহ দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর আবার আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। ধারণাটা সত্য। প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনচ্যুত জর্ম্মণ সম্রাটের সহিত ইতালীর বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার একটা সাদৃশ্য আছে. সেই স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরবঘোষণা, সেই অসির ঝনৎকার, সেই দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ, সেই অলঙ্কারস্রাবী জ্বালাময়ী ভাষা। ফল দুই ক্ষেত্রেই সমান দাঁড়াইবে কিনা প্রশ্নের বিচার করিবার সময় আজও আসে নাই। তবে ফাশিস্ত শাসনতন্ত্র যে ইতালীকে আপাততঃ শক্তিশালী ও সুশাসিত করিয়া তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র স্থান নাই। সিনিয়র মুসোলিনি তাঁহার নবপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে এই শাসনতন্ত্রের জয়গান করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে নিজের প্রতিও নিতান্ত অবিচার করেন নাই।—

"আমার চরিত্রবল ফাশিস্ত আন্দোলনকে যে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার করিয়া তুলিতেছিল, আমি ব্যক্তিবিশেষের এই প্রভাব হইতে দলকে মুক্ত করিতে ও তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু উহাকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা ও প্রয়াস আমার যতই বাড়িয়া চলিল, ততই যেন আমি আরও ভাল করিয়া বুঝিতে লাগিলাম যে, আমার নেতৃত্ব, আমার সাহায্য, আমার মন্ত্রণা আমার অসি ভিন্ন আমাদের দলের দাঁড়াইবার, বাঁচিবার, জয়ী হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

ফাশিস্ত আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯১৯ সনে। সেই সকল দিনের কথা বলিতে বলিতে সিনিয়র মুসোলিনি এক জায়গায় লিখিতেছেন,—

"আমাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট এবং সরল বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা এই—আমাদের যুদ্ধজয়ের ফলকে যেমন করিয়া হউক চিরস্থায়ী করা এবং যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহাদের পবিত্র স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখা..."

ইতালীর এই কয়েক লক্ষ মৃত সন্তানের নামে ফাশিস্ত শাসনতন্ত্র যে ইতালীর আরও কত সহস্র সন্তানকে নিহত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহার হিসাব আজও হয় নাই। ইতালীর কোনও সংবাদপত্রে ফাশিস্তদলের বিরুদ্ধে একটি বর্ণও প্রকাশিত হইবার উপায় নাই। স্বাধীনমত ব্যক্ত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া ইতালীর প্রধান সংবাদপত্র 'করিরে দিতালিয়া' বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। তবুও অনেক ইতালীবাসী বিদেশে পলাইয়া গিয়া ফাশিস্তদের অত্যাচারের কথা কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রফেসর সাল্‌ভেমিনি একজন। তিনি দুই তিন বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের রিভিউ অফ রিভিউজ ও অন্যান্য পত্রিকায় বর্ত্তমান ইতালীর শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দিয়াছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ও কম্যুনিষ্ট নেতা আঁরি বারব্যুস্ ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনিয়াছেন তাহার একটিও যদি সত্য হয় তবে ফাশিস্ততন্ত্র যে বিধাতার একটা অভিসম্পাত একথা অস্বীকার করিবার পথ নাই। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে দোষ কবুল করাইবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় বলিয়া মসিয় বারব্যুস্ বলেন, নিম্নলিখিত অত্যাচারগুলি তাহাদের কয়েকটি।—"গরম জলে বন্দীদের হাত ডুবাইয়া রাখা; খাইতে না দেওয়া; অন্ধকারে বন্ধ করিয়া রাখা; শরীরের মধ্যে ইনজেক্‌সন্ করিয়া বিষ ঢুকাইয়া দেওয়া; নখের নীচে ও শরীরের অন্যান্য নরম স্থানে পিন ফুটাইয়া দেওয়া; এক প্রকার বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া পেটে ঘা করিয়া দেওয়া; ছুরী দিয়া জিবে ক্ষত করা; শরীরের স্থান বিশেষের লোম টানিয়া তুলিয়া ফেলা; বিষাক্ত পোকার কামড় খাওয়ান।" ফাশিস্তগণ তাঁহাদের শাসনে ইতালীর দ্বিতীয় 'রিসর্জ্জিমেণ্টো' (জাগরণ) হইতেছে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। মাৎসিনির বাণী যে এই নবজাগরণের মন্ত্র নয় এইটাই উপলব্ধি করিবার বিষয়।

আফগানিস্থান—

আফগানিস্থানের আমীরের বিরুদ্ধে শিনওয়ারীরা যে কেন বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার কারণ সম্বন্ধে নানা গুজব শোনা যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর আমানুল্লা খাঁ স্বদেশে পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন, তাহাই এ বিদ্রোহের মূলে; কেহ বা কথাটাকে নিতান্তই বাজে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। এ সুযোগে সোভিয়েট রুশিয়ার সংবাদপত্রগুলি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে নানা কথা রটাইতে ছাড়ে নাই। কিন্তু শিনওয়ারী বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল যাহাই হউক, ইহাতে যে আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তার স্বদেশকে আধুনিক করিয়া তুলিবার সংকল্প টলিবে না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কাবুলিওয়ালাকে এবারে সাহেবী টুপী পরিতেই হইবে। সত্য কথা বলিতে কি কাবুলিওয়ালার ঢিলা পায়জামা ও কাফ্‌তান ছাড়িয়া খাট কোর্ত্তা পরিতে কিছুমাত্র

আপত্তি নাই। সম্প্রতি 'ষ্টেটস্‌ম্যান্‌' পত্রিকায় একটি মার্কিণ মহিলার আফগানিস্থান ভ্রমণের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও এই কথাই সপ্রমাণ হয়। এই মহিলাটির নাম মিস্‌ মট স্মিথ। তিনি বলেন,—

"আফগানিস্থানের লোকেরা নিজেদের উন্নতি দেখিয়া নিজেরাই মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা শিশুদের মত অবাক ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যেন বুক ঠুকিয়া বলিতে চায়, দেখ দুই বৎসর আগে আমরা কি ছিলাম, আর আজ আমরা কি হইয়াছি! আফগানিস্থানের বাহিরে কাহারও কাহারও একটা বিশ্বাস আছে যে, আমীর আমানুল্লা যদি এই ধরণে রাজ্য ও সমাজ সংস্কার চালাইতে থাকেন তবে তাঁহাকে শীঘ্রই আততায়ীর হস্তে নিহত হইতে হইবে। কিন্তু আফগানিস্থানে যাঁহাদের বাস তাঁহাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। তাঁহারা মনে করেন আমীর আরও বেশী করিয়া সমাজ-সংস্কার না করিলেই তাঁহার পক্ষে নিহত হইবার সম্ভাবনা বেশী। তিনি পরিবর্ত্তনের একটা বেগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহার গতি একটু মন্থর হইলেই প্রজাগণ চঞ্চল হইয়া উঠিতে চায়। তাই আফগানিস্থানের চতুর শাসনকর্ত্তা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একবার যখন তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে পরিবর্ত্তনের নেশা ধরাইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে আরও কিছু বেশী করিয়াই নেশা যোগাইতে হইবে।"

য়ুরোপীয় পোষাকের প্রবর্ত্তন, অবরোধপ্রথার উচ্ছেদ, ও স্কুল কলেজ স্থাপন, মিস্‌ মট-স্মিথ বিশেষ করিয়া এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কাবুলের দুইটি স্কুল ফরাসী ও জার্ম্মাণদের দ্বারা পরিচালিত। ফরাসী স্কুলটিতে নীচের ক্লাসে ছেলে ও মেয়েদিগকে একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টেলিগ্রাফ শিখাইবার জন্য আর একটি স্কুল আছে সেইটিই আমীরের বিশেষ সখের জিনিষ। আমানুল্লা খাঁর যন্ত্রপাতির দিকে একটা প্রবল ঝোঁক আছে। তাঁহার শাসনে আফগানিস্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার মধ্যেও আমরা কলকারখানারই প্রাধান্য দেখিতে পাই। আমীর আমানুল্লার ব্যক্তিগত অভিরুচি ভিন্ন ইহার বড় একটা রাজনৈতিক কারণও অবশ্য আছে। এযুগে শিল্পে ও বাণিজ্যে, অন্ততঃ রণনীতিতে য়ুরোপীয় হইতে না পারিলে কোনও নন-য়ুরোপীয় জাতির পক্ষে য়ুরোপীয় জাতিদের কবল হইতে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া টিঁকিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। তাই এসিয়ার সকল জাতিই এই বিষয়ে আধুনিক হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একজন জাপানীর একটা উক্তি মনে করিয়া রাখিবার মত। রুষজাপান যুদ্ধের পর কোনও য়ুরোপীয় ভদ্রলোক জাপানের দ্রুত উন্নতির প্রশংসা করাতে জাপানী ভদ্রলোকটি এই উত্তর দেন, আমরা আগে খুব ভাল ছবি আঁকিতে পারিতাম, আমরা শিল্পীর জাত ছিলাম, তখন আপনারা আমাদিগকে বর্ব্বর বলিতেন, এখন আমরা মানুষ মারিতে শিখিয়াছি তাই আপনারা আমাদিগকে সভ্য বলিতেছেন।"

আফগানিস্থানেও য়ুরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সুকুমার কলা অপেক্ষা য়ুরোপের এরোপ্লেন, মেশিনগান, মটরকার, কলকব্জার উপরই বেশী মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আফগানিস্থান হয়ত অন্য সব বিষয়েও য়ুরোপীয় হইয়া উঠিবে।

আফগানিস্থানবাসীদের য়ুরোপীয় হইয়া যাইবার পক্ষে বহুকাল-প্রচলিত কতকগুলি সংস্কার ছাড়া আর কোনও বিশেষ বাধা নাই। ভারতবর্ষের লোকেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে যে দোটানায় পড়িয়াছে, আফগানিস্থানের অধিবাসীদের মনে সে নিদারুণ সংশয় ও দ্বন্দ্বের স্থান নাই। তাহাদিগকে পদে পদে প্রাচীন সভ্যতার অভিমানের সঙ্গে নূতন সভ্যতার আমেজের বোঝাপড়া করিয়া অগ্রসর হইবার দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু চীন, জাপান, পারস্য সকলেরই ত সভ্যতা ভারতবর্ষের মতই প্রাচীন, সবক্ষেত্রে তত



আমীর আমানুল্লা ও রাজ্ঞী সুরিয়া

প্রাচীন না হইলেও তেমনি উন্নত ছিল। তাহারা এত তাড়াতাড়ি য়ুরোপীয় রীতিনীতি ধরিয়া ফেলিল কি করিয়া? তাই মনে হয়, ভারতবর্ষেরও অল্পদিনের মধ্যে য়ুরোপীয় হইয়া যাইবার পক্ষে বাধা ভারতবাসীদের প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্ব নয়, অন্য কিছু। অদ্ভুত শোনাইলেও কথাটা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভারতবর্ষের পরাধীনতাই ভারতবাসীদের প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকাল-প্রীতির হেতু। আজ যদি ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষ হইতে অপসৃত হয়, তবে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা চীনাম্যানের টিকি ও তুরস্কের খিলাপতের পথে যাইবে কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

সংবাদ পত্রের সম্মান—

"স্পেক্টেটর" বিলাতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সাপ্তাহিক। সম্প্রতি তাহার অস্তিত্বের একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের সকল পত্রিকা স্পেক্টেটরকে অভিনন্দিত করিয়াছে ও বিগত

৩০শে অক্টোবর 'টাইম্‌স্' পত্রিকার প্রধান সত্বাধিকারী মেজর জন অ্যাষ্টর ক্লারিজ হোটেলে একটি ভোজ দিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল গণ্যমান্য সাহিত্যিক, বিজ্ঞানবিদ্‌, সংবাদপত্রলেখক ও রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মিঃ বল্‌ডউইন তাঁহার অভিভাষণের একস্থলে এই কথাগুলি বলেন,—

"প্রহরীর কাজ, সংবাদদাতার কাজ, সমালোচকের কাজ, লোকে সংবাদপত্রের নিকট হইতে যাহা কিছু আশা করিয়া থাকে, 'স্পেক্টেটর' সে সবই করিয়াছে। এই সকল কাজের দ্বারা জনসাধারণের সেবা, এবং জনসাধারণের সেবাই সংবাদপত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য এই দুইটি জিনিষকে স্পেক্টেটর' নিজের মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সে কখনও কুরুচি ও ভাঁড়ামির দ্বারা সোনার সঙ্গে খাদ মিশাইতে সম্মত হয় নাই; হুজুকের জন্য, লাভের জন্য দেশের হিত ভুলিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই।"

নিস্বার্থ ও নির্ভীকভাবে দেশের সেবাকে আদর্শ করিয়া লইয়াছে বলিয়াই 'স্পেক্টেটরে'র এত প্রতিপত্তি। 'স্পেক্টেটর' জনসাধারণের মতকে জন সাধারণের মত বলিয়াই কখনও শ্রদ্ধা করে নাই। স্পেক্টেটরের একশত বৎসরের ইতিহাসে এমন সময়ও গিয়াছে যখন অপ্রিয় সত্য বলার জন্য তাহার গ্রাহকসংখ্যা দিনের পর দিন কমিয়াই চলিয়াছে, তবুও সে নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। বর্ত্তমানকালে য়ুরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্রের হুজুক ছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আর একটি গুরুতর অন্তরায় দেখা দিয়াছে। এই সকল দেশের ক্রোরপতিরা একটির পর একটি সংবাদপত্র কিনিয়া লইয়া সাময়িক পত্রগুলিকে নিতান্তই ব্যবসায়, অথবা নিজেদের স্বার্থ-সাধনের উপায় করিয়া তুলিতেছেন। এই বিপদের হাত হইতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'টাইম্‌স্' যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, এ বৎসর 'স্পেক্টেটর'ও তাহাই করিয়াছে। এই দুইটি পত্রিকারই একটি করিয়া কমিটি আছে। ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ও অন্য তিন চারি জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার সভ্য। 'টাইম্‌স্', অথবা 'স্পেক্টেটরে'র শেয়ার বিক্রয় করিতে হইলে ইঁহাদের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কেহ এই দুইটি পত্রিকার আংশিক সত্ত্ব কিনিতে চাহিলে ইঁহারা অনুসন্ধান করিয়া সেই ব্যক্তি লাভ অথবা স্বার্থের জন্য সম্পাদকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অভিমত না দিলে কোনও শেয়ারবিক্রয় আইন-অনুযায়ী সিদ্ধ হয় না। 'স্পেক্টেটর' সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর আর একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার মত। তিনি বলেন,—"'স্পেক্টেটর' যাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত, তাঁহারা সকলেই নিজেদের মাতৃভাষাকে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন।" হায়! বাংলাদেশের কয়টি সাময়িকপত্র সম্বন্ধে আজ একথা বলিতে পারি?

সুবার্ট শতবার্ষিকী—

১৮২৮ সালের ১৯শে নভেম্বর জার্ম্মাণ সঙ্গীত-স্রষ্টা সুবার্টের মৃত্যু হয়। য়ুরোপে এবৎসর তাঁহার মৃত্যুর শতবার্ষিক স্মৃতি-সভা হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে সকল য়ুরোপীয় পত্রিকাতেই সুবার্ট সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, ও বহু বিশেষজ্ঞ তাঁহার জীবন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। য়ুরোপীয় সঙ্গীতবিদ্‌দের মধ্যে একমাত্র বেটোফেনের নামই আমাদের অনেকের কাছে পরিচিত। সুবার্ট বেটোফেনের সমকক্ষ না হইলেও সমশ্রেণীর। এই দুইজনের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সুবার্টের জীবন একত্রিশ বৎসরের মাত্র। বয়সের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুবার্ট এবং বেটোফেনের মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। বেটোফেন বিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্রষ্টা, সুবার্ট গানের লেখক ও সুরদাতা। একজন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ বলিয়াছেন, "সুবার্ট



সুবার্ট

সঙ্গীত স্রষ্টাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি।" সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। তিনিও সুর ও কথা মিলাইয়া একটা নূতন ধরণের সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুবার্টকে সেক্সপীয়রের সহিত তুলনা করিয়া "টাইম্‌স্ লিটরারি সাপ্লিমেণ্ট" বলিতেছেন,—"সুবার্টের পাশে যুবা সেক্সপীয়রকে এক উদ্দাম, উন্মত্ত, অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, অনন্যমনা রূপ-বিলাসী বলিয়া মনে হয়—যেন সে শুধু নিজের শক্তির উচ্ছল আতিশয্যেই মাতিয়া আছে, যেন সে শুধু জীবনোৎসবের বর্ণ, আলোক ও উত্তেজনায়ই তৃপ্ত ও অভিভূত। সুবার্টের মধ্যেও সেই প্রাণের প্রাচুর্য্য, সেই রূপানুভূতির পূর্ণতা, সৌন্দর্য্যের পায়ে সেই আত্মবিসর্জ্জন আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সে সকলই তাঁহার জীবনে না হউক, গানে সংযত হইয়া, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে সৌন্দর্য্যের তিনি স্রষ্টা, তাহাতে সম্ভোগের ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাহা শান্ত আনন্দেরই আর একরূপ, যে প্রেমের তিনি কবি তাহাও নিবিড় হইয়া পূজার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ সুবার্ট না জানিয়া, না শিখিয়া, একজন সত্যকার "মিষ্টিক"।

—

ভারতবর্ষ

কংগ্রেসের উদ্যোগপর্ব্ব—

কংগ্রেস আগতপ্রায়। কলিকাতায় কংগ্রেসের আয়োজন পুরাদমে চলিতেছে। সকলেই কংগ্রেসের আশায় আছেন বলিয়া এই মাসে

বড় কোনও রাজনৈতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে কলিকাতায় আরও অনেকগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান হইবে। তাহার প্রধান প্রধানগুলির নাম নীচে দেওয়া হইল।

কংগ্রেস, ২৯শে, ৩০শে ৩১শে ডিসেম্বর; যুবক কংগ্রেস—সভাপতি শ্রীযুক্ত নারিমন্, ২৫শে ডিসেম্বর; সামাজিক কন্‌ফারেন্স, সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়াকার, মহিলা কনফারেন্স—সভানেত্রী ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী; মস্‌লেম্‌লিগ্‌ ২৬শে হইতে ২৪শে ডিসেম্বর; রাষ্ট্রভাষা কনফারেন্স; নিখিলভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কনফারেন্স; খিলাপাৎ কন্‌ফারেন্স; লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্স ইত্যাদি।

অখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন—

নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে কাশীতে অখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহা-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই মহাব্রাহ্মণসম্মেলন উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্বেষী বেদনিন্দকদের স্বৈরাচার হইতে সনাতন-ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রধান তিনটি এই,—

"প্রথম প্রস্তাব গোরক্ষা বিষয়ক। গরুসমূহ হিন্দুমাত্রেরই মাতৃবৎ পালনীয় ও রক্ষণীয় এবং তন্নিমিত্ত সনাতনধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই বদ্ধ-পরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। যুক্তপ্রদেশের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত অখিলানন্দ শর্ম্মা কবিরত্ন এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ওজস্বিনী হিন্দিভাষায় গো-মহিমাবর্ণন করিয়া গোরক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ মুগ্ধচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি দ্বারা উহার অনুমোদন করিয়াছেন।

"দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা মহাশয়ের উপস্থাপিত বিবাহ বিল—যাহা এখন সিলেক্ট কমিটিতে গিয়াছে—তাহা হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশকর। মহারাণীর ঘোষণাবাণী অনুসারে প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই—এ বিল সত্বরই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

"এই প্রস্তাব পাশ হইবার সময় মুহুর্মুহু উচ্চস্বরে 'সনাতন ধর্ম্মকী জয়' ঘোষিত হইতে থাকে। এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে যাইয়া কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিধর শর্ম্মা চতুর্ব্বেদী জলদগম্ভীরস্বরে ইহার পরিণাম যে ভাবে বর্ণন করেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

"তৃতীয় প্রস্তাবের মর্ম্ম যাহাতে সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ বিরুদ্ধ কোন বিধান ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাদিতে এবং মিউনিসি-প্যালিটী প্রভৃতিতে উপস্থিত না হয়। তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ। প্রস্তাবের শেষাংশে বলা হইয়াছে যে, যদি ঐ রূপ কোন বিধান বিধিবদ্ধ হয় তাহা হইলে সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি উহা স্বীকার করিবেন না, এবং ঐরূপ বিধানের বিরোধিতা করিবেন।"

বহু বিচারের পর ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতেও উপনীত হইয়াছেন;—

"মহামান্য গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। স্ত্রীগণের বিবাহকাল গর্ভাষ্টম বৎসর মুখ্য, নবম দশায় মধ্যম, একাদশ দ্বাদশ গৌণ, তাহার ঊর্দ্ধ্ব আপৎকাল। (১) ঋতু দর্শনে বৃষলীত্ববোধক বচনের তাৎপর্য্য এই যে ঋতুমতী বিবাহে ধর্ম্ম-কার্য্যে অনধিকারিতা। (২) ব্রাহ্মণাদি জাতির অবান্তর জাতিসহ পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। (৩) ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণই ধর্ম্মাচরণ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করিতে পারিতেন। (৪) বিধবাবিবাহ ও দম্পতির বিবাহমোক্ষ সর্ব্বথা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। সৎশূদ্রগণের বিধবাবিবাহ নিন্দ্য। (৫) অস্পৃশ্যনীয়গণের অস্পৃশ্যত্ব জাতিগত, কর্ম্মগত নহে। (৬) পর্ব্বোপলক্ষে বা জনসমারোহে ম্লেচ্ছগণের বা অন্ত্যজগণের স্পর্শ বিষয়ে দোষাবহ হইবে না এবং তাহারা যদি চতুর্হস্তাধিক খাদাবচ্ছিন্ন কূপের জল গ্রহণ করে তাহাতে দোষ হইবে না।" ইত্যাদি

এখন আমাদের একমাত্র ভরসা নিখিল ভারতীয় যুবক সংঘ। তাঁহারা যদি ভারতবর্ষ আজই 'সোশিয়ালিষ্ট' অথবা 'কম্যুনিষ্ট' হইয়া যাউক এরূপ কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই দুই দলের প্রস্তাবে কাটাকাটি হইয়া কাজের ঘরে শূন্য পড়িবে।

লোকহিত-শিক্ষার জন্য দান—

কাঁথির নীহার জানাইতেছেন যে, মেদিনীপুর লালগড়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাহা রায় মহাশয় লালগড়ের সাধারণ শিক্ষার সহিত কৃষি-শিক্ষা প্রদানের জন্য একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালনকল্পে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা আয়ের প্রায় ৩৯,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়াছেন! জেলাবোর্ডের চয়ারম্যান মহাশয়কে ঐ ট্রাষ্ট সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। দাতার এই বদান্যতা দেশের ধনী জমিদারদের অনুকরণীয় হইলে দেশের অনেক অভাব অসুবিধা দূর হইয়া যায়।

বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষে জনসেবা—

একজন পত্রপ্রেরক আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, গত বৎসর ১৩৩৪ সালে বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে অজন্মা হয়। বৈশাখ মাসে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে



বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক

সভাপতি করিয়া একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। ঠিক ঐ সময়েই জনসাধারণের পক্ষ হইতে 'শক্তি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা ও শ্রীযুত যতীশচন্দ্র পাল স্বামী কমলানন্দ পরিব্রাজককে সভাপতি করিয়া "দুর্ভিক্ষ সেবা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাকার্য্য আরম্ভ করেন। সমিতির ধনভাণ্ডার শূন্য হইলেও শ্রীযুত যতীশচন্দ্র পাল

চাউল সরবরাহের ভার গ্রহণ করেন। এবং জনসাধারণ প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিকে নিখিল বাংলা নানাভাবে সাহায্য করেন। ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অনাহারে কয়েকজনের মৃত্যুও ঘটে।

এই সময় মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহাতাব "দুর্ভিক্ষ সেবা-সমিতির" পেট্রণরূপে দুর্গাপুর, আমলাজোড়া, লোয়া এবং পারাজ গ্রামে শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র পালের সহিত পরিভ্রমণ করেন এবং সেবা কার্য্যে নিয়োগ করেন। এই সময় সিয়াড়সোলের রাজকুমার পশুপতি নাথ বানিয়াও জেলার দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন। মহারাজকুমার বর্দ্ধমান এবং রাজকুমার, পশুপতিনাথ সিয়াড়সোল সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়া দুঃস্থ জেলাবাসীকে সাহায্য করিতে থাকেন। মহারাজকুমার দুয়াড়নড়ি গ্রামে শ্রীযুত ভবানী দাস মজুমদার প্রতিষ্ঠিত "দুয়াড়নড়ি পল্লী সেবা সমিতি" ভবনে উপস্থিত হইয়া তথাকার জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যবিতরণ করেন। দুর্ভিক্ষে এই "সেবা সমিতি" প্রায় এক হাজার নববস্ত্র এবং কিছু কম ছয় মাস ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে সহস্রাধিক নরনারীকে আড়াই সের হিসাবে চাউল বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও মহানুভবগণের কৃপায় বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ এখন ঘুচিয়াছে।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী মাতাজীর সাধনা, পরিশ্রম এবং উৎসাহের বলে এই কলিকাতানগরীতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতাজী ভারত-ভূমির বহুস্থানে পরিভ্রমণকালে এদেশীয় নারীজাতির বিবিধ সমস্যা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য :—(১) হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজ অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা প্রচার; (২) সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং অসহায়া মহিলাদিগকে আশ্রয়দান এবং জীবন ধারণোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষাপ্রদান; এবং (৩) আদর্শ নারী-জীবন যাপনের পথে সহায়তা করা। সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে এবং ব্রহ্মচর্য্যবিধি-নিয়মে আশ্রমটী পরিচালিত হয়। আশ্রমের সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্রীনিবাস এবং একটী অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ও আছে। শিক্ষাদান এবং আভ্যন্তরীণ কার্য্যপরিচালনার ভার উপযুক্ত নারীকর্ম্মিসঙ্ঘের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত। সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত, রান্না, সাংসারিক গৃহকর্ম্ম, সূতাকাটা, তাঁতবোনা, সেলাই, দর্জ্জির কাজ প্রভৃতি এখানে শিখান হয়,—যাহাতে প্রয়োজন হইলে আমাদের সমাজের নারীগণও সদুপায়ে এবং সম্মানের সহিত জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে—আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের, এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিক্ষা সমাজ এবং ধর্ম্মমূলক এই নারী-শিক্ষাশ্রমটী এযাবৎ সাধারণের সাহায্য না লইয়াই সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি মাতাজীর অনুমতি লইয়া জষ্টিস্ শ্রীমন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন মালব্য, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি অসহায়া মাতা ভগিনীগণের দুঃখে যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাহাদিগকে ত্যাগস্বীকার করিয়াও আশ্রমের সাহায্য করিতে নিবেদন জানাইয়াছেন।

অতি সামান্য সাহায্যও সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদিকা, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬নং রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বৈদ্য পরিষৎ ও আয়ুর্ব্বেদ ভেষজ ভবন—

ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সুপ্রচার ও কালোপযোগী সংস্কার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের সমবেত চেষ্টায় একটি পরিষদ গঠিত হইয়াছে। পরিষদের চিকিৎসকমহামণ্ডল স্বাস্থ্য ও রোগ বিজ্ঞান এবং ভেষজ ও চিকিৎসাতত্ত্ব লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। একটি আদর্শ ভেষজোদ্যান, আরোগ্যশালা, গ্রন্থাগার ও স্থায়ী প্রদর্শনী সংস্থাপনের চেষ্টাও পরিষদের পক্ষ হইতে হইতেছে।

পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে সাহচর্য্য, উৎসাহ ও সাহায্যলাভের জন্য পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার সদস্য হইবার অধিকারী। সদস্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য ব্যতীত যাহাতে স্বাধীনভাবে অর্থাগমের উপায় হয় তাহার জন্য এই পরিষদের সদস্যগণের অর্থে, পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে একটি আয়ুর্ব্বেদভবন সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ভেষজ-ভবনের লভ্যের একটা অংশ আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও সেবা কার্য্যে ব্যয় করা যাইবে।

৩৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতায় পরিষদের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের নিকট অপরাপর বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

ডাক্তার ননীগোপাল মিত্র সম্প্রতি বার্লিনের এম ডি উপাধি লইয়



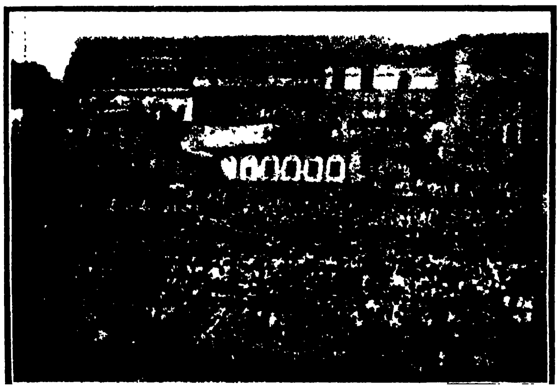
ডাক্তার ননীগোপাল মিত্র



শ্রীযুক্ত আলতাফ চৌধুরী



কাশীর সন্তরণ প্রতিযোগীতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিযোগী।
বামে - রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয়।
মাঝখানে মন্নলাল, প্রথম। ডাইনে—রবিচন্দ্র মাণিক, দ্বিতীয়।



ঘাটের দৃশ্য—দর্শকগণ সন্তরণকারীদিগকে দেখিতেছেন।

ইয়ুরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইনি বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিশু হাঁসপাতালে অধ্যাপক চের্ণির নিকট শিশুদের রোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। অধ্যাপক চের্ণি, বর্তমানকালে শিশু চিকিৎসার যে উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অন্যতম প্রবর্তক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া ডাক্তার মিত্র লণ্ডন ও বার্লিনের বিভিন্ন হাঁসপাতালে "একস-রে" সম্বন্ধে চর্চ্চা করেন। তিনি এই সকল বিষয়ে অনেক মৌলিক গবেষণা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিশু-মৃত্যু-বহুল দেশে তিনি তাহার নবলব্ধ বিদ্যার দ্বারা সমাজের সেবা ও হিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন।

শ্রীযুক্ত আলতাফ আলী চৌধুরী উত্তর বঙ্গের দেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত ইস্মাইল চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। ইনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে সেণ্টসবেরী পুরস্কার পাইয়াছেন।



"রোনাল্ড‌শে চ্যালেঞ্জ শিল্ড" জয়ী বয়স্কাউটগণ ও তাহাদের নেতা

কাশীতে সন্তরণ-প্রতিযোগীতা—

সম্প্রতি কাশীতে একটি সন্তরণ-প্রতিযোগীতা হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগীদিগকে তের মাইল সাঁতার কাটিতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রথম হন, তাঁহার এই তের মাইল আসিতে তিন ঘণ্টা চৌদ্দ মিনট পাঁচ সেকেণ্ড লাগে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিযোগীর যথাক্রমে সাতমিনিট সাতান্ন সেকেণ্ড ও দশ মিনিট সাতান্ন সেকেণ্ড বেশী লাগে। কাশীর মহারাজকুমার পুরস্কার বিতরণ করেন।

বয়স্কাউটের চিকিৎসাশিক্ষা—

কলিকাতা সেণ্টজন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিবৎসর বয়স্কাউটদের একটি প্রতিযোগীতা হয়। এই প্রতিযোগীতায় স্কাউট দগকে প্রাথমিক চিকিৎসা, আহতদের সাহায্য প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা দেখাইতে হয়।

যে দল এই সকল কাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারে তাহাদিগকে "অল বেঙ্গল রো-নাল্‌্শ চ্যালেঞ্জ শিল্ড্" পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর কলিকাতার ৯.২য় দল এই শিল্ড পাইয়াছে। সাপ্তাহিক "ওয়েলফেয়ার" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এই দলের নেতা।

সতীদাহ

শ্রী সীতা দেবী

অবনী এবং সুরেন্দ্র বাল্যকালের বন্ধু। কলেজে পড়ার সময় অবধি একসঙ্গে কাটাইয়া এখন কার্য্যগতিকে দুইজন দুইদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। সুরেন্দ্র থাকে বেহারে, অবনী এখন পর্য্যন্ত কলিকাতার মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

দুই বন্ধু যেখানেই থাকুক না কেন, পূজার ছুটিতে এক জায়গায় আসিয়া জুটিত। এবারেও সে নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুরেন্দ্রের স্ত্রী বাপের বাড়ী যাত্রা করিয়াছেন, ছেলেমেয়ে লইয়া। সে স্বয়ং বন্ধুর বাড়ী দিনকয়েকের মত আটকা পড়িয়াছে।

সকালে চা খাইতে খাইতে দুই বন্ধুতে গল্প হইতেছিল। সাম্‌নে খান দুই দৈনিক সংবাদপত্র।

চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া অবনী বলিল, "মানুষের ভিতরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শুভবুদ্ধি জাগে, আইন করে কখনো তাকে সোজা রাস্তায় রাখা যায় না। এই যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, ভিন্নজাতে বিয়ে দেওয়া, এই সব নিয়ে এত আইন-কানুন হচ্ছে, তুমি মনে কর, এতে কিছু কাজ হবে?"

সুরেন্দ্র বলিল, "অন্ততঃ অকাজ হওয়া কিছু কম্‌বে। সমাজশুদ্ধ সকলের সুবুদ্ধি একসঙ্গে জেগে উঠ্‌বে এটা অবশ্য কেউ আশা করে না, কিন্তু যে দু চারটে মানুষের মনে তা অলরেডি জেগে আছে, তারা সে অনুসারে কাজ করতে বাধা পাবে না। এবং তাদের দেখাদেখি অন্য আরো পাঁচটা মানুষ উৎসাহ পেতে পারে। এই রকম করেই সব কাজ এগোয়।"

অবনী বলিল, "এসব ত নিজে থেকেই আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছিল, আরো দশ বিশ বছরে একেবারেই যেত। এ নিয়ে এত হাঙ্গাম করে দেশবিদেশে নিজেদের কেলেঙ্কারি জাহির কর্‌বার কি এমন প্রয়োজন পড়েছিল? মাদার ইণ্ডিয়ার মত বই বেরয় কি আর সাধে?"

সুরেন্দ্র বলিল, "দশ বিশ বছরে যেত কি না খুব সন্দেহ। আর যেতই যদি, তা হলেও এই বিশ বৎসরে বিশ হাজার মেয়ের বলিদান ত আটকাল? মানুষের জীবনের একটা মূল্য আছে ত? থিওরির খাতিরে কেবলি তাদের গলায় ফাঁস দেওয়া চলে না।"

অবনী বলিল, "আসল কথা সামাজিক ব্যাপারে আইনের হাত দেওয়াটা আমি পছন্দই করি না। বিশেষ করে আরো করি না এই জন্যে যে আইন বিদেশীর হাতে। আমাদের পলিটিক্যাল অধিকার ত কিছু নেইই, সামাজিক অধিকারগুলিও যদি তাদের হাতে ছেড়ে দিই, তা হ'লে ক্রীতদাসের চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ রইলাম কোনখানে?"

সুরেন্দ্র একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, "দুটো ঈভ্‌লের ভিতর লেসার ঈভলটা বেছে নিতে হবে, তা ছাড়া উপায় কি? তোমার মতে ত তা হ'লে আইন করে সতীদাহ বা সন্তানহত্যা নিবারণ করতে দেওয়াও অন্যায়।"

অবনী বলিল, "অতটা অবশ্য বল্‌তে পারি না। যেখানে নিতান্ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি সেখানে কি আর করা যাবে?"

সুরেন্দ্র বলিল, "চিরজীবন যন্ত্রণা ভোগ করাটা কি আর পুড়ে মরে যাওয়ার চেয়ে কম শাস্তি?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবনী বলিল, "সতীদাহ বা সন্তানহত্যার আমি বিন্দুমাত্র সমর্থন করছি তা মনে ক'র না। কিন্তু মানুষে স্বেচ্ছায়, ভালবাসা বা ধর্ম্মের খাতিরে কতদূর পর্য্যন্ত যে যেতে পারে, তা এই সব ব্যাপারে বোঝা যায়। এখন আইনের খাতিরে এ সব কথা ভাবাই বারণ। এতে ত্যাগের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌ছে বলে তোমার মনে হয় না?"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "গাঁজাখোরের মত কথা বলো না। আইনে কি হিউম্যান নেচার বদ্‌লে যায়? এখন যে মেয়েদের স্বামী মরে তাদের মধ্যে পুরাকালের সতীদের অকৃত্রিম ভালবাসা বা আত্মবলিদানের ক্ষমতা নেই তুমি মনে কর?"

অবনী বলিল, "খুব সন্দেহ। অতদূর পর্য্যন্ত তারা ভাব্‌তেই পারে না।"

সুরেন্দ্র বলিল, "দিব্যি পারে। যদি এখন কোন কাজ না থাকে, ত তোমায় একটা গল্প বলি।"

অবনী বলিল, "তেমন দরকারী কাজ কিছুই নেই, ও বেলা বেরলেও চল্‌বে। রান্না বান্না হওয়া অবধি গল্প চল্‌তে পারে।"

সুরেন্দ্র বলিল, "বৌ ঠাকরুনকেও ডাক না হয়। শুনে তাঁর পতিভক্তি বাড়লে তোমারই লাভ।"

অবনী বলিল, "কাজ নেই ভাই। তারচেয়ে রান্নার তদারক করে ভক্তির পরিচয় দিলে পতির লাভ বেশী।"

সুরেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, যেমন তোমার অভিরুচি। আমার গল্প তবে সুরু করা যাক।"

নামধামগুলো বদ্‌লে বল্‌ছি, কারণ যাদের গল্প তারা এখনও বেঁচে আছে। হঠাৎ তাদের লুকনো কথা ছড়িয়ে দিলে তারা খুসি নাও হতে পারে। তোমার মনে আছে বোধ হয়, বেহারে প্র্যাকৃটিশ করতে যাই যখন. তখন আমার সাংসারিক অবস্থা কি পরিমাণ শোচনীয় ছিল। দেশে ত কিছুই করতে পারলাম না, তোমার মত বাপের পয়সাও ছিল না যে বসে খাব, কাজেই বিদেশ যাত্রা ছাড়া উপায়ান্তর কিছু দেখলাম না।

কোথায় যাব ভেবে যখন কূল কিনারা পাচ্ছি না, তখন হঠাৎ একদিন মনোরঞ্জনের চিঠি পেলাম। আমার চেয়ে বছর কয়েকের সীনিয়র সে, তবে ভাবসাব এককালে বেশ ছিল। আমাদের গ্রামেই তার বাড়ী। বছর কয়েক আগে বেহারে গিয়ে প্র্যাকৃটিশ্ করছিল বলে শুনেছিলাম। মাঝে অনেকদিন আর তাদের কোনো খোঁজখবর পাই নি।

হঠাৎ তার চিঠি দেখে অবাক হলাম। এতকাল পরে আমাকে মনে পড়ল কি কারণে? পড়ে দেখলাম আমাকে তার ওখানে গিয়ে কাজ করবার জন্যে ডাক দিয়েছে। তার প্র্যাকৃটিশ ওখানে মন্দ হচ্ছিল না, কিন্তু হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়াতে বড় বিপদে পড়েছে। কাজকর্ম্ম কিছু করতে পারে না, ধারকর্জ্জ বিস্তর জমে উঠেছে, সংসার চালান দায়। আমি যদি যাই, তাহলে তার কেস্‌গুলো আমার হাতে আস্‌তে পারে। একজন বন্ধুমানুষ কাছে থাকলে তারও সুবিধা।

আমার যেতে কোনোই আপত্তি ছিল না। বাক্স বিছানা বেঁধে, অনেক কষ্টে গোটাপঞ্চাশ টাকা ধার করে বেরিয়ে পড়লাম। মনোরঞ্জনকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম, যদিও সে যে রকম অসুস্থ বলে লিখেছিল, তাতে ষ্টেশনে আস্‌তে খুব সম্ভবই পারবে না তা বুঝতেই পারছিলাম।

যাহোক প্রায় দুদিন ই, আই রেলওয়ের প্যাসেঞ্জার গাড়ীর অপূর্ব্ব আরাম উপভোগ করে গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌছলাম। এধার ওধার তাকিয়ে বন্ধুবরের কোনই চিহ্ন দেখতে পেলাম না। স্থির করলাম, একা ডেকে, ঠিকানার সাহায্যে নিজেই তার বাড়ী আবিষ্কার করতে হবে।

কুলির মাথায় জিনিষ চাপিয়ে প্লাটফর্ম্ম থেকে বেরিয়ে চল্‌লাম। প্রায় গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে পৌছেচি এমন সময় বছর তেরো চৌদ্দর একটি বাঙালী ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হল। বাঙালী যাত্রী খুব বেশী ছিল না, এবং আমিই বেরিয়েছিলাম সর্ব্বাগ্রে। আমার কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি সুরেন্দ্রবাবু?"

আমি বল্‌লাম, "হ্যাঁ। তুমি কে বল দেখি? তোমাকে ত চিন্‌তে পারছি না?"

ছেলেটি বল্‌লে, "আমাকে চিন্‌বেন না। আমি মনোরঞ্জন বাবুদের বাড়ীর কাছেই থাকি। তিনি ত আস্‌তে পারলেন না, তাই কাকীমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা, চল, গাড়ী ডেকে বেরিয়ে পড়া যাক্‌।"

মনোরঞ্জনের বাড়ী পৌছতে লাগ্‌ল পুরো আধটি ঘণ্টা। সে ষ্টেশন থেকে অনেক দূরে ঘিঞ্জি নোংরা এক বস্তিতে ছোট একটা বাড়ী নিয়ে আছে। পাড়াটার মধ্যে সুদৃশ্য বা বড় বাড়ী একটাও নেই। রাস্তা এবং তার দুই ধারের নর্দ্দমার দশা দেখে ত আমার বমি উঠে আসতে লাগ্‌ল। এইখানে থাক্‌তে হলেই গিয়েছি আর কি? এর চেয়ে দেশে পড়ে না খেয়ে মরাও যে ভাল ছিল।

ছেলেটি গাড়ী থামাতে বলে নেমে পড়ল। ভাড়া

রঙচটা একটা দরজায় ঘা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, "কাকীমা!"

দরজাটা হড়াৎ করে খুলে গেল। ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দেখ্‌তে পেলাম। চাকর বাকর কিছু নেই আন্দাজ করে নিয়ে গাড়োয়ানের সাহায্যে পোঁটলা পুঁটলী সব নামিয়ে নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। ছেলেটি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাইরে গিয়ে গাড়োয়ানকে বিদায় করে এল।

মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় ভিতর থেকে মনোরঞ্জন ডেকে বল্‌লে, "ভিতরে এস হে সুরেন, আমার এমন ক্ষমতা নেই যে বাইরে গিয়ে অভ্যর্থনা করি।"

ভিতরে ঢুকলাম। ঘরের ভিতর একটা তক্তপোষে একটি মানুষ শুয়ে। মনোরঞ্জন ছাড়া কেউ আর হওয়া সম্ভব নয় বলেই তাকে চিনলাম, তা না হলে চিনবার কোনো উপায় ছিল না। তক্তপোষেই গিয়ে বসলাম, ঘরে বসবার আর কোনো জায়গা ছিল না।

মনোরঞ্জন বল্‌লে, "থাক, এসে পৌছেচ তাহ'লে, রাস্তায় বেশী কষ্ট হয়নি ত?"

আমি বল্‌লাম, "না বিশেষ কিছু নয়। নিজের এরকম দশা করলে কি করে'? আমরা ত বরাবর শুনে আস্‌ছি বেশ দু পয়সা আন্‌ছ।"

মনোরঞ্জন বল্‌লে, "ঠিকই শুনছিলে। বছরখানিক আগে স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি যে এমন দশা আমার হবে। কি যে কাল রোগে ধরল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। এ যে ম্যালেরিয়া না কালাজ্বর না যক্ষ্মা কিছুই বুঝিনা।"

আমি বল্‌লাম, "ডাক্তার দেখাচ্ছ না?" সে বল্‌লে "যতদিন পয়সা ছিল, ততদিন ডাক্তার কবিরাজ, হাকিম, কিছুই দেখাতে বাকী রাখিনি। এখন খেতে জোটে না, ডাক্তার দেখাব কোথা থেকে?"

আমি বল্‌লাম, "দেশে চলে গেলেও ত পারতে, সেখানে আর যাই হোক, এমন না খেয়ে মরার দশা হ'ত না।"

মনোরঞ্জন বল্‌লে, "সে কথাও না ভেবেছি তা নয়। কিন্তু কার ভরসায় যাব? বাপ মা বেঁচে নেই, নিজের একটা ভাইও নেই। আত্মীয়স্বজন আছে অবশ্য, কিন্তু ঘাটের-মড়া ঘাড়ে করতে কেউ রাজী হবেনা। শ্বশুর আছেন, কিন্তু শাশুড়ী নেই, কাজেই সেদিকেও খুব সুবিধা নেই। তাছাড়া তাদের নিজেদেরই অবস্থা ভাল নয়। এখানেই অগত্যা থেকে গেলাম।"

আমি বল্‌লাম, "তাইত, এখন তোমার ত একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয়। এরকম করে ফেলে রাখ্‌লে ত চল্‌বে না?"

মনোরঞ্জন বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হবে এখন, তাড়াতাড়ি নেই। আগে মুখ হাত ধোও, কিছু খাও দাও। ওগো, তুমি আবার কোথায় গিয়ে লুকিয়ে রইলে? ওসব করলে এখন চল্‌বে না। ঘরে ত আর দশটা ঝি চাকর নেই? সুরেন আমার নিজের ছোট ভাইয়ের মত, ওর সামনে লজ্জা করার কোনো প্রয়োজন নেই।"

মনোরঞ্জনের স্ত্রী আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর এসে ঢুকলেন। মুখের উপরের ঘোমটাটা তিনি উঠিয়েই ফেলেছিলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। আশ্চর্য্য সুন্দর মুখ। শুধু সুন্দর নয়, মুখশ্রীর ভিতর এমন একটা কিছু আছে যা সচরাচর চোখে পড়েনা। চট্ করে তখন মাথায় এল না, সে জিনিষটা কি।

মনোরঞ্জন বল্‌লে, "এই আমার গিন্নি।" উঠে পড়ে তাঁকে একটা প্রণাম করলাম, যদিও বয়সে তিনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু নমস্কার করতে ইচ্ছা হল না। প্রণাম করে বল্‌লাম, "বৌদিদি, আমি আপনার ছোট দেওর, আমার সামনে লজ্জাটজ্জা করবেন না।"

তাঁর মুখে একটুখানি হাসির আভাস দেখা দিল। মনোরঞ্জন বল্‌লে, "সরোজ, রান্নাবান্নার খবর কি রকম?"

সরোজিনী মাথা নীচু করে বল্‌লেন, "হয়ে এসেছে, ঠাকুরপো স্নান করে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সব হয়ে যাবে।"

মনোরঞ্জন বল্‌লে, "আজ মাছটাছ কিছু আনিয়েছ?"

মনোরঞ্জনটা কি গাধা! পাছে বেচারীকে লজ্জায় পড়তে হয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি আমি বল্‌লাম, "আমি নিরামিষের ভক্ত বেশী, মাছের জন্যে কিছু ব্যস্ত হ'তে হবে না।"

যাই হোক, বৌদিদি বল্‌লেন, "মাছ আজ আনিয়েছি। আপনি স্নান করে আসুন।"

বাক্স থেকে ধুতি, তোয়ালে, সাবান সব বার করে' স্নান করতে চল্‌লাম। স্নানের ঘর বলে' কোনো আপদ ছিল না, কলতলাতেই কাজ সারতে হ'ল।

মনোরঞ্জন রুগী, ভাত খায় না। কাজেই রান্নাঘরে, কাঠের পিঁড়ির উপর একলাই খেতে বসা গেল। রান্না বিশেষ কিছু হয়নি, ডাল, ভাত, বেগুন ভাজা, মাছের ঝোল। তবু তাই এত তৃপ্তি করে খেলাম যে বল্‌বার নয়। বৌদিদি হাতা নিয়ে পরিবেশন করছিলেন, তখন তাঁর দিকে চেয়ে মনে হ'ল, তাঁকে আগে যেন কোথায় দেখেছি। কিছুক্ষণ ভেবে বুঝতে পারলাম তাঁকে ঠিক দেখিনি, কিন্তু ঠিক এই মুখ এই মুখের ভাব, শত সহস্র

বার আমাদের অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে দেখেছি। এ মেয়েটি নিতান্তই এ-কালের, কিন্তু তার চেহারা, ভাবভঙ্গী, চাল চলন সব যেন আমাদের পৌরাণিক যুগের। ইনি সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তী হ'লে কোনখানে বেমানান হ'তনা। কাজ করছেন, কথাবার্ত্তা বলছেন, অথচ মনে হচ্ছে, তিনি যেন কিছুর মধ্যে নেই। কোন এক অতীতকালের জীবনের মধ্যে তাঁর মন যেন পড়ে রয়েছে। এ-মেয়েকে ভক্তি করা যায়, পূজা করা যায়, কিন্তু একে নিয়ে ঘর করা যায় কি করে বুঝলাম না। অন্ততঃ মনোরঞ্জনের মত একান্ত সাধারণ জীব তা পারে কি করে?

খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের ছোট ঘরটাতে ছেঁড়া খাটিয়ায় শতরঞ্চি পেতে' খুব এক ঘুম দিলাম। বিকালটা এধার ওধার ঘুরে কাটিয়ে দিলাম। ঐ অন্ধকূপের মত ঘরে পাঁচ মিনিট থাকতেই আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। পরদিন থেকে কাজে নেমে পড়া গেল। নিজেরও তাড়া ছিল, কিন্তু মনোরঞ্জনের তাড়া যে আরো বেশী, তা বুঝতে দেরী হয়নি। সে সহরের মধ্যে আগে যে বাড়ীটাতে থাকত, সেটা সৌভাগ্যক্রমে খালি ছিল। আশার উপর নির্ভর করে সেটা ভাড়া নিলাম, মস্ত সাইন বোর্ড ঝুলালাম, বাড়ীর ভিতরের ঘরগুলো শূন্য খাঁ খাঁ করতে লাগল, তবু বসবার ঘরটা বেতের চেয়ার, টেবিল্, বেঞ্চি প্রভৃতি এনে একরকম সাজিয়ে ফেল্‌লাম। মনোরঞ্জনের এক আলমারী আইনের বই পোকায় কাট্‌ছিল, সেগুলি আলমারী শুদ্ধ উদ্ধার করে আন্‌লাম। সে তার বড় বড় মক্কেলের কাছে চিঠি দিল, ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও করে' এলাম।

অদৃষ্ট তখন একটু সুপ্রসন্ন ছিল বোধ হয়, এত সব আয়োজন বিফল হলনা। প্রথম থেকেই কেস্ জুট্‌তে লাগ্‌ল। একমাসে যে লাখপতি হয়ে উঠ্‌লাম তা বল্‌তে পারিনা, তবে নিজের বাসা খরচ চলে যেতে লাগ্‌ল এবং মনোরঞ্জনেরও বাড়ীতে যাতে হাঁড়ি চড়া বন্ধ না হয়, তার ব্যবস্থাও করতে পারলাম। তার পুরোনো ডাক্তারকে একদিন পাকড়ে আন্‌লাম। বল্‌লাম সম্প্রতি ওষুধের দাম নিয়েই তাকে তুষ্ট থাক্‌তে হবে, তবে মা লক্ষ্মীর কৃপা অচলা থাকলে ভিজিটের টাকাও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর আদায় হয়ে যাবে।

রোজই প্রায় মনোরঞ্জনের ওখানে যেতাম। তার ওষুধ, কিছু ফল, না হয় বিস্কুট, এবং খরচ চালানোর জন্যে অন্ততঃ একটা টাকা দিয়ে আস্‌তাম। সে নিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করতনা। আমার পশারের মূলেই ছিল সে, কাজেই কিছু কমিশন নিতে তার বাধ্‌ত না। তা ছাড়া ভুগে ভুগে তার শরীর মনের এমন অবস্থা হয়েছিল যে অতশত ভাববার তার ক্ষমতাও ছিলনা বোধ হয়। কিন্তু বৌদিদির মুখ দেখে মনে হ'ত যেন এই করুণার দান নিতে তিনি মরমে মরে যাচ্ছেন।

দিনকতক পরে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুরপো, ছোটবৌকে, খুকীকে আনবেননা এখানে?"

আমি বল্‌লাম, "এখনি তাড়া কিসের? আগে পশারটা ভাল করে জমুক, তারপর আন্‌লেই হবে এখন। তারা ওখানে ত ভালই আছে।"

বৌদিদি বল্‌লেন, "তা হ'লে, অত বড় বাড়ী একটা শুধু শুধু রেখে লাভ কি? আমরাও ত এদিকে বাড়ী ভাড়া দিচ্ছি, দশ পাঁচ টাকা যা হোক? আমি বলি, পিছনের ঘরদুটো আমাদের ভাড়া দিয়ে দিন। আমি থাকলে মহারাজকেও রাখবার কিছু দরকার হবে না।"

আমি বল্‌লাম, "বৌদিদি, আপনি যদি দয়া করে আমার বাড়ীতে গিয়ে উঠেন, তা হ'লে কত যে খুসি হই, তা বল্‌বার নয়। সমস্তদিন বাড়ীটা খাঁ খাঁ করে, প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ ভাড়া নেবার কথা বলে'ই ত মাটি করলেন। ও সবে কাজ নেই। মহারাজের রান্না খাওয়ার হাত থেকে যদি আমি নিষ্কৃতি পাই, তা'হলেই নিজকে ঋণী বলে জানব।"

এ বন্দোবস্তটা বৌদিদির খুব যে মনঃপুত হ'ল তা নয়, কিন্তু মনোরঞ্জন এমন উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল, যে, তিনি আর বাধা দিতে ভরসা পেলেন না। দিন দুই পরেই তাঁরা জিনিষপত্র নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন।

বাড়ীর চেহারা অনেকটা ফিরল বটে, এবং খাওয়া দাওয়ার উন্নতি হল যথেষ্ট। কিন্তু নিরানন্দ ভাবটা বিশেষ যে কাট্‌ল, তা নয়। মনোরঞ্জন জ্বরে ধুঁকৃত। সারাটা ক্ষণ। তার মুখে বাবা রে, গেলাম রে, ছাড়া অন্য কথা ছিল না। বৌদিদি সারাদিন নীরবে কাজ করে যেতেন, দিনের মধ্যে একবারও তাঁর গলার স্বর শুনতে পেতাম কিনা সন্দেহ। এখানে এসে তিনি কেন জানিনা আরোই যেন মুষড়ে পড়লেন। মুখের হাসি ত একেবারেই লোপ পে'ল।

প্রথমে বুঝতে পারলামনা এর কারণটা কি। স্বামীর অসুখ একটা মস্ত কারণ বটে, কিন্তু সে ত নূতন কিছু নয়, অনেক দিন থেকেই চল্‌ছে। সাংসারিক অবস্থাও আগের তুলনায় খারাপ বলা চলে না। তবে এত বিষাদের মানে কি?

মানেটা নিতান্তই ঘটনাচক্রে ধরা পড়ে গেল, অন্ততঃ তখন তাই মনে করলাম। আমার পাশের বাড়ীটাতে কে থাকে, সে কি করে, এ সবের খবর প্রথম প্রথম বড় একটা নিইনি। মাঝে মাঝে একটি বাঙালী ভদ্রলোককে দেখতাম, ঢুকতে, বেরতে। তার চেহারা

এবং পোষাক দুইই কিছু অসাধারণ গোছের। সে যে কি করে এখানে, বুঝতামনা, বিশেষ আগ্রহও করিনি জানবার জন্যে। ক্রমে এধার ওধার থেকে শুনলাম, লোকটি আর্টিষ্ট, বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। স্ত্রী-পুত্র আছে কিনা কেউ জানে না, অন্ততঃ এখানে সে জাতীয় কাউকেই কোনদিন দেখা যায় নি। এখানের বাঙালী সমাজে তার বেশী গতিবিধি ছিলনা, কাউকে নিজের সঙ্গে মিশবার যোগ্য সে মনে কর্‌ত না বোধ হয়।

মনোরঞ্জনরা যে দিকের ঘরে থাকত, তার একটা জানলা দিয়ে এই আর্টিষ্টের ছবি আঁকবার ঘরের ভিতরের একটা দিক দেখা যেত। আগে এদিকের জানালা সে বড় খুল্‌তনা, কিন্তু আজকাল মনোরঞ্জনকে দেখ্‌তে গেলেই দেখ্‌তাম, আর্টিষ্ট মহাপ্রভুর জান্‌লা হাঁ করে' খোলা। বৌদিদি যেরকম সুন্দরী, তাতে অরসিক লোকেও তাঁকে দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারত কিনা সন্দেহ; এ হেন রসিক লোক যে ব্যস্ত হবে সে আর আশ্চর্য্য কি? তবে বৌদিদি আমার আজকালকার 'তরুণ'-সাহিত্যের বৌদিদিদের দলের একেবারেই নয় বলে' আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কাজেই এই জানলা খোলা নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাইনি।

বিকালে সেদিন কোর্ট থেকে একটু সকাল সকাল ফিরে এসেছিলাম। মনোরঞ্জনের জন্যে একটা ওষুধ ডিস্‌পেনসারী থেকে নিয়ে এসেছিলাম, সেটা হাতে করে' তাদের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। মনোরঞ্জন ঘুমচ্ছে, বৌদিদি খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। ও বাড়ীর ঘরেরও জান্‌লা খোলা এবং আমাদের যুবক চিত্রকরটি দাঁড়িয়ে। কথাবার্ত্তা কিছু শুন্‌তে পেলাম না, কিন্তু বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লাম না।

চিত্রকর যুবকটিই আমায় দেখতে পেল প্রথম, কারণ বৌদিদি আমার দিকে পিছন ফিরে ছিলেন। সে চমকে সরে যেতেই, বৌদিদিও পিছন ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখটা একেবারে মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন। তাদের দুজনের ব্যবহারেই আমার সন্দেহটা বেশ বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াল। একজন পুরুষ এবং একজন নারী জানলা দিয়ে পরস্পরকে দেখ্‌লে বা পরস্পরের সঙ্গে কথা বল্‌লেই যে মহাপাপ একটা কিছু হয়ে যায়, তা নয়। অন্য মেয়ে হ'লে এটা দারুণ রকম অস্বাভাবিকও কিছু হ'ত না, তবে বৌদিদির পক্ষে অস্বাভাবিকই ছিল। তা ছাড়া আমাকে দেখে অমন করে পালাবার দরকার ছিল কি? তারা নিজেরাই যেন নিজেদের অপরাধ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

এরপর বৌদিদির কথাবার্ত্তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। আমি সবকিছুর মানেই একরকম বুঝতে পার্‌লাম। কিন্তু কি কর্‌ব,বুঝেও বুঝলাম না। হাতে এমন কিছু প্রমাণ নেই, যা নিয়ে আর্টিষ্ট মহোদয়কে গিয়ে সোজাসুজি আক্রমণ করা যায়। সে নিশ্চয়ই ঠ্যাঙা নিয়ে আস্‌বে। বৌদিদিকে কিছু বল্‌তে সঙ্কোচেই আমার মুখ বন্ধ হয়ে রইল। মনোরঞ্জনকে কিছু বলা মানে ত তাকে খুন করা। অতএব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করেই রইলাম।

মনোরঞ্জনের পাওনাদারগুলি ক্রমে মুখর হয়ে উঠছিল। তারা সংখ্যায় বড় কম নয়। ডাক্তার, ওষুধের দোকানের মালিক, মুদী, কাপড়ের দোকানদার, বাড়ীওয়ালা, ইত্যাদি। প্রথম চিঠি এল, তারপর দরোয়ান, তারপর তাঁরা নিজেরা বাড়ী চড়াও হতে সুরু কর্‌লেন। বাড়ীটা আমার, এবং মনোরঞ্জন রোগশয্যায়, কাজেই মুখোমুখি বাক্যালাপের সুযোগ তাঁদের ঘটত না, কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁরা উচ্চকণ্ঠে যা মধুবর্ষণ করে যেতেন, তাতে ভিতরের মানুষ দুটির অন্তরাত্মা যে পুলকিত হয়ে উঠ্‌ছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ থাকৃত না।

উকীলের চিঠিও আসতে আরম্ভ কর্‌ল। চিঠিপত্র নিজে না খুলে বৌদিদি কখনও মনোরঞ্জনের হাতে দিতেন না। ইংরেজী চিঠি দেখে আমার কাছে নিয়ে এসে বল্‌লেন, "কে লিখেছে, ঠাকুর পো, একটু দেখ।"

এক সপ্তাহের মধ্যে এই তাঁর আমার সঙ্গে প্রথম কথা। আমার তাঁর দিকে তাকাতেই অশান্তি বোধ হ'চ্ছিল। এক রকম অন্যদিকে তাকিয়েই তাঁকে চিঠির মর্ম্ম বুঝিয়ে দিলাম। চিঠি দুটো হাতে করে' তিনি স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েই রইলেন।

এ মেয়েটি ক্রমেই আমার কাছে প্রহেলিকা হয়ে উঠছিলেন। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু এমন একান্ত মনে পতিসেবা যে করছে, স্বামীর দুঃখ অপমান যার বুকে মৃত্যুবাণের মত বাজছে, সে মেয়ের মনে যে পাপ থাক্‌তে পারে, তা বিশ্বাস করতেই মন উঠতনা। হয়ত আমি যা দেখেছি তা নিতান্তই ঘটনাচক্রে অপরাধের মূর্ত্তি ধরেছিল। আসলে হয়ত সেটা কিছুই নয়। আরো স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত মনে মনেও বৌদিদিকে অপরাধিনী কর্‌বনা ঠিক কর্‌লাম।

কিন্তু ভাগ্যের হাতে আমরা খেলার পুতুল মাত্র। ক'দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা রীতিমত পেকে দাঁড়াল, এবং তার নিদারুণ ট্র্যাজিক সমাপ্তিটাও খুব বেশী দূরে রইল না।

সন্ধ্যার সময় ছোক্‌রা চাকরটা আমার ঘরে বাতি

দিতে এল। অন্যদিন বাতি রেখে দিয়ে সে চলে যায়, আজ দরজার কাছে দাঁড়িয়েই রইল। আমি জিগ্‌গেষ কর্‌লাম, "কিরে রঘুয়া, কি চাস্?"

সে হাত জোড় করে বল্‌লে "বাবু, একটা কথা বল্‌ব, কিছু মনে কর্‌বেন না। আপনি মা বাপ, আপনাদের নিন্দা হতে দেখ্‌লে সইতে পারবনা, তাই বল্‌ছি। না হ'লে এসব কথা মুখেই আন্‌তাম না।"

আমি বল্‌লাম, "অত কথায় কাজ কি? যা বল্‌তে চাস্, বলে ফেল।"

রঘুয়া বল্‌লে, "দুপুরে আপনি যখন কোর্টে যান, বেমারওয়ালা বাবু ঘুমিয়ে পড়েন, তখন মাজী পাশের বাড়ী চলে যান। আবার ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে আসেন।"

প্রথমে ইচ্ছা হ'ল ছোঁড়ার মাথাটা দিই গুঁড়ো করে। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নিলাম। ওর দোষ কি? যা দেখেছে, তাই বল্‌ছে। অন্য লোকও যে এতদিন বল্‌তে আরম্ভ করে'নি, এই আশ্চর্য্য। কিন্তু মানুষের মুখ এত বড় প্রতারণাই কি করতে পারে? সাক্ষাৎ দক্ষকন্যা সতীর মত যার মূর্ত্তি, সে এমন কাজ করবে? নিজের চোখে দেখলেও সে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়না।

রঘুয়াকে বল্‌লাম," তুই কি করে জান্‌লি?"

সে বল্‌লে, "রোজ দুপুরে মাজী আমায় ছুটি দিয়ে দেন সে দিন মাথা ধরেছিল বলে বাইরের ঘরে শুয়েছিলাম, মাজী তা জান্‌তেন না। ঘুমিয়ে উঠে বড় জল তেষ্টা পেয়েছিল, জল খেতে তাই রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। গলির দিকের দরজা খোলা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মাজী ঠিক সেই সময় ও বাড়ীর রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরলেন। তিনি আমাকে দেখ্‌তে পাবার আগে আমি পালিয়ে এলাম।"

আমি জিগ্‌গেষ করলাম, "ঐ একদিনই দেখেছিস্?"

ছোক্‌রা বল্‌লে, "না, কাল পরশু দুদিনই আমি লুকিয়ে থেকে দেখেছি। রোজ তিনি যান একটার সময়, দুটো বাজতে না বাজতে ফিরে আসেন।"

ছোক্‌রাকে ত তখনকার মত বিদায় কর্‌লাম, আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করব বলে'। তাকে অনেক করে বারণ করে দিলাম, যেন কাউকে কিছু না বলে। কিন্তু কি যে ব্যবস্থা কর্‌ব, তা কিছু ভেবেই পেলাম না। বৌদিদির উপর আমার অধিকার কি? তিনি যা খুসি করতে পারেন, আমি বাধা দিতে পারিনা। যার অধিকার আছে, সে ত মর্‌তে বসেছে। এ ব্যাপার জান্‌লে আর চব্বিশঘণ্টা বাঁচবে কিনা সন্দেহ। তবু বৌদিদির সঙ্গে একবার ভাল করে বোঝাপড়া কর্‌তে হবে ঠিক কর্‌লাম। কিন্তু চাকরের কথায় নির্ভর করে নয়। নিজে হাতে হাতে ধরতে হবে। তারপর আর কিছু না পারি, সৌখীন আর্টিষ্ট বাবুর পিঠের চামড়ায় গোটাকতক দাগ কেটে আস্‌ব।

পরদিন কোর্টে গেলামই না। সাড়ে দশটায় ঠিক বেরিয়ে গেলাম। রঘুয়াকে বলে গেলাম, একটার পরেই ফিরব, সে যেন সদর দরজা খোলা রাখে। তাকে মাজী ছুটি দিলে, সে কোথাও বাড়ীর ভিতরেই লুকিয়ে থাকবে বল্‌লে। এই সব ফাঁদ পাত্‌তে লজ্জায় যেন নিজেরই মাথা কাটা যাচ্ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি আর কোনো উপায় রাখেনি।

বেলা দেড়টা আন্দাজ বাড়ী ফিরে এলাম। রঘুয়া বল্‌লে, মাজী এই একটু আগে গিয়েছেন, আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরে আস্‌বেন। এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম, যেখান থেকে আমি বেশ দেখতে পাব, কিন্তু আমাকে চট্ করে দেখা যাবে না।

দুটো বাজতে না বাজতেই পাশের বাড়ীর খিড়কির দরজা খুলে গেল। বৌদিদি বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন। নিজের গুপ্তস্থান ছেড়ে বেরিয়ে তাঁকে বেশ দুকথা বল্‌তে যাব, এমন সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যেখানে ছিলাম, সেখানেই থেকে গেলাম। মানুষের মুখে এমন যন্ত্রণার চিহ্ন আমি আর কখনও দেখিনি। তাঁর সমস্ত মুখটা যেন বিকৃত হয়ে উঠেছে।

কি যে এর মানে কিছুই বুঝলামনা। বৌদিদি ঘরে ঢুকে যাবার পর আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলাম। বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগ্‌লাম। কি করা যায়? পাশের বাড়ীর ছোকরার সঙ্গে একবার দেখা করব ঠিক করলাম। কাল দুপুরে বৌদিদি যখন যাবেন ওখানে, সেই সময় আমিও গিয়ে জুট্‌ব। একটা হেস্তনেস্ত করে তবে বেরব।

কিন্তু আমার প্ল্যান সব ওলট্ পালট্ হয়ে গেল। একটার সময় বাড়ী ফিরব মনে করেছিলাম, দৈবগতিকে খানিকটা দেরী হয়ে গেল। সবে বাড়ী ঢুকেছি, এমন সময় মনোরঞ্জনের ঘর থেকে একটা বিকট চীৎকার শোনা গেল। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তার ঘরে ঢুকলাম। বৌদিদির হাত চেপে ধরে মনোরঞ্জন পাগলের মত চেঁচাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে যা সব কথা বেরচ্ছে, তা ভদ্র সমাজে বিশেষ শোনা যায়না।

আমি তাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। বল্‌লাম, "একি করছ? মারা পড়বে যে? তোমার এই দশার উপর এমন এক্সাইটেড্ হতে আছে?"

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌তে লাগ্‌ল, "বেঁচে থেকে কি কর্‌ব? মর্‌লেই এখন ভাল। আমি পড়ে ধুঁক্‌ছি,

আমার সাধ্বী স্ত্রী কোথায় গিয়েছিলেন জান? পাশের বাড়ী বিহার করতে। ওকে আমার চোখের সামনে থেকে সরাও বল্‌ছি। তা না হ'লে এই শরীর নিয়েই আমি ওকে খুন করব। ওঃ, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। একে আমি ভগবানের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করতাম।"

আমি বৌদিদিকে বল্‌লাম, "আপনি এখন একটু সরে আসুন। ওকে এত উত্তেজিত হতে দিলে ভয়ানক অনিষ্ট হবে।"

মনোরঞ্জন চেঁচিয়ে বল্‌লে "একেবারে সরে যাও, আর মুখ দেখিও না। পার ত দুনিয়া থেকেও সরে যাও। এই তোমার একমাত্র রাস্তা এখন।"

বৌদিদি আল্‌না থেকে একখানা মোটা চাদর তুলে নিয়ে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পিছন পিছন চল্‌লাম, মনোরঞ্জন বিছানায় পড়ে ভাঙাগলায় গালাগালি করেই চল্‌ল।

সত্যই তিনি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বৌদিদির সামনে দাঁড়ালাম। বল্‌লাম "একি আপনিও কি মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাগল হলেন নাকি? যাচ্ছেন কোথায়?"

বৌদিদি বল্‌লেন, "আমায় যেতে দিন, ঠাকুর পো, এখন আর আমায় রেখে কিছু লাভ নেই।"

আমার বুকের ভিতরটা যেন ব্যথায় মোচড় দিচ্ছিল। এত আনন্দ করে যাঁকে এ বাড়ী ডেকে এনেছিলাম, তাঁকে শেষে এমন করে বিদায় দিতে হবে? বল্‌লাম, "আপনি বাইরের ঘরে থাকুন. ওর সামনে না গেলেই হবে। আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ যদিও যথেষ্ট, তবু আপনাকে আমি দোষী মনে করতে কিছুতেই পারছি না।"

বৌদিদির মুখে একটু হাসি দেখা দিল। বল্‌লেন, "কেন ঠাকুর পো? মেয়েমানুষকে দোষী বিশ্বাস করাই ত আমাদের দেশে সব চেয়ে সহজ ব্যাপার।"

আমি বল্‌লাম, "সে যাই হোক, আপনি এখন যাবেন না। মনোরঞ্জন একটু ঠাণ্ডা হোক, তারপর আপনার যা বলবার আছে বলবেন।"

বৌদিদি বল্‌লেন, "আমার কিছু বল্‌বার নেই। আপনি আমার জন্যে ঢের করেছেন, নিজের ভাইও এতটা করত না। এখন শেষ দয়া এইটুকু করুন, আমায় ছেড়ে দিন। এখানে আমি আর টিক্‌তে পারব না।"

আমি বল্‌লাম, "কোথায় যাচ্ছেন অন্ততঃ বলে যান। যদি এই ব্যাপারের কোন কূল কিনারা ভগবান করে দেন, তখন আপনাকে আমি যেমন করে পারি ফিরিয়ে আন্‌ব।"

বৌদিদি বল্‌লেন, "যে ছেলেটি ষ্টেশনে আপনাকে আনতে গিয়েছিল, তার কাছে খবর পাবেন হয়ত।" এই বলে তিনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেলেন। রাস্তায় একটা গাড়ীতে তাঁকে উঠতে দেখলাম। সেটা মিনিট খানিকের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

মনোরঞ্জনকে থামাতে কিছুতেই পারলাম না। তার চীৎকার আর গালাগালি সমানেই চল্‌তে লাগল। রঘুয়াকে তার কাছে বসিয়ে, আমি পাশের বাড়ী দৌড়লাম। একজন হাতছাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু আর একটিকে ছাড়ছিনা। বেশ মোটা গোছের একটি লাঠি হাতে নিয়েই চল্‌লাম।

পাশের বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা বুড়ো হিন্দুস্থানী এসে দরজা খুলে দিলে। জিজ্ঞেস করলাম, "বাবু কিধর?"

বাবু নাকি ঘণ্টা খানেক আগে গাড়ী করে বেরিয়ে গেছেন। কখন আসবেন, তা সে জানে না। আজ আসবেন কিনা, তাও সে জানেনা। এমন দুচার দিন তিনি বাইরেও থাকেন। জিনিষ পত্র কিছু নিয়ে গিয়েছেন নাকি? বিশেষ কিছু নিয়ে যাননি।

যাক, এটাও বোধহয় হাতছাড়া হ'ল। নিজের বোকামীকে ধিক্কার দিলাম। কাল গিয়ে তাকে দিব্যি পিটিয়ে আসা যেত। একজনের সংসার এমন করে ছারখার করে দিয়ে কেমন আরামে চলে গেল। বাড়ী ফিরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম।

মনোরঞ্জনের পাগলামির জ্বালায় ত অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। সে খাবেনা, ঘুমাবেনা, ওষুধ দিতে গেলে মারতে আসবে। রঘুয়া ত ভয়ে তার ঘরে যেতেই চায়না। আমার নূতন প্র্যাক্‌টিশ, সারাদিন রুগী আগলে ত বসে থাক্‌তে পারি না? নিরুপায় হয়ে দেশে তার আত্মীয়দের কাছে চিঠি লিখতে হ'ল। বৌদিদি মারা গিয়েছেন বলে' লিখে দিলাম। মনোরঞ্জনকে অনেক করে বোঝালাম, সে যেন কথাটা এখন ফাঁশ না করে। হয়ত এর কোন কিনারা পাওয়া যাবে। যে স্ত্রী এত দিন এমন ভাবে সেবা করেছে, সে একবার অপরাধ করলেও তাকে এমন করে বিসর্জ্জন দিতে আমি ত পারতাম না। কিন্তু বন্ধুবর এ বিষয়ে খাঁটি আর্য্য দেখলাম। যাইহোক এখনকার মত কথাটা চেপে যেতে সে রাজী হ'ল, এবং দিন কয়েক পরে তার এক খুড়তুতো ভাই এসে তাকে দেশে নিয়ে গেল।

মনোরঞ্জন ঘাড় থেকে নামতেই আমি বৌদিদির সন্ধানে লেগে গেলাম। খোকাদের বাড়ী গেলাম। তারা সোজা জবাব দিলে, কিছু জানেনা। তাদের রকম দেখেই বুঝলাম কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু তাদের উপর জোর ত নেই কিছু? অনেক করে বোঝালাম যে

খবরটা জানালে বৌদিদির কোনই অনিষ্ট নেই, কিন্তু তাদের মতের পরিবর্ত্তন হ'ল না।

অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। খবরের কাগজে বেনামী বিজ্ঞাপন দিলাম, ডিটেক্‌টিভের শরণ শুদ্ধ নিলাম, কোনই ফল হ'ল না। অগত্যা নিরস্ত হতে হ'ল। নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে এই অপ্রিয় ঘটনাটা ভুলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তবু ভিতরের ঘরগুলোর দিকে যখনই চাইতাম, বুকের ভিতরটা হু হু করত। এই অল্পদিনের পরিচয়েই আমি তাঁকে নিজের বোনের মত ভালবেসেছিলাম।

মাসখানিক কেটে গেল। ওদের কথা মন থেকে মুছে যেতে আরম্ভ করেছিল। হঠাৎ সামান্য একটা ব্যাপারে, সমস্ত মন জুড়ে আবার সেই সব কাহিনীই জেগে উঠ্‌ল। সকাল বেলার ডাকে মনোরঞ্জনের নামে গুটি তিনচার চিঠি এসে পৌছল। রিডাইরেক্ট করতে যাব, এমন সময় মনে হ'ল একটু খুলে দেখি, রোগী মানুষের কাছে সব জিনিষই পাঠান চলে না।

খুলে দেখলাম—পাওনাদারের তাগিদ নয়, পাওনাদারের রসিদ! কে তাদের রাতারাতি সব টাকা চুকিয়ে দিয়েছে।

মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠল। ও হতভাগার ভাবনা এত করে আর কে ভাব্‌বে? সে কি নিজেকে বলি দিয়ে স্বামীর ঋণই মিটচ্ছিল? অমন মেয়ে তা' কি পারে? পারে হয়ত। কিন্তু একে পাপ বলব, না আত্ম-বিসর্জ্জন বল্‌ব? স্বামীর জন্যেও এমন অধঃপাতে যাওয়া তার উচিত হয় নি। তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের চেহারা মনে পড়ল। সে কি মানসিক দ্বন্দ্বেরই ফল? ভগবান ভিন্ন এর সত্যাসত্য কে বুঝবে? যাই হোক, রসিদগুলো মনোরঞ্জনের নামে পাঠিয়ে দিলাম। তার মনটা একটু ঠাণ্ডা থাকবে। কে দিয়েছে, তা নিয়ে সেও মাথা ঘামাবে, হয়ত ভাব্‌বে আমিই দিয়ে দিয়েছি।

দিন কেটে চল্‌ল। পূজোর সময় এ দেশে রামলীলা হয়, কাজেই আফিস আদালত সব বন্ধ। যাদের ঘরে স্ত্রী পুত্র আছে, তারা ছুটির দিনগুলো ঘরে কাটায়, আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়াদের ঘরে সময় কাটাবার কোনো হেতু ছিলনা, আমি প্রায় সারাটা দিনই এধার ওধার ঘুরে বেড়াতাম। সভাসমিতি, এর বার্ষিক অধিবেশন, ওর ষাণ্মাসিক অধিবেশন লেগেই ছিল। কাজেই সময় কাটাবার জন্যে বেগ পেতে হতনা।

একটা চিত্রপ্রদর্শনীও হচ্ছিল। আমারই সমব্যবসায়ী এক বন্ধুকে নিয়ে একদিন প্রদর্শনী দেখতে যাত্রা করা গেল। আমার বাসা থেকে এগ্‌জিবিশনের হল্‌টা একটু দূরে। একখানা ট্যাক্সি জোগাড় করে' বেরিয়ে পড়া গেল।

বন্ধুকে বল্‌লাম, "ট্যাকে কিছু নিয়ে বেরিয়েছেন ত? ধরুন যদি কোনো ছবি খুব পছন্দ হয়ে যায়?"

বন্ধু হেসে বল্‌লেন, "ট্যাকের যা অবস্থা, তাতে কালিঘাটের পট বড় জোর কেনা চলে। আপনি বরং আইন-আকাশের উদীয়মান সূর্য্য, দুচার শ' টাকা আর্টের খাতিরে খরচ করতে পারেন।"

হলে পৌছলাম। সেদিন বেশী ভীড় ছিল না, ঘুরে ফিরে সব দেখতে লাগলাম। লোকজনের ধাক্কায় ক্রমে দুই বন্ধু দুদিকে ছিটকে পড়লাম।

হঠাৎ ডাক শুন্‌লাম, "সুরেন বাবু, এদিকে আসুন।"

পাশ কাটিয়ে গিয়ে বন্ধুবরের কাছে হাজির হ'লাম। কি ব্যাপার?

সে বল্‌লে, "দেখুন এ ছবিখানা। এরপর আর কোনো দিন বল্‌বেন না যে আমাদের আর্টিষ্টদের অয়েল্ পেন্‌টিঙে হাত নেই। কি গ্র্যাণ্ড এঁকেছে। ওদেশে হ'লে এর জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।"

তার বক্‌বকানি আমার কানে যাচ্ছিল কিনা সন্দেহ। ছবিখানা দেখে আমার দশা প্রায় বজ্রাহতের মতই হয়েছিল। ছবির নাম, "সতীদাহ।" জলন্ত চিতা, নির্জ্জন নদীতটে ভয়াবহ শ্মশানভূমি। চিতার উপরে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সতী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করে বসে। তার মুখ হুবুহু আমার হতভাগিনী বৌদিদি সরোজিনীর। তাঁর মুখে সেই যে যন্ত্রণার ভাব দেখেছিলাম, এই ছবির মুখেও তাই, আরো যেন গাঢ়তর। কিন্তু সেই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই আরো একটা অলৌকিক ভাব ফুটে উঠেছে, যা কেবল সরোজিনীর মুখেই ফুট্‌তে পারত। চিত্রকরের নামও পরিচিত, আমাদের প্রতিবেশী।

বন্ধু বল্‌লেন "কি হে, একেবারে মাটিতে পুঁতে গেলে যে? চমৎকার ছবি না? টাকা থাকলে কিনে ফেল্‌তাম, কিন্তু এটা কোন এক মহারাজার সম্পত্তি দেখছি। দেখছ, চার হাজার টাকায় বিক্রী হয়েছে।"

আমি বল্‌লাম, "হ্যাঁ, চমৎকার ছবি বটে, কিন্তু আমার শরীর বড় খারাপ লাগ্‌ছে, আমি বাড়ী চল্‌লাম।" বিস্মিত বন্ধুকে আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে আমি এক রকম ছুটেই চলে' গেলাম।

প্রদর্শনীর কর্ত্তাদের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁহাদের সাহায্যে চিত্রকর অনুকুল মল্লিকের ঠিকানা সহজেই বার করতে পারলাম। কি কি তাকে



যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ

শিল্পী শ্রীমতী সুকুমারী দেবী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কেমন ভাবে বল্‌ব,তা বেশ ক'রে মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে নিয়ে তার বাড়ী চল্‌লাম।

সে ব্যক্তি সবে বৈকালিক চা পান ক'রে একটা চুরুট ধরিয়েছে, এমন সময় আমার শুভাগমনে একেবারে আঁৎকে গেল। চুরুটটায় টান দেওয়ার কথা শুদ্ধ সে ভুলে গেল। আমি নমস্কার করে বল্‌লাম "কি মশায়, চিনতে পার্‌ছেন না, নাকি? এতকাল আমার পাশের বাড়ী ছিলেন।"

নিজেকে সামলে নিয়ে অনুকূল বল্‌লে, "ও আপনিই ১৫ নং এ থাক্‌তেন বুঝি? তা কি মনে ক'রে?"

আমি বল্‌লাম, "আপনার 'সতীদাহ' ছবিখানা বড় চমৎকার হয়েছে। তাই আপনার কাছে না এসে পার্‌লামনা।"

সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

আমি বল্‌লাম, "এর মডেল কি দুনিয়ায় আর ছিল না, যে, গরীব ভদ্র লোকের সর্ব্বনাশ করতে গিয়েছিলেন?"

এতক্ষণে সে বেশ খানিকটা সপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল। বল্‌লে, "আমাদের এদেশে যে মডেলগুলি সুলভ তাদের নিয়ে সতীর ছবি আঁকা যায় ব'লে আমি অন্ততঃ মনে করিনা। কিন্তু সর্ব্বনাশটা আমি কি কর্‌লাম? তাঁর কাজের জন্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিইনি, একথা তিনিও বল্‌বেন না।"

আমি বল্‌লাম, "ন্যাকা সাজবেন না মশায়। টাকায় কি মানুষের মান ইজ্জৎ নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ হয়?"

সে বেশ একটু গরম হয়ে বল্‌লে, "ন্যাকা দেখি আপনিই সাজছেন। আমার সামনে ঘণ্টা খানিক করে তাঁকে বসে থাকতে হ'ত, তাতেই তাঁর মান ইজ্জৎ গেল? তিনি আপনাদের এই কথা বলেছেন নাকি?"

আমি বল্‌লাম, "তিনি যে আমাদের কাছে নেই, তা মশায় বেশ ভাল করেই জানেন।"

লোকটি এবার চটেই গেল। বল্‌লে, "দেখুন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজে বক্‌বার সময় আমার নেই। যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন, যে, তাঁর কোনো রকম অসম্মান আমি করেছি, বা তাঁর সঙ্গে যা কথা হয়েছিল, সে টাকা আমি দিইনি, তখন আস্‌বেন। তাঁকে যন্ত্রণা যে টুকু দিতে বাধ্য হয়েছি, তাও তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়ে।"

আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি যন্ত্রণা দিয়েছিলেন? বেশী কিছু নয় ত?"

সে খুব একটা উদাসীন ভাব মুখে আনবার চেষ্টা করে বল্‌লে, "শুনতে চান, শুনুন। আগুনে পোড়ার যন্ত্রণার ভাবটা তাঁর মুখে আনা আমার দরকার ছিল। সেই জন্যে লোহার শিক পুড়িয়ে রোজ তাঁর পিঠে ছ্যাঁকা দেওয়া হ'ত।"

আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম। এত বড় অমানুষ যে মানুষে হয়, তা বিশ্বাস করতে বাধ্‌ছিল। আর হতভাগিনী বৌদিদি আমার! তাঁর পায়ের ধূলো নেবার যোগ্য আমরা নই। অথচ আমরাই তাঁর বিচারক সেজে তাঁকে কত বড় দণ্ড দিয়েছি!

লোকটার সামনে বসতে আর পার্‌লাম না। উঠে পড়ে বল্‌লাম, "দেখুন আইনতঃ শাস্তি দেবার অধিকার আমার নেই, তা না হ'লে এই লাঠির ঘায়ে আপনার আর্টভরা মাথাটা আমি দুফাঁক ক'রে দিতাম। বে-আইনী কাজ করতেও আমার আটকাত না, কিন্তু থানা পুলিশ করবার সম্প্রতি আমার সময় নেই। এর চেয়ে বড় কাজ আমার আছে, তাই এবারকার মত আপনি বেঁচে গেলেন।"

লোকটা হাসবার চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু হাসিটা জমলনা বিশেষ। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।"

সুরেন্দ্র থামিয়া গেল। খানিক পরে বলিল, "এই মেয়ে সহমরণে যেতে পার্‌ত না বলে তোমার মনে হয়?"

অবনী বলিল, 'তা আর বলি কি করে? কিন্তু নিতান্ত তুমি বল্‌ছ বলেই এটা বিশ্বাস করলাম, অন্যলোকের কাছে শুন্‌লে নিশ্চয় গল্প বলে উড়িয়ে দিতাম।"

সুরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, ঠিক বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয় বটে।"

অবনী বলিল, "কিন্তু গল্পটা এখানে থামিয়ে দিলে বড় বেশী ট্র্যাজিডি হয় হে। তাঁকে কি আর পাওয়া যায় নি?"

সুরেন্দ্র বলিল, "তোমার ছেলেমানুষের মনটা এখনও যায়নি দেখছি। গোড়াতেই বলেছিলাম না, তাঁরা বেঁচে আছেন? বেঁচে আছেন জেনেও আমি কি আর নিশ্চিন্ত ছিলাম? বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা আবার ঠিক গিয়ে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখন ওঠা যাক, বেলা বেশ হয়েছে।"

লাইব্রেরির মুখ্য কর্ত্তব্য

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। লোহার সিন্ধুক বোঝাইয়ের জন্যে টাকা সংগ্রহই হোক্, বা সম্প্রদায়ের আয়তন বাড়াবার জন্যে লোক সংগ্রহই হোক্, সেই সংগ্রহবায়ুর ধাক্কায় মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, ঘাটে পৌঁছবার উদ্দেশ্যটা সেই অন্ধ বেগে অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে,—সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয় একথা মনে থাকে না।

অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অল্প চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠেসা করে' রাখে। যার অনেক টাকা, আমাদের দেশে তাকে বড়োমানুষ বলে, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগদানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহঙ্কার-তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হ'লে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মানলাভের জন্যে ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।

আমাদের ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে তার দু'রকমের আধার, এক অভিধান, আর এক সাহিত্য। গণনা করে' দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেশী ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়। অথচ তাদের সঞ্চয় আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশি একথা মান্‌তেই হয়।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে সেই একই কথা। লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহার-যোগ্য করে তোল্‌বার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার কর্‌তে চায়না। তার কারণ সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা সহরের মতো হ'য়ে ওঠে যার বাড়িঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।

যারা বিশেষ ভাবে বই সন্ধান কর্‌বার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়েচলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্চে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেই হেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পার্‌লেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেন না, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা ক'রে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হ'লো বড়ো লাইব্রেরি, আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি ক'রে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি ক'রে তোলে।

এই কথাটি যদি মনে রাখা যায় তাহ'লে বোঝা যাবে লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখ্‌লেই তার কাজ সারা হ'ল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ

সেটুকু সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থ-বোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হ'লে চল্‌বে না।

কিন্তু লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশি বড়ো হ'লে কোনো লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেই জন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যত ভাণ্ডার, ছোট ছোট লাইব্রেরি ভোজন-শালা—তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।

ছোট লাইব্রেরি বল্‌তে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাক্‌বে কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাক্‌বে না, প্রত্যেক বই থাক্‌বে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরিয়ান্ হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভী, শেল্‌ফ ভর্ত্তির অহঙ্কার তাঁকে ত্যাগ কর্‌তে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাক্‌বে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য, আর লাইব্রেরি-য়ানের থাক্‌বে গুদামরক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য-পালনের যোগ্যতা।

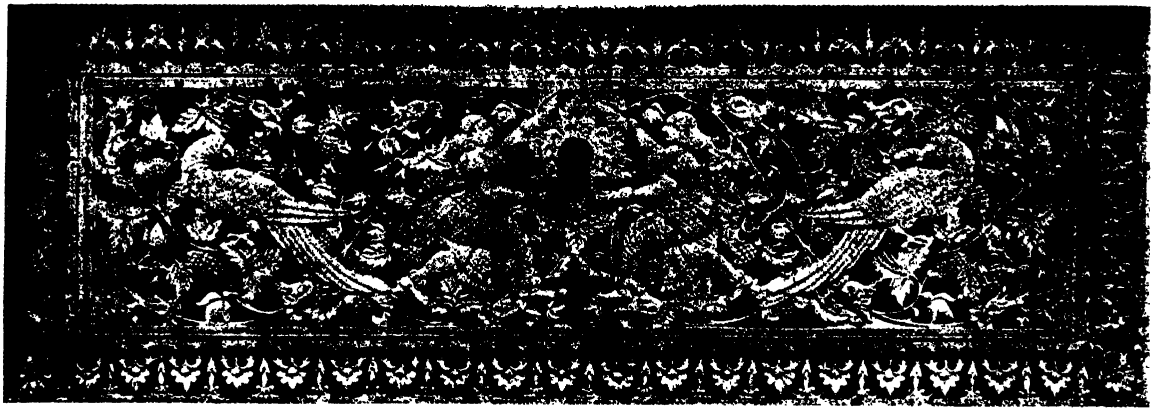
মনে কর কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে, কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত ভাবে নির্দ্দিষ্ট করে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তাহলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। নইলে এই সকল পত্রিকা বারো আনা অপঠিত ভাবে স্তূপাকার জমে উঠে লাইব্রেরির স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে। নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে দেন। যে কোনো বিষয়ে কোনো ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।

ঘোষণা হবে কার কাছে? বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর কাছে। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রোরয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখ্‌তে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরীর মর্ম্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্ত্তব্যপালন, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।

যে-বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেচেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্ত্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই বিষয়বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কি কি বই প্রকাশিত হচ্চে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্ব্বাচন কর্‌তে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীর উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জ্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হ'লে একটা অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেই খানে পাঠযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হ'লে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে যদি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয়, তবে সেই লাইব্রেরি-গুলিতে কি কি বই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।

এই প্রবন্ধে আমি যে-কথাটি বল্‌তে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্ত্তব্য, গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।



গজদন্তশিল্প

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাগ্-ঐতিহাসিক প্রস্তরযুগের শিল্পের যে সকল নিদর্শন আমাদের সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার মধ্যে অতিকায় হস্তীর (Mammoth) দাঁতের কাজগুলি অতি সুন্দর। সে যুগের মানুষের শিল্পকলা অতি অসংস্কৃত ও আদিম, কেননা তখন এই বিষয়ে শিক্ষা দীক্ষা ত ছিলই না, উপরন্তু যন্ত্রপাতিও ছিল ততোধিক অসংস্কৃত। কিন্তু হাতীর দাঁত এমনই জিনিষ যে, সেই শিক্ষার অভাব এবং স্থূল যন্ত্রপাতি সত্ত্বেও তখনকার শিল্পীর কাজ এই সভ্যযুগের লোকের চোখে সুন্দর বলিয়াই মনে হয়।

তাহার কারণ এই যে, হাতীর দাঁত শিল্প-কার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। কর্ত্তন, ক্ষোদন, ছেদন, ইত্যাদি কারু-কার্য্যের সকল প্রথাই ইহাতে সহজ ও সরল ভাবে করা সম্ভব। সুতরাং আদিম মানুষ এই পদার্থের সাহায্যে সহজেই তাহার শিল্পচাতুর্য্য দেখাইতে সক্ষম হয়।

হাতীর দাঁত স্বভাবতই সুন্দর, মসৃণ এবং স্নিগ্ধ-স্পর্শ। এই সকল নানা কারণেই শিল্পসৌন্দর্য্যগ্রাহীর নিকট ইহা এতই আদরণীয়।

আমাদের দেশে এই শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন।

রামায়ণে ভরতের রামের অন্বেষণে যাত্রার বিবরণে ভরতের অনুচরদিগের মধ্যে গজদন্তক্ষোদকের উল্লেখ আছে। মহাভারতের হরিবংশ নামক পরে যুক্ত অংশে হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের বিবরণে গজদন্তনির্ম্মিত বাতায়নের উল্লেখ আছে। ঐ দুই পুস্তক খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে লিখিত বলিয়া খ্যাত। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে লিখিত অর্থশাস্ত্রে গজদন্ত নির্ম্মিত তরবারিমুষ্টি, এবং গজদন্তনির্ম্মিত মহামূল্য দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন বাৎস্যায়নের কামসূত্রে গজদন্তনির্ম্মিত পুত্তলিকা, গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের ভারতবিবরণীতে গজদন্ত-নির্ম্মিত বলয় আভরণ, মৃচ্ছকটিকে গজদন্তনির্ম্মিত তোরণ, বৃহৎ-সংহিতায় গজদন্ত অলঙ্কৃত কাষ্ঠশয্যাসন ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, হাতীর দাঁতের কাজ আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পমধ্যে অন্যতম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশে এমন কোনও গজদন্ত শিল্পের নিদর্শন নাই যাহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই হাতীর দাঁত পূজার উপকরণ হইতে পারে না। সুতরাং দেবমন্দিরে তাহার স্থান না থাকায়, গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্যাদি যত্নে রক্ষিত হয় নাই।

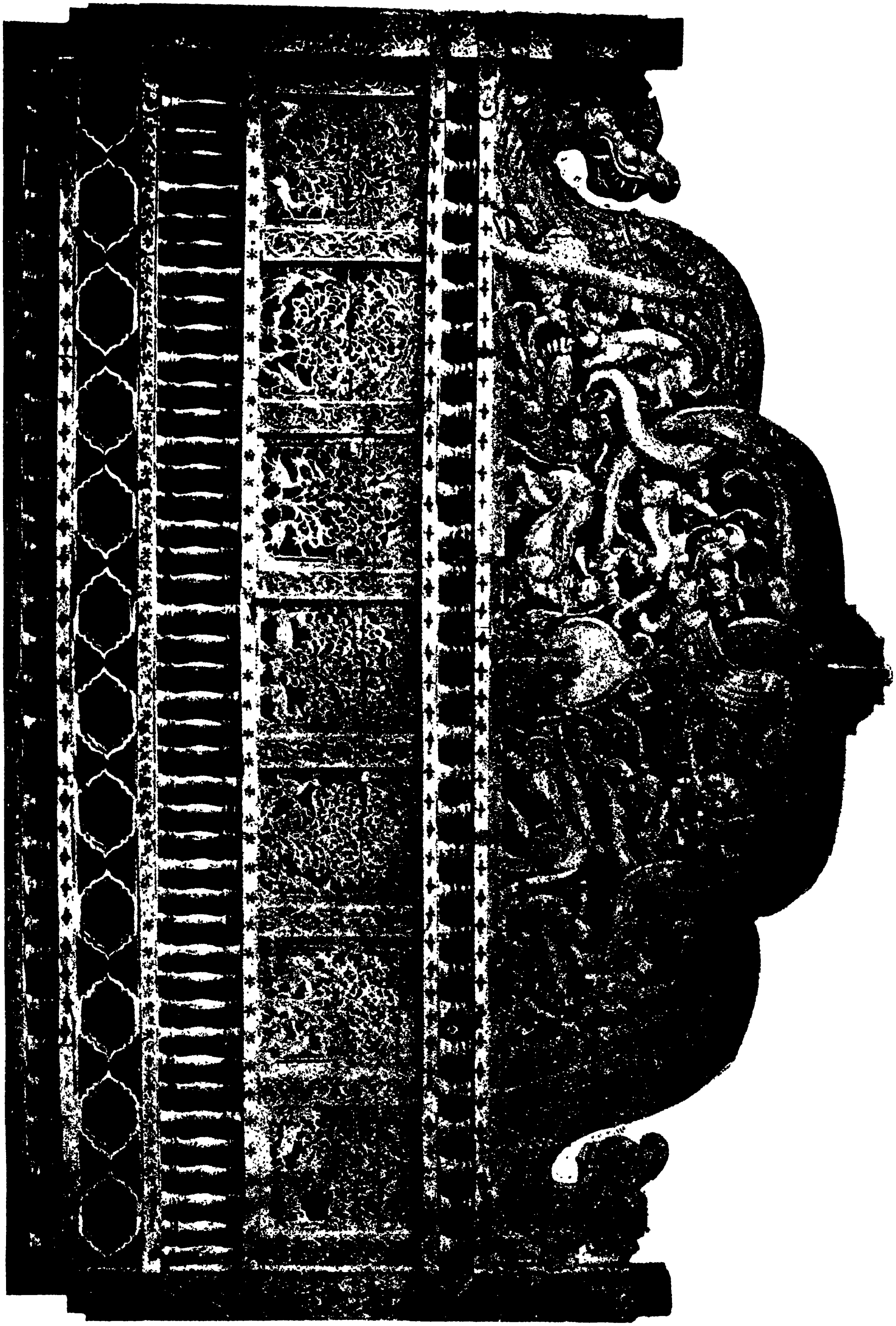
যদিও এদেশে প্রাচীন গজদন্ত-শিল্পের কোনও নিদর্শন নাই কিন্তু প্রাচীন গজদন্ত-শিল্পীর কার্য্যকুশলতার নিদর্শন আছে। সাঁচী-স্তূপের দক্ষিণ দিকের তোরণের অংশে ইহা



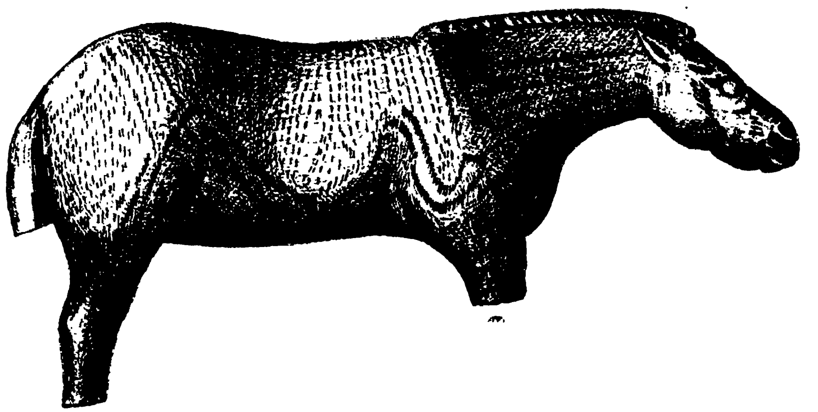


উড়িষ্যার গোবিন্দরাম শিল্পীর নির্ম্মিত গোপাল মূর্ত্তি

পশ্চাৎ সম্মুখ



মহীশূরের প্রাচীন গজদন্ত শিল্পের নিদর্শন



প্রস্তরযুগের শিল্প। অতিকায়হস্তীদন্ত নির্ম্মিত অশ্বমূর্ত্তি

লিখিত আছে যে ঐ অংশ "বিদিশানগরের গজদন্ত শিল্পীগণ কর্ত্তৃক ক্ষোদিত এবং উৎসর্গীকৃত" সুতরাং ঐখানে আমরা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের ভারতীয় গজদন্ত শিল্পীর কারুকৌশলের নিদর্শন পাই। ব্রাহ্মণাবাদে প্রাপ্ত গজদন্তের 'দাবাবড়ে' খৃঃ ৮ম শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাই এদেশের ঐ শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশের নানাস্থানে হাতীর দাঁতের কাজ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ এবং দিল্লী অঞ্চলের কাজ উৎকৃষ্ট।

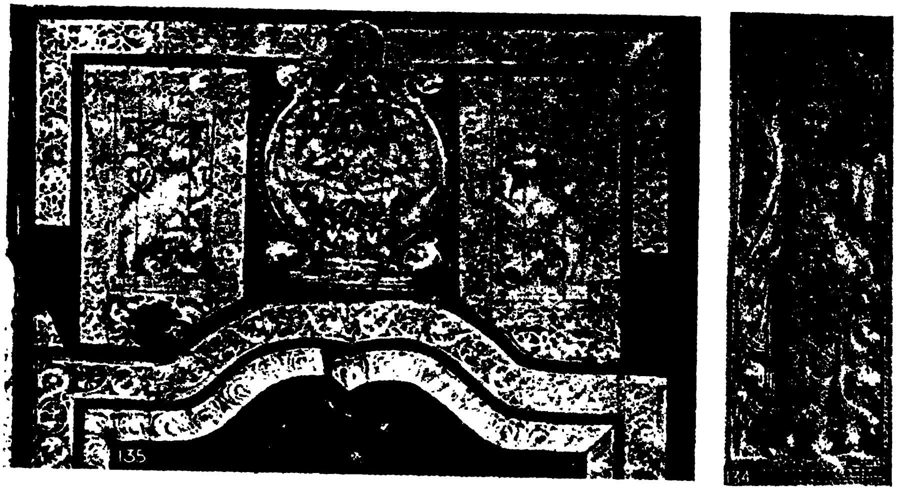
ডাঃ কুমারস্বামীর মতে বৌদ্ধ সিংহল এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। সেদেশে বুদ্ধ মূর্ত্তি হইতে গৃহদ্বারের অলঙ্কার পর্য্যন্ত নানা প্রকারের দ্রব্য এই পদার্থে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সে দেশের শিল্প ভারতীয় ভাস্কর্য্য প্রথার পরিমাপে অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই কিন্তু উড়িষ্যা বা মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের কাজ কারু-কৌশল হিসাবে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। সিংহলের কাজ প্রস্তর ভাস্কর্য্যের অনুরূপ, উড়িষ্যা মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের শিল্প দারু-শিল্প এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-কারের শিল্পের মধ্যবর্ত্তী, ইহাই আমার ধারণা।

শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ এই শিল্পে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও তাহার এতটা স্থানচ্যুতি ঘটে নাই কিন্তু বাঙ্গালীর শিল্প সম্বন্ধে স্বদেশ-প্রীতির অভাব বা বিদেশীর অনুকরণ-প্রবণতার দরুণ এখন এ প্রদেশের গজ-দন্ত-শিল্প লুপ্ত প্রায়। ১৮৮৩ খৃঃ জয়পুর শিল্প-প্রদর্শনীতে মুর্শিদাবাদের লালবিহারী নামক শিল্পীর কাজ ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে এদেশে ও বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের গজ-দন্ত-শিল্প অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করে। এখনকার কথা না বলাই ভাল। যাঁহারা এবিষয়ে জানিতে চাহেন তাঁহারা ১৩২০ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

দক্ষিণভারতের শিল্প সেখানকার ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের উৎসাহ দানের ফলে এখনও জীবিত আছে। উড়িষ্যার শিল্পের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। কিন্তু বংলার মত শোচনীয় দুর্দ্দশা কোথাও হয় নাই।

অল্প দিন হইল দিল্লীতে এই শিল্পের খুব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বিদেশী ক্রেতার আদরে সেখানে অনেক শিল্পীর অন্নসংস্থান হইয়াছে। এবং এই সকল শিল্পীর মধ্যে বাঙ্গালী, শিক্ষক এবং নিপুণ কারিগরের, কাজ করিতেছে।

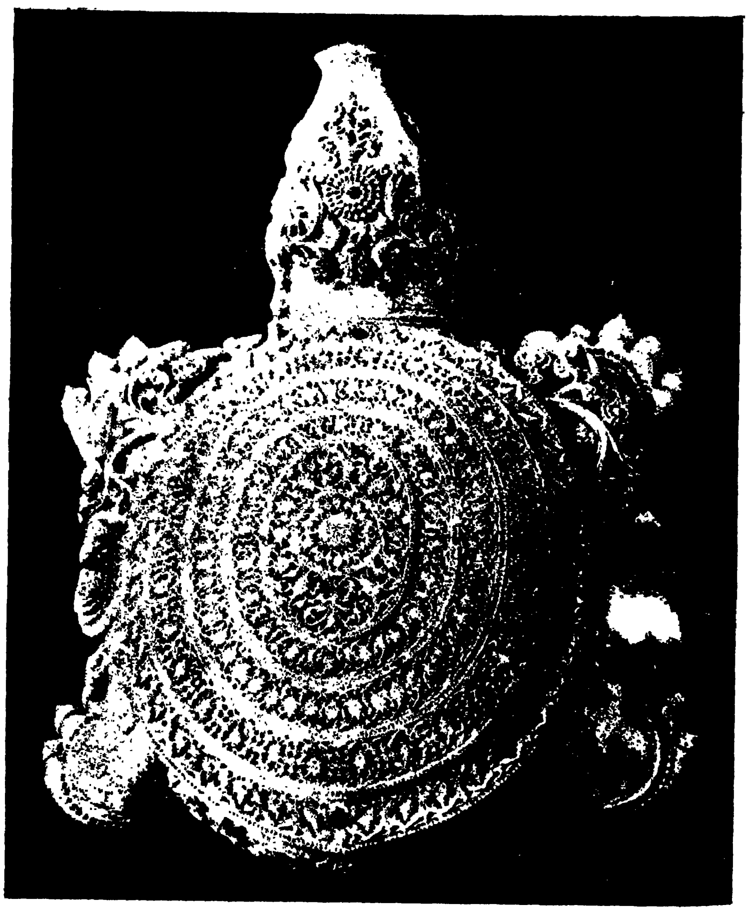
শোনা যায় মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব বিদেশ (সম্ভবতঃ পাটনা বা দিল্লী) হইতে গজ-দন্ত-শিল্পী এ প্রদেশে আনয়ন করেন। মুর্শিদাবাদের এক ভাস্কর তাহার নিকটে ঐ কার্য্য শিক্ষা করে। তাহার পুত্র তুলসী খাটুয়র মুর্শিদাবাদ গজ-দন্ত-শিল্পের প্রাণ দাতা। তুলসী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে তিনি নবাবের আদর



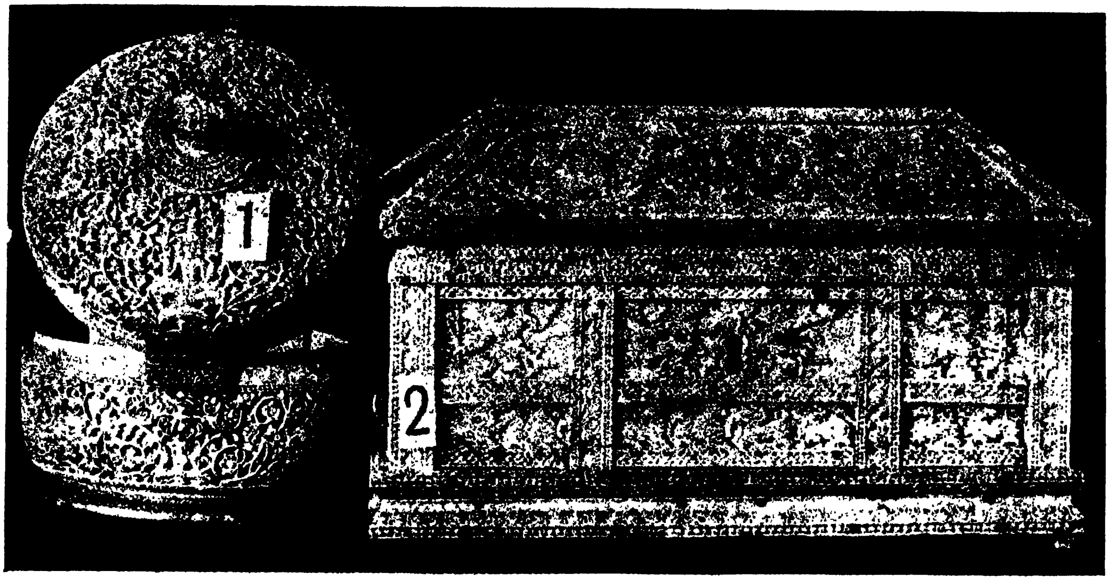
সিংহলের প্রাচীন গজদন্তশিল্প

অনুরোধ-এবং শেষে বাধা উপেক্ষা করিয়া পলাইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করেন। তীর্থ-যাত্রার খরচ নির্ব্বাহ এই নিপুণ শিল্পীর পক্ষে সহজ ছিল। সামান্য যন্ত্র-পাতির দ্বারা তিনি যাহা কিছু নির্ম্মাণ করিতেন তাহাই সর্ব্বজন-আদৃত এবং সহজেই বিক্রীত হইত। এইরূপে তিনি গয়া কাশী বৃন্দাবন ইত্যাদি দর্শন করিয়া শেষে জয়পুরে যান। সেখানকার মহারাজা তাঁহার শিল্পকলা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত এবং আদর-যত্ন করেন। দীর্ঘ ১৭ বৎসর কাল প্রবাসে অতিবাহিত করিয়া তুলসী মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন।

তখন তাঁহার পূর্ব্বকার প্রভু নবাব গত। নূতন নবাব তুলসীর গুণের কথা শুনিয়াছিলেন সেইজন্য তুলসী ফিরিবা মাত্র দরবারে তাঁহাকে ডাকান হয়। নূতন নবাব তুলসীকে ভূতপূর্ব্ব নবাবের প্রতিকৃতি গজদন্তে নির্ম্মাণ করিতে বলেন। এই

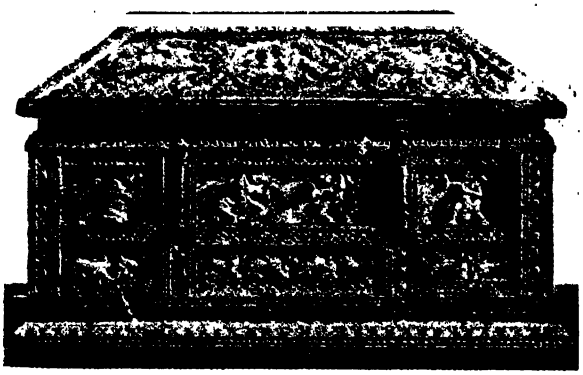


উড়িষ্যার প্রাচীন গজদন্তশিল্প



দক্ষিণ ভারতের গজদন্তশিল্প

প্রতিকৃতি এত অবিকল হইয়াছিল যে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তুলসীকে গত ১৭ বৎসরের বেতন দান করেন।



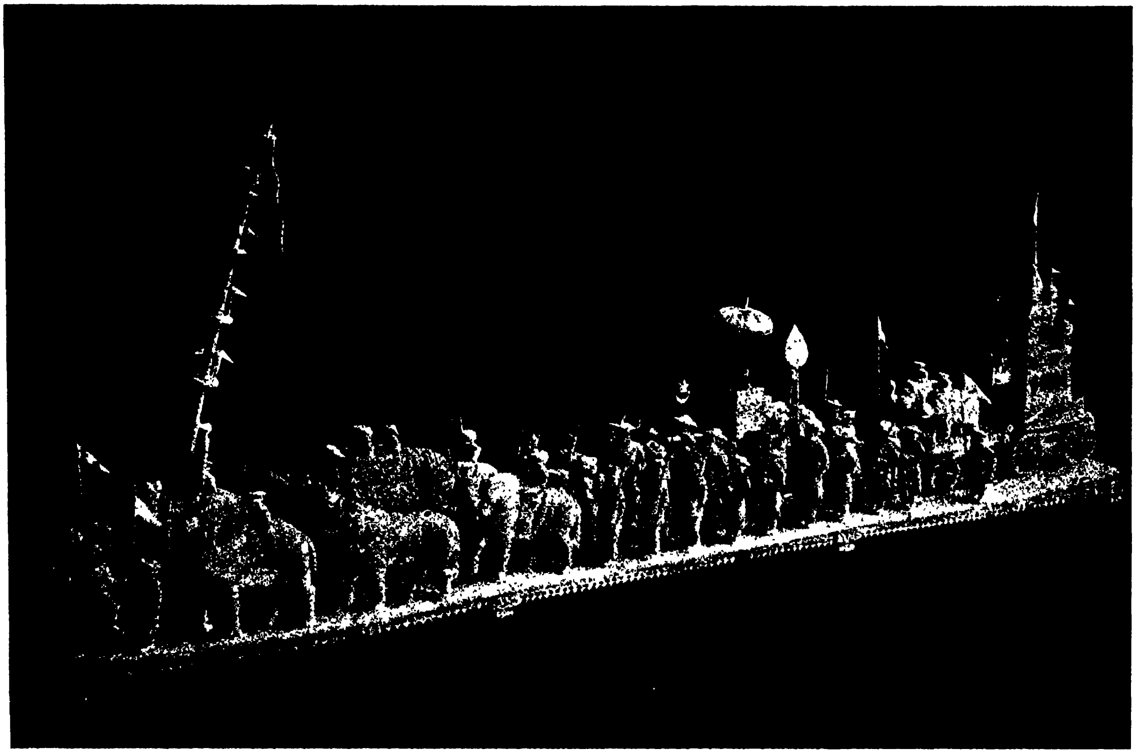
গজদন্তনির্ম্মিত কৌটা। ত্রিবাঙ্কুর।

এই মহাগুণী শিল্পী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের (তাঁহার আত্মীয়সকল) দ্বারা এ প্রদেশে গজদন্ত-শিল্পের এতই উৎকর্ষ সাধন হয় যে দিল্লীতে এখন তাঁহাদের বংশধরগণ, বংশের আদি গুরুর দেশে, শিক্ষা ও দীক্ষা দান করিতে গিয়াছে। ইহা বঙ্গের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু ইহাও সত্য যে এই সকল গুণী লোক নিজদেশে অনাদৃত হইয়া অন্নের কারণে বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

শোনা যায় ত্রিপুরা শ্রীহট্ট ইত্যাদি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে এখনো নিপুণ কারিগর আছে। তাহাদের কাজের নিদর্শন বাজারে দেখা যায় না তাহাদের ঠিকানাও সাধারণে জানে না।

রংপুরে কুড়িগ্রাম অঞ্চলে পাঙ্গাগ্রামে কয়েকঘর মুসলমান খোন্দকার পরিবার ছিল। তাহারা এককালে গজদন্ত-শিল্পে নিপুণ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করে। এখন তাহাদের নামই শোনা যায় না।

এখন এদেশে গজদন্ত-শিল্পের যে বিশেষ অবনতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ শিল্পীদের কারুকার্য্যে বিশেষ আড়ষ্টভাব আসিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে ক্রেতার অভাবে তাহারা তাহাদের শিল্পের ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। দেব-দেবীর অসংস্কৃত মৃণ্ময়মূর্ত্তির অনুকরণ, অল্প কয়েকটি সাবেকী সহজ আদর্শের গতানুগতিক অনুকরণ, সাধারণ খেলনা, চুড়ি আংটি ইত্যাদি, এই এখনকার শিল্পীর গণ্ডী। নূতন নক্সা বা নূতন প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উৎসাহ বা জ্ঞান তাহার নাই, যদিও একথা বলা যায় না যে তাহার নৈপুণ্য বা কারুকৌশল লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও অর্থোপার্জ্জনের পন্থা



মুর্শিদাবাদের গজদন্তশিল্প। জগন্নাথের রথযাত্রা

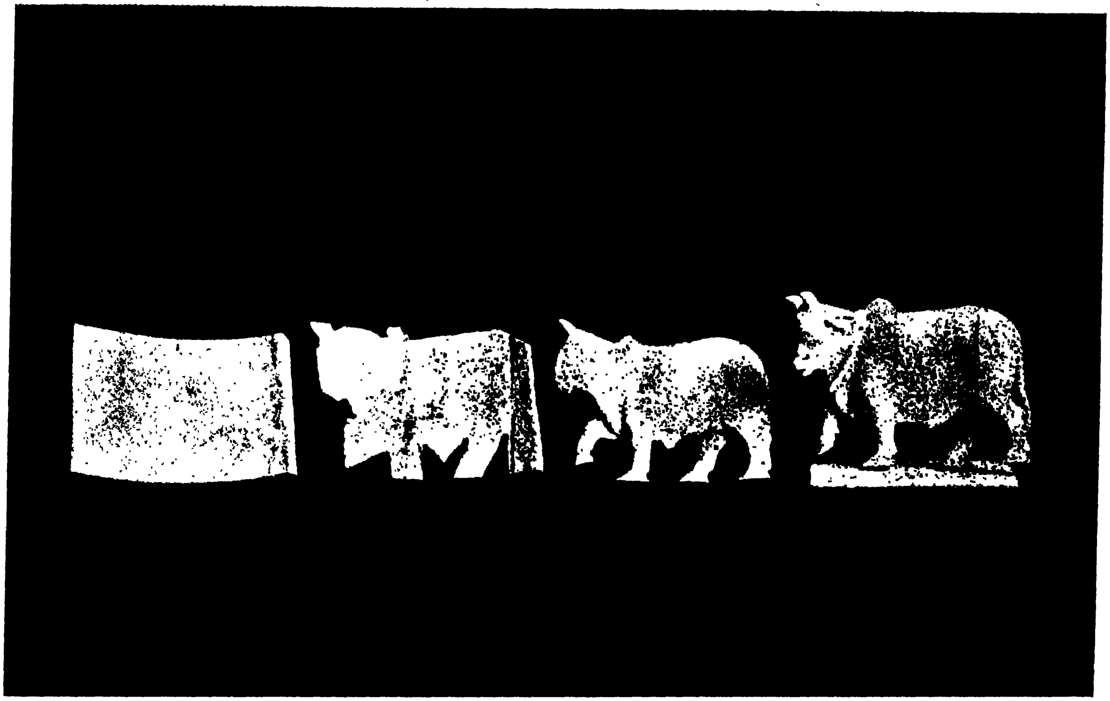
পাইলে এ বিষয়ে উন্নতি করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু সে উৎসাহ দান এবং অর্থোপার্জ্জনের পথনির্দ্দেশ করিবে কে?

মুর্শিদাবাদের শিল্পীর কাজের বিশেষত্ব তাহার সমস্ত কাজ একখণ্ড দন্ত হইতে প্রস্তুত করার চেষ্টা। খণ্ড যোজনা দ্বারা শ্রম ও ব্যয় সংক্ষেপের সে পক্ষপাতী নহে। ইহাতে তাহার কাজ সুদৃঢ় এবং খাঁটী হয় এবং ইহা তাহার নৈপুণ্যেরও পরিচায়ক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ এবং কৌশলের সামান্য অভাব ঘটিলেই দ্রব্যটি আড়ষ্ট বা অন্য দোষযুক্ত হয়। যে শিল্পী (যথা অন্যান্য প্রদেশের শিল্পী) খণ্ডযোজনা করে তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যোজনা করিয়া বৃহৎ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব। এবং এক খণ্ডে দোষ ঘটিলে তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য একখণ্ড প্রস্তুত করিলেই চলে।

সুতরাং বঙ্গের গজদন্তশিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে এখানের কারিগরদিগকে প্রথমে আমাদের প্রাচীন শিল্পের অনুযায়ী নক্সা পরিকল্পনা ইত্যাদি শিখাইতে হইবে। তৎপরে, তাহাদের কারুকার্য্যপ্রথাও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে। নূতন প্রকারের সৌখিন লোকের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি এবং বিদেশে আদৃত প্রাচীন দ্রব্যের নিপুণ অনুকরণ ইত্যাদিও আবশ্যক।

মূল কথা এই যে এখন একটি কারুশিল্প-বিদ্যালয় এবং একটি ব্যবহারিক শিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনীর বিশেষ আবশ্যক। কেন না বিদেশীয় যন্ত্রাদি (যথা প্যান্টাগ্রাফ, নানা প্রকারের বুলি ও ক্ষোদন ছেদন, ছিদ্রকরণ ইত্যাদির যন্ত্রাদি) ব্যবহার শিক্ষা এবং এদেশের শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দর্শন ভিন্ন এই শিল্পের অবনতি রোধ করা সম্ভব হইবে না।

এখনকার শিল্পীর কার্য্যপ্রথা অতিশয় গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে একখণ্ড দাঁত মাপ অনুসারে কাটিয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের সাহায্যে নক্সা কাটা হয়। সেই নক্সার ধারায় বাটালির (রুখানি) দ্বারা



শিল্প-পদ্ধতি। খণ্ড কর্ত্তন, স্থূল আকারে পরিণতি, আকার দান, কারুকার্য্য শেষ।

মোটামুটি কাটিয়া ছাঁটিয়া দ্রব্যটি স্থূল আকৃতিতে আনিয়া, উকায় ঘষিয়া তাহাকে যথা আকারে পরিণত করা হয়। তাহার পর তুরপুন এবং বুলি (graver) বা কলম দ্বারা কাজ শেষ করিয়া, জিনিষটিকে ভিজা অবস্থায় মাছের আঁশ ও চা খড়ি দ্বারা পালিশ করা হয়। যদি কখন খণ্ড যোজন প্রয়োজন হয় যন্ত্র সাহায্যে খণ্ডগুলিতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া হাতীর দাঁতের কীলক দ্বারা যোজনা করা হয়।

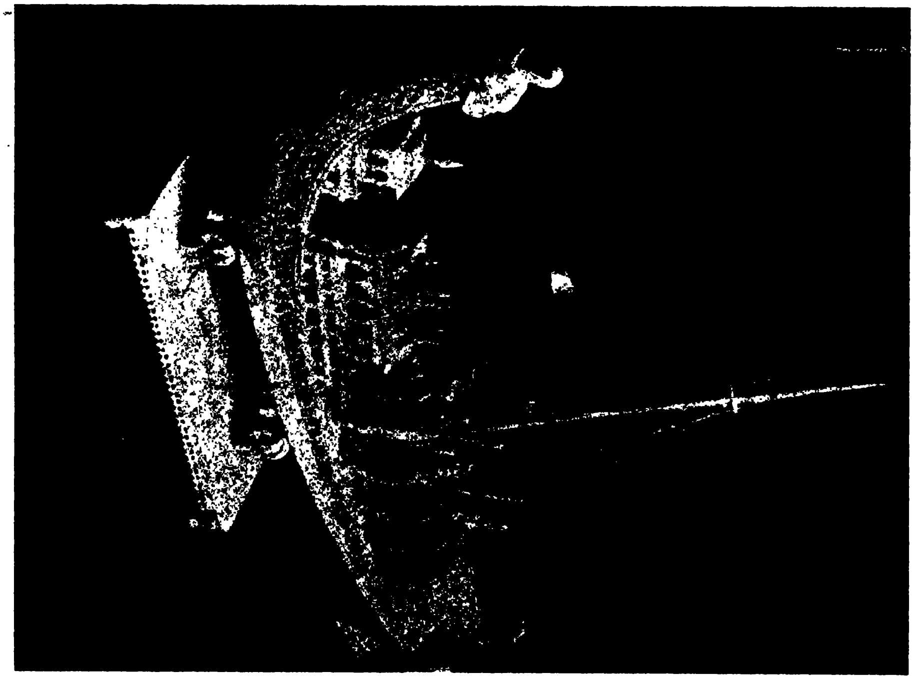
গজদন্তের স্বাভাবিক বর্ণই সাধারণতঃ বজায় রাখা হয়। কিন্তু কখন কখন লাক্ষা যোগে প্রস্তুত বর্ণ সাহায্যে ঐ সকল দ্রব্য রঞ্জন করা হইয়া থাকে। বিশেষে বাদ্য-যন্ত্রাদির অলঙ্কার এবং অঙ্গ-ভূষণ অলঙ্কারে ইহার ব্যবহার বেশী প্রচলিত। কখন কখন অন্য পদার্থের (যথা কচ্ছপ খোলস বা কাঁচকড়া) সঙ্গে ইহার যৌগিক ব্যবহার হয়। ভিজাগাপটম ও তাঞ্জোর এই প্রকার রঞ্জন ও কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

ত্রিবাঙ্কুর ও উড়িষ্যার শিল্পে এখনও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ধারা বহিতেছে। মহীশূর সিংহল, বাংলাদেশ দিল্লী ইত্যাদিতে বৈদেশিক প্রভাব দেশীয় শিল্প-প্রথাকে গ্রাস করিয়াছে। ফলে ঐ সকল প্রদেশের গজদন্ত-শিল্পের বিশুদ্ধভাব আর নাই।

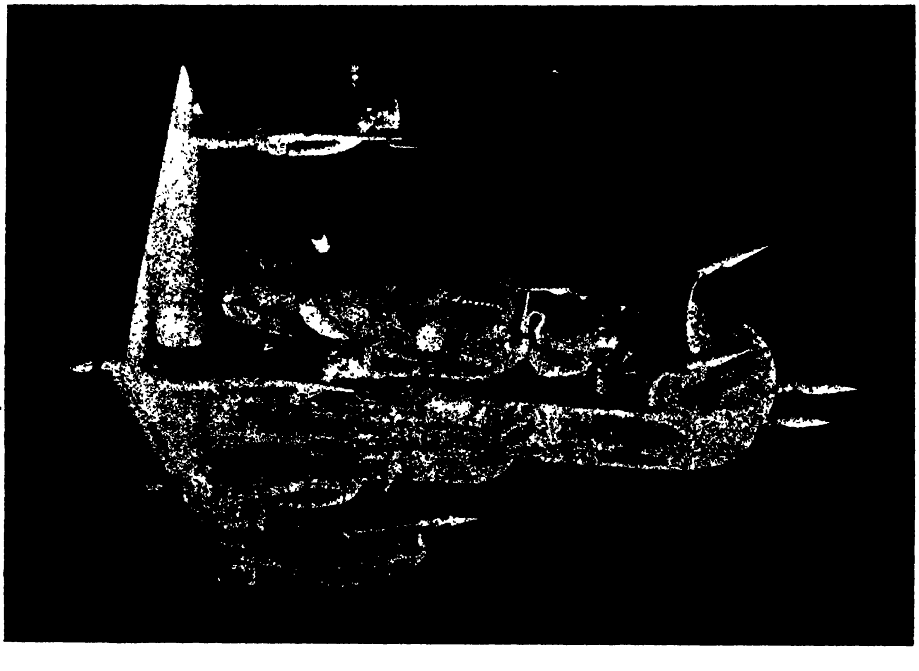
মহীশূরের প্রাচীন শিল্পের মৌলিকতা গিয়াছে; এখন বিদেশী ভাবাপন্ন "রিয়ালিষ্টিক" পরিকল্পনা তাহার স্থানে অধিষ্ঠিত। এবং দিনে দিনে এইরূপে অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য বাস্তবের ঠেলায় বিতাড়িত হইতেছে।

রাজপুতানায় জয়পুর, বিকানির, উদয়পুর এই সকল অঞ্চলে গৃহদ্বার ইত্যাদিতে গজদন্তের ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা মুঘল প্রথা অনুযায়ী অলঙ্কার কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদয়পুর বড়িপোল প্রাসাদে গজদন্তের এইরূপ ব্যবহারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে।

শয্যাসনে গজদন্তের ব্যবহার সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। কাশীনরেশের এইরূপ শুদ্ধ গজদন্ত নির্ম্মিত এক প্রস্থ আসবাব ছিল। কোম্পানীর আমলের লুণ্ঠনকারী বিদেশী দস্যুদের হাতে তাহা পড়ে নাই কিন্তু ব্রিটিশ-শার্দ্দূল শ্রীল শ্রী লর্ড কর্জ্জন মহাশয় তাঁহার স্ত্রীর

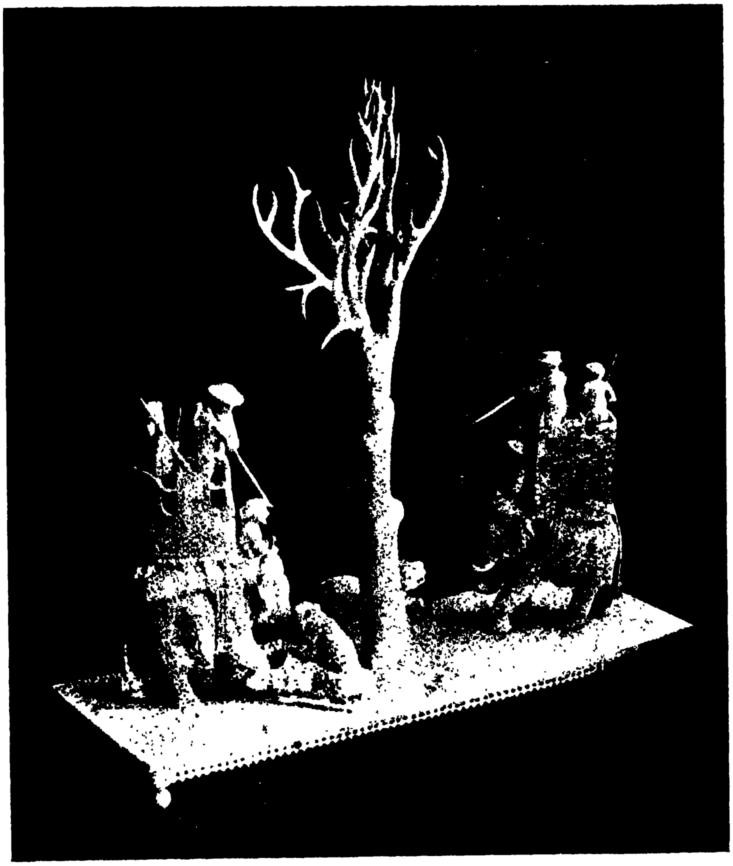


মুর্শিদাবাদ। বজরা



মুর্শিদাবাদ। শোভাযাত্রা

মারফৎ সেগুলি সংগ্রহ করেন। পরে তিনি দেশে যাইবার সময় এগুলি লইয়া যাইবার চেষ্টাও করেন। কিন্তু তিনি ভুলক্রমে সে সকল আসবাব কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কারণে তাহা ঐখানে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। সে দুঃখ বোধ হয় তাঁর মরণ কালেও যায় নাই।



মুর্শিদাবাদের শিল্প। শিকার চিত্র

মুসলমানী যুগের অনেক অস্ত্রশস্ত্রে এই প্রকার পদার্থের ব্যবহার দেখা যায় যাহা সচরাচর মৎস্য-দন্ত (fish ivory) নামে পরিচিত। উহার মধ্যে কিছু সিন্ধুঘোটকের দংষ্ট্রা কিন্তু অধিকাংশই পুরাকালের অতিকায় হস্তীর (Mammoth) দন্ত। কিরূপে উহা এদেশে আসিল তাহা এখনো জানা যায় নাই। তবে চীন দেশে ঐ প্রকার গজদন্তের ব্যবহার বহুকাল হইতেই প্রচলিত। সাধারণতঃ ঐ প্রকারের গজদন্ত উত্তর সাইবিরিয়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইত।

প্রাচীন মিশর, অসুর ও বাবিল দেশ গ্রীস, রোম, ইত্যাদি প্রাচীন জনপদে গজদন্তের ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল। এখনও চীন ও জাপান স্থান-বিশেষতঃ চীন গজদন্ত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এদেশের খ্যাতি অন্য সকল দেশ অপেক্ষা অধিক ছিল এবং তাহা অকারণে নহে। এদেশের প্রস্তরশিল্পী ভাস্করের কারুকৌশল ও শিল্প নৈপুণ্য যে কারণে বিখ্যাত এককালে এখানের গজদন্ত শিল্পীর খ্যাতিও সেই কারণে ভুবন বিস্তারিত হয়।

আবার ভারতভূমির মধ্যে বঙ্গদেশ তাহার শিল্পী সন্তানদিগের মেধা ও পরিকল্পনার চাতুর্য্যে এই শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

১৮৬৪ খৃঃ পঞ্জাব শিল্প প্রদর্শনীর বিচারকগণের মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল—

"The East has long been famed for its ivory manufacturers. From the earliest times of which we have any record, India has not only had a sufficiency of ivory for its own requirements but a large surplus for exportation. It is not improbable that cargoes of ivory from the West of India, with the Gold of Ophir were carried in ships of Tarshish to decorate the palace and temple of Solomon. From the presence of this valuable material in such abundance and the luxurious tastes of the Princes and nobles who successively surrounded themselves with all that skill could produce and wealth command, *it is natural that India should produce the most cunning workers in ivory.* This has been to a certain extent the case, *but the skill attained in the art has been chiefly confined to certain localities such as the neighbourhood of Murshidabad in Bengal,* and has not been co-extensive with the distribution of the material."

"প্রাচ্যদেশ চিরকালই তাহার গজদন্ত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে ভারতবর্ষে তাহার নিজের প্রয়োজনপূরণের জন্য যথেষ্ট, উপরন্তু রপ্তানির জন্য প্রচুর পরিমাণ গজদন্ত উৎপন্ন হইত। ইহা অসম্ভব নহে যে, পশ্চিম ভারত হইতে গজদন্ত, ওফিরজাত স্বর্ণের সহিত, তারশীশের নৌবাহিনী যোগে সলোমানের প্রাসাদ ও মন্দিরের শোভা বর্দ্ধনের জন্য যাইত। এই মহার্ঘ বস্তুর প্রাচুর্য্য এবং এই দেশের রাজন্য ও আভিজাতবর্গের বিলাসপ্রবণতা, যাহার দরুণ ঐ সকল ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে নিজেদের চারিপাশে ঐশ্বর্য্য ও কারু কৌশলে লব্ধ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি একত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৌশলী গজদন্তশিল্পী উৎপাদন করিবে ইহা স্বাভাবিক মাত্র। ব্যাপারও ইহাই ঘটিয়াছে কিন্তু এই শিল্পে অত্যধিক কৌশল স্থানবিশেষেই দেখা যায় **যথা বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ অঞ্চল**, এবং তাহা কেবলমাত্র গজদন্তের প্রাচুর্য্যের অনুপাতে ঘটে নাই।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক কাল ছিল যখন গজদন্ত শিল্পে কারুকৌশলের উদাহরণ দিতে হইলেও মুর্শিদাবাদের নামই প্রথমেই আসিত। এখন এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে এইমাত্র বলা চলে—

তে হি নো দিবসা গতাঃ।

কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে আদর্শে আমাদের দেশে ক্ষেতের কাজ হওয়া উচিত, আমি জানি সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। কৃষিকার্য্যে নূতন জ্ঞান ও নূতন চিন্তা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। যদি জড় প্রথার উপর বরাত দিয়া উদাসীন থাকি তবে আধুনিক কালের দাবী রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বকালে আমাদের গ্রামের হাটই ছিল আমাদের ফসলের হাট, আমাদের ফল ফলাইবার চেষ্টা সেই সঙ্কীর্ণ পরিধির উপযুক্ত ছিল। এখন বিশ্বের হাটে আমাদের চাষীদের তলব পড়িয়াছে, জোগান দিতে কুলায় না। বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আগে আমাদের গৃহস্থদের প্রয়োজনের পরিমাণ যতটা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়াছে, অথচ উৎপাদনের উপায়গুলি পূর্ব্ববৎ, এবং উৎপাদনের শক্তিও বাড়ে নাই। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এমন সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। কৃষিজীবী দেশের পক্ষে বিশেষ দরকার উদ্বৃত্তসঞ্চয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বাহিরের হাটে মূল্যের পতন, আকস্মিক উৎপাত মাঝে মাঝে অনিবার্য্য। সে স্থলে পূর্ব্বসঞ্চিত সম্বল হাতে না থাকিলে দল বাঁধিয়া নিরুপায়ে মরিতে হয়। সেই দারুণ দৃশ্য প্রায়ই আমাদের চোখে পড়িতেছে। শুধু তাই নয়—আমাদের দেশে চাষীর বিপদ কেবল যে নৈমিত্তিক তাহা বলিতে পারি না, তাহা নিত্য। টানাটানি প্রতিদিনই চলিতেছে। তাই উদ্বৃত্ত দূরে থাক ঋণের দায়ই বাড়িয়া চলিয়াছে, বর্ত্তমানের দায়ে তাহাদের ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িল। চাষী ছাড়া আমরা অন্য যাহারা আছি, বাক্য ছাড়া কোন প্রকার উৎপাদনের প্রায় কিছুই করিতেছি না। সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরে চাষী যাহা ফলাইতেছে উপরিস্তরের লোক নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাদেরই সেই ফসলের ভাগ লইতেছে, দেশের অল্প ধন নিয়ত গ্রহণ করিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে কোন ধন দেশকে ফিরাইয়া দিতেছে না।

সেই উপরিতন লোকদের কথা এখন থাক্। চাষীদের হাতে যাহাতে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় থাকে—আশু তাহার উপায় করা উচিত—অন্যান্য সকল সমস্যার চেয়ে এটা বড়ো বই ছোটো নয়। এই উদ্বৃত্তসঞ্চয় হইতেই তাহাদের স্বাস্থ্য,

তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহাদের উৎসব সম্ভবপর। সে সঞ্চয় যদি না থাকে তবে তাহারা মূঢ়তা, অস্বাস্থ্য, অপমান ও নিরানন্দের মধ্যে কেবলই তলাইতে থাকিবে, ও তাহার ফলে তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া তাহাদের কর্ম্মকে মূল্যহীন ও স্বল্পফল করিয়া তুলিবে। যত লোক দেশে বাস করিতেছে নানা কারণে তাহাদের শক্তি যদি অল্প হয়—তবে তাহাদের সংখ্যাধিক্যে ব্যয় যত বাড়িবে, আয় তত বাড়িবে না,—সুতরাং দারিদ্র্যের দুঃখই কেবল বাড়িয়া চলিবে। এ কথা ভুলিলে বিপদ যে, উদ্বৃত্ত অন্নই আমাদের শক্তির পরিচয় ও শক্তির আশ্রয়, এই শক্তিই সকল সভ্যতার মূল।

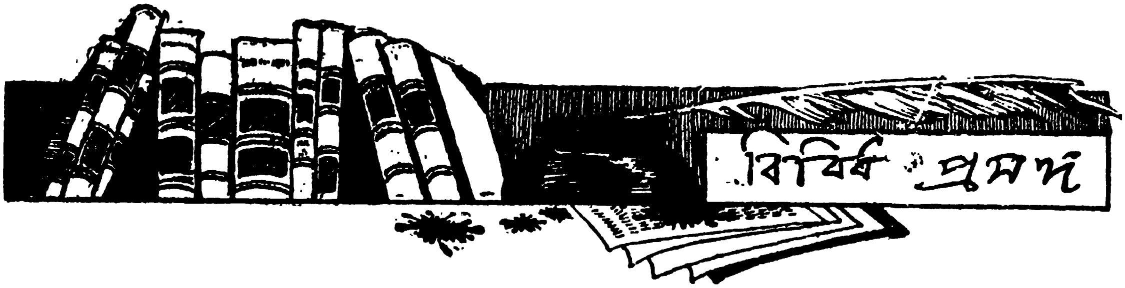
আজ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই ফসল ফলানোর ব্যাপার কেবল মাত্র চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবনপটু যান্ত্রিকদল ইহাতে মন দিয়াছেন। যাহা অন্ধ অভ্যাসের কাজ ছিল তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবামাত্র আশ্চর্য্য সফলতা ঘটিয়াছে। তাই আমাদের দেশের কৃষির পশু ও কৃষি-ফলের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিলে আমাদের মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে অযোগ্যতার বিধিনির্দ্দিষ্ট শাস্তি মৃত্যু, সেই শাস্তি স্বীকার করিয়াও দেশের বুদ্ধি এই কাজে একটুও লাগিল না! উপবাসে মরিতে মরিতেও নিরক্ষর চাষীর উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাকিবে; স্বচেষ্টায় তাহার উন্নতি করিতে পারি এ শ্রদ্ধা নিজের উপর নাই—তাই জীর্ণ সাবেক কালকে দিয়া বর্ত্তমান কালের বিপুল দায় মিটাইবার তাড়ায় প্রাণ বাহির হইল।

পলিটিক্‌স্‌প্রমত্ত দেশের এই অপরিসীম জড়তা সত্ত্বেও যাঁহারা সাধ্যমতে কৃষি সাধারণের উন্নতিকল্পে কাজে লাগিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে সন্তোষবিহারী একজন। অনেক দিন হাতে কাজ করিয়াছেন, এখন হাতে-কলমে কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত। কৃষিশিক্ষা প্রচারের উপযোগী একখানি পাঠ্য গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন—এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন যে গুরুতর, তাহাতে কাহারো সন্দেহ থাকা উচিত নহে এবং এরূপ গ্রন্থ লিখিবার উপযুক্ত ব্যক্তি যে তিনি, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।



পূজা

[illegible]

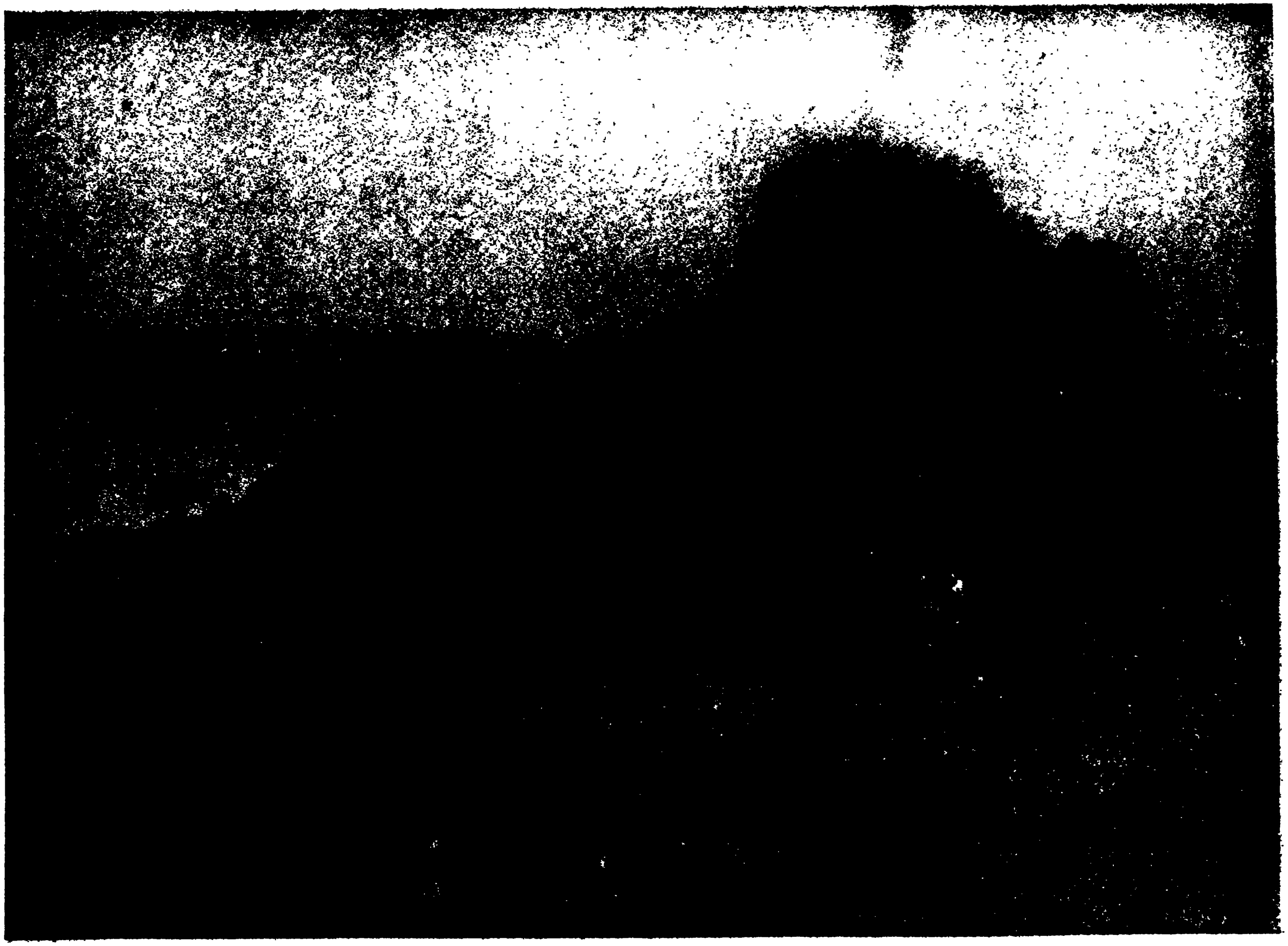


লাজপৎ রায়

মানুষের সমস্ত শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে কোন একটি অঙ্গকে সুস্থ ও সবল রাখা যায় না, ইহা সকলের কাছেই সোজা কথা। কিন্তু কোন জাতির শ্রীসম্পদ শক্তি রক্ষা করিতে ও বাড়াইতে হইলে যে তেমনি মানবজীবন ও মানবচিন্তার সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উন্নতি করা আবশ্যক ইহা সকলের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। সেই জন্য ভারতবর্ষে অনেক আংশিক সংস্কারক ও আংশিক সংস্কার-প্রয়াসী দেখা যায়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা যে-সংস্কার চেষ্টায় ব্যাপৃত তাহাই দেশের উন্নতির জন্য আবশ্যক ও যথেষ্ট। ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বিদেশীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপান চলে। আমাদের অত্যধিক রাজনৈতিক আন্দোলন-প্রিয়তার ইহা একটি কারণ। অন্যবিধ কারণে অনেক লোক কেবল সমাজ-সংস্কারের উপর, কেহ বা ধর্ম্মসংস্কারের উপর জোর দিয়া থাকেন। এইরূপ নানা দিকে আমাদের সংস্কারচেষ্টা ধাবিত হইয়া থাকে। ইহা অনেকটা স্বাভাবিকও বটে। কারণ, যাঁহারা জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন, এরূপ শক্তিমান লোকের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু আমরা যে যেরূপ কাজ করি না কেন, মানবজীবনের অখণ্ডতা এবং তাহার সকল বিভাগের উন্নতির পরস্পরসাপেক্ষতা আমাদের স্বীকার করা উচিত এবং পরস্পরের সাহায্য করা উচিত। ইহা গেল সাধারণ লোকদের কথা। যাঁহারা অসামান্য শক্তির অধিকারী তাঁহারা মানবজীবনের নানা বিভাগে কাজ করিয়া থাকেন।

আধুনিক ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়াছিলেন। তিনি যে নানাবিধ উৎপীড়ন এবং বিপদাশঙ্কা সত্ত্বেও সংস্কার-চেষ্টা হইতে বিরত হন নাই, বিশ্বের মঙ্গলবিধানে, সত্য ন্যায় ও শ্রেয়ের জয়ে বিশ্বাস তাহার প্রধান কারণ। তাঁহার মানবহিতৈষণা তাঁহাকে নানাবিধ সংস্কার-চেষ্টায় নিযুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী কোন কোন সংস্কারকের চেষ্টাও বহুমুখী ছিল। এখনও ঐ প্রকারের সংস্কারক জীবিত আছেন। ইঁহাদের মতামত, প্রতিভা ও শক্তি সকল দিকে রামমোহনের মত না হইলেও তাঁহার সহিত ইঁহাদের এই সাদৃশ্য আছে, যে, তাঁহাদের জীবনে এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, যে, কেবল কোন এক দিকে সংস্কার জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে।

লালা লাজপৎ রায় এই প্রকারের সংস্কারক ছিলেন। তিনি যৌবন কালেই আর্য্যসমাজের সভ্য হইয়া ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছিলেন। তাহার জন্য এবং আর্য্যসমাজসংসৃষ্ট কলেজ স্কুল প্রভৃতির জন্য তিনি নিজের সময়, শক্তি ও অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তাঁহার ধর্ম্মমত ঠিক আর্য্যসমাজীদের মত ছিল না; কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ে ও সামাজিক বিষয়ে সংস্কার-প্রয়াসী ছিলেন। হংসরাজ ও গুরুদত্ত বিদ্যার্থীর সহিত তিনি দয়ানন্দ এংলোবেদিক কলেজ স্থাপন করেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের এবং বার্ষিক আয়ের অনেক অংশ তিনি এই শিক্ষালয়কে দান করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ও অনেকগুলি তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। তাহার মধ্যে অনেকগুলি দরিদ্র সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়দের" উন্নতির জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনাথালয় স্থাপন, বিধবাদের শিক্ষা ও সাহায্যার্থ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থাপনেও তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। দেশী লোকদের দ্বারা আধুনিক প্রণালীতে চালিত ব্যাঙ্ক যথেষ্ট না থাকায় দেশী লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হয় এবং দেশের অনেক টাকা



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

বিদেশীর হস্তগত হওয়ায় দেশ দরিদ্র হয়। বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানী সমূহের দ্বারাও দেশের এইরূপ অনিষ্ট হয়। এই অনিষ্টনিবারণ দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিবার ও রাখিবার নিমিত্ত লালা লাজপৎ রায় দেশী ব্যাঙ্ক ও জীবন বীমা কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। তিনি হিন্দী ও উর্দ্দুতে অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কোন কোনটি ছাত্রদের পাঠের উপযোগী, অন্যগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য। ইংরেজীতেও তাঁহার অনেকগুলি বহি আছে। বন্দেমাতরম্ নামক উর্দ্দু এবং পীপল্ নামক ইংরেজী কাগজ তিনি স্থাপন করেন। দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌সেরও তিনি, অন্ততঃ এক সময়ে, একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের ও আমেরিকার অনেক কাগজের তিনি লেখক ছিলেন। মডার্ন্ রিভিয়ুতে নিজের নামে এবং "ইজ্জৎ" ছদ্মনামে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি "The Evolution of Japan and other Papers" নামক পুস্তকের আকারে বাহির হইয়াছিল। কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁহার 'United States of America. A Hindu's Impressions and a Study" নামক পুস্তকেরও অঙ্গীভূত হইয়াছে।

তিনি লোকের কাছে প্রধানতঃ রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতা বলিয়াই অধিক পরিচিত। তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যিষ্ঠতা ও বাগ্মিতার জন্য তিনি গবর্ন্মেণ্টের সন্দেহভাজন হইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে বিনাবিচারে তিনি নির্ব্বাসিত হন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার কারাবাস সম্বন্ধে তাঁহার একটি বহি আছে। গত মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে তিনি আমেরিকা যান। সেখান হইতে তাঁহাকে ছয় বৎসর দেশে ফিরিতে দেওয়া হয় নাই। ১৯২০ সালে তিনি দেশে আসিতে পান। আমেরিকায় থাকিতে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে দেশে সত্য জ্ঞান বিস্তারের জন্য লেখা ও বক্তৃতার দ্বারা প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন ধর্ম্মাচার্য্য ডক্টার সাণ্ডার্ল্যাণ্ড তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। আমেরিকা প্রবাসকালে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার একটি বৃত্তান্ত ইয়াং ইণ্ডিয়া নাম দিয়া লেখেন। এই পুস্তক গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষে আনা নিষেধ করেন। কয়েক বৎসর পরে এই নিষেধ প্রত্যাহৃত হয় এবং উহা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। মিস্ মেয়োর ভারতের নিন্দাপূর্ণ বহির যতগুলি জবাব বাহির হইয়াছে, লালাজির লিখিত "আন্‌হ্যাপী ইণ্ডিয়া" তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম।

তিনি হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী উভয় ভাষাতে সারবান্ ও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি নির্ভীক, স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। যাহা কিছু করিতেন প্রকাশ্য ভাবে করিতেন, কখন কোন গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন না। তিনি মুখে যে কোন প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন, তাহার জন্য অর্থ দিতেন এবং যথাশক্তি কাজ করিতেন—বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত থাকতেন না। বক্তৃতাগুলি দিলাম দেশকে এবং টাকাকড়ি রাখিলাম নিজের জন্য, এ প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। দরিদ্রের সন্তান হইয়াও তিনি স্বোপার্জ্জিত কয়েক লক্ষ টাকা নানা সৎকাজে দিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ নিজের পঞ্চাশ হাজার, সহধর্ম্মিণীর পঞ্চাশ হাজার, এবং অন্যের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রায় একলক্ষ টাকা দিয় গিয়াছেন। কাংড়া উপত্যকার ভূমিকম্পে যখন প্রভূত ক্ষতি হয়, তখন তিনি কর্ম্মী ও বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন লোকদের খুব সাহায্য করেন। উড়িষ্যার গত দুর্ভিক্ষে তাঁহার স্থাপিত সার্ভেণ্ট অব্ দি পীপ্‌ল্ বা জনসেবক সমিতির সহকারিতায় তিনি অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন।

দিনের অধিকাংশ সময় নিজের ও পরিবারের জন্য খাটিব, বেশীর ভাগ শক্তিও তজ্জন্য ব্যয়িত হইবে, বাকী যাহা থাকিবে তাহা দেশের কাজে লাগাইব,—এই নিয়ম অনুসারে যাঁহারা চলেন কেবল তাঁহাদের দ্বারা দেশের উন্নতি হইতে পারে না। অন্য দেশে যদি বা হয় আমাদের দেশে হইতে পারে না, কারণ আমাদের দেশে পরিবার মানে কেবল স্ত্রীপুত্রকন্যা নহে। সময় ও শক্তির অধিক ও শ্রেষ্ঠ অংশ যাঁহারা দেশের সেবায় উৎসর্গ করিবেন, তাঁহাদের দ্বারাই যথেষ্ট কাজ হইতে পারে। এইরূপ

লোক টাকা দিয়া পাওয়া যায় না, পাওয়া যদি যাইত তাহা হইলেও যথেষ্টসংখ্যক সেরূপ লোক নিযুক্ত করিবার মত টাকা নাই। অধিকন্তু দেশের কাজে প্রাণ দিয়া লাগিলে প্রহার, কারাবাস, নির্ব্বাসন, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। যাহারা কেবল বা প্রধানতঃ টাকার জন্য খাটিবে তাহারা এত দুঃখ সহিতে প্রস্তুত কেন হইবে? এইরূপ নানা কারণে আমাদের দেশে কোন বড় কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে, অনন্যকর্ম্মা সেবাব্রত এমন লোক চাই যাঁহারা বাহ্য বেশে না হইলেও কার্য্যতঃ সন্ন্যাসী। এইরূপ লোক সংগ্রহ করিয়া দেশের কাজে লাগাইবার নিমিত্ত লালা লাজপৎ রায় জনসেবক সমিতি স্থাপন করেন। তাঁহার আহ্বানে আত্মোৎসৃষ্ট লোক আসিয়াছেন এইজন্য যে, তিনি নিজেও "তনমনধন" উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তুমি আমি ডাকিলে আসিবে না।

কিন্তু শুধু ত্যাগী ও উৎসাহী হইলেই কাজ হয় না। জ্ঞান চাই, কাজ করিবার সমীচীন প্রণালীতে অভ্যস্ত থাকা চাই। লালাজীর নিজের নানা বিষয়ে বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল, তিনি বিস্তর বহি পড়িয়াছিলেন। আমেরিকায়, ইউরোপে, জাপানে, ভারতবর্ষে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তিনি রাষ্ট্রনীতি, সমাজসংস্কার, শিক্ষা, বিপন্নের সেবা প্রভৃতি নানা কার্য্যক্ষেত্রে কাজ করিবার সুরীতি জানিতেন। জনসেবক সমিতির সভ্যেরাও যাহাতে জ্ঞানী হন এবং প্রকৃষ্ট প্রণালীতে কাজ করিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হন, সেইজন্য তিনি সমিতির লাইব্রেরী এবং টিলক রাজনীতি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজের বাসগৃহ এই সমিতি ও বিদ্যালয়কে দান করিয়া পরে অন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের দেশে যাঁহারা বক্তৃতা করেন, লেখেন, বা অন্যবিধ কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ আদর্শ লইয়া স্বপ্ন দেখেন, আপাততঃ কার্য্যতঃ কি হইতে পারে না পারে তাহা ভাবেন না। অন্য কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে মোটেই আমল দেন না, গায়ে আঁচড় না লাগাইয়া সহজে অল্প স্বল্প সুবিধা কি পাওয়া যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টায় ফিরেন। লালা লাজপৎ রায় অন্য রকমের মানুষ ছিলেন। মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা অসীম ছিল, আদর্শ উচ্চ ছিল, মহৎ স্বপ্ন তিনি দেখিতেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না. স্বপ্ন ত্যাগ না করিয়া, আদর্শ ছাড়িয়া না দিয়া, আপাততঃ যাহাতে সিদ্ধি লাভ অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর, সেইরূপ চেষ্টায় তিনি আপত্তি করিতেন না। এই কারণে, যদিও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "এমন হীন কে আছে যে স্বদেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চায় না?" ; বলিয়া গিয়াছেন, "পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমার মনের মধ্যে আছে" ; তথাপি তিনি ডোমিনিয়ন অবস্থা লাভের চেষ্টায় সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি যে ভয়ে ডোমিনিয়ন-অবস্থার পক্ষে মত দেন নাই, তাঁহার সমস্ত জীবন ও তাঁহার মৃত্যু তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন আগেকার, "আবশ্যক ও সাধ্যায়ত্ত হইলে দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি বলপ্রয়োগেও পশ্চাৎপদ হইব না", তাঁহার এই উক্তি।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে যত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই লালাজীর স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের কাহারও হিতৈষণা তাঁহার হিতৈষণার মত বহুমুখী ও ফলবতী নহে। বিশ্বাসে, জ্ঞানে, বাগ্মিতায়, আদর্শানুরাগে, কর্ম্মিষ্ঠতায়, আত্মোৎসর্গে, সাহসে, দেশের উন্নতির আদর্শের ব্যাপকতা ও গভীরতায় একাধারে তাঁহার মত কেহই নহেন। তাঁহার আসন আপাততঃ শূন্য থাকিবে।

—

লাজপৎ রায়ের মৃত্যু

নিজে যে কাজ করিবেন না, অন্যকে সে কাজ করিতে বলিবার লোক লালা লাজপৎ রায় ছিলেন না। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেখানে অন্যকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে ঘরে বসিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সেই জন্য যে দিন সাইমন কমিশন লাহোর আসে, সেই দিন, দেশ যে উহা চায় না তাহা সদলবলে ঘোষণা ও প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি জনতার সহিত রেলওয়ে ষ্টেশনে যান, এবং জরাজীর্ণ ও অসুস্থ দেহেও পশ্চাতে না থাকিয়া আগেকার সারিতে গিয়া দাঁড়ান। ফলে তাঁহার উপর

উপর্য্যুপরি আঘাত পড়ে। কয়েক দিন পরে এই কারণেই যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা বলিয়াছেন। বৃদ্ধের দেহে হৃৎপিণ্ডের উপর এরূপ আঘাতে মৃত্যু হইতেই পারে। শুধু তাহাতেই যদি বা মৃত্যু না ঘটিতে পারিত, নিরুপায় অবস্থায় অপমান সহ্য করিবার অন্তর্দাহ যে তাহা ঘটাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আঘাতে তাঁহার বুকের উপর যে স্ফীতি ও ক্ষতের চিহ্ন হইয়াছিল, তাহার ছবি কাগজে দেখিয়াছি। এই চিহ্ন দেশকে স্বাধীন করিতে না পারিলে কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

দেওয়ান চমনলাল কাগজে লিখিয়াছেন, লালাজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ত জান উহারা আমাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল।" তখন লালাজী জানিতেন না, হত্যার এই চেষ্টা সফল হইবে।

রেলওয়ে ষ্টেশনে পুলিশের লোকদের দ্বারা প্রহার যে বিনা কারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক হইয়াছিল, তাহা লালাজী বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু তা ছাড়া, অন্য লোকেরা, প্রতিষ্ঠিত লোকেরাও তাহা বলিয়াছেন।

সরকার পক্ষের একটা কথা এইরূপ বাহির হইয়াছে, যে, যাহাতে জনতা কাঁটা-তারের বেড়া ছিঁড়িয়া ষ্টেশনে ঢুকিয়া না পড়ে, তাহার জন্য পুলিশ সাধারণভাবে লাঠি চালাইয়াছিল, কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া লাঠি চালায় নাই। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা। একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট লালাজীর কলার ধরিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল। কয়েকজন দেশী কন্সটেবলও তাঁহাকে প্রহার করে। তাহার পর তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ানতে তাঁহার জন্য অভিপ্রেত আঘাত তাঁহাদের উপর পড়ে। সুতরাং বাছিয়া তাঁহাকে আঘাত করা অভিপ্রেত ছিল। তাঁহাকে বধ করা অভিপ্রেত ছিল কিনা, অন্তর্য্যামী জানেন। তাহা না থাকিলেও ইম্পীরিয়্যালিজম নামক সাম্রাজ্যপূজা যে তাঁহার মৃত্যুর জন্য দায়ী, দেশভক্ত ভারতীয় মাত্রেই এইরূপ মনে করিবেন।

আমাদের যাঁহারা অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহারা যে কত বড়, ভারতবর্ষের পরাধীনতা হেতু তাহা বিদেশীরা এবং আমরাও সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং তাঁহাদের বিরোধী দলের সব রাজনৈতিক লোকদের কথা ভাবুন। ইহাঁদের মধ্যে একজনও কি মানবপ্রেমে, জ্ঞানে, দানে, বিচিত্র কর্ম্মিষ্ঠতায়, বাগ্মিতায়, লিখনপটুতায়, আত্মোৎসর্গে, দেশের সেবায়, সাহসে, লালা লাজপৎ রায়ের চেয়ে বড়? একজনও কি নিজের দেশের জন্য তাঁহার মত উৎপীড়ন ও দুঃখ সহ্য করিয়াছেন? কেহই না। কিন্তু ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না, যে, ইহাঁদের মধ্যে কেহ শান্তি ভঙ্গ বা শান্তি ভঙ্গের উপক্রম না করিলেও ইংলণ্ডের গবর্ন্মেণ্টের ভৃত্যদের দ্বারা অপমানিত ও প্রহৃত হইতে পারেন। অথচ আমাদের দেশের একজন শিরোমণিকে ভাড়াটিয়া সরকারী সামান্য চাকররা অপমান ও প্রহার করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিল না। এই প্রভেদের একমাত্র কারণ এই যে, সাম্রাজ্যোপাসক ইংরেজরা তাহাদের অধীন ভারতবর্ষের কোন মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না—সে মানুষ যত বড়ই হউক না কেন।

লাজপৎ রায় স্মৃতি ফণ্ড

লাজপৎ রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, ডাক্তার আনসারী ও শেঠ ঘনশ্যামদাস বিরলা এক আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। বিরলা মহাশয় পনর হাজার টাকা দিয়াছেন। দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই এই আবেদনের সমর্থন করিবেন।

লাজপৎ রায়কে লোকে যাহাতে না ভুলে এমন কাজ তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে এখন কেবল তাঁহার আরব্ধ কাজগুলি সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। পাঁচলক্ষ টাকার ফণ্ডটি দ্বারা তাঁহার জনসেবক সমিতির স্থায়িত্ব বিধান করিয়া যাহা বাকী থাকিবে, তাহা তাঁহার আরব্ধ অন্যান্য কাজে লাগাইতে পারিলেই হয়।

লাজপৎ রায়ের সহিত আমার পরিচয়

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, স্যার হেনরী কটন তাহার সভাপতিত্ব করেন। এলাহাবাদের অন্যতম প্রতিনিধি হইয়া আমি ঐ কংগ্রেসে যাই। সেখানেই আমি লালাজীকে প্রথম দেখি ও তাঁহার বক্তৃতা শুনি। তাঁহার বাগ্মিতার খ্যাতি আমার জানা ছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ-ভাবে তখন বুঝিতে পারিলাম, যে, তিনি বাগ্মী। তিনি কি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এখন আমার মনে নাই। কিন্তু ইহা মনে আছে, যে, তিনি এমন কিছু বলিতেছিলেন যাহা প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহতার মতের বিরুদ্ধ ছিল। এইজন্য তিনি লালাজীকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, বসিলেন না; নিজের বক্তব্য নিঃশেষে বলিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। তখনই বুঝিয়াছিলাম, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকটিকে নিরস্ত করা সুসাধ্য নহে।

বোম্বাইয়ে লালাজীর সহিত আমার পরিচয় হয় নাই। আগে লিখিয়াছি, ১৯০৭ সালে তিনি নির্ব্বাসিত হন। খালাস পাইবার পর ১৯০৮ সালে যখন তিনি দেশে আসেন, তখন একবার এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তখন এলাহাবাদবাসীরা তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। আমি তখন তাঁহাকে একদিন আমার বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি সৌজন্য সহকারে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন আমার বাসা ছিল কোটাপার্চার একটি বাড়ীতে। যে বারান্দায় যেখানে তাঁহাকে বসাইয়াছিলাম, তাহা আমার এখনও মনে আছে। আমার কন্যা দুটি তখন ছোট ছিল। অথচ তাহারা যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল, তখন তিনি নিজেই আগে নমস্কার করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা যখন আমাদের বাঙালী হিন্দু রীতিতে তাঁহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিল, তিনি প্রণাম করিতে দিলেন না। তাঁহার আগমনে আমি যে খুব সম্মানিত হইয়াছি, একথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম; অন্য কি কথা হইয়াছিল, মনে নাই। কয়েক মিনিট মাত্র তিনি আমার বাসায় ছিলেন, কিন্তু সেই বিশ বৎসর আগেকার কথা তাঁহার মনে ছিল। দু তিন বৎসর আগে তিনি হিন্দু সভা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া রেঙ্গুন যান। সেখানে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক সামাজিক সম্মেলনে তিনি আমার কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সীতাকে চিনিতে পারিয়া স্বয়ং তাহার সহিত কথা বলেন। সীতা তখন আমাকে সে কথা লিখিয়াছিলেন। লালাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য কথাও সংগ্রহের যোগ্য মনে করিয়া আমি সীতাকে বিশেষ বৃত্তান্তের জন্য লিখিয়াছিলাম। উত্তরে সীতা লিখিয়াছেন :—

"লালা লাজপৎ রায় এখানে হিন্দু মহাসভার নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। কোথায় ছিলেন ঠিক বলতে পারি না। আমি তখন যে বাড়ীতে ছিলাম, তার ল্যাণ্ডলর্ড একজন মহারাষ্ট্রীয়। তাঁর নাম মিঃ হালকর। তিনি আমাদের অপোজিট ফ্ল্যাটেই থাক্‌তেন। তাঁরা একদিন লালাজীকে নিমন্ত্রণ করেন। তাতে আমিও গেয়েছিলাম। আমি ভাবি নি, তিনি আমাকে চিন্‌তে পারবেন। কিন্তু তিনি নিজেই এসে বল্‌লেন, "I congratulate you on your excellent writing." আমেরিকায় থাকতে আমার লেখা পড়েছিলেন বল্‌লেন। এলাহাবাদে ছেলে-বেলায় আমাদের দেখেছিলেন বল্‌লেন। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন; তুমি এক জায়গা ছেড়ে কোথাও নড় না, তাও বল্‌লেন। "Your father is never so happy as when left alone." এলাহাবাদে তিনি আমাদের প্রণাম করতে দেননি বটে।" *

এই পত্রাংশটি ছাপিবার অনুমতি কন্যার নিকট লওয়া হয় নাই।

লালাজী যে আমার স্থাণুতার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ইউরোপ যাত্রার আগে। তাহার পর আমাকে কতকটা সচল হইতে হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে আমি যখন লাহোর যাই, তখন তাঁহার সহিত দেখা করিবার খুব ইচ্ছা ও আশা ছিল। কিন্তু তিনি তখন লাহোরে ছিলেন না। তাঁহার সহিত শেষ দেখা হয়, কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় আলবার্ট হলে হিন্দু সভা কর্ত্তৃক আহুত একটি সভায় তিনি, পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা

* আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শান্তাই আমাকে প্রথমে স্মরণ করাইয়া দেন, যে, লালাজী তাহাদিগকে তাঁহাকে প্রণাম করিতে দেন নাই।

প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি ও অন্যান্য বক্তারা বঙ্গদেশে নারীহরণের বাহুল্যে লজ্জা প্রকাশ করেন। বক্তৃতার পর আমি তাঁহাকে নমস্কার করি, তিনি প্রতিনমস্কার করেন; কোন কথা হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লাজপৎ রায় আমার ইংরেজী মাসিকে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—বিশেষতঃ যখন তিনি আমেরিকায় ছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে এবং অন্য উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত চিঠি লেখালেখি হইত। আমি তাঁহাকে শেষ যে চিঠি লিখি ও তিনি তাহার যে উত্তর দেন, তাহার একটি অংশের কিছু আভাস দিব।

তাঁহার ইয়ং ইণ্ডিয়া নামক যে পুস্তকের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার সমালোচনা আমি মডার্ণ রিভিয়ুতে করিয়াছিলাম। পুস্তকটির পরিচয় দিয়া প্রশংসা করিয়াছিলাম। একটি জায়গা লালাজী পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করেন, এইরূপ ইচ্ছা আমার ছিল। তাহা কাগজে ছাপিয়া দিলে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা হইবে এবং ইংরেজরা তাহার অপব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে ভাবিয়া আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে চিঠি লিখি। তাঁহার পুস্তকে "বেঙ্গলী বাবু" কথাটির প্রয়োগ ও তাহাদের সম্বন্ধে কোন কোন কথা থাকায় এইরূপ লিখি। তিনি উত্তরে লেখেন, যে, ঐ কথাটি তাঁহার নহে, ইংরেজদের। তাহাতে আমি লিখি, যে ভবিষ্যৎ সংস্করণে যেন উহা " " এইরূপ উদ্ধার-চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়। আমার অন্যান্য মন্তব্য অনুসারেও তিনি পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাধারণ ভাবে লেখেন, "My own personal feelings towards the Bengalis is one of sincere gratitude and admiration." তাহা অস্বাভাবিক নহে। যৌবন কালে যে সব কারণে ন্যাশ্যান্যালিজমের অর্থাৎ স্বাজাতিকতার দিকে তাঁহার মনের প্রবণতা ঘটে, পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত সংস্পর্শ তাহার অন্যতম কারণ, ইহা বসু মহাশয়ের সহোদর মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের একটি লেখা হইতে অবগত হইয়াছি।

—

আচার্য্য বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব

গত ১লা ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞানমন্দিরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দৈ. . কাগজে বাহির হইয়াছে। আমরা সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কয়েকটি কথা মাত্র বলিব।

উৎসবের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ প্রণীত "জনগণমন-অধিনায়ক, জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা" গানটি শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী প্রভৃতি দ্বারা গীত হয়। তাহার পর অধ্যাপক কালিদাস নাগ উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত যে কবিতাটি পাঠ করেন, তাহা কবির হস্তাক্ষরে অন্যত্র মুদ্রিত হইল। তাহার পর দেশবিদেশ হইতে আগত বহু টেলিগ্রাম ও চিঠি বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ পাঠ করেন। ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রলাঁর চিঠিটি মূল ফ্রেঞ্চ ভাষায় পড়িয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন অধ্যাপক কালিদাস নাগ। তৎপরে বহুসংখ্যক অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয়। প্রথমে আচার্য্য মহাশয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমাকে তাঁহাদের অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিতে বলা হয়। তাহা পড়িবার পর আমি মৌখিক কিছু বলিয়াছিলাম।. আমি যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই:—

"এই আনন্দের দিনে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত কেহ হইতেন না। তিনি যে পুণ্যলোকেই থাকুন, এই উৎসবে সেখান হইতে যোগ দিতেছেন। তিনি এই আশা পোষণ করিতেন, যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তেমনি ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও অচিরে জগৎকে নূতন কিছু শিখাইবে। বসু মহাশয়ের বিজ্ঞানমন্দির' তাঁহার জীবিত কালে নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতেন, যে, বসু বিজ্ঞানমন্দিরে নূতন জ্ঞানলাভার্থ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীর আগমন হইবে। সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। নিবেদিতার সহিত সমসাময়িক সমুদয় ভারতীয় মনীষীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহাদের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে জানিয়া যেমন তিনি ভারতের প্রতি ভক্তিমতী হইয়াছিলেন ও ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য্য বসুকে জানিয়া ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তিনি উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন।

"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুকে যে কবিতা দ্বারা আজ অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রথম অভিনন্দন নহে। মানুষ কীর্ত্তিমান্ হইবার পর তাঁহার প্রশংসা ও তাঁহাতে বিশ্বাস ঘোষণা অনেকেই করে। কিন্তু কবি একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন জগদীশচন্দ্র এখনকার মত বিখ্যাত হন নাই, তখন লিখিয়াছিলেন:—

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে



সপ্ততিতম জন্মোৎসবে আচার্য্য বসু ও তাঁহার পত্নী

হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধু পার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্ব্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ !
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

যে কবির কণ্ঠ দিয়া ক্ষীণ মাতৃস্বর' নিঃসৃত হইয়াছিল, তিনি এখন ত অজ্ঞাত অখ্যাত নহেনই—তখনও ছিলেন না—এবং সেই ক্ষীণ মাতৃস্বরের প্রতিধ্বনি আজ দেশ-বিদেশে উঠিতেছে।

"আঠাশ বৎসর পূর্ব্বে আর এক মনীষী বসু মহাশয়কে অসাধারণ প্রাতিভাশালী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ১৯০০ সালে প্যারিসে লিখিয়াছিলেন :—

"আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র,—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব

ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতি।" পরিব্রাজক, ১২২।২৩ পৃষ্ঠা

"আমি আচার্য্য মহাশয়ের অযোগ্য ছাত্র, বিজ্ঞান শিখিতে পারি নাই, তাঁহার পথের পথিক হই নাই। কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব সকলকেই আশা ও বল দিতে পারে।* তপস্যা ও সাধনার ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও শক্তি এক। ভারতবর্ষে যিনি যে ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভ করুন না, সংগ্রামে তাঁহার জয় অন্য সকলকেই এই শিক্ষা দিতে পারে, যে, ভারতীয়দের কিছু করিবার শক্তি আছে, জগৎকে নূতন কিছু দিবার আছে। আধুনিক কালে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে আচার্য্য বসুই প্রথমে দেখাইয়াছেন, ভারত কেবল দেনদার নয়, ঋণী নয়, ভিক্ষুক নয়, ভারতের কিছু দিবার আছে। তাঁহার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।"

অতঃপর আরও কতকগুলি অভিনন্দন পঠিত হয়। তাহার কোন কোনটি হইতে দুএকটি কথার উল্লেখ করিতেছি। ভিয়েনার প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ অধ্যাপক মোলিশ তাঁহার অভিনন্দনের শেষে বলেন :—

As a representative of the West I wish to convey our heartiest congratulation to you as a leading plant-physiologist. It is my good fortune that I should be the first plant-physiologist from the West who has come to your Institute to cement the bond of intellectual co-operation between the Orient and the Occident. The extraordinary twin trees from a single seed of the palm will be a symbol of this and we shall plant it together. And though we may not gather the fruit of what we sow to-day, yet we believe in a future which transcends all our hopes.

জ্ঞানরাজ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সহযোগিতার প্রতীক-স্বরূপ একটি নারিকেল হইতে জাত যমজ গাছ দুটি আচার্য্য বসু ও অধ্যাপক মোলিশ একত্র রোপণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সভাপতি ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় ঐ বিভাগের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন পত্র রচনা ও পাঠ করেন, তাহাতে বসু মহাশয়ের কার্য্য ও প্রতিভার যথার্থ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।



আচার্য্য বসু ও অধ্যাপক মোলিশ কর্ত্তৃক একত্রে রোপীত যমজ নারিকেল বৃক্ষ

"The first and greatest of instruments of which you are the master, the instruments, which has been the maker of your other instrument is your synthetic vision—a poetic faculty which you have harnessed to the great task of a scientific exploration of the universe. This synthetic vision is a peculiarly Indian gift and is associated in you with other characteristically Indian elements, a power of yogic concentration—the capacity of identifying oneself with the object of one's contemplation, a gift of generalisation and abstraction and, above all, the intuition of the unity of all being and all life."

বৃহত্তর ভারত পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ

* ইহার অনুরূপ কথা প্রাক্তন ছাত্রদের অভিনন্দনে ছিল। যথা—
"We rejoice that your heroic march into the citadel of the unknown in science has been hope-inspiring not only in the realm of scientific endeavour but in other fields of thought and activity as well in the Motherland."

সরকার যে অভিনন্দন পাঠ করেন, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

"আমাদের পরিষদ ভারতবর্ষের অতীত কৃতিত্ব ও কীর্ত্তির চর্চ্চা করে। তাহার গৌরব করিবার অধিকার তখনই বৈধ ও সত্য হয়, যখন আপনার মত একজন প্রতিভাশালী জীবিত ভারতসন্তান দেখান, যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সত্যদ্রষ্টাদের বংশ একেবারে লুপ্ত হয় নাই।"

রমাঁ রলাঁ তাঁহার কবিত্বপূর্ণ চিঠিটিতে বলেন, "আমা অপেক্ষা যোগ্যতর লোকেরা আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মহিমা গান করিবে। আমি ঘোষণা করিতেছি সেই সত্যদ্রষ্টা আপনার মহিমা যিনি বৃক্ষত্বকের ও পাষাণের অবারণে লুক্কায়িত প্রকৃতির মর্ম্মকথা জগৎকে শুনাইয়াছেন।" (ইহা সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য মাত্র।) "হে সৌম্য জাদুকর, আপনাকে নমস্কার করি।"

চীনের বর্ত্তমান রাজধানী নাংকিঙের ন্যাশন্যাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে টেলিগ্রাম আসে :—

"Many happy returns to life devoted to discovering ultimate truth and mystery of life. The world looks to you to lift science into the realm of spiritual reality. All Asia shares in your glory."

তাৎপর্য্য। "চরম সত্য ও জীবনের রহস্য আবিষ্কারে উৎসর্গীকৃত আপনার জীবনে জন্মদিনের এই উৎসবের এই আনন্দ আরও বহুবার আসুক। জগৎ আপনার নিকট এই আশা করে, যে, আপনি বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তার রাজ্যে উন্নীত করিবেন। সমুদয় এশিয়া আপনার গৌরবের অংশী।"

উৎসবের মধ্যে আরও দুটি গান হয় ; একটি শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর, অপরটি রবীন্দ্রনাথের রচিত।

অভিনন্দনের শেষে আচার্য্য বসু সংক্ষেপে ইংরেজীতে উত্তর দেন। তাহার একটি অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"আমি গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া যে সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি, জ্ঞানের সীমা বিস্তারার্থ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কিছু দান করিয়া জাতিসংঘের মধ্যে তাহার একটি সম্মানিত স্থান অর্জ্জন করিবার জন্য তাহা করিয়াছি। জগৎ আজ যুযুৎসু দুই দলে বিভক্ত ; তাহার ফলে সভ্যতার লোপের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। জগদ্ব্যাপী ধ্বংসনিবারণের এক উপায় আছে—তাহা সকল মানবের হিতার্থ মনোরাজ্যে সহযোগিতা। ইহাই প্রাচ্যের বাণী। চীন যে বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তার জগতে উন্নীত করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই বাণীরাই নবতম দ্যোতন। তাহাতে এই সত্যই ঘোষিত হইয়াছে, যে, সকলের মধ্যে প্রাণের একত্বের মত সকল মানবের মহৎ অভিলাষনিচয়ের একত্ব সম্পাদন করিতে হইবে—কেবল তাহার দ্বারাই মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতরূপে রক্ষিত হইতে পারে।

"আমার সমুদয় চেষ্টার মধ্যে আমি কখনও সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম না। আমরা যখন উভয়েই অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সব সংশয়ের দিনেও তাঁহার বিশ্বাস কখনও টলে নাই।

"আমার সম্মুখে আমার অনেক [illegible] ছাত্রকে দেখিতেছি যাঁহারা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতম দায়িত্ব ও বিশ্বাসভাজনতার পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের কৃতিত্ব আমার জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। আমি কেবল তাঁহাদের কথাই বলিতেছি না যাঁহারা যশ ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য অনেকের কথাও বলিতেছি যাহারা পৌরুষের সহিত জীবনের দুর্ব্বহ ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন এবং যাঁহাদের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাময় জীবন অনেকের দুঃখময় জীবনে আনন্দের রশ্মি সঞ্চার করিয়াছে।"

—

"আর্য্যভবন"

নিরামিষভোজী যে-সব লোক বিলাত যান, মাছ মাংস ডিম কিছুই যাঁহারা খান না, তাঁহাদের বড় অসুবিধা হয়। তথায় নিরামিষ ভোজনশালা কতকগুলি আছে বটে, কিন্তু



আর্য্যভবন স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভবনদ্বার উন্মোচন করিতেছেন

তাহাদের রান্না ভারতীয় লোকদের রুচি অনুযায়ী নহে ; এবং কেবল সিদ্ধ ছাড়া অন্য কোন রকম সেখানে কিছু খাইতে গেলে তাহা, যে চর্ব্বির রান্না নহে, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। দেশে থাকিতে তাঁহারা যে ঘৃতের রান্না খান, তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই চর্ব্বি থাকে বটে ; কিন্তু



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু



শ্রীমতী অবলা বসু

চোখের আড়ালে যাহা ঘটে, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। লণ্ডনে ছাত্রদের জন্য খৃষ্টিয়ানেরা গাওয়ার ষ্ট্রীটে যে ছাত্রনিবাস ও ভোজনশালা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ডাল ভাত রুটি নিরামিষ তরকারী



আর্য্যভবন—অতিথিগণ চা পান করিতেছেন

পাওয়া যায় বটে, কিন্তু রন্ধনে খাঁটি ঘি মাখন ব্যবহৃত হয় কিনা জানি না। তদ্ভিন্ন তথায় একই পাকশালায় নিরামিষ দ্রব্য এবং গোমাংস শূকরমাংস প্রভৃতি রান্না হয়। খাইবার ঘর এবং টেবিলও আমিষাশী নিরামিষাশীর



আর্য্যভবনের অতিথিগণ

জন্য আলাদা নাই। সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্মমত বশতঃ কোন কোন খাদ্য দ্রব্য পরিহার করেন, সেখানে তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।

ছাত্রেরা অল্প বয়সে বিলাত যান। তাঁহারা অনেকে অভ্যাস ও রুচি বদলাইয়া ফেলেন। কিন্তু অধিকবয়স্ক নিরামিষাশী গোঁড়া হিন্দু জৈন প্রভৃতির বড় মুস্কিল বোধ হয়। ভোজনে সঙ্কট ত আছেই। অন্যান্য দৈনিক কৃত্যেও অসুবিধা আছে।



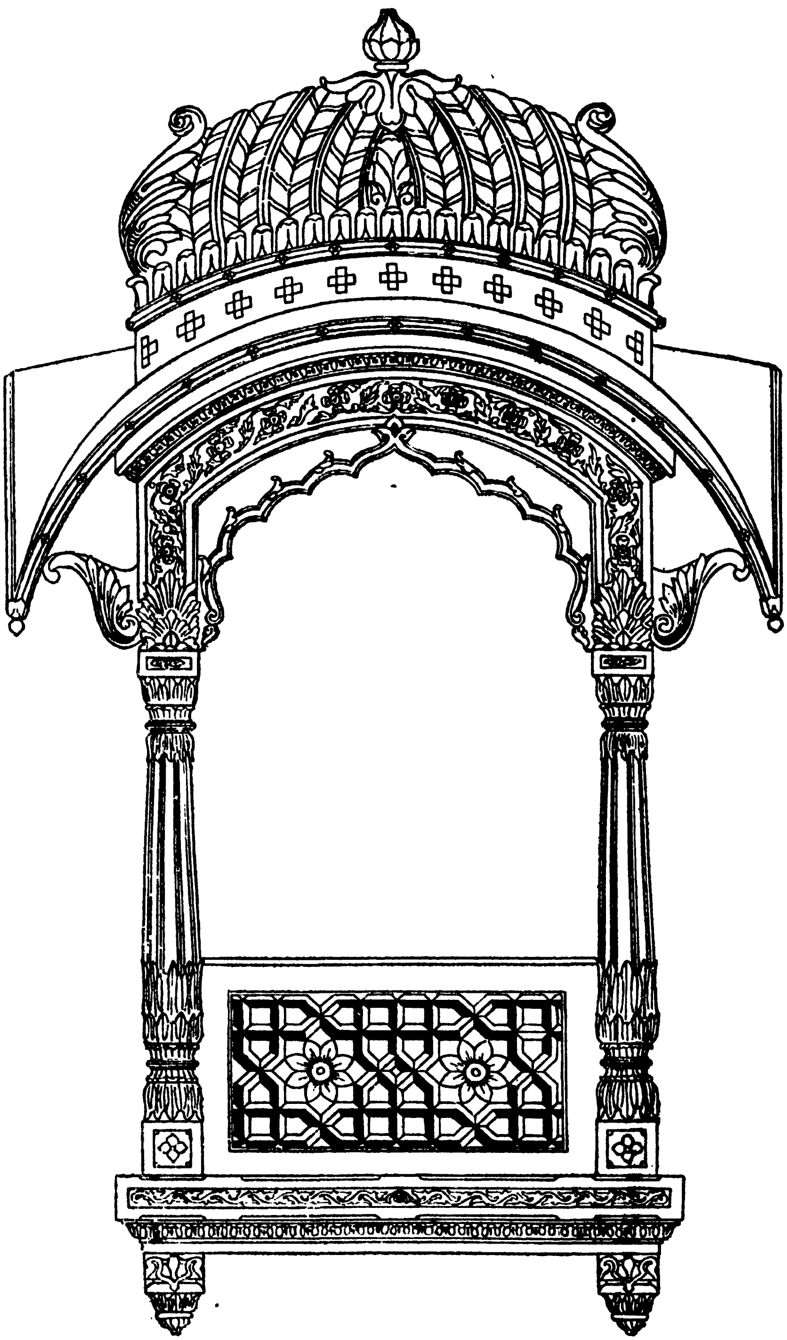
আর্য্যভবন—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান স্যর অতুলকে ভবনের দ্বার উন্মোচন করিতে আহ্বান করিয়াছেন, স্যর অতুল প্রত্যুত্তর দিতেছেন

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য শেঠ ঘনশ্যাম-দাস বিরলার উদ্যোগে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে লণ্ডনে "আর্য্যভবন" নামে একটি নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় লক্ষ টাকা শেঠ ঘনশ্যামদাস স্বয়ং দিয়াছেন।



আর্য্যভবনের দ্বার উন্মোচনের পর অতিথিগণ শ্রীমতী মৃণালিনী সেন স্যর অতুলচন্দ্র, সম্মুখম্ চেট্টি, মিসেস্ এস্, ডি, সেহ্‌গ্‌ল, শ্রীযুক্ত খৈতান্, প্রভৃতি

বাকী পঞ্চাশ হাজার তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয় রামগোপাল মোহতা দিয়াছেন। এখানে কেবল মাত্র নিরামিষ দ্রব্য ভোজনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাচক ব্রাহ্মণ আছে। কোন প্রকার মদ্য বা অন্য মাদক দ্রব্য এখানে ব্যবহৃত হইতে পারে না।



ঝরোকার কারুকার্য্য

"আর্য্যভবন" প্রধানতঃ অল্প দিনের জন্য ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য অভিপ্রেত। সাধারণতঃ তাঁহারা চারি মাসের বেশী তথায় থাকিতে পারেন না। জায়গা থাকিলে ছাত্রদিগকেও রাখা হয়। মোট দশ জনের স্থান আছে। নিকেতনটি লণ্ডনের একটি উঁচু জায়গায় অবস্থিত। এখানে কুয়াসা কম হয়। রোদ আলোও অপেক্ষাকৃত বেশী। লণ্ডনের অন্য অনেক রাস্তার চেয়ে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তায় গাড়ী চলাচল কম বলিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ। থাকিবার জায়গার জন্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথার জন্য, Mr. K. M. Banthiya, Hon. Secretary, Arya Bhavan, 30 Belsize Park, London, N. W. 3, এই ঠিকানায় চিঠি লিখিতে হইবে।

ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যা

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে প্রাচীন এক সহর আবিষ্কার করায় জানা গিয়াছে, যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে পাকা ঘরবাড়ী ছিল এবং স্থাপত্যের উন্নতি হইয়াছিল। তাহার অনেক পর হইতে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে, যে, ভারতের নানা প্রদেশে নানা প্রকারের স্থাপত্য-রীতি এপর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা খুব জানা কথা। যত প্রকার প্রয়োজনের যত রকম বাড়ীর সেকালে দরকার হইত, আমাদের দেশী মিস্ত্রীরা তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারিত। এখনকার নূতন প্রয়োজনের জন্য যদি নূতন কোন রকম ইমারতের দরকার হয়, তাও তারা বানাইতে না পারে এমন নয়। তথাপি বিদেশীর রাজত্বে বিদেশী প্রভাবে এমন সব ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, যা মোটেই দেশী রীতির অনুযায়ী নয়—কতকগুলা ত এমন, যে, সেগুলাকে কোন রীতিরই অনুযায়ী বলা চলে না।

মানুষ যে-রকম বাড়ীতে থাকে, যে প্রকার গ্রামে সহরে পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকে, তাহার প্রভাব তাহার মনের উপর পড়ে। এই জন্য স্থাপত্য-রীতিটা একটা বাজে

জিনিষ নয়, কেবল সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্য, সৌখীনতা অসৌখীনতার ব্যাপারও নয়। তা ছাড়া, স্থাপত্যের উত্থানপতন উৎকর্ষ অপকর্ষ অন্য সব শিল্প ও কলার উত্থান-পতন উন্নতি অবনতির সহিত জড়িত। ভাস্কর্য্যে চিত্রাঙ্কণ দারুশিল্প প্রভৃতির সহিত ইহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই সব কারণে আমাদের দেশে স্থাপত্যের উন্নতির প্রয়োজন।

তাহার অর্থ এ নয়, যে, প্রাচীন যাহা ছিল, হুবহু ঠিক্ তাহার নকল করিতে হইবে। চিত্রবিদ্যাটিকে ঠিক্ দেশী করিবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁহার শিষ্যেরা এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রাচীনের নকলই করিয়াছেন, তা নয়। প্রাচীন তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে, উৎসাহ ভরসা দিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা দেশী প্রাণ লইয়া নূতন চোখে দেখিয়া যাহা আঁকিবার তাহা আঁকিয়াছেন। সময় ও অবস্থা বদলাইয়াছে, দেশ বদলাইয়াছে; সুতরাং ঠিক্ প্রাচীনের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। কিন্তু প্রাচীনের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব ও আবশ্যক।

স্থাপত্যেও এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা দেশে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা দেশের বাহিরেও বাঙালীর দ্বারা যে এ চেষ্টা হইতেছে, তাহার কিছু বৃত্তান্ত আমরা পরে দিব। এখানে বলিতে সুখ বোধ হইতেছে, যে, বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টি প্রধানতঃ যাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে তিনি স্থাপত্যব্যবসায়ী না হইলেও একটি সুন্দর খাঁটি দেশী জিনিষ তিনি রচনা করাইয়াছেন।

আমাদের এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলকলেজগুলিতে স্থাপত্য শিখান হয় না। যদি হইত, তাহা হইলেও বোধ করি বিদেশী কিছু শিখান হইত, যেমন সরকারী আর্ট স্কুল-গুলিতে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য রেখা টানা ও রং দেওয়া শিখান হইয়া আসিতেছিল। এখন দেশের লোককেই দেশী স্থাপত্য শিখাইবার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন করিতে হইবে, দেশী স্থপতি ও রাজমিস্ত্রীদিগকে দেশী রীতিতে অট্টালিকা নির্ম্মাণে উৎসাহ দিতে হইবে। কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেনও। কেবল ধনীরাই যে ইহা করিতে পারেন, এমন নয়। দেশী রীতিতে বাড়ী করিতে খরচ বেশী হয়, ইহা একটা ভুল ধারণা। মধ্যবিত্ত লোকেরাও দেশী ধরণের বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতে পারেন।

—

উৎকলের একতাবিধান

উৎকলের সভ্যতা অতি প্রাচীন। এক সময় উৎ-কলীয়েরা শক্তিমান্ জাতি ছিলেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের নষ্ট শক্তি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা সমবেত ভাবে করিতে পারিতেছেন না। কেন না, তাঁহাদের দেশটি এখন নানা প্রদেশের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা কোন প্রদেশেরই প্রধান অংশীদার নহেন। তাঁহাদের উন্নতি সাধন, তাঁহাদের শিক্ষাসম্পাদন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা আদি কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টেরই একমাত্র বা প্রধান কর্ত্তব্য নহে। তাই সমুদয় উৎকলকে এক করিবার চেষ্টা অনেক বৎসর হইতে হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও ফল ফলে নাই। নেহরু কমিটির রিপোর্টে কিছু লিখিলেই যে তৎক্ষণাৎ কিছু কাজ হইয়া যাইত, এমন নয়। কিন্তু তথাপি আমরা মনে করি, ভাষা অনুসারে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে উৎকলের প্রতিই সর্ব্বাগ্রে মন দেওয়া উচিত ছিল। নেহরু কমিটি তাহা দেন নাই। আমাদের সন্দেহ হয়, যে, ঐ কমিটির উপর বেহারের প্রভাব ছিল, উৎকলের ছিল না; উৎকলকে ছাড়িয়া দিলে বেহারের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের খরচ বর্ত্তমান বড়মানুষি চা'লে চালান সহজ হইবে না বলিয়া উৎকলকে বলি দেওয়া হইতেছে। ইহা উচিত নয়।

উৎকলের সমুদয় টুকরাকে জোড়া দিয়া একত্র করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি একটি নূতন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সাফল্য কামনা করি। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার সভ্যেরা ও অন্যেরা কটকের রাজপথ দিয়া উৎকলের প্রতীক চিত্র ও পতাকাদি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা উপায়ে একীভবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উৎকলীয়েরা উদ্বুদ্ধ হইলে তাঁহারা সমবেত চেষ্টা করিতে পারিবেন। তখন সিদ্ধিলাভ হইবে।

—

বড়োদা রাজ্যের প্রজাদের কনফারেন্স

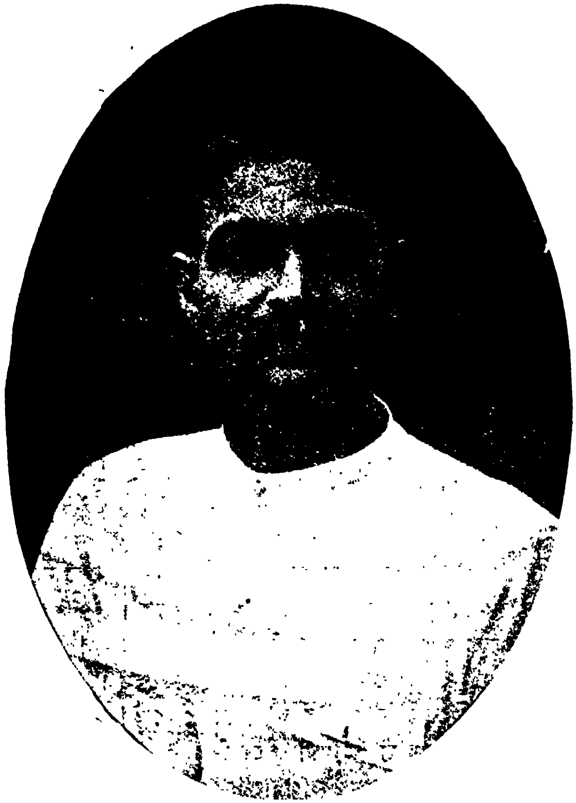
শ্রীযুক্ত দরবার গোপাল দেশাই মহাশয়ের সভাপতিত্বে বড়োদা রাজ্যের প্রজারা সম্প্রতি যে কনফারেন্স করেন, তাহাতে দেশাই মহাশয় বলেন, যে, মহারাজা গায়কবাড় প্রায়ই নিজ রাজ্যে থাকেন না, ইউরোপে থাকেন। ইহাতে রাজকার্য্যে অমনোযোগ বশতঃ রাজ্যের উন্নতি হয় না, এবং যে-টাকা রাজ্যে খরচ হইলে প্রজারা নানা আকারে তাহার কতক অংশ পাইত, তাহা বিদেশে ব্যয়িত হইয়া বিদেশীর হস্তগত হয়। অতএব, দেশাই মহাশয় বলেন, হয় মহারাজা দেশে থাকুন, নতুবা তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কোন বংশধরকে তাহাতে বসান। দেশাই মহাশয় অবশ্য এ কথাও বলেন, যে, মহারাজা স্বাস্থ্যের জন্য বিদেশে থাকিতে বাধ্য হন। তাহা হইলে তাঁহার গদী ত্যাগ করাই উচিত। অসুস্থতাই যে তাঁহার বিদেশবাসের একমাত্র বা প্রধান কারণ, সে বিষয়ে আমাদের

সন্দেহ আছে। বরং ইহাই সত্য মনে হয়, যে, আমোদ-আহ্লাদ বিলাসিতায় বিদেশে কালযাপন তাঁহার স্বাস্থ্যহানির কারণ। গায়কবাড়ের নিকট এক সময় লোকে অনেক আশা করিয়াছিল। সে আশা ফলবতী হয় নাই।

কনফারেন্সের অভ্যর্থনাসমিতির নেত্রী শ্রীমতী শারদা মেহতা বলেন, যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা বড়োদার ট্যাক্সের হার বেশী। জমির খাজনা দেড়গুণ। ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের হার আরও বেশী। ব্রিটিশ ভারতে বার্ষিক আয় ২০০০ টাকা হইলে তবে ট্যাক্স দিতে হয়, বড়োদায় ৭৫০ হইলেই দিতে হয়। ব্যবস্থাপক সভা একটা আছে বটে, কিন্তু তাহার ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ, যে, তাহার ও-নামটাই মিথ্যা। অবশ্যশিক্ষণের আইন বড়োদায় ২০ বৎসর আছে, তথাপি প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তৃত হয় নাই। দশ বৎসর আগে বড়োদার কৃষকদের মোট ঋণ ছিল সাত কোটি টাকা, এখন হইয়াছে দশকোটি।

কোন দেশী রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ রাজ্যের তুলনায় যে দেশী রাজ্যকে নিকৃষ্ট বলিতে হয়, ইহা কম দুঃখ ও লজ্জার কারণ নয়।

এখানে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের বাংলা দেশে মহিলারা সার্ব্বজনিক দেশহিতকর কাজে ততটা এখনও নামেন নাই, যত অন্য কোন কোন প্রদেশের মহিলারা নামিয়াছেন। যে-সকল বঙ্গমহিলা পর্দা মানেন না, তাঁহারা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আরও বেশী করিয়া লোকহিতের জন্য ব্যবহৃত হইলে তাঁহারা প্রীত হইবেন, দেশের উপকার হইবে, এবং তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিবেন।



দরবার গোপাল দাস দেশাই

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে সকল রাজনৈতিক দলের কনভেন্সানের অধিবেশন হইবে। ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে প্রমাণিত হইতেছে, যে, কংগ্রেসই দেশের একমাত্র বা সর্ব্ববাদিসম্মত প্রধান রাজনৈতিক মণ্ডলী নহে। তাহা না হইলেও আমরা কলিকাতাবাসীরা ইহার সাফল্য চাই। কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে কলিকাতাবাসীর নামে, সুতরাং ইহার সকল ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হইলে যাঁহারা স্বরাজ্য দলের লোক নহেন তাঁহাদেরও পরোক্ষভাবে অপযশ হইবে।

স্বরাজ্যদলের কর্ত্তারাই অভ্যর্থনা সমিতির সব ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন। তাঁহারা মাত্র অল্প দিন আগে বলিয়াছেন, বাড়ী বাড়ী গিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য সংগ্রহ করিবেন। এ-কাজটি অনেক আগে করা উচিত ছিল। এখনও মন দিয়া করিলে কাজ উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তারা কাগজে উদ্দীপক বিজ্ঞাপন দিয়া যদি ঘরে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে হইবে না।

কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয়

ভারতীয়েরা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, না ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা চায়, এবার কংগ্রেসের ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। এ বিষয়ে প্রবাসীতে আগে বহুবার অনেক কথা লেখা হইয়াছে। আমাদের মতে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন-শ্রেণীভুক্ত হইলে অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল হইবে। কিন্তু ইহাই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্বীকার করিতে পারি না। তাহার কারণ অনেক বার বলিয়াছি। আমরা বত্রিশ কোটি অব্রিটিশ লোক পাঁচ কোটি ব্রিটিশ লোকের সঙ্গে অপ্রধান সমষ্টি রূপে চিরকাল যুক্ত থাকিব, এমন কেন মনে করিতে হইবে?

আমাদের প্রতি তাহাদের মনের ভাবকে মৈত্রী বলা যায় না, তাহাদের প্রতি আমাদের মনের ভাবও অনুকূল নয়। পরে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু

যদি কাহারও সহিত বন্ধুত্বসূত্রে যুক্ত থাকিতেই হয়, তাহা হইলে ব্রিটেনের চেয়ে বা তাহার সমান অকপট বন্ধু শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে আর একটিও কখনও মিলিবে না, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই।



মিসেস্ শারদা মেহ্‌তা—বরোদা প্রজা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী

ভারতবর্ষকে ব্রিটেন ডোমিনিয়ন হইতে দিবে কি না, সন্দেহ; তথাপি ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। কিন্তু আপাততঃ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। যদি এই কারণে কেহ ডোমিনিয়ন হওয়ার পক্ষে মত দেন, তাহাতে আপত্তি করি না। কিন্তু ইহা চরম লক্ষ্য নহে। যাঁহারা ডোমিনিয়ন-অবস্থার ওকালতী করিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান অনেকের পূর্ণ স্বাধীনতায় অরুচি নাই—যদি তাহা পাওয়া যায় বা পাইবার কার্য্যোদ্ধার-উপযোগী উপায় আবিষ্কৃত হয়।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী, বাসভবন নির্ম্মাণ, যানবাহন—সকল বিষয়ে মানুষ উন্নতি করিতেছে, কিন্তু শেষ লক্ষ্য বা সীমা এখনও কল্পনার চক্ষুতেও প্রত্যক্ষ হয় নাই। সুতরাং যাঁহারা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটসকে চরম আদর্শ বলাইতে চান, তাঁহাদের জেদ অশ্রদ্ধেয়। তাঁহারা জোর এই টুকু বলিতে পারেন, তাঁহারা নিজেদের জীবিত কালে উহার বেশী কিছু আশা করেন না বা চান না। কিন্তু ভবিষ্যৎকে বা দেশের বর্ত্তমান সর্ব্বসাধারণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, ক্ষমতাও নাই।

—

সামাজিক কন্‌ফারেন্স

কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কন্‌ফারেন্স হইয়া থাকে, এবারেও হইবে। যাঁহারা কথা বলেন, কাজে কিছু করেন না, তাঁহারা যে কথা বলিবার প্রয়োজনটুকুও স্বীকার করিতেছেন এবং কথা বলিতেছেন, ইহা মন্দের ভাল বটে। কিন্তু সমাজ সংস্কারের সভাতেও অনুষ্ঠাতা অপেক্ষা বাক্যোচ্চারকদিগের বাহুল্য বা প্রাধান্য না-ঘটা বাঞ্ছনীয়।

—

হিন্দুসমাজ রক্ষা

আমরা হিন্দু কি না, সে সম্বন্ধে যিনি যাহাই মনে করুন, হিন্দুসমাজ রক্ষা কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহা ভাবিবার ও বলিবার অধিকার আমাদের আছে—তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না।

হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে ইহার প্রত্যেক মানুষকে কার্য্যতঃ অন্য মানুষের মত মানুষ মনে করিতে হইবে। কাহারও জন্মগত বংশগত নীচতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সমাজ টিঁকিবে না। যাহারা নীচ জাতি বলিয়া বিবেচিত বা অভিহিত হয়, তাহারা ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহী হইতেছে। ভালই হইতেছে। কোন কোন জাতি ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করিয়া তদ্বৎ আচরণ করিতেছে। যাহাদের সমষ্টিগত চেতনা অল্প পরিমাণেও হইয়াছে, তাহারা কেহই শূদ্র বা অন্ত্যজ থাকিতে চায় না। যাহারা বৈশ্যত্ব দাবী বা স্বীকার করে, তাহারাও কয়দিন বৈশ্যত্বে সন্তুষ্ট থাকিবে, বলা কঠিন, এ অবস্থায় সকলের মনুষ্যোচিত সমান অধিকার স্বীকৃত না হইলে, হয় গৃহবিবাদে হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে থাকিবে, নয় ইহার আরও অনেক লোক মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান হইয়া যাইবে। যখন দেশে খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় নাই, তখন লোকে অগত্যা সব অপমান, অসুবিধা, উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও হিন্দুসমাজের আশ্রয়ে থাকিত। ভারতে ঐ

দুই ধর্ম্মের আবির্ভাবের পর হইতে অনেক কোটি লোক হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। হিন্দু মিশনের লোকেরা, হিন্দু-সভার লোকেরা, হিন্দুর হ্রাস নিবারণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি চান। তাঁহাদের পরিষ্কার বুঝা চাই, যে, মুসলমান সমাজে ও খৃষ্টিয়ান সমাজে জন্মজাতিবংশ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের ও প্রত্যেক খৃষ্টিয়ানের যে সম্মান ও অধিকার আছে, হিন্দুসমাজে জন্মজাতিবংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুর অন্ততঃ ততটুকু সম্মান ও অধিকার থাকা চাই। নতুবা হিন্দুসমাজের বলক্ষয় ও সংখ্যাহ্রাস অনিবার্য্য।

"অস্পৃশ্যতা" ও "অনাচরণীয়তা"র সম্পূর্ণবিলোপ-সাধন ত চাই-ই। অধিকন্তু, যে-কোন হিন্দুর যে কোন বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার চাই। পূজা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কাহারও কেবল জন্মবশাৎ একচেটিয়া থাকিবে না— "জুতাসেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত যে-কোন কাজ স্বেচ্ছা ও যোগ্যতা অনুসারে যে-কেহ ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

কোন হিন্দুকে অপর কোন হিন্দুর সহিত পংক্তিভোজন করিতে বাধ্য করিতে পারা যাইবে না, তাহা উচিতও হইবে না, কোন হিন্দু পরিবারকে অন্য কোন হিন্দু পরিবারের সহিত ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত পংক্তিভোজন করিলে বা ভিন্নশ্রেণীস্থ পরিবারের সহিত ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলে তাঁহার হিন্দুত্ব লুপ্ত হইবে না।

অনেকে মনে করিতে পারেন, এইভাবে জাতিভেদ পরিবর্ত্তিত বা লুপ্ত হইলে হিন্দুসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। তাহা ভুল। হিন্দুসমাজের মত জাতিভেদ বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান সমাজে না থাকাতেও যখন তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তখন জাতিভেদবিহীন হিন্দুসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেন না থাকিবে? বরং আমাদের নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন হইলে সব হিন্দু হিন্দু হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করিবে ও তাহাতে হিন্দুসমাজের সঙ্ঘবদ্ধতা ও শক্তি বাড়িবে এবং সংখ্যাহ্রাস বন্ধ হইবে।

নারীদের অবস্থার উন্নতি হিন্দুসমাজের অপর একটি অত্যাবশ্যক সংস্কার। এক সময় ছিল যখন বালিকাদের মত বালকদেরও বিবাহ শৈশবে ও বাল্যে হইত, এখনও অনেক প্রদেশে কোন কোন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হয়। এখন অন্ততঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলেদের শৈশবে ও বাল্যকালে বিবাহ আর হয় না। তাহাতে হিন্দুত্ব লোপ পায় নাই। মেয়েদের বিবাহও তাহাদের যথোচিত শিক্ষাসমাপনের পর দিতে হইবে। শিক্ষিত সমাজে এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ ও কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে তাহার অবনতি বা হিন্দুত্বলোপ হয় নাই। জ্ঞান লাভের অধিকার, দেহের পূর্ণ বিকাশের অধিকার বালকদের যেমন বালিকাদেরও তেমনি আছে। পুরুষদের যাহা যাহা শিক্ষণীয় বিষয়, নারীদেরও শিক্ষণীয় বিষয় ঠিক্ সেই সেইগুলি যদি বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে নারীরা কোন কোন পৃথক বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারেন; বালিকাদের ও নারীদের পাঠ্য পুস্তকও আলাদা হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষা তাহাদের হওয়া চাই। অল্পবয়সে, শিক্ষাসমাপনের পূর্ব্বে, দেহের পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বে, তাহাদের মাতৃত্ব ঘটান কখনও উচিত নয়।

অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধন না করিলে নারীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না, শিক্ষার সুব্যবস্থা হইবে না, সাহস বাড়িবে না, লোকহিতসাধনের শক্তি ও সুযোগ বাড়িবে না। এই সব বিষয়ে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রদেশ, মহীশূর, তামিল নাড়ু, কেরল বাংলাদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আমাদের মহিলা-সংবাদ বিভাগ পাঠ করেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বাংলাদেশের নারীদের চেয়ে অন্য অনেক অঞ্চলের নারীদের কার্য্যক্ষেত্র কত বিস্তৃত এবং জীবনের সাফল্যের সুযোগ কত বেশী। মুসলমান সমাজে পর্দা হিন্দুসমাজের চেয়ে বেশী কড়া। কিন্তু মুসলমানদের দেশ তুরস্কে পর্দা আর নাই, আফগানিস্থানে উহার দ্রুত তিরোভাব হইতেছে।

অনেকে পাশ্চাত্য স্ত্রীস্বাধীনতার কুফলের উল্লেখ করিবেন। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য রকমের বা অন্য কোন রকমের স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করিতেছি না। স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা এক জিনিষ নয়। হিন্দুমহিলারা তীর্থক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেন, অথচ তীর্থস্থানগুলি দেবোপম-পুরুষজাতিতে পূর্ণ নয়। এই সব স্থানে যদি বঙ্গনারী-দিগকে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া চলে, তাহা হইলে বঙ্গের গ্রামে ও সহরে কেন চলিবে না?

যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার নিন্দা করেন, তাঁহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে, যে, অবরোধ প্রথা থাকার দরুন বঙ্গীয় সমাজের নীতি ভারতবর্ষের স্ত্রীস্বাধীনতাবিশিষ্ট অংশগুলি অপেক্ষা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। মানুষকে ভাল রাখিবার জন্য স্বাধীনতা হরণ অনুচিত। মানুষের, নর-নারী উভয়ের, স্বাধীনতা থাকিবে, চরিত্রও ভাল থাকিবে, এরূপ উপায় অবলম্বন করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে। যাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার দোষহীনতার মূল্য কি? যাহার হাত পা বাঁধা, সে যদি চুরি না করে, তাহা হইলে কেহ তাহাকে সাধু বলে কি? বিধাতা মানুষকে ভাল মন্দ দুই হইবার ও করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়াছেন বলিয়াই মানুষ সৎ হইলে তাহার প্রশংসা অসৎ হইলে নিন্দা হয়।

যাঁহারা বাল্যে বা যৌবনে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন, তাঁহাদের আবার বিবাহ দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

বালবিধবা ত বস্তুতঃ বিধবাই নহেন। বাল-বিধবার বিবাহ না দেওয়া ঘোরতর অধর্ম্ম। সেই অধর্ম্মের ফল হিন্দু সমাজ ভুগিতেছে—কি আকারে ও প্রকারে ভুগিতেছে, বলা অনাবশ্যক। স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া এইরূপ অনেক বিধবার পাতিত্য বা সমাজান্তরে আশ্রয় গ্রহণ তাহাদের বিবাহ না দেওয়ার ফল। অন্তঃপুরে নির্য্যাতনেও অনেকের স্বধর্ম্মত্যাগ ঘটে। অন্য সব বিধবাদেরও পুনর্ব্বিবাহে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

মোটের উপর সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে কুমারী, সধবা ও বিধবা নারীকে অসম্মান অশ্রদ্ধা নির্য্যাতন ভোগ করিতে না হয়। দারিদ্র্য, রোগ পুরুষনারী উভয়েরই হইতে পারে; কিন্তু সমাজে ও পরিবারে সকলেরই সম্মানিত স্থান থাকা উচিত, এবং তাহার ব্যবস্থা সাধ্যায়ত্ত।

—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের চতুর্থ বার্ষিক সংখ্যাটি চমৎকার হইয়াছে। সম্পাদক বিষয় নির্ব্বাচন ও লেখক নির্ব্বাচনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অনেকগুলি প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট। চিত্রগুলি সুনির্ব্বাচিত ও সুমুদ্রিত হইয়াছে। সহরের কাজ কেমন করিয়া চালাইলে এবং তাহাতে কি কি প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহা সুন্দর, স্বাস্থ্যকর এবং সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী হয়, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট পড়িলে সে জ্ঞান জন্মে। এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশ করিয়া এবং শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের উপর ইহার সম্পাদনের ভার দিয়া কৌন্সিলরগণ কেবল কলিকাতার নহে অন্য সব মিউনিসি-প্যালিটীর উপকার করিয়াছেন—অবশ্য যদি তাঁহারা উপকৃত হইতে ইচ্ছা করেন এবং তদনুরূপ আয়োজন করেন। কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল দলাদলি আছে, অথচ কাগজখানি নিরপেক্ষ ভাবে চালিত হয়, ইহা প্রশংসার কথা। কাগজটি নিজের খরচ নিজেই চালায়, অথচ মিউনিসিপালিটী বিনা মূল্যে নিজেদের সব বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা পান।

—

ইন্দোরে প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এবার ইন্দোরে প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন হইবে। ইহার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। এবৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস না হইলে হয় ত ইন্দোরে যাইতাম। সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মীরা আমাকে প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া- ছিলেন। সে অনুরোধও রক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা "প্রবাসী"র পাঠক, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবেন। কারণ, বিশেষ করিয়া প্রবন্ধ না লিখিলেও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের সুযোগ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে "প্রবাসী"তে অনেক কথা অনেক বার লিখিয়াছি।

—

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা

হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকের মাতৃভাষা, তার নীচেই বাংলা। সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং চিন্তা ও ভাব প্রকাশের উপযোগিতায় বাংলা ভারতীয় কোন ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ উহার উত্তরার্দ্ধে, বাঙালীরা সকল প্রদেশে নানা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে গিয়া থাকে। কোন জাতিকেই সাধ্যপক্ষে এমন অবস্থায় ফেলা উচিত নয় যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষার চর্চ্চায় বাধা জন্মে বা নিরুৎসাহ হইতে হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে লোকেরা কলিকাতায় ও বাংলাদেশে আসিয়া থাকেন। ভারতীয় প্রধান প্রধান সব ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের অসুবিধা হয় না। কেবল প্রবেশিকা ও এম্ এর কথা লিখিলেই চলিবে। প্রবেশিকায় বাংলা ছাড়া পরীক্ষার্থীরা হিন্দী, ওড়িয়া, উর্দ্দু, অসমিয়া, বর্ম্মী, খাসী, আধুনিক তিব্বতী, মৈথিলী, মরাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, কন্নাড, মলয়ালম, নেপালী পার্ব্বতিয়া, সিংহলী, মাণপুরী, গারো, পোর্ত্তুগীজ, এবং আধুনিক আর্মানিয়ান, এই সব ভাষার কোনটিতে পরীক্ষা দিতে পারে। এম্এতে বাংলা ছাড়া হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া, গুজরাতী, অসমিয়া, মরাঠী উর্দ্দু, তামিল, তেলুগু, মলয়ালম, কন্নাড এবং সিংহলীতে পরীক্ষা দেওয়া চলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দীর প্রতি এই অতিরিক্ত সম্মান দেখাইয়াছেন, যে, ইতিহাসে ইহার এম্এ পরীক্ষার্থীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ছয় খানি হিন্দী পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব বাংলাদেশ অন্য প্রদেশবাসীদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আতিথ্যধর্ম্ম যে ভাবে পালন করিতেছেন, অন্য সব প্রদেশও বাংলার প্রতি সেইরূপ আতিথেয়তা দেখাইবেন আশা করা অন্যায় নহে। শিক্ষানীতি অনুসারে ত বাঙালী ছাত্রদিগকে বাংলায় পরীক্ষা দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা একান্ত অনুচিত।

গত বৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা ভাষা উঠাইয়া দিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল। উহার য়্যাকাডেমিক কৌন্সিল উহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু ওরিয়েন্ট্যাল ফ্যাকাল্টি এবং তৎপরে আর্টস্

ফ্যাকাল্টি বাংলার সপক্ষে মত দেন। সর্ব্বশেষে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সীণ্ডিকেট বাংলাভাষাকে অন্যতম পরীক্ষার বিষয় রাখিবার পক্ষে গত ৩রা এপ্রিল মত দিয়াছেন। এই সুফলের জন্য পঞ্জাবের বাঙ্গালীরা ও অন্য প্রবাসী বাঙালীরা অধ্যাপক এস্ এন্ দাসগুপ্ত, পি এন্ মৌলিক, এইচ্ কে ভট্টাচার্য্য এবং এ দাসগুপ্তের নিকট ঋণী। অধ্যাপক দিওয়ান চাঁদ শর্ম্মা প্রভৃতি যে সব পঞ্জাবী ভদ্রলোক বাংলার সপক্ষে মত দিয়াছেন, তাঁহারা আরও ধন্যবাদার্হ। বঙ্গের বাহিরে অন্যত্রও বাংলাকে বাদ দিবার এইরূপ চেষ্টা হইতে পারে। তাহা হইলে তথাকার উদ্যোগী বাঙালীরা লাহোর ফর্ম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের নিকট হইতে তাঁহাদের নোটটি চাহিয়া লইবেন।

তাহাতে দেখিতে পাই, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকে পরীক্ষার বিষয় বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। পঞ্জাবের চারি হাজার লোকের মাতৃভাষা বাংলা। তাহার মধ্যে সাত শতের উপর লাহোরে থাকে। তা ছাড়া, যাঁহাদিগকে সরকারী চাকরী উপলক্ষ্যে ভারতের সব প্রদেশে বদলী হইতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাঙালী তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের বড় অসুবিধা হয় যদি কোন প্রদেশে তাঁহাদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেওয়া না চলে। একজন য়্যাকাউণ্টেণ্ট-জেনের‍্যাল, শ্রীযুক্ত জয়-গোপাল ভাণ্ডারী এম্ এ—তিনি পাঞ্জাবী, এই অসুবিধার কথা বলিয়াছেন।

একটা আপত্তি উঠিয়াছিল, যে, পঞ্জাবে খুব কম পরীক্ষার্থী বাংলায় পরীক্ষাদেয়। উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান্, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যাতেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঐরূপ বা তদপেক্ষাও কম হয়। কিন্তু ঐ বিষয়গুলি ত পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা হইতে কেহ কখনও উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন নাই?

—

লাঠি কমিশন

সাইমন কমিশন যে দিন জাহাজ হইতে বোম্বাইয়ে নামে, সে দিন অন্য অনেক জায়গার মত কলিকাতায় হরতাল হইয়াছিল। হরতালের দিনে পুলিশ যে কলিকাতায় নানা জায়গায় লাঠি চালাইয়াছিল, তাহা এখনও ভুলিবার কারণ ঘটে নাই। তাহার পর সম্প্রতি লাহোরে ও লক্ষ্ণৌতে কমিশনবর্জ্জনকারীদের উপর লাঠি পড়িয়াছিল। তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহাদের সফরের আরম্ভে লাঠি তাহাদের সফরের মধ্যে লাঠিবাজী হওয়া বিচিত্র নহে। এখন অন্তে কি হয় দেখিতে বাকী আছে।

লাঠি কমিশন যে ঠেঙাইয়া সহযোগিতা আদায় করিতে চায়, তাহার কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। কিন্তু কমিশনের প্রতি লোকদের অসন্তোষ প্রকাশ লাঠিবাজী দ্বারা বন্ধ করা যে তাহার সভ্যদের অননুমোদিত, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

—

কমিশনের গোস্‌সা

চৌরঙ্গীর ভারতবন্ধু বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন—ভারতের কি দশা হইবে ভাবিয়া। কেন না, ভারতবন্ধু অবগত হইয়াছেন, লাহোরে ও লক্ষ্ণৌতে এবং তদুপরি কানপুরে কমিশন বর্জ্জকদের ব্যবহারে কমিশনের সভ্যদের ভারতের প্রতি সদয় প্রাণ পাষাণবৎ কঠোর হইয়া গিয়াছে। এখন যদি কমিশনকে রিপোর্ট লিখিতে হইত, তাহা হইলে নাকি ভারতবর্ষকে নূতন কিছু বর দানের অনুরোধ না করিয়া উহার সভ্যেরা ভারতীয়দের বর্ত্তমান সব উচ্চ অধিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পূর্ব্ব অবস্থায় স্থাপন করিতে বলিত। ভারতবন্ধু আশা করেন, যে, কমিশন যখন কলিকাতায় আসিবে, তখন কলিকাতাবাসীরা এমন ভাল ছেলে হইবে, যে, কমিশনের পাষাণ প্রাণ গলিয়া আবার মাখনের মত হইবে এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ বহুৎ বহুৎ বক্‌শিশ পাইবে।

মার খাইল বর্জ্জনকারীরা, গোস্‌সা হইল কমিশনের যাহার খাতিরে লাঠিবাজী হইয়াছিল!

ভারতবন্ধুকে ভাবিতে হইবে না। ভারতীয়েরা কোন ভিক্ষা চায় না—কেবল চায়, যে, কুত্তাকে যেন ডাকিয়া লওয়া হয়।

—

কমিশন বর্জ্জন

কমিশন-বর্জ্জনের মানে এত দিন এই ছিল, যে, বর্জ্জন-কারীরা উহার সমক্ষে সাক্ষ্য দিবেন না। কিন্তু উহার সমক্ষে সহযোগীরা যে সাক্ষ্য দিবে, তাহা ছাপিতে কোন বর্জ্জনকারী কাগজেরও আপত্তি হয় নাই। তাই আমরা অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম, "এইরূপ করায় বয়কটটা পুরাদস্তুর হইতেছে না।" (২৯৫ পৃষ্ঠা)। কমিশন ফ্রী প্রেসের সহিত অন্যায় ব্যবহার করায় এবং লাহোরে ও লক্ষ্ণৌতে পুলিশ লাঠি চালানতে নেতারা পুরা বয়কটের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাতে প্রায় সব দেশী

কাগজ আর কমিশনের সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষ্য ছাপিবেন না। তবে, তাঁহারা আবশ্যক মত সাক্ষ্যের কোন কোন অংশের সমালোচনা করিতে পারিবেন এবং কমিশনের গোপনীয় সাক্ষ্য ও দলিলাদি হস্তগত হইলে তাহা ছাপিবেন।

গত রবিবারে কলিকাতায় সাংবাদিক সমিতির ও অন্য সাংবাদিকগণের যে সভা হয় তাহাতে ঐ মর্ম্মের প্রস্তাব ধার্য্য হয়। এই সভার আর একটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

"যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর আচরণের ফলে সাইমন কমিশনের সফর উপলক্ষে লাহোরে ও লক্ষ্ণৌতে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, এই কন্‌ফারেন্স তাহাদের কার্য্য গর্হিত হইয়াছে বলিতেছেন। এই সকল অত্যাচার যাহাতে না হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা না করায়, বা প্রকাশ্য ভাবে এই সকল অত্যাচারের সহিত নিজেদের সংস্রবহীনতা ঘোষণা না করা স্যার জন সাইমনের তাঁহার নিজের প্রতি, এদেশের অধিবাসী- বৃন্দের প্রতি এবং স্বাধীনতা ও ন্যায়ের প্রাথমিক নীতির প্রতি কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া এই কন্‌ফারেন্স বিবেচনা করেন।"

—

সমগ্র ভারতের সাংবাদিকদিগের কন্‌ফারেন্স

ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারীর গোড়ায় সমগ্র ভারতের সাংবাদিকদিগের একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান কলিকাতার সাংবাদিকদিগের উক্ত সভায় স্থির হয়। তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়:—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সহকারী সভাপতি—মৌলনা আক্রাম খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমান, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী সরলা দেবী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ। সদস্যগণ—এই দিনের সভায় উপস্থিত সকল সদস্য। ইহা ব্যতীত আরও সদস্য গৃহীত হইতে পারিবে।

অভ্যর্থনা সমিতির প্রত্যেকসদস্যকে ৫৲ টাকা ফী দিতে হইবে, ধার্য্য হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনে সভার ৫ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই কোরাম হইবে।

—

বগুড়ার বরদাসুন্দরীর মোকদ্দমা

এই মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল ২৪শে অগ্রহায়ণের আনন্দবাজার পত্রিকায় যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে বর্ণিত বগুড়ার প্রধান উকীলদের আচরণের বিষয় পড়িলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। সমস্ত চিঠিটি সকলের পড়া উচিত। আমরা কয়েকটি বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বিগত ৬ই নভেম্বর হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি সি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও উপরোক্ত মোকদ্দমার মোশনটী অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই মোকদ্দমায় বগুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হাইদার আলি সাহেবের কোর্টে আসামীরা খালাস পায়। তার পর সেশন জজের নিকট আপীল করা হয় এবং উহা অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের চেষ্টায় "ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি সি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও রাধিকারঞ্জন গুহ এবং রাজকুমার চক্রবর্ত্তী উকীলদ্বয় হাইকোর্টে বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিয়াছেন।"

বিগত এপ্রিল মাসে ঢাকার ডাঃ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দাস, সূত্রধর-জাতীয়া বিধবা বরদাসুন্দরীর নির্য্যাতনের কথা আমায় লিখেন এবং যাহাতে এ বিষয়ের প্রতিকার হয়, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। বরদার পিতা কৃষ্ণচন্দ্রকে বারম্বার পত্র লিখিয়া উত্তর পাওয়া গেল—"আমার কন্যা স্বইচ্ছায় মুসলমান হইয়া নিকা করিয়াছে। আমি মোকদ্দমা চালাইতে সম্মত নহি।" পত্রখানি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আমি ১৪ই মে বগুড়া রওনা হই।

আদালতে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। কৃষ্ণচন্দ্র ও তাহার সাক্ষীগণকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া বোধ হইল। পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিল—"আমি ত লিখিতে পড়িতে জানি না। আমার অজ্ঞাতে কেহ লিখিয়া থাকিবে।"

গ্রামে মাত্র চারি ঘর সূত্রধর। বিপক্ষরা কৃষ্ণচন্দ্রের উঠানটুকুও বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিল। মোকদ্দমা বিচারাধীন কালে একদিন রান্নাঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় হতভাগ্যের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থের অন্নাদি নষ্ট হইয়া ছিল।

পরবর্ত্তী মোকদ্দমার দিন উক্ত সম্মিলনীর আদেশে বরদা সাহায্য-ভাণ্ডারের অর্থে আমি বগুড়া রওনা হইলাম। এবার গিয়া ভাবান্তর দেখিলাম। সকলেই যেন এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক। আমার তথায় গমনে যেন সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিবার আশঙ্কার সম্ভাবনা। হিন্দু সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাস বাবু আমায় আর বগুড়া আসিতে নিষেধ করিলেন, কেবল টাকা পাঠাইলেই কার্য্য সুচারুভাবে চলিবে।

মোক্তার শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু ও অমূল্য বাবু বরদাকে সিভিল সার্জ্জন দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া বয়স নির্ণয় জন্য হাজত অথবা অন্য কোন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিকট রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং বগুড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীর চট্টোপাধ্যায় (ব্রাহ্ম) মহাশয় এজন্য সারা দিন কোর্টে হাজির ছিলেন, কিন্তু হাকিম উহা মঞ্জুর করিলেন না। অন্য হাকিমের নিকট মোকদ্দমাটি স্থানান্তরের দরখাস্ত হয়, কিন্তু তাহাও অগ্রাহ্য হয়। বহুকাল আসামীদের আয়ত্তাধীন এবং তাহাদের প্রভাবগ্রস্ত বরদার এজাহারের উপর নির্ভর করিয়া হাকিম আসামীদের খালাস দেন। সেশন জজের নিকট মোশন করা হইল, কিন্তু উকিল পাওয়া গেল না।

মোকদ্দমার পরদিন সংবাদ আসিল, প্রধান উকিলগণ কেহ বাটীতে বিবাহ, কেহ আসামী প্রতিপত্তিশালী প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়ৎ এবং তাঁহার প্রধান মক্কেল, ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া মোকদ্দমায় দণ্ডায়মান হন নাই।

বগুড়ার "প্রথম শ্রেণীর উকীলগণ" যে দরিদ্র কৃষ্ণচন্দ্রের উপর দয়া করেন নাই, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। ব্যবসা দ্বারা টাকা রোজগার করা তাঁহাদের কাজ, দয়া করিলে চলিবে কেন? কিন্তু ফী দিতে চাহিলেও প্রধান উকীলগণ যে মোকদ্দমা লয়েন নাই, ইহা আইনজীবীদের নীতির বিরুদ্ধ কাজ হইয়াছে। সেদিন শিকাগো য়ুনিটি কাগজে আইনজীবীদের নীতি (Lawyer's Ethics) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে পড়িতেছিলাম, কতকগুলা গুণ্ডা একটি ভদ্রলোককে খুন করে। তাহাদের পক্ষসমর্থনের জন্য অন্য কোন আইনজীবী পাওয়া না যাওয়ায় নিহত ব্যক্তির পরম বন্ধু এক প্রধান আইনজীবী আসামীদের মোকদ্দমা চালান। ইঁহার সহিত বগুড়ার প্রধান উকীলদের ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহারা যে কৃষ্ণচন্দ্রের মোকদ্দমা লন নাই, তাহা পসারহানি, প্রাণহানি, অঙ্গহানি, প্রভৃতি কোন বা সর্ব্বপ্রকার হানির ভয়ে। কিন্তু মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার নামই জীবন, কাপুরুষের জীবন মৃত্যুর অধম।

সর্ব্বত্র হিন্দুসমাজের অধিকতর সংহতি ও নারীরক্ষায় সচেষ্টতা আবশ্যক। তাহাতে 'নীচ' জাতি ও 'উচ্চ' জাতির বিচার করিলে চলিবে না। "হিন্দুসমাজ রক্ষা" শীর্ষক নিবন্ধিকায় আগে যাহা বলিয়াছি, তদ্রূপ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে এই সংহতি ও সচেষ্টতা সম্ভবপর নহে।

—

নবীন জাপান-সম্রাটের অনুশাসন

নবীন জাপান-সম্রাট তাঁহার অভিষেক উপলক্ষ্যে যে অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে আছে :— "আমাদের প্রতিজ্ঞা, সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রজাদের শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি করা এবং তাহাদের মানসিক নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন দ্বারা সকলের সন্তোষ ও সদ্ভাব উৎপাদন করিয়া সমগ্র জাতিকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা।" জাপান-সম্রাট শিক্ষাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। ভারতের ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট শিক্ষাকে অতি অপ্রধান স্থান দিয়া থাকেন।

—

"ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্র"

কিছু দিন হইতে ইংরেজরা তাঁহাদের সাম্রাজ্যকে "কমন্‌ওয়েল্‌থ্" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থাৎ কিনা উহার সব কাজ অধিবাসীদের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের মত অনুসারে হয়। তাহা সত্য নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীর ও দেশের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং ব্রিটিশরা কমন্‌ওয়েল্‌থ কথাটি ব্যবহার করিয়া আত্মপ্রতারিত হইতেছেন ও অপরকে প্রতারিত করিতেছেন। এই আত্মপ্রতারণা ও পর-প্রতারণার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমাদের গোচর হইয়াছে। গত রবিবারে সমালোচনার জন্য দার্শনিক ম্যুরহেডের 'য়ুস্ অব্ ফিলসফী' বা 'দর্শনের উপযোগ' নামক বহি পাইয়া দেখিলাম, তাহাতে 'ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ অব নেশ্যন্স্' নামক একটি অধ্যায় আছে, কিন্তু বহিটির কোথাও ভারতবর্ষের নামটি পর্য্যন্ত নাই। অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ৪৫ কোটি লোকের মধ্যে ৩২ কোটি ভারতবর্ষে বাস করে। ভারতবর্ষকে মোটে আমলে না আনিয়াই সাম্রাজ্যটা কমন্‌ওয়েল্‌থ!

—

নব্যতন্ত্রের বঙ্গীয় চিত্রকরসম্প্রদায়

নব্যতন্ত্রের বঙ্গীয় চিত্রকরসম্প্রদায় বলিতে কেহ যদি মনে করেন, আমাদের বড় বড় চিত্রকরেরা সবাই একই রীতি একই পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু পার্থক্যও খুব আছে।

নিজের বাড়ীর ছেলেদের সকলেরই ভাল লাগিবার কথা, কারণ তাহারা নিজের। কিন্তু যদি অন্যেরাও তাহাদের প্রশংসা করে, তবেই ঠিক্ মনে করা যাইতে পারে, যে, তাহাদের সদ্‌গুণ আছে। তেমনি, আমাদের পক্ষে বাঙালী চিত্রকরদিগকে শক্তিমান্ ও প্রতিভাশালী মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু যদি সমজদার বিদেশী ও বিপ্রদেশীরা তাঁহাদের প্রশংসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সমর্থিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। যে-সব দেশের লোকদের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, তথাকার সমজদার লোকেরা আমাদের শিল্পীদের প্রশংসা করিয়াছেন, দোষ-ত্রুটির কথাও বলিয়াছেন। এই প্রকার উভয়দিগ্‌দর্শী সমালোচকদের প্রশংসার মূল্য আছে। নানাকারণে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব জন্মিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যদি বিপ্রদেশী কোন যোগ্য সমালোচক আমাদের

চিত্রশিল্পীদের গুণকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহা শ্রদ্ধের মনে না করিবার কোন কারণ থাকে না।

মান্দ্রাজের "হিন্দু" তথাকার ও সমগ্র ভারতের একটি প্রধান খবরের কাগজ। কিছুদিন হইল তাহাতে শ্রীযুক্ত জী বেঙ্কটাচলম্ নব্যতন্ত্রের বাঙালী চিত্রকরদের চিত্রকলার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় তিনি প্রথমে দেন। ভূমিকা স্বরূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

The Tagores are outstanding personalities, not only in India, but in the world. The most famous of them, Rabindranath Tagore, is hailed as, perhaps, the greatest living poet in the world. His two nephews, Abanindranath Tagore and Goganendranath Tagore. are no less great in their own art and are equally well-known in this country and elsewhere as leaders of a new art movement. A narrow lane from one of the crowded and busy streets of Calcutta leads you to a secluded square with stately buildings on its three sides, in which dwell the famous family of Tagores, who have been India's great cultural interpreters to the West. The two artist-brothers live in a mansion facing that of their great poet-uncle, and the whole environment is Indian : Indian furniture, Indian draperies; Indian utensils, all of exquisite beauty, are to be seen in the rooms. Here they dream, design, work and teach.

অবনীন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলম্ বলেন—

Tagore is a most sensitive artist, in whose works one sees not only the subtle suggestiveness of the Hindu mind but the exquisite colouring and finish of Persian art and the perfected technique of Japanese painting. He borrows freely the methods and mannerisms of the Far-Eastern art, as it expresses more freely his real genius than the heavy, cumbersome Western technique in which he was trained.

সমালোচক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অর্দ্ধ শতাব্দীরও উপর ধরিয়া সরকারী আর্টস্কুল সকলে ভারতীয় ছাত্রেরা শিক্ষা পাইয়াও কেহ উল্লেখযোগ্য নূতন কিছু করিতে পারে নাই, অথচ পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি এবং পারসীক, চৈনিক ও জাপানী পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বা তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ বিশিষ্টরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কারণ মোটামোটি এই, যে, চৈনিক, পারসীক, জাপানী এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় প্রকৃতির সহিত আধুনিক ভারতীয়দের প্রকৃতির যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, পাশ্চাত্য জাতিদের প্রকৃতির সহিত ততটা ঘনিষ্ঠ যোগ নাই।

পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কণ রীতি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য পথের পথিক প্রথমে হন অবনীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম বিদ্রোহী। বেঙ্কটাচলম্ বলেন :—

The first one to raise the standard of revolt was Abanindranath Tagore ; he was not merely a rebel but a constructive genius. His was the first effort to synthesise the refined delicacy of Japanese painting, the purity of Chinese art, the exquisite finish of Persian miniatures and the idealism of Hindu art. Tagore is essentially an experimentalist, as all great masters were.

অতঃপর সমালোচক অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছবির উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়া সর্ব্বশেষে "শাহজাহানের পরলোক-যাত্রা" ছবিখানির বর্ণনার আরম্ভে বলিয়াছেন :—

Restraint is the soul of art ; and Tagore's great masterpiece, "The Passing of Shah Jehan," is a superb example of repose and restraint.

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলমের শেষ কথা—

He does not bind himself to any set of art traditions or conventions ; hence the originality, the newness and the boldness of his art. He sums up in himself, in short, all that is great, good, beautiful and true in his country's art : its mysticism, its symbolism, its idealism, its suggestiveness; the sublime spirituality of his race, the daring imagination of his ancestors, the sensitive-emotional sensibility of his province and the utmost freedom of expression in life and art. He is, forsooth, his own ancestor.

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলম্ বলেন, যে, তিনি হইতেছেন

a picturesque adventurer on the high seas of Indian art, and is an artist of versatile genius. He took to painting rather late in his life, and is a self-made artist. He never studied in any school of art or under any master. He was a connossieur of art before he took to creative work himself. A born artist, with leisure, comfort and money at his command, he was able to play with brush and

colours as he liked, and some of the playful experiments of his artistic moods have given us new aesthetic joys. Goganendra's intuitions express themselves in gorgeous colours and delightful patterns : his fertile imagination conceives ideas and creates forms that are interestingly intriguing and fascinatingly puzzling. His originality is vivid, spontaneous and charming. His power of expression is varied and he stands out in India, among his colleagues, as not only the greatest cartoonist and caricaturist (to whom Bengal owes much of her progress in social reform) and a supreme painter of gorgeous sun-set landscapes, which drew the unstinted admiration and praise of the artists and art-critics in the salons of Paris, but as, perhaps the most idealistic and imaginative of cubistic and impressionistic artists in the world.

অতঃপর তাঁহার অনেকগুলি ছবির বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া সমালোচক বলিতেছেন :—

Goganendranath is also a daring experimentalist like his brother, Abanindranath.

What things of rare beauty may Goganendranath yet bring from the spacious depths of his many-coloured moods? The world is the richer for an artist of his type and genius.

নন্দলাল বসু সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলম্ বলেন :—

Next, perhaps, to Abanindranath Tagore, Nandalal Bose is the more well-known artist of modern India. As the Head of the School of Painting (Kalabhavan) of the Viswabharati University at Santiniketan and as one of the leaders of the Neo-Bengal School of Painting, he is widely recognized as one of the master-artists of the world. He has not the eclectic genius of his master Abanindranath Tagore, but he has in abundance the creative genius of a master-mind. He is distinctly himself and has not allowed any style or school of painting to influence him except his own country's classical art of Ajanta.

রবীন্দ্রনাথের সহিত বিদেশ ভ্রমণ করিয়া নন্দলাল চিত্রাঙ্কণের কারিগরী সম্বন্ধে কিছু হদিশ পাইয়াছেন, কিন্তু

they never influenced his art as they have done in the cases of other artists of India. Nandalal's art is typical of the Hindu genius ; his great works show the sculpturesque effect of the ancients.

বেঙ্কটাচলমের মতে

Nandalal Bose has all the imaginative sensibility of a sensitive artist and the strength of a creative genius. He has a golden heart for a teacher and is beloved of his pupils. His students revere him and regard him with the greatest affection and look up to him as their friend and guide. His true greatness lies, like that of his compeer and co-student Venkatappa of Mysore, in his utter simplicity and the sincerity of his art.

প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকায় এবং দেবদেবীর মূর্ত্তিতে নন্দলাল যে নূতন ভাব ও কাব্যরসের সঞ্চার করিয়াছেন, সমালোচক তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রূপকার নন্দলালের কারিগরীর বিশেষত্ব বেঙ্কটাচলম্ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"His greatest characteristic feature, as an artist, is the dynamic vitality of his lines. In this he is the nearest to the Ajantan masters ; in fact he is the most Ajantan among modern Indian painters. He has been deeply influenced by this art of ancient India. We see it in every detail of Nandalal's art, Not that he has no originality ; he has that in abundance. In fact, it is given to few artists to invest well-known themes with the charm and freshness of a new conception, and Nandalal has coined new types from the richness of his imagination and the inner vision of his soul.

Nandalal's special contribution to modern art is this recreation of the forgotten art-traditions of India. Nandalal is not a delicate colourist like Tagore or Venkatappa, but a master of lines, vigorous and virile. His lines always tend to move, sway, curve, ever suggesting motion. Nandalal is also a great illustrator of books ; Rabindranath, the poet, owes much to him for illustratihg his songs and poems in a delicate and sensitive way.

নন্দলালের অনেকগুলি ছবির উল্লেখ ও প্রশংসা দক্ষিণ ভারতের এই লেখকের সমালোচনায় দৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে

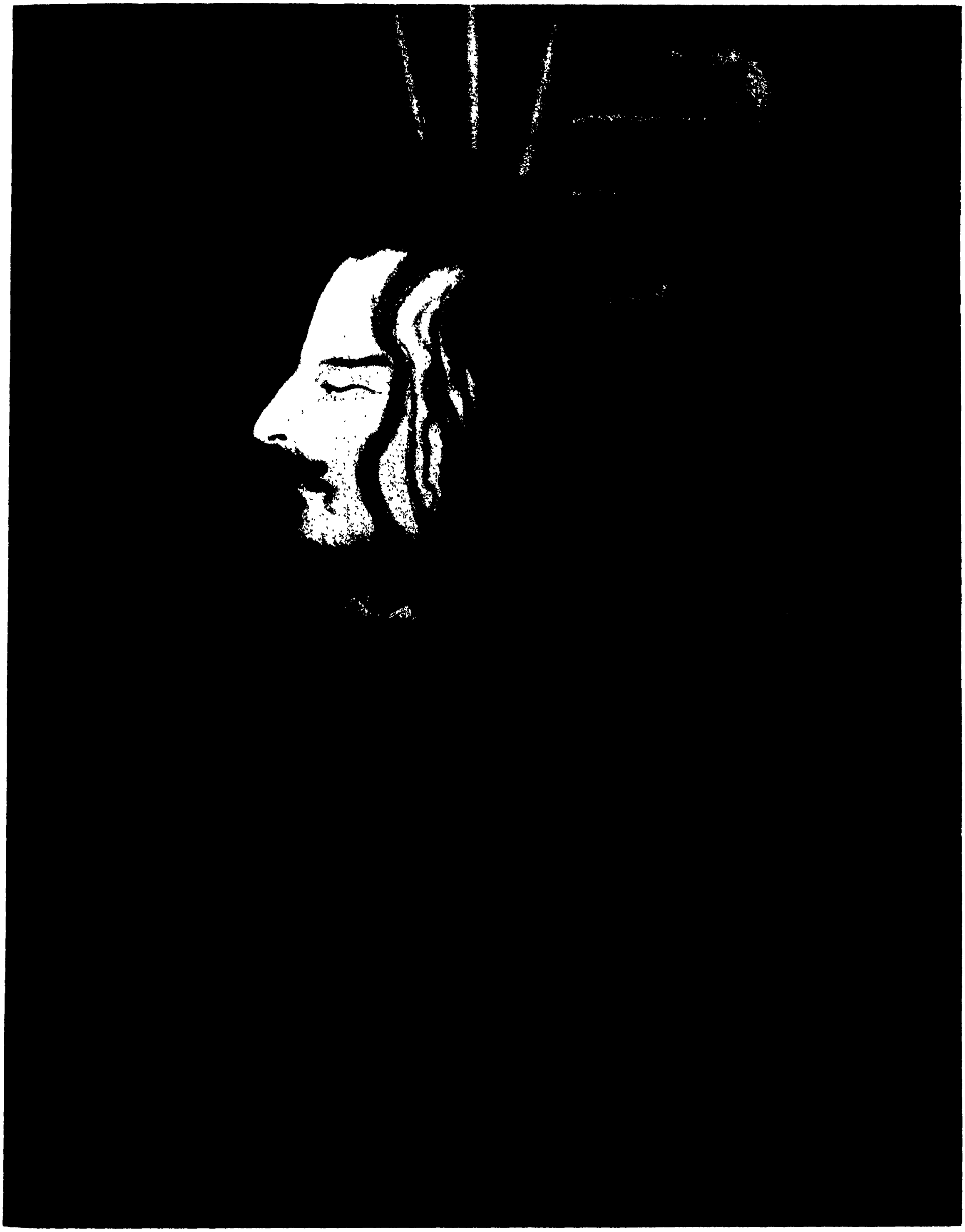
His great masterpiece, "Shiva Mourning over Parvati," is a work to be ranked with the best painting ever done by any master under any clime.

Nandalal is unapproachable in work of this kind ; he is a master-mind and the master-artist, But he has another side to his nature, unsuspected by many. His child-like heart ever keeps him in playful moods, and at times, mischievous ; and paintings, sketches and drawings done in that mood make an irresistible appeal.

He is a dearly loved man, both as an artist and a teacher. May he be spared long for India!

ইংরেজী বাক্যগুলির সরল ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাংলায় করা দুঃসাধ্য বলিয়া তাহার চেষ্টা করিলাম না।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিব

শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩৫

৪র্থ সংখ্যা

শেষের কবিতা

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বল্লে, "কাল কল্‌কাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করচে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।"

"আত্মীয়স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব?"

"খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের? তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে বদল আজ আমার হোলো এ কি জাত বদল, এ যে যুগ বদল, তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেচেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।"

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জ্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েচে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দী থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েচে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েচে অস্তসূর্য্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়ালো। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্দ্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্চে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্ম্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্ত্যজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে

অন্ধকার হোলো ঘন. সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বল্‌লে, "চলো এবার।" কেমন তার মনে হোলো এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বল্‌লে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধ'রে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চল্‌ল।

বল্‌লে, "কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তার আগে আর দেখা করতে আস্‌ব না।"

"কেন আস্‌বে না?"

"আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে বয়ে স্বর্গ।"

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চল্‌ল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না শুরু হয়ে আছে। মনে হোলো জীবনে কোনো দিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভ দৃষ্টি হোলো, এর পরে আর কি বাসর ঘর আছে? রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনি সেই প্রণামটি করে, বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেচ। কিন্তু সে আর হোলো না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বল্‌লে, "বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তাহলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।"

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে :—

"তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্ত্তের দৈন্য রাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব্ব হাসি,
নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি,
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

"বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এলো? তোমার এ কবিতা এখনি ফিরিয়ে নাও।"

"ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবী করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না—এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?"

"কিন্তু আমি জান্‌তে চাই এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়?"

"রবিঠাকুরের।"

"তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখিনি।"

"বইয়ে বেরয় নি।"

"তবে পেলে কী করে ?"

"একটি ছেলে ছিলো, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এদিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস ! সময় পেলেই সে যেত রবিঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।"

"আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দি"

"সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।"

"তাকে দয়া করেচ ?"

"করবার অবকাশ হোলোনা, মনে মনে প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন"

"যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারচি এটা সেই হতভাগারই মনের কথা"

"হাঁ, তারই কথা বই কি"

"তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল ?"

"কেমন করে বল্‌ব ? ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর এক টুক্‌রো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়চে ঠিক বল্‌তে পারি নে :—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রু জল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ বন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদ শত দল।"

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল ? ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়—কিন্তু কেমন একটা ভয় আসচে মনে। বলো, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।"

"একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল, তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতা দুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবিঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্চি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।"

"সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই ?"

"কেমন করে বল্‌ব ? কিন্তু এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েচি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।"

"বন্যা, রবিঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো

লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।”

“দেখ মিতা, মেয়েদের ভালো লাগা তার আদরের জিনিষকে আপন অন্দর মহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।”

“তাহলে আমারো আশা আছে, বন্যা। আমার বাজারদরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।”

“আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথশেষের কবিতাটা শুনে নিই।”

‘রাগ কোরোনা, বন্যা, আমি কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।”

“রাগ করব কেন?”

“আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেচি, তার ষ্টাইল্—”

“তার কথা তোমার কাছে বারবারই শুনতে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।”

“সর্ব্বনাশ! তার বই! সে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপ্‌তে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—”

“ভয় কোরোনা, মিতা, তুমি তাকে যে-ভাবে বোঝো আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেব এমন ভরসা আমার আছে। আমারি জিৎ থাকবে।”

“কেন?”

“আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোট ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেল্‌ফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।”

“আর বল্‌তে ইচ্ছে করচে না। মাঝখানে বড্‌ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।”

কিচ্ছু খারাপ হয়নি। হাওয়া ঠিক আছে।”

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল :—

“সুন্দরী তুমি শুকতারা
 সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্ব্বরী যবে হবে সারা
 দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের পরে
আধেক আলোক রেখা রন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হলো ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমতে ঘুমতে গুমরে উঠ্‌ছে! কী আইডিয়া! গ্র্যাণ্ড!

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে,
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ!

কিন্তু এমন হাল্কা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড্ড বেশী; যে-নদীর জল মরেচে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বল্‌চে:—

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ? ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ও পারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুন্‌ল:—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে বাণী হোলো হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ হাতে করে এলো বলে:—

নিশীথের তল হতে তুলি'
লহ তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,'
আলোকে তাহারে কর ধন্য।

যেখানে সুপ্তি হোলো লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধোজাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকাল বেলা চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাইনে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যূষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে, তোমার ঐ রবিঠাকুরের কবিতাটার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।"

"রাগ করো কেন, মিতা? রবিঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না এ কথা বারবার ব'লে লাভ কী?"

"তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—"

"ওকথা বোলো না, মিতা। আমার ভালো লাগা আমারি, তাতে যদি আর কারো সঙ্গে আমার মিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয় সেটাতে কি আমার দোষ? না হয় কথা রইল, তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তাহলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।"

"কথাটা অন্যায় হোলো যে! পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে এই জন্যেই তো বিবাহ।"

"রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।"

"ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধেবেলার সুর বিগড়ে গেল।"

"একটুও না। যা কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে-সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।"

"আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ বাড়ির বুলডগের মতো—ধুতির কোঁচাটা দুলচে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোনটা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তক্‌মা দেখলে ল্যাজ নাড়ে।"

"তা মানতেই হবে। পক্ষপাত জিনিষটা স্বাভাবিক জিনিষ নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাসে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কানমলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে! সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাক্‌গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জ্জমায়।"

"না না, মিতা, তোমার ইংরেজি থাক্, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্ত্তীর হওয়াই চাই! আর কারো নয়।"

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে, "জয় নিবারণ চক্রবর্ত্তীর! এতদিনে সে হোলো অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।"

"তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাক্‌বে?"

"না থাকে তো তাকে কানমলে বিদায় করে দেব।"

"আচ্ছা কানমলার কথা পরে স্থির করব, এখন শুনিয়ে দাও।"—

অমিত আবৃত্তি করতে লাগ্‌ল :—

কত ধৈর্য্য ধরি'
ছিলে কাছে দিবস শর্ব্বরী।
তব পদ-অঙ্কন গুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে!
আজ যবে
দূরে যেতে হবে—
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয় গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠেনি জ্বলি',
শূন্যে গেছে চলি'
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টীকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।
এবার তোমার আগমন
হোম হুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিন শেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহ ভরে
তোমার ঐশ্বর্য্য মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিও আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।

১৩

আশঙ্কা

সকাল বেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল শিলঙ্ থেকে যাবার আগে আজ সকাল বেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হোলো। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে জায়গাটা থেকে চ'লে এল য়ুক্যালিপটাস্-তলায়। হাতে দুই একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা, কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলি বল্‌চে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হ'য়ে গেল। আজ সকালে এক একবার মেঘ-রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্চে। মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, অমিত চির-পলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে কখন্ সে গল্প সুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেছে চ'লে। লাবণ্য তাই ভাব্‌ছিল ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়, অকাল অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এমন সময় বেলা তখন নটা, অমিত দুমদাম শব্দে ঘরে ঢুকেই মাসিমা মাসিমা করে' ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে তাঁর ঘরকে ভ'রে রেখেছিল। সে চ'লে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকাল বেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়চে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডাকেন নি, বুঝেছিলেন আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, কোলের থেকে বই গেল প'ড়ে, জান্‌তেও পার্‌লে না। এ দিকে যোগমায়া ভাঁড়ারঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, "কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প না কি ?"

"ভূমিকম্পই তো। জিনিষপত্র রওনা ক'রে দিয়েচি ; গাড়ি ঠিক ; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা। সেখানে এক টেলিগ্রাম।"

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর সব ভালো ত?"

লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুলমুখে বললে, "আজই সন্ধেবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তার দাদা নরেন।"

"তা ভাবনা কিসের, বাছা? শুনেচি ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম ক'রে জায়গা হবে না?"

"সেজন্যে ভাবনা নেই, মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ্ ক'রে হোটেলে জায়গা ঠিক করেচে।"

"আর যাই হোক্ বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের ক্ষ্যাপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরই।"

"না মাসি, আমার প্যারাডাইস্ লস্ট্। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতি-পরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতি-সভ্য কামরায়।"

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসেনি যে, অমিতর যে-সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্ত্তেই সেটা বুঝ্তে পার্লে। অমিত যে আজ কলকাতায় চ'লে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্ত্তি ছিল না। কিন্তু এই যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হলো এইটেতেই লাবণ্য বুঝ্লে যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুল্‌ছিল সেটা কোনদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।"

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বল্লে, "আমি হোটেলেই যাই, আর জাহান্নমেই যাই কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।"

অমিত বুঝেচে সহর থেকে আস্‌চে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে মনে নানা প্ল্যান করচে যা'তে সিসির দল এখানে না আস্‌তে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আস্‌ছিল যোগমায়ার বাড়ীর ঠিকানায়, তখন ভাবেনি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘট্‌তে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাক্‌তে চায় না, এমন কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশী উদ্বেগ যোগমায়ার কাছে অসঙ্গত ঠেকেছিল; লাবণ্যও ভাব্‌লে অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হ'য়ে দাঁড়াল।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?"

লাবণ্য একটু যেন কঠিন ক'রে বল্‌লে, 'না, সময় নেই।"

যোগমায়া ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন "যাওনা, মা, বেড়িয়ে এসো গে।"

লাবণ্য বল্‌লে, "কর্ত্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোয় বড়ো অবহেলা হয়েচে। খুবই অন্যায় করেচি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।" ব'লে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত ক'রে রইল।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত; পীড়াপীড়ি কর্‌তে সাহস কর্‌লেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বল্‌লে, "আমিও চল্‌লুম কর্ত্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক ক'রে রাখা চাই।"

এই ব'লে চ'লে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। বল্‌লে, "বন্যা, ঐ চেয়ে

দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্চে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েচি। বাড়ির মালেক অবাক, নিশ্চয় ভেবেচে ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার ক'রে থাক্‌ব। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েচে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটীরের ঐশ্বর্য্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাক্‌বে।"

লাবণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়্‌ল। বল্‌লে, "আর কারো কথা অত ক'রে তুমি ভাব কেন? না হয় আর সবাই জান্‌তে পার্‌লে। ঠিকমতো জান্‌তে পারাই তো চাই, তা হ'লে কেউ অমর্য্যাদা কর্‌তে সাহস করে না।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বল্‌লে, "বন্যা, ঠিক ক'রে রেখেচি, বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাক্‌ব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।"

"ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ, মিতা। আবার একদিন যদি ঢুক্‌তে চাও দেখ্‌বে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্য্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বলো নি, সেটা হচ্চে ত্যাগের।"

"বন্যা, ওটা তোমাদের রবিঠাকুরের কথা। সে লিখেচে, সাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসেনি যে, আমরা তৈরি করি, তৈরি জিনিষকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন্‌। একটা অনাসৃষ্টি ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো, সৃষ্টি কর্‌লেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই ব'লে ঐ ছেড়ে যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে সাজাহান মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেচেই, ওরা কি একজন মাত্র? সেই জন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পার্‌ল না। নিবারণ চক্রবর্ত্তী বাসর ঘরের উপর একটা কবিতা লিখেচে,—সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্‌ট্‌ কার্ডে লেখা :—

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হ'য়ে প্রভাতের রথচক্র রবে।
হায়রে বাসর ঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ঙ্কর।
তবু সে যতই ভাঙে চোরে,
মালা-বদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন ক'রে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু না হয় নীরব।

কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি' তব শয্যাতল ?
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার পানে।
হে বাসর ঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর ॥

রবিঠাকুর কেবল চ'লে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেবো, দরজা খুল্‌বে না ?"

"মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবচ প্রথম দিন থেকেই আমি জান্‌তে পারিনি যে, তুমিই নিবারণ চক্রবর্ত্তী ? কিন্তু তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনি আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি কর্‌তে সুরু কোরো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা কোরো।"

অমিত আজ নানা বাজে কথা ব'লে ভিতরের কোন্ একটা উদ্বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধেবেলায় বেখাপ হয়নি, আজ সকাল বেলায় তার সুর কেটে যাচ্চে। কিন্তু সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগ্‌ল না। একটু নীরসভাবে বল্‌লে, "তা হ'লে যাই, বিশ্বজগতে আমারো কাজ আছে, আপাতত সে হচ্চে হোটেল পরিদর্শন। ওদিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্ত্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোলো বুঝি।"

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধ'রে বল্‌লে, "দেখো, মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা কর্‌তে পারো। যদি একদিন চ'লে যাবার সময় আসে, তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ ক'রে চ'লে যেয়ো না।" এই ব'লে চোখের জল ঢাক্‌বার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল য়ুক্যালিপ্‌টাস্ তলায়। দেখ্‌লে সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধর্‌লে। জীবনের ধারা চল্‌তে চল্‌তে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সবচেয়ে সকরুণ। তার পরে দেখ্‌লে ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবিঠাকুরের বলাকা। তার নীচের পাতাটা ভিজে গেচে। একবার ভাবলে ফিরিয়ে দিয়ে আসিগে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেলে যাব-যাব কর্‌লে, তাও গেল না ; ব'সে পড়্‌ল গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব ক'রে মেজে দিয়েচে। ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ পাচ্চে চারদিকের ছবিটা ; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুদে দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেক্‌ল। আস্তে আস্তে বেলা চ'লে যাচ্চে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনি খুব কষে কাজে লাগ্‌বে ব'লে লাবণ্যের পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছ-

তলায় বসে', আর থাক্‌তে পার্‌লে না, বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছল ছলিয়ে। কাছে এসে বল্‌লে, "মিতা, তুমি কী ভাবচ ?"

"এতদিন যা ভাব্‌ছিলুম একেবারে তার উল্‌টো।"

"মাঝে মাঝে মনটাকে উল্‌টিয়ে না দেখ্‌লে তুমি ভালো থাকো না। তা তোমার উল্‌টো ভাবনাটা কী রকম শুনি।"

তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম,—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগ্‌চে সকাল বেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি,—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার ফলা-ওয়ালা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চল্‌বে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক্‌, বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌লে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান্‌ লোক, পথ কেবল দুজনের।"

"ডায়মণ্ড্‌ হারবারের বাগানটা তো গেছেই, তারপরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর বেচারাও গেল। তা যাক্‌গে। কিন্তু চল্‌বার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কী রকম কর্‌বে ? দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুক্‌বে, আর আমি আর একটাতে ?"

"তার দরকার হয় না বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে থাকাটাই বুড়োমি।"

"হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হোলো, মিতা ?"

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেচ বোধ হয়, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদওয়ালা। ভারত ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান কর্‌বে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েচে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার কর্‌তে চায়, আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বল্‌লে, "শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম্‌-এ দিয়েছি। তার সব খবরটা শুন্‌তে ইচ্ছে করে।"

"এক সময়ে সে ক্ষেপেছিল আফগানিস্থানের প্রাচীন সহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল, সেইটেকে আয়ত্ত কর্‌বে। ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তারো পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুষ্‌তু পড়লে, পাঠানী কায়দা কানুন অভ্যেস কর্‌লে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখ্‌তে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধর্‌লে সেখানে ফরাসী পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেচেন তাঁদের কাছে পরিচয় পত্র দিতে, ফ্রান্সে থাক্‌তে তাঁদের কারো কারো কাছে আমি পড়েচি। দিলেম পত্র কিন্তু ভারত সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তারপর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলি পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েচে হিমালয়ের পূর্ব্ব প্রান্তটাতেও সন্ধান কর্‌বে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখ্‌তে চায়। ঐ পথ-ক্ষ্যাপাটার কথা মনে করে আমারো মন উদাস হ'য়ে যায়। পুথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোক খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েচে পথের পুথি পড়্‌তে, মানব বিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জানো ?"

"কী, বলো।"

"প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকন-ধরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েচে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানিনে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হোলো প্রায় দুপুর, জানালার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল, একটা ফুলন্ত জারুল গাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোন একজনের কথা বল্‌তে গেল, নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বল্‌লেনা, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পার্‌লুম, ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চল্‌তে চল্‌তে ও পায়ে পায়ে ক্ষইয়ে দিতে চায়।"

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদতত্ত্বের ঝোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগ্‌ল, ঘাসের মধ্যে সাদায় হল্‌দেয় মেশানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুণে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বল্‌লে "জানো, বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েচ।"

"কেমন করে?"

"আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হোলো তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দুমাস ধরে মনে মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধূ, ঘরে এসো। তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেল্‌লে, বল্‌লে, এখানে জায়গা হবে না, বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদী গমন হবে।"

বনফুলের বটানি আর চল্‌ল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বল্‌লে "মিতা, আর নয়, সময় নেই।"

ক্রমশঃ

গীতার বিভূতি-তত্ত্ব

মহেশচন্দ্র ঘোষ

পরমাত্মার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ, তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্যক্‌রূপে জানিতে হইলে বিভূতি-তত্ত্বেরও আলোচনা করা আবশ্যক। অদ্য এই বিষয়ই আলোচিত হইবে।

'বিভূতি' শব্দের অর্থ বৈভব, ঐশ্বর্য্য, আবির্ভাব, বিকাশ, বিশেষরূপে অভিব্যক্ত ভাব, ইত্যাদি। গীতাকার প্রধানতঃ চারিটি স্থলে এই তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে

সপ্তম অধ্যায়ের চারিটি শ্লোক (৭।৮—১১) বিভূতি বিষয়ক। এই কয়েকটি শ্লোক বুঝিতে হইলে ইহার পূর্ব্বের চারিটী শ্লোকের (৭।৪—৭) বিষয়ও জানা আবশ্যক। এই শ্লোক কয়েকটীর বক্তব্য বিষয় এই :—

৪র্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের প্রকৃতি আট প্রকার, যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার।

৫ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ঐ আটটি অপরা প্রকৃতি। ভগবানের জীবভূতা আর একটি প্রকৃতি আছে যাহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, এই দুইটি প্রকৃতি হইতে সর্ব্বভূত উৎপন্ন হইয়াছে। (এই দুইটি ভগবানেরই প্রকৃতি সুতরাং) ভগবান্‌ই জগতের প্রভব ও প্রলয়।

৭ম শ্লোকের শেষ দুই চরণে ভগবান বলিতেছেন :—মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে, তেমনি এই সমুদায় আমাতে গ্রথিত।"

এই প্রকার উপমা মহাভারতের অপর স্থলেও পাওয়া যায় (বন ৩০।২৬ ; শান্তি ৪৭।২১ ; ২০৬।১ ইত্যাদি)

ইহার পরের চারিটি শ্লোক বিভূতি বিষয়ক। শ্লোক কয়েকটির অনুবাদ এই:—

"হে কৌন্তেয়! আমি জলে রস, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা, সমুদায় বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ; নরগণের মধ্যে পৌরুষ। ৭।৮

আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যে তেজঃ, সর্ব্বভূতে জীবন, এবং তপস্বিগণে তপস্যা। ৭।৯

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও; আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃ। ৭।১০

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্‌গণের কামরাগ-বিবর্জ্জিত বল, এবং ভূতগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম। ৭।১১"

এই চারিটি বিভূতি-শ্লোক। ইহার পরেই এই প্রকার আছে :—

"যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক ভাব সে সমুদায় আমা হইতেই (জাত) এইরূপ জানিবে। সে সকলে আমি নাই, কিন্তু তাহারা আমাতে। ৭।১২"

মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বিভূতি-শ্লোকসমূহ দ্বারা পরিণাম-বাদই প্রতিপন্ন হয়; অর্থাৎ বলিতে হয় ভগবান্‌ই রস, প্রভা, জীবন প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বের চারিটি শ্লোক এবং পরের শ্লোকে বিরুদ্ধভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, এ সমুদায় অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ জড়প্রকৃতি। এ সমুদায় অবশ্যই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা নহে। সপ্তম শ্লোকে মণি ও সূত্রের উপমা দ্বারা এ সমুদায়কে পরমাত্মা হইতে পৃথক করা হইয়াছে। মণি এবং সূত্র এক নহে; তেমনি জগৎ ও পরমাত্মাও এক নহে। ইহার পরেই বিভূতি-শ্লোক সমূহ। এই শ্লোকসমূহের পরেই বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা জগতে (অবস্থিত) নহেন, কিন্তু জগৎ পরমাত্মাতে (৭।১২)।

বিভূতি-শ্লোকসমূহের পূর্ব্বেও দ্বৈতবাদ এবং পরেও দ্বৈতবাদ। কিন্তু বিভূতি-শ্লোকসমূহের মুখ্য ভাব অদ্বৈতবাদ। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? তিনভাবে ইহার মীমাংসা করা সম্ভব।

(১) বিভূতি-বিষয়ক অংশের গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরমাত্মার অচিন্ত্য প্রভাবে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। পরমাত্মাকে অবলম্বন না করিলে প্রকৃতি কিছুই করিতে পারে না—প্রকৃতি যাহা করে, তাহা ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াই। এই অর্থে বলা যাইতে পারে যে, ভগবানই জলে রস, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা ইত্যাদি।

(২) কেহ কেহ বলেন যে, ষষ্ঠ শ্লোকের পরই দ্বাদশ শ্লোকের স্থান। ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—

'পরা ও অপরা'—এই দুই প্রকৃতি হইতে সর্ব্বভূত উৎপন্ন হইয়াছে। (আমার প্রভাবেই এই সমুদায় সম্ভব হয়, সুতরাং) "আমিই সমুদায় জগতের প্রভব ও প্রলয়" ৭।৬।

এই কথাই দ্বাদশ শ্লোকের প্রথম তিন চরণে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব—সে সমুদায় আমা হইতেই (উৎপন্ন) এইরূপ জানিবে।"

ইহাতে শেষে বা লোকের এই ভ্রান্তি হয় যে, পরমাত্মা হইতেই বুঝি প্রত্যক্ষভাবে এই সমুদায়ের উৎপত্তি হয়, সেইজন্য চতুর্থ চরণে বলা হইয়াছে :—

"সে সকলে আমি নহি; কিন্তু তাহারা আমাতে।"

ষষ্ঠ শ্লোকের সহিত দ্বাদশ শ্লোকের সংযোগ করিলে অর্থ অতি সরল হয়। কিন্তু যদি 'মণি-সূত্র' শ্লোক এবং বিভূতি-বিষয়ক শ্লোকসমূহ এতদুভয়ের অন্তরে নিবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ভাবের ব্যত্যয় এবং অর্থের অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। সুতরাং সপ্তম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত চারিটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্তই বলা উচিত।

(৩) পূর্ব্বোক্ত দুইটি ব্যাখ্যা যদি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে গীতায় আত্ম-বিরোধী মত আছে।

নবম অধ্যায়ে

নবম অধ্যায়ে বিভূতি-বিষয়ক শ্লোকসমূহ এই :—

"আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমিই ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম। ৯।১৬

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা এবং পিতামহ। আমিই বেদ্য, পবিত্র ওঁকার, ঋক্, সাম এবং যজুঃ; গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, স্থান (আধার), নিধান, (অথচ) অব্যয়। ৯।১৭।১৮

হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ প্রদান করি, আমিই জলবর্ষণ করি, জল আকর্ষণ করি; আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ এবং অসৎ। ৯।১৯"

মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, পরমাত্মাই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, ঘৃত অগ্নি ও হোমরূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহাতে পরমাত্মা ও প্রকৃতি এতদুভয়ের একত্ব স্বীকার করা হয়; কিন্তু গীতার মতে ইহারা পৃথক্। দ্বিতীয় বক্তব্য এই, পরমাত্মা অব্যয় ও অবিকারী কিন্তু উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে বলা হয় যে পরমেশ্বরের বিকার আছে। উদ্ধৃত অংশে আরও বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা উত্তাপ প্রদান করেন, জলবর্ষণ করেন বা আকর্ষণ করেন ইত্যাদি। ইহাতে নিষ্ক্রিয় পরমাত্মায় কর্ত্তৃত্ব আরোপ করা হয়। সুতরাং এস্থলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কার্য্য করে প্রকৃতিই; কিন্তু প্রকৃতি পরমাত্মার অধীন। এই জন্য প্রকৃতির কার্য্যকে পরমাত্মায় আরোপ করা হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে

দশম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বিভূতি-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে বিভূতি-বর্ণনার একটি বিশেষত্ব আছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি কি ভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে হইবে। ইহারই উত্তরে ভগবান্ বিভূতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে ভগবানের উক্তি এই :—

"হে গুড়াকেশ! আমি সকল ভূতের অন্তঃকরণে অবস্থিত আত্মা এবং আমিই ভূত-সমূহের আদি, অন্ত ও মধ্য। ১০।২০

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে অংশুমান রবি, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা। ১০।২১

ইহার পরে আরও আঠারটি শ্লোকে এইভাবেই বিভূতি-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই—তিনি বেদের মধ্যে সামবেদ, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, গিরিসমূহের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, নাগগণের মধ্যে অনন্ত, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, সমাস-সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত, কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য ইত্যাদি।

জগতের বস্তু-সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রত্যেক শ্রেণীতেই বস্তুর সংখ্যা হইবে অসংখ্য। গীতাকার বলেন প্রত্যেক শ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা, তাহাকেই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই ভগবানের প্রভাবে উদ্ভূত এবং ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান। এক অর্থে সমুদায় বস্তুই ভগবানের মহিমা। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ, কোন বস্তু বা অশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ বস্তু অবলম্বন করিয়া ভগবানের মহিমা চিন্তা করা যত সহজ, সাধারণ বস্তুর সাহায্যে চিন্তা করা তত সহজ নহে। এইজন্য গীতাকার উপদেশ দিয়াছেন —জগতে যাহা যাহা বিভূতিযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ, সেই সেই বস্তুকেই ঈশ্বর বোধে চিন্তা করিতে হইবে। আবার এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে জগতের সমুদায় বিভূতি দ্বারাও ভগবান্‌কে সম্যক্‌রূপে অনুভব করা যায় না। এ সমুদায় তাঁহার তেজের অংশ মাত্র (১০।৪১) এবং ভগবান্ একাংশ দ্বারা এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

ইহাই দশম অধ্যায়ের বিভূতি-তত্ত্ব। সত্য সত্যই যে ভগবান্ উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, অশ্বত্থ, বাসুকি, সুমেরু দ্বন্দ্ব সমাসাদির আকার ধারণ করিয়াছেন) তাহা নহে। তুচ্ছ বস্তু অপেক্ষা মহৎ বস্তুই তাহার মহিমা অধিকতর

ঘোষণা করে, এইজন্য মহৎ বস্তু-সমূহকেই পরমাত্মরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং বিভূতি-তত্ত্ব পরিণাম-বাদের কথা নহে—ইহা পরমাত্মাকে চিন্তা করিবার একটি উপায়মাত্র।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বিভূতি-বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"আদিত্যগত যে তেজঃ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, আর চন্দ্রমাতে যে তেজঃ এবং অগ্নিতে যে তেজঃ সে তেজঃ আমার বলিয়াই জানিবে। ১৫।১২

আমি বল দ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূতসমূহকে ধারণ করি; আর রসাত্মক সোম হইয়া সমুদায় ওষধিগণকে পুষ্ট করি। ১৫।১৩

আমি বৈশ্বানর (অর্থাৎ জঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ু সমাযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি। ১৫।১৪

আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান এবং (তাহাদিগের) বিলোপ। সমুদায় বেদ দ্বারা আমিই বেদ্য, আমি বেদান্তকৃৎ ও বেদবিৎ। ১৫।১৫

সপ্তম অধ্যায়ের বিভূতি-বিষয়ে যে তিনটি মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে এখানেও সেই তিনটি মন্তব্য প্রাকাশ করা যাইতে পারে।

(১) গৌণ অর্থ গ্রহণ করাই প্রশস্ত। পরমাত্মার প্রভাবে প্রকৃতি কার্য্য করে; এই অর্থ বুঝাইবার জন্য পরমাত্মাতেই প্রকৃতির কর্তৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(২) এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রকার বলিবার প্রবল যুক্তি রহিয়াছে। এই চারিটি শ্লোকের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের কোন সম্বন্ধ নাই বরং কিছু বিরুদ্ধ ভাবও রহিয়াছে। একাদশ শ্লোক এই :—

"(ধ্যানাদিতে) যত্নশীল যোগিগণ আত্মাকে শরীর মধ্যে অবস্থিত দেখেন; কিন্তু যত্নশীল হইলেও অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ এবং মন্দমতিগণ ইহাকে দেখে না।"

ইহার পরই যে গীতাকার বলিবেন যে, আদিত্যগত তেজঃ এবং চন্দ্রমাদির তেজঃ ভগবানেরই, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

(৩) তৃতীয় মত এই যে, গীতায় আত্ম-বিরোধ রহিয়াছে। এইস্থলে পরমাত্মার কর্তৃত্ব ও বিকার স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু অন্যত্র ইহার বিরোধী মত দৃষ্ট হয়।

উপসংহার

গীতার চারিটি স্থলে বিশেষভাবে বিভূতি-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে দুইটি স্থল প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। কিন্তু দশম অধ্যায়ের বিভূতি-তত্ত্ব বিষয়ে এ প্রকার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে ইহা দ্বারা পরিণাম-বাদ ও ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতা প্রমাণিত হয়, কিন্তু গীতার ঈশ্বর অব্যয়, অবিকারী ও অকর্ত্তা। সুতরাং বিভূতি-বিষয়ক অংশের গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।

কিন্তু সাধকগণ অনেকেই এই গৌণ ভাবকে মুখ্য ভাব রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থ-গ্রহণে ভুল হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। গীতার পরমেশ্বর অব্যক্ত, নির্গুণ ও বিশ্বাতীত। কিন্তু মানুষ চায় নিত্য কর্ম্মশীল মঙ্গলময় বিধাতা। মানুষ প্রিয়রূপে এবং প্রিয়তমরূপে উপাসনা করিতে পারে তাঁহাকেই, যিনি মুখ্য অর্থে এবং প্রত্যক্ষভাবে পিতা মাতা, ধাতা, ভর্ত্তা, সখা ও সুহৃৎ। কিন্তু গীতাকারের মতে অব্যক্তাদি ভাবই পরমাত্মার পারমার্থিক ভাব; বিভূতি গৌণ ভাব। মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে যখন পরমাত্মাকে প্রিয়তমরূপে উপাসনা করা যায় না, তখন মানুষকে বাধ্য হইয়াই গৌণ ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮

অণিমাকে বিবাহ করিয়া প্রকাশ অমরনাথের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থায় মন দিয়াছিল। বিস্তর টাকা-কড়ি লোকের কাছে পড়িয়া। সে-সমস্ত সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার হইলেও বুদ্ধি ও কৌশল খাটাইয়া অনেকস্থলেই সে কৃতকার্য্য হইল। টাকা-কড়ি করুণার হাতে বুঝাইয়া দিয়া একদিন সে কহিল,—দিদি, তোমাদের কাজ ত প্রায় শেষ ক'রে আনলুম, এখন আমার নিজের যে কিছু কাজ করা দরকার।

করুণা জিজ্ঞাসা করিল,—কি কাজ করবে ভাই ?

প্রকাশ কহিল—মুলুকচাঁদের কাপড়ের কারখানাটা শুনেচি সস্তাদরে বিক্রী হচ্চে। সওদাগরি আপিসে এত দিন কাজ করেচি—আমার স্থিরবিশ্বাস, আমি কল চালাতে পারবো। কিন্তু আমার ত টাকা পয়সা নেই যদি তোমরা আমায় কিছু টাকা ধার দাও—

করুণা কহিল,—বিলক্ষণ! ধার কিসের ভাই? এ টাকা যেমন আমাদের তেমনি যে তোমারও।

প্রকাশ ঘাড় নাড়িল,—না দিদি, টাকা তোমাদের। আমি শুধু ধার বলে নিতে রাজি আছি। লাভের টাকা থেকে বছর বছর ধার শোধ দিব।

কারখানাটি বাড়ীর নিকট। বাহিরের বারান্দা হইতে ইহার অত্যুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দেখা যাইত। মাঝখানে ইংরেজী হরফ 'টি'র আকারে লম্বা দুইটি দালান, লাল ইঁটে গাঁথা দেয়াল, উপরে ঢেউ-খেলান টিনের ছাদ অর্দ্ধ চক্রাকার চাঁদের মত। পিছনে একটি স্থূল চিম্‌নি আকাশ ভেদিয়া উঠিয়াছে।

বছর দুই পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার অসচ্চরিত্র পুত্র মুলুকচাঁদের হাতে পড়িয়া কলটির অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একে ব্যবস্থার অভাব, তত্ত্বাবধানের ত্রুটি, তাহার উপর কাপড়ের মূল্য হঠাৎ কমিয়া গিয়া কারবারে প্রভূত লোকসান দাঁড়াইল, এবং অল্পকাল মধ্যে ঋণজালে মুলুকচাঁদ এমনি জড়িত হইয়া পড়িল যে, অব্যাহতি অসম্ভব বুঝিয়া, দেনা মিটাইয়া যাহা কিছু পায় তাহাই হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে কারখানাটি সে বেচিবার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু কাপড়ের বাজার তখন মন্দা—ক্রেতার সংখ্যা অধিক ছিল না। তাই প্রকাশ অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্য দিয়া কারখানা খরিদ করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র সে রাজি হইল এবং দুইচার দিন মধ্যেই নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া দলিল রেজিষ্টারি করিয়া দিল।

পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ হইল। ভোর বেলা আবার বাঁশী ফুঁকিয়া উঠিল, কুলির দল আবার আসিয়া মাকু চালাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রকাশ আসিয়া মজুরদের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিত, মিষ্ট কথায় তাহাদের উৎসাহিত করিত এবং ইঞ্জিন দেখিয়া, গুদাম ঘুরিয়া পরিশেষে আপিস ঘরে বসিয়া হিসাব পরীক্ষা করিত। দেখিতে দেখিতে সময় কিরূপে কাটিয়া যাইত, প্রকাশ তাহা বুঝিতে পারিত না। মেঝে কাঁপাইয়া কলের চাকাগুলি ঘর্ঘর শব্দে ঘুরিত, ঝন্ ঝন্ করিয়া টিনের ছাদ প্রতিধ্বনি করিত, ইহাও যেন কোন প্রিয়বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ! প্রকাশ মুগ্ধ হইয়া যাইত।

একদিন অণিমা ও করুণাকে লইয়া সে কারখানা দেখাইয়া আনিল। ঐটা গুদাম—এইটা আপিস ঘর—ওই যে প্রাচীর, উহার বাহিরেও তাহার জমি—ঐস্থানটির সে উন্নতি করিবে, কুলিদের বস্তি বসাইবে—বস্তির ঘরগুলি হইবে স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন, কেননা, কুলিদের লইয়াই না কারখানা, তাহাদের বঞ্চিত করিলে চলিবে কেন? এইরূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকটি জিনিস দেখাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, চারিদিকের সকল বস্তুই যে তাহার, ভাবিতেও সে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতে

লাগিল। বস্তুতঃ তাহার প্রতিভা বাধাবন্ধহীন কর্ম্মের মধ্যে এখন যেমন স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল, এমন আর কখনো পায় নাই। জীবনের এত মূল্য, আগে তাহা কে জানিত? বর্ষার নদী যেমন কূল ছাপাইয়া উঠে, তেমনি চারিপাশের কঠোর নিষ্পেষণের নাগপাশগুলি একে একে যখন ছিন্ন হইয়া গেল, তখন তাহার নিশ্চিন্ত উদার হৃদয় মুক্ত আগ্রহে কর্ম্মের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার অধ্যবসায় দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল, অমায়িক ব্যবহারের গুণে সে সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিল। সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিয়া দিবসের কাজগুলি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাহার মন আনন্দে অধীর হইয়া পড়িত। এই স্বেচ্ছাবৃত কাজগুলি যে তাহার সকল আকাঙ্ক্ষার চরম পরিণতি—বিধাতা তাহাকে এই বিচিত্র কর্ম্মযোগের উপযোগী করিয়াই ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই যে কর্ম্মিষ্ঠ লোকটি সারাদিন পরিশ্রম করিতেছে, শ্রান্তি নাই অবসাদ নাই—দিবারাত্র অণিমা ভাবিত, কিরূপে তাহার চিত্তবিনোদন করিয়া ক্লান্তি দূর করিবে। ভালবাসিয়া ও ভালবাসা লাভ করিয়া তাহার অন্তর ফুলের মত বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং ফুলের মতই পূর্ণ আগ্রহে নিত্য নূতন বেশ-ভূষায় সাজিয়া আসিয়া সে স্বামীর মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে দেখা দিত। শয়নকক্ষে দেয়ালে সংলগ্ন বৃহৎ মুকুরের সামনে দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিতে দেখিতে সে পুলকিত হইয়া উঠিত এই যে অঙ্গের স্বাস্থ্য, ভ্রূর ভঙ্গিমা, অধরের অলক্তরাগ, কবরীর বন্ধন—ইহার কিছুই যে তাহার নিজের সম্পদ নহে, এ সব লইয়া সে কি করিবে? এ যে স্বামীর রত্ন-ভাণ্ডার—সে গচ্ছিত রাখিয়াছে শুধু তাহাকেই নিবেদন করিবে বলিয়া। নিশীথে শয়নের পূর্ব্বে ভূষণগুলি একটি একটি করিয়া সে যতক্ষণ খুলিয়া দেখিত, ততক্ষণ পিছনে দাঁড়াইয়া অলক্ষ্যে প্রকাশ তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে মোহিত হইয়া যাইত, তারপর কাছে গিয়া অণিমার ব্রীড়ানত মুখখানি চুম্বন করিয়া, শুভ্র শয্যার উপর তাহাকে বসাইত।

কাজ ও ভালবাসা—ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র আনন্দ। প্রকাশের দিনগুলি যেন হু হু করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সুখের জীবন, তবু মাঝে মাঝে একটা অস্বস্তি তাহার মন তোলপাড় করিয়া দিত—সে তাহা কোন মতে রোধ করিতে পারিত না। অণিমা ও নিজের ভিতর সে একটা মস্ত ব্যবধান অনুভব করিতেছিল। অনিমার নির্ভরশীল একান্ত বিশ্বাস প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে মনে করাইয়া দিত যে, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মতই সে ইহার ভালবাসা গ্রহণ করিতেছে। অভিনয় শেষে, শ্রদ্ধা টুটিয়া গেলে, আর কি অণিমা তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারিবে? তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তর এই প্রশ্নটির জবাব দিত—হোক অভিনয়। চিরটাকাল যদি এমনি কাটিয়া যায় তাহা কি এতই মন্দ? কিন্তু, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই একটা শঙ্কা, প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া মেঘের মত ঘনাইয়া আসিল। একদিন হয়ত সকলি প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কোথায় থাকিবে তখন এই মায়াজাল? সেদিন অণিমার বক্ষে যেরূপ দারুণ আঘাত বাজিয়া উঠিবে, তেমন ভয়ঙ্কর বোধ করি দুইটা গ্রহের সংঘর্ষও নহে। তাহার উদারতা, তাহার মহানুভবতা, এমন কি তাহার যে অসীম সাহসের গুণে সে কুলিদের রক্ষার জন্য বন্দুকের সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, এই সত্যকার প্রবৃত্তিগুলিও অণিমার কাছে লোক-দেখান ভড়ং বলিয়া মনে হইবে। সে আর যাহাই হোক, জগদীশ্বর জানেন, সে ভণ্ড নহে—এমন অভিযোগ তাহার পরম শত্রুও করিতে পারিবে না।

এইরূপ দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়ন করিবার একটি বিশেষ কারণও ঘটিয়াছিল। কেন বলা যায় না, প্রথম হইতেই যোগমায়া তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। বিবাহের পর প্রথামত বরকন্যা মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে আসিলে, উন্মাদিনী হাস্য করিয়া কহিয়াছিল,—বাড়ীর চারিধারে যে-সব ভৌতিক আত্মা ঘুরিতেছে, সে তাহাদের কথা শুনিয়াছে—এ বিবাহে মঙ্গল নাই, কাহারো নহে। পাগলের প্রলাপ!—কিন্তু প্রকাশের মনে হইয়াছিল, কোন দুর্জ্ঞেয় অন্ধ গহ্বর হইতে এই কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী বাহির হইয়া গেল। সেই দিন হইতে সে যোগমায়ার সম্মুখে আর কখন আসে

নাই—শাশুড়ীকে দেখিলে সে শঙ্কিত হইয়া উঠিত, মনে হইত যেন ইহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাহার অন্তর ভেদ করিয়া জীবনের গোপন রহস্যগুলি খুঁটিয়া বাহির করিতেছে।

একদিন কিন্তু বিপদ-ভেরী স্পষ্টই বাজিয়া উঠিয়াছিল। ছুটির দিন—বাহিরের ঘরে ইজিচেয়ারে শুইয়া প্রকাশ একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিল, চওড়া রাঙাপেড়ে একখানি শাড়ী পরিয়া এক মাথা সিঁদুর পরিয়া অপূর্ব্ব বেশে অণিমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঈষৎ হাসিয়া প্রকাশ কহিল,—বাঃ, চমৎকার মানিয়েচে, কিন্তু আজ হঠাৎ এমন খেয়াল হল যে?

অণিমাও হাসিল। বলিল, আজ্ঞে না মশাই, খেয়াল নয়। আজ যে সাবিত্রী-ব্রত, আমি তোমাকে প্রণাম করতে এসেচি।—বলিয়া পরম ভক্তিসহকারে গললগ্নী-কৃতবাসে সে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

প্রকাশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা সরিল না। অণিমা কহিল,—একবার ভিতরে এস দেখি—কাজ আছে।

—আবার কি কাজ?

—সে আছে। তোমায় আগে থেকে বলে ভড়কে দেবার দরকার নেই। চল শীগ্‌গির, পুরুতঠাকুর বসে আছেন।

—কি সর্ব্বনাশ! তুমি দেখ্‌চি রীতিমত একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেচ।

—ওলো, তোদের হলো—বলিতে বলিতে করুণা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

ঈষৎ বিরক্তির সহিত প্রকাশ কহিল,—দিদি, তুমি যে বল অণিমার সবেতেই বাড়াবাড়ি, সে কথা ঠিক। এ সব কি কাণ্ড আরম্ভ করেচে বল দেখি?

দিদি হাসিয়া কহিল,—এতদিনে বুঝ্‌লে ভাই? ওর যা ঝোঁক চাপ্‌বে তা ও করবেই।

প্রকাশ ভিতরে উঠিয়া আসিল। মিছামিছি গণ্ডগোল করিয়া লাভ কি? তার চেয়ে কাজটা শীঘ্র সারিয়া ফেলিতে পারিলেই আপদ চুকিয়া যায়। ঘরের মধ্যস্থলে একটি কার্পেটের আসন বিছান, একপার্শ্বে পূজার উপকরণ, সম্মুখে ছোট একটি পাথরের শিবলিঙ্গ ফুল বিল্বদলে আচ্ছাদিত। অপর পার্শ্বে রূপার রেকাবিতে রাশীকৃত ফলমূল পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। কম্বলের আসনে ফোঁটা-তিলক-কাটা একজন শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ সবেমাত্র শিব পূজা শেষ করিয়া বসিয়াছিল।

সে কহিল,—ওই আসনখানিতে বসুন। এই ধরুন গঙ্গোদক, প্রসাদী ফুল। মা আমার পতিব্রতা, সাক্ষাৎ সাবিত্রী। যজন-যাজনে এমন ভক্তিমতী স্ত্রী কারু ভাগ্যে ঘটে না।

গম্ভীর মুখে আসনখানির উপর বসিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—আর কি করতে হবে?

পুরোহিত কহিল,—কিছু না। আপনি শুধু চিত্ত সমাহিত করে পতিব্রতার পূজা গ্রহণ করুন। জানেন ত, পতির্গুরু স্ত্রীজাতিনাং—

ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা হাসির রোল শুনিয়া প্রকাশ চমকিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখিল, দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া যোগমায়া হাসিতেছেন।

পুরোহিত বলিতেছিল,—প্রণাম কর মা। স্বামী সাক্ষাৎ শিব।

আবার সেই হাসি!

কে যেন তাহার পৃষ্ঠের উপর ঘা-কতক চাবুক বসাইয়া দিয়াছে, ঠিক সেইভাবে প্রকাশ আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। এ যে শুধু পাগলিনীর একটা খেয়ালের হাসি তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের ভিতর সারাটিক্ষণ একটি দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিবামাত্র আত্মবিস্মৃত হইয়া, প্রহৃত ছাত্রের মত কম্পিত কলেবরে সে বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

অণিমার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—মাকে এখানে কে আসতে দিলে, দিদি?

শুষ্ক মুখে করুণা কহিল,—কি জানি, দেখি দিদিমা কোথা।

—এ তার কেমন ধারা আক্কেল, দিদি? এখানে ক্রিয়াকর্ম্ম হচ্চে তা কি সে জানে না।

সুরধুনী পাশের একটি ঘর ঝাঁট দিতেছিলেন। কথা শুনিয়া সেখানে আসিয়া কহিলেন,—আমি কি জানি বাছা, সে এখানে উঠে এসেচে?

করুণা বলিল,—মাকে ছেড়ে দিয়ে কি কাণ্ডই করে বসেচ বল দেখি? প্রকাশকে মা মোটেই দেখতে পারে না, তা ত জান। দেখলেই গাল দেয়, শাপ দেয়। শাশুড়ী ত! শাশুড়ী যদি অমন করে, জামায়ের মনে তা না লেগে পারে

ক্ষুব্ধস্বরে সুরধুনী কহিল,—চব্বিশ ঘণ্টা কেমন করেই বা চোখোচোখি রাখা যায়, বাছা। একটু এ-ঘর ও-ঘর করেচি ত সুট করে পালাবে। কতবার বলেচি করু, তীর্থ-টীর্থ দেখে কোন জায়গায় আমাদের পাঠিয়ে দে—ঠাকুর-দেবতা দেখে বেড়ালে ওর মন ভাল থাকবে। তা, সে কথা তোরা কানেও তুলবি না, খালি আমায় দুষবি—তুমি কিছু দেখ না। আমার হয়েচে মরণ সত্যি!—বলিয়া বাহিরে গিয়া তিনি মনের বিরক্তিটা ঝাঁটার উপর ঝাড়িয়া সবেগে হস্ত চালনা করিতে লাগিলেন।

সারাদিন প্রকাশ বাহিরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে বুঝিয়াছিল, তাহার আশঙ্কা অমূলক, মিথ্যা চাঞ্চল্য দেখাইয়া সে শুধু দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছে। এতদিন একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনে জাগিলেও তাহা লইয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে সে ভরসা করে নাই। সত্যই সে কি এমনি কিছু অপকর্ম্ম করিয়াছে যাহা তাহাকে নিজের কাছেও ঘাড় হেঁট করিয়া রাখিবে? বাহ্যতঃ লোকসমাজ তাহার কাজ গর্হিত সাব্যস্ত করিবে, তাহা সে জানে! কিন্তু তাহার অন্তরও কি সেই গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিয়া তাহাকেই গঞ্জনা দিবে, তাহার স্বপক্ষে দুটি কথাও বলিবে না? একদিন সে যখন আপন স্বভাবসিদ্ধ শক্তি চাপিয়া ধরিয়া নিষ্ফল জীবন বহিতেছিল, জগতের চক্ষে সে ছিল তখন নিষ্কলঙ্ক, আর আজ নিজের মঙ্গল পরের কল্যাণার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াও সে অপরাধী—ইহাই কি বিধান? সকল অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে একমাত্র নীতিই কি শুধু অপরিবর্ত্তনীয়?

রোজ সন্ধ্যাকালে অণিমাকে লইয়া প্রকাশ গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইত। মাঝে মাঝে অশোকও সঙ্গে যাইত। সে এখন তিন বছরের বালক—হৃষ্টপুষ্ট গঠন, গোলগাল কচি মুখ, কৃষ্ণতার সমন্বিত উজ্জ্বল চোখ দুটি পদ্মের মত ভাসা ভাসা, মাথায় অপর্য্যাপ্ত কালো কোঁকড়ান চুল। বালক সাজিয়া-গুজিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, প্রকাশ কোন ছুতায় তাহাকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিয়া অণিমাকে কহিল,—চল অণিমা।

অণিমা কহিল,—অশোক রইল যে?

প্রকাশ বলিল,—আজ আর ওকে সঙ্গে নিয়ে কাজ নেই। চল।

খড়ির মত শুভ্র পথ চড়াই উৎরাই ভাঙিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া রাণী পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেছে। সহরের প্রান্ত হইতে রাণী পাহাড় ক্রোশ খানেক অন্তর। আরও দূরে কয়েকটা কৃষ্ণকায় পাহাড়ের ছুঁচাল চূড়া সেই রাস্তারই পার্শ্বদেশে ঐরাবতের মত শুঁড় উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া। সাম্‌নে পিছনে চতুর্দ্দিকে কঙ্করময় পতিত জমি। অনেক দূরে রাস্তার একটা পুলের নীচে ক্ষুদ্র খাদ কাটিয়া একটি শীর্ণ প্রবাহ খানিকটা বালি জলসিক্ত করিয়া মন্দগতি বহিয়া চলিয়াছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া তাহারা এই পথ ধরিয়া চলিল। নির্জ্জন পথ, কেহ কোথাও নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি রাখাল বালক ঝরণার ধারে গরু চরাইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সূর্য্য ডুবিয়া গেছে, আকাশের রংএর খেলা—লাল, নীল, পীত সবুজ, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বর্ণের ছটায় পশ্চিম জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

হাত ধরিয়া আঙুলে আঙুল জড়াইয়া পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছিল। মুখে কাহারো কথা ছিল না, দৃষ্টি—গোধূলির ছায়ালোকে চিত্রিত দৃশ্যের দিকে। পুরাতন দৃশ্য—বিশ্বসৃষ্টি হইতে সেই একই উদয়াস্ত অনন্তকাল জুড়িয়া কোন অসীম মহা-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে। পুরুষানুক্রমে মানুষ ঐ একই সৌন্দর্য্য মুগ্ধবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিয়াছে—কত গানে গাহিয়াছে, কত চিত্রে আঁকিয়াছে। তথাপি উহার রঙীন রেখাগুলি সীমার বন্ধন ছিঁড়িয়া, নিত্য নূতন সাজে দেখা দিয়া যেন ইহাই জানাইয়া গিয়াছে—এখনো ফুরায় নাই! হে কবি, হে শিল্পী—আবার আঁক, আবার গাও!—

পাহাড়ের উপর একটি বৃহৎ উপলখণ্ডে তাহারা আসিয়া বসিল। তাহারা কি ক্লান্ত—পথশ্রান্ত? প্রকাশের ললাটে ধীরে ধীরে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়া বহু ধারায় নামিতে লাগিল। তাহার স্কন্ধে ভর দিয়া, পা দুটি মুড়িয়া অণিমা হেলিয়া বসিয়াছিল। এই দম্পতিকে ঘেরিয়া একটা বিচিত্র স্বপ্নমায়া চিত্রে, গানে, কাব্যের ছন্দে গড়িয়া উঠিতেছিল। ঠিক যেন সেই নিদাঘ সন্ধ্যারই প্রতিবিম্ব—তেমনি অলস কর্ম্মশ্রান্ত, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে রং বদলাইয়া পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, শালবনের মাথায় মাথায় পড়িয়া ঝিকিমিকি করিতেছে!

একটি দিনের স্মৃতি অণিমার মনে জাগিয়া উঠিল। প্রকাশের কোলের উপর ঝুঁকিয়া, ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল,—আজ এক বৎসর—মনে পড়ে?

প্রকাশ কি ভাবিতেছিল। স্বপ্নাবিষ্ট চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল, গোধূলির আলো অণিমার মুখখানির উপর পড়িয়া ওষ্ঠের হাসিটুকু উজ্জ্বল বর্ণে রাঙিয়া দিয়াছে। একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—তা আর পড়ে না? সেদিন আমার পুনর্জন্ম।

অণিমা বলিল, একটা বছর যেন দেখতে দেখতে কেটে গেল। মনে হয় যেন সে দিন।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। দূর গগনে একটি খণ্ড-মেঘের পানে প্রকাশ উদাস নেত্রে চাহিয়া রহিল।

—কি ভাবচো?

—কিছু না।

—আমি বলচি, নিশ্চয়ই কিছু ভাবচো।

প্রকাশ মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল, তারপর কহিল,—আচ্ছা অণিমা, যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমি কে, আমার পূর্ব্ব ইতিহাস কি, কিছুই তোমরা জানতে না। কোন খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করনি। তোমাদের সাহস ত বড় কম নয়!

অণিমা গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল,—তোমার পরিচয় তুমি নিজে যা দিয়েছিলে তাই যথেষ্ট। আমরা কি তোমায় চিনি না? লোক চিনতে হলে তার পিছনে গোয়েন্দা লাগান ছাড়া অন্য উপায় নেই, তুমি কি তাই মনে কর?

প্রকাশ কহিল,—গোয়েন্দা লাগানই বোধ করি ঠিক। সাধুতার মুখোস পরে কত মেকী লোক যে সংসারের হাটে সাঁচ্চা জহরতের দামে বিকিয়ে যাচ্চে, তার ইয়ত্তা নেই।

হাসিয়া অণিমা কহিল,—তোমার উপমা খাটলো না। মেকী জিনিষ হাতে তুললেই চেনা যায়—বিশেষ জহুরি যদি জহরতের কদর বোঝে।

প্রকাশও হাসিয়া কহিল,—যে ভালবেসেচে সে কি নিজেকে একজন পাকা জহুরি বলে দাবি করতে পারে? না না, অত পাকা জহুরি তুমি নও। ধর—আমি যদি একজন ফেরারী আসামী হতুম, পুলিসের ভয়ে নামধাম গোপন করে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই নি, তা তুমি কেমন করে জান্‌লে?

অণিমা বলিয়া উঠিল,—অসম্ভব। কোন্ ফেরারী আসামী ধনীর বিরুদ্ধে গরীবদের হয়ে লড়াই করে? এর নাম গা ঢাকা নয়।

প্রকাশ আবার হাসিল,—আচ্ছা, তা যেন হল। ফেরারী আসামী আমি নই, হলে অনেক দিন আগে ধরা পড়ে যেতাম। কিন্তু আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, কোন বিষয়ই ত তুমি কিছু জান না। আমি যে তোমাকে সব কথাই খুলে বলেচি, কোন বিষয়ে গোপন করি নি, তা তুমি কেমন করে জান্‌লে? এমনও ত হতে পারে—আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী এখনো বেঁচে আছে—

তাহার চিবুক আঙুল দিয়া টিপিয়া অণিমা কহিল,—যাও। কি সব ঠাট্টা আরম্ভ করেচ।

প্রকাশ কহিল,—যদি সত্য হয়?

তাহার কণ্ঠস্বরে বোধ হয় একটু সত্যের সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল—অণিমা ক্ষণকাল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—যা বললে তা কি সত্যি? বল।

অণিমার মুখমণ্ডল কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতেছিল। প্রবল আবেগ ভরে মুষ্টির স্নায়ুগুলি সঙ্কুচিত হইতেছিল, প্রকাশ তাহা অনুভব

করিল। কি যে বলিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

—বল, বল!

হাত ছাড়িয়া অণিমা সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পাহাড়ের একটা ধার খাড়াভাবে একটা গভীর খাদের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। নীচে প্রকাণ্ড কয়েকটা কাল পাথর, সম্মুখে একটা সরু পথের ওপারে আর একটা পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। কোন দিকে না চাহিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে অণিমা সেই দিকে ছুটিয়া চলিল।

প্রকাশ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণে একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা মনে জাগতে তাড়াতাড়ি পিছন হইতে আসিয়া অণিমার হাতখানি মুষ্টিমধ্যে টানিয়া ধরিল।

—ফের অণিমা—ফিরে এস।

অনিমা হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

—ছাড় বলচি—আমায় ছেড়ে দাও।

অণিমা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—সে প্রাণপণে আকর্ষণ করিল। দুইজন তখন পর্ব্বতের ভৃগুস্থানে—আর এক পা, নিম্নে গহ্বর মুখ মেলিয়া আছে। হুড়া-হুড়ি তখনো চলিতেছিল।

প্রকাশ চীৎকার করিয়া উঠিল,—মিথ্যা অণিমা, সব মিথ্যা।

এক মুহূর্ত্তে অণিমার সমস্ত শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রকাশ কহিল,—আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম, তাও কি বুঝতে পার নি?

অণিমা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। সংশয় অনিশ্চয় তাহার অন্তর্যাতনা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বিশ্বাস করিবে, কি করিবে না—কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

প্রকাশ তখনো বলিতেছিল,—মিথ্যা অণিমা—এক বর্ণও সত্য নয়। এমন কথায়ও তুমি বিশ্বাস করলে? ছি!

পাথর-গড়া মূর্ত্তির মত নির্নিমেষ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অণিমা বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না। তাহাকে বক্ষমধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া রুমালখানি দিয়া প্রকাশ ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

কতক্ষণ তাহারা এইভাবে বসিয়াছিল, কেহই জানিল না। এক মুহূর্ত্তের এই ঘটনাটি উভয়ের মধ্যে যেন একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছিল। কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করিল না।

নীচে গভীর শব্দ শুনিয়া প্রকাশ দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল—গাড়ী খানা ওরা এখানে নিয়ে এসেচে। নামি চল।

অণিমা নড়িল না। ক্লান্তির অবসাদে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দুইবাহু দিয়া তাহার ছিপ্‌ছিপে দেহযষ্টি সযত্নে সাপ্‌টিয়া লইয়া প্রকাশ তাহাকে তুলিয়া ধরিল। জ্যোৎস্না নিভিয়া আসিতেছিল, নীলাভ আকাশে হীরার মত তারা জ্বলিতেছে। বাতাস স্বচ্ছ; নীচে মাটির দেওয়াল ঘেরা পুতুল ঘরের মত ক্ষুদ্র গ্রাম খান আঁধারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সম্মুখে আকাশের গায়ে ঈষৎ পীত রেখা টানিয়া একটা উল্কা নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল। সেই তৃণবিরল ঢালু পথ বহিয়া সতর্ক পদক্ষেপে তাহারা ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। পাহাড়ের নীচে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছিল। নিবিড় নিস্তব্ধতা ধরণীর বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, পায়ের তলে কাঁকরগুলির তীক্ষ্ণ শব্দে দ্বিগুণ হইয়া কানে বিঁধিতে লাগিল। অণিমার স্খলিত বাহুলতা কণ্ঠে জড়াইয়া, কটিদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া, তাহার সবটুকু ভর স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া, প্রকাশ ভাবিল—মোটে এই! সে যে আরো ঢের বেশী বহিতে পারে!

১৯

সত্যই প্রকাশ বুক বাঁধিয়াছিল—যাহা হয় হোক, সকল কথা খুলিয়া সে বলিবেই। কিরূপে কথাটি পাড়িবে পূর্ব্ব হইতে সে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার সকল গণনা গুলাইয়া গেল যখন সে অণিমার সম্মুখে প্রকৃত পরীক্ষার জন্য সম্মুখীন হইল। সে দেখিল,

তাহার উপর অণিমার বিশ্বাস গিয়াছে, অথচ সে যাহা বলিতে চাহিতেছিল, তাহাও আর বলা হইল না।

গাড়ী ধীরে ধীরে চলিয়াছে। ভিতরে প্রকাশ অণিমার দেহ বাহুবেষ্টিত করিয়া তখনো ধরিয়াছিল।

কষ্টে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া সে কহিল—এমন কথাটাও তুমি বিশ্বাস করে বললে, অণিমা? ছি—এই তোমার ভালবাসা!

বাহিরে গাড়ীর আলো পিছনের গোলাকার কাঁচের ভিতর রোষকষায়িত চক্ষের মত জ্বলিতেছিল। অণিমা সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া কথাটা নানাভাবে তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। সত্যই কি তাই? যেমন সহজে সে বিশ্বাস করিয়াছিল, তেমনি সহজেই কি সে কথাগুলি অবিশ্বাস করিবে? প্রকাশ বলিয়াছে এ শুধু একটা পরীক্ষা। কায়মনোবাক্যে কখনো কি সে স্বামীর প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছে যে আজ তাহার এই অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন হইল?

খুর দিয়া রাস্তার পাথরগুলি প্রহৃত করিয়া ঘোড়াটা মন্থর গতিতে ছুটিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে চাবুক খাইয়া হঠাৎ গতিবেগ বাড়াইয়া তখনি আবার হ্রাস করিতেছিল। গাড়ী একটা চড়াই ভাঙ্গিয়া উঠিতে দূরে বিদ্যুতালোক শোভিত সহরটি দেখা গেল। নীলাকাশের নীচে উচ্চ চিম্‌নিগুলি সারি সারি থামের মতন অটল দাঁড়াইয়া।

গাড়ী আসিয়া বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইলে উভয়ে নামিয়া ঘরে গেল। করুণা আসিয়া বলিল,—আজ তোমাদের ফিরতে বড় দেরী হয়েচে, ভাই।

জামা ছাড়িতে ছাড়িতে প্রকাশ কহিল,—আমরা আজ পাহাড়ে উঠেছিলাম।

বাগানে যুঁই ফুলের ঝাড়ের নীচে বেঞ্চটির উপর অণিমা আসিয়া বসিয়াছিল। এতক্ষণ প্রকাশের কাছে, অন্তরে অন্তরে কেমন জানি সে একটা অশান্তি অনুভব করিতেছিল, নির্জ্জন একাকী বসিয়া জুঁইফুলের গন্ধবাহী স্নিগ্ধ বায়ুর স্পর্শে মন তাহার অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল। আজিকার ব্যাপারটি নূতন করিয়া আবার ভাবিতে গিয়া সে অনেক কথা ভাবিল, পিতার বিষয়, তাঁহার অনাচারের বিষয় মনে পড়িয়া গেল। সারাজীবন এই লোকটি সমাজের চোখের সম্মুখে অনাচার করিয়া বেড়াইয়াছেন।

এসব দেখিয়া শুনিয়াই ত তাহার মাতা পাগল হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কি ইহার প্রতিবিধান করিয়াছে!? তাহার মনে পড়িল, একদিন সে সুরা-মত্ত পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—তুমি কি এই চাও বাবা, যে আমরা ঘরছাড়া হয়ে চলে যাই? সেদিন সে কেবল একটা কথার কথা বলিয়াছিল, উহার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ প্রকাশ যখন প্রতারণার কথা বলিল, পরিহাস ছলে পরখ করিয়াছে জানাইল, তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে ইহাই জাগিয়া উঠিতেছিল যে, এ শুধু তাহার পরীক্ষা নহে—এ একটা বিষম নারীসমস্যা। নারী-জীবনের সুখ-দুঃখ লইয়া ছিনি-মিনি খেলার উত্তরে জবাব দিতে কয়জন নারী সমর্থ হইয়াছে? অপমান প্রতারণা লাঞ্ছনা সহ্য করিতেই সে জানে, জবাব দিতে শিখে নাই।

শয়ন করিতে অণিমা যখন ঘরে ঢুকিল, প্রকাশ জাগিয়াই ছিল, সে বাতি নিভাইল না। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল,—আমার পরীক্ষাটি যে এখনো শেষ হয় নাই, তা বোধ ক'র ভুলে গেচ।

প্রকাশ চমকিয়া উঠিল,—কেন?

অণিমা বলিল,—তুমি আমায় প্রশ্নই করেচ, কিন্তু আমার উত্তর শোন নি।

প্রকাশ কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা ফুটিল না।

অণিমা বলিয়া গেল,—এখন শোন আমার জবাব। তুমি যা বলেছিলে তা যদি সত্যি হত, যদি সত্যই তুমি আমায় প্রতারণা করতে, তা হলে তোমার ও আমার ভিতর সমস্ত সম্বন্ধ এখানেই শেষ হয়ে যেত।

শুষ্ক হাসি হাসিয়া প্রকাশ কহিল,—এ সম্বন্ধ কি শেষ হয় অণিমা? তুমি যে আমার স্ত্রী!

দৃপ্তস্বরে অণিমা কহিল,—যা কিছু দাবি সবই কি তুমি স্ত্রীর উপর করতে চাও? স্বেচ্ছাচারী স্বামী স্ত্রীর

অধিকার অস্বীকার করে অনাচার করবে, প্রতারণা করবে—আর স্ত্রী মনের দুঃখ মনে চেপে নির্জ্জনে বসে নিষ্ফল কান্না কাঁদবে, এই কি সতীধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম কে সৃষ্টি করেছিল? যিনি করেছিলেন তিনিও নারীর মত নেওয়া একটিবারও আবশ্যক মনে করেন নি। একটা জাতিকে এমন ধারা শৃঙ্খলিত করে রাখার অধিকার তাকে কে দিলে?

এই তেজগর্ভ বাক্যগুলি ফোয়ারার মত অবিশ্রাম বাহির হইয়া চলিল। উত্তেজনার তাপে তাহার মুখমণ্ডল রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া গভীর নিশ্বাস টানিয়া সে আবার বলিতে লাগিল,—তুমি আমার ভালবাসা পরখ করতে চেয়েছিলে। কি উত্তর দিলে তোমার কাছে প্রতিপন্ন হত, আমি তোমাকে ভালবাসি—তা বলতে পারি না। কিন্তু এ যদি তুমি মনে কর যে, স্বামীর উপর শ্রদ্ধা হারিয়েও স্ত্রী তাকে ভালবাসতে পারে, তবে সে একটা মস্ত ভুল। যে স্ত্রী স্বামীর অনাচার, স্বামীর প্রতারণা জেনেশুনেও তার আশ্রয় ত্যাগ করে না, সে থাকে স্বামীকে ভালবাসে বলে নয়,"নেহাৎ সহায়হীন নিরাশ্রয় বলে। তার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার সবই তাকে বেড়ী দিয়ে বেঁধে রেখেচে।

প্রকাশ পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়া ছিল, আলোচনাটি তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই। তাহার বিস্তৃত দেহের পানে উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া অণিমা জিজ্ঞাসা করিল,—ঘুম পেয়েচে?

—হুঁ।

অণিমা উঠিয়া বাতি নিভাইয়া প্রকাশের পাশটিতে শুইয়া পড়িল। মনের সব কথা বলিয়া ফেলিয়া মনটা তাহার একখণ্ড শোলার মত হালকা বোধ হইতেছিল—যেন আজ সে একটি জটিল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশের দেহের উপর উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া গুঞ্জনরবে সে কহিল, চালাকি হচ্চে? পাশ ফের!

প্রকাশ সাড়া দিল না। নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাহার গণ্ডদেশে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিতে সে বাধা দিল,—আঃ ছাড়। কি করচ?

অণিমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কহিল,—তুমি কি আমার উপর রাগ করেচ?

—রাগ কিসের? তোমার উপর রাগ করবার আমার অধিকার কি?

'অধিকার' কথাটির উপর একটু জোর দিয়াই প্রকাশ বলিয়াছিল; খোঁচাটা অণিমার বুকে শেলের মত গিয়া বিঁধিল—সে প্রকাশকে ছাড়িয়া দিল। কহিল—কথাটি কি বড় মিছে? আমি স্ত্রী বলেই না এমন উঁচু গলায় রাগ দেখাতে পারচো। আর কেউ হলে—

কণ্ঠস্বরে একটু শ্লেষ মিশাইয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—আর কেউ হলে কি হত?

অণিমা চাপিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না। সে ঝাঁ করিয়া বলিয়া ফেলিল, আর কেউ হলে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার দাবিটুকুও সে করতে পারতো। স্ত্রীর কি সেটুকুও করতে নেই?

অন্ধকারেও প্রকাশের চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। সে তীব্র কণ্ঠে কহিল, ভালই করলে অণিমা, আজ আমায় স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়ে। কিন্তু এতই যদি ভেবেছিলে, তাহলে আমাদের সম্বন্ধটা দাবি দাওয়া, অনুগ্রহ কৃতজ্ঞতার উপর ফেলে রেখে দিলেই চলতো! সাবিত্রী-ব্রত করতে কে বলেছিল? ভড়ং করে ওসব পূজা আর্চ্চাই বা কেন?

তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েচ। সেজন্য এখন আর দুঃখ করলে চলবে কেন? কথা কটি বলিবার পর শয্যাত্যাগ করিয়া অণিমা ধীরপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

আদি গুজরাটী সাহিত্য *

শ্রী ননীগোপাল চৌধুরী এম, এ

বৈদিক সংস্কৃতের যুগ হইতে গুজরাটী ভাষার উৎপত্তি পর্য্যন্ত ভাষার যে একটি অপ্রতিহত গতি দেখা যায়, সে গতি ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় না। সংস্কৃত ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান গুজরাটী ভাষাতে পরিণত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর বৈয়াকরণিক হেমচন্দ্র শৌরসেনী অপভ্রংশের যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন সে অপভ্রংশ প্রাকৃত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রচলিত প্রাকৃত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর শৌরসেনী নাগর অপভ্রংশের ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাকৃতের নিদর্শন 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' দৃষ্ট হয়, কিন্তু 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র অপভ্রংশ বিশুদ্ধ শৌরসেনী অপভ্রংশ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে যাহা হউক, নাগর অপভ্রংশ হইতে গুজরাটী ভাষার উৎপত্তি হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ গুজরাটী ভাষার নিদর্শন আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাই না। এই দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে কি ভাষার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? মুসলমান রাজত্বের প্রথম ভাগে (দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) জৈন সাধুগণ অশিক্ষিত ও অৰ্দ্ধশিক্ষিত দেশবাসীদের মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারার্থে তৎকালীন কথ্য ভাষা অর্দ্ধঅপভ্রংশ ও অৰ্দ্ধগুজরাটীতে 'রাস' রচনা করিতেন। বাঙ্গলার বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মধ্যে যেমন বাঙ্গালা ভাষার উন্মেষ দেখিতে পাই, সে রকম এই 'রাস' সাহিত্যে গুজরাটী ভাষার উন্মেষ দেখিতে পাই,

"কাতী করবত কাপতাঁ, রহিলউ † আব্‌হ। ছহ (১)
নারী রিধ্যা টলবলহ, জা-জীব্‌হ তা। দহ"

"ছুরিকা ও করাতের আঘাতে শীঘ্র মৃত্যু হয়, কিন্তু যাহারা নারীর দ্বারা বিদ্ধ তাহারা আজীবন দহিতে থাকে।" যেমন ভাষার উৎপত্তির দিক হইতে 'রাস' সাহিত্য অমূল্য, সেরূপ দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গুজরাটের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতেও তাহার মূল্য কম নহে। সে যুগের একটি অস্পষ্ট ছায়া চিত্র এই 'রাস' সাহিত্যে দেখিতে পাই।

এই 'রাস' সাহিত্যের মত মিশ্র ভাষায় লিখিত ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দের 'মুগ্ধারবোধমৌক্তিক' নামক একটি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে; যদি 'রাসের' ভাষাকে গুজরাটী বলা যায় এবং বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষাকে বাংলা বলা যায়, তাহা হইলে ইহার ভাষাকে গুজরাটী বলিতে আমার কোন আপত্তি নাই; ইহার ভাষাকে শৌরসেনী নাগর অপভ্রংশ ও বিশুদ্ধ গুজরাটীর মধ্যবর্ত্তী যুগের ভাষার নিদর্শন-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ব-ভাগে মাড়োয়ারী ও গুজরাটী ভাষা তত বিভিন্ন হয় নাই; এমন কি বর্ত্তমান যুগেও উভয় ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত তত পার্থক্য নাই এবং সেজন্য আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা গুজরাটী ভাষাকে প্রতীচ্য রাজস্থানীয় ভাষার অন্তর্গত করেন। "মুগ্ধারবোধমৌক্তিকে"র ভাষাকে প্রাচীন প্রতীচ্য-রাজস্থানী ভাষা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে; সেজন্য ইহা প্রাচীন গুজরাটী ভাষার উন্মেষকালীন নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। মোট কথা, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত শৌরসেনী অপভ্রংশের যুগ এবং ত্রয়োদশ

* গুর্জ্জর জাতির নাম হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি।
গুর্জ্জরত্রা=গুর্জ্জরত্রা > গুজ্জুরও (প্রা) > গুজরাত। এই শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ 'গুজরাত' কিন্তু বাংলায় এই শব্দ 'গুজরাট' বলিয়া উচ্চারিত হয়, কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও 'গুজরাট' শব্দ দেখিতে পাই, বাংলায় 'রাত' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাট' শব্দের প্রয়োগের কারণ কি? বোধ হয় 'রাত' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'রাষ্ট্র' শব্দ হইতে, এই বিবেচনা করিয়া 'রাট' (রাষ্ট্র > রট্ঠ > রাট) শব্দ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

† 'বহিলউ' দেশী প্রাকৃত শব্দ, ইহার অর্থ 'শীঘ্র'
(১) প্রাকৃত শব্দ আব্‌হ ছহ হইতে বোধ হয় গুজরাটী ক্রিয়া 'আবে ছে'র উৎপত্তি, ইহার অর্থ 'আসিতেছে।' 'বহিলউ আব্‌হ ছহ' = শীঘ্রই আসছে, অর্থাৎ মৃত্যু সন্নিকটে।

শতাব্দীর প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত গুজরাটী ভাষার উন্মেষকালীন যুগ।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বিশুদ্ধ গুজরাটী ভাষার উৎপত্তি হয়, কিন্তু এই যুগের ভাষা সম্বন্ধেও একটি সমস্যার সমাধান না করিলে ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাঠিয়াওয়াড়ের কৃষাণ-কবিদের গীতি কবিতার ও ভড়লী বাক্যের ভাষাতে যদিও একটু পুরানো ভাষার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবুও দেখিতে তাহা হালের গুজরাটীর মত। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি মেহতা ও মীরাবাঈর কবিতার ভাষায় ও হালের গুজরাটীতে কোন প্রভেদ নাই। আবার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বুলার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি পদ্মনাভের "কান্হড দে প্রবন্ধ" নামক কাব্যের ভাষা অতি পুরাতন। ইহার অর্থ কি? কৃষাণ-কবিদের গীতিকা, ভড়লীবাক্য ও মীরা মেহতার পদাবলী লোকমুখে অধিক প্রচলন হেতু ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু "কান্হড দে প্রবন্ধ"র কথা দূরে থাকুক, এমন কি গ্রন্থকারের নাম পর্য্যন্তও গুজরাটীরা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জানিত না। সেজন্য ইহার ভাষার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং এই গ্রন্থে আমরা মেহতার ও মীরার যুগের ভাষার অবিকল নিদর্শন পাই। আবার মেহতার ও মীরার পদাবলীর মধ্যে পর যুগের অনেক প্রক্ষিপ্ত পদাবলী পাই এবং ঐ সকল প্রক্ষিপ্ত পদাবলীর ভাষা আধুনিক।

এতদিন পর্য্যন্ত নরসিংহ মেহতাকে গুজরাটী কবিতার 'জনক' বলিয়া অভিহিত করা হইত; কিন্তু 'রাস'-সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। শুধু যে 'রাস' গুলিই নরসিংহ মেহতার (১৪১৪-১৪৮১ খৃঃ) পূর্ব্ব যুগের সাহিত্যের নিদর্শন তাহা নহে; কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশের কৃষাণ-কবিদের গীতিকা ও ভড়লী-বাক্যগুলিও আমার মতে নরসিংহ মেহতার পূর্ব্বে রচিত—পূর্ব্বের না হইলেও অন্ততঃ সমসাময়িক; বাংলার কৃষাণ-কবিদের মত কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশেও কৃষাণ কবিরা অতীত যুগের বীরের বীরত্ব-কাহিনী ও প্রেমিকের প্রেমগাথা, ঘাটে, মাঠে ও নদীর কূলে গাহিয়া থাকে। বেদের মত তাহারা এই গীতিকাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে নাই এবং কোন্ অজানা যুগে কোন্ কৃষক-কবির দ্বারা এগুলি রচিত হইয়াছিল তাহারও খবর রাখে নাই। রাণকদেবী ও সিদ্ধরাজের গীতিকাটি অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। অনহিলওয়াড় পাঠনের রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক (একাদশ শতাব্দী) জুনাগড়ের রাণী রাণকদেবীর হরণ বৃত্তান্তটি লইয়াই গীতিকাটি রচিত। এই একাদশ শতাব্দীর ঘটনাটি লইয়া ন্যূনকল্পে দুই এক শতাব্দীর মধ্যে গীতিকাটি রচিত হওয়া সম্ভব। নরসিংহ মেহতার সমসাময়িক রাজারা মণ্ডালিকের গীতিকাটিও বোধ হয় নরসিংহ মেহতার সময়ে রচিত হয়।

বাংলা দেশের খনার বচনের ন্যায় গুজরাটেও ভড়লীর বচন প্রচলিত আছে। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, মেবারের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হুড়রড়ের একমাত্র কন্যা ভড়লী পিতৃদেবের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্রটী ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন এবং কালক্রমে খনার মত কতকগুলি বচন রচনা করিয়াছিলেন। এই রকম কিংবদন্তীর মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা এবং ভড়লী নামে এই সকল বচনের কোন রচয়িত্রী ছিল কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই বচনগুলি চাষাদের কৃষিবেদ; অনেক যুগের সঞ্চিত কৃষিজ্ঞান এই বচনগুলির মধ্যে নিহিত আছে। খনার বচনের ন্যায় অতি অল্পকথায় কৃষির মূল সূত্রগুলি রচিত হওয়াতে এবং অনেক পুরাতন শব্দের প্রয়োগ থাকাতে ভাষা অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য। বোধ হয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এগুলি রচিত হয় নাই।

"শ্রাবণ পহেলী পাঁচদীন, মেহ ন মাঁডে আল
পিযু পধারো মালরে হমে জশু মোসাল"

"যদি শ্রাবণের পাঁচদিন পূর্ব্বে মেঘ বর্ষণ না করে, (স্ত্রী স্বামীকে বলে) প্রিয়! তুমি মালবায় যাও, আমি মামার বাড়ী যাই।"

"পুরব্ তানে কাচবী* আথমথে সুর
ভডলী বায়ক† এম ভণে দুধে জমাডু কুর"

* 'কাচবী'—এই শব্দটি দেশী প্রাকৃত, ইহার অর্থ রামধনু।

† বায়ক—এইটিও প্রাকৃত শব্দ, বোধ হয় সংস্কৃত 'বাচক' শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি।

"যদি সূর্য্যাস্ত সময়ে পূর্ব্বদিকে রামধনু দেখা যায়, ভড়লী মনে করে লোককে দুধে ভাতে খাওয়ান যায়।"

এই তমসাবৃত আলো আঁধারের যুগে গুজরাটের হৃদয় জাগ্রত হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রভাতে কোন্ শুভক্ষণে এবং কোন্ কারণে প্রথম গুজরাটের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। ভগবান কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা গুজরাটে বলিয়াই কি গুজরাটের হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল? এ প্রশ্নের কোন সমাধান হয় নাই, এই ভক্তিসাপ্লুত গুজরাটের হৃদয়-তন্ত্রীতে গুজরাটের প্রথম কবি নরসিংহ মেহতা যখন অঙ্গুল স্পর্শ করিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব সুর বাজিয়া উঠিল। মেহতা সময় বুঝিয়া ভক্তিসপ্লাবিত গুজরাটের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমস্ত গুজরাটের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন এবং সমস্ত গুজরাটের অন্তরের অব্যক্ত বাণী নিজে ব্যক্ত করেন।

আদিযুগের গুজরাটী কবিদের মধ্যে নরসিংহ মেহতা ও মীরাবাঈএর স্থান অতি উচ্চে। উভয়ের জীবনে এই সাদৃশ্যটুকু আছে যে, উভয়েই কৃষ্ণের ভক্ত এবং ভারতের অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় সমাজ ও লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নামে মত্ত হইয়াছিলেন। মেহতা জুনাগড়ের উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও জুনাগড়ের পার্শ্বস্থিত অস্পৃশ্য ধেড় জাতির ও অন্যান্য সাধুর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া উপাসনা করিতেন এবং সেজন্য জাতিভ্রষ্টও হইয়াছিলেন। আজীবন ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু সেজন্য তিনি দুঃখিত ছিলেন না। ভগবানে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস থাকার দরুণ সংসারের অভাব এবং আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিতেন।

মেহতার কবিতাকে * প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ভক্তি-বিষয়ক কবিতা ও শৃঙ্গার কবিতা। শৃঙ্গার কবিতাগুলি যদিও বাহিরে দেখিতে কামগন্ধী তথাপি একটু মনোনিবেশ করিলে সেগুলি যে ভক্তিমূলক তাহা প্রতীয়মান হয়। এই সব শৃঙ্গার কবিতার নায়ক কৃষ্ণ যে ব্যভিচারী নহেন তাহা বুঝাইবার জন্য কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"সুনো তমে নারী, অমে ব্রহ্মচারী,
অমনে তে কোই এক জানে রে।
বেদ ভেদ লহে নহি মারো, সনকাদি নারদ বখানে রে।"

কিন্তু মেহতাকে অমর করিয়া রাখিবে তাঁহার প্রভাতিয়া গান। প্রভাতে গুজরাটের প্রতি গৃহ নরসিংহ মেহতার প্রভাতিয়া গানে মুখরিত হয়। প্রভাতিয়ার ভাষা সরল এবং তাহাতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ঘটাও কম।

মীরা ও মেহতার আলোকে গুজরাটীদের চক্ষু এত ঝলসিয়া গিয়াছিল যে, সে যুগের অপর দুইজন কবি এখন কেবল নামে পরিচিত। "ভীমের" (১৪৮৪ খৃঃ) নাম উল্লেখ যোগ্য না হইলেও অপর কবি ভালন (১৪৩৯ খৃঃ—১৫৩৯) একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও উচ্চদরের কবি ছিলেন। ভাষার সৌন্দর্য্যে মীরা ব্যতীত অন্য কাহারও নীচে তাঁহার স্থান নহে, এমন কি এক্ষেত্রে মেহতাও তাঁহার সমকক্ষ নহেন। ভালন সংস্কৃত কাদম্বরীর গুজরাটী অনুবাদ করেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন তাঁহারা দেবভাষায় পুস্তক রচনা করিতেন—দীনা মাতৃভাষা তাঁহাদের জ্ঞানের বোঝা বহন করিতে পারেন, একথা বিশ্বাস করিতেন না। গুজরাটী ভাষার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের টান এত অধিক ছিল যে, সে কালের প্রচলিত প্রথা উপেক্ষা করিয়া গুজরাটীতে পদাবলী রচনা করিতে থাকেন। তিনি নলাখ্যান ও চণ্ডী-আখ্যান নামে দুইটী ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

মীরাবাঈ সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। এমন কি তাঁহার জন্মতারিখ ও স্বামীর নাম সম্বন্ধে নানাজনে নানামত পোষণ করেন। কাহারও মতে মীরাবাঈ চিতোরের রাণা কুম্ভের স্ত্রী, আবার কাহারও মতে তিনি রাণা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজের স্ত্রী। এই রকম কিংবদন্তী আছে যে মীরাবাঈ আশৈশব কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার শিবোপাসক স্বামী তাহা পছন্দ করিতেন না; সেজন্য উভয়ের মধ্যে ভাল ভাব

* মেহতা পদাবলী ব্যতীত আরও অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যথা :—
হারমালা, চাতুরীচত্রিশী গোবিন্দগমন, দানলীলা, চাতুরী ষোড়শী, শামলদাসনো বিবাহ এবং সুরত সংগ্রাম

ছিল না। তাঁহার স্বামী এ কলঙ্ক অপনোদনের জন্য মীরাকে বিষপ্রয়োগ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপায় গরলও অমৃত হইল।

"বিষণো প্যালো মোকল রে, দেজো মীরানে হাথ।
অমৃত জানী মীরাঁ পী গয়াঁ, জেনে সহায়
শ্রী বিশ্বনো নাথ।"

মীরাবাঈএর ননদী উদাবাঈ মীরাকে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া রাজ-অন্তঃপুরে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

"ভাভী বলো বচন বিচারা
সাধোঁকী সংগত দুঃখ ভারী, মানো বাত হমারী
ছাপা তিলক গল হার উতরো, পহিরো হার জুহারী"

তাহার উত্তরে মীরাবাঈ বলিলেন—

"উদাবাঈ মন সমঝ, জারো অপনে ধাম
রাজপাট ভোগো তুমহী, হমনে ন তাসুঁ কাম"

এই বলিয়া তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ রাধাকৃষ্ণের নাম নিয়া কাটাইয়া দিলেন। আশৈশব মীরাবাঈ ভগবান কৃষ্ণকেই নিজের স্বামী বলিয়া জানিতেন। রাণাকে নিজের স্বামী বলিয়া মীরা স্বীকার করেন নাই—কৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র স্বামী; এইভাবে তাঁহার পদাবলী রচিত

"অব নহিঁ মানুঁ রাণা থাঁরী, মৈঁ বর পায়ো গিরধারী"

ঐ নামে কি যে অমৃত পাইয়াছেন, তাহা নিম্নের কবিতা হইতে জানা যায়—

"বোল মা বোল মা রে, রাধাকৃষ্ণ বিনা বীজুঁ বোল মা
সাকর শেরডীনা সব্দ তজিনে, কডবো লীমডো
ঘোল মা রে,
চাঁদ সুরজমু তেজ তজিনে, আগীয়া সংগাতে
প্রীত জোড় মা রে।

মীরাবাঈএর কবিতা * হিন্দি, রাজস্থানী ও গুজরাটী ভাষায় পাওয়া যায়। রাজপুতানী হইয়া গুজরাটী ভাষায় লিখিতে যাওয়ার ফলে তাঁহার অনেক কবিতাতে তিনটি ভাষা অতি সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

পদাবলীতে মীরাবাঈ মেহতা হইতে ভাষায় মধুর ও ভাবে সংযত এবং মীরার পদাবলীর মধ্যে স্ত্রীলোকের কোমল ভাবটি সুস্পষ্ট, সেজন্য মেহতার পদাবলী হইতে মীরার পদাবলী জনসাধারণের অধিক প্রিয়। তুলসী ও কবীরের মত মীরার কবিতাগুলি ভক্তিরসে পূর্ণ—তাঁহার প্রত্যেক বাক্যটী অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে ভক্তিরস আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট এবং তাহাই এত সরল। ভারতের ভাষা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে এবং দুই একজন কবি ব্যতীত ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে মীরার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এখন গুজরাটের প্রতি গৃহে জ্যোৎস্না-প্লাবিত অঙ্গনে মাতা ও কন্যা তালে তালে করতালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্যভঙ্গীতে মীরার পদাবলী গাহিয়া থাকেন। যে মীরা চিতোর-রাজবংশের কলঙ্ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন—যাঁহার স্বর্ণথালায় প্রয়োজন ছিল না—যিনি দ্বারকায় পর্ণ-কুটীরে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন—

"সোনানী থালী মারে কাম ন আবে বালা, তুলসীনী
মালাএ তরবুঁছে।
মন্দির মালিথাঁ মারে কাম ন আবে বালা, পডেলী
ঝুঁপডীমা মারে মরবুঁছে।"

তাঁহার নাম আজ গুজরাটের প্রতি গৃহে—ধনীর ও নির্ধনের প্রাসাদে ও পর্ণকুটীরে উচ্চারিত হয়।

* মীরাবাঈএর নিম্নলিখিত কবিতাগুলি গুজরাটীতে পাওয়া যায়:—(১) নরসিংহজীকা মায়রা (২) রামগোবিন্দ (৩) গীত-গোবিন্দের টীকা (৪) পদাবলী।

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কারাগারে ফারেজ ও লোবান (যাঁহাকে আরাতামা হাতিল নামে জানিতেন) স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছিলেন। গালিম তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা ইচ্ছামত আহার করিতেন, দিবাভাগে একত্রে থাকিতেন। গালিম মাঝে মাঝে তাঁহাদের সংবাদ লইতে আসিতেন। ফারেজ প্রাণভয়ে অস্থির, তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিবেন। লোবান নির্ভীক, ফারেজের ভীরুতা দেখিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন। বলিতেন, অন্য সময় আমরা টাকা লইয়া জুয়া খেলিতাম, এবার পণ আর কিছু বেশী। জিতিলে অনেক লাভ, হারিলে প্রাণ দিতে হইবে। আমাদের হার হইয়াছে।

—গালিম কেমন করিয়া জানিতে পারিল ?

—সে কথা ত তোমাকে বলিয়াছি। আরাতামা কোন কৌশলে আমাকে বুদ্ধিহারা করিয়া আমারই মুখ দিয়া সকল কথা বাহির করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে আমার সম্পত্তি হরণ করিয়াছিল, এইবার প্রাণহরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

—তোমার প্রাণদণ্ড নাও হইতে পারে কিন্তু আমার এ যাত্রা নিষ্কৃতি নাই।

এমন সময় গালিম আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন,—রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমি সকল কথা জানাইয়াছি।

ফারেজের মুখ শুকাইয়া গেল, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কহিলেন,—এইবার আমরা ঘাতকের হস্তে যাইব।

গালিম কহিলেন, তোমাদের প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। রাজার প্রকৃতি কঠিন নয়, তোমাদের দ্বারা কোন ক্ষতি হয় নাই। যুদ্ধে রাজার জয় হইয়াছে, আরাদ নিহত হইয়াছেন। রাজা আরাতামার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তোমরা রাজার নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিও, লঘুদণ্ডেই তোমরা নিষ্কৃতি পাইবে।

লোবান কহিলেন—রাজা মার্জ্জনা করিতে চাহিলেও আরাতামা তাঁহাকে উত্তেজিত করিবে।

—কেন, আরাতামার বিদ্বেষের কারণ কি ?

—আরাতামা আমার শত্রু, সে সাধ্যমত আমার অপকার করিবে।

—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আরাতামা তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না। তোমরা রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ এজন্য কিছু শাস্তি হইতে পারে, কিন্তু রাজার যেরূপ ক্ষমাগুণ ও উদার প্রকৃতি তাহাতে তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। আমার বন্ধু হইয়া তোমরা এমন কর্ম্ম করিয়াছ ইহাতে আমার অত্যন্ত লজ্জা ও অপমান হইয়াছে। কর্ত্তব্যে অবহেলার অপরাধে আমি মহারাজের নিকট দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি হাসিয়া সেকথা উড়াইয়া দিয়াছেন।

তাহার পর গালিম বাষ্টীকে দেখিতে গেলেন। কারাগারে স্ত্রীলোককে আবদ্ধ রাখিবার স্থান ছিল না। কারাধ্যক্ষের গৃহে একটি কক্ষে বাষ্টীকে রাখা হইয়াছিল। আর দুইজন স্ত্রীলোক তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিত।

বাষ্টীর কেশ রুক্ষ, বেশ অযত্নে পরিহিত, চক্ষু ম্লান, সর্ব্বদা অবনত। গালিম কহিলেন,—বাষ্টী, আরাতামা ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাষ্টী মাথা তুলিল না, গালিমের দিকে চাহিল না, অস্পষ্ট কর্কশ কণ্ঠে কহিল,—আমার তাহাতে কি ?

—তোমাকে তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

—আমি যাইব না। এখানেই আমার যাহা হইবার হইবে।

—এখানে তোমার থাকিবার আর কোন আবশ্যক নাই। রাজা তোমাকে কোন শাস্তি দিবেন না, আমিও তোমাকে আর আটক করিয়া রাখিব না। আরাতামার কাছে তুমি মার্জ্জনা চাহিও, তাহা হইলে তিনিও ক্ষমা করিবেন।

বাষ্টীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল হস্তে হস্ত নিষ্পেষিত করিয়া অঙ্গারের ন্যায় দুই চক্ষু তুলিয়া কহিল,—আরাতামার রূপে আপনারা ভুলিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনি। বরং ব্যাঘ্রীর ক্ষমা থাকিতে পারে, কুপিতা ভুজঙ্গিনী দংশন না করিতে পারে, কিন্তু আরাতামার হৃদয়ে ক্ষমা নাই। তাহার কাছে কি অস্ত্র আছে দেখিয়াছেন?

গালিম বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, মনে করিলেন অপমানে ও কারাবাসে বাষ্টীর চিত্তের বিকৃতি হইয়া থাকিবে। কহিলেন,—তিনি স্ত্রীলোক, অস্ত্র লইয়া তিনি কি করিবেন?

বাষ্টী আবার শিহরিয়া উঠিল, চক্ষের অগ্নি নিভিয়া গেল। কহিল, সে অস্ত্র দেখিতে উজ্জ্বল, ক্ষুদ্র, সুন্দর, রত্নমণ্ডিত অলঙ্কারের মত। তাহার স্পর্শে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা। আমি জানি, আমি সে সুখ অনুভব করিয়াছি।

গালিম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার সংশয় আরও দৃঢ় হইল। তিনি বাষ্টীকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ওদিকে লোবান ষড়যন্ত্র অপরাধে ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া ওবেদার বড় ভয় হইয়াছিল। লোবানকে ত তিনিই স্থান দিয়াছিলেন, আবার তাঁহার বাড়ী ভাড়া দিয়াছিলেন। বাষ্টীও ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া ওবেদা বুঝিলেন যে সেও চক্রান্তে লিপ্ত। ওবেদা না জানিয়া অনুরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। যে বাড়ী লোবান ভাড়া করিয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া তল্লাস হইল, ওবেদার পার্শ্বনিবাসেও কিছু সন্ধান করা হইল। ওবেদা ভাবিয়া চিন্তিয়া, সাহস করিয়া গালিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। গালিম চিনিতে পারিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—লোবান তোমার বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল?

ওবেদা সকল কথা মনে ঠাহরাইয়া গিয়াছিলেন। গালিমের প্রশ্নে তিনি চক্ষে অঞ্চল তুলিলেন, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিলেন তাহাতে কি অপরাধ করিয়াছি? তাহার পেটের ভিতরের কথা আমি কেমন করিয়া জানিব?

—তোমার চিন্তার বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কেননা তোমার যে কোন অপরাধ আছে এরূপ সন্দেহ কেহ করে নাই, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কিন্তু লোবান ও বাষ্টী দুইজনেই আরাতামার বিদ্বেষী। তাহার কারণ কিছু জান

—কাহার মনে কি আছে আমি কেমন করিয়া জানিব? লোবান ধনা, যেমন অন্য লোক এখানে আসে সেও সেইরকম আসিয়াছে আমি এইমাত্র জানি। তবে ঐ স্ত্রীলোকটার উপর আমার অনেক রকম সন্দেহ। লোবানের কাছে সর্ব্বদা যাওয়া-আসা করিত। লোবান এখানে অল্পদিন আসিয়াছে, যুবা পুরুষ একা থাকে, তার সঙ্গে বাষ্টীর কি প্রয়োজন? আরাতামার কিছু আবশ্যক হইলে তিনি ভৃত্যকে পাঠাইতেন, বাষ্টীকে পাঠাইবেন কেন? হয়ত আরাতামা কিছু জানিতে পারিয়া তাহাকে শাসন করিয়া থাকিবেন সেই কারণে বাষ্টীর রাগ।

—তাহা হইতে পারে, কিন্তু লোবানের আক্রোশ কেন?

—বাষ্টী তাহার কাছে কিছু লাগাইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি ভিতরকার কথা কিছু জানি না, ইহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।

তোমার সম্বন্ধে আমি কিছু শুনি নাই। ওবেদা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গালিম বাষ্টীকে আরাতামার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে দেখিয়া আরাতামা বেথরকে আদেশ করিলেন—ইহাকে বাড়ীর বাহিরে কোথাও যাইতে দিবে না, কাহারও সহিত দেখা করিতে দিবে না। আমার সম্মুখে আসিতে দিবে না। পরে বিচার করিয়া আমি ইহাকে শাস্তি দিব। বাষ্টী কোন কথা কহিল না, আরাতামার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

সেনাপতি বিজয়ী সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রাজার আদেশে নগরে দীপাবলীর সমারোহ হইল, সৈন্যদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হইল, তারপর তাহারা আপন আপন শিবিরে চলিয়া গেল। সেনাপতি সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হইলেন। রাজার সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে গেলেন সে সময় গালিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা সেনাপতিকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। অল্প কথার পর সেনাপতি কহিলেন—মহারাজ, নগরে যে চক্রান্ত হইয়াছিল তাহার ব্যবস্থা কি হইবে?

সেনাপতি সকল কথা এখনও জানিতে পারেন নাই। রাজা কহিলেন—আপনি ও আমি দুইজনই যুদ্ধস্থলে। নগর-রক্ষার ভার গালিমের উপর। কিরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল ইনি অবগত আছেন।

সেনাপতি গালিমের মুখের দিকে চাহিলেন। গালিম কহিলেন, আমি সকল কথা মহারাজকে নিবেদন করিয়াছি।

—অপরাধীরা ধৃত হইয়াছে?

—হাঁ, মহারাজের আদেশমত তাহাদের দণ্ড হইবে।

সেনাপতি কহিলেন,—মহারাজ, এইসঙ্গে আর এক অপরাধের বিচার করিতে হইবে।

রাজা বলিলেন,—কাহার অপরাধ?

—আমরা শুনিয়াছিলাম রুদেলা আরাতামাকে বন্দিনী করিয়াছে। সে কথা মিথ্যা।

—মিথ্যাই ত মনে হয়, কারণ আরাতামা নিজের গৃহে।

রাজা গালিমের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

—আরাতামা ও রুদেলাকে আরাতামার বিমানে স্বচক্ষে আমি দেখিয়াছি। আরাতামা বলিলেন, তিনিই রুদেলাকে বন্দী করিয়াছেন। কি কৌশলে তাহা আমি বলিতে পারি না।

রাজা কোন কথা কহিলেন না, স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

সেনাপতি বলিতে লাগিলেন,—রুদেলাকে আমি বন্দী করিতে চাহিলাম, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। মহারাজ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন আরাতামা আমাকে অপমান করেন, আমাকে হত্যা করিবেন ভয় দেখান।

—সেনাপতি, আপনি বলেন কি? আরাতামা যে স্ত্রীলোক!

—রুদেলা মুক্ত অসি-হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল।

—আপনার কটিতে অসি ছিল না? আপনি কি সেখানে একা ছিলেন? আপনি কি আরাতামাকে পরুষ বাক্য বলেন নাই?

রাজার প্রশ্নের লক্ষ্য বুঝিয়া সেনাপতির মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মুখে কথা আটকাইতে লাগিল। কহিলেন, না, আমার সঙ্গে কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। রুদেলাও একা নয়, বেথর মল্ল ও ভল্লধারী আমাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত। রুদেলাকে ধরাইয়া না দিলে বিদ্রোহ অপরাধ হয় একথা আমি আরাতামাকে বলিয়াছিলাম। তাঁহার সাক্ষাতে রক্তপাত হওয়া উচিত নয় বিবেচনা করিয়া আমরা ক্ষান্ত হই। তাহার পর রুদেলাকে বিমানে লইয়াই আরাতামা প্রস্থান করিলেন।

রাজা সস্মিতমুখে কহিলেন,—আপনি দিগ্বিজয়ী সেনাপতি হইলেও আরাতামার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। রুদেলা বন্দী, রাজসেনাপতি বিজিত, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়।

এই সময় একজন প্রতিহারী আসিয়া যুক্তকরে, অবনতমস্তকে, মৃদুস্বরে রাজাকে কিছু নিবেদন করিল।

রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন,—ভালই হইয়াছে। সেনাপতি, আরাতামার গৃহে চলুন, তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। গালিম, তুমিও চল।

সেনাপতি বাক্‌শূন্য। আরাতামা বিদ্রোহী প্রধান রুদেলাকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেনাপতির অবমাননা করিয়াছেন, আবার তাহার উপর রাজাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন। রাজাও দ্বিধাশূন্য হইয়া তাঁহার গৃহে গমন করিতেছেন। এই রমণী কি রাজাকেও পরাজিত করিয়াছে?

যাইবার সময় সেনাপতি কহিলেন,—মহারাজ, যদি

অনুমতি হয় তাহা হইলে কয়েকজন সৈনিক সঙ্গে লইয়া যাই।

—কেন ?

—রুদেলাকে বন্দী করিবার জন্য।

—কোন প্রয়োজন নাই। আপনি গালিমের সঙ্গে আসুন।

রাজা চলিয়া গেলেন। পথে সেনাপতি গালিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

—আমিও সকল কথা জানি না। সেখানে জানিতে পারা যাইবে।

গৃহের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া আরাতামা রাজার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজা আসিলে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বৃহৎ সজ্জিত কক্ষে লইয়া গেলেন। আসন গ্রহণ করিয়া রাজা কহিলেন,—সেনাপতি ও গালিমও আসিতেছেন।

আরাতামা কহিলেন,—সেনাপতি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—হইবারই কথা। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

সেনাপতি ও গালিম আসিলেন। রাজার আদেশমত তাঁহারাও উপবেশন করিলেন।

রাজা কহিলেন,—সেনাপতি, এই নগরে শত্রুর গুপ্ত মন্ত্রণার কথা হইয়াছিল। আমরা যে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে, সেই অবসরে নগর হস্তগত করিয়া রাজকন্যাকে অবরুদ্ধ করিবার পরামর্শ হইতেছিল। কাহার বুদ্ধিতৎপরতায় সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় ?

সেনাপতি কহিলেন,—আমি কেমন করিয়া জানিব ?

—যিনি নগর রক্ষা করেন তাঁহারই গৃহে আমরা আসিয়াছি।

—আরাতামা ? তিনি কেমন করিয়া জানিবেন ? তিনিও ত যুদ্ধক্ষেত্রে।

—কেমন করিয়া জানিলেন তাহা আমরা কেহ জানি না। জানিয়া কি করিয়াছিলেন গালিম বলিতে পারিবেন।

গালিম কহিলেন,—আমি সম্পূর্ণ অতর্কিত ছিলাম এবং সে অপরাধ আমি মহারাজের নিকট স্বীকার করিয়াছি। ফারেজ ও লোবান আমার বন্ধু, তাঁহারা দুইজনেই ইহাতে লিপ্ত ছিলেন। আরাতামা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাত্রে আসিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠান। লোবান এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজমুখে সকল অপরাধ স্বীকার করেন। আরাতামার পরিচারিকা কিছু জানিতে পারে এইরূপ সংশয় করিয়া আরাতামা তাহাকেও অবরোধ করিতে বলিলেন। তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার আর আবশ্যক নাই বিবেচনা করিয়া আমি তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছি।

রাজা কহিলেন,—উত্তম করিয়াছ। তাহার কোন অপরাধ থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যে নয়।

আরাতামা অবনতমস্তকে বসিয়াছিলেন। কহিলেন,—মহারাজ, ফারেজ, লোবান ও অপর অপরাধীদিগের কি দণ্ড হইবে ?

রাজা উপস্থিত সকলের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি।

সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন,—সে কি, মহারাজ ! ঘরের শত্রুকে মার্জ্জনা ! কণ্টক উপাড়িয়া ফেলিতে হয়।

রাজা হাত তুলিয়া সেনাপতির আপত্তি থামাইয়া দিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন,—কণ্টকতরুতে ফুলও ফোটে। ভবিষ্যতে অশান্তির কোন আশঙ্কা নাই, কারণ আরাদের অবর্ত্তমানে শত্রুতার কোন কারণ থাকিবে না। আমরা জয়যুক্ত হইয়াছি, ক্ষমার এই উত্তম সময়, এ অবসর শাস্তিবিধানের নয়।

আরাতামা আবেগের সহিত বলিলেন,—মহারাজের জয় হউক ! আপনার ক্ষমাগুণে বিজয়লক্ষ্মী বরাভয় করে আপনাকে বরণ করিবেন।

রাজা কহিলেন,—আরও একজন বন্দীর বিচার করিবার আছে। সে ভার আপনার উপর।

আরাতামা ডাকিলেন,—উরীম !

উরীম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। আরাতামা বলিলেন,—রুদেলাকে ডাক।

রুদেলা আসিলেন। নিরস্ত্র। রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাপতির প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন না।

আরাতামা কহিলেন,—মহারাজ, রুদেলার প্রতি কি আদেশ ?

রাজা রুদেলাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই মনোহর কান্তি, রূপবান যুবক দস্যুপতি, যুদ্ধে অমিত বিক্রম শূর বীর! রাজা কহিলেন,—রুদেলা, যুদ্ধে তুমি বন্দী হও নাই, আমার সেনাগণ তোমাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। তুমি এত বড় বীর কিন্তু আরাতামা রমণী হইয়াও তোমাকে বন্দী করিয়াছেন, এ কথা সত্য ?

—সত্য, মহারাজ।

—ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি। আরাতামা তোমাকে অপর শাস্তি দিবেন না, আমিও দিব না। তুমি স্বচ্ছন্দে যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার।

সেনাপতি সবেগে কহিলেন—মহারাজ!

রাজা সেনাপতির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—সেনাপতি আপনার বিস্মৃতি হইতেছে। আমার আদেশের উপর আপনি কথা কহিতেছেন ?

সেনাপতি স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

রুদেলা যুক্তকরে, গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—মহারাজ, শাস্তিতে দেহের যাতনা হয়, হৃদয়ে আঘাত লাগে না। আপনার ক্ষমাগুণে আজ আমি সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিতেছি। আপনি মহৎ, আমি দুর্ব্বৃত্ত দস্যু। আজ হইতে আমি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিলাম। অনুমতি হয় এখানেই বাস করিব। যদি কখন বিশ্বাসের উপযোগী বিবেচনা করেন, তাহা হইলে রাজাজ্ঞা মস্তকে বহন করিব।

রাজা কহিলেন, তোমার কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। শীঘ্রই তোমাকে কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিয়োগ করিব।

আরাতামা কহিলেন,—আর একটি কর্ম্ম বাকি আছে। আমার পরিচারিকা বাষ্টী বিশেষ অপরাধিনী না হইলেও দোষী বটে, তাহাকেও আপনাদের সাক্ষাতে ক্ষমা করা আমার কর্ত্তব্য।

উরীম আরাতামার আদেশে বাষ্টীকে ডাকিয়া আনিল। বাষ্টীর পূর্ব্বেকার সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ, অঙ্গের সংস্কার নাই। চক্ষের দৃষ্টি অস্থির, হাত বস্ত্রের মধ্যে। আরাতামা যেদিকে পৃষ্ঠ দিয়া বসিয়াছিলেন সেইদিক দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আরাতামা কহিলেন,—বাষ্টী, মহারাজের ও আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও।

বাষ্টী বেগে আরাতামার পশ্চাতে গিয়া, বস্ত্র হইতে ছুরি বাহির করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে বিদ্ধ করিল। আরাতামা কাতরোক্তি করিয়া একপাশে হেলিয়া পড়িলেন।

গালিম লাফ দিয়া বাষ্টীকে ধরিয়া তাহার হস্ত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইলেন। ছুরি রক্তমাখা। বাষ্টী বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। উন্মাদের হাসি।

রাজা অস্থির হইয়া রুদেলাকে কহিলেন,—বাষ্টীকে বাঁধিয়া রাখ। সেনাপতি আপনি আমার যন্ত্ররথে গিয়া এখনি রাজচিকিৎসককে লইয়া আসুন।

বেথর আসিয়া বাষ্টীকে লইয়া গেল। শেমিদা ছুটিয়া আসিয়া, কাঁদিয়া আরাতামার সম্মুখে আছাড়িয়া পড়িল।

আরাতামার মুখ ক্লিষ্ট, পাংশুবর্ণ, চক্ষের জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিতেছে। রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—মহারাজ, বাষ্টীকে ক্ষমা করিবেন।

রাজার চক্ষু উদ্বেলিত হইয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। কহিলেন,—করিব।

আরাতামার মুখ দেখিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যু আসন্ন। ছুরি মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়াছে।

আরাতামা আবার কহিলেন,—আমার কটিদেশে বহুমূল্য রত্ন আছে, সেগুলি লোবানকে দিতে আদেশ করিবেন।

—করিব।

রাজচিকিৎসক আসিলেন। কি করিবেন ? রাজকন্যা সাফিরা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিলেন।

আরাতামা স্থির। নিশ্বাসে একটু কষ্ট, চক্ষের আলোক দেখিতে দেখিতে নিভিয়া আসিতেছে। মুখে একটু হাসির আভাস। কহিলেন,—এই এত দর্প, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতাম না, এক মুহূর্ত্তে সব ফুরাইল। একটা দাসীর হাতে মৃত্যু! কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহারই শাস্তি? হইবে। হয়ত একটু পরে জানিতে পারিব, হয়ত পারিব না। আঃ!

সূর্য্য অস্ত যায়। মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ঈষৎ লোহিত আভা আরাতামার মুখে পড়িয়াছে। বাহিরে নিসর্গ

স্তব্ধ, ঘরেও সকলে স্তব্ধ। রাজকন্যা নিঃশব্দে রোদন করিতেছিলেন, শেমিদা একপাশে বসিয়া নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতেছিল।

—রুদেলা! আরাতামা অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন। রুদেলা অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়াছিলেন। সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন। আরাতামার চক্ষে মৃত্যুচ্ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। কহিলেন,—ভাল দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকার করিয়া আসিতেছে। তোমার সঙ্গে শেষ কথা। তোমার কথার উত্তর দেওয়া হইল না।

একটি ছোট নিশ্বাস, তাহার পর সব ফুরাইয়া গেল। সে হাসিটুকু আরাতামার মুখে লাগিয়া রহিল।

তাঁহার রহস্য তাঁহার সঙ্গে গেল।

সমাপ্ত

রসায়নে দৈবঘটনার প্রভাব

অধ্যাপক শ্রী আনন্দকিশোর দাশ

কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে প্রভূত গবেষণার প্রয়োজন। বহু যত্ন ও অধ্যবসায়, বহু সংযম, সাধনা ও একাগ্রতার পরই সাধক সফলকাম হইতে পারেন। কোন কোন স্থলে দেখা যায় আকস্মিক দৈবঘটনাও ফললাভে সহায়তা করে। আমার প্রবন্ধে ঐরূপ কয়েকটি কৌতুকাবহ আবিষ্কারের ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা প্রধানতঃ রাসায়নিক আবিষ্কারেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

নীল রং আবিষ্কারের ইতিহাস

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা ও বিহার অঞ্চলে বিস্তর নীলের চাষ হইত।

১৮৮৪-৮৫ সনে ভারতবর্ষে ৮,৯৭,৯১৭ একর জমিতে নীলের চাষ ছিল, ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ১৮৯৬—৯৭ সনে উহা ১৫,৮৩,৪০৪ একরে পরিণত হয়। নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে তৎ তৎ অঞ্চলের কৃষককুল জর্জ্জরিত ছিল। ৺দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কিন্তু নীলের চাষ কমিতে কমিতে ১৯১২ সালে ২,১৪,৫০০ একর জমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের ন্যায় অন্যান্য দেশেও নীলের চাষ এই হারে কমিয়াছে।

তবে কি নীলের কার্য্যকারিতার হ্রাস হইল? তাহা নহে। বরং সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীল রঙের আবশ্যকতা বাড়িয়াছে। তবে যে নীল পূর্ব্বে মাতা বসুমতী হইতে আহরিত হইত, তাহা আজকাল রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়। এই আবিষ্কার প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটি আশ্চর্য্য দৈবঘটনার সমাবেশ দেখা যায়।

ন্যাপ্‌থিলিন্ গুটিকা আজকাল সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়; এই ন্যাপ্‌থিলিন্ হইতে সঞ্জাত 'থ্যালিক্ এসিড্' নীল রং'র অন্যতম প্রধান উপকরণ। ন্যাপ্‌থিলিন্‌কে সাল্‌ফরিক্ এসিড্ যোগে সিদ্ধ করিলে 'থ্যালিক্' এসিড্ হয় বটে, কিন্তু ইহার পরিমাণ এত সামান্য এবং এই প্রক্রিয়া এত সময়সাপেক্ষ যে ব্যবসায়-হিসাবে উহাতে কোন লাভ টিকে না; জর্ম্মাণ রাসায়নিক বেয়র সাহেব এই পরিবর্ত্তনটিকে শীঘ্রগামী ও অল্পায়াস-সাধ্য করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতেছিল না। একদা ন্যাপ্‌থিলিন্‌কে সাল্‌ফরিক্ এসিডে সিদ্ধ করিবার সময় তিনি তাহার তাপমান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার হস্তস্থিত তাপমান যন্ত্রটি ভাঙিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেয়র সাহেবের ভাগ্যবিধাতা সুপ্রসন্ন হন। কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈয়ারী করার সুলভ পন্থা আবিষ্কৃত

…। বুঝিবা "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকরের" …তর ক্রন্দন বিধাতার কর্ণকুহরে পৌঁছিয়া তাঁহাকে বিচলিত …রিয়াছিল। তাই তিনি এই দৈবঘটনা ঘটাইয়াছিলেন।

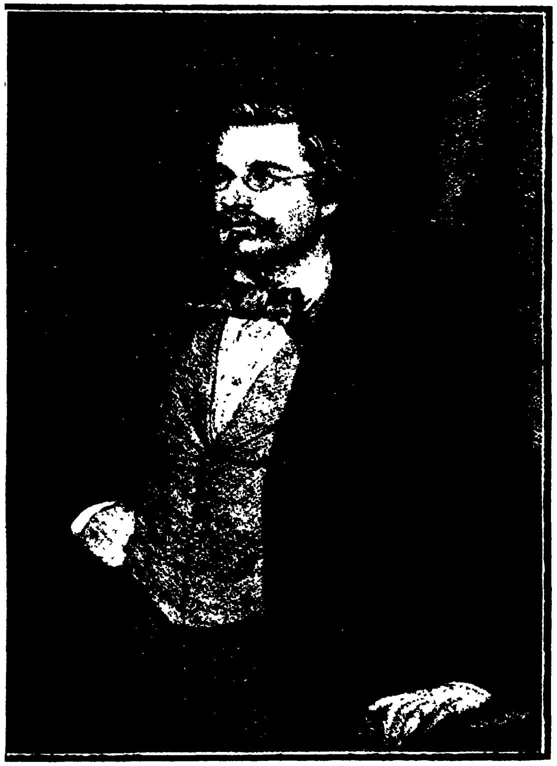
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ন্যাপ্‌থিলিন্‌ হইতে "নীলের" প্রধান উপকরণ থ্যালিক্‌ এসিড্‌ তৈয়ার করাই ছিল …য়ার সাহেবের উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু সাল্‌ফরিক্‌ যোগে তাহা সুকর হইতে ছিল না। তাপমান যন্ত্রটি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পরিবর্ত্তনটি কেমন সহজ হইয়া গেল।

প্রভূত পরিমাণে "থ্যালিক্‌ এসিড্‌" প্রস্তুত হইল। কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, ভগ্ন তাপমান যন্ত্রের পারদের সংস্পর্শে এই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। ন্যাপথিলিন ও সাল্‌ফরিক্‌ এসিডের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ পারদ মিশ্রিত হইলে অতি সহজে ও অল্প সময়ে প্রভূত পরিমাণ থ্যালিক্‌ এসিড প্রস্তুত হয়।

ডাইনেমাইট্‌

সুইডেন্‌-নিবাসী নোবেল্‌ সাহেব সাহিত্য, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কর্ত্তাদের জন্য বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীতে এই দানের তুলনা খুব কমই আছে। এত দানের উপযোগী অর্থ তিনি কোথা হইতে সঞ্চয় করিলেন? নোবেল্‌ সাহেব ছিলেন একজন রাসায়নিক, তাঁহার আবিষ্কৃত ডাইনেমাইট্‌, ব্লাষ্টিং জিলেটিন্‌, প্রভৃতি বিস্ফোরক তাঁহার এই অপরিমেয় অর্থাগমের অন্যতম কারণ বটে। এই বিস্ফোরক দুইটির আবিষ্কারের ইতিহাস বড়ই কৌতুকপূর্ণ।

গ্লিসারিন্‌ সকলেরই পরিচিত। ইহাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা নোবেল সাহেব নাইট্রোগ্লিসিরিন্‌এ পরিণত করেন। নাইট্রোগ্লিসিরিন একটি দ্রব পদার্থ এবং ইহার বিস্ফোরণ ক্ষমতা খুব বেশী, কিন্তু দ্রব বলিয়া ইহার ব্যবহারে বড় অসুবিধা এবং নাড়াচাড়া বিশেষ আশঙ্কাজনক। কাজেই এই ভয়ঙ্কর পদার্থ কোথাও পাঠাইতে হইলে উহাকে বোতলে ভরিয়া ঐ বোতল কাগজে কিংবা করাতের গুঁড়াদ্বারা বিশেষ সতর্কতার সহিত প্যাক্‌ করিয়া তবেই পাঠান সম্ভব হইত। একদিন ঘটনাক্রমে ঐ প্যাক্‌ করা অবস্থাতেই একটি বোতল ভাঙিয়া সমস্ত নাইট্রোগ্লিসারিন বালিতে ছড়াইয়া পড়ে। এই দুর্ঘটনার কারণ প্যাকারের অসতর্কতা; কিন্তু এই অসতর্কতাই ডাইনেমাইট্‌ আবিষ্কারের পন্থা সুগম করিল। কারণ দেখা গেল যে, ঐ আর্দ্র বালিও অনেকটা নাইট্রোগ্লিসারিন্‌এর



প্রোফেসর হফ্‌ম্যান্‌

বিস্ফোরক ধর্ম্ম পাইয়াছে। তখন হইতেই স্থানান্তরে পাঠাইবার সময় এই তরল নাইট্রোগ্লিসিরিন্‌কে না পাঠাইয়া তদ্বারা সিক্ত বালি কিংবা ক্রিস্‌ক্রাইট্‌ নামক একপ্রকার সচ্ছিদ্র প্রস্তর পাঠান হইত। নাইট্রোগ্লিসিরিনে সিক্ত ক্রিস্‌ক্রাইট্‌কেই ডিনেমাইট্‌ কহে।

ব্লাষ্টিং জিলেটিন্‌—

কিন্তু দেখা গেল যদিও ডিনেমাইট্‌ নাইট্রোগ্লিসিরিন্‌-এর বিস্ফোরক ধর্ম্ম যথেষ্ট পরিমাণে পায়, তবু তাহা সর্ব্বাংশে পায় না। ইহার বিদারণ ক্ষমতা নাইট্রোগ্লিসিরিন্‌ হইতে অপেক্ষাকৃত কম। নোবেল্‌ সাহেব তাহাও দূরীকরণে

কৃতসংকল্প হইলেন। একটি দৈবঘটনা তাঁহাকে সহায়তা করিল।

তূলা জাতীয় পদার্থকে রাসায়নিকগণ সেলুলুস্ কহেন। গ্লিসিরিন্‌কে যেমন নাইট্রোগ্লিসিরিন্ করা যায়, তেমনি সেলুলুস্‌কেও নাইট্রো-সেলুলুসে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহারাও বিস্ফোরক ধর্ম্মাবলম্বী বটে। তবে নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য এই যে, ইহারা কঠিন পদার্থ, তরল নহে। ইহাদিগকে গান্ কটন্ বলে—ইহাই ধূম্রহীন বারুদের মূল পদার্থ। ইহারা ইথর বা এল্‌কহলে গলিয়া গেলে কলোডিয়ন্ কহে। ইথরে দ্রবীভূত নাইট্রোসেলুলুস্ খোলা পাত্রে থাকিলে ইথর বাষ্পীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা কঠিন হইয়া যায়। এইজন্য কাটা জায়গা বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে কলোডিয়ন্ দ্বারা উহা আবৃত করা বড় সুবিধা। একটু নাইট্রোসেলুলুস্ ইথরে ভিজাইয়া তরলীভূত জিনিষটি কাটাস্থানের উপর ২।১ ফোটা দেওয়া হয়, দেখিতে দেখিতে উহা কঠিন হইয়া যায়, জায়গাটিও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত হয়।

একদা নোবেল্ সাহেব রসায়নাগারে গবেষণায় ব্যাপৃত, দৈবাৎ কাচ লাগিয়া তাঁহার একটি আঙুল কাটিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি কাটা আঙুলটিতে ইথরে ভিজান গান্ কটন্ ছড়াইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে স্থানটি আবৃত হইয়া গেল। কিন্তু, এই আবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষের কপাট খুলিয়া গেল। ফলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিস্ফোরক ব্লাষ্টিং জিলেটিন্-এর আবিষ্কার সম্ভব হইল! তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, দ্রব নাইট্রো-গ্লিসিরিন্ ইথরে সিক্ত নাইট্রোসেলুলুসের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে, ইথর বাষ্পীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে মিলিয়া হয় ত একটি কঠিন পদার্থে পরিণত হইতে পারে—যেমন ইথর সহযোগে তরলীভূত কলোডিয়ন্ তাঁহার কর্ত্তিত অঙ্গুলির উপর ক্রমে কঠিন হইয়াছে। তিনি পরীক্ষার্থে উভয় পদার্থ মিশ্রিত করিলেন—'জেলী' জাতীয় 'না-কঠিন-না-তরল' একটি পদার্থ প্রস্তুত হইল—তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অতুলনীয় বিস্ফোরক ব্লাষ্টিং জিলেটিন্ ও কর্‌ডাইট আবিষ্কৃত হইল। কিয়েসেরাইট্ নাইট্রোগ্লিসিরিনের বিদারণ-ক্ষমতা যেটুকু অপহরণ করিয়াছিল, কলোডিয়ন্ তাহার দ্বিগুণ ক্ষমতা জোগাইল—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাইট্রো-গ্লিসিরিনের ন্যায় কলোডিয়ন্ (স্মোকলেস পাউডার)ও বিস্ফোরক ধর্ম্মাবলম্বী বটে। এক নাইট্রোগ্লিসিরিন্ বা ডিনেমাইটই যথেষ্ট, তাহার সঙ্গে যখন নাইট্রোসেলুলুস্ যুক্ত হইল, তখন ইহাদের সংমিশ্রিত বিদারণ-ক্ষমতার নিকট পৃথিবীর সমস্ত কঠিন পদার্থ পরাভূত হইল—আল্পসের ন্যায় পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিয়া উহার মধ্য দিয়া ৯॥০ মাইলব্যাপী সেণ্ট গথার্ড, ১৩ মাইলব্যাপী সিম্প্লন প্রভৃতি প্রস্তুত সম্ভব হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কর্ত্তা ইহাও বুঝিলেন, জগতের শান্তিভঙ্গের, যুদ্ধবিগ্রহ ঘটাইবার সম্ভাবনাও বাড়িল। তাই বুঝি নোবেল সাহেব "শান্তির" জন্যও একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

কয়লা আলকাৎরা (কোল্ টার্) রং ও এনিলাইন্ রং

কলোম্বাস্ খুঁজিতে বাহির হইলেন ভারতবর্ষ, আর আবিষ্কার করিয়া বসিলেন আমেরিকা; এমনধারা একটি জিনিষ খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘটনাচক্রে তদপেক্ষা মূল্যবান্ অপর কিছু আবিষ্কারের ইতিহাস রসায়নশাস্ত্রে বিরল নহে।

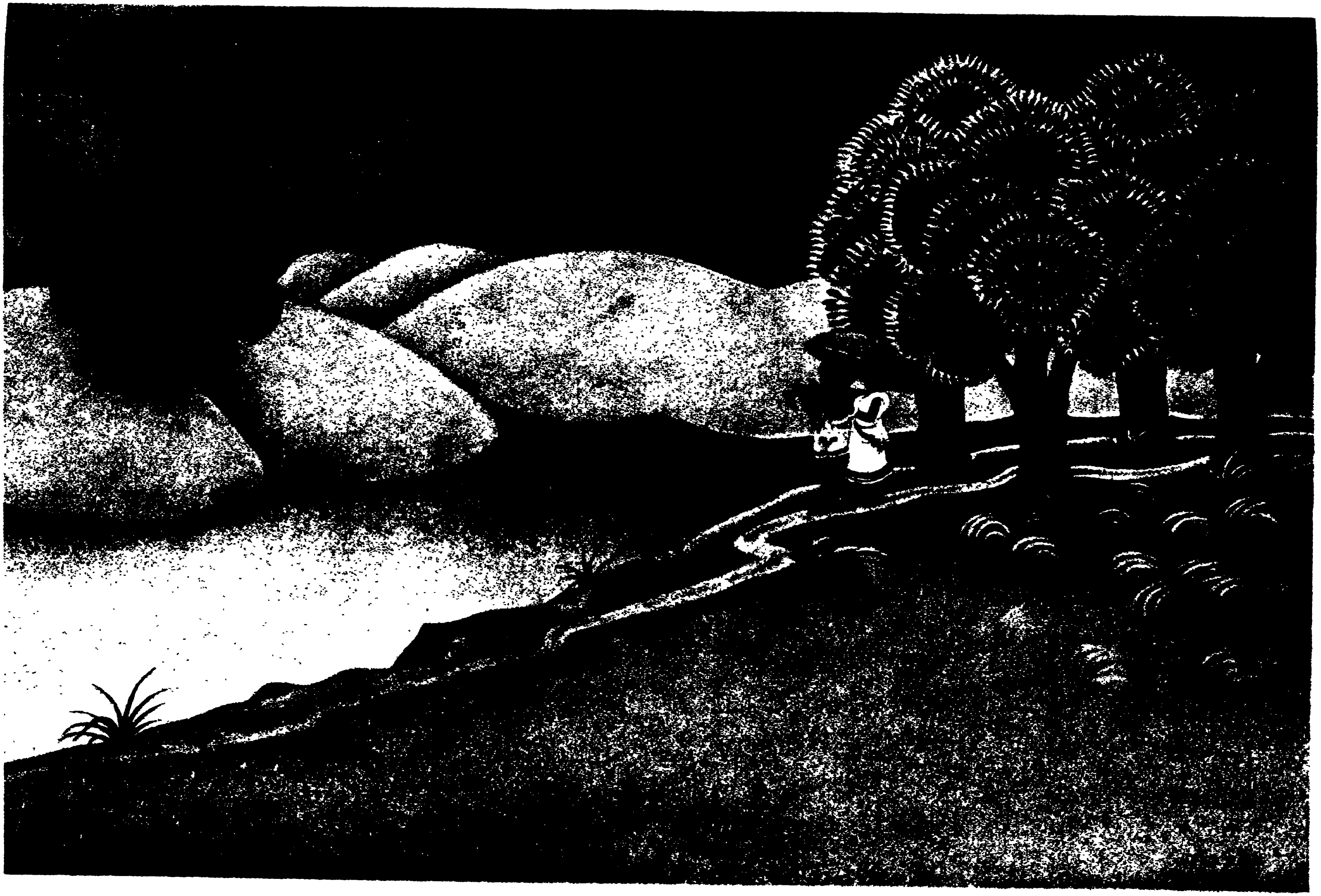
পার্কিন্ নামক জনৈক ইংরেজ রাসায়নিক কুইনাইন তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘটনাচক্রে মভ্ নামক একটি অতি মূল্যবান্ রঞ্জন পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারে আলকাৎরা (কোল্ টার) হইতে রঞ্জন পদার্থ তৈয়ারের সূত্রপাত হয়।

কোল্ টার

কয়লা-আল্‌কাৎরা কাহাকে বলে সকলেই জানেন। জিনিষটি দেখিতে নোংড়া হইলেও বড় মূল্যবান্। ইহা হইতে যে কত সুন্দর সুন্দর রং, কত সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য, কত মূল্যবান ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অধুনা যেসব রঞ্জন পদার্থ প্রচলিত, তাহাদের অর্দ্ধেকের অধিক কয়লা-আল্‌কাৎরা হইতেই উদ্ভব, এবং সে হিসাবে পার্কিন্ সাহেবকে কয়লা আলকাৎরা-রংএর জন্মদাতা বলা যায়।

লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব্ সায়েন্স-এ হফ্‌ম্যান নামক জনৈক জর্ম্মান রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক পার্কিন তাঁহার অধীনে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত



প্রান্তর-পথ

শ্রী যদুপতি বসু

হন। পার্কিনের রসায়নে এত অনুরাগ ছিল যে, দুপুরে আহারের সময়ে তিনি খাইতে না গিয়া সেই সময়টুকু রসায়নের অতিরিক্ত বক্তৃতা শুনিতে ব্যয় করিতেন। হফ্‌ম্যান সাহেব পার্কিন্‌কে কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন্‌ তৈয়ার করার গবেষণায় নিযুক্ত করেন। কয়লা-আলকাৎরা হইতে উৎপন্ন এনিলাইন নামক একটি পদার্থকে প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা কুইনাইনে পরিণত করার সম্ভাবনা হইতেই এই গবেষণার সূচনা ঘটে। দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পার্কিন্‌ সাহেব সফলকাম হইতে পারিলেন না। অনেকেই এ অবস্থায় অসম্ভব মনে করিয়া উহা ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিত—কিন্তু পার্কিন্‌ সাহেব সে ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। আরও অতিরিক্ত খাটিবার জন্য নিজের আবাসগৃহে একটি ছোট গবেষণাগার তৈয়ার করিয়া পার্কিন্‌ সাহেব ছুটির সময়ও গবেষণা চালাইতে আরম্ভ করেন। এত যাঁহার উদ্যম, তাঁহার সাধনা এক রকমে না এক রকমে সিদ্ধ হইবেই। একদা ঐ সংক্রান্ত কাজ করিতে করিতে কতকগুলি কাদা কাদা কালো জিনিষ বাহির হইল। সাধারণতঃ ঐ প্রকার জিনিষ ফেলিয়াই দেওয়া হয়,কিন্তু পার্কিন সাহেব উহা না ফেলিয়া এল্‌কহল্‌ দিয়া উহা ধুইতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, যতই ধুইতেছেন ততই ঐ কালো জিনিষ হইতে একটি লাল রং বাহির হইতেছে। যত না ঘষেন, মাজেন, তবু লাল। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পার্কিন্‌ দেখিতে পাইলেন যে,এনিলাইনে টোলুইডাইন্‌ নামক একটি পদার্থ মিশ্রিত ছিল এবং তাহা হইতেই এই লাল রংএর রঞ্জন পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অধুনা মৌভ্‌ নামে পরিচিত। ঘটনাক্রমে এনিলাইন্‌ বিশুদ্ধ না থাকিয়া টোলুডাইন্‌ সংযুক্ত থাকাতেই এই আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল। কোথায় তিক্ত কুইনাইন্‌, আর কোথায় উজ্জ্বল লালবর্ণের রঞ্জন পদার্থ!

গ্যাসের তরলীকরণ

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের ন্যায় এক খুঁজিতে আর এক জিনিষের আকস্মিক আবিষ্কারের আর একটি উদাহরণ দিতেছি।

বাষ্প ও বায়বীয় পদার্থে একটি তথাকথিত মনগড়া পার্থক্য আছে। যাহা সহজে তরল হয় তাহাই বাষ্প, যথা জলীয় বাষ্প; যাহা সহজে তরল হয় না তাহা বায়ু, যথা অম্লজান, যবক্ষারজান, ইত্যাদি। ফ্যারাডে সাহেব প্রমাণ করেন যে, সমস্ত বায়বীয় পদার্থই মূলতঃ তরল পদার্থ বটে। তাঁহার গবেষণার মূলে বায়বীয় পদার্থ মাত্রকেই তরল পদার্থে পরিণত করার পন্থা আবিষ্কৃত হয়। অধুনা এমন-সব যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, যে, উহাদের সাহায্যে যত খুসী তরল বায়ু* প্রস্তুত করা সম্ভব।

ফ্যারাডে সাহেব একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। তিনি বিখ্যাত স্যার হাম্‌ফ্রি ডেভির সহকারী ছিলেন। দপ্তরীর কাজের শিক্ষানবিশী হইতে স্বকীয় উৎসাহ ও জোগাড়ে তিনি ডেভি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি ডেভি সাহেব অপেক্ষাও বোধ হয় বড় বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন।

ক্লোরিন্‌ নামক বায়ু বরফজলে চালাইলে উহা বরফজলের সঙ্গে মিশিয়া একটি কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই জিনিষটির প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজে নানারূপ মতদ্বৈধ ছিল। ডেভি সাহেব ফ্যারাডেকে এই সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত করেন। একটি কাচের নলের বদ্ধদিকে ঐ কঠিন জিনিষটি রাখিয়া তাহাকে উত্তপ্ত করিয়া উহার ধর্ম্মাবলী পরীক্ষা করিবেন, এই ছিল ফ্যারাডে সাহেবের উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্যে জিনিষটি নলের ভিতর রাখিয়া অপর দিক বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দিতে আরম্ভ করেন। ডাক্তার প্যারিস্‌ নামক জনৈক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক দেখিতে পাইলেন যে, ফ্যারাডের নলের মধ্যে তৈলাক্ত একটি জিনিষ রহিয়াছে। ফ্যারাডে নলটি ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিয়াই গবেষণা করিতেছে, এই ধারণা হইতে ডাক্তার প্যারিস তাঁহাকে অনুযোগ দিলেন। ফ্যারাডে জানিতেন উহা নলের ময়লা নহে, তবু তিনি সবে নবদীক্ষিত আর, ডাক্তার প্যারিস একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, এ অবস্থায় ভরসা করিয়া ডাঃ প্যারিসের কথার প্রতিবাদ করিতে তিনি সাহস পাইলেন না। পরে যখন তিনি বদ্ধ নলের একটি

* তরল বায়ু কথাটা 'সোনার পিতলের কলসের' ন্যায় শোনায়, কিন্তু উপায় নাই।

মুখ উন্মুক্ত করিলেন, অমনি একটি ভীষণ শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ তৈলাক্ত জিনিষটি অন্তর্হিত হইয়া গেল। ব্যাপার কি? আবার পরীক্ষা করিলেন, আবার সেই শব্দ। ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, যে, ঐ তৈলাক্ত জিনিষ আর কিছুই নহে—উহা তরলীভূত ক্লোরিন্ বায়ু মাত্র। চাপ ও শৈত্য যোগে উহা তরলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; নলের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে চাপ অন্তর্হিত হইল, তরলীভূত বায়ুও পুনরায় নিজ অবয়ব ধারণ করিয়া প্রস্থান করিল। এই আবিষ্কারে এক নূতন গবেষণার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—ক্রমে রসায়ন-শাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইল।

স্যাকেরিন্

ঐ জাতীয় আবিষ্কারের আর একটি দৃষ্টান্ত মধুর চেয়েও মিষ্টি স্যাকেরিন্।

একদা ইরা রেম্‌সেন্ নামক একজন আমেরিকাবাসী রসায়নবিৎ আল্‌কাৎরা লইয়া কিছু কাজকর্ম্ম করার পর ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে ফিরেন ও গৃহস্বামিনীকে কিছু খাবার দিতে বলেন। বাটীতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, যাহাতে হাত দেন তাহাই ভয়ানক মিষ্টি—এত মিষ্টি যে একেবারে অখাদ্য। তিনি চটিয়া ল্যাণ্ডলেডীকে খুব গালমন্দ দিলেন। সে বেচারী দোহাই দিয়া বলিল, "রুটীতে মোটেই বেশী মিষ্টি দিই নাই, রোজ যেমন দিয়া থাকি তেমনই দিয়াছি।" কিন্তু কে বিশ্বাস করে? ঘটনাচক্রে খাওয়ার সময় রেম্‌সেন্ সাহেবের হাতের একটি আঙুল মুখে লাগাতে তাহাও বিষম মিষ্টি লাগিল। অগত্যা হাত ধুইয়া আবার খাইতে বসিলেন,—তবু মিষ্টি। আবার ধুইলেন, খুব রগড়াইয়া ধুইলেন, তবু মিষ্টত্ব কমে না, কি বিপদ! হাতের ময়লা কি উঠিবেই না? তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল, অমনি ল্যাবরেটরিতে ছুটিলেন—যেসব জিনিষ লইয়া কাজ করিতেছিলেন প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন দাগ দিলেন এবং উহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে এমন একটি জিনিষ বাহির হইল, যাহার সঙ্গে মিষ্টত্বে চিনিও হার মানে। বস্তুতঃ এই আবিষ্কৃত জিনিষ স্যাকেরিন্—চিনি হইতে তিনশত গুণ অধিক মিষ্ট। বিগত মহাসমরের সময় যখন চিনির অভাব হইয়াছিল, তখন স্যাকেরিন্ অনেকস্থলে চিনির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।

আলোকচিত্র

আলোকচিত্র কাহাকে বলে সবাই জানেন। ক্যামেরাতে প্লেট বসাইয়া কয়েক নিমেষ সম্মুখে ধরিলাম—ব্যস ছবি উঠিয়া গেল। কিন্তু এই নিমেষের ব্যাপার করিতে,—এই যে "ব্যস্", ইহার সমস্যা সমাধান করিতে কত পরিশ্রম, কত উৎকণ্ঠা, কত বিফলতা গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ আলোকচিত্র আবিষ্কারক ডেগুরে সাহেবের রকম-সকম দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী এত ভীতা ও সন্ত্রস্তা হইয়া পড়েন যে, তিনি একদা জনৈক ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী প্রকৃতিস্থ আছেন, না পাগল হইয়াছেন? কারণ এই ব্যাপারটিকে কার্য্যকরী করিবার চেষ্টায় ডেগুরে সাহেব দিনের অধিকাংশ সময় রসায়নাগারেই কাটাইতেন। তিনি জাতিতে ফরাসী, তাঁহার ব্যবসায় ছিল রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট আঁকা। ক্রমে ছবি স্থায়ী করার প্রচেষ্টা তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

তিনি জানিতেন সিল্‌ভার নাইট্রেট আলো লাগিলে কাল হইয়া যায়। একদা একখানা রূপার থালায় আইওডাইন বাষ্প রাখিয়াছেন—পার্শ্বে ঘটনাক্রমে একটা চামচে ছিল। তিনি দেখিয়া অবাক্ হইলেন যে, তাঁহার থালাখানাতে চামচের একটি কাল ছায়া বসিয়া গিয়াছে। ক্রমে পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারিলেন যে, আইওডাইন বাষ্প-সংযুক্ত রূপার থালা সহজে আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে পারে। তবে তাহা বড়ই সময়সাপেক্ষ। বহুক্ষণ সূর্য্যের কিরণে রাখিলে তবেই প্রতিকৃতি বসে বটে। একদা তিনি চিত্র তুলিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আইওডাইন বাষ্পে এক খানা রূপার থালা সূর্য্যের কিরণে দিয়াছেন, অকস্মাৎ একখণ্ড মেঘ সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া ফেলিল; সূর্য্যদেবের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া অগত্যা মনোদুঃখে পাত্রখানা একটি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। সেই দেরাজে একটি খোলা পাত্রে খানিকটা পারদও

ছিল। অদৃষ্ট যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর সমাবেশ হয় বটে। ডেগুরে পরদিন প্লেটখানা বাহির করিয়া দেখিলেন, উহাতে সুন্দর একটি ছবি রহিয়াছে, ব্যাপার কি? প্লেটখানা অতি অল্প সময় মাত্র সূর্য্যের আলোকে ছিল, তবু ইহাতে কেমন ছবি উঠিয়া গিয়াছে! অথচ অন্যান্য দিন কত দীর্ঘ সময় উহা সূর্য্যকিরণে রাখিতে হইত। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, ছবি তুলিবার জন্য দীর্ঘকাল প্লেট সূর্য্যকিরণে রাখার আবশ্যকতা নাই। অতি অল্প সময় রাখিলেই উহাতে একটি অস্পষ্ট ছায়া পড়ে। ঔষধের সাহায্যে অতি অল্প আয়াসে সেই ছায়াকে স্পষ্ট করা যাইতে পারে। উপস্থিত ক্ষেত্রে দেরাজের পারদ বাষ্প এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। আলোক-চিত্রকরগণ এই প্রক্রিয়াকে পরিস্ফুট করা বা ডেভেলপ করা বলেন। আজ-কাল পারদের পরিবর্ত্তে নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অস্পষ্ট ছায়াকে সহজে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারা যায়।

বেকেরেল রশ্মি

সূর্য্যদেবের সাময়িক করুণার অভাব কিরূপে আরও একটি মহদাবিষ্কারের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহার বিবরণ দিতেছি।

সকলেই এক্স্ রে বা রঞ্জন-রশ্মির নাম অবগত আছেন। একটি কাঁচের নল হইতে বায়ু যথাসম্ভব নিষ্কাশিত করিয়া, তাহাতে তাড়িতের চালনা করিলে নলের একপ্রান্ত হইতে একরূপ অতি তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃকণা নির্গত হয়, ইহা বহু অস্বচ্ছ, কঠিন, তমোময় পদার্থকে ভেদ করিতে পারে। উহারা নিজে অদৃশ্য থাকিয়াও পদার্থ-বিশেষকে জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলে, এমন কি কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আবৃত আলোকচিত্রের প্লেটকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে পারে। এই জ্যোতির ধারাকে এক্স্ রে বা রঞ্জন-রশ্মি কহে।

পদার্থ-বিশেষকে সাময়িকভাবে জ্যোতিষ্মান করিবার ক্ষমতা সূর্য্যকিরণেও বিদ্যমান আছে। কেল্‌সিয়ম্ সাল্‌ফিড্, বেরিয়ম্ সাল্‌ফিড্ প্রভৃতিকে যদি কিয়ৎক্ষণ প্রখর সূর্য্যকিরণে রাখা যায়, তবে তাহাদের অণুগুলি এমন উত্তেজিত হয় যে, উহারা অন্ধকার গৃহে আলোক বিকীরণ করিতে পারে। এই আলোকরশ্মির মধ্যে



মাইকেল ফ্যারাডে

এক্স্ রের ন্যায় অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা-যুক্ত তীক্ষ্ণ রশ্মিকণা বিদ্যমান আছে কি না এই সম্বন্ধে গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হন, বেকেরেল নামক জনৈক ফরাসী অধ্যাপক। তাঁহার পরীক্ষার প্রণালী ছিল এই প্রকার। কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আবৃত একখানা আলোক-চিত্রের পটের উপর এলুমিনিয়ম ধাতুনির্ম্মিত একটি পাত রাখিয়া তদুপরি পরীক্ষোপযোগী পদার্থরাশি রাখিতেন এবং তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময় প্রখর সূর্য্যকিরণে রাখিয়া তৎপর প্লেটখানা পরিস্ফুট করিতেন। পদার্থ-বিশেষ সূর্য্যকিরণে উত্তেজিত হওয়ার পর উহা হইতে নিঃসৃত রশ্মি নিম্নস্থ প্রতিলিপি প্লেটে কতদূর আক্রান্ত হইয়াছে, পরিস্ফুট করিলেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। পরীক্ষার ফলে ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, বরুণক ধাতু-সংযুক্ত পদার্থ সূর্য্যকিরণে ক্ষণিক জ্যোতিষ্মান হইলেও,

উহা হইতে নির্গত রশ্মিমালা খুব তীক্ষ্ণ ও ক্ষমতাশালী; উহারা প্রায় একস্‌ রের অনুরূপ প্রখর। একদা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সজ্জিত আলোকচিত্রের প্লেট, এলুমিনিয়ম প্লেট ও বরুণক সংযুক্ত পদার্থ সূর্য্যকিরণে রাখিয়াছেন,—হঠাৎ সূর্য্যদেব বিমুখ হইলেন। কিন্তু এই অবকাশে বেকেরেল্‌ সাহেবের অদৃষ্ট-দেবী সুপ্রসন্ন হাসি হাসিলেন—রেডিয়ম ধাতু আবিষ্কারের পন্থা উদ্‌ঘাটিত হইল। ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সজ্জিত জিনিষ তিনটি দেরাজের অভ্যন্তরে রাখিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। পরে একদিন দেরাজ খুলিয়া এবং বরুণক-সংযুক্ত প্লেটগুলি ঠিক সজ্জিত অবস্থায় পাইয়া নিম্নস্থ আলোকচিত্রের প্লেটখানা 'পরিস্ফুট' করিলেন এবং প্লেটখানা আক্রান্ত হইয়াছে দেখিলেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল, এই প্লেটগুলি সূর্য্যকিরণে সঞ্জীবিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই; তবে আলোকচিত্রের প্লেট কি প্রকারে আক্রান্ত হইল? তবে কি বরুণক-সংযুক্ত পদার্থকে সূর্য্য-কিরণে উত্তেজিত করার কোন আবশ্যকতা নাই? পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন,—ক্রমশঃ দেখিলেন বরুণক ধাতু-সংযুক্ত পদার্থরাশি হইতে স্বতঃই একরূপ রশ্মিধারা নির্গত হয়,—যাহারা এক্স রে ধর্ম্মাবলম্বী। সূর্য্যকিরণের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপ স্বতঃনির্গত কিরণধারাকে রেডিয়ো এ্যাক্‌টিভ্‌ রশ্মি কহে। ইহাই পরে মাদাম কুরির রেডিয়ম ধাতু আবিষ্কারের উপকরণ যোগাইয়াছিল।

রবার সংশ্লেষণ

নীলের ন্যায় রবারও উদ্ভিদ্‌-রাজ্য হইতে সংগৃহীত হয়। তবে নীলগাছ ছোট ছোট, আর রবার গাছ অশ্বত্থ বা বট গাছের ন্যায় প্রকাণ্ড। এই গাছে ছিদ্র করিয়া রাখিলে তাহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় একরূপ রস নির্গত হয়—উহাই ক্রমে রবারে পরিণত হয়। এই গাছ প্রধানতঃ ব্রাজিল রাজ্যে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, তবে জাভা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইহার বিস্তর আবাদ হইয়াছে।

বিগত মহাসমরের সময় মটর গাড়ী এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য এত রবার দরকার হয় যে, পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ্‌ রাজ্য তাহা সরবরাহ করিতে সক্ষম হয় নাই—তাই অনেকস্থলে এমনও হইয়াছিল যে অতিরিক্ত রবার আদায়ের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তদ্দেশবাসিগণকে মারিয়াছে, আবার অতিরিক্ত দুগ্ধ বা রস আহরণ করিতে গিয়া স্থানীয় লোকেরা গাছগুলি ধ্বংস করিয়াছে।

বৎসরে ২০০০,০০০,০০০ সেণ্ট মূল্যের রবার এক ব্রাজিল হইতে রপ্তানি হয়। রাসায়নিকগণ ভাবিলেন, যদি কোন উপায়ে নীলের ন্যায় রবারও তাঁহারা রসায়নাগারে প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে ঐ প্রচুর অর্থ তাঁহাদের হস্তগত হইবে। ঘটনাচক্রে ঐ স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করার এক সুযোগও উপস্থিত হইল।

ইংরেজ রাসায়নিক টিল্‌ডেন্‌ সাহেব একদা ইসোপ্রেন্‌ নামক একটি তরল পদার্থ শিশিতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই পদার্থটি তার্পিন তৈল হইতে উৎপন্ন হয়। কিছুদিন পরে টিল্‌ডেন্‌ সাহেব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, শিশিস্থিত ঐ তরল পদার্থ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে এবং পরীক্ষার ফলে জানিতে পারিলেন যে, ঐ জমাট-বাঁধা দ্রব্যটি রবার। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও উহা পুনরায় তৈয়ার করিতে পারিলেন না। তাহা হইলেও রাসায়নিক সমাজ একটা মস্ত নূতন তথ্য অবগত হইল যে, ইসোপ্রেন্‌ হইতে রবার প্রস্তুত করা সম্ভব। তখন দলে দলে ইংরেজ ও জর্ম্মান রাসায়নিকগণ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য হইল, কিরূপে এই প্রক্রিয়াটি কার্য্যে পরিণত করা যায়, কিরূপে কৃত্রিম রবার প্রস্তুত সম্ভব হয়।

ইংরেজ রাসায়নিকগণ পার্কিন সাহেবের অধীনে একটি দল গঠন করিলেন—ইঁহাদের প্রাণান্ত চেষ্টা এক দৈব ঘটনা-যোগে সফল হইল। মাথুস নামক পার্কিনের জনৈক সহযোগী ইসোপ্রেন্‌ শুকাইবার জন্য তাহা পত্রক-ধাতু-সংযুক্ত এক পাত্রে রাখিয়া দেন। কয়েক দিন পরে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, সমস্ত ইসোপ্রেন্‌ রবারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে ইসোপ্রেন্‌ হইতে কৃত্রিম উপায়ে পত্রক ধাতু-সাহায্যে রবার তৈয়ারী সম্ভব হইল বটে, কিন্তু বিপদ হইল এই যে, উদ্ভিদ্‌ রাজ্য রবার গাছের পরিবর্ত্তে পাইন গাছ হারাইতে বসিল—কারণ ইসোপ্রেন্‌ তৈয়ার করিতে তারপিন্‌ লাগে, আর এই তারপিন্‌ পাইন বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। কাজেই এই ব্যাপার নীলের

স্থায় ততটা সুবিধাজনক হইল না। তবে উদ্ভিদ্‌রাজ্য বাদ দিয়াও কৃত্রিম উপায়ে রবার তৈয়ারের পন্থা আছে, কিন্তু ঐ প্র্রক্রিয়াগুলি বড়ই ব্যয়সাধ্য।

এদিকে জর্ম্মান রাসায়নিকগণও এতকাল আলস্যে অতিবাহিত করেন নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে কার্য্য করিতে করিতে ইসোপ্রিন্ হইতে পত্রক-সাহায্যে কৃত্রিম রবার-প্রস্তুতের প্রণালী অধিগত করিলেন, কিন্তু পেটেণ্ট করিতে গিয়া আবিষ্কারকর্ত্তা হ্যারিস্ সাহেব দেখিলেন, মাত্র এক মাস পূর্ব্বে জনৈক ইংরেজ রাসায়নিক উহা পেটেণ্ট করিয়া গিয়াছেন। হ্যারিসের তখনকার মানসিক অবস্থা অনুমেয়।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পার্কিন সাহেবের পিতা স্যর হেন্‌রি পার্কিন্ এল্‌জারিন্ নামক একটি রঞ্জন পদার্থ বহু আয়াসে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া যখন উহা পেটেণ্ট করিবেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, জর্ম্মান রাসায়নিক গ্রাবে ও লিবরম্যান মাত্র একদিন পূর্ব্বে উহা পেটেণ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এবার ৪০ বৎসর পরে, তাঁহার পুত্র রবার-সংশ্লেষণ ব্যাপারে পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিলেন, জর্ম্মানিকে পরাজিত করিলেন।

রবার ভালকানাইজ করা

রবার বড় নরম, উহাকে শক্ত করিতে না পারিলে তেমন কার্য্যকরী হয় না। জনৈক জর্ম্মান রাসায়নিক তার্পিনে গন্ধক গলাইয়া তাহার সহযোগে রবার শক্ত করা যায়, ইহা আবিষ্কার করেন বটে; কিন্তু তবু উহা কার্য্যকরী করিতে পারেন নাই। আমেরিকাবাসী চার্লস্ গুড্ইয়ার সাহেব দশ বৎসর প্রচেষ্টার পর এক দৈবঘটনার সাহায্যে উহা কার্য্যকরী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৮৩৯ অব্দে তিনি একদা রবার ও গন্ধক লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছেন—হঠাৎ ঐ মিশ্রিত পদার্থ তাঁহার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। মাটীতে পড়িলে বিশেষ লাভ হইত না, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িল একেবারে জলন্ত চুল্লীর উপর। পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন যে, ঐ মিশ্র, গরম পদার্থ শক্ত অথচ সঙ্কোচ-প্রসারশীল হইয়া গিয়াছে। ক্রমে তিনি পরীক্ষার ফলে গন্ধক ও রবারের অংশের অনুপাতটি নির্দ্ধারিত করিলেন ও উহা পেটেণ্ট করিয়া সুবিখ্যাত গুডইয়ার কোম্পানী স্থাপন করিলেন, উহার বিজ্ঞাপন পথে-ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি আবিষ্কারের কাহিনী এইখানে উপস্থাপিত করা হইয়াছে; উহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি দৈব-ঘটনা জড়িত। এখন জিজ্ঞাস্য, এই সব আবিষ্কার কি কেবলই দৈবানুগ্রহে? ইহাদের মূলে কি আর কিছু নাই? এই আবিষ্কারগুলির নিগূঢ় কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই প্রত্যেক আবিষ্কারের সঙ্গে কত বিনিদ্র রজনীর, কত অভুক্ত অন্নের, কত বিফলতার ইতিহাস জড়িত আছে। কি প্রাণান্ত পরিশ্রম, কি অক্লান্ত অধ্যবসায়, কি অপরিসীম ধৈর্য্য প্রত্যেকটি আবিষ্কারের জন্য দায়ী। বীজবপন করিলেই তাহা ফলপ্রসূ হয় না, ক্ষেত্র উর্ব্বর হওয়া চাই, বীজ গ্রহণ ও ধারণের উপযোগী হওয়া চাই। 'টবে' আবহমান-কাল হইতেই মানবদেহ স্নাত হইয়া আসিতেছিল, তবু "আপেক্ষিক গুরুত্ববাদ" এক আর্কিমিডিস্ই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। "পতনশীল ফল" প্রত্যেক মানব-চক্ষুর দৃষ্টির সম্মুখেই পতিত হইয়াছে, কিন্তু "মাধ্যাকর্ষণবাদ" এক নিউটনই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐ মনীষিগণের ধ্যান-ধারণা ঐ বিষয়গুলির মধ্যে একান্ত-ভাবে অভিনিবিষ্ট ছিল এবং ছিল বলিয়াই এই আকস্মিক ঘটনা-পরম্পরা,—যাহা সাধারণের নিকট আপাতদৃষ্টিতে দৈবঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে—তাহা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিল, তাঁহাদের চিন্তার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মন কতটা তন্ময়, কতটা অভিভূত থাকিলে মানুষ প্রকাশ্য রাজপথে অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় উন্মত্তের ন্যায় "পাইয়াছি," "পাইয়াছি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে পারে (যেমন আর্কিমিডস্ করিয়াছিলেন), অথবা ক্ষুধাতৃষ্ণা সম্বন্ধে এতটা উদাসীন হইতে পারে যে, অপরকর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন নিজের ভুক্ত মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইতে পারে (যেমন নিউটনের হইয়াছিল)?

মহৎকাজে মহদাবিষ্কারে চাই অভিনিবেশ, চাই

একাগ্রতা, চাই অধ্যবসায়, চাই সুকৃতি। ইহা যাঁহাদের আছে, ভগবান তাঁহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠানের উপর তাঁহার শুভাশীষ বর্ষণ করেন। তাহাকে দৈব বলিতে পারি, আকস্মিক বলিতে পারি, কিন্তু চিরকালই "বিষ্ণুপদ" ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাণেই প্রেমের ফোয়ারা ফুটাইয়া তুলিবে, জরা-মরণ-ব্যাধি ভগবান বুদ্ধদেবের প্রাণেই বৈরাগ্যের তাড়না জাগাইবে—আমাদের মত লোকদের প্রাণে নহে।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও শতবর্ষ

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বহুদিন হইল সেই বক্তৃতা ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তক হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

"এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্ ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধাতে সমুজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। ধর্ম্মের উন্নতির জন্যই তিনি এখানে উদিত হন। * * প্রথম বয়সেই সাংসারিক সকল সুখ ত্যাগ করিয়া এক সত্যের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিলেন। এত অল্প বয়সে পরিব্রাজক হইয়া কঠোর হিমালয় ভেদ করিয়া ধর্ম্মের অপ্রতিহত অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতা দয়ালু হইয়া তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিলেন। একটি কি গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার কত কষ্ট করিতে হইল। কিন্তু তাহার দ্বারা তাঁহার আত্মার আরো উন্নতি হইল; তিনি জানিতে পারিলেন, আত্মার কত বল, আর সংসারের কি ক্ষুদ্রতা। তখন আরো তাঁর উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল এবং সেই নূতন উৎসাহের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃ-পুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন; যতদিন তাঁহার সে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ছিল, ততদিন তিনি তাহা নিপুণরূপে পালন করিতেন। যখন জানিলেন যে, অসীম জগতের ঈশ্বর অনন্ত, তখনি তিনি অনন্তের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেন—যেমন সত্য জানিলেন, অমনি সেই সত্যের অনুরোধে শরীর-মনকে ধাবিত করিলেন। * * তাহার পরে তিনি বিষয়-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, তাহা সমুদয় নিঃশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে নিক্ষেপ করিলেন। * * তাঁর জীবনের এই মহান্ লক্ষ্য ছিল যে, পৃথিবীর সকল লোকই কলহ-বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরাতন অনাদি ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। এই লক্ষ্য করিয়া তিনি কলিকাতা আসিয়া বাস করিলেন এবং এই সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে কোন ধর্ম্মের লোক হউক, এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন। দেখ তাঁর কেমন উচ্চ লক্ষ্য। * * ১৭৪১ শকে ব্রহ্মোপাসনার একটি সংক্ষেপ পুস্তক মুদ্রিত করিলেন—তার নাম অবতরণিকা। এই পুস্তকেতেই ব্রহ্মোপাসনার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ১৭৫০ শকে কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ রোপণ করেন। ১৭৫১ শকে এই স্থানে তাহা প্রতিরোপিত হয়। ১৭৫২ শকে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, এবং ১৭৫৫ শকে সেখানে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। * * রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা না করিয়াছিলেন, তাহার শতগুণ এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য তাঁহার করিতে হইয়াছিল—ইহার জন্য

শরীর মন সকলি দিয়াছিলেন। একদিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়িয়াছেন, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহার মূর্ত্তি ছবির মত চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; আর তিনি অল্প কথায় তাঁহার অনেকখানি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাই আমি রচনার প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, রামমোহন রায় মানবজাতির এবং স্বদেশের কল্যাণের জন্য বহু কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও ধর্ম্মের বিস্তার তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য এবং সকলের চেয়ে বড় কাজ বলিয়া তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লেখকও স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন—

"রাজা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন এবং জীবনের মহাব্রত বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারে ব্রতী হইলেন।"

রামমোহন রায় যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারকে জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যে ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মের এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ উৎসাহের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং বাংলা-দেশের নানাস্থান হইতে বিস্তর পুরুষ ও মহিলা কলিকাতায় আসিয়া, কয়েক দিন একত্র হইয়া উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন এবং একসঙ্গে আহার করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; একদিন এই মহোৎসবে হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শী, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ ও আর্য্যসমাজের প্রতিনিধিরূপে কয়েকজন ভারতবাসী ও ইংরাজ মিলিত হইয়া আপন আপন ধর্ম্মের উদার ও মহৎ ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রচারিত উদার ধর্ম্মের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সুতরাং এই উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও ধর্ম্মের বিস্তার বিষয়ে যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে হয় ত পাঠকদিগের নিকট তাহা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হইবে না।

এখন বোধ হয় ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই স্বীকার করেন, মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী। কিন্তু তিনি দেশের রাজনীতির উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, বিষয়-বাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি আর সকল রকম উন্নতির চেয়ে ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও ধর্ম্মের বিস্তারকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং মহাব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন কেন? এই ধর্ম্মের দ্বারা দেশের কি সুমহৎ কল্যাণ হইবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন? তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই বোধ হয় একবার চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই বিষয়ে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে এই কথাই মনে হয় যে, রামমোহন রায় সকলের চেয়ে ধর্ম্মকেই মানব-জীবনের ও মানব-সমাজের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরে প্রাচীন ঋষির এই মহাবাক্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল যে, "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম সম্ভেদায়" অর্থাৎ ঈশ্বরই লোকভঙ্গ-নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। ধর্ম্মের জন্যই মানব-সমাজ রক্ষা পাইতেছে। গীতাকার বলিয়াছেন, "সূত্রে মণি গণাইব" যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরেতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ যে তোমার হাতে মণিহারের মালাগাছি, উহার ভিতরে একটি সূক্ষ্ম সূত্র প্রচ্ছন্ন আছে। সেই সূত্র তুমি দেখিতে পাইতেছ না বটে, কিন্তু উহাই মণি-সকলকে ধারণ করিয়া আছে। এখনি সেই অদৃশ্য সূত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেল দেখি, দেখিবে হারের মণি সকল ধূলায় পড়িয়া গড়াইতে থাকিবে। তেমনি মানব-সমাজের ভিতরের প্রচ্ছন্ন একটি ধর্ম্মসূত্রই সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; জগতের ধর্ম্মবিহীন লোক সেই সূত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেলুক দেখি; দেখিবে এই সুন্দর মানব-সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, মানুষের সভ্যতার গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, মানব-সমাজ হাজার হাজার বৎসর পশ্চাতে পিছাইয়া গিয়া আদিম বর্ব্বরতার যুগে উপস্থিত হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানীই স্বীকার করিবেন, মানবজাতির উন্নতির

মূলেই জ্ঞান এবং ধর্ম্ম। রামমোহন রায় এই সত্যই অনুভব করিয়াছিলেন। যেমন কোন প্রসিদ্ধ সহরের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সহরটা যে কত বড়, তাহা বুঝিতে পারা যায়, তেমনি রামমোহন রায় এই পৃথিবীর অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া মানবজাতির ধর্ম্মের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাই ধর্ম্মটা যে কত বড় জিনিষ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নর-নারীর যত রকম প্রার্থনার বস্তু আছে, সকলের চেয়ে ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ, সে বিশ্বাস তাঁহার অতি উজ্জ্বলরূপেই ছিল। সেইজন্যই তিনি জগতের ধর্ম্মের গ্লানি এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্মে পরিণত হইতে দেখিয়া ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়, যে-ধর্ম্ম নরনারীর সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও সুখশান্তি বিধান এবং প্রেমের বিস্তারের জন্যই স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসে,—মানুষ অজ্ঞানতা, মানবীয় দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সেই ধর্ম্মকেই পাপ ও দুর্নীতির দ্বারা মলিন এবং বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা রক্ত-পিপাসু রাক্ষসের মত করিয়া তোলে কেন? এই সকল প্রশ্ন রামমোহনের হৃদয়কে যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনচরিত ও পারস্য ভাষায় লিখিত "তোহাফাতুল মওয়াহিদ্দীন" গ্রন্থখানি পড়িলে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

রামমোহন রায় সেইজন্যই ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, হিংসা-বিদ্বেষ ও নিকৃষ্ট ভাব হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় এক উদার ও উন্নত ধর্ম্ম সংস্থাপন ও তাহার বিস্তারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। এ কথা কে না জানে যে, রামমোহন রায়ের মত স্বাধীনতাপ্রিয় লোক এ দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধীনতাই তিনি সহিতে পারেন নাই। মানুষের আত্মার মহত্ত্ব ও গৌরব যে কত, তাহা তিনি উৎকৃষ্টরূপেই জানিতেন; জানিতেন বলিয়াই মহৎ লোকের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই তিনি দেশকে—দেশের ধর্ম্ম ও সমাজকে সর্ব্ব-প্রকার নিকৃষ্ট ভাব ও অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজার যে বৃহৎ জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন, উহার তিনটি অধ্যায়ে রাজার শিষ্য পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়েরই উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহা ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে। উহার ষোড়শ অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ রাজার বিষয়ে বলিতেছেন—

"সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার উচ্ছেদ করিয়া, ঐতিহাসিক ও অলৌকিক অভ্রান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রকৃতি বা ব্রহ্মাণ্ড গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানোপার্জ্জন এবং মনুষ্য জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতিচেষ্টাই যে ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃষ্ট উপায়, এই সকল ভাব ও মত বেদান্ত শাস্ত্র, কোরাণ কিংবা অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হন নাই। আরব দেশীয় মতাজল এবং মওয়াহিদ্দীন সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ-সকল, ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিমূলক গ্রন্থ সকলে রাজা এই সকল মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন * * ইউরোপের মধ্যযুগের কুসংস্কার-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতার আলোকে তিনি উপনীত হইলেন।

"মানবের মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। শাস্ত্র, জনশ্রুতি, দেশাচার এবং কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের মুক্তি, ইহাই বর্ত্তমান যুগের মূলমন্ত্র।"

এই বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা শুধুই রাজার রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা যে কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনচরিত হইতে একটি কথা উদ্ধৃত করিব। রাজা একশত বৎসর পূর্ব্বে যে রাজনৈতিক অধিকারের আশা করিয়াছেন, তাহা এই—

"তিনি কেনেডা দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে, কেনেডার সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ সময়ে নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যদি কোনকালে বর্ত্তমান চিন্তা বা অনুমানের অতীত কোন ঘটনার দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই ভারতরাজ্য সমগ্র এসিয়াখণ্ডে জ্ঞানে ও সভ্যত বিস্তারের উপায়স্বরূপ হইবে।"

এই স্বাধীনতাপ্রিয় রামমোহন রায় দেশের ধর্ম্মকে যে কিরূপ অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ভ্রান্তভাবের অধীন হইয়া পড়িতে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার "বিচারগ্রন্থ" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। রাজার সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে ত বিদ্বেষ ছিলই, তাহা ছাড়া হিন্দুসমাজের, শাক্ত,

বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত বিদ্বেষ ও বিবাদ ছিল। তাঁহার রচিত "পথ্যপ্রদান" বইখানি পড়িলেই বিদ্বেষ ও বিবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এই গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল বিদ্বেষমূলক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে যথার্থই মনে অত্যন্ত ক্লেশ হয়। ঐ সময়ে ইউরোপের ধর্ম্মসমাজেও যে কুসংস্কার ও হিংসা-বিদ্বেষ খুব কম ছিল, তাহাও নহে ; ঐ সকল দেশের বিস্তর লোক ধর্ম্মের মধ্যে ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও অধর্ম্ম দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং অনেক সময় ধর্ম্মের দ্বারা মানুষের কল্যাণ না হইয়া যে অকল্যাণই হইতেছে, তাহাই লোকের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছিলেন। এখনো অসত্য ও কুসংস্কারের জন্যই কত শিক্ষিত মানব-হিতৈষী ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে ঘৃণা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদের কথা স্মরণ করিয়া কত শিক্ষিত দেশ-হিতৈষী লোক মনের দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, "হে ধর্ম্ম, জাতিতে জাতিতে বিবাদ বাধাইয়া মানুষের রক্তপাত করা ও মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখাই যদি তোমার কাজ হয়, তবে তুমি রসাতলে যাও, পৃথিবী নাস্তিকতায় ভরিয়া উঠুক, সংসারে শান্তি ও প্রেম ফিরিয়া আসুক।"

যে রামমোহন ধর্ম্মকেই মানব-সমাজের রক্ষক এবং মানবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া মনে করিতেন, তিনি কিরূপে ধর্ম্মের এই গ্লানি, ধর্ম্মের এই হীনতা এবং ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের অধীনতা সহ্য করিবেন? সহ্য করিতে পারিলেন না বলিয়াই, তিনি ধর্ম্মকে উদার, মহৎ, পবিত্র এবং সমস্ত নরনারীর শক্তিলাভ করিবার ও প্রাণ জুড়াইবার বস্তু করিয়া তুলিবার নিমিত্ত ধর্ম্মসংস্কারে আত্মোৎসর্গ করিলেন। সেইজন্যই তিনি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উপযোগী এক উন্নত বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু ভাষা শিক্ষা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু সাধন ও নানা দেশ পর্য্যটনের পরে তিনি উদার উন্নত বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মই লাভ করিলেন। রাজা সেই বিশ্বজনীন্ ধর্ম্ম দুই মূল সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথমটি সমস্ত নরনারীর চিরবাঞ্ছিত দেবতা অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা, দ্বিতীয়টি মানবজাতির হিতানুষ্ঠান। এ বিষয়ে রাজার জীবনচরিত-লেখক তাঁহার গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

> "বেদ, কোরাণ, বাইবেল, এই তিনটি প্রধান শাস্ত্র পাঠ করিয়া রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত তিন শাস্ত্রই পরমেশ্বরের একত্ব ও মানুষের প্রতি দয়া, এই দুই মহাসত্যের উপদেশ রহিয়াছে।"

রাজা তাঁহার তোহাফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন যে, তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া, অনেক জাতির ধর্ম্মপ্রণালী দেখিয়া ও সেই সকল ধর্ম্মকে পরস্পর তুলনা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, সকল ধর্ম্মেই জগতের কর্ত্তা ও বিধাতা একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনাদি পুরুষে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন্। সুতরাং ইহা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। এক জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস কোন কৃত্রিম উপায়ে কেবল অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। *

রামমোহন রায় যে মানুষের সেবাকেও উপাসনারই অঙ্গ করিয়াছেন, এইটির উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> "যিনি ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভসাধনার্থ প্রাণমন অর্পণ করেন, 'মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা' এই মহার্থবোধক পরম পবিত্র পার্সিক বচনটি যিনি সতত আবৃত্তি করিয়া নিজচরিতে নিরন্তর সম্যক্‌রূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষণা গুণের একত্র সংযোগ ভূমণ্ডলের আর কখন ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় না।"

রামমোহন রায় তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মানবাত্মার গূঢ়স্থানে নিহিত সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্মের মূল সত্যকে ধর্ম্মব্যবসায়ী যাজকেরা অনাবশ্যক বহু মতের দ্বারা এবং বহু অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ; উহাতেই ধর্ম্ম জটিল এবং অসত্য ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ধর্ম্মসমাজের শাসনকর্ত্তারা ঐ সকল জটিল কুটিল মত এবং অর্থশূন্য বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মসমাজের লোকদিগের

---

* আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজার জীবনচরিত দেখুন।

বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট ও স্বাধীনতা হরণ করেন। তাহা করেন বলিয়াই ধর্ম্ম অনেক সময় অনেক পরিমাণে অধর্ম্মে পরিণত হইয়া জনসমাজের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই করিয়া থাকে। ধর্ম্মের বহু মতের দ্বারা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীনতা হরণ করা আদিম মানুষের অজ্ঞতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইজন্যই মানবাত্মার মহত্ত্বে আস্থাবান্, মানবহিতৈষী রামমোহন সর্ব্বজাতির উপাস্য দেবতা একমাত্র অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের অর্চ্চনা ও নরনারীর কল্যাণসাধন—এই দুই সত্যের উপরেই তাঁহার বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এই দুই সত্যের দ্বারাই সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন সম্ভব।

এই স্বদেশপ্রেমিক পুরুষ আপনার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন ও ভ্রাতৃভাবের উপরেই এ দেশের জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দেশ ত এখন আর শুধু হিন্দুর নহে; হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান সকলের। আবার হিন্দুর মধ্যেও কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের নহে; যে লক্ষ লক্ষ নিম্ন বর্ণের লোক উচ্চ বর্ণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার তলে বাস করে, দেশ তাহাদেরও বটে। কাজেই সর্ব্বলোকের পিতা ও সর্ব্বশ্রেণীর উপাস্য দেবতা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ও লোকহিত অথবা উদার ভ্রাতৃভাবের দ্বারাই ভারতবাসীর হৃদয়ের মিলন সম্ভব, নচেৎ অন্য কোনরূপ সাময়িক স্বার্থের উত্তেজনায় ক্ষণস্থায়ী বাহিরের মিলন সম্ভব হইলেও, চিরস্থায়ী প্রাণের মিলন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান দুইটিই ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। দুই জাতির উপযোগী এক সুমহান্ ধর্ম্মের দ্বারা ইঁহাদের হৃদয় প্রেমে বিগলিত করিতে না পারিলে আর প্রকৃত মিলনের আশা কোথায়? আশা নাই বলিয়াই রাজা মিলনধর্ম্মের প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন রাজা স্বদেশী ও বিদেশী লোকদিগকে চমকিত করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত মন্দিরের ট্রাষ্ট্ ডিড্‌পত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উহার কয়েকটি কথা এই—

"যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য উপাসনা-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে উপাসনা করিতে সকলের সমান অধিকার।

"যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।"

রামমোহন রায় দেশের জাতীয় একতা ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ধর্ম্মসংস্কারের এবং এক সমুন্নত ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজন যে বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার একখানি পত্র পাঠ করিলে, মনে আর কোন রকম সংশয়ই থাকিতে পারে না। রাজা এই পত্রখানি ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তাঁহার কোন ইংরেজ বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতের উনবিংশ অধ্যায় হইতে উক্ত পত্রের বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রণালী তাঁহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নহে। জাতিভেদ আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদিগকে স্বদেশানুরাগ বঞ্চিত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহু সংখ্যক বাহ্য অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বহু প্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাহাদিগকে কোন গুরুতর কার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ তাহাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

রামমোহন রায়ের প্রচারিত ধর্ম্মের দ্বারা যে দেশের আর এক মহা উপকার হইবে, সেই বিশ্বাসও তাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস এবং সেই দেশের জ্ঞানীলোকদিগের রাশি রাশি চিন্তা এ দেশে জাহাজ-বোঝাই হইয়া আসিয়া পৌঁছিবে। তাহাতে দেশের অশেষ কল্যাণ হইলেও অকল্যাণের আশঙ্কাও নিতান্ত সামান্য নহে। ঐ দর্শন বিজ্ঞান ও চিন্তারাশি

কামানের গোলার মতই এ দেশের শিক্ষিত লোকদিগের অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে। শুধু কি তাই? ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ধর্ম্ম যে এদেশে আসিয়া পৌছিতেছে, তাহারও শক্তি কি কিছু কম? সেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হইল এসিয়ার পরাধীন ইহুদি জাতির মধ্যে; তাহার পরে তিন শত বৎসর রোমের রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিল; অবশেষে ইউরোপের বহু দেববাদ ও মূর্ত্তি-পূজাকে সংহার করিয়া সমস্ত নরনারীর হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই ধর্ম্ম যে এ দেশের মূর্ত্তিপূজা ও প্রাচীন বিশ্বাসের কোনই অনিষ্ট করিবে না, এমন ত হইতেই পারে না।

যদি ঐ সকলের দ্বারা এ দেশের শিক্ষিত লোকের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যায়, আর তাহার জায়গায় জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্মত সময়ের উপযোগী কোন মহৎধর্ম্ম তাঁহাদের অন্তরের ধর্ম্মবিশ্বাস অটুট রাখিতে সমর্থ না হয়, তবে এ দেশের মহা অনিষ্ট হইবে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতিরই এক একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বই তাহাদিগকে শক্তি দান করে, তাহাদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে এবং তাহাদিগকে মহৎকার্য্যে উদ্দীপিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের লোকের সেই বিশেষত্বই হইতেছে তাহাদের আত্মার সুগভীর ধর্ম্মভাব। এ দেশে এত যে পরাধীনতা, এত যে শিক্ষার অভাব, এত যে দারিদ্র্য ও রোগ, শোক, তবুও লক্ষ লক্ষ নরনারী ধর্ম্মকে বুকে ধরিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া সকলই সহ্য করে। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ভাষায় বলা যায়—

"আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণে নিত্য ধারা হাসে চন্দ্র সূর্য্য তারা
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।"

কিন্তু এই ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাস যদি শিক্ষিত লোকদিগের হৃদয় হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশের যে ভয়ানক দুর্গতি হইবে। রামমোহন দেশের এই দুর্গতি নিবারণের জন্যই হিন্দুজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ও দর্শন হইতে ইউরোপেরই উন্নত দর্শনবিজ্ঞান-সম্মত এবং বহু মনস্বীব্যক্তির স্বীকৃত এক উদার বিশ্বজনীন্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে একবার উদার-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন ত, যথার্থই রামমোহনের প্রচারিত ধর্ম্ম কালের মহাতরঙ্গের ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানের এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের আঘাত হইতে এ দেশের উন্নত ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না?

হয় ত অনেকেই জানেন যে, রামমোহন রায় ১৮২৮ সালের ১৬ই ভাদ্র তাঁহার প্রচারিত উদার ধর্ম্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পরে সেই উপাসনার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইল। রাজা ১৮২৯ সালের ১১ই মাঘ সেই মন্দিরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তাহার পরে ১৮৩০ সালের ১৫ই নবেম্বরই তাঁহাকে বিলাত যাত্রা করিতে হইল। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি সেই বিদেশ হইতেই পরলোকে প্রস্থান করিলেন। কাজেই দেশের শিক্ষিত ও ধর্ম্মপিপাসু লোকদিগকে তাঁহার উপাসনা মন্দিরে আকৃষ্ট করিয়া একটি উন্নত ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিবার তিনি সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। যদি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, হয় ত তখন তাঁহার উন্নত জ্ঞান, উদার প্রেম এবং অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবনের দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিতে এবং সেই মণ্ডলীর দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিতেন। কারণ তাঁহার বিলাতগমনের পরে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত লোকদিগের অন্তর হইতে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কার চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু তবুও রাজা তাঁহার ধর্ম্মের জন্য একটি উপাসনা-মন্দির স্থাপন করিয়া প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে যে একটু উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া গুটিকয়েক গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার যে বাণী লিপিবদ্ধ ছিল, উহারই আকর্ষণে দলে দলে শিক্ষিত পুরুষ ও নারী আসিয়া তাঁহার উদার ধর্ম্ম হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধু রামতনু লাহিড়ী, ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ রাজনারায়ণ বসু, জ্ঞানী অক্ষয়কুমার দত্ত, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, ভক্ত ও বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধক অঘোরনাথ গুপ্ত, ভক্ত

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্যাগী শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বদেশহিতৈষী আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির মত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উত্থিত হইয়া, আপনাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের দ্বারা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যকে আশ্চর্য্যভাবে উদার ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ও স্বদেশের সেবার কাহিনী, হয় ত এ দেশের উন্নতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকিবে।

এখন এ দেশে কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হওয়ায়, বহু লোকের ধর্ম্মধারণা উজ্জ্বল, ও সামাজিক আদর্শ উন্নত হইয়াছে। রামমোহন দেশের কল্যাণের জন্য ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে যে মহৎ আদর্শ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শই তাঁহাদের অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে মায়াকুহক বিস্তার করায়, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতেছেন। এখন বিপুল হিন্দুসমাজের বক্ষে বাস করিয়া মূর্ত্তি-পূজার পরিবর্ত্তে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলে, জাতিভেদ অস্বীকার কবিয়া নিম্নবর্ণের অন্ন খাইলে, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিয়া অবরোধের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, কেহই আর মানুষকে একঘরে করিয়া সমাজের বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহে না।

আমাদের ত মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ের উন্নত জ্ঞান এবং কালের অনতিক্রমনীয় শক্তিই রামমোহন রায়ের প্রচারিত উদার ধর্ম্মের প্রধান সহায়। এই উভয়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত ও চিন্তাশীল নরনারীর অন্তরে এমন প্রভাব বিস্তার করিতেছে যে, মানুষের ধর্ম্মচিন্তার গতিই বিশ্বজনীন্ ও মিলন-ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে ; সকল দেশের ধর্ম্মরসজ্ঞ জ্ঞানীরাই স্বীকার করিতেছেন যে, সর্ব্বজাতির আরাধ্যদেবতা যে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনা ও মানবের হিত-সাধন—অর্থাৎ ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব ইহাই ধর্ম্মের সকলের চেয়ে বড় কথা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত সভার সম্মানিত সভাপতি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই দুই সত্যের উপরেই ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। এই দুই সত্যের উপরেই যদি ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ত বলিতেই হইবে, রামমোহন রায় যে উদার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই, কিন্তু সার্থকই হইয়াছে।

আমরা সর্ব্বশেষে মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপ্রচার-বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিব। তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বেদান্ত সূত্রের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"আমার দেশের লোকদিগের * * নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন করিয়া সেই বিষয়ে আমি অবিশ্রান্ত দুঃখের সহিত চিন্তা করিতাম। * * ইঁহারা সহিষ্ণুতা, সুশীলতা প্রভৃতি অনেক মহদ্‌গুণে উন্নত পদবীর উপযুক্ত ছিলেন। এই সংস্কারের অধীন হইয়া আমি তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকের অংশ-বিশেষের প্রকৃত অনুবাদ-সকল প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। সেই সকল অনুবাদ-অংশ যে কেবল ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনা শিক্ষা দেয়, তাহা নহে ; কিন্তু এরূপ পবিত্র নীতি এবং বিশুদ্ধ মতে অলঙ্কৃত, তাহা আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। * * দেশের লোকদিগের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ আমাকে প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিতে বাধ্য করিয়াছে—যাহাতে আমার দেশের লোক নিজের ধর্ম্মপুস্তক-সকল অবগত হইয়া যথার্থ অনুরাগের সহিত পরমেশ্বরের একত্ব এবং সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে, তজ্জন্য আমি উদ্যোগ করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিবেক ও সরলতা কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াতেও নিন্দা, বিদ্বেষ ও অপবাদের স্রোতে আমাকে ভাসিতে হইল।

"যদিও প্রচুর প্রতিবন্ধক, কিন্তু আমি এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শান্তভাবে সকল সহ্য করিতাম যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা সকল লোকেরা ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিবে। হয় ত আমার স্বদেশবাসিগণ ইহা কৃতজ্ঞতার সহিতও গ্রহণ করিবে। লোকে যে যাহা বলুক, আমি এই আশা হইতে বঞ্চিত হইতে পারি না, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্যভাবে পুরস্কার দান করেন, তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক অভিপ্রায় গৃহীত হইবে।"

ধারে বিক্রী নাই

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ধারে বিক্রী নাই ! ধারে বিক্রী নাই !

সুতো দিয়ে লটকানো একটি কাগজের বোর্ডে কথাকটি বড় বড় হরফে লেখা।

দোকানের আকৃতি ও দোকানদারের প্রকৃতিই যথেষ্ট বিজ্ঞাপন। তা দেখে ধার চাওয়া দূরে থাক্, মেকি সিকিটা-আস্‌টা চালাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত কেউ করে না।

একটি খোলার ঘরে আড়্-করে' পাতা কয়েকখণ্ড তক্তার উপর গোটাকতক ঝুড়িতে চাল ডাল নুন, আর দেয়ালে ঝুলানো তাকটিতে কতকগুলি লজেঞ্জেসের শিশি ও সিগারেটের বাক্স—এই ত মোট পুঁজি। কিন্তু এই সামান্য বেসাতের পিছনে খাটতো একটি বৃহৎ মাথা, পেশল বাহু, আর সবল দেহ। বড় রাস্তা দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে দেখা যেত—দোকানদার বাঁধানো লাল খাতাখানির উপর হেঁট্ হয়ে বসে' একমনে হিসাব কষছে, আর খরিদ্দার ঝাঁপের তলে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা দেখে পছন্দ করছে। খাতা ছেড়ে দোকানদার ধরে তৌল, সতর্ক দৃষ্টিতে দাঁড়ির পানে চেয়ে থাকে বেশি-কম যেন এক রত্তিও না হয়, ঠোঙায় ভরে সওদা তুলে দেয়, মুখের পানে চায় না, দেখে শুধু বাড়ানো দুখানি হাত—কোনটি কচি-কোমল, কোনটি রুক্ষ-কঠিন। সে যেন হগ্ সাহেবের বাজারের একটি চক্‌লেটের কল—শ্লটের ভিতর পয়সা দিলে জিনিষ বেরিয়ে পড়ে আপনা-আপনি !

নানা লোকে নানা কথা বল্‌তো, কিন্তু তা ছিল যেন অন্ধকারে তারার ঝিকিমিকি—দোকানদারের আদৎ পরিচয়কে দিত একেবারে গুলিয়ে। সে নাকি সাত বছর জেল খেটে এসেছে ! এমন লোককে ভদ্রলোক করবে না খাতির, আর ছোটলোক করবে না অবজ্ঞা—তাই ভদ্রর কাছ থেকে সে পেত' যেমন ঘৃণা, ভয়ও ঠিক সেই পরিমাণে সে ছোটদের কাছে লাভ করতো। এই দোকান থেকে জিনিষ কিনে তাকে তুষ্ট করবার প্রচেষ্টা ওলা-শীতলারই মত এদের একটা কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দোকান খুলে বসেছে সে—কিন্তু কিন্‌ছে কারা, কোথা থাকে তারা, মাথার কতটুকু ঘাম পায়ে ফেলে তারা ঐ আধলার তেল, আধলার নুন কিনে দিন গুজরান করচে, এ-সব খবর জানবার জন্য তার মনে কখনো এতটুকু কৌতূহল জেগে উঠতো না। সে খোঁজে তার দরকার? সে যা পেল তার বদলে দিল কতটুকু, এর বেশি জেনে কোনো লাভ নেই। জেল থেকে খালাস হবার পর হাকিমের অনুগ্রহে 'পুওর-ফাণ্ডে'র কিছু টাকা পেয়ে এই দোকানটি সে করেছিল ; সে টাকা সে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেচে। ঠক্‌তে চায় না সে যেমন, ঠকাতেও ত কাউকে চায় না। পড়তা ধরে দাম কষে' যতখানি পারে লাভ সে করবেই, ছাড়বে না একটি পাইও—কিন্তু খদ্দেরকে না-দিলে-নয় যতটুকু জিনিষ তার এক রত্তিও কম দেবে তেমন লোক রাখু নয়।

ছোট লোকে বল্‌তো, বাজারের কম্‌তি-ওজন তারা ফাউএ পুষিয়ে দেয়, আর ফাউ না দিয়ে রাখু নেয় তার ঠিক ওজনটি পুষিয়ে। ভদ্রলোক বল্‌তো, ওকে আবার বিশ্বাস? ছোট বিষয়ে সাধুতা কেবল দাঁও মার্‌বার ফিকির !

আসলে, লোকে তাকে ভয় বা ঘৃণা, অবজ্ঞা বা খাতির যাই করুক—বুঝতো না তাকে কেউ। সত্য, মহাজনের বাড়তি ধন লুঠে' নিতে চেয়েছিল সে এক অজন্মার বছর পেটের জ্বালায়। বাড়ীতে বুড়ো মা আর বিধবা বোন ছিল—খেতে দেবার সঙ্গতি নেই, বাড়ীটি সুদ্ধ দেনায় বাঁধা, মজুরি কোথা যে খেটে খাবে। ভিক্ষা করেও ধার যখন সে পেলে না তখন জোর করেই ধার তাকে নিতে হয়েছিল, এবং সেই একটি দিনের ঋণ

শোধ দিয়ে এসেছে সে সাতটি বছর বেগার খেটে! কিন্তু সে এমন ঋণ, যার আসল মিটে গেছে কোন্‌দিন, সুদ চলেছে জীবনভোর।

সে জেল-ফেরত—সে ডাকাত!······

এমন লোকের দিকেও কেউ নজর দেয়! স্যাক্‌রা-দোকানের লোচন কর্ম্মকার হঠাৎ বলে উঠেছিল, ঈস্—এ যেন ভূতের উপর পেত্নীর দৃষ্টি। সকল বিষয়েরই ইতিহাস থাকে চোখের আড়ালে বন্ধ, দরকার হয় যখন তখনি তার চোর-কুঠরির দরজা খোলে। ব্যাপারটা লোচনের গোচর করবার আগে বহু চেষ্টা করেও ক্ষান্তমণি তার মেয়ে মানদাকে রাখুর সুনজরে ফেল্‌তে পারেনি। যে যা বলে বলুক, দোকানদারিতে রাখু কিছু পয়সা করেচে, আর বিয়ে ত একদিন সে কর্‌বেই, তখন মানদাকে করতেই বা বাধা কি? মানদাকে নীল শাড়ীখানি পরিয়ে, তেল-চকচকে খোঁপাটি বেঁধে, রূপোর চুড়ি দু-গাছি মেজে-ঘষে' হাতে দিয়ে, ক্ষান্ত তাকে অভিসারে পাঠাতো ছাই-মাটি কেনার অছিলায়, আর সে যখন জিনিষপত্রের সঙ্গে তার ব্যর্থ উদ্যম নিয়ে ফিরে আস্‌তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে, তখন রাখুর অন্ধ চোক দুটির দোষ চাপতো সেই মেয়েটির উপর। কী হাভা মেয়ে! এ-জিনিষ ভালো ও-জিনিষ মন্দ, এটা নিয়ে সেটা ফেরত দিয়ে—এমনি করেই ত দোকানদারের সঙ্গে সারাটা দিন কাটানো যায়। এমন বাড়ন্ত যৌবন মানদার, সে-খেয়াল কি মেয়েটার এতটুকুও নেই?

আলাপী বল্‌তে রাখুর ছিল দুইটি প্রাণী—লোচন স্যাক্‌রা, আর সাদা রোঁয়া-ওয়ালা কুকুর টুলি। কাজকর্ম্ম সেরে সে টুলিকে নিয়ে একলা বসে' খেলায়, শেখায় বলের পিছু ছুট্‌তে আর দু'পায়ের উপর দাঁড়াতে। কিন্তু হাজার হোক্ টুলি অবলা জানোয়ার, অচেনা লোককে ঘরে ত আনবেই না, বরঞ্চ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলেই সে-যেন বাঁচে। তাই সুপারিশের জন্য ক্ষান্তমণিকে অগত্যা শরণ নিতে হল লোচন স্যাক্‌রার। লোচন বুড়ো মানুষ, নিজের ঘটকালির সখ অনেকবার সে মিটিয়েছে, এখন চায় পরের ঘটকালির রসাস্বাদ কর্‌তে।

বিকাল-বেলা ঝাঁপ তুলে রাখু দোকানের সাম্‌নের জায়গাটি ঝাঁট দিচ্ছিল, লোচন গিয়ে বল্‌লে,—বলি ওহে ভায়া, জীবনটা কি এমনি করেই কাটাবে, না বে'থা একটা কিছু কর্‌বে?

ঝাঁটা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে রাখু এসে নিজের আসনে বস্‌লে। লোচন সাবধানে সেই তক্তার উপর চড়ে বসে' হুঁকায় গোটাকতক খাটো টান দিয়ে বল্‌লে,—ভালো পাত্রী একটি আছে। মানদাকে জান ত?

ঘাড় নেড়ে রাখু বল্‌লে,—না।

একটু কেসে লোচন বল্‌লে—রোজ দুবেলা আসে তোমার দোকানে সওদা কিন্‌তে, আবার বল কি না জান না। ন্যাকামি রাখ।

সেই মেয়ে! রাখুর মনে পড়্‌লো, দুটি নিটোল বাহু আর গোড়া-পুষ্ট, ডগা-সরু লম্বা-লম্বা আঙুল। ঐ হাতই যে তাকে মুখের পরিচয় দিয়ে যায়!

লোচন তার পানে চাইল, মন ভিজেছে কিনা তাই পরখ্ কর্‌তে। বল্‌লে,—মেয়েটা দেখ্‌তে বেশ। বে' করবে ত বল, যোগাড় করে দিতে পারি।

রাখু সংক্ষেপে জবাব দিল,—ইচ্ছে নেই।

—সে কি হে, সংসার কর্‌বে না?

রাখু খাতার একটা বাজে অংশে হিসাব কষে' তা লোচনের সাম্‌নে মেলে ধরে বল্‌লে,—এই দ্যাখো লোচন-খুড়ো। দুজনার খরচ পনর টাকার কম হয় না, আর আমার একলার খরচ মাত্র সওয়া আট টাকা। পরের জন্য মাসে মাসে এতগুলো টাকা খরচ করতে যাব কেন?

লোচন অবাক হয়ে গেল। বল্‌লে,—আরে তোমার কষ্ট ত চোখেই দেখ্‌চি। সঙ্গী নেই—

—টুলি আছে।

—খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট, আদর-যত্নের অভাব।

রাখু তেমনি বেঁকে বল্‌লে,—হোটেলের খাওয়া হোটেলের যত্ন জেলের চেয়ে ঢের ভালো।

অসহিষ্ণুভাবে লোচন জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু রোজগার কর্‌ছ কার জন্যে শুনি?

রাখু এবার হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। হাসে সে কদাচিৎ, কিন্তু যখন হাসে তখন যেন ভূমিকম্পে চৌচির ফাটল থেকে গলিত ধাতু-স্রাব ছুটতে থাকে।

—কার জন্যে রোজগার? লোচনের কথার প্রতিধ্বনি করে সে যেন বুঝাতে চাইল যে, তার টাকা সে দরিয়ায় ঢেলে দেবে তবু তাই নিয়ে ভাগাভাগি করবে না সে কারু সঙ্গে।

লোচনের এই অভিযানের ফল জান্‌বার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ক্ষান্ত রাস্তার মোড়ে পাকুড় গাছের তলায় প্রতীক্ষা করছিল। সে ফিরে এসে সকল কথা বল্‌তে ক্ষান্ত রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে রাখুর উদ্দেশে এমন কতকগুলো শব্দ প্রয়োগ করলে, যা সাহিত্যে পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত এখনো হয় নি।

বাড়ী এসে ক্ষান্ত মানদাকে বল্‌লে—আধ্‌লার জিনিষ ধার দেবে না—ঠকাবেও। এ-দেখেও যাস্‌ কেন পোড়ারমুখী রাখুর দোকানে জিনিষ কিন্‌তে?

মানদার ভারি দায় পড়েছে রাখুর কাছে যেতে! সত্য বলতে গেলে—মা যতবার পাঠিয়েছে তার সিকিবারও সেখানে যায়নি সে। সে গেছে ঐ চন্দন-পাহাড়ের নিরালা আড়ালটিতে, যেখানে সুমন্ত্র ছোঁড়া নিত্য আসে গরু চরাতে। দুজনায় বসে কথা কইতে কইতে বেলা আস্‌তো পড়ে। সাঝের সূর্য্য ঝরণার জলে ফাগ মিশিয়ে দিত, মুঠি মুঠি সেই জল অনর্থক আকাশে ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে তারা সৃষ্টি করতো এক রঙীন কল্পনালোক! সুমন্ত্র তার বাঁশের পাঁচান মুখের পরে আড়্‌ ক'রে ধরে' ফুঁকতে সুরু করতো। নিমেষ-মধ্যে পাঁচনি ধরতো বাঁশীর রূপ, কর্ম্ম হত অশ্রান্ত সঙ্গীত। তারপর বাসামুখে উড়ন্ত পাখীর কলরব শুনে বাড়ী-ফেরার কথাটি যখন তাদের মনে জেগে উঠ্‌তো, বাঁশী ফেলে তখন সুমন্ত্র ধরতো তার হাতখানি, আর বল্‌তো,—ধানকাটার আর মাসতিনেক বাকি…মুনিব বিয়ে করবার টাকা দেবে বলেছে…তখন বল্‌বো তোর মাকে…এ ক'টা দিন সবুর কর্‌ মানু।……

মানদা বেঁচে গেছে, আর তাকে এখন রাখুর দোকানে ছুট্‌তে হয় না। বাজারে মুদি-দোকানে-যাবার রাস্তা একই, যেতে যেতে আড়্‌চোখে চেয়ে দেখে সেই দোকানের পানে। রাখু তার খাতার উপর ঝুঁকে হিসাব নিয়ে তেমনি ব্যস্ত। হঠাৎ মানদা দেখে, কোন্‌ ফাঁকে রাখু মুখ তুলে আছে তারই পানে দৃষ্টি মেলে। আ মর্‌ ঢং দেখ! চোখ দুটো যেন তার হাতখানিকে গিল্‌তে চায়! পরক্ষণে রাখুর মুখে একটা কুটিল হাসির রেখা ফুটে ওঠে। যেন বলে,—কেমন দেখ্‌লি ত? রাখুকে জড়াতে পারিস্‌ এতবড় জাল তোরা এখনো বুন্‌তে শিখিস্‌নি। ক্ষোভে মানদার গাল দুটি জল্‌তে থাকে, অভিমানে ঠোঁট দুটি ফুলে ওঠে। কি লজ্জা! এই অহঙ্কারী লোকটার দর্প চূর্ণ কর্‌তে এত করেও সে পারে নি। সুমন্ত্র মজেছে—তাকে সে ভালবাসতে চায়, জ্বালাতে চায় না। রাখু মজেনি—তাকে সে ভালোবাস্‌তে চায় না, জ্বালাতে চায়। সে-সুযোগ যদি সে একটিবারও পায়!…

সহরটি তেমন বড় না হ'লেও স্বাস্থ্যকর। ছুটি হ'লেই নানা জায়গা থেকে ট্রেণ বোঝাই লোক এসে পড়ে পঙ্গপালের মত, তখন আর একটি বাংলাও খালি পড়ে থাকে না। আর আর দোকানদারের মত রাখুরও মরশুম সেই সময়। সকালে সন্ধ্যায় তার দোকানের সাম্‌নে দিয়ে চলেছে ছড়ি হাতে সৌখীন বাবুর দল, বাহারে রং-এর শাড়ী-পরা মেয়েদের অবিচ্ছিন্ন শোভাযাত্রা, আর যূথভ্রষ্ট ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে। কেউ যায় নিকটে—চন্দন-পাহাড়ে উঠে সহরটিকে দেখতে খেলাঘরের মত ক'রে। কেউ যায় দূরে—শান্তি হ্রদের প্রশান্ত নীল বক্ষ দাঁড় বেয়ে অশান্ত করে তুল্‌তে।

চপল হাসি, চটুল কৌতুক চলেছে অবিশ্রান্ত—রাস্তা বেয়ে।

—লেমনচুস্‌ কটা ক'রে দোকানদার?

—চারটে পয়সায়।

হঠাৎ মেয়েটি উঠলো চীৎকার করে। রাখু মুখ তুলে দেখলে, টুলি ছুটে গিয়ে তার চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে খেলা করছে, আর এক-একবার পিছনের দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠছে।

রাখু বল্‌লে,—ভয় নেই। ও কিছু বল্‌বে না।

কিন্তু এরি মধ্যে মেয়েটির ভয়-বিস্ময় আনন্দ-পুলকে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। বাঃ, কি সুন্দর কুকুরটি—কি চমৎকার দাঁড়াবার ভঙ্গি। সে যেমন তাকে দু-হাতে সাপটে ধরতে যাচ্ছে, টুলিও তেমনি ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে' এগিয়ে পেছিয়ে লাফাচ্ছে।

রাখু নির্ণিমেষ-নেত্রে চেয়ে রইলো সেই ক্রীড়ক-যুগলের পানে। বছর ছয়ের ফুটফুটে মেয়ে—মাথার অপর্য্যাপ্ত চুল কপালের উপর আর ঘাড়ের ধারে ধারে দোরস্ত করে ছাঁটা, গায়ে হাল্কা বেগুনি রং-এর ফ্রক। টুলি যত লাফিয়ে-লাফিয়ে ঘোরে চর্কাটির মত, সে-ও তেমনি দৌড়ে দৌড়ে হাসে পুতুলটির মত। এ শুধু খেলা—বেচাকেনার কোনো বালাই নেই!

তাদের দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে রাখু শিশি থেকে এক মুঠো লোজেঞ্জ ঢেলে বের করলে।

দূরে গৃহকর্ত্রীর ডাক শোনা গেল,—নীলা, দুষ্ট মেয়ে! চলে এস শিগ্গির।

খেলা ছেড়ে সে অমনি চলে যাচ্ছে, রাখু ডাক্‌লে,—খুকি, লেমনচুস্।

লোজেঞ্জের কথা চঞ্চলা বালিকা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। ছুটে গিয়ে মোড়ক হাতে নিয়ে পয়সা বাড়িয়ে ধরে বল্‌লে,—এই নাও পয়সা।

রাখু ঘাড় নেড়ে বললে,—আজ নেব না। কাল এসো লেমন্‌চুস কিন্‌তে।

ধারে বিক্রী নাই!—জমকালো অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপন তেমনি ঝুলানো!

লোজেঞ্জের একটি গুলি মুখে পূরে নীলা জিজ্ঞাসা করলে,—কুকুরের নাম কি, দোকানদার?

—টুলি।

—টুলি—বেশ ত? পাহাড়ে যাই এখন, ফিরে এসে ওর সঙ্গে আবার খেলা কর্‌বো,—এই বলে সে ছুটে চলে গেল।

খাতা খুলে খরচের অঙ্কটি বসিয়ে জমার ঘরে রাখু লিখলে—শূন্য!

নীলার বাবা যামিনীবাবু নিকটের একটি বাংলা ভাড়া করে কল্‌কাতা থেকে এসেছিলেন হাওয়া বদ্‌লাতে—সঙ্গে নীলা আর নীলার মা। কলকাতায় সারাটি দিন আপিসে বদ্ধ থেকে বহির্জ্জগতকে গিয়েছিলেন তিনি একেবারে ভুলে, আর এখানে এসে সারাটি দিন বহির্জ্জগতে থেকে অন্তর্জ্জগতকে ভুলেছেনও তেমনি। স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে কখনো হেঁটে কখনো মোটরে সর্ব্বক্ষণই তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তারি মধ্যে যখনি একটু ফাঁক পায়, নীলা অমনি ছুটে আসে রাখুর দোকানে টুলির সঙ্গে খেল্‌তে। শিকলটি হাতে ধরে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে-দৌড়ে সে তাকে বাড়ী নিয়ে যায় মাকে দেখাবে বলে'—বক্‌লশের ঘুঙুর বাজে—টুলি ছোটে তার সঙ্গে চামরের মত লোমশ লেজটি ফুলিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। তারপর সে দোকানে ফিরে এসে রাখুর কাছে বসে' গল্প করে আর যত খুসী "লেমনচুস্" খায়। রাখু চায় না দাম—সে-ও দেয় না পয়সা। কিন্তু এই চমৎকার বন্দোবস্তটি হয়ে গেল এমনি চুপি-চুপি যে, যে-টুলির সম্পর্কে তাদের এত মাখামাখি, সেই টুলি-ও তার কিছু টের পেল না।

বিমর্ষ মুখে নীলা বল্‌লে, দোকানদার—কল্‌কাতা চলে গেলে টুলিকে পাব কোথা যে খেল্‌বো?

একটু ম্লান হেসে রাখু বললে,—কাজ কি দিদি কলকাতায় গিয়ে? তুমি থাক' না এখানে?

নীলা মুখটি নামিয়ে গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—মা কি তা দেবে দোকানদার? টুলি চলুক আমার সঙ্গে। ওর কিচ্ছু কষ্ট হবে না।

—কষ্ট? না, কষ্ট কিসের? রাখু বল্‌লে,—আচ্ছা, টুলিকে আমি তোমায় দিলাম।

তার গলাটা খামকা যেন ধরে এসেছিল।

বিকাল-বেলা যামিনীবাবুর চাকর এসে যেমন জানালে যে বাবু তাকে একবার ডেকেছে, অমনি রাখুর বুকটা দুর্ দুর্ করে উঠ্‌লো। তার বিষয় বাবু কিছু টের পেয়েছে না কি? তা হলে নীলা কি আর কখনো আস্‌বে তার দোকানে? কিন্তু খানিক-পর নীলা এসে যখন তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো—বল্‌লে, বাবাকে তুমি বল্‌বে চল যে টুলিকে আমায় দিয়েছ—তখন শঙ্কা কেটে গিয়ে তার মুখের উপর প্রচুর খুসীর হাসি দেখা দিয়েছিল।

সে বল্‌লে, কলকাতায় ফির্‌তে তোমাদের এখনো দেরি আছে—কেমন দিদি?

ঠোঁটটি উল্‌টে নীলা বল্‌লে,—কি জানি।

বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে যামিনীবাবু খবরের কাগজটি উলটে-পালটে দেখছিলেন। কোণে এসে রাখু দাঁড়ালো জোড়হাত করে'।

কাগজটি রেখে যামিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ে হয়েচে—তুমি না কি নীলাকে কুকুরটি দিয়ে দিয়েছ ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ও কুকুর কোথা পেয়েছিলে তুমি ?

সে বললে, কোন সাহেবের খানসামা তাকে কুকুর-ছানা দিয়েছিল—দুই বছর ধরে সে তাকে পুষেছে।

আচ্ছা, কিছু বকশিস দিচ্ছি নাও, বলে' পকেট থেকে একটি নোট বের করে তিনি রাখুর হাতে দিলেন।

রাখু প্রতিবাদও করলে না, আগ্রহও দেখালে না।

সে খুসী হয়নি মনে করে যামিনীবাবু বললেন,—এখন ঐ টাকা কটি নাও—যাবার সময় আরো কিছু বকশিস্ দিয়ে যাব।

ঘাড় গুঁজে রাখু তার দোকানে চলে এলো। হায় রে কপাল। সকলের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ হয়ে উঠেছে একটা বেচাকিনির। যাকে দিক্, যেমন করে দিক্—নগদ মূল্য এড়িয়ে যাওয়া চল্‌বে না! ···

মানদা রাস্তা দিয়ে যায় আড়্‌চোখে তেমনি করে চেয়ে চেয়ে—দেখাতে চায় যেন তার রূপের পসরা। ভাবনা কিসের ? দোকান আছে ঢের! সে দৃষ্টি রাখুর মনে একটা কোমল বেদনা জাগিয়ে তোলে—ভারি ইচ্ছে করে তাকে কাছে ডাকে। ওরে, দোকান থাক্‌লেই কি চলে যেতে হয় সেখানে ? মায়া-মমতা বলে কি কিছু নেই ওর মনে ?

দ্বিধা-সঙ্কোচ সব উড়িয়ে দিয়ে সে ডাক্‌লে,—মানদা —ও মানদা।

একটু ইতস্তত করতে করতে মানদা এগিয়ে এল।

রাখু বল্‌লে, আমার দোকানে আর আসিস্ না কেন মানদা ?

উল্লাসে মানদার চোখদুটো অকস্মাৎ জ্বলে উঠ্‌ল। কাপড়ের খুঁটটি আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে ঠিক সময়েই জবাব দিলে—মা বারণ করে। বলে, তুমি না কি ঠকাও।

রাখু বলে উঠ্‌লো,—না না, অমন কথা বলিস্‌নি। চাল-ডাল, তেল-ঘি, নুন-মশলা কি চাই বল।

ঈষৎ হেসে মানদা বল্‌লে—ও-মা পয়সা কোথা যে অত-সব জিনিষ কিন্‌বো ?

দামের কথা ভাবিস্ নি। তুই শুধু আমার জিনিষ-গুলি নিয়ে যা,—এই বলে' সওদা তুলে রাখু ঠোঙা ভরতে লাগ্‌লো, একটিবার মেপেও দেখ্‌লে না যে কতখানি সে দিয়েছে

জিনিষ-পত্র দেখে খুসী হয়ে ক্ষান্তমণি বললে,—দেখ্‌লি ত মানু নেপালের দোকানে চার গণ্ডায় পাওয়া যায় কত। আর রাখু ? দূর দূর—ও একটা ডাকাত!

মানদা মুখ ফিরিয়ে হাস্‌লে। তার অর্থ—মা জানেও না যে ও-জিনিষ রাখুরই দোকানের, পয়সা নেয়নি সে একটিও, এবং ঐ পয়সা জমিয়ে সে কিন্‌বে সুগন্ধ তেল আর বিলাতি চিরুণী! ·····

টুলি কুকুরটা এমন যে ছাড় পেলেই সে অমনি রাখুর দোকানে ছুটে যাবে। এটুকু বোঝে না যে সে আর এখন রাখুর নয়—নীলা নিয়েছে তাকে কড়ি দিয়ে কিনে। নির্ব্বোধ প্রাণী কি না, সভ্য জগতের আইন-কানুন জান্‌বে সে কেমন করে ?

নীলাদের যাওয়া ঠিক হয়ে গেল আর সাত দিন পর। নীলা এসে রাখুর কাছে সেই খবর দিয়ে বল্‌লে, কি মজা! কলকাতায় গেলে টুলি আর তোমার কাছে যখন-তখন ছুটে আস্‌তে পার্‌বে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাখু চুপ করে বসে' রইলো। কয়েক দিনের মধ্যেই টুলি ভুল্‌বে যেমন, নীলাও ভুল্‌বে তাকে তেমনি। তাদের মনে আঁচড়ও থাক্‌বে না, কিন্তু এ ক'টা মাস এক সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ খেলা-ধূলা করে' রাখুর মনের উৎস-মুখের পাষাণ-চাপকে ফেলেছে তারা সরিয়ে—যে বান ছুটেছে এখন, তাকে রোধ করবে কে ?

রোজকার মত নীলার হাত-ভরে লেমনচুস্ দিয়ে কাতর-দৃষ্টিতে রাখু তার মুখের পানে চেয়ে রইলো।

লেমনচুস্ চুস্‌তে চুস্‌তে নীলা তার দড়ি-হারগাছি ও হাতে বাড়িয়ে ধরে বললে,—এই দ্যাখো দোকানদার, কেমন নতুন হার।

রাখু জিজ্ঞাসা করলে,—মা গড়িয়ে দিয়েছে বুঝি ?

ক্ষুব্ধ কুণ্ঠিত স্বরে নীলা বল্‌লে,—না—ও মা'র হার ;

এত বলি, কিছুতে গড়িয়ে দেবে না। আজ কত কাঁদ্‌লুম, তাই পরতে দিয়েছে।

রাখু হঠাৎ বলে উঠলো,—আচ্ছা, আমি তোমায় একটি হার গ'ড়িয়ে দেব'খন।

নীলা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো,—সত্যি দেবে? বেশ, বেশ। ঠিক এমনি হার চাই কিন্তু—মাকে বল্‌বো, দ্যাখো, তুমি দিলে না, দোকানদার দিয়েছে।

নীলার গলা থেকে আল্‌গোছে হারটি খুলে নিয়ে রাখু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর তাকে একটু বস্‌তে বলে' সে উঠে লোচন স্যাকরার দোকানে গেল।

লোচনকে বল্‌লে,—এমনি একটি হার গড়তে পারবে লোচন খুড়ো?

হারগাছি হাতে নিয়ে, নাকের ডগায় সুতো-বাঁধা চশমা-জোড়ার উপর থেকে চেয়ে হাস্‌তে হাসতে লোচন বল্‌লে, এত দিনে বুঝলুম মানদাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তিট কি। বলি, কোথায় রেখেচ তাকে? দেখতে-শুন্‌তে কেমন?

রাখু ভ্রূক্ষেপও করলে না। বল্‌লে,—যেমন করে' হোক্ ছ' দিনের মধ্যে চাই ই।

—ঈস্! ভারি জরুরি তাগাদা যে!

তারপর নিক্তিতে ওজন করে' কষ্টি পাথরে সোনা কষে, নমুনাটি এঁকে নিয়ে লোচন বল্‌লে,—দাম পড়বে দেড় শ' টাকা।

—বেশ, তাই দেব.—এই বলে' দোকানে ফিরে এসে রাখু নীলার গলায় হারটি প'রিয়ে দিলে। বল্‌লে,—যাবার দিন ঠিক এমনি একটি হার তোমায় দেব। বাবাকে আর মাকে কিছু বলো না কিন্তু। তা হলে তারা আমায় দিতে দেবে না, তোমায় নিতে দেবে না।

নীলা বলে' উঠলো,—বেশ বেশ, ভারি মজা হবে।—তারপর উঠে বল্‌লে—যাই দোকানদার। আজ আমার পুতুল-ঘরে ঢের কাজ। এই হার পরে' কনে বিয়ে কর্‌বে।......

চন্দন-পাহাড়ের গায়ে ছোট-ছোট ক্ষেতগুলি ডুবন্ত রবির সোনালি কিরণে গিল্‌টি-করা সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে—কে জানে কোন্ রাজসভায়! আকাশে রাঙা' মেঘের ঝালর দোলে।

মানদা যায় আর সুমন্ত্র আসে সেই দরবারে ধানকাটা সারা হয়ে গেছে, এধার ওধার গরু-গুলি চরে' বেড়ায় স্বচ্ছন্দে। সুমন্ত্র আর বাঁশী বাজায় না, ঘরকরণার কথা কয়। ঘরের চালখানি ছাইতে কত খরচ পড়লো, কত টাকা দিয়ে এসেছে সেদিন সে মানদার মাকে বিয়ের খরচ বাবদ, বাকি কত টাকাই বা তাকে দিতে হবে বিয়ের দিন গুণে—এসব কা ছাই মাথা-মুণ্ড কথা! শুন্‌তে শুন্‌তে মানদা বিরক্ত হয়ে ওঠে, সুমন্ত্রকে দেখায় তার মাথাটি ঘুরিয়ে খোঁপার চিরুণী, আর হাতখানি তুলে ধরে' চক্‌চকে কাচের চুড়ি। রাখু তাকে বিনা পয়সায় জিনিষ দেয় আর সেই পয়সা বাঁচিয়ে কি-কি জিনিষ সে কিনেছে—সে-সব গল্প করে' আপনার ছলচাতুরীতে আপনি-ই সে হেসে মরে। কিন্তু সুমন্ত্র সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, বলে, পয়সা বাঁচিয়ে রাখু চায় তোর মন ভাঙাতে। খবরদার!

চোখে কটাক্ষ হেসে মানদা বলে,—তুইও যেমন! দিচ্ছে, দিক না। আর দুটো দিন বৈ ত নয়। তারপর......

ছয় দিনের দিন লোচন স্যাকরা হার গড়িয়ে এনে দাম চাইল। দাম বাকি রেখে রাখু কাউকে নিজের জিনিষ দেয় না, দাম বাকি রেখে পরের জিনিষ সে নেবেই বা কেমন করে'? তবিল উজাড় করে' ঢেলে দিতে হল লোচনকে। ছেলেবেলায় বলি-রাজার কথা সে শুনেছিল—স্বর্গ মর্ত্ত্য যখন সব গেল, তখন বামন-দেবতার পায়ের স্থান করে' দিয়েছিল সে নিজের বুকের উপর! সে-ও কি তাই দেবে

আজ দুদিন মানদা আসেনি তার দোকানে!

হারটিকে নেড়ে-চেড়ে সে দেখতে লাগলো। চমৎকার! দেখতে ঠিক সেদিনকার সেই হারেরই মত—চিনে আলাদা করতে পারে সাধ্য কার? সকাল থেকে নীলার দেখা নেই। এখন একবার সে যদি আস্‌তো!

যামিনীবাবুর চাকরকে আস্‌তে দেখে হারগাছি সে তাড়াতাড়ি জামার ভিতর লুকিয়ে ফেল্‌লো।

লোকটা ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়েছিল। বল্‌লে,—বাবু তলব দিয়েছেন। এখুনি যেতে হবে।

তলব? কিসের জন্য? ও, সেই যাবার দিনের বক্‌শিস্!—মরণ!

রাখু উঠে দাঁড়ালো। এই সুযোগে যার হার তাকে সে গোপনে দিয়ে আস্‌তে পার্‌বে।

যামিনাবাবু অধীরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাখুর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লেন,—এস ভিতরে

পিছন পিছন রাখু ঘরে ঢুকলো। যামিনীবাবুর প্রখর দৃষ্টি তার মর্ম্মে গিয়ে বিঁধেছিল যেন তীরের মতন।

তিনি বললেন,—কয়েকদিন আগে নীলা তোমার দোকানে একগাছি দড়ি-হার পরে' গিয়েছিল, মনে আছে? সেটি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথা আছে জানে?

রাখুর মুখ শুকিয়ে এলো। সে কোনো জবাব দিতে পারলে না।

যামিনাবাবু বলে গেলেন,—নীলা ছেলেমানুষ, কি-যে বলে তার ঠিক নেই। এমন হ'তে পারে—খুলে দেখে হারগাছি তুমি তার গলায় না পরিয়ে আর কোথাও ফেলে রেখে দিয়েছিলে, অবশ্য ভুলে।

রাখু যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, এমনিভাবে সে দাঁড়িয়ে রইলো। সে যে নিজের টাকায় হার গড়িয়ে এনেছে আজ নীলার গলায় পরিয়ে দেবে বলে'!

যামিনীবাবু আবার বল্‌লেন,—ভালো করে ভেবে দেখ, রাখু। এ-ব্যাপার আমি পুলিসের হাতে তুলে দিতে চাই না। আগে তুমি কি ছিলে কোথা ছিলে, সে বৃত্তান্ত তোমার যেমন জানা, তাদেরও তেমনি তাতে তোমার বিপদ হতে পারে।

রাখুর দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত যেন আর নেই। কোনো কথা না বলে, কোনো দিকে না চেয়ে, ধীরে ধীরে ফতুয়ার পকেটে আঙুল ক'টি চালিয়ে দিয়ে প্রাণশূন্য যন্ত্রের মত হারগাছি টেনে বের করলে এবং প্রাণশূন্য যন্ত্রেরই মত সে তা' যামিনীবাবুর হাতে তুলে দিল।

যামিনীবাবু একটিবার সেই হারের পানে চেয়ে নিঃসংশয় হয়ে বল্‌লেন,—দিয়ে ভালোই করেছ রাখু। আর তোমার কোনো ভয় নেই।

মুখ বুজে রাখু চলে যাচ্ছিল, যামিনাবাবু ডাকলেন,—তোমায় অমন বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে দেব না রাখু। এই নাও কিছু বক্‌শিস্। এই বলে' কয়েকটা টাকা বের করে ধরলেন।

বিষধর সাপকে যেন ফণা তুলে ছোবল মার্‌তে দেখেছে ঠিক তেমনি করেই রাখু চমকে উঠলো। পরক্ষণে সারা মন তার লাঠি হাতে উদ্যত হয়ে দাঁড়ালো।

দাঁতে দাঁত চেপে রুক্ষ ভাঙা গলায় সে বল্‌লে, জেলে পাঠান্, শাস্তি দিন—যা খুসী করুন বাবু। কিন্তু দোহাই আপনার, বার বার এমন করে বক্‌শিস দিয়ে আমায় অপমান করবেন না।

যামিনীবাবু অবাক হয়ে তার দৃপ্ত মূর্ত্তির পানে স্থিরনেত্রে চেয়ে রইলেন, যতক্ষণ রাখু সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাগানের ভিতর অদৃশ্য হয়ে না গেল। তাঁর মুখের রেখায় একটু শ্লেষের হাসি দেখা দিয়েছিল। দাঁও ফস্‌কেছে যখন, সামান্য বকশিস্ মনে তখন না ধরারই কথা!

গেটের কাছে নীলা দাঁড়িয়েছিল। রাখু বেরিয়ে আস্‌তে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কোমল স্বরে ডাক্‌লে,—দোকানদার!

রাখু তার পানে চাইলো যেন অভ্যাস-বশে, ইচ্ছা করে' নয়।

নীলা বল্‌লে,—বাবা বল্‌ছে, তুমি ডাকাত। আমি বলেছি তাকে, মিছে কথা।

ঐ কটি কথাই যে যথেষ্ট। রাখুর মন থেকে অপবাদ ও অপমানের বেদনা যেন কোন যাদু-মন্ত্রে দূর হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ নীলাকে কোলে তুলে নিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো। আর সেই হাসির উপর ঝরে' পড়্‌লো চোখের জল অবিরল ধারায়—যা বারণ মান্‌লে না কোনমতে!··· ···

অনেক দিন পর আজ রাখু আবার তার খাতাটি নিয়ে হিসাব খতিয়ে দেখ্‌লে—যতদিন সে তার লাভকে গণ্ডা-পনের ছোট-ছোট খোপগুলির ভিতর ভরে' রেখে এসেছিল,

তার হিসাবও মিলেছে ততদিন। যখন নগদ দাম সে নিত হাতে হাতে চুকিয়ে, ধারে বিক্রী করেনি, তখন সে তার ঐ ক্ষুদ্র তবিলের বাক্সটি ভরে তুলেছিল, নিজেকে রিক্ত করে'। কিন্তু আজ সে এক বৃহৎ মহাজনী কারবার সুরু করে' দিয়েছে, সেখানে নগদ চলে না একেবারে, ধারে বিক্রীই সব—আর সে-ধার শোধ হবার নয় এ-জন্মেও!

একটানে সে ঐ "ধারে বিক্রী-নাই"-বোর্ডটি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দূর রাস্তা দিয়ে মানদা আস্‌ছিল, কোথা থেকে রাখু তা জানে না। তার তবিল গেছে, কিন্তু সে ত আছে। তবিল খালি করেছে সে যতখানি, আপনাকেও যে ভরে তুলেছে ততখানি! সে আজ দেবে সেই আপনাকেই বিলিয়ে। বলি রাজার দান সবাই জানে, তার দান জান্‌বে না কেউ। মানদা তার জিনিষগুলি নিয়ে গেছে, নেবে না কি শুধু তাকেই? সে কি তার জিনিষের চেয়েও ছোট?

সে ডাক্‌লো,—মানদা, এদিকে আয়।

মানদার হাতে একটি পুঁটুলি, মুখে পান। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এলো। রাখু মুখ নামিয়ে নিলে। তার দিকে চেয়ে এ কথা সে বলবে কেমন করে'—ওগো একদিন এসেছিলে তুমি আমার কাছে, আমি তোমায় দাম দিয়েও কিনিনি, আজ আমি এসেছি তোমার কাছে, তুমি আমায় বিনামূল্যে গ্রহণ কর।

মানদা বললে,—দুদিন আজ বাড়ী ছিলাম না। এই ফির্‌ছি।

—কোথা থেকে?

মানদা কথা-কটিতে একটু জোর দিয়েই বললে,—শ্বশুর বাড়ী থেকে।

রাখু চম্‌কে উঠে চাইলে তার মুখের পানে। চোখ দুটিতে কৌতুক ভরে' মানদা দুষ্ট হাসি হাস্‌লে। তার সিঁথির টকটকে সিঁদুর যেন রাখুকেই শাসাচ্ছে। সে আর কথাটি মাত্র বল্‌লে না।

মানদা বলে গেল,—কোথা বিয়ে হল, কেমন ক'রে বিয়ে হ'ল, জিনিষ-পত্র টাকা-কড়ি কি কি তারা দিয়েছে, ইত্যাদি। তার একটি কথাও রাখুর কানে গেল না। চোখ-কান সবই যেন তার পাথরের মত অসাড় হয়ে উঠেছিল। শুধু বুকের ভিতর একটা নাই-নাই শব্দের প্রলয় বয়ে যেতে লাগ্‌লো। টুলি নাই…নীলা নাই…মানদা নাই!…

মানদা দোকান ছেড়ে বাড়ীর দিকে খানিক এগিয়েছে, রাখু ছুটে বেরিয়ে এসে ডাক্‌লে,—মানদা—মানদা।

সে ফিরে এলো।

রাখু বললে—ধার-বাকির হিসাব কষতে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে; এ ঝক্‌মারি আর সইতে পারি না, মানদা। এখন থেকে দোকান চালাবি তুই।

বাষ্পে তার চোখ দুটি ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছিল—স্বর কাঁপছিল। হাসি ভুলে মানদা রইলো বিস্ময়মুগ্ধ করুণ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে।

এক গোছা চাবি তার হাতে গুঁজে দিয়ে রাখু বললে—আমার একটা কথা শুন্‌বি কি? তোর দোকানে কেউ যদি এসে ধার চায়-ধার দিস্‌। আমার মত তাকে হাঁকিয়ে দিস্‌নি যেন। চললুম মানদা।

সে চলে গেল। পরদিন কেউ আর তাকে সেখানে দেখ্‌তে পেলে না।

* * * *

মাসখানেক কেটে গেছে। সুমন্ত্র ও মানদা রাখুর দোকান চালায়, আবার ঝগড়াও বাধায় রাখুকে নিয়ে। এখন আর মানদা শুন্‌তে চায় না রাখুর নিন্দা, আর সুমন্ত্র সইতে পারে না রাখুর প্রশংসা।

বাবুদের ভীড় কমে গেছে। তারা সব দেশে ফিরেছে কোন্‌দিন। এমন সময় একদিন আশ্চর্য্য হয়ে সবাই দেখ্‌লে, যামিনীবাবু এসেছেন আবার নীলা আর তার মাকে নিয়ে।

ষ্টেশন থেকে গাড়ী করে তারা বরাবর এসে থামলো সেই দোকানের সাম্‌নে।

নীলা ডাক্‌লে,—দোকানদার।

যামিনীবাবু নেমে জিজ্ঞাসা করলেন,—এইটে রাখুর দোকান না?

সুমন্ত্র শঙ্কিত হয়ে বলে উঠলো,—তার দোকান কিসের

মশায়? আমি কিনে নিয়েছি পয়সা দিয়ে। দলিল আছে।

মানদা এগিয়ে এসে বললে, না বাবা। ও সব মিছে। দোকান সে আমায় চালাতে দিয়ে গেছে। যেদিন সে ফিরে আস্‌বে, দোকানটিও আমি তখন তার হাতে সঁপে দেব।

যামিনীবাবু আবার প্রশ্ন করলেন,—সে কোথা গেছে জান?

সুমন্ত্র বললে,—জেল-টেল কোথাও গিয়ে থাক্‌বে।

মানদা রেগে বললে—সাধু-ফকির মানুষকে বলছিস অমন করে'? তোর কি শাপ-মন্যির ডর নেই?

নীলার মা গাড়ীতে বসে সব শুনছিলেন। বললেন,—দ্যাখত নালা, কি বিপদেই তুই আমাদের ফেলেছিস্‌। গলার হারগাছিকে অমন করে কি পুতুলের বাক্সে পুরে রাখতে হয়? এখন আমাদের পরের হার বয়ে বেড়াতে হবে কতদিন, কে জানে।

যামিনীবাবুর মনে জেগে উঠছিল তখন এক দৃপ্তমূর্ত্তি—রুক্ষ কর্কশ! সেদিন এই লোকটি চেয়েছিল এক মহান্‌ উপলব্ধি কর্‌তে, তাই লাঞ্ছনাকে সে অমন তুচ্ছ-জ্ঞানে গায়ে মেখে নিতে পেরেছিল!

গাড়ীতে উঠে বসে তিনি স্ত্রীকে বললেন,—ও-হারের দাম জহরতের চেয়েও বেশী—যত্ন করে তুলে রেখে দিও। নীলার বিয়ের সময় ঐ হবে তার শ্রেষ্ঠ যৌতুক!

ব্যর্থতার গৌরব

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

আঁখি মোর যে দিকে ফিরাই—
এ ধরার প্রতি গৃহে ব্যগ্র বাহু যখনই বাড়াই—
আঁকড়িতে যাই যত ধরণীর ধূলি—
কিছু তো পড়ে না ধরা—আলিঙ্গনপাশ যায় খুলি!
এ ধরার গৃহে গৃহে উৎসব লগন
অহরহ চলিয়াছে, কেবলি যখন
আপন বেদনাহত বক্ষে চাপি অধীর পিপাসা,—
অন্তরের উদ্বেলিত আশা,
দ্বিধায় জড়িত পদে লজ্জানত সজল নয়নে
ধীরে ধীরে আসি সেই উৎসব অঙ্গনে
স্নেহের ভিখারী, যবে রই দাঁড়াইয়া,
কেহ তো কহে না কথা—আদরে কেহ তো আসি লয় না ডাকিয়া
এ ভাগ্যবিহীনে; মোর লাগি
কোনো গৃহে স্নেহভরা কারো আঁখি রহে না তো জাগি!
আমারে ঘেরিয়া চলে সবাকার বিজয়-উৎসব;
মোর ঘরে তার ধ্বনি হয়ে যায় আপনি নীরব।
বরণ-মালিকা পরে ঘরে ঘরে তারা
বরণীয়, শোভনীয়; আমি হই সারা
দ্বারে দ্বারে কর হানি;
কোথাও আমার লাগি এতটুকু স্নেহমাখা বাণী
ওঠে না তো গুঞ্জরিয়া।
পথে-চলা এ জীবন সাঙ্গ হয় পথেতে চলিয়া!

* * * *

পথে-চলা জীবনের হে মহারাজ!
ভুল তোমা বুঝিব না আজ।
গৃহে গৃহে যার লাগি ব্যর্থতার তীব্র উপহাস,
তারি লাগি স্নেহের কী করুণ প্রকাশ
বিকাশিলে পথে পথে!—
মন্দিরের দেবতা কি বাহিরিলে দিগ্বিজয়-রথে
দুই ধারে বিলাইয়া করুণার ধারা?
ঘরে যার মিলিল না সাড়া,
বাহিরে তাহার তরে সাজাইলে দানের সম্ভার,—
দীপ্ত করি হৃদয়ের গ্লানি অন্ধকার!
কুসুমের স্মিত সম্ভাষণে,
আলোকের সুনিবিড় অচ্ছেদ্য পুলক-আলিঙ্গনে,
স্পন্দিত বক্ষের পরে সমীরের মৃদুল পরশে,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের কাকলীর অমৃত-বরষে,
সুদূর-বিস্তৃত স্নিগ্ধ শ্যাম মহিমায়,—
গৃহহারা ভুলে যায় গৃহ-বেদনায়!
যে দান দুহাতে তুমি বিলাইলে হে মহারাজ!
ব্যর্থ এ জীবন মোর গৌরবে ভরিয়া উঠে আজ।



ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য কোন কোন মহাত্মার চেষ্টায় কিরূপ দ্রুততর উন্নতিমার্গে চলিয়াছিল তাহা ঐ একশত বৎসরের মোটামুটী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর "লিপিমালা" এবং তাহার কিছু পরেই তৎকৃত 'রাজাবলী' প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ইনি "প্রতাপাদিত্যচরিত" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই তিনখানাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম গদ্য-সাহিত্য। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধচন্দ্রিকা" ইহার পূর্ব্বে রচিত হয়। 'তোতা ইতিহাস" তাহারও পূর্ব্বে। সুতরাং রামরাম বসুই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম গদ্য-সাহিত্য-লেখক তাঁহার "লিপিমালার" ভাষা —"তোমাদের মঙ্গল সমাচার অনেক দিন পাই নাই। তাহাতে ভাবিত আছি। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত, গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পাবেন নাই।" রাজাবলীর ভাষা:—"শকাদি পাহাড়ী রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে মারিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট হইলেন।"

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "বত্রিশ সিংহাসন" রচিত হয়। তাহার ভাষা:—"একদিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কথা কিছু কহিল না।"

উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকার" ভাষা কিন্তু "বত্রিশ সিংহাসনের" মত সরল বা সুখবোধ্য নহে। বিকট সংস্কৃতের অনুকরণে উৎকট ভাষায় লিখিত:—"কোকিল কলালাপবাচাল, যে মলয়ানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

তার পর ১৮১১ খৃষ্টাব্দে "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" রচিত হয় এবং লণ্ডনে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। কৃষ্ণচন্দ্র চরিতের ভাষা:—"পরে নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশীতে প্রেরণ করিলেন।" দীনেশবাবু যে বলিয়াছেন "কৃষ্ণচন্দ্র চরিতের ভাষা খাঁটী বাঙ্গলা, ইহার উপর ইংরাজী গদ্যের কোন ভাব দেখা যায় না" তাহা ঠিক। বোধ হয় "কৃষ্ণচন্দ্র চরিতই" খাঁটী বাঙ্গলা ভাষার প্রথম গদ্য-সাহিত্য। ঠিক এই সময়ে বা কিছু পরে রামজয় তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক "সাংখ্য ভাষ্য", লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক "মিতাক্ষরা" ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক "ন্যায়দর্শন" বঙ্গভাষায় লিখিত হয়।

এই সময়ে কলেজের বাঙ্গলা পাঠ্য ছিল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "পুরুষ পরীক্ষা" "হিতোপদেশ" প্রভৃতি। বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার প্রভৃতি দেখিয়া পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সংস্কৃতজ্ঞ টোলের পণ্ডিত ছাড়া অন্য লোক বড় একটা সাহিত্য চর্চ্চা করিত না, তখনকার বাঙ্গলা লিখিতে হইলে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইত তজ্জন্য তৎকালে ইহা একরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই একচেটিয়া ছিল, কিন্তু এভাব বেশী দিন থাকিল না, ইহার কিছুদিন পরেই মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় অনেকটা সফলতা লাভ করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙ্গলা সাহিত্য নব কলেবর ধারণ করিয়া উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহার "পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী," "বেদান্তের অনুবাদ," "কঠোপনিষদ," "পথ্য প্রদান" প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা করা বাহুল্য, কারণ রাজা রামমোহনের গ্রন্থ সাহিত্যসেবী মাত্রেরই অধীত। মহাত্মা রামমোহনের পর পাদরী কৃষ্ণমোহন ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গলা ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাদরী কৃষ্ণ বন্দ্যো "বিদ্যাকল্পদ্রুম" নামে একখানা মাসিক পত্রও প্রচার করেন।

বড়লাট লর্ড হার্ডিং-এর নামে "বিদ্যাকল্পদ্রুম" উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। সেই উৎসর্গপত্রের ভাষা দেখিলেই শত বৎসর পূর্ব্বের মাসিক পত্রের অবস্থা ও ভাষা কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে:—"গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে, অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম; কিন্তু সম্প্রতি কেবল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইলাম।"

এই সময়ে উক্ত দেশীয় পাদরীর "ষড়দর্শন সংগ্রহ" গ্রন্থ এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহের ভাষা—"আমরা পল্লিবাসীজনের প্রতি অমর্যান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শ পক্ষের উল্লেখ করিতেছি; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক এমন আমাদের অভিসন্ধি নহে।" এই বিবিধার্থ সংগ্রহ ভিন্ন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল "রহস্য সন্দর্ভ," "পত্র কৌমুদী," "শিবাজীর জীবনী," "মিবারের ইতিহাস" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দী, পার্সী, উর্দ্দু, ইংরাজী, গ্রীক্, লাটীন, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

এইরূপে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ প্রকারে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে সবিশেষ যত্নপর হয়েন। তাঁহার "শিশুশিক্ষা" তিন ভাগ প্রকাশিত হইয়া প্রথম শিক্ষার্থী বাঙ্গালী বালকগণের বিশেষ উপকারে আইসে। মদনমোহন "সর্ব্ব শুভঙ্করী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত "রসতরঙ্গিণী", "বাসবদত্তা" প্রভৃতি পদ্যকাব্য তৎকালে বঙ্গ সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

ইহার পরই গুপ্ত কবির কাল। সে সময় কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলা সাহিত্যে কিরূপ প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছিলেন তাহা বঙ্কিমবা প্রভৃতি তাহার শিষ্যগণের প্রভাবেই পরিলক্ষিত হইতে পারে

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত কবির সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। এই প্রভাকর হইতেই কবির যশঃপ্রভা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে "প্রভাকর" বন্ধ হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় প্রকাশিত হয়। তখন সপ্তাহে তিন দিন "প্রভাকর" প্রকাশিত হইত, পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে "প্রভাকর" দৈনিক হইয়া পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মাসিকে পরিণত হয়। এই প্রভাকরই তখন বিখ্যাত সংবাদপত্র ছিল। প্রায় শিক্ষিত ভদ্রলোকমাত্রেই ইহার গ্রাহক ছিলেন। তার পর উক্ত গুপ্ত কবি "পাষণ্ড পীড়ন" নামক একখানা সংবাদপত্রও বাহির করেন। ইহা নব প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্থিতি-কামনায় কিছুদিন বাগযুদ্ধ করিয়া শেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশকও কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি বঙ্গ ভাষায় গদ্য ও পদ্যে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য কোনও বিষয় বাদ যাইত না। তিনি সকল বিষয়েই লেখনী চালনা করিতেন।

এক্ষণে আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথে আর চারিজন গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম রঘুনন্দন গোস্বামী; ইনি রামচরিত্রাবলম্বনে "রামরসায়ন" নামক অতি সুন্দর একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার পর কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস, বিচিত্রবিলাস ও রাই উন্মাদিনী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যভাণ্ডারের অঙ্গ পুষ্ট করে। রাধামোহন সেন মহাশয়ও "সঙ্গীত তরঙ্গ" প্রকাশিত করিয়া এই সময় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কাদম্বরীর অনুবাদক পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন। তারাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা দিব্য প্রাঞ্জল ও শ্রুতিসুখকর। তৎকালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের লিখিত বাঙ্গলা একরূপ অবোধ্যই ছিল। তাহার উদাহরণ প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি। কিন্তু তারাশঙ্কর, কাদম্বরীর অনুবাদে সংস্কৃতমূলক বাঙ্গলা যে কিরূপ সুন্দর করা যাইতে পারে তাহার পথ দেখাইয়াছেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পথানুসরণে বঙ্গভাষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন করেন।

কাদম্বরীর ভাষা:—"...সখে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি। চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন, বান্ধবহীন হইয়া কিরূপে এই দেহভার বহন করি। কি আশ্চর্য্য! আজন্ম পরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায়, পরিত্যাগ করিয়া গেলে?" উক্ত তর্করত্ন মহাশয় 'রাসেলাস' নামক একখানি ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহার ভাষা:—"বৃদ্ধ এইরূপ আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া রাজকুমারের মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন 'কুমার! তুমি কি নিমিত্ত প্রাসাদের সুখসম্ভোগ ও আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থিতি কর ও লোকের সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া মৌনভাবে থাক?" এই যে তারাশঙ্কর বাঙ্গলা ভাষাকে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিলেন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকারেই নূতনভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

(অর্চ্চনা, পৌষ, ১৩৩১)　　　　শ্রী শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ

—

দুর্গা

দুর্গাপূজা শারদীয়া পূজা। এই মহাপূজা শরৎ ঋতুতেই হয়। আজকাল শরৎকাল বলিলে ভাদ্র আশ্বিন মাস বুঝায়; পূর্ব্বে কিন্তু আশ্বিন ও কার্ত্তিক বুঝাইত। এই পূজা বাঙলা দেশের সকলের চেয়ে বড় পূজা; ইহার চেয়ে বড় পূজা বাঙলায় নাই—ভারতে নাই। কোন কোন দেশের এই পূজাকে নবপত্রিকার পূজা বলে। নেপালে নবপত্রিকার উৎসব হয়। এই পূজা করিবার সময় কদলী, দাড়িম, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী, এই নয়টী গাছ একত্র করিয়া তাহার উপর পূজা করিতে হয়। এ পূজায় কোন প্রতিমা থাকিবার ব্যবস্থা নাই।

আমাদের দেশে দেবীপূজা দুইরূপ—বাসন্তীপূজা পূজার একরূপ, অপর রূপে হয় দুর্গা পূজা। বাসন্তীপূজা করিবার নিয়ম, এক, দুই বা তিন দিন; আর দুর্গাপূজার বিধি একদিন হইতে আরম্ভ করিয়া একপক্ষ পর্য্যন্ত. সাধারণতঃ বাসন্তীপূজা তিন দিনের পূজা। কালিকাপুরাণে অষ্টমীকল্পের আর দুর্গোৎসববিবেকে নবমীকল্পের বিধি আছে। ইহাদের মতে এই পূজা দুইদিন বা একদিন করা চলে। পূজাতে চণ্ডীপাঠও আছে। ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষ-মূলে আমন্ত্রণ ও প্রতিমার 'অধিবাস' করিয়া থাকিতে হয়, পরদিন সপ্তমীতে আমন্ত্রিত বিল্বশাখা কাটিয়া যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। বাসন্তীপূজার প্রবর্ত্তনকাল সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, ৬২ অধ্যায়) বলেন প্রথমে কৃষ্ণ গোলোকে রাসমণ্ডলে মধুমাসে (চৈত্রমাসে) দুর্গাদেবীর পূজা করেন। দ্বিতীয় বারে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সঙ্গে মধুকৈটভের যুদ্ধের সময়ে প্রাণ-সঙ্কটকালে দেবীপূজা করেন। বসন্তের ও শরতের পূজার পার্থক্য আছে। বাসন্তীকে কালোচিত পূজা বলে, শারদীয়া পূজাকে অকাল পূজা বলে, এইটুকুই প্রধান ভেদ। অকাল বলিলে আমরা বুঝি কি? সৌর বর্ষের মকর সংক্রান্তি হইতে ৬ মাস অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ; কর্কট সংক্রান্তি হইতে ৬ মাস অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক অয়নে দেবতারা জাগ্রত থাকেন অপর অয়নে নিদ্রিত। যখন তাহারা জাগ্রত তখন "কাল", যখন নিদ্রিত তখন "অকাল"। উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত এবং দক্ষিণায়নে নিদ্রিত, তাই—উত্তরায়ণের বাসন্তী কালের পূজা, আর দক্ষিণায়নের শারদীয়া অকালের পূজা। আর অকালের পূজা বলিয়াই এই পূজার এত আদর। অকালে দেবতাদের নিদ্রা, কাজেই দেবীকে জাগাইতে হয়; সেইজন্যই বোধনের ব্যবস্থা। শারদীয়া পূজার শুধু আমন্ত্রণ ও অধিবাস করিলেই চলে না, এ পূজায় বোধন করিতে হয়। আর এই বোধনই এই পূজায় প্রধান ও বিশেষ কার্য্য।

আমরা যে দুর্গাপূজা করিয়া থাকি সেই দেবীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা দরকার। লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ মূর্ত্তি সংযুক্ত দুর্গাপূজার ধ্যান করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু এইরূপ একত্র সংযুক্ত মূর্ত্তির বর্ণনা একটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। একমাত্র কালীবিলাস তন্ত্রে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ সুর ও সিংহ সমন্বিত দুর্গাদেবীর আরাধনার কথা আছে। ইহারই বচন অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে পূজা করিতে হয়।....

দেবীর রূপ—মাথায় জটা, অর্দ্ধচন্দ্রের মুকুট, তিনটী চক্ষু, মুখ পূর্ণচন্দ্রের মত, দেহের আভা তপ্তকাঞ্চনের তুল্য, দাঁড়াইবার ভঙ্গী বেশ সুন্দর—তাহার দেহ—নবযৌবনসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, দন্ত—

মনোহর; ভাব—উগ্রতিভঙ্গিমাযুক্ত' দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী। মূলোত্থিত মৃণালবৎ দশবাহুযুক্তা। দেবীর দশহাত। সকলের উপরে প্রথম দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, তাহার নীচে খড়্গ, তার নীচে চক্র, ক্রমনিম্নে তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি; বামবাহু—উর্দ্ধ হইতে ধরিলে পাই ১। খেটক, ২। গুণযুক্ত ধনুক। ৩। পাশ, ৪। অঙ্কুশ, ৫। ঘণ্টা ও পরশু।

দেবীর নিম্নে ছিন্নশির মহিষ। মহিষের মাথা কাটা যাওয়ায় খড়্গপাণি দানব বাহির হইতেছে। এই দানবের হৃদয় শূল দিয়া উদ্ভিন্ন হওয়ায় অস্ত্র বাহির হইয়া পড়িতেছে। অঙ্গ রক্তে রঞ্জিত, আরক্ত চক্ষু বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। মুখ ভ্রুকুটীতে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। দেবী পাশযুক্ত বামহস্তে তাহার কেশ ধরিয়া রাখিয়াছেন. তাহার রক্ত বমন হইতেছে, দেবী তাহাকে "আঃ" এই শব্দ করিয়া সিংহকে দেখাইয়া দিতেছেন। দেবীর দক্ষিণ পদ সমানভাবে সিংহের উপর, বামপদের অঙ্গুষ্ঠ উঁচু হইয়া মহিষের উপর। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা. চণ্ডী, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডা—এই অষ্টশক্তিতে দেবী পরিবৃতা। দেবী দশভুজা, ত্রিনেত্রা। তিনি দ্বিভুজ হইতে আটাশ হাত ধারণ করেন।

দেবীর পূজা কয়েকটী পদ্ধতি মতে সম্পন্ন করিতে হয়। সাধারণতঃ বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত পদ্ধতি, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে দেবী পূজিত হইয়া থাকেন।

মৈমনসিং জেলায় মৎস্যপুরাণোক্ত পদ্ধতি ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী মতে পূজা বিহিত হয়। রাজসাহী জেলায় বাণীনাথ কৃত দুর্গাপূজা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া দেবীর পূজা হইয়া থাকে। আরও দু'একটি জেলায় একটু আধটু ইতর-বিশেষ আছে।

দেবীপুরাণ ও দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি বোধ হয় এক নয়। দেবী-পুরাণে (২২ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক) আছে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে নয় রাত্রি পূজার ব্যবস্থা—

"কন্যাসং স্থৌরবৌ শুক্রশুক্রমায়ত্য নন্দিকাম্ ॥"

দেখা যাইতেছে, দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতির ধারা ইহাতে নাই। এ পূজা যে রামচন্দ্রের পূজা অথবা ইহাতে যে অকাল বোধন আছে, এ সব কথা কালিকাপুরাণে নাই, বিসর্জ্জনের কথাও নাই। এই পুরাণের ধ্যান ও দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতির ধ্যান এক নয়। পদ্ধতির ধ্যান কালিকাপুরাণের ধ্যান। দেবীপুরাণে—২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১ ও ৩২ অধ্যায়ে পূজা ও বিধি দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি হইতে এক রকম পদ্ধতি তৈয়ার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি হইয়া যাইবে না।

কালিকাপুরাণে ৫২ হইতে ৬১ অধ্যায় পর্য্যন্ত দেবীর আবির্ভাব ও পূজার কথা আছে। প্রচালত পদ্ধতি সম্বন্ধে সেই একই কথা, তবে কাটামটা বজায় আছে। কালিকাপুরাণে দেবীর মূর্ত্তি তিন রকম—একবার ইনি উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভুজা, একবার ভদ্রকালী ষোড়শ-ভুজা, একবার দুর্গা কাত্যায়নী দশভুজা। এই তিন মূর্ত্তিতেই দেবী মহিষমর্দ্দিনী। এই পুরাণের ৬০ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম সৃষ্টিতে মহিষাসুরকে উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ভদ্রকালীরূপে, এখন দুর্গারূপে তাহাকে বধ করিয়া থাকেন। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কালিকাপুরাণোক্ত কয়েকটী বচন পাওয়া যায়।...

লিঙ্গপুরাণে বলে 'শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা'।

'দুর্গাপূজাবিধি' চতুঃকর্ম্মময়ীর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "স্নপন—পূজন—বলিদান—হোমরূপা সা চ"। লিঙ্গপুরাণমতে নবমীতে দশভুজার বোধন, আর কালিকাপুরাণমতে পূজা করিলে নবমীতে দশভুজার বোধন। দেবী পূজায় বলির বিধি আছে। আজকাল ছাগবলি দেখিতে পাওয়া যায়, মহিষবলিও হয়। কালিকাপুরাণ (৬৭ অধ্যায়) বলেন মেষ শার্দ্দূল, শূকর, গণ্ডার, গো, রুরু, শরভ ইহারাও দেবীর পূজায় বলির পশু। বাঙলাদেশে ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়, কোন কোন স্থানে নরবলিও দেওয়া হইত। মহাকবি বাণ এক চণ্ডিকা মন্দিরের বর্ণনায় তাঁহার কাদম্বরীতে নরবলির কথা বলিয়াছেন। ইঁহার শত বৎসর পরে ভবভূতি 'মালতী মাধবে' চামুণ্ডা-মন্দিরের বর্ণনায় নরবলি আনিয়া ফেলিয়াছেন। আরও একশত বৎসর পরে 'সমরৈচ্ছকহা'য় হরিভদ্র চণ্ডিকা-মন্দিরে শবরদের নরবলির বর্ণনা করিয়াছেন। কালিকাপুরাণে কালীর কাছে নরবলি দিবার সমস্ত খুঁটিনাটির বর্ণনা আছে। কালিকাদেবী নররক্তে ক্ষুধিত থাকেন। মহাভারতে পাওয়া যায়, দুর্গাদেবী মদ্য, মাংস ও বলিতে বড়ই তুষ্ট। দুর্গাপূজায় এইগুলি বিশেষ অঙ্গ ছিল। বামাচারীরাও দুর্গাপূজা করে, সে এক অদ্ভুত বীভৎস প্রণালীর পূজা।

দেবীর আবির্ভাব বা উৎপত্তি—কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও কাশীখণ্ডে দেবীর উৎপত্তির কথা আছে। দেবী-ভাগবত, মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামচন্দ্রের অকালে পূজার কথা আছে।...

দুর্গা নামের কারণ—দেবীপুরাণ বলেন দেবতারা দেবীকে স্মরণ করায় তিনি তাহাদিগকে রিপু-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্যই দেবীর নাম হইল দুর্গা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, ৫৭ অঃ) বলেন, দুর্গ বলিতে দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কর্ম্মবন্ধন, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় ও অতিরোগ বুঝায়। দেবী এই সকল নাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা।...

দেবীপুরাণ (৩৭ অধ্যায়) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (প্রকৃতিখণ্ড, ৬৭ অধ্যায়) দুর্গার নামের এক মস্ত ফিরিস্তি দিয়াছেন। মহাভারতেও (৬.২৩) দুর্গার গুণ ও নামের প্রকাণ্ড তালিকা আছে। এটা অর্জ্জুনের দুর্গাস্তব।

দুর্গার লীলার মধ্যে প্রসিদ্ধ লীলা তাঁহার অসুরদমন। অসুর-দলনই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের বিষয়। দুর্গা-পূজকদের এখানি বিশেষ শাস্ত্র। এই গ্রন্থে দুর্গা সমগ্র দেবতাদের সমষ্টিভূত শক্তি হইতে চণ্ডিকা নামে আবির্ভূতা হন। তাঁহাকে তাঁহারা ক্রোধে মহিষাসুরের উপর ফেলেন। দেবী সমস্ত অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। তারপর চণ্ডিকা ও মহিষাসুরে একা একা যুদ্ধ। শেষে মহিষাসুরের মাথার উপর দাঁড়াইয়া তার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন এই অসুর মহিষের আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কাঁধের ভিতর দিয়া অসুর বাহির হইল। দেবী তাহাকেও বিনাশ করিলেন। আমাদের প্রতিমায় মার এই মূর্ত্তি আছে। ছবিতেও এই মূর্ত্তি। কাব্যেও এই মূর্ত্তি। ৭ম শতকের মহাকবি বাণ এই দৃশ্যই তাঁর চণ্ডীশতকে প্রত্যেক শ্লোকেই বর্ণনা করিয়াছেন। মহিষাসুর বধ ছাড়াও দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের কথা আছে। এই দুই অসুর দেবতাদের তাড়াইয়া ত্রিলোক কাড়িয়া লইয়াছিল। দেবতারা পার্ব্বতীর সাহায্য চাহিলেন। তিনি তখন গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। তাঁর শরীর হইতে আর এক দেবী বাহির হইল—নাম অম্বিকা বা চণ্ডিকা। শুম্ভ নিশুম্ভের দুই সহচর ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ। তাহাদে

পরামর্শে শুম্ভ এই সংবাদ দিয়া দূত পাঠাইল যে, সে তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। দেবী রাজী হইলেন। তবে কড়ার করিলেন যে তাঁহাকে যুদ্ধে হারাইতে হইবে। এই শুনিয়া শুম্ভ অনেক অসুর লইয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিবার জন্য ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন। তিনি তো সকলকে বধ করিয়া ফেলিলেন। চণ্ডমুণ্ডের পালা এইবার। তারাও বিপুল সেনা লইয়া গল। অম্বিকা তাহাদের দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের চোটে কপাল দিয়া আর এক দেবী বাহির হইলেন। ইনি হইলেন কালী—শীর্ণদেহা, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিতা, নরমুণ্ডহারা, তাঁর প্রকাণ্ড মুখের ভিতর দিয়া জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহার সঙ্গে খুব যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চণ্ডমুণ্ডকে মারিয়া ফেলিলেন—তাহাতে তাঁহার নাম হইল চামুণ্ডা। এ নাম ইঁহার আগে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। পরে মালতী-মাধবে আছে। এইবার শুম্ভ বিপুল বলবাহিনী লইয়া অম্বিকার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। দেবতারা সব দেহধারণ করিয়া অম্বিকার দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অসুরদের ভিতর ছিল রক্তবীজ। তার রক্ত মাটিতে পড়িলেই আর রক্ষা নাই অমনি একজন জন্মিবেন। যুদ্ধ চলিল। এদিকে রক্তবীজের রক্তে অসংখ্য অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। চণ্ডিকার তখন আদেশ হইল—চামুণ্ডা! রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়িবার আগেই খাইয়া ফেল। শেষে রক্তশূন্য করিয়া ক্লান্ত অসুরকে মারিয়া ফেলিলেন। অতঃপর দেবীর সিংহ অসুরদের মধ্যে মহাত্রাস উৎপাদন করায় নিশুম্ভ দেবীকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সমর হইল। নিশুম্ভ পপাত মমার চ। শুম্ভকে দেবী নিহত করিলেন। এই এক আখ্যায়িকা।

দুর্গার আর এক মূর্ত্তি আছে। সে মূর্ত্তি যোগনিদ্রা বা নিদ্রা কালরূপিনী। হরিবংশে (৩২-৩৬) বৈশম্পায়ন বলেন—দেবকীর পুত্রনাশে কংসের মতলব নষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণু পাতালে যান। সেখানে তিনি নিদ্রকালরূপিনীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সহায়তা করিলে তিনি তাঁকে সারা দুনিয়ায় জাহির করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি যশোদার নবম সন্তানরূপে সেইদিন জন্মিবেন, সেদিন তিনি দেবকীর অষ্টম পুত্ররূপে জন্মিবেন। তার পর উভয়কে বদলাবদলি করা হইবে। তাঁকে পাহাড়ে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। তখন তিনি অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়া তাঁহারই সমান গৌরব পাইবেন। ইন্দ্র তাঁর স্তুতি করিবেন ও তাঁহাকে কৌষিকী নামে তাঁর ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আর ইন্দ্র বিন্ধ্য পর্ব্বতে তাঁর অনন্তকাল বাসের ব্যবস্থা করিবেন। সেখানে তিনি বিষ্ণুধ্যান করিয়া শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিবেন এবং জীববলি দ্বারা পুজিত হইবেন।

এই একই আখ্যায়িকা আবার বিষ্ণুপুরাণ (৫।১) প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে আছে। আর এক পুরাণের মতে ইনি বিষ্ণুর যশোভাক্ [মার্কণ্ডেয় (১।২৪৮)] কল্পান্তে যখন বিষ্ণু অনন্ত সমুদ্রে যোগনিদ্রাতে রত হইলেন, মধু ও কৈটভ তাঁর কাছে আসিল। মতলব ব্রহ্মাকে নাশ করিবে। কিন্তু বিষ্ণু চক্র দিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলেন। যোগনিদ্রা এ সময় কি করিলেন? ব্রহ্মা তাঁহাকে আরাধনা করায় তিনি বিষ্ণুর চক্ষু ছাড়িয়াছিলেন! বিষ্ণু জাগিয়া উঠিলেন। অসুর বিনষ্ট হইল।

মহাভারতে দেবীকেই কৈটভনিসূদন বলা হইয়াছে।

যে সময় মহাভারত লেখা হয় তখন দুর্গার পূজা খুব প্রতিষ্ঠিত। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণের সময়ও খুব চলিত।

(প্রবর্ত্তক, পৌষ, ১৩৩৫)　　শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শৈব-ধর্ম্ম

শৈব সম্প্রদায়ের উপাস্যদেবতা মহাদেবের অসংখ্য গুণসমূহের মধ্যে লোক-পীড়াকর বিধ্বংসের হেতুস্বরূপ যে সকল ভীষণ গুণ তাহা বৈদিক যুগে কোনদিনই তাঁহার উপাসকগণের বিস্মৃতির বিষয় হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা ভয়েরই সহিত উপাসিত হইতেন। তাঁহার উপাসনা না করিলে উপাসক সম্প্রদায় নানা প্রকার ভীষণ বিপদে পতিত হইবেন এবং ঐ সকল বিপদ হইতে একমাত্র পরিত্রাণের কারণ তিনিই—এরূপ জ্ঞান বৈদিক যুগের শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত, তাহার প্রচুর প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই।...

যাহা দেখিলে মানবের ভয় উপস্থিত হয়, সেইরূপ বস্তুর দর্শনে ভয় নিবৃত্তির জন্য রুদ্রের স্মরণ করিতে হইত এবং তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিতে হইত।

এই কারণে তিনি বৈদিক যুগে অন্য সকল দেবতা অপেক্ষা প্রধানভাবে উপাসিত হইতেন। এক বিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতাই তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া উপাসিত হইতেন না। ভীতি মিশ্রিত ভক্তি বৈদিক শৈব ধর্ম্মের মূল উপাদান ছিল ইহা বৈদিক সাহিত্য দর্শন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

জীবনে যে সকল বিপদ উপস্থিত হইলে মানবসমূহ ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেই সকল বিপদের সম্ভাবনা বা উপস্থিতি রুদ্রদেবতার উদ্দেশে যাগ ও স্তুতি করিবার নিমিত্ত রূপে বৈদিকযুগে পরিগণিত ছিল। মারীভয়, দুরারোগ্য রোগসমূহ, সর্প, ঝটিকা, বজ্রাঘাত প্রভৃতি ভয়াবহ কারণসমূহ উপস্থিত হইলে বৈদিকযুগে গৃহস্থগণ একান্ত ভক্তির সহিত ঐ সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রুদ্রের উপাসনা করিত। জনহিতকর মধুর কার্য্যাবলী নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত মহনীয় মহিমা ও নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ বৈচিত্র্য লীলা সমূহ সম্মিলিত হইয়া মানবহৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি হয়, তাহাই হইল বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব উপাসনার মূল ভিত্তি। ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্ম এই ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিষ্ণুর উপাসনার সহিত প্রীতি বিস্ময় বিমিশ্রিত উদার ভাব নিয়ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু রুদ্রের উপাসনায় প্রধান উপাদান হইতেছে দুঃখবহুল সংসারে সর্ব্বদা পরিদৃশ্যমান উদ্বেগপূর্ণ ভীষণ ভীতির হৃদয়ক্ষোভকর আবেগ। শিব-উপাসনার ইহাই হইল মূলভিত্তি।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ ১৩৩৫)　　শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ

—

সাংখ্যের পুরুষ

যদিও আগে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভূত প্রভৃতি থেকে আত্মা ভিন্ন তথাপি এখন জড়বাদের যুগ—দেহাত্মবাদের উপর বেশী লোকের আস্থা; সেই জন্য প্রাচীন দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের মত ভাল করে পরীক্ষা করা যাক্। দেহ-চৈতন্যবাদীরা বলেন যে চৈতন্য হচ্ছে দেহের বিকার বিশেষ। দেহের অবয়বগুলির মিলন-বিশেষের ফলে চৈতন্যের উদয় হয়। চৈতন্য বলে' আর স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিবার দরকার নাই। সাংখ্যাচার্য্যগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রত্যেক অবয়বেই কি চৈতন্য আছে?' যদি তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন তাহা হইলে চৈতন্যকে অবশ্যই দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলে স্বীকার

করিতে হইবে। তাহা হইলে মরণ বা সুষুপ্তি কোন কালেই হইতে পারে না; কারণ চৈতন্যের লোপ না হইলে ত আর মরণ প্রভৃতি হয় না। আর অবয়বের ধর্ম্ম যদি চৈতন্য না হয় তাহা হইলে তাদের গড়া জিনিষে চৈতন্য আসতে পারে না; কারণ, কারণের বিশেষ ধর্ম্মগুলির অধিকারী হচ্ছে কার্য্য। আর এক কথা—চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইতেই পারে না; কারণ, দেহের প্রত্যক্ষযোগ্য ধর্ম্মগুলিই বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। চৈতন্য প্রত্যক্ষযোগ্য ধর্ম্ম; আর চৈতন্য যদি দেহের ধর্ম্ম হয় অবশ্য অবশ্যই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া পড়িবে। ইহা কোন দেহাত্মবাদীর অভিপ্রেত হইতে পারে না।

বৌদ্ধ দল এসে বলেন যে জ্ঞান বলে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিতেই হবে; কিন্তু আত্মা জ্ঞানপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের কাছে যে আত্মা স্থির বলে মনে হচ্ছে ওটা ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ভুল করে প্রদীপের শিখাকে এক বলে মনে করি। কিন্তু যুক্তির দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করিলে বুঝব যে, প্রদীপের শিখা প্রত্যেক ক্ষণেই পরিণামশীল,—কখনও এক হতে পারে না। সেই রকম জগতের সব্ব পদার্থই ক্ষণিক সুতরাং জ্ঞানও ক্ষণস্থায়ী। আর এই বিজ্ঞানধারাই আত্মা। বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদ না বুঝলে জ্ঞানের ক্ষণভঙ্গুরতা ঠিক করে বুঝা যায় না। কিন্তু এই প্রবন্ধে ক্ষণিকবাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বোধে ক্ষণিকবাদের অনুকূল যুক্তি দেখান হইল না। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সেগুলি সব বল্‌তে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক। এখানে তাদের যুক্তির দুই একটী দেখাইয়া বিরত হব। ক্ষণিকবাদে কারণ হইতে কিরূপে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা প্রতিপন্ন করা যায় না; কারণ, কার্য্য যখন হবে তখন কারণ থাকে না; আর কারণ যখন থাকে তখন কার্য্য কোথায়? কারণই কার্য্যাকারে পরিণত হয়। কারণই যদি না থাকিল তাহা হইলে আর কার্য্য হবে কি করে? ক্ষণিক-বাদই যখন যুক্তির আঘাত সহিতে অক্ষম, তখন তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের ক্ষণপ্রবণতা কি করে টিকিবে? বিজ্ঞানগুলি যদি ক্ষণিক হয় তাহা হইলে তাহার স্থিতিদশায় অন্য বিজ্ঞান নাই – সে তার আগেকার বা পরের বিজ্ঞানের খবর জানে না; কারণ, কাহারও খবর জানতে হইলে যাহার খবর জানিব তাহার সত্তা থাকা চাই। সে নিজেরও খবর জানে না; কারণ, আগেই দেখান হয়েছে যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম একই ব্যক্তি হতে পারে না। ফল হইল এই যে, ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বীকার করিলে কোন কালেই জ্ঞান হইতে পারে না। এরূপ আত্মবাদ আমরা কি করে স্বীকার করিব—কি করে জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করিব আমার জ্ঞান নাই। যদি বৌদ্ধেরা বলেন, আর একটী জ্ঞান স্বীকার করিব যাহার দ্বারা পূর্ব্বের জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আবার সেই জ্ঞানের প্রকাশের জন্য আর একটী জ্ঞান, তার জন্য আর একটী জ্ঞান—এই ভাবে অবিরাম জ্ঞানধারাই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান নিজে প্রকাশিত না হইলে ত আর অপরকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই অবিশ্রান্ত জ্ঞানধারার শেষও নাই, সকলের প্রকাশও নাই। সুতরাং তাঁহারা যে আঁধারে ছিলেন সেই আঁধারেই থাকিবেন। এই রকম অনন্ত জ্ঞানধারা স্বীকার করিলেও এই জ্ঞান জন্য এই স্মৃতি হয়েছে বলিবার উপায় নাই। কারণ অনন্ত জ্ঞানের কোন্‌টী কোন্‌ স্মৃতির জনক, ঠিক করে বল্‌তে চেষ্টা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং আমাদের আত্মা ক্ষণিক হলে চল্‌বে না।

জৈনের দল এসে বল্লেন যে বৌদ্ধদের মত শুনিলে আরও অসুবিধা হয়। আমরা পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। আর এ কথাও যুক্তিসঙ্গত 'যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল ভোগ করে'। আত্মা যদি স্থায়ী নহেন তাহা হইলে তাঁর পুনর্জন্ম কিরূপে সম্ভবপর হয়? আত্মা ভাল-মন্দ কাজের ফলে স্বর্গে ও নরকে যান। এক কথায়, আত্মার গতি আছে। আর এই গতি মানিতে হইলে আত্মার বিভু (সর্ব্বব্যাপক) পরিমাণ মানিলে চলিবে না। আর আত্মার অণু পরিমাণ হইলেও চলে না; কারণ, আত্মা দেহের সব জায়গায় সুখদুঃখ অনুভব করেন। দেহের বাহিরের সুখ-দুঃখ আত্মার অনুভবের বিষয় হয় না; সুতরাং আত্মাকে দেহ পরিমিত বলে স্বীকার করিতে হইবে। জৈনদের আত্মবাদের আরও অনেক বলিবার কথা আছে; কিন্তু প্রবন্ধে স্থান অল্প বলে প্রয়োজনীয় অংশমাত্র আলোচিত হইল। সাংখ্যেরা বলেন যে এই রকম মত আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এই মতে আত্মা হলেন মধ্য-পরিমিত। আত্মার এই রকম পরিমাণ মানিলে বিনাশী বলিতে হইবে, কারণ এই রকম পরিমাণের সব জিনিষই বিনাশশীল—যেমন বাড়ী, ঘর, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি। আরও একটী অসামঞ্জস্য এই মতে আছে। সেটা হচ্ছে যে আত্মার জন্মান্তর স্বীকার করা হয়—আত্মা যে হাতী বা পিপীলিকা দেহ লইয়া জন্মিতে পারেন না তাহার কোন প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান দেহও কখন এক আকারের থাকে না—রোগা মোটা হয়ই হয়। আর দেহের বৃদ্ধি কে অস্বীকার করিতে পারে? এসব ক্ষেত্রে আত্মাকেও বড় ছোট হইতেই হবে। আত্মার অবস্থার পরিণাম হবেই। আত্মা পরিণামী হইলে চিরস্থায়ী হইতেই পারেন না, যেহেতু পরিণামী বস্তুমাত্রই বিনাশশীল। সুতরাং জৈন মতে আত্মাকে অনিত্য বলিতেই হইবে। আত্মা অনিত্য হইলে জৈনদের মুক্তিবাদ মানা আর না মানা একই হয়ে দাঁড়ায়। যাঁর মুক্তি হবে তিনিই যদি না থাকেন তাহা হইলে সে মুক্তিবাদের মূল্য কি? সুতরাং আমরা জৈনবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরা বলেন যে আত্মা নিত্য ও অণুপরিমিত। তাঁদের অবলম্বন শ্রুতি। এখানে শ্রুতি-প্রদর্শন নিরর্থক। সাংখ্যেরা বলেন যে আত্মার অণু পরিমাণ হলে চলে না। দেহের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সুখদুঃখের অনুভব যুগপৎ হইয়া থাকে। একই সময়ে মাথার যন্ত্রণার ও পায়ে শৈত্যের অনুভব হইতে পারে। ক্ষুদ্রতম আত্মা কি করে দুই বিভিন্ন জায়গার যাতনা ও শীতলতার অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। বৈষ্ণবেরা বলিতে পারেন যে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপশিখা যেমন আপন রশ্মি বিস্তার করে সমস্ত ঘরে আলো দেয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রতম আত্মা নিজ জ্ঞান-কিরণ বিস্তৃত করে সমস্ত দেহের সুখদুঃখ অনুভব করেন। এরূপ উত্তরের প্রতিবাদে বলা যেতে পারে যে আত্মা অবিকারী, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান ও তাঁর বিকার জ্ঞান নহে। আত্মা বিকারী হলে তার মুক্তি হতে পারে না তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, ন্যায় ও বৈশেষিক মতের আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করা হবে যে আত্মা অবিকারী।

আমরা বৈষ্ণব মতে সন্তুষ্ট হতে পারিলাম না। এখন যুক্তি তর্কে সজ্জিত ন্যায় বৈশেষিক মতের আলোচনা করা যাক্‌। ন্যায় বৈশেষিক মতে আত্মা নবদ্রব্যের অন্যতম। এই মতে আত্মা বহু, বিভু (সর্ব্বগত) ও নিত্য। এই অংশে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সহিত সাংখ্য দর্শনের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মার বিশেষ গুণ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি। এক কথায়, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহেন। জ্ঞানরূপ গুণের যোগে আত্মা জ্ঞানী হন। নৈয়ায়িকেরা আত্মাকে কর্ত্তা ও

ভোক্তা বলে স্বীকার করেন। সাংখ্যমতে আত্মা ভোক্তা,—কর্ত্তা নহেন। সাংখ্যেরা বলেন যে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত আত্মবাদ চরম নহে। এই বাদে আত্মাপরায়ণ ব্যক্তিরা আত্মবাদের প্রথম সোপানে মাত্র উঠিতে পারেন। শ্রুতি স্মৃতি গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে যে কামাদি মনের ধর্ম্ম, প্রকৃতিই প্রকৃত কর্ত্তা, আত্মা দ্রষ্টামাত্র, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্যমুক্ত।

শ্রুতিঃ—'তীর্ণোহি তদা ভবতি হৃদয়স্য শোকান্ কামাদিকং মনএব মন্যমানঃ সম্প্রভোলোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব, যদত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেনভবতি।

স্মৃতিঃ—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানিগুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে ॥
'নির্ব্বাণ ময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।
দুঃখাজ্ঞানময়া ধর্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তেতুনাত্মনঃ ॥'

এখন দেখা যাক্ আত্মার প্রকৃত রূপ কি? আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এই মত শুধু শ্রুতি স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, না যুক্তিরও প্রবণতা ওই দিকে?

সাংখ্যেরা বলেন যে আত্মা যদি প্রকাশস্বরূপ না হন তাহা হইলে তিনি স্বভাবতঃ হইলেন জড়। জড়ের কোন কালে প্রকাশ দেখা যায় না—যেমন ইষ্টকাদি কোনকালেই সচেতন হতে পারে না। অতএব আত্মা সূর্য্যাদির ন্যায় প্রকাশস্বরূপ। এখন প্রশ্ন সততই মনে উদিত হয় যে আত্মা কি প্রকাশধর্ম্মা (অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম কি প্রকাশ)? এই প্রশ্নের মীমাংসা করে সাংখ্যাচার্য্য বলিতেছেন যে আত্মা নির্গুণ, তাঁহার ধর্ম্ম চৈতন্য হইতে পারে না। আত্মাকে প্রকাশ স্বরূপ বলা হইয়াছে। এইরূপ বলায় লাভও আছে, কম কল্পনা করিতে হইয়াছে। আত্মার ধর্ম্মপ্রকাশ বলিতে গেলে অধিক পদার্থ মানিতে হইবে (আত্মা মানিতে হইবে, প্রকাশ মানিতে হইবে ও তাহাদের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। এক কথায় আত্মা ছাড়া দুইটী অতিরিক্ত পদার্থ মানিতে হইবে। আর এ মানায় কোন ইষ্ট সিদ্ধি নাই।) তেজ ও প্রকাশের ভেদ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি: কেন না আমরা তেজের স্পর্শ করি, কিন্তু প্রকাশের স্পর্শ হয় না। সুতরাং তাহাদের ভেদ কল্পনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু জ্ঞানরূপ প্রকাশের গ্রহণ না হইলে আত্মা গৃহীত হন না। অতএব আত্মা ও জ্ঞানের ভেদসাধক যুক্তি কিছুই পাওয়া যায় না। আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও দ্রব্য, কারণ আত্মার সহিত অন্য পদার্থের সংযোগ হয় ও আত্মাকে কাহাকে আশ্রয় করে বাঁচতে হয় না। সুতরাং ইনি নিত্য দ্রব্য।

আত্মা যে নির্গুণ সে পক্ষে আরও যুক্তি দেখান যাইতেছে। ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ কখনও নিত্য নহে; কারণ তাহারা জন্য (উৎপত্তি বনাশশীল) বলে বেশ অনুভূত হয়। কোন ব্যক্তিই নিজের অনুভবের অপলাপ করিতে পারেন না। আত্মার অস্থায়ী গুণ স্বীকার করিলে তাঁকে পরিণামী বলিতেই হইবে। দুইটী আসল পদার্থের পরিণাম স্বীকার করিলে মহা গৌরবাবহ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। আর পরিণামের কথা ত বলা যায় না। কখনও অজ্ঞানরূপ পরিণাম হইতে পারে। সেইরূপ পরিণাম হইলে জ্ঞান ইচ্ছাদি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। জ্ঞানাদি যে আমার হইয়াছিল তাহা ঠিক করে মনে করিতে পারি না। মন সদাই সংশয়াচ্ছন্ন থাকে। কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া যদি কিছুক্ষণ থাকেন তার পর সংজ্ঞা লাভ করিলে তিনি পূর্ব্বের কথাগুলি ঠিক করে মনে আনিতে পারেন না। তাঁর মনোরাজ্যে সন্দেহেরই অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই রকম আমাদের জ্ঞান হইতে হইতে যদি মাঝে মাঝে অজ্ঞান এসে উপস্থিত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানে সন্দেহ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। আমাদের এই রকম পরিণামশীল আত্মা স্বীকার করিতে হইলে মনে ভয়েরই উদ্রেক হয়। মনে হয়, নির্গুণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ।

নির্গুণ আত্মা স্বীকার করিলে আরও বিভিন্ন দিকে কল্পনার লাঘব হয়। ন্যায় বৈশেষিক মতে ইচ্ছাদির উৎপত্তি হইতে হইলে আত্মার, মনের ও আত্মমনঃ সংযোগের অস্তিত্ব বিশেষভাবে অপেক্ষিত। উক্ত তিনটীই বিশেষ কারণ। কিন্তু আমরা দেখি যে মন থাকিলেই ইচ্ছাদির উৎপত্তি হয় ও মন না থাকিলে ইচ্ছাদি হয় না। অতএব মনকেই ইচ্ছাদির কারণ রূপে স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে আত্মা যে নির্গুণ ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। আরও দেখান যাইতে পারে যে নৈয়ায়িকের মতে সবিকল্প প্রত্যক্ষ হইতে হইলে চারিটী পদার্থের প্রয়োজন (১) অন্তঃকরণ, (২) ব্যবসায় (ঘট এই প্রকার জ্ঞা·), (৩) অনুব্যবসায় (এইটী ঘট এই আকারের জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞানটী এই জ্ঞানের বিষয়) ও (৪) আত্মা (ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের আশ্রয়)। সাংখ্য পক্ষে মাত্র তিনটী পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে (১) অন্তঃকরণ, (২) ব্যবসায় স্থানীয় অন্তঃকরণবৃত্তি ও (৩) অনন্ত অনুব্যবসায়স্থানীয় নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিগুলি প্রকাশ করেন বলিয়াও তাঁহাকে অপরিণামী জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হয়।

(ভারতবর্ষ, ১৩৩৫ পৌষ।) শ্রী জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য

মহিলা-সংবাদ

কুমারী বাচুবেন লোটওয়ালা বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একজন সদস্য। যে-সকল ভারতীয় মহিলা সর্ব্বপ্রথম কর্পোরেশন-প্রবেশে অগ্রণী ছিলেন, কুমারী লোটওয়ালা তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় ভি-জে পাটেলের সহিত বিলাত গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি 'হিন্দুস্থান প্রজামিত্র' নামক দৈনিক-পত্রখানির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই দৈনিকখানির স্বত্বাধিকারী তাঁহার পিতা। ইহার



কুমারী বাচুবেন লোটওয়ালা



কুমারী এল্ রামুন্নী

প্রচার যথেষ্ট। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে কুমারী লোটওয়ালাই সর্ব্বপ্রথম দৈনিক-পত্রের সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করিলেন।

কুমারী এল্ রামুন্নী—ইনি মাদ্রাজ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বেলারী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

মিসেস জে-এস-জাষ্টিন—ইনি টেনিভেলী জেলা শিক্ষা-পরিষদের সভ্যরূপে নিয়োজিত হইয়াছেন।



মিসেস জে-এস-জাষ্টিন

মিসেস জে-কে-বাপ্পু একজন ভারতীয় খৃষ্টান মহিলা। সমাজের কল্যাণ-কর্ম্মে ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শিশুমঙ্গল ও মদ্যপান-নিবারণ-কার্য্যে ইঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনা কম নহে। ইনি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

কুমারী গুলাব এইচ্ মকুন্দ রাও—সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পরলোকগত রায় বাহাদুর মকুন্দ রাও-এর দৌহিত্রী। ইন্দোর-রাজ হোলকারের ছোট মহারাণী ইন্দির বাঈ এরও তিনি নিব



মিসেস জে-কে-বাপ্পু



কুমারী গুলাব এইচ্ মকুন্দ রাও

আত্মীয়া। গত বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কুমারী রাও ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে প্রথম তিনিই কলেজের 'ফেলো' হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কুমারী রাও এখন উইলসন্ কলেজের নিম্নতর বিভাগে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন।

সিংহলে বৌদ্ধ নারীগণ রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকার লাভ করিতেছেন। গত বৎসর Donoughmore কমিশন, যখন সিংহলে রাজনৈতিক অবস্থা পরিদর্শন করিতে যান, তখন মহিলারা সমবেত হইয়া দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার প্রার্থনা করেন। ৩০ বৎসর বয়স হইলেই সিংহল-রমণীরা ভোট দিবার অধিকার লাভ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভাতেও যাইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-লাভের জন্য ইঁহারা চেষ্টা করেন নাই বটে, তাই বলিয়া শিক্ষায় সিংহলবাসিনীরা বিশেষ পশ্চাৎপদ নহে। সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলা হইয়াছে। এই-সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রী-সংখ্যাও বড় অল্প নহে—তের হাজার। আজকাল সিংহলে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের অনুপাত শতকরা পঁচিশ।

অমৃতসর

শ্রী হরিহর শেঠ

অমৃতসর নামটার উপর কেমন একটা মোহ অনেক দিন থেকেই আমার মধ্যে ছিল, তবু কখনও যে এ স্থানটি দেখিতে আসব তাহা মনেই হইত না। কিন্তু যা মনে করা যায় না, তাও অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে। আমারও এবার হরিদ্বার দেরাদুন বেড়াইতে আসিয়া তাই ঘ ।

লাহোর হইতে ফিরিবার পথে আমরা অমৃতসর আসি। উভয় স্থানের দূরত্ব পঁয়ত্রিশ মাইল। লাহোর হইতে মোটর-বাসে করিয়া বরাবর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া প্রায় দুই ঘণ্টায় অমৃতসর আসিয়া পৌঁছিলাম। এমন তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন দীর্ঘ সরল সুন্দর পথ ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। সমস্ত পথটির মধ্যে দশ এগার মাইল ভিন্ন প্রায় সমস্তই পিচ দেওয়া থাকায় যেমন ধূলা ছিল না, তেমনই মোটরে আসা আনন্দদায়ক হইয়াছিল। পথটিতে লোক-চলাচল কম দেখিলাম। এই পথই পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়াছে।

অমৃতসরে পৌঁছিবার প্রায় এক মাইল দেড় মাইল দূর হইতে সহরের অট্টালিকা-সমূহ নয়নগোচর হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথম যে অট্টালিকা পথপার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা এখানকার সর্ব্বপ্রধান কলেজ—খালসা কলেজ। ইহা একটি ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদোপম সৌধ। বাহিরে কোন স্থানে একটুও চুণ বালির নাম নাই. কিন্তু এমন মনোরম সুবৃহৎ বাড়ী অন্যত্রও সচরাচর দেখা যায় না। সমস্ত সহরটির মধ্যে ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন অট্টালিকা আর দ্বিতীয় নাই।

শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস দ্বারাই সম্রাট আকবর সাহের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর নামক সুবৃহৎ পুণ্য সরোবরটি এবং চতুষ্পার্শ্বে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহার নাম হয় রামদাসপুর। পরে তৎপুত্র অর্জ্জুন সিংহ কর্ত্তৃক সরোবরের নামে সহরের নামকরণ হইয়া ইহাই শিখদিগের রাজধানী হয়। তৎপূর্ব্বে এ স্থানের নাম ছিল চক। শিখ-জাতির ইহা পরম তীর্থ। তাঁহারা এই সরোবরকে মহা পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। অন্যান্য প্রাচীন নগরের ন্যায় ইহাও প্রাচীর-বেষ্টিত এবং ত্রয়োদশটি ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। শিখদিগের সময় সহরের ভিতরে যে সব দুর্গাদি ছিল, তাহা আর কিছুই নাই। নগর-প্রাচীরের বাহিরে যে পরিখা ছিল তাহার চিহ্ন প্রায় সকল স্থানে লুপ্ত হইয়াছে; এখন কেবল কতিপয় প্রবেশ-তোড়ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিখ-কীর্ত্তির মধ্যে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদি ভিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রণজিৎ সিংহ কৃত তাঁহার গুরু গোবিন্দ সিংহের নামে উৎসর্গীকৃত গোবিন্দগড় নামক সুদৃঢ় দুর্গটি এখনও পূর্ব্বেরই মত দণ্ডায়মান থাকিয়া শিখ-গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

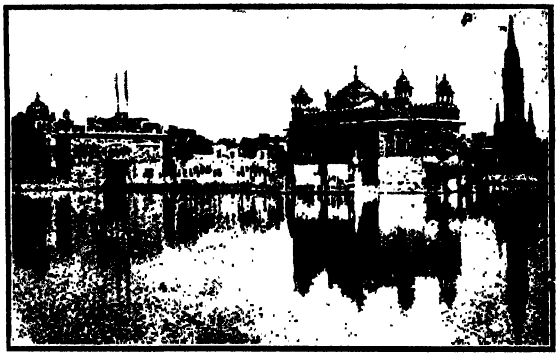
হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী মুসলমান নৃপতি মহম্মদ সাহ ও তাঁহার পুত্র তৈমুর কর্ত্তৃক এখানকার বহু মন্দির ও দেবালয় বিনষ্ট করা হয়। বর্ত্তমানে যে সকল আছে উহা শিখদের দ্বারা পরে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে মুসলমান দেবালয়গুলিও তাঁহারা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

প্রথমেই আমরা অমৃতসরের মধ্যমণি পুণ্য তীর্থ অমৃতসর নামক সরোবর ও তন্মধ্যস্থ স্বর্ণ-মন্দির দেখিতে যাইলাম। আমরা যে হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিলাম উহা নগর-প্রাচীরের বাহিরে ষ্টেশনের নিকট। হল্ গেট্ নামক একটি প্রকাণ্ড তোরণের মধ্য দিয়া সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। প্রথম হল্‌বাজার, তৎপরে বহু জনবহুল এবং অট্টালিকা ও তন্নিম্নে বিবিধ দ্রব্যের বিপনিপূর্ণ পথগুলি অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে এখানকার সুন্দর সুউচ্চ ক্লকটাওয়ারটি দণ্ডায়মান, অদূরে বালার্কের কনক কিরণ-পাতে মন্দিরের কনকচূড়া উদ্ভাসিত

হইতেছিল। ক্লকটাওয়ারটির নির্ম্মাণ-কৌশল যেমন পরিষ্কার, উচ্চতাও তেমনই। দেখিতে কতকটা খৃষ্টানদের গির্জ্জার মত। ইহারই নিকটে তথাকার ব্যবস্থামত একজন রক্ষকের কাছে জুতা মোজা ছড়ি রাখিয়া আমাদের অনাবৃত মস্তকে কাপড় দিয়া সেই সরসীকূল ও স্বর্ণ মন্দিরে যাইবার জন্য মর্ম্মরমণ্ডিত সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া অবতরণ করিলাম। এখানে আমরা দেখিলাম বৃহৎ সরোবরের চারিদিকে শ্বেত প্রস্তরমণ্ডিত প্রশস্ত চত্বরে এখানে-ওখানে কোথাও শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ, কোথাও রামায়ণ মহাভারত, কোথাও গীতা পাঠ বা কথকতা চলিতেছে। আবার কোথাও হারমোনিয়ম-সহযোগে ধর্ম্ম-সঙ্গীত অথবা শিখগুরুদিগের করুণ বিয়োগ-গাথা গীত হইতেছে। ইহারই মধ্যে পবিত্র সরোবরের সলিল ভেদ করিয়া শিখ-জাতির পবিত্র তীর্থ দরবার সাহেব বা সুবর্ণ-মন্দির উঠিয়াছে।

মন্দির-প্রবেশের জন্য একদিক দিয়া একটি প্রস্তর-সেতু আছে। এই সেতুতে যাইবার পূর্ব্বে উর্দ্ধাংশ সুবর্ণ-খচিত একটি অতি সুন্দর ফলকাবৃত ও নিম্নাংশ লতা পাতা-খোদিত প্রস্তরের উপর বহু বর্ণের মূল্যবান পাথরের বিচিত্র কারুকার্য্যময় সিংহদ্বার আছে। প্রথম প্রবেশ-পথের বাম পার্শ্বে একখানি সুবর্ণখচিত ফলকে এই অদ্ভুত দৈব কাহিনীটি ইংরেজী ভাষায় লেখা আছে—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল নিশাশেষে রাত্রি ৪॥০টার সময় অকস্মাৎ একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক গোলকের আকারে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া উত্তর দ্বার দিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ফাটিয়া যায়। সে-সময় মন্দিরে গীতবাদ্য হইতেছিল এবং প্রায় চারিশত লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই

পাষাণ-সেতু দিয়া মন্দিরে যাইতে অনেকের, বিশেষতঃ একটু বয়স্কা নারীদের হাতে এক একখানি ক্ষুদ্রাকৃতির ধর্ম্মপুস্তক দেখিলাম। কেহ বা একস্থানে বসিয়া, কেহ বা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া পাঠরতা রহিয়াছেন। মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। উহা বহু জনাকীর্ণ, ভিতরে অতি সুন্দর সুবর্ণ-খচিত কারুকার্য্যময় রেলিংয়ের নিম্নে সুবর্ণ-খচিত চন্দ্রাতপতলে গ্রন্থ সাহেবের পূজা হইতেছে। ইহাই আদি গুরু নানকের ধর্ম্মগ্রন্থ। নিকটে গায়কগণ বসিয়া অতি মনোহর সুললিত তান-সংবলিত



সুবর্ণ মন্দির—অমৃতসর

গীতবাদ্যে জনগণের কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতেছে। সমাগত লোকদের মধ্যে অনেকেই তন্ময় হইয়া সেই গান শুনিতেছেন, কেহ বা একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থ-সাহেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া অথবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছেন। ভিতরে যে-কেহ আসিতেছেন সকলেই হালুয়া প্রসাদ পাইতেছেন। এখানে শিখদের ভক্তিরসাপ্লুত হাবভাব দেখিলে মন প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে ভরিয়া উঠে। মনে হয় এমন প্রেমের রাজ্য বুঝি কোথাও কখনও দেখি নাই। এখানে অতি বড় পাষণ্ডের মস্তকও আপনা হইতেই অবনত হইয়া থাকে। আমরা পাঞ্জাবী ভাষায় সে সঙ্গীতের কিছুই বুঝিতে না পারিলেও যতক্ষণ রহিলাম সে সঙ্গীতে ডুবিয়া রহিলাম।

এই মন্দিরকে শিখেরা গুরুদরবারও বলিয়া থাকে ইহা দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহার ভিতর ও বাহির উভয়ের সৌন্দর্য্যই মনোরম। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরও সুবর্ণ-মন্দির বটে, কিন্তু তাহা চতুর্দ্দিকের ঘন হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে থাকায় তেমন শোভাশালী দেখায় না, কিন্তু এখানকার মন্দিরটি বহুবিস্তৃত স্থানের মধ্যে বিশেষ একটি বিস্তৃত সরসী মধ্যে থাকায় এবং আকারে বৃহৎ বলিয়া অতীব মনোহারী। সূর্য্য-কিরণ পড়িলে উহার দিকে চাওয়া যায় না। মহারাজা রণজিৎ সিংহের দ্বারাই মন্দিরের এতাদৃশ সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সরোবর

সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। মহারাজা সতের ক্রোশ দীর্ঘ একটি খাত খনন করিয়া ইরাবতী নদী হইতে জল আনয়ন করিয়া এই পুষ্করিণীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।



হল্ গেট্—অমৃতসর

এই সরোবরে স্নান করিলে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে একটি মন্দির আছে। সন্ধ্যার সময় এখানকার পূজা-পাঠ, কথকতা প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজগুলি একটি দেখিবার জিনিষ। অকালীদের এই অট্টালিকাকে শিখেরা ভক্ত অকালী বলে। অপরাহ্নে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানে একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত বিশিষ্ট স্থানে শিখগুরু ও প্রধানদের বহু অস্ত্রশস্ত্র যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় পূজার্চ্চনা প্রভৃতির পর অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত প্রত্যেক তরবারি কৃপাণাদির আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহা কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইত, তাহা সবিশেষ বর্ণনান্তর অন্য একজনের হস্তে সমর্পিত হয়। এই সময় উভয় পার্শ্বে দুই ব্যক্তি দুইখানি উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে দণ্ডায়মান থাকে। এই অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনের পূর্ব্বে যখন যাজক মহাশয় বেদী হইতে শ্রোত্রীমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের জাতীয় ভাষায় ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা করেন, তখনও তাঁহার হস্তে একখানি উন্মুক্ত তরবারি দেখিয়াছি।

অমৃতসরে দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য—অটলবাবা বা অটলেশ্বরের মন্দির। এরূপ বিরাট স্তম্ভাকার মন্দির অন্যত্র দেখা যায় না। উচ্চতায় ইহা শতাধিক ফুটেরও অধিক, সাত আট তলায় বিভক্ত। উপর হইতে অসংখ্য হর্ম্ম্যরাজিপূর্ণ অমৃতসর সহরটি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। সৌধ-সমূহের বৈচিত্র্য দেখিলাম না, অধিকাংশই ইট বাহির করা এবং কার্ণিশবিহীন। মন্দিরের নিম্নতলে চতুর্দ্দিকে পিত্তল ফলকে শিখগুরুদিগের ও যুদ্ধাদির চিত্র উৎকীর্ণ আছে। দ্বিতীয় তলের দেওয়ালেও নানা বিষয়ের সুরঞ্জিত চিত্র শোভিত। এই মন্দির শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্রের সমাধির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দির-সান্নিধ্যে চারিদিকে বাঁধান যে সরোবর আছে, উহার নাম কৌলসর—উহা গোবিন্দ সিংহের পত্নীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত।

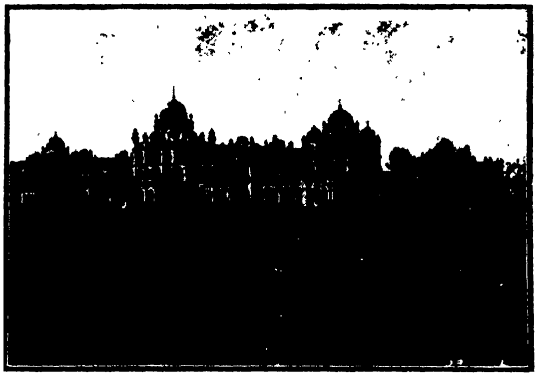
এখান হইতে আমরা রামবাগ নামক সুপ্রসিদ্ধ উদ্যান দেখিতে যাইলাম। এই উদ্যানটি বিস্তৃত এবং সুরচিত। এখানে একটি পুরাতন অসংস্কৃত প্রাসাদ আছে। উহাতে লেখা আছে, এক সময় উহা মহারাজা রণজিৎ সিংহের গ্রীষ্মাবাস ছিল। এক্ষণে ইহার মধ্যে দ্বিতলে মিউনিসিপ্যালিটির একটি পুস্তকাগার দেখিলাম। পুস্তকের সংগ্রহ নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষার কোন পুস্তক দেখিলাম না। দেখিলাম ভিতরে একটি ছোট থিয়েটার-গৃহ আছে। এই অট্টালিকার উভয় পার্শ্বে দুইটি খুব বড় চৌবাচ্চা আছে, তাহাতে বহুসংখ্যক লোহিত, পীত প্রভৃতি বর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে।

এখানে শিখদের ছোট-বড় মন্দির আরও অনেকগুলি আছে। হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত যে প্রমাণ মূর্ত্তি আছে তাহা অতি সুন্দর। মন্দিরটি নব-নির্ম্মিত, এখনও উহার বহির্দ্দেশের এবং অভ্যন্তরের কোন কোন স্থানের কাজ শেষ হয় নাই। ইহাও একটি বিস্তৃত সরোবরের মধ্যে অবস্থিত। এস্থানও মধুর গীতবাদ্য-মুখরিত। এই মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার বিষয় উহার উপরের প্রশস্ত সমতল খিলান। উহা লম্বে প্রায় ৩৫ ফুট, প্রস্থে ২৬ ফুট। এত-বড় সোজা খিলান কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যেখানে এই মন্দির অবস্থিত সে স্থানটি বেশ খোলা, নিকটে তেমন বড় বাড়ী অধিক নাই। অদূরে মাঠের মাঝে পরিখা-পরিবেষ্টিত গোবিন্দ গড়ের দুর্গ। প্রধান ফটকের উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ তোপ মাটিতে অর্দ্ধ-প্রোথিত অবস্থায় আছে। পাশ-সংগ্রহের সময় না থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। বাহির হইতে যাহা দেখিলাম তাহাতে উহা বেশ অভগ্ন অবস্থায় আছে মনে হইল। শুনিলাম ভিতরে দর্শনীয় তেমন কিছু নাই।

এস্থান হইতে আমরা জালিয়নয়ালা বাগ দেখিতে যাইলাম। এচিসন্ পার্কের পার্শ্ব দিয়া যাইতে কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া পথে একটি সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে পড়ার জন্য আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। প্রায় সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী গুর্খ-সৈন্য সবাদ্য মার্চ্চ করিয়া যাইতেছে, পশ্চাতে বহুসংখ্যক মালবাহী গাড়ী ও উষ্ট্র। সৈন্যদের মধ্যে একজন অশ্বারোহী ও একজন পদাতিক বাঙ্গালী ছিল। শুনিলাম এই সৈন্যবাহিনী জলন্ধর হইতে পেশোয়ার যাইতেছে। বিলম্ব অনেক হইলেও এই প্রসিদ্ধ স্থানটি না দেখিয়া ফিরিতে পারিলাম না। ইহা একটি অনতিবৃহৎ উদ্যান, সহরের জনাকীর্ণ পল্লীর চতুর্দ্দিকে ঘন সৌধরাজির মধ্যে অবস্থিত। এই উদ্যান এখন কংগ্রেসের সম্পত্তি, একজন বাঙ্গালী এখন এখানকার অধ্যক্ষ। তিনি এবং তথাকার রক্ষক হিন্দুস্থানী দ্বারবান— কোথায় মেশিন-গান বসান হইয়াছিল এবং কিভাবে জনতার উপর গুলি বর্ষিত হইয়াছিল, এসব বিষয় অনেক কথা বলিলেন। একটি বাটীর দেওয়ালে যে-সব গোলার দাগ অঙ্কিত থাকিয়া শাসিতের প্রতি শাসকের প্রবল অত্যাচারের সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আমাদের দেখাইলেন।

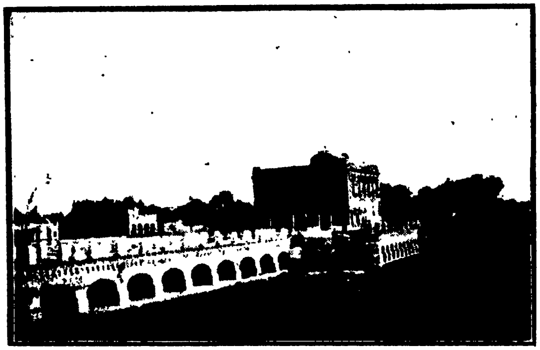
এখানে টাউন হল, লাইব্রেরী, সরকারী বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পার্ক্ প্রভৃতি সমস্তই আছে, তবে তাহা তেমন বৃহৎ নহে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি পাষাণমূর্ত্তি আছে। শুনিলাম সহর হইতে বার-চৌদ্দ মাইল দূরে তারণ তোরণ নামে একটি দৈবশক্তি-সম্পন্ন অতি বৃহৎ সরোবর আছে; তথায় যদি কোন মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সন্তরণ দ্বারা পার হইতে পারে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি রোগমুক্ত হয়। সময়াভাবে আমাদের আর তথায় যাওয়া হইল না।



খালসা কলেজ—অমৃতসর

অমৃতসর একটি ব্যবসায়প্রধান স্থান। হাণ্টার সাহেবের ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার নামক গ্রন্থে দেখা যায়, তদানীন্তন সময়ে দিল্লীর পর পাঞ্জাবের মধ্যে অমৃতসরের ন্যায় ধনজন ও বাণিজ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ সহর আর দ্বিতীয় ছিল না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ১৩৩৯২৫। ইহার সমৃদ্ধি বিষয়ে আজও হাণ্টার সাহেবের কথা বলা চলে কি না জানি না, কিন্তু আমার একদিনের ভ্রমণেই যাহা বুঝিলাম, তাহাতে মনে হইল বুঝি ইহা এখনও বলা চলে। প্রায় সর্ব্বত্র-বিক্ষিপ্ত এত দোকানপত্র কলিকাতা কাশী দিল্লী কাণপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ভিন্ন আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। হলবাজার, জয়মল সিংয়ের কাটরা, আলুওয়ালা কাটরা, গুরুবাজার, কর্ম্মণ দেউড়ি প্রভৃতি স্থানগুলি অসংখ্য বিপণিতে পূর্ণ। কলিকাতার ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কোন কোন ব্যাঙ্কের শাখা এখানে আছে। কলিকাতার বড়বাজার খোংরাপটী, চীনাবাজার প্রভৃতি স্থানের ন্যায় এখানে পথগুলি সাধারণতঃ অপ্রশস্ত এবং কোথাও কোথাও বড়ই অসুবিধাজনক। সিভিল লাইন্—যাহাকে স্থানীয় লোকেরা ঠাণ্ডি-সরাই বলিয়া থাকে, এই স্থানটিই পরিষ্কার এবং এখানকার পথগুলিও পরিষ্কার ও প্রশস্ত। মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ প্রশংসা করিবার কিছু দেখিলাম না। শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত

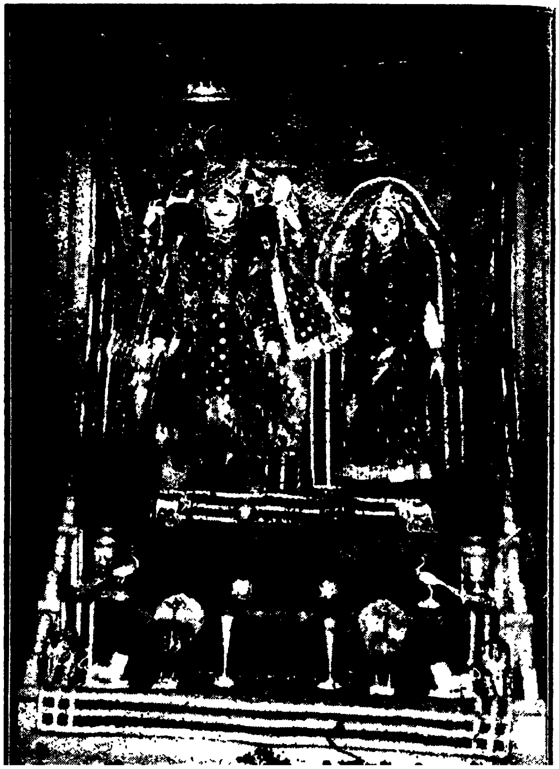
বনবিহারী দত্ত নামে একজন ভদ্রলোকের সহিত এখানে পরিচয় হইলে তাঁহার নিকট শুনিলাম, এখানে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। কোন কোন জনবহুল পল্লীর মধ্যে এমন অনেক পরিবার দেখা যায় যেখানে প্রতি



লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির—অমৃতসর

দশজনের মধ্যে আটজন এই রোগে মরিয়াছেন। এখানে সময় সময় বিসূচিকা, জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এখানে বৈদ্যুতিক আলোক আছে, কিন্তু জলের কল এখনও হয় নাই। এখানেও বাঙ্গলার মত পাল্কি গাড়ী নাই, টঙ্গা যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে একপ্রকার মালবাহী গাড়ী দেখিলাম, উহা একটি মহিষ ও তিনজন লোকে টানিয়া লইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের সহিত আমরা দেবী সহায় চম্পামলের গালিচার কারখানা দেখিতে গেলাম। ইহা একটি খুব বড় কারখানা। এখানে বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই বালক ও অল্পবয়স্ক যুবক। স্বল্প কৌশলে ও স্বল্প ব্যয়ে গালিচা প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া জয়পুর-ভ্রমণকালে তথাকার একটি গালিচা-প্রস্তুতের কারখানা দেখিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, আজও সেই কথাই মনে হইতে লাগিল—এমন কাজ আমাদের বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠা করিলে অনেক যুবকের অন্ন-সংস্থানের পথ কি কিছু সুগম হয় না? অমৃতসর গালিচার কাজের জন্য বিখ্যাত হইলেও, শুনিলাম দেশীয় লোকেদের প্রতিষ্ঠিত কারখানার মধ্যে মাত্র এইটিই উল্লেখযোগ্য। আর



শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

ইহা অপেক্ষা যেটি বৃহৎ কারখানা আছে তাহার নাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কারপেট কোম্পানি। ইহার পরিচালক ইংরেজ। প্রথমোক্তটির কাজ ক্রমে কমিয়া শেষেরটি বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। বড় কারখানা আর না থাকিলেও দুই-একখানি তাঁত এখানে বহু গৃহেই বিদ্যমান আছে।

সরকারী বয়ন বিদ্যালয়ও এখানে আছে। আমরা উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে রেশমী বস্ত্র, জরির ফুল, ছিট, জরির ফিতা বয়ন করিতে ও সূতা রঞ্জনের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এখানকার সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় অতি যত্নসহকারে আমাদিগকে তথাকার সকল প্রকার তাঁতের কাজ, রঞ্জন-প্রণালী প্রভৃতি দেখাইয়া দিলেন। সাধারণ শিক্ষালয় ভিন্ন এখানে অন্ধদের শিক্ষালয় ও সঙ্গীত-বিদ্যালয় আছে। অমৃতসরের গালিচা ভিন্ন, রেশম ও পশমজাত বস্ত্র ও জরির কাজের জন্য এস্থান প্রসিদ্ধ।

এখানে শালের কাজও খুব বেশী, কিন্তু এ কাজের তাঁতীরা অধিকাংশই কাশ্মীরী। বৎসরের মধ্যে এপ্রেল ও নভেম্বর মাসে এখানে দুইটি বড় মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা উপলক্ষে হাতী ঘোড়া ভেড়া ছাগল প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। এখানে হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতি বহু জাতি বাস করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। শুনিলাম সমগ্র সহরে মাত্র সাত আট ঘরের অধিক বাঙ্গালী নাই। *

* এই প্রবন্ধে Imperial Gazetteer of India নামক গ্রন্থের কিছু সাহায্য লইয়াছি।

না জলে না স্থলে

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পেন্সন আর পিঞ্জরাপোল দুইটা জিনিষ একই, তফাৎ এই যে, একটা দ্বিপদের জন্য, অপরটা চতুষ্পদের জন্য। বৃদ্ধ বয়সে সকল জানোয়ারের পিঞ্জরাপোলে স্থান হয় না, বুড়া হ'লে সব মানুষের ভাগ্যে পেন্সন জোটে না। সে হিসাবে যদি ধর তা হ'লে আমি ভাগ্যবান, কেন-না আমি যে জলজীয়ন্ত বেঁচে আছি, মাসে মাসে তার একখানা সার্টিফিকেট যোগাড় করে পেন্সনের টাকা নিয়ে আসি। কিন্তু তার থেকে যখন ইন্‌কম টেক্স কেটে নিত, তখন আমার মনে হ'ত আমার উপর এটা ভারি জুলুম হচ্চে।

গবর্মেণ্টের উপর আমার রাগের এইটে প্রধান কারণ কিন্তু পিঞ্জরাপোলে ঢুকে শিং দিয়ে গুঁতোবার চেষ্টা করা কিংবা জোয়ান জানোয়ারের মতো তিড়িং মিড়িং করে' লাফানো যেমন ভুল, পেন্সনভোগীর পক্ষে তেড়েমেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়া সেই রকম ভুল। বয়স হ'লে হাতপায়ের গাঁটে গাঁটে যেমন বাত ধরে, মনের গাঁটগুলোও সেই রকম বেতো হয়ে পড়ে।

সে কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল আমার।

পেন্সন পাবার পূর্ব্বে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলুম। কয়েকজন বন্ধু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন রায় বাহাদুর আর রাজা বাহাদুর সমান, কেন-না রায় মানে রাজা। নতুন উপাধি একখানা তক্তায় লিখিয়ে বাড়ীর দরজা-গোড়ায় ঝুলিয়ে দিলুম। বাড়ীতে ঢুকতে, বাড়ী থেকে বেরুতে সে লেখা আমার চোখে পড়ত—রায় ভোলানাথ মিত্র বাহাদুর। বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যে যেত তার নজরে সেটা ঠেকত। আমার জানা একটি লোক রায় বাহাদুর হয়েছিল, তাকে নাম ধরে' ডাক্‌বার জো ছিল না, কেউ রায় বাহাদুর না বল্‌লে চটে' লাল হত। আমার ততটা না হোক্ রায় বাহাদুর বললে যে শুন্‌তে ভাল লাগ্‌ত সে কথা কেমন করে' অস্বীকার করব ?

কোন্ সময় যে লম্বা নামওয়ালা একটা আন্দোলনের বন্যা দেশে এসে পড়্‌ল তা বুঝতেই পারা গেল না। অভিধানে ননকোঅপরেশনের জোড়াতাড়া দিয়ে একটা মানে পাওয়া যায়, কিন্তু কে কার সঙ্গে যে ননকোঅপরেট করে সে একটা কঠিন হেঁয়ালী হয়ে উঠ্‌ল। গবর্মেণ্টের সঙ্গে যোগ দিতে না হ'লে সরকারী চাকরী এক ধার থেকে ছাড়তে হয়, হয়ত পেন্সন নিয়েও টানাটানি পড়ে। প্রজারা বলে জমিদারের খাজনা দেবে না, তারপর হয়ত ধোপা-নাপিতও বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, একদিন যদি গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলে' বসেন তোমার সঙ্গে আর কোঅপরেট করব না, কাল থেকে ভাঁড়ার তুমি বের করে' দিও তোমার সংসার তুমি দেখো। এই বলে' চাবির গোছা আমার পায়ের কাছে ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে যদি ফর্‌কে চলে যান, তখন আমি দাঁড়াই কোথায় ?

কয়েকজন রায় বাহাদুর তাদের সনদ ফিরিয়ে দিলে, জনকতক কবে কোথায় কি মেডেল পেয়েছিল ফেরত পাঠিয়ে দিলে। আমার রায় বাহাদুরীর ঝোলানো তক্তা-

খানায় লোকে অন্য রকম নজর দিতে আরম্ভ করলে। আমার বসবার ঘর ঠিক রাস্তার উপর, খড়খড়ীর পাখি খুলে লোকের চলাচল দেখতাম, আর তাদের কথা জানালা বন্ধ করে' দিলেও কানে আসত। মাঝে মাঝে কথাগুলো শুনতে তেমন মিষ্টি লাগত না, বিশেষ যখন ছেলে-ছোকরার দল সে পথ দিয়ে যেত।

একজন হয়ত বললে. ওরে, এই একটা রায় বাহাদুর!

—এরাই সব ধামা-ধরার দল!

—যেমন তোপটানা ঘোড়াগুলো ছাপ-মারা তেমনি এদেরও পিঠে ছাপ!

—গরুর গলায় ঘণ্টা দেয় এ আবার নামের গলায় ঘণ্টা!

দিন-দুইচার এই রকম শুনে শুনে একদিন সন্ধ্যা-বেলা তক্তাখানা খুলে ফেলে যে ঘরে ভাঙ্গাচোরা জিনিষপত্র ছিল, সেইখানে এক কোণে রেখে দিলুম।

২

যুদ্ধস্থলে একদল সৈন্য নিজেদের পতাকা নামিয়ে যদি একটা সাদা নিশান তুলে ধরে, আর তাতে যেমন তাদের পরাজয় সূচিত হয়, আমারও সেই অবস্থা হ'ল। রায় বাহাদুরীর তক্তাখানা ছিল আমার সমর-পতাকা আর সাদা পাঁচিল হ'ল সাদা নিশান। ননকোঅপরেশনের হ'ল জয়, আর আমার হ'ল পরাজয়।

দূত পাঠাবার বেলা হ'ল উল্টা রকম। যারা হারে তারাই সন্ধি করবার জন্য দূত পাঠায়, কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। আমি চুপচাপ ঘরে বসে' আছি, অন্য পক্ষ থেকে আরম্ভ হ'ল দূতের আমদানী। তাই কি এক আধজন? কেউ বা ভগ্নদূত, কেউ হয়ত রুদ্রদূত, আবার কারুর তর্জ্জন শুনে শেষ দিনের যমদূতকে আমার মনে পড়ত। সকলেই যে অচেনা তা নয়, কেননা দলের নামটাই নতুন, মানুষগুলা তো আর নতুন নয়! গদাধর পাকড়াসী আমাদের পাড়ার, এককালে আমার বাড়ীতে তাস খেলার আড্ডায় জুটত। সে এখন নতুন দলের একজন পাণ্ডা। আমার নামের আর খেতাবের সাইন-বোর্ডের অন্তর্ধান দেখে সে এসে হাজির। বললে, বেশ করেচ ভোলানাথ। এখন দেশের কাজে লাগো। তোমার রায় বাহাদুরীর সনদখানা ফেরত পাঠিয়েচ?

আমি বললাম, সে একখানা কাগজ বইত নয়, সেখানা ফেরত দেওয়া কি নিতান্ত দরকার?

—দরকার বই কি, তা না হ'লে ওরা কি করে জানবে তুমি আমাদের দলে এসেচ? গবর্মেণ্টকে জানাতে হবে যে, তুমি তাদের গ্রাহ্য কেয়ার কর না।

—শেষে যদি আমার পেন্সন নিয়ে টানাটানি করে?

—সে সাধ্য তাদের নেই। আর গেলই বা তোমার পেন্সন? কত বড় বড় উকীল-ব্যারিষ্টার তাদের হাজার হাজার টাকার আয় ছেড়ে দিলে আর তুমি এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না?

—ও বিষয় আমি কিছু ভাবিনি।

—এতে ভাববার কি আছে? যেমন কথা তেমনি কাজ। তোমার ওই তক্তা নামাবার বেলা ভেবেছিলে? আর দেখ, তোমার কাছে আমাদের আরও লোক আসবে। তুমি বিলাতী ধুতি পরে' আছ কি বলে'? বিলাতী কাপড় সব পুড়িয়ে ফেলা হচ্চে। তুমি আজই খাদি ধুতি আর জামা তৈরি কর। হয়ত কাল তোমার কাছে ডেপুটেশন আসবে।

গদাধর স্বদেশী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে খাদি ধুতি আর খাদি পাঞ্জাবী কিনে আনলাম। তার পরদিনই ডেপুটেশনের আবির্ভাব। দুএকজন ভারিক্কে লোক, বাকি সব নব্য পেট্রিয়ট। প্রথমে ত সকলে মিলে আমার অনেক সাধুবাদ করলে, তারপর যিনি ডেপুটেশনের মুখপাত তিনি বললেন, এই শনিবারে আমাদের একটা মিটিং আছে, আপনাকে সভাপতি হ'তে হবে।

কি বিপদ! পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে' আফিস আর ঘর করেচি, সভার আমি কি জানি? আমি বললাম, মশায় আর কাউকে দেখুন। আমি কখনো সভায় যাইনি আর প্রকাশ্য সভায় আমি একটা কথাও বলতে পারব না।

—ও আপনার বিনয়ের কথা। সব কাজই নতুন আরম্ভ করতে হয়। আমাদের এই দল কি এতদিন ছিল?

আপনাকে ত বেশী কিছু বল্‌তে হবে না, যা বলবার কইবার আমরাই কর্‌ব।

—আমাকে কি বলতে হবে তাও ত জানি নে।

—সে আর কি এমন বড় কথা! হ্যাঁ হে নিতাই, তুমি প্রেসিডেণ্টের একটা স্পীচ লিখে ভোলানাথবাবুকে দিয়ে যেও ত। আপনি সেইটে মুখস্থ করে' নিলেই হবে। এখন আমরা যাচ্চি কর-মশায়ের কাছে, আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে। শনিবার বিকেল বেলা ভলণ্টিয়াররা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

ডেপুটেশন বিদায় হ'লে আমি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লাম। এককালে সেই স্কুল-কলেজের গাদা গাদা বহি মুখস্থ করতে হত, আর এই বয়সে আবার বক্তৃতা মুখস্থ করতে হবে! তার পর বক্তৃতায় কি লিখে দেবে কে জানে! সেখানে সি-আই-ডি রিপোর্টার একটি একটি কথা লিখে নেবে, আমি হয়ত প্রথমবার বক্তৃতা করেই সিডিশনের ঠেলায় পড়ি। আর তাই যদি পড়তে হয় ত পরের কথা তোতা পাখীর মত আউড়ে ধরা পড়্‌ব কেন? সত্যি কি একটা স্পীচ আমি লিখতে পারিনে? চিরকাল ত লিখেই এসেচি, তখন না হয় রায় আর রিপোর্ট লিখ্‌তাম, এখন না হয় আর একটা কিছু লিখ্‌তে হবে। এতকাল গবর্মেণ্টের চাকরী করে' এখন গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা আমার কেমন বাধো বাধো ঠেক্‌তে লাগল। যাই হোক্‌, গোটাকতক কথা নোট করে' রাখ্‌লাম, সংযত ভাষায়, সংযতভাবে লিখ্‌ব বলে'।

মাঠে বেড়িয়ে সন্ধ্যার পর ফিরে এসে দেখি নিতাই বৈঠকখানায় বসে' খবরের কাগজ পড়্‌চে। আমি বল্‌লাম, কি নিতাইবাবু, স্পীচ লেখা হয়েচে না কি?

—মশায়, আমাদের কি লিখ্‌তে দেরী লাগে? স্পীচ যা লিখেচি তা শুনে সব তাক্‌ লেগে যাবে।

—কই, দেখি।

নিতাই পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের কর্‌লে। আমি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে বল্‌লাম, এ যে মস্ত বড় হয়েচে।

—প্রেসিডেণ্টের স্পীচ বড় হলে দোষ কি? সমস্ত কাগজে রিপোর্ট হ'য়ে যাবে, আপনি একদিনে ফেমস্‌ হয়ে পড়বেন।

মনে মনে ভাব্‌লাম, লর্ড বায়রণের মতো বুঝি!

স্পীচ পড়বার চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে দেখি এমন জড়ানো লেখা যে, দু লাইন পড়তে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠতে হয়। বল্‌লাম, এ লেখা আমি ভাল পড়তে পার্‌চি নে।

ফস্‌ করে নিতাই আমার হাত থেকে কাগজগুলা টেনে নিলে। বললে, হ্যাঁ, আমার হাতের লেখা একটু টানা। আমি আপনাকে পড়ে' শুনাচ্চি।

বলেই পড়তে আরম্ভ করে' দিলে। মিনিট দুইয়ের মধ্যে তার হাত-পা চালা দেখে আমি একটু সরে বস্‌লাম। গলার গোটে বাড়ীর ছেলেরা ছুটে এল, দরজার সাম্‌নে পথে লোক জড় হ'ল। আমি বললাম, নিতাইবাবু, এ ত মিটিং নয়, তুমি আমাকেই পড়ে শোনাবে, রাস্তার লোককে এখন শোনাবার দরকার কি?

—আপনি কি বলেন মশায়, স্পীচ যেমন করে' দেওয়া উচিত, সেই রকম করে' না পড়লে ভাল শোনাবে কেন?

—তোমার মত অত জবর গলা ত আমার নেই, আর দশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলাও আমার অভ্যাস নেই।

—আচ্ছা বেশ, আমি আস্তে পড়চি।

খানিক শুনেই আমি স্থির করেছিলাম যে, আস্তে কিংবা জোরে কোন রকমেই নিতাইকে আর পড়তে দেওয়া হবে না। বল্‌লাম, আর তোমাকে কষ্ট কর্‌তে হবে না, এর পর আমি পড়ে' নেব। একটা কথা তোমাকে জিগ্‌গেস করি, এই যে এতখানি পড়লে এ সমস্তটা ডাহা সিডিশন নয় কি?

—তা হতে পারে।

—তুমি হলে কি এই রকম বক্তৃতা কর্‌তে?

—ও ত আমি আপনার জন্য লিখেচি। আমি নিজের কথা ভাবিনি।

—আমাকে ত ভাব্‌তে হয়।

—তা হলে আপনি ভয় পাচ্চেন?

—খুব সাহসী বলে আমার খ্যাতি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কি আমাকে বোকাও সাজতে হবে? নিজের মনে যা আসে বলে যদি ধরা পড়ি ত পড়্‌ব, আর একজনের কথা আউড়ে বিপদ ডেকে আন্‌ব কেন?

—তা হলে আপনি আমার লেখা স্পীচ দেবেন না ?

—তুমি রেখে যাও, আমি ভাল করে' পড়ে' ভেবে দেখ্‌ব।

নিতাই কাগজগুলা রেখে দিয়ে, রেগে দুম্ দুম্ করে' সিঁড়ি নেমে চলে' গেল।

সভাতে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ভলন্টিয়ারদের পিছনে আমি প্রবেশ কর্‌তেই চারদিকে হাততালি পড়ে গেল। কর্ত্তৃপক্ষ থেকে একজন আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচন কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌তেই আবার হাততালি। আমি উঠে গিয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করে' বক্তৃতা আরম্ভ করে' দিলুম। প্রথম প্রথম কথা ঠেকে ঠেকে যেতে লাগ্‌ল, তারপর কোনো মতে খানিক বল্‌লুম।

নিতাইয়ের লেখা স্পীচ থেকে একটা কথাও বলিনি। আমি নিজে যেমন পেরেছিলুম একটুখানি লিখে মুখস্থ করেছিলুম। বক্তৃতা শেষ করে' যখন বসে' পড়লুম, তখন অল্প-স্বল্প হাততালি পড়ল বটে, কিন্তু শ্রোতাদের যে খুব ভাল লেগেছে তা মনে হ'ল না। অপর বক্তারা বেশ তেজের সহিত অনেক কথা বল্‌লেন। সভা ভঙ্গ হবার পর দেখি নিতাই মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। দলপতিদের মধ্যে একজন আমাকে বল্‌লেন, প্রথমবারের হিসাবে আপনার বক্তৃতা মন্দ হয়নি। অভ্যাস নেই বলে' আপনাকে একটু সাম্‌লে বলতে হয়েচে, আর দিন-কতক পরে খোলাখুলি সব কথা বল্‌তে পার্‌বেন।

পরের দিন খবরের কাগজে নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ হ'ল। দেশী কাগজে লিখলে আমি খুব সাবধানে বলেছি, তবে আমার মত লোকের কাছ থেকে এর বেশী আশা করা যায় না। ইংরেজদের কাগজে লিখলে আমার মতন লোককে এমন দলে মিশতে দেখে তারা বিস্মিত হয়েচে। গবর্মেণ্টের কাজে আমার বেশ সুখ্যাতি ও সম্ভ্রম ছিল, আমার পক্ষে ইংরেজ-বিদ্বেষ অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। আমার স্পীচের ভাষা সংযত হ'লেও অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তারপর দিন গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছ থেকে এক চিঠি। তিনি লিখচেন—মাই ডিয়ার রায় বাহাদুর, কাল সকাল বেলা সাড়ে দশটার সময় অনুগ্রহ করে' আমার সঙ্গে দেখা করবে।

এ কথাটা কি সকলের জানা আছে যে, উপাধিপ্রাপ্ত দেশী লোকদের চিঠি লেখবার বেলা ইংরেজরা শুধু উপাধিটাই লেখেন, নাম লেখেন না ? উপাধিতে নামটা চাপা পড়ে যায়, আর যাঁরা এ রকম চিঠি পান তাঁরা আপ্যায়িত হন। রায় বাহাদুর কি খাঁ বাহাদুর হ'লে কি বাপ-মায়ের রাখা নামটা লোপ পেয়ে যায় ? ইংরেজি উপাধির বেলা এ রকম সম্বোধন কর্‌বার প্রথা নেই, নাইট্ হলে তাকে সর নাইট্ বলে' কেউ চিঠি লেখে না। নাম বাদ দিয়ে শুধু উপাধি লেখা যে বিসদৃশ সেটা এইবার আমার চোকে ঠেক্‌ল।

নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট হাউসে হাজির হ'লেম। প্রাইভেট সেক্রেটারীর বাবু আমাকে দেখে কিছু তাচ্ছিল্যভাবে হেসে বল্‌লেন, কি রায় বাহাদুর, আপনি না কি নতুন দলের চাঁই হয়েছেন ?

আমি কিছু রুক্ষভাবে বল্‌লুম,—তাতে দোষ কি ?

—জলে বাস করে' কি কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া পোষায় ?

—জলটা কি কুমীরের ?

এমন সময় লাল চাপকান-পরা চাপরাসী এসে বল্‌লে, সাহেব সলাম দিয়া।

গেলুম সাহেবের কাছে। সাহেব বল্‌লেন, গুড মর্ণিং, রায় বাহাদুর, বসো।

সাহেবের সাম্‌নে একটা চেয়ারে বস্‌লুম। সাহেবের টেবিলে খান-কতক খবরের কাগজ ছিল, একখানা কাগজের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে, মুখ টিপে একটু হেসে সাহেব বল্‌লেন, এটা ত তোমার স্পীচ ?

—হাঁ সাহেব।

—খুব খারাপ না হ'লেও এ তেমন লয়েল স্পীচ হয় নি। তুমি গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলে, গবর্মেণ্ট উপাধি য়ে তোমার সম্মান করেচেন, এখনও তুমি পেন্সন পাও। রাজবিদ্বেষীদের দলে তোমার যোগ দেওয়া উচিত নয়।

রায় বাহাদুরীর সনদ আমার পকেটে ছিল, বের করে' টেবিলে সাহেবের সামনে রাখলুম। বললুম, এই সনদ ফেরত দিচ্চি। চিরকাল ত গবর্মেণ্টের চাকরী করেচি, বুড়' বয়সে যেটুকু পারি দেশের কাজ কর্‌ব।

সাহেব খানিকক্ষণ আমার সনদের দিকে চেয়ে রইল। তারপর রেগে বল্লে,—গবর্মেণ্ট যেমন পুরস্কার দেয়, অপরাধীকে সেই রকম শাস্তিও দিয়ে থাকে।

—শাস্তির জন্য প্রস্তুত আছি, বলে' আমি উঠে চলে' এলুম।

গাড়ীতে উঠে মনে হল রাগের মাথায় কাজটা ভাল করিনি। ভেবে-চিন্তে' কাজ করাই আমার অভ্যাস, হঠাৎ এ-রকম মরিয়া হ'য়ে ওদের চটাবার কি দরকার? গলা-বাজি করে' যে সিডিশন প্রচার করে' বেড়াব তার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেন-না আমার ধাত সে রকম নয়। আর লীডর হবারও কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না। মাঝ থেকে লাট সাহেবের বাড়ী গিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে ঝগড়া করে' কি ফল হ'ল?

এই রকম পাঁচ রকম ভাবনায় মনটা খারাপ হয়ে' গেল। বাড়ীতে ফিরে বিকেল বেলা জলখাবার খাচ্চি, এমন সময় গৃহিণী বল্লেন, এ বয়সে তোমার আবার এ কি বুদ্ধি হ'ল?

—কি বুদ্ধি?

—এই হই হই করে' কতকগুলো পাগলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো?

—দেশের উন্নতি কর্‌বার চেষ্টা কি পাগলামি?

—তা নয় ত কি? ইংরেজের সঙ্গে কি তোমরা পারবে? আর তুমি চিরকাল ইংরেজের চাকরী করে' এসেচ, তুমি কোন্ মুখে তাদের বাদ সাধতে যাও?

—ইংরেজ ত আর ঘর থেকে আমাকে মাইনে দেয়নি, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেয়। আর দেশের সব টাকা তারা যে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্চে।

—এতদিন ত সে কথা তোমার মনে পড়েনি। এরি মধ্যে তোমার ভীমরথী হয়েচে। কোন্ দিন তোমায় ধরে' জেলে নিয়ে যাবে।

—তা যায় যাবে। দেশের কত বড় বড় লোককে নিয়ে গিয়েচে।

—তা হলে জেলে গিয়ে জাঁতা পিষে তুমিও এইবার বড়লোক হবে।

মুখ আমাকেই বন্ধ করতে হল, কারণ গৃহিণীর মুখ বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাহিরের ঘরে বসে' ভাবতে লাগলুম পেট্রিয়ট হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার। এখন পর্য্যন্ত ত কিছুই করিনি, একটা স্পীচ, তাও ফুলঝুরির মতন, তাতে তুবড়ি হাউইয়ের মতো আতসবাজি মোটেই ছিল না। তাতেই সি-আই-ডির কালো কেতাবে আমার নাম উঠেচে, বাইরে বড় সাহেবের চোক-রাঙ্গানি, ঘরে ভার্য্যার মুখ ঝামটানি। আমার মতো লোকের পক্ষে পরীক্ষা বড় কঠিন হয়ে উঠল।

দিন কয়েক পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম হ'ল তিন মাস প্রকাশ্য সভা কোথাও হবে না, যারা এ-রকম সভা কর্‌বে কিংবা সভায় উপস্থিত থাক্‌বে তাদের কারাদণ্ড হবে। অমনি আমার কাছে আর এক ডেপুটেশন এসে উপস্থিত, আদেশ অগ্রাহ্য করে' সভা কর্‌তে হবে, তাতে জেলে যেতে হয় সেও ভাল।

এ-রকম বাহাদুরীতে কি লাভ আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। সভায় লোক জড় হ'য়ে বক্তৃতা আরম্ভ হতেই পুলিশ ধর্‌বে জেনেশুনে মিছিমিছি জেলে গিয়ে কি ফল? যাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন তাঁরা আমাকে বোঝাসেন এ রকম হুকুম অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়, এ রকম আদেশ পালন না করাই তার ঠিক প্রতিবাদ। আমার মনে হ'ল যেটুকু রয় সয় সেইটুকু ভাল, সাধ করে' ঘর ছেড়ে জেলে বাস করায় কোন লাভ নেই। আমি সভায় যেতে অস্বীকার কর্‌লুম।

ডেপুটেশনের মুখপাত বল্লেন, আমরা ভেবেছিলাম আপনার সাহস আছে, দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন। সেটা আমাদের ভুল। চিরকালের অভ্যাস কোথায় · ইংরেজের সাম্‌নে দাঁড়ানো রায় বাহাদুরদের কাজ নয়।

আমি বল্‌লাম, রায় বাহাদুরীর সনদ আমি লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ফেরত দিয়েচি।

—তা যাই করুন, কাজের বেলা আপনার সাহসে কুলিয়ে উঠ চে না।

ডেপুটেশন তো রেগেমেগে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল আর আমার লাভের মধ্যে হ'ল এই যে, কোনো দিক বজায় রইল না। ধোপার কুকুরের অবস্থা হল,

ঘরের, না ঘাটের। সাহেব মহলে মুখ দেখাবার পথ ঘুচিয়ে এসেছি, বাড়ীতে গৃহিণীর মুখ তোলোপানা, অবশেষে পেট্রিয়টের দল থেকেও নাম কাটা গেল।

তার পরদিন খবরের কাগজে আমার নামে এক চিঠি, কত রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে' চিঠিতে প্রমাণ করা হয়েচে যে, যেমন চিতাবাঘের গায়ের দাগ বদলানো যায় না, সেই রকম গবর্মেণ্টের চাকরীর ছাপ কখনো মেটে না।

পুরাকালের মতো আমার কথায় যদি ধরণী দ্বিধা হ'ত তা হ'লে আমি ভূগর্ভে প্রবেশ কর্‌তাম।

৪

মনটা খারাপ হ'য়ে যাওয়াতে দিন-কয়েকের জন্য আমি আর এক জায়গায় চলে গেলাম। সেখানে আমার এক-জন জানা লোক থাকতো, সেখানকার এঞ্জিনিয়র, নাম হরপ্রসাদ। লোকটা কিছু সাহেবী রকম, কিন্তু আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ বলে' তার বাংলায় গিয়ে উঠ্‌লুম। আমাকে দেখে অন্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা কর্‌লে, হ্যাঁ হে, ভোলানাথ, তোমার নামে খবরের কাগজে কত কি দেখ্‌ছিলুম, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

—ও সব কিছু নয়, আমাকে নিয়ে নতুন দলে টানা-টানি করেছিল।

—হঠাৎ তুমি পেট্রিয়ট্ হ'তে গেলে কেন? তুমি সরকারী লোক, রায় বাহাদুর হয়েচ, তোমার আবার এ রোগ কেন?

—পৃথিবী-সুদ্ধ সকল জাত স্বাধীন, আমরাই কি চিরকাল পরাধীন হয়ে থাকব?

—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ তোমার এ জ্ঞান টন্‌টনে হয়ে উঠ্‌ল যে? এতকাল যে চাকরী কর্‌তে কার অধীন ছিলে?

—তাই বলে' কি দেশের অবস্থা ভাবতে নেই?

—যারা ভাবে তারা ভাবুক, তোমার আমার সে খোঁজে দরকার কি?

আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্চে এমন সময় মিষ্টার চৌধুরী এলেন। ইনি ডেপুটী। হরপ্রসাদ পরিচয় করিয়ে দিলে। মিষ্টার চৌধুরী আমার হাতখানা ধরে' খুব নাড়া দিয়ে বল্‌লেন, ও হো! আপনার নাম আমাদের খুব জানা আছে। আপনি ত একজন নতুন লীডর হয়েচেন

—ও সব বাজে কথা। লীডর হওয়া দূরে থাকুক্, দলে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েচে।

—ব্রেভো! এ একটা ভাল খবর বটে। যে দলে বরাবর ছিলেন, সেই দলই আপনার পক্ষে ভাল।

দু'একটা কথা আমি চেপে গেলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা আর সনদ ফিরিয়ে দেবার কথা প্রকাশ কর্‌লাম না।

সন্ধ্যাবেলা হরপ্রসাদ আমাকে তাদের ক্লাবে নিয়ে গেল। সেখানে জেলার সব কর্ম্মচারী, উকীল, ডাক্তার জড় হয়। ব্রিজ খেলার খুব ধূম। আমাকে নিয়ে খানিক রঙ্গ হ'ল, কিন্তু সকলেই বুঝলে যে আমার নামে যে সব রব উঠেছিল, সে বাড়ানো কথা, সত্যিসত্যি আমি গবর্মেণ্টের বিরোধী নই।

দিন দুই পরে হরপ্রসাদ আমাকে বল্‌লে,—ওহে, আজকে মল্লিকদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেচি।

—বেশ, মল্লিক কে?

—সে একজন ব্যারিষ্টার, বেশ পয়সা আছে আর রোজগারও ভাল। সে মেম বিয়ে করেচে, তারা দু'জনেই আস্‌বে।

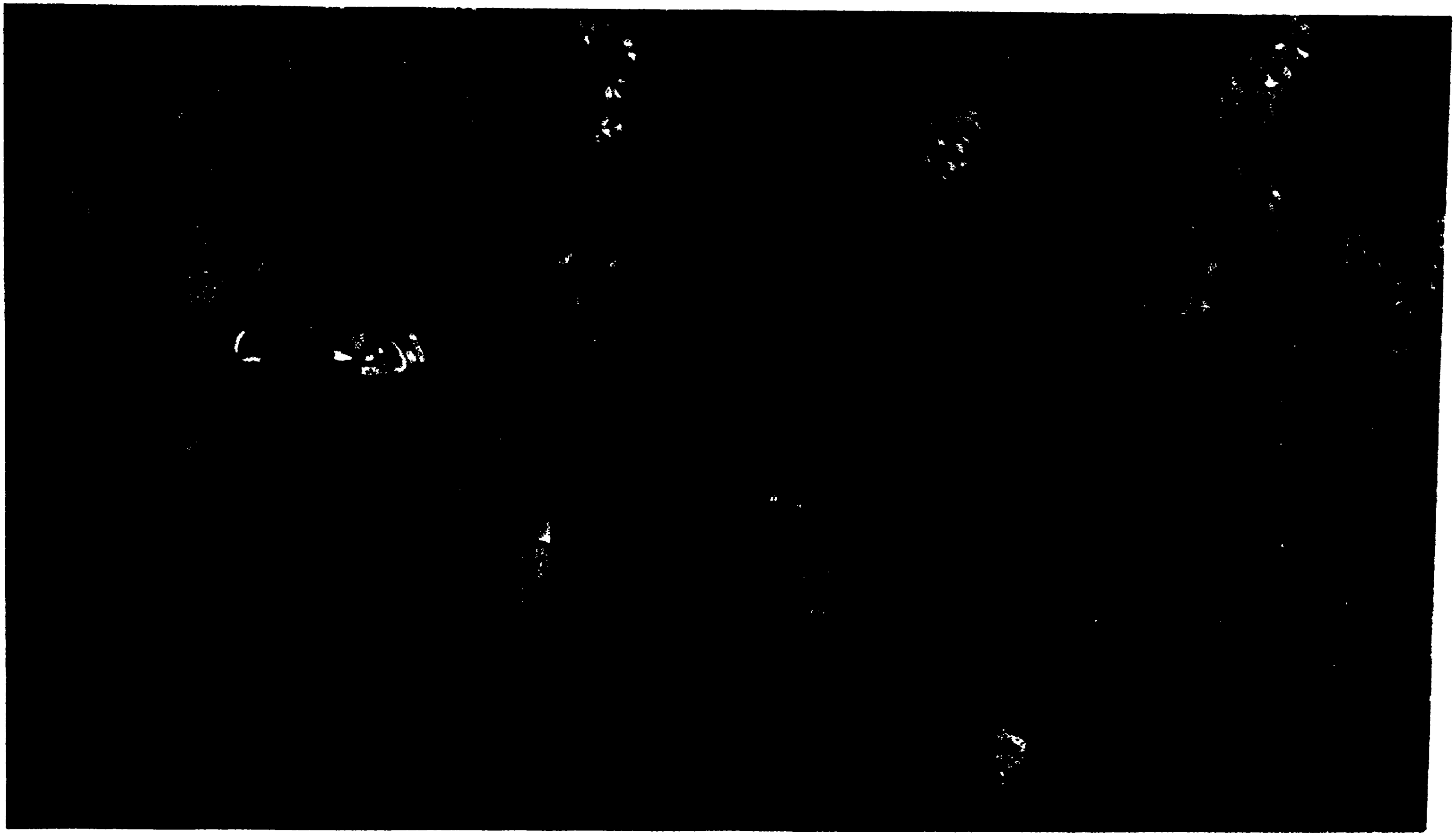
—ভাল কথা। মেম কি বিলাতে বিয়ে করেছিল?

—না, সে আগে এক সাহেবের ছেলেদের গবর্ণেস ছিল, অল্পদিন হ'ল মল্লিক তাকে বিয়ে করেচে। তোমাকে আজ রাত্রে পোষাক পর্‌তে হবে।

—কেন, ধুতি কি অপরাধ কর্‌লে?

—মল্লিকের স্ত্রী হাজার হোক্ মেম ত বটে। তার সঙ্গে টেবিলে ধুতি পরে' খেতে বসা ভাল দেখায় না।

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বল্‌লুম, বাপ পিতামহ চিরকাল ধুতি পরে' এসেচে, আর এখন একজন মেম আস্‌বে বলে' ধুতি অসভ্য বেশ হ'ল? এ যেন গবর্ণেস কিন্তু খোদ গবর্ণর যদি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আসেন তা হ'লেও বাড়ীতে আমি ধুতি ছাড়া আর কিছু পরব না।



আশ্রম-ছায়ায়

শ্রী সুকুমার দেউস্কর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হরপ্রসাদ মুস্কিলে পড়ল। বল্‌লে, তুমি নিতান্ত ওল্ড ফ্যাশনের লোক। ধুতি না ছাড়লে তুমি তাদের সঙ্গে টেবিলে বসে' কি করে' খাবে?

—না হয় খাব না।. আর তোমার গবর্ণেসের সঙ্গে আলাপ কর্‌বারও আমার কোন দরকার নেই। আমি আর-একটা ঘরে থাকব সেইখানে আমার খাবার দিয়ে যেতে বলো। ইংরেজি খাবার চাই নে, বামুন যা রাঁধবে তাই দিতে বলো।

সে রাত্রে আমার আর খানা খাওয়া হল না, মল্লিক-দম্পতীর দর্শনলাভও হ'ল না। তার পরদিন আমি বাড়ী ফিরে এলুম।

আমার অদৃষ্টে প্যাজ পয়জার দুই হ'ল।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

(যশল্মীর)

রাজপুতানা ভারতের মরুস্থলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার কেন্দ্রস্থান যশল্মীর। এই উষর মরুভূমির দেশেও শস্য-শ্যামলা বঙ্গজননীর সুসন্তানদের আবির্ভাবের অভাব হয় নাই। ইহার রাজধানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও বালুকঙ্করময় ভূমির বক্ষে বিরাজিত থাকিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যে চিত্তহারী হইয়া আছে। ইহা রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় শত মাইল দূরে অবস্থিত। এই রাজ্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ২৫০ মাইল দীর্ঘ ও উত্তর হইতে দক্ষিণে ১২০ মাইল প্রশস্ত। এখানে যাতায়াতের জন্য উষ্ট্র ও অশ্বই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। এত দূরে অবস্থিত থাকায় রাজপুতানার উত্তর-পশ্চিম বিভাগের এই রাজ্যের মরুভূমিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া আজিও বহিতে পায় নাই। তাই আজও এখানে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অটুট থাকিয়া আর সকল হইতে যশল্মীর আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। চতুর্দ্দিকের বালুরাশিপূর্ণ জলশূন্য উষর ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যিনি রাজধানীর পীতবর্ণ প্রস্তরে কারুকার্য্যখচিত সৌধ-মালায় পরিবৃত অত্যুচ্চ গিরি দুর্গস্থ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী সজ্জিত নগরীতে প্রবেশ করিবেন, তিনিই ইহার সুবৃহৎ হ্রদ-শোভিত মনোহর প্রাসাদ উপবন শিল্পাদি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইবেন এবং কলারসজ্ঞ দর্শক এখানকার শিল্প-বৈচিত্র্য এবং প্রধানতঃ বাস্তুশিল্পের স্থানীয় বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবেন। পাশ্চাত্য প্রভাবের অভাবে রাজধানী যশল্মীর প্রায় আট শত বৎসর ধরিয়া তাহার এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। ইহার হর্ম্ম্য ও বাস্তুশিল্পের এই ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিবার জন্য যে বাঙ্গালী এখানে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, আজ তাঁহার কথাই বলিব। তিনি এই রাজ্যের ষ্টেট এঞ্জিনীয়র শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত, এ, এম, আই, এম, ই. এম, আর, এ, এস, (লণ্ডন)। কলিকাতা জোড়াবাগানের দত্ত বংশে ইঁহার জন্ম। পিতা ৺জগৎদুর্ল্লভ দত্ত ডিরেক্টর জেনারল অব পোষ্ট অপিসে কর্ম্ম করিয়া পেন্সন গ্রহণের চার বৎসর পরে ১৯০২ অব্দে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ৺মতিলাল দত্ত মহাশয় ৩২ বৎসর গবর্ণমেণ্ট পেন্সন ভোগ করিয়াছিলেন। বড়বাজারের শেঠগণ নেপালবাবুর মাতুল বংশ। শেঠ ও বসাকদিগের ন্যায় এই দত্ত বংশও কলিকাতার পুরাতন অধিবাসী। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে নেপালবাবুর পিতামহ জোড়াবাগানের বাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতার শিমুলিয়ায় আসিয়া নূতন বাস স্থাপন করেন। নেপালবাবু ১৮৯০ অব্দে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি General Assembly's Institution হইতে ১৯০৬ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যন্ত্রকলা বিদ্যালাভের জন্য শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯০৮ সালে সাব্‌ ওভারসীয়ারী

পরীক্ষায় বাঙ্গালার মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসর শিবপুর মাইনিং বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর খনিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া পর বৎসর প্রথম ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন ও সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি (First Scholarship) প্রাপ্ত

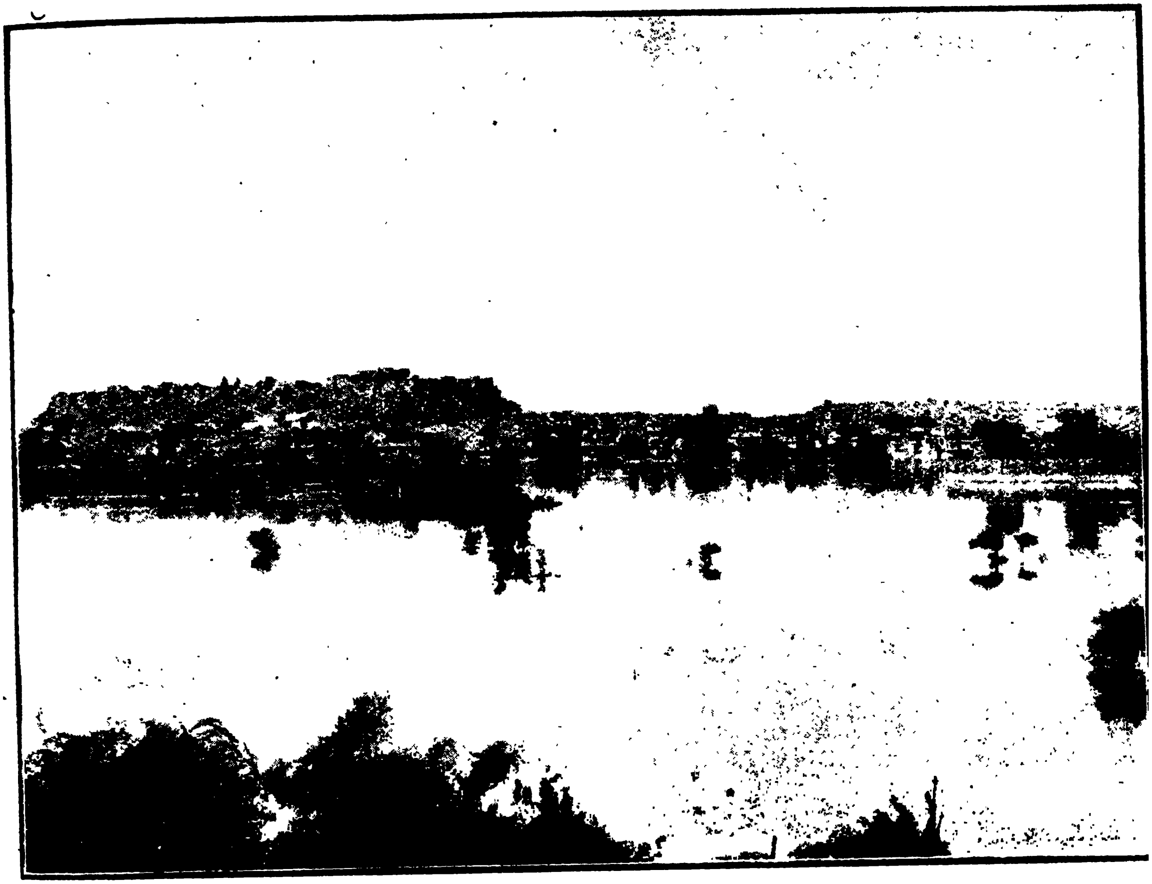


শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত

হন। পর বৎসর ১৯১০ অব্দে শেষ পরীক্ষায় উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নেপালবাবু খনিবিদ্যার ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি আর এক বৎসর তড়িৎ ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কিছুকাল কলেজের ডাইনামো ও পাওয়ার হাউসের ভার লইয়া কর্ম্ম করেন এবং ১৯১১ অব্দে উচ্চ প্রশংসাপত্র পাইয়া কলেজ ত্যাগ করেন। কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যশল্মীর রাজ্য হইতে প্রধান মন্ত্রী ভারত-সরকারের খনি-বিভাগের প্রধান পরিদর্শককে একজন সুদক্ষ খনি ও ভূবিদ্যাবিৎ লোকের জন্য পত্র লেখেন। চীফ ইন্‌স্পেক্টর শিবপুর কলেজে উক্ত পত্র পাঠাইয়া লোকের জন্য লিখিলে তথাকার খনিবিদ্যার অধ্যাপক রবার্টস সাহেব নেপালবাবুর জন্য সুপারিশ করেন।

এই সূত্রে নেপালবাবু যশল্মীর রাজ্যে ১৯১২ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রস্‌পেক্টিং ও পূর্ত্তবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই তাঁহাকে ষ্টেট এঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত করেন। নেপালবাবু পাহাড়-পর্ব্বত নদী বন প্রান্তর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কতকগুলি খনিজ সম্বন্ধে বিশেষ আশাসজনক সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু বাষ্পীয় শকট রাজ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকায় এবং অন্য অনেক অসুবিধার জন্য তৎসমুদয় লাভজনক কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার সংগৃহীত কতকগুলি নিদর্শন শিবপুর কলেজে প্রেরিত হইয়াছিল। কলেজের খনি-পরিষদের (Mining Society) সভাপতি ও Mining Journal-এর সম্পাদক সভার এক অধিবেশনে এই সংগ্রহের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মহারাজা সাহেব prospecting-এর কার্য্যে বিশেষ যত্ন লইতেন এবং উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। তিনি একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণের জন্য নেপালবাবুকে তাহার পরিকল্পনা করিতে বলেন। নেপাল-বাবু রাজপুতানার সমস্ত বড় বড় মন্দির কিছুদিন ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার পর স্থানীয় বিশিষ্টতার অনুকূল একটি সুন্দর ডিজাইন প্রস্তুত করেন। মহারাজা তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত অনুমোদন করেন এবং তদনুসারে মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৯১৪ অব্দে বর্ত্তমান মহারাজার রাজ্যাভিষেককালে গভর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট স্যর এলিয়ট কল্‌ভিন ও রাজপুতানার রেসিডেণ্ট কর্ণেল উইণ্ডহাম যশল্মীরে আগমন করেন। এই সূত্রে নেপালবাবু "কল্‌ভিন স্কুল" এবং উইণ্ডহাম পবলিক লাইব্রেরী এই দুইটি বাড়ীর জন্য ডিজাইন প্রস্তুত করেন। কল্‌ভিন সাহেব তাহা রাজপুতানার পূর্ত্তবিভাগের (Rajputana P. W. D) সেক্রেটারী সাহেবের নিকট মতামতের জন্য

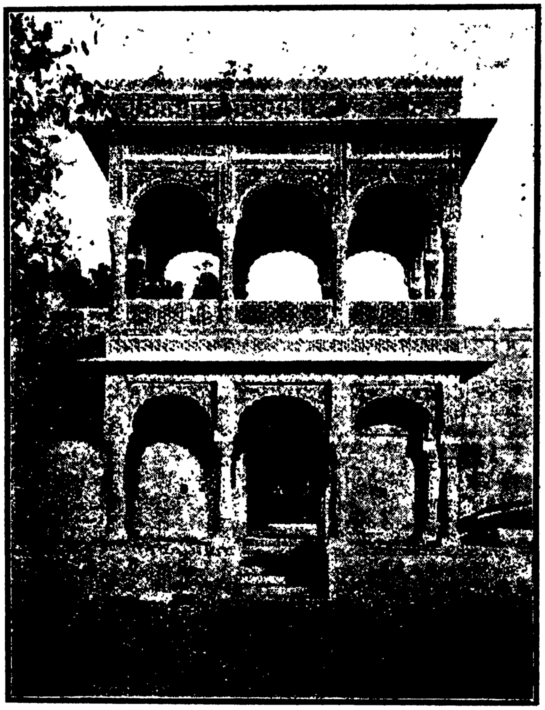


'গড়সী-সর' হ্রদের দৃশ্য

পাঠাইয়া দেন। ডিজাইন অনুমোদিত হইয়া আসিলে নেপালবাবুর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান মহারাজা সাহেবের এক কুমার গিরিধর সিংহের শিক্ষার ভার নেপালবাবুর হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৯১৪ হইতে ১৯২০ অব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৭ সাত বৎসর তিনি কুমারকে শিক্ষা দান করেন। তাঁহার কার্য্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা সাহেব তাঁহাকে অর্থ ও অনেক শিরোপা দ্বারা পুরস্কৃত করেন। নেপালবাবু পুরস্কারের টাকা তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর স্মারক-স্বরূপ "ক্ষেত্রমণি মেডল ফণ্ড" নাম দিয়া কোম্পানীর কাগজ করিয়া দেন এবং তাহার বাৎসরিক সুদ হইতে একখানি রৌপ্যপদক দরবার স্কুলের প্রথম হিন্দু বালককে প্রতি বৎসর মহারাজা সাহেবের জন্মদিবসে দিবার জন্য স্থির করাইয়া দেন। নেপালবাবু যশল্মীরে আগমনাবধি অবসর পাইলেই রাজপুত বালক কিংবা অন্য জাতীয় দরিদ্র বালকদের গৃহে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। এ প্রকৃতি তাঁহার নূতন নহে। তাঁহার ছাত্রাবস্থাতে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ও অনুশীলন সমিতির সভ্য থাকিয়া স্কুল ও কলেজের পাঠাভ্যাসের অবসর সময়ে নৈশবিদ্যালয়ে শ্রমজীবী বালক ও যুবকগণকে শিক্ষাদান করিতেন। সেই সময় মেহের-পুরাদি কেন্দ্রে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। তিনি যশল্মীরে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সহরবাসীদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন এবং স্থানীয় ভদ্রসন্তানদের উৎসাহ দান করিতে থাকেন। তাহার শুভ পরিণাম-স্বরূপ ১৯১৫ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "সর্ব্ব হিতকারী

বাচনালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। সকলে একমত হইয়া নেপাল-বাবুকে তাহার উপসভাপতি (Vice-President) নির্ব্বাচন করেন। উহা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে।



দেওধি-তোরণ—যশল্মীর

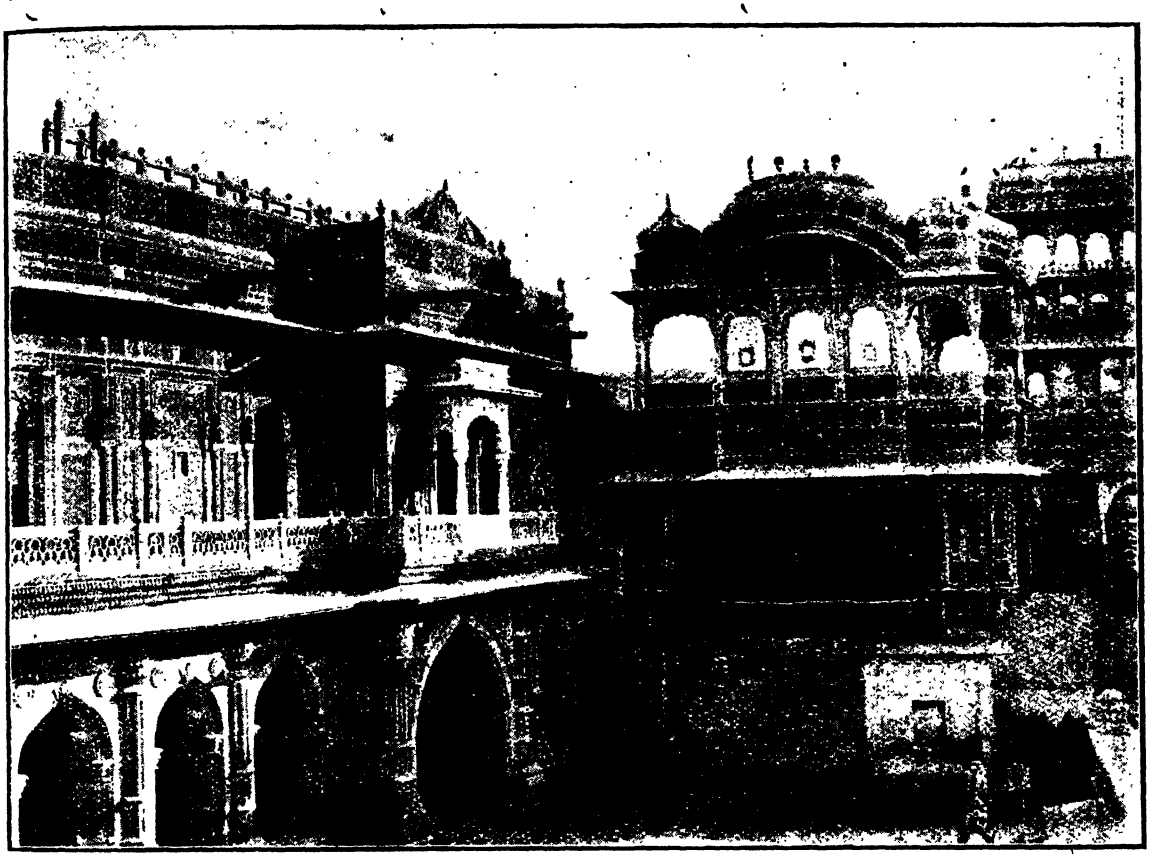
যশল্মীর রাজ্যের অধিকাংশ ভাগ বালুরাশীতে পূর্ণ। সাধারণতঃ তথায় কূপ প্রায় তিন শত ফীট গভীর হইয়া থাকে এবং সমস্ত বৎসরে প্রায় আট ইঞ্চি মাত্র বারিপাত হয়। সুতরাং স্থানে স্থানে জলকষ্ট ভোগ হয়। কৃষিকর্ম্মেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য নেপালবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সহরের নিকট "গড়সী-সর" নামে একটি হ্রদ আছে। তাহাতে বৃষ্টির জল ধরা হয়। উক্ত হ্রদে জল আনিবার জন্য তিনি খাল ও নালা (Feeder channel) কাটাইয়া দিয়াছেন এবং মধ্যে একটি বাঁধ দিয়া জল থাকিবারও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে সরোবর পরিপূর্ণ হইলে প্রায় তিন বৎসর তাহাতে পানীয় জল থাকে। স্থানে স্থানে কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য তিনি অনেক ছোট-বড় বাঁধ বা "এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট" বাঁধিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে বঙ্গবাড়ী (Bungwari) নামে একটি খাড়ুন (Dam) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা ১৯১৫-১৬ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কূপ-খননের জন্য সকলকে উৎসাহ দেওয়া



যশল্মীরের একটি সৌধের বারান্দা

হইতেছে। রাজ্যের যাবতীয় সেচ-সম্বন্ধীয় (irrigation work) কার্য্য নেপালবাবুর তত্ত্বাবধানে আছে।

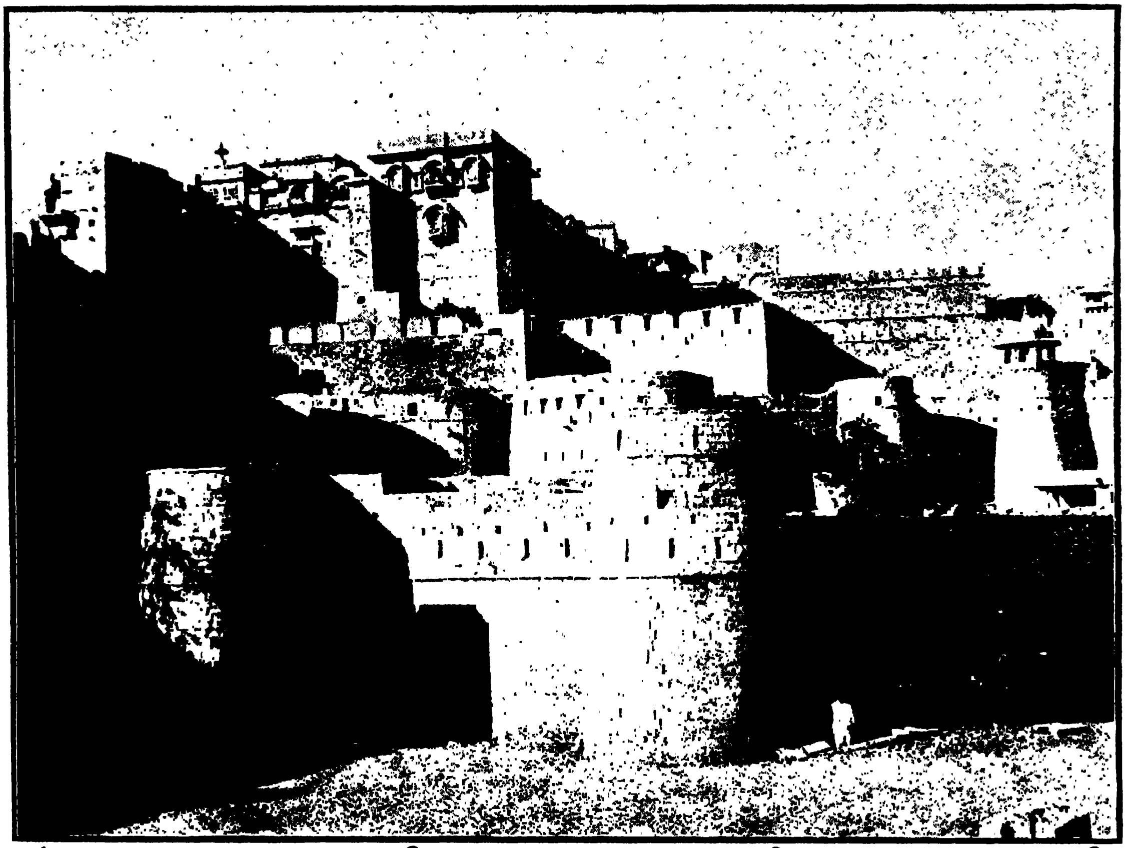
১৯১৬ অব্দে তিনি রাজপ্রাসাদের একটি নূতন ডিজাইন করেন। মহারাজা সাহেবের তাহা অনুমোদিত হওয়ায় প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। নেপালবাবুর কর্ম্মকুশলতায় যশল্মীরের রাস্তাঘাটের নানা স্থানে বিশেষ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও নূতন নূতন পথ-ঘাট তৈয়ার হইতেছে। রাজপ্রাসাদ, জাবাহির বিলাস ভবন, টাউন হল, লাইব্রেরী, স্কুল প্রভৃতি যে-সকল ইমারত নেপালচন্দ্রের দ্বারা পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে এবং রাজএষ্টেট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগের উচ্চ উচ্চ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস Calcutta Municipal Gazette (4th August 1926)এ দৃষ্ট হইবে।



'জাবাহির বিলাস' প্রাসাদ—শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

সেট্‌ল্‌মেণ্টের কার্য্যেও নেপালবাবুর দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি সার্ভে এবং সেট্‌ল্‌মেণ্টের জন্যও প্রশংসিত হইয়াছেন।

ষ্টেট এঞ্জিনীয়ারের কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত আরও অনেক কাজ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে করিতে হয়। কখন কখন তাঁহাকে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্যও করিতে হয়। মহারাজা যখন দিল্লীর নরেন্দ্র-মণ্ডলের ("Conference of Ruling Princes & Chiefs") অধিবেশনে প্রত্যেক বৎসর উপস্থিত হন, তখন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্যভার নেপালবাবুর উপর ন্যস্ত হয়। ১৯১৬ অব্দ হইতে এই কার্য্য তিনি এ পর্য্যন্ত অতিশয় দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত করিয়া আসিতেছেন। মহারাজা যখনই বাহিরে tour করিতে যান তখন প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য তাঁহারই উপর অর্পিত হয়। যশল্মীরে ভারত-সরকার হইতে কোন পলিটিকাল অফিসারের আগমন হইলে তাঁহার বাসের বন্দোবস্ত নেপালবাবুকে করিতে হয়। যশল্মীর রাজ্যে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত পরিব্রাজক ও দর্শক হিসাবে সময়ে সময়ে দেশীয় রাজন্য, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এবং বৈদেশিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিয়া থাকেন এবং তখন তাঁহাদের অভ্যর্থনার ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। সকলেই তাঁহাদের সুখ-সুবিধার ও সহায়তা এবং সৌজন্যের জন্য নেপালবাবুর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন; মেহেরপুরের জমীদার রায় ইন্দুভূষণ মল্লিক বাহাদুর, যোধপুর রাজ্যের একাউণ্টাণ্ট-জেনারেল মিষ্টার জে, ডবলু ইয়ং, পশ্চিম রাজপুতানা ষ্টেটসের



দুর্গ ও প্রাসাদ—যশল্মীর

রেসিডেণ্ট কর্ণেল ম্যাকফার্সন, সি, আই, ই বাহাদুর, জেনারেল ক্রফোর্ড, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের মিলিটারী সেক্রেটরী, এবং লেডী চেমশফোর্ড -প্রমুখ অনেকের পত্রই দেখিয়াছি। সকলেই একবাক্যে নেপালবাবুর সুখ্যাতি করিয়াছেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। যশল্মীরের আদর্শ পুরাতত্ত্বের নিদর্শনগুলি দেখিবার জন্য আমেরিকা, য়ুরোপ ও নানা স্থানের ভ্রমণকারীরা এ রাজ্যে আসিয়া থাকেন এবং এখানকার নূতন ও পুরাতন সৌধাবলীর নির্ম্মাণ-পদ্ধতির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ১৯২৭ ডিসেম্বরে জনৈক আমেরিকান আর্টিষ্ট আর্কিটেক্ট (Miss Francis Polt Dillon, B.A., B.Sc.) আসিয়া নেপাল-বাবুকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। অন্য সময়ে মিষ্টার কিল্‌ব্যর্ণ নামে জনৈক কলারসজ্ঞ ১৯২৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরে লিখিয়াছিলেন,—

"Dear Mr. Dutt.... ... ... I do most sincerely congratulate you on your beautiful Darbar Hall. It must be a great satisfaction to be able to design buildings in such perfect keeping with the rest of the place and find craftsmen still capable of carrying out your idea."

মধ্যে মধ্যে নেপালবাবুকে সদর আদালতের কার্য্যও করিতে হয়। আইন-কানুনের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন এবং স্থানীয় নিয়ম, রীতি-নীতি ও আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের ফলে তিনি এই গুরু কর্ত্তব্যও অতিশয় প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়ারের উপর যশল্মীরের মহারাজার এতদূর বিশ্বাস যে, তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য দিতে, দরবারের প্রতিনিধি-স্বরূপ বাহিরে পাঠাইতে, প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতে কার্য্য করিতে দিতে অথবা প্রধান বিচার-



জৈনমন্দির—যশল্মীর

পতির পদে কার্য্য করিতে দিতে—ফলতঃ রাজ্যের যে-কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিতে কুণ্ঠিত হন না। ১৯২১ অব্দে সদর আদালতের প্রধান বিচারপতি পরলোকগমন করিলে, নেপালচন্দ্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বিচারাসনে বসিতে মহারাজা বাধ্য করেন।

ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের উপর নেপালবাবুর অধিকার যেরূপ অসাধারণ তৎপ্রতি তাঁহার অনুরাগও তদ্রূপ প্রগাঢ়। যশল্মীরে আসিয়াই তিনি তথাকার প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দিরাদি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে থাকেন। ছাত্রজীবনেও তিনি সুবিধা পাইলেই ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণার্ক প্রভৃতির বিখ্যাত মন্দিরাদির কারুকার্য্যগুলি অতিশয় যত্নের সহিত দেখিতেন ও বিচার করিতেন। যশল্মীরে তাঁহার পরিকল্পিত মন্দির নির্ম্মাণের পর হইতে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন ও মোগল যুগের তথা বর্ত্তমানের সমস্ত আদর্শ স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া আসিতেছেন এবং সময় সময় তাহার নক্সা করিয়া লইতেছেন। তিনি বাস্তুশিল্পকলা-বিষয়ক সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং স্থানীয় মিস্ত্রী ও শিল্পিগণকে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে হাতে-কলমের কাজ শিক্ষাও করিয়াছেন। ১৩৩৩ সালের ১৬ই পৌষ তারিখের "হিতবাদী"র অতিরিক্ত পত্রে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"ভারতীয় হর্ম্ম্যশিল্পের অনুরাগী ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে আমরা দুইজনের নাম করিতে পারি—শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নেপালবাবু সুদূর রাজপুতানায় বাঙ্গালীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি এখন যশল্মীর রাজ্যের ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার। তাঁহারই চেষ্টায় যশল্মীর মহারাজের প্রাসাদ দেশীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারে পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে।" নেপালবাবু সুপ্রসিদ্ধ মাসিক হিন্দী পত্রিকা "সরস্বতী"তে

ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়া থাকেন।

যখন প্রধান মন্ত্রী ছুটিতে বা কোন কার্য্যবশতঃ রাজধানীর বাহিরে যান, তখন তাঁহার কার্য্যের ভার নেপালচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয়। প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যও তিনি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। তিনি শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের "মাইনিং সোসাইটী", কলিকাতা "মাইনিং ও জিওলজিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউট অব ইণ্ডিয়া" নামক সভা, ইংলণ্ডের ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন অব মাইনিং এণ্ড মেক্যানিকাল এঞ্জিনীয়ার্স, লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী, যশল্মীরের সর্ব্বহিতকারী বাচনালয় প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সভার সভ্য। মহারাজের দরবারে নেপালচন্দ্রের উচ্চাসন আছে। তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ে যেরূপ সম্মানিত, তদ্রূপ দরবারের বাহিরে সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এ রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি বাবু অমৃতলাল সান্যাল। তিনি এখানকার রাজস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং মহারাজার নিকট ইংরেজী সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতেন। তিনি ১৯১১ অব্দের ডিসেম্বর মাসে যশল্মীর রাজ্য হইতে পেন্সন লইয়া স্বীয় জন্মভূমি "সোনারপুর" গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং প্রায় ১৫ বৎসর কাল পেন্সন ভোগ করিয়া ১৯২৬ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পর এবং নেপালবাবুর পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী হইয়া যশল্মীরে আসেন নাই।

টেবু

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

শশধর তর্কচূড়ামণির আমল থেকে আমরা আমাদের সমাজের প্রচলিত যতকিছু বিধি-নিষেধ আছে, সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে লেগে গিয়েছি। হিন্দু-সমাজ নিতান্ত অন্ধের মত যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানকে শুধু মেনেই চলেছে, আমরা ব্যস্ত হয়েছি ইলেক্‌ট্রিসিটি ও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌-এর অধ্যায়ে তার সার্থকতা খুঁজে বার করতে। একথা ভেবে দেখার মনোবৃত্তি আমাদের হয় না যে, হিন্দুসমাজের বাইরেও জগৎ জুড়ে বৃহৎ মানব-সমাজ রয়েছে; সেই নরসমাজের সভ্য অসভ্য নানা স্তরের বিবিধ সামাজিক বিধানের মধ্যে কত-রকম আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব ও প্রচলন হয়েছে। সে-সবের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের সামাজিক বিধি-নিষেধগুলোর সত্যাসত্য উপযোগিতা অনুপযোগিতা নির্দ্ধারণ করা যে প্রয়োজন, সেকথা আমাদের মনেও হয় না। অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের আলোকপাত করে' আমাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে বিচার করতে আমরা এখনও শিখিনি। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আমরা এক রকম অজ্ঞাত-সারেই অনেকগুলো সংস্কারকে মেনে চলি; সেগুলোকে আমরা বিচার করে' দেখিনে। এরকম কয়েকটি সংস্কারের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হিন্দুসমাজ ছাড়াও অন্যান্য লোকসমাজে ঐ ধরণেরই অনেক সংস্কার রয়েছে, সেদিকে নজর করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

"টেবু" নামটাই একটু অদ্ভুত ঠেকে আমাদের কাছে। আসলে ওটা বাংলা ত নয়ই, ইউরোপীয় কোন ভাষায়ও ও-শব্দটা ছিল না। পোলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে যেসব মানুষ থাকে, তাদের মধ্যেই ঐ শব্দটা প্রচলিত আছে। ওদের কাছ থেকেই ইউরোপীয় ভাষায় এ শব্দটা ধার নেওয়া হয়েছে। টেবু সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে আগে কথাটার মানে বোঝা দরকার। আশ্চর্য্য এই যে, যদিও বাংলা ভাষায় "টেবু"র কোন প্রতিশব্দ নেই,

তথাপি আমাদের মধ্যে ওই আইডিয়াটা খুবই প্রচলিত আছে। শুধু আমাদের কেন, পৃথিবীর সব জায়গায় সব সমাজেই ওই সংস্কারটি যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। আমরা অনেক সময় যখন কোন-একটা কিছু করতে যাচ্ছি, তখন অনেকের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মুখে শুন্‌তে পাই "ওটা করতে নেই, ওটা দোষ"। তেমনি আবার এমনও শুন্‌তে পাই "ওটা করতে হয়, ওটা ভাল"। এই যে বিধি-নিষেধগুলো, সব সময়ই যে তার এক একটা বিশেষ কারণ থাকে তা নয়। শুধু একটা সংস্কারের বশেই আমরা এগুলো মেনে চলি। এই ধরণের যে বিধি-নিষেধ তাকেই বলে "টেবু"।

এসব বিধিনিষেধ যে কেবল বর্ত্তমান কালেই আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা নয়। অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও এসব মান্‌তেন। তাঁরা আবার সেগুলো শাস্ত্র-গ্রন্থেও লিখে গেছেন; তাই আমরা আমাদের শাস্ত্রেও টেবু-জাতীয় অনেক বিধি-নিষেধ দেখ্‌তে পাই। আবার আমরা এমন অনেক টেবু মেনে চলি যা সংস্কৃত শাস্ত্রের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু "স্ত্রীশাস্ত্র" নামক অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্রের মধ্যে। অনেকে মনে করেন খৃষ্টানদের প্রতিপাল্য যে "দশটি আদেশ" (Ten Commandments) আছে সেগুলোও এই টেবুরই অন্তর্গত। আমাদের দেশে সংস্কার আছে কখনও চৌকাঠে বস্‌তে নেই, নরুণ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাট্‌তে নেই, খেতে বসে হাঁচলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াতে হয়, ঘুমে ঢুলে কারও গায়ে পড়লে যে পড়ে ও যার গায়ে পড়ে, উভয়েরই একটা অজ্ঞেয় অনিষ্ট ঘট্‌বে ইত্যাদি। এ সমস্তই টেবুর অন্তর্গত।

আপাতদৃষ্টিতে টেবুকে যত তুচ্ছ মনে হয়, ওটা তত তুচ্ছ নয়। টেবু একটা সামাজিক বিধান-বিশেষ; সমাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের সঙ্গে টেবুর অতি নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। অনেকস্থলেই সমাজ-বিধি ও ধর্ম্ম-বিধি থেকে টেবুর পার্থক্য কোথায়, খুঁজে পাওয়া শক্ত। অনেক আদিম সমাজে টেবুর প্রাবল্য দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। সেসব সমাজে টেবুর কল্যাণেই শাসন-যন্ত্রটা ঠিক থাকে। সভ্য সমাজে ধর্ম্মবিধি এবং পেনাল কোড্‌ অর্থাৎ দণ্ডবিধির যা কাজ, ওসব সমাজে টেবুর সেই কাজ। টেবুর ভিতরকার কথা এই যে, ওগুলো মেনে চললে তোমার কল্যাণ হবে, না মান্‌লে তোমার অকল্যাণ হবে। কি কল্যাণ হবে, অথবা কি অকল্যাণ হবে, তা ভেবে দেখার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে যে, ওই বিধি-নিষেধগুলোর অশেষ ক্ষমতা। তাই ভয়ে, বিস্ময়ে এবং লোভে সবাই টেবু মেনে চলে। তার সুফল হয় এই যে, অতি নির্ব্বিঘ্নে সমাজ রক্ষা হয়, কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হতে পারে না। আর কুফল হয় এই যে, তার ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হতে পায় না, তার চিত্তবৃত্তি শুকিয়ে মরে এবং মানুষ নাম ব্যর্থ হয়।

কিন্তু তাই বলে' টেবুর মধ্যে যে, কোনও যুক্তিতর্ক নেই, এমন মনে করা ভুল। ভূতের যুক্তি, অপদেবতার যুক্তি, নরকের যুক্তি, শীতলা, ওলা, শনির দৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্র (এবং আধুনিককালে ম্যাগনেটিজম্‌ ইলেক্‌ট্রিসিটি) প্রভৃতি বহু যুক্তিতর্ক টেবুর মধ্যে আছে। তা ছাড়া আছে অভিজ্ঞতার যুক্তি। আদিম মানব যখন নিজের চিৎশক্তির উপর নির্ভর করে নির্ভীকভাবে জগতে বিচরণ করতে সাহস পায় না, যখন বাহ্যপ্রকৃতির রুদ্ররূপ তার অন্তরকে কেবলি অভিভূত করতে থাকে অথচ তার মধ্যে বিস্ময়কে জাগিয়ে তুলতে পারে না, তখনই তার অভিভূত মূঢ় চিত্তের ভীতিকল্পনা ভূত-প্রেত, শনি-শীতলা বা স্পিরিচুয়ালিজমের রূপ ধরে' আবির্ভূত হয়। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে কখনও অভিজ্ঞতার যুক্তি থাকে বলে কোনো কোনো টেবুর কল্যাণমুখী উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাই যখন শুনি রাত্রে সেলাই করতে নেই, তখন তার অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু যখন রাত্রে দোকানে গিয়ে হলুদ কিন্‌তে গেলে দেয় না, অথচ যদি বলি এক পয়সার "রং" দাও অমনি এক পয়সার হলুদ দেয়, তখনও তার কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। রাত্রি-বেলায় তেল বিক্রী হয়, কিন্তু মধু বিক্রী হয় না। রাত্রে কাউকে এক ডাক দিলে উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু তিন ডাকের পর উত্তর মেলে। এগুলোর নামই হচ্ছে টেবু। রাত্রিবেলায় প্রসাধন করতে নেই এবং আয়নায়

মুখ দেখা দোষ; আমরা আজকাল বলি রাত্রে আয়নায় মুখ দেখলে চোখ নষ্ট হয়।

আমাদের জীবনে টেবুর প্রাধান্য কতখানি তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বলতে গেলে একমাত্র টেবুর দ্বারাই আমরা নিয়ন্ত্রিত। একটু পরেই আমরা এসব টেবুর কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব। তা ছাড়া টেবুর প্রকৃতি অতি বিচিত্র, কখন্ কোন্ স্থানে কি উপায়ে যে টেবুর বাধা পাব, তা আজকাল আমরা ভেবেই ঠিক করতে পারিনে। আজ যা টেবু নয়, কালই তা টেবু; এখানে যা টেবু নয় ওখানেই সেটা টেবু; তোমার যা টেবু নয় আমারই তা টেবু। আমাদের জীবনের গতি এমনি করেই পদে পদে বাধা পাচ্ছে। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আজ বেগুন খেতে পারি, কাল পারি না; কারণ আজ দ্বাদশী আর কাল ত্রয়োদশী। কোন্ তিথিতে কি কি খাওয়া যাবে না, টেবু তা বিধিবদ্ধ করে রেখেছে। আজ দক্ষিণ দিকে যেতে পারি, কিন্তু কাল পারব না; কারণ আজ বুধবার ভাল দিন, আর কাল বৃহস্পতি বার দিকশূল হয়;—একথা টেবু বলছে। সকাল বেলা একটা মঙ্গল কার্য্য সুরু করতে পারব, কিন্তু বিকাল বেলা পারব না; কারণ সকালে লগ্ন ভাল, কিন্তু বিকালে লগ্ন ভাল নয়, বারবেলা ত্র্যহস্পর্শ, মঘা, অশ্লেষা, অমাবস্যা পূর্ণিমা কত কি!! সর্ব্বদাই আকাশে চাঁদ দেখছি, কিন্তু আজ পারব না, কারণ আজ নষ্টচন্দ্র। তুমি গ্রহণের চাঁদ দেখছ, কিন্তু আমি দেখতে পারব না, কারণ আমার মীন রাশি। এরকম শত শত টেবুর বিধি-নিষেধে আজ আমাদের জীবনীশক্তি আড়ষ্ট হয়ে এসেছে; আমাদের জীবনের গতি মন্থর এবং কল্যাণের পথ কণ্টকিত হয়ে উঠেছে।

তবে মনে রাখা দরকার যে একমাত্র হিন্দু-সমাজেই যে টেবুর একাধিপত্য তা নয়; যে কোন আদিম সমাজে টেবুর প্রাধান্য অতি বিস্ময়জনক। শুধু তাই নয়, খৃষ্টান ইউরোপ-আমেরিকায়, বৌদ্ধ চীন-জাপানে এবং মোস্‌লেম তুর্কী-মিশরেও টেবুর দেখা পাওয়া যায়। তবে হিন্দু সমাজে টেবুর যে কঠোর মূর্ত্তি ও নির্দ্দয় উৎপীড়ন দেখ্‌তে পাই, তেমন সভ্য জগতের আর কোথাও আছে বলে' মনে হয় না। তাই এই টেবু-জর্জ্জরিত হিন্দুসমাজে আজ এতখানি চিত্তের দুর্ভিক্ষ ও বুদ্ধির মন্বন্তর ঘটেছে; যেখানে শুধু হাঁচি-টিকটিকিতেই মানুষের কল্যাণ ধর্ম্ম পদে পদে ব্যাহত হয়, সেখানে যে উদ্যম, অধ্যবসায়, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও সাধনার স্থানে ভীতি, আশঙ্কা ও ঔদাস্য দেখা দেবে তা আর বিচিত্র কি? টিকটিকিটা মাথায় পড়লে কি লাভ, দক্ষিণ অঙ্গে পড়লে কোন্ লোকে গতি আর বাম অঙ্গ স্পর্শ করলে কি ক্ষতি, রাস্তায় বেরুবার সময়—ডান দিকে সাপ, বাম দিকে শেয়াল অথবা সুমুখে গরু থাক্‌লে কার্য্যসিদ্ধি কিংবা কার্য্য নষ্ট হবে, তাই নির্দ্ধারণ করা যাদের সাধনা, মানুষের উৎসাহ উদ্যম পরিশ্রমের সঙ্গে কার্য্য-সিদ্ধির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সে চিন্তা তাদের মনে কখনো জাগতে পারে না।

আগেই বলেছি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা "টেবু-ক্রেসি"র সমস্ত হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চল্‌তে বাধ্য। নতুবা সমাজে "আইন ও শৃঙ্খলা" থাকে না। আমাদের শাস্ত্রে যে দশ সংস্কারের বিধান রয়েছে তার সঙ্গে টেবু-সংস্কারও কতখানি অনুস্যূত হয়ে আছে তা দেখা দরকার। ওই দশ সংস্কার ও টেবু একেবারে টানা-পড়েনের মত পরস্পর জড়িয়ে রয়েছে। এগুলো যে কেবল আমাদের সমাজেই আছে তা নয়, অন্যান্য সমাজেও প্রায় একই রকম টেবু দেখতে পাওয়া যায়। নারীদের গর্ভাবস্থা থেকেই টেবুর ক্রিয়া সুরু হয়। সকল সমাজেই গর্ভিনী নারীদের ওঠাবসা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সমস্ত বিষয়েই অসংখ্য অর্থহীন বিধি-নিষেধ অর্থাৎ টেবু দেখতে পাওয়া যায়। আমাজোন নারীরা গর্ভাবস্থায় বিকট দাঁতওয়ালা বা দাগওয়ালা কোন জন্তুর মাংস খেতে পায় না; পাছে ভাবী সন্তানের দাঁত কদাকার হয় বা তার গায়ে দাগ হয়। ট্রান্সসিল্‌ভেনিয়াতে গর্ভিনী নারীদের গ্রন্থিযুক্ত কাপড় পরা নিষেধ, যেহেতু ওই গ্রন্থিওয়ালা কাপড় পরলে সুপ্রসব হয় না। ওই একই উদ্দেশ্যে তারা গর্ভিনীর ঘরের দরজা বা বাক্সের সমস্ত তালা খুলে রাখে। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে অন্তঃসত্ত্বা নারীরা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরে না। সাইবেরিয়ায় কোন কোন স্থানের নারীরা হাঁটার সময় পায়ের কাছে যতকিছু ইটপাটকেল পায় স-

সরিয়ে সরিয়ে চলে ; তাতে নাকি সুপ্রসবের সমস্ত বিঘ্ন অপসারিত হয়। মনে রাখা উচিত টেবুর এই সব বিধি-গুলোই অবশ্যপ্রতিপাল্য, নতুবা অকল্যাণ সম্ভাবনা। আবার অনেক স্থানে গর্ভের সমস্ত সময়টাতেই গর্ভিনী অশুচি বলে' গণ্য হয়, তাদের থাকার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে হয়। অনেক স্থলে প্রসবের পরও ঐ অশৌচ থাকে। আমাদের দেশেও প্রসবের পর শুধু প্রসূতি এবং শিশু নয়, আঁতুড়-ঘরটা পর্য্যন্ত অশুচি হয়ে যায়।

তারপর নাম-করণ। আমাদের দেশে শিশুর কল্যাণার্থ এক এক স্থানে এক এক প্রকার টেবু-বিধি আছে। তা ছাড়া এ বিষয়ে টেবুর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে নামের একটা মস্ত প্রভাব আছে ; তাতে কল্যাণও হতে পারে, অকল্যাণও হ'তে পারে। তাই শিশুর অকল্যাণকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে অনেক চাতুরী করা হয়। অনেক স্থানে শিশুর পিতামাতা শিশুর যথার্থ নাম গোপন করে আর এক নামে ডাকে। যেন ভূত-প্রেত প্রভৃতি তার ঠিক নাম জেনে তার কোন অপকার করতে না পারে। বোর্ণিওতে কারও কোনো অসুখের পর তার নাম বদলে ফেলা হয়, যেন অপদেবতা আবার ফিরে এসে তাকে চিন্‌তে না পেরে তার কোনো ক্ষতি না করতে পারে। আমাদের দেশেও ওরকম প্রথা আছে। যমদেবতাকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পিতামাতা ছেলের মূল্য অতি মাত্রায় কমিয়ে দিয়ে দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি এমন কি, "ফেলো" প্রভৃতি নাম রাখেন। অনেক সময় ছেলের নাক-কাণ বিঁধিয়ে তার শরীরে খুঁত করে রাখা হয়, যেন যমরাজ তার খুঁত দেখে তুচ্ছ করে ফেলে যান। আবার এমনও দেখা যায়, যখন বারবারই ছেলে হয়ে মারা যায়— তখন নূতন শিশুর জন্মের পরেই তাকে কারও কাছে এক পয়সায় বিক্রী করে দিয়ে সেই বিক্রীত ছেলেকে নিজের ঘরে লালন-পালন করা হয়, যেন যমরাজ আর পরের ছেলেকে নিয়ে যেতে না পারেন। পোলিনেশিয়ায় কোন কোন স্থানে রাজার নামটাই টেবু, অর্থাৎ ওনাম কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। শুধু নাম নয়, ওই নামের একটি অক্ষরও কেউ মুখে আন্‌তে পারে না ; এমনি করে রাজাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা হয়। আবার মৃত ব্যক্তির নামও টেবু, তাতে করে জীবিত ব্যক্তিরা মৃত্যুর সমস্ত সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে।

নামের টেবু সম্বন্ধে আরও অনেক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শুধু নাম নয়, অনেক সময় ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে কথা কওয়া কিংবা তার সাম্‌নে যাওয়া পর্য্যন্ত টেবু। নাভাজো জাতির মধ্যে কোনো জামাতা সমস্ত জীবনেও শাশুড়ীকে দেখতে পর্য্যন্ত পায় না, কারণ ওটা টেবু। মধ্য-এশিয়ায় কির্‌গিজ জাতির মধ্যে অতি চমৎকার টেবু প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে কিরগিজ-মেয়েরা শ্বশুর কিংবা ভাসুর কিংবা শ্বশুরালয়ের যে-কোনো পূজ্য ব্যক্তির দিকে চাইতেও পারে না, তাদের নামটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে না। নাম উচ্চারণ করা দূরে থাক্‌, শ্বশুর-ভাসুরের নামের অংশ-বিশেষ হলে' কির্‌গিজ-মেয়েরা নিত্যব্যবহার্য্য শব্দগুলো পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে পারে না। একবার একটি নেকড়ে বাঘ কোনো কিরগিজ পরিবারের একটি মেষশাবককে ধরে' নদীর ওপারে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। কিরগিজ-নারী তা দেখতে পেয়েছিল ; কিন্তু স্বামীকে সে কথা খুলে বল্‌তে পারেনি, কারণ নেকড়ে, মেষ, নদী ও বন সব ক'টা কথাই তার শ্বশুর ভাসুর কারো-না-কারো নামের অংশবিশেষ ছিল। তাই স্বামীকে কথাটা তার এভাবে ঘুরিয়ে বল্‌তে হয়েছিল, "দেখ, হালুম করা জীবটা ভ্যা-করা বাচ্চাটাকে চক্‌চকে জিনিষটার ওপারে শন্‌শন্‌-করা জায়গাটার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"* এ বিষয়ে কিরগিজ-সমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের সমাজেও নারীদের শ্বশুর (বিশেষতঃ মামাশ্বশুর) ভাসুর একবারেই টেবু ; কিরগিজ

* She...was forbidden to employ the usual words for lamb, wolf, water and rushes, as they formed part of the names of her relations by marriage. Accordingly, in telling her husband of a wolf carrying off a lamb through the rushes on the other side of the water, she was obliged to use circumlocution and say, "Look yonder, the howling one is carrying the bleating one young through the rustling one's on the other side of the glistening one." Social Origins and Social Continuities by A. M. Tozzer, p. 175.

সমাজের মতো আমাদের সমাজেও শ্বশুর-ভাসুরের নামেরও ওই রকম হাস্যকর পরিণাম প্রায়ই ঘটে থাকে। শ্বশুর কিংবা ভাসুরের দিকে চাইতে নেই, ঘোমটা টেনে রাখতে হয়। তাদের নামের অংশ-বিশেষও উচ্চারণ করতে নেই। তবে শ্বশুর-ভাসুরের সঙ্গে স্বামীর নামটাও আমাদের দেশে টেবু হয়েছে, যদিও চিঠির খামের উপর নামটা লিখতে কোনো দোষ নেই। হয়ত কারও শ্বশুরের নাম দুর্গা-প্রসাদ; তার পক্ষে কিন্তু দুর্গাপূজা কথাটা বলাও টেবু। তাই দুর্গাপূজা অনেক সময় "কুর্গা" পূজা হয়ে দেখা দেয়; শ্বশুর-বংশে পূজ্য ব্যক্তির নাম রয়েছে কালীচরণ, তাই কালজিরে হয়ে যায় "ময়লাজিরে" হরনাথ নাম উচ্চারণ করতে নেই, সঙ্গে সঙ্গে হরতাল কথাটা পর্য্যন্ত বিবাহিতা মেয়ের মুখে "মরতাল" রূপ ধারণ করে। এই টেবুর কৃপায় কত পরিবারে যে চাকরের নামটা পর্য্যন্ত বদলাতে হয়, তার সংখ্যা নেই। এক পরিবারে চাকরের নাম ছিল গোবিন্দ, সে বাড়ীর এক কর্ত্তার ঐ নাম থাকায় মেয়েরা গোবিন্দকে "রাধাচরণ" বলে' ডাকতে থাকে।

তার পর আসে বিয়ের কথা। বিয়ের বহুদিন পূর্ব্ব থেকে শেষ পর্য্যন্ত, শাস্ত্রীয় আচার থেকে সুরু করে' স্ত্রী-আচার অবধি কত যে টেবু বর-কনেকে মেনে চল্‌তে হয়, হিন্দুপাঠককে তার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আজ শুভদৃষ্টি, বর-কনে আজ প্রথম পরস্পরের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করবে। কিন্তু কালই আবার কালরাত্রি, কেউ কারো কেশাগ্রটি পর্য্যন্ত দেখতে পাবে না! দেখলে এমন এক ভয়ানক অকল্যাণ ঘটবে, যা কেউ ভাবতেই পারে না। টেবুর এমনি অপারমহিমা। আর এই বিয়ে থেকে সুরু করে মৃত্যু পর্য্যন্ত হিন্দুদের সমস্ত গার্হস্থ্য জীবনটাই এই টেবুর বিধি-নিষেধে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে আছে; একটু এদিক্-ওদিক্ হলেই সর্ব্বনাশ। উঠতে, বস্‌তে-শুতে-খেতে কি নিয়ম পালন করতে হবে, কি করতে হবে না—টেবু তা পাকা রকম নির্দ্ধারিত করে রেখে দিয়েছে। পূবদিকে মুখ করে খেতে বস্‌লে কি লাভ হবে, দক্ষিণ দিকে মুখ করলে কি ক্ষতি হবে, তা জানা চাই। পূব ও দক্ষিণে মাথা দিয়ে শুলে কি লাভ এবং উত্তর ও পশ্চিমে মাথা দিয়ে শুলে কি ক্ষতি, তাও উপেক্ষা করলে চল্‌বে না। রাস্তায় বেরুতে হলে ডান পা আগে ফেল্‌ব, কি বাম পা আগে ফেল্‌ব, কোন্ নাকের নিঃশ্বাসের সঙ্গে কোন্ পা ফেলার কি সম্পর্ক, নিরীহ হিন্দুসন্তানের তা অবশ্য-জ্ঞাতব্য এবং সেমতে চলা অবশ্যকর্ত্তব্য। তার খাদ্য-দ্রব্যটি পর্য্যন্ত টেবুর কল্যাণে দিনক্ষণ দেখে নির্দ্দিষ্ট করে' দেওয়া হয়েছে। এমন কি, হিন্দু স্বামিস্ত্রীর সম্পর্কটিও টেবুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তিথি নক্ষত্র দিনক্ষণ দেখে টেবু তারও বিধিবিধান শাস্ত্র ও পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে' রেখে দিয়েছে। শুধু তাই নয়; হিন্দুসন্তান মরেও যে টেবুর গোয়েন্দার নজর থেকে নিস্তার পাবে, তার যো নেই। কখন মরলে কি হবে, ঘরে মরলে কি দোষ, বাইরে মরলে কি লোকপ্রাপ্তি ইত্যাদি কোনো খুঁটিনাটিই সূক্ষ্মদর্শী টেবুর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

টেবুর অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। ইচ্ছে করলে আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বোধ করি যা বলা হয়েছে তার থেকেই বোঝা যাবে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন টেবুর দ্বারা কিরূপ আকীর্ণ হয়ে আছে। আমাদের বিশেষতঃ নারীদের, সমস্তটা জীবনই যেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি, অতি তুচ্ছ বিষয় থেকে অতি শ্রেষ্ঠ কার্য্য, সমস্ত বিষয়েই টেবু-জর্জ্জরিত হয়ে আছে। এখন থেকে বাইশ-শো বছর আগেও ভারতীয় হিন্দু-সমাজে এই টেবুর প্রাধান্য কতখানি ছিল এবং এই টেবুর অনুষ্ঠান-কলাপকে এখনকার একজন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষা কি চোখে দেখ্‌তেন, সে বিষয়ে দু'একটা কথা বল্‌লে আশা করি পাঠকগণের আনন্দই হবে। মহামনীষী সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ভারতীয় জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বল্‌ছেন ;—

"অস্তি জনো উচাবচং মঙ্গলং করোতে আবাধেসু বা আবাহ-বিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসাৰ্ম্ভ বা। এতার্ম্হি চ অঞার্ম্হি চ এদিসায়ে জনো উচাবচং মঙ্গলং করোতে। এত তু সহিড়ায়ো বহুকংচ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মঙ্গলং করোতে। * * * অপফলং তু যো এতারসং মঙ্গলং। অয়ং তু মহাফলে মঙ্গলে য ধর্ম্মমঙ্গলে।" (নবম পর্ব্বত-লিপি, গির্ণার)—অর্থাৎ "জনসাধারণ রোগের সময়

বিবাহাদিতে, পুত্রজন্মোৎসবে বা প্রবাসকালে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। এ রকম অন্যান্য উপলক্ষ্যেও নানা অনুষ্ঠান করা হয়। এ বিষয়ে মেয়েরাই কিন্তু বেশী পটু; তারা নানা উপলক্ষ্যে কত যে তুচ্ছ ও নিরর্থক অনুষ্ঠান করে' থাকে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানে ভালো খুব কমই হয়; সত্যিকার যা ধর্ম্মানুষ্ঠান তাতেই কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ হয়।" তাহলেই দেখতে পাচ্ছি শুধু আজকাল নয়, দুহাজার বছর আগেকার হিন্দুরাও (বিশেষতঃ মেয়েরা) ওই টেবু ধর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। রাজর্ষি অশোক তাই সকলকে টেবুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' সত্যধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে আহ্বান করেছিলেন। সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, "ওই ক্ষুদ্র ও নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কল্যাণ নেই, তোমরা তা ছেড়ে দিয়ে যথার্থ যা কল্যাণ-ধর্ম্ম তারই সাধনা কর।"

আজ দু হাজার বছর পরেও কি আমরা আমাদের সেই মহাপুরুষ সেই রাজর্ষির অমৃতবাণীকে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সার্থক করে' তুলব না? আমরা কি আজ মোক টেবুধর্ম্ম থেকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে ওই রাজ-ঋষিকে আমাদেরই বলে' দাবী করার, গৌরব করার, যথার্থ অধিকার লাভ করব না?

আজও আমাদের সমাজে উঠ্‌তে টেবু, বস্‌তে টেবু, চল্‌তে টেবু, টেবুর আর বিরাম নাই। আর সব চাইতে দুঃখ এই যে, আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এখনো টেবুকে নিয়েই গর্ব্ব করে বেড়ান, আর তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করেন। আমাদের বিরাট হিন্দুসমাজ আজ এই অসংখ্য টেবুর শরশয্যায় শুয়ে উত্তরায়ণের অপেক্ষা করছে। অথচ এই আত্মঘাতই আমাদের পরম গর্ব্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে স্বেচ্ছামৃত্যু, তার হাত থেকে আজ আমরা মুক্তি চাই। টেবুর অগণিত শরজাল আমাদের আকাশকে আজও মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওই মেঘকে অপসারিত করে' আমাদের চিত্তপ্রতিভার প্রখরসূর্য্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমাদের টেবুক্লিষ্ট অন্তরাত্মা যে আজ আর্ত্তনাদ করে' কেবলি বল্‌ছে, "অপাবৃণু, অপাবৃণু সত্যধর্ম্মকে মুক্ত কর।"

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

আসামে বৌদ্ধধর্ম্ম

আসামের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর তাঁহার 'আসাম বুরঞ্জী'তে লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে, সেই ধর্ম্মস্রোত আসামেও প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কি?

শ্রী অমিতাভ দত্ত

কয়লা কোথায় আছে জানিবার উপায়

মাটির নিম্নে কোথায়ও খনি, বিশেষতঃ কয়লার খনি থাকিলে তাহা জানিবার উপায় কি? একটি পুষ্করিণী খননকালে উহার তলদেশে কয়লার ন্যায় কঠিন ও চেহারাবিশিষ্ট পদার্থ বাহির হইয়াছে। এক হস্ত পরিমিত ঐরূপ একটি স্তরের নিম্নে পুনঃ পরিষ্কার মৃত্তিকা বাহির হইয়া খননকার্য্য শেষ হইয়াছে। ঐখানে কয়লার খনি থাকা সম্ভব কি না?

রেশমশিল্প

অল্পায়াসে প্রচুর কাঁচা রেশম সূতার বা রেশম গুটির পাইকারী ক্রেতা কিরূপে সংগ্রহ করা যায়। কেহ 'দাদন' দিয়া রেশম সূতা প্রস্তুত করাইয়া লইতেছেন কিনা, তাঁহার বা তাঁহাদের ঠিকানা কি? গভর্ণমেণ্ট হইতে রেশম প্রস্তুত করার জন্য কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যায় কি না?

শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

অপ্রাপ্য বই

গড়্‌ড়-বিষয়ে এবং নবগ্রহ-বিষয়ে কোন পুস্তকাদি প্রকাশ হইয়াছে কি, প্রকাশ হইয়া থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী রাইমোহন বরাট বর্দ্ধণ

স্মৃতি-পদক

জৈনধর্ম্মের বা বৌদ্ধধর্ম্মের উপাস্য দেব, "শীতলনাথ" ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিযুক্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য-পদক কোথায় প্রাপ্তব্য এবং তাহার মূল্য কি, জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী মাধবচন্দ্র মজুমদার

জলছবির কারখানা

কোথাও "জলছবির" কারখানা আছে কিনা এবং থাকিলে কোথায়; না থাকিলে, 'জলছবি' কিরূপে প্রস্তুত করা যায়, যিনি জানেন, জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী

বাংলাদেশের নাম

গৌড়, বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে?

প্রভাতকুমার সেন

দ্বাদশ ভৌমিক

১। বাংলার ইতিহাসে যে দ্বাদশ ভৌমিকের কথা আছে, তাঁহাদের নাম কি কি? এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী কে ছিলেন? মোগলগণ কাহার অধিনায়কত্বে কোন কোন সময় এই দ্বাদশ পরগণা অধিকার করেন?

রাণা ভীমসিংহের পুত্রগণের নাম

২। রাণা ভীমসিংহের বারটি ছেলে ছিল। তাঁহাদের নাম কি? আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিলে কে কোন্ যুদ্ধে মারা যান?

নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন-পুস্তক

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক সম্প্রতি যে আইন পাশ হইয়াছে এবং যাহা বড়লাট বাহাদুরের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, তৎসম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণসহ কোন পুস্তক (বঙ্গভাষায়) কেহ প্রকাশ করিয়াছেন কি না? প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কোথায় ও কত মূল্যে পাওয়া যাইবে?

শ্রী কুমারকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ছুতারের কাজ

ছুতারের কাজ শিখিবার সরল কোনও বাঙ্গলা সচিত্র বই থাকিলে কোথায় পাওয়া যাইবে? সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তকের নাম করিবেন

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লোহার দাগ

লৌহনির্ম্মিত বাক্সে কাপড় রাখিলে অনেকদিন পর কাপড়ে লৌহের দাগ পরে। উহা আর উঠাইবার উপায় নাই। কোনও প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য আছে কিনা যাহাতে দাগ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়।

শ্রী বীরেশলোভন সেন

সিরাপ তৈয়ার করিবার নিয়ম

বাজারে নানা প্রকার গোলাপের সিরাপ, আনারসের সিরাপ প্রভৃতি পাওয়া যায়। উহা নিশ্চয়ই ফল বা ফুল হইতে রস extract করিয়া তৈয়ার করে না। Artificial কি scent দিয়া তৈয়ার করে, তাহা কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীমতী ইলাবতী সেন

বিলাত ফেরতের প্রায়শ্চিত্ত

বিলাত গেলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান কোন্ হিন্দুশাস্ত্রে আছে?

শ্রীমতী মালতীকুসুম দাশগুপ্তা

খাদ্যে বিষ

পানীয় জল সুগন্ধি করিবার জন্য প্রতি গ্লাসে ২।১ ফোঁটা বেঙ্গল কেমিক্যালের "অগুরু" দিলে সেই জল বিষাক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা বা তাহা পানে স্বাস্থ্যের কোন অপকার হয় কি না?

প্রায় সর্ব্বত্র রেলওয়ে ষ্টেশনে ও দোকানে দেখা যায় যে কাগজে খাইবার দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। যে কালীতে কাগজ ছাপান হয় সেই কালীতে কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে কিনা যাহাতে ঐ কাগজের কালী খাবারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া খাবার খারাপ হইতে পারে এবং ঐ খাবার খাইয়া শরীর খারাপ হইতে পারে। যদি ঐ খাবার খাইয়া স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন ও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত কি না?

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাজা 'গৌরগোবিন্দ'

শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা 'গৌরগোবিন্দের' জাতি ও কৌলিক উপাধি কি ছিল?' তাঁহার আদি বাসস্থান কোথায়? কোন্ সময়ে (কোন্ শকাব্দে বা খৃষ্টাব্দে) তিনি শ্রীহট্টের রাজা হন? তাঁহার জীবনচরিত বা বিশেষ বিবরণ কোথায় পাওয়া যাইতে পারে? শ্রীহট্ট জেলার বা অন্য কোনস্থানে তাঁহার কোন বংশধর আছেন কি? থাকিলে কোথায়, ও কি নাম?

শ্রী রোহিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

মেয়েদের ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় পুস্তক

বাঙলা ভাষায় মেয়েদের ব্যায়াম সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ও চিত্রসম্বলিত কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে সে গ্রন্থের নাম কি? প্রণেতা কে? প্রকাশক কে? কোথায় পাওয়া যায় এবং মূল্য কত?

শ্রী ভোলানাথ ঘোষ

বাংলা প্রতিশব্দ

Advertisement ও Notice এর ঠিক বাঙ্গলা অনুবাদ কি?

Examination, experiment, trial ও test এর সঠিক অনুবাদ কি?

শ্রী সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তক

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কাহার লিখিত এবং কি ভাল পুস্তক বাংলা ভাষায় আছে—প্রাপ্তিস্থান এবং মূল্য সম্বন্ধে যদি কেহ জানান তাহা হইলে বড় উপকার হয়।

শ্রী বিভূতিভূষণ সরকার

তুলা-ধুনুনীর কল

তুলা ধুনুনীর কোন কল আছে কি না। থাকিলে তাহা কোথায় পাওয়া যায় ও মূল্য কত?

শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র রায়

সংস্কৃত পত্রিকা

সমগ্র ভারতে বর্ত্তমানে কেবল একখানি সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উহার নাম 'মঞ্জুভাষিণী'। ইহা কাঞ্জিভেরম বা কাঞ্চী হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। ইহা প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত হয়। কিছু কিছু খবর ইহাতে থাকে সত্য, তবে সপ্তাহের সমস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত ইহাতে পাওয়া যায় না।

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

—

মীমাংসা

শ্রীশ্রী শঙ্করদেবের জীবনী

মহাপুরুষ শ্রীশ্রী শঙ্করদেবের জীবনচরিত ইংরাজিতে মাদ্রাজের জী এ-নটেশন কোম্পানি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছোট-হইলেও নির্ভরযোগ্য। মূল্য অল্প, প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

বি, পি, বরুয়া

আসামের মহাপুরুষ শ্রীশ্রী শঙ্করদেবের ইংরাজী জীবন-চরিতের নাম—Kamrupiya Sankar Deb's life, by Banikanta Kakati, M. A. Professor, Cotton College, Gauhati. Published by G. A. Natesan, Madras, Price 4 annas only.

প্রকাশকের নিকট উক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রী রোহিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

'নিকুচি'

'নিকুচি' দেশজ শব্দ। ক্ষুদ্রতা, স্বল্পভাবতা বা সঙ্কীর্ণতাই ইহার অর্থ। কোনও কিছুর সঙ্কীর্ণতা বা অর্থহীনতার প্রমাণার্থেই চলিত ভাষার সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা,—কাজের নিকুচি। 'নিকুচি'র সহিত 'কোরেছে' কথাটির ব্যবহারই বেশী পরিলক্ষিত হয়; যথা,—"দুত্তোর হাসির নিকুচি কোরেচে"—ইত্যাদি। আমাদের মেয়ে-মহলেই এই শব্দটির বেশি প্রচলন।

আমার মনে হয় 'কুঞ্চ' ধাতু হইতেই 'নিকুচি' শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কৃত 'নিকুঞ্চিত' (নি-কুঞ্চ-ক্ত) শব্দেরই ইহা অপভ্রংশ।

শ্রী ভোলানাথ ঘোষ

"নিকুচি"—শেষ। "নিকুচি করা"—শেষ করা অর্থাৎ কিছু করিতে বাকী না রাখা।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কাব্যবিনোদ, বি-এ,

রূপ ও সনাতনের উপাধি

শ্রীশ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীদ্বয়ের উপাধি দবিরখাস্ ও সাকার মল্লিক নহে। "দবির খাস্ ও সাকর্ মল্লিক।" গৌড়ের বাদশাহ উল্লিখিত মহাপুরুষগণের গুণে প্রীত হইয়া জায়গীর-সহ উক্ত উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। শ্রীরূপের উপাধি ছিল দবির খাস্ (দবির—লেখক; মুন্সী); ইনি বাদশাহের খাস্ মুন্সী বা Private Secretary ছিলেন। শ্রীরূপ একজন সুলেখক ছিলেন; তাঁহার হস্তাক্ষরও খুব সুন্দর ছিল। সেইজন্যই তাঁহাকে "দবির খাস্" উপাধি দান করা হইয়াছিল। শ্রীরূপের হস্তাক্ষর যে মনোহর ছিল তাহা চৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায়। যথা—"শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। শ্রীসনাতনের উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক"। ইনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বা পণ্ডিত ছিলেন, (সাকর—জ্ঞানী; মল্লিক—শ্রেষ্ঠ, মর্য্যাদাশীল)। শ্রীসনাতনকে বাদশাহ প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

'ঘর জেউতী' পত্রিকা

'ঘর জেউতি' নামক অসমীয়া সংবাদ-পত্রের ঠিকানা—

কার্য্যাধ্যক্ষ—'ঘর জেউতি'
মেলা চকর,
শিবসাগর, আসাম।

অধ্যক্ষের নাম—শ্রীযুত তারাপ্রসাদ চালিহা, বেরিষ্টার এম্-এল-সি।

আব্দুল মগ্নি

মাধবদেবের জীবনী

গৌহাটী হইতে প্রকাশিত, "বাঁহী" নামক সুবিখ্যাত অসমীয়া মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়ের 'শঙ্কর দেব' আরু মাধবদেব' নামক অসমীয়া ভাষার লিখিত পুস্তকে মাধবদেবের জীবনকথা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বাংলা কিংবা ইংরাজী ভাষায় লিখিত, উক্ত মহাপুরুষের কোনো জীবনী আজও প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীহট্টের 'কমলা' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৩১), আসামপর্য্যটক শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক লিখিত "অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মাধব দেব" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এ ছাড়া বাংলা মাসিক পত্রিকাদিতে মাধব দেবের সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা আমার নজরে পড়ে নাই।

শ্রী নলিনীকুমার ভদ্র

পারলৌকিক রহস্য

পারলৌকিক রহস্য নামে কালীবর বেদান্তবাগীশ পণ্ডিত কৃত একটী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে প্রাপ্তব্য, মূল্য ৸০ আনা।

শ্রী লালমোহন রায়।

"জলটুঙ্গী" ও "কামটুঙ্গী"

বিক্রমপুর রাজা বল্লালের সময় কোন কোন স্থানে "জলটুঙ্গী" ছিল। "জলটুঙ্গী" পুষ্করিণীর উপর উচ্চ কাষ্ঠ থাম দ্বারা নির্ম্মিত গৃহবিশেষ। বিক্রমপুর আমতলী গ্রামের পূর্ব্ব-উত্তর দিকে একটী বৃহৎ সরোবরের উপর রাজা বল্লালের জলটুঙ্গী ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে; এখন তাহা না থাকিলেও জলটুঙ্গীর স্থানটি হইতে টঙ্গিবাড়ী গ্রাম ও হাট সৃষ্টি হইয়াছে বর্ত্তমানে টঙ্গিবাড়ী নামে থানা পোষ্ট আফিসও স্থায়ী হইয়াছে। ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে উক্তরূপ জলটুঙ্গী ও কামটুঙ্গী হইতে টঙ্গি বা টাঙ্গী রেল ষ্টেশনের নাম সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রী রাইমোহন বরাট।

বেতালের বৈঠকে (প্রবাসী পৌষ সংখ্যা ৩৭৭ পৃষ্ঠা) মণিলাল সেনশর্ম্মা লিখিয়াছেন, টুঙ্গী অর্থ ঘর কিন্তু আমরা যতদূর জানি টঙ্গী মানে ঘর। শ্রীহট্ট জিলায় টঙ্গী সাধারণতঃ বৈঠকখানাকে বলে এবং মুসলমান জমিদারদের মধ্যে এই শব্দটী বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ "টঙ্গীঘর"কেও বৈঠকখানা বলেন।

শ্রী বিমলরঞ্জন দে।

মনে হইতেছে যেন প্রবাসীরই প্রশ্নোত্তর বিভাগে কিছুদিন পূর্ব্বে একটা উল্লেখ দেখিয়াছিলাম যে, মহাভারতের যুগে সাতবারের নাম সৃষ্টি হয় নাই, যেহেতু মহাভারতের কোথাও কোন বারের নাম নাই। কিন্তু দেখিতেছি বনপর্ব্বে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদে সত্যভামা দ্রৌপদীকে বলিতেছেন "দ্রৌপদী, তুমি সোমবারাদি ব্রতচর্য্যা উপবাসাদিরূপ তপ......ইহার কোন উপায়ে পাণ্ডবদিগকে বশীভূত রাখিয়াছ?

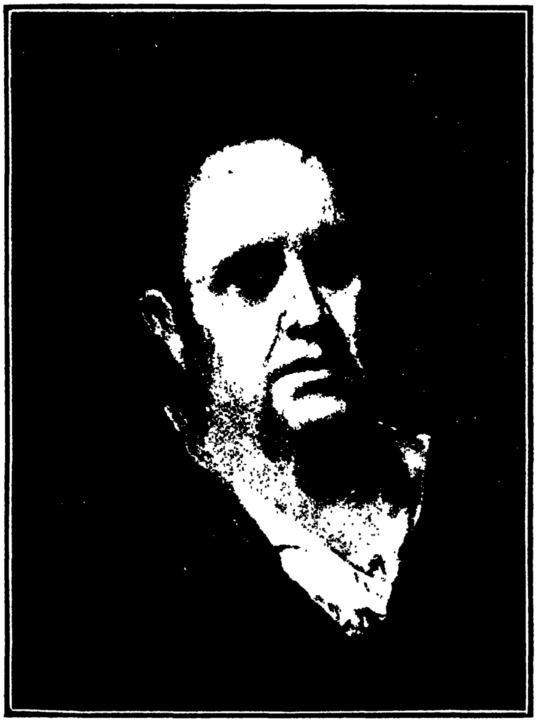
৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, বসুমতী সংস্করণ, ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

শ্রী সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়।



চিত্রশিল্পী গইয়া—

গত ১৬ই এপ্রিল স্পেনের অমর চিত্রশিল্পী গইয়ার মৃত্যুর শতবার্ষিকী পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমস্ত ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় গইয়ার জীবনী ও শিল্পকলার বিশদ আলোচনা হইয়াছিল।



শিল্পী গইয়া—নিজের অঙ্কিত প্রতিরূপ চিত্র

গইয়ার শিল্পপ্রতিভা ছিল প্রধানত বস্তুনিষ্ঠ ; তাঁহার চিত্রকলার মধ্যে যে একটি অভিনব সংবেদনা-বোধ (sensitiveness) তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার মূল উপাদান তিনি তাঁহার নিজ বিচিত্র, উচ্ছৃঙ্খল জীবন হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান শিল্প-সমালোচক বলেন যে, আর কোনো লোকই সমসাময়িক জীবনের নানাদিকবার জিনিষকে নিজ শিল্প-কলায় এমন রূপ দিতে সমর্থ হন নাই।' পরবর্ত্তী যুগের শিল্পীদের উপরও গইয়ার অশান্ত প্রতিভার যথেষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। মিলানের 'লিলাষ্ট্রীজিয়ন ইতালিয়ানা' নামক পত্রিকা এই প্রভাব নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছে—"তাঁহার সূতীক্ষ্ণ সহজবোধের বলে তিনি চিত্রকলায়



রাজা চতুর্থ চার্লসের পরিবার

আলোক ও গতির নূতন সমস্যাকে আপনা হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; তাই, নূতন যুগের পূর্ব্বক্ষণে তিনিই যুগ-প্রবর্ত্তক স্বরূপ দাঁড়াইলেন। ডেলাক্রোয়া, দোমিয়ে, মেনেট্, হুইস্‌লার ও সার্জ্জেন্ট তাহার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হন। আধুনিক কালের



মাড্রিডের হত্যাকাণ্ড

স্ফুট-রীতি অনুসারী প্রতীতিবাদী (ইম্‌প্রেশনিষ্ট) শিল্পীগণ যে কথা বলিতে চাহেন তিনি তাহাই বলিয়াছিলেন, 'প্রকৃতির মধ্যে রেখা কোথায়? আমি ত দেখি না। আমি শুধু আলোক-পরিস্ফুট বা ছায়াবৃত বস্তুই দেখিতে পাই, আমি শুধু অগ্রগামী বা বিলয়মান ক্ষেত্রই (প্লেন্) দেখিতে পাই।'

গইয়ার জীবনে চিত্রকলার অপেক্ষাও প্রমোদ-বিলাসের আকর্ষণ প্রবলতর ছিল। তাঁহার সমস্ত শিল্পকলা তাঁহার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জন্মিয়াছে এই চিত্রকলায় তাঁহার নিজ জীবনের প্রত্যেক অংশটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে গইয়ার জন্ম হয়। বাল্যাবধি তিনি চিত্রাঙ্কণে অভিনিবেশ দেন, এবং বাল্যেই অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল যৌবন স্পেনদেশীয় মহিষ-যুদ্ধে বা অসংযত আমোদ-প্রমোদেই বেশী অতিবাহিত হইত। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ছিল দুর্দ্দান্ত ও শক্তিধর্ম্মী; তাই রাজশিল্পী হইয়া তিনি উগ্রতেজে, ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে, শক্তিতে ও প্রতিভায় রাজসভার মহিলাদের বিমুগ্ধ ও সভাসদদের উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই সময়কার চিত্রিত প্রতিরূপে কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা দুইই দেখা যায়। গইয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্র 'চতুর্থ চার্লসের রাজপরিবার' এই সময়েই অঙ্কিত। চিত্রের মধ্যস্থিতা রাণীর প্রতিলিপিটি বিশেষ রূপে দ্রষ্টব্য—এই দীর্ঘ স্থূল দেহে শিল্পী কঠিন বিরক্তির সহিত চতুরতা ও অশোভন অসংযমের এক অদ্ভুত সমাবেশ সাধন করিয়া স্পেনের রাণীকে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহার পরে গইয়ার দুর্ভাগ্যের দিন সমাগত হইল। নেপোলিয়নের স্পেন্ বিজয়ের পূর্ব্বেই তিনি শ্রুতিশক্তি হারাইয়া লোক-সমাজ হইতে দূরে একাকী কালযাপন করিতে বাধ্য হন। তখন পূর্ব্বেকার কঠিন ব্যঙ্গ উন্মত্ত, অধীর বিকৃত ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইগুলি যেন শিল্পীর প্রলাপোক্তি। তাঁহার অনেক প্রসিদ্ধ এচিং কিন্তু এই সময়েই উৎকীর্ণ। এই সময়ের একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র নেপোলিয়নের আক্রমণকালীন মুরাটের অনুষ্ঠিত মাড্‌রিড নগরীর বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

সপ্তম ফার্ডিনেণ্ডের সিংহাসন-প্রাপ্তির সঙ্গে অশীতিপর বধির শিল্পীকে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইতে হইল। নির্বাসনেই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বরিডায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

—

মহাকবি গ্যয়টের চিত্রকলা—

মাসখানেক পূর্ব্বে একখানি বাঙলা মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত একটি চিত্র বাহির হইলে সকলেই বিস্মিত হন। সাহিত্যিকদের মধ্যে চিত্রশিল্পী বড় বেশী জন্মান নাই। ইংলণ্ডে আমরা ব্লেক, রসেটিকে পাই; ফ্রান্সে হুগোর চিত্রকলা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মতে উহা তাঁহার উপন্যাসের চেয়েও বেশী আনন্দকর। এবার জার্ম্মেনী হইতে মহাকবি গ্যয়টের অঙ্কিত একখণ্ড চিত্রপুস্তক-প্রাপ্তির খবর পাওয়া গিয়াছে। গ্যয়টে এই চিত্র-পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন, 'ভ্রমণ-পুস্তিকা'। ইহার চিত্রগুলি মহাকবি ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আটান্ন বৎসর বয়সে ওইমার হইতে জেনার পথে ভ্রমণকালে আঁকিয়াছিলেন।—নদী পারের পপ্‌লার গাছ—পাহাড়ের উপরের



গ্যয়টের একখানি চিত্র

একটি ক্ষুদ্র দুর্গ, এমনি সামান্য দৃশ্য অবলম্বন করিয়া কবি চিত্র আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহারই মধ্যে কাব্যরস যেন রেখায় ও রঙে রূপ



গ্যয়টের আর একখানি চিত্র

পাইয়াছে। 'ডি বক্' নামক জার্ম্মাণ পত্র এই পুস্তক আবিষ্কার উপলক্ষে লিখিয়াছে—"এই পুস্তিকাখানিকে আমরা যথার্থই গ্যয়টের দৃশ্যচিত্রে রূপায়িত কাব্যখণ্ড বলিতে পারি।"

—

উরের সমাধি-প্রথায় নরমেধ—

পেনিসিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন মিউজিয়ম একযোগে প্রাচীন চাল্ডি জাতির প্রধান নগর উরের ধ্বংসস্থল খনন করিয়া এক রাজ-সমাধি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমাধিতে সুমার সম্রাট মেস্-কলম-ডুগ ও তাঁহার মহিষী শুব-আদ্ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমাহিত হইয়াছিলেন। এই রাজ-দম্পতির পরলোকে সেবার জন্য তাহাদের উনষাটটি সহচর-সহচরী, দাস-দাসী ও ছয়টি ষাঁড় ও দুইটি গাধাকে, জীবন্ত সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। পার্শ্বের চিত্রে এক আধুনিক চিত্রকর উরের সেই প্রণষ্ট দৃশ্যটি চিত্রকলায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে উরের এই আবিষ্কার মিশরের কোনো আবিষ্কার অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে। ইউফ্রেতিস নদীর কূলে ইহাই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম নিদর্শন।



উরের সমাধি দৃশ্য—আধুনিক শিল্পী কর্ত্তৃক পুনঃকল্পিত

সাহিত্যের আভিজাত্য

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়

সাহিত্যের 'আভিজাত্য' বলিয়া কোনো গুণ বা ধর্ম্ম আছে কি না, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই ডিমোক্রেসী'র যুগে ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র যখন জনগণের জয় জয়কার তখন সাহিত্যে আভিজাত্যের কথা উচ্চারণ করিতেও ভয় হয়। সাহিত্যের আভিজাত্য বলিতে কি যে বুঝায়, তাহা জানিবারও প্রয়োজন হয় নাই—ডিমোক্রেসী-বিরোধী কথাটাই নিন্দা ও সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, 'সাহিত্য-রচনার উপদান কি রাজা-জমিদার আমীর-ওমরাহের ঐশ্বর্য্যলীলা, প্রমোদকক্ষের বিলাস-মেলা অথবা সমাজের আভিজাত্য গরিমা, বংশের কৌলীন্য-মহিমা? এই উপাদান-বস্তু লইয়াই কি সাহিত্যের আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা? যদি তাহাই হইয়া থাকে, মাটির ধূলায় লুটাইয়া দাও সাহিত্যের সেই মিথ্যা আভিজাত্য গর্ব্বকে, সাহিত্যের গণতন্ত্র সেই আভিজাত্যের উপর ধ্বংসের মন্ত্র উচ্চারণ করুক।'

তবে তাহাই হউক্, সাহিত্যের আভিজাত্য বলিতে যদি আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকি, তবে সেই অভিজাত্যের এই চরম দুর্গতিলাভই একমাত্র গতি হউক। দুঃখ-বেদনায় যাহারা পীড়িত, দারিদ্রক্লিষ্ট, অত্যাচারে পিষ্ট যাহারা, ঘৃণিত হীনতা ও দীনতায় যাহারা অবলিপ্ত, তাহারা যদি আমার সাহিত্যের পূজা-বেদীতে আসন না পাইল, আমার সাহিত্য সকলের প্রাণে যদি তাহাদের জন্য সহানুভূতি না জানাইল, সকলের সঙ্গে সত্যকার সাহিত্যবোধ যদি না জন্মাইতে পারিল, তবে সে সাহিত্য তাহার আভিজাত্য গর্ব্ব লইয়া আপন অহঙ্কারে আপনি মাতিয়া থাকুক, এবং সেই মদমত্ত আভিজাত্যের উপর সমলোচকের নিন্দোক্তি অজস্র বর্ষিত হইতে থাকুক—কেহ আপত্তি করিবে না।

সুখের বিষয়, সাহিত্যের 'আভিজাত্য' বলিতে সাহিত্যের যে স্বভাব-ধর্ম্মের প্রতি আমি ইঙ্গিত করিতেছি, সেই আভিজাত্যের অর্থ তাহা নয়। সাধারণতঃ আমরা যখন অনেকগুলি লোকের মধ্য হইতে একটি লোককে লক্ষ্য করিয়া বলি, 'ইনি অতি ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মজীবন ইনি জ্ঞাপন করেন'—তখন আমরা তাঁহাকে যে আভিজাত্য দান করি, সে আভিজাত্যের নিকষ হইতেছে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহার ধর্ম্মজীবন। সেই নিকষে এই লেখা পড়িয়াছে, তাঁহার দৈনন্দিন জীবন দ্বেষ হিংসা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র হীন প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে—লোভ-লালসার স্থান তাঁহার মধ্যে নাই। বুঝিতে পারি ধর্ম্মের যাহা স্বরূপ, তাহার মধ্যে নীচতা আবিলতা কুটিল পঙ্কিলতা কিছুই নাই, এবং নাই বলিয়াই ধর্ম্মজীবন যাহার, তাহাকে আমরা সাধারণ জীবনের উর্দ্ধে একটা আভিজাত্যের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। সেইজন্য ধর্ম্মের স্বরূপই তার আভিজাত্য, এই কথাটা স্বীকার করিতে আমাদের কোনই দ্বিধাবোধ থাকে না। ধর্ম্মের মধ্যে যখন নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির লীলা, লোভ ও মোহ স্থান পায়, ধর্ম্মের আভিজাত্য তখন নষ্ট হয়। মহাস্ত পুরুষ বুদ্ধের যে পরম বাণী অর্দ্ধ পৃথিবী জুড়িয়া একদিন প্রেম ও শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই ধর্ম্মের স্বভাবাভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহার কুৎসিত আচার-ব্যবহারের মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়া এবং মানুষের নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝি সেইজন্যই বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না, আর তিব্বতে আজ যে ধর্ম্ম বাঁচিয়া আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের কলঙ্ক! বাঙলা দেশে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব প্রেম-ধর্ম্মও যেদিন লালসায় পঙ্কিল হইয়া উঠিল, সেইদিন সেই প্রেম-ধর্ম্মের আভিজাত্যও ক্ষুণ্ণ হইল; সেইজন্যই বাঙলায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে 'নেড়ানেড়ি'র ধর্ম্ম বলিয়া আজও লোকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। তেমনি বৈদিক মাতৃপূজা-ধর্ম্মের মধ্যে যেদিন হইতে শবর, আভীর, বিন্ধ্যাটবীবাসীদের করালী দেবীর করাল নিষ্ঠুর আচার-ধর্ম্ম প্রবেশলাভ করিল, সেইদিন হইতে বৈদিক দেবীপূজা-

ধর্ম্মের আভিজাত্যও নষ্ট হইল। ইতিহাস এই সত্যকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

ধর্ম্মে যেমন, শিল্প-সাহিত্যেও তেমনি। লোভে লাঞ্ছিত, মোহে মলিন হইলেই তাহার আভিজাত্য নষ্ট হয়। মহাকবি ভাস, কালিদাস ও ভবভূতির কথা উল্লেখ করিতেছি। সাহিত্যের ধর্ম্ম কি, স্বরূপ কি ইঁহারা তিন-জনই সে কথা জানিতেন; কাজেই ইঁহাদের ভাব ও কল্পনার মধ্যে যে-সব চরিত্র সৃষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহারা জীবনে যাহা স্থূল ও অসুন্দর তাহাকে কখনও স্বীকার করে নাই। ইঁহাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্যে, দাম্পত্য-মিলনের মধ্যে, লোভের লাঞ্ছনা, মোহের ক্ষুধা ও যৌনাকর্ষণের তীব্রতা সমস্তই ছিল, কিন্তু সাহিত্যরস-সৃষ্টিতে এসব তথ্য কখনও ঐকান্তিক হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভাসের নিজের নয়, কিন্তু তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র, ভাব ও আদর্শ লইয়া, তাহারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পরবর্ত্তীকালে রচিত "মৃচ্ছকটিক" নাটকের চারুদত্ত ও বসন্তসেনার কথাবার্ত্তার মধ্যে, ব্যবহারের মধ্যে কত বড় একটা সংযম; চিত্তের সমস্ত সংগ্রামের ভিতরও কল্পনা ও আদর্শ কত উঁচু সুরে বাঁধা—মানুষের রক্তমাংসের সমস্ত 'রিয়্যাল' কামনা সে সুরের অনুভূতিকে বুঝিতেও পারে না। কালিদাসের 'শকুন্তলায়', 'কুমারসম্ভবে'ও তাই। যতদিন শকুন্তলা শুধু দেহের কামনায় এবং মনের উন্মাদনায় দুষ্মন্তের প্রতি লুব্ধ, ততদিন প্রেম তাঁহার সার্থক হইল না—দুষ্মন্তের রাজসভায় তাঁহার প্রত্যাখ্যাত প্রেম যেদিন তপস্তার অনলে শুদ্ধ হইল, প্রেম-ধর্ম্ম তাহার স্বীয় আভিজাত্য ফিরিয়া পাইল, সেইদিন শকুন্তলা সার্থক সত্য হইলেন। গিরিকন্যা উমা মদনের সাহায্য লইয়াছিলেন বলিয়া মহেশ্বরের প্রেম লাভ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তপস্বিনী উমার তপশ্চর্য্যার আভিজাত্য মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিল। কালিদাসের সাহিত্য-ধর্ম্মের সত্য জীবন-ধর্ম্মের সত্যকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছিল বলিয়াই, সে সাহিত্য আভিজাত্য লাভ করিয়াছে—তিনি রাজকবি ছিলেন বলিয়া নয়, কিংবা তিনি রাজৈশ্বর্য্য-সমৃদ্ধ নায়ক লইয়া নাটক রচনা করিয়া-ছিলেন বলিয়াও নয়। এই আভিজাত্যে রাজকবি কালিদাসকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন দরিদ্র, সম্পদ-সৌভাগ্য-বঞ্চিত ভবভূতি। তাঁর উত্তররামচরিতের রাম বাল্মীকির রাম অপেক্ষাও সুন্দর ও মহান্। "উত্তররামচরিতে" মানব-জীবনের এবং এই প্রকৃতি জগতের যে সুন্দর ভাব ও আদর্শ-চিত্র তিনি সাহিত্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহার কাছে সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় মাথা লুটাইয়া পড়ে। এক অখণ্ড প্রেমে এই দীন কবি পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—সেই প্রেমেরই বা কি বিচিত্র অনুভূতি! রাম ও সীতার পুনর্মিলনের মধ্যে ভবভূতি যে প্রেম-রহস্যের সন্ধান পাঠককে দিয়াছেন, কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলনের মধ্যেও তাহা নাই। জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাটো অনুভূতি ভবভূতির অমর তুলিকায় অপূর্ব্ব রস ও সৌন্দর্য্য-সম্পাতে ভরিয়া উঠিয়াছে। অথচ সেইসব প্রত্যেকটি সত্য সার্থক অনুভূতিই মুরারী ও রাজসভাকবি রাজশেখরের হাতে পড়িয়া কি নিদারুণ অপকর্ষতাই লাভ করিয়াছে। মুরারীর "অনর্ঘরাঘব" এবং রাজশেখরের "বালরামায়ণ ও "বালভারত" পড়িলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, জীবনের পক্ষে তাহা সত্য নয়, একথা কিছুতেই বলিতে পারি না, কিন্তু সাহিত্য-রসের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জগতে তাহা সার্থক সত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভাব ও ভাষার সংযমে, কল্পনা ও অনুভূতির ঐশ্বর্য্যে ভাস, কালিদাস এবং দরিদ্র ভবভূতির সাহিত্য অভিজাত-সাহিত্য এবং মুরারী রাজশেখরের সাহিত্য রাজকবির সাহিত্য হইয়াও অপকৃষ্ট সাহিত্য, অভিজাত-সাহিত্য নয়। কারণ সাহিত্যের আভিজাত্য তো রক্ত-সম্বন্ধের আভিজাত্য নয়; যিনি লিখিয়াছেন এবং যাহাদের লইয়া লেখা হইয়াছে, সাহিত্যের আভিজাত্য তাহাদের লইয়াও নয়। সাহিত্যের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষতা লইয়া।

আমাদের ভারতবর্ষের শিল্প ইতিহাস হইতে আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে বক্তব্য বিষয়টি হয় তো আরও পরিষ্কার হইতে পারে। যাঁহারা নবম শতাব্দী

হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারকের খবর নিশ্চয়ই জানেন। পণ্ডিতেরা বলেন, এই সময়কার অসংখ্য মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে যে-সকল প্রস্তর মূর্ত্তি রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের আভাস অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। নরনারীর যৌনমিলনের ও কামবিলাসের চিত্র তাহার মধ্যে প্রচুর। ভুবনেশ্বরে "মুক্তেশ্বর" বা "রাজা-রাণী" মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রের মূর্ত্তিগুলি যখন দেখি, কোনারকের সূর্য্যমন্দিরের মূর্ত্তিগুলির দিকে যখন তাকাই, তখন তাহাদের শিল্প-সুষমা ও সৌন্দর্য্য-মহিমাই চোখের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে—তাহাদের কামবিলাস, দেহবুভুক্ষার লীলা অত্যুগ্র হইয়া দেখা দেয় না। বুঝিতে পারি, ভুবনেশ্বর ও কোনারক শিল্পের আভিজাত্যকে বজায় রাখিয়াছে। পুরীর মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রেও সেই একই জিনিষ রূপায়িত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে, অথচ সেগুলি যখন দেখি, তখন আমাদের সমস্ত শিল্পসংস্কার, রূপ ও সৌন্দর্য্যের সংস্কার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আহত হয়; কারণ সেখানে সেই ইন্দ্রিয়-লালসাই একান্ত হইয়া দেখা দিয়াছে—তাহার উপর রস ও সৌন্দর্য্যের আলোক-সম্পাত হয় নাই। বুঝিতে পারি, পুরীতে শিল্পের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—শিল্পের স্বভাবধর্ম্ম সেইখানে বজায় নাই। অথচ পুরীর মন্দির রাজৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ও সম্মানিত; তবুও তাহা রস এবং সৌন্দর্য্যের জগতে আভিজাত্য লাভ করিতে পারিল না। শিল্প-রসিকের কাছে তাহার কোনো মূল্য নাই। আর ভুবনেশ্বর কোনারকের মন্দির দেবতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও বিজন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়াও রস এবং সৌন্দর্য্যের পরমাভিজাত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে এবং যুগে যুগে শিল্প-রসিকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা। সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্য অসীম, কিন্তু সে রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি লাভ করে একটা সীমার মধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া, সেজন্য সে নিজের চারিদিকে একটা সীমারেখা টানিয়া দেয়। যাহা লইয়া রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি লাভ করে, তাহা অনেক কিছু লইয়াই বিশ্লেষণ করে একথা সত্য, কিন্তু ফুল ফুটাইবার সময় কেউ মাটির নীচেকার গোবর ও পচা জঞ্জালের 'সার'গুলি তুলিয়া ধরিয়া দেখায় না, দেখায় তার ফুল ও ফল। কারণ সেই গোবর ও পচা জঞ্জাল মাটীর এবং গাছের পক্ষে একান্তই 'রিয়্যাল' হইলেও পরিণত ফল ও বিকশিত ফুলের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতার সীমার বাহিরে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—কাব্যের ছন্দ। ছন্দ একটা বন্ধন, একটা সীমা। এই সীমাবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বাঁধিয়া তবেই কবি তাঁহার ভাবসৌন্দর্য্যকে রূপদান করিয়া থাকেন। ভগবানের রহস্যও তাহাই। ভগবান পরমপুরুষ, তিনি অসীম, তাঁহার সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, অনুভূতির সীমা নাই, আনন্দলোকের সীমা নাই; কিন্তু মানুষ যখন এই অসীমকে পাইতে চায়, তখন সে সেই অসীম ভগবানকেই একটা সীমার মধ্যে বাঁধে। সেই ভগবান তখন প্রত্যেকের Personal God, কুলদেবতা, ইষ্টদেবতা, গৃহদেবতা, প্রত্যেকের জীবনদেবতা হইয়া প্রত্যেকের কাছে তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য ও অনুভূতিকে বিকশিত করিয়া তোলেন। সীমার মধ্যে বন্ধনকে মানিয়াই তাঁহার অসীমত্ব উপলব্ধি হয়। সূর্য্যের আলোও তেমনি—তাহার কোনো বিশিষ্ট রূপ নাই, রঙ্ নাই; কিন্তু তাহা যখন গাছের পাতার সীমার মধ্যে ধরা দেয়, তখন তাহা হয় সবুজ, যখন ফুলের পাপ্ড়ির সীমার মধ্যে ধরা দেয়, তখন তাহা হয় লাল গোলাপী, আরও কত কি? সূর্য্যের আলোর সীমাহীন রূপ, রস ও সৌন্দর্য্য এমনি করিয়াই সীমার মধ্যে বিকশিত হয়। সাহিত্যও এই সীমাকে স্বীকার করে এবং করে বলিয়াই তাহার রস ও সৌন্দর্য্য বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। সৃষ্টি করিবার সময় শিল্পী সব জিনিষকেই কখনও নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে না—সে বাছে, বাদ দেয় এবং বিচার করে, এবং এতখানি বন্ধন সে স্বীকার করে বলিয়াই তাহার সত্য সনাতন, ধর্ম্ম হইতেছে তার আভিজাত্য। সাহিত্যের কল্পলোকে ইন্দ্র আছেন, রুদ্র আছেন, বরুণও আছেন। আবার নৃত্যপরা মেনকা উর্ব্বশীও আছেন—রসের বিপুল উচ্ছ্বাসে, আঁখির বিলোল কটাক্ষে নৃত্যের তালও বারবার কাটিয়া যায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়-লাঞ্ছনা দ্বারা চিত্ত যখনই কাহারও লাঞ্ছিত হয়, তখনই সে

কল্পলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়, রস ও সৌন্দর্য্য সেখানে ক্ষুব্ধ ও আহত হয়। কারণ সাহিত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই বাণী বীণাপাণি যে পদ্মবনে বিহার করেন তাহা শুভ্র; কামনার রজোগুণে তাহা রাঙা নয়। কবিতা যেমন ছন্দের বন্ধনকে মানিয়া কাব্যের সীমার মধ্যে স্থান লাভ করে, সাহিত্যও তেমনি নানান বন্ধনকে মানিয়া, নানান কিছু বাদ দিয়া অনেক কিছুকে শুদ্ধ ও শুচি করিয়া তবে সে রস ও সৌন্দর্য্যের জগতে আসন পায়। ঐ বাছবিচারের মধ্যে, সীমারেখার মধ্যে সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্যের স্থান বলিয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম চিরকাল আভিজাত্যের ধর্ম্ম।

আর 'সাহিত্য মানুষের জীবন লইয়া' এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবনের যে সারল্য ও সৌন্দর্য্য, শান্তি ও পবিত্রতা, তাহাও কি একটা সীমার মধ্যেই বিকশিত হইয়া উঠে না? ইহা তো চিত্তের বা মনের কোনো সঙ্কীর্ণতার কথা নয়, একথা স্বীকার করিতে তো কোনো লজ্জা নাই যে, যেজন সমস্ত দীনতা ও মলিনতা, কুশ্রীতা ও অসংযমের ভিতর হইতে আপনাকে মুক্ত রাখে, তাহার জীবন একটা সহজ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে; সেই জীবনই তো ভগবানের চরণ-পদ্মে প্রসাদীফুলের মতো উৎসর্গ করা চলিতে পারে। জীবন যাহার সেই শান্ত-শ্রী দ্বারা মণ্ডিত, সেই জীবনই তো অভিজাত-জীবন, সেই জীবনই তো কুলীন জীবন। বংশের কৌলিন্য, রক্তের বা ধনের বা মানের আভিজাত্য জীবনকে আভিজাত্য দান করে না—জীবনের সমৃদ্ধই সে আভিজাত্য দান করে।

এইজন্যই অভিজাত-সাহিত্য কখনো বড়লোকের সাহিত্য নয়। আবার বড়লোক লইয়া লেখা, সমাজের উচ্চস্তর লইয়া লেখা হইলেই তাহা অভিজাত-সাহিত্যের আসন হইতে বিচ্যুত হইবে, এ কথা বুঝিলে চলিবে না। আসল কথা সাহিত্যের আভিজাত্য ধন বা দারিদ্র্যের মধ্যে নাই, উচ্চ ও নীচের মধ্যে নাই, কিংবা ছেঁড়াচটাবৃত, পঙ্কিল দুর্গন্ধময় কুলীবস্তীতেও নাই। সাহিত্যের আভিজাত্য কল্পনার দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য-বিচারের মধ্যে, ভাবের উচ্চনীচ বিচারের মধ্যে, রস ও সৌন্দর্য্যের সার্থক অনুভূতির মধ্যে। রসবোধের জগৎ সাহিত্যের জগৎ। এই রসবোধ যেখানে ক্ষুণ্ণ হইল, মানুষের জীবন-ধর্ম্মের লাঞ্ছনা দ্বারা যেখানে লাঞ্ছিত হইল, সেইখানে সাহিত্যের আভিজাত্যও ক্ষুণ্ণ হইল।

অথচ বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের ছোট-বড় লেখক, অনেকেই অভিজাত-সাহিত্যের অর্থ করিয়াছেন, বড় লোকের সাহিত্য, বড়লোক লইয়া লেখা সাহিত্য; এবং তাহার মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে, আমাদের যাঁহারা সাহিত্যগুরু, যথা, কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কেহই অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ লইয়া, তাহাদের সহজ ও সুখবোধ্যভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পান নাই এবং সেই কারণে তাঁহাদের সাহিত্য অভিজাত-সাহিত্য হইয়া রহিয়াছে; তাহার সঙ্গে জন-সাধারণের কোনো যোগ নাই। এই দুঃখবোধ সত্য হইলেও সাহিত্যের উৎকর্ষের দিক হইতে তাহা কোনো নিন্দার কথা নয়। কিন্তু যে-সাহিত্য বড়লোক লইয়া লেখা সাহিত্য, যে-সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ নাই, তাহাই অভিজাত-সাহিত্য, এ কথা মনে করা ভুল; তাহাকে হয় তো অন্য কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যাইতে পারে। 'অভিজাত' কথাটা সাহিত্যের বিশেষণ, আভিজাত্য সাহিত্যের ধর্ম্ম; সাহিত্যের দোষগুণ দ্বারা আভিজাত্য বিচার্য্য এবং সে বিচারফলের উপর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত। লেখকের অথবা লেখ-বিষয়ের নায়ক-নায়িকার অথবা পাঠক-পাঠিকার ধন, মান, বংশের আভিজাত্য লইয়া নয়।

আসলে, শ্রেষ্ঠ শিল্প বা সাহিত্যে ডিমোক্রেসী বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। জনসাধারণ কখনো প্রতিভাবান শিল্পী বা সাহিত্যিকের সুবিচারক হইতে পারে না, কিংবা সূক্ষ্ম রসাস্বাদনের স্বতঃস্ফূর্ত্তবৃত্তি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। শিল্পী কিংবা কবির সৃষ্টি জনসাধারণের বোধশক্তির কিংবা গ্রহণশক্তির পরিমাপকে গ্রাহ্য করিয়া চলে না, সে চলে আপন ভাব ও ভঙ্গী পন্থা অনুসরণ করিয়া। পাঠক বা দর্শক যদি তাঁহার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে না পারেন এবং সেইজন্য নিন্দায় শতমুখও হইয়া উঠেন, তাহাতে শিল্পী কিংবা কবির কিছু যায় আসে না। তিনিই

শিল্পগুরু, কাব্যগুরু, যিনি পাঠকের বোধশক্তি বা গ্রহণ শক্তির সমান ক্ষেত্রে নামিয়া আসেন না বরং দিনের পর দিন জনসাধারণকে আপন প্রতিভাদ্বারা আকর্ষণ করেন এবং ক্রমে তাহাদিগকে বোধ ও অনুভব-শক্তির সেই সমুন্নত শিখরে উন্নীত করেন।

অভিজাত-সাহিত্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট অর্থবোধ আমাদের নাই বলিয়াই যত তর্ক ও বিরোধ আজ দেখা দিতেছে। কথাটা বুঝাইবার জন্য দু'একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ম্যাক্সিম গোর্কির Lower Depths রুষিয়ার সমাজের নীচুস্তরের লোক লইয়া লেখা; তাহাদের কদর্য্য জীবন, লালসা কামনা বুভুক্ষা লইয়া সমস্ত গল্প-ভাগটির সৃষ্টি. কিন্তু তাহা সত্ত্বেও Lower Depths খুব উঁচুদরের অভিজাত-সাহিত্য, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। 'Lower Depths' জীবনের সত্য, 'রিয়্যাল' অনুভূতিকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সার্থক নিপুণতায় অভিষিক্ত করিয়াছে—ভাবের ঐশ্বর্য্যে তাহা সমৃদ্ধ এবং কল্পনার গঙ্গাবারি-সিঞ্চনে তাহা সঞ্জীবিত। সেইজন্যই Lower Depths অভিজাত সাহিত্য। "মৈমনসিংহ গীতিকা" বাঙলার এক প্রান্ত জেলার নিঃস্ব দরিদ্র জনসাধারণের অত্যন্ত সরল জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর কতকগুলি কাহিনী, অথচ তাহা সত্ত্বেও "মৈমনসিংহ গীতিকাকে" কিছুতেই অভিজাত-সাহিত্য হইতে বাদ দেওয়া চলিতে পারে না। জীবনের অনুভূতি সেই পল্লী-কবিদের কাছে শুধু 'রিয়্যাল' নয়, সার্থক সত্য এবং তাহারা যে 'বাঙাল' দেশের 'বাঙাল' ভাষায়, সাহিত্যের কলাকৌশলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সেই সার্থক সত্যানুভূতিকে রূপ দান করিয়াছে, তাহাতে সে-সাহিত্যের আভিজাত্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিরহিণী মদিনা যে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও "পরাণ থাকিতে খসমের" চিন্তা ছাড়িতে চায় না, সে যে দিনের পর দিন "গামছা বান্ধা দই" আর "তালের পিঠা" তৈরী করিয়া শিকায় তুলিয়া রাখে, "শাইল ধানের চিড়া আর বিন্নি ধানের খই হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে—এই বিশ্বাসে যে, "কতদিন পরে খসম নিশ্চয় আসিব", কিন্তু দিনের পর দিন যায়, 'হায়রে পরাণের খসম ফিরা নাহি চায়।" মদিনার প্রাণের এই যে বিরহের সুতীব্র অনুভূতি, এই যে ক্রন্দন, ইহা তো "মেঘদূতের" নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহানুভূতির অপেক্ষা কম নয়। মদিনার প্রেমের একনিষ্ঠা, তাহার অনাবিল আবেগ, হৃদয়ের গভীর অনুভূতিই সাহিত্যের আভিজাত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহার অপমানাহত প্রেম যদি ইন্দ্রিয়-তাড়নায় চঞ্চল হইয়া তাহার চরিতার্থতা কামনা করিত, তবে মদিনাকে ক্ষমা করিবার যুক্তি হয় তো বুদ্ধির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইত না, কিন্তু সাহিত্য-ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহার আভিজাত্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইত। জীবনের বিচিত্র সত্য ও সার্থক অনুভূতি এবং রসের অভিব্যক্তিই মৈমনসিংহের কাব্যকথাকে আভিজাত্য দান করিয়াছে। বড়লোকের জীবন-কথা লইয়া রচিত নয় বলিয়া তাহা অপকৃষ্ট সাহিত্য, এ কথা বাতুলেও বলিবে না।

জীবন ও প্রকৃতির যাহা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের গোচর ও অগোচর সব-কিছুই সাহিত্যের উপাদান-বস্তু হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের আসরে আসন পাইতে হইলে রস ও সৌন্দর্য্যের মণিকোঠায় আসিয়া তাহার পৌঁছান চাই। বীভৎসতা জীবনের, কিন্তু সাহিত্যের যাহা, তাহা হইতেছে বীভৎস রস। সেইজন্যেই আলঙ্কারিকেরা কাব্যের নবরসের মধ্যে বীভৎস রসকেও স্থান দিয়াছেন—বীভৎসতাকে নয়। জীবনের বীভৎসতা মানুষকে পঙ্কিল ও কুৎসিত করে, কিন্তু সাহিত্যের বীভৎস রস পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং পাপীর প্রতি সমবেদনা জাগায়। জীবনের রিয়্যালিটির সঙ্গে সাহিত্যের রসের তফাৎ ঐখানে।

অভিজাত-সাহিত্যের স্বভাবধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে এই কথাটা জানা দরকার যে, সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্যের রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছে জীবনের দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সমস্ত চেতনা ও অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া। রিয়্যা-লিজম'এর ধর্ম্ম সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়, তাহা জীবনের ধর্ম্ম। জীবনের মধ্যে যাহা অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের যাহা গোচর, রক্তমাংসের মধ্যে যাহার প্রকাশ, তাহা 'রিয়্যাল,' তাহা প্রত্যেকেরই এক, কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত, যাহা দৃশ্যরূপের অতীত, যাহা মর্ম্মগত এবং কল্পনা ও হৃদয়ের মধ্যে যাহার প্রকাশ তাহা ট্রুথ্ (সত্যম্), তাহা রসিক সুজনের, তাহা অভিজাত। জীবনের মধ্যে যাহার

স্থিতি, চোখের দেখার মধ্যে যাহার রূপ, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মত যাহার রস, দেহের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিলয় তো একদিন হইবেই। কিন্তু যাহা অরূপ রূপাতীত, তাহা যে অমর; যাহা অতীন্দ্রিয় তাহা যে চিরন্তনী। যে রূপ চোখে দেখি, সে-রূপ তো দেখা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই মরণলাভ করে, কিন্তু দেখার বাহিরে মনের মধ্যে যে-রূপের সৃষ্টি হয়, তাহার তো মৃত্যু নাই। সেই অমৃতরূপই সাহিত্যের রূপ। এই অমৃতরূপই সাহিত্যকে আভিজাত্য দান করে। রূপকথার যে রূপ, জীবনে তাহার কোনো স্থান নাই। 'কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল' আর এক নিমেষে 'ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়িয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার'—এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে, দেখিয়াছে, অথচ সাহিত্যের এ রূপকে অস্বীকার করে কে? এই রূপ কল্পনার রূপ, শিশুচিত্তের ঐশ্বর্য্যের রূপ। এইজন্যে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ঠাকুরমার রূপকথাও যে অভিজাত-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠরূপ বলিয়া গণনা করিতেই হইবে।

সাহিত্যের জগৎ ইন্দ্রিয়-কামনার রূপ-প্রতিবিম্বের জগৎ নয়, কদর্য্য বীভৎস চরিত্র-চিত্রের তালিকাও নয়। মালী যেমন ফুল-বাগানের আগাছা ও জঞ্জাল বাছিয়া বাছিয়া দূর করিয়া দেয়, সাহিত্যও তেমনি বাছে, বাদ দেয় ও বিচার করে। সেইজন্যই শ্রেষ্ঠ শিল্পী যিনি, তিনি সব জিনিষকে দেখান না, সব কথাকে প্রকাশ করেন না। জীবনের মধ্যে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের প্রতি তাঁহার সচেতন সহানুভূতি এবং মানব-জীবনের যে-আদর্শ নিন্দায় ব্যথিত হয় না, প্রশংসায় বিচলিত হয় না, অর্থ সম্পদের পায়ের তলায় যাহা বিক্রীত হয় না, সেই আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা—এই সমস্তই তাঁহার সাহিত্যকে অমরত্ব দান করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যৌনমিলনের যে সম্বন্ধ, তাহার খবর তো আদিম মানব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকলেই জানে—তাহার মধ্যে রহস্যের নূতনত্ব আর কি আছে? সাহিত্য-স্রষ্টা যিনি, আর্টিষ্ট যিনি, তাঁহার ভুলিয়া গেলে চলিবে না, মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়া মানুষের প্রেমকে কখনো যৌনমনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কোঠায় ফেলিয়া বিচার করা চলিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ শিল্পী যিনি, তিনি কখনো ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার বিবরণ পাঠকের কাছে ঘোরালো করিয়া তোলেন না, তাহার চরম পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করেন। নরনারীর মনুষ্যত্বের সাধনা ও সংগ্রাম জীবনের প্রতিদিনের সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের যে-দোলায় নিরন্তর আন্দোলিত হয়, শিল্পীর কাছে শুধু তাহারই অনুভূতি মূল্যবান্—পশুপ্রবৃত্তির নির্লজ্জ লীলার বিবৃতি নয়। গোতমীর আশ্রমে শকুন্তলার পুত্রলাভের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে যে কুৎসিত ইঙ্গিত পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে, সেই ইঙ্গিতের কোনো আভাস কালিদাস কোথাও দেখাইয়াছেন কি? অথচ কালিদাস সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অজ্ঞ ছিলেন না। বাণভট্ট, বিচিত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহার 'পত্রলেখা'র প্রেমোন্মুখ হৃদয়কে দিনের পর দিন শুধু তাহার শেষ পরিণতির দিকেই লইয়া গিয়াছেন। তাহার তৃষিত যৌবন কি একদিনের জন্যও প্রিয়ের সঙ্গ কামনা করে নাই? কিন্তু বাণভট্ট সে কামনার আভাস কোথাও মাথা তুলিতে দেন নাই। 'কাব্যে উপেক্ষিতা' বলিয়া পত্রলেখার জন্য আমরা হৃদয়ে যতই ব্যথা অনুভব করি না কেন, কবির পক্ষে ইহাই ছিল একমাত্র পথ। দেহের রক্তমাংসের কামনা নয়, একমাত্র সেই কামনাই সাহিত্যের রাজ্যে সত্য ও সার্থক, যে-কামনার জন্য মানুষ মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং কোনো দুঃখবোধকেই গ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য করে না। হোমার ও বাল্মীকি, শেক্সপিয়র ও কালিদাস, গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথ মানুষের রক্তমাংসের খবর কিছু কম রাখিতেন না, কিন্তু সাহিত্যের রাজ্য হইতে এই কদর্য্য জঞ্জালকে বরাবর তাঁহারা দূরেই রাখিয়াছেন, আর আজ সেই পরিত্যক্ত জঞ্জাল কুড়াইয়া আমাদের দেশের নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস হইতেছে।

এই জিনিষটি আজ পশ্চিমেও দেখা দিয়াছে এবং অনেক প্রসিদ্ধনামা সাহিত্যিকই ইহাকে ভীতির চক্ষে দেখিতেছেন। আমেরিকার "Century" পত্রিকায় (Dec. 1927) সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা J. A. R. Wylie এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। তাঁহার লেখা একটু উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতে চাই। তিনি বলিতেছেন,—

'It seems to me there is the odour of death about the first story of the youngest story-teller. . . And it is not only in the writing. It is in the writers. Many of them, by their almost ferocious endeavour to appear new and different suggest a conscious staleness. The more they assert themselves as people engaged in a difficult and specialized task, the more they endeavour to individualize themselves in the public imagination by eccentricities or sheer bad manners, the more one suspects that if there is anything new under the Sun, they at any rate have not found it. * * * To keep themselves nimble and supple they perform giddy and bewildering gymnastics. Some of them leave out their verbs. Some invert their sentences so that a perfect commonplace bears a seductive suggestion of lurking originality. Some assume an engaging air of rustic simplicity. They try, in fact, not only to appear different but to feel different—to suggest to themselves that they at least are grappling sincerely with real life. To their yearning spirits Freud appeared like a rescuing angel !! * *

'Man is a spirit. That is one of the disturbing facts which modern fiction has got to take into account or perish.'

এই "মহতী বিনষ্টি" হইতে বাঙলা সাহিত্যকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়-লালসার পঙ্কলিপ্ত কালিমায় বাঙলা সাহিত্যের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা অপেক্ষা দুর্গতি আর কি হইতে পারে ?

ধর্ম্মের মতো, শিল্পের মতো, সাহিত্যেরও স্বভাবধর্ম্ম তাহার আভিজাত্য। সেই আভিজাত্য লেখকের বা লেখ-বিষয়ের নায়ক-নায়িকার বা পাঠক-পাঠিকার বংশের কৌলন্যে নয়, ধনের আভিজাত্যে নয়, মানের গৌরবে নয়। সে আভিজাত্য জীবনের প্রত্যেকটি রহস্যের সত্য অনুভূতিতে—বাস্তব অভিজ্ঞতায় নয় ; রস ও সৌন্দর্য্যের সার্থক বিকাশে, ভাষার সংযমে এবং ভাব ও কল্পনার সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যে। এই আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইলে সাহিত্যের ধর্ম্ম অবমানিত হয়।

সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্য প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম মানিয়া চলে এবং সূর্য্যের আলোর মতো, কাব্যের ছন্দের মতো একটা সীমার মধ্যে বন্ধনকে মানিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। বাদ দিতে, বাছিতে না জানিলে, নির্ব্বিচারে সকল জিনিষ গলাধঃকরণ করিলে অজীর্ণতার উদ্গারে বাণীর অগুরু-গন্ধ পূত মন্দিরও কলুষিত হইয়া উঠে।

সাহিত্য মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, কারণ সাহিত্য বাস্তবতাকে লইয়া নয়—সার্থক সত্যকে লইয়া। জীবনের ক্ষেত্রে যাহা বাস্তব, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাই সত্য হইবে, এমন নিয়ম নাই। সাহিত্যের রাজ্য জীবনকে অতিক্রম করিয়া আছে—জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সাহিত্য-সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে না। সেইজন্যেই নরনারীর প্রেমের মধ্যে বাস্তব যে যৌনমিলন ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কাহিনী, তাহার বিবৃতি ও অভিজ্ঞতা সাহিত্যের মধ্যে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না—যেখানে তাহা করে, সেখানে সাহিত্যের স্বধর্ম্ম অবমানিত হয়।

বাঙলা সাহিত্যে বর্ত্তমানে জীবনের একদিকের বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে এবং মনে হয়, এই উৎকট বাস্তবতার মধ্যে যে নগ্ন নির্লজ্জ বীভৎসতা ও অসংযত বিলাস আছে, তাহার আওতায় পড়িয়া বাঙলা সাহিত্যের স্বভাবাভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। এই উৎকট বাস্তবতা-প্রীতিকে দেশে-বিদেশে অতীতে ও বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা কখনো আদর করেন নাই এবং কি সাহিত্যে, কি সমাজে, ইহার ফল কোথাও কল্যাণকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। যেদিন সাহিত্যের এই স্বভাবধর্ম্মের স্রোত বন্ধ হয়, সেদিন জাতির দুর্দ্দিন। বাঙলাদেশ ও জাতির সেই দুর্দ্দিন কোনোদিনই না আসুক ! *

---

* রঙপুর সারস্বত সম্মিলনী'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

লালা লাজপৎ রায়

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

সি, এফ্, এণ্ড্রুজ্

১

লালা লাজপৎ রায়ের কথা ভাবিলেই যে কথাটি সর্ব্বাগ্রে আমার মনে আসে তাহা এই—তিনি পাঞ্জাবী-চরিত্রের আদর্শ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন। পাঞ্জাবী চরিত্র আমার সুপরিচিত, কারণ ভারতবর্ষে পাঞ্জাবই আমার প্রথম বাসভূমি, পাঞ্জাবকেই আমি প্রথম ভালোবাসি। এই পাঞ্জাবের পল্লী-অঞ্চলে যেদিন আমি পাঞ্জাবী কৃষাণদের সংস্পর্শে আসিলাম, সেদিনই সত্যকার ভারতবর্ষ জীবন্ত রূপ ধরিয়া আমার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল—আমি সেইসকল পল্লীবাসীর অমূল্য চরিত্রবল দেখিতে পাইলাম। আমি দশ বৎসর পাঞ্জাবে ছিলাম, সেই প্রদেশের প্রত্যেকটি স্থান—সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত, আমার পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপরেও আমি প্রায়ই পাঞ্জাবে গিয়াছি। 'মার্শাল ল'-এর অব্যবহিত পরে আমি যে কয় মাস পাঞ্জাবে কাটাই, তখন সেখানে 'মার্শাল ল'-এর সময়ে অনুষ্ঠিত অন্যায় ও অত্যাচার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—আমার ভারতবাসকালে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহার মধ্যে ওই মাস-কয়টিই গভীরতম ও নিবিড়তম বেদনার। তাহার চার বৎসর পরে অকালী আন্দোলনকালে আমি যখন শিখ-সম্প্রদায়ের অনুরোধে আর একবার পাঞ্জাবে যাই, তখনও আবার সেই নিদারুণ অত্যাচারের পুনরভিনয় দেখি; কিন্তু এইবার অকালীদের বীরত্বময় ত্যাগ ও সহনশীলতার একটি পরমাশ্চর্য্য দীপ্তিও সেই সঙ্গে দেখিয়াছিলাম।

এই-সব অভিজ্ঞতায় পাঞ্জাবকে আমি ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। পাঞ্জাবের মধ্যে একটি জিনিষ আছে; তাই যখনই আমি পাঞ্জাবীদের সংস্পর্শে আবার ফিরিয়া যাই, তখনই তাহা আমার হৃদয় স্পর্শ করে, আমাকে পরম আনন্দ দান করে।

লালা লাজপৎ রায়ের মধ্যে পাঞ্জাবের এই-সকল গুণ যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ, তাঁহার চরিত্রে পাই এক আন্তরিকতা ও স্পষ্টবাদিতা। যাঁহারা সত্য-সত্যই পাঞ্জাবের মুখপাত্র, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রে এই গুণ দুইটি দেখিয়াছি। তাঁহাদের সকলের ব্যবহারেই একটি সরলতা আছে। তাহা অনেকাংশে স্থূল বলিয়া ঠেকিতে পারে; কিন্তু যেসব বীর ও স্বাধীন জাতি তাহাদের স্বাধীনতার স্মৃতি একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই, তাহাদের পক্ষে এইরূপ সরলতা স্বাভাবিক। একবার মাত্র আমি পাঞ্জাবের এই স্বাধীন-প্রকৃতিকে অবনত হইতে দেখিয়াছি। ১৯১৯এর 'মার্শাল ল'র পরে আমি যে মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা আমি ভুলিতে চাই। কিন্তু লাজপৎ রায়ের মাথা তখনও অবনত হইতে পারিত, এই কল্পনা আজও কেহই করিতে পারেন না। অসহযোগ আন্দোলন যখন পূর্ণ শক্তিতে চলিয়াছে, তখন আমি আবার তাঁহাকে দেখিতে পাই। তাঁহার শরীর তখন পীড়ায় কাতর, কিন্তু তাঁহার প্রাণ তখন দীর্ঘ কারাবাসের আদেশ পাইয়া স্বচ্ছন্দ ও উৎফুল্ল। সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত যেন তিনিই ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'সানন্দ সৈনিক' (হ্যাপি ওয়ারিয়র)। ইহার পরেও কোনোদিন আমি তাঁহাকে অন্য কোনোমূর্ত্তিতে কল্পনা করিতে পারি নাই। তাঁহার চরিত্রে এই স্বচ্ছ আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীকতা আসিয়া মিশিয়াছিল। তাঁহার 'পাঞ্জাব কেশরী' নাম অর্থহীন নয়। এই নাম তাঁহারই উপযোগী। সময়ে সময়ে তাঁহার চরিত্রে যে একগুঁয়েমি দেখা যাইত, তাহা তাঁহার অকপট স্পষ্টবাদিতারই অনুরূপ। কিন্তু, কাহারো নিকট হার না মানিয়া নিজের মত ও লক্ষ্যে অবিচলিত থাকিবার পক্ষে এই একগুঁয়েমি তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্রের সকল দিকই সুবিকশিত হইয়াছিল। একগুঁয়েমি যদি তাহার মধ্যে কতকটা দোষ হয়, তবে মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার অফুরন্ত কৌতুক-বোধ সেই দোষ

অনেকাংশে লঘু ক'রিয়া দিত। লালাজী কোনো সময়ই কৌতুক-বোধ হারাইতেন না। যখনই কেহ তাঁহাকে কোনো ব্যাপারের কৌতুককর দিক্‌টি দেখাইয়া দিত, তখন তিনি যেরূপ মুক্তপ্রাণে প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া নিজের আচরণ লইয়া কৌতুকানুভব করিতেন, তাহা দেখিতেও প্রাণে আনন্দ হইত, এবং শিখিতেও আনন্দ হয়। তাঁহার রসিকতার কখনো অভাব হইত না। নিদারুণ দৈহিক দুর্ব্বলতায় যখন তাঁহার দেহ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, তিক্ততা ও বিরক্তিবোধই যখন তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, তখনো দেখিয়াছি কোনো রঙ্গ-রসিকতায় হয়ত তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন—মনে হইল দেহের সমস্ত ক্লান্তি ঘুচিয়া গিয়া বুঝি নূতন সুস্থ-সবলতা আবার তাঁহার দেহে জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল তাঁহার উদারতা। অসীম বলিলে যাহা বুঝা যায়, এ বর্ণে বর্ণে তাহাই। তাঁহার হৃদয় এতটা প্রশস্ত ছিল যে, যেন দিতে না পারিলেই তিনি আহত হইতেন। দেশে এমন কোনো বৃহৎ কাজ ছিল না যাহার সাহায্য তিনি করেন নাই। দেশের ও দশের কাজে তিনি নিজের সম্পত্তি ও নিজের আয়ের সমস্ত অংশ দান করিয়াছিলেন। এই অকাতর দানই তাঁহার দীর্ঘ জীবনে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দিয়াছিল।

লালাজীর এই অফুরন্ত উদারতার আর একটি মহৎ বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজের ক্ষতি অতি অল্প সময়েই ভুলিয়া যাইতেন। অন্যায়কারীর উপর পারিলে তিনি এক মুহূর্ত্তও ক্রোধ পুষিয়া রাখিতেন না। ভিন্নদেশী সরকার তাঁহার উদার হৃদয়ের মহিমা না বুঝিয়া তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়া, কারাবাসে দণ্ডিত করিয়া, নির্ব্বাসন দিয়া নানারূপ নির্যাতনে উত্যক্ত করিয়াছে; কিন্তু তথাপি তিনি কোনো সময়েই বিন্দুমাত্র জাতিবিদ্বেষ মনে মনেও পোষণ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় এত বড় ছিল যে, কোনো ক্ষুদ্র বিদ্বেষই তাহাতে স্থান পাইত না—মুক্তি পাইলেই তিনি আবার প্রারব্ধকর্ম্মে ফিরিয়া যাইতেন,—যেন কিছুই ঘটে নাই। আমি বার বার এই জিনিষটি লক্ষ্য করিয়াছি, বার বার বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি যে, এত দুঃখ ও অত্যাচার সহিয়াও তিনি কি করিয়া অন্তরের স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।



লালা লাজপৎ রায়

তাঁহার ইংরেজ ও মার্কিণ বন্ধুদের প্রতি তাঁহার অন্তরের টান ছিল। তাঁহাদেরও তাঁহার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। এইরূপ কোনো কোনো বন্ধুর সহিত আমার লণ্ডনে দেখা হইয়াছে, কাহারো কাহারো সহিত নিউ ইয়র্কে দেখা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাকে হারাইয়া ইঁহারা নিদারুণ অভাব বোধ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছেন, যাঁহার প্রতি তাঁহাদের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল, তিনি আর নাই। সত্য সত্যই লালা লাজপৎ রায়ের লোকান্তরে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের লোক নিদারুণ মর্ম্মবেদনা পাইয়াছে।

২

লালাজীর লক্ষ্যের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই। রাষ্ট্রনীতি অনেক সময়েই বড় ক্লেদাক্ত জিনিষ। ইহাতে যোগদান করিলে খুব কম লোকই হস্ত কলঙ্কিত না করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারেন।

বাধ্য হইয়া লালা লাজপৎ রায়কে দেশের জন্য লেজিস্‌লেটিভ য়্যাসিম্ব্লিতে সদস্যরূপে যোগদান করিতে ও

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির নানাবিধ ঝগড়া ও ঝকমারির মধ্যে যাইতে হইত। গত কয়েক বৎসর তিনি আমার নিকট যেসব চিঠি লিখিতেছিলেন তাহাতে এই সকল ঝঞ্ঝাটে যে তিনি কিরূপ ক্লেশ পাইতেছিলেন, তাহা দেখা যায়। এই-সব কাজ তাঁহার পক্ষে মর্ম্মন্তুদ পীড়াদায়ক ছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন যে, তিনি শীঘ্রই রাষ্ট্রনীতি হইতে অবসর লইবেন; কারণ, ইহাতে তাঁহার মন বড় বেশী অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। তথাপি, তিনি আমরণ ইহা ছাড়েন নাই, এবং অপর সকলে অবসর লইলেও তিনি দেশের সেবাতেই শেষ অবধি নিযুক্ত ছিলেন।

গত কয়েক বৎসর দিল্লী বা সিমলা গেলে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইত। আমি অনেক সময়ে তাঁহার গৃহে বসিয়া যখন 'আফিম্' বা 'প্রবাসী ভারতবাসী' বা দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্বন্ধে বই লিখিতাম, তখন হয়ত তিনি তাঁহার সেক্রেটারীকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিজের রাষ্ট্রীয় পরিষদের বক্তৃতা, কিংবা তাঁহার লাহোরের পত্রিকা 'দি পিপ্‌ল'-এর জন্য প্রবন্ধ, কিংবা শেষের দিকে, 'মাদার ইণ্ডিয়া'র উত্তরস্বরূপ 'আন্‌হ্যাপি ইণ্ডিয়া' ('অভাগিনী ভারত') নামক তাঁহার গ্রন্থের পরিচ্ছেদ মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন। 'আন্‌হ্যাপি ইণ্ডিয়া' নামটি বড়ই শোচনীয় বলিয়া আমার নিকট বোধ হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে নামটি বদলাইতে বলিয়াছিলাম, কারণ, এ নাম যেন আর্ত্তনাদের মত শোনায়। তিনি আমার আপত্তির অর্থ বুঝিয়াছিলেন, ওনাম বদলাইতে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম তিনি বোধ হয় অন্য নাম স্থির করিবেন; কিন্তু যখন বই বাহির হইল তখন পুরাতন নামটিই রহিয়া গেল—যদিও ওই নামের জন্য তাঁহার বা আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না।

'আন্‌হ্যাপি ইণ্ডিয়া' বইখানি সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাই। যখন আমি তাঁহার নিকটে ছিলাম তখন তিনি ঐ বইখানি ঠিক সময়ে শেষ করিবার জন্য ভয়ানক পরিশ্রম করিতেন। তিনি অনেক সময়ে বহু পৃষ্ঠা 'গ্যালি-প্রুফ' ফেলিয়' দিয়া আমাকে শুদ্ধ করিতে বলিতেন। আমি এইসব প্রুফ্ শুদ্ধ করিয়া ছাপার জন্য তৈয়ারী করিয়া দিতাম প্রেসের কম্পোজিটর ও 'প্রিণ্টার্স ডেভল্'-এর কথা ভাবিলে আমার সত্যই দয়া হয়—একই কাগজে আমাদের দুইজনার দুই হাতের শুদ্ধ প্রুফ্ উদ্ধার করিতে এবং শেষ মুহূর্ত্তে শেষ প্রুফ্ প্রেসে পাঠানোর সময় লাজপৎ রায় অনেক সময় আগাগোড়া যে সব পরিবর্ত্তন করিতেন তাহা ঠিক মত মিলাইতে ইহাদের প্রাণান্তকর কষ্ট হইত। সত্যই, এইরূপ বহু কাজের ভিড়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রুফ্ দেখা গুরুতর কথা। লালাজীর চরিত্রে যে রঙ্গ-কৌতুক-বোধ দেখিয়াছি, লালাজীর গৃহের তখনকার চিত্রের কথা মনে পড়িলে আমার তেমনিতর সরস রঙ্গে হাসি পায়। দিল্লীতে তাঁহার গৃহের মেঝেতে কাগজ ছড়াছড়ি যাইতেছে, দুই এক মিনিট্ পরে-পরেই টেলিফোর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছে, তাঁহার সেক্রেটারী নোট টুকিয়া লইতেছেন, লালাজী নিজে 'আন্‌হ্যাপি ইণ্ডিয়া'র শেষ প্রুফ্ হাতে লইয়া বসিয়াছেন,—কখনো ইংরেজের কোনো একটি কথা জানিতে চাহিতেছেন, কখনো বা কোনো অঙ্কপত্রের (ষ্টাটিষ্টিক্‌সের) কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সব ব্যাপার যেন 'য়্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' ধরণের চলিয়াছে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবই চুকিয়া যাইতেছে—ঠিক সময়ে লালাজী লেজিস্‌লেটিভ্ য়্যাসেম্‌ব্লিতে যাইবার জন্য কোনোরূপে উঠিয়া পড়িতেছেন,—ঠিক সময়ে এ্যাসেম্বলীতে অস্পৃশ্যদের শিক্ষার জন্য বা ভারতীয় নারীদের শিক্ষার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন। ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য ও ভারতবর্ষের নারীদের উন্নতি তাঁহার অন্তরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য উপায় নির্দ্দেশ করিবার ভার পাইলে আমি বলিতাম, অস্পৃশ্যদের মুক্তি বা ভারত-নারীর উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো-একটি মহৎ পন্থা যেন অবলম্বিত হয়।

আর একটি জিনিষের কথাও উল্লেখ না করিলে চলে না—ইহাই তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করিত; তাহার কারণ, ইহার সহিত তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিবারের ভাগ্য জড়িত ছিল। এ জিনিষ—তাঁহার নিজ প্রদেশ পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে বন্যার বিস্তার। একদিনের কথা মনে আমার পড়িতেছে—সোলোনে দারুণ

গ্রীষ্মে, ধূলায় ও রৌদ্রে তিনি আমার সঙ্গে পাহাড়ী উঁচু-নীচু পথে চলিয়াছেন—কখনো হাঁপাইতেছেন, থামিতেছেন, একটু নিঃশ্বাস লইতেছেন,—ঘামে তাঁহার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া উঠিয়াছে ;—উদ্দেশ্য, একটি সভায় উপস্থিত হওয়া। সেই সভায় আলোচনার বিষয় ছিল সোলোনের অন্যদিকে যক্ষ্মা রোগীদের বাসোপযোগী একখণ্ড জমি পাওয়া যায় কি না তাহার আলোচনা। এই কাজ না হইলে লালাজী এত কঠোর শারীরিক কষ্ট সহিয়া এই দীর্ঘ পথ যাইতে পারিতেন না। আমি স্বীকার করি যে, সে সভায় যাইবার জন্য আমার নিজের ততটা ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না ; লালাজীর আন্তরিক উৎসাহই আমাকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু যখন দেখিলাম সেই সভা স্থির করিল যে, এই গুরুতর প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কার্য্যতঃ কিছু করা দরকার, তখন আমি লালাজীর নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব করিলাম। সেই কাজ কত দূর অগ্রসর হইয়াছে জানি না ; কিন্তু লালাজীর নামের সহিত যুক্ত করিয়া যদি কিছু গড়া সম্ভব হয়, তবে তাহাতেই লালাজীর স্মৃতিরক্ষার উৎকৃষ্ট আয়োজন হইবে।

পরিশেষে তাঁহার প্রতি আমার ব্যক্তিগত নিবিড় প্রীতি ও তাঁহারও আমার প্রতি গভীর স্নেহের কথা নিবেদন করিতে চাই। শেষ অবধি, সত্যসত্যই আমরা পরস্পরের কাছে ভাইএর মত ছিলাম। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে বসিয়া আজ যখন বন্ধু-স্মৃতি লিখিতেছি তখনও দর্শনমাত্রেই তিনি যেরূপ প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গনে, সানন্দ হাস্যে উচ্চ কণ্ঠে আমায় 'হ্যালো, চার্লি' (এই যে, চার্লি) বলিয়া অভিনন্দিত করিতেন, তাহা আমার মনে পড়িতেছে, আর সেই স্মৃতিতে আমার প্রাণ কিরূপ বিচলিত হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহার চিঠিতে আমি সেই স্নেহ, সেই প্রীতি, সেই ঐকান্তিকতা, সেই সত্যনিষ্ঠা দেখিতে পাইতাম। শেষ চিঠিতে তাঁহার 'আন্হ্যাপি ইণ্ডিয়া'র ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রকাশের কথা ছিল। আমি এখন সর্ব্বদাই ভাবিতেছি কি করিয়া এই বইখানির ভারতীয় সংস্করণটিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার উপযোগী স্থায়ী রূপ দেওয়া যায়। বইখানিকে একটু সংক্ষিপ্ত করা দরকার হইতে পারে। 'মাদার ইণ্ডিয়া' ইয়ুরোপ ও আমেরিকা, এই দুই মহাদেশেই যে দারুণ বিষ ছড়াইয়াছে, 'আন্হ্যাপি ইণ্ডিয়ার' সারাংশও তাহার বিরুদ্ধে অতিশয় কার্য্যকর হইবে।

মানুষ-বাঘ

(জনৈক রাজকর্ম্মচারীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে)

রামচন্দ্র রাও, ওরফে সরীমন্ত (শ্রীমন্ত ?) আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি সগর থেকে ধামোরী গিয়ে সেখানে আমায় না পেয়ে, আমার পেছনে ধাওয়া করে আজ এখানে এসে ধরেছেন।

পেশোয়াদের আমলে এঁর অবস্থা ভালই ছিল। দেওরীর পরগণা হাতে থাকাতে খরচ-খরচা বাদে প্রায় লাখখানেক টাকা মুনফা থাকত। এ-অঞ্চল কোম্পানীর দখলে আসার পর এঁকে একটা জায়গীর দেওয়া হয়েছে, তার আয় বাৎসরিক ২০,০০০৲ টাকা।

দেশী সম্ভ্রান্ত লোকেদের জাঁকজমকের প্রবৃত্তির দরুণ নানা রকম বাজে খরচ আছে, সেই কারণে হাতী-ঘোড়া, লোকলস্কর রাখতে আয়ের অধিকাংশই উড়ে যায়। তার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পর পেশোয়ারা বিদায় হবার পর তাদের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার আদালত কাছারী ইত্যাদি অন্য জায়গায় যায়। সুতরাং এখানকার জমিজমা ও ফসলের দাম ও শতকরা ৩০% কমে গেছে। বন্ধু সরীমন্তের আয়ও এই রকমে কমে গিয়েছে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সগর জেলা আমার হাতে থাকার সময়

আমি ইহার দুর্দ্দশার কথা গভর্ণমেণ্টকে জানাই এবং আমার চেষ্টার ফলে এই বিষয়ে সুবিচার হয় ও তাহাতে সরীমন্তের আয় অনেক বাড়ে।

লোকটি ছোট্‌্টখাট্টু, বড়জোর পাঁচ ফুট লম্বা, কিন্তু অতি সুদর্শন এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় অতি সম্ভ্রান্ত লোকের মত ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা। সকালের খাওয়ার পর সরীমন্তর সঙ্গে গল্প চলেছে। কথায় কথায় এ-অঞ্চলে (সগর ও নর্ম্মদার মাঝের জায়গায়) বাঘের উৎপাতের কথা উঠ্‌ল। কত লোক বাঘের দৌরাত্ম্যে প্রাণ হারিয়েছে, এ কথাপ্রসঙ্গে সরীমন্তের এক পার্শ্বচর বলে উঠ্‌ল—

"একটা মানুষ মারতে পারলেই বাঘ নির্ভয় হয়। কেননা তার পর থেকে সেই মানুষটার ভূত বাঘটার ঘাড়ে চড়ে তাকে সব বিপদ থেকে বাঁচিয়ে চালায়। ভূতটা বেশ ভাল করে জানে যে, যেখানে বাঘটা মানুষ মেরেছে সেখানের শিকারীরা তাকে মারবার ফন্দিতে ঘুরবে, সুতরাং বাঘটাকে সেই ভূত কিছুদিন অন্য জায়গায় নিয়ে ফেরে-যেখানে বাঘ নির্ব্বিঘ্নে মানুষ মারতে পারে।"

আমি পার্শ্বচরটিকে জিজ্ঞেস করলাম, বাঘের হাতে মারা পড়ে' সে লোকের ভূত তার শত্রুতা না করে উল্টে উপকার করে বেড়ায়, এ কি করে হয়? তাতে সে লোকটি বল্‌লে "ভূত যে কেন এমন করে, তা ত জানি না হুজুর। তবে কিনা ভূত জাতটাই পাজী। আর এ কথাও সত্য যে, মানুষটা থাকে যত ভাল, তার ভূতটা হয় তেমনি খারাপ, যদি না তাকে শ্রাদ্ধশান্তি বা মন্ত্র পড়ে ভদ্রস্থ করা হয়।"

এ বিশ্বাস ভারতবর্ষময় প্রচলিত। এখানকার লোকের ধারণা এই যে, মানুষখেকো বাঘ মারতে হলে প্রথমে তার হাতে যেসব লোক মরেছে, তাদের উদ্দেশে বলি তর্পণ ইত্যাদি করে তাদের ঐরকম বাঘের চাকরী থেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়। *

এদেশে আরও বিশ্বাস আছে যে, এক রকম গাছের শিকড় খেলে মানুষ বাঘ হয়ে যায়। এসব সম্বন্ধে সরীমন্তের মত জিজ্ঞেস করায় তিনি বল্লেন, "এ লোকটি যা বল্‌ছে তার অধিকাংশই সত্যি—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আমার মতে এই জেলার মানুষ-খেকো বাঘগুলো অন্য এক রকমের। এগুলো মানুষ, মন্ত্র বলে বাঘ হয়ে ফির্‌ছে। লোকে জানে না কিন্তু মধ্যভারতের জঙ্গলে এই রকম মানুষ-বাঘ ঢের আছে। তারপর এই রকম মন্ত্রে-সৃষ্টি বাঘ চেনাও যায়। সাধারণ বাঘ, যাকে এদেশে 'বোরা' বলে, তার খুব লম্বা লেজ আছে, আর ঐ রকম মানুষ-বাঘের লেজই থাকে না।"

কি করে, মানুষ-বাঘ হয়, সে সম্বন্ধে সরীমন্ত বল্‌লেন,—"দেওরীর জঙ্গলে এক-রকম শিকড় পাওয়া যায়, যা খাওয়ামাত্রই মানুষ বাঘে পরিণত হয়। আর একটা শিকড় আছে, সেটা খেলে ঐ বাঘ আবার মানুষ হয়ে যায়। আমাদেরই পরিবারে আমার ছেলেবেলায় এই জাতীয় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে আমি শুনেছি। আমাদের ধোপা রঘু ছিল বিষম মাতাল। একদিন তার জানবার ইচ্ছা হল যে, মানুষের বাঘ-অবস্থায় মনের কি রকম ভাব হয়। ঐ কারণে সে অনেক খুঁজে-পেতে একদিন জঙ্গল থেকে দুটি শিকড় এনে বাড়ীতে উপস্থিত হল। বাড়ী এসে সে তার স্ত্রীকে বল্‌ল যে, সে একটি শিকড় খেয়ে বাঘে পরিণত হওয়ামাত্রই যেন তার মুখে অন্য শিকড়টি গুঁজে দেওয়া হয়। স্ত্রী তাতে রাজী হয়ে একটি শিকড় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রঘু অন্য শিকড়টি খাওয়ামাত্রই বাঘে পরিণত হল। তার স্ত্রী স্বামীর ঐ বিকট চেহারা দেখে ভয়ে দৌড়ে পালায়। রঘু বেচারা কি করে, বাঘ হয়ে জঙ্গলে গেল এবং সেই অবস্থায় তার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকে খাবার পর তাকে গুলি করে মারা হয়। গুলি করে মারবার পর তাকে এই কারণে চেনা গেল যে, তার লেজ ছিল না। এই জন্যে যদি কখনো কোন লেজহীন বাঘের কথা শোনেন, তবে বুঝবেন যে কোনও অভাগা ঐ শিকড় খেয়ে বাঘ হয়ে গেছে। আরও বাঘ যত রকমের আছে, তার মধ্যে ঐ বাঘই সবচেয়ে ধূর্ত্ত ও ভয়ানক।"

বন্ধুবর এ বিষয়ের সত্যাসত্য কি করে ঠিক করেছেন জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস প্রায় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে

---

* প্রাচীন রোমেও এই জাতীয় কুসংস্কার ছিল। আগ্রিপিনা তাঁর ছেলে সম্রাট নিরোর উপর চটে তাঁর সৎ-ছেলে ব্রিটানিকসকে রাজা করার চেষ্টায় প্রথমেই মন্ত্রবলে নিরোর পিতা,—যাকে তিনি বিষযোগে হত্যা করেন—এবং সিলানি দল, যাহারা আগ্রিপিনার চক্রান্তেই প্রাণ হারায়, ইঁহাদের প্রেতাত্মাবর্গের সাহায্য চাহেন।

দাঁড়ুয়ে গিয়েছে। আমার লোকজন সবাই একথা বিশ্বাস করে, বল্‌তে কি এ-অঞ্চলে একজন লোক নেই, যে একথা অবিশ্বাস করে।

একবার জব্বলপুর থেকে মিরজাপুর যাবার পথে মৈহারের রাজার সঙ্গে ঐ পথের কটরা গিরিশঙ্কটে মানুষ-খেকো বাঘের উৎপাত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। রাজা বলেছিলেন,—"এইসব বাঘগুলো যদি সাধারণ বাঘ হোতো, তবে তাদের মারতে খরচ বা কষ্ট কিছুই ছিল না। কিন্তু নিশ্চয় জানবেন যে যেসব বাঘ এগুলোর মত অসংখ্য মানুষ মারে তারা নিজেরাও মানুষ, শুধু বিজ্ঞান বলে তারা বাঘের দেহ নিয়েছে। বাঘ যত আছে, তার মধ্যে এদের সামলান সবচেয়ে মুস্কিল।"

আমি বল্‌লাম,—"আচ্ছা রাজা-সাহেব এরা নিজেদের বাঘে পরিণত করে কি করে ?

"আমরা মূর্খ লোক, আমরা জানি না। তবে যাদের ঐ বিদ্যা আয়ত্ত হয়েছে, তাদের পক্ষে ঐ কাজ খুবই সোজা। এই মৈহার উপত্যকায় এক বড় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এ-বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং এ অভ্যাসও তাঁর খুবই ছিল। তাঁর একটা মালা ছিল, তিনি বাঘে পরিণত হওয়ামাত্রই তাঁর এক শিষ্য ঐ মালাটা তাঁর গলায় পরিয়ে তাঁকে ফের মানুষের দেহে ফিরিয়ে আন্‌ত। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে, যখন তাঁর পুরাণো শিষ্যেরা দূর দেশে তীর্থে তীর্থে ছড়িয়ে পড়েছে, একদিন তাঁর বিশেষ ইচ্ছা হল যে, একবার আগেকার মত বাঘের আকার ধারণ করেন। তিনি তাঁর এক নূতন চেলার কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে সাহস করে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে ঐ মালা পরাতে পারবে কি না। সে বললে, "নিশ্চয়, আমার আপনাতে ও ঈশ্বরে এতই বিশ্বাস যে, আমি কিছুতেই ভয় পাব না।" পুরোহিত একথা শুনে তার হাতে মালাটি দিয়ে মন্ত্রবলে বাঘের আকার ধারণ করতে লাগলেন। শিষ্য পাশে দাঁড়িয়ে, এ ব্যাপার দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। শেষে সেই বাঘরূপী পুরোহিত যখন মন্দির কাঁপিয়ে এক ভীষণ গর্জ্জন করলেন, ঐ শিষ্য ভয়ে মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়্‌ল, মালাটা তার হাত থেকে দূরে ছটকে গেল। বাঘরূপী পুরোহিত তাকে ডিঙ্গিয়ে এক লাফে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল এবং তারপর অনেকদিন ধরে আশপাশের পথে অত্যাচার করেছিল।"

"কটরা গিরিশঙ্কটের বাঘগুলোর মধ্যে ঐ বুড়ো পুরুত-ঠাকুরও আছে না কি ?"

"বোধ হয় না। তবে আমার মনে হয় যে ওরা সকলেই মানুষ। ওদের বোধ হয় সেই পুরোহিতের বিদ্যাটা একটু বেশী আয়ত্ত হয়েছিল ; লোকের ঐ জ্ঞান হলে তারা তার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়—যদিও তার দরুণ তাদের নিজেদের এবং অন্য লোকের সর্ব্বনাশ হয়।"

"অ'চ্ছা এগুলো যদি সাধারণ বাঘ হয় তবে আপনি এদের উৎপাত বন্ধ করার কি উপায় করতে পারেন ?"

"আমি পূজা, বলি, এই-সবের সাহায্যে, যেসব প্রেতাত্মা ঐ বাঘগুলোকে শিকার দেখিয়ে, বিপদ থেকে বাঁচিয়ে বেড়ায় তাদের সন্তুষ্ট করব। বাঘে কোন লোককে খেলেই তার আত্মা ঐ রকমে বাঘের ঘাড়ে চেপে বা আগে আগে চলে তাকে রক্ষা করে বেড়ায়। গোণ্ড বা অন্য জঙ্গলী লোক যারা এসব কাজে সিদ্ধহস্ত, তাদের দশ-বিশ টাকা দিয়ে জঙ্গলে বেদী স্থাপন করে সেখানে বলি দিতে বল্‌লেই হয়। তারা গিয়ে ঐসব প্রেতাত্মাদের নিবেদন করবে যে, যদি তারা ঐ বাঘের চাকরী ছাড়ে, তবে প্রতি বৎসর ঐ বেদীতে তাদের উদ্দেশে বলি, পূজা ইত্যাদি হবে। এ কাজ করা হলে আমি শপথ করছি যে, ঐসব মানুষ খেকো বাঘ হয় মারা পড়বে, নয় মানুষ-খাওয়া ছাড়তে বাধ্য হবে। যদি এতে কোন ফল না হয় তবে বুঝবেন যে, হয় ঐ বাঘগুলো বাঘরূপী মানুষ, নয় আপনার গোণ্ডেরা আপনার দেওয়া টাকা পূজোয় খরচ না করে আত্মসাৎ করেছে।"

দিনশেষে

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

লাল হ'য়ে ওই নীল নভোতল সোনালি হয় যে শেষে—
যেন নেবু-রঙ্‌ ওড়্‌না খসিছে রজনীর কালো কেশে!
সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুময়,
দিনশেষে তবু কেন মনে হয়—
এখনো যে-টুকু রয়েছে সময়,
লই মোরা ভালোবেসে;
এস, কাছে এস, চুম্বন করি সুগন্ধ কালো কেশে।

দিন যে ফুরালো, রবে না এ আলো, আসিছে নিশুতি-রাতি;
সে আঁধারে, সখি, কেহ যে হবে না কাহারো বাসর-সাথী!
নিশীথ-আকাশে আসিবে যে তারা,
চির-তিমিরের প্রহরী তাহারা,
চোখে-চোখে শুধু করিবে ইসারা
সে কি কৌতুকে মাতি'—
এত প্রেম, প্রাণ—সব নির্ব্বাণ! শেষে এল সেই রাতি!

*   *   *   *

এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু—কত রঙ, কত রূপ!—
হায় সখি, হায়, ও রাঙা অধর করে যেন বিদ্রূপ!
শত যুগ ধরি' রূপসী বসুধা
মিটাইতে নারে অসীম যে ক্ষুধা—
এক যৌবনে ফুরা'বে সে সুধা?
তারি পরে যম-যূপ!
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ, এত রূপ!

রূপ যে অশেষ—যুগ-যুগান্ত এমনি অটুট রবে,
হেথাকার ফুল এমনি ফুটিবে মৃদু মধু-সৌরভে!
আমাদের মত কত বিহঙ্গ,
কত বিচিত্র ক্ষণ-পতঙ্গ
লভি' তার সেই রূপের সঙ্গ
বসন্ত-উৎসবে,
লইবে বিদায়, ধরণীর ফুল এমনি ফুটিয়া রবে

তবু সেইটুকু মধু-পার্ব্বণ হেলা করি' কেটে যায়!—
মধু-হ্রদ হ'তে একটি কণিকা শুষিতে সে ভয় পায়!
উষালোকে হেরে সন্ধ্যার ছায়া,
দিবস-দুপুরে কত প্রেত-কায়া,—
হায় সখি, একি নিদারুণ মায়া,
একি বাধা পা'য়-পা'য়!
চির-নিশীথের একটি সে দিবা ভয়ে ভয়ে কেটে যায়!

*   *   *   *

অসীম ক্ষুধার একটু সে সুধা যে করে পুলকে পান,
সে যে জীবনের বনে বনে পায় সুমধুর সন্ধান!—
মাটি ফেটে ফোটে নামহারা ফুল,
লতার বিতানে দোলে এলোচুল,
পাতায় পাতায় লিপি সে অতুল,
বায়ু-মর্ম্মর গান!
সারা জীবনেও হেন মধুবনে ফুরায় কি সন্ধান?

দিনশেষে তাই নয়নে আমার উথলে অশ্রুজল,
কবরী খুলিয়া ওই কেশপাশে মুছাও কপোল-তল।
বক্ষে আমার রাখ হাতখানি,
গুঞ্জর' কাণে পরমা সে বাণী,
'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি,
তবু নহে নিষ্ফল—
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোরা একফোঁটা আঁখিজল।'

এই যে তুলিনু মুখখানি হাতে—চাও দেখি মুখে মোর,
আর একবার—শেষবার—চোখে লাগুক নেশার ঘোর!
ভুলে' যাও ব্যথা—বৃথা কলঙ্ক!—
সলিলের তলে আছে সে পঙ্ক;
তুমি খুলে' ধর মধু-করঙ্ক
আপন গন্ধে ভোর,
কালো হ'য়ে আসে নীল বন-রেখা, রাখ এ মিনতি মোর!



গীতার অক্ষর ও ব্রহ্ম

গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় "গীতার অক্ষর ও ব্রহ্ম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে চিন্তার উদ্বোধক অনেক উপাদান থাকিলেও, লেখকের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত, নিম্নলিখিত কারণে ঠিক মনে হয় না।

১। লেখকের প্রথম ও প্রধান আপত্তি এই যে, "উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রে পরমাত্মাকেই অক্ষর এবং ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।" বস্তুতঃ, এ আপত্তি অমূলক। মুণ্ডকোপনিষদের (২।২) "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"—এই মন্ত্রে "অক্ষর"-শব্দ মায়া, "প্রধান" বা মূলপ্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (১।২।২১-২২; ১।৩।১০) আচার্য্য শঙ্করও "অক্ষর"-শব্দকে কয়েকবার এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থাকে "ক্ষর" (= বিনাশশীল) বলাই ঠিক। কিন্তু, সংসারবীজভূত অব্যক্ত প্রকৃতি, সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেই অনাদি ও অনন্ত বলিয়া, "অক্ষর"। গীতার যে তিনটি শ্লোকে (১৫।১৬।১৮) অক্ষরের নিম্নস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে "অক্ষর"-শব্দ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। "অক্ষর" শব্দকে এই অর্থে গ্রহণ করিয়া, শঙ্কর, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ গীতার এই তিনটি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র কষ্টকল্পিত বা দুর্বোধ্য বলিয়াও মনে হয় না। এই সকল কারণে, গীতার এই তিনটি শ্লোককে "অবৈদান্তিক" বলা যায় না।

২। লেখকের দ্বিতীয় আপত্তি, গীতায় "ক্ষরকেও পুরুষ বলা হইয়াছে" বলিয়া। এস্থলে ক্ষরে পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ লাক্ষণিক মাত্র; এজন্য ইহাতে কোনও দোষ নাই! এরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগের লৌকিক ও বৈদিক দৃষ্টান্ত প্রচুর। আম্রবিক্রেতাকে গ্রাহক পর হইতে "ও আম, ও আম" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। "সম্প্রসাদ"-শব্দ সুষুপ্তিবাচক হইলেও ব্রহ্মসূত্রে (১।৩।৮, শাঙ্করভাষ্য) প্রাণ অর্থেও ইহার লাক্ষণিক প্রয়োগ আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীতে জীব বা পুরুষের অন্নরসময় শরীর, প্রাণ প্রভৃতি উপাধিক আবারও পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। কৌষীতকি-উপনিষদেও প্রাণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে (২।১)।

৩। লেখকের তৃতীয় আপত্তি, গীতায় "কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণরূপী ভগবান্‌কে বা পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা" হইয়াছে বলিয়া। তাঁহার মতে, ইহা উপনিষদ্-বিরুদ্ধ। তিনি নিজেই ছান্দোগ্য উপনিষদের যে মন্ত্র (৮।১২।৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেই বোধ হইবে যে, তাহাতে ব্রহ্মকেই "উত্তমঃ পুরুষঃ" বলা হইয়াছে। এখানে, 'শরীর হইতে সমুত্থান' করার অর্থ, অন্নময়াদি মায়ায় শরীর-বিষয়ক অভিমান হইতে মুক্তি; আর 'পরমজ্যোতির' অর্থ—ব্রহ্ম। এই পরমজ্যোতি বা ব্রহ্মকে পাইলে জীব যে ব্রহ্মই হন, তাহা উপনিষদের বহুস্থলে লিখিত আছে (মুণ্ডক, ৩।২।৯; প্রশ্ন, ৬।১ বৃহ, ৫।৫।১৩; ইত্যাদি)। ব্রহ্মসূত্রের (৪।৪।১) শাঙ্কর-ভাষ্যেও আলোচ্য শ্রুতিটির এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ছান্দোগ্যোপনিষদের ব্রহ্ম-প্রকরণেই, ইন্দ্রের ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরেই, ব্রহ্মা তাঁহাকে এই উপদেশ দিতেছেন। গীতার 'পুরুষোত্তম' শব্দ ব্রহ্মবোধক। যেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে তিনটি পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে ঠিক পরবর্ত্তী শ্লোকেই ব্রহ্মকে অন্য দুইটি পুরুষ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে ও তাহার শ্রেষ্ঠত্বমত্তও জানাইতে হইলে, তাহাকে পুরুষোত্তম বলাই যুক্তিসঙ্গত। উপনিষদের "উত্তমঃ পুরুষঃ", "পুরুষঃ পরঃ" প্রভৃতি শব্দ, এবং গীতার "পরং পুরুষম্", "পুরুষঃ পরঃ", ও "পুরুষোত্তম" শব্দ পরস্পরের প্রতিশব্দ মাত্র। 'বাসুদেব', "পুরুষোত্তম" প্রভৃতি শব্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার অভীষ্ট নাম হইলেও, এ সমস্তেরই লক্ষ্যার্থ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই (অবশ্য, সে পরমাত্মার সম্বন্ধে উপাসকগণের দার্শনিক ধারণা যাহাই হউক না কেন)। আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় ঘোর বিবর্ত্তবাদী অদ্বৈত-বেদান্তীও পরমাত্মাকে বাসুদেবাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন (গীতাভাষ্য, উপক্রমণিকা ইত্যাদি)। শব্দের "বাচ্যার্থ" ও "লক্ষ্যার্থ" উভয়েরই সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে, প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। উপাস্যদেবতাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বড় বড় নামে অভিহিত করিলেও, সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার প্রতিষেধ হয় না।

৪। লেখকের চতুর্থ আপত্তি—গীতায় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক শ্লোক লইয়া (১৪।২৭)। "সাধারণ ভাবের" মত, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেও, এস্থলে "প্রতিষ্ঠা"-শব্দ অভেদ বোধক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কৃষ্ণভক্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা আর কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলা, একই কথা। কৃষ্ণভক্তিকে উপায় বলিলে, কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিকেই উপায় বলা হয়– কৃষ্ণকে উপায় বলা না'ও হইতে পারে। আলোচ্য শ্লোকের অন্তর্গত "মাম্"-পদের "বাচ্যার্থ" ভক্তবিশেষের ভগবান্ হইলেও, ইহার "লক্ষ্যার্থ" পরম ব্রহ্ম। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকের অন্তর্গত "অহম্" শব্দেরও তাহাই অর্থ (আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর টীকা দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য শঙ্করও এই অহম্-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রত্যগাত্মা।" তিনি "প্রতিষ্ঠা"-শব্দেরও অর্থ করিয়াছেন—"সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্ম-রূপে নিশ্চয়ীকরণ।" গীতার আলোচ্য স্থানে "প্রতিষ্ঠা"-শব্দের এইরূপ অভেদ-বোধক অর্থে ব্যবহার উপনিষদ্-বিরুদ্ধও নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদের এক স্থানে (৭।২৪।১)—"সেই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, 'স্বীয় মহিমায়।" এখানে ব্রহ্ম (ভূমা) ও তাঁহার মহিমার অভেদ বুঝাইবার জন্যই যে "প্রতিষ্ঠিত"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অভিন্নত্ব আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্য ইহার পরেই বলা হইয়াছে—"যদি বা ন মহিম্নীতি"।

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।



বিদেশ

লণ্ডন বাংলা সাহিত্য সম্মিলনী—

লণ্ডনে সম্প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদিগের একটি সাহিত্য-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা উহার কর্ম্ম-সচিবগণের নিকট হইতে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি পাইয়াছি।—

লণ্ডনে বাঙালী ছাত্র অনেক, অথচ তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইতে পারে এ রকম কোনও বৈঠক লণ্ডনে ছিল না। অনেকদিন ধরিয়াই এখানকার বাঙালী ছেলেরা এই রকম একটা সমিতির অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। তাই কয়েকজনের উৎসাহে বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের চেষ্টায়, গত ৫ই চৈত্র (ইং ১৮ই) মার্চ্চ এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয় ইহার উদ্দেশ্য বাংলাভাষী লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে বাঙলা ভাষায় নানা রকম প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া। সম্মিলনীর অধিবেশনগুলি সাধারণতঃ মাসে দুইবার হইয়া থাকে। সভায় যে-সকল লঘু-গুরু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।—

"বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।"

"বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।"

"প্রাচ্যসভ্যতা প্রাচ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায়।"

"আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানব-সভ্যতার উন্নতির উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।"

"ভারতীয় নারীর আদর্শ।"

"ভারতে পল্লী সংগঠন।"

"ভারতে প্রজনন শাসনের প্রয়োজনীয়তা।"

"উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধিবিরুদ্ধ হওয়া উচিত।"

এই সমস্ত বিষয়ের বাদানুবাদের ভিতর দিয়া আমাদের ছেলেদের মনের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। "বিবাহ অনুষ্ঠান বর্জ্জনীয়" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ সভ্য মত দিয়াছিলেন; "প্রজনন-শাসনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত ও অধিকাংশ সভ্যই মনে করেন যে, "উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধিবিরুদ্ধ হওয়া উচিত।"

লণ্ডন-প্রবাসী সমস্ত বাঙলাভাষী লোকদিগকে সম্মিলিত করিবার জন্য ও নূতন ছাত্র ছাত্রীদের অভিনন্দন করিবার উদ্দেশ্যে গত ১৪ই অক্টোবর একটা উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবে প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার পত্নী, লর্ড সিংহ প্রভৃতি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এ কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেকে আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন, মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী তটিনী দাস ও শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গত ২৪ শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত "গঠনের কাজ" সম্বন্ধে সম্মিলনীতে তাঁর স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষক ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। সমিতির কাজ বাড়িয়া চলিয়াছে, সেইজন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহার দ্বারা সমিতির কার্য্যের সহায়তা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আপাততঃ এই সম্মিলনীর সভ্যদের জন্য একটা পুস্তকাগারের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

আমরা দেশ হইতে এই কাজে উৎসাহ ও সাহায্য পাইব এই উদ্দেশ্যে স্বদেশবাসীদের কাছে আমাদের সমিতির কথা জানাইতেছি।

শ্রী বীরেশচন্দ্র গুহ
শ্রী লাবণ্যবালা দাস
শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন
কর্ম্মসচিব।

—

ভারতবর্ষ

কলিকাতা কংগ্রেস—

১৯২০ সনের বিশেষ অধিবেশনের পর কলিকাতায় এইবার কংগ্রেসের ৪৩তম অধিবেশন। কলিকাতার উদ্যোক্তৃগণ কংগ্রেসের অধিবেশন সার্থক করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ উদ্যম দেখাইয়াছেন ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। বিদেশীয় প্রতিনিধি-বর্গ ও দর্শকগণ তাঁহাদের আয়োজনের প্রাচুর্য্যে ও কর্ম্মদক্ষতায় বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ 'রাজসিক' আয়োজন ইতিপূর্ব্বে আর কোনো কংগ্রেসের অধিবেশনেই দেখা যায় নাই।

কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ও প্রতিনিধিদের সেবার জন্য এবারও বরাবরের মত স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এবারকার স্বেচ্ছাসেবকদিগের সৈনিকেরা আদর্শে সংগঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—'সেবকের' আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ইহাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সামরিক পোষাক, সামরিক পদবী— জেনারেল্ অফিসার্ কমাণ্ডিং' সংক্ষেপে 'জি, ও, সি'—প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার শুভাশুভ, ভালমন্দের কথা না বলিয়া মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের নিকট এই সব সামরিক কায়দা-কানুন, নাম পদবী নূতন ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ সমর-শূন্য 'সামরিকতার' বাড়াবাড়িতে একটু কৌতুকানুভব করিয়াছেন। তবে, স্বেচ্ছা-সেবক-মণ্ডলীভুক্ত যুবক ও মহিলাবৃন্দ সাধারণত বিনয়, সেবাপরায়ণতা, শ্রমসাহিষ্ণুতার বহু পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সকলেই সাধুবাদ করিয়াছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে কয়েক বৎসর হইতে যে খাদি-প্রদর্শনী বসিত, এবার তাহাকে প্রসারিত করিয়া একটি বিশাল প্রদর্শনীতে



কংগ্রেসের শোভা-যাত্রার একটি দৃশ্য



পদাতিক ভলান্টিয়ার-বাহিনী

পরিচিত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানাবিধ জিনিষ এই প্রদর্শনীতে আসিয়াছে। যাঁহারা বিদেশীয় কলকব্জা আমদানি করেন, তাঁহারাও অনেকে প্রদর্শনীতে ঐসব কলকব্জা দেখাইয়া লোককে বহু নূতন জ্ঞান দান করিয়াছেন। একমাত্র দেশী কাপড়ের কল ও তাঁত ছাড়া আর সকল জিনিষই এখানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। টাটা কোম্পানী, মার্টিন কোম্পানি, বার্ণ কোম্পানি, কলিকাতা ট্রামওয়ে, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, প্রভৃতি সাহেব-ঘেষা অনেক প্রতিষ্ঠানও ইহাতে যোগদান করিয়াছে। মোটের



শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিতেছেন

চারিদিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। আগামী বৎসরে কংগ্রেস লাহোরে নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

কংগ্রেস ছাড়াও কলিকাতায় কংগ্রেস-মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে অনেক ছোট বড় সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সর্ব্বদল-সম্মিলন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলন বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। মিঃ জিন্নার মারফৎ মুসলেম্ লীগ্ যে প্রস্তাব প্রেরণ করেন, তাহা পরিত্যাক্ত হওয়ায় মুসলমানগণ সম্মিলন ত্যাগ করেন। শিখদের প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তাঁহারাও চলিয়া যান। তবে সর্ব্বদল সম্মেলনের সভ্যদের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি ও ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে উপেক্ষা, বেশ আশাপ্রদ।

সামাজিক সম্মিলনে বোম্বাই-এর মিঃ এম্-আর, জয়াকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ খুব যুক্তিপূর্ণ। নারী-সমাজ সম্মিলনের নেত্রী ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণীর অভিভাষণেও বেশ যুক্তি ও সাহসের চিহ্ন আছে।

কংগ্রেসের ও অন্যান্য সভা-সম্মিলনের প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী হইবে কি না, এখন তাহাই দ্রষ্টব্য।



শ্রমজীবিগণের দেশবন্ধু নগরে প্রবেশ



দেশবন্ধু নগর—সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে

তরুণ-আন্দোলন—

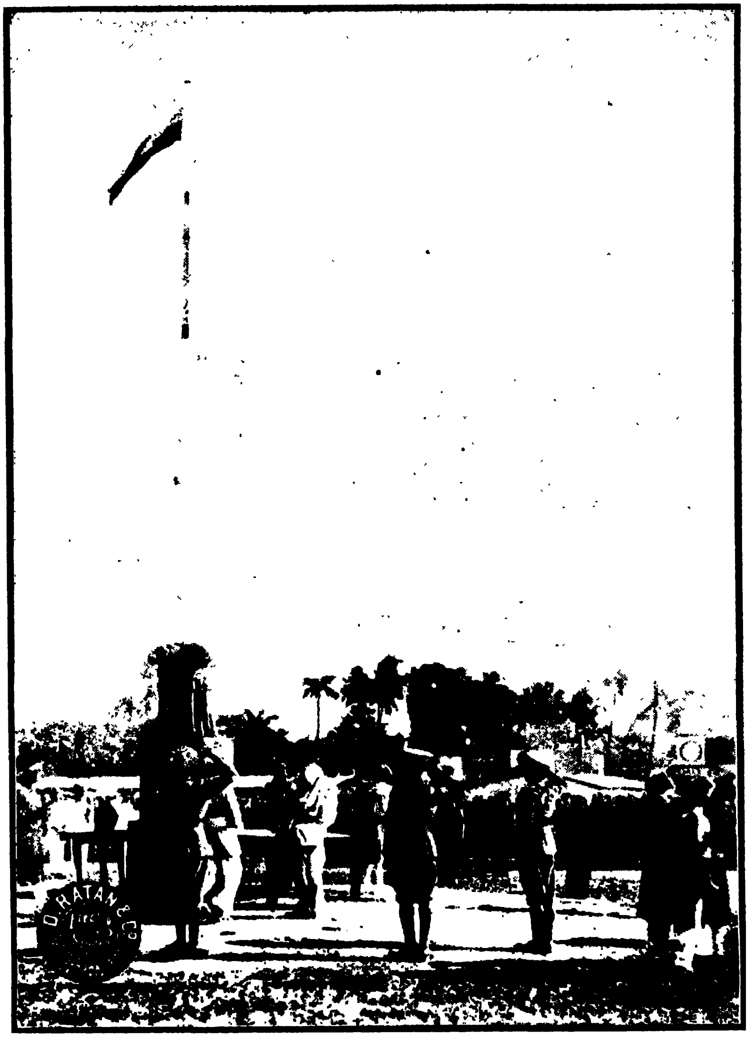
কংগ্রেস সপ্তাহে কলিকাতায় ভারতীয় যুবক কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিযাছে। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে বক্তৃতা দেন, তাহা হইতে দেশের যুবকদের মনোভাব বেশ স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। এই বক্তৃতার কয়েকটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"তরুণ বা তরুণীদের যে কোন সমিতিকে যুবক সমিতি আখ্যা দেওয়া চলে না। কোন সমাজ-সংস্কার-সংঘ বা দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-সমিতিকে প্রায়ই যুবক সমিতি বলা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং তাহার দূরীকরণের চেষ্টায় ফলে যে যুব-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তাহাকেই বাস্তবিক যুবক সমিতি নাম দেওয়া যায়। যুবক আন্দোলন শুধু সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, উহা পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া একটা নূতন সৃষ্টি করে। যুবক আন্দোলনের সৃষ্টির পূর্ব্বে চাই বর্ত্তমান অবস্থাজনিত একটা চাঞ্চল্য, একটা অধৈর্য্যের ভাব।

"এই জাগরণ শুধু বাহিরের জাগরণ নহে, ইহা প্রাণের জাগরণ। ভারতের যুবক সম্প্রদায় প্রাচীন নেতাদের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া এখন আর প্রাচীন নেতাদের প্রতি অন্ধভাবে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে রাজী নহে। তাহারা ইহা বেশ বুঝিয়াছে যে, তাহাদিগকেই নূতন ভারত গড়িতে হইবে, তাহাদিগকেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে হইবে।...আমি আজ দেশের মধ্যে দুইটা আন্দোলন বা দুইটা দেশের চিন্তাধারার প্রাধান্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই বিষয়ে আমি স্পষ্টভাবে ও নির্ভয়ে আমার মত প্রকাশ করিব। আমি যে দুইটি চিন্তাধারার উল্লেখ করিলাম, তাহার একটি সবরমতী ও অপরটি পণ্ডিচারী হইতে উদ্ভূত।

'সবরমতী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক্ উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে, আধুনিক যাহা কিছু সব মন্দ, অনেক পরিমাণে কিছু উৎপাদন অত্যন্ত অশুভ জনক, অভাব ও জীবিকানির্ব্বাহের আদর্শ বাড়ান উচিত নহে, আমাদিগকে আবার গোযানের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চা ও সামরিক-শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করিতে হইবে।

'পণ্ডিচারী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে, শান্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর কিছুই মহৎ নাই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধ্যান, অনেক সৎকার্য্য থাকিলেও ঐরূপ যোগ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আন্দোলনের ফলে অনেকে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে যে, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য্য দ্বারাই মাত্র বর্ত্তমান অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, প্রকৃতিকে জয় করিতে হইলে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে



ধ্বজা উত্তোলন

এবং চারিদিক হইতে আমরা যেরূপভাবে বিপদ-জালে জড়িত, তাহাতে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা দুর্ব্বলতা মাত্র। এই চিন্তাধারার নিষ্ক্রিয়তারই আমি প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের এই দেশে যোগী ঋষি বা আশ্রমের প্রবর্ত্তন একটা নূতন ব্যাপার নহে। আমাদের যোগী ঋষিদের আদর চিরকালই থাকিবে। কিন্তু আমরা যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে চাই, আমরা এখন তাহা হইলে চাই প্রবল কর্ম্মবাদ। আমাদিগকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে এবং আধুনিক যুগের সহিত মেলামেশা করিয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা আর এখন পৃথিবীর এক প্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে পারিব না। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, তখন তাহাকে তাহার আধুনিক শত্রুর সহিত আধুনিক উপায়ে সংগ্রাম করিতে হইবে—রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় দিকেই ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। গোযানের দিন চলে গিয়াছে, এবং তাহা আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভা- নাই। আমি ভারতের অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপা- নাহ। ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে তাহাকে তা- বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। দ- সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানে পৃথিবীকে আমাদের শিখাইব- অনেক জিনিষ আছে। এক কথায় আমাদের প্রাচীন আদ- আধুনিক বিজ্ঞানের বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে আমাদিগকে এক- সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। আমাদিগকে একদিকে যে- "বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাও" চীৎকারে বাধা দিতে হইবে, তেম- অপর দিকে আধুনিক ইউরোপের অনুকরণে অর্থশূন্য পরিবর্ত্তনে- বিরোধিতাও করিতে হইবে।



কংগ্রেস মণ্ডপের অভ্যন্তর



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিদর্শন

পৃথিবীতে য়ুরোপীয় সভ্যতাই একমাত্র জীবন্ত সভ্যতা, তাহারই প্রবল স্রোতমুখে আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি, ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন ভারতবর্ষকে নব্য চীন, নব্য তুরস্ক, নব্য জাপান ও নব্য আফগানিস্থানের মত য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর, তথাকথিত তরুণ আন্দোলন তাহারই অন্যতম দিক, এই বক্তৃতায় একথা সরলভাবে স্বীকার করিয়া, প্রাচীন আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সম্বন্ধে কয়েকটা মামুলী কথা না বলিলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

বাঙ্গালী ছাত্রের স্বাস্থ্য—

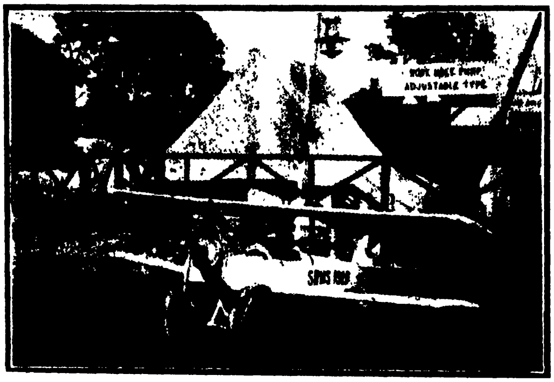
ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কমিটি আছে, এসংবাদ অনেকেরই জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এই কমিটি ১৯২৭ সনে যে-সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার একটি বিবরণী প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালী ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য ও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই ভাবনার কথা। প্রায় পনর হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কমিটি যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই,—

(১) ছাত্রগণের মধ্যে ব্যাধির প্রসার। শতকরা ৭১ জন ছাত্র কোন-না-কোনও ব্যাধিগ্রস্ত, ১৯ জনের মাত্র স্বাস্থ্য ভাল বলা যাইতে পারে; শতকরা ৩৫ জন কোন-না-কোনও গুরুতর



দেশবন্ধু নগর—হাসপাতালের দৃশ্য

ইহাদের মধ্যে হৃদযন্ত্রের পীড়া শতকরা ৪ জনের, ফুস্‌ফুসের ব্যাধি অপেক্ষাকৃত কম, শতকরা ২০ জনের গলনালীর ব্যাধি, শতকরা ২ জনের প্লীহা ও শতকরা ১২ জনের পাকযন্ত্রের ব্যাধি; দৃষ্টিশক্তি শতকরা ৩২ জনের খারাপ; শতকরা ৩০ জনের দাঁত খারাপ।



দেশী এরোপ্লেন

(২) ছাত্রগণের শারীরিক অবস্থা। গড়ে বাঙ্গালী ছাত্রের শরীর পাঁচফুট ছয় ইঞ্চ উচ্চ; বুকের ছাতি (অপ্রসারিত অবস্থায়) সাড়ে একত্রিশ ইঞ্চ; ওজন ১ মণ ১৫ সের। এই প্রসঙ্গে বিবরণীতে আর একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষকগণ বলিতেছেন যে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রগণ দৈহিক আয়তনে, শক্তিতে ও স্বাস্থ্যে অন্যান্য কলেজের ছাত্রগণের অপেক্ষা ভাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসমিতি কেবলমাত্র ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিরও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের জন্য এই বিষয়ে যতটুকু কাজ করা উচিত, ততটুকু কাজ করিতে পারিতেছেন না। তবুও তাঁহারা যে-সকল চেষ্টা করিতেছেন তাহাদিগের চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) রুগ্ন ও পীড়াগ্রস্ত ছাত্রগণের চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান, (২) কলেজে কলেজে ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকা চালাইবার ক্লাব স্থাপন, (৪) ছাত্রগণের খাদ্যের উন্নতি, ও (৫) শরীরচর্চ্চায় উৎসাহ দান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থের অনটনের জন্য ছাত্রগণের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন না। তবুও ১৯২৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ৭৫টি পীড়াগ্রস্ত ছাত্রের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু ছাত্র তাঁহার নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে ক্যাপ্টেন পি কে গুপ্ত (আই এম্ এস্) কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আজকাল মেসে ও হোষ্টেলে ছাত্রগণের জন্য যে-খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থের অত্যন্ত অভাব। ছাত্রগণের খাদ্য কি হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর একটি প্রস্তাব করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রস্তাব কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট পাঠান। খাদ্য-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, প্রথমতঃ, ইহাতে খরচ কিছু বেশী হওয়ার সম্ভাবনা (যদিও তাহা অতি সামান্য), দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণের অধিক পরিমাণ আটা ও ডাল খাইতে আপত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের দরুণ ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যতটা চেষ্টা হওয়া উচিত ততটা হইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ

নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাও ছাত্রগণের নিজেদেরই বেশী যত্নবান হওয়া আবশ্যক। অশিক্ষিত লোকেরা অজ্ঞতার জন্য অথবা বুদ্ধির অভাবে শরীরের যত্ন করিতে জানে না একথা বলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-শিক্ষিত ও উচ্চ-শিক্ষার্থী ছাত্রগণের পক্ষে একথা স্বীকার করা বড়ই লজ্জার কথা।

দেশী এরোপ্লেন—

পার্শ্বের ছবিতে প্রদর্শিত এরোপ্লেনটির সমস্ত কলকজ্জা ও সরঞ্জাম মাদ্রাজের শ্রীরাম মোটর স্কুল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। গত বড়দিনের সময়ে মাদ্রাজের প্রদর্শনীতে এই এরোপ্লেনটি প্রদর্শিত হয় ও অনেকবার চালান হয়।

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬। কুআলা লুম্পুর

রবিবার ৩১শে জুলাই ১৯২৭।

আজ রবিবার। সকালে নানা কবিদর্শনার্থী লোকের আগমনে; আরিয়াম্‌কে আর আমাকে তাদেরকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকৃতে হ'ল। আমরা এদেশে ভ্রমণের জন্য সাধারণ ইংরেজী ঢঙের পোষাক মাত্র এনেছিলুম—সাদা জীনের স্যুট্, সাদা গলা-আঁটা জামা। ডিনার, সান্ধ্য-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে কবির সঙ্গে আমাদেরও উপস্থিত থাকৃতে হ'চ্ছে—দেশী পোষাক. ধুতী পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু নেই। আজ আমরা স্থানীয় এক দরজীর দোকানে গিয়ে সাদা আর কালো রেশমের আচকান পাজামা আর টুপী তৈরী করাবার ব্যবস্থা ক'রে এলুম। ভারতীয় ভদ্র পোষাক হিসাবে, কোনও রকমের লম্বা আচকান বা শেরওয়ানী জাতীয় আঙরাখা একরকম গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে। বাঙলাদেশে অবশ্য আমরা সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ-সভাদিতে আমাদের খাঁটি বাঙালী পোষাক—ধুতী পাঞ্জাবী আর চাদর প'রেই যাই, কিন্তু বাইরের পক্ষে, যেখানে সমস্ত অবাঙালী আর ভারত বহির্ভূত লোক নিয়েই কারবার, সেখানে ধুতীটা ঠিক সুবিধার নয়। আমাদের অভ্যস্ত হলেও, একটু বিসদৃশ ঠেকে, পাজামা জাতীয় সেলাই করা অধোবস্ত্র পরিহিত শিরোভূষণ-যুক্ত অন্য জাতীয় লোকদের মধ্যে ধুতী-পরা খালি-মাথা বাঙালীকে কেমন যেন ঢিলে-ঢালা, কেমন 'হংসমধ্যে বকো যথা'-গোছ বেখাপ্পা দেখায়। তাই মনে হয়, বাঙলার বাইরে বাঙালীর পোষাকে তার প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করাই ভালো। যে সকল ভারতীয় মুসলমান মহিলা আজকাল পর্দ্দার বাইরে আস্‌ছেন, ঘেরা টোপ ছেড়ে দিয়ে সহজ ভাবে অন্য মেয়ে পুরুষদের সামনে মুখ খুলে দাঁড়াতে সঙ্কোচ বোধ ক'র্‌ছেন না, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঘরে পাজামা প'র্‌তে অভ্যস্ত, তাঁরা বাইরে এই অশোভন ভারত-বহির্ভূত পাজামা আর প'র্‌ছেন না, তাঁরা পৃথিবীর অন্যতম সৌষ্ঠবময় নারীর পরিচ্ছদ সাড়ীই প'র্‌ছেন। শিক্ষিতা সিন্ধী, পাঞ্জাবী হিন্দু, শিখ, আর অন্য হিন্দু মেয়েরাও ক্রমে পোষাকে এই অশোভন এবং প্রাদেশিক রুচি বর্জ্জন ক'রেছেন, সাড়ীর চল ক্রমেই বেড়ে উঠছে। পুরুষের লম্বা আঙরাখা, পাজামা, মাথায় পাগড়ী বা কোনও রকম টুপী; আর মেয়েদের সাড়ী, এই এখন জাতি-নির্ব্বিশেষে আধুনিক কালের শিক্ষিত ভারতবাসীর বাইরেকার পোষাক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের তাই ইংরেজী পোষাক আর ধুতী, এই দুইয়ের বদলে আচকান প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রতে হ'ল। কিন্তু আচকান বা চাপকান ততটা অভিজাত দেখতে নয়, আর হালে এই রকম ছাঁটের আঙরাখা, ইংরেজদের ঘর-গৃহস্থালীর আর কুঠী-আপিসের চাকর নোকরদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বোতাম-আঁটা চাপকানটা যেন জোব্বা আর বিলিতী কোটের মাঝামাঝি একটা আপোষ নিষ্পত্তি; বাবু ভাইয়ার চাপকান, বা খিদ-

মদ্গারের চাপকান, যেন এংগ্লো-ইণ্ডিয়ার মূর্ত্তিমতী অনুচারণা। প্রাচীনকালের দিল্লীয়াল বা লখনবী মুসলমানদের সাদা মলমলের বা অন্য কাপড়ের যে চমৎকার পোষাক হ'ত, ঠিক একেবারে চাপকান বা আচকান নয়, বরং তার চেয়ে লম্বা জিনিস, সঙ্গে চুড়ীদার পাজামা আর মাথায় দোপাল্লা সাদা রেশমের সূতোর কাজ করা টুপী,—তার সামনে আজ-কালকার আলীগড়ানুমোদিত স-ফেজ আচকান-ময় মুসলমানী পোষাক আমার চোখে অতিশয় সৌষ্ঠবহীন দেখায়। এই সব কারণে চাপকানটা আমার ততটা পছন্দসই নয়, যতটা সাবেক কালের আভিজাত্য অনুসারী দুল্টিদার শেরওয়ানী জাতীয় জামা। যাই হোক্ এই সমস্ত sartorial বা 'পরিচ্ছদ-বিজ্ঞান' ঘটিত খুঁটী-নাটী চিন্তার অবসর ছিল না; দেশ থেকে মনের মতন দেশী পরিচ্ছদ তৈরী ক'রে সঙ্গে আনিনি, আর সঙ্গে বিলিতী ঈভ্‌নিং-সুট্‌ও ছিল না (আর তিন বছর ইউরোপে থাক্‌বার কালে ও পাট কখনও করি-ও নি), ধুতী বা সাদা সুট প'রে যেখানে যাওয়া শোভা পাবে না, সেখানকার জন্য তাড়াতাড়ী একটা কিছু করিয়ে নেওয়া চাই। গিয়ান সিং নামে এক শিখ ভদ্রলোকের মস্ত কাপড়-চোপড় আর দরজীর দোকান চ'ল্‌ছে,—একটী ছোটো-খাটো হোয়াইটাওয়ে-লেড্‌ল-কোম্পানীর দোকান ব'ল্‌লেই হয়; সেখানে কাপড় দেখে জামার মাপ দিয়ে এলুম। দোকানের যে ওস্তাগরটী এসে আমাদের মাপ নিয়ে কাপড় ছাঁটবে, সে পোষাকে ইউরোপীয়, ধর্ম্মে মুসলমান, জাতিতে মিশ্র—তার বাপ ভারতীয়, মা মালাই। মালাই আর ইংরাজি ছাড়া আর কোনও ভাষা জানে না।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে আজ আকাশে খুব ঘনিয়ে মেঘ ক'রে এল', খুব ঝম-ঝম করে বৃষ্টিও প'ড়তে লাগল। নীচে ক্লাব-ঘরের বৈঠকখানাটীতে আমরা জমায়েৎ হ'লুম। সময়োপযোগী বই · হিসাবে আমার সঙ্গে আনা পকেট-সংস্করণ মেঘদূত একখানি ছিল, বা'র ক'রলুম। ব'সে ব'সে পড়া যাচ্ছে, এমন সময়ে কবি নীচে এলেন। বইটা তাঁকে এগিয়ে দিলুম। বর্ষার কবিতার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ চ'ল্‌ল। আমি তাঁকে ব'ললুম—একটী বড়ো লক্ষ্য ক'রবার জিনিস, বৈদিক কবিতায় বর্ষার বড়ো একটা স্থান নেই, দু একটি জায়গা ছাড়া। সাধারণ সংস্কৃতের আর হিন্দী আর বাঙলার বর্ষার কবিতায় আমরা যে রস আস্বাদ ক'রতে পাই—প্রাবৃটের ঘনঘটা, বিদ্যুতের চমকানি, কদমফুল, কেয়া, বিরহিণী, ময়ূর, বৃন্দাবন—এক একটী সংস্কৃত শ্লোকে আর পুরাতন হিন্দী পদে বা মল্লারের গানে যে রস যেন জমাট বেঁধে আছে—'বিজুরী চঙ্‌্অকৈ, মেহা গরজৈ, লরজৈ মেরো জিয়রা। পূরব পছও্আ পও্অন চলতু হৈ, কৈসে বারূঁ দিয়রা॥'—'মহারাজা, কেওআড়িয়া খোলো। ছাই ঘন ঘটা রসকী বূঁদ পড়ে'—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর'—আরও কত ছোটো ছোটো পদ বা পদের ভগ্নাংশ যা আমাদের মনে লেগে আছে,—সেই সবে, আর সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে রস ওত-প্রোত ভাবে মিশে র'য়েছে, তার কোনও পরিচয় কি ভারতের প্রাচীনতম কবিতায় নেই! বর্ষার মধ্যেকার যে রোমান্স, যে মিস্টিসিজম্ বা ভাবের অন্তর্ম্মুখিতা,—এ জিনিস কি প্রাচীন আর্য্যেরা উপলব্ধি ক'রতে পারে নি? অথচ ইন্দ্র বজ্র হেনে বৃত্র অসুরকে মেরে মেঘ থেকে বারি ধারা উন্মুক্ত ক'রছেন, প্রচুর বর্ষা নাম্‌ছে,—পর্জ্জন্য দেব র'য়েছেন, মরুদ্‌গণ র'য়েছেন; বর্ষার কিছু কমী ছিল না, বর্ষার জল পেয়ে ব্যাঙের স্ফূর্ত্তি আর তাদের হাঁক ডাক ও বৈদিক কবি লক্ষ্য ক'রেছেন, তাতে আর কিছু হোক্ না হোক্ তাঁর পরিহাস-রস-বোধ সাড়া দিয়েছে, তিনি গুরুকুলের পড়ুয়া ছেলে বা দক্ষিণাকামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মাঠের মধ্যে গলাসাধায় তৎপর এই দর্দ্দুর-মণ্ডলীর তুলনা ক'রেছেন—কিন্তু বর্ষার মেঘের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, বনের কোমল সবুজ—'মেঘৈর্মেদুর-মম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ"—বৈদিক যুগের চোখে পড়ে নি, তাদের চিত্তকে স্বপ্নাবিষ্ট মোহাবিষ্ট করে নি। অথচ বৈদিক কবি যে কিছু দেখতে জান্‌তেন না, তা তো নয়। আকাশের আলো, ঊষার গোলাপী আর সূর্য্যোদয়ের সোনালী—এইগুলিই তাঁদের চিত্তকে যেন বেশী ক'রে অভিভূত ক'রেছিল। আকাশ, উদার উন্মুক্ত আকাশে ঊষা অন্তে সূর্য্যের উদয়, আকাশ-ভরা আলো, পূর্ণ আলো—এই হ'চ্ছে

যেন বৈদিক প্রকৃতি-বর্ণনার মূলসূত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী ভারতের কাব্য-সরস্বতীর বীণায় প্রকৃতির যে সুরটী বেশী ক'রে আর সব চেয়ে বেশী দরদের সঙ্গে বেজেছে, সেটী হ'চ্ছে বর্ষার সুর, অরণ্যানীর মহিমা। এর কারণ কি?—কারণ সম্বন্ধে আমার একটী মতবাদ আমি কবির কাছে নিবেদন ক'রলুম, যে, বৈদিক কবিতার প্রাকৃতিক অনুপ্রাণনা ভারতের বাইরের, ভারতের ভিতরকার নয়,—ঈরানের মরু প্রান্তরের মধ্যে, তার বিরল-শষ্প পর্ব্বত-পথের মধ্যে, যেখানে ভারতের ঘনঘটাময় প্রাবৃট্‌কাল অজ্ঞাত, সেখান দিয়ে যখন আর্য্যেরা ভারতাভিমুখে আগমন ক'রছিল, সেই সময়েই, ভারতের বাইরে, তাদের কবিরা যে সমস্ত দেবার্চ্চনার ঋক্ সূক্ত বা কবিতা রচনা করেন, তার অনেকগুলিই ভারতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁচেছিল, আর তার পরবর্ত্তী যুগে ভারতে রচিত ঋক্‌সূক্তের সঙ্গে একত্র ঋগ্বেদে আর অন্য বেদে গ্রথিত হয়েছিল। ভারতের বাইরের প্রকৃতির ছাপ বৈদিক আর্য্যের মনে কিছুকাল ধ'রে বিদ্যমান ছিল, ভারতে এসে ভারতের প্রকৃতিকে আস্তে আস্তে সে দেখতে শিখলে। তারপর যখন ভারতে এসে কোল (অষ্ট্রিক) আর দ্রাবিড় অনার্য্যের সঙ্গে আর্য্যদের মেলা-মেশা হ'ল, আর্য্যে অনার্য্যে মিলে যখন ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা গ'ড়ে তুল্‌লে, যখন আর্য্যেরা আর বিদেশী বিজেতা রইল না, তখন ভারতের প্রকৃতি আর্য্যের ভাষার কাব্যে ধরা দিলেন—মহাভারত রামায়ণের কবিতায় ভারতের বন আর ভারতের বর্ষার আকাশ পুরোপুরি ধরা দিলে।—যাই হোক্ মেঘদূত থেকে স'রে আলোচনা ক্রমে প্রাগৈতিহাসিক যুগ আর বৈদিক ভাষাতত্ত্বের দিকে গতি নেবার যোগাড় ক'র্‌ছে দেখে নিজেই 'থ্যামা দিলুম'। কারণ বহুদিন পরে অমন ঘন মেঘের কোলে না'রকেল গাছের চুড়োর পুঞ্জীভূত সবুজ সুষমাকে নিরর্থক আর ব্যর্থ ক'রলে, নিজেকে বঞ্চিত করা হয়, আর কবির উপরও উৎপীড়ন করা হয়। বর্ষা প্রকৃতির শোভার পূর্ণ অনুভূতির মধ্যে তাঁকে একলা রেখে আমার মেঘদূত নিয়ে আমি অন্যত্র চ'লে এলুম।

বিকাল তিনটে সাড়ে তিনটের দিকে বৃষ্টি একটু ধ'রতে আমরা এগ্‌জিবিশনে গেলুম, যেখানে গত রাত্রে 'রোঙ্গেং' নাচ দেখে এসেছিলুম। এগ্‌জিবিশনে আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মালাই শিল্পের নিদর্শন দেখা। একটা ঘরে মালাই জাতির হাতের কাজ নানা সুন্দর সুন্দর জিনিষ সংগ্রহ ক'রেছে। এদের রূপার কাজ বেশ সুন্দর—ছোটো ছোটো জিনিস, কোমরবন্দের কাজ করা রূপার বগ্‌লস, ছোটো ছোটো নক্সাদার বাটী, কৌটো, এই সব; রেশমের লুঙ্গী, অতি চমৎকার সব রঙ; সোনার জরীর কাজ করা, বেনারসী কাপড়ের মত রেশমী কাপড়; ত্রেঙ্গানু-তে তৈরী পিতল কাঁসার বাসন, পানের বাটা; লোহার দা, ছুরী, ইস্পাতের ক্রিস্; পয়সা বা চুরুট রাখবার ঢাকনদার পেটক—নানা রঙে রঙানো বেতের বা তাল-পাতার তৈরী: এই সব। Basket-work বা পাতার বা বেতে বোনার কাজ হ'চ্ছে এদের এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। আমি ছোটো ছোটো দু-একটা জিনিস নিলুম—বেতের কাজের নমুনা হিসাবে। সুরেনবাবু শান্তিনিকেতন কলাভবনের কিছু কিংখাব জাতীয় কাপড় আর অন্য জিনিস সংগ্রহ ক'রলেন।

আজ বিকালে ৫টায় ছিল কুআলা লুম্পুর শহরের মিউনিসিপালিটীর তরফ থেকে কবির অভিনন্দন, স্থানীয় টাউন হলের বাড়ীতে; প্রচুর লোক সমাগম হ'য়েছিল, স্থানাভাবে অনেকে হলে জায়গা পেলে না। চীনা আর তামিল লোকই বেশী ছিল; কিছু পাঞ্জাবীও ছিল। সেলাঙর-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত J. Lornie জে লর্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; সভাপতির আর স্বাগতকারিণী সভায় নেতা শ্রীযুক্ত Loke Chow Thye লোক্-চাউ থাই কবির প্রশস্তি প'ড়লেন, কবিকে মাল্য দান হ'ল, তার পর চমৎকার একটী রূপার আধারে করে তাঁকে অভিনন্দন-সূচক মান-পত্র দেওয়া হ'ল। কবি সংক্ষেপে দু এক কথা ব'ললেন, আর তাঁর জীবনের কার্য্য আর তাঁর বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে যা তিনি ব'ল্‌তে এসেছেন তা পরের দিনের সভায় ব'লবেন ব'ললেন।

সভাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। এঁর নাম স্বামী আদ্যানন্দ। এঁর কাছে শুনলুম

যে কুআলা-লুম্পুর শহরের বাইরে শহরতলীতে মিশনের একটি শাখা আছে। তার সংলগ্ন পাঠাগার আছে, স্থানীয় তামিল হিন্দু যুবকেরা সেখানে গিয়ে থাকে। বাইরেথেকে আগত হিন্দু জনসাধারণ এসে ২।৪ দিনের মতন সেখানে আশ্রয় পায়—কতকটা ধর্ম্মশালার ভাব। বৎসরে কতকগুলি উৎসব হয়। পরমহংসদেবের জন্মদিনে প্রচুর আহার্য্য ভাত তরকারী বিতরণ হয়, তামিল কুলি আর অন্য গরীব লোকে আর ভদ্র হিন্দুরাও এই মহোৎসবে যোগ দেন। চীনাদের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব আছে, এই জন্মোৎসবে তারা স্বেচ্ছায় টাকা দিয়ে সাহায্য ক'রে সৎকার্য্যে 'শরীক' হয়।

আমাদের বাসায় অন্যান্য অভ্যাগত কবিদর্শনেচ্ছুদের মধ্যে একটী পাঞ্জাবী ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। একেবারে প্রৌঢ় নন। হিন্দু। এদেশে কিছুকাল থেকে বেশ পশার জমাচ্ছেন। একটু অত্যধিক সরল লোক। ইনি দেখি, আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বাসার বৈঠকখানায় ব'সে মহা তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। এঁর শ্রোতারা বিশেষ কৌতুক আর পরিহাসমিশ্র ভাবে এঁর কথা শুনছেন। এঁর কথা হ'চ্ছে এই: কবি যে বিশ্ব-ভারতীর আদর্শ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা তাঁর পণ্ডশ্রম হ'চ্ছে। লোকে তাঁর কথা বুঝ্‌বে না। তাঁর উচিত, ভারতীয়দের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রে একটী বড় বিজ্ঞান-মন্দির খোলা। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক আর পদার্থবিৎ সকলে আহূত হবেন, আর তাঁরা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে একটা জিনিস আবিষ্কারের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবেন। জিনিসটা আর কিছু নয়—কোনও রকম সাঙ্ঘাতিক প্রাণহন্তারক রশ্মি—যার নাম আগে থাক্‌তেই তিনি দিয়ে রাখছেন Death Ray. এই রশ্মি ভারতবর্ষের কোনও স্থানে ব'সে পৃথিবীর যেখানে খুশী চালাতে পারা যাবে, আর যে বস্তুর উপরে এই রশ্মি প'ড়বে, তাএকেবারে ধ্বংস হ'য়ে যাবে—poison gas বিষাক্ত গ্যাস্ আর আর লড়াইয়ের বোমায়ও সে রকম ধ্বংস ক'রতে পার্‌বে না। ভারতবাসীরা যে দিন এই Death Ray আবিষ্কার ক'রতে পারবে, সেই দিনই পৃথিবীর তাবৎ জাতি বিশ্বভারতীর বাণী শুন্‌বে, ভারতের সভ্যতায় তাদের আস্থা হবে। ভদ্রলোক নিজে তাঁর এই Death Ray বাদ আর তার কার্য্যে পরিণতির সম্ভাবনা আর উপযোগিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁর কথায় অন্য ভদ্রলোকেরা কেউ তাঁকে উৎসাহিত ক'রে আর কেউ তাঁর সঙ্গে মত-বৈপরীত্য প্রকাশ ক'রে তাঁকে নাচাচ্ছে। কথাটা পাগলের মতন শোনালেও, যে মূল চিন্তা থেকে এই Death Rayর খেয়াল তাঁর মগজে গজিয়েছে সে মূল চিন্তাটি হ'চ্ছে এই—Si vis pacem, para bellum 'যদি শান্তি চাও, তো লড়াইয়ের জন্য তৈরী থাকো'। শক্তির অনুপাতে শ্রদ্ধা, আর শান্তি। অবশ্য এই মনোভাবের বিপক্ষে যুক্তি আছে। যাক্—Death-Ray-ওয়ালা ভদ্রলোকটি কবির কাছে তাঁর প্ল্যানটী কবি যাতে অনুমোদন ক'রে স্বীকার ক'রে নেন তার জন্য বিনীত ভাবে নিবেদনও ক'রেছিলেন। প্রথমটায় কবি একটু চম্‌ক উঠেছিলেন এই অভিনব প্রস্তাব শুনে, পরে তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁকে ব'ল্‌লেন যে তিনিও প্ল্যান বোঝেন না, আপাততঃ তাঁরই প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্ না।

রাত্রে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোজ্ঞ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে কবির নিমন্ত্রণ ছিল, সঙ্গে আমরাও বাদ পড়ি নি; কবির কুআলা লুম্পুরে আগমন উপলক্ষে মনোজ্ঞবাবুর বাড়ীতে যেন কুটুম্ব সমাগম হ'য়েছে, সেরেম্বানের শ্রীযুত নন্দী, মালাক্কার গুহরা, আর অন্য বাঙালী সপরিবারে এঁর অতিথি। বাঙালী ছাড়া স্থানীয় ভারতীয় অন্য কতকগুলি ভদ্র সজ্জনও নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন—সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত তালালা, শ্রীযুক্ত বীরস্বামী, রাও সাহেব শ্রীযুক্ত সুব্বায়া নায়ুডু (ভারত সরকারের প্রতিনিধি, ভারতীয় কুলীদের সুবিধা অসুবিধা দেখিবার জন্য নিযুক্ত) প্রভৃতি। একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রলুম, আর সে সম্বন্ধে কবিও আমাদের কাছে সাধুবাদ ক'রেছিলেন, যে এই বাঙালী ভদ্রলোকটী অন্য ভারতীয়দের মধ্যে কেমন জমিয়ে নিয়ে ব'সেছেন—প্রাদেশিক অভিমান বর্জ্জিত হ'য়ে, অকৃত্রিম হৃদ্যতার সঙ্গে এঁরা যে মেলামেশা ক'রছেন—বাঙালী, তামিল, তেলুগু, সিংহলী, পাঞ্জাবী—এটা দেখে খুবই আনন্দ হ'ল। মল্লিক মহাশয় যে সকলেরই শ্রদ্ধা

আর ভালোবাসার পাত্র হ'য়ে এখানে আছেন, এটা দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ'লুম। আমাদের খাওয়াচ্ছেন বাঙালী ঘরের গৃহিণীরা, আহারের ব্যবস্থা স্বদেশী মতে চমৎকারই হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত নান্দের মহাশয়ের শিশু কন্যার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেওয়া গেল; এই শিশুটী আমার মালয় ভ্রমণের একটী আনন্দময় স্মৃতি। বাঙালী অবাঙালী কেউ কবিকে ছাড়লেন না, তাঁকে গান শোনাতে হ'ল। এইরূপ স্বজাতীয় বান্ধব সম্মিলনে পরম আনন্দে আমরা সন্ধ্যা আর প্রথম যাম যাপন ক'রে বাসায় ফিরলুম।

১লা আগষ্ট ১৯২৭, সোমবার।—

রাও সাহেব শ্রীযুক্ত সুব্বায়া নায়ুড়, মালাক্কায় এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল, ইনি আজ দুপুরের পর এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'র্তে। এঁর কাছ থেকে মালাই দেশের ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছু খবর জানা গেল। শতকরা ৮০ জন শ্রমিক তামিল, ৯ জন তেলুগু ৪ জন মোপলা (মালয়ালম্ ভাষী), বাকী হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী। রবার-বাগানে না'রকল-বাগানে যারা কুলিগিরি ক'রতে আসে, তারা অনেকে অর্থাভাবে স্ত্রী পুত্র নিয়ে আস্তে পারে না। যদি এ-রকম সম্ভাবনা থাকৃত যে তারা যে কয় বছরের মেয়াদ নিয়ে বাগানে খাট্‌তে যাচ্ছে, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে, নিজে ধান চাষ কর্‌বার জন্য বা ফল ফুলুরীর তরী-তরকারীর বাগান কর্‌বার জন্য সরকারের কাছ থেকে এক টুকরো জমী পাবে, তা হ'লে প্রায় সকলেই স্ত্রী পরিবার নিয়ে এসে এদেশে কায়েমী অধিবাসী হ'য়ে যেত। কিন্তু এ তাবৎ এদের ছোটো একটু ক'রে ভূখণ্ড পাবার কোনও সুযোগ ঘ'টুছে না। তাই এই সব ভারতীয় কুলীর অবস্থা হ'য়েছে ত্রিশঙ্কুর মতন, বা ধোবার কুকুরের মতন, 'ন ঘর-কা, ন ঘাট-কা'। কিছু টাকা জমিয়ে যদি ঘরে ফির্‌ল, সে টাকা দুদিনে ফুঁকে দিয়ে আবার এল কুলিগিরি ক'র্তে। তবে এরা স্ত্রী পুরুষে খাটে ব'লে অনেকে আবার সস্ত্রীক ও আসে। সমস্যা হ'চ্ছে, কি করে জমী দিয়ে এ দেশে এদের বসানো যায়। মালাই সরকার (আর কতকটা ইংরেজও) নারাজ—দেশে বেশী ভারতীয় বাস করে এটা পছন্দ ক'রছে না। অথচ দেশে বিস্তর জমী প'ড়ে আছে, মানুষের অভাবে আবাদ হ'চ্ছে না। শ্রীযুক্ত সুব্বায়া ব'ল্‌লেন যে ভারত সরকারের লেখা লেখি চ'ল্‌ছে মালয় সরকারের সঙ্গে যাতে ভারতীয় কুলীরা মেয়াদ অন্তে কিছু করে চাষের জমী পায়, আর তিনি আশা করেন যে এ বিষয়ে মালয় সরকার অনুকূল হবে।—তাঁর মতে মোটের উপর কুলীদের নৈতিক অবস্থা ভালোই। বিকালে একদল পাঞ্জাবী এল' কবিকে দর্শন ক'রতে—শিখ, হিন্দু, মুসলমান। এদের মাতব্বর হিসাবে সঙ্গে ছিল এক মুসলমান ফৌজী লোক, বোধ হয় কোনো ধনী চীনা বা অন্য জাতীয় লোকের বাড়ীতে দরওয়ানী করে। সকলেই সামান্য কাজ করে, মিস্ত্রী, মোটর চালক প্রভৃতি। দুই একজন অর্দ্ধ-শিক্ষিত হিন্দুও আছে, এদেশে চাকরীর প্রত্যাশায় এসেছে। কবি তখন অন্য কতকগুলি লোকের সঙ্গে কথা কইছিলেন, তাই আমাকে খানিকক্ষণ ধ'রে বাড়ীর হাতার ময়দানে ব'সে ব'সে এদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুল্‌তে হ'ল। মুসলমান ফৌজী লোকটী জানালে যে সে শুনেছে যে কবি একজন আলা দর্‌জার শাএর অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর কবি তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর প্রতি খোদা-তালার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি তসওউফ্ বা সুফী সাধকের যোগ্য ব্রহ্মজ্ঞানও পেয়েছেন। এই শ্রেণীর লোকেরা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নমস্য। তাই তাঁরা তাঁর দর্শনের জন্য এসেছে। আমি সংক্ষেপে বিশ্বভারতী, কবির কি উদ্দেশ্যে এই বৃদ্ধ বয়সে ভ্রমণে বহির্গমন, এই সব সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌লুম। কবিকে উপহার দেবার জন্য সঙ্গে ক'রে এরা নিয়ে এসেছিল একটা সামান্য জিনিস —রং-করা ছোটো একটী মাটীর ভাঁড়ে একটী কাপড়ের গোলাপ গাছ, তাতে দুটো লাল কাপড়ের ফুটন্ত গোলাপ, একটী কালো পাখী গোলাপের পাশে ব'সে আছে। কবির কাছে এদের নিয়ে যেতে এরা তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়াল, ফৌজী লোকটী উর্দ্দূতে বিনয় ক'রে তার আনীত উপহারটী দিলে, ব'ল্‌লে যে কবি হ'চ্ছেন ভারতের বুলবুল, ভারতের দিল্ হ'চ্ছে গোলাপ, তার কাছে কবি তাঁর গান শোনাচ্ছেন তাকে মুগ্ধ ক'রে দিচ্ছেন, তাই কাপড়ের তৈরী এই গুল্ আর বুলবুলের মূর্ত্তি তারা এনেছে। কবি এই সকল অতি সাধারণ লোকের কাছ থেকে এই

ভাবে সমাদর পেয়ে আনন্দিত হ'লেন, যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে খুশী ক'রে সকলকে বিদায় দিলেন। আমি এদের প্রত্যুদ্গমন করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এলুম। একটা পাঞ্জাবী হিন্দু ছোকরা আমার কাছে এসে অতি বিনীতভাবে তার উর্দু-মিশ্র পাঞ্জাবী গ্রাম্য উচ্চারণের ইংরেজিতে ব'ল্‌লে যে, "মিডিল্"আর"সকুল্-ফায়্নল্" বা "ম্যাট্রিকিউল্যাশন্" পাস-করা সুযোগ্য ভারতীয় লোকেদের এদেশে চাকরী জুট্‌ছে না, সে শেষোক্ত পরীক্ষা পাস ক'রে এসেছে, কোনও কিছুর সুবিধা হ'চ্ছে না, বেকার ব'সে থাকতে হ'চ্ছে—কবির সঙ্গে গভর্ণর সাহেবের বন্ধুত্ব আছে, লাটবাড়ীতে তিনি মেহ্‌মান্ বা অতিথি ছিলেন এ কথা সে কাগজে প'ড়েছে,—এখন হুজুর যদি কবিকে ব'লে দেন আর কবি যদি গভর্ণর সাহেবকে এক ছত্র লিখে দেন তা হ'লে বিস্তর বেকার শিক্ষিত ভারতীয় যুবকের এই মালাই দেশে একটা হিল্লে হ'য়ে যায়—আর বিশেষতঃ যখন ভারতীয়দের তরক্কী বা উন্নতি হোক্ এটা তাঁর বিশেষ কাম্য বস্তু।

কতকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক সপরিবারে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এলেন। দূর দূর জায়গা থেকে এসেছেন, এঁদের কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেই উঠেছেন। এখানে ফেডারেটেড্ মালাই ষ্টেট্‌স্-এর সরকারে চাকুরী করেন, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। এদেশে কারু কারু অনেক বৎসরের বাস। এঁদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে প্রতিবেশী এক গুজরাটী ভদ্রলোকের স্ত্রীও এসেছেন। ছেলে-পুলে এখানেই বড়ো হ'য়েছে। দেশে যাওয়া কচিৎ ঘটে, এক বছর দু বছর অন্তর। ছোটো বড়ো ছেলে মেয়ে কতকগুলি দেখলুম। খোঁজ নিলুম, এদের অনেকে ভালো ক'রে বাঙলা ব'ল্‌তে পারে না। খেলুড়ীদের সঙ্গে মালাই বলে, অন্য লোকেদের সঙ্গে মালাই, এমন কি কখনো কখনো বাপ-মারও সঙ্গে ছেলেরা মালাই বলে। ইস্কুলে শেখে আর বলে খালি ইংরিজী। এক্ষেত্রে তারা যদি বাঙলা না শেখে, বা ভুলে যায়, তাদের দোষ কি? এঁদেরই একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ছেলেকে দেখলুম, খাসা বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত চেহারা, চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি, এই দেশেই বড়ো হ'য়েছে, এখানকার ইস্কুলে বরাবর প'ড়ে পাস ক'রে এখানেই একটা সরকারী ইস্কুলে মাষ্টারী ক'র্‌ছে, এর ছাত্রেরা তামিল, চীনে, পাঞ্জাবী, মালাই; এ কিন্তু বাঙলা কইতে পারে না। ছোকরা বাঙলায় আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে পার্‌লে না ব'লে বিশেষ দুঃখিত আর লজ্জিত হ'ল, তবে প্রতিশ্রুতি দিলে যে মাতৃভাষার চর্চা ক'র্‌বে। এর দিন কয়েক পরে আবার যখন অন্যত্র তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন সে আমার সঙ্গে দু চারটে কথা বাঙলাতেই ক'য়েছিল।

২রা আগষ্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার।——

আজ কবির শরীর অসুস্থ, জ্বরভাব মতন, আর অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব ক'র্‌ছেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে বিকালে তাঁর বক্তৃতা দিতে হ'ল—আগে থাক্‌তেই যা ঠিক হ'য়ে ছিল। চীনা থিয়েটার (থিয়েটারটীর নাম Drury Lane Theatre!—আমাদের Minerva Theatre, Star Theatre, Classic Theatre, Emerald Theater, এমন কি Thespian Temple ব'লেও ক্ষণিকের জন্য এক বাঙলা থিয়েটার হ'য়েছিল, সেই সব বাঙলা থিয়েটার-ওয়ালাদের বিদেশী নামের প্রতি প্রীতি স্মরণ করিয়ে দেয়)—স্থানীয় চীনা থিয়েটার হলে তাঁর বক্তৃতা, চীফ সেক্রেটারী সাহেব হলেন সভাপতি। বক্তৃতা হয়েছিল সুন্দর; ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, সমগ্র জগতের জাতিগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, এই বিষয়ে কবি ব'ললেন। বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্য করবার জন্য টিকিট বিক্রী ক'রে স্থানীয় ভারতীয় আর চীনারা মিলে এক Variety Entertainment করে, এটী রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত চ'লেছিল। কবিকে রাত্রে আহারের পরে এক সময়ে এসে তাঁর ইংরেজী কবিতা গুটি পাঁচেক পাঠ ক'রে যেতে হয়েছিল। আমরা এই entertainment এ ছিলুম—নানান দিক্ দিয়ে এটী বেশ কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হয়েছিল। এর প্রোগ্রামটীতে এই জিনিষগুলি ছিল:—একটী চীনা ক্লাবের ব্যাণ্ড কর্ত্তৃক ইউরোপীয় গত বাজানো; দুটী চীনা নাটিকা—Yan Kheng Benevolent Dramatic Association কর্ত্তৃক আধুনিক চীনা সমাজ অবলম্বন ক'রে ছোটো একটী হাল ফ্যাশানের নাটক আর Chui Lok Amateur Dramatic Association কর্ত্তৃক সেকেলে ধরণের

একটী চীনা নাট্যাভিনয়; আরও ছিল Chin Woo বা চীনা কসরৎ, কতকটা জাপানী জিউ-জুৎস্থর মতন; চীনা যুবকদের জিম্‌নাষ্টিক; Selangor Chinese Women's Athletic Association এর চীনা মেয়েদের নাচের তালে জিম্‌নাষ্টিক আর ব্যায়াম প্রদর্শন; আর স্থানীয় Vivekananda Tamil Girls' School এর ছোটো ছোটো মেয়েদের গানের সঙ্গে নাচ—Kollattam কোল্লাট্টম্ এই নাচের নাম। চীনাদের Chin Woo চিন্‌-উ কসরৎ আগে কখনো দেখিনি, এর নামই শুনিনি, এটীকে কার্য্যকারিতায় জিউ-জুৎস্থর প্যাঁচের চেয়ে কম ব'লে মনে হ'ল না। চীনে মেয়ে আর পুরুষদের ব্যায়াম প্রদর্শন দেখে বেশ মনে হ'ল চীনা জাতটা এদেশে এসে ঘুমিয়ে নেই, এরা একেবারে যেন তৈরী হ'য়ে রয়েছে। চীনা boy scout বা ব্রতী বালকেরা খুব চতুর, চটপটে। চীনাদের একটা অদম্য প্রাণবন্ত উৎসাহ সব কাজেই দেখা যায়, সেটার সামনে ভারতীয়েরা মরারও অধম। আধুনিক চীনার কার্য্যকারিতা আর ভারতের নিষ্ক্রিয়তা, এই দুই জাতের মেয়েদের প্রদর্শিত ব্যায়াম ক্রীড়ায় আর নাচগানে পরিস্ফুট হ'ল। চীনা মেয়েরা খুব যোগ্যতার সঙ্গে ড্রিল দেখালে, তাদের নৃত্য-মিশ্র ব্যায়াম-রীতি, আর নাচ দেখালে। তাতে সমস্ত জিনিসটাতে কোথাও শালীনতার ত্রুটী দেখলুম না, বরং এদের মেয়েদের শিক্ষায় একটী বেশ দার্ঢ্য ভাবের সমাবেশ দেখা গেল, যেটা হয় তো এই যুগে আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে। চীনারা বন্দোবস্ত ক'রেছে, অনেক ক্লাব ব্যায়াম-শালা নিজেরা চালাচ্ছে, কিন্তু বাইরে তাই নিয়ে হৈ-চৈ নেই। ভারতীয় শিশু মেয়ে কতকগুলি হাতে দুটো ক'রে রঙীন ছড়ি বা কাঠি নিয়ে ছড়িগুলি মাঝে মাঝে ঠুকেঠুকে কখনো বৃত্তাকারে কখনো ঘুরে ফিরে নাচ্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে ভজন-জাতীয় তামিল গানও চ'ল্‌ল। ছোটো মেয়েদের সামান্য নাচ—এই হ'ল ব্যাপার। কিন্তু একটী তামিল ভদ্রলোক এই কোল্লাট্টম্ নাচের cosmic বা আধ্যাত্মিক এক ব্যাখ্যা ক'রে লম্বা দুতিন পৃষ্ঠার এক বিরাট লেখা তৈরী ক'রে এনে আমাদের হাতে দিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে কবি সেটা প'ড়ে এই নাচের গভীর অর্থটী উপলব্ধি করেন।

চীনে নাটিকা দুটীর মধ্যে যেটী হাল-ফ্যাশানের, সেটীর কথা বস্তু হ'চ্ছে একটী শিক্ষিত পরিবারে নানা হাস্যরসের কথার মধ্যে কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা—আর রবীন্দ্রনাথের উপরে যে কবিতাটী একটী যুবক লিখলে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে সেইটীকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হ'ল। নাটকের এই কবিতাটীর একটা ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হ'য়েছিল, আমাদের অবগতির জন্য, চীনা ভাষায় লেখা প্রোগ্রামের মধ্যে। অনুবাদের ইংরেজীটা ঠিক বিশুদ্ধ না হ'লেও, তার আশয় থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এখানকার চীনারা যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান ক'রেছে সেই শ্রদ্ধার হার্দিকতা আর গভীরতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

দ্বিতীয় নাটিকাটী তার আখ্যায়িকা বিষয়ে মামুলী ঢঙের জিনিস। তবে একটী বাঁচোয়া ছিল যে, এই নাট্যে চীনা ঝাঁঝ, কাঁসা আর কাঁসীর "ঐক্যতান বাদন" ছিল না। গল্পটী এই:—শাশুড়ী বউয়ের উপর বড়ই অত্যাচার করেন, আদর্শ মাতৃভক্ত পুত্র, বউয়ের স্বামী, মায়ের এই দুর্ব্যবহারের প্রতীকারের জন্য কিছু ক'রতে না পেরে, মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধ মঠে গিয়ে ভিক্ষু হ'য়ে গেল, বউটী অনেক যন্ত্রণা সহ্য ক'রে আদর্শ চীনা পুত্রবধূর মতন শাশুড়ীর সেবা ক'রলে; পরে হ'ল শাশুড়ীর মৃত্যু। এইখানে নাটক আরম্ভ। বউটী তার নিরুদ্দেশ স্বামীকে এখন খুঁজতে বা'র হ'য়েছে। ষ্টেজে এসে কতক falsetto গলায় গান গেয়ে, কতকটা বা 'গদ্যচ্ছন্দ' আউড়ে মেয়েটী দর্শকদের কাছে নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়ে দিলে। তার পর চীনা ভিক্ষুর পোষাকে মাতৃভক্ত স্বামী মহাশয়ের প্রবেশ, হাতে জপমালা আর একটী চামর, মুখে একেবারে নির্ব্বিকার পুরুষের ভাব। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে চিনতে পারলে। স্ত্রীর কাতর মিনতি, স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। স্বামী তখন মঠের মধ্যে ধর্ম্মের শান্তি পেয়েছেন—স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে, ভিক্ষুর ব্রত ভাঙা অধর্ম্ম এই বুঝিয়ে, তাকে বিদায় ক'রে দিলেন। যে অভিনেতা মেয়েটী অভিনয় ক'রছিল তার ভাবে, ভঙ্গিতে, গানে, কথায় একটা ব্যাকুলতা, একটী একাগ্র আহ্বান বেশ ফুটে উঠেছিল। স্বামীটীর এই ধর্ম্মপ্রাণতা আমাদের

মোটেই অনুমোদিত না হ'লেও, বৌদ্ধ ভিক্ষুর অভিনয়ে এমন সুন্দর একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব, তার গানের সহজ সুরে এমন একটা ধীর শান্ত ভাব অভিনেতা এনেছিল যে মনে মনে তাকে আমরা খুবই সাধুবাদ দিচ্ছিলুম। স্বামীর ভূমিকার অভিনেতা ছোকরা শুনলুম এখানকার এক বহু লক্ষপতির বংশধর।

পুস্তক-পরিচয়

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন, বি-টি কর্ত্তৃক পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্য-ঘটিত বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত, এবং দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও যাজ্ঞবল্ক্য দর্শন-বিষয়ক ভূমিকাসহ সম্পাদিত, কলিকাতা ২১০।৩.২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট "দেবালয়" নামক ভবনের ত্রিতল গৃহে সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

অনুবাদক ও সম্পাদক মহোদয়দ্বয়ের নাম সুধীসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। এই পত্রিকায় ছান্দোগ্যোপনিষৎ সমালোচনাকালে ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। এক্ষণে গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য।

গ্রন্থের মূলাংশ বিভক্ত করিয়া যেভাবে পদপাঠ মধ্যে প্রত্যেক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং ব্যাকরণের নিয়ম উল্লেখপূর্ব্বক দুরূহ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাতে একদিকে এই উপনিষৎখানির ভাষা বুঝিতে বালকেরও আর কষ্ট বোধ হইতে পারে না, অন্যদিকে আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর বৈদিক ভাষার মধ্যে প্রবেশের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। যদি ইহাতেও উপনিষদের বক্তব্য সহজে বুঝা না যায়, তজ্জন্য এই পদপাঠের নিম্নে যে আক্ষরিক অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে মূলগ্রন্থে কি বলা হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই দুইটি বিষয়, বিশেষতঃ পদপাঠের জন্য, অনুবাদক মহাশয় অমর হইয়া থাকিবেন। অনুবাদক মহাশয়ের এই উদ্যমের ফলে বৃহদারণ্যক উপনিষৎখানি বোধ হয় সাধারণের মধ্যেও আদৃত হইবে, সাধারণের উপনিষৎপাঠে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

মন্তব্য-মধ্যে অনুবাদক মহাশয় একাধারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শঙ্কর, আনন্দগিরি, প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণের সহিত মূলের স্পষ্টার্থ মাত্র প্রদর্শনের অনুরোধে যেখানে যেখানে তাঁহার মতভেদ ঘটিয়াছে, সে সমস্তই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মোক্ষমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পাণ্ডিতবর্গের মতামতও তিনি এই উপলক্ষ্যে উপেক্ষা করেন নাই। এই প্রসঙ্গে দেখা যায় তিনি বহুস্থলে অপরের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম করেন নাই। আমাদের মনে হয়, ইহা দিলে ভালই হইত। এই অংশে শ্রদ্ধেয় মহেশবাবুর অসাধারণ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, তিনি তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘকালের উপনিষৎ-চিন্তার ফল আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিলেন। এজন্য বেদান্ত-চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বোধ হয় শ্রদ্ধেয় মহেশবাবুর নিকট নিজেকে ঋণী জ্ঞান করিবেন।

গ্রন্থশেষে অতিরিক্ত মন্তব্য মধ্যে শ্রদ্ধেয় মহেশবাবু উপনিষদ্ যুগের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতা যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার সুরুচিসম্পন্ন সুসংযত মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই উপনিষদের আখ্যায়িকা-ভাগ মধ্যে কতিপয় আচার-ব্যবহার প্রাচীন যুগের আচার ব্যবহার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে দুর্নীতি ও বর্ব্বরোচিত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রদ্ধেয় অনুবাদক মহাশয়ের যত্নে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ দুইখানি সাধারণেরও সুখপাঠ্য হইল, এবং উপনিষদ্ আলোচনার স্বাধীন চিন্তার পথ প্রশস্ত হইল।

এইবার সম্পাদক মহাশয়ের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচ্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় দশখানি উপনিষদ্ ইতঃপূর্ব্বে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-প্রকাশে তাঁহার বাধা ঘটে; শ্রদ্ধেয় মহেশবাবুর পরিশ্রমের ফলে তাঁহার সেই উপনিষৎ-প্রকাশ বাসনা পূর্ণ হইল। তিনি যেরূপ দক্ষতা সহকারে এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতেই এই পুস্তকের কাঠিন্য বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। বলিতে কি অনুবাদক মহাশয়ের উদ্দেশ্য, সম্পাদক মহাশয়ের চেষ্টায় সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে মনে হয়।

মুখবন্ধ ও ভূমিকা মধ্যে তিনি যেসব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরও বহু শিক্ষণীয় বিষয়ই আছে। পাশ্চাত্য ভেদাভেদ-বাদ বা হেগেলের মতবাদকে সত্যজ্ঞান করিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া তিনি ইহা লিখিয়াছেন, এবং উপনিষদে সেই বাদই অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব যাহাতে এই দৃষ্টিতে পাঠকগণ উপনিষৎ পাঠ করেন, তজ্জন্যই তাঁহার এই ভূমিকা রচনা। বলা বাহুল্য, এই মতবাদটিই আজকাল ইংরেজী শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে। যাঁহারা ভারতীয় অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের আলোচনা ও প্রচার কামনা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এই উদ্যম হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্য পাইবেন। কিন্তু এই ভূমিকা মধ্যে যাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহা তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অত্যধিক স্বাধীন চিন্তাপরায়ণতা। তিনি মহর্ষি

যাজ্ঞবল্ক্যকে যথোচিত সম্মান করিয়াও তাঁহার নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদকে সাধ্যমত আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন নাই, বিচার মল্লের নির্ভীকতা ইহাতে তিনি বড় কম প্রদর্শন করেন নাই। তবে যাঁহাদের কৃপায় অশেষ শত্রু সংঘ স্মরণাতীত কাল হইতে বিধ্বস্ত করিয়া আজও বেদগ্রন্থ বর্ত্তমান, সেই মীমাংসক প্রভৃতিগণের দৃষ্টিতে উপনিষদ আলোচিত হইলে এই গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই অন্য আকার ধারণ করিত। যাহা হউক, তিনি এই প্রসঙ্গে যেসব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আজীবন সাধনার ফল, তাঁহার সূক্ষ্মচিন্তার চরম উৎকর্ষাবস্থা, তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিতে হইলে, প্রাচ্য দার্শনিক চিন্তার পরম পরিষ্কার যেসব গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই জাতীয় প্রাচ্য দার্শনিক গ্রন্থে অভিজ্ঞতা আবশ্যক, ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃত, মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি, প্রভৃতি গ্রন্থের জ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এই আলোচনা ও আক্রমণের ফলে যদি পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সমাজে এই-সব গ্রন্থের যথারীতি পঠনপাঠন হয়, তাহা হইলে সাধারণের মহা উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আমরা এ গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞান (The Wisdom of Solomon) ও **মার্ক-কথিত মাঙ্গলিক** (S. Mark's Gospel), শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায় অনুদিত ও খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার সমিতি হইতে প্রকাশিত, প্রত্যেকখানির মূল্য ।৹ আনা।

বাঙলা দেশে খৃষ্টধর্ম্ম বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নানা পুস্তকেরও বাঙলায় অনুবাদ হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু যাঁহাদের জন্য এই সমস্ত পুস্তক লেখা হইয়াছে তাঁহারা তাহা পড়িতে পারেন না। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, এই পুস্তকগুলির বাঙলা নিতান্ত ভয়ঙ্কর। একথা বলাই বাহুল্য যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকসমূহে অবশ্যজ্ঞাতব্য ও উপাদেয় নানা কথা ও ভাব আছে, এবং শুদ্ধ চিত্তে পড়িলে ইহা হইতে অনেকের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রধানত অনুবাদের ভাষার দোষে বাঙালী পাঠকদের নিকট ঐ-সমস্ত পুস্তক একবারে অপাঠ্য হইয়াই আছে। চুনীবাবু এই দুইখানি পুস্তকের যে রীতিতে ও ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। বস্তুতই তিনি ইহা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। আমরা যাহাতে অতি সহজেই ঐসব গ্রন্থে আলোচিত বিষয়-সমূহকে বুঝিতে পারি, তাহার উপায় তিনি করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

তাঁহার নিকটে আমাদের একটি অনুরোধ আছে, তাঁহার উল্লিখিত বই দুইখানি দেখিয়াই ইহা বলিতেছি তিনি যদি The Imitation of Christ নামক পুস্তকখানি অবিকৃতভাবে বাঙলায় অনুবাদ করিয়া দিতে পারেন তো বস্তুতই অনেকের উপকার করিবেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ছুটির বই—শ্রীজগদানন্দ রায়—প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, মূল্য এক টাকা

রায় সাহেব জগদানন্দ রায় মহাশয় বৈজ্ঞানিক বিষয় শিশুদের উপযোগী করিয়া লিখিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি ইতিপূর্ব্বেই কয়েকখানি গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া শিশু-সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে আচার্য্য জগদীশের আবিষ্কার ও অন্যান্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বইখানি শিশুসমাজে সমাদর লাভ করিবে।

পল্লীর আলো—শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৯৫ পৃষ্ঠা। সিল্কে বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১।৹ ; প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

আমরা এই উপন্যাসখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম। চরিত্র ও গল্পের ভিতর দিয়া গ্রন্থকার প্রায় প্রতি অধ্যায়ে জাতীয় মুক্তির বাণী ও আধুনিক ভাবধারা অতি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ বই ঘরে ঘরে পঠিত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে।

ঘূর্ণী পথে—শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক শ্রীমুরারী-মোহন মুখোপাধ্যায়, বেহালা। দাম পাঁচ সিকা।

উপন্যাস। দুই বন্ধুর অদ্ভুত প্রেমের অভিব্যক্তি। দীপ্তিময়ের স্বভাবটা আগাগোড়াই নারীর মত কোমল, ভাব-প্রবণ, কিশোরীর মত মান-অভিমান-ভরা। শেষে একটি মেয়েকেই দীপ্তি ও মণি দুই বন্ধুরই ভালবাসা, মণির দীপালিকে লাভ ও দীপ্তিময়ের নিরুদ্দেশ হওয়া। দীপ্তিময়, মণি ও দীপালিকে লইয়াই বইখানা, তাহাদের আশেপাশে আর কেহ বা কিছু নাই। এ যেন গাছের সব ছাঁটিয়া দিয়া গুড়িটি দাঁড় করানো।

যাহা হউক,—বইটির লেখা সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন। রচনায় কৌশলও আছে। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

উপাসনা রহস্য বা সাধন তত্ত্বাভাস—শ্রী শ্রীধরচন্দ্র ভক্তিরত্ন সিদ্ধান্ত বাচস্পতি সঙ্কলিত। পৃঃ ১৭৬ ; মূল্য ১৲। প্রাপ্তিস্থান শ্রীচন্দ্রশেখর বাগ, মহিষাদল পোঃ মেদিনীপুর।

গ্রন্থকার যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতি নিম্নস্তরের কথা। কিন্তু বাহ্য পূজাই যাঁহাদিগের আদর্শ, তাঁহারা এই পুস্তক পড়িয়া সুখী হইবেন।

হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা, প্রথম ভাগ—মৌলবী শেখ ইদ্রিস আহমাদ্ বি, এ প্রণীত। পৃঃ ৫১ ; মূল্য ।৵৹

'হাদিস' মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র; ইহার স্থান কোরাণের নিম্নেই। এই হাদিস অবলম্বন করিয়া এই পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে। ইহার আলোচ্য বিষয়—'স্ত্রী-সম্মান', বিবাহে মতামতের স্বাধীনতা, স্ত্রী-বর্জ্জন, ইত্যাদি।

কোরাণের মহাশিক্ষা ; দ্বিতীয় ভাগ—মৌলবী শেখ ইদ্রিস আহ্‌মাদ বি-এ প্রণীত। পৃঃ ৫৮ ; মূল্য ৷৹

আলোচ্য বিষয়—"মহিমাময় খোদা", নামাজ-প্রার্থনা, দুনিয়া, পরকাল, কোরবানি, মহাজন ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, পরনিন্দা, অশান্তি ও অত্যাচার, ন্যায় বিচার, ইসলাম ধর্ম্মে উদারতা ইত্যাদি। পুস্তিকাতে অনুবাদসহ মূল আরবী দেওয়া হইয়াছে।

কবিতা কুসুমাঞ্জলি—পৃঃ ৪৩; মূল্য।৵০

কবিতাসমূহ রচনা করিয়াছেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম-এ। দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে।

মনই আত্মা ও বিশ্ব; তৃতীয় খণ্ড—লেখক শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ানিবাস, পুরী। পৃঃ ২৪০+৪১; মূল্য ২৲।

এ পুস্তক ছাপাইবার কোন আবশ্যক ছিল না। জগৎ অনেক অগ্রসর হইয়াছে।

কবি-দর্পণ—শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে প্রণীত। (৯১/২×৭); পৃঃ ১০৪; মূল্য ১৲ প্রাপ্তিস্থল—গ্রন্থকার, পোঃ কালীর বাজার, কাঠাল, ময়মনসিংহ।

কয়েকজন পথিকের আত্মকাহিনী, পদ্যে লিখিত।

নির্ম্মাল্য—লেখক ও প্রকাশক—শ্রী নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপক। পৃঃ ৯০; মূল্য।৵০

ইহাতে সেবাধর্ম্ম, পল্লীগ্রামের উন্নতি, জাতীয়তা গঠন, সাধারণ পুস্তকাগার, ভারতে মৃগয়া প্রথা, লিপিবিদ্যা—এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। সংস্কৃতে লিখিত একটি সরস্বতী স্তোত্রও আছে।

নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাও আমরা পাইয়াছি।

১। মালা, শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত। (২২টি কবিতা)।

২। নাপিত বিজয়, ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ শীল শর্ম্মা প্রণীত।

৩। মর্ম্মবাণী, শ্রীরসময় দাস প্রণীত (১৭টি কবিতা)

৪। অমিয়, শ্রীবসন্তকুমার কাব্যতীর্থ প্রণীত (কবিতা, ধর্ম্ম-বিষয়ক)।

৫। প্রসূনাঞ্জলি, শ্রীবৈদ্যনাথ পাল প্রণীত (কবিতা)।

৬। অবাক্, শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত (ব্যঙ্গ কবিতা)।

৭। বিধবা বিবাহ, শ্রীহৃদয়চন্দ্র দেব প্রণীত (বিধবা-বিবাহ-সমর্থক কবিতা)।

৮। মাতৃস্নেহ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত (একটি গল্প)।

৯। সতী কাহিনী, দীনতারিণী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১০। সমাজ বিজ্ঞান, শ্রীস্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত।

১১। সাধনার পথে, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত।

১২। প্রফুল্ল (একজন ছাত্রের জীবনী)

১৩। বাঙ্গালি নামের অর্থ কি? শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী প্রণীত।

১৪। মুক্তি মন্দির, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার প্রণীত। (ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রবন্ধ)।

১৫। শিক্ষা বিজ্ঞানের সম্ভাবনা ও তাহার মূল্য, Ward James প্রণীত Psychology applied to Education নামক পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদের অনুবাদ। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক অনূদিত (মূল গ্রন্থ উপাদেয়; বঙ্গভাষায় সমগ্র গ্রন্থ অনূদিত হইলে তাহাও মূল্যবান্ হইবে)।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সাত রাজ্যের গল্প—শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আট আনা।

তেপান্তরের মঠ—শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিঃ, এলাহাবাদ। আট আনা।

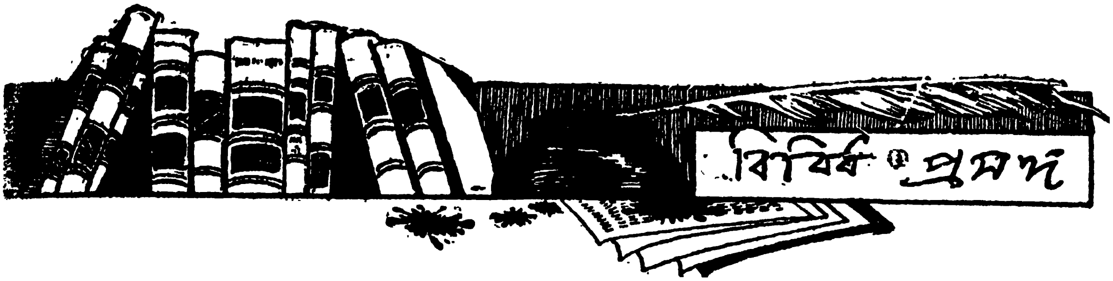
দুইখানি সুচিত্রিত পুস্তকই ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত। প্রথম পুস্তকে নয়টি এবং দ্বিতীয় পুস্তকে বড় তিনটি গল্প আছে। ছেলেদের জন্য রচিত হইলেও গল্পগুলি বুড়াদের কম উপভোগ্য নয়। গল্পগুলির বাঁধুনী, অতি চলিত রীতিতে বলার কৌশল ও মনোহারী ভাষা অতিশয় প্রশংসার যোগ্য। কার্ত্তিকবাবুর শিশুসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা এই সুন্দর গল্প পুস্তক দুইটি ছেলেদের হাতে দেখিলে সুখী হইব। দ্বিতীয় পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

পাঞ্চজন্য—শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিঃ, এলাহাবাদ। বারো আনা।

বাংলা পদ্যে গীতার অনুবাদ। পদ্য আধুনিক দ্বাবিংশাক্ষর ছন্দে গ্রথিত। মূল সংস্কৃতের ভাব প্রকাশের জন্য দীর্ঘ পয়ারের প্রয়োজন বটে, এবং সে বিষয়ে অনুবাদক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহার ছন্দে মাঝে মাঝে ত্রুটিও লক্ষিত হয়। সুশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে তাঁহার অনুবাদ আদৃত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষে এ অনুবাদ সহজ হইবে না, অথচ গীতার বাংলা অনুবাদ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অল্পশিক্ষিত লোকদের উপযোগী হওয়াই দরকার।

গুপ্ত

"আদি গুজরাতী সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি বর্ত্তমান সংখ্যার জন্য মুদ্রিত হওয়ার পর দেখিলাম, লেখক ইহাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কোন কোন কথা অন্য একটি মাসিক পত্রেও লিখিয়াছেন। কোন লেখক একই বিষয়ে বা সদৃশ বিষয়ে যুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন কাগজে প্রবন্ধ লিখিলে সম্পাদকদিগকে তাহা জানান বাঞ্ছনীয়।—প্রবাসীর সম্পাদক।



বিদেশে ভারতের মিথ্যা সংবাদ

বিদেশে ভারতবর্ষের সংবাদ প্রেরণের উপায়গুলি বিদেশীদের হাতে। আমাদের নিজের কোন উপায় নাই। রয়টারের তারের খবর বিদেশী কোম্পানীর দ্বারা প্রেরিত হয়। বেতার বার্ত্তাও বিদেশীদের দ্বারা প্রেরিত হয়। আমরা পয়সা খরচ করিয়া খবর পাঠাইতে পারি বটে; কিন্তু নিয়মিত সংবাদ পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা ভারতীয়দের নাই, তাহার জন্য কোন কোম্পানী গঠিত হয় নাই। "ফ্রী প্রেস" অল্প স্বল্প বিলাতী খবর এদেশে পাঠাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এই মান্দ্রাজী দেশী কোম্পানী নিয়মিত খবর পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বিলাতে তাঁহাদের একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন।

ভারতীয়েরা যদি এদেশ হইতে বিদেশে সত্য সংবাদ পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলেও তাহা পাঠাইতে হইবে ইংরেজের তার মারফৎ, কিংবা ইংরেজের অধিকৃত আকাশ-তরঙ্গের মারফৎ। সুতরাং যে যে সত্য সংবাদ ইংরেজদের খুব বেশী প্রতিকূল হইবে, তাহার সমস্তটিই বা কোন কোন অংশ প্রেরিত হইবে না, কিংবা বিলম্বে প্রেরিত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও খবর পাঠাইবার বন্দোবস্ত আমাদের থাকিলে অধিকাংশ সংবাদ বিদেশে পৌঁছিতে পারে।

কিন্তু শুধু পৌঁছিলেই ত হইবে না; খবরগুলি বিলাতী ও অন্য বিদেশী কাগজে ছাপা হওয়া চাই। ইংরেজদের কাগজে ভারতীয় খবর বেশী ছাপা হইবার সম্ভাবনা কম; সব জাতিই নিজের ভাবনাই বেশী ভাবে। ভারতীয় খবর ইংরেজদের স্বার্থের প্রতিকূল হইলে ত ছাপা হইবেই না। খুব বেশী টাকা খরচ করিয়া ভারতীয় একখানি দৈনিক বিলাতে চালাইলে ভারতীয় খবর ছাপা হইতে পারে; কিন্তু বেশী ইংরেজ উহা পয়সা দিয়া কিনিয়া পড়িবে না। "ইণ্ডিয়া" নামক সাবেক কংগ্রেসের যে সাপ্তাহিক কাগজখানি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইত, তাহার বিলাতী অধিকাংশ পাঠক উহা বিনা মূল্যে পাইত। যাহা হউক, বিলাতে ভারতবর্ষীয় দৈনিক চালাইবার মত টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা ভারতীয় কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাই। তাহা থাকিলেও অত খরচ করা উচিত হইত কিনা, সন্দেহের বিষয়। আর এক উপায়, বিলাতী কোন কাগজকে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাতে আমাদের সংবাদ ছাপান। কিন্তু তাহাও বেশী ব্যয়সাপেক্ষ, এবং এরূপ কাগজের ইংরেজদের অপ্রিয় হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ওরূপ বন্দোবস্ত কোন কাগজের সহিত করা চলিবে কিনা, সন্দেহ।

ভারতবর্ষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত খবরের কাগজের মধ্যে ইংরেজদের কাগজগুলারই বিদেশে কাটতি বেশী। দেশী কাগজও অল্প স্বল্প যায় বটে। কিন্তু বিদেশী সম্পাদকেরা ভারতীয় সংবাদাদি ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের কাগজ হইতে সংগ্রহ করিতেই ভালবাসে। এবং আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের সংবাদাদি প্রায়ই বিকৃত বা মিথ্যা হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে বিদেশে ভারতবর্ষের সত্য সংবাদ সব সময় পৌঁছে না, মিথ্যাই প্রচারিত হয়। তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। নমুনাস্বরূপ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদ দিতেছি।

আমেরিকায় লিভিং এজ্ নামক একটি কাগজ আছে। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল; মধ্যে পাক্ষিক হইয়া এখন মাসিক হইয়াছে। ইহার ডিসেম্বর সংখ্যায় সাইমন কমিশন সম্বন্ধে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে নীচে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"This commission, it will be remembered, spent last spring in India making preparations for its

investigations : but little more than preparation was then possible because of the hostile attitude of Indian opinion, a hostility which resulted in boycotting and riots...

"A few months in which to think things over have persuaded most of the Indian leaders to take a more conciliatory course while the Simon Commission is in India this fall and winter. The Swarajists or extreme home rulers were defeated in the Bengal Legislative Council this July, and in August the 'All Parties' Conference went so far as to submit a tentative constitution for the consideration of the Statutory Commission. When Sir John Simon and his fellow Commissioners again left England on September 27, eight out of the nine provincial councils had agreed to co-operate and the ninth was on the eve of doing so. This change in Indian opinion has largely been due to the tact and obvious sincerity of Sir John Simon.

"The plans of the Commission are roughly as follows : to the five hundred odd memorials already received from various Indian sources and printed as contributory data, will be added the findings of the Hartog Committee on education and the information supplied the Commission itself, sitting with the general Indian Committee and the various co-operating provincial committees in each of the nine provincial capitals......"

তাৎপর্য্য। এই কমিশন ইহার অনুসন্ধানের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত গত বসন্ত ঋতু ভারতবর্ষে যাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন ভারতীয় মতের বিরোধিতা বশতঃ বন্দোবস্তের বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই—সেই বিরোধিতা বশতঃ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও কমিশন-বর্জ্জন ঘটিয়াছিল।

কয়েক মাস চিন্তা করিবার সময় পাওয়ায় অধিকাংশ ভারতীয় নেতা বর্ত্তমান শরৎ ও শীতকালে সাইমন কমিশনের ভারত-প্রবাস সময়ে তাহার অধিকতর প্রীতিসাধক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজীরা পরাজিত হয় এবং আগষ্ট মাসে 'সকল দলের' কন্‌ফারেন্স কমিশনের তুষ্টিসাধনের পথে এতটা অগ্রসর হন, যে, সাইমন কমিশনের বিবেচনার জন্য একটি কন্‌ষ্টিটিউশ্যনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া দাখিল করেন। যখন গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সার জন সাইমন ও অন্য কমিশনারেরা ইংলণ্ড হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন নয়টির মধ্যে আটটি প্রাদেশিক কৌন্সিল সহযোগিতা করিতে রাজী হইয়া গিয়াছে, এবং নবমটি রাজী হইবার উপক্রম করিয়াছে। ভারতীয় মতের এই পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ ঘটিয়াছে সার জন সাইমনের বিজ্ঞজনোচিত কার্য্যপ্রণালী এবং স্পষ্ট প্রতীয়মান অকপটতার জন্য।

কমিশনের কার্য্যের ক্রম মোটামুটি এইরূপ :—যে পাঁচশতাধিক আবেদন নানা ভারতীয় সমিতি আদির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শিক্ষা সম্বন্ধে হার্টগ কমিটির সিদ্ধান্তগুলি যুক্ত হইবে এবং কমিশন নিজেও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমিতির সহিত সম্মিলিত বৈঠকের দ্বারা যেসব তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও যুক্ত হইবে।......

লিভিং এজে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ ধারণা জন্মে, যে, কমিশন বয়কট করিয়া ভারতীয়েরা যে খুব ভুল করিয়াছিল তাহা তাহারা কয়েক মাস চিন্তার পর বুঝিতে পারিয়া এখন কমিশনের তুষ্টি সাধনের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতেছে, শত শত আবেদন পাঠাইতেছে এবং সকল দলের কন্‌ফারেন্স পর্য্যন্ত তাহাদের খসড়া কন্সটিটিউশ্যনটি সাইমন কমিশনের জন্য প্রস্তুত করিয়া হুজুরে হাজীর করিয়াছে। এইরূপ ধারণা যে কতটা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পাঠকেরা তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

—

শ্রমিকদের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা

বাইশে পৌষ রবিবার বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফিডারেশনের আফিসে বঙ্গের আঠারটি শ্রমিকসংঘের পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। উত্তরে তিনি সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন :—

"বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফিডারেশন শ্রমিকদের পক্ষ হইয়া অনেক দিন হইতেই ভাল কাজ করিতেছেন। আমি বাউড়িয়াতে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি এবং আজ এখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইতেছে, যে, তাঁহারা শ্রমিকদলের উপর অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইবেন না।

"শ্রমিকদের স্বার্থ সম্বন্ধে সংবাদপত্রসমূহের উদাসীনতার কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলাল বলেন, বাউড়িয়ার ১৫ হাজার শ্রমিক গত সাড়ে পাঁচ মাস হইতে কলওয়ালাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম, যে, খুব কম লোকই একথা অবগত আছেন। আমার নিকট ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। যথাযথভাবে শ্রমিক পক্ষের কথা সম্ভবতঃ দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করা হয় না। যদি তাহা করা হয়, তাহা হইলে দেশের লোকে এই বিষয়ে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবেন। শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশের প্রস্তাব সম্বন্ধে পণ্ডিত জওয়াহরলাল বলেন, প্রস্তাবটি খুবই ভাল। কিন্তু আমাদের হাতে টাকাকড়ি কিরূপ আছে, তাহা না দেখা পর্য্যন্ত আমি এই সম্বন্ধে কোন আশা দিতে পারি না।

"পাট কলের শ্রমিক সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলাল বলেন, ব্যাপকভাবে বৃহত্তর সংগ্রাম চালাইবার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত, আমি এখনও বলিতে পারি না ; কিন্তু আমাদের উপর যদি জোরজবরদস্তিই আরম্ভ হয়, শ্রমিকদিগকে যদি পিষিয়া মারিবার জন্যই চেষ্টা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সাহস সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে। কিছু না করার ব্যর্থতার অপেক্ষা বীরের মত যুদ্ধ করিয়া যে ব্যর্থতা, তাহা অনেক ভাল। বাউড়িয়া পাট কলের অনেক অংশীদার ভারতবাসী ; যদি তাহাদের উপর কিছু চাপ দেওয়া হয়, তবে কিছু সুফল হইলেও হইতে পারে।

"শ্রমিক আন্দোলনের সম্বন্ধে কংগ্রেসের মতিগতির উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলাল বলেন, কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে জমিদার অথবা

ধনিক সম্প্রদায়ের দখলে, একথা সত্য না হইলেও, যাঁহারা ঐ শ্রেণীর লোকদের উপর নির্ভরশীল, প্রতিষ্ঠানটি যে তাঁহাদের হাতে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্কে একটি কর্ম্মতালিকা আছে বলিয়া আমি শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কিরূপ ভাবে কি ধারণা লইয়া কাজ করিতে চাহেন, আমি জানি না।

"উপসংহারে পণ্ডিত জওয়াহরলাল বলেন, বর্ত্তমান বৎসর শ্রমিকদের পক্ষে বড়ই সঙ্কটপূর্ণ বৎসর। শিল্পবাণিজ্যসম্পৃক্ত বিরোধ বিল এবং বলশেভিক বিতাড়ন বিল—এই দুইটি শ্রমিক স্বার্থবিরোধ বিল আইনে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে। নিখিল ভারত শ্রমিক সঙ্ঘ স্থির করিয়াছেন, যে, ঐ দুইটি বিল আইনে পরিণত হইলে একদিন ধর্ম্মঘট করা হইবে। সেরূপ সময় আসিলে আপনারা যে ফলপ্রদ ভাবে আন্দোলন করিবেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ঐ দুইটি বিল পাশ হইলে শ্রমিক আন্দোলন দমনকল্পে গবর্ণমেণ্টের হাতে নূতন হাতিয়ার জুটিবে। সংগ্রাম ব্যতিরেকে আমরা নিজেদের শক্তি দৃঢ় করিতে সক্ষম হইব না, একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিয়া এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

শ্রমিকদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করা যে কর্ত্তব্য এবং সে চেষ্টা যে ভাল করিয়া হয় না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যথেষ্ট চেষ্টা কেন হয় নাই এবং কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে, ধীরভাবে তাহার আলোচনা ও বিবেচনা করা দরকার।

সংবাদপত্রসমূহের উদাসীনতা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহারা কেন উদাসীন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা চাই।

বাংলা দেশে যত কলকারখানা আছে, তাহাদের অধিকাংশ শ্রমিক বাঙালী নহে, অধিকাংশ হিন্দীভাষী। ভাষার এই ভিন্নতা তাহাদের সহিত বাঙালী জনসাধারণের মিলামিশা ও ঘনিষ্ঠতা না হইবার একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ, পৃথিবীর অন্যত্র যেমন কতকটা আছে, বঙ্গেও তেমনি অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সহিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর লোকদের সংস্পর্শ কম। তৃতীয় কারণ, শ্রমিকরা যে-সব কলকারখানায় কাজ করে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী যে-সব বস্তিতে বাস করে, তথায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের যাতায়াত নাই।

আরও একটি কারণ আছে বলিয়া অনুমান হয়। যে-সকল শিক্ষিত লোক শ্রমিকদের নেতৃত্ব করেন, তাঁহারা শ্রমিকদের দুঃখদুর্দ্দশা দেশের সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিনা আমরা অবগত নাই। শ্রমিকদের জন্য একটি আলাদা খবরের কাগজ বাহির করিবার আগে বর্ত্তমান কাগজগুলির দ্বারা কতটা কাজ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে কি?

অধিকাংশ শ্রমিক হিন্দীভাষী। কলিকাতায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কয়েকটি হিন্দী কাগজ আছে। হিন্দীভাষী শ্রমিকদের সহিত হিন্দীভাষী সাংবাদিকদের বেশী সহানুভূতি থাকিবার কথা। শ্রমিকদের অবস্থায় এই সাংবাদিকদিগকে অধিকতর মনোযোগী করিবার কি কি চেষ্টা হইয়াছে আমরা জানি না। কিন্তু ইহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, যে, কলিকাতার অনেক হিন্দী কাগজ ধনিক শ্রেণীর লোকের টাকা খাইয়া থাকে। শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাহাদের ঔদাসীন্য সহজবোধ্য। তথাপি জানা দরকার, শ্রমিকনেতারা তাহাদের নিকট কখনও শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠাইয়া থাকেন কিনা।

আমরা মাসিক কাগজ চালাই। দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে যতবার যত রকম বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে, মাসিকে তাহা হইতে পারে না। তথাপি এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য করিতে অনিচ্ছা নাই। আমাদের যতটুকু উদাসীনতা আছে তাহা পরিহার করিতে শ্রমিক-নেতারা আমাদিগকে যথেষ্টবার যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছেন তাগিদ দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না—যতটা মনে পড়িতেছে, একবারও এরূপ তিরস্কার বা তাগিদ পাই নাই।

বলিতে পারেন, তোমরা নিজেই কেন উদ্যোগী হইয়া এ বিষয়ে খবর লইয়া বার বার কলম চালাও নাই? সে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু সব মানুষের মত সম্পাদকদেরও বিশেষ রকম কাজ আছে। তাহা করিয়া, বিশেষ খবর লইয়া অতিরিক্ত আরও দশটা কাজে হাত দিবার মত সময়, সুযোগ ও শক্তি আমাদের নাই।

কলিকাতার কোন একটি সমিতি দ্বারা সমাজের উপকার হইতেছে। ইহার পক্ষ হইতে এরূপ অভিযোগ মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, যে, দেশের লোকে ইহাকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য ও লোকসাহায্য করে না। তাহা সত্যও বটে। অথচ ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে, কোন এক ব্যক্তি অনুরুদ্ধ ও জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহার কমিটির সভ্য হইতে ও

চাঁদা দিতে রাজী হইলেও তাহাকে সভ্য করা হয় নাই। সম্ভবতঃ এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ টাকা ও তাঁবেদার কর্ম্মী চান, কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণ নিজের পরিচালনার অধীন রাখিতে চান। শ্রমিকনেতাদের এইরূপ কোন মনের ভাব আছে কিনা, তাঁহারা আত্মপরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিবেন। "হিতকর কাজ হউক, কিন্তু তাহা আমারই দ্বারা, আমারই কর্ত্তৃত্বে হউক," এইরূপ মনের ভাব অনেক বিখ্যাত লোকের মধ্যে লক্ষিত হইয়াছে।

শ্রেণী হিসাবে ধনী শ্রেণীর লোকেরা, স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা, কলকারখানার মালিকেরা, এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও, শ্রমিকদের শত্রু (অবশ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রমিকনেতারা ছাড়া!) শ্রমিকনেতারা যদি এইরূপ একটা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের মনেও এইরূপ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা ভ্রমাত্মক হইবে, এবং তাহাতে ফল ভাল হইবে না। যেমন প্রত্যেক জমিদারকেই রায়তের শোষক শত্রু মনে করা ঠিক নয়, তেমনি প্রত্যেক ধনিককে ও স্বচ্ছল অবস্থার লোককে শ্রমিকদের শত্রু মনে করা ভুল।

ভারতবর্ষে, যে-যে কারণেই হউক, কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং হিন্দু সমাজের কোন কোন জাতির মধ্যে অসদ্ভাব ও বিরোধ বিদ্যমান আছে। তাহার উপর ধনিকের ও শ্রমিকের সম্পর্ককে পাকাপাকি বিরোধমূলক হইয়া দাঁড়াইতে দিলে তাহা মহা অনর্থের মূল হইবে।

শ্রমিকদের সাহায্যার্থ বিদেশী কোন শ্রমিক সমিতির নিকট হইতে টাকা আসিলে কোন স্থলেই লওয়া উচিত নয়, মনে করি না। কিন্তু দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে এতদর্থে টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। এইজন্য এমন কিছু বলা বা করা উচিত-নয়, যাহার দ্বারা দেশের সমগ্র লোকসমষ্টি, "যাদের আছে"ও "যাদের নাই", এরূপ দুটা পরস্পর যুধ্যমান লোকসমষ্টিতে বিভক্ত না হইয়া পড়ে। আমরা এখনও পরাধীন জাতি। স্বাধীনতালাভ সমস্ত জাতিটা এক না হইলে হইবে না, যদিও এমন মনে করি না, তথাপি যত বেশী ঐক্য হইবে ও থাকিবে স্বাধীনতালাভের তত বেশী সুবিধা হইবে, ইহা সত্য কথা। এই জন্য দেশে নূতন বিরোধের উদ্ভব নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা কর্ত্তব্য। বিদেশী ঝগড়া দেশে আমদানী করা উচিত নয়। বিদেশী কোন সমিতি বা সঙ্ঘের সহিত আমাদের বন্ধুভাব রাখায় ক্ষতি নাই, তাহা রাখাই উচিত; কিন্তু আমাদের কোন সমিতিকে বিদেশী কোন সমিতির অঙ্গীভূত করা অনুচিত। তাহার অনেক কারণ আছে।

—

শ্রমিক সমস্যায় বাঙালীর কর্ত্তব্য

বিদেশী ও বি-প্রদেশী বণিক ধনিক ও কলকারখানার মালিকেরা বঙ্গে ধন আহরণ করিতেছে, ইহা ভাবিয়া অলস-ভাবে বিমর্ষ হইয়া থাকা বৃথা, ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া অনিষ্টকর। যে-যে উপায়ে ধন উৎপাদন ও উপার্জ্জন করা যায়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া ও সমুচিত উপায় অবলম্বন করিয়া দারিদ্র্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা বাঙালীদের কর্ত্তব্য।

অবাঙালী ধনিকদল বাঙালীর মাথার উপর থাকিতেছে, ইহা যেমন আমাদের পক্ষে অগৌরবের কারণ, তেমনি অধিকাংশ শ্রমিক যে বাঙালী নয়, ইহাও অগৌরবের কারণ।

শুধু অগৌরব নহে, ইহাতে নৈতিক ও অন্য বিপদও আছে।

ধনীদের উপর সামাজিক মতের প্রভাব আগেকার চেয়ে কমিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রভাব বেশী নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। বাঙালী ধনীদের মধ্যে যাহারা দুশ্চরিত্র হয়, বাঙালী সমাজের প্রভাব তাহাদের উপর যতটুকু থাকে, বঙ্গের অবাঙালী ধনীদের মধ্যে যাহারা দুশ্চরিত্র তাহাদের উপর বাঙালী সমাজের প্রভাব ততটুকু নাই। এই দিক্ দিয়া বঙ্গীয় সমাজের নৈতিক ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু শ্রমিকরা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ও ব্যাপক নৈতিক অনিষ্টের কারণ কেন না, অবাঙালী ধনিক অপেক্ষা অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশী।

স্বভাবতঃ অবাঙালী কোন শ্রেণীর লোক বাঙালী সেই শ্রেণীর লোকের চেয়ে নিকৃষ্ট, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। অবস্থাবশতঃ যাহা ঘটে, তাহাই বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যত কলকারখানা আছে, তাহার অধিকাংশ শ্রমিক বাঙালী নয়। তাহারা নিজ নিজ প্রদেশ ও পল্লী ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে। স্ত্রীলোক শ্রমিকরাও ঐরূপ। নিজেদের পল্লীগ্রামে, সমাজে ও পরিবারে থাকিতে তাহাদের উপর যে সুপ্রভাব তাহাদিগকে সৎপথে রাখিত, এখানে সে সৎপ্রভাব নাই; অথচ নরনারীর পরস্পর আসঙ্গলিপ্সা আছে। কিছু অনিষ্ট এইদিক দিয়া হয়। তাহার পর, যাহাদিগকে একটানা অনেক ঘণ্টা একঘেয়ে কাজ করিতে হয়, তাহারা স্বভাবতঃ আমোদ ও উত্তেজনা চায়। সরকারী আবগারী বিভাগ তাহাদিগকে তাহা জোগাইয়া তাহাদের অধঃপতনের সহায়তা করে।

এই প্রকারে কলকারখানার শ্রমিক কেন্দ্রগুলি দুর্নীতির বিষ ছড়াইবার কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। এমন অনেকগুলি জায়গা আছে, যেগুলি আগে ছোট পল্লীগ্রাম ছিল, এখন মাঝারি রকমের শহর হইয়া উঠিয়াছে। এই-সব শহরের অধিকাংশ অধিবাসী অবাঙালী হিন্দীভাষী। সুশিক্ষা পাইবার, উপদেশ পাইবার, সৎসঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের কম। বাঙালী সমাজের প্রভাবের মধ্যে যাহা সু, তাহা ইহাদের উপর বর্ত্তে না। অথচ ইহাদের মধ্যে মন্দ যাহা আছে, তাহার দ্বারা বাঙালী সমাজের অনিষ্ট হইতেছে।

এই-সকল কারণে ভারতহিতৈষী বঙ্গহিতৈষী সজ্জনদিগকে বঙ্গের শ্রমিক-সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিবেন, তাঁহারা হিন্দী না জানিলে তাহা শিখিয়া বলিবার অভ্যাস করুন।

কলিকাতায় কংগ্রেস

এবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে যত লোকসমাগম হইয়াছিল, কলিকাতায় বা অন্য কোথাও ইহার পূর্ব্বে কোন অধিবেশন উপলক্ষ্যে এত জনতা হয় নাই। আয়োজনও তদনুরূপ হইয়াছিল। প্রতিনিধি ও দর্শকদের জন্য সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদল সভার ও কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির অধিবেশনের জন্য স্বতন্ত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিনিধিদের বাসের জন্য যথেষ্ট বাসকক্ষ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।



পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু



শ্রীযুক্তা অ্যানি বেশান্ত

সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু মহাশয়কে অপূর্ব্ব সমারোহের সহিত ৩৪ ঘোড়ার গাড়ীতে ষ্টেশন হইতে তাঁহার বাসস্থানে আনা হইয়াছিল। তাঁহার আগমনপথে স্থানে স্থানে সুশোভন তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল।



পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধী

কংগ্রেস প্রভৃতির অধিবেশনের সময় শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত, ও প্রতিনিধিদের বাসকক্ষসমূহে তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক বালক ও যুবক এবং বালিকা ও যুবতীদিগকে ভলাণ্টিয়র নিযুক্ত করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা মোটের উপর নিয়মানুগত্যের সহিত কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করিয়া নিজেদের কাজ সুনির্ব্বাহ করিয়াছে। তাহাদের বাধ্যতা সহিষ্ণুতা ও শক্তিমত্তা প্রশংসনীয়।

—

কংগ্রেস-প্রদর্শনী

এবারকার কংগ্রেসের মত প্রদর্শনীও বৃহৎ ব্যাপার। এরূপ একটি জিনিষ খাড়া করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চালান প্রশংসার বিষয়। প্রদর্শনীতে যত শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার ও শিখিবার জিনিষ। প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্যবিভাগ, লোকহিতসাধন বিভাগ, মাতৃমঙ্গল বিভাগ প্রভৃতি লোকশিক্ষার জন্যই অভিপ্রেত।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হই নাই, যে, স্বাস্থ্যসম্পৃক্ত সরকারী বিভাগ সকলে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের হুকুম বাহির হইয়াছিল, যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা যেন প্রদর্শনীর স্বাস্থ্য-বিভাগে কোন জিনিষ না পাঠান। একদিক দিয়া ইহা ভালই হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে, বিদেশী গবর্ন্মেণ্ট দেশী টাকার সাহায্যে যে-সব আয়োজন করেন ও যে-সব লোক রাখেন, তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও দেশের লোকেরা প্রদর্শনীর সব রকম বিভাগ খাড়া করিতে ও চালাইতে পারে।

পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর অভিভাষণ

কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহার বক্তব্য বিশদরূপে কথিত হইয়াছে। ইহা সমুদয় বাংলা ও ইংরেজী খবরের কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদিন পরে ইহার সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক, এবং ইহার বিস্তারিত সমালোচনারও প্রয়োজন নাই। তাঁহার বক্তৃতার কেবল দুটী অংশ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই।

—

পণ্ডিত মোতিলালের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা

তিনি কংগ্রেসের জন্য যে কার্য্যতালিকা দিয়াছেন, তাহার সব কাজগুলিই দরকারী ও ভাল। দেশকে স্বাধীন করিবার ও রাখিবার জন্য তৎসমুদয়ের প্রয়োজনও আছে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে স্বরাজ-স্থাপনের জন্য করণীয় কোন কার্য্যের তাহাতে উল্লেখ নাই। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ খুব দরকার, নারীদের অবরোধপ্রথার উচ্ছেদসাধনও আবশ্যক। এইরূপ আরও যে-সকল কর্ত্তব্যের উল্লেখ আছে, তাহা অবশ্যকরণীয় বটে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কিছু করা দরকার যাহা ব্যতিরেকে পূর্ণ স্বাধীনতা বা ঔপনিবেশিক স্বরাজ কিছুই পাওয়া যাইবে না। ব্রহ্মদেশে বর্ম্মাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা নাই, অবরোধ প্রথাও

নাই; অথচ ব্রহ্মদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা বা আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব নাই। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অতএব রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে স্বশাসন-ক্ষমতা লাভ সাক্ষাৎভাবে যাহার উদ্দেশ্য এরূপ কিছু করা চাই। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় অন্ততঃ ইহা বলিতে পারিতেন, যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একদল প্রচারক নিযুক্ত হইবেন, যাঁহারা শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে গিয়া স্বশাসন-ক্ষমতা না থাকায় সকল বিষয়ে আমাদের কি অসুবিধা ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে তাহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন, এবং এই সকল বক্তৃতার চুম্বক পুস্তিকার আকারে ভারতীয় প্রধান প্রধান ভাষায় মুদ্রিত হইবে।

এই প্রচারকগণের আর একটি কর্ত্তব্য হইবে, সার্ব্বজনিক কাজের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াও প্রত্যেকের কিছু সময় অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া। যদি এরূপ চেষ্টার দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে পব্লিক স্পিরিটের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।

আমরা যেরূপ কাজের কথা লিখিলাম, তাহাও সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্রীয় স্বশাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অভিপ্রেত নহে; তাহাও প্রস্তুতি মাত্র। সাক্ষাৎ চেষ্টা কি প্রকার হইবে, আগে হইতে তাহা বলা কঠিন। তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। কিরূপ অবস্থায় কি করিতে হইবে, জনবহুল সভায় আলোচনা দ্বারা তাহা স্থির করা যায় না। ধীর ও অভিজ্ঞ কয়েকজন নেতা কমিটি করিয়া তাহা স্থির করিতে পারেন।

ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা

পণ্ডিত মোতিলাল তাঁহার অভিভাষণে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তাঁহার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য তিনি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই, সকল ধর্ম্মের মূলীভূত সার কোন অংশ অনুসারে ধর্ম্মের বিচার করেন নাই, কেবল ধর্ম্মের নামে প্রচলিত সেই সকল মত আচার অনুষ্ঠান বুঝিয়াছেন, যাহা মানুষকে গোঁড়া, সঙ্কীর্ণমনা, অন্ত-


শ্রীযুক্ত মোতিলাল নেহরু

ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষপরায়ণ, পরমত-অসহিষ্ণু, ও স্বার্থপর করে। ধর্ম্মের অর্থ যদি ইহাই হইত তাহা হইলে, শুধু রাজনৈতিক কেন, অন্য-সব প্রচেষ্টারই সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকা বাঞ্ছনীয় হইত। কিন্তু মানবের ও অন্য জীবের প্রতি মৈত্রী ধর্ম্মের অন্তর্গত, সত্য আচরণ ধর্ম্মের অন্তর্গত, আরও নানা সৎগুণ ও প্রবৃত্তি ধর্ম্মের অন্তর্গত। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মমত আস্তিক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; নাস্তিক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও আছে। কিন্তু উভয়বিধ ধর্ম্মমত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে, উভয়ের মধ্যে মঙ্গলের একটি ধারণা আছে, সত্য ও ন্যায়ের একটি ধারণা আছে, এবং এই বিশ্বাস আছে, যে, বিশ্বের অন্তর্নিহিত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ও ওতপ্রোতভাবে স্থিত কোন নিয়ম ও শক্তির প্রভাবে মঙ্গলের সত্যের ন্যায়ের শুচিতা পবিত্রতার জয় ও প্রতিষ্ঠার দিকে জগতের গতি হইতেছে ও হইবে। এইরূপ ধারণা ও বিশ্বাস ধর্ম্মের মূলীভূত। এই বিশ্বাস থাকাতে অনেক বীর স্বাধীনতার জন্য অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াছেন এবং প্রাণ দিয়াছেন।

অতএব ধর্ম্মের নিগূঢ় ও শ্রেষ্ঠ অর্থে তাহার সহিত রাজনীতি ও অপর সমুদায় মানবিক ব্যাপারের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ থাকা উচিত। নতুবা ধর্ম্মবর্জ্জিত রাজনীতি দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বাড়িতেই থাকিবে।

—

আফগানিস্থানে বিদ্রোহ সম্বন্ধে গুজব

ভারত-গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে সম্প্রতি একটি জ্ঞাপক পত্র বাহির হইয়াছে, যে, সেই সকল খবরের কাগজের নামে প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট-সমূহকে মোকদ্দমা করিতে বলা হইয়াছে যাহারা এইরূপ গুজব প্রকাশ করিয়াছে বা করিবে, যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ষড়যন্ত্রে আফগানিস্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে বা ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহ বা সাহায্য দিতেছেন। যাহাতে ভারত-গবন্মেণ্টের মিত্র কোন রাজ্যের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিতে পারে, যে-সব কাগজ এরূপ কিছু লেখে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত আইন আছে বটে।



আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লা

মোকদ্দমা হইলে অবশ্য ভারতীয় লোকদের দ্বারা চালিত কোন কোন কাগজের—বিশেষতঃ ভারতীয় ভাষায় চালিত কাগজের—বিরুদ্ধেই হইবে। কিন্তু এদেশে ইংরেজদের দ্বারা চালিত কোন কোন কাগজে আফগানিস্থানে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে-সব অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা সংবাদ বাহির হইয়াছে ও যাহার বিরুদ্ধে আফগানিস্থানের কন্সাল প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই সব কাগজকে ত গবন্মেণ্ট তিরস্কার বা সাবধান করিয়া দিলেন না? মাকড় মারিলে ধোকড় হয়!

আর একটা গুজব নানা কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, লরেন্স নামক এক ইংরেজ মুসলমান ফকীরের বেশে পঞ্জাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে গুপ্ত চর এবং সে আফগানিস্থানের শিন্‌ওয়ারীদিগকে রাজা আমানুল্লার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল ও অস্ত্র জোগাইয়াছিল। এই গুজব কে প্রথম রটাইয়াছিল, গবর্মেণ্টের তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সংবাদও বাহির হইয়াছে, যে, শিন্‌ওয়ারীরা বিলাতী রাইফল লইয়া লড়িয়াছিল। এত বন্দুক তাহারা ভারতীয় গোরা-সৈন্যদের নিকট হইতে যদি চুরি করিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অকর্ম্মণ্য বা অসাবধান গোরা-সৈন্যদের কি শাস্তি হইয়াছে তাহা গবর্মেণ্টের প্রকাশ করা উচিত।

—

ডোমীনিয়ন-অবস্থা ও স্বাধীনতা

ডোমীনিয়ন-অবস্থা ও পূর্ণ-স্বাধীনতা সম্বন্ধে "প্রবাসী"র মত বহুবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চরম লক্ষ্য যে পূর্ণ-স্বাধীনতার নিম্নস্থানীয় কিছু হইতে পারে না, তাহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছি, যে, যাঁহারা ডোমীনিয়ন মর্য্যাদা পাইবার প্রয়াসী তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। কারণ, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যতম ডোমীনিয়নে পরিণত হইলে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা তাহার উন্নতি হইবে। তখনও যাঁহারা স্বাধীনতাকামী থাকিবেন, তাঁহাদের স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা চালাইবার সুবিধা বাড়িবে বই কমিবে না।

ইহা কথিত হইয়াছে—আমরাও বলিয়াছি, যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য নহে; চরম লক্ষ্য সকল জাতির পরস্পরের প্রতি নির্ভর। কিন্তু সে অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে প্রত্যেক জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের কানাডা প্রভৃতি ডোমীনিয়নগুলি ব্রিটেনের উপর যতটা নির্ভর করে, ব্রিটেন তাহাদের কোনটির উপর ততটা নির্ভর করে না। যে যে শত্রুজাতি ব্রিটেনকে আক্রমণ করিলে ব্রিটেন একাই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, সেই সেই জাতি অষ্ট্রেলিয়া কানাডা বা দক্ষিণ-আফ্রিকাকে আক্রমণ করিলে তাহারা ব্রিটেনের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

পরস্পর-নির্ভরের যে আদর্শকে পূর্ণ-স্বাধীনতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলা হইয়াছে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকিয়া সে আদর্শে পৌঁছা যায় না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের উপর যতটা নির্ভর করে, ইংলণ্ডও ভারতবর্ষের উপর ততটা নির্ভর করে, এ অবস্থা কালক্রমে উৎপন্ন না হইতে পারে এমন নয়। কিন্তু জাপান ফ্রান্স চীন আমেরিকা বা জার্মেনীর উপর ভারতবর্ষ যতটা নির্ভর করে, ভারতবর্ষের উপরও তাহারা ততটা নির্ভর করে—এ অবস্থা ভারতবর্ষ ব্রিটেনের ডোমীনিয়ন থাকিতে কি ঘটিতে পারে? তাহা যদি না পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত জাতির পরস্পর-নির্ভরের আদর্শ ভারতবর্ষ ডোমীনিয়ন থাকিতে কেমন করিয়া বাস্তবে পরিণত হইতে পারে? অবশ্য এই অবস্থা দূর ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু কথাটা চরম লক্ষ্য সম্বন্ধেই হইতেছে। সেইজন্য দূর ভবিষ্যতে কি হইতে পারে না-পারে, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

যাঁহারা ডোমীনিয়ন-অবস্থার ওকালতী করেন, তাঁহারা কেহ কেহ বলেন উহা কার্য্যতঃ স্বাধীনতারই সমান; কেহ বা বলেন উহা স্বাধীনতা অপেক্ষা একটুও কম নহে। অনেক বিষয়ে যে উহা স্বাধীনতার সমান, তাহা সত্য। কিন্তু সম্পূর্ণ সমান নহে। পূর্ণ-স্বাধীন দেশ নিজের সুবিধা অনুসারে অন্য যে-কোন দেশের সহিত সন্ধি করিতে পারে, সেই দেশকে এমন বাণিজ্যিক বা অন্য সুবিধা দিতে পারে যাহা অন্য দেশকে দেওয়া হয়, নাই। আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, চিলী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বাধীন দেশ ইংলণ্ডের বিরোধী দেশের সহিতও এরূপ সন্ধি করিতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের কোন ডোমীনিয়ন তাহা পারে কি? ভারতবর্ষ ডোমীনিয়ন হইলেও পারিবে কি? পারিবে না। ডোমীনিয়ন অবস্থা যে পূর্ণ-স্বাধীনতার সমান নহে, তাহা দেখাইবার জন্য এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ এত বড় একটা দেশ, ইহার লোকসংখ্যা এত কোটি, ইহার সভ্যতা এত প্রাচীন ও বিচিত্র—এরূপ একটি দেশ স্বয়ং সূর্য্য না হইয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যরূপ সৌর-জগতের অন্যতম গ্রহ হইয়া থাকিবে, এ আদর্শের মধ্যে কোন স্বাভাবিকতা নাই। অষ্ট্রেলিয়া কানাডা দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি যে-সব দেশের প্রধান লোকসমষ্টি ও সভ্যতা ব্রিটেন ও ইউরোপ হইতে আগত ও উদ্ভূত, তাহারা ব্রিটেন-সূর্য্যের গ্রহ হইতে ও থাকিতে পারে (যদিও তাহাতে কানাডা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার পূরা সম্মতি নাই); কিন্তু ভারতের লোকসমষ্টি ও সভ্যতা পাশ্চাত্য কোন দেশ হইতে আগত ও উদ্ভূত নহে। আমাদের পক্ষে কাহারও গ্রহ হওয়া স্বাভাবিক নহে, সম্মানকরও নহে।

কিন্তু আমর ডোমিনীয়নত্ব-লাভের বিরোধী নহি। কারণ, ইহা ভারতবর্ষকে পূর্ণ-স্বাধীনতার বিপরীত দিকে লইয়া যাইবে না; বরং স্বাধীনতার পথে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিবে।

পৃথিবীর নানা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, সাধারণতঃ একটা একটা করিয়া অনেকগুলা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তবে স্বাধীনতাকামীরা স্বাধীন হইয়াছে। ডোমীনিয়নত্ব-লাভ সেইরূপ একটা যুদ্ধজয়ের—বড় একটা যুদ্ধজয়ের—সমান মনে করা অসঙ্গত হইবে না। যে-সব স্বাধীনতাকামী নিজেদের কোন স্বতন্ত্র পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না (তাহা

যে কারণেই হউক) অথচ ডোমীনিয়নত্ব-প্রার্থীদের সহিত বিরোধ করেন, আমরা তাঁহাদের আচরণ সঙ্গত মনে করি না। কেবল স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার করিলে, সোশ্যালিজ্‌ম্ চাই বলিলে, বিপ্লব উপস্থিত করিতে হইবে বলিলে, স্বাধীনতা আসিবে না। পথ চাই এবং সেই পথে চলা চাই। ডোমীনিয়নত্ব-লাভের চেষ্টা যে একটা পথ নহে, তাহা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না। অন্য পথও আছে; কিন্তু তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাহা নির্দ্দিষ্ট হইলেও ডোমীনিয়নত্বলাভচেষ্টার পথও একটা পথ থাকিবে। যাঁহারা সেই পথের পথিক তাঁহারা সেই পথে চলুন; তাঁহাদিগকে সেই পথে চলিতে দেওয়া হউক। যাঁহারা অন্য পথের পথিক, তাঁহারাও সেই অন্য পথে চলুন; তাঁহাদেরও সেই পথে চলিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকুক। পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক বিচার আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু বিরোধ ভাল নয়। ডোমীনিয়নত্ব যদি ভারতের পরাধীনতা ও ইংরেজের প্রভুত্ব বাড়াইত, তাহা হইলে আমরা ইহাকে স্বাধীনতার পথের একটা পান্থশালা মনে করিতাম না।

পৃথিবীতে নানা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীর সমষ্টি আছে। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি প্রত্যেক সমষ্টি আবার নানা শাখায় বিভক্ত। ধর্ম্মান্ধ ও গোঁড়া যাহারা তাহারা কেবল নিজের মতটিকেই সত্য মনে করে, অন্য ধর্ম্মের বা নিজ ধর্ম্মের অন্য শাখার লোকেরাও যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রেও এইরূপ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা আছে। তাহা বর্জ্জনীয়। স্বাধীনতাকামী ও ডোমীনিয়নত্বলিপ্সুদের মধ্যে মতভেদকে যদি ইংরেজরা নিজেদের একটা সুযোগ মনে করিয়া ভারতের অধীনতা-শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিতে চায়, তাহা হইলে সেরূপ চেষ্টা তাহাদের পক্ষে অদূরদর্শিতার কাজ হইবে। কারণ, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সব ভারতীয় দলের লোকই অসন্তুষ্ট, সবাই অগ্রসর হইতে চায়—কেহ কম, কেহ বেশী; কিন্তু কেহই ডোমীনিয়নত্ব অপেক্ষা কম কিছু চায় না। সুতরাং ভারতবর্ষকে অচিরে ডোমীনিয়নের সমান অধিকার না দিলে, উভয় দলেরই বিরোধিতা ইংরেজকে সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু তাহাকে ডোমীনিয়ন হইতে দিলে কেবল স্বাধীনতালিপ্সুদের বিরোধিতা সহ্য করিতে হইতে পারে। অবশ্য আমাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিয়া ইংরেজ উভয় দলেরই বিরোধিতা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু পরাধীনের বল কখন কোথা হইতে আসিয়া পড়িবে, অতীত কালে ইতিহাসপ্রথিত অনেক প্রবল জাতি তাহা অনুমান করিতে পারে নাই; ইংরেজেরও সেইরূপ ভ্রম হইতে পারে।

—

কোন্ দিক্ দিয়া স্বাধীনতায় পৌঁছা যায় না?

ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিকদিগের দলকে অন্যেরা মডারেট বলে এবং যাঁহারা আপনাদিগকে লিবার‍্যাল বলেন, তাঁহারা বলেন তাঁহারা ডোমীনিয়নত্ব চান। "ততঃ কিম্" এর কোনও উত্তর তাঁহারা না দেওয়ায় বুঝিতে হইবে, যে, হয় ইহাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য, কিম্বা তাঁহারা মনের মধ্যে কিছু গোপন রাখিতেছেন। অন্য যাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য ডোমীনিয়নত্ব চাহিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ স্বরাজ্যদলের কংগ্রেসওয়ালা। তাঁহাদের প্রধান প্রধান অনেক লোক বলিতেছেন, যে, তাঁহারা স্বাধীনতাকে ডোমীনিয়নত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু সকলের সহিত সম্মিলিতভাবে একটি দাবী উপস্থিত করিবার নিমিত্ত এবং চরম লক্ষ্য স্বাধীনতায় উপনীত হইবার জন্য কোন অবলম্বনীয় উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া তাঁহারা ডোমীনিয়নত্ব চাহিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীনতালিপ্সু-দিগকে ডোমীনিয়নত্বের দাবীতে রাজী করিবার নিমিত্ত ইহাও বলিতেছেন, যে, তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা স্বাধীনতার নিকটতর এবং বর্ত্তমান ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা যত কঠিন ডোমীনিয়ন-ভারতবর্ষে তাহা তত কঠিন হইবে না। যাঁহারা স্বাধীনতা চান এবং ডোমীনিয়নত্বের বিরোধী, তাঁহারা ত বলিতেছেনই, যে, ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক ছিন্ন না হইলে ভারতবর্ষ কখন মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ ফ্রীডমে পৌঁছিতে পারিবে না। এই সকল কারণে ইংরেজরা বলিতেছে, "তোমরা কেহই আমাদের সহিত যুক্ত থাকিতে চাও না। তাহা কেহ বা স্পষ্ট ভাষায় খুলিয়া বলিতেছ, কেহ বা তাহা না বলিয়া ডোমীনিয়নত্ব পাইলে তাহাকে ব্রিটেনের সহিত সম্পর্কশূন্য স্বাধীন অবস্থায় পৌঁছিবার ধাপ-স্বরূপ ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় পোষণ কর। অতএব, তোমাদিগকে ডোমীনিয়নত্বও দেওয়া হইবে না।" ইংরেজদের এই ধমকে কোন কোন ভারতীয় নেতাও ভাবিতেছেন, যাহারা ডোমীনিয়নত্ব চায় অথচ বলিতেছে যে স্বাধীনতা তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় এবং যাহারা একেবারে স্বাধীনতা চাহিতেছে, উভয়েই ভারতের রাজনৈতিক প্রগতির পরিপন্থী।

এ অবস্থায় ইংরেজদের কিছু ভাবিবার আছে।

তাহারা ভাবিতেছে ও বলিতেছে, "ভারতীয়দিগকে ডোমীনিয়ন অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিলে তাহারা ব্রিটেনের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইবে; অতএব আমরা ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখিব, ডোমীনিয়ন হইতে দিব না।" কিন্তু প্রভুত্ব-গর্ব্ব ও ক্রোধ দ্বারা মতিভ্রান্ত হওয়া

উচিত নয়, ইতিহাসের শিক্ষা মনে রাখা দরকার। স্মরণাতীত কাল হইতে অনেক দেশ পরাধীন হইয়াছে, আবার স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। যাহারা স্বাধীন হইয়াছে, তাহারা কি সবাই কেবল ডোমীনিয়ন-অবস্থার মত কোন অবস্থা হইতে স্বাধীন হইয়াছে? তাহা ত নহে। যথেচ্ছাচারী বিদেশী সম্রাটের অধীন, বিন্দুমাত্রও স্বশাসন-অধিকারশূন্য অনেক দেশ স্বাধীন হইয়াছে; আবার অল্প বা অধিক অধিকারশালী পরাধীন দেশও স্বাধীন হইয়াছে। এমন কোন রাজনৈতিক অবস্থা নাই যাহা হইতে কোন-না-কোন দেশ স্বাধীন না হইয়াছে। বস্তুতঃ, যেমন ইংরেজীতে বলে, "অল্ রোড্স্ লীড টু রোম," "সব রাস্তাই রোমে পৌঁছায়," এবং বাংলায় বলে, সব নদীর জলই সাগরে গিয়া পড়ে, তেমনি সাক্ষাৎভাবেই হউক বা প্রতিক্রিয়া বশতই হউক, সব রকম রাজনৈতিক অবস্থার চরম পরিণতি হইতে পারে স্বাধীনতা। অল্প অল্প করিয়া অধিকার লাভ করিতে করিতে পূর্ণ-স্বশাসন অধিকারে পৌঁছা যাইতে পারে; আবার কোন জাতিকে বেশী দাবাইয়া রাখিলে তাহারা প্রতিক্রিয়াবশতঃ উল্টা দিকে গিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। প্রভেদ কেবল এই, যে, সোজা পথে শাসক জাতি শাসিত জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিলে, শাসিত জাতি স্বাধীনতা পাইবার পরও শাসক জাতির বন্ধু থাকিতে পারে; কিন্তু উৎপীড়ন অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াবশতঃ শাসিতেরা স্বাধীন হইলে শাসকদের সহিত বন্ধুত্ব থাকে না।

অতএব ইংরেজরা জবরদস্তী ও জুলুমের পক্ষপাতী না হইলে তাহাদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে। ভারতীয়েরাও কোন প্রকার ধমকে দমিয়া না গেলে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। স্বাধীনতা বা ডোমীনিয়নত্ব, যিনি যাহা চান, ধর্ম্মপথে থাকিয়া তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করুন। বৃথা পরস্পরের সহিত বিরোধ করিবেন না, বাক্‌সর্ব্বস্বও হইবেন না।

—

আমেরিকায় ভারতীয়ের কৃতিত্বস্বীকার

আমেরিকার য়ুনাইটেড্ ষ্টেটসের বার কোটী লোকের মধ্যে কয়েক হাজার ভারতীয় মুষ্টিমেয় মাত্র, এবং তাহাদেরও অধিকাংশ সাধারণ শ্রমিক বা ছাত্র। তথাপি, আমেরিকার জীবিত বিখ্যাত লোকদের জীবনী-কোষে ("হু ইজ্ হু ইন্ আমেরিকা" নামক গ্রন্থে) দুইজন ভারতীয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত স্থান পাইয়াছে। একজন শ্রীযুক্ত শঙ্কর আবাজী বিসে; অন্যজন শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস। বিসে মহাশয় ছাপাখানার হরফ চালিবার কয়েকটি যন্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি রসায়নী বিদ্যাতেও আবিষ্কর্ত্তা ও উদ্ভাবক বলিয়া পরিচিত। এইজন্য তিনি আমেরিকায় সম্মানসূচক ডি, এস্‌সী ও পি এইচডি উপাধি পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত



শ্রীযুক্ত শঙ্কর এ বিসে

তারকনাথ দাস গ্রন্থকার ও সাংবাদিক। তিনি ভারতবর্ষের ও বিদেশের অনেক সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

—

ডোমীনিয়নত্ব দিবার মিয়াদ

কংগ্রেসের গত অধিবেশনে অধিকাংশ প্রতিনিধির মত অনুসারে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে, এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করিতে রাজী হন, তাহা হইলে কংগ্রেস নেহরু রিপোর্ট অনুযায়ী শাসনপ্রণালী গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটেন ভারতবর্ষের ডোমীনিয়নত্বে রাজী না হইলে, ট্যাক্স না-দেওয়া ও অন্যবিধ অসহযোগ প্রণালী অবলম্বিত হইবে এবং পূর্ণ-স্বাধীনতালাভের চেষ্টা আরব্ধ হইবে।

স্বাধীনতাবাদী ও ডোমীনিয়নবাদীদের মধ্যে রফা করিবার জন্য প্রস্তাবটিকে এই আকার দেওয়া হয়। কিন্তু তাহাতেও সকল স্বাধীনতাবাদী প্রতিনিধির সম্মতি পাওয়া যায় নাই। নয় শত প্রতিনিধি স্বাধীনতার পক্ষে মত দিয়াছিলেন।

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে

ডোমীনিয়ন করিতে রাজী না হইলে পুরামাত্রায় অসহযোগ চালান হইবে, এই প্রস্তাব যাঁহারা মুসাবিদা করিয়াছিলেন, ইংরেজ জাতিকে ভয় দেখান তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, তাঁহারা জানেন ইংরেজ জাতিকে বিপন্ন বা বিশেষ অসুবিধা-গ্রস্ত করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে ভারতের নাই, এক বৎসরে তাহা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু প্রস্তাবকদের ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্য না থাকিলেও প্রস্তাবটির ভাষা হইতে সেরূপ মানে ন্যায়তঃ করা যাইতে পারে। অতএব অধিকতর সাবধানতার সহিত প্রস্তাবটি লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল।

যে এক বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে।

ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের প্রবলতম দলের দ্বারা ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। শীঘ্র নূতন করিয়া পার্লেমেন্টের সভ্য নির্ব্বাচন হইবে। তাহার ফলে বর্ত্তমান রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য না থাকিতেও পারে। দলের ভাগ্যবিপর্য্যয় হইবে কি না-হইবে, এরূপ অনিশ্চয়ের অবস্থায় রক্ষণশীলেরা ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর গুরুতর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইবে, আশা করা যায় না। নূতন নির্ব্বাচনের পর তাহাদের প্রাধান্য যদি বজায় থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষের সমস্যাটাতেই আগে মন দিবে, এমন আশা করা যায় না। তাহাদের স্থানে যদি অন্য কোন দল পার্লেমেন্টে প্রবল হয়, তাহাদেরও তাড়াতাড়ি আগেই ভারতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিবার কারণ দেখা যাইতেছে না। সব জাতিই নিজের জাতির সমস্যার কথাই আগে ভাবে। তবে যদি আমরা ব্রিটেনকে এমন কোন অসুবিধায় ফেলিতে পারিতাম যাহাতে তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে যে-কোন দলই প্রবল থাকুক বা হউক, তাহারা তাড়াতাড়ি আমাদের দাবীতে কান দিত। তেমন অসুবিধায় ফেলিতে পারিলে এক বৎসরের মিয়াদেরও দরকার হয় না, এক মাস বা এক পক্ষই যথেষ্ট হয়। কিন্তু সেরূপ অসুবিধা জন্মাইতে হইলে, সমস্ত ভারতীয় জাতি না হউক, একটা জনবহুল শক্তিশালী দলের রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভে সর্ব্বস্বপণ করা চাই, প্রাণপণ করা চাই। সেরূপ কোন দল এখনও গঠিত হয় নাই। এক বৎসরে গঠিত হইবে কি?

গণতান্ত্রিক প্রণালীতে যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহার রীতি এই, যে, অধিকাংশের মতে যাহা স্থির হয়, অল্পসংখ্যকেরাও তদনুসারে কাজ করেন—অন্ততঃ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন না। এখন জিজ্ঞাস্য এই, স্বাধীনতাবাদীরাও কি এই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডোমীনিয়নত্বের চেষ্টা করিবেন? তাহা যদি না করেন, তাঁহারা কি অন্ততঃ ডোমীনিয়নত্বের বিরুদ্ধে কিছু করিতে বলিতে লিখিতে নিবৃত্ত থাকিবেন? সেরূপ কোন লক্ষণ ত দেখা যাইতেছে না।

আর একটি কথাও বিবেচ্য। কংগ্রেসের অধিবেশন ৩১শে ডিসেম্বরের আগেই হইয়া থাকে। তাহা হইলে এক বৎসরের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই লাহোরে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন শেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং সেই অধিবেশনে ভারতবর্ষের ডোমীনিয়নত্ব স্বীকার বা স্বাধীনতালাভের চেষ্টা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব বা কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে না। অবশ্য কংগ্রেসের অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর আরম্ভ করিয়া ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারীর সূর্য্যোদয়ের পর শেষ করিলে চলিতে পারে। শেষোক্ত দিন সূর্য্যোদয়ের পর কংগ্রেসের সভাপতি বড়লাটকে, ভারত-সচিবকে ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে টেলিগ্রাফে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করা সম্বন্ধে কিছু সঙ্কল্প করা হইয়াছে কি না। তাঁহাদের উত্তরের জন্য কত ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা কংগ্রেস বিবেচনা করিবেন।

মিয়াদ ৩৬৫ দিন পরিমিত। এক বৎসর না করিয়া ৩৬০ দিন করিলে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর তাহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, এবং তাহার পর কংগ্রেস মামুলী তারিখে বসিয়াও ব্রিটেনের সিদ্ধান্ত জানিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারিতেন।

—

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদের একজন প্রাচীন ও বড় উকীল ছিলেন। সাবেক কংগ্রেসের সহিত এবং পরে লিবার্যাল দলের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল এলাহাবাদের এংলোবেঙ্গলী স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালে বিদ্যালয়টির অট্টালিকা, ছাত্রদের খেলিবার জায়গা প্রভৃতি বাড়ান হইয়াছিল, এবং উহা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র সন্তান শ্রীমতী প্রতিভা দেবী কবিতার পুস্তক লিখিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।

—

"জাতীয় সপ্তাহে" নানা সভাসমিতি

খৃষ্টীয় বৎসরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেস এবং অন্য নানা সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে জাতীয় সপ্তাহ বলা হয়। যেখানে যে বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেখানে সে বৎসর নানা প্রদেশ হইতে খুব জনসমাগম হয়। সেইজন্য এই সুযোগে কংগ্রেস ছাড়া আরও ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশটি সভাসমিতির অধিবেশন সেখানে জাতীয় সপ্তাহে হইয়া থাকে। প্রত্যেকটির

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহাদের অভিভাষণ আছে। তা ছাড়া যতগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়, তাহার উপস্থাপক সমর্থক আছেন। তাঁহারা বক্তৃতা করেন। বাদ-প্রতিবাদের বক্তৃতাও হয়। এই প্রকারে নানা জনের মুখ হইতে যে বাক্যবন্যা প্রবাহিত হয়, তাহার সবগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া সংবাদপিপাসু পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতে পারে এমন খবরের কাগজের এখনও জন্ম হয় নাই। তেমন উদ্যোগী তত বড় কাগজ যদি বা থাকিত, তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার মত পাঠকও দেখা যায় না।

দৈনিকের সম্পাদক যাঁহারা তাঁহাদের মহাবিপদ। শুধু রিপোর্ট ছাপিতেই তাঁহারা পারেন না; তাহার উপর প্রত্যেক সভার উদ্যোক্তারা চান, যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্পাদকীয় কিছু লেখা বাহির হয়। তাহা করা সম্ভবপর না হইলেও প্রধান প্রধান সভা সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু লিখিতে পারেন, কারণ তাঁহারা সপ্তাহে ছয় দিন কাগজ বাহির করেন। সাপ্তাহিকের সম্পাদকদেরও বিপদ কম নয়। এক সপ্তাহের একখানি কাগজে এত খবর দেওয়া ও তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা কঠিন। পরবর্ত্তী দুই এক সপ্তাহে তাহা করিতে গেলে পুরাতন জিনিষে কাগজ বোঝাই করিতে হয়। তাহা সুবিধাজনক নহে।

মাসিক কাগজওয়ালাদের বিপদ আর এক রকমের। আমরা বাংলা মাস অনুসারে কাগজ বাহির করি। সুতরাং জাতীয় সপ্তাহ শেষ হইবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমাদের কাগজ প্রকাশিত হয়। তখন খবর পুরাতন হইয়া যায়। পুরাতন খবরের আলোচনা করা সুবিধাজনক নয়। তদ্ভিন্ন খবর-জোগান মাসিকের কাজ নয়; অথচ মন্তব্য করিতে গেলে, যে ঘটনা বা ব্যাপারের উপর মন্তব্য করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে না বলিলে চলে না।

একখানি কাগজের একটি সংখ্যায় এত সভাসমিতির সব বক্তৃতাদির আলোচনা করা সম্ভবপর নহে—বিশেষতঃ যখন আমাদিগকে প্রবন্ধ কবিতা উপন্যাস গল্প প্রভৃতিও ছাপিতে হয়।

একটি সপ্তাহে একই স্থানে যে-সব সভার অধিবেশন হয়, তাহার সবগুলির কাজে লোকে ভাল করিয়া মন দিতে পারে না। প্রধানতঃ রাজনৈতিক সভার কাজেই লোকে মন দেয়। এইজন্য অন্য-সব সভার উদ্দেশ্য ভাল করিয়া সিদ্ধ হয় না। তথাপি কিছু কাজ হয়। রাজনৈতিক বিষয় ছাড়া অন্য নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কতকগুলি লোকের দৃষ্টি পড়ে।

প্রত্যেক সভার অধিবেশন স্বতন্ত্র স্থানে ও তারিখে করিলে তাহার সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। অসুবিধা এই, যে, প্রধানত কংগ্রেসের জন্য আগত যে-সব লোককে সমাজ-সংস্কারাদির জন্য আহূত সভাতেও বক্তা ও শ্রোতা রূপে পাওয়া যায়, স্বতন্ত্র স্থানে ও তারিখে সভা হইলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ রাজনীতি ছাড়া কেবল অন্য কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য বেশী লোক পাওয়াই কঠিন। আর এক অসুবিধা এই, যে, খৃষ্টীয় বৎসরের শেষ সপ্তাহ ছাড়া অন্য কোন সময়ে সপ্তাহাধিক-ব্যাপী ছুটি ভারতবর্ষের সব প্রদেশে সব আফিস আদালত শিক্ষালয়ের নাই।

স্বতন্ত্র স্থানে ও সময়ে সভার অধিবেশনের সুবিধা এই, যে, অল্পসংখ্যক লোক আসিলেও, যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা কেবলমাত্র সেই সভারই কাজে মন দিতে পারেন। কোন কোন সভার এইরূপ অধিবেশন হইয়াও থাকে।

—

ভারতীয় নারীদের সামাজিক কন্‌ফারেন্স

ভারতীয় নারীদের সামাজিক কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন ময়ূরভঞ্জের প্রবীণা মহারাণী এবং অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন ত্রিবাঙ্কুড়ের ছোট মহারাণী। উভয়েরই অভিভাষণ সুন্দর হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাণীর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের প্রগতির একটি বাধা এই, যে, মুখে যাহা বলা হয় কাজে তাহা করা হয় না। কেন যে কথার সঙ্গে কাজের এই পার্থক্য হয়, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া পুরুষরা প্রায়ই যত দোষ চাপান বাড়ীর মেয়েদের উপর—পিতামহী মাতামহী মাতা স্ত্রী ভগিনীর উপর; বলেন, যে, তাঁহারা সমাজ-সংস্কারে বাধা দেন। মহারাণী বলেন, আমরা সংস্কারবিরোধী, আমাদের নামে এই অপবাদ আর হইতে দেওয়া উচিত নয়। ইহার উপায় হইতেছে, খুব ব্যাপকভাবে সকল বয়সের নারীদের শীঘ্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

নারীদের কন্‌ফারেন্সে হিন্দু মুসলমান আদি নানা সম্প্রদায়ের মহিলারা যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা পর্দার বিলোপ, বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ, বালবিধবাদের বিবাহ, বরপণ নিবারণ, বালিকাদের শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কাদের শিক্ষা, উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন, কারখানা আইনের সংশোধন, নরনারী উভয়ের সমান নৈতিক অধিকার স্থাপন, প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রস্তাব ধার্য্য করেন। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মহিলারাও যে সমাজ-সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা সুলক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী বিদুষী উপন্যাসলেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে নির্দ্ধারিত প্রস্তাবটি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং তাহার সমর্থক বক্তৃতা করেন।

হিন্দু অবলা-আশ্রম

হিন্দু অবলা-আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন :—

"মফঃস্বলের বহু জনসেবক ভদ্রলোক নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকদিগকে হিন্দু অবলা-আশ্রমে পাঠাইতে দ্বিধা বোধ করেন, কারণ তাঁহাদিগকে আশ্রমে ভর্ত্তি করা হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিত নহেন। অনেকেই আমাদের নিকট চিঠি লিখিয়া অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন, এদিকে হয়তো অসহায়া রমণী এমন লোকের হাতে পড়িয়া যায় যে, তাহাকে আর কলিকাতায় আনা সম্ভব হয় না। অনেক বিধবার গর্ভজাত সন্তানদেরও এই অবস্থা হয়। সুতরাং আমি এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে সবিনয়ে জানাইতেছি, যে, অসহায়া নারী এবং জারজ শিশুদের আশ্রয় দিবার জন্যই হিন্দু অবলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে কেহ অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া এই স্থানে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন। মফঃস্বল হইতে যাহারা আসিবে, তাহাদিগকে অবিলম্বে ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া কেহ কলিকাতায় আসিলে কোন অসুবিধা হইবে না।"

হিন্দু অবলা-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া অতি মহৎ কাজ করিয়াছেন। জারজ শিশুদের জন্ম সম্বন্ধে তাহাদের কোনই দায়িত্ব নাই। তাহারা ঠিক অন্য-সব শিশুদেরই মত নিষ্কলঙ্ক। অতএব তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রযত্নে হওয়া উচিত। যে-সকল নারীর পদস্খলন হয়, অনেকস্থলে তাঁহারাও প্রতারিতা এবং নির্দ্দোষ। সুতরাং তাঁহাদেরও রক্ষণাবেক্ষণ ও ভদ্রভাবে জীবনযাপনের উপায় হওয়া উচিত। আর, যদি কাহারও দোষ হইয়াই থাকে, তাহা হইলেও সমাজের পক্ষে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আরও অধঃপতিত করা অতীব অন্যায় ও হৃদয়হীন ব্যবহার। সকলেরই সংশোধনের উপায় থাকা উচিত। পুরুষরা অনেকে হাজার বার নানা অপরাধ করিয়াও সামাজিক দণ্ড পায় না। নারীকেও সেইরূপ স্বেচ্ছাচারিণী হইতে হইবে, ইহা কেহ চান না। কিন্তু সকল অবস্থাতে সকল অনুতপ্তা নারীরই সৎপথে ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকা উচিত।

—

ভারতীয় সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেন্স

ভারতীয় সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেন্সের সভাপতি বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম রাও জয়াকরের অভিভাষণ সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ হইয়াছিল। তিনি বলেন, "এখন আর লোকে জাতিভেদের অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট নহে, এখন বর্ত্তমান আকারের জাতিভেদের উচ্ছেদের দাবীই উত্থাপিত হইয়াছে। যদি তথাকথিত নীচ জাতিদের মুখপত্রগুলি পড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, তাহারা সকল মানুষের জন্মগত সাম্যের ভিত্তির উপর আপনাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। তাহারা হিন্দুজাতির প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া হিন্দুসমাজে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা দেখাইতেছে এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে হিন্দুত্বের নিজের পরিবর্ত্তন-সাধনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে প্রমাণ করিতেছে। তাহারা চায়, যে, ব্রাহ্মণ্য হৃদয়মনের উৎকর্ষের একটি আদর্শ দেখান যাহার দিকে শূদ্রেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে।"

"শুদ্ধি" সম্বন্ধে জয়াকর মহাশয় বলেন, "উহাকে আর উহার প্রাথমিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা তাহার পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান হইয়াছিল, তাহাকে যদি শুদ্ধিরূপ রসায়নী বিদ্যা দ্বারা আবার হিন্দু করা যায়, তাহা হইলে সেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া দ্বারা কেন যে একজন শূদ্রকে উচ্চতর জাতিতে পরিণত করা যাইবে না, বলা কঠিন। 'শুদ্ধি' আন্দোলনে অনেক উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়াছে যাহার ফলে হিন্দুসমাজের সাধারণ উন্নয়ন ঘটিতে পারে। অ-ব্রাহ্মণরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, যথোচিত 'শুদ্ধি' দ্বারা শূদ্র কেন ক্ষত্রিয় হইতে পারিবে না? প্রাচীন শাস্ত্রে এরূপ উন্নয়নের উল্লেখ আছে। অনেক সাধু ব্যক্তির জীবনে তাহা ঘটিয়াছে। এই সামাজিক উন্নয়নের দুটি সুবিদিত দৃষ্টান্ত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। যদি এই নীতি একবার মানিয়া লওয়া যায়, যে, অনুষ্ঠানবিশেষ স্পর্শমণির মত নীচকে উচ্চে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে জাতিতে জাতিতে যে অশান্তি ঘটে, তাহা মিটাইবার জন্য এই নীতির প্রয়োগের কোন সীমা থাকিবে না।"

সংগঠন সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ইহার অর্থ সংস্পর্শ, পরস্পরের সহিত মিলামিশা ও যোগস্থাপন। লোকেরা সমান সমান ভাবে না মিশিলে উহা সম্ভব পর নহে।...... প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মগুলির হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণে তাহার উপকার হইয়াছে। তাহারা হিন্দুধর্ম্মকে নিজেকে দৃঢ় ও সংহত করিতে শিখাইয়াছে।"

সামাজিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা যে গবর্ন্মেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই আবশ্যক ও হিতকর, তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন। যখনই শাসকদের নিজের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা ভারতীয়দের অপ্রিয় এবং ভারতীয় লোকমতের বিরুদ্ধ আইনও প্রণয়ন করেন; কিন্তু সামাজিক বিষয়ে শিক্ষিত লোকমত যাহা চায়, এমন কি যে-বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, এরূপ বিষয়েও গবর্ন্মেণ্ট আইন করিতে চান না।

হিন্দুনারীর দায়াধিকার ও সম্পত্তিতে অধিকার প্রাচীন কালে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিক ন্যায়ানুমোদিত ছিল। গত শতাব্দীর আশীর কোঠা পর্য্যন্ত ইংরেজরা নিজের দেশে নারীকে স্বাধীনভাবে সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে

বা তাহার স্বত্বাধিকারী হইতে দেখিতে অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ইংরেজ-জজ বিলাতে বসিয়া হিন্দু আইনের অর্থ করিতে গিয়া যে হিন্দুনারীর অধিকার সীমাবদ্ধ করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবশ্য হিন্দু আইন ব্যাখ্যাসহ ও পরিবর্ত্তনসহ। কিন্তু হিন্দু-জজেরা ব্যাখ্যা করিয়া করিয়া অল্পে অল্পে নারীর অধিকার বাড়াইবে, এই আশায় বসিয়া থাকিলে আশা পূর্ণ হইতে কয়েক শতাব্দী লাগিবে। সেই জন্য জয়াকর মহাশয় বলেন, নূতন আইন করিয়া এই কাজটি শীঘ্র সারিয়া ফেলা উচিত।

তিনি বলেন, "নারীরা চান তাঁহাদের বিবাহের বয়স ন্যূনকল্পে ষোল করা হউক। সম্মতির বয়স এখন অত্যন্ত কম, ইহা তাঁহাদের আর একটি অভিযোগ। স্বামী মনোনয়ন সম্বন্ধে তাঁহারা চান, যে, মনোনয়নের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করা হউক। বস্তুতঃ তাঁহারা চান, যে, জা'ত (caste) নির্ব্বিশেষে মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করিবার অধিকার তাঁহাদিগকে দেওয়া হউক।

"হিন্দুশাস্ত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার অধিকার কোন কোন অবস্থায় দেওয়া হউক, কোথাও কোথাও এই দাবী উঠিয়াছে। নারীরা জানেন, বিবাহ একটি সংস্কার। কিন্তু ইহা ধর্ম্মানুমোদিত সংস্কার হইলে কেবল একবার হইতে পারে। টাকাওয়ালা লোকের খেয়াল অনুসারে তাহার যতবার সাধ্য ততবার বিবাহ সংস্কার হইতে পারে না। বিবাহ সংস্কার দুই পক্ষের মধ্যে হয়। এক পক্ষ—পুরুষ—যদি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বারবার বিবাহ করে, তবে সেরূপ লোকের কোন স্ত্রী কেন তাহার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারিবে না ? এই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়া কঠিন। বহু বৎসর পূর্ব্বে একটি শ্লোকের * উপর নির্ভর করিয়া বিধবা নারীকে পুনর্ব্বার বিবাহের অধিকার দেওয়া হয়। তাহা হইলে প্রাচীন ভারতে বৈধব্য ভিন্ন অন্য চারি আপদেও নারীর আবার বিবাহ হইত। এখন সেরূপ অবস্থায় অন্ততঃ বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বর্ত্তমান সময়ে আইন অনেক দিক্ দিয়া বড়ই শোচনীয়। একটি দৃষ্টান্ত এই—স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্বধর্ম্ম অনুসারে বিবাহিত পত্নীর সহিত বিবাহচ্ছেদের দাবী করিতে পারে; কিন্তু ঐ পত্নী এরূপ স্বামীর সহিত ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ আইন অনুসারে ছিন্ন করিতে পারে না।"

সভাপতি মহাশয় আরও অনেক বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শেষে ব্যায়ামাদির দ্বারা নারীদের শারীরিক উন্নতির প্রয়োজন প্রদর্শন করেন।

* "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেন্সে অনেকগুলি সময়োচিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে একত্র পংক্তিভোজন ও ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান চালাইয়া এবং অস্পৃশ্যতা ও তজ্জনিত সমুদায় অধিকারহীনতা দূর করিয়া শীঘ্র শীঘ্র জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ-সাধন; বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ, আইন দ্বারা পুরুষ ও নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্দ্দেশের পক্ষে মত প্রকাশ, এবং হরবিলাস সরদা প্রণীত বিলের সমর্থন; গবর্ন্মেণ্টের আবগারী নীতির প্রতিবাদ।

—

ছাত্রদের স্বাস্থ্য

কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরামর্শ দিবার ও সাধ্যমত অন্য রূপে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২০ সালে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। ১৯২০ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত আট বৎসরে ইহার স্বাস্থ্যপরীক্ষকেরা ১৪,৮৬৬ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। ১৯২৭ সালের রিপোর্ট ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মুদ্রিত হইয়া সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানটি সাতিশয় হিতকর। কিন্তু যথেষ্ট টাকা না থাকায় কমিটি আবশ্যক-মত ডাক্তার ও ব্যায়ামশিক্ষক ও অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য সব কলেজের সব ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এপর্য্যন্ত হয় নাই। যাহাদের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাদেরও সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যাহা করা দরকার, তাহা করিতে পারা যায় নাই। এই কাজটির জন্য গবর্ন্মেণ্টের ও দেশের ধনীলোকদের প্রচুর অর্থ সাহায্য করা উচিত। কয়েকটি দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপব্যয় আছে। তাহা নিবারণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহার এই কর্ত্তব্যটির জন্য অধিক টাকা খরচ করিতে পারেন।

কলেজের ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা মোটেই হয় নাই। তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা অপেক্ষা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা অধিকতর বৃহৎ ব্যাপার। একটি কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা দেশব্যাপী এত বড় কাজ হইতে পারে না। প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায়, প্রত্যেক শহরে বা প্রত্যেক গ্রামে কমিটি ও আয়োজন করিলে তবে এই কাজটি হইতে পারে। মফঃস্বলে কে ইহার অগ্রণী হইবেন ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটির নূতন রিপোর্ট পড়িয়া প্রীত হওয়া যায় না। যাহাদের স্বাস্থ্যে সাধারণ

খুঁৎ আছে, সাত বৎসরে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ২৫·৭ জন হইতে ৩৪·৭ জনে উঠিয়াছে। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজনের এমন পীড়া আছে আবলম্বে যাহার চিকিৎসা হওয়া উচিত।

শতকরা চারিজনের হৃৎপিণ্ডের কোন না কোন দোষ আছে।

ফুস্‌ফুস্‌আদি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের দোষ প্রত্যেক দুইশত জনের মধ্যে একজনের আছে।

কণ্ঠনালীর দোষ অনেক বেশী ছাত্রের আছে—শতকরা কুড়িজনের কণ্ঠাভ্যন্তরে কিছু-না-কিছু দোষ আছে। রিপোর্টের মতে ইহার কারণ শহরের বহুজনাকীর্ণতা ধোঁয়া ও ধূলা। তাহা সত্য। কিন্তু ছাত্রদের অনেকের সিগারেট, বিড়ি ও চুরুটের ধূমপান কি অন্যতম কারণ হইতে পারে না? আমাদের অনুরোধ, কমিটির ডাক্তারেরা যে-সব ছাত্রের কণ্ঠের দোষ পাইবেন, তাহাদের মধ্যে কতজন ধূমপান করে, তাহার সংখ্যা নিরূপন করুন।

অজীর্ণ কোন-না-কোন রকমের আছে শতকরা ১২ জনের। ইহার কারণ, ছাত্রদের খাদ্য যেরূপ হওয়া উচিত তাহা নহে; তাহারা ভাল করিয়া না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি খাদ্য উদরাস্থ করিয়া দ্রুত কলেজে যায়, এবং দৈনিক অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস (যথা ব্যায়ামাদি অঙ্গসঞ্চালনের অভাব) তাহাদের আছে।

বর্দ্ধিত প্লীহা শতকরা ২ জনের আছে।

কোন-না-কোন খুঁৎ যাহাদের আছে, এরূপ ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৭১জন। ইহার মানে নিখুঁৎ শরীর কেবল শতকরা ২৯ জন ছাত্রের আছে। ইহা শোচনীয় অবস্থা।

চোখের কোন-না-কোন দোষ যাহাদের আছে, তাহাদের সংখ্যা গত সাত বৎসরে শতকরা ৩৬ হইতে ৩২·৬ হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ। কমিটি বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী এবং সান্‌ অপ্টিক্যাল কোম্পানীর সহিত ছাত্রদিগকে ন্যূন মূল্যে চশমা জোগাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

দাঁতের ও মাড়ীর কোন-না-কোন রোগ অনেক ছাত্রের আছে। তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অর্থাভাবে কমিটি কিছু করিতে পারেন নাই।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার, এবং মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাসে ভ্রমণ এবং ব্যায়াম ও খেলার প্রয়োজন।

খাদ্যতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয় একটি আদর্শ খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বলের সব ছাত্রনিবাসের কর্ত্তৃপক্ষকে ইহা পাঠান হইয়াছে। এই খাদ্যতালিকার অনুসরণে দুটি প্রধান বাধা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গড়পড়তা মাসিক খাদ্যব্যয় ছাত্রপ্রতি ১৩ টাকা হইতে ১৬ টাকা হইবে, এবং কলিকাতার অধিকাংশ ছাত্রনিবাসে দিনে একবারও রুটি বা চাপাটি প্রস্তুত করান সহজ হইবে না। অনেক ছাত্রও ভাতের পরিবর্ত্তে বেশী করিয়া আটার রুটি ও ডাল খাইতে রাজী নয়। তাহাদিগকে এই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। মাসিক দুই টাকা বেশী ব্যয় অনেক ছাত্র করিতে পারে যদি ধূমপায়ীরা সিগারেট বিড়ি চুরুট ছাড়িয়া দেয়, এবং কলিকাতায় বায়োস্কোপ থিয়েটার যাওয়ার মাত্রা কমায়।

ব্যায়াম সম্বন্ধে রিপোর্টে দেখিতেছি, ৪৮টি কলেজের মধ্যে কেবল ১২টিতে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যায়াম ও খেলা ছাত্রদের অবশ্যকর্ত্তব্য করিয়াছেন এবং ২টিতে সে নিয়ম না থাকিলেও কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন, শতকরা ৯৫জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যায়াম করে ও খেলে। ৩৭টি কলেজের নিজের খেলিবার জায়গা আছে, ৫টি বন্দোবস্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী জায়গা ব্যবহার করে, ৬টির কোন খেলিবার জায়গা নাই। ব্যায়ামের যন্ত্রাদিসমন্বিত ব্যায়ামশালা কেবল ১৯টি কলেজে আছে। ২০টি কলেজে ব্যায়ামাদির শিক্ষক আছেন। এইজন্য তাহাদের ছাত্রপ্রতি বার্ষিক দুই টাকা খরচ হয়। এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দাঁড় টানিয়া নৌকা চালাইবার ক্লাব আছে।

—

ভারতীয় লাইব্রেরীসমূহের কন্‌ফারেন্স

ভারতীয় লাইব্রেরীসমূহের কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবার কথা ছিল। তজ্জন্য তিনি একটি ছোট অভিভাষণও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতা বশতঃ কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পাঠ করেন। উহা পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট-বড় সকল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষদের উহা পাঠ করিয়া তদনুসারে কাজ করা উচিত।

কন্‌ফারেন্সে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গবর্মেণ্ট, জেলা ও লোক্যাল বোর্ড এবং ম্যুনিসিপালিটিস-মূহকে শহর ও গ্রাম সকলে সর্ব্বসাধারণের জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করিতে ও তদ্দ্বারা শিক্ষা বিস্তার করিতে অনুরোধ করা হয়। আর একটিতে, কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর বর্ত্তমান লাইব্রেরিয়ান অবসরগ্রহণ করিলে, তাঁহার পদে লাইব্রেরী পরিচালনে জ্ঞানবান্‌ ও দক্ষ একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করিতে ভারত-গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



কান্দাহারের বাজার ও দুর্গ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৩৮ | ৫ম সংখ্যা

শেষের কবিতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেচে যে লাবণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙসুদ্ধ বাঙালী জানে। গভর্মেণ্ট আফিসের কেরাণীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রীবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়্ল মানব জীবনের জ্যোতির্ম্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্ত্তন, একেবারে ফার্ষ্ট্ ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্য্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয় নাট্যের নানা প্রকার ব্যাখ্যা চল্‌চে।

পাহাড়ে-হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজ্জে—এটর্ণি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ, সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে-গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারচে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দ্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখ্‌তে পাই তাতে ধূমকেতুর ল্যাজার বা মুড়োর কোনই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায় ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখ্‌তে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায়নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকট ভাবে

প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেচে এবং নিজেকে ভুলিয়েচে যে ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝ্‌তে পারেনি। কিন্তু দেখেও দেখ্‌তে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত। চুরি বিদ্যের মতোই, তার সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখ্‌বার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালী সমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেচে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে "অমিত রায়ের অমিতাচার।" মুখে সব চেয়ে নিন্দে করেচে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ করেচে তারাই। যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতি বিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কল্‌কাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুট-ধূমাকৃত অত্যুক্তি উদ্গারে সিসি-লিসি মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাক্‌বেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে এমন কথা উঠেচে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেচে। অমিতর সম্মতি সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু অমিত হাম্বাগ্‌টা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেচে। এমন কি, তারযোগে অত্যন্ত বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়েনি,—কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউয়ের মতো কোথাও তার কোন দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হোলো অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্ব্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায় টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জ্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিষ্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এই জন্যে আর্ট সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো সহরের বোহীমিয় পাড়ায় সে বাস করেচে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হোলো,এখন সে ছবির সমজ্‌দারীতে পরিপক্ক বলেই নিজের প্রমাণ-নিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চট্‌কাতে পারে। ফরাসী ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্ত দেশকে সযত্নে কণ্টকিত করেচে, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ্য সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাস-বৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হোত। দামী হাভানা দুচার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোষ্টে ফরাসী ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো—

এসব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজেষ্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা, এমন সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদ্গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্য সম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই করা,—বিলিতী কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালী মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্ব্বের প্রতি গর্ব্ব সহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির ল্যাজের মত বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করচে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যা'কে তা'কে দেখতেই পায় না, যদিবা দেখে ত লক্ষ্যই করে না, যদি বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁট দুটিতে সরল মাধুর্য্য ছিল, এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মত ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি, তার পরিভাষা জানিনে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাংলা সাপের খোলষের মত ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহু দুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গীতে আলগোছে রাখ্‌বার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর যখন সুমার্জ্জিত-নখর-রমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলঙ্করণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ খুর-ওয়ালা জুতো-জোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগল জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পায়নি, কিন্তু ডবল্ প্রোমোশন পেয়ে চলেচে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুসিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্ব্বদা একটা চলন বলন টগবগ করচে, উপাসক মণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা, এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে সাড়ির বহর ইঞ্চি দুই তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসম্বৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্ত্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার আমসত্ত পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না, ক্রিষ্টমাসের প্লাম্ পুডিঙ্গ এবং পৌষপার্ব্বণের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালীর কাছে সে নাচ শিখচে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সঙ্কোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে চলে এসেচে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত

শ্রেণী বিভাগে লাবণ্য গবর্ণেস্। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার "স্পেশাল্ ক্রিয়েশান্"। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেচে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জ্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্ম্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত এক সঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েচেন নিরেট্ নির্ব্বোধ করে। তাই, স্বজাতি-মোহমুক্ত আত্মীয় মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কি রকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেচে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জান্‌তে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রু-পক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তারপর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন-এক পোচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝকঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েচে তা নয়, সব শুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েচে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে, এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে সখ নেই বললেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে করেচে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, "দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামচ। এখন দেখ্‌চি তুমি হয়ে উঠ্‌চ, যাকে বলে গ্রীণ, এখানকার পাইনগাছের মতো, হয়ত আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইণ্টারেস্‌টিঙ্ নয়।"

অমিত বার্ডস্বার্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্ব্বাক নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন "mute insensate things."

শুনে সিসি ভাব্‌লে, নির্ব্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশী সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় স্ফুট, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায় সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশী রকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরী হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তারপরে মুখ দেখে মনে হয় ঝোড়ো হাওয়ায় যে-কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলচে তারি মতো শত দীর্ণ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে রবিঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যের নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লালকালী দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিষটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, ক্ষিদে সংগ্রহ করতে চলেচি। ক্ষিদের জোগানটা কোথায়, আর ক্ষিদেটা খুবই যে প্রবল তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর কিছু আছে একথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে, কেটি মনে-মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসঙ্কোচে সখী-যুগলের কাছে বলে, "চলেচি এক জল-প্রপাতের সন্ধানে।" কিন্তু প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্ অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের

মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, একজায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে চলেচে। মেয়ে দুটি নিতান্ত নিরীহ ভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বল্‌লে পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে আর দেরি নয় আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন্ গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল। সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে!

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। গাড়িবারাণ্ডায় এসে চোখে পড়্‌ল বাড়ীর রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চল্‌চে। বুঝতে বাকি রইল না, এরি মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টকটক ক'রে উপরে উঠে ইংরেজিতে বল্‌লে, "দুঃখিত।"

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বল্‌লে, "কাকে চান আপনারা?

কেটি একমুহূর্ত্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "মিস্‌টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।"

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পার্‌লে না, অমিট্রায়ে কোন্ জাতের জীব। বল্‌লে, "তাঁকে তো আমরা চিনিনে।"

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোক-ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়্‌ল একটা আড়হাসির রেখা। কেটি ঝাঁঝিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "আমরা তো জানি, এ বাড়ীতে তাঁর যাওয়া আসা আছে oftener than is good for him।"

ভাব দেখে লাবণ্য চম্‌কে উঠ্‌ল, বুঝ্‌লে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে, "কর্ত্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।"

লাবণ্য চ'লে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোমার টীচার?"

"হাঁ।"

"নাম বুঝি লাবণ্য?"

"হাঁ।"

"গট্ ম্যাচেস্?"

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ কর্‌তে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝ্‌ল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বল্‌লে, "দেশালাই।"

সুরমা দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে সুরমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ইংরেজি পড়ো?"

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চ'লে গেল। কেটি বল্‌লে, "গবর্ণেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানার্স শেখেনি।"

তার পরে দুই সখীতে টীপ্পনী চল্‌ল। "ফেমাস্ লাবণ্য! ডিভিনিশস্! শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্‌ক্যানো বানিয়ে তুলেচে, ভূমিকম্পে অমিটর হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এধার থেকে ওধার! সিলি! মেন্ আর্ ফানি।"

সিসি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠ্‌ল। এই হাসিতে ঔদার্য্য ছিল। কেননা, পুরুষ মানুষ নির্ব্বোধ ব'লে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটেনি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েচে, দিয়েছে একেবারে চৌচীর ক'রে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ অদ্ভুত ধরণে কাপড়-পরা গবর্ণেস্! মুখে মাপন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া, কাছে বস্‌লে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা প'ড়ে যায়। কী ক'রে অমিট্ ওকে এক মোমেণ্টও সহ্য করে!

"সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা ক'রে হাঁটে। কোন্ এক সৃষ্টিছাড়া উল্টো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।"

এই ব'লে টেবিলে এল্‌জেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারট্‌টা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রূপোর শিকলওয়ালা প্রসাধনের থলি বের ক'রে মুখে একটু খানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেন্সিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুল্‌লে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধ নয়নবিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের পরে। দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্য্য ভঙ্গ হয়। খুব ক'রে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের সাড়ি প'রে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া চুলে দুই চোখ আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেচে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাম্‌নের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্ম্মল সাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত ক'রে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন কর্‌লে। সিসি ঘাড় ধ'রে টেনে আন্‌লে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জ্জনী তাড়ন করে বললে, "নটি ডগ্।"

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে অত্যন্ত নিলিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌ল। যোগমায়ার পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা, লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁৎ আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গছিয়ে দেবার কৌশল করচে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরী ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সাম্‌নে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, "আমি সিসি, অমির বোন।"

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, "অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারো মাসি হই, মা।"

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, "এসো, মা, ঘরে বস্‌বে এসো।"

সিসি বল্‌লে, "সময় নেই, কেবল খবর্‌ নিতে এসেচি, অমি এসেছে কি না।"

যোগমায়া বল্‌লেন, "এখনো আসেনি।"

"কখন আস্‌বেন জানেন ?"

"ঠিক বল্‌তে পারিনে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করে আসিগে।"

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্র স্বরে বলে উঠ্‌ল, "যে মাস্টার্‌নি এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিট্‌কে সে কোনকালে জানেই না।"

যোগমায়ার ধাঁধাঁ লেগে গেল। বুঝ্‌লেন কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝ্‌লেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। একমুহূর্ত্তে মাসিত্ব পরিহার করে বল্‌লেন, "শুনেচি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।"

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাস্‌লে। তাকে ভাষায় বল্‌লে বোঝায়, "লুকোতে পারো, ফাঁকি দিতে পার্‌বে না।"

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হ'য়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই ; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য্য তার মনকে টেনেছিল। তাই, যখন দেখ্‌লে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়্‌লে না, তার মনে কেমন সঙ্কোচ লাগ্‌ল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন্‌ দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত,—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সঙ্কোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব্ব আছে ; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালমানুষী বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখ্‌লে তাকে সে অস্থির ক'রে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা ব'লে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সঙ্কুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখ্‌তে পার্‌লে আরাম পায়। সিসি সেই দলের,—সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্ব্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়েছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সাম্‌নে সিসির এই সঙ্কোচ কড়া ক'রে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে ক'রেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হ'য়ে উঠল। তবু জোর ক'রে এম্‌নি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রূ এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মার্‌তে প্রস্তুত—that much for it !

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক্‌। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল মাথায় ছিল ফেল্‌ট্‌ হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্ত্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটীরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্‌ফ্‌, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরাম কেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেই জন্যে, বিকেলে সাড়ে চারটে বেলায় চা-পান সভার পূর্ব্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনো প্রকার

তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্য-সম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোন মতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আস্ত।

আজ হোটেল থেকে বেরবার আগেই কলকাতা থেকে এসেচে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাবণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে ব'সে ব'সে কল্পনা করেচে। আজ হোলো ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চল্‌বে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেচে লাবণ্য যেখানে পড়াচ্চে সেইখানে গিয়ে বল্‌বে,—একদিন হাতীতে চ'ড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোট, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন তৈরী প্রাসাদে প্রবেশ করেনি। আজ এসেচে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো ক'রে রেখেচ,—সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত একথাও মনে ক'রে এসেছিল যে, ওকে বল্‌বে, ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাংক্‌চুয়ালিটি ;—কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী ক'রে ?

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে,—মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাচটা ছয়টার মতো। অমিত ঘড়ি দেখ্‌লে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইসারায় আকাশের প্রতিবাদ করে। যেমন বহু দিনের জ্বোরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মমিটার মিলিয়ে দেখ্‌তে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দ্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্ল্লজ্জ।

বারান্দার যে-কোণটায় ব'সে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখ্‌লে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌ল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল, নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার ; মর্ত্ত্যে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব ব'লেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্ত্ত্যেই দেখা দেয় তখন নিয়ম ভেঙ্গে তাকে সেলাম ক'রে নিতে হয়। আশা হোলো, লাবণ্য নিয়ম ভাঙার গৌরব বুঝেচে বা ; লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন ক'রে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেচে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্চে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝ্‌তে বাকি রইল না। ট্যাবি কুকুরটা তার প্রথম মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটীর পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠ্‌ল। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্ভাব প্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে "মাসি" বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে প'ড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন ক'রে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "মাসিমা, লাবণ্য কোথায় ?"

"কি জানি, বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।"

"এখনো তো তার পড়বার সময় শেষ হয়নি।"

"বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।"

"চলো, একবার দেখে আসি সে কী করচে।" যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু চেঁচিয়েই ব'লে উঠ্‌ল, "অপমান! চলো, কেটি, ঘরে যাই।"

কেটিও কম জ্বলেনি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বল্‌লে, "কোনো ফল হবে না।"

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "হতেই হবে ফল।"

আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বল্‌লে, "চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করচে না।"

কেটি বারাণ্ডায় ধন্না দিয়ে ব'সে রইল। বল্‌লে, "এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।"

অবশেষে বেরিয়ে এলো অমিত, সঙ্গে নিয়ে এলো লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্দ্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধ'রে নিয়ে এল। একমুহূর্ত্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়্‌ল লাবণ্যর হাতে আঙটি। মাথায় রক্ত চন্ ক'রে উঠ্‌ল, লাল হয়ে উঠ্‌ল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বল্‌লে, "মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।"

ইতিমধ্যে আর এক উপদ্রব! সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুক্কুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্দ্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ ব'লেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হ'য়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁস্‌ফোঁসানিতে যুদ্ধের আশুফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হ'য়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্র গর্জ্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে ক'রে অপরিমিত চীৎকার সুরু ক'রে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কানমলা দিতে লাগ্‌ল। এই কানমলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাস্‌ল।

এই গোলমালটা একটু থাম্‌লে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বল্‌লে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোনোনি, কিন্তু বোধ হচ্চে, আর দশজনের কাছ থেকে শুনেচ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হ'য়ে গেচে, কলকাতায় অঘ্রান মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে আন্‌তে দেরি করলে না। বল্‌লে, "আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্! কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয়নি বলেই ঠেক্‌চে, রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেচে মুখের কাছে।"

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমতো হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুঝলে কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বল্‌লে, "আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্চ? আমি ব'লেছিলুম বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাস্‌চে। ওটা আমারই দোষ;—আমার কোন্ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।"

কেটি শান্ত স্বরেই বল্‌লে, "কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার ত জিৎ হোলো, এবার আমারো যাতে হার না হয়, সেটা করো।"

"কি করতে হবে, বলো।"

"নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেণ্টেল্‌ম্যান্‌রা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস্‌ দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেস্‌-এ নিয়ে যাবই। এদেশে যত ঝরণা যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষ কালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো না, ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েচে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose !"

সিসি কোনো কথা না ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌ল। কেটি বল্‌লে, "মনে পড়চে সেই গল্পটা—একদিন তোমার কাছেই শুনেচি, অমিট্‌। কোন্‌ পার্শিয়ান্‌ ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসেছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায় ? মিস্‌ লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বল্‌লে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আস্‌তেই হবে।"

সিসি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বল্‌লে, "অমিট্‌ আপনার নাম মুখে আন্‌লে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বল্‌লে, কমলালেবুর মধু ; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বল্‌বার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস্‌ করে বলে ফেল্‌লেন, অমিট্‌কে জানেনই না। তবু সান্‌ ডে স্কুলের বিধান মতো ফল ফল্‌লো না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই পেয়ে নিলেন, আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জান্‌লেন, এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে ? দেখ তো, সিসি, কী অন্যায় !"

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। টাবি কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্ত্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হোলো।

কেটি বল্‌লে, "অমিট্‌ তুমি জানো, এই হীরের আঙটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাক্‌বে না। এ আঙটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেচে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে ?"

সিসি বল্‌লে, "বাজি রাখতে গেলে কেন, ভাই ?"

"মনে মনে নিজের উপর অহঙ্কার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহঙ্কার ভাঙল,—এবারকার মতো আমার রেস্‌ ফুরালো, আমারি হার। মনে হচ্চে অমিট্‌কে আর রাজি করতে পার্‌ব না। তা এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে সেদিন এত আদরে আঙটি দিয়েছিলে কেন ? সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না ? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘট্‌তে দেবে না ?"

বল্‌তে বল্‌তে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সাম্‌লে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আঙটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবী যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপোষে অমিত সেই পাঞ্জাবীর সঙ্গে নদীতে বাচ

খেলেছিল। অমিতরই হোলো জিৎ। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা ব'লে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেচে। সেইক্ষণে অমিত কেটির হাতে আঙটি পরিয়ে দিলে, তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগেনি, তার হাসিটি সহজ ছিল, তার মুখ ভাবের আবেগে রক্তিম হ'তে বাধা পেত না। আঙটি হাতে পরা হ'লে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বল্‌তে শেখেনি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল, "মন্ আমী," ফরাসী ভাষায় যার মানে হচ্ছে বঁধু।

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না, কী বল্‌বে।

কেটি বল্‌লে, "বাজিতে যদিই হার্‌লুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্ অমিট্। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বল্‌তে দেবো না।"

ব'লে আঙটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুত বেগে চ'লে গেল। এনামেল করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ক'রে চোখের জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

(ক্রমশঃ)

গীতার কর্ম্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

কর্ম্মবিষয়ে গীতাকারের কি মত, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ। কেহ বলেন কর্ম্ম কেবল নিম্নতম সাধকদিগের জন্য, কেহ বা বলেন মুক্ত পুরুষগণও কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং বিষয়টি আলোচ্য।

কর্ত্তা কে ?

কর্ম্ম করে কে ? অবশ্যই মানব। মানব, নর, জন, মানুষ, পুরুষ ইত্যাদি শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে। এই সমুদায় শব্দ সচরাচর 'দেহযুক্ত আত্মা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু গীতাতে কোনস্থলে ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে আত্মার দিকে, কোনস্থলে দেহের দিকে, এবং এমন স্থলও আছে, যে স্থলে আত্মা ও দেহ এই উভয়ের প্রতিই সমান দৃষ্টি

সুতরাং 'মানব কর্ম্ম করে' বলিলেই যে বুঝিতে হইবে 'আত্মা কর্ম্ম করে' এ প্রকার নহে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিষ্ক্রিয়—আত্মা কর্ম্ম করেও না, করিতে পারেও না। কর্ম্ম করে প্রকৃতি, কর্ম্ম করে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি।

গুণসমূহের কার্য্য

গুণ তিনটি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। নির্ম্মলতা, শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি সত্ত্বগুণ হইতে প্রকাশিত হয় (১৪।৬, ১৮।১৪ ইত্যাদি)। এই গুণ জ্ঞানাসক্তি ও সুখাসক্তি দ্বারা মানবকে আবদ্ধ করে (১৪।৬)। রজোগুণ হইতে প্রবৃত্তি, তৃষ্ণা, অশান্ত ভাব, স্পৃহা, কর্ম্মের আরম্ভ, ইত্যাদি উৎপন্ন হয় (১৪।৭, ১২ ইত্যাদি)। রজোগুণের জন্যই কর্ম্মাদিতে

মানবের প্রবৃত্তি জন্মে (১৪।১২)। এই গুণের জন্যই মানুষ কর্ম্মে আসক্ত হয় (১৪।৭)। তমোগুণ হইতে মোহ, অজ্ঞানতা, প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয় (১৪।৮)।

সংক্ষেপে বলা হয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের কার্য্য, প্রবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য, এবং মোহ তমোগুণের কার্য্য (১৪।২২ দ্রষ্টব্য)।

এই গুণত্রয় দ্বারা অব্যয় আত্মাও অচিন্ত্য উপায়ে সংসারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে (১৪।৫)।

গুণাতীত অবস্থা

কিন্তু যখন দেহী এই গুণ-সমূহকে অতিক্রম করে, তখন সে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে (১৪।২০)।

এই পৃথিবীতে বাস করিয়াও মানুষ গুণাতীত হইতে পারে। গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি তাহা গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে। লিখিত আছে যে, যখন গুণত্রয়ের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তখন গুণাতীত ব্যক্তি এই গুণত্রয়কে দ্বেষ করেন না এবং গুণত্রয়ের অভাব দৃষ্ট হইলেও এ সমুদায়কে আকাঙ্ক্ষা করেন না (১৪।২২)। গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীনবৎ বর্ত্তমান থাকেন, তিনি গুণ দ্বারা বিচলিত হন না, গুণের কাজ গুণ নিজে করিতেছে, এই ভাবিয়া তিনি অচঞ্চল থাকেন। তিনি আপনাতে আপনি অবস্থিত ; তিনি ধীর ; লোষ্টপাষাণ স্বর্ণে তিনি সমভাবাপন্ন ; সুখ ও দুঃখ, প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও প্রশংসা, মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্র সমুদায়ই তাঁহার নিকট সমান। তিনি সর্ব্বপ্রকার উদ্যম পরিত্যাগী (সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী) ১৪। ২৩-২৫ ; ১২। ১৬

অনেকে মনে করেন জীবন্মুক্ত পুরুষ পুণ্যকার্য্য করেন—তিনি করেন না পাপকার্য্য। এ মত ঠিক নহে। তিনি শুভ এবং অশুভ (১২। ১৭) এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত (২। ৫০) উভয়ই পরিত্যাগ করেন। সাধু ও পাপীর প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি ৬। ৯।

কেহ কেহ মনে করেন,এ সমুদায় স্তুতিবাদ—মুক্তাবস্থার গৌরব ঘোষণা করিবার জন্যই ঐ প্রকার ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। এ মতও ভ্রমাত্মক। পূর্ব্বোক্ত উক্তি-সমূহ গীতার মৌলিক তত্ত্বেরই পরিণাম। মৌলিক তত্ত্ব এই :—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি—কিছুই আত্মা নহে বা আত্মার নহে—এ সমুদায়ই প্রকৃতির বিকার। কার্য্য করে ইন্দ্রিয়াদি। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম সম্পাদিত হয় ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রভাবে ; পুণ্যাদি কর্ম্ম উৎপন্ন হয় সত্ত্বগুণ হইতে, এবং পাপাদি কর্ম্ম উৎপন্ন হয় রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, পাপ ও পুণ্য উভয়ই গুণ হইতে উৎপন্ন, এবং গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং ইহাও যদি স্বীকার করা হয় যে, প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণ আত্মা হইতে পৃথক, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পাপ ও পুণ্য কিছুই আত্মার নহে, কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করে না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা গীতাকারের মতটিকে আরও পরিষ্কার করা যাইতে পারে। উদাসীন এক মানব নদীতীরে দণ্ডায়মান ; সে দর্শন করিতেছে নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, নদীপ্রবাহে তাহার আমিত্ব নাই, মমত্ব নাই, জল স্বচ্ছই হউক বা পঙ্কিলই হউক, উভয়ই তাহার নিকটে সমান ; কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। মুক্তাত্মাও তেমনি কর্ম্মনদীর উপকূলে দণ্ডায়মান ; তিনি দেখিতেছেন কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার আমিত্ব নাই, মমত্ব নাই ; ইহা পাপদ্বারা পঙ্কিলই হউক বা পুণ্যদ্বারা স্বচ্ছীকৃতই হউক, উভয়ই তাঁহার নিকট সমান ; কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। উদাসীন ভাবে তিনি দণ্ডায়মান।

মুক্তাত্মার কর্ম্ম

আমরা আত্মার তিন অবস্থা কল্পনা করিয়া লইতে পারি, (১) বিদেহ মুক্তি, (২) জীবন্মুক্তি, এবং (৩) বদ্ধাবস্থা। বিদেহ মুক্তির সহিত কর্ম্মের কি সম্বন্ধ প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাউক। এই অবস্থায় আত্মা বিদেহ, ইন্দ্রিয়াতীত এবং গুণাতীত। যেখানে ইন্দ্রিয় ও গুণ, সেই-খানেই কর্ম্ম ; যেখানে ইন্দ্রিয়াদি নাই, এবং গুণসমূহও নাই, সেখানে কর্ম্মও নাই। সুতরাং মুক্তাত্মার কর্ম্ম নাই, এই অবস্থায় আত্মা অকর্ত্তা।

জীবন্মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম

দেহত্যাগের পূর্ব্বেও মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে ; ইহাকে জীবন্মুক্তি বলা হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষও গুণাতীত

গুণাতীত অবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, ('গুণাতীত' প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। এ স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্ম গুণমূলক। কর্ম্মের প্রতি মানুষের যে স্পৃহা জন্মে, কর্ম্ম করিবার জন্য মানুষের যে প্রবৃত্তি হয়, এবং মানুষ যে কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহার মূলে রজোগুণ (১৪।১২)। রজোগুণের উত্তেজনাবশতঃ যেমন মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তেমনি এই গুণের প্রভাবে সে কর্ম্মে আসক্তও হয় (১৪।১৫)।

মানব যখন জীবন্মুক্ত হয়, তখন সে গুণাতীত; তাহার উপর কোনো গুণেরই কার্য্য নাই, সুতরাং রজোগুণেরও কার্য্য নাই। সুতরাং সে কর্ম্মে প্রবৃত্তও হয় না, কর্ম্মে আসক্তও হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জীবন্মুক্ত পুরুষও ত দেহধারী, তাঁহার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায়ই আছে, তবে তিনি কার্য্য করিবেন না ইহার অর্থ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি থাকিয়াও যেন নাই। তিনি মনে করেন, ইন্দ্রিয়সমূহই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তিনি নিজে কিছু করেন না। কর্ম্ম করিতেছে প্রকৃতি; তিনি স্বয়ং অকর্ত্তা (৩।২৭; ৫।১৩; ১৪।২৩ ইত্যাদি)। তিনি সর্ব্বদা উদাসীনভাবে বর্ত্তমান (১২।১৬; ১৪।২৩,), ইন্দ্রিয়সমূহ যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে দ্বেষ করেন না, আবার তাহারা যদি কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, তাহা হইলেও তিনি এ বিষয়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, (১৪।২২, ২৩)। যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, তাঁহার কোনো কর্ম্ম নাই (৩।১৭)। ইহলোকে কর্ম্মদ্বারা বা কর্ম্মত্যাগ দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না (৩।১৮)। তিনি কেবল শারীর স্বাভাবিক কর্ম্মই করেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কোন 'মমত্ব' নাই (৪।২১)। তিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী (১২।১৬; ১৪।২৫)। গীতার আদর্শ পুরুষ যেমন কর্ম্মে আসক্ত নহেন, তেমনি কর্ম্মত্যাগেও আসক্ত নহেন (২।৪৭)।

জীবন্মুক্ত পুরুষ এই প্রকার।

বদ্ধজীবের কর্ম্ম

আমরা কর্ম্মজগতে বাস করি; আমরা মনে করি আমাদের ইন্দ্রিয় আছে, কার্য্য করিবার প্রয়োজন আছে, এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিও আছে। আমরা কর্ম্ম করি, সুখ-দুঃখে আবদ্ধ হই, সংসারে জড়িত হই, ইহাই বন্ধনদশা। কর্ম্মজগৎ বন্ধনের জগৎ; কর্ম্মবন্ধনের অতীত হওয়াই মোক্ষ।

কেহ কেহ বলেন, কর্ম্মই যখন বন্ধনের কারণ, তখন কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই ত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়?

কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব

(১)

কিন্তু গীতাকার বলেন, মানুষের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। "কর্ম্ম না করিলে মানুষের জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না।" ৩।৮

(২)

দ্বিতীয়তঃ, "কদাচ কেহ ক্ষণকাল কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণসমূহ (অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি) সকলকেই অবশ করিয়া কার্য্য করায়।" ৩।৫

অপর একস্থলে বলা হইয়াছে যে, মানুষের ইচ্ছা না থাকিলেও রজোগুণ সমুদ্ভুত কামক্রোধাদি তাহাকে কার্য্যে নিয়োজিত করে (৩।৩৬, ৩৭)।

দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম না করিলে মানুষ জীবন ধারণও করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষকে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়।

(৩)

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ

কেহ কেহ মনে করেন, ইন্দ্রিয়াসক্তিই যখন সকল অনিষ্টের মূলে, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেই ত সমুদায় বন্ধন কাটিয়া যায়।

কিন্তু গীতাকার বলেন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মানুষ আপনার প্রকৃতি অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। আত্মা প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মানবের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ সত্ত্বগুণপ্রধান, কেহ রজোগুণপ্রধান, কাহারও জীবনে বা তমোগুণই বিশেষভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও সহজে এই সমুদায় গুণকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এ বিষয়ে গীতাকারের উক্তি এই :—

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হয়। (ইন্দ্রিয়) নিগ্রহ কি করিতে পারে? ৩।৩৩

লোকে বাহিরে কর্ম্ম না করিতে পারে, কিন্তু অন্তরে যদি সেই বিষয়ে চিন্তা করে, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তাহার কর্ম্মত্যাগ হইল না। এই শ্রেণীর লোককে নিন্দা করিয়া গীতাকার বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সমূহকে স্মরণ করিয়া অবস্থান করে, সেই মূঢ়চেতা, কপটাচারী বলিয়া উক্ত হয়।" ৩।৬

ইচ্ছা, কামনা, আসক্তি, সুখস্পৃহা ইত্যাদি কর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়। কর্ম্ম অন্তর্গত ভাবের বাহ্যপ্রকাশ। বাহ্যপ্রকাশ না থাকিলেই যে অন্তর্গত ভাব থাকিবে না, তাহা নহে। কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগৃহীত হইলেও অন্তরে বাসনাদি কার্য্য করিতে পারে। এইজন্য গীতাকার ইন্দ্রিয়নিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই।

(৪)

কর্ম্ম দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য

চতুর্থতঃ, গীতাকারের একটি বিশেষ মত এই যে, "কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না" "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" ৩।৪

'নৈষ্কর্ম্ম্য' শব্দের মুখ্য অর্থ ও ধাত্বর্থ 'কর্ম্মরাহিত্য' 'কর্ম্মশূন্যত্ব'। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয় না ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। মানবজীবন এমনভাবেই গঠিত যে, ইন্দ্রিয়গণকে কিছু আহার না দিলে ইহাদিগকে সহজে বশীভূত করা যায় না। অনেকে তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করেন,কিন্তু অনেক সময়ে অতৃপ্ত বাসনা, অনাস্বাদিত সুখের কল্পনা ইহাদিগের প্রাণকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলে। পরিমিত ভোগের পরই ভোগত্যাগ সহজ হইয়া থাকে (৬।১৬, ১৭)। প্রথম হইতেই যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সহজে সিদ্ধিলাভ হয় না।

"ন চ সংন্যসনাদেব
সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।" ৩।৪

এজন্যও গীতাকার কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

যোগ ও কর্ম্ম

(ক)

পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়, মুক্তাত্মাও নিষ্ক্রিয় এবং জীবন্মুক্ত পুরুষেরও কর্ম্ম নাই। মুক্ত হওয়াই যখন সকল সাধনার লক্ষ্য, তখন সাধককে কর্ম্মের অতীত হইতেই হইবে। অথচ গীতাকার বলিতেছেন যে, মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব, অথচ কর্ম্মের অতীত হইতে হইবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? গীতাকার বলিতেছেন—"কর্ম্ম কর, কিন্তু যোগস্থ হইয়া"—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" ২।৪৮

যোগ গীতার একটি মুখ্য ভাব। সমত্বই যোগ—সমত্বং যোগমুচ্যতে ২।৪৮। সমত্ব অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়ের সাম্যভাব, স্থৈর্য্য, প্রশান্ত ভাব ইত্যাদি। 'যোগ' শব্দের স্থলে 'বুদ্ধিযোগ'ও ব্যবহৃত হইয়াছে (২।৪৯)। কেহ কর্ম্ম করিয়াও মুক্ত আর কেহবা কর্ম্মত্যাগ করিয়াও বদ্ধ। গীতাকার বলিয়াছেন,—

যিনি কর্ম্মফলকে আশ্রয় না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী; নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি (সন্ন্যাসী বা যোগী) নহেন ৬।১।

সাধক যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া নিরগ্নি হইতে পারেন, পূর্ত্তাদি কর্ম্মত্যাগ করিয়া অক্রিয় হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি কামনা ও আসক্তি ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়াও কর্ম্মাসক্ত। আর যাঁহার মন বুদ্ধি চিত্ত সংযত, যিনি অনাসক্ত, তিনি কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী। বাহিরে কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবান্তর বিষয়—মুখ্য বিষয় যোগযুক্ত অবস্থা।

এইজন্য গীতাকার কর্ম্মকে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান দিয়াছেন।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম
বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়। ২।৪।৯

"হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অতীব নিকৃষ্ট।"

যিনি যোগযুক্ত, তাঁহার উপর কর্ম্মের কোন প্রভাবই নাই। এইজন্যই কর্ম্ম অপেক্ষা যোগ শ্রেষ্ঠতর। গীতাকারের মতে যোগযুক্ত পুরুষ তপস্বী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং "কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী" যোগী কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ৬।৪৬।

(খ)

কুশলতা না থাকিলে কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। যোগরূপ উপায় অবলম্বন করিলে মানব কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়াও কর্ম্ম করিতে পারে। এইজন্য যোগকে 'কৌশল' বলা হইয়াছে। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্", কর্ম্মসমূহে কৌশলই যোগ।২।২৫

কয়েকটি প্রমাণ

আত্মা কোন কর্ম্ম করে না, কর্ম্ম করে প্রকৃতি। কিন্তু মোহবশতঃ মানুষ মনে করে 'আমিই কর্ম্ম করিতেছি।' প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে সাধক অনুভব করেন যে, প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে। এ অবস্থায় কোন কার্য্যেই তাঁহার 'মমত্ব' নাই। আমরা তখন লৌকিক ভাষায় বলি, তিনি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন। এ বিষয়ে গীতায় অসংখ্য প্রমাণ। আমরা নিম্নে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক)

"প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্ম্মসমূহ সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে 'আমি কর্ত্তা'।" (৩।২৭)। আর যে ব্যক্তি গুণ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ববিৎ, সে মনে করে "গুণসমূহই (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহই) গুণে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে। এইরূপ মনে করিয়া সে আসক্ত হয় না" (৩।২৮)।

(খ)

পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ আছে :—

"যে ব্যক্তি যোগযুক্ত নহে, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস দুঃখলাভেরই হেতু হয়; আর যোগযুক্ত ব্যক্তি অবিলম্বে ব্রহ্ম লাভ করে।" ৫।৬

যে ব্যক্তি যোগযুক্ত নহে, যাহার চিত্ত নিত্যচঞ্চল ও অসংযত, তাহার কর্ম্মত্যাগ দুঃখেরই কারণ। কাম্য বস্তু ভোগ করা যাইতেছে না অথচ অন্তরে ভোগবাসনা; ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক ঘটনা আর কি হইতে পারে? এইজন্যই গীতাকার বলিয়াছেন, যোগবিহীন ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাস দুঃখজনক।

উক্ত শ্লোকের পরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"যিনি যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, এবং যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মভূত, তিনি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না। ৫।৭

যুক্ত তত্ত্ববিৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস-প্রশ্বাস কর্ম্ম, কথোপকথন, মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, (চক্ষুর) উন্মীলন ও নিমীলন—(এই সমুদায় কার্য্য) করিয়াও ধারণা করেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহই ইন্দ্রিয়-বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং তিনি মনে করেন, 'আমি কিছুই করিতেছি না'।" ৫।৭, ৮

জিতচিত্ত দেহী মনদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস করিয়া নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপুরে (স্বয়ং কোন কর্ম্ম) না করিয়া (এবং অপরকে কোন কর্ম্ম) না করাইয়া সুখে অবস্থান করে। ৫।১৩

প্রভু লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। স্বভাবই (অর্থাৎ প্রকৃতিই) কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। ৫।১৪

(গ)

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মতত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—

"যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যুক্ত, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ" ৪।১৮।

এই অংশের নানাপ্রকার অর্থ করা হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয় সঙ্গত ব্যাখ্যা এই—'যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম

দেখেন' অংশের অর্থ—'যিনি প্রকৃতির কর্ম্মের মধ্যে আত্মার নিষ্ক্রিয়ভাব দেখেন'। 'যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন'—অংশের অর্থ 'যিনি দেখেন আত্মা নিষ্ক্রিয়, অথচ কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে'।

ইহার মূলে এই ভাব যে আত্মা অকর্ত্তা, অথচ এই আত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে। স্মুতরাং এক অর্থে আত্মা 'সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ'।

ইহার পরের চারিটি শ্লোক এই :—

"যাঁহার সকল কর্ম্ম কাম ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে; জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন। ৪।১৯

যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত, যিনি নিরাশ্রয়, (অর্থাৎ যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন না) তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও কিছুই করেন না। ৪।২০

যিনি নিষ্কাম, সংযত-চিত্ত, যিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি কেবল শরীরধারণের জন্য কর্ম্ম করেন (বা শরীরের যে সমুদায় কর্ম্ম স্বাভাবিক, যিনি কেবল সেই সমুদায় কর্ম্মই করেন), যিনি কর্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হন না (৪।২১); স্বয়ম্ উপস্থিত বস্তুলাভে যিনি সন্তুষ্ট, যিনি (সুখ-দুঃখাদি) দ্বন্দ্বের অতীত, নির্ব্বৈর, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান, তিনি কর্ম্ম করিয়াও আবদ্ধ হন না। ৪।২২

(ঘ)

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি জগতে অতুলনীয় :—

"কর্ম্মেই তোমার অধিকার; কর্ম্মফলে কখনও (অধিকার) না (হউক)। তুমি কর্ম্মফলহেতু (অর্থাৎ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী) হইও না। অকর্ম্মেও (অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগে) তোমার আসক্তি না হউক।" ২।৪৭

এখানে বলা হইতেছে যে, কর্ম্মফলেও আসক্তি থাকিবে না এবং কর্ম্মত্যাগেও আসক্তি থাকিবে না।

কি ভাবে কর্ম্ম করিবে, তাহা পরের কয়েকটি শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

"হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান হইয়া সমুদায় কর্ম্ম কর। সমতাই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।" ২।৪৮

পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে কৃপণাঃ ফলহেতবঃ—যাহারা ফল কামনা করে, তাহারা কৃপণ (অর্থাৎ কৃপার পাত্র)। ২।৪৯

যাহারা ফল কামনা করে না, তাহারাই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়।

উপসংহার

যাহারা বদ্ধজীব, তাহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া গীতাকার এই উপদেশ দিতেছেন,—

"কর্ম্ম কর, কিন্তু যোগস্থ হইয়া; কর্ম্ম কর, কিন্তু ফল কামনা না করিয়া; কর্ম্ম কর, কিন্তু আসক্ত না হইয়া।" গীতার সর্ব্বত্রই এই উপদেশ। যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহারা এই বিধির উপরে। তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম সম্ভব নহে। তাঁহারা জানেন—"আমরা কর্ম্ম করি না, কর্ম্ম করিতে পারি না—সমুদায় কর্ম্ম প্রকৃতির; প্রকৃতিই সমুদায় কর্ম্ম করিতেছে।" সিদ্ধপুরুষ কর্ম্মও করেন না এবং অ-কর্ম্মেও আসক্ত নহেন।

অপরাপর তত্ত্ব পরে আলোচিত হইবে।

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীশিক্ষা

শ্রী বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি

যে-সমস্ত রমণী বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ত বেশ বুঝিতে পারিতেনই, শিক্ষা-ব্যাপারেও একেবারে অন্ধকারে ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগের অনেক রমণী শিক্ষাদীক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ-ভ্রাতাদেরই সমকক্ষ ছিলেন। অবিবাহিতা

বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিংবা গৃহেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে কথার কোনও ইঙ্গিত অবশ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। পালিধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের মতে থেরীগাথার শ্লোকগুলি ঋষিকল্পা নারীদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। নারীদের প্রতিভার প্রমাণ-স্বরূপ সুক্কার ধর্ম্মবক্তৃতা এবং ক্ষেমা ও ধর্ম্মদিন্নার দার্শনিক আলোচনা প্রভৃতিরও উল্লেখ করা যায়। সুতরাং সে যুগের নারীদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না একথা বলিলে বৌদ্ধ-সাহিত্যে যে-সব ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহাই উপেক্ষা করা হয়। প্রাচীন ভারতের পাণ্ডিত্যের জন্য যে-সব রমণী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই-চারিজনের নাম, ইউরোপীয়দের না হোক্ অন্ততঃ বহুভারতবাসীর স্মৃতিপথে এখনও জাগিয়া আছে। থেরীগাথা যাঁহারা গান করিতেন, তাঁহারাই রচনা করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ দেখা যায়, কিন্তু বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের যুক্তি অতি সামান্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাইতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের একথা অবিশ্বাস করিবার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, বুদ্ধের সময়ে যাঁহারা সাংসারিক জীবন পরিহারপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় আনন্দের রসাস্বাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন, বহু সময়ে বিশেষভাবে মার যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ইন্দ্রিয়-লালসার লোভ বা নানাবিধ বিভীষিকা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহারাই মুখে মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবময় শ্লোক-সকল রচনা করিয়া গান করিতেন। গাথাগুলি যে মেয়েদের দ্বারাই গীত হইত, তাহা নিঃসংশয়েই বলা যায়। তাহা ছাড়া যে-সমস্ত রমণী শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণও প্রদত্ত হইল। বুদ্ধের সময় মেয়েদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা যে প্রচলিত ছিল, তাহা এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

বক্তৃতা দিতে পারিতেন এমন একটি রমণীর উল্লেখ সংযুক্তনিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুক্কা নাম্নী একজন ভিক্ষুণী রাজগৃহের এক বৃহৎ জনতার সম্মুখে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া একজন যক্ষ এতই প্রীতিলাভ করিয়াছিল যে, রাজগৃহের রাস্তায় রাস্তায় সে বলিয়া ফিরিতেছিল—সুক্কা সুধা বিতরণ করিতেছেন, যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদের সেই সুধা পান করিয়া আসা উচিত (১ম খণ্ড, পৃঃ ২১২—২১৩)। ক্ষেমা বিনয়গ্রন্থ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, প্রচুর পড়িয়াছিলেন, চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারিতেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। একদা রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় কি না?" তিনি বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধ এ কথায় কোনও উত্তর দেন নাই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই কেন?" ভিক্ষুণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন কাহাকেও জানেন যিনি গঙ্গার বালুকা এবং সমুদ্রের জলবিন্দু গণনা করিতে পারেন?" রাজা কহিলেন, "না।" ভিক্ষুণী বলিলেন, "যদি কেহ পঞ্চ স্কন্ধের আকর্ষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে তবে সে অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং মৃত্যুর পর এইরূপ জীবের পুনর্জ্জন্ম ধারণার অতীত বস্তু।" এই উত্তর শুনিয়া রাজা পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। (সংযুক্তনিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪—৩৮০)।

ভদ্দা কুণ্ডলকেশা সংসার ত্যাগ করিয়া নিগণ্ঠ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। তারপর নিগণ্ঠদের ধর্ম্ম-মত অধিগত করিয়া তাঁহাদের সাহচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি পণ্ডিতদের কাছে কাছে ঘুরিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তর্কে এক সারিপুত্র ছাড়া আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। এই সারিপুত্র তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ৯৯)।

মজ্ঝিম নিকায় গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনে সুপণ্ডিতা ধর্ম্মদিন্না নাম্নী একজন শিক্ষিতা মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

একদিন ধম্মদিন্নার স্বামী তাঁহাকে আর্য্যঅষ্টাঙ্গিকমার্গ, সংস্কার, নিরোধসমাপত্তি হইতে উদ্ধারলাভের উপায় এবং নানা প্রকারের বেদনা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। ধম্মদিন্না প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "পঞ্চ উপাদানখন্ধের দ্বারা সংস্কার নির্ম্মিত।" তৃষ্ণার অর্থে সংস্কার সমুদয়। তৃষ্ণাধ্বংসের অর্থ সংস্কার-বিনাশ, মহান আটটি পথের দ্বারা সংস্কার-নিরোধ লাভ করা যায়। মূর্খ যাহারা তাহারাই পঞ্চ উপাদানখন্ধকে একত্রে এবং পৃথকভাবে অত্তাকে (আত্মাকে) দেখে। জ্ঞানী শিষ্যেরা বাক্য, নিশ্বাসপ্রশ্বাস এবং মনের কার্য্যকে এইরূপ ভাবে গ্রহণ করেন না। যাঁহারা নিরোধসমাপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐগুলিকে একটির পর একটি রোধ করেন। বেদনা তিন প্রকারের—যথা, সুখ, দুঃখ, এবং অদুঃখ—অসুখ [১ম খণ্ড পৃঃ ২৯৯ হইতে] ধম্মদিন্না বিনয়গ্রন্থ বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন (দীপবংশ, ১৮ পর্ব্ব)।

বিমানবত্থুভাষ্যে (পৃঃ ১৩১) একটিমাত্র শিক্ষিতা রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রমণীটি শ্রাবস্তীর জনৈক উপাসকের কন্যা—তাঁহার নাম ছিল লতা। তিনি শিক্ষিতা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। সঙ্ঘমিত্তা তিন রকমের বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। যাদুবিদ্যাতে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল (দীপবংশ, ১৫ পর্ব্ব)। বিনয়পিটক তিনি এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অন্যলোককে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিতেন। বস্তুতঃ অনুরাধপুরে বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন (দীপবংশ, ১৮ পর্ব্ব)। অঞ্জলি ছয়টি অলৌকিক গুণ এবং মহান দৈবশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। সঙ্ঘমিত্তার মত তাঁহারও বিনয়পিটকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সুতরাং তিনি অন্য লোককেও এই গ্রন্থ হইতে শিক্ষা দান করিতে পারিতেন। তিনি অনুরাধপুরে ১৬ হাজার ভিক্ষুণীসহ গমন করিয়াছিলেন এবং বিনয়-পিটক হইতে সত্যসত্যই শিক্ষাও দান করিয়াছিলেন। উত্তরা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যাদুবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনুরাধপুরে গমন করিয়া তিনি বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। কালি একজন দুশ্চরিত্রের কন্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের মন অত্যন্ত পবিত্র ছিল এবং তিনি সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই সুপণ্ডিতা ছিলেন। তিনিও অনুরাধপুরে বিনয়-পিটক সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। যে-সব ভিক্ষুণী বিনয় আলোচনার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সপত্তা, ছন্না, উপালি এবং রেবতীর নাম বিশেষ-ভাবেই উল্লেখযোগ্য। সীবলা এবং মহারুহা অনুরাধ-পুরে বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। সমুদ্দনাভা অনুরাধপুরে বিনয়পিটক শিক্ষা দান করিয়া-ছিলেন (দীপবংশ, ১৮ পর্ব্ব)। হেমা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন এবং আলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল (দীপবংশ, ১৫শ পর্ব্ব)। তিনি বিনয়-পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। (১৮ পর্ব্ব)। অগিগমিত্তা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল (১৫ সর্গ)। চূলনাগা, ধন্না, সোনা মহাতিস্সা, চূল-সুমনা এবং মহাসুমনা প্রভৃতি নারীগণ শিক্ষিতা, প্রতিভা-সম্পন্না এবং শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন (১৮ সর্গ)। নন্দুত্তরা বিদ্যা এবং শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ৮৭)। যে-সমস্ত ভিক্ষুণী বিনয়পিটক আয়ত্ত করিয়া-ছিলেন, পটাচারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারিণী (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫ এবং দীপবংশ, ১৮ সর্গ)। উল্লিখিত থেরীগণ ব্যতীত আরও অনেক রমণীর নাম পাওয়া যায় যাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উপ্পলবন্না, শোভিতা, ইসিদাসিকা, বিশাখা, সবলা, সঙ্ঘদাসী, এবং নন্দা বিনয় গ্রন্থ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। থেরী উত্তরা, মল্লা, পব্বতা ফেগ্গু, ধম্মদাসী, অগ্গিমিত্তা এবং পসাদপালা অনুরাধপুরে বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান

করিতেন। সধম্মনন্দী, সোমা, গিরিদ্ধি, দাসী, এবং ধম্মা বিনয় গ্রন্থ বেশ ভালভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। সুমনা, মহিলা, মহাদেবী, পদুমা, এবং হেমাসা অনুরাধপুরে বিনয়-পিটক হইতে শিক্ষাদান করিতেন। (দীপবংশ, ১৮ সর্গ)। দিব্যাবদানে রাত্রিকালে বুদ্ধবচন-পাঠ-নিরতা নারী-ছাত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃঃ ৫৩২)।

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

২০

প্রত্যূষে বাঁশীর তীক্ষ্ণ আওয়াজে প্রকাশ জাগিয়া উঠিল। অভ্যাসমত অণিমার দিকে পাশ ফিরিতে দেখিল, অণিমা শুইয়া নাই—গত রাত্রে সেই যে অণিমা বাহিরে গিয়াছিল, আর ফিরে নাই। প্রতিদিন এই সময় সে শয্যা ত্যাগ করিত, আজ তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিল না। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া সে এখন চোখ-দুটির ভিতর জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। মুক্ত জানালা দিয়া কলের শব্দ ভাসিয়া আসিয়া তাহার কানের ভিতর কি যেন এক ব্যথার সুর বাজাইয়া গেল।

রৌদ্রকিরণ ঘরের পরিচ্ছন্ন মেজের উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। বাহিরে ফুলগাছের টবগুলির চারিপাশে কয়েকটা প্রজাপতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল। রাত্রির চাপা গুমটের পর এখন একটু বাতাস ফুর ফুর করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঘরের অনতিদূরে পশ্চিম দিকে একটা লিচুর বাগান, অপর্য্যাপ্ত লিচু ফলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সদ্যোত্থিত প্রভাত-বায়ুর স্পর্শে লিচুর গুচ্ছগুলি দুলিয়া দুলিয়া নড়িতেছিল।

এক পেয়ালা চা ও কিছু খাবার লইয়া করুণা ঘরে ঢুকিল। প্রকাশ তখনো বিছানায় শুইয়া। চায়ের বাটি এবং রেকাবিটি আলগোছে টিপয়ের উপর রাখিয়া করুণা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

—এখনো শুয়ে যে? তোমার কি অসুখ করেছে ভাই?

প্রকাশ উঠিয়া বসিল।

করুণা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—এত বেলা পর্য্যন্ত তুমি ত কখনো শুয়ে থাক না। অসুখ বিসুখ করেনি ত?

প্রকাশ কহিল,—না।

করুণা বলিল,—কল নিয়ে তুমি যেমন দিনরাত খাট্‌চো—আমি ভাই বরাবর বারণ করচি। ভগবান ত আর কারু শরীর লোহা দিয়ে তৈয়ের করেননি।

—না দিদি, ও কিছু নয়,—বলিয়া প্রকাশ শয্যা ত্যাগ করিল। সে চটিজুতা পায়ে দিয়া ঘরের বাহিরে যাইতেছিল। দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—অণিমা কোথায় দিদি?

করুণা হাসিয়া কহিল,—আজ তার কাঁধে রান্নার ভূত এসে চেপেছে। শিশির ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে নিজেই রাঁধ্‌তে বসেছে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রকাশ পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল,—কাল কি সে তোমার কাছে গিয়েছিল দিদি?

—কখন?

—রাত্তিরে?

—রাত্তিরে, আমার কাছে? কৈ না! তাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছিলে নাকি? কোন দরকার ছিল?

—না না, দরকার কিছু নয়। তুমি বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলে,—বলিয়া প্রকাশ বাহিরে চলিয়া গেল।

সে ফিরিবামাত্র অশোক আসিয়া চাপিয়া ধরিল,—মেসো মশায়, তোমার সঙ্গে আড়ি। কাল সন্ধ্যেবেলা তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিলে যে?

করুণা হাসিয়া কহিল,—কাল তোমরা চলে যাবার পর ছেলের কি কান্না! সে আর কিছুতে থামে না।

তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া প্রকাশ কহিল,—আজ তোমায় ঠিক বেড়াতে নিয়ে যাব।

অশোক আবদার ধরিল,—মাসীমাকে নিতে পাবে না বলে দিচ্চি।

করুণা জিজ্ঞাসা করিল,—কেন রে?

অশোক কহিল,—মাসীমা দুষ্টু।

করুণা কহিল,—ওরে হতভাগা ছেলে, তোর মনে এই? মাসীমাকে বনবাস দিবি?— বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

প্রকাশ চা পান শেষ করিয়াছিল। কাছে আসিয়া করুণা অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল,—মার অবস্থা ত দেখ্‌চ ভাই, দিনদিনই যেন খারাপ দিকে চলেছে। সে-দিন যে কাণ্ডটা করলে –

বাধা দিয়া প্রকাশ কহিল,—কিছু নয়, কিছু নয়। ওঁর কথা কি আর ধরতে আছে? উনি ত আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

করুণার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। সে বলিল,—তা ঠিক, নৈলে তুমি জামাই—মা ভাল থাকলে কি আর তোমার আদর-যত্নের শেষ ছিল? এমনি অদৃষ্ট! কি করবে বল?—তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া লইয়া সে আবার কহিল,—দিদিমা বলছিল মাকে কোন তীর্থস্থানে রাখতে। ঠাকুর-দেবতা দেখলে মন ভাল থাকতে পারে।

—বেশ ত।—ঘড়ির দিকে তাকাইয়া প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আলনা হইতে কামিজ টানিয়া লইয়া পরিতে পরিতে কহিল,—মার সঙ্গে কে থাকবে?

—দিদিমা আর কিষণ থাকলেই চল্‌বে। আমার ত যাবার যো নেই এখন।

—তাই হবে, বলিয়া প্রকাশ বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

—দাঁড়াও ভাই। আমার যে এখনো কথা শেষ হল না।

প্রকাশ ফিরিয়া বলিল,—হবে এখন। তাড়াতাড়ি কি? আমার বড্ড দেরী হয়ে যাচ্চে।

—আজ কলে না গেলে হত না? তোমার শরীর ভাল নেই।

—না দিদি, একবার দেখে আস্‌তে হবে।

কলে আসিয়া প্রকাশ ইঞ্জিন্‌-ঘরে গেল। কল চলিতে-ছিল। নীল কুর্ত্তা-পরা ইঞ্জিনের মিস্ত্রি আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে মুখে কালি—একখণ্ড ময়লা কাপড় দিয়া চাকাগুলি সাফ করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়াছে। সে কৃশ, অকালবৃদ্ধ—কয়লার উত্তাপে, অত্যধিক পরিশ্রমে কোমরের উপর দিক সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

তাহার পানে চাহিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন আছ ইব্রাহিম? তুমি যে সেদিন বলেছিলে তোমার শরীর কাহিল হয়ে পড়েচে, আর ইঞ্জিনের কাজ করতে পারবে না, তা কি ঠিক করেচ?

মিস্ত্রি বিষণ্ণ মুখে কহিল,—কি আর করি হুজুর? আর কোনো কাজ ত জানি না, কবরে যদ্দিন না যাই তদ্দিন একাজ করতেই হবে। নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরবো। হুজুর যদি মেহেরবানি করে রাখেন, তাড়িয়ে না দেন—

প্রকাশ কহিল,—না না, আমি তোমায় তাড়িয়ে দেব না।

মিস্ত্রি সেলাম করিয়া আবার কাজে লাগিল।

একটু দূরে দাঁড়াইয়া প্রকাশ চলন্ত কলটির চাকাগুলি দেখিতেছিল। ছোট-বড় পিতলের লোহার নানাবিধ চাকা—উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘুরিতেছে। মাথার উপর প্রকাণ্ড উষ্ট্র লোমের ফিতা কারখানা ঘরের মাকুগুলিকে চালাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ফিরিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে বয়লার হইতে ফোঁস ফোঁস করিয়া বাষ্প নির্গত হইয়া ঘর ভরিয়া যাইতেছে।

প্রকাশ একটি একটি করিয়া তাঁতগুলি দেখিতে লাগিল। অসংখ্য সূতার টানা উঠিতেছে, নামিতেছে—মধ্য দিয়া মাকুগুলি তড়িদ্গতি ঘুরিতেছে। একটা গোল লম্বা কাঠ কাপড়ের বোনা-অংশ সঙ্গে সঙ্গে গুটাইয়া লইতেছে।

গুদাম-ঘরে রাশি রাশি কাপড় ও সূতা জমা করিয়া রাখা হইয়াছিল। একটিবার ঘুরিয়া দেখিয়া প্রকাশ আপিসে

ফিরিয়া আসিল, এবং সেখানে বসিয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত কাজ করিল।

বাহিরে প্রখর রৌদ্র। সূর্য্যের তাপে তাতিয়া উঠিয়া কটাহের মত পিঙ্গলবর্ণ আকাশ চারিদিকে আগুন ছড়াইতেছিল। রৌদ্রের দিক হইতে সরিয়া, দালানের যে ধারে লম্বা ছায়া পড়িয়াছে, সেখানে আসিয়া একজন স্ত্রীলোক একটি খাবারের পুঁটুলি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যুবতী হইলেও রেখায় রেখায় মুখের চেহারা কেমন বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। পরণে একখানি মলিন ঘাগরা, শতছিন্ন—স্থানে স্থানে অন্য কাপড় দিয়া তালি দেওয়া হইয়াছে। সে দাঁড়াইয়াছিল, যেন একটি বিষণ্ণ দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি! পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া প্রকাশ বাহিরে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি ইব্রাহিম মিস্ত্রির স্ত্রী না?

সে বলিল,—জি হাঁ।

—তুমি কি রোজই মিস্ত্রির খাবার নিয়ে আস?

—জি না—মিস্ত্রির বেমার। সে আজ সকালে নাস্তা না খেয়ে বেরিয়েচে।

প্রকাশ আর কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইতেছিল, দেখিল, ইব্রাহিম কলঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। ইব্রাহিম কোনদিকে না চাহিয়া সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল। ইঞ্জিনের আগুনে তাহার মাথা পুড়িয়া যাইতেছিল, কানের ভিতর একটা তীক্ষ্ণ শব্দ অনবরত বাজিতেছিল। প্রকাশ সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়াই উঠিতে চেষ্টা করিল। তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া চাপিয়া ধরিয়া প্রকাশ কহিল—না, না, উঠে কাজ নেই। তারপর স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওর কোন রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেচ কি? দেখ্‌চ না শরীর কেমন খারাপ হয়ে গেছে?

স্ত্রী বলিল,—ডাক্তারবাবু দেখে দাওয়াই দিয়েচেন। কিন্তু বলে দিয়েচেন, কাজ বন্ধ না করলে দাওয়াই ধরবে না।

এ-সব কথা মুনিবের কানে যায় ইব্রাহিমের মোটে ইচ্ছা ছিল না। তাই ধমক দিয়া সে কহিল,—তুই থাম না। তোকে বাহাদুরি করতে কে বল্লে শুনি? ডাক্তারের ও-সব বাজে কথা হুজুর। কাজ আমি বেশ করতে পারি।

প্রকাশ বলিল,—তা জানি ইব্রাহিম। তুমি বেশ কাজ করচ। কিন্তু তোমার কাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় অনিষ্টকর। তোমাকে আমি এক মাস ছুটি দিলাম। পূরো মাইনে পাবে।

ইব্রাহিম অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। স্ত্রীর চোখে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—ভগবান আপনার ভাল করবেন।

প্রকাশ কহিল,—কিন্তু চুপ করে বসে থাক্‌লে চলবে না। ইব্রাহিম। ভাল করে চিকিৎসা করান চাই। ইব্রাহিমের স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—চিকিৎসার খরচ-পত্র আছে ত?

সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সলজ্জভাবে কি বলিল। প্রকাশ মনিব্যাগ খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিল। কহিল,—তুমি কিছু লজ্জা করো না। যখন যা দরকার আমার কাছে এসে চাইবে, বুঝ্‌লে?

ইব্রাহিম সেলাম করিয়া বলিল,—হুজুরের মেহেরবানি আমাদের চিরকাল মনে থাকবে।

প্রকাশ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। স্নান করিয়া আসিয়া সে খাইতে বসিল। থালা সাম্‌নে রাখিয়া অণিমা নানাবিধ তরকারির বাটিগুলি গোল করিয়া সাজাইয়া দিল। করুণা একখানি পাখা লইয়া সাম্‌নে আসিয়া বসিল।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—অণিমা এখনো খায়নি বুঝি?

—না।

—কেন? আমি ত বলেচি, আমার ফিরতে বেলা হয়—ভাত বেড়ে রেখে দিয়ে তোমরা সব খেয়ে নিও।

করুণা কহিল,—আজ অণু রেঁধেচে। তোমায় না খাইয়ে কেমন করে খাবে?

প্রকাশ আহার করিতে লাগিল। অন্যদিন দ্বিপ্রহরে কল হইতে ফিরিয়া সে যথেষ্ট ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিত এবং প্রচুর আগ্রহ-সহকারে আহার্য্যগুলি সব নিঃশেষ করিয়া ফেলিত। আজ তাহার ক্ষুধাবোধ ছিল না।

তরকারিগুলি আঙুল দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সে থালার একধারে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল। দেখিয়া করুণা কহিল, কিছু খাচ্চ না যে?

—খিদে নেই।

—তবে একটু ঘোল এনে দি ভাত দিয়ে চট্‌কে খাবে।

—আমি ত ঘোল খাই না।

করুণা কহিল,—ওই ত তোমার দোষ। এটা খাই না, ওটা খাই না। ঘোল এমন ভাল জিনিষ তা তুমি খাবে না। আজ আমি ও কথা শুন্‌চি না, একটু খেতেই হবে, বলিয়া সে নিরামিষ ঘরে গিয়া ঢুকিল।

রান্নাঘর হইতে কি একটা হাতে করিয়া অণিমা প্রকাশের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশের পাতে তাহার স্বহস্ত-প্রস্তুত ব্যঞ্জনগুলির লাঞ্ছনা দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—রান্না ভাল হয়নি বুঝি?

—না, রান্না ভালই হয়েচে।

—তবে ওগুলি ঠেলে রেখেচ কেন? আমি রেঁধেচি বলে?

রাত্রের ব্যাপারটা প্রকাশের বুকে কাঁটার মত তখনো বিঁধিয়া ছিল। কিছুমাত্র না ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ কহিল, কাল যা বলেচ, তারপর তোমার রান্না যদি মুখে না রোচে, সে দোষ আমার নয়।

অণিমার চোখ ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, —বেশ খেও না। আমারও দিব্যি রইল তোমায় যদি কখনও কিছু রেঁধে খাওয়াই।

প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। করুণা গিয়াছে, তাহার জন্য এক বাটি ঘোল লইয়া আসিতে,সে বোধ করি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, বারান্দার প্রান্তে ভৃত্যের হাত হইতে জলের ঘটি লইয়া সে আঁচাইতে বসিল।

করুণা আসিয়া তাহাকে আঁচাইতে দেখিয়া কহিল,— ওকি, উঠে পড়লে যে?

—ঘোল এনেচ বুঝি? দাও খাচ্চি, বলিয়া গামছা দিয়া মুখ মুছিয়া হাত বাড়াইল। তারপর এক চুমুকে সবটুকু ঘোল নিঃশেষ করিয়া সে বাটি ফিরাইয়া দিল।

কখন যে অণিমা উপরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, করুণা তাহা জানিতে পারে নাই। সে নীচের ঘরগুলি ঘুরিয়া রান্নাঘর তালাস করিয়া উপরে উঠিয়া মার ঘরে আসিল। পূর্ব্বরাত্রে যোগমায়ার ঘুম হয় নাই, সুরধুনী তাহার মাথায় একটা উগ্রগন্ধ কবিরাজী তৈল ঘষিয়া ঘষিয়া মালিশ করিতেছিলেন। আপন মনে খুঁং খুঁং করিতে করিতে যোগমায়া জানালার বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়া ছিলেন।

—অণিমা উপরে এসেচে দিদিমা?

—হাঁ, বলিয়া অণিমা যে ঘরে আছে সেই ঘর আঙুল দিয়া দেখাইলেন। সব সময় উন্মাদ রোগীর কাছে ঝুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে অনেক সময় বড়ই বিমর্ষ দেখা যাইত। তখন তিনি শুধু হাঁ না, দুটি একটি কথার উত্তর দিয়া যাইতেন।

—আজ বুঝি আর ঘুম পাড়াতে পারলে না?

সুরধুনী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—না।

যোগমায়া করুণার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিতে করুণা কহিল,—কেন বসে আছ মা? একটু ঘুমোও না?

একটি অঙ্গভঙ্গি করিয়া যোগমায়া কহিল,—ঘুম পালিয়ে গেছে।

করুণা কহিল, চোখ বন্ধ করে একটু শুয়েই দেখ না মা, ঘুম আসবে।

ঈষৎ হাসিয়া যোগমায়া বলিল, তুই জানিস না মা— যে যায় সে আর কখনো আসে না।

পাশের ঘরের কপাট বন্ধ। করুণা ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—অণিমা, দোর খোল।

কেহ জবাব দিল না।

বারান্দার দিকে একটা জানালা খোলা ছিল। করুণা সেখানে গিয়া ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল, অণিমা কিসের একরাশ কাগজপত্র লইয়া বসিয়াছে।

করুণা অবাক হইয়া গেল,—করচিস্ কি অণিমা? বেলা দুটো, এখন কি না তুই পড়তে লিখতে বস্‌লি? খাবি নি?

মুখ না তুলিয়া অণিমা বলিল,—আমি খাব না।

—সে কি, কেন খাবি না?

অণিমা বলিল,—আমি একটা কাজ করচি দিদি। তুমি যাও, খেয়ে নাওগে।

অকস্মাৎ করুণা ঝঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিল,—প্রকাশ কিছু খায়নি, তাই বুঝি তোরও আজ খাওয়া হবে না। খ্যাপা মেয়ে, খিদে না থাকলেও ওকে খেতে হবে নাকি? নে নে, আর একদিন রেঁধে খাওয়াস্ এখন।

—সে ব্যবস্থা তোমার কাছে নিতে আসব না দিদি, বলিয়া উঠিয়া আসিয়া সে সজোরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

করুণা কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল। ডাকাডাকি মিছা, সে অণিমাকে বিলক্ষণ চিনিত। খোলা ছাদের গরম বাতাসে তাহার গা জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অদূরে কল হইতে একটা ঝক্‌ঝক্ শব্দ অবিশ্রান্ত কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ক্ষুণ্নমনে সে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল।

২১

সন্ধ্যাকালে প্রকাশ অশোককে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল, অণিমা আজ আর সঙ্গে গেল না। প্রকাশ নিজেই টমটম্ হাঁকাইয়া চলিল। তাহারা মাইল-দুইমাত্র গিয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ একটা আন্ধি ছুটিল। জোর হাওয়ার সঙ্গে রাজ্যের ধূলা উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে ধূলায় ধূলায় চারিদিক ছাইয়া গেল, বৃক্ষ পাহাড় মাঠ পথ একটা ধূসর ঘন যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ধূলা—মুখ-চোখ পোষাক-পরিচ্ছদ ধূলায় একাকার। আন্ধির জন্য প্রকাশ প্রস্তুত ছিল না, গাড়ী থামাইয়া সহিসকে ঘোড়া ধরিতে বলিয়া চাদরখানি মাথার উপর ঢাকিয়া অশোককে কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিল। ক্রমে বাতাস শীতল হইয়া আসিতেছিল, শেষে হিমের মত ঠাণ্ডা বায়ু বহিতে সুরু করিল। মাথার উপর মেঘ আসিয়া জমিয়াছিল, তারপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। ঘোড়া ফিরাইয়া প্রকাশ বাড়ীর দিকে ছুটাইয়া দিল।

তাহারা যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন বৃষ্টিধারা বেগে নামিতেছে। দুজনই জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, অশোক শীতে কাঁপিতেছিল। তাহাকে কোলে তুলিয়া প্রকাশ নামিয়া ঘরের ভিতর গেল, করুণাকে ডাকিয়া কহিল,—আঃ—কি দুর্য্যোগেই পড়েছিলুম দিদি। আন্ধি—তারপর বৃষ্টি। কে জান্‌ত, এরকম হবে? এখন তাড়াতাড়ি অশোকের পোষাকটা বদ্‌লে দাও দেখি। ও বড্ড ভিজেচে।

অশোকের চেহারা দেখিয়া করুণা হাসিয়া উঠিল। পরিষ্কার সবুজ রংএর পোষাক ময়লা হইয়া গিয়াছে, লম্বা লম্বা চুলগুলি চোখের উপর মুখের উপর এখনো লাগিয়া আছে—প্রান্ত বাহিয়া টস্‌টস্ করিয়া জলের ফোঁটা তখনো ঝরিতেছিল।

করুণা কহিল,—কেমন ছেলে, শিক্ষা হয়েচে? মাসীকে ফেলে আর কখনো যাবি বেড়াতে?

আজ সারাটি দিন উপরের ঘরে বসিয়া অণিমা কি লিখিয়াছে, এখন নীচে নামিয়াছিল। অশোকের অবস্থা দেখিয়া ক্ষণকাল সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল,—একজন ভিজিয়ে নিয়ে এলেন আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌চ দিদি? ছেলের অসুখ করতে পারে তাও কি তোমাদের খেয়াল নেই? ওকে এমন করে বেড়াতে পাঠান কেন জিজ্ঞেস করি?

ক্ষিপ্রহস্তে সে অশোকের জামা খুলিতে লাগিয়া গেল। পাশের ঘরে প্রকাশ জামা ছাড়িতেছিল, তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অণিমা বলিয়া গেল,—মাগো মা, কি ভেজাই ভিজেচে। এতে কি অসুখ না করে যায়? ছেলেটাকে না মেরে কেউ সুস্থ হবে না। তুই হতভাগা ছেলে, কেন গেলি বল্‌ত?

করুণা কহিল, একটু না হয় ভিজেচে, তাতে কি হয়েচে? তুই ভয় করিস্ নি, ওতে কিছু হবে না।

মুখনাড়া দিয়া অণিমা বলিল,—তুমি থাম দিদি। ভগবান না করুন যদি অসুখ-বিসুখ হয়, তখন হাঙ্গামা তোমাকে আমাকেই পোহাতে হবে। যারা বড়মানুষি করে গাড়ী চড়ে বেড়ান, তাঁরা কিছু দেখ্‌তেও আস্‌বেন না।

অণিমার আজিকার ব্যবহার আগাগোড়া করুণার কাছে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বোধ হইতেছিল। এক্ষণে প্রকাশের

প্রতি এই-সব ইঙ্গিত শুনিয়া সত্যসত্যই সে রুষ্ট হইল। বলিল,—অণিমা, তোর কি কোনোকালে জ্ঞানবুদ্ধি হবে না? কাকে কি কথা বল্‌তে হয়, না হয়—তাও শিখ্‌বি না? লোকে তোর একগুঁয়েমি কদ্দিন সহ্য করবে, বলত? আমার হয়েচে মরণ সত্যি।

ঝগড়া করিবে বলিয়াই অণিমা যেন আজ কোমর বাঁধিয়াছিল। সে কাহাকেও কিছু সহ্য করিতে বলে না। ওঃ—ভারি তাহার দায়! কেহ সহ্য না করিল ত তাহার ভারি বহিয়া গেল। তাহার অভাব কতটুকু যে লোকের অপমান গায় মাখিয়া পড়িয়া থাকিবে? সে কাহারো দাসী-বাঁদী নয় যে, যখন-তখন চোখ রাঙাইয়া শাসন করা চলিবে।—বলিয়া অশোককে কাঁধে তুলিয়া লইয়া গট্‌ গট্‌ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া অণিমা ঘরে গিয়া খিল দিল।

এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। থোকে থোকে তারা জ্বলিয়া উঠিল—কে যেন বর্ষণ-উর্ব্বর আকাশের বুকে অসংখ্য আগুনের বীজ বুনিয়া দিয়াছে। ঝঞ্ঝার কোন চিহ্ন আর রহিল না, শুধু পূর্ব্ব-দিগন্তে একখণ্ড মেঘ নিশীথ রাত্রে স্তব্ধ বনানীর মত প্রসারিত—মাঝে মাঝে ক্ষীণ বিদ্যুল্লতা। বারান্দায় একটি বেতের চেয়ারে প্রকাশ বসিয়াছিল, সম্মুখে সারি সারি ফুলের টব—চারিদিকে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিয়া-নিভিয়া উড়িতে লাগিল।

আজ সারাদিন একটি বিমর্ষভাব প্রকাশের অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, সন্ধ্যার আঁধারে এখন যেন তাহা নিবিড় হইয়া চাপিয়া বসিল। অণিমা তাহাকে কটাক্ষ করিয়া যে-কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়াও রাগ বা অভিমান কিছুই তাহার হয় নাই—এসব যেন তাহারি কর্ম্মপরম্পরার স্বতঃসিদ্ধ ফলমাত্র! সে স্বীকার করুক আর না-ই করুক, ঐশ্বর্য্যের কামনা ভোগের তৃষা তাহাকে এই পথে চালাইয়া আনিয়াছে, কে তাহা অবিশ্বাস করিবে? যতদিন সে এই ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবে, ততদিন ভালবাসার দাবি খাটিবে না।

—প্রকাশ, ভাই!

করুণা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—দেখ্‌লে ভাই, কাণ্ডটা? কি-ই বা বলেচি আমি, তা তোমায় সুদ্ধ পাঁচকথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। বলে কি না—তুমি বড়মানুষি করচ! ছিঃ, মেয়েমানুষের কি কখনো এমন কথা শোভা পায়?

প্রকাশ উঠিয়া পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পিছনে পৃষ্ঠের নীচে হাত রাখিয়া, আঙুলে আঙুল জড়াইয়া, দৃষ্টি মাটির পানে নিবদ্ধ করিয়া কহিল,—কে জানে দিদি, হয়ত তাই হবে। অন্ততঃ এ সব টাকা-কড়ি বিষয়-আশয় না থাক্‌লে বোধ করি আমাদের দুজনকার মধ্যে বোঝা-পড়া এত জটিল হয়ে উঠ্‌তো না।

করুণা নির্ব্বাক হইয়া রহিল, কথাগুলি সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, প্রকাশ রাগ করিয়াছে। রাগ ত করিবারই কথা! সে প্রকাশের পানে চাহিয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা গেল না।

প্রকাশ বলিতে লাগিল,—আজ যদি সত্যসত্যই একটু আরাম খুঁজে থাকি, সেজন্য তোমরা আমায় দোষ দিও না দিদি। আমি গরীব ছিলাম, তা তোমরা জান। কিন্তু গরীবের জীবন যে কিরূপ, তা কি একবার ভাব্‌তেও চেষ্টা করেচ? সামান্য একটা চাক্‌রীর জন্য রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েচি, খিদে পাচ্চে আর রাস্তার কল টিপে খালি খালি জল খাচ্চি। সে কেমন খিদে? পেটের নাড়িগুলি ছিঁড়ে দিচ্চে—মাতালের মত অঙ্গ অবশ করে তুল্‌চে—মাথার ভিতর আগুন ছুট্‌ছে—চোখে ঝাপসা দেখ্‌চি। মনে হচ্চে, কেউ যেন সাঁড়াশী দিয়ে চোখ দুটো উপ্‌ড়ে ফেলচে। আর চিন্তা? সে কথায় কাজ কি?—উঃ কি দিনই গেছে! জান দিদি, কি করতে যাচ্ছিলাম? চুরি—হাঁ, চুরি! একদিন চুরি করবার লোভ হয়েছিল। বরাতের জোর, তাই কোনমতে সামলে গিয়েছিলাম।

প্রকাশ চুপ করিল। তাহার বেদনাদীর্ণ কণ্ঠস্বর যেন কোনো আঁধার গহ্বর হইতে উঠিয়া করুণার কানে বাজিতে লাগিল। তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—তুমি কিছু মনে করো না ভাই। মন্দ ভেবে অণিমা একটি কথাও বলেনি, সে স্বভাব ওর নয়।

ছেলেমানুষ—মুখে যা আসে তাই বলে ফেলে। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার কি এই নিয়ে দুঃখ করতে আছে?

বাগানে গাছের তলায় তলায় পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি জ্বলিতেছিল—নীলাভ স্নিগ্ধ দীপ্তি। প্রকাশ সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতীতের কথা বলিতে গিয়া অতীত-স্মৃতি তাহার অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল এবং সেই আলোর শিখায় তাহার মন কলিকাতার এঁদো গলিটিতে অনন্ত দরিদ্রতার মধ্যে অফুরন্ত দুঃখ অভিযোগ লইয়া পতঙ্গের মতই ছুটিয়া আসিল। মনে হইল, এখনো সেই দিনগুলি এক একটি সত্যের আলো হাতে লইয়া তাহার জীবনের পথে পথে দাঁড়াইয়া আছে, এই বাড়ী গাড়ী বাগান কল অণিমা করুণা—একে একে সব চলিয়াছে সেই আলোরই পথ দিয়া, ছায়াবাজীর বিচিত্র শোভাযাত্রার মত এবং ছায়াবাজীরই মত একদিন নিশাশেষে সকলই অদৃশ্য হইয়া যাইবে!

পরদিন সকালে প্রকাশ যখন শয্যা ত্যাগ করিল, তখন কল চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্লান্তির পর রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল, এমন কি অণিমা পাশে আসিয়া শুইয়াছিল কি না, তাহা সে টের পায় নাই। তাহার শরীর বেশ তাজা, মন প্রফুল্ল বোধ হইতেছিল। মুখ-হাত ধুইয়া শিস্ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া সে চা পান করিল এবং জলযোগ সারিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া সে কলে গেল। গুদাম-ঘরে কাপড়ের গাঁট বাঁধা হইতেছিল। মজুরেরা একটা চাপকলের মধ্যে গাঁটগুলি ফেলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে লোহার পাত দিয়া পেঁচাইয়া বাঁধিতেছিল। প্রকাশ তাহাদের কাজ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল।

কলের ইঞ্জিনিয়ার সদাশিববাবু আসিয়া অভিবাদন করিল,—আপনি কি ইব্রাহিম মিস্ত্রিকে একমাসের ছুটি দিয়েচেন?

প্রকাশ ফিরিয়া তাহার পানে চাহিয়া স্মিতহাস্যে কহিল,—হাঁ সদাশিববাবু। ওর শরীর খারাপ।

ইঞ্জিনিয়র কহিল,—কিন্তু এখন ওকে ছুটি দিলে ত চলবে না বাবু। কলের কাজ ও যেমন জানে, এমন কেউ জানে না। ও গেলে কল চালান শক্ত হয়ে উঠবে। যতদিন আর একজন মিস্ত্রি না জোগাড় করে উঠতে পারি, ততদিন ওকে থাকতে হবে।

—বেশ ত, শিগগির করে একজন মিস্ত্রি আনুন না?

—আজ্ঞে মিস্ত্রি জোগাড় করা এখন একটু কঠিন হবে।

—তাই ত!

লম্বা চোঙওয়ালা তৈলাধার লইয়া ইব্রাহিম একটি পিতলের নলদণ্ডে তেল দিতেছিল। তাহার মাথায় রুমাল বাঁধা, বাম হাত কোমরে ভর করিয়া সে সম্মুখের দিকে উপুড় হইয়া দেখিতেছিল। কোথায় একটা স্ক্রু ঢিলা হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে একটা ঝনঝন্ শব্দ তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। তাহার পশ্চাতে অগ্নিকুণ্ডের মুখ—একজন স্টোকার মুখ খুলিয়া মিনিটে মিনিটে কয়লা ঢালিতেছিল। যখনি সে মুখ খুলিতেছে, তখনি একটা আগুনের হল্কা ইব্রাহিমের শীর্ণ দেহখানি পুড়াইয়া দিয়া যাইতেছিল।

সদাশিববাবু আসিয়া কহিল,—তুমি এখন ছুটি পাবে না ইব্রাহিম, বাবুকে জানিয়ে এলাম।—তাহার অধরে ক্ষীণ হাসির একটু হিল্লোল খেলিয়া গেল, যেন বুঝাইয়া দিল যে, ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে যাওয়া সব সময় নিরাপদ নহে।

ইব্রাহিম মুখ তুলিয়া চাহিল, ঈষৎ রাগত স্বরে কহিল, কে চায় তোমার ছুটি, বাবু? তোমাদের অনুগ্রহে বেঁচে থাকার চেয়ে এই কলের আগুনে পুড়ে মরা ঢের ভাল। তারপর যেন নিজমনে বলিয়া গেল, কতদিনে খোদা ছুটি দেবেন কে জানে? স্ত্রী বলে, কাজ ছেড়ে দাও। আরে মর্, ছেড়ে দিলে খাবি কি? বলে, আমি কাজ করবো, তুমি কিছুদিন বসে খাও। না, তা হচ্চে না। আমি মরে গেলে যা খুশী করিস্, কিন্তু যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন নয়।

ঘরের বাহিরে প্রকাশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল,—ইব্রাহিম; ইঞ্জিনিয়রবাবু বলচেন, এখন মিস্ত্রি পাওয়া যাচ্চে না, তোমায় কিছুদিন বাদে ছুটি দিতে। তোমার যদি অসুবিধা না হয়—

সদাশিব কহিল,—অসুবিধা আর কি হবে বাবু? আর হলেই বা কি করা যাবে? কল ত আর মিস্ত্রি নৈলে চলবে না?

ইব্রাহিমের দিকে ফিরিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—কি বল?

ইব্রাহিম কহিল,—তাই হবে হুজুর।

আপিস ঘরে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ আয়ব্যয়ের হিসাব লইয়া বসিল। বাজার মন্দা, বেচাকিনি সুবিধার হইয়া উঠে নাই। লোকসান পড়িবে না ত! তাহা যদি হয়, উপায়? অন্যান্য কল-ওয়ালার মত তাহাকেও শেষে মজুরদের আবশ্যকীয় অন্নবস্ত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে না কি?

দ্বিপ্রহরে ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশ বাড়ী ফিরিয়া বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিতে দেখিল, একতাড়া কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া অণিমা ঝুঁকিয়া নিবিষ্টমনে সেগুলি পড়িতেছে। উপরে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় সে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল. প্রকাশ আসিতে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না।

কিসের কাগজ এ-সব? প্রকাশ জানিত, উপরের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এ কয়দিন অণিমা কি লিখিয়াছে—কাহাকেও কিছু বলে নাই, করুণাকেও নহে। সে কি লিখিতেছে, জানিবার জন্য প্রকাশ উৎসুক হইয়াছিল, কিন্তু একটি কথাও সে অণিমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। কাল হইতে অণিমা তাহার সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কহে নাই, সে-ও তাহাকে সমানে উপেক্ষা দেখাইয়াই আসিয়াছে। সুতরাং স্নানান্তে আহারের পর বৈঠকখানা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ যখন দেখিল, অণিমা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, আর টেবিলের উপর সেই কাগজগুলি একখণ্ড কাঁচ চাপা দেওয়া অবস্থায় পড়িয়া, তখন সে আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ একটি চেয়ার টানিয়া বসিয়া অণিমার লিখিত কাগজগুলি পড়িতে আরম্ভ করিল।

সেটি একটি প্রবন্ধ। নাম দেওয়া হইয়াছে, 'নারীর জীবন-সঙ্কট'। সম্ভবতঃ কোন মাসিকপত্রের জন্য লিখিত। প্রকাশ মুখবন্ধের খানিকটা পড়িয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া গেল, শেষে একটা জায়গায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি থামিল। সে পড়িল,—

সমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করতে হলে নারী-জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করা দরকার। পুরুষের অস্তিত্ব নিজের জন্য, পৃথিবীর ভাল মন্দ সে আপন সুখ-বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু নারীর জীবন তার নিজের জন্য নয়, পরের জন্যই সে বেঁচে আছে। সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরের কাজে আত্মনিয়োগ করতো, তবে তার তুল্য মহৎ জগতে কেউ থাক্‌তো না। কিন্তু সে পরের জন্য কাজ করে. তার আর কোন উপায় নেই বলে। এ কাজে মহত্ব কোথায়? আরো যদি পাঁচটা কাজ থাক্‌তো, এবং সেগুলি উপেক্ষা করে সে যদি স্বেচ্ছায় এই পরের কাজটি মাথায় তুলে নিত, তবেই না তাকে মহৎ বলতে পারতাম? বাধ্য হয়ে কাজ করা স্বতঃপ্রবৃত্তি নয়। স্বামী তাকে দেখে শুনে ঘরে এনেচে, এই কড়ার করে নিয়েচে যে, সে স্বামীর সেবাযত্ন করবে, সন্তান পালন করবে। একজন ভাড়াকরা নার্স যেমন জীবিকার জন্য রোগীর শুশ্রূষা করে থাকে, তাকেও তেমনি করে শিক্ষা দেওয়া হয়েচে, এই সব সেবাযত্ন করতে। এইজন্যই ত সমাজে তার আদর নেই, কোন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করতে হলে তার মত নেওয়া কেউ আবশ্যক মনে করে না, তার যোগ্য স্থান থেকে সে বঞ্চিত। সাধারণ রমণীর পক্ষে এটাই বোধ করি একটা অতুল গৌরব যে, সংসারে সে মাতা পত্নী স্বসা দুহিতার স্থান অধিকার করচে। কিন্তু এই গৌরবময় আসনটির উপর তার সবখানি দাবী কত সূক্ষ্ম সূত্রে দোদুল্যমান, তা প্রণিধান করলে বোধ করি কেউ অলীক স্বপ্ন দেখে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবেন না। বিজেতা যদি অবরোধ-প্রাচীর মধ্যে কোন বন্দীর মর্য্যাদা বজায় রেখে তাকে সম্মানিত করে থাকেন, তবে সে গৌরব বিজেতার—বন্দীর নয়। মর্য্যাদার দাবী করতে হলে আত্মশক্তির দরকার, নারীর সম্মান আত্মশক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত নয়, পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করচে।...

মাঝের দিকে একটা জায়গায় লেখা আছে—

ইতিহাসের আদিম যুগ হতে স্বেচ্ছাচারী পুরুষ

স্ত্রীজাতিকে সেই যে পদানত করে রেখেচে, আজিকার সভ্য জগতেও সে তেমনি অবনমিতা। প্রাচীনকালে যুদ্ধে যে বংশ জয়লাভ করতো, সে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে বিজিতের নারীসমূহ সাথে করে ঘরে ফিরতো। স্ত্রীজাতি তখন একটা মূল্যবান জিনিষ বলেই পরিগণিত হত। আজ বাহ্যতঃ সে অবস্থা না থাকলেও, জিজ্ঞাসা করি, আসলে কোন পরিবর্ত্তন ঘটেচে কি? সমাজের বিধি-নিষেধ সব পুরুষই ব্যবস্থা করে থাকে, তাতে নারীর কোন হাত নেই। তাদের রচিত বিধি-ব্যবস্থা নিজেদের ষোল আনা স্বার্থ বজায় রেখে নারী-ভাগ্যের উপর, তাদের ভালমন্দর উপর বিজাতীয় শাসন চালাচ্চে। শত কর্ম্ম অপকর্ম্মের দ্বার আপনার জন্য মুক্ত রেখে, একটিমাত্র লৌহবর্ত্ম দেখিয়ে দিয়ে নারীকে বল্‌চে, এই তোমার পথ—ঝঞ্ঝা বন্যা অগ্ন্যুৎপাত, যাই হোক্ না কেন, এ পথ থেকে তুমি নাম্‌তে পাবে না। তারা বলে, এ নৈলে সমাজের ক্ষতি হবে, সংসার চলবে না! যেন সমাজটা কেবল তাদেরই জিনিষ, নারীর নয়—যেন ভগবান সমাজ-রক্ষার ভার তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্চেন!······

আরো নীচে প্রকাশ পড়িল—

হে নির্য্যাতিতা, অবনমিতা জাতি—মনেও করো না, লাঞ্ছনা সহ্য করে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করা সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা! সতীর ধর্ম্ম কখনো এত নির্জ্জীব, এত দুর্ব্বল হতে পারে না। পুরুষ তোমাকে চিরদিন বুঝিয়ে এসেচে তুমি শক্তিহীন, তুমিও বিশ্বাস করতে শিখেচ তুমি সত্যই তাই, এ অত্যাচার তোমাকে সহ্য করতেই হবে। কিন্তু স্ত্রীজাতির নৈসর্গিক শক্তি কখনো কখনো এতবড় ধোঁকা-টাকেও কাটিয়ে উঠিতে সক্ষম হয়েচে, ইতিহাস পাঠে তা বেশ জানা যায়। ফ্রান্সে জান দা'র্কের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের দেশে দুর্গাবতী ও ঝান্সীর রাণীও এই শক্তির দৃষ্টান্তস্থল। সুভদ্রা কি অর্জ্জুনের রথ চালাননি? চিত্রাঙ্গদা লড়াই করেছিলেন কি নিয়ে?—চাই আত্মশক্তির উদ্বোধন! নারীকে কর্ম্মসহচরী হতে হবে। কর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগ্রত হলে শক্তি ফিরে আসবে, তখনি তোমার ত্যাগ মহিমান্বিত হয়ে উঠবে, তার আগে নয়।···

প্রবন্ধটির প্রতি ছত্র প্রকাশের অন্তরে দাগিয়া-দাগিয়া বসিয়া গেল। অবনমিতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে অণিমা তাহার মানস-চক্ষুর সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়াছিল, যেন কোন অনন্ত-কালের বেদনা কবির অমর ছন্দে প্রতিধ্বনি করিয়া—

বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া,
অশ্রু সাগরে ভাসা—

আলগোছে কাগজগুলি যথাস্থানে রাখিয়া প্রকাশ আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া আসিল। সে যেন এইমাত্র কাহার অন্তর্জগতে লুকাইয়া প্রবেশ করিয়া সেখানকার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সন্ধান লইয়া ফিরিতেছে। সেই রাজ্যের রূপ রস গন্ধ স্পর্শে সে অবাক হইয়া গেল।

তাড়াতাড়ি সে কলে ফিরিল। সেখানে শুধু কোলাহল, গঞ্জন, তাড়াহুড়া—বাঁধা-ধরা নিয়ম দিয়া মানুষের কাজ ওই কলের চক্রগুলির মতই নিয়ন্ত্রিত। চারিদিকের অবরুদ্ধ গরম বাতাসে সে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তথাপি যে একটিমাত্র প্রশ্ন তাহার পিছন পিছন ব্রহ্মাস্ত্রের মত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, তাহার হাত হইতে সে মুক্তি পাইল না। জীবন কি এমন করিয়া বিরোধে বিরোধেই কাটিবে? ইহার কি কোন সামঞ্জস্য নাই? সংসারে সকলেই যদি নিজের দিকে চাহিয়া চলিবে, তবে পরের জন্য রহিল কি—কতটুকুই বা? ইঞ্জিন্-ঘরে ইব্রাহিম বয়লার হইতে দূরে দাঁড়াইয়া উকো দিয়া এক টুকরা লোহা প্রাণপণ জোরে ঘষিতেছিল। ছুটির আশায় নিরাশ হইয়া সে যেন তাহার রুগ্ন দেহের সবটুকু শক্তি এক মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে চাহে। বিষণ্ণ নয়নে প্রকাশ তাহার কাজ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহার দাঁতে টুকরাটি শক্ত করিয়া আটকান—তাহার উপর ইব্রাহিম ঝুঁকিয়া। শ্রমজাত ক্লান্তির দরুণ তাহার মুখ ঈষৎ স্ফীত, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে। তাহার দুর্ব্বল হস্তের স্নায়ুগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

প্রকাশ কহিল,—এত পরিশ্রম কেন করুচ ইব্রাহিম? এ কাজ আর কাউকে দিয়ে করলেই ত পার।

—না হুজুর, কেউ করতে পারবে না।

—বলিয়া সে আবার লোহা ঘষিতে লাগিল।

প্রকাশ ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল। এই লোকটিকে কর্ম্ম হইতে কিছুদিন অবসর দিবার জন্য সত্যই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, কিন্তু অচিরাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা হইল না ভাবিয়া সে দুঃখিত হইল। কল ত বন্ধ রাখিলে চলিবে না—সে কলের মুনিব, না কলটাই এখন তাহার মুনিব হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর অবাধে হস্তক্ষেপ করিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া সে আপিস ঘরে ঢুকিল। ঘরটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, মাথার উপর পাখা ঘুরিতেছে, টেবিল বেশ সাজান গুছান—একপার্শ্বে বেহারা সদ্যঃপ্রাপ্ত ডাকের চিঠিপত্র আনিয়া রাখিয়াছে। প্রকাশ একে একে চিঠিগুলি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। ব্যবসাপত্রের কথা—কোনটি দর জানিতে চাহিতেছে, কোনটি দালালের পত্র, কেহবা মাল সরবরাহ করিবার ফরমাস দিয়াছে। প্রকাশ পড়িয়া পত্রগুলির পাশে হুকুম লিখিয়া দিল। একে একে পত্র-পাঠ শেষ হইয়া আসিলে প্রকাশ দেখিল, নীচে তাহার নামের ছোট একখানি খাম পড়িয়া আছে, এতক্ষণ এটি চোখে পড়ে নাই। পত্রখানি হাতে লইতে সে চিনিল, সুরবালার পিতার পত্র। বহুদিন অন্তর মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া বৃদ্ধ সুরবালার অবস্থা জানাইতেন। দুই তিনখানা পত্র পাইবার পর উত্তরে প্রকাশ শুধু এইমাত্র লিখিয়া দিত যে, সে ভাল আছে। সে যে এখানে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে, এ সংবাদ প্রকাশ বরাবর গোপন করিয়া আসিয়াছিল। পাছে এই-সব চিঠি অণিমার হাতে পড়ে সেজন্য নিজ নামের চিঠিগুলি সে আপিসে গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। প্রকাশ পত্র খুলিয়া ফেলিল,—শ্বশুর লিখিয়াছেন, সুরবালার অবস্থা এখন যেন একটু ভাল দেখা যাইতেছে, সকলি ভগবানের ইচ্ছা। প্রকাশ কি এখন একবার দেশে ফিরিবে না? দূর দেশে দীর্ঘকাল সে একা পড়িয়া আছে, তাহার জন্য সর্ব্বদা তিনি চিন্তিত। তাহার কি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই?

চিঠি পড়িয়া প্রকাশ ক্ষণকাল তুষ্ণীভাবে বসিয়া রহিল। নিজের জন্য খাসা অবস্থা-সঙ্কট প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে সে! অণিমা জানে না, সে কে—সুরবালা জানে না সে কি হইয়াছে। অণিমার কাছে সে নিরাত্মীয়, নির্বান্ধব—তাহাকে বিবাহ করিয়া কলের মালিক হইয়াছে, অধ্যবসায় ও দক্ষতা গুণে প্রতিপত্তিশালী। সুরবালার কাছে এখনো সে তেমনি গরীব, অন্নের সংস্থান নাই, পেটের দায়ে প্রবাসে চাকরী করিয়া মরিতেছে। অতীত ও বর্ত্তমান দুইটি স্বতন্ত্র প্রবাহ ধরিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে, কোথাও মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এমনি করিয়া কি এই দুইটি নারী চিরকাল ভ্রান্তির পথে অগ্রসর হইবে আর ইহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া, ভ্রান্তির মূল সে, নির্ব্বিকারচিত্তে আপন দ্বিবিধ সত্তা বজায় রাখিয়া চলিবে? উভয়ের প্রতি সে যে একটা প্রকাণ্ড অন্যায় করিয়া বসিয়াছে, এবং এখনো করিতেছে, সে আর তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। এরূপ ভাব তাহার মনে আজ নূতন জাগিয়া উঠে নাই, কিন্তু চিরদিন সে যুক্তির বলে নূতন নূতন নীতি উদ্ভাবন করিয়া বিবেকের ক্ষীণ প্রতিবাদ চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখিয়াছিল। যুঝিয়া যুঝিয়া সে এখন শ্রান্তি বোধ করিতেছিল। সে অনুভব করিল তর্ক করিয়া যাহাই কেন সে প্রতিপন্ন করিয়া থাকুক, তাহার সকল চিন্তা সকল কাজ আপনাকেই ঘেরিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সুরবালার দিকে, অণিমার পানে সে চাহিয়াও দেখে নাই। অণিমার প্রবন্ধের একটি কথা তাহার অন্তঃকরণে কাঁটার মত ফুটিয়াছিল,—পুরুষের অস্তিত্ব নিজের জন্য, পৃথিবীর ভালমন্দ সে নিজের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক কি না, সে কথা সে আজ ভাবিল না, তর্কও করিল না। সে শুধু আপনাকে এই স্বার্থপর জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ কল্পনা করিতে লাগিল। যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সে-ই যেন নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে, বঞ্চনা করিতেছে—তাহাকেই বিশ্বাস করিয়া, তাহারি বিধি-নিষেধ মানিয়া যুগ যুগান্তরের নারী অশ্রুসিক্ত সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতেছে!

প্রকাশ উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে বাতাস অন্য দিনের মত গরম নয়। বাহিরে কুলিরা কাপড়ের গাঁটগুলি শকটে তুলিয়া দিতে-ছিল। একটা গাছের তলায় অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় কয়েকটা মহিষ শুইয়া ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। যেখানে মহি

বোঝাই হইতেছিল, তাহার পাশে একটা ঘরে বসিয়া কয়েকজন বাবু একমনে খাতা লিখিতেছিল। তাহারা জানিল না, দূর জানালার পিছে দাঁড়াইয়া প্রকাশ তাহাদের পানে চাহিয়া আছে, আর ভাবিতেছে তাহার অতীত জীবনের কথা। অমনি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া সেও কেদিন কাজ করিয়াছে, ঐ সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর ভিতর জবরদস্তি করিয়া নিজেকে ভরিয়া রাখিয়াছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পিষিয়া ফেলিয়াছে, বাসনার কথা ভাবিতেও ভরসা করে নাই! ছুটির বাঁশী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কল বন্ধ হইল। কুলিরা ঘণ্টাখানেকের ছুটি পাইয়াছে, খাইয়া আসিয়া আবার কাজে লাগিবে। কাতারে কাতারে কুলির দল বাহিরে আসিতে লাগিল। সকলের মুখে বাড়ী যাইবার আনন্দ তাহারা মন্থর গমনে দুলিয়া দুলিয়া উচ্চকণ্ঠে কথা বলিতে বলিতে চলিল। কিছু পূর্ব্বে শকটগুলি বোঝাই মাল লইয়া সারি সারি রেল ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করিয়াছিল।

একখানি চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া প্রকাশ পত্র লিখিতে বসিল। ইতিমধ্যে কখন যেন তাহার মন হঠাৎ একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল। না না, এমন ধারা জীবন বহন করা আর তাহার চলিবে না। সুরবালাকে সে এখনি লিখিয়া জানাইবে, ক্ষমা ভিক্ষা মাগিবে। সুরবালার প্রতি যে-সব রূঢ় ব্যবহার সে করিয়াছে, সকলি এখন জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল। একটি দিনের জন্যও এই স্ত্রী মুখ ফুটিয়া তাহার কোন কাজের প্রতিবাদ করে নাই, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া সকল গ্লানি সহ্য করিয়া আসিয়াছে। তাহার রোগজীর্ণ দেহ, শীর্ণ মুখ মনে পড়িতে প্রকাশের চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। কম্পিত হস্তে পত্রখানি শেষ করিয়া সে বারবার পড়িয়া দেখিল। না, এবার সে কোন কথা গোপন করে নাই, কাহাকেও দোষ দেয় নাই, সমস্ত অপরাধ মাথা পাতিয়া লইয়াছে! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বেহারার হাতে চিঠিখানি সে ডাকে পাঠাইয়া দিল।

[ক্রমশ]

দৃশ্য-পট

শ্রী কুমারলাল দাশগুপ্ত

বিশ্বের শিল্পশালায় দৃশ্য-পট চিরদিন অনাদৃত। অজ্ঞ নয়, অভিজ্ঞের মতেও বিষয়-পট (subject painting) ও আলেখ্য-পটের (portrait painting) তুলনায় দৃশ্য-পট হীনগুণ। তাই দেখতে পাওয়া যায় প্রতিভাবান্ শিল্পীরা তাদের শক্তি দৃশ্য-পটে বিশেষ নিয়োগ করেন নি। এই যে একটা ধারণা—যার মূল কত শত শতাব্দীকে বেষ্টন করে আছে—যা গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মধ্যদিনে, ইউরোপীয় নবযুগে ও (Renaissance) অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর একদল বিপ্লবী তাকে নির্ভুল বলে মেনে নিতে রাজী হল না।

প্রাচীন বল্‌ছেন দৃশ্য-পটের রচনাসামগ্রী জড়পদার্থ—দৃশ্য-পটের পটুয়াকে জড়পদার্থের বিন্যাসে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করতে হয়, তাই তার কল্পনা বাধা পায়, শক্তি প্রকাশ পাবার বৃহৎ ক্ষেত্র পায় না। দৃষ্টিশোভন হয় তো দৃশ্য-পট হতে পারে, কিন্তু কোন বিরাট বা মহান্ ভাবকে মূর্ত্তি দিতে সে অক্ষম। মানুষের অন্তরকে সীমার বন্ধনলুপ্ত করে অসীমের দিকে নিয়ে যায় যে শিল্পসুষমা—দৃশ্যপটে তারই অভাব। নবীন বল্‌ছে, এ কথা সত্য নয়। শিল্পজগতে কল্পনার তুলনায় পদার্থের মূল্য কতটুকু? পদার্থের বিন্যাস একটা ইঙ্গিত করে মাত্র—দ্রষ্টার অন্তরে সেই ইঙ্গিত সৃজন করে বিপুল রহস্য। পট ইঙ্গিত করে' কল্পনাকে জাগিয়ে দেয়, কল্পনা তখন সীমাকে অতিক্রম করে, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করে, মৃতকে অমর করে। রাস্কিন এইখানে নবীনদের হয়ে বলেছেন যে, বস্তুর সত্যকার বিরাট রূপের

পরিচয় নির্ভর করে আমাদের বোধশক্তি ও কল্পনাশক্তির উপর।* এই হচ্ছে খাঁটি কথা। পট-রচনার সামগ্রীর



কোরিণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত একটি "স্ক্রিন"

মূল্য নিরূপিত হবে দ্রষ্টার অন্তরের সম্পদের তুলনায়। পট-রচনার সামগ্রীরও একটা নিজস্ব মূল্য আছে, কিন্তু তাকে অন্যায় মর্য্যাদা দিলে শিল্প ক্ষতিস্বীকার করে। বিন্যাসনিপুণ শিল্পী তাকে এক অপরূপ রূপে বিন্যাস করেন—পটে একটা ইঙ্গিত সৃজন করতে। এই ইঙ্গিতই হচ্ছে সেই শিল্পসুষমা যা মানব-অন্তরকে দিশেহারা করে। ইঙ্গিতকে ফুটিয়ে তুলতেই সামগ্রীর প্রয়োজন—তাই তার আসন উপরে দিলে শিল্প নীচে নেমে আসে।

"Whether the power of the object over the heart was to be small or great depended altogether upon what it was understood for, upon its being taken possession of and apprehended in its full nature, either as a granite mountain or a group of panes of glass, and thus, always, the real majesty of the appearance of the thing to us, depends upon the degree in which we ourselves possess the power of understanding it— that penetrating, possession-taking power of the imagination, which has been long ago defined as the very life of the man, considered as a seeing creature." (Modern Painters).

এই গেল প্রথম কথা। তারপরে আবার প্রাচীন বল্‌ছেন যে, দৃশ্য-পটের পটভূমি অপরিসর। বিরাট আকাশ বা অনন্ত জলধি, দিগ্‌দিগন্ত বা বিপুল সুদূরকে আঁকবার ক্ষমতা দৃশ্য-চিত্রকরের নাই। বিরাটের সন্ধান সে কেমন করে দেবে? নবীন তার জবাব দিয়ে বল্‌ছে যে, বিরাটকে বোঝাতে হলে বিরাটকে আঁক্‌বার প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন হয় "সিম্বল" বা প্রতীকের। কবি যেমন গুটিকয়েক কথার বিন্যাসে অরূপকে রূপ দেয়, সীমার মধ্যে অসীমের প্রতিষ্ঠা করে, সুদূরকে নিকটে আনে, তেমনি পটুয়াও পটের বুকে দু'একটি বস্তুর অপরূপ বিন্যাসে, দু'একটি বর্ণের অপরূপ মিলনে এই অসাধ্যকে সাধন করে।

এমন অনেক জিনিষ আছে যাদের মধ্যে কে কুলীন আজ পর্য্যন্ত তার মীমাংসা হয়নি, কোনদিন হবেও না। শিল্পসভার এ তর্কেরও শেষ হবে না। তার মানে এই যে, কুলীন কেউ কম নয়। বিষয়-পট বা আলেখ্য-পটের পক্ষে যা সম্ভব, দৃশ্য-পটের পক্ষে তা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। দৃশ্য-পট যে বৃহৎকে, মহৎকে, প্রকাশ করতে পারে, দৃশ্য-পট যে মানব-আত্মাকে তৃপ্তি দিতে পারে, এর প্রমাণ আমরা



'স্পিটহেড'—টার্ণার

ইউরোপে না পেলেও এশিয়াতে পেয়েছি। এশিয়ার শিল্প-তীর্থ যে চীন, শত শতাব্দী ধরে যেখানে শিল্পী সুন্দরের আরাধনা করেছেন, যেখানে শিল্পীর অন্তর পটদর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই চীন দৃশ্য-পটকে এমন এক

অভিনব রূপ দিয়েছে যা আজ পর্য্যন্ত হয়ে রয়েছে পৃথিবীর পরম বিস্ময়।

ইউরোপে দৃশ্য-পট স্বাতন্ত্র্য পেল সপ্তদশ শতাব্দীতে। গ্রীক এবং রোমান শিল্পে দৃশ্য-পট অনাদৃত হয়েছে। রেনেসান্সের যুগে প্রকৃতি চিত্রে স্থান পেল অলঙ্কার হিসাবে। তার যে নিজস্ব একটা রূপ আছে, আর সে রূপ যে জীবরূপের চেয়ে কম নয়—একথা কেউ তখন ভাবেনি। এমনি করে বহু শতাব্দীর মধ্যে দিয়ে বহু অনাদর অপমান মাথায় নিয়ে দৃশ্য-পট যখন সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে পৌছল, তখন সে কতিপয় প্রতিভাশালীর (ক্লদ লরঁ্যা, পুস্যাঁ, রুইসডাল, হবেমা) কাছ থেকে পূজা পেল। সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালী যখন র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো আর টিসিয়ানের মন্ত্র জপছিল, তখন রোমে এল ফ্রান্স, ফ্লাণ্ডারস আর হল্যাণ্ড থেকে কতিপয় বিদেশী, যারা গ্রহণ করলো আর এক সাধনা—দৃশ্য-পটের সাধনা। বিপ্লবের সূচনা হল।

ফরাসী শিল্পী ক্লদ লরঁ্যা গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক কাহিনী থেকে বিষয় নির্ব্বাচন করে এমন-সব মনোরম দৃশ্য-পট আঁকতে লাগলেন—আজ পর্য্যন্ত যাদের জুড়ী মেলেনি। এতদিন মূর্ত্তিকে ফুটিয়ে তুলতেই শিল্পী অলঙ্কার-রূপে দৃশ্যের সমাবেশ করেছেন—লরঁ্যা এসে ঐ দৃশ্যকেই ফুটিয়ে তুলতে করলেন মূর্ত্তির সমাবেশ। তাঁর হাতে মূর্ত্তি দৃশ্যের মাঝখানে এমন একটি স্থান অধিকার করলো যেখানে সে তার বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে এক অখণ্ডরূপ ধারণ করলো। আকাশে রবি-কিরণের অপরূপ লীলা পটে প্রথম প্রকাশ করলেন লরঁ্যা। দূর দূরান্তরকে ফুটিয়ে তোল্‌বার কৌশলও প্রথম জান্‌লেন এই ফরাসী শিল্পী। এমনি করে দৃশ্য-পট নানারূপে, নানা ভঙ্গীতে ফুটে উঠতে লাগল।

এই সময়ে নিকোলাস পুস্যাঁ এসে দাঁড়ালেন লরঁ্যার পাশে। এই দুই প্রতিভাশালীর কাছ থেকে শিল্পজগৎ অনেক সম্পদ লাভ করল। কাম্পানিয়া, আলবান আর সাবাইন পর্ব্বতের রূপ পুস্যাঁ নানা ভঙ্গে প্রকাশ করতে লাগলেন। ডচ্ প্রতিভা রেম্ব্রাণ্ট, আর জেকব রুইস্‌ডাল দৃশ্য-পটকে আরও মহীয়ান করে তুল্‌লেন। বিরাট আকাশের নীচে, দিগন্তবিস্তৃত ধরণী এই দুই শিল্পীর কবি-



পর্ব্বতের দৃশ্য—চীনদেশীয় প্রাচীন ছবি

হৃদয়ের স্পর্শ নিয়ে যখন পটে ফুটে উঠতো, তখন কেউ তাকে অসম্মান করতে পারত না। শিল্পজগতে এই দুই শিল্পীর সৃষ্টি অন্য কারো সৃষ্টির চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। 'রাগরঞ্জিত দৃশ্য-পট' এই আখ্যা পেল রেম্ব্রাণ্টের চিত্র। রুইসডালের পটে প্রকাশ পেল একটা সুকরুণ সুর, তাই শিল্পীসমাজে তিনি নাম পেলেন "The melancholy Jacques of Painting." আকাশে আলোর যে দীপ্তি—ক্লদ লরঁ্যা যা প্রথম পটে আঁকলেন, ডচ-শিল্পী হবেমা তাকে আরও মনোহর করে তুললেন। হবেমার বিশেষত্ব হচ্ছে আলো ও ছায়ার অপরূপ বিন্যাসে।

এইবার আর একজন শিল্পীর কথা বলব, রাস্কিন

যাঁকে প্রাণ খুলে প্রশংসা করেছেন। তিনি হচ্ছেন ইংরেজ শিল্পী টার্ণার। প্রকৃতির বহু রূপ তিনি সারা জীবন ধরে এঁকে গেছেন। প্রকৃতির শান্ত মাধুর্য্য তিনি এঁকেছেন, প্রকৃতির কঠিন, পরুষরূপ তিনি এঁকেছেন, প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর রূপ--ঝড়ঝঞ্ঝাও তিনি এঁকেছেন। আর তাঁর এই আঁকা নিখুঁৎ। ঝরণার জলধারার স্বচ্ছতা, সাগরের জলরাশির বর্ণমাধুরী, পাথরের স্তর-



মিশরের পথে—পাতিনির

বিন্যাস তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে কিছুই এড়াতে পারেনি। রাস্কিন তাই বলেছেন, "টার্ণার যেমন শিল্পী তেমনি ভূতত্ত্ববিদ"। * শিল্পীর পক্ষে এটা যে খুব একটা বড় কথা তা নয়। কিন্তু শিল্পজগতে এমন একটা সময় আসে যখন শিল্পীকে ভূতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ এমন কি অস্থিতত্ত্ববিদও হ'তে হয়। শিল্পে বৃহৎ ও মহৎকে ফুটিয়ে তুলতে ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা ও অস্থিতত্ত্বের প্রয়োজন নাও হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে শিল্পীকে এ সকল বিষয়ে অজ্ঞ হ'লে চলবে না। অজ্ঞতার উপরে বৃহতের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ইংরেজ শিল্পী টার্ণার একা পথ চলেননি, উইলসন, গেন্‌স্‌বরো, কনষ্টেবল ঐ একই পথের পথিক।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপে এমন একটা সময় এল যখন সমস্ত শিল্পীসমাজ দৃশ্য-পটের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবার রোম নয়, প্যারিস হ'ল শিক্ষাপীঠ। জাপানী ছবির পরশ লেগে ফ্রান্সে দৃশ্য-পট এক অভিনব রূপ গ্রহণ করল। 'ইম্প্রেসনিজমে'র খ্যাতি চারিদিকে



'আর্কেডিয়া'র দৃশ্য—পুসঁ্যা

ছড়িয়ে পড়ল। দিগ্বিদিক থেকে শিল্পীরা নবযুগের শিল্পী-গুরু Manet আর Monet-এর কাছে মন্ত্র নিতে এল।



'ডায়ানা'র শিকার—দমেনিচিনো

ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে দৃশ্য-পট স্বাতন্ত্র্য লাভ করল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে তার অভীষ্ট লাভ করল না। দৃশ্য-পট যে অন্য পটের মত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করতে পারে, তার নিদর্শন পেতে ইউরোপের চিত্রশালায় গেলে নিরাশ হ'তে হবে। যেতে হবে এশিয়ার চিত্রশালায়। ভারতের শিল্পী প্রকৃতির উপাসনা করেনি, সে করেছে মূর্ত্তির। সে গড়েছে পাথরের মূর্ত্তি, ধাতুর মূর্ত্তি—সে পটেও এঁকেছে মূর্ত্তি, আর এই মূর্ত্তির ভিতর

* Turner is as much of a geologist as he is of a painter.

দিয়ে ভারতের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। অজন্তার গুহাচিত্রে নিছক দৃশ্যের সন্ধান পাই না। তবে রূপ নরনারী-সম্মত দৃশ্য, অর্থাৎ মূর্ত্তি ও প্রকৃতির একীভূত রূপ ভারতের শিল্পী যে মাঝে মাঝে আঁকেন নি—একথা বলা ভুল হবে। রাজস্থানী রাগ-রাগিণীর ছবিগুলি হচ্ছে এই শ্রেণীর।

ভারতের নয়, এশিয়ার শিল্পতীর্থ যে চীন, সেই প্রাচীন চীনে দৃশ্য-পটের পটুয়া সিদ্ধিলাভ করেছেন। ইউরোপের সপ্তদশ শতাব্দীতে দৃশ্যপট স্বাতন্ত্র্যলাভ করল, আর চীনে করলো চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মাঝখানে। ইউরোপে আজ যখন দৃশ্য-পটের পটুয়ার সাধনা সুরু হল—সুদূর একাদশ শতাব্দীতে সুং যুগে চীনের শিল্পী সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করল।

প্রাচ্য চিরদিন স্থূলকে বর্জ্জন করেছে, সূক্ষ্মের জন্যে। অন্তরের সৌন্দর্য্যকে পটে প্রকাশ করতে তাই তার তুলি বাহিরের সৌষ্ঠবকে ত্যাগ করে চলে। প্রাচ্যের শিল্পী তাই সাধক—তার সাধনা তুলির লেখায়। এরই ভিতর দিয়ে বৃহতের পরশ পাবার তার প্রয়াস। এই তার যাগযজ্ঞ, এই তার জপ আর তপ। সমগ্র এশিয়ার শিল্পসাধনার মূলে রয়েছে এই কথা। এই তত্ত্বকে না জানলে চীন-শিল্পীর অপরূপ সৃষ্টির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া আজ সম্ভব হবে না।

চীন-শিল্পী পটে পরিচয় দেয় আপনার অন্তরের। পট হচ্ছে শিল্পীর অন্তরের পরিচয়-লিপি। চীন-শিল্পী তার অন্তরে বৃহতের যে স্পর্শ পেল, যে সত্যের সন্ধান পেল—পটে তারই পরিচয় নিখুঁৎ করে লিখ্‌ল। তাই সে পট নিছক রঙের খেলা নয়—এমন একটা রহস্যের আধার যা দ্রষ্টার অন্তরেও বিরাটের স্পর্শ দান করে। চীন-শিল্পী আপনার অন্তরের সত্যকে পটে প্রকাশ করতে দৃশ্যের সহায় নিয়েছে। প্রকৃতির প্রতি এই যে আকর্ষণ—এ আকর্ষণের পরিচয় চীনদর্শনেও পাওয়া যায়। অনন্ত আকাশ, অপার সমুদ্র, শ্যামল বন, কঠিন পর্ব্বত, উচ্ছ্বসিত জলধারা—এরা যে মানব-জীবনের সহচর, একটা অদৃশ্য যোগসূত্রে প্রত্যেকে যুক্ত, প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরম আত্মীয়, এ সত্য চীনের ঋষি লাভ করেছিলেন, তাই চীন



একটি প্রাচীন চীনদেশীয় দৃশ্য-পট

প্রকৃতির ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে তার ভাবকে প্রকাশ করেছে এবং তার এ প্রকাশ ক্ষীণ বা অস্ফুট হয়নি।

চীনের চিত্রশালায় ঢুকে যাকে সবার আগে স্মরণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন কু-কাই-সি। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মাঝখানে এই শিল্প-সাধকের তুলি যে-সব ছবি এঁকেছিল, তার ক্বচিৎ দু'একখানির সন্ধান আজ মিলেছে। তিনি বিশেষ করে দৃশ্য-পটের পটুয়া ছিলেন কি না একথা যখন জানা নাই, তখন তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে তাং যুগে প্রবেশ করতে হবে।

তাং যুগের (৬১৮-৯০৫) দৃশ্য-পটের সেরা পটুয়া হচ্ছেন

ওয়াঙ ওয়ে। দৃশ্য-পট সম্বন্ধে তাঁর একটি উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যাবে তিনি কোন্ শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। তিনি বলেছেন—দৃশ্য-পট আঁকতে গেলে আগে চাই ভাবকে। অগ্রবর্ত্তী এই ভাবকে তখন অনুসরণ করবে তাকে মূর্ত্তি



দৃশ্য-পট—উইংসন

দেবার উপযোগী বস্তু-সম্ভার। সত্যকার শিল্পীর পক্ষে এইটিই হচ্ছে খাটি কথা। একটা দৃশ্য-পটে এঁকে নিয়ে, যারা তারপরে পরখ করে কি ভাব কতখানি তাতে প্রকাশ পেল এবং সেই অনুসারে কি নাম সেই পটকে দেওয়া যেতে পারে, তারা আর যাই হোক, শিল্পী নয়। ভাব যেখানে আগে এল—শিল্পী যেখানে ধ্যানে ভাবের ধরা পেলেন এবং সেই ধ্যানলব্ধ যখন বস্তু-বিন্যাসে পটে মূর্ত্ত হয়ে উঠল, তখনই সে হ'ল সত্যকার শিল্প, আর সেই পটুয়া হলেন সত্যকার শিল্পী। ওয়াঙ ওয়ে নিজে ছিলেন সেই সত্যকার শিল্পী। চীনে এককালে যে দক্ষিণপন্থীরা শিল্পী-সমাজে প্রাধান্য পেয়েছিল, গভীর মহান সুন্দরের রূপ অনাড়ম্বরভাবে পটে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল বলে যারা একদিন খ্যাতিলাভ করেছিল—ওয়াঙ ওয়ে ছিলেন সেই শিল্পী-সম্প্রদায়ের আদি গুরু। শেষ বয়সে শিল্পী-গুরু শহর ছেড়ে জনবিরল বনের কোণে আশ্রম রচনা করেছিলেন। সেইখানে তাঁর দিন কাটতো ছবি এঁকে আর কবিতা লিখে। সমসাময়িক সমালোচকেরা বলতেন তাঁর ছবি ছিল যেন কবিতা, আর তাঁর কবিতা ছিল যেন ছবি।

এইবার আমরা সুং যুগে (৯৬০-১২৮০) প্রবেশ করব। কালের কোলে এই সুং যুগ শিল্পের খ্যাতিতে অমর হয়ে আছে। দৃশ্য-পট এক অভিনব রূপ নিয়েছিল এই যুগে। এই যুগের শিল্পী শুধু একটি মাত্র রঙে ছবি এঁকেছেন, আর সেই একটি মাত্র রং হচ্ছে চীনের কালি। বৃহৎ ভাবকে পটে প্রকাশ করতে প্রয়োজন হয় 'সিম্বল' বা প্রতীকের—তাকে ফুটিয়ে তুলতে বহু বর্ণের প্রয়োজন হয় না। র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা বহুবর্ণের ছবির যে একরঙা প্রতিলিপি, তাতে আসল ছবির বিশেষত্বটুকু পূর্ণমাত্রাতেই থাকে। কিন্তু এইখানে এক আপত্তি তুলে কোন কোন শিল্পসমালোচক বলেছেন যে, দৃশ্য-পট সম্বন্ধে ও নিয়ম খাটে না, কারণ বর্ণবৈচিত্র্যই হচ্ছে দৃশ্য-পটের সারবস্তু। কথাটা ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ দৃশ্য-পট দৃশ্য হিসাবে আঁকা হয়। মানুষ হিসাবে যতক্ষণ মানুষকে আঁকা হয়, ততক্ষণ প্রয়োজন হয় মানব-দেহের বিশেষ বিশেষ বর্ণের। কিন্তু যখনই মানব-দেহের ভিতর দিয়ে শিল্পী চায় ইন্দ্রিয়াতীত বৃহৎ ও মহৎকে প্রকাশ করতে, তখনই সেই অস্থিতত্ত্ব ও বিশেষ বিশেষ বর্ণের প্রয়োজন ক্ষীণ হয়ে আসে। তার প্রমাণ ভারতীয় শিল্পে সুপ্রচুর।

এক রঙের ছবি আঁকতে গিয়ে কেমন করে দূরের ও কাছের জিনিষকে বিভিন্ন রং ব্যবহার না করে' একই রং হাল্‌কা ও গাঢ় করে বসিয়ে আঁকতে হয়, চীন-শিল্পী ইউরোপের শিল্পীর বহু বহু আগে তা শিখেছিলেন। তাং যুগের শিল্পী-কবি ওয়াঙ ওয়ে আবিষ্কার করেন এই উপায়। বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে গেলে বস্তু যে তার বর্ণের স্বরূপ হারায়, দূরত্ব যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে—এসমস্ত তত্ত্ব ওয়াঙ ওয়ে প্রথম প্রচার করেন। ওয়াঙ ওয়ের প্রণীত এই সমস্ত বিধিবিধান লিয়োনার্দো দাভিঞ্চির "চিত্রলক্ষণ" এর কথা মনে করিয়ে দেয়। আলো বাতাস সংক্রান্ত 'পর্সপেক্‌টিভ'-এর সঙ্গে সঙ্গে চীনের ছবির 'পর্সপেক্‌টিভ' সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার, কারণ সাধারণতঃ 'পর্সপেক্‌টিভ' বললে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে ইউরোপের ছবির। ইউরোপের 'পর্সপেক্‌টিভ্' হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট একটি স্থান থেকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে যে ব্যবধান-বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাই। চোখ সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে সরে যেতে

পারবে না। চোখ থেকে বস্তুর দূরত্ব অনুসারে বস্তুকে কখনো ছোট, কখনো বড়, কখনো বাঁকা, কখনো সোজা করে আঁকা হবে। কিন্তু এতে একটা মুস্কিল হচ্ছে



পথ—হবেমা

এই যে, একই স্থান থেকে একই দিকে দৃষ্টিপাত করলে শুধু একটি বস্তুকেই স্পষ্ট দেখা যায়, আর গুলো দেখায় অতি অস্পষ্ট। তাই ইউরোপের শিল্পীরা চোখকে একটু-আধটু ঘোরাবার ফেরাবার অধিকার দিয়েছেন, আর এই নতুন 'পর্সপেক্‌টিভ্'-এর নাম দিয়েছেন perspective of sentiment। বহু উর্দ্ধ থেকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে যে পর্সপেক্‌টিভ্ পাওয়া যায়, চীনের শিল্পী তাকে বিশেষ করে আমাদের দেখিয়েছে। তাই চীনের পটে পাওয়া যায় একটা বিরাট বিস্তৃতি, অসীম আকাশ, মেঘ-সমুদ্র, উদার প্রান্তর, পর্ব্বত, নদী, অরণ্যানী।

দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে আর একটা মহত্তর, সুন্দরতর জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন সুং যুগের শিল্পীরা, তাই তাঁদের সাধনা হয়েছিল পটে সেই মহত্তর ও সুন্দরতর জগতকে ফুটিয়ে তুলতে। সেদিন ফ্রান্সে যেমন একদল শিল্পী—বারবিজোঁ গোষ্ঠী (Barbizon school) শহর ছেড়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিল, তেমনি সেই সুদূর অতীতে সুং যুগের শিল্পীও নির্জ্জন পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে থেকে প্রকৃতির পরিচয় লাভ করতেন। প্রকৃতিও যে তাঁদের কাছে হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের আঁকা দৃশ্য-পটে। তারা কখনো এঁকেছেন পাহাড়ের চূড়া মেঘলোক ভেদ করে উর্দ্ধে উঠে গেছে, নীচে পড়ে আছে নদ-নদী, মাঠ-বন—যেন সে ধরণীরই একজন, ধরণীই তার আশ্রয়, কিন্তু তবু সে ধরণীর ধূলি থেকে বহু



শেবার রাণীর সমুদ্রযাত্রা—ক্লদ

উর্দ্ধে। তাঁরা কখনো এঁকেছেন পাহাড়ের গায়, মাঠের বুকে কুয়াশার রহস্য—যেন পাহাড় হারিয়েছে তার কর্কশতা, মাঠ হারিয়েছে তার বিবর্ণতা, যেন তারা অতিপরিচিত সাধারণ পাহাড়, বন, মাঠঘাট আর নয়, তারা যেন একটা স্বপ্নলোক, কল্পরাজ্য। তাঁদের আঁকা উড়ে চলা হাঁসের সারির পাখার আওয়াজ যেন শুনতে পাওয়া যায়, গাছের পাতার ইঙ্গিতে বুক যেন সাড়া দেয়। লী-চেঙ, ফান্-কুয়ান্ মা-ইউয়ান্, সিয়া-কিউই, লা-মিন্, মী-ফাই এঁরাই হচ্ছেন সুং যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। শিল্পজগতে এঁদের নাম অমর হয়ে আছে।

রাজবংশের ছেলে লী-চেং ছিলেন খামখেয়ালী মানুষ। মদের নেশায় যখন তাঁর মন খুশী হয়ে উঠত, তখনি কেবল তিনি ছবি আঁক্‌তেন। নেশার বশে আঁকা তাঁর ছবি দ্রষ্টার মনেও নেশা ধরিয়ে দিত।

ফান্-কুয়ান যৌবনে ছিলেন লী-চেঙের শিষ্য—লী-চেঙের অনুকরণে তিনি ছবি আঁকতেন। কিন্তু অনুকরণে তাঁর সাফল্য এল না তাই লী-চেঙ-এর তৈরি পথ ছেড়ে তিনি নিজের হাতে নিজের পথ বানিয়ে নিলেন। তিনি বল্‌তেন, "ওস্তাদের আঁকা ছবি দেখে ছবি-আঁকা শেখার চেয়ে আসল জিনিষটি দেখে শেখা ঢের

ভাল, আবার সেই জিনিষের বাহিরটা দেখে শেখার চেয়ে ভিতরটা দেখে শেখা আরো ঢের ভাল। এ শুধু তিনি মুখে বলেননি, কাজেও এ কথা খাটিয়েছেন। মা-ইউয়ান' এর আঁকা দৃশ্য-পটে পাওয়া যায় একটা দৃঢ়, অটল ভাব। তাঁর আঁকা পাহাড়ের চূড়া যেন পৃথিবীর ভয়ভাবনা সুখদুঃখের অতীত, তাঁর আঁকা পাইন গাছ যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা, শীত-গ্রীষ্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ঠিক এর বিপরীত ভাব দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ছেলে লা-মিনের আঁকা পটে। লা-মিন্' এর আঁকা দৃশ্য-পটে ফুটে উঠেছে একটা স্বপ্নলোকের সৌকুমার্য্য। সিয়া-কিউই চীনের কালির একরঙা ছবি এমন ওস্তাদী করে এঁকেছেন যে, মনে হয় বুঝি তা হরেক রকম রঙেই আঁকা। তুলির উপর কতখানি দখল থাকলে এমন ব্যাপার ঘটান সম্ভব, তা আজকাল কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবে না। মী-ফাই ছিলেন সুং যুগের ইম্প্রেসনিষ্ট।

রেনেসান্সের-এর যুগ যেমন ইউরোপে একবারই এসেছে, বৌদ্ধযুগ যেমন ভারতে একবারই এসেছে, তেমনি সুং যুগ চীনে একবারই এসেছিল। বিধির যে বিধানে দিনের শেষে রাত্রি আসে, সেই বিধানে শিল্পোজ্জ্বল সুং যুগের শেষে এল হীনপ্রভ কত শত যুগ! এশিয়ার শিল্পের ইতিহাসে তামসঘন রাত্রি সুদীর্ঘকাল আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল। আজ মনে হচ্ছে সেই রাত্রির অন্ধকারের বুকেই ফুটে উঠ্‌ছিল আর এক উজ্জ্বল সৃজন-উষার সম্ভাবনা।

বীরভূমের খনিজ-সম্পদ

শ্রী গৌরীহর মিত্র

১—লৌহ

বর্ত্তমান বীরভূমির মত পুরাতন বীরভূমি এত ক্ষুদ্রায়ত ছিল না। তখন দেওঘর হইতে ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত বীরভূমির সীমা বিস্তৃত ছিল। পুরাতন বীরভূমি লৌহ, কয়লা, ঘুটিং, খড়িমাটি, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রস্তর প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান বীরভূমির সীমান্তর্গত ভূমিখণ্ড এই-সকল খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ।

এখানকার স্থানীয় উপাদান হইতে দেশীয় প্রণালীতে লৌহ সংগৃহীত হইত। অনুমান পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত "ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে" বীরভূমে প্রচুর পরিমাণে লৌহ উৎপন্ন হইবার কথার উল্লেখ আছে। এই স্থানের সংগৃহীত লৌহ দেশবিদেশে রপ্তানি হইত। লৌহের উপাদান ধাতব প্রস্তররাজি (ores) এখানে তখন যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল, বঙ্গদেশের এমন কি ভারতবর্ষের অন্য কোনস্থানে সেরূপ পাওয়া যায় নাই। এখন বীরভূমে লৌহ-নিষ্কাসন প্রথা আর না থাকিলেও ধাতব লৌহস্তরের (ores) অভাব নাই। কয়লা, প্রস্তর, ঘুটিং ও খড়িমাটির কারবারের অবস্থা এখনও এখানে অসচ্ছল নহে।

বীরভূমের পুরাতন ঢেকারু জাতিই লৌহ-নিষ্কাসনের এক প্রকার উদ্ভাবন-কর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লৌহের জন্মদাতা বলিয়া এই সুনিপুণ জাতি জন্মকার বা কর্ম্মকার নামে অভিহিত। এই জাতির আদিম নিবাস বীরভূমি নহে। লৌহ-নিষ্কাসন তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় জানিয়া বীরভূমের লোকে লৌহ গলাইবার জন্য তাহাদিগকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কি তাহার কিছুপরে এদেশে প্রথম আনয়ন করে। অবশেষে তাহারা এই জেলার অধিবাসীরূপে পরিগণিত হয়। বীরভূমে ইংরেজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে লৌহের কারবারে দিনদিন অবনতি দেখা দেয়। পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই লৌহ-সংক্রান্ত ব্যবসায় বা কারবার লুপ্ত হইলে এই জাতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করে।

বীরভূমের বেলিয়া (বেলে), নারায়ণপুর, আয়াস, দেউচা, ডামরা, গণপুর প্রভৃতি গ্রামে দেশীয় প্রণালীতে লৌহ-নিষ্কাসন হইত। এই-সমস্ত গ্রামের মধ্যে নারায়ণপুরেই এই ব্যবসায়ের বৃহৎ কারবার ছিল।

বীরভূমের সবডিভিজন্ রামপুরহাটের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রবাহিত ব্রাহ্মণী নদীর তীরে নারায়ণপুর গ্রাম অবস্থিত। এই নারায়ণপুর গ্রাম লৌহের কারবারে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখানে লৌহের উপাদান প্রস্তর (ores) এত অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল যে, এখনও সেই সমস্ত সংগৃহীত প্রস্তরের বৃহৎ বৃহৎ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নারায়ণপুর গ্রামে 'কাঁচা' (pig iron) এবং পাকা লৌহ নিষ্কাসনের জন্য ৭৫টি করিয়া সর্ব্বসমেত ১৫০টি 'কোটশাল' ও 'ঢুকিশাল' (কামারশাল) ছিল। নারায়ণপুর গ্রামের প্রায় তিন মাইলের মধ্যে বলবন্ত নগরের সীমানায় ব্রাহ্মণী নদীর অপর তীরেও কাঁচা ও পাকা লোহা প্রস্তুতের ২৫টি করিয়া মোট ৫০টি 'কোটশাল' এবং 'ঢুকিশাল' ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, বহু পূর্ব্বে নারায়ণপুরের সন্নিকটবর্ত্তী আয়াস নামক গ্রামে লৌহ-নিষ্কাসন হইত। এই আয়াস গ্রামের (আয়স—লৌহ-সংক্রান্ত) নামই ইহার লৌহ-সংক্রান্ত প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

উপযুক্ত গৃহের অভাব-নিবন্ধন বর্ষাকালে এবং পূজা-পার্ব্বণাদিতে প্রায় চারিমাস কাল লৌহ-নিষ্কাসন কার্য্য একরূপ বন্ধ থাকিত। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের ভূপৃষ্ঠে এবং এক-দেড়হস্ত পরিমাণ মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে যুগপৎ রক্ত ও হরিদ্রাভ প্রস্তর (চলিত কথায়—বীচ পাথর) অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই-সকল প্রস্তর হইতেই লৌহ নিষ্কাসিত হইত। এই প্রস্তর হইতে, সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে যেভাবে লৌহ নিষ্কাসিত হইত, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

একটি বড় চালার ঘরে দশহাত দীর্ঘ ও দশহাত প্রস্থ এবং ছয়-সাত হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া উহাকে প্রাচীর দিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা হইত। চালাঘর ইত্যাদি নির্ম্মাণে বার-চৌদ্দ টাকার বেশী খরচ হইত না। কেবল-মাত্র অদূরবর্ত্তী খরবোনা গ্রামের মৃত্তিকাই এই প্রাচীর (partition) নির্ম্মাণ-কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচিত হইত। প্রাচীরের তলদেশের মধ্যস্থানে একটি ছিদ্র থাকিত। গর্ত্তের একপার্শ্বে মাচা বাঁধিয়া তাহার উপরিস্থিত দুইটি হাপরের নল ঐ ছিদ্র দিয়া পরান হইত। অপর দিকের



মহম্মদ বাজার—লৌহকারখানা

খালি গর্ত্তে, লৌহের উপাদান প্রস্তরগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া কাঠকয়লার সহিত থাক বাঁধিয়া সাজান হইত। একহস্ত পরিমিত উচ্চ এক থাক কাঠকয়লা সাজাইয়া তাহার উপর ঐরূপ পরিমিত এক থাক প্রস্তর সাজান হইত। এইরূপভাবে অনেক থাক কয়লা এবং প্রস্তর সাজান হইলে খরবোনার মাটির দ্বারা সমস্ত থাকই আবৃত করিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক মাচার উপরিস্থিত লোক অনবরত হাপর দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিত। ক্লান্তি-বশতঃ হাপরের ক্রিয়ার ন্যূনতা হইবার আশঙ্কায় যথাসময়ে লোক পরিবর্ত্তন করা হইত। এইরূপ সাতদিন সাতরাত হাপর করিলে পর প্রস্তর হইতে লৌহ নিষ্কাসন হইত। এইরূপ কার্য্য করিতে এক এক শালে প্রায় শতাধিক মজুরের প্রয়োজন হইত। কারিকর প্রাচীরের মধ্যস্থিত ছিদ্র দিয়া শাল এবং অগ্নির অবস্থা দেখিত। প্রস্তর গলিয়া নিষ্কাসিত হইলে কারিকর ছিদ্র হইতে তাহা টানিয়া বাহির করিয়া লইত। এইরূপ-ভাবে প্রাপ্ত লৌহ 'কাঁচা লৌহ' (pig iron) নামে পরিচিত ছিল। যাহারা এই কার্য্যাদি করিত, তাহাদের উপাধি

ছিল 'শাশা'। এইরূপে ১৫০টি শাল হইতে কাঁচা ও পাকা লোহা প্রস্তুত হইত। প্রথমতঃ লৌহ-নিষ্কাসন অর্থাৎ কাঁচা লোহা মুসলমানেরা তৈয়ারী করিত। হিন্দুরা কেবল কাঁচা লোহাকে পাকা লোহায় পরিণত করিত মাত্র।



বক্রেশ্বর—শ্বেতগঙ্গা

গোলাকার তাল ও লম্বাকৃতি লৌহকে যথাক্রমে 'ডুকী' ও 'বাতা' বলিত। যাহারা এই লোহার কারবার করিত, জনসাধারণে তাহাদিগকে 'শালুই' বলিত। প্রস্তর হইতে লৌহ নিষ্কাসিত হইয়া গেলেও তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহা সংযুক্ত থাকিত। এইরূপ প্রস্তরখণ্ড হইতে লৌহ সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় মজুরদের ছেলেমেয়েরা দৈনিক প্রায় দেড়-দুই আনা উপায় করিত। তখনকার দিনে এইরূপ সামান্য আয়ই একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। শালুইরা ইহাদের নিকট হইতে লৌহ খণ্ড বা চূর্ণ ক্রয়পূর্ব্বক গলাইয়া পাকা লোহায় পরিণত করিয়া বেশ লাভবান হইত।

এক এক কোটশালে প্রতি ক্ষেপে বিশ-পচিশ মণ কাঁচা লোহা নিষ্কাসিত হইত। এই লোহা মণ-প্রতি দেড়-দুই টাকা দরে বিক্রয় হইত। কাঁচা লোহা তৈয়ারী করিতে মণ-প্রতি দেড় টাকা করিয়া খরচ পড়িত, খরচ-খরচা বাদে ঐ লোহা বিক্রয় করিয়া ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা লাভ পাওয়া যাইত। তখন পাকা লোহা পাঁচ ছয় টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। ইহার আনুষঙ্গিক খরচখরচা বাদে প্রায় একশত টাকা লাভ থাকিত। প্রতি শালেই কিছু-না-কিছু পরিমাণ উৎকৃষ্ট লোহা (যাহাকে মুচ বলিত) পাওয়া যাইত। 'মুচ' ইস্পাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল। মুচ লোহা আট টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। এই মুচ লোহাই বারুদ-কারখানায় অত্যধিক ব্যবহৃত হইত। এইস্থানে প্রস্তুত প্রায় সমস্ত লোহাই আজিমগঞ্জের নিকট লৌহ-গঞ্জে রপ্তানি হইত। রপ্তানি-কার্য্যে উপরন্তু মণ প্রতি প্রায় একটাকা হিসাবে লাভ থাকিত। বৈদেশিক লৌহের আমদানি হইলে তাহার সমকক্ষতায় না পারিয়া নারায়ণপুরের লৌহের কারবার ১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই উঠিয়া যায়। যে জনাকীর্ণ নারায়ণপুর এক সময় প্রতিদিন আট-দশ হাজার কুলি-মজুরের অন্নসংস্থান করিত, আজ তাহা একপ্রকার লোকশূন্য। শালুইগণ সেকালে লৌহের কারবার করিয়া এখানকার মধ্যে ধনশালী ও প্রতাপশালী পরিবার বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বংশ এখন লোপ পাইয়াছে। আজ তাহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত। ব্রাহ্মণী নদীর তীরে পাহাড়ের মত লৌহ প্রস্তররাশি আজিও দর্শকের মনে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া প্রাণে বেদনার সঞ্চার করে।

সদর সবডিভিজনের অন্তর্গত সিউড়ী হইতে প্রায় আট মাইল উত্তরাংশে অবস্থিত মহম্মদ বাজারের (মামুদ বাজার) চারি মাইল উত্তরে দেহচা গ্রাম কাঁচা লোহা নিষ্কাসনের একপ্রকার কেন্দ্র ছিল। ইংরেজী ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে দেহচা গ্রামে লৌহ-নিষ্কাসনের জন্য ত্রিশটি চুল্লী ছিল। প্রতি চুল্লী হইতে বিশ-পচিশ মণ কাঁচা লোহা তৈয়ারী হইত। তবে বর্ষাকালে এবং পূজাপার্ব্বণে মাসকয়েক লৌহ-নিষ্কাসন কার্য্য বন্ধ থাকিলেও প্রতি চুল্লী হইতে বৎসরে প্রায় এগার শত মণ করিয়া কাঁচা লোহা তৈয়ারী হইত। নারায়ণপুর, গণপুর ও ডামরা গ্রামে যথাক্রমে ৩৫, ৬ ও ৪টি করিয়া কাঁচা লৌহ নিষ্কাসনের চুল্লী ছিল। এই-সমস্ত চুল্লী হইতে বৎসরে প্রায় ৭৫ × ১১০০ = ৮২,৫০০ মণ কেবল কাঁচা লোহাই তৈয়ারী হইত। এতদ্ব্যতীত বীরভূমের অন্যান্য স্থানেও যে লোহা প্রস্তুত না হইত এমন নহে। কাঁচা লোহাকে পাকা লোহায় পরিণত করিতে গেলে এক-চতুর্থাংশ ওজনে কম হইত

অর্থাৎ দশমণ কাঁচা লোহাকে পাকা লোহায় পরিণত করিতে গেলে ওজনে সাত মণ বিশ সের দাঁড়াইত। তখন বীরভূম বা এতদঞ্চলে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। এইজন্য কাঠকয়লার দ্বারা লৌহ-নিষ্কাসন এবং কাঁচা লোহাকে পাকা লোহায় পরিণত করা হইত। এই কাঠ-কয়লার দ্বারা প্রস্তুত লৌহ ইংলণ্ড দেশে খনিজ কয়লার দ্বারা প্রস্তুত লৌহ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ছিল। বার লোহা (bar iron) প্রস্তুত করিতে হইলে কাঠকয়লার সঙ্গে ঘুটিং প্রস্তর মিশ্রিত করিয়া দিত। বার লৌহ প্রস্তুত করিবার মোটামুটি ব্যয় এইরূপ হইত—

৫০০০	মণ	লৌহ প্রস্তর	৫ পয়সা মণ হিসাবে		৩৯০৲
৭০০০	,,	কাঠকয়লা	৩	,, ,, ,,	৩২৮৲
১০০০	,,	ঘুটিং	৬	,, ,, ,,	৯৩৲
					৮১১৲

সাধারণতঃ এই লৌহ নৌকাযোগে কলিকাতায় রপ্তানি হইত। এইভাবে রপ্তানি করিবার ব্যয় মণ-প্রতি প্রায় দশ-বারো টাকা হিসাবে লাগিত।

ইংরেজী ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর আমলে ইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা নামক জনৈক দেশীয় ব্রাহ্মণ উন্নত উপায়ে লৌহ-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া বর্দ্ধমান কৌন্সিলের হাত দিয়া সরকারের নিকট প্রথম চারি বৎসর কাল বিনা শুল্কে কর্ম্ম চালাইবার পর পঞ্চম বর্ষ হইতে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এইরূপ শুল্ক যথানিয়মে প্রদান করা একপ্রকার অসম্ভব বুঝিয়া সরকার উক্ত দরখাস্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ একার্য্যে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

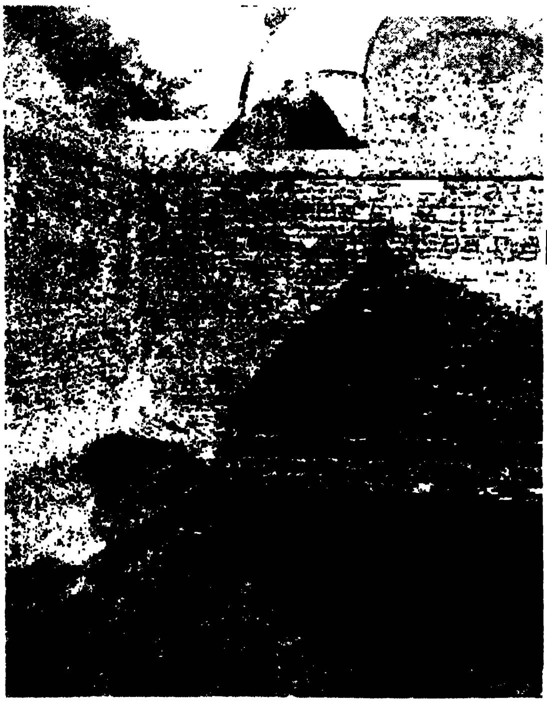
সমার হিট্‌লী কোম্পানী (Summer Heatly & Co.) পঞ্চকোট (তখন বীরভূমের অধীন ছিল) এবং বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে লৌহ প্রস্তুত করিবার স্বত্ব উপভোগ করিতে থাকিলে মট্ এবং ফারকুহর কোম্পানী (Motte and Furquhar & Co) ইংরেজী ১৭৭৭ সালে বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে কোম্পানীর জমিদারী-সমূহে লৌহ প্রস্তুত ও তাহা বিনা শুল্কে বিক্রয় করিবার আদেশ প্রার্থনা করিয়া সরকারকে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। ফারকুহর কোম্পানী প্রথমতঃ মানভূম জেলার ঝরিয়া নামক স্থানে কয়লার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তৎকালে বীরভূমে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট



বক্রেশ্বর—পাপহরা

প্রস্তর-প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অবিলম্বে ঝরিয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে-সর্ত্তে ঝরিয়ার কয়লার ব্যবসায় করিবার সম্মতি পাইয়াছিলেন, সেই সর্ত্তে ইংরেজী ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের বিভিন্ন স্থান হইতে লৌহ-নিষ্কাসন ও ব্যবসায় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। বীরভূমে তাঁহার এই ব্যবসায়ের বিক্ষিপ্ত স্থান-সমূহ সমবেতভাবে "লৌহ মহল" বা "লোহা মহল" নামে পরিচিত হইল। ফারকুহর কোম্পানী ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ইংলণ্ড হইতে আনীত দ্রব্যের চার-পাঁচ গুণ মূল্যে এদেশজাত লৌহের গোলাগুলি সরবরাহ করিতে সম্মত হন। তখনও বীরভূমি ইংরেজের করতলগত হয় নাই। শেষে যদিও এই সমস্ত সর্ত্তের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি তদানীন্তন বীরভূমের মুসলমান-অধিপতি নগর-রাজ ও অন্যান্য মুসলমান জায়গীরদারগণ তাঁহার এই ব্যবসায়ের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। ফারকুহর কোম্পানী ইংরাজ-সরকারকে বহু অনুরোধ-উপরোধ করিলে পর সরকার ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে চুল্লী-নির্ম্মাণ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য পনর হাজার টাকা সাহায্য করেন। এই কোম্পানী ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত বীরভূমে তাঁহাদের কারবার চালান, কিন্তু কতদূর কি করিয়াছিলেন তাহার

সঠিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজা ও জায়গীরদারগণ লৌহ মহলের রাজস্ব তাঁহাদের প্রাপ্য বলিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ করেন। ফারকুহর সাহেব লৌহ-সংক্রান্ত কারবার পরিত্যাগ করিলে ঠিক এই



বক্রেশ্বর—জীবিত কুণ্ড

সময় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফলতার বারুদের কারখানায় কার্য্য করিতে গমন করেন। ফারকুহর সাহেবের ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই লোহা মহলের ইজারা ছিল। তদনন্তর এই লোহা মহল জমিদারের হস্তগত হয়। তিনি এই লোহা মহল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন লোকের সহিত স্বতন্ত্রভাবে বন্দোবস্ত করেন। এই-সমস্ত লোক ইচ্ছানুযায়ী কর বৃদ্ধি করিলে বহুতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে সেই সেই লাটের মালিক এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহা মহলের মালিকের সহিত বিবাদ আরম্ভ করেন। এই বিবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হয় এবং লাটের মালিক এবং লোহা মহলের মালিক স্বতন্ত্র বলিয়া মীমাংসিত হয়। S. G. T. Heatly সাহেবের "Contributions Towards a History of the Development of the Mineral Resources of India" নামক পুস্তকে লিখিত বিবরণ-পাঠে জানা যায় যে, ফারকুহর কোম্পানি-প্রস্তুত কাঁচা লোহা কলিকাতায় পাচ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। বালেশ্বর এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত সেই প্রকারেরই লোহা যথাক্রমে সাড়ে ছয় টাকা ও দশ টাকা হইতে এগার টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, বীরভূমের এই লৌহ কারবার যদি বিলুপ্ত হইয়া না যাইত, তাহা হইলে অন্যান্য দেশে প্রস্তুত লৌহের মত লৌহই এখানে সস্তায় মিলিত সন্দেহ নাই।

ওয়েলবি জ্যাক্সন (Welby Jackson) নামক জনৈক সাহেব তখনকার কালে বীরভূমের লোকের দ্বারা দেশীয় প্রণালীতে লৌহ-নিষ্কাসন সম্বন্ধীয় এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, পঁচিশ মণ লৌহ নিষ্কাসন করিতে চারদিন চার রাত সময় অতিবাহিত হইত এবং তাহাতে মোট সত্তর টাকা মাত্র ব্যয় হইত। লৌহ মহলের ইজারাদারগণ প্রত্যেকবার লৌহ-নিষ্কাসন জন্য একটাকা এবং মুচ্ লোহার মণ-প্রতি দেড় আনা হিসাবে করের দাবী করিত। ওয়েলবি সাহেব এইরূপভাবে কর-আদায়ের কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তবে মনে হয়, ফারকুহর সাহেব নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিলে, জমিদারগণ লোহা মহল বিভিন্ন লাটে বিক্রয় করিলে নূতন অধিকারীবৃন্দ এই স্বত্বের দাবী করিতেন।

ভারতবর্ষে রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাবনা উপলক্ষে বিলাতের কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ডাক্তার ওল্ডহাম সাহেবকে ভারতের লৌহ-প্রস্তুতের তথ্য অবগত হইবার জন্য এদেশে প্রেরণ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এতৎ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পুস্তকে সে সময়ের বীরভূম ও দামোদরের উপত্যকার ধাতব লৌহ সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্য তেমন ফলপ্রদ হয় নাই। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইংরেজী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ডি, সি, ম্যাকে

কোম্পানী লৌহ-প্রস্তর হইতে লৌহ-নিষ্কাসনের জন্য বীরভূমের সদর সিউড়ীর ছয় মাইল উত্তরে মহম্মদ বাজারে (মামুদ বাজার) Birbhum Iron Works Company নাম দিয়া একটি কারখানা স্থাপন করেন। ইহার দশ বৎসর পরে ম্যাকে সাহেবের মৃত্যু হইলে এই কোম্পানী লুপ্ত হইয়া যায়। পরে ইহা কিছুকাল পর্য্যন্ত একজন দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা সময় সময় পরিচালিত হইত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই কারখানা বার্ণ কোম্পানীর হস্তে আসে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এতৎ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই কারখানায় ৪০ অশ্বশক্তি (40 Horse Power) ইঞ্জিন ছিল। এই কারখানা হইতে দৈনিক ১৩৫ হইতে ১৪০ মণ কাঁচা লোহা তৈয়ারী হইত। এই কোম্পানী লৌহের কারবারে আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই। উপরন্তু কারখানা উঠিয়া যাওয়া সত্ত্বেও এখনও এই কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই কারখানায় লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রপাতি প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অব্যবহার্য্যরূপে পতিত ছিল। এখন এইস্থানের বৃহৎ কারখানার ভগ্নাবশেষ দেখিলে ইহার বিশালতার কথা স্বতঃই মনে জাগিয়া উঠে।

সিউড়ীর পশ্চিমে আট মাইল দূরে টাঙ্গমুলি প্রভৃতি গ্রামে এখনও লৌহ-প্রস্তরের বহু স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই স্তর মৃত্তিকার চার-পাঁচ ফিট নিম্নেই থাকে এবং ইহা হইতে শতকরা ৪০।৫০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। ১৮০০ খৃঃ ১২ই এপ্রিল তারিখে বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর জি, পারলিঙ সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের প্রেসিডেণ্ট উইলিয়ম কাউপার সাহেবকে যে পত্র লিখেন, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, বীরভূম জেলায় সে সময় বিভিন্ন স্থানে প্রায় একশত লৌহ-কারখানা ছিল এবং প্রত্যেক কারখানায় ১০ জন করিয়া লোক নিযুক্ত থাকিত।

বর্ত্তমানকালে বীরভূমের কোনস্থান হইতেই আর লৌহ প্রস্তুত হইতেছে না।

২—কয়লা

যে বিস্তৃত কয়লা-ক্ষেত্র রাণীগঞ্জ কোলফিল্ড নামে পরিচিত, তাহা এককালে বীরভূমের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অজয় তীরবর্ত্তী আরং এবং বড়জোড় কোলিয়ারি ভিন্ন আর কয়লার খনি নাই। রসা গ্রামে কয়লার খনির কার্য্য সম্প্রতি আরব্ধ হইয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবে বীরভূমের অন্তর্গত অজয় নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রায় সর্ব্বত্রই কয়লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্থানসমূহে এখনও বিশেষভাবে কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অজয় তীরবর্ত্তী আরং কোলিয়ারির খাদ। তাহা একজন মুসলমান ইজারাদার কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই খনি হইতে অতি অল্পপরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয়। এখানকার কয়লা তেমন উৎকৃষ্ট নহে। বড়জোড় কোলিয়ারি নূতন হইলেও ইহা হইতে মন্দ কয়লা পাওয়া যায় না।

৩—প্রস্তর

বীরভূমের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ আকারের বেলে পাথর পরিদৃষ্ট হয়। দুবরাজপুরের সুবৃহৎ প্রস্তর বিদেশীয়-গণের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রায় তিন-চার শত বিঘা পরিমাণ ডাঙ্গার মধ্যে জঙ্গলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় শত শত প্রস্তর স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক-একটি প্রস্তরের বেড় শতাধিক হস্ত; উচ্চতাও প্রায় তদ্রূপ। প্রকৃতির এই লীলা দেখিয়া কেহ বিস্মিত না হইয়া পারে না।

বড়রা অঞ্চলের প্রস্তর হইতে নবনির্ম্মিত কান্তাপরিহার-পুর রেলওয়ের জল-নিকাসের যাবতীয় পুল প্রস্তুত হইয়াছে।

রামপুরহাট মহকুমার মধ্যে রাজগাঁ ষ্টেশনের নিকট মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রস্তরের কারবারের কথা বহুজনবিদিত।

৪—গন্ধক

বীরভূম হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে বক্রেশ্বর নামক পীঠস্থান। এইস্থানে অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এইগুলি দর্শনীয় বস্তু। এই প্রস্রবণগুলি স্বতন্ত্রভাবে কুণ্ডাকারে পরিবেষ্টিত। এই কুণ্ডসমূহের জলের উত্তাপ ১৬২ ডিগ্রি (ফারেণ হিট্) পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণপ্রস্রবণের উত্তাপ ১২৮ ডিগ্রির ন্যূন নহে। মন্দির-সংলগ্ন শ্বেতগঙ্গা নামক সুবৃহৎ কুণ্ডের জল অর্দ্ধাংশ শীতল ও অর্দ্ধাংশ উষ্ণ। এই উষ্ণপ্রস্রবণ-সমূহের জলের গন্ধ তীব্র গন্ধকের ন্যায়। এইজন্য অনেকেই অনুমান করেন, এই প্রস্রবণের নীচে নিশ্চয়ই গন্ধক জাতীয় কোন ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয় নাই।

৫—খড়িমাটি

মহম্মদ বাজারের সন্নিকট খড়ে, সিউড়ীর নিকট সিঙ্গুর, খয়রাসোল থানার অন্তর্গত বড়রা গ্রামে প্রচুর পরিমাণে খড়িমাটি পাওয়া যায়। এই-সমস্ত খড়িমাটি মৃণ্ময় গৃহের প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বারা প্রলিপ্ত গৃহগুলি চূণকাম করা ঘরের মত হয়। সিঙ্গুরের মাটিতে অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত আছে। খড়ের খড়িমাটি গাড়ীপ্রতি দুই আনা হিসাবে এবং সিঙ্গুরের খড়িমাটি ছোট ছোট গোলাকারে দুই-তিন পয়সা পণ (৮০টি) হিসাবে বিক্রয় হয়। বড়রার খড়ি প্রস্তরের ন্যায় শক্ত। তাহা কাঠখড়ি নামে অভিহিত হয়। ব্যবহার কালে ইহাকে ঘষিয়া বা পিষিয়া লইতে হয়। বালকগণ ইহা পেনসিলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

খাদ্য-সংরক্ষণ ও তাহার প্রণালী

শ্রী নির্ম্মলানন্দ পালিত

উদ্ভিদ বা পশুজগৎ থেকে উৎপন্ন যা-কিছু আমরা আহার্য্যরূপে ব্যবহার করি, তা প্রধানতঃ সবই আঙ্গারিক ; তাদের রাসায়নিক গঠন-প্রণালী এমন বিচিত্র ও অদ্ভুত যে, ঘরে সঞ্চয় করে রাখবার জো নেই, দু'একদিনের মধ্যেই পচ্‌তে আরম্ভ হয় ; তা ছাড়া সেগুলি বারমাস সমান ভাবে পাওয়া যায় না, অথচ এক ঋতুর অপর্য্যাপ্ত উৎপত্তি অন্য ঋতুর অভাব মোচনের জন্যে সঞ্চয় করা বিশেষ দরকার। সেইজন্য আদিকাল থেকে খাদ্য-সংরক্ষণ করবার প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা হয়ে আসছে। আগে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল কম ; যেমন আজকাল এদেশে যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করে থাকে, তাদের লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানা নেই ; পণ্য যখন অত্যধিক, ক্রেতা কম, তখন সস্তায় মাল ছেড়ে দিয়ে সব বেচে ফেলে, অবিকৃত অবস্থায় জমিয়ে রাখবার পন্থা তারা জানেও না বা জমাবার প্রয়োজনও বোঝে না, সেইরকম পাশ্চাত্য দেশেও আগে এই ব্যবসা নীরেট মূর্খদের হাতেই ছিল। কিন্তু পরে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন তারা এক একটা ঋতুর অভাব বুঝতে পারল, তখন সঞ্চয়ের জন্য নানারকম চেষ্টা করতে লাগল। বিজ্ঞানের আদরও তখন খুব বেড়ে গেছে ; কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও অল্পবিস্তর বিজ্ঞানচর্চ্চা চলছে এবং জ্ঞানবিস্তারের সুবন্দোবস্ত হয়েছে ; কাজেই তাদের চেষ্টা ক্রমেই উন্নতি লাভ করে আজ অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অতি সাধারণ খাদ্যসামগ্রী আজকাল বারমাসই কিছু কিছু পাওয়া যায়, এমন কি স্বল্পস্থায়ী বাগানের সুস্বাদু ও মুখরোচক ফলগুলি পর্য্যন্ত আমরা এমন অসময়ে আমাদের সুখসম্ভোগ ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারি যে, তখন হয়ত তাদের উৎপাদক গাছগুলি শীতের হাওয়ায় শুকিয়ে উজাড় হয়ে গিয়েছে অথবা বরফের তলায় চাপা পড়ে আছে। বড় বড় পার্ব্বত্য অভিযান বা সমুদ্রযাত্রায় মানুষ

আর খাবারের পরোয়া রাখে না, শুধু নোনা মাছ মাংসের উপর নির্ভর না করে কৌশলে সঞ্চিত যথেষ্ট সুস্বাদু মাংস বা শাকসব্জী খেতে পায় ; যে কোন দুর্গম পথে বা দুস্তর সাগরে এখন মানুষ শহর বা বন্দরের মত খাবার সুখ উপভোগ করে।

কেমন করে খাদ্যদ্রব্য বহুকাল অবিকৃত রাখা যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করতে হলে প্রথমে তাদের অত্যদ্ভুত গঠন-প্রণালী ও পচবার কারণ জানা আবশ্যক। আমাদের সাধারণ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত আহার্য্যই আঙ্গারিক, অর্থাৎ অঙ্গার (কার্ব্বন C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O), কখন কখন নাইট্রোজেন (N) ও কদাচ ফস্‌ফরাস্ (P) ও গন্ধক (S) এই ছয়টি মূল উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত ; কিন্তু সংখ্যায় মাত্র ছ'টি হলেও তাদের রাসায়নিক সংযোগপ্রথা এত বিচিত্র যে, এই ছয়টি থেকে সংখ্যাতীত বিভিন্ন রকমের জিনিষ উৎপন্ন হতে পারে। একটি উদাহরণ দিই—যে চিনি আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি, তা খেতে এত সুমিষ্ট ও দেখতে এমন সুশ্রী সাদা ধবধবে দানাদার হলেও বস্তুতঃ কালো কয়লা ও জল ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা শুনে অনেকেই আশ্চর্য্য হবেন, কিন্তু এটা প্রমাণ করা বেশী শক্ত নয়। একটা লোহার কড়ায় কিছু চিনি উনুনে চড়িয়ে দিয়ে উপরে ঢাকা দিলে একটু পরে দেখা যায় কড়ায় আর চিনির লেশমাত্র নেই, তার পরিবর্ত্তে একটা কালো জিনিষ পড়ে আছে এবং ঢাকাটার ভিতরদিকে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমেছে। কালো জিনিষটা বার করে আগুনে ফেলে দিলেই পুড়ে যায়, সেটা শুধু বিশুদ্ধ কয়লা। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক কতটা কয়লা ও কতটা জলীয় উপাদান মিলে চিনি তৈরী হয়েছে তা আবিষ্কার করেছেন। সেটা লেখবার সঙ্কেত $C_{12}H_{22}O_{11}$ অর্থাৎ বারটি পরমাণু অঙ্গার, বাইশটি হাইড্রোজেন ও এগারটি অক্সিজেনের যৌগিক সংমিশ্রণে সুমিষ্ট চিনির উৎপত্তি। আবার স্বাদহীন আটা, গম, ফেন (starch)-এর পরিচয় $C_{24}H_{40}O_{24}$ অর্থাৎ মোটামুটি চিনির কাছাকাছি, কেবল পরিমাণে একটু তফাৎ। কিন্তু বাহিরের আকার ও গুণে তাদের কত প্রভেদ। সময় সময় এই গঠন-প্রণালী অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে, যেমন ডিমের শাদা অংশটুকু দেখতে জলের মত, কিন্তু তার পরিচয় প্রায় $C_{100}H_{310}N_{50}O_{120}PS_2$ (সঠিক আবিষ্কৃত হয় নাই)। চিনি ও গম শীঘ্র নষ্ট হয় না, কিন্তু ডিম এত সহজে পচে কেন? কতকটা একই উপাদানে এদের উৎপত্তি, ডিমের মধ্যে বেশীর ভাগ শুধু ফস্‌ফরাস্ ও গন্ধক আছে ; এগুলি খনিজ পদার্থ, নষ্ট হয় না, তবে ডিমের পচার কারণ কি? উত্তরে স্বতঃই মনে উদয় হবে চিনি ও গমের সৃষ্টি অতি সরল, তাদের ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ নেই, কিন্তু ডিমের সৃষ্টি অতি জটিল, তাই সেটা পচে। অর্থাৎ পচন এমন একটা গুণ যার দ্বারা অতি জটিল জিনিষ ভেঙ্গে-চুরে কতকগুলি সরল জিনিষে পরিণত হয়। ডিমের কতকটা অঙ্গার ও হাইড্রোজেন অক্সিজেনে মিলে অঙ্গার-দ্রাবকের সৃষ্টি করে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পর মিলে জল হয়, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন মিলে এ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও গন্ধক মিলে সালফ্যুরেটেড হাইড্রোজেন ইত্যাদি সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক মনীষী লিবিগের মতে প্রত্যেক আঙ্গারিক বস্তুর ক্ষয় ও পচন অনিবার্য্য, কিন্তু তিনি "ক্ষয়" ও "পচন" এই দুটো কথাকে আলাদা ধরে দুই রকম ব্যাখ্যা করেছেন। জিনিষ বাইরে খোলা পড়ে থাকলে বাতাসের জলকণা ও অক্সিজেনের সাহায্যে একপ্রকার দহন কার্য্য চলতে থাকে ; জিনিষ বিনষ্ট হয় অথচ উত্তাপের আদৌ সৃষ্টি হয় না ; এইরকম সরল পরিণতিকে লিবিগ ক্ষয়প্রাপ্তি বলেন। পচার অর্থ অন্য ; তিনি লিখেছেন, "যদি এক টুকরো আপেল বা আলু একটা ডিসে ফেলে রাখি তবে দেখতে পাই শীঘ্রই সদ্যকাটা সাদা দিকটা কালো হয়ে আসে ; আলু ও আপেলের মধ্যে জল আছে যার দ্বারা তাদের অণুপরমাণুগুলি সহজ সরল গতিবিধি করতে সমর্থ হয় এবং একটা আর একটার কাছে যাওয়া আসা করতে পারে ; এইটুকু হল বিশেষ দরকার। যে কাটা দিকটা বাতাসের সংস্পর্শে খোলা পড়ে আছে সেখানে অণুগুলির একটা অদল-বদল আরম্ভ হয় ও ফলে তারা কতকগুলি নূতন জিনিষের সৃষ্টি করে। এক ধার থেকে আরম্ভ করে এই অদল-বদল চলতে থাকে, ক্রমে সমস্তটা কাল হয়ে আসে—এই পরিবর্ত্তনের নাম পচন।" লিবিগের মত যাই হোক,

বিজ্ঞানের দিক থেকে পচা অর্থে এখন আমরা বুঝি যে, সমস্ত জিনিষ জলের মধ্যে থেকে একটা রূপান্তর ঘটায়, যেমন চিনি থেকে মদ ও অঙ্গার-দ্রাবক উৎপন্ন হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথমটা বাইরের অক্সিজেনের সংস্পর্শ একটু দরকার,কিন্তু একবার পচন আরম্ভ হলে জলীয় উপাদান ছাড়া আর বিশেষ কিছুর সাহায্য লাগে না। সব সময়ই আগে ক্ষয়, পরে পচন, সেইজন্য প্রথমটা অক্সিজেনের প্রয়োজন। এই অক্সিজেনের সংস্পর্শ যদি কোনরকমে বন্ধ করা যায় তবে ক্ষয় নিবারণ হয়, ক্ষয় না হলে শীঘ্র পচন আরম্ভ হতে পারে না; উপরন্তু যদি জলের সংস্পর্শও রোধ করা যায় তবে পচবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। অতএব আমরা দেখতে পাই খাদ্যসংরক্ষণ-প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য জল ও বাতাসের প্রভাব থেকে উদ্ধার সাধন করা।

কতকগুলি জিনিষকে পচন নিবারকরূপে ব্যবহার করা হয়; সুরাসার ও লবণ জল টেনে নিয়ে গাঁজন (fermentation) নিবারণ করে। সোরা, ভিনিগার, রাঁধবার মশলা ও চিনির ব্যবহারও কতকটা এইরূপ; অনেক সময় বরফের মধ্যে রেখে পচন নিবারণ করা হয়, তাতে জল-ভাগ জমে গেলে অনুপরমাণুগুলির অবাধ গতি স্থগিত হয় ও তাদের রূপান্তর ঘটতে পারে না।

প্রথমে আমরা জীবোৎপাদিত খাদ্যের সংরক্ষণ-প্রণালী আলোচনা করব। সাধারণতঃ যে সব পন্থা অবলম্বন করা হয় তাদের তালিকা,—

১। শুকিয়ে রাখা
২। ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা
৩। নুন ও চিনি মেশান
৪। ধোঁয়া লাগান
৫। ভিনিগার দেওয়া
৬। আংশিক সিদ্ধ করে বাতাস বহির্ভূত করা
৭। পাত্রে আবদ্ধ করা
৮। সুরাসার দেওয়া

শুকিয়ে অবিকৃত রাখার একটি সাধারণ উদাহরণ সিরিশ; গঁদের আটায় বা সিরিশের আটায় শীঘ্র দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু শুক্‌নো গঁদ বা সিরিশ অনেককাল অবিকৃত থাকে। ডিমের সাদা অংশ অর্থাৎ এ্যালবুমেনও এইরকম শুকিয়ে রাখা যায়; খানিকটা ডিমের এ্যালবুমেন একটা প্লেটে করে আগুনের কাছে মৃদু আঁচে রেখে দিলে বার চোদ্দ ঘণ্টা পরে জল মরে' স্বচ্ছ ও হলদে হয়ে আসে, ক্রমে কঠিন ও চকচকে হয়, অবশেষে স্পর্শমাত্র অভ্রকণার মত ছড়িয়ে পড়ে। সাহেবেরা কফি খাবার জন্য এইরকম শুকনো এ্যালবুমেন বোতলে ভরে রাখে। তৈরী কফি দেখ্‌তে বড় ময়লা, তাকে পরিষ্কার করবার জন্যে আগে অর্দ্ধেকটুকু জলে একটুকরো এ্যালবুমেন সিদ্ধ করে নিয়ে পরে বাকী অর্দ্ধেক জল ও কফি মিশিয়ে দিতে হয়, তাহলে দুএক মিনিটের মধ্যে ময়লা কেটে সুন্দর কাচের মত স্বচ্ছ পানীয় প্রস্তুত হয়।

সিরিশ ও এ্যালবুমেন হচ্ছে মাংসের দুটি প্রধান উপকরণ; মাংসের তৃতীয় বস্তু আঁশ বা তন্তুও সহজে শুকোনো যায়। শুকনো সিরিশ গরম জলে গলে যায়, কিন্তু উত্তাপ দিয়ে জমান এ্যালবুমেন জলে নরম হয় না, তবে ১৪০° ডিগ্রির তলে রেখে না জমিয়ে যদি শুধু শুকিয়ে রাখা যায়, তাহলে ঠাণ্ডা জলেও গলান যায় ও তার সমস্ত সদ্‌গুণ অব্যাহত থাকে। সেইজন্য মাংস শুকিয়ে রাখতে হলে বেশী উত্তাপ দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা হরিণ, ষাঁড় ও মোষের মাংস শুকিয়ে একরকম পিঠে তৈরী করে; ক্যাপ্টেন ব্যাকের মাসিকপত্রে এইরূপ একটি প্রণালী দেওয়া আছে, "বড় একটুকরো মাংস বেশী দিন থাকে না, কারণ তার ভেতরটা শুকোয় না ও সেইখানে পচ ধরে, কিন্তু পাতলা করে কাট্‌লে জল শুকোনো সহজ হয়। সাধারণতঃ একটা বড় জন্তুর পেছন থেকে থোলো থোলো মাংস সরু ফালির মতন চিরে রোদে বা মৃদু আঁচে শুকিয়ে গুঁড়ো করা হয়। তারপর এক সের গুঁড়োয় আধ সের চর্ব্বি গলিয়ে মেখে সেই জন্তুর চামড়ায় তৈরী থলের মধ্যে গেদে চালান দেওয়া হয়। একটা ষাঁড় থেকে এইরকম এক থলে অর্থাৎ এক মণের কিছু বেশী মাংস পাওয়া যায়। সমুদ্রযাত্রীরা এই মাংস খুব পছন্দ করে, জল মরে সার-টুকু থাকে বলে এক সের মাংস একটা লোকের সমস্ত দিনের খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট। কাঁচা বা একটু জলে সিদ্ধ করে নিয়ে খেতে হয়। কখন কখন নাবিকেরা কিছু

ময়দা বা যবের ছাতু মিশিয়ে সুস্বাদু করে নেয়। যারা বেশী সৌখীন তারা হাড়ের মজ্জা, কিসমিস্, মনাক্কা ও শুকনো ছোট ছোট ফল মিশিয়ে লোভনীয় পদার্থ করে তোলে। সৈনিক ও সমুদ্রযাত্রীরা সঙ্গে এক কাপ চা পেলেই যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করে, জলখাবার, মধ্যাহ্ন ভোজন ও রাত্রের জন্য তারা আর কিছু চায় না। এই রকম মাংস দু'চার বৎসর বেশ সুন্দর থাকে, কেনেডার সমুদ্রযাত্রীরা এবং হাড্‌সন্‌স্ বে কোম্পানীর স্কচেদের মধ্যে এই মাংসের বহুল প্রচার আছে।"

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ-আমেরিকায় গরুর মাংস পাতলা করে কেটে সমুদ্রের নোনা জলে ডুবিয়ে রোদে শুকিয়ে রেখে দেয়। সুদূরের পথিক বা সমুদ্রযাত্রীরা এই মাংস হামানদিস্তায় কুটে কাদার মত করে তাতে কিছু ভুট্টার ছাতু মিশিয়ে চামড়ার থলিতে ঠেসে সঙ্গে নিয়ে যায়; তখন আর রাঁধবার দরকার হয় না। পাশ্চাত্য দেশে এরকম শুকনো মাংসের যথেষ্ট চলন থাকলেও তাঁরা স্বীকার করেন যে, শুকনো মাংসে তার সুস্বাদ, সুগন্ধ ও পুষ্টিকর রস অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে মাছের পেট চিরে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখার প্রথা আছে।

ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা

ঠাণ্ডায় যে মাংস বহুকাল অবিকৃত থাকে তার একটা অদ্ভুত ও জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছিল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, যখন প্যালাস সমুদ্র ভ্রমণে বেরিয়ে লীনা নদীর মুখে এসে দেখলেন, সামনে সমুদ্র ঠাণ্ডায় জমে একটা বিরাট সীমাহীন প্রান্তরের মতন পড়ে রয়েছে ও তার তীরে একটা অতিকায় জন্তুর মৃতদেহ বরফের মধ্যে চাপা পড়ে আছে। সময় সময় বাতাস লেগে যেমন একটু একটু বরফ গলে ভেতরের মাংস বেরিয়ে পড়ত আর অমনি আশেপাশের ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘরা ছুটে এসে খাবার নিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিত। কুভিয়েরের মতে এই জন্তু আধুনিক কোন রকম হাতীর সঙ্গে মেলে না, এবং সম্ভবতঃ বহু প্রাচীন পুরাকালের জলপ্লাবনে ভেসে এসে বরফের মধ্যে চাপা পড়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে ছিল। এই অদ্ভুত জীবটির কয়েক গাছি চুলমাত্র এখন রয়্যাল কলেজ অফ্ সার্জ্জন্‌স্-এর মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে।

রাশিয়া, কেনেডা, হাড্‌সন্‌স্ বে ও অন্যান্য প্রদেশে, যেখানে তুষারপাত কতকটা অবিচ্ছেদী, সেখানে এরকম জমান-মাংস বাজারের একটা সাধারণ সামগ্রী বলে পরিগণিত হয়। দেশভ্রমণকারীরা রাশিয়ার জমা মাংসের বাজারগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন, সেখানে কত দূর দেশান্তর থেকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ হয়, ঠাণ্ডায় জমে থাকে, কিছুমাত্র নষ্ট হয় না। মিষ্টার কোল্ পিটাস্‌বর্গের বাজার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন; সেখানে সারাটফ থেকে পায়রা, ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে হাঁস ও লিভোনিয়া থেকে মোরগ-মুরগী বিক্রী হতে এসেছিল; আবার যে সমস্ত রাজহাঁস ষ্টেপ্‌স্-এর বিশাল প্রান্তরে উড়ে বেড়ায় ও অদ্ভুত শিকারী অশ্বারোহী কসাকদের নির্ম্মম চাবুকের ঘায়ে প্রাণ দেয়, তারা পর্য্যন্ত বাদ যায়নি। এই সমস্ত পাখীর জীবনীশক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে দেহের উত্তাপ-উৎপাদক শক্তি লুপ্ত হয় ও তৎক্ষণাৎ তুষারপাতে জমে প্রস্তরীভূত হয়। তখন সেগুলি সেই অবস্থাতেই সিন্দুকে বোঝাই হয়ে রাজধানীতে বিক্রীর জন্য চালান হয়ে আসে। সেদেশে তুষারের প্রভাব এত তীব্র ও দ্রুত যে, শিকারের বলিগুলির কিছুমাত্র আকৃতিভেদ ঘটে না। একটি দুগ্ধফেননিভ শশক হয়ত শিকারীর সাড়া পেয়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ঠিক সেই সময় বন্দুকের গুলিতে তার প্রাণ গেল আর অমনি তার সমস্ত দেহ ঠাণ্ডায় জমে নিথর-নিস্পন্দ হল; ভূলুণ্ঠিত হবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পেল না, যখন তাকে বাজারে আনা হল তখনও তার কান খাড়া ও পাগুলি সামনে পিছনে বিস্তৃত আছে, যেন তড়িৎস্পর্শে পলায়ন-তৎপর জীবটির ক্ষণিকের জন্য গতিরোধ হয়েছে মাত্র, জীবনীশক্তি লুপ্ত হয়নি। বাজারে এইরূপ পশুপক্ষীগুলি এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয় যে, তাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়; কোথাও কালো সুতোয় ঝুলানো পাখীগুলি যেন ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে, কোথাও টেবিলে সাজান মুরগী বা খরগোস চার পা তুলে ছুট দিচ্ছে, আবার কোথাও মাঠের উপর একটা বন্য হরিণ নির্ব্বিবাদে

জানু ভেঙ্গে পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে আছে, তখনও তার উন্নত নাসা ও বিশাল শৃঙ্গ সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করছে; যেন প্রত্যেক জীবটি জীবিত, কেবল মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের মোহস্পর্শে একটি বিরাট পশুশালা অচৈতন্য।

বরফে জমান জীবজন্তু কাটবার আগে উত্তাপ লাগিয়ে নরম করবার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার, যদি হঠাৎ গরম করা হয় তবে শীঘ্র পচতে আরম্ভ করে এবং অবিলম্বে রাঁধলেও চিমড়ে ও স্বাদহীন হয়, সেইজন্য সাধারণতঃ এগুলি আগে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা উচিত।

উত্তরাঞ্চলের যে সমস্ত নদী বিলাতের পূর্ব্ব সীমান্তে এসে পড়েছে তার অনেক মাছ লণ্ডনের বাজারে বরফ চাপা হয়ে বিক্রী হতে আসে। আজকাল প্রত্যেক ভাঙ্গন মাছের আড়তে একটা করে বরফ-ঘরে শীতকালে তুষার সঞ্চয় করে রাখা হয়, সেখান থেকে মাছগুলি বৃহদায়তন কাঠের সিন্দুকে বরফগুঁড়োর সঙ্গে ঠাসা হয়ে যখন লণ্ডনের বাজারে বিক্রী হতে আসে, তখন মনে হয় যেন তাদের এইমাত্র জল থেকে তোলা হল। সে মাছ কিন্তু জমান নয়, কেবল ঠাণ্ডা করা। কলিকাতায়ও এইরকম বাইরে থেকে মাছ বরফ দিয়ে চালান হয়ে আসে, কিন্তু তার ব্যবস্থা এত সুন্দর নয়। বিলাতে প্রত্যেক মৎস্য-ব্যবসায়ী বাড়ীতে মাটির উপরে বা মাটির তলে একটি করে বরফের প্রকোষ্ঠ রাখে; কিন্তু মাংস-বিক্রেতার তেমন কোন বন্দোবস্ত নেই; তাদেরও করা উচিত। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর অনেক জায়গায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে একটি করে বরফের সিন্দুক থাকে, পচনশীল খাদ্যাদি রাখবার জন্য সমস্ত গ্রীষ্মকাল তার ব্যবহার হয়; এমন কি সাধারণের সুবিধার জন্য কসাইরা রাস্তায় বড় বড় বরফ-খানা তৈরী করে রাখে, এইজন্যে ইংরেজদের রাজধানীর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় যত মাংসের অপচয় হয়, দক্ষিণ কেরোলিনার অগ্নিবর্ষী উত্তাপেও তদপেক্ষা কম হয়। সেখানে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় বাজারের নিকটবর্ত্তী বরফখানায় মাংস চালান হয়ে আসে এবং সমস্ত রাত ধরে বরফ চাপা দিয়ে সেগুলি প্রায় জমিয়ে ফেলা হয়। পরের দিন প্রত্যূষে যখন মাংস বিক্রী হতে আসে তার পরেও কয়েক ঘণ্টা সেগুলি বেশ ঠাণ্ডা থাকে। বিলাতেও যদি এই পন্থা অবলম্বন করা হত তাহলে প্রভূত জীব-জন্তুর অপচয় নিবারণ হত; এক লণ্ডন শহরেই প্রতি বৎসর দুই হাজার টন মাংস পচে নষ্ট হয়। জমান-মাংসের সুগন্ধ ও স্বাদ অনেক বিকৃত হয় বটে, কিন্তু বরফে ৩২° ডিগ্রি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করা ও জমানর মধ্যে অনেক প্রভেদ।

নুন ও চিনি মাখান

নানারকম নুন দিয়ে অনেক সময় মৎস্য-মাংসাদির পচন নিবারণ করা হয়। সোরার ব্যবহার খুব বেশী, যেহেতু ইহা দামেও সস্তা এবং জলে অধিক পরিমাণে গলে; যে জিনিষ জলে যত গলে, জলটানার ক্ষমতাও তার তত বেশী। সাধারণ নুন বর্ষাকালে বাইরের হাওয়ার জল টেনে গলে থাকে, সেই রকম সোরা মাংসের জলটুকু টেনে নিয়ে গলে যায়, তখন মাংসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে' এ্যালবুমেনকে (যে অংশ সিরিশ ও আঁশ অপেক্ষা সমধিক পচনশীল) রক্ষণ করে। সেইজন্য সোরা আগে আগুনে তাতিয়ে সম্পূর্ণ জলহীন করে নেওয়া ভাল, তাহলে জলটানার ক্ষমতা বাড়ে। বাক্সের মধ্যে থাকে থাকে মাংস ও সোরা ঠেসে ভর্ত্তি করে রাখলে অনেকদিন থাকে, অথবা মাংসের গায়ে ভাল করে সোরা রগ্ড়ে মাখিয়েও রাখা যায়।

মাংস রাখার আর একরকম প্রথা নুনের আরক-জলে আচারের মত করা। তাতে মাংস একেবারে নুনে জরে যায় না এবং তার পুষ্টিকর রসের ক্ষতিও কম হয়, কিন্তু বেশীদিন থাকে না। শুয়োরের মাংস নুন মাখাবার পর শুকিয়ে রাখতে হয়, সেজন্য চাষীরা রান্নাঘরের প্রকাণ্ড চিমনীর পাশে মাংস ঝুলিয়ে রাখে; স্পেন ও পর্ত্তুগালের থাক্তি মেটাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কড্‌মাছ জরিয়ে রাখা হয়, কিন্তু বিলাতে কড্‌মাছের আচারেরই আদর বেশী, নোনা আচারের মত একেবারে সম্পূর্ণ না চিরে কেবল নাড়ীভুঁড়িটুকু বাদ দিয়ে নুনজলে মজিয়ে নেয়। তারপর না শুকিয়েই পিপে বোঝাই করে। সুস্বাদু আচারের জন্য সম্পূর্ণ চিরে শিরদাঁড়া ফেলে দিয়ে সমভাগ নুন ও চিনিতে দু'তিনদিন মাছ রেখে দেওয়া হয়; তারপর জোড়ায় জোড়ায় বেঁধে সমুদ্রের ধারে

বাঁশের উপর ঝুলিয়ে শুকিয়ে রাখে। কলিকাতায়ও কিছু কিছু নোনা মাছের চলন আছে, পাতলা চাকা চাকা করে কেটে হাঁড়ির মধ্যে নুন ও একটু নিশাদল মিশিয়ে রাখে।

নুনের মত চিনিরও জল শোষণ করে পচন নিবারণ করার ক্ষমতা আছে। গুড়ের মধ্যে চুবিয়ে রাখলে মাংস কয়েক মাস টাটকা থাকে; মাছ চিরে চিনি মিশিয়ে দু'তিনদিন রেখে বাতাসে উল্টে পাল্টে শুকিয়ে রাখলে শীঘ্র পচে না; তিন চার সের একটা ভাঙ্গন মাছের জন্য বড় এক চামচ বাদামী চিনিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়, একটু শক্ত করে রাখতে হলে একটু সোরাও যোগ করে দিতে হয়।

ধোঁয়ায় শুকিয়ে রাখা

ধোঁয়ায় শুকিয়ে রাখার উপকারিতা শুধু আগুনের উত্তাপের জন্য নয়, কাঠ পোড়ালেই তার সঙ্গে যে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাদের গুণ অসাধারণ। কাঠ বা কয়লা পোড়ালে যে আলকাতরা পাওয়া যায়, সেটা বস্তুতঃ মানুষের শত-সহস্র অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর খনিবিশেষ। কয়লার আলকাতরায় কাপড় রঙাবার জন্যে হরেক রকমের নয়নরঞ্জন রং, রোগীর উৎকট ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে নানাবিধ ঔষধ, ধনীর বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার তরলসার ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সৌখীন ও প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপত্তি। কাঠের ধোঁয়ার সঙ্গে দুটি অসাধারণ রোগ-বীজাণুনাশক তরল পদার্থের বাষ্প প্রভূত পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, তাদের নাম 'পাইরোলীগ্‌নীয়াস্' এসিড ও 'ক্রীয়জোট'। প্রথমটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ভিনিগার, ঘরে ঘরে আচার ও মোরব্বার জন্যে ত যথেষ্টই ব্যবহার হয়, অতএব এর পচন-নিবারক শক্তি আমাদের অজানা নেই।

ক্রীয়জোটের বিশেষ ব্যবহার বড় বড় বৃক্ষকাণ্ড উইয়ের সর্ব্বনাশী গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যে। ক্রীয়জোট মাখিয়ে না রাখলে ক্যালিফোর্ণিয়ার কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রার অতিকায় রেডউড্ বর্ষাকালের সজল হাওয়ার আনুকূল্যে উইয়ের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যেত। ক্রীয়জোটের আর একটা মস্ত গুণ এ্যালবুমেন জমায়। কয়লার চেয়ে কাঠের ধোঁয়ায় বেশী ক্রীয়জোট থাকে অতএব কাঠই বেশী ব্যবহার হয়; খুব ধীরে ধীরে ধোঁয়া লাগালে ভিনিগার ও ক্রীয়জোট মাংসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে পারে। য়ুরোপে ১২ ফুট লম্বা ১২ ফুট চওড়া ও ৭ ফুট উচ্চ একটি কুঠুরী তৈরী করে তার উপরে লোহার কড়ি পেতে আস্ত মাংস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ছাতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে ও নীচে পাঁচছয় ইঞ্চি মোটা করে য়ুনীপার, রোজমেরী, পিপারমিণ্ট প্রভৃতি সুগন্ধি কাঠের গুঁড়ো বিছিয়ে দেয়। করাতের গুঁড়োয় আগুন হয় কম, কিন্তু ধোঁয়া উদ্গার করে বেশী এবং সুগন্ধি কাঠ হলে মাংসে একটা সুঘ্রাণ লেগে থাকে।

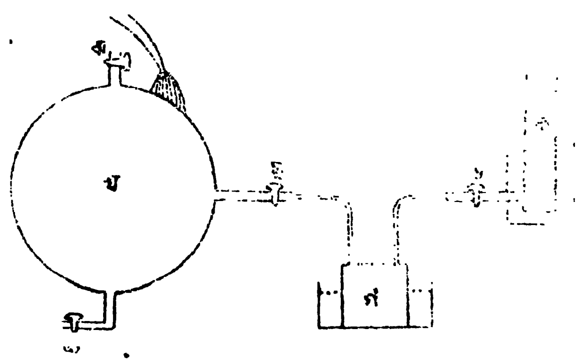
আংশিক সিদ্ধ করে বাতাস বহির্ভূত করা

১৮১০ খৃষ্টাব্দে মসিয় এপার্ট আবিষ্কার করেন যে, খাদ্যদ্রব্য অল্পপরিমাণে সিদ্ধ করে মাটির পাত্রে মুখ এঁটে বাতাসের অসংস্পর্শে রাখলে শীঘ্র পচে না; এই অভিনব প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য ফরাসী সরকার তাঁকে ১২০০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার প্রদান করেন। শাকসব্জী, ফলমূল ইত্যাদি একটা হাঁড়িতে রেখে ফাঁকে ফাঁকে বালি বা হাওয়া বার করে দেবার জন্য যে-কোন অসংলগ্ন পদার্থ ভরে দিলে বহুকাল টাটকা থাকে। কাঠের গুঁড়ো ঠাসা আঙুর স্পেন ও পর্তুগাল থেকে রপ্তানি হয়ে এসে লণ্ডনের বাজারে টাটকা ব'লে বিক্রী হয়।

মাংস রাখতে হলে আগে একটু গরম করে নেওয়া দরকার; মাংসের মধ্যে এ্যালবুমেনটাই শীঘ্র পচে, কিন্তু উত্তাপ পেলে এ্যালবুমেন কঠিন হয়ে যায়, তখন আর শীঘ্র পচে না, এইজন্যই কাঁচা মাংসের চেয়ে রান্না মাংস সমধিক স্থায়ী; বেশীদিন রাখতে হলে বাতাসের সংস্পর্শও বর্জ্জন করা উচিত, শুধু বাইরের নয়, ভিতরে মাংসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বাতাস আছে তাকেও দূর করতে হবে। অল্প সিদ্ধ করলে উত্তপ্ত বাতাস আয়তনে বিস্তৃত হয়ে বেরিয়ে আসে, সেই অবস্থায় বায়ুশূন্য আধারে মুখ বন্ধ করে রাখলে আর পচ্‌বার কোন ভয় নেই।

মসিয় এপার্টের উক্ত প্রণালী একটু রূপান্তরিত করে মেসার্স ডন্‌কিন্‌ এণ্ড কোং পেটেণ্ট নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রণালীতে মাংস সিদ্ধ করবার সময় যে রস নির্গত হয়, সেটা পৃথক করে জ্বাল দিয়ে ঘন করা হয়; তারপর আংশিক সিদ্ধ মাংস থেকে হাড় কাঁটা ইত্যাদি বাদ দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে কিছু শাকসব্জী, ফলমূল মিশিয়ে টিনের কেনেস্তারায় ভর্ত্তি করে সেই ঘনীভূত রস ঢেলে দেওয়া হয়। উপরের ঢাকনায় একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র রেখে সবসুদ্ধ কেনেস্তারা ফুটন্ত লবণাক্ত জলে বসালে ভিতরের রস ফুটতে থাকে এবং নির্গত বাষ্পের দ্বারা সমস্ত বাতাস বিতাড়িত হয়; তখন ভিজে কাপড় জড়িয়ে মুহূর্ত্তের জন্য বাষ্প-নির্গমন বন্ধ করে উপরের মুখ ঝেলে দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা হলে বাতাসের চাপে কেনেস্তারার চারিধার ভিতরের দিকে তুবড়ে আসে। ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় এইসব কেনেস্তারা একটা পরীক্ষা-গৃহে কিছুদিনের জন্য আবদ্ধ থাকে। কৃত্রিম উপায়ে ঘরটি ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত রাখা হয়; যদি কোন কেনেস্তারার ভিতরে বিন্দুমাত্রও বাতাসের অক্সিজেন থাকে তবে মাংস পচতে আরম্ভ করে ও প্রভূত বায়বীয় দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাদের চাপে সেই কেনেস্তারাটি অচিরে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। যে কেনেস্তারাগুলি টিকে যায় তার মাংস কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বেশ অবিকৃত থাকে। এইরূপে একদেশের সুস্বাদু সরস খাদ্য দূর দেশান্তরের উষ্ণ আবহাওয়ায় বহু দিন বহু মাস, এমন কি বহু বৎসর পরেও ভোগ করা যায়। ক্যাপ্টেন র‍্যাশ্‌ ভারতবর্ষে আসবার সময় যে এক বোঝা মাংস এনেছিলেন তার একটি টিনও নষ্ট হয়নি এবং উষ্ণ প্রদেশসমূহে ৩৫০০০ মাইল ঘুরে দুই বৎসর পরে যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখনও সে মাংস পূর্ব্বের মতই টাট্‌কা ছিল। নৌবাহিনীর রসদের জন্য এই মাংসের বহুল প্রচার আছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মসিয় এপার্টের প্রণালীর আর একটু পরিবর্ত্তন করে মিঃ বীভান আবার পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। মাংসের টিন থেকে বায়ু তাড়াবার জন্য একটা বায়ু-নিষ্কাষণ যন্ত্র অথবা বায়ুহীন আধার ও তৎসঙ্গে গলিত সিরিশে পূর্ণ একটি পাত্র এমনভাবে সংলগ্ন করা হয় যে, বাতাস যেমন নির্গত হয় সঙ্গে সঙ্গে সিরিশ ঢুকে তার স্থান অধিকার করে। ডন্‌কিনের প্রণালী অনুসারে কেনেস্তারার ভিতরের ঘন রস ফোটাবার জন্য যে অত্যুগ্র উত্তাপের প্রয়োজন, এ ক্ষেত্রে তার বিন্দুমাত্র আবশ্যক নেই, বরং একেবারে শীতল অবস্থায় এবং বাতাসের সংস্পর্শের সম্পূর্ণ বাহিরে মাংস সুসিদ্ধ হয়। তাঁদের ব্যবহৃত যন্ত্রের আংশিক প্রতিলিপি দেওয়া হল।



ক একটি সুউচ্চ বর্ত্তুলাকার পাত্র গরম জলে বসান, ঘ পর্য্যন্ত গলিত সিরিশে পূর্ণ; নীচে নল লাগান আছে, চ নলের ছিপি, ভিতরে লম্বা ছিদ্র আছে; যখন ছিদ্রের মুখ নলের মুখের সামনে থাকে তখন পাত্র থেকে সিরিশ গ পাত্রে নেমে আসতে পারে; একটু ঘুরিয়ে দিলে ছিপির ছিদ্র নলের মুখ থেকে সরে যায়, সিরিশ আর নামতে পারে না।

খ একটি বৃহৎ ধাতব গোলক; নীচের নল দিয়ে জলের বাষ্প ভিতরে প্রবেশ করে' উপরের নল দিয়ে নির্গত হয়। কিছুক্ষণ পরে বাষ্পের সঙ্গে ভিতরের বাতাসও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়, তখন জ ও ঝ ছিপি বন্ধ করে উপর থেকে ঠাণ্ডা জলের ধারা ঢেলে দিলে অবিলম্বে বাষ্প জমে আয়তনে সঙ্কুচিত হয়ে কয়েক বিন্দু জলকণামাত্রে পরিণত হয়।

গ একটি টিনের পাত্র, ভিতরে মাংস বা যে কোন খাদ্য সঞ্চয় করার আবশ্যক তাই ভর্ত্তি করে টিনের ঢাকনি ঝেলে দেওয়া হয়। ঢাকনিতে দুটি সরু সীসার নল

চ ও ছ ছিপির সঙ্গে সংলগ্ন। মাংসের পাত্র গরম জলে ডুবিয়ে ১২০° পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। ছ ছিপি খুললে মাংসের পাত্র থেকে হাওয়া বেগে শূন্য গোলকের দিকে ধাবিত হয়, তখন বায়ুমণ্ডলের চাপ আর না থাকায় এই সামান্য উত্তাপেই মাংস সুসিদ্ধ হয় ও ভিতরের বাতাস নিষ্কাশিত হয়। একটা মুর্গী রাঁধতে ১৫ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অতঃপর চ ছিপি খুলে ক পাত্র থেকে গলা-সিরিশ নামিয়ে মাংসের পাত্র পূর্ণ করে সীসার নল দুটিকে ঢাকনার ঠিক ওপর থেকে আগুনের সাহায্যে গালিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সুসিদ্ধ মাংসের সঙ্গে ময়দা মেখে একরকম বিস্কুট তৈরী হয়, এই খাবারের আজকাল সুধীসমাজে ভয়ানক আদর, যেহেতু এতে পুষ্টিকর উপাদানের ভাগ অত্যন্ত বেশী; একজন পরিশ্রমী লোকের পক্ষে আধপোয়া বিস্কুট সমস্ত দিনের খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। বিস্কুটগুলি খুব হাল্কা, বহুকাল থাকে এবং অতি সহজে রপ্তানি হতে পারে বলে সেনাদল, নৌবাহিনী ও সমুদ্রযাত্রী অভিযানের রসদের পক্ষে খুব উপযুক্ত। যে-সব দেশে ছাগল ভেড়া প্রচুর, হয়ত শুধু চর্ম্মব্যবসায়ীর চামড়ার জন্য বা কৃষকের জমির সারের নিমিত্ত হাড়ের জন্য অবাধে হত্যা করা হয়, সেখানে এইরূপ বিস্কুট প্রস্তুত করার যথেষ্ট অর্থকরী উপকারিতা আছে। আমাদের কাছে এইসব জীবজন্তু এত মহামূল্য হলেও জগতে এমনও স্থান আছে যেখানে শত শত ছাগ মেষ জলে ডুবিয়ে মারা হয়, শুধু তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে; এতবড় অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করবার জন্যে একখণ্ড মাংস বা একটুকরো হাড়ও মানুষের কাজে লাগান হয় না।

ত্রিপুরা জেলার পল্লী-সঙ্গীত

শ্রী সারদাচরণ রায়

ইংরেজীতে যে-সকল গানকে 'প্যাষ্টোরাল সঙ্স্' (Pastoral songs) আখ্যা দেওয়া হয়, এ দেশেও যে তাহার অস্তিত্ব আছে, তা একাধিক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। অল্পদিন হল ময়মনসিংহ-গীতি আবিষ্কারে বঙ্গসাহিত্যের যে সম্পদ বৃদ্ধি হল, বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের তা অবিদিত নেই। মাসিকে মাঝে মাঝে 'পল্লীগান-সংগ্রহ' অনেক দিন থেকে বাহির হচ্ছে এবং ইহাদের পাঠক ও প্রশংসকের অভাব নেই।

গ্রে'র কথায় 'Mute inglorious Milton' কম-বেশী সকল গ্রামেই ছিল। তাঁদের রচিত গান আজও গ্রামের বাটে মাঠে গ্রামবাসীরা গেয়ে আত্মহারা হচ্ছে—মেয়েরাও ব্রতপূজায় গাইতে ছাড়ে না। ত্রিপুরা জেলায় অসংখ্য গান প্রচলিত। এগুলোকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—'প্রেম-সঙ্গীত ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত'। ইহাদের রচয়িতাদের নাম ও পরিচয় পাওয়া শক্ত, কারণ কতকাল ধরে যে এ সকল গান গাওয়া হচ্ছে তা ঠিক করে বলা সহজ নয়। ইহাদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে হলে গ্রামের দাদামশায়দের অর্দ্ধবিস্মৃত কথার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। অবশ্য কবির জীবনী তার কাব্য-উপলব্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ সহায়ক (তার জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী তার লেখায় অল্পবিস্তর ছায়াপাত না করে পারে না)। তাহলেও আমাদের খুব ক্ষতির কারণ নেই, যেহেতু সকল গ্রাম্য কবিদের কাব্য-জীবন ক্রমোন্নতি-পরিচায়ক কোনরূপ অবস্থা-পরম্পরার ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়নি (যাকে gradual development বলা হয়)। রস-সৃষ্টিই কেবল তাদের জীবনের একমাত্র কর্ম্ম ছিল না। সংসারে সহস্র কর্ম্মের ভিতর হতে কিছু সময় চুরি করে, তাদের কাব্য-চর্চ্চা হতো।

'প্রেমই' কাব্যের প্রাণ। যাবতীয় সাহিত্যের মুখ্য বিষয়ই প্রেম; প্রেম ইহাদের সৌষ্ঠব। ইহার সম্পর্কে অনেক কথাই সমালোচনা হিসাবে উঠতে পারে, কিন্তু সে আলোচনা এস্থলে প্রাসঙ্গিক হবে না। আলোচ্য প্রেমসঙ্গীতগুলির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রেমের সকল প্রকার উচ্ছ্বাসই 'রাধা কৃষ্ণের' প্রেমের রূপ ধরে অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির কথা মোটেই নেই, তা বলা চলে না, তবে কবির ব্যক্তিত্ব নায়ক-নায়িকার মধ্যে যতদূর সম্ভব ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গানগুলি অধিকাংশই খুব টানা ভাটিয়াল সুরে গাওয়া হয়। সুতরাং ঘোর কাজের বন্যার মধ্যেও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে ইচ্ছে করে। এ গান যাঁদের কোনদিন শোনবার সৌভাগ্য হয়নি, গানের চেহারা দেখে এসকলের চমৎকারিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করবেন না। শুধু অশিক্ষিতেরাই নয়, অনেক আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিই গানগুলির মাধুর্য্য স্বীকার করেছেন। প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে নিম্নলিখিতটি আমাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে হয়:—

"তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী অ প্রাণনাথ
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী,
বাঁশী দেও দেও, নইলে মোরে সঙ্গে নেও:
নইলে কর নিজ দাসী।
অ প্রাণনাথ
তোমার বাঁশীর টানে, ভাইটাল নদী, উজান চলে,
আমি নারী হয়ে কেমনে গৃহে রই। অ প্রাণনাথ
শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইতে রাধার কাছে বিদায় নিতে
আমি নারী হয়ে বিদায় দেই কেমনে। অ প্রাণনাথ।"

কি তীব্র উচ্ছ্বাস এই গানটিতে, যেন নায়িকার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা গানের রূপ ধরে বাহির হয়ে আসছে। কৃষ্ণের বাঁশীর উন্মাদনায় রাধিকা উন্মাদিনী। বাঁশী এবং কৃষ্ণ নায়িকার কাছে অবিচ্ছিন্ন। প্রেমাস্পদকে যে বাঁশীর সুরে নায়িকা অনুভব করছে, বাঁশীর স্বর-লহরীর অপরূপত্ব বাঞ্ছিতকে মণ্ডিত করেছে তাই বিদায়ক্ষণে নায়িকা তার কাছে সেই বংশীই যাজ্ঞা করলে। একটা আকুলতা অন্তরের অন্তস্তলে এসে পৌছয়। এই পাগল-করা বাঁশীর আর একটি গান:—

"শ্যামের বাঁশীরে, ঘরের বাহির করলে আমারে
যে যন্ত্রণা বনে যাওয়া, গৃহে থাকা না লয় মনে।
ঘরের বাহির করলে আমারে।
যথায় তথায় যাওরে বাঁশী, সঙ্গে নিয়ে আমারে
পায়ে ধরি বিনয় করি, লাঞ্ছনা দিও না মোরে
ঘরের বাহির করলে আমারে।
ভেবে রাধারমণ বলে শুনগো ললিতে, পাইতাম যদি,
শ্যামের বাঁশী, ভাসাইতাম যমুনার জলে।
ঘরের বাহির করলে আমারে।
যে দুঃখ দিয়াছ বাঁশী, আমার অন্তরে, এমন বান্ধব নাই যেগো
দেখাব কারে;—মনে রইল দেখাব মইলে
ঘরের বাহির করলে আমারে।"

এখানে রচয়িতার অদ্ভুত ভাববিলাস দেখতে পাই। বাঁশীর সুরে পাগলিনী নায়িকার অদম্য আবেগ, অসহনীয় চাঞ্চল্য! বাঁশী শুনে নায়িকা পাগল,—তার চাইতে আরও বেশী পাগল বাঁশীর অধিকারীকে না দেখে।

মিলন-বিরহের মাঝামাঝি ভাব নিয়ে অনেক গান রচিত, নিছক মিলনে বৈচিত্র্য নেই, একান্ত বিরহও দুঃসহ। একাধারে মিলন-বিরহ সঙ্গীতের যে একটা মায়া আছে, তা কোনদিক দিয়েই একঘেয়ে নয়। যেমন,—

"নিবেদন করিরে বন্ধু, নিবেদন রাখ, অধীনী দাসীর নামটি
চরণেতে লিখরে। চরণেতে লিখতে যদি, আঁচড়িয়া যায়,
ধুলাতে লিখিয়া নাম, চরণ রাইখো তায়।
আমি যে তোমার বন্ধু, তোমারে তোষিতে দেখ কি সাধ্য আমার,
যখন বসিবে বন্ধু রমণীগণ সনে, চরণ পানে চাইতে
তোমার দাসীরে পড়বে মনে। যেই ধন দিক্ বন্ধু, সেই ধন
তুমি, তোমারে তোমায় দিয়া, দাসী হব আমি। দ্বিজ
চাঁদনবীনে বলে, শুন গুণমণি, অন্তিমে পাই যেন
চরণ দুখানি।"

'পায়ে ধরে মিনতি,' ইহাতে মনোহারিত্ব কিছু নেই। কিন্তু 'ধুলাতে লিখিয়া নাম, চরণ রাইখ তায়'—ইহার অভিনবত্বে প্রশ্ন করা চলে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও এই প্রকার বিনয়াতিশয্য দেখতে পাই—

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না
পথের শুকনো ধুলো যত,
কে জানিত আসবে তুমি গো
অমন অনাহূতের মত?"

অনেক খোঁজ করে চাঁদনবীনের জীবনের যতটুকু জানা যায়, তাহা এই। ত্রিপুরা জেলার বায়েক নামক গ্রামে চাঁদনবীন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাকীর্ত্তন করে বেড়ানোই তাঁর ব্যবসা ছিল। সংসারের কাজকর্ম্মের দিকে তাঁর কোনদিনই নজর

ছিল না, তখনও বাঙলার বুকে সহস্র অভাব-অনটন, ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হয়নি। কাজেই তাঁর কাব্যপ্রতিভা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। এই এক কবিরই রচনা—

"কালার নাম শুইনারে আমি হইলাম উদাসী।
আশমান কালা, জমীন কালা, আরও কালা পানি
দেহের মধ্যে আছেন কালা, কাল নীলমণিরে।
কেবা না পীরিতি করে, কার বা না এত জ্বালা!
কালার সনে কইরা যেন হলো দ্বিগুণ জ্বালারে।
আপন কর্ম্মদোষে খেয়াঘাটে গেলাম, পার হইবার আশে,
আছে তরী, না আছে কাণ্ডারী, তরী আপনি ভাসেরে
কালার নাম শুইনারে, আমি হইলাম উদাসী।"

তেমনি আবেগপূর্ণ আর একটি গান,—

"মোদের প্রাণকৃষ্ণনি দেখতে পাই,
চল্‌গো মোরা জল আনিতে যাই। জলের স্থলে দেখ্‌ব কৃষ্ণ,
বিলম্বেতে কার্য্য নাই, কদম্বেরি মূলেতে বাঁশী রাধা বলে, প্রাণবল্লভে
বাজায় বাঁশী। যদি অন্য কাজে মগ্ন থাকি, তবু বংশীর ধ্বনি শুনতে
পাই। পর সবে নীলাম্বরী শাড়ী, কাঁচনটি বাজু আইটে
কাঙ্কে লও ঝারি, চরণে নূপুর বরণ, যেমন রুমুঝুমু গো শুনতে
পাই। মোদের প্রাণকৃষ্ণনি দেখতে পাই,
চললো মোরা জল আনিতে যাই।"

বিরহ সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত করুণ; চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলে।—

"অ তারে ভুলায়ে রাখিল কোন রমণী, প্রাণসজনী
এল না শ্যাম গুণমণি।
আসবে বলে রসরাজ, নিকুঞ্জ করেছি সাজ, কত লাজ
পাইলাম গো সজনী। আমি কৃষ্ণছাড়া রই কেমনে
প্রাণে কি আর ধৈরজমানে! এখন বৃন্দাবনে হইলাম
কলঙ্কিনী। এ জীবনে নাহি কাজ, মরণে কইরেছি
সাধ, বিসর্জ্জন দেওগো এখনে। অধীন হরচন্দ্র
বলে রাই মইলগো শ্যামানলে, এখন কর্ণে শুনি কোকিলার
'কুহু কুহু' ধ্বনি গো প্রাণসজনী,
এলোনা প্রাণসজনী,
সে যে শ্যাম গুণমণি।"

গানটির রচয়িতা হরচন্দ্র দে। সে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে চাকরী করতো। গৃহস্থালীর সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে তার গান গাইবার ও গাঁজা পুড়াইবার সময় ছিল। লেখাগুলো তার প্রভুর খাতা হতে পাওয়া গেছে। সে বড়-একটা লেখাপড়া জানতো না। রসজ্ঞ মনিব যত্ন করে গানগুলি লিখে নিতেন। শুনা যায় তার পত্নীর একটা কলঙ্ক ছিল। কলঙ্ক আবিষ্কারের পর থেকেই তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘট্‌লো, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার বাড়ী 'মুচাগাড়া', ত্রিপুরা জেলার একটি গণ্ডগ্রাম। তাহার গানের সৌন্দর্য্য বিশেষ করে এই গানটিতে ফুটে উঠেছে।—

"কোকিল ডাইকনারে দুঃখিনীর কাছে, আর কি কৃষ্ণ ব্রজে আছে।
বৃন্দাবনের পশুপক্ষী ডালে বসে ডাকতাছে * রজ মালতীর
সুখের পুষ্প গাছের মধ্যে মলিয়া রইছে। আর কি
কৃষ্ণ ব্রজে আছে। বৃন্দাবনের তরুলতা শুকাইয়া
রইছে। ময়ূর ময়ূরী সব নৃত্য ছেড়ে নীরব আছে। মথুরাতে
গেলে কৃষ্ণ, কুব্জারাণী ভুলাইয়াছে। কুব্জারাণী আহ্লাদিনী,
আহ্লাদে আহ্লাদে রাখ্‌ছে।
আর কি কৃষ্ণ ব্রজে আছে।"

রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে লিখিত হলেও গানগুলোতে যে মানবীয় প্রেমের আধিক্য আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান নিতে গেলে বিফল হবারই সম্ভাবনা। প্রণয়ীকে অন্যাসক্ত দেখলে, প্রেমিকার ব্যথার সীমা থাকে না, ইহাই চিরন্তন; তাই কবি লিখেছেন "মথুরাতে গেলে কৃষ্ণ, কুব্জারাণী ভুলাইয়াছে।" অভিমানিনী রাধার মনের কথা নীচের গানটিতে পরিস্ফুট।

"মানকইরে কমলিনী, আছে মানের ভারে, মনেতে কপট কইরে।†
কালোরূপ আর হেরব না, কালোবদন আনতে যাব না, কালো
নাম আর লব না জন্ম-জন্মান্তরে। রাধে কয় বৃন্দে সইগো,
পীরিত নয়গো ভাল, প্রেমের কি এমনি জ্বালা, প্রেম
কইরে পরের সনে, পরে কি পরের বেদন জানে।
পরের জ্বালাতে হইল সোনার অঙ্গ কালা।
পরের সঙ্গে করব না প্রেম বুইঝেছি এতদিনে। হইতো সই পরের
অধীন, পরের মন জোগাব কয়দিন, পর তো আপন হয় না কোন-
দিন। আইজ আমি মইরে গিয়ে, বিধাতাকে কব, রূপ-যৌবন
ফিরিয়ে দেব। বৃন্দে কয় রাই, আমরা ত এমন করে থাকি,
মইজেছে দুইটি আঁখি। আবার ভাবি মনে মনে,
আপন মান আপনি ত্যজে, প্রাণনাথকে মনে রাখি।"

শেষ পদটি যেন একবার পড়ে তৃপ্তি হয় না। আপন-হারা প্রেমে অভিমানের স্থান নেই। প্রেমিকার অন্তর জুড়ে নায়কের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। তাহারই রূপধ্যানে নায়িকা বিভোরা—তাই (আপন মান আপনি ত্যজে প্রাণনাথকে মনে রাখি)।

আর একটি বিরহের গান—

---

* 'পশুপক্ষী ডালে বসি ডাকতাছে' কথাটা হাস্যজনক হলেও এস্থলে যে মার্জ্জনীয়, তাহা হয়ত না বললেও চলে।

† এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারিনে। ইহা কোন প্রাদেশিক কথা নহে।

"কইও তো
প্রাণবন্ধুর লাগল পাইলে, আরনি হইব দেখা গো, অভাগী রাধা মইলে। তোরা কে কে যাবি মধুপুরে গো সখী অ প্রাণবন্ধুর লাগল পাওতে। রাধিকার দুঃখের কথা গো, আমি লেখিয়া পাঠাই। নিঃসরে কি ধান গো সখী, বিনা বরিষণে,
সম্বাদে কি জুড়ায় প্রাণগো, বিনা দরশনে।"

পূর্ব্বোক্ত গানগুলি সমুদায়ই নায়িকার উচ্ছ্বাস নিয়ে লিখিত। নায়কের উচ্ছ্বাস নিয়ে যে দুই-একটা গান পেয়েছি, আমরা এখন তাহাই উদ্ধৃত করছি।—

এখন হাসিমুখে বিদায় দেওগো রাধা-প্যারী
নিশ গেল, প্রভাত হইল, ডাকছে ডালে শুক-সারি।
আদ্য পোহাইল সুখের নিশি, শুন ওগো প্রাণপ্রেয়সী, ব্রজবাসী
উঠিল জাগিয়া, দেখ্‌লে মোরে কুঞ্জদ্বারে, কলঙ্ক হবে তোমারই।
জাগিয়া কাল-কুটিলা, জান্‌তে পারলে কুঞ্জের খেলা, যন্ত্রণা তোমারই।
কেন হরিষে-বিষাদ ঘটাও রাই, এখন ছেড়ে দাও যাই কুঞ্জদ্বারে।
আমার কেন পড়েছে মনে গো। ধেনু চরাইতে বনে রাখাল সনে
কর্ত্তে খেলা-ধূলা। আমি গোচারণে নিধুবনে বাজাব মোহন
বাঁশরী। মহেন্দ্রের মোহ-নিশা, কেমনে পাই পথের দিশা,
এই ভিক্ষা মাগি শ্রীহরি, অন্তিমকালে এই চরণে, রেখো চরণ বংশীধারী।"

ঠিক self-disclosure বলা না গেলেও গ্রাম্য-কবিদের গানের শেষভাগে আমরা সাধারণতঃ কতকটা তাই দেখতে পাই। ইংরেজি সাহিত্যে ইহার পেছনে একটা ইতিহাস রয়ে গেছে, কিন্তু এখানে আমাদের কোন কারণ জানা নেই। পরন্তু কবির আত্মোক্তিটুকু বাদ দিলেই (যেমন উপরিউক্ত গানটিতে) ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে সুবিধে হয়। অবশ্য একটা প্রশ্ন উঠবে গানগুলি ভক্তিপ্রেম-মিশ্রিত এবং সেইহেতু এগুলিকে 'প্রেম-সঙ্গীত' আখ্যা দেওয়া যথার্থ কি না। সেকথা আমরা উপসংহারে আলোচনা করব।

ধর্ম্ম-সঙ্গীতের (দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক) রচয়িতারা যে দুঃখবাদী ছিলেন, তা একটু লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট দেখা যায়। মানবজন্মের অসারতা প্রায় সকল গানেরই গোড়ার কথা। বৈরাগ্য এবং জীবনের প্রতি ধিক্কার গানে গানেই ধ্বনিত হচ্ছে। যেমন—

কি খেলা খেলতে আসলি আমার মন।
হরিনামের খেলা না খেলিয়ে, তাসপাশাতে দিলি মন।
(অ মনরে অরে মন)
শিশুকালে বাল্যখেলা, অপোগণ্ড কৌতুকখেলা,
যুবাকালে যুবা খেলায় দিলি মন।
অ তোর শমনে জুড়াইয়াছে খেলা চাইয়ে দেখ মনরে ভোলা,
সে খেলায় পাঁকে পইড়ে, হারাইবি জীবন-ধন।
(অ মনরে অরে মন)
খেলিবারে আইসে ছিলি, মায়াতে আটক হইলি,
নামের খেলা পাশরিলি কাল খেলাতে দিলি মন।
অয়ে ছয় ব্যোমবাইট্যায় (১) যুক্তি কইরে,
রঙ্গের গুটি কাঁচা কইরে নেতে চায়।
চৌরাশিকুণ্ডের খেলাতে হারাইলি মন।
(অ মনরে অরে মন)
খেলা খেল পরিপাটি, সার কর হরিনামটি,
অঙ্গে মাইজে ভক্তিমাটি, দেহমাটি কর মন।
অ তোর সাঙ্গ হইল ভবের খেলা, অল্পমাত্র আছে বেলা,
জপ হরিনামের মালা, সময়ে যা কর মন।
(অ মনরে অরে মন)।
গোঁসাই জগদানন্দে বলে, বৈভব কেন রইলে ভুইলে,
নামের খেলা না খেলিয়ে, বিফলে গেল জনম।
অ তোর আশায় আশায় দিন গেল, গণার (২) দিন ফুরাইয়ে গেল,
কালগ্রহণ পতিত হইল, উপায় কি করবি এখন।"

উপরিউক্ত গানটিতে বৈরাগ্যই একমাত্র সম্বল, এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে। এই ভাবের যে কত গান, তার সংখ্যা নেই।

"অবোধ মন তোরে বুঝাব বা কি,
বার বার দিতেছ ফাঁকি,
কি বলিয়ে এইলি ভবে, সেই কথা তোর মনে নাই কি!
মনরে চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ কইরেছ তুমি,
আবার যেতে সাধ আছে নাকি!
রঙ্গরসে দিন বৃথায় যায়, সেই কথা কি তোমার মনে নাই।
মনরে তুই কোটি জনম সাধনাতে,
মানব-জনম পেলে তাতে,
আবার যেতে সাধ আছে না কি!
আত্মঅহঙ্কারে হইলে সুখী
পাতকী ওতোর গুরুর সেবায় না দিলে দেহ,
তোর মতন পাতকী আর কি!
গোঁসাই কৃষ্ণচন্দ্রে বলে,
যা দিয়াছ কর্ণমূলে,
তার তুমি মর্ম্ম নিলা কি!
আছে শ্রীগুরুরূপের ধন, মোহর-মারা,
মুখের কথায় পাওয়া যায় কি!"

জগদানন্দের কোন পরিচয়ই জানা নেই। এই গানটিও তার।

"আগে দালান কোঠায় তালা না লাগাইয়ারে বেহুস মন,
কাঁজলা (৩) কোঠায় রয়েছ বসিয়ে।
মনা ভাই ঐ পথে ডাকাতির ভয়, আগামী-নিগমী (৪) কয়,
তাহা তুমি জাইনাকি জান না।
মহালের মধ্যভাগে, জ্ঞান-বাতি জ্বালাইও আগে,
তস্কর যাবে ভয়েতে পলাইয়ারে বেহুস মন।

(১) ষড় রিপু :—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য
(২) জীবন-আয়ুর শেষ :—
(৩) অন্ধকার মগ্ন কোঠায়
(৪) ভূত ও ভবিষ্যত

মনা ভাই। হনুমান আর বিভীষণ,
তারা করে জাগরণ, নাহি জানে মহিরে কুমন্ত্রণা।
বিভীষণের রূপ ধরি, সাজি আইল দশগিরি,
রাম লক্ষণকে নিয়ে গেল হরিয়ারে মন।"

অন্তর যার জ্ঞানদীপ্ত, পঙ্কিলতা সেখানে স্থান পায় না। ভাবনাসুলভ কুপ্রবৃত্তিও তাহার কাছে হার মেনে যায়। ইহাই উপরিউক্ত গানটির মূলতত্ত্ব। তার আর কোন রচনা পাইনি।

ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী নবীনগরের চৌধুরী জমিদার-বংশ বনিয়াদি ঘর। এ বংশের জমিদার আনন্দ-মোহন রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্রসন্তান ৺মোহিনী-মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত রসজ্ঞ লোক ছিলেন। তাঁহার তিনজন ভৃত্য ছিল—গুণবল্লভ, কুশাই ও গগন। গুণবল্লভ জাতিতে নমঃশূদ্র, কুশাই জাতিতে মাল ও গগন জাতিতে মালী ছিল। তাদের কাজের মধ্যে এই ছিল যে, তাহারা সময়ে অসময়ে দোতারা বাজিয়ে গান গাইতো, যতক্ষণ না বাবুর ঘুম আসতো, ততক্ষণ 'মেঘবরণ চুল, তুলাবরণ রাজকন্যার' রূপকথা শুনাতো ও আরঙ্গি টেনে বাবুর ঘুম আনতো ও ফরমাইস-মত গান গাইতো। কুশাইয়ের রচিত সবগুলো গান না পেলেও একটি গান পেয়েছি। নিম্নলিখিত গানটি কুশাইয়ের রচিত।—

নিবিড় এক রসের ঘরে, রসন্তরে ভুলতে আছে চিন্তামণি।
অষ্টদলে রত্নাসনে, বিরাজ করে পরশমণি।
ছয়দলে বারামখানা, কর ঠিকানা, কাজে ধর রসের খনি।
সে যে মৃণালেতে যোগমায়াতে জোয়ার ভাটা দেয় আপনি,
অমাবস্যা নিশাকালে, ধর্ত্তে পার্লে সে বারুণী।
কর্ণিকার ধারা বহে রসময়ের, সে ধারার নাম লাবিন।
তিনদিনে ঠিকানা কর, কাজে ধর, কেমনে চলে সৌদামিনী।
তারে মূলাধারে, সহস্রাধারে উল্টা কলে উঠাও টানি,
অধীন কুশাই বলে, অবহেলে পাইতে পারো চিন্তামণি।"

উপরউক্ত গানটি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রত্যক্ষতা নিদর্শন করছে। গানগুলির ভাষা ব্যাকরণদুষ্ট হলেও, আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিও ইহাদের মাধুর্য্যে ও সুরতরঙ্গে পুলকিত হয়ে উঠে। ইহাদের ভাষাতে গ্রাম্যতাদোষ থাকলেও এগুলি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিই করে। রামপ্রসাদের গানগুলি বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে, মাঠে মাঠে এমন কি স্ত্রীমহলে ব্রতপূজাদিতেও যা গীত হয়ে থাকে, সেগুলি কি বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেনি? অবশ্য ভাব ও ভাষা সমভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছে এরূপ উচ্চ কবিদের কাব্যই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

শিক্ষিত কেন্দ্রে যেমন উচ্চ কবিদের কাব্যের আদর ও প্রয়োজনীয়তা আছে, অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের মধ্যেও এই পল্লী-সঙ্গীতগুলির যথেষ্ট মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহারা কর্ম্মবহুল পল্লী-জীবনের শান্তিসঞ্জীবনী। পাঠান রাজত্বের শেষভাগে ভারতে যখন সমাজ ও ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটেছিল—যখন দুরূহ কটমটে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব জনসাধারণের হৃদয় অধিকার কর্‌তে পারলে না, তখন দেশে দেশে জনসাধারণের হৃদয়-রঞ্জনকারী ভাব ও ভাষা লয়ে সন্ন্যাসী ও কবিদের আবির্ভাব দরকার হয়েছিল। তখন ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব অতি সহজে দেশে প্রচারিত হয়েছিল। এই পল্লী-সঙ্গীতগুলিও তেমনি পল্লীবাসীদের ধর্ম্মজীবন-গঠনের সহায়ক।

ভাষাসম্পদে হেয় হলেও ভাব ও আধ্যাত্মিকতায় দরিদ্র নয় এই গানগুলি। ইহারা পল্লীবাসীদের আস্তিকতা, প্রেমপ্রীতি, ভাবভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি করে এবং তাদের তৃষিত জীবনে অমৃতবারি সিঞ্চন করে। এমন কি এরূপ গান শুনে পল্লীবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ মহাপ্রাণতা লাভ ও ঈশ্বরতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে সিদ্ধিলাভ করে। এই পল্লী-সঙ্গীতগুলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আভরণ না হলেও, ইহারা যে পল্লীবাসীদের শান্তিরসায়ন ও ধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়ক, এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকতে পারে না।

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাংলা ভাষায় প্রাচীন কাব্যে কয়েকটি ভিন্ন ভাষার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসকে আদি কবি ধরিলে তাঁহার ভাষা অতি নির্ম্মল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ বাংলা হইলেও তাহাতে অনেক মৈথিল ও হিন্দী শব্দ পাওয়া যায়। দুইজন মিথিলাবাসী কবির রচনা—কবিশেখর বিদ্যাপতি ঠাকুর ও কবিরাজ গোবিন্দদাস ঝা—বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইঁহাদের অনুকরণে অনেক বাঙালী কবি এক প্রকার মিশ্র মৈথিল ও বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন।

এই হইল প্রাচীন বাংলা কাব্যের এক স্তর। তাহার পর আর এক স্তরে প্রচুর হিন্দী, উর্দ্দু ও ফার্সী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের রচনায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও স্থানে স্থানে করিয়াছেন।

মৈথিল ও বেহারের চলিত হিন্দী শব্দের অর্থ করা কঠিন। না আছে তাহার ব্যাকরণ, না আছে কোনও মুদ্রিত পুস্তক। এ ভাষা মুখে মুখে শিখিতে হয়। যাঁহারা সে ভাষা না জানিয়া আন্দাজে অর্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের পদে পদে ভুল হইবারই কথা। তাহার উপর লিপিকরের অসংখ্য প্রমাদ আছে। কিন্তু উর্দ্দু ও ফার্সী শব্দ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ব্যাকরণ, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সবই আছে। এখন যেমন আমরা সকলেই ইংরেজিনবীশ, ইংরেজী বুকনি ছাড়া নিছক বাংলা আমাদের মুখেই আসে না, নবাবী আমলে সেই রকম উর্দ্দু ফার্সী জবান আকছর লোকের মুখে লাগিয়া থাকিত। বালকেরা টোলে সংস্কৃত পড়িত, মখতবে মিঞা সাহেবের কাছে উর্দ্দু ফার্সী পড়িত। দরবারী ভাষা ছিল উর্দ্দু, উর্দ্দুতে অনেক দলিলপত্র লেখা হইত, কাজীর বিচার হইত উর্দ্দুতে। ফার্সী না জানিলে নবাবী সেরেস্তায় কাহারও চাকরী হইত না।

বাংলা ভাষার সহিত উর্দ্দু মিলাইয়া কবিতা রচনা করিতে সকলের অপেক্ষা মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছিলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। তাঁহার বিরচিত শিবায়ন ও সত্যনারায়ণ ব্রতকথা দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিশেষ তাঁহার সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপীরের কথা সর্ব্বত্র প্রচলিত। এত অধিক প্রচলন বাংলা ভাষায় কিংবা দেশে অন্য কোনও পুস্তকের নাই। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পঞ্জিকায় এই ক্ষুদ্রকায় পুস্তকখানি ছাপা হয়। বিস্ময়ের কথা এই যে, সাহিত্য হিসাবে এই মহামূল্য পুস্তকের কিছু সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু বৎসর পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে টীকাও ছিল, কিন্তু অনেক ফার্সী শব্দের অর্থ ভুল। তাহার পর আর কেহ কিছু করেন নাই। এই গ্রন্থের কোনও বিশুদ্ধ সংস্করণ নাই, উর্দ্দু ও ফার্সী শব্দাবলীর যথাযথ অর্থ করিবার কোনও প্রয়াস হয় নাই। অথচ রামেশ্বরের এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র সত্যপীরের কথা হয়। সত্যপীরের সিন্নি দিবার প্রথাও আমাদের দেশে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্য রক্ষা করিতে হইলে এই সকল গ্রন্থের পাঠ নির্ণয় করিয়া অজ্ঞাত অথবা বিস্মৃত ভাষার শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থ জানিয়া সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিতে হয়।

এক মান্দ্রাজ অঞ্চল ছাড়া, ভারতের সর্ব্বত্র সত্যনারায়ণের পূজা ও সত্যনারায়ণের কথা হয়। সত্যনারায়ণ ব্রতের বিবরণ স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে কথিত আছে। নারদ ঋষি মর্ত্ত্যলোকে নানা প্রকার দুঃখ দেখিয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া দেবদেব নারায়ণকে এই দুঃখ-প্রশমনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে শ্রীভগবান বলেন, কলিযুগে সত্যনারায়ণের পূজা ও ব্রত ব্যতীত দুঃখ-মোচনের অন্য উপায় নাই। এই কথার প্রমাণস্বরূপ নারায়ণ নারদকে কয়েকটি আখ্যায়িকা শুনাইলেন।

যেখানে সত্যনারায়ণের কথা হয় সেখানে স্কন্দপুরাণের এই কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

বাংলাদেশে সত্যনারায়ণের পুঁথি কয়েকজন লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের রচনাই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। তিনি ও অন্য লেখকেরা স্কন্দপুরাণের বর্ণনাই অনুসরণ করিয়াছেন। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাঠুরিয়া ও এক বণিকের অখ্যায়িকা মূল সংস্কৃতে যেমন আছে, বাংলা পুঁথিতেও প্রায় সেই রকম আছে। কেবল একটি বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। স্কন্দপুরাণে দরিদ্র দুঃখী ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে তাহাকে দেখা দেন। বাংলা পুঁথিতে ভগবান মুসলমান ফকিরের বেশে ব্রাহ্মণের নয়নগোচর হইলেন। পরিশেষে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সংশয় ভঞ্জন করিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য মোচন করিয়া তাহাকে পূজার পদ্ধতিতে নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া ভোগ দিতে আদেশ করিয়া গেলেন। পুরাণের সত্যনারায়ণ বাংলা পুঁথিতে সত্যপীর হইলেন। সত্যপীরের কথা বঙ্গদেশের বাহিরে কেহ জানে না, অপর সকল প্রদেশে স্কন্দপুরাণোক্ত দেবতারই পূজা ও কথা হয়।

যেকালে রামেশ্বর ও অন্যান্য কবিগণ তাঁহাদের কাব্য রচনা করেন, সে সময় সত্যপীরের পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে কিরূপে এই পূজার সূচনা হয়, সে-বিষয়ে আমি সন্ধান করি নাই, তবে ইহার মূলে যে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের উচ্চ আদর্শ আছে, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। কোরাণের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ নয়, প্রাচীন ইহুদীয় মহাজনদিগের মহত্ত্ব সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের সময় ধর্ম্মসাম্য রক্ষিত হইত না। সূফী কবি ও ভাবুকেরা কোনরূপ ভেদাভেদ মানিতেন না, কিন্তু সাধারণতঃ উদারতার অপেক্ষা উগ্রতাই অধিক লক্ষিত হইত। এই যে মুসলমান কলন্দরের রূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবের কল্পনা, ব্রহ্মের বিরাট ব্যাপকতা, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা, সকল ধর্ম্মে সত্যের অনুসন্ধিৎসা, ইহা সেই প্রাচীন মহৎ উদার আর্য্য জাতির চিন্তাপরম্পরার প্রণালী। ধর্ম্মবিরোধের তুল্য অপর বিরোধ নাই, সকল বিরোধের শান্তি হইয়াছিল এই পুণ্যভূমিতে। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি আর আমার পিতা (ঈশ্বর) এক; এই অপরাধে রোমান শাসনকর্ত্তার বিচারে ইহুদীয়েরা তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করে। সূফীশ্রেষ্ঠ মন্সুর বলিতেন, অন্ অল্ হক্, আমি সত্য, অর্থাৎ ঈশ্বর; এই কারণে পারস্যদেশে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাঁহার দেহ ভস্মসাৎ করে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যভারতে এরূপ অবিচার হইত না। উপনিষদে আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি; উপনিষৎ বেদের উপাঙ্গ। বুদ্ধদেব বেদ ও জাতিভেদ মানিতেন না; তিনি বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। যদি যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদ ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নিঃসংশয় তাঁহারা অবতার বলিয়া গণ্য হইতেন। আর্য্যসন্তান ব্রাহ্মণ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য যে মুসলমান ফকিরের আকৃতিতে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই।

রামেশ্বর উচ্চশ্রেণীর কবি নহেন। বৈষ্ণব যুগে যে অমৃত ধারা উৎসারিত হইয়াছিল, তাঁহার রচনায় তাহা পাওয়া যায় না। নিসর্গের সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় অথবা মানবচরিত্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণে তাঁহার গুণপনা প্রকাশ পায় না। সত্যনারায়ণের কথায় তিনি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণকার-কৃত সত্যনারায়ণ অথবা সত্যদেবের চিত্র তেমন দেবতুল্য হয় নাই, তাঁহার চরিত্রে সাধারণ মানবের দুর্ব্বলতা অর্পিত হইয়াছে। সত্যপীরের চিত্রে রামেশ্বর আর একটু রং ফলাইয়াছেন। সত্যপীর যেমন নিঃস্ব ব্রাহ্মণকে বিত্তশালী করিলেন, সেইরূপ বণিক সিন্নি মানিয়া নিতে ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাকে মিথ্যা চোর অপবাদে কারাগারে নিক্ষেপ করাইলেন, আবার তাহাকে মুক্ত করিবার সময় রাত্রে অকারণে রাজাকে ভয় দেখাইলেন। বণিক সদানন্দ ও তাহার জামাতা দেশে ফিরিলে সদানন্দের কন্যা আহ্লাদে অভুক্ত সিন্নি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল এই অপরাধে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইল, পরে অনেক কাঁদাকাটার পর পীর মৃতকে পুনর্জীবিত করিলেন। এই সকল অলৌকিক ঘটনায় দেবতার মহত্ত্ব নাই, মানুষের লঘু চরিত্রের পরিচয়

আছে। এই-সকল ত্রুটি থাকিলেও এই গ্রন্থ লুপ্ত হইবে না, কারণ ইহা পূজা-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে; যেখানে সত্যনারায়ণের কথা হয় সেখানেই এই গ্রন্থের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, ঘরে ঘরে পাঁজিতে এই কাব্য রক্ষিত আছে, বৎসরের পর বৎসর নূতন পঞ্জিকায় মুদ্রিত হয়।

বিশেষ কোন গুণ না থাকিলে কোন গ্রন্থের এতকাল ধরিয়া এত লোকের কাছে সমাদর হয় না। রামেশ্বরের কাব্যের গুণ তাঁহার ভাষায়। এই কবি অসামান্য ভাষা ও শব্দকুশলী। সংস্কৃত ত জানিতেনই, তাহার উপর ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় অসীম ক্ষমতা। এই ভাষা তিনি ফকিরবেশী সত্যপীরের মুখে দিয়াছেন। কথোপকথনে পাল্টাপাল্টি বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় সওয়াল জবাব পড়িয়া চমৎকৃত হইতে হয়। আগাগোড়া ভাষা চোস্ত, জমাট, ধারালো, ফেনাইবার ফাঁপাইবার চেষ্টা কোথাও নাই। বড় কবি না হইলেও বড় কথা, স্মরণীয় কথা আছে। বড় কবির এক প্রমাণ তাঁহাদের বাণী চলিত, নিত্য ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া যায়। কালিদাসের অনেক উপমা অনেকে জানে। শেক্‌স্‌পীয়রের অনেক কথা ইংরেজি ভাষায় সচরাচর ব্যবহার হয়, মিল্টনের রচনা হইতে অনেক গভীর কথা উদ্ধৃত হয়, টেনিসনের অনেক কথা ইংরেজি ভাষার সৌষ্ঠব সাধন করে। ধর্ম্ম এক, সম্প্রদায় বিস্তর, ঈশ্বর এক, তাঁহার নাম নানা। রাম ও রহিম এক, রামেশ্বর এই কথা কয়েকবার বড় মধুরভাবে লিখিয়াছেন। কোরাণের প্রত্যেক সূরা অথবা পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে এই কয়টি কথা থাকে—বিসমিল্লাঃ অর্‌রহমান, অর্‌রহীম। রহমান ও রহীম—এই দুইটি আরবী শব্দের অর্থ দয়াময়। দুটিই আল্লার নাম। রামেশ্বর লিখিয়াছেন—

অতঃপর বন্দিব রহিম রাম রূপ।

স্থানান্তরে—

রাম রহিম দোয় নাম ধরে এক নাথ।

আবার—

মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।

উর্দ্দু কিংবা ফার্সী শব্দ বাংলা অক্ষরে বানান করা বড় কঠিন, উচ্চারণ ত হইতেই পারে না, কারণ আরবী ও ফার্সীর অনুরূপ অনেক অক্ষর বাংলায় নাই। ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষা জানা থাকিলে তবেই সে-সকল শব্দ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারা যায়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ অবলম্বন করিয়া আমি ফার্সী ও উর্দ্দু শব্দসমূহের অর্থ করিয়াছি।

জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর,
দেব দেব জগতের নাথ।

দস্তগীর অর্থে যিনি সকল বিষয়ে সহায়তা করেন, মহাপুরুষ ও পীরের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

কলিতে যবন দুষ্ট, হৈন্দবী করিল নষ্ট,
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।

হৈন্দবী শব্দের এখন আর প্রয়োগ নাই, অর্থ হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুয়ানী। আর একস্থানে হিন্দব শব্দ আছে, অর্থ হিন্দুজাতি।

যে ব্রাহ্মণের উপাখ্যান লইয়া কথা আরম্ভ হইল, তাহার নিবাস দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর, নাম বিষ্ণুশর্ম্মা। ব্রাহ্মণের অবস্থা 'লঙ্ঘনে বঞ্চন কভু ভিক্ষায় ভক্ষণ'। একদিন অভুক্ত অবস্থায় অপরাহ্নকালে বটবৃক্ষতলে বসিয়া ব্রাহ্মণ শোক করিতেছে, দেহত্যাগের কল্পনা করিতেছে, এমন সময় মাধব পীর সাজিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোহর কৃষ্ণমূর্ত্তি, মাথায় পাগ, অঙ্গে

বড়ি বড়ি কৌড়ী গ্রন্থিত গুধড়ী
ছাগ ছাল থলি থাল দণ্ড।

গুধড়ী চলিত হিন্দী কথা, অর্থ কাঁথা। বড় বড় কড়ি-গাঁথা কাঁথা, হাতে ছাগচর্ম্মের থলি, থালা ও দণ্ড।

ঘণ্টা রণ রণ জিগীর ঘন ঘন
ঝন্ ঝন্ জিঞ্জির শব্দ।

জিগীর শব্দের উচ্চারণ জিকর, অর্থ উল্লেখ, বলা। ফকির ঘন ঘন আল্লার নাম করিতেছেন। জিঞ্জির (জঞ্জীর) শব্দের অর্থ শিকল।

ফকিরে ও ব্রাহ্মণে নিম্নরূপ কথাবার্ত্তা হইল—

কপটে করুণাময় দ্বিজে কয় বাওয়া।
মৈ খুব ফকীর হুঁ লেগা মেরা দোয়া॥
তু বাওয়া বখ্‌তাওয়র ধরম আত্মা দেখা তুঝে।
মৈ ভুখা ফকীর হুঁ খিলাও কুছ মুঝে॥
তমাম দুনিয়া দেখা সবহি ঈমান ছুটা।
কঁহা কোই খয়রাত ন করে এক মুঠা॥
দ্বিজ বলে দেওয়ান ও কথা কও কাকে।
মনস্তাপে মরিতে বসেছি ঐ পাকে॥

কলি হইল প্রবল মজিল ধর্ম্মপথ।
দেওয়ান কহেন বাওয়া কহো হকীকত ॥
নিজ দুঃখ কয়া দ্বিজ করেন রোদন।
নারিনু খাওয়াতে আমি বড় অভাজন ॥
মৃত্যুকালে মোর ধর্ম্ম মজাইলে মিছে।
ধর মোর বসন অশন কর বেচে ॥
বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝিয়া বলে বচ্চা।
দুনিয়ামে ঐসাভি আদমি রহে সচ্চা ॥
ভলা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে।
রাত দিন যৈসা তৈসা দুখ সুখ হোয়ে ॥
জানা গয়া বাত বাওয়া জানা গয়া বাত।
কপড়াতো লেও ভলা আও মেরা সাথ ॥
জও তো সৎপীর মেরা জও তো সৎপীর।
তেরা দুখ দূর করেঁ তও হম ফকীর ॥
ঐসা কুছ হুনর বতায় দেঁও তোয়।
ফিয়ে পিছে সিতাব খয়ের খুব হোয় ॥
সত্যপীর পাঁওমে একিদা করো দিল্।
সাহেব করেগা তেরা নিয়ত্ হাসিল ॥
আপসেঁ চলায় দেও সিরনিকে মদ্দ্।
কোই তেরা হুকুম করেগা নহি রদ্ ॥
জিস্কো তু জো কহেগা সোহি হোগা সহি।
পীর বরাবর হোগা করো যাকে এহি ॥
দ্বিজ বলে দেওয়ান কহিলে মহাশয়।
যবনের কার্য্য-সে তো ব্রাহ্মণের নয় ॥
ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভজিব কেন অন্ত।
ডুবাইব পরকাল ইহকাল জন্ত ॥
দেওয়ান কহেন শুনো গেয়ান কি বাত।
রাম রহিম দোয় নাম ধরে এক নাথ ॥
অভেদ তুম্হারে বহা শাস্তর কি সার।
তুম্হে ভেদ ভলা নহি করো তো অখ্তিয়ার ॥

ফকিরের কথা বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষায়, ব্রাহ্মণের বাংলা। প্রথমে শব্দ সকলের অর্থ করিয়া পরে উদ্ধৃত অংশের বাংলা অনুবাদ করিব। বাওয়া অর্থে বাবা, বাছা। ফকিরকেও বাওয়া বলে। খুব অর্থে উত্তম, ক্ষমতাশালী। দোয়া, আশীর্ব্বাদ। দাতাওয়র, দাতা। ভুখা, ক্ষুধিত। খিলাও, খাওয়াও। ঈমান, ধর্ম্ম, নিষ্ঠা। দেওয়ান, মহৎ ব্যক্তি; রাজমন্ত্রীকে দেওয়ান বলে; আমাদের দেশে যেমন বাবু উপাধি, হিন্দুদেশে সেই রকম দেওয়ান উপাধি, আবার দেওয়ান হাফিজ বলিতে হাফিজের বিরচিত গ্রন্থ বুঝাইবে, কিন্তু সকল প্রকার প্রয়োগে এই শব্দ সম্মানসূচক। হকীকত, বৃত্তান্ত, সত্য বিবরণ। জও, যদি। হুনর অর্থে কৌশল, বাংলা ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। সিতাব, শীঘ্র। খয়ের, মঙ্গল। পাঁওসে, চরণে। একিদা, মিলিত, নিবিষ্ট। সাহেব, ঈশ্বর। নিয়ত, বাঞ্ছা। সিরনি, নৈবেদ্য, প্রসাদ, এই শব্দ বাংলায় সিন্নি হইয়াছে। মদ্দ, প্রথা, পদ্ধতি। সহি সত্য। অখ্তিয়ার শব্দ একত্যার আকারে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, অর্থ ক্ষমতা, স্বীকার।

ফকির আগাগোড়া ব্রাহ্মণকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, অনুবাদে 'তুমি' লিখিয়াছি।

ফকিরের বেশধারী করুণাময় সত্যনারায়ণ কপট করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, বাবা, আমি উত্তম ফকির, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। বাবা, তুমি দাতা, তোমাকে ধর্ম্মাত্মা দেখিতেছি, আমি ক্ষুধিত ফকির, আমাকে কিছু আহার করাও। সমস্ত জগৎ দেখিলাম, সকলেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, কেহ কোথাও একমুষ্টি ভিক্ষা দান করে না। ফকির ত এই কথা বলিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেইদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিতে গিয়া নিজে পাইয়াছিলেন।—

কেহ কহে ফিরে মাগ' প্রসবেছে নারী।
কেহ কহে নিত্য কি তোমার ধার ধারি ॥
কেহ গালি দেয় কেহ করে দূর দূর।
মারিতে চলিলা কেহ হইয়া নিষ্ঠুর ॥

ফকির সকল কথা জানিতে চাহিলে ব্রাহ্মণ নিজের দুঃখের কাহিনী বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, অবশেষে কহিল, ধর মোর বসন, অশন কর বেচে। এই ছদ্মবেশী অন্তর্যামী ফকির বাছিয়া বাছিয়া ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছিত, তাড়িত, ভিক্ষাবঞ্চিত হইয়া, সারাদিন অনশনে কাটাইয়া, সায়ংকালে ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিবার মানস করিতেছিল, কিন্তু কন্থা, পাগ, প্রবাল কণ্ঠমালাধারী যবন ভিক্ষুক সম্মুখে উপনীত হইয়া যাচ্ঞা করিতেই এই কপর্দ্দকশূন্য মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণ নিজের জীর্ণ অঙ্গবস্ত্র দান করিল। এই দান মহাদান; ইহা মুক্ত হস্তের দান নয়, মুক্ত প্রাণের দান। যে রমণী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে নিজের লজ্জাবস্ত্র বুদ্ধদেবের উদ্দেশে দান করিয়াছিল তাঁহারও দান এইরূপ। ব্রাহ্মণের মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া ফকির বিস্ময়ানন্দে কহিলেন, পুত্র, পৃথিবীতে এমন সত্য-প্রকৃতি মানুষও হয়! কেন, বাবা, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে কেন? যেমন রাত্রিদিনের পর্য্যায় দুঃখ-সুখও সেইরূপ, একের পর অপর আসে। ভাল, তোমার কাপড় লও, আমার সঙ্গে এস। যদি আমার পীর সত্য

হন, যদি আমার পীর সত্যপীর, তোমার দুঃখ দূর করিতে পারি তবেই আমি যথার্থ ফকির। তোমাকে এমন কিছু কৌশল শিখাইয়া দিই যাহা করিলে পরে সত্বর তোমার যথেষ্ট মঙ্গল হয়। সত্যপীরের চরণে হৃদয় নিবিষ্ট কর, ভগবান তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তুমি নিজে সিন্নির প্রথা চালাইয়া দাও, কেহ তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। তুমি যাহাকে যাহা কহিবে তাহাই সফল হইবে, তুমি গিয়া আমার কথামত কার্য্য কর, তাহা হইলে পীরের তুল্য হইবে। ব্রাহ্মণ আবার আপত্তি করিলে ফকির তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, জ্ঞানের কথা শুন, একই প্রভু রাম ও রহিম দুই নাম ধারণ করেন। আমি তোমাকে কহিতেছি শাস্ত্রের সার অভেদ, তোমার পক্ষে ভেদজ্ঞান ভাল নয়, ইহাই স্বীকার কর।

তাহার পর ফকির ব্রাহ্মণবেশ ও তৎপরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে পঞ্চরত্ন দান করিলেন। সত্যপীরের পূজার পদ্ধতি সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন,

পীরস্থাংশে মুজরা করিবে পুনর্ব্বার।
সত্যপীর নারায়ণ দ্বিঅংশ প্রকার॥

মুজরা অর্থে হিসাব, ভাগের নির্ণয়। প্রসিদ্ধ হিন্দী দোঁহায় আছে,

রাম ঝরোখে বৈঠ্‌কে সবকা মুজরা লে।
জিস্‌কি জৈসি চাকরী উস্‌কো ওয়সাহি দে॥

রাম গবাক্ষে বসিয়া সকলের হিসাব গ্রহণ করেন, যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহাকে সেইরূপ দেন।

চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিয়া ফকির অন্তর্হিত হইলেন, ওদিকে ব্রাহ্মণীর পিতৃবেশে অলঙ্কার, বস্ত্র, নানা সামগ্রী নিজের মস্তকে বহন করিয়া তাহার কুটীরে দেখা দিলেন। যখন ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিল সে সময় তাহার শ্বশুরের রূপধারী সত্যপীর নারায়ণ নাই, তাঁহার প্রদত্ত সামগ্রী-সকল রহিয়াছে। পত্নীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল,

চক্রপাণি চিনিতে নারিলে চন্দ্রমুখী।
প্রভু এসেছিলা, সাধ্বি! হৈয়া তোর পিতা।
তুমি ধন্যা, পীরকন্যা, কীর্ত্তি কল্পলতা॥

বিস্তর আপত্তি, নানা বিদ্রূপের পর, বিষ্ণুশর্ম্মা ও সত্যপীরের অলৌকিক ক্ষমতা ও ক্রিয়া দেখিয়া, বিশ্বস্ত হইয়া সকলে সত্যপীর নারায়ণের পূজা দিতে আরম্ভ করিল। তখন বিষ্ণুশর্ম্মার অট্টালিকার সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইল।—

দুয়ারে দুন্দুভি বাজে ফুকুরে বিষাণ।
আকাশে আল্লাম উড়ে পীরের নিশান॥

আল্লাম শব্দের অর্থ কি? ইহা ফার্সী আলম শব্দ, অর্থ লোক, লোকসমূহ। পংক্তির অর্থ লোকে আকাশে পীরের নিশান উড়াইল।

কাঠুরিয়ার কথা সংক্ষিপ্ত, পীরের সিন্নি মানিয়া তাহার দারিদ্র্য মোচন হইল। স্কন্দপুরাণে আছে কাষ্ঠকেতু কাষ্ঠ-বিক্রয়লব্ধ ধনে সত্যনারায়ণের ব্রত করিবে মানস করাতে সেইদিন তাহার কাষ্ঠ দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হইল।

এক স্থানে 'রেলা' শব্দ আছে।—

দেখি অতি রেলা অনুমতি দিলা শেষে।

রেলা উর্দ্দু কিংবা ফার্সী শব্দ নয়, গ্রাম্য হিন্দী শব্দ, অর্থ ঠেলা, ভিড়।

এই ত গেল লাভের দিক। অপর পক্ষে, সিন্নি মানিয়া দিতে ভুলিয়া গেলে কিরূপ শাস্তি হয় তাহার দৃষ্টান্ত সদানন্দ বেণে। এই বণিক সন্তান-কামনায় সত্যপীরের সিন্নি মানিয়াছিল। পীরের কৃপায় সদানন্দের কন্যা হইল, কন্যা বড় হইলে, তাহার বিবাহ হইল, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক সদানন্দের মানত রক্ষা হয় নাই, পীরের সিন্নি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। অবশেষে সদানন্দ বণিক

দক্ষিণ সফরে নৌকার ব্যাপারে
জামাতা সহিতে গেলা।

ব্যাপার শব্দ বাণিজ্যার্থে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র ও বোম্বাই প্রদেশে ব্যবহৃত হয়, উচ্চারণ বেওপার।

সেখানে রাজার সহিত বেচাকেনা হইল, রাজার অতিথি হইয়া পরম সমাদরে শ্বশুর জামাতা বাস করিতে লাগিল। সিন্নি না পাইয়া এতদিন সত্যপীর কিছুই করেন নাই এখন তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল বণিককে শিক্ষা দিতে হইবে।—

সাধু সুখে পাইল, আমা পাসরিল,
প্রমাদে পাড়িব তারে।
যেন কোন জন করিয়া মানন
আর না এমন করে॥
হর-চোর পীর, পশি নৃপতির
কোষে করাইল চুরি।
রাজধন লয়ে, রাতারাতি বয়ে,
পুরিল সাধুর তরি॥

রাজকোষের চোরাই মাল পর দিবস সদাগরের নৌকায় পাওয়া গেল, অমনি কোটাল শ্বশুর জামাইকে বাঁধিয়া, মারিয়া, কারাগারে পুরিল। তাহারা কারাগারে অস্থিচর্ম্মসার হইতে থাকুক এদিকে মথুরায় বিষ্ণুশর্ম্মার ব্রাহ্মণী পুত্রের কল্যাণ হেতু সত্যপীরের সিন্নি দিয়া সকলকে খাইতে দিলেন। সেখানে সাধুয়ানী (সদানন্দের ভার্য্যা) ও তাঁহার কন্যা উপস্থিত ছিলেন। বণিকানী কহিলেন, তাঁহার পতি ও জামাতা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে তিনিও সত্যপীরের সিন্নি দিবেন।—

ব্রাহ্মণীরে ইর্ষাদ রাখিয়া গেলা ঘরে।
সদয় হইলা পীর সাধুর উদ্ধারে॥

ইর্ষাদ শব্দ ছাপা হয় ইসাদ ; ইসাদ অর্থশূন্য শব্দ, ইর্ষাদ অর্থে আদেশ, ইচ্ছা। সিন্নির নাম হইতেই পীর সাধুর উদ্ধারে যত্নবান হইলেন। হইয়া কি করিলেন? অর্দ্ধরাত্রে রাজার স্বপ্নাবস্থায় প্রচণ্ড ফকির মূর্ত্তিতে রাজার বক্ষে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

কাহে রে কুট্টন গির্দ্দি মৌত লগা তেরা।
ছোড়্ সদানন্দ নাম সেবককো মেরা॥
নহি ঠৌর মারুঙ্গা রখেগা কওন চচা।
উয়হ লোগ ভি চোর অওর তু লোগ ভি সচ্চা॥
তসকীর খাতির উসে পীর এত্তা কিয়া।
এঁও নহি তো তেরা মত্তা উয়হ কাঁহাসে লিয়া॥
অও তো ওয়হি লেতা মত্তা অওতো ওয়হি লেতা।
বিহানকো কেঁও রহতা রাতহি চলা যাতা॥
তেকা ওকা গুণাহ্ নহি সবি গুনহা মেরা।
ছোড় দে গরিবকো চলা যায় ডেরা॥
ঔর এক হিসাব কি বাত কহোঁ শুন্।
যেত্তা মত্তা লিয়া তিস্‌কা দেগা দশ গুণ॥
অও তো বণিয়া কো তু লুট নহি লেতা।
বারহ্ বরিখ মে বারহ্ গুণ হোতা॥
শাহা মজকুর কি দস্তুর কুছ বুঝে।
থোরা দিলায় দিয়া এনা মাফ কিয়া তুঝে॥
বিহানকো ছোড়ান কিজে কহোঁ বের বের।
মেরা বাত ন রখেগা মরেগা আখের॥

কুট্টন গির্দ্দি গালি, যে ব্যক্তি নিন্দিত লোক কর্ত্তৃক বেষ্টিত। মৌত, মৃত্যু। ঠৌর ঠাঁই, স্থান। তস্‌কীর, অপরাধ। খাতির, জন্য, কারণে। এঁও, এরূপে। মত্তা, ধন, সম্পত্তি। তেকা, উর্দ্দু কিংবা ফার্সী শব্দ নয়, প্রাদেশিক হিন্দী শব্দ, অর্থ তার। ওকা'ও ঐরূপ শব্দ, অর্থ উহার। শাহা, রাজা, বাদশাহ। মজকুর, দরিদ্র। এনা, হিন্দী, ইহাকে।

কেন রে হতভাগা, তোর কি মৃত্যু উপস্থিত? সদানন্দ নামক আমার সেবককে ছাড়িয়া দে, নহিলে এখানেই তোকে মারিয়া ফেলিব, কোন্ চাচা তোকে রক্ষা করিবে? ওরা সব চোর আর তোরা বড় সাধু, না? অপরাধের কারণ পীর উহাকে এরূপ করিয়াছিল, এমন না হইলে তোর ধন ওরা কোথা হইতে লইল? যদি ও ব্যক্তি তোর ধন লইত, ওই যদি লইত তাহা হইলে রাতারাতিই চলিয়া যাইত, সকাল বেলা এখানে কেন থাকিবে? ওর ও দোষ নয় তোরও দোষ নয়, সকলই আমার দোষ, গরিবকে ছাড়িয়া দে, বাড়ী চলিয়া যাক্। আর একটা হিসাবের কথা শোন্, যত ধন লইয়াছিস্ তাহার দশ গুণ দিবি। তুই যদি বণিকের ধন লুটিয়া না লইতিস্ তাহা হইলে বার বৎসরে বার গুণ বাড়িত। রাজা আর দরিদ্রের নিয়ম কিছু বুঝিস্? উহাকে অল্পই দেওয়াইলাম, তোকে মার্জ্জনা করিলাম। বারবার বলিতেছি সকাল বেলা উহাদের ছাড়িয়া দিবি, আমার কথা রক্ষা না করিলে শেষে মরিবি।

প্রভাতে রাজা উঠিয়াই প্রাণের দায়ে বণিকদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আরও দশ নৌকা ধন দিলেন। এখানে বিবেচনার কথা আছে। বিষ্ণুশর্ম্মার প্রতি দেবতার দয়া দেবতারই উপযুক্ত, কিন্তু সদানন্দ বণিকের প্রতি কিরূপ বিচার হইল? সে সিন্নি মানিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেই, হইত। আর যদি তাহাকে শাস্তি দেওয়াই স্থির হইল, তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল বিলম্ব হইল কেন? তাহার পর রাজার কোষাগার হইতে ধন লইয়া বণিকের নৌকায় রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল? চোর অপবাদে সদানন্দকে কারারুদ্ধ না করাইয়া তাহাকে কি আর কোন শাস্তি দেওয়া যাইত না? সদানন্দই যেন অপরাধী, তাহার জামাতার কি দোষ? দ্বাদশ বৎসর তাহারা কারাগারে কাটাইল, সত্যপীর তাহাদের মুক্তির কথা একবারও ভাবেন নাই, আর যেই বণিক-পত্নী সিন্নি মানিলেন, অমনি পীর সদয় হইয়া তাহার স্বামী ও জামাতার মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন। ইহা ত একপ্রকার উৎকোচের লোভ, এরূপ মিষ্টান্নপ্রিয়তায় ত দেবতাকে মনে পড়ে না, বৃন্দাবনের বটুবালক মোদক-

লুব্ধ মধুমঙ্গলকে মনে পড়ে। মধুমঙ্গল এমন গুণের যে টানাটানি পড়িলে পৈতা বাঁধা দিত। আবার সম্পূর্ণ নিরপরাধী রাজাকে স্বপ্নাবস্থায় গালিগালাজ দিয়া তাঁহাকে প্রাণের ভয় দেখানো কেন? বণিক যে চোর নয়, যথার্থ চোর খোদ সত্যপীর সে কথা রাজা কেমন করিয়া জানিবেন? এ প্রকারে সিন্নি-পদ্ধতি প্রচার করিলে ভক্তি উড়িয়া যায়, থাকে শুধু ভয়। শীতলা ও ওলাবিবির পূজা এবং সত্যপীরের পূজা একশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। আর বিচার ত দেবতার মতো নয়, মগের বর্গীর বিচার।

এত পীড়নে ও শাস্তিতেও সদানন্দ বণিকের পরীক্ষা পূর্ণ হইল না। সে বেচারা ও তাহার জামাতা বাজ-দত্ত বিত্ত লইয়া দেশে ফিরিতেছে, পথে এক ঘাটে ফকিরের সঙ্গে দেখা।

ফকীর শরীর হয়ে, সাধুর নিকট গিয়ে,
জিজ্ঞাসেন কেয়া লে যাও বাওয়া।
আধা চিজ দেও মুঝে পীরকা দোহাই তুঝে
ককঙ্গা বহুত কুছ দোওয়া॥
পীরের বচন শুনে পরিহাসে কয় বেণে
কেত্তা দিন ভয়ো হো ফকীর।
কমাই তো খুব দেখা, ওয়কুফ কি নহি লেখা,
করামৎ কেয়া কিও জাহির॥
এক কৌড়ী লে যা চলা! পীর কহে পায়া ভালা,
কেয়া চিজ লে যাও কহো মুঝে।
শুন্ রহ্ঁ কেত্তা মত্তা—সাধু কহে লত্তাপত্তা
কেত্তা নাম বতাউঙ্গা তুঝে॥
কহে সাধুর জামাই, খাক লে যাতা হুঁ মৈঁ,
তুম্হাসমে ভেরা কওন কাম।
শুনি পীর মৌনে রয় তৎক্ষণে তদ্রূপ হয়
দোঁহে যে যাহার নিল নাম॥
দেখে সাধু হৈল সর্ব্বনাশ।
নায়ে হৈতে নামে তড়ে ফকীরের পায় পড়ে
রক্ষ রক্ষ বলে দুই দাস॥

স্কন্দপুরাণে কেবল সাধুতে ও সত্যনারায়ণ প্রভুতে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জামাতার কথা রামেশ্বর যোগ করিয়াছেন। ওয়কুফ শব্দের অর্থ বুদ্ধি। এ কথাটা আমাদের অজানা মনে হয়, কিন্তু বুদ্ধি বাদ দিলে যে শব্দ হয়, অর্থাৎ বেওয়কুফ, আমাদের বিলক্ষণ পরিচিত। ঐরূপ করামৎ বাংলায় কেরামৎ হইয়াছে। খাক্ অর্থে ছাই। উর্দ্দু বাংলা মিশ্রিত ভাষার বাংলা তর্জ্জমা ঐরূপ হইবে। সত্যপীর ফকিরের অবয়ব ধারণ করিয়া সাধুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, কি লইয়া যাইতেছ? তোর পীরের দোহাই, অর্দ্ধেক সামগ্রী আমাকে দাও, অনেক কিছু আশীর্ব্বাদ করিব। পীরের কথা শুনিয়া সদানন্দ পরিহাস করিয়া কহিল, ফকির হইয়াছ কত দিন? তোমার রোজগার তো খুব দেখিতেছি, বুদ্ধির সীমা নাই, কেরামৎ কি জাহির করিয়াছ? যা, এক কড়া কড়ি লইয়া চলিয়া যা! ফকির বলিল, ভাল, পাইলাম, কি জিনিষ লইয়া যাইতেছ আমাকে বল, কত ধন, শুনি। বণিক কহে, লতাপাতা, তোকে কত নাম বলিব? সাধুর জামাই বলে আমি ছাই লইয়া যাইতেছি, তোর সে খোঁজে কি কাজ? শুনিয়া সাধু মৌন রহিল, বণিক দুইজন যে রকম বলিয়াছিল তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইল, অর্থাৎ কয়েকখানা নৌকা লতাপাতায় ভরিয়া গেল, বাকি নৌকাগুলা ভস্মপূর্ণ। সদানন্দ দেখে সর্ব্বনাশ হইল, তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে নামিয়া ফকিরের পায় পড়ে, দুইজন দাসের মত বলে, রক্ষা কর, রক্ষা কর!

বিস্তর কাকুতি-মিনতির পর ফকির-পীর তাহাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিলেন, নৌকায় যেমন ধন ছিল আবার সেইরূপ হইল। বণিকের গ্রামে উপনীত হইয়া নৌকা যখন ঘাটে লাগিল, তখন সে সংবাদ নৌকা হইতে ঘোষিত হইল।

নায় ছিল বাদ্যভাণ্ড তার দিল কাঠি।
কামানে পলিতা দিয়া কাঁপাইল মাটি॥

যুদ্ধের জাহাজেই শুধু কামান থাকে না, বণিকের নৌকাতেও কামান থাকিত।

সাধু আইল দেশে ধেয়ে যত নর নারী।
সদানন্দ দ্রুত দূত পাঠাইল পুরী॥

সদানন্দের কন্যা চন্দ্রকলা ঘরে বসিয়া পীরের সিন্নি খাইতেছিল, সাধুর আগমন-সংবাদ শুনিয়া সিন্নি ফেলিয়া ঘাটে ছুটিল। বাপ সিন্নি মানিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, কন্যা উচ্ছিষ্ট সিন্নি পাতে ফেলিয়া গেল। বাপকে বহুকাল শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল, কন্যার শাস্তি হইতে বিলম্ব হইল না।

প্রসাদ ফেলেছে পীরের আছে পূর্ণ কোপ।
দর্প চূর্ণ বাড়া অহঙ্কার কৈল লোপ॥
সদ্য দিল প্রতিফল দেখে গিয়া সতী।
বাপ বন্ধু কাঁদে ঘাটে ডুবে মৈল পতি॥

কাঁদাকাটি করিয়া কন্যা জলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে যা

এমন সময় পীর বৃদ্ধ বিপ্রবেশে দেখা দিলেন, বলিলেন, আমি জ্যোতিষী, গণনা করিয়া দেখিয়াছি সাধুর জামাতা মরে নাই, কন্যার অপরাধে এইরূপ ঘটিয়াছে। কন্যা রূপে গুণে ধন্যা হইলেও

বয়ো ধর্ম্মে বুদ্ধি নহে ভাল।
পীরের সিন্নিণি এ টে করে ফেলে এল ছুটে
সেই অপরাধে এত হৈল ॥

কন্যা আবার ঘরে গিয়া পাতের সিন্নি তুলিয়া খায়, তখন তাহার পতি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। স্কন্দপুরাণেও ঘটনা এইরূপ, তবে সিন্নির পরিবর্ত্তে সত্যদেবের প্রসাদেব উল্লেখ আছে।

এই-সকল ইন্দ্রজালের মত অলৌকিক ঘটনা-সমষ্টির সমাবেশ সত্যনারায়ণের মহিমা ও প্রতাপ ঘোষণা করিবার জন্য, কিন্তু সত্যনারায়ণ যে কেমন করিয়া সত্যপীর হইলেন তাহা জানি না। গ্রন্থশেষে আছে—

গ্রন্থ সাঙ্গ হইল বিরচিল দ্বিজরাম।
সবে হরিধ্বনি কর মজুরা সেলাম ॥

মজুরা অর্থে অনেক।

রামেশ্বর একটি প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন, এখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সদানন্দ ও তাহার জামাতা গৃহে ফিরিলে পর স্ত্রীলোকেরা নৌকা বরণ করিতে গেল।

মায়ে ঝিয়ে চন্দ্রকলা ডিঙ্গা মঙ্গলিতে গেলা,
আগে পিছে শত সীমন্তিনী।
সুখের নাহিক ওর শংখ ঘণ্টা ঘন ঘোর
হুলাহুলি, জয় জয় ধ্বনি ॥

এই নৌকা-মঙ্গলের স্ত্রীআচার-পদ্ধতি এখন আর নাই। কোথা হইতে থাকিবে? সেকালে লোকে জানিত লক্ষ্মীর বাহন নৌকা, পেঁচা নয়। যে বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন তাহার গতিবিধি ছিল জলপথে নৌকা-যানে, বোঝাই-করা নৌকা আনাগোনা করিত। সদানন্দ দশ নৌকা ভরা রাজার ধন লইয়া দেশে ফিরিয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা শাঁখ বাজাইয়া, নৌকা বরণ করিয়া সে ধন ঘরে তুলিয়াছিল। এখন সে বাণিজ্য নাই, সে পালভরা, মালভরা নৌকা নাই, গৃহলক্ষ্মীরাও আর তরণী-বিহারিণী লক্ষ্মীর মঙ্গলাচরণ করেন না।

মহিলা-সংবাদ

মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ নারীর জীবন অধিকতর আশাপ্রদ, উপযোগী ও মধুর করিয়া তুলিবার জন্য ভারতের একদল মহিলা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন,—ইহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কলিকাতার সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি-সমিতির কথা অনেকেই জানেন। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় বাঙলার বহুস্থানে—এমন কি বাঙলার বাহিরেও, অনেক-গুলি মহিলা-সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য,—স্ত্রীশিক্ষার প্রচার, উটজ-শিল্পের উন্নতি, নানারূপ হস্তশিল্পের প্রচলন, ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষাদান, প্রভৃতি। সমাজ-হিতকর নানাবিধ অনুষ্ঠানও সমিতিগুলির লক্ষ্যের বিষয়ীভূত। মাঝে মাঝে শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের বক্তৃতারও আয়োজন আছে। আমরা যে চারিজন মহিলার চিত্র প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা চারিটি মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা। নিঃস্বার্থভাবে, বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া, ইঁহারা নারী-সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

বোম্বাই শহরে সম্প্রতি স্ত্রীমহামণ্ডল প্রদর্শনী বসিয়াছিল। ইহাতে শ্রীমতী লীলাবতী দেসাই-অঙ্কিত কতকগুলি 'রঙ্গোলী' চিত্র প্রদর্শিত হয়। শ্রীমতী লীলাবতী, ব্যারিষ্টার মঙ্গলদাস দেসাই-এর পত্নী। ছবিগুলি সাধারণের কাছে বিশেষ প্রশংসালাভ করে। 'রঙ্গোলী' এতদিন আলঙ্কারিক চিত্রকলার (decorative) মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল; রঙ্গোলী-চিত্রে মনুষ্য-মূর্ত্তির সমাবেশও যে

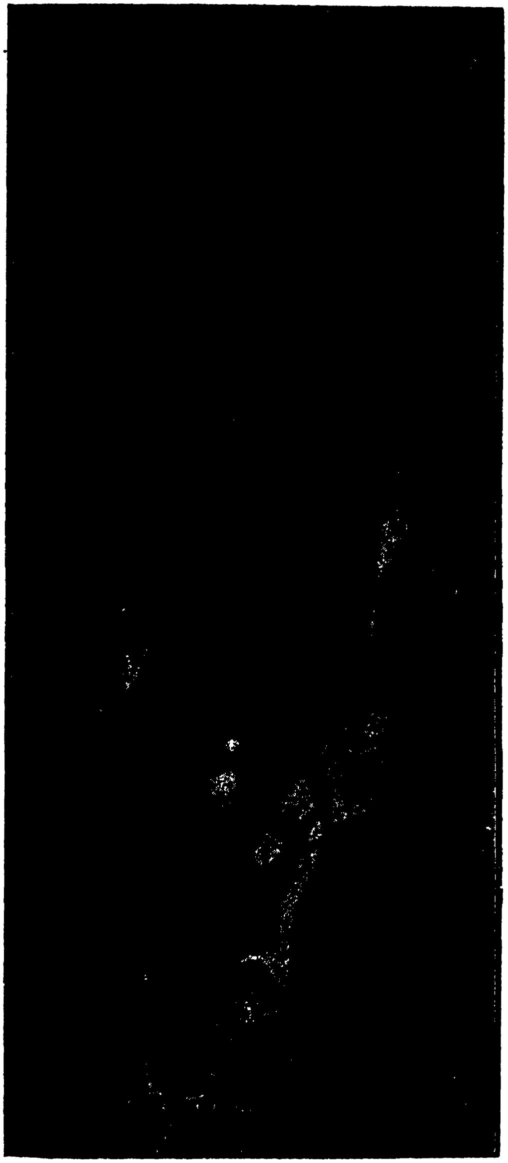


'ব্রজোলী' চিত্র—যশোদা ও কৃষ্ণ





সম্ভবপর, শ্রীমতী দেসাই তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অসিতকুমার হালদার ও আবদুর রহমান চাঘতাই-এর আদর্শে এই 'রঙ্গোলী' চিত্রগুলি অঙ্কিত। আমরা



'রঙ্গোলী' চিত্র—প্রদীপ ও চন্দ্র

কয়েকখানির প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। মেঝের উপর রঙীন খড়ির গুঁড়া দিয়া 'রঙ্গোলী' চিত্র আঁকিতে হয়। এই কারণে মূলচিত্রের হুবহু প্রতিলিপি ক্যামেরাতে তোলা



শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সেন, সম্পাদিকা—টালা মহিলা-সমিতি



শ্রীমতী নলিনীবালা চৌধুরাণী, সম্পাদিকা—শ্রীহট্ট মহিলা-সমিতি

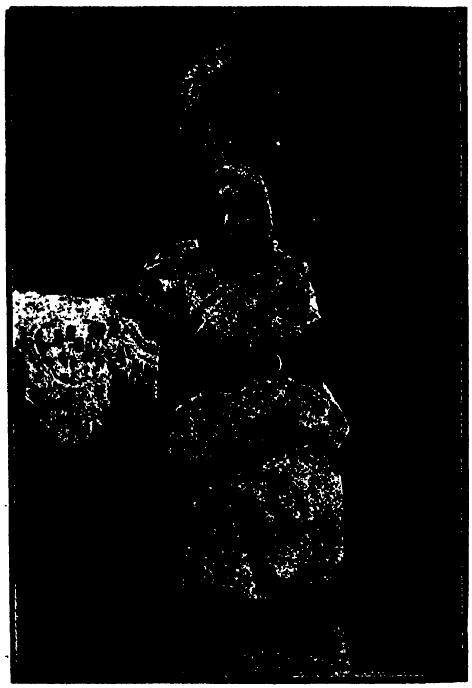


মাদারিপুর মহিলা-সমিতি



নিমতা মহিলা-সমিতি

সম্ভবপর নয়। কিন্তু তবুও মূলচিত্রগুলি কত উচ্চাঙ্গের তাহা মুদ্রিত প্রতিলিপি হইতে অনুমান করা দুঃসাধ্য হইবে না। শ্রীমতী দেসাই তাঁহার 'রঙ্গোলী' চিত্রগুলির জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুইটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য-পদক লাভ করিয়াছেন।



শ্রীমতী রাধারাণী সান্যাল, সম্পাদিকা—রাজশাহী মহিলা-সমিতি



বরিশাল মহিলা-সমিতি



শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী হুগলী ও পিরোজপুর (বরিশাল) মহিলা-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা

বিদুষী চন্দা বাঈ ভূতপূর্ব্ব এম্-এল-এ নারায়ণদাসের জ্যেষ্ঠকন্যা, এবং আরার প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার চন্দ্রকুমার জৈনের পুত্রবধূ। বিবাহের এক বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। অল্পবয়স হইতেই লেখাপড়ার দিকে চন্দা বাঈ-এর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ



চন্দা বাঈ



শ্রীমতী সুনীতি মিত্র

ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। জৈন-সিদ্ধান্তে তাঁহার দখল বিলক্ষণ। বিহার-অঞ্চলে পর্দ্দা-প্রথার বড়ই বাঁধাবাধি, ইহা সত্ত্বেও চন্দা বাঈ শিক্ষা-সম্বন্ধে মোটেই হতাশ হন নাই। স্ত্রীজাতির কল্যাণের জন্য এই বিদুষী মহিলা অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে 'উপদেশ-রত্নমালা', 'সৌভাগ্য-রত্নমালা', 'নিবন্ধ-রত্নমালা', 'মহিলাত্ত্বঁকা চক্রবর্ত্তিত্ব' উল্লেখযোগ্য। গত সাত বৎসর ধরিয়া চন্দা বাঈ বিশেষ দক্ষতার সহিত "জৈন মহিলাদর্শ" মাসিক পত্রখানি সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ধনীর দুলালী হইয়াও তিনি অতি অনাড়ম্বরভাবেই জীবন যাপন করিয়া থাকেন। আরার নিকট ধর্ম্মপুরায় তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে "স্ত্রী জৈন-বালা-বিশ্রাম" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দূরদূরান্তর হইতে বালিকা ও বিধবাগণ আসিয়া এখানে বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া থাকে। চন্দা বাঈ নিজে এখানে অধ্যাপনা করেন এবং মাঝে মাঝে শিক্ষার্থিনীদিগকে নানা শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

—

রাষ্ট্র বা দেশের সেবায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী সুনীতি দেবীর নাম করা যাইতে পারে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। সুনীতি দেবী কিছুদিন বাঙলার স্কুল-পরিদর্শকের কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলনের ফলে সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তিনিও কারাবাস বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙলায় ও যুক্ত-প্রদেশে অনেক সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যের সহিত সুনীতি দেবীর নাম বিজড়িত। স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। সাইমন-বর্জ্জন-কমিটিতেও তাঁহার নাম দেখা যায়।

যক্ষের ধন

শ্রী সীতাদেবী

দীনবন্ধু সাহা টাকা করিয়াছিল ঢের। গ্রামের লোকে নানাজনে নানাকথা বলিত, কারণ সত্য কথাটা কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। কেহ বলিত এক লাখ; কেহ বলিত, "পাগল হয়েছ? একলাখ ত ওর কাছে খুদ্‌কুঁড়ো। ঐ বুড়োর সিন্দুকে যা টাকা আছে, তাই দিয়ে এ গাঁয়ের মত দশখানা গাঁ কেনা যায়।"

কিন্তু এতটাকা ভোগ করিবে কে তাহা লইয়া সকলের ভাবনার অবধি ছিল না, এক দীনবন্ধু ছাড়া। সংসারে তাহার আপন বলিতে এক স্ত্রী এবং একটি কন্যা। উহাদের জন্য বরাদ্দ ছিল দিনে তিন আনার বাজার, এবং মাসে কয় সের করিয়া চাল। সে নিজে খাওয়া-দাওয়া এমনই সংক্ষেপ করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে ব্যাপারে না ছিল সময়ের অপব্যয়, না অর্থের। সকালে গুড়, মুড়ি এবং একঘটি জল, সন্ধ্যায় গ্রামের রাধাগোবিন্দজীর প্রসাদ। স্ত্রী-কন্যাও যে তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিত না, ইহাতে তাহার বিরক্তি এবং ক্ষোভের সীমা ছিল না।

যাহা হউক, ভগবান অবশেষে তাহার দীর্ঘশ্বাসের ঘটায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীটি জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া একদিন মরিয়া বাঁচিল, কন্যা সত্যবতীকে মামার বাড়ীর লোক আসিয়া লইয়া গেল। দীনবন্ধুর বুকের একটা জায়গা বেদনায় দিনকতক যেন একটু খচ্‌খচ্‌ করিল, কিন্তু দৈনিক তিন আনা জমা দিলে মাসে প্রায় ছ'টা টাকা হয়, চালের দামটাও নিতান্ত কম নয়, এই চিন্তাটা মনে আসিবামাত্র তাহার ক্ষতস্থানে কে যেন সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়া দিল। সে আরো মন দিয়া সুদ আদায় করিতে লাগিল, তাহার দোকানের কেনা-বেচার কাজ আরও নিখুঁৎভাবে চলিতে লাগিল।

সত্যবতী মামার বাড়ীই থাকিয়া গেল এবং বছরে

পর বছর কাটিয়া চলিল। দীনবন্ধু প্রতি বৎসর পূজার সময় বারো-চৌদ্দ আনা পয়সা খরচ করিয়া কন্যাকে হয় একখানি ডুরে শাড়ী, না হয় একখানি চৌখুপি শাড়ী কিনিয়া পাঠাইত। তাহারই ঋণগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি গিয়া কাপড়খানি দিয়া আসিত এবং সত্যবতীর খবরটাও লইয়া আসিত। ইহা ছাড়া কন্যার সহিত পিতার আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। আপনার জনকে ত আর খোরাকীর পয়সা দেওয়া যায় না, কাজেই দীনবন্ধু কোনোদিন সে চেষ্টাও করে নাই।

সত্যবতীর বিবাহও মামার বাড়ী হইতেই হইয়া গেল। দীনবন্ধু তখন ভারি মোকদ্দমায় ব্যস্ত, কিছুতেই সময়মত যাইয়া উঠিতে পারিল না। মেয়েকে কিছু দিবারও সুবিধা করিতে পারিল না। বৎসরের পর বৎসর আবার কাটিয়া চলিল, পূজার সময়ের সে বারো আনা খরচও দীনবন্ধুর বাচিয়া গেল। কুটুম্বাড়ী ত আর শুধু একখানি শাড়ী পাঠান চলে না? গুছাইয়া গাছাইয়া তত্ত্ব করার দরকার। কিন্তু ঘরে গৃহিণী নাই, অত উৎপাত করে কে? কাজেই জামাই বাড়ী তত্ত্ব করাটা শেষ অবধি বাদই পড়িয়া গেল। দীনবন্ধুর বাড়ীর দেওয়ালের ইঁট এক একটা করিয়া, স্থানে স্থানে খসিয়া পড়িতে লাগিল, চূণবালি ত অনেকদিনই বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। উঠান গাছগাছড়া ঝোপেঝাপে ভরিয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর সাপের ভয়ে সেদিকে কেহই পা বাড়াইত না। দীনবন্ধুর প্রাণে ভয়-ডর বলিয়া পদার্থ ছিল না। অন্ধকারে এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে সে নিশাচরের মত ঘুরিয়া বেড়াইত, তেল কিনিতে পয়সা খরচ; কাজেই লণ্ঠনও ব্যবহার করিত না। ঘরের ভিতর কেবল শুধু একটি মাটির প্রদীপ এককোণে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিত। চারিপাশের অন্ধকারকে আরো ভয়ানক ও বিভীষিকাময় করিয়া তোলা ছাড়া এই ক্ষীণ আলোতে আর কোনো কাজ হইত না। চোরেও এমন স্থানে যাইতে ভয় পাইত। কাজেই প্রৌঢ় দীনবন্ধুর অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া একলা ভাঙা বাড়ীতে দিন কাটাইতে কোনোই অসুবিধা হইল না।

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। দীনবন্ধুর আবার কপাল ভাঙ্গিল। কন্যা সত্যবতী বিধবা হইয়া আবার তাহারই ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, কারণ মামার বাড়ীতে তাহাকে আশ্রয় দিবার মত আর কেহ অবশিষ্ট ছিল না। তাহার দিদিমা এবং বড়মামা দুইজনেই মারা গিয়াছিলেন। শুধু যে সেই আসিল তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আসিল তাহার বালক পুত্র বলাই।

এই ছেলেটার প্রতি প্রথম হইতেই দীনবন্ধু জাতক্রোধ হইয়া উঠিল। একে ত উড়ো আপদ ঘাড়ে আসিয়া চড়িল, সেই যথেষ্ট বিরক্তির কারণ। সত্যবতীর জন্য তবু তাহার দুচার আনা খরচ করা অভ্যাস ছিল, সেটা তাহার তত গায়ে লাগিল না। এখন ত তাহার খরচ আরো কমই হইবে। বিধবা মানুষ একবেলা খায়, তাহার উপর মাছমাংস কিছুই খায় না। দীনবন্ধু বৃদ্ধও হইয়াছে, বাতটাও তাহাকে দিনের দিন শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিতেছে, মাঝে মাঝে ব্যথায় সারারাত চীৎকার করে। তৃষ্ণা পাইলে উঠিয়া গিয়া একটু জল খায়, এমন ক্ষমতা তাহার থাকে না। দুই-এক টাকা মাইনা এবং খাওয়া দিয়া একটা লোক রাখিতে অনেকেই তাহাকে উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধুর ভরসা হয় না। কে কেমন মানুষ তাহার ঠিকানা আছে কি? শেষে অল্প একটু সুখ করিতে গিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব যাক আর কি? কিন্তু নিজের সন্তান সম্বন্ধে সে ভয় ত আর নাই? সে বুড়া বাপকে মাইনা করা চাকরের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী যত্ন করিবে এবং মাইনাও তাহাকে দিতে হইবে না। খাইবেও সে ঢের কম। কাজেই কন্যাকে এক রকম সে খুশী হইয়াই অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

উঠানের কাঁটা গাছ, পোকামাকড় বিছা প্রভৃতি বাঁচাইয়া, নিজের ভাঙা সদরদরজার চৌকাঠটার উপর দাঁড়াইয়া বলিল, "আয় মা আয়, এও চোখে দেখ্‌তে হল! রাধাগোবিন্দজীর ইচ্ছা, আমরা কি করতে পারি?"

সত্যবতী শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "ভাল আছ ত বাবা? বড় তাড়াতাড়ি আস্‌তে হল, আগে খবর দিতে পারিনি।"

দীনবন্ধু ভাবিয়াছিল কন্যা বুঝি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে, কাজেই নিজের চোখেও সে

একটুখানি জল আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। মেয়ের ভাব দেখিয়া একটুখানি দমিয়া গেল। সত্যবতীর মনে তখন বৈধব্যের দুঃখ অপেক্ষাও, এমন বাপের ঘরে আসিয়া গলগ্রহ হওয়ার লজ্জাটা বেশী করিয়া জাগিতেছিল, কান্না তাহার আসিল না।

দীনবন্ধু বলিল, "তা ভিতরে আয় মা। গাড়োয়ানটাকে বিদায় করে দে। তোর কাছে পয়সা আছে ত?"

সত্যবতী সংক্ষেপে বলিল, "আছে! বলাই, নেমে আয় না, গাড়ীর ভিতরে কি করছিস?"

বলাই কাপড়ের একটা পুঁটুলি লইয়া নামিয়া পড়িল। বাকি জিনিষ, একটা মাঝারি গোছের টিনের বাক্স, এবং একটা বিছানার বড় পোটলা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানই নামাইয়া দিল।

বলাইকে দেখিয়াই দীনবন্ধুর পিত্ত জ্বলিয়া গিয়াছিল। এই বয়সের ছেলে, খাইবে ঠিক হাঁসের মত, দৌড়ধাপ করিয়া কাপড়ও ছিঁড়িবে বছরে ক'খানা তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। জামাইয়ের মৃত্যুর জন্য এই তাহার প্রথম দুঃখ হইল। হতভাগা বাঁচিয়া থাকিলে ত আর এ আপদ তাহাকে ঘাড়ে করিতে হইত না।

বলাই তাহার ভবিষ্যৎ বাসস্থানের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সত্যবতী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা জিনিষপত্রগুলো কোথায় রাখবে, লোকটাকে একটু দেখিয়ে দাও। তারপর ওকে বিদায় করে দিই।"

তাহারা সবাই বিদায় হইলেই দীনবন্ধু বাঁচিত। কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন অগত্যা বলিল, "এই দিকে নিয়ে আয়। একটু বাঁচিয়ে চলিস্, পোকামাকড়ের অন্ত নেই। দিনদিন অথর্ব্ব হয়ে পড়ছি, এসব সাফ্ করবারও আর ক্ষমতা নেই। তোর ছেলেটা দেখছি বেশ বড়সড় হয়েছে; ও কি পারবে না?"

সত্যবতীর মুখ আরো কঠিন হইয়া উঠিল। বাপের কথার উত্তর না দিয়া গাড়োয়ান এবং পুত্রের সাহায্যে নিজের জিনিষপত্র লইয়া সে সেই ইটকাঠের স্তুপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

বাড়ীর সব ক'টা ঘরেই ছাদ প্রায় সবটা বা আংশিক-ভাবে খসিয়া পড়িয়াছিল, বাকি ছিল কেবল একটা ঘর। ইহাতেই লোহার সিন্দুকসহ দীনবন্ধু বাস করিত। রান্না-বান্না করার তাহার দরকার হইত না, কাজেই সে-ঘরখানাও ভগ্নদশায় পড়িয়াছিল। নিজের ঘরে অন্যলোকের প্রবেশ সে মোটেই পছন্দ করিত না। কিন্তু মেয়ে এবং নাতিকে ত বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখা যায় না? অগত্যা এই ঘরের মধ্যেই তাহাদিগকে তখনকার মত স্থান দিতে হইল।

গাড়োয়ানটা বিদায় হইয়া যাইবামাত্র সত্যবতী বলিল, "সকাল থেকে ছেলেটা কিছুই খায়নি। তোমার রান্না-বান্নার পাট নেই বোধ হয়? রান্নাঘর কোথা? দুটো ভাতে ভাত সেদ্ধ করে নিই।"

দীনবন্ধু বিপন্নভাবে বলিল, "জোগাড় ত কিছু নেই। রান্নাঘরের চাল পড়ে গেছে, কি করে কি করবি?"

সত্যবতী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "যেমন করে হোক করতেই হবে। ছেলেটা ত সারাদিন উপোস করতে পারে না? আমি জোগাড় করছি।"

দীনবন্ধু বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল। হাঁ, মেয়ের জেদ আছে বটে। ভগ্ন দালানের একটা কোণ ইঁট কাঠ তুলিয়া ফেলিয়া সে ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিল, তাহার পর কয়েকটা ইঁট পাতিয়া একটা অস্থায়ী উনান খাড়া করিয়া ফেলিল। শুকনো কাঠের অভাব ছিল না, দেখিতে দেখিতে উনানে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সত্যবতীর সঙ্গে তাহার বাসন-কোসনগুলি সৌভাগ্যক্রমে ছিল, এবং পথে রাঁধিয়া খাইবার উদ্দেশ্যেই হৌক বা এখানে আসিয়া কাজে লাগিবার সম্ভাবনায়ই হৌক, চাল, ডাল এবং গুটি-কয়েক আলু বেগুনও ছিল। সুতরাং ভাতে ভাত শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া গেল। দীনবন্ধু খাইতে কোনো আপত্তি করিল না। নিজের পয়সা খরচ না করিতে হইলে, সে সময়ে সময়ে রসনাকে লাগাম ছাড়িয়া দিত। নাতি এবং দাদামশায় মিলিয়া শীঘ্রই পিতলের বগুনাটি খালি করিয়া ফেলিল। সত্যবতী অনেক পথ আসিয়া স্নানাদি না করিয়াই তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়াছিল, সে আর খাইল না। ইহাদের আহারান্তে, এঁটো বাসন-কোসন লইয়া সে গ্রামের পুকুরে চলিয়া গেল। বাসন

মাজিয়া, ধুইয়া, স্নান সারিয়া, সিক্তবস্ত্রে সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সূর্য্য অস্ত যাইবার আর দেরি নাই। এ বেলা আর রান্নার উপায় ছিল না, কাজেই রাধা-গোবিন্দজীর প্রসাদ খাইয়াই বলাইকে ঘুমাইতে হইল।

পরদিন সকাল হইতেই দীনবন্ধু বুঝিল, তাহার ঘরে শনি প্রবেশ করিয়াছে। কত দিক দিয়া যে খরচ তাহাকে করিতে হইবে ভাবিয়া, মাথা তাহার ঘুরিতে লাগিল। মেয়ে এবং নাতির থাকার জন্য একখানা ঘরের উপর যেমন তেমন করিয়া একটা খড়ের চাল অন্ততঃ দিতে হইবে, রান্নাঘরের জন্যও একটা চালা বাঁধিয়া দিতে হইবে। তাহার পর চালডাল কেনা, নিত্য বাজার খরচ এসব ত আছেই। ইহাতেই কি আর নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে? হতভাগা ছোঁড়ার কাপড়, জামা, কত কি এর পর কিনিতে হইবে? হায়, হায়, ইহার বাপ মরিল ত এই অকাল-কুষ্মাণ্ডকেও সঙ্গে লইয়া গেল না কেন? দীনবন্ধুর বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেই কি ইহার জন্ম হইয়াছিল?

কিন্তু যতই আপশোষ করুক, কিছু খরচ তাহাকে করিতেই হইল। পাকা দেওয়ালের উপর খড়ের চাল দিয়া ঘর একখানা খাড়া হইল, রান্নাবান্নার জন্য একখানা চালাও বাঁধা হইল। সামনের ঝোপঝাপ কাটিয়া সত্যবতী এবং বলাই চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত করিল, এবং একটা প্রদীপের বদলে একটা লণ্ঠন এবং গোটাদুই প্রদীপ এখন এই ভাঙ্গাবাড়ীর অন্ধকার দূর করিতে লাগিল। রোজ বাড়ীতে যখন হাঁড়ি চড়িতেছে, তখন দীনবন্ধুও একবেলা করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। খরচ যখন হইতেছেই তখন নিজের দেহটাকে কষ্ট দিয়া আর লাভ কি? এক বেলার বেশী রান্না করিতে দিতে সে কোনোপ্রকারেই রাজী হইল না। এ আবার মেয়ের অন্যায় আবদার। কেন ছোঁড়া একবেলা ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া থাকিতে পারে না নাকি? সে নিজে ত এতকাল এমনি করিয়াই কাটাইয়াছে। সত্যবতী নিরুপায় হইয়া সকালের রাঁধা ভাত তরকারীই কিছু কিছু ছেলের জন্য লুকাইয়া রাখিয়া দিত, তাহাতেই বালককে তুষ্ট থাকিতে হইত।

দীনবন্ধু আজকাল মেয়ের যত্নে আরামে আছে বটে। সে মাছ ভাত খায়, রাত্রে জল চাহিলে হাতের কাছে জলের ঘটি পায়, পায়ে তেল মালিশের প্রয়োজন হইলে তাহারও অভাব হয় না। শীতে তাহার জীর্ণ হাড় ক'খানা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিলেও, সে ছেঁড়া একখানা চাদরের বেশী কিছু আবরণ কোনোদিন ব্যবহার করে নাই। এখন কন্যা তাহার অবস্থা দেখিয়া নিজের বিছানার পুঁটুলি হইতে তাহাকে মোটা একটা কাঁথা দান করিয়াছে। জিনিষটা পুরানো হইলে কি হয়, শীত কাটে তাতে চমৎকার। সন্ধ্যার পর বাহির হইতে হইলে, পদে পদে সাপ বা বিছার উপর পা দিবার ভয় আর নাই। শরীর ভাল না থাকিলে তাহাকে বাহিরে যাইতেও হয় না, বলাই তাহার উপদেশ-মত সকল ফরমাস খাটিয়া আসে।

কিন্তু মন তাহার অশান্তির আগুনে পুড়িয়া যাইতে-ছিল। এত খরচ তাহার স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতেও কোনো দিন হয় নাই। এক একটা করিয়া পয়সা বাহির করিত, আর তাহার বুকের এক একটা পাঁজর যেন খসিয়া পড়িত। ইহারা তাহাকে ধনেপ্রাণে সারা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু সত্যবতীর কঠোর মুখের দিকে তাকাইলে তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া যাইত। মেয়ে এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া অবধি হাসেও নাই, কাঁদেও নাই, পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া আছে। কথাও সে এক রকম বলে না। তাহার চোখের দিকে তাকাইলে দীনবন্ধুর বুকের ভিতরটাও ভয়ে ছম্ ছম্ করে। কাহারও কাছে সে নিজের দুঃখ জানাইতে পারে না, দুনিয়ায় তাহার বন্ধু কেহ নাই। মনের আগুন মনেই ধোঁয়াইতে থাকে।

হঠাৎ একদিন সত্যবতী বলিয়া বসিল, "ছোঁড়াটা বসে থেকে থেকে বয়ে যাবে। ওকে এই গাঁয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দাও।"

দীনবন্ধুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। পাঠশালায় ভর্ত্তি করিবে বৈ কি? কত বড় নবাব পুত্র! তাহার পর তুই বেটা মাসে মাসে আট আনা করিয়া মাইনা দে, বই রে,

শেলেট রে, সব জোগাড় করিয়া দে। কাপড় জামা কিনিয়া দে। তাহার যেন পিতৃদায় উপস্থিত হইয়াছে!

কিন্তু মেয়েকে এত কথা বলিবার সাহস তাহার হইল না। শুধু বলিল, "মাইনে দেবে কে?"

সত্যবতী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আট আনা পয়সা ত? আমিই দেব, যেমন করে পারি।"

দীনবন্ধু বলিল, "আর বছর বছর বই শেলেট জোগাবে কে?"

সত্যবতী সে কথার উত্তর না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন, বৃদ্ধ নিবারণ মুখুজ্জ্যে। সারাদিন খাটিয়া তিনি সবে বাড়ী ফিরিয়াছেন। হাত-পা ধুইয়া, গামছাখানি উঠানের দড়ির উপর মেলিতে যাইবেন এমন সময় কে একজন তাঁহার পায়ের কাছে অবনত হইয়া প্রণাম করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন রান্নাঘর এবং গোয়াল-ঘরের ধুঁয়ায় আরো গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ চিনিতে না পারিয়া, ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা? সন্ধ্যেবেলা চোখে ভাল দেখি না।"

সত্যবতী নিজের পরিচয় দিল। বলিল, "অনেকদিন এসেছি। রোজ ভাবি আপনাকে প্রণাম করে যাব, কাজের গতিকে হয়ে ওঠে না। আমার ছেলেটার দয়া করে গতি করে দিন। বাড়ী বসে বসে দিনের দিন দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

বৃদ্ধ নিবারণের স্বভাবে দয়া-দাক্ষিণ্য যে খুব বেশী ছিল তাহা নয়। তবু বিধবা মানুষ, এই গ্রামেরই মেয়ে, তাহাকে ত সোজা ফিরাইয়া দেওয়া চলে না? কাজেই বলিলেন, "আমি আর কি গতি করব বাছা? পাঠশালা ত আর আমার সম্পত্তি নয়? মাইনে নিই, পড়াই। মাইনে যদি দিতে পার, ত কালই নেব ভর্ত্তি করে। পুরনো বইটই দুচারখানা জোগাড় করে বড় জোর দিতে পারি। আমারও ত অবস্থা জান বাছা, দিন আনি, দিন খাই।"

সত্যবতী বলিল, "আচ্ছা বাবা, মাইনে না হলে নাই যদি হয়, মাইনে দেব। বই শ্লেট আপনি দয়া করে জোগাড় করে দেবেন।"

পরদিন সকালেই স্নানাহার করিয়া, পরিষ্কার কাপড় পরিয়া বলাই মায়ের সঙ্গে গুরুমশায়ের বাড়ী হাজির হইল। সত্যবতী বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ছ'টি টাকা রাখিয়া দিল। বলিল, "বাবা, এই এক বছরের মাইনা একসঙ্গে দিয়ে রাখলাম। কি জানি পরে যদি আর জোগাড় করতে না পারি। বই আপনি দেবেন বলেছিলেন।"

দীনবন্ধুর কন্যা যে আবার মাইনা দিবার পয়সা জোগাড় করিতে পারিবে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। না হইলে বই দিবার কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত কি না সন্দেহ। পুরাতন বই শ্লেট সংগ্রহ করিয়া তিনি সাধারণতঃ অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতেন। কিন্তু কথা যখন দিয়া ফেলিয়াছেন, তখন কি আর করা যায়? অগত্যা একখানি ছেঁড়া বই এবং ভাঙা শ্লেট তাঁহাকে বাহির করিতে হইল। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বলেছি যখন, তখন নিশ্চয়ই দেব। বলি মাইনের টাকাটা চট্ করে জোটালি কি করে? তোর বাপ বুড়ো ত সহজে টাকা বার করবার লোক নয়?"

সত্যবতী বলিল, "বাবা দেয়নি, আমিই আমার বাসন-কোষন বেচে দিয়েছি।"

বলাই পাঠশালে গেল, এবং সত্যবতী ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাঙা বাড়ীর সকল বিভীষিকা ও দৈন্য আজ কেবলি তাহার চোখে খোঁচা মারিতে লাগিল। যে এ সকলই ভুলাইয়া রাখিত, সে এখন অন্যস্থানে।

পরদিন সকালে মাটির হাঁড়িতে রান্না হইতে দেখিয়া দীনবন্ধু মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর রান্নার বাসন কোথায় গেল? থালা গেলাশও দেখছি না যে?"

সত্যবতী বলিল, "বলাইয়ের পাঠশালার মাইনে দিতে সব বেচে দিয়েছি।"

দীনবন্ধু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ক' টাকায় বিক্রী করলি? কার কাছে?"

সত্যবতী বলিল, "কামার বাড়ী। ছ'টাকায় বেচেছি।"

দীনবন্ধু কপালে এক চড় মারিয়া বসিয়া পড়িল।

"এমন বুদ্ধি না হলে, এমন কপাল হবে কেন? জিনিষ-গুলোর দাম কম করে বারো চোদ্দ টাকা। পুরনো বলে না হয় আট ন' টাকাই হোক্। তুই ছ' টাকায় বেচে এলি? পাঠশালার মাইনে ত আট আনা। বাকি পয়সা কি করলি?"

সত্যবতীর জানাই ছিল টাকা বাড়ী লইয়া আসিলে, কোনো না কোনো উপায়ে তাহা বাপের হাতে গিয়াই পড়িবে। এইজন্যই সে সব টাকা একসঙ্গে গুরুমশায়ের হাতে দিয়া আসিয়াছিল। বাপের কথার উত্তরে বলিল, "এক বছরের মাইনে একসঙ্গে দিয়ে এসেছি।"

কন্যার ভয় ভুলিয়া গিয়া দীনবন্ধু উচ্চকণ্ঠে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। এইরকম বুদ্ধি মেয়েমানুষ ভিন্ন আর কাহার? এক বছর ছোঁড়া পাঠশালায় পড়িবে কিনা তাহারই ঠিকানা নাই, দিয়া আসিল এক বৎসরের মাইনা। এক বৎসর যে ছেলে বাঁচিয়াই থাকিবে, তাহারই বা কি স্থিরতা? নিবারণ মুখুজ্জ্যেকে তাহার জানা আছে। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করিয়া বরং ফিরিয়া পাইবার আশা থাকে, কিন্তু গ্রামের গুরুমশায়ের হাতে টাকা দিয়া তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা করা একেবারেই বৃথা। মেয়ে যেন মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী! ঘরে ঢুকিয়া অবধি দীনবন্ধুরও যে কত ক্ষতি সে করিল তাহার ঠিকানা নাই। নিজের পয়সার উপর যাহার মমতা নাই, সে কি আর বাপের পয়সায় মায়া করিবে? বেশ, না হয় বাসন বিক্রিই করিয়াছিস, টাকাটা এমন করিয়া হাতছাড়া করিবার কি দরকার ছিল? বাপের হাতে দিলে মাসে মাসে সুদে কত পয়সা আসিত, তাহার ঠিকানা আছে? না, মেয়ে গিয়া ছেলেকে পাঠশালে ভর্ত্তি করিলেন এক বছরের জন্য। ছেলে জজ হইবে আর কি?

নিজের অর্থের যে কি ব্যবস্থা করিবে ভাবিয়া ভাবিয়া দীনবন্ধু অস্থির হইয়া উঠিল। মেয়ের হাতে পড়িলে সে দুদিনেই সব উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিবে। সে বৃদ্ধ হইতে চলিল, আর ক'দিন বাঁচিবে? গায়ের রক্ত জল করিয়া না খাইয়া না পরিয়া, যে-ঐশ্বর্য্য সে সঞ্চিত করিয়াছে তাহা কোথায়, কাহার কাছে সে গচ্ছিত রাখিবে? ভাবিতে ভাবিতে মাথা তাহার গোলমাল হইয়া যাইবার জোগাড় হইল। ঘুমের ঘোরেও "ওরে সব গেল রে, সব গেল," করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিত। সত্যবতী আসিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া দিত।

বলাইয়ের পড়াশুনা চলিতে লাগিল। দীনবন্ধু কিন্তু দিনের দিন বেশী করিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। মেয়ে ছেলের জন্য যেসব কাপড়চোপড় আনিয়াছিল, তা দিনের দিন জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইতেছিল। এর পর কোন্‌দিন সে কাপড় চাহিয়া বসিবে। এ শীতটা কোনো রকমে কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু পরের শীতে ইহারা কি আর কিছু পয়সা না খসাইয়া ছাড়িবে? মেয়েরও কাপড় হয় ত কিনিয়া দিতে হইবে। তাহার পর, আজ এ বেড়াটা ভাঙিয়া যায়, কাল ও চালের খড় উড়িয়া যায়। দীনবন্ধু যেন বেড়া-আগুনের মধ্যে পড়িয়াছিল।

শীতকালটা কাটিয়াই গেল। বসন্তের হাওয়া দিবামাত্র কিন্তু গ্রামে অসুখের ধুম লাগিয়া গেল। শীত গিয়াছে মনে করিয়া সবাই মহোৎসাহে গরম কাপড় কম্বল ইত্যাদি বিদায় দিয়া, দুদিন যাইতে-না-যাইতেই জ্বরে পড়িতে আরম্ভ করিল। সর্দ্দি জ্বর তবু ভাল, কিন্তু হাম, পান বসন্ত এবং অবশেষে আসল বসন্তেরও নাম শোনা যাইতে লাগিল। সমস্ত গ্রামটা যেন অশুভ আশঙ্কায় মুষড়িয়া পড়িল।

দীনবন্ধু সুদ আদায় করিয়া বেলা বারোটা আন্দাজ বাড়ী ফিরিয়া বলিল, "দেখ মা, একটু তেতো-টেতো খাস, সাবধানে থাকিস, ঠাণ্ডা-টাণ্ডা যেন লাগে না। মা শীতলার যে রকম দয়া দেখছি গাঁয়ের ওপর।"

বাধা দিয়া সত্যবতী বলিল, "ছেলেটার একটা টিকে দিয়ে দিলে হয় না?"

দীনবন্ধু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "ও টিকে-ফিকেতে কিছু হয় মনে করিস্? কিছু না, কিছু না। শুধু পয়সা নষ্ট। অদৃষ্টে থাকলে হাজার টিকেতেও ও আটকাবে না।"

সত্যবতী কিছু বলিল না। কিন্তু মনের ভিতরটা তাহার থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ভাগ্যদেবতা এক একটি মানুষকে চিহ্নিত করিয়া

রাখিয়া দেন, কৃপা বর্ষণ করিবার জন্য। সত্যবতী জন্মাবধি এই কৃপা উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখনও বঞ্চিত হইল না। দুদিন পরে বলাই পাঠশালা হইতে অসময়ে জ্বর-গায়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পরদিন দেখা গেল তাহার গায়ে বসন্তের গুটি বাহির হইয়াছে।

সত্যবতীর বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া গেল। তাহার প্রিয়জনের মধ্যে মৃত্যু সকলকেই অপহরণ করিয়া এই বালকটিকে মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিল। ইহারই উপর তাহার অন্তরের সকল স্নেহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া সে বাঁচিয়াছিল। এবার এই আশ্রয়টিও তাহার বুঝি ভাঙিতে চলিল। কিন্তু দুঃখ সহিয়া সহিয়া তাহার হৃদয়ে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল, কোনো আঘাতই তাহাকে সহজে বিচলিত করিতে পারিত না। সে অবিচলিত ভাবে ছেলের সেবা করিয়া যাইতে লাগিল। সেদিন হইতে ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হইয়া গেল।

দীনবন্ধু ভয়ে পাগলের মত হইয়া উঠিল। এইবার বুঝি তাহার সর্বস্ব যায়। এই কাল রোগে তাহাকে ধরিলেই হইয়াছে! এই বুড়াবয়সে সে কি আর বাঁচিবে? আর সে মরিলে কন্যা দুদিনেই সব উড়াইয়া দিবে। যাইবার জায়গা থাকিলে সে নিজের ধনসম্পত্তি লইয়া তখনই পলায়ন করিত, কিন্তু জগতে বন্ধু বলিয়া কেহ তাহার ছিল না। এত টাকা লইয়া পথে বাহির হওয়াও মহা দায়। প্রাণে বাঁচিবে সে কতক্ষণ? নিরুপায় হইয়া নিজের ভাঙা ঘরে বসিয়া সে দেবতার নাম জপ করিতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়া না হওয়ায় তাহার কোনো দুঃখ ছিল না। আগের মত মুড়ি খাইয়াই সে বেশ চালাইয়া দিল।

বলাইয়ের সর্বাঙ্গ বসন্তের গুটিতে ছাইয়া গেল। জ্বরের ঘোরে অচেতন বালক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে লাগিল। সত্যবতী ছেলের মাথার কাছে বসিয়া হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রথম প্রথম তাহার আশা ছিল ছেলে আপনা হইতেই সারিয়া যাইবে। পাড়াগাঁয়ে এরূপ বসন্ত হইয়া সারিতে সে অনেককে দেখিয়াছে। কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল যে, সহজে সারিবার ব্যাধি এ নয়। তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায় নিরুপায় মাতৃস্নেহ! তাহার যে কোনো ক্ষমতাই নাই।

বাপের কাছে কোনো কিছু চাহিতে সত্যবতীর মাথা কাটা যাইত। কিন্তু এখন আর কোনো সঙ্কোচ, কোনো অভিমান রাখিবার তাহার উপায় ছিল না। দীনবন্ধুর কাছে গিয়া, অতিকষ্টে চোখের জল সাম্‌লাইয়া সে বলিল, "বাবা, একটা ডাক্তার-বদ্যি, কিছু এনে দেখাও। নইলে বলাই আমার বাঁচবে না।"

দীনবন্ধু খাতা লইয়া সুদের হিসাব কষিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, "ডাক্তার? ডাক্তার কোথা পাব? এ গাঁয়ে মোটে ডাক্তার নেই, আন্‌তে হলে ভিন গাঁ থেকে। ও বাবা, সে কি কম খরচ? গাড়ীভাড়া দে, জলখাবার দে, তার উপর দক্ষিণার টাকা।"

সত্যবতীর মাথার ভিতর যেন জ্বালা করিতে লাগিল। একি মানুষ না পিশাচ? সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "টাকার ত গাদা করেছ। অত টাকা তোমার খাবে কে? মরবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে? ছেলেটা আমার যেতে বসেছে, তার জন্যে দশটা টাকা খরচ করতে পার না?"

দীনবন্ধু সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া পড়িল। বলিল, "কোথায় আমার টাকা? সব বেটাবেটি কেবল আমার টাকা দেখছে। পেটে খাই না, ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াই, আমি টাকা কোথা পাব?"

সত্যবতী বলিল, "বাবা, ওসব ন্যাকামি রাখ এখন। কোনদিন বাপের কাজ করনি, আজ কর। মরলে পর টাকা তোমার সঙ্গে যাবে না। ধর্ম্মের কাছে কি জবাব-দিহি করবে? এমন করে নিজের সন্তানকে দগ্ধে মের না।"

দীনবন্ধু চেঁচাইয়া উঠিল, "আরে গেল যা! ছুঁড়ি পাগল না কি? বল্‌ছি টাকা নেই, তবু প্যান্ প্যান্ করবে। মরে গেলে সঙ্গে যায় না যায়, তোর কি রে বেটি? সরে যা, সরে যা, আমার এখন তাগাদায় বেরতে হবে।"

দীনবন্ধু পলায়নই করিল। ঘরে থাকিলে মেয়ে ত জ্বালাইয়া মারিবে। নিজের ঘরের দরজায় একটা তালা মারিয়া গেল, যদিও লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার কোনো

সম্ভাবনা সত্যবতীর ছিল না। বসন্তের ভয়ে গ্রামের কোন লোক কিছুদিন অন্ততঃ তাহার বাড়ীর ধার দিয়াও হাঁটিবে না, তাহা তাহার জানা ছিল। দোকানঘরে গিয়া সে আড্ডা গাড়িল, রাত্রেও সেখান হইতে নড়িল না।

সত্যবতী চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। একেলা এই যমপুরীতে কি করিবে সে? ছেলে তবে তাহার যাইবেই? কুহকিনী আশা তাহার কাণে কতবার মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়া গেল, না, ভাল হইবে। এখন যেন একটু জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জ্বর যেন একটু কম। কিন্তু হায় বৃথা আশা। বালক অল্পে অল্পে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ঘরে আর কেহ নাই। অচেতন বালককে ফেলিয়া গ্রামের ভিতর সাহায্যের আশায় সে যায়ই বা কি করিয়া? ছেলে যদি জল চায়? বিকারের ঘোরে বিছানা ছাড়িয়া যদি গড়াইয়া গিয়া আঘাত পায়? হায় ভগবান! একি দারুণ পরীক্ষায় ফেলিলে? ছেলে ত চলিলই, কিন্তু মা হইয়া সে এক ফোঁটা ওষুধ তাহার মুখে দিতে পারিল না, তাহাকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টাই করিতে পারিল না।

ভগবান শেষের দিকে অল্প একটু করুণা করিলেন। সন্তানের মৃত্যু-যন্ত্রণা মাকে অধিক দেখিতে হইল না। আঁধার রাত্রে পরিশ্রান্তা নিদ্রিতা মাতার নিকট হইতে বলাই চিরদিনের জন্য বিদায় হইয়া গেল। তাহার কষ্ট লাঘব করিতে পারে নাই বলিয়া অভিমান করিয়াই যেন মাকে কিছু বলিয়া গেল না।

পরদিন সকালে গ্রামের লোক বিস্মিত হইয়া দেখিল বিধবা একটি রমণী পথে পাগলিনীর মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে, ছেলের সৎকার করিতে। ছেলে রাত্রে মারা গিয়াছে। বাপ তাহার বাড়ী ছাড়িয়া তিনদিন আগে পলায়ন করিয়াছে।

"নীচ" জাতের মড়া, বসন্তের মড়া, কে ছুঁইবে? সকলেই বিধবার নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। "কাছে আসিস্ না মাগি, সরে যা। নিজের ছেলে মরেছে বলে সকলকে মজাতে চাস্?"

একজন দূর হইতে উপদেশ দিয়া গেল, "তোর বুড়ো-বাপকে বল, থানায় খবর দিতে। মেথরে এসে মড়া ফেলে দেবে এখন। দীনু বুড়োর বাড়ীর কে যাবে মড়া ফেল্‌তে? সে মরলেও কেউ ছোঁবে না।"

সত্যবতী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বলাই, বলাই বাবা আমার! তোকে কেউ ছুঁইবে না। আচ্ছা, তোর মা এখনও বাঁচিয়া আছে। তোকে বাঁচাইতে পারে নাই, কিন্তু একসঙ্গে যাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। সত্যবতী মনে মনে সব স্থির করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভাঙা বাড়ীর দেওয়ালগুলা পর্য্যন্ত যেন এই পৈশাচিক অট্টহাসিতে শিহরিয়া উঠিল।

কাঠের অভাব নাই, ঝোপঝাড়ও বিস্তর। চালের খড়ও বাঁশ দিয়া টানিয়া টানিয়া নীচে ফেলিতে লাগিল। লণ্ঠনের কেরোসিন আনিয়া তাহার উপর ঢালিয়া দিল। বলাইয়ের চিতা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া গেল। ছেলেকে কোলে করিয়া সত্যবতী মাঝখানে আসিয়া বসিল।

"নে এইবার তোর টাকা আগ্‌লাবার লোকের আর অভাব হবে না। আমরা মায়ে বেটায় আগলাব," বলিয়া জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি একটা সে খড়ের গাদার উপর ছুঁড়িয়া দিল।

অগ্নির লেলিহান শিখা যখন আকাশে হাতছানি দিয়া উঠিল, তখন গ্রামের লোকের খেয়াল হইল। চীৎকার, চেঁচামেচি, দৌড়াদৌড়ি লাগিয়া গেল। কিন্তু সে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের নিকটে অগ্রসর হইবারই তাহাদের ভরসা হইল না, নিবাইবার চেষ্টা করা ত দূরে থাকুক। কেবল পাগলের মত চীৎকার করিয়া সকলে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

দীনবন্ধু সবে তখন দোকান-ঘরে মুড়ি লইয়া খাইতে বসিয়াছে। গ্রামের একটা ছোকরা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "তোমার বাড়ী যে পুড়ে গেল, দীনবন্ধু।"

"অ্যাঁ, কি বল্‌লি?" বলিয়া বৃদ্ধ মুখের গ্রাস ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল। এমনি বেগে সে রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিল যে, বালকও তাহার পিছনে পড়িয়া রহিল।

মাতাপুত্রের চিতার আগুন তখন আশেপাশের বনজঙ্গলে লাগিয়া দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভীত ত্রস্ত গ্রামবাসীর দল দূরে দাঁড়াইয়া।

দীনবন্ধুকে দেখিয়া একজন বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল, "কোথায় ছিলি পিচেশ বুড়ো এতক্ষণ? তোর মেয়ে যে পুড়ে মরল?"

"ওরে আমার সর্ব্বস্ব গেল রে, সর্ব্বস্ব গেল," বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া দীনবন্ধু সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের ভিতর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

গ্রামের লোকে দীনবন্ধুর বাড়ীর সামনের পথে চলাই বন্ধ করিয়া দিল। অতি অসমসাহসী কেহ দুএকবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের অজ্ঞান অবস্থায় পথে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। বৃদ্ধ মেয়ে এবং নাতিসহ যক্ষ হইয়া নিজের ধন রক্ষা করিতেছে, এই গুজব ক্রমে গ্রামে গ্রামে রটিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

পৃথ্বীরাজ, টিপু সুলতান আর পিণ্ডারী দস্যুদলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে! পিণ্ডারীদের দু'তিনজন আহত হইয়া ধরাশয্যা লইয়াছে—তবু দুর্দ্ধর্ষ দলটা হটিতে চায় না। টিপু সুলতানের কানের কাছ দিয়া একটি আঁকা-বাঁকা আমের ডাল বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল; সে সেটা কুড়াইয়া লইয়া দস্যুদের আক্রমণ করিতে যাইবে, এমন সময় পৃথ্বীরাজের করচ্যুত একটা মাটির চাংড়া পিণ্ডারী-সর্দ্দারের নাকের উপর পড়িয়া তাহার নাকের নীচেটা রক্তে, এবং মুখের বাকিটা ধূলায় ধূসরিত করিয়া দিল।

এই সময় স্কুলের টিফিন পিরিয়ড্ শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়িল। টিপু সুলতান এবং অক্ষত পিণ্ডারী কয়জন ছুটিয়া গিয়া ক্লাসে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত যে যার পড়া সুরু করিয়া দিল। তিনটি পিণ্ডারী আহত হইয়াছিল; তাহারা নিজের নিজের জখমে হাত দিয়া মন্থর গতিতে স্কুলের দিকে আসিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে রহিল মাত্র পৃথ্বীরাজ এবং পিণ্ডারী-সর্দ্দার। বিজেতা গিয়া আহত শত্রুকে সমবেদনার কোমলস্বরে প্রশ্ন করিল,—বড্ড লেগে গেছে, না ভাই?

পিণ্ডারী বলিল,—বেশী নয়···ইস্—তোর পা'টা···

—ও কিছু নয়; দাঁড়া, কাপড়ের খুঁটটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে আসি—বলিয়া পৃথ্বীরাজ একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জলের ঘরের দিকে ছুটিল। জল আনিয়া নাকটা মুছাইয়া দিতেছিল, পিণ্ডারী বলিল,—এর পরেই নবীন মাষ্টারের ক্লাস,—আজ আবার নতুন বেত কেড়েচে···

এমন সময় স্কুলের বারান্দা হইতে টিপু সুলতান হাঁক দিল—তোমরা-সব এস শীগ্‌গীর, স্যার ডাকচেন; খেলা যে তোমাদের শেষ হতে যায় না।

পিণ্ডারী বলিল,—নিশ্চয় সব বলে দিয়েছে।

পৃথ্বীরাজ বলিল—তাহ'লে আজ এস্পার কি ওস্পার যা হয় একটা করব,—ওকে আস্ত রাখ্‌ব না···

বারান্দা হইতে তাগাদা আসিল—চলে এস, স্যার কতক্ষণ বসে থাক্‌বেন?

দুজনে উগ্রভাবে চাহিয়া দেখিল;—পৃথ্বীরাজের চেহারাটা অত্যন্ত কালো এবং চোখ দুইটা অত্যন্ত শাদা বলিয়া করুণার চক্ষে চাহিলেও উগ্র দেখায়। আহত পিণ্ডারী-দস্যু কয়টি থামের আড়ালে ইহাদের অপেক্ষায় ছিল; সকলে একসঙ্গে প্রবেশ করিল। টিপু নিজের আসনে বসিয়া একটা বই খুলিয়া বলিল—স্যার আমরা ততক্ষণ সময় নষ্ট না করে পুরনো পড়া করি?"—বলিয়া একবার অপরাধীদের পানে চাহিল।

নবীন মাষ্টার প্রশ্ন করিলেন,—রস্‌কে, পৃথ্বীরাজের তারিখ কত ?

রসিক, অর্থাৎ বর্ত্তমান ঘটনার পৃথ্বীরাজ চুপ করিয়া রহিল।

নবীন মাষ্টার আবার প্রশ্ন করিলেন—মাখ্‌না, টিপু স্থলতান কোন্ সালে জন্মেছিল।

মাখনলাল, অর্থাৎ এই আখ্যায়িকার পিণ্ডারী-সর্দ্দার যেন তারিখটা 'পেটে। আসছে মুখে আসছে না' ভাব দেখাইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।

নবীন মাষ্টার বলিলেন,—হুঁ! আর আপনারা দয়া করে বল্‌তে পারেন—পিণ্ডারীরা আকবরের কে হ'ত ?

যে তিনটিকে আহত পিণ্ডারী-দস্যু বলিয়া পরিচিত করিয়াছি তাহাদের ছুইজনে, যেন ভয়ানক মুখস্থ আছে এই ভাবে মনে করিবার ভঙ্গিমায় দ্রুত ঠোঁট নাড়িতে লাগিল। তৃতীয়টি অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল; নবীন মাষ্টারের রসিকতা ধরিতে না পারিয়া গোলমাল করিয়া বলিয়া ফেলিল—আকবরের পিসেমশায় হ'ত স্যার···

'শপাৎ' করিয়া বেত নামিল।—"আকবরের পিস্তেমশায় হ'ত; ভিন্সেণ্ট স্মিথের ঠাকুদ্দা রায় দিলেন···"—অন্য পিঠ-গুলাতেও শপাশপ্ শপাশপ্ আওয়াজ হইতে লাগিল। নবীন মাষ্টার গর্জ্জাইতে লাগিলেন—লক্ষ্মীছাড়া-সব পেটে বোমা মারলে হিষ্ট্রির একটা অক্ষর বেরোয় না—পৃথ্বীরাজ টিপু স্থলতান আর পিণ্ডারীদের একসঙ্গে লড়াই হচ্চে!—হিষ্ট্রির পিণ্ডিচট্‌কানো হচ্চে; এই রস্‌কে লক্ষ্মীছাড়া হচ্চে হারামজাদার জড়।—শপাৎ শপাৎ··

রসিকের কালো মুখ রাগে অপমানে যন্ত্রণায় তাঁবাটে হইয়া উঠিয়াছিল। উস্—উস্—করিয়া চোখ মুখ কুঁচকাইয়া মার খাইল। শেষ হইলে প্রচণ্ডভাবে একবার টিপুর দিকে চাহিয়া লইয়া দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, আমরা একটুও মারামারি করিনি; কে বলেচে ?

নবীন মাষ্টার হঠাৎ বেত বন্ধ করিয়া দিলেন, ডাকিলেন,—অন্তা।

অনন্তকুমার, অর্থাৎ আজকার টিপু স্থলতান, মাষ্টারকে শুনাইয়া,—আমায় এইখানটায় একটু বুঝিয়ে দাও তো ভাই—বলিয়া সবে পাশের ছেলের নিকট জিয়োমেট্রির একটা পাতা মেলিয়া ধরিয়াছিল; আহ্বানমাত্রেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল,—আজ্ঞে স্যা—র!

—এরা আজ মোটেই লড়াই করে নি ?

—করেছিল বই কি স্যার! আমি স্যার কত করে বুঝিয়ে বললাম স্যার—টিপিন পিরিয়ডটা কি ভাই হুড়োহুড়ি দাপাদাপি করবার জন্যে স্যার দিয়েচেন ?—তা আমার কথা স্যার······

আর শেষ করিতে হইল না, রসিক বাঘের মত একটা লাফ দিয়া অন্তার ঘাড়ে পড়িল এবং তাহার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চাপা কান্নার একটা "গি—গি" শব্দ করিতে করিতে কিল, চড়, আঁচড়ানি, কামড়ানি যা স্থবিধা পাইল তাই দিয়া নিজের আশ মিটাইয়া, মাথাটা ঝাঁকানি দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল এবং পলকের মধ্যে নবীন মাষ্টারের লাঠিটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া একদৌড়ে সদর রাস্তার উপর দাঁড়াইল! সেখানে দাঁড়াইয়া লাঠিটা খেলাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—আজ সমস্ত স্কুল একধারে আর রসিক একধারে—একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার যা হয় কিছু করব—চলে আয় অন্তা, মরদকা বাত হাথীকা দাঁত।

সমস্ত স্কুলটা বারান্দায় আসিয়া জড় হইল। শিক্ষকেরা "ধরে আন্ ছোড়াকে, ধরে আন্"—বলিয়া অনিশ্চিত-ভাবে হুকুম করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই আর বারান্দা হইতে নামিতে সাহস করিল না। দারোয়ান রামভজ্জু "হামি যাবে, হাল্‌মার্‌নাজিকে কিবুপাসে"—বলিয়া নামিয়া গট্ গট্ করিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইল। রাস্তায় বিছাইবার জন্য এক জায়গায় পাথর-ভাঙা জড় করা ছিল। "চলে আয়, এই তো মাংতা হ্যায়," বলিয়া রসিক সেইখানে গিয়া দাড়াইল। ···রামভজ্জু পিছনে দেখিতে দেখিতে তাড়াতাড়ি বারান্দায় ফিরিয়া আসিল। বলিল—ঐ ডাকু আছে; স্কুলের গাছের আমগুলো কে ঢিল মেরে লুকসান্ করিয়েসে বাবু ?—ওহি তো··

(২)

রসিকের এই প্রথম অপরাধ নয়, এবং এইটাই যে সবচেয়ে উৎকট তাহাও নহে। ছোকরা, পৃথ্বীরাজ,

টিপু সুলতান, শিবাজী, নাদির শাহ প্রভৃতি কয়েকটি দুর্দ্দম ঐতিহাসিক চরিত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী এবং যাহাদের ভূমিকায় এ যাবৎ যেসব দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার এক একটাতেই এক একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। সবাই ছেলেপুলে লইয়া ঘর করে, কাজেই সেসব ভীষণ ব্যাপারের উল্লেখ যত কম করা যায় ততই ভাল,—দুরন্তপনার আঁচ লাগিতে কতক্ষণ ?

রসিকের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল। তাহার পিতা গিয়া হেড মাষ্টারের হাতে ধরিলেন। নূতন লোক,—কড়া প্রিন্সিপলের, বলিলেন—অমন দুর্দ্দান্ত, বদমায়েস ছেলের নাম আর লেখা যেতে পারে না; তবে আমি Good characterএর certificate দিচ্ছি, অন্য স্কুলে আপত্তি করবে না। কি জানেন ?—ছেলেদের সত্যি কথা বল্‌তে উপদেশ দোব আর নিজেদের কথার কিম্বা ক্লাসের একটা…ইত্যাদি

রসিকের শিক্ষা-পর্ব্ব এইরূপে শেষ হইল। পিতা বলিলেন,—হতভাগাকে এবার এমন জায়গায় দোব যে উঠ্‌তে বস্‌তে বেত—উঠ্‌তে বস্‌তে বেত…

রসিকের ঠাকুরমা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—ওমা, কি অলুক্ষণে কথা গো!—ঢের বিদ্যে হয়েছে; কুলীনের ছেলে—এইবার বিয়ে দিতে আরম্ভ কর। তিনি বেঁচে থাক্‌লে এতদিন কটা বিয়ে যে…

রসিকের পিতা বলিলেন,—আরম্ভ কর মানে ? তোমরা কি ভেবেচ কুলীন বলে ছেলের গলায় দশ-বারটি বউ ঝুলিয়ে দোব ?—আমার চারটে মা, ছ'টা সেজ-খুড়ী, আর তিনটে নিজের পাপ পুষতে পুষতে নাজেহাল হতে হল; আবার ওপাঠ আমি পড়ি ? বিয়ে দোব সেই 'একে চন্দ্র';—তাও এখন ঢের দেরী।

রসিকের ঠাকুরমা তখন তিনটি পুত্রবধূ এবং তদনুরূপ নাত্‌নী নাত্‌বৌ সকলকে লইয়া একটা কড়া দল তৈয়ার করিয়া অষ্টপ্রহরই কান্নাকাটি সুরু করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম কর্ত্তার অগোচরেই এবং অবশেষে তাঁহার জ্ঞাতসারেই ঘটকিনী যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রথমটা কর্ত্তা রোষ এবং বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহার পর ঔদাসীন্য এবং অবশেষে ঘটকিনীর হাতের শাঁসাল কন্যাপক্ষের পরিচয় পাইয়া খোসামোদ সুরু করিয়া দিলেন।

শেষে একদিন, স্কুল ছাড়িবার মাস-তিনেকের মধ্যে এক জমিদার রায়সাহেবের কন্যার সহিত রসিকের শুভবিবাহ হইয়া গেল। মেয়েটি থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া; রসিকেরও বিদ্যার সীমা ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া সকলে বলিল,—বাঃ, এও এক রকম রাজ-যোটক!

জোড়ে গিয়া রসিক অন্যান্য উপহারের মধ্যে শালীদের তরফ হইতে যোগীন্দ্রনাথ বসুর একখানি পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য লাভ করিল। ছয় সাতদিন পরে যখন ফিরিয়া আসিল, কাব্যখানি হইতে বাছা বাছা অংশ তাহার অনেক কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। মাখনের সঙ্গে দেখা হইতে বলিল,—অ্যায়সা এক কেতাব পাওয়া গেছে রে!

মাখন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিল।

"তবে শোন"—বলিয়া রসিক বইটা হইতে খানিকটা গুরুগম্ভীর কবিতা গড় গড় করিয়া আওড়াইয়া গেল। শেষ করিয়া বুকটা চিতাইয়া অল্প অল্প হাসিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল; বলিল,—কেমন, রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে না ?

মাখন নিরীহ ভালমানুষের মত মাথা নাড়িয়া জানাইল—ওঠে।

রসিক বলিল,—বিকেল বেলায় আসিস্; সেইখানটায় গিয়ে দু'জনে পড়া যাবে,—রোজ। শ্বশুরবাড়ীতে বউয়ের সঙ্গে পড়তাম;—আগে সে চুপি চুপি কি একটা বই বের করলে—কি 'বিদ্যের' বই—তার বৌদি বিয়েতে উপহার দিয়েচে;—মোটেই ভাল লাগল না। তারপর দুজনে এইখানা পড়তাম; সমস্ত রাত কেটে যেত—তার তো আমার চেয়ে বেশী মুখস্থ হয়ে গেছে—খুব বিদ্বান ভাই—দেখতেও সবাই বলে বেশ—মাথায় তোর মতন হবে…

মাখন বলিল,—তোর সঙ্গে কথা কয় ?

রসিক বিস্মিতভাবে চাহিল।

মাখন জবাবদিহি-স্বরূপ বলিল,—বৌদি দাদার সঙ্গে কথা কয় না কি না।

রসিক বিজ্ঞের মত প্রায় উচ্চহাস্য করিয়াই বলিল,—

ওটা ওদের দিনের বেলা লোক ঠকান; রাত্তিরে সব বউয়েরা কথার জাহাজ—তোর বৌদিও, আমার বউও।··· বিয়ে কর্‌লে দেখবি এই রকম অনেক নতুন মজা আছে।

তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিল,—কিন্তু ভাই, গরিব রসিকের একটা কথা মনে রেখ,—যে-বাড়ীতে মেলা শালাজ আছে সেখানে বিয়ে কোরো না—আড়ি পেতে পেতে নাকাল করে মারবে···একদিন রাত্তিরে আমার রক্ত মাথায় উঠে গিয়েছিল,—একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার করেছিলাম আর কি—বউ পা দুটো জড়িয়ে ধরলে তাই রক্ষে।···শালাজ কাকে বলে জানিস্ তো?—হুঁঃ, তুই বেচারি আর কোত্থেকে জান্‌বি?—শালার বউ—ডবল প্রমোশন কি না, এক নম্বর দুষ্টু হয়।—তোদের নবীন মাষ্টারের বেতকেও হার মানাতে পারে···

নবীন মাষ্টারের নামে তাহার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল—অন্তা কোথায় রা? তাকে একদিন আচ্ছা করে গো-বেড়েন দিতে হবে, সেদিন তেমন জুত হয়নি···

এই রকম ভাবে পনের ষোল দিন কাটিল; একদিন রসিক চোখ নাচাইয়া বলিল,—তোদের রসিক যে কাঁদিয়ে চল্‌ল রে ছোঁড়া; একেবারে যার নাম বিলেত, শ্বশুর টাকা দিচ্চে—বলিয়া মাখনের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিবার জন্য চাহিয়া রহিল। একটু পরে তাহার কাঁধে একটা সখ্যতার চাপড় বসাইয়া হাসিয়া বলিল,—নারে না; তুই যে ভেবেই খুন। শ্বশুরের পয়সায় ছেলেকে বিলেত পাঠাবে, বাবা সে বান্দাই নয়; তা ভিন্ন আমরা না কুলীন?—সে কথা বুঝি ভুলেই গিছলি তুই?···শ্বশুর কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছে ভাই; বলে, এইখানে এসে পড়া-শুনো করুক, তারপর বিলেত গিয়ে···

মাখনের মনে অন্য একটা বিষয় তোলপাড় করিতেছিল, কহিল,—অন্তাকে মারবার একটু সুবিধে হয়েচে!

রসিক সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—কি রকম?

আমরা যেখানে বসে বই পড়ি, সে জায়গাটা টের পেয়েচে; আজ আসবে; আমায় বল্লে—বলে দিস্।

রসিক তাহার পিঠে তিন চারটা ছোট চাপড় দিয়া বলিল,—চট্ করে যা, সেইখানটায় কতকগুলো ইট ভেঙ্গে জড়···

মাখন বলিল,—সে রেখে এসেচি, আর নদী থেকে পাক তুলে রেখেচি—চোখের জন্যে—আর ভিজে মাটি আর বিচুটির ড্যালা।

রসিক বিস্ময় এবং প্রশংসায় চাহিয়া রহিল, ভাষা পাইল না যে মনের ভাবটা প্রকাশ করে।

গিয়া দেখিল, একটাও মিছা কথা নয়:—যুদ্ধের মাল-মসলা গাদি করা রহিয়াছে!

—কখন আসবে?—বলিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। বলিল,—বিলেতে যাবার আমারই কি ইচ্ছে নাকি তোদের ছেড়ে? বউটাও তাহলে বাঁচবে না।··· বউয়ের নাম 'অমলা'···বাবা বলেচে 'এ কটা মাস ঠাণ্ডা হয়ে থাকুক্, তারপর হেড মাষ্টারকে বলে-কয়ে নামটা লিখিয়ে দোব'খন—কেন শ্বশুরের পয়সায় বিলেত যাবে, আর কেনই বা শ্বশুরের ভাতে পড়ে থাকতে যাবে? তা আর ডাংপিটেপনা ছেড়েই দোব ভাবচি; শুধু একবার অন্ত্যাকে আচ্ছা—আ করে···

মাখন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, বলিল,—ঐ সব আস্‌চে।

একটা জঙ্গলের মোড় ফিরিয়া চার পাঁচজন ছেলে দেখা দিল—বিশ ত্রিশ গজ দূরে। দুএক জনের পকেট ভারী,—মাখন বলিল,—"ঢিল আছে।" অন্তা পিছনে ছিল, কহিল,—আরে মাখ্‌না যে!—এখানে!···তোমরা-সব দেখে রাখ ভাই—স্যার আমাদের অত করে একজনের সঙ্গে মিশ্‌তে···

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাশের একজনের মাথায় ঠকাস্ করিয়া একটা ঢিল সজোরে আসিয়া পড়িল। আর একজনের ঠোঁটের উপর একটা বিচুটিবাহক ঢেলা পড়িয়া একসঙ্গে যন্ত্রণা এবং কুটকুটনিতে অস্থির করিয়া দিল। অনন্তকুমার সুড়ুৎ করিয়া বনের আড়ালে সরিয়া পড়িয়াছিল, সেখান হইতেই বলিল,—তোমরা কেউ পিঠ দেখিও না—চালিয়ে যাও; আমি বাবার বন্দুকটা নিয়ে এলুম বলে···

রসিক উৎকট চীৎকার করিয়া তাহাকে তাড়া করিতে

তাহার ডান পায়ে একটা আদ্ধা ইট আসিয়া পড়িল—তাহারও উপর অগ্রসর হইতে একটা ঢিলে কপালটা ফাটাইয়া দিল।·· বিপক্ষদল অনন্তকুমারের পথ ধরিল।

রসিক নিজের কাপড়টা ছিঁড়িয়া মাখনকে বলিল,—"বেঁধে দে।" তাহার পর তাহার কাঁধে ভর দিয়া খোড়াইতে খোড়াইতে বাড়ী চলিল। পথে বলিল,—অন্তা হারামজাদা খুব সটকে পড়ল···

*　　*　　*　　*

বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। রসিকের বাপ বলিলেন,—নাঃ, ভেবেছিলাম হতভাগাকে ঘরজামাই হতে দোব না; ওর কপালে শ্বশুরবাড়ীর ঝাঁটা লেখা আছে তার আমি কি করব? কাল পর্য্যন্ত ওর শ্বশুরের চিঠি এসেচে—আমি কাটান দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আর না—দোব বিদেয় করে—থাক্ সেখানে গিয়েই থাকুক্ আর গ্রামের ত্রিসীমেয় ঢুকতে দোব না···

ঠাকুরমা কান্নার আওয়াজ চড়াইয়া বলিলেন,—ওরে তারা যে বিলেত পাঠিয়ে খেরেস্তান করে আমার অমন সোনারচাঁদকে পর করে দেবে রে—আমার বুড়া বয়সে কি শেষে এই দুগ্‌গতি ছিল—আজ তিনি বেঁচে থাকলে তোরা এমন কথা কি মুখে আন্‌তে পারতিস্···

এক সৎমা বলিলেন,—তার চেয়ে বউকে নিয়ে এস বাপু,—ছেলে ঠাণ্ডা থাকবে'খন, ডাগর বউ···

অন্য সৎমা পরামর্শ দিলেন,—কিম্বা আর একটি বিয়ের কথাবার্ত্তা সুরু করে দাও না কেন?—ছেলে একটু অন্যমনস্ক থাকবে'খন।—সেই রাণাঘাটের মেয়েটি আমার যেন চোখে লেগে আছে··

রসিকের মা কিছু বলিলেন না;—শুধু অশ্রুজলের তর্ক চালাইয়া গেলেন।

কিন্তু কোন ফল হইল না। কপালের ঘা-টা সারিয়া গেলে শ্বশুরবাড়ীর যাত্রী হইয়া রসিক রেলগাড়ীতে সওয়ার হইল। গাড়ীটা ঠিক ছাড়িবার সময় মাখন প্লাটফারমের একটা কোণ হইতে সজল নেত্রে মৌনভাবে আসিয়া গাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। রসিক চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাসিয়া বলিল,—কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?—তাহার পর চাপা গলায় ডাকিল,—শোন্।

মাখন কাছে আসিলে চুপিচুপি বলিল,—শীগ্‌গির ফিরে আস্‌চি;—শিবাজী সন্দেশের চেঙারির মধ্যে কেমন বাদশাকে কলা দেখিয়ে পালিয়েছিল—মনে নেই?—বলিয়া মাখনের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

মাখন এই সঙ্কেতের গূঢ় অর্থটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইল।

(৩)

রসিকের শ্বশুর রায়সাহেব পান্নালাল রায়চৌধুরী জমীদার এবং কোটপ্যাণ্টধারী বাদ দিয়া আর সবার কাছেই প্রবল প্রতাপান্বিত। রাজ-সম্মানের একটা ফসল তুলিয়া আবার জমীতে সার দিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের শ্যালক সম্প্রতি ভারতে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার একটা হিল্লে করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব লাভ করিয়া একটু চিন্তান্বিত আছেন। সাহেব বলিয়াছেন—লোকটি বরফের উপর স্কেটিং করিতে ইংলণ্ডে অদ্বিতীয়। আর কোন গুণ আছে কিনা সাহেব নিজেও বলেন নাই এবং রায়সাহেবেরও প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই। স্ত্রীপুত্র, আমলা-গোমস্তা, দাসদাসী সকলের উপরই তিরিক্ষি হইয়া ক্রমাগতই ভাবিতেছেন—বরফের ওপর স্কেটিং করে, এমন লোককে কোথায় বসান যায়। ইতিমধ্যে বেহাইয়ের পত্র আসিল—তিনি রাজি, রায়সাহেব তাহার জামাইকে যেরকম ভাবেই না কেন শিক্ষা দান করেন—বিলাতে পাঠাইয়াই হোক্, কিম্বা বাড়ীতে রাখিয়াই হোক্···

রায়সাহেবের বিলাতে পাঠানই ইচ্ছা ছিল। জামাই সেখান হইতে একটা কেওবিষ্টু হইয়া আসিলে, মেয়েদের জিদে, কুলের খাতিরে অপদার্থ জামাই করার অপবাদ তো তাহার মিটিবেই, চাই কি ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলে ঐ বিলাত-ফেরৎ জামাইয়ের জোরেই শেষ বয়সে একটা শাঁসাল গোছের খেতাব লইয়া মরিতে পারিবেন।·· ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গিয়া বলিলেন,—হুজুর আপাততঃ তো আমার হাতে কোন কাম নেই যা মিষ্টার আইডেনের বহুমুখী প্রতিভার উপযোগী হ'তে পারে।—তবে ভাবছি জামাইটি আপনাদের 'হোমে' পাঠাব। মিঃ আইডেন যদি অনুগ্রহ করে তাকে একটু একটু ইংরেজি শিক্ষা দেন

এবং বিলাতি আদব-কায়দায় একটু তালিম দেন তো মস্ত একটা উপকার হয়। আপনারা রাজার জাত, আমি আর কি প্রতিদান দিতে পারি? তাঁকে আমার বাগান-বাড়ীটা ছেড়ে দোব, পান তো খান না—সিগারেট খাবার জন্যে মাসে শ' তিনেক ক'রে দোব—একটা মোটর গাড়ী চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর অধীনে থাকবে—আর—আর চণ্ডীমণ্ডপটা পরিষ্কার করে রাখব, শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধান আছে, ইচ্ছে হলে স্কেটিং খেল্‌বেন।—হতভাগা বাঙলা দেশে বরফ জমে না—এসে পর্য্যন্ত তাঁর স্কেটিংএর জন্য অসুবিধেই না হচ্চে; উচ্ছন্ন যাক্ এমন দেশ; গ্রীষ্মকালে একটু খাবার জলই পাওয়া যায় না তো আবার বরফের মাঠ!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন যে, রায়সাহেবের বন্ধুত্বই তাহার পরম মূল্যবান সামগ্রী—তিনি তাঁহার কোন প্রস্তাবেই আপত্তি করিতে পারেন না এবং আশা করেন তাহার শ্যালক মিঃ আইডেলও তাঁহার খাতিরে সম্মত হইবেন; তবে যেমন সিগারেট খাইবার জন্য রায়সাহেব তিনশত দিবেন বলিলেন, সেইসঙ্গে খানা প্রভৃতির জন্যও যদি আরও শ'খানেক ধরিয়া দেন তো মিঃ আইডেলকে রাজি করা সহজ হইয়া পড়িবে।

রায়সাহেব এটা তাঁহার পরম সৌভাগ্য মানিয়া লইলেন। আসিবার সময় শেকহ্যাণ্ডের পর গোটা দুইতিন আভূমি দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া বলিয়া আসিলেন,—হুজুর গোলাম বার্থডে অনার্স লিষ্টে এবার একেবারেই বাদ পড়ে গেল। সামনে নূতন বৎসরের খেতাব বিতরণ আসছে—আপনারই হাতে সব।

রসিকের তালিম সুরু হইল। শ্বশুর বলিলেন,—বাবাজি, একটু তাড়াতাড়ি সাহেবের কাছে কিছু ইংরেজি লেখাপড়া আদায় ক'রে নাও। যত শীগ্‌গির নিজের কাজ গুছিয়ে নিজেকে বিলেত যাবার যুগ্যি ক'রে নিতে পার ততই ভাল। অন্য মাষ্টার রাখলেও চল্‌ত, একটা খাতিরে প'ড়ে এ মাস গেলে পাঁচ-শ টাকার ধাক্কায় পড়ে গেছি।

রসিকের বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল না। সমস্ত রাত নববধূর সঙ্গে কাব্যচর্চ্চা করে—সমস্ত দিন ধরিয়া বধূটি ঘুমাইয়া কাটায় আর বরটি শিক্ষকের কাছে বসিয়া ঢোলে। শিক্ষক বিলাতের নূতন উৎসাহ লইয়া দিন-কতক খুব চেষ্টা করিল। ছাত্রকে ইংরেজি শিক্ষা দিবার সুবিধার জন্য নিজে খানিকটা বাঙলাও শিখিয়া ফেলিল। কিছুই ফল হইল না। তখন সে আরাম-কেদারায় পা তুলিয়া দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সিগারেট টানিতে সুরু করিয়া দিল। মনে হইল যেন তিন-শ' টাকার শেষ আদলাটি পর্য্যন্ত ধুঁয়ায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া দিবে।

কথাটা যখন জানাজানি হইয়া গেল, রসিক-দম্পতিকে বিভক্ত করিয়া আলাদা আলাদা দুইঘরে জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। বধূটির বড় লজ্জা এবং একটু দুঃখ হইল, এবং রসিকের হইল রাগ। কয়েকদিন পরে যখন ওর লজ্জার জড়তা এবং এর রাগের বেগটা অনেকটা কাটিয়া গেল, তখন গোপনে পত্রাচার আরম্ভ হইল। তাহাতে আমাদের ঘরোয়া আটপৌরে প্রেমের হাহুতাশ বড় থাকিত না,—এদিক থেকে থাকিত বই-থেকে-তোলা পৃথ্বীরাজের বীরোচ্ছ্বাস আর ও-তরফে ক্ষত্রিয় কুমারী সংযুক্তার অগ্নিময়ী বাণী!

এও একদিন অন্তঃপুরের গোয়েন্দাদের হাতে পড়িয়া গেল। শ্বশুর ভাবিলেন, এতো ভালা বিপদে পড়া গেল! রসিককে ডাকিয়া বলিলেন—বাবাজি, আমি বল্‌ছিলাম তুমি গিয়ে না হয় বাগান-বাড়ীর একধারে সাহেবের সঙ্গে থেকে বিদ্যা অর্জ্জন কর;—এইটিই আমাদের সেই ঋষি-মুনিদের আমলের সনাতন প্রথা কিনা।

রসিক মুখ গোঁজ করিয়া গিয়া বাগান-বাড়ীতে উঠিল এবং সেইদিনই তাহার নিজের সনাতন প্রথায় প্রথমে সাহেবের খানসামা ও পরে খোদ সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া একটা রীতিমত ফ্যাসাদ বাধাইয়া অন্তর্দ্ধান হইল।

—তাহার মানে, সেখানে অন্তর্দ্ধান হইয়া স্বগৃহে আসিয়া আবির্ভূত হইল।

পিতা আগুন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—এক্ষুনি বেরুক্ ও বাড়ী থেকে,—কার হুকুমে আবার বাড়ীতে এসে ঢুকেছে!

মেয়েরা-সব রসিককে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুরমা রসিককে বুকে চাপিয়া, চক্ষের জলে স্নান করাইয়া বলিলেন,—ষাট্, বাছা আমার! জেলার মাচিষ্টেকের শালাকে একটু চটিয়ে ফেলেচে; যদি বুদ্ধি ক'রে ঘরে না পালিয়ে আস্‌তো তো এতক্ষণ যে হাজতে গিয়ে উঠত,—আমার সেকথা ভাবতেও যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আজ তিনি বেঁচে থাক্‌লে কি তোরা এমন কথা বল্‌তে পারতিস্?

দরদীদের দলের মধ্যে পড়িয়া রসিকেরও চক্ষু ডব ডব করিয়া উঠিয়াছিল; ঠাকুদ্দার উল্লেখে চাপা আবেগে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ঠাকুদ্দা বেঁচে থাক্‌লে?—ঠাকুদ্দা বেঁচে থাক্‌লে আজ শ্বশুর ব্যাটার সঙ্গেও একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার করে আসতাম—হ্যাঁ...

অবশ্য 'এস্‌পার কি ওস্‌পার' কিছু একটা হয় নাই বলিয়া রসিকের নিরাশ হইবার কোন কারণ ছিল না। শ্বশুরবাড়ীতে হুলস্থুল এবং ক্রমে সারা জেলাতেই একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। জেলার চুনোপুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত যত সাহেব ছিল সকলের নিকট দরবার করিয়া রায়সাহেবের পায়ের সূতা ছিঁড়িল। শেষকালে আইডেল সাহেবকে চার হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিরাগ এবং খেতাবের উপর ফাঁড়াটা কাটাইয়া ছিলেন। টাকাটা গণিয়া দিয়া বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন,—আজ থেকে অমলি বিধবা হ'ল; কেউ যেন আমার সামনে জামায়ের নাম পর্য্যন্ত না মুখে আনে।

দিন-দুইতিন পরে কুটুম্বিতা বজায় রাখিবার জন্য রসিকের পিতা পুত্রের আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া একখানি পত্র দিয়া লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন। লোকটা উত্তম-মধ্যম কয়েক ঘা খাইয়া গালি দিতে দিতে ফিরিয়া আসিল, বলিল,—বল্‌লে আমার মেয়েও নেই, জামাইও নেই,—নিকালো হিঁয়াসে—নিকালো!—ওঃ সে কি গর্জ্জন—তারপরেই এই চোরের মার, কর্ত্তা-মশাই......

সকলে ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। শুধু ঠাকুরমা 'তিনি' বাঁচিয়া থাকিলে এ-অবস্থায় কি করিতেন নির্ণয় করিয়া সমস্যাটা সমাধান করিয়া দিলেন, কহিলেন,—মিন্সের নাকের ওপরে ছেলের বিয়ে দাও; কুলীনের ছেলের আবার বৌয়ের ভাবনা কি গা?...কি দাদা, বিয়ে করবি তো?

রসিক, বৌ যে কি বস্তু খানিকটা স্বাদ পাইয়াছিল, একটু হাসিয়া ঘাড়টা কাৎ করিয়া জানাইল, সে খুব রাজি।...'পেসাদী' ঘটকিনীর দেমাকী চালে বাড়ীটা আবার টলমল করিতে লাগিল।

রসিক কিন্তু নিজের অন্তরকে ভুল বুঝিয়াছিল। দুরন্ত হাঁদা গোবিন্দ গোছের ছেলে,—কিই বা সে অন্তরের মত সূক্ষ্ম জিনিষের খোঁজ রাখে? যে-ভাবটা যখন মনের উপর স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেইটার উপর তাহার বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া দেওয়া তাহার ধর্ম্ম। নূতন যখন বিরহ হইল সে দেখিল, বৌ নামক একটা বিস্তর সুবিধাজনক পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে—ঘাড়টা বাঁকাইয়া একেবারে কাঁধের উপর ফেলিয়া জানাইল—হ্যাঁ, বিবাহ করিবে বৈ কি! এবং তাহার দাম্পত্য জীবনে নানান ঝঞ্ঝাট বাধাইত এমন-সব অপ্রয়োজনীয় কি অল্প প্রয়োজনীয় লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিল,—কিন্তু দেখ ঠাকুমা, এ শ্বশুরবাড়ীতে যেন মেলা কেউ না থাকে —এই শালী-শালাজ এরা সব—

কিন্তু কথা হইতেছে যে দাম্পত্যের দেবতাটি ক্রমাগত মারপেঁচের মধ্যে দিয়াই নিজের অধিকারটি সাব্যস্ত করিয়া যান, সুতরাং তিনি যে রসিক এবং রসিকের পিতামাতা ঠাকুরমা প্রভৃতির সুবিধার জন্য রসিকের মনে আগাগোড়া একটা ভাবই কায়েম করিয়া রাখিবেন, এমন আশা করা নিতান্তই ভুল। সেইজন্য, যখন বিবাহের কথাটা বেশ পাকা হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়টিতে রসিকের মনে এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বধূমাত্র হইলেই তাহার চলিবে না। তাহার অমলাকেই চাই, বিশেষ করিয়া—নিতান্তই এতদিন শুধু বধূর অভাব ছিল—একটা শূন্যতা মাত্র। আজ দেখিল অভাবটা আসলে অমলার অভাব,—শূন্যতাটাও বেদনায় ভরিয়া উঠিল, যা তাহার পক্ষে একেবারেই নূতন।

প্রথমে ভালমানুষের মত একটু ওজর-আপত্তি করিল। লোকে বলিল, "তবু ভাল।" ঠাকুরমা বলিলেন,—একটু লজ্জা হয়েচে আর কি, ওটা কেটে যাবে'খন। এক কথাতেই রাজি হয়েছিল বলে ওকি আমার তেমনি বেহায়া গা ?

গায়ে হলুদের দিন রসিক একেবারেই বাঁকিয়া বসিল। যখন তাহাকে অত্যধিক প্ররোচনা এবং ভয় প্রদর্শনের দ্বারা সোজা করিবার চেষ্টা করা হইল, সে গায়ে হলুদের সমস্ত সরঞ্জাম ফেলিয়া ছড়াইয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।··কর্ত্তার গর্জ্জনের সঙ্গে মেয়েদের কান্না মিলিয়া উৎসবের বাড়ীতে একটা বীভৎস কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুরমা নাতনী এবং নাতবৌদের একত্র করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আমি ওর এতটুকু বয়স থেকেই বলে আসচি ও ঠিক তোদের দাদামশায়ের মত হবে :—তাঁর ছিল বটে ছ'-ছ'টা বিয়ে—কি করবেন, কুলীনের ছেলে—কিন্তু এই পেরথোমটার ওপরই সে কি পোড়া টান ছিল···

(৪)

একটা নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া রসিক একখানা চিঠি পড়িতেছিল ; মাখন আসিয়া নিঃশব্দে পাশে বসিল। বলিল,—চৌধুরীরা খুব গাল পাড়চে।

রসিক চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্নের ভাবে মাখনের দিকে চাহিল। সে সংক্ষেপে বলিল,—কাল নষ্টচন্দ্র ছিল কিনা···

—ওঃ, মনেই ছিল না ;—কাল বিকেলে এই চিঠিটা পেলাম কি না··· এ বছরটা আমার ফাঁকই গেল ;—কি কি লোকসান্ করলি ?

—দু' কাঁদি কলা, একটা ফলুন্তে কুমড়ো গাছ, আর পাতকুয়োয় কেরাসিন তেল।

—মন্দ হয়নি ; ওদের অনেকগুলো কাঁচা ইটও পোড়াবার জন্যে সাজান রয়েচে—যাক্, আমার আর এবছর মনেই ছিল না।···বউ একটা চিঠি দিয়েচে, শোন্—'প্রিয়তম প্রাণেশ্বর'—বেশ বাঙ্গালা জানে, না ?

মাখন ঘাড় নাড়িল।

"প্রিয়তম প্রাণেশ্বর, তুমি গিয়েচ পর্য্যন্ত আমার যে কি করেই কাটচে তা অন্তর্যামীই জানেন। দাসীকে কি এমনি করেই পায়ে ঠেলে যেতে হয় ? কোন্ গুরু-অপরাধে অপরাধিনী আমি ? কত জন্মের পুণ্যের ফলে তোমা হেন পতি লাভ করলাম, কিন্তু কি পাপে আমি সে ধনে বঞ্চিত হলাম ? আমার প্রাণে অহরহই বিরহের আগুন জ্বলছে, কিন্তু সে আগুন নিবুবার কেউ নেই—বোন ভাজ আর ছোট ভাইয়েরা সবাই বৈরী, খালি চিঠি লিখ্‌ছি কিনা ভেতরে ভেতরে সে সন্ধান। আমি তো এ-চিঠি বাটী হইতে লিখিতেছি না, অখিলদা'দের বাটী হইতে। অখিলদা'র বৌয়ের সঙ্গে খুব ভাব হইয়াছে। নাম শরৎকুমারী। তুমিও তারই ঠিকানায় চিঠি দিও আমায়, সে আমায় দিয়ে দেবে। বাড়ীর ঠিকানায় কখনও চিঠি দিও না। আমরা দুজনে মিলে আজকাল পৃথ্বীরাজ পড়চি। আমার অনেক মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। অখিলদার বউ বলে—অখিলদা নাকি বলেন তুমি খুব সাহসী বীরপুরুষ। অখিলদা নিজে বড্ড স্বদেশী কিনা। কিন্তু হায় পোড়া অদৃষ্ট আমার, আমি বীরজায়া হইতে পারিলাম না। মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল, পিতা বিমুখ, বিধি বাম। এ পিতৃগৃহ আমার পক্ষে কারাগার হয়ে পড়েচে। হায় স্বামিন্, পৃথ্বীরাজ যেমন সংযুক্তাকে বীরদর্পে তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া বিশ্বজগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তুমি কি আমায় সেইরূপ করিবে না ?

তা বলে তুমি যেন সত্যিসত্যি অমন কিছু করতে যেয়ো না বাপু, হ্যাঁ। আমার বড্ড ভয় করে। যেদিন অমন মারধোর করে চলে গেলে সেদিন আমার যে কি ভয় করেছিল।

শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম নিও। এখন তবে ৮০

ইতি

তোমার শ্রীচরণের জন্মজন্মের দাসী

শ্রীমতী অমলাবালা দেবী।"

—বেশ হয় কিন্তু তা'হলে, না ?

—কি ?

—এই পৃথ্বীরাজের মত শ্বশুরবাড়ী থেকে কেড়ে নিয়ে আসা।

—হুঁ

—কিন্তু ঘোড়া পাব কোথায়?

—আমার বাবা যেটাতে চড়ে রুগী দেখ্‌তে যান,তাতে হবে না? বাবা তো বাতে ভুগ্‌চেন।

—দূর, তার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হয়; শেষকালে তাড়া খেয়ে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা হুড়মুড় করে পড়ে মরব?—তা ভিন্ন চড়্‌বার পর তার রাশ ধরে খানিকটা টেনে নিয়ে যেতে হয়, তবে চলে।

—তা বটে, তবে দুজনের জায়গা বেশ হত; পেটটা বেশ মোটা আছে, আর পিঠটা খুব নীচু।

—আমি একটা উত্তর লিখেচি।—নে, পড়-দিকিন, পরের মুখে শুনি কি রকম হ'ল। তোদের ঘোড়ার কথাও আছে।"

মাখন পড়িতে লাগিল—প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী অমলা বালা আমার শতসহস্র চুম্বন গ্রহণ ক'রো…

রসিক টীকা করিল—দূর থেকে তা' হয় না বটে; কিন্তু আমার পিস্‌তুতো মেজদা'কে গোড়াতেই ঐ রকম লিখতে দেখেচি। মরুকৃগে, পড়্‌।

—"আমাকে বীর বলে লজ্জা দিও না, তবে সেদিন আরও অনেককে ঠেঙ্গাবার ইচ্ছে ছিল। আমার সঙ্গে যদি মাখন থাক্‌ত তো দেখতে; তাকে তুমি চেন না।"

রসিক বলিল—তোর কথাও লিখে দিলাম।

—"আগে বেশ ছিল। সবাইকে মেরে-ধরে যুদ্ধ করে বিয়ে করে আন্‌ত। তাতে শ্বশুরবাড়ীতে জ্বালাতন করবার লোকও অনেক কমে যেত। কিন্তু আজকাল অন্য রকম হয়ে গেছে। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তা না থাকৃগে। বাবা বলেন, নিজের বউ নিজের ঘরে নিয়ে আস্‌ব. তাতে আদালত আমাদের দিকে। সেখানে রায়সাহেবী খাটবে না, হ্যাঁ। তোমার যেমন সংযুক্তার মত হতে সাধ যায়, আমারও ঠিক তেমনি পৃথ্বীরাজের মত তোমায় নিয়ে অশ্বারোহণে বীরদর্পে মেদিনী কম্পিত করিয়া পালিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোন সুবিধে নেই। মাখনের বাবার একটা ঘোড়া আছে। তার পিঠে চড়লেই কিন্তু সাম্‌নে পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে পেছনে হঠ্‌তে আরম্ভ করে। তখন জিব দিয়ে টকাস্‌ টকাস্‌ করে একরকম শব্দ করতে হয়, তা আমার ভাল আসে না। আচ্ছা অমলা আমি যদি একটা ভাল ঘোড়া যোগাড় করি তো আমার সঙ্গে পালিয়ে আসবে তো? আগেকার মেয়েরা আগুনে পুড়ে মরত, আর তুমি এটুকু পারবে না? বাবা আমার আর-একটা বিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি করিনি। আমি তোমায় ভয়ানক ভালবাসি। আমারও বিরহানলে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ঠাকুমা খালি মাঝেমাঝে সান্ত্বনা দেন। শীঘ্র পত্র দিবে। আমার চিত্তচকোর বড় ব্যাকুল হইয়াছে। ইতি

জন্ম জন্ম তোমারই"

রসিক আবার একটু টীকা করিল—চিত্তচকোর এক-রকম পাখী—শেষকালেই ঐরকম লিখতে হয়।…বেশ হয়নি লেখাটা?

মাখন বলিল,—হুঁ।

তাহার পরদিন বেশ করিয়া এসেন্স মাখাইয়া পত্রখানি ডাকে দিয়া দুই তিনদিন অতীত হইতেই রসিক গিয়া পোষ্ট আপিসে হাজরি দিতে লাগিল। মাসখানেক নিয়মিতভাবে গেল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তখন নিরাশ হইয়া দিনকতক যাওয়াই ছাড়িয়া দিল; তাহার পর আবার আশায় বুক বাঁধিল। এই রকম করিয়া আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে অনেক দিন কাটিয়া গেল—দু'মাস চারমাস—পাঁচমাস কাটিয়া গেল—কোন উত্তরই নাই। রসিক ক্রমাগতই বধূকে উদ্দেশ করিয়া মাখনের কাছে বলিতে লাগিল—আর একমাস—আর পনের দিন—আর একহপ্তা দেখব, তারপর ধাঁ করে বিয়ে করে বস্‌ব, এই তোকে বলে রাখলাম মাখনা।

ঠাকুরমা তাহার পিতাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন—ছেলে যে এদিকে কালী হয়ে গেল, একটা হেস্তনেস্ত কিছু কর্‌।—তিনি বেহাইকে তিন চারখানা পত্র দিলেন প্রথমে খুব মিনতির ভাব, ক্রমে ক্রোধ এবং পরে কন্যার উপর নিজের দাবী সাব্যস্ত করিয়া। কোন জবাবই আসিল না।

রসিক শেষকালে হার মানিয়া একদিন মাখনের সঙ্গে

...রামর্শ করিতেছিল তাহাকে মালিনী সাজাইয়া, কিংবা ভিখারী বালক সাজাইয়া বধূ-সকাশে কি করিয়া পাঠান যায়, এমন সময় তাহার ছোট বোন হাতে একটা চিঠি লইয়া আসিয়া বলিল—বকশিস্ দাও।

রসিক আগ্রহভরে তিন-চারবার চাহিল, তাহার পর পুরস্কারস্বরূপ তাহার গালে একটা প্রচণ্ড চড় বসাইয়া চিঠিটা কাড়িয়া লইল। লেখা ছিল—

জীবিতেশ,

কোথা হইতে পত্র দিতেছি তুমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে না। তোমার প্রেমাবেগপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আমার সেই হৃদয়ের নিধিকে সযতনে বাক্সে বন্ধ করে রেখেছিলাম। তিন দিন ছিল। তার পর চুরি যায়। তাহার পর বাড়ীতে হৈ হৈ পড়ে যায়। তোমার সুধামাখা লিপিখানিতে ঘোড়া পৃথ্বীরাজ আর পালাবার কথা ছিল কি না সেই হ'ল কাল। বাবা বললেন, ভ্যালা পাপতো, এটারও মাথা খেয়েচে? স্থির হোলো আমি গিয়ে মামার বাড়ী থাকবো। এখানে দু'কোশের মধ্যে পোষ্টাপিস নেই আর কড়া পাহারা। আমার কাগজ কালি কলম টিকিট সব কেড়ে নিয়ে একবস্ত্রা করে এই দ্বীপান্তরে দিয়েচেন। সবাই বলে, তবে অমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে গেলেন কেন বাপু? আমি মনে মনে বলি, তোমরা সে যে কি ধন কি করে জানবে? হায় নাথ, এই পাঁচ মাস তের দিন যে কি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করচি, কে সেই অন্তরের গূঢ় মর্ম্মবেদনা বুঝিবে? তোমার জন্যে প্রাণ সর্ব্বদাই হুহু করিতে থাকে। শেষকাল আজ পাঁচমাস তেরদিন পরে আমার মামাতো বোন শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে দেখে তাহার হাতে-পায়ে ধরে এই চিঠিখানি ফেলে দিতে বললাম। তার মত ধরাধামে আজ সুখী কে? আমারও ইচ্ছে হচ্ছে আজ লজ্জাসরম মান-অপমান জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার কাছে ছুটে যাই। নারীর হৃদয় তুমি কি বুঝিবে সখে?

বাবা নূতন বছরে কোন খেতাব পাননি বলে তোমার ওপর ভারি চটে আছেন। বার্থডে লিষ্টের আশায় আছেন। এই ঝোঁকই হয়েছে কাল, কি যে লাভ এতে? এইসবের জন্যে সাহেবদের এবার একটা মস্ত ভোজ দেবেন ইংরেজি মাসের তের তারিখে, শনিবার। খুব ঘটা হবে। আমায় শুনচি দিনকতকের জন্যে সেই উপলক্ষে নিয়ে যাবেন। অহো, এইটে যদি আমার স্বয়ংবর-সভা হোত, আর পৃথ্বীরাজের মত বাবা তোমার একটা মূর্ত্তি গড়ে দারোয়ান করে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন আর অমনি আমি মালা নিয়ে সভার আর কারোর দিকে না চেয়ে সটাং গিয়ে তোমার মূর্ত্তির গলায় মালা দিয়ে দিতাম আর অমনি হৈ হৈ পড়ে যেত আর তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমায় ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পালাতে। আজকাল ঘোড়ার চেয়ে মটরে ঢের সুবিধে। না বাপু, তোমায় এসব লিখতে সাহস হয় না। একটা কাণ্ড করে বসবে আবার। তবে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। একবার কি এখানে আসতে পারবে না। আমি সেইদিন আমাদের পশ্চিম দিকের খিড়কির দরজার কাছে রাত সাড়ে সাতটার সময় দাঁড়িয়ে থাকবো। অন্ধকার রাত্রি। বাড়ীর আর সবাই তামাশা দেখবে আমি একটা ছুতো করে সরে পড়ব। দোহাই তোমার, একবার এস, সুধু একবারটি। এসো, এসো, এসো এই তিনবার বল্‌চি। আবার তো সবাই আমায় এই বনবাস দেবেই।

তুমি চিঠির গোড়ায় শত সহস্র যে জিনিষের কথা লিখেছিলে তা আমারও ইচ্ছে হয়, কিন্তু লিখতে বড় লজ্জা করে, যাও। যদি আস তো যত চাও দোব। কেউ যেন টের না পায়। আমার কোটি কোটি প্রণাম নিও। এখন তবে ৮০

ইতি তোমার শ্রীচরণের জন্মজন্মের দাসী
শ্রীমতী অমলাবালা দেবী

রসিক অনেকক্ষণ মৌনভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার পর অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া—আজ ক' তারিখ রে?

মাখন হিসাব করিয়া বলিল—তোরসু মাইনে দিয়েচি —৭ তারিখে; ৮—৯, আজ ১০ তারিখ।

রসিক আরও নিবিষ্ট মনে খানিকটা ভাবিল, তাহার পর বলিল,—ও মেয়েমানুষ কি বুঝবে? ঘোড়া হলে

খুব মানাতো,—খটাখট্ খটাখট্ ক'রে তুজনে এক ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটেচি—সে এক দেখতেই···

আর একটু পরে বলিল—মোটর চালাতেও আমার খুব অব্যেস হয়ে গেছে—শ্বশুরবাড়ীতে ঐ কামই কর্ত্তাম কিনা সমস্তদিন।···মোটরের কথা তোর আমার মাথায়ই ঢোকেনি; বৌ মেয়েমানুষ হলেও কি রকম বুদ্ধি দেখেচিস্?

তুটি হাঁটুর ওপর থুতনিটা চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ উৎসাহভরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—হয়েছে রে, যাব; একটা আয়সা মতলব এঁটেচি। তোকে বলব'খন।···কাল বিকেলে—সেইখানে।"

* * * *

তের তারিখের সন্ধ্যা উতরাইয়া গিয়া বেশ গা-ঢাকা গোছের অন্ধকার হইয়াছে। সাঙ্কেতিক পশ্চিম দরজার কাছে গিয়া রসিক দাঁড়াইল। সমস্ত লোক উৎসবের দিকে; ওদিকটায় একেবারে কেউ নেই।

দরজা খুলিয়া রঙীন কাপড়-পরা একটি কিশোরী মূর্ত্তি উঁকি মারিয়া আবার দরজাটা একটু ভেজাইয়া দিল। রসিক আরও খানিক অগ্রসর হইয়া বলিল—এসো, এসেচি।

কিশোরী বাহির হইয়া আসিল। চোখোচোখি হইতেই রসিক হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি কিন্তু চোখ নত করিল এবং একটু পরে তাহার বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল ও চাপা-কান্নার আওয়াজ হইতে লাগিল।

রসিক বলিল,—তবে চল্‌লাম; এইজন্যে আমি মেয়েমানুষকে তুচক্ষে দেখতে পারি না···

মেয়েটি ফোঁপানর মধ্যে বলিল,—কি বল্‌চ?

—মামার বাড়ী বড় না শ্বশুরবাড়ী বড়?

—শ্বশুরবাড়ী।

—তা'হলে এগিয়ে এস। মোটর ঠিক করে রেখেছি। ড্রাইভার ব্যাটা তামাশা দেখ্‌চে। দেরী করোনা, ভেস্তে যাবে।

মেয়েটি এবার ভীতভাবে মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রসিক কোমর হইতে একটা ঝকঝকে ছোরা বাহির করিল, বলিল—তা হলে এই দেখ; তোমার সামনে নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দেব, আর ভূত হ'য়ে ওদিকে গিয়ে একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার ক'রে ছাড়ব···

বধূটি ভয়মুগ্ধভাবে চাহিয়া পা বাড়াইল। রসিক তাহার হাতটা ধরিয়া তুজনে খুব সন্তর্পণে মোটরে আসিয়া উঠিল এবং এতক্ষণ পরে বধূকে একটা চুম্বন করিয়া মোটর ছাড়িয়া দিল। বলিল—ভয় নেই, আমায় জড়িয়ে বস।

যেখানে উৎসব হইতেছিল তাহার সামনে দিয়াই রাস্তা। রসিক গলা বাড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল—চল্‌লাম নিয়ে।

প্রথমটা সবাই হতভম্ব হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—

ধর্—ধর্—সাজ্—সাজ্—রব পড়িয়া গেল। তুই তিনটা ঘোড়া, একখানা মোটরকার আর লোকের পাল ছুটিল; কিন্তু রসিককে তখন আর পায় কে?······ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইলের রাস্তা একদমে পার হইয়া একেবারে বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিজে বাড়ীর মধ্যে হন্ হন্ করিয়া ঢুকিয়া, একটা ঘরে খিল দিয়া ভিতর হইতে বলিল—ঐ এনে দিয়েচি সদর দোরে. দেখগে সব।



আফগান সওদাগর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



শিবাজীর কীর্ত্তি

যাঁহারা দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন, নূতন পথ দেখাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই শিবাজীর স্থান। তাঁহার জন্ম সুদূর দরিদ্র মহারাষ্ট্রে; ধন-সম্পদ, লোক এবং বিদ্যাবল, অতি সামান্য লইয়াই তিনি রণক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন। তখন মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অতি প্রবল; ভারত-ইতিহাসের গগনে প্রখর সূর্য্যের মত দেদীপ্যমান; তাহার অন্তরের শূন্যতা, প্রাণের দুর্ব্বলতা কেহই জানে না, কেহই বাহির হইতে দেখিতে পায় না। এই মহামহিমান্বিত দিল্লীর একচ্ছত্র সম্রাটের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই সফল হয় নাই। আর এই দক্ষিণী জায়গীরদারের দ্বিতীয় পুত্র কি বাতুল যে, শাহান্‌শাহের রাজ্য আক্রমণ করিতেছে? তাহার পুঁজিপাটা কি, তাহার এই দুঃসাহসের ভিত্তি কি? সে যে সফল হইতে পারিবে, এরূপ কল্পনা করিবার কারণ কি?

এই কল্পনার অতীত স্থানেই ইতিহাসের প্রকৃত পুরুষত্ব দেখা দেয়। শিবাজী শেষে জিতিলেন, কারণ তিনি নিজের অন্তর্নিহিত বলে বলীয়ান, তিনি নবপথের প্রদর্শক এবং প্রথম পথিক। তিনি নিজের প্রতিভার বলে দেশজয়, রাজ্যশাসন, সভাস্থাপন, নৌ-বল সৃষ্টি করেন; কোন ফরাসী কর্ম্মচারী তাঁহার সেনাকে শিক্ষা দেয় নাই, তাঁহার কোন প্রদেশ শাসন করে নাই।

মহাপুরুষের শক্তিবলে, ক্ষণজন্মা ঐতিহাসিক বীরের দৈবদৃষ্টিতে তিনি জানিতে পারেন যে, ঠিক কোন্ যুদ্ধের প্রণালীতে, কোন্ কোন্ দেশের সহিত কোন্ কোন্ সময়ে সন্ধি-বিগ্রহ করিলে সফলতালাভ হইবে। ইতালির উদ্ধার কর্ত্তা কাভুর সত্যই বলিয়াছেন যে, "সম্ভব যাহা, তাহার জ্ঞানই রাজনীতির সার।"

শিবাজী রাজশ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি জানিতেন, কতদূর (এবং কখন) অগ্রসর হইতে হইবে এবং কোন্‌খানে হাত গুটান উচিত। তাই তাঁহার সর্ব্বক্ষেত্রেই জয়লাভ হয় এবং তাঁহার একগুঁয়ে অন্ধ বীরপুত্র শম্ভুজী ব্যর্থজীবন, হৃতরাজ্য হইয়া অকালমৃত্যুতে পতিত হয়।

কোন কোন মারাঠী লেখকেরা বলেন যে, শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল—'হিন্দবী স্বরাজ স্থাপন করা।" একথা বলিলে তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব ছোট করা এবং ইতিহাসের সত্যের বিরুদ্ধে যাওয়া হয়। তিনি হিন্দবী স্বরাজ চান নাই। চাহিয়াছিলেন এবং দিয়াছিলেন স্বরাজ, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রজার হিতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া, রাজপদকে ঈশ্বরের (বা গুরু রামদাসের) তহবিলদারী মনে করিয়া সুখ-সম্ভোগ, দম্ভ দমন করিয়া একমনে ন্যায়ের জয়, অন্যায়ের দমনে জীবন ব্যয় করেন।

হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই তাঁহার রাজ্যে ধর্ম্ম ও পদ সম্বন্ধে সমান সুবিধা পাইত। তিনি মুসলমান সাধু ও কোরাণকে কম শ্রদ্ধা করিতেন না; তাঁহার দান সন্ন্যাসী ও দরবেশকে সমভাবে আশ্রয় দিত। নারীমাত্রেই তাঁহার রাজ্যে অনাচারীর হাত হইতে রক্ষা পাইত। অসংখ্য মুসলমান তাঁহার সৈন্য-বিভাগে, যুদ্ধ-জাহাজে, মুনশীখানায় উচ্চপদ পাইয়াছিল।

আর প্রকৃত রাজার মত তিনি গুণের আদর করিতেন; লোক দেখিয়া চরিত্র বুঝিতে পারিতেন এবং আশ্চর্য্যরূপে উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিতেন। এরূপ না করিতে পারিলে কোন দেশই সুশাসিত হইতে পারে না।

ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণের মন্ত্র ছিল, কিন্তু এ ধর্ম্ম কার্য্যক্ষেত্রে, বাস্তব জগতে, প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জগতে গৌরবমণ্ডিত হন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, কংগ্রেস সংখ্যা) শ্রীযদুনাথ সরকার

—

পর্দ্দাপ্রথা

'পর্দ্দা' শব্দটিই আমাদের স্বদেশের নয়, এটি বৈদেশিক ফারসী শব্দ। এদেশে মুসলমান-আগমনের পূর্ব্বে যে 'পর্দ্দা' প্রথার প্রচলন ছিল না তাহা শব্দাভাব দ্বারাই প্রমাণ হয়, পর্দ্দার মত সাধারণ প্রচলিত অপর কোন শব্দ আমাদের শব্দকোষে দেখা নাই।...

আর্য্যদিগের মধ্যে যে বহু প্রাচীনকালে অবরোধপ্রথা ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা বেদ উপনিষদাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকিলে আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে, ব্যবহারশাস্ত্রে সর্ব্বত্রেই নারীর অতদূর উচ্চাধিকার দেখা যাইত না। রাজ্যাভিষেকে রাজা পট্টমহাদেবীর সহিত সভামণ্ডপে সমাসীন হইয়া অভিষিক্ত হইতেন, বিবাহ সভায় সমবেত জনগণের সমক্ষে কন্যা সম্প্রদান শাস্ত্রবিধি, রাজকন্যারা সহস্র রাজা ও রাজপুত্রমধ্যে একমাত্র সখী বা কঞ্চুকী সমভিব্যাহারে নিজের মনোমত পতিনির্ব্বাচন করিয়া লইতেন।...

বৈদিকযুগের ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নীদের মধ্যে 'মন্ত্রদ্রষ্টা' অর্থাৎ বেদমন্ত্র-রচনাকারিণীর সংখ্যা নিতান্ত কম বলা চলে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, তখন আর্য্য-নারীর সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না (এ ঘটনা অনার্য্যমিশ্রণের পূর্ব্ববর্ত্তী কথা)। বেদমন্ত্র-রচয়িত্রীগণের মধ্যে আমরা ইঁহাদের নাম জানিতে পারি—অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা, যমী, বিশ্ববারা, আত্রেয়ী, শ্রুতকীর্ত্তি, সত্যশ্রবা, ঘোষা, রিজিশ্বা, জরিতা, সুবেদা, অগস্ত্যমাতা, ভারদ্বাজী, রেবতী, নিরাবরী, সৌপায়নী, সারদা, ঐশ্বরা, বাগাম্ভৃনী, শার্দ্দা, অপলা, আঙ্গীরসী, শাশ্বতী, এই বাইশজন পূর্ণবিদ্যাপরায়ণা বিদুষী নারী ব্যতীত বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি গার্গী মৈত্রেয়ীর নাম সকল শিক্ষিত নরনারীরই সুপরিচিত। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা, বেদমন্ত্র-রচয়িত্রী, মহীয়সী এই-সকল মহিলা নিশ্চয়ই অবরোধনিবাসিনী ভীরুস্বভাবা অবলা ছিলেন না।......

প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত সভ্যজগতেই এ প্রথা বিদ্যমান। কোথাও এই অন্তঃপুর-বিভাগ পাঁচিল দিয়া ঘেরা, কোথাও বা পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, কোথাও পাহারা দিয়া আবদ্ধ, কোথাও বিধি-নিষেধ

মাত্রায় নিবদ্ধ। নর বাহিরের শ্রমবহুল কার্য্যে নিযুক্ত রহিল, নারী গৃহিণী ও জননীরূপে অন্তঃপুরে স্থান লইলেন, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন এবং সন্তান লালনের জন্য ইহাই নিরাপদ এবং প্রশস্ত ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে কর্ম্মসমন্বয় হইল।...

ভারতবর্ষে অবরোধ-প্রথা যে আদৌ ছিল না তা' নয়। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালি-সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় পূর্ব্বকালেও রাজান্তঃপুরবাসিনী কুলকন্যাগণকে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' বলিয়া বিশেষভাবে গর্ব্ব করা হইত।...মহাভারত স্ত্রী-পর্ব্বে দেখা যায়,কুরুকুলমহিলাবৃন্দের সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পূর্ব্বে দেবগণও যাহাদের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্রপথে পতিত হইতে লাগিল।"

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবীর বনগমন উপলক্ষেও এই বাধার কথা বেশ জোরের সঙ্গেই উত্থিত হইয়াছিল।

এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগের পরেই রাজ-রাজড়াদিগের ঘরে সাধারণতঃ রাণী বা রাজবধূগণ লোকসমক্ষে বাহির হইতেন না, তাঁহারা 'অসূর্য্যম্পশ্যা'ই ছিলেন, কিন্তু তথাপি এই অবরোধকে আমরা এখনকার মত পর্দ্দা সিসটেম বলিতে পারি না। ইউরোপে বা ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ-সকলেও রাণী বা রাজঘরণারা সাধারণের মত পায়ে হাঁটিয়া পথে বাহির হন না, রাজ রাজড়াদের গতিবিধির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সর্ব্বদেশে এবং সমস্ত কালেই হইয়া থাকিত এবং এখনও হয়, ইহাতে পূর্ব্বযুগে অর্থাৎ পৌরাণিক কালে নারীমাত্রেই অবরোধবাসিনী অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন, এমন কথাই প্রমাণ করে না। নেপালেও অবরোধ-প্রথা নাই, কিন্তু রাজবাড়ীর মেয়েদের সেখানেও খোলাখুলি ভাবে পথে বাহির হওয়া রীতিবিরুদ্ধ।

রাণীরা রাজ্যাভিষেকে, রাজকন্যারা স্বয়ম্বর-সভায়, প্রয়োজন ঘটিলে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীসহ ভীষণ দুর্গম বিপদসঙ্কুল বিজনারণ্যে, সখীসহ পতি-নির্ব্বাচনকল্পে নগরে বা বনে যত্রতত্রই ভ্রমণাধিকার উপযুক্ত পাত্রী হইলেই পাইতেন; ইহাও ঐ সকল পুরাণ-কাহিনী মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই পর্দ্দার বিবি তাঁদের ঠিক বলিতে পারি না।

বৌদ্ধযুগেই প্রধানতঃ আমরা রাজবাড়ীর বাহিরের সাধারণের জীবনযাত্রার সহিত কতকটা পরিচিত হইবার সুযোগ পাই. সেখানে কিন্তু গৃহস্থকন্যা ও গৃহিণীদের আমরা অবরোধবাসিনী দেখিতে পাই না, অর্থাৎ অন্তঃপুরিকা হইলেই অসূর্য্যম্পশ্যা নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বৃক্ষতলে তপস্যামগ্ন সাধকের জন্য আহার্য্য প্রদান করিয়া আইসেন, কেহ জীবন-ভিক্ষার্থ সাধকের চরণে মৃতপুত্র লইয়া গিয়া লুটাইয়া পড়েন, তাঁদের মধ্যে ধনসম্পদ পতিপুত্র সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া কত শতই প্রব্রজ্যাগ্রহণান্তর নবধর্ম্ম ও নূতন মার্গকে আশ্রয়পূর্ব্বক বাহিরের কাজে দূর দূরান্তরে পথে প্রান্তরে বাহির হইয়া যান। এমন কি সুদূর সিংহল দেশে পর্য্যন্ত রাজান্তঃপুরিকা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসেন। বুদ্ধপত্নী গোপা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনদের সাক্ষাতে অবগুণ্ঠন প্রদান করিতেন না, তিনি এ সম্বন্ধে অনুযুক্ত হইয়া যে গাথাটি বলিয়াছিলেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হয় না—

"শরীর যাঁহাদের সংযত, বাক্য যাঁহাদের সংযত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহাদের সুরক্ষিত ও মন নির্ম্মল, বদন আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের কি হইবে? যাঁহাদের চিত্ত সুরক্ষিত. ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত থাকে, অন্য পুরুষের দিকে যাঁহাদের চিত্তগমন করে না এবং স্ব-পতিতেই যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় যাঁহারা উপযুক্তভাবে প্রকাশ পান, তাঁহাদের বদন আচ্ছাদন করিবার প্রয়োজন কি?"

ধর্ম্ম সনাতন, কিন্তু আচার কখনও সনাতন হইতে পারে না—যেমন পর্দ্দাপ্রথা। দেখা যায়, মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতেই বিশেষ করিয়া এই প্রথাটি জাঁকিয়া বসিয়াছিল। যেমন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, পশ্চিম-বঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু পাঞ্জাবে অবগুণ্ঠনের প্রথা থাকিলেও অবরোধের প্রথা এক্ষণে খুব কম। বাঙ্গালার শহর ভিন্ন পল্লীগ্রাম ইহার কবলে প্রায় পড়েই নাই। এখনও ইহার পূর্ণ প্রকোপ চলিতেছে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অধিবাসিনীদের উপর দিয়াই। এমন কি যে রাজপুত জাতির নারীগণ একসময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা পর্দ্দার জেনানা!

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে পর্দ্দা বলিতে যা বুঝায়, যতটুকু দেখিয়াছি, তেমন কিছু দেখি নাই; বরং এখনই ইহা বাড়িতেছে। কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠেই দেখিয়াছি মেয়েরা পায়ে হাঁটিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যায়; ঠাকুর দেখিতে, গঙ্গাস্নান করিতে, পাড়া বেড়াইতে পায়ে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকে, কোন নিন্দা নাই।

আমাদের মধ্যে পর্দ্দাপ্রথার সবচেয়ে কঠিনতা ভোগ করিতে হয় আমাদের বিহারবাসিনী ভগ্নিদিগকে। এদের বড়ঘরের মেয়েরা প্রায় অসূর্য্যম্পশ্যা! ঘরে জানালা থাকে না, অঙ্গন সঙ্কীর্ণতর, তাই বাপ স্বামীপুত্র প্রায়ই চরিত্রহীন. বোন মেয়ে স্ত্রী মায়ের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক বড় কম; বার মহলে বন্ধুবান্ধব, চাকরবাকর, রাত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাড়া করা স্ত্রীলোক এই-সব লইয়াই তাদের জীবনযাত্রা প্রায়ই নির্ব্বাহ হয়। ঘরের মেয়েরা থাকেন বধূ অবস্থায় "কনিয়া" বনিয়া।...

সেবার রেল ষ্টেশনের একটা কাণ্ড হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল! বিহারের এক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ অন্যত্র যাইতেছেন, সঙ্গে বিস্তর মোটঘাটের সঙ্গে মোটা চাদরে আপাদমস্তক মণ্ডিতা গৃহিণীও সেই মোটের মধ্যে মোট বনিয়া পুঁটুলী পাকাইয়া বসিয়াছিলেন। ট্রেন আসিল, মুটিয়ারা মোট তুলিয়া ক্রতহস্তে কামরার মধ্যে ফেলিয়া অন্য লগেজ আনিতে ছুটিবে, তাড়াতাড়ির চোটে সেই কাপড়ের মোটে পরিণত গিন্নীটিকেও তাহারা মোট ভাবিয়া তুলিয়া লইয়া কামরার মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং অন্য কুলি সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটা ভারী বোঝা ঐ মেয়েটির ঘাড়ের উপর ফেলিল! আশ্চর্য্য যে তথাপি ইজ্জৎ-হানির ভয়ে মেয়েটি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে নাই! যখন সর্ব্বত্র খুঁজিয়া অবশেষে মোটমুটরীর তলা হইতে উঁহাকে টানিয়া বাহির করা হইল, তখন তাহার অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থা।...

আপনাকে দ্বিধা করিয়া পতি-পত্নীরূপে উভয়ে মিলিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে, জগতে নবযুগ আনিতে হইবে। ইহার মধ্যে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় লোকাচারের বাধা সেদিনের প্রয়োজনে সমাজ-ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মাত্র, যাহা সচল দেশাচার মাত্র, অচল শাস্ত্রবিধি নয়—তাহার স্থান নাই। যদি ইহার জন্য আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে এ কথা সত্য হয়, এ বিধি উঠিয়া যাওয়া উচিত; যদি গরীব গৃহস্থ-সংসারে সাংসারিক অসংখ্য অসুখ ও অসুবিধা হইতেছে হয়, যদি এর জন্য বালিকাদের স্কুলের শিক্ষা পাওয়া কষ্টকর হয়, এ নিয়ম শিথিল হওয়া বঙ্গে বা বিহারে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।...

বিদেশী অনুকরণে আমাদের কাজ কি? আমাদেরই দেশে, আমাদেরই স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মী মহারাষ্ট্রে এবং দাক্ষিণাত্যে মেয়েদের সম্বন্ধে যে উদারতাপূর্ণ ব্যবহার পূর্ব্বাপর হইতেই চলিয়া আসিতেছে (সেখানে অন্তঃপুর আছে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা আছে, অবরোধ নাই, কখনও ছিল না উহাই ভারতীয় আদর্শ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সকলে তাহারই অনুকরণ হোক, এ ছাড়া আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই।

(বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৫) শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

—

সাহিত্যে আর্ট

সাহিত্যে আর্ট এখন অনেকেরই আলোচনার বিষয় হয়েছে এবং নানা দিক থেকে আর্টকে বুঝবার চেষ্টা চল্‌ছে। আমি আজ শুধু সাহিত্যের আর্টের আলোচনা করব ...

এক শ্রেণীর শিল্পী ও সমজ্‌দার বল্‌বেন যে, আর্ট যখন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত নয়, তখন তার বিশ্লেষণ কর্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। আর্ট নিত্যই নব নব রূপ সৃষ্টি কর্‌ছে; এবং এই রূপ-সৃজনে তার গতি স্বচ্ছন্দ ও অনিয়ন্ত্রিত। কোন বাঁধা নিয়মের বশে সে চলে না, কোন law সে মানে না। আর্ট কিছুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়। বাহ্য-জগতে ঘটনার অভিব্যক্তির মত আর্টের প্রকাশের কোন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা নাই। অতএব আর্টের বিশ্লেষণ হ'তে পারে না।

এই শ্রেণীর সমালোচকগণ অনেকেই আর্টের প্রকাশ কেন, মানসিক কোন ব্যাপারেরই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা মানেন না। মানুষের চিন্তা এঁদের মতে স্বাধীন-ইচ্ছা-প্রসূত। এই ইচ্ছা ও চিন্তার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট law বা আইন-কানুন নেই। অপর শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বল্‌বেন, বহির্জ্জগতে যখন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা মানছি, তখন মনোজগতেই বা মান্‌বো না কেন? মানুষের মন এমন কি সৃষ্টিছাড়া পদার্থ, যা নিয়মের বশীভূত নয়? আজ আমি মনের সকল কার্য্যের, সকল চিন্তার কারণ নির্দ্দেশ না কর্‌তে পারি, কিন্তু পরে যে পারব না, তার প্রমাণ কি? অজ্ঞ ব্যক্তি বহির্জ্জগতের কার্য্যকারণ মান্‌তে চায় না। আপেল কেন মাটিতে পড়ে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বলে, নিজের স্বভাবে পেকে পড়েছে। এর যে অন্য কারণ থাক্‌তে পারে, সে তা ভাববার আবশ্যকতাই দেখে না। বৈজ্ঞানিকের মন কারণ না জানতে পারলে সন্তুষ্ট হয় না। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হচ্ছে, এ কথা বৈজ্ঞানিক কল্পনাতেও আন্‌তে পারেন না: একই বস্তু একই সময়ে দুই বিভিন্ন জায়গায় থাক্‌তে পারে, এ কথা কল্পনায় আনা যেরূপ অসম্ভব, কারণ ব্যতীত কার্য্য হচ্ছে, ইহাও সেইরূপই অসম্ভব কথা—তা সে বহির্জ্জগতেই হোক, আর মনোজগতেই হোক। কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিই বল্‌বেন, যে, মনোজগতে বা আর্টের প্রকাশে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা নাই। কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা যদি মানি, তা হ'লে একদিন না একদিন তা আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ব, এ কথা মানাও কিছু অলৌকিক নয়। আজ আর্টের স্বরূপ নির্দ্দেশ কর্‌তে না পারি, কিন্তু একদিন তা পারব।

মনোবিদ্‌গণ বলেন, আমাদের জ্ঞানের গোচরে যেসব মানসিক চিন্তা বা ভাবের উদয় হয়, তাহাই সমস্ত মন নয়। আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের ভিতর নানা ব্যাপারই চল্‌ছে। এই-সকল ব্যাপারই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞাতসারে, যে-সকল ইচ্ছা বা চিন্তা আস্‌ছে, তা নিয়ন্ত্রিত করছে। হঠাৎ মনে একটা ভাব বা চিন্তা এল, তা যে বিনা কারণে স্বতঃই উৎপন্ন হোলো, এরূপ মনে করলে ভুল হবে। অজ্ঞাত মনে বা নির্জ্ঞানে ইহার উৎপত্তি। নির্জ্ঞানবিদ্‌ অনেক ক্ষেত্রে বল্‌তে পারবেন, কি অবস্থায় কোন্‌ ইচ্ছা মনে আসে। নদীর প্রবাহ দেখছি। হঠাৎ একটা মাছ ভেসে উঠল। এই মাছ যে সেই মুহূর্ত্তে সেইখানে সৃষ্ট হোলো, তা নয়। দৃষ্টির গোচরীভূত না হোলেও এই মাছ নদীর মধ্যেই ছিল, এবং বিশেষ কারণে উপরে উঠেছে, ইহাই ঠিক কথা। সেইরূপ কোন চিন্তা বা ভাব হঠাৎ সৃষ্ট হয়েছে না মনে করে তা মনের নির্জ্ঞান প্রদেশ থেকে উঠেছে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।...

আর্টের উৎস যদি নির্জ্ঞানেই রইল তবে আর্টের মূলে রুদ্ধ-ইচ্ছা স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ, মনোবিদ্‌ বল্‌ছেন, আমাদের রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি ছদ্মবেশ ধরে আর্টে প্রকাশিত হয়। ছদ্মবেশ থাকায় আর্টের মূল স্বরূপ ধরা পড়ে না: বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশ্লেষণ করলে আর্টের মধ্যে রুদ্ধ বা অসামাজিক ভাব ধরা পড়বে অসামাজিক ইচ্ছাগুলি যদি উলঙ্গ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেত, তা হ'লে তাদের দেখে আমাদের মনে ঘৃণা, বিরক্তি ও ভয়ের উদ্রেক হোতো—তারা আর আর্ট থাক্‌ত না। সমাজের চাপে এই সকল রুদ্ধ-ইচ্ছা ছদ্মবেশ ধরতে বাধ্য হয়; এবং তখন তারা অনায়াসেই মনের মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থান পায়। প্রত্যেক ইচ্ছার প্রকাশের উদ্দেশ্য তার তৃপ্তিসাধন। আর্টের প্রকাশে রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি কাল্পনিক তৃপ্তি পায়। এই তৃপ্তি হতেই আর্টের আনন্দের উৎপত্তি। অসামাজিক মন এই-সকল ইচ্ছার পরিতৃপ্তি খুঁজলেও সামাজিক মনে তাদের স্থান নেই; কিন্তু যখন তারা আর্টের ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়, তখন সামাজিক ও অসামাজিক উভয় মনই তৃপ্তিলাভ করে। অসামাজিক মনের তৃপ্তি আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে, কেবল তাহার আনন্দই জ্ঞানে ফুটে উঠে। আর্ট সামাজিক আদর্শে চলে, কি চলে না, এ নিয়ে কেন যে এত বাদ্‌বিতণ্ডা হচ্ছে, তা এই ব্যাপায় কিছু বুঝা গেল। Art for Art's sake ব'লে কিছু নেই। আর্টে সামাজিক চাপ থাক্‌বেই, নচেৎ তা আর্ট না হয়ে অশ্লীল কদর্য্য বস্তুতে পরিণত হবে। আর্টে গুপ্তভাবে অসামাজিকতাও থাকবে, নচেৎ তা উচ্চাঙ্গের আর্ট হবে না। শিল্পী সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে থেকেই অসামাজিক বৃত্তিকে মূর্ত্ত করেন।

আর্টের এই ব্যাখ্যা মান্‌লে আর্টের প্রকাশে মানুষের চিরন্তন রূপের অভিব্যক্তি স্বীকার করতে কোন বাধা থাকে না। যাকে রূপ বলি, তার মূল অসামাজিক প্রবৃত্তির গোপন তৃপ্তিতে। কিন্তু এই রূপ সামাজিক গণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। সামাজিক গণ্ডী ও আদর্শ বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, এমন কি বিভিন্ন গোষ্ঠীতেও বিভিন্ন। অনুন্নত culture-এর আর্টে রুদ্ধ ইচ্ছার ছদ্মরূপের বাহুল্যের আবশ্যকতা নেই। কিন্তু সামাজিক আদর্শ উন্নত হ'লে ছদ্মবেশের আড়ম্বর বেশী দরকার হয়। অনুন্নত সমাজে যেটা আর্ট, উন্নত সমাজ তাকে কদর্য্য মনে করতে পারে। এক দেশে, এক যুগে যা সুন্দর, অন্য দেশে অন্য যুগে তাই ই কুৎসিত। কাজেই আর্ট পরিবর্ত্তনশীল। সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিকাশ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বলা বাহুল্য, এরূপ আর্টও আছে, যা নবসমাজে আদৃত কখন কোন শিল্পী সামাজিক গণ্ডীর প্রভাব অতিক্রম করে ছদ্মবেশের বাহুল্য কমিয়ে দিয়ে, নিজের অন্তরস্থ রুদ্ধ বৃত্তিকে মূর্ত্ত দেন। তখন সমাজে হৈ হৈ পড়ে যায়। একদল এইরূপ আর্টের প্রশংসা করেন, এবং Art

for Art's sakeএর দোহাই দেন। রক্ষণপন্থী বলেন, ইহা আর্ট নয়—অশ্লীলতার কুৎসিত প্রকাশমাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে মতভেদ অনিবার্য্য। দুইদলের সামাজিক আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলেই এই মতভেদ, বুঝতে হবে। শিল্পীর এরূপ প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত সমাজে চলেও যেতে পারে, কিংবা পরিত্যক্তও হ'তে পারে। সমাজে কোনরূপ সংস্কারের প্রচেষ্টাও এই প্রকারের। একদল তাকে ভাল বলেন, অপর দল তার বিরোধী হন—ইহাই সনাতন রীতি।

নির্জ্ঞানবিদের আর্টের ব্যাখ্যা মানলে আর্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে যে বিরোধ চল্‌ছে, তার অনেক প্রশ্নেরই সু-মীমাংসা হয়। কিন্তু প্রধান আপত্তি এই যে, যে আর্টকে আমরা সকলেই সুন্দর ও স্বর্গীয় ব'লে মনে করি, তার মূল যে কুৎসিত আধারে প্রতিষ্ঠিত এ কথা মানা শক্ত। সুবাস যে শেষ পর্য্যন্ত পঙ্কের দুর্গন্ধের পরিণতি, এ কথা মন মান্‌তে চায় না। পরশুরামের ভাষায় বল্‌তে পারি, ফুলের সৌন্দর্য্যই উপভোগ্য, কাজ কি আমাদের সারের অনুসন্ধানে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ত ছাড়বার পাত্র নন। এমন দেবায়তন মনুষ্য-শরীর শেষ পর্য্যন্ত বানরের শরীরের ক্রম-বিবর্ত্তনের ফল! সৌন্দর্য্যও শেষ পর্য্যন্ত কদর্য্যতারই রূপান্তর!

নির্জ্ঞানবিদের এই মত সত্য কি না, তা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করবেন। সাধারণের পক্ষে যেমন ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ সত্য কি না, বলা অসম্ভব, সেইরূপ নির্জ্ঞানবিদের এই মত সত্য কি না বলা অসম্ভব। তবে মোটামুটি মনে এই সন্দেহ উঠে যে, সব আর্টই কি এইরূপ অসামাজিক রুদ্ধ ইচ্ছা হ'তেই উৎপন্ন? প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপভোগ্য বিবরণের মধ্যে মনুষ্যের কদর্য্য প্রবৃত্তির স্থান কোথায়? নির্জ্ঞানবিদ্‌ উত্তর দেবেন, আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্যকেও সোজাসুজি দেখি না; মনুষ্য নিজ প্রবৃত্তির রঙীন চসমার মধ্য দিয়েই সব জিনিষ দেখে ও উপভোগ করে; লতাকে দেখে স্ত্রীলোকের কথা মনে করে; মহা-মহীরুহের সঙ্গে রাজার তুলনা করে, ইত্যাদি। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যে কবিত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা আছে, তার মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে কোন কুৎসিত বৃত্তির নিদর্শন নেই, এ কথা সত্য; কিন্তু কালিদাসের মেঘদূতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় প্রবৃত্তির রঙীন আলোক যে কতটা পড়েছে, তা সহজেই দেখা যায়। একদিকে মনুষ্যের বিভিন্ন প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে আর্টের বিকাশ, অপর দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় আর্টের অভিব্যক্তি, এই উভয়ের সংযোগ কোথায়, মেঘদূত তা দেখিয়ে দেয়। কাজেই নির্জ্ঞান মনোবিদ্‌কে এক কথায় হটানো চলে না।

নির্জ্ঞানবিদ্‌ এখন পর্য্যন্ত আর্টের সমস্ত তথ্য নিরূপণ করতে পারেন নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য! যেদিন ইহা সম্ভব হবে, সেদিন synthetic artও সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিকের আর্ট বুঝবার চেষ্টা ও রসিকজনের আর্ট উপভোগ করা বিভিন্ন ব্যাপার; কিন্তু তবুও এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা সংযোগের সূত্র আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।..

আর্টের মূল হচ্ছে নির্জ্ঞানে। নির্জ্ঞান আর্টের মূলে রস যোগান; কিন্তু মূলই ত আর বৃক্ষের সবটা নয়—বৃক্ষ তখনই সুন্দর, সুশোভন মনোমোহন হয়, যখন সে শাখা-প্রশাখা, পল্লব-পত্র-পুষ্প-মণ্ডিত হয়। সেই রকম, সাধারণের কাছে আর্ট উপভোগ্য হয় তার বহির্বেশ দ্বারা—তার শাখা-পল্লব, পত্র-পুষ্পের শোভায়, অর্থাৎ, সোজা কথায়, যে লেখকের বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গী সুন্দর, বচন-বিন্যাস সুষ্ঠু, বর্ণনা মনোহর, চরিত্র-চিত্রণ অনবদ্য—সর্ব্বোপরি যা শ্রোতা ও পাঠকের মনে অনাবিল সৌন্দর্য্যের রসধারা প্রবাহিত করে, সেই লেখকই প্রধান আর্টিষ্ট; তিনিই সত্য, শিব, সুন্দরের পুরোহিত। আর যিনি তা পারেন না, তিনি আর্টিষ্ট নন। এই বল্‌বার ভঙ্গী ও সুমুসীয়ানাতেই কে প্রকৃত আর্টিষ্ট, আর কে তা নহেন, সাধারণে তা জান্‌তে পারে।

(উত্তরা, পৌষ ১৩৩৫) শ্রীজলধর সেন

—

হুগলী জেলার কথা

সাহিত্য ও শিল্পকলা

বাংলার মধ্যে হুগলী জেলা বড় কম মনীষার আকর নহে। ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ের মানুষ—তিনিই রাজাজ্ঞায় হিন্দু আইন প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য "শ্যামাকল্প লতিকা" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭৭০ খৃঃ পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ দর্শনগ্রন্থ "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী" রচনা করেন—উহা ১৮৩২ খৃঃ রাজা কালীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনুদিত হয়। স্বনামধন্য পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও গুপ্তিপাড়ার, তথা হুগলী জেলার গৌরব—তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে অপূর্ব্ব ওজস্বিতাময়ী বাগ্মিভূতি দান করিয়া ভারত-বিশ্রুত যশোকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপ ইংরাজী ভাষায় অদ্ভুত প্রতিভাশালী রাষ্ট্রনৈতিক বক্তা ৺রামগোপাল ঘোষও হুগলী জেলার সুসন্তান। সুবিদ্বান্‌ জষ্টিস্‌ দ্বারিকানাথ মিত্র ও রাজা দিগম্বর মিত্র এই জেলারই মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) বৈদ্যবাটি গ্রামে তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করেন। যুগভাবের ঋষি ও চিন্তাবীর ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই হুগলী জেলার বক্ষে বসিয়াই মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালীকে কর্মঠ ব্রতের দীক্ষা-মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম-যুগের অন্যতম জ্যোতিষ্ক, অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ার দিকপাল পুরুষ ও সাহিত্যক্ষেত্রে মহারথ ছিলেন। আর আজিকার জীবিত যাঁহারা, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি বরেণ্যগণেরও বরণীয়, অক্ষয়কীর্ত্তিমান্‌—বঙ্গসাহিত্যের তৃতীয় সম্রাট্‌ যাঁহাকে বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না—সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কল্প-স্রষ্টা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজও বঙ্গসাহিত্যের উদয়শিখরে স্বীয় কিরণজ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছেন। তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া, আজ কাঁঠাল-পাড়া ও কলিকাতা নগরীরই তুল্য দেবানন্দপুর বঙ্গবাসীর পুণ্যতীর্থ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই দেবানন্দপুরেই প্রাচীন বাংলার কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর নিজ জন্মভূমি হইতে আশ্রয়চ্যুত হইয়া স্থানীয় জমিদার দত্তমুন্সীদের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও এইখানে ১৭৩৭ খৃঃ তাঁহার প্রথম কাব্যরচনা প্রকাশ করেন। এই উভয় ঘটনার স্মৃতিই দেবানন্দপুরের নাম বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।...

এই জেলার শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ্‌—ফরাস-ডাঙ্গার সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প—ঢাকার মসলিন ও শান্তিপুরের মিহিধুতির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু ছিল। চন্দননগর আজিও সামান্য পরিমাণে এই বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব সম্মান বজায় রাখিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন দক্ষ শিল্পীকুল কালক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। তাহাদের শূন্য স্থান পূরণ করার কেহ থাকিতেছে না। এখানকার অহিফেন, নীল, রেশম, চাউল, দড়ি, চিনির কারবার—যাহা এককালে খুব প্রচলিত

ছিল, তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। আরামবাগ পরগণার (কলমী, খানাকুল, কৃষ্ণনগর. মায়াপুর প্রভৃতি) রেশম ও বস্ত্রশিল্প ধ্বংসোন্মুখ—আজ নবীন দেশকর্ম্মিগণের উদ্যমে যত্নে যদি কোনমতে তাহা রক্ষা পায়। আরামবাগের বালি, গোঘাট থানার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ, বৈঙ্কী, মোরারহাট, খামারপাড়া, পলবা থানার মধ্যে ঘোলসারা. শ্রীরামপুর, জনাই ও বাঁশবেড়িয়ার পিতলের বাসন, রেকাবী, বোগ্‌না, গাড়ু, খেলনা, লোটা, বঁড়শী, ঘণ্টা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ—চাঁপাডাঙ্গার পানদানী সর্ব্বত্র সমাদৃত। ঝুড়ি, চুবড়ী, মাদুরচেটি মায়াপুর, বন্দীপুর, মগরা, শ্রীরামপুর, আক্রী, বোরাই ও আরামবাগের পল্লী-সমূহে পাওয়া যায়। বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, সুগন্ধ্যার মাটির বাসন প্রচলিত। ভদ্রেশ্বরে চীনামাটির বাসন প্রস্তুত হইত। এখানকার গঞ্জে ধান চাল ও পাটের বিরাট আড়ৎ ছিল—'কালনা হইতে কলিকাতার মধ্যে এত বড় গঞ্জ কিছু পূর্ব্বে আর কোথাও ছিল না।' দাদপুর (ধনিয়াখালি) ও চণ্ডীতলায় মুসলমান-রমণীরা চিকণের কাজ করে—এই কারুশিল্পের সমাদর সুদূর ইউরোপে প্যারি নগরীর বিলাস-কক্ষে ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়। হুগলী জেলায় গুড়ের কাজ মন্দ হয় না। হরিপাল, দ্বারহাটা, কৈকালা, জয়নগর, খরসরাই, আঁটপুর ও রাজবলহাটে তাঁতে প্রস্তুত কাপড় এখনও উৎপন্ন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ কোম্পানী তাঁতীদিগকে ৮৫,৪৩৩৲ দাদন দিয়াছিল বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়; এখানকার হাটে উৎকৃষ্ট মখমল বিক্রয় হইত। ব্যাণ্ডেলের ছানার ব্যবসা অদ্যাপি চলন্ত। জনাই-এর মনোহরা এ অঞ্চলের লোভনীয় মিষ্টান্ন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে তামার কাজ ও অপকৃষ্ট রেশম-শিল্প দৃষ্ট হয়। এখানকার ধান চাল ও শাক-সবজীর হাট আরামবাগ মহকুমায় সর্ব্বপ্রধান। মগরাতেও তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরের কাপড়ের ছাপ ও রঙের কাজ বহুপ্রসিদ্ধ। এখানে রেশমী কাপড় ও রুমালও তৈয়ারী হয়। মায়াপুরের রেশম শিল্প লুপ্ত। শ্যামবাজার, কায়ারপাট, কলাগাছিয়া, রাধাবল্লভপুরে তসর উৎপাদন ও সাড়ী. ধুতি, যোড় বুনন হয়। রাঙ্গিনাবালী দেওয়ানগঞ্জ ও উদয়রাজপুর প্রভৃতি আরামবাগের পল্লীসমূহে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাগজ প্রস্তুত হইত। আজও মহানাদ, কোলশা, ও বালী দেওয়ানগঞ্জে মুসলমানেরা যে দেশী তুলট কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা যেমন মজবুৎ, তেমনি দরে সস্তা। বাংলা হিসাবের খাতার জন্য ইহার চাহিদা যথেষ্ট। খলসিনী, নবগ্রাম, চাতরা, শঙ্করপুর, বেলকুলি, উত্তরপাড়ায় দড়ি তৈয়ার হয়। বদনগঞ্জে কড়িকাঠ ও তসর আমদানী হয়। বলাগড় নৌ-শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। এখান হইতে নেপালী শালকাঠে তৈয়ারী অসংখ্য তরণী কত যুদ্ধজয় ও জলদস্যু বিতাড়ন করিত।. আজও সেই নৌবাটে দুই-একখানি নৌকা প্রস্তুত হয়।

এই সকল শিল্পবিদ্যা পুনর্জ্জাগ্রত অথবা সজীব, সতেজ করিবার জন্য জাতির সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন। নূতন নূতন শিল্পচর্চ্চা এবং পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে।

(প্রবর্ত্তক, পৌষ ১৩৩৫)

জাপান-সম্রাটের রাজ্যাভিষেক

বর্ত্তমান জগতে যতই সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের সাম্রাজ্য-সীমা বাড়িয়া চলিয়াছে, ততই সম্রাটদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। একমাত্র ইংলণ্ড ও জাপান, এই দুই ক্ষুদ্র দ্বীপের অপূর্ব্ব কর্ম্ম ও মনীষাসম্পন্ন দুই জাতিই তাঁহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে নিজ নিজ জাতির ও রাষ্ট্রের ঐক্য-প্রতীক হিসাবে দুই সম্রাটকে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের পায়ে সাম্রাজ্যের সমস্ত গরিমা নিবেদন করে। দুই জাতিই কুলগত সম্রাটকে বরণ করিয়াছে, দুই জাতিই তাঁহাদের সমস্ত শাসন-সংরক্ষণ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্রাটদ্বয়ের অভিপ্রায়ানুরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করে, অথচ দুই জাতিরই সম্রাট সত্য রাষ্ট্র-শাসনে প্রায় হস্তক্ষেপ করেন না, করিবার অবসরও পান না। তথাপি, ইহাঁরাই সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা, জাতির নিয়ন্তা, ইহাঁদেরই ঘিরিয়া রহিয়াছে জাতির অনেকখানি আশা আনন্দ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

জাপানের সম্রাট যে জাপানের নর-নারীর হৃদয়ে কতখানি আসন জুড়িয়া আছেন, তাহা তাঁহাদের সম্রাটদের পরলোকপ্রাপ্তিতে বা রাজ্যাভিষেককালে বেশ বুঝা যায়। সম্রাটের মৃত্যু জাতির দুর্ভাগ্যেরই সূচনা বলিয়া জাপান অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও মনে করিত। জাপানীরা কেহ কেহ রাজপ্রীতির বশে সম্রাটের মৃত্যুর পরে আত্মহত্যাও করিতেন। ১৯১২ সনের ৩০শে জুলাই কীর্ত্তিমান সম্রাট মেইজির মৃত্যু হইলে বিখ্যাত সেনাপতি নোগি পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করেন। গত ১৯২৬ সনের ২৫শে ডিসেম্বর সম্রাট টেইশোর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু

আকস্মিক নয়, তিনি বহুদিন রোগশয্যায় আবদ্ধ ছিলেন; তথাপি এই ঘটনায় সমস্ত জাপান ও প্রবাসী জাপানীরা শোকে মুহ্যমান হন। তাঁহার সমাধিকালীন শোকযাত্রায় সহস্র সহস্র জাপানী মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে নগ্নশিরে পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু জাপানের প্রথানুযায়ী অশৌচকাল উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার অভিষেক উৎসব হয়।

সম্রাট হিরোহিতো জাপানের রাজবংশের ১২৪শ সম্রাট। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আট বৎসর বয়সে ১৯০৮ সনে গকুশিন্ সামরিক



জাপান-সম্রাট হিরোহিতো—তাকামিকুরা সিংহাসনে অধিরোহণ-কালীন হরিদ্রাভ রক্ত পরিচ্ছদে



জাপান-সম্রাজ্ঞী—শিশিন্‌দেন হলে অভিষেকোৎসবকালীন পরিচ্ছদে

বর্ত্তমান সম্রাটের রাজ্যাভিষেকেও জাপানীদের মনে সম্রাটের প্রতি যে গভীর প্রীতি ও ভক্তি আছে, তাহা দেখা গিয়াছে। সত্য বটে অভিষেকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জাপান-সরকার প্রায় একহাজার সাম্যবাদীকে গ্রেপ্তার করেন ও চণ্ড নীতির আশ্রয় লন। সাধারণ জাপানীরা এখনো রাজাকে দেবতার মতই মনে করে। জাপানের নূতন সম্রাট হিরোহিতো মিচি-নো-মিয়া'র রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় গত ১৯২৮ সনের ১০ই নবেম্বর তারিখে। অবশ্য পিতার মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই তিনি জাপানী নিয়মে সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, বিদ্যালয়ে পোর্ট আর্থার-বিজয়ী সেনাপতি নোগির নিকটে তাঁহার অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। পবিত্রস্মৃতি সম্রাট মেইজির মৃত্যু হইলে সম্রাট টেইশো সিংহাসন আরোহণ করেন, ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে হিরোহিতো ক্রাউন্‌প্রিন্স বা যুবরাজ বলিয়া পরিগণিত হন। এই যৌবরাজ্যে অভিষেক উৎসব হয় চার বৎসর পরে ১৯১৬ সনের ৩রা ডিসেম্বর। তাহার পূর্ব্বেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গকুশিন্ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নৌ-সেনাপতি কাউণ্ট টোগোর নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত হয় ১৯২১ সনের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে, এবং একমাস



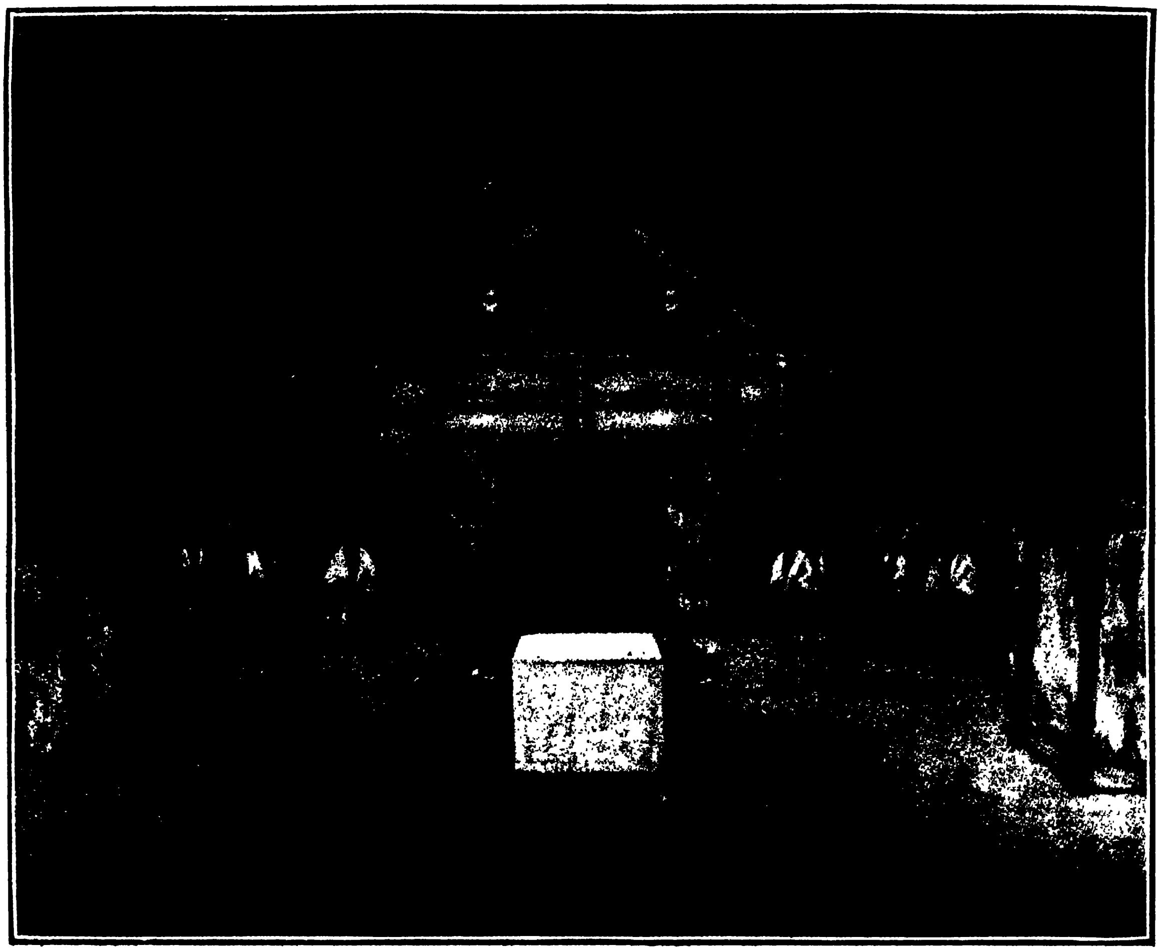
পরলোকগত সম্রাট টেইশোর শব সমাধি মন্দিরে বাহিত হইতেছে (৭ই ফেব্রুয়ারী)—জাপানী সরকারী ফটোগ্রাফ হইতে

পরে জাপানের ভাবী সম্রাট ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে বাহির হন। ছয় মাস পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে সম্রাট টেইশোর পীড়া বৃদ্ধি পাইলে তিনিই প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহাকে একদিকে রাষ্ট্রকর্ম্ম ও আর একদিকে রুগ্ন পিতার সেবা করিতে হইত।

রাজ-প্রতিনিধির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কালেই যুবরাজ হিরোহিতো রাজবংশজ প্রিন্স কুনোর কন্যা প্রিন্সেস্ নাগা-কোর পাণিগ্রহণ করেন। ১৯১৯ সনেই তিনি যুবরাজের পাত্রীরূপে মনোনীতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাগ্‌দান হয় ১৯২২ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর, কিন্তু বিবাহ-উৎসবের অল্পপূর্ব্বে ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সমস্ত জাপান নিদারুণ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তাই, বিবাহ-উৎসব তখন স্থগিত থাকে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী এই বিবাহ-উৎসব মহোৎসাহে সম্পন্ন হয়।

সম্রাজ্ঞী নাগা-কো রাজবংশেরই কন্যা। প্রিন্স কুনিয়োশি কুনি'র আজাবু-সৌধে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তাঁহার জন্ম হয়। যুবরাজের পাত্রীরূপে মনোনীতা হইবার পূর্ব্বে তিনি পিয়ারেসেস্ কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাহার পর হইতে তিনি পিতৃগৃহে ভাবী-জীবনের উপযোগী শিক্ষা আয়ত্ত করিয়াছেন।

সম্রাট হিরোহিতোর বিশেষ পাঠ্য প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁহার আকাশাকো প্রাসাদে এই বিষয়ের একটি বিশেষ বীক্ষণাগারও আছে। সম্রাট জাপানের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্যও বিশেষ গবেষণা করিয়া থাকেন। আকাশাকো প্রাসাদের একভাগে তিনি নিজ যত্নে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিয়া ধানের চাষ করিয়াছেন্। হিরোহিতো পিতামহ মেইজির মত জাপানী ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতেও সিদ্ধহস্ত। এই-সব কবিতার মধ্যে তাঁহার প্রজা-হিতৈষণার ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায়। যথা—



পরলোকগত সম্রাট টেইশোর অন্তিম সৎকার—শিল্পী হিরোমিৎসু নাকাজাবা কর্ত্তৃক অঙ্কিত

(গিরি-গরিমা)

তাতেয়ামা নো সোরা নি সুবিয়ুরু উষিসা য়ু।
নারায় তোজো ওমো মিয়ো নো সুগত মো।

অর্থাৎ উদার নীল আকাশে তাতেয়ামা তাহার গিরি-শিখর তুলিয়া দিয়াছে,—আমার রাজত্বও যেন এমনি গরিমাময় হয়।

সম্রাট মিতব্যয়ী ও মিতাচারী। ইয়ুরোপীয় ভোজন-রীতি ও পরিচ্ছদই তাঁহার পছন্দ। পথঘাটে সাধারণত সেনাপতির পরিচ্ছদেই তিনি বাহির হন।

সাম্রাজ্ঞী নাগা-কো'র বিশেষ মনোযোগ চারুশিল্পে। তিনি কৃষিবিদ্যায় ও ক্ষুদ্র কবিতা-রচনায় স্বামীর মতই পারদর্শিনী। সম্রাট টেইশোর রোগশয্যাপার্শ্বে তিনিও স্বামীর সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন।

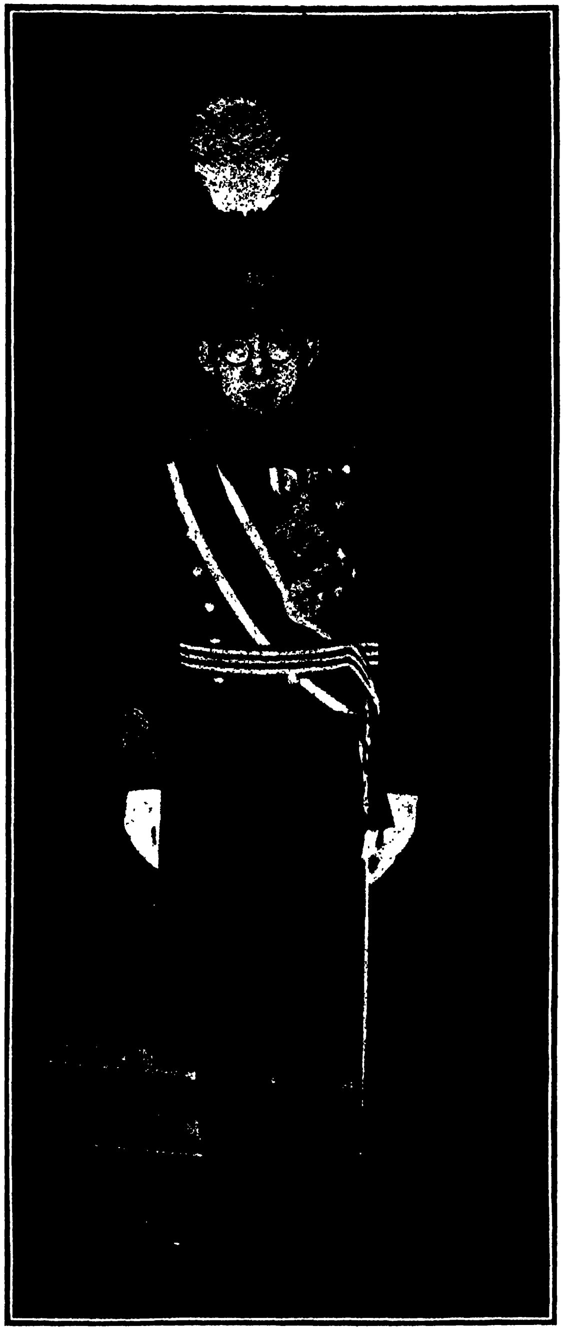
জাপান ইয়ুরোপীয় ভাব ও ইয়ুরোপীয় ধারায় সঞ্জীবিত হইয়াছে—দিনে দিনে সেখানে পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রসার বাড়িতেছে। কিন্তু, জাপানী রাজ্যাভিষেকে এখনো জাপানের স্বদেশী রীতিনীতি, স্বদেশী পদ্ধতি ও স্বদেশী আদিম শীন্‌টো ধর্ম্ম একেবারে অকৃত্রিম ও অপরিবর্ত্তিত আকারে রহিয়াছে। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গগুলিতে জাপানী ধর্ম্মবিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায়। 'পিতৃপূজা' জাপানের আদিম ধর্ম্ম।

জাপানের সম্রাটগণও উৎসবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলিতে নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিয়া থাকেন। জাপানের রাজবংশ ভগবতী আদিত্যানীকে (অমতেরস্থ-ও-মিকামি) তাঁহাদের বংশের প্রতিষ্ঠাত্রী ও কুলমাতা মনে করেন—অর্থাৎ, সমস্ত জাপানের মতে সম্রাটগণ সূর্য্যাবংশীয়; শুধু তাহাই নয়, মৃত্যুর পরে তাঁহারা পিতৃ-লোকে সেই অমর কূলেই ফিরিয়া যান। জাপানের অভিষেক-উৎসবের অন্যূন ত্রিশটি অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটিই জাপানী ধর্ম্মবিশ্বাসের এই মূল তত্ত্বটি বারে বারে মনে করাইয়া দেয়।

সমস্ত রাজ্যাভিষেক-উৎসবকে জাপানী ভাষায় বলা হয় 'তাই-রেই' অর্থাৎ উৎসব। পূজা বলিলে যেমন সমস্ত বাঙালী একটি বিশেষ দেবীর আরাধনাই বুঝেন, জাপানীরা তাই-রেই বলিতে তেমনি এই একটি বিশেষ উৎসবকেই বুঝেন। ইহাতেই বুঝা যায় জাপান-সম্রাটের রাজ্যাভিষেক সমস্ত জাপানের উৎসব।

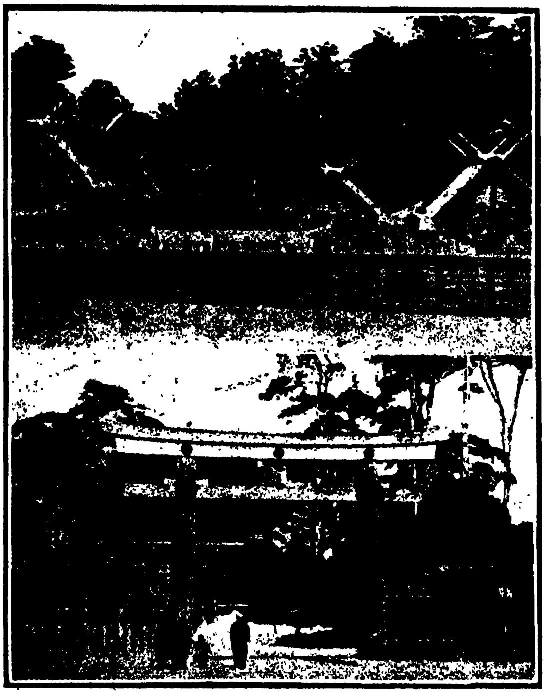
নূতন সম্রাটের অভিষেকোৎসব হয় ক্যোটো রাজ-প্রাসাদে। ক্যোটো জাপানের পুরাতন রাজধানী। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মেইজি এইস্থান পরিদর্শন করিয়া স্থির করেন যে, ভবিষ্যতে জাপান-সম্রাটদের অভিষেক-ক্রিয়া জাপানের পুরাতন রাজপুরেই হইবে। ক্যোটোতে এই দ্বিতীয় অভিষেক,—প্রথম অভিষেক হয় ১৯১৫ সনের ১০ই নবেম্বর যখন সম্রাট টেইশো সিংহাসন অধিরোহণ করেন। দ্বিতীয় অভিষেক এই ঠিক ১৩ বৎসর পরে।

তাই-রেইর একার্দ্ধ সিংহাসনারোহণ আর অর্দ্ধ দাইজো-সাই—অর্থাৎ শ্রদ্ধা-নিবেদন। অশৌচকাল অতিবাহিত হইলে নূতন সম্রাট সিংহাসনারোহণ করেন, তখন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটদের আত্মার নিকটে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জাপান-সাম্রাজ্য ও কুলপ্রতিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর দান দর্পণ, তরবারি ও রত্ন—এই পবিত্র প্রতীকত্রয় প্রাপ্তির সংবাদ নিবেদন করেন। প্রজাসাধারণের নিকটেও তখনই তাঁহার সিংহাসনারোহণ-সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। দাইজো-শাই ক্রিয়া ইহার পরে অনুষ্ঠিত হয়। নূতন সম্রাট বৎসরের নূতন ধান্য ও জলস্থলের অন্যান্য উৎপন্নদ্রব্য তখন পূর্ব্বতন সম্রাটগণের সমাধি-মন্দিরে সেই পিতৃকুলের উদ্দেশে নিবেদন করেন; তিনি নিজেও এই-সব ভোজ্যের কতকটা গ্রহণ করেন। বাহ্যত এ অনুষ্ঠান অনেকটা হিন্দুর শ্রাদ্ধোৎসবের মতই।



প্রিন্স চিচিবু—পরলোকগত সম্রাট টেইশোর সমাধি ক্রিয়ায় সম্রাটের প্রতিনিধি

বর্ত্তমান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ৬ই নবেম্বর অভিষেকোদ্দেশ্যে টোকিও ত্যাগ করেন। দর্পণ তরবারি ও রত্ন, তিনপবিত্র প্রতীক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। ইহার পূর্ব্বে জেঙ্গি উৎসব অর্থাৎ প্রারম্ভিক-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই



উপরে—ইশির মহামন্দির
নিম্নে—টোকিওর মেইজি মন্দির

উৎসবের প্রধান অঙ্গ দিন-ক্ষণ নির্দ্দেশ করা। টোকিওর প্রাসাদস্থ কাইশোকোদোরো বা সম্রাটদের উপাসনা-বেদিকার সম্মুখে বর্ত্তমান সম্রাট ১৭ই জানুয়ারী নিজ আত্মীয়দের লইয়া প্রার্থনা করেন যেন তাঁহার ভাবী অভিষেক-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই সময়েই আদি সম্রাট্ জিম্মু, ও নিন্‌কো, কোমেই, মেইজি ও টেইশো প্রভৃতি আধুনিক সম্রাটদের সমাধি-ভবনে, এবং সম্রাট-কুলের আদিমাতা অমতেরসু-ও-মিকামি দেবীর আইসি মহামন্দিরে এই তারিখ-নির্দ্দেশের কথা ও পূজা দিবার জন্য লোক প্রেরিত হইয়াছিল। প্রারম্ভিক-উৎসবের ইহাই প্রধান অঙ্গ।

ইহার পরেই হোঙ্গি বা প্রধান অনুষ্ঠান ও উৎসব-সমূহ। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর টোকিও-ত্যাগের সঙ্গে ইহার সূচনা। তবে তাহার পূর্ব্বেই কাইশিকোদোরা (উপাসনা-বেদিকা) ক্যোটোর শুন্‌কো-দেন প্রাসাদে পাঠানো হয়। প্রথানুযায়ী রাজদম্পতী ৬ই ডিসেম্বর নাগোয়া প্রাসাদে রাত্রি যাপন করেন এবং পরদিন বিকাল দুই ঘটিকায় ক্যোটোতে উত্তীর্ণ হন। ক্যোটোর শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে সেই দর্পণ, তরবারি ও রত্ন। এই তিন পবিত্র সাম্রাজ্য-প্রতীক শুন্-কো-দেন গৃহে রাখিয়া রাজ-দম্পতি প্রাসাদের নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে উপস্থিত হন। ২৮শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এই গৃহেই তাঁহারা অবস্থান করেন।

১০ই নবেম্বর রাজ্যাভিষেক—সম্রাট তাকামিকুরা নামক সিংহাসনে বসিবেন। শুন্‌কো-দেন ভবনে কাইশিকোদারোর সম্মুখে গম্ভীর প্রসন্ন মুখে অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা প্রিন্স কুজো অন্যান্য সম্ভ্রান্তবর্গের সহিত দাঁড়াইলেন। সাড়ে আট ঘটিকা হইতে আঠারো শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় আঙ্গিনায় অপেক্ষা করিতেছেন। প্রথম আঙ্গিনায় আছেন রাজমন্ত্রী প্রভৃতি মাত্র ২৮০জন। সাড়ে নয় ঘটিকায় জাপানী বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হইল, কাশিকো-দোকোরোর দ্বার উন্মুক্ত হইল, সমবেত সম্ভ্রান্তমণ্ডলী পিতৃগণের উদ্দেশে ধান, শাকসব্জী ও মৎস্যের নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠিক দশ ঘটিকায় সম্রাট প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে শ্বেত রেশমের পরিচ্ছদ—পরিচ্ছদের নাম হাকু-নো-গ্যোফুকু। শুধু উত্তরীয়ের কিনারায় রক্তবর্ণের আভাস। অভিষেক-উৎসবের অধ্যক্ষ প্রিন্স ইতো, প্রধানমন্ত্রী ব্যারন তনকা প্রভৃতি তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া পার্শ্বের গৃহ হইতে লইয়া আসিলেন। সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করিলেন—দুইজন কঞ্চুকী সিংহাসনের দুইদিকে পবিত্র তরবারি ও রাজ-মোহর রাখিয়া আবার ফিরিয়া গেল। একটু পরেই সম্রাজ্ঞীও প্রবেশ করিলেন। সম্রাজ্ঞীর পরিধানেও জাপানের স্মরণাতীত কালের পরিচ্ছদ—সিল্কের কারাগিনু বা আংরাখা, ওন্-ইৎসুৎ-সুগিনু বা পাচ ভাঁজের সুবিখ্যাত পরিচ্ছদ; তাঁহার কেশ-রচনা ও-সুবেরাকাষী ধরণের। স'দশটায় সম্রাজ্ঞী তাঁহার আসন গ্রহণ করিলেন। তখন দরবারের কর্ম্মকর্ত্তা প্রিন্স কুজো সাকাই গাছের শাখা সম্রাটের হাতে তুলিয়া

দেন। ইহা পবিত্র জিনিষ, সম্রাট গ্রহণ করিয়া উহা কুলাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিলেন এবং উচ্চ গম্ভীরকণ্ঠে সেই দেবীকে তাঁহার সিংহাসনারোহণের কথা জানাইলেন। তিনি থামিলে সম্রাজ্ঞীও একটি সাকাই শাখা লইয়া পূর্ব্বানুরূপ আবৃত্তি করিলেন। এইরূপে সাড়ে দশটায় এই সিংহাসনারোহণ-অনুষ্ঠান শেষ



সম্রাটের লিখিত কবিতার প্রতিলিপি

হইল—সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলেন। উৎসবের একটি প্রধানতম পর্ব্ব কাইশিকো-দোকোরোর সম্মুখে মহাদেবীর উদ্দেশে এই বিজ্ঞপ্তি।

অপরাহ্নে শিশিন্‌দিন হলের উৎসব। ১৫২১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই গৃহেই এই উৎসব হইতেছে। বর্ত্তমান শিশিন্‌দিন হল আন্‌সেই যুগের তৃতীয় বর্ষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। দেড় ঘটিকা হইতে অতিথিবর্গ অপেক্ষা করিতেছেন, জার্ম্মাণ-দূত ডাক্তার সল্‌ফ্‌ ও অন্যান্য বিদেশীয় রাজদূতগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা হইল। আড়াইটার পরে প্রিন্স চিচিবু প্রিন্স তাকামৎসু, প্রিন্স কানিন্‌ প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের নিম্নে আসন গ্রহণ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই মহা প্রতীহারের ঘোষণা-শেষে ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে সম্রাট উত্তর অঙ্গন দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদনের পশ্চাদস্থ সিংহাসনে উপবেশ করিলেন—সমগ্র জনতা নমস্কার করিল। সম্রাটের পরিচ্ছদ হরিদ্রাভ রক্তবর্ণের—প্রভাত-সূর্য্যের বর্ণের ও গরিমার জ্ঞাপক। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শোমুর সম্রাট হইবার সময়ে ইহার প্রথম প্রচলন। এই পোষাকের নাম গো-হো—বিশেষ অনুষ্ঠানেই মাত্র সম্রাটগণ ইহা পরিধান করেন। অন্য কাহারো ইহা পরিধানের অধিকার নাই।



প্রধান মন্ত্রী ব্যারন তনকা

একটু পরেই সম্রাজ্ঞী পাঁচ ভাঁজের রঙীন পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া উত্তর অঙ্গন দিয়া প্রবেশ করিলেন ও আচ্ছাদন-বস্ত্রের অন্তরালস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। সকলে আবার প্রণতি জানাইল।

দুইটা সাতচল্লিশ মিনিটে সম্রাট আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আপনার ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন।—ছাব্বিশ শতাব্দী যাবৎ মহাদেবীর কুলে যে সিংহাসন অচল হইয়া রহিয়াছে তিনি আজ তাহা গ্রহণ করিতেছেন। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মতই প্রজা ও রাজার সম্পর্ক আধ্যাত্মিক, সেই সম্পর্ক এই জাতির মধ্যে অটুট থাকুক। পিতামহ মেইজি যে দূরদৃষ্টির প্রভাবে জাপানে নবযুগ উদ্বুদ্ধ করেন, পিতা টেইশো সেই ধারাকেই বরণ করিয়াছেন, তিনিও সেই ধারারই, সম্রাট ও প্রজার

সংযোগে ও সংশ্মিতায় সুন্দর, সেই ধারাকেই অনুসরণ করিবেন। তিনি স্বরাষ্ট্রের শিক্ষায়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্ট হইবেন, পররাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় করিয়া পৃথিবীতে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি যত্ন করিবেন। পিতৃগণ তাঁহার সহায় হউন।—প্রধানমন্ত্রী ব্যারণ



সিংহাসনের সম্মুখস্থ দেবদারু চিত্রাঙ্কিত অপূর্ব্ব আবরণ-বস্ত্র বামপার্শ্বে পবিত্র রত্ন ও তরবারি রক্ষিত হইয়াছে

তনকা ইহার উত্তরে প্রজাপক্ষের অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন এবং বান্‌জাই পতাকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনবার জয়ধ্বনি করিলেন, 'সম্রাটের বান্‌জাই।' বানজাই জাপানের অভিষেককালীন জয়ধ্বনি—কতকালের পুরাতন কেহ বলিতে পারে না। ইহা মূলত চীনা জিনিষ, কিন্তু জাপানী আনন্দজ্ঞাপক করতালিকে এই চীনা-পদ্ধতি হারাইয়া দিয়াছে। সেইদিন সেইক্ষণে প্রত্যেক জাপানী এই ধ্বনিতে যোগদান করিয়াছে, প্রত্যেক জাপানী জাহাজ সিটি দিয়াছে, জাপানের মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়াছে। ঠিক তিন ঘটিকায় এই অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। ১০ই নবেম্বরের ইহাই শেষ উৎসব।

ইহার চারদিন পরে দাই-জোসাই উৎসব---সেই পূর্ব্ব কথিত পিতৃপুরুষকে 'চরুদানের' উৎসব, পচা ভাত হইতে তৈয়ারী পানীয় নিবেদনের উৎসব। ১৪ই নবেম্বরের সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত দাইজো-গু প্রাসাদে এই অনুষ্ঠান। দাইজো-গু এই উপলক্ষে আদিম প্রথায় তৃণ ও খড়ের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাসাদের অঙ্গনের দুইভাগ—পূর্ব্বে সুকি দেন্, পশ্চিমে য়ুকি, দেন। অনুষ্ঠানেরও এইরূপ দুইভাগ য়ুকি-দেন্ ও সুকি-দেন্। য়ুকি ও সুকি নামক দুই প্রদেশের উৎপন্ন শস্যে এই অনুষ্ঠান আদিকাল হইতে অনুষ্ঠিত হয়, তাই এই নাম। য়ুকি-দেন্ সন্ধ্যার উৎসব, য়ুকির ধান, য়ুকির পল্লী-গীত সহযোগে সম্পন্ন হয়; সুকি-দেন্ নিশীথের উৎসব, সুকির ধান সুকীর পল্লীগীত ইহাতে প্রয়োজন হয়।

সাড়ে পাঁচটায় প্রধান তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইল, ধীরে ধীরে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল, ছয়টার পরে অতিথিবর্গ সমবেত হইলেন। পার্শ্বস্থ কইর‍্যু-দেন হলে সম্রাট চিন্‌কন্ অনুষ্ঠান পালন করিলেন, অর্থাৎ দেহমন পরিশুদ্ধ করিলেন। তৎপর সময়োপযোগী শ্বেত রাজ-পরিচ্ছদে তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সম্রাজ্ঞীও দেবদারু পাখা-হস্তে তাঁহার সহিত সেইখানে যোগদান করিলেন। বন্য দ্রাক্ষালতায় রাজপরিষদবর্গ ও রাজ্ঞীর সহচরীবৃন্দ সজ্জিত হইলেন। য়ুকির নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের ধান্যে তর্পণ হইবে—সেই ধান পেষণের সঙ্গে অদূর রন্ধনশালায় পুরাতন গ্রাম্যগীত ইনাৎসুকি চলিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা প্রিন্স ইতো অন্তর্বেদিকার সম্মুখে শীন্‌টো মন্ত্র ও প্রার্থনা পাঠ করেন। ৬।৪০ মিনিটে সম্রাট্ য়ুকির প্রধান ভবনে যাত্রা করিলেন। প্রায় অগ্রে অগ্রে রাজভ্রাতা, রাজপুত্রগণ ও প্রধান রাজপুরুষগণ কঞ্চুকীর সহিত আসিয়া দর্পণ, তরবারি ও রত্ন আয়তন-সম্মুখে স্থাপন করেন। প্রিন্স ইতো তাঁহাদের পুরোভাগে, সঙ্গে রাজকুলের অন্যান্য সকলে। সম্রাটের মাথায় খড়ের রাজছত্র। তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন সম্রাজ্ঞী ও রাজকুলের অন্যান্য কন্যাগণ। তাঁহারা উপাসনা-স্থানের বহিরাঙ্গিনায় (প্রাসাদের দক্ষিণে) উপবেশন করিলে য়ুকি প্রদেশের পুরাতন পল্লী-সঙ্গীত গান চলিল। প্রথমে সম্রাট উপাসনা করিলেন, তাহার পর সম্রাজ্ঞী। উপাসনা-শেষে সম্রাজ্ঞী কইর‍্যু-দেন হলে ফিরিয়া গেলেন। সম্রাট আঙ্গিনার অভ্যন্তরস্থ অন্তর্বেদিকায় উপাসনা করিতে চলিলেন। তখন সাতটা বাজিয়াছে। অন্ন ও অন্যান্য শস্য, শাকসব্জী, মৎস্য ও শামুক প্রভৃতি সুরা-সহযোগে সম্রাট কুলমাতা মহাদেবী আদিত্যানী অমতেরসু-ও-মিকিমার ও স্বর্গমর্ত্ত্যের অন্যান্য দেবদেবীর উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। ইহার পরেই ওন্-নাওরাই, অর্থাৎ সম্রাটের সেই-সব খাদ্য

ও পানীয় আস্বাদন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সম্রাট পিতৃগণের সঙ্গে জলস্থলের নূতন উৎপন্ন-রাজি গ্রহণ করিলেন। তাহা শেষ হইলে আবার কাগুরা সঙ্গীত উঠিল —কইরুদেন্-হ্নে সম্রাট ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে দাইজো-সাই উৎসবের প্রথম পর্ব্ব যুকি-দেন-এর উৎসব রাত্রির প্রথম ভাগে শেষ হইল। স্থকি-দেন উৎসব ইহারই অনুরূপ—রাত্রি সাড়ে বারোটায় ইহা আরম্ভ এবং রাত্রি প্রায় তিনটায় সমাপ্ত হয়।

অভিষেকের শেষ প্রধান অনুষ্ঠান—ওমিয়াএ বা রাজ-ভোজ। ১৬ই ও ১৭ই নবেম্বর দুইদিন এই অনুষ্ঠান হইল। ১৬ই নবেম্বরের ভোজই প্রধান। ঐ দিন দিবা দ্বি-প্রহরে প্রাসাদের ভোজনশালায় বিদেশীয় রাজদূত ও তাহাদের পত্নীগণ, বিশিষ্ট অতিথিগণ, সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ও রাজপুরুষগণ একত্র হইলে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী পার্শ্বস্থ বিশ্রামাগারে নৌ-সেনাপতি কাউণ্ট টোগো, প্রধান মন্ত্রী তনকা, জার্ম্মাণ-দূত ডাক্তার সল্‌ফ প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথি ও রাজপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি ভোজনশালায় প্রবেশ করিয়া বারোটা তের মিনিটে প্রজাবর্গ ও বিদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বোধন করিয়া এক অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রজাদের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী তনকা ও রাষ্ট্র-দূতদের পক্ষ হইতে ডাক্তার সল্‌ফ ইহার যথোচিত কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক উত্তর প্রদান করেন। তারপরে ভোজনাগারের সম্মুখস্থ আবরণ অপসৃত হইল, এবং শ্বেত ও কৃষ্ণ মদিরা পরিবেশন করিলে ভোজনোৎসব আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কুমেমাই নৃত্য সাড়ে বারোটায় আরম্ভ হইয়া পনের মিনিট কাল চলিল; জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মুর শত্রুজয়-উপলক্ষে এই নৃত্যের সৃষ্টি—ইহা বিশেষ তেজোব্যঞ্জক। তারপর আধঘণ্টা প্রাচীন পল্লী-নৃত্য ফুজ্জকু-নো-মাই; সর্ব্বশেষ নৃত্য গোসেচি-নো মাই —পঞ্চ-তরুণীর নৃত্য। এই নৃত্যের জন্য ক্যোটোর সম্ভ্রান্ত প্রাচীনতম বংশের আটজন তরুণীকে প্রথম মনোনীত করা হয়—তাহাদের মধ্যে যে পাঁচজনের নাম নামগুটিকায় ভাগ্যক্রমে উঠে, তাঁহারাই এই গৌরব লাভ করেন। দুইশত বৎসর হইল সম্রাট তেম্মু যখন বীণা বাজাইতেছিলেন, তখন বীণার তানের সঙ্গে সঙ্গে মেঘের কোলে পাঁচজন দেবদূত আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পরিচ্ছদের ঢিলা হাতা পাঁচবার দোলাইয়া নৃত্য করিয়া মিলাইয়া যান। সেই সময় হইতে সম্রাট তেম্মু সম্ভ্রান্তকুলের তরুণীদের দিয়া সেই নৃত্যই পুনরভিনয় করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন।



গোসেচি নৃত্যের জন্য নির্ব্বাচিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া কন্যাগণ গুটিখেলায় ইহাঁদের যে পাঁচজনের নাম উঠিয়াছিল তাঁহারাই নৃত্য করিয়াছিলেন

গোসেচি নৃত্য সংযমে, সৌন্দর্য্যে ও সুষমায় অপরূপ। পনের মিনিট কাল এই নৃত্য হইল ও ইহার দশ মিনিট পরে রাজদম্পতি সকলকে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া ভোজ-উৎসব হইতে সেইদিনকার মত বিদায় লইলেন।

১৭ই নবেম্বরের উৎসব পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জায় পূর্ব্ব-দিনকার মতই, তবে ততটা 'আনুষ্ঠানিক' নহে। ইহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ২৫১৭ জন; ইহার আহার্য্যাদি সকলই বিদেশীয় রুচির। ভোজের পরে বিদেশীয় অনুকরণেই গানের জলসাও হয়।

এইরূপে জাপান-সম্রাটের রাজ্যাভিষেক-উৎসবের চতুরঙ্গ শেষ হইল—১০ই কাশীকি-দোকোরোর সম্মুখে সিংহাসনারোহণ ইহার প্রথম অঙ্গ, তারপরে শিশিন্দেন প্রাসাদের অনুষ্ঠানসমূহ, তৎপর দাইজোসাই বা শ্রদ্ধা-নিবেদন, শেষে ওমিয়াএ বা রাজভোজ। সর্ব্বশেষে ক্যোটো-পরিত্যাগের পরে ২০শে ও ২১শে তারিখে প্রারম্ভ উৎসবের মত আবার ইশি'র আদিত্যানীর মহামন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে পূজা দিয়া জিম্মু, নিন্কো, মেইজি, টেইশো প্রভৃতি পূর্ব্ব সম্রাটগণের সমাধি-মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া রাজ-দম্পতি অভিষেক-উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করেন।

আলোচনা

'গীতার অক্ষর ও ব্রহ্ম'

(প্রত্যুত্তর)

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে 'গীতার অক্ষর ও ব্রহ্ম' শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। মাঘ মাসে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"লেখকের প্রথম ও প্রধান আপত্তি এই যে, 'উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রে পরমাত্মাকেই অক্ষর ও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে'। বস্তুতঃ এই আপত্তি অমূলক। মুণ্ডকোপনিষদের (২।২) "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই মন্ত্রে "অক্ষর" শব্দ প্রধান বা মূল প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই—

উক্ত মন্ত্রের অর্থবিষয়ে সুরেন্দ্রবাবুই ভুল করিয়াছেন। ঐ মন্ত্রোক্ত 'অক্ষর' অর্থ মায়া বা প্রকৃতি বা প্রধান নহে। তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন একটি মন্ত্রের শেষার্দ্ধ (২।১।২)। প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে উক্ত মন্ত্রের সমগ্র অংশ, ইহার পূর্ব্বের মন্ত্র (২।১।১) এবং পরের মন্ত্রও (২।১।৩) বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। তাহাই করা যাউক—

প্রথম মন্ত্রের পদপাঠ :—

তৎ এতৎ সত্যম্, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ, তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে, তত্র চ এব অপিয়ন্তি ২।১।১

দ্বিতীয় মন্ত্রের পদপাঠ : -

দিব্যঃ হি অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরঃ হি অজঃ অপ্রাণঃ হি অমনাঃ শুভ্রঃ হি অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ২।১।২

তৃতীয় মন্ত্রের পদপাঠ :—

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ২।১।৩

প্রথম মন্ত্রের অর্থ :—

সেই এই (অক্ষর পুরুষ) সত্য। যেমন সুদীপ্ত পাবক হইতে তৎসদৃশ (অর্থাৎ অগ্নি সদৃশ) সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, হে সোম্য! তেমনি অক্ষর হইতে (অক্ষরাৎ) বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। ২।১।১

এই মন্ত্রের 'তৎ এতৎ' অংশের অর্থান্তরও আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ—"যাহা পরে বলা হইতেছে তাহা"। শঙ্করের মতে 'তৎ' অর্থ অক্ষর নামক পুরুষ (তদক্ষরং পুরুষাখ্যং)। আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিলাম।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ :—

(সেই অক্ষর) পুরুষ দিব্য অমূর্ত্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ প্রাণবিহীন, মনোবিহীন, শুভ্র, এবং পর অক্ষর হইতে (পরতঃ অক্ষরাৎ) শ্রেষ্ঠ। ২।১।২

এস্থলে যে পুরুষের কথা বলা হইল, শঙ্করের মতে সে পুরুষ— সর্ব্বোপাধিভেদবর্জ্জিত অক্ষর পুরুষ। শঙ্কর 'অক্ষর' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ—

ইহা হইতে (এতস্মাৎ, অর্থাৎ এই অক্ষর পুরুষ হইতে) প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, এবং বিশ্বধারিণী এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ২।১।৩

এই মন্ত্রের 'এতস্মাৎ' শব্দের অর্থ শঙ্করের মতে 'এই পুরুষ হইতে' (এতস্মাদেব পুরুষাৎ)।

প্রথম মন্ত্রে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'তৎ এতৎ' এবং 'অক্ষরাৎ', দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই 'পুরুষঃ' এবং তৃতীয় মন্ত্রেও তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই 'এতস্মাৎ'। দেখা যাইতেছে যে, প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রের মতে অক্ষর পুরুষ হইতেই সৃষ্টি। প্রথম মন্ত্রের 'অক্ষর' যে পরমাত্মা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৃতীয় মন্ত্রেও সেই পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। কোন মন্ত্রেই প্রকৃতি বা প্রধান বা মায়ার কথা বলা হয় নাই। এস্থলে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। গীতার মতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির অভ্যন্তর হইতে। উপনিষদের এইস্থলে বলা হইতেছে, যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে তাহা সাক্ষাৎভাবে পুরুষ হইতে। এই দুই মতের পার্থক্য অতি গুরুতর। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে শঙ্কর উপনিষদের এই অক্ষরকে 'প্রকৃতি' বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি তাহ

করেন নাই। তাঁহার মতে প্রথম মন্ত্রের 'অক্ষর' অর্থ অক্ষর পুরুষ এবং তৃতীয় মন্ত্রেও ঐ অক্ষর পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মন্ত্রের 'অক্ষর ও পুরুষ (প্রকৃতি নহে)। তাহা হইলে দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইল এই—(অক্ষর) পুরুষ, 'অক্ষর' (পুরুষ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ কি? পুরুষ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অক্ষর অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা যেন অর্থশূন্য কথা। বিষয়টি কঠিন। সুতরাং ব্যাখ্যা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ পরিষ্কার করা যাইতেছে। অপ্রমত্ত ফিলিপ (Philip the sober) যেমন প্রমত্ত ফিলিপ (Philip the drunk) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুষুপ্ত যাজ্ঞবল্ক্য যেমন স্বপ্নগ্রস্ত যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্নাত ভবভূতি যেমন অভ্যক্ত ভবভূতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনি (বিশ্বাতীত) অক্ষর (বিশ্বগত) অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অক্ষর অক্ষর অপেক্ষা। কিন্তু যে অক্ষর শ্রেষ্ঠ তাহা (বিশ্বাতীত) অক্ষর; আর যে অক্ষর অশ্রেষ্ঠ তাহা (বিশ্বগত) অক্ষর। পরমাত্মার দুই দিক—বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত। বিশ্বাতীত ভাব দেশকালাতীত; আর বিশ্বগত ভাব দেশকালে প্রকাশিত এবং সৃষ্টিব্যাপারে লিপ্ত। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার বিশ্বগত ভাব অপেক্ষা বিশ্বাতীত ভাব শ্রেষ্ঠ। এ মন্ত্রের 'অক্ষর' অর্থ সৃষ্টিকর্ত্তা অক্ষর। এ অক্ষরকে মায়া বা প্রকৃতি বলিবার কোন কারণ নাই। মুণ্ডকোপনিষদে আরও পাঁচ বার অক্ষর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১।১।৫, ১।১।৭, ১।২।১৩, ২।২।২, ২।২।৩)। ইহার প্রত্যেক স্থলেই পরমাত্মাকে অক্ষর বলা হইয়াছে। ২।১।১ মন্ত্রের অক্ষরও পরমাত্মা। আর আমরা ২।১।২ অংশের যে ব্যাখ্যা দিলাম, তাহাতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, এস্থলে অক্ষর অর্থ বিশ্বগত পরমাত্মা। কোনস্থলেই অক্ষর অর্থ মায়া বা প্রকৃতি নহে।

প্রাচীন উপনিষদ্ দশখানা। শ্বেতাশ্বতর ও মাণ্ডুক্য অতি প্রচলিত উপনিষদ্ হইলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং এ দুইখানা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন দশখানা উপনিষদের অক্ষরতত্ত্ব আলোচনা করা যাইতে পারে। এই দশখানার কোনস্থলেই অক্ষর অর্থ মায়া বা প্রকৃতি নহে।

অক্ষর শব্দে বিশেষ্য বিশেষণ উভয়ই হয়। বিশেষ্য হইলে ইহার অর্থ অকারাদি বর্ণ। ইহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশেষণ 'অক্ষর' শব্দ। এই অক্ষর শব্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদে এগারবার (তৃতীয় অধ্যায় ৮ম ব্রাহ্মণে), কঠোপনিষদে একবার (৩।২), প্রশ্নোপনিষদে চারবার (চতুর্থ প্রশ্নে) ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইহার অর্থ পরমাত্মা; এমন একটা স্থলও নাই যেস্থলে ইহার অর্থ মায়া বা প্রকৃতি হইতে পারে।

গৌড়পাদাচার্য্য এবং শঙ্কর যাহাকে 'মায়া' বলেন সে মায়া প্রাচীন উপনিষদে নাই। গীতার প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব খাঁটি দ্বৈতবাদ; প্রাচীন উপনিষদে ইহার স্থান নাই। উপনিষদ্ খাঁটি অদ্বৈতবাদী। উপনিষদের মতে কেবল একটি মাত্র সত্তাই আছে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এই সত্তার নাম ব্রহ্ম, আত্মা পরমাত্মা, অক্ষর ইত্যাদি।

সুতরাং এপ্রকার কল্পনাও করা যায় না যে, উপনিষদের 'অক্ষর' অর্থ মায়া বা প্রকৃতি হইতে পারে। সুতরাং সিদ্ধান্ত- যে প্রাচীন উপনিষদের মতে অক্ষর পরমাত্মাই।

গীতার যে সমুদায় অংশে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা মূল প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কোন অংশেই অক্ষর অর্থ মায়া বা প্রকৃতি নহে।

শঙ্কর কি অর্থে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের প্রবন্ধের বা মতামতের কোন সম্বন্ধ নাই।

লেখক প্রতিবাদে লিখিয়াছেন "সংসার বীজভূত অব্যক্ত প্রকৃতি, সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেই অনাদি ও অনন্ত বলিয়া 'অক্ষর'।"

লোকে 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই 'বেদান্ত' শব্দ ব্যবহার করে। বেদান্ত শব্দের মৌলিক অর্থ উপনিষদ্। ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদ্ সমূহের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে এইজন্য ব্রহ্মসূত্রও বেদান্ত; তবে ইহার ঠিক নাম 'বেদান্ত দর্শন'। ইহার পরে বেদান্ত নামে যে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা 'নব্য বেদান্ত'। ইহা সাংখ্যভাবাপন্ন। নব্য বেদান্তে প্রকৃতিকে কি বলা হইয়াছে বা হয় নাই, তাহার সহিত আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। মূল বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে প্রকৃতি বা অনাদি প্রকৃতির স্থান নাই।

২। লেখকের দ্বিতীয় মন্তব্য বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

৩। তৃতীয় মন্তব্য বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই:—

যে-কোনস্থলে 'উত্তম পুরুষ' থাকিলেই তাহা 'পুরুষোত্তম' হয় না। লোহারামের ব্যাকরণেও উত্তম পুরুষ আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।৩) দেহ হইতে উত্থিত আত্মাকে উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে। এস্থলে পরমাত্মাকে লক্ষ্যই করা হয় নাই। ঐস্থলের বক্তব্য বিষয় দেহধারী আত্মা নিকৃষ্ট পুরুষ আর দেহোত্থিত আত্মা উত্তম পুরুষ। এই পুরুষ ব্রহ্ম কি না তাহা স্বতন্ত্র কথা। অদ্বৈতবাদের প্রমাণে লোহারামের উত্তম পুরুষকেও পুরুষোত্তম এবং পরমাত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়।

গীতাতে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'আমি বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত'। ইহা সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম, বেদের কোনস্থলেই কৃষ্ণ বা বাসুদেব বা গোবিন্দকে পুরুষোত্তম বলা হয় নাই। এ মত এ পর্য্যন্ত খণ্ডিত হইল না।

৪। চতুর্থ মন্তব্য বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই:—

'পরমাত্মা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' এ প্রকার ভাব এবং ভাষা হইতে কোন প্রকারেই প্রমাণ করা যায় না যে, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম সর্ব্বাংশে এক। আশ্রয়-আশ্রিতের সম্যক্ একত্ব থাকিতে পারে না।

ইহার ব্যাখ্যা উপলক্ষে লেখক 'ভূমার প্রতিষ্ঠা' বিষয়ক অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অতি বিকৃত। ভূমার মহিমার সঙ্গে ভূমার একত্ব স্থাপন করিবার জন্য ভূমাপ্রকরণের অবতারণ করা হয় নাই। ঐস্থলের আলোচ্য বিষয়—ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভূমার আশ্রয় কোথায়? সনৎকুমার উত্তর দিয়াছিলেন, 'স্বে মহিম্নি' অর্থাৎ আপনার মহিমাতে। তিনি ইহাও বলিতে পারিতেন, 'আত্মন্যেব' বা 'স্ব এব' অর্থাৎ আপনাতে। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভূমা 'অন্য প্রতিষ্ঠ' নহেন, তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ তিনি আপনাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত। এই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্যই বলা হইয়াছে 'স্বে মহিম্নি'। ইহা শুনিয়া নারদ মনে করিতে পারিত যে, তবে ভূমারও আশ্রয়স্থল আবশ্যক। এই সংশয় বিদূরিত করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন—তিনি নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন, অর্থাৎ তাহার প্রতিষ্ঠাই নাই। তিনি অপ্রতিষ্ঠ। ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আছে কিনা, তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ, না 'অন্য প্রতিষ্ঠ', না অপ্রতিষ্ঠ ইহাই ভূমাপ্রকরণের আলোচ্য বিষয়। 'ভূমা ও ভূমার মহিমা এক' এ প্রকার আলোচনা করা এ প্রকরণের উদ্দেশ্য নহে।

আর একটি জিজ্ঞাস্য—ভূমার সহিত ভূমার মহিমার যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত পরমাত্মার কি সেই সম্বন্ধ ?

৫। এস্থলে আমাদিগের শেষ বক্তব্য এই—বহুপূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মকে হীন করিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মসংহিতাতে (৫।৪৬) এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

যস্য প্রভা প্রভাবতো জগদণ্ড কোটি—
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

এস্থলে ব্রহ্মের কয়েকটি বিশেষণ আছে, অনাবশ্যকবোধে সে সমুদায়ের অনুবাদ দেওয়া গেল না। এই শ্লোকে কয়েকটি বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে বর্ণনা করিয়া শেষে বলা হইল—"এমন ব্রহ্ম যে গোবিন্দের প্রভাবের প্রভা (যস্য প্রভবতঃ প্রভা), সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি"।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর অনুবাদ এই—

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি। ইত্যাদি (আদি ২)।

তিনি নিজেও একটি শ্লোক রচনা করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মকে কৃষ্ণের 'তনুভা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ, ৩য় শ্লোক এবং ১।২।২)।

ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ, ইহা বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের একটা প্রচলিত বিশ্বাস।

এই সমুদায় আলোচনা হইতে বুঝা যায় গীতার পুরুষোত্তমপ্রকরণ এবং 'ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' বিষয়ক অংশ কাহাদিগের রচনা।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

"উদ্ভিজ্জ" ঘৃত

[প্রতিবাদ]

কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'উদ্ভিজ্জ ঘৃত ও বর্ণহীন খনিজ তৈল' সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

"আসল ঘিয়ে মানুষের দেহের পুষ্টির পক্ষে ভাইটামীন নামক যে-সব পদার্থ থাকে, উদ্ভিজ্জ তৈলে সে সব নাই।" (সম্পাদকীয় বক্তব্য)

—আমার বক্তব্য এই যে, আসল ঘি সাধারণতঃ ১৪০ হইতে ১৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে প্রস্তুত হয়। ভাইটামীন ১২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপে নষ্ট হইয়া যায়—ইহা বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। বিশেষতঃ ভাইটামীন যে ভাজার উত্তাপে টিকেনা তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং আসল ঘিতে ভাইটামীন আছে, ইহা কি করিয়া স্বীকার্য্য ? সম্পাদক মহাশয়ের এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে ?

সম্পাদক মহাশয় আরও বলিতেছেন—"উদ্ভিজ্জ তৈলে মানুষের দেহের পক্ষে হিতকর এমন কোন কোন পদার্থ আছে যাহা তেলের সহিত হাইড্রোজেন মিশাইবার প্রক্রিয়ায় নষ্ট হইয়া যায়"—ইহার স্বপক্ষে প্রমাণ কি ? কার্লটন এলিস, কোকিন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ইহা ত স্বীকার করেনই না, উপরন্তু তাঁহারা বলেন যে অশোধিত উদ্ভিজ্জ তৈলে অনেক সময় মানবদেহের অহিতকর যে-সব উপাদান থাকে, হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় সেই সব অহিতকর উপাদান নষ্ট হয় ও ঘনীভূত তেল আহার্য্যের উপযোগী হয়। কোকিন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ক্রোটন তেলের কথা বলেন। তেল হিসাবে ইহা বিষবৎ কিন্তু হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত হইলে ইহা আহার্য্যের উপযোগী হয়। সম্পাদক মহাশয় ইহার বিপক্ষে প্রমাণ দিলে সুখী হইব।

কার্লটন এলিসের 'Hydrogenation of Oils' গ্রন্থ এ বিষয়ে সর্ব্বত্র প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়। উহাতে এলিস পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিশেষজ্ঞগণের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত তেল দেহের পক্ষে পুষ্টিকর—অনিষ্টকর নহে। অনেকের মতে এই ঘনীভূত তৈল মাখন হইতেও পুষ্টিকর, কারণ মাখনে শতকরা ৯৭ ভাগের বেশী স্নেহপদার্থ থাকে না কিন্তু ঘনীভূত তৈলে শতকরা ৯৯·৯৮ ভাগ স্নেহপদার্থ থাকে।

মানুষ ঘি ব্যবহার করে ভাইটামীনের জন্য নহে, উহার স্নেহ-পদার্থের (fats) জন্য—একই কারণে আমরা ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহার করিতে পারি। মানবদেহ কেবল ভাইটামীন খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। লবণ, শ্বেতসার, প্রভৃতির ন্যায় স্নেহ-পদার্থের অভাব হইলে মানুষ ক্ষীণস্বাস্থ্য হইবেই। দেশে শতকরা পনরজন লোক সস্তায় ঘি, দুধ, মাখন পায় কি ? ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তেল সস্তা ও পুষ্টিকর। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে—এমতাবস্থায় এদেশের দরিদ্রলোক সস্তায় কোন স্নেহপদার্থসমন্বিত খাদ্য পাইলে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে কি ?

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

জাগ্‌-গান

গত শ্রাবণের প্রবাসীর "বেতালের বৈঠক" স্তম্ভে 'জাগ্‌-গান' অবলম্বনে বিবৃত প্রথাগুলি হইতে বাকরগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত প্রথার প্রায় সর্ব্বাংশে পার্থক্য লক্ষিত হওয়ায় নিম্নলিখিত বিবরণটি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছি।

বাকরগঞ্জ অঞ্চলে 'জাগ্‌ গান' বলিয়া কোন গানের নাম শুনা যায় না। এই শ্রেণীর গান 'কুলাইর ছড়া' নামে প্রচলিত, ইহার সহিত মুসলমান বা অন্য কোন অহিন্দুর কোনরূপ সম্পর্ক থাকা নিষিদ্ধ। পৌষ-সংক্রান্তির দিন প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতেই "কুলাই পূজা" হইয়া থাকে, ইহা এই অঞ্চলের হিন্দুমাত্রেরই বারমাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে একটি। পুরোহিত-ঠাকুর ঘটস্থাপন করিয়া "কুলাই" দেবীর অর্চনা করেন, অনেকস্থলে প্রতিমাস্থাপন, ছাগবলিদান প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ ঘটা করা হয়। প্রত্যেক হিন্দু জমিদারের কাছারীতে বিশেষভাবে এই পূজা হইয়া থাকে। পূজার জন্য সাধারণতঃ বাহির বাড়ীতে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে, ইহাকে "কুলাই খোলা" বলা হয়। "কুলাই" প্রতিমা অনেকাংশে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার অনুরূপ, তবে "কুলাই" দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী। প্রতিমার দুই পার্শ্বে খোলার দুই প্রান্তে দুইটি কুমীর ও দুইটি বাঘ প্রস্তুত করা হয়, এই পূজা



"বা মারু" পর্ব্বত হইতে বালা হিসার ও কাবুলের দৃশ্য

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

লক্ষ্মীপূজারই নামান্তর মাত্র; ইহাকে বাস্তু দেবতার পূজাও বলা হয়।

কোন কোনস্থলে গ্রামের হিন্দু বালক ও যুবকগণ একত্র হইয়া বিশেষভাবে আমোদ করার জন্ত এইরূপ পূজার বারোয়ারী বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। ইহারই খরচ সংগ্রহের জন্ত সকলে দল বাঁধিয়া সারা পৌষমাস (বিশেষতঃ শেষভাগে) সন্ধ্যার পর বাড়ী বাড়ী গিয়া "কুলাই"'র ছড়া গাইয়া চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করে। এই ব্যাপার "কুলাইর ভিক্‌মাগা" নামে পরিচিত। সংক্রান্তির দিন দিনের বেলায় পূজা শেষ হয় এবং সমস্ত রাত্রি ছড়া গাহিয়া ও অন্তান্ত প্রকার গ্রাম্য আমোদ করিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়।

সম্পূর্ণ ছড়াটি এই—

আইলামরে শরণে,
লক্ষ্মী দেবীর বরণে ;—
লক্ষ্মী দেবী দিউন বর,
ধানে চাউলে ভরুক ঘর,
(বা চাউল কড়ি বিস্তর)
চাউল না দিয়া দেবেন কড়ি
গিরির (গৃহীর) দুয়ারে সোণার লড়ি,
সোনার লড়ি রূপার মালা
মাক্ থাড়ালে (মেঝেতে) টাকার ছালা।
একটি টাকা পাইরে,
বাণিয়া বাড়ী যাইরে,
বাণিয়া বাড়ী ঘুঘুর বাসা,
টাকা ভাঙ্গাই সুমুপাশা,
সুমুপাশা নানা ধন,
কুলাইরে দেবা কত ধন!
সরুয়া নলের চাষ কলাই
মাণিক নলের বেড়া
লক্ষ্মী হাতে দেও ভিক্
যাই হালিয়াপাড়া।
হালিয়াপাড়া যাইতেরে
গাঙ্গে লাগল সোত
ঠাকুর কুলাই বোল,

ছড়াটী একেবারে অর্থহীন নহে, ইহার অর্থ মোটের এইরূপ দাঁড়ায়। গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—"লক্ষ্মীদেবীর বরণ (অর্চ্চনা) করার জন্য তোমার শরণ লইতে আসিয়াছি। (অর্থাৎ তোমার নিকট ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি), লক্ষ্মীর বরে তোমার ঘর ধান চাউলে পূর্ণ হউক। (অথবা তোমার বিস্তর চাউল ও টাকা পয়সা হউক)। চাউল না দিয়া (কারণ চাউল বহিয়া নেওয়া কষ্টকর) পয়সা দিও তাহা হইলে গৃহীর অর্থাৎ তোমার দুয়ারে সোণার কাঠি হইবে, তোমার রূপার মালা হইবে ও তোমার ঘরের মেঝেতে ছালাভরা টাকা থাকিবে, (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইবে) আমরা একটা টাকা পাইলেই উহা লইয়া বাণিয়া বাড়ী যাইব, কিন্তু বাণিয়া বাড়ীতে আবার বহু দুষ্ট লোক থাকায় (ঘুঘু বলিতে দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন চালাক লোককে বুঝায়, এই অর্থে "বাস্তু ঘুঘু" শব্দের ব্যবহার নভেল নাটকে দেখা যায়) সুমুপাশা গ্রামে গিয়া টাকা ভাঙ্গিব। কারণ সেখানে বহু ধন রত্ন আছে, এত আছে যে "কুলাই" দেবীকে আর কত দেওয়া যায়। গৃহিণী, তোমার লক্ষ্মী-হস্তে ভিক্ষা দিয়া আমাদিগকে বিদায় কর কারণ আমরা এখন নলের বেড়া দেওয়া কলাই ক্ষেত পার হইয়া চাষা পাড়ায় যাইব, বিশেষতঃ সেখানে যাইতে নদী পার হইতে হইবে, সে নদীতে আবার খুব স্রোত, সকলে "কুলাই" ঠাকুরের নাম উচ্চারণ কর।

দুই একটী শব্দের অর্থসঙ্গতি হয় না, এই ধরণের গ্রাম্য ছড়ায় ইহা স্বাভাবিক।

প্রবাসীতে লিখিত "আড় বাঘের" ছড়াটীও এই সঙ্গে প্রচলিত আছে। "আড় বাঘ" না হইয়া "আর বাঘ" হওয়া উচিত, এখানে আর অর্থ "অন্য একটী" কারণ এই ছড়াটী আরম্ভ করা হয় "এক বাঘ অমুক" ইত্যাদি বলিয়া এবং পরে "আর বাঘ অমুক" ইত্যাদি বলিয়া অন্যান্য বাঘের পরিচয় দেওয়া হয়, ছড়াটীর নাম "বার বাঘের লেখা" অর্থাৎ বার রকমের বাঘের বিবরণ, "কুলাই" দেবী ব্যাঘ্র-বাহিনী বলিয়াই বোধ হয় ব্যাঘ্রগোষ্ঠীর কোষ্ঠী-কুলজির এত কদর।

এই প্রকার আমোদ এখন লুপ্তপ্রায়, পূর্ব্বে যে স্থলে পৌষ মাসের প্রতি রাত্রিতে এইরূপ বালকদের তিন চার দল বিদায় করিতে হইত এখন সে স্থলে সারা মাসে কদাচিৎ এক আধ দল দেখা যায়।

শ্রী হেমকান্ত দাশ

—

নরওয়েতে পূর্ণগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ

বিগত ভাদ্র সংখ্যা "প্রবাসী"তে অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা এফ্, আর, এস্, মহাশয় "নরওয়েতে পূর্ণগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "আজ যদি কলিকাতায় সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস (গ্রহণ) ঘটে, তাহা হইলে ১৮ বৎসর ১১ মাস পর পর কলিকাতায় বা নিকটবর্ত্তী স্থানে আর দুবার পূর্ণ (গ্রাস) সূর্য্য-গ্রহণ দেখা যাইবে।" (৭২৫ পৃঃ)। কিন্তু এই প্রবন্ধেরই একস্থানে বলিয়াছেন ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে এবং ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল (৭৩১ ও ৭৩৩ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে, এই দুইটি গ্রহণের একটির ২৯ বৎসর পর ৩০ বৎসরে পরবর্ত্তী গ্রহণ ঘটিয়াছিল (শেষোক্ত গ্রহণ ২২শে জানুয়ারী হইয়াছিল এতজ্জন্য ২৯ বৎসর পর ৩০ বৎসরে বলা হইল)। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় যে বলিয়াছেন, এক স্থানে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হইবার ১৮ বৎসর ১১ মাস পর আবার সেই স্থানে পূর্ণগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ হইবে তাঁহার এ কথা ঠিক হইল না। গত ১২ ১১ ২৮ তারিখে যে আংশিক সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছে তাহাও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের গ্রহণ হইতে ৩০ বৎসরে ঘটিয়াছে।

এই প্রবন্ধের অপর স্থানে অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন "প্রাচীন জাতিদিগের ঐতিহাসিক কাল সঙ্কলনের জন্ত এই সমস্ত (পূর্ণগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণের) বিবরণ অতি মূল্যবান.........এইরূপ গ্রহণ ধরিয়া গণনা করিয়া শ্লিমান প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ট্রয় নগর ও আর্গস যে গ্রীকেরা ধ্বংস করিয়াছিল সেই নগর খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন।... ডাঃ ফ্রদারিংহাম প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃঃ পূর্ব্ব ১১৯৭ সালে ট্রয়নগর ধ্বংস হইয়াছিল। যদি আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ প্রাচীন পুঁথি কেতাবে এইরূপ সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে রাম, রাবণ, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র হয়ত রক্ত মাংসেরই মানুষ হইয়া দাঁড়াইবেন" (৭২৬ পৃঃ)।

আমরা অধ্যাপক মহাশয়কে বিনীতভাবে জানাইতেছি প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এইরূপ পূর্ণগ্রাস সূর্য্য গ্রহণের বর্ণনা রহিয়াছে।

ঋষিগণের মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞসময়ে এই গ্রহণ ঘটিয়াছিল। ৫ম মণ্ডলের ৪০ সূক্তে সূর্য্য-গ্রহণের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহার স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় রাম রাবণ প্রভৃতির সময় নির্ণয় করিলে একটা কাজের মত কাজ হইবে।

ঋকের অনুবাদ

হে সূর্য্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল তখন নিজ স্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবন সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল (৫)।

হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্য্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্য্যবিঘাতক অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রকাশিত করিলেন (৬)।

আসুর স্বর্ভানু অন্ধকারদ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলে অবশেষে অত্রিপুত্রগণ তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন (৯)।

এখানে যে "স্বর্ভানু" সূর্য্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিবার কথা রহিয়াছে এই স্বর্ভানু অর্থ চন্দ্র। স্বর, ভা, সু (সুদ্) এই তিনটি শব্দে স্বর্ভানু পদে রহিয়াছে। স্বর— আকাশ। ভা—(অন্য হইতে) যে দীপ্তি পায়। কাহার নিকট হইতে কে দীপ্তি পায়? সূর্য্য হইতে চন্দ্র দীপ্তি পায়। সু—প্রেরণ করা। কোথায় প্রেরণ করে? পৃথিবীতে। অতএব যে অন্য হইতে প্রাপ্ত দীপ্তি (আলোক) পৃথিবীতে প্রেরণ করে সেই স্বর্ভানু। অসুরেরা যজ্ঞ বিঘাতক। মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞসময়ে সূর্য্যকে অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করাতে যজ্ঞের ব্যাঘাত হওয়ায় স্বর্ভানুকে অসুর বলা হইয়াছে।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব।
রঙ্গপুর।

প্রাচীন আফগানিস্থান

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আফগান-জাতি; আফগানিস্থানে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা

কাশ্মীর ও আফগানিস্থানে যাইবার পথে ভারতের সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ধরিয়া যে-সব উপত্যকা পড়ে, সেগুলিতে, এবং তাহার চারিপাশের পর্ব্বতে নানা জাতীয় লোকের বাস; ইহাদের নানা ভাষা, উৎপত্তিও ভিন্ন ভিন্ন। একেবারে উত্তরে, হিন্দুকুশের ও পশ্চিম-হিমালয়ের সানুদেশে যাহারা বাস করে, তাহারা আর্য্যভাষী, 'দরদ' জাতীয় লোক। পশ্চিমে থাকে ফার্সীভাষী 'তাজীক' জাতি, এবং তাহাদের উত্তরে তুর্কীভাষী কতকগুলি যাযাবর জাতি। ইহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে বাস করে, তাহারা আফগান বা পাঠান, এবং দক্ষিণে যাহাদের বাস তাহারা বেলুচি ও দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী ব্রাহুই জাতি।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার, 'আফগানিস্থান' বলিতে এখন আমরা যে দেশ বুঝি, আগে কিন্তু ঠিক তাহা বুঝাইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন আফগান-জাতি স্বাধীন হয়, তখন হইতেই উহার 'আফগানিস্থান' নাম চলিতেছে। পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশটি কোন সুনির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত, অথবা ইহার খণ্ডাংশগুলি জাতি বা ভাষার একতা দ্বারা গ্রথিত ছিল না। 'আফগানিস্থান' বলিতে শুধু 'আফগানদের থাকিবার স্থান' বুঝাইত; ইহা একটা সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড নির্দ্দেশ করিত বটে, কিন্তু বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অনেকাংশ উহার গণ্ডীভুক্ত ছিল না। আবার এমন অনেক প্রদেশ উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহা এখন স্বাধীন রাজ্য অথবা বৃটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত।

এমনও একদিন ছিল যখন আফগানিস্থানের গোমাল নদীতীর হইতে বৈদিক-যজ্ঞের ধূম আকাশে উঠিত, আর তখ্‌ৎ-ই-সুলেমানের পর্ব্বত-কন্দর আর্য্যঋষিগণের সামগানে মুখরিত হইত। ঋগ্‌বেদের সময় পিতৃগণের বাসভূমি ছিল—দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফগানিস্থান (রোহ্‌), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্চনদ ভূমি। * মহাভারতের যুগেও বাহ্লীক (বল্‌খ্‌) এবং গান্ধার (পেশোয়ার) আর্য্য ঋষি-

* Rapson's *Ancient India*, p. 39.

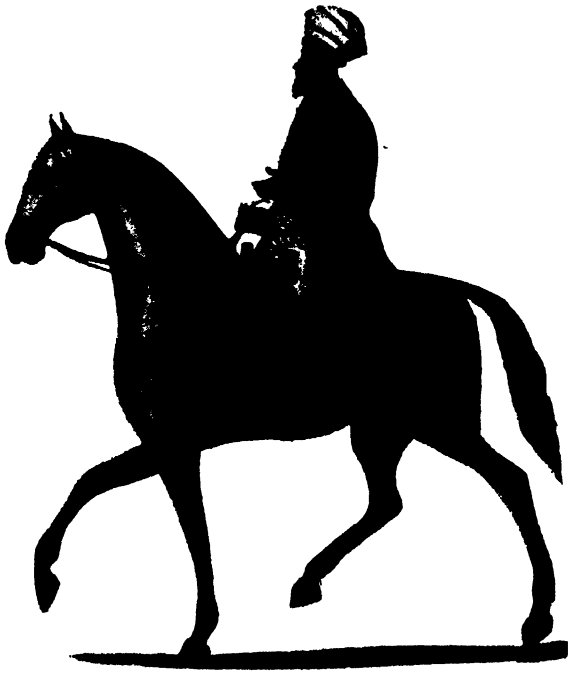
গণের বাসস্থান ছিল। আলেকসন্দর যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখনও আফগানিস্থান, সিস্তান ও বেলুচিস্থান আর্য্য-সভ্যতার অন্তর্গত। মগধের মৌর্য্যগণের রাজ্য হিরাত নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। নিজ কাবুল নগরে 'তুর্কী-শাহী' জাতীয় হিন্দু (অথবা বৌদ্ধ) রাজারা রাজত্ব করিতেন; তাঁহারা কুষাণ-সম্রাট কণিষ্কের বংশও হইতে পারেন। আটকের উত্তরে, সিন্ধুনদের তীরে 'উন্দ' বা 'ওহিন্দ' নগর এই 'শাহ' উপাধিধারী হিন্দু-রাজাদের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের বহুলোক বৌদ্ধ, জরথুশ্ত্র-শিষ্য অগ্নি-উপাসক ও মূর্ত্তিপূজক ছিল।* জলালাবাদ ও পেশোয়ারের সমতলভূমিতে এবং কাবুলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৌদ্ধ-সভ্যতার নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। আফগানিস্থানের উত্তর সীমায় বামিয়ান পর্ব্বতে খোদিত প্রকাণ্ড বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলির কথা অনেকেই জানেন।

সেই হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে বর্ত্তমান 'কাবুল' নদীর



মহমান্দ আফগান

নাম ছিল 'কুভা' এবং প্রদেশের নাম ছিল 'উদ্যান'; কুরুম (উপত্যকা) ছিল—'ক্রুমু'; 'গোমাল' ছিল 'গোমতী'; পেশোয়ার (সংস্কৃত 'পুরুষপুর' বা 'পুষ্পপুর') ছিল 'গান্ধার', ইত্যাদি। এই সমস্ত বৈদিক নামেরই প্রতিধ্বনি।



সম্ভ্রান্ত দুর্রাণী

এখনও আফগানিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশের অনেক ভৌগোলিক নামের মধ্যে বৈদিক নামের আভাস পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত, গজনীর সুলতান মামুদের মুন্শী—অল্ উৎবী'র 'তারিখ-ই-য়ামিনী' গ্রন্থে আফগানদের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তাহার পূর্ব্বে আফগানেরা অজ্ঞাত-অখ্যাত অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। গজনবী-বংশের রাজ্যকালে-আফগান জাতির বাসস্থান ছিল সুলেমান পর্ব্বতে। তাহাদের বিরুদ্ধে গজনীর মুসলমান-সুলতানেরা মাঝে মাঝে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন (১০২৩)। আফগানেরা তখনও 'ইস্লাম' গ্রহণ করে নাই, কারণ ঐতিহাসিক বৈহাকী তাহাদের 'অভিশপ্ত কাফের' আখ্যা দিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে আফগানেরা ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, কিন্তু এই নব ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে কোন নৈতিক পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই,—তাহাদের ভাষা, শাখা-সংগঠন (tribal organization)

* *Encyclopaedia of Islam*, "Afghanistan" by M. Longworth Dames.

ও দুর্দ্দমনীয় লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি অটুট থাকিয়া গেল। কালক্রমে আফগানেরা তাহাদের আদি বাসভূমি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফগানিস্থান (রোহ) পরিত্যাগ করিয়া ঘুরিতে



ভাঝাক—গ্রীষ্মের পোষাকে

ঘুরিতে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাবুল প্রভৃতি স্থানে বসতি বিস্তার ও প্রাধান্য স্থাপন করে।

'আফগান' নামের উৎপত্তি এবং তাহাদের জাতিতত্ত্ব বা কুলজী লইয়া নানা মুনির নানা মত। আফগানেরা আপনাদিগকে 'বেন-ই-ইস্রাইল' (ইস্রাইলের সন্তান) বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ কেহ তাহাদের 'য়িহুদী' বলিলে অবমানিত মনে করে। সুপণ্ডিত ডেম্‌স্ নানা মতের সমালোচনা করিয়া, গবেষণার ফলে সাব্যস্ত করিয়াছেন—আফগান-জাতি তুর্ক-ইরাণী জাতিদ্বয়ের মিশ্রণের ফল।* এই মতই পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তর-ভারতে আফগান-শক্তির বিস্তার

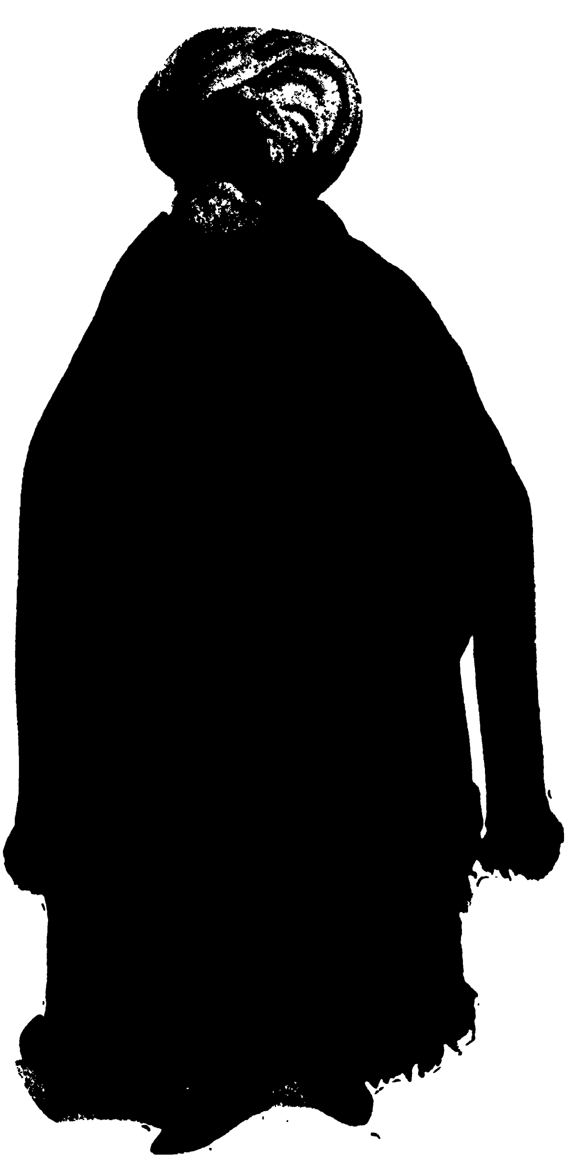
গজনীর তুর্ক-আমীর সবুক্-তিগিনের সৈন্যদলে প্রথমে আফগানগণকে বৃত্তিভুক সৈন্যরূপে দেখা যায়। তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ যখন তুখরিস্তানে সমরাভিযান করেন, তখনও তাঁহার দলে আফগান-সৈন্য ছিল। এই গজনবী-বংশের রাজ্যকালে আফগানেরা নগণ্য পার্ব্বত্য জাতি। ঘোরী-বংশের প্রাধান্যকালেও তাহারা প্রতিষ্ঠা-হীন। মুহম্মদ ঘোরী যখন তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে চৌহান-পতি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন (১১৯২), তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষেই আফগান-সৈন্য ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, আফগানেরা তখনও পুরাদস্তুর ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি হইতেই হিন্দুস্থানে মুসলমান-বিজয়ের সূত্রপাত হয়।

পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরের ভারতেতিহাসে কচিৎ আফগান-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখা যায়, দু'একজন আফগান-সর্দ্দার দাক্ষিণাত্যে ও বিহারে জায়গীর পাইয়াছেন। দাস-বংশের রাজত্বকালে অল্পসংখ্যক আফগান দিল্লীশ্বরের সৈন্যদলে যোগ দিতে সুরু করে। বল্‌বনের মেওয়াৎ-আক্রমণকালে তাঁহার তিন হাজার আফগান-অশ্বারোহী ও পদাতিক বিশেষ বিক্রমের পরিচয় দেয়। আমীর তাইমুরের ভারত-আক্রমণ পর্য্যন্ত আফগানেরা পার্ব্বত্য-দস্যু বলিয়াই পরিচিত ছিল। তাঁহার অন্তর্ধানের পর (১৪০০) দিল্লী-সাম্রাজ্যের দারুণ দুরবস্থা ঘটে; সেই সুযোগে লোদী-বংশীয় আফগানগণ পঞ্জাবে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। সৈয়দ-বংশের শেষ

* *Ibid.*, p. 162.

রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বহ্‌লুল লোদী সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৪৫০)। ভারতে আফগান-রাজত্বের সূচনা হইল। বহ্‌লুল দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর জৌনপুর-রাজ্য দখল করিলেন। ইহাই আফগানদের প্রথম জাতীয় কীর্ত্তি। রোহ্‌বাসী * আফগানদিগকে হিন্দুস্থানের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি তাহাদের আশাতীত অর্থ ও জায়গীর দিতেন। ফলে বহু আফগান-বংশ ভারতে আগমন ও বসতি করিল। ইহাদের মধ্যে লোদীগণ পঞ্জাব, দিল্লী ও তাহারও নিকটবর্ত্তী স্থানে; ফরমূলীগণ অযোধ্যা ও বহ্‌রাইচ জেলায়; লোহানীগণ গাজিপুর ও দক্ষিণ-বিহারে; সরওয়ানীগণ কানপুরে, এবং সুরগণ বিহারের শাহাবাদ-অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বহ্‌লুল লোদীর মৃত্যুর পর, স্বর্ণকার-নন্দিনীর গর্ভজাত তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র সিকন্দর লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। আফগান-সামন্তেরা তাঁহার গুণে বশীভূত ছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লী-সাম্রাজ্য তাঁহার শাসনকালে কতকটা ব্যবস্থিত হইয়া উঠে। কিন্তু আফগান-রাজ্য বেশীদিন টিকিল না। সিকন্দরের মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইলেন—সুলতান ইব্রাহিম (১৫১৭)। ইব্রাহিম ক্রূর, কপটাচারী, সন্দিগ্ধমনা ও নীতিজ্ঞানহীন সম্রাট। অচিরে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। আত্মসম্মানের উপর আঘাত আফগান বরদাস্ত করে না,—আফগান-সম্ভ্রান্তগণ রাজার উপর রুষ্ট হইলেন। ইব্রাহিমের উৎপাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পঞ্জাবের দৌলৎ খাঁ লোদী কাবুলে দূত পাঠাইলেন—বাবরকে ভারতাক্রমণে উত্তেজিত করিবার জন্য। পরিণাম ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ কি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন? পাণিপথে যে-সংগ্রাম হইল, তাহাতে ইব্রাহিম আপনার গর্ব্বোন্নত শির বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না (১৫২৬)। যে-সব আফগান-সামন্ত বাবরকে ভারতে আমন্ত্রণ করেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, বাবর কিছুদিন এদেশে থাকিয়া, তাইমূরের মত ধনদৌলৎ আত্মসাৎ করিয়া, শেষে ঘরে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন, বাবরের এদেশ হইতে নড়িবার নামগন্ধ নাই—তিনি লুপ্ত লোদী-সাম্রাজ্যের উপর মোগল-রাজত্বের বনিয়াদ গাঁথিয়া তুলিতে চান, তখন তাঁহাদের মনে নিজ নিজ ক্ষমতা ও আধিপত্য-লোপের আশঙ্কা হইল।



হিন্দ্‌কী—শীতবস্ত্রে

ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। কয়েক বৎসরের জন্য মোগল ভারত হইতে বিতাড়িত হইল। শূর-বংশীয় আফগান, সুকৌশলী শের শাহ্‌ ভারতে পুনরায় আফগান-রাজ্য

* রোহ্‌ হইতে রোহিলা আফগান নামের উৎপত্তি।

স্থাপনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন যোগ্য বংশধর ছিল না, তাই তাঁহার মৃত্যুর পনের বৎসর পরই আবার ভারতে মোগল-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতে পাঠান-রবি অস্তমিত হইল সত্য, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাহাদের উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। মোগল-সম্রাটদের মধ্যে আকবরই সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মোট কথা, মোগল-সরকার বুঝিয়াছিলেন, প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তি বজায় রাখিতে হইলে—কাবুল যাইবার পথ নিরাপদ রাখিতে হইলে—দস্যু আফগানদের



আফগান যোদ্ধা

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অপেক্ষা ঘুষ দিয়া তাহাদের বশ করিবার চেষ্টাই শ্রেয় ও অল্পব্যয়সাধ্য। এই কারণে পার্ব্বত্য আফ্রিদী, শিন্‌ওয়ারী, ইউসুফজাই এবং খটক্ জাতিরা কাবুল ও ভারতের মধ্যস্থিত পথে বণিক ও পথিকের নিকট হইতে যে কর আদায় করিত, তাহাদের সেই অধিকার মোগল-সরকার একপ্রকার মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সব-সময় নিয়মিত বৃত্তি দিয়াও আফগানদের বাধ্যতা আদায় করা সম্ভব হইত না। এইজন্য মোগল-যুগে অনেকবার পেশোয়ারের ইউসুফজাইরা ও খাইবার-পথের আফ্রিদী আফগানেরা দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়, অনেকবার দীর্ঘকাল যুদ্ধও হয়, এবং সময়ে সময়ে মোগল-



সশস্ত্র গ্রাম্য দুর্‌রাণী

সৈন্যকে ভীষণ পরাজয়ের কলঙ্ক লইয়া ফিরিতেও হইয়াছে। তাহার সাক্ষ্য—আকবর ও আওরংজীবের রাজত্বকালের ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল-রাজশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িল। দিল্লী আর কাবুলের খোঁজখবর রাখে না; শিথিলভাবে সাম্রাজ্যের শাসন চলিতে লাগিল। এই সুযোগে পারস্যের রাজা নাদির শাহ্ আফগানিস্থান অধিকার করিলেন—দিল্লীর বাদশাহ্ কাবুল ও আফগানিস্থানের মায়া কাটাইয়া বিজয়ী বীরের সহিত সন্ধি করিলেন। নাদিরের অপমৃত্যুর পর (১৭৪৭) তাঁহার সিংহাসন পাইলেন আহ্মদ শাহ্ আবদালী। তিনি নাদিরের একজন সৈনিক—কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী এক আফগান-শাখায় তাঁহার জন্ম। আহ্মদ শাহ্ আফগানিস্থান



ইউসুফজাই আফগান



হাজারা আফগান

এবং পঞ্জাবে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিবার জন্য 'তুর্‌রাণী' (=মুক্তা সদৃশ) আখ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশধরগণ 'তুর্‌রাণী রাজবংশ' বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত।

এতদিন পর্য্যন্ত আফগানেরা কখন দিল্লীশ্বরের, কখন পারস্যের সফবী-রাজবংশের অধীন ছিল। এখন তাহারা

দেশে স্বরাজ্য স্থাপন করিল—সমস্ত দেশ স্বজাতীয় এক রাজার অধীন হইল। এই সময় হইতেই সমগ্র দেশের নাম হইল—আফগানিস্থান।

আফগান-চরিত্র

আফগানিস্থান সমতলভূমি নহে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-উপত্যকায় বিভক্ত। এক এক উপত্যকায় এক এক



মহ্‌সুদ ওয়াজিরি

বংশের লোকের বাস। সমতলভূমির যে-কোন জাতি অপেক্ষা আফগানেরা সাহসী ও কর্ম্মঠ, কিন্তু এক গোষ্ঠীর (clan) সহিত অপর গোষ্ঠীর, অথবা এক বংশের সহিত অপর বংশের বিবাদ প্রায় লাগিয়াই আছে। এই বিবাদ এবং পৃথক ভাবে বাস, এক সমবেত জাতি-গঠনের প্রধান অন্তরায়। শুনা যায়, ইউসুফজাই আফগানদের উপর তাহাদের এক প্রসিদ্ধ ফকির অভিসম্পাত দিয়াছিলেন,—'তোমরা চিরদিন স্বাধীন থাকিবে, কিন্তু কখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না।'*

আফগানেরা বংশ-গৌরবে গর্ব্বিত, অথচ আরবদের মত সামাজিক সাম্যপ্রিয় (democratic)। বিবাদ এবং রক্তপাতেই পাঠানের আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্র তাহার ক্রীড়াস্থল, মৃত্যু তাহার সুহৃদ্, দস্যুতা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দস্যুবৃত্তির অভাবে কৃষি তাহার অবলম্বন। প্রাচীন টিউটন জাতির মত, রক্তপাতে যাহা লাভ করা যায়,



গিলজাই আফগান—গ্রীষ্মের পোষাকে

তাহার জন্য ঘর্ম্মপাত করায় সে অপমান বোধ করে। পাঠানের ধর্ম্মোন্মাদনা ও প্রতিহিংসাবৃত্তি অতি ভীষণ। সে অপরাধীকে ক্ষমা করিতে জানে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে, বিষাক্ত সর্প কিংবা ক্ষিপ্ত হস্তীর হাত হইতে মানুষ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পাঠানের প্রতিহিংসার কাছে কাহারও অব্যাহতি নাই। জাতীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আফগানেরা ইরাণ ও তুরাণবাসীর (ইরাণ—পারস্য, তুরাণ—মধ্য-এশিয়া) দোষগুণ কতক পরিমাণে পাইয়াছে। শৌর্য্যের সহিত ধূর্ত্ততার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই পাঠান-চরিত্রের বিশেষত্ব। ইতিহাস পাঠানের

* Sarkar's *Aurangzib*, iii. 221*n*.



বর্ম্মপরিহিত দুররাণী সামন্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

বীরত্ব ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তে যেমন উজ্জ্বল, ক্রূরতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় তেমনই কলঙ্কিত। যুদ্ধে অনেক সময় শত্রু কর্ত্তৃক বাহুবলে পরাস্ত না হইয়াও সন্দিগ্ধমনা পাঠান কল্পিত ভয়ে চকিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে। রাজপুত বা শিখের মত পাঠান বীরত্বের অন্ধ আবেগে চালিত হয় না—আত্মরক্ষার জন্য কপট-যুদ্ধ করিতে পটু, কিন্তু তাই বলিয়া কাপুরুষ নহে।



গিল্‌জাই আফগান



দুর্‌রাণী আফগান



শিন্‌ওয়ারী যোদ্ধা

আফগান-চরিত্রের অপর এক বিশেষত্ব—সাম্য ও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পাঠানের স্বজাতি-প্রেম না থাকিতে পারে, কিন্তু স্বদেশ-প্রীতি আছে। পাঠান অক্লান্তশ্রমী, মিতাহারী, রণদুর্ম্মদ, অব্যর্থলক্ষ্যভেদী; কিন্তু নিয়ম মানিতে বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে অক্ষম—সকলেই 'হাম-বড়া'; আফগানকে পরাজিত করা কঠিন না হইতে পারে, কিন্তু বশীভূত করা অসম্ভব। প্রবল শত্রুর নিকট ক্ষণকালের জন্য

বশ্যতাস্বীকার করিলেও, সুযোগ পাইলে সে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। স্বদেশেও তাহারা দীর্ঘকাল যথেচ্ছাচার-মূলক শাসন-পদ্ধতির অধীন থাকে নাই। সর্ব্বদা আপনার সহজাত-অধিকার—স্বাধীনতা—রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একজন আফগান এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবকে বলিয়াছিল,—'বিবাদ অশান্তিতে আমরা দুঃখিত নহি—যুদ্ধের আশঙ্কায় আমরা ভীত নহি, রক্তপাতেও আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব—আমরা কখনও কাহারও প্রভুত্বের পীড়ন সহ্য করিব না।'*

আফগান জাতি বহু যুদ্ধে জয়ী হইলেও, কখনও দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ-পরিচালন, অথবা দূরদেশে অভিযান করিতে সক্ষম হয় নাই; স্বদেশে থাকিয়া কোন দূরবর্ত্তী দেশে কখনও সাম্রাজ্য শাসন অথবা রক্ষা করে নাই। নিজ দেশে তাহারা অজেয়,—বিদেশে নহে। স্বাস্থ্য ও শক্তিতে তাহারা অতুলনীয়। বৎসর বৎসর তাহাদের বংশ এমনই বাড়িয়া চলে যে, সেই দ্রুত জন-সংখ্যাবৃদ্ধি পার্শ্ববর্ত্তী দুর্ব্বল সমতলবাসীর পক্ষে ত্রাসের কারণ হইয়া উঠে।

মুসলমান হইলেও পাঠানেরা অনেক বিষয়ে কোরাণ মানিয়া চলে না। ঋণ দিয়া টাকার সুদ লইতে, অথবা স্বধর্ম্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দ্বিধা করে না। শাখা-সংগঠন (tribal organization) তাহাদের মজ্জাগত;—ইসলাম ধর্ম্ম তাহাদের জাতীয় চরিত্রের উপর সূক্ষ্ম আবরণ দিয়াছে মাত্র।

ইসলাম-জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আফগানের দান নাই। আরব, পারসিক ও তুর্ক—এই তিন জাতির প্রত্যেকেরই যে বিশিষ্ট গুণ আছে, পাঠান তাহার সকল-গুলি হইতেই বঞ্চিত।

* Dorn's *History of the Afghans*, Preface, vi.

দীক্ষা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিদিন প্রভাতে ধরণী নূতন করে আলোকের দীক্ষা গ্রহণ করে—প্রতিদিন প্রভাত-সূর্য্য তার ললাটে জ্যোতির টীকা পরিয়ে অন্ধকার হ'তে, সুপ্তি হ'তে, অচৈতন্য হ'তে তাকে মুক্তির দীক্ষা দেয়; যদি না দিত তা' হ'লে সে তার সার্থকতা হ'তে বঞ্চিত হ'ত, পৃথিবী বস্তুপিণ্ডরূপে চল্‌ত। এই চৈতন্য উদ্বোধিত হয়েছে বলেই জীবধাত্রীরূপে তার যথার্থ সার্থকতা।

একটা প্রদীপের কিছুই কমেও না বাড়েও না যখন একটা আলোকের কণা এসে তার শিখা জ্বেলে দেয়; তা'তে তার ভাবের বা আয়তনের কিছু কমবেশ হয় যে তা নয়, কিন্তু সে সার্থকতা লাভ করে। আমাদের গৃহের প্রদীপ প্রতি সন্ধ্যায় তার ললাটে মঙ্গল-শিখা গ্রহণ ক'রে চরিতার্থ হয়। তেমনি প্রতিদিন প্রভাতে ধরণী সূর্য্যালোকের স্পর্শে আপনার তাৎপর্য্য লাভ করে। এই-জন্য কত যুগযুগান্তর সে অপেক্ষা করেছে, যুগ যুগ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ ক'রে তপস্যা করেছে, তারপর একদিন পেয়েছে তার চৈতন্যের শিখা। জড় সত্তা থেকে প্রাণবান সত্তায় তার প্রকাশ পূর্ণতর হয়েছে। সেই তার শ্রেষ্ঠতর পরিব্যক্তির দীক্ষামন্ত্র প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গনে এসে পৌঁছয়; একটি নীরব বাণী আকাশ পূর্ণ ক'রে তাকে বলে, "তুমি ধন্য"।

আজকে ৭ই পৌষও একটি দীক্ষা-দিনের সাংবাৎসরিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইদিনে যে দীক্ষা নিয়েছিলেন, সেটাকে আশ্রয় ক'রে এই আশ্রম গ'ড়ে উঠেছে, বিচিত্র হয়ে উঠেছে, যেমন করে সূর্য্যের আলোক সমস্ত জীবমণ্ডলীকে জাগ্রত করে রেখেছে, সজীব

করে রেখেছে, ফুলে ফলে, পশুতে পক্ষীতে বিচিত্র করে রেখেছে, তেমনই করে এই নির্জ্জন প্রান্তরের মাঝখানে, এই তরুশূন্য ভূমিখণ্ডে তাঁর দীক্ষার আলোক যখন এসে স্পর্শ করল, তখন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে বিচিত্র কল্যাণরূপ সে উদ্বোধিত করল। ঠিক কোন্ ভাবের উপর, কোন্ সত্যের উপর এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত, সে কথাটি আজ আমরা স্মরণ করব।

অল্পদিন হ'ল আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর কাছে একজন বিখ্যাত ইংরেজ-কবির কবিতা আমি ব্যাখ্যা করছিলাম; কবিতাটি তাঁর দীক্ষার গাথা। তিনি বলেছেন—আমি একটি বিশেষ দিনে জীবনের পরম দীক্ষা গ্রহণ করেছি। সেদিন থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে আমার সমস্ত জীবনকে আমি নিবেদন করেছি এবং জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে যা' নির্ম্মল, যা' উজ্জ্বল তা'কে নিজের মধ্যে অনুভব করে তা'র কাছে আমার সমস্ত জীবনকে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে দিয়েছি। তিনি বলেছেন, সংসারের নানা সুখ-দুঃখ, অভাব-অকল্যাণের ভিতর দিয়ে পরম পরিপূর্ণ পরমসুন্দরের আবির্ভাব ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। বস্তুপিণ্ডের মধ্যেও ফুল ফোটে—তাই দেখি, যখন চারিদিকে নিরন্তর স্বার্থ নিয়ে হানাহানি চলেছে তখন অকস্মাৎ কোন বীরহৃদয় জগতের উদ্ধারের জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন করে। অথচ ব্যাপকভাবে দেখ্‌তে পাই অমঙ্গলকে। তাই মনে দ্বিধা হয় এই পরিপূর্ণতার রূপ এই যে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মঙ্গল, যার মধ্যে কোন একটা পরম সত্যের আবির্ভাব আছে সে কি শুধু ক্ষণস্থায়ী কল্পনা? তারপর একদিন বসন্তের দক্ষিণ সমীরণে বনে বনে পশু-পক্ষীর জীবনে যখন আনন্দের লহরী তরঙ্গায়িত হ'ল প্রেমের স্পন্দনে, সৌন্দর্য্যের বিকাশে, তখন তিনি হঠাৎ নিজের অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করলেন এই পূর্ণতার ঐক্য; তিনি অনুভব করলেন যা'কে ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পাই তা' মায়া নয়, কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, তা সমস্ত দুঃখ-ক্ষতি, সমস্ত মৃত্যু-আঘাতের অন্তরতর ধ্রুব সত্য। অকস্মাৎ যেমন রিক্ত শাখাকে সুন্দর করে ফুল ফোটে তেমনি কবির অন্তরে দীক্ষার ফুল ফুট্‌ল, বিশ্বের কেন্দ্রে তিনি পরমসুন্দরকে অনুভব করলেন; তিনি তাকে প্রণাম করলেন—তুমি সত্য, তোমাকে আমার সমস্ত আশা-বিশ্বাস, আমার জীবন নিবেদন করলাম্।

সেইরকম দীক্ষার দিন আসে আমাদের জীবনে। অধিকাংশ মানুষই আমরা অদীক্ষিত; আমাদের মধ্যে পূর্ণতর সত্তার দীক্ষালোক পৌছয় না, আমাদের চোখ খোলে না। হঠাৎ একদিন যখন অন্তরে অন্তরে বন্ধন ক্ষয় হয়ে আসে, তখন চোখ মেলে দেখি সূর্য্য উঠেছে, আলো এসেছে, দীক্ষার দিন উপস্থিত হ'ল। সুখ দুঃখ আঘাতের ভিতর দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে এমন বাণী কেমন করে জীবনে অবতীর্ণ হ'ল কেউ জানে না। সেই দীক্ষার বাণীর জন্য প্রত্যেক মানুষ অপেক্ষা করে। অদীক্ষিত মানুষ ত' মনুষ্যত্বের পথে চলেনি, সে ত' পশুপক্ষীর সঙ্গে এক ক্ষেত্রে বিচরণ করছে; তারা উপরে উঠ্‌তে পারে না। আমরা ত' দীক্ষিত জীবনকে বিশ্বাস করি না, মৃত্যু দিয়ে আবৃত, প্রতিদিনের সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ ধূলিতে আবিল বায়ুমণ্ডলের উপরে আর কোন দিব্যধাম আছে এ কথা ত' আমরা বিশ্বাস করি না। সাধক বলেছেন—অমৃতের পুত্র তোমরা, দিব্যধামে তোমরা বাস কর, আমরা তা' স্বীকার করি না কারণ আমরা যেখানে বাস করি সেখানে নানা আকারে অমঙ্গল বিচরণ করে, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষে জর্জ্জরিত, আত্মাভিমানে পরিস্ফীত মানুষ আমরা, প্রতিদিন যা' দেখছি তাতেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের ভিতরে অমৃত পুরুষ রয়েছেন, এই মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে দিব্যধাম প্রস্তুত রয়েছে, এ কথা তিনিই বল্‌তে পেরেছেন যাঁর মধ্যে আলোক এসে অবতীর্ণ হয়েছে, সকলে তা' পারে না। সেইজন্য যাঁরা আত্মার মধ্যে কোন পুণ্য লগ্নে আলোকের, চৈতন্যের, সত্যের দীক্ষা আপনা-আপনি লাভ করেছেন, তাঁদের জীবনকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে আমাদের জীবনকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

বেদে আছে মৃত্যু যেমন তাঁর ছায়া অমৃতও তেমনি তাঁর ছায়া। সংসারে দুই বিপরীত জিনিষ দেখ্‌তে পাই। একদিকে দেখি এই স্থূল সংসার; এই দুঃখ-শোকের সংসার মৃত্যুদ্বারা অধিকৃত ও জড়ের ভারে পীড়িত।

আবার দেখি, এই ভারকে অতিক্রম ক'রে উপরে তুল্‌তে পারে এমন কিছু আছে, এই জগতের মধ্যেই। একদিকে মৃত্যুকে দেখ্‌তে পাই আর একদিকে অমৃতকে অনুভব করি। মৃত্যু যদি সংসারের সত্য ধর্ম্ম হত তা'হ'লে জীব কোনদিন জন্মগ্রহণ কর্‌তে পার্‌ত না; অমৃতের প্রতি অবিশ্বাসের যদি সত্য ভিত্তি থাকত তা হ'লে কোনো সাধক কোনো সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ কর্‌তে পার্‌তেন না, তা হ'লে মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ত। কিন্তু মৃত্যুর অন্তরে অন্তরে অমৃত বিরাজ করছে, সেইজন্য মানুষের আশার অন্ত নাই; যত বড় দারিদ্র্য বিপদ তাকে অধিকার করুক না কেন, তার বিশ্বাস যায় না যে ভিতরে অমৃত-সম্পদ আছে।

কবি বলেছেন যা-কিছু সুন্দর কখনও তা'কে দেখা যায়, কখনও বা সে চলে যায়; ফুল ফুটে ঝরে যায়। ফুলের ফোটাটাই বড় সত্য, ঝরে যাওয়া নয়। বস্তুর পরিমাণ আয়তনে কিন্তু শতদলের পরিমাপ আয়তনে নয়। পিণ্ডাকার পাথরের চেয়ে তার আয়তন কম। তার মূল্য অমৃতের পরিচয়ে। এতটুকু একটু ফুল আপন ক্ষণজীবনের মধ্যেও মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। পরিপূর্ণতার আবির্ভাব যখন সেই ছোট ফুলটির মধ্যে দেখি তখন বুঝি, এ শুধু বস্তুমাত্র নয়, দেশকালে সীমাবদ্ধ এর মধ্যে আরও কিছু আছে যার সীমা পাওয়া যায় না। সেই অনির্ব্বচনীয়কে যিনি একান্ত উপলব্ধি করেছেন তিনিই সার্থকতা লাভ করেছেন।

মৃত্যুর ভিতর থেকে অমৃতকে জয় কর্‌তে হবে; সেই দীক্ষাই অমৃতলোকের দীক্ষা।

আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা, আহারনিদ্রা প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাপারে পশুপক্ষীর সঙ্গে আমরা সহজ রয়েছি, সে ত' মৃত্যুর অধিকারে; সেখানে যত প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, প্রমাদ, বিদ্বেষবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি, মাৎসর্য্য সংসারে নানারকম দুঃখের সৃষ্টি করে। সেইজন্য কবি বলেছেন, "আমি যখন নিজেকে নিবেদন করে দিলাম তখন আমি আপনাকে জয় করব, আর সবাইকে ভালবাসব। তিনি বল্‌লেন, যেখানে মৃত্যুর দ্বারা মানুষ অধিকৃত ভয় সেখানে; যেখানে সে সংসারী, বিষয়ী সেখানে সে মরে মারে, দুঃখ দেয় দুঃখ পায়, সেখানে তার যত দৈন্য, যত ব্যর্থতা। ভয় যদি করতে হয় তাকেই ভয় করতে হ'বে। যেখানে জগতের সঙ্গে মিল সেখানে মানুষ আপনার আত্মাকে পায়; যেখানে সে অহঙ্কারের সীমাকে অতিক্রম করে সেখানে দেশ নাই, বিদেশ নাই, জাতি নাই, বিজাতি নাই, শত্রু নাই। যারা সেই আত্মাকে পেয়েছে তারা অমৃতকে পেয়েছে। যাঁরা বিদ্বেষবুদ্ধি ভেদবুদ্ধিকে বড় করে বাড়িয়ে না তোলেন তাঁরা শান্ত সমাহিত শুদ্ধ হয়ে অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁরা দিব্যধামে আছেন—সেই দিব্যধামে, পদে পদে যেখানে ভেদের প্রাচীর চিত্তকে প্রতিহত করে না।

স্বার্থ থেকে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত করে যাঁরা আপনাকে নিবেদন করে দিয়েছেন পরম পরিপূর্ণের কাছে, তাঁরা সমস্ত জীবনকে নিবেদন করেছেন, সকলের হয়ে। তাঁদের দীক্ষা আমাদের প্রত্যেকের দীক্ষা। সেই দীক্ষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হোক্।

উপদেশ

সকলের চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই বিশ্বের সৃষ্টির যে রহস্য তা' দ্বারা আমরা চারিদিকে পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। আমরা দেখ্‌ছি কালে কালে যুগে যুগে কত রকম রূপের উদ্ভাবন হচ্ছে, যা বিরল ছিল ক্রমে ক্রমে তা' বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ছে; যার মধ্যে জড়তা ছিল তার মধ্যে প্রাণ জেগে উঠ্‌ছে। সমস্ত দেশ কাল পরিপূর্ণ করে এই যে একটা সৃষ্টির ব্যাপার চল্‌ছে অনাদি কাল থেকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার বিরাম নাই। এই যে আশ্চর্য্য উদ্যম, প্রকাণ্ড একটা শক্তি যা অব্যক্ত থেকে ক্রমাগত ব্যক্তের দিকে চল্‌ছে—যা কল্পনা করা যায় না, কর্‌লে মন অভিভূত হয়ে যায়—যা মানুষ অন্য সব জীবের চেয়ে বেশী করে অনুভব কর্‌ছে এর সঙ্গে যোগ দিতে পার্‌লেই আমাদের সার্থকতা। সৃষ্টির তত্ত্বটা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। অন্য জীবজন্তু সংসারে জন্মেছে, সৃষ্টির ধারা বেয়ে তারা ভেসে চল্‌ছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা, আহার-নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারাই তাড়িত হয়ে চল্‌ছে কিন্তু মানুষকে সৃষ্টিকর্ত্তার সরিক হতে হয়েছে; হয়ে তবে সে গৌরব

লাভ করেছে। গুহার মধ্যে জন্তু বাস করছে, গাছের ডালে পাখী বাসা বেঁধেছে কিন্তু মানুষ আপনার লোকালয় বহুধা শক্তিযোগে সৃষ্টি করেছে; শুধু লোকালয় নয় মানুষ আপনাকে আপনার সমাজের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছে, স্বার্থকে দমন করতে হয়েছে, প্রতিবেশীর জন্য ভাব্‌তে হয়েছে, বহু লোকের এবং বহুযুগের জন্য তাকে কিছু-না-কিছু উৎসর্গ করতে হয়েছে।

সৃষ্টি করবার যে চিত্তবৃত্তি তার ভিতর প্রয়োজন আছে নিরাসক্তির। বিশ্ববিধাতা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি সহজেই করেছেন, লোভের, ক্রোধের, বাহিরের তাড়নায় নয়, আপনার আনন্দের পরিপূর্ণতায়। সেই সৃষ্টি থেকে নিজের কাজের মধ্যে তিনি একই কালে দূরে অথচ নিকট রয়েছেন; এইটাই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান কথা। যাঁরা প্রধান করে নিজেকেই দেখেন সেখানে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তাঁরা ব্যর্থ হ'ন। আপনাকে ভুলেই সৃষ্টি করতে হয়। পূর্ণস্বরূপ যিনি আপনার সৃষ্টির আনন্দে আনন্দিত তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ হয় তখনই কর্ম্মে যখন আমাদের আনন্দ অথচ ফলে যখন আমাদের আসক্তি নেই। তখনই বিশ্বকর্ম্মার জগৎরচনার সঙ্গে আমাদের জীবন ও কর্ম্ম-রচনার যথার্থ যোগ হয়। এই আশ্রমের মধ্যে সেই কথাটাই আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

যেখানে মানুষ বিষয়ী সেখানে আপনাকে দেখ্‌বার দিকে তার দৃষ্টি, সেখানে তার আপনার অহঙ্কার পরিতৃপ্ত করবার দিকে দিনরাত্রি নজর রাখতে হয়, সেখানে সে যে বিশেষ কিছু সৃষ্টি করে না, তার মানে কি? সে এমন কিছু রেখে যায় না চন্দ্রসূর্য্যের সঙ্গে যার যোগ আছে, কালকে অতিক্রম করেও যা থাকবে, যা নষ্ট হলেও একেবারে নষ্ট হয় না সূক্ষ্মভাবে থেকে যায়।

পৃথিবীতে কত শুভ অনুষ্ঠান হয়েছে, কত সাধক জন্ম-গ্রহণ করেছেন তার চিহ্নও নাই। কিন্তু আজকের মানুষ যা হয়েছে, আজ যদি কোন গৌরব সে লাভ করে থাকে, কোন জায়গায় সে পশুর চেয়ে বড় হয়ে থাকে তার পিছনে তাঁদের সাধনা রয়েছে। সে সমস্ত সাধনা আজ বিশেষ রূপ হারিয়ে সাধারণভাবে সমস্ত মনুষ্যজাতির অন্তরে নব নব সঙ্কল্পে ও বাহিরে নব নব পরিকল্পনায় বিকাশ পাচ্ছে। এই হ'ল সৃষ্টি। চন্দ্র সূর্য্য নিভে যায় না তা' নয়; কিন্তু বিশ্বে যে দীপালিকার উৎসব হয়েছে তার অন্ত নেই, কারণ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি এক আধার ত্যাগ করলেও অন্য আধারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই হচ্ছে সৃষ্টি। মানুষ অনেক কাজ করে যা আপন সঙ্কীর্ণ সীমাতেই পর্য্যবসিত। সে সৃষ্টি নয়। পৃথিবীতে অনেক কুবের জন্মগ্রহণ করেছে যারা লোহার সিন্দুকে টাকা ভরেচে, এবং তার দ্বারে পাহারা, তবু সেই ধনরাশি বিলুপ্ত হয়ে গেচে। কারণ ধনে সৃষ্টির হাত নেই, আছে সম্পদে। ধন নিজেরই, সম্পদ সকলেরই।

এই আশ্রমে আমাদের এমন একটা কর্ম্মক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আমরা আনন্দের দান দিতে পারি; আত্মার সকলের চেয়ে বড় অর্ঘ্য যা' আমরা অসীমকে নিবেদন করতে পারি এমন একটা পুণ্যক্ষেত্র এখানে রয়েছে; একে সার্থক করতে পারি যদি অন্তরের ভিতর শক্তির উদ্বোধন হয়; তা' হ'লে এখানকার যোগ্যতা আমরা লাভ করতে পারব।

এখানকার বালকবালিকাদের এবং সকলকে বল্‌ছি আমাদের সৃষ্টি করতে হ'বে; প্রত্যেক গাছপালা প্রত্যেক ভূমিখণ্ডে যেন কিছু দান করে যেতে পারি; এই অপরূপ যজ্ঞক্ষেত্রটিকে সুন্দর করে, কল্যাণময় করে, নিষ্পাপ করে তৈরী করব।

সৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাই, যেখানে রূপ তার মাঝখানে একটি কেন্দ্র আছে। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন এই যে পরমাণু এর মাঝে আছে একটা কেন্দ্র পদার্থ। সৌরলোকে কেন্দ্র আছে সূর্য্য; আমাদেরও সেইরূপ কেন্দ্রের দরকার। বিশ্বকেন্দ্রে আছে বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা; তিনি রূপসৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর সেই ইচ্ছা সমস্তকে এক করেছে। সেই পরম ইচ্ছাকে আবর্ত্তন করতে করতে নানা রূপ উদ্ভাবিত। সেই আত্মদান করবার নিরাসক্ত আনন্দ আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হোক্ তবেই যথার্থ সৃষ্টি হ'বে। অহঙ্কার দ্বারা সৃষ্টি হয় না; পরিপূর্ণ আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ যা বিশ্ববিধাতার আনন্দ যা সমস্ত লোকের কেন্দ্র-স্থলে রয়েছে সেই আনন্দের এককণা মাত্র আসুক আমাদের

প্রাণের মাঝখানে; সব মানুষের যিনি বিধাতা তাঁর আসনের একপাশে আমাদের স্থান হোক্।

আশ্রম সেই অপেক্ষায় আছে, যাঁরা সৃষ্টির সাধক তাঁরা আসুন সব জায়গা থেকে, আসুন এখানে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য নয় আপনাকে দান করবার জন্য।

এখানকার সেই আহ্বান সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বল্‌তে পারি না, বাধা বারবার এসেছে; কিন্তু ভয় পাব না, নিরাশ হ'ব না। বিশ্বের কেন্দ্র থেকে আজ বাণী উঠ্‌ছে, বল্‌ছে—"তোমরা এস আমার সঙ্গে, কাজ কর। তোমাদের চারিদিককে নির্ম্মল কর, নিরাময় কর, সুন্দর কর, কল্যাণময় কর; জীবন দিয়ে, শক্তি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে সৃজন কর।"*

* শান্তিনিকেতনে আচার্য্যের উপদেশ

দরদী

শ্রী অমিয়া দেবী

হে বিশ্ব-দেবতা
যেথায় অপূর্ণ গীতি অসম্পূর্ণ কথা
অসম্পন্ন জীবনের আয়োজন যত
মিথ্যার বেদীর 'পরে গড়িছে নিয়ত
অন্ধ গর্ব্ব ভ্রান্ত অহঙ্কার,
উদ্দাম বাসনা
নিত্য যেথা করিছে রচনা
কণ্ঠের বাঁধন-গ্রন্থি দুঃখ শোক দ্বন্দ্ব হাহাকার;
আপনার যাত্রা পথদ্বারে
আলোকের গতিরোধ করি
মূঢ় যেথা নিজ হাতে তুলিতেছে দুর্ভেদ্য প্রাকার
শ্রান্তিহীন রাত্রিদিন ধরি
অন্ধ অন্ধকারে,
জানি আমি তুমি সেথা থাকো,
অতন্দ্র প্রহরী হ'য়ে নিশিদিন জাগো,
দলিতের অশ্রুজলে তোমারি ললাটে পড়ে লিখা
শোণিতাক্ত বেদনার টীকা।

যে সৌন্দর্য্য এ বিশ্বের চিরন্তন বেদনার গানে
চরম দুঃখের বুকে পরম আশ্বাস বয়ে আনে
তুমি তারি প্রাণ-স্বর, মুখরিছ অন্তরের বেণু,
বিশ্বের হৃদয়-পদ্মে সংগোপন সুরভিত তুমি পদ্মরেণু।

পরশ রতন ওগো, লোহার শৃঙ্খলে তুমি নিত্য কর সোনা
এ নশ্বর জীবনের ক'টি দিন গোণা
ক'রে দাও অনন্ত অক্ষয়,
প্রাণের অমৃতলোকে পলকে পলকে
উদ্ভাসিয়া তুলিতেছ পরম বিস্ময়,
ব্যর্থেরে সার্থক কর মৃত্যুমাঝে দাও বরাভয়
হে শাশ্বত জয় তব জয়।



থিয়েটারের টিকিট-বিক্রয়কারী কলের মানুষ—

ফ্রান্সের আর্‌রা নামক স্থানের এক থিয়েটারের প্রবেশদ্বারের নিকটে একটি অদ্ভুত দর্শন মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির হস্তস্থিত বাক্সের মুখে পয়সা রাখিলেই থিয়েটারে প্রবেশ করিবার টিকিট পাওয়া



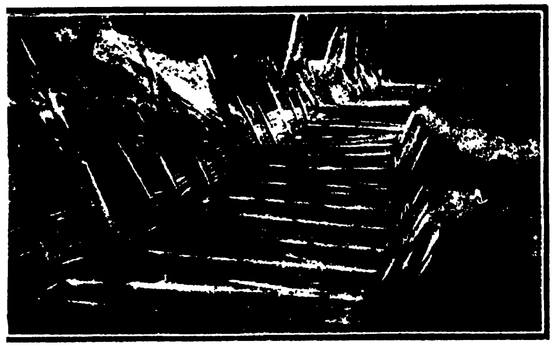
টিকিট বিক্রয়কারী মূর্ত্তি

যায়। টিকিট-বিক্রয়ের এই অদ্ভুত ব্যবস্থা সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করে এবং সেই কারণে থিয়েটারে দর্শকের ভিড়ও বেশ হয়। টিকিট বিক্রয়কারী মূর্ত্তির মুখের চমৎকার হাসি-হাসি ভাবটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব পছন্দ করে।

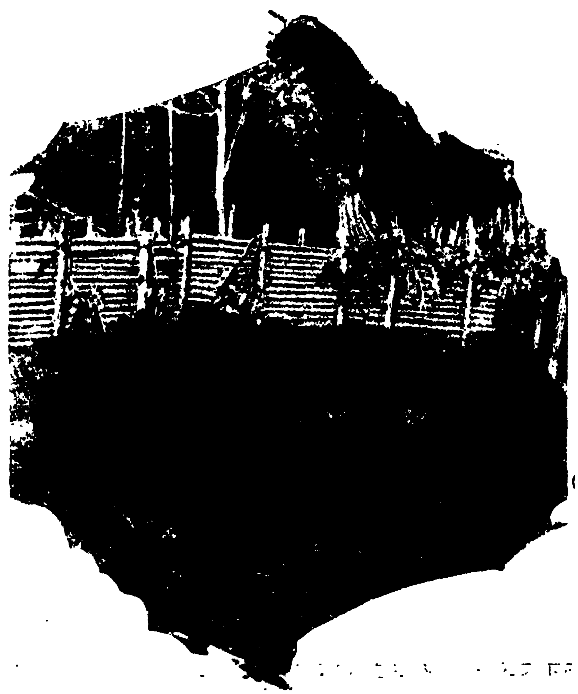
বন্যহস্তী ধরা—

মহীশূর রাজ্যে বন্য হস্তী ধরিয়া বিক্রয় করার বেশ বড় ব্যবসা আছে। বন্য হস্তীদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট জঙ্গল সরকার হইতে রক্ষা করা হয়। প্রতিবৎসর অন্তত একবার করিয়া এইখানে হাতী ধরা হয়।

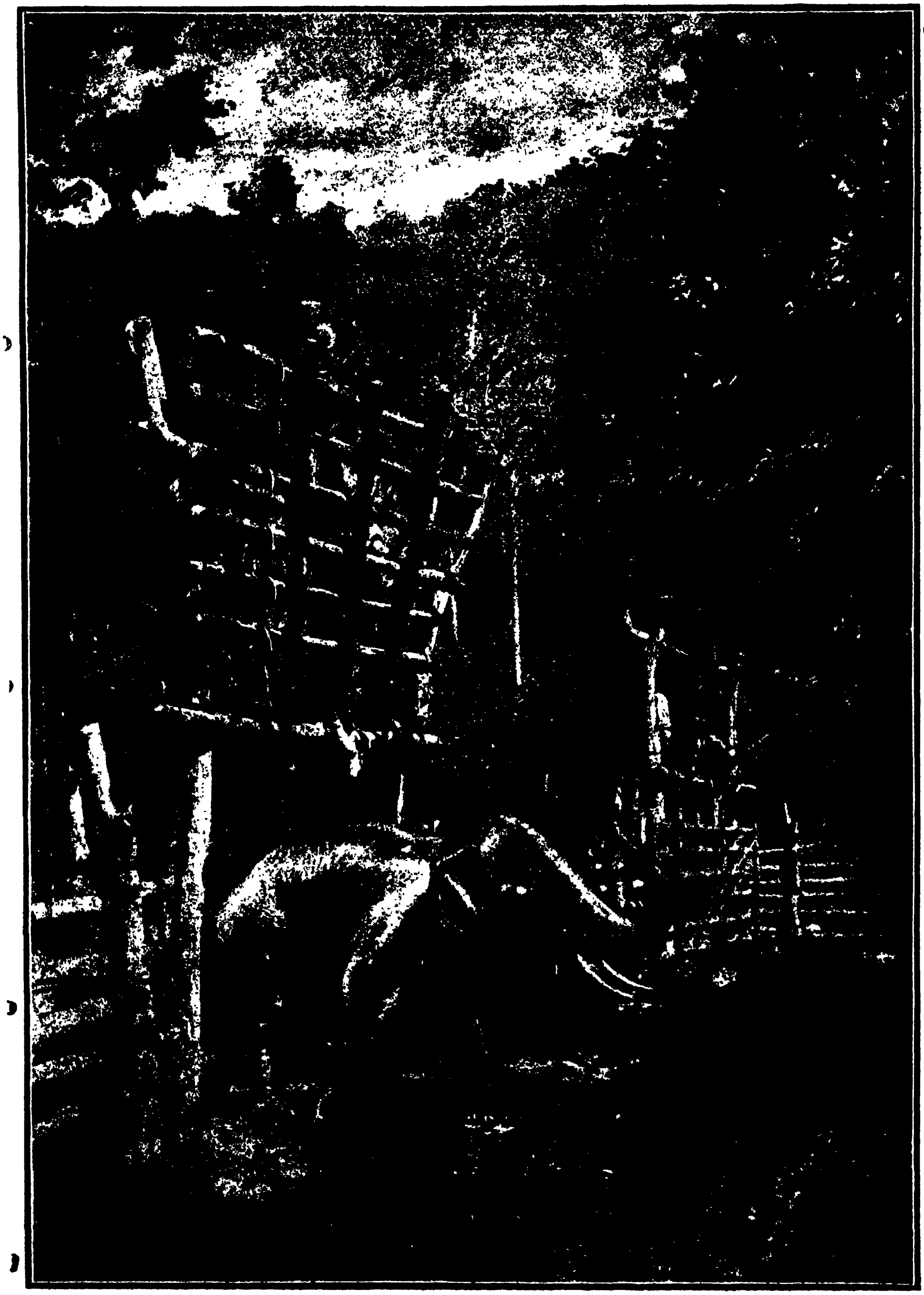
জঙ্গলের মাঝে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া মাটিতে বড় বড় খুঁটি পুঁতিয়া ঘেরাও করা হয়। বেড়া শক্ত করিবার জন্য খুঁটিগুলিকে শিকল দিয়া গাঁথা হইয়া থাকে। বেড়া দেওয়া স্থানের ভিতর প্রবেশ করিবার ফাটক বাদ দিয়া বেড়ার চারিপাশে ভিতরের দিকে গভীর করিয়া পরিখা কাটা থাকে। এই পরিখা থাকে বলিয়াই হাতীর



বন্য হাতী যাহাতে বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তাহার সম্মুখে এইরূপ গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্তের ধারে ধারে খুঁটি পুঁতিয়া পথ আরও দুর্গম করিয়া দেওয়া হয়।

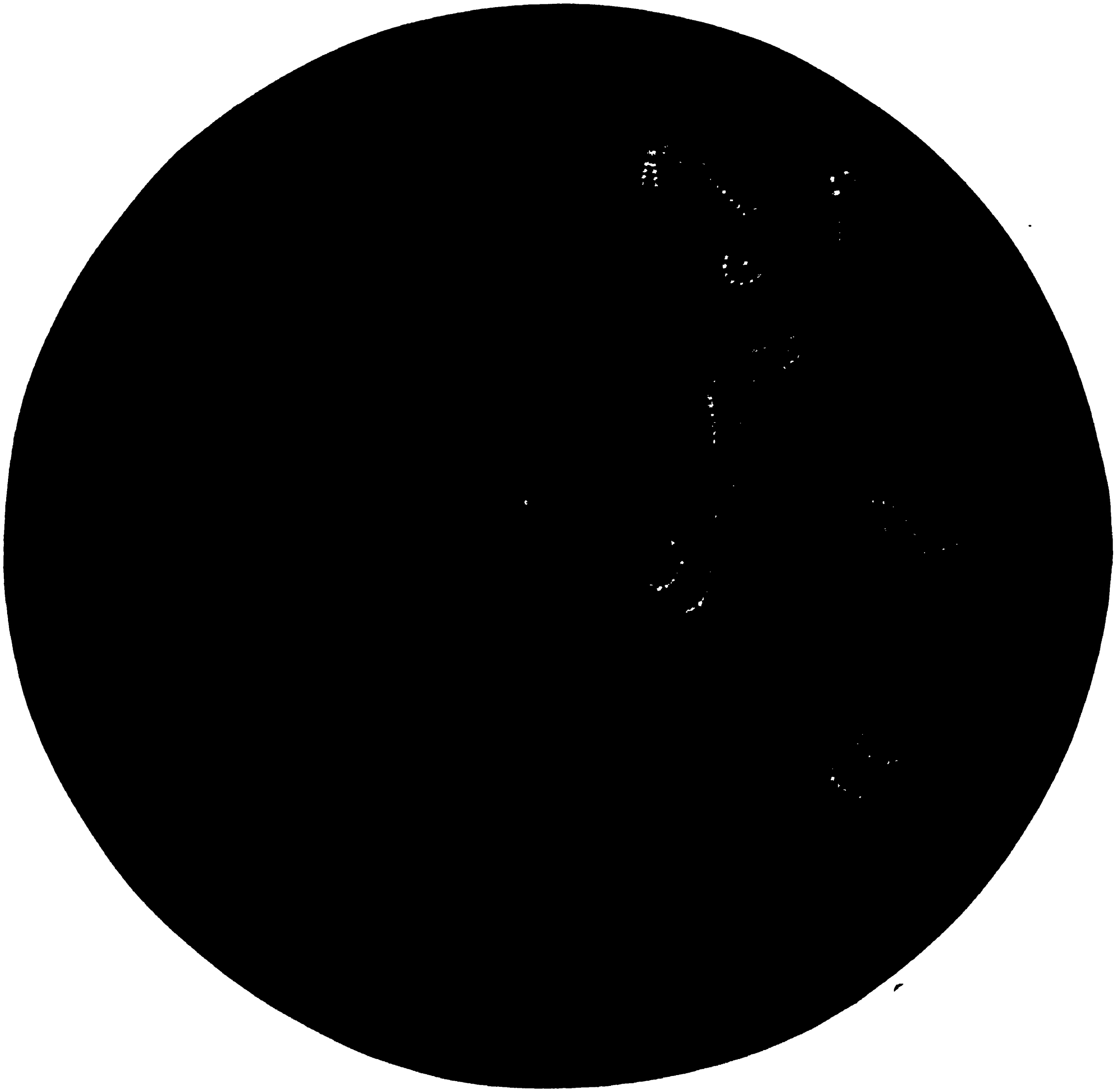


খেদার ভিতরে এক পাল বন্য হাতী



হাতী কটক দিয়া খেদার ভিতর ঢুকিতেছে

দল ভয়ে একসঙ্গে বেড়া ভাঙিবার চেষ্টা করে না। পরিখার অপর দিকেও বেড়া দেওয়া হয়—এবং দুই বেড়ার মাঝে লম্বালম্বিভাবে কাঠের ঠেকা দিয়া বেড়া বিশেষ শক্ত রাখা হয়। তারপর বেষ্টিত স্থানের প্রবেশদ্বার হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে একটি চওড়া রাস্তার মত কাটা হয়। রাস্তার দুইপাশে গাছ পালা, মাটি ইত্যাদি জমা করা থাকে। এই সমস্ত করা হইলে পর পাঁচ

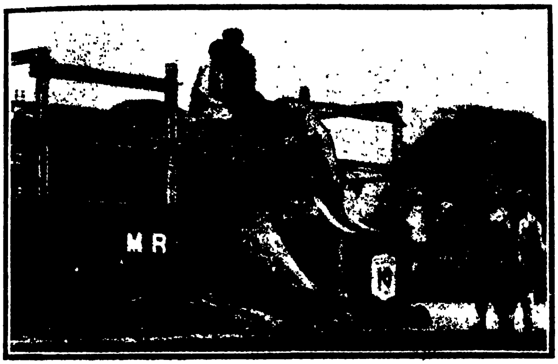


“প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌর কান্তি”

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী

র শত স্থানীয় লোক ঢাক-ঢোল, নানা প্রকার বোমা পটকা ইত্যাদি লইয়া জঙ্গলের চারিদিকে বিশেষ হট্টগোল লাগাইয়া দেয়; কেবলমাত্র বেষ্টিত স্থানে যাইবার পথের মাঝে এবং কাছাকাছি কোনো প্রকার শব্দ করা হয় না। হাতীর পাল ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ রাস্তায় আসিয়া পড়ে এবং রাস্তা ধরিয়া ক্রমশ বেড়া দেওয়া স্থানের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। হাতীর পাল এইস্থানে প্রবেশ



বন্য হাতীকে গাড়ী হইতে নামান হইতেছে

করিবামাত্র বেড়ার বাঁশের যত দরজা ফেলিয়া দিয়া হাতীর দলের বাহির হইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইবার পোষা হাতীর দলের সাহায্য লইতে হয়। পোষা হাতীর পাল বেড়ার বাহিরে নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকে। বেড়ার মধ্যে বন্দী হাতীর দল কিছু শান্ত হইলে পর একদল পোষা হাতীকে বেড়ার মধ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা এক একবার ভিতরে গিয়া



পোষা হাতী দ্বারা বন্য হাতীকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে

এক একটি হাতীকে ঘেরাও করিয়া বাহিরে লইয়া আসে, তারপর তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে নির্দ্দিষ্ট কোনো প্রকাণ্ড গাছের তলায় লইয়া যায়। এইখানে হাতীর পায়ে বেড়ী পরাইয়া শিকল দিয়া তাহাকে গাছে বাঁধা হয়। এইভাবে তাহাদের কয়েকদিন বাঁধিয়া বন্দী অবস্থায় অভ্যস্ত করিয়া ইহাদের এক একটিকে এক বা ততোধিক পোষা হাতীর সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধিয়া শহরে চালান দেওয়া হয়।

বনের হাতী ক্রমশ মানুষের পোষ মানে এবং কিছুকাল পরে এই হাতীই আবার অন্য বন্য হাতী ধরিবার কাজে মানুষের সাহায্য করে।

শহরের ময়লা সাফ করার সমস্যা—

বর্ত্তমান সময়ে শহরের ময়লা কম খরচে তাড়াতাড়ি, রাস্তার লোকজনকে কোনোপ্রকার অসুবিধায় না ফেলিয়া এবং কোনো প্রকার দুর্গন্ধের সৃষ্টি না করিয়া কিভাবে সরাইয়া ফেলা যায়, ইহা এক মহা সমস্যার কথা হইয়াছে।



'ইনসিনারেটর' ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বের আবর্জ্জনা স্তূপ

বহুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মানির নুরেমবার্গের নিকটের এক শহরের ময়লা পোড়াইবার কলগুলিকে নানা প্রকার ফল ফুলের বৃক্ষপূর্ণ বিশেষ উদ্যানে রাখা হইত।



আবর্জ্জনা পুড়াইবার চুল্লী

ক্যালিফোর্ণিয়ার সাউসালিটো নামক স্থানে আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য প্রাচীর-বেষ্টিত নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এইস্থান সান্ ফ্রান্সিস্কো উপসাগরের একেবারে উপরেই। ওয়াশিংটন শহরের কাছে সিটল নামক স্থানে আবর্জ্জনারাশি তিন ফুট নীচে পুঁতিয়া ফেলা হয় এবং তাহার উপর ছিদ্রযুক্ত বিশেষ দ্রব্য দিয়া ঢাকিয়া

দেওয়া হয়। আবরণের ছিদ্রগুলি দিয়া হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু আলো যায় না। আবর্জ্জনারাশি ক্রমে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যায়। এই প্রকারে এইস্থানে বহু পোড়ো জমিকে খেলার মাঠ ইত্যাদিতে পরিণত করা হইয়াছে।



পূর্ব্বে যেখানে আবর্জ্জনাস্তূপ ছিল, ইনসিনারেটর ব্যবহৃত হইবার পর তাহা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে

মাসাচুসেটস্এর উরসটার নামক স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি ময়লা নষ্ট করিবার জন্য—অন্তত বহুল পরিমাণে কমাইবার জন্য—শূকর পুষিয়া থাকে। এইখানে প্রায় ৫০০০ শূকর আছে। বহুস্থলে ময়লা পোড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। ময়লা পোড়াইয়া ফেলা স্বাস্থ্যের দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ময়লা আবর্জ্জনা ইত্যাদি পুড়িয়া যে ছাই হয়, তাহা চাষের কাজে ভাল সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

চার্লসটন শহরে ময়লা পোড়াইবার একটি খুব ভাল কল আছে। ইহাতে এককালে ৭০ টন ময়লা পুড়িতে পারে। এই কলে ময়লা পুড়িবার সময় কল হইতে গন্ধ বা ধোঁয়া বাহির হয় না। কলটি দেখিতে অতি চমৎকার। শহরের লোকেরা ইহার জন্য গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। শহরের নারীরাই বিশেষ করিয়া এই কলটি শহরে আনাইয়াছেন। কলের অনেকটা অংশ মাটির নীচে থাকে। ময়লা আবর্জ্জনা ইত্যাদি উপর হইতে কলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যেখানে ময়লা পড়ে এবং জমা হয় তাহার নীচে অতি ভীষণ গরম হওয়ার চেম্বার (বা কুঠরি) আছে। ময়লা আবর্জ্জনা ইত্যাদি গরমের চোটে পুড়িয়া যায়—এমন কি লোহালক্কড় ইত্যাদিও গলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই ময়লা পোড়াইবার কলে ১০০০ হইতে ১৯০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ ওঠে। ইহার মধ্যে জীবজন্তুর লাস দুই-এক মিনিটেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

চন্দ্রের কথা—

জে এ-লয়েড নামক রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির একজন সদস্য "ডিস্কভারি" নামক পত্রিকায় চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা লিখিয়াছেন।

চাঁদের মধ্যে যে সকল গুহা দেখা যায় তাহার সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত নানা বৈজ্ঞানিক দিয়াছেন। চন্দ্রের এই-সকল গোলাকার গহ্বর নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখ। এই-সকল আগ্নেয়গিরিতে সকল সময় অগ্নি উদ্গীরণ হইত না। হাওয়াই দ্বীপে 'মাউনা লোয়া' নামে একটি ধাতুস্রাবের হ্রদ আছে। ইহার পরিধি প্রায় তিন মাইল। এই হ্রদের উপরের ভাগ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—তাহা এত শক্ত যে তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া যায়—কিন্তু নীচে যখন আগ্নেয়োদ্গার হইতে সুরু হয় তখন হ্রদের উপরের জমাট ধাতুস্রাব ফুলিয়া ওঠে এবং স্থান বিশেষ ফাটিয়া যায়। এই ফাটল দিয়া গলিত



পূর্ণচন্দ্রের ফটোগ্রাফ



চন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ গুহা ও খাদ

ধাতু ইত্যাদির স্রোত হ্রদের কূল ছাপাইয়া পড়ে। ইহার ফলে আগ্নেয়গিরির মুখের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং হ্রদের চারিপাশের পাড়ও উঁচু হইতেছে। চন্দ্রের আগ্নেয়গিরির মুখগুলিও খুব সম্ভবত এই প্রকারেই হইয়াছে।

সম্প্রতি চন্দ্রের এই-সকল গুহা বা আগ্নেয়গিরির মুখ

সম্বন্ধে একটি নূতন কথা শোনা যাইতেছে। চন্দ্রের আগ্নেয়-গিরির উদরস্থিত গ্যাস সময়বিশেষে তপ্ত হইয়া বাড়িয়া ওঠে এবং আগ্নেয়গিরির মুখের জমাট স্তরের অপেক্ষাকৃত নরম স্থানগুলিকে ফুলাইয়া দেয়। ক্রমশ ফোলা বাড়িতে বাড়িতে আগ্নেয় গিরির মুখের জমাট ধাতুর স্তর ফাটিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের জমাট ধাতু গোলাকারে ধসিয়া গিয়া আগ্নেয়-গিরির মধ্যে গলিত ধাতুর কূপে পড়িয়া যায়।

চন্দ্রের যে-সকল অংশকে আমরা কালো দেখিতে পাই—এই সকল অংশে জল নাই—ইহা সম্প্রতি জানা গিয়াছে। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে এই কালো স্থানগুলিকে মরুভূমির মত দেখা যায়। খুব সম্ভবত এই স্থানগুলি শুষ্ক সমুদ্রতল—তবে স্থিরনিশ্চয় করিয়া ইহা বলা অসম্ভব। চন্দ্রের এই কালো অংশগুলির প্রায় গোলাকার আকৃতি দেখিয়া ইহাদের আগ্নেয়-গিরির মুখের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নাই। সম্প্রতি নানা পর্য্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চন্দ্রে বায়ু বা বাষ্পমণ্ডল আছে। কিন্তু চন্দ্রে যে বায়ুমণ্ডল আছে—তাহার সহিত আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কোনো প্রকার সাদৃশ্য নাই।

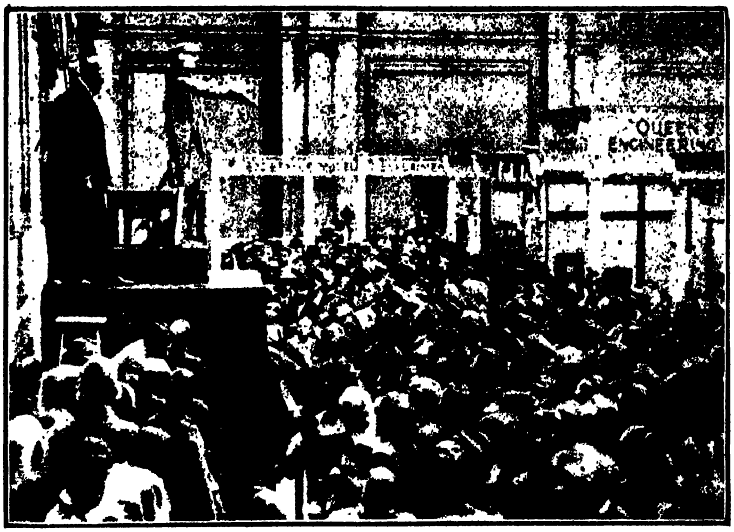
—

কলের মানুষ—

বিজ্ঞানের বলে আজকাল মানুষের নানা কাজ যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে। পূর্ব্বে যে-সমস্ত কাজ মানুষের হাত ছাড়া সম্পাদিত হইবার কল্পনাও কেহ করিতে পারিত না, সেই সমস্ত কার্য্যই যন্ত্রের দ্বারা অবলীলাক্রমে হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের এক সভাতে এক অদ্ভুত কলের মানুষের আবির্ভাবের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

সভাতে লোকজন বসিয়া আছে। বক্তৃতামঞ্চের উপর একটি বিকটাকার কলের মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার অঙ্গের বহিরাবরণ অ্যালুমিনিয়ম-পাতের তৈয়ারী। হাত পা সমস্তই আমাদের মত। মাথা আছে কিন্তু দাঁত বা ঠোঁট নাই। চোখের কোটর খালি। এই অদ্ভুত মুর্ত্তিকে দেখিলে ভয় হয়। হঠাৎ সভার লোক চমকিয়া দেখিল—যে কলের মানুষ তাহার বিরাট হাত তুলিয়া সভাকে নিস্তব্ধ হইবার ইঙ্গিত করিল। কলের মানুষের ব্যবহার দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত! তারপর আরো বিস্ময়কর ব্যাপার—এই কলের মানুষ বক্তৃতা আরম্ভ করিল "সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা আজ আমাকে এই সভার সভাপতি করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি জানি যে এই গুরু কার্য্যভার বহন করিবার যোগ্য আমি নহি......" ইত্যাদি। কলের মানুষ সভ্যজগতের সকল দেশের সকল সভাপতিদের বাঁধা-বুলি আওড়াইতে লাগিল। বক্তৃতা করিবার সময় কলের মানুষের শূন্য চক্ষুদিয়া ভীতিকর একপ্রকার হলদে রংএর আলোক বাহির হইতে লাগিল।

এই সভার মানুষ সভাপতি কোনো কারণে সভাতে উপস্থিত হইতে না পারায়—একজন ইঞ্জিনিয়ার এই অদ্ভুত কলের মানুষকে দিয়া সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করান। ইহার মুখ দিয়া সভাপতির



কলের মানুষ বক্তৃতা করিতেছে

অভিভাষণ পাঠ করান হয়। এই কলের মানুষের কার্য্য দেখিয়া মনে হয় যেন ইহার মানুষের মত মস্তিষ্ক ও বিচার বুদ্ধি আছে। দূর হইতে রেডিওর সাহায্যে, বা কলের মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত করিয়া ইহাদের নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী এবং কার্য্য করান সম্ভব হয়। বেতারের সাহায্যে নাবিকহীন নৌকা, চালকহীন মোটরকার, ড্রাইভার-হীন ইঞ্জিন দূর হইতে চালান সম্ভব হইয়াছে।

এই-সকল দেখিয়া মনে হয় যে ক্রমে মানুষের সকল গৃহ-কর্ম্মই এই কলের মানুষের সাহায্যে চলিবে। ঘরে বসিয়া কল টিপিলেই সকল কার্য্য হইবে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন ধোওয়া, কাপড় কাচা, রান্না করা, অতিথিকে অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন করা, গাড়ী চালান, পত্রবাহকের কার্য্য ইত্যাদি সকল প্রকার কার্য্যই কলের মানুষের দ্বারা চলিবে।

কলের সাহায্যে এখন নানা প্রকার হিসাব রাখা এবং যোগ বিয়োগ গুণ ইত্যাদি অঙ্কের নানা কাজ হইতেছে—এই সমস্ত মানুষকে বহু পরিশ্রম হইতে বাঁচাইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কেবল খাওয়া আর ঘুমান ছাড়া কলেই হয়ত মানুষের অন্য সব কাজ হইবে।



পুরাতনী—শ্রীহরিহর শেঠ। প্রাপ্তিস্থান—আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

হরিহরবাবুর লেখার সহিত মাসিকপত্রের পাঠকেরা সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকে তিনি অনেক পুরাতন কথা শুনাইয়াছেন। পুস্তকে প্রকাশিত বহুচিত্র বিষয়-বস্তুকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু স্থানাভাবে সব কথা বলা সম্ভব হইবে না।

হরিহরবাবু লিখিয়াছেন,—"হেষ্টিংস কর্ত্তৃক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল কেহ কেহ ১৭৮১ও বলিয়াছেন।.. হেষ্টিংসের নিজব্যয়ে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম কোন্ স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কোনও গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাই নাই। ইহার বর্ত্তমান ভবন দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং ইংরাজি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই আবাসে স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজি বিভাগ খোলা হয়।" (পৃঃ ৬৫, ৬৭)

এই বিবরণে অনেক ভুল আছে। কলিকাতা মাদ্রাসার ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ:— ১৭৮০, সেপ্টেম্বর মাসে একদল গণ্যমান্য শিক্ষিত মুসলমান গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানান যে, তাঁহারা মজিদ-উদ্দীন নামে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছেন; এই সুযোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে, মুসলমান-ছাত্রেরা মজিদ-উদ্দীনের অধীনে প্রধানতঃ মুসলমান-আইন শিক্ষা করিয়া সরকারী কার্য্যের উপযোগী হইতে পারিবে। হেষ্টিংস এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন; তিনি পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনকে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার উপর একটি স্কুল চালাইবার ভার দিলেন। ইহার জন্ত মাসে মাসে ৬২৫৲ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের জন্ত অল্পদিন পরেই হেষ্টিংস ৫,৬৪১৲ টাকা দিয়া, 'বৈঠকখানার নিকট, পদ্মপুকুরে' একখণ্ড জমি কিনিলেন। ১৭৮০ অক্টোবর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল পর্য্যন্ত হেষ্টিংস নিজব্যয়ে স্কুলটি চালাইয়াছিলেন। ১৭৮১, এপ্রিল মাসে তিনি বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করিলেন, অতঃপর সরকারের উচিত মাদ্রাসা-পরিচালনের সমস্ত খরচ-খরচা বহন করা, এবং পদ্মপুকুরে কেনা জমির উপর একটি উপযুক্ত কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ করা। বোর্ড তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন। কিন্তু ১৭৮২, এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা-পরিচালনের কোন ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৭৮২, ৩রা জুনের Consultation-এ প্রকাশ, ১৭৮১, ৩০এ এপ্রিল হইতে ১৭৮২, ১লা মে পর্য্যন্ত মাদ্রাসার হিসাব-নিকাশ বোর্ডের নিকট পেশ করিয়া, হেষ্টিংস তাঁহার খরচ-খরচা বাবদ ১৫,২৫১৲ টাকা ও পদ্মপুকুরে যে-জমির উপর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার দাম ৫,৬৪১৲ টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, বোর্ড তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, ১৭৮২, জুন মাসের পূর্ব্বেই মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুবাজারের দক্ষিণে, পূর্ব্বে যে বাড়ীতে চার্চ্চ-অব স্কটল্যাণ্ডের জেনানা মিশন স্থাপিত ছিল, সেই জমির উপরই মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর, এবং ছাত্রগণের নৈতিক-উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায়, সরকার ১৮২৩, জুন মাসে অপেক্ষাকৃত উপযোগী স্থানে—মুসলমান-বহুল কলিঙ্গাতে (বর্ত্তমান ওয়েলেসলী স্কোয়ার) একটি নূতন মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জমি-ক্রয় ও কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্ত ১,৪০,৫৩৭৲ টাকা মঞ্জুর হইল। ১৮২৪, ১৫ই জুলাই বর্ত্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়; ১৮২৭, আগষ্ট মাস হইতে এখানে নিয়মিতরূপে কলেজ বসিতে থাকে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসায় সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী ক্লাস খোলা হয়।

সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে এস-সি-সান্যাল মহাশয় ১৯১০ সালের *Bengal : Past and Present* পত্রে (জানুয়ারী—জুন, পৃঃ ৮৩-১১১, ২২৫-৫০) কলিকাতা মাদ্রাসার বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮২৪ সালে প্রকাশিত Chas. Lushington সাহেবের *The History, Design & Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its vicinity* পুস্তকের ১৪০ পৃষ্ঠাতেও পুরাতন মাদ্রাসার ইতিহাস দেওয়া আছে।

পৃঃ ৬৮-৬৯ :—হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা সর্ব্বপ্রথম রামমোহন রায়ের মনে স্থান পায়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইড ঈষ্টের গৃহে এ সম্বন্ধে হিন্দুদের প্রথম যে সভা হয়, তাহার তারিখ ১৮১৬, ১৪ই মে। ১৮১৬, ১৮ই মে তারিখে লেখা হাইড ঈষ্টের একখানি চিঠিতে হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার আদি ইতিহাস পাওয়া যায়। এই চিঠিখানির অংশ বিশেষ মেজর বি-ডি-বসু তাঁহার *Education in India under E. I. Co.* পুস্তকের ৩৭-৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটারী, ডাঃ জন্ ময়েট ১৮৫৩ সালে হিন্দুকলেজের যে ইতিহাস লেখেন, তাহা ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত *Selections from the Records of the Bengal Government*-এর চতুর্দ্দশখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃঃ ২,৫ :—'সতী' সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আলোচনা রাজা রামমোহন রায়ের 'সতী'-সম্বন্ধীয় তিনখানি পুস্তিকাতে পাওয়া যাইবে। সতীদাহ 'আইন বিরোধী বলিয়া বিধিবদ্ধ হইবার' কত পূর্ব্ব হইতে রামমোহন এই বর্ব্বর প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—সরকার তাঁহার সাহায্যের জন্য কতটা ঋণী,—এ সমস্ত কথা মিস্ কোলেটের রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীতে দেওয়া আছে। গ্রীক-লেখকদের রচনা-পাঠে জানা যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই প্রথা পঞ্জাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং, ইহার অনেক আগেও 'সতীর' অস্তিত্ব ছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। (Mc Crindle in *Ancient India as described in Classical Literature*. p. 69).

'ভারতে প্রাণান্তকর প্রথা' প্রবন্ধটি লিখিবার পূর্ব্বে হরিবাবু J. Peggsএর India's Cries to British Humanity পুস্তকখানি পাঠ করিলে হয় ত কিছু কাজের কথা পাইতেন।

অল্পদিন হইল, টমসন্ সাহেব 'সতী' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথা—শ্রীসরোজকুমার সেন, বি-এ। শিশুসাথী সিরিজ। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেনের শিশুদের গল্প বলিবার উপযুক্ত সরসতা আছে। আখ্যানবস্তু নির্ব্বাচনেও তিনি শিশুচিত্ত সম্বন্ধে তাঁহার সহৃদয়তা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। বইয়ের ছবিগুলি অতীব সুন্দর। হায়! শিশুদের পুস্তকে সুদৃশ্য সুন্দর ছবি আমাদের দেশে এত বিরল!

ছাপা বেশ বড় ও পরিচ্ছন্ন। গোলাপী বাঁধাইয়ের উপর উজ্জ্বল প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি যে সহজেই শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করিবে তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি।

শ্রীজীবনময় রায়

থার্ডক্লাশ—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০। ১৪৪ পৃঃ।

গল্পের বই—তেরটি ছোট গল্প এক সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম গল্পটির নামেই বইয়ের নামকরণ।

শুনিয়াছি বাংলা দেশে গল্পের বই চলে না—না চলিলেও দুঃখ নাই। মাসিকপত্রের আকর্ষণে ও কলম চালাইবার মোহে বাংলায় প্রতি মাসে যে সব গল্প গজাইতেছে ও ঝরিতেছে, সেগুলিকে সাময়িক সাহিত্যের উর্দ্ধে নিত্যকালের জন্য চয়ন করিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া কোনোদিন মনে হয় নাই।

এই নাতিবৃহৎ বইখানির গল্পগুলিও বিভিন্ন মাসিকপত্রে বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই গল্পগুলি যদি মাসিকপত্রের পাতাতেই আত্মগোপন করিয়া থাকিত, তবে সত্য সত্যই বাঙলা সাহিত্য কিছুটা বঞ্চিত রহিয়া যাইত।

এই গল্পগুলিকে দুইটি দিক হইতে দেখা চলিতে পারে—প্রথমত বিষয়-বস্তুর দিক হইতে, দ্বিতীয়ত রূপ-সাধনের দিক হইতে।

বিষয়-বস্তুর দিক হইতেই সম্ভবত লেখক গল্পগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াছেন—সেইদিক হইতে দেখিলে এই তেরটি গল্পের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহজেই চোখে পড়ে। তেরটি গল্পের বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর মধ্য দিয়া যাহা ফুটিয়াছে তাহা বিচ্ছিন্ন নয়—তাহা এক, একই বাঙালী সমাজের সমগ্র জীবনযাত্রার কয়েকটি দিক। ছোট গল্পের আয়তনে ও কারুকর্ম্মের মধ্যে জীবনের বা সমাজের সমগ্রতাকে প্রকাশ করিবার মত অবসর নাই। তাহা করিতে গেলে গল্প ছোট হইলেও ভারী হইয়া উঠে, তাহার গতি মন্থর হয়। এই বইখানির ছোট গল্পগুলি সত্যই ছোট, অর্থাৎ তাহা মানব-জীবনের বা সমাজ-জীবনের এক একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বা বিশেষ পর্ব্বের উপর এমন একটি রশ্মিপাত করে যাহাতে সমগ্র জীবনের নিগূঢ় কথাটি সেই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এইদিক হইতেই এই বইখানি ছোট গল্পের বড় বই। 'থার্ডক্লাশে' যখন বদ্ধ গাড়ীর পচা উষ্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দম বন্ধ হইয়া আসে, তখন 'ওরে বিপিন—বিপিনরে'—একটি কথা বদ্ধ জীবনের সমস্ত তিক্ততাকেও চিরিয়া নিষ্ফল নৈরাশ্যের ব্যর্থ আর্ত্তনাদের মতই ধ্বনিত হয়। 'তীর্থেও' সেই পচা আবহাওয়া, সেই বাবু মালীর ব্যর্থ অপেক্ষা। 'লাটের স্পেশালে'ও শীতরাত্রির মধ্যে সেই আবহাওয়ার ছোঁয়াচ, তবে বিষয়-বস্তু এখানে ব্যক্তির জীবনের ব্যথা। বহির্জীবনের নিদারুণ প্রেক্ষাপটের উপর সেটি আরো নিবিড় ও কঠোর হইয়াছে। 'নিধিরামের বেসাতি', 'বছিরের দরগা,' 'গিরিবালার জীবনপঞ্জী' সর্ব্বশেষ শাঁখের করাত'—কোথাও স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস লইবার মত অবসর নাই;—'চণ্ডীমণ্ডপ' হইতে 'তীর্থ' পর্য্যন্ত আজ সর্ব্বত্রই সেই 'থার্ডক্লাশ'! উপায় নাই, বাঙলার সমাজ আজ যে 'থার্ডক্লাশে'। আশাও কি আছে? হঠাৎ যদি 'চণ্ডীমণ্ডপে' আজ পশুপতির কুস্তীর আখড়া জাঁকিয়া উঠে, তবেই কি কোনো আশা আছে?—বাংলার আশা-ভরসার শেষকথা যেন—'ওরে বিপিন—বিপিন রে—'।

আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যেও 'রিয়ালিজম্' 'রিয়ালিজম্', শুনিতেছি। রিয়ালিজম্ আছে কিনা জানি না, কিন্তু এই গল্প-কয়টিতে 'রিয়ালিটি' আছে। আজকাল রুশ-লেখকদের নাম প্রায়ই উল্লেখিত হয়; কিন্তু তাহাদের অনুরূপ কৃতিত্বের চিহ্ন বোধ হয় বাঙলার 'থার্ডক্লাশে'র মত জিনিষেই প্রথম পাওয়া গেল। তবে মুস্কিল এই, গল্পগুলি প্রেমিক ও ভাবপ্রবণদের চোখের জলের চোরাপুঞ্জি নয়, আবার বাস্তববাদীদের যৌন-আকর্ষণের কল্পিত অগ্ন্যুৎপাতও নয়। তাহার কারণ, এ 'রিয়ালিজম' নয়, এ 'রিয়ালিটি।'

এ 'রিয়াল' বলিয়াই রূপ-সাধনাকে উপেক্ষা করে নাই। যদি 'বাস্তবতার' অত্যুগ্র মোহই লেখককে পাইয়া বসিত, তবে হয় ত রূপ খর্ব্ব হইত। আবার বিপদ এই, অপরিণত-শক্তি লেখকের হাতে পড়িলে ইহাতে পাতায় পাতায় অশ্রুজলের বান ডাকিত। কিন্তু লেখকের কোথাও সেই সস্তা জিনিষের মোহ দেখা যায় না; কোথাও সেই রঙ ফলাইবার চেষ্টাও নাই। হৃদয় দিয়া যে বিষয়কে তিনি অনুভব করিয়াছেন, সেই বিষয়-রচনায় সংযম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার বেদনা বোধ তীব্রতর হইয়া ফুটিয়াছে, রূপসৃষ্টিও সার্থক হইয়াছে।

ভরদ্বাজ

সাহিত্য-কৌস্তুভ—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, কাব্যরত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরত্ন-ভবন, শিবপুর, হাওড়া, মূল্য এক টাকা।

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষার বিখ্যাত গদ্য-লেখকগণের রচনার নমুনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ পরিচয় ইত্যাদি ও পরিশিষ্টে দুর্ব্বোধ্য শব্দ ও বাক্যের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

কবিতা-কৌস্তুভ—তৃতীয় ভাগ। শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, কাব্যরত্ন। প্রকাশক—শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরত্ন-ভবন, শিবপুর। মূল্য এক টাকা।

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য কবিতা-সংগ্রহপুস্তক। কবি-পরিচয় ও শব্দার্থও দেওয়া আছে।

দীপান্বিতা—কবিতা পুস্তক, শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বাংলা ভাষার মাসিক-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচীর শান্ত মধুর কবিতা অবশ্যই তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে মাসিকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতেও হেমবাবুর কবিতার একটা অতিপরিচিত করুণ সুর মনকে স্পর্শ করে। বিভিন্ন মাসিকের পাতায় বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলিই কবি 'সুরসমতা' রক্ষা করিয়া এই কাব্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; কাব্যামোদীগণের ইহাতে সুবিধাই হইয়াছে। কবিতা পড়িতে পড়িতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে মন পীড়িত হয় না, কবি-মনটিকে সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

হেমবাবুর কবিতাগুলির মধ্যে একটা শান্ত-সমাহিত ভাব আছে; আজকালকার অতি-প্রচলিত ঝঞ্ঝা, বিদ্রোহ ইত্যাদির প্রভাব এই কবিকে স্পর্শ করে নাই। এই হিসাবে দীপান্বিতা নামটি সার্থক হইয়াছে। কবি যে-জগতে বিচরণ করিয়াছেন, তাহা আমাদেরই অতিপ্রিয় গৃহ প্রাঙ্গণ, আমাদেরই নদীমাতৃকা এই বাংলা দেশ, ঝিল্লিমুখর নিশুব্ধ গ্রাম, পরিচিত হাট মাঠ বাট। প্রথম কবিতাটির একটি স্তবকে সমগ্র কাব্যখানির একটি সহজ পরিচয় পাওয়া যায়—

কবে গঙ্গার তীরে তীরে তোরে অনুসরি ফিরি মনেরি মনে;
শেফালি পরায় সঙ্গোপনে।
মাঠেরি বিরহ বেজেছিলো বুঝি রৌদ্র ঝিমানো বটেরি ছায়ে;
সোণালি ঘুঙুর রুণিছে পায়ে—
শ্যামল পরশ-বুলানি আঁচল সকল গায়ে—
আসিলে আজো কি সুদূরিকা সখি, নিখিলজনের মানস গীতা
কবিতাময়ী গো দীপান্বিতা।

অল্প পরিসরের মধ্যে কবির কাব্যখানির সমগ্র পরিচয় দেওয়া যায় না। আমরা সে চেষ্টা করিব না। বাংলা কাব্যকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহারা হেমবাবুর এই কাব্যখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ-লিপিখানি সুন্দর হইয়াছে।

পূজার অর্ঘ্য—গল্প পুস্তক। শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বিজয়া সাহিত্য মন্দির, কাশীধাম ও রাজসাহী। মূল্য ১।০—প্রাপ্তিস্থান—ডি-এম লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকে সাতটি বড় বড় গল্প আছে। সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও গ্রন্থকার এই সাতটি গল্পে বাংলার সমাজ-জীবনের যে নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচায়ক। অল্প কয়েক পাতার এক একটি গল্পে তিনি বাংলার সমাজের যে করুণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাহার মনে দাগ রাখিয়া যায়, মনে হয় সেই সমাজ ও জীবনকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। গ্রন্থকারের অঙ্কিত চরিত্রগুলিও অতি অল্প পরিসরের মধ্যে সুন্দর ফুটিয়াছে। সতীরাণী ও পল্লী-বিরাগ গল্প দুইটি আমাদের খুব ভাল লাগিল।

মাতৃ তীর্থ (উপন্যাস)—শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, রাজসাহী, গোবিন্দধাম। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোটগল্প লেখক হিসাবে সুরেশবাবু যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই ছোট উপন্যাসখানিতে দেখিতে পাই। এই উপন্যাসখানিও বাংলার গ্রাম্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত। আমাদের হতভাগ্য সমাজের অনেক করুণ চিত্র এই উপন্যাসে লেখকের অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'প্রবোধ' গ্রন্থকারের সার্থক সৃষ্টি।

সুলোচনা (উপন্যাস)—এস-জি-মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—ডি-এম লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পদ্মলোচন ও ত্রিলোচন নামক দুইখানি উপন্যাস লিখিয়া গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বেই যশস্বী হইয়াছেন। 'পদ্মলোচন' সিরিজের এইটি তৃতীয় উপন্যাস। লেখক ইঙ্গবঙ্গ সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতার জন্য তাঁহার প্রয়াস সফলতালাভও করিয়াছে। 'সোনা' ও 'মিমি' এই দুইটি নায়িকার মধ্যে পড়িয়া নায়ক 'আলো'র মনের দ্বন্দ্ব গ্রন্থকার চমৎকার দেখাইয়াছেন। 'সোনার' চরিত্র গ্রন্থকারের নিপুণ সৃষ্টি।

লাজপৎ রায়—(জীবনী) শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী প্রণীত। প্রকাশক দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্। ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দাম বারো আনা।

পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের এই জীবনীটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা প্রাঞ্জল, লিখনভঙ্গী সুন্দর। লেখার গুণে লালাজির প্রদীপ্ত মূর্ত্তিখানি পাঠকের চোখের সামনে জাগিয়া উঠে।

স

বিজয়ী প্রাচ্য—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদিগকে এমনই বিমূঢ় ও হীনবল করিয়াছে যে, মাত্র তিন-চার শত বৎসর আগে আমাদের প্রাচ্য ভূখণ্ড যে অমিতবিক্রমে নব নব দেশ-জয়ে অভিযান করিয়াছিল তাহা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। গ্রন্থকার সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের শক্তিমত্তার গৌরবময় ইতিহাস চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচ্য যে চিরদিন এমন দলিত হৃতসর্ব্বস্ব অবস্থায় ছিল না, তাহা এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদিগের স্মরণ করার বিশেষ মূল্য আছে। এই প্রাচ্যগৌরবমূলক চিন্তাপূর্ণ পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"এসিয়াবাসীদের সম্মুখে আজ এক বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। শুধু নিজ নিজ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না—এই পাটোয়ারী পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে যে-সব পাশ্চাত্য লোক পিষ্ট হইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করাও আমাদেরই কাজ। পাটোয়ারী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে নৈতিক আদর্শ লইয়া আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে। ইউরোপের বিরুদ্ধে এসিয়ার বিদ্রোহের ইহাই হইল বিশেষত্ব।"

বিদ্রোহী আয়র্লণ্ড—শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। বর্ম্মন্ পাব্লিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

কোন প্রসিদ্ধ ফরাসী সংবাদপত্র-সেবীর পুস্তক অবলম্বনে আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানির আলোচনা বিশদ ও সরল। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে পুস্তকটি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-সখা—শ্রীবিপিনবিহারী মণ্ডল। ভারত-বান্ধব লাইব্রেরী, ১৩।১ রামচাঁদ নন্দী লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল অবধি কি কি স্বাস্থ্য-বিধি পালন করিলে ও কিরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে শরীর ও মন সুস্থ ও পবিত্র রাখা যায়, তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ আলোচনা ইহাতে আছে। পুস্তকটি প্রত্যেক গৃহীর নিত্যসঙ্গী হইবার উপযুক্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ—(১ম ভাগ) স্বামী রামানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, নূরনগর, খুলনা। দশ আনা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের নানা বিষয়ক উপদেশ চয়ন করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে গ্রথিত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উপদেশগুলির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই চয়ন-গ্রন্থ সুন্দর হইয়াছে।

ছিন্ন-বীণা—শ্রীমোহিনী দাস। এসোসিয়েটেড্ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোং লিঃ, ৪০ কলতাবাজার, ঢাকা। এক টাকা।

কবিতার বই। ছন্দে ও মিলে যথেচ্ছাচার, অজস্র ভ্রম। কবিতার ভাবেরও মাথামুণ্ড নাই। যিনি বই রচনা করিয়াছেন তিনি নারী কি পুরুষ তাহাও বুঝা গেল না।

ধর্ম্মবীর শ্রদ্ধানন্দ—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শিক্ষক-সমবায় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দশ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষক ও ভারতের স্বাজাত্যবোধের প্রকৃষ্ট পরিপোষক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ধর্ম্মাদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী ভারতবাসী মাত্রেরই অনুসরণীয়। শিথিলচরিত্র বাঙালীর নিকট এই কর্ম্মবীরের গুণকীর্ত্তনের অধিকতর প্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এই কর্ম্মীর জীবনকথা অতি সরল সুন্দরভাবে গ্রথিত হইয়াছে। পাঠকসাধারণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে উন্নত করুন।

আত্ম-প্রতিষ্ঠা—৺ অশ্বিনীকুমার দত্ত। বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ছয় আনা।

স্বায়ত্তশাসন-লাভ বা স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সুন্দর সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

পাঞ্চজন্য—শ্রীপশুপতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান। এক টাকা।

নাটক। শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বে অর্জ্জুনাদির কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ—ইহাই নাটকটির মূল আখ্যান। রচনা মন্দ হয় নাই। কিন্তু এই একই বিষয়ে এতবেশী নাটক বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে যে, ইহা বড়ই একঘেয়ে লাগে।

জাতি-সংগঠন—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

লেখক মহাশয়ের রচনা পাঠকসাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছে। দেশগঠন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য ও গবেষণা বিশেষ সারবান। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ভারতবাসীকে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করিতে কি কি পন্থা অবলম্বনীয়, তাহা এই পুস্তকে দূরদৃষ্টির সহিত নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম—শ্রীমণিময় প্রামাণিক। বর্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা। এক টাকা।

আমেরিকা, লাইবিরিয়া, কিউবা-দ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ফরাসী দেশ, ইতালী প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দেশবাসীর মনে যে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার স্পৃহা জাগিয়াছে তাহার নিদর্শন এই সব পুস্তকের প্রকাশে। পুস্তকখানিতে অতীব সরল সুবিন্যস্ত ভঙ্গীতে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ঐ সমস্ত দেশের মুক্তি-সংগ্রামের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিশেষ অনুধাবন যোগ্য।

দীপশিখা—শ্রীমতিলাল দাশ। বেঙ্গল পাবলিশিং কোং, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আট আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলিতে মাঝে মাঝে চিন্তা ও ভাবের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পরিণত নহে। ছন্দেও কবির হাত পাকে নাই, বিশেষ ত্রুটি আছে। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অত্যন্ত প্রকট। আরও চেষ্টা করিলে লেখক সু-কবিতা লিখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা—শ্রীমতী রাধারাণী রায়। গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ছয় আনা।

দুই বীর নারী রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। ছেলেমেয়েদের পাঠের পক্ষে পুস্তকখানি বেশ সরল ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

প

শ্রীশ্রীসরস্বতী তত্ত্ব-পূজা ও স্তব—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ পয়সা।
সরস্বতী পূজার তত্ত্ব ও বিধি এই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে।

আদর্শ হিন্দুরমণী—শ্রীঅমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৬১ রঘুনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, মূল্য ৵০।

অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে সুচিত্রিত করিয়া সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি পুরাণ-বিখ্যাত রমণীগণের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা প্রাঞ্জল ও লালিত্যপূর্ণ। বইখানি শিশু-সাহিত্যকে পুষ্ট করিবে।

গুরুদক্ষিণা—শ্রীরামব্রহ্ম পট্টনায়ক রচিত 'তিন অঙ্কাত্ত নাটক'।

পুস্তকখানি নাটকাকারে লিখিত হইয়াছে—কিন্তু ইহা অভিনয় করিবার যোগ্য নহে। ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর নাটকও বলা যায় না।

মনে রেখো—শ্রীমৃগলাল দত্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা

'গৃহস্থের নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ।" অনেকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংবাদ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেকের এই পুস্তক কাজে লাগিবে।

রাজ্যশ্রী—শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক। ইহা ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নাটক-হিসাবে ভাল হয় নাই।

উল্কা—কবি অনন্তকুমার বসু প্রণীত কবিতার বই। মূল্য এক টাকা দুই আনা। ইংরেজিতে যাহাকে 'র‍্যাবিশ' বলে ইহা সেই শ্রেণীর কবিতা-পুস্তক। ছন্দ ভাব ভাষা সবই উৎকট।

গ্রন্থকীট

ব্রহ্মচর্য্য—(মহাত্মা গান্ধী লিখিত) শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ; ১৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা, পৃঃ ৫৬।

'হিন্দী নবজীবন,' 'ইয়ং ইণ্ডিয়া,' ও 'Self-restraint vs. Self-indulgence' নামক পুস্তকে মহাত্মা গান্ধী সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ ও অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তকখানায় বিনয়বাবু তাহা বাঙালী পাঠকের জন্য সঙ্কলিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে বাঙলায় দুষ্পাঠ্য বই অনেক আছে ; কিন্তু সত্যকার শীলতা ও শোভনতা, এই প্রবন্ধ কয়টিতে যেমন স্পষ্ট, তেমন বড় কোথাও দেখা যায় না। অনুবাদের মধ্যেও বিনয়বাবু মহাত্মাজীর সরল, সতেজ ও সংযত ভাবটিকে ঠিকরূপে ধরিয়াছেন। আশা করি, বাঙালী-সমাজে বইখানি আদৃত হইবে।

ভা

বয়াটে—উপন্যাস—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ। প্রকাশক আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

উপন্যাসের নামের অনুরূপ ভাষাও যেন বয়াটে, একেবারে বন্ধনহীন। মনে হয় গ্রন্থকার স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের মত নূতন একটা experiment করিতেছেন। পড়িতে পড়িতে বহুস্থলে হুতোম প্যাঁচাকে মনে পড়ে এবং গ্রন্থকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি পঞ্চাশ বছর too late। উপন্যাসের বিষয়-বস্তুও একটু নূতন ধরণের ; এই পুস্তকখানি অতিআধুনিক সাহিত্য পর্য্যায়-ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বইখানিতে কোনও Problem নাই—গ্রন্থকারের এই কবুল জবাব সত্ত্বেও আমরা দেখিলাম গ্রন্থখানি problem-এ ভরপুর। লিখন-ভঙ্গী যাহাই হউক, গ্রন্থকারের গল্প বলার ক্ষমতা আছে।

নীলপাখী—(সচিত্র নাটক)—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড এলাহাবাদ। মূল্য ১॥০ টাকা।

পুস্তকখানি বিখ্যাত মরিস মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড' নামক নাটকের অনুবাদ। ব্লু বার্ডের অনেকগুলি অনুবাদ আমরা দেখিয়াছি এবং নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যামিনীবাবুর 'নীলপাখী' অনুবাদ-হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মূল বহির ইংরেজী অনুবাদে যে রস পাওয়া যায় বাংলাতে তাহা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আট-দশ বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী' পত্রিকায় এই অনুবাদটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল তখন আমরা ব্যগ্রভাবে পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিতাম। আজ সেই নাটকটির সমস্তটা একসঙ্গে দেখিতে পাইয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিলাম। যামিনীবাবুর নাটকটিকে রূপ দিয়াছেন বিখ্যাত শিল্পী সারদাচরণ উকীল ও রণদাচরণ উকীল। চিত্রগুলি অপরূপ হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

স

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সম্পদ

পণ্ডিত শ্রী রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর বহু কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে-সকল বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কাশী ও বৃন্দাবনে বাঙ্গালীরা যে-সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নাটোরের রাণী ভবানীর কীর্ত্তিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া ভূকৈলাসের ঘোষাল-রাজের কীর্ত্তিও কম নহে। অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীর্ত্তিসমূহ উল্লেখ না করিলেও চলে। রাণী ভবানীর ছত্র, রাণী বিদ্যাময়ীর ছত্র, লোকনাথ মৈত্রের ছত্র, কালীবাবুর ছত্র, নদীয়ার ছত্র, সাহার ছত্র প্রভৃতি ছত্রসমূহ অন্নদানের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। বৃন্দাবনে অধিকাংশই বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। দেবালয় বা কুঞ্জসমূহ বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তি। তন্মধ্যে রাণী স্বর্ণময়ীর কুঞ্জ, বর্দ্ধমান রাজকুঞ্জ, লালাবাবুর কুঞ্জ প্রভৃতি কুঞ্জসমূহ সমধিক উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও বহুতর বাঙ্গালীর কুঞ্জ রহিয়াছে। এই সকল দেবালয়ের সেবা পূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অনেকেই আগ্রা মথুরা প্রভৃতি জেলায় ভূসম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে পাইকপাড়া রাজপরিবারের লালাবাবুর কুঞ্জের সম্পত্তি

প্রচুর ও উল্লেখযোগ্য। অধুনা রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডে প্রচুর ব্যয়ে দুইটি কুঞ্জ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বারাণসীতে রাণী ভবানী বহুতর বাড়ী ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া গিয়াছেন। আজিও সেই সকল নিষ্কর বাড়ী তাহাদিগের উত্তরাধিকারীরা ভোগ করিতেছেন।

এলাহাবাদে কতিপয় অর্থসম্পদশালী বাঙ্গালী আছেন। ইঁহারা সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কোন-না-কোন উপায়ে সম্পদশালী হইয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেরই বাসভবনের চিহ্ন নাই। কানপুর, আগরা, দিল্লী, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানেও বাঙ্গালীর সম্পদ কম নহে। অধিকাংশই যে ইংরেজের সহায়তায় বা সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সম্পদশালী হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যে সকল বাঙ্গালী রহিয়াছেন, তাঁহারাও বাঙ্গালীর সুনাম রক্ষা করিয়াই আছেন। আগরার রায় নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের (পাবনাবাসী), রায় রমাপ্রসাদ বাগচি বাহাদুর (রাজসাহীবাসী), ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য্য (শ্রীহট্টবাসী) ইঁহারা ডাক্তারী ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাঙ্গালার যশ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা স্বগৃহে অন্নদানে ও পরোপকারে মুক্তহস্ত ছিলেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর মধ্যে ইঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ব্রজসুন্দরবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন; তিনি বিনা ভিজিটে ও বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া গরীব রোগীর চিকিৎসা করিতেন। প্রত্যহ তিন চারিশত রোগী তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইয়া ঔষধ লইত। আর দুইজন আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে দিল্লীর ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের (বরাকপুরবাসী) নাম উল্লেখযোগ্য। হেমবাবুও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার গৃহে নিত্য অন্নছত্র বসিত। ইহা ছাড়া আরও অনেকের কথাই বলা যাইতে পারে। সে সকল কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

এখন একটি কপর্দ্দক-সম্বলহীন বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তির কথা আলোচনা করিব। তাঁহার নাম কৃষ্ণানন্দ স্বামী। কাশীর পশ্চিমে ভারতে যতগুলি শহর আছে, প্রত্যেক শহরেই তিনি এক একটি কালী বাড়ী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভ্রমণকারী বা উমেদার বাঙ্গালীদের বাসস্থানাভাব দেখিয়া তিনি সকলের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সেই অর্থদ্বারা কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া যান। কাশীর অনতিপশ্চিমে মির্জাপুর শহরেই তিনি সর্ব্বপ্রথম কালীবাড়ী স্থাপন করেন। তৎপরে এলাহাবাদ, মিরাট, আগরা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ, দিল্লী, লাহোর, মূলতান অমৃতসর, অম্বালা, জলন্ধর, রাউলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি শহরেও এক একটি কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কালীবাড়ীর সেবার জন্য কোন কোনস্থানে ভূ-সম্পত্তিও আছে। সাধারণতঃ প্রবাসী বাঙ্গালীদের চাঁদাদ্বারা ইহাদের ব্যয় চলিয়া থাকে। এলাহাবাদের কালীবাড়ী গুড্‌ম্যান এণ্ড কোংর স্বত্বাধিকারী নিতাইবাবুর সহায়তাতেই এতকাল চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল কালীবাড়ীতে ভ্রমণকারী বা ক্ষণপ্রবাসী বাঙ্গালীরা অবস্থান করিতে পারেন ও বিনাব্যয়ে আহারাদিও পাইয়া থাকেন। কৃষ্ণানন্দ মহাপুরুষ ছিলেন; তাঁহার এ কীর্ত্তি লোপ পাইবার নহে। সবগুলি কালীবাড়ীই শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহারা বাঙ্গালীর সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। কৃষ্ণানন্দ স্বামী আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে বোধ হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কালীবাড়ী স্থাপন করিতেন।

কাবুলে কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহারা জাতিতে বাঙ্গালী হইলেও কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই পাঞ্জাবপ্রবাসী। বাঙ্গলায় তাঁহাদের কোথায় বাসস্থান ছিল তাহা ঠিক নাই। সুদূর কাবুল শহরেও কৃষ্ণানন্দের কীর্ত্তি রহিয়াছে, বর্ত্তমান কাবুল শহরে কৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক কালীবাড়ী আছে। দেবীর সেবাপূজা পূর্ব্ববর্ত্তী আমীর-প্রদত্ত ভূসম্পত্তি দ্বারা চলিয়া থাকে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কাবুল গিয়াছিলাম, তখন দ্বারকানাথ ব্রহ্মচারী নামক একজন বাঙ্গালী তাহার সেবাইত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর কোন বাঙ্গালী সেবাইত হন নাই। এখন কাবুলের হিন্দুরাই

উহার সেবাপূজা করিয়া থাকেন। যখন আমীর দোস্ত মহম্মদ ও আমীর আবদর রহমানের মধ্যে রাজ্য লইয়া সংগ্রাম হয়, তখন কৃষ্ণানন্দ আমীর আবদর রহমানের পক্ষে সেখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তৎপর ইংরেজ-রাজের সহায়তায় আমীর আবদর রহমান জয়লাভ করেন ও দোস্ত-মহম্মদ দেরাডুনে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাসিত হন। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ আবদর রহমান কৃষ্ণানন্দকে কালীবাড়ী যাহাতে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে তদুপযুক্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। অদ্যাপি তদ্দ্বারাই তাহার সেবাপূজা স্বচ্ছন্দে চলিয়া থাকে।

আবদর রহমান জীবিত থাকা কালে আমি যৌবনের উৎসাহে কাবুল গিয়াছিলাম। যখন আমার সহিত আবদর রহমানের পরিচয় হইয়াছিল সেইদিন হইতেই আমার আহারাদির বন্দোবস্ত আমীর-সরকার হইতে হইত, প্রত্যহ আমার আহারের জন্য সরকার হইতে একটি করিয়া ছাগ কালী দেবীর নিকট বলি দিয়া পাঠান হইত। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত আমার খাতিরও জন্মিয়াছিল। তিনি প্রায়ই দেবীর প্রসাদ-গ্রহণে যত্ন করিতেন, কিন্তু আমি অপারগ হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান আমীর ও কাবুল-বাসী মুসলমানগণ এই কালীবাড়ীর প্রতি অত্যাচার অনাচার করেন না। কোন উদাসীন ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী সেখানে গেলে কালীবাড়ীর উন্নতি সাধন করিতে পারেন। স্বামী কৃষ্ণানন্দ ভারতের পশ্চিম প্রদেশে এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। এখন এই-সকল কীর্ত্তি বাঙ্গালীরাই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

রাউলপিণ্ডি ও পেশোয়ারে যে কালীবাড়ী আছে, তাহাদের সেবাইতগণ বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী। মিলিটারী বিভাগের বাঙ্গালীগণ এই কালীবাড়ীদ্বয়ের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তখন স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা বা যাত্রীদের আশ্রয়স্থান ছিল না, বাঙ্গালীদের পক্ষে কালী-বাড়ীই আশ্রয় সম্বল ছিল। পেশোয়ারে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কনট্রাক্টরী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ও সেখানে প্রচুর ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন।

রাউলপিণ্ডি ও পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে বহুতর নির্ব্বাসিত আফগানিস্থানবাসী অবস্থান করিতেছেন। দোস্ত মহম্মদ ও আবদর রহমানের সংগ্রামের পর এই-সকল কাবুলীরা ভারতে নির্ব্বাসিত হইয়া আসেন। ইঁহারা অনেকেই প্রভূত সম্পদশালী, কেহ কেহ ভারতেও ভূসম্পত্তি করিয়াছেন।

এই-সকল কালীবাড়ীতে ক্ষণপ্রবাসী বড়লোক বাঙ্গালীরা ভ্রমণ-উদ্দেশ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে আসিবার সময় বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকেন।

রাউলপিণ্ডিতে ট্রিবিউনের এডিটার প্রমথেশ্বর গুপ্ত যখন অবস্থান করিতেছিলেন আমি তখন তথায় গিয়াছিলাম। সেই সময় ভ্রমণ-উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার জনৈক বিশিষ্ট জমিদার সদলে সেই কালীবাড়ীতে গিয়া অবস্থান করেন। তাঁহাকে সেই কালীবাড়ীতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে দেখিয়াছি। প্রমথেশ্বরবাবু বৈষ্ণব ছিলেন; সুতরাং তাঁহার গৃহে মাংস প্রবেশ করিতে পারিত না। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া অন্ততঃ সে প্রদেশে শীতকালে প্রায় সকলেই মাংস আহার করিয়া থাকেন। মুসলমানদের ত কথাই নাই।

কাশ্মীরে বাঙ্গালীর সম্পদ না থাকিলেও বাঙ্গালীর প্রভুত্ব এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বহুদিন সেখানে দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় এখনও কাশ্মীরে চাকরী করিতেছেন। আমি কাশ্মীরে গিয়া তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। নীলাম্বরবাবু কিছুদিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার কিছুপূর্ব্বে আমার সহিত বাঁকুড়ায় তাঁহার শেষদেখা। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুপরামর্শে নীলাম্বরবাবুকে কাশ্মীর-রাজ চাকরী ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হন। নীলাম্বরবাবু যে-সকল ভূসম্পত্তি কাশ্মীরে করিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাহা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। সেই হইতে তাঁহার কাশ্মীরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইবে ইংরেজ-রাজ নীলাম্বর-বাবুকে ভয় করিতেন। এখন পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী কাশ্মীরে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে পারে না। নীলাম্বরবাবু ও ঋষিবরবাবু বাঁকুড়ায় জমিদারী এবং টাকা-দাদনের ব্যবসা কর্ম্মচারী দ্বারা করাইতেন। দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রবাসী বাঙ্গালীরা ইংরেজের চক্ষুশূল, তাহাদের উপর ইংরেজের

তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। সুতরাং এখন আর কোন বাঙ্গালী স্থায়ী কোন কার্য্য বা ভূসম্পত্তি তথায় করিতে পারেন না।

রাজপুতনা, জয়পুররাজ্যে বাঙ্গালীর প্রভুত্ব একচেটিয়া। রাজকার্য্য ও স্কুল-কলেজের উচ্চকাজগুলিতে বাঙ্গালীর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি বাঙ্গালীর সেইরূপ আধিপত্য রহিয়াছে। কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরে দেওয়ান ছিলেন। কান্তিবাবু জয়পুরে বিস্তর ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাজসরকারের অনুগ্রহে এখনও তথায় অবস্থান করিতেছেন। ফলে কান্তিবাবুর আমলে জয়পুর-রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। রাজপুতনায় এমন প্রভুত্ব কোন বাঙ্গালী করিয়া যাইতে পারেন নাই। কান্তিবাবুর পত্নীবিয়োগ জয়পুরেই হইয়াছিল। তাঁহার শ্মশানে বৃহৎ মন্দির কান্তিবাবুই করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তৎপর কান্তিবাবুও জয়পুরে দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র সেই মন্দিরের পার্শ্বেই পিতৃশ্মশানমন্দির করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে দৈনিক পূজা হয় ও রীতিমত দীপ দেওয়া হইয়া থাকে। কান্তিবাবু জয়পুরে রাজপ্রাসাদ তুল্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এখনও বাঙ্গালীদের সম্মান জয়পুরে অটুট রহিয়াছে, অনেকে জয়পুরেই চিরপ্রবাস স্থান করিয়া লইয়াছেন। কান্তিবাবুই অনেক বাঙ্গালীকে জয়পুর-রাজ্যে লইয়া গিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব যখন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির-ধ্বংসপ্রয়াসে বৃন্দাবন আসেন, তৎপূর্ব্বেই বৃন্দাবনের দেব-দেবী সমূহ জয়পুর-রাজ কর্ত্তৃক তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই সময় দেবালয়ের বাঙ্গালী সেবাইতগণ তৎসহ জয়পুরে নীত হন। আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ জয়পুরে দেবসেবা করিয়া আসিতেছেন। রাজসরকারের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য আয় দ্বারা তাঁহাদের সেবা পূজা চলিয়া থাকে। বৃন্দাবনের বিগ্রহ মদনমোহনজী করৌলীতে নীত হইয়াছিলেন। জয়পুরের রাজকন্যা করৌলীর রাজপুত্রসহ পরিণীতা হইলে যৌতুকস্বরূপ মদনমোহনজীকে প্রদান করা হয়। সেখানকার দেবতার সেবাইত বাঙ্গালী; তাঁহাদের বংশধরগণও অদ্যাপি তথায় অবস্থান করিতেছেন।

দিল্লীর বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করিয়া যশোরেশ্বরী দেবীকে জয়পুরে লইয়া যান। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সেবাইত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণও নীত হন। তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি জয়পুরের পূর্ব্ব রাজধানী আম্বের নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি দ্বারা দেবীর সেবাপূজা ও তাঁহাদের ভরণপোষণ চলিয়া থাকে। সেই সময় মানসিংহ কর্ত্তৃক আর একদল ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা হইতে রাজপুতনায় যান। তাঁহারা পুষ্কর তীর্থে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়া অদ্যাপি তথায় অবস্থান করিতেছেন। আমি তীর্থ উদ্দেশে সেখানে গিয়া অপর ব্রাহ্মণকে পাণ্ডা করিয়াছিলাম। আগে জানিলে তাঁহাদিগকেই পাণ্ডা করিতাম। বাদশাহ-প্রদত্ত প্রচুর নিষ্কর ভূসম্পত্তি এখনও তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মানসিংহের অনুশাসনে তাঁহারা পুষ্কর তীর্থের পাণ্ডা পদ লাভ করিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহারা তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ-সহ বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেবী যশোরেশ্বরীর সেবাইতগণ এখনও তদ্রূপভাবে মিশিতে পারেন নাই। উদয়পুরের মহারাণা বা ইংরেজ-রাজ পুষ্করের ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূমির স্বত্ব নষ্ট করেন নাই। ইহা তাঁহাদের উদারতা বলিতে হইবে। এই সকল ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা ও শস্যশ্যামলা।

দ্বারকাতীর্থে বাঙ্গালীর প্রভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা-নিবাসী জনৈক স্কুল-মাষ্টার হঠাৎ উদাসীন হইয়া দ্বারকায় আইসেন। তিনি দ্বারকায় আসিয়া ত্রিবিধ পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি ধর্ম্মো-পদেষ্টা সাজিলেন, রোগে ঔষধ দিতেন, মামলা-মোকদ্দমায় আইন বেআইনের পরামর্শ দিতেন। ফলে কিছুদিন পরে তাঁহার খুব প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া যায়। কালক্রমে তিনি প্রচুর অর্থবান হন এবং দ্বারকায় প্রাসাদতুল্য দেবমন্দির ও বাটী নির্ম্মাণ করেন। বহু গোধন তাঁহার ছিল, তাঁহার প্রদত্ত গব্য দিয়া দ্বারকায় প্রায় সকল দেব-দেবীমন্দিরের সেবা চলিত। বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী-দিগকে তিনি তথায় আশ্রয় দিতেন। আমি গিয়াও

তাঁহারই আশ্রমে উঠিয়াছিলাম। এখন তাঁহার কাল-প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি উদাসীনের ভাণ করিয়া আসিয়া পরে খাঁটি বৈরাগীই হইয়াছিলেন। তাঁহার সে সম্পদ এখন কি অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি।

ভারতের দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী-প্রাধান্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। থাকিলেও অতি কম ও গণনীয়ের মধ্যে নহে।

নেপাল স্বাধীন রাজ্য, সেখানে বাঙ্গালীর প্রভাব আছে; কিন্তু কোন বাঙ্গালীই সেখানে কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা ভূসম্পত্তি করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি যখন নেপালে গিয়াছিলাম তখন নেপালে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বাঙ্গালী ছিলেন। এখনও তাঁহাদের পদে বাঙ্গালীই রহিয়াছেন। কেবলমাত্র রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার ইঞ্জিনিয়ার নেপালে বাগমতী নদীতীরে স্থায়ী বাসস্থান এবং ভূসম্পত্তি করিয়াছেন। ভারতের প্রদেশান্তরে বঙ্গ ব্যতীত যে-সকল স্থানে গিয়াছি, সকল স্থানেই বাঙ্গালী বুদ্ধি-প্রভাবে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন দেখিয়াছি। তৎপ্রদেশের লোকেরা বাঙ্গালীকে ইংরেজের বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করে। ইংরেজ রাজ্য দখল করিতেন আর সেই রাজ্যের দপ্তর বাঙ্গালীরা পরিচালনা করেন। এই সর্ত্তে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া ইংরেজ ও বাঙ্গালী রাজ্য দখল ও পরিচালন করেন, এই বিশ্বাস অদ্যাপি তাহাদের আছে। নেপাল রাজ্যের নিম্ন প্রদেশে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা তদ্দেশ জাত বস্ত্র ও মহিষা-ঘৃত আনিবার জন্য যাতায়াত করিয়া থাকে। নেপালে ইঞ্জিনিয়ার রাজকৃষ্ণবাবু ব্যতীত বাঙ্গালী কেহ স্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন কিনা অবগত নহি। রাজকৃষ্ণবাবু হাবড়ার দফরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

এখন ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচয় দিব। ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর গতিবিধি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইংরেজ-রাজ ব্রহ্মদেশ (লোয়ার ব্রহ্ম) দখল করিবার পর হইতে বাঙ্গালীর তথায় প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে। তৎপর ইংরেজ ব্রহ্মদেশ দ্বিতীয়বার (আপার ব্রহ্ম) অধিকার করিলে ক্রমে বহুতর বাঙ্গালী তথায় কর্ম্মসূত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। চাকরী ব্যতীত ব্যবসায়-সূত্রেও কম বাঙ্গালী এখানে প্রবেশ করেন নাই। তথায় যাওয়ায় অনেকেরই ভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের কম লোক তথায় যায় নাই। ঢাকার ও ময়মনসিংহের দক্ষিণার্দ্ধের অনেক লোক ব্রহ্মদেশে আছে। বহু মুসলমান ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যের জন্য তথায় গিয়াছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালীর বহু লোক ব্রহ্মদেশে আছে। ওকালতী কার্য্য করিতেও অনেক বাঙ্গালী তথায় আছেন। খাস রেঙ্গুন শহর ব্যতীত ব্রহ্মদেশের ন্যায় সকল জেলা-কোর্টেও বাঙ্গালী উকীল রহিয়াছেন। কেহ কেহ বহুবিস্তৃত ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এখনও ব্রহ্মদেশে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের পথ খোলা রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশে গেলে হিন্দুর সমুদ্র-লঙ্ঘন জন্য জাতি যায় না বলিয়া বাঙ্গালী হিন্দুরা ক্রমে সে দেশে গিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়াও কোন কোন বাঙ্গালী সেখানে প্রচুর ধনবান হইয়াছেন।

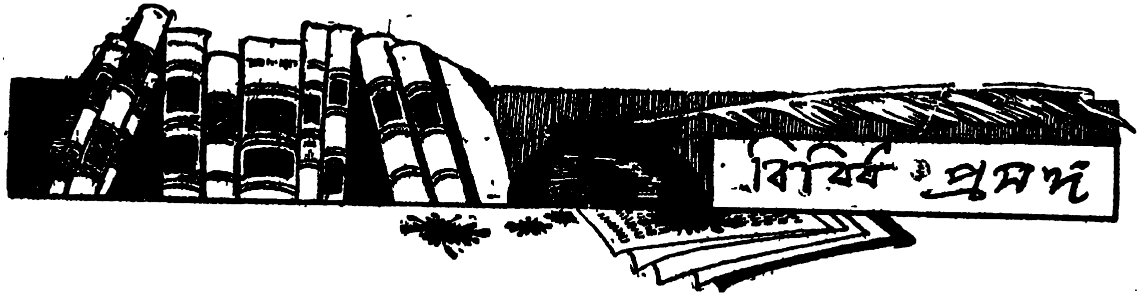
কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এঁড়েদহ গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় প্রথম হইতে ব্রহ্মদেশে ওকালতী করিতেছেন। রেঙ্গুন চিফ্‌কোর্টে তিনি একজন প্রধান উকীল। ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী গেলে তিনি তাহাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া উপকার করিয়াছেন। তাঁহাকে বহু বাঙ্গালী প্রতারণা করিলেও এই প্রবৃত্তি তাঁহার লোপ হয় নাই। রেঙ্গুন শহরে ও সমগ্র ব্রহ্মদেশে তিনি স্বীয় নামে বিলক্ষণ পরিচিত। চট্টগ্রাম বিভাগের জামাল ব্রাদার্স সে দেশে খুব পরিচিত। তাঁহারা ধান, চাউল, কাঠ ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবসায় করিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। ব্যবসায়-সূত্রে অনেকেই ফুলিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ অঞ্চল বাসী শিবনাথ রক্ষিত ইংরেজের দ্বিতীয় ব্রহ্ম অভিযানের (আপার বর্ম্মা দখল) অব্যবহিত পরই ব্রহ্মদেশে কনট্রাক্‌টরী সূত্রে তথায় গমন করেন। তিনি দরিদ্র অবস্থা হইতে বহু লক্ষ টাকা সেখানে উপার্জ্জন করেন। তিনি বহু বাঙ্গালীকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়া ব্রহ্মদেশে লইয়া গিয়া তাহাদের সৌভাগ্য আনিয়া দিয়াছেন। শিবনাথ স্বীয় প্রতিভা-বলে ব্রহ্মদেশে পরিচিত

ছিলেন। তিনি উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানী মন্দালয় (মাণ্ডালে) শহরে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় প্রতি বৎসরই প্রচুর অর্থব্যয়ে মহাধূমধামে সেখানে শারদীয়া পূজা করিতেন। ব্রহ্মের লাট সাহেব বাহাদুর তাঁহার বাড়ীতে কয়েকবার উৎসবাদি উপলক্ষ্যে গমন করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে রেঙ্গুণে কুঞ্জবাবুর ও মাণ্ডালে শহরে শিবনাথবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ব্রহ্মে বাঙ্গালীদের স্থায়ী কীর্ত্তি এ যাবৎ দেখিতেছি না, তবে বাঙ্গালী হিন্দুরা মিলিয়া প্রায় প্রত্যেক শহরেই কালীবাড়ী, দুর্গাবাড়ী, হরিসভা স্থাপন করিয়াছেন, আর বাঙ্গালী-মুসলমানেরা প্রায় প্রতি শহরেই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভারতের পশ্চিম-প্রদেশের ন্যায় ব্রহ্মদেশও বাঙ্গলা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। পূর্ব্বে আহার্য্য দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য ছিল; অধুনা বাঙ্গলার মতই হইয়াছে। ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর স্থায়ী কীর্ত্তি ব্রহ্মদেশে থাকিয়া যাইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে।

ব্যবসায়-সূত্রে কোন কোন বাঙ্গালী যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতিতেও বাস করিতেছেন। সুদূর আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেও না কি দু'-একজন বাঙ্গালী স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। জাভাতে ময়মনসিংহবাসী রায় সরোজিনী বর্দ্ধন বাহাদুর ডাক্তারী ব্যবসায় করিয়া যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। কালপ্রভাবে বাঙ্গালী এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতেছেন। কেহ বা শিক্ষাহেতু, কেহ বা অর্থ ও যশ অর্জ্জনের আশায় নানাদেশে যাতায়াত করিতেছেন। ব্রহ্মদেশে ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের এমন কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের লোকই আসিয়া যেন লুটপাট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলা হইতে রেল চলিলে ব্রহ্মদেশে বহু বাঙ্গালী যাতায়াত করিবে।

এখন একটি বাঙ্গালী রমণীর কথা কহিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হরিদ্বারে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদের অস্থায়ী বাসস্থানাভাবহেতু এই রমণী ভিক্ষা করিয়া একটি ধর্ম্মশালা গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পুণ্যবতী রমণীর সহিত এলাহাবাদে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি ধর্ম্মশালার জন্য ভিক্ষা করিতেছিলেন। আমিও তখন তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া অর্থ-আদায়ে সহায়তা করিয়াছিলাম। সেই বৎসরই হরিদ্বার গিয়াছিলাম। তখন দেখিছিলাম তাঁহার সেই বাড়ীটি প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। তিনি আমাকে সেই বাড়ীতে আশ্রয় লইতে কহিয়াছিলেন; কিন্তু আমি অন্যত্র উঠিয়াছিলাম। এই পুণ্যবতী রমণীর নাম আমি অবগত নহি। সকলে তাঁহাকে "জটাধারী মাই" বলিয়া ডাকিত, অন্য নাম কেহ জানে না। তাঁহার মাথায় এক বোঝা লম্বা জটা ছিল বলিয়াই তিনি এই নামে পরিচিতা ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান বাঙ্গলার কোন্ জেলা বা বা কোন্ গ্রামে ছিল তাহাও কেহ অবগত নহে। তিনি তখন প্রাচীনা ছিলেন। এ যাবৎ তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া বোধ হয় না। সাধু ইচ্ছা থাকিলে অর্থাভাবে কোন সাধুকার্য্যই আটক থাকে না। তাহার উত্তম প্রমাণ জটাধারী মাই কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মশালা স্থাপন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায়ও উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে গমন করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা এই পুণ্যকার্য্য সমাপন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার কত উৎসাহ দেখিয়াছি। এই পুণ্যকীর্ত্তি করিয়া তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। হরিদ্বারে পৌছিয়া জটাধারী মাই'র আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই লোকে তাঁহার এই বাড়ী দেখাইয়া দেয়। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন একটি অতি বৃদ্ধ বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীও সে আশ্রমে বাস করিতেন। তিনি জটাধারী মাই'র পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। পনের বৎসর পূর্ব্বে পুনরায় যখন হরিদ্বার গিয়াছিলাম তখন সেই ব্রহ্মচারী পরলোকে। জটাধারী মাই তখনও জীবিত ছিলেন। ইহা ছাড়া নাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতিতেও বাঙ্গালী আছেন, সে-সকল স্থলেও কেহ কেহ স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গোয়ালিয়র, ঝান্সী প্রভৃতি স্থানেও বাঙ্গালীর আধিপত্য রহিয়াছে। সে-সকল স্থলে ও আজমীরেও কেহ কেহ স্থায়ী বাসভবন করিয়াছেন।



আমেরিকায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রবাসীর সম্পাদককে ইংরেজী নববর্ষের অভিবাদন জানাইয়া কানাডার কুইবেক শহর হইতে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, যে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে ও কানাডায় সর্ব্বত্র লোকে সমারোহের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে এবং তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার বক্তৃতার সাড়া পাইতেছেন। আমেরিকার কোন কোন কাগজ পড়িলে বুঝা যায়, তিনি তথায় গিয়া বক্তৃতা করায়, নিজের কবিতা আবৃত্তি করায়, এবং লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহায় সেখানে তাঁহার সম্বন্ধে ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা জন্মিতেছে। শিকাগোর য়ুনিটী নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকে লিখিত হইয়াছে, "তিনি জগতের অন্যতম মহীয়সী নারী। তাঁহা হইতে বুদ্ধি ও আত্মার এমন একটি শক্তি বিকীর্ণ হয় যাহা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা বলিয়া চিহ্নিত করে।"



শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

ভারতবর্ষের পুরুষেরা সবাই দেবতুল্য এবং এদেশে নারীদের কোনই দুর্গতি লাঞ্ছনা হয় না, ইহা কোন বুদ্ধিমান সত্যবাদী ভারতসন্তান বলে না। কিন্তু আমেরিকায় ও পাশ্চাত্য জগতের আরও নানা অংশে ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্বন্ধে যে জঘন্য ধারণা জন্মান হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। আমেরিকায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সফরে এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তথাকার লোকেরা দেখিতেছে, ভারতবর্ষের একজন নারীর পক্ষে বিদেশী ভাষাতেও এমন সুন্দর বক্তৃতা করা ও কবিতা লেখা সম্ভব যাহা ইংরেজীভাষী বেশী লোকে পারে না। তাহারা দেখিতেছে, ভারতীয় একজন নারীকে তথাকার লোকেরা স্বেচ্ছায় সকল ধর্ম্মের জাতির ভাষার লোকদের



নিখিলভারতীয় নারীশিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের প্রধান কর্ম্মিবৃন্দ

উপবিষ্ট (বামদিক্ হইতে)—১ শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু, ২ পি. কে সেন-জায়া (অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদিকা), ৩ শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, ৪ মজহরল্‌হক্-জায়া (অভ্যর্থনা-সমিতির নেত্রী), ৫ মণ্ডীর রাণী (সভানেত্রী), ৬ ফরদুনজী-জায়া, ৭ মিসিস্ হদিকোপর, ৮ এস্ সি মুখোপাধ্যায়-জায়া, ৯ বৈরামজী-জায়া। দণ্ডায়মান (বামদিক্ হইতে)—১ শুক্ল-জায়া, ২ শ্রীমতী [illegible], ৩ কুমারী নীলকণ্ঠ, ৪ মিসিস্ আর্ভিং, ৫ কুমারী বাহাদুরজী, ৬ কুমারী ন্যাজ্‌রাস্, ৭ মায়াদাস-জায়া, ৮ শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিকা), ৯ কুমারী কোপল্যাণ্ড, ১০ কুমারী ক্ষেমচন্দ, ১১ মুখোপাধ্যায়-জায়া, ১২ হালে‍র্কর-জায়া।

বৃহত্তম রাষ্ট্রনৈতিক সভার নেত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারা দেখিতেছে, তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে ভারতে ও পরে ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন, এবং প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর আপন ইচ্ছা অনুসারে ভিন্ন জাতির এক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহারা ইহাও অবগত হইতেছে, যে, তাঁহার কন্যাপুত্রগণ সকলেই শিক্ষিত এবং কেহই শৈশবে বা বাল্যে বিবাহিত নহে। ভারতবর্ষের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত এরূপ একজন মহিলা আমেরিকায় উপস্থিত হওয়ায় মনস্বী আমেরিকানরা আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছেন। য়ুনিটী লিখিয়াছেন, তাঁহার আমেরিকায় উপস্থিতি "প্রোফাউণ্ড কন্‌গ্র্যাচুলেশনের", সৌভাগ্যব্যঞ্জক গভীর আনন্দপ্রকাশের, বিষয়।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর আমেরিকায় তোলা একখানি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হইল।

ভারতীয় নারীশিক্ষা-কন্‌ফারেন্স

নিখিলভারতীয় নারীশিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশন সম্প্রতি পাটনা শহরে হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে মহিলা প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। শহরে খুব একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। যাঁহারা পর্দা মানেন এবং যাঁহারা পর্দা মানেন না, পাটনার এরূপ সকল শ্রেণীর মহিলারাই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পুরুষদেরও বসিবার আলাদা জায়গা ছিল। বিহারের গবর্ণরের স্ত্রী লেডী ষ্টীভেন্সন কন্‌ফারেন্সের প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। তিনি এই কার্য্যে যোগ দিতে আহূত হইয়া প্রারম্ভিক কার্য্য করিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ভারতীয় পুরুষদের মত ভারতীয় নারীরাও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সরকারী মুরুব্বিয়ানার সাহায্য না লইয়া নিজ নিজ চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে তাহা দেশের পক্ষে অধিকতর



নিখিলভারতীয় নারীশিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

উপবিষ্ট (বামদিক্ হইতে)—১ এস্ কে পি সিংহ জায়া, ২ এইচ্ এল্ নন্দক্যুলিয়র-জায়া (খাজাঞ্চী), ৩ কাশীপ্রসাদ জায়সবাল-জায়া (উপনেত্রী), ৪ মজ্‌হরুলহক-জায়া, ৫ পি কে সেন-জায়া, ৬ ঈশ্বরী নন্দনপ্রসাদ-জায়া, ৭ জ্ঞানচন্দ্-জায়া।
দণ্ডায়মান (বামদিক্ হইতে)—১ ডি এল নন্দক্যুলিয়র-জায়া, ২ মুলে-জায়া, ৩ গোপালপ্রসাদ-জায়া, ৪ শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা, ৫ অম্বানা-জায়া, ৬ এ টি সেন-জায়া, ৭ ডি এন্ সরকার-জায়া।

মঙ্গলের কারণ হইবে। তাহাতে ভারতের সম্মানও বাড়িবে। নতুবা, দেশবিদেশে—বিশেষতঃ বিদেশে, ঘোষিত হইতে পারে, যে, ইংরেজ লাটের পত্নীর প্রভাবেই যাহা কিছু হইবার হইয়াছে, ভারতীয় পুরুষ বা নারীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া কিছু করিতে পারে না। অথচ সত্য কথা এই, যে, এই সব কন্‌ফারেন্সের উদ্যোগ-আয়োজন ও পরিশ্রম বেশীর ভাগ ভারতীয় মহিলাদিগকেই করিতে হয়।

বেহার হেরাল্ড বলেন, কন্‌ফারেন্সের এই অধিবেশনটির সাফল্য অধিক পরিমাণে শ্রীমতী পি কে সেন-জায়া ও শ্রীমতী এস্ এন্ মজুমদার-জায়ার সুশৃঙ্খল কাজ করিবার ক্ষমতার জন্য ঘটিয়াছে। আমরা ভারতীয় পুরুষ ও মহিলাদের—বিশেষতঃ মহিলাদের—নাম ভারতীয় রীতিতে লিখিবার পক্ষপাতী। কিন্তু বিহারের খবরের কাগজে তাহা না পাওয়ায় যাহা পাইয়াছি তাহাই লিখিলাম। এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে বেহার হেরাল্ড শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়েরও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজের কন্যা, কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হওয়ায় পদবী বাঙালীর মত হইয়াছে। তাঁহার বন্দোবস্ত করিবার ও বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা বেশ আছে।

হিমালয়ের ক্রোড়ে বিরাজমান মণ্ডীনামক পার্ব্বত্য রাজ্যের রাণী শ্রীমতী ললিতকুমারী সাহিবা এই অধিবেশনে সভানেত্রীর কাজ করেন। তাঁহার সলজ্জ বক্তৃতা-পাঠ, দাঁড়াইবার সুশোভন ভঙ্গী এবং দেহশ্রী সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

বেহার হেরাল্ড আরও বলেন, কন্‌ফারেন্সের

ব্যবস্থাপিকারা যে সভার স্থান পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসটিকে সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাতে তাহাদের সুবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; কারণ, কোন সাজসজ্জা করিলে তাহা মহিলাদের নানা রঙের জাঁকাল বিচিত্র সাড়ীর ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হইয়া যাইত। শোভা ও সৌন্দর্য্য অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের নারীদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অন্যদিকেও কিছু বলিবার আছে। আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের মহিলাদের এবং গরীব চাষী ও মজুরদের বাড়ীর মেয়েদের পরিচ্ছদে যত তফাৎ, পাশ্চাত্য দেশের ঐ উভয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদের প্রভেদ তত নয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েদের কাপড়-চোপড়ে ও ধনী পরিবারের মেয়েদের কাপড়-চোপড়েও তফাৎ বেশ লক্ষিত হয়। এই পার্থক্যবশতঃ হয় অনেক নারীকে ধনীদের দেখাদেখি পরিচ্ছদের জন্য অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয়, নতুবা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। মহিলারা যদি প্রতিকার প্রার্থনীয় মনে করেন, তাহা হইলে উপায়চিন্তাও তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে।



লালা লাজপৎ রায়



মণ্ডী রাজ্যের রাণী শ্রীমতী ললিতকুমারী সাহিবা
পাটনায় নিখিলভারতীয় নারীশিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের সভানেত্রী

লালা লাজপৎ রায়ের স্মৃতিরক্ষা

লালা লাজপৎ রায়ের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা দুই প্রকার হইতেছে। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সমষ্টি ভারতীয় মহাজাতি। লাজপৎ রায় এই মহাজাতির হিতৈষী নেতা ছিলেন। এই মহাজাতির পক্ষ হইতে ডাক্তার আন্সারী, পণ্ডিত মদন-মোহন মালবীয় * প্রমুখ নেতারা পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিয়া লাজপৎ রায়ের দ্বারা প্রারব্ধ কোন কোন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সকলেরই সমর্থনযোগ্য।

* বাংলা দেশের অনেক কাগজ "মালবীয়" না লিখিয়া "মালব্য" লেখেন। তাহা ভুল। পণ্ডিতজী সংস্কৃত জানেন এবং নিজে "মালবীয়" লেখেন। তাহাই ঠিক। বঙ্গে অন্ত কয়েক জন লোকের নামও কখন কখন ভুল লেখা হয়। ঐ নামগুলির ঠিক বানান ও উচ্চারণ গোখলে, নটেশন্, নটরাজন্, শঙ্করন্ নায়ার, মুঞ্জে, ইত্যাদি।

লাজপৎ রায় হিন্দু মহাসভারও নেতা ছিলেন। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে উঁহারই কাজ স্থায়ীভাবে চালাইবার নিমিত্ত ডাক্তার মুঞ্জে ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি হিন্দুহিতৈষিবর্গ এক লক্ষ টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু মহাসভার সকল সভ্য এবং হিন্দুনামধারী অন্য সকলে এই ফণ্ডে টাকা দিবেন, এই আশায় উদ্যোক্তারা আবেদন করিয়াছেন।

বৃহত্তর ভারত যাত্রী

বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক স্বামী মঙ্গলানন্দ পুরী ইতি-পূর্ব্বে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি



স্বামী মঙ্গলানন্দ পুরী ও তাঁহার দুইটি শিষ্য

তিনি ধীরেশ্বর ও বিজয় পাল সিং নামক দুইজন ব্রহ্মচারী শিষ্যের সহিত সিঙ্গাপুর (সিংহপুর) অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। সেখান হইতে তিনি শ্যাম, সুমাত্রা, জাভা ও বালী দ্বীপ যাইবেন।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস

মাঘের প্রবাসীতে, ৫৯৯ পৃষ্ঠায়, লিখিত হইয়াছিল যে, আমেরিকার জীবিত বিখ্যাত লোকদের জীবনীকোষে দুইজন ভারতীয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত স্থান পাইয়াছে।



ডাক্তার শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস

তাহার মধ্যে একজনের ছবি আমরা মুদ্রিত করিতে পারিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসের ছবি দিলাম। ইনি আমেরিকাতেই বহু বৎসর ছিলেন। এখন জার্মেনীতে আছেন।

সুলেমানের বংশধর

আমাদের দেশের কোন কোন রাজবংশ সূর্য্যবংশী শ্রীরামচন্দ্র হইতে, কেহ বা চন্দ্রবংশ হইতে, আবার কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া দাবী করেন। প্রাচীনত্বের এইরূপ দাবী আমাদের দেশেই আবদ্ধ নহে। আফ্রিকার

আবিসীনিয়া দেশের নাম ভূগোলপাঠকদের নিকট পরিচিত। হাব্‌সীদের দেশ বলিলে তাহা অনেকে আরও সহজে বুঝিতে পারিবেন। সেই দেশের বর্ত্তমান

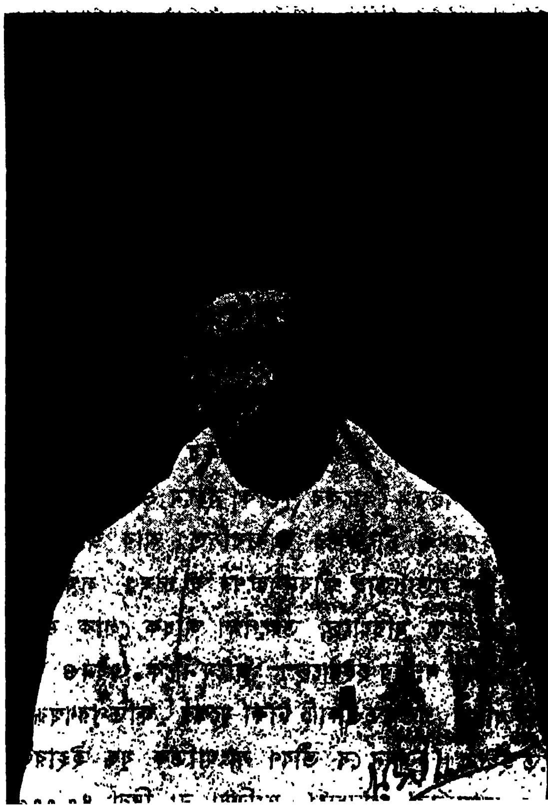


আবিসীনিয়ার রাজা রাস্‌ তফারী

রাজার নাম রাস্‌ তফারী। তাঁহার দাবী এই, যে, প্রাচীন কালে ইহুদীদের স্থলেমান (ইংরেজীতে সলোমন) নামক যে জ্ঞানী ও বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁহার ও তাহার মহিষী রাণী শেবার তিনি বংশধর। ইহুদীদের রং ফরসা, হাব্‌সীদের রং মিশ্‌ কালো। হাব্‌সীদের রাজা রাস্‌ তফারীর রং কিরূপ জানি না।

দর্শন-কংগ্রেস

এবার দর্শন-কংগ্রেসের অধিবেশন মান্দ্রাজে হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছিল। তাহাতে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিভাব্যঞ্জক উৎকৃষ্ট অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত আনন্দশঙ্কর ধ্রুব। তাঁহার অভিভাষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে এই দর্শন-কংগ্রেস ছাড়া আরও কোন কোন কন্‌ফারেন্সের



প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত আনন্দশঙ্কর ধ্রুব

সভাপতিরূপে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা মনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

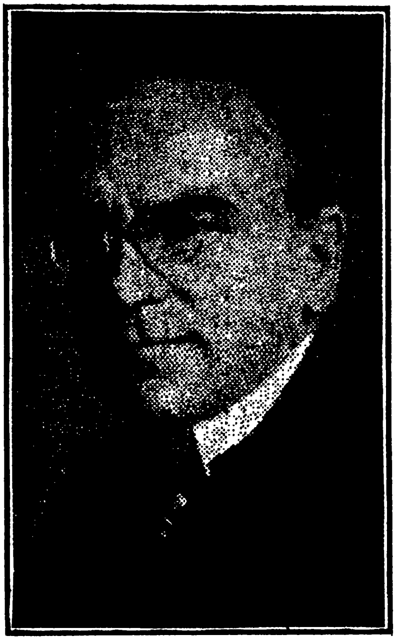
জার্মেন জাতির মানসিক শক্তি

মানসিক শক্তিতে ও সংস্কৃতিতে (কালচারে) জার্মেন জাতির চেয়ে বর্ত্তমান সময়ে অন্য কোন জাতি শ্রেষ্ঠ নহে। তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। বছর তিন আগে আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মেন পুস্তক-প্রকাশকেরা গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে প্রকাশিত চল্লিশ হাজারের অধিক গ্রন্থের একটি প্রদর্শনী খোলে। এই বহিগুলি নানা বিদ্যা বিষয়ে লিখিত। ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত যখন জার্মেনী পৃথিবীর

কয়েকটি বলবত্তম জাতির সহিত জীবন-মরণের যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তখন তাহার অধিবাসীরা বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় এতগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিল! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?

মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের অনেক নেতা স্কুলকলেজের ছাত্রদিগকে উহা বর্জ্জন করাইতে যত ব্যস্ত, তাহাদিগকে জ্ঞানদানে তত ব্যস্ত নহেন। তাহার ওজুহাত এই, যে, আমাদের জাতি এখন স্বাধীনতার জীবনমরণ-সংগ্রামে লিপ্ত,এখন কি গোলামখানায় বহি মুখস্থ করিবার সময়? অথচ এই যে জীবনমরণ-সংগ্রাম, ইহা প্রধানতঃ কাহারও কাহারও সুতাকাটায়, তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক লোকের চরকার আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানে ও শ্রবণে, বহুসংখ্যক লোকের অন্যবিধ বক্তৃতা শ্রবণে,এবং বহুতম লোকের পতাকা বহনে ও শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধনে ও চীৎকারে পর্য্যবসিত; আর জার্মেনীর সংগ্রাম ছিল সত্যসত্যই জীবনমরণের সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাতে মরিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক লোক জখম হইয়া কাজের বাহির হইয়াছে। জার্মেনীকে এখনও বহু বৎসর ধরিয়া শতশত কোটি টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে হইবে। এমন যে ভীষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ ইহারও মধ্যে জার্মেনরা জ্ঞানচর্চ্চা ছাড়িয়া না দিয়া ৪০,০০০ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছিল। তাই এই আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান্ জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে, মানুষের মত বাঁচিয়া আছে।

মহাযুদ্ধের ফলে তাহারা গরীব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া যায়। কিন্তু আবার সামলাইয়া উঠিয়াছে। নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবনের জোরে আবার তাহারা শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্য সব জাতিদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান দানের ক্ষেত্রেও এখন তাহারা কম যায় না। আবার বিদেশী ছাত্রেরা—বিশেষতঃ ব্রিটেন ও আমেরিকার ছাত্রেরা—অধিকতর সংখ্যায় জার্মেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। গত ১৯২৮ সালেও বিজ্ঞানে জার্মেনীর শ্রেষ্ঠতার এক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাইন্‌রিক ভিলাণ্ড ১৯২৮ সালের রসায়নীবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যে জার্মেন অধ্যাপক সোমেরফেল্ড কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, পদার্থবিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা বড় অধ্যাপক এখন কেহ নাই।



অধ্যাপক হাইনরিক ভিলাণ্ড

আমাদের গ্রাজুয়েটেরা বিশেষ কিছু শিখেন না, গ্রাজুয়েটেরা অতি কৃপাপাত্র জীব, ইত্যাকার কথা যিনি যত ইচ্ছা বলুন, তাহাতে আপত্তির কারণ হইতে পারে না, যদি বক্তারা সঙ্গে সঙ্গে এমন উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বনের চেষ্টা করেন যাহার দ্বারা আমাদের স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় হয়। নতুবা, গ্রাজুয়েট হওয়ার নিন্দা করিব অথচ গ্রাজুয়েট-কারখানার সংস্রব ছাড়িব না, অধ্যাপকতাও পরিত্যাগ করিব না, এরূপ মনের গতি বড় অদ্ভুত। হায় হাততালি! অপার তোমার মহিমা!

—

আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের মুদ্রা

আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া সমস্ত দ্বীপটি এখন আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্ বা আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্র নামে পরিচিত। গ্রেট ব্রিটেনের রাজা এখনও ইহার রাজা

বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য সব অংশের মুদ্রায়, যেমন ভারতবর্ষের টাকাকড়িতে, যেরূপ ইংরেজরাজের আবক্ষ মূর্ত্তি থাকে, আইরিশরা এখন



আয়ার্ল্যাণ্ডের নূতন মুদ্রা

আর তাহাদের মুদ্রায় তাহা মুদ্রিত করিতেছে না। তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা, আয়ার্ল্যাণ্ড যাহাতে ধনী, সেই সব জীবজন্তু প্রভৃতির ছবি মুদ্রিত করিতেছে।

আফগানিস্থানের অবস্থা

আফগানিস্থানের অবস্থা যে কি, প্রথমতঃ তাহা ঠিক্ জানাই কঠিন; তাহার উপর দৈনিক কাগজগুলিতে নিত্য নূতন খবর বাহির হইতেছে। যখন রাজা আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নিজের বড় ভাই ইনায়েতুল্লা খাঁকে রাজা হইতে দেন। কিন্তু বিদ্রোহী নেতা বাচ্চা-ই-সাকোর প্রতাপে তাঁহাকেও রাজ্য ত্যাগ করিতে হয়। এই ভিস্তিওয়ালার পুত্র হবিবুল্লা খাঁ নাম লইয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। তাহার পর তাহারও ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা কয়েকবার শুনা গিয়াছে। আমানুল্লা খাঁর শ্যালক (বা ভগ্নীপতি?) সর্দার আলি আহমেদ জান তাঁহার আমলে কাবুলের শাসক ছিলেন। এই আলি আহমেদ জানও যুদ্ধ করিতেছেন। কেহ বলেন তিনি নিজে রাজা হইবার চেষ্টায় আছেন, কেহ বলেন তিনি জয়ী হইয়া আমানুল্লাকেই আবার সিংহাসনে বসাইবেন। যাঁহাদের নাম এপর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও কেহ কেহ রাজা হইবার চেষ্টায় আছেন বলিয়া খবর আসিতেছে।



সর্দার আলি আহমেদ জান

ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট একাধিকবার বলিয়াছেন, তাঁহারা আফগানিস্থান সম্বন্ধে বরাবর নিরপেক্ষ আছেন, পরেও থাকিবেন। ইংলণ্ডে কিন্তু স্যার মাইকেল ও-ডায়াইয়ারের মত কোন কোন লোক আমানুল্লার পতনে ও আফগানিস্থানের অন্তর্যুদ্ধে উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। স্যার মাইকেলের মতে ত আমানুল্লা খাঁ যুজার্পার, অর্থাৎ আফগানিস্থানের রাজা হইবার তাঁহার ন্যায্য অধিকার নাই, তিনি গায়ের জোরে সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। স্যার মাইকেল বোধ করি শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া লবকোট বা লাহোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আফগানিস্থানে বিদ্রোহটা যে কেমন করিয়া ঘটিল, সে বিষয়ে নানা গুজব রটিতেছে। গুজব প্রমাণ করা কঠিন। আমানুল্লা যে-সব সামাজিক ও শিক্ষাদিবিষয়ক সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেগুলি যে কারণ না হইতে পারে, এমন নয়। ইহাও সম্ভব, যে, সেইগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্য লোকেরা শিন্‌ওয়ারী ও অন্য আফগান জাতিদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ-প্রবর্ত্তন ভিন্ন আমানুল্লার বাঞ্ছিত আর সব সংস্কারই আবশ্যক ও হিতকর। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ-প্রবর্ত্তন যে আফগানিস্থানের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা অনাবশ্যক। তবে, এমন হইতে পারে, যে, আমানুল্লা মনে করিয়াছিলেন, এশিয়ার লোকদের নিকৃষ্টতা বা অনগ্রসরতা সম্বন্ধে তাহাদের নিজেদের ও বিদেশীদের যে ধারণা আছে, পোষাক বদলাইলে তাহা দূর হইবে। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র।

কর্ণেল লরেন্স ওরফে শ ওরফে স্মিথ

এরূপ একটা গুজব রটিয়াছিল, যে, যে কর্ণেল লরেন্স আরব দেশে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল, সে-ই শিন্‌ওয়ারীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল। এই গুজবের কোন প্রমাণ আমরা অবগত নহি। এই লরেন্স রিভোল্ট ইন্ দি ডেজার্ট (মরুভূমিতে বিদ্রোহ) এবং পিলার অব্ ফায়ার (আগুনের স্তম্ভ) নামক গ্রন্থদ্বয়ের লেখক। সে আরব দেশের ভাষা ও রীতিনীতির সহিত সুপরিচিত। সেখানে আরবদের মত পোষাকই পরিত। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের অনেক দিন আগেকার এক সংখ্যায় তাহার আরবীয় পোষাকপরা যে ছবি বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি এখানে দিতেছি। এই লোকটি পঞ্জাব সীমান্তে আস্‌মানী ফৌজে এয়ারম্যান (আকাশনাবিক) শ নাম লইয়া সামান্য কাজ করিত। কর্ণেলের মত বিখ্যাত ও উচ্চপদস্থ লোককে নাম বদলাইয়া কেন এরূপ সামান্য কাজ সীমান্তে করিতে দেওয়া হইল, সে বিষয়ে প্রশ্ন বিলাতের ডেলী নিউস্ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আফগানিস্থানে বিদ্রোহ হইবার পরেই তাহাকে কেন সরান হইল, এবং সে বিলাতে পৌঁছিয়া অন্য যাত্রীদের মত বন্দরে না নামিয়া রণতরী-বিভাগের একটি নৌকার সাহায্যে



কর্ণেল লরেন্স

প্লিমাথে কেন ডাঙায় উঠিল, এবং হাতে মুখ ঢাকিয়া দৌড়িয়া কেন বাসায় ঢুকিল, তাহাও বুঝা যায় না। সেখানে সে স্মিথ নাম লইয়াছে। এবম্বিধ বিষয়েও ডেলী নিউস্ প্রশ্ন করিয়াছে।

পঞ্জাবের কোন কোন কাগজে লালা লাজপৎ রায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে একটা গুজব উল্লিখিত হইয়াছিল, যে, এই লরেন্স পীর করম শাহ নাম লইয়া মুসলমানী ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাঁহারা এয়ারম্যান শ কিম্বা পীর করম শাহ্‌কে দেখিয়াছেন, তাঁহারা লরেন্সের ছবির সহিত তাহাদের চেহারার মিল আছে কিনা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

—

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত কার্য্যবিবরণ হইতে দৃষ্ট হয়

চারি বৎসরে ইহার কাজের খুব উন্নতি ও বিস্তৃতি হইয়াছে।

চারি বৎসর পূর্ব্বে মাত্র সাত-আটটি সমিতি লইয়া কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহার স্থানে সমিতির সংখ্যা ২২২টি হইয়াছে। ঐ সকল সমিতির সভ্যসংখ্যা ন্যূনপক্ষে ৪,৬৪০ জন হইবে। বাংলা দেশে এমন একটিও জেলা নাই, যেখানে আমাদের একটি বা ততোধিক মহিলা-সমিতি নাই। সমিতিতে যোগদান করিয়া মহিলাগণ বাহিরে একটা বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র পাইয়া ঘর ও বাহিরের কর্ম্মের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিবার জন্য নূতন উদ্যমে কার্য্য করিতেছেন।

সাধারণ শিক্ষা প্রদান ছাড়া সমিতিগুলির দ্বারা আরও নানা প্রকার কাজ হইয়া থাকে। যথা, নারীদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা, গৃহশিল্প শিক্ষা এবং গৃহশিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা, শিশুমঙ্গল সমিতি ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন এবং শিক্ষিতা ধাত্রীদিগকে মহিলা-সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা, আবশ্যক স্থানে বালিকাবিদ্যালয়-স্থাপনে সহায়তা করা, বাংলার হাঁসপাতালসমূহে ক্রমশঃ সূতিকা-কক্ষ স্থাপনে সাহায্য করা, ইত্যাদি।

মহিলা-সমিতির মুখপত্র "বঙ্গলক্ষ্মী" বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর চেষ্টায় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

মহিলা-সমিতির দ্বারা অন্যান্য দিকে দেশের যত উপকার হইতেছে, তাহা অপেক্ষা গভীরতর হিত এই হইতেছে, যে, বঙ্গ-নারীরা নিজের মঙ্গল নিজে করিতে শিখিতেছেন এবং অন্তঃপুরের বাহিরেও যে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া, শুধু আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, কিন্তু শ্রেয়ের সন্ধানে অবরোধের বাহিরে আসিতেছেন।

—

রাজস্ব সম্বন্ধে বাংলা দেশের প্রতি ঘোরতর অবিচার

বাংলা দেশকে ভারত গবর্মেণ্ট যত টাকা রাজস্ব খরচ করিবার জন্য রাখিতে দেন, তাহা যে অত্যন্ত কম এবং তাহার দ্বারা বাংলা দেশের প্রতি যে ঘোরতর অবিচার করা হয়, তাহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। সে বিষয়ে বঙ্গের লাটদের মত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের সমর্থক উক্তিরও উল্লেখ অনেক বার করিয়াছি। কিন্তু এই অন্যায়ের এখনও প্রতিকার না হওয়ায় আবার এই বিষয়টির আলোচনা করিতে হইতেছে।

প্রথমেই বঙ্গের লোকসংখ্যা ও উহার প্রাদেশিক বরাদ্দের বিষয় মনে রাখা দরকার। তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৮ সালের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্স ইয়্যার বুক হইতে এই তালিকা সংকলিত।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	১৯২৬-২৭ সালের প্রাদেশিক বরাদ্দ
বোম্বাই	১৯৫ লক্ষ	১৫৩২ লক্ষ
ব্রহ্মদেশ	১৩২ লক্ষ	১০৫১ লক্ষ
মান্দ্রাজ	৪২৩ লক্ষ	১৬৫৪ লক্ষ
বাংলা	৪৬৬ লক্ষ	১০৪৯ লক্ষ
পঞ্জাব	২০৬ লক্ষ	১১৭৬ লক্ষ
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫৫ লক্ষ	১৩২১ লক্ষ

অন্যান্য বৎসর কিছু কম বেশী বরাদ্দ সর্ব্বত্র হয়; কিন্তু বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গের বরাদ্দই বরাবর সকলের চেয়ে কম হইয়া থাকে।

বাংলা সরকারের কম টাকা পাইবার একটি হেতু এই দেখান হয়, যে, সব প্রদেশেই ভূমির রাজস্ব প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের পাওনা বলিয়া ধরা হয়; বাংলা দেশে এই খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় এখানে উহা কম আদায় হয়, সুতরাং বাংলা দেশের বরাদ্দ মোটের উপর কম দাঁড়ায়। এখন দেখিতে হইবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ জমীর খাজনার সরকারী অংশ কি পরিমাণে কম হয়। এ বিষয়ে সাইমন কমিশনের সম্মুখে বাংলা গবর্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে স্যার জন সাইমন এই তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন, যে, বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিলে বাংলা গবর্মেণ্ট আরও এক কোটি টাকা জমীর রাজস্ব পাইতেন। অর্থাৎ তাহার বরাদ্দ ১০৪৯ লক্ষ না হইয়া ১১৪৯ লক্ষ হইত। কিন্তু ইহাও বঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট হইত না। সব প্রদেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম।

অথচ সব প্রদেশই খরচ করিবার জন্য বঙ্গের চেয়ে বেশী টাকা পায়। লোকসংখ্যা যত বেশী হয়, তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি, সুবিচার ও শান্তি রক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতির জন্য তত বেশী টাকার দরকার। কিন্তু বাংলা দেশ তাহার লোকসংখ্যার অনুপাতেটাকা পায় না। ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের একতৃতীয়াংশেরও কম; অথচ সেই দেশও বাংলা অপেক্ষা বেশী টাকা পায়। এই কারণে বাংলা দেশের কোন দিকেই উন্নতি হইতে পারিতেছে না। যদি বাংলা দেশ হইতে মোট রাজস্ব আদায়ই কম হইত, তাহা হইলে ভারত গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে বলা চলিত বটে, "তোমাদের বাসভূমি হইতে বেশী রাজস্ব আদায় হয় না, এইজন্য তোমরা বেশী টাকা পাও না।" কিন্তু বস্তুতঃ বাংলা দেশ হইতে অন্য কোন প্রদেশের চেয়ে কম রাজস্ব আদায় হয় না, বরং বেশীই হয়। তাহাও আমরা ঠিক্ ঠিক্ টাকার পরিমাণ লিখিয়া অনেক বার দেখাইয়াছি। সম্প্রতি গত ১৮ই জানুয়ারী মাইনিং ও জিয়লজিক্যাল ইন্স্‌টিটিউটের সান্ধ্যভোজে বঙ্গের লাট বলিয়াছেন :—

"Something like 45 per cent. of the total revenue of the Central Government comes through Bengal and at the same time she finds herself with scarcely any money to run her own administration."

"ভারত গবর্ন্মেণ্টের মোট রাজস্বের মোটামুটি শতকরা ৪৫ টাকা বঙ্গদেশের মারফতে আসে, অথচ বাংলা দেশ তাহার রাষ্ট্রীয় কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট টাকা পায় না।"

ভারত গবর্ন্মেণ্টের প্রায় অর্দ্ধেক রাজস্ব বাংলা দেশে আদায় হয়, অথবা বাংলাই অন্য বড় প্রদেশসকলের চেয়ে কম টাকা পায়!

বাংলা দেশকে রাজস্বের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত রাখিবার জন্য আর এই একটা কারণ দেখান হয়, যে, যাহা বঙ্গে আদায় হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গের অধিবাসীরা ত তাহার সমস্তটা দেয় না। যেমন, বঙ্গে ইন্‌কম্ ট্যাক্স খুব বেশী আদায় হয়। কিন্তু যে-সব জিনিষের ব্যবসাদারেরা এই ট্যাক্স দেয়, সে-সব জিনিষের অনেক অংশ বঙ্গের ভিতর দিয়া বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে যায়। তথাকার ক্রেতারা জিনিষগুলির যে দাম দেয়, তাহার মধ্যে ট্যাক্সও ধরা থাকে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু জিনিষগুলির এই অংশ স্থির করা অসাধ্য নহে। শতকরা যত অংশ বঙ্গের বাহিরে যায়, বঙ্গে আদায়ী ইন্‌কম্ ট্যাক্স হইতে সেই অনুপাতে টাকা বাদ দিয়া বাংলা দেশকে দেওয়া হউক। তাহা হইলেও আমরা অনেক কোটি টাকা পাইব।

কিন্তু এই যে নীতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সে সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। ব্রিটেনের বড় বড় ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকরা অনেক ইন্‌কম ট্যাক্স দেয়। কিন্তু তাহাদের পণ্যদ্রব্যের অনেক অংশ ভারতবর্ষে বিক্রী হয়। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের মত একই সাম্রাজ্যের অংশ। অথচ ব্রিটেনে আদায়ী সমস্ত ইন্‌কম ট্যাক্সই ব্রিটিশ রাজকোষে জমা হয়, ভারতবর্ষ তাহার কোন অংশ পায় না।

যিনি যত তর্কই করুন, ইহা কেহ অপ্রমাণ করিতে পারিবেন না, যে, বঙ্গের অন্ততঃ মান্দ্রাজের সমান ১৬৫৪ লক্ষ টাকা পাওয়া উচিত। যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটাকে একটা দুষ্কর্ম্ম বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে সে অপরাধ বাংলা দেশের লোকে করে নাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত গবর্ন্মেণ্ট তাহা করিয়াছিলেন। তথাপি যদি তাহার জন্য বাংলা দেশের জরিমানা হওয়া উচিত বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে স্যার জন সাইমনের হিসাব অনুসারে তাহার পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশী নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ ভূমির রাজস্বের সরকারী অংশের এক কোটি টাকা বঙ্গের জমিদারেরা পান, এবং তাঁহারা বঙ্গের অধিবাসী। বঙ্গবাসী এই লোকগুলির প্রাপ্ত এই এক কোটি টাকা বাদ দিয়া বঙ্গের ন্যূনকল্পে ১৫৫৪ লক্ষ টাকা পাওয়া উচিত। ইহা খুব কম করিয়া ধরা হইল।

বঙ্গের বাহিরের নিখিলভারতীয় পেট্রিয়টগণ কেহ বঙ্গের প্রতি এই অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও করেন না, ইহার অর্থ কি?

—

বিহার-উড়িষ্যায় নারীর অধিকার

বিহার-উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় ধার্য্য হইয়াছে, যে, ঐ প্রদেশের নারীরাও ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি-

নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন। এই সুবিবেচনার জন্য উক্ত সভার অধিকাংশ সভ্য ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেনের পত্নী প্রভৃতির চেষ্টায় অনেক সভ্য ন্যায়পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। এখন তথায় নারীশিক্ষার দ্রুত বিস্তৃতি ও উন্নতির বন্দোবস্ত হইলে সুসঙ্গত কাজ হইবে।

—

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের ছাড়াছাড়ি

ব্রহ্মদেশের আয়তন বঙ্গের তিনগুণ, কিন্তু লোকসংখ্যা বঙ্গের এক তৃতীয়াংশেরও কম। যদি তথাকার অধিবাসী বর্ম্মীরা খুব কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী হইত, তাহা হইলেও এত বড় দেশের কৃষি পণ্যশিল্প বাণিজ্যের সম্যক বিস্তৃতি ও উন্নতি কেবল তাহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারিত না। বস্তুতঃ, সাইমন কমিশনের সম্মুখে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী এণ্ডার্সন সাহেবের সাক্ষ্যের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে, যে, ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যোগ উদ্যম ও পরিশ্রমে ব্রহ্মের কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি বাড়িয়াছে। অথচ ইংরেজরা ব্রহ্মকে ভারত হইতে আলাদা করিতে চায়। তাহাদের হাতের পুতুল অনেক বর্ম্মীও তাহাই চায়। কিন্তু ভিক্ষু উত্তম প্রভৃতি প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ও সাহসী লোকেরা ব্রহ্মের সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যোগ রাখিতে ব্যগ্র।

ইংরেজরা ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায় এই জন্য, যে, তাহা হইলে তাহারাই উহার শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় একছত্র রাজত্ব করিতে পারিবে। আর একটি প্রধান কারণও আছে। ইহা জানা কথা, এবং সাইমন কমিশনের সম্মুখে প্রমাণিতও হইয়া গিয়াছে, যে, ভারতীয় শিক্ষিত লোকেরা ব্রহ্মে যাওয়ায় ও থাকায় বর্ম্মীদের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা হইতেছে। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাহাদের এই চোখফোটা ইংরেজরা চায় না ও সহ্য করিতে পারে না। আমরা কিন্তু ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ উভয়েরই হিতের জন্য উভয়ের সংযোগ রক্ষার পক্ষপাতী।

যাহা হউক, ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের রাষ্ট্রীয় সংযোগ থাক্ বা না থাক্, বাংলা দেশ স্বভাবতঃ উহার নিকটবর্ত্তী থাকিবেই। সুতরাং বাঙালীদের ওখানে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে, কারণ দেশটি বিরলবসতি ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যশালী। কোন দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত ও বেদখল করিয়া বিদেশীরা ঐশ্বর্য্যশালী হউক, ইহা আমরা চাই না। কিন্তু পূর্ব্বেই ব্রহ্মের আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়াও সেখানে বহু কোটি লোক এখনও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় বাস করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী হওয়া দরকার।

কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে সপ্তাহে তিন বার ষ্টীমার যায়। তা ছাড়া চট্টগ্রাম হইতেও যায়। অধিকাংশ যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীর। তাহাদের তালিকা কোন খবরের কাগজে বাহির হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের তালিকা বাহির হয়। আমরা মধ্যে মধ্যে তাহা পড়িয়া দেখি, তাহার মধ্যে বাঙালী কয়জন। বাঙালী পুরুষ ও মহিলার নাম পাই বটে, কিন্তু বঙ্গের ব্রহ্মদেশের সান্নিধ্যহেতু যত বাঙালীর ব্রহ্মদেশে যাইবার কথা, তত নাম পাই না। রেঙ্গুনের ষ্টীমারের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যেও স্বয়ং দেখিয়াছি বাঙালী যাত্রী বেশী নয়। বাংলা দেশ উর্ব্বর বলিয়া হয় ত বাঙালীরা বেশী কুণো ও উদ্যমহীন হইয়াছে। অন্য কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু এখন বঙ্গেও চিরদুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। তাহাতে ক্রমশঃ হয় ত অভাবের তাড়নায় বাঙালী বেশী পরিমাণে বাহিরে যাইতে শিখিবে।

যে দেশ মাতৃভূমির সহিত একরাষ্ট্রভুক্ত নহে, সেখানে গিয়াও উদ্যোগী লোকেরা সঙ্গতিপন্ন হইতে পারে। জাভা, সিঙ্গাপুর, মলয় উপদ্বীপ চীন সাধারণতন্ত্রের সহিত যুক্ত নহে। অথচ ঐসব দেশে চৈনিক লোকেরা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে; ব্রহ্মদেশেও হইতেছে।

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। ব্রহ্মদেশের কোন্ আফিসে কয়টি কাজ খালি আছে বা নাই, কোথায় কোন্ আদালতে আরও কয়জন উকীলের পসার হইতে পারে বা পারে না, তাহা আমরা জানি না, জানিবার চেষ্টাও করিব না। কৃষি শিল্পবাণিজ্যের কি সুবিধা

আছে, তাহা সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী, উদ্যমশীল লোকেরা স্বয়ং গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

—

শশিভূষণ নিয়োগী

রেঙ্গুনের সওদাগর ও জনহিতৈষী স্বর্গীয় শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ গত ১৮ই জানুয়ারী তথায় একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রেঙ্গুনের মেয়র শ্রীযুক্ত মোহম্মদ রাফী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতায় নিয়োগী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তিনি রেঙ্গুনের একটি সওদাগরী আফিসে অল্প বেতনের কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। পরে স্বয়ং বড় বণিক হন। তিনি নানা সৎকাজে জীবদ্দশায় চারি লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন।

—

মহিলা ম্যুনিসিপ্যাল কমিশনার

ভারতবর্ষের যে-সব অঞ্চলে অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই, যেমন মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতীয় প্রদেশসকলে, সেখানে কোন কোন দেশী মহিলা ম্যুনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়াছেন, বঙ্গে কেহ হন নাই। উত্তর ভারতের অন্যত্রও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিপূর্ব্বে এলাহাবাদের নেহরু পরিবারের এক মহিলা তথাকার ম্যুনিসিপাল কমিশনার হইয়াছিলেন। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে শ্রীমতী সুনীতি মিত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহিলারা এইরূপ কাজে অগ্রসর হইলে ম্যুনিসিপালিটী-গুলির শিশু ও নারীদের স্বাস্থ্যের এবং সামাজিক পবিত্রতার প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়িতে পারে।

—

থিয়েটার ও প্রদর্শনী

বঙ্গের মফস্বলে অনেক শহরে যে কৃষিশিল্পাদির প্রদর্শনী হয়, তাহা ভাল। তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকাও অনাবশ্যক নহে। কিন্তু যাহাতে সামাজিক অপবিত্রতা পরোক্ষভাবে সমর্থিত হয় ও বাড়িতে পারে, এমন কোন বন্দোবস্ত করা উচিত নয়। কোথাও কোথাও কলিকাতা হইতে থিয়েটারের দল লইয়া যাওয়া হয়, যাহাদের অভিনেত্রীদের অসৎ চরিত্র সুবিদিত এবং সঙ্গদোষে অভিনেতাদের চরিত্রও সন্দেহের অতীত নহে। এরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়। বরিশালের ছাত্রেরা ও অন্য ভদ্রলোকেরা এই কারণে তথাকার প্রদর্শনী বয়কট করিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছে। টাঙ্গাইলেও এইরূপ প্রদর্শনী বর্জ্জনের প্রশংসনীয় চেষ্টার সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

—

কাশ্মীররাজ ও নারীনিগ্রহ

কাশ্মীর রাজ্যে এইরূপ আইন হইয়াছে, যে, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ হইলে তাহার কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত দণ্ড দুই-ই হইতে পারিবে।

—

বঙ্গে নারী-নিগ্রহ

বাংলা দেশে নারীর উপর অত্যাচার খুব বেশী হয়। বাংলা গবর্ন্মেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অত্যাচার দমনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হওয়ায় সরকারপক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হয়, যে, প্রতিকারের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় গবর্ন্মেণ্টের নাই। অবশ্য, সেরূপ অভিপ্রায় না থাকিবার কোন রাজনৈতিক কারণ থাকিতে পারে। তাহা অনুমান করিতে পারা যায়, কিন্তু ঠিক্ কিছু বলা যায় না।

এই লজ্জাকর ও জঘন্য অবস্থাকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের আর একটা কারণে পরিণত করিতে আমরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সেইজন্য বঙ্গের কোন কোন হিন্দু-সংবাদপত্রের মুসলমানদের কৃত এইরূপ দৌরাত্ম্যের উপর বেশী জোর দেওয়ার আমরা পক্ষপাতী নহি, যদিও সংখ্যা দ্বারা সঞ্জীবনীতে ইহা সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখান হইয়াছে,

যে, মুসলমান-নামধারী দুর্বৃত্ত লোকেরাই বেশী পরিমাণে এইরূপ কাজ করে। অন্যদিকে দু' এক জন অভিযুক্ত মুসলমান বিচারে খালাস পাইলে তাহা হইতে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব বা অধিকাংশ অভিযোগ মিথ্যা, অনেক মুসলমান কাগজের এইরূপ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টাও অসঙ্গত ও অনুচিত মনে করি। সকল ধর্ম্মের ও জাতির নারীদের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষিত হওয়া চাই, এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল দুর্বৃত্তের শাস্তি দ্বারা চরিত্র-সংশোধন আবশ্যক।

—

বিবাহের বয়স নির্দ্ধারক বিল ও গবর্ন্মেণ্ট

শাস্ত্রধ্বজী এক জন মান্দ্রাজী সভ্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে, হরবিলাস সরদা মহাশয়ের বাল্যবিবাহ-নিবারক ও বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্দ্ধারক বিলের বিবেচনা সম্মতির বয়স কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না-হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত থাকুক। তদনুসারে অধিকাংশ সভ্যের মতে বিবেচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে। সরকারী সব সভ্য মান্দ্রাজী সভ্যের প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়াছেন।

যখন এই বিল প্রথম পেশ হয়, তখন স্যার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন। তিনি গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে বলেন, যে, বিলটি পেশ করায় তিনি বাধা দিবেন না, কারণ তাহা রীতি নহে, কিন্তু তাহার পর পদে পদে তিনি ইহার আইনে পরিণত হওয়ায় বাধা দিবেন। মৃত মাডিম্যান সাহেবের এই ধমক অনুসারে কাজ হইয়াছে। মিস্ মেয়োর মত ভাড়াটিয়া লোকদের দ্বারা যাহাই লেখান হউক, ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণতঃ সমাজ-সংস্কার চায়, ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের কিন্তু তাহা অভিপ্রেত নহে।

সম্মতির বয়স কমিটির রিপোর্টের অপেক্ষায় বিবাহের বয়স বিলটির বিবেচনা কেন স্থগিত রাখা হইল, গবর্ন্মেণ্ট তাহার কারণ সম্বন্ধে যে জ্ঞাপনী বাহির করিয়াছেন, তাহাতে বোকা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। সমাজ-সংস্কারকেরা কেহ তাহা সত্য মনে করিবে না।

অনেকে সন্দেহ করেন, বলশেভিক বহিষ্কারের ব্যপদেশে গবর্ন্মেণ্ট যে আইন করিতে চাহিতেছেন, তাহার সপক্ষে কতকগুলি শাস্ত্রধ্বজী সভ্যের ভোট পাইবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট এই চা'ল চালিয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে সরকারী চা'লটা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে;—কারণ এগারটা বেশী ভোটে বলশেভিক বহিষ্কার বিল বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ আইন করিবার ইহা দ্বিতীয় চেষ্টা। প্রথম চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

কোন্ একটি কাগজে দেখিলাম, গবর্ন্মেণ্ট আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ভয় পাইয়া সমাজ-সংস্কারের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন। কিন্তু পশ্চাৎপদ হওয়াটা অনেক আগে হইতেই চলিতেছে, আফগান-বিদ্রোহ অনেক পরের কথা। মাডিম্যান সাহেবের পূর্ব্বোল্লিখিত কথা যখন উচ্চারিত হইয়াছিল, তখন আফগানিস্থানে বিদ্রোহের স্বপ্নও কেহ দেখে নাই। গবর্ন্মেণ্ট যদি সত্য সত্যই ভীত হইতেন, তাহা হইলেও তাহা অমূলক ভয় বলিয়াই অন্যেরা মনে করিত। কারণ, ভারতবর্ষ আফগানিস্থান নহে। এখানে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা আফগানিস্থান অপেক্ষা বহুবিস্তৃত, এবং ধর্ম্মান্ধতা-প্রসূত দুর্দ্দান্ততা এখানে কম। বেসরকারী লোকদের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়াও এখানে দুঃসাধ্য। তদ্ভিন্ন, সামাজিক সংস্কারকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইতে চেষ্টা করিবার বিদেশী লোকও ভারতবর্ষে বা তাহার সীমান্তে নাই।

আইনের সাহায্য পাইলে অল্প বয়সে বালক-বালিকাদের বিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা যত সহজে সফল হইত, আইন না হইলে তাহা হইবে না। কিন্তু আইনের সাহায্য না পাইলেও এই সংস্কার দুঃসাধ্য হইবে না, অসাধ্য ত নহেই। সংস্কারপ্রয়াসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ নানা উপায় অবলম্বন করিতে থাকুন। দৃষ্টান্তপ্রদর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। শিক্ষিত সমাজে বালকদের বিবাহ ত অনেক দিনই বিরল হইয়াছে, বালিকাদের বিবাহও ১৪।১৫ বৎসরের আগে আজকাল সাধারণতঃ হইতেছে না। যত দিন তাহারা

অবিবাহিত থাকে, নারীশিক্ষোৎসাহীরা সেই সময়টা সুশিক্ষা দিবার কাজে লাগাইতে থাকুন।

—

ভারতীয় সংবাদপত্র ও বিদেশী রাষ্ট্র

অধ্যবসায় সুপ্রযুক্ত হইলে তাহা যেমন প্রশংসনীয়, তাহার অপপ্রয়োগ হইলে তাহা তেমনি নিন্দনীয়। ইংরেজ গবর্মেণ্টের অধ্যবসায় আছে। তাঁহারা যাহা একবার করিতে মনস্থ করেন, তাহা সহজে ছাড়িয়া দেন না।

কয়েক মাস আগে পড়া গিয়াছিল, এইরূপ একটা আইন হইবে, যে, ভারতীয় কোন খবরের কাগজ যদি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন কিছু লেখে যাহাতে ভারত গবর্মেণ্টের সহিত তাহার বিরোধ ঘটিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সম্পাদকের শাস্তি হইবে। এরূপ আইন করিবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই।

পাশ্চাত্য স্বাধীন কোন কোন দেশের খবরের কাগজের লেখায় কখন কখন দেশে দেশে যুদ্ধ বাধিয়াছে বটে। কারণ, তাহারা স্বাধীন এবং তাহাদের খবরের কাগজের মত দ্বারা দেশের লোক চালিত হয়, এবং দেশের লোকেরাই গবর্মেণ্ট গঠন করে ও চালায়। তথাপি পাশ্চাত্য কোন মহাশক্তিশালী দেশে এ প্রকার আইন নাই।

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। আমাদের গবর্মেণ্ট আমরা গঠন করি না, চালাই না। উহা আমাদের খবরের কাগজের লেখা দ্বারা সুপথে বা কুপথে চালিতও হয় না। কোন রাজ্যের সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা উহা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটেনের স্বার্থ অনুসারে করিয়া থাকে, সে বিষয়ে আমাদের মতের অপেক্ষা রাখে না—আমাদের মতের বিরুদ্ধেও যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় আমরা যদি কোন বিদেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্যায় এবং অসত্য কথাও লিখি, তাহা হইলে এমন বেকুব বিদেশী কোন জাতি বা গবর্মেণ্ট নাই, যাহারা আমাদের লেখাকে ভারতপ্রভু ইংরেজের মত মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিবে।

ভারতীয় খবরের কাগজের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত অস্ত্র অনেকগুলি আছে। যথা, পীন্যাল কোডের খুব স্থিতিস্থাপক রাজদ্রোহবিষয়ক ধারা, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা, কোন শাস্ত্র বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অপমান করিলে তাহার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। ইহাতেও প্রবলপরাক্রান্ত সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট নহেন। আরও অস্ত্র চাই। তথাস্তু। কিন্তু তাহাতেও দেশী সংবাদপত্রসমূহ নির্বীর্য্য বা লুপ্ত হইবে না।

—

"গবর্মেণ্ট" কাহাকে বলে

গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার উদ্রেক করা পীন্যাল কোড্ অর্থাৎ ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন অনুসারে একটি গুরুতর অপরাধ। স্বাধীন থাকিবার এবং পরাধীন লোকদের পক্ষে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। পরাধীন দেশে এই ইচ্ছার ন্যায্যতা ও স্বাভাবিকতা প্রদর্শন করিতে হইলে, পরাধীন লোকদের মধ্যে এই ইচ্ছা প্রবল করিতে হইলে, এবং পরাধীন থাকিয়াও যথাসম্ভব সুশাসন পাইতে হইলে বিদেশী শাসনের, শাসনপ্রণালীর এবং রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারীদের সমালোচনা করিতেই হয়। ন্যায্য, সত্য ও ফলদায়ক সমালোচনা করিতে গেলে এমন-সব কথা বলিতে হয়, যাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠান ও মানুষগুলির প্রতি সম্মানের ভাব না বাড়িতে পারে। কিন্তু সেরূপ সমালোচনার ব্যাখ্যা এই হইতে পারে, যে, তাহার দ্বারা গবর্মেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা উৎপাদন করা হইতেছে। এইজন্য, পরাধীন দেশে এরূপ আইন ন্যায়সঙ্গত বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। স্বাধীন দেশে ন্যায়সঙ্গত কিনা, তাহা তথাকার লোকেরা বলিবেন।

পরাধীন দেশে এরূপ আইনের ন্যায্যতা যদি বা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও গবর্মেণ্ট কথাটির অর্থ লইয়া মতভেদ হইতে পারে। যে-কয়টি মানুষের হাতে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, যেমন সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল বা গবর্ণর, তাঁহারা সমষ্টিগতভাবে যাহা করেন, তাহাকে গবর্মেণ্টের কাজ বলা

যাইতে পারে। তাহার সমালোচনাকর্ত্তাদের অভিপ্রেত অথচ অজ্ঞাত ও অনির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা "রাজদ্রোহ" (সিডিশ্যন) নামক অপরাধবাচ্য হইতে পারে। কিন্তু ফরোয়ার্ড ও বাংলার কথার নামে সিডিশ্যনের মামলার আপীলের রায়ে বিচারপতি গ্রেগরী বলিতেছেন, যে, সিভিল সার্ভিসের বা পুলিসের প্রতি অশ্রদ্ধার উৎপাদক লেখাও সিডিশ্যন বিবেচিত হইতে পারে। কারণ গবর্মেণ্টকে মানবীয় কার্য্যকারকের (হিউম্যান এজেন্সীর) দ্বারা কাজ করিতে হয় বলিয়া কার্য্যকর্ত্তা সেই-সব মানুষ গবর্মেণ্টের সহিত অভিন্ন; যেমন পল্লীগ্রাম অঞ্চলে পাহারাওয়ালা গবর্মেণ্টের প্রতীক। ইহা বড় বিপজ্জনক ব্যাখ্যা। তাহা হইলে পাহারাওয়ালাদের বদ্-জবান কি সরকার বাহাদুরের বদ্-জবান? পানওয়ালার কাছে পাহারাওয়ালা যে বিনিপয়সায় পান খায়, তাহা কি সরকার বাহাদুরকেই ভোগ দেওয়া হয়? পাহারাওয়ালা যে বিনিপয়সায় মোটর বাসে চড়ে, তাহা কি সরকার বাহাদুরেরই অবদান? মস্তর কীর্ত্তির কথা না হয় উহ্যই রহিল। বিচারপতি গ্রেগরীর ব্যাখ্যায় সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা এবং রাজনৈতিক সভার বক্তারা বিপন্ন হইলে সরকার বাহাদুরের কিছু আসিয়া যায় না, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় সরকারী কর্ম্মচারীদের দোষে যে সরকার বাহাদুর অসম্মানভাজন ও বিদ্বেষের পাত্র হইবেন, তাহার উপায় কি? একটি দৃষ্টান্ত লউন। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের পুলিস ইন্‌স্পেক্টার-জেনারাল সোয়েন সাহেব সাইমন কমিশনের সম্মুখে বলেন, যে, ঐ প্রদেশের কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবলদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন ঘুষখোর। তাহা হইলে এই উৎকোচগ্রাহিতা বিহার-উড়িষ্যার গবর্মেণ্টেরই দোষ? অতএব তাহা উদ্‌ঘাটন করায় সোয়েন সাহেব পীন্যাল কোডের ১২৪এ ধারা অনুসারে অপরাধী। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার নামে কোন মোকদ্দমা হয় নাই।

—

"বয়েজ্ নার্সারী হোম"

কলিকাতায় নলিনবিহারী সরকার ষ্ট্রীটের ৬নং ভবনে স্থিত "বয়েজ্ নার্সারী হোম" নামক ছাত্রাবাসসমন্বিত বিদ্যালয়টি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত। ইহার ইংরেজী শিখাইবার রীতি উৎকৃষ্ট। শিশুরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ক্রিয়া ও ভাববিশেষের সহিত শব্দবিশেষের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া ভাষা শিক্ষা করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ শিক্ষাপ্রণালীতে এখানে ইংরেজী শিখান হয়। অন্যান্য বিষয়ও উৎকৃষ্ট রীতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম-শিক্ষার ও খেলার বন্দোবস্ত আছে। নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত ইহার অধ্যক্ষ। তিনি শিক্ষা-কার্য্যে দক্ষ। ভারতীয় ও বিদেশী অনেক শিক্ষাপারদর্শী বিখ্যাত লোক এই বিদ্যালয়ের প্রশংসা করিয়াছেন।

—

অজন্টার গুহাচিত্রাবলী

আটাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা কাগজের মধ্যে প্রথমে অজন্টা সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। অজন্টার গুহাবলী সম্বন্ধে গ্রিফিথ্ সাহেবের লেখা যে দুই খণ্ড বৃহৎ সচিত্র পুস্তক আছে, তাহা হইতে আমাদের প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশিত রঙীন ছবিগুলি গ্রিফিথের ছাত্র কয়েক জন চিত্রকরের নকলের প্রতিলিপি। তাহার পর লেডী হেরিংহাম নন্দলাল বসু প্রমুখ চিত্রকরদিগের সাহায্যে কৃত কতকগুলি নকলের প্রতিলিপি ছাপেন। উভয় গ্রন্থই মূল্যবান্। কিন্তু হাতের নকলে নকলকর্ত্তার নিজের বিশেষত্ব অল্পস্বল্প আসিয়া পড়ে। এইজন্য যান্ত্রিক উপায়ে নকল প্রস্তুত করাইবার কথা উঠে।

কালক্রমে ও মানুষের ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণে অজন্টাগুহার চিত্রাবলীর অনেকগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকৃত হইয়াছে। বাকী কতকগুলি মোটের উপর ভাল অবস্থায় আছে। সেইগুলি যথাসম্ভব আদিম অবস্থায় পরিণত করিয়া ও মেরামত করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত হায়দরাবাদের মহিমান্বিত নিজাম মহোদয় বহু ব্যয়ে ইতালী হইতে চিত্রসংরক্ষণ-কার্য্যে দক্ষ লোক আনাইয়া

আবশ্যকমত মেরামত আদি করাইয়াছেন। অজণ্টার গুহাবলী তাঁহারই রাজ্যে স্থিত। তিনি আর একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ করাইতেছেন। যত চেষ্টাই করা যাক্, কালের ধ্বংসশক্তিকে সম্পূর্ণ প্রতিহত করা মানুষের অসাধ্য। এইজন্য অজণ্টার চিত্রাবলী এখনও যেরূপ আছে, তাহার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়া রাখিলে অনেক শতাব্দী পরের মানুষও তাহার সম্বন্ধে কিছু ধারণা ধকরিতে পারিবে, নতুবা পারিবে না। পূর্ব্বে যে যান্ত্রিক উপায়ের কথা বলিয়াছি, সেই উপায়ে নিজাম বাহাদুরের ব্যয়ে এইরূপ প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। যান্ত্রিক উপায়টি হইতেছে রঙীন ফোটোগ্রাফী। ইহার দ্বারা রেখাঙ্কন ত মূল চিত্রের অনুরূপ হইয়াছেই, রংও যথাসম্ভব মূলের অনুরূপ হইয়াছে। ইউরোপ হইতে একজন সুদক্ষ লোক আনাইয়া এই কাজ করান হইয়াছে। তাহার পর এই-সকল ছবি হইতে ব্লক প্রস্তুত করাইয়া বৃহৎ পুস্তকের আকারে প্রকাশিত করা হইতেছে। হায়দরাবাদের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর য়াজদানী সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই কাজ হইতেছে। মুদ্রাঙ্কণাদি বিলাতে হইতেছে। ভূমিকা লিখিয়াছেন চিত্রালোচনায় দক্ষ মিঃ লরেন্স বিনিয়ন। চিত্রগুলির বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন য়াজদানী সাহেব। এই বৃহৎ গ্রন্থ চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডে ১৬টি রঙীন এবং ২৪টি একরঙা চিত্র থাকিবে। কাগজ খুব মজবুত ও সরেস। প্রত্যেক খণ্ডের দাম এখন ৮ গিনি অর্থাৎ প্রায় ১২০ টাকা করিয়া; প্রকাশের পর দশ গিনি করিয়া হইবে। আমাদের নিকট একখানি রঙীন ও একখানি একরঙা ছবির নমুনা এবং লেখার নমুনা আসিয়াছে। তাহা হইতে উপরিলিখিত বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল।

—

বাঁকুড়ায় শিক্ষক-কনফারেন্স

সমগ্র বাংলা দেশের বেসরকারী বিদ্যালয়সকলের শিক্ষকদের একটি সভা আছে। তাহার অঙ্গীভূত এক এক জেলার শিক্ষকদের এক একটি সমিতি আছে। বাঁকুড়া জেলায় এ পর্য্যন্ত এইরূপ সমিতি ছিল না। সেইরূপ সমিতি স্থাপন করিবার নিমিত্ত গত মাসে বিষ্ণুপুর শহরে ঐ জেলার শিক্ষকদের একটি কনফারেন্স হয়। অবসর-প্রাপ্ত স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। সম্পাদক ছিলেন বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসীর সম্পাদক বাঁকুড়া জেলার লোক বলিয়া এবং পূর্ব্বে শিক্ষক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। জেলার সকল দিক্ হইতে অনেক শিক্ষক কনফারেন্সে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শহরের অনেক ভদ্রলোক কনফারেন্সের কার্য্যে যোগ দিয়া শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সরকার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে শিক্ষাবিভাগের দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাসীর সম্পাদককেও একটি অভিভাষণ পড়িতে হইয়াছিল। তাহা কোন কোন কাগজে ছাপা হইয়াছে। কনফারেন্সের কাজ যেরূপ শৃঙ্খলা ও উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে সমিতির কাজ হইতে সুফলের আশা করা যায়।

কনফারেন্স হইয়াছিল বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ও হলে। এই বিদ্যালয় শহরের বাহিরে প্রাচীন দুর্গ-প্রাকারের অদূরে বিস্তৃত ময়দানে নির্ম্মিত। বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের গৃহ পাকা। আলো ও বাতাস প্রচুর। দেখিয়া স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া মনে হয়। ছাত্রদের খেলার ও বেড়াইবার জায়গা অপর্য্যাপ্ত। বালকদিগকে পরীক্ষা করিবার সময় ছিল না, থাকিলেও করিতাম না—তাহা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু কয়েক জন শিক্ষকের সহিত মিশিয়া ও তাঁহাদের কোন কোন লেখা দেখিয়া তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী বলিয়া ধারণা হইয়াছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকটেই বিষ্ণুপুরের পণ্য-শিল্প বিদ্যালয়। ইহার বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম। এখানে ছাত্রেরা কাঠের আসবাব প্রস্তুত করিতে, নানা প্রকার সূতী ও রেশমী কাপড় বুনিতে, লোহার নানা রকম জিনিষ প্রস্তুত করিতে এবং ল্যাম্প প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যের উপর নিকেলের গিল্টি করিতে শিখে।

তাহাদের জিনিষের কাটতি আছে। বিষ্ণুপুরের রেশমী কাপড় বেনারসীর মত সুন্দর অথচ অধিক টেঁকসই ও সস্তা। কলিকাতায় কোন কোন দোকানে ইহা বেনারসী বলিয়া বিক্রী হয়। এই শিল্প-বিদ্যালয়ে সাধারণ লেখা-পড়া শিক্ষাও কিছু দেওয়া হয়। ছাত্রাবাস আছে। বিশেষ বৃত্তান্ত প্রধান শিক্ষককে চিঠি লিখিয়া জানিতে হয়।

বাঁকুড়া জেলার শিক্ষক-কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন আগামী বৎসর বাঁকুড়া শহরে হইবে। তখন জেলা শিক্ষক-সমিতির এক বৎসরের কাজের হিসাব পাওয়া যাইবে।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন এবার ইন্দোরে হইয়াছিল। ইহা সপ্তম অধিবেশন। ইচ্ছা-সত্ত্বেও আমরা ইহাতে যোগ দিতে পারি নাই। ইহার সম্বন্ধে এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিয়াছেন :—

"শুনিলাম অধিবেশনের কাজ বেশ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ডাঃ মেঘনাদ সাহা মহাশয়ের ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে বক্তৃতা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রদর্শনীও বেশ সফল হইয়াছিল। তথায় ইন্দোরের স্থানীয় বহু স্ত্রীলোক প্রত্যহ দলে দলে উপস্থিত হইতেন। মহিলাদের অধিবেশনের কার্য্যও সুসম্পাদিত হইয়াছিল শুনিলাম। কংগ্রেসের জন্ত এবার লোক অন্যান্য বার অপেক্ষা কম হইলেও নিরুৎসাহজনক একেবারেই হয় নাই। অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত, প্রতিনিধিদের বাসের স্থান ও আহারাদির বিশেষ আয়োজন এবং আপ্যায়নের কোনই ত্রুটি হয় নাই শুনিলাম। হোলকার দরবার হইতেও এ সকল বিষয়ে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। ধার রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রী রায় সাহেব প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হইতে কয়েক দিন পূর্ব্বেই অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যে সাহায্য দান করিবার জন্ত গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

এলাহাবাদ হইতে অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ যে ধারাবাহিক বৃত্তান্ত পাঠাইয়াছেন, সংক্ষিপ্ত আকারে তাহার কোন কোন অংশ নীচে মুদ্রিত হইল।

"২৬শে ডিসেম্বর আরম্ভসূচক সঙ্গীত গীত হইবার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণটি অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরে মূল সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হয়। ইহার পর মূল পরিচালক-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন ও উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তৎপরে বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতির নির্ব্বাচন ও সম্মিলনের আলোকচিত্র * গ্রহণ করা হয়। ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে সাড়ে আটটায় বৃহত্তর বাঙ্গলা শাখার অধিবেশন হয়। উক্ত শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কোন অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ জ্ঞানেন্দ্রবাবুর লিখিত (মুদ্রিত) অভিভাষণটি পাঠ করেন। অভিভাষণটি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ও উহাতে বৃহত্তর বঙ্গ শাখার করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে বহু সঙ্কেত আছে। অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকায় বহু ইন্দোর-বাসীর ও সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে শিল্প ও কলা প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হয়। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গীত হইবার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়, ইন্দোর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কোন অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার বাণী পাঠ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। ইন্দোর-রাজ্যের বাদ্যকরগণ বাদ্যধ্বনি করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত শাখার অধিবেশন হয়। পাটনা ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গীত ও ললিত কলার শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইনি নিজের অভিভাষণটি পাঠ করেন ও ব্ল্যাক বোর্ডের সাহায্যে সঙ্গীত শিক্ষার প্রণালী বুঝাইয়া দেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয়।

* ইহা আমরা পাই নাই।

সভাপতি সূর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে উহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতাটি অত্যন্ত সারগর্ভ ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। সভায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল :—

(ক) এলাহাবাদ সম্মিলনের কেন্দ্র হইবে। (খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মূল পরিচালক-সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিবেন—

(১) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়—সভাপতি (২) বাবু কিরণচন্দ্র সিংহ—সম্পাদক (৩) অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ (গ) এই সম্মিলন আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইবে (ঘ) সম্মিলনের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রায় ২,০০০্ টাকা তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

"প্রায় ৭৫জন প্রতিনিধি ইন্দোরে আসিয়াছিলেন।

"মহিলা-সম্মিলনও হইয়াছিল।

"সম্মিলনে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য হইয়াছিল ও বন্দোবস্ত সুন্দর হইয়াছিল।

"ইন্দোরের অল্পসংখ্যক প্রবাসী বাঙ্গালী তাঁহাদের আন্তরিক যত্নে ও আতিথেয়তায় প্রতিনিধিগণকে প্রীত করিয়াছিলেন।

"আগামী বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন নাগপুরে হইবে।"

সাধারণ সভাপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত ও সুবিবেচিত হইয়াছিল। দেশের বৃহত্তর কাজ যে প্রবাসী বাঙালীদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের সহিত একযোগে করা উচিত, তাঁহার এই মত ও তাহার সমর্থক যুক্তি ঠিক। যথোচিত স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন তাঁহার বক্তৃতায় আছে। তিনি "উত্তরা" মাসিককে যে নাগরী অক্ষরে এক বৎসর ছাপাইয়া চালাইতে বলিয়াছেন, সে পরীক্ষা পরিচালকগণ করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু সব বাংলা বহি ও কাগজ নাগরী অক্ষরে ছাপা নানা কারণে চলিবে না। প্রথমতঃ এত বড় একটা পরিবর্ত্তন সরকারী হুকুম ও ক্ষমতা ব্যতীত হইতে পারে না (তুরস্কে অক্ষরের পরিবর্ত্তন সরকারী হুকুমেই হইয়াছে)। দ্বিতীয়তঃ, নাগরীতে ছাপিলে তাহার অবাঙালী পাঠক যত জুটিবে, তার চেয়ে অনেক বেশী বাঙালী পাঠক কমিবে। আমাদের নিজের মতে যে বাংলা অক্ষর নাগরী অক্ষরের চেয়ে সরল ও সুন্দর, সে আপত্তি তুলিব না।

—

বলশেভিক বহিষ্কার বিল

সরকার বাহাদুর এরূপ একটি আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের ভোটে সিলেক্ট কমিটির হাতে দিয়াছেন, যাহা আইনে পরিণত হইলে তাহার জোরে বিদেশী যে-কোন লোককে জাহাজে উঠাইয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিবেন। জাহাজ-ভাড়াটা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে দেওয়া হইবে। তাড়িত লোকটা যে দোষী তাহা অন্য অভিযুক্তদের বিচারের মত প্রকাশ্য আদালতে সাধারণ বিচারপদ্ধতি অনুসারে প্রমাণ করিতে হইবে না, সরকার বাহাদুরের না-পছন্দ লোকটিকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে সে দোষী নহে। সাত দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীলও সে করিতে পারিবে, তার চেয়ে বেশী বিলম্বে করিলে চলিবে না; কিন্তু তাহাও সাধারণ আপীলের মত নহে।

এরূপ আইনের বিরুদ্ধে আমাদের নানা আপত্তি আছে। সংক্ষেপে তাহার দুএকটা বলিতেছি।

সরকার বাহাদুর ব্যক্তিবিশেষ নহেন। এই যে অপুরুষ সরকার বাহাদুর, ইনি চরের চোখে দেখেন শুনেন। চরেরা কাহাকেও কম্যুনিষ্ট বা বলশেভিক বলিলেই তাহা স্বতঃসিদ্ধ হয় না। সেই ব্যক্তি যে বাস্তবিকই তাই, তাহা প্রকাশ্য আদালতে সাধারণ প্রমাণপদ্ধতিক্রমে প্রমাণিত হওয়া দরকার। নতুবা তাহা ন্যায়বিচার বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। এরূপ বিচারে কোন বিপদও নাই। ইতিপূর্ব্বে দেশী কয়েক জন কম্যুনিষ্টের যে বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের শাস্তিও হয়; কিন্তু কোন সাক্ষীকে কেহ আঘাত বা বধ করিবার চেষ্টা করে নাই।

কেহ আপনাকে কম্যুনিষ্ট বা বলশেভিক বলিলে বা

অন্তে তাহাকে ঐ আখ্যা দিলেই সে দণ্ডযোগ্য হয় না। প্রমাণ করিতে হইবে, যে, সে বলপূর্ব্বক, অস্ত্রের সাহায্যে, এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা বা চক্রান্ত করিতেছে বা অন্য কোন বেআইনী কাজ করিতেছে। এরূপ কোন দোষ প্রমাণ করিতে গবর্ন্মেণ্ট বাধ্য না থাকিলে ফল এই দাঁড়াইবে, যে, ভারতে যে-কোন বিদেশী ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার সহায় হইবে, গবর্ন্মেণ্ট তাহাকেই বল্‌শেভিক বদ্‌নাম দিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিবেন। ভারতীয় কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ স্বাধীনতা অপেক্ষা ডোমিনিয়ন-অবস্থাকে এই কারণে শ্রেষ্ঠ বলেন, যে, স্বাধীনতা হইতেছে অন্য রাষ্ট্রের সহিত সংযোগ-বিহীন (আইসোলেটেড), কিন্তু ডোমিনিয়ন-অবস্থায় ব্রিটেনের মত শক্তিশালী দেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগ থাকিবে।* ভারতীয় লিবার‍্যাল বা উদারনৈতিকরা এই আইসোলেটেড ইণ্ডিপেণ্ডেন্সকে অর্থাৎ অন্যের সহিত যোগবিহীন স্বাধীনতাকে ভয় করেন; অন্য কোন কোন রাজনৈতিক দলের লোকেরা তাহা করেন না। কিন্তু ভারতীয় সকল রাজনৈতিক দলের লোকেরাই ভারতবর্ষের পক্ষে আইসোলেটেড ডিপেণ্ডেন্স অর্থাৎ অন্য দেশের সহিত সংস্পর্শবিহীন অধীনতাকে সাতিশয় অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। ভারতবর্ষের সহিত বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন আগন্তুক বিদেশীমাত্রকেই ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার সহজ অস্ত্র শাসকদিগকে দিতে দল হিসাবে কোন দলের লোকই চান না।

বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে যে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ও তৎ-সম্পর্কে রক্তপাত ও প্রাণনাশ হইতেছে, তাহা কম্যুনিষ্টদের অপকীর্ত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অশান্তি ও প্রাণহানি কি বিদেশে কি ভারতে পূর্ব্বেও হইয়া গিয়াছে যখন বলশেভিকদের উদ্ভব হয় নাই। তখন যে-যে কারণে উহা ঘটিয়াছিল, এখনও সেই-সব কারণ বিদ্যমান। সেইগুলিই প্রধান কারণ। সেই কারণগুলি দূর করা উচিত। শ্রমিকরা যে ধন-উৎপাদনে সাহায্য করে, তাহার ন্যায্য অংশ তাহাদের পাওয়া উচিত, এবং তাহাদের বাসগৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের যথোচিত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাহা না করিলে, প্রভু ও বণিক ইংরেজদের চক্ষুশূল সব বিদেশীদিগকে তাড়াইয়া দিলেও অশান্তি ঘটিতে থাকিবে। সুখ-সুবিধা-উন্নতির চিন্তা কেবল বিদেশীদের মাথাতেই আসে এবং তাহারাই তাহা ভারতবর্ষে আনে, এমন নয়। এরূপ চিন্তা সব দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মনে স্বভাবতও উদিত হয়।

বিলটির সিলেক্ট কমিটির হাতে যাওয়ার পক্ষে ১৩ জন বেসরকারী মুসলমান-সভ্য এবং অদলভুক্ত দুই জন হিন্দু-সভ্য মত দিয়াছেন। অনুকূলে ভোটদাতাদের মধ্যে মুসলমানদের এই আধিক্যের একটা কারণ বোধ হয় বোম্বাইয়ে পাঠানদের উপর আক্রমণ ও তাহাদের কয়েকজনের প্রাণহানি। বোম্বাইয়ে কোন্ পক্ষের দোষগুণ কিরূপ জানি না। কিন্তু যে শিশুচুরির গুজব ও আতঙ্কে পাঠানদের উপর আক্রমণের সূত্রপাত হয়, সেরূপ গুজব ও আতঙ্ক কলিকাতায় ও অন্যত্র আগেও হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রাণহানিও হইয়াছিল। তখন বলশেভিক ছিল না, বলশেভিক-ভীতি ছিল না। অনেক বৎসর আগে কলিকাতায় এইরূপ গুজব শিখদের বিরুদ্ধে রটিয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। পাঠানবধের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগ না থাকিবারই সম্ভাবনা।

বিলটি আইনে পরিণত হইলে রুশিয়া হইতে আগত টাকা গবর্ন্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু রুশিয়া হইতে টাকা আসিলেই যে প্রেরক ও পাওনাদার অপরাধী, এরূপ মনে করিয়া উভয় পক্ষের এই প্রকার শাস্তি হওয়া ন্যায়সঙ্গত হইবে না। প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ হওয়া চাই, যে, টাকাটা বে-আইনী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসিয়াছে। অন্ততঃ পক্ষে প্রেরক ও পাওনাদারকে তাহাদের দোষশূন্যতা প্রমাণ করিবার প্রকাশ্য সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু বাজেয়াপ্তির কথা তাহাদিগকে জানাইবার ব্যবস্থাও বিলে নাই।

এইরূপ টাকা বাজেয়াপ্তির অন্য কারণ ও অভিপ্রায় যাহাই থাক, ইহার দ্বারা রুশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে, বিনাশও হইতে পারে। রুশিয়া যদি অস্পৃশ্য হয়, তাহা হইলে সে যেমন ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য

* এই বিষয়ের আলোচনা অনেক বার করিয়াছি।
প্রবাসীর সম্পাদক।

তেমনি ব্রিটেনেরও অস্পৃশ্য। কিন্তু রুশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বাড়াইবার জন্য বিলাতে খুব চেষ্টা হইতেছে। তাহার প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ষ্টেট্স্‌ম্যান্ কাগজের যে নবম পৃষ্ঠায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলশেভিক বহিষ্কার বিল সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কের রিপোর্ট ছাপা আরম্ভ হইয়াছে; সেই পৃষ্ঠাতেই ঐ কাগজের নিম্নমুদ্রিত নিজস্ব টেলিগ্রাম ছাপা হইয়াছে।

BRINGING SOVIET INTO
'FAMILY OF NATIONS'
(FROM OUR CORRESPONDENT)
London, Feb. 7.

A meeting of prominent manufacturers and others interested in the extension of the export trade to Russia, has unanimously resolved immediately to institute a representative delegation to proceed to Russia not later than March 8

British firms supporting the delegation include Armstrong Whitworth & Co. Ltd., Dunlop Rubber Co., Ltd., Mather and Platt, Ltd., the Society of British Manufacturers and Traders, the Associated British Machine-Tool Makers, Rowntree and Co., Ltd., Ruston and Hornsby, Ltd., Ransomes, Sims and Jefferies, Ltd., Leyland Motors, Ltd, the British Portland Cement Manufacturers and Wm. Beardmore and Co., Ltd.

In his presidential address to the Bradford Chamber of Commerce, Mr. D. Hamilton said, the time had come when the peaceful penetration of Russia might with advantage be speeded up. By that means, and not by a system of boycott, Russia could be brought back into the family of nations.—*Copyright.*

তাৎপর্য্য। "লণ্ডন, ৭ই ফেব্রুয়ারী। রুশিয়ার সহিত রপ্তানী-বাণিজ্যের বিস্তারে স্বার্থযুক্ত প্রধান প্রধান কারখানা-মালিক ও অন্যদের এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে, যে, ৮ই মার্চ্চ বা তৎপূর্ব্বে রুশিয়ায় যাইবার জন্য অবিলম্বে একটি বণিকপ্রতিনিধিদল গঠন করিতে হইবে। (ইহার পর টেলিগ্রামে এই প্রতিনিধিদল-প্রেরণের সমর্থক প্রধান প্রধান কারখানাওয়ালা ও ব্যবসাদারদের তালিকা আছে।) ব্র্যাডফোর্ড চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতিরূপে মিঃ ডি হ্যামিণ্টন নিজ অভিভাষণে বলেন, রুশিয়ায় শান্তিপূর্ণ প্রবেশ লাভজনকরূপে দ্রুততর করিবার সময় আসিয়াছে। সেই উপায়েই রুশিয়াকে জাতিসমূহের পরিবারে আবার আনিতে পারা যাইবে, বয়কট-প্রণালীর দ্বারা নহে।"

স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রেরার সাহেব বিলের সমর্থক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, প্রস্তাবিত আইনটি কেবল বিদেশী কম্যুনিষ্টদের জন্য অভিপ্রেত, দেশী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন নূতন আইন করিবার এখন সরকারের কোন ইচ্ছা নাই; তাহাদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য বর্ত্তমান সব আইনই আপাততঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইবে। ইহার মধ্যে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নাই, যে, ভবিষ্যতে দেশী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন নূতন আইন হইবে না। সম্ভবতঃ বিদেশী বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের নিমিত্ত যে সূচ্যগ্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা পরে দেশী কম্যুনিষ্ট-আগাছা উন্মূলনের নিমিত্ত ফাল প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বাভাস। শ্রমিকদিগকে ও তাহাদের দেশী নেতাদিগকে কম্যুনিষ্টদলভুক্ত বলিয়া সায়েস্তা করিবার চেষ্টা যে হইতে পারে, ট্রেড ডিস্পিউট বিল (বাণিজ্যিক বিবাদ বিল) তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রমিকদের দুঃখ দূর করাই শান্তিস্থাপনের প্রধান উপায়। অবিবেচক শ্রমিক-নেতা কেহ কেহ থাকিতে পারে, যাহারা মনে করে, শ্রেণী-যুদ্ধ (ক্লাস-ওয়ার) অর্থাৎ ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অসদ্ভাব ও সংঘর্ষ উৎপাদনই শ্রমিকদের উন্নতির (এবং হয় ত কাহারও কাহারও নিজেদেরও স্বার্থসিদ্ধির) প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু শ্রেণী-যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ উপায় নহে, অনিবার্য্য ও নহে। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা যাহা করে, ভারতবর্ষের লোকদিগকেও যে তাহাই করিতে হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। অন্য উপায়ে শ্রমিকদের উন্নতি হইতে পারে। তাহাতে শান্ত ভাব ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসঙ্গত ব্যবহার

১৯২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানাবিধ সুনিয়মভঙ্গ অপরাধে কলিকাতার এথীনিয়ম ইন্‌টিটিউশন্ বিদ্যালয়কে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। গত জানুয়ারী মাসের টীচার্স জার্ন্যালে দেখিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় আবার তাহাকে সেই অধিকার দিয়াছেন, অথচ যে-সব অনিয়ম করায় স্কুলটির অধিকার-

লোপ ঘটিয়াছিল তাহার প্রতিকার হয় নাই, অন্যায়ভাবে পদচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ বা ক্ষতিপূরণও হয় নাই! কোন্ ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রকারে নিজের মুখে চূণকালি মাখিয়াছেন? কেহ কোন প্রকার তদ্বির করিয়াছে কি? না, যেহেতু একটা ভাল কাজ যদুবাবুর আমলে হইয়াছিল, অতএব তাহা পণ্ড করাই শ্রেয়ঃ, এই যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে? কোনও স্কুলের অধিকার পুনর্লাভে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই, কিন্তু নিয়ম পালনের দ্বারা তাহা হওয়া উচিত।

টীচার্স জার্ন্যালের জানুয়ারী সংখ্যার ৫৫ হইতে ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

—

গুরুশিষ্যে

খবরের কাগজে একটি নূতন রকমের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দেখিলাম। ইহার প্রথম শুনানী কলিকাতার ছোট আদালতে ১লা ফেব্রুয়ারী হইয়াছিল। ২২শে আবার শুনানী হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের মাধব মিশ্র নামক এক জন শিক্ষক অমরেন্দ্রনাথ সিংহ নামক এক ব্যক্তির নামে এই দাবী করিয়া নালিশ করিয়াছেন, যে, তিনি সিংহকে এই সর্ত্তে পালি প্রাকৃত ও হিন্দী শিখাইয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে এম্ এ পরীক্ষার আগে ২৫০ ও ফল বাহির হইবার পর ছাত্রটি এম্ এ পাস হইলে আরও ২৫০ টাকা দেওয়া হইবে। ছাত্রটি পাস হইয়াছেন, কিন্তু সব টাকা দেন নাই বলিয়া এই নালিশ। ছাত্রটি জবাবে বলিতেছেন, মিশ্র তাঁহাকে মাস দুয়ের জন্য কেবল মৈথিলী হিন্দী শিখাইয়াছিলেন; তাহার জন্য তাঁহাকে মাসিক ১০০ হিসাবে ২০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ৫০০ টাকা দিবার চুক্তি সিংহ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, মিশ্র এম্ এ পরীক্ষায় মৈথিলীর প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন এবং সম্ভবতঃ উত্তর-পরীক্ষকও হইবেন বলিয়া, তিনি ছাত্রটিকে বলেন, যে, যদি তিনি তাঁহাকে আরও তিন শত টাকা দেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীতে পাস করান হইবে। এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া সিংহ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর ৩০০ টাকা মিশ্রকে দিতে রাজী হন। মিশ্র সিংহের কাছে কোন চুক্তিপত্র লইতে সাহস করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মীয় সারদানন্দ ঠাকুরের নামে ৩০০ টাকার একটি হ্যাণ্ড্‌নোট লয়েন; এই পরিষ্কার সর্ত্ত উহ্য থাকে, যে, সিংহ প্রথম শ্রেণীতে পাস না হইলে হ্যাণ্ডনোটটি তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে। এখন সিংহ বলিতেছেন, যে, যেহেতু তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই এবং চুক্তিটিও বে-আইনী ও সার্ব্বজনিক-হিত-বিরুদ্ধ, সেই জন্য তিনি টাকা দিতে বাধ্য নহেন। তবে যদি আদালতের মতে সর্ত্তটি বৈধ হয়, তাহা হইলে হ্যাণ্ডনোটটির উপর ভিন্ন মিশ্র টাকা পাইতে পারেন না। অতএব তিনি তাহা আদালতে উপস্থিত করুন।

—

চট্টগ্রামে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা

চট্টগ্রাম ম্যুনিসিপালিটীতে প্রাথমিক অবশ্যশিক্ষণ নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার ১৯২৮-২৯ সালের শিক্ষাবিষয়ক যে রিপোর্ট চেয়ারম্যান মৌলবী নূর আহমেদ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, আবশ্যিক শিক্ষানীতির দরুণ ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা আশানুরূপ বাড়িতেছে। ১৯২৭ সালে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ২১৩০; তাহা বাড়িয়া ১৯২৮ সালে ২৫০০ হয়। ১৯২৭ সালে ছাত্রীর সংখ্যা ১০৫২ ছিল; ১৯২৮ সালে তাহা ১৩৫২ হয়। ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে চট্টগ্রাম শহরে ছয় হইতে এগার বৎসর বয়সের বালকের সংখ্যা ২৫০০, এবং ঐ বয়সের বালিকার সংখ্যা ১৪০০। অবশ্য তাহাদের সংখ্যা গত আট বৎসরে আরো বেশী হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহা ঠিক, যে, আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় চট্টগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইবার বয়সের প্রায় সব বালক-বালিকা এখন শিক্ষা পাইতেছে।

—

আমেরিকায় পাট-আমদানীর উপর ট্যাক্স

কলিকাতার ভারতীয় বণিকদের সমিতি (ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্স) আমেরিকায় পাট হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদির উপর শুল্কবৃদ্ধির প্রস্তাবের কথা শুনিয়া ভারত-

গবর্ন্মেণ্টকে তদ্বিষয়ে এক টেলিগ্রাম পাঠান। সমিতি শুনিয়াছেন, এখন আমেরিকায় আমদানী পাট হইতে প্রস্তুত পণ্যের উপর প্রতি পাউণ্ডে যে এক সেণ্ট (২ পয়সা) করিয়া শুল্ক আছে, তাহা বাড়াইয়া ১২ সেণ্ট (ছয় আনা) করিবার প্রস্তাব তথাকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার তারিখ ছিল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।

ভারতীয় বণিক-সমিতির মতে পাটের কাপড়ের উপর আমেরিকায় প্রতি পাউণ্ডে ছয় আনা করিয়া শুল্ক বসিলে শুল্কটা ঐ কাপড় প্রস্তুত করিবার প্রধান খরচের দ্বিগুণেরও বেশী হইবে। তাহা হইলে ঐ পাট-পণ্য আমেরিকার বাজারে এত দুর্মূল্য হইবে, যে, তথায় তাহার কাটতি কমিয়া যাইবে, সুতরাং ভারতীয় পাটের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়া ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এই কারণে ভারতীয় বণিক্-সমিতি ভারত গবর্ন্মেণ্টকে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ গবর্ন্মেণ্টকে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষের বক্তব্য জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফল কি হইয়াছে তাহা জানা বাংলা দেশের লোকদেরই সকলের চেয়ে বেশী দরকার।

—

কলিকাতায় সর্ব্বধর্ম্মপরিষদের অধিবেশন

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় সকলধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের একটি পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। ইংরেজীতে ইহাকে পার্লেমেণ্ট অব রিলিজ্যন্স বলা হইয়াছিল। এই সভার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ দুটি ছিল। প্রথম, ধর্ম্মসম্বন্ধে আধুনিক ঔদাসীন্যের কারণ আলোচনা এবং তাহার প্রতিকারের উপায়-নির্দ্দেশ। দ্বিতীয়, মানবজাতির মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের উচ্ছেদ দ্বারা শান্তি স্থাপনের উপায়। ভারতবর্ষের নানা ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্বান ও চিন্তাশীল লোকেরা এবং অন্যান্য দেশ হইতে আগত ঐরূপ অনেক লোক সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম দিন সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ক্ষুদ্র সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। বঙ্গের মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মৌলবী আবদুল করিম, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রোতার সংখ্যা বরাবর খুব বেশী হইয়াছিল।

এমন এক সময় ছিল যখন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকের একসঙ্গে অন্ততঃ বাহ্য মৈত্রীর সহিতও ধর্ম্মচর্চ্চা করা প্রচলিত ছিল না। সে বিষয়ে পৃথিবীর কতকটা উন্নতি হইয়াছে।

—

বাঙালী মুসলমানের ভাষা

বাঙালী মুসলমানদের ভাষা যে বাংলা, এটা এত স্পষ্ট ও সোজা কথা, যে, এ বিষয়েও যে তর্ক উঠিতে পারে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতে পারে। কিন্তু এ তর্কও মাঝে মাঝে উঠে। সম্প্রতি ২।১ মাসের মধ্যে উঠিয়াছিল। মৌলবী আবদুল করিমের মত বিদ্বান্ বিচক্ষণ ও বঙ্গের সব জেলার অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তি যে বাংলাকেই বাঙালী মুসলমানদের ভাষা বলিয়াছেন তাহা আশানুরূপই হইয়াছে। যে-সব অসভ্য লোকদের ভাষার শব্দসম্পদ্ নাই, যাহাদের ভাষায় সাহিত্য নাই, যাহাদের ভাষায় নানা বিচিত্র ও সূক্ষ্ম মনোভাব, দার্শনিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক সত্য, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহাদের পক্ষে নিজ মাতৃভাষা ছাড়িয়া অন্য ভাষা গ্রহণ হয় ত অবস্থাবিশেষে দরকার হইতে পারে;—যেমন ফিলিপাইন দ্বীপে ইংরেজী শিখান ও চালান হইতেছে। কিন্তু বাঙালীর ভাষা ভারতবর্ষের কোন চলিত ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে এবং ইহার সাহিত্যও চলিত ভারতীয় কোন ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এই ভাষা ও সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান অধিকন্তু খৃষ্টিয়ান আদি সব ধর্ম্মের লোকেরা গড়িয়াছে।

যাঁহারা বাঙালী মুসলমানকে বাংলা ছাড়াইয়া উর্দ্দু ধরাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ শিক্ষায় আরও অনগ্রসর হইয়া পড়িত।

—

"মল্ল ভারত"

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "য়্যাথলেটিক ইণ্ডিয়া" বা "মল্ল ভারত" নামক একটি নূতন ইংরেজী মাসিক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অল্পবয়স্ক লোকদের ব্যায়াম-অনুশীলনের সাহায্য হইবে। কলিকাতার ওয়েলফেয়ার দ্বারাও অনেক বৎসর হইতে এই কাজ হইয়া আসিতেছে, যদিও ব্যায়ামচর্চা ছাড়া ওয়েলফেয়ারের অন্য উদ্দেশ্যও আছে।

—

"শৃঙ্খলিত ভারত - তাহার স্বাধীনতায় অধিকার"

আমেরিকার বিখ্যাত ভারতবন্ধু আচার্য্য সাণ্ডারল্যাণ্ডের "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ, হার্ রাইট টু ফ্রীডম্, ("শৃঙ্খলিত ভারত—তাহার স্বাধীনতায় অধিকার") নামক পুস্তকের ভারতবর্ষীয় সংস্করণ গত ২১শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষীয় এই সংস্করণে মাত্র দুই হাজার খানি বহি ছাপা হইয়াছে। তাহার মধ্যে মোটামুটি ছয় শত বহি বিক্রী হইতে বাকী আছে।

এরূপ বহি ইতিপূর্ব্বে কেহ লেখেন নাই। ভারতবর্ষের পরাধীনতায় ভারতের, ব্রিটেনের, সমুদয় পৃথিবীর কি অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে তাহা এই বহিতে দেখান হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের বিরুদ্ধে যত কুযুক্তি উত্থাপিত হয়, তাহা ইহাতে খণ্ডিত হইয়াছে। এই বহি বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, মরাঠী, গুজরাটি, তেলুগু, মলয়ালম, ওড়িয়া প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় এবং ব্রহ্মদেশের বর্ম্মী ভাষায় অনুবাদের অনুমতির জন্য অনেক চিঠি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার মহাশয় প্রবাসী-সম্পাদককে অনুমতি দিবার না-দিবার ভার দিয়াছেন। এখনও কোন ভাষায় অনুবাদ করিবার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

—

সেনাদলে অফিসারদের বেতন যথেষ্ট নয় !!

ভারতবর্ষের দেশী ও ইংরেজ-সৈনিকদের রাজার নিয়োগপত্র-প্রাপ্ত অফিসাররা প্রায় সবাই ইউরোপীয়। তাহাদের বেতন জাপানের সৈন্যদলের অফিসারদের বেতনের চেয়ে অনেক বেশী। জাপানী অফিসাররা রণকৌশল জানে না, কেহ বলিতে পারিবে না। জাপানে তাহারা দেশী, সুতরাং অল্প বেতনেই কাজ করিতে পারে। ভারতবর্ষেও অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে সুদক্ষ দেশী অফিসার যথেষ্টসংখ্যক পাওয়া যাইতে পারে। তাহা পাইবার ব্যবস্থা না করিয়া প্রধানতঃ উক্ত অফিসার-শ্রেণীর লোকদের বেতন আরও বাড়াইবার কথা একজন সভ্য বিলাতী পার্লেমেণ্টে তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব উইণ্টার্টন বলিয়াছেন, ১৯৩০ সালে বিবেচনা করা যাইবে। তাহার মানে ভারতের ধন আরও শোষিত হইবে।

—

"ওঁ" পড়িবার ও বলিবার অধিকার

সম্প্রতি গঙ্গার ঘাটে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় "ওঁ নমঃ শিবায়" এবং "ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়" এই দুই মন্ত্র হিন্দুসমাজভুক্ত সকল জাতীয় অনেক লোককে দিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি গোঁড়া লোক নানা কুতর্ক তুলিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি বোধ হয় অদ্বিজের "ওঁ" উচ্চারণে। তাঁহারা যে কিরূপ কাল্পনিক জগতে বাস করেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বেদাদি শাস্ত্র ইউরোপ আমেরিকা ভারতবর্ষ জাপান সর্ব্বত্র সকল ধর্ম্মের লোকের অধিগম্য হইয়াছে। সবাই ইচ্ছা করিলেই "ওঁ" বলিতে পড়িতে পারে, অনেকে "ওঁ" পড়ে ও বলে। অথচ এই পণ্ডিতরা তাঁহাদের নিজের দেশের ও সমাজের অধিকাংশ লোককে তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে চান। কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই।

কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্য উচ্চারণে কোন ফল হয় না—বাক্যগুলি যে ভাষার ও যে ধর্ম্মের লোকেরই হউক। কিন্তু তৎসমুদয় উচ্চারণ করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

—

"ছ" ও "স"

কোরান শরীফে কিম্বা অন্য কোন মুসলমানী শাস্ত্র-গ্রন্থে ইহা লেখা নাই, যে, মুসলমানদিগকে বাংলা লিখিবার সময় "স" এর জায়গায় "ছ" লিখিতে হইবে। ইহা ধর্ম্ম-

নিয়ম নহে বলিয়া অমুসলমান আমরাও সহজ বুদ্ধি ও ভাষা-বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান অনুসারে এ বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

ভারতীয় দেবনাগর ও তাহা হইতে উৎপন্ন বাংলার মত অন্য বর্ণমালায় শ, ষ, স এই তিনটি বর্ণ আছে। "হ" ছাড়া অন্য-সব উষ্মধ্বনির পক্ষে এই তিনটি অক্ষর যথেষ্ট। ইংরেজী "S" (এস্) বাংলায় বরাবর "স" দিয়া লেখা হইতেছে। আবার আরবী ইস্লাম্, সৈয়দ প্রভৃতি শব্দ ইংরেজীতে Islam Saiyid ইত্যাদি রূপ লিখিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বাংলা দন্ত্য "স" ঐরূপ উষ্মধ্বনির পক্ষে যথেষ্ট। তাহার জন্য "ছ" ব্যবহার করা অনাবশ্যক। তদ্ভিন্ন, যদি ইংরেজী "S" এর মত ধ্বনি বুঝাইবার জন্য "ছ" ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে "ছ" এর প্রকৃত উচ্চারণ যে "চ্হ্," তাহার জন্য কোন্ অক্ষর ব্যবহৃত হইবে? ছন্দ, ছত্র, ছাত্র, ছালা, ছক্কা, প্রভৃতি শব্দ কি প্রকারে লিখিত হইবে?

বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা তাহাই যাহাতে এক একটি ধ্বনির জন্য এক একটি অক্ষর আছে, এবং একই ধ্বনির জন্য একাধিক অক্ষর ব্যবহৃত হয় না বা একই অক্ষর দ্বারা একাধিক ধ্বনি সূচিত হয় না। এইরূপ বিচারে দেবনাগর ও তদুৎপন্ন বর্ণমালাগুলি যতটা বৈজ্ঞানিক, অন্যকোন বর্ণমালা ততটা নহে, যদিও সেগুলিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নহে।

আমরা জানি, বাংলায় চলিত কথাবার্ত্তায় শ ষ স প্রায় একই রকমে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইংরেজী ও অন্য বিদেশী শব্দের "S" (এস্) উচ্চারণের জন্য যখন স ব্যবহৃত হয়, তখন শিক্ষিত বাঙালীরা তাহার উচ্চারণ এস্ এর মতই করেন।

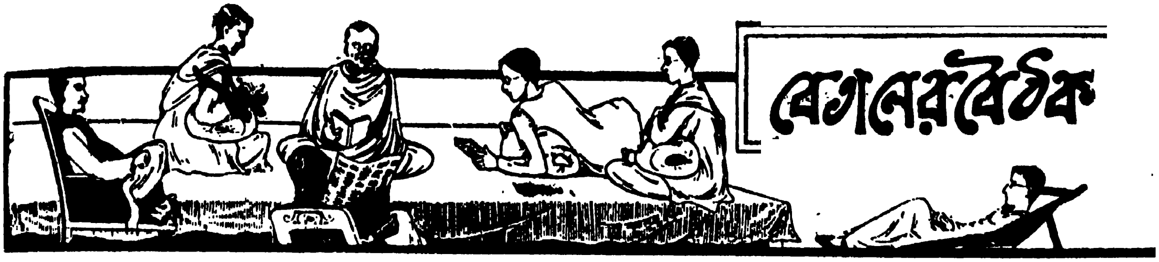
বঙ্গের কোন কোন জেলায় ছ এর উষ্ম উচ্চারণ প্রচলিত আছে জানি; কিন্তু সেইরূপ ল ও ন এর উল্টা-পাল্টা ব্যবহার (লোকের যায়গায় নোক, নৌকার জায়গায় লৌকা), ড় ও র এর উল্টাপাল্টা ব্যবহার (পড়ার জায়গায় পরা, পরার জায়গায় পড়া), শ ও হ এর উল্টাপাল্টা ব্যবহার, এবং "রাম বাবুর বাগানে আম চুরির" জায়গায় "আমবাবুর বাগানে রাম চুরি" কোন কোন জেলার সাধারণ লোকদের মুখে শুনা যায়। তথাপি, এই-সকল উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সাহিত্যে আমদানীর যোগ্য নহে।

বৈষ্ণব-কবিতা

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

বৈষ্ণব-কবিতাটিরে পড়িলাম বহু শতবার;
সে-দিন কুয়াশা-রাত্রি;—নাগরী সে নগরীর শিরে
ধূম্র-ধূলি জমিয়াছে অন্ধকারে প্রাকারে প্রাচীরে
পথের আলোকে মিশি'। মনে হ'ল, বহু বর্ষ-পার;—
আজিকার শতাব্দীর শত প্রশ্ন-ক্লান্ত সমস্যার
তুহিনের তুঙ্গ-শীর্ষে ক্ষীণপ্রাণ চন্দ্র-রশ্মিটিরে
শঙ্কিত চরণে কেহ রাখিয়াছে অতি ধীরে ধীরে;—
চ'লে গেছে; আছে শুধু অঞ্চলের সুগন্ধ তাহার!

পদ্মের সৌরভ সে কি?—অথবা সে রাজ-অন্তঃপুরে
লক্ষ্মীর অঞ্চল-স্পর্শ সভা-কবি-চিত্ত-বাতায়নে,
অথবা রূপসী রামী যৌবনের মর্ম্মহারা সুরে
করে আত্মবিনোদন উন্মাদ কবির কাব্যসনে!
উন্মাদ—উন্মাদ কবি; আজি তাই দূর হ'তে দূরে
কাব্য-পিক্ গেয়ে যায়—পশে গান কাণ হ'তে মনে!



জিজ্ঞাসা

আমেরিকায় হিন্দু-উপনিবেশ—

আমেরিকায় হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি অথবা প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের কোন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে কি না? পাওয়া গিয়া থাকিলে কখন কোন্ প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে, এবং কোন্ গ্রন্থে অথবা সাময়িক পত্রে কোন্ সময়ে তাহার বিবরণ বাহির হইয়াছে?

শ্রী ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী

স্বপ্নতত্ত্ব

১। 'স্বপ্নতত্ত্ব' বিষয়ক কোনও পুস্তক আছে কি না, থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

২। আমাদের দেশে মেয়েরা এমন কি পুরুষেরাও পত্র লিখিয়া খামের পিছনে একটা সমচতুর্ভুজ আঁকিয়া মধ্যে ৭৪॥৹ লিখিয়া দেন। ইহার অর্থ কি?

শ্রী রমেন্দ্রকুমার চৌধুরী

নৈশ-বিদ্যালয়

বঙ্গদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোনও নৈশ-বিদ্যালয় আছে কি না, থাকিলে কোথায় এবং ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়গণের নিকট হইতে নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে কোনও প্রকার উপদেশাদি পাওয়া যায় কিনা। কিংবা ঐ সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষায় কোনও পুস্তকাদি আছে কি না, থাকিলে কোথায় পাওয়া যাইবে, কাহার কৃত, এবং মূল্য কত?

শ্রী প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

Water-colour painting শিক্ষার কোন বাংলা পুস্তক আছে কি? যদি থাকে তবে তাহা কোথায় পাওয়া যায়? এইরূপ ছবি আঁকিবার ভাল রংএর নাম কি ও তাহা কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী মিহিরকুমার দত্ত

কাগজ জ্বালাইবার উদ্দেশ্য কি?

প্রায়ই দেখা যায়, দোকানদারগণ দোকান বন্ধ করিবার সময় দোকানের সম্মুখে এক টুকরা কাগজ জ্বালাইয়া ফেলিয়া দেয়। এইরূপ করিবার প্রকৃত কারণ কি?

শ্রী কালিদাস নন্দী

বাংলা 'সেঞ্চুরি ক্যালেণ্ডার'

ইংরেজীতে Century Calender আছে। বাঙ্গালায় সেরূপ কিছু আছে কি না বা কেহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন কি না?

শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষি-কলেজের নাম কি ও তাহা কোথায়? ভারতবাসীর পক্ষে পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কৃষি-কলেজে পড়া সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট?

শ্রী নির্ম্মলকান্তি সেন

'ভোগী'

আগেকার দিনে কামরূপের কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে না কি 'ভোগী' নামক এক শ্রেণীর লোক থাকিত। ঐ লোকগুলিকে ভোগী বলা হইত কেন এবং কি উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে মন্দিরে রাখা হইত?

শ্রী অমিতাভ দত্ত

—

মীমাংসা

বাঙ্গলা ভাষায় ভূপর্য্যটন-কাহিনী

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের প্রণীত "বর্ত্তমান জগত" নামক বাঙ্গলা বইয়ে ভূপর্য্যটন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। আধুনিক কালে তিনিই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত বেশী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভূ-প্রদক্ষিণ নামক আরও একখানি বই আছে, তাহার লেখকের নাম মনে নাই, কিন্তু বইখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

বাংলা প্রতিশব্দ

মাঘ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত বেতালের বৈঠকে 'বাংলা প্রতিশব্দ সম্বন্ধে একটি 'জিজ্ঞাসা' বাহির হইয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তা কতকগুলি ইংরেজী শব্দের সঠিক বাংলা অনুবাদ কিরূপে করা যাইতে পারে জানিতে চাহিয়াছেন। আমার মতে নিম্নলিখিতরূপে শব্দগুলির অনুবাদ করা যাইতে পারে। তবে স্থানবিশেষে অন্য রকম অনুবাদের প্রয়োজন হইতে পারে।

Advertisement—বিজ্ঞাপন
Notice—বিজ্ঞপ্তি
Examination—পরীক্ষা

Experiment—পরীক্ষা করিয়া দেখা অথবা 'পরীক্ষণ'
Trial—যাচাই
Test—কষিয়া দেখা

শ্রীকল্যাণী দেবী

ছুতারের কাজ সম্বন্ধীয় পুস্তক

মাঘ মাসের প্রবাসীতে বেতালের বৈঠকে "ছুতারের কাজ" শিখিবার সরল বাঙ্গলা পুস্তকের ঠিকানা—

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-ই প্রণীত, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত "সূত্রধর" নামক সচিত্র একখানা বাঙ্গলা পুস্তক আছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র, প্রাপ্তিস্থান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ওয়ারী, পোঃ ঢাকা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্রীহট্ট।

ব্রহ্মচারী দুর্গাচৈতন্য

প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইন-পুস্তক

নূতন সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় লিখিত দুইখানি পুস্তিকা এই অঞ্চলের বাজারে দেখা যায় :—

১। বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৯২৮ সালের সংশোধক আইনের কথা। কুমিল্লার উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বি, এল, প্রণীত এবং উক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা।

২। নূতন সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। জজকোর্টের জনৈক উকিল সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র আচার্য্য, মডেল লাইব্রেরী—ঢাকা ও ময়মনসিংহ। মূল্য ৵১০ তিন আনা।

শ্রী সরোজকুমার সরকার

সাপ্তাহিক সংস্কৃত পত্রিকা

মাদ্রাজ কাঞ্জিভরম বা কাঞ্চী হইতে প্রতি শুক্রবার "মঞ্জুভাষিণী" নামে একখানি সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকা

কলিকাতা হইতে "ক্ষত্রিয় সংস্কার" এবং "বঙ্গবাসী" পত্রিকার হিন্দী সংস্করণ—এই দুইখানি সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন আরও দুই-একখানি পত্রিকা আছে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হিন্দুসমাজে পূজা গুরু ও পুরোহিতের সাহায্যে হইয়া থাকে। গুরু ও পুরোহিতের নিকট শিক্ষা করিয়া নিজে নিজে পূজা করা কর্ত্তব্য। গুরু ও পুরোহিত মন্ত্র বলিবেন নিজে বসিয়া পূজা করিবেন। প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করা গৌণ অনুষ্ঠান। কাতর ও চাকুরী বা অন্য কারণে নিজে পূজা করিতে না পারিলে প্রতিনিধি দেওয়ার বিধি আছে। গুরু ও পুরোহিতের ব্যবসা হওয়াতেই হিন্দু অনুষ্ঠান লোপ পাইতেছে। পল্লীগ্রামের শিক্ষিত অধিকাংশ লোক জীবিকার জন্য শহর বা অন্য স্থানে বাস করার হেতু সম্প্রতি পাবনা জেলার কোন গ্রামে বিজ্ঞাপন দিয়া এক গুরু-অভিনয় হইয়াছে। সেই বিজ্ঞাপনের অবিকল নকল দিতেছি :—

"শ্রীশ্রীপ্রভুগোপাল চৈতন্য সুন্দর।
অনুপমতনুসৌম্যং নিশ্চলধ্যানদৃষ্টিং
প্রকটিতব্রজভাবং বাল গোপাল লীলং
পরমধ্যেয়ং বিমলবালসারল্যমূর্ত্তিং
গুরুবরমভিবন্দে মূর্ত্তচৈতন্যদেবং॥"

উক্ত প্রভু গোপাল নিজেকে চৈতন্য অবতার প্রকাশ করিয়া এক দম্পতির একজনকে নন্দ ঘোষ ও তাহার স্ত্রীকে যশোদা সাজাইয়া কোন গ্রামে তাহার বিধবা মাতার বাড়ী উপস্থিত হইয়া আভিমাতা, মাসিমাতা, মাসতুত ভগিনী ভাই প্রভৃতি এবং কল্পিত নন্দঘোষের জন্মভূমি মাতুলালয় যাইয়া মামা, মামি, মামাতু ভাইভগিনী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং আসিয়া খাইয়া যান প্রকাশ করে। উক্ত বিজ্ঞাপনের বর্ণে বর্ণে সকল অভিনয় হইয়াছে। উক্ত গোপাল গুরুর বয়স অনুমান ৩৫.৩৬। উক্ত মা যশোদা গোপাল রাত্রিতে শুইয়া থাকিতেন। গোপালকে তৈল দিয়া স্নান করান, গব্য ও উষ্ণ দুগ্ধ খাওয়ান প্রভৃতি হইয়াছে। সাধারণ লোকে যেমন নিত্য আহার করে তদ্রূপ উক্ত গোপাল আহারও করিয়াছেন। আহারান্তে ভক্তবৃন্দ তাহার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছে। দুধের বাটীতে মুখ ধোওয়া জল (কুলকুচি) মৃতামৃত বলিয়া এবং স্নান করার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত জল চরণামৃত বলিয়া ভক্তগণ খাইয়াছেন। এরূপ গুরু অভিনয় নূতন তামাসা।

শ্রী দীননাথ লাহিড়ী

"বাউল-গান"

গত পৌষ (১৩৩৫) সংখ্যার "প্রবাসীতে" "বাউল গানের" মীমাংসায় সুধারাম বাউল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"ঢাকা জেলার 'চোরমর্দ্দন গ্রামে' সুধারাম বাউলের বৃহৎ কেন্দ্র আছে, তাঁহার বহু শিষ্য মিলিত হইয়া ঢাকা বিক্রমপুরের "সেরেজাবাদ" গ্রামেও একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।"

আমি সুধারাম বাউলের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা কিন্তু অন্যরূপ। সুধারাম বাউল জাতিতে নমঃশূদ্র ছিলেন; তিনি আনুমানিক ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মাঠিভাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবদ্ভক্ত ও একজন সিদ্ধ সাধক হিসাবে পরিচিত হইবার পর অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার নাকি অনেক স্ত্রী-শিষ্যাও ছিল।

হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সুধারাম উন্মত্তবৎ বিক্রমপুরের "সেরেজাবাদ" গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন; সেখানে তিনি কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। "চোরমর্দ্দন" গ্রামে সুধারামের কোন কেন্দ্র আছে কি না জানি না। তবে সুধারামের শিষ্যেরা সেরেজাবাদ গ্রামে কোন কেন্দ্রস্থাপন করে নাই; কেন্দ্রস্থাপন করিয়াছিল মুচিখোলায়। মুচিখোলা তখনকার দিনে ভীষণ শ্মশানভূমি ছিল। ঐস্থানে পূর্ব্ব দিনের বেলায়ও কোন লোক সাহস করিয়া আসিত না। ঐ স্থান আখড়া-নির্ম্মাণের উপযুক্ত বলিয়া সুধারাম নির্দ্দেশ করায় তাঁহার শিষ্যেরা মুচিখোলায় আখড়া নির্ম্মাণ করেন। মুচিখোলার ঐ স্থানটি শ্রীনগরের জমিদার স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের অধিকারভুক্ত ছিল। সুধারামের শিষ্যেরা তাঁহার নিকট ঐ স্থানটি চাহিবামাত্র তিনি বিনা আপত্তিতে সুধারামের আখড়া স্থাপনের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্র সেনগুপ্ত



বিদেশ

নব্য রুশ-সভ্যতা—

রুশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া সুবুদ্ধির কাজ নহে। প্রথমতঃ, রুশিয়ায় মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যে একটা পরীক্ষা চলিতেছে তাহা এতটা নূতন ধরণের যে সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতে গেলেই পুরাতন-পন্থীর বিদ্বেষ ও নব্যপন্থীর উৎসাহ, দুইএরই মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। আসলে ঘটিয়াছেও তাই। দ্বিতীয়তঃ, রুশিয়ায় যে পরীক্ষা চলিতেছে বলিয়াছি তাহা আজ পর্য্যন্তও শেষ হয় নাই। ১৯১৮ সনে বলশেভিজ্‌মের যে রূপ দেখা গিয়াছিল ১৯২৮ সনে তাহার আর সে আকৃতি-প্রকৃতি নাই। আরও কয়েক বৎসর গেলে বলশেভিজম্‌ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা আজ কে বলিতে পারে?

তবুও নব্য রুশিয়ার রাজনৈতিক বিপ্লব মানুষের সভ্যতায় ও মানসিক বিবর্ত্তনে যে একটা ছাপ রাখিয়া যাইবে, এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকমাত্রেই একমত। অনেকের মতে এইটাই রুশ-বিপ্লবের সবচেয়ে বড় কথা, শাসনপদ্ধতি অথবা কৃষি বাণিজ্য শিল্পের রীতি-পরিবর্ত্তন এই বিপ্লবের গৌণ ফল মাত্র। সম্প্রতি 'নিউ রিপাব্লিক' পত্রিকায় আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ জন ডিউইর রুশিয়া-ভ্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ ডিউইরও এই মত। প্রসঙ্গক্রমে লেনিনের পত্নী তাঁহাকে বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতিই রুশিয়ার বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির উদ্দেশ্য। সে দেশে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে তাহা শুধু রাজনীতি ও শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনেই আবদ্ধ থাকিবে না। মানব-সভ্যতার নূতন একটা রূপ দেওয়াই তাহার প্রকৃত লক্ষ্য।

এই সিদ্ধান্তের টীকাস্বরূপ সেদিন রুশিয়ার বর্ত্তমান শিক্ষক-সচিব এ ভি লুনাচারস্কি বার্লিনের একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট নূতন রুশ সাহিত্য ও আর্টের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। রুশ আর্টে যে একটা বিপ্লব হইয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা ফ্যুলপ মিলারের বিখ্যাত পুস্তকের চিত্রসমূহের মধ্যেই পাইয়াছি। কাব্য ও গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে লুনাচারস্কি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক মসিয় অঁরি বারব্যুস্‌ কর্ত্তৃক সম্পাদিত "মঁদ" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বিগত এগার বৎসরে রুশিয়ার উপর দিয়া যে পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, সঙ্গীতে তাহার বিশেষ কোন প্রভাব দেখা না গেলেও, কাব্যে ও নাটকে শ্রমিকগণ আজ পর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছে ও ভবিষ্যতে যাহার আশা-ভরসা রাখে, তাহাকে লইয়া যে একটা সত্যকার সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাই। গত দুই বৎসরের মধ্যেই এই সাহিত্য বিশেষ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিপ্লববাদী কাব্য সম্প্রতি একটু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে যুবক শ্রমজীবী চোলোকভের "নীরব দান", পান্টেরিয়েফ রচিত কৃষকজীবনের কাহিনী "ক্রস্কি", ও কারাইয়েভার "কাঠের বাড়ী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেবেডিন্‌স্কি শিল্পী হিসাবে ইহাদের অপেক্ষা কম শক্তিশালী হইলেও তাঁহার রচিত "রাসপ্রম" নব্য রুশ সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। নাটক-রচয়িতাদের মধ্যে কিরশন ও বিলিজেরকভস্কিই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

রুশ বিপ্লব রুশজাতির জীবনে যে নূতন ধারা আনিয়া দিয়াছে তাহার সুনিবিড় পরিচয়, ও তাহাকে আর্টের সাহায্যে মূর্ত্ত করিয়া তোলাই এই নূতন সাহিত্যের লক্ষ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে রুশিয়ার অন্তর্বিপ্লবই সাহিত্যের প্রেরণা জোগাইত, এখন রুশিয়ায় যে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে তাহাই সে প্রেরণা জোগাইতেছে। নব্য রুশ লেখকদের মধ্যে সর্ব্বোপরি আমরা পাই, একটা অদম্য আশা ও উৎসাহের বাণী। এইখানেই অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তাহার বিরোধ। সেখানে প্রায়ই দেখিতে পাই যে, একটা রুগ্ন মনস্তত্ত্বের কচ্‌কচি, সংশয় ও নিরাশাপূর্ণ "হ্যাম্‌লেটিজম্‌", ও অবান্তর অলঙ্কার ও ক্ষুদ্রতা সাহিত্যকে পাইয়া বসিয়াছে।

ইণ্টারন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট—

আজ দশ বৎসর হইল 'লিগ্‌ অফ নেশনস' স্থাপিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের স্বপ্ন সত্য হইয়াছে কি না, এই যুদ্ধভারপীড়িত জগতে লিগ্‌ অফ নেশন্‌স্‌ সত্য সত্যই শান্তিস্থাপনের সাহায্য করিয়াছে কি না, এই ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিচার করিবার সময় আজও আসে নাই। এই নবস্থাপিত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এত বড় যে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে দশ বৎসর কিছুই নয়। তবে লিগ্‌ অফ নেশনস্‌ এক বিষয়ে যে কৃতকার্য্য হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক মিঃ জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি "ইণ্টারন্যাশনাল থট" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, পৃথিবীকে যদি যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যে রাজ্যে, জাতিতে জাতিতে উদ্দেশ্যহীন প্রতিযোগিতা, সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠীর এই নিদারুণ গৃহবিরোধ হইতে মুক্তি দিতে হয়, তাহা হইলে চিত্তের মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা আনিতে হইবে; সাহিত্য, আর্ট ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেই সর্ব্ব-

প্রথমে এই বিশ্বজনীন মনোবৃত্তির চর্চ্চা করিতে হইবে। সাহিত্য, আর্ট ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র হইতে ক্রমে ক্রমে এই উদারতা রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করিবে। লিগ্ অফ নেশন্‌সের চেষ্টার ফলে এই সার্ব্বজনীন মনোভাবের ক্রমশঃই প্রসার হইতেছে ও অনেকেই অত্যুগ্র জাতীয়তার কুফল দেখিতে পাইতেছেন। অবশ্য এই ভাব চিরস্থায়ী হইতে অনেক সময় লাগিবে। রাজনীতিতে



অধ্যাপক গিলবার্ট মারে—ইণ্টারন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সভাপতি

ইহার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে শিক্ষা ও সাহিত্যেই ইহার প্রথম চর্চ্চা করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া লিগ্ অফ নেশন্‌স্ ও "ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্টেলেক্‌চুয়েল কো-অপারেশন" নামে একটি বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন।

এই প্রতিষ্ঠান প্যারিস নগরে অবস্থিত। ফরাসী গবর্ণমেণ্টই ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। ইহার অধ্যক্ষ ফরাসী ঐতিহাসিক মঁসিয় লুশের। পূর্ব্বে বিখ্যাত গণিতবিদ্ অধ্যাপক লরেন্‌টস্ ইহার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অক্সফোর্ডের গ্রীক-সাহিত্যের অধ্যাপক আচার্য্য গিলবার্ট মারে উহার সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাদাম কুরি ও মঁসিয় দেস্ত্রে উহার সহকারী সভাপতি।

ইণ্টার ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউটের কার্য্যাবলী এখন চারিভাগে বিভক্ত। (১) লেখক ও বৈজ্ঞানিকদের রচনা ও আবিষ্কারের সত্ত্বসংরক্ষণ (২) পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আদানপ্রদান ও সম্বন্ধস্থাপন; (৩) পুস্তকের তালিকা-সঙ্কলন ও (৪) পৃথিবীর সকল মিউজিয়মের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কারুশিল্পের প্রচার।

বৈজ্ঞানিকগণ জীবন উৎসর্গ করিয়া যে-সকল তথ্য আবিষ্কার করেন তাহার সুবিধা ভোগ করেন অনেক সময়েই অর্থশালী বণিকেরা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে শিল্প-বাণিজ্যে যে আর্থিক লাভ হয়, তাহার কিয়দংশ অন্ততঃ যাহাতে বৈজ্ঞানিকগণ পাইতে পারেন তাহার একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট কতকগুলি প্রস্তাব আনিয়াছেন। সেইগুলি শীঘ্রই লিগ্ অফ নেশন্‌স্ ও তাহার অন্তর্ভুক্ত গবর্ণমেণ্টসমূহদ্বারা গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত 'ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট' প্রতি বৎসর পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল ভাষায় সাহিত্যের দিক দিয়াই হউক কিম্বা গবেষণার দিক দিয়াই হউক যে-সকল মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত অক্টোবর মাসে প্রাগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনী বসিয়াছিল।

বার্ণার্ড শ'—

প্রাচীনকালে রাজাদের মনে কোন বিষয়ে কোন সন্দেহ জাগিলেই তাঁহারা ঋষিদের শরণাপন্ন হইতেন। ঋষিরাও তাঁহাদের যথোচিত উপদেশ দিতে বিমুখ হইতেন না। সংবাদপত্রের লেখকগণই বর্ত্তমান যুগের ঋষি। তাঁহাদের কাছেও যে-কোনও সন্দেহের, যে-কোনও সমস্যার সমাধান না পাইলেও সন্ধান পাওয়া যায়। সম্প্রতি একটি বিদেশী পত্রিকায় জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র যে কয়েকটি উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা শুধু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার অনেকগুলি দিকের নয়, বার্ণার্ড শ'রও চির-বার্ণার্ড-শত্বের পরিচয় পাই।

গত সেপ্টেম্বর মাসে লিগ্ অফ্ নেশন্‌সের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য বার্ণার্ড শ' যখন জেনিভায় যান, তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ তাঁহার নিকটে গিয়া "ইণ্টারভিউ" আদায় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের মত সংবাদপত্রের রিপোর্টার মারফৎ মনের কথা জগৎকে শুনাইলে বার্ণার্ড শ'র বিশেষত্ব কোথায় থাকে? তাই বার্ণার্ড শ' কাগজওয়ালাদিগকে নিকটে ঘেঁসিতে দেন নাই। অবশেষে 'আন্তর্জাতিক ছাত্রসঙ্ঘের' ছাত্রগণ তাঁহাকে একস্থানে চা খাইবার মিথ্যা নিমন্ত্রণ করিয়া কিছু শুনিয়া লয়।

তাঁহার নবপ্রকাশিত Intelligent Woman's Guide to Socialism নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়া একজন ছাত্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিল:—

Intelligent Woman মানে কি?

বার্ণার্ড শ' উত্তর করিলেন,"যে আমার Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism"—দাম পনর শিলিং—কিনিবে সেই Intelligent Woman."

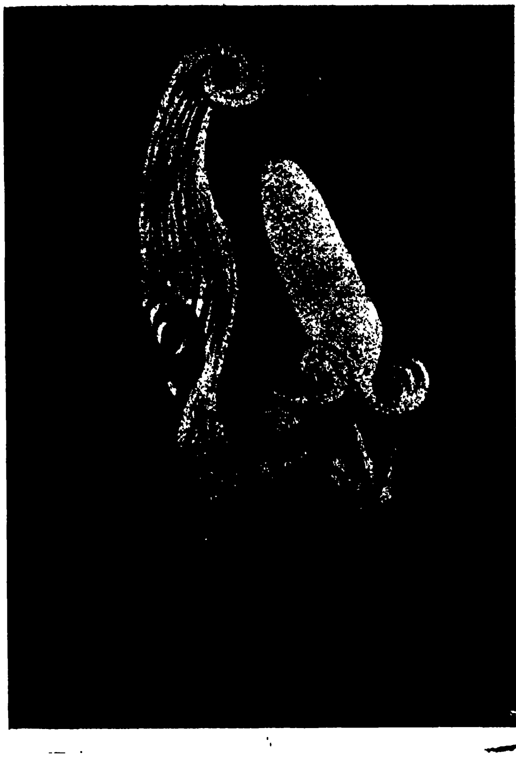
পুনরায় প্রশ্ন হইল—

"আপনি মানবজাতির প্রতি আস্থা হারাইয়াছেন, এ কথা কি সত্য?" শ' উত্তর করিলেন,—"আমার মানবজাতির প্রতি কোন দিন আস্থা ছিল একথা আপনাকে কে বলিল? মানবজাতি অবিরত পরিবর্ত্তনশীল। ইতিহাস বলে ছয় সাতটা মানব-সভ্যতা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সকলেই আমাদের মত সভ্যতার একটা সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, এবং রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ফলে মানুষ সকল জিনিষই ভাঙিয়া ফেলে বলিয়া লোপ পাইয়াছে। আমাদের সভ্যতাও কেন যে তাহাদের মত লোপ পাইবে না তাহার কোন কারণ ত আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। বরঞ্চ লক্ষণ দেখিয়া লোপ পাইবে বলিয়াই মনে হয়।"

ছাত্র—আমরা কি আমাদের সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য কিছুই করিতে পারি না ?

মিঃ শ'—কি করা যাইতে পারে এ সম্বন্ধে লিগ্ অফ্ নেশনস্ অনেক কথা বলিতেছে। আমিও আমার বইএ কিছু কিছু বলিয়াছি। কিন্তু লোকে লিগের কথা শুনে না, আমার বইও কিনে না। যাহা হউক বর্ত্তমান যুগের মানুষই ত সৃষ্টির চরম জিনিষ নয়। আমরা যদি লোপ পাই, তবে জীবনের স্রোতে আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল কোনও জীব আরও তাড়াতাড়ি সৃষ্ট হইবে এইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

দ্বিতীয় ছাত্র বার্ণার্ড শ'কে যে প্রশ্ন করে ও তাহার উত্তরে শ' যাহা বলেন তাহাতে এদেশে আমরা বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষার



বার্ণার্ড শ'র একটি ব্যঙ্গ-চিত্র

আবর্ত্তে পড়িয়া যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সমাধানেরও একটা ইঙ্গিত আছে।

ছাত্র—আইরিশ ও ওয়েল্‌শ্ জাতিদের কি নিজেদের ভাষা ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজী ধরা উচিত ?

শ'—আপনি বোধ করি ইংরেজ ?

ছাত্র—না আমি ওয়েল্‌শ্।

শ'—সে ত আরও খারাপ কথা। আমি ওয়েল্‌শ্ ভাষা বুঝিতে পারি না। লেখকের দিক হইতে এ ভাষায় বই লিখিয়া একেবারেই লাভ নাই এটুকু অন্ততঃ আমি জানি। ছোট ছোট দেশের লোক নিজেদের ভাষায় খুব ভাল বই লিখিয়াছেন, এ রকম অনেককে আমি জানি। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি করিয়া তাঁহাদের বইএর, সকলে পড়িতে পারে এ রকম কোন ভাষায়—ধরুন ইংরেজী কিম্বা আমেরিকান ভাষায়—অনুবাদ হয় সর্ব্বপ্রথম তাহারই চেষ্টা করেন। আইরিশ ভাষা ত একটা হাস্যকর ভাষা মাত্র। আইরিশরা ইংরেজদের চেয়েও ইংরেজী অনেক ভাল বলিতে পারে, তবুও যে তাহারা কেন ইংরেজী বলিতে চায় না তাহাই আমি বুঝিতে পারি না। আপনাদের মধ্যে পৃথিবীর কোন 'মাইনর' ভাষা মাতৃভাষা, এরকম দুর্ভাগ্য ব্যক্তি যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব একটা বহু প্রচলিত ভাষা শিখিয়া নে'ন—ইহাই তাঁহার কাছে আমার অনুরোধ।

তৃতীয় ছাত্র—লিগ্ অফ্ নেশনস্ সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি ?

শ'—দেখুন, আমি নাটক রচনা করি, ষ্টেজের বন্দোবস্তের দিকেই আমার বেশী নজর। একটা মঞ্চ হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক বক্তৃতা দেন তা' দেখি। কিন্তু তিনি কি বলিতেছেন তাহাতে কেহই বিন্দুমাত্র কাণও দেয় না। তাঁহাকে তাঁহার গভর্ণমেণ্ট যাহা বলিতে বলিয়াছে তিনি তাহাই মাত্র বলেন, ইহাই মন না দেওয়ার কারণ। সেদিন শুধু ব্রিঁয়া ভুল করিয়া কয়েকটা সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু নাটক-লেখক হিসাবে আমি চুপি চুপি আপনাদিগকে বলিতে পারি যে, মঞ্চের পিছনে পর্দ্দাটির ব্যবস্থা বড়ই চমৎকার। সেক্রেটারিয়াট্-এর মহিলা কর্ম্মচারীরা ইহাকে ঠিক কাজে লাগাইতে পারেন। একটা লম্বা বক্তৃতার শেষে নূতন পোষাক পরিয়া ইঁহাদের একজন পর্দ্দার আড়াল হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে যখন একধার হইতে আর এক ধারে গিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়েন, তখন শ্রোতার দল চমকিয়া জাগিয়া উঠে। বক্তাও এতক্ষণে তাঁহার বক্তৃতা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে ভাবিয়া খুব খুশী হইয়া উঠেন।

ইংলণ্ডের সমস্যা—

বিলাতে কয়েক মাসের মধ্যেই 'জেনারেল ইলেক্‌শন' হইবে। রক্ষণশীল, শ্রমিক ও উদারনৈতিক এই তিন দলই এই ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ও এইবারের নির্ব্বাচনে কোন্ পক্ষ জিতিবে এই বিষয়ে সংবাদপত্রে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। গত ইলেক্‌শনের পূর্ব্বেই জিনোভিএভের চিঠি প্রকাশিত হইবার ফলে রক্ষণশীল দল অপ্রত্যাশিতভাবে জিতিয়া গিয়াছিল। এবারে শ্রমিকদল না জিতিলেও আরও অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবে, এই অনুমান করা যায়। রক্ষণশীলদল এই চারি বৎসরে ইংলণ্ডের কতকগুলি গুরুতর সমস্যা-সমাধানে বিশেষ কোনও ফল দেখাইতে পারেন নাই। বেকার শ্রমজীবীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, বাণিজ্য ও শিল্পের অবস্থাও ভাল নয়। যদি এই কয়মাসে রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট এই অবস্থার কোনও প্রতিকার না করিতে পারে তাহা হইলে, পুনরায় তাহাদের হাতে ইংলণ্ডের শাসনভার ন্যস্ত হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অর্থনৈতিক সমস্যাই আজিকালিকার দিনে ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। শিল্প-বাণিজ্যের উপরই ইংলণ্ডের শক্তি ও সম্পদ প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধের পর হইতে এই শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। এই হ্রাস বিশেষ করিয়া কয়লা, লৌহ, রেল ও বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যবসায়গুলিতেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার



সাইমন কমিশন বয়কটের একটি মিছিলের দৃশ্য

ফলে ইংলণ্ডের অর্থক্ষতি ত হইতেছেই তাহার উপর আবার বহু শ্রমজীবীকে বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইতেছে।

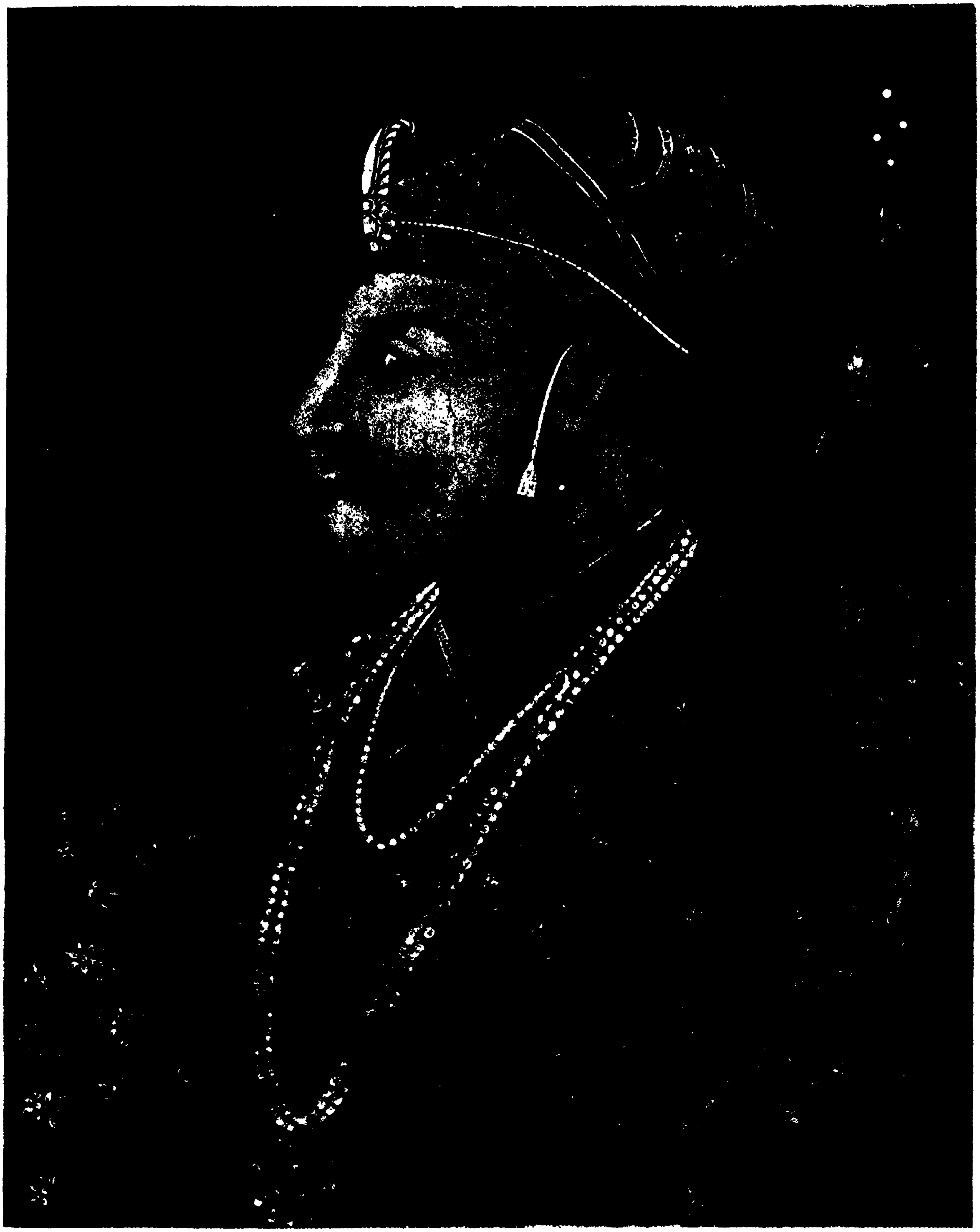
বলা বাহুল্য, তিনটি রাজনৈতিক দলই, জিতিলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বাড়াইবার ও শ্রমজীবীদের বেকার অবস্থা কমাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে বলিতেছে। তবে এই বিষয়ে তিন দলের মত তিন কেন, বহু। রক্ষণশীল দলের মধ্যে কেহ কেহ অর্থনীতিতে যাহাকে 'প্রটেক্‌শন' বলে সেই পথ অনুসরণ করিতে চান। ইঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান "হোম সেক্রেটারী" সার উইলিয়াম জয়নসন-হিক্‌স্ প্রধান। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য সকলে "প্রটেক্‌শনে"র পন্থা অবলম্বন করিতে সম্মত নহেন। ইংলণ্ডের লোক বাণিজ্যের অবাধ চলাচলের এত পক্ষপাতী যে, আমদানী-রপ্তানীর উপর শুল্ক বসাইতে গেলে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটিতে পারে। তাই রক্ষণশীল দল বিদেশী শিল্পের অন্যায় প্রতিযোগিতায় যে-সকল দেশীয় শিল্পের অনিষ্ট হইতেছে সেই শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য "সেফগার্ডিং অ্যাক্‌ট" অনুযায়ী বিদেশী আমদানীর উপর স্বল্পহারে শুল্ক বসাইতে চান। ইহা ছাড়া ট্যাক্স ও মাল পাঠাইবার ব্যয় হ্রাস করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিবারও প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রমিকদলের নেতা মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এইরূপ কোনও উপায়ে শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ কোনও উন্নতি হইবে বলিয়া মনে করেন না। তিনি সোশিয়ালিষ্ট মতবাদ অনুযায়ী বড় বড় শিল্পগুলিকে ক্রমে ক্রমে সরকারের অধীনে লইয়া যাইবার পক্ষপাতী। তিনি যে-সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। লিবারেল দলের নেতা মিঃ লয়েড জর্জ্জ কৃষিকার্য্যের বিস্তার করিলে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে করেন।

চিত্রপরিচয়

এই সংখ্যায় প্রকাশিত আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় চিত্রগুলি মেজর জেমস্ র‍্যাট্রে কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও তাঁহার রচিত আফগানিস্থান নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



রাজা টোডরমল্ল
প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৩৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শেষের কবিতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা :—

"শিলঙে কাল রাত্রে এসেচি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেচি আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারিনি। আজ এসেচি তোমার কাছে সেই কথাটি শোন্‌বার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাইনে। ভয় কোরো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।"

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ ক'রে ব'সে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হ'য়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েচে, বাড়তে দেয়নি, তার সেই কচি বেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার ক'রে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব্ব; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্ব্বলতা ব'লে মনে মনে ধিক্কার দিয়েচে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিল, অভিমান হোলো ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হ'তে পারত নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হ'য়ে উঠল;—সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্ত্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখ্‌লে, "তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাওনি; আজও তোমার যা দেবার জিনিষ তাই দিতে এসেচ কিছুই দাবী না ক'রে। চাইনে ব'লে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহঙ্কারও নেই।"

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েচে এমন সময় অমিত এসে বললে, "বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসিগে।"

অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল, ভেবেছিল লাবণ্য আজ হয় তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বল্‌লে "চলো।"

দুজনে বেরোলো। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধর্‌তে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধর্‌লে, তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এলো না। চল্‌তে চল্‌তে সেদিনকার সেই জায়গাতে এলো যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেইদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বল্‌লে, "একদিন একজনকে যে-আঙটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে আঙটি খোলালে কেন?"

অমিত ব্যথিত হ'য়ে বল্‌লে, "তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন ক'রে, বন্যা। সেদিন যাকে আঙটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?"

লাবণ্য বল্‌লে "তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।"

অমিত বল্‌লে, "কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে-আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।"

"কিন্তু, মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার ক'রে রাখ্‌লে না কেন? যে কারণেই হোক আগে তোমার মুঠো আল্‌গা হয়েছে তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েচে ওর উপরে, ওর মূর্ত্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েচে ব'লেই দশের মনের মতো ক'রে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হোতো না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকৃত। থাক্‌গে ওসব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখ্‌তে হবে।"

"বলো, নিশ্চয় রাখ্‌ব।"

"অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পারো ওকে আমোদ দিতে পারবে।"

অমিত একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "আচ্ছা।"

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বল্‌লে "একটা কথা তোমাকে বলি, মিতা, আর কোনোদিন বল্‌ব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ ক'রে বল্‌চিনে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বল্‌চি, আমাকে তুমি আঙটি দিয়ো না,

কোনো চিহ্ন রাখ্‌বার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন, বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়্‌বে না।”

এই ব’লে নিজের আঙুলের থেকে আঙটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেচে, তেম্‌নি নীরবে, তেম্‌নি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধর্‌লে অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি।

সেই য়ুক্যালিপ্‌টাস্ গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিক ক্ষণ ধ’রে শূন্য মনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম ক’রে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, ঘর খুলে দেবো কি? ভিতরে বস্‌বেন? অমিত একটু দ্বিধা ক’রে বল্‌লে, “হাঁ।”

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বস্‌বার ঘরে গেল। চৌকি, টেবিল, শেল্‌ফ্ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা; দুচারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব্, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোট পেন্সিল টেবিলের উপরে। পেন্সিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি,আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়্‌ল, লোহার খাটটা শব্দ ক’রে উঠ্‌ল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা! তাকে প্রশ্ন কর্‌লে কোনো কথাই বল্‌তে পারে না। সে একটা মূর্চ্ছা, যে মূর্চ্ছা কোনোদিনই আর ভাঙ্‌বে না।

তার পরে শরীর মনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন ক’রে অমিত গেল নিজের কুটীরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যাননি। বুঝ্‌লে, তিনি স্নেহ ক’রেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হ’ল যেন শুন্‌তে পেলে, শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান, বাছা। সেই চৌকির সাম্‌নে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম কর্‌লে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

১৭

শেষের কবিতা

কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশঙ্কর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চম্‌কিয়ে দেয়, মোটরে ক’রে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশঙ্কর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা ক’রে বলচে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠে পড়ে লেগেচে। কাজ পেয়েচে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্ত্তি গড়বার সখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে

আপন উপরকার রঙীন্ পাপ্‌ড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা ক'রে। অমিতর বোন্ লিসি না কি বল্‌চে, যে কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে না কি বড্ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্চে। বন্ধুদের সে ব'লে দিয়েচে তাকে কেতকী ব'লে ডাকতে; এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি পড়ত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা-শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে না কি নিভৃতে ডাকে "কেয়া" ব'লে। একথাও লোকে কানাকানি করচে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্চে রবিঠাকুরের "নিরুদ্দেশ যাত্রা।" কিন্তু লোকে কী না বলে! যতিশঙ্কর বুঝে নিলে অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝ দরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতী এ প্রসঙ্গ শোনেনি। অমিতর ব্যবহারেও অনেকখানি বদল ঘটেচে। পূর্ব্বের মতোই যতীকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না, যতী বুঝতে পারে আলোচনার ধারাটা এখন বইচে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতীকে ডাক পাড়ে না। যতীর বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে অমিতর "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতী আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অমিতদা, শুনলুম, মিস্ কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?"

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বল্‌লে, "লাবণ্য কি এ খবর জেনেচে?"

"না, আমি তাকে লিখিনি। তোমার মুখে পাকা খবর পাইনি ব'লে চুপ করে আছি।"

"খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয় তো বা ভুল বুঝবে।"

যতী হেসে বললে, "এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়? বিয়ে করো যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।"

"দেখো, যতী, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌সনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই মানব জীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।"

যতী বল্‌লে, "অর্থাৎ তুমি বল্‌চ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।"

"আমি বল্‌চি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।"

"তোমার বিশেষ মানেটাই বলো না।"

"সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বল্‌তে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহলেও আর একটা কথায় গিয়ে পড়ব, ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।"

"তাহলে অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে, আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড় এমন হলে তো কাজ চলে না।"

"ভায়া, মন্দ বলোনি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেচে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাৎ দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে

তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি ; উপায় কি ? তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হোক্ চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।"

"তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে ?"

"এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয় তাহলে খতম করতে দোষ নেই।"

"ধরে নাও না প্রাণের গরজেই।"

"সাবাস্, তবে শোনো।"

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতী আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান ক'রে আসচে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্নে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেচে।

অমিত বল্‌লে, "অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানাকাজে দরকার,—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পারচ ?"

"সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।"

"যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।"

"তোমার কথা ঠিক বুঝচি, কি, না, সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর একটু স্পষ্ট করে বলো অমিতদা।"

অমিত বল্‌লে, "একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।"

"কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না ?"

"জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে মানুষ অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো,—যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু তুমি যাকে মনে করো রোম্যান্স সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে না কি ? কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও র'য়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্ত্ত্যেও ঘটাব রোম্যান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটাকে দেউলে ক'রে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যান্টিক ! তা'রা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরম হংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে-স্থলেও উপলব্ধি করব আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক্ আমার লাবণ্যর, জয় হোক্ আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক্ অমিত রায়।"

যতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, "দেখ ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলচি, হয়তো সেটা আমারি কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে। আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে নইলে এসব কথার রূপ চ'লে যায়—কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যতী একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না ?"

"যার হয় তারই হয় আমার হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—"

"তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্চি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

"তা হোক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।"

"নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে ?"

"দেব।"

অমিতর এই চিঠি :—

সেদিন সন্ধেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষ মুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্ত্তীটা যেদিন ধরা পড়েচে সেইদিন মরেচে—অতি সৌখীন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারি কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে :—

তব অন্তর্দ্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি ;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি' গিয়েছ আপনি ॥

জীবন আঁধার হোলো, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হ'তে
পূজামূর্ত্তি ধরি' প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে ॥

মিতা

তার পরেও আরও কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরাম-কেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেম্‌সের পত্রাবলী পড়চে। এমন সময় যতিশঙ্কর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ'মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্ব্বতের শিখরে। অপর পাতে—

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।

ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি' তার জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হ'তে বহু দূরে।
মনে হয় সহস্র মৃত্যুরে
পার হ'য়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হ'তে যদি দেখ চাহি'
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

কোনোদিন কর্ম্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হ'তে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয় তো দিবে সে জ্যোতি,
হয় তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।

তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাকো, তাহারি আরতি
হোক্ তব সন্ধ্যাবেলা
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে
তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাব-রসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয় তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

মোর লাগি' করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।

উৎকণ্ঠ আমার লাগি' কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হ'তে আনি'
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তা'র
পেয়েছি নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হ'তে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্য্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায় ॥

বন্যা

ব্যাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর
২৫ জুন, ১৯২৮

সমাপ্ত

রামমোহন রায়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের জীবনে যে-সব লাভ পরম লাভ মাঝে মাঝে তাই উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের উৎসবের দিন। সেদিন যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, যা আমাদের সত্য, যা আমাদের গৌরবের, তারই জন্যে আসন প্রস্তুত হয়, অন্তরের আলো বড়ো করে জাগাই, যা আমাদের চিরন্তন সেদিন তাকে ভালো করে দেখে নেবার জন্যে আমরা মিলি।

পশুপাখীদেরও প্রাণের ঐশ্বর্য্য আছে। সে তাদের প্রাণশক্তিরই বিশেষ বিকাশ। পাখী উড়তে পারে, এ তার একটি সম্পদ। মাঝে মাঝে এই সম্পদকে সে উপলব্ধি করতে চায়, মাঝে মাঝে সে ওড়ে, কোন প্রয়োজনে নয়, ওড়বারই জন্যে; সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, আমি পেয়েছি। এই তার উৎসব। বুনো ঘোড়া খোলা মাঠে এক এক সময় খুব করে দৌড়ে নেয়,—কোন কারণ নেই। সে নিজেকে বলে, আমার গতিবেগ আমার সম্পদ; আমি পেয়েছি। এই উৎসাহ ঘোষণা করেই তার উৎসব। ময়ূর এক একবার আপন মনে তার পুচ্ছ বিস্তার করে, আপন পুচ্ছ-শোভার প্রাচুর্য্য-গৌরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে, আপন অস্তিত্বের ঐশ্বর্য্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সে অনুভব করে যে জীবলোকে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে। সেও বলে, আমি পেয়েছি।

কিন্তু মানুষের উৎসব তার প্রাণ-সম্পদের চেয়ে বেশী কিছু নিয়ে। যা সে সহজে পেয়েছে তাতে সে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, যা সে সাধনা করে পেয়েছে তাতেই সে মানুষ। সে আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি যখন সৃষ্টি করে তখনই সে আপনাকে সত্য করে পায়। তখনই সে বলে, আমি পেয়েছি। তার আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ।

যা খুশী তাই বানিয়ে তোলা মাত্রকেই সৃষ্টি বলে না। কোন বিশ্বসত্যকে লাভ করার যোগে প্রকাশ, ও প্রকাশ করার যোগে লাভ করাকেই বলে সৃষ্টি। সুতরাং সে কারো একলা নয়। পশু-পক্ষীর যে উৎসবের কথা পূর্ব্বে বলেছি সে তাদের একলার, মানুষের উৎসব সকলকে নিয়ে। লক্ষপতি তার ব্যবসায়ে মস্ত লাভ করতে পারে,—তা নিয়ে সে ঘটা করে ভোজ দিতেও পারে, কিন্তু সেইখানেই সেটা ফুরাল, মানুষের উৎসবলোকে সে স্থান পেল না। সে আপন লাভকে অতি সতর্কতা ও কৃপণতার সঙ্গে লোহার সিন্দুকের মধ্যে বন্দী করে রাখে, তারপরে একদিন সে অতি কঠিন পাহারার ভিতর থেকেও শূন্যে অন্তর্ধান করে। সে নিজে সৃষ্টি নয় বলেই উৎসব সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি মানে উৎসৃষ্টি, যা সকল ব্যয়কে অতিক্রম করে দানরূপে থেকে যায়।

চিরকালের ঐশ্বর্য্য যখন তার কাছে প্রকাশ পায় তখন মানুষ বড়ো করে বল্‌তে চায় "আমি পেয়েছি"। একথা সে বল্‌তে চায় সকল দেশকে, সকল কালকে, কেন না পাওয়া তার একলার নয়। ঋষি একদিন বিশ্বকে বলেছিলেন, পেয়েছি, জেনেছি। বেদাহং। ঋষি সেই সঙ্গেই বলেছেন, আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পাওয়া—শৃণ্বন্তু বিশ্বে। এই বাণীই উৎসবের বাণী। মানুষের উৎসবে চিরন্তন কালের আনন্দ ও আহ্বান।

ঘরে যখন কোনো শুভ ঘটনা ঘটে, যেমন সন্তানের জন্ম বা বিবাহ, সেটাতেও আমাদের দেশের মানুষ সকলকে ডাকে, বলে, "আমার আনন্দে তোমরাও আনন্দ কর। আমার গৃহের উৎসব যখন বাইরে গিয়ে পৌঁছবে তখনই তা সম্পূর্ণ হবে।" বস্তুতঃ মানুষের ব্যক্তিগত শুভ ঘটনা, যা মানব সম্বন্ধের কোনো একটি বিশেষ রূপকে প্রকাশ করে যেমন জননীর সন্তান লাভ বা নর-নারীর প্রেম সম্মিলন, তাও একান্ত ব্যক্তিগত নয়, নবজাত শিশু বা নবদম্পতি শুধু মাত্র ঘরের না, তারা

সমস্ত সমাজের। এইজন্তে গৃহের উৎসবকে সর্ব্বজনের উৎসব যখন করি তখনই তা সার্থক হয়।

আজকের উৎসবের বাণী হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানবের হয়ে আমরা একটি ব্রত লাভ করেছি, ব্রতপতি আমাদের এই ব্রতকে সার্থক করুন। এ আমাদের মিলনের ব্রত। একটি মহৎ জীবনের ভিতর থেকে এই ব্রত উদ্ভাবিত, একজন মহামানব এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আমরা যেন একে গ্রহণ করি।

মানুষ তার যে জীবনকে সহজে পেয়েছে সেই জীবনকে সৃষ্টি করার দ্বারা বিশিষ্টতা দিলে তবেই তাকে যথার্থ করে পায়। তা করতে গেলেই কোনো একটি বড়ো সত্যকে আপন জীবনের কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করা চাই। সেই কেন্দ্রস্থিত ধ্রুব সত্যের সঙ্গে আপন চিন্তাকে কর্ম্মকে আপন দিনগুলিকে সংযুক্ত করে জীবনকে সুসংযত ঐক্য দিতে পারলে তবেই তাকে বলে সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কেন্দ্রটি না পেলে তার দিনগুলি হয় বিচ্ছিন্ন, তার কর্ম্মগুলির মধ্যে কোনো নিত্যকালের তাৎপর্য্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে স্তূপাকার হয়ে থাকে, রূপ পায় না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিশ্বসৃষ্টির যজ্ঞে যা কিছু থাকে অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত, যা কিছু রূপ না পায় তাই হয় বর্জ্জিত। একেই বলে বিনষ্টি। যাঁরা আপনার মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা পেয়েছেন, যাঁরা নিজের জীবনের মধ্যে সত্যকে বাস্তব করে তুলেছেন তাকে রূপ দিতে পেরেছেন, অমৃতাস্তে ভবন্তি।

অধিকাংশ মানুষ বিষয়লাভের উদ্দেশ্যকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ উদ্যম এই এক উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতেও জীবনকে ব্যর্থ করে, তার কারণ এই যে মানুষ মহৎ, যতটুকু তার নিজের পোষণের জন্ম, যতটুকু কেবল তার অদ্যতন, তাতে তার সমস্তটাকে ধরে না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্তে মানুষ দুটি শব্দ সৃষ্টি করেছে, অহং আর আত্মা। অহং মানুষের সেই সত্তা যার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন চিরকালের থেকে ক্ষণিকতার মধ্যে, সর্ব্বলোকের থেকে এককের মধ্যে তাকে পৃথক করে রেখেছে। আর আত্মার মধ্যে তার সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন সত্তা। সমস্ত জীবন দিয়ে যদি মানুষ অহংকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায় না, তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেন না সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন প্রদীপের পক্ষে আলোকে পাওয়া। মানুষের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি ও আত্মাকে দান করা একই কথা। আপনার সৃষ্টিতে মানুষ আপনাকে পায় এবং আপনাকে দেয়। এই দান করার দ্বারাই সে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বজনের মধ্যে নিত্য হয়।

আমাদের মধ্যে বিচিত্র অসংলগ্ন ও পরস্পর-বিরুদ্ধ কত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলি প্রাকৃতিক; মাটি যেমন, শিলাখণ্ড যেমন প্রাকৃতিক। এরা সৃষ্টির উপকরণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সঙ্কল্পের বলে যখন একটি সম্পূর্ণ মূর্ত্তি উদ্ভাবিত করে, তখনই মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অর্পণ করে। বাঘের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে, তার হিংস্রতা তার জীবনযাত্রার উপযোগী, এইজন্ম তার মধ্যে ভালোমন্দর মূল্য ভেদ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব অস্তিত্বরক্ষায় মানুষের সম্পূর্ণতা নয়; বহুযুগের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে সৃষ্টি করে তুলছে,—সেই তার মনুষ্যত্ব। এই তার আপন সৃষ্টির পক্ষে তার প্রকৃতিগত যে উপাদান অনুকূল তাই ভালো, যা প্রতিকূল তাই রিপু। এইজন্তে মানুষের জীবনের মাঝখানে এমন একটি মূল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা বিরুদ্ধতাকে সমন্বয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ঐক্য দান করতে পারে। তবেই সে আপনার পরিপূর্ণ চিরন্তন সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া। না পাওয়া মহতী বিনষ্টি। অর্থাৎ যে বিনাশ তার দৈহিক জীবনের অভাবের বিনাশ সে নয়, তার চেয়েও বেশী; যা তার অমৃত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনাশ, তাই।

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্ব্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্ব্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে

সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য দিতে পারে,—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি; সে এমন কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না, যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড় সৃষ্টি। সেই জন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হ'তেই যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হ'তে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য,এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের মূলে মানবজাতি এমন কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ভক্তি জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা বলে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন, অথচ তার অন্তরের মধ্যে পরস্পর যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ করছে তা পরম রহস্যময় তা অনির্ব্বচনীয়। তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদূরে অতিক্রম করে চলে।

বিশেষ বিশেষ উপজাতি আপনাদের ঐক্যবন্ধনের গোড়ায় যে দেবতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেবতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ঐক্য বিস্তার করলেও অন্য সমাজের বিরুদ্ধে ভেদবুদ্ধিকে একান্ত উগ্র করে তোলে। ধর্ম্মের ঐক্যতত্ত্বকে সঙ্কীর্ণ সীমায় স্থানিক রূপ দেবামাত্রই তা বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছেদের সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিভীষিকা অনেক আছে, ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মারী, কিন্তু মানুষের ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যায় ধর্ম্মের বিভীষিকার সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। সর্ব্বমানবের অন্তরতম যে গভীর ঐক্য মানুষের ধর্ম্মই তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু ছিল, এবং সেই শত্রুতা যে আজো ঘুচে গেছে তা বলতে পারি নে।

তাই যুগে যুগে যাঁরা সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁদের সাধনা এই যে, দেবতার সম্বন্ধে মানুষের যে বোধ স্থানে, রূপে ও ভাবে খণ্ডিত তাকে অখণ্ড করা; সাম্প্রদায়িক কৃপণতা যে ধর্ম্মকে আপন আপন বিশেষ বিশ্বাস, বিধি ও ব্যবহারের দ্বারা বদ্ধ করেছে তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সর্ব্বমানবের পূজা-বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা। যখনই তা ঘটে তখনই সেই ধর্ম্মের উৎসবে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়, সেই উৎসব-ক্ষেত্র কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না। তখন ধর্ম্ম-বোধের সঙ্গে যে অবাধ ঐক্যতত্ত্ব একাত্ম তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইতিহাসে দেখা গেছে, একদা য়িহুদিরা তাঁদের ঈশ্বরকে তাঁদের জাতিগত অধিকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে রেখেছিলেন; তাঁদের ধর্ম্ম তাঁদের দেবতার প্রসাদকে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে একান্ত পুঞ্জিত করে রাখবার ভাণ্ডার-ঘরের মত ছিল। সেই দেবতার নামে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করাকে নিজ দেবতার পূজার অঙ্গ ব'লেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের দেবতাকে হিংস্র, বিদ্বেষ-পরায়ণ, রক্তপিপাসুরূপে ধ্যান করাই তাঁদের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। সেদিন তাঁদের ধর্ম্মোৎসব তাঁদেরই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিল সঙ্কুচিত, সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই শুধু যে ছিল অনাহূত তা নয়, তারা শত্রু বলেই গণ্য হইত।

যিশু এলেন ধর্ম্মকে মুক্তি দিতে। ঈশ্বরকে তিনি সর্ব্বমানবের পিতা বলে ঘোষণা করলেন,—ধর্ম্মে সকল মানুষের সমান অধিকার, ঈশ্বরে মানুষের পরম ঐক্য এই সাধন-মন্ত্র যখন তিনি মানুষকে দান করলেন তখন এই সাধনার সম্পদ সকল মানুষের উৎসবের যোগ্য হল।

যিশুর শিষ্যেরা এই মন্ত্র সকলেই সত্যভাবে গ্রহণ করেছে এমন কথা বলতে পারি নে। মুখে যাই বলুক, পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মবুদ্ধি মোটের উপর ওল্ড টেষ্টামেণ্টের ভাবেই সংঘটিত। এইজন্য যুদ্ধবিগ্রহের সময় তারা ঈশ্বরকে নিজেদের দলভুক্ত বলেই গণ্য করে, যুদ্ধে প্রতিকূল পক্ষ বিনষ্ট হলে তাতে তারা ঈশ্বরের পক্ষপাত কল্পনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের নামে যে য়ুরোপে হিংস্রতা বহু শতাব্দী ধরে প্রশ্রয় পেয়েছে—শুধু তাই নয় যখন তারা যিশুর বাণীর প্রতিধ্বনি ক'রে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের কথা বলে তখন সেই সঙ্গেই নিজেদের রাজার জন্যে দেশের জন্যে

ঈশ্বরের কৃপায় সকল প্রকার উপায়ে মর্ত্ত্যরাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই জয়ী করতে চেষ্টা করে। এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাদের ধর্ম্মযাজকেরা যত বিদ্বেষের উত্তেজনার অনুমোদন করেছে এমন সৈনিকেরাও নয়।

এর কারণ বাইবেলে যে অংশে ঈশ্বর রাগদ্বেষচালিত দলপতিরূপে কল্পিত ও বর্ণিত সেই অংশই তাদের নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায় হয়ে তাদের অহমিকা ও পরজাতিবিদ্বেষকে বল দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্বেও খৃষ্টের বাণী যে কাজ করছে না তা হ'তেই পারে না। তার কাজ গূঢ়, গভীর। বস্তুত আমাদের স্বাভাবিক অহঙ্কার দেবতাকে ক্ষুদ্র ক'রে আমাদের শুভবুদ্ধিকে খণ্ডিত করে বলেই পরম সত্যের অদ্বৈতরূপ উপলব্ধির জন্যে আমাদের আত্মার এত গভীর প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্চে অনৈক্য-বোধ থেকে মুক্তি। রিপুমাত্রই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ ঘটায়, কেন না ভেদ আমাদের অহং-এর মধ্যে, এবং আমাদের রিপুগুলি এই অহং-এরই অনুচর। তারা আত্মাকে অবরুদ্ধ করে। সাধকেরা যখন ঐক্যের বিশ্বক্ষেত্রে আত্মাকে মুক্তি দান করেন তখনই তার আনন্দকে তার উৎসবকে সর্ব্বদেশে কালে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন মুসলমান বাহির থেকে এল তখন সেই সংঘাতে দুই ধর্ম্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্ম্মের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করেনি, তাকে শতধা বিভক্ত ক'রে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম্ম আপন সম্প্রদায়কে এক-করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ নির্দ্দয়-ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতর ঐক্যকে উপলব্ধি করেনি। বাইরের দিক থেকে আঘাত ক'রে মুসলমান মানুষের বাহ্যরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্ম্মের বাহ্যরূপের বেড়াকে বহু-গুণিত করে হিন্দু মানুষে মানুষে যে বাহ্যভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্ম্মের স্বাক্ষর দিয়ে তাকে নানা বিধি-বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই দুইপক্ষে ধর্ম্মবিরোধের অন্ত ছিল না,—আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।

সেদিন ভারতে যে-সব সাধক জন্মেছিলেন তাঁরা ভেদ-বুদ্ধির নিদারুণ প্রকাশ দেখেছেন। তাই মানুষের চিরকালীন সমস্যার সমন্বয় করবার জন্যে তাঁদের সমস্ত মন জেগেছিল,—এই সমস্যা হচ্চে, ধর্ম্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু স্থাপন করা। সে কেমন করে হ'তে পারে? না,—সকল ধর্ম্মের বাহিরে দেশ কালের আবর্জ্জনা জমে উঠে তার সাম্প্রদায়িক রূপকে কঠিন করে তোলে, সেদিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়,—আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধা নেই। এক কথায় অবিদ্যার মধ্যেই বাধা, অজ্ঞানের বাধা। যেখানে কোন এক শাস্ত্রে বলে বাসুকীর মাথার উপরে পৃথিবী স্থাপিত সেখানে আর এক শাস্ত্র বলে দৈত্যের কাঁধের উপর পৃথিবী স্থাপিত,—এই মত ভেদ নিয়ে আমরা যদি খুনোখুনি করি তবে সেই অজ্ঞানের লড়াই বাইরের দিক থেকে কিছুতেই মিটতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিরোধ মেটে এইজন্যে যে, সেখানে বিশ্বাসের যে আদর্শ সে বিশ্বজনীন বুদ্ধি, সে প্রথাগত বিশ্বাস নয়, লোক-মুখের কথা নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে,—সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে নেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঐক্যসাধক ঋষিরা সকল ধর্ম্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম্ম আছে, তাকেই ভেদবোধপীড়িত মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সাময়িক ইতিহাসের; আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আনে। দাদু কবির নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ করে এক পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সমন্বয়।

এই বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়োজন ভারতে যেমন এমন আর কোথাও নয়। এই ভারত-ইতিহাসে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল নাম তাঁদেরই যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ শান্তি করতে চেয়েছেন। তাঁদের যে গৌরব সে রাষ্ট্রনীতির কূটবুদ্ধির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ সাধনার। এদেশে বড় বড় যোদ্ধা ও সম্রাটের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিক বহু অন্বেষণে কালের আবর্জনাস্তূপের মধ্য থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার করে আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহ্যিকতার আবরণ দূর করে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে সর্ব্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন তাঁরা একদা সর্ব্বজনের কাছে যতই আঘাত ও প্রত্যাখ্যান পেয়ে থাকুন দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে লুপ্ত হতে চায় না। এঁরা অনেকেই ছিলেন অবিদ্বান অন্ত্যজ জাতীয়, কিন্তু এঁদের সম্মান সর্ব্বকালের; এঁরা ভারতের সবচেয়ে বড়ো অভাব মেটাবার সাধনা করেছেন,—এবং ভেবে দেখতে গেলে সেই অভাব সমস্ত মানুষের।

আধুনিক ভারতে সেই সাধনার ধারা বহন করে এনেছেন রামমোহন রায়। তিনি যখন এলেন তখন সমস্যা আরো জটিলতর, তখন প্রবল রাজশক্তির হাত ধরে খৃষ্টান-ধর্ম্মও এই ধর্ম্মভার-বিদীর্ণ দেশে এসে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্ম্মের সর্ব্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানবলোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য; মানুষের পরমসত্য হচ্চে মানুষ এক, এই সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। রামমোহন আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছিলেন এবং আত্মার যোগে সকল মানুষকে ধর্ম্মসম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীনতম সাধকরাও এই ঐক্যের বাণী চিরকালের মতো আমাদের দান করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, শান্তং শিবমদ্বৈতং—যিনি অদ্বৈত যিনি এক তাঁর মধ্যেই মানুষের শান্তি, তাঁর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ। এই বাণী অনেক কাল ভারতে সাম্প্রদায়িক কোলাহলে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল। তিনি তাকেই তাঁর জীবনে তাঁর কর্ম্মে ধ্বনিত করে তুললেন। আজ প্রায় একশো বছর হোলো তিনি এই একের মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন। যে ইচ্ছা ভারতবর্ষের গূঢ়তম ইচ্ছা, সেই তার চিরকালের ইচ্ছার সঙ্গে আজকের দিনের যোগ আছে। ভারতের সেই ইচ্ছাই একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের এক বরপুত্রের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এইদিনেই তাকে তিনি সফলতার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃত লাভ করেছেন প্রতিকূলতার সাময়িক কুহেলিকায় তাঁদের দীপ্তিকে গ্রাস করতে পারবে না। তাই যাঁদের মনে শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা ভারতের সনাতন ঐক্যবাণীর একটি উৎস-মুখ বলেই আজকের এইদিনের পবিত্রতাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং রামমোহনের মধ্যে যে প্রার্থনা ছিল সেই প্রার্থনাকে কায়মনোবাক্যে উচ্চারিত করবেন যে, ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতা থেকে, জড়বুদ্ধি থেকে, বহিরন্তরের দাসত্ব-দশা থেকে, মুক্তিলাভ করুক্—য একঃ—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।*

* শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ব্যাখ্যাত।

গীতার ভক্তি-তত্ত্ব

মহেশচন্দ্র ঘোষ

'ভক্তি' শব্দ প্রধানতঃ ধর্ম্ম-জগতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য স্থলেও আমরা ভক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি—যেমন রাজভক্তি, প্রভুভক্তি ইত্যাদি। এই সমুদায় স্থলে 'সম্মান করা' 'সেবা করা' ইত্যাদি অর্থে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বর-ভক্তিরও মৌলিক ভাব ইহাই। ঈশ্বর অনন্ত ক্ষমতাশালী, তিনি সবই করিতে পারেন, মানবের সুখদুঃখ তাঁহারই হস্তে। তিনিই একমাত্র কল্যাণদাতা; সুতরাং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা ও সম্মান করা এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা স্বাভাবিক। এই শ্রদ্ধা বা ভক্তি ভয়মিশ্রিত। সমুদায় আদিম ধর্ম্মের মূলেই ভয়।

উপাস্য—উপাসক

উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ ভক্তির প্রকৃতিকে নিয়মিত করে। মাতাপিতার প্রতি যে ভক্তি, রাজা ও প্রভুর প্রতি ভক্তি সে প্রকার নহে। রাজা ও প্রভুর প্রতি যে ভক্তি তাহা প্রধানতঃ ভয়মূলক; মাতা ও পিতার প্রতি যে ভক্তি তাহার মধ্যে ভয় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ প্রীতিমূলক। আর যিনি সখা সুহৃদ্ এবং প্রাণের প্রাণ, তাঁহার প্রতি যে প্রীতি, তাহা বিশুদ্ধ প্রীতি।

গীতার ঈশ্বর

গীতাতে ঈশ্বরকে নানাভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। একদিকে তিনি রুদ্র মূর্ত্তি (১১।২৩-৩০), সংহর্ত্তা (৯।১৮, ১১।৩২, ১৩।১৭) এবং প্রভু (১১।৪, ১৪।২১, ৫।১৪); অপরদিকে তিনি পিতামাতা, সখা ও সুহৃৎ (১১।৪৪, ৪।৩, ৯।১৭, ১৮ ইত্যাদি)। রুদ্রকে আমরা ভক্তি করিতে পারি না, কিন্তু মাতাপিতা সখা সুহৃৎকে কি প্রাণের অনুরাগ না দিয়া থাকিতে পারি? অর্জ্জুন কৃষ্ণের সখা, অথচ অর্জ্জুনকে কৃষ্ণের ভক্ত বলা হইয়াছে (৪।৩)। কিন্তু পার্থিব সখ্য ও সৌহার্দ্যকে সাধারণতঃ ভক্তি বলা হয় না। স্রষ্টা, পাতা, ধাতা, প্রভু, শরণ, পিতা, মাতার প্রতি যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। গীতাতে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই প্রকার অনুরাগ।

সহজ পথ

গীতাতে ভক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা পথ, কিন্তু ইহাই একমাত্র পথ নহে। আরও পথ আছে; কিন্তু ভক্তির পথ সহজ। দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ—এই দুইটির তুলনা করা হইয়াছে। ১১শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন কোন্ শ্রেণীর সাধক ঈশ্বরকে লাভ করে (১১।৫৫)। ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই প্রকারে সততযুক্ত হইয়া যে ভক্তগণ তোমার উপাসনা করে, আর যাহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে কাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগবিৎ?" ১২।১

এস্থলে দুই শ্রেণীর সাধকের কথা বলা হইল। এক শ্রেণীর সাধক 'ভক্ত'; অন্য শ্রেণীর সাধক জ্ঞানপথাবলম্বী এবং অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক। এই দুই শ্রেণীর সাধকগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, অর্জ্জুন তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে ভগবান বলিলেন—

"আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া, পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহারা যুক্ততম আমি (এইরূপ) মনে করি।" ১২।২

"কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া, সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষরকে পর্য্যুপাসনা করে (অর্থাৎ ধ্যান করে), তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" ১২।৩,৪

"সেই অব্যক্তাসক্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়; কারণ দেহিগণ অব্যক্তা গতি দুঃখেই প্রাপ্ত হয়।" ১২।৫

"কিন্তু যাহারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্ত-যোগ দ্বারা ধ্যান করিয়া আমাকে উপাসনা করে, আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সমুদয় ব্যক্তিকে আমি মৃত্যু-সাগর হইতে অচিরাৎ উদ্ধার করি।" ১২।৬,৭

এই কয়েকটি শ্লোকে বলা হইল যে, জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিলেও মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু এ পথ অত্যন্ত কঠিন। ভক্তিদ্বারা ভগবানের উপাসনা করিলেই মুক্তিলাভ সহজ হয়।

ভক্তি ও প্রাপ্তি

ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, এ প্রকার উক্তি আরও অনেক আছে।

(ক)

"হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে অনন্যাভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।" ৮।২২

যে ভক্তি অন্য কাহারও দিকে ধাবিত হয় না, তাহাই অনন্যাভক্তি।

নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক ভগবানের উক্তি।

(খ)

যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে সেবা করে, সে এই গুণ-সকল সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম ভাবের যোগ্য হয় (অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভের উপযুক্ত হয়)। ১৪।২৬

যে ভক্তির ব্যভিচার নাই অর্থাৎ অন্য কাহারও দিকে গতি নাই, তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি।

(গ)

"হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরম, মদ্ভক্ত সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে নির্বৈর, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" ১১।৫৫

(ঘ)

"তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমারই উপাসক হও এবং আমাকেই নমস্কার কর; (তাহা হইলে) আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" ১৮।৬৫

এই সমুদায় স্থলে বলা হইল—ভগবদ্ভক্ত ভগবান্‌কে প্রাপ্ত করে।

জ্ঞান ও ভক্তি

অবিমিশ্রা ভক্তি বলিয়া কোন অবস্থা নাই। ইহার সঙ্গে জ্ঞান অল্প বা অধিক কিছু থাকিবেই থাকিবে। উপাস্য দেবতার বিষয়ে যদি কিছুই না জানা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রীতি করা অসম্ভব। তিনি কে, তাঁহার প্রকৃতি কি, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি, এ সমুদায় কিছু না জানিলে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই আসিতে পারে না। এ জ্ঞান অধিক না হইতে পারে, কিন্তু সামান্য কিছুও থাকা আবশ্যক। কুকুর কাহারও প্রতি অনুরক্ত, কাহারও প্রতি বিরক্ত। এ প্রকার হয় কেন? সে জানে কে মিত্র, এবং কে শত্রু; মিত্রের প্রতি তাহার ভক্তি, শত্রুর প্রতি বিরক্তি। ধর্ম্মজগতেও ইহাই সত্য। ধর্ম্মপথেও জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। গীতাকারও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

(ক)

একস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পার্থ! দৈব প্রকৃতি সমাশ্রিত মহাত্মগণ অনন্যচেতা হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অব্যয়রূপে জানিয়া ভজনা করে।" ৯।১৩

প্রথমে এই জ্ঞান হয় যে, উপাস্য দেবতা সর্ব্বভূতের কারণ ও অব্যয়; ইহার পরে তাঁহার ভজনা।

(খ)

"যে এইরূপে অসংমূঢ় হইয়া (অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া) আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সেই সর্ব্ববিৎ সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করে।" ১৫।১৯

এস্থলেও বলা হইল প্রথমে ঈশ্বর-বিষয়ে জ্ঞান, তাহার পরে তাঁহাকে ভজনা।

(গ)

ভগবানের আর একটি উক্তি এই—"আমি সমুদায়ের উৎপত্তি-হেতু এবং আমা হইতেই সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়,—ইহা জানিয়া বুধগণ ভাবসমন্বিত হইয়া আমার ভজনা করে।" ১০।৮

এস্থলেও জ্ঞানের পরে ভজনা।

ভক্তি ও জ্ঞান

একদিকে যেমন ইহা সত্য যে, জ্ঞান না থাকিলে ভক্তি হয় না, অপর দিকে ইহাও সত্য যে, ভক্তি ভিন্ন সম্যক্ জ্ঞান লাভ অসম্ভব। যাহাকে আমরা প্রীতি করি না, তাহার বিষয় জানিবার জন্ম আমাদের স্পৃহাও হয় না। গীতাকার সাধারণ ভাবে ত বলিয়াছেনই যে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' (৪।৩৯)—'শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করে'; তিনি বিশেষ ভাবেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

(ক)

একস্থলে ভগবান্ এইরূপ বলিতেছেন—

"হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যভক্তি দ্বারা এবংবিধ আমাকে তত্ত্বতঃ জানা যায়, দর্শন করা যায়, এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়।" ১১।৫৪

এস্থলে বলা হইতেছে যে, প্রথমে ভক্তি, তাহার পরে জ্ঞান, ও দর্শন এবং ঈশ্বরে প্রবেশ।

(খ)

একস্থলে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিষয়ে বর্ণনা করিয়া ভগবান্ এইরূপ বলিতেছেন—

"আমার ভক্ত এই প্রকার জানিয়া আমার ভাবপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।" ১৩।১৯ (বা ১৩।১৮)।

এস্থলে বলা হইল ভক্তই জানিতে পারে। সে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে, তাহার পরে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

(গ)

আর একস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন—

"যাহারা সততযুক্ত; এবং আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ (অর্থাৎ জ্ঞানযোগ) অর্পণ করি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করে।" ১০।১০

এস্থলে বলা হইল যাহারা ভজনা করে, অর্থাৎ যাহারা ভক্ত, তাহারা বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করে এবং সেই জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মলাভ করে।

(ঘ)

একস্থলে ভগবান্ এরূপ বলিতেছেন—

"ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা শোকও করে না, আকাঙ্ক্ষাও করে না। সে সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করে।" ১৮।৫৪

"আমি যে প্রকার ও যৎ-স্বরূপ, তাহা সে ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ জানে; আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাহার পরে আমাতে প্রবেশ করে।" ১৮।৫৫

প্রথম শ্লোকে (১৮।৫৪) ভক্তিলাভের কথা বলা হইল। যে উপায়ে পরাভক্তি লাভ হয়, সে উপায় জ্ঞান। সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া জ্ঞানমার্গের কথা। যে-ব্যক্তি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ও সমদর্শী হইয়াছে, সে-ব্যক্তি পরাভক্তি লাভ করে। ইহার পরের শ্লোকে বলা হইল, এই প্রকার ভক্ত ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে। তাহার পরে ঐ শ্লোকেই বলা হইল এই প্রকার জ্ঞানী ভগবানে প্রবেশ করে। এস্থলে আমরা চারিটি ক্রম দেখিতেছি (১) জ্ঞানসাধন (২) ভক্তিলাভ (৩) তত্ত্বজ্ঞানলাভ (৪) ব্রহ্মে প্রবেশ অর্থাৎ মুক্তি।

দুই প্রকার আদর্শ

ভক্তি-জগতে দুই শ্রেণীর ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর আদর্শ ভক্তির উচ্ছ্বাস, ভক্তির তরঙ্গ। ইহা-দিগের মতে ভক্তির আটটি সাত্ত্বিক ভাব। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু নামক গ্রন্থে (দক্ষিণ, ৩৭) এই প্রকার লিখিত আছে—

"স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ (স্বর-বিকৃতি), কম্প, বৈবর্ণ্য (বর্ণ-বিকৃতি), অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব।"

ঐ গ্রন্থেরই অপর একস্থলে (দক্ষিণ, ২।২) লিখিত আছে যে, ভক্তগণের জীবনে 'অনুভাব' নামক কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণ কয়েকটি এই—

'নৃত্য, বিলুঠন (গড়াগড়ি), গীত, ক্রোশন (চিৎকার), তনুমোটন (গা-মোচড়ান), হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকা-পেক্ষা ত্যাগ (অর্থাৎ লোকের মতামত অগ্রাহ্য করা) লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কাদি।"

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবনে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় লক্ষণই প্রকাশিত

হইয়াছিল। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে এই সমুদায় ভাবের বিশেষ আদর।

কিন্তু গীতার ভক্তি অন্য শ্রেণীর। ইহাতে কোন প্রকার চঞ্চলতা নাই। সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতার অতীত হওয়াই গীতার আদর্শ। কর্ম্মীই হউক, বা জ্ঞানীই হউক, বা যোগীই হউক বা ভক্তই হউক—সকলেরই আদর্শ 'যুক্তাবস্থা'। ভক্তকেও যুক্তাবস্থা লাভ করিয়া ভজন করিতে হইবে। এবিষয়ে ভগবানের কয়েকটি উক্তি এই—

(ক) "যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত (ভক্তগণ) আমাকে সতত কীর্ত্তন করিয়া, নমস্কার করিয়া, নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে।" ৯।১৪

কীর্ত্তন করা এবং নমস্কার করা বাহ্য অবস্থা। বাহ্য অবস্থা যথেষ্ট নহে; ভক্তগণকে যত্নশীল, দৃঢ়ব্রত এবং নিত্যযুক্ত হইতে হইবে। এ সমুদায় যোগস্থ পুরুষের লক্ষণ। গীতাকারের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যোগস্থ হইয়া, নিত্যযুক্ত হইয়া, ভগবানের ভজনা করিতে হইবে।

(খ) "অনন্তকাম হইয়া ধ্যানপূর্ব্বক যে সমুদায় ব্যক্তি আমার উপাসনা করে, সেই সমুদায় নিত্যযুক্ত ব্যক্তির (নিত্যাভিযুক্তানাম্) যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি।" ৯।২২

বলা হইল উপাসককে নিত্যযুক্ত হইতে হইবে।

(গ) আর একটি শ্লোক এই :—

"অনন্যচিত্ত হইয়া যে জন সতত আমাকে স্মরণ করে, হে পার্থ! নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।" ৮।১৪

এস্থলে বলা হইল অনন্যচিত্ত উপাসককে নিত্যযুক্ত যোগী হইতে হইবে। নিত্যযুক্ত যোগী হইলেই ঈশ্বর-প্রাপ্তি সহজ হয়।

(ঘ) ১০।১০ শ্লোক পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 'সততযুক্ত' ভক্তগণকেই ভগবান্ মোক্ষলাভের উপায়ভূত বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। ভক্তগণকে 'সততযুক্ত' হইতে হইবে।

(ঙ) ৯।২৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 'প্রযতাত্মা' ব্যক্তি যদি ভক্তি-সহকারে ভগবানকে পত্র, পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন (এই শ্লোক পরে উদ্ধৃত হইবে)।

বাহ্য পূজাতেও 'প্রযতাত্মা' হওয়া আবশ্যক।

(চ) আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ১২।১ শ্লোকে অর্জ্জুন যে ভক্তের বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল সে ভক্ত 'সততযুক্ত'।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে অর্জ্জুনের ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ ১২।২ শ্লোকে 'নিত্যযুক্ত' ভক্তকেই অব্যক্তের উপাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গীতার শ্রেষ্ঠ ভক্ত 'নিত্যযুক্ত' বা 'সততযুক্ত'।

(ছ) একস্থলে এইরূপ আছে "হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে (৭।১৬)। তাহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত এক-ভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ" (৭।১৭)।

এই স্থলে জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে ৭।১৭। কিন্তু এই জ্ঞানী কেবল জ্ঞানী নহেন, ইনি নিত্যযুক্ত ও "এক-ভক্তি"। একমাত্র ভগবানেই যাহার ভক্তি তিনিই 'এক-ভক্তি'। জ্ঞানীই হউন বা ভক্তই হউন, তাঁহাকে নিত্যযুক্ত হইতে হইবে।

চারিটি উপায়

একাদশ অধ্যায়ের শেষ দুইটি শ্লোক এবং সমগ্র দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ-বিষয়ক। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান্ একস্থলে (১২।৫) বলিয়াছেন যে জ্ঞানপথ অত্যন্ত ক্লেশকর। ভক্তিপথ ইহা অপেক্ষা সহজ। এইজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তি পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই :—

(১) "আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর; তাহা হইলে মৃত্যুর পরে আমাতেই বাস করিবে।" ১২।৮

(২) "হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে না পারি, তাহা হইলে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।" ১২।৯

(৩) "যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, মৎকর্ম্মপরায়ণ হও, আমার জন্য কর্ম্ম করিলেও সিদ্ধিলাভ করিবে।" ১২।১০

(৪) "আর যদি ইহা করিতেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে মদযোগাশ্রিত এবং সংযতচিত্ত হইয়া সমুদায় কর্ম্মফল ত্যাগ কর।" ১২।১১

এই চারিটি শ্লোকে চারিটি উপায়ের কথা বলা হইল। (১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ঈশ্বরে চিত্ত-সমাধান। ঈশ্বরে যদি পরা অনুরক্তি থাকে, তাহা হইলে চিত্ত আপনা আপনি তাঁহাতে মগ্ন হইয়া থাকিবে। (২) ইহা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলেও ঐ সাধনে বিরত হইবে না। অভ্যাস যোগদ্বারা চঞ্চল চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ঈশ্বরে সমাধান করিবে। (৩) চেষ্টা করিয়াও যদি ঈশ্বরের ধ্যান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মপথ অবলম্বন করিবে। ঈশ্বরের জন্য যে কর্ম্ম তাহাই সম্পন্ন করিবে। ঈশ্বরের কর্ম্ম কি সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ হইবেই। মৌলিক কথা এই, যে কর্ম্মকে ঈশ্বরের প্রিয়কর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে সেই কর্ম্মই করিবে। (৪) যদি ঈশ্বরের প্রিয় কর্ম্ম করাও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ফল কামনা না করিয়া নিত্য কর্ম্ম করিবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে চারিটি উপায় এই—

(১) প্রীতিবশতঃ স্বাভাবিক ভাব ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান।

(২) অভ্যাস দ্বারা ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান।

(৩) ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন।

(৪) ফল কামনা না করিয়া নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিরই প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। যে প্রেমিক, সে প্রেমাস্পদের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেই। যে ঈশ্বরের ভক্ত সে কি ঈশ্বরের চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে? তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য ঈশ্বরের সঙ্গলাভ। সেইজন্য এই চারিটা পথের মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যানকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথেও ভক্তির স্থান রহিয়াছে। ভক্তের পক্ষেই অভ্যাসসাধন সহজ হয়; আর ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের মূলেও ভক্তি, যাহার প্রতি প্রীতি আছে, তাহার জন্যই সহজে কার্য্য করা যায়। কিন্তু চতুর্থ পথের সাধক ভক্তি-বিরহিত হইয়া এমন কি ঈশ্বর-বিরহিত হইয়াও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে। এই চারিটি পথের মধ্যে প্রথমটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধকের জন্য; নিম্নতম অধিকারীর জন্য চতুর্থটি।

অন্য চারি পথ

কিন্তু ইহার পরের শ্লোকে গীতাকার অন্যপ্রকার চারিটি পথের কথা বলিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

"অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ত্যাগ হইতে ইহার পর শান্তি লাভ হয়।" ১২।১২

এস্থলে স্তর এই :—

(১) অভ্যাস, (২) জ্ঞান, (৩) ধ্যান, (৪) কর্ম্মফল-ত্যাগ।

অভ্যাসের স্থান নিকৃষ্ট এবং কর্ম্মফল-ত্যাগ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে পথকে নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহারই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ নানা প্রকার ব্যাখ্যাদ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সামঞ্জস্য করা সম্ভব নহে। আমাদিগের মনে হয়, প্রথম চারিটি শ্লোকে গীতাকার নিজের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে অন্য প্রকার মতও প্রচলিত ছিল। তিনি পরের শ্লোকে এই প্রকার একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাচীন কালের আচার্য্যগণ নিজ মত ব্যাখ্যা করিবার সময় অপরের মতও উদ্ধৃত করিতেন (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২০,২১,২২ দ্রষ্টব্য)। চতুর্থ পথের যাত্রিগণ ভাবিতে পারে যে, তাহারা নিকৃষ্ট পথে চলিতেছে এবং এই ভাবিয়া নিরাশ হইতে পারে। উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গীতাকার যেন বলিতেছেন, তোমরা নিরাশ হইও না—অনেক আচার্য্য নিষ্কাম কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠতম স্থান দিয়া থাকেন।

গীতার অনেক সংস্করণ হইয়াছে এবং প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু-না-কিছু সংযোজিত হইয়াছে। হইতে পারে এই প্রকার একটি সংস্করণের সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন।

কোন্ ভক্ত প্রিয়?

নিত্যযুক্ত ভক্তগণ কিভাবে সাধন করিবেন, এপর্য্যন্ত

তাহাই ব্যাখ্যা হইল। কোন্ ভক্ত ভগবানের প্রিয় এখন তাহাই ব্যাখ্যাত হইবে।

ভগবান বলিতেছেন,—

আমার যে ভক্ত সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, মমতা-বিহীন, নিরহঙ্কার, সর্ব্বদুঃখে সমান, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত, আমাতে যাহার মনোবুদ্ধি অর্পিত, সেই আমার প্রিয়। ১২।১৩,১৪

যাহা হইতে লোক (অর্থাৎ জগৎ) উদ্বিগ্ন হয় না এবং যে ব্যক্তি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, যে হর্ষ, পরশ্রী-কাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সে আমার প্রিয়। ১২। ১৫

আমার যে ভক্ত অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ (যাহার ব্যথা দূরীভূত হইয়াছে), সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, সে আমার প্রিয়। ১২।১৬

যে ব্যক্তি হৃষ্ট হয় না, দ্বেষ করে না, শোক করে না. আকাঙ্ক্ষা করে না, যে শুভাশুভ পরিত্যাগী ও ভক্তিমান্, সে আমার প্রিয়। ১২।১৭

(যে ব্যক্তি) শত্রু ও মিত্রে সমান, তদ্রূপ মান ও অপমানে (সমান), শীত ও উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে সমান, আসক্তি-বর্জ্জিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্য, মৌনী, যাহা কিছু পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহশূন্য, স্থিরবুদ্ধি ও ভক্তিমান, (সেই ব্যক্তি) আমার প্রিয়। ১২।১৮,১৯

যাহারা পূর্ব্বোক্ত এই ধর্ম্মামৃতের পর্য্যুপাসনা করে, যাহারা শ্রদ্ধাবান্ মহৎপরায়ণ ভক্ত, তাহারা আমার অতীব প্রিয়। ১২।২০

পূর্ব্বোক্ত আটটি শ্লোক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ভগবানের প্রিয় ভক্তগণের প্রকৃতি এই প্রকার—

(১) জগতের বিষয়ে—

তাহারা কাহাকেও দ্বেষ করে না, সর্ব্বভূতে তাহাদের মৈত্রী ও করুণা, তাহারা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করে না, কেহ তাহাদিগকেও উদ্বিগ্ন করে না।

(২) নিজের বিষয়ে—

(ক) তাহারা কর্ত্তব্যপালনে দক্ষ এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়।

(খ) অথচ তাহারা সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, শুভাশুভ-পরিত্যাগী, উদাসীন ও গৃহত্যাগী।

(গ) তাহাদের 'আমিত্ব' 'মমত্ব' বিদূরিত হইয়াছে, তাহারা অনাসক্ত, অনপেক্ষ (অর্থাৎ কাহারও অপেক্ষা করে না), তাহারা ব্যথা শোক, হর্ষ ও আকাঙ্ক্ষার অতীত ; এবং শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও স্তুতি, মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্র ইত্যাদিতে সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন। তাহারা সতত সন্তুষ্ট, স্থিরমতি, সংযতচিত্ত এবং যোগী

(ঘ) তাহারা শুচি, অর্থাৎ পবিত্র।

(৩) ঈশ্বর বিষয়ে—

তাহারা শ্রদ্ধাবান্, ঈশ্বরপরায়ণ, ঈশ্বরে তাহাদিগের মনবুদ্ধি অর্পিত, তাহারা উপাসক।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে ( ) সর্ব্বভূতে ইহাদিগের প্রীতি (২) ইহারা কর্ম্মণ্য অথচ কর্ম্মের অতীত ; নিত্যযুক্ত, সংযতাত্মা এবং পবিত্র এবং (৩) ইহারা ভক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ।

কোন প্রাচীন গ্রন্থে বা কোন আধুনিক গ্রন্থেও ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দেওয়া হয় নাই। এবিষয়ে গীতাকার উপনিষদের অনেক ঋষিকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

ভক্তি ও উপাসনা

ঈশ্বরে যে পরা অনুরক্তি, তাহাই ভক্তি (সা পরানুরক্তিরীশ্বরে, শাণ্ডিল্যসূত্র ১৷২)।

প্রেমিকের স্বভাবই এই যে, সে তাহার প্রিয়তম হইতে দূরে থাকিতে পারে না, নিত্যই সে তাহার সঙ্গ-লাভের জন্য ব্যাকুল। ঈশ্বর-প্রেমিকও ঈশ্বরের সহবাস এবং সংস্পর্শ অনুভব করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। তিনি ঈশ্বরের প্রেমে বিভোর ; তিনি তৎপর, তৎপরায়ণ, তন্নিষ্ঠ, তন্ময়।

কিন্তু সকলের হৃদয় সব সময়ে প্রেমে পূর্ণ থাকে না। সাধারণ লোক অধিকাংশ সময়েই ঈশ্বর-ভাব-বিরহিত হইয়া জীবন যাপন করে। এমন কি ধার্ম্মিক লোকও অনেক সময়ে ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে। কিন্তু

তাঁহারা ত সব সময়ে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরকে মনন করিবার জন্য তাহারা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে, অন্য সময়েও মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকে। ঈশ্বরের কথা মনে হইলেই ভক্তিভরে তাহাদের মস্তক অবনত হয়। সাকারবাদিগণ উপাস্য দেবতা বা কোন অবতারের চরণোদ্দেশে মস্তক অবনত করে, নিরাকারবাদিগণও ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করে। প্রণাম একটি বাহ্য চিহ্নমাত্র। ইহার মৌলিক ভাব শরণ-গ্রহণ ও আত্মসমর্পণ। প্রণাম করিবার সময়ে যদি ঐ প্রকার ভাব মনে না আসে, তাহা হইলে সেই প্রণাম অর্থহীন হইয়া পড়ে, সে প্রণাম অসিদ্ধ হয়।

এই প্রকার স্মরণ, শরণ-গ্রহণ ও আত্মসমর্পণ সহজ ব্যাপার নহে। শারীরিক ও বাহ্য ব্যাপার যত সহজ, মানসিক ব্যাপার তত সহজ নহে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানসিক ব্যাপারই কঠিন। অতি অল্পলোকই নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের মনন নিদিধ্যাসন করিতে পারে।

এইজন্য মানুষ একটা সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ইষ্টদেবতার কোন মূর্ত্তি বা স্মারক কোন চিহ্ন স্থাপন করা হয়। এই মূর্ত্তিকে বা চিহ্নকে উপাস্য দেবতার প্রতিনিধি-রূপে প্রণাম করা হয় এবং পুষ্পফলাদি অর্পণ করা হয়। এই সমুদায় কার্য্যে বিশেষ কোন মানসিক শ্রম নাই। কিন্তু অপরদিকে বিপদ অনেক; ঈশ্বর বাহিরেই রহিয়া গেলেন, তাঁহাকে অন্তর্য্যামিরূপে এবং প্রাণের প্রাণরূপে প্রাণে আর অনুভব করা হয় না।

আর এক প্রকার বাহ্যপূজা আছে যাহা প্রাণবিহীন, কেবল বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ। ইহার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্বন্ধ নাই।

আমরা ধর্ম্মসাধনের তিনটি স্তর পাইলাম। প্রথম স্তরে ঈশ্বরের ভাব স্বাভাবিক, চিন্তা করিয়া ঈশ্বরের ভাবকে প্রাণে আনিতে হয় না। উচ্চতম সাধকগণ ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়াই আছেন। দ্বিতীয় স্তরে চিন্তা করিয়া ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ে আনিতে হয়, স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা হয়। তৃতীয় স্তরে বাহ্য ঘটনাদির সাহায্যে ভক্তির সহিত তাঁহাকে পূজা বা প্রণাম করা হয়।

গীতাতে এই প্রকার স্তর বিভাগ করা হয় নাই; কিন্তু ইহাতে প্রত্যেক স্তরের কথাই পাওয়া যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর

(ক) একস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন—

"মচ্চিত্তঃ সততং ভব"—সতত মচ্চিত্ত হও। ১৮।৫৭

আমাতে যাহার চিত্ত, সেই 'মচ্চিত্ত'। এস্থলে 'আমাতে' অর্থ 'ভগবানে'। 'মচ্চিত্ত' শব্দ আরও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে (৬।১৪, ১০।৯, ১৮।৫৮)।

অনুরূপ আরও অনেক কথা আছে, যেমন—

(১) মদাশ্রিত (মামুপাশ্রিতাঃ, ৪।১০)

(২) মৎপরম (১১।৫৫) এবং মৎপর (২।৬১, ৬।১৪, ১২।৬, ১৮।৫৭)।

(৩) মন্মনা (৯।৩৪, ১৮।৬৫) এবং মদ্গতপ্রাণ (১০।৯)।

(৪) মন্ময় (৪।১০)

(৫) মদ্ভাবপ্রাপ্ত (৪।১০) ইত্যাদি।

এ সমুদায়ের অর্থ এই—

(১) সাধক ঈশ্বরের আশ্রিত হইয়া থাকিবে। (২) ঈশ্বরকে পরম বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবে।

(৩) মন প্রাণ ঈশ্বরে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে, (৪) সাধক তন্ময় অর্থাৎ ব্রহ্মময় হইবে, (৫) এবং ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইবে।

কোনস্থলে বা জ্ঞানযোগের সাহায্যে, কোনও স্থলে বা ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আদর্শ সর্ব্বত্রই এক। ব্রহ্মসূত্রের ভাষায় (১।১।৭) বলা যাইতে পারে যে, গীতারও মুখ্য উদ্দেশ্য 'তন্নিষ্ঠ হওয়া' অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া। আমরা অনেক সময়ে প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার অর্থ অতি গভীর। যে ব্যক্তি ব্রহ্মে নিশ্চিন্তরূপে স্থিত, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ। এই প্রকার হওয়াই গীতার আদর্শ এবং ধর্ম্মজগতে ইহাই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। উক্ত কালেও এই আদর্শই গৃহীত হইয়াছে। 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ' গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮।২৩)। শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষা

'তৎসংস্থ'; তাঁহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্যক্‌রূপে যাহার স্থিতি, সেই 'তৎসংস্থ' বা ব্রহ্মসংস্থ (১৩)।

(খ) ভগবান্ একস্থলে বলিতেছেন—

তমেব শরণংগচ্ছ
সর্ব্বভাবেন ভারত। ১৮।৬২

হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও।

অপর একস্থলে আছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬

'সমুদায় ধর্ম্ম (অর্থাৎ বাহ্য সাধন-প্রণালী) পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ গ্রহণ কর।'

বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষ আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? মানবের একমাত্র নিত্য আশ্রয় ভগবান্। এস্থলে সেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্যই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হরিভক্তি বিলাসের একাদশ বিলাসে 'শরণাগতি' বিষয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে। শ্লোকটি এই:—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা,
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

শরণাগতি ছয় প্রকার (১) আনুকূল্যের সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, (৩) তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাস, (৪) তাঁহাকে রক্ষাকর্তৃরূপে বরণ, (৫) তাঁহাতে আত্মনিক্ষেপ এবং (৬) দীনতা। (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ, ২২)।

শরণ-গ্রহণের মধ্যে কি কি ভাব আছে, তাহা এস্থলে সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতাতে যে শরণ-গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূলেও যে এই প্রকার ভাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(গ) ভগবান্ একস্থলে বলিতেছেন—

"মচ্চিত্ত (মন্মনা) হও, মদ্ভক্ত হও, মদ্‌যাজী হও অর্থাৎ আমাকে জান কর এবং আমাকে নমস্কার কর।" ৯।৩৪; ১৮।৬৫।

(ঘ) অনেকস্থলে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

'সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর' (৮।৭) 'সর্ব্বসময়ে আমাকে স্মরণ কর।'

ঈশ্বরকে স্মরণ করিলে কল্যাণ হয় এ বিষয়ে আরও কয়েকটি শ্লোক আছে (৮।১৩,১৪; ৮।৮-১০ ইত্যাদি)।

পূর্ব্বে যে-সমুদায় শ্লোক উদ্ধৃত হইল তাহার কতকগুলি প্রথম স্তরের সাধকগণের কথা এবং কতকগুলি দ্বিতীয় স্তরের সাধক সংক্রান্ত। দ্বিতীয় স্তরের সাধকগণের অস্থায়ী ভাব যখন স্থায়ী হয়, তখন তাহারাই প্রথম শ্রেণীর সাধক বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর

অষ্টম অধ্যায়ের দুইটি শ্লোক এই:—

"যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্রপুষ্প ফল ও জল প্রদান করে, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই সমুদায় বস্তু গ্রহণ করি।" ৯।২৬।

"হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভক্ষণ কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমুদায়ই আমাকে অর্পণ কর।" ৯।২৭

পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান বাহ্যপূজা। এই সমুদায় বাহ্য পূজাতে ভক্তি নাও থাকিতে পারে, কিন্তু এস্থলে ভক্তির পূজার কথাই বলা হইয়াছে। গীতাতে অন্য দেবতার পূজার কথাও আছে (৭।২০; ৯।২৩ ইত্যাদি)। সম্ভবতঃ এ সমুদায় মূর্ত্তিপূজা নহে।

হোম ও তপস্যা ধর্ম্মমূলক। এ সমুদায় বাহ্যপূজাও ভক্তিপ্রণোদিত হইতে পারে। দান সর্ব্বস্থলে ও সর্ব্ব-ঘটনাতে ধর্ম্মমূলক নাও হইতে পারে; কোন কোনস্থলে ধর্ম্মমূলকও হইতে পারে।

কিন্তু মানুষ এমন অনেক কর্ম্ম করে, যাহা মানব পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীরই সাধারণ ধর্ম্ম। আর ইহা ছাড়াও অনেক কর্ম্ম আছে, যাহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সমুদায় কার্য্যকেও গীতাকার ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। 'যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভক্ষণ কর'—সে সমুদায়ই ঈশ্বরে অর্পণ কর।

হোম, তপস্যা এবং দানকে ঈশ্বরে অর্পণ করা সহজ। কিন্তু আহার বিহারাদিকে ধর্ম্মময় করা অত্যন্ত কঠিন।

যাহারা এই প্রকার করিতে পারেন, তাঁহারা উচ্চতর সাধক।

মন্তব্য

তৃতীয় স্তরের পূজা বাহ্যপূজা; কিন্তু এ পূজাও ভক্তি-মূলক হইতে পারে, এবং ভক্তি থাকিলে ভগবান্ বাহ্য পূজাও গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় স্তরের সাধক অন্তরেই ঈশ্বরের মননাদি করিয়া থাকে। তাহারা সংসারে যাহা কিছু করে, তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করে। জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মপিপাসু ব্যাকুল আত্মা এই শ্রেণীর সাধক।

প্রথম ও সর্ব্বোচ্চ স্তরের সাধক সর্ব্বদাই ব্রহ্মভাবে মগ্ন। ব্রহ্মভাব নিত্যই তাহাদের প্রাণে জাগ্রৎ। ইহাদিগের জীবনে স্মরণ মননের স্থান নাই; যাহা নিত্যই জাগ্রৎ, তাহার আবার জাগরণ কি? দ্বিতীয় স্তরের সাধকগণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া, যুক্তিতর্ক করিয়া কার্য্য করে, এবং সেই কার্য্য ব্রহ্মে অর্পণ করে। কিন্তু প্রথম স্তরে ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণাদিও অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহা দেওয়া হয় নাই, তাহাই দেওয়া যাইতে পারে। যাহা ব্রহ্ম হইতে প্রসূত এবং ব্রহ্মেই স্থিত, তাহাকে আবার ব্রহ্মে কি প্রকারে স্থাপন করিবে? উচ্চতম সাধকগণ ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মভাব দ্বারা প্রাণোদিত হইয়াই কার্য্য করেন। ইঁহারা জানেন না কেন কার্য্য করেন, কে যেন ইঁহাদের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লয়। এই 'কে' আর কে? ইনি স্বয়ং ভগবান্। ইঁহারা ব্রহ্মাবিষ্ট হইয়া সংসারে বিচরণ করেন।

ভক্তি ও মুক্তি

বর্ত্তমান যুগে ভক্তির আদর্শ অতি উচ্চ। ভক্তি কেবল পথ নহে, লক্ষ্যও ভক্তি। ধর্ম্মের আদিতে ভক্তি, মধ্যে ভক্তি এবং অন্তেও ভক্তি। কিন্তু গীতাতে ভক্তি লক্ষ্য নহে, ভক্তি জ্ঞানলাভের এবং মোক্ষলাভের একটি পথ।

(ক) 'ভক্তি ও প্রাপ্তি' অংশে এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি (৮।২২; ১।১৫৫; ১৪।২৬; ১৮।৬৫)। এই কয়েকটি শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। দ্বৈতবাদিগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ঈশ্বরপ্রাপ্তির পরেও জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে; সুতরাং তখনও ভক্তি থাকা সম্ভব। এ বিষয়ে ইহাদিগের প্রমাণ ১২।৮ শ্লোক। ভগবান এইস্থলে বলিয়াছেন—

> নিবসিষ্যসি ময্যেব
> অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ

"মৃত্যুর পরে আমাতেই বাস করিবে ইহাতে কোন সংশয় নাই।"

ইহার উত্তর এই নির্ব্বাণ মুক্তিতেও জীবাত্মা নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেই বাস করে। সুতরাং ঐ শ্লোক দ্বারা স্পষ্টভাবে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

(খ) 'ভক্তি ও জ্ঞান' অংশে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি শ্লোক নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রতিপাদক। অনুবাদ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। বিষয়টি গুরুতর বলিয়া নিম্নে মূল শ্লোক দুইটিও উদ্ধৃত হইল।

> ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য
> অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
> জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন
> প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ১১।৫৪

এস্থলে তিনটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক

(১) জ্ঞাতুম্ (জানিতে), (২) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে), (৩) প্রবেষ্টুম (প্রবেশ করিতে)।

বলা হইতেছে যে, ভক্তি দ্বারা প্রথমে ঈশ্বরকে জানা যায়, তাহার পর দেখা যায়, তাহার পর ঈশ্বরে প্রবেশ করা যায়।

অপর শ্লোকটি এই—

> ভক্ত্যা মামভিজানাতি
> যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা
> বিশতে তদনন্তরম্। ১৮।৫৫

এস্থলে (১) জ্ঞাত্বা—জানিয়া

(২) বিশতে—প্রবেশ করে।

এস্থলে বলা হইতেছে যে, ভক্তিদ্বারা প্রথমে ঈশ্বরকে জানা যায়, তাহার পর ঈশ্বরে প্রবেশ করা যায়।

অন্যত্র (৮।১১) বলা হইয়াছে—বীতরাগ যতিগণ

অক্ষর ব্রহ্মে প্রবেশ করেন (বিশন্তি···বতয়ো বীতরাগাঃ)। জীবাত্মা যে মোক্ষাবস্থায় পরব্রহ্মে প্রবেশ করে, এই ভাব উপনিষদ্ হইতে গৃহীত। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৮) এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়ঃ—যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তগমন করে, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হয় (উপৈতি)। প্রশ্নোপনিষদেও (৬।৫) ঠিক এই প্রকার একটি মন্ত্র আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গীতায় যে বলা হইয়াছে সাধক ঈশ্বরে প্রবেশ করেন, তাহার অর্থ নির্ব্বাণ মুক্তি। জীবাত্মা নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মত্বই লাভ করে।

মহারাষ্ট্র দেশ ও মারাঠা জাতি

শ্রী যদুনাথ সরকার

১৯১১ সালের গণনায় দেখা গেল যে, সমগ্র ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় দুই কোটি নরনারী মারাঠী ভাষা বলে। ইহার মধ্যে এক কোটির কিছু বেশী বোম্বাই প্রদেশে, প্রায় আধ কোটি মধ্য-প্রদেশ ও বেরারে, এবং পঁয়ত্রিশ লক্ষ নিজামের রাজ্যে বাস করে। সিন্ধু বিভাগ বাদ দিলে বোম্বাই প্রদেশের যাহা থাকে তাহার অর্দ্ধেক অধিবাসীর, মধ্য-প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশের এবং নিজাম-রাজ্যের সিকি লোকের মাতৃভাষা মারাঠী। এই ভাষার দিন দিন বিস্তৃতি হইতেছে, কারণ ইহার সাহিত্য বৃহৎ এবং বর্দ্ধিষ্ণু, আর মারাঠারা তেজস্বী উন্নতিশীল জাতি।

প্রকৃত মহারাষ্ট্র দেশ বলিলে বুঝাইত দক্ষিণ-ভারতের উঁচু জমির পশ্চিম প্রান্তে প্রায় আটাশ হাজার বর্গ মাইল স্থান; অর্থাৎ, নাসিক, পুণা ও সাতারা এই তিন জেলার সমস্তটা, এবং আহমদনগর এবং শোলাপুর জেলার কিছু কিছু,—উত্তরে তাপ্তী নদী হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর আদি শাখা বর্ণা নদী পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে সীনা নদী হইতে পশ্চিম দিকে সহ্যাদ্রি (অর্থাৎ পশ্চিম-ঘাট) পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত। আর, ঐ সহ্যাদ্রি পার হইয়া আরব-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে লম্বা ফালি জমি তাহার উত্তরার্দ্ধের নাম কোঁকন, এবং দক্ষিণ ভাগ কানাড়া ও মালবার; এই কোঁকনে থানা, কোলাবা ও রত্নগিরি নামে তিনটি জেলা এবং সংলগ্ন সাবন্ত-বাড়ী নামক দেশী রাজ্য প্রায় দশ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপিয়া আছে। ইহার অধিকাংশ লোকে এখন মারাঠী বলে, কিন্তু তাহারা সকলেই জাতিতে মারাঠা নহে।

মহারাষ্ট্র দেশে বৃষ্টি বড় কম এবং অনিশ্চিত; এজন্য অল্প শস্য জন্মে,এবং তাহাও অনেক পরিশ্রমের ফলে। কৃষক সারা বৎসর খাটিয়া কোনমতে পেট ভরিবার মত ফসল লাভ করে। ইহাও আবার সকল বৎসরে নহে। যে শুষ্ক পাহাড়ে দেশ, তাহাতে ধান হয় না, গম ও যব জন্মে অত্যন্ত কম। এ দেশের প্রধান ফসল এবং সাধারণ লোকের একমাত্র খাদ্য জোয়ারি, বাজরী এবং ভুট্টা। মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিতে এই-সব গাছের চারা শুকাইয়া যায়, জমির উপরটা পুড়িয়া ধূলার রং হয়, সবুজ কিছুই বাঁচে না, অসংখ্য নরনারী এবং গরু-বাছুর অনাহারে মারা যায়। এইজন্যই আমরা এতবার দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে পাই।

পাহাড় বনে ঢাকা অনুর্ব্বর দেশ, কাজেই লোকসংখ্যা বড় কম। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সহ্যাদ্রি পর্ব্বতশ্রেণী মেঘ পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া সমুদ্রে যাইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর এই সহ্যাদ্রি হইতে পূর্ব্বদিকে কতকগুলি শাখা বাহির হইয়াছে। এইরূপে দেশটা অনেক ছোট ছোট অংশে বিভক্ত, প্রতি অংশের তিনদিকে

পাহাড়ের দেয়াল আর মাঝখান দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত কোন প্রাচীন বেগবতী নদী। এই খণ্ড-জেলাগুলিতে মারাঠারা নিভৃতে বাস করিত, বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিত না, কারণ তাহাদের না ছিল ধনধান্য, না ছিল তেমন কিছু শিল্প-বাণিজ্য, না ছিল বণিক সৈন্য বা পথিককে আকৃষ্ট করিবার মত সমৃদ্ধ রাজধানী। তবে ভারতের পশ্চিম সাগরতীরের বন্দরগুলিতে পৌঁছিতে হইলে এই প্রদেশ পার হইয়া যাইতে হইত।

এই নির্জ্জনবাসের ফলে মারাঠা জাতি স্বভাবতঃই স্বাধীনতাপ্রিয় হইল এবং জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিল। এই দেশে প্রকৃতিদেবী নিজ হইতে অসংখ্য গিরিদুর্গ গড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে আশ্রয় লইয়া মারাঠারা সহজেই অনেকদিন ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে বা বহুসংখ্যক আক্রমণকারীকে বাধা দিতে পারিত; অবশেষে শ্রান্তক্লান্ত শত্রু অবসন্নমনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত। পশ্চিমঘাটশ্রেণীর অনেক পর্ব্বতের শিখরদেশ সমতল আর পাশগুলি অনেকদূর পর্য্যন্ত খাড়া, অথচ তাহাদের উপরে অনেক ঝরণা আছে। অতীত যুগে এই পাহাড়ের গা হইতে ট্র্যাপ প্রস্তর গলিয়া পড়িয়া অতি কঠিন ব্যাসল্ট (কষ্টিপাথর) খাড়া দেয়াল অথবা স্তূপের আকারে বাহির হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গা বা খোঁড়া যায় না। পর্ব্বতের চূড়ায় পৌঁছিবার জন্য পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটিলেই এবং পথরোধের জন্য গোটাকয়েক দরজা গাঁথিলেই, সম্পূর্ণভাবে দুর্গ গঠিত হয়,—বিশেষ কোন পরিশ্রম বা অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। এরূপ এক-একটি গিরি-দুর্গে আশ্রয় লইয়া পাঁচশত লোক বিশ হাজার শত্রুকে বহুদিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। অগণিত গিরিদুর্গ দেশময় ছড়ানো থাকায়, বিনা কামানে মহারাষ্ট্র জয় করা অসাধ্য।

যে দেশের অবস্থা এরূপ, সেখানে কেহই অলস থাকিতে পারে না। প্রাচীন মহারাষ্ট্রে কেহই অকর্ম্মণ্য ছিল না—কেহই পরের পরিশ্রমলব্ধ ফলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত না; এমন কি গ্রামের জমিদার (পাটেল বা প্রধান,কেও শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিয়া তবে নিজের সংস্থান করিতে হইত। দেশে ধনীর সংখ্যা খুব কম ছিল, এবং তাহারা ব্যবসায়ীশ্রেণীর। জমিদারগণেরও যে গৌরব ছিল তাহা ততটা মজুত টাকার জন্য নহে, যতটা শস্য ও সৈন্য-সংগ্রহের জন্য।

এরূপ সমাজে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ কায়িক পরিশ্রম করিতে বাধ্য;—সৌখিনতা ও কোমলতার স্থান সেখানে নাই। প্রকৃতিদেবীর কঠোর শাসনে সকলকেই কায়ক্লেশে অনাড়ম্বরভাবে সংসার চালাইতে হইত, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা, অনন্যমনে জ্ঞান বা সুকুমার শিল্পের চর্চ্চা,এমন কি ভব্যতা পর্য্যন্ত অসম্ভব ছিল। উত্তর-ভারতে মারাঠা-প্রাধান্যের সময় এই বিজেতাদের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইত—তাহারা অহঙ্কারী হঠাৎ-বড়লোক, কোমলতা ও ভব্যতাহীন, এমন কি বর্ব্বর। তাহাদের প্রধান ব্যক্তিরাও শিল্পকলা, সামাজিকতা, এবং সৌজন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না। ভারতের অনেক প্রদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠারা রাজা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা কোন সুন্দর অট্টালিকা, মনোহর চিত্র বা কারুকার্য্যময় পুঁথি প্রস্তুত করায় নাই।

মহারাষ্ট্র দেশ শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর; এরূপ জলবায়ুর গুণও কম নয়। এই কঠিন জীবনের ফলে মারাঠা-চরিত্রে আত্মনির্ভরতা, সাহস, অধ্যবসায়, কঠোর আড়ম্বরশূন্যতা, সাদাসিদে ব্যবহার,সামাজিক সাম্য, এবং প্রত্যেক মানবেরই আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা,—এই-সব মহাগুণ জন্মিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পর্য্যটক ইউয়ান্ চুয়াং মারাঠা জাতিকে এইরূপ চক্ষে দেখিয়াছিলেন, —"এই দেশের অধিবাসীরা তেজী ও যুদ্ধপ্রিয়; উপকার করিলে কৃতজ্ঞ থাকে, অপকার করিলে প্রতিহিংসা খোঁজে। কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিলে তাহারা ত্যাগস্বীকার করে, আর অপমান করিলে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়ে না। তাহারা প্রতিহিংসা লইবার আগে শত্রুকে শাসাইয়া দেয়।"

যে সময় এই বৌদ্ধ-পথিক ভারতে আসেন, তখন মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের মধ্য অংশে সুবিস্তৃত ও ধনজনপূর্ণ রাজ্যের অধিকারী। তাহার পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিজয়ের ফলে স্বরাজ্য হারাইয়া তাহারা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় লইল,

এবং গরিব অবস্থায় কোণ-ঠাসা হইয়া পড়িল। এই নির্জ্জন দেশে জঙ্গল, অনুর্ব্বরা জমি এবং বন্যজন্তুর সহিত লড়াই করিয়া ক্রমে তাহারা ভব্যতা ও উদারতা অনেকটা হারাইল বটে, কিন্তু অধিকতর সাহসী, চতুর এবং ক্লেশ-সহিষ্ণু হইয়া উঠিল। মারাঠা-সৈন্যগণ সাহসী, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী; রাত্রে নিঃশব্দে আক্রমণ করা, অথবা শত্রুর জন্য ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া থাকা, সেনাপতির মুখ না চাহিয়া বুদ্ধিবলে নিজকে বিপদ হইতে মুক্ত করা, এবং যুদ্ধের অবস্থা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে রণ-প্রণালী বদলানোর ক্ষমতা—একাধারে এই গুণগুলি একমাত্র আফঘান এবং মারাঠা জাতি ভিন্ন এশিয়া মহাদেশে অন্য কোন জাতির নাই।

ধনী এবং সুসভ্য সমাজে যেমন অসংখ্য শ্রেণী-বিভাগ, উচ্চনীচ-ভেদ আছে, ষোড়শ শতাব্দীর সরল গরিব মারাঠাদের মধ্যে সেরূপ ছিল না। সেখানে ধনীর মান ও পদ দরিদ্র হইতে বড় বেশী উঁচু ছিল না, এবং অতি দরিদ্র লোকও যোদ্ধা বা কৃষকের কাজ করিত বলিয়া আদরের পাত্র ছিল; অন্ততঃ তাহারা আগ্রা-দিল্লীর অলস ভিক্ষুকদল বা পরান্নভোজী চাটুকারদের ঘৃণিত জীবন যাপন করা হইতে রক্ষা পাইত, কারণ এদেশে কুড়ে পুষিবার মত কোন লোক ছিল না। প্রাচীন প্রথা এবং দারিদ্র্যের ফলে মারাঠা-সমাজে স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দিত না, অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিত না। স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে মহারাষ্ট্রে জাতীয় শক্তি দ্বিগুণ হইল এবং সামাজিক জীবন অধিকতর পবিত্র ও সরস হইল। ঐ দেশের ইতিহাসে অনেক কর্ম্মী ও বীর মহিলার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শুধু যে-সব বংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিত, তাহারাই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের অবরোধে রাখিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ-বংশের স্ত্রীলোকেরাও অবরোধ-মুক্ত, এমন কি অনেকে অশ্বারোহণে পটু ছিলেন।

এই সামাজিক সাম্যভাব ধর্ম্ম হইতেও বৃদ্ধি পাইল। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রগ্রন্থ নিজহাতে রাখিয়া ধর্ম্মজগতে কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছিলেন বটে; কিন্তু নূতন নূতন জন-ধর্ম্ম উঠিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে শিখাইল যে লোকে চরিত্রের বলেই পবিত্র হয়,—জন্মের জন্য নহে; ক্রিয়াকর্ম্মে মুক্তি হয় না, হয় অন্তরের ভক্তিতে। এই নব ধর্ম্মগুলি ভেদবুদ্ধির মূলে আঘাত করিল। তাহাদের কেন্দ্র ছিল এই দেশের প্রধান তীর্থ পংঢারপুরে। যে-সব সাধু ও সংস্কারক এই ভক্তিমন্ত্রে দেশবাসীকে নবজীবন দান করিলেন, তাঁহারা অনেকেই অব্রাহ্মণ নিরক্ষর,—কেহ দর্জি, কেহ ছুতার, কেহ কুমোর, মালী, মুদী, নাপিত, এমন কি মেথর। আজিও তাঁহারা মারাঠা দেশে ভক্ত-হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন। তীর্থে তীর্থে বাৎসরিক মেলার দিনে অগণিত লোক সম্মিলিত হইয়া মারাঠাদের জাতীয় একতা, হিন্দুজাতির একপ্রাণতা অনুভব করিত; জাতিভেদ ঘুচিল না বটে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে, প্রদেশে প্রদেশে ভেদবুদ্ধি কমিতে লাগিল।

মারাঠী জন-সাহিত্যও এই জাতীয় একতা-বন্ধনের সহায় হইল। তুকারাম ও রামদাস, বামন পণ্ডিত ও মোরো পন্ত প্রভৃতি সন্ত-কবির সরল মাতৃভাষায় রচিত গীত ও নীতিবচনগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছিল। "দক্ষিণদেশ ও কোঁকনের প্রত্যেক শহর ও গ্রামে, প্রধানতঃ বর্ষাকালে, ধার্ম্মিক মারাঠা-গৃহস্থ পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবর্গ লইয়া শ্রীধর কবির "পোথী"-পাঠ শুনে। ভাবাবেশে তাহারা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে থাকে, মাঝে মাঝে কেহ হাসিল, কেহ দুঃখের শ্বাস ফেলিল, কেহ বা কাঁদিল। যখন চরম করুণ রসের বর্ণনা আসে তখন শ্রোতারা একসঙ্গে দুঃখে কাঁদিয়া উঠে, পাঠকের গলা শুনা যায় না।" [একবার্থ]

প্রাচীন মারাঠী কবিতায় সুদীর্ঘ গুরুগম্ভীর পদ-লালিত্য ছিল না, ভাবোচ্ছ্বাসময় বীণার ঝঙ্কার ছিল না, কথার মারপেচ ছিল না। "নিরক্ষর জনসাধারণের প্রিয় পদ্য ছিল 'পোবাড়া' অর্থাৎ 'কথা' (ব্যালাড্)। ইহাতেই জাতীয় চিত্তের স্ফুরণ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সমতলক্ষেত্র, সহ্যাদ্রির গভীর উপত্যকা এবং উচ্চগিরিশ্রেণী—সর্ব্বত্রই গ্রামে গ্রামে দরিদ্র 'গোন্ধালী'-গণ (অর্থাৎ, চারণেরা) ভ্রমণ করে, এখনও সেই অতীত যুগের ঘটনা লইয়া 'কথা ও কাহিনী' গান করে,—যখন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অস্ত্রবলে সমগ্র ভারত জয় করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সমুদ্রপার হইতে আগত বিদেশীর কাছে আহত বিধ্বস্ত

হইয়া দেশে পলাইয়া আসিয়াছিল। গ্রামবাসীরা ভিড় করিয়া সেই কাহিনী শুনিতে থাকে, কখন বা মুগ্ধ নীরব থাকে, কখন বা উল্লাসে উন্মত্ত হয় ।" [একবার্থ]

মারাঠী জনসাধারণের ভাষা আড়ম্বরশূন্য, কর্কশ, কেবলমাত্র কাজের উপযোগী। ইহাতে উর্দ্দুর কোমলতা, শব্দবিন্যাসের মারপেঁচ, ভাবপ্রকাশের বৈচিত্র্য, ভব্যতা ও আমীরি সুর একেবারেই নাই। মারাঠারা যে স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রজাতন্ত্রপ্রিয় তাহার প্রমাণ—তাহাদের ভাষায় 'আপনি' অর্থাৎ সম্মান-সূচক কোন ডাক ছিল না। সকলেই 'তুমি'।

এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল, মহারাষ্ট্র দেশে ভাষায় ধর্ম্মে চিন্তায় জীবনে এক আশ্চর্য্য একতা ও সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রীয় একতার অভাব ছিল; তাহাও পূরণ করিলেন—শিবাজী। তিনিই প্রথমে জাতীয় স্বরাজ্য স্থাপন করিলেন; তিনি দিল্লীর আক্রমণকারীকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যে যুদ্ধের সূচনা করেন, তাহা তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ চালাইয়া দেহের রক্তদানে মারাঠা-মিলন গাঁথিয়া তুলিল। অবশেষে পেশোবাগণের রাজত্বকালে সমগ্র ভারতের রাজরাজেশ্বর হইবার চেষ্টার ফলে যে জাতীয় গৌরব-জ্ঞান, জাতীয় সমৃদ্ধি, জাতীয় উৎসাহ জাগিয়া উঠে,তাহা শিবাজীর ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া দিল,—কয়েকটি জাত্ (caste) এক ছাঁচে ঢালা হইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ (nation) গঠিত হইবার পথে অগ্রসর হইল। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে ইহা ঘটে নাই।

'মারাঠা' বলিতে বাহিরের লোক এই নেশন্ বা জনসঙ্ঘ বোঝে। কিন্তু মহারাষ্ট্রে এই শব্দের অর্থ একটি বিশেষ জাত্ অর্থাৎ বর্ণ, সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী নেশন নহে। এই মারাঠা জাত এবং তাহাদের নিকট-কুটুম্ব কুন্‌বী জাতের অধিকাংশ লোকই কৃষক সৈন্য বা প্রহরীর কাজ করে। ১৯১১ সালে মারাঠা জাত্ সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং কুন্‌বীরা পঁচিশ লক্ষ ছিল। এই দুই জাত লইয়া শিবাজীর সৈন্যদল গঠিত হয়—যদিও সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছিলেন।

"মারাঠা (অর্থাৎ কৃষক) জাত্ সরল, খোলামন, স্বাধীনচেতা, উদার ও ভদ্র; সদ্ব্যবহার পাইলে পরকে বিশ্বাস করে; বীর ও বুদ্ধিমান, পূর্ব্বগরিমা স্মরণ করিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল। ইহারা মুরগী ও মাংস খায়, মদ ও তাড়ি পান করে (কিন্তু নেশাখোর নহে)। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার মারাঠা জাত্ হইতে যত লোক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়, অন্য কোন জাত্ হইতে তত নহে। অনেকে পুলিস এবং পাইক হরকরা হয়। মারাঠারা কুন্‌বীর মত শান্ত ভদ্রব্যবহারকারী, মোটেই রাগী নহে, কিন্তু অধিকতর সাহসী ও দয়াদাক্ষিণ্যশালী। তাহারা বেশ মিতব্যয়ী, নম্র, ভদ্র ও ধর্ম্মপ্রাণ। কুন্‌বীরা এখন সকলেই কৃষক হইয়াছে—তাহারা স্থির,শান্ত, শ্রমী,সুশৃঙ্খল, দেবদেবীভক্ত, এবং চুরি-ডাকাতি বা অন্য অপরাধ হইতে মুক্ত। তাহাদের স্ত্রীলোকগণ পুরুষের মত বলিষ্ঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।"

মারাঠা-চরিত্রের গুণের কথা বলিলাম, এইবার তাহাদের দোষগুলির আলোচনা করা যাক।

মারাঠা-রাজশক্তি বিদেশ-লুণ্ঠনের বলে বাঁচিয়া থাকিত। এরূপ দেশের রাজপুরুষেরা নিজের জন্য লুঠ করিতে, অর্থাৎ ঘুষ লইতে, কুণ্ঠিত হয় না। প্রভুর প্রবৃত্তি ভৃত্যে দেখা দেয়। শিবাজীর জীবিতকালেও তাঁহার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীরা নির্লজ্জভাবে ঘুষ চাহিত ও আদায় করিত।

মারাঠাদের মধ্যে ব্যবসায়-বুদ্ধি বড় কম, ইহার ফলে তাহাদের রাজত্ব ক্ষণস্থায়ী হয়। এই জাতির মধ্যে একজনও বড় শ্রেষ্ঠী (ব্যাঙ্কার) বণিক ব্যবসায়-পরিচালক এমন কি সর্দ্দার ঠিকাদারের উদ্ভব হয় নাই। মারাঠা-রাজশক্তির প্রধান ত্রুটি ছিল—অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপারকতা। রাজারা সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত, নিয়মিত সময়ে ও সুচারুরূপে রাজ্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ এবং শাসন-যন্ত্র ঠিক এবং দ্রুত পরিচালন করা তাঁহাদের সকলেরই নিকট অসম্ভব ছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান মারাঠারা এক অতুলনীয় সম্পদে ধনী। মাত্র তিন পুরুষ আগে তাহাদের জাতি শত শত যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিল,দৌত্যকার্য্য ও সন্ধির তর্ক ষড়যন্ত্র-জালে লিপ্ত হইয়াছিল, রাজ্যের রাজস্ব-চালনা আয়ব্যয়-নির্ব্বাহ করিয়াছিল, সাম্রাজ্যের নানা সমস্যা সমাধানের

জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা যে-ভারতের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা এখন সেই ভারতেরই অধিবাসী। এই-সব কীর্ত্তির স্মৃতি প্রতি মারাঠার অন্তরে অবর্ণনীয় তেজের সঞ্চার করে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধীর শ্রমশীলতা, সরল চালচলন, মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য প্রাণের টান, যাহা উচিত বলিয়া জানি তাহা করিবই—এই দৃঢ়পণ, ত্যাগস্পৃহা, চরিত্রের দৃঢ়তা, এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্যে বিশ্বাস,—এই-সব গুণে মারাঠী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের অপর কোন জাতি হইতে কম নহে, বরং অনেকস্থলে শ্রেষ্ঠ। হায়! সেই সঙ্গে তাহাদের যদি ইংরেজের মত অনুষ্ঠান-গঠনে ও বন্দোবস্তে দক্ষতা, সকলে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিবার শক্তি, লোককে চালাইবার ও বশ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা দূরদৃষ্টি, এবং অজেয় বিষয়-বুদ্ধি (common sense) থাকিত, তবে ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরূপ হইত।

নিষ্ফল ক্রোধ

শ্রী প্রমথনাথ রায়

(Gustave Flaubert-এর ফরাসী হইতে)

মুশা গ্রাম সুপ্তির স্পর্শে শান্ত নিস্তব্ধ আকার ধারণ করিয়াছে। একে একে সকল গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, শুধু গ্রামের ডাক্তার মঁশিয়ে ওলাঁর গৃহে তখনো একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে।

সবেমাত্র গির্জ্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝড়ের বেগে পাহাড় হইতে বাতাসে বরফের ঢেলা ছুটিয়া আসিতেছে, ছাতের উপরে শিলাপাতের শব্দ হইতেছে।

যে-গৃহ হইতে আলোক আসিতেছিল সেই গৃহের একটি কক্ষে একজন স্ত্রীলোক বসিয়া। বয়সের চাপে তাহার শরীর বাঁকিয়া গিয়াছে, ত্বকে কুঞ্চন সুরু হইয়াছে। বসিয়া সেলাইয়ের কাজ করিতে করিতে সে এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, বারবার তাহার চক্ষু বন্ধ হইয়া আসিতেছে এবং মস্তক সম্মুখের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও বাতাসের বেগে সজাগ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিমনীর পার্শ্বে সরিয়া গিয়া হাত দুইটা আড়াআড়ি ভাবে আগুনের উপর রাখিয়া সে নিজেকে একটু উষ্ণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

যে-সকল স্ত্রীলোক আমরণকাল প্রভুপরিবারে থাকিয়া সততার সহিত প্রভুর সেবা এবং তাঁহার সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, এ বৃদ্ধা তাহাদেরই একজন।

সে মঁশিয়ে ওলাঁর জন্ম দেখিয়াছে; পূর্ব্বে সে তাঁর আয়া ছিল, বর্ত্তমানে পরিচারিকার কাজ করে। তাহার মনিব সেই যে সকালবেলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন এখন পর্য্যন্ত ফিরেন নাই। তাঁহারই জন্য এক্ষণে সে আগুনের পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি জাগিয়া পাহাড়ের উপর বাতাসের গর্জ্জন শুনিতেছে; আর নানা আশঙ্কায় তাহার মন কাঁপিয়া উঠিতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে তার সোনার শৈশবে, পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে অগ্নিপার্শ্বে সমবেত হইয়া, অন্ধকারে শীতের রাতে পাহাড়ে সংঘটিত যে-সকল রোমাঞ্চকর খুনের কাহিনী এবং প্রেতের গল্প শুনিতে শুনিতে তাহার বালিকা-হৃদয় আনন্দে আন্দোলিত হইয়া উঠিত, এক্ষণে বিষন্ন অন্তঃকরণে সে অতীতের সেই সকল কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসনেত্রপটে তাহার সারা জীবনের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। স্বগ্রামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে বৈচিত্র্যহীন-ভাবে এই সুদীর্ঘ জীবনের সমস্ত দিন কাটিয়া গিয়াছে,

কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে দুঃখ, বেদনা কিংবা অনুরাগের অভাব নাই।

বাহিরে একটা কুকুরের কাতর ডাক এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। "এসেছে!" এই বলিয়া সে চমকিতভাবে চেয়ার ছাড়িয়া ছুটিয়া দরজার কাছে গেল। অল্পক্ষণ পরে দ্বারদেশে একজন পুরুষের চেহারা ভাসিয়া উঠিল। বরফে তাহার পরণের প্রকাণ্ড বাদামী ক্লোকটা সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি বলিলেন—"আগুন আন, বার্থা, আগুন আন! শীতে মারা গেলাম।"

বার্থা বাহির হইয়া গেল এবং ক্ষণকাল মধ্যে একবোঝা জ্বালানি কাঠ সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। চিমনীতে কয়লার তখনো সামান্য উত্তাপ ছিল, তাহা দ্বারাই সেগুলিকে জ্বালান হইল। মঁশিয়ে ওলাঁ ক্লোকটা খুলিয়া ফেলিয়া আগুনের সম্মুখে বসিলেন এবং সাদরে তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট কুকুরের পিঠটা চাপড়াইয়া দিলেন। বেচারা বিষণ্ণনেত্রে মনিবের দিকে চাহিয়া তাঁহার সিক্ত হাত দুইটা চাটিতে লাগিল।

বার্থা প্রশ্ন করিল—"আপনার দাঁতের অবস্থা এখন কেমন?"—

"খারাপ, বড় খারাপ! পাহাড়ের এই ঠাণ্ডা হাওয়া আমাকে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। গত চার রাত্রি ধরে এক মিনিটের জন্য ঘুমুতে পারিনি। আজ রাত্রেও ঘুম হবে না।"

—"এই ফক্স!" ডাক শুনিয়া কুকুরটা নিজের শরীরটা মনিবের পায়ের কাছে বিস্তৃত করিয়া দিয়া কণ্ঠ হইতে এক প্রকার অদ্ভুত স্বর বাহির করিতে লাগিল।

—"চুপ কর্, ফক্স, চুপ কর্।"

ধমক খাইয়া বেচারা ব্যথিত জীবের মত গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

—"চুপ!"—বার্থা আবার বলিল—"চুপ!" এবং নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে পা দ্বারা ঠেলিয়া দিল।

মঁশিয়ে ওলাঁ বলিলেন—"ওকে চুপ করতে বলছ কেন? ওর মেজাজ এখন ভাল না; একে সে ক্লান্ত তার উপর ক্ষুধিত।"

—"এই নে!" বলিয়া বার্থা চিমনীর পার্শ্বে অবস্থিত একটা আলমারীর ভিতর হইতে এক টুকরা রুটি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। ফক্স একবার ছলছলনেত্রে রুটিটার দিকে চাহিল, তারপর সুন্দর কালো মস্তকটি ফিরাইয়া বিষণ্ণভাবে মনিবের দিকে চাহিয়া রহিল।

মঁশিয়ে ওলাঁ বলিলেন—"কি হয়েছে তোর?"

বার্থা বলিল—"অসুখ করে থাকবে।"

মঁশিয়ে ওলাঁ—"হাঁ, তাই।"

বার্থা—"ক্ষিধে পেয়েছে? কি খাবেন?"

মঁশিয়ে ওলাঁ—"আমি? কিচ্ছু না—আমি শুতে চল্লুম, ঘুমে হবে কিনা জানিনে, তবে এখনো কয়েকটা আফিংএর গুলি আছে, তা' দিয়ে চেষ্টা করে দেখব। আচ্ছা আসি এখন। বার্থা, আগুন নিবিয়ে ঘুমোতে যাও। ফক্স, তুই তোর কোণে যা।"

এই বলিয়া তিনি দরজা খুলিলেন। ফক্স মনিবের আদেশ অমান্য করিয়া তাহার পিছনে চলিল। কিন্তু মঁশিয়ে ওলাঁ তাহাকে ফেলিয়াই দ্রুতবেগে উপরে নিজের কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং জ্বর-রোগীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় শুইয়া আফিং গিলিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বার্থা স্বীয় কক্ষে নিদ্রা গেল, কিন্তু বেচারা ফক্স সিঁড়ির কাছে শুইয়া কাতর আর্ত্তনাদ দ্বারা মাঝে মাঝে তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। ক্রমে বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল, বরফপাত বন্ধ হইল এবং মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র উঠিল।

পরদিন প্রাতে বেলা এক প্রহরের সময় বার্থা নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া উপাসনান্তে হলঘরে আসিয়া দেখিল, মঁশিয়ে ওলাঁর দরজা তখন পর্য্যন্ত বন্ধ। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বেচারী আজ কত ঘুমুচ্ছে! কিন্তু এখনই হয় ত আবার বাইরে যাবে।"

এমন সময় প্রতিবেশী ডাক্তার বার্ণাডো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"উনি কোথায়?"

বার্থা উত্তর দিল—"ঘরেই। গিয়ে দেখুন না, কি

ঘুমটাই আজ ঘুমুচ্ছেন।" বার্ণাডো ভিতরে গিয়া ডাকিলেন—"উঠুন, আর কত ঘুমুবেন, বেলা হয়েছে যে!"

মঁশিয়ে ওলাঁর নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার মস্তক বিছানা হইতে সরিয়া গিয়াছিল এবং হস্তদ্বয় পালঙ্কের বাহিরে শূন্যে ঝুলিতেছিল। বার্ণাডো নিকটে গিয়া তাঁহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিলেন—"বাপরে; যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা!"

ধাক্কা খাইয়া মঁশিয়ে ওলাঁর কলেবর প্রথমটা সরিয়া গিয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল। আশঙ্কায় বার্ণাডোর মুখ পাংশু হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া দেখিলেন সেগুলি ঠাণ্ডা। মুখের কাছে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন নাসিকা শ্বাসপ্রশ্বাসহীন। বুকের উপর আঙ্গুল রাখিয়া দেখিলেন তাহা স্পন্দনরহিত। বার্ণাডো দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বার্থা তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না, শুধু দেখিল তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত পাংশু এবং ঠোঁট দুইটা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে।

ঘণ্টাখানেক পরে দশ-বারজন ডাক্তার শান্ত এবং বিষণ্ণভাবে মঁশিয়ে ওলাঁর শয্যার চারিদিকে দাঁড়াইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল—"এঁর মৃত্যু হয়েছে!" ইহাদের ভিতর মাত্র একজনের মনে সন্দেহ হইল, বোধ হয় তিনি নিদ্রিত, কিন্তু প্রমাণাভাবে স্বীয় অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া সেও অবশেষে অন্য সকলের সঙ্গে মত দিল।

সেদিন সারা গ্রামে কি বিষণ্ণতা! গ্রামের সকলের পিতৃতুল্য হিতার্থী বন্ধু যে ছিল সে আর নাই! তাহার জন্য প্রতি গৃহের দরজা বন্ধ, প্রত্যেক ব্যক্তি বেদনায় মূক; তাহার জন্য শিশুদের মুখ হাস্যহীন, বৃদ্ধদের চক্ষে জল। অতি মিহি কণা কণা বৃষ্টি পড়িতেছিল, বরফে বরফে গ্রামের রাস্তা সকল সাদা হইয়া গিয়াছিল। সেই বৃষ্টি আর বরফের ভিতর দিয়া শব লইয়া সকলে সমাধিক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকজন লোক শোকচিহ্নস্বরূপ কালো পোষাক পরিয়া সর্ব্বাগ্রে শবাধার বহন করিয়া লইয়া চলিল, পশ্চাতে শিশুরা নীরব বিস্ময়ে অনুগমন করিতে লাগিল; পুরোহিতগণের অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠ হইতে নিম্নস্বরে গীতধ্বনি উঠিতে লাগিল।

কিন্তু এই শোকাভিভূত শব-যাত্রার ভিতর যে-প্রাণীর অন্তঃকরণ সেদিন মৃতের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ অনুভব করিয়াছিল, সে কোন স্ত্রীলোক কিংবা শিশু কিংবা মৃতের কোন আত্মীয়-বান্ধব নয়, সে একটা সামান্য কুকুর মাত্র! বেচারী ফক্স মানুষের মত অশ্রুসজলনেত্রে, অবনত মস্তকে, কাতরধ্বনি করিতে করিতে অন্য সকলের সঙ্গে তার প্রিয় মনিবের শবানুগমন করিতেছিল।

সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সকলে মৃত আত্মার সদ্গতির জন্য শেষ প্রার্থনা করিল। নির্জ্জনস্থান কিছুক্ষণের জন্য এতগুলি লোকের সমবেত কণ্ঠস্বরে মুখর হইয়া উঠিল। অবশেষে মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক অনন্ত-কালের জন্য শবাধারটিকে ভূগর্ভে রক্ষিত করিয়া ইহার উপর মাটি চাপা দেওয়া হইল।

ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে সকলে যেমন আসিয়াছিল তেমন ফিরিয়া গেল। সমাধিক্ষেত্র আবার নিস্তব্ধ আকার ধারণ করিল। কেবল একটি প্রাণী সে স্থান পরিত্যাগ করিল না, সে ফক্স। শোকবিধুর কুকুর তার মৃত মনিবের সমাধিপার্শ্বে মাটিতে শুইয়া, যাহারা কুয়াসার ভিতর দিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিল, বিষণ্ণনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি আসিল। সুন্দর, শশী-সনাথ রাত্রি। ম্লান জ্যোৎস্না সমাধিভূমির প্রস্তরখণ্ডগুলিকে চিক্কণ শুভ্র শোভায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। সেই চন্দ্রালোকিত রাত্রে সমাধি-ক্ষেত্রে মৃত্তিকানিম্নে শবাধারের ভিতর শুইয়া মঁশিয়ে ওলাঁ নিদ্রার ঘোরে নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার চোখের সম্মুখে সুদূর প্রাচ্য দেশের ছবি ভাসিয়া উঠিল। সেই সুদূর সুন্দর প্রাচ্যদেশ, যেখানে শত শত মসজিদ মন্দিরের স্বর্ণশিখরসমূহ নিষ্কলঙ্ক নীলিমাতলে উজ্জ্বল দিবালোকে ঝিকঝিক করিতে থাকে; যেখানে নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতর পুষ্পসুরভি প্রবেশ করিয়া মন-প্রাণ মাতাল করিয়া দেয়; যেখানে উচ্চ তালিবনশ্রেণী চারিদিকে ছায়া নিক্ষেপ করিয়া ভূমিকে সর্ব্বদা সুশীতল করিয়া রাখে, আর সেই সুশীতল ভূমির মসৃণ তৃণের উপর দিয়া নিরীহ মৃগশিশুসকল নির্ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন

দেখিতেছেন দেবদূতগণ শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া প্রেরিত পুরুষের কাণে কাণে কোরাণের গান গাহিতেছে, সুন্দরী শ্যামাঙ্গী যুবতীগণ বুলবুলগীতমুখর দ্রাক্ষাচ্ছাদিত কুঞ্জবনে বিহার করিতে করিতে তাহাদের বিশালায়াতন নেত্রপ্রান্ত হইতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।...এইরূপ কত স্বপ্ন তাঁর মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া আনাগোনা করিতে লাগিল! কিন্তু হায়, এ সুখস্বপ্ন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, কঠোর বাস্তব জগতে পুনরায় তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষু মেলিয়া তিনি অনুভব করিলেন দীর্ঘকাষ্ঠখণ্ড তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি কম্পিত হস্তে স্পর্শ করিয়া দেখিলেন শিয়রের দিকে এবং দুইপার্শ্বে কেবল কাঠ। শরীরে হাত দিয়া দেখিলেন শরীর বস্ত্রহীন। সহসা তাঁহার মনে ভয় হইল, একবার বোধ হইল তিনি যেন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, পর মুহূর্ত্তে মনে হইল যেন বুকের উপর কঙ্কালের হাড় অনুভব করিতেছেন। বাস্তব অবস্থা হইতে মনকে দূরে রাখিবার জন্য, কঙ্কালের চিন্তাটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া পুনরায় স্বপ্ন দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিদ্রাক্লান্ত চক্ষু শত চেষ্টা করিয়াও আর মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পারিলেন না।

ভয়ের মাত্রা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে বিস্ময় তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজেকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য তিনি বলিতে লাগিলেন—"না! না! এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমনভাবে কবরের ভিতর অনাহারে নিরাশায় মারা যাওয়া—কি ভয়ানক!"—এই বলিয়া চারিপাশে হাতড়াইতে লাগিলেন।—"আমি কি পাগল হয়েছি? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? এ কি কাঠ? হাঁ, এই ত আমার পালঙ্ক। এর উপরেই ত আমি প্রতি-রাত্রে নিদ্রা যাই। এ বস্ত্র কিসের? ও, এ যে আমার পরণের কাপড়...কিন্তু এ যে নরম! এ যে কবর! এ যে জীবন্ত সমাধি!..." এই বলিয়া তিনি বিকটভাবে হাসিয়া উঠিলেন।

কবরের শৈত্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ হইতে লাগিল, এমন বোধ হইল যেন জ্বর হইবে। আঙ্গুলের গ্রন্থিতে বেদনা অনুভূত হইল, তিনি চক্ষের কাছে হাত তুলিয়া ধরিলেন, কিন্তু এমন অন্ধকার যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঠোঁটের কাছে রক্তের গন্ধ টের পাইয়া স্থির করিলেন নিশ্চয় শবাধারের পেরেকে আঁচড় লাগিয়া সে স্থান কাটিয়া গিয়াছে।

"মারা যেতে হবে! এমন অসহায়ভাবে মারা যেতে হবে! না, সে হতে পারে না। আমি এই নরকের ভিতর থেকে, এই শবাধারের ভিতর থেকে বাহির হব। হায়, মৃত্যু! ভাবিতেও কেমন লাগে। এই সুন্দর পৃথিবীর শ্যামলতার উপর দিয়ে আর আমার এই বিমুগ্ধ দৃষ্টি ভেসে বেড়াবে না। এই মনোহারিণী প্রকৃতি, ঐ প্রান্তর, ঐ আকাশ, ঐ গিরিমালা—আর আমি তাদের দেখ্‌তে পাব না। আমি তাদের চিরদিনের মত ত্যাগ করে চলেছি!" এই বলিয়া মনোবেদনায় তিনি সর্ব্বাঙ্গ মোচড়াইতে লাগিলেন।

ক্রোধে তাঁহার কান্না আসিল, তিনি চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। হায় যদি কেহ সে সময় দেখিতে পাইত কত করুণ অশ্রু তাঁহার চক্ষু হইতে হাতের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছিল! কি কাতর রোদনধ্বনি সেই কবরের ভিতর বিলীন হইয়া গিয়াছিল! শবাধার ভাঙ্গিবার জন্য তিনি নিদারুণভাবে ইহার গাত্রে আঘাত করিতে লাগিলেন। যে বস্ত্রখণ্ডদ্বারা তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল, নখদ্বারা তাহা ছিঁড়িতে লাগিলেন, দাঁত দিয়া তাহা কুচি কুচি করিয়া কাটিতে লাগিলেন। তাঁহাকে যেমন জোর করিয়া কবরের ভিতর চাপা দেওয়া হইয়াছিল, যেন তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি এক্ষণে এমন করিতেছিলেন।

কিন্তু সে কঠিন কাষ্ঠখণ্ড অত্যন্ত সুদৃঢ় বোধ হইল। অবশেষে ক্লান্ত দেহে, আশাহীন হৃদয়ে, চক্ষু বন্ধ করিয়া তিনি ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

সহসা কবরের ভিতর তাঁহার নিরাশান্ধকার হৃদয়ে আশার ক্ষীণ জ্যোতিঃ রেখা দেখা দিল। কবরের উপর মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন, মনে হইল কেহ যেন তথাকার মাটি খুঁড়িতেছে। পদধ্বনি ক্রমেই স্পষ্টতর

বোধ হইতে লাগিল। আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, করজোড়ে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন—"হে ভগবান! তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ, তুমি কি আমাকে রক্ষা করবে না? এই শীতল অন্ধকার কবরের ভিতর থেকে আমাকে উদ্ধার কর প্রভু! মৃত্যু একদিন আছে সত্য, কিন্তু এখনো ত আমার মরণের বয়স আসেনি! আমি বাঁচতে চাই। বেঁচে থাকা এত সুখের, জীবন এমন আনন্দময়!" এই বলিয়া হর্ষাবেগে তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে লগিলেন।

কবরের উপর কোন মানুষ যে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, এ সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। নিশ্চয় কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই কবরের ভিতরে কোন জীবিত মনুষ্যকে গোর দেওয়া হইয়াছে সন্দেহ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তার মঙ্গল করুন। তাঁহার বক্ষস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, আনন্দে তিনি না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সম্ভব হইলে হয় ত তিনি লাফাইয়া উঠিতেন।

পদধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রমে দূরে সরিয়া গেল। সমস্ত পুনরায় নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল।

মঁশিয়ে ওলাঁ কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু আর কোন শব্দ কানে আসিল না। আবার শুনিতে চেষ্টা করিলেন, কিছুই শুনিলেন না। হায়! তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চিত! ক্রমে তাঁহার মন স্বর্গ সম্বন্ধে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল এ-সব দুর্ব্বল মানুষের আবিষ্কৃত কথার কথা মাত্র। না হইলে তিনি এমন কাতরভাবে ডাকিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন না কেন? সন্দেহ ক্রমে ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত হইল। এতদিন ধরিয়া তিনি এই দুইটা অর্থহীন শব্দে এমন আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছেন মনে করিয়া বিদ্রূপের স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—"দুঃখের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কোথায়? তিনি যদি থাকেন তা' হলে এ সময় আমাকে উদ্ধার করতে আসছেন না কেন? যারা সুখী তারাই ঈশ্বরের উদ্ভাবন করেছে। আমি তাঁকে মানিনে। ওটা একটা অন্ধ শক্তিরই নামান্তর মাত্র।"

ক্ষোভে, ক্রোধে, অবিশ্বাসে, দুর্ব্বলতায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন, নখদ্বারা মুখমণ্ডল আহত করিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর! তুমি মনে করেছ আমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে আমি তোমার কাছে কাতর-ভাবে প্রার্থনা করব? না। আমি অনেক ভুগেছি, অনেক সয়েছি। তোমার কাছে আমি প্রার্থনা জানাব না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি! পরকাল? আমি পরকাল মানিনে! স্বর্গ? সে ত মানুষের কল্পনা মাত্র! স্বর্গসুখ? কে তা চায়? নরক?—সেখানে যাবার সাহস আমার আছে!"

হাসি ও অশ্রুতে তাঁহার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। তথাপি তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কোথায় তুমি ঈশ্বর? যদি তুমি থাক তবে এসে আমাকে উদ্ধার কর না কেন? সত্যি যদি তুমি থাক তবে কোন্ অপরাধে আমাকে অমন অবস্থায় ফেলেছ? আমাকে এমনভাবে যন্ত্রণা পেতে দেখে তোমার কি আনন্দ হয়? আমি দুর্ভাগ্য, তাই তোমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলাম। আমার জীবন ফিরিয়ে দাও, আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দাও, তুমি ত দেখ্ছ, আমি কি যন্ত্রণা ভোগ করছি, কি কাঁদন কাঁদ্ছি। আমার এ দুঃখের অবসান কর, এ অশ্রু নিবারণ কর প্রভু!"

তিনি চুপ করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য এক্ষণে মনে মনে তাঁহার ভয় হইল। কবরের উপর তিনি তাঁর প্রিয় কুকুরের কাতর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে হয় ত প্রভুর মৃত্যুশোকে কাতর হইয়া কিংবা তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া এই শব্দ করিতেছিল। শব্দ শুনিয়া তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"বেচারী বন্ধু আমার!"

অবরুদ্ধ স্থান হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বারবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে আর একবার শেষবারের মত চেষ্টা করিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন—"ঈশ্বর, তুমি যদি আমাকে উদ্ধার

না কর, তাহলে আমি নিজের চেষ্টাতেই বাহির হব।” এই বলিয়া উপুড় হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা তিনি শবাধারের বিরুদ্ধে ধাক্কা দিতে লাগিলেন। অবশেষে শবাধার সামান্য উন্মুক্ত হইল। মুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি বিজয়োল্লাসে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু শবাধার ঈষৎ উন্মুক্ত হইলেও উপরে ছয় ফিট উচ্চ যে মাটি চাপা ছিল, আর সামান্য অঙ্গ চালনা করিলেই সেই মাটি নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিত। মঁশিয়ে ওলাঁ এই নূতন বিপদ লক্ষ্য করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে নিশ্চেষ্ট দেহে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে মরিয়া হইয়া হয় মৃত্যু, না হয় মুক্তি পণ করিয়া পুনরায় ধাক্কা দিলেন।

অতি সহিষ্ণু ব্যক্তির সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। পুরাতন হইলেও প্রবাদটি যে সত্য তাহাতে ভুল নাই। কারণ মঁশিয়ে ওলাঁর কুকুরটা কবরের উপরে বসিয়া এমন চীৎকার করিতেছিল যে, কবরখানার খনক আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য সেখানে আসিয়া দেখিল কবরের মাটি ঈষৎ নড়িতেছে। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটির নীচে শবাধারটা ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—“চমৎকার ঘটনা, নিশ্চয় এর ভিতরে কিছু ঘটেছে!” এই বলিয়া সে শবাধার উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, মঁশিয়ে ওঁলার মৃতদেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মাথাটা ঘাড় ভাঙ্গিয়া একেবারে বুকের নীচে চলিয়া গিয়াছে।

পরে মাঝে মাঝে সে যখন গ্রামের লোকদিগের বৈঠকে বসিয়া সাহসের গর্ব্ব করিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিত, তখন বলিত—“সে চেহারা যদি দেখ্‌তে! আমি যে এমন সাহসী, আমি যখন প্রথম দেখেছিলাম, ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। বড় বড় চোখদুটা গর্ত্ত থেকে বের হয়ে এসেছে, ঘাড়ের শিরাগুলি ফুলে তারের মত শক্ত হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটা কোণের কাছে উপরের দিকে উঠে গেছে, কাঁধের ভিতর দিয়ে দাঁতগুলি এমনভাবে বেরিয়ে আছে যে, দেখে মনে হয় যেন মৃত্যুকালে বিকট ভাবে হাসছিল।”

কুকুরটা এবং বেচারী বার্থার কি হইল বোধ হয় আপনারা জানিতে চাহিতেছেন। কুকুরটা এই ঘটনার পর সমাধিক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া যায় এবং কয়েক দিন পরে এক শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করে। বেচারী বার্থার কথা আর কি বলিব। মঁশিয়ে ওঁলার মৃত্যুর পর হইতে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়। গ্রামের বালকেরা তাহাকে পাগলী বলিয়া ডাকিত। রাত্রে, সুন্দর জ্যোৎস্নালোকে, বাতাস যখন পাহাড়ের উপর গর্জ্জন করিয়া ফিরিত, তুষারপাতে সবুজ পৃথিবী যখন সাদা হইয়া যাইত, লোকে মাঝে মাঝে দেখিত একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে সমাধিক্ষেত্রের রাস্তা ধরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। অবশেষে একদিন সে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, ইহার পর আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

২২

কয়েক দিবস কাটিয়া গেল। প্রকাশ সারাদিন কলের কাজ দেখিতে লাগিল, দুপুর বেলা একটিবার বাড়ী গিয়া আহার সারিয়া তখনি আবার কলে ফিরিত। বাড়ী থাকিতে সে এখন কেমন সঙ্কোচ বোধ করিত। তাহার মনে হইত, সে একজন আগন্তুক, বাড়ী-ঘর কিছুই তাহার আপনার নহে—নিতান্ত নির্লজ্জের মত এখানে চড়াও করিয়া বসিয়া পরের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছে! বৈকালে গাড়ী চড়িয়া বেড়ান সে একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। সন্ধ্যাকালে শহরের অপর্য্যাপ্ত ধূলার মধ্য

দিয়া সে একলা হাঁটিয়া চলিত, কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সময় তাহার পা যেন আর অগ্রসর হইতে চাহিত না। এক-একবার তাহার ইচ্ছা হইত, সব ছাড়িয়া দিয়া আবার দেশে পলাইয়া যায়, যেমন ছিল তেমনি ভাবে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু কোন্ যাদুমন্ত্রে সে যে ঐ কলটির কাছে বাঁধা পড়িয়াছিল, ইহাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইবার কল্পনাও সে সহিতে পারিত না। এ যেন তাহারি একটা জীবন্ত সৃষ্টি! ইহার বৃহৎ বাষ্পপূর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড, শিরার মত অসংখ্য নলকূপ হইতে বাষ্প-রক্ত প্রবাহিত—ক্রোধ-লালসা, ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুক্ত দুর্ম্মদ বর্ব্বর! ইহা ছাড়া আরও একটি বাধা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইত। এ সকল ত্যাগ করিয়া লাভ কি? ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে ওজন করিয়া সে দেখিল অণিমার যতদূর ক্ষতি সম্ভব তাহা ত হইয়াছে—তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করিবে সে কোন্ বিচারে? এখন তাহার মনে একটা নূতন সংশয় আসিয়া দেখা দিয়াছিল। চিরদিন সে আপনাকে বুঝাইয়া আসিয়াছে, অণিমাকে সে ভালবাসে এবং ভালবাসে বলিয়াই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। সে কি শুধু একটা মন-বোঝান কথার কথা? কিন্তু তাই যদি না হইবে, তবে অণিমাকে সে আর আগের চোখে দেখিতে পারিতেছে না কেন? সমগ্র স্ত্রীজাতি হইতে পৃথক করিয়া তাহার অন্তর একদিন ইহাকে নিতান্তই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল—কোথায় গেল তাহার সেই ভালবাসা? না, সেই স্বপ্নের ঘোর এখন সত্যই কাটিয়া গিয়াছে?

আজকাল প্রকাশ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বারান্দায় বসিয়া বই পড়িত। অণিমা ঘুমাইলে পা টিপিয়া ঘরে গিয়া পাশটিতে শুইত, তাহাকে জাগাইত না। বর্ষারম্ভে মেঘে মেঘে আকাশ তখন কালো হইয়া উঠিয়াছিল। চাঁদ নাই, তারা নাই—গাছের তলায় তলায়, ঝোপে-ঝাড়ে রাশি রাশি অন্ধকার। চারিদিকে ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝির শব্দ আর ভিজা ঘাসের উগ্র গন্ধ। ঝিল্লিরবে ঘাসের গন্ধে প্রকাশের নিদ্রা আসিতে লাগিল, সে চক্ষু দুটি জোরে ঘসিয়া শরীরটা একবার নাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া আবার বইখানি তুলিয়া লইল। সবেমাত্র অণিমা আহার করিয়া আসিয়াছে। হয় ত এখনো ঘুমায় নাই—প্রকাশ ঘরে গেল না। সারাদিনের পরিশ্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, দেখিতে দেখিতে অক্ষরগুলি আবার মুছিয়া আসিতে লাগিল। তখন সে বই বন্ধ করিয়া ইজিচেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিল।

সে যে কতক্ষণ এইরূপে ঘুমাইয়া রহিল তাহা সে জানিতে পারে নাই। একটি কোমল হাতের স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল অণিমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। টিপয়ের উপর বাতিটা তখনো জ্বলিতেছিল—বাতির দীর্ঘ উজ্জ্বল রশ্মি অণিমার মুখের উপর পড়িয়া ম্লান রেখাগুলি গভীর করিয়া আঁকিয়া দিয়াছিল।

সে কহিল,—শোবে চল। অনেক রাত হয়েছে।

লজ্জিত হইয়া প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—হাঁ চল, শুইগে। সে আর কিছু বলিল না—সোজা গিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। অনেক দিন পরে আজ এই প্রথম কথা। তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া অণিমার চোখ দুটি বাষ্পাকুল হইয়া আসিতেছিল। ক্ষণকাল প্রকাশের পাশে নীরবে বসিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল,—ওগো আমি মাপ চাইচি। তুমি আমায় এমন করে শাস্তি দিও না।

অভিমান, অনুতাপ, আবেগ—এই তিনটি তারই সেই কণ্ঠস্বরে ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া গেল। প্রকাশ চমকিয়া উঠিল। তাহার মনের ভিতর আবার দ্বন্দ্ব জাগিতেছিল। উপেক্ষা, অনাদর, বিরাগ দিয়া এই যে সে তাহাদের স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিতে বসিয়াছে, ইহাই কি ঠিক? কেন, অণিমার অপরাধ?

অণিমা আবার বলিল,—না বুঝে একটা কথা বলেচি, তার কি মাপ নেই?

সে কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রকাশ কহিল,—সত্যি বল্‌চি অণিমা, তোমার উপর আমার কোন রাগ নেই।

রাগ নাই!—তবে কেন সে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইবে, যেন এ বাড়ীর সে কেহ নহে? প্রকাশ কি

মনে করে, তাহার এই ভাবান্তর অণিমা লক্ষ্য করে নাই ? না, অত অন্ধ সে নয়। তাহার কথাগুলি প্রকাশের মনে আঘাত করিয়াছে, তাহা সে বুঝে। ছি ছি, কেন ওসব কথা সে বলিয়াছিল ? কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, স্বামীর মনে ব্যথা দিবার জন্য সে বলে নাই। সমীচীন সীমা ছাপাইয়া সে যেমন সেদিন স্বামীর প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই, এখন আবার তেমনি স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া মার্জ্জনা-ভিক্ষা করিতে অন্তরে অন্তরে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ভিতর ব্যাপারটা যে আগাগোড়াই অস্বাভাবিক। একটা কাল্পনিক প্রতারণার কথা বলিয়া তাহাকে পরীক্ষা করা প্রকাশের পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক, আবার তাই লইয়া সে যে দুরন্ত অভিমান করিয়াছিল, তাহাও ত তেমনি অদ্ভুত। প্রকাশ এমন অদ্ভুত পরীক্ষা করিল কেন ?

প্রকাশ বলিতে লাগিল, কি জান অণিমা, অনেক সময় আমরা পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারি না, কখনো বা ভুল বুঝি। তোমার প্রবন্ধটি পড়ে তোমায় যেমন বুঝতে পেরেছিলুম, এমন কখনো বুঝিনি। তুমি সত্যি বলেচ অণিমা—আমরা বড় স্বার্থপর। স্বার্থের জন্য না করতে পারি এমন কাজ নেই।

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। বিষণ্ণদৃষ্টিতে সে অণিমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সহসা অণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রবন্ধের কথা মনে পড়িতে সে যেন বুকের ভিতর একটা বিছার কামড় অনুভব করিল। স্বামীর সেবা, সন্তানপালন যেখানে সংসার-ধর্ম্ম, সেখানে লক্ষ লক্ষ নারীর মত তাহাকেও যে এই শাশ্বত ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে! মিছা সে অধিকার দাবী করিয়াছে, জগতে অধিকারই কি সব ?

দেরাজ খুলিয়া অণিমা কাগজগুলি বাহির করিল। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—এখনো মাসিকে পাঠাও নি যে ?

—না।

—কেন ?

অণিমা জবাব দিল না, প্রবন্ধটির পাতা উল্‌টাইয়া দেখিতে লাগিল। ছত্রে ছত্রে প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস, এখন যেন তাহা নিজের কাছেও বিকারগ্রস্তের বিকট প্রলাপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শুধু একটা উদ্দাম অভিমানই না তাহাকে এই অস্বাভাবিক ভাবের পথে চালাইয়া লইয়া আসিয়াছে ? নারীজাতিকে দেখিতে গিয়া সে আপনাকে দেখিয়াছে, ভাবিতে গিয়া আপনাকে ভাবিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ দুই হাতের আঙুল দিয়া কাগজগুলি জোরে চাপিয়া ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

প্রকাশ অবাক হইয়া গিয়াছিল,—ও কি ছিঁড়ে ফেল্লে যে ?

অণিমা শুধু বলিল,—ছি !

দুইজন পাশাপাশি শুইয়া রহিল, কাহারো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রকাশ মনে মনে অণিমার যে সরল সাহসী মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিমেষমধ্যে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। মেঘজাল আবার ঘিরিয়া আসিল—অণিমার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনগুলি প্রকাশের কাছে বড়ই রহস্যপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। সাধারণ রমণীর মত পরের উপর একান্ত নির্ভরশীলা, অণিমার এই নূতন ভাবান্তর এখন সে নিজের মনের সহিত কোনমতে আর মিলাইয়া লইতে পারিল না। সে যেন অণিমার সেই দৃপ্ত তেজস্বী রূপই দেখিতে চাহে, সামান্য সেবাদাসীর মত আর তাহাকে লাভ করিতে চাহে না। বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া অণিমা কাঁদিতেছিল, প্রকাশ বাধা দিল না। উপরে আষাঢ়ের আকাশ ভাঙিয়া বারিধারা তখন নামিয়া আসিতেছিল। সেই কালো আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের তরল রেখাগুলি চারিদিকে ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল।

সকাল-বেলা কলের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, রোজ যেমন বাজে। কারখানার পাশেই কুলির বস্তি। আপন আপন ছোট কুঠরি হইতে মজুরেরা বাহির হইয়া পড়িল। শুষ্ক মুখ, চোখে তখনো ঘুমের ঘোর লাগিয়া আছে—সম্মুখে পূরা একটা দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বোঝা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

কলের মিস্ত্রি ইব্রাহিম ৩নং ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে

আসিল। ভিতরে স্যাঁৎসেতে মেজের উপর চাটাই, এক কোণে কয়েকখানা পিতলের বাসন, মাটির হাঁড়ি এবং একটি কলাই-করা বদ্‌না। একখানা জীর্ণ তৈলসিক্ত নোংরা কাঁথা চাটায়ের উপর বিছানো, সেখানে তিন-চারিটি ছেলে-মেয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ইব্রাহিমের স্ত্রী সোফি জিজ্ঞাসা করিল,—আজও নাস্তা করে যাবে না?

—না, তুই এক বাটি চা দে,—বলিয়া ইব্রাহিম সিঁড়ির উপর বসিয়া মুখ ধুইতে লাগিল।

কুলির দল সারি সারি কাজে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইব্রাহিমকে সম্ভাষণ করিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিল, সে কেমন আছে। একজন কহিল,—চাচা, তোমার ছুটির কতদূর হল?

ইব্রাহিম কহিল,—রেখে দাও ছুটি। যেদিন খোদা ছুটি দেবেন, সেইদিন মিল্‌বে। তোমার আমার ছুটি কোথায়? খাটতে এসেচি, খেটেই যাব।

তাহারা চলিয়া গেল। চৌকাঠের উপর ইব্রাহিম চায়ের বাটি লইয়া বসিল, চা পান করিতে করিতে বলিল,—কি জানিস্ সোফি, আমি কি আর নিজের জন্য ভাবি? ভাবনা কেবল তোর জন্য আর ওই বাচ্চাগুলোর জন্য। এমন করে ক'দিনই বা কাজ করবো? মুনিবের যথেষ্ট অনুগ্রহ, তাই এখনো তাড়িয়ে দেয়নি।

স্ত্রী কহিল,—আজ আবার বাবুকে ছুটির জন্যে বল।

হঠাৎ ইব্রাহিম জ্বলিয়া উঠিল,—আরে থাম্ মাগী। ছুটি ছুটি করে তোরা আমায় একেবারে অস্থির করে তুলেচিস। একজন ভাল মিস্ত্রী পাওয়া না গেলে ছুটি হবে কেমন করে? মুনিবের চাকরি করচি, এখন কি তার কল বন্ধ করে দিয়ে তার লোকসান করাব? না, সে-সব আমা হতে হবে না।

বাকি চা-টুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া সে নীল কোর্ত্তাটি পরিধান করিল, তারপর মন্থরগমনে কলের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় পাঁচ বছরের বড় ছেলেটি চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বাহিরে আসিয়া ডাকিল,—আব্বা, আব্বাজান।

ইব্রাহিম ফিরিয়া দাঁড়াইল,—কিরে ইসমাইল, উঠেচিস বেশ, বেশ—সকাল সকাল আজ মক্তবে যাস্। —মাথা হেলাইয়া একটু হাসিয়া সে আবার শিথিল পেশীগুলি টানিয়া টানিয়া চলিতে লাগিল।

প্রকাশ যখন কলে আসিল তখন ইব্রাহিম কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। ইব্রাহিমের কাছে দাঁড়াইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—কি ইব্রাহিম, মিস্ত্রি পাওয়া গেল না?

ইব্রাহিম কহিল,—না হুজুর, ভাল লোক পাওয়া যাচ্চে না। যারা আস্‌চে ইঞ্জিনিয়রবাবু তাদের পছন্দ করচেন না। আর আমারও বোধ করি এখন ছুটির দরকার হবে না।

প্রকাশ আপিস-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া খাতাপত্র দেখিতে বসিল। বেচাকেনা বড় লাভজনক হইয়া উঠে নাই, কাপড়ের বাজার তেমনি মন্দা, লোকসান পড়িবারই সম্ভাবনা। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম কর্ম্ম-কুশলতা কিছুই ত কোন কাজে লাগিল না। সে মাথা খাটাইয়া হিসাব কষিতে পারে, প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে পারে, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে প্রতিকূল দৈব আসিয়া সবই যখন ওলট-পালট করিয়া দিয়া যায়, তাহার সাধ্য কি যে প্রতিবিধান করে? এই যে অনাবৃষ্টির দরুণ গত বৎসর তুলার ফসল নষ্ট হইয়া গেল, সে কি এক বিন্দু জল দিয়াও কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিতে পারিয়াছে; কে ভাবিয়াছিল, বিদেশী কাপড় এমন অকস্মাৎ বাজার ছাইয়া ফেলিবে? কয়লার দর হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিবে, সেকথা পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারে এমন দূরদৃষ্টি কাহারো আছে কি?

দরজায় এক ব্যক্তির ছায়া আসিয়া পড়িতে প্রকাশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল,—কে ও, বিনয়-দা! বিস্ময়ে আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বিনয়বাবুর হাত ধরিল। কহিল,—এখানে এখন হঠাৎ? কবে এলে? কখন এলে?

একখানি চেয়ার টানিয়া বিনয়বাবু বসিলেন। চাদর দিয়া ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছিয়া লইয়া তিনি কহিলেন,—আপিসের একটা কাজে সাহেব আমাকে পাঠিয়েচেন। কাল রাত্রে এখানে এসেছি। অনেকদিন তোমার খবর



বসন্তোৎসব

শিল্পী—শ্রী: মনীষী দে

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা]

পাইনি। তুমি যে এখানে একজন কলের মালিক হয়ে বসেছ, তা জানতাম না। তুমি না কি আবার বিবাহ করেছ ?

প্রকাশের গলা শুকাইয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ কণ্ঠনালীর ভিতর সে জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল, তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না। সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

বিনয়বাবু এ-সব কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—তা ভালই করেচ বিয়ে করে। তুমি যেমন কষ্ট সহ্য করেছ, এমন কেউ পারতো কি না সন্দেহ। তোমায় দেখে আমার বড় দুঃখ হত, প্রকাশ। তোমার জীবন একেবারে ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছিল।

বিস্মিতনেত্রে প্রকাশ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এতকাল যাহা বলিয়া সে নিজেকে বুঝাইয়া আসিতেছিল, এ যে সেই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি! তাহার চোখ দু'টি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়া বিনয়বাবু চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বলিলেন,—তুমি এখন দশজনের মধ্যে একজন—এই কল আপিস গুদাম সবই তোমার। কতলোক প্রতিপালন করুচ, এ-সব তোমারই উপযুক্ত প্রকাশ, তাই ভগবান দিয়েছেন। তোমার উপর আপিসের বাবুরা কি অত্যাচারই না করতো, কিন্তু তারা তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌বারও উপযুক্ত নয়, সে কথা কি তারা বুঝতো? যেদিন শুনলাম তুমি কুলি-হাঙ্গামায় পড়ে পুলিসের গুলিতে আহত হয়েচ, সেদিন মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। যশোদাবাবু কি বলেছিল জান? তোমার যে অশেষ দুর্গতি হবে—চাকরিটি পর্য্যন্ত খোয়াবে, তা নাকি সে আগে থেকে জানতো। ওরা কেউ তোমায় চিনতে পারেনি।

প্রকাশ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। বিনয়বাবুর মমতামাখা কথাগুলি তাহার কানে মধুর ঝঙ্কার দিয়া বাজিতে লাগিল। তাহারি অন্তরের নিগূঢ় বেদনা এই সহৃদয় বন্ধুটি সহানুভূতির ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে; সে তাহাকে দোষ দেয় নাই। অতীত জীবনের সাক্ষী, সে জানে কি দুর্ব্বিসহ কষ্টের বোঝা তাহাকে বহিতে হইয়াছে। না, সে অপরাধী নহে। তাহার মনের ভিতর যুক্তি-তর্ক আবার মাথা তুলিতেছিল, সে ভুলিয়া গেল—অণিমার কথা, সুরবালার কথা। তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটা মহৎ উদ্দেশ্যের মুকুট পরিয়া আবার আসিয়া দেখা দিল। অদম্য পিপাসা লইয়া সে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—এখন তাহারি প্রচুর বারিবর্ষণে কতশত নরনারীর ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইতেছে, তাহারা দুই হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে!

গদগদ স্বরে প্রকাশ কহিল,—বিনয়-দা তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তুমি আমায় সকল রকমে সাহায্য করেচ। তুমি ছিলে বলেই না আপিসে কাজ করতে পারতুম, নৈলে বোধ করি পাগল হয়ে যেতুম।

খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রকাশ আপিসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্লাইব ষ্ট্রীটের সেই সওদাগরি আপিস, পিতলের কাউণ্টার, অন্ধকার ঘর—সব তাহার মনে পড়িতেছিল। কে কেমন আছে, কাজ কিরূপ চলিতেছে, কাহার কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা? বিনয়বাবু একটি ভাল পদ পাইয়াছেন শুনিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিল। তারপর বিনয়বাবুর পারিবারিক কথা উঠিল। গত বৎসর তিনি এলাহাবাদে একটি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, এখান হইতে ফিরিবার পথে মেয়েটিকে একবার দেখিয়া যাইবেন। তিনি এখন শিবপুরে থাকেন—ছেলেটি বড় হইয়াছে, সামান্য লেখা-পড়াও শিখিয়াছে। তিনি তাহাকে চাকরি করিতে না দিয়া একটি দোকান খুলিয়া বসাইয়াছেন। অদৃষ্টে থাকিলে, ঐ দোকান হইতেই ভরণপোষণের সংস্থান হইবে। কিছু উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে বিবাহ করাইবেন, পরিশেষে অবসর লইয়া তিনি পুত্রের কাজে সহায়তা করিবেন। এই নিরভিমানী ব্যক্তিটির কথাবার্ত্তায় সন্তোষের শান্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ মুগ্ধ হইল। নির্নিমেষ নয়নে সে তাহার ধীর গম্ভীর মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শেষজীবনের আশার কথা অবহিতচিত্তে শুনিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর বিনয়বাবু উঠিলেন। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—আমার বাড়ী এসে উঠ্‌লে না কেন বিনয়-দা? কোথা আছ?

—বলেচি ত, তুমি এখানে আছ জানতাম না। আমি একটা হোটেলে আছি—অনেক দূর, শহরের ভিতর। আমি কালই চলে যাব। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

—আজ বিকালে আমার বাড়ী আস্‌বে বিনয়-দা?

—বিকালে নয়, সন্ধ্যার পর আস্‌বো।

—তা'হলে কথা রইল, আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবে।

—আচ্ছা।

বিনয়বাবু চলিয়া গেলেন। বহুদিন পর এই পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া প্রকাশের মনে হইতে লাগিল, একদিন যে-অতীতের খেইটি সে খোয়াইয়া বসিয়াছিল, আজ আবার তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। তাহার চারিদিকে অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু যে প্রবল ইচ্ছা-শক্তি লইয়া মূল মানুষটি গঠিত, সে যে আগাগোড়া একই রহিয়া গিয়াছে, এতটুকু বদলায় নাই! কি দারিদ্র্যের ভিতর, কি সম্পদের মধ্যে ঐ শক্তিটাই ত' তাহার মনের উপর সমানে প্রভুত্ব চালাইয়া আসিয়াছে, উহাকে বাদ দিলে তাহার সত্তার কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে?

২৩

বিনয়বাবু চলিয়া যাইবার খানিকক্ষণ পর ইঞ্জিনিয়র সদাশিব আসিয়া বলিল,—বাবু, ইব্রাহিমের সঙ্গে আর ত পারা যায় না। দিনদিন ও কেমন খিটখিটে হয়ে উঠ্‌চে। আজ ষ্টোকার আসেনি, একজন লোক দিলুম, কয়লা দেবে আর কলের কাজ করবে। ও তাকে তাড়িয়ে দিলে, বললে ওর কর্ম্ম নয়। আমি গিয়ে বুঝিয়ে বল্‌লুম, একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে আজকের মত কাজ চালিয়ে নাও। আমার কথা ত শুন্‌লেই না, উল্‌টো আমাকে যে-সব কথা শুনিয়ে দিলে, তা আপনাকে কি বল্‌বো।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—কাজ কেমন করে চল্‌চে?

ইঞ্জিনিয়র বলিল,—ওই কয়লা দিচ্চে।

—সে কি, ও যে অসুখে ভুগ্‌চে। অত আগুনের তাত সইবে কেমন করে?

একটু হাসিয়া সদাশিব কহিল,—আপনি ওকে মাথায় তুলেচেন বাবু। কি ওর হয়েচে যে কাজ করতে পারবে না? ও আজকাল যেমন হয়েচে, অন্য কেউ হলে তাড়িয়ে দিত, আপনি বলেই না রেখেচেন! কিন্তু বাবু, আর ত সহ্য হয় না। সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করচে, এর একটা ব্যবস্থা না করলে অন্যলোক আর কদ্দিন টি'কে থাক্‌বে বলুন ত?

কলের শব্দতরঙ্গ, বাষ্পের ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস ক্রমাগত ভাসিয়া আসিতেছিল। আকাশে মেঘ হঠাৎ কাটিয়া গিয়া সূর্য্যদেব পূর্ণ উদ্যমে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সমস্ত কারখানাটা বৃহৎ জ্বলন্ত উনানের মত তাতিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারি মধ্যে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কুলির দল আপন আপন কাজ যন্ত্রের মত করিয়া যাইতেছিল। প্রকাশ উঠিয়া কল-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, মানুষের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, কালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, এ কল কাহারো নিজস্ব সম্পত্তি নহে। প্রত্যেক মানুষকে এই কলের যাঁতায় পিষিয়া মরিতে হয়—হোক্, প্রতিবাদ করা চলিবে না। মানবজাতির বিজয়-নিশান চিরদিন মানুষের রক্তেই রঞ্জিত হইবে!

ইঞ্জিনে কয়লা দিয়া ইব্রাহিম জানালার দিকে ফিরিয়া বসিয়াছিল। আগুনের আঁচে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে হাঁপাইতেছিল। কলের একঘেয়ে শব্দ তাহার কর্ণপটহ বধির করিয়া দিয়াছিল, প্রকাশ আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

ক্ষুণ্ণস্বরে প্রকাশ কহিল,—সকলেই তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করচে ইব্রাহিম। এ রকম হলে ত চল্‌বে না।

ইব্রাহিম ফিরিয়া বিমর্ষ দৃষ্টিতে প্রকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে-মুখে পরিশ্রমের কঠোর রেখাগুলি পরিস্ফুট—সে তখনো হাঁপাইতেছিল।

প্রকাশ আবার বলিল,—তোমাকে কাজ করবার জন্য মাইনে দেওয়া হচ্চে, ঝগড়া করবার জন্য নয়। তুমি ইঞ্জিনিয়রবাবুর অধীন, সে যা বল্‌বে তাই তোমাকে মান্‌তে হবে। তাকে রুক্ষ কথা বলে তুমি নিতান্ত বেয়াদপি দেখিয়েচ। তোমাকে সাবধান করচি, ভবিষ্যতে এ রকম বেয়াদপি করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

—কসুর হয়েচে হুজুর। আমার সম্বন্ধে আর কখনো কোন কথা শুনতে পাবেন না।

সে উঠিয়া কাজে লাগিল। প্রভুর ভর্ৎসনা তীরের মত তাহার অন্তরমধ্যে গিয়া বিঁধিয়াছিল, সে মরমে মরিয়া গেল। আজকাল তাহার কেমন কথায় কথায় রাগ হয়, এমন কি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সম্মানটুকু পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারে না। দীর্ঘকাল চাকরি-জীবনে এমন কখনো তাহার হয় নাই। অগ্নিকুণ্ডের মুখ খুলিয়া একটি হাতলওয়ালা বেলাতি দিয়া সে কয়লা ঢালিতে লাগিল, তারপর আগুন উস্‌কাইয়া বেলাতি টানিয়া বাহির করিয়া অগ্নিকুণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া দিল। আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে তাহার মুখের চামড়া পুড়িয়া ঝলসিয়া যাইতেছিল, উত্তপ্ত রক্তের ধাক্কায় কপালের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। সে ভ্রূক্ষেপ করিল না, অবিশ্রাম কাজ করিয়া গেল। একটা করুণ হতাশা তাহার আর সমস্ত অনুভূতিগুলি অসাড় করিয়া দিয়াছিল। আর সে কাহারো কথা শুনিবে না, কাহাকেও কথা শুনাইবে না—খোদা তাহাকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, সবটুকু কাজে প্রয়োগ করিতে সে কিছুমাত্র কার্পণ্য করিবে না।

দুপুর বেলা কিছু খাবার গামছায় বাঁধিয়া, এক হাতে পুঁটুলি অন্য হাতে কাঁচের গেলাসে সরবৎ লইয়া সোফি কারখানায় উপস্থিত হইল। ইব্রাহিম যন্ত্রে তেল দিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—কি এনেচিস, সরবৎ?—দে।

সোফি সরবতের গেলাস তাহার হাতে দিল। দুই হাতে গেলাসটি চাপিয়া ধরিয়া এক চুমুকে ইব্রাহিম সবটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, তারপর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল,—আঃ—এতক্ষণ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

জামার আস্তিন দিয়া মুখ মুছিয়া সে আবার তেলের ডিবা তুলিয়া লইয়া ঘরে যাইতেছিল, দেখিয়া সোফি বলিল,—দাঁড়াও। খাবার এনেচি যে, খেয়ে যাও।

—না, আমি আর কিছু খাব না। তুই এখন যা, আমার ঢের কাজ আছে।

—অনেকক্ষণ ত খেটেচ, একটু বিশ্রাম কর।

একটু ক্ষীণ হাসিয়া ইব্রাহিম কহিল,—আর বিশ্রাম! জানিস্ সোফি, যে-মুনিব কোনদিন কাউকে কিছু বলে না, আজ আমি তার কাছে বকুনি খেয়েচি—আমি এমনি অপদার্থ হয়ে পড়েচি আজকাল। আমার মাথা বিগড়ে গেছে, কি বলি কি করি কিছু ঠিক নেই।

বলিতে বলিতে লোকটার চোখ দুটা ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহার গলা ভাঙিয়া গেল, সে আর কথা বলিতে পারিল না। সোফির মনে আঘাতটা বড় বাজিল। রুগ্ন স্বামী প্রাণ দিয়া কাজ করিতেছে, তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিতে মুনিব এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করিল না। অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া সে কহিল,—তুমি সকালে নাস্তা করনি, এখন কিছু খেয়ে নাও। না খেলে কাজ করবে কেমন করে?

—না রে না, তুই যা। সত্যি বল্‌চি, আমার খিদে নেই,—বলিয়া সে ঘরে গিয়া অগ্নিকুণ্ডের মুখ খুলিয়া ফেলিল এবং বেলাতি দিয়া আর একবার কয়লা ঢালিয়া দিল। গোলাকার মুক্ত দ্বার দিয়া একটা আগুনের হলকা তাহার মুখের উপর গলিত ধাতুপ্রবাহের মত আসিয়া পড়িয়াছিল। বেলাতির হাতল ছাড়িয়া দিয়া ইব্রাহিম পিছু হাঁটিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল, তারপর ক্রুদ্ধ জন্তুর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বেলাতি ঠেলিয়া ঠেলিয়া আগুন উসকাইতে লাগিল।

তাহাকে এরূপ শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া সোফি উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া সে কহিল,—ও গো একাজ তুমি করো না। আমার কথা রাখ—না খেয়ে মরি সেও ভাল, তবু এমন সর্ব্বনেশে কাজ তোমায় কিছুতে করতে দেব না।

ইব্রাহিম ধমকাইয়া উঠিল,—থাম্ মাগী, তুই যাবি কি না বল্। নইলে—

সে একটা ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গি করিল। সোফি হাত ছাড়িয়া দিল, তাহার কান্না আসিতেছিল। স্বামীর অন্তরে তাহার এবং সন্তান কয়টির জন্য একটু কোমল স্থান সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা সে জানিত, কিন্তু তাহা হইলেও মতলব-বিরুদ্ধ হইলে এক-একদিন সে তাহাদের রাগের মাথায় প্রহার করিতেও ছাড়িত না। সোফি আর

কিছু বলিল না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পর ছুটির বাঁশী বাজিয়া উঠিল। দলে দলে মজুরেরা বাহির হইয়া পড়িল, হাস্য পরিহাস গল্প করিতে করিতে বস্তির দিকে চলিল। ইব্রাহিম ঘরের বাহিরে বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়া বসিয়াছিল, কেহ তাহার পানে ফিরিয়া চাহিল না। একটা লাট্টুর মত তাহার মস্তিষ্ক বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল, চোখের সম্মুখে সবই যেন কাঁপিতে লাগিল, কানের ভিতর একটা অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনিত হইতেছিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া চৌবাচ্চা হইতে এক বালতি জল তুলিয়া সে মাথায় ঢালিল। শেষে সিক্ত মস্তকে একটা অশত্থ গাছের তলায় শুইয়া চক্ষু নিমীলিত করিল। এক ঘণ্টা পর আবার যখন কাজে ফিরিবার বাঁশী বাজিল, তখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

—মিস্ত্রি, মিস্ত্রি—ওঠ।

ইব্রাহিম চোখ মেলিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিল। একজন বলিষ্ঠদেহ মজুর নত হইয়া দুই হাতে ঝাঁকি দিয়া তাহাকে জাগাইয়াছিল। সে কহিল,—ওঠ, ওঠ। সময় হয়েচে— কল চালাবে এস।

ইব্রাহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যই ত, সময় হইয়াছে— তাহাকে এখনই আবার কাজে যাইতে হইবে। এই এক ঘণ্টা কাল কেমন করিয়া কাটিল তাহা সে জানিতেও পারে নাই। তখনো তাহার মাথার ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া আগুনের ফুলকি ছুটিতেছিল। অবসন্ন স্নায়ুগুলাকে চাবকাইয়া খাড়া করিয়া দক্ষিণে বামে দুলিয়া দুলিয়া সে কল-ঘরের দিকে ছুটিল। কয়লার আগুন নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল, সে আবার কয়লা ঢালিয়া দিল। তারপর সেই জলন্ত উনানের মুখ বন্ধ করিয়া সে কল চালাইবার লৌহদণ্ডটি দুই হাতে ধরিয়া আকর্ষণ করিল—সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল, এবং একটা বিকট হুঙ্কারে ঘরটি ভরিয়া উঠিল। আর একটি লৌহদণ্ড ঠেলিতে গিয়া ইব্রাহিমের হাত আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গেল— সে পারিল না। হঠাৎ সে টলিতে টলিতে হটিয়া আসিল, তাহার পদদ্বয় যেন আর দেহের ভার রক্ষা করিতে পারিতেছে না। দেখিতে দেখিতে চোখের তারা দুটি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল, মুষ্টি-বদ্ধ হাত উর্দ্ধে তুলিয়া সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর একটিবার সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া তৎক্ষণাৎ পার্শ্বদেশে গড়াইয়া পড়িল।

সংলগ্ন লম্বা ঘরটিতে একে একে মজুরেরা আসিয়া জুটিতেছিল। ইব্রাহিমের চীৎকার শুনিয়া সকলে দরজার সামনে ছুটিয়া আসিল। ঝটিকাহত বৃক্ষকাণ্ডের মত ইব্রাহিমের দেহ অবলুণ্ঠিত পড়িয়া আছে, নিস্পন্দ অসাড়! চক্ষু জ্যোতিঃহীন, মুখ দিয়া সূতার মত সূক্ষ্ম রক্তধারা নির্গত হইতেছিল। তাহার চারিদিক ঘিরিয়া মজুরেরা বিষম গোল করিতে আরম্ভ করিল। কেহ উঠাইয়া বসাইল, কেহ ঝাঁকিতে লাগিল। একজন কোথা হইতে একপাত্র জল সংগ্রহ করিয়া মাথায় ছিটাইতে লাগিল।

—তুলে দাঁড় করাও।

—না—দাঁড় করিয়ে কাজ নেই, শুইয়ে রাখ।

—এখানে বড় গরম। বাইরে নিয়ে চল।

—হাঁ, তাই চল।

—কিছু নয়—সন্দিগর্মি। চোখেমুখে জলের ঝাপ্টা দাও, সেরে যাবে এখন।

ধরাধরি করিয়া ইব্রাহিমের সংজ্ঞাশূন্য দেহ তাহারা বাহিরে লইয়া আসিল। সকলের মুখেই নূতন নূতন ব্যবস্থা। কেহ উপুড় করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া শোয়াইয়া রাখিতে চাহে, কেহ পা দুটা উর্দ্ধে ধরিয়া মাথা নীচু করিতে চাহে। একজন একটা কাঠি দিয়া নাকের ভিতর নাড়িতে লাগিল।

—ও কি করচ?

—গোলমরিচের গুঁড়ো আন—হাঁচিয়ে দিচ্চি।

—পাগল, নিশ্বাস কোথায়?

—ভারি জান! দেখ্‌চ না নিশ্বাস বইচে?

চারিদিকে লোকের ভিড়—চীৎকার—বিশৃঙ্খলা। পিছনের লোকেরা সামনের লোকদের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ পিছন হইতে একটা গোলমাল উঠিল, সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও—বাবু এসেচেন। সকলে শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। প্রকাশ আসিয়া চারি-পাশের লোকদের সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল, তারপর

একজন ডাক্তার আনিতে আদেশ দিয়া নত হইয়া ইব্রাহিমের দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল। জীবনের কোনো সাড়া নাই, মুখমণ্ডল বিকৃত, ঈষৎ পীত তারা দুটি ঊর্দ্ধে উঠিয়া চোখের পাতায় অর্দ্ধেকখানি ঢাকা পড়িয়াছে।

ইঞ্জিনিয়র সদাশিব পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—শুনেচেন বাবু—এমন আহাম্মক, সারাদিন কিছু খায়নি। পরিশ্রমের কাজ কি কেউ না খেয়ে করে?

প্রকাশ কিছু বলিল না। ইব্রাহিমের বক্ষের উপর হাত রাখিয়া সে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ না বুকটা একবার নড়িয়া উঠিল? কৈ, কিছু নয়—এ যে পাথরের মতই স্পন্দনরহিত। লোকটি কি তবে মারা গিয়াছে? হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ, কঠিন—গায়ে তখনো একটু উত্তাপ লাগিয়া ছিল। অকস্মাৎ প্রকাশ অনুভব করিল, কে যেন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার জামা ধরিয়া টানিতেছে। সে ফিরিয়া দেখিল, সোফি। তাহার মাথায় ঘোমটা নাই, চুলগুলি আলুথালু রুক্ষ, চোখ হিংস্র জন্তুর মত জল্ জল্ করিতেছে।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত সোফি রুখিয়া উঠিল,—তোমার কি এতটুকু দয়ামায়া নেই বাবু, সরে যাও, সরে যাও—ওকে ছুঁয়ো না।—বলিয়া দুই হাতে সজোরে সে প্রকাশকে ঠেলিয়া দিল।

সহসা জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রভুর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একজন মজুর ছুটিয়া আসিয়া সোফির কেশাকর্ষণ করিল, রোষকষায়িত চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল,—মুখ সামলাও!—

প্রকাশ বাধা দিল, ভর্ৎসনার স্বরে কহিল,—ছাড়্। ছি ছি, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিলি? লজ্জা হল না?

সে অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—হুজুর মুনিব। ওর এত বড় সাহস, আপনাকে আক্রমণ করে?

প্রকাশ কহিল,—সে বোঝা-পড়া আমার, তোমাদের নয়। খবরদার ওকে কেউ কিছু বল্‌লে আমি তাকে কঠিন সাজা দেব।

সোফি ভূতলে বসিয়া পড়িয়া স্বামীর মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়াছিল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রুজল অবিরল ধারায় নামিয়া আসিতে লাগিল। শোকের প্রতিচ্ছবি, উদ্ভ্রান্ত করুণ মূর্ত্তি—তাহার পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া প্রকাশের অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

ডাক্তার আসিল। নাড়ী দেখিয়া, হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া সে হতাশার সহিত ঘাড় নাড়িল—অত্যধিক পরিশ্রমে রক্ত মাথায় উঠিয়া শীর্ণ স্নায়ু ছিন্ন করার ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে। সোফি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—তাহার সব শেষ হইয়াছে, সে অনাথিনী!

প্রকাশ আর মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইল না, কল বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া বাড়ী ফিরিল। বেলাশেষে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আসিল, বাতাস জোরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চারিদিকে গাছগুলি সবেগে মাথা নাড়িতেছিল। এই অশান্ত প্রকৃতির খেলা সে চাহিয়াও দেখিল না, অনেকক্ষণ একাকী বাগানে ঘুরিয়া শেষে একটি বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল, আজও সকালে সে এই রুগ্ন মৃতকল্প ব্যক্তিকে অযথা তিরস্কার করিয়াছে। তাহার উপর সবটুকু অপরাধ চাপাইবার জন্যই বুঝি ইব্রাহিম তাহার ভর্ৎসনাগুলি নীরবে সহ্য করিয়া গেল? সন্ধ্যা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছিল—প্রকাশ সেইখানে বসিয়া রহিল। একজন বেহারা আসিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি খুলিয়া প্রকাশ পড়িল, বিনয়বাবু লিখিয়াছেন—কাজের দরুণ তাঁহাকে এখনি চলিয়া যাইতে হইতেছে, আসিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত। বিনয়-বাবুর কথা প্রকাশ বিস্মৃত হইয়াছিল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া চিঠিখানি সে পকেটে ভরিয়া রাখিল।

অণিমা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, কহিল,—কলের মিস্ত্রি না কি হঠাৎ মারা গেছে?

প্রকাশ মুখ তুলিল,—হাঁ অণিমা, দোষ আমার। আমি তাকে ছুটি দিয়েও ছাড়লুম না।

তাহার চোখদুটি ছল ছল করিতেছিল। সে বলিয়া গেল,—অসুস্থ শরীর জেনেও আমি তাকে কাজ থেকে মুক্তি দিই নাই। আমার হুকুম তামিল করতে কাজের ভিতর লোকটা মরে গেল।

তাহার কণ্ঠস্বরে অনুশোচনার তীব্র জ্বালা ফুটিয়া উঠিতেছিল, অণিমা তাহা অনুভব করিল। সমবেদনায়

তাহার অন্তর ভরিয়া গেল, সে কহিল,—না না, তোমার কি দোষ?

প্রকাশ কথাটা কানে তুলিল না। খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—একটা কাজ করবে অণিমা?

কি?

—সংসারে ওর কেউ নেই—কেবল স্ত্রী আর কয়টি ছেলেপুলে। তারা বড় গরীব, ওর রোজগারে খেয়ে বাঁচত। তাদের ভার নিতে পারবে?

অণিমার মুখমণ্ডল দীপ্ত হইয়া উঠিল, স্বামীর বিরাট হৃদয় সে যেন মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরমধ্যে ধারণ করিতে পারিয়াছিল। গদগদ স্বরে সে কহিল,—ওদের জন্য তুমি ভেবো না। ওদের কোন কষ্ট হবে না, সে ভার আমার রইল।

রাত্রে চারিদিক আঁধার করিয়া বর্ষা নামিল। অন্তর্গূঢ় করুণ বেদনার মত বাতাস হাহাকার করিয়া ছুটিয়া ফিরিতেছিল। প্রকাশের চোখে নিদ্রা আসিল না। অবিচ্ছিন্ন জলধারা নিঝুম রাত্রির বক্ষের উপর ক্রমাগত শরবর্ষণ করিয়া গেল। সেই বৈচিত্র্যশূন্য শব্দতরঙ্গের স্তরে স্তরে যেন কাহার মর্ম্মান্তিক বিলাপ অস্ফুট স্বরে ভাসিয়া আসিতেছিল। চোখ বুজিয়া প্রকাশ অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল। পার্শ্বে অণিমা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই নিরবচ্ছিন্ন বিপর্য্যয়ের মধ্যে অণিমার নিরুদ্বেগ নিশ্বাসগুলি যেন কোন নিষুপ্ত অমরার সুরভিত উষ্ণ মলয়ার মত বহিয়া যাইতে লাগিল। এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশে মেঘজাল পাতলা হইয়া আসিতেছিল, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া একে একে তারাগুলি আবার ফুটিয়া উঠিতেছিল। দূরে ঘণ্টার শব্দে প্রকাশ চোখ মেলিল। নীরব বিশ্বপ্রকৃতি! নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় একটি বিনিদ্র পাখী অনর্থক ডাকিতেছিল। অকস্মাৎ একটা তীক্ষ্ণ ক্রন্দনরোল তাহার কানে আসিয়া বাজিল। কাহার বুকভাঙা আর্ত্তনাদ? প্রকাশ উঠিয়া বসিল, কান পাতিয়া আবার শুনিল—সেই আকুল ক্রন্দন! হু হু শব্দে তাহার বুকের ভিতর ঝড় বহিয়া গেল। গভীর রাত্রে অনাথিনী স্বামীহারা সোফি আর্ত্তস্বরে কাঁদিতেছে! ইব্রাহিমের মৃতদেহ কবর দিয়া তাহারা সবেমাত্র ফিরিয়াছিল।

মহিলা-সংবাদ

যে-সব নারী জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বরেণ্য হইয়াছেন, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার পিতা—স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ও ইহার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনে তাঁহার "অবলাবান্ধব" পত্রিকা নির্ভীক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার মূলেও দ্বারকানাথের কৃতিত্ব ছিল। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর মাতা—কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ও পতির ন্যায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী গ্রাজুয়েট—এবং প্রথম লেডী ডাক্তার। যে পাঁচজন মহিলা সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন, কাদম্বিনী তাঁহাদের মধ্যে একজন। বিদুষী জ্যোতির্ম্ময়ী পিতামাতার উপযুক্ত সন্তান। পিতামাতার নির্দ্দেশ-মত তিনিও সমাজের কল্যাণ-কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, নারী-শিক্ষা সমিতি, দীপালী সমিতি (নারী-ব্যায়াম শাখা), প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। কিছুদিন পূর্ব্বে বিক্রমপুর যুবক-সম্মিলনীর কর্ণধাররূপে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীর মধ্যে নূতন ভাব সৃষ্টি করিয়া,সামাজিক মিলনের বিরোধী আকস্মিক বাধাবিঘ্ন দূর করিতে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। আজ জ্যোতির্ম্ময়ী

নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মান্দ্রাজের দ্বিতীয় প্রাদেশিক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্মিলনের



শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ

সভানেতৃত্ব করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন ;—বলা বাহুল্য এই কাজ তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া, মান্দ্রাজের নরনারীর শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারেও শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী বিশেষ অগ্রণী। কর্ম্মজীবনের প্রথম পর্ব্ব হইতেই তিনি শিক্ষাকার্য্য বরণ করিয়া লইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া তিনি কিছুদিন বীটন কলেজে কাজ করেন, পরে কটকের র‍্যাভেন শ' গার্লস কলেজের একমাত্র নারী-শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত হন। তাহার পর যথাক্রমে সিংহলের কলম্বো বৌদ্ধ গার্লস কলেজে (১৯১৭-১৯) ও পঞ্জাবের জলন্ধর কন্যামহাবিদ্যালয়ে (১৯২০-২১) অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া, কলিকাতা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে



শ্রীমতী সি-সঞ্জীব রাও

যোগদান করেন। সেখান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, এখন তিনি বিধবাশ্রম 'বিদ্যাসাগর বাণীভবনের' অবৈতনিক সহকারী সম্পাদিকা ও প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী কলিকাতা কর্পোরেশনের ফ্রি প্রাইমারী স্কুল কমিটিতে একমাত্র মহিলা সভ্য থাকিয়া, অনাথ বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর উৎসাহ-উদ্দীপনা শ্রমজীবীর কল্যাণ-সাধনেও নিয়োজিত হইয়াছে। কলম্বো অবস্থান-কালে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অনধিক দ্বাদশবর্ষীয় বালক-বালিকার শ্রমিকের কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছে। এই সময় বৃহত্তর ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার মিলন পরিকল্পনাও তাঁহার মনে স্থান পায়। তাঁহারই আহ্বানে ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ সিংহলে গমন করেন এবং

তাঁহাদের উভয়ের সমবেত চেষ্টায় ভারতীয় কলা ও সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য কলম্বোতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

—

মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী সি-সঞ্জীব রাও-ই সর্ব্বপ্রথম



রঙ্গ নায়কী আম্মাল

ভিজাগাপটম জেলা-বোর্ডের সভ্যরূপে নিয়োজিত হইয়াছেন।

—

রঙ্গ নায়কী আম্মাল—ইনি সম্প্রতি মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পশ্চিম গোদাবরী জেলা-শিক্ষাপরিষদের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীমতী সরস্বতী বাঈ ওভালেকর থানা-নিবাসী জনৈক মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। চিকণ-কার্য্যে তিনি নিপুণ শিল্পী। খদ্দরের উপর তাঁহার শিল্প-কার্য্যের নমুনা কলিকাতা কংগ্রেসে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

—

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলাদেবী সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন :—

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব যেমন স্বীয় সাধনা ও সিদ্ধির



শ্রীমতী সরস্বতী বাঈ ওভালেকর

দ্বারা অপূর্ব্ব সাধন-ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এই মহিলার সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা শোনা যাইতেছে। ইঁহার সাধনা, সমাধিভাব, কথা বলা, ছোট সামান্য কথার ভিতর দিয়া অনেক দার্শনিক তথ্যের মীমাংসা করা সত্যসত্যই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা দেবী ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত খেওড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তীর সহিত ত্রয়োদশ বর্ষে তাঁহার বিবাহ হয়।

শৈশবাবধি নির্ম্মলাদেবী অতিশয় ভক্তি ও ভাবপ্রবণ-হৃদয়া ছিলেন। সপ্তদশবর্ষ বয়সে বিনা উপদেশে তাঁহার শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পঞ্চবিংশ বৎসর হইতে উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি তাঁহাতে ক্রমোৎকর্ষ ও প্রসার লাভ করে। ভাবাবেশে প্রহরের পর প্রহর তাঁহার কাটিয়া যাইত এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিত; কি এক অব্যক্ত মহাভাবের উন্মাদনায় কত দিন রাত্রি তিনি আত্মহারা হইয়া থাকিতেন; কখনও কখনও বহুদিনের জন্য মৌনভাব অবলম্বন করিতেন, সে সময় দেখা যাইত তাঁহার ব্যবহারিক দৈনিক কার্য্যাদি চলিতেছে অথচ তিনি যেন কাহার স্বরূপ-অনুধ্যানে ডুবিয়া আছেন। ১৩৩০ সালে ঢাকায় পদার্পণ করার পর হইতে উপরোক্ত ভাবাদি উত্তরোত্তর পরিণত অবস্থা লাভ করিয়াছে।

সাংসারিক হিসাবেও ইনি একজন আদর্শগৃহিণী ও পতিব্রতা রমণী। ঘরকন্না, রন্ধন, পরিবেশন ও লোকরঞ্জনে সিদ্ধহস্তা। নির্ম্মলাসুন্দরী ভাল লেখা-পড়া জানেন না, একরূপ নিরক্ষরা বলিলেই হয়, অথচ সহজ সরল কথায় বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্যা ও তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাপূরণ ক্ষমতায় তাঁহার নিকট অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকেও হার মানিতে হয়।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাঁহার দয়া, তাঁহার স্নেহ, দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নামে পরিচিতা।

আনন্দময়ীর উপদেশবাণী এইরূপ—"ন্যায়, সত্য ও সংযমের আশ্রয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে;



শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা দেবী

দীনদুঃখীর যথাসাধ্য সেবা করিবে; শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত প্রত্যহ ইষ্টনাম গ্রহণ করিবে এবং সকল কার্য্য ও চিন্তায় একমাত্র অভীষ্ট দেবতার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ অভ্যাস করিবে। স্মরণ রাখিবে—একমুখী আকাঙ্ক্ষা, তীব্র আকুলতা ও শিশুর মত সরল ভাবই সাধনার প্রাণ।"

মূক-বধির শিক্ষা

শ্রী চুণীলাল ভট্টাচার্য্য

মূক-বধির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে তৎপূর্ব্বে তাহাদের সম্বন্ধে যে-সকল ভুল ও অসঙ্গত ধারণা সাধারণ লোকে পোষণ করিয়া থাকে, সেগুলির নিরাকরণ দরকার; নচেৎ কাজে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। যুক্তিহীন ধারণা কার্য্যক্ষেত্রে প্রধান বাধা। বহুদিন পূর্ব্বে নিজদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত সিডনি স্মিথ তাঁহার গবেষণাপূর্ণ রচনাতে সাধারণের কতকগুলি যুক্তিবিহীন ধারণার উল্লেখ করিয়া তাহা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ শিক্ষার আলো না পায় ততদিন তাহার ভিতরে একটা যুক্তিহীন মত পোষণের স্পৃহা দেখা যায়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ ক্রমশঃ অপসারিত হয়। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে, শিক্ষার প্রভাবে আমাদের কাজও অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতায় যখন প্রথম মূক বধির শিক্ষার প্রচলন হয়, তখন কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোকও এই শিক্ষার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নয়,—যাঁহারা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এই অভাবগ্রস্ত মানবশাখার উন্নতির জন্য একটু স্থানসংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার অব্যবহার্য্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ কোনও স্থানের পাগলা গারদে ইহাদিগকে রাখিলেও যে চলে, এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, তাঁহাদেরই বা দোষ কি? শিশুকে যেমন জ্যামিতির অঙ্ক বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা, ইহাদিগকেও মূক-বধির শিক্ষার কথা জানান প্রায় তদ্রূপ বৃথা। যাঁহারা নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে পারেন না, যাঁহাদের হৃদয় শিক্ষার সাহায্যে মার্জ্জিত ও উদার হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে মূক-বধির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা যে একটু কঠিন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু এখন আর সে সময় নাই। দেশ ভাবরাজ্যে অনেকটা প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছে, সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে, সর্ব্বসাধারণ আমাদের কথাগুলি একটু মনোযোগপূর্ব্বক শুনিবেন এবং তৎপরে কর্ত্তব্য কি তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। দেশের কাজ ভাগাভাগি করিয়া না লইলে কাজের সুবিধা হয় না। দেশের কাজ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। যাঁহারা এদিকে আসেন নাই বা অন্যান্য কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের যদি কেবল সহানুভূতি পাওয়া যায় তাহা হইলেই এই মহৎ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারে।

এখন মোটামুটিভাবে মূক-বধির সম্বন্ধে সাধারণের যে কতকগুলি ধারণা আছে, তাহারই উল্লেখ করিব।

১। অনেকেই মনে করেন বা জানিয়া আছেন যে, বোবা ও কালা একই ব্যক্তি নয়। অর্থাৎ কেহ বা বোবা কেহ বা কালা। এক ব্যক্তিই যে কালা হওয়ার ফলে বোবা হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই জানেন না।

২। বোবা দেখিলেই কেহ কেহ মনে করেন যে, এ একটা বোকা, ইহার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই। তাহাকে পাগল বলিয়া ধিক্কার দিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না এবং তাহাকে সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

৩। অনেকেরই বিশ্বাস, বোবার আলজিভ নাই—তাই সে কথা বলিতে পারে না।

৪। অনেকের ধারণা বোবা কাণে শুনিতে পায়।

৫। কেহ কেহ মনে করেন, বোবা গান করিতে পারে।

৬। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ধারণা যে, অন্ধদের তুলনায় মূক-বধিরগণের অবস্থা ভাল।

এতদ্ব্যতীত আরও ছোটখাট অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ও ধারণা দৈনন্দিন কার্য্যের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদের নিকট পৌছায়। স্ত্রী-পুরুষ বহু দর্শক স্কুল দেখিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল রকমের লোকই থাকেন। ইঁহাদের প্রশ্নাদি শুনিয়া আমাদের এই কথাটাই বারবার মনে জাগিয়া উঠে যে, আর কোনও স্বাভাবিক অভাব-গ্রস্ত মানবশাখা-সম্বন্ধে বোধ করি এত ভুল ধারণা মানুষের নাই।

যে খোঁড়া সে খোঁড়াই। তাহার খোঁড়া হওয়া সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। হাঁটার ধারণাটাই তাহার বিশিষ্ট দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করাইয়া দেয়। যে কাণা তাহার সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। যে অন্ধ তাহার অবস্থার সত্যতা তীব্রভাবে বর্ত্তমান। ইহাদের প্রত্যেকের অবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত এমন কিছু নাই যাহা অন্যে দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু মূক-বধির ভিন্ন জীব। বাহির হইতে তাহাকে দেখিলে তাহার কোনও অভাবের কথাই মনে আসিবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সহিত কথা বলার কোন প্রয়োজন না আসিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সর্ব্বসাধারণের মত। রাস্তা দিয়া দশজন লোক যায়, সেও যায়। ভয় পাইলে তাহারা দৌড়ায়, সেও দৌড়ায়, তাহারা জলে সাঁতার দেয়, সেও সাঁতার দেয়। মাঠে যখন খেলা হয় তখন অন্যান্য দর্শকগণের মধ্যে সেও একজন। বায়স্কোপও সে অন্যান্য দশজনের মতই উপভোগ করে। যেখানে ম্যাজিক বা সাপের খেলা হয় সেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে। মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড়ক্ষেত্রে সে বর্ত্তমান, কিন্তু যেখানে গান সেখানে সে নাই। থিয়েটারে সে নাই, টাউনহলেও সে নাই। বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ঝঙ্কার, সুবক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতা তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

আকাশের ঘোর বজ্রনিনাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কীটপতঙ্গের মৃদুধ্বনি কিছুই তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না। কোকিলের কুহু রব, পাপিয়ার গান, কাকের কর্কশ শব্দ, স্রোতস্বিনীর কলতান তাহার নিকট অবোধ্য।

পিছন হইতে সম্বোধন কর উত্তর পাইবে না, চীৎকার কর ফল হইবে না। সামনে আসিয়া তাড়াতাড়ি একটা প্রশ্ন করিয়া বস, দেখিবে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আবার প্রশ্ন কর জবাব মিলিবে না। তোমার রাগ হইবে। যদি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হও তবে তোমার দয়া হইবে। তখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে, সে ঠিক তোমারই মত নয়। কিছু বিশেষ অভাব আছে। যে-বিশেষত্ব তোমা হইতে তাহাকে পৃথক করিতেছে তাহা শ্রুতি। এই শ্রুতি-দ্বারা তুমি তাহা হইতে বিশিষ্ট এবং এই শ্রুতির অভাব-হেতু তোমা হইতে সে বিশিষ্ট।

এইভাবে শ্রুতিহীনতা বিষয়ে তোমার দৃষ্টি পড়িলে তুমি ক্রমে তাহাতে আরও একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবে। সেটা কি ? সে কথা বলে না। তোমার শত চীৎকার করা সত্ত্বেও সে নিরুত্তর। দুই একটা অবোধ্য ইঙ্গিত বা ইসারা সে করিতেছে মাত্র। হয়ত বা তৎসঙ্গে পশুর ন্যায় দুই একবার গম্ভীর আওয়াজ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তোমার জবাব মিলিল কই ? হয়ত তাহার ইঙ্গিত ও শব্দের ভিতর কোনও অর্থ আছে, কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে অক্ষম। পশুপক্ষীর ডাকের যেমন ব্যাখ্যা আমরা করিতে পারি না, তদ্রূপ তাহার ইসারা ও অস্বাভাবিক শব্দও তোমার নিকট ব্যাখ্যাত হইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে তোমার আর একটা ধারণা হইল যে, সে বোবা। বাস্, এই পর্য্যন্ত। তুমিও আর জিজ্ঞাসা করিলে না, সেও চলিয়া গেল। তোমারও সংবাদ লইবার কোনও প্রয়োজন রহিল না।

তুমি দুইটা অভাবই তাহাতে লক্ষ্য করিলে ;—প্রথম তাহার বধিরতা, দ্বিতীয় তাহার বাক্‌হীনতা কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ-সূত্র আছে বলিয়া তোমার মনে হইল কি ? ঐ বধিরতাই যে বাক্‌হীনতার জন্মদাত্রী, তাহা কয়জন জানে ? সোজা কথায় কালা হইলেই বোবা হয়। কেন হয়, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা কাহাকে বোবা বলি ? যে কথা বলিতে

পারে না, যাহার কথিত ভাষা নাই। কেন সে কথা বলিতে অক্ষম? আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের শরীরের কোন্ কোন্ অংশের কাজ হয়? একটু নজর করিলেই দেখা যাইবে যে, কথা বলিবার সময় নিম্নলিখিত শরীরাংশের প্রয়োজন হয়,—ওষ্ঠ, দন্ত, মূর্দ্ধা, কঠিন ও নরম তালু, জিহ্বা ও নাসিকা। আচ্ছা, যদি তাই হয় তবে দেখা যাউক এই-সব অঙ্গ বোবারও আছে কি না। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে (যাঁহাদের সন্দেহ হয় তাঁহারা একজন বোবাকে পরীক্ষা করিতে পারেন অথবা মূক-বধির বিদ্যালয়ে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন) যে, বোবাদের ঐ সকল অঙ্গ সুস্থ অবস্থায় আছে। তবে দোষ কোথায়? বাগ্‌যন্ত্রে দোষ নাই, কারণ পরিষ্কার স্বর প্রত্যেকের গলা হইতেই বাহির হয়। ফুস্‌ফুস্ ও সুস্থ—দেহের সুস্থতাই তাহার নিদর্শন।

কথা বলিবার যন্ত্রে যখন কোনও দোষ পরিলক্ষিত হইল না তখন বোবা হওয়ার কারণটা অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আমরা কি ভাবে কথা শিখি? সৃষ্টিকর্ত্তা কি জন্মিবার সময়ে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটা ভাষার থলি দিয়া দেন? যদি তাহাই হইত, তবে ছোটবেলাতেই সব কথা বলিতে পারিনা কেন? 'পা' 'পা' 'মা' 'মা' বলিবার কি প্রয়োজন? প্রথম অবস্থা হইতেই ত বড় বড় বাক্য যোজনা করিয়া কথা বলিতে পারিতাম। কই তাহা ত হয় না। আর যদি তাহাই হইত, তবে বাঙ্গালীর ছেলেকে কি এই ইংরেজী শিক্ষার দারুণ প্রয়োজনে বিধাতা একটা ইংরেজী ভাষার থলিও দিতে পারিতেন না?

কিন্তু তাহা হয় না। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলাই বলে, ইংরেজের ছেলে ইংরেজী বলে। বাপ মা বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, বলিয়া কি? না, তা নয়। তাহা হইলে রবিবাবুর 'গোরা'-ও ছোটকাল হইতেই ইংরেজী বলিত।

তুমি জার্ম্মান ভাষা বলিতে পার না কেন? তোমারও ত সকল বাগযন্ত্রই ঠিক আছে। কিন্তু তুমি ত বেশ ইংরেজী বলিতে পার। ইহার কারণ কি? তুমি বাঙ্গালীর ছেলে, এমন সুন্দর, প্রাঞ্জল ইংরেজী তোমার মুখ হইতে কি করিয়া বাহির হয়? তুমি অমনি উত্তর করিলে—"আমি ত' জার্ম্মান ভাষা শুনিনি, তাই জার্ম্মান ভাষা বলিতে পারি না। আমি ছোটবেলা থেকেই ইংরেজী ভাষা বল্‌তে শুনেছি, তাই ইংরেজী ভাষা বল্‌তে শিখেছি।" এই উত্তরই সত্য। এখন দেখ, আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভাষা শিক্ষা করি কি না। আমরা কথা শুনি, সেই কথা অনুকরণ করিয়া বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টাই বাল্যকাল হইতে আরম্ভ হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

রাস্তায় বেড়াইতেছি। এক বাড়ীতে একটি লোক গান গাহিতেছে। দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে গানটি মুখস্থ করিয়া চলিয়া আসিলাম। কি করিয়া গানটি মুখস্থ করিলাম। শুনিয়া নয় কি? আমরা শুনিয়া শুনিয়াই ভাষা শিখি। ভাষা ত জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আসে না। অনুকরণ করিয়া শিখিতে হয়।

শ্রবণেন্দ্রিয়ই ভাষাশিক্ষার সহজ ও স্বাভাবিক দ্বার। কেবল ইংরেজী বই পড়িয়া ইংরেজী বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী বলা অনুক্ষণ শুনিতে হয়। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্র সহস্র যুবক বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু সহজে ইংরেজী বলিতে অনেকেই প্রায় পারেন না। এ দোষ তাঁহাদের নয়। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কোনও ভাষা না শুনিতে পাইলে তাহা বলা চলে না। যে শিশুকাল হইতেই বিলাতে সাহেব-মেমদের সমাজে প্রতিপালিত হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহাদের কথা শুনিয়াছে, তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া ইংরেজীতে যাহাকে উত্তর দিতে হইয়াছে, তাহাকে কেবল যে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষা করিতে হইয়াছে তা নয়, তাহার গলার স্বর পর্য্যন্ত সাহেবী ধরণের হইয়া গিয়াছে।

তারপর আরোহ-প্রথা অবলম্বনেও বধিরতা ও মূকত্বে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যত বোবা দেখা গিয়াছে, তাহারা সকলেই জন্মবধির। কাজেই ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বধিরতাই মূকত্বের কারণ।

কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন "মশায়, কানে শোনে না, অথচ বেশ ত কথা বলে। সে ত স্কুলে পড়ে নাই।" এখানে কেবল একটু পর্য্যবেক্ষণের অভাব।

ভাষা গঠিত হইবার পর অধিক বয়সে শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হইলে ভাষা থাকিয়া যায়। ঐ অবস্থায় শ্রবণশক্তির সহিত ভাষার তিরোধান হয় না। কিন্তু একটা কিছু হইবেই। তিনি যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন তাহার স্বর ধরিয়া গিয়াছে। স্বরের লালিত্য নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার আর গান গাহিবার শক্তি নাই। গাহিবার চেষ্টা করিলেও না শোনার দরুণ স্বরের ক্ষমতা বা প্রয়োজন-মত pitch রক্ষা করিতে তিনি পারেন না। যখন শব্দই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া আছে, তখন শব্দের সমস্ত ধর্ম্ম, গুণাগুণও শ্রুতির উপরেই নির্ভর করিবে।

মূক-বধির হইলেই যে মূর্খ হইবে এমন কোন কথা নাই। জন্ম-বধিরতার সঙ্গে মূর্খতার কোন সম্বন্ধ নাই। অহরহ মূক-বধিরের সঙ্গে থাকি। আমারও পূর্ব্বে সাধারণের ন্যায় এই সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ছিল। বর্ত্তমানে ইহাদের সংস্রবে থাকাতে আমার পূর্ব্ব ধারণা দূরীকৃত হইয়াছে। যাহার সাধারণ বিচারবুদ্ধি নাই, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ মূর্খ বলিয়া থাকি। এই সাধারণ বুদ্ধির বিকাশ আমাদের কথিত ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষাতেও হইতে পারে। এই ভাষা বোবাদের নিজ ভাষা বা ইসারার ভাষা। এই ভাষাকেই ইংরেজীতে 'সাইন ল্যাংগোয়েজ' বলে। মনের ভাব যাহার দ্বারা ব্যক্ত করা চলে এবং একত্র বাসের ফলে যাহা সমশ্রেণীর জীব বিনাআয়াসে বুঝিতে সক্ষম, তাহাই ভাষা। আমরা, অর্থাৎ শ্রুতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, কথিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা মুখের কথার দ্বারা ভাবের আদান-প্রদান নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কেবল ইহাই পর্য্যাপ্ত নয়। এই কথিত ভাষার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিও ব্যবহার করিয়া থাকি।

এই প্রকার অঙ্গভঙ্গির মূল কোথায় তাহা বিচার করিবে অন্য বিজ্ঞান। এখানে তাহার বিষয় উল্লেখ করিব না। ভাষা যখন গড়িয়া উঠিতেছিল অর্থাৎ ভাষার বাল্যাবস্থায় যখন ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত শব্দরাশির অভাব হইয়াছিল, তখন ইসারা বা অঙ্গভঙ্গিই সেই অভাব পরিপূরণের কার্য্য করিয়াছিল, এইরূপ অনুমানে বোধ করি দোষ নাই। পরে ভাষার পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হইলেও অঙ্গভঙ্গিগুলি (gestures) আমরা ছাড়িতে পারি নাই। উহারাও 'সাথের সাথী' হইয়া গিয়াছে। এই হেতুই যখন কাহাকেও 'এস' বলিয়া ডাকি তখন দক্ষিণ হস্তও প্রসারিত হইয়া আপনিই দেহের দিকে নামিয়া আসে। এই প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে।

ইসারার ভাষাও অন্যান্য কথিত ভাষার ন্যায় arbitrary signs দিয়া তৈয়ারী। gesture স্বাভাবিক, sign (সঙ্কেত) artificial (কৃত্রিম) এবং arbitrary, তবে প্রায় অনেক সময়েই sign এর অনুসন্ধানে কোন-না-কোন একটা অর্থ মিলিয়া থাকে। তবে উহা অধিকাংশ স্থলেই accidental। সাধারণ সম্মতির স্থানও এই ভাষা-গঠনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কোনও নূতন ব্যক্তি বা বস্তু দেখিলে প্রথম একটি বালক ঐ ব্যক্তি বা বস্তুনির্দ্দেশক একটা কিছু ইসারা করে। যদি অধিকাংশের তাহা পছন্দ হয় তবেই উহা ভাষাতে পরিণত হইবে, নচেৎ নয়। যদি ইতিমধ্যে কোন চতুর, বুদ্ধিমান বালক—যাহার প্রভাব সকলের উপর আছে—অন্য কোনও একটা যোগ্য চিহ্ন বাহির করিয়া দিতে পারে তবে পূর্ব্বের ব্যক্তি ভোটে হারিয়া যাইবে এবং তাহার আবিষ্কৃত চিহ্ন অব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। পরবর্ত্তী বালকের চিহ্নই উপযুক্ত বলিয়া ভাষাতে স্থান পাইবে।

মূক-বধির সঙ্ঘ, সমাজ বা সমিতিই ইসারার ভাষা গঠন করে। ইহা কোথায় সম্ভব? যেখানে ইহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, স্কুল আছে, কলেজ আছে এবং শিল্পকাজের কারখানা আছে। যেখানে স্কুল ইত্যাদি থাকিবে সেইখানেই মূক-বধিরের সঙ্ঘ বা সমিতির সৃষ্টি সম্ভব। একক ভাবে কোনও মূক-বধির একটা ভাষা গঠন করিতে পারে না। তাহার ইসারা সুন্দর নয়, পর্য্যাপ্তও নয়। সুতরাং সে সমিতির সহযোগে আসিলে তাহাকে পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের উপাসক হইতে হইবে। এই খানেও একটা স্বাভাবিক বা ঐতিহাসিক সত্য কাজ করে। Testimony বা বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লওয়া মানব-মনের একটা ধর্ম্ম।

পিতা যাহা বলেন পুত্র তাহা মানিয়া লয়, শিক্ষক যাহা বলেন ছাত্র তাহা মানিয়া লয়, রাজা যাহা বলেন

প্রজা তাহা স্বীকার করিয়া লয়, শক্তিমান যাহা বলে দুর্ব্বল তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে—ইহাই মানব-মনের ইতিহাস। এই স্বীকার করা, এই বিশ্বাস করা বা মানিয়া লওয়াটা না থাকিলে বড়ই মুস্কিল হইত। পূর্ব্বপুরুষগণ জিনিষের যে প্রকার নামকরণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই পরবর্ত্তী সন্তানগণ সন্তুষ্ট। এমন কি নিজের নামেও কেহ কখনও আপত্তি করেন নাই তাহা যতই না কেন রুচি-বহির্ভূত হউক। মানব-মনের এই মানিয়া লওয়ার ধর্ম্মটা না থাকিলে কোন ভাষাই গড়িয়া উঠিতে পারিত না।

মূক-বধিরদিগের নিজ ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে sign বা ইসারা করিয়া গেল তাহা পরবর্ত্তিগণ উল্টাইবে না। আপনিই মানিয়া লইবে। অপরিচিতের উপর পরিচিতের এই দাবী চিরদিনই রহিয়া যাইবে। সুতরাং যে sign একবার স্কুলে বা সমিতিতে 'পাস' হইয়া গিয়াছে তাহার আর পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই ভাষার সাহায্যেই মূক-বধিরগণ সাধারণতঃ আপনাদের ভাবরাশি নিজেদের মধ্যে ব্যক্ত করে।

কোনও শ্রুতিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি ইসারার ভাষা জানেন, তবে তিনিও তাহাদের সহিত আলাপে যোগদান করিতে পারেন। মূক-বধিরগণ আমাদিগকে ঘৃণা করে না। আমরাই তাহাদিগকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমরাই এই অসহায় মানবশাখাকে অসহানুভূতির বেড়া দিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছি। একবার দেখি নাই, একবারও বুঝিতে চেষ্টা করি নাই তাহারাও আমাদের মত, তাহাদেরও অবিকৃত বিচারবুদ্ধি আছে, তাহাদের জ্ঞান আছে, আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে। তাহারাও আমাদের মত লেখাপড়া শিখিতে পারে, শিল্পকাজ করিয়া নিজেকে, নিজের পরিবারকে ভরণপোষণ করিতে পারে।

মূক-বধিরদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার ও বুঝিবার আছে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি মোটামুটি হিসাবে উহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম।

সহচরী

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

তুমি বন্ধু আছ পাশে,—একথা যখনি মনে হয়,
অন্ধ-রাতে সপ্তর্ষির পানে আমি মুগ্ধচোখে চাই!
রাশি রাশি হেম-পদ্ম মন-সরে;—তা'রি গান গাই—
মনের কুহেলি হ'তে টুটে' যায় অপার সংশয়!
আলোকে আকুলি' উঠে এ বিশ্বের অজস্র বিস্ময়;—
প্রকাশের ভাষা খুঁজি; প্রাণ পেয়ে নিত্য বেঁচে যাই।
তোমার নয়নে তাই বারে বারে আপনা হারাই!
কোটিসূর্য্য-বিভা যেন একসাথে মরমে উদয়!

এস আজি, ধরো হাত,—শঙ্কা মনে, দুর্দ্দিন ঘনায়!
বজ্রের গর্জ্জনে আর সংগ্রামের ত্রস্ত ধূলি-জালে
আচ্ছন্ন নয়ন মোর! দুরু-দুরু বক্ষের ব্যথায়
সন্ধ্যার সঞ্চার হেরি। বেদনায় কুঞ্চিত এ ভালে
অজানা চিন্তার ভার স্তূপে স্তূপে নিত্য মূরছায়!
সে-রেখা মুছিয়া দিবে জেনেছি এ প্রদোষের কালে।

বসন্ত-উৎসব

শ্রী শান্তা দেবী

(১)

সপ্তদশ বসন্তের অনেক পরে সপ্তবিংশ বসন্তও পার করিয়া এক বসন্ত সন্ধ্যায় মোহন মল্লিকাকে তাহার শ্রীহীন গৃহে বরণ করিয়া আনিল। এতদিন সমস্যায় সমস্যায় জীবনটা কণ্টকাকুল হইয়াছিল; আজ মোহন হাঁফ ছাড়িয়া নিঃশ্বাস লইল—তাহার যে সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে। মল্লিকার হৃদয়কোরক আনন্দে ফুটিয়া উঠিল, আজ তাহার অতীতের সকল সুখস্বপ্ন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকেই ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোহন এতদিন তাহার একলা ঘরে বসিয়া কলালক্ষ্মীর পূজা করিয়াছে. গৃহলক্ষ্মীর আসন শূন্যই পড়িয়াছিল। কাগজে, কাপড়ে, মাটিতে, পাথরে নিশ্চল মানসী মূর্ত্তি কত রূপেই ফুটিয়া উঠিত, যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু ফাটা শানের মেঝের উপর সচলা গৃহিণীর পদচিহ্ন যতদিন না পড়িল ততদিন সে গৃহের দিকে তাকাইতেও মানুষের আতঙ্ক হইত। বছরের পর বছর ধরিয়া সঞ্চিত আবর্জ্জনায় গৃহ এমন ভরাট হইয়া উঠিল যে মোহনের নিজের সেখানে ঠাঁই পাওয়া ভার হইল। আবর্জ্জনার রাশি যতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে রিক্ততা ততই প্রকট হইয়া উঠিল। বিছানায় চাদর নাই, বালিশে তেলের পুরু আবরণ এনামেলের মত চক্‌চকে হইয়া উঠিয়াছে,—জামার বোতাম চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া সূতার বন্ধন ছাড়িয়া গিয়াছে, কাপড়ের পাট খুলিলেই শতগ্রন্থি দন্ত বিকশিত করিয়া হাসে, পকেটে টাকা থাকে না, কিন্তু কে যে লইয়াছে তাহাও মনে আসে না, "বাসে" উঠিয়া পকেট হাত্‌ড়াইয়া আবার নামিয়া পড়িতে হয়। বাড়ী আসিয়া দেখে খাবার কিনিয়া রাখিতেও ভুল হইয়া গিয়াছে। মোহনকে তাহার শীর্ণ দেহ মলিন বিছানায় পাতিয়া নিদ্রার আরাধনায় মন দিতে হইত।

সকলেই বলে এ সকল সমস্যারই সমাধান বিবাহ। মোহন সে কথা মাথা পাতিয়াই স্বীকার করিত, কিন্তু বিবাহ ঘটিয়া উঠাও যে একটা সমস্যা। কে কন্যা দেখে, কে কথা পাড়ে, কে আয়োজন করে? সকল ভারই যে একলার উপর। নিজে যে যাইবে, যদি লোকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এমনি সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সমাধানটাও সমস্যায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মল্লিকা সেই পাড়ারই মেয়ে। লোকে বলিত,—"যার ঘরে এ মেয়ে যাবে তার সংসার উথ্‌লে উঠ্‌বে।" ইহাকে যে পাইবে সে যে অতি বড় ভাগ্যবান্ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তবু মেয়ের কপালে ঘর বর জুটিত না। মনে মনে কত সোনার সংসার সে সাজাইত; কিন্তু হাতের কাছে কোন হতভাগ্যকেই তাহার কৃপা-স্পর্শের প্রার্থী দেখা যাইত না। বসন্তের গাঁথা মালা তাহার সাজিতেই শুকাইয়া যাইত, মল্লিকা চূর্ণ-পুষ্প বাতাসে ছড়াইয়া দিত আর ভাবিত কবে কোন সুদূর বসন্তের দিনে তার মালা গাঁথা সার্থক হইবে। জীবনের শূন্যতা হৃদয় ব্যথায় আকুল করিয়া তুলিত, কিসে তা পূর্ণ হইবে আপনি বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; কেবল শত কাজের সন্ধানে ফিরিয়া ফিরিয়া ভাবিত এই বুঝি তাহার তৃষিত আত্মার গঙ্গাজল। দশজনে বলিত কর্ম্মেই মল্লিকার আনন্দ, ত্যাগেই তাহার প্রাণ, কিন্তু সে নিজে দেখিত অন্ধকারের মত নিরানন্দ সমস্ত জীবনটা ছাইয়া ফেলিতেছে, প্রাণের সমস্ত রস নিংড়াইয়া ত্যাগ মূর্ত্তি ধরিতেছে। মানুষ বলিত বিশ্বে তোমার প্রাণের অফুরন্ত সম্পদ বিলাইয়া দাও, ধন্য হইবে; বসন্ত-বাতাস বলিত একটি গৃহকোণ আলো করিয়া পুষ্পমঞ্জরীর মত ফুটিয়া ওঠ সার্থক হইবে।

প্রজাপতি সদয় হইলেন। পলাশ, শিমুল কৃষ্ণচূড়া যখন বসন্তের বিজয় তোরণ আবীরে রঙাইতেছে তখন মোহন একদা আসিয়া মল্লিকার হৃদয় জয় করিয়া লইয়া

গেল। দশজন বলিল, "আহা, এতদিনে লক্ষ্মীছাড়ার দিকে লক্ষ্মীর সুদৃষ্টি পড়ল। এইবার ও পোড়া কাঠেও ফুল ফুটবে।" মল্লিকার সঙ্গিনীরা বলিল, "মল্লি, তোর ভাগ্যি ভাল ভাই, অরসিকের হাতে পড়ার কি দুঃখ তা তোকে বুঝ্‌তে হ'ল না।"

(২)

উৎসব-পর্ব্বের পর সংসারের চিরন্তন প্রথামত গৃহ-পর্ব্ব সুরু হইল। মোহন বলিল, "তুমি এসেছ, সংসারে এবার আর আমার কোনো অভাব থাক্‌বে না।"

মল্লিকা মধুর হাসিয়া বলিল, "থাক্‌লেই বা দুঃখ কি? তুমি একলাই সব অভাব আড়াল করে রাখ্‌বে। আমি কি অভাবের ভয় করি?"

মোহন বলিল, "সংসারে থাক্‌তে হলে খাওয়া পরা, শোওয়া, ঘুমনো ইত্যাদি কতকগুলো জিনিষ না হলে চলে না যখন, তখন অন্তত সেটুকুর অভাব যাতে না হয় সেটা ত দেখ্‌তে হবে। এতদিন একলা ছিলাম, কেউ কারুর জন্যে দুঃখ করবার ছিল না; আজ থেকে তুমি আমি পরস্পরের সহায়। তোমার যেখানে পা টল্‌বে আমার হাতখানা শক্ত করে ধোরো, আমার যেখানে গলা শুকিয়ে উঠ্‌বে তুমি তৃষ্ণার জল যোগাবে।"

মল্লিকা বলিল, "ঘরে বসে শুক্‌নো ডাঙ্গায় আমিই বা কোথায় আছাড় খাব আর চারবেলা পেট পুরে খেয়ে তোমারই বা মরুভূমির আরব যাত্রীর মত আকণ্ঠ শুকিয়ে উঠ্‌বে কি করে? তুমি নিজের দিব্যি বসে বসে ছবি আঁকবে আর আমি নিত্য নূতন সাজে সেজে নব নব রূপে তোমার ধ্যানমূর্ত্তিকে জাগিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করব।"

মোহন তাহার চিবুক নাড়িয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই হবে গো, সুন্দরি, তাই হবে। এখন সংসারযাত্রাটা অন্তত সচল করবার জন্যে কি দরকার সেইটুকু বল দেখি। তুমি ত খুব কাজের মেয়ে বলে খ্যাতি আছে; খুঁটি-নাটি কোথায় কি দরকার এক নিশ্বাসেই ত বলে দিতে পারবে, তারপর তোমার হাতে সংসার আপনি কলের চাকার মত চল্‌বে।"

মল্লিকা বলিল, "হ্যা, অকাজের সঙ্গী ত এতদিন কেউ ছিল না। তাই পরের কাজ করে করেই হাড় পাকিয়েছি। নীল আকশের দিকে তাকিয়ে তারা গুণ্‌লে কেউ ত 'আন্‌মনা' বলে একখানা ছবি এঁকে ফেল্‌ত না, তাই হাঁড়িকুঁড়ির তদারক করেই দিন কাটাতাম।"

মোহন বলিল, "আচ্ছা, হাঁড়িকুঁড়ির তদারক করবার জন্যে যদি একটি ভূত ধরে আনি তাহলে তুমি ত অন্নপূর্ণা আছ, ক্ষুধার্ত্তকে খাইয়ে দাইয়েও অবসর মত তারা গুণ্‌তে কি চাঁদ ধরতে অনায়াসে পারবে। 'আন্‌মনা' 'তন্মনা' কি 'জাল বোনা' যা বল্‌বে তাই ছবি এঁকে দেব।"

মল্লিকা বলিল, "ভূতেদের নিয়ে ভূতনাথেরই কারবার বেশী, অন্নপূর্ণা বেচারী পেরে উঠ্‌বে কি না সন্দেহ।"

মোহন বলিল, "কেন পারবে না? তুমি শিখিয়ে দিলেই ভূত মানুষ হয়ে উঠ্‌বে।"

শীঘ্রই একটি ভূতের আমদানি হইল। চেহারাখানা দেখিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে বানর ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার সমস্ত সাহস উবিয়া যায়। নাকটা মুখের সঙ্গে প্রায় সমতল, কপালটা ঢিপির মত উঁচু, হাত পা শরীরের তুলনায় যেমন ক্ষীণ তেমনি দীর্ঘ, রংটাও প্রত্যহ একবাটি তেলমাখার গুণে বার্ণিশ করা জুতার মত বেশ চকচকে। হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একটা আবীর রঙের পাঞ্জাবী কুর্ত্তায় রূপার জিঁজির দেওয়া বোতাম লাগাইয়া মাথায় সাদা ফুলকাটা মসলিনের টুপি পরিয়া সে চীনা বাদাম ফিরি করিতে আসিয়াছিল।

বিবাহের মাসখানেক পরে মল্লিকার সেদিন কারখানা হইতে বাড়ীর সব আসবাব আসিয়া পড়িয়াছে; মুটেরা সেগুলি গৃহের যথাযথ স্থানে বসাইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার ভিতর কাপড়-চোপড় বই বাসন ইত্যাদি হাজার জিনিষ গুছাইয়া রাখে কে? মুটেদের শ্রীপদের ধূলিতে ঘরের মেঝে এবং শ্রীহস্তের চিহ্নে জিনিষপত্র এমন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে এই মুহূর্ত্তেই তাহার সংস্কার না করিলে গৃহিণীর সুনাম জলে ভাসিয়া যায়।

মল্লিকা লোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যারে, চাকরী করবি? এই রোদে রোদে জিনিষ ফিরি করে মরার চেয়ে ঘরে বসে দুবেলা খাওয়া কি ভাল নয়?"

লোকটা খুসী হইয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, ভাল ত আছে। তুমি নোকরী দিলেই আমি করি।"

মল্লিকা বলিল, "আজই করবি ত যা তোর কাপড়-চোপড় নিয়ে আয়।"

তাহার কিছুমাত্র আপত্তি দেখা গেল না। চীনা-বাদামের টুক্‌রিটা নামাইয়া সে ভোঁ দৌড় দিল। আধঘণ্টা না যাইতে একটা টিনের বাক্স ও একটা সবুজ ছিটের বালিশ লইয়া সে হাজির হইল। তারপর তাহার বিচিত্র সাজসজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া ধুতির উপর একটা জোলার গামছা কোমরে জড়াইয়া ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া সারাবাড়ী ধুইতে সুরু করিল। তাহার ঐ সরু সরু হাতে আধমণি ঘড়ার জল টান দিয়া কাঁধের উপর তুলিয়া যখন এক এক লাফে দুইটা করিয়া সিঁড়ি টপ্‌কাইয়া সে উপরে উঠিতেছিল, তখন মল্লিকার মনে পড়িতেছিল ছেলেবেলায় দেখা রামায়ণে গন্ধমাদন পর্ব্বত বহনের ছবি। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল মানুষটার হাত পা ছিঁড়িয়া ভাঙিয়া যায় না কেন? প্রথম দিনেই যে এমন নমুনা দেখাইল খাইয়া দাইয়া সবল হইয়া উঠিলে এবং পাকা হাতের শিক্ষা পাইলে তাহাকে দিয়া সকল অসাধ্যই সাধন করানো যাইবে ভাবিয়া মল্লিকার মনটা আনন্দেও ভরিয়া উঠিল।

কানু কোনো কাজেই 'না' বলিত না। মল্লিকা বলিল, "কানু, রান্না করতে পারবি?" সে বলিল, "মা শিখ্‌লিয়ে দিলেই পারব।" এক সপ্তাহ না যাইতে চীনা-বাদামওয়ালা সত্যসত্যই চিংড়িমাছের কাট্‌লেট ও রুই মাছের চপ্‌ পাতে দিতে লাগিল। মোহনের বহুকাল ক্ষুধিত রসনা তৃপ্তিতে তাহা অমৃত জ্ঞান করিল; শিক্ষণ-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া মল্লিকা মালাইকারি ও মুড়ির ঘণ্ট শিখাইতে ছুটিল।

দিনকয়েক মহা উৎসাহে শিক্ষণ কার্য্য চলিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই মল্লিকা ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিল। মোহন বাহিরের ঘরে বসিয়া আগের মতই একা তাহার মানস সুন্দরীর মূর্ত্তি গড়িত; পথপার্শ্বে দেবদারু গাছগুলি নূতন কিশলয়সম্ভারে ঝলমল করিত, একজোড়া পায়রা রান্না ঘরের ঘুলঘুলিতে বসিয়া পরস্পরকে সোহাগ দেখাইত, আবার থাকিয়া থাকিয়া মুক্ত আকাশের দিকে উড়িয়া যাইত; মল্লিকা তেল হলুদ লঙ্কা মাখিয়া রান্নাঘরে কানুর বিদ্যার পরীক্ষা লইতে লইতে চঞ্চল হইয়া উঠিত। এত কাল ধরিয়া যে স্বপ্নরচনা সে করিয়াছিল জীবনের আজ প্রথম সার্থক বসন্তের দিনের সহিত তাহা ত কোনো খানেই মিলিতেছে না। এত যে কাব্যগ্রন্থ সে সঞ্চয় করিয়া আনিল মোহনের সঙ্গে তাহার চর্চ্চা করিবে বলিয়া তা'ত সমস্তই আপন আপন বুকের সম্পদ লইয়া নীরবে পড়িয়া আছে। এত যে সোনালী, রূপালী, বাসন্তী, আশমানী পরিচ্ছদের সে স্তূপ করিয়া আনিয়াছে, সকালে সন্ধ্যায় কতরূপে সাজিয়া মোহনের দৃষ্টি মুগ্ধ করিবে বলিয়া তাহা অন্ধকার সিন্দুকের গহ্বরেই সকল বর্ণসম্ভার লইয়া পড়িয়া রহিল; মল্লিকার এদিকে দিন কাটিতেছে তেলকালিমাখা বঙ্গলক্ষ্মী মিলের শাড়ী পরিয়া আর ওদিকে মোহনের পটে ফুটিয়া উঠিতেছে কোন্ রাজপুতানীর জরির ঘাঘ্‌রা আর উড়িয়ানীর লাল আঁচল। মল্লিকা কাজের মাঝখানে অকস্মাৎ বলিয়া বসে, "কানু, এগুলো ত তোকে অনেকবার দেখিয়েছি, তুই আপনি পারবিনে? আমি একটু অন্য কাজে যাচ্ছি।"

কানু খুসী হইয়া বলে "নিশ্চয় পারব মা। আপনি যান না!" সত্যই সে পারিল দেখিয়া মল্লিকা নিশ্চিন্ত মনে রান্নার সকল ভার তাহার হাতেই ছাড়িয়া দিল। কি যে রাঁধিতে হইবে তাহাও বলিত না কেবল তরকারী কুটিতে আর ভাঁড়ার বার করিয়া দিতে কানু মল্লিকাকে ডাকিতে আসিত।

সকাল বেলা উঠিয়া ভাঁড়ারটা দিয়া কাজকর্ম্ম কিছু নাই দেখিয়া মল্লিকা একদিন বলিল, "আচ্ছা, এতদিন ধরে এত যে ছবি আঁক্‌লে, যাদের পয়সার জন্যে এঁকে দিয়েছ তাদের কথা আলাদা, কিন্তু নিজের ভাল লাগার জন্যে যাদের ছবি আঁক, তারা কি ঘরের হতে নেই? কেবলি পরের ছবি আঁকৃছ, আমি কি এতই খারাপ দেখ্‌তে যে আমার একটা ছবিও আঁকা যায় না! আমাকে দেখ্‌লেই বুঝি তোমার সব ভাব শুকিয়ে যায়! নিজে ত কোনদিন আঁক্‌তে চাইলে না তাই সেধেই বল্‌তে এসেছি।"

মোহন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তোমার ছবি কি

অমন হুড়োতাড়ার মধ্যে যা তা করে হয়? সে অনেক যত্ন করে মনের অনেক মালমশলা খরচ করে তবে হবে। তা তুমি যখন রাগ করছ তখন চলনসই একটা আজই শুরু করা যাবে। যাও, ভাল করে সেজে এস গিয়ে।"

সেই মুহূর্ত্তেই কানু আসিয়া বলিল, "মা-জি, তরকারিটা কুটে দিতে হবে।"

মোহন তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "ভারি ত আড়াইখানা লোকের রান্না, তা আবার তরকারী কুটে দিতে হবে! যা নিজে যোগাড় করে নি গে যা।"

মোহনের একটি ছোট ভাই ছিল, তাহাকে সে আধখানা ধরিত।

কানু হাসিয়া বলিল, "আমি ত পারিই বাবু, মা যদি না বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারেন তাই ডাকতে আসি।"

তরকারি কোটা পর্য্যন্ত কানুর হাতে আসিল। কিন্তু ভাঁড়ার দিতে রোজ সকালে অনেকখানি সময় যায়, তা-ছাড়া তেল-ঘি চাল ডাল ঘাঁটিয়া আবার হাত ধুইতে হয়, মোহন অতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সকালের আলোটা নষ্ট করিতে চায় না। মল্লিকা রোজই দেরী করে দেখিয়া সে বলিল, "কি এমন তোমার হীরে জহরত ভাঁড়ারে আছে যে রোজ একঘণ্টা তার পিছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হবে? ওসব ছেড়ে দাও না ওই লক্ষ্মীছাড়াটার হাতে, অনেক হাঙ্গাম চুকে যাবে।"

মল্লিকা তাহাই দিল। মোহনের কাছে বসিয়া ছবি আঁকাইতে পারিলে সে কি আর কানুর ভাঁড়ার সামলাইতে যায়? এই ত সবে দুই মাস বিবাহ হইয়াছে, এখনই তাহার অত সংসার-আসক্তি হয় নাই। দু পয়সা গেলে কিই বা আসে যায়! তাহার বিনিময়ে যে সঙ্গসুখ সে পায় তাহা অমূল্য! কিন্তু কানু যে ছাড়ে না। মল্লিকা যখন রেশমি ফিতা ও ফরাশী সুগন্ধি দিয়া চুল বাঁধিতেছে, সে আসিয়া বলে, "মা, চালে ত কুলোল না, আর এক পো চাল চাই।"

মল্লিকা চারিটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলে, "যা কিনে নিগে যা।"

কানু আবার আসে। মল্লিকা খোঁপায় সোনার চিরুণী দিতেছিল; কানু আসিয়া বলিল, "সুক্তো যে রাঁধতে বললে মা, তা আদাও নেই সর্‌ষেও নেই। হলুদ দিয়ে রাঁধব?"

মল্লিকা বলিল, "তুই একটা আস্ত গাধা। একসঙ্গে সব চাইতে পারিস্ না। পাঁচ শ' বার আমি পয়সা দিতে পারি না। এই নে, দু পয়সার কিনে আনিস্।"

মল্লিকা ষ্টুডিওতে গিয়া বসিল। মোহন তখন কেবলি তাহার মাথাটা দুইহাত দিয়া ধরিয়া ঘুরাইতেছে ফিরাইতেছে। কানু সেখানেও পরদা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, "মা, ছোটবাবু বেশম দিয়ে বেগুণ-ভাজা খাবেন বললেন, ওতে ত বেশী তেল লাগবে, কোথায় পাই?"

মোহন ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, "পাবি যমের বাড়ীতে! যা, বেরো এই টাকাটা নিয়ে, সারাদিনে আর একটি কথা বলতে পাবি না। যার যা দরকার কিনে আন্‌বি। খবদ্দার আর এমুখো হবি না।"

কানু টাকা লইয়া পলাইয়া গেল। সারাদিন তাহার দেখা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যায় সে আসিল হিসাব দিতে। মল্লিকা দোতালায় উঠিবার সিঁড়ির ধাপে গম্ভীরভাবে বসিয়া বলিল, "নে, কি এনেছিস বল্ চট্ করে। দেরী করিস্ না—আর কত ফিরেছে তাও দেখি।"

কানু বলিল, "কিছু ফেরেনি মা, সব খরচ হয়ে গেছে। এই দেখ না এক পয়সার বেশম, দেড় পয়সার তেল, পাঁচ পয়সার সাবান, জলখাবার চার আনা—"

কানু বলিয়া চলিল; একটা বলে ত দশটা ভুলিয়া যায়। আধঘণ্টা পরে মল্লিকার খাতায় একটা মস্ত ফর্দ্দ তৈয়ারী হইল, যোগ দিয়া দাঁড়াইল সাড়ে চৌদ্দ আনা। মল্লিকা বলিল, "বাকি ছ'টা পয়সা কি করেছিস্?"

কানু মাথা চুলকাইয়া বলিল, "ছ পয়সা বাকি? তাহলে লিখতে ভুল হয়েছে। মা, আর একবার লিখিয়ে লিন। তেল আড়াই পয়সা, বেশম দু পয়সা..."

মল্লিকা তাড়া দিয়া বলিল, "এই বললি দেড় পয়সা আর এক পয়সা, এরি মধ্যে আবার সব বেড়ে গেল? চুরি করবার মতলব বুঝি?"

কানু জিভ কাটিয়া বলিল, "চুরি কেন করব মা, দু পয়সা মেঙেই লিব।"

উপরতলা হইতে মোহন হাঁক দিয়া বলিল, "তোমাদের লাখ টাকার হিসেব কি কিছুতেই শেষ হবে না, রাত যে এগারটা বাজে।" মল্লিকা বলিল, "দাঁড়াও আর একটু বাকি আছে।"

এবার যোগ দিয়া হিসাব দাঁড়াইল আঠারো আনা। মল্লিকা বলিল, "আচ্ছা বাঁদর যা হোক তুই! সারারাত ধরে রকম রকম হিসেব লেখাবি, শোব ঘুমোব কখন?"

কানু বলিল, "সারাদিনের কথা কি ভদ্দর লোকের মনে থাকে মা, যে গরীব আদমির থাক্‌বে? আর একবারটি লিখে লিন।"

মোহন চেঁচাইয়া বলিল, "তুমি না আজ জ্যোৎস্না রাতে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যাবে বলেছিলে, ছাদেও ত হল না; সারারাত কি হিসেবই লিখবে? মেয়েদের চার পয়সার মায়া কিছুতেই ঘোচে না।"

মল্লিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল, "আঃ, চাকর বাকরের সাম্‌নে কি যে বল তার ঠিক নেই; তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

আবার বাহিরে আসিয়া বলিল, "কানু, ও বাড়ীর হরিকে দিয়ে আজকেরটা লিখিয়ে রাখিস্, আমি কাল দেখব অখন। সেত লিখতে জানে, লেখা থাকুলে আর কোনো গোলমাল হয় না।"

সকাল বেলাই কানু আবার টাকা চাহিতে আসিল। মল্লিকা বলিল, "হিসেবটা কই?"

মোহন চটিয়া বলিল, "আজকের টাকাটা ত দাও, হিসেব পরে হবে এখন।"

কানু টাকা হাতে করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলিল, "নীচে ফেলে এসেছি, এখনি এনে দিচ্ছি।"

সকালে ষ্টুডিওতে দুটি সুসজ্জিতা মেয়ে আসিয়াছিল ছবি আঁকাইতে। বেনারসী শাড়ী, রঙীন ছাতা, রেশমী ব্যাগ কোথাও কোনো প্রসাধনের ত্রুটি নাই তাদের। খানিক বাদে কানু আসিয়া তেলমাখা একখানা খাতা তাহাদের রেশমী ব্যাগের উপর ধপাস্ করিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই যে মা, এনেছি হিসেবটা, দেখে দেবেন একবার।" মল্লিকা ও মোহন কট্‌মট্ করিয়া চোখ রাঙাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। ব্রহ্মতেজ থাকিলে কানু ভস্ম হইয়া যাইত। কানু খাতাখানা তুলিয়া পলাইল।

যখন মল্লিকার সময় হয় তখন কানুকে পাওয়া যায় না, যখন কানু খাতা হাতে আসে তখন মল্লিকা কাজে ব্যস্ত। তিন চার দিন হিসাব জমিয়া উঠিল। মল্লিকা বলিল, "দেখ্, আমি জমাটা রোজ লিখে রাখি, তুই খরচটা রোজ লেখাবি, তারপর সময়-মত আমি সবটা মিলিয়ে নেব।"

সাতদিন পরে দেখা গেল জমার চাইতে খরচ প্রায় তিন টাকা বেশী হইয়া গিয়াছে। কানু বলিল তাহার নিজের টাকা হইতে সে কতকগুলা জিনিষ আনিয়াছে, কারণ মাকে যখন তখন ডাকিলে বাবু বড় বিরক্ত হন। কথাটা মল্লিকা অস্বীকার করিতে পারিল না, তিনটা টাকা কানুকে দিয়া দিতে হইল। কিন্তু বেশী সাবধান হইবার উৎসাহ কর্ত্তা গৃহিণী কাহারও দেখা গেল না।

মোহন ও মল্লিকা বাঁচিয়া গেল। রান্না দেখাহতে হয় না, জিনিষ কিনিয়া দিতে হয় না, ভাঁড়ারও বাহির করিতে হয় না, এমন কি হিসাবও লইতে হয় না—সমস্তই কানু করে। সাত দিন আট দিন অন্তর একবার খাতাটা দেখিয়া দিলেই হয়। তাহাদের সারাদিন কাটিতে লাগিল ছবি গান গল্প লইয়া. নয়ত বন্ধুবান্ধব থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখিয়া। ইহাই ত স্বর্গসুখ, কোনো বাধা নাই, কোনো কর্ত্তব্য নাই, কেবল অনাবিল আনন্দ। মল্লিকা যে পাকা গৃহিণী সে বিষয়ে মোহনের কোনো সন্দেহ রহিল না। মোহন যে আদর্শ স্বামী মল্লিকাও তাহা মানিয়া লইল।

একবার মাসকাবার হইবার পর দেখা গেল টাকার থলি একেবারে খালি, মাথা-পিছু ত্রিশ টাকা খাওয়া খরচ হইয়াছে। মাস-তিনেক মল্লিকা হিসাব মেলায় নাই। অনেক কাল পরে খাতা হাতে করিয়া মল্লিকা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল তাহাদের বাড়ীতে ত এমন হইত না, পনের টাকা খরচেই একজনের বেশ চলিত। নূতন সংসার করিতে আসিয়াই সে স্বামীর খরচ বাড়াইয়া দিল, ইহাতে মনটা একটু মুসড়াইয়া গেল বটে কিন্তু ইহাও মনে হইল এই সুদীর্ঘ অক্ষয় বসন্ত-উৎসবের মূল্য কি ইহার চেয়েও

কম? এই কয়টা টাকার বিনিময়ে সে যাহা পাইয়াছে, অতীতে কি ভবিষ্যতে অর্থনীতির নিপুণ চর্চ্চা করিয়া তাহা কি কখনও পাওয়া সম্ভব?

মল্লিকার চিন্তায় বাধা দিয়া মোহন আসিয়া বলিল, "খাতা কোলে করে কি ভাব্‌ছ বসে বসে? আমার দরজির বিলটা এসেছে, কুড়িটা টাকা দাও।"

মল্লিকা বলিল, "টাকা ত নেই!"

মোহন বলিল, "কি রকম? এক মাসেই দুশ' টাকা খরচ করে ফেল্লে? আমার ত একশ'ও লাগ্‌ত না।"

মল্লিকা বলিতে পারিল না যে তাহার জন্য এই কয়মাসে কত ফুল এসেন্স আতর পাউডার তেল মোহনই কিনিয়া আনিয়াছে, তাছাড়া সে একটা বাড়তি মানুষ খাওয়া দাওয়াও ত করিয়াছে। নিজের খরচের কথা বলিতে মল্লিকার লজ্জায় বাধিল। সে বলিল, "একটা চাকর বেড়েছে, তার মাইনে, তার খাওয়া।"

মোহন বলিল, "চাকর আছে ত হয়েছে কি! তার পিছনে খরচ করবার জন্যে কি তাকে রেখেছি, না কাজ পাব বলে রেখেছি?"

মল্লিকা বলিল, "চাকরের হাতে সব ছেড়ে দিলে খরচ বেশীই হয়।"

মোহন বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন বেশী হবে? যেই এক পয়সা বেশী করবে, তখ্‌খুনি তাড়া দেবে, উঠ্‌তে বস্‌তে পিছনে না লেগে থাক্‌লে কখনও চাকর ঠিক থাকে?"

মল্লিকা বলিল, "যদি সারাদিন পিছনেই লেগে থাক্‌ব তাহলে নিজে কাজগুলো করলেই হয়। পিছনে লেগে থাক্‌বার জন্যে কি চাকর রেখেছি, আমার কি আর কোনো কাজ নেই?"

মল্লিকার চোখ সজল হইয়া আসিল। সে ত পিছনে লাগিয়াই থাকিত, মোহনই ত অল্পে অল্পে তাহাকে পূর্ণ ছুটির মাঝখানে চিরবসন্তের মেলায় আনিয়া ফেলিয়াছে; আবার সেই কি না উল্টা রাগ করে! মোহন বলিল, "আচ্ছা, তোমার কাজ আছে তুমি থাক, আমিই যাচ্ছি ওটাকে শিক্ষা দিতে। তিন মাসের মধ্যে একদিন নীচে নাম্‌তে পার না এতই তোমার কাজ!"

রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। এ সময় মোহন কোনোদিন চাকরের ঘরে যায় না। আজ সে গর্জ্জন করিতে করিতে কানুর দরজায় গিয়া ঘা দিল, "লক্ষ্মীছাড়া, শীগ্‌গির দরজা খোল্‌ বল্‌ছি।"

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। মেঝের উপর তিন চারটা বিকটদর্শন হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া লোক পাগড়ী কুর্ত্তা খুলিয়া খালিগায়ে বড় বড় ভাতের থালায় মাছ মাখিয়া খাইতে বসিয়াছিল, একসঙ্গে উঠিয়া জোড়-হাত করিয়া দাঁড়াইল। "বাবু, আজকের দিনটা মাপ করুন, কালই সব চুকিয়ে দেব।"

মোহন ভাল করিয়া না বুঝিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "চুকিয়ে দিবি কি আবার! বেরো এখ্‌খুনি আমার ঘর থেকে।"

একটা লোক মোহনের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবু মশায়, রাস্তায় বার করে দেবেন না, ঘর-ভাড়াটা আজ দিচ্ছি, কাল হোটেল-খরচা দেব।"

মোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কিসের ঘর-ভাড়া, কিসের হোটেল-খরচা? কেনো হতভাগা কোথায় গেল?"

লোকটা বলিল, "আচ্ছা ওর হাতেই দেব বাবু, ওই ত রেখেছে। মাথা-পিছু দু টাকা ঘর-ভাড়া পারব না বাবু, আপনি দেড় টাকা করে বলে দেবেন। খাওয়াটা ঠিকই দেব, কানুর হোটেলে খাসা চপ খাওয়ায়, বলে বাবুদের চেয়ে তোদেরই ভাল। খাটিয়ে একটু আধটু নেয়, কিন্তু পয়সাও মাপ করে।"

মোহন বলিল, "আমি তোদের সব পয়সা মাপ করলাম, তোরা এখ্‌নি বেরো। আমার বাড়ীতে কাউকে খেতেও হবে না, হোটেলের খরচাও দিতে হবে না। কেনো এসে টের পাবে।"

লোকগুলা বলিল, "সে এখন আস্‌বে না বাবু, সুদের তাগাদা করে বেড়াচ্ছে। রাতে নইলে ত লোককে পায় না।"

(৩)

মল্লিকা ইক্‌মিক্ কুকার কিনিয়াছে, ষ্টুডিওতে বসিয়াই রান্না-খাওয়া চলে; মোহনের বিরহ ভোগ করিতে হয় শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ সে যায় বাজার করিতে।

বসন্ত

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দূরতীর্থ নীলাম্বরতলে
বসন্ত এসেছ ধরণীতে।
অকূলের এনেছ আহ্বান
অমৃতের বিজয়-সঙ্গীতে।
সহসা বিস্মিত উদ্বোধন
কুসুম-চকিত করে বন,
আনন্দের হিল্লোল সঞ্চারে
উৎসুক অশোক-মঞ্জরীতে
অতিথি, প্রাণের মন্ত্র তব
পল্লব-কল্লোলে, কাকলীতে ॥

শ্যামলের গভীর অন্তরে,
উৎসবের উৎস-রসধার
উচ্ছলিত দিকে দিগন্তরে
মুখরিত অরণ্য কান্তার।
অশোক কিংশুক বনে বনে
মত্ত হয়ে ওঠে আয়োজনে,
ধরণীর আত্মসমর্পণ
সীমা নাহি জানে আপনার।
ছন্দে গন্ধে বর্ণে অর্ঘ্যে তারি
পূর্ণের প্রণতি উপহার ॥

অনন্তের নিভৃত মন্দিরে
চিত্ত মোর যায় স্বপ্নাভাসে,
যেথানে অলক্ষ্য তাঁরে ঘিরে
সুখ দুঃখ নৃত্যের বিলাসে
জন্মমরণের তালে তালে
জীবন মাতিল মহাকালে,
ঘূর্ণিত ছন্দের আবর্ত্তনে
সৃষ্টির আনন্দ ফিরে আসে,
আত্ম-প্রদক্ষিণ কক্ষ পথে
দেওয়া-নেওয়া বিশ্বের প্রকাশে ॥

কুহকবিদ্যার ফল

(ফরাসী হইতে)

শ্রী স্বর্ণলতা চৌধুরী

উফ্‌ল্ মহাশয় ছিলেন আমুদে মানুষ। বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্প ক'রে সন্ধ্যাটা কাটাতে পারলে আর তিনি কিছু চাইতেন না। তাই ব'লে যে তিনি নেহাৎ খেলো মানুষ ছিলেন তা নয়। স্বামী হিসাবে তিনি আদর্শ ছিলেন, বাপ হিসাবেও তাঁর জুড়ি মিল্‌ত না। তাঁর কোনো দোষ ছিল না তা বলা যায় না; দোষহীন মানুষ আর পাওয়া যায় কোথায়? বুদ্ধিটা তাঁর কিছু কম ছিল। তিনি দয়ালু ছিলেন খুব, তাঁর চরিত্র ছিল নিখুঁৎ, কিন্তু বুদ্ধিটা ছিল নিতান্তই মোটা।

নিজেকে দার্শনিক ব'লে তিনি প্রচার করতেন বটে, এবং কুসংস্কারকে প্রাণ ভ'রে ঘৃণাও করতেন, তবু নুনের বাটি উল্টে গেলে তাঁর অসোয়াস্তির সীমা থাকত না,

টেবিলে ছুরি এবং কাঁটা আড়াআড়ি ভাবে থাকলে তিনি ভয় পেয়ে যেতেন এবং খাবার সময় ত্রয়োদশ চেয়ারে বসতে বল্‌লে প্রাণ গেলেও রাজি হতেন না।

কার্ণিভাল উৎসবের সময় এসে পড়ল। উফ্‌ল্‌ মশায় নিজের এবং তাঁর স্ত্রীর সব আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। সন্ধ্যাবেলাটা খাওয়া-দাওয়া গল্প-গাছার মধ্যে বেশ আনন্দেই কাট্‌ল। নিমন্ত্রিতের দল যত পারল ঠেসে খেল, যতক্ষণ না গলা ভেঙে গেল ততক্ষণ গল্প করল আর গান করল। মদও নিতান্ত কম খরচ হল না। সকলেরই দিল্‌ বেশ খুলে গেল। উফ্‌ল্‌ মহাশয়ের ত বেজায় ফূর্ত্তি লাগতে লাগল!

ক্রমে নিমন্ত্রিতের দল বিদায় হ'য়ে গেলেন, ছেলে-পিলেরা শুতে গেল। উফ্‌ল্‌-গিন্নীও তাঁর খাশ ঝিকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। উফ্‌ল্‌ মহাশয়ের একটু ব্যায়াম করা প্রয়োজন বোধ হল। তিনি ঘরের এধার থেকে ওধার পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশ্‌ দিতে লাগলেন। শিশ্‌টা অবশ্য বেসুরাই দিচ্ছিলেন।

উফ্‌ল্‌ মশায়ের বড় ছেলেটি তাঁর মতই দিল্‌খোলা এবং নির্ব্বোধ। নিমন্ত্রিতের দল বিদায় নিতে আরম্ভ করবামাত্র সেও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। একজায়গায় ছদ্মবেশে নাচ হচ্ছিল, সে সেইখানে গিয়ে জুটল।

ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষে উফ্‌ল্‌ মশায় উপরে চল্‌লেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কোনোমতে রেলিং ধ'রে উঠছিলেন। দোতালায় উঠে সামনেই দেখলেন, তাঁর ছেলের ঘরের দরজা খোলা। তিনি সোজা গিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর একটু কৌতূহল হ'য়ে থাকবে, নয় একটু গল্প করার ইচ্ছা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

তাঁর ছেলে তখন অল্পদূরে এক হোটেলে নাচে মশগুল হয়ে উঠেছিল।

উফ্‌ল্‌ মশায় ছেলেকে ঘরে না দেখে খাটের উপর ব'সে পড়লেন। খাটের পাশে একটা চেয়ারে অনেক-গুলি ছদ্মবেশ তাঁর ছেলে ফেলে গিয়েছিল, তিনি সেইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। সবুজ রঙের উপর জরির কাজকরা একটা পোষাক, সল্‌মা-চুমকি বসান রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের সময়ের একটি পোষাক এবং ভালুকের চামড়ার একটি পোষাক ছিল। এই পোষাকটি এমনভাবে তৈরি যে, সেটি পরলে ভিতরের মানুষের আর কোনো চিহ্নই দেখা যায় না, ঠিক একটি কালো ভালুক ব'লেই মনে হয়! উফ্‌ল্‌ মশায় পোষাকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন, জিনিষটা দেখে তাঁর বড়ই পছন্দ হল। তাঁর গায়ে সেটা ঠিক হয় কিনা দেখতে তাঁর একটু কৌতূহল হল, প'রে দেখলেন একেবারে ঠিক হয়। গিন্নীর কুসংস্কার দূর করবার এটা একটা ভাল সুযোগ ব'লে তাঁর মনে হল। গিন্নীটি বোকামীতে প্রায় কর্ত্তার সমানই। তাঁর যত রকম যাদুবিদ্যা এবং কুহকবিদ্যায় অগাধ বিশ্বাস। ডাইনীরা ছোট ছেলেপিলে খাবার জন্যে যে মন্ত্রবলে জানোয়ারের মূর্ত্তি ধরে, সে বিষয়ে তাঁর কোনোই সন্দেহ ছিল না।

উফ্‌ল্‌ মশায় ভাবলেন, এই সুযোগে ওর মন থেকে এই সব বাজে বিশ্বাসগুলো দূর ক'রে দেওয়া যাক। আমাকে এই পোষাকে দেখ্‌লে সে ঠিক ভাববে কোনো ডাইনীই ভালুক সেজে এসেছে, তারপর যখন পোষাকটা খুলে ফেলব, তখন আচ্ছা বোকা বন্‌বে। কুহকবিদ্যায় আর কোনোকালে বিশ্বাস করবে না।

গিন্নীর দরজার কাছে গিয়ে তিনি কান পেতে শুন্‌তে লাগলেন। ভিতরে তখন ঝিটা কথা বল্‌ছে। উফ্‌ল্‌ মশায় নীচে খাবার ঘরে নেমে গেলেন, কারণ গিন্নী একলা না হলে সুবিধা হবে না। ঝিটা নেমে এলে যাতে দেখতে পান, সে জন্যে ঘরের দরজাটা খোলা রেখে দিলেন।

তারপর একখানা বই নিয়ে আগুনের সামনে ব'সে পড়তে আরম্ভ করলেন। বইখানা ভাগ্যক্রমে ছিল কুহক-বিদ্যা সম্বন্ধে; উফ্‌ল্‌ মশায় মন্ত্রবলে রূপান্তরিত হওয়ার পরিচ্ছেদটি খুলে মন দিয়ে পড়তে লাগলেন।

বহুরূপী যাদুকরদের কাহিনী পড়তে পড়তে কখন এক সময় টেবলের উপর মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, বইটা তাঁর কোলেই থেকে গেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত কি যে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তার ঠিকানা

নেই। কোথাও বা মানুষে নেকড়ে বাঘ হয়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা ভালুক হয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা বিকট চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গিন্নীর ঝি, তাঁর চুল আঁচড়ে বেঁধে দিয়ে, রাত্রের পোষাক পরিয়ে নীচে নেমে আসছিল। খাবার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল যে দরজাটা খোলা, ভিতরে তখনও আলো জ্বলছে। চাকরগুলো ঘরের আলো নিবিয়ে দিতে ভুলে গেছে মনে ক'রে সে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল, বাতি নেবাবার জন্যে।

সেই মাঝরাত্রে, একলা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, বেচারী দেখলে, আগুনের সামনে ভীষণ এক কালো ভালুক, টেবিলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছে। তার কোলের ওপর একখানা খোলা বই, তার পাশে একটা রুমাল। ঝিয়ের হাতের বাতি প'ড়ে গেল, সে প্রাণভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল।

উফ্‌ল্ মশায় হঠাৎ চমকে জেগে উঠে কেমন যেন হয়ে গেলেন। তাঁর যেটুকু বুদ্ধি বা ছিল, তাও লোপ পেল। তার সামনেই ছিল একখানা বড় আয়না। ঘুমিয়ে পড়বার আগে তিনি যে ছদ্মবেশ পরেছিলেন, সে কথা ভুলে গেলেন, খানিক আগে কুহকবিদ্যা বিষয়ে কি কি যে পড়ছিলেন, তাই তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল; তার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল যে কেউ মন্ত্রবলে তাঁকে ভালুক ক'রে দিয়েছে। এই বিশ্বাস হবামাত্র, তিনি ঝিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী ঝিয়ের চীৎকার শুনে সিঁড়ির মুখে ছুটে এসেছিলেন, তিনি দেখলেন ভয়াবহ একটা জানোয়ার, ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। সদর দরজা খুলে সেটার রাস্তায় বেরিয়ে যাবার শব্দ পাবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন।

উফ্‌ল্ মশায় ভয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে করতে তিনি রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলেন। স্বভাবতঃই তাঁর গলার স্বরটা বেশ ভারি এবং মোটা ছিল, এখন ভালুকের মুখোসের ভিতর দিয়ে বার হওয়ার দরুণ সেটা আরো বিকট শোনাতে লাগল।

রাস্তায় ওরকম আওয়াজ শুনে দু চারজন লোক জানলা দিয়ে মাথা বার ক'রে দেখতে গেল। কিন্তু ব্যাপার দেখবামাত্র যে যার বিছানায় ছুটে ফিরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

একজন পাহারাওয়ালা রোঁদ্ ফিরতে ফিরতে হঠাৎ তাঁর সামনে এসে পড়ল। হাতের লণ্ঠন ফেলে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ লম্বা দৌড় দিল।

ঐ রাস্তার পরের রাস্তাতেই একটি মহিলা বাস করতেন। তিনি সুন্দরী ত ছিলেনই, কিন্তু ধনবতী ছিলেন তার চেয়েও বেশী। এক মুদীর দোকানের কর্ম্মচারী তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। দোকানেই চাল বিক্রী করতে করতে মহিলাটির সঙ্গে তার আলাপ হয়। মেয়েটির তাকে অপছন্দ ছিল না, তবে কন্যার মা-বাবার দারুণ অমত, তাঁরা ছোকরাকে বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতেই বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। ছোক্‌রা বড় চালাক। মেয়েটিকে প্রণয় নিবেদন করবার আর কোনো উপায় না পেয়ে সে একদল বাজনদার ভাড়া ক'রে নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে ব্যবস্থা হল যে ঘণ্টা-পিছু দু টাকা ক'রে তারা পাবে, কিন্তু সারারাত মেয়েটির ঘরের জানলার নীচে তাদের বাজনা বাজাতে হবে।

আজ রাত্রেও তারা কথামত বাজিয়ে চলেছিল। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা কালো ভালুক খাড়া দাঁড়িয়ে ছুটতে ছুটতে তাদের মধ্যে এসে পড়ল। বাজনা-টাজনা ফেলে দিয়ে, টাকার কথা ভুলে তারা সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। কিন্তু প্রণয়ী ছোকরাটি সেখান থেকে নড়ল না। সদর দরজা চেপে ধ'রে সে দাঁড়িয়ে রইল। জানোয়ারটা যদি ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রাণ দেবে তবু নিজের প্রণয়িনীর কোনো বিপদ হতে দেবে না।

ভালুকটা কিন্তু তাকে লক্ষ্য না ক'রে, গর্জ্জন করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটে চ'লে গেল। ছোক্‌রা তখন চারিদিকে ছড়ানো বাজনাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, মেয়েটির ঘরের জানলার দিকে খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে নিজের বাড়ী ফিরে গেল।

একদল কলেজের ছেলে রাত্রে স্ফূর্ত্তি করতে

বেরিয়েছিল। যত রকম অদ্ভুত কাণ্ড তারা ভাবতে পারছিল, সব ক'রে চলেছিল।

পরদিন সকালে ক্লাশের ছেলেদের কাছে বড়াই করতে হবে ত? অবশ্য এসব কীর্ত্তিগুলিতে তাদের নিজেদের বিপদ বিশেষ কিছুই ছিল না, অন্য লোকদেরই ক্ষতি। তারা রাস্তার আলো ভেঙে, লোকের বাড়ীর দরজার কড়া খুলে দিয়ে, মহাশব্দেই রাস্তা চলেছিল।

অবশ্য কোনো পাহারাওয়ালার হাতে ধরা পড়লে, একটু মুস্কিলের ব্যাপার। তখন এই যুবকগুলিকে পকেটের পয়সা খরচ ক'রে মুক্তিলাভ করতে হত।

ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বীরত্বের কাজ ছিল, মাঝরাত্রে গিয়ে রাস্তার ঘণ্টা বাজান। দরজার কড়া খুলে আসাটাও খুব আশ্চর্য্য শৌর্য্যের পরিচয় ব'লে তারা ধরত।

সেইরাত্রে চারজন ছাত্র মিলে, একজন সম্ভ্রান্ত নগরবাসীর সদর দরজাটা স্ক্রু দিয়ে এঁটে বন্ধ ক'রে দিচ্ছিল। কাজটায় যথেষ্ট নিপুণতার প্রয়োজন। হঠাৎ একটা ভয়ানক চীৎকার শুনে তারা চম্‌কে উঠল। ছাত্র চারজনের মুখ একেবারে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। মিনিটখানেক পরে তারা দেখতে পেল একটা ভয়াবহ জানোয়ার রাস্তা দিয়ে দৌড়ে তাদের দিকে আসছে। যুবক কয়জন একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে ভিতরে মিলিয়ে যাবার চেষ্টায় আকুল হয়ে উঠল। প্রত্যেকে চেষ্টা করতে লাগল অন্য একজনের পিছনে লুকোবার। যার গায়ে সব চেয়ে জোর সেই সবার পিছনে জায়গা ক'রে নিল, যার গায়ে জোর কম, সে বেচারা সকলের সামনে, সকলকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

জানোয়ারটা তাদের সামনে এসে এক মুহূর্ত্তের জন্যে দাঁড়াল। চাঁদের ক্ষীণ আলো আর রাস্তার আলোর সাহায্যে তারা সেটাকে ভাল ক'রে দেখতে পেল। সত্যিই ভীষণ মূর্ত্তি! ভয়ে একজন যুবকের হাত থেকে স্ক্রু প্যাঁচ দেবার যন্ত্রটা ঠন্ ক'রে প'ড়ে গেল। শব্দ শুনে জানোয়ারটা তাদের দিকে ফিরে দেখলে, তারপর ভাঙা গলায় গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাদের দিকে আসতে লাগল। ঐ ভীষণ জীবটিকে নিজেদের দিকে আসতে দেখে, যুবক চারজনের ভয়ে একেবারে বুদ্ধি লোপ হল। চীৎকার ক'রে, এ ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে তারা রাস্তায় গিয়ে পড়ল, তারপর উঠে চারজন চারদিকে দৌড় দিল। পুলিশের সাহায্যের জন্যে তারা প্রাণপণে চীৎকার করছিল, যদিও পুলিশকে এতদিন ধরে তারা দিব্যি কলা দেখিয়ে এসেছে।

পরদিন তারা বন্ধুবান্ধবদের কাছে কি গল্প করেছিল, তা ঠিক বলতে পারি না। একজন ছাত্র নিজের তলোয়ারটাকে দু' টুক্‌রো ক'রে ভেঙে, ব'লে বেড়াতে লাগল যে সে ঐ জানোয়ারটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তলোয়ার ভেঙেছে। আর একজন সকলকে নিজের গায়ের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বলতে লাগল, জানোয়ারটা তাকে কি ভীষণ আঁচড়ে দিয়েছে। তৃতীয় একজন হাতখানা ব্যাণ্ডেজ ক'রে প্রচার করল, ঐ ভীষণ জীব তার হাত কাম্‌ড়ে প্রায় দু টুকরো ক'রে দিয়েছে। যুবকরা সকলেই একবাক্যে বলল যে তাদের ভয়ানক যুদ্ধ করতে হয়েছিল বটে কিন্তু জানোয়ারটাকে শেষ অবধি তারা হারিয়ে, তাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে উফ্‌ল্ মশায়ের অবস্থা হল শোচনীয়; পুলিশের জন্য যুবকদের চীৎকার শুনেই তাঁর ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। তিনি ভাব্‌লেন, পুলিশ এলেই ত আমাকে ধরবে, তারপর বিচার ক'রে, আমাকে যাদুকর ব'লে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। সর্ব্বনাশ, এখন করা যায় কি!

তিনি ভয়ে ভয়ে আবার বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলেন। পাছে পুলিশে তাঁকে দেখে ফেলে, এই ভয়ে তিনি আঁধার জায়গা খুঁজে খুঁজে সেইখান দিয়ে চলছিলেন। বাড়ী পৌছলেই রক্ষা; তখন গিন্নীকে তিনি বলবেন, ছোরা দিয়ে তাঁর কপালে এক খোঁচা দিতে। রক্ত পড়লেই তিনি নিজমূর্ত্তি ফিরে পাবেন, কারণ কুহকমন্ত্রবলে রূপান্তরিত হওয়ার এই একমাত্র প্রতিবিধান।

কিন্তু ভয়, বিস্ময় প্রভৃতির আতিশয্যে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি একরকম লোপই পেয়ে গিয়েছিল। তিনি রাস্তাঘাট কিছুই চিন্‌তে না পেরে অতি শোকাকুলভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগ্‌লেন। নিজের বাড়ী আর কোথাও খুঁজে পান না। যতই ঘুরতে লাগ্‌লেন, ততই তাঁর

মাথা গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। এক বুড়োর ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন শেষে। সে ত ভয়ে ফুটপাথে প'ড়ে মূর্চ্ছাই গেল। উফ্‌ল্ মহাশয় নরহত্যা করেছেন ভেবে, আরো বিষণ্ণ মনে অন্য একদিকে দৌড়ে চল্‌লেন।

একদল লোক রাত্রে গাড়ী ক'রে ফিরছিল। তিনি দৌড়ে গাড়ীটার কাছে গিয়ে পথ জিগ্‌গেস করলেন। কিন্তু ফল হল বিষম। কোচম্যানটি ভয়ে পাগল হয়ে লাফ দিয়ে নীচে পড়ল। ঘোড়াগুলো হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গাড়ী নিয়ে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল, ভিতরের লোকগুলি প্রাণভয়ে চীৎকার করতে লাগল।

অবশেষে আর চলতে না পেরে উফ্‌ল্ মশায় একটা সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন, তিনি একেবারেই হাল ছেড়ে দিলেন। আর রক্ষা নেই। তাঁকে আগুনে পুড়ে মরতেই হবে। কল্পনার চোখে ঐ ভয়াবহ শাস্তির দৃশ্য তিনি বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

হঠাৎ তাঁর কানে একটা পরিচিত গলার স্বর এসে ঢুকল। গলাটা তাঁর বড় ছেলের। তাঁর মনে একটু আশার সঞ্চার হল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের দিকে এগিয়ে চললেন। ছেলে তখন নাচের মজলিশ থেকে বাড়ী ফিরছিল। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে মদ খেয়েছিল। কাজেই মাথাটা তার তখন বিশেষ পরিষ্কার ছিল না। পথে চলতে চলতে সে আপনমনে বক্‌বক্ করছিল। হঠাৎ উফ্‌ল্ মশায়কে দেখে তার বক্তৃতা এবং গান দুইই বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে যে ভালুকের চামড়ার ছদ্মবেশ সে চেয়ারের উপর রেখে এসেছিল, সেটা দিব্য দুই পায়ে হেঁটে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এ কি কাণ্ড! যুবকের মনে হল নিহত ভালুকের প্রেতই আবার তার পূর্ব্ব দেহে ফিরে এসে হিসাব-নিকাশ করতে বেরিয়েছে।

সে মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভালুকটার দিকে চেয়ে রইল, ভয়ে তখন তার চোখ ঠিক্‌রে বেরচ্ছে, সারা শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

সম্ভব হলে সে মাটিতে গর্ত্ত করে ঢুকে যেত। হঠাৎ সে শুন্‌ল ভালুকের মুখ থেকে তার নিজের নাম বার হচ্ছে। আর মুহূর্ত্ত মাত্র দেরি না করে, সে পিছন ফিরে প্রাণপণে দৌড় দিল। উফ্‌ল্ মশায় ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তিনি যতই ডাকেন, ছেলেও তত জোরে দৌড়য়। অগত্যা তিনিও তার পিছন পিছন ছুটে চললেন।

দুজনেই বেশ রীতিমত জোরে দৌড়চ্ছিলেন। ছেলে দৌড়চ্ছিল প্রাণের ভয়ে, পাছে ভালুকটা তাকে ধরে ফেলে। বাপ দৌড়চ্ছিলেন, বাড়ী খুঁজে পাবার আশায়।

ছেলে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, ভালুকটা বেশ এগিয়ে এসেছে, তাকে ধর্‌ল ব'লে। তার গর্জ্জনও শোনা গেল, সে যুবকের নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। সে এক রাস্তা ছেড়ে আর এক রাস্তা, এ-গলি ছেড়ে ও-গলি করে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল, কিন্তু ভালুক কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়ল না। যেদিকে সে যায় জানোয়ারটাও সেইদিকে যায়। যুবক যখন দেখ্‌ল যে সেটার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, তখন সে সোজা বাড়ীর দিকে ছুটল। বেরবার সময় সে বাগানের রেলিং ডিঙিয়ে বেরিয়েছিল। রাত-বিরাতে ফূর্ত্তি করতে যখনই সে যেত এইভাবেই যাওয়া-আসা করত। এখনও সে বাগানের দিকেই চলল। সে আশা করছিল ভালুকটা তাকে ধরে ফেলবার আগে সে রেলিং টপকে ভিতরে যেতে পারবে এবং খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে।

সে রেলিং-এর কাছে গিয়ে পৌছল। ধীরে-সুস্থে রেলিং টপ্‌কানোও একটু মুস্কিলের ব্যাপার, তার উপর একাজ যদি খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়, তাহলে বিপদের সীমা থাকে না। উফ্‌ল্ মশায়ের ছেলে সবে রেলিং বেয়ে উঠে, নীচে লাফিয়ে পড়বার জোগাড় করছে, এমন সময় কালো একটা থাবা তার একখানা ঠ্যাং চেপে ধরল। টানাটানি করে কিছুতেই সে পা ছাড়াতে পারল না, ভালুকটা তার পা ধরেই রেলিং বেয়ে উঠতে লাগল। ছেলে প্রাণপণে পা ছুঁড়তে লাগল, মুক্তিলাভ করবার জন্যে, এবং দুই হাতে রেলিং চেপে ধরে সাহায্যের জন্যে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল। ভালুকটা উপরে উঠে, তাকে বেশ করে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। যুবক প্রাণভয়ে লাফিয়ে নীচে পড়াতে, ভালুকটাও তার সঙ্গে

সঙ্গে লাফ দিল। কিন্তু মাটিতে না পড়ে দুজনেই মাঝ-পথে আটকে গেল।

রেলিংগুলোর মাথায় সব ছুঁচালো গজাল বসান। একটা গজালে ভালুকের চামড়াটা আটকে গেল, উফ্‌ল্‌ মশায় আর তাঁর ছেলে শূন্যে ঝুলতে লাগলেন। দুজনেই সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে লাগ্‌লেন, ছেলের গলা অবশ্য বাপের ঢের উপরে উঠল।

বাড়ীর এক তলার পিছন দিকের জানলাগুলোতে আলো দেখা গেল। অল্পক্ষণ পরেই একদল ঝি আর চাকর, বন্দুক, তলোয়ার পিস্তল প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে এল। সকলের পিছনে এলেন গিন্নী, তিনি তখনও রাত্রির পোষাক পরে আছেন।

মাকে দেখে ছেলে চীৎকার করে তাঁকে ডাকতে লাগ্‌ল। গিন্নী যেই দেখলেন তাঁর ছেলেকে একটা বিকট-দর্শন ভালুক দুহাতে ধরে রয়েছে, তিনি ত তখনই মূর্চ্ছা গেলেন। বাড়ীতে একটা বুড়ো চাকর ছিল, সে সরাইস্যার উপর সর্দ্দারি করে বেড়াত। সে দুইহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে এগিয়ে এল। যুবক চীৎকার করে তাকে বলল, "ভালুকটার মাথায় গুলি কর।" উফ্‌ল্‌ মশায় বৃথাই চেঁচাতে লাগলেন, "গুলি কোরো না, গুলি কোরো না, আমি তোমাদের কর্ত্তা।" ভালুকের মাথার ভিতর থেকে তাঁর গলার স্বর ভয়ানক অদ্ভুত শোনাতে লাগল, সকলে তাতে আরও ভয় পেয়ে গেল। আর একটু হলেই উফ্‌ল্‌ মশায়কে মাথায় গুলি খেয়ে মরতে হত, এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে পোষাকের বোতামগুলো পটাপট ছিঁড়ে গেল, এবং ভদ্রলোক ছেলেকে নিয়ে ধুপ্‌ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। ভালুকের চামড়ার পোষাকটা রেলিংএ ঝুলেই রইল।

উফ্‌ল্‌ মশায় উঠে বললেন, "বাঁচা গেল বাবা। কুহকমন্ত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।"

ছেলে বলে উঠ্‌ল, "আরে এ যে বাবা দেখি! তুমি ভালুক সেজে কি করছিলে?"

গিন্নী মূর্চ্ছা থেকে উঠে বসে বল্‌লেন, "ওমা, এ কি কাণ্ড! এ যে কর্ত্তা!"

বুড়ো চাকর বল্‌লে, "আরে রাম, রাম! কর্ত্তা যে! আর একটু হলেই ত গিয়েছিলেন!"

উফ্‌ল্‌ মশায় বল্‌লেন, "এস, আমরা কোলাকুলি করি। বড় বেঁচে গিয়েছি।"

ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্যজাতি

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

ময়ূরভঞ্জে যে-সব হিন্দু বাস করেন, তাঁরা হয় বাঙালী না হয় উড়িয়া। সেখানে উড়িষ্যাবাসীদেরই প্রভাব বেশী। হিন্দু ছাড়া যারা সেখানে সাধারণতঃ বাস করে তারা সেখানকারই পার্ব্বত্য জাতি। ময়ূরভঞ্জের এক অংশ সিংভূমের দিকে ব'লে সেখান থেকে কিছু কিছু বাঙালী ও কুরমী ময়ূরভঞ্জে আশ্রয় নিয়েছে। আর অপর দিকে উড়িষ্যার লোকেরা সেখানে গিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। পার্ব্বত্য জাতিদের আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগ, যারা হিন্দু সভ্যতা ঠিকভাবে গ্রহণ করেনি, যদিও তারা হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, যেমন সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি। আর দ্বিতীয়, যারা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ ক'রে নিজেদের হিন্দু ব'লে পরিচয় দিচ্ছে, যেমন ভূঁইয়া, বাথুড়ী, পুরাণ, ভূমিজ, পান প্রভৃতি। এদের আদমসুমারির সময় সরকার অর্দ্ধ হিন্দু ব'লে গণ্য করে। এ ছাড়া যারা আছে, যেমন উড়িয়া ব্রাহ্মণ, করণ, গোড়, মহন্ত এরা পুরামাত্রায় হিন্দু। সুতরাং এখানে আমরা একদল লোক পাচ্ছি যারা সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে; আর একদল, যারা সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে আসছে ক্রমশঃ, ও অপর একদল যারা একটা সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যেই রয়েছে।

হিন্দুধর্ম্মের নামে একটা নালিশ আছে যে, হিন্দুধর্ম্মে বিজাতীয় লোকেরা প্রবেশ করতে পায় না। কিন্তু ময়ুরভঞ্জে আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই কেমন ভাবে পার্ব্বত্য জাতিরা নিজেরাই ক্রমশঃ হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করছে ও কিছুকাল পরে নিজেদের হিন্দু বলে বড় গলায় ঘোষণা করছে ও উপবীত গ্রহণ করছে। এই সব জাতিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্য কোন সভাসমিতি করতে হয়নি, কোন আন্দোলন করতে হয়নি, তারা আপনা থেকেই হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ করছে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ময়ুরভঞ্জের কোল বা সাঁওতালরাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে চায়। ভুঁইয়া, বাথুড়ী, পুরাণ এই সব জাতিরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনুসরণ করে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তারা খোল-করতাল নিয়ে ভূমিতে নানারকম আল্‌পনা এঁকে সঙ্কীর্ত্তন করে। সকলের চেয়ে মজার জিনিষ এইটি যে, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের সময় তারা বাংলা কীর্ত্তন করে। আর মহন্তরা বা পানেরা "করম-পূজার" সময় যেসব গান করে সেগুলিও বাংলা। উড়িষ্যার অন্যান্য স্থানেও যেমন চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব দেখা যায়, ময়ুরভঞ্জের সংকীর্ত্তনেও সেই প্রভাব লক্ষিত হয়। আব মহন্তরা করমপূজার সময় যেসব বাংলা গান করে, সেগুলি বোধ হয় সিংভূম বা মানভূম হইতে গিয়াছে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—ভুঁইয়া, বাথুড়ী, পুরাণ, ভূমিজ প্রভৃতির পুরোহিত উড়িয়া ব্রাহ্মণ, কিন্তু মহন্তদের পুরোহিত হচ্ছে বাঙালী ব্রাহ্মণ। এইস-ব বাঙালী ব্রাহ্মণদের নামের শেষে "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন গৌর ঠাকুর। বাংলাদেশেও সেই প্রথা এখনও আছে, অনেক সময় পুরোহিতকে "ব্রাহ্মণ ঠাকুর" বা "ঠাকুর মশাই" বলা হয়। যা হোক, মনে হয় মহন্তদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও বাংলাদেশ থেকে আমদানী। হিন্দুমন্দিরে এ সকল জাতিই পূজা দিতে আসে। এমন কি খিচিংএর ঠাকুরাণীর মন্দিরে সাঁওতাল কোলরাও মুরগী মানত করে পূজা দেয়।

আমরা যেমন সাধারণতঃ লোকেদের আর্য্য বা অনার্য্য অথবা সভ্য ও অসভ্য এই দুই ভাগে ভাগ করি, তেমনি ময়ুরভঞ্জের লোকেদের মধ্যেও সভ্যতার পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য দুটি বিভাগ আছে। একটি "হাটুয়া" অর্থাৎ যারা সাধারণতঃ সভ্যতার দাবী করে, যেমন উড়িয়া ব্রাহ্মণ, করণ প্রভৃতি; অপরটি "কলাপিটিয়া" অর্থাৎ যারা সভ্যতার স্তরে এখনও পৌছে নাই, যেমন ভুঁইয়া, পুরাণ, বাথুড়ী প্রভৃতি। কিন্তু কোন কোন স্থানে ভুঁইয়ারাও নিজেদের "হাটুয়া" বলে দাবী করেছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, তারাও উড়িষ্যাবাসীদের মত দ্রুত সুসভ্য হয়ে উঠছে। সেজন্য অনেক স্থলে তারা নিন্দনীয় প্রথা ত্যাগ করছে, যেমন, অনেকে নিষিদ্ধ মাংস বা মদ্য খাওয়া ত্যাগ করেছে। অনেকে আবার সুসভ্য হবার জন্য নিজেদের যে নাচের প্রথা আছে, তাও ছেড়ে দিচ্ছে। অনেকে আবার মুখে স্বীকার করে না যে তাদের মধ্যে নাচের প্রথা আছে, যদিও উৎসবের সময় নিজেদের মধ্যে নাচ হয়। এখনও ভূমিজদের মধ্যে যে-রকম নাচের প্রথা রয়েছে, তা দেখে মনে হয় যে, এ নাচ সাঁওতাল বা কোল নাচ অপেক্ষা অনেক খারাপ। সাঁওতাল বা কোলদের নাচে যে স্বচ্ছন্দ ভাব ও গতি দেখতে পাওয়া যায়, এদের নাচে তা পাওয়া যায় না। বরং সাঁওতাল বা কোল মেয়েরা যেমন স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে নাচে যোগ দেয়, এদের মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। শুধু একটি মাত্র মেয়ে এই নাচে পুরুষদের সঙ্গে যোগ দেয়, এবং সেই মেয়েও কাপড়-চোপড়ে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে দেখা দেয়। এখানেই এই-সব জাতিদের উপর হিন্দুসভ্যতার কুফল দেখা যায়। যেখানে মেয়েদের অবাধ ও স্বচ্ছন্দ গতি ছিল, সেখানে হিন্দুসভ্যতার ফলে অবাধ গতি আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

শুধু এই নয়, হিন্দুসমাজের অন্য কুফলও তাদের মধ্যে দেখা গেছে। হিন্দুসমাজে যে ছুৎমার্গ এত অনিষ্টসাধন করেছে, সেই ছুৎমার্গ এদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অনেক স্থানে এই ছুৎমার্গ খুব প্রবল আকার ধারণ করেছে। যেমন হিন্দুসমাজে উচ্চ নীচ জাতিভেদ আছে, এদের মধ্যেও তেমনি আছে। ভুঁইয়া, পুরাণ, বাথুড়ী,—এরা নিজেদের উচ্চজাতি বলে মনে করে এবং ভূমিজ বা পানকে স্পর্শ করতেও চায় না। স্পর্শ করলে যথাশাস্ত্র

প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এই এদের ধারণা। প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন এদের উড়িয়া ব্রাহ্মণ—যাকে অনেক সময় "ব্রহ্মা" বলা হয়। সেজন্য পুরাণ বা বাথুড়ীরা নীচজাতির সঙ্গে কাজ পর্য্যন্ত করতে চায় না।

এই সব জাতিদের মধ্যে ভুঁইয়াই সকলের শ্রেষ্ঠ। কেয়ঞ্জর রাজ্যে ভুঁইয়ারা রাজার অভিষেকের সময় রাজাকে "রাজতিলক" পরিয়ে দেয়। অনেকে মনে করেন যে, ভুঁইয়ারাই আগে ময়ুরভঞ্জের রাজা ছিল, পরে তাদের হাত থেকে "ভঞ্জ" রাজারা রাজশক্তি কেড়ে নিয়েছে। খিচিংএ যে ঠাকুরাণীর মন্দির আছে তাতে ভুঁইয়ারা অনেক উচ্চপদ পেয়েছে। সেই মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকা সত্ত্বেও, একজন ভুঁইয়া পুরোহিত আছে। তাকে "দেহুরী" বলা হয়। এ ছাড়া আরও অনেক ভুঁইয়া কর্ম্মচারী সেই মন্দিরে নিযুক্ত আছে। এই-সব কাজের জন্য তারা ব্রহ্মোত্তর উপভোগ করে। এজন্য ভুঁইয়ারা সাধারণতঃ অন্য জাতি অপেক্ষা বেশী সম্মান পায়। ভুঁইয়ারা নানা "খিলি" বা শ্রেণীতে বিভক্ত। এক খিলির লোকে সেই খিলির মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। কতকগুলি খিলির নাম—(১) অস্থরাঢ় (২) কান্তি (৩) কাশিয়াড় (৪) বাঢ়মুণ্ডী (৫) নারেঙ্গী প্রভৃতি। এদের বিশ্বাস যে এরা পশ্চিম দিক থেকে এসেছে, এবং প্রথম যারা আসে তারা বারো ভাই ছিল, সেই অনুসারে এদের মধ্যে বারো খিলির নাম হয়েছে। এদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে এরা ভূমি থেকে হয়েছে বলে এদের ভুঁইয়া বলা হয় এবং নাগভূমিকে মাথায় করে রাখে বলে এদের "নাগেশ" গোত্র। এদের সমাজবন্ধন খুব সুদৃঢ়। সমস্ত ভুঁইয়াদের সমাজ-নেতা যিনি হন, তাঁর নাম "ভল্‌ভাই"। ময়ুরভঞ্জের সকল ভুঁইয়ারা একত্র মিলিত হয়ে সমাজের নেতা ভল্‌ভাইকে নির্বাচন করে, পরে রাজা সেই নির্ব্বাচনে নিজের সম্মতি জানান। ভলভাইয়ের সাহায্যের জন্য আর একজন কর্ম্মচারী থাকে, তার নাম "ডাকুয়া"। ডাকুয়ার কাজ সভা আহ্বান করা। যখন বিশেষ প্রয়োজনে সব ভুঁইয়াদের ডাকার দরকার হয়, তখন ডাকুয়া সকলকে একস্থানে সমবেত করায়। সেখানেই সামাজিক সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়। এ ছাড়া আর একজন কর্ম্মচারী আছে, তার নাম—"পাণিপাত্র।" যখন কোন সামাজিক ভোজ হয়, তখন পাণিপাত্রই সকলের প্রথমে অগ্নিদেবকে ভোজ্যদ্রব্য অর্পণ করে নিজে খান।

বাথুড়ীরা এখনও অনেক স্থানে জমিদাররূপে আছে। করণজিয়া, আদিপুর, দাসপুর ও সিমলিপালে বাথুড়ী জমিদার এখনও দেখা যায়। এরা অন্যদের চেয়ে কিছু পরিমাণে শিক্ষিত। এরাও নানা খিলিতে বিভক্ত। পুরাণদেরও নানা খিলি আছে, যেমন—সি, ধড়, দেও, ধীর প্রভৃতি। এ ছাড়া এদের গোত্র আলাদা, সেই সব গোত্রের নামে আমরা নানারকম জন্তুর নাম পাই; যেমন "শাল" অর্থাৎ মাছ, "খুন চড়ই" অর্থাৎ পাখী, "নাগ" অর্থাৎ সাপ। পুরাণদের সামাজিক নেতা যিনি তাঁকে "বাবু" বলা হয়, তাঁহার সহায়তার জন্য "করণ" আছে। অনেক সময় সমাজ-নেতা আর একজন কর্ম্ম-চারী নিযুক্ত করেন, তাকে বলা হয় "দেশপ্রধান"। দেশপ্রধানের অধীনে যে কর্ম্মচারী থাকে তাকে বলা হয় "মহানায়েক"।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে ভূমিজ ও পান এদের মধ্যে নীচ জাতি বলে বিবেচিত হয়। ভুঁইয়া পুরাণ ও বাথুড়ী-দের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে, কিন্তু ভূমিজ ও পানদের পুরোহিত নাই। পানদেরও নানা রকম খিলি আছে, ভূমিজদেরও আছে। পানদের পূজা ও বিবাহাদি কাজ "বোষ্টুমে" করে, বোষ্টুমের অধিকার কেবল এই জাতির মধ্যেই বিস্তৃত। ভূমিজদেরও পূজাদি উড়িয়া ব্রাহ্মণে করে না, "দেহুরী" করে। একটু মজা এই যে ভুঁইয়া পুরাণ ও বাথুড়ীদেরও দেহুরী পুরোহিত আছে, আবার উড়িয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। যখন হিন্দু দেবদেবীর পূজা হওয়া দরকার, তখন ব্রাহ্মণ এসে শাস্ত্রবিধান মত পূজা করে, কিন্তু যখন নিজেদের জাতীয় পূজার দরকার তখনই দেহুরীর ডাক পড়ে। সেজন্য এদের পূজা পার্ব্বণের মধ্যে দুটি স্তর আমরা পাই, এক স্তর হচ্ছে হিন্দু সমাজ থেকে আমদানী, আর এক স্তর হচ্ছে এই-সব জাতির আদিম পূজাপার্ব্বণ। একদিকে যেমন হিন্দু সমাজ এই-সব জাতির উপর নিজের প্রভাব বিস্তার

করেছে, হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, জীমূতবাহন পূজা, করম রাজার পূজা, ত্রিনাথদেবের পূজা, মকর পরব, নবান্নের উৎসব ("নুয়া খাওয়া") যেমন এই-সব জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তেমনি এদের যে আদিম পূজা তা-ও ঐ দেশের হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে—"বারখণ্ডা"। সাধারণতঃ গ্রামের সর্দ্দারের বাড়ীর কাছে একটি চালাঘরে বারখণ্ডার পূজা হয়। সেখানে কতকগুলি মাটির মূর্ত্তি, বিশেষ করে মাটির ঘোড়া রাখা আছে। যখন কারও অসুখ করে বা কোনো বিপদ হয়, তখন অসুখ বা বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে এখনো পূজা "মানত" করে ও বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে যথাসাধ্য পূজা দেয়। এখানকার পুরোহিতকে দেহুরী বলা হয়। এখনও ভূঁইয়া, পুরাণ, বাথুড়ীদের সঙ্গে হিন্দুরাও এমন কি ব্রাহ্মণরাও পূজা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া দেহুরীরা "বড়ামের"ও পূজা করে। এখানেও হিন্দুরা পূজা দিতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

কুহেলিকা

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

ভুরু কুঁচকে চোখদুটোকে একটু টেনে যেদিন সুনীলা নাগ রাকেশ রুদ্রের পানে চেয়ে দেখ্‌লে—সেদিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রুদ্র তিন দিস্তা কাগজ মক্‌সো করেও যখন সফল মনোরথ হলো না—তখন 'দুত্তোর' বলে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে বেড়াতে যাওয়ার জন্য জামা কাপড় ঠিক কর্‌তে যেতেই দেখ্‌তে পেল—তখনও পাশের দড়ির খাটের উপরে পড়ে ইন্দ্রনাথ মনের সুখে নাক ডাকাচ্ছে। হাত-ঘড়িটার পানে চেয়ে দেখ্‌ল—ছ'টা দশ। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর দিতেই বুঝ্‌তে পার্‌ল—অন্য যে কাজেরই সময় হোক্—কিন্তু এ বেড়ানোর সময় মোটেই নয়। অনাদরে বালির কাগজের ভিতর দিয়ে কোন অবকাশে যে বেড়ানোর সময়টা চলে গেছে, সে যে জান্‌তেও পারেনি তা'।

পৌষের কুয়াশা চারিদিকে আপনার প্রভুত্ব-জাল বিস্তার করেছে। তার উপরে ঝির্ ঝির্ করে বাতাসও দিচ্ছে। এতক্ষণে সেও অনুভব কর্‌ল শীতটা একটু বেশীই পড়েছে—অন্ততঃপক্ষে তুলনায় বাংলা দেশের চাইতে ত বটেই! তখন দুঃখ হলো—তার ইন্দ্রনাথের জন্য। আহা বেচারী! ঘুমুচ্ছে; ঠাণ্ডা বাতাস লেগে এখনই তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। মনে হতেই সে জানালা বন্ধ করে দিল।

জানালা-বন্ধের আওয়াজে ইন্দ্রনাথের আধভাঙ্গা ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ রগ্‌ড়াতে রগড়াতে উঠে বস্‌ল। তার পর রাকেশের মৃদু পদ-সঞ্চারের শব্দে প্রশ্ন করলে—"কে?"

রাকেশ উত্তর দিল—"আমি।"

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ইন্দ্রনাথ ফের জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"নাম বল্‌ছো না কেন বাবা। নামটা কি মামাশ্বশুরের—না ভাসুরের। আমি ত সর্ব্বনাম—সকলেরই নাম হতে পারে।"

হেসে রাকেশ বল্‌ল—"কি, গলা চিনিস্‌নে না কি? যে, যা তা' বল্‌চিস্?"

সেই রকম জড়িত সুরেই ইন্দ্রনাথ বল্‌ল—"কেন, আপত্তি কি নামটি বলার; চিনিতো সব—কাশী মিত্তিরও চিনি—নিমতলাও চেনা আছে। জানিস্‌নে ঘুমিয়ে আছি।"

রাকেশ হেসে ফেল্‌ল—বল্‌ল—"ঘুমিয়ে আছিস্ কি? একদম মরে আছিস্।"

"তাও ভাল। তা' হ'লে ত' এ ঘুম ভাঙ্গতো না। তোর ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হবে—তুই আমার লাখ্ টাকা দামের ঘুম ভাঙ্গালি?" বলেই ইন্দ্রনাথ গুন্-গুন্ করে গান ধর্‌ল—

"কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।"

রাকেশ বল্‌ল—"সত্যি ভাই! আমারও আজ ঠিক হয়েছে—"

সে যে পাশে পাশে চলেছিল তবু জানিনি।

কি রকম?"—ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল।

"শোন—আজ আবার দেখা হয়েছিল।"

"কার সঙ্গে?—সেই সর্পিণী মহাশয়ার?" বলে ইন্দ্রনাথ দু'পাটি দাঁত বার করল।

বিরক্ত হয়ে রাকেশ বল্‌ল—"তা' যা ইচ্ছে বল্‌তে পারিস্—সাপই বল্—আর হাতিই বল—"

"বাঃ! বা! চমৎকার আইডিয়া! ঠিক হয়েছে।" ইন্দ্রনাথ রাকেশকে কথা বল্‌তে দিল না। সে চোখ নাচাতে নাচাতে বলে গেল—"হাতি, নিশ্চয়ই হাতি! তা' না হলে অমন মন্থর গতিতে চলে। চমৎকার বলেছিস্। একটা মেডেল তোর পাওনা হয়ে রইল। একেবারে খাঁটি গজেন্দ্রগমন।"

"না, তুই আমাকে বল্‌তেই দিবি নে—"বলে রাকেশ একটা হতাশার ভাব অভিনয় করল।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু সমানই চালিয়ে গেল—"বল্‌বি আবার কি? কবিতা হলো না—এই ত'? তার দরকার নেই। তুই যে কথা বলেছিস্—তার দামই লাখ টাকা—তা-ই দেয় কে?"

"না ভাই, বড়ই দুঃখ রয়ে গেল—কবিতাটা আরম্ভ কর্‌তে বসেছিলাম। দিস্তে তিনেক কাগজও নষ্ট হয়েছে। না, তুই হাস্‌ছিস্—কিচ্ছু বল্‌বো না।" ভীষণ হতাশার ভঙ্গিতে রাকেশ নীরব হয়ে বস্‌ল।

ইন্দ্রনাথ বল্‌ল—"তুই কবিতা লিখতে জানিস্‌নে'। ধর্-প্রেমের কবিতা লিখবি ত'? আগের কর্ত্তারা যা লিখে গেছেন—তার থেকেই সুরু কর্।"

কাজের কথা বল্‌বে ভেবে রাকেশ হাঁ করে ইন্দ্রনাথের মুখের পানে চেয়ে রইল।

ইন্দ্রনাথ সুরু করল—"রবিবাবুর থেকে কিছু নিস্‌নে যেন—ধরা পড়বি। আর একটু নেমে আয়। এই আরম্ভ কর্—কুমুদরঞ্জনের—'এই নদীরই এই ঘাটেতে—' আর নয়। তারপরই করুণানিধানের—'জাফরাণ-রাঙা অঞ্চল'।"

—"কি ঠাট্টা কর্‌ছিস্?"—রাকেশ বিরক্ত হয়ে বল্‌ল। ইন্দ্রনাথ বল্‌ল—"ঠাট্টা কর্‌বো না কি সন্দেশ খেতে দেব? আমার এমন লাখ টাকা দামের ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলি?"

রাকেশ আর একটি কথাও বল্‌ল না। গম্ভীর হয়ে ইন্দ্রনাথের পানে পিছন ফিরে চেয়ারটি চেপে বসে রইল।

(২)

যেমন রেলওয়ের ইঞ্জিনগুলির জল বদ্‌লানোর জন্যে মাঝে মাঝে একটা করে watering station থাকে—তেম্‌নি বাংলা দেশের ভদ্রসমাজের জলবায়ু বদ্‌লানোর জন্যে গোটাকতক watering station আছে। তারই একটিতে রাকেশ আর ইন্দ্রনাথ জলবায়ু পরিবর্ত্তন কর্‌তে এসেছে।

আরও জনকতক 'চেঞ্জার' সেখানে স্বাস্থ্য-সঞ্চয় কর্‌ছেন। তার মধ্যে বৃদ্ধ উমেশ নাগ ও তরুণী সুনীলা নাগ—আর গুহ গ্যাঙ্গোলী গপ্তা প্রভৃতিও আছেন।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় উমেশ নাগের বৈঠকখানায় চায়ের মজলিশ্ বসে। উমেশ নাগের অবস্থা স্বচ্ছল। তাই বিদেশের সঙ্গহীন জীবনকে সঙ্গী দিয়ে ভরিয়ে তুল্‌তে ঐ পয়সা খরচটা তাঁকে স্পর্শই করে না।

কিন্তু উমেশ নাগ সদাশয় মজলিশী লোক হ'লেও—সুনীলা মেয়েটি তত মিশুক নয়। সে অবশ্য তাদের সম্মুখে বার হয়—চা প্রত্যেকের কাপে ঢেলে দেয়। কেউ আর এক আধখানা কেক্-বিস্কুট প্রভৃতি নেবেন কি না তাও প্রশ্ন করে। বন্ধুদের পরিচয় দিয়ে উমেশ যখন শেষে বলেন, "ইনি সুনীলা নাগ," তখন সে শুধু নমস্কার করে কাজে মন দেয়। কিন্তু কাউকেই বিশেষ করে আমল দেয় না—বা পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে কথাও বলে না। এমন কি কারও পানে একবার চেয়েও দেখে'না।

এই চেয়ে-না-দেখাটা চেঞ্জারদের—বিশেষ করে

যারা তরুণ—তাঁদের মনে বড় ব্যথা দেয়। কেন তাঁরা কি মানুষ নন যে একটু চেয়ে দেখলে—দু'দণ্ড কথা কইলে শ্রীমতী নাগের মর্য্যাদা ক্ষয়ে যাবে। এ যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি। সুনীলার এই না-চাওয়াটা দিনদিন যেন রাকেশকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌ছিল।

যখন-তখন ত' আর উমেশ নাগের বাড়ী যাওয়া চলে না। সেইজন্য রাকেশ সদর রাস্তাগুলোয় ঘুরে বেড়াত—শুধু সুনীলার সুনীল চোখের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। তাই সে ভুরু কুঁচ্‌কানো যে দৃষ্টিটুকুর মোহন স্পর্শ লাভ করেছে—সেইটুকুর মধুর কাহিনী বুকে চাপ্‌তে না পেরে ইন্দ্রনাথের কাছে বার করে দিতে চায়, কিন্তু ইন্দ্রনাথ তা' গ্রাহ্যই কর্‌ল না। যথাসময়ে 'স্যানিটেরিয়মে'র ঘড়িতে খাওয়ার ঘণ্টা বাজল—দু'জনেই খেতে গেল। ইন্দ্রনাথ লক্ষ্য কর্‌ল—রাকেশ একটি কথাও বল্‌ল না। খেয়ে শোওয়ার ঘরে এসে ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন কর্‌ল—"কি, রাগ হয়েছে?"

পুরু ঠোঁটখানা একটু বিস্তৃত করে রাকেশ বল্‌ল—"হবে না। তুই কেবলি আমার সঙ্গে লাগ্‌বি।"

ইন্দ্রনাথ হেসে জানাল এই বিদেশে বিভুঁয়ে—যেখানে আর কোনও আত্মীয় নেই, সেখানে সে রাকেশ ছাড়া আর কার সঙ্গে লাগতে যাবে।

এইভাবে কথা বল্‌তে বল্‌তে আবার তাদের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এল। দু'জনে নিজের নিজের খাটে শুয়ে পড়ে নিদ্রার আশায় গল্প চালাতে লাগল। রাকেশ আরম্ভ কর্‌ল—"আজ দুপুরে যখন পোষ্টাপিসে যাচ্ছিলাম—"

ইন্দ্রনাথ সুরু কর্‌ল—"আজ দুপুরে আমি যখন বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—"

এবার আর রাকেশ চুপ কর্‌ল না। সে জানে চুপ কর্‌লেই ইন্দ্রনাথ একটানা ঘুমের গল্প করে যাবে, কোনো বাধাই মান্‌বে না। তাই সে তার কথা চালিয়ে গেল—"তখন দেখি শ্রীমতী নাগও পোষ্টাপিসে চলেছেন—আমি ঠিক তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। তোমাকে সত্যি কথাটাই বল্‌বো। আমার নজর নিজের পথের পানে ছিল না—তাঁর গতি-ভঙ্গির দিকেই ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ একটা উঁচু জায়গায় আঘাত লেগে ছিট্‌কে উঠ্‌লাম। টাল সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। মাটিতে হাত দিয়ে আত্মরক্ষা কর্‌তে হল। হাতের ও পায়ের ঘর্ষণে খানিকটা ধূলা উড়্‌ল। বোধ হয় তার কিছু অংশ তাঁর গায়ে লেগে থাক্‌বে। লেগেছেই যে—এ কথা জোর করে বল্‌তে পার্‌ব না। তিনি ভুরু কুঁচ্‌কে ত' ছিলেনই; তা'তে খানিক বিরক্তির খাদ মিশিয়ে একবার আমার পানে চেয়ে দেখে পোষ্টাপিসের রোয়াকে না উঠে পাশ দিয়ে চলে গেলেন—কোথায় তা' কে জানে?"

রাকেশ চুপ কর্‌ল। তার মনে হল—ইন্দ্রনাথ কিছুই শুন্‌ছে না। দু'বার 'ইন্দ্র, ইন্দ্র'—বলে ডাক দিল। তৃতীয়বারে ইন্দ্রনাথ উত্তর দিল—"কি বল্‌ছিস্?"

রাকেশ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্‌ল—"তুই শুন্‌চিস্ নে!"

ইন্দ্রনাথ চোখ টেনে আকর্ণ বিস্তৃত করে বিস্ময় জানিয়ে বল্‌ল—"বাবা! শুন্‌চি নে—আলবৎ শুন্‌চি আর চোখ বুজে তা' অনুভব কর্‌ছি।"

"ছাই কর্‌চিস্"—বলেই রাকেশ হেসে ফেলল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—"এই ত প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত ঘুমুলি। আবার এরই ভিতরে ঘুম। আচ্ছা, এত ঘুমোস্ কি করে?"

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথ জবাব দিল—"প্রেম-বাই নেই বলে। যাক্, তুই এককাজ করে ফেল্ দেখি। 'প্রপোজ' কর্!"

বিস্মিত রাকেশ বল্‌ল—"সে কি? প্রপোজ কর্‌ব—কার কাছে? ও কথাও বলে না, হাসেও না, ফিরেও চায় না। তুই বলিস্ কি?"

"আমি যা' বলি—তা' ভালই বলি। যখন তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে—আর কেক্ নেবে কি না? তখনই চোখ-কান বুজে কাজটা সেরে ফেলিস্। দেখিস, পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—তুইও ঘুমুতে পারবি। আমারও ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হবে না।"

(৩)

সেদিন সম্ভবতঃ পূর্ণিমা। যদি পূর্ণিমা না-ও হয়—তারই কাছাকাছি একটা তিথি বটে! জ্যোৎস্নার আলো রাকেশের প্রাণ ভরিয়ে তুলেছে। সে হাস্‌তে হাস্‌তে শ্রীযুক্ত নাগের বৈঠকখানায় এসে একখানা চেয়ারে চেপে বস্‌ল। উমেশ নাগ প্রশ্ন করলেন—"আপনার বন্ধুটি কই?"

মিষ্টার গপ্তা সমর্থন করিলেন—"আপনার Q-এর পাশে U-টিকেত দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।"

হেসে গ্যাঙ্গোলী বল্‌লেন—"আস্‌চেন, টাইপ্-রাইটিঙে Q-ই আগে বসে তারপর U বসে। বুঝলেন মিষ্টার্ গপ্তা।"

সকলেই হেসে উঠ্‌লেন,—আর সঙ্গেসঙ্গেই ইন্দ্রনাথ এসে প্রবেশ কর্‌ল।

প্রতিদিনকার মত শ্রীমতী নাগ চা পরিবেশন স্বরু কর্‌লেন। নানা সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলার আলোচনার ভিতর দিয়ে মৃদুমন্দভাবে চা-পান চলতে লাগ্‌ল। গুহ বল্‌লেন—"ঠিক এম্‌নি চাঁদের আলোর ক্ষোভে বুঝি কবি গেয়েছেন—

'এমন চাঁদিনী মধুর যামিনী সে যদি গো শুধু আসিত।"

সকলেরই মনপ্রাণ তখন জ্যোৎস্নার হার্ম্মনিতে বেজে উঠেছিল—'সে 'যদি' গো শুধু আসিত'। হায়! সে আসে না। ঐ যদি পর্য্যন্তই র'য়ে যায়।

শ্রীযুক্ত নাগও গুহের স্বরে স্বর ধর্‌লেন—"শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মশায়ও মনে হয় এমনি চাঁদের আলোয় বসেই লিখেছিলেন—

এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।"

এমন সময় সমস্ত ছন্দের যতি ভঙ্গ করে রাকেশ চেয়ে বস্‌ল—"আমাকে আর এক কাপ চা দেবেন, মিস্ নাগ?"

সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে কাপে চা ঢেলে দিতে দিতে শ্রীমতী নাগ বললেন—"আপনার ভুল হয়েছে মিষ্টার রুদ্র! আমি মিস্ নাগ নই—আমি মিসেস্ নাগ।"

ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের সুইচ্ টিপে দিলে মুহূর্ত্তেই যেমন ঘরখানি অন্ধকার হয়ে যায়—'মিসেস নাগ' এই শব্দটি শুনে সকলের মুখ ঠিক তেম্‌নি এক মুহূর্ত্তে অন্ধকার হয়ে গেল। গভীর দুঃখে গ্যাঙ্গোলী জানালেন—"Sorry indeed!"

গপ্তা বল্‌লেন—"By jove! আমি যে ভাব্‌চি—আজকালকের ভিতরেই propose কর্‌বো।"

ইন্দ্রনাথ একটা শব্দ শুনেই চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌ল—রাকেশের মাথাটা ঢলে চেয়ারের হাতলের উপর পড়েছে। সে শ্রীযুক্ত নাগের নিকট সাহায্য নিয়ে রাকেশকে সুস্থ কর্‌তে লেগে গেল।

সরল সুরে মিসেস্ নাগ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"এঁর কি ভির্‌মির ব্যামো আছে?"

সখেদে ইন্দ্রনাথ জানাল—"আজ্ঞে হাঁ।"

জানিনে মিষ্টার নাগের মনে জেগেছিল কি না—এরূপ বিভিন্ন বয়সে বিয়ে করে তিনি ভাল করেন নি।



নারীর মূল্য

কুমারী কন্যা পিতৃগৃহে পুত্রের মতই ভবিষ্যতের আশা, কেবল বিবাহ-সমস্যার একটি কেন্দ্র নয়, এই কথা মনে রাখিয়া ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতি-সাধনের জন্য, ভবিষ্যৎ সমাজের একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহার শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হইবে। বিবাহের বাজারে সুলভে পার করিবার জন্য শুধু উপরে পালিশ করিলে চলিবে না। বিবাহিতা নারী গৃহস্বামীর মতই গৃহতন্ত্রের একজন নিয়ন্তা, গৃহের ভালমন্দ, নিজের, স্বামীর ও সন্তান-সন্ততির ভালমন্দের ভার গৃহস্বামীর মত তাহারও, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। বিবাহ হইবামাত্র তাহার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল. কেবল পতিব্রতা পত্নী হইয়া চলিতে পারিলেই তাহার আত্মা, মন ও মস্তিষ্কের আর কোনো প্রয়োজন থাকিবে না, আমাদের সমাজে এই যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, নারীজাতির কল্যাণের পথ ইহার মত অন্ধকার আর কিছু করে নাই। স্বামীই স্ত্রীর সকল সমস্যার মীমাংসা একথা ভুলিতে হইবে। কন্যা বিবাহ না করিতে পারে, করিলেও নিজ দেহ-মনের ভরণ পোষণের ভার নিজ হাতে রাখিতে পারে, নিজ জীবনের কার্য্যক্ষেত্র নিজে বাছিয়া লইতে পারে, কেবলমাত্র মানসিক নয়, আর্থিক স্বাধীনতাও তাহার থাকা প্রয়োজন, এই কথা প্রত্যেক নারীর ও প্রত্যেক কন্যার জননীর মনে রাখা উচিত। কৌমার্য্যে আর্থিক ও মানসিক ভার পিতামাতার উপর, বিবাহিত জীবনে স্বামীর উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত জানিলে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কখনও গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষমতা জন্মে না, কোনোদিকেই সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় না।

এইজন্য শিশুকাল হইতে কন্যাকে এমন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে যেন সে মনে করে যে, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহার নিজের হাতে। পিতার প্রচুর অর্থ থাকিলেও পুত্রকে যেমন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে, প্রত্যেক কন্যাকেও তেমনি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। কন্যাকে পুত্রের মত আদর করার অর্থ এ নয় যে পিতার সম্পদ তাহাকে পুত্রের মতই কেবল যথেচ্ছ ব্যয় করিতে দেওয়া হইবে। একটা বয়সের পর পুত্র যেমন নিজের আয় ও ব্যয় দুইটির জন্যই দায়ী হয় ও চিন্তা করিতে শিখে কন্যাকেও তাহাই করিতে হইবে। কুমারী কন্যাকে বিবাহের আশায় অলস করিয়া গৃহে বসাইয়া রাখা তাহার আত্মার অপমান। শিশু-সন্তানের জননী ভিন্ন আর সকল নারীর পক্ষেই গৃহসর্ব্বস্ব হইয়া বসিয়া থাকা যে আপনার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করা ও নারীজাতির অকল্যাণ করা ইহা নারীমাত্রেই যেদিন বুঝিবেন সেইদিন নারী-উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে।

সমাজের আর্থিক ও মানসিক সম্পদ বৃদ্ধির ভার, সমাজকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ করার ভার পুরুষের মত নারীরও, এই কথা মনে রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষার পথ সর্ব্বাগ্রে বাধাহীন করিতে হইবে।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা অতি সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে, যেটুকু বা হইয়াছে তাহাও একমুখী। শিক্ষিতা মেয়েদের আর্থিক উন্নতির বিশেষ কোন উপায় নাই। স্কুল কলেজে মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে উপার্জ্জন করিতে হইলে সকলকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে হয়। এই শিক্ষা বাস্তবিক মানসিক উৎকর্ষের জন্যই বেশী প্রয়োজন। ইহা নারীদের সকলেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু ইহার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সময় হইতে উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত কেতাবী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য-শিক্ষণীয় অন্ততঃ একটি করিয়াও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

যে মেয়েরা ২০।২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার সময় পান, তাহাদের লোকহিতকর নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত ; যেমন, চিকিৎসা, শুশ্রূষা, আইন ইত্যাদি। এই সকল কাজে লোকহিতও হয়, অর্থ উপার্জ্জনও হয়। সন্তানবতী রমণী ও গৃহিণীদের পক্ষে গৃহের বাহিরে কর্ম্ম করা কঠিন। এইজন্য কুটীরশিল্পাদি মেয়েদের আর্থিক-উন্নতির পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেসব মেয়েদের শিক্ষা সমাপন হয়, তাহাদের প্রত্যেককে এক একটি কুটীর-শিল্প শিক্ষা দিলে তাহারা সংসারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বাধীনতার আনন্দ পায়, তা ছাড়া গৃহে উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের অভাব হইলে তাহাদের ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিতে হয় না। এই ভিক্ষার ঝুলি যে তাহাদের সাংসারিক দৈন্যের পরিচয় তাহা নয়, ইহাতে মানুষের আত্মার ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যে মুহূর্ত্তে মানুষ ভিক্ষার লজ্জা ভোলে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার আত্ম-সম্মানের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ভিক্ষা ও পরমুখাপেক্ষিতা যাহাদের জীবন-ধারণের উপায় তাহারা কি কখনও স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, না, নিজেদের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিতে পারে ?

(বঙ্গলক্ষ্মী—ফাল্গুন, ১৩৩৫) শ্রীশান্তা দেবী, বি-এ

—

গোলকোণ্ডা

বাঙ্গালীদের মধ্যে 'গোলকোণ্ডা প্রদেশের হীরক-আকরের" কথা অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু এখন গোলকোণ্ডা প্রদেশে আকরের মত হীরক-আকর আর নাই। নিকটে হায়দ্রাবাদ রাজ্য-সীমার মধ্যে—নানা স্থানে হীরক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এত ক্ষুদ্র যে বাহির করিবার ব্যয় পোষায় না…গোলকোণ্ডা বহুকাল হীরকের বিক্রয়স্থান-রূপে প্রসিদ্ধ ছিল, ও এখানে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হীরা কাটা হইত।… তখন যে রাজার ভাল হীরকের প্রয়োজন হইত, সে আপনার শ্রেষ্ঠীকে গোলকোণ্ডাতে পাঠাইত। এখনও হায়দ্রাবাদের বাজারের শিল্পীরা হীরা মরকত ইত্যাদি কাটিয়া থাকে ও নানা মূল্যবান্ প্রস্তরে নাম খোদাই করে।

গোলকোণ্ডা কতদিনের নগর ঠিক জানা নাই, কিংবদন্তী দ্বারা এইমাত্র জানা যায় যে, কৃষ্ণরায় বা কৃষ্ণদেব নামা কোনও নরপতি এ অঞ্চলে মৃগয়ার্থ আসিয়া স্থান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, মুচকুন্দ নামক পার্ব্বত্য নদীর তীরে কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তরের বন্ধুর

প্রাচীরবৎ উচ্চ পর্ব্বতের উপর যথেষ্ট পাথার বা সমতল স্থান আছে, ঐ পর্ব্বতের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহা অজেয় হইবে, দুর্গ-নির্ম্মাণের জন্য নিকটে ভাল পাথরেরও অভাব নাই। তিনি বড় বড় পাথর কাটিয়া কাদা দিয়া জুড়িয়া প্রাচীর গাঁথিয়া আপনার মনের মত একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, ও তাহার নাম "গোপালকোণ্ডা" রাখিলেন। এদেশের ভাষাতে "কোণ্ডা" অর্থে "গিরি" পাহাড়ের উপর বা নিকটের নগরগুলি প্রায়ই "কোণ্ডা নামে অভিহিত হয়। "গোপাল" শব্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবহৃত কি না, ঠিক বলা যায় না। এই দেশে অতি প্রাচীনকালে গোপাল আহীরদের রাজ্য ছিল, তাহাদের কৌলিক নাম বা উপাধি "পাল" ছিল। এখনও ঐ প্রদেশে আহীরওয়ারা নগর ও আহীরওয়ারা নাম প্রাচীন আহীর আধিপত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। আধুনিক বুরহানপুর হইতে ১০।১২ মাইল দূরে আসীর নামক এক দুর্গ ও নগর আছে. ঐতিহাসিক খাফি খাঁ বলেন, আসীর শব্দ "আসা আহীর" শব্দের অপভ্রংশ, আসা নামক কোনও আহীর রাজা ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।...কৃষ্ণদেব সমস্ত নগর ও দুর্গটিকে দৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত করিয়াছিলেন। দুর্গের নাম ক্রমে গোলকোণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

আজকাল ঐ প্রদেশ অন্ধ্র বা তৈলঙ্গ দেশের সীমামধ্যে অবস্থিত, দেশবাসীর মাতৃভাষা তৈলঙ্গী, কিন্তু তখন কোন্ জাতি ও কোন্ ভাষাভাষীরা বাস করিত ঠিক জানা নাই। এই দুর্গ নির্ম্মিত হইবার পর কোনও সময়ে এ দেশ অগ্নিকুলোদ্ভব চোহানদের হস্তগত হইয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়রা নির্ম্মূল হইলে দেশে অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িল. বৈদিকধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য লোপ পাইল। সে সময়ে ভারতের নানা স্থানে অনার্য্য মধ্য এশিয়াবাসী যোদ্ধারা রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। মহাভারতে কালযবনের উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরই তক্ষক বা নাগবংশীয়দের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল ; এই তক্ষকবংশীয়রা বোধ হয় তাহার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করিয়া নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যদিও ইহারা যাযাবরবংশীয় Nomad Scythians, তথাপি চন্দ্রবংশীয় আর্য্যদের সহিত তাহাদের বিবাহ হইত।...

ব্রাহ্মণরা কয়েক বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভা ও কনফারেন্স করিয়া শেষে আবু পর্ব্বতে এক যজ্ঞ, বা আধুনিক ভাষায় শুদ্ধিসভা আহূত করিলেন। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা তক্ষকবংশীয় হইতে বাছিয়া কয়েকটি বীরবংশকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন ও গলায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করাইয় রাজপুত বা রাজপুত্র নামে নবপর্য্যায়ের ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন। এই বংশকে অগ্নিকুলোদ্ভব বা অগ্নিকুল বলিত, তাহাদের মধ্যে চারিটি বংশ প্রধান, অর্থাৎ ইন্দ্রের অংশ প্রমার, ব্রহ্মার অংশে চালুক্য বা সোলঙ্কী রুদ্রের অংশে পরিহার ও বিষ্ণুর অংশে চোহান। আবার, ইহাদের মধ্যে চোহান সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। ইহারা সকলেই দেবী-উপাসক শৈব ছিল। চোহানদের ইষ্টদেবী শাকম্ভরী দেবীর নামে তাহাদের রাজধানীর নাম শাকম্ভরী বা শাম্ভর রাখা হইয়াছিল। এখনও শাম্ভর হ্রদের একটি ছোট দ্বীপে ঐ শাকম্ভরী দেবীর মন্দির আছে। পরবর্ত্তী কালে তাহাদের রাজধানী অজয়মেরু বা আজমীরে স্থাপিত হইল। চোহানবংশ বৃদ্ধি পাইলে রাজকুমাররা ভিন্ন ভিন্ন দেশ জয় করিয়া আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে চোহানদের বাসস্থান শিবালিক পর্ব্বতের উপত্যকা. কাবুল, কান্দার, পেশাওয়ার, লাহোর, মুলতান, ঠাট্টা হইতে দাক্ষিণাত্যে আধুনিক বুরহানপুরের কাছে আসের, গোলকোণ্ডা ইত্যাদি নানা স্থানে ছড়ান ছিল' এই সকল চোহান রাজারা নানা শ্রেণী ও বংশে বিভক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে আপন আপন রাজ্যশাসন করিতেন, কিন্তু বিপদ-আপদের সময়ে অজমীর-পতি (বা সম্ভরীনাথ, বা জঙ্গলেশ)কে আপনাদের প্রধান বা সমাজপতি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।...

ঈশীয় একাদশ শতাব্দীতে খান্দেশে আধুনিক বুরহানপুর হইতে ১০।১২ মাইল দূরে আসীর, গোলকোণ্ডা, ও গোলকোণ্ডা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে হাঁসী দুর্গ চোহানদের অধিকৃত প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। যখন গজনীপতি সুলতান মহ্‌মুদ ১০২৪ ঈশাব্দে সোমনাথ-মন্দির আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, দাক্ষিণাত্যে ও স্বর্ণলঙ্কাতে বহুধনপূর্ণ অনেক মন্দির আছে, সেগুলি লুট করিতে ও পবিত্র ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিয়া "খোদা ও দীনের" সেবা করিতে তিনি এক সেনাপতিকে কতক সৈন্যসহ পাঠাইলেন। তিনি বেশ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে যুক্তি, তর্ক বা শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয় না। একজন হিন্দুকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহার শিখা কাটিয়া, গলায় ঝোলান পৈতা খুলিয়া, মুখে এক টুকরা গোমাংস ঠেকাইয়া দিতে পারিলেই সে তৎক্ষণাৎ আলোক প্রাপ্ত হইয়া মুসলমান হইয়া যায়, আর সহস্রবার মাথা খুঁড়িলেও হিন্দু হইতে পারে না। মুসলমানশাস্ত্র অনুসারে যে ব্যক্তি এইরূপে ইসলাম প্রচার করিতে পারে. সে অনন্তকাল, অনন্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। অতএব এত অল্প আয়াসে এতটা শুভ লাভের আশা তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না—কেহই পারে না।...

এই ঘটনার পরও বহুকাল গোবলকোণ্ডাতে চোহানদের বাস ছিল। ১২৯৬ ঈশাব্দে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ খিলজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা অলাউদ্দীন সর্ব্বপ্রথমে দাক্ষিণাত্য লুট করিবার উদ্দেশ্যে দেবগিরি (আধুনিক অওরঙ্গাবাদ হইতে আট মাইল পশ্চিমে যেখানে দওলতাবাদ দুর্গ ও রেল ষ্টেশন) আক্রমণ করিলেন। ঈশাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে দেবগিরিতে যাদব বংশীয়রা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন গোবলকোণ্ডা তাহাদের অধীন ছিল, তাহার পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অলাউদ্দীন বারবার আক্রমণ করিয়া যাদবদের দুর্ব্বল করিয়া দিলে কোনও সময়ে ওয়ারাঙ্গলের অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের আধিপত্য হয়। ১৩৪৭ ঈশাব্দে গুলবর্গাতে মুসলমানদের বহমনী-বংশীয় রাজ্য স্থাপিত হইল। ১৩৭৪ ঈশাব্দে ওয়ারাঙ্গলের রাজা বহমনীরাজ মহম্মদ শাহকে গোবলকোণ্ডা উপহার দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। মহম্মদ তখন দুর্গের মধ্যে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গের নাম মহম্মদনগর রাখিলেন। বহুকাল উহার নাম মহম্মদনগর গোলকুণ্ডা ছিল, কিন্তু এখন লোকে সে নাম ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল গোলকোণ্ডা বলে।

বহমনীরাজ্যের পূর্ব্বপ্রদেশের একজন তরফদার (সুবাদার বা শাসনকর্ত্তা) গোলকোণ্ডাতে থাকিতেন। সুলতান কুলী নামক এক ইরানবাসী ভারতে ব্যবসা করিতে আসিয়া, পরে এই বহমনীবংশীয় রাজাদের চাকরী স্বীকার করেন, ও ক্রমে "কুতুব-উল-মুল্ক" উপাধি লাভ করিয়া গোলকোণ্ডার তরফদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রভু বহমনী রাজাকে দুর্ব্বল দেখিয়া ১৫১২ ঈশাব্দে তরফদারের মসনদ তাকিয়া তুলিয়া একখানি সিংহাসন পাতিয়া ছত্র মাথায় দিয়া বসিলেন, ও আপনার নাম "সুলতান কুলী কুতুবশাহ" রাখিলেন। এইরূপে গোলকোণ্ডাতে কুতুবশাহী রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই বংশের ইব্রাহীম কুতুবশাহ (১৫৫০—১৫৮০) দেখিলেন যে, দেশে আর অসি ও বর্শার যুদ্ধ প্রচলিত নাই, যুদ্ধে বড়

বড় তোপের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, ও গোলকোণ্ডার মাটি দিয়া গাঁথা প্রাচীর বড় বড় প্রস্তর দ্বারা গাঁথা হইলেও, বন্দুকের গুলি সহ্য করিতে পারে বটে, কিন্তু তোপের গোলার সম্মুখে স্থায়ী হইতে পারে না। সেইজন্য তিনি প্রাচীন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে চাঁচা পাথর ও চুণ দিয়া দৃঢ় করিয়া নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই নূতন দুর্গ এখনও আছে।...

কুতুবশাহী রাজা মহম্মদ কুলীব (১৫৮০—১৬১২) এক হিন্দুপত্নী ছিলেন, তাহার নাম ছিল ভাগমতী। রাজা তাহার বাসের জন্য গোলকোণ্ডা হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে, মুসী নদীতীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং তথায় থাকিতেন; ক্রমে, সামন্তরাও ঐ রাজপ্রাসাদের কাছে গৃহ নির্ম্মাণ করিল। এইরূপে যে নূতন নগর গড়িয়া উঠিল, তাহার নাম "ভাগনগর" রাখা হইয়াছিল, কিন্তু রাজার দেহান্তের পর মুসলমানদের রাজধানী হিন্দুর নামে থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "হায়দ্রাবাদ" নামকরণ করা হইল।...১৫৮৯ ঈশাব্দে গোলকোণ্ডাতে ভাল পানীয় জলের অভাব হইলে, কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিল, তখন সাধারণ অধিবাসীরা পলাইয়া ভাগনগরের উপকণ্ঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিল, সেই সময় হইতে গোলকোণ্ডা পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু শত্রুভয় হইলেই রাজা ও প্রজা উভয়ে তাহার অভেদ্য প্রাচীরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত।

সম্রাট অওরঙ্গজেব গোঁড়া সুন্নী ছিলেন। তিনি যেমন হিন্দুদের ঘোর শত্রু ছিলেন, সেইরূপ শিয়াদেরও বিধর্ম্মী কাফের বিবেচনা করিতেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর গোলকোণ্ডা ও অহমদনগরের রাজারা শিয়া ছিলেন। এই ধর্ম্মান্ধতার জন্য তিনি গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর উভয় রাজ্য জয় করিয়া রাজবংশ নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

কুতবশাহী বংশের অষ্টম বা শেষ নরপতি তানাশাহ, সপ্তম রাজার জামাতা ছিলেন। তিনি এক বিদ্বান সাধু ফকীরের পুত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রবাদ হায়দ্রাবাদে এখনও প্রচলিত আছে। তিনি অন্য রাজাদের মত গান শুনিতে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু গায়কগায়িকা বা বাদ্যকারদের নিকটে আসিতে দিতেন না। গোলকোণ্ডাতে তাঁহার গান শুনিবার ঘরখানি এখনও দর্শক ও পর্য্যটকদের দেখান হয়। তাঁহার বসিবার ঘর দ্বিতলে, প্রায় দুইশত গজ মাঠের পর এক দোতালার দালানে বসিয়া গায়ক-গায়িকারা গান করিত। তিনি ঐরূপ দূরের গান ও বাজনা শুনিতে ভাল বাসিতেন। ১৬৮৭ ঈশাব্দের এক রাত্রে যখন তানাশাহ নিশ্চিন্তমনে আপনার প্রমোদ-বাসরে বসিয়া গান শুনিতেছিলেন, তখন হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে এক খিড়কীরক্ষক সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতায় অওরঙ্গজেবের পুত্র কুমার মোয়জ্জম দশহাজার অশ্বারোহী সহিত দুর্গে প্রবেশ করিয়া, নিঃশব্দে দুর্গ অধিকার করিয়া রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করিয়াছেন।......তিনি গানের আসর ছাড়িয়া যুদ্ধ স্থগিত করিতে আজ্ঞা প্রচার করিয়া, অতিথি রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। যখন তাঁহার সহিত হাসিমুখে গল্প করিতেছিলেন, তখন একজন সেবক আসিয়া জানাইল যে তাঁহার আহারীয় প্রস্তুত হইয়াছে। তানাশাহ রাজকুমারকে ভোজন করিতে আহ্বান করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার ঐ সময়েই আহার করা অভ্যাস। রাজকুমার দুইজন সেনাপতিকে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইলেন ও তানাশাহ পলাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে বন্দী করিতে গোপনে আজ্ঞা করিলেন। তানাশাহ উভয়কে সঙ্গে করিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন, ও নানা খোস ও রহস্যালাপের গল্পসহিত তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলেন। সেনাপতিরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার এরূপ বিপদের সময়ে আহারে কিরূপে রুচি হইতেছে। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আমি এক সাধু ফকীরের পুত্র, আমার পিতা অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ফকীর বলিয়া কখনও কিছু সংগ্রহ করিতেন না, প্রত্যহ যাহা পাইতেন তাহা ব্যয় করিতেন, নিজের প্রয়োজন পূর্ণ হইবার পর কিছু থাকিলে ভিখারীদের দান করিতেন। আমাদের প্রত্যহ আহার জুটিত না, বাল্যে আমাকে প্রায়ই উপবাস করিয়া থাকিতে হইত, কখন কোনদিন ভাগ্যক্রমে সুস্বাদু খাদ্য পাইতাম। তাহার পর রাজকন্যার সহিত বিবাহ হইল, রাজার অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায় আমিই রাজা হইলাম। পনের-ষোল বৎসর রাজভোগে কাটাইলাম, আজ করুণাময় জগদীশ্বর রাজ্য কাড়িয়া অন্যকে দিলেন, আজ আমার রাজভোগে আহার করিবার শেষদিন, কাল খাইতে পাইব কি না, পাইলেও কি পাইব কে বলিতে পারে? যাহাই পাই, এরূপ ভাল খাদ্য নিশ্চয়ই পাইব না। এ অবস্থায় ঈশ্বরের দানের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা মূর্খের কাজ, বরং আজ আরও আনন্দের সহিত আরও তৃপ্তিপূর্ব্বক এই রাজভোগ ভোগ করা উচিত।"

তানাশাহ বন্দীরূপে সেনানীবেষ্টিত হইয়া দওলতাবাদের দুর্গে পালকীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পথে একস্থানে বাহকরা পাল্কী রাখিয়া কিছুদূরে বিশ্রাম করিতেছিল; সেই সময়ে তিনি দেখিলেন একজন গ্রাম্য সক্কা (জলবাহক ভিস্তি) জল লইয়া যাইতেছে। তিনি তাহার কাছে এক বাটি জল চাহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন সক্কা তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না, কিন্তু সে তাঁহাকে পূর্ব্বে কোনও স্থানে দেখিয়াছিল, ও এ সময়ে বন্দীভাবে তানাশাহের যাত্রার কথা শুনিয়াছিল। সক্কা বলিল, "আমার বাটিটি ভাঙ্গা, আপনার হাতে দিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন অস্বীকার করিতে পারি না।" তানাশাহ জলপান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, নিকটে এক কপর্দ্দক নাই, এই গরীব সক্কার বাটিটি রিক্ত ফিরাইয়া দিই কিরূপে? তখন মনে পড়িল তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে একখানি হীরক লুকান আছে, তিনি তাহাই বাটিতে রাখিয়া সক্কাকে দিলেন। তাঁহার সহিত অওরঙ্গজেবের গুপ্তচর ছিল, সে হীরকখানি সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিল। সম্রাটের শ্রেষ্ঠীরা তাহার মূল্য ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার স্থির করিয়াছিল; অওরঙ্গজেব সক্কাকে দুই সহস্র টাকা দিয়া হীরক রাখিবার কষ্ট হইতে মুক্তিদান করিলেন।

গোলকোণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যের এক প্রদেশের সুবাদারের আবাসস্থান হইল। এইরূপে ইহা প্রায় ৫৫ বৎসর মোগল-সুবার প্রধান নগর ছিল। ১৭৪২।৪৩ ঈশাব্দে আসফজাহ নিজাম-উল-মুল্ক দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের নিয়োজিত দাক্ষিণাত্যের সুবাদাররূপে হায়দ্রাবাদে বাস করিতেছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটকে দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনার উপাধি পরিবর্ত্তন করিলেন না, অথবা কোন প্রকার রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন না। তাঁহার বংশধর এখনও আসফজাহ নিজাম-উল-মুল্ক ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদার উপাধিসহ হায়দ্রাবাদে রাজ্য করিতেছেন।

(বসুধারা, ফাল্গুন, ১৩৩৫) শ্রী অমৃতলাল শীল

—

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান

শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধান সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবি কথা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে,—আজ তাহাই আমার আলোচনার বিষয়।... আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্য প্রভুর জীবন সম্বন্ধে যে-সকল চরিতাখ্যান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের কোনটিতেই শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্বন্ধে কোন কাহিনী বর্ণিত হয় নাই।... ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিরোধানের উল্লেখ নাই। কবি কর্ণপুর মহাপ্রভুকে স্বয়ং দেখিয়াছিলেন, ১৫৭২ খৃঃ অব্দে তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রণয়ন করেন। তিনিও মহাপ্রভুর তিরোধানের উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃঃ অব্দে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন; তিনিও মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে নির্ব্বাক। শুধু ১৪৫৫ শকে তিনি স্বর্গারোহণ করেন, এই কথাটি গ্রন্থারম্ভে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস সম্ভবতঃ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য-ভাগবত রচনা করেন; তাহাতে মহাপ্রভুর তিরোধানের কথা নাই। আনুমানিক ১৬৪০ খৃঃ অব্দে নিত্যানন্দ তাঁহার প্রেমবিলাস ও ১৭০৮ খৃঃ অব্দে নরহরি সরকার তাঁহার প্রসিদ্ধ ভক্তিরত্নাকর মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই-সকল পুস্তকের কোনটিতেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুর তিরোধানের কোন কথা নাই।

মনে হয় যেন বৈষ্ণব চরিতাখ্যায়িকারচকগণ একযোগে এ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন মর্ম্মান্তিক কষ্টের কথা লিখিতে নাই, এই জন্যই কি এ ব্যবস্থা?...অন্যবিধ কয়েকটি কারণেও তাঁহার তিরোধান রহস্যময় করিবার অভিপ্রায়ে গোঁড়া বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের লীলাবসান গোপন করিয়াছিলেন। তাঁহার লীলা নিত্য,—সুতরাং তাহার শেষ বর্ণনা করা অপরাধ। "অদ্যাপি সে লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবার পায়।" এই নিত্য-লীলার শেষ তাঁহারা কল্পনা করেন নাই। জনসাধারণ তাঁহাকে স্বয়ং জগদ্বন্ধু বলিয়া জানিত; তাঁহার জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হওয়ার কাহিনী পাণ্ডারা দেশমধ্যে প্রচার করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারেরা এই জনশ্রুতির বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়া তাহাদের বিশ্বাসে হানা দিতে ইচ্ছা করেন নাই, অথচ সেই জনশ্রুতি সমর্থন করিয়া সত্যের অপলাপ করাও সঙ্গত মনে করেন নাই। বৈষ্ণব-সমাজ তখন স্বীয় আইন-কানুন লইয়া দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মূলতঃ সকলে একই কথা বলিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীরা পুস্তক দেখিয়া অনুমোদন করিয়া দিলে, তবে কোন পুস্তক সেকালে বৈষ্ণব জনসাধারণে প্রচারিত হইত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক সেই গণ্ডীতে পড়ে নাই; এইজন্য নানা ঐতিহাসিক অভিনব তথ্যবহুল হইলেও গোঁড়া বৈষ্ণব সমাজে সেই গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল সূত্র ছিল—বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সেই সূত্র ও মত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী ছিলেন; সুতরাং যে-সকল পুস্তকে সেই মূল সূত্রগুলির প্রতি স্থির লক্ষ্য না থাকিত, সেগুলি তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না।...

শ্রীচৈতন্যের লীলাবসান সম্বন্ধে তিনটি জনশ্রুতি আছে। (১) জগন্নাথের অঙ্গে লীন হওয়া (২) গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া। তৃতীয় বিশ্বাসটি অত্যন্ত আধুনিক। শ্রীচৈতন্য প্রভু সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস কয়েকজন আধুনিক শিক্ষিত লেখকের চেষ্টায় দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহা একান্ত ভিত্তিহীন।...তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, চৈতন্যচরিতামৃতের এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমোন্মাদ অবস্থায় বঙ্গোপ-সাগরের নীল জলে চন্দ্রলেখার দীপ্তি দেখিয়া মনে করিলেন রাইকানু তথায় লীলা করিতেছেন এবং তখনই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সেই লীলাতরঙ্গে আত্মনিমজ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন,—চৈতন্য সমুদ্র হইতে আর উদ্ধার পান নাই, সেইখানেই তাঁহার লীলার শেষ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ঘটনাটি এইরূপ।...এক জেলে তাঁহাকে জালে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার প্রেমোন্মাদের শেষের দিকে ভাবাবেশে তাঁহার অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হইত। এবারও তাহাই হইয়াছিল।...এই ঘটনা যে সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহার পরেও আনুমানিক সার্দ্ধ দুই মাস তিনি জীবিত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত এই ঘটনার পরবর্ত্তী অনেক কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন।...এখন দেখা যাইতেছে, জেলের দ্বারা রক্ষা পাওয়ার পরেও শ্রীচৈতন্য আরও অনেক লীলা করিয়াছিলেন। পুরী বা অন্য কোথাও এ প্রবাদ নাই যে সমুদ্রে পড়িয়া তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

গোপীনাথে লীন হওয়ার কথা আমরা কোন লিখিত গ্রন্থে পাই নাই।...গদাধর জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় দেহ ত্যাগ করেন। তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ, এমন কি শ্রীমতী রাধিকার অবতার বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি গোপীনাথ মন্দিরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে চৈতন্যদেব স্বয়ং গোপীনাথের-মন্দিরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। গোপীনাথ-বিগ্রহের অঙ্গে মহাপ্রভুর লীন হওয়ার প্রবাদটি এই-সকল কারণে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়... ঈশান নাগর মহাপ্রভুর সুবিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। তাঁহার রচিত অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথের সমীপবর্ত্তী হন, তখন মন্দিরের কপাট আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়। ভক্তগণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আশঙ্কাতুরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, "কিছু কাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিল। গৌরাঙ্গপ্রকট সবে অনুমান কৈল।" ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ শেষ হয়। লোচনদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এই পুস্তকেও লিখিত আছে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন (১৪৫৫ শকে) মহাপ্রভু জগন্নাথের সঙ্গে লীন হইয়া যান। জয়ানন্দ ১৫৪০ খৃঃ অব্দে তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন, ইহাতেও উল্লিখিত আছে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চৈতন্য গুণ্ডিবাড়ীতে অদৃশ্য হইয়া যান।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে যখন চৈতন্য উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পায়ে একটা ইট বিঁধিয়া যায়। ইহার পরের দিন নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করেন, কিন্তু আষাঢ়ী শুক্লা ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া যায়। তখন তিনি উত্থান-শক্তিরহিত হইয়া গুণ্ডিবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন রথযাত্রা, জগন্নাথ গুণ্ডিচায় (গুণ্ডিবাড়ীতে) ছিলেন। পরদিন সপ্তমী তিথি। লোচনদাস লিখিয়াছেন—মন্দিরের দরজা বন্ধ, বহু ভক্ত তাঁহার দর্শনেচ্ছায় তথায় ভিড় করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডারা দরজা খোলে নাই। ঈশান নাগরও এই দরজা বন্ধ হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। তার পরে লোচনদাস লিখিয়াছেন:—বহু আবেদন নিবেদনের পর দ্বার মুক্ত হইল—তখন এক পাণ্ডা আসিয়া বলিল "গুণ্ডিবাড়ীতে প্রভুর হৈল অদর্শন। সাক্ষাতে দেখিল গৌর-প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন বিবরণ। এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখচন্দ্রমা প্রভুর না দেখিব আর।" জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, ষষ্ঠীর

দিনে পায়ের বেদনা বৃদ্ধি পাওয়াতে যখন মহাপ্রভু গুণ্ডাবাড়ীতে শয়ন করিলেন, তাহার পরদিন চারিদিক হইতে বিচিত্র পুষ্পমাল্য মন্দিরে আনীত হইল।

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।...সুতরাং ইহাতে এ কথা তো প্রমাণিত হয় না যে, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে লীন হইয়াছিলেন; বরঞ্চ স্পষ্ট করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ তথায় পড়িয়া রহিল। সেই প্রেমের চিন্ময় বিগ্রহশ্রী—পবিত্র দেহ কোথায় গেল, জয়ানন্দ তাহা বলিলেন না।

তারিখ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই। ১৪৫৫ শকের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিনে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়।...এই সময় জগন্নাথ গুণ্ডাবাড়ীতে ছিলেন,—তখন রথযাত্রার সময়—জয়ানন্দ-বর্ণিত রথারোহণে চৈতন্য প্রয়াণের পরিকল্পনার সঙ্গে তৎকাল-সংঘটিত রথযাত্রার কিছু সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয়।

এখন জয়ানন্দ "টোটা" কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন। এই টোটার দ্বারা গুণ্ডিচা-গৃহই অনুমিত হইতেছে; কারণ, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তখন রথযাত্রার সময়—জগন্নাথ গুণ্ডিচা-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যেদিন তাঁহার পদকমলে ইষ্টকাগ্র বিদ্ধ হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করেন। এই নরেন্দ্র সরোবরও গুণ্ডিচা-গৃহের অদূরবর্ত্তী।" "টোটা" অর্থে "বাগান" বা "বাগান বাড়ী।"...পুরী এক সময় "টোটার" দেশ ছিল, তথায় বহু উপবন ছিল। মুরারি গুপ্তের চরিতামৃতেও গুণ্ডিচা-বাড়ী "পুষ্পবাটী" (টোটা) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচা-বাড়ীতে জগন্নাথ ছিলেন, লোচনদাস এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।...

কিন্তু ঠিক সময়টা সম্বন্ধে কিছু গোলমাল আছে। লোচনদাস লিখিয়াছেন, রবিবার দিন তৃতীয় প্রহরে তিনি জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, রবিবার দিন রাত্রি দশ দণ্ডের সময় তাঁহার তিরোধান ঘটে। লোচনদাসের মতে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় রবিবার বেলা ৪টা, এবং জয়ানন্দের মতে রবিবার রাত্রি ৯॥০ টা ...জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যে দুইখানি পুঁথি হইতে নগেন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত পুস্তকের সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার একখানি ২৫০ বৎসরের প্রাচীন, আর একখানি ২০৮ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। এমতাবস্থায় এই সুপ্রাচীন নজিরকে অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণই নাই।...

দেখা যায় যে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া মন্দিরের দরজা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বন্ধ ছিল। ইহা বড়ই অদ্ভুত কথা! রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচা-মন্দিরের সদর দরজা এ ভাবে কেন বন্ধ থাকিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই মনে হয় যে বহু সময় ব্যাপিয়া মন্দিরের মধ্যে সংগোপনে কোন ব্যাপার ঘটিতেছিল। সেই ব্যাপার কি?...এ কথাটা সহজেই মনে হয়, গুণ্ডিচা-মন্দিরেই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল, নতুবা দীর্ঘকাল ভক্তগণকে মন্দিরের বাহিরে রাখা হইল কেন? যদি মহাপ্রভুর দেহ স্থানান্তরিত করা হইত, তবে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে করা যাইতে পারিত, এবং তাহা হইলে অল্পবিস্তর সমারোহ বা গোলমাল না হইয়া যাইত না। যে-কোন স্থানেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইত, সংগোপনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই-খানেই কতকটা শোকের উচ্ছ্বাস এবং সমারোহ হইতই। সুতরাং মনে হয়, মন্দিরের মধ্যেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সমাধি দিয়া সে স্থান পাথর চাপা দিয়া পুনরায় মেরামত করা হইয়াছিল, এইজন্যই এতটা সময়ের দরকার হইয়াছিল। তাঁহার লীলাবসানের সংবাদ অবশ্যই প্রতাপরুদ্রকে দেওয়া হইয়াছিল। হয় ত, তিনি গোপনে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর লীলা নিত্য। ঈশান নাগর লিখিয়াছেন—"যদ্যপি চৈতন্যাপ্রকট নহে ভক্ত স্থানে। লোক সিদ্ধ মহা খেদ হৈল ভক্তগণে।" (অদ্বৈত-প্রকাশ, ২১শ অধ্যায়) এই নিত্যলীলার শেষ পরিকল্পনা করা বৈষ্ণবের প্রাণে অসহ্য। এজন্য তাঁহার অপ্রকট হওয়ার ব্যাপারটা সংগোপিত হইয়াছিল।

এখন গুণ্ডিচা-গৃহে যে মহাপ্রভুর সংগোপন হইয়াছিল, তাহার আভাষ কবিকর্ণপুর কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কিছু পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে রথযাত্রার সময় প্রতাপরুদ্রের ক্ষেদোক্তি মর্ম্মান্তিক। গুণ্ডিচাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন "সোহয়ং নীলগিরীশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ সা গুণ্ডিচা। তে তে দিগ্বিদিকাগতাঃ সুকৃতিনস্তান্তা। আরামাশ্চ ত এব নন্দন বন শ্রীনাং তিরস্কারিণঃ। সর্ব্বাঙ্গেব মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে।"

সংক্ষেপার্থ "এই সেই নীলগিরীশ্বর, সেই রথযাত্রা ও গুণ্ডিচা। তদুপলক্ষে দিক্‌দিগন্তর হইতে পুণ্যাত্মা ভক্তগণ দণ্ডায়মান। নন্দনবন অপেক্ষাও শোভাশালী সেই উপবন। কিন্তু আজ মহাপ্রভুর বিরহে আমার সমস্তই শূন্য বোধ হইতেছে।" গুণ্ডিচার সঙ্গে মহাপ্রভুর লীলাবসানের স্মৃতি অতি নিবিড় ও করুণাত্মকভাবে বিজড়িত। সেখানে যাইয়া প্রতাপরুদ্রের এইরূপ মনোভাব হওয়া স্বাভাবিক।...

এখন কথা হইতেছে, লোচনদাস লিখিয়াছেন, রবিবার দিন বেলা চারটার সময় মহাপ্রভুর লীলাবসান হয়; কিন্তু জয়ানন্দ লিখিয়াছেন রাত্রি ৯॥ টার সময় নবদ্বীপচন্দ্র অস্তমিত হন।" এই বৈষম্যের সমাধান কি করিয়া হইতে পারে?

আমার মনে হয়, এই মতদ্বৈধ খুব একটা বড় ব্যাপার নহে, ইহার অতি সহজ উত্তর আছে। লোচনদাস জানাইয়াছেন, শনিবার দিন পায়ের ব্যথা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে মহাপ্রভু গুণ্ডাবাড়ীতে আনীত হন। পরদিন রবিবার প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন ছিল। তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার লীলা-শেষ আশঙ্কা করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বেলা চারটার সময় তাঁহার তিরোধান ঘটে। তৎপর তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া সেই স্থান মেরামত করিতে আরও ৫|৬ ঘণ্টা সময় অতীত হয়। সুতরাং এই-সকল কার্য্য নির্ব্বাহান্তে রাত্রি ৯॥০টার সময় মন্দিরের দ্বার খোলা হয়। এখন যে-সকল পাণ্ডা এ বিষয়ে ঠিক সত্যকার সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহারা জানাইয়াছিলেন, বেলা চারটার সময় তাঁহার লীলাবসান হয়। কিন্তু যাঁহারা দরজা খোলার সময়টাই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন ৯॥০টার সময় তিনি গুপ্ত হন। এই কারণে তিরোধানের সময় সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন রূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।...

এখন আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য—তাঁহার সমাধি গুণ্ডিচা-মন্দিরের কোন্ স্থানে দেওয়া হইয়াছিল?...আমি সেই মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, দুইটি চন্দনকাঠের বৃহৎ সেতু তথায় রহিয়াছে। মাসীমাতা ঠাকুরাণীর বিগ্রহের পার্শ্বে জগদ্বন্ধুর সাময়িক অবস্থানের জন্য পাদপীঠের স্থান রহিয়াছে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গৃহটিতে মহাপ্রভুর কোন নিদর্শন নাই। ক্ষুব্ধ মনে ফিরিতেছিলাম, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম সেই ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বারদেশের এক প্রান্তে শত-শতদলনিন্দিত অতি সুদৃশ্য মহাপ্রভুর চরণ-চিহ্ন বিরাজমান। উহা অভ্যন্তর গৃহের

দ্বারের এক প্রান্তে এবং তাহার পরে গুণ্ডিচার বহু-স্তম্ভ-শোভিত বিরাট মণ্ডপগৃহ—সেই মণ্ডপ-গৃহের প্রকাণ্ড দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া পাণ্ডারা তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন এবং সেই পদচিহ্ন তাঁহার সমাধির নির্দ্দেশক করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।...

পাণ্ডারা বলিয়াছেন, কোন অজ্ঞাত কারণে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব গুণ্ডিচা-বাড়ীর ঐ চরণ চিহ্নের উপর পড়িয়া লুটপুটি হইয়া অজস্র ধারে নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। যদিও মহাপ্রভুর সংগোপন অতি গূঢ় বিষয়—তাহা লোকচক্ষু হইতে যথাসম্ভব অন্তরাল করা হইয়াছে—তথাপি ঐ চরণ-চিহ্নের উপর এতাদৃশ মর্ম্মান্তিক শোকাভিনয় কি কোন বিগত কালের লুপ্ত স্মৃতি সংস্কারকে ক্ষীণ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিতেছে।

(ভারতবর্ষ ফাল্গুন, ১৩৩৫) শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন

পূর্ণ চৈত্র

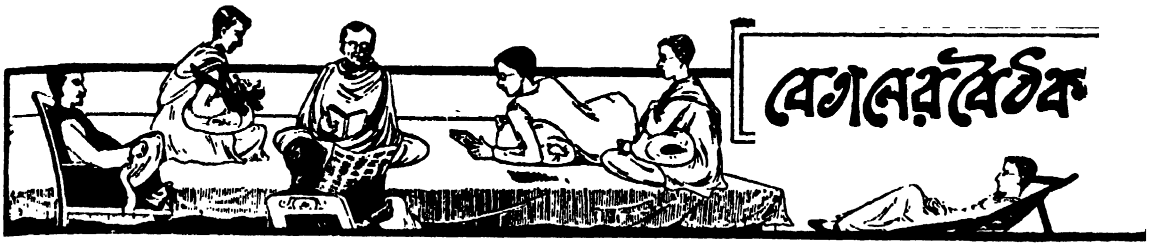
শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

এই চৈত্র—ঋতুর গোধূলি, বর্ষশেষ ;
আয়ু-শেষ বিদায়ের বেলা
পূর্ণ প্রমোদের মেলা,—
সমুজ্জ্বল উৎসবের বেশ !
দেখেনা যে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে
আসন্ন বিরহ ;—
প্রসন্ন খুশীতে ভরা স্বর্ণ-সমারোহ !
বিস্ময়ের কথা !
চক্ষে বিন্দু অশ্রু নাই, বক্ষে নাই ব্যথা !
মুখে হাসি,—উগ্রগন্ধ পুষ্পাসব-পান,—
রক্তিম নয়ান ;
'ভোঁওরী'-সারঙ বাজে,—মৌমাছিরা গুঞ্জরিয়া গায়,—
নাচে প্রজাপতি-পরী,—পিক সে বাজায়
মোহকর কামনার বাঁশী ;
এই চৈত্র—চিন্তাহীন, বিভ্রান্ত, বিলাসী।

হায়, মর্ত্ত্য-মানুষ আমরা,—
দুর্ব্বল কোমল চিত্ত বড় মায়া-মমতায় ভরা ;
ভাঙনের কূলে বসি', শিয়রে রাখিয়া সর্ব্বনাশ,
এই যে মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়া তীব্র উপহাস,
আমাদের কল্পনা-অতীত ;—ভয় করে !
এই ভয় জয় করে,
জানিনা সে নির্ভীক কেমন—
কোন্ উপাদানে গড়া মন !...

অশ্রুময় আঁখি,
বিয়োগের, বিদায়ের দিনে—মোরা থাকি
প্রিয়জন-মুখে ম্লান চেয়ে ;
মলিন কপোল বেয়ে
ব'য়ে যায় আঁখি-ঝরা জল ;
করতলে রাখি' করতল,
কি যে কব ভাবিয়া না পাই...
কণ্ঠ কাঁপে—কাঁদিয়া ভাসাই !
এই অশ্রু, এই যে বেদনা,
বুঝে না যে-জনা
এই ক্ষুব্ধ রোদনের সমুদ্র-তুফানে
শঙ্কাহীন প্রাণে
কর্ণহীন প্রমোদ-ভেলায়
তুলিয়া হাসির পাল, বাজাইয়া বাঁশী, ভেসে' যায়
নিরুদ্দেশে—নির্ব্বিকার,
কে কহিবে—রহস্য কি তার !

আজি তবু মনে হয়, এই ভালো, মোদের ধরায়
যাহা যায়, যাহা যাবে, বিয়োগ, বিদায়,
এ ত' চিরন্তন ;
এরি লাগি' নিত্য যদি মানুষের মন
হাহাকার করে' মরে
আকুল অন্তরে,
মিলনেরে ম্লান করে ভাবিয়া বিরহ,
জীবনের উপকূলে বসি'—অহরহ
মরণের বন্যা-ভয়ে ভীত-
সচকিত ;
তা' হ'লে ত একান্ত দুর্ব্বহ,
দুর্ব্বিসহ,
ব্যর্থ এই মানব-জীবন—
জাগ্রত এ দুঃস্বপনে কিবা প্রয়োজন ?
তার চেয়ে ঢের ভালো – ঐ রঙ্গ-হাসি,
আপনার ব্যথাটারে ব্যঙ্গ-ভরে চলি উপহাসি' ;
যতক্ষণ আছে কিছু, যতক্ষণ আছি—
যতক্ষণ বাঁচি,
পরিণাম চিন্তা নাই, নাই চাওয়া অতীতের পানে,
অফুরন্ত গানে প্রাণ পরিপূর্ণ করি' বর্ত্তমানে
পূর্ণ ভাবে আমি থাকি,—
পূর্ণ পাত্র হাতে দিক সাকী !



জিজ্ঞাসা

(১)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব এবং তদীয় কাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা এ পর্য্যন্ত ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত কোন্ কোন্ গ্রন্থে করা হইয়াছে ? গ্রন্থগুলির নাম, মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

(২)

ওড়িয়া সাহিত্যের বর্ত্তমান ও প্রাচীন প্রধান প্রধান লেখকগণের গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে, কলিকাতায় এরূপ কোন পুস্তকের দোকান থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা দিলে বাধিত হইব।

শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

(৩)

কিছুদিন হইল দক্ষিণ-ভারতবর্ষে অশোকের কয়েকটি নূতন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে কোন্ পত্রিকার কোন সংখ্যায় হইয়াছে ?

(৪)

কাব্যপ্রকাশ, দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণ—এই তিনখানি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের কোন বাংলা অনুবাদ বা অনুবাদ-সংবলিত সংস্করণ আছে কি না ?

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

(৫)

যে-সব ভারতবর্ষীয় অবিবাহিতা বিদুষী মহিলা জনসাধারণের হিতকর কোনও কাজে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম, এবং তাঁহাদের যদি কোনও জীবনী লিখিত হইয়া থাকে তবে তাহার লেখকের নাম ও প্রাপ্তিস্থান, কেহ জানাইলে সুখী হইব।

( )

ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ পুরাণের মতানুযায়ী শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয় ?

সুরেশচন্দ্র রায়

(৭)

টমাস হার্ডির কোনও বই বাংলায় অনুবাদিত হইয়াছে কি না; যদি হইয়া থাকে তবে বইয়ের ও অনুবাদকের নাম এবং প্রাপ্তিস্থান জিজ্ঞাস্য।

(৮)

সাধারণতঃ দেখিতে পাই, বর্ষাকালে দরজা ও জানালার কাঠ অল্প ফুলিয়া উঠে এবং দরজা-জানালা বন্ধ করিতে কষ্ট হয়; কাঠের এই আয়তন-বৃদ্ধি কিরূপে বন্ধ করা যায় ?

শ্রীসুধীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

(৯)

আষাঢ় মাসের প্রথম সাত দিনকে "সাতকন্যা" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার কোন শাস্ত্রীয় যুক্তি আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহা কি ?

(১০)

পূজোপচারে যে অর্ঘ্য দিবার বিধি আছে, তাহার তাৎপর্য্য কি ? অর্ঘ্যে (১) গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, দূর্ব্বা ও সর্ষপ ; (২) জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, অক্ষত, তিল, যব, সর্ষপ—এই আট আট প্রকার দ্রব্য দিবারই বা বিধি কেন ?

(১১)

বাংলা সন যাহা বর্ত্তমানে ১৩৩৫ সন বলিয়া চলিতেছে তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কি ?

শ্রীমধুসূদন বিদ্যাবিনোদ

(১২)

ফরাসীভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করিবার কোনও বাংলা পুস্তক আছে কি না? থাকিলে নাম কি, মূল্য কত এবং কোথায় প্রাপ্তব্য ?

French-Bengali কোন অভিধান আছে কি না, থাকিলে মূল্য কত ও কোথায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীসুনীলবরণ রায়
শ্রীঅমরেন্দুকুমার রায়

(১৩)

বাংলা দেশে "আজি ক, খ" বলিয়া একটা কথা প্রাচীন পণ্ডিতদের -মুখে শুনা যায়। এই 'আজি'র আকার কিরূপ এবং ইহার কোনও বিশেষ অর্থ আছে কি না? আজকাল এই কথাটার ব্যবহার একেবারেই নাই কেন ?

(১৪

বাংলায় কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে, অভিক্ষা ও আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্বদেশকল্যাণকামী কোনও প্রতিষ্ঠান আছে কি না, বা ঐরূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে কি না ? থাকিলে কোথায় এবং তাঁহাদের কর্ণধারার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত কি ? কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীসরলানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৫)

যশোহর, খুলনা প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র গাজীর গীত হইয়া থাকে ; নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যে ইহা খুবই প্রসারলাভ করিয়াছে ; এ সম্বন্ধে 'গাজী' ও 'কালু-গাজী-চম্পাবতী' পুঁথি ব্যতীত অন্য কোনও পুস্তক আছে কি না,—থাকিলে তাহা কোথায় পাওয়া যায় ?

(১৬)

বাংলা ভাষার শব্দ ও বানান ঠিক করা সর্ব্বপ্রথমে কাহার দ্বারা হয় এবং বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম কোন্ কবিতা ও গদ্য পুস্তক বাহির হয় ? তাহার রচয়িতা কে ?

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

(১৭)

বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাজারে এক প্রকার কালি পাওয়া যাইত যাহাকে "অদৃশ্য কালি" বলা হইত। উক্ত কালিতে লিখিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই লিখন অদৃশ্য হইয়া যাইত, কিন্তু লিখিত কাগজে অল্প আগুনের উত্তাপ দিলেই সমস্ত পুনঃপ্রকাশিত হইত। উক্ত কালি কিরূপে এবং কি কি উপাদানে প্রস্তুত হইত এবং এক্ষণে পাওয়া যায় কি না ? যদি পাওয়া যায় তবে কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮)

রাস্তার চৌমাথায় জল ঢালিবার কারণ কি ? কখনো কখনো দেখা যায় যে, গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিবার সময় কোন কোন মহিলা-চৌমাথা রাস্তার উপর গঙ্গাজল ঢালেন। ইহার কারণ কি ?

(১৯)

বাংলা দেশের মধ্যে কতগুলি চলচ্চিত্র কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? কোন্ কোন্ স্থানে উহাদের আপিস এবং ঠিকানাই কি ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত

(২০)

দাবাখেলার সম্বন্ধে বাংলাভাষায় কোন বই আছে কি ? দাবাখেলা কোন্ দেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত ছিল ? ভারতবর্ষে কতকাল যাবৎ উক্ত খেলার প্রচলন ?

শ্রীহিমাংশু চৌধুরী

(২১)

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে ফল কাঁচা অবস্থায় টক্ লাগে। কিছুদিন পর, গাছে থাকিলে বা ঘরে রাখিয়া দিলে (অর্থাৎ পাকিলে) সুমিষ্ট হয়। উহার phenomenon কেহ জানাইলে বিশেষ সুখী হইব।

(২২)

বোম্বাইএর রাস্তাতে একদিন দেখিয়াছিলাম একটি লোক কাঁচ ভাঙিয়া উহা আবার পূর্ব্বানুরূপ কি একটা জিনিষ দিয়া জোড়া দিতেছে। হাতে লইয়া দেখিলাম যে জোড় ধরা খুব শক্ত। কি জিনিষ প্রয়োগে এরূপ করা যায়, তাহা কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী বীরেশলোচন সেন

(২৩)

ফাল্গুন, চৈত্র মাসের পর হইতেই দেখা যায় যে, সাধারণ পুকুরের জল ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তাহাতে গুঁড়ি গুঁড়ি কি এক প্রকার 'পানার' মত জিনিষ হয়। উহা নীলবর্ণ। তাহা লাগিলে কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত খারাপ হইয়া যায়। উহা নষ্ট করিবার কোনও প্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে কি ?

শ্রীমতী ইলাবতী সেন।

(২৪)

বিমান (Aviation) সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার কোনও কলেজ বা ইন্‌ষ্টিটিউট আছে কি না, তাহা জানাইলে সুখী হইব। ভারতে বিমান সম্বন্ধীয় এক ক্লাব (Civil Aviaticn Club) বোম্বেতে খোলা হইয়াছে, উহাতে training-এর কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই।

শ্রী রণেশলোচন সেন

(২৫)

Vitamin সংযুক্ত জিনিষ খাওয়াই বিধেয়। চাউলে Vitamin যথেষ্ট আছে। চাউল যতই পুরান হইতে থাকে, Vitaminও ক্রমে কমিতে থাকে। উহার সন্তোষজনক কারণ কেহ দিতে পারিলে সুখী হইব।

(২৬)

কাপড় প্রভৃতি অনেকক্ষণ ভিজা অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে, উহাতে স্থানে স্থানে কাল দাগ (বা তিলা) পড়ে। নূতন কাপড়ে অতি শীঘ্র সেরূপ দাগ পড়ে। এমন কোন রাসায়নিক দ্রব্য আছে কি যাহাতে ঐ দাগ অনায়াসে উঠিয়া যায় ?

শ্রীমতী ইলাবতী সেন

(২৭)

ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে ঘোড়া, গরু এবং ছাগল আজকালও বন্য অবস্থায় পাওয়া যায় ; পাওয়া গেলে শিকারে কোনও বাধা আছে কি না ? ভারতবর্ষের বাহিরেই বা বন্য ঘোড়া, গরু ও ছাগল পাওয়া যায় কোন্ কোন্ দেশে ?

শ্রী সত্যভূষণ সেন।

(২৮)

একটি তাপমান-যন্ত্র (Thermometer) ভাঙিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ পারদ কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কারের উপর পড়িয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত অলঙ্কারগুলির পারদমাখা স্থানসমূহ রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। যাহার দ্বারা উক্ত দাগ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইতে পারে এরূপ কোনও প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য আছে কি ?

শ্রী মতী আভাময়ী দেবী

—

মীমাংসা

বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক

বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক সংখ্যায় 'দ্বাদশ' নহেন, বহু। প্রধান প্রধান ভুঞাগণের নাম দেওয় গেল :—

১। ওসমান ও ভ্রাতৃবর্গ ; ২। ঈশা খাঁ ও তাহার পুত্রগণ, এব

ভ্রাতুষ্পুত্র আলওল খাঁ; ৩। মাসুম খাঁ কাবুলি ও তাহার পুত্র মির্জ্জা মুনিম খাঁ; ৪। দরিয়া খাঁ; ৫। খালসির জমিদার মধুরায়; ৬। শাহ্ জাদপুরের জমিদার রাজা রায়; ৭। চাঁদ প্রতাপের নাবুদ রায়; ৮। বাহাদুর গাজী, সোণা গাজী, আনোয়ার গাজী; ৯। মাতঙ্গের জমিদার পালোয়ান; ১০। হাজী শামসুদ্দিন বোগ্ দাদি; ১১। ফতেহ্ বাদের (ফরিদপুর) জমিদার মজলিস কুতব; ১২। বাক্‌লার (বাকরগঞ্জ) জমিদার রামচন্দ্র; ১৩। চিনা জোয়ার (পুটিয়া) জমিদার পীতাম্বর ও অনন্ত, ১৪। আলাইপুরের আলাবক্স; ১৫। ভুলুয়ার (নোয়াখালী) অনন্তমাণিক্য; ১৬। যশোহরের প্রতাপাদিত্য।

মোগলহস্তে বঙ্গের শেষ পাঠান রাজা দায়ুদের পরাজয়ের পর বাংলার স্বাধীনতারক্ষার ভার বারভুঞাঁর উপর পড়ে। সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ভুঞা ইশা খাঁ আকবরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাংলার মোগল-সুবাদার ইসলাম খাঁ তাঁহাকে ১৬১১ খৃঃ অব্দে পরাস্ত করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিত Bengal Chiefs' Struggle for Independence in the Reign of Akbar and Jehangir (Bengal: Past and Present, Vol.XXXV) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নৈশ-বিদ্যালয়

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে রাত্রিতে পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। আই এ এবং বি-কম পড়ান হয়। নৈশ-বিদ্যালয়-পরিচালন সম্বন্ধে উপদেশসম্বলিত কোনও পুস্তকের নাম জানা নাই, তবে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষমহোদয়ের নিকট নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালনের তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গৌড়, বঙ্গ, বাঙ্গালা

গৌড়—কথিত আছে, পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার গৌড় নামক দৌহিত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইজন্য ইহাঁর নাম হইয়াছে গৌড়।

প্রাচীনকালে গৌড় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। যথা—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকল-বিন্ধ্যাচলের উত্তরে এই পাঁচটি প্রদেশকে পঞ্চগৌড় বলা হইত।

বঙ্গ—সোমবংশজ বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পঞ্চজন ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে। তাহাদিগের মধ্যে বঙ্গ নামক পুত্র যে বিভাগে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করেন তাহার নাম বঙ্গ। সংস্কৃত ভাষাতে পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গই বঙ্গ নামে প্রখ্যাত ছিল। মতান্তরে এই প্রদেশের আদিম নিবাসীর উপাস্য দেবতা 'বঙ্গা' ও দেবী 'বঙ্গী' হইতে ইহার নাম বঙ্গ হইয়াছে।

বাঙ্গালা—আইন-ই-আকবরীতে আছে—"নামি আসলি বাংলা বঙ্গ" অর্থাৎ বাঙ্গালার আসল নাম বঙ্গ। ইহার মতে পূর্ব্বকালের রাজারা নিম্নদেশের অনেকস্থানে দশ হস্ত উর্দ্ধ, বিশ হস্ত প্রশস্ত এক একটি বাঁধ বা আল দিয়াছিলেন, একারণ বঙ্গ আল এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল এবং ঐ বাঙ্গাল হইতে বাঙ্গালা নাম হইয়াছে।

চট্টগ্রামের সন্নিকটে "বাঙ্গালা" নামে একটি শহর প্রাচীন মানচিত্রে পাওয়া যায়। মার্কো পোলো ও রসীদউদ্দীন নামক দুইজন পর্য্যটক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে "বাঙ্গালা" নাম সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেতালের বৈঠকে (প্রবাসী মাঘ সংখ্যা ৫৪৯ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় জলছবির প্রস্তুত-প্রণালী জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এই;—

জিলাটিন (Gelatine) উষ্ণ জলে গুলিয়া লইয়া উহার স্থায় কোন মসৃণ পদার্থের উপর পাতলা স্তরে ঢালিয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়। উক্ত কাগজে ডিমের চটচটে অংশ মাখাইয়া, বাইক্রমেট অব পটাসের (Bichromate of Potash) জলে ডুবাইয়া লইতে হয়। তৎপর কোন প্রকার অর্দ্ধ-স্বচ্ছ পদার্থের উপর অঙ্কিত বা মুদ্রিত চিত্রের নিম্নে কাগজ স্থাপন করিয়া প্রখর রৌদ্র-তাপে কিছুকাল রাখিলে, ঐ কাগজে চিত্রটি ছাপিয়া যায়। অনন্তর উহা ইচ্ছামত রঞ্জিত করিয়া উষ্ণ জলে প্রক্ষালিত করিলে যে-সকল স্থান আলো লাগাতে গাঢ়বর্ণপ্রাপ্ত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান ব্যতীত অপরাংশের জিলাটিন ও বর্ণ জলে দ্রব হইয়া যায়। এখন এই ছবিটিকে উষ্ণ জল হইতে উঠাইয়া সাবধানে গঁদ-যুক্ত কাগজে বসাইয়া লইলেই জলছবি হইল।

শ্রীসুনীলবরণ রায়
শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার রায়

সিরাপ তৈয়ার করিবার নিয়ম

সিরাপ প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিষের আবশ্যক—চিনি ও ফলের রস বা ফলের সুগন্ধি। চিনি জ্বাল দিয়া রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফলের রস মিশাইলে সেই ফলের গন্ধযুক্ত সিরাপ তৈয়ার হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে খুব কম সিরাপ-প্রস্তুতকারকই ফলের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ নানা রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রণ করিয়া যে কোনও ফলের অনুরূপ গন্ধ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ফলের রসের পরিবর্ত্তে এই রাসায়নিক সংমিশ্রণই অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নে একটি ফলের গন্ধ প্রস্তুতের সংমিশ্রণ তালিকা প্রদত্ত হইল:—

আনারসের গন্ধ:—

এমিল বুটেরিক ইথার	১০ ভাগ
বুটেরিক ইথার	৫ ভাগ
গ্লিসারিণ	৩ ভাগ
আল্‌ডিহাইড	১ ভাগ
ক্লোরোফর্ম্ম	১ ভাগ
এসেটিক ইথার	৫ ভাগ
এমিল এসেটিক ইথার	৩ ভাগ
এমিল বুটেরিক ইথার	২ ভাগ
গ্লিসারিণ	২ ভাগ
ফরমিক ইথার	১ ভাগ
নাইট্রাস ইথার	১ ভাগ
মিথিল স্যালিসিলিক ইথার	১ ভাগ

কৃষির স্কুল

বাংলা দেশে উপস্থিত দুইটি কৃষি সম্বন্ধে স্কুল আছে। একটি হুগলি জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায়। তাহার নাম চুঁচুড়া এগরিকালচার স্কুল, পোঃ সুগন্ধা হুগলী। অপরটি Shaw Wallace কোম্পানীর। Shaw Wallace Company, Calcutta এই ঠিকানায় লিখিলে জানিতে পারিবেন। আগামী ১৯২৮ সাল হইতে রাজসাহীতে একটি গভর্ণমেণ্ট স্কুল খোলা হইবে। Director of Agriculture-Bengal, Calcutta এই ঠিকানায় লিখিলে ইহার বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রী দেবপ্রসাদ গাঙ্গুলি

গাছের পোকা

পোকা দুই প্রকার—(১) এক প্রকার পোকা কেবলমাত্র পাতা খায় (২) অপর গাছের রস খাইয়া ফেলে। যে পোকায় পাতা খায় তাহা মারিতে হইলে ২ পাউণ্ড হইতে ৪পাউণ্ড Lead Arsenate ৫০ গ্যালন জলে মিশাইয়া গাছে পিচকারীর দ্বারা দিতে হয়। বাহারি গাছে Powder Hellebore গরম জলে মিশাইয়া দিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে। যে পোকায় গাছের রস চুষিয়া ফেলে তাহাদের মারিতে হইলে চূণ ও গন্ধক সমান পরিমাণে জলে মিশাইয়া ও গরম করিয়া লইয়া পিচকারীর দ্বারা গাছে দিতে হয়। এক বার (Bar) বা দুইখানি সাবান এক বালতি জলে মিশাইয়া দিলেও পোকা মরিয়া যায়। কিংবা তামাক পাতা জলে ভিজাইয়া দিলেও চলে।

শ্রী দেবপ্রসাদ গাঙ্গুলি

অপ্রাপ্য বই

গরুড় বিষয়ে বঙ্গভাষায় নিম্নলিখিত পুস্তকখানি দেখা যায় :—

"অনন্ত-গরুড়-রহস্য"—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। মূল্য রাজসংস্করণ আট আনা এবং সাধারণ সংস্করণ ছয় আনা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থাধ্যক্ষ— তরুণ শক্তি সাহিত্য মন্দির, কাশীপুর। (যশোহর)।

লোহার দাগ

নিম্নলিখিতরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে, কাপড়ের লোহার দাগ উঠিয়া যাইবে। যথা—

(১) দুই-তিন ফোঁটা বৃষ্টি বা বরফের জলের সহিত এক ফোঁটা "নাইট্রিক্ এসিড্" মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রিত দ্রব্যটি দাগযুক্তস্থানে লাগাইয়া পরে ধুইয়া লইলে, লোহার দাগের চিহ্ন থাকিবে না।

(২) 'অক্জালিক অফ পটাস্' জলে গুলিয়া তাহাতে কাপড় কাচিলেও অনায়াসে দাগ উঠিয়া যাইবে।

(৩) রেশমী কাপড়ের দাগ উঠাইতে হইলে, এক ভাগ লেমন এসেন্স ও পাঁচ ভাগ 'টার্‌পেন্‌টাইন্' একত্র করত নেক্ড়ায় করিয়া দাগযুক্ত স্থানে লাগাইয়া কিছু সময় পরে কাপড় কাচিলে সহজেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

(৪) টক আমরুল শাকের রস, কামরাঙ্গা, ও লেবুর রসের সহিত ভাতের ফেন মিশাইয়া তাহা দ্বারা দাগযুক্ত স্থান বারবার ঘষিয়া পরে সাবান দিয়া কাচিয়া লইলেও দাগ উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তক

বৈদান্তিক পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কৃত 'সাংখ্য-দর্শন' নামক একখানা পুস্তক আছে। প্রাপ্তিস্থান বসুমতী সাহিত্য-মন্দির। ১৬৬ নং বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৷৷০।

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী (বর্ত্তমানে, শ্রীসন্তদাসজী ব্রজবিদেহী নামে পরিচিত) প্রণীত দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে সুচিন্তিত এবং বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। প্রাপ্তিস্থান :—চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ। ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা।

শ্রী নলিনীকুমার ভদ্র

আলোচনা

জৈনী শ্রাবক ও ওসওয়াল

প্রবাসীতে [আশ্বিন, ১৩৩৫, ৯০২ পৃঃ] জয়পুর প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে, "জৈনী দুই প্রকার, ১ম শ্রাবক অর্থাৎ সরাওগী অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বকথক, ইঁহারা হিন্দু দেবদেবী মানেন না। ২য় ওসওয়াল, ইঁহারা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত, জৈনী হইলেও দেবদেবী মানেন।" আমি আশা করিয়াছিলাম, প্রবাসীর কোনও জৈনী পাঠক এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু কার্ত্তিকের প্রবাসীতে প্রতিবাদ না দেখিয়া আমি প্রতিবাদ করিতেছি।

জৈনীরা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মমত বহু পুরাতন; তাঁহাদের ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা গুরু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদিগুরু ঋষভদেবের অব্দ লিখিতে ৭৬টি সংখ্যা পাশাপাশি লিখিতে হয়। তাঁহাদের শেষ বা ২৪তম তীর্থঙ্কর, মহাবীর স্বামী, পূর্ব্ব ঈশাব্দ ৫৯৯ সৌর বৈশাখ, চান্দ্রচৈত্র-শুক্লা-ত্রয়োদশীর দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ও পূঃ ঈশাব্দ ৫২৮ কার্ত্তিক অমাবস্যার দিন নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বজ গুরু বা ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী ৮১৭ পূঃ ঈশাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ও একশত বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথস্বামীর সময়েই, অথবা তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই জৈনদের "তীর্থ-চতুষ্টয়" ছিল, অর্থাৎ (১) সাধু (সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, বা মুনি), (২) সাধ্বী (ভিক্ষুণী, সন্ন্যাসিনী), (৩) শ্রাবক (গৃহস্থভক্ত) ও (৪) শ্রাবিকা; অতএব গৃহস্থ জৈনী মাত্রেই শ্রাবক। পার্শ্বনাথ স্বামী স্বয়ং বস্ত্রধারণ করিতেন, ও তাঁহার সময়ে সাধুরাও বস্ত্রধারণ করিত, কিন্তু মহাবীর স্বামী স্বয়ং বস্ত্রত্যাগ করিলেন, ও তাঁহার সময় হইতে সাধুরা বিবস্ত্র থাকিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর স্বামীর তিরোভাবের সময়ে জৈনদের এক মত ও এক

সম্প্রদায় ছিল, তাহার বহুকাল পরে নানা সম্প্রদায়ে ভাগ হইয়াছে। মহাবীর স্বামীর জীবিতাবস্থায় ভারতে কোনও সম্প্রদায়ে বা ধর্ম্মে মূর্ত্তিপুজা প্রচলিত ছিল না। পূঃ ঈ ৪০৩ হইতে ৩৭৭ পর্য্যন্ত জৈনদের গদিগুরু প্রভব স্বামী জৈনসঙ্ঘ শাসন করিয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে সর্ব্বপ্রথমে, পুজার জন্য মহাবীর স্বামীর মূর্ত্তি উপকেশপত্তন নামক স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল। ঐ স্থাপনার ঠিক সময় জানা নাই, কিন্তু ৪০০ পূর্ব্ব ঈশাব্দ বলিলে তিন বৎসরের বেশী ভুল হইতে পারে না। এই সময় হইতে সকল জৈনরা মহাবীর স্বামীর মূর্ত্তি পুজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ইহার পর কোনও সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধরা মূর্ত্তিপুজা আরম্ভ করিয়াছেন।

জৈনরা দেবদেবী, হিন্দুরা যে ভাবে মানেন, সে ভাবে মানেন না। মহাবীর স্বামীর জীবনীতে শিব ও দুর্গা মহাবীর স্বামীর তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাই, ও দেবতারা তীর্থঙ্করদের সেবা ও স্তুতি করিতেছেন দেখিতে পাই। জৈন প্রচারকরা যখন জৈনধর্ম্মে বৈষ্ণব বা শৈব সম্প্রদায় হইতে নূতন শ্রাবক সংগ্রহ করিতেন, তখন নূতন শ্রাবকদের আপনাদের পূর্ব্বেকার কুলদেবতা গৃহদেবতা ইত্যাদি সকল প্রকার পুজা ত্যাগ করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহারা ত্যাগ করিল কিনা জৈন প্রচারকরা সে সম্বন্ধে বিশেষ কঠোরতার সহিত দেখিতেন না; তাহার ফলে অনেক নূতন জৈনরা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু কতক কতক প্রাচীন কুলাচার কুলদেবতার পুজা ইত্যাদিও করিয়া থাকে, যদিও ইহা প্রকৃত জৈনধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

প্রায় চারশত বৎসর হইল একদল জৈনরা [ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজিদের মত] মূর্ত্তিপুজা করিতে অস্বীকার করিল, কেননা মহাবীর স্বামী স্বয়ং মূর্ত্তিপূজক ছিলেন না, ও মূর্ত্তিপুজা করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সময়ে মূর্ত্তিপুজার ধারণাই ভারতবাসীর ছিল না। ভারতবাসী হিন্দুরা তখন বেশীর ভাগ বৈদিক ও যাজ্ঞিক ছিল,তাহারা যজ্ঞে বহু পশুহিংসা করিত, এই পশুহত্যা নিবারণ করা মহাবীর স্বামী ও বুদ্ধদেবের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সংস্কারকরা হিন্দু সময়ের কুলদেবতার পুজাও ত্যাগ করিল। এই দলকে চলিত কথায় "বাইসটোলী" বলে, কেন না মোটে ২২জন লোক মিলিয়া এই সংস্কার আরম্ভ করেন, এখন বাইসটোলী দলে অনেক লোক আছে। অতএব বাইসটোলীরা মহাবীর স্বামীর মূর্ত্তি পুজা করেন না, হিন্দু দেবদেবী পুজাও করেন না, কিন্তু মহাবীর স্বামীর প্রচারিত অন্য সিদ্ধান্তগুলি মানেন; অন্য শ্রাবকরা মহাবীর স্বামীর ও অন্য তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি পুজা করেন, ও যাহার শ্রদ্ধা হয় সে হিন্দুদের দেবদেবীও মানে। হিন্দু দেবদেবী মানা না মানা লোকের আপন আপন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে মাত্র, বিধানানুসারে জৈনধর্ম্মের সহিত হিন্দু দেবদেবীর কোনও সংস্রব নাই। ঈশাব্দের অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জৈনদের মধ্যে আর এক সংস্কারক দল হইয়াছে, সেটি ১৩ জন মিলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া "তেরাপন্থী নামে প্রসিদ্ধ। এদলে এখনও অতি অল্প লোকই আছে।

উপরে বর্ণিত প্রভবস্বামীর শাসনকালে [প্রায় ৪০০ পূঃ ঈ] ওসওয়াল বা অওসওয়াল সম্প্রদায়ের জন্ম হইয়াছিল। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রা সম্রাট ছিলেন, তাঁহদের রাজধানী ছিল কল্যাণনগরে। এই কল্যাণনগর আধুনিক নিজাম রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধে অর্থাৎ মরহটওয়াড়ীতে একজন সামন্ত জায়গীরদারের (Nawab of Kaliani) প্রধান বাসস্থান। ঐ রাজবংশের একজন রাজকুমারের বৃত্তির টাকা লইয়া সম্রাটের সহিত কিছু মনোমালিন্য হইলে, রাজকুমার সম্রাটকে ত্যাগ করিয়া আপনার স্ত্রী, শিশুপুত্র, ও ২১৩ শত সহচর লইয়া আপনার ভগ্নীপতি, মরুদেশের রাজার কাছে চাকরীর চেষ্টায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। মরুদেশের রাজা তাঁহাকে সে সময়ে প্রজাহীন, জনমানবশূন্য অওস গ্রামে বাস করিতে দিলেন, ও শীঘ্রই কোনও কাজের ব্যবস্থা করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। এই অওস গ্রাম আধুনিক যোধপুর হইতে নয় ক্রোশ দক্ষিণে ও তাহার আধুনিক স্থানীয় উচ্চারণ অওশিঁয়াঁ। রাজকুমার সেখানে বাস করিবার একমাস মধ্যে, তাঁহার শিশুপুত্র পীড়িত হইয়া মরণোন্মুখ হইল।

এখানে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ বলে, কোনও রোগে মরণাপন্ন হইয়াছিল, কেহ বলে শিশুকে সাপে কামড়াইয়াছিল; যাহা হউক, বৈদ্যরা প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন, সেই সময়ে রাজকুমার সংবাদ পাইলেন যে, গ্রামের বাহিরে এক গাছতলায় কতকগুলি শক্তিশালী উলঙ্গ সাধু আসন করিয়াছেন। তিনি তাহাদের মধ্যে প্রধান সাধুর (রত্ন প্রভু সূরী) কৃপাভিক্ষা করিলেন ও সাধুর চেষ্টায় শিশু নীরোগ হইল। কৃতজ্ঞ রাজকুমার সাধুকে কিছু অর্থস্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সাধু কিছুতেই ধন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; পরে বলিলেন "তুমি আপনাকে আমার ঋণী ভাবিতেছ, ও সেই ঋণ শোধ করিতে চাহিতেছ। আমি সাধু, ধনরত্ন ছুঁইবার অধিকার আমার নাই তবে, আমি বাক্য দান করিতেছি যে, তুমি আপনার অনুচর স্ত্রী-পুত্র সকলকে লইয়া তিন দিন মাত্র মন দিয়া আমার উপদেশ শুনিলে সম্পূর্ণ অঋণী হইবে।" রাজকুমার স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিন দিন উপদেশ শুনিয়া সকলের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, সকলেই সাধুর প্রচারিত জৈনধর্ম্ম গ্রহন করিল। তাহার পর তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহাদের উদরপালন কিরূপে হইবে, কেন না তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়, জীবহত্যা না করিলে যুদ্ধ হয় না, ও জৈনধর্ম্মে তাহা নিষিদ্ধ। তখন সাধু রাজকুমার ও তাঁহার সহচরদের বলিলেন, "আমার আজ্ঞানুসারে তোমরা বৈশ্যদের ব্যবসায় অর্থাৎ বাণিজ্য অবলম্বন কর।" এই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রা অওস গ্রামে বাসকালে জৈনধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অওসওয়াল (অওসগ্রাম বাসী) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রাজবংশীয় বলিয়া জৈনসমাজে অওসওয়ালদের বিশেষ সম্মান দেখিয়া পরবর্ত্তী কালের অন্য অনেক জৈনরা দশ পাঁচ দিন অওস গ্রামে বাস করিয়া আপনাদের অওসওয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, অতএব এখন অওসওয়ালদের মধ্যে অন্য বর্ণের জৈনও আছে, সকলেই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়সন্তান নহে।

এই ক্ষত্রিয়রা ছাড়া আর কোনও যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় বেশী সংখ্যায় বোধ হয় জৈনসমাজে প্রবেশ করে নাই, যাহা করিয়াছে অল্প দুই চারিটি। যদিও জৈনধর্ম্ম সকল জাতীয় লোককে জৈন করিয়া লইতে পারে, ও বিধিমত তাঁহাদের জাতি বিচার নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ বোধ হয় কেবল বৈশ্য, বণিক ও ব্রাহ্মণেরাই জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন রাজা ব্যক্তিগতভাবে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে কোনও জৈন রাজবংশের সন্ধান পাই নাই। জৈনদের মধ্যে অনেক উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান দেখা যায়। এক কালে জৈনমাত্রেই বিদ্বান ছিল, তখন সকল জৈনকেই লোকে "বিদ্বাবান্" বলিত। তাহারা কখনই ভারতের নিরক্ষর নিম্ন বর্ণের সন্তান হইতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জৈন সাহিত্য বাহির করিয়া লইলে তাহার গৌরব নষ্ট হইয়া যায়, বস্তুতঃ বৈষ্ণব ও শৈব সাহিত্য(পেক্ষা জৈনসাহিত্য পুষ্ট।

অওসওয়াল সম্প্রদায় ও পূজার্থে মূর্ত্তি স্থাপিত হইবার প্রায় দুই শতাব্দী পরে, জৈন সাধুদের মধ্যে কতক সাধু শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে সাধুরা প্রায়ই নগরের বাহিরে বনে জঙ্গলে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া শ্রাবিকাদের উপদেশ দিতে ও প্রচার করিতে হইলে বস্ত্রধারণ আবশ্যক, সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অন্য কতকগুলি প্রাচীন নিয়ম ত্যাগ করিলেন না, উলঙ্গ রহিলেন। এই শ্বেতবস্ত্রধারণারম্ভ সম্বন্ধেও দুইটি প্রবাদ আছে। এক প্রবাদানুসারে ইহার আরম্ভ মালবদেশে হইয়াছিল, অন্য প্রবাদানুসারে মগধে। বোধ হয় দুইটি প্রবাদই ঠিক। এইরূপে, প্রাচীন উলঙ্গদল দিগম্বর ও বস্ত্রধারীরা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ হইল, ক্রমে ইহাদের পূজাপদ্ধতি, ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারে কিছু কিছু প্রভেদ হইতে লাগিল। এই দুই সম্প্রদায়েই অওসওয়াল আছে, তবে বেশীর ভাগ শ্বেতাম্বরী। আজকাল অওসওয়ালদের মধ্যে (১) প্রাচীন পন্থী অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজক, (২) বাইসটোলী অর্থাৎ যাহারা মূর্ত্তি পূজা করে না, ও অতিঅল্প, (৩) তেরাপন্থী আছে। প্রাচীন-পন্থীদের মধ্যে অনেকে আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাসমত শিব, বিষ্ণু, বা শক্তির পূজাও করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ পূজাতে সাধারণ জৈনরা যোগদান করে না।

'সরাওগী'' শব্দটি ''শ্রাবক'' শব্দের রূপান্তর মাত্র। তবে, বহুকাল হিন্দুরা সরাওগী শব্দটি গালিরূপে ব্যবহার করিতেন, অতএব অসম্মানসূচক হইয়া পড়িয়াছে। শ্বেতাম্বরীরা এখন প্রায়ই দিগম্বরীদের সরাওগী ও নিজেদের শ্রাবক বলেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল

—

মীরাবাঈএর বাণীর যাথার্থ্য

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে দেখলাম শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত ও শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার আশ্বিনের প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার "মীরাবাঈ ও অন্যান্য হিন্দী-কবি'' শীর্ষক প্রবন্ধের দুটি অংশ নিয়ে আলোচনা করে আমায় সম্মানিত করেছেন।

প্রবাসী ও অন্যান্য মাসিকপত্রে হিন্দী-কবি-সমাদর শীর্ষক যে-সব প্রবন্ধ লিখেছি ও হিন্দী ভাষার বিষয় যা-যা উল্লেখ করেছি তাতে আমার হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের হরেক রকমের মাসিকপত্র, নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা, মাধুরী, সরস্বতী, মনোরমা, মিশ্রবন্ধু-বিনোদ, কবিতাকৌমুদী, গ্রীয়ারসন সাহেবের হিন্দী ভাষার ইতিহাস ও বহু পুরাতন হিন্দী গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। বলা বাহুল্য মীরা বাঈএর জীবন কথার ও বাণীর মালমশলাও এই সব উপায়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে। সুতরাং দীনেশবাবু ফরিদপুর জেলার কোন পল্লীগ্রামের পাঠাগারে পুঁথি সংগ্রহ করতে গিয়ে মীরাবাঈ এর একটি দোঁহা পেয়েছেন, সেটি, না, আমার প্রবন্ধের উল্লিখিত পদটি যথার্থ,—তা অন্য কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ বিচার করে দেখবেন।

সুধাংশু বাবুর কথার উত্তরে এই বল্‌ছি যে, আমার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বাৎসল্যভাবের ও মাতৃস্নেহের বড় বেশী গান নেই—এই কথাটি প্রকাশ করে বলা। রবীন্দ্রনাথের ''শিশু ভোলানাথ'' ও ''শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে'' প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি গান বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। আমার উদ্দেশ্য ছিল বাৎসল্যভাবের গানের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা 'শুন ব্রজরাজ' গানটি কাহার রচিত তা' নিয়ে আমি আলোচনা করিনি। 'শুন ব্রজরাজ' গানটির রচয়িতা দাশরথি রায় নন—ইহা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত—এই প্রামাণিক বিবরণ দিয়ে সুধাংশুবাবু আমার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন।

শ্রীসূর্য্য বাজপেয়ী-চৌধুরী

—

বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার যোগ

গত পৌষের প্রবাসীতে অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন লিখিতেছেন যে, "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শাখা কটকে স্থাপিত হইবার সময় শুনিয়াছিলাম এবং আশাও ছিল যে, এইবার বুঝি উৎকলের কথা বঙ্গভাষায় শুনিতে পাইব, কিন্তু সে আশাও আশামাত্র রহিয়া গেল।'' অধ্যাপকমহাশয়ের উক্তি পড়িয়া এই ধারণা হয় যে, তিনি সাহিত্য-পরিষৎ উঠিয়া গিয়াছে এইরূপ কিছু ইঙ্গিত করিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির দ্বারা স্থানীয় স্থায়ী-বাসিন্দা ভদ্রলোকগণের সাহায্যে এই শাখাপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাঝে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন ইহা দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। ইহার নিজস্ব একটা লাইব্রেরী আছে। এখানে প্রায়ই সাহিত্যবিষয়ক অধিবেশন এবং প্রতি সপ্তাহেই ছাত্রগণের আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যপরিষদের এক চাতুর্ম্মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার কথা চলিতেছে। ইহাতে উৎকলে বাঙ্গালীদের স্থান, প্রভাব ও ইতিহাস এবং উৎকল সাহিত্যের চর্চ্চা প্রধানতঃ স্থানলাভ করিবে। প্রিয়রঞ্জন বাবু উড়িয়া ভাষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক বাঙ্গালী লেখকের নাম উল্লেখ করেন নাই।

সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের নাম স্মরণ করা উচিত। ইহারই আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট উড়িয়া ভাষাকে স্বতন্ত্র একটা ভাষারূপে স্বীকার করিলেন ও উড়িষ্যায় বাংলাভাষাকে পঠন-পাঠনের মিডিয়ম করিবার উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়। উৎকল-দীপিকা বলিয়া প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশপূর্ব্বক উৎকলীয় গদ্য সাহিত্যে ইনি নূতন যুগ আনেন এবং গদ্যে রাজনৈতিক আলোচনা ইনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। রায় রামশঙ্কর রায় বাহাদুর উড়িষ্যার প্রথম বিশিষ্ট নাট্যকার। বর্ত্তমানে উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ও ঐতিহাসিক নাট্যকার শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম 'ভূবিদ্যা'বিষয়ক বই লেখেন।

ইংরাজী সাপ্তাহিক Star of Utkal ৺ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশরৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্র দত্তগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আই সি এস্ প্রভৃতির রচনাও যথেষ্ট আদৃত হয়।

কটক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ছাত্রশাখার সদস্যবৃন্দ।

—

'টেবু ফোবিয়া'

গত মাঘ মাসের ''প্রবাসী''তে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'টেবু' শীর্ষক প্রবন্ধে নানা দেশীয় কতকগুলি কুসংস্কারের আলোচনা

করিয়াছেন এবং হিন্দুসমাজেই ঐ সকল কুসংস্কারের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমাদের জীবনে টেবুর প্রাধান্য কতখানি তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বলতে গেলে একমাত্র টেবুর দ্বারাই আমরা নিয়ন্ত্রিত।" টেবু বলিয়া তিনি যে সকল সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সকলগুলিই যে হেতুবিহীন ও কুসংস্কার এমন কথা বলা যায় না। হিন্দু-সমাজে যে সকল সংস্কার প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কতকগুলি মেয়েলী সংস্কার; আর কতকগুলি শাস্ত্রানুসারে স্মরণাতীত কাল অবধি চলিয়া আসিতেছে। মেয়েলী সংস্কারগুলির অধিকাংশই অর্থবিহীন; কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারগুলি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন নয়। এই সকল সংস্কার যাঁহারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই কোন একটা সদুদ্দেশ্য ছিল। ঐ সকল সংস্কার বিজ্ঞান-সম্মত কিনা তাহাই আজকাল গবেষণার বিষয় হইয়াছে। কারণ এটা বিজ্ঞানের যুগ, কাজেই টেবুর ভিতর কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা অন্যায় নয়।

প্রাচীনেরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পারদর্শী না হইলেও তাঁহাদের ভিতর যে বৈজ্ঞানিক শক্তির বীজ উপ্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা আজকাল প্রাচীন যুগের সব রীতিনীতিই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই; কিন্তু আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের সংস্কারের মধ্যে কোন সার্থকতা ছিল কিনা। জ্ঞানগরিমায় তাঁহারা আধুনিক যুগ হইতে অবনত ছিলেন না তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যাহা স্বীকার না করিয়াছে তাহা সত্য হইলেও বিশ্বাস করিতে চাহেন না। 'টেবু ধর্ম্ম'-লেখক মহাশয় সম্ভবত এই শ্রেণীর লোক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আকাশযানের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেহ সহজে বিশ্বাস করিতেন কি যে, রামায়ণ মহাভারতের যুগেও শূন্যপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল?

প্রাচীন হিন্দুসমাজে যে প্রকার নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল বর্ত্তমান যুগে তাহার শত ভাগের একভাগও নাই। তাহাদের সামাজিক, নৈতিক ও শারীরিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নানাবিধ সংস্কারের (অর্থাৎ টেবুর) প্রচলন করিতে হইয়াছিল। তাহারা পঞ্জিকা দেখিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, কাজেই কথায় কথায় টেবুর অনুসরণ করিতে হইত। আমরা যখন দেখিতে পাই তাহাদের পঞ্জিকার নির্দ্দেশ মত আজিও পলে অনুপলে প্রত্যেক কার্য্য ঘটিয়া যাইতেছে, তখন পঞ্জিকাকারের অসাধারণ জ্যোতির্গণনার পরিচয় পাই। যাহাদের নির্দ্দেশ মত রবি শশীর উদয়াস্ত, জোয়ার ভাটার গতিবিধি, গ্রহণ উপগ্রহণ প্রভৃতির আবির্ভাব ও অন্যান্য নৈসর্গিক ঘটনাসমূহ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়া যাইতেছে, তাহাদেরই নির্দ্দিষ্ট "ত্রয়োদশীতে বেগুন খাইতে নাই," "রবিবারে ক্ষৌরী হইতে নাই," "দিকশূলে যাত্রা নিষেধ" প্রভৃতি অসংখ্যবিধি নিষেধগুলির যে কোনই ভিত্তি নাই, তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতদিন না এই সকল টেবুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন আধুনিক শিক্ষাভিমানী সমাজ তাহা ঘৃণার চক্ষেই দেখিবে।

আধুনিক শিক্ষিতদের নিকটও টেবু-ফোবিয়া গ্রস্তদের নিকট হিন্দুর সন্ধ্যা আহ্নিক ও সমস্ত সংস্কারই কুপ্রথা বলিয়া বিবেচিত। অথচ হিন্দুর আহ্নিক কার্য্যের একটী প্রক্রিয়া প্রাণায়াম জিনিসটী ফুসফুসের ব্যায়ামের ও স্বাস্থ্যের পরিপোষক বলিয়া বিজ্ঞান কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লোকদের সকল কার্য্যই ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমুদয় কার্য্যে ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের দোহাই দিতেন।

হিন্দু সমাজে যে কুসংস্কারের প্রভাব খুবই বেশী তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সমস্ত বিধি-নিষেধই যে কুসংস্কার এমন কথাও বলা যায় না।

যেগুলির কোন অর্থ নাই বা কোন উদ্দেশ্য নাই সেইপ্রকার সংস্কারগুলি আমরা অবশ্যই বর্জ্জন করিব। কিন্তু যে গুলি শাস্ত্রানুমোদিত এবং প্রাচীন কাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, বিনা যুক্তিতর্কে এবং উহাদের কোন সার্থকতা আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান না করিয়া উহা বর্জ্জন করা সঙ্গত মনে হয় না। বিজ্ঞানসম্মত কারণে যদি কোন কোন সংস্কার অপরিহার্য্য হয় তবে টেবু-ফোবিয়াগ্রস্তদের সেনাই দুঃখের কারণ থাকিতে পারে না; কাজেই বিজ্ঞানের মাপ-কাঠি দ্বারা সংস্কারসমূহের বিচার করা অযৌক্তিক নহে। এ সম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয় ততই সমাজের পক্ষে হিতকর।

শ্রী নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার দিকে মুসলমান সমাজের দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, প্রয়োজনের তাড়না, সরকারী কূটনীতির চক্র, অদূরদর্শী মোল্লাদের চীৎকার প্রভৃতি নানারূপ অনুকূল-প্রতিকূল আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা-বিষয়েও মুসলমানেরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। ইংরেজী শিক্ষা, মাদ্রাসার ওল্ড্ স্কীম, মাদ্রাসার নিউ স্কীম—এগুলির মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বন করিলে সমাজের শিক্ষা-সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলেই যেন গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন হইতে এ-সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য

না করিলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, এদিকে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি কথা বলিতেছি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, অথবা কি হওয়া উচিত, এবং প্রচলিত পদ্ধতিগুলির দ্বারা তাহা পূর্ণ হইতে পারে কিনা, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। বর্ত্তমানে যে তিনটী পথ মুসলমানদের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহার কোনটী অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইতে পারে, তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

মাদ্‌রাসার নিউ স্কীম্ যতদিন প্রচলিত হয় নাই, ততদিন এ-সম্বন্ধে আন্দোলন-আলোচনার তেমন কোনো কারণ ঘটে নাই। যাঁহাদের চাকুরী করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা স্বভাবতঃই ইংরেজী শিক্ষা-লাভে অগ্রসর হইতেন; পক্ষান্তরে যাঁহারা "দিনী ইল্‌ম্ হাসিল্" করিয়া 'বাহাস্-' বিতর্ক ও ফৎওয়া-জারি দ্বারা দিন গুজরান করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা স্বতঃই ওল্ড স্কীম্ মাদ্‌রাসায় প্রদত্ত শিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেন। এ-দুইটি পথের মধ্যে কোন একটা অবলম্বন করিতে হইলে বড়-একটা বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হইত না। যাঁহার যেদিকে অভিরুচি, তিনি সেই দিকেই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু আজকাল নিউ স্কীম্ নাম দিয়া ইংরেজী ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার এক অদ্ভুত খিচুড়ীর আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাতেই মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

মুসলমানেরা অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা কার্য্যতঃ বেশী ধার্ম্মিক হউন বা না হউন, অনেকের কাছে তাঁহাদের এইরূপ একটা সুনাম আছে। মোল্লাদিগকে মুরগী মাংসে পরিতৃপ্ত করা; দরিদ্রের প্রাপ্য অর্থ তাঁহাদিগকে দান করিয়া তাঁহাদের একাধিক স্ত্রী ও পুত্রকন্যার বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা করা; তাঁহাদের আদেশ-উপদেশে সংকীর্ণ 'মজহাবী' কলহে প্রমত্ত হইয়া সমাজের মুণ্ডপাত করা; পীর সাহেবদিগের আদেশগুলিকে অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্র-বাণীর তুল্য মনে করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে তাঁহাদের পদচুম্বন ও প্রতি বৎসর তাঁহাদের অনুষ্ঠিত মেলায় যোগ দিয়া সমাজের অর্থ-লুণ্ঠনের পথ উন্মুক্ত করা; কেহ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধি-ব্যবস্থার যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা চাহিলে তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট 'কাফের' মনে করা,—এ সকল কার্য্যকে যদি ধার্ম্মিকতার লক্ষণ বলিয়া মানিতে হয়, তবে বস্তুতঃই মুসলমানদের এরূপ সুনাম লাভের যোগ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এবংবিধ "পরম ধার্ম্মিকতার" সুযোগ লইয়া অপরিণামদর্শী মোল্লারা মরহুম স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিলে সহজেই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ এতই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সৈয়দ আহ্‌মদকে বাধ্য হইয়া ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৎসামান্য ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু এ-যুগে একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত প্রাচীন মতবাদের স্তূপ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, একই বিদ্যালয়ে এবং একই সময়ে দুইটাই অধীত ও অধ্যাপিত হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক এখনও এত শক্তিশালী হয় নাই যে, কেহ যুগপৎ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞান এবং কোর্‌আন, হাদিস্, ফেকা, ওসুল প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া ঐ সকল বিষয়ে পণ্ডিত হইতে পারেন। এইজন্য মরহুম সৈয়দ আহ্‌মদ প্রতিষ্ঠিত কলেজে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষাকেই প্রধান স্থান দিয়া মোল্লা-বিরোধের তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্য ধর্ম্মশিক্ষার নামমাত্র স্থান করা হইয়াছিল। এবং এই জন্যই যে-সকল দেশে মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও উক্ত দুই প্রকার শিক্ষার সংমিশ্রণ সঙ্গত বা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং কখনো হইবে এমন আশাও করা যায় না।

কিন্তু আমাদের দেশের মোল্লা-বুদ্ধিকে ধন্যবাদ; অপর কোন দেশে যাহা সঙ্গত বা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, এদেশে তাহাকেই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বলা বাহুল্য, মাদ্‌রাসার নিউ স্কীম এইরূপ চেষ্টার ফলেই প্রসূত হইয়াছে। যে-ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক হইতে এই নিউ স্কীমটী বাহির হইয়াছে, তিনি নিজে একজন কাঠমোল্লা হউন বা না হউন, কাঠমোল্লার দৃষ্টি-

সংকীর্ণতা তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই এবং এই কারণেই নিউ স্কীম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন প্রণালী তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই।

ওল্ড্ স্কীম মাদ্রাসাসমূহে শুধু ধর্ম্মশিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং তাহাও খুব অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেশমাত্রও ছাত্রদের গোচরীভূত হইবার উপায় নাই; এ-ছাড়া বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গলাকে শিক্ষার বাহন করা দূরে থাকুক স্বতন্ত্রভাবে ঐ-ভাষাটি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত সেখানে নাই। এরূপ শিক্ষার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। ওলড্ স্কীম পাস করিয়া মৌলবী হইয়া যাঁহারা বাহির হন তাঁহাদের জ্ঞান দেখিলে একেবারে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; মাতৃভাষাতেও অজ্ঞ; কোর্আন-হাদিসও তাঁহারা ভালরূপ জানেন না, (কারণ ওল্ড্ স্কীমে 'ফেকা' পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোর্আন হাদিসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে)। এরূপ লোকদের দ্বারা সমাজের কী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে?

পক্ষান্তরে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত। তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের সহিত সর্ব্বত্র প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ; সরকারী চাকুরী করিয়া অথবা ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে ও সমাজের শক্তি-সম্মান বর্দ্ধনে সক্ষম। কিন্তু কোরআন-হাদিস সম্বন্ধে তাঁহাদের তেমন কোন জ্ঞান নাই এবং আরবী-সাহিত্যের চর্চ্চা না করায় কোরআন হাদিস হইতে জ্ঞান-আহরণের ইচ্ছা তাঁহাদের হইলেও তাহা পূরণ করিবার উপায় নাই। তাঁহারা কাঠমোল্লাদিগকে সাধারণতঃ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। তাহার কারণ—একদিকে তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব ও অন্যদিকে মোল্লাদের আধুনিক জ্ঞানের ও প্রকৃত ধর্ম্ম-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব।

যিনি নিউ স্কীমের উদ্ভাবক, তিনি ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের ও পুরাপুরি মোল্লাদের ভিতরকার এই ব্যবধানটুকু লোপ করিতে চাহিয়াছেন এবং যাহারা নিউ স্কীম জিনিষটার স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়াই পরম উপাদেয় পদার্থ জ্ঞানে উহার সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বস্তুতঃই নিউ স্কীমের দ্বারা আমাদের সমাজের শিক্ষা-বৈষম্য দূরীভূত হইবে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের নামে পুঞ্জীকৃত প্রাচীন মতবাদের স্তূপসমস্তই এক সঙ্গে, এক সময়ে অধীত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু নিউ স্কীমে এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিবার চেষ্টা হওয়ায় উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; শুধু ব্যর্থ হয় নাই, সমাজের পক্ষে ইহা একটা ঘোর অনিষ্টকর প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। কিরূপে, তাহা আমরা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

মাদ্রাসার নিউ স্কীম অনুসারে কোমলমতি বালকগণকে চারটী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়:—সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাঙ্গলা ও ইংরেজী এবং ধর্ম্মশিক্ষার জন্য উর্দ্দু ও আরবী! ছাত্রদের সৌভাগ্যক্রমে পারসী ভাষাটাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে; নতুবা তাহাদিগকে চারটীর স্থলে পাঁচটী ভাষা শিক্ষা করিতে হইত! যাহা হউক সুকুমারমতি বালকগণকে চার-চারটী ভাষা একই সময়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে যে তাহাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর অতি ভীষণ অত্যাচার করা হয়, এই সহজ কথাটী বুঝিতে অসাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার দরকার হয় না। শৈশবে এই অত্যাচারের ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্ম মহৎ ও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে না।

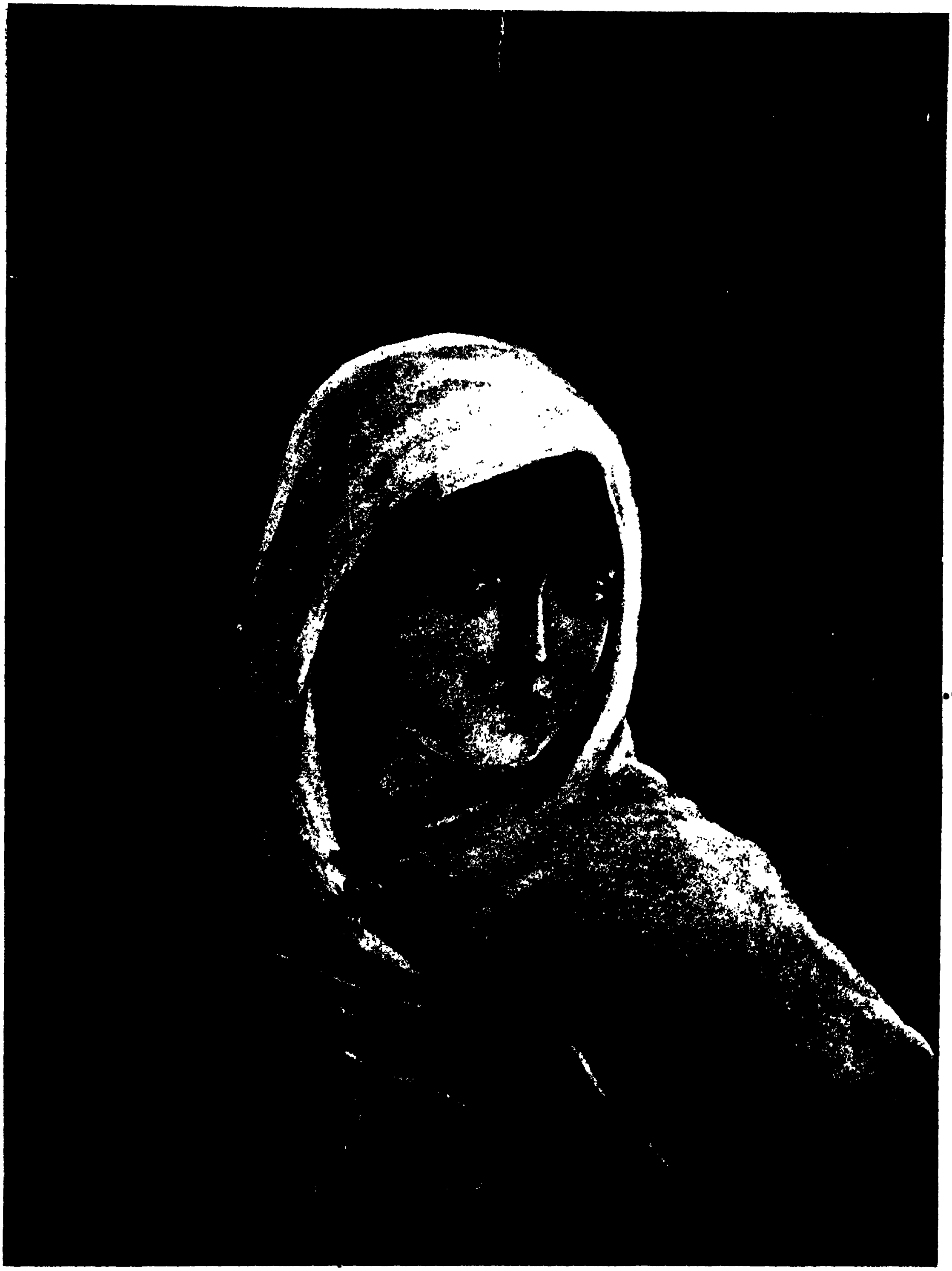
হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক অর্থশালী, সুতরাং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা সাধারণতঃ যেরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইতে পায়, মুসলমান বালকেরা তাহা পায় না। ইহা ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বালকেরা সুশিক্ষিত পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নীর সংসর্গে থাকার ফলে তাহাদের বুদ্ধি ও চিন্তা যেরূপ মার্জ্জিত হইতে পারে, মুসলমান সমাজে শিক্ষার

প্রসার না ঘটায় মুসলমান ছেলেদের সাধারণতঃ সেরূপ হয় না। এজন্য অন্যান্য কারণে হিন্দু ছেলেদের জ্ঞানবৃত্তি যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে সাধারণ মুসলমান বালকদের তাহা পারে না। অথচ হিন্দু বালকেরা প্রথম শিক্ষার্থীরূপে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শুধু বাঙ্গলা পড়িতে আরম্ভ করে এবং ২।৩ বৎসর শুধু বাঙ্গলা পড়িবার পর ইংরজী অক্ষরের সহিত পরিচিত হয়। ইহাতেই কিন্তু তাহারা গলদ্ঘর্ম্ম হয়। কারণ, একে বাঙ্গলায় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা করিতে হয়; তাহার উপর আবার বৈদেশিক ভাষা ইংরেজীর ব্যাকরণ ও রচনাপদ্ধতির গুরুভার ক্রমশঃ তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান বালকদের উপর ইহার দ্বিগুণ অত্যাচার করা হয়। তাহারা নিউ স্কীম্ মাদ্‌রাসায় ভর্ত্তি হইয়া প্রথম হইতেই বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে আরবী পড়িতে আরম্ভ করে। ইহার পরেই হিন্দু ছাত্রেরা যে-স্থলে কেবল ইংরেজী শিক্ষা করে, মুসলমান ছাত্রগণকে সে স্থলে উর্দ্দু ও ইংরেজী—এই দুইটি ভাষা শিখিতে হয়। জুনিয়র মাদ্‌রাসার শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষা ও তিনটি বৈদেশিক ভাষা—মোট চারটি ভাষার ভয়াবহ পেষণ চলিবার পর অল্পবয়স্ক মুসলমান ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট ও অমার্জ্জিত মন ও মস্তিষ্কের দশা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়া স্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সকল ছাত্র জুনিয়র ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ অতিক্রম করিবার পর ম্যাট্রিকুলেশন স্কুল অথবা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, যেখানেই প্রবেশ করুক না কেন, কোনখানেই তাহাদের জ্ঞানবৃত্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কারণ ভাষা-ও-পাঠ বাহুল্যে তাহা অঙ্কুরেই অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মোট কথা, একটু চিন্তা করিলেই একথা বুঝিতে পারা যাইবে যে নিউ স্কীম মাদ্‌রাসার ছাত্রদের দ্বারা মুসলমান সমাজে জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্মের প্রসার ঘটিতে পারে না। জুনিয়র ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ অতিক্রম করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ প্রভৃতির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে তাহারা সাধারণতঃ হিন্দু ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে জিনিষটার বলে তাহারা হিন্দু ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে, বাল্যাবস্থায় চার-চারটি ভাষার পেষণে তাহা অনেকাংশে বিকল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলে চাকুরী ক্ষেত্রেও তাহাদিগকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট পদে পদে পরাজিত হইতে হইতেছে ও হইবে। আর শুধু চাকুরীর কথাই বা বলি কেন? ডাক্তারী, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ অন্য সম্প্রদায়ের লোক-দের ন্যায় প্রতিভার পরিচয় দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

অন্যদিকে যাহারা মাদ্‌রাসার শিক্ষাই পাইতে চায়, তাহারা জুনিয়র পাস করিয়া হুগ্‌লী, ঢাকা অথবা সিরাজগঞ্জে সিনিয়র মাদ্‌রাসায় পড়িতে যায়। এইসকল স্থানে পূর্ণ চারটী বৎসর অধ্যয়নের পর সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা বাহির হন, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও পারদর্শিতা জন্মে না কিম্বা ইংরেজী বাঙ্গালাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। ফলে তাঁহারা "না ঘর্-কা না ঘাট্-কা" অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হন। হাই স্কুলের মৌলবীগিরী ছাড়া অন্য কোন চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যা তাঁহাদের হয় না। অধুনা ঢাকা ও সিরাজগঞ্জে 'ইসলামিক' (!) ম্যাট্রিকুলেশন, 'ইসলামিক' আই-এ প্রভৃতি খাস 'ইসলামী' পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলেজগুলিতে ২।১টি আরবী অধ্যাপকের পদ মিলিলেও মিলিতে পারে; কিন্তু অন্যান্য চাকুরীর সাধারণ প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে এই সকল 'ইসলামী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের অবস্থাও শোচনীয়।

ফল কথা, নিউ স্কীমের আবিষ্কর্ত্তা ও সমর্থকেরা উহার সম্বন্ধে যত উচ্চ ধারণাই পোষণ করুন না কেন, উহা দ্বারা মুসলমান সমাজের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না—একথা এখনই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং যত দিন যাইবে ততই আরও অধিক স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্মে মহৎ ও সুন্দর হইতে না পারিলে কোন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে সরকারী বা সওদাগরী চাকুরীর চিন্তা একেবারে



বিধবা
শ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

ত্যাগ করিলে মুসলমানদের চলিবে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কৃষির যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরেই চাকুরীর কথা শিক্ষিত লোকদের মনে উদিত হয়। তাছাড়া সরকারী চাকুরীতে রাজশক্তির মারফতে শিক্ষিত লোকদের—এবং আবার তাঁহাদের মারফতে সমাজের, যে শক্তি ও সম্মান লাভ হয়, কৃষিতে—অন্ততঃ আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায়—তাহা কোন রকমেই পাওয়া যাইতে পারে না বলিয়া জনসাধারণের ধারণা। আবার শক্তি-সম্মান অর্জ্জন করিতে না পারিলে কোন সমাজ জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করা দূরে থাকুক, সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতেও পারে না। এ অবস্থায় চিন্তাশীল দূরদর্শী ব্যক্তিরা নিউ স্কীম মাদ্‌রাসার সার্থকতা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভাল হয়। আমরা যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে ইহাই মনে হয় যে, এরূপ মাদ্‌রাসার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই মুসলমান সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পথ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িবে। কারণ মাদ্‌রাসাগুলি সমাজের যোগ্যতা শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধির সহায়তা না করিয়া বরং ঐ সকলের পথে বিষম বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

অবশ্য মাদ্‌রাসা-ভক্তেরা আমাদের এ কথার উত্তরে বলিতে পারেন—আমরা ত কাহাকেও মাদ্‌রাসায় পড়িতে বাধ্য করিতে পারি না; যাঁহাদের ইচ্ছা, মাদ্‌রাসার পথ ছাড়িয়া সাধারণ ইংরেজী শিক্ষার দিকে চলিয়া যাইতে পারেন, কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে যাইবে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদেরও কিছু বলিবার আছে। মোল্লারা সাধারণতঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ; এই শিক্ষার দিকে অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ সমাজকে বিমুখ করিয়া তুলিবার কোন সুযোগই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই এবং এখনও করিতেছেন না, কিন্তু যতদিন নিউ স্কীম প্রচলিত হয় নাই, ততদিন তাঁহারা এ আন্দোলনটী প্রবলভাবে চালাইবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। বস্তুতঃ ওল্‌ড্ স্কীমে মাতৃভাষা শিক্ষার আদৌ সুযোগ না থাকায় এবং ইংরেজী বাধ্যতামূলক না হওয়ায় মুসলমান সমাজের দৃষ্টি সমগ্রভাবে উহার দিকে আকৃষ্ট করা অসম্ভব ছিল। কেন না, লোক-সাধারণ "দিনী ইল্‌ম্ হাসিল্" করিবার জন্য যতই উৎসুক হউক না কেন, বিদ্যার্থীরা সকলেই মোল্লা সাজিয়া সমাজের গলগ্রহে পরিণত হউক—এ-অবস্থা তাহারা কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করিত না এবং এখনও করে না। কিন্তু নিউ স্কীম বস্তুতঃ যতই অসার জিনিস হউক না কেন ইহার সহিত ইংরেজী ও বাঙ্গলার সংস্রব থাকাতে মোল্লাদের চমৎকার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাঁহারা সর্ব্বত্র সমুচ্চ কণ্ঠে ইংরেজী বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে "দিনী ইল্‌ম্ হাসিল্" করিবার জন্য মুসলমান সাধারণকে অনবরত উত্তেজিত করিতেছেন এবং তাহার ফলে মুসলমানেরাও সাধারণ ইংরেজী শিক্ষার পথ ছাড়িয়া দিয়া দলে দলে নিউ স্কীমের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছেন। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল স্থানে মুসলমানদের দ্বারা মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হওয়া সম্ভব ও সঙ্গত ছিল, সেখানে বিনা বিচারে নিউ স্কীমের জুনিয়র মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং যে-সকল স্থানে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টার ফলে মধ্য ইংরেজী স্কুল চলিতেছিল, সেখানে মুসলমানদের মনোভাব মাদ্‌রাসার অনুকূল হইয়া পড়ায় স্কুলগুলির অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে।

এই অবস্থা অধিক দিন চলিতে থাকিলে মোল্লার সংখ্যা যথেষ্ট বৰ্দ্ধিত হওয়া সম্ভব হইলেও তদ্দারা সমাজের কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্য শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আশু মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এ-সম্বন্ধে এখন হইতেই ঘোর আন্দোলন সুরু না হইলে গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করিবেন না। চিন্তাশীল মুসলমান মাত্রেরই এই সন্দেহ সহজেই হইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট একটা গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই নিউ স্কীমের প্রচলন ও পরিপোষণ করিতেছেন। তাই দেখা যায়, মধ্য-ইংরেজী স্কুলগুলি বহু সাধ্য-সাধনা না করিলে ইম্পিরিয়াল এডুকেশন ফণ্ড হইতে সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু মাদ্‌রাসাগুলি জেলা বোর্ড হইতে অতি উচ্চ হারে সাহায্য পাইলেও সহজেই আবার ঐ ফণ্ডের পৃষ্ঠ-পোষকতা পাইয়া থাকে। মুসলমানেরা সাধারণ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক

দৃষ্টি প্রশস্ত হইতেছে এবং তাঁহারা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব প্রতিপত্তি হ্রাস করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। আর একপুরুষ কাল মুসলমানেরা এইভাবে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে থাকিলে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার ফল অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে—ইহা গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই কারণে তাঁহারা মুসলমানদের শিক্ষা-সম্পর্কিত মতি-গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। সাধারণ স্কুল-কলেজে হিন্দু ছাত্রদের সহিত একত্র একই শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এবং আবাল্য একত্র অধ্যয়নের ফলে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সখ্যভাব জন্মে, সেই সূত্র অবলম্বনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ প্রীতি-সহানুভূতির ভাব বদ্ধমূল হইলে উভয়ের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও কার্য্য স্বভাবতঃ একই পথ ধরিয়া চলিতে থাকিবে। তাহা হইলে এদেশে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য নিরাপদ থাকিবে না। এজন্য ধর্ম্মশিক্ষার ছুতা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুর সংস্রব হইতে মুসলমানদিগকে যতটা সম্ভব দূরে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এবং বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। অশিক্ষিত লোকদের ত কথাই নাই; শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অতি অল্প লোকই সমাজের ও দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন। মুসলমান সমাজে এইরূপ সর্ব্ব-ব্যাপী চিন্তাহীনতার সহিত একটা মেকি ধর্ম্মভাব মিলিত হওয়ায় গভর্ণণ্টের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, মরহুম সৈয়দ আহ্মদের ন্যায় একজন শক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব না হইলে আমাদের কল্যাণ নাই। মোল্লারা নিউ স্কীমের সম্বন্ধে জনসাধারণকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে সবিশেষ আহ্লাদের কারণ ঘটিয়াছে। হিন্দু-সমাজকে এমন ভাবে প্রতারিত করা এখন আর সম্ভব নয়। কারণ, হিন্দু সমাজ ধর্ম্মশিক্ষার নামে নাচিয়া উঠেন না; এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধারণ ইংরেজী শিক্ষার কোনরূপ খিচুড়ীর আয়োজন হইলে তাঁহারা প্রকৃত রহস্য সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। এজন্য হিন্দুদের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গবর্ণমেণ্ট 'বেওকুফ' মুসলমানদের স্কন্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থার প্রতীকার করিতে হইলে একটি জবরদস্ত ওঝার প্রয়োজন।

আমরা এ-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আপাততঃ যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। বলা আবশ্যক, ইহা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত নহে। আপাততঃ আমাদের ইহাই মনে হইতেছে যে, আমাদের সমাজের শিক্ষা-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে ওল্ড্ স্কীম ও নিউ স্কীম উভয় প্রকারের মাদ্রাসাগুলি তুলিয়া দিয়া সাধারণ ইংরেজী শিক্ষা রাখিয়া দিতে হইবে। ইংরেজীর সহিত দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আরবী অবশ্যপাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। মধ্যইংরেজী স্কুলের শেষ দুই শ্রেণীতে বা শুধু শেষ শ্রেণীতে আরবী সুরু করা যাইতে পারে (যেমন অনেক মধ্য ইংরেজী স্কুলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যকরণের উপক্রমণিকা পড়ান হয়)। তাহা হইলে ম্যাট্রিকুলেশনের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রদের প্রাথমিক অসুবিধা আর থাকিবে না, অন্ততঃপক্ষে অনেক কমিয়া যাইবে। ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, বি-এ প্রভৃতির আরবী পাঠ্য নির্দ্দেশ করিবার সময় কোর্‌আন ও বিশ্বস্ত হাদিসের দিকেই প্রধান ও প্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত ছাত্রদের পক্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে। যাঁহারা ম্যাট্রিক, আই-এ, কিংবা বি-এ পাশ করিবার পর আরবীতে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চান, তাঁহাদের জন্য কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি কেন্দ্রে একটি করিয়া বিশিষ্ট আরবী কলেজ স্থাপিত হইলেই চলিবে। যাঁহারা ম্যাট্রিক, আই-এ অথবা বি-এ পড়িয়া আরবী কলেজে প্রবেশ করিবেন তাঁহারা যথাক্রমে চার, তিন ও দুই বৎসর অধ্যয়ন করিলে আরবী গ্রাজুয়েটের সনদ পাইতে পারিবেন। এইভাবে আরবী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে মুসলমান সমাজে কাঠমোল্লাদের সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে এবং উপযুক্ত মৌলবীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বলা বাহুল্য, এতদর্থে উপযুক্ত

ব্যক্তিগণের দ্বারা আরবীর একটা সম্পূর্ণ নূতন 'নেসার' (পাঠ্যতালিকা) প্রস্তুত করাইয়া তদনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে আরবী কলেজে উর্দ্দু ভাষায় একটা মোটামুটী জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু না হইলে আমাদের চলিবেই না, এ-ধারণা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। আরবী সাহিত্য ও ইতিহাস (হাদিসকেও ইতিহাসের অঙ্গ বলা যাইতে পারে) এখানে প্রধান পাঠ্য বিষয় হইবে। প্রাচীন 'মন্তেক' (ন্যায়শাস্ত্র) ও ফলসফা (philosophy—দর্শন) বর্ত্তমান যুগে স্বতন্ত্রভাবে—বিশেষতঃ আরবীতে—শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা আরবী কলেজে চার কিংবা তিন বৎসর পড়িবেন, অপরিহার্য্য বিবেচিত হইলে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আধুনিক ন্যায়-দর্শন মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বলিতে ভুলিয়াছি, আরবী কলেজে শিক্ষার বাহন বাঙ্গালাই করিতে হইবে।

আমাদের মনে হয়, এই প্রস্তাবটির মূল নীতিগুলি ধরিয়া এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিলে মুসলমান সমাজের শিক্ষাসমস্যার একটা সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব।

যাহারা মধ্যইংরেজী, উচ্চপ্রাইমারী বা নিম্নপ্রাইমারী ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ত্যাগ করিবে, তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা কি হইবে?—এখানে কেহ কেহ এ-প্রশ্ন তুলিতে পারেন। উত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ওল্ড্ স্কীম বা নিউ স্কীম মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিলেও অতটুকু বিদ্যায় কিছুই ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে না। আরবীর একখানা চটি প্রাথমিক ব্যাকরণ, উর্দ্দুর পহ্লী-দুস্রী কেতাব অথবা কোরআনের আম্পারার কিয়দংশ পড়িতে শিখিলেই ধর্ম্মশিক্ষা লাভ হইল, এমন কথা কোন কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট লোক বলিবেন না, কিংবা অন্যে বলিলে স্বীকার করিবেন না। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, অতি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া যাহারা পড়াশুনা বন্ধ করিবে, মাদ্রাসায় পড়িলেও তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষা কিছুমাত্র হইবে না। এজন্য বরং উর্দ্দু দিলীয়াত্ কি পহ্লী, দুস্রী প্রভৃতি কেতাবের অনুকরণে সরল বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচিত হইলে বালকেরা তাহা সহজেই পড়িয়া লইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এরূপ পুস্তক বুঝিবার মত মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে বালকবালিকাদের ধর্ম্মশিক্ষার কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। কেন না, সমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য শৈশবে, এমন কি বাল্যেও অপরিহার্য্য নহে।

শেষ কথা বর্ত্তমানে নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলির দ্বারা ভিন্ন কোন প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে না। ইহার উচ্ছেদসাধন করিয়া ইংরেজীর সহিত কি ভাবে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে উভয় দিক রক্ষা হয়, উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। এদিকে শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আশু মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা এবিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা সুরাহা বাহির করিবার চেষ্টা করুন, ইহাই আমাদের কামনা। তাঁহাদের চিন্তার ফল সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে আমরা প্রয়োজনমত আরও কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

তুরস্কের নবজন্ম

বিধাতা মাঝে মাঝে প্রত্যেক জাতিকেই এক একবার কঠিন সঙ্কটের নিকষ-পাষাণে কষিয়া তাহার দর যাচাই করিয়া নেন। যুদ্ধে পরাজয় জাতির ইতিহাসে তেমনি একটি মহা সঙ্কটের মুহূর্ত্ত, সেই সঙ্কটে শক্তিমান্ জাতিও নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে, আত্ম-প্রত্যয় হারাইয়া ফেলে এবং মহাকালের বিচারসভায় চিরকালের মত আপনার পরাজয় মানিয়া লয়। কিন্তু এই পরাজয়কেই চূড়ান্ত বলিয়া না মানিয়া যে-জাতি নূতন করিয়া শক্তি-সাধনায়

অগ্রসর হয়, বিধাতার কঠিন পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, পরাজয়ের পাষাণ-ভারে তাহার দুর্ব্বার প্রাণ-গতি চিরদিনের মত স্তব্ধ হইয়া যাইতে পায় না, মানবেতিহাসের পাতায় তাহার কাহিনী কর্ম্মে ও জ্ঞানে, যশে ও গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া থাকে।—এই যুগে এমনিতর প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে জার্ম্মাণজাতি ও তুর্কজাতি। জার্ম্মানীর পক্ষে এই সাধনা নূতন নয়; যে প্রাণ-ধর্ম্ম ও কর্ম্মনিষ্ঠার বলে নেপোলিয়নীয় মহাসঙ্কটের পরেও জার্ম্মানী ভাঙিয়া পড়ে নাই, এই যুগে পুনরায় ভার্সাই-এর সন্ধিপত্রের নিষ্ঠুর দণ্ডকে মাথা পাতিয়া লইয়া সেই শক্তি ও সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জার্ম্মানী আবার স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু তুর্কীর পক্ষে এই নব-চেতনা-লাভ একেবারে অভাবনীয়। বহুশতাব্দী যাবৎ তুর্কশক্তি রোগশয্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল, যুদ্ধশেষে ইয়ুরোপের শক্তিপুঞ্জ মরণোন্মুখ তুর্কজাতির শ্মশান-শয্যাই রচনা করিয়াছিল; এমনি সময়ে বাজিল তুর্কীর নব-জীবনের বোধনশঙ্খ। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা, মৃতকল্প প্রাচ্যজাতিদের নিকট এই মুমূর্ষু জাতির জীবন-লাভ এক পরম আশার ও অপরিমিত আনন্দের বাণী।

জন্মকথা

নূতন তুরস্কের জন্ম হইয়াছে অল্পদিন পূর্ব্বে। তাহার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত,এত সংক্ষিপ্ত যে, একটি মানুষের জীবনকে ঘিরিয়াই তাহার বিকাশ, এই কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু সেই মানুষটির জীবনেরই মত তুর্কীর ইতিহাসও মহান্, উদার ও বিস্ময়কর। সেই অপূর্ব্ব-কর্ম্মা মানুষটি সাদা কথায় নব্য তুর্কীর এই অপূর্ব্ব জন্মকথা সকলকে শুনাইয়াছেন। ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে 'তুর্ক জাতীয় পরিষদে' রাষ্ট্রগুরু মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কী সদস্যদের নিকট ছয়দিনে ছয়টি বক্তৃতায় নবরাষ্ট্রের জন্মকথা ব্যক্ত করেন। সেই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—

"১৯১৯ সালের ১৯ শে মে আমি সেম্‌সুনে অবতরণ করিলাম। তুরস্কের অবস্থা তখন এইরূপ:— সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন, জাতি যুদ্ধে অবসন্ন, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, রণ-বিরামের কঠিন সর্ত্তে (মুদ্রোস্-এর চুক্তিপত্র—৩০শে অক্টোবর ১৯১৮) সমগ্র জাতি হৃতশক্তি, সর্ব্বস্বান্ত। দেশের নেতৃবর্গ (আনোয়ার পাশা ও তা'লৎ পাশা) তখন প্রাণের দায়ে পলাতক। দুর্ব্বল-চিত্ত, মনুষ্যত্ব-হীন সুলতান বাহিদাদ্দিন নিজের রাজদণ্ড ও খলিফা-পদটুকু হারাইবার ভয়ে যে-কোনোরূপ গ্লানিকর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত। সামাদ্ ফরিদ্ পাশার মন্ত্রীমণ্ডলে কাহারও আস্থা নাই। সকলেই বুঝিতেছে, বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ অটোম্যান্ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের আয়োজন করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহা প্রতি-রোধ করিবার সম্ভাবনা দেখিতেছিল না। সেনা-নায়ক ও কার্য্যকুশল কর্ম্মচারীদল যুদ্ধেই প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল; যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা ভাবিতে পারেন নাই যে, সুলতান জাতির স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতেছেন। ভাবিবার মত সাহস ও বোধশক্তিও তাঁহাদের ছিল না, বহুশতাব্দী ধরিয়া যাঁহারা ধর্ম্মের অনুশাসনে স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের নিকটে মাথা নোয়াইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেই পারিতেন না—পাতিশাহ্ ও খালিফা ভিন্ন কি করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব।

পূর্ব্ব আনাটোলিয়ায় আমি প্রেরিত হইলাম তৃতীয় সৈন্য-বাহিনী পর্য্যবেক্ষণের জন্য। শিভাস্-এ আমি এই বাহিনী ও এর্জেরুম্-এ ১৫ শ সৈন্য বাহিনী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেশের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিলাম—আমার সমস্ত সঙ্কল্প ও চিন্তা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বুঝিলাম, এই অটোম্যান্ সাম্রাজ্য, এই খিলাফৎ ও পাৎশাহী শাসন একেবারে অচল।

তুর্কজাতিকে কেন্দ্র করিয়া এক নূতন স্বাধীন তুর্ক-রাষ্ট্রের পত্তন করিতে হইবে। ইস্তাম্বুল ত্যাগের পূর্ব্বেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, সাম্‌সুনে অবতরণ করিয়া আমি কর্ম্মে উদ্যোগী হইলাম।

ব্যাপার সহজ নয়—জনগণকে বিদ্রোহ করিতে আহ্বান করা হইল—সে-বিদ্রোহ অটোম্যান্ সম্রাটের বিরুদ্ধে, অটোম্যান্ শাসনের বিরুদ্ধে, খলিফার বিরুদ্ধে, সমস্ত মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে। নূতন ভাবে সমাজ

বিন্যাস করিতে হইবে, তুর্কীর জাতীয় চেতনাকে নূতন রূপ দান করিতে হইবে, সমগ্র জাতিকে নূতন আকারে বিকশিত করিতে হইবে। অত্যন্ত দুঃসাহসের কথা,—কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

আমি বুঝিলাম, এই কার্য্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের অনুমোদনও আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। ১৯১৯ সনের ২১শে জুন আমাসিয়া হইতে আমি পূর্ব্ব-এর্জেরুমে এক কংগ্রেস আহ্বান করিলাম। ইস্তাম্বুলের ব্রিটিশ-রাষ্ট্রদূতের পরামর্শে ইস্তাম্বুল-সরকার আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিল। কোনো ফলোদয় হইল না; ৮ই জুলাই স্বয়ং সুলতান আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া সমস্ত দায় হইতে মুক্তি দিলেন।

২৩শে জুলাই এর্জেরুমে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল—চৌদ্দ দিন আলোচনার পর স্থির হইল—তুরস্কের উপর বিদেশীয়দের আধিপত্য কিছুতেই সহ্য করা হইবে না; ইস্তাম্বুল-সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে জাতীয় সরকারই জাতির সম্মানরক্ষার ভার লইবে এবং ইস্তাম্বুল-সরকারকে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিবে; অতএব অবিলম্বে দেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া "জাতীয় পরিষদ্" আহ্বান প্রয়োজন। বিভিন্ন সরকারকে এইসব সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া আমি ইস্তাম্বুলের প্রধান উজীরকে ইহার যুক্তিযুক্ততা ও জাতীয় দলের শক্তির কথা জানাইলাম।

৪ঠা সেপ্টেম্বর সিভাস্ কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। ইহাতেও প্রায় পূর্ব্বরূপ সিদ্ধান্তই পুনর্গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের প্রস্তাবও আমি বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জকে জানাইয়া সুলতানকে অনুরোধ করিলাম যে, অবিশ্বাসী দামাদ্ ফরিদ্‌কে মন্ত্রীত্ব হইতে যেন তিনি অপসারিত করেন, দেশের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষায় যেন তিনি কর্ণপাত করেন। ইস্তাম্বুলের তার-ঘর হইতেই দামাদ্ ফরিদ্ এই বার্ত্তা ফেরৎ পাঠাইলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর জাতীয় দল ইস্তাম্বুল-সরকারের সমস্ত অধিকার অস্বীকার করিয়া ঘোষণা করিল, ইস্তাম্বুল-সরকারের কোনো তার অতঃপর আর গ্রহণ করা হইবে না।

এইবার জাতীয় শাসন-পরিষদ আহ্বানের কাজ। দেরী করিবার মত সময় নাই। ইস্তাম্বুল-সরকার বহুদিন হইতেই পরিষদ আহ্বানে প্রতিশ্রুত ছিল, কিন্তু কার্য্যত তাহার বিরোধিতা করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৪ই সেপ্টেম্বর আমি ভাবী পরিষদের কার্য্যক্রম নির্ণয় করিলাম,



মুস্তাফা কামাল ও তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী
(১৯২৩ সালে গৃহীত ফটোগ্রাফ)

—সুলতানকে জানাইলাম, সিভাস্-এর জাতীয় কমিটি একবার তাঁহাকে তাহাদের বক্তব্য বিজ্ঞাপন করিয়া নিজেদের তুরস্কের বিধি-সঙ্গত সরকার বলিয়া মনে করিবে। ইস্তাম্বুল-সরকারও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল—আমাদের সঙ্গে মিটমাটের কথা চলিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারঘরে সারারাত্রি জাগিয়া আমি ৮ ঘণ্টাকাল কথা চালাইলাম—জাতির স্বার্থকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করা হইবে না, দামাদ্ ফরিদ্‌কে ত্যাগ করিতেই হইবে, জাতির মন্ত্রণাই সুলতানকে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনদিন পরে দামাদ্ ফরিদ্ বিদায় হইল, নূতন মন্ত্রী আলি রিশাদ্ পাশার সঙ্গে

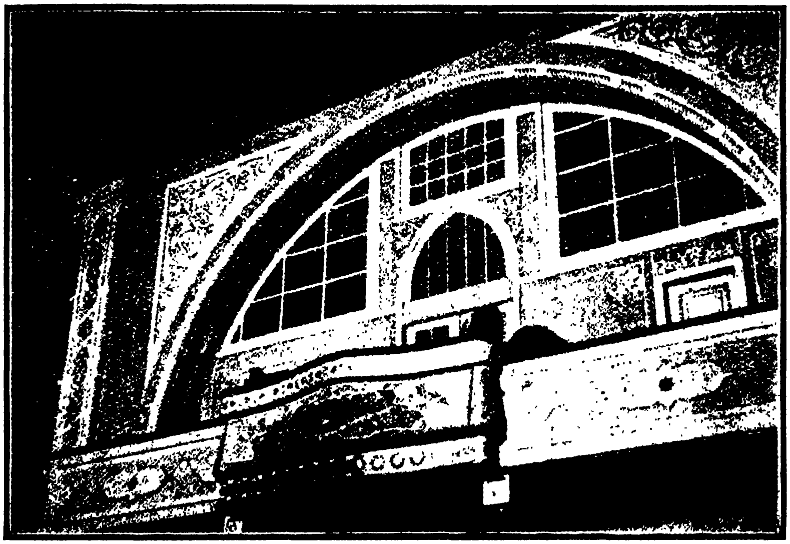
আমাদের মিটমাটের কথাবার্ত্তা চলিল। মিত্র শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সন্ধির পূর্ব্বে জাতীয় শাসন-পরিষদ্ আহ্বান করিতে হইবে। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল ছল করিয়া কালক্ষেপ করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমাদের অধীরতায় অবশেষে নির্ব্বাচনের আয়োজন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯২০ সনের ২৮শে জানুয়ারী নূতন পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়—অধিকাংশ



মুস্তাফা কামাল নবপ্রচলিত বর্ণমালা শিক্ষা দিতেছেন

প্রতিনিধিই জাতীয় দলের। সেই অধিবেশনেই আমরা কয়েকজন ন্যাশনাল প্যাক্ট—জাতীয় চুক্তিপত্র—স্বাক্ষর করিলাম। তুর্ক আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলি এই চুক্তিপত্রে স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে।—তুর্ক জাতি আরবীদের স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইল, কিন্তু অপরাপর মুসলমান প্রদেশের (যেমন পূর্ব্বথ্রেস্, মোসাল, প্রভৃতির) উপর তুর্ক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবে, দার্দ্দানালিস্ প্রণালী-পথ উন্মুক্ত রহিবে, ইস্তাম্বুলে বা অন্যত্র বিদেশীয়দের আধিপত্য সহ্য করা হইবে না; ইয়ুরোপের সংখ্যাল্প জাতিরা সেইসব দেশে যেরূপ বিশেষ অধিকার পায় তুর্ক রাষ্ট্রের সংখ্যাল্প জাতিরাও তুরস্কে তাহা ভোগ করিবে। এইবার মিত্রশক্তি চমকিত হইল, ১৬ই মার্চ্চ তাঁহারা ইস্তাম্বুল দখল করিলেন, এপ্রিল মাসে তাঁহাদেরই নির্দ্দেশে স্থলতান জাতীয় পরিষদ্ ভাঙিয়া দিলেন, জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের ধর্ম্মদ্রোহী ও রাজদ্রোহী বলিয়া বর্ণনা করিলেন। আমাদের প্রতিনিধিগণ এঙ্গোরায় সমবেত হইয়া নিজেদের তুর্কজাতির প্রতিনিধি ও তুর্করাষ্ট্রের কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বেইমান ইস্তাম্বুল সরকার ১০ই আগষ্ট সেভরের কলঙ্কিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল, কিন্তু এঙ্গোরায় আমরা উহাকে স্বীকার করিলাম না। সাকরিয়ার যুদ্ধে মিত্রশক্তি দিবারাত্র কুড়ি দিন যুদ্ধ করিয়া এঙ্গোরা-বিজয়ের আশা ত্যাগ করিলেন, আমাদের সৈন্যবল ও শক্তি সংহত করিয়া আমরা স্মার্ণা ও পূর্ব্বথ্রেস হইতে গ্রীক্‌দের উচ্ছেদ ও এনাটোলিয়া হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। ককেশীয় এরিভিনা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, ইয়ুসফ কামাল বে মার্চ্চ মাসে মস্কোতে সোভিয়েট্-এর সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের বন্ধুত্ব ক্রয় করিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে লণ্ডন সম্মেলনে আমরা ইতালি ও ফ্রান্সের সহিত বুঝাপড়া করিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে সিলিসিয়া ও উত্তর-সিরিয়ার রেলপথ ফিরিয়া পাইলাম—মিত্রশক্তির মিত্রতা আর অটুট রহিল না। গ্রীক্-তুর্ক সমরে অনন্যোপায় হইয়া ইংলণ্ড মুখে নিজেদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। কিন্তু, ১৯২২ সনের আগষ্ট মাসেও আমাদের প্রতিনিধি ফতে বে যখন লণ্ডনে দার্দ্দানালিস প্রণালী জাতিসঙ্ঘের হাতে অর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন,তখনো লয়েড জর্জ্জ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ২৬শে আগষ্ট আমরা গ্রীক্‌দের আক্রমণ করিলাম, গ্রীক্-সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; ৯ই সেপ্টেম্বর স্মার্ণা আমাদের করতলে ফিরিয়া আসিল। এইবার আমরা কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে ইয়ুরোপের সীমানায় মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনীর সহিত মুখামুখি আসিয়া পড়িলাম। ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যের নিকট সমরায়োজনের বার্ত্তা প্রেরণ করিল। এই উপকূল ও প্রণালীকে তাঁহারা নিরপেক্ষমণ্ডল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, চানাক্-এর হ্যারিংটন-বাহিনীর সহিত ও ইজমিদ্-এর মিত্র সেনাদলের সহিত আমাদের প্রায় সঙ্ঘর্ষ হইবে,

এমন সময় মিত্রশক্তি আমাদের পূর্ব্বথ্রেসের দাবী স্বীকার করিয়া, যুদ্ধ বিরামকালে আমরা ইস্তাম্বুল আক্রমণ করিব না, এই প্রতিশ্রুতি লইয়া মিলন সম্মেলনের আয়োজন করিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) আমরা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, মুদানিয়ায় ৩রা অক্টোবর একাদশজন এঙ্গোরা-দূত সমবেত হইলেন,—তাঁহাদের আলোচনার ফলে ২০শে নবেম্বর লোজনে ইস্মেত্ পাশা এঙ্গোরার দাবী লইয়া সন্ধির উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন। ১৯২৩ সালের ২৪শে জুলাই লোজন সম্মেলন শেষ হইল। জাতীয় দলের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।"



জাতীয় মহাপরিষদে প্রেসিডেন্টের বসিবার স্থান

মিত্রশক্তি যখন (২৭শে অক্টোবর) এঙ্গোরাকে সন্ধির জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, ইস্তাম্বুলের সরকারের পতন প্রায় তখনই সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১লা নবেম্বর জাতীয় পরিষদ্ স্থলতান-পদ ও অটোম্যান সাম্রাজ্যকে এক সঙ্গে বিদায় দিল। ৪ঠা নবেম্বর জাতীয় দলের নিযুক্ত পূর্ব্বথ্রেসের শাসনকর্ত্তা তাফেৎ পাশা ইস্তাম্বুল সরকার দখল করিলেন, ২৯শে অক্টোবর সাধারণ-তন্ত্র বিঘোষিত হইল—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্ক-সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন, ইস্মেৎ পাশা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেন। ১৯২৪ সনের ২০শে এপ্রিল তুর্ক-সাধারণতন্ত্রের কনষ্টিটিউশ্যান্ বা মৌলিক রাষ্ট্র-বিধি গৃহীত হইল, নূতন তুর্করাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তেরশত বৎসর ধরিয়া যে-রাজবংশের সম্রাটগণ খৃষ্টান-শক্তিপুঞ্জের সহিত ক্রমাগত যুঝিয়াও এতদিন সম্রাট কনেষ্টান্টাইনের আসনে অচল হইয়া ছিলেন, তুর্কীর জাতীয় দল. তাঁহাদের মুসলমান প্রজাগণ, আজ তাঁহাদের সেই সিংহাসন হইতে নামাইয়া বিতাড়িত করিয়া দিল।

বাহেদেদ্দিন পলাইয়া মাল্টাতে আশ্রয় লইলেন, রাজবংশের আব্দুল মজিদ্ কিছুদিনের জন্য তাঁহার খিলাফৎটুকুর অধিকারী হইলেন। কিন্তু তাহাও অল্পদিনের জন্য। তুর্কী-পরিষদ তুর্কীরাষ্ট্রকে ধর্ম্ম-নেতাদের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাই, মাত্র পনের মাস পরে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে খলিফাকেও অস্বীকার করিয়া খিলাফৎএর জীবনকাল নিঃশেষ করিয়া দিল। মুসলমান-জগতের দুর্ব্বহ নেতৃত্ব তুর্ক চাহে না, সে শুধুমাত্র তুর্কের জাতীয়তাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া জ্ঞান করে।

ধর্ম্ম-বিপ্লব

তুর্কীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় বিপ্লব বোধ হয় রাষ্ট্রের নয়, ধর্ম্মের ও সমাজের। ইস্লাম ও খিলাফৎ শতশত বৎসর যাবৎ তুর্কীর মনে ও প্রাণে নিবিড় প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর সকল পুরাতন ধর্ম্মের মতই এই আরবীয় ধর্ম্মের গণ্ডীমধ্যেও অচলতা ও জড়তা, নানারূপ কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা জমিয়া উঠিয়াছে। তুর্কী ধর্ম্মনিষ্ঠার নামে এইগুলিকেও সভয়ে বিনা বিচারে মাথা পাতিয়া লইত। জাতীয় দল জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিতে

গিয়া দেখিল যে, এই পথে প্রথম বিঘ্ন, এই কুসংস্কারগুলি; দ্বিতীয়,স্বয়ং খলিফা যিনি মুসলমান সমাজের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রলোভনে পুনঃ পুনঃ অন্য জাতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তুর্কীর জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, এই ইস্‌লাম ধর্ম্ম যাহার প্রভাবে মানুষের স্বাজাত্যবোধ বাধা



মালেক খানুম

পায়, ধর্ম্মগত ঐক্যবোধ মাত্র সুদৃঢ় হয় এবং তুরস্কে খলিফারাজের নীচে আর একটি রাজ আধিপত্য করে—মোল্লারাজ। তুর্কী খিলাফৎকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রথম দুইটি বিঘ্ন অপসারিত করিয়াছে। প্রথমাবস্থায় ইস্‌লামকে রাষ্ট্র ধর্ম্মরূপে কিছুকাল স্বীকার করিলেও তুর্কী পরিষদ্ পরে তুর্করাষ্ট্রকে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, এবং এইরূপে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথ সুপ্রসারিত করিয়াছে। বর্ত্তমান তুর্করাষ্ট্রে ইস্‌লাম, খৃষ্টধর্ম্ম বা য়িহুদি ধর্ম্মের মত অন্যতম ধর্ম্ম মাত্র। সেই ইস্‌লাম ধর্ম্মকেও তুর্কী আবার পাশ্চাত্যরূপ দিয়াছে, মধ্যযুগের আরবীধর্ম্মকে এই যুগের তুর্কজীবনের উপযোগী করিয়া লইয়াছে। মস্‌জিদে গির্জ্জার ধরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, জুতা বাহিরে খুলিয়া রাখিতে হয় না, প্রার্থনার সহিত সঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে, যে নেমাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমানগণ খাঁটি আরবীতে আবৃত্তি করে, তুর্ক মুসলমান আজ তাহার তুর্কী অনুবাদ পাঠ করেন, তুর্ক মৌলবী আজ তুর্কী ভাষায়



মাদাম আহ্‌মেদ ফরিদ্ বে
(লণ্ডনস্থ রাষ্ট্র দূতের পত্নী)

উপদেশ দেন। এই দুঃসাহসিক কার্য্য বিনাবিঘ্নে সাধিত হয় নাই; যদিও তুর্ক-জনসাধারণ গাজীর ইচ্ছাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি কুর্দ্দিস্তানের ধর্ম্মান্ধ অধিবাসীদের মধ্যে মোল্লা, হোজ্জা, প্রভৃতি ইস্লাম-প্রচারকগণ ১৯২৪ সনে বিপ্লববহ্নি জ্বালাইয়া তুলিয়াছিলেন। গাজী ও জাতীয় দল নির্ম্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন। সাধারণ তুর্কীর মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা আছে, কিন্তু গাজীর অপূর্ব্ব জীবন ও অপূর্ব্ব হিতবুদ্ধিতেও তাহাদের বিশ্বাস অসীম।

শিক্ষা-সমস্যা

খিলাফৎ বিসর্জ্জন ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে



মুস্তাফা কামাল ও তুর্ক মহিলাসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ

সঙ্গে তুর্ক শিক্ষাসচিবের হাতে তুর্কদের শিক্ষাদানের সমস্যা উপস্থিত হইল। এতদিন মোল্লা মৌলবী ও দরবেশগণ মক্তব, মাদ্রাসা, ও দরবেশদের শিক্ষালয়ে তুর্কী জনসাধারণের শিক্ষা দিত। এইবার তুর্ক-সরকার সেই ভার গ্রহণ করিলেন। অর্থাভাবে শিক্ষাকার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, কিন্তু ইস্‌লাম রাষ্ট্রধর্ম্ম হইতে নাকচ হইলে, যুগ যুগ ধরিয়া নানা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে যে ওয়াক্‌ফ্‌ ধনসম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তুর্কী সরকার তাহা হস্তগত করিয়া লইলেন এবং তাহার সহায়ে জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়া তুর্কীকে নূতন আদর্শে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই আদর্শে কোনো ধর্ম্মমূলক শিক্ষাই দেওয়া নিষিদ্ধ। সুলতানদের সময়ে অনেক ফরাসী নান সন্ন্যাসিনী) ও পাদ্রী এবং মার্কিণ প্রচারক তুর্কী নরনারীদের আধুনিক শিক্ষার সহিত খৃষ্টধর্ম্মমূলক উপদেশ দিয়া তুরস্কের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিতেন, তাহাদের শিক্ষালয়গুলিতেও এখন ঐরূপ ধর্ম্মমূলক শিক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে। নব্য তুর্কের শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় ভাবাত্মক ও সম্পূর্ণ আধুনিক, উহার সহিত ধর্ম্মের লেশমাত্র সম্পর্ক রাখিতে তুর্ক শিক্ষাগুরু ও তুর্ক-সরকার অস্বীকৃত। কিন্তু, অর্থাভাবে তুর্ক-সরকার এখনো মূল রাষ্ট্রবিধির ৮৭ ধারার প্রতিশ্রুতি-মত বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে শিক্ষাপদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—শিক্ষা-বিভাগ তুর্কী ভাষা, তুর্কী সাহিত্য, তুরস্কের ভূগোল ও তুরস্কের ইতিহাস অবশ্য অধীতব্য বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

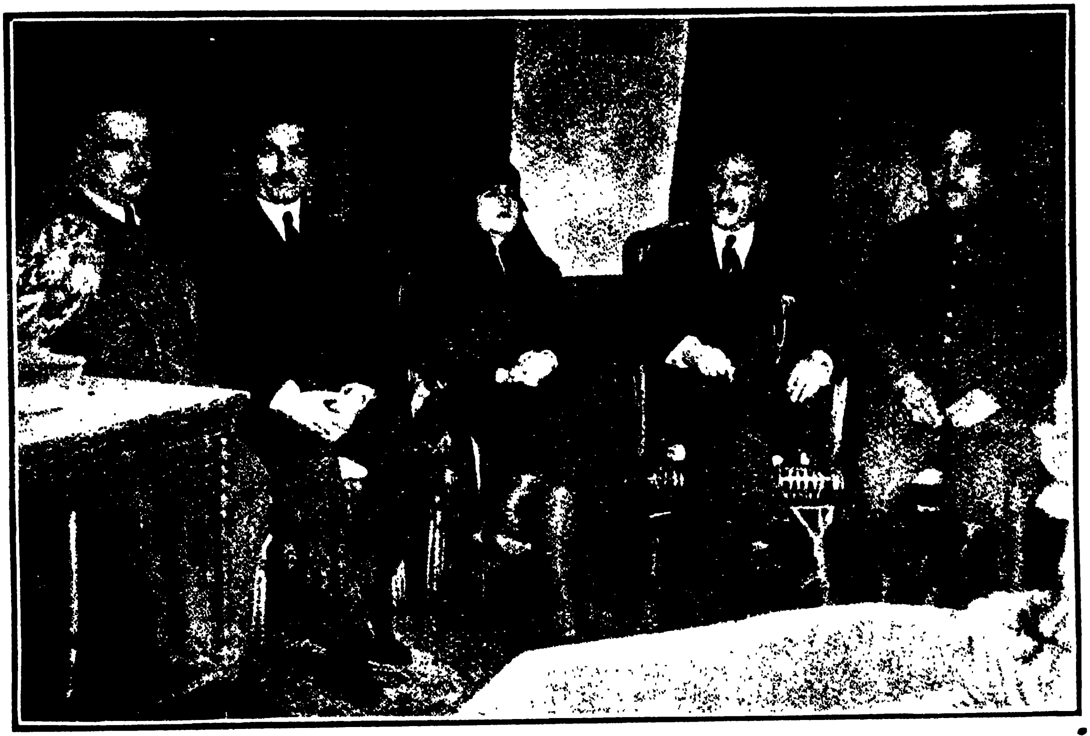
নারী-প্রগতি

নব্য তুরস্কের নারী স্বাধীনতাও ধর্ম্মবিপ্লবের মতই অভাবনীয় ও ধর্ম্মবিপ্লবের মতই দুঃসাহসিক কাজ। নারী শক্তিকে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম হেরেমে পুরিয়া বিলাস-বাসনার সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছিল। তুর্কীর হেরেম স্বদেশে তাহার মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়াছে, বিদেশে তাহাকে উপহাস ও লাঞ্ছনার সামগ্রী করিয়াছে।



স্কুলের বালক-বালিকাগণ একত্রে ব্যায়াম শিক্ষালাভ করিতেছে

তুর্কনারীরও আত্মসম্মানবোধ ধীরে ধীরে জাগিতেছিল —পিয়ের লোতির "ডেজাস্যাঁতের" ('মোহমুক্তা') নায়িকা, জেনেব্ ও মেলেক, এই দুই বোনের হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে তুর্ক-নারীর জীবনের এই দৈন্য ও লাঞ্ছনাবোধ এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা ফরাসী ঔপন্যাসিকের নিকট ছল প্রেমের অভিনয় করিয়াও তুর্কনারীর স্বপক্ষে তাঁহার লেখনীর সহায়তা গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু তখনো সাধারণ তুর্ক-নারী অচেতন। তাহার পর আসিল ১৯০৮ এর 'যুবক তর্ক' আন্দোলন ও অবশেষে তাহার নিষ্ফলতা। বলকান্ যুদ্ধের সমকালে তুর্ক-নারী স্বদেশের সমস্যায় কোথাও কোথাও সচকিতা হইলেন; হালিদে খানুমের মত দুই একজন নারী পুরুষের সভায়ও বক্তৃতা করিয়া ও তুর্ক-নারীকে শিক্ষা দিয়া, স্বদেশকে জাগাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গত মহাযুদ্ধকালে পুরুষশক্তি যখন রণস্থলে, তখন নারীশক্তির সহায়তাতেই দেশের শাসনকার্য্য চালনা করিতে হইল। তুর্ক-নারী তখন গৃহের বাহিরে আসিলেন, কিন্তু তখনো তাঁহার আপাদমস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত, তাঁহার মনের ও প্রাণের দ্বন্দ্ব বা সঙ্কোচ ঘোচে নাই। তাহার পরে এঙ্গোরায় জাতীয় দলের আন্দোলন, ইহার নেতৃবৃন্দ নারীরও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী, নারীকে সহধর্ম্মিণী রূপে বরণ করিতে চাহেন। সমগ্র জাতি যখন উৎকর্ণ হইয়া জাতীয় দলের আদেশের অপেক্ষায় রহিয়াছিল, তখন তুরস্কের নারীশক্তিও তাহার মুক্তি আহ্বান শুনিতে পাইল। এই-সব নারীর শীর্ষস্থানীয়া হালিদে খানুম—আপনার অদ্ভুত মনীষাবলে তিনি জাতীয় দলের মন্ত্রণায় বিশেষ প্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, আবার জাতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে তিনি পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন সাকরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও শক্তির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। জাতীয় দল ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আদেশ করিলেন, তুর্ক-নারী ইচ্ছা হইলে অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিতে পারিবেন। কার্য্যত গাজী মুস্তাফা ও তাঁহার সহচরগণ পরমোৎসাহে তুর্কনারীকে অবগুণ্ঠন-ত্যাগে উৎসাহিত করিলেন,—ইস্তাম্বুলের পথে তুর্কনারী উন্মুক্ত মুখে স্বচ্ছন্দে বাহির হইলেন, তাঁহার



১। রাউফ্ বে, ২। মাতিক্কা খানুম, ৩। মুস্তাফা কামাল, ৪। মাহ্‌মুদ বে
মুস্তাফা কামাল পাশা ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ—

পরিধানে প্যারিসের হাল্‌ফ্যাশানের পরিচ্ছদ, তাঁহার মাথার চুল শিঙ্গেল-করা, ছোট-ছোট, তাহার গতিতে ও জীবনে পাশ্চাত্য নারীর স্বচ্ছন্দতা। প্রধান মন্ত্রী ইস্‌মেৎ পাশা ও অন্যান্য জাতীয় দলের নেতা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে নর-নারীর নৃত্যোৎসবের আয়োজন করিতেন; স্বয়ং গাজী অবগুণ্ঠন-হীনা মহিলাদের সহিত নৃত্যে যোগদান করেন। এইরূপে বহু শতাব্দীর ইসলাম-শাসন হেলায় ঠেলিয়া তুর্কনারী স্বদেশের ত্রাতা গাজীর উৎসাহে ও প্রেরণায় আপনার অবজ্ঞাত জীবন ছাড়িয়া মুক্ত বায়ুতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অপরদিকে নারীকে যুক্তিসঙ্গত অধিকার দিবারও আয়োজন চলিল; ইস্‌লামানুমোদিত বহুবিবাহ প্রথা একদিনে দণ্ডনীয় বলিয়া প্রচারিত হইল—তুর্কীর লজ্জা, তাহার হেরেম, তুরস্ক হইতে লোপ পাইল। ইসলামের শিথিল বিবাহ-ভঙ্গের আইনও পরিবর্ত্তিত হইল, নারীও তালাক্ বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিলেন, সম্পত্তি সম্পর্কিত আইনেও তাঁহার সমান অধিকার স্বীকৃত হইল। তুর্কনারী আজ অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, অনেকে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করিতেছেন, অনেকে হাসপাতালে সেবিকার কর্ম্ম করিতেছেন, কেহ কেহ নানা কাজকর্ম্মে যোগদান করিয়া আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন। 'তুর্কনারীর অধিকার-রক্ষা সমিতি' তাঁহাকে এইসব কর্ম্মে সহায়তা করে—স্বয়ং গাজী এই মহাসঙ্ঘের সভাপতি। আধুনিক তুর্ক নারীর জীবনে পূর্ব্বকার কুণ্ঠিত, আড়ষ্টভাব নাই, পূর্ব্বকার পরাধীনতার গ্লানি ও হেরেমে আত্ম-গোপনের লাঞ্ছনা নাই। গাজী তাঁহার সম্মুখে পৃথিবীর আনন্দ-লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

শাসন সংস্কার

শাসন কর্ম্মেও তুর্কী-সরকার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন



এঙ্গোরার অধীবাসিগণ জাতীয় মহাপরিষদ সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার উদ্বোধন দেখিতেছেন

করিয়াছেন। পূর্ব্বেকার কাজীর বিচার ও অর্থহীন হাদিসের আইন-কানুন বর্জ্জন করিয়া নব্য তুর্কী স্থইজার-লণ্ডের অনুরূপ সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত-অধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করিয়াছে; অপরাধ-সম্পর্কিত আইন ইতালীয় ও বাণিজ্য-আইন জার্ম্মাণ আদর্শে প্রণীত হইয়াছে। সরকারী বিভাগগুলিতে বজেট, হিসাব-সংরক্ষণ ও হিসাব-পরীক্ষার নিয়ম সুস্থির করা হইয়াছে। তুর্কী-সরকার দরিদ্র, কিন্তু অমিতব্যয়ী নয়—তাই, তাহার আর্থিক অসচ্ছলতা প্রজাদের পক্ষে পীড়াদায়ক নয়।

কৃষি ও শিল্প

তুর্ক-রাষ্ট্র ধনী নয়, তাই তাহার কয়লা, তেল প্রভৃতি খনিজ পদার্থগুলিকে ঠিকভাবে সে কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। অপরপক্ষে, বিদেশ হইতে মূলধন লইতেও জাতীয় সরকার অস্বীকৃত। মিশর, চীন প্রভৃতির ভাগ্য তাহাদের সুপরিজ্ঞাত, বিদেশীয় বণিকের মানদণ্ড অতি অল্প সময়ে বিদেশীর শক্তির রাজদণ্ডে পরিণত হয়—ইহা তাহাদের জানা আছে। তুর্কী নিজের কৃষি ও শিল্পকে নিজেই রাখিতে চায়। তথাপি নূতন নূতন রেলপথ (এঙ্গোরা-সিভাস্-লাইন, সামসুন্-সিভাস্ লাইন, এঙ্গোরা-এরেলজি লাইন প্রভৃতি) খুলিয়া, নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া (ইশ্ ব্যাঙ্কেসিস্, ব্যাঙ্ক দি কমার্স এ দি ইদাস্ত্রি, ইত্যাদি) দেশের কৃষি ও শিল্পোন্নতির গোড়া-পত্তন করা হইয়াছে। শিল্প-বিপ্লব সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহার আয়োজন চলিয়াছে।

পরিচ্ছদ-বিপ্লব

তুর্কের জীবনের সমস্তদিকেই বিপ্লবের ও নূতন আদর্শের তরঙ্গাঘাত লাগিতেছে—জীবন্ত তুর্কীকে না দেখিলে তুর্কীর প্রাণশক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। আবার জীবন্ত তুর্কীকে দেখিলে প্রথমেই চোখে পড়ে তাহার পরিচ্ছদ—তুর্কীর ফেজ আর নাই, আজ ইয়ুরোপীয় পদ্ধতির টুপী তাহার মাথায় উঠিয়াছে। অথচ, স্মার্ণার পতনের পরে ইয়ুরোপীয় টুপি পোড়াইয়া তুর্ক জাতি বিজয়োৎসব করিয়াছিল। তুর্কী সেই টুপীকেই তিন বৎসর পরে মাথায় তুলিয়া লইল। এমন কি মোল্লাদের প্ররোচনায় টুপীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় জাতীয় দল ছয়জন বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেও দ্বিধা করে নাই।

লিপি-সংস্কার



প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদের একটি কক্ষ

তুরস্কের নূতন পরিবর্ত্তন তুর্কলিপিতে রোমক বর্ণমালার প্রয়োগ। তুর্কী অন্যান্য অনেক মুসলমান জাতির মত আরবীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই আরবীয় বর্ণমালাকেও গ্রহণ করিয়াছিল। আরবী বর্ণমালা ব্যঞ্জনবর্ণ-বহুল, আরবী ভাষার পক্ষে উপযোগী; কিন্তু তুর্কী ভাষায় স্বর-বাহুল্য, তুর্কীভাষীদের আরবী বর্ণমালায় অনেক অসুবিধা, একই বর্ণ-সমন্বয়ে বহুশব্দ ও বহুধ্বনি প্রকাশ করিতে হয়। রোমক বর্ণমালায় সেই-সব ধ্বনি প্রকাশে সুবিধা, অথচ এই বর্ণমালা আশ্চর্য্যরূপ সহজ ও বিজ্ঞান-সম্মত, আবার সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান যুগে ইহা প্রায় পৃথিবী-ব্যাপী। তুর্কী-পরিষদ্ গতবৎসর মে মাসে স্থির করেন, এই বর্ণমালাই তুর্কভাষায় প্রয়োগ করিতে হইবে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার প্রচলন হওয়া চাই, দুই বৎসর পরে সরকারী কাজ-কর্ম্মের চার আনা রোমক লিপিতে চলিবে, তিন বৎসরপরে আট আনা, ও চার বৎসর পরে বারো আনা কাজই রোমক বর্ণমালায় পরিচালিত হইবে। তুর্ক শিক্ষাসচিব তাই সমস্ত দেশকে নূতন করিয়া বর্ণজ্ঞান করাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কাফিখানায় বোর্ড টাঙাইয়া পানার্থীদের অবসর সময়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সংবাদপত্রগুলি কতকাংশ সংবাদ রোমক বর্ণমালায় মুদ্রিত করিয়া পাঠকদিগকে উহা পাঠে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, ডল্‌মা বাঘ্‌চে প্রাসাদে স্বয়ং গাজীর দৃষ্টান্তে দুইশত পরিষদ-সদস্য, সরকারী কর্ম্মচারী ও সংবাদপত্র-সেবক নূতন বর্ণমালা শিখিয়াছেন। এই লিপি-পরিবর্ত্তন নিতান্ত ছোট জিনিষ নয়—রোমক লিপি গ্রহণ নূতন তুর্কীর দূরদৃষ্টি ও সাহসের পরিচায়ক।



বালক-বালিকাগণ স্কুলে একত্রে ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে

তুর্করাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ইতিহাস একটি মাত্র মহাপ্রাণ কর্ম্মনিষ্ঠ মানবের সৃষ্টি। প্রশ্ন হইতে পারে—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার এই সাধনা কি সার্থক হইবে?—যদি গাজী

জীবিত থাকেন, তবে তুর্কীকে তিনি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন। তাঁহার প্রেরণা জাতিকে লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিবে। এই লক্ষ্য কি? প্রাচীন তুর্ক-গরিমার পুনরুদ্ধার নয়, নূতন করিয়া জীবনারম্ভ, নূতন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা, জাতির নূতন করিয়া গোড়াপত্তন। এই নবজন্মে তুর্কী ধর্ম্ম ছাড়িয়া, প্রাচীন প্রাচ্যের দিকে পিছন ফিরিয়া, অশনে-বসনে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে ইয়ুরোপীয় সভ্যতাকেই বরণ করিতে লোলুপ। ইয়ুরোপের নিকট মাথা নোয়াইয়াই গাজী কামালের জাতি ইয়ুরোপের সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে চায়। এ বড়ই আশ্চর্য্য যে, ইয়ুরোপীয়ের রাষ্ট্র-শৃঙ্খল হইতে যে-প্রাচ্য জাতি আপনাকে মুক্ত করিয়াছে,—জাপান, চীন, আমানুল্লার আফ্‌গানিস্থান, বা গাজীর তুরস্ক,—সে আর ইয়ুরোপীয় সভ্যতা ও ইয়ুরোপীয় আচারকে গ্রহণ করিতে ভয় করে না, লজ্জা পায় না। ইহাতে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন মনে পড়ে—স্বাধীন জাতির এই 'দাসমনোভাব' কেন? কিন্তু এই কথা ভুলিলে চলিবে না, আজকালকার এই সভ্যতা দেশবিশেষের দান নয়,—ইয়ুরোপের নয়, আমেরিকার নয়,—উহা কালের সম্পত্তি—বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের। যে বর্ত্তমানের সঙ্গে তাল রাখিতে চাহে তাহাকে উহা বরণ করিতেই হইবে। তুর্কী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বরণ করে নাই, আধুনিক সভ্যতাকেই আশ্রয় করিয়াছে, তুর্কীর মুখ এসিয়ার দিকেও নয় ইয়ুরোপের দিকেও নয়—তাহার মুখ সম্মুখে, তাহার দৃষ্টি উর্দ্ধে ভাবীকালের ইঙ্গিত-পাঠে নিবদ্ধ।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অকৃত্রিম সুহৃদ্, অনবদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, ভূতপূর্ব্ব "ভারতী"-সম্পাদক মণিলাল-বাবুর অকালে আকস্মিক মৃত্যু হইল। নিউমোনিয়া রোগ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর প্রাণ হরণ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আরো দুইজন বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সাধককে আমরা এমনি অকালে অকস্মাৎ হারাইয়াছি—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁরা দুজনেই মণিলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

১৯১০ সালের শেষভাগে মণিলালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। একদিন সকাল বেলায় 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। নিত্যকার মত তিনি তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পাশের গলির মধ্যে পুরাতন প্রবাসী আপিসে প্রুফ-দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই কুঠরির মধ্যে এক প্রিয়দর্শন গৌরকান্তি দীর্ঘকায় যুবকের আবির্ভাব হইল। চারুবাবুর মুখে তাঁর পরিচয় পাইলাম। আগন্তুকের বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে সেদিন একটি সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি ভদ্রলোকের পরিচয় পাইয়াছিলাম—আজ উনিশ বৎসর পরে তাঁর মৃত্যুর পরও সেই পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে।

শিবনারায়ণ দাসের গলির মোড়ে তখন "কান্তিক প্রেস" ছিল। মণিলাল সেই ছাপাখানার মালিক ছিলেন। সেখানে প্রত্যহ অপরাহ্নে আমরা মিলিত হইতাম। এই বৈঠকে আমি নিয়মিত হাজির থাকিতাম। আর থাকিতেন চারুবাবু, কবি সত্যেন্দ্র, সৌরীনবাবু ও সত্যেন্দ্রের সতীর্থ সুহৃদ্ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলে মধ্যে মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীও আসিতেন। আমাদের মধ্যে কেহ নূতন কিছু রচনা করিলে সেই সভায় পাঠ করিতেন। তারপর পঠিত রচনা সম্বন্ধে সকলের অসঙ্কোচ মতামত প্রকাশ চলিত। সত্যেন্দ্র প্রায়ই কবিতা পড়িতেন, ছোট গল্প শুনাইতেন

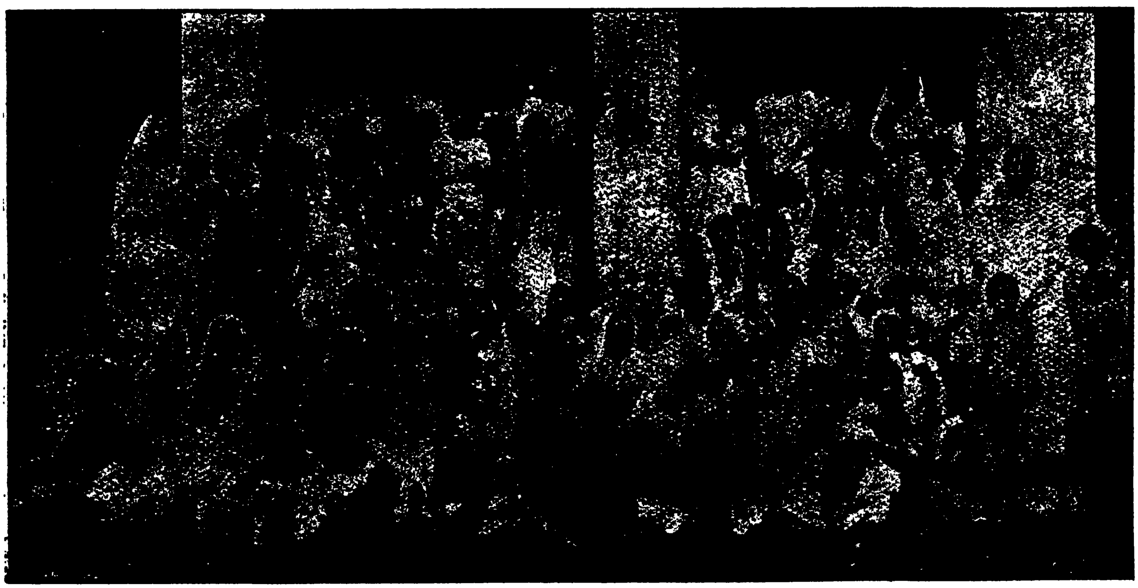
প্রধানত চারুবাবু ও মণিলাল; কখনো কখনো সৌরীন-বাবু। মণিলালের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ছোট গল্প সেই যুগের রচনা।

অনেক লেখক রচনা করেন নাম জাহির করিবার মোহে—মণিলাল সে-শ্রেণীর লেখক ছিলেন না। তাঁর লেখার মধ্যে সংযম ও সতর্কতার পরিচয় সুস্পষ্ট। মনের মধ্যে তাগিদ না আসিলে তিনি লিখিতেন না—ইহাই তাঁর রচনার উৎকর্ষের হেতু। অধুনা বহুকাল তিনি কলম বন্ধ রাখিয়াছিলেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে কোনো-কিছুতেই তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না—এই সময় তাঁর গভীর বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া মনে মনে পীড়িত হইয়াছি। জীবনটাকে তিনি যেন একান্ত অবহেলায় স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট গীতি-নাট্য "মুক্তার মুক্তি" তাঁর শেষ গ্রন্থ। রবীন্দ্র-শিষ্য-রচিত বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি খুঁজিতে গিয়া একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথের "ধূপের ধোঁয়ায়" মনে পড়ে।

মণিলালের sense of humour প্রখর ছিল। বন্ধু-মহলে তিনি প্রচুর হাস্য-পরিহাস করিতেন, কিন্তু তার মধ্যে কোনো আবিলতা ছিল না। দীর্ঘকাল অন্তরঙ্গ-ভাবে তাঁর সঙ্গে মিশিয়াছে, কিন্তু তাঁর মুখ হইতে কখনো একটা কুৎসিৎ কথা উচ্চারিত হইতে শুনি নাই। তিনি ছিলেন born aesthete বাহিরে এবং ভিতরে; তাঁর পক্ষে বাক্যে বা ব্যবহারে, *বোধ করি চিন্তায়ও vulgar* হওয়া অসম্ভব ছিল। অপরিচিতের সভায় তিনি নীরব থাকিতেন, এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া গর্ব্বিত মনে করিত। কিন্তু সামান্য পরিচয়েও তাঁর ভদ্রতায় মুগ্ধ হয় নাই এমন মানুষ আমি জানি না।

মণিলাল কেবল যে নিপুণ সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন তাহা নয়—তিনি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রসিক ও সমালোচকও ছিলেন। সাহিত্যের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার শক্তি তাঁর ছিল—তাঁর সহিত আলাপ-আলোচনায় সে-পরিচয় বহুবার পাইয়াছি। তিনি একদিকে যেমন বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন অন্যদিকে তেমনি দৃঢ়চেতাও ছিলেন। ন্যায়-অন্যায়-বোধ তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল। লোকের বিরাগ ভাজন হইবার ভয়ে বা বয়সের সম্মান রক্ষা করিবার প্রচলিত প্রয়াসে ন্যায্য কথা বলিতে কখনো তিনি দ্বিধা করিতেন না।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আন্দাজ বিয়াল্লিশ হইয়াছিল। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয় মোহনলাল ও শোভনলাল ছোট গল্প লিখিয়া শৈশবেই যশস্বী হইয়াছেন।

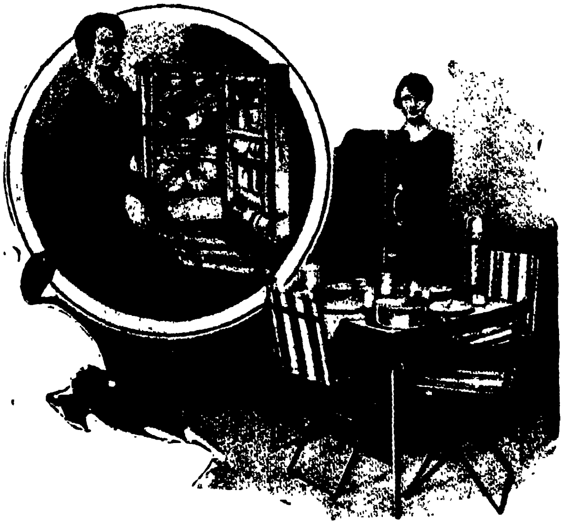


কলিকাতার একটি শিশুমঙ্গল কেন্দ্র



ক্যাম্পার্স ব্যাগে চেয়ার ও টেবিল—

সুটকেস অপেক্ষা সামান্য বড় একটি বাক্সের মধ্যে চেয়ার টেবিল এবং রান্না করিবার ও খাওয়া-দাওয়া করিবার সমস্ত বাসন-কোসন বন্ধ থাকে। মোটরকারওয়ালাদের পক্ষে ইহা লইয়া বনভোজনে যাওয়া অতি সুবিধাজনক। দরকারমত ইহা খুলিয়া টেবিল



ক্যাম্পার্স ব্যাগে চেয়ার ও টেবিল

ফিট করিয়া বাসন ইত্যাদি বাহির করিয়া লওয়া যায়; তারপর ভোজন আদি শেষ হইলে আবার সব প্যাক করিয়া বিনাকষ্টে এই অভিনব সুটকেস মোটরের পিছনে বাঁধিয়া বা পাশে রাখিয়া যেখানে খুশী যাওয়া যায়। এই টেবিল সুটকেসে চারজনের উপযোগী জিনিষপত্র লওয়া যায়।

মাউণ্ট এটনার অগ্নি-উদ্গীরণ—

গত নবেম্বর মাসে এটনা পাহাড় হইতে অগ্নি উদ্গীরণ আরম্ভ হয়। ইহার ফলে সিসিলির কতকগুলি সমৃদ্ধিশালী শহর গলিত ধাতুস্রাবের তলে চাপা পড়িয়াছে। আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতু ইত্যাদি উদ্গীরণের ফলে বড় বড় শহরের লোকজন শহর ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিতেছে। ঘরবাড়ী এবং অন্যান্য সকল সম্পত্তি পশ্চাতে ফেলিয়া তাহারা কোনো রকমে প্রাণরক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি গলিত ধাতুর স্রোত জারে (Giarre) নাম শহর গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই শহরের জনসংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। গলিত ধাতুর স্রোত অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ইহার চাপে এখন শহরের বড় বড় বাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। শহরের বাহিরে যাইবার পথও একটির পর একটি বন্ধ হইতেছে। টেলিগ্রাফের তার, গ্যাস পাইপ, রাস্তার আলো, জলের ট্যাঙ্ক,



মাউণ্ট এটনা হইতে উত্থিত ধাতুস্রাব ঘর ও বাড়ী গ্রাস করিতেছে

পাইপ ইত্যাদি সমস্তই ধাতুস্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। ধাতুর স্রোত যখন শহরের উপর আসিয়া পড়ে, তখন জনহীন শহর ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।

মাসকালি নামক একটি শহরও লোকশূন্য হইয়াছে। এই শহরের হাওয়া এখন উনানের হাওয়ার মত গরম। শহরে ১,০০০ লোক



মাউণ্ট এটনার ধাতুস্রাব

আজ গৃহহীন সম্বলহীন। শহরটি আজ বিরাট অগ্নিস্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে। যে স্থান গতকল্য লোকের কোলাহলে পূর্ণ ছিল আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। সমস্ত শহরটি অগ্নিস্রোতে ডুবিবার



মাউন্ট এটনার অগ্নি-উদ্গীরণ

পর গির্জ্জার চারিপাশে গলিত ধাতুর স্রোত জমা হইতে থাকে। তাহার পর গির্জ্জার চূড়া ভাঙিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গির্জ্জার ঘণ্টা আপনা হইতে শেষবারের মত বাজিয়া ওঠে। দূর হইতে ঘণ্টা-ধ্বনি শেষ বিদায়ের শোকপূর্ণ ক্রন্দনধ্বনিরমত মনে হয়।

—

বিমানচারিণীদের কথা—

স্ত্রীলোকেরা প্রায় ১০০ বছরের বেশী হইল পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য আকাশে বেলুন ইত্যাদির সাহায্যে উড়িবার এবং নানা প্রকার কসরৎ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। ১৮১৯ সালে Mme. Blanchard বেলুনে উড়িতে গিয়া প্রাণ হারান।

১৯২০ সালে বেলমণ্টে সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেন প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে পৃথিবীর সকল দেশের লোকে যোগদান করে। এই



কুমারী লরা ব্রমওয়েল

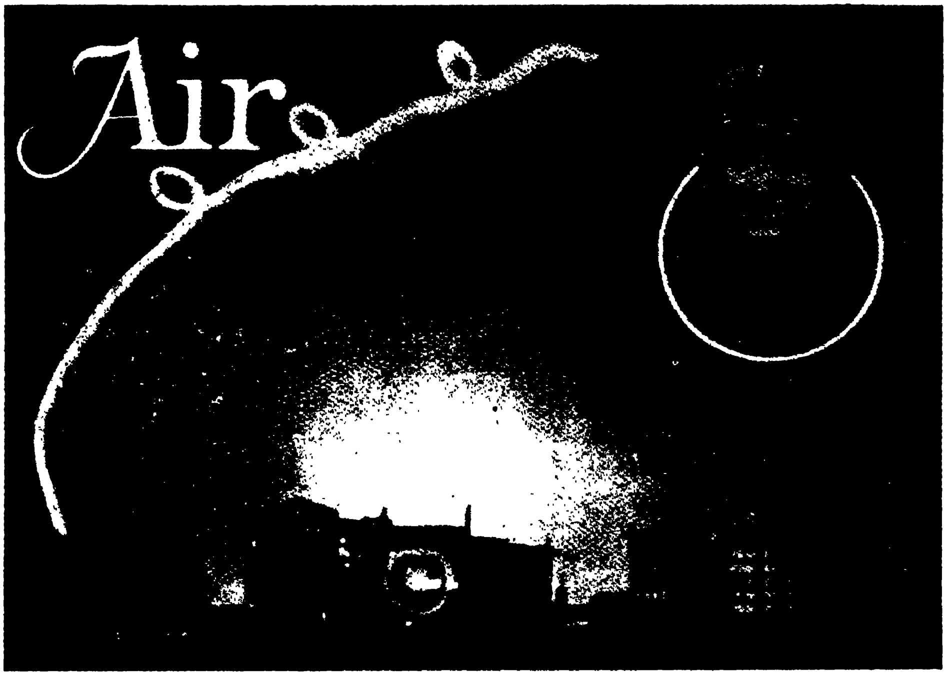
প্রতিযোগিতায় Mme Helene Dutrieu নামে একজন মহিলা যোগদান করেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই মহিলার সাহস দেখিয়া তাঁহাকে 'Chevalier of the Legion of Honour সম্মানে সম্মানিত করেন। ফরাসী এবং মার্কিন মহিলারাই প্রথম



জাপানী নারী বৈমানিক কুমারী শিগেনো কিবে

উড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইঁহাদের দেখা-দেখি ইংরেজ এবং জার্ম্মান-নারীরাও এরোপ্লেন চড়া এবং চালানোতে বিশেষ উৎসাহ এবং সাহস দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে Elfride Riolte নামে একজন জার্ম্মান নারী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জেপেলিন-চালক নিযুক্ত হন। অন্য কোনো নারী



শিকাগোর নৈশ-আকাশে রুথ ল'র হাতের লেখা

এই সম্মান এবং কাজ এখনও প্রাপ্ত হন নাই। ইংলণ্ডে নারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মিসেস্ মরিস্ হিউলেট এরোপ্লেন চালকের লাইসেন্স লাভ করেন।

একজন ফরাসী বৈমানিক সর্ব্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন—কিন্তু নারীদের মধ্যে হ্যারিয়েট কুইম্বি নামক একজন মার্কিন-মহিলা



জার্ম্মানীর প্রধান নারী-বৈমানিক ক্র্যালাইন থিয়া রাশকে

১৯১২ সালে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে এরোপ্লেনে করিয়া উড়িয়া যান। এই সময় এই অবলার নাম জগতে বিষম বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এই মহিলা সেই সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা নারী-বৈমানিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন—কিন্তু ইনি ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার প্রায় এক বৎসর পরে আমেরিকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এই সময়ে মিস্ বারনেটা নামক একজন মহিলা অতি বিখ্যাত বৈমানিক ছিলেন। এই মহিলাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম রাত্রিকালে বিমান চালান। রাত্রিকালে এরোপ্লেন চালানো এই সময় লোকে অতি বিপদজনক এবং একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে করিত।

মিস লিলিয়ান টড নামে একজন মহিলা একটি এরোপ্লেন তৈয়ার করেন। আর কোনো নারী-বৈমানিক এরোপ্লেন তৈয়ারি করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের বিষয়, এই এরোপ্লেনের উপযুক্ত মোটর না পাওয়ায় ইহাকে আকাশে উঠানো সম্ভব হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সকল দেশেই (স্বাধীন) নারীরা পুরুষদের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের মত এই বিষয়েও সমান পাল্লা দিতেছেন। নারীদিগকে বিমান-চালনা শিখাইবার জন্য বহু শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বহু মহিলা বৈমানিকের কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতেছেন।

বিশেষ করিয়া আমেরিকা এবং জার্ম্মানিতে বহু মহিলা-বৈমানিকের কাজ করিবার জন্য বহু শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। এই দুই দেশে অন্যদেশ অপেক্ষা শিক্ষালয়ের সংখ্যাও বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

ভারতবর্ষে ভারতীয় পুরুষদের জন্ত বৈমানিকের কাজ শিক্ষা করিবার কোনো প্রকার বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। দুই-একজন ভারতের বাহিরে গিয়া এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কয়েকজন এখনও শিক্ষালাভ করিতেছেন।

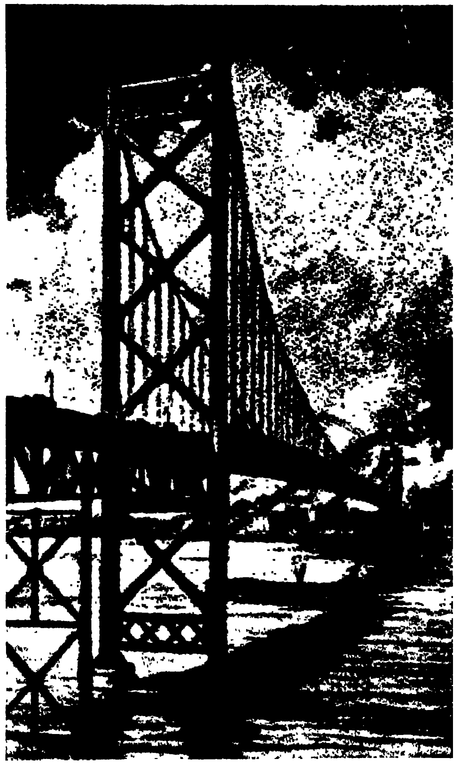
বৃহত্তম সেতু—

কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি সেতু তৈয়ার হইতেছে। এই সেতুর নাম- "অ্যাম্‌বাসাডর ব্রিজ' হইবে এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে খরচ পড়িবে প্রায় ৬ কোটি টাকা। পুলটি ডিট্রয়ট (Detroit) এবং স্যাণ্ডইচ এই দুই শহরকে যুক্ত করিবে। ১৯২৯ সনের ১লা জুলাই এই পুল নির্ম্মাণ শেষ হইবে।

সমস্ত পুলটি ৭৪০০ ফুট লম্বা এবং ইহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল লম্বা হইবে। পুলের মাঝখানের (জল হইতে) উচ্চতা ১৫২ ফুট; বড় বড় জাহাজ ইহার নীচ দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিবে।

এই সেতু-নির্ম্মাণে ২৪০০০ টন ইস্পাৎ, ২৫০০০ টন পাথর-কুচি ইত্যাদি কংক্রিট মসলা, ৪০০০০ পিপা সিমেণ্ট খরচ হইবে। সেতুর উপর রাস্তার আয়তন ৬০,০০০ বর্গ গজ এবং ফুটপাথের আয়তন ৮০০০ বর্গ গজ হইবে।

পুলের লোহা, তার ইত্যাদিকে জলীয় বায়ু হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বিশেষ এক প্রকার পালিস দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইবে। এই পালিসের উপর দস্তা এবং কয়েকবার রং লাগাইয়া দেওয়া হইবে। সর্ব্বশেষে এই সকল লোহার খুঁটি ইত্যাদি এবং কেবল্ বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক রকম নরম তার দিয়া জড়াইয়া রাখা হইবে।



দুই দেশের মিলন-সেতু—অ্যামবাসাডর ব্রিজ

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৭) কুআলা-লুম্পুরের জের।

বুধবার, ৩রা আগষ্ট ১৯২৭।—

সকালে কবি বেশ প্রফুল্লচিত্ত। আমাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় খানিক খুব আলোচনা চ'ল্‌ল—বংশ-পরম্পরা-গত মানসিক প্রবণতা এক দিকে, আর এক দিকে দেশের জল-বায়ুর পারিপার্শ্বিক, Heredity vs. Climate and Environment, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টার প্রভাব মানুষের মনে বেশী ক'রে হয়। এ বিষয়ের নিষ্পত্তি অবশ্য হ'ল না, কিন্তু দেশের প্রকৃতির প্রভাবটি যে একটি মস্ত জিনিস, heredity-কেও যে ব'দলে দেয়, এই মতবাদের অনুকূল কবির মত।

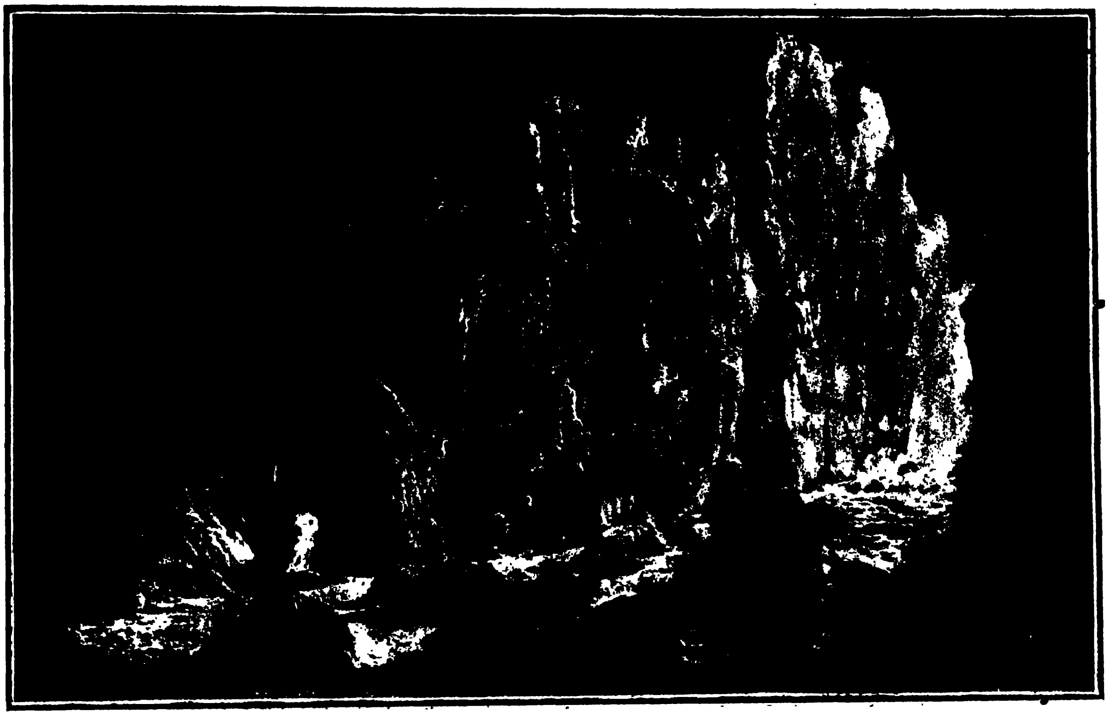
ফেডারেটেড-মালায়-ষ্টেট্‌স-এর সরকারী ছাপাখানায় গিয়ে মালাই জাতি আর সভ্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি বই কিনে আনা গেল। আর স্থানীয় বিবেকানন্দ তামিল স্কুল দেখে এলুম। এটী তামিল মেয়েদের ইস্কুল, স্থানীয় হিন্দু তামিল ভদ্রলোকেদের উৎসাহে স্থাপিত হ'য়েছে। ইস্কুলটী বেশ চ'লছে; অনেকটা জায়গা জুড়ে বাড়ী, বড়ো বড়ো

ঘর, অনেকগুলি ছোটো বড়ো মেয়ে প'ড়ছে ; তামিলদের যোগ্যতার পরিচায়ক এই ইস্কুলটী দেখে বেশ খুশী হ'লুম।

২০ শে জুলাই আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছেচি। এ পর্য্যন্ত এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সকল জাতির লোকে উচ্ছ্বসিত ভক্তি আর শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে সম্বর্দ্ধনা ক'রেছে, কোনও জায়গায় একটুও বিরোধভাবের প্রকাশ বা পরিচয় পাইনি। সাধারণ ইউরোপীয়েরা কিন্তু এ-দেশে ভারত-বাসীদের অতি হীন চোখে দেখে থাকে, কুলীর জাত ব'লে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতের লোক হ'য়ে এদেশে এসে রাজাধিরাজের চেয়েও বেশী সম্মান পাচ্ছেন, সকলেই ভক্তি আর ভালোবাসার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ ক'র্ছে—এই ব্যাপারটী কিন্তু আমাদের সুপরিচিত এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান মনোবৃত্তির অধিকারী অনেক শ্বেত-চর্ম্মের কাছে বড্ড একটা অস্বস্তির কথা হ'য়ে উঠেছিল ; মালয় দেশের মধ্যে দিয়ে তাঁর ভ্রমণ যে একটী বিরাট triumphal progress হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, এটা অনেকের ভালো লাগ্ছিল না। এই অস্বস্তি আর বিরূপ ভাবকে প্রকাশ ক'রলে সিঙ্গাপুরের "মালায়া ট্রিবিউন" কাগজ। এই কাগজের সম্পাদক গ্রান্‌ভিল্ রবার্টস-এর কথা আগে ব'লেছি—লোকটা কবিকে সিঙ্গাপুর না ওয়ারার বন্দর দেখাতে চেয়েছিল, আর যেদিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে আসি সেদিন সদলে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিল। শুনলুম, লোকটা ভারতীয়দের কাছে নানা বিষয়ে সাহায্য পেয়েছিল ; কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কাগজে অভিযান ক'রে এ তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিয়েছিল। ২রা আগষ্টের "মালায়া ট্রিবিউন"-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল—Dr. Tagore's Politics : রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ imperialism-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ক'রেছেন, তিনি "শাংহাই টাইমস্" সংবাদপত্রে ইংরেজদের দ্বারা চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ জা'তের রাজনৈতিক কীর্ত্তিকলাপকে কঠোর কষাঘাত ক'রেছেন, ইংরেজদের বহু নিন্দাবাদ ক'রেছেন, আরও ইঙ্গিত ক'রে হুমকী দেখিয়েছেন যে এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। এইরূপ বহু কথা ব'লে তাঁর কাছে এই সংবাদ-পত্রে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় যে, তিনি ব্রিটিশ-শাসিত মালাই দেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রছেন, রাজার আদর পাচ্ছেন, সর্ব্বত্র সমস্ত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর সহানুভূতি আর সহযোগিতা পাচ্ছেন ; বাইরে সত্যিই সেই ব্রিটিশ জাতির নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছেন কি না। ঐ দিনেরই কাগজে "শাংহাই টাইমস্"এর প্রবন্ধ ব'লে খানিকটা লেখা তুলে দেওয়া হয়।

এখন রবীন্দ্রনাথ "শাংহাই টাইমস্"এ কোনও পত্র লেখেননি। হ'য়েছিল কি, ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ শাংহাইয়ে চীনাদের উপরে ইংরেজ কর্ত্তৃক আনীত ভারতীয় শিখ পাহারাওয়ালার অত্যাচার দেখে বড়ই ব্যথিত হন, আর এই ব্যাপার নিয়ে বাঙলায় একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেটী "শূদ্র ধর্ম্ম" নামে, ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে বা'র হয়। এই প্রবন্ধ ইংরেজীতে অনূদিত হ'য়ে ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসের মডার্ণ-রিভিউ-তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী প্রবন্ধ মডার্ণ-রিভিউ থেকে নানা কাগজে উদ্ধৃত হ'য়ে ঘুরে ফিরে শেষে "শাংহাই টাইমস্" কাগজে ওঠে, আর তা থেকে "মালায়া ট্রিবিউন" এই প্রবন্ধের বিকৃত অংশবিশেষ নিয়ে কবির বিরুদ্ধে লিখ্‌তে আরম্ভ করে। ঐ সময়ে চীনে ইংরেজদের অবস্থা বড় সন্তোষপ্রদ ছিল না ; ইংরেজের বিরুদ্ধে চীনাদের শত্রুভাব, ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি, চীনের ইংরেজ অধিবাসীদের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্য ভারতীয় সেপাই যাচ্ছে, বিলেত থেকে মানোয়ারী জাহাজ যাচ্ছে। সুতরাং ঠিক সময় বুঝেই "মালায়া ট্রিবিউন্" মালাই দেশের মালিক ইংরেজদেরকে কবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রলে। আর কবির বিরুদ্ধে দেশের রাজা ইংরেজ চ'টে গেলে, ভয় পেয়ে ভারতীয় আর চীনা কেউই প্রকাশ্যে কবির প্রতি শ্রদ্ধা বা তাঁর বিশ্বভারতীর সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে সাহস ক'রবে না! উদ্দেশ্য যে ছিল এই, তাতে সন্দেহ হয় না।

"মালায়া ট্রিবিউন"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা কবির কানে উঠতে, তাঁর নামে যে প্রবন্ধ চালানো হ'য়েছে, তাতে দু চারটে কথা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ক'রে, আর কবির

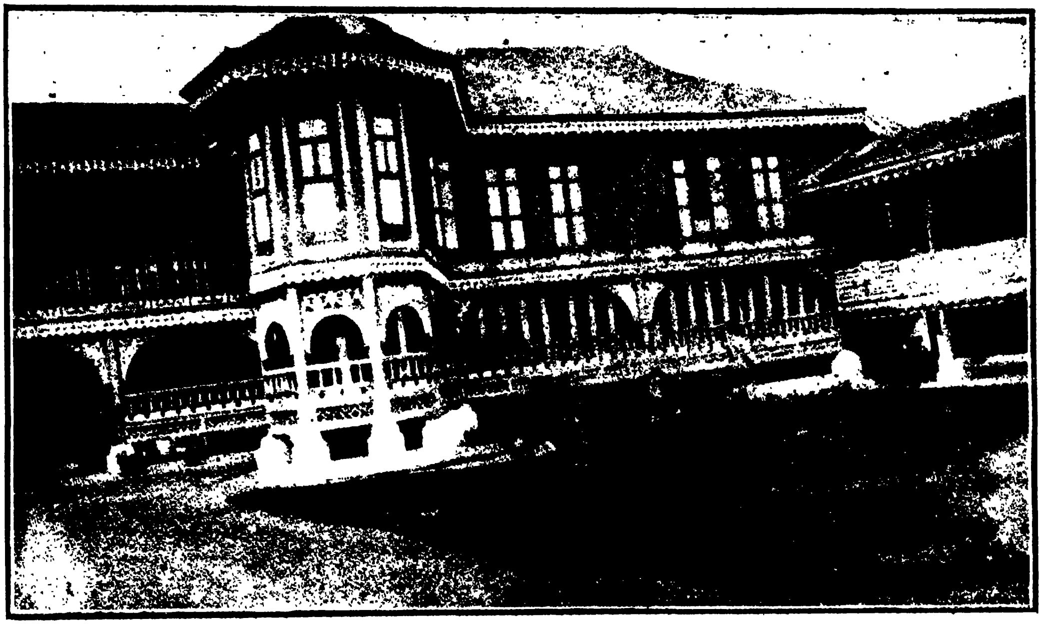


কুআলা-লুম্পুর—বাটুগুহ—ভিতর হইতে

নিজের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ক'রে ছাপানো দেখে, তিনি সিঙ্গাপুরের সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজে বিশেষ ক'রে সেই অংশের প্রতিবাদ ক'রে এক তার পাঠিয়ে দিতে ব'ললেন। "মালায়া ট্রিবিউন"-কে গ্রাহ্যই করা হ'ল না। কিন্তু তা ব'লে "মালায়া ট্রিবিউন" ছাড়লে না, দিন তিনেক ধ'রে খুব আস্ফালন ক'রলে। দু একখানা ইংরেজদের কাগজও এই ঘোঁটে যোগ দিলে। এখন মডার্ণ-রিভিউ-এর প্রবন্ধের কথা আমাদের কারু মনে ছিল না, কবিরও না। কিন্তু কুআলা-লুম্পুরের আদালতের একজন তামিল কর্ম্মচারী এই প্রবন্ধটী আমাদের গোচর ক'রলেন। একটা that কে ব'দলে and ক'রে, একটা সেমিকোলন লাগিয়ে তাঁর মডার্ণ-রিভিউ-তে ছাপা প্রবন্ধের কোনও বাক্যের অর্থ উল্‌টে দিয়েছে। কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয়দের সংবাদপত্র "মালায়ান ডেলি এক্সপ্রেস" তাদের ৬ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় এই সব কথা খুলে লিখে দিলে—Anti-Tagore bubble pricked—an object lesson in dishonest journalism—mischievous propaganda exposed ব'লে কড়া মন্তব্য লিখলে। কুআলা-লুম্পুরের ইংরেজদের কাগজ "মালায় মেল" আগে থাকতেই কবি তথা ভারতবাসীদের বিরোধী ছিল, এখন দিন দুই ধ'রে "মালায় ট্রিবিউন"-এর সঙ্গে গলা মেলালে। এদিকে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে কবি যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদেরই মতন তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছিলেন, সে মত থেকে একটুও সরেন নি, সে কথা তিনি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেন। বিরোধী ইংরেজদের কাগজের মধ্যে দু একখানা কাগজ দু তিন দিন ধ'রে বিপক্ষে লিখ্‌লে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমরাই অবাক হ'য়ে গেলুম—বেসরকারী ইংরেজ, আর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা, এই খবরের কাগজের লেখালেখি সত্ত্বেও আর চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে কবির নিজের মত স্পষ্ট ক'রে কাগজের মারফৎ শুনিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কেউ বিচলিত হয় নি। স্থানীয় কতকগুলি বিশিষ্ট ইংরেজ কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে তাঁদের কার্ড দিয়ে গেলেন, সিঙ্গাপুরের ইংরেজদের সব চাইতে বড়ো ক্লাব থেকে কবির সেক্রেটারী হিসাবে আরিয়মকে চিঠি লিখে

জানালে যে,এইরকম ঘৃণ্য কলম-বাজীর সঙ্গে ভদ্র ইংরেজের যোগ নেই ; আর কুআলা-লুম্পুরে আর তার আশপাশের দু একটী শহরে যেখানে কবি আহূত হ'য়ে গেলেন, সেখানেই রাজকর্ম্মচারী ইংরেজ আর বেসরকারী ভারতীয় মালাই চীনা আর ইউরোপীয় সকলেই এসে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত যোগদান ক'র্লেন। এটা আমাদের অনুমান হয়, মালয় গভর্ণমেণ্ট "মালায়া ট্রিবিউন"-এর এই ইম্পিরিয়ালিজ্ম্ এর আতিশয্য, যা রবীন্দ্রনাথের মত জগৎপূজ্য কবিকে অপদস্থ ক'রে নিজেরই বর্ব্বরতার পরিচয় দিচ্ছিল, তার অনুমোদন করে নি। এইসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, কবি মালয় দেশের ইংরেজ কর্ম্মচারী বা বেনিয়া বা কাগজওয়ালাদের ভয়ে বা খাতিরে তাঁর মডার্ণ-রিভিউয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ, যা নিয়ে খানিকটা জল ঘোলাবার চেষ্টা হ'ল, তার জন্য একটুও 'কিন্তু-কিন্তু' হন্ নি। এসম্বন্ধে তাঁর হ'য়ে আরিয়াম ৭ই আগষ্ট তারিখে মালাইদেশের সমস্ত খবরের কাগজে যে চিঠি লেখেন সে চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ব'লে শেষ কথা বলেন—কোনও গভর্ণমেণ্টের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যায়-বুদ্ধির অনুমোদিত উক্তিকে প্রত্যাহার ক'র্তে পারেন না,তাতে এও বলা হয় ;—আর এই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটাও চুকে যায়। কুআলা-লুম্পুরের "মালায় মেল"-এর লোক এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁর রাজনৈতিক মত যাই হোক্ না কেন, ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি রকম ; তখন তিনি বলেন যে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আর অন্য বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্বেও, ব্যক্তিগত ভাবে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুভাব আছে, লর্ড লিটন্ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসেন, তাঁকে লাট-বাড়ীতে আমন্ত্রণ করা হয়, আর বাঙলার লাটেরা তাঁরও আতিথ্য স্বীকার ক'রেছেন।

ব্যাপারটা তো সহজেই মিটল মালাই দেশে, কিন্তু ভারতে তার ঢেউ এসে পৌঁছুলো। দেশে ফিরে শুনলুম, এই নিয়ে দেশের খবরের কাগজের মধ্যে দুই একটীতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অবর্ত্তমানে৷ তাঁর দেশের লোকের চোখে হীন প্রতিপন্ন কর্বার চেষ্টা হ'য়েছে। ভারতের তথা রবীন্দ্রনাথের পরম হিতৈষীরা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে মালাই দেশের এই সব ভারতীয়দের বিরোধী ইংরেজদের খবরের কাগজের মন্তব্য পাঠিয়ে দেয়। তা থেকে জাতীয়তার উদ্বোধক এই দেশী কাগজগুলিতে মোটা হরফের শিরোলিখন দিয়ে এইরূপ ইঙ্গিত করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে যা ব'লেছিলেন, মালয় দেশে গিয়ে সেখানকার ইংরেজদের খুশী রাখবার জন্য তিনি নিজ উক্তির প্রত্যাহার ক'রেছেন। একেই ইংরেজী প্রবচনে বলে, পিছনদিক থেকে ছুরী মারা। অমনি বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের একজন দিগ্‌গজ মোড়ল, যিনি নিজের সম্বন্ধে নাকি ছাপায় উক্তি ক'রেছেন যে সাহিত্য রঙ্গমঞ্চের আসরে তিনি অনেক নাচ-ই নেচেছেন, সম্প্রতি অবসর নিতে চাচ্ছেন, তিনি কাগজে চিঠি লিখে তাঁর righteous indignation ব ন্যায্য ক্রোধ প্রকাশ ক'রলেন যে, লাটবাড়ীর ভোজের আর আরামের লোভে বুড়া বয়সে রবীন্দ্রনাথ সাহসের অভাব দেখিয়ে কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত হ'য়ে নিজের উক্তিগুলি ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। হায়রে, ইউরোপের স্বাধীন রাজারা যাঁকে সম্মানের স্থান ডানদিকে বসিয়ে খাওয়াতে পার্লে কৃতার্থ হয়, যাঁর বাড়ী ব'য়ে এসে নিজ দেশে যাবার জন্য যাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে যায়, এক একটা সমগ্র জা'তের কাছ থেকে যাঁর জন্য নিমন্ত্রণ আসে, —পৃথিবীর প্রধানতম কবি ব'লে বিশ্বজগতের তাবৎ শিক্ষিত লোকে যাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছে, যিনি নিজের আর নিজের দেশের মর্য্যাদার কথা আর জগতের শ্রেষ্ঠজন-গণের মধ্যে নিজের আসন কোথায় তা বিলক্ষণ বোঝেন,—তাঁর সম্বন্ধে আমাদের গেঁয়ো ঘোঁট-মজলের পাণ্ডা, নূতন পরকীয়াতন্ত্রের সাহিত্যের ওস্তাদ এসে শিষ্টজনোচিত ভদ্র ভাষা প্রয়োগ ক'রে বল্ছেন to save his skin and to retain for himself the comfort and the honour of the Government hospitality ইত্যাদি, আগষ্টের ৩রা তারিখে, "মালায়া ট্রিবিউন্" কবির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ ক'রলে, আর তার দিন ১৩৷১৪ আগে কবি কেন এই আক্রমণের প্রতিবাদ করবার জন্য ২০শে ২২শে জুলাই যখন তিনি সিঙ্গাপুরে লাটের অতিথি ছিলেন তখন লাট-বাড়ী ত্যাগ ক'রে humblest Chinese



কুআলা কাংসার—আস্তানা পুত্র—নূতন রাজবাটী

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র]

dwelling-এ গেলেন না—এটা কবির অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাঁর কাপুরুষতা। জবর psycho-analyst, তারিখের আর ঘটনার ক্রমের সম্বন্ধে একটু "ব্যাভ্রোম" হয়। সেই যে গল্পে আছে, মিঞা সাহেব স্বপ্ন দেখলেন, বিবির পর উঠেছে; পর উঠেছে তো চিঁড়িয়া, আর চিঁড়িয়া তো একেবারে মুরগী—অম্‌নি নিদ্রিত অবস্থায় ছুরি নিয়ে বিস্‌মিল্লা ব'লেই গলায় আড়াই প্যাঁচ।

অপ্রিয় কথার আলোচনা যাক্। ব্যাপারটা নিয়ে দেশ-উদ্ধারের sole agency প্রাপ্ত মোসাহেবী-মার্কা স্বাধীনতার জন কতক অগ্রদূত (যারা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ফিরিঙ্গী পর্ত্তুগীস এই অপূর্ব্ব তথ্য একাধিকবার প্রকাশ ক'রে নূতন গবেষণার পুলকে আত্মহারা হ'য়ে গড়াগড়ি দিয়েছিল) রবীন্দ্রনাথের অবর্ত্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ইতর ঘোঁট তুলেছিল ব'লেই, কথাটার অবতারণা ক'রে রবীন্দ্রনাথের সাথী হিসেবে দেশবাসীর কাছে যা ঘ'টেছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখলুম।

আজ দুটোর পরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ইস্কুল ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনে কবির বক্তৃতা ছিল। ছেলেরা আর মাষ্টাররা, আর স্থানীয় বহু শিক্ষিত ইংরেজ জড়ো হ'ল। ছেলেদের মধ্যে চীনা আর মালাই-ই বেশী, কিছু সিংহলী আর তামিল আছে; পাগড়ী মাথায় দুই একটি শিখ ছেলেকেও দেখলুম। নানা জাতের সমাবেশ এই দেশে, যারা এদেশে বসবাস ক'রছে তাদের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র হ'চ্ছে ইংরেজী ভাষা আর ইংরেজী শিক্ষার যোগসূত্র। চীনা, মালাই, তামিল, পাঞ্জাবী—একই ইংরিজি বা ফিরিঙ্গিয়ানা ভাবে গ'ড়ে উঠছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা নেই, বা নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় নেই। এরা যাতে কালা বা হ'লদে ইংরেজ ব'নে যায়—এই হ'চ্ছে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর অবস্থাগতিকে, এই উদ্দেশ্য না হ'য়েই বা যায় কি ক'রে? কি রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার—কোথায় চীনা, কোথায় তামিল, কোথায় পাঞ্জাবী, কিন্তু একস্থানে এসে এরা মিলিত হ'ল, আর এক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ইংরেজের অধীনে এদের যেন এক কড়ায় ঢেলে গালিয়ে নেওয়া হ'চ্ছে। এর ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে তা কে জানে?—ইস্কুলে কবি ছোটো একটা বক্তৃতা দিলেন, আর "শিশু"র তরজমা Crescent Moon থেকে কিছু প'ড়ে শোনালেন।

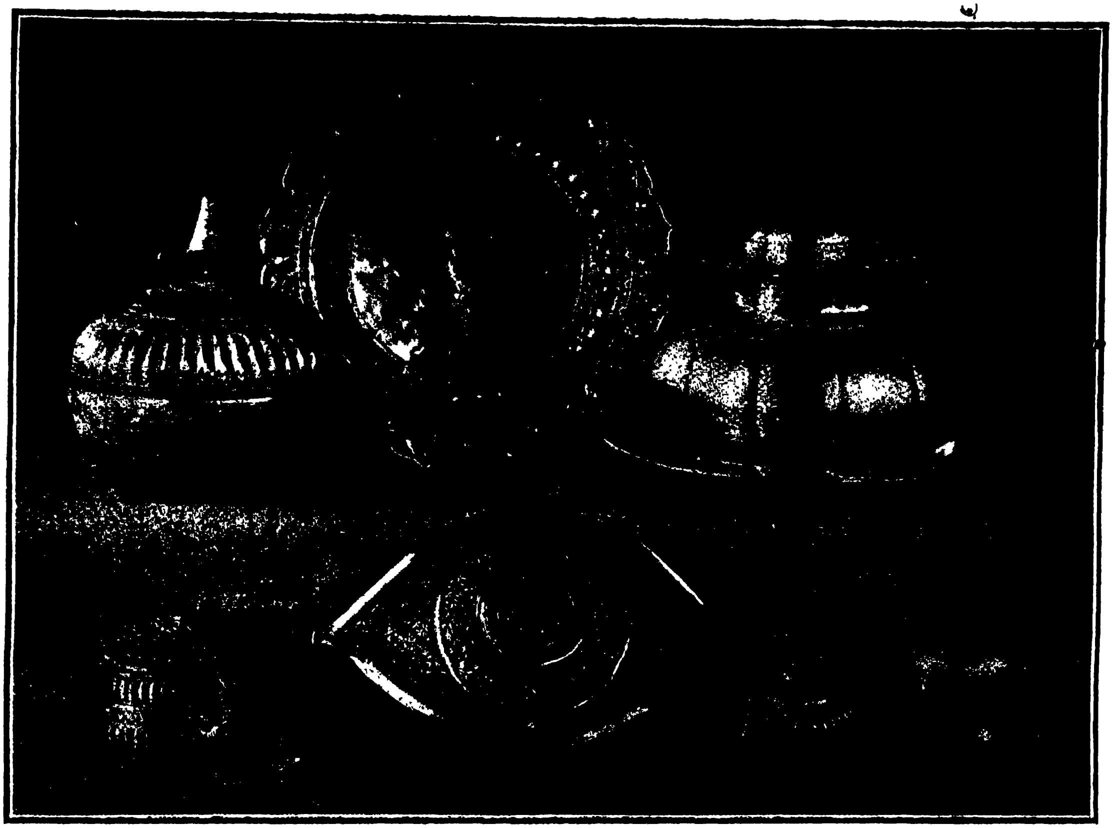
তারপরে কবিকে মোটরে ক'রে নিয়ে গেল Seremban সেরেম্বানে, Negri Sembilan নেগরি সেম্বিলানের রাজধানী এই শহর। তিনি সন্ধ্যার দিকে সেখানে পঁউছুবেন, সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা, পরের দিন দুপুরের মধ্যে ফিরবেন। ধীরেন বাবু আর আমি র'য়ে গেলুম। বিকালে আমরা ফ্যঙ-এর সঙ্গে গেলুম কুআলা-লুম্পুর শহরের মাইল কতক উত্তরে ঐ দেশের এক দর্শনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দেখতে—বাটু পাহাড়ের বিরাট গুহা। এক্‌টী পাহাড়ের পাদদেশে মোটর থেকে নামতে হ'ল। গোটা কতক সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের সানুদেশে ওঠা গেল, সেখানে অল্প একটু সমতল জায়গা, স্বাভাবিক বারান্দার মতন। আশে পাশে কতকগুলি বিরাট বিশাল মহীরুহ। একটি ছোটো ঝরনা। মনোরম স্থান, অল্পের মধ্যে পাহাড় আর অরণ্যানীর মিশ্রন। বারান্দার সামনেই গুহার মুখ। চূনা পাথরের পাহাড়। গুহার ভিতরে যথেষ্ট আলো আছে। ভিতরটা তিন চার তালার সমান উঁচু হবে। গুহার ছাত থেকে পাথর জমাট বেঁধে বট গাছের ঝুরির মতন যেন নীচে নেমে আসবার চেষ্টা ক'রেছে; তাতে ভারতের প্রাচীন যুগের কোনও মন্দিরের ভিতরের পদ্মকাটা পাথরের চাঁদোয়া, বা মধ্যযুগের ইউরোপীয় গথিক গির্জ্জার ছাতের ভিতরের দিক্‌কার সাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোণে কোণে, আলো-আঁধারীর মধ্যে, সাম্‌নে ছোটো বড়ো বিরাট পাথরের লম্বা লম্বা চাবড়া খাড়া র'য়েছে, সেই সবগুলি দূরথেকে দেখে নানাপ্রকারের মানুষ দৈত্য দানব পশু পক্ষী যেন প্রস্তরীভূত হ'য়ে র'য়েছে এই রকম কল্পনা করার একটা প্রবৃত্তি সহজেই জেগে ওঠে। পরে সুরেনবাবুর সঙ্গে আর একবার এই গুহা দেখতে আসি, শিল্পীর কল্পনা—সুরেনবাবু ব'ললেন, এইসব পাথর যেন দিনের আলোয় পাথর, রাত্রে এরা বেঁচে ওঠে, আর নিজের নিজের রূপ ধ'রে এই গুহার ভিতর অতীত জীবনলীলার পুনরভিনয় করে। গুহার ভিতরটার পরিসর খুব বেশী নয়। পাহাড়টাকে কিন্তু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে গুহা, গুহার অপর পারে পাহাড়ের আর এক অংশ, সেখান থেকে আকাশ দেখা যায়, পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে চড়া যায়। এটী যেন একটি প্রকৃতির তৈরী মন্দির; মধ্যযুগের হিন্দুমন্দিরের বা খ্রীষ্টান cathedral বা গির্জ্জাঘরের পরিকল্পনা মানুষ যেন এই রকম গুহা দেখেই ক'রেছিল। গুহার বাইরে গুহামুখের পাথরের গায়ে চীনারা এসে নিজেদের অক্ষরে কি খুঁদে রেখে গিয়েছে; আর গুহার ভিতরে এক কোণে তামিলেরা একটি মন্দির ক'রে নিয়েছে—সেখানে এক ব্রাহ্মণ শিব সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি নিয়ে প্রদীপ জেলে ব'সে আছে। বলা বাহুল্য, এই মন্দিরে পূজার জন্য সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থদান ক'রে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করা গেল।

বহুদিন পরে একটি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম।

কুআলা-লুম্পুর থেকে যেতে হবে Ipoh ইপো-তে—এটি Perak পেরাঃ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো শহর। ইপো-তে ৯ই আর ১০ই তারিখে মালাইদেশের সরকারী আর অন্য ইস্কুলের শিক্ষকদের একটি সম্মেলন হবে, কবিকে তার উদ্বোধন ক'রতে হবে, আর কথা হ'ল যে এই উপলক্ষ্যে আমাকে এক প্রবন্ধ প'ড়তে হবে। ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রবন্ধ। ক'দিনে একটু আধটু সময় ক'রে নিয়ে প্রবন্ধটা লিখে ফেলতে হবে। আজ রাত্রে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করা গেল।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আগষ্ট।—

কবি দুপুরে সেরেম্বান থেকে ফির্‌লেন। বিকালে এক বিশেষ চা-পান সভা আহ্বান ক'রে স্থানীয় চীনারা কবিকে সংবর্দ্ধনা ক'রলে, আমাদের বাসাবাড়ীর হাতায়। অনেকগুলি চীনা ভদ্রলোক এসেছিলেন, আর সিংহলী আর ভারতীয়ও অনেকে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। যথারীতি বক্তৃতা শিষ্টাচারাদি হ'ল। এই চা-পান সভায় ফোটো নেওয়ার পালা এল, অনেকেই সঙ্গে ক্যামেরা এনেছিল, ফোটো তুললে। বাঙালী মহিলা কয়জন ছিলেন, কেবল কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁরা এই সভায় উপস্থিত হন। নিজের ছবি ওঠাতে এঁরা নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল যে সে লোক এসে, একই সভায় উপস্থিত হয়েছি ব'লে ছবি তুলে নিয়ে যাবে, এ বড়ো উৎপাত। একটা আধবুড়ো লোক, জা'তে সিংহলী, নানা দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এঁদের ছবি নেবার চেষ্টা



পানের ডিবা — থালা — জলের ঘটী

কৌটা — কোমরবন্ধের বগলস্ — চূণের কৌটা

মালাই দেশের রূপার কাজ

ক'র্‌ছিল। লোকটা অতি অভব্য। কিন্তু দেখে খুশী হ'লুম, তার ছবি নেওয়া হ'ল না। মহিলারা একটি টেবিলের চার ধারে ব'সেছিলেন, লোকটার ছবি নেবার মতলব বুঝতে পেরে এঁরা অতি সহজভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু এ নাছোড়বান্দা। ব্যাপারটা দেখে আমরা একবার ধীরে ধীরে এসে তার ক্যামেরার সামনে আড়াল ক'রে দাঁড়ালুম। তখন আস্তে আস্তে সে স'রে গেল, আর বিরক্ত ক'রলে না। বাঙালী মেয়েদের স্বাভাবিক এই শালীনতাটুকু আমাদের ভালোই লাগ্‌ল।

রাত্রে এখানকার টাউনহলে আমাকে আর আরিয়ামকে ম্যাজিক লান্টার্ণের সাহায্যে বক্তৃতা দিতে হ'ল। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছ থেকে ভারতীয় স্থাপত্য আর ভাস্কর্য্য আর ভারতীয় চিত্রকলার কতকগুলি স্লাইড নিয়ে এসেছিলুম; এই সব স্লাইড দেখিয়ে 'ভারতীয় চিত্রশিল্পের উপরে হ'ল আমার বক্তৃতা, আর আরিয়ামের কাছে ছিল শান্তিনিকেতনের স্লাইড। ঘণ্টা দুই লাগ্‌ল দুটো বক্তৃতায়—ভীড় হ'য়েছিল বেশ, লোকে পালাল না, বিষয়টা নোতুন ছিল, অনেকে তাই মন দিয়ে চুপ ক'রে শুন্‌লে; বক্তারা এতেই খুশী।

শুক্রবার, ৫ই আগষ্ট।—

বিকালে আমরা কবির সঙ্গে Klang ক্লাঙ্‌ ব'লে একটি ছোটো শহরে গেলুম। কুআলা-লুম্পুরের পূবে, বাইশ মাইল রাস্তা মোটরে যাওয়া গেল। দেশটি এখানে চমৎকার, সবুজে ভরা, রবারের আর না'রকল গাছের ঘন বন, ছোটো ছোটো ঢালু পাহাড়ে উঁচু নীচু পথ। ক্লাঙ-এ স্যার ম্যাল্‌কম্‌ ওয়াট্‌সন্‌ নামে একজন ইংরেজ রবারের বাগান ক'রে বাস ক'রেছেন। ইনি এ অঞ্চলে একজন নামী সরকারী ডাক্তার ছিলেন, ম্যালেরিয়া

সম্বন্ধে একপত্রী। কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই দেশেই র'য়ে গিয়েছেন। এক পাহাড়ের উপর তাঁর চমৎকার বাড়ীটী, আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। স্থানীয় ভারতীয় চীনা মালাই আর ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের আগমন হ'য়েছিল এঁরই বাড়ীতে, কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। স্যর ম্যালকম্ অতি অমায়িক লোক, বিশেষ শিক্ষিত, কবির ভক্ত পাঠক। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে, একত্র চা-পান ক'রে আমাদের ঘণ্টাখানেক বেশ কাটল। তারপর শহরে এলুম। এখানকার এংলো-চাইনীস্ ইস্কুল ঘরের হলে সভা। কবিকে বাইরে দাঁড়িয়ে সমাগত জনমণ্ডলীর আর ছাত্রদের কাছে দর্শন দিতে হ'ল, হল-ঘরে সকলের স্থান হওয়া অসম্ভব। স্যর ম্যালকম কবির একটি অতি সুন্দর পরিচয় দিলেন, অতি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কবির মহত্ব, আর কি ভাবে তিনি নিজে তাঁর কাছে ঋণী তার কথা ব'ললেন। কবি একটু বক্তৃতা দিলেন, তারপর তাঁর ইংরেজী বই থেকে কিছু কিছু কবিতা প'ড়লেন। ইংরেজ মেয়ে পুরুষ অনেকে ছিল। কবি যখন Crescent Moon থেকে শিশুর বিদায় কবিতাটির অনুবাদ প'ড়ছিলেন, একটি ইংরেজ মেয়ের চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল প'ড়ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে রুমাল দিয়ে উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টা দেখলুম। এই রকমে বৈকালটি অতি আনন্দে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরেই কুআলা-লুম্পুরে আমরা বাসায় ফিরলুম। রাত্রে মনোজবাবুর বাড়ীতে আহার হ'ল—আর সেখানে অন্য নানা ভারত-বাসীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আর আলাপ হ'ল।

একজন চীনা লক্ষপতি আমাদের ব্যবহারের জন্য তাঁর মোটরগাড়ী দিয়েছেন। কবিকে একদিন তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এঁর পিতা চীন দেশ থেকে নাকি সামান্য কুলী হ'য়ে মালাই দেশে আসেন। কিন্তু ক্রমে ব্যবসায়ে হাত দিয়ে কোটি ডলারের মালিক হ'য়ে মারা যান। স্কচ বণিকদের পরামর্শে ছেলেকে স্কট্‌লাণ্ডে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পাঠান। পড়াশুনো কিছু হয়নি। কিন্তু ছেলে বিষয় বুদ্ধি খোয়ায় নি। যদিও একটু আজগুবী জিনিসে বিশ্বাস করে। এক তামিল জ্যোতিষী এর ঠিকুজী তৈরী ক'রে ভাগ্য গণে এর কাছে অনেক পয়সা নিয়েছে। এর মনে বিশ্বাস, কবিও একজন অলৌকিক শক্তিশালী যোগী, গণৎকার, দয়া হ'লেই তাকে বৈষয়িক tip দু একটা দিতে পারেন।

শনিবার, ৬ই আগষ্ট।—

সকালে বন্ধু-সমাগম। তিনটেয় চীনাদের Confucian School-এ কবির বক্তৃতা, তার পরে Kajang কাজাং ব'লে কুআলা-লুম্পুরের দক্ষিণে একটি ছোটো শহরে বিকালের মতন কবি গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এলেন। রাত্রে সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত তালালার বাড়ীতে ছিল নৈশ ভোজ। এখানে পরিচিত ভারতবাসী অনেকেই ছিলেন। বহু সিংহলীর মতন তালালা একেবারে সাহেব ব'নে গিয়েছেন। ঘরে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে ইংরিজিই বলেন। মেয়েদের পোষাক ইংরিজি। দুই ছেলে, একজনের নাম Cyril, আর একজনের Cecil, বা ঐ রকম একটা "কুসুম-পেলব" নাম। এরা মোটেই সিংহলী জানে না। এই নানা জা'তের মিশ্রণের দেশে সকলেরই অবস্থা ক্রমে এই রকমই দাঁড়াবে। বাঙলা ভালো জানে না, এ রকম বাঙালী ছেলেও তো এই দেশেই দেখেছি। যাক্, তালালারা মানুষ হিসাবে চমৎকার। এই ভোজন-সম্মেলনে আমি সবচেয়ে বেশী খুসী হ'য়েছিলুম, এক মালাই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে। মালাই দেশে এসে এতদিন পরে এই প্রথম একজন উচ্চবংশের আর উচ্চ শিক্ষিত মালাইয়ের সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করবার সুযোগ হ'ল। এঁর নাম Dato' Rambau দাতোঃ রাম্বাউ। 'দাতোঃ' অর্থে ক্ষুদ্র রাজা। ইনি বিলেত-ফেরত, স্থানীয় এফ্-এম্-এস্ কাউন্সিলের সদস্য। মালাই ভাষা, মালাইদের সংস্কৃতি ইত্যাদির আলোচনা, রক্ষা আর উন্নতিকল্পে মালাই জা'তের মধ্যে কোনও সচেতন চেষ্টা আছে কি না, শিক্ষিত মালাইরা এ বিষয়ে অবহিত কি না—এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় জানলুম যে এ সব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত মালাই কেয়ার করে না। মালাই জা'তের নিজস্ব শিল্প প্রায় সর্ব্বত্রই লোপ পেয়েছে। এক সুদূর মফস্বলে যা কোথাও কোথাও একটু-আধটু আছে। তবে কলা-শিল্প রক্ষার জন্য ইংরেজরা সচেষ্ট ; আর মালাই জা'তের মধ্যে যে

কলাকৌশল বিদ্যমান সেটা যাতে লোপ না পায়, সেজন্য পেরাঃ-রাজ্যের রাজা তাঁর রাজধানী কুআলা-কাঙ্সার-এ একটী শিল্পবিদ্যালয় খুলেছেন। এ ছাড়া মালাই জা'তের ছোকরাদের জন্য একটী গুরু-ট্রেনিং বিদ্যালয় আছে,—এখানেই যা অল্পস্বল্প মালাই ভাষার অনুশীলন হয়। আর সাহেবেরা (সরকারী কর্ম্মচারী আর মিশনারী দুইয়ে) মিলে কিছু কিছু মালাই ভাষা আর সাহিত্যের চর্চ্চা ক'রেছে। আমি ব'ললুম, আচ্ছা', আপনারা শিক্ষিত লোকে মিলে একটা মালয়-সাহিত্য-পরিষৎ করুন না কেন, তাহ'লে তো আপনারা মিলে আপনাদের ভাষা আর সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে দিয়ে নিজেদের বিপর্য্যস্ত জাতীয় সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ক'রে একটী গৌরবের বস্তু ক'রে তুলতে পারেন; আপনাদের জা'তের মধ্যে কল্পনা আছে, কবিত্ব-শক্তি আছে—আপনাদের প্রাচীন গদ্য কাব্য আর বীর-গাথা তো উঁচু দরের জিনিস; আপনাদের গীতি কবিতা 'পান্তুন্'-এর নাম আর রূপ, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের খোঁজ যিনি রাখেন তিনিই জানেন; তাছাড়া আপনাদের কারিগরের হাতের রূপার কাজ, জরীর আর রেশমের কাপড়, বেত বোনার কাজ—এ সব কলা-শিল্প হিসাবে খুবই সুন্দর;—এ সব জিনিস থেকে কেন আপনারা বঞ্চিত হন, আর জগৎকেও বঞ্চিত করেন? A federation of all cultures; সব জাতির সংস্কৃতি মিলে একটী বিরাট সভ্যতা-সংঘ—তাতে আপনার জা'তেরও স্থান থাকা উচিত। ইনি বেশ ধীরভাবে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, আমায় ব'ল্লেন—মহাশয় আপনি যা ব'লছেন ঠিক বটে একটী মালাই ভাষা-সাহিত্য আর সভ্যতা-সংরক্ষণী সভার আবশ্যকতা হ'য়েছে; শিক্ষিত মালাইদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার; এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে আরো আলাপ ক'রতে চাই। সে'দিনের মতন এঁর সঙ্গে আলাপ শেষ হ'ল। পরে শ্রীযুক্ত ভালালা এঁর সঙ্গে আমার পুনর্দর্শন করাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু কি একটা জরুরী মীটিংএ এঁকে কোথায় চ'লে যেতে হয় ব'লে এই মালাই সজ্জনটীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

(৮) ইপোঃ।

রবিবার, ৭ই আগষ্ট।—

আজ আমরা কুআলা-লুম্পুর ত্যাগ ক'রলুম দুপুরের গাড়ীতে। বাড়ী থেকে বিদায় নেবার আগে চীনা চাকর



আরিয়াম্, লেখক, ক্যাঙ্, ধীরেন্দ্রনাথ
[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর গৃহীত আলোকচিত্র]

আর খানসামারা এল—হাত জোড় ক'রে কবিকে প্রণাম ক'রলে। এদের নিঃশব্দে অতি ক্ষিপ্র দক্ষতার সঙ্গে কাজ ক'রে যাওয়া, আর এদের চির-প্রফুল্ল ভাব চিরকাল আমাদের মনে থাকবে। একটী বুড়ো চাকর ছিল, তার যত্ন,—আর একজন ছোকরা তার সদানন্দ হাসিমুখ আর তার নাম "আ-হয়" ব'লে তাকে ডাক্‌লেই তার একগাল হাসি কখনও ভুলবো না।

শহরের অধিকাংশ ভারতীয় আর চীনা বন্ধুরা ষ্টেশনে এলেন আমাদের রেলে তুলে দিতে। ইপোর পথে

মাঝে দুটো ষ্টেশনে কবিকে সংবর্দ্ধনা করা হ'ল, অভিনন্দন পত্র পড়া হ'ল, মালা দেওয়া হ'ল। যেখানে গাড়ী থামে, সেখানেই কবিদর্শনার্থী লোকের ভীড়। বাঙালী ভদ্রলোকও দু চার জন এলেন, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ীতে ইপো থেকে আগত ভারতীয় আর চীনা কতকগুলি ভদ্রলোক ছিলেন, ইপো শহরের অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে এঁরা আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ীতে চং-লিং ব'লে একটী চীনা ভদ্রলোক কবির সঙ্গে চীনাদের ধর্ম্মজীবন নিয়ে আর সাধারণ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা নিয়ে বেশ সদালাপ ক'রলেন।

এবারকার পথটাও বেশ পাহাড়ে' পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বন পুড়িয়ে জঙ্গল সাফ করা হ'চ্ছে, রবারের বাগান হবে সেখানে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ইপোতে পৌছানো গেলো। এখানে ষ্টেশনে পূর্ব্ববৎ ভীড়। পেরাকের রাজার বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, রাজার তরফ থেকে তাঁর মন্ত্রী Raja Bendahara রাজা বন্দাহারা ষ্টেশনে এসে কবিকে স্বাগত ক'রলেন।

সোমবার, ৮ই আগষ্ট।—

রাজার বাড়ী যে রাস্তায়, তার নাম Jalan Astana অর্থাৎ রাজার আস্থানের বা প্রাসাদের সড়ক। মালাই দেশে মালাই ভাষায় রাস্তার নামকরণ, বেশ লাগল। কলিকাতায় এটা এখনও হ'ল না, হবে কিনা তাও জানি না; সেই অনাবশ্যক 'ষ্ট্রীট, রোড লেন, স্কোয়ার, এভেনিউ', ইত্যাদি; সড়ক, রাস্তা, গলি, চত্বর, কুঞ্জবীথি—এসব বাঙলা কথা বাঙলা অক্ষরে লেখা নামের ফলকে স্থান পেলে না। অথচ পশ্চিমের শহরে New City Road হিন্দী আর উর্দ্দুতে 'নয়া শহর সড়ক' বলে লেখা হ'চ্ছে। এই দেশে উপনিবিষ্ট একজন তামিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, এঁর নাম শ্রীযুক্ত গুণরত্ন ডসন (Dawson), ইনি ভারতীয়দের তরফ থেকে আমাদের তদ্বির করবার জন্য রইলেন। পেরাকের রাজার এক কর্ম্মচারীও ছিল; এই ভদ্রলোকটী মালাই জাতীয়, নাকে চোখে রঙে মালাই, কিন্তু খুব ভারিক্কে চেহারা, বিরাট-বপু, পাঠান বা খাঁটী আরবের মতন চেহারা। এর নামটী হচ্ছে' "ইওপ্"।

আজকের দিনে নানা কাজ। মালাই দেশের শিক্ষকদের সম্মেলনের উদ্বোধন হ'ল সকালে। প্রথম অধিবেশনে স্থানীয় এক ইংরেজ জজ সভাপতি হলেন, কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল। দেশটায় জীবনযাত্রা সহজ, পয়সাও শস্তা, তাই লোকের মনে শ্রমসাধ্য cultureএর প্রতি টান হওয়া শক্ত, —এই রকম কথা ব'লে সভাপতি তাঁর বক্তৃতার অবতারণা ক'রলেন, আরও ব'ল্‌লেন যে কবির আগমনের ফলে দেশে একটা culture এর হাওয়া বইবে আশা করা যায়, ইত্যাদি। সম্মেলনের একজন নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত নবরত্নম্ ব'লে একটী তামিল ভদ্রলোক, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ী, খর্ব্বাকার, শ্যামবর্ণ পাতলা একহারা মানুষটী, একটু খোষ-পোষাকী; তিনি তাঁর অভিভাষণ প'ড়লেন। মালাইদেশের শিক্ষকদের এক পরিষৎ, বহু চেষ্টার পর বিলেতের ইস্কুলমাষ্টারদের সঙ্ঘের সঙ্গে তাদের শাখা হিসেবে গৃহীত হ'য়ে যুক্ত হ'য়েছে, এইটে ছিল অভিভাষণের একটী প্রধান কথা। এতে নাকি মালয় দেশের শিক্ষাবিভাগের শ্বেত-চর্ম্মদের আপত্তি ছিল,সে আপত্তি সত্ত্বেও শেষে গৌরবময় বহুবিঘ্ন-প্রতিষেধক এই সম্পর্ক ঘ'টেছে—তাই সম্মেলনে একটু বিশেষ উল্লাস ছিল।

বিকালে টাউন-হলে নগরবাসীদের পক্ষ থেকে কবিকে অভ্যর্থনা করা হ'ল; এখানে চা-পান, বক্তৃতা, আলাপ। চীনা, মালাই, তামিল, সিংহলী, সিন্ধী, ভাটিয়া, শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দু; চার পাঁচজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, একজন ডাক্তার, একজন এখানকার ব্যারিষ্টার, আর বাকী সকলে সরকারী দপ্তরে কাজ করেন। এই চা পান সভা শেষ হবার পর, শ্রীযুক্ত ডসন আমাদের শহরটায় একটু ঘুরিয়ে নিয়ে, শহরের বাইরে এক চীনা মন্দির দেখাতে নিয়ে গেলেন। শহরটা চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ছে। এক জায়গায় সরকার থেকে কেরাণী আর অন্য অন্য অফিসারদের জন্য বাড়ী ক'রে দিয়েছে। প্রশস্ত ঘাসে ভরা চত্বরের চারপাশে ছোটো ছোটো সুন্দর সুন্দর বাঙলা বাড়ীর সারি, ঘন না'রকেল গাছের কুঞ্জের মাঝে; চত্বরে চীনা তামিল আর মাথায় বিরাট পাগড়ী প'রে শিখ ছেলেরা একত্র খেলা ক'রছে; কোনও বাড়ীতে রঙীন সাড়ী প'রে তাদের অপূর্ব্ব ভারতীয় লালিত্যমণ্ডিত চেহারায় তামিল ভদ্রঘরের মেয়েরা

ব'সে ব'সে সেলাই ক'রছে, বই প'ড়ছে, চকিতের মত চোখ তুলে আমাদের চলন্ত গাড়ীর দিকে তাকিয়ে, কবিকে দেখে প্রীত বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছে। কোথাও পাজামা পরা চীনা বা পাঞ্জাবী মা ছেলে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে। শহর ছাড়িয়ে আমরা বাইরে এসে পড়লুম। পরিষ্কার রাস্তা, দেশটা যেন মাজা-ঘষা। চারদিকে পাহাড়ের শ্রেণী। ভরসন্ধ্যার অস্তমিত সূর্য্যের ম্রিয়মাণ আলোর একটা উদাস-করা শান্তির ভাব

চীনে মন্দিরে এসে পৌছুলুম। একটা বাঁধ-মতন, তার ধারেই পাহাড়, পাহাড়ের ভিতরে একটা স্বাভাবিক গুহা, ভিতরে নানা মুখে সেই গুহা গিয়েছে। গুহাটীকে অবলম্বন ক'রে মন্দির। কোথাও কোথাও বা পাথর কেটে দু একটা দোতালা কুঠরী তৈরী করা হ'য়েছে। মন্দিরের ভিতরে নানা দেবতার মূর্ত্তি, প্রধান বেদির উপরে, আর আশেপাশে; মূর্ত্তিগুলি হয় কাঠের, নয় মাটির, খুব উজ্জ্বল রঙে রঙানো। Tao তাও ধর্ম্মের মন্দির। এক পুরোহিত আছে; অতি অপরিষ্কার ব'লে বোধ হ'ল লোকটাকে—নীলারঙের আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটিবাঁধা লম্বা চুল, তার উপরে নীল কাপড়ের একটা ছোটো টুপী। তাও-ধর্ম্মের দেবতা আছে, বুদ্ধমূর্ত্তিও আছে। তাও-বাদীরা দেবতা বিষয়ে উদার। পুরোহিত আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে সব দেখালে। গুহাটী চৌরস নয়, তাই মন্দিরও চারদিকে সমান বা সমতল হয়নি। এক জায়গায় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হ'ল, পাহাড়ের ভিতরে সুবিধামত ledge বা তাক পেয়ে পাথর কেটে দোতালা ঘর বানিয়েছে। আলো জ্বেলে আমাদের একটা অন্ধকার পথ দিয়ে গুহার আর এক অংশে নিয়ে গেল, সেখান থেকে পাহাড়ের ওধারে বাইরে যাবার পথ আছে। বেশ একটা mystic বা রহস্যময় ভাব এই গুহাময় মন্দিরটার ভিতর। সব বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখা। মন্দিরের প্রধান বেদির কাছে ফিরে এলুম। পুরোহিতের বক্‌শিশ হিসাবে কিছু দক্ষিণা দেওয়া গেল। লোকটা খুশী হ'য়ে নিলে। শ্রীযুক্ত ফ্যঙ্ ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তিনি দোভাষীর কাজ ক'রলেন। একজন ধর্ম্মপ্রাণ ধনী চীনা ভদ্রলোক পুণ্যকর্ম্ম হিসাবে বিতরণের জন্য চীনা ভাষায় তাও-ধর্ম্ম সক্রান্ত একখানি লিথো ছাপা বই রেখে দিয়েছেন পুরোহিতের কাছে। এতে নরক-দুঃখ বর্ণনার বিস্তর ছবি আছে। এই বই এক এক খণ্ড ক'রে পুরোহিত মহাশয় আমাদের উপহার দিলেন।

শহরে ফিরে এলুম যখন, তখন রাত্রি পুরো হয় নি। কবিকে বাসায় রেখে আমরা ক'জন সদলে বা'র হ'লুম ইপোর বাজারে ঘুরতে—"বারাং বারাং তম্বাগা, মলায়ু বিকিন্, লামা পুঞা"—অর্থাৎ প্রাচীন মালাই কাজ পিতলের জিনিসের সন্ধানে। কোথাও মিল্‌ল না। মালাই শিল্প যে লোপ পেয়েছে, তার সন্দেহ নেই। অভাবে তামিল মুসলমান মুদীর দোকানে নানা রকমের দক্ষিণ ভারতের জিনিসের সমাবেশের মধ্যে দুই একটা দক্ষিণী পিতলের প্রদীপ আর অন্য জিনিস দেখে, তাই কেনা গেল।

মঙ্গলবার, ৯ই আগষ্ট।—

সকালে কবিকে চীনাদের Yuk Choy Public School য়াক্ চয় ইস্কুলে নিয়ে গেল, ফাঙ আর আরিয়াম সঙ্গে রইলেন। সুরেন বাবু ধীরেন বাবু আর আমি মোটরে ক'রে পেরাঃ রাজ্যের রাজধানী, আর পেরার রাজার বাসভূমি Kuala Kangsar কুআলা-কাংসার নগর দেখতে বেরুলুম, আমাদের সঙ্গে রইল সেরেম্বানের তামিল ছেলেটী দুরৈরাজসিংহন্, আর পেরার রাজবাটীর সেই জবরদস্ত চেহারার কর্ম্মচারীটী। মালাইদেশের অপূর্ব্ব রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ। পথে প'ড়্‌ল ক'টা গণ্ডগ্রাম—Tanjong Rambutan তাঞ্জং রাম্বুতান, Sungei Siput সুঙেই সিপুৎ, Salak সালাঃ, Enggor এঙ্গোর; উড়িষ্যার গাঁয়ের বড়ো দাণ্ডের মতন বড়ো সড়ক গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে। এই সড়কের দুধারে দোকান পাট, বাজার; সব চীনা আর তামিল দোকানী,—মালাইদের দেখা-ই নেই—অথচ এই অঞ্চলটা এদিকে মালাইদের প্রধান নিবাস ভূমি, তাদের সভ্যতার একটা বড় কেন্দ্র। প্রত্যেক গাঁয়ের বাজারের মধ্যে, মোটর রাস্তার ধারে, রেল-ষ্টেশনের নাম লেখা পাটাতনের মতন বড়ো বড়ো কাঠের ফলকে ইংরিজিতে, আরবী অক্ষরে মালাইয়ে, তামিলে আর চীনায় গাঁয়ের নাম লেখা; মোটর-চড়া পথিকের গোচরার্থে।

আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ ক'রতে ক'রতে পেরাঃ নদীর তীরে এসে প'ড়লুম, নৌকায় তৈরী সাঁকোর উপর দিয়ে মোটর পার হ'ল। ওপারে পঁউছে গাড়ী চ'ল্‌ল। এইবার মালাইদের বসতি বেশী। পারে পঁউছে, গাড়ী একটা চড়াই জায়গা আস্তে আস্তে উঠে, তারপর বেগ বৃদ্ধি ক'রে চল্‌'বে; দেখি, একটা অতি শিশু বেরাল বাচ্ছা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আমাদের গাড়ী আস্‌ছে তার দিকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে আছে। মোটর-চালক মালাই, তার লক্ষ্য নেই, সে গাড়ীর গতি বাড়াচ্ছে। "কুচিং, কুচিং" অর্থাৎ বেরাল বেরাল ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে গাড়ী থামালে। যেখানে বেরালটী ছিল, সেখানে রাস্তার ধারে এক পাল মালাই ছেলে-বুড়ো ব'সে ছিল; রাস্তার মাঝখানে বেরাল-ছানা, হঠাৎ গাড়ী থেমে গেল,—এই ব্যাপার দেখে তাদের কৌতুক রসকে বড়ই উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌লে, তারা ঐক্যতানে হেসেই আকুল। বেরালটাকে সরাবার আগ্রহ কারু নেই। শেষে হাত নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে দেখাতে একটা ছোঁড়া দল থেকে বেরিয়ে এসে বেরালটাকে ধ'রে তুলে ছুঁড়ে রাস্তার ধারের পগারের ভিতর ফেলে দিলে। মালাই মনোভাব আর জনসাধারণের রসবোধ জিনিসটা ভালো বুঝলুম না, ভালোও লাগ্‌ল না।

কুআলা-কাংসারে মালাই কলেজের বাড়ী দেখলুম। এই কলেজটী মালাই দেশের রাজবংশের ছেলেদের জন্য—ভারতবর্ষের রাজকুমার কলেজগুলির মতন। মালাই আর্টস্‌-এণ্ড-ক্রাফট্‌স্‌ স্কুলে গেলুম। প্রাচীন মালাই শিল্পকে জীইয়ে রাখবার জন্য এই ইস্কুল। ভারতে ব্রিটিশ সরকার কতক স্থানে এই রকম ইস্কুল স্থাপন ক'রেছেন, যেখানে আধুনিক রীতিতে শিল্প-বিদ্যা তো শিক্ষা দেওয়া হয়-ই, তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাবেক কলা-শিল্প যাতে লোপ না পায়, তার কারিগর যাতে হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। লখ্‌নৌতে, লাহোরে, মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে এইরূপ Arts and Crafts School আছে। দেশীরাজ্যের মধ্যে জয়পুরে, মহীশূরে আর ত্রিবাঙ্কুরেও আছে। সিংহল কান্দীতে এক বেসরকারী সমিতিরও একটী ইস্কুল আছে। এই সব ইস্কুলে সাবেক চালের ওস্তাদ কারিগরদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়, তাদের কাছে সাগরেদ বা ছাত্র হ'য়ে, সাধারণতঃ যে জাতীয় লোকের মধ্যে এই শিল্পকার্য্যের প্রচার আছে সেই জাতির ছেলেরা কাজ শেখে। গুরু আর শিষ্যের হাতের কাজ ইস্কুলেই বিক্রী হয়, কলা-রসিক ব্যক্তিগণ কিনে ইস্কুলের উদ্দেশ্যের সহায়তা করেন। গেঁয়ো যোগী ভীখ পায় না; সাধারণতঃ ভারতবাসী ধনী ব্যক্তি নিজের দেশের শিল্প-সম্পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ আর অন্ধ, বেশী দাম দিয়ে বাজে বিদেশী জিনিস কিন্‌বে, কিন্তু শিল্পকলার পরিচায়ক হাতে তৈরী যে সব কাজ—যেমন ধাতুর কাজ, পাত্র, গহনা প্রভৃতি; মীনা; খোদাই কাজ—পাথরে, কাঠে, হাতীর দাঁতে; কাপাস, রেশম আর উলের কাপড়; জরীর কাজ, ইত্যাদি—বিদেশী কলাবিদ্‌গণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন ক'রে থাকে, সে কাজের দিকে তারা ফিরেই চায় না; তার সৌন্দর্য্য বুঝবার মত চোখ আর বিদ্যা দুইই আমাদের নেই। এই সব ইস্কুলে কিছু সরকারী সাহায্য পেয়ে, আর বিদেশী রূপ রসিকদের রস বেত্তৃত্বের উপরে নির্ভর ক'রে, কোথাও কোথাও প্রাচীন হাতের শিল্প কিছু-কিছু বেঁচে আছে। কুআলা-কাংসারের ইস্কুলের কথা শুনে অবধি তাই সেটী দেখবার ইচ্ছে ছিল। মালাই রূপার কাজ ভারী সুন্দর। Niello কাজ, মালাই ভাষায় যাকে "চুটাম্‌" কাজ বলে—এই কাজে রুপোর খোদাই, মধ্যে মধ্যে কালো মীনার ভরতি করা—অতি চমৎকার; কিন্তু বড় দামী, আর আজকাল দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে যাচ্ছে। কুআলা-কাংসারে সুরেনবাবু শান্তিনিকেতনের জন্য দুই চারটী রূপার জিনিস নিলেন, আমি পাঁচ ডলারে সাবেক চালের মাটীর শরার মতন গোল তলা ওয়ালা ছোটো একটী রূপোর বাটী নিলুম, ধারে পদ্মলতার মত নক্‌শা কাটা। মালাই দেশের সভ্যতার অন্য অঙ্গের মতন তার শিল্পও ভারত থেকে এসেছিল, কি হিন্দু যুগে আর কি ইসলামী যুগে। কিন্তু মালাই শিল্পী ভারতের অন্ধ অনুকরণ করেনি। সে তার কাজে এমন একটু মনোহর বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল, যাতে এই শিল্পকে তার জা'তের নিজস্ব সে ক'রে নিয়েছিল। সুরেনবাবু এই রকমের বাটীর সম্বন্ধে ঠিকই মন্তব্য করেন, এমন সুন্দর পাত্রে ক'রে কোনও জিনিস খেলে তার

সোয়াদ যেন বাড়ে—আর যা-তা এতে খেতে নেই—দেবভোগ্য আহার্য্য, যেমন সুন্দর সুগন্ধি পায়েস নিয়ে এই রকম বাটী থেকে খেতে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর রূপকর্ম্মের সৌন্দর্য্যকেও উপভোগ ক'রতে হয়। জাপানী Cha-no-yu "চা-নো-ইউ" অনুষ্ঠানে চা-পানের সঙ্গে-সঙ্গে তার চীনা মাটীর তৈজসের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যেমন।

এর পরে, কুআলা-কাংসারের বাজারে খানিক ঘুরলুম। এক চীনা মণিহারীর দোকানে মালাই জাঁতি আর ছোটো একটী মালাই ছুরী (ক্রিস্) কিনলুম ; এক চীনা হোটেলে সকলে কিছু জলযোগ ক'রলুম। তারপর Astana Besar বা বড়ো রাজবাটী দেখা গেল, দূর থেকে ; এটী রাজার হাল ফ্যাশানের বসত-বাড়ী। একটী জিনিস দেখে আশ্চর্য্য মানলুম—রাজবাড়ীতে ভারতীয় (পাঞ্জাবী) সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। রাজবাড়ীর কাছেই এখনকার রাজার পিতার তৈরী ছোট্টো একটী মসজিদ দেখলুম ; সুন্দর ভারতীয় মুসলমানী ঢঙে, দিল্লী আগরা ফতেপুরী ঢঙে তৈরী তার আজানের মিনারটী ; কিন্তু এক-গম্বুজের ছোটো মসজিদ-বাড়ীটী আদিযুগের বিশুদ্ধ আরব পদ্ধতিতে তৈরী। কাছে এক মক্তব, সেখানে আরবী পড়ানো হয়। রাজা বন্দাহারার বাড়ী, উচু টিলার উপর ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের বাড়ী, এগুলিও দেখানো হ'ল। তারপর আমাদের পাণ্ডা ইওপ্ আমাদের নিয়ে চ'লল রাজার পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে। Bukit Stiakelimpahan ব'লে নাতি-উচ্চ একটী ঢালু পাহাড়ের গায়ে পুরাতন মালাই ঢঙে খুঁটীর উপরে তৈরী কাঠের কতকগুলি বড়ো বড়ো বাড়ী। এই প্রাসাদের নাম Astana Putra, বা Astana Merchu। আমাদের সংস্কৃত 'পুত্র' আর 'পুত্রী' শব্দ মালাই ভাষায় 'রাজপুত্র' আর 'রাজপুত্রী' অর্থে ব্যবহার হয়, যেমন ভারতবর্ষে 'কুমার, কুওঁর, কোঙার' শব্দ ; স্পেনে Infant অর্থে 'রাজপুত্র'। Astana Putra তে রাজার আর রাজপরিবারের ছেলেরা থাকে রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরা অনেকে থাকে। ইপো থেকে, আমরা পেরার রাজার মোটরে এসেছি, সঙ্গে আছে রাজভৃত্য ইওপ। আমরা বিনা প্রশ্নে রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় এলুম। একদিকে খোঁটার উপর কাঠের একটা মস্ত একচালার মতন, তাতে অনেকগুলি মালাই স্ত্রীলোক র'য়েছে, সে দিকে আহারের আয়োজন চ'লছে। একটী চমৎকার নোতুন বাড়ী দেখলুম, মালাই ধাঁজে তৈরী, ইওপ বললে সেটী রাজার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষ্যে তৈরী হ'য়েছিল। পেরার রাজার মেয়ের বিয়ে হয় আর এক মালাই রাজ্যের রাজকুমারের সঙ্গে। মালাই বিয়ের একটা প্রধান অনুষ্ঠান, বর-ক'নেকে একটি দামী গদির বিছানার উপর বসানো হয়। গদির তাকিয়ার দুই মুখে কাজ করা রূপোর চাকতি থাকে। এই বিছানা এক খুব জমকালো ব্যাপার। যেন সিংহাসনে রাজা-রাণীকে বসানো। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগত, বড়ো লোক হ'লে প্রজারা সকলে এসে বর-ক'নের সামনে ভেট বা উপহার দেয়। এই রকম রীতি যবদ্বীপেও আছে, আর রাজা-রাজড়া আর বড়ো লোকের বাড়ীতে এই বর-ক'নের বিছানা বা গদি আলাদা একটা ঘরে থাকে। এই গদি যেন পবিত্র জিনিস আর কেউ কোনও সময়ে তার উপর বসে না, এই গদিকে যবদ্বীপে দেবী শ্রীর গদি বলে। কুআলা-কাংসারের এই বিয়ের বাড়ীতে এই রকম গদি দেখলুম ; আর তা ছাড়া মালাই জাতের বৈশিষ্ট্য নানা দ্রব্য-সম্ভারে ভরা এই বাড়ীটী ; সাবেক ধরণে সাজানো মালাই রাজাদের বাস-ঘর বেশ দেখা গেল। বাড়ীটীতে রাজপরিবারের মহিলারা ছিলেন ; আর ছিলেন কতকগুলি বৃদ্ধ, যেন প্রাচীন ভারতের রাজপ্রাসাদের বিশ্বস্ত কঞ্চুকী। মালাইদের মধ্যে পরদা প্রথা নেই, এই যা রক্ষা। সোনা-রূপার তৈজস-পত্র, "কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত," প্রজাদের উপহৃত নানা জিনিস, সোনা রূপার ময়ূর, সব পরিষ্কার ভাবে সাজানো র'য়েছে। অথচ বাড়ীটী মিউজিয়ম নয়, বাসের বাড়ী, ছেলেপুলেদেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

কুআলা-কাংসারে এক চীনা জহুরী আর মহাজনের দোকানে তার কাছে বাঁধা রাখা মালাই কারু-শিল্পের কতকগুলি সুন্দর নমুনা দেখা গেল, দু একটা ছোটো জিনিসও আমরা নিলুম। তারপরে আবার সেই সুন্দর পথ দিয়ে ইপোতে আমাদের বাসায় ফেরা।

সন্ধ্যায় ইপোর টাউনহলে কবির বক্তৃতা আর পাঠ হ'ল। পেরাঃ রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সাহেবের সভাপতি হ'বার কথা ছিল, তিনি অলঙ্ঘ্য কারণে আসতে না পারায় স্থানীয় প্রধান বিচারপতি সভাপতি হ'লেন। পরে রেসিডেণ্ট সাহেব চিঠি লিখে কবিকে জানান, নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় পোল বন্ধ হয়,তাই তিনি আসতে পারেন নি; আর তাই-পিং শহরে পরে যখন কবি বক্তৃতা করেন, তখন তিনি উপস্থিত থেকে সভাপতির কাজ করেন, আর বলেন যে ইপোর সভায় তিনি হাজির থাকতে পারেন নি এটা তাঁর কাছে একটা বিশেষ আপশোশের কথা, ইত্যাদি। "মালায়া ট্রিবিউন"-এর সাধু চেষ্টা এই ভাবেই মাঠে মারা গেল।

রাত্রে ন'টায় আমার বক্তৃতা হ'ল, ছায়াচিত্র-যোগে, আধুনিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উপর. স্থানীয় এংগ্লো চাইনীস স্কুল-গৃহে।

একটী চীনা যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, একে বেশ লাগ্‌ল। "বাবা"-চীনা, খাঁটী চীনা সংস্কৃতির ধার ধারে না, তোয়াক্কাও রাখে না। এর নাম Goon Khooi Koon গুন্-খুই-কুন্। ইংরেজী ইস্কুলেই বরাবর লেখাপড়া শিখেছে,কি একটা আপিসে কাজ করে। লম্বাচওড়া দোহারা চেহারা, কথা বার্ত্তায় এমন চমৎকার হৃদ্যতার পরিচয় খুব কম পেয়েছি, ভারী সদালাপী রসালাপীআমুদে লোকটী। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে এর বেশ সদ্ভাব। চীনা গান, চীনা বাজনা, মালাই নাচ আর গান এর চেষ্টায় আমরা ইপোতে আবার ভালো ক'রে শুনতে পাই।

বুধবার, ১০ই আগষ্ট।—

পেরার রাজার বাড়ীর অবস্থানটী অতি চমৎকার। বাড়ীর পিছন দিয়ে দুকূল ছাপিয়ে ছোট্ট Kinta কিন্তা নদীটী ব'য়ে যাচ্ছে। ওপারে কাছে পাহাড়, দূরেও পাহাড়। নদীর ধারে সুন্দর ঘাসের মাঠ, একটী ঘাট, কতকগুলি বড়ো বড়ো গাছ, আর ফুল-বাগান। মালী তামিল জাতীয়। দুপুরে নদীর ধারে একটী চেয়ার নিয়ে গাছের তলায় ব'সে বই পড়া বড়ো আরামের। মাঝে মাঝে দূরে পাহাড় অঞ্চল থেকে ডিনামাইট দিয়ে টিনের খনির পাহাড় ফাটানোর গুরু-গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি দ্বারা বাহিত হ'য়ে স্নিগ্ধ-গম্ভীর কানে লাগছে। ইপোতে আমাদের চারদিনের অবস্থানের স্মৃতির সঙ্গে এই বাড়ীটীর সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে জড়িত।

সকাল সাড়ে আটটায় মালায়ান্-টীচারস্-কন্‌ফ্রেন্স-এ আমার প্রবন্ধ প'ড়লুম, "ভারতের কতকগুলি শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যা আর ইস্কুলে মাতৃভাষার স্থান" এই বিষয়ে। এর পরে শ্রীযুক্ত গুণরত্ন ডসন্ মহাশয় আমাদের এক টিনের খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন।

টিন্ এদেশের এক প্রধান খনিজ সম্পৎ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে চীনা লেখকেরা মালয় দেশের টিনের কথা উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন। ডাচেরা সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকে এদেশ থেকে খুব টিন কিন্‌ত। মালাইরা নিজেরা আগে উপর উপর মাটী খুঁড়ে টিন বা'র ক'র্‌ত। খনি অনেক, লোক কম; চীনারা এসে এই কাজে যোগ দিলে, আর উনবিংশ শতকের মধ্যে চীনারাই এই কাজ প্রায় পুরো দখল ক'রে নিলে। মালাই খনির মালিক বা খনির কুলি খুব কম। চীনারা মালাই সরকারকে আইন মোতাবেক মুনফার একটা হিস্‌সা দেয়, কিন্তু নিজেরা টিন খুঁড়ে বা'র করে। ইংরেজ কোম্পানী কিছু কাজ চালাচ্ছে, খাজনা দিয়ে দু তিনটে ফরাসী কোম্পানীও কাজ ক'রছে, কিন্তু শ্রমিক সব চীনা। আর চীনাদেরও অনেকগুলি Kong-si "কং-সী" বা কোম্পানী আছে। মালাই দেশের টিন যা বা'র করা হয় তার বারো আনা চীনা কোম্পানীদের হাতে। টিন বা'র করবার তিন রকম পদ্ধতি আছে। উপর থেকে খুঁড়ে যায়—এটী প্রাচীন পদ্ধতি। খনি হয় যেন বিরাট পুকুর খোঁড়া। মাটী আর ধাতুমিশ্র মাটী বা পাথর কেটে কেটে উপরে তোলে। এই পুকুর-কাটা খনি জলে ভ'রে যাবার আশঙ্কা আছে, তাই জল ছেঁচে তুলতে হয়। অন্য এক রকম রীতি আছে, তাতে পাইপে ক'রে জল এনে খুব জোরে পাহাড়ের গায়ে ফেলা হয়; তাইতে ক'রে পাহাড় আর মাটির ভাঙন ধরে; তারপরে আছে কয়লার খনির মতন মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে যাওয়া। এই তৃতীয় পদ্ধতিটী হ'চ্ছে আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতি, খালি ইংরেজদের হাতে যে অল্প

কতকগুলি খনি আছে সেখানেই এই রীতিতে কাজ হয়। এই তৃতীয় রীতি বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ।

আমরা যে খনি দেখতে গেলুম, সেটী ইপো শহর থেকে অল্প কয়মাইল দূরে। খনির নাম Beatrice Mine, জমীর দখলকার Dr. Rogers ডাক্তার রজার্স ব'লে একজন সিংহলের তামিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, তাঁর মেয়ে বেয়াট্রিস্-এর নামে এই খনি। Thong-yin Kong-si ব'লে এক চীনা কোম্পানী কাজ চালাচ্ছে। সরকার (অর্থাৎ ফেডারেটেড-মালাই-ষ্টেটস্-এর গভর্ণমেণ্ট) নিজের প্রাপ্য কর পায়; ডাক্তার রজার্স শতকরা একটা রয়ালটী পান, সেটী নাকি মাসে হাজার চল্লিশ ডলারের কাছাকাছি। খনির কাজ চালানোর সমস্ত খরচ চীনাদের, বাকী লাভও তাদের। শ্রীযুক্ত ডসন্ আমাদের নিয়ে খনিতে পৌঁছুলেন। খনির ম্যানেজার এক চীনা যুবক, সুগঠিত দেহ, অতি ভদ্র, বিলেতে গিয়ে খনির কাজ শিখে এসেছেন, তিনি সঙ্গে ক'রে সব দেখালেন। সে সব লিখে বর্ণনা করবার চেষ্টা ক'রবো না। কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত। দেখে মানুষের শক্তিকে প্রশংসা ক'রতে হয়, আর অদ্ভুত মেনে প্রাচীন কবির সঙ্গে ব'লতে হয়—পৃথিবীতে বহু আশ্চর্য্য বস্তু আছে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য হ'চ্ছে মানুষ। কেমন ক'রে মাটির ভিতরে বিরাট গহ্বর কেটে তার মধ্যে থেকে চাবড়া চাবড়া টিন মিশ্র পাথর উপরে আনা হ'চ্ছে, কেমন ক'রে খুব উঁচুতে সেই সব চাবড়া কলে ফেলে পিষে গুঁড়োনো হ'চ্ছে, তারপর গুঁড়ো থেকে নানা প্রাকৃতিক আর রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারায় টিন আর অন্য ধাতু আলাদা ক'রে ফেলা হ'চ্ছে—এসব ব্যাপার এক দিকে; আর ওদিকে কাজ চ'লেছে বিরাট বিশাল গুহা-মধ্যে; মাটির ভিতরে এই গুহা কাটা হ'য়েছে—এই lode বা খনির পথ প্রায় ৩০০ ফীট গভীর, আরও বেড়ে যাচ্ছে; ঢালু রেলে ক'রে lodeএর তলা থেকে, যেখানে খনির কুলিরা কাজ ক'রছে। সেখান থেকে, ছোটো ছোটো গাড়ী ক'রে টিন-মিশ্র পাথরের চাবড়া উপরে আনা হ'চ্ছে, সেখান থেকে জল ছেঁচে উপরে তুলে ফেলা হচ্ছে; সেই ঢালু রেলের পাশে কাঠের সিঁড়ি তৈরী হ'য়েছে, তাই দিয়ে খনির ভিতরে আমরা নামলুম। তেরছা-ভাবে গুহা-পথ ধরে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। তলায় পাথরের গা থেকে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে চীনা কুলিরা সব ধাতু-মিশ্র মাটি পাহাড় কাটছে—ভূগর্ভস্থ বিরাট গুহাটা বিজলীর আলোতে উদ্ভাসিত; খালি খনির ভিতর ব'লে, আর ভূগর্ভে জল থাকার দরুণ, একটা ভাপসা গন্ধ, একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব। সেখানে চীনা কুলিরা পিল্‌পিল্ ক'রছে, বহুসংখ্যক পাথর কাটা ছেনির আওয়াজ গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিতে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রতিফলিত হ'চ্ছে। চীনা কুলিদের মুখে রা-টিও নাই, সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে কলের মত কাজ ক'রে যাচ্ছে। যতটা টিনের চাবড়া এক এক জনে ওঠাবে সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক পাবে। সমস্ত জিনিসটার ক্ষিপ্রকারিতা আর সুব্যবস্থা দেখে চীনাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা না হ'য়ে যায় না।

দেখে শুনে উপরে ফিরে আসা গেল। খনির ম্যানেজার শিষ্টতা ক'রে আমাদের বরফ-লেমনেড খাওয়ালেন। ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম। পথে শ্রীযুক্ত ডসন্ এই খনির সম্বন্ধে দু চারটি খবর দিলেন। প্রথমটায় এই খনির কাজ ভালো চ'ল্‌ছিল না, উপর উপর যা টিন পাবার তা বা'র ক'রে নেওয়া হয়েছিল, তারপরে কিছু বা'র হচ্ছিল না, মালিকেরা খুব গভীরভাবে খোঁড়বার জন্য যথোপযুক্ত টাকা খরচ ক'রতে পারছিল না। তারপর ডাক্তার রজার্সের হাতে আসে খনিটা। তিনিও প্রথম সুবিধা ক'রতে পারেন-নি, কারণ কোনও বড়ো চীনা কোম্পানী সাহস ক'রে হাত দিতে চায়নি। তখন এক চীনা কুলির বিধবা স্ত্রী, তার পুঁজী ছিল মাত্র কয়েক শত ডলার, সে কপাল ঠুকে এই খনির ইজারা নিলে, ছ' মাসের জন্য। অল্পস্বল্প খুঁড়ে কিছু হ'ল না, তার সব টাকা প্রায় ব্যর্থভাবে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। ইজারা শেষ হ'তে যখন দিন পনেরো বাকী আছে, তখন ধাতুর একটা ছোটো আকর, যাকে ইংরিজিতে 'পকেট' বলে, তাতে হাত প'ড়ল। এইতেই তার কপাল ফিরে গেল। যে কয়দিন খনি তার হাতে ছিল, তার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে লোক লাগিয়ে প্রাণপণ যত্নে যতটা পারে তুলে নিলে। একটা বিশেষ তারিখের মাঝ-রাত্তির পর্য্যন্ত তার ইজারা ছিল; তাকে আর তার কুলিদের সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরিয়ে দেবার জন্য ফৌজী পুলিস মোতায়েন ক'রতে

হ'য়েছিল। কিন্তু চীনা স্ত্রীলোকটী এই কয় দিনেই বহু সহস্র ডলারের মালিক হ'য়ে গেল।

আজকে নানা কবিদর্শনকামী লোকের আগমন। সিঙ্গাপুরের মেথডিষ্ট মিশনের এক আমেরিকান মিশনারী এলেন, মিষ্টার লী। গোঁড়ামি নেই; কবির সঙ্গে বেশ আলাপ ক'রলেন। এই মিশনের লোকেরা মালাই সাহিত্যের অনেক ভালো ভালো প্রাচীন বই রোমান অক্ষরে আর আরবী অক্ষরে ছাপিয়েছেন, মালাই অভিধান প্রভৃতিও প্রণয়ন ক'রেছেন, মালাই সংস্কৃতির একটা দিক এঁদের দ্বারা খুবই রক্ষা হ'য়েছে। সুঙেই-সিপুৎ ব'লে কুআলা-কাংসারের পথে একটী গ্রাম পড়ে, সেখান থেকে বীরস্বামী ব'লে একজন চেট্টি মহাজন এলেন কবির সঙ্গে আলাপ ক'রতে। এই ভদ্রলোকটী ইংরজী জানেন না। গত কালও ইনি সপরিবারে কবিকে দর্শন ক'রতে এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে পরিচয়ে বেশ আনন্দ হ'ল। কবিও খুশী হ'লেন। কবির লেখা যা তামিলে বেরিয়েছে ইনি সে সব প'ড়েছেন। গোঁড়া চেট্টি ঘরের আধা-বয়সী লোক, কিন্তু তাঁর উদার মন আর তাঁর সমাজ আর ধর্ম্মের দোষ সংস্কারের চেষ্টা দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়। প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে এই অঞ্চলে মহাজনী আর টিনের খনির কাজ ক'রছেন। এঁদের গদির চীনা কুলিরা কিছু কাল হ'ল মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের কতকগুলি জিনিস পায়, সোনা রূপার জিনিস, মূর্ত্তি-টুর্ত্তিও কিছু ছিল ব'লে ইনি অনুমান করেন। কুলিরা সেগুলি আত্মসাৎ ক'রে এদের খালি একটী তামার মূর্ত্তি দেয়, সেই মূর্ত্তিটী ইনি আমাদের দেখাতে আনেন। মূর্ত্তিটী দেখেই আমার বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ ক'রে উঠ্‌ল।—এটী একটী যবদ্বীপীয় বিষ্ণু মূর্ত্তি, খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতকের হবে; আধ হাত প্রমাণ, দু-এক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের জন্য মূর্ত্তিটী দিতে এঁর নিজের আপত্তি ছিলনা, কিন্তু মূর্ত্তিটী এঁদের ফারমের বা গদির সম্পত্তি, অন্য অংশীদার রাজী হ'লেন না—কারণ এই মূর্ত্তিটী পাওয়ার পর থেকেই নাকি এঁদের ব্যবসায়ের উন্নতি, মূর্ত্তিটী ভারী পয়মন্ত মূর্ত্তি। এর উপর কথা চলে না। এখন, মালয়-উপদ্বীপ এক সময়ে যবদ্বীপের রাজাদের অধীন ছিল; সুতরাং যবদ্বীপের হিন্দুযুগের শিল্পের আর ধর্ম্মের নিদর্শন যে কিছু কিছু এ দেশেও পাওয়া যাবে তা আশা ক'রতে পারাযায়। এই ঐতিহাসিক যোগের, আর এ অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার অস্তিত্বের একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে এই মূর্ত্তিটীর দাম।

বিকালে মালাই দেশের শিক্ষকেরা কবিকে আর আমাদের নিয়ে ছবি তুললেন, চীনা ইস্কুলের হাতায়। তামিল, চীনা, দু একটী মালাই, একজন বাঙালী—এঁরাই শিক্ষক। তারপর আমরা গেলুম চীনা চেম্বার-অফ-কমার্স-এর বাড়ীতে। এখানে চা-পানের ব্যবস্থা। চীনা ধরণে ব্যবস্থা, নানাবিধ চীনা মেঠাইয়ের সমাবেশ। কবিকে চীনা ভাষায় এখানকার কর্ত্তারা অভিনন্দন দিলেন, তার জন্য ইংরিজিতে অভিনন্দনের উক্তিকে অনুবাদ করা হ'ল। কবি যথা-যোগ্য উত্তর দিলেন, ভারত ও চীনের যোগ সম্বন্ধেও বল্‌লেন। ফ্যঙ তার অনুবাদ ক'রলেন কান্টনী চীনাতে। এর পরে যেতে হ'ল, ভারতীয়দের এক মাস্‌-মীটিং বা সাধারণ সভায়। এক মস্ত মাঠের মধ্যে এই সভার আয়োজন। হাজার দুতিন ভারতবাসী—তামিল আর শিখই বেশী—জমা হ'য়েছে। এখানেও কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল ইংরিজিতে, পরে অভিনন্দনের তামিল আর পাঞ্জাবী অনুবাদও পড়া হল। কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল—এ দেশে ভারতবাসীর দায়িত্বের কথা নিয়েই তিনি ব'ল্‌লেন। বক্তৃতা আর সভা চুকলে, এক চীনা খনির অধিকারী Tow-kay Leong Sin Nam তাও-কে লিওং সিন্‌-নাম কবিকে শহরের আশ-পাশে খনি অঞ্চলে নিজের গাড়ী ক'রে একটু ঘুরিয়ে আনলেন। চীনাদের মধ্যে যাঁরা অর্থে আর সমাজ-সেবায় বড়ো হন, তাঁদের এই সম্মানের পদবী Tow-kay দেওয়া হয়। কথাটির ঠিক মানে জানি না, তবে কতকটা ভারতীয় "শেঠ-জী"র মতন এর অর্থ।

এই শহরে সিন্ধী রেশম আর কিউরিও (মণিহারী) ব্যবসায়ীদের দু তিন খানা দোকান আছে। এদের মধ্যে একটী ফার্ম্ম Messrs. Wassiamall Assomall. পেনাঙে, বাতাবিয়ায় আর অন্যত্র এঁদের কারবার আছে। এঁরা আমাদের আহার পাঠাবার ভার নিয়েছিলেন। এঁদের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরখচন্দ্‌ আজ রাত্রে তাঁদের দোকান-

বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। স্থানীয় কতকগুলি ভারতীয় আর অন্য ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। অতিথিদের 'সেবা'র জন্য রাজোচিত আয়োজন ক'রে ছিলেন, তবে এঁদের বড়ো দুঃখ হ'ল যে কবি স্বয়ং আস্‌তে পারলেন না। সিন্ধী বণিকেরা রেশমের কাপড়, গালিচা আর নানা রকমের কিউরিও বা মণিহারী জিনিষের দোকান ক'রে পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। এখানে এঁদের সঙ্গে একটু পরিচয় হ'ল, পরে আরও ঘনিষ্ট পরিচয় হয় যবদ্বীপে গিয়ে, এঁদের অতিথি হ'য়ে এঁদের সঙ্গে বাতাবিয়ায় কয় দিন পরম আনন্দে কাটিয়ে আসি। তাতে ক'রে একটু নিকট থেকেই এঁদের দেখবার সুযোগ হয়, আর এঁদের ধরণ-ধারণ দেখে এঁদের সম্বন্ধে বেশ একটা প্রশংসার ভাব আমার মনে এসেছে—এঁদের নানা সমস্যার কথাও মনে জেগেছে, তা নিয়ে এঁদের সঙ্গে আলোচনাও হ'য়েছে। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে যবদ্বীপের প্রসঙ্গে ব'লবো।

বৃহস্পতিবার, ১১ ই আগষ্ট।—

সকালে ছবি তোলার পাট—স্বাগতকারিণী সভার সভ্য আর অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কবির ফোটো নেওয়া হ'ল। দুপুরে আমাদের জন্য তামিল রীতিতে রান্না নানা রকম তরকারী আর অন্ন এল ব্যারিষ্টার কুমারস্বামীর বাড়ী থেকে। ব্যারিষ্টার সাহেব নিজে এসে আমাদের সঙ্গে আহারে যোগ দিলেন। খোলা-প্রকৃতির সরল-চিত্ত এই ব্যারিষ্টারটী, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, মোটা সোটা গোলগাল চেহারা, মাথায় বাবরী চুল। ফাঙ্-ও সঙ্গে ছিলেন, নানা হাস্য-রসের মধ্যে খাওয়া দাওয়া হ'ল। আজ কবিকে Telok Anson তেলোঃ-আন্‌সোন্ ব'লে একটী শহরে যেতে হবে, ইপোর দক্ষিণে পঞ্চাশ ষাট মাইল মোটর পথে। কবিকে নিয়ে যাবার জন্যে সেখান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন, পেরার 'রাজা মুদা' বা যুবরাজের তরফ থেকে একটী মালাই ভদ্রলোক এসেছেন। ফাঙ্ আর আমি রইলুম, আরিয়াম, ধীরেন বাবু, সুরেন বাবু কবির সঙ্গে গেলেন। Telok Anson এ কবিকে গিয়ে যথারীতি অভিনন্দন গ্রহণ আর বক্তৃতা দান ক'রতে হ'ল। রাত্রেই প্রায় সাড়ে এগারোটায় তিনি ফিরলেন। যাওয়া আসায় এক শ' মাইলের উপর মোটর ভ্রমণ, এক বেলায়।

(৯) তাই-পিং।

শুক্রবার, ১২ ই আগষ্ট।

আজ ইপোঃ ত্যাগ। Taiping—তাই-পিং যেতে হবে, মোটরে। পথে কুআলা-কাংসারে অবতরণ ক'রে সেখানে কবিকে শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে মানপত্র নিতে হবে, তাঁকে কিছু ব'লতেও হবে। কুআলা-কাংসার থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে—তিন জন শিখ ভদ্রলোক, একজন তামিল খ্রীষ্টান, আর একজন চীনা ভদ্রলোক। 'তাই-পিং' শহর পেরাঃ রাজ্যের রাজধানী,—যদিও রাজার পৈত্রিক বাস-ভূমি হ'চ্ছে কুআলা-কাংসারে, আর বেশীর ভাগ ঐখানেই তিনি থাকেন। "তাই-পিং" চীনা কথা, মানে "মহতী শান্তি"। এটী ইপোর চেয়ে ছোটো শহর, রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো শহর হ'চ্ছে ইপোঃ। বেলা দেড়টায় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করা গেল। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ডসন্ চ'ল্‌লেন। কুআলা-কাংসারে তাই-পিং থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল—তাঞ্জোর থেকে আগত ঐ শহরে উপনিবিষ্ট ডাক্তার মোহম্মদ ঘোস, লাহোরের শ্রীযুক্ত নবাবদীন, আর তামিল ভদ্রলোক মুরুগেশন্ পিল্লেই। কুআলা-কাংসারে চীনা ইস্কুল বাড়ীতে কবিকে নিয়ে সভা হ'ল, পেরার রাজবংশের Raja Di Hilir রাজা দি হিলির সভাপতি ছিলেন। স্থানীয় তামিল ভদ্রলোক Louis Thivy জন লুইস্ তিবী আর চীনা ইস্কুলের অধ্যক্ষ Lau Lam Boh লাউ-লাম-বোঃ বক্তৃতা দিলেন। অল্প কথায় কবি কিছু ব'ল্‌লেন। তার পরে তাই-পিং যাত্রা হ'ল।

তাই-পিং-এর মোটর রাস্তাটী অতি মনোহর প্রাকৃতিক শোভাময় স্থান দিয়ে গিয়েছে। দেড় ঘণ্টা পরে. সাড়ে চারটেয় আমরা তাই-পিং পঁউছুলুম। আমাদের সরাসরি টাউন হলে নিয়ে গেল। সেখানে কবিকে যথারীতি অভিনন্দন দেওয়া, পরে চা-পান। ডাক্তার মোহম্মদ ঘোস স্থানীয় ভারতীয়দের নেতা, তাঁরই যত্নে ওখানকার ভারতীয়দের একটী ক্লাব আর সমিতি বেশ চ'ল্‌ছে, সমিতির বাড়ীর জন্য জমী তিনিই

দিয়েছেন। হৃদয়বান্ জনপ্রিয় লোক। সভায় তিনি কবিকে স্বাগত ক'রলেন। পেরাঃ-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট অনারেবল মিষ্টার এচ্-ডব্লিউ-টম্‌সন্ ছিলেন সভাপতি। তারপর বাসায় যাওয়া গেল, আমাদের বাসা-বাড়ীটী পেরার রাজার একটী Rest House, অর্থাৎ বড়ো বড়ো সরকারী অফিসারদের জন্ত তৈরী ডাকবাংলা বা হোটেল। এরই একটী আলাদা অংশে কবির থাকবার জন্ত ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

তাই-পিং-এর সিনেমা থিয়েটারে কবির বক্তৃতা হ'ল। Human Dignity—এই ছিল বক্তৃতার বিষয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শের ব্যাখা করেন।

শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র দাস ব'লে একটী বাঙালা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি ইপোর ডাক-বিভাগে কাজ করেন।

রাত্রে আমাদের বাসায় স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তিদের সঙ্গে নৈশ ভোজ ছিল। রাজার ছেলে, Tunku 'তুঙ্কু' যাঁর উপাধি, তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার ফার্ণাণ্ডেস্ ব'লে একটী সিংহল থেকে আগত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি সিংহলের Burgher 'বার্গর' জাতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ মিশ্র ডাচ-পোর্ত্তুগীজ-সিংহলী। এঁদের সমাজ এখন সিংহলের দেশী খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

Woodall উডল নামে এক সিংহলী তামিল খ্রীষ্টান পরিবারের দুই ভাই তাই-পিং প্রবাসী; আর এক ভাই শ্যাম-দেশে গিয়ে বাস ক'রছেন, ইনি শ্যাম-দেশের প্রজা হ'য়ে গিয়েছেন, শ্যামদেশীয় জনৈক মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন, আর শ্যামদেশের সরকারে খুব বড়ো পদ পেয়েছেন, Kun 'কুন্' ব'লে শ্যামরাজের দেওয়া যে উচ্চ উপাধি আছে তা পেয়েছেন, এঁর পুরা নাম এখন Kun Phra Woodall। দক্ষিণ শ্যামে Singgora সিঙ্গোরা নগরে এক জন উচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তাই-পিং থেকে সিঙ্গোরা দুশো মাইলেরও বেশী পথ, মোটরে ক'রে এসেছেন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে। এঁর ছেলেপুলেরা মাঝে মাঝে তাই-পিং-এ তাদের পিতৃব্যদের কাছে এসে থাকে। ফ্রা উডল আরিয়ামের পিতৃবন্ধু। কবি যাতে শ্যামদেশে যান, সে বিষয়ে এঁর খুব আগ্রহ। কবির যাওয়া সম্বন্ধে সম্মতি পেলে ইনি সব ব্যবস্থা ক'রবেন। কবির সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হ'ল। কবি শ্যামে যেতে রাজী হ'লেন। আজ রাত্রেই ইনি সিঙ্গোরা যাত্রা ক'রলেন।

রাত্রি দশটা হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু শুনলুম, তাই পিং-এ একজিবিশন আর মেলা বসেছে; আমরা দেখ্‌তে বেরুলুম। শ্রীযুক্ত ডসন্ আমাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন। গিয়ে দেখি, ঠিক মেলা বা একজিবিশন্ নয়, ক'লকাতায় যে carnival আসে, এ সেই গোছের ব্যাপার। নানা তাঁবু, ভিতরে নাচ গান কৌতুক দর্শনের ব্যবস্থা। ফিলিপিনো নাচ, আর হাওয়াইই-দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত একদল নাচিয়ে আর বাজিয়েদের দেখলুম, হাওয়াইই-দ্বীপের বিখ্যাত Hula-hula 'হুলা হুলা' নাচ দেখলুম। এই নাচের রুচি অতি কদর্য্য বোধ হ'ল। রাত্রে ডিনারে আমাদের সঙ্গে অভিজাত ঘরের একটী মালাই যুবক যোগদান ক'রেছিলেন, বেশী কথাবার্ত্তা ইনি কন্ নি। মেলায় গিয়ে দেখি, ইনি নিজ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে ক'রে এনেছেন। একটু আশ্চর্য্য লাগ্‌ল, মালাই হ'য়েও এঁর স্ত্রী ওড়নায় মুখ ঢেকে চ'লেছেন। এঁদের এই দলটী, বিশুদ্ধ ধরণের মালাই পোষাকের সৌষ্ঠবে, আর দূরথেকে দৃষ্ট দেহের লালিত্যে আর চলন-ভঙ্গীতে যে উচ্চ বংশের, তার সন্দেহ থাকে না, দর্শকের দৃষ্টিকে অম্‌নিই আকর্ষণ করে।

শনিবার, ১৩ই আগষ্ট।—

আজ সকালে একটী তামিল যুবক কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এল। শ্যামবর্ণ, পাতলা একহারা চেহারা, খালি পা, খদ্দরের ধুতি পরা, অতি সাধাসিধে মানুষ। গুটিকতক চমৎকার গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছে। কবি ব'সে ব'সে লিখছেন, তাঁর কাছে একে নিয়ে এলুম। কবির টেবিলের উপর ফুলগুলি রেখে, সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলে। তার পরে হঠাৎ ভাবের উচ্ছ্বাসে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল। তার ভক্তির আধিক্য আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই অহৈতুক রোদন দেখে কবি তো অবাক্। সে তার কান্নার মধ্যে বাষ্প-গদগদকণ্ঠে এই কথাগুলি জানালে যে মাস কতক পূর্ব্বে সে দেশে গিয়েছিল, উত্তর

ভারতে সর্ব্বত্র ঘুরেছে, কিন্তু এক গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম আর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম ছাড়া আর কোথাও সাধারণভাবে খদ্দর ব্যবহৃত হ'তে সে দেখে নি। খদ্দর না হ'লে দেশের উন্নতি হবে না, মহাত্মা গান্ধীজী এই শিক্ষাদ্বারা দেশকে উজ্জীবিত ক'রছেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক আর ছাত্রেরা তাঁর এই শিক্ষা পালন ক'রছে, অতএব ভারতবর্ষের উদ্ধারের আর দেরী নেই। (সেই সময়ে খদ্দরের ঢেউ অন্য সব জায়গার মত শান্তিনিকেতনেও পঁউছেছিল, খদ্দর "মীটিং-কা-কাপড়া" হয়ে তখন পেট্রিয়টিক ভণ্ডামির আবরণ এতটা হয় নি, এর অন্ধ গোঁড়া তখন চারিদিকে); চরখা-ধর্ম্মের সম্বন্ধে কবির প্রকাশিত অভিমত সে জানে না। তাকে শান্ত ক'রে, তার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ করা গেল। খদ্দর-বাদ সম্বন্ধেও দু একটা কথা কওয়া গেল। যাই হোক্, সে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে, আর একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে চ'লে গেল।

সকালে দু ঘণ্টা আমরা তাই-পিং-এর মিউজিয়মে কাটালুম, চমৎকারভাবে এই সময় কাট্‌ল। এখানে মালাইদের শিল্পের এক অপূর্ব্ব সংগ্রহ আছে—সিঙ্গাপুরের মিউজিয়ম বা কুআলা-লুম্পুরের মিউজিয়মের চেয়েও ভালো। আর তা ছাড়া, এদেশের বন্য জাতি, মালাইদের জ্ঞাতি Semang সেমাং আর Sakai সাকাই জাতির ঘর-গৃহস্থালীর আর তাদের আদিম সংস্কৃতির নানা দ্রব্যেরও চমৎকার সংগ্রহ আছে। মালাইদের সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সব জিনিস ব্যবহার হয়, তারও কিছু কিছু রেখেছে। আমাদের দেশের মঙ্গল অনুষ্ঠানে স্ত্রী-আচারে রঙীন চালের গুঁড়োর যে 'শ্রী' থাকে,—একটা পাহাড়, তার গায়ে গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি—এরাও তদনুরূপ একটা পাহাড় করে, এটা খড়ের, কাগজের বা সোলার হয়, আবার ধান গাদা ক'রেও করে। আমাদের অবৈদিক বহু আচার অনার্য্য যুগ থেকে পাওয়া, আর হয় তো ইন্দোনেসিয়ায় প্রচলিত অনুষ্ঠান আর আমাদের বেদবহির্ভূত অনুষ্ঠান উভয়েরই সাধারণ মূল হ'চ্ছে আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের নানা রীতিনীতি আর অনুষ্ঠান। সাকাই আর সেমাং জাতি বাঁশের তৈরী নানা ভোজন-পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করে, বাঁশের চোঙ, বাঁশের কাঁকই প্রভৃতি। এগুলিতে আঁচড় টেনে নানা নক্‌শা কাটা আছে। অনেক নক্‌শা নাকি আমাদের বাঙলা দেশের কাঁথার সেলাইয়ের নক্‌শার সঙ্গে মেলে। সুরেনবাবু আর ধীরেনবাবু মিউজিয়মের জিনিসপত্রের নকল এঁকে এঁকে তাঁদের নোট-বুক ভরাতে লাগ্‌লেন। শ্রীযুক্ত ডসন্ তো এই সব জিনিসের প্রতি আমাদের টান আর এগুলিকে বোঝবার জন্য এদের আলোচনার জন্য আমাদের সামান্য শ্রম স্বীকার দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। এর মধ্যে কি যে রস আমরা পাই তা তিনি ঠাহর ক'রতে পারলেন না, তবে মান্‌লেন যে এর ভিতর নিশ্চয়ই কিছু আছে, অনভিজ্ঞ বলে তিনি ধ'রতে পারছেন না।

দুপুরের 'সেবা'র পরে রেলে করে পিনাং যাবার জন্য আমরা ষ্টেশনে যাত্রা করলুম। পথে Indian Association গৃহে কবিকে পদার্পণ ক'রতে হল। সুন্দর দোতালা বাড়ীটি। Association এর সভাপতি ডাক্তার ঘোস-ই এর প্রাণ। বাড়ীটি, আর এই সভার নানা শ্রেণীর সদস্যের মধ্যে একতা, এই অঞ্চলের ভারতবাসীদের যোগ্যতার আর পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যের পরিচায়ক।

তারপরে ষ্টেশনে পঁউছে বিদায়ের পালা। ষ্টেশনে একখানা গাড়ী দক্ষিণ দিক থেকে এল। একদল শিখ নাম্‌ল। ষ্টেশনের বাইরের সড়কে এরা মিছিল করে ঢোলক বাজিয়ে গান ক'রতে ক'রতে গেল। শুনলুম, এরা বরযাত্রী, ক'নেদের বাড়ী তাই-পিং-এ, বিয়ের জন্যে এসেছে।—ষ্টেশনে বন্ধুদের কাছে বিদায় নেওয়া গেল। সকলেই যেন কতদিনের বন্ধু হ'য়ে গিয়েছে। শ্রীযুক্ত ডসন ইপোঃ থেকে এসেছেন; এই ক'দিন তো আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতন ছিলেন। কবির পায়ের ধূলো নিলেন, বিদায়কালে ভদ্রলোকের গলার স্বর ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল। আমাদেরও মনে কষ্ট হ'ল।

(১০) পিনাং।

সাড়ে তিনটের গাড়ী তাই-পিং ছাড়লে। পিনাঙের পথে পূর্ব্ববৎ যে যে ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌ল সেখানেই ভীড়। Parit Buntar এ কতকগুলি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে

দেখা—এঁরা কুআলা-লুম্পুরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যের দিকে আমরা Prai প্রাই ষ্টেশনে পৌঁছুলুম। পিনাং শহর একটি ছোটো দ্বীপে। সরকারী লাঞ্চের ব্যবস্থা হ'য়েছিল, তাতে ক'রে আমাদের শহরে নিয়ে গেল। শহরের জেটিতে কবির অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হ'য়েছিলেন অনেকে। কবির পূর্ব্বপরিচিত অনারেবল্ মিষ্টার পি, কে, নাম্বিয়ার এসেছিলেন। ইনি পিনাঙের একজন প্রধান ব্যক্তি। মালয়ালীভাষী নায়র, এখানে ব্যারিষ্টারী করেন, ষ্টেটস্-সেট্‌লমেণ্ট্‌স্ কাউন্সিলের মেম্বার। শরীর অসুস্থ, কিন্তু সৌজন্যের অবতার বৃদ্ধ স্বয়ং এসেছেন। সঙ্গে তাঁর পুত্র ডাক্তার মনোন্, আর পুত্রবধূ: ইনি জার্ম্মান-দেশীয়া। আলাপ আর শিষ্টাচারের পরে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় যাত্রা আমরা ক'রলুম।

পিনাং শহর থেকে আট মাইল দূরে, পিনাং দ্বীপের উত্তরে, Tanjong Bungah তাঞ্জং বুঙা বলে একটি জায়গায়,সমুদ্রের ধারে Ooi Hong Lim উই-হং-লিম নামে এক চীনা ভদ্রলোকের দোতলা বাংলা বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। অনেকগুলি চীনা আর ভারতীয় ভদ্রলোক সঙ্গে এলেন। রাত্রে খুব বড়ো ডিনার হ'ল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণন্ ব'লে একটি তামিল যুবক, ইনি কুআলা-লুম্পুরে আমাদের পরিচিত কুমারস্বামী ব'লে একজন রবার-বাগানের মালিক আর ধনী ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র, আর Ong Huck Lim ওং-হাক-লিম্ ব'লে একটি চীনা ব্যারিষ্টার যুবক, রাত্রে এখানে র'য়ে গেলেন, আমাদের সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্য। এই দুইটি যুবকের সঙ্গে আমাদের চমৎকার ব'নে গিয়েছিল; বিশেষতঃ হাক্-লিম্—চীনা হ'লেও ক'দিনে তাঁর সঙ্গে যে হৃদ্যতা হ'য়েছিল, তাতে মনে হ'য়েছিল, এই রকম সৌজন্যপূর্ণ খোলাপ্রাণ শিক্ষিত লোক পে'লে তার সঙ্গে প্রতিবেশী হিসেবে এক দেশে বেশ আনন্দেই বাস করা যায়। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে হাক্-লিমের খুবই অন্তরঙ্গতা।

রবিবার ১৪ই আগষ্ট।—

পিনাং শহরে আগে একবার আমি এসেছিলুম, ১৯১২ সালে, পনেরো বছর আগেকার কথা। তখন এখানে দু দিন মাত্র ছিলুম। শহরটা একটু ছড়িয়ে প'ড়েছে এই যা, অন্য পার্থক্য কিছু নজরে পড়্‌ল না। পূর্ব্ব-পরিচিত বিষ্ণুমন্দিরে গেলুম—এই মন্দির অনেক দিনের—পিনাং যখন ভারত সরকারের অধীন ছিল। আর দ্বীপান্তরের আসামীদের যখন "পুলি-পোলাও" অর্থাৎ "পুলো-পিনাং" বা পিনাং দ্বীপে পাঠানো হ'ত, আন্দামানে যখন পাঠানোর ব্যবস্থা হয় নি, তখন এখানকার ভারতীয় কেরাণী আর পাহারওয়ালারা মিলে এই মন্দিরটি করে। জমি তখন শস্তা ছিল; মন্দিরের কিছু ভূসম্পত্তি আছে, এখন সেই জমির উপসত্ব থেকে মন্দির চলে। মন্দিরের পুরোহিত চট্টগ্রাম থেকে আগত, এঁর নাম শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। পিনাং-এর হিন্দুদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সম্মান আছে। মালয়দেশে শ্যামদেশে যে সব ভোজপুরিয়া আর অন্য হিন্দু চাকরীর জন্য যায়, তারা পথে পিনাঙে এই মন্দিরেই আশ্রয় নিয়ে থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে মন্দিরে দেখা হ'ল না, পথেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘ'টে গেল।

শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ার পরিবারের সঙ্গে এ কয়দিনে বেশ আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের জারমান পুত্রবধূ স্বামীর সংসারে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। এঁরা হিন্দু। আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত নাম্বিয়রের এক ছোট ভাই ইনি অবিবাহিত, ভাইপো ডাক্তার মেনোনের ছেলে-মেয়েদের নিয়েই আছেন। ছেলেদের দেশী নাম রাখা হয়েছে—রামন্ অচ্যুতন্ দেবকী স্বামী, ছেলেপিলে, শ্বশুর, খুড়-শ্বশুর এদের নিয়ে ঘরের গৃহিণী হ'য়ে এই জারমান মহিলাটি কেমন সহজভাবে সকলের সঙ্গে বনিয়ে সংসার চালাচ্ছেন, দেখে তাঁকে মনে মনে সাধুবাদ দিতে হ'ল। ডাক্তার মেনোন্ বেশ সজ্জন। পিনাঙে একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র, ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত স্নেহভাজন যুবক, বিদেশে এসে নাম্বিয়ার পরিবার আর ডাক্তার মেনোনের কাছে বেশ সৌহার্দ্দ্য লাভ করেছেন।

আজকে বিকালে স্থানীয় চীনাদের একটি বড়ো ক্লাবে, Hu Yew Seah হু-ইউ-সিয়াতে কবিকে যেতে হ'ল। চা পানের পাট এখানে ছিল। এইখানে এই ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত Heah Joo Seang হিয়া-জু-সিয়াং কবিকে মান-পত্র দিলেন। মান-পত্রের উত্তরে

কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল, চীন আর ভারতের সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাবে ব'ললেন। এই সভায় পিনাঙের বহু লোকের আগমন হ'য়েছিল। এই সভার নোতুন বাড় ... কবিকে তার মঙ্গলেষ্টক স্থাপন ক'রতে হ'ল।

এই অনুষ্ঠান হ'য়ে গেলে, কবি তাঞ্জং বুঙাতে ফিরলেন, আমরা গেলুম শহরের বাইরে চীনাদের এক মন্দির দেখ্‌তে। বৌদ্ধ মন্দির। এখানে কতকগুলো সাপ পুষে রেখেছে; সবুজ রঙের ছোটো ছোটো সাপ, এগুলো বেদির আশেপাশে আর মন্দিরের নানা স্থানে নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। এদের ডিম খেতে দেয়। এখানে এই সাপ দেখবার জন্য ভীড় হয়, পয়সাও পড়ে। মন্দিরের পুরোহিতেরা পয়সা-আকর্ষণের এই এক বেশ ফন্দী বা'র করেছে।

সোমবার, ১৫ই আগষ্ট।—

সকালে চীনা ইস্কুলগুলির ছাত্রেরা Chung Ling High Schoolএ সমবেত হ'ল, কবি তাদের সামনে কিছু ব'ললেন। ছেলেদের খুবই উৎসাহ। এখানে ভারতবাসীরাও এসেছিল। দেখ্‌লুম উপনিবিষ্ট "বাবা" চীনা আর ভারতবাসী, এরা বেশ বন্ধুভাবেই থাকে।

বিকালে ছিল এম্পায়ার থিয়েটার হলে বক্তৃতা। পিনাঙের রেসিডেণ্ট কাউন্সিলর অনারেবল্‌ মিষ্টার আর স্কট সভাপতি হ'লেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Nationalism: এই বিষয়ে কবির যে স্পষ্ট মত আছে, যা অনেক শক্তিশালী জাতির পক্ষে রোচক হয় না, তাই তিনি আর একবার বেশ স্পষ্ট ক'রে বলেন। আর জগতের শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক মনোভাবের আবশ্যকতা, আর এই কার্য্যে বিশ্বভারতীর সহায়তা সম্বন্ধেও উল্লেখ করেন।

চীনের কন্‌সালের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। কন্‌সাল কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর জন্য, বিশেষতঃ সেখানে চীনা ভাষার অধ্যাপনের ব্যবস্থার জন্য চীনাদের মধ্যে যাতে সাহায্য পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন স্বীকার ক'রলেন।

সন্ধ্যের দিকে, শহরের বাইরে, পিনাং-দ্বীপের প্রায় মাঝামাঝি, Ayer Hitam আয়ের ইতাম ব'লে একটা পাহাড়ের উপর এক চীনা বৌদ্ধ-মন্দির আছে তাই দেখতে গেলুম। এখানে চীনারা এক বিরাট ব্যাপার ক'রেছে। রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছিল, তাই বেশীক্ষণ থাকতে পারলুম না। ফ্যঙ্‌ সঙ্গে ছিলেন, তাঁর সাহায্যে পুরোহিতদের সঙ্গে এক ... । ক'রলুম; সুরেন-বাবু তুলি ধরে "নমো বুদ্ধায়" লিখে দিলেন খানকতক কাগজে—তারপর বিদায় নিলুম। মন্দিরের স্মারক হিসাবে পুরোহিতেরা একটি ছোটো ঘণ্টা উপহার দিলেন, একটি কাঠিতে লাগানো এই ঘণ্টা, পূজার সময় পুরোহিতেরা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এই ঘণ্টা বাজায়।

ফিরে এসে, স্থানীয় United Indian Association গৃহে কবির সঙ্গে ডিনার খেতে যেতে হ'ল।

মঙ্গলবার, ১৬ই আগষ্ট।—

হাক্‌-লিমের এক চীনা বন্ধু মিষ্টার Ui উই এলেন কবিকে একটু বেড়িয়ে আনবার জন্য। মিষ্টার উই একজন স্থানীয় ধনকুবের, ছেলেপুলে নেই, একটি ভাগ্নীকে দত্তক নিয়েছেন। পিনাং শহরের উপর দিয়ে গিয়ে প্রায় বারো শত ফীট উঁচু পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়ে মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন। অতি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা। সবুজ না'রকল গাছের শ্রেণী, সমুদ্র, পাহাড়। শ্রীযুক্ত উই-য়ের একটি বাগানে আশ্চর্য্য এক সাত-ডেলে না'রকল গাছ হ'য়েছে, পরে সেটি দেখিয়ে আনলেন।

আজকে পিনাং থেকে সুমাত্রা যাত্রা ক'রবো। দুপুরে নাম্বিয়ারদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজন, বিকালে মিষ্টার উইয়ের বাড়ীতে চা-পান। সিন্ধী দোকানী বাসিয়ামল-আসোমল কোম্পানী বাতাবিয়ায় তাঁদের ব্রাঞ্চকে তার ক'রে দিলেন, কবি আজ যবদ্বীপ যাত্রা ক'রছেন। আরিয়াম র'য়ে গেলেন, মালয় দেশে বিশ্বভারতীর জন্য স্বীকৃত চাঁদা সংগ্রহ ক'রে পরে শ্যামদেশে যাবেন, কবির শ্যামে অবস্থানের বিষয়ে সব স্থির ক'রতে। বিকাল সাড়ে চারটায় আমরা সুমাত্রা-গামী জাহাজে চ'ড়লুম ব্লু-ফনেল-লাইন, ইংরেজ কোম্পানী; তাদের ছোটো জাহাজ, নাম Kuala কুআলালা। সারারাত ধরে পাড়ী দিয়ে কাল সকালে ওপারে উত্তর সুমাত্রার বন্দর Belawan বেলাওয়ানে পঁউছুবো। সেখানে কালই জাহাজ ব'দলে

আমরা ডচ্ জাহাজে চ'ড়বো, সেই জাহাজ সিঙ্গাপুর হ'য়ে আমাদের যবদ্বীপে পৌঁছে দেবে।

জাহাজে চ'ড়লুম, আরিয়াম-প্রমুখ বন্ধুরা বিদায় নিলেন। ইপোর গুণরত্ন ডসন্ এসেছিলেন, হাক্-লিম, কৃষ্ণন্ আর অন্য স্থানীয় বন্ধুরা এসেছিলেন। বন্ধুরা চলে গেলেন। জাহাজ ছাড়্‌ল। এইবার আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্ব্ব—মালাই পর্ব্ব—চুকল, যবদ্বীপের পথে মালাই দেশটা ঘোরা হ'ল, ব্রিটিশ অধিকার ছেড়ে কাল ডচেদের এলাকায় সুমাত্রায় পঁউছুবো। সুমাত্রার জগৎ যবদ্বীপেরই জগতের অংশ ; এইবার সত্যিই যবদ্বীপের দিকে চ'ললুম।

সনেট-কাব্য ও 'দীপালি'*

শ্রী সত্যসুন্দর দাস

এই কাব্যখানির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমার নিজের কিছু কৈফিয়ৎ আছে। আজকাল পুস্তক-সমালোচনায় যে রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল না—কারণ গ্রন্থ ভাল হউক, মন্দ হউক গ্রন্থকারের পক্ষে কিছু বলিয়া বাজারে তাহার পসার করিয়া দেওয়ার নামই সমালোচনা। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই তাহাতে ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা দুরভিসন্ধি সূচিত হইয়া থাকে। আমিও বাহ্যতঃ সেই সনাতন রীতিরই অনুসরণ করিতেছি বলিয়া মনে হইবে ; এবং যদি গ্রন্থখানির প্রশংসাই করি তবে তাহা ভদ্রজনোচিত হইবে, অতএব, ভদ্রসমাজে আমার কুণ্ঠার বা সঙ্কোচের কারণ নাই। তথাপি কৈফিয়তের প্রয়োজন আছে, তার কারণ, দীপালির কবিতাগুলি যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার জন্য আমি নিজেই অনেকটা দায়ী। সাহিত্য-সাধনায় লেখক আমার সহযোগী ও সতীর্থ। কাব্য ও সাহিত্যের আদর্শ আমার জীবনে আমি যেটুকু ধরিতে পারিয়াছি তাহার মূলে এই নীরব নিস্পৃহ আত্মগোপনকারী বন্ধুটির যথেষ্ট সাহচর্য্য আছে। বাল্যকাল হইতে ইনি কবিতা লিখিতেছেন, কিন্তু কখনও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সংস্কৃত, বাংলা ও য়ুরোপীয় কাব্যরসে তাঁহার হৃদয় চিরদিন ভরপুর এবং চিরদিন কাব্যের একটি কঠোর আদর্শ তিনি নিজের মনে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজী কাব্যে Browning ও Browning-জায়ার কবিতার তিনি একান্ত পক্ষপাতী—বাংলা কাব্যের প্রায় সকল কবিরই তিনি পক্ষপাতী। কিন্তু বিশেষ করিয়া দুইজন বিভিন্ন প্রকৃতির কবি তাঁহার অন্তরে কাব্য-প্রেরণা জাগাইয়াছেন—অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন। Browning-জায়ার *Sonnets from the Portuguese* ও D. G. Rossetti'র *House of Life* তাঁহার নিকট a joy for ever! ইংরেজী এলিজাবেথীয় যুগ ও উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সেরূপ পরিচয় আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিরই আছে বলিয়া মনে হয়। এহেন ব্যক্তি যে কাব্যরসিক এ কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু কাব্যরসিক হইলেই কবি হওয়া যায় না। "দীপালি" রচয়িতা কি কবি নামের যোগ্য? এ কাব্য যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহারাই ইচ্ছামত ইহার উত্তর দিবেন। আমার একটা উত্তর আছে তাই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এ কাব্য লেখকের যৌবনারম্ভে মুকুলিত হইয়াছিল, আজ যৌবন শেষে তাহা পূর্ণবিকশিত হইয়াছে। কেবল কাব্য আলোচনা করিলেই কবি হওয়া যায় না—নিজের জীবনে যদি কাব্য-প্রেরণার কোনও বস্তু থাকে এবং তাহার প্রকাশের প্রয়োজন ও আয়োজন যদি সাধনাযুক্ত হয়, তবেই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব—সুশীলকুমারের কাব্যখানিও তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার জীবনে যেটুকু রস, রূপ, গন্ধ ও আলো তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, ঠিক সেইটুকুই প্রকাশ করিয়াছেন—অতিরিক্ত আশা বা চেষ্টা করেন নাই।

কাব্যের আদর্শ ও কাব্যকলার সম্বন্ধে নিরতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার কবিতাকে একটি বিশিষ্টরূপে আকার দিতে পারিয়াছেন। এইরূপ যোজনা সার্থক হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার কবিতাগুলি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। নিজের অতি গোপন নিভৃত নিঃসঙ্গ বাসনা অতিশয় গভীর ও আন্তরিক ভাবানুভূতি প্রকাশের পক্ষে 'সনেট'ই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কবিতার এই সনেট-রূপটিকে তিনি অবিচলিত সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন, এই সাধনার ইতিহাস আমি জানি। এইরূপ সাধনার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে—সেই শ্রদ্ধাই এই কবিতাগুলির দ্বারা জয়যুক্ত হইয়াছে। আজিকার দিনে নিরতিশয় চাপল্য ও অসংযমের কোলাহলে একজন যশোলিপ্সাহীন কবির নিভৃত সাধনার ফল যেটুকু পরিপক ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এ কবিতাগুলি অন্ততঃ পাঁচ বৎসর অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। সুকবিতার এই দুর্ভিক্ষের দিনেও ইহার একটিকেও মাসিকে প্রকাশ করাইতে পারি নাই। তাহার কারণ, শুধু সঙ্কোচ নয়, অভিমানও নয়, এগুলিতে কবির শুধুই কাব্যকল্পনা নয়—নিগূঢ় মর্ম্মকথা আছে—যে অন্তরের মানুষটি অন্তরঙ্গ বলিয়াই বাহিরে আসিতে চায় না, ইহাতে কবির সেই গূঢ় আত্ম-প্রতিকৃতি আছে ; যে কথা প্রকাশ করিলেই তাহাকে ছোট করা হয়, কবির সেই একান্ত আত্মগত ভাবনা, আপনার নিকটেই আত্মনিবেদন, এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে। কেন তিনি এগুলি প্রকাশ করিতে চান না তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন।—

ক্ষুদ্র শুক্তি পড়ে' ছিল আঁধারে অতল
মুক্তাটি বুকে তার সযতনে ধরি' ;

* দীপালি—শ্রী সুশীলকুমার দে। প্রকাশক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কবে তারে আলোকের শ্মশানে আহরি'
নিল তার বুক চিরে বুকের সম্বল!
ধুলার আড়ালে ছিল ক্ষুদ্র বীজ পড়ি',
বুকে তার জীবনের সঞ্চয় অচল;
অঙ্কুর বিকাশি' টুটি' মরম-অর্গল
বেড়ে নিল ছিল যাহা বুক তার ভরি'।
একদিন গান মোর নিরাশা-তিমিরে
প্রেমটুকু ধরেছিল বুকেতে গোপন,—
কেন তারে কেড়ে লও আলোকের তীরে
ছিন্ন করি' সঙ্কোচের স্নিগ্ধ আবরণ?
রহে মুক্তা, রহে তরু; শুক্তি, বীজ মরে—
রহিবে কি প্রেমটুকু, গান যদি ঝরে?

কিন্তু তবু যে প্রকাশ হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, এই উদ্ধৃত কবিতাটির মধ্যেই আছে। যাঁহারা কাব্য রস-পিপাসু তাঁহারা এই কবিতাটি পড়িলেই বুঝিবেন, এই কবিতাটির লেখকের রচনার বিশেষত্ব কি? এবং বাংলা কাব্যের আসরে ইঁহাকে পরিচিত করার প্রয়োজন আছে কি না? যদি না থাকে তবে আমিই ভুল করিয়াছি, কিন্তু যদি সে প্রয়োজন থাকে, তবে আমার এই আলোচনাও সার্থক হইবে। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

প্রথমেই বলিয়া রাখি "দীপালি" নামটি আমার পছন্দ হয় নাই। দীপালি নাম না রাখিয়া 'হরিতালী' রাখিলেও আমার আপত্তি ছিল না। কবিতাগুলির মধ্যে আধুনিক ফ্যাশনের কিছুই নাই—নামটা কিন্তু একটু ফ্যাশন-ঘেঁসা হইয়াছে এবং বড় বেশী ফ্যাশনেবল্। অবশ্য সনেট-জাতীয় বা সনেটাকৃতি কবিতার চলন আজকাল খুব বেশী। আধুনিক কালে Sonneteer হওয়াই সব চেয়ে সহজ বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছে, কিন্তু সনেট যে কি বস্তু এবং কি গুণ থাকিলে চতুর্দ্দশপদী কবিতা 'সনেট' পদবী পাইতে পারে সে-বিষয়ে কাহারও জিজ্ঞাসা আছে বলিয়া মনে হয় না—থাকিলে, ওমার-খৈয়ামী কবিতার মত এত ঝাঁক ঝাঁক সনেট বাজারে বাহির হইত না। 'দীপালির' কবিতাগুলি শুধু চতুর্দ্দশপদী কবিতা নয়। ইহার মধ্যে সনেটের ষোল আনা না হইলেও বারো আনা গুণ আছে। প্রথমেই সনেটের রূপ বা formএর কথা বলিব।

বাংলা কাব্যে সনেট ছিল না—চতুর্দ্দশপদী কবিতাই ছিল—পরে আধুনিক কালে, সনেটের ছন্দোবন্ধ ও মিলের নিয়ম কেহ কেহ মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বেকার 'চতুর্দ্দশপদী' সনেট না হইলেও তাহার অনেকগুলিই উৎকৃষ্ট কবিতা বটে—আমি রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের ঐ নামীয় কবিতার কথা বলিতেছি। কিন্তু আধুনিক সনেটগুলির অনেকে আকারে সনেট হইলেও কবিতায় সনেট নয়। তাহার কারণ সনেটের নাগপাশ শুধু কতকগুলি মিলের বিন্যাসেই নয়—আসল বন্ধনটি শুধু দেহের নয়, আত্মারও। আত্মার স্ফূর্ত্তি যত অধিক এই বন্ধনের কঠিন পীড়নে তাহার দীপ্তিও তত অধিক। সনেটের এই বন্ধন একটা বাহিরের বেশ নয়—সনেট-জাতীয় কবিতার ভাব-মূর্ত্তিই এই মিল-বিন্যাস ও ছন্দোবন্ধ। একটি অতি গভীর আবেগ বা ভাবনাকে ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশ করিতে হইলে তাহাকে ক্ষুদ্র হইলে চলিবে না—স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত তাহাকে যত চাপিয়া ছোট করা হইবে, ততই যেন তাহার সেই সংহত-শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সনেটের এই নাগপাশের সৃষ্টি। যে কবি ইহার উদ্ভাবন করেন তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই থাক্, মিল-বিন্যাসের ও গঠনের মধ্যে একটি যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে, হয়ত তাহাই ছিল ইহার প্রধান আকর্ষণ। আদি কবির অনুষ্টুপ ছন্দ যেমন করুণার আবেগে নিঃসৃত হইয়াছিল—আদি সনেটও তেমনি প্রেমের আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসেও প্রেমই ছিল ইহার প্রধান উৎস; এবং ইয়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সনেটগুলির প্রেমই একমাত্র বিষয় না হইলেও তাহাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বত্রই একটা খুব গভীর আবেগ passion বা sentimentই সনেটের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—বৈঠকী আলাপ, রসিকতা বা ইয়ারকির চুটকি উৎকৃষ্ট সনেটের প্রেরণা হয় নাই। এইজন্য উত্তরকালের একজন নিপুণ সনেট-কবি সনেট সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

A sonnet is a moment's monument,—
　Memorial from the Soul's eternity
To one dead deathless hour. Look that it be,
Whether for lustral rite or dire portent,
Of its own arduous fulness reverent:
　Carve it in ivory or in ebony,
As Day or Night may rule; and let Time see
　Its flowering crest impearled and orient.
A sonnet is a coin: its face reveals
　The soul,—its converse, to what power 'tis due:—
Whether for tribute to the august appeals
　Of Life, or dower in Love's high retinue,
It serve; or, 'mid the dark wharf's cavernous breath
　In Charon's palm it pay the toll to Death.

নিখুঁত সনেটের আকারে সনেটের প্রাণবস্তুর এমন যথার্থ পরিচয় যে কবির লেখনীমুখে বাহির হইয়াছে—সনেটের প্রতি যাঁহার এতখানি শ্রদ্ধা, তিনি নিজেও যে একজন উৎকৃষ্ট সনেট-রচয়িতা হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। D G. Rossetti তাঁহার সনেট-কাব্য *House of Life*এর মুখবন্ধ স্বরূপ এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

সনেটের form ও content কেন যে পার্ব্বতীপরমেশ্বরের মত নিত্যসম্পৃক্ত ইহা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই ইহার কারণ বুঝিবেন। প্রেমের আবেগেই সনেটের জন্ম—ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, সনেটের content একটা অতি গভীর হৃদয়াবেগ—এই passion কেবল উৎসারিত হইলেই হইবে না—তাহাতে যে কোনও উৎকৃষ্ট lyricএর জন্ম হইতে পারে—সে ক্ষেত্রে কোনও বন্ধনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেখানে এই passion পুষ্পপাকের মত একটি সুস্পষ্ট ভাবনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়া উঠে, সেইখানেই তাহা সনেটের রূপ গ্রহণ করিতে পারে। একদিকে যেমন আবেগ অপর দিকে তেমনিই অন্তর্নিরুদ্ধ গভীরতা—এই উভয়ের প্রয়োজনে তরলোচ্ছল ভাব-বাষ্প যে নিয়মে গাঢ় হইয়া উঠে—সনেটের মিল-বিন্যাস ও স্তবকগঠন সেই স্বাভাবিক নিয়মের ফল। কবির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস কেমন করিয়া এই অতি কঠিন নিয়ম-বন্ধনেই সার্থক হইয়া উঠে, এই নাগপাশের কৃত্রিমতা ও সনেট-কবির অকৃত্রিম আন্তরিকতা কেমন করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে—উৎকৃষ্ট সনেট পড়িবার সময় ইহাই ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এইজন্যই সনেট লেখকের বিশিষ্ট প্রতিভা ও কৃতিত্বের প্রয়োজন। যে কোনও ভাব বা ভাবনাকে সনেটের ভঙ্গী ও ছাঁচে ঢালা অসম্ভব। ভাব ও রূপের মধ্যে যেখানে একটা স্বাভাবিক আসক্তি থাকে, সেখানেই কাব্য-প্রেরণা আপনা হইতেই সনেটের সন্ধান করে। তাহা না হইলে যাহা হয় তাহাই আজকাল বাংলা কাব্যে হইতেছে—এ বিষয়ে একজন ইংরেজ-লেখকের উক্তি আমাদের সম্বন্ধেও খাটে—

"Not only is there still a general ignorance of what a sonnet really is and what technical qualities are essential to a fine specimen of this poetic genus, but a perfect plague of 'eeble productions in fourteen-lines has done its utmost to render the sonnet as effete a form of metrical expression as the irregular ballad-stanza with a meaningless refrain."—(Irregular ballad-stanzaর স্থানে, রবীন্দ্রনাথের অসম-ছন্দের অনুকরণে লিখিত ঝুড়িঝুড়ি পয়ার-কবিতা ও গাথার উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

সনেটের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। সনেটের আদি প্রবর্ত্তন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আকার ও প্রকারে যত রূপ দেখা দিয়াছে এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে মোটামুটি কিছু বলিব। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইতালীয় ভাষায় সনেটের একটা রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে। পরে বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় এই ইতালীয় আদর্শের নানা রূপান্তর ঘটে। তথাপি এসম্বন্ধে একটা কথা সকলেই স্বীকার করেন যে সনেটের সেই আদি রূপটিকে যে কবি যতটা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন তিনি তত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইংরেজী কাব্যে Shakespeare, Milton, Wordsworth ও D. G. Rossetti সর্ব্বোৎকৃষ্ট সনেট লিখিয়াছেন। ফরাসী-সনেটের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু অনেকের মতে সনেট সে ভাষায় সমধিক উৎকর্ষ লাভ করে নাই। Shakespeareএর সনেট এতই স্বতন্ত্র যে, তাহার ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। তিনটি চারি চরণের শ্লোকে একটি ভাব ক্রত-বিকশিত হইয়া সর্ব্বশেষে একটি পয়ার-শ্লোকে নিঃশেষ হইয়াছে। যে ভাব আবেগ-প্রধান, অর্থাৎ একান্ত গীতিপ্রাণ, যেখানে ভাবকে একটি ভাবনায় কেন্দ্রীভূত করিয়া, উত্থান ও পতনের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, একটি সংযত সঙ্গীত-মাধুরী দ্বারা, শুধু প্রাণ নয়, কানেও মনে তাহার অনুরণন দীর্ঘ ও গভীরতর করিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই—সেখানে সনেটের এই আকারই উপযুক্ত। ইহাকে আমরা Romantic সনেট বলিতে পারি: কিন্তু যেখানে ভাবের সহিত ভাবনার গভীরতা ও সংযম এবং তজ্জন্য সূক্ষ্মতর সঙ্গীত-চাতুরীর প্রয়োজন—Lyric উচ্ছ্বাসকে গভীর অথচ গভীরতর মাধুরীতে মণ্ডিত করার প্রয়োজন—সেইখানে আদি বা Natural Sonnetএর রূপই বিশেষ উপযোগী। Milton এই দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে Wordsworth খাঁটি সনেটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে ইংরেজী-কাব্যে সনেটের পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহাতে এই আদি রূপটির প্রতি বিশেষ আসক্তি এবং তাহা হইতেই অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সনেট ও সনেট-কাব্যের জন্ম হইয়াছে। এই আদি রূপটির একটু পরিচয় দিব। মনে রাখিতে হইবে এই আদি রূপেরও রূপভেদ আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে রূপটি বিশেষ করিয়া প্রাধান্যলাভ করিয়াছে সেইটিকেই আমরা আদি রূপ বলিব। সনেটের চৌদ্দটি লাইন দুইভাগে বিভক্ত; একটিতে আট লাইনের অষ্টক (octave) অপরটি ছয় লাইনের ষট্‌ক (sestet)—এই প্রথমটিতে আবার চারি লাইনের পর একটি বিরাম এবং আট লাইনের পর পূর্ণচ্ছেদ; ইহাতে দুইটিমাত্র মিল, তাহার বিন্যাস এইরূপ:— গ ঘ ঘ গ, গ ঘ ঘ গ। অপরার্দ্ধের অর্থাৎ ষট্‌কের মধ্যেও দুইটি ভাগ আছে। প্রত্যেকটির নাম ত্রিপদিকা বা tercet। এখানে দুই বা তিনটি মিল থাকিতে পারে, এবং তাহার বিন্যাসেও যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। এই যে দুইটি প্রধান ভাগ—ভাবের দিক হইতে ইহার প্রয়োজন এই যে, প্রথমার্দ্ধে ভাবের উদ্বোধন এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভাবের নিবর্ত্তন থাকিবে। মিল-বিন্যাস, এবং ভিতরকার সামান্যচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের কোনও বহির্গত কারণ নাই—যাঁহারা ওস্তাদ সনেট-লেখক তাঁহারা ইহার মধ্যে সনেটের সঙ্গীতরূপের ও ভাবরূপের একটি দুর্ল্লক্ষ্য প্রকাশ-রীতি লক্ষ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বহু experiment-এর ফলে সনেটের এই classical রূপটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দশ বার ষোল বা ততোধিক লাইন, অষ্টমাত্রিক, দ্বাদশমাত্রিক, এবং তদপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ পদ; এবং নানা মিল-বিন্যাস, এমন কি মিলহীন রচনাও সনেটের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই রূপটি একটি বিশিষ্ট ধরণের ভাববস্তুর উপযুক্ত আশ্রয় বলিয়া ধারণা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক আলোচনা করিব না। ইংরেজ-কবি Theodore Watts-Duntonএর বিখ্যাত সনেট হইতে তাহার শেষাংশটি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।—

A sonnet is a wave of melody:
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "octave," then returning free
Its ebbing surges in the Sestet roll
Back to the deeps of life's tumultuous sea.

* * *

এইবার আলোচ্য কাব্যখানির সনেটত্ব কোথায় এবং কতটুকু, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু একটা কথা প্রথমেই বলিয়া রাখি। সনেটের গঠনের যে আদর্শের কথা বলিয়াছি, অক্ষরে অক্ষরে তাহার পালন খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে কয়েকটি প্রধান নিয়ম না মানিলে 'সনেট'কে চতুর্দ্দশপদী কবিতা বলিব, সনেট বলিব না। (১) 'অষ্টক' ও 'ষট্‌ক' এই দুইটি ভাগ ভাবে ও রূপে স্পষ্ট হওয়া চাই। (২) সমগ্র কবিতাটি one and whole হওয়া চাই। (৩) ভাবের মধ্যে dignity ও repose থাকিবে, এবং সেজন্য ইংরেজী ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও দ্বৈমাত্রিক বা যুক্তাক্ষরমূলক মিল ব্যবহৃত হইবে না; ইংরেজীতে যাহাকে close rhyme বলে সেরূপ মিলও থাকিবে না। (প্রথমোক্ত মিলের উদাহরণ, যথা—বন্ধ-গন্ধ, বা কন্যার-বন্যার; শেষোক্ত মিল যথা—বিরল-তরল, শরণ-মরণ—এইরূপ মিলকে close rhyme বলে, সনেটের মিলগুলি খুব স্পষ্ট পৃথক হওয়া চাই)। (৪) সনেটের ভাব গভীর হইবে, তাহাতে অর্থগৌরব থাকিবে, কিন্তু হেঁয়ালি বা ধোঁয়া থাকিবে না। (৫) অষ্টক ও ষট্‌ক ছাড়া আর কোনও পৃথক ভাগ থাকিবে না। এই শেষোক্ত নিয়মটির সম্বন্ধে আধুনিক বাংলা সনেট-লেখক বিশেষ সাবধান হইবেন। আজকালকার তথাকথিত আদর্শ-সনেটে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। বোধ হয় ফরাসী-সনেটের অনুকরণ করিতে গিয়া এই হাস্যকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। ফরাসী-সনেট-কবিরা সনেটের Sestet-এর প্রথম দুই চরণে মিল রাখার পক্ষপাতী—তাহাতে একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয়; তথাপি মূল নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না; কারণ এই দুই পদ পৃথক নয় Sestet-এরই অঙ্গ। কিন্তু বাঙালী সনেট-লেখক ইহাকে Sestet হইতে পৃথক করিয়া এক অদ্ভুত effect-এর সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা সনেটের continuityর অন্তরায়, এইরূপ কবিতা সনেট-পদবাচ্য নয়।

এই নিয়মগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিলে দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার,—যাঁহাদের চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি lyric হিসাবে সুন্দর হইয়াছে, তাঁহারা কেহই ভাবে ও রূপে যাহাকে খাঁটি সনেট বলে তাহা লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলির ভাব-বিকাশ ও পরিণতি সুন্দর; কিন্তু গঠনের কোন

নিয়ম না থাকায় ইহাদের চতুর্দ্দশপদী আকার নিতান্তই ইচ্ছাধীন, দুই লাইন কম বা দুই লাইন বেশী হওয়ার পক্ষে কোনো বাধা ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেবেন্দ্রনাথের প্রায় সকল সনেটে অষ্টক ও ষট্‌কের একটা স্পষ্ট ভাববিভাগ আছে এবং ভাবের এমন গভীর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস আছে যে, গঠনের পারিপাট্য না থাকিলেও সেগুলিকে আমরা সেক্‌স্‌পীরীয় রোমান্‌টিক সনেটের শ্রেণীতে ফেলিতে পারি। এ যুগে একমাত্র দেবেন্দ্রনাথই যে সনেটের আদর্শ অনেকটা মনে রাখিয়া ছিলেন এবং উঁহারই মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত সনেটটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে।—

বসন্তের ঊষা আসি' রঞ্জি' দিল যুগল কপোলে,
তাই ও ফুলের বাস, ফুল হাসি আননে প্রিয়ার!
নিদাঘের রৌদ্র আসি' ঝলসিল ললাট-নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার!
ঘন-ঘোর বর্ষারাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে,
তাই গো প্রিয়ার পীঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার!
নাচিল শরৎশশী রূপহ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে,
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার!

রাহু কেতু দুই ঋতু—শীত ও হেমন্ত শুধু হায়
প্রিয়ায় হৃদয়ে পশি' ছড়াইল কঠিন তুষার!
তাই প্রিয়ে, তাই বুঝি সুকঠিন হৃদয় তোমার?
উপাসনা আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায়!
আমি গো বুঝিতে নারি—দেবী তুমি অথবা রাক্ষসী!
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিম্বা ঘোরা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী!

এই কারণে দেবেন্দ্রনাথের সনেটগুলিতে খাঁটি সনেটের রূপ না থাকিলেও—বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট সনেট রূপ হিসাবে সেগুলিকে বরণ করিয়া লইতে আপত্তি নাই। কবিবর অক্ষয়কুমার যে কয়েকটি সনেট লিখিয়াছেন তাহাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা কবিতায় সনেটের মিল-বিন্যাস ও গঠন অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সনেটের ভাব-গভীরতা ও ভাব-বিকাশ আদৌ সনেটের উপযোগী হয় নাই। সনেটের আকার যে তাহার ভাববস্তু হইতে স্বতন্ত্র একটা কাঠামো মাত্র নয়, তাহা এই কবিতাগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। "A Sonnet is either all air and fire or a mere wooden toy"—এ উক্তি যথার্থ। এইজন্য অক্ষয়কুমারের কবিতা আকারে সনেট হইলেও আসলে সনেট হয় নাই। তথাপি তাঁহার একটি সনেট বক্তব্যের দিক দিয়া one and whole হইয়াছে, গঠনেরও পারিপাট্য আছে। সনেটটি উদ্ধৃত করিবার মত—

ঈশানচন্দ্র

মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ;
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব।
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন;
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ।
বিহারী—করুণা-লক্ষ্মী, বরুণলোচন;
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ।

তুমি মন্থনের শেষে আসিলে, 'যোগেশ,'
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল!—
কালকূট-কটুগন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ,
সুর নর যক্ষ রক্ষ আতঙ্কে বিহ্বল!
প্রজাপতি বুক্কর—রক্ষঃ বিশ্বপ্রাণ,
মূর্ত্তিমান্ প্রেমমন্ত্র—সাক্ষাৎ ঈশান!

এই কবিতাটিতে মিল-বিন্যাসের ত্রুটি কিছু অধিক হইয়াছে—প্রায় সর্ব্বত্র close rhyme এবং শেষে একটি rhymed couplet আছে; এজন্য সনেটের সঙ্গীত-রূপটি তেমন ফোটে নাই।

মাইকেলের "চতুর্দ্দশপদীর" কথা ছাড়িয়া দিলে—এ যাবৎ বাংলা সনেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। মাইকেল পথপ্রদর্শকমাত্র; তাঁহার দুই চারিটি সনেট সুন্দর কবিতা হইলেও তাহারা "চতুর্দ্দশপদী" কবিতামাত্র। কিন্তু বাংলা ভাষায় তিনি যেমন একটি সনেটের মোটামুটি বাহ্যিক রূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও তিনি তেমনি একটি সুস্পষ্ট সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছিলেন। সনেট-জাতীয় কবিতা যে কবির ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যান-ধারণার উপযোগী "চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি" তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

সুশীলকুমারের কবিতাও বিষয়বস্তুতে খাঁটি সনেট। আপনার হৃদয়ের নিভৃত-গভীর আবেদন এই কবিতাগুলির সনেট-রূপকে সার্থক করিয়াছে। একজন বিদেশী সনেট-সমালোচকের উক্তি তাঁহার এই সনেটগুলি সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে—

He pipes a solitary tune of his own life, its love, its devotion, its fervour, its prophetic exaltation, its passion, its despair, its exceeding bitterness.

যে ব্যক্তিগত সুগভীর ও আন্তরিক ভাবানুভূতি, ধ্যান ও গীতি, কল্পনার নিরন্তর আবেগে, শুক্তির মধ্যে মুক্তার মতই প্রাণের মধ্যে অতি পরিস্ফুট নিটোল সুডৌল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল কাব্যবিন্দু রূপ ফুটিয়া উঠে, তাহার নিদর্শন এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে। তাঁহার কথা একটি সারাজীবন দিয়া দেহে মনে ও প্রাণে প্রেমের যে একনিষ্ঠ অথচ বিচিত্র অনুভূতি—বিরহ-মিলন, সংশয়-আশ্বাস, স্মৃতির দংশন ও কল্পনার প্রলেপ, রাগ বিরাগ, ভোগ ও ত্যাগের মধ্য দিয়া জীবনের যে একটি পরমা সিদ্ধি—তাহারই কথা তিনি যখন যেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন—এক একটি সনেটের আকারে তাহাকেই রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্য শুধু এক একটি ফুল হিসাবে নয় সেগুলির গাঁথনির মধ্যে একটি অখণ্ড কাজের আভাস আছে এবং অনেকগুলি কবিতা বাহ্যতঃ একই বিষয়ের বলিয়া মনে হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের পারম্পর্য্য আছে। আমার মনে হয় এইজন্যই এই সনেটগুলির আকারেও বৈচিত্র্য ঘটিবার সঙ্গত কারণ আছে।

আকার বা রূপ হিসাবে দুইটি অনিয়ম লক্ষ্য করিবার আছে। একটি, তাহার অষ্টকগুলিতে দুইটি মাত্র মিল থাকিলেও বিন্যাসে একটু স্বাধীনতা আছে। এই ত্রুটি খুব বড় নয়, কারণ প্রেমই তাঁহার কাব্যের একমাত্র প্রেরণা। প্রেম-কবিতা গীতি-প্রধান, লিরিক-মাধুরীই তাহার সর্ব্বস্ব। এজন্য খুব ধীর-গম্ভীর মিল-বিন্যাস এই কবিতাগুলির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী নয়। তথাপি গঠনের খাঁটি আদর্শও কয়েকটি সনেটে রক্ষিত হইয়াছে। একটি উৎকৃষ্ট সনেট এই আদর্শে রচিত—উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে—

ভেবেছিনু তবু ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের তরে
মধুর সুন্দর হবে বিদায়ের ক্ষণ;

বাক্য হয়ে যাবে শুধু নীরব বেদন,
বেদনা মিলায়ে যাবে আঁখির নির্ঝরে!
গর্ব্বহত প্রেম তবু আঁকড়িয়া ধরে
চিরন্তন দম্ভটুকু অতি প্রাণপণ,—
মরম মমতাহীন, নিরশ্রু নয়ন,
আয়ুক্ষীণ শিখা যেন হাসিটি অধরে!
নীরবে সে চলে গেল!—তখন নয়নে
দৃষ্টি মোর দৃষ্টিহারা মিনতি-কাতর!
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বন্ধনে
কা'রে জড়াইতে চায় বুকের ভিতর;
চিরন্তন-তৃষাতুর লোলুপ অধর
স্পন্দিয়া মূরছি' পড়ে অসত্য-চুম্বনে!

এই কবিতাটি একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ সনেট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম লাইন হইতে শেষ লাইন পর্য্যন্ত একটি অবাধ ভাবপ্রবাহ,—মধ্যে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের যতি, শেষের দুই ছত্রে ভাবের পূর্ণপরিণতি ও আবেগের মর্ম্মান্ত মূর্চ্ছনা। সনেটের দুই অংশে পরপর ভাবের যে উদ্বোধন ও নিবর্ত্তনের কথা, flow and ebbএর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই কবিতাটির সম্পর্কে সেই নীতির বিচারে ইংরেজ-সমালোচকের একটি উক্তি মনে পড়ে—

When it is a love sonnet, or the emotion is tender rather than forceful, the music sweet rather than dignified, it will be found to correspond to the law of flow and ebb, *i.e.*, of the inflowing solid wave (the octave), the pause, and then the broken resilient wash of the wave (the sestet):—

পাঠক সনেটটি বার দুই তিন পড়িলেই এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। এই সনেটের গঠন যেমন নির্দ্দোষ তেমনই ইহার মধ্যে একটি বাক্য অতিরিক্ত নাই, একটি পদও অবান্তর বা অর্থহীন নহে। কিন্তু আকারে সর্ব্বত্র এরূপ না হইলেও, এবং প্রত্যেক সনেটটি এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও আবেগের আন্তরিকতায়, অর্থের সুস্পষ্টতায় এবং ভাবের গভীরতায় 'দীপালি'র অধিকাংশ সনেটেই এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য মিল-বিন্যাসের এই ত্রুটি মার্জ্জনা করা যায়। কিন্তু আর একটি ত্রুটি কিছু গুরুতর—প্রায় বহু সনেটের শেষ দুই চরণ rhymed couplet হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শেষের rhymed couplet সম্বন্ধে আপত্তি আছে। কিন্তু এ আপত্তি সকল সনেট সম্বন্ধে নহে। সেক্‌স্‌পীরীয় সনেটের পক্ষে rhymed couplet ending যথার্থই সুন্দর। কিন্তু Petrarcan বা আসল সনেটের পক্ষে এইরূপ দুই চরণের পয়ারে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। উভয়ের প্রকৃতি স্বতন্ত্র তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একজন সমালোচকের মতে

—The Shakespearian sonnet is like a red-hot bar being moulded upon a forge till—in the closing couplet—it receives the final clinching blow from the heavy hammer: while the Petrarcan on the other hand is like a wind gathering in volume and dying away again immediately on attaining a culminating force.

আর একজন সমালোচক বলেন—

"There are broadly speaking two normal types in English of sonnet structures—the Petrarcan and Shakespearean; whenever a motive is cast in the mould of the former a rhymed couplet ending is, to my own ear at least, quite out of place; whenever it is embodied in the latter, the final couplet is eminently satisfactory."

আমার নিজের ধারণাও তাই। এবং ইহা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই কাব্যেই আছে বলিয়া মনে হয়। সুশীলকুমার যে খাঁটি Petrarcan বা আদর্শ সনেট লিখিয়াছেন—তাহার একটি উদ্ধৃত করিয়াছি। ঠিক খাঁটি সেক্‌স্‌পীয়র না হইলেও তিনি নিজে একটা মাঝামাঝি সনেট-রূপ আয়ত্ত করিয়াছেন—অষ্টকে মাত্র দুইটি মিল—এবং এই মিলের বিন্যাস সম্বন্ধে কোথাও আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন, কোথাও ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই শেষে rhymed couplet আছে। যেখানে অষ্টকের মিল-বিন্যাসে এবং ভাবের ক্রমবিকাশে কোনও সুর ভেদ নাই, সেখানে এই rhymed couplet ending আপত্তিজনক নয়। কিন্তু যেখানে (প্রায় সর্ব্বত্রই) তিনি অষ্টক ও ষট্‌কের পৃথক পদপর্য্যায় ঠিক রাখিয়াছেন, এবং আদ্যন্ত ভাবের ক্রমবিকাশের অনুযায়ী মিল-বিন্যাস অনেকটা বজায় রাখিয়াছেন সেখানে এই rhymed couplet ending আমার মতে না হইলেই ভালো হইত, দুইটি উদাহরণ দিব।—

মোর তরে, হে অপর্ণা, হে তাপসী প্রিয়া,
বল্কলে শোভিলে অঙ্গ ত্যজি' আভরণ;
মোর সাথে মহারাসে রহিলে মগন
অশ্রু ও কলঙ্ক শুধু জীবনে মাগিয়া;
সহিলে ঋষির শাপ আমারি লাগিয়া।
কণ্ঠে দিলে লতা-ফাঁসি বরিয়া মরণ;
আনিলে স্বৈরিণী-দেহে সাবিত্রীর মন;
অচ্ছোদের তীরে ধ্যানে রহিলে জাগিয়া;

স্বয়ম্বরে কতবার কণ্ঠে মালা দিলে;
রণক্ষেত্রে রথরশ্মি হাতে তুলে নিলে;
কতবার অপমান সহি' সভাতলে
মোর পাপ মুছে নিলে নয়নের জলে;
আমার চিতায় পুড়ি' জন্ম-জন্মান্তরে
হে প্রাক্তনী, সাথে সাথে আছ চিরতরে!

এখানে অষ্টকের মিল-বিন্যাস নিখুঁত, কিন্তু অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে ভাবের কোন বিরাম বা পরিবর্ত্তন নাই—এইজন্য শেষের rhymed couplet টির একান্ত প্রয়োজন আছে, ওইটি না থাকিলে সমগ্র কবিতাটি ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। এখানে অষ্টকের নিখুঁত মিল-বিন্যাসের কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না—থাকিলেও হানি হয় নাই। কিন্তু—

কবে ফুটিয়াছে ফুল আজও সে সুবাস;
বাঁশরী বেজেছে কবে, ভাসে তার সুর;
কবে যে জ্বলেছে দীপ, এ হৃদয়পুর
ধরে' আছে আজো তার উজ্জ্বল আভাস!
পাইনি তো এতদিন সুরভি নিঃশ্বাস—
কুসুমের পানে চেয়ে হৃদয় বিধুর;
ছিল আলো, প্রাণ তবু দহন-আতুর;
আর্ত্তনাদে ডুবে ছিল সুরের উচ্ছ্বাস;

ভোগের ভিখারী ছিনু, তাই আপনার
বুঝি নাই এতদিন ঐশ্বর্য্য অপার;
মিথ্যাগর্ব্বে বসেছিনু রাজবেশ পরি'
প্রেম দিল টীকা তার নিঃস্ব রিক্ত করি'!

ফুল ঝরে, বাঁশী থামে, দীপ নিভে আসে,—
গন্ধটুকু, সুরটুকু, আলোটুকু ভাসে!

এই সনেটটি উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়াছে, কিন্তু আদর্শ সনেট হয় নাই। এখানে অষ্টক ও ষট্‌কের ভাগটি নিখুঁত, এবং ভাগের বিকাশের স্তরগুলিও আদর্শ সনেটের অনুযায়ী,—অষ্টকের অন্তর্গত দুইটি চতুষ্পদীর পরস্পর সম্বন্ধ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু এই খাঁটি Petrarcan সনেটের সঙ্গীত রূপটি সমগ্র ষট্‌কের মিল-বিন্যাসে নষ্ট হইয়াছে। শেষের দুই চরণের মিলটি ঘুরাইয়া দিলে মনের সঙ্গে কানের বিরোধ ঘটিত না।

তথাপি 'দীপালি'র সনেটগুলির আকার ও গঠন সম্বন্ধে এই যে আলোচনা করিলাম, ইহা শুধু 'দীপালির' জন্যই নয়। সনেটের আদর্শটিকে বাংলা সাহিত্যে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এ সম্বন্ধে কঠোরতার প্রয়োজন আছে। সুশীলকুমারের কাব্যখানি পৃথক পৃথক সনেটের সমষ্টি নয়—একখানি সনেটমাল্য। একই মূল ভাববস্তুকে নানা রূপ দেখাইবার একটা অভিপ্রায় কাব্যখানির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এজন্য বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। সেই বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াও তিনি খাঁটি সনেট-রচনায় যে এতখানি সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা অল্প প্রশংসার যোগ্য নহে। ইহাও জানি, এই সনেটগুলির মধ্যে এমন একটি সহজ অথচ সংযত, গভীর অথচ প্রাঞ্জল প্রকাশের ভঙ্গী আছে এবং সর্ব্বোপরি এমন একটি ভাব-সংহতি ও অর্থগৌরব আছে যাহার সহিত তাহার গঠনের একটি গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে; এইখানেই তাঁহার সনেট-রচনা সার্থক হইয়াছে।

এইবার কাব্যখানির ভাববস্তুর কিছু পরিচয় দিব। ইতিপূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। এই কাব্যখানিতে কবি প্রেমকে শুধুই চিন্তালেশহীন, আবেগমূলক গীতোচ্ছ্বাসের বস্তুরূপে কল্পনা করেন নাই। অতিশয় serious ও sincere সাধনার মন্ত্রস্বরূপ এই প্রেমের মধ্যে একটি সত্যোপলব্ধির প্রয়াস, এবং পাঁচটি পৃথক অবস্থায় তাহার ক্রম পরিণতি চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রেম দেহ এবং আত্মা এই দুইয়েরই দাবী সমান করিয়া মিটাইতে চায়—একটা আগে একটা পরে নয়; প্রথম হইতেই দুইয়ের মধ্যে এই বিরোধ ও তজ্জনিত সংশয় ফুটিয়া উঠিয়াছে—মিলনে বিরহ এবং বিরহে মিলন, ভোগের অতৃপ্তি এবং ত্যাগের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলিকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে। সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে যেন একটি বিশাল হৃদয়সিন্ধু প্রসারিত হইয়া আছে। তাহার চিরবিক্ষুব্ধ জলরাশি যেমন অতল, তেমনি প্রভাত ও সন্ধ্যা, ঝটিকা ও শান্তি, দীপ্ত মধ্যাহ্ন ও অন্ধকার নিশীথ তাহার উপরে প্রহরে প্রহরে নানারূপ ছায়াপাত করিতেছে। চিরচঞ্চল সমুদ্রের মতই একটা অশান্তি ও আকুলতা সর্ব্বক্ষণ তাহাকে আলোড়িত করিয়াছে এবং সর্ব্বশেষে সে যেন ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; দ্বন্দ্বের শেষে কবি একটা গভীর সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। এই দ্বন্দ্বের মূলে যতখানি সাধনা আছে, তাহাই এই কাব্যখানির প্রেম কল্পনাকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। জীবনে যাহাকে নিঃশ্রেয়স বলিয়া কামনা করিয়াছি তাহাকে এতটুকু ছোট করিয়া গ্রহণ করিব না। প্রাণের মধ্যে যে সত্য-পিপাসা জাগিয়াছে বাহিরের বাস্তবের মধ্যে তাহাকে পাইতে চাই, কল্পনায় তাহাকে ভোগ করিব না। রক্তমাংসের ক্ষুধার মধ্যেই বৃহত্তর ক্রন্দন রহিয়াছে। দেহ বাদ দিয়া আত্মা নয়, আত্মাকে বাদ দিয়াও দেহ নয়—কবি এই সত্যটিকে কখনো অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নন—অন্তরের এই হোমাগ্নি-শিখায় তিনি এই 'দীপালি' সাজাইয়াছেন। এই uncompromising attitude তাঁহার কাব্যখানির প্রাণ। এই যে ভাবের সহিত বস্তু, আবেগের সহিত চিন্তা, কামনার সহিত সাধনা—ইহাই তাঁহার কবিতায় সনেটত্বের কারণ। অতঃপর কয়েকটি উদাহরণ দিব। ইহা হইতে পাঠক কবির কাব্য-প্রকৃতি এবং কাব্য-সৃষ্টি উভয়েরই কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

(১) আমি নীচ তুমি উচ্চ, তবু ঢাকে সব
দীনতা প্রেমের গর্ব্ব, প্রেমের গৌরব!
দেবদারু শুষ্ক তৃণ, কিবা আসে যায়—
আগুন সমান জ্বলে; তাই আজ দীন
তোমার সম্মুখে আসি' হাসিয়া দাঁড়ায়।
মুখে তার সে আলোক-আভাস-নবীন।—১৫ পৃঃ

(২) ে মিকের বাণী
চিরদিন নিখিলের বুকের ভিতরে
বাঁধা বুঝি এক সুরে—তাই আমাদের
ক্ষুদ্র এই সুখে দুখে এ হাসি ক্রন্দনে
জাগে যেন নিশিদিন লক্ষ প্রেমিকের
সে অনাদি অনুভব ভাবের বন্ধনে!
আজ শুধু জাগে মনে আমি আর তুমি
কল্প কল্প আছি ব্যাপি মিলনের ভূমি।—২৩ পৃঃ

(৩) ভালবাসি তোরে, তবু এই কথা দুটি
কথায় ফোটে না শুধু; দুজনার মুখ
আলোকিতে তুলে' ধরি' সোনার দেউটি—
হাত থেকে খসে' পড়ে, কেঁপে ওঠে বুক!—৩৪ পৃঃ

(৪) বাহিরে দেবতা আমি দীপ্ত অনুরাগে—
প্রাণে মোর শুধু দীন মানুষটি জাগে!—৪২ পৃঃ

(৫) পতঙ্গের মত শুধু বিমুগ্ধ নয়ন
ঘুরিব বেড়িয়া কত মরণ-আহ্বান?
বাহিরে বলয়ে রহে আলোক-দহন
অন্তরে আছে কি তার তমিস্রা নির্ব্বাণ?—৪৫ পৃঃ

(৬) ঢাকে হৃদয়ের সীমা নয়নের নীরে—
স্মিরিতি-জড়িত দূর দিগন্তের রেখা;—৬৯ পৃঃ

(৭) তোমার হাসিটি মুক্ত কৃপাণের মত
কৃপাহীন বাজে বুকে শত উপেক্ষায়—
এ যে রক্তমাংস তাই ব্যথা, মৃদু ক্ষত,
একটু শোণিত ঝরে—কিবা আসে যায়?
তুমি ভাবিয়াছ ভয়ে ভঙ্গ দিব রণ?
প্রেম আজ সব ভয় করেছে হরণ।—৮৫ পৃঃ

(৮) জীবন মিশিয়া গেছে নয়নের জলে
একটানা খরস্রোতে বহে নিশিদিন,
'ভয়ে' আছে তারি নীচে হৃদয়ের তলে
দুঃখরাশি পাথরের মতন কঠিন,
উপরেতে অশ্রুবন্যা করে ছল ছল—
বাহিরেতে শুনি তাই হাসি খল খল!—৮৬ পৃঃ

(৯) এ কবিতা নহে নিন্দা, নহে শুধু গালি,
আছে প্রেম, নাই তার স্নিগ্ধ আবরণ!
মর্ম্মে বিঁধে বেদনার অসি অনুক্ষণ
বাহিরেতে দেখা যায় রক্ত স্রোত খালি!
জীবনের যজ্ঞে যত প্রাণমন ঢালি,
তত দীপ্ত শিখা আর অঙ্গার দহন।—৯২ পৃঃ

(১০) দীন আমি, হীন আমি, নিতান্ত অসার
পড়ে' আছি তুচ্ছ পঙ্ক আঁধারে অতল—
তবু মূলটুকু রাখি হৃদয়ে আমার
আলোকের দেশে ফোটে প্রেম শতদল ;
শিকড় আঁকড়ি' বুকে ধন্য আমি তবু—
এ জীবনে আর কিছু চাহি নাই কভু !—৯১ পৃঃ

(১১) পূর্ণতায় আসে শুধু চির অবসাদ,
অংশ লভে চিরদিন পূর্ণতার স্বাদ !—৯৭ পৃঃ

(১২) পাষাণের পদে লুটি শীর্ণ-পরিসর
প্রেমগঙ্গা গোমুখীতে বদ্ধ চিরতরে ?
প্লাবিয়া ধরণী ঝরি আলোক নির্ঝরে
হাসিয়া ভাসিয়া যাক্, সম্মুখে সাগর !
গৃহকোণে ক্ষুদ্র শিখা নিভে নিশাশেষে,
পূর্ব্বাশার মেঘথরে রবি ওঠে হেসে' ।—৯৮ পৃঃ

(১৩) চোখ নহে মনে বুঝি বেশী দেখা যায়,—
ওগো মনোময়ি, তাই এতকাল পরে
চোখের আড়ালে থাকি' আপন লীলায়
তুমি ধরা দিলে বুঝি অন্তরে অন্তরে !

* * *

ক্ষুদ্র দীপ নিভে গেছে আকুল নিঃশ্বাসে
আকাশের তারাটির আলো প্রাণে ভাসে !

উপর-উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলি লেখকের ভাবনা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিচায়ক। এগুলি হইতে তাঁহার কবিমানসের পূর্ণ-পরিচয় পাওয়া যাইবেনা ; কারণ সনেট-জাতীয় কবিতার কোনও অংশই সম্পূর্ণ নয়—কোনও বাক্য, কোনও উপমা বা কোনও চিন্তার পৃথক মূল্য নাই। সনেটের গাঁথনির মধ্যে অতি পুরাতন পরিচিত বাক্যও সম্পূর্ণ নূতন হইয়া উঠে। এই গাঁথনির ভঙ্গীই লেখকের মৌলিকতার পরিচয়। সুশীলকুমারের সনেটগুলির সম্বন্ধে এই কথা আরও বেশী করিয়া মনে রাখিতে হইবে। Rhetoric, Invention বা অতিসূক্ষ্ম কল্পনা-বিলাস এই সনেটগুলির বিশেষত্ব নয়। একটা স্বতন্ত্র Personal attitude —অতিশয় পুরাতন কথাকে আপনার প্রাণের সুরে নূতন করিয়া তোলা। কাব্যের নানা উপাদান ও উপকরণকে অসঙ্কোচে আপনার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার উপচাররূপে গ্রহণ করা—ইহাই কবিতাগুলির diction ও technique প্রধান লক্ষণ। এজন্য সংস্কৃত ও ইংরেজী-কাব্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ নাই—বাংলা কাব্যকানন হইতেও দুই চারিটি পাপড়ি বা পল্লব তিনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে ছিঁড়িয়া লইয়া এখানে-ওখানে গাঁথিয়া দিয়াছেন। দীপালির প্রথম সনেটটি Browning-এর একটি কবিতার paraphrase, আরও দুইটি সনেটে D. G. Rossettiর *House of Life*-এর দুইটি সনেটের প্রতিধ্বনি আছে ; Browning, জায়া-Shelley অথবা Tennysonএর ভাব বা ভঙ্গী কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মৌলিকতার লাঘব হয় নাই—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গী অতিশয় স্বতন্ত্র। কারণ, কেবল কবিতাগুলির পৃথক সৌন্দর্য্য হিসাবেই নয়—সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে একটা নূতন-দৃষ্টি ও চিন্তা-ভঙ্গী আছে। এজন্য তাঁহার styleও নিজস্ব,—ভাষায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ভাষা নিরতিশয় বাহুল্যবর্জ্জিত, অর্থহীন কলকাকলী ইহার কোথাও নাই ; শব্দালঙ্কারের চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। বরং ভাব ও অর্থের দিকে অতিরিক্ত লক্ষ্য থাকায় লেখক অনেক সময়ে যেন ইচ্ছা করিয়াই ছন্দ ও মিলের সৌষ্ঠব রক্ষা করেন নাই—যদিও সে সৌষ্ঠব সাধন করিবার শক্তি যে তাঁহার আছে, তাহার প্রমাণ বহুস্থানে মিলিবে। ভাষার এই প্রসাদগুণ ও কঠিন দীপ্তির জন্য তিনি কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের নিকট কতকটা ঋণী বলিয়া মনে হয়।

আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, তথাপি কাব্যখানি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। সমালোচকের কর্ত্তব্য কতটা পালন করিতে পারিয়াছি তাহার বিচার পাঠকগণই করিবেন। "দীপালি" একখানি সনেট-কাব্য বলিয়াই এবং সনেট সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের খুব পরিষ্কার ধারণা নাই বলিয়াই এই প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। "দীপালি" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার অনেকখানিই এই সনেটের আদর্শের দিক হইতে—একথা পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি। বিশুদ্ধ কবিতা হিসাবে সুশীলকুমারের কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা কাব্যামোদী পাঠকেরাই বলিবেন—আমি কেবল পরিচয় দিলাম মাত্র।

সর্ব্বশেষে গ্রন্থখানির মুদ্রণ-সৌষ্ঠব সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। এ বিষয়ে প্রকাশক মহাশয় একটু দুঃসাহস করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আজকালকার দিনে বাজারে যেমন কাগজ ছাপা বাঁধাই ক্রেতার মনোরঞ্জনের পক্ষে প্রয়োজন—এই গ্রন্থের প্রসাধনে তাহার কিছুই নাই। অতিশয় মূল্যবান দেশী hand-made কাগজে বইখানি ছাপা হইয়াছে। বাঁধাইও তেমনি মূল্যবান—কিন্তু এমনি চাকচিক্য-হীন ও নিরলঙ্কার যে রাংতা-বিলাসী বাঙালী-পাঠক ইহাতে মুগ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি এই দুঃসাহস প্রশংসনীয় এবং আশা হয় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে এই কাব্যখানির ভিতরকার সংযত শ্রীর মত বাহিরের শ্রীটিও সকলের মনে ধরিবে। মুদ্রণ-কর্ম্মের একটি ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম—কবিতাগুলির একটি সূচীপত্র দেওয়া হয় নাই অন্ততঃ প্রথম লাইনের একটি সূচীও থাকা উচিত ছিল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বৃষ্টলে রামমোহন রায়ের সমাধি

বৃষ্টল হইতে রামমোহন রায় স্মৃতি-রক্ষা কমিটি নিম্নলিখিত-রূপ একটি আবেদন ভারতীয় সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন ঃ—

আর্ণোস ভেল গোরস্থানে রাজা রামমোহন রায়ের কবরের উপর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যে স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার অবস্থা বিশেষ খারাপ এবং তাহা অবিলম্বে মেরামত হওয়া প্রয়োজন।

স্মৃতি-সৌধের থামগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এবং সমগ্র সৌধটি যে-কোন মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইতে পারে। মেরামতের জন্য প্রায় ৩০০-৩৫০ পাউণ্ড (৪০০০।৫০০০ টাকা) প্রয়োজন হইবে এবং এই টাকা শীঘ্রই তার যোগে বিলাতে পাঠাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু অধিক টাকা দিয়া একটি স্থায়ী ফণ্ড করা প্রয়োজন; কারণ মেরামত মধ্যে মধ্যে করিতেই হইবে এবং টাকা মজুত থাকিলে এই কার্য্য যথাসময়ে ও যথাযোগ্যরূপে করা যাইবে। আমরা কি রামমোহন রায়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য এক হাজার পাউণ্ডের (প্রায় ১৫০০০ টাকার) একটি ফণ্ড করিতে আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করিতে পারি না? যে-কোন চাঁদা ও দান শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক মডার্ণ-রিভিউ, ২।১ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতায় পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের কর্ম্ম-জীবন বিশেষভাবে জড়িত। রামমোহন রায় ইয়োরোপে নবীন ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি। কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি শিক্ষা কিম্বা অপরাপর ক্ষেত্রে, রামমোহনের কর্ম্মের পরিচয় আমরা সর্ব্বত্রই পাই। রামমোহন রায়কে সকল দিক দিয়া নিঃসন্দেহে ভারতের নবযুগ-প্রবর্ত্তক বলা চলিতে পারে। এই কারণে বিদেশে যেস্থলে তিনি তাঁহার নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেস্থল ভারতবাসীর মহাতীর্থস্থান বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই মহাপুরুষের স্মৃতি-সৌধ উপযুক্তরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করা ও তজ্জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করা। সামান্য কয়েক সহস্র মুদ্রার জন্য যদি রামমোহনের স্মৃতি-সৌধ উপযুক্তরূপে রক্ষিত না হয় তাহা অপেক্ষা ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে!

রামমোহন রায় বাঙালীর গৌরব এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা বাঙালীর বিশেষ করিয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় যে, বৃষ্টলের সমাধি রক্ষা ব্যতীতও ভারতবাসী-দিগের আরও কোনও উপযুক্ততররূপে ইয়োরোপে ভারতের এই তীর্থস্থানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত। যদি কোন উপায়ে ইংলণ্ডে ভারতীয়দিগের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার্থ একটি মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহার দ্বারা রাজা রামমোহন রায়ের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষা হইতে পারে। ভারতের উন্নতিশীল ব্যক্তিমাত্রেরই রামমোহন রায়ের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, ভারতের সকল সংবাদপত্রেই রামমোহন স্মৃতিরক্ষা কমিটির আবেদনটি যত্নের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার উপরে কোন কোন সাংবাদিক সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াও বিষয়টির প্রতি পাঠকের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে আশা হয় যে, শীঘ্রই কমিটির প্রয়োজনীয় ১,০০০ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়া যাইবে। তৎপরে আমাদের প্রস্তাবিত আলোচনা ও মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে।

—

বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ ও মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার

কয়েক দিবস হইল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী বস্ত্র বয়কট সম্বন্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে।

আন্দোলনের পূর্ব্বাহ্নেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিদেশী বস্ত্রে অগ্নি-সংযোগ লইয়া পুলিশের ও কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। পুলিশের হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় সাধারণের ব্যবহারের জন্য যে পার্ক, সেখানে আগুন জ্বালাইলে সাধারণের অমঙ্গল হইতে পারে। এই কারণে তাঁহারা কংগ্রেসের সম্পাদকের উপর আগুন না জ্বালাইতে আদেশ দিয়া এক নোটিশ জারি করেন। মহাত্মা গান্ধী নোটিশ সত্ত্বেও পার্কে গমন করিয়া বিদেশী বস্ত্রের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করেন এবং ফলে পুলিশ জোর করিয়া আগুন নিভাইবার প্রচেষ্টায় বহু নির্দ্দোষী লোকের উপর লাঠি চালাইয়া সাধারণের হিতসাধন করে। এই ঘটনার পরে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের সম্পাদক উভয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আর্ল উইনটারটন অবশ্য পার্লামেন্টে এই গ্রেপ্তারের কথাটি অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু, যেস্থলে মহাত্মা গান্ধীকে পুলিশ ৫০৲ টাকার ব্যক্তিগত জামীন-পত্র সহি করিতে বাধ্য করিয়াছে সে ক্ষেত্রে পুলিশ রাজপথ দিয়া মহাত্মা গান্ধীকে হাতে হাতকড়ি দিয়া বাঁধিয়া না লইয়া গিয়া থাকিলেও তাঁহাকে গ্রেপ্তারই করিয়াছে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। পুলিশের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিষয়গতভাবে কিছু বলা যাইতে পারে না, কারণ বিষয়টি বিচারাধীন এবং মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ ব্যক্তিগণ সত্যসত্যই কোন অপরাধ করিয়াছেন কি না তাহা আদালতে স্থির হইবে। তবে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের যে ধারা অনুসারে পুলিশ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আগুন নিভাইতে গিয়াছিলেন, সচরাচর সেই ধারা জারি করিবার জন্য পুলিশ ঠিক এতটা উৎসাহ ও শক্তির পরিচয় দেন বলিয়া আমাদের ধারণা নহে। কলিকাতার রাজপথে বহুস্থলে বহুসময় আগুন জ্বলিতে দেখা যায় এবং তজ্জন্য পুলিশ ত আশেপাশের লোকজনের উপর লাঠি চালায়ই না, বরং, অনেক স্থলে দেখা যায় যে, শান্তিরক্ষকগণ আগুন জ্বলিতে থাকা সত্ত্বেও নিকটবর্ত্তী আলোকস্তম্ভে হেলান দিয়া সুখনিদ্রা উপভোগ করিতেছেন অথবা, শীতকাল হইলে সেই আগুনের সাহায্যে দেহ উত্তপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পুলিশের বীরত্বের মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির আগুন জ্বালানর বিরুদ্ধ ধারাটি নাই। তাহা ছুতা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন-কার্য্য যাহাতে শান্তিতে না হইতে পারে, অর্থাৎ বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করা যাহাতে দুরূহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। পুলিশের হয়ত ধারণা যে, কোন আইনের ছুতা করিয়া দেশের কর্ম্মীজনের মস্তকে লগুড়াঘাত করিলেই, বিদেশী-বর্জ্জন বন্ধ হইয়া, ল্যাঙ্কাশায়ারে ঘন ঘন কাপড়ের অর্ডার যাইতে আরম্ভ হইবে। যাঁহারা লগুড়-বাদে বিশ্বাসী, অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন সামরিক শক্তি এবং সত্য ধর্ম্ম ও ন্যায় একই জিনিষ, তাঁহাদের পক্ষে উপরোক্তরূপ ধারণা পোষণ করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ লাঠি চালানর ফল বিপরীত হইবে। বেত মারিয়া কিম্বা লাঠি চালাইয়া সভাভঙ্গ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভারতীয় ক্রেতা বাজারে অধিক করিয়া বিদেশী মাল ক্রয় করিবে না। এই গেল বিষয়টির পুলিশ-ঘটিত দিকের কথা।

অপরদিকের কথা এই যে, বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে পারিব অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারিব, এরূপ আমাদের ধারণা নহে। আমরা যদি সত্যই ভারতে সকল দিক দিয়া নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিতে চাহি, তাহা হইলে কতিপয় মনোমুগ্ধকর বা চমকপ্রদ ঘটনার অভিনয় করিয়া তাহা সম্পন্ন হইবে না। ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কল যদি আমাদের শত্রু হয় তাহা হইলে তাহার দমন ভারতে নূতনতর কাপড়ের কলের সৃষ্টি করিয়াই সম্ভব। আমরা প্রায়ই শুনি যে, আমাদের দেশে ১০ বা ৫০ সহস্র যুবক দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। উত্তম কথা। আমাদের প্রস্তাব এই যে, এই-সকল যুবক প্রাণ না দিয়া পাঁচ কিম্বা দশ বৎসরের জন্য দেশের জন্য নিজেদের শ্রম দান করুন। কংগ্রেস বহুসংখ্যক মিল খাড়া করিয়া এই-সকল যুবকের শ্রমে অধিক লাভ না করিয়া বস্ত্র বুনিবার ব্যবস্থা করুন। সুভাষবাবু-প্রমুখ ক্যাপিটালিষ্ট-বিরোধী শ্রমিক-নেতৃগণ জানেন যে মিলের মালিকগণ কত অধিক লাভ করিয়া তৎপরে বাজারে জিনিষ বিক্রয় করেন। জিনিষের মূল্য-বৃদ্ধির ইহা এক কারণ। অপর এক কারণ শ্রমিকের

বেতন। বেতন অধিক হইলে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং কম হইলে মূল্যের হ্রাস হয়। স্থতরাং যদি এরূপ কাপড়ের কল স্থাপন করা যায় যেখানে লাভ করা হইবে না এবং শ্রমিকগণও প্রাণপণে যথাসম্ভব অল্পব্যয়সাধ্য জীবন যাপন করিয়া পূরাপুরি কাজ করিবেন, তাহা হইলে সেই সকল কলের কাপড় জগতের যে-কোন দেশের কাপড়ের চাইতে সস্তায় বাজারে বিক্রয় হইবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি কংগ্রেসের কর্ম্মীগণ অতঃপর এই উপায়ে বিদেশী বণিককে জব্দ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। বস্ত্রযজ্ঞ করিয়া ঈপ্সিত লাভের আশা বড়ই ক্ষীণ!

—

হাজি বিল্ ও ইংরেজ শিপিং চেম্বর

ভারতবর্ষের উপকূল-বাণিজ্যে শুধু ভারতবর্ষীয় জাহাজ ব্যবহৃত হইতে পারিবে—শ্রীযুক্ত সরভাই হাজি এই মর্ম্মে একটি আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন। বিলাতী চেম্বার অব্ শিপিং তাহাদিগের বার্ষিক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, উপকূল-বাণিজ্য-সম্পর্কীয় যে আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ জাহাজী কারবারের বিষম ক্ষতি হইবে, এই কল্পিত আইন অর্থনীতির দিক হইতে ভ্রমাত্মক, জাতিগত পক্ষপাতদুষ্ট, ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ইহা মনোমালিন্য ঘটাইবে, অতএব ভারত-সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে যেন ব্রিটিশ জাহাজী কারবারের বর্জ্জনমূলক বা তাহার ক্ষতিকারক কোনো আইন গৃহীত না হয় সরকার এইরূপ ব্যবস্থা করেন।

হাজি বিল্ ব্রিটিশ উপকূলস্থ বা সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজের কারবার নষ্ট করিতে চাহে না। ইহার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের উপকূলে ও ভারত-সমুদ্রে ভারতীয় নৌ-বাণিজ্য ও জাহাজী কারবার পুনর্গঠিত করিয়া তোলা। এই কাজে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ নিজ রাজশক্তি ও জাহাজী কারবার প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নৌ-বাণিজ্য নষ্ট করিয়াছে, সেই বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। তাহাতে ইংরেজ জাহাজী কারবারের ক্ষতি হইলেও ইংরেজের আপত্তি করা উচিত নয়; কারণ, ইংরেজের এই কারবার অন্যায়-রূপে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছিল। যে কারবার অপরের অনিষ্ট করিয়া একচেটিয়া করা হইয়াছে, তাহার কোনো ন্যায়ানুমোদিত অধিকারই নাই। অবশ্য, ভারতবর্ষের নৌ-বাণিজ্য যদি ইংরেজ-রাজশক্তির শত্রুতায় নষ্ট না হইত, বা আপনা হইতেই লুপ্ত হইত, তাহা হইলেও হাজি বিলের মত বিলের সহায়ে ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ন্যায়সঙ্গত হইত। জাহাজওয়ালা জাতিমাত্রই এক সময়ে না এক সময়ে তাহাদের জাহাজী কারবারের সৃষ্টি ও উন্নতির জন্য উপযুক্তরূপে বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্য দেশের এই-সব দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিলের প্রস্তাবের স্বপক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই-সব দৃষ্টান্ত না থাকিলে ভারতবর্ষের পক্ষে এইরূপ উপায়ে বাণিজ্যের সৃষ্টি বা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা অন্যায় হইত না।

অর্থনীতির দিক হইতেও এইরূপ আইন মোটেই 'ভ্রমাত্মক' নয়। এ বিষয়ে ইংরেজদের মতবাদ বিশ্বাস করা চলে না। ইংরেজের মুখে জাতিগত পক্ষপাতের কথা শুনিলে হাসি পায়। ভারতবর্ষে এমন কোন কার্য্যক্ষেত্র নাই যেখানে ইংরেজ পক্ষপাতের পরিচয় দেয় না। ভারতবাসীরা ত সেই জাতিগত পক্ষপাতের দোষই মুছিয়া ফেলিতে চায়। যদি আমরা ইংরেজকে ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষ ছাড়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্য কোনো অংশ হইতে হটাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে ইংরেজের আপত্তি করিবার কারণ থাকিত। সাম্রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্যের আশঙ্কা করা হইয়াছে, যখন ভারতীয় নৌ-বাণিজ্য সংহার করা হইয়াছিল, তখনই কি সেই মনোমালিন্যের কারণ ঘটে নাই? তখন এই আশঙ্কা হইল না কেন? যে সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ভারতবর্ষের কল্যাণ বা আত্মসম্মানের বিরোধী, ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সম্পর্ককে শ্রদ্ধা করা বা মানা অসম্ভব। সাম্রাজ্য-সম্পর্ক এইভাবে নানারূপে ভারতবর্ষের অবনতিকর হইতেছে

বলিয়াই আজ ভারতবাসী সেই সম্পর্কচ্ছেদনে বদ্ধপরিকর হইতেছে। আজ যদি পূর্ণস্বাধীনতা লাভের বা রক্ষা করিবার কোন কার্য্যকরী পথ থাকিত, তবে ঔপনিবেশিক অধিকার-কামীরাও পূর্ণস্বাধীনতাকামীদের সহিত যোগদান করিতেন।

—

রপ্তানীমালের ফেরৎ-ভাড়া (ডেফার্ড রিবেট)

ভারতবর্ষের জাহাজী কারবার প্রায় ইংরেজ-কোম্পানীর একচেটিয়া। এই-সব-ইংরেজ কোম্পানী যাহারা মাল রপ্তানীর ব্যবসা করেন তাঁহাদের সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত করে যে, যদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে রপ্তানীদার ঐ কোম্পানী ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানীর জাহাজে মাল রপ্তানী না করেন, তবে ঐ নির্দ্দিষ্ট কালে যে ভাড়ায় মাল রপ্তানী হইয়াছে শতকরা দশটাকা হিসাবে সেই মূল ভাড়া আংশিকভাবে রপ্তানীদার ফেরৎ পাইবেন; কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের পরেও অন্য জাহাজ কোম্পানীর সহিত কারবার করিলে পূর্ব্ব কোম্পানী এই ফেরৎ-ভাড়া বা 'ডেফার্ড রিবেট্' রপ্তানীদারকে ফেরৎ দেন না। রপ্তানীদার একবার এইরূপ একটি কোম্পানীর সহিত কারবার করিলে আর সেই কোম্পানীর হাত হইতে বাহির হইতে পারেন না। 'ডেফার্ড রিবেট' প্রভৃতির জন্য বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব কোম্পানীর সহিতই তাঁহাকে কারবার চালাইতে হয়। এই কারণে কোন ভারতীয় কোম্পানী জাহাজী কারবার আরম্ভ করিলেও রপ্তানীদার সেই দেশী কোম্পানীর জাহাজে মাল চালান দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত সরভাই হাজি 'ডেফার্ড রিবেট' নীতি আইনানুসারে অসিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদে একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। সেই বিল 'সিলেক্ট কমিটি' আলোচনা করিতেছে। বিলটি পাশ হইলে দেশী জাহাজ কোম্পানীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

জাহাজী কারবারের উপর যে রয়াল কমিশন বসিয়াছিল, তাহারাও এইরূপ 'ডেফার্ড রিবেট্'কে দূষণীয় বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই নীতিতে অন্যান্য দোষের সহিত এই কয়টি দোষের উৎপত্তি হয়—যথা, কয়েকটি জাহাজ কোম্পানী দলবদ্ধ হইয়া এইরূপ 'ডেফার্ড রিবেট্'এর সুবিধা দিয়া রপ্তানী ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লয়, এবং এই উদ্দেশ্যে যাহা ন্যায্য ভাড়া তাহার অপেক্ষাও কম ভাড়া গ্রহণ করিয়া রপ্তানীদারদের মুঠার মধ্যে লইয়া আসে এবং অন্যান্য জাহাজী কারবারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্যায়রূপে ব্যবসাক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়।

—

সমানাধিকারের বক্তৃতা

'সব শেয়ালের এক রা'—তেমনি বিলাতে ও ভারতবর্ষে সব ইংরেজই একইরূপে 'সমান অধিকার' দাবী ও 'জাতিগত পক্ষপাতিত্বের' ধূয়া ধরিয়া সমস্বরে চীৎকার জুড়িয়াছেন। ইংরেজ অবশ্যই শৃগাল নহে, পশুরাজ; কিন্তু চীৎকারের বহর দেখিয়া আমাদের বাঙলা প্রবাদটি মনে পড়ে।

স্যর উইলিয়ম কেরী এই কেশরী-গোষ্ঠীর একজন,—'হোমে' বসিয়াই তিনি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন। ব্রিটিশ্ চেম্বার অব্ শিপিংএর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ্ জাহাজী কারবার ও ব্রিটিশ্ বণিক্-মণ্ডলী ভারতবর্ষের নিকট কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করে না; ব্রিটিশ্ জাতি ভারতবর্ষের সহিত যেইরূপ আচরণ করে, ব্রিটিশ্-বণিক্ ভারতবর্ষের নিকট তদনুরূপ আচরণটুকুই প্রত্যাশা করেন। বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে চেম্বারের সভাপতি স্যর জর্জ্জ গড্ফ্রে ও তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে হেনরি ফোর্ড ইচ্ছা করিলে আজ মাঞ্চেষ্টারে মোটর গাড়ীর ফ্যাক্টরি খুলিতে পারেন, সেল্ফ্রিজ্ ইচ্ছা করিলে অকসফোর্ড ষ্ট্রীটে ব্যবসাক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারেন, যে কোনো চট্টোপাধ্যায় বা বসু ল্যাঙ্কাশায়ারে কাপড়ের কল বা ডাণ্ডিতে পাটের কল স্থাপন করিতে পারেন, বিদেশী বলিয়া ইংরেজ জাতি তাহাদের বাধা দিবে, এরূপ নয়।

ইংরেজের মুখে এই-সব বড় বড় ধর্ম্মের কথা শুনিলে রাগও হয়, হাসিও পায়। আজ যখন ভারতীয় নৌ-বাণিজ্য ও ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ও

তাহার ফলে ভারতবাসী দরিদ্র, দুর্ব্বল, ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যাদিতে পূর্ব্বেকার উদ্যম ও কার্য্য-কুশলতা যখন সে অনেকাংশে হারাইয়া ফেলিয়াছে,—যখন ভারতবর্ষের এই ধ্বংসের উপর ব্রিটিশ নৌ-বাণিজ্য, ব্রিটিশ শিল্প ও পণ্যদ্রব্য এমনভাবে ফাঁপিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে যে তাহার সহিত আঁটিয়া উঠা অসাধ্য বা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তখন পরম ধার্ম্মিক, পরম ন্যায়পরায়ণ, অপক্ষপাতী ব্রিটিশ-ধনপতিরা হঠাৎ মাত্র সমান অধিকার দাবীটুকু দাখিল করিয়াই সন্তুষ্ট—তাঁহারা ভারতবাসীর অনুরূপ আচরণ পাইলেই খুশী। যদি ভারতবাসীদের এইরূপ শক্তি বা কৌশল আয়ত্ত থাকিত যে তাহার সহায়ে তাঁহারা ব্রিটেনে অধিকার স্থাপন করিতে পারিতেন, এবং যদি সেই অন্যায় রাষ্ট্রীয় অধিকারের বলে তাঁহারা ব্রিটেনে আর্থিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তবে কোনো চট্টোপাধ্যায় বা বসু ব্রিটিশ-ধনপতিদের নিকট বকধার্ম্মিক সাজিতে চাহিলে ঠিক নিজেদের 'জাতিগত নিরপেক্ষতার' বা সর্ব্ব জাতির প্রতি সমান আচরণ-প্রদর্শনের কথা এই ইংরেজ-বক্তাদের মত উচ্চকণ্ঠে জাহির করিতেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের মাত্র গোড়ার দিকেই যে ভারতবর্ষীয় বণিক ও ব্যবসায়ীরা এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেন, তাহা নয়; আজো ব্রিটিশ-বণিক্ যে সুবিধা ভোগ করে ভারতবর্ষীয় বণিক তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ভারতবর্ষে প্রস্তুত কোনো জিনিষের জন্য ভারতীয় রেল-পথ কি অনুপাতে ভাড়া আদায় করেন, কিন্তু বিলাতে প্রস্তুত সেই জিনিষই এই দেশে আমদানী করিলে সেই-সব রেলপথে কি অনুপাতে ভাড়া পড়ে, কিম্বা ভারতবর্ষের কাঁচামাল ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরীর জন্য রপ্তানী করিতে হইলে রেল-ভাড়া কি হারে দিতে হয়, অন্যত্র রপ্তানী করিলেই বা কি হারে দেওয়া দরকার, যত্নসহকারে এই-সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে অনেক সূক্ষ্ম পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। যদি কোনো ভারতীয় ব্যবসায়ী ঠিক অপর একটি ইংরেজ ব্যবসায়ীর সমাবস্থাপন্নও হন, তথাপি কোনো ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের নিকট ইংরেজ ব্যবসায়ী যে-সব সুবিধা লাভ করিবেন ভারতবাসী তাহা পাইবেন না। খনির ব্যবসায়ে অনেক রকম সূক্ষ্ম 'জাতিগত পক্ষপাতে'র সন্ধান পাওয়া যায়। সরকারী ষ্টোর বা দ্রব্য-ভাণ্ডারের জন্য জিনিষপত্র কিনিবার কালে সরকার ইংরেজ ব্যবসায়ী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন না।

—

ভারতের কলকারখানায় ধর্ম্মঘট

কোন বিষয়ের সামাজিক লাভ-লোকসান বিচার করিতে হইলে দুই উপায়ে সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম, কোন উচ্চ আদর্শের দিক দিয়া বিষয়টির মীমাংসার চেষ্টা করা, অপর উপায় হইতেছে টাকা আনা পাই দিয়া হিসাব করিয়া খতাইয়া লাভ হইল কি লোকসান হইল তাহা স্থির করা। কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের সর্ব্বত্র কল-কারখানায় বেতন, কর্ম্মের সময় ও অপরাপর বিধি-ব্যবস্থা লইয়া ধনিকে ও শ্রমিকে ঝগড়া বিবাদ চলিতেছে। প্রায়ই শুনা যায়, অমুক কারখানায় ধর্ম্মঘট হইল বা অমুক কারখানার মালিক শ্রমিকদিগকে কারখানা হইতে বহিষ্কৃত বা "লক আউট" করিয়াছেন। এই প্রকার ধর্ম্মঘট ও "লক আউটের" ন্যায্যত বা ঔচিত্য বিচার করিবার ক্ষেত্রেও আমরা উপরোক্ত দুই পন্থার যে-কোন এক পন্থা বা উভয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। প্রথমত দেখা যাউক ভারতে এই ধর্ম্মঘটের ও "লক-আউটের" জের কতদূর পৌছাইয়াছে। এই সংক্রান্ত ঘটনাবলির হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ভারতে কারখানা-মহলে এই ধর্ম্মঘট অস্ত্রটি ক্রমশ অধিক ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১৩৪টি ধর্ম্মঘট "লক আউট" হয়। ইহাতে ২৭০৪২৩ জন শ্রমিক জড়িত ছিল এবং একজন শ্রমিকের এক দিবসের কার্য্যতে এক "কর্ম্ম-দিবস" ধরিলে, ১২, ৫৭৮, ১২৯ কর্ম্ম-দিবস নিষ্কর্ম্মাভাবে অপচয় হয়। ১৯২৪ খৃঃ অব্দে প্রায় ১১,০০০,০০০ কর্ম্ম-দিবস এই ভাবে নষ্ট হয়। অর্থাৎ ১৯২৫ খৃঃ অব্দে অবস্থা তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা খারাপ হয়। ১৯২৬ খৃঃ অব্দে ধনিক-শ্রমিক সংঘাতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প লোকসান হয়। অর্থাৎ, এই বৎসরে মোট এগার লক্ষ কর্ম্ম-দিবস

অপচয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে গড়-পড়তা বাৎসরিক চুয়াত্তর লক্ষ কর্ম্মদিবস নষ্ট হইয়াছিল। ১৯২৬ খৃঃ অব্দের অবস্থা তাহা হইলে দেখা যায় ভালই ছিল। এই বৎসরে ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকগণ শতকরা ৮০ বার সম্পূর্ণ বিফল-মনোরথ হয় এবং আন্দাজ কুড়িবার কিছু কিছু সুবিধা অর্জ্জন করে। ১৯২৬ খৃঃ অব্দের ধর্ম্মঘট প্রভৃতির তালিকা নিম্নলিখিত রূপ—

প্রদেশ	ধর্ম্মঘট প্রভৃতির সংখ্যা	জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা	নষ্ট কর্ম্মদিবসের সংখ্যা
বাংলা	৫৭	১৪১,৮০৮	৮৩৭,৯৭৮
বোম্বাই	৫৭	২৫,২০১	৭৭,৩৯০
মান্দ্রাজ	২	১৩১	১৩৩৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৪	১৫:৪	১৭৭৬০
যুক্তপ্রদেশ	৩	১৩১০	১৪৫৭০
পাঞ্জাব	...	...	...
বিহার ও উড়িষ্যা	৩	৫৭০০	১৩,৬০০
আসাম	১	৫০০	১,০০০
ব্রহ্ম	১	১০,৬৪৭	১৩৩,৮৪৫
সমগ্র বৃটিশ ভারত	১২৩৮	১৮৬৮১১	১,০৯৭,৪৭৮

কোন্ কোন্ জাতীয় কল-কারখানায় কিভাবে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল, নিম্নের তালিকায় তাহা দেখান হইয়াছে।—

কলকারখানার স্বরূপ	গোলযোগের সংখ্যা	জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা	নষ্ট কর্ম্ম দিবস
কটন মিল	৫৭	২২,৭১৩	৭৯০২৭
জুট মিল	৩৩	১২৯,৯৫১	৭৬৯০২২
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	৪	১২২৪	৮৭০৭
শহর পরিষ্কার	১৩	৪৯৮০	২৫৬১২
রেলওয়ে ওয়ার্কশপ	৩	৬৯০০	১০৫০০
তেলের খনি	১	১০,৬৪৭	১৩৩৮৪৫
তেলের কল	১	৫৫১	৪৬৮৫
ছাপাখানা	২	৯০	৫৭০
চা-বাগান	১	৫০০	১০০০
কয়লার খনি	১	২০০	১৬০০
অন্যান্য	১২	৫০৫৫	৬২৯১০
মোট—	১২৮	১৮৬৮১১	১০৯৭৪৭৮

কি কি কারণে এই-সকল ধর্ম্মঘট প্রভৃতি ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকা দেখিয়া বুঝা যায়।—

প্রদেশ	বেতন	বোনাস	কর্ম্মচারী	ছুটি ও কর্ম্মসময়	অপরাপর
বাংলা	২৭	৩	৮	১১	৮
বোম্বাই	২৭	১	২২	...	৭
মান্দ্রাজ	...	...	...	...	২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩	...	...	...	১
যুক্তপ্রদেশ	...	...	...	...	৩
পাঞ্জাব	...	...	...	...	...
বেহার ও উড়িষ্যা	২	...	১	...	...
আসাম	...	...	...	...	১
ব্রহ্ম	১	...	১	...	...
ব্রিটিশ ভারত—	৬০	৪	৩১	১১	২২

কোন্ কোন্ কারবারে কি কি কারণে কয়বার ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেখান হইল।

কলকারখানার প্রকার	বেতন	বোনাস	কর্ম্মচারী	ছুটি ও কর্ম্ম সময়	অন্যান্য
কটন মিল	২৪	১	২২	...	১০
জুট মিল	১২	৩	৫	৯	৪
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	২	...	...	১	১
শহর-পরিষ্কার	৯	...	১	...	৩
রেলওয়ে ওয়ার্কশপ	১	...	১	...	...
তেলের খনি	১	...	...	...	...
তেলের কল	১	...	...	...	...
ছাপাখানা	১	...	১	...	...
চা-বাগান	...	...	...	...	১
কয়লার খনি	১	...	...	...	...
অপরাপর	৮	...	...	১	৩
	৬০	৪	৩১	১১	২২

এই ১২৮টি ধর্ম্মঘটের মধ্যে ১০৪টি বিফল হয়, ১২টি আংশিকভাবে সফল হয় এবং মাত্র ১২টি সম্পূর্ণ সফল হয়।

উপরের তালিকাগুলি দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে ধর্ম্মঘট হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেতন লইয়া এবং তৎপরে উপরওয়ালা কর্ম্মচারীর নিয়োগ, দুর্ব্যবহার প্রভৃতি লইয়া। ন্যায় ও সুবিচারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে

দেখা যায় যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ কলকারখানার শ্রমিকদিগের বেতন কারবারের লাভের তুলনায় যথেষ্ট নহে; এমন কি, অনেক স্থলে শ্রমিকদিগের ও তাহাদের পরিবারের উপযুক্ত ভরণ-পোষণ হইতে পারে ততটুকু বেতনও দেওয়া হয় না। সুতরাং বেতন লইয়া যে গোলযোগের সৃষ্টি হইবে উহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ যদি অত্যল্পবেতনভোগী ভারতীয় শ্রমিকের পার্শ্বেই একই প্রকার অথবা অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য করিয়া বিদেশী শ্রমিকগণ চতুর্গুণ বেতন পাইয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করে তাহা হইলে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। উপরওয়ালার উৎপীড়ন ও অত্যাচারও আমাদের শ্রমিকদিগের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অঙ্গ বলিলেই চলে। এই প্রকার অত্যাচার অধিকাংশ সময়ে শারীরিক এবং কখন কখন আর্থিকও হয়। অর্থাৎ মারপিট, গালিগালাজ, জোর করিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটান প্রভৃতি ব্যতীতও উপরওয়ালারা গরীব শ্রমিকের বেতনেও কখন কখন তাহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভাগ বসাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং শ্রমিক-মহলে সাক্ষাৎ উপরওয়ালার সম্বন্ধে বিদ্বেষ স্বাভাবিক। বোনাস ও কর্ম্মের সময় বা অপরাপর বিধি-ব্যবস্থা লইয়া গোলযোগও বেতন ও উপরওয়ালা সংক্রান্ত বিবাদের সহিত এক জাতীয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, তাহা হইলে বলা যায় যে ধর্ম্মঘট প্রভৃতির কারণ বিশেষ গূঢ় নহে—পেটের ভাত ও গায়ের কাপড়েরই ব্যাপার, তৎসঙ্গে অপমান ও উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার কথাও কিছু আছে। সুতরাং, যদি জাতীয়ভাবে ধর্ম্মঘট-নিবারণের চেষ্টা করিতে হয় তাহা হইলে যাহাতে বেতন, বোনাস, ছুটি, উপরওয়ালার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিকগণ সর্ব্বত্র সুবিচার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এখন দেখিতে হইবে জাতীয়ভাবে এই-সকল ধর্ম্মঘট হইতে আমাদিগের কতটা ক্ষতি হয় এবং বিদেশীদিগের কতটা লাভ হয়। এ কথা সহজবোধ্য যে আমাদের দেশের শ্রমিক যদি যে-কোন কারণেই হোক না কেন কাজ না করিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের বাজারে স্বদেশী মাল যথেষ্ট মজুত না থাকিবার সম্ভাবনা এবং ফলে বিদেশী মাল-বিক্রয় বৃদ্ধি হইবে। এতদ্ব্যতীত দেশের শ্রমিকের শ্রমের মধ্যে দেশের ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। সুতরাং শ্রম করিবার সুযোগের হানি হইলে দেশের ঐশ্বর্য্যের হানি হইবে এবং দেশ এই ঐশ্বর্য্য-হানির পরিমাণ অনুসারে দরিদ্র হইবে। শুধু গত বৎসরের বোম্বাই অঞ্চলেও কাপড়ের কলের ধর্ম্মঘটগুলির অর্থনৈতিক ফলাফল বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহাতে আমাদের দেশের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। বিগত ৩১শে অক্টোবরের পূর্ব্ববর্ত্তী সাতমাসের অবস্থার সহিত তৎপূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, গত বৎসরে ঐ সময়ে এদেশে সুতা তৈয়ারী হইয়াছিল ৩১০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে উক্ত সময়ে হইয়াছিল ৪৮৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। বোনা জিনিষ গত বৎসরে মাত্র ৮৯৩০০০০০০ গজ হইয়াছিল, তৎপূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ে হইয়াছে ১৩৯,৬০,০০,০০০ গজ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের স্বদেশী মাল অল্প-প্রস্তুত হওয়াতে জাপানী ও বিলাতী মালের কাটতি গত বৎসর কিছু অধিকই হইয়াছে।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির দিক দিয়া এই-সকল শ্রমিক বনাম ধনিক ঝগড়া-বিবাদ কিঞ্চিদ্মাত্রও বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনের দুইশতাধিক বৎসরের অধঃপতনের ফল কাটাইয়া উঠিতে হইলে আগামী বহু বৎসর কাল আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে ধনিক, শ্রমিক, ক্রেতা-বিক্রেতা সকলে মিলিত হইয়া অর্থনৈতিক, উন্নতির কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। যাঁহারা রাজনৈতিক সমাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক বা অপর কোন প্রকার প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া শুধু বিবাদের খাতিরেই ধনিক-শ্রমিক বিবাদ সৃজন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ দূরদর্শিতার সহিত বিচার করিয়া তৎপরে ঐ জাতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। ন্যায়ের ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যদি কেহ দেশের অনন্ত দারিদ্র্যের একটা পথ খুলিয়া দিয়া বসেন তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না—কারণ সকলের জন্য উপযুক্ত অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করাই জাতীয়

অর্থনীতির মূলসূত্র, সকলে মিলিয়া সাম্য সহকারে অনাহারে থাকিলে অর্থনীতির আদর্শ বজায় থাকিবে না।

যে-সকল শ্রমিক ও শ্রমিক-নেতারা অল্পেতেই বিদেশীয় আন্দোলনজীবিদের কথায় ভুলিয়া দরিদ্র শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘটের পথে লইয়া যান, তাঁহারা যেন এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখেন যে, বিদেশীর সুবিধা আমাদের দেশের কারখানার শ্রমিকদের আলস্যে। সুতরাং বিশেষ যাচাই না করিয়া কোন বিদেশী "প্রচারকের" কথায় বিশ্বাস না করাই শ্রেয়। অবশ্য সকল বিদেশীই যে বিদেশী কলওয়ালার নিকট ঘুষ খাইয়া এদেশে "কম্যুনিজম্" প্রচার করিতে আসেন তাহা নহে। তবে এরূপ লোকের এদেশে আসা অসম্ভব নহে। সর্ব্বশেষে একটা কথা সকল লোকের বোঝা প্রয়োজন। শ্রমিকের অর্থনীতি ও ধনিকের অর্থনীতি বস্তুত পরস্পর-বিরোধী নহে। বহুক্ষেত্রে ধনিকের ও শ্রমিকের যথার্থ অর্থ-নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য-কলাপের জন্যই এরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। সত্যকার অর্থনীতি এক, তাহা জাতীয় (বা বিশ্বমানবীয়)। ইহার চর্চ্চা ও প্রচারেই আমাদের উন্নতি।

—

ভারতীয় ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা

ডাক্তার মুঞ্জে ভারতীয় ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, মিঃ ক্রফোর্ড তাহা সংশোধন করিলে প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে—বারো হইতে ২০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ভারতীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের বাধ্যতামূলক দেহ-চর্চ্চা, খেলা-ধূলা, ড্রিল, প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে ছোট রাইফেল রেঞ্জ ব্যবহারে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইবে। ভারত-সরকারের শিক্ষাবিভাগীয় সম্পাদক মিঃ বাজপাই এই সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণকালে জানান যে, ভারত-সরকারের নিজ আওতায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে অর্থসঙ্কুলান হইলে ভারত-সরকার সেইসব বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলন করিবেন, কিন্তু প্রাদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের জন্য প্রাদেশিক সরকারদের এই প্রস্তাব পাঠাইয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন, ইহার বেশী করিতে পারিবেন না। ছোট রাইফেল রেঞ্জ ব্যবহার শিক্ষা কিরূপে দেওয়া যাইবে সরকার তাহা স্থির করিবেন ও প্রাদেশিক সরকারদের জানাইবেন।

এই সংশোধিত প্রস্তাবে কোনও সদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার মুঞ্জে বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভালো'। ছোট রাইফেল রেঞ্জের রাইফেলে ও আসল রাইফেলে অনেক তফাৎ। আসলের তুলনায় প্রথমটি প্রায় খেলনার সামিল। যদি বালকদিগকে সত্য-সত্যই সামরিক শিক্ষা দেওয়া স্থির হয়, তবে এই-সব জিনিষ দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা না করাই ভালো।

কিন্তু ছোট রাইফেল রেঞ্জেও যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার স্থিরতা কি? ভারতসরকার মাত্র নিজ সীমানার বিদ্যালয়গুলিতে ইহা চালাইবেন, আবার তাহাও অর্থ-সঙ্কুলান হইলে। অর্থ কোন কালে সঙ্কুলান হইবে কিনা সন্দেহ।

ব্রিটিশ ভারতের অতি সামান্য অংশ ভারত-সরকারের খাস অধিকারে। ইহার বাহিরের অন্য অংশগুলি সম্বন্ধে ভারত-সরকার কোনো প্রতিশ্রুতিই দেন নাই। প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের রিপোর্ট লইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন। চমৎকার কথা, তবে এই পথটা বহুবার সরকার বাহাদুর অনুসরণ করিয়াছেন, বড় পুরানো হইয়া গিয়াছে।

যে-সব ইংরেজের ও ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি আছে তাঁহারা বেশ জানেন যে আমাদের বালক ও যুবকগণ সুস্থদেহ হইয়া উঠে, সরকার ইহা মোটেই চাহেন না। তাহারা যুদ্ধক্ষম হয়, ইহা সরকার সহ্যই করিবেন না। আজকালকার যুদ্ধে দৈহিক শক্তি খুব বেশী কাজ দেয় না। স্বাধীনতা-সমর আরম্ভ হইলেও লাঠি চালাইয়া ভারতবাসী হঠাৎ কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। অতএব ছাত্রদের শুধু বাধ্যতামূলক দেহ-চর্চ্চার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে সরকার কেন আপত্তি করিতেছেন? ইহা করিলে বড় সাহেবেরা সুস্থদেহী কেরাণী পাইবেন।

যদি দেহচর্চ্চা পল্লী-অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে, তাহা হইলে সাহেব কলওয়ালারা নিজেদের কলের জন্য বেশ সুস্থদেহ মজুরও পাইবেন।

অর্থাভাব সরকারের পুরাতন ওজর। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যগত স্বার্থনাশের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অর্থাভাব বলিয়া গণ্য হয় না। কুড়ি বছর আগে ভারত-সরকারের সামরিক ব্যয়ের সহিত বর্ত্তমান সামরিক ব্যয়ের তুলনা করা যাউক :—১৯০৮ সালের সামরিক ব্যয় ছিল ২১,৯৭,-১৩০০০ টাকা, ১৯০৯ সনে ২৮,৭৬,৫৮,৯৮০ টাকা ; ১৯২০ সনে সামরিক ব্যয় ছিল ৮৩,২২,৪৯,৫০০ টাকা, ১৯২৭-২৮ সনে ৫৬,৭২,৪৯,৫০০ টাকা। ১৯০৮এ ভারতরক্ষার জন্য যাহা ব্যয় হইত ১৯২০ সনের সেই খরচ তিনগুণ বাড়াইতে এবং আধুনিক কালে তাহা দ্বিগুণ রাখিতে ভারত-সরকারের অর্থাভাব হয় নাই। নিজের দরকার বুঝিলে সরকার জলের মতই অর্থব্যয় করিতে পারেন। আজ যে এই জাতি অসুস্থ, কার্য্যে অক্ষম ও শক্তিহীন হইয়া আছে, ইহার মূলেও সরকারের বিধি-ব্যবস্থা। আমাদের বালক ও যুবকগণ উপযুক্ত রকম সামরিক শিক্ষালাভ করে ইহাই আমরা চাই।

—

সামরিক শিক্ষা কেন চাই

আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও বালক-বালিকাদের সকলেরই পক্ষে ব্যায়াম প্রয়োজন, তাহা না হইলে এই জাতি ভগ্নদেহ ও স্বল্পায়ু রহিয়া যাইবে। ভারতবাসীর আয়ু গড়ে ২৩ বৎসর, অন্য অনেক জাতির গড়-পড়তা আয়ু ৪৬ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত। জীবন-যুদ্ধে বাঁচিতে হইলে, স্বাধীন হই বা ইংরেজের রাজত্বেই থাকি, আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য লাভ করিতেই হইবে। একমাত্র শরীর চর্চ্চা করিলেই স্বাস্থ্যলাভ করা যায় এমন নয়। পুষ্টিকর খাদ্য, মুক্তবায়ু, পরিচ্ছন্ন বাসগৃহ প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। জীবন-যাত্রার এই-সব অপরিহার্য্য জিনিষগুলি লাভের জন্য সমস্ত জাতিকে সচেষ্ট ও উন্মুখ করিতে হইবে।

কিন্তু, সামরিক শিক্ষা কেন প্রয়োজনীয় ? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই কি আমরা উহা চাই ? আমরা নিজেদের জ্ঞান ও মত অনুসারে বলিতে পারি যে যতই পূর্ণস্বাধীনতা কামনা করি না কেন উহা কি উপায়ে লাভ করা সম্ভবপর ও কি উপায়ে অসম্ভব তাহা আমরা বিলক্ষণ উপলব্ধি করি। আমরা বুঝি যে, যদি সামরিক শিক্ষা ও রাইফেল ছোঁড়ার অভ্যাস থাকিত, তথাপি আমাদের যুবকগণ বিদ্রোহ করিয়া ইংরেজের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিতে পারিত না। আজকালকার যুদ্ধে প্রধান প্রয়োজন বড় বড় কামান যাহাতে অনেকদূরে গোলা ছোঁড়া যায়, উড়োজাহাজ যাহাতে নিম্নস্থ দেশে বোমা নিক্ষেপ করা যায়, সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক, বিষাক্ত গ্যাস, ও অনেক রকমের মারাত্মক জীবাণু ও বীজাণু। আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ্যলাভ (সম্ভব হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা) অস্ত্রশস্ত্রে সম্ভব হইবে না। আমরা মহান আত্ম-ত্যাগ করিতে পারিলে ও দৃঢ়ভাবে রাজশক্তিকে চাপ দিতে পারিলেই স্বরাজ্যলাভে সমর্থ হইব। অবশ্য, যদি কোনো বিদেশীয় রাজশক্তি সত্যসত্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার জন্য বা ঐরূপ ওজুহাতে ইংরেজের সহিত সমরে অবতীর্ণ হয়, এবং তাহাতে ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সেরূপ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিতেছি না ; যুদ্ধ হইলেও ভারতবর্ষ-ত্যাগের মত দুর্ভাগ্য ইংরাজ সহজে স্বীকার করিবে না।

একদিন-না-একদিন ভারতবর্ষের উপর ইংরেজের আধিপত্য শেষ হইবে ; আজও যদি ইংরেজ ন্যায়পরায়ণতার ও সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় দেন, তাহা হইলে সেদিন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধু-সম্পর্কই থাকিবে। কিন্তু, ইংরেজের নকল সহৃদয়তা ও ইংরেজের মুরুব্বিয়ানা ভারতবর্ষের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ না ঠেকিলে কোনো অধিকার স্বেচ্ছায় দিবে বা দিয়াছে ইহা কোনো ভারতবাসী বিশ্বাস করেন না।

ভারতবর্ষে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনৈতিক কর্ত্তৃত্বের অবসান হইবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু এই কর্ত্তৃত্ব হারাইয়াও ব্রিটেন ভারতের সহিত সখ্য বজায় রাখিতে পারে—যদি সে এখনই যথার্থ ন্যায়নিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপরায়ণ হয়। দয়া ও করুণার ভাণ করা ও সর্ব্বদা মুরুব্বির মত পিঠ চাপড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করা আজিকার দিনে সম্পূর্ণ নিরর্থক। হৃদয়ের

ঔদার্য্য বশতঃ ব্রিটেন ভারতবর্ষকে এটি-সেটি দিয়া সাহায্য করিতেছে একথা খুব অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই মনে করেন। সকলেই জানেন যে ইংরেজ যাহা কিছু দিয়াছে তাহা ঘটনা-চক্রে পড়িয়াই দিয়াছে। ভারতবর্ষ ইংরেজের হাতে যে 'বর' লাভ করিয়াছে তাহা সুবিধা ও বাধ্যতামূলক, ইংরেজের উদার হৃদয়ের পরিচায়ক নহে।

ভারতবর্ষ এখনও ব্রিটেনের বিপদকালের বন্ধু হইতে পারে যদি ব্রিটেনের রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টি দূরপ্রসারী হয় এবং সে ভারতবর্ষের যুবকদের জাতীয় মর্য্যাদা ও আত্মরক্ষার জন্য সেই সামরিক শিক্ষা প্রদান করে যাহা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের যুবকেরা পাইয়া থাকে। এই কার্য্য করিলে ব্রিটেন রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিবে। যথার্থ বন্ধুভাবে এই শিক্ষা-প্রদানে যদি ব্রিটেন এখন বিরত থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে ব্রিটেন কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হইলে সে ভারতবর্ষের সহায়তালাভে বঞ্চিত হইবে। অবশ্য, ভারতীয় যুবকেরা যদি তখনও এখনকার মতন নির্ব্বীর্য্য ও শক্তিহীন থাকে তাহা হইলে তাহারা যোগ দিলে ব্রিটেনের যেমন বিশেষ কিছু সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনই তাহারা অন্যপক্ষে যোগ দিয়া তাহাকে যে বিশেষ কিছু বিপদগ্রস্ত করিতে পারিবে তাহারও আশঙ্কা নাই। তবে এটাও ঠিক যে ব্রিটেনের শত্রুতা যাহারা করিবে বা করিতে সক্ষম তাহারা সংখ্যাহীনতার জন্য ইংরেজের নিকট হঠিবার পাত্র নয় এবং ভারতবর্ষের যুবকদিগকে বাদ দিয়াও তাহারা চলিতে পারে। তাহারা যদি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরেজের প্রজাগণকে অসন্তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট দেখিতে পায় তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদের নিজেদের মানসিক প্রবৃত্তি ও দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেই আমরা একথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সামরিক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে স্বরাট্ হইতেই হইবে। স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য ক্ষমতা, অধিকার ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার ক্ষমতা অধিকার ও কর্ত্তব্যজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আত্মরক্ষার ক্ষমতা একদিনে লাভ করা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যতে বহির্শক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। বর্ত্তমানে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন এই কারণেই ঘটিতেছে। অবশ্য এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণেও এখন সামরিক শিক্ষা প্রয়োজন।

চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে ভীরুতা একটা প্রধান অন্তরায়। এই ভীরুতা পরিহার করিতেই হইবে। কোনও জাতিই স্বভাবতঃ ভীরু হইতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য মানুষ ভীরু ও দুর্ব্বল হয়; সুতরাং ভীরুতা দূর করা কঠিন নয়। অতিরিক্ত সভ্য হওয়ার দরুণও মানুষ ভীরু হয়; অস্ত্রশস্ত্রাদির সহিত পরিচয় না থাকার দরুণ দৌর্ব্বল্য, ইহার আর এক কারণ। যদি এদেশের যুবক-যুবতীরা অবাধে অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিবার অধিকার পায় এবং সেইগুলি ব্যবহার করিতে গিয়া মাঝে মাঝে আহত ও রক্তাক্ত হয়—সামরিক যে কোনোপ্রকার শিক্ষা লইতে হইলে যাহা অপরিহার্য্য—তাহা হইলে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহারের ও রক্ত দেখিবার ভয় ইহাদের কাটিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত, ভারতের যুবক-যুবতীর মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে একটা রহস্য ও বিস্ময়ের ভাব বদ্ধমূল করাইবার চেষ্টা চলিতেছে সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে তাহা দূরীভূত হইবে। দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে এবং সামরিক শিক্ষার অপরিহার্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতার সাহায্যে তাহাদের চরিত্রও উন্নত হইবে।

—

সামরিক কার্য্যে একচেটিয়া অধিকার

আজকালকার এই অন্নবস্ত্রের অভাবের দিনে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতের রক্ষণকার্য্যের জন্য প্রতি বৎসর যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় তাহার দ্বারা অন্ন-সংস্থান হয় কত লোকের এবং সে-সকল লোক কাহারা। ভারতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ হইয়াছিল ১৯২৫-২৬ খৃঃ অব্দে ৬০,৩৯, ৩৭,০০০ টাকা, ১৯২৬-২৭ (রিভাইজড এষ্টিমেট) ৬০,২০, ২৩,০০০ টাকা

এবং ১৯২৭-২৮ খৃঃ অব্দে (বজেট এষ্টিমেট) ৫৬,৭২,৪৯,০০০ টাকা। এই টাকার মধ্যে প্রায় ১০ কোটি টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয় এবং বাকি ভারতবর্ষে হয়। খরচের মধ্যে সৈন্যদিগের বেতন, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খাবার, যাতায়াত, জীবজন্তু ক্রয়, চিকিৎসা, প্রভৃতি নানাপ্রকার খরচ আছে। এই সকল সূত্রে ইংলণ্ডে ব্যয়িত টাকা ব্যতীত আরও অনেক টাকা শেষ অবধি ইংলণ্ডেই যায়। এই টাকা ইংলণ্ডে পাঠানর ন্যায় অন্যায় বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। যে টাকা ভারতবর্ষে সৈন্য ও অপরাপর সামরিক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের বেতন প্রভৃতির বাবদে খরচ হয় তাহা কাহারা পায় তাহাই আলোচ্য। এই টাকাও বহু কোটি এবং ইহার খরচে পক্ষপাত দৃষ্ট হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার আছে। প্রথমত ভারতবর্ষে বহুলোক সামরিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করে যাহারা ভারতের অধিবাসী নহে এবং যাহাদের উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থ প্রায় সম্পূর্ণই ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৭০০০ বৃটিশ সেনানায়ক ও প্রায় ৬০,০০০ বৃটিশ সেনানীর কথা উল্লেখযোগ্য। ইহারা যে কার্য্য করে তাহা ভারতীয়ের দ্বারা অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে এবং ইহারা যে বেতনে কার্য্য করে তাহার বহু অল্প বেতনেই উপযুক্ত ভারতীয় সেনানায়ক ও সেনানী পাওয়া যাইতে পারে। ইহা গেল একটা জাতীয় একচেটিয়া বন্দোবস্তের কথা এবং ইহার বিরুদ্ধে বলিবার নাই এরূপ কথা অল্পই আছে।

দ্বিতীয়ত ভারতের সেনাবিভাগে একটা প্রাদেশিক ও ও ক্ষুদ্রগণ্ডীগত একচেটিয়া ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। ভারতে নাকি কতকগুলি "সামরিক জাতি" আছে এবং তাহারা ব্যতীত যুদ্ধ করিতে অপর কেহ পারে না। কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ অমূলক কারণ বৃটিশ আধিপত্যের পূর্ব্বে ভারতের সকল জাতিই যুদ্ধ করিত এবং কোন কোন বর্ত্তমানে অসামরিক জাতি বৃটিশদিগের বিরুদ্ধেও ইতিপূর্ব্বে বিশেষ সক্ষমতার সহিত লড়াই করিয়াছে। এই "সামরিক ও অসামরিক জাতি" বিভাগরূপী মিথ্যার সৃষ্টির মূলে বৃটিশের প্রতি সখ্য বা তাহার অভাবের কথাই বেশী করিয়া আছে। অর্থাৎ যে সকল জাতি ব্রিটিশকে বরাবর বন্ধু (প্রভু) ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের পরদেশ অধিকার-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে, তাহারাই ভারত-সরকারের "নিমক খাইবার" বা চাকুরী পাইবার অধিকার পাইয়াছে। এই সকল জাতির মধ্যে শিখ, গুর্খা, পাঠান, ঘাড়ওয়ালি রাজপুত, জাঠ ডোগরা প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইহারা যে খুবই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু সুবিধা পাইলে যে অপর জাতীর লোকেরা ইহাদের সমতুল্য হইতে পারিবে না এ কথাও বলা চলে না। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান যন্ত্রযুদ্ধের যুগে শুধু শারীরিক শক্তি বা দুর্দ্ধর্ষতা দিয়া যোদ্ধা বিচার চলে না। বহু সামরিক বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথা ও বুদ্ধিমত্তার স্থান সর্ব্বোচ্চে—যথা কামান, এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরীন, বেতার, যুদ্ধের বিধিব্যবস্থা-কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে শুধু নিছক শারীরিক তেজ দিয়া কিছু হয় না। বুদ্ধিমান, সুস্থ, সাহসী ও একনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই এই-সকল কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই সামরিক জাতি কথাটির জন্য ভারতের বহু লোক শুধু ট্যাক্স দিতেছে কিন্তু সামরিক নিয়োগগুলির কোন প্রকার ফলভোগ করিতে পারিতেছেন না। এই ফল ত্রিবিধ। (১) উপার্জ্জনের মধ্যে (২) আত্মরক্ষার ক্ষমতা লাভে ও (৩) সামরিক শিক্ষাজাত শারীরিক ও মানসিক উন্নতিতে। আমরা বাঙালীরা চাকুরী না পাইয়া হা-হুতাশ করিয়া বেড়াই ও দেশরক্ষার জন্য ট্যাক্স দিয়া থাকি; কিন্তু সামরিক কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া বেতন উপভোগ করিবার অধিকার আমাদের নাই। বাংলাদেশে যে উপযুক্তরূপ তেজস্বী সবল ও কষ্টসহিষ্ণু যুবক ৫০০০০ নাই তাহা নহে। পরীক্ষা করিয়া লইলে আজই এই সংখ্যক সৈনিক ও সেনানায়ক বাংলাদেশে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ এবং যদি কখন আমাদের দেশের এরূপ অবস্থা হয় যে, বৃটিশ বালুচি গুর্খা কিম্বা শিখ জাতীয় সৈন্য আমাদের রক্ষা করিবার জন্য বাংলাদেশে থাকিবে না তাহা হইলে আমাদের সবিশেষ দুর্গতি ও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, আমাদের জাতীয় যে-সকল দুর্ব্বলতা আছে তাহাও বহুল পরিমাণে সামরিক শিক্ষার ফলে দূর হইতে পারে। ইহাতে ভবিষ্যতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয়।

সকল দিক দিয়া দেখিলে মনে হয় যে, ভারতে সামরিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল প্রদেশকে সমান অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ইহাকে Proportional Recruitment অথবা অপর কোন নাম দিয়া ইহার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদে ও অন্যত্র চেষ্টা করা প্রয়োজন। ভারতে যেরূপ প্রাদেশিকতা প্রচার করা হইতেছে, তাহাতে কোন প্রদেশ আত্মরক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে অপরাপর প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবে এরূপ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে।

—

ব্যায়াম ও খেলার সরঞ্জামের উপর শুল্ক

ভারতে যে-সকল খেলার সরঞ্জাম আমদানি হয় তাহার উপর শতকরা ৩০৲ হারে শুল্ক দিতে হয়। অর্থাৎ এই শুল্কের ফলে যে ক্রিকেটের ব্যাট কিম্বা টেনিস র‍্যাকেট অথবা ডাম্বেল ৫০৲ কিম্বা ২৫৲ টাকা মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতে পারিত তাহার মূল্য ৬৫৲ অথবা ৩২৷৷০ হইয়া দাঁড়ায়। ব্যায়াম ও খেলার সরঞ্জামের উপর শুল্ক বসানর ফলে উৎকৃষ্ট সরঞ্জাম ক্রয় করা ছাত্র-মহলে কঠিন হইয়াছে। এই কারণে কোন কোন লোকের মতে এই শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শুল্কের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ (১) দেশীয় ব্যবসার সংরক্ষণ (২) রাজস্ব আদায় (৩) কোন দ্রব্যের প্রচার কামনা। শেষোক্ত উদ্দেশ্য ব্যায়াম ও খেলার সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে। সুতরাং আমাদের দেখিতে হইবে এই শুল্ক তুলিয়া দিলে তাহার ফলে আমাদের দেশীয় ব্যায়াম ও খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুত-কারকদিগের কতটা ক্ষতি হইতে পারে এবং রাজস্বই বা কতটা কমিতে পারে। ভারতে যে-সকল ঐ জাতীয় সরঞ্জাম আমদানি হয় তাহার মধ্যে কতকগুলি দেশীয় জিনিষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিক্রয় হয় এবং কতকগুলি উৎকৃষ্ট বা পেটেণ্টদ্বারা সংরক্ষিত বা এদেশে প্রস্তুত হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া আমাদের ব্যবসার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। প্রথমোক্ত জাতীয় সরঞ্জামগুলি যদি শুল্কবিমুক্ত হইয়া এদেশে প্রবেশ করে তাহা হইলে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা; কিন্তু শেষোক্তগুলি কিছু সস্তায় বিক্রয় হইলে আমাদের খেলোয়াড় ও ব্যায়ামকারীদিগের সুবিধা হইতে পারে। রাজস্বের দিক দিয়া খেলা ও ব্যায়ামের সরঞ্জামের শুল্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ খেলনা ও খেলার সরঞ্জামের উপর শুল্ক বসাইয়া গভর্ণমেণ্ট যত টাকা পান তাহার অধিকাংশ আসে খেলনা এবং তাস হইতে। শুধু খেলার সরঞ্জামের উপরে শুল্ক বসাইয়া মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা লাভ হয়। সম্ভবত এই শুল্কের বেশীর ভাগই কম দামী সরঞ্জাম হইতে সংগৃহীত হয়। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের ব্যায়াম ও খেলার সরঞ্জামের শুল্ক কমাইলে বা উঠাইয়া দিলে রাজস্বের প্রায় কোন ক্ষতিই হইবে না বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সমস্ত বিষয়টির আরও বিশদ আলোচনা না করিয়া স্থিরনিশ্চয় কিছু বলা যায় না।

—

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব

সরকার বংলাদেশকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাংলাদেশ যদি সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষপাতী হয় তাহা হইলে এই বাবদ সকল ব্যয়ই তাহাকে নিজে বহন করিতে হইবে; কারণ, বাংলা-সরকারের তহবিলে মজুত টাকা নাই। তবে এ প্রশ্ন যদি কাহারও মনে উদিত হয় যে, বাংলায় বাংলা-কৃষকের কায়িক পরিশ্রমে উৎপাদিত পাটের 'মনোপলি' বাবদ চারকোটি টাকা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর আত্মসাৎ করেন কেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহার জবাব এই যে, এই মহদ্‌কার্য্যের জন্যই বাংলা দেশ সৃষ্ট হইয়াছে।

—

বাংলার নারী শিক্ষা-সম্মেলন

সম্প্রতি বাংলার নারী-শিক্ষা-সম্মেলনের যে কয়টি অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে অনেকেই এদেশে অবিলম্বে নারীদিগের শিক্ষার জন্য কোনও উন্নততর প্রণালী প্রবর্ত্তনের আবশ্যক, ইহা জানাইয়াছেন। প্রথম অধিবেশনে শ্রীমতি অবলা বসু সভানেত্রী ছিলেন। এই সকল অধিবেশনে কলিকাতার ও মফস্বলের এমন অনেক গণ্যমান্য মহিলা উপস্থিত ছিলেন যাঁহারা নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-

প্রচারে ব্রতী। বিদ্যালয়-জীবনের মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ক আলোচনা ছাড়া খেলা-ধূলা, হাতের কাজ, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়েও দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আলোচনা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মেয়েদের হাতের কাজের একটি প্রদর্শনীও হয়। উড়িষ্যার স্কুল ইন্সপেক্‌ট্রেস মিস এন্ বি নায়ক অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বলেন যে, সমাজের শিক্ষিতা মহিলাদের কর্ত্তব্য বাড়ী বাড়ী গিয়া বাড়ীর মেয়েদের সহিত একটা ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া তোলা। এবিষয়ে তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর দে মহাশয়ের পত্নী একটি প্রবন্ধে এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন ও এই উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করা আবশ্যক তাহার উল্লেখ করেন।

দার্জ্জিলিংএর মিসেস পি, কে, মজুমদার মহাশয়া এখনকার ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাসের নিন্দা করিয়া বলেন যে, বালিকাদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু মহাশয়া এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন ও বিদ্যালয়ে এবং বাড়ীতে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত বিশেষভাবে করিতে বলেন।

শ্রীমতী সোম বলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতির জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। শ্রীমতী ভেরুলকর ও শ্রীমতী রায় ইন্সপেক্‌ট্রেসদের নিকট আরও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী লতিকা বসু এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

—

মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথা নিবারণ

স্বার্থান্বেষী দুষ্টলোকদের যথেষ্ট বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক-সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট ডাঃ শ্রীমতী মথুলক্ষ্মী রেড্‌ডী, তাঁহার দেবদাসীপ্রথা-নিবারণ বিলটি পাশ করাইয়া আইনে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মাদ্রাজ প্রদেশে দেবতার মন্দিরগুলি এতদিন যেভাবে বারবনিতালয়ের সামিল হইয়া তত্রস্থ দেশবাসীর ঘোর লজ্জার কারণ হইয়া ছিল তাহা আর অধিক দিন থাকিবে না। দেশী মহীশূর রাজ্য সর্ব্বপ্রথমে দেবতার নামে এই-ভাবে বালিকাদের উৎসর্গ করার প্রথা রদ করে। ইহা প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর জন্যও অবিলম্বে এইরূপ আইন প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এই বালিকা-উৎসর্গের আসল তাৎপর্য্য কি তাহা বোম্বাইয়ের নায়ক-মারাঠা-মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

> বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ দুইটির অংশ-বিশেষে এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে অজ্ঞ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের মনে এরূপ একটা ধারণা আছে যে তাহাদের পূজ্য দেবতাদের মন্দিরে নৃত্য-গীতের জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত না থাকিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং এই দেবতার মন্দিরে বালিকাদের রাখা হয়। এই কার্য্যের জন্য বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহে বলিয়া অথবা তাহাদিগকে সুবিধামত নিযুক্ত করা যায় না বলিয়া কুমারীদিগকে উৎসর্গ করা হয়। মন্দিরের কার্য্যের জন্য কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট জাতির কুমারীদেরই নির্ব্বাচিত করা হয়। কোনও কুমারী একবার উৎসর্গীকৃত হইলে সারাজীবনে আর বিবাহ করিতে পারে না। ইহার জন্য এই-সকল বালিকাদিগের এক একটা ঝুটা বিবাহ দেওয়া হয়; এইরূপ বিবাহের অভিনয় হইয়া গেলে অপর কেহ তাহাদিগকে বিবাহ করিতে সাহসী হয় না। কারণ, এই ধরণের বিবাহ হইয়া গেলে এই-সকল বালিকারা দেবতাদের বিবাহিতা পত্নী বা সেবিকা দাসী বলিয়া গণ্য হয়। যে জাতি হইতে এই সকল বালিকা সংগৃহীত হয় সেই জাতির স্ত্রীলোকেরা প্রায় সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই কুৎসিত বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে; সম্ভবতঃ এইভাবে বহুদিন যাবৎ দেবতার নামে মেয়েদের উৎসর্গ করার ফলে এই বংশানুক্রমিক বা জাতিগত বেশ্যাদলের সৃষ্টি হইয়াছে ও আজিও সৃষ্ট হইতেছে। শিক্ষা ও সংস্কার-মাহাত্ম্যেও এই-সকল কুমারী বালিকারা মন্দিরের দাসী হইয়াও অতি জঘন্য দেহ-বিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করে। বিভিন্ন ব্যবসায় সম্পর্কে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বংশে বংশে একই কাজ করিয়া এক একটা জাতি গড়িয়া তোলে এই সকল মেয়েরাও তেমনি একটা স্বতন্ত্র বেশ্যাজাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। উচ্চ নীচ অন্য সকল জাতিই ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং তথাকথিত অতি নিম্ন জাতীয় লোকেও দেবতার নামে এভাবে কুমারীদের উৎসর্গ করিতে ঘৃণা বোধ করে। উৎসর্গ-উৎসবের মিথ্যা অভিনয় সত্ত্বেও এই জাতীয় স্ত্রীলোকেরা যথাসময়ে এই জাতিগত বৃত্তি অবলম্বন করিতে ছাড়ে না। তাহাদের মনে দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া পবিত্র বা উচ্চভাবের লেশমাত্র থাকে না; এবং এই কুৎসিৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহারা দেবতাদের অভিশাপের ভয় করে না। আসলে এই উৎসর্গ অর্থেই বেশ্যাবৃত্তি-অবলম্বন বুঝায়। সুতরাং এই ব্যাপারের সহিত পবিত্রতা ও ভক্তি-ভাবের বিন্দুমাত্র যোগ আছে উহা যেন কেহ মনে না করেন।

বহু দেবতাতে বিশ্বাস অজ্ঞতার ফল, কিন্তু দুর্নীতি-মূলক না হইতেও পারে। দেবতাদের কাজে কুমারী-উৎসর্গ ব্যাপারটাও গোড়ায় দুর্নীতিমূলক ছিল না। ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে দেবতার পুরোহিতদের সমান পর্য্যায়ে তাহাদের স্থান ছিল। কিন্তু নানা কারণে দেবদাসীরা জঘন্য জীবন

যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। উপরোক্ত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটুকু দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই কুৎসিৎ প্রথা প্রচলনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও কিছু হাত আছে।—

যে সকল দরিদ্র অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার এই প্রথার কবলে পড়িয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই দেহ-বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দেবতার কাজে ইহাদের কন্যারা উৎসর্গীকৃত হয় বলিয়া পরিবর্ত্তে ইহাদের জন্য লাখেরাজ জমি ও মাসহারার ব্যবস্থা আছে। যদি ইহারা কুমারীদের উৎসর্গ করিতে বিরত হয় তাহা হইলে তাহাদের ইনাম বাজেয়াপ্ত করা হয়।* গত শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'ইনাম কমিশন' পূর্ব্বতন ভূস্বামীদের দ্বারা এই সকল দেবদাসীদিগকে প্রদত্ত সনদ অনুযায়ী ইনাম ইহাদিগকে ভোগ করিতে দেন এই কারণে যে, ইহারা মন্দিরের কার্য্য-নির্ব্বাহে সাহায্য করে। এইভাবে গবর্ণমেণ্ট গৌণভাবে এই প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দায়ী।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের স্থলবিশেষ ব্যতীত এই প্রথা ভারতের অন্যত্র কখনই প্রচলিত ছিল না।

—

ইংলণ্ডের বিবাহের বয়স নির্দ্ধারক বিল

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে আইন প্রচলিত আছে তাহাতে নারীর বিবাহের বয়স অন্ততঃ ১২ ও পুরুষের অন্ততঃ ১৪ হওয়া চাই। বিগত ১২ বৎসরের মধ্যে এই দেশে ৩১৮টি বিবাহ হইয়াছে যাহাতে মেয়ের বয়স ছিল ১৫, ১৮টি বিবাহ হয় যাহাতে মেয়ের বয়স ছিল ১৪; ৩টি বিবাহে মেয়ের বয়স ১২ হইয়াছিল। এই এই বয়সে ভারতবর্ষে যত সংখ্যক বিবাহ হয় তাহার তুলনায় এই সংখ্যাগুলি অতি কম। তবে অতীত কালে ইংলণ্ডে বাল্যবিবাহ আরও অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইংলণ্ড তখনই স্বাধীন ছিল। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার ছিল বলিয়া ইংলণ্ড স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকারী নহে এরূপ কথা কেহ মনে করিত না। স্বাধীনতার সাহায্যেই ইংলণ্ড ক্রমশ কুসংস্কার-সমূহের উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি হাউস অব লর্ডস-এ একটি আইনের খসড়া স্থাপন করা হইয়াছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে মেয়েদের বিবাহের বয়স অন্ততঃ ১৬ হওয়া চাই। এই আইনের সাহায্যে প্রাচীন কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইবে। ইংলণ্ডে এই খসড়ার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন ইতিপূর্ব্বে হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু সরদা বিলের বিরুদ্ধে কয়েকজন ভারতবাসী আন্দোলন করিয়াছেন; এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। অথচ রাজকর্ম্মচারী,এমন কি রাজকর্ম্মচারী নহেন এমন ইংরেজেরা এই যুক্তি দেখান যে ভারতবর্ষে কতকগুলি সামাজিক কুসংস্কার আছে বলিয়াই ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য নহে। এ বিষয়ে অনেক দেশী রাজ্যের শাসন-কর্ত্তারা অনেক বেশী সংস্কার-মুক্ততা ও উন্নতির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যদি ভারতবর্ষে জাতীয় শাসনতন্ত্র বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারাও সামাজিক সংস্কারের বিদ্বেষী হইত না।

হাউস্ অব লর্ডস্-এ এই খসড়া লইয়া আলোচনার সময় ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া লর্ড বাক্‌মাষ্টার স্বীকার করেন যে, এই আইন সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অবস্থা প্রায় সমান। এমন কি এক বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা ইংলণ্ডের চাইতেও ভাল। সম্ভবতঃ এই উক্তির কারণ এই যে, ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাগ্‌দানের সামিল; কারণ বিবাহের পরই স্ত্রী-পুরুষ স্বামিস্ত্রীর মত বসবাস করে না। এই-সকল কথায় আমাদের উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ নাই।

—

বঙ্গদেশের ১৯২৯-৩০ সনের বজেট

এই বৎসরের বঙ্গীয় সরকারের বজেট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বজেটের মতই—ইহাতে বঙ্গদেশের দুঃখ কিছুমাত্র লাঘব হইবে বলিয়া মনে হয় না। বজেট আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয় ৮৮লক্ষ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে, উদ্বত্ত-তহবিল হইতেও অনেক টাকা খরচ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে; অবশ্য শিক্ষাবিভাগের জন্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সাড়ে চার লক্ষ টাকা বেশী মঞ্জুর করা হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ বিভাগের জন্য ব্যয় করা হইবে পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ১৬ লক্ষ টাকা বেশী।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তির কারণ, বঙ্গদেশের সহিত

* শ্রীমতী মথুলক্ষ্মী রেড্ডীর খসড়ার এই-সকল ইনাম যাহাতে বাজেয়াপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা আছে—প্রঃ সঃ

ভারত-সরকারের আচরণ। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী, কিন্তু ভারত-সরকার বঙ্গদেশের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সামান্য।

—

রাজস্ব সম্বন্ধে বাংলাদেশের প্রতি অবিচার

গত সংখ্যা 'প্রবাসীতে' আমরা এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়া আমরা ইহার আরো আলোচনা করিতে চাই। বঙ্গদেশের জনসাধারণ ও বাংলা-সরকার এই বিষয়ে তৎপর হউন—ইহাই আমাদের ইচ্ছা; কারণ অন্যথায় বঙ্গদেশে হিতকর কোনো কার্য্য করা সহজ হইবে না।

বাংলাদেশ যে রাজসরকারে কম রাজস্ব জোগায় এমন নয়। বঙ্গদেশের ছোটলাট বাহাদুরের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের শতকরা ৪৫ টাকা বঙ্গদেশের মারফতেই আসে—আমরা পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ভারত-সরকার ভারতবর্ষের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেন?

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, মেষ্টন নির্দ্ধারণের জন্যই বাংলার দুর্দ্দশা, ঐ সময় হইতেই ভারত-সরকার বাংলা দেশের প্রতি অবিচার করিতেছেন। কিন্তু ইহা সত্য নয়। বঙ্গদেশ বরাবরই ভারত-সরকারকে খুব বেশী রাজস্ব জোগাইয়াছে, তাহার নিজের খরচের জন্য কম টাকা রাখিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের হিসাব-রক্ষার নিয়ম ও রাজস্বের ভাগ-বণ্টনের নিয়ম-কানুন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই সত্যটি সহজে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তথাপি নিম্নে ষ্টেটস্‌ম্যান্স ইয়ার বুক হইতে কয়েকটি তালিকা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা যাইবে যে ভারত-সরকার বরাবরই বাংলা দেশ হইতে খুব বেশী রাজস্ব আদায় করিয়াছে; ফলে বাংলাদেশের ভাগ্যে অল্প টাকাই জুটিয়াছে।

১৯০৯ সনের আয়-ব্যয়

প্রদেশ	রাজস্ব	ব্যয়
বঙ্গদেশ (বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া)	১৮১৪ লক্ষ	৮,৩১ লক্ষ
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	৪৬৬ লক্ষ	৩০২ লক্ষ
বোম্বাই	১৫৬১ লক্ষ	৭৪৫ লক্ষ
মান্দ্রাজ	১৩৬৫ লক্ষ	৬৬৮ লক্ষ
পাঞ্জাব	৬০৬ লক্ষ	৪০৭ লক্ষ
যুক্তপ্রদেশ	১০৬০ লক্ষ	৭৫৭ লক্ষ
ব্রহ্মদেশ	৮৩৮ লক্ষ	৫০৯ লক্ষ

ঐসব প্রদেশের ১৯১৮-৯ সালের তালিকা এইরূপ:—

প্রদেশ	রাজস্ব	ব্যয়
বঙ্গদেশ	২৫৫২ লক্ষ	৮৫৪ লক্ষ
বোম্বাই	২৬৭৫ লক্ষ	১২৮১ লক্ষ
মান্দ্রাজ	:৯২২ লক্ষ	:৯৬ লক্ষ
পাঞ্জাব	১০১১ লক্ষ	৭১২ লক্ষ
যুক্তপ্রদেশ	১২১৩ লক্ষ	১০২৩ লক্ষ
ব্রহ্মদেশ	১:৯০ লক্ষ	৭০৪ লক্ষ

এই-সব বৎসরে বঙ্গদেশে আদায়ী কোনো কোনো টাকা বঙ্গদেশের বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, বাংলার রাজস্বের বরাদ্দ কম করিয়া দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২৬-২৭ সালের তালিকা গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে কিরূপে চালাকি করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে বঙ্গদেশে ঐ বৎসরে (বরাদ্দ ১০৪৯ লক্ষ) একমাত্র ব্রহ্মদেশ (বরাদ্দ ১০৪৩ লক্ষ) ভিন্ন উক্ত সব কয়টি প্রদেশের রাজস্ব অপেক্ষা অনেক কম রাজস্ব আদায় হয়। ১৯১৮ সনের তালিকার সহিত সেই তালিকার তুলনা করিলে মনে হইবে, অন্যান্য দেশ যে অনুপাতে বর্দ্ধিত রাজস্ব জোগাইয়াছে, বঙ্গদেশের রাজস্ব-বৃদ্ধির অনুপাত তদপেক্ষা অনেক কম। ১৯২৬-২৭ সালের বঙ্গের বরাদ্দ ১৯১৮-১৯ এর বরাদ্দ অপেক্ষা ১৮ কোটি টাকা কম, বোম্বাইএ ঐ সময়ের মধ্যে ঐ বরাদ্দ কমিয়াছিল প্রায় ১০ কোটি, মান্দ্রাজে প্রায় ৩ কোটি। ইহার অর্থ এই নয় যে এই-সব প্রদেশে ১৯২৬-২৭ সনে কম রাজস্ব আদয় করা হইয়াছে। কোনো কোনো বিভাগীয় রাজস্ব ১৯১৮-১৯এর পরে প্রাদেশিক সরকারের

হাত হইতে ভারত-সরকারের হাতে চলিয়া গিয়াছে, সেই কারণে ১৯২৬-২৭ ও তৎকালীন তালিকায় প্রদেশগুলির বরাদ্দ রাজস্ব কম দেখায়। যে-যে কারণে বঙ্গদেশের রাজস্ব বেশী হয়, ঠিক সে-সে বিভাগগুলি ভারত-সরকার হস্তগত করিয়া বঙ্গদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় করিয়া রাখিয়াছেন। 'মেষ্টন-নির্দ্ধারণের' পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশকে এইরূপে জব্দ করিবার আয়োজন চলিয়াছিল।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই' বঙ্গের দারিদ্র্যের কারণ, এই মর্ম্মে যে একটা কথা সম্প্রতি সরকারী ও আধা-সরকারী মহলে বলা হয়, তাহা মোটেই সত্য নয়, আমরা গত সংখ্যা 'প্রবাসীতে' তাহা দেখাইয়াছি, এখানে পুনরুক্তি করিলাম না।

—

রেলের বজেট

১৯২৯-৩০ খৃঃ অব্দের রেলওয়ের বজেট অনুসারে এই বৎসর রেলের আয় ১০৭ কোটি টাকা ও ব্যয় কিঞ্চিদধিক ৯৬ কোটি টাকা হইবে। অর্থাৎ ইহাতে মোট লাভ হইবে ১১ কোটি টাকা। লাভটা সম্পূর্ণই অবশ্য ব্যবসাদারী রেল লাইনগুলি হইতে হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনজাত লাইনগুলি হইতে কোন লাভ হয় না। সে যাহা হউক, রেলওয়েগুলি সমবেতভাবে লাভজনক এবং এই লাভের অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের নিকট প্রাপ্ত অর্থ হইতে। সুতরাং অবিলম্বে লভ্যাংশ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের ওয়েটিং-রুম ও গাড়ীর উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। এখন এ বিষয়ে বিশেষ কোন লক্ষ্য দেওয়া হয়ই নাই, বরং উপরওয়ালাদিগের তাচ্ছিল্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী-দিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। আরামের কথা দূরে থাকুক, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণও গাড়ীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য কতকটা দায়ী; কিন্তু রেল কোম্পানীর শিক্ষিত কর্ম্মচারিগণ তাহাদের সেই কারণে আরও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে ন্যায়ত পারেন না। বরং সর্ব্বাপেক্ষা লাভের খরিদ্দার বলিয়া তাহাদের বিবিধ উপায়ে উন্নততররূপে ট্রেনে যাতায়াত করিতে শিখাইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

—

রেলের লাভ ও বাংলাদেশ

আমাদের ধারণা এই যে রেলের যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ, অন্তত বহুলোকে, বাংলাদেশ হইতে যাতায়াত করিয়া থাকে এবং এই কারণে রেলের লাভের অনেকাংশ বাংলার সাহায্যেই উপার্জ্জিত হয়। এই কারণে রেলওয়ের লাভের টাকায় বাংলাদেশের কোন অধিকার না থাকিলেও অন্তত বাংলাদেশ এইটুকু দাবী করিতে পারে যে রেলের চাকুরী, রেলের বিলিব্যবস্থা, রেলের গাড়ী, ওয়েটিং-রুম ষ্টেশন প্রভৃতির সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে বাংলা যেন অপর প্রদেশের তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

—

রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা ফণ্ড

'প্রবাসী' ছাপিতে যাইবার পূর্ব্ব অবধি রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা ফণ্ডের জন্য যা টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

পূর্ব্বে সংগৃহীত	৩৫১৲
শ্রী অশোকমোহন বোস	৫০০৲
মিসেস এম, এম, বোস	২০০৲
মিসেস ডি, এন, রায়	২০০৲
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১ম কিস্তি)	২৫০৲
শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৫৲
এস, এন, রায়, আই-সি-এস (দিল্লী)	১০০৲
শ্রীযুক্তা কিরণ বোস	১০০৲
শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা বোস	১০০৲
এ, সি, সেন	৫০৲
রায় প্রমথনাথ চৌধুরী বাহাদুর	৪০৲
মোট	২০২৬৲

এই টাকা হইতে ১২৫ পাউণ্ড তারযোগে বিলাতে পাঠান হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি প্রথম কিস্তিতে ২৫০৲ দিয়াছেন।

—

ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথকীকরণ

অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে ব্রহ্মদেশীয় "পিপল্‌স্ পার্টি'র নেতা উ বা পে ব্যবস্থাপক-সভায় ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশকে পৃথকীকরণের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আর্থিক কারণে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা সঙ্গত বিবেচনা করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই আর্থিক কারণগুলি যে কি তাহা বুঝা গেল না। গোখ্‌লে একবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় দেখাইয়াছিলেন যে ব্রহ্মদেশ শাসনের ব্যয়নির্ব্বাহ কোনো বৎসরেই ব্রহ্মদেশের রাজস্বদ্বারা হয় না। ব্রহ্মদেশের উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের অর্থ ব্যয় হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মদেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্স ইয়ার বুক হইতে দেখিলাম যে, এই দুই বৎসরই ব্রহ্মদেশে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী ছিল।

ব্রহ্মদেশের সহিত সংযুক্ত থাকা হেতু ভারতবর্ষের অনেক দিক হইতে সুবিধা হয়, একথা সত্য। সেখানে অনেক ভারতীয় কেরাণী ও অল্পসংখ্যক ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছে। যদি ব্রহ্মদেশীয়েরা এই-সকল কাজ করিতে পারিত, তবে এখনও ভারতীয় লোককে নিযুক্ত করিতে হইত না। ব্রহ্মদেশে আজকাল ব্রহ্মদেশীয় লোক-দিগকেই সর্ব্বাগ্রে চাকুরী দেওয়া হইতেছে। ইয়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের আপিসেও ব্রহ্মদেশীয় লোকে কাজ চালাইতে পারিলে আর ভারতবর্ষীয় নেওয়া হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এইটুকু পরিবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মদেশকে স্বতন্ত্র করিবার আবশ্যক নাই। এখন বাকী রহিল ভারতবর্ষীয় আইন-ব্যবসায়ীদের কথা। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হইবে, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে সে দেশে যে-সকল ভারতবর্ষীয় উকীল আছেন তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া চলিবে না, নূতন উকীল যাইবার পথ বন্ধ হইবে মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মদেশ যতদিন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ততদিন ভারতবর্ষীয় ব্যারিষ্টারের সে দেশে ব্যবসায় আরম্ভ করা বন্ধ করা যাইবে না। ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষীয় ব্যারিষ্টারের সংখ্যাও কম নয়।

ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের অধিকাংশই মজুর, কতকাংশই ব্যবসায়ী ও দোকানদারও আছে। ব্রহ্মদেশীয়েরা মজুরের কাজ করে না, ভারতবর্ষ কিম্বা চীন হইতে মজুর আনিতে হয়। ইয়ুরোপীয়গণ মজুরের কাজ কখনো করিবেন না। তাঁহারা ব্রহ্মদেশের বড় বড় কারখানা ও বাণিজ্য-ব্যবসায় একচেটিয়া করিতে চাহেন। অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা তাঁহাদেরই সম্পত্তি; তবে ভারতীয়দের হাতেও সামান্য কিছু আছে বটে। কতক ভারতবাসী চাষবাসও করিতেছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশকে পৃথক করিলেও ব্রহ্মদেশীয়েরা দেশের ধন-সম্পত্তি যাঁহারা সর্ব্বাধিক শোষণ করিতেছে সেই ইয়ুরোপীয়দের কিছুতেই বাধা দিতে পারিবে না।

ইয়ুরোপীয়দের আসল আপত্তি এই যে ব্রহ্মদেশীয়েরা ভারতবাসীর সংস্পর্শে আসিয়া দিনে দিনে রাষ্ট্রীয় চেতনা লাভ করিতেছে ও রাজনৈতিক-কর্ম্মে যোগদান করিতেছে। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশীয়দের আর্থিক দুর্গতির দিকেও তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইয়ুরোপীয়েরা ভাবিতেছে যে, ব্রহ্মদেশ পৃথকীকৃত হইলে ব্রহ্মদেশীয়দের আর্থিক ও রাজনৈতিক চেতনা বাধা পাইবে এবং তাহাতে ইয়ুরোপীয় শোষণকারী-দের ভাবী বিপদ বিদূরিত হইবে। কিন্তু তাহাদের এই আশা সফল হইবে কি না সন্দেহ। বড় দেরী হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মদেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বীজ ইতিপূর্ব্বেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যদি ইয়ুরোপীয়দের এই আশা পূর্ণও হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশীয়দের নিদারুণ ক্ষতি হইবে।

এই-সব কারণে, ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক অধিকার লাভ না করা পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশীয়দের চুপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল। তাহার পরে এই পৃথকীকরণের প্রস্তাব আলোচনা করা চলিত। বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মদেশ একাকী

স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিবে না ; এই কারণে ভিক্ষু ওত্তম ও ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ লোকই ব্রহ্মদেশের পৃথকীকরণের বিরোধী।

—

ডাক্তার নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে ডাক্তার নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতী চিকিৎসক হারাইল। বঙ্গদেশের দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া অত্যল্প কালমধ্যে বাংলার স্বাস্থ্য-সমিতি (Bengal Health Association) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ও স্বয়ং তাহার সম্পাদক হইয়া অক্লান্তভাবে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও কলেরার বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি কলিকাতায় দুইটি চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কালাজ্বরের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ইন্‌জেকৃশন দিতেন। ইট্‌লী কেন্দ্রে তিনি বহুসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডিপ্লোমা পান ও পরে কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়ুরোপে গিয়া লণ্ডনের রস ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করেন ও প্যারিসের পাস্তর ইনষ্টিটিউটেও কাজ করেন। তাঁহার গবেষণার ফল ইয়ুরোপের কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত ও উচ্চ-প্রশংসিত হইয়াছিল। ডাক্তার নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য যে কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই কাজ ভাল করিয়া চালাইয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করার চেষ্টা হওয়া উচিত।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ২৩শে ফাল্গুন সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু হইয়াছে। তিনি 'ভারতীর' সম্পাদকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি ছোট গল্প ও ছেলেদের জন্য গল্প লিখিতে খুব ভাল পারিতেন ইঁহার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইনি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের জামাতা ছিলেন। এই সংখ্যার প্রবাসীতে তাঁহার সম্বন্ধে একটি ছোট নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

—

বোম্বাইয়ে দাঙ্গা

বোম্বাইয়ে যে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ ঘটিয়া বহুলোক হতাহত হইল, তাহার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে।

ছেলে-ধরার ভয়ে যে এদেশে এখন এরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিতে পারে তাহার প্রধান কারণ বিগত দুইশত বৎসর কাল ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট এদেশবাসীকে সকল প্রকার শিক্ষাহীন নিরক্ষর করিয়া রাখিয়াছেন। আর এক কারণ, গভর্ণমেণ্টের বিধি-ব্যবস্থার ফলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বৃদ্ধি। তৃতীয় কারণ, এদেশের পুলিশের রাজনৈতিক "অপরাধ" দমনের প্রতি অত্যধিক সজাগ ভাব ও অপরাপর অপরাধ দ্রুত দমন করিবার মত চেষ্টার বা শক্তির বা উভয়েরই অভাব। বোম্বাইয়ের জনতা স্থল-বিশেষে পাঠানদিগের উপর আক্রমণ করে। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে পাঠানগণ সুদের কারবার করিয়া খায় এবং ধর্ম্মঘটকালে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বর্দ্দোলিতে পাঠানদিগকে সত্যাগ্রহ ভাঙ্গিতে লাগান হইয়াছিল। ইহাও বোম্বাইবাসীর পাঠান-বিদ্বেষের মূলে থাকিতে পারে।

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

রুশিয়ার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—

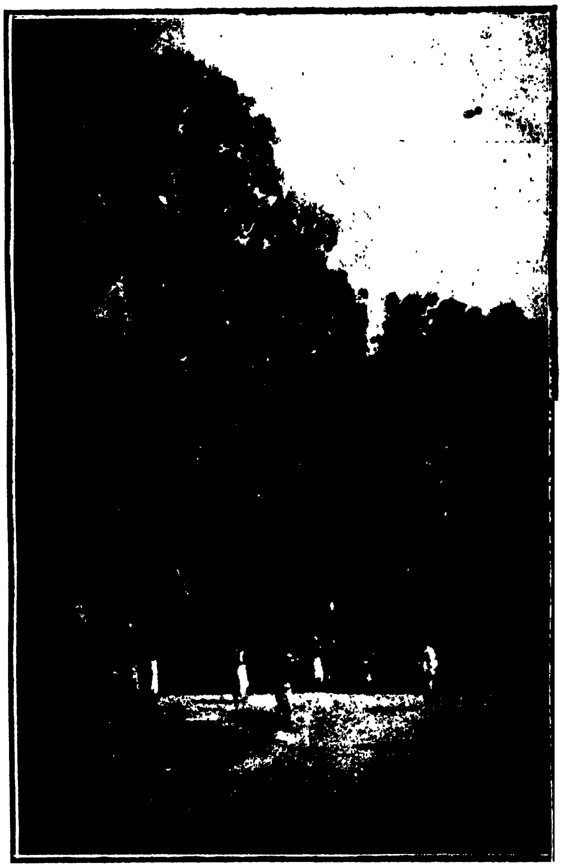
রুশিয়া বর্ত্তমান যুগের স্ফিংক্‌স্। তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা ও বাদানুবাদ যতই বাড়িয়া চলিয়াছে রহস্যও তাহার যেন ততই দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালির মত হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ জন ডিউই রুশিয়া-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। তিনি বলেন, রুশিয়া যে বিপ্লবের অগ্রদূত সে বিপ্লব রাজনৈতিক নয় নৈতিক ও মানসিক। রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে এইরূপ একটা ইঙ্গিত লেনিনও করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের ধারা বদলাইয়া যাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত গণতন্ত্র স্বাধীনভাবে সমাজকে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পায়



মশার ডিম নষ্ট করিবার জন্য ডোবাতে কেরোসিন দেওয়া হইতেছে
বীরনগর

নাই, ততদিন তাহাদের প্রার্থিত আদর্শসমাজ স্বপ্নমাত্র ছিল, শিক্ষা ও সমবেত চেষ্টার দ্বারা কি করা যাইতে পারে, অথবা যাইতে পারে না, তাহা অনুমানের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল। ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের শক্তি শুধু শাসকদের হাত হইতে শাসনতন্ত্র ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কার্য্য পদ্ধতিরও একটা আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যে শক্তি এতদিন বিপ্লব প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হইতেছিল, তাহা এতদিনে সমাজ ও সভ্যতার সেবায় নিয়োজিত হইল। 'সোশিয়ালিজমে'র প্রচার ও সমবায়ের বিস্তার একই কাজ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন হইয়া না গেলে, সমবায়ের বিস্তার হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই মানসিক জগতে একটা বিপ্লব আনাই রুশ-বিপ্লবের গোড়াকার কথা।

লেনিনের এই মতের সমর্থনের উদ্দেশ্যে ডাঃ ডিউই লেনিন-পন্থীর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। লেনিন-পন্থী বলেন যে, প্রত্যেকটি মানুষকে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদানই রুশিয়ার বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য। সেদেশে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে তাহা আরও একটা বড় বিপ্লবের কয়েকটা সিঁড়ি মাত্র। আর্থিক বিষয়ে স্বাধীনতা ও সাম্য না থাকিলে, মানুষের পূর্ণবিকাশ হয় না। এই পূর্ণবিকাশের জন্যই আর্থিক বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়াছে।



বনজঙ্গলের দৃশ্য, বীরনগর—এইরূপ বনই ম্যালেরিয়া বিস্তারের অন্যতম কারণ



ডাঃ বেণ্টলি ও ডাঃ ম্যালকল্‌ম্‌ ওয়াটসনের বীরনগর পরিদর্শন

পরিশেষে ডাঃ ডিউই বলিতেছেন যে, রুশ-বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে তাহাকে, রাজনৈতিক বিপ্লব বলিয়া না ধরিয়া, মানব-মনের ও মানুষের কর্ম্ম নীতির একটা আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

এই কথাগুলি কি সত্য? রুশ-বিপ্লবের একজন নেতা অন্ততঃ, তাঁহার দেশের বর্ত্তমান শাসকদের দ্বারা মানবজীবনের, শুধু মানবজীবনের কেন রুশিয়ারও কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি আর কেহই নহেন, লেনিনের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ লিও ট্রট্‌স্কি। সম্প্রতি তাঁহার রচিত 'রুশিয়ার প্রকৃত অবস্থা' নামে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, 'বুরোক্রেট' ও বুর্জ্জোয়া'র দল আবার রুশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করিতেছে, এবং তাহারা মার্কস্‌ কথিত সুসমাচার ত্যাগ করিয়া ঘৃণিত ক্যাপিটালিজ্‌মকে আবার ফিরাইয়া আনিতেছে। রুশিয়া সম্বন্ধে ট্রট্‌স্কির মত একেবারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার নহে। ১৯২১ সনে এন্‌ ই পি (নিউ ইকনমিক পলিসি) প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে রুশিয়ায় সোশিয়ালিজমের বিশুদ্ধতা যে একটু কমিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। ষ্টালিন, চিচ্‌রিন প্রভৃতি নেতাদের প্রধান উদ্দেশ্য রুশিয়ার রাষ্ট্র-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কম্যুনিজমের প্রচার নয়। জগতে কম্যুনিজম-ধর্ম্মের প্রচার করিতে গিয়া রুশিয়ার কোনও ক্ষতি করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন। এই কারণেই তাঁহারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়া সে সকল দেশের গভর্ণমেণ্টের শত্রুতা অর্জ্জন করিতে চান না। এই প্রশ্ন লইয়াই ষ্টালিনের দল ও ট্রট্‌স্কি, রাকভস্কি, কামেনেফ প্রমুখ পূর্ব্বতন নেতাদের মধ্যে লেনিনের মৃত্যুর পর বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে ট্রট্‌স্কি পরাজিত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

সোশিয়ালিজমের জন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় রুশিয়ার শাসন-পদ্ধতির যে বিশেষ কোনও উৎকর্ষ দেখা যায় নাই তাহা 'ইজভেষ্টিয়া'য় প্রকাশিত নিম্নলিখিত রিপোর্ট হইতেই প্রমাণিত হইবে। মস্কোর একজন পুলিশ-অফিসর তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট কোনও এক রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে এই রিপোর্টটি দেন।—

"যথাসম্মানপুরঃসর জানাইতেছি যে ১১ ও ১২ তারিখ রাত্রিতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। রাত্রি তিনটার সময়ে আপনি মত্ত অবস্থায় বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে দপ্তরখানায় যাইতে আদেশ করেন। আপনাকে সেখানে লইয়া গেলে পর আপনি তিন বোতল মদ লইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। তারপর আপনি আমাকে সকল কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে সেই তিন বোতল মদ পান করাইয়া তাহাদিগকে আপনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আপনাকে অভিনন্দন করিতে আদেশ করিলেন। তারপর আপনি আবার তাহাদিগকে হাজতে পুরিয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন।

ইহার পর আপনি আমার ও কমরেড্‌ মানলেফের কাকুতি-



বীরনগর পল্লীমণ্ডলের কর্ম্মিগণ জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন

মিনতি ও নিষেধ না শুনিয়া আমাদের মুখে কয়েক ঘা চড় মারিলেন এবং তারপরই সংজ্ঞা হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।"

আমেরিকায় হিন্দুস্থান সম্মিলন—

আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্দবৃদ্ধি, এবং ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ১৯১১ সনে শিকাগো নগরে 'হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন অফ্ আমেরিকা'র প্রতিষ্ঠা করেন। আঠার বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকার পনরটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা স্থাপিত করিয়াছে। হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন নিয়মিতভাবে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার কয়েকটি এই,—(১) ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ছাত্র আমেরিকায় শিক্ষালাভের জন্য যায়, তাহাদিগকে শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংবাদ দিয়া সাহায্য করা; (২) সভ্যদিগকে উপদেশ, সুপারিশ চিঠি এবং প্রয়োজন হইলে অর্থ দিয়া সাহায্য করা; (৩) বক্তৃতা ইত্যাদি দিয়া ভারতবর্ষকে আমেরিকার নিকট পরিচিত করা; (৪) ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক নাটক আমেরিকায় অভিনয় করান; (৫) অন্যান্য সামাজিক আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা।

আমেরিকায় ও ইয়োরোপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান অতি স্বল্পবিস্তৃত বলিলেই চলে। এ অবস্থায় হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের মত একটি প্রতিষ্ঠান যে অতিশয় প্রয়োজনীয়, তাহা যিনি মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র কুফল দেখিতে পাইয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন। সম্প্রতি হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ প্রচারের জন্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একশত পুস্তকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিতেছেন। এই তালিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাহিত্য, সামাজিক জীবন, ধর্ম্ম, বর্ত্তমান অবস্থা রাজনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পুস্তক আছে।

হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন নূতন ভারতীয় লেখকগণকে আমেরিকায় পরিচিত করিয়া দিতে উৎসুক। যদি কোনও লেখক এ বিষয়ে ইচ্ছুক থাকেন তবে তিনি এই সম্মিলনের মুখপত্র 'হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট' নামক পত্রিকার সম্পাদকের নামে, ৫০০ নং রিভার সাইড ড্রাইভ, নিউইয়র্ক এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সকল তথ্য জানিতে পারিবেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের ১৭তম উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উপস্থিত থাকিয়া হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের কার্য্যের অনেক প্রশংসা করেন।

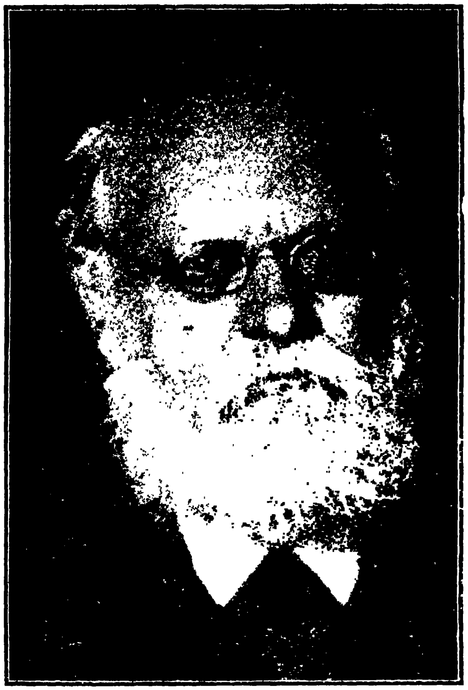
বাংলা

পাটনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বিহার-ওড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির আমন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাটনায় 'বলিদ্বীপে ভারতের একটি অতীত উপনিবেশ' বিষয়ক



বর্ত্তমান যুগের সোশিয়ালিজমের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা কার্ল মার্কস্



প্রবীণ সোশিয়ালিষ্ট নেতা কার্ল ক'উট্স্কি

বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাক্ষেত্রে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও শিক্ষিতা মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সুনীতি বাবু তাঁহার বলিদ্বীপ-ভ্রমণের এক ক্ষুদ্র বিবরণ দিয়া বলদ্বীপের ভৌগলিক সংস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, বলিদ্বীপের ইতিহাস, বলিবাসীদের ধর্ম্মজীবন, সামাজিক জীবন, তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতায় ভারতীয় তান্ত্রিক আচার, ভারতীয় বিকৃত সংস্কৃত, শিথিল জাতিভেদ, ও কিরূপে দ্বীপাঞ্চলের পলিনেশীয় সভ্যতা তাহাদের চিন্তা.কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহা সরল ও সরস ভাষায় বিবৃত করেন। চল্লিশখানা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের চিত্রযোগে বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের নিকট চিত্তাকর্ষক ও সুপরিস্ফুট করা হইয়াছিল।

পর দিবস পাটনা 'রবীন্দ্র সভার' আমন্ত্রণে সুনীতি বাবু 'বাঙালা ভাষার জন্মকথা' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বৈদিক কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যভাষার বিকাশ ও পরিণতি অতি সুন্দররূপে দেখাইয়া দেন। সভার পক্ষ হইতে শিল্পী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের দ্বারা অলঙ্কৃত একটি সুন্দর মানপত্রে সুনীতি বাবুকে তাঁহার মাতৃভাষার সেবা ও শিল্পানুরাগের জন্য অভিনন্দিত করা হয়। প্রবাসী বাঙালীসমাজকে তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের জন্য ধন্যবাদ দিয়া সুনীতি বাবু নিজ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার—

গ্রামবাসীদের সম্মিলিত চেষ্টায় কি করিয়া ম্যালেরিয়ার হ্রাস করিয়া দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায় উলা বা বীরনগর গ্রাম তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বীরনগর একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ছিল। ১৮৫৬ সালের ম্যালেরিয়া জ্বরের পর উহার লোকসংখ্যা চল্লিশ হাজার হইতে আড়াই হাজারে পরিণত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত বীরনগর একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায়ই পড়িয়াছিল। বৎসর পাঁচেক আগে গ্রামবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একটা 'পল্লীমণ্ডলী' স্থাপন করেন। এই মণ্ডলীর উদ্যোগে এই কয়েক বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ানিবারণের জন্য নিয়মমত বিধি-ব্যবস্থা করা হইতেছে। যে মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার সঞ্চার হয় তাহার ডিম নষ্ট করিবার জন্য পুকুরে ও ডোবায় কেরোসিন তৈল দেওয়া হইতেছে, মশার আশ্রয়স্থল বন-জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইতেছে এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে কুইনিন বিতরণ করা হইতেছে। গ্রামের লোকের চেষ্টার ফলে বীরনগরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ডাঃ বেণ্টলি ও 'রস ইন্‌ষ্টিটিউটে'র ডাঃ ম্যাল্‌কল্‌ম্ ওয়াটসন বীরনগর পরিদর্শন করিয়া এবং সেখানকার ম্যালেরিয়ানিবারক কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া গ্রামবাসীদের চেষ্টা ও কার্য্য-নিপুণতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডার্লো বীরনগরের উন্নতি দেখিয়া বলিয়াছেন যে, বীরনগরের দৃষ্টান্তে নিরাশহৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়; যে মিউনিসিপালিটিই ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কমিশনারদিগকে বীরনগরে পাঠাইয়া দৃষ্টান্তদ্বারা শিক্ষা দেওয়া ও উৎসাহিত করা উচিত।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত